মাসিক বসুমতী

ষষ্ঠ বর্ষ—প্রথম খণ্ড

১৩৩৪ সালের বৈশাখ সংখ্যা হইতে আশ্বিন সংখ্যা

সম্পাদক—

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির

কলিকাতা, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী-বৈদ্যুতিক-রোটারী-মেসিনে"

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৬ষ্ঠ বর্ষ] বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত [১ম খণ্ড

বর্ণানুক্রমিক বিষয়সূচী

চিত্রসূচী—বৈশাখ

জ্যৈষ্ঠ

আষাঢ়

শ্রাবণ

ভাদ্র

আশ্বিন

সূচীপত্র সমাপ্ত

৬ষ্ঠ বর্ষ] বৈশাখ, ১৩৩৪ [ম সংখ্যা

রামকৃষ্ণ বল, নেচে চল,
বদন ভ'রে গাও রে নাম !
নামে শীতল করে, ব্যথা হরে,
সুধা ঝরে অবিরাম !

নামে মায়া-পাশ খসে, মাত নাম-রসে,
প্রেম-পরশে মুদিত কলি
ফুটবে হরষে,—
নামের ফাঁদে আপনি সেধে,
ধরা দেবে গুণধাম।

কায কি জপে, কায কি তপে,
কায কি মিছে বাদ,
রামকৃষ্ণ ব'লে কাঁদ—
কাটবে মনের মলা মাটী খাদ,
হৃদয়মাঝে, মোহন সাজে,
হেরবি মনচোরা ঠাম।

নামে হও মাতোয়ারা,
নামের বলে, পাষাণ গলে,
বয় প্রেমধারা,
কর নাম হৃদয় খুলে
নামে হবে প্রাণারাম।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

গীতাষ্টক

ও কোন্ পাগল যায় পথে তোর
যায় চলে এই একলা রাতে;
ওরে ডাকিস্ নে তোর আঙিনাতে॥
সুদূর দেশের বাণী, ও যে
যায় বলে, হায়, কে তা জানে,
কী সুর বাজায় একতারাতে।
ওরে ডাকিস্ নে তোর আঙিনাতে॥

ও যে সকালে রইবে না তো,
…কের আসর পাতো।
বাঁধন-ছেঁড়ার মহোৎসবে
গান যে ওকে গাইতে হবে
নবীন আলোর বন্দনাতে।
ওরে ডাকিস্ নে তোর আঙিনাতে॥

— ১ —

২

কার চোখের চাওয়ার হাওয়ায় দোলায় মন
তাই কেমন হয়ে আছিস্ সারাক্ষণ॥
হাসি যে তাই অশ্রুভারে নোওয়া,
ভাবনা যে তাই মৌন দিয়ে ছোঁওয়া,
ভাষায় যে তোর সুরের আবরণ;
তুই কেমন হয়ে আছিস্ সারাক্ষণ॥

তোর পরানে কোন্ পরশমণির খেলা,
তাই হৃদ্গগনে সোনার মেঘের মেলা।
দিনের স্রোতে তাই তো পলকগুলি
ঢেউ খেলে যায় সোনার ঝলক তুলি,
কালোয় আলোয় কাঁপে আঁখির কোণ॥

৬

তোর ভিতরে জাগিয়া কে যে,
তারে বাঁধনে রাখিলি বাঁধি।
হায় আলোর পিয়াসী সে যে
তাই গুমরি উঠিছে কাঁদি॥

যদি অতলে রহিল প্রাণ,
কেন বীণায় জাগেনা গান,
যদি গগনে জাগিল আলো,
কেন নয়নে লাগিল আঁধি॥

আসি নব প্রভাতের বাণী
দিল করে করে আনি
ফুলে নব জীবনের আশা
কত ছন্দে ছন্দে পায় ভাষা।

যেথা ভুলায়ে দিয়েছে রাত,
যেথা ফুলে [illegible] হাত;
তোর ভুবনে ভবনে কেন
হেন হয়ে গেল আধা-আধি॥

—•—

৭

নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়
খুলে যাবে এই দ্বার।
জানি জানি তোর বন্ধন ডোর
ছিঁড়ে যাবে বারবার॥
খনে খনে তুই হারায়ে আপনা
সুপ্তি-নিশীথ করিস যাপনা,
বারে বারে তোরে ফিরে পেতে হবে
বিশ্বের অধিকার,
জানি জানি তোর বন্ধন-ডোর
ছিঁড়ে যাবে বারবার॥

স্থলে জলে তোর আছে আহ্বান,
আহ্বান লোকালয়ে।
চিরদিন তুই গাহিবি যে গান
সুখে দুখে লাজে ভয়ে।
ফুলপল্লব নদীনির্ঝর
সুরে সুরে তোর মিলাইবে স্বর,
ছন্দে যে তোর স্পন্দিত হবে,
আলোক অন্ধকার।
জানি জানি তোর বন্ধন ডোর
ছিঁড়ে যাবে বারবার॥

৮

আমার মুক্তি আলোর সুরে এই আকাশে।
আমার মুক্তি ধুলায় ধুলায় ঘাসে ঘাসে।
দেহ মনের সুদূর পারে
হারিয়ে ফেলি আপনারে,
দিগ্‌দিকে ছড়ায় আমায় মোর বাতাসে॥

সব দেশে মোর শ্যামল বনের মনের সাথে,
ফুল-সৌরভ মোর বিচিত্র দেশায় পরাণ মাতে।
কত পাখির কাকলিতে
উঠে আমার সাড়া যে হেথা,
মুক্তি আমার মেঘের বীণায় সুদূর ভাসে॥

নুর্নবার্গ
১১ সেপ্টেম্বর
১৯২৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মুনিক
১৮ সেপ্টেম্বর
১৯২৬

চা-পান না বিষপান ?

জিলা খুলনার দক্ষিণাংশের নদ-নদীতে এক প্রকার মৎস্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার নাম 'গাগড়া।' জনসাধারণ এই মৎস্যকে 'হাবা' বলিয়াও অভিহিত করিয়া থাকে। এই শ্রেণীর মৎস্যের বিশেষত্ব এই যে, এই মৎস্যের সম্মুখে টোপ ফেলিলেই উহারা টোপ দর্শনমাত্রেই গিলিয়া ফেলে, বিন্দুমাত্র ভাবনা-চিন্তা বা দ্বিধা বোধ করে না। আমার মনে হয়, সমগ্র বাঙ্গালী জাতি এই 'হাবার' মত 'হাবা' নামে অভিহিত হইবার উপযুক্ত ; কেন না, বিদেশীয় —বিশেষতঃ ইংরাজ বণিকের টোপ দর্শনমাত্রে গিলিতে অভ্যস্ত জাতি, বাঙ্গালীর মত ভূভারতে দ্বিতীয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কেন, তাহা বুঝাইতেছি।

এ দেশে ইংরাজ বণিকদিগের নানা কারকারবার আছে, তন্মধ্যে চা-বাগিচার বাণিজ্য অন্যতম। যে চা-বাগিচায় আড়কাঠিরা কুলী চালান করে এবং এ দেশের কুলীরা যে সকল চা-বাগিচায় মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া বাগিচার শ্রীবৃদ্ধিসাধন করে, অথচ যাহার ফলভোগ করে বিদেশীয় ইংরাজ বণিক, সেই সকল চা-বাগিচা ধনসম্পদের আকর-ভূমি—এক একটা ক্ষুদ্র রাজ্য বলিলেও হয়। ইংরাজ বণিক এমন অনেক চা-বাগিচা এ দেশে গড়িয়া তুলিয়াছেন। এগুলি বৃহদায়তন জমীদারীবিশেষ। দার্জ্জিলিঙ্গ, জলপাই-গুড়ি ও আসাম প্রভৃতি অঞ্চলে এই জমীদারীগুলি অবস্থিত। এই সকল চা-বাগিচা হইতে বৎসরে কোটি কোটি মুদ্রার চা দেশবিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। কিন্তু আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি নাই, ঘৃতাহুত হুতাশনের মত উহা ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হয় ও ভীষণ চটচটা রবে জ্বলিয়া উঠে। ইংরাজ কোম্পানীরা এই চা-চালানী ব্যবসায়ে রাজার রাজ্যের আয় উপভোগ করিতেছেন বটে, কিন্তু তাহাতেও তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হয় নাই। তাঁহারা দেখিলেন, বাঙ্গালার পৌনে পাঁচ কোটি লোককে, পরন্তু সমগ্র ভারতের ৩০ কোটি অধি-বাসীকে চা-খোর করিতে পারিলে টাকার মাচায় বসিয়া টাকার ছিনিমিনি খেলা সম্ভবপর হয়—টাকার গাছ পুঁতিয়া চুণি-পান্নার ফল পাড়িয়া খাওয়া যায়। দুঃখ এই,—এই গর্দ্দভ জাতি (বাঙ্গালী বা ভারতবাসী) আপনার মঙ্গল বুঝে না! বুঝিবেই বা কিরূপে? তাহারা যে নাবালক নালায়েক জাতি। না হইলে তাহারা এমন স্বর্গীয় সুধার মত চা-পানের মর্ম্ম বুঝে না? এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এক পেয়ালা চা-পানে কত তৃষ্ণা দূর হয়!—সেই চা-পান না করিয়া তাহারা পান করে কি না সরাই-কুঁজায় রক্ষিত শীতল পানীয় জল, সরবৎ, ঘোল, ডাব? ছিঃ ছিঃ! সান্ত্বনা এইটুকু যে, বিলাত-ফেরত অথবা তথাকথিত শিক্ষিতদের মধ্যে চা-পানের প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। ইহা মন্দের ভাল। কিন্তু সাবালক ইংরাজ বণিক নাবালক দেশীয়দিগকে ত চা-পানের সুখ হইতে বঞ্চিত রাখিতে পারেন না, কেন না, তাঁহারা যে এই নাবালক জাতির অভিভাবক! অতএব তাঁহারা স্থির করিলেন যে, এই জাতিকে চণ্ডু, চরস, গাঁজা, অহিফেনের মত চায়ের নেশাতেও নেশাখোর করিতে হইবে।

তখনই চা-করদিগের সলাপরামর্শ জল্পনা-কল্পনা চলিল। সে আজ ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বের কথা। তখন লর্ড কার্জ্জন ভারতের ভাগ্যবিধাতা বড় লাট। তাঁহার ন্যায় 'ভারত-হিতৈষী' যে চা-করদিগের পরামর্শ মথিলিখিত সুসমাচারের মত হজম করিবেন, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। লর্ড কার্জ্জন চায়ের উপর কিছু সেস্ অর্থাৎ শুল্ক নির্দ্ধারণ করিলেন। এই সেস্ সংগ্রহের ফলে সরকারী তহবিলে কয়েক লক্ষ টাকা জমিতে লাগিল। টাকাটার সদ্ব্যবহার হইতেও বিলম্ব হইল না। Tea Association বা য়ুরোপীয় চা-কর সমিতি এই অর্থসাহায্যের ফলে কলিকাতা সহরের মোড়ে মোড়ে চায়ের দোকান খুলিলেন এবং পরার্থে দধীচির অস্থিদানের ন্যায় বিনামূল্যে জনসাধারণকে অমূল্য চা-সুধা বণ্টন করিতে লাগিলেন। তৃষ্ণার্ত্ত পথিক বিনামূল্যে সুধাপান করিয়া শ্রান্তদেহে স্ফূর্ত্তি ও সজীবতা আনয়ন করিল। এ দিকে এক পয়সার প্যাকেট চা বিনামূল্যে জন-সাধারণের মধ্যে বিতরিত হইতে লাগিল। এই পরোপকারী বণিক জাতি এইরূপে এ দেশে চা-রূপ অপরূপ টোপ

ফলিলেন, আর 'হাবা' মাছের ন্যায় হাবা বাঙ্গালী জাত র্ব্বাগ্রে ছুটিয়া গিয়া কোঁৎ করিয়া সেই টোপ গিলিয়া ফেলিল! সই জাতি শেষে চায়ে এমন নেশাখোর হইয়া উঠিল যে, গুরু ইংরাজকেও সে নেশার বিস্তায় পরাজিত করিল।

নেশার এই একটি লক্ষণ যে, সময়মত নেশার জিনিষ না পাইলে হাই উঠিতে থাকে, গা গুলাইয়া উঠে, গা-গতোর ভাঙ্গিয়া পড়ে, মন অস্থির ও চঞ্চল হইয়া উঠে। আফিম-খোর যতই দরিদ্র হউক না, তাহার ওক্তমত পরিমিত প্রমাণ অহিফেনের বড়ী বা গুলী পাইবার জন্য করিতে না পারে, এমন দুষ্ক্রিয়া জগতে নাই। অনেকে পোষা পাখীকে সরিষা বা তিল পরিমাণ অহিফেন খাওয়াইতে শিখান। এই পাখীকে পিঞ্জর হইতে মুক্ত করিয়া দিলেও, সে আকাশে-বাতাসে যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া বেড়াইলেও নিয়মিত সময়ে অহিফেন সেবনের জন্য পিঞ্জরে ফিরিয়া আসিবেই। যতক্ষণ তাহার প্রভু তাহার বরাদ্দ যোগান না দেন, ততক্ষণ সে ছট্‌ফট্ করিতে থাকে। নেশার এমনই মহিমা!

বাঙ্গালী জাতিকেও চায়ের নেশাখোর করিবার নিমিত্ত ইংরাজ বণিকরা কত রঙ্গ-বেরঙ্গের তর-বেতর বিজ্ঞাপন দিয়াছেন—জলের মত পয়সা ঢালিয়া কত হ্যাণ্ডবিল, কত প্লাকার্ড প্রচার করিয়াছেন। থিয়েটারে, বায়স্কোপের অভিনয়ে এবং মঞ্চের দৃশ্যে, ট্রামে, বাসে, বাড়ীর প্রাচীরে, ষ্টেশনে, বাজারে গঞ্জে, হাটে-মেলায়, পূজা-পার্ব্বণে, কোথায় চায়ের বিজ্ঞাপন ছড়ান হয় নাই? এমন কি, বক্তার বক্তৃতায়, গানের ছড়ায়, কেতাবের প্লটে চায়ের কথা উঠিয়াছে—সংবাদপত্রের স্তম্ভে বিজ্ঞাপনের ঘটার কথা না-ই উল্লেখ করিলাম। একে কোটিপতি ধনকুবের ইংরাজ বণিক, তাহার উপর তাঁহার সহায় স্বয়ং প্রবলপ্রতাপ সরকার বাহাদুর। এ সোনায় সোহাগায়—এ মণিকাঞ্চন যোগাযোগে কি না সম্ভব হয়? তাই প্রচারের ও বিজ্ঞাপনের ফলও ফলিয়াছে। পূর্ব্বে প্রভাত হইলে লোক 'কা কা' রব শুনিয়া শয্যাত্যাগ করিত, এখন 'চা চা' ডাক দিয়া শয্যাত্যাগ করে! অতি প্রত্যূষে অলি-গলির চায়ের দোকানে বাঙ্গালী বাবুকে বাসিমুখে চা-পান করিতে যাইতে দেখা যায়—দোকানে সারি সারি বেঞ্চে বাবুদিগকে চায়ের দিকে ভোরের অন্ধকারেও হা-প্রত্যাশী হইয়া বসিয়া থাকিতে দেখা যায়। হায় রে নেশা!

প্রকৃত প্রস্তাবে চা খাদ্য নহে, উহা উত্তেজক (Stimulant) মাত্র। আমার মনে আছে, বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব ছোট লাট সার চার্লস ইলিয়ট একবার বলিয়াছিলেন যে, "Ganja is a concentrated food, গাঁজা ঘনীভূত খাদ্যদ্রব্য।" এক ছিলিম গাঁজায় দম দিয়া পাল্কীবেহারারা একদমে এক ক্রোশ ছুটিয়া যায়, বাঁকুড়া জিলার রসুইয়া বামুন এক ছিলিম গাঁজা চড়াইয়া মাথায় গামছা বাঁধিয়া রাশীকৃত লুচি-মোণ্ডা অথবা অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া ফেলে। এই হিসাবে মদিরাও খাদ্যসার। যে হেতু, এক গেলাস গলাধঃকরণ করিয়া কত লোক কত রকম সুকর্ম্ম-কুকর্ম্ম করিয়া ফেলিতে পারে। চা-ও এই শ্রেণীর খাদ্য। যিনি একবার চায়ের মোহিনী শক্তিতে বশীভূত হইয়াছেন, তাঁহার আর নিস্তার নাই। সময়মত চায়ের পেয়ালা না পাইলে প্রাণ অস্থির হইয়া উঠে, মন চঞ্চল হয়, কাযে 'আঠা' লাগে না। যে গৃহস্থ-গৃহে একবার এই মোহিনীর প্রবেশলাভ ঘটিয়াছে, সেই গৃহের আর মঙ্গল নাই। গৃহের আবালবৃদ্ধবনিতা নিত্য দুই বেলা চায়ের জন্য 'ধরণা' দিয়া থাকে। এমন কি, কোনও কোনও গৃহে দুগ্ধপোষ্য শিশুরাও চায়ের নেশায় বিভোর হইতে শিখিতেছে। আক্ষেপের কথা, পিতামাতা বা অভিভাবকরা ইহা দেখিয়াও সর্ব্বনাশের প্রতীকার-সাধনে উদ্যোগী হইতেছেন না! বরং অনেক অভিভাবক এই নেশায় অভ্যস্ত হইতে বাড়ীর ছেলেমেয়েকে প্রশ্রয় দিয়া থাকেন।

এক পিয়ালা চায়ে সারবান্ পদার্থ কিছুই নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। হোমিওপ্যাথিক ডোজে কয় ফোঁটা দুধ ও চিনি থাকে বটে, কিন্তু উহাকে পুষ্টিকর খাদ্যের মধ্যে গণ্য করা যায় না। আমি বোম্বাই সহরে দেখিয়াছি যে, পথে পথে যেখানে 'বিশ্রান্তি-ভবন' আছে, সেখানে আফিসের কেরাণী বাবুরা প্রত্যূষে ৭টায় আফিসে যাইবার পথে এক কাপ চা পান করিয়া লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে আফিসে ছুটেন। আবার আফিসের কাযে অবসাদ বা ক্লান্তি আসিলেই 'বিশ্রান্তি-ভবনে' দৌড়াইয়া যায়েন। তাঁহারা দিনে এইরূপ ৪।৫ বার চা পান করিয়া থাকেন। তাঁহাদের কৈফিয়ৎ এই,—"আমরা গরীব কেরাণী, ক্ষুধা পায়, খাই কি? চা খাইলে ক্ষুধা মরিয়া যায়।" কি সর্ব্বনাশকর অধোগতি! ক্ষুধামান্দ্যই যেন প্রার্থনীয়! এই চা যে অগ্নিমান্দ্য,

অজীর্ণতা বা ডিস্‌পেপসিয়ার মূল কারণ, তাহা বলাই বাহুল্য।

অধুনা হাটে-বাজারে, পথে-ঘাটে, তটে-বাটে, রেলে-ষ্টীমারে, যেখানে যাও, দেখিবে, চায়ের ডিপো বা চায়ের কলসী। কেবল বাবুরা নহে, চাকর-বাকর, মুটে-মজুর, গাড়োয়ান-কোচম্যান,—সারেঙ্গ-খালাসী সকলেই চায়ের নেশায় ক্রীতদাস হইয়া উঠিতেছে। চতুর ইংরাজ বণিক দূরে দাঁড়াইয়া মুচকিয়া হাসিতেছে, আর মজা উপভোগ করিতেছে—'হাবা' কেমন টোপ গিলিয়াছে! বাঙ্গালা-দেশে যত চা উৎপন্ন হয়, তাহার শতকরা ৯৭ ভাগ ইংরাজ বণিকের চা-বাগিচায় তৈয়ার হয়, মাত্র ৩ ভাগ দেশীয়রা উৎপন্ন করে। অর্থনীতির দিক্ দিয়া দেখিলেও বুঝা যায়, ইহাতে কোন্ জাতির সর্ব্বনাশ হইতেছে। যে ভাবে বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে চা প্রসারলাভ করিতেছে, তাহাতে মনে হয়, আর ৫।৭ বৎসরের মধ্যেই গ্রাম্য কৃষকগণও লাঙ্গল চষিতে চষিতে চায়ের পিয়ালায় চুমুক না মারিলে জমীর পাট করিতে পারিবে না। যদি ৩০ কোটি ভারত-বাসীর এক-পঞ্চমাংশও চায়ের বশীভূত হয়, ৬ কোটি ভারতবাসী যদি অন্যূন এক পয়সাও চায়ের জন্য নিত্য খরচ করে, তাহা হইলে প্রত্যেকে মাসে ৮ আনা এবং বৎসরে ৬ টাকা,—এই হিসাবে বৎসরে ৩৬ কোটি টাকা ইংরাজ বণিকের পকেট পূর্ণ করিবে। ইহাও ভারতের এক পঞ্চমাংশ লোকের হিসাব মাত্র, ইহার অধিক লোক যে চা খায় না, তাহা বলা যায় না; পরন্তু প্রত্যেকে ১ পয়সাই যে চায়ের জন্য ব্যয় করে—তাহার অধিক ব্যয় করে না, তাহারই বা স্থিরতা কি?

এই চা-পানে বাঙ্গালী জাতির স্বাস্থ্যের যে কি সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহাও পরে বুঝাইবার চেষ্টা করিব। এই প্রবন্ধে খাদ্য-সমস্যার অবতারণা করা হইল মাত্র।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

নব বর্ষ

আজি জগতের দ্বারে কেন এত ভিড় বেধেছে
ও কে নবীন পশারী আমাদের ঘরে এসেছে।
কিবা নব-চম্পক-বরণ সু-কায়
রক্ত-রাজীব ফুটে দু'টি পায়
দীপ্ত ললাটে মুকুতার প্রায়
শ্রমবারি ঝর ঝরিছে
বুঝি বহুদূর হতে এসেছে।

পথধূলি ভালে কুন্তল ধূসর
প্রখর উত্তাপে দগ্ধ তনুবর
এস ছুটে সবে আইস সত্বর
ক্ষণ রাখি কৌতুক আবরি
নামায়ে পশরা করহ স্নিগ্ধ
নব কিশোর নবীন পশারী।

আজি জগতের দ্বারে কেন এত ভিড় বেধেছে
ও কে নবীন ভূপতি আমাদের দেশে এসেছে।
মুকুটে দীপ্ত শতেক সূর্য্য
আননে ভাতিছে অমিত বীর্য্য
নয়নে উথলে করুণ শৌর্য্য
সূক্ষ্ম ওষ্ঠে দৃঢ়তা আবরি
এস নিয়ন্ত্রী নৃপতি আমারি।

যাঁহার নিদেশে এসেছ এ দেশে
যাঁহার আদেশ চাহিয়া
বল সুদর্শন সম্বাদ তাঁর
কেমন সে রাজা, কেমন আকার
কোথা কত দূরে সে পুরী তাঁহার
প্রকৃতি-পুঞ্জের এই হাহাকার
কভু যায় কি না সেথা ভাসিয়া?

কত নিয়ামক তোমার মত
কত এল গেল চ'লে সে
বর্ষকাল ধরি জীবন-প্রবাহ
লয়ে ক্রীড়া করি স্বদেশে।
কেন নিয়ে এস কেন নিয়ে যাও
উদ্দেশ্য কি জান কি না তাও
আমাদেরই মত এস অন্ধকারে
যাও অন্ধকার বাহিয়া
কেবলি আদেশ মানিয়া।

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

৯

কলকাতায় সতীশ আর লীলার বিয়ে হয়ে গেল, এবং তাতে লোকসমাগমের কোন প্রকারের অভাবই বোঝা যায় নি। তরুণের দল আনন্দের সঙ্গে বিবাহে যোগ দিলে এবং ব্রাহ্মণগণ ভূরিভোজন ও প্রচুর দক্ষিণায় পরিতুষ্ট হয়ে এই তরুণ দম্পতিকে বহু আশীর্ব্বাদ ক'রে গেলেন। প্রকাশ বাবুও বিবাহে এসেছিলেন, কিন্তু অজীর্ণের দোহাই দিয়ে কোনও খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ না ক'রে সাবধানে জাতি রক্ষা ক'রে গেলেন।

বিবাহ হয়ে যাওয়ার দিনকতক পরে সতীশ তার কুসুমপুরের বাড়ীতে ফিরে এল, তার এক কারণ যে, সে এইখানে থাকাই বেশী পছন্দ করত এবং দ্বিতীয় কারণ তার চরকা-স্কুলটি।

যে গৃহে লীলা এক দিন কৃপার পাত্রী এবং সামান্য আশ্রিতা মাত্র ছিল, আজ সে যখন সেখানে কর্ত্রীরূপে ফিরে এল, তখন সে গৃহের সৌষ্ঠব যেন শতগুণে বেড়ে গেল। বাড়ীতে নূতন চূণকাম হ'ল, এবং ধুয়ে পুছে পরিষ্কার ক'রে সমস্তটা যেন একটা ছবির আকার ধারণ করলে।

এ যেন হেমন্তের শেষে বসন্তের শুভাগমন। মুহূর্ত্তে ভেল্কীবাজীর মত যেন গাছে গাছে লতায় লতায় ফুল ধ'রে ওঠা—সমস্ত কানন যেন বিহঙ্গের কলগানে মুখরিত হওয়ার মত। যেখানে প্রাণের অভাব ছিল, সেখানে যেন এক নিমেষে প্রাণের বিপুল প্রবাহ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

স্বপ্নের মধ্য দিয়ে সত্যের পানে যাওয়ার মানুষের জীবনের এও যে একটা পথ আছে, এরই মনোরম অনুভূতি সতীশের জীবনকে যেন মধুময় ক'রে তুলেছিল। নদীর ঢেউয়ে অবাধে ভেসে যাওয়ার জীবনের মধ্যে যেন একটা উদ্দেশ্য পাওয়া গেল, রোগাবসানে শরীরে শক্তিসঞ্চারের মত এও যেন জীবনকে নব-নব কার্য্যের জন্য শক্তিমান্ ক'রে তুললে। প্রেম যেখানে সার্থক হয়, সেখানে জীবনকেও সে সার্থকতার পথে নিয়ে যায়।

সতীশ তার লাইব্রেরী ঘরটিতে ব'সে দেওয়ানজীর পাঠান হিসাবপত্র দেখছিল—এমন সময় লীলা ঘরের ভিতর এসে বল্লে, "চা খাবার সময় হ'ল, চা নিয়ে আসব কি?"

সতীশ হিসাব-পত্র রেখে বল্লে, "তোমার দয়া! এখন আমার চার্জ্জ ত সম্পূর্ণ তোমার হাতে।"

লীলা মৃদু হাস্য ক'রে সতীশের দিকে একটা কটাক্ষ ক'রে বল্লে, "বেশ বেশ, আর ঠাট্টা করতে হবে না। নিজের চার্জ্জ নিজে নিয়ে, শরীরটি যা ক'রে তুলেছিলে।"

সতীশ হেসে বল্লে, "সত্যি লীলা, এরি মধ্যে শরীরটা বেশ নাদুস-নুদুস হবার উপক্রম করছে, তোমার কর্ত্রীত্বের বাহাদুরী আছে বটে! আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি এইটুকু বলতে পারি যে, যারা ডিসপেপটিক, তাদের অন্ততঃ চটপট বিয়ে ক'রে ফেলা উচিত, খাবার তোয়াজটা হয় বেশ, অন্ততঃ নতুন নতুন।"

হঠাৎ লীলার হাতে একটা নেকড়া জড়ান দেখে সতীশ বল্লে, "ও কি?"

লীলা সেটা বাঁ হাত দিয়ে ঢেকে বল্লে, "ও কিছু নয়!"

সতীশ বল্লে, "কিছু নয় কি রকম, কি হয়েছে?"

লীলা হেসে বল্লে, "কড়া থেকে গরম তেল চলকে উঠে একটু পোড়ার মত হয়েছে।

সতীশ উঠে গিয়ে নেকড়াটা খুলে বল্লে, "এই তোমার পোড়ার মত? এ ত দিব্যি পুড়েছে। কালো কেন, কি দিয়েছ?"

লীলার ডাক্তারী বিদ্যায় এইটুকু জানা ছিল যে, মানুষের দেহে যেখানেই যেরূপ দাহ হোক না কেন, তার অমোঘ ওষুধ হচ্ছে কালী, সুতরাং সে বেশ ক'রে তাতে কালী লাগিয়েছিল। কিন্তু এই সস্তা ওষুধটির উপর সতীশের হয় ত তার মত অচলা ভক্তি না থাকতে পারে, এই আশঙ্কায় সে লজ্জিত হয়ে আস্তে আস্তে বল্লে, "কালী।"

সতীশ হেসে উঠে বল্লে, "কালী? এত ভাল সব ওষুধ

থাকতে, কালী? আমাকে বল্লে না কেন, লীলা? আর তুমি ও-সব রান্না বান্না করতে যাও কেন, বামুন ত রয়েছে?"

লীলা তার উজ্জ্বল চোখ দুটো সতীশের মুখের উপর স্থাপিত ক'রে বল্লে, "মেয়েমানুষ রাঁধবো না ত কি করব? বামুনের হাতে খেয়ে ত শরীরের ঐ দশা হয়েছিল! হাত ত আর চিরকাল পোড়া থাকবে না, মেয়েমানুষের অমন একটু আধটু পুড়লে কিছু হয় না!"

সতীশ আজকালকার মাসিকে ও সংবাদপত্রে নারীর প্রতি পুরুষের আবহমানকাল অত্যাচারের এবং আধুনিক নারী-জাগরণের নারী-লিখিত জ্বালাময়ী কাহিনী সব পড়েছিল, সুতরাং লীলার মুখে স্ত্রীলোক সম্বন্ধে এই তত্ত্বকথা শুনে তার যেমন হাসি এল, তেমনই বুকের মধ্যে যেন একটা আরামও অনুভব করতে লাগল।

সে হেসে বল্লে, "আচ্ছা, হাত পুড়িয়ে খুব ভাল কাযই করেছ, না হয় স্বীকার করলাম। কিন্তু ওটা বাঁধা থাকা দরকার আর একটু শক্ত ক'রে। এসো আমি বেঁধে দিচ্ছি।"

সতীশ স্নেহের সহিত তার হাতটি আপনার হাঁটুর ওপর রেখে তাকে বাধতে লাগলো।

এমন সময় দুয়ারে একটি মনুষ্যমূর্ত্তি দেখা গেল এবং মুহূর্ত্তে সে দুয়ারের বাইরে গিয়ে বল্লে, "মাপ করবেন, সতীশ বাবু।" সতীশ স্বর চিনতে পেরে বললে, "আরে, সুপ্রভা যে, এসো এসো।"

সুপ্রভা মলিন মুখে এসে একটা চৌকীর উপর বসল। লীলা চঞ্চল হয়ে উঠল, দেখে সতীশ বেশ শক্ত ক'রে তার হাত ধ'রে বাঁধতে বাঁধতে বল্লে, "লীলা হাত পুড়িয়েছে, তাই এই পরিচর্য্যা।"

সুপ্রভা চুপ ক'রে রইল এবং লীলা হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে গেল।

লীলা চ'লে যাওয়ার পর সতীশ সুপ্রভার দিকে চেয়ে বল্লে, "আজ রাধতে গিয়ে লীলা হাত পুড়িয়েছে, কেন যে নিজে রাঁধতে যাওয়া, তা ত জানি না। তার পর তার একটা রীতিমত বিহিত করলে হ'ত, তা না খানিকটা কালী ঢেলে বেঁধে রেখেছে- কালী হ'ল ওর পোড়ার ধন্বন্তরি।" ব'লে সতীশ হাসতে লাগল।

বর্ষায় যখন নদীর বুক ভ'রে ওঠে, তখন সে নিজের কলগানেই ভরপুর হয়ে বয়ে চলে, পরের কথা ভাববার সময় পায় না। সতীশেরও বোধ করি সেই রকম হয়েছিল। এই যে মেয়েটি আজ মলিন মুখ ক'রে তার কাছে এসে বসলে, তার কথা শোনবার আগেই সে নিজের কথা, তার প্রিয় প্রসঙ্গ ব'লে যেতে লাগল।

সুপ্রভা কাঠের মত ব'সে সেই কথা, প্রেমিকের সেই নূতন প্রেমের কাহিনী, যা নিজেকে ক্ষুদ্রের মধ্য দিয়ে, বৃহতের মধ্য দিয়ে, তুচ্ছের মধ্য দিয়ে নানা রকমে প্রকাশ ক'রে আনন্দ পায়, ক্ষান্ত হয় না, শ্রান্ত হয় না—সেই চিরন্তন কাহিনী শুনতে লাগল। এ যেন তার কাছে মরীচিকার মত, আলেয়ার মত, শুধু তৃষ্ণা বাড়িয়ে দেয়, চোখ ধাঁধিয়ে দেয়।

যে দিন প্রভাতে সুপ্রভা সতীশের চরকার স্কুলের শিক্ষয়িত্রীর পদ গ্রহণ ক'রে তার সতীশের সঙ্গে প্রথম দেখা হ'ল, সে দিনকার সেই শুভ্র প্রভাতের সুন্দর স্মৃতিটি সে হয় ত কোনও দিনই ভুলতে পারবে না। সতীশের সঙ্গে সেই দেখা—তার জীবন-পদ্মের কোরকের উপর প্রথম শান্ত সূর্য্য-রশ্মি-পাত! সেই পদ্মের মুদিত কোরকগুলি ধীরে ধীরে কেমন ক'রে যে বিকশিত হয়ে উঠছিল, তা সে জানত না, কিন্তু তার রক্তের তালে তালে নাড়ীর প্রতে ক স্পন্দনে যে অভিনব প্রাণের সাড়া প'ড়ে গিয়েছিল, তাকে ত ভুল করা চলে না। যে শব্দ ক'রে, গর্জ্জন ক'রে আপনাকে প্রকাশ করে, সে মানুষকে সাবধান ক'রে দেয়, কিন্তু যার বিকাশ নিস্তব্ধ নিঃশব্দ, শুদ্ধ মাত্র একটি রেখাপাতে, একটিমাত্র সুকুমার হিল্লোলে, মৃদু কম্পনে, সে-ই মানুষের বুকে সব চেয়ে দাগ বসিয়ে যায়। আর সেই দাগের রেখায় রেখায় যে বেদনা আর যে রক্ত ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে, সে কোনও দিনই মোছে না।

প্রেম বল, ভালবাসা বল, এ একটা নিশ্চয় কিছু নূতন। সুপ্রভা ছিল সতীশের স্কুলের সামান্য শিক্ষয়িত্রী, সে হয় ত কোনও দিন একে প্রকাশ করতে পারত না, তাকে হয় ত বা এই ঘরেই চিরদিন নির্ব্বাক্‌ভাবে কাটিয়ে দিতে হ'ত। বুকের এই যে মাণিক—সে হয় ত বুকেরই মধ্যে চাপা থেকে যেত। কিন্তু হয় ত তা নাও হ'তে পারত। হয় ত বা এক দিন এই কৌস্তভ-মণির নয়ন-ভোলানো আলো তার গোপন আবাসস্থল থেকে বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়তে পারত,

হয় ত বা এক দিন মধুর প্রভাতে অথবা ঝাপসা সন্ধ্যায় সে সতীশের দুই চক্ষুকে হঠাৎ ধাঁধিয়ে দিত, তার পর তাদের জীবন-পথে যুগল-যাত্রা চলত। প্রেমের সুবর্ণ-রাজ্যে ত ছোট-বড় ধনি-দরিদ্র নেই, সেই সোনার রাজ্যের অমর আলোকে যাদের উদ্ভাসিত করলে, তারা কেউ গল্প-রাজ্যের রাজপুত্র-রাজকন্যার চেয়ে ছোট নয় যে।

অথচ এত কথা স্পষ্ট ক'রে সে কোনও দিনই হয় ত ভাবে নি। এই বারান্দার এক পাশে সতীশ ব'সে ব'সে তার চরকা-কাটা দেখছে, আর এই স্নেহ-দৃষ্টির উৎসাহে বারান্দার এক পাশে সুপ্রভার হাত থেকে চমৎকার সরু সুতা কাটা হচ্ছে, বোধ করি, এর চেয়ে বেশী আপাততঃ তার আর কোন কাম্য ছিল না। হয় ত বা এমনই ক'রে তার প্রিয়তমের চোখের দৃষ্টির সামনে ব'সে সে চিরদিন সুতো কেটে যেতে পারত, এবং যে দিন এই ভবের সুতো কাটার পালা শেষ হত, সে দিন জীবনের পরিপূর্ণ সার্থকতার আনন্দেই সে প্রসন্নমুখে পরপারে যাত্রা করত!

কিন্তু তার জীবন-সূত্রে এই যে কঠিন জোট প'ড়ে গেল, তাকে আর খোলবার সে কোনও উপায়ই দেখতে পেলে না। হঠাৎ যেমন সূর্য্যের আলো নিভে গেলে সমস্তই অন্ধকারময় হয়ে ওঠে, তেমনই তার জীবনের আনন্দের আলো নির্ব্বাপিত হয়ে গিয়ে সে যেন গভীর আঁধারে হাত্‌ড়ে বেড়াতে লাগল। যে লতার শিকড় তাজা রসাক্ত, তার যেমন প্রত্যেক পাতা, প্রত্যেক ফুল, প্রত্যেক ফুলের সুকুমার পাপড়ি পর্য্যন্ত রসাল, তেমনই একদা রস.সক্ত তার জীবন-ধারা মুহূর্ত্তে যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। তার যে প্রত্যেক ছোট কাযের মধ্যে আনন্দ-ধারা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত, এখন তা নীরস হয়ে গেল। দিনের পর দিন এই সুতা কাটার মধ্যে তার জন্যে আর কোন অর্থ রইল না—এর শুষ্ক ঘরঘরানি তার কাছে একান্ত নিরানন্দ দায়ক বোধ হ'ল। বাতাসের যে আনন্দ আঘ্রাণ ক'রে তার অন্তর পরিপুষ্ট হচ্ছিল, সে যেন নিমেষে তার দম বন্ধ ক'রে দেবার উপক্রম করলে।

সুতরাং হাত বাঁধতে গিয়ে - পুড়ে যাওয়া নিয়ে প্রেমিক-প্রেমিকার এই যে অভিনয়, এ যেন তাকে বিদ্ধ করতে লাগল, সতীশের হাসি যেন তাকে নির্ম্মম উপহাস করতে লাগলো!

তার শুকনো বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে সতীশের হাসি থেমে গেল, সে বল্লে, "ইস্, সুপ্রভা, তোমার চেহারা যে বড্ড খারাপ দেখাচ্ছে, অসুখ-টসুখ হয়নি ত?"

সুপ্রভা ধীরে মাথা নেড়ে বল্লে, "না।"

সতীশ বল্লে, "তবে?"

সুপ্রভা তার জলসিক্ত চোখ দুটি সতীশের মুখের দিকে স্থাপিত ক'রে বল্লে, "আমাকে বিদায় দিন, সতীশ বাবু!"

সতীশ বিস্মিত হয়ে বল্লে, "সে কি সুপ্রভা?"

সুপ্রভা চুপ্ ক'রে রইল।

সতীশ বল্লে, "তার মানে চরকা-ইস্কুল উঠিয়ে দিতে হবে যে, সুপ্রভা! না-না, তোমাকে নইলে যে চলবে না,—তোমার কি আরও খরচের দরকার সুপ্রভা, বল, আমি তাও দেবো।"

সুপ্রভা মাথা নেড়ে জানালে, না।

সতীশ বল্লে, "তবে, তবে কি জন্যে যেতে চাও, তা কি জানতে পারি?"

সুপ্রভা কাঠের মূর্ত্তির মত ব'সে রইল—সতীশ বিস্মিত-ভাবে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

হঠাৎ সুপ্রভা দুই হাতে মুখ ঢেকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, বল্লে, "তা আমি বলব না—বলতে পারব না।"

সতীশ নির্নিমেষে তার মুখের দিকে, তার কম্পিত দেহের দিকে চেয়ে এর কারণ ভাবতে লাগল। রাত্রিশেষে যেমন অন্ধকারের মধ্যে ধীরে ধীরে উষার আলোক ফুটে ওঠে, তেমনই সতীশের কাছে যেন এর অর্থ ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগলো! তখনকার ছোট ছোট প্রতিদিনকার কাহিনী তার মনে পড়তে লাগল; তখন সে যা বোঝেনি, এখন যেন বুঝতে পারলে! এই নারী তার গোপন হৃদয়াবরোধে যে কাহিনী সঙ্গোপনে রেখেছিল, প্রতিদিনকার হাস্য-পরিহাস চরকা-কাটা মেয়ে-পড়ানর মধ্যেও যে সে রসসঞ্চয় ক'রে উঠ্‌ছিল, অন্ধ সতীশ তা না দেখলেও এই নারী-হৃদয় তার বিকাশের কার্য্য এক দিনও বন্ধ রাখে নি! অথচ আজ! আজ যখন ঐ পদ্ম তার শতদল নিয়ে আশ্চর্য্য সুষমায় প্রস্ফুটিত হয়ে উঠল, তখন তার অন্ধ-দেবতা তাকে পদাঘাত ক'রে চ'লে গেল! সেই ভীষণ নিষ্ঠুর পদ-দলনে এই নারী-হৃদয়ে যে বেদনার রক্ত শত-ধারায় ক্ষরিত হচ্ছে, তার কথা ভেবে সতীশের বুকের

ভিতরটা যেন টন-টন করতে লাগল। অথচ উপায় কৈ? সতীশ অনেকক্ষণ চুপচাপ ক'রে ব'সে রইল। দূরে বাতাসের সোঁ সোঁ আওয়াজ এবং নিকটে এই নারীর দীর্ঘশ্বাসের শব্দ তার কাছে যুগপৎ যেন স্বপ্নের মত বোধ হ'তে লাগল।

অথচ এই মুহূর্ত্তটা জীবনের পক্ষে কত বড় মুহূর্ত্ত! নারী যে ক্ষণে তার গোপন হতাশ প্রেম নিবেদন ক'রে পুরুষের কাছ থেকে বিদায় নিতে আসে, সে ক্ষণ কারও পক্ষে ছোট নয়; অথচ ঠিক এই মুহূর্ত্তেই তারা নিরুপায়।

তার পর সতীশ বল্লে, "সুপ্রভা, বুঝেছি। এখন এইটুকুই শুধু বলতে পারি যে, আমাকে মাপ করো।"

সুপ্রভা কোন উত্তর দিলে না।

সতীশ বল্লে, "কিন্তু না গেলে কি একবারেই চলবে না? একবার ঐ স্কুলের কথাটা ভেবে দেখো, ও ত তোমারও কম প্রিয় ছিল না। তুমি যেখানেই যাও, অলস ত কোথাও থাকবে না, সুতরাং তোমার স্নেহ আর কর্ম্মকুশলতা থেকে যদি এই স্কুলটি বঞ্চিত না হ'ত ত বড়ই ভাল হ'ত। কিন্তু হয় ত বা আমার এ অনুরোধ করবার অধিকার আর নেই।"

সুপ্রভা খোলা জানালার পথে অনেকক্ষণ ও-পারের মলিন দিগন্তের দিকে চেয়ে রইল, তার পর চোখের জল মুছে আপনাকে সংযত ক'রে বল্লে, "আমাকে মাপ করবেন। এ'কথা কোনও দিন আপনার গোচর করবার আমার ইচ্ছা ছিল না, প্রবৃত্তিও ছিল না। কিন্তু মেয়েমানুষের মন।" তার পর হাতজোড় ক'রে বল্লে, "আমাকে বিদায়ই দিন। মনকে আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারি নি। দূরেই থাকতে চাই। কাল সকালের ষ্টীমারেই যেতে চাই।"

এমন সময় লীলা চা এনে সতীশকে দিয়ে, সুপ্রভার দিকে ফিরে বল্লে, "দিদি, চা খাবেন চলুন না।"

সুপ্রভা সংক্ষেপে "না" ব'লে দাঁড়িয়ে উঠে, সতীশকে একটা শুষ্ক প্রণাম ক'রে চ'লে গেল। তার মুখের ভাব এমনই করুণ এবং যাওয়ার ভাবটা এমনই অস্বাভাবিক যে, লীলা সতীশকে এর কারণ না জিজ্ঞাসা ক'রে থাকতে পাল্লে না। বল্লে, "সুপ্রভা-দিদির মুখ অত বিমর্ষ কেন, আর তিনি হঠাৎ উঠে চ'লে গেলেন যে?"

সতীশ সংক্ষেপে বল্লে, "কি জানি।"

লীলা সতীশের মুখের দিকে চেয়ে আশ্চর্য্য হয়ে গেল, সেখানে কিছুক্ষণ আগে যে উজ্জ্বলতা ছিল, তা আর নেই। সে কিছুই বুঝতে না পেরে আস্তে আস্তে বাড়ীর ভিতরে চ'লে গেল।

সতীশ সেইখানে ব'সে ব'সে এই আশ্চর্য্য ঘটনার কথা যতই ভাবতে লাগল, ততই তার মন এই ব্যথিতা নারীর দুঃখের কাহিনীতে আর্দ্র হয়ে উঠতে লাগলো। স্বয়ং তাকে আশ্রয় ক'রে এই যে করুণ ঘটনাটি ঘটল, তার জন্যে হয় ত তার নিজের কোন দোষ নেই, কিন্তু হায়, ঐ কোমল-হৃদয়া নারী। সে হয় ত আজ নিঃশব্দে তার জীবনের সমস্ত সুখের কাছ থেকেই বিদায় গ্রহণ ক'রে গেল। অথচ তাকে সান্ত্বনাটুকু পর্য্যন্ত দেবার কেউ নেই।

১০

তার পরদিন উঠে সতীশের মনে হ'ল, যেন তার বুকের উপর একটা গুরুভার চেপে রয়েছে। এই ঘটনা থেকে সে নিজেকে যতই বিচ্ছিন্ন করবার জন্য নানা যুক্তি-তর্কের অবতারণা করেছে, ততই যেন এই ভার তাকে আরও চেপে ধরেছে। কোথায় যেন কি একটা ভুল—কি একটা অন্যায় রয়ে গেছে, যার হাত থেকে সে আপনাকে কিছুতেই মুক্ত করতে পারছে না। এবং বারংবার তার মনের মধ্যে ফুটে উঠছে সুপ্রভার সেই দুটি সজল চোখ যা বোধ করি, তার হৃদয়ের তীব্র দাহকে কিছুতেই নির্ব্বাপিত করতে পারে নি। এই নিরাশ্রয় আর্ত্ত রমণী নিজের মনে যে নিরুদ্দেশের পথ নির্ব্বাচন ক'রে নিলে, সেখানে সে কেমন ক'রে কোথায় যাবে। এই কথা ভেবে সতীশের পীড়িত মন ব্যথাতুর হ'তে লাগল। অথচ সে ভেবে তার পক্ষে আর কি পথ আছে, তাও ঠিক করতে পারলে না।

একটি শুভ্র অনাঘ্রাত ফুল সকালবেলায় ফুটে সন্ধ্যায় যেমন সকলের অলক্ষ্যে ঝ'রে পড়ে, পৃথিবীর নিত্যকার ঝ'রে-পড়ার করুণ-কাহিনীর মধ্যে এও যেন তেমনই একটি।

হঠাৎ সতীশের মনে পড়ল যে, সুপ্রভা ত তার কাছ থেকে একটি পয়সাও নেয়নি; অথচ তার ত প্রাপ্য ছিল। যে নারী তার সমস্ত ত্যাগ ক'রে ধুলোমাটীর পথে বেরিয়ে পড়ল, তার কাছে নিশ্চয়ই এ কটা টাকা কিছুই নয়। কিন্তু সতীশ ভাবলে যে, এ কয়টা টাকা থাকলেও হয় ত সুপ্রভার কিছু সুবিধা হ'তে পারে।

তার প্রাপ্য টাকা কয়টি এবং তার উপর আরও কিছু

টাকা নিয়ে সতীশ ষ্টীমার-ঘাটের উদ্দেশ্যে চলল। সে যে আর কিছুতেই ফিরবে না, তা সতীশ জানত, কিন্তু তবুও একবার শেষবার এই মহীয়সী নারীকে দেখবার জন্যে সতীশ উৎকণ্ঠিত হয়েছিল।

ষ্টীমার-ঘাটে সতীশ যখন পৌছল, তখনও ষ্টীমার ছাড়তে দেরী আছে। সে ইচ্ছা করেই সকাল সকাল গিয়েছিল, যেন কোন ক্রমেই সাক্ষাতের এই সুযোগ না হারায়। গঙ্গার শীতল হাওয়াও তার মনের ভাবকে কমাতে পারলে না।

ক্রমে ক্রমে এক আধজন ক'রে যাত্রী আসতে লাগল; সতীশ নদীর উঁচু পাড়ের উপর ব'সে, তাদের দেখে ভাবতে লাগল, এদের যাওয়া আসা চলবেই, কিন্তু আজ এই ষ্টীমার যে নারীটিকে বহন ক'রে নিয়ে যাবে, সে আর কোনও দিন ফিরে আসবে না!

ক্রমশঃ যাত্রীর সংখ্যা বাড়তে লাগল, যাত্রীর ভারে আর গঙ্গার ঢেউ-এ ষ্টীমার দুলে দুলে উঠতে লাগল। তার পর ষ্টীমারএর চোং দিয়ে কালো ধোঁয়া উঠতে লাগলো, যাত্রীরা ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঠেলাঠেলি সুরু ক'রে দিলে।

অথচ সুপ্রভার দেখা নেই! হয় ত বা ভুল হয়ে থাকবে মনে ক'রে সতীশ ষ্টীমারএর উপর গিয়ে চারিদিক্ ভাল ক'রে দেখে এলো, কোথাও সুপ্রভা নেই। নীচে এসে দাঁড়াতেই ষ্টীমার ভোঁ দিয়ে দুলতে দুলতে যাত্রা করলে।

হঠাৎ যেন একটা আরামে সতীশের বুকটা ভ'রে উঠল, —সুপ্রভা ত গেল না! কিন্তু তার পরেই মনে হ'ল যে, ষ্টীমার ত একবার নয়, বহুবার যায়, এ ষ্টীমারে না গেলেও অন্য ষ্টীমারে সুপ্রভার যাবার কোন বাধা নেই।

গঙ্গার মাঝখানে গিয়ে ষ্টীমার যখন আর একবার ভোঁ দিলে, তখন সতীশের চমক ভাঙ্গল, সে চিন্তিতমনে বাড়ী ফিরল।

বাড়ী ফিরে তার বারান্দার রোয়াকে উঠতেই সতীশ যার-পর-নাই বিস্মিত হয়ে গেল। দেখতে পেলে সুপ্রভা নিবিষ্টমনে ব'সে চরকায় সুতো কাটছে।

সতীশ স্তব্ধ হয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখলে, তার পর সুপ্রভার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে "সুপ্রভা, গেলে না?"

কাল সন্ধ্যার সে আঁধার, সে মলিনতা, সে দুঃখ সুপ্রভার মুখের ওপর থেকে ধুয়ে পুছে পরিষ্কার হয়ে গেছে—এ যেন প্রভাতের শুভ্র অনবদ্য ফুলটি।

সুপ্রভা হাসতে হাসতে উঠে এসে গলায় কাপড় দিয়ে সতীশকে প্রণাম ক'রে বল্লে, "না, গেলাম না।"

সতীশ জিজ্ঞাসা করলে, "যাবে না?"

সুপ্রভা স্মিতমুখে বললে, "না, যাব না।"

সতীশ সস্নেহে তার হাত সুপ্রভার মাথার ওপর রেখে বল্লে, "সুপ্রভা!"

সুপ্রভা বল্লে, "আশ্চর্য্য মনে কচ্ছেন? আমি অনেক ভেবে দেখলাম। কোথায় যাব? সতীশ বাবু, মেয়েমানুষের জীবনই যে দুঃখের সঙ্গে লড়াইয়ের একটা মস্ত ইতিহাস। তা থেকে পালিয়ে ত দুঃখের হাত থেকে নিস্তার নেই। কাল সন্ধ্যাবেলা মনে হয়েছিল যে, এখানকার হাওয়া যেন আমার দম বন্ধ ক'রে দিচ্ছে—আজ সকালে সেই হাওয়া আমাকে আর তেমন কষ্ট দিচ্ছে না।"

সতীশ বল্লে, "আশ্চর্য্য, আশ্চর্য্য তোমাদের মেয়েদের মন।"

সুপ্রভা বল্লে, "কিছু আশ্চর্য্য নয়! আমার বরং মনে হয় যে, আশ্চর্য্য আমাদের মনের দুর্ব্বলতা। একটা রাত্রি ভাল ক'রে ভেবে দেখলাম যে, এ আমার ছেলেমানুষী! বিপদের কাছ থেকে পালিয়ে কেউ উদ্ধার পায় না, বিপদের সম্মুখীন হয়ে তাকে জয় করাকেই হ'ল উদ্ধারের উপায়। তেমনই ক'রে আমি উদ্ধার পেতে চাই, পালিয়ে নয়। কাল সমস্ত রাত্তির জেগে জেগে এই আমি ঠিক করলাম।"

সুপ্রভা হেসে উঠল।

সেই হাসির শব্দে চমকে উঠে, সতীশ ভাবতে লাগলো এই অপূর্ব্ব নারীর এক রাত্রের সাধনার কথা। যে প্রবৃত্তিকে সহস্র বর্ষের সাধনাতেও পুরুষ জয় করতে পারে নি, তাকে জয় কল্লে এ এক রাত্রে? এ বলে কি? অথচ এর মুখ আজ শিশিরে ধোয়া ফুলের মতই শুভ্র, এর চোখ দুটি বহ্নির মত ভাস্বর, এ আজ অসঙ্কোচে হাসছে।

সুপ্রভা বল্লে, "আমি ভেবে দেখলাম, আমাদের কাযের কি অভাব আছে? পৃথিবীতে তাড়নের ভার পড়েছে আপনাদের পুরুষদের ওপর, কিন্তু পালনের ভার যে আমাদের উপর। আর এই পালন চলছে কত বিবিধ প্রকারে ও কত বিচিত্র উপায়ে। মেঘ যখন তাড়ন করলে, তখন সে হ'ল বজ্র, আর সে যখন পালন করবার জন্যে সহস্রধারায় বিগলিত হয়ে পড়ল, তখন সে হ'ল বৃষ্টি! পালন ত

একরকমে হয় না যে, তার জন্যে ভাবতে বসতে হবে। মা ছেলেকে পালন করেন, আর আমি এই যে চরকার মেয়েগুলিকে নিয়ে দিন কাটাচ্ছি, সে-ও ত' একরকম পালন"—ব'লে সুপ্রভা হাস্‌তে লাগল।

সতীশ মুগ্ধ, বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইল। তার পর খানিকক্ষণ পরে বললে, "সুপ্রভা, এই যে কথাগুলো তুমি এত সহজে ব'লে গেলে, একে কাযে পরিণত করবার জন্যে বহু সহস্র বৎসর বহু নর-নারী চেষ্টা করছে এবং বহু লোকই সফল হয় নি, কচিৎ এক আধ জন যারা পেরেছে, তারা নিজেরাও ধন্য হয়েছে, অপরকেও ধন্য করেছে।"

সুপ্রভা বল্লে, "আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন অসফল না হই!"

তার পর খানিকটা থেমে বল্লে, "আপনি সে দিন বলেছিলেন যে, মনে মনে অচলা ভক্তি ছিল বলেই কাঠবিড়ালী অতবড় সাগর-বন্ধনে এক মুঠো বালি দিয়ে সাহায্য করতে সাহস পেয়েছিল। আমি এই কথাটা অনেকবার ভেবেছি। আমার ত সে অচলা একাগ্র ভক্তি ছিল না, আরও মনে মনে একটা ভক্তির স্পর্দ্ধা করতাম, তাই হয় ত এত দিন কোনটাই হয় নি। এখন আশীর্ব্বাদ করুন, আমার এই সামান্য কাযের উপর যেন সেই অচলা ভক্তি আসে।"

সতীশ বল্লে, "তোমাকে আশীর্ব্বাদ করবার যোগ্যতা যদি থাকে ত কায়মনোবাক্যে তা করছি সুপ্রভা!"

এমন সময় সুপ্রভার পড়ুয়া রমা এসে ডাক্‌লে, "গুরু-মা!" জননী আপনার সদ্যঃপ্রসূত সন্তানকে যেমন লোলুপ স্নেহ-দৃষ্টিতে দেখেন, তেমনই অপরূপ দৃষ্টিতে রমার মুখের দিকে চেয়ে সহসা তাকে বুকের মধ্যে গভীর স্নেহালিঙ্গনে জড়িয়ে ধ'রে, বর্ষার বারিধারার মত অজস্র চুম্বনে তাকে বিহ্বল ক'রে, সুপ্রভা বলতে লাগলো, "রমা আমার, মা আমার, মেয়ে আমার, সোনা আমার,—"

সতীশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখে স্পষ্ট অনুভব করলে, এই রহস্যময়ী নারীর অপার স্নেহের গতি কোন্ পথ থেকে কোন্ পথে গিয়েছে! কাল যে নারী ছিল প্রেমিকা, আজ সে মহিমময়ী জননী!

সতীশের চোখ জলে ভ'রে এল, সে মনে মনে বললে, হে বিচিত্রা, হে মহীয়সী, হে আনন্দরূপিণী নারী, তোমাকে বার বার নমস্কার করি।"

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

সমাপ্ত

ঘোষণা

ঝিল্লীরব-মুখরিত কাননের পথে
কি জানি কে দাঁড়াইয়া আছে প্রতীক্ষায়;
মোহন মুরলী করে নীরব নিশীথে
না জানি, ব্যাকুল হয়ে কেন সে বেড়ায়!

উঠিল কাননমাঝে বাঁশরীর তান,
দিগ্‌দিগন্তরে হ'ল প্রতিধ্বনি তা'র;
সেফালী, রজনীগন্ধা, চম্পকের ঘ্রাণ—
মধুময় করিল সে মধুর ঝঙ্কার!

সে সঙ্গীতে কি ইঙ্গিত বুঝিল যে জন,
কোনমতে নারিল সে রহিবারে ঘরে;
ছুটিল সে দরশিতে রাতুল চরণ;
ঢাকি নীলবাসে তনু অনুরাগভরে!

আর না বাজিল বাঁশী কাননে, কাননে,
আর নাহি বিরহীর যাতনা-বেদনা;
চন্দ্রিকা-কিরণ-স্নাত বিজন বিপিনে
জয় জয় জয় রবে রহিল ঘোষণা!

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।

ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজ শাসনের ইতিহাস *

দেওয়ানী সনন্দ পাওয়ার পর ইংরাজ প্রথমতঃ যে ভাবে এ দেশের কায-কর্ম্ম চালাইয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। এক রাজস্ব আদায় ভিন্ন শাসন-সম্বন্ধীয় আর কোন কিছুতেই তাঁহারা হাত দিতে সাহস পান নাই। তাহা যে তাঁহাদের কর্ত্তব্য, এ কথাও তখন মনে হয় নাই। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে যখন তাঁহারা পার্লামেণ্টের নিকট হইতে নূতন সনন্দ প্রাপ্ত হন, তখন এক জন গভর্ণরের পদ ও তিনটি প্রেসিডেন্সীর প্রতিষ্ঠা হয়। ১৭৭৩-৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে রাজস্ব আদায় হইতে আরম্ভ করিয়া শাসন-সম্বন্ধীয় যত কিছু কায ক্রমশঃ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে আসিয়া পড়ে, এই সব কাযে প্রথমে তাঁহারা বিলাত হইতে কর্ম্মচারী আমদানী করিতে আরম্ভ করেন। তাহার ফলে শাসন অত্যন্ত বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। উৎকোচ গ্রহণ সার্ব্বজনীন প্রথা হইয়া দাঁড়ায়। সকল বিষয়ে প্রজার উপর উৎপীড়ন ও ন্যায়ের অবমাননা ঘটিতে আরম্ভ করে। ১৭৯ খৃষ্টাব্দে যখন সনন্দের কথা উঠে, তখন এই অত্যাচার ও উৎকোচ-প্রথা এত দূর চরমে উঠে যে, পিট পার্লামেণ্টে দাঁড়াইয়া বলেন—"ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে ভাবে ভারতবর্ষ শাসন করিতেছে, তাহাতে আমাদের জাতীয় চরিত্রের উপর দোষ আরোপিত হইতেছে. ইজ্জত নষ্ট হইতেছে ও ন্যায়ের মর্য্যাদা লঙ্ঘিত হইতেছে।" সুতরাং পার্লামেণ্টে স্থির হয় সব কাযে বিলাত হইতে ইংরাজ আমদানী করিলে আর চলিবে না। তাহার ফলে ইংরাজ 'ক্লার্ক'এর এ দেশে আসা বন্ধ হইয়া গেল, ঘুস নেওয়া-দেওয়ার প্রথা বন্ধ করিবার চেষ্টা হইতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে এ দেশের লোককে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করা আবশ্যক হইয়া উঠিল। তখন একটা নূতন সমস্যা উপস্থিত হইল। দেশের লোকের কথা ইংরাজ বুঝে না, ইংরাজের কথা দেশের লোক বুঝে না, ঠারে-ঠোরে কথা চালাইতে হইত। সুতরাং দোভাষীর প্রয়োজন হইল; কিছু দিন পর্য্যন্ত দোভাষী দিয়া কায চলিল। আমাদের কলিকাতা আসিবার আগে স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু 'একাল ও সেকাল' নামে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাতে তখনকার vocabulary বা শব্দ ছিল,—

'নেট মানে মশা
কাকুম্বার শশা, আর প্লাউম্যান চাষা।'

এই ভাবে ভাষাজ্ঞান লাভ করিতে হইত। এখন রাধাবাজারও নাই, আর ইংরাজের সেই গতিবিধিও সেখানে নাই। হোয়াইটএওয়ে লেইডল ও অন্যান্য ইংরাজ ব্যবসাদাররা আসিয়া পড়িয়াছে ও সস্তায় জিনিষ বিক্রয় করিতেছে; সুতরাং এখন ইংরাজ রাধাবাজারে যান না। আগে যে সকল গোরা খালাসী, কেরাণী বা নাবিক হইয়া আসিত, তাহারা রাধাবাজারে জিনিষপত্র কিনিতে যাইত। একটা গল্প আছে, আজকালকার ছেলেরা জানেন না। এক জন কেরাণী কি অপরাধ করিয়াছিলেন বলিয়া সাহেব তাহাকে বরখাস্ত করেন। তিনি সাহেবকে বলিতেছেন—you live I live, you die I die, my father mother die, my black stone die অর্থ—সাহেব, তুমি যদি বাঁচাও, আমি বাঁচিব, তুমি যদি মার, আমি মরিব, আমার মা-বাপ মরিবে, এমন কি, আমার Black stone অর্থাৎ শালগ্রাম-শিলার পর্য্যন্ত মৃত্যু হইবে। এই ভাবে কিছু দিন চলিয়াছিল। ইংরাজ দেখিল—দেশের লোকের সঙ্গে কারবার করিতে হইবে, কাযেই দেশীয় ভাষা শিক্ষা করা প্রয়োজন হইয়া উঠিল। কেবল তাহাই নহে, যখন দেওয়ানী আদালতের প্রতিষ্ঠা হইল, তখন ইংরাজ এ দেশে বিলাতের আইন প্রচলিত করিতে চেষ্টা করেন নাই। হিন্দু আইন অনুসারে—দায়ভাগ ও মিতাক্ষরা অনুসারে বিচার হইত ও হিন্দুর দায়াধিকার নির্ণীত হইত; মুসলমান আইন অনুসারে মুসলমানদের বিচার হইত। তখন যে ইংরাজ রাজকর্ম্মচারী এ দেশে আসিতেন, তাঁহাদিগকে এ দেশের শাস্ত্র, সাধনা ও সাহিত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হইত। এই সকল খবর রাখা তাঁহাদের প্রয়োজন হইয়া উঠিল। এই হেতু ইংরাজ ক্লার্কদের শিক্ষার জন্য কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম নামে একটা কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। সেখানে এ দেশী পণ্ডিত ও মৌলভীরা পড়াইতেন। ইঁহারা হিন্দু ও মুসলমান আইনের যে অর্থ করিয়া দিতেন, সেই অনুসারে সদর দেওয়ানী আদালতে বিচার হইত।

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চার্টার

* থিওসফিকেল সোসাইটী হলে বক্তৃতা।

রিনিউড হয়, তখন তৃতীয় জর্জ্জ রাজা ছিলেন। এই চার্টার তাঁহার রাজ্যের ৫৩ নং অ্যাক্ট বলিয়া তাঁহার নাম ৫৩ জর্জ্জ অ্যাক্ট হয়। পার্লামেণ্ট সেই অ্যাক্টে একটা ধারা সন্নিবিষ্ট করিয়া দেন। তাঁহারা বলেন, ভারতবর্ষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যে আয় হইবে, তাহা হইতে রাজ্যরক্ষার জন্য, সৈন্য-সামন্তের জন্য এবং সিভিল ও মিলিটারীর জন্য খরচ হইয়া যে টাকা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা হইতে ঋণের সুদ দিয়া যে টাকা বাকী থাকিবে, তাহা হইতে প্রতি বৎসর অন্ততঃ এক লাখ টাকা এ দেশীয় লোকের শিক্ষার জন্য ব্যয় করিতে হইবে। পার্লামেণ্টে এই আইন বিধিবদ্ধ হইলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টর এই আইনের একটা টিপ্পনী করিয়া বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের কাছে একখানি চিঠি লিখেন। এই এক লাখ টাকা কি করিয়া খরচ করিতে হইবে, সেই চিঠিতে তাহা নির্দ্দেশ করেন। পার্লামেণ্টের অ্যাক্ট আছে—"প্রতি বৎসর অতিরিক্ত রাজস্বের টাকা হইতে অন্যূন এক লক্ষ টাকা লইয়া দেশীয় সাহিত্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা ও পুষ্টিসাধন করিতে এবং দেশীয় শিক্ষিত পণ্ডিত লোককে উৎসাহ দান করিতে হইবে।"

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টর বিলাত হইতে টিপ্পনীতে লিখেন—"এই ধারায় দুইটি বিশেষ প্রস্তাব সম্বন্ধে বিচার আলোচনা করিতে হইবে। প্রথম, দেশীয় পণ্ডিত লোককে উৎসাহ দান করিতে হইবে ও সাহিত্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে; দ্বিতীয়,—দেশীয়গণের মধ্যে বিজ্ঞান শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে।" ইঁহারা একবারে শিক্ষার পদ্ধতি উল্টাইয়া দিলেন, পরে যেটা ছিল, সেটাকে ইঁহারা আগে লইয়া আসিলেন এবং আগেরটা শেষে দিলেন। তাহার পর লিখিলেন—"যেখানে হিন্দু পণ্ডিতরা আমাদের সঙ্গে একমত হইবে, সেখানে (স্কুল-কলেজ না করিয়া) তাহাদের গৃহে গৃহে বিদ্যাদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে।" তাহার পর বলিতেছেন- "রাজনীতির দিক্ হইতে দেখিতে গেলে অর্থাৎ কিসে রাজ্য রক্ষা হয়, কিসে ইংরাজের প্রভু-শক্তি রক্ষা ও বৃদ্ধি হয়, তাহাদের সম্পদ্ বৃদ্ধি হয়, সে দিক্ হইতে দেখিতে গেলে ইহার দ্বারা অনেক সুফল পাওয়া যাইতে পারে।" কেমন করিয়া? "কাশীধামের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইবে। এই একটা তীর্থস্থান, এখানে সকল প্রদেশ হইতে সকল শ্রেণীর হিন্দু কখনও না কখনও আসে।" মুসলমানের শক্তি তখন একরকম শেষ হইয়া আসিয়াছে। মোগলরা পঙ্গু হ য়া পড়িয়াছে। তাহারা যে উঠিয়া আবার কিছু করিতে পারিবে, সে আশঙ্কা নাই; কিন্তু মোগল সাম্রাজ্যের ভগ্নাবশেষ হইতে দুইটি ক্ষাত্রশক্তি জাগিয়া উঠিয়াছে (১) দাক্ষিণাত্যে মারাট্টারা, (২) পশ্চিমে শিখরা। তখন এই দুই শক্তি ইংরাজের প্রাণে বিভীষিকা জাগাইয়া দিয়াছিল, সেই জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টর বলিতেছেন,—"কাশী আমাদের হাতে আসিয়াছে। এমন একটা যন্ত্র হস্তগত হইয়াছে, যাহার সাহায্যে আমরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের অভিজাতবর্গের ও জনসাধারণের সঙ্গে পরিচিত হইতে পারিব, এবং তাঁহাদের মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিতে সমর্থ হইব। কাশী মারাট্টাদিগের প্রধান কেন্দ্রস্থান। এখনও কাশীতে অনেক মন্দির আছে, যাহা মহারাষ্ট্র ছত্রপতিরা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং রাজনীতির ভাবে দেখিতে গেলে বেণারসে একটা শিক্ষার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করা উচিত।"

আর কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগের জন্য সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কেন? সংস্কৃতে যে আইন আছে, ধর্ম্মশাস্ত্র আছে, লোক সকল কি ভাবে কর্ম্মাকর্ম্মে পরিচালিত হইবে, তাহার বিধি-ব্যবস্থা আছে, তাহা জানিলে রাজকার্য্যপরিচালনে সুবিধা হইবে,—এই নিমিত্ত সংস্কৃত শিখিবার প্রয়োজন।

রসায়নশাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ আছে, যে সকল য়ুরোপীয় ডাক্তারী ব্যবসা করিবেন, ঐ সকল গ্রন্থ জানা থাকিলে তাঁহাদের উপকার হইতে পারে। সংস্কৃতে গণিত, জ্যোতিষ, জ্যামিতি, বীজগণিত আছে। য়ুরোপে এই সকল শাস্ত্রের যতটা উন্নতি হইয়াছে, এখানে ততটা উন্নতি হয় নাই বটে, কিন্তু যাহা আছে, তাহার সূত্র অবলম্বন করিয়া সরকারী কর্ম্মে যাহারা নিযুক্ত হইবে, তাহাদের সঙ্গে দেশের লোকের যোগস্থাপনের একটা উপায় হইবে,—ইহাই ইংরাজের উদ্দেশ্য।

তাই ইংরাজ স্থির করিলেন যে, ইংরাজ কর্ম্মচারীরা যাহাতে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কেবল যে আমাদের উপকারের জন্য পার্লামেণ্ট এই টাকা দিয়াছেন, তাহা নহে, এই টাকাটার খরচের ভার যাহাদের উপর পড়িল, তাহারা কেবল আমাদের

কল্যাণের জন্য যে তাহা করিয়াছেন, তাহা নহে, তাহাদেরও স্বার্থ খুব ঘনিষ্ঠভাবে ইহার সঙ্গে জড়িত ছিল। বৃটিশ-সাম্রাজ্যের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সংস্কৃত-সাহিত্য শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া সরকার ইংরাজ কর্ম্মচারীর ও এ দেশীয়দের মধ্যে পরস্পর শ্রদ্ধাপ্রীতি উৎপাদনের চেষ্টা করিলেন।

পার্লামেণ্ট যে উদ্দেশ্যে টাকা দিলেন, কোর্ট অফ্ ডিরেক্টাররা যে উদ্দেশ্যে তাহা খরচ করিতে চাহিলেন, তাহা কিন্তু কার্য্যে পরিণত হইল না। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজের গভর্ণর স্যার টমাস মনরো এক মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন। তাহা দেখিলেই তখনকার ইংরাজদের মনের ভাব বুঝিতে পারা যায়। সেই মন্তব্য এইরূপ ;—

"আমরা দেশের ভৌগোলিক ও কৃষিসম্বন্ধীয় জরীপ করিয়াছি, আমরা দেশের ধন-সম্পদের অবস্থা এবং লোকসংখ্যা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি। কিন্তু দেশের শিক্ষার অবস্থা জানিবার বিষয়ে কোনও কাযই করি নাই বলিলে হয়।"

যদি তাঁহারা সে অনুসন্ধান করিতেন, তবে জানিতে পারিতেন, এখন আমরা যতটা নিরক্ষর হইয়া পড়িয়াছি, ইংরাজ আসিবার পূর্ব্বে ততটা নিরক্ষর দেশের লোক ছিল না. গ্রামে গ্রামে পাঠশালা ছিল, মুসলমানদের জন্য মোক্তব ও মাদ্রাসা ছিল, প্রত্যেক মসজেদে কোরাণপাঠ হইত। সেই জন্য মুসলমানরা আরবী শিখিত, হিন্দুদের জন্য গ্রামে গ্রামে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু ইংরাজ-শাসন যতই বিস্তৃত হইতে আরম্ভ হইল, এই সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ততই নষ্ট হইয়া গেল। সার টমাস মনরো বলিয়াছিলেন,—"আমরা শিক্ষা বিষয়ে কিছুই করি নাই। এ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অতি সামান্য—আংশিক মাত্র।"

ইংরাজ আসিবার পূর্ব্বে আমাদের শিক্ষার অবস্থা কি ছিল, তাহা যখন তাঁহারা অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করেন, তখন এমন ২।১টি বিষয়ে তাঁহাদের চোখ পড়িল, য়ুরোপে পর্য্যন্ত যাহার অনুকরণ হইয়াছে। উহা মনিটারী সিষ্টেম। যাহারা পড়াতে একটু আগাইয়া গিয়াছে, এমন পড়ুয়া দ্বারা নীচের পড়ুয়াদের শিক্ষার ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত শিক্ষিতের দ্বারা—যাহারা ততটা শিক্ষিত নহে, তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি বিলাতে এখন খুব প্রচলিত হইয়াছে। মাদ্রাজের এক জন মিশনারী এ সম্বন্ধে বিলাতের কাগজে লিখেন। তাহার জন্য বিলাতে ও য়ুরোপের অন্যান্য দেশে এই শিক্ষাপদ্ধতি খুব প্রচলিত হইয়া পড়ে। ইংরাজ স্বীকার করিয়াছেন, এই নূতন ধরণের শিক্ষাপ্রণালী আমাদের নিকট হইতে গিয়াছে, পাণিনি দর্শনে শিক্ষা সম্বন্ধে যে বিধান আছে, তাহাতে বলা হইয়াছে,—যে কয়টা ধাপে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়, অধ্যাপনা তাহার শেষ ধাপ। প্রথমে শব্দজ্ঞান, মুখে মুখে শিক্ষা অর্থাৎ কান দিয়া খালি কথা শুনিতে হইবে, ক্রমে ক্রমে তাহার অর্থবোধ করিতে হইবে, অভিধান, কোষ, ব্যাকরণ ইত্যাদির সাহায্যে তাহার অর্থ নির্ণয় করিতে হইবে। সকলের শেষে অধ্যাপনা, যাহা তুমি শিখিয়াছ, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা আর এক জনকে শিখাইতে না পারিতেছ, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার শিক্ষা সাবুদ হইল কি না প্রমাণ হয় না। এই জন্য আমাদের পণ্ডিতদের লক্ষ্য অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা, এক দিকে পড়া, আর এক দিকে পড়ান, ইংরাজীতে ইহাকে বলে reproduction. Reproduction না হইলে কোন জিনিষ সফল হয় না। Reproduction অর্থে আর এক জনকে দান করা, শেখান। আজকাল প্রথম শ্রেণী অর্থে দশম শ্রেণী। আমরা আরম্ভ করিতাম ৮ম শ্রেণী হইতে, ক্রমশঃ ৭ম, ৬ষ্ঠ, ৫ম, এই ভাবে উঠিতাম। এখন ফার্ষ্ট ক্লাশ ১০ম শ্রেণী বা ম্যাট্রিক ক্লাস। সে যাহা হউক, প্রাচীনকালে নিয়ম ছিল,—এই ১০ম ক্লাশের ছেলেরা—৭ম, ষষ্ঠ, ৫ম ক্লাশের ছেলেকে পড়াইবে। শিক্ষার এই ব্যবস্থার কথা প্রথমতঃ মিঃ বেল ইংলণ্ডে প্রকাশ করেন। তাহার পর আমেরিকা ও য়ুরোপের নানা স্থানে এই শিক্ষাপ্রণালী গৃহীত হয়।

আমাদের প্রাচীন শিক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে এখানে দুইটি প্রমাণ উদ্ধৃত করিতে পারি। লাড্‌লু তাঁহার "হিষ্ট্রী অব বৃটিশ ইণ্ডিয়া" পুস্তকে বলেন,—"প্রাচীন হিন্দুর গৃহমাত্রেই বালকবালিকারা লিখিতে, পড়িতে এবং অঙ্ক কষিতে পারিত। এখন যেখানে আমরা আমাদের ব্যবস্থা দ্বারা প্রাচীন গ্রামের এই ব্যবস্থা ভাসাইয়া দিয়াছি, সেখানেই গ্রাম্য পাঠশালার অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে। বাঙ্গালা দেশ ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।"

তাহার পর দাক্ষিণাত্য সম্বন্ধে এল্‌ফিন্‌ষ্টোন ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছিলেন,—"আমরা যে ভাবে শাসনকার্য্য চালাইতেছি, তাহার ফলে লোকের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চ্চা

কমিয়া যাইবে। এমন কি, বর্ণজ্ঞান পর্য্যন্ত লোপ পাইবে। ব্রাহ্মণদের মধ্যে লেখাপড়ার হ্রাস, পরন্তু ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির মধ্যেও সেই শিক্ষা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে না।

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক দেশীয় লোকের শিক্ষার জন্য এক লক্ষ টাকা দেওয়া হইল। ১০ বৎসর পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে কিছুই করা হইল না, কেবল নথীপত্র চলাচল হইতে লাগিল। বিলাত ও এ দেশের কর্ত্তাদের মধ্যে চিঠি-পত্র লেখা-লেখিই চলিল, কাযে কিছুই হইল না। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালাদেশে এক "কমিটী অব পাবলিক ইনষ্ট্রাক্শান" প্রতিষ্ঠিত হইল। তাহার সেক্রেটারী হইলেন সংস্কৃতজ্ঞ হোরেস হেমেন উইলসন। আধুনিক বাঙ্গালা ও ভারতের সাধনা তাঁহার কাছে অনেক বিষয়ে ঋণী। তিনিই প্রথমে সংস্কৃতের ভাণ্ডার উদ্‌ঘাটিত করিয়া তাহা হইতে অনেক অমূল্য জিনিষ বাহির করিয়াছিলেন। কিন্তু এক দিকে যেমন তাঁহার সংস্কৃতভাষানুরাগ অসাধারণ ছিল, অন্য দিকে তেমনই তাঁহার স্বজাতিপ্রেমও অসাধারণ ছিল। ভারতবর্ষের লোকরা পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানে উন্নত হয়, ইহা তিনি আদৌ ইচ্ছা করিতেন না। সুতরাং এমন ব্যক্তি যখন "কমিটী অব পাবলিক ইনষ্ট্রাকশনের" সম্পাদক বা প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা হইলেন, তখন পাবলিক ইনষ্ট্রাকশন কিরূপ হইবে, সহজেই তাহা অনুমেয়। আমি তাঁহার প্রতি অবিচার করিতেছি না। উইলসন প্রথমতঃ ডাক্তার হইয়া এ দেশে আসেন, কিন্তু এখানে আসিয়া ডাক্তারী করেন নাই, তিনি নিজেকে সংস্কৃত অধ্যয়নে নিয়োজিত করেন এবং সংস্কৃত ভাষাতত্ত্ব বা 'ফাইললজি' সম্বন্ধে অনেক তথ্য আবিষ্কার করেন। তিনি নিজে সংস্কৃত পড়িয়াছিলেন, সংস্কৃতের প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল; সুতরাং তাঁহার উদ্দেশ্য হইল, পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত টাকাটা যেন সংস্কৃত শিক্ষাবিস্তারে ব্যয় হয়। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে যখন পার্লামেণ্টের একটা কমিশন বসে, তখন উইলসনের ভিতর-কার অভিপ্রায় প্রকাশ হইয়া পড়ে। প্রশ্ন হইল, এ দেশের লোকদিগকে কোম্পানীর অধীনে চিকিৎসা আদি বিষয়ে উচ্চ পদে নিযুক্ত করা যাইবে কি না, এ দেশের লোক আই, এম, এস, হইতে পারিবে কি না? তিনি বলিলেন, —"এরূপ করিলে য়ুরোপীয়দিগের জন্মগত সংস্কারের বিপক্ষে কায করা হইবে।"

আজ এক শত বৎসর পরে সেই একই কথা উঠিয়াছে, দেশীয় ডাক্তাররা য়ুরোপীয়দিগের চিকিৎসা করিতে পারি-লেও য়ুরোপীয় মহিলার চিকিৎসা করিতে পারিবে কি না, ইহা সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যেখানে য়ুরোপীয় অধিবাসী আছে, সেখানে দেশীয় ডাক্তার সিভিল সার্জ্জন হইতে পারিবে না আপত্তি উঠিয়াছে। আমি জানি, অনেক কৃতবিদ্য দেশীয় ডাক্তারকে কোণঠাসা করিয়া রাখা হই-য়াছে, এই কারণে যে, ইংরাজরা তাঁহাদিগের চিকিৎসাধীনে থাকিতে সম্মত হয়েন না। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে হেমেন উইলসন সেই কথাই বলিয়াছেন। আজ ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে সেই একই কথা উঠিয়াছে। উইলসন বলিয়াছিলেন,—"দেশীয় ডাক্তাররা চিকিৎসা-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হইলেও য়ুরো-পীয়রা তাহাদিগকে কিছুতেই পছন্দ করে না—তাহাদের বিপক্ষে তাহাদের একটা বদ্ধমূল অন্ধ অবিশ্বাস আছে। বিলাতে এ দেশীয়রা ডাক্তারী শিক্ষা করিতে গিয়া বিশেষ কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছে; মিঃ চক্রবর্ত্তী তাহাদের মধ্যে অন্যতম। অথচ ভারতের প্রবাসী য়ুরোপীয়ানরা তাঁহাকেও পছন্দ করে না।"

ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে হেমেন উইলসন এক-বারেই রাজী ছিলেন না। পার্লামেণ্ট কমিটী তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন,—"ভারতবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলে কেমন হয়?" তিনি বলিলেন,—"ভারতবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া কি উপকার হইবে, বুঝি না। নেটিভরা বি, এ, এম, এ, হইয়া নিজের দেশের লোকের নিকট কি সম্মান পাইবে? য়ুরোপীয়দের নিকট ত তাহাদের কোনও কদর থাকিবেই না। এই উপাধির জোরে তাহারা য়ুরোপীয়দের মধ্যে যদি উচ্চ স্থান পায়, তাহা হইলে য়ুরো-পীয়রা সন্তুষ্ট হইবে না।"

উইলসন ইংরাজী শিক্ষার বিরোধী ছিলেন, সুতরাং ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে যখন কমিটী প্রতিষ্ঠিত হইল এবং হেমেন উইলসন তাহার সেক্রেটারী হইলেন, তখন ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে, সেই কমিটী কিছুই করিলেন না। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে কমিটী শুধু এই একটা প্রস্তাব পাশ করিলেন যে, ঐ ১ লক্ষ টাকা দিয়া ভাল মাদ্রাসা ও সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করা যাউক। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ধারণা ছিল, দেশের লোক ইংরাজী শিক্ষা পছন্দ করিবে না। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে

কলিকাতা সহরের ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, কায়স্থ ও অন্যান্য ধনী ও অভিজাতবর্গ সার এডওয়ার্ড হাইড ইষ্টের বাড়ীতে সম্মিলিত হইয়া একটা ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। উহা পরে হিন্দু কলেজে পরিণত হইয়াছে। সভাতে ৫০ হাজার টাকা উঠে। তাহার পর আরও ৫০ হাজার উঠিয়াছিল। এই টাকা মতিলাল শীল, রাধাকান্ত দেব প্রভৃতি রক্ষণশীল হিন্দুরা চাঁদা করিয়া উঠাইয়া দেন। সার এডওয়ার্ড হাইড ইষ্ট সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। তাঁহার বাড়ীতে যাঁহারা সভা করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার নিকট গিয়া বলিয়াছিলেন, "সভার কার্য্য আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে আপনাকে একটু অন্য ঘরে আসিতে হইবে।" তিনি অন্য ঘরে গেলেন, তখন কয়েক জন ব্রাহ্মণপণ্ডিত তাঁহার সম্মুখীন হইয়া করযোড়ে হাত বাড়াইয়া দিলেন। তিনি ভাবিলেন, ইঁহারা বোধ হয় করমর্দ্দন করিতে চাহিতেছেন; কিন্তু ইঁহারা ত আমাদিগকে স্পর্শ করেন না। তখনকার দিনে এমন লোক ছিল, যাহারা ইংরাজের বাড়ীতে কায করিত, অথচ বাড়ী ফিরিবার পূর্ব্বে আফিসের পোষাক শুদ্ধ গঙ্গায় অবগাহন-স্নান করিয়া গৃহপ্রবেশ করিত। ইঁহারা যখন হাইড ইষ্টের সম্মুখে হাত আগাইয়া দিলেন এবং তিনি প্রায় করমর্দ্দন করিতে যাইতেছেন, তখন তাঁহাদের বদ্ধহস্ত মুক্ত হইলে তিনি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন, তাঁহাদের হাতে সুগন্ধি ফুল রহিয়াছে এবং সেই ফুল তাঁহারা তাঁহাকে উপহার দিতে যাইয়া বলিলেন, "এই ফুলের সুগন্ধ যেমন চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়াছে, সেইরূপ তুমিও চেষ্টা কর—যাহাতে জ্ঞানের সুগন্ধ, জ্ঞানের আলোক চারিদিকে বিকীর্ণ হয়।" যাঁহারা হিন্দু-কলেজ প্রতিষ্ঠা করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহাদের ভাব কিরূপ ছিল! সার এডওয়ার্ড হাইড ইষ্ট তাঁহার ভগিনীকে পত্র লিখিতে গিয়া এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সেই পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা হইতে এই সংবাদ আমরা সংগ্রহ করিয়াছি।

যাহা হউক, ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে "কমিটী অব পাবলিক ইন্‌ষ্ট্রাক্‌শন" এক প্রস্তাব করিলেন,—"এ দেশে ইংরাজী শিক্ষা দিলে চলিবে না, দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।" হেমেন উইলসন বলিলেন, "ইংরাজী শিখিলে এ দেশের লোক য়ুরোপীয়দের সমকক্ষ হইতে চেষ্টা করিবে, সুতরাং তাহা কিছুতেই হইতে পারে না।" তাঁহারা স্থির করিলেন, ১ লক্ষ টাকা দিয়া সংস্কৃত কলেজ এবং মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করিবেন। এই সময় রাজা রামমোহন রায় অগ্রসর হইলেন। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে তিনি লর্ড আমহার্ষ্টকে যে চিঠি লিখেন, তাহাতে তিনি এই প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি লিখেন, "আমরা শুনিয়াছিলাম, সদাশয় পার্লামেণ্ট এ দেশের লোকের শিক্ষার জন্য কিছু টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন। আমরা ভাবিয়াছিলাম, সেই টাকা আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষাবিস্তারের জন্য খরচ হইবে। এখন শুনিতেছি, সংস্কৃত ও আরবী শিক্ষার জন্য সেই টাকা ব্যয়িত হইবে।" এই প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া রাজা রামমোহন রায় লর্ড আমহার্ষ্টকে যখন চিঠি লিখেন, তখন হইতে দ্বন্দের সূত্রপাত হয়। এক দল বলিলেন, "ইংরাজী শিক্ষা দিও না, য়ুরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষাও দিও না, সে আলোক এ দেশে আসিতে দিও না।" আর এক দল বলিতে লাগিলেন, "ঐ আলোক আনিতে হইবে, ঐ শিক্ষা দিতে হইবে।" এক দলের নাম অরিএণ্টেলিষ্ট, আর এক দলের নাম এ্যাংলিসিষ্ট দুই দলে তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া গেল। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই সংগ্রাম চলিল।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

ভাগ্যহত

মোর—ঘুম তো ভাঙে নি হায়!
সে যে—এসেছিল ওগো অতি ভোরে ভোরে
আমার আঙ্গিনায়।
সে যে—বাজাইয়ে গেছে মুরলী তাহার
আমার ঘুমের ঘোরে;
সে যে—নাচাইয়ে গেছে পরাণ আমার
কোমল মধুর স্বরে।

সে যে এসেছিল ভাবি নাই তাহা,
ভাবিনু স্বপন কি মধুর আহা!
প্রাতে উঠে দেখি বাঞ্ছিত মোর
এসে ফিরে গেছে হায়!
চরণ-চিহ্ন পড়ে আছে শুধু
ছোট মোর আঙ্গিনায়।

শ্রীসত্যজীবন বসু

৫৪

সেই দিন বৈকালে অপর কোন বিশেষ কায না থাকায় ডাক্তার ভাদুড়ীর নিকট যে ঠিকানাটা জানিয়া আসিয়াছিলাম, তাহার সন্ধান করিবার জন্য হাতীবাগানে বেড়াইতে গেলাম। আমাদের পল্লী হইতে হাতীবাগান অল্পই দূরে। সেখানে পৌছিয়া ঠিকানা অনুযায়ী বাড়ী খুঁজিয়া পাইতে বেশী বিলম্ব হইল না; কিন্তু সেই বাড়ীতে ও তাহার কাছাকাছি সব যায়গায় উমাপতির স্ত্রীর অনুসন্ধান করিতে সময়ও যথেষ্ট লাগিল, অথচ ফলও কিছুই হইল না। ডাক্তার সকালে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার বেশী আর কিছু জানিতে পারিলাম না। কাযেই ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে ফিরিয়া চলিলাম।

সামান্য দূর অগ্রসর হইতে না হইতে কাহার একখানা হাত আমার বামস্কন্ধের উপর পড়িয়া সবলে আমার গতিরোধ করিবার চেষ্টা করিল। আমি চমকিত হইয়া ফিরিয়া দেখিলাম, হাতখানার মালিক আর কেহ নহে, স্বয়ং ইন্‌স্পেক্টার গাঙ্গুলী মহাশয়। আমাকে কোন কথা কহিবার অবকাশ না দিয়াই তিনি সহাস্যে বলিলেন, "অরুণ বাবু, হঠাৎ এ দিকে কি মনে ক'রে?"

আমার চমক ভাঙ্গিলে আমিও হাসিয়া বলিলাম, "এ দিকটা যে 'সি আই ডী'র খাস দখলে এসেছে, তা জানতুম না বলেই বোধ হয় এসে পড়েছি।"

"বেশ! যখন 'সি আই ডী'র দখলে এসে পড়েছেন, তখন 'সি আই ডী' আপনাকে সহজে ছাড়ছে না।—এই আপনাকে 'অ্যারেষ্ট' ক'রে নিয়ে চল্লুম।" বলিয়াই আমার হাতের মধ্যে তাঁহার হাত দিয়া আমাকে একরকম জোর করিয়াই ফিরাইয়া লইলেন এবং টানিতে টানিতে পার্শ্ববর্ত্তী একটা বাড়ীর দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন।

আমি কিছু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "ব্যাপারটা কি বলুন দেখি?"

"এমন বেশী কিছু নয়; এ দিকে যখন এসেইছেন, তখন গরীবের এই সামান্য আস্তানায় একবার—"

"ওঃ! তাই বলুন; আপনার এইখানে বাড়ী? তা জানলে একবার কেন, এত দিনে হাজারবার আপনার এখানে এসে উৎপাত করতুম। তাই বুঝি আগে এ কথা কখনও জানান নি!"

"তা বটে! আপনারা হলেন উকীল মানুষ,—কথায় ত পারবার যো নেই!—যা হোক, এখন আসুন, ভিতরে বসবেন চলুন।"

তৎপরে যথেষ্ট সৌজন্যের সহিত তিনি আমাকে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া গিয়া বাহিরের ঘরে বসাইলেন এবং আমার সকল আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া, চা ও জলযোগের ব্যবস্থা করিলেন। পাঁচ রকম কথার পর তিনি নিজেই হানা বাড়ীর খুনের কথা পাড়িয়া, সে সম্বন্ধে আমি নূতন কোন সন্ধান বাহির করিতে পারিলাম কি না, জানিতে চাহিলেন। তখন অন্ততঃ তাঁহার এতটা সৌজন্য ও অতিথেয়তার প্রতিদান হিসাবেও, এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু ঘটিয়াছে, সবই সংক্ষেপে তাঁহাকে বলিতে হইল। শেষে আজ এখন কি উদ্দেশ্যে এ দিকে আসিয়াছিলাম ও তাহা যে সম্পূর্ণ বিফল হইল, তাহাও বলিলাম।

সব শুনিয়া নলিনী বাবু বলিলেন, "তাই ত, অরুণ বাবু! আপনি ত তা হ'লে কাযটা একরকম প্রায় শেষ করেই ফেলেছেন দেখছি। আমাদের 'সি আই ডী'কে বেশ রীতিমত টেকা মেরেছেন বলতে হবে!—এখন সামান্য যেটুকু বাকী আছে—"

"বাকী যা আছে, তা যে নিতান্ত 'টুকু' বা 'সামান্য', তা ত আমার মনে হয় না। যে লোকটা হানা বাড়ীতে বাস করছিল, সে যদি উমাপতি সরকারই হয় ত সে কেনই বা ওখানে থাকত, আর তাকে কে কি জন্য খুন করলে,—এই প্রধান কথাগুলোই ত এখনও কিছুই জানা যায়নি। অতএব আমার উপর যে সব প্রশংসা বর্ষণ করলেন, সেগুলা ঠিক উপযুক্ত ক্ষেত্রে পড়ল ব'লে মনে

করতে পারি না। সে যা হোক, এখন সৌভাগ্যক্রমে আপনাকে যখন আবার হাতে পেয়েছি, তখন আবার একবার আপনাকে এর মধ্যে না টেনে এনে ছাড়ছি না, মশায়!"

"আমাকে আবার নতুন ক'রে টানবেন কি, অরুণ বাবু! আমি ত গোড়া থেকেই এই অনুসন্ধানে জড়িয়ে আছি। তবে এ পর্য্যন্ত কিছু যে করতে পারি নি, সেটা আমারই দুরদৃষ্ট,—সে কথা আপনাকে বলতে এখন আর আমার কোন দ্বিধা নাই। যা হোক, আমা দ্বারা এখনও যা কিছু সম্ভব, তা আমি অবশ্যই করতে প্রস্তুত আছি।"

"বেশ! তা হ'লে এখন আপনার প্রথম কায, ঐ উমাপতির স্ত্রীর সন্ধান করা। তাকে যদি খুঁজে বার করতে পারেন, তা হ'লে খুনী আসামীকে বার করা বেশী দুরূহ হবে না বোধ হয়।"

"এ কাযটা আমি বোধ হয় খুব শীঘ্রই শেষ করতে পারবো। কালপরশুর মধ্যেই হয় ত সে মাগীর সন্ধান আপনি পেতে পারবেন।"

"বলেন কি! কাল-পরশুর মধ্যে?"

"খুব সম্ভব, তাই হবে। কারণ, যে বাড়ীর ঠিকানা আপনি বললেন, সে বাড়ী আমি জানি, তার মালিককেও আমি বিলক্ষণ চিনি। সে একবার কোকেনের একটা হাঙ্গামায় ধড়া প'ড়ে পুলিসকে নিজের দলের সব সন্ধান ব'লে দিয়ে খুব সাহায্য করেছিল। সেই জন্য সে নিজে খালাস পায়, আর সেই থেকে পুলিস তাকে হাতে রেখে, মাঝে মাঝে অনেক কায করিয়ে নেয়। লোকটা ভারী চালাক ও ধড়ীবাজ। কিন্তু, তা হলেও ওর ভাড়াটে ঐ মাগী প্রায় মাস দুই আগে ওকে ফাঁকি দিয়ে অনেক মাসের ভাড়া ফেলে রেখে বাড়ী ছেড়ে বেমালুম স'রে পড়েছে। লোকটা অনেক চেষ্টাতেও তার কোন সন্ধান না পেয়ে শেষে আমাদের শরণাগত হয়, এবং একটা বেশ পাকা গোয়েন্দার সাহায্যে মাগীটার সম্প্রতি সন্ধান পেয়েছে, শুনেছি। বিষয়টা আমাদের কোন কাযের সংক্রান্ত নয় ব'লে আমি এতে আগে মোটেই মনোযোগ দিই নি। তখন যদি জানতুম যে, এর সঙ্গে হানা বাড়ীর খুনের সম্পর্ক আছে, তা হ'লে কি এত দিন চুপ ক'রে থাকতুম?"

"যা হোক, এখন তা হ'লে একটু তৎপর হবেন।"

"সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকবেন। কিন্তু এর মধ্যে যে আর একটা মস্ত গুরুতর কথা উঠছে, সেটার বিষয় কি করা যাবে, তা ভেবেছেন কি?"

"কি কথা?"

"উমাপতির স্ত্রী ধরা পড়লে হয় ত হানা বাড়ীর খুনের সব রহস্য ভেদ হ'তে পারে; কিন্তু আপাততঃ যখন এ কথা নিঃসন্দেহে সাব্যস্ত হয়েছে যে, হত ব্যক্তি বর্দ্ধমানের বিহারী ঘোষ নয়, এবং বিহারী ঘোষ এখনও বেঁচে আছেন, তখন শ্রীমতী যমুনা ঘোষের দশা কি হবে? সে খুনী হোক, আর না-ই হোক, আপাততঃ মিথ্যা প্রবঞ্চনায় ইন্‌সিওরেন্সের টাকা হাসিল করার অপরাধে তার শ্রীঘরে বাস ত অনিবার্য্য!"

"শুধু তাঁর কেন, এ বিষয়ে যারা তাঁর সাহায্যকারী, তাদেরও ত তাই!"

"তারা কে?"

"তা ত এখনও ঠিক জানা যায় নি। ঐ উমাপতির স্ত্রীকে ধরতে পারলেই জানা যাবে।"

"সে ত পরে হবে। এখন আপাততঃ যমুনা ঘোষের ঐ গুরু অপরাধের কথা আমি যখন জানতে পেরেছি, তখন পুলিসের লোক হয়ে আমি ত চুপ ক'রে থাকতে পারি না।"

"কি করবেন তবে? তাঁকে কি এখনই গ্রেফ্‌তার করতে চান না কি?"

"হাঁ, তাই ত উচিত!"

"কিন্তু, তা হ'লে সঙ্গে সঙ্গে তার দলের লোকরা সব গা-ঢাকা দিয়ে ফেলবে। তাদের আর ধরতে পারবেন না।"

"তবে আপনি কি করতে বলেন?"

"আমার পরামর্শ আপনার মনে লাগবে কি না, জানি না; কিন্তু বোধ হয়, যতক্ষণ না উমাপতির স্ত্রীকে হস্তগত করা যায়, অন্ততঃ ততক্ষণ যমুনা ঘোষকে গ্রেফ্‌তার না ক'রে তার উপর গোপনে কড়া পাহারা লাগিয়ে রাখলে ভাল হয়। যেন পালাতে না পারে।"

"কিন্তু এ বিষয়ে আমি নিজের উপর দায়িত্ব রাখতে চাই না। আমি এখনই হেড আফিসে যাচ্ছি; সেখানে কর্ত্তারা যা হয় করবেন। কিন্তু বিহারী ঘোষের বেঁচে থাকার খবর আমরা যে জেনেছি, সে কথাটা যেন ঘুণাক্ষরেও না প্রকাশ হয়।"

আমি 'তথাস্তু' বলিয়া সে দিনের মত গাঙ্গুলী মহাশয়ের নিকট বিদায় লইলাম। [ক্রমশঃ।

শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

বেদান্তের বেদ্য

এ সংসারে সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বস্তু কি? ইহার উত্তর হইতেছে, আমিই আমার কাছে সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বস্তু। আমার সকল ব্যবহারের যাহা মূল উপাদান, সেই আমিই যে কে, তাহা আমরা যে কেহই ভাল করিয়া বুঝি না—ইহা অপেক্ষা অধিক বিস্ময়ের কারণ আর কি হইতে পারে বল দেখি? যাহার অপেক্ষা সুচির-পরিচিত এ সংসারে আমার কেহই নাই, যাহার জন্য এ সংসারে স্ত্রী-পুত্র, ধন-জন ও ঐশ্বর্য্য, সেই আমিই যে কে, তাহার নির্ণয় করা অপেক্ষা কঠিনতর সমস্যা মানবের পক্ষে আর কিছুই হইতে পারে না, এ কথা হয় ত অনেকের কর্ণে আপাততঃ উন্মত্তের প্রলাপ বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারে; কিন্তু সেই উপেক্ষার অট্টহাসে—"আমি কে?" এই মানবের অনাদি ও অনন্ত প্রশ্নের যে অণুমাত্রও মীমাংসা হইবে না, তাহা স্থির।

একটু ভাবিয়া বল দেখি ভাই, আমি কে? জননীর জঠর হইতে সদ্যোনির্গত শিশু যখন ছিলাম, আমার এই চিরপরিচিত আমিত্বের কোন খবর তখন আমার মগজে ছিল কি না, তাহা ত মনে পড়ে না। তাহার পর কবে কোন্ অজানা শুভ বা অশুভ মুহূর্ত্তে অকস্মাৎ কোথা হইতে এই আমিত্ব আসিয়া আমার দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সব জুড়িয়া জগদ্দল পাথরের ন্যায় আমাকে চাপিয়া পিষিয়া ফেলিবার উদ্যোগ করিয়াছে, তাহাও স্মরণ-পথে আসে না—সেই মুহূর্ত্ত হইতে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত—এই সুদীর্ঘ কাল ব্যাপিয়া এক ক্ষণের জন্যও এই আমিত্বের গুরুভার আমার বিলুপ্ত হয় নাই; কি স্বপ্নে, কি জাগরণে কিংবা সুষুপ্তির নিবিড় অন্ধকারে, আমার এই আমিত্ব সর্ব্বদাই আমাকে আমি করিয়া রাখিয়াছে, অথচ এই আমি যে কে, তাহা এক ক্ষণের জন্য এত দিনেও আমি বুঝিতে পারিলাম না, এ বিষম প্রহেলিকার সমাধান কে করিবে?

সংসারী মানব এই প্রহেলিকার সমাধান করিতে অগ্রসর হইয়া বলিয়া থাকে—এই দেহই আমি, আমি যাইতেছি, আমি খাইতেছি, আমি গৌর, আমি কাল, আমি স্থূল বা আমি কৃশ—এই সকল সর্ব্বানুভবসিদ্ধ ব্যবহারও আমাদিগকে তাহাই বুঝাইয়া দিতেছে। এই উত্তর কি ঠিক? ভাবিয়া দেখিলে, এই উত্তরের মধ্যে কিন্তু আমাকে আমি ধরিতে পারি না—কেন, তাহা বলি। দেহ আমার যে উপাদানে গঠিত হইয়াছে, তাহা যদি আমার বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্যে ভিন্ন ভিন্ন হয়, তাহা হইলে দেহও যে আমার ভিন্ন ভিন্ন হইবে, তাহা ত স্থির। বাল্যকালে যে অন্ন ও রস হইতে এ দেহ গঠিত হইয়াছিল, যৌবনের দেহের উপাদান অন্ন ও রস তাহা হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন; আবার যৌবনকালের দেহের উপাদান যে অন্ন ও রস, তাহা হইতে বার্দ্ধক্যের দেহের উপাদান অন্ন ও রস সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। তাহাই যদি হইল, তবে আমার বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্যের দেহ ত ভিন্ন ভিন্ন। আমি কিন্তু বাল্যকালের আমি হইতে যৌবনের বা বার্দ্ধক্যের আমাকে কিছুতেই ভিন্ন বলিয়া ক্ষণকালের জন্যও বিশ্বাস করি না। প্রত্যুত, আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, যে আমি শৈশবে খেলাধূলায় মাতিয়া থাকিতাম, সেই আমি যৌবনে রমণীর প্রেমে বিভোর হইয়াছিলাম, আবার সেই যৌবনের আমি আজ বার্দ্ধক্যের জীর্ণদেহে মরণকে নিকটবর্ত্তী জানিয়া, পরে আমার কি দশা হইবে, এই ভাবনায় অস্থির হইয়া দিনযাপন করিতেছি। বাল্যের ছোট-খাট দেহ কোথায় চলিয়া গিয়াছে, যৌবনের হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ দেহের সকল চিহ্ন অতীতের অব্যক্ত গহ্বরে বিলীন হইয়া গিয়াছে—আর আজ জরাজীর্ণ দুর্ব্বহ রোগ-ক্লিষ্ট দুর্ব্বল ও দুর্ব্বহ দেহ আমারই অসহনীয় ভার বলিয়া বোধ হইতেছে। এই ত আমার দেহের অবস্থা, প্রতিক্ষণে তাহার পরিবর্ত্তন হইতেছে। আমি কিন্তু সেই আমিই রহিয়াছি, এই জ্ঞান, এই বিশ্বাস থাকিতে আমি কেমন করিয়া বুঝিব, আমি দেহ ছাড়া আর কিছুই নহি? এই জন্য সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে,

দেহ আমি নহি, কিন্তু, দেহ আমার, সুতরাং দেহ হইতে আমি যে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্, তাহা ত সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

ইহার পর আর এক দল দার্শনিক অগ্রসর হইয়া বলিবেন, আমি যে দেহ নহি, তাহা সত্য হইতে পারে, কিন্তু, এই দেহের মধ্যে অবস্থিত যে চক্ষু, কর্ণ, ঘ্রাণ, শ্রোত্র ও ত্বক্ নামে কয়টি ইন্দ্রিয় আছে, সেই পাঁচটি ইন্দ্রিয় মিলিত হইয়াই ত আমি হইয়া পড়িয়াছি; সুতরাং এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ই 'আমি। এরূপ উত্তরও আশ্বাসজনক হয় না, কারণ, ইন্দ্রিয় নষ্ট হইলে ত আমি নষ্ট হই না—যাহার চক্ষু নাই, যাহার শ্রবণ-ইন্দ্রিয় নষ্ট হইয়াছে, নাসিকায় যে গন্ধ গ্রহণ করিতে পারে না, কর্ণ যাহার একবারে গিয়াছে, পক্ষাঘাত রোগে ত্বগিন্দ্রিয় যাহার স্পর্শশক্তিকে চিরদিনের জন্য হারাইয়াছে, সেও ত আপনাকে আমি বলিয়াই বুঝিয়া থাকে; ইন্দ্রিয় গিয়াছে বলিয়া যে সে গিয়াছে, এ কথা ত সে বিশ্বাস করে না, সুতরাং ব্যষ্টিভাবে বা সমষ্টিভাবে ইন্দ্রিয়ই যে আমি, এরূপ সিদ্ধান্তও কিছুতেই যুক্তিসহ হইতে পারে না।

তবে এ আমি কে?—অনেকে বলিয়া থাকেন, মনই আমি। নৈয়ায়িক প্রভৃতি দার্শনিকগণ কিন্তু তাহা মানেন না, তাঁহারা বলেন, মন কেমন করিয়া আমি হইবে? মন হইল আমাদের অন্তঃকরণ, সে ত প্রত্যক্ষ নহে, আমি কিন্তু আমার নিকট প্রত্যক্ষসিদ্ধ, মনের অস্তিত্ব আমরা অনুমান-প্রমাণের দ্বারা জানিতে পারি, অর্থাৎ সময়ে সময়ে আমাদের নয়নের বা শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সহিত রূপ বা শব্দ প্রভৃতি বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হইলেও আমরা রূপ দেখিতে পাই না বা শব্দ প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিতে পারি না; যদি সেই সেই ইন্দ্রিয়ের সহিত সেই সেই বিষয়ের সম্বন্ধ হইলেই প্রত্যক্ষ হইত, তাহা হইলে কেন এইরূপ হয়, এই জন্য কল্পনা করিতে হইবে যে, আমাদের মন বলিয়া এমন একটি অন্তরিন্দ্রিয় আছে, যাহার সহিত নয়নেন্দ্রিয়ের যোগ হইলে, তবে আমাদের সেই নয়নেন্দ্রিয় নিজের সহিত সম্বন্ধ রূপের জ্ঞান উৎপাদন করিতে পারে এবং তাহার সহিত যোগ না থাকিলে রূপের সহিত সম্বন্ধ হইয়াও রূপের প্রত্যক্ষ জন্মাইতে পারে না। এই প্রকার কল্পনা বা অনুমানের সাহায্যে আমরা আমাদের মনকে সিদ্ধ করিয়া থাকি, সুতরাং মন আমাদের কাছে অনুমেয়; তাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান আমাদের কখনই সম্ভবপর নহে। তাহাই যদি হইল, তবে সে অনুমেয় মন—আমার প্রত্যক্ষসিদ্ধ আত্মার স্বরূপ হইবে কি প্রকারে?

তবে কি বুদ্ধি আমার আত্মা? তাহাই বা হইবে কেমনে? সাংখ্য প্রভৃতি দার্শনিকগণের মতে বুদ্ধির ধর্ম্ম হইল কৃতি বা প্রযত্ন, এইরূপ ইচ্ছা, দ্বেষ প্রভৃতিও বুদ্ধির ধর্ম্ম বলিয়া অঙ্গীকৃত হয়। এই সকল ধর্ম্মযুক্ত যে বুদ্ধি, তাহা আমার আত্মা হইবে কিরূপে? কারণ, যাহা জ্ঞেয়, তাহা জ্ঞাতা হইতে পারে না; জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার কর্ম্ম হইল জ্ঞেয়, আর জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার যে কর্ত্তা, তাহাই হইল জ্ঞাতা। ক্রিয়া-মাত্রেরই স্বভাব এই যে, যে তাহার কর্ম্ম, সে তাহার কর্ত্তা হইতে পারে না। এই দেখ না কেন, অগ্নির ক্রিয়া হয় দাহ, সেই দাহরূপ ক্রিয়ার কর্ম্ম যে কাষ্ঠ প্রভৃতি, তাহাকে দাহই বলা যায়, সেই দাহক্রিয়ার যে কর্ত্তা অগ্নি, তাহা কখনই দাহ্য হইতে পারে না। সেইরূপ জ্ঞান বা প্রকাশ-রূপ ক্রিয়ার কর্ম্ম যে জ্ঞেয়, তাহা কখনই সেই জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার কর্ত্তা বা জ্ঞাতা হইতে পারে না। বুদ্ধি বা কর্ত্তা যদি আমাদের জ্ঞেয় বলিয়া অঙ্গীকৃত হয়, তাহা হইলে তাহা কখনই জ্ঞাতা হইতে পারে না, ইহা স্থির। এই ভাবে বিচার করিতে করিতে আমরা যতই অগ্রসর হইয়া থাকি, ততই আমার এই আমি আমার জ্ঞানের সীমাকে অতিক্রম করিয়া কোথায় অন্তর্হিত হইয়া পড়ে, তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, অথচ আমাদের সকলের দৃঢ় বিশ্বাস, আমি যেমন আমার কাছে পরিচিত ও প্রত্যক্ষসিদ্ধ, সেইরূপ আর কোন বস্তুই হইতে পারে না, অথচ বিচার করিয়া দেখিতে গেলে, আমার প্রত্যক্ষসিদ্ধ কোন বস্তুর মধ্যে এই আমির বা আমার আত্মার কোন অস্তিত্ব আমরা কেহই খুঁজিয়া পাই না। আত্মস্বরূপকে অবলম্বন করিয়া এই যে প্রহেলিকা, এই যে বিষম সমস্যা, এই প্রহেলিকা বা সমস্যার সমাধান করিবার জন্য মানুষ অতি প্রাচীনতম কাল হইতে ব্যতিব্যস্ত হইয়াই আছে, তাই যমরাজের অতিথি হইয়া নচিকেতা ব্যাকুল-ভাবে বরদানোদ্যত যমরাজকে বলিয়াছিলেন,—

"যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে
অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহং
বরাণাং মে এষ বরস্তৃতীয়ঃ।"

—কঠোপনিষৎ।

এই যে মানুষ মরিয়া থাকে দেখিতে পাওয়া যায়, এই মৃত্যুর পরও সেই মানুষের অস্তিত্ববিষয়ে লোক সন্দেহ করিয়া থাকে।

কেহ বলে, মৃত্যুর পরও সে থাকে, আবার কেহ বলে, দেহের সঙ্গে তাহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায়। হে যমরাজ, তুমি দয়া করিয়া এই বিষয়ে যাহা যথার্থ জান, তাহাই আমাকে উপদেশ কর। তুমি যে তিনটি বর আমাকে দিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি করিয়াছ, ইহাই আমার সেই তৃতীয় বর।

মরণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নিকট এইরূপ প্রার্থনা যে কেবল নচিকেতাই করিয়াছিল, তাহা নহে। যে দিন হইতে মানব এই সংসারে প্রবেশ করিয়াছে, সেই দিন হইতেই মানব এই আত্মতত্ত্ব জানিবার জন্য মৃত্যুর বিধাতা সেই আদিপুরুষ দেবতার নিকট ব্যাকুলভাবে এই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতেছে। শৈশবের ক্রীড়ার আবেশময় স্বপ্নজীবন যৌবনের জ্বালাময়ী লালসার প্রদীপ্ত আলোকে ভাঙ্গিয়া পড়িলে, কিছু-দিনের জন্য মানুষ মোহ-মদিরার দুরন্ত মত্ততায় বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া, ঐ সুখ ঐ সুখ করিয়া মরু-মরীচিকায় প্রলুব্ধ তৃষার্ত্ত মৃগের ন্যায় এদিকে ওদিকে ছুটাছুটি করিয়া থাকে, পরিশেষে বার্দ্ধক্যের সীমার কাছে দাঁড়াইয়া যখন অতীত ও বর্ত্তমানের বৈষম্যময় অবস্থানিচয়ের পরিবর্ত্তনশীলতার প্রতি চাহিয়া চাহিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া ক্লান্ত ও উদ্বিগ্ন হইয়া পড়ে, আর সেই অনন্ত পরিবর্ত্তনের মধ্যে অপরিবর্ত্তনশীল, অথচ যেন পরিবর্ত্তিত, দেহ মন ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির সহিত মেশা-মেশিভাবে নিয়ত অবস্থিত হইলেও যেন কাহারও সহিত মিশ্রিত নহে বলিয়া প্রতীত, চিরপরিচিত হইয়াও যেন নিতান্ত অপরিচিত-প্রায়—এই আমির দিকে ফিরিয়া চাহিতে আরম্ভ করে, তখন তাহাকে কে বলিয়া দিবে, তাহার শান্তি কোথায়? ধনে জনে মানে ঐশ্বর্য্যভোগে বা বিলাসে তৃপ্তি বা শান্তি যখন মানুষ খুঁজিয়া পায় না, তখন তাহার তৃপ্তি বা শান্তি পাইবার উপায় কি? আমার জন্য এ সংসার, অথচ আমি কে, তাহা জানিতে না পারায়, বিবেকী চিন্তাশীল মানবের হৃদয়ে জিজ্ঞাসার যে দারুণ পিপাসা প্রচণ্ড দাবা-নলের ন্যায় লেলিহান শিখাজাল বিস্তার করিয়া জাগতিক বস্তুমাত্রকেই অসহ্যভাবে প্রতপ্ত করিয়া তুলে, তখন তাহার সেই জিজ্ঞাসারূপ দারুণ পিপাসাকে মিটাইবার জন্য সে কোন্ চিরশান্ত অমৃত-সাগরে অবগাহন করিয়া শান্তি পাইবে, তাহার সন্ধান তাহাকে কে বলিয়া দিবে?

মানুষের রচিত বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, দর্শন, বার্ত্তা প্রভৃতি শাস্ত্র তাহাকে সে সন্ধান দিতে সমর্থ হয় না, কল্পনা-সহচরী কবিপ্রতিভার স্বপ্নাবেশ-বিজড়িত কাব্য-উপন্যাসও তাহার সম্মুখীন হইতে লজ্জা বোধ করে।

আত্মতত্ত্বোপলব্ধির জন্য সৃষ্টির আদি হইতে সমুদ্ভূত জীবের এই অনন্ত পিপাসাই বেদান্তে অর্থাৎ উপনিষদে যেমন ফুটি-য়াছে, তেমনটি বড় আর কোথায়ও দেখা যায় না। তাহার পত্রে পত্রে, মানবের এই শান্তির জন্য—চির-অশান্তিময় পিপাসা কত আকারে কত ভাবে যে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে, তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না।

ঐ শুন, উপনিষদের শান্তিময় ক্রোড়ে বসিয়া সেই অতৃপ্তিময়—অশান্তিময় মানবের আত্মজিজ্ঞাসা কি ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে।

"কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি
চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি॥'

—কেনোপনিষৎ।

কাহার ইচ্ছায় বা কাহার প্রেরণায় পরিচালিত হইয়া আমার মন বিষয়সমূহে নিপতিত হয়? আমার এই দেহ-যন্ত্রের সহিত যুক্ত করিয়া কে আমার প্রাণকে প্রথমে চালাইয়া দিয়াছে? কাহার ইচ্ছায় এই আমার বাগিন্দ্রিয় এত কথা বলিতে পারিতেছে? কে গো সে দেবতা, যে আমার নয়ন ও কর্ণকে রূপ ও শব্দের সহিত সম্বদ্ধ করিয়া দিতেছে?

এই প্রশ্নের সমাধান মানবের কল্পনাময়ী মনোবৃত্তির অতীত, তাই ভাবিয়া ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া সে পরিশেষে ইহাই স্বীকার করিতে বাধ্য হয়,—

"ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনঃ।
ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ॥"

—কেনোপনিষৎ।

চক্ষুঃ সেখানে পৌঁছায় না, বাগিন্দ্রিয়ের তাহা বিষয় নহে, মন তাহাকে ধরিতে পারে না; তাহা সামান্য জ্ঞানেরই

যখন বিষয় নহে, তখন তাহা বিশেষ বিজ্ঞান বা প্রত্যক্ষের বিষয় কি প্রকারে হইবে? তাই বলি, কোন্ প্রমাণের সাহায্যে বুঝিয়া লোক তাহার উপদেশ করিবে?

শুধু কি তাই, এই সর্ব্বাশ্চর্য্যভূত আত্মতত্ত্বকে কল্পনার সাহায্যে বা প্রমাণের পাশবন্ধনে বাঁধিয়া সম্মুখে হাজির করিয়া দেখিবার বা দেখাইবার জন্য সৃষ্টির আদি হইতে এই সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়া মানবের যত অধ্যবসায়, যত প্রযত্ন, যত পরিশ্রম—সেই সকলের পরিণাম কি হইয়াছে বা কি হইতে পারে, এক কথায় স্পষ্ট ভাষায় মুক্তলজ্জ হইয়া সে বিষয়ে উপনিষদ্ কি বলিতেছে? উপনিষদ্ বলিতেছে—

"যস্যামতং তস্য মতং
মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাম্
বিজ্ঞাতমবিজানতাম্।"
—কেনোপনিষদ্।

যাহার মতি তাহাকে ধরিতে পারে না, তাহার কাছে সে বস্তু মতির বিষয় হইতেও পারে, আর যে ভাবে—ইহা আমার মতির বিষয় হইয়াছে, তাহার পক্ষে সে বস্তু মননের বিষয়ই হইতে পারে না; কারণ, তাহা বিজ্ঞাতার অবিজ্ঞাত অথচ অবিজ্ঞাতার বিজ্ঞাত।

এই সর্ব্বাশ্চর্য্যের শিরোভূত অত্যাশ্চর্য্য আত্মতত্ত্ব বা আমি কে? ইহা যে জানিতে পারিয়াছে, সেই এ সংসারে আশ্চর্য্য মানুষ, তাই উপনিষদ্ বলিতেছে—

"আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনং
আশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ॥"

কোন অসাধারণ ব্যক্তি আশ্চর্য্যবৎ ইহাকে দেখিতে পায়, আবার কেহ বা আশ্চর্য্যের ন্যায় ইহার কথা কহিয়া থাকে। কোন ভাগ্যবান্ মানব আশ্চর্য্যের ন্যায় ইহার কথা শুনিয়া থাকে; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই আত্মতত্ত্বকে দেখিয়া বলিয়া বা শুনিয়াও কেহ ইহাকে প্রকৃত স্বরূপে জানিতে সমর্থ হয় না।

এই বিজ্ঞাতার অবিজ্ঞাত অথচ অবিজ্ঞাতার বিজ্ঞাত অত্যাশ্চর্য্যভূত আত্মতত্ত্বকে যে পর্য্যন্ত মানুষ জানিতে না পারে, সে পর্য্যন্ত সে অসম্পূর্ণ মানুষ, সে বাহিরে মানুষের আকারে প্রতীত হইলেও ভিতরে তাহার পশু হইতে কোন বৈলক্ষণ্যই নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

এই ভাবে আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসার অবশ্যম্ভাবিতা ও অত্যাবশ্যকতা প্রতিপাদন করিয়া উপনিষদ্ অবশেষে কি বলিতেছে? সে বলিতেছে—

"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥"

তাহাকে বিশেষভাবে জানিবার জন্য অর্থাৎ নিজের সাক্ষাৎকারাত্মক অনুভূতির বিষয় করিবার জন্য সেই আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তি সমিৎপাণি হইয়া, শ্রুতিপারংগত ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে।

তাই তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া দেবর্ষি নারদ এক দিন ব্রহ্মনিষ্ঠ—ব্রহ্মার মানসপুত্র—সনৎকুমারের নিকটে উপস্থিত হইয়া বিনীতভাবে আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন—

'অধীহি ভগব ইতি'

হে ভগবন্, আমাকে উপদেশ প্রদান করুন।

সনৎকুমার কহিলেন,—

'যদ্ বেথ তেন মোপসীদ ততস্তে ঊর্দ্ধং বক্ষ্যামি"

তুমি কতদূর জানিয়াছ, অগ্রে তাহা আমাকে জানাও, তাহার পর আমি তোমাকে জানাইব।

তখন নারদ বলিলেন—

ঋগ্‌বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্বেদং সামবেদমথর্ব্ববেদং চতুর্থমিতিহাসং পুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং, পিত্র্যং, রাশিং, দৈবং, নিধিং, বাকোবাক্যং, একায়নং, দেববিদ্যাং, ব্রহ্মবিদ্যাং, ভূতবিদ্যাং, ক্ষত্রবিদ্যাং, নক্ষত্রবিদ্যাং, সর্পদেবজনবিদ্যাং, এতদ্ভো ভগবোঽধ্যেমি। সোঽহং ভগবো মন্ত্রবিদস্মি নাত্মবিৎ, শ্রুতং হ্যেব মে ভগবদ্দৃশেভ্যস্তরতি শোকমাত্মবিদিতি। সোঽহং ভগবঃ শোচামি, তং মে ভগবান্ শোকস্য পারং তারয়ত্বি।"

আমি ভগবন্! ঋগ্‌বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও চতুর্থ অথর্ব্ববেদ পড়িয়াছি; পঞ্চম বেদরূপ ইতিহাস ও পুরাণ পড়িয়াছি, তাহার পর পিতৃবিদ্যা, রাশিবিদ্যা, দৈববিদ্যা, নিধিবিদ্যা, ন্যায়শাস্ত্র, একায়ন শাস্ত্র, দেববিদ্যা, ব্রাহ্মণবিদ্যা,

ভূতবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা, সর্পবিদ্যা, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি দেবযোনিবিদ্যা, এই সকল বিদ্যাই জানিয়াছি, সেই আমি কিন্তু, ভগবন্! আমাকে কেবল মন্ত্রবিদ্ বলিয়াই বোধ করিতেছি, আপনাদিগের ন্যায় মহাপুরুষগণের মুখে শুনিয়াছি, যে আত্মবিদ্, সেই সকল প্রকার শোক হইতে নিষ্কৃতি পায়। আমি কিন্তু সেই আত্মবিদ্ হইতে পারি নাই, সেই আমাকে আপনি ভগবন্! আত্মবিদ্যার উপদেশ দিয়া শোকরূপ অপার সাগরের পারে লইয়া চলুন, ইহাই প্রার্থনা করিতেছি।

নারদের অধীত এত প্রকার বিদ্যার পরিচয় পাইয়া সনৎকুমার বিস্মিত হইলেন না, ধীরভাবে অতি গম্ভীর স্বরে তিনি কেবল ইহাই বলিলেন—

"যদ্ বৈ কিঞ্চৈতদধ্যগীষ্ঠা নামৈবৈতৎ।"

তুমি যাহা কিছু পড়িয়াছ, তাহা সকলই নাম ছাড়া আর কিছুই নহে।

ব্রহ্মর্ষি সনৎকুমারের এই উত্তরই স্পষ্টভাবে আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতেছে মানুষ আপনি কে, এই বিষয় না বুঝিয়া আর যত কিছু বুঝে, সে বুঝা নামমাত্র, প্রকৃতবোধ তাহার হয় নাই, ইহা স্থির; কারণ, যে বুঝিবে, সেই যদি অবুদ্ধ থাকিয়া গেল, তবে সেই বোদ্ধার অবোদ্ধা যাহা কিছু বুঝিল, তাহাকে বোধ বলা যাইতে পারে না, তাহা অবোধের 'বোঝা' ছাড়া আর কি হইতে পারে? যে বোঝা হইতে ধনের বোঝা, মানের বোঝা বা ঐশ্বর্য্যের বোঝা বাড়িয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে শোকের পার বা দুঃখনিবৃত্তি হইবার সম্ভাবনা অণুমাত্রও নাই। কি সভ্য, কি অসভ্য, কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত, সকল মানুষই দুঃখ হইতে নিস্তার পাইতে সর্ব্বদাই কামনা করিয়া থাকে। যে জ্ঞানের প্রভাবে মানবের সেই দুঃখনিবৃত্তির কামনা পূর্ণ হইতে পারে না, তাহা বিষয়ী জীবের পক্ষে প্রশংসনীয় হইতে পারে, তাহাতে কিছুই আইসে যায় না। বিবেকীর পক্ষে, প্রকৃত মনুষ্যত্বকামীর পক্ষে, তাহা কিন্তু ভুয়া নাম ছাড়া আর কিছুই নহে, ইহাই হইল সনাতন হিন্দুধর্ম্মের সার রহস্য। এই রহস্যজ্ঞান যাঁহার নাই, তিনি যত বড়ই হউন না কেন, হিন্দুর অধ্যাত্মশাস্ত্র চিরদিনই তাঁহাকে ব্যবহারিক মানুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া আসিতেছে, তিনি পারমার্থিক মানুষ নহেন—হইতেও পারেন না। যাক্ সে কথা, এখন প্রকৃতের অনুসরণ করা যাক্।

এই ভাবে দেবর্ষি নারদের পরীক্ষা সমাপন করিয়া দিব্যর্ষি সনৎকুমার তাঁ[illegible]মি কে, ইহা বুঝাইবার জন্য যাহা বলিয়াছেন, তাহা চিরপুরাতন হইলেও চিরনূতন—তিনি বলিয়াছিলেন—"অথাত আত্মাদেশঃ। আত্মৈবাধস্তাৎ আত্মা উপরিষ্টাৎ আত্মা পশ্চাৎ আত্মা পুরস্তাৎ আত্মা দক্ষিণতঃ আত্মা উত্তরতঃ আত্মৈবেদং সর্ব্বং ইতি।"

এইবার তোমাকে আত্মার উপদেশ দিতেছি—আত্মা নীচে, আত্মা উপরে, আত্মা পিছনে, আত্মা সম্মুখে, আত্মা উত্তরে, আত্মা দক্ষিণে। হে নারদ! এ সংসারে যাহা কিছু আছে, ছিল বা থাকিবে, তাহা সকলই এই আত্মা।

এই অনন্ত বৈষম্যের সহিত মিশ্রিত হইয়া যাহা সর্ব্বদা একরূপ বিভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত, অনন্ত বিভিন্ন নামরূপাত্মক নিখিল প্রপঞ্চের সত্তা, যাহার সত্তারই উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই আত্মার স্বরূপ যে জানিতে পারিয়াছে, তাহার স্বরূপ কি, তাহাই বুঝাইবার জন্য আবার দিব্যর্ষি সনৎকুমার বলিতেছেন,—

"স বা এষ এবং পশ্যন্ এবং মন্বান এবং বিজানন্ আত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাট্ ভবতি, তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি। অথ যে অন্যথাতো বিদুরন্যরাজানঃ তে ক্ষয্যলোকা ভবন্তি, তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু অকামচারো ভবতি।"

যে মানব এই আত্মাকে এই ভাবে দেখে, এই ভাবে মনন করে এবং এই ভাবে আপনার বিশেষানুভূতির বিষয় করিতে সমর্থ হয়, তাহার আত্মাতেই অনুরাগ হয়, সেই আত্মার সহিতই ক্রীড়া করিয়া থাকে, তাহার নিত্য সহচর আত্মাই হইয়া থাকে। তাহার আত্মাই আনন্দ হয়। সেই প্রকৃতপক্ষে স্বরাট্ হইয়া থাকে, তাহার সকল লোকে ইচ্ছানুসারে বিচরণ করিবার সামর্থ্য লাভ হয়। আর, যাহারা এই ভাবে আত্মাকে না বুঝিয়া ভাবান্তরে বুঝিয়া থাকে, তাহারা স্বরাট্ হইতে পারে না, তাহারা অন্যের উপর রাজত্ব করিলেও আপনার উপর তাহাদের রাজত্ব সংস্থাপিত হইতে পারে না, সুতরাং সর্ব্বত্রই সকল অবস্থাতেই তাহার পরতন্ত্রতাই থাকিয়া যায়, সে কখনও স্বতন্ত্র হইতে পারে না।

ইহাই হইল বেদান্তপ্রতিপাদ্য আত্মতত্ত্ব। এই সর্ব্বব্যাপী—সর্ব্বাত্মভূত—সারাৎসার—পরাৎপর আমার আত্মা, তোমার আত্মা, বিশ্বমানবের সর্ব্বজীবের আত্মা, এই আত্মতত্ত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য উপনিষদ যে বিরাট আয়োজন

অনাদিকাল হইতে করিয়া রাখিয়াছে, এই প্রবন্ধে তাহার দিঙ্‌মাত্রই প্রদর্শিত হইল। অবসর পাইয়া ইহার আলোচনা আবার করিবার ইচ্ছা রহিল। পরিশেষে আর একটি কথা বলিবার আছে এই যে, সংবাদপত্র পড়িয়া, সভা-সমিতিতে যাইয়া অনেকেরই মনে হয়, হিন্দুজাতির মধ্যে স্বরাজ-সাধনার মঙ্গলকামনা বুঝি সত্য সত্যই জাগিয়া উঠিয়াছে। এই কামনার চরিতার্থতাসাধনের জন্য আসিন্ধু আহিমাচল একটা সঙ্ঘশক্তি জাগাইবার জন্য দেশের নেতৃবর্গ সামর্থ্যানুসারে চেষ্টাও করিতেছেন, কিন্তু এই স্বরাজ-সাধনার মূলভিত্তি কি, তাহার সন্ধান লইবার জন্য কয় জন মাথা ঘামাইয়া থাকেন, তাহাই জিজ্ঞাস্য। প্রাচীন ভারতের মহর্ষিগণ কিন্তু অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানকেই এই স্বরাজ-সাধনার মূলভিত্তি বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, আমার আত্মা বা তোমার আত্মা একই বস্তু, তোমার বা আমার আকারগত পার্থক্য থাকিলেও তুমি ও আমি বস্তুতঃ এক, এই সর্ব্বাত্মৈক্যবোধ ব্যতিরেকে মানবের মুক্তি বা বন্ধননিবৃত্তি গগন-কমলিনীর ন্যায় অলীক। ব্যক্তিগত ভোগলালসারূপ করাল রাক্ষসীর বিকট কবল হইতে নিজের বিষয়াসক্ত চিত্তকে উদ্ধার করিতে না পারিলে কেহই যথার্থ স্বরাজলাভে অধিকারী হইতে পারে না। এই মহান্ সত্যকে ভুলিলে চলিবে না, ভারতের বেদান্ত ঋষি সনৎকুমারের মুখ দিয়া অতি প্রাচীনকাল হইতেই এই কথাই আমাদিগকে শুনাইয়া আসিতেছে, তাই সনৎকুমার বলিয়াছেন, 'স স্বরাট্ ভবতি,—তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি' সেই (আত্মতত্ত্ববিদ্‌ই) স্বরাট্ হয়, সর্ব্বত্রই তাহার সকল ইচ্ছা পূর্ণ হইয়া থাকে।

আবার তিনিই বলিতেছেন,—

"অথ যে অন্যথা বিদুঃ অন্যরাজানঃ
তে—ক্ষয্যলোকা ভবন্তি তেষাং সর্ব্বেষু
লোকেষু অকামচারো ভবতি।"

আর যাহারা এই উপনিষদ্‌বেদ্য আত্মার সর্ব্বাত্মভাবকে না বুঝিয়া বিপরীতভাবে বুঝিয়া থাকে, তাহারা অপরকে নিজের রাজা করিয়া থাকে, তাহারা যে লোকেই থাকুক না কেন, সর্ব্বত্রই তাহাদের ইচ্ছা প্রতিহত হইয়া থাকে। ইহাই হইল হিন্দুর স্বরাজ, ঋষিরা এই স্বরাজেরই সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহারা সকল সাধনার মূলভূত আত্মতত্ত্বজ্ঞানের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর তাঁহাদের স্বরাজরূপী বিশ্বব্যাপী বিরাট প্রাসাদ গাঁথিয়া, তাহারই সর্ব্বোপদ্রবশূন্য শান্ত শীতল অভ্যন্তরে আশ্রয় লইয়া, বীতকাম হইয়াছিলেন। তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করিয়া প্রতীচ্য-সভ্যতার আপাতচাকচিক্যময় ভুয়া স্বরাজের জন্য দৌড়িলে প্রতিপদেই বাধা পাইতে হইবে, অথচ স্বরাজও আসিবে না। স্বরাজকে অগ্রে আত্মহৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, অন্তরে স্বরাজ না বসিলে বাহিরে স্বরাজের মূর্ত্তি কিছুতেই ফুটিবে না। স্বরাজ-সাধনার উদ্বোধনের দিনে—তাই বলি, বেদান্তের বেদ্য আত্মস্বরূপের অনুশীলন আমাদের পক্ষে একান্ত আবশ্যক—একান্ত অপরিহার্য্য· এই স্বরাজ যদি ভারতে আবার প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে ভারতই যে সর্ব্ববন্ধন-মুক্ত হইয়া চরম বা পরম নির্বৃতি লাভ করিবে, তাহা নহে, ভারতের এই আর্যস্বরাজের বিরাট পতাকার সুস্নিগ্ধ সুশীতল ছায়ার আশ্রয়ে বসিয়া, পৃথিবীর সকল দেশের দেহাত্মাভিমানী সকল নর-নারীই তখন অকারণ দ্বেষহিংসা ও ঈর্ষ্যার বিশ্বগ্রাসী দাবানলের মর্ম্মন্তুদ জ্বালা হইতে অনন্তকালের জন্য অপার শান্তি লাভ করিতে পারিয়া ধন্য হইবে। জানি না, ভারত আবার কবে এই স্বরাজসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া, অশান্তিময় পৃথিবীতে আবার আধ্যাত্মিক শান্তি-সমুদ্রকে বিশ্বজনীন প্রেমকল্লোলাবলীর প্রভাবে সমুদ্বেল করিয়া তুলিবে। তাহাই যদি হয়, তবে স্বরাজ-সাধনার মহাসিদ্ধিলাভে সমগ্র মনুষ্যজাতি চরিতার্থ হইবে।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।

প্রকৃতি

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গ্রহ

সূর্য্য ও বুধ গ্রহের মধ্যে একাধিক গ্রহের অবস্থানের সম্ভাবনা বৈজ্ঞানিকদিগের মনে বহু দিন হইতে উদিত হইলেও আজ পর্য্যন্ত গ্রহ আবিষ্কারের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। বৃত্তভাগের পরিধি অবলম্বনে প্রত্যেক গ্রহ সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। নিউটনের মতবাদ অনুসারে সূর্য্য হইতে প্রত্যেক গ্রহ-কক্ষের নিকটতম স্থান পর্য্যন্ত প্রসারিত সরল রেখার দিক শূন্যে চিরস্থায়িরূপে নির্দ্দিষ্ট; অবশ্য গ্রহগণ পরস্পরের অভিমুখে আকৃষ্ট হওয়ায় প্রত্যেক গ্রহ-কক্ষের পরিবর্ত্তন হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু এই পরিবর্ত্তন অতি সামান্য হইলেও গণনা করিয়া নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায়। গণনা অনুসারে বুধ-গ্রহ-কক্ষের পরিবর্ত্তন যে পরিমাণে হওয়া উচিত, তাহা অপেক্ষাও অধিক পরিমাণ হওয়ার কারণ বহু দিন পর্য্যন্ত সঠিক স্থিরীকৃত হয় নাই; কারণ, নিউটনের উপরি-উক্ত মতবাদ যে অভ্রান্ত নহে, ইহা প্রমাণ করিবার মত উপযুক্ত যুক্তি কোন বৈজ্ঞানিকের নিকট ছিল না। সুতরাং স্থির করা হয় যে, নিশ্চিতই কোন অদৃশ্য গ্রহ সূর্য্য ও বুধ গ্রহের মধ্যে অবস্থান করিয়া বুধ গ্রহকে আকর্ষণ করিতেছে ও ফলে বুধের কক্ষ পরিবর্ত্তিত হওয়ায় কক্ষের নিকটতম স্থানকে অগ্রসর হইতে দেখা যাইতেছে। যদি প্রকৃতই কোন গ্রহ সূর্য্য ও বুধের মধ্যে অবস্থান করে, তাহা হইলে সূর্য্য হইতে ইহার দূরত্বের অল্পতার জন্য দিবারাত্রির যে কোন সময়ে, এমন কি, সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তকালেও দূরবীক্ষণ সাহায্যে দৃষ্টিপথে পতিত না হইলেও পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণকালে অথবা সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যে অজ্ঞাত গ্রহটির আসিবার সময় নিশ্চিতই তাহার সন্ধান পাওয়া যাইত। অধ্যাপক ওয়াটসন প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ কর্ত্তৃক নূতন গ্রহটি দৃষ্ট হইয়াছে, ইহা প্রথমে প্রচারিত হইলেও পরে তথাকথিত আবিষ্কারকগণ তাঁহাদের ভ্রম স্বীকার করিতে বাধ্য হন। একটি বৃহৎ গ্রহের পরিবর্ত্তে যদি অতি ক্ষুদ্র গ্রহপুঞ্জ অবস্থান করে, তাহা হইলে গ্রহপুঞ্জ অধিক পরিমাণে সূর্য্যালোক প্রতিফলিত করার ফলে সূর্য্যগ্রহণকালীন শ্বেত আলোকচ্ছটা-রূপে আকাশের এক স্থানে প্রতীয়মান হইত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেরূপ কিছু আজ পর্য্যন্ত কাহারও দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। সম্প্রতি আইনষ্টাইন্ মহোদয় (Einstein) সুপ্রসিদ্ধ আপেক্ষিকতামূলক মতবাদ (Theory of relativity) আবিষ্কার করায় নিউটনের পূর্ব্বোক্ত মতবাদ যে ভ্রান্ত, ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। আইনষ্টাইনের মতবাদ অনুসারে সূর্য্য হইতে প্রত্যেক গ্রহকক্ষের নিকটতম স্থান পর্য্যন্ত প্রসারিত সরল রেখার দিক শূন্যে স্থির থাকিবার আবশ্যকতা নাই, তাহা নিয়তই ধীরে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। জটিল গণিতবিদ্যার সাহায্যে গণনা করিয়া বুধ-গ্রহকক্ষের চঞ্চলতার পরিমাণ স্থিরীকৃত হইয়াছে; ইহার সহিত দৃশ্য চঞ্চলতার পরিমাণের অসাধারণ সামঞ্জস্য হওয়ায় সূর্য্য ও বুধ গ্রহের মধ্যে একটি বৃহৎ গ্রহ বা অতি ক্ষুদ্র গ্রহ-পুঞ্জের অবস্থানের সম্ভাবনা বৈজ্ঞানিকদিগের মন হইতে অধুনা দূরীভূত হইয়াছে।

বুধ গ্রহ

সৌরজগতের অন্তর্গত অন্যান্য গ্রহাপেক্ষা বুধগ্রহ সূর্য্যের নিকটে অবস্থিত। কোথায় বা কোন্ সময়ে এই গ্রহটি প্রথম দৃষ্ট হয়, তাহা সঠিক জানা যায় না। তবে বহু প্রাচীন যুগে প্রাচ্য জ্যোতির্বিবদ পণ্ডিত কর্ত্তৃক যে ইহা

আবিষ্কৃত হয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বৎসরের সকল সময়ে এই গ্রহটিকে চর্ম্মচক্ষুতে দেখিতে পাওয়া যায় না। চৈত্রমাসে সূর্য্যাস্তের প্রায় ২ ঘণ্টার মধ্যে বুধগ্রহকে পশ্চিম-গগনে অস্ত যাইতে দেখা যায়; সে সময়ে ইহা সন্ধ্যা-তারা নামে পরিচিত। আশ্বিনমাসে সূর্য্যোদয়ের প্রায় ২ ঘণ্টা পূর্ব্বে পূর্ব্বাকাশে উদিত হইয়া সূর্য্যোদয়কালে অন্তর্হিত হইয়া যায়; তখন এই গ্রহটি প্রভাত-তারা নামে অভিহিত হয়। উভয় ক্ষেত্রেই গ্রহটি চক্রবালের অধিক উপরে অবস্থান করে না এবং শ্বেত আলোকরাশি বিকীর্ণ করিতে থাকে। সূর্য্য হইতে বুধগ্রহের গড়ে দূরত্ব ৩ কোটি ৬০ লক্ষ মাইল। কিন্তু সূর্য্য গ্রহকক্ষের কেন্দ্র হইতে ৭৫ লক্ষ

চিত্র নং ১ বুধগ্রহের বিভিন্ন কলা

মাইল দূরে অবস্থান করিতেছে; ফলে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ-কালীন সূর্য্য হইতে ইহার দূরত্বের হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়া থাকে ও তদনুসারে গ্রহের গতিবেগ পরিবর্ত্তিত হয়। সূর্য্যের নিকট-তম স্থানে আগমন করিলে সূর্য্য হইতে গ্রহের দূরত্ব ২ কোটি ৮৫ লক্ষ মাইল হয় ও প্রতি সেকেণ্ডে উহা ৩৬ মাইল গতিতে সূর্য্যকে আবেষ্টন করিতে থাকে; অপর পক্ষে গ্রহ-কক্ষের সর্ব্বাপেক্ষা দূরবর্ত্তী স্থানের সূর্য্য হইতে ব্যবধান ৪ কোটি ৩৫ লক্ষ মাইল; গ্রহটি এই স্থানে উপনীত হইয়া প্রতি সেকেণ্ডে ২৩ মাইল গতিতে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে।

বুধগ্রহ পৃথিবীর সমপরিমাণ স্থান অপেক্ষা ৭ গুণ অধিক আলোক ও উত্তাপ সূর্য্য হইতে প্রাপ্ত হয়।

সূর্য্য হইতে ৪ কোটি ৩৫ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থানকালীন যে পরিমাণ উত্তাপ বুধগ্রহ প্রাপ্ত হয়, তাহার কিঞ্চিদধিক দ্বিগুণ উত্তাপ ২ কোটি ৮৫ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থান-কালে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং বুধগ্রহে অন্ততঃ ২ ঋতু বর্ত্তমান। সূর্য্য হইতে প্রাপ্ত আলোকের শতকরা মাত্র ১৭ অংশ বুধগ্রহ প্রতিফলিত করে ও অবশিষ্টাংশ শোষণ করিয়া লয়; ফলে ইহা সমধিক উজ্জ্বল আকারে প্রতীয়মান হয় না। পৃথিবী হইতে দূরত্ব অনুসারে বুধগ্রহের ব্যাস আপাতদৃষ্টিতে ৫ ইঞ্চি হইতে ১৩ ইঞ্চি; কিন্তু প্রকৃত ব্যাস কিঞ্চিদধিক ৩ সহস্র মাইল। সুতরাং পৃথিবীর বহিরাবরণ ও আয়তনের তুলনায় বুধগ্রহের বহিরাবরণ ও আয়তন যথাক্রমে এক-সপ্তমাংশ ও এক-অষ্টাদশাংশ। আকারে ও

চিত্র নং ২ বুধগ্রহমধ্যস্থ চিহ্ন

আয়তনে সৌরজগতের অন্তর্গত সকল গ্রহাপেক্ষা ইহা ক্ষুদ্র।

চন্দ্রের ন্যায় বুধগ্রহের বিভিন্ন কলা পৃথিবী হইতে দৃষ্ট হয় (চিত্র নং ১) প্রত্যেক গ্রহ সূর্য্য হইতে আলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে ও বুধগ্রহের কক্ষ পৃথিবীর কক্ষের মধ্যে অবস্থান করিতেছে, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। সুতরাং সূর্য্যা-লোকপ্রাপ্ত বুধগ্রহের যে অংশ পৃথিবীর অভিমুখে অবস্থিত, মাত্র সেই অংশ আমরা দেখিতে পাই। পৃথিবীর নিকটতম স্থানে আগমন করিলে এই গ্রহটি অমাবস্যার চন্দ্রের ন্যায় অদৃশ্য হইয়া যায়; পৃথিবী হইতে গ্রহের দূরত্ব অপেক্ষাকৃত অধিক হইলে পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। অবশ্য দূরবীক্ষণযন্ত্র ব্যতিরেকে বুধগ্রহের আকারের পরিবর্ত্তন দৃষ্টিগোচর হয় না।

১৮৮৯ খৃঃ অঃ ইটালীদেশবাসী সিয়াপারেলী (Schiaparelli) বুধগ্রহমধ্যস্থ কতকগুলি চিহ্ন আবিষ্কার করেন (চিত্র নং ২)। এই চিহ্নাদির গতি হইতে তিনি স্থির করেন যে, ৮৮ দিনে বুধগ্রহ একবার ঘূর্ণিত হয়। বুধগ্রহ ৮৮ দিনে সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে, ইহা বহু পূর্ব্বেই স্থিরীকৃত হইয়াছে। সুতরাং চন্দ্রের ন্যায় বুধগ্রহের অর্দ্ধাংশ সূর্য্যাভিমুখে নিয়ত অবস্থান করে ও বৎসরের সকল সময়ে সূর্য্য হইতে আলোক ও উত্তাপ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু অপর অর্দ্ধাংশ চির-অন্ধকারে আবৃত থাকে।

পৃথিবীর সহিত বহু বিষয়ে সাদৃশ্য না থাকায় অনুমান করা হয় যে, বুধগ্রহ জীবের বাসোপযোগী নহে। তবে জগৎ বৈচিত্র্যময়; সৃষ্টিরহস্য আমাদিগের নিকট অজ্ঞাত; কাযেই পৃথিবীর জীব হইতে বিভিন্ন নূতন জীব সম্ভবতঃ বুধগ্রহে বসবাস করিতেছে; তাহাদিগের বিষয় আমরা বিন্দু-মাত্র অবগত নহি।

আর এক বিষয়ে বুধগ্রহ উল্লেখযোগ্য। সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যে বুধগ্রহ আগমন করিলে সূর্য্যের পৃষ্ঠভাগের উপর একটি ক্ষুদ্র কৃষ্ণবর্ণসম্পন্ন বিন্দু আকারে ইহা প্রতীয়মান হইতে থাকে; আকারে এত ক্ষুদ্র যে, দূরবীক্ষণ সাহায্যে দৃষ্টিগোচর হয়। আগামী বৎসরের ২২শে কার্ত্তিক এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হইবে।

শুক্র গ্রহ

পৃথিবী ও বুধ গ্রহের মধ্যে শুক্র গ্রহ অবস্থান করিয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। উজ্জ্বলতায় ইহা সকল গ্রহ হইতে শ্রেষ্ঠ। নক্ষত্রদিগের মধ্যে উজ্জ্বলতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সিরিয়স (Sirrius) নক্ষত্র ও আকারে সর্ব্ববৃহৎ গ্রহ বৃহস্পতি অপেক্ষা শুক্রগ্রহ যথাক্রমে ৯ গুণ ও ৫ গুণ অধিক উজ্জ্বল। অন্ধকার রজনীতে ইহার ঔজ্জ্বল্য ও সৌন্দর্য্যের নিকট গগনমণ্ডলস্থ প্রত্যেক জ্যোতিষ্ক সৌন্দর্য্যহীন ও নিষ্প্রভ বলিয়া মনে হইতে থাকে। সময়ে সময়ে দিবাভাগেও ইহা দৃষ্টিগোচর হয় এবং রাত্রিকালে যে সমুদয় পদার্থের উপর ইহার আলোক পতিত হয়, তাহাদিগের সুস্পষ্ট ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়। বুধগ্রহ অপেক্ষা অল্প সূর্য্যালোক প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও শুক্র অধিকতর উজ্জ্বল কেন? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, প্রাপ্ত সূর্য্যালোকের শতকরা মাত্র ১৭ ভাগ বুধগ্রহ হইতে প্রতিফলিত হয়; কিন্তু অপর পক্ষে সূর্য্যালোকের শতকরা প্রায় ৬৫ ভাগ শুক্রগ্রহ হইতে প্রতিফলিত হয়। বুধগ্রহের ন্যায় সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ইহা প্রভাততারা (শুকতারা) ও সূর্য্যাস্তের পরে সন্ধ্যা-তারা নামে পরিচিত। সূর্য্য হইতে শুক্রগ্রহের গড়ে দূরত্ব প্রায় ৬ কোটি ৭২ লক্ষ মাইল। অন্যান্য গ্রহকক্ষের কেন্দ্র
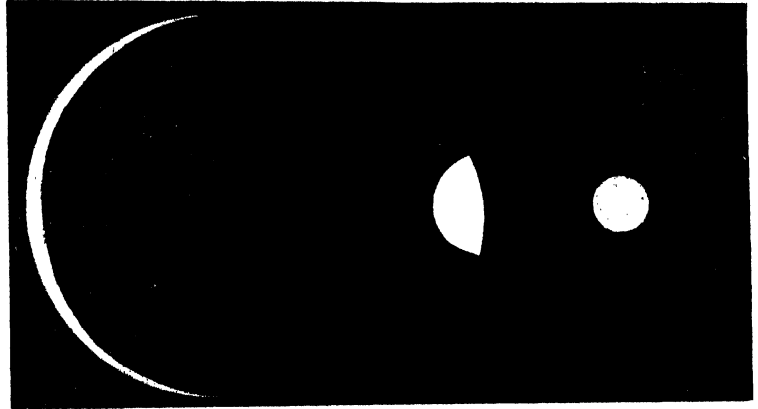
চিত্র নং ৩ দূরবীক্ষণযন্ত্র সাহায্যে দৃষ্ট শুক্রগ্রহের বিভিন্ন দৃশ্য

অপেক্ষা শুক্র-কক্ষের কেন্দ্রের নিকটে সূর্য্য অবস্থিত। ফলে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণকালীন সূর্য্য হইতে দূরত্বের হ্রাস ও বৃদ্ধি অপেক্ষাকৃত অল্পপরিমাণে হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে পৃথিবী হইতে শুক্রের দূরত্ব ১ কোটি ৬০ লক্ষ মাইল পর্য্যন্ত হয়; পৃথিবীর এত নিকটে অন্য কোন গ্রহ আগমন করে না। পৃথিবী হইতে দূরত্ব অনুসারে আপাতদৃষ্টিতে বুধ-গ্রহের ব্যাস ১১ ইঞ্চি হইতে ৬৭ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়; কিন্তু ইহার প্রকৃত ব্যাস ৭ সহস্র ৭ শত মাইল। সুতরাং শুক্র গ্রহের বহিরাবরণ ও আয়তন পৃথিবীর বহিরাবরণের ও আয়তনের প্রায় সমকক্ষ। সৌরজগতের অন্তর্গত গ্রহগণের তুলনামূলক চিত্রে পৃথিবী ও শুক্র প্রায় সম আকারে প্রতীয়মান হইতেছে (১নং চিত্র—প্রকৃতি দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ পৌষসংখ্যা)।

শুক্রের কক্ষ পৃথিবীর কক্ষের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া বুধ-গ্রহের ন্যায় শুক্র-গ্রহেরও পৃথিবী হইতে বিভিন্ন কলা দৃষ্ট হইয়া থাকে। ১৬১০ খৃঃ অঃ গ্যালিলিও কর্ত্তৃক এই তথ্য আবিষ্কৃত হয়। নং ৩ চিত্রে দূরবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে শুক্র-গ্রহের বিভিন্ন দৃশ্য প্রদর্শিত হইয়াছে। পৃথিবী হইতে শুক্র-গ্রহের দূরত্বের বৃদ্ধির সহিত আপাতদৃষ্টিতে আকারের হ্রাস হইতে থাকে। সুতরাং শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়ার ক্ষীণ চন্দ্রের ন্যায় বৃত্তাংশাকারে যখন শুক্রগ্রহ পরিলক্ষিত হয়, তখন পৃথিবী হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় ৩ কোটি মাইল। কিন্তু অপরপক্ষে ক্ষুদ্র পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় যখন ইহা প্রতিভাত হইতে থাকে, তখন পৃথিবী হইতে ইহার দূরত্ব ১৬ কোটি মাইল (চিত্র নং ৩)।

চিত্র নং ৪ সূর্য্যোপরি তিমিরাচ্ছন্ন শুক্রগ্রহ

শুক্রপৃষ্ঠ ৫৫ মাইল গভীর ঘন বায়ুমণ্ডল দ্বারা এরূপ আবৃত যে, পৃষ্ঠের স্বরূপ দূরবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যেও পরিলক্ষিত হয় না; শুক্রের বায়ুমণ্ডলে ভাসমান মেঘমালা আলোক-রশ্মি এত অধিক পরিমাণে প্রতিফলিত করে যে, শুক্রের তুষার-ধবল শ্বেতমূর্ত্তি ব্যতীত অন্য কোন মূর্ত্তি আমরা দেখিতে পাই না। গ্রহমধ্যস্থ কোন স্থায়ী চিহ্ন সুস্পষ্ট দৃষ্ট না হওয়ায় শুক্রগ্রহ আপন মেরুদণ্ডের চতুর্দ্দিকে কত দিনে ঘূর্ণিত হয়, তাহা বহুদিন পর্য্যন্ত সঠিক স্থিরীকৃত হয় নাই। জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক শ্রয়ট্যার (Schröter) স্থির করেন যে, প্রায় ২৩ ঘণ্টা ২১ মিনিটে শুক্র একবার ঘূর্ণিত হয়। কিন্তু সম্ভবতঃ ২ শত ২৫ দিনে শুক্রগ্রহ একবার ঘূর্ণিত হয়; ইহা শিয়াপ্যারেলী কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত হইয়াছে।

বুধগ্রহ অপেক্ষা শুক্রগ্রহ প্রাণীর বসবাসের অধিকতর উপযুক্ত। বুধগ্রহের বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের উপস্থিতি স্পেক্‌ট্রস্‌কোপ যন্ত্র দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে; এখন বায়ুমণ্ডলে যদি অক্সিজেন্ থাকে, তাহা হইলে নিশ্চিতই তথায় প্রাণিবর্গ বাস করে; কিন্তু ইহা অনুমান মাত্র। বুধগ্রহের ন্যায় শুক্রগ্রহ যখন পৃথিবী ও সূর্য্যের ঠিক মধ্যভাগে আগমন করে, তখন উহা সূর্য্যোপরি তিমিরাচ্ছন্ন ক্ষুদ্র বৃত্ত তুল্য প্রতীয়মান হয় (চিত্র নং ৪); দূরবীক্ষণযন্ত্র ব্যতিরেকেও এই ঘটনা দৃষ্টিগোচর হয়। প্রতি শত বৎসরে মাত্র ২ বার শুক্রের এরূপ অবস্থাপ্রাপ্তি হইতে দেখা যায়। ৭৭ বৎসর পরে পৃথিবী ও সূর্য্যের ঠিক মধ্যভাগে শুক্র পুনরায় আগমন করিবে। এই ঘটনা হইতে সূর্য্যের দূরত্ব ইত্যাদি স্থির করা হইত; কিন্তু অধুনা অন্য উপায়ে স্থিরীকৃত হয়।

পৃথিবী গ্রহ

পৃথিবী সৌরজগতের অন্তর্গত একটি গ্রহ। অন্যান্য গ্রহের ন্যায় ইহাও অন্তরীক্ষে দ্রুত বিচরণ করিতেছে। শুক্র অথবা মঙ্গল হইতে দেখা সম্ভবপর হইলে, পৃথিবী একটি ক্ষুদ্র উজ্জ্বল তারকার মত প্রতীয়মান হইবে। পৃথিবীবিষয়ক বহু তথ্য

পরে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইবে; এখানে মাত্র কয়েকটি বিষয় সংক্ষিপ্তাকারে লিখিত হইল।

পৃথিবী একটি বৃহৎ গোলক; ইহার ব্যাস ৭ হাজার ৯ শত ১৮ মাইল; ইহার উত্তর ও দক্ষিণ একটু চাপা। প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ১৮½ মাইল গতিতে ৩৬৫¼ দিনে পৃথিবী সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে। ২৪ ঘণ্টায় ইহা একবার ঘূর্ণিত হয়; ফলে দিন ও রাত্রি হইয়া থাকে। সূর্য্য হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল। পৃথিবী সম-পরিমাণ জলরাশি অপেক্ষা প্রায় ৫½ গুণ অধিক ভারী। পৃথিবীকে ওজন করা হইয়াছে। ১৬২ সংখ্যার পশ্চাতে একাদিক্রমে ২১টি শূন্য (০) বসাইলে যে সংখ্যা হয়, প্রায় তত মণ পৃথিবীর ওজন। বুধ ও শুক্র গ্রহের ন্যায় ইহা উপগ্রহহীন নহে। চন্দ্র পৃথিবীর উপগ্রহ।

[ক্রমশঃ।

শ্রীশিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

সাধের পল্লী

সাধের পল্লী, সুখের পল্লী, কেন রে এমন নিরুৎসব?
নাই সে মিলন, প্রাণের মাঝে, নাই সে হাসির মধুর রব॥

দলাদলির হলাহলে প্রাণ যে এখন শান্তিহীন।
বিদ্বেষেতে সাধের পল্লী জ্বলছে এখন রাত্রি-দিন॥

একই পথে চলাফেরা কেউ দেখে না কাহার মুখ।
কুটিল বুদ্ধি মামলাবাজি গ্রাস করেছে সকল সুখ॥

মায়ের চোখে অশ্রুধারা ছেলের চোখে ঝরছে জল।
ভুঁই চ'লে যায় রাজার গ্রাসে বড় ঘরের কতই ছল॥

মো-সাহেবীর মধুরতা বাড়ছে যত বাবুর কাছে।
চাটুকারটি দেখান তত, মাথায় তাঁহার বুদ্ধি আছে॥

ধামাধরার ধুম দেখে কে—তারাই এখন সমাজনেতা।
ছোকরা-দলে উঠছে ফুটে, নূতন ফ্যাসন, নূতন কেতা॥

থিয়েটারের রঙ্গমহলে—অভিনয়ের বিষম চোট্।
আড়াআড়ি বাড়ছে বেজায় আড্ডাঘরে দারুণ ঘোঁট॥

ম্যালেরিয়ায় মরছে গরীব—নেয় না কেহ তাদের খোঁজ।
মজুর ধোঁকে কুঁড়েয় ব'সে রোজগার তার হয় না রোজ॥

মরলে মানুষ লোক জোটে না, ভাগাড়েতে ফেলায় শব।
হাড় নিয়ে তার খেলে কুকুর শকুন করে ভীষণ রব॥

পিপাসাতে জল জোটে না, পার কিনে খাও গে ডাব।
না হয় পচা জল তুলে খাও—ঘুচাও তা'তে তৃষার তাপ॥

বাবু থাকেন সহর-সুখে—পুকুরগুলা পূর্ণ পাঁকে।
চণ্ডী-দালান বটে বেঁধা—দেউড়ীতে তার শিয়াল ডাকে॥

সহুরে সব কাগজগুলোয় বেরোয় পল্লী-সুখের স্তব।
কাযে কিন্তু সাধের পল্লী, সোনার পল্লী নিরুৎসব॥

পাখীর গানে ফুলের বাসে ঘুচত যদি পেটের দায়।
উকীলেরা ফিরত দেশে, কেরাণীরা ফিরত গাঁয়॥

আয় রে ফিরে, আয় রে ও ভাই,—পল্লীমায়ের আঁচলতলে।
সোনার স্বর্গ গড়ব মোরা ভক্তিভাব আর ঐক্যবলে॥

রোগীর মুখে পথ্য দিব, কাটব রে বন আপন হাতে।
শুক্‌ন পুকুর করব দীঘি—পঞ্চায়তের পয়সাতে॥

একমুঠি চাল গাঁয়ের সেবায় রাখলে গো মা ভক্তিভাবে।
তাতেই কত পয়সা হবে, তাতেই কত শান্তি পাবে॥

মিলের জোরে ঘাসের দড়ায় বাঁধা পড়ে মত্ত হাতী।
মিলের জোরে পোহাবে রে দেশজোড়া এই দুখের রাতি॥

ফুটবে হাসি মুখে মুখে—টুট্‌বে প্রাণের হা-হা রব।
সাধের পল্লী সুখের পল্লী করবে কতই মহোৎসব॥

৺মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

নবজীবন

১

"রাখাল এখানে আছ কি?—এই যে, রাখাল, বেশ যা হোক! আফিস থেকে বাড়ী যাও নি?"—কথাগুলা বলিতে বলিতে বিনোদবিহারী গহনার দোকানে প্রবেশ করিল। রাখালচন্দ্র হাতের হুঁকাটি মুকুন্দ মিস্ত্রীকে দিয়া একরাশি ধূম উদ্গিরণ করিতে করিতে বলিল, "আরে কে ও, বিনোদ? তুমি? তুমি কোত্থেকে হে? আকাশ থেকে পড়লে না কি?"

বিনোদ বলিল, "হাঁ, এক রকম তাই বটে। তা বাড়ী না গিয়ে এখানে যে? এ দিকে রাত ৯টাও যে হয়ে এল? ব্যাপারখানা কি?"

রাখাল জুতাজোড়াটি পরিতে পরিতে বলিল, "বলছি হে বলছি, চল, পথেই কথা হবে'খন। ভাল কথা, তামাক—"

বাধা দিয়া বিনোদ বলিল, "না, খাই না—আমাদের মত খেটেখেকো লোকের মরবারই অবকাশ নেই, তা তামাক! ঐ দুটো চারটে সিগারেট খাই, তাতেই চ'লে যায়। তা যাক্ গে, তার পর—"

ততক্ষণ উভয়ে পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। রাখাল বলিল, "তার পর আর কি, চুটিয়ে সংসার করা যাচ্ছে। তুই কবে এলি ময়ূরভঞ্জ থেকে বল দিকি, আজ বছর তিন ত একেবারে উধাও।"

বিনোদ বলিল, "এই আজ সবে কলকাতায় এইছি।"

বিনোদ একটা সিগারেট ধরাইল এবং রাখালকেও একটা দিল। দুই জনে বাল্যবন্ধু, স্কুল-কলেজে একসঙ্গে পড়াশুনা করিয়াছে, তাহার পর যে যাহার জীবনের পথে চলিয়া গিয়াছে। রাখাল চুরুটের ধূম উদ্গিরণ করিতে করিতে বলিল, "ব্যবসা কেমন চলছে তোর? তোর বাড়ীর খবরও আর পাইনে মোটে। ফ্যামিলি কি জঙ্গলে নিয়ে গিয়েছিস না কি?"

"হাঁ, বছরখানেক হ'ল নিয়ে গিয়েছি—না হ'লে থাকতে পারিনি।"

"ছেলেপুলের লেখাপড়ার কি করছিস?"

"না রে, সে কালাজঙ্গল আর নেই, বারিপোদায় স্কুল হয়েছে—আর অমিয় ত কটক কলেজেই পড়ছে, ছুটী হ'লে যায় বারিপোদায়। তোর কেমন চল্‌ছে রে? মাইনে-টাইনে বাড়লো?"

রাখালের ম্লানমুখে দুঃখের হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল, "ওঃ বিস্তর! এত যে, লোহার সিন্দুক উপচে প'ড়ে যাচ্ছে!"

কথাটা ঘুরাইয়া লইয়া বিনোদ বলিল, "তা, রাত ৯টা বাজে, আফিস থেকে বেরিয়েছিস ত সন্ধ্যের সময়, এতক্ষণ এই স্যাকরার দোকানে ব'সে কি করছিলি?"

রাখাল ক্ষণেক নীরবে রহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল, "করি কি বল দিকি? বাড়ী ঢুকলেই ছেলে বেটা শুভঙ্করীর অঙ্ক বুঝিয়ে দিতে বলে!"

বিনোদ হো হো উচ্চ হাসিয়া উঠিল। কিন্তু রাখাল তাহাতে বিন্দুমাত্র যোগদান না করিয়া বলিল, "ঐ ত, হেসে উঠলে! তোমাদের কি বল না—কর্ম্মস্থান থেকে ঘরে ফেরবার সময় বুকখানা আহ্লাদে দশ হাত হয়ে ওঠে—বাড়ী গিয়ে কতক্ষণে আপনার জনকে দেখবো, ছেলে-মেয়েকে বুকে ক'রে নেবো—গিন্নীর সঙ্গে সুখ-দুঃখের কথা কইবো। আর আমার—থাক, সে কথায় কায নেই!"

বিনোদেরও মুখ গম্ভীর হইল। সে বলিল, "কেন, তোমারও ঘরে ত সব রয়েছে—"

রাখাল আর পারিল না, বহুকালের রুদ্ধস্রোত বন্ধুর

সহানুভূতির উত্তাপে গৈরিক-নিঃস্রাবের মত ছুটিয়া বাহির হইল, "হাঁ, সব রয়েছেই বটে! সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর ঘরে ফিরে প্রাণ জুড়ুবো—না কেবল দেহি দেহি, কেবল নেই নেই! সবাই আমায় খাটিয়ে নিতে চায়, কেউ আমায় ত খেটে দিতে চায় না! চিড়িয়াখানার জানোয়ারের মত দুবেলা দুমুঠো খেতে দেয়—ঐ পর্য্যন্ত। তার পর? তার পর গিন্নী বলবেন, তাঁর ভাজের সাধে টাঙ্গাইলের সাড়ী দিয়ে তত্ত্ব করা হয় নি, তিনি আর খোঁটা খেতে পারেন না। মেয়ে বলবেন, তাঁর কুরুসকাঠি চাই, পশম চাই, কেরেপের কাপড়ের পাড় চাই পুতুলের জন্যে—ছেলে বলবেন,—"

বিনোদ বাধা দিয়া ব্যথিত স্বরে বলিল, "থাক্, থাক্, আর বলতে হবে না। তা, সেই ৪৫ টাকা মাইনেই আছে, না, কিছু বেড়েছে?"

"হাঁ হাঁ, বেড়েছে বৈ কি! চার বছরে ৫টি টাকা। তার থেকেও প্রভিডেণ্ট ফণ্ডে কেটে নেয়। কামাইটা আসটাও আছে। ভাল যা হোক, আপনার কথায় পাঁচ কাহন করছি। কলকাতায় এসেই আমার এখানে এসেছিস—এ গরীব বন্ধুকে—"

রাখালের গলাটা কেমন কাঁপিয়া উঠিল। বিনোদের চোখের পাতাও যেন ভিজিয়া আসিল, সে তাড়াতাড়ি বলিল, "গরীব ত গরীবেরই কাছে আসে।"

রাখাল বলিল, "হুঁ, তা ঠিক, তুই গরীবই বটে! তা, আমি যে দোকানে ছিলুম, জানলি কি ক'রে?"

বিনোদ বলিল, "বাড়ীতে জিজ্ঞাসা ক'রে জানলুম, আফিস থেকে ফিরে আসিস্ নি। পথে বেরিয়ে কিছু দুর যেতেই চারু বাবুর সঙ্গে দেখা হ'ল, সেই যে আমাদের সঙ্গে ফুটবল খেলা দেখতে যেত—তিনি ব'লে দিলেন, ঐ স্যাকরার দোকানে মাঝে মাঝে বসে।"

রাখাল তখন বাড়ীর কড়া নাড়িতেছিল। বাড়ীর বাহিরদিকটা অন্ধকার। কিছুক্ষণ আওয়াজ দিবার পর ভিতর হইতে বিরক্তির সুরে উচ্চারিত হইল, "ভাল আপদ!" দরজাটা খুলিয়া একটা আলোক দেখা দিয়াই চকিতে লুকাইয়া গেল। রাখাল অন্ধকারে দিয়াশালাই জ্বালিয়া কোনও মতে বন্ধুকে জীর্ণ বৈঠকখানা-ঘরে বসাইয়া অন্দরে চলিয়া গেল।

বিনোদ মুহূর্ত্ত পরেই শুনিতে পাইল, বামাকণ্ঠে পরুষ স্বরে ঝঙ্কৃত হইতেছে,—"ওঃ, তবে ত কেতাথ ক'রে দিলে আর কি! দাসী-বাঁদী দশ জন রয়েছে কি না বাড়ীতে—ইয়ার-বক্সী নিয়ে এলেন রেতে, তার জাবা কর সবাই!"

বিনোদ স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। যখন রাখাল একটা হারিকেন লইয়া বাহিরে আসিল, তখন বিনোদ তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিল, "আজ এখন আসি ভাই,—আমার সম্বন্ধীদের ওখানে নেমন্তন্ন রয়েছে। কাল দেখা কোরবো যখন হোক। তুই হাত-মুখ ধুয়ে জিরু গে যা। আর দেখ, এইটে তোর ছেলেমেয়েকে দিস, আমার গিন্নী ওদের খেলতে দিয়েছে।"

উত্তরের প্রতীক্ষা না রাখিয়াই বিনোদ দ্রুতপদে চলিয়া গেল। রাখাল তাহাকে একবার বাধা দিতে গিয়া মুহূর্ত্ত পরেই থমকিয়া দাঁড়াইল, তাহার একখানা হাত বন্ধুর দিকে প্রসারিত হইলেও দেহযষ্টি এক পদও নড়িতে চাহিল না।

২

কেদারার হাতলে বাঁধা উত্তরীয়খানি সবেমাত্র খুলিয়া রাখালচন্দ্র গলদেশে ধারণ করিতেছে, এমন সময়ে বড় বাবুর ঘরে তাহার ডাক পড়িল। রাখালচন্দ্রের বুকখানায় যেন সজোরে একটা হাতুড়ির ঘা পড়িল—না জানি অদৃষ্টে কি আছে!

প্রভাতে কাহার মুখ দেখিয়া শয্যাত্যাগ করিয়াছে, এই কথাটা ভাবিতে ভাবিতে আর সঙ্গে সঙ্গে দুর্গানাম জপিতে জপিতে রাখালচন্দ্র বড় বাবুর ঘরে হাজিরা দিল। তাহাকে দেখিয়া বড় বাবু এক গাল হাসিয়া বলিলেন, "এই যে রাখাল, বাড়ী যাচ্ছ? কাল ত ছুটী, এত তাড়াতাড়ি কেন হে? সবে ত কাঁটায় কাঁটায় ছটা।"

রাখালচন্দ্র আমতা আমতা করিয়া বলিল, "আজ্ঞে না, তা না। সবাই যাচ্ছে, তাই আমি উঠছিলুম।"

"বেশ করেছিলে উঠেছিলে। ছুটীর পর কে আবার ব'সে থাকে? তা দেখ রাখাল, বলছিলুম কি, বাড়ীতে সকাল সকাল দরকার আছে কি? যদি না থাকে, তা হ'লে এই ফর্দ্দটা নাও দিকি, একবার নতুন বাজারটা হয়ে যেতে হবে। কাল ক'জন লোক খাওয়াব—আমার বড় শালার মেজো নাতনীর অন্নপ্রাশন। হাঁ, ভাল কথা, কাল আমার ওখানে খেও, তোমারও নেমন্তন্ন।"

বড় বাবু উত্তরের প্রতীক্ষা না রাখিয়াই কক্ষত্যাগ

করিলেন, আর্দ্দালী সঙ্গে সঙ্গে বাবুর এট্যাচি কেসটা লইয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিতে চলিল। যাইতে যাইতে বড় বাবু একবার পশ্চাতে ফিরিয়া বলিলেন, "হাঁ দেখ, বাজারটা সেরে ফেরবার পথে চোরবাগান হয়ে যেও, প্রমথদের ওখান থেকে হারমোনিয়াম আর ডুগী তবলাটাও নিয়ে যেও। একখানা গাড়ীই ক'রে নিও।"

বড় বাবু চলিয়া গেলেন, সঙ্গে আর্দ্দালী, মোসাহেব, উমেদার পাঁচ সাত জন ভিড় করিয়া তাঁহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিতে চলিল। রাখাল বারান্দায় দাঁড়াইয়া হস্তস্থিত ফর্দ্দের দিকে তাকাইয়া অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগিল।

কাল পরশ্ব দুই দিন ছুটী, বড় আশায় রাখাল আজিকার সন্ধ্যার পর ফণী বাবুদের ওপাড়ায় 'রাজাবাহাদুরের' রিহার্সাল দেখিতে যাইবে বলিয়া বুক বাঁধিয়াছিল, সেখানে আজ তাহাদের চড়ুইভাতি। কেরাণী-জীবনে ছুটীর সুখটুকুই যা কিছু, তাহাতেও বিধি বাদ সাধিল! এমনই অদৃষ্ট!

রাখাল ছাতাটি বগলে লইয়া ভাবিতে ভাবিতে চলিল। সংসারে 'রোজগেরে' সে একাকী, তাহার মুখের দিকে চাহিয়া পাঁচ সাতটি প্রাণী—রোজগার মাসে মাত্র ৫০টি টাকা! দক্ষিণে আনিতে বামে কুলায় না, কোনওরূপে দিন গুজরাণ হয় মাত্র। ভাগ্যে শিমুলিয়ার পৈতৃক ভিটাটুকু আছে, বাড়ীভাড়া লাগে না, না হইলে সহরে বাস করা তাহার অদৃষ্টে ঘটিত না। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। গৃহিণীর চোখরাঙ্গানি, ছেলেপুলের বাহানা আর পড়াশুনার খরচ, গলায় বিবাহযোগ্যা কন্যা, বাজার-দেনা,—ইহারই নাম সংসার! ইহার মধ্যে হাবুডুবু খাইয়া রাখালচন্দ্র কোনও মতে তীরে উঠিতে পারিতেছে না, মাঝে মাঝে জীবন তাহার দুর্ব্বহ বলিয়া মনে হয়। যদি বা মরুভূমির মধ্যে ওয়েশিসের মত বৎসরে কয়টা ছুটীর মুখ চাহিয়া সে বাঁচিয়া থাকে, তথাপি তাহাতেও বড় বাবুর শুভদৃষ্টির মঙ্গলস্পর্শ এড়াইয়া যায় না। আফিসের কাযে যে শুভদৃষ্টি তাহাকে উঠিতে বসিতে আচ্ছন্ন করিয়া থাকে, ছুটীর দিনে বন্ধুর আলয়ে একটু আরামের—একটু আমোদের মধ্যেও তাহার খরপ্রভাব হইতে তাহার মুক্তি পাইবার উপায় নাই! এ কি বিড়ম্বনা!

কিন্তু সে জানিত, ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানিয়া থাকে। ইহাই তাহার সান্ত্বনা। ঢেঁকি ঢেঁকিই বটে! বাড়ীতেও ঢেঁকি ঢেঁকি, আফিসেও তাই। তবে বন্ধুগৃহেই বা তাহার ব্যতিক্রম হইবে কেন? কেরাণী-জীবনে দুঃখ বা আপশোষ করিয়া ফল কি? এ জীবনে তাহার মত মানুষ তাড়না খাইতেই জন্মিয়া থাকে। গৃহে তাড়না, আফিসে তাড়না, পথে ঘাটে সর্ব্বত্রই তাড়না—সর্ব্বদাই ভয়, ভয়ে ভয়েই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয়। সদাই আতঙ্ক, গৃহিণী কি বলিবে, ছেলেরা কি মনে করিবে, বড় বাবুর পাণ হইতে চূণ খসিল কি না, বড় সাহেবের ঘরে 'রিডাক্সন্ লিষ্টে' নাম-ডাকের সময় তাহার পালা উপস্থিত হয় কি না!

অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে দিতে রাখালচন্দ্র পথাতিক্রম করিতে লাগিল। হ্যারিসন রোডের জংসনে উপস্থিত হইয়া সে দেখিল, পথের একটা খোলা যায়গায় এক স্বদেশী সভা হইতেছে। শ্রোতা অধিকাংশই হিন্দুস্থানী, বক্তাও তাই। রাখাল দাঁড়াইয়া কিছু বক্তৃতা শুনিল। সে যতটুকু হিন্দী জানিত, তাহাতে বুঝিল, বক্তা হস্তের ও মুখের নানারূপ কসরৎ ও কৌশল দেখাইয়া বলিতেছে,—"ভাই সব! জুজুকে জুজু বলিয়া ভয়ে দূরে রাখিলে ভয় চিরদিনই থাকিয়া যাইবে। কিন্তু একবার যদি সাহসে বুক বাঁধিয়া জুজুর সম্মুখে গিয়া বুক ফুলাইয়া দাঁড়াও, তাহা হইলে দেখিবে, জুজু কত ছোট, আর তুমি কত বড়। তুমি মানুষ, বিধাতার সৃষ্টি, তুমি কিসে ছোট?"

রাখালচন্দ্র আবার পথে নামিয়া পড়িল। সে বক্তার কথাটা মনের মধ্যে ক্রমাগত তোলাপাড়া করিতে লাগিল, "তুমি মানুষ, তুমি কিসে ছোট?"

কিছু দিন পূর্ব্বে রাখালচন্দ্র সংবাদপত্রে পূর্ব্ববঙ্গের এক বিখ্যাত স্বদেশী বক্তার বক্তৃতার সারাংশ পাঠ করিয়াছিল। এখন সেই বক্তৃতার কথাটা জোর করিয়া তাহার মনের রুদ্ধ দ্বারে আঘাত করিতে লাগিল। তাহার মনে পড়িল, বক্তা বক্তৃতায় এক গল্প বলিয়াছিলেন। গল্পটি এই:—

"জ্যোৎস্নাপ্লাবিতা যামিনীতে আমি গ্রামান্তরে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতেছি। পথ জনমানবশূন্য, প্রকৃতি নিস্তব্ধ নিঝুম, কচিৎ কোথাও গ্রাম্য কুক্কুরের কর্কশ কণ্ঠস্বর বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে। দেগঙ্গার প্রকাণ্ড বিলের নিকটস্থ হইবামাত্র আমার গা ছমছম করিতে লাগিল। ঐ না ফাঁসীতলার অশ্বত্থবৃক্ষ? বায়ুতাড়নায় উহার পত্রগুলি থর থর

কাঁপিতেছিল। কি ও কি? ঐ না উহার আগ-ডালে কি একটা প্রকাণ্ড মূর্ত্তি দীর্ঘ শুষ্ক বাহু প্রসারণ করিয়া, মুখব্যাদান করিয়া অট্ট অট্ট হাসিতেছে? ঐ না উহার ভাঁটার মত চোখ দুটা ঘুরিতেছে? ভয়ে অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। এক পদও আর অগ্রসর হইতে পারিলাম না। কিন্তু যাইতেই ত হইবে। মনে হইল, যদিই বা উহা প্রেতযোনি হয়, তাহাতেই বা ভয় কি? আমি ত মানুষ, ঐ মূর্ত্তি আমার কি অনিষ্ট করিবে? এক পদ অগ্রসর হইলাম। তখন সাহস ফিরিয়া আসিল। পদে পদে আরও অগ্রসর হইলাম, ভূতের একখানা হাত উড়িয়া গিয়াছে। মনে মনে হাসিলাম। আরও অগ্রসর হইলাম, সঙ্গে সঙ্গে আরও একখানা হাত অদৃশ্য হইল। বৃক্ষের তলদেশের সমীপবর্ত্তী হইবামাত্র দেখিলাম, ভূতের মুণ্ডও অন্তর্দ্ধান করিয়াছে, মূর্ত্তির স্থানে জ্যোৎস্নার আলোক বৃক্ষপত্ররাশির মধ্যে অবাধে খেলা করিতেছে। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলাম। এই ভূত? হাসির কথা, লজ্জার কথা! আমি মানুষ. দূর হইতে ভূতকে আমার অপেক্ষা কত বড় দেখি!"

হঠাৎ রাখালচন্দ্রের চক্ষুর সম্মুখ হইতে একখানা ঘন অন্ধকারের যবনিকা সরিয়া গেল, আর রাজপথের বিদ্যুতালোককেও পরিম্লান করিয়া জ্যোৎস্নার দুগ্ধস্নিগ্ধ ধবলিমা রজতনির্ঝরের শুভ্রধারার মত তাহার নয়নপথে হাসিয়া উঠিল!

৩

"হাঁ মা, শাজীরে শামরিচ কোন্ হাঁড়ীতে রেখেছ? এ দিক্‌কার তাকে ত নেই।"

মেনকার গলার সাড়া পাইয়া মেনকার গর্ভধারিণী দালান হইতে জবাব দিলেন, "ঐ যে লো, পশ্চিম দেয়ালের কুলুঙ্গীর মধ্যে। পাশাপাশি দুটো হাঁড়ী—ওর আর একটাতে গরম মশলা আর তেজপাতা—"

"পেয়েছি মা, পেয়েছি।" কথাটা বলিয়া মেনকা আবশ্যক মশলাপাতি লইয়া দালানে আসিল, তাহার মা চমৎকারিণী তখন একডাঁই আলু-পটল ছাড়াইতে বসিয়াছিলেন।

মেনকা মশলাপাতি লইয়া বাছিতে বসিল, তাহার ছোট ভগিনী সনকা জলে ভিজান পেস্তা-বাদাম ছাড়াইতেছিল। কায করিতে করিতে মেনকা বলিল, "বাবা না কি আজ থাকবে না, কে কোত্থেকে না কি এয়েছে, তার ওখানে খেতে যাবে?"

চমৎকারিণী বলিলেন, "কে জানে বাছা, সে কি করবে। বাড়ীতে একটা কায—উনি অমনই চল্লেন ধেয়ে পুরোনো ইয়ারের সঙ্গে আড্ডা মারতে।"

মেনকা ব্যঙ্গের স্বরে বলিল, "তাও যদি তাদের নিজের বাড়ী হ'ত! সে না কি তাদের কোন কুটুমের বাড়ী। মা গো! বাবার যদি ধড়ে একটু মান-অপমান জ্ঞান থাকে।"

গৃহিণী মুখ ঘুরাইয়া বলিলেন, "মুখে আগুন বন্ধুর! বলে আপনি পায় না শঙ্করাকে ডাকে! সনকা, যা দিকি চাবীর থোলোটা নিয়ে, হাত-বাক্সটা খুলে দুটো টাকা নিয়ে আয় দিকি। আর দেখ্, ও ঘরে পড়ছে বুঝি, ব'লে আয়, তোর গোলাপ মাসীর বাড়ী যেন এখনই গিয়ে নেমন্তন্নটা ক'রে আসে। আফিসের ছুটী হ'ল ত, বই মুখে গুঁজে বসলেন অমনই। মুখে আগুন!" সঙ্গে সঙ্গে বঁটীর অঙ্গে আলুর কচ-কচ আওয়াজ চলিতে লাগিল।

সনকা ঘরের মধ্য হইতে বলিল, "বাক্সয় যে মোটে একটা টাকা আর ক' গণ্ডা পয়সা রয়েছে মা, দু' টাকা ত নেই।"

"ও মা, সব ফুরিয়ে গেল? এখনও যে ঘি আনতে হবে, ময়দা আনতে হবে সবেদা, বেশম—যা, যা, দৌড়ে যা, ওদের ঠেঞে গোটা চারেক টাকা নিয়ে আয় গে যা।"

যাঁহার উদ্দেশে কথা কয়টি উচ্চারিত হইল, সেই বাড়ীর 'কর্ত্তা' রাখালচন্দ্র সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তানের পশ্চাতে নানা কাকুতি-মিনতি করিতে করিতে অন্দরে প্রবেশ করিতেছিলেন। পুত্র একবারে সাক্ষাৎ রামচন্দ্র, নাম তাহার বিভূতিভূষণ। সে উচ্চহাস্যে দালান মুখরিত করিয়া চীৎকার করিয়া বলিতেছিল, "দেখ্ মা, কেমন রেলগাড়ী টেনে আনছি দেখ্। দিদি, তুই ইঞ্জিন হবি?"

বিভূতির রেলগাড়ীটি চমৎকার! সে তাহার পিতার সখের হুঁকার গলায় দড়ি বাঁধিয়া মেঝে, চৌকাঠ, উঠান, দালান কিছু বিচার না করিয়া ঘর্ঘর শব্দে টানিয়া আনিতেছিল, আর তাহার বেচারা বাপ মুখখানি কাঁচুমাচু করিয়া নানা কাকুতি-মিনতি করিতে করিতে তাহাকে হুঁকা

ফিরাইয়া দিতে অনুরোধ করিতেছিল। ব্যাপার দেখিয়া মা ও মেয়েরা উচ্চহাস্যে বিভূতিভূষণের হাসিকেও আচ্ছন্ন করিয়া দিল।

রাখালচন্দ্র নিরুপায় হইয়া একটু কঠিন হইবার ভাব দেখাইয়া বলিল, "ছি! বিভূ! হুঁকো নিয়ে কি খেলা করে! দাও, আমি রেখে আসি গিয়ে।"

গৃহিণীর মুখ অমনই গম্ভীর হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "দেখো, বারবন্দের তালুকখানা যেন ভেঙ্গে খ'সে পড়ে না! ঢঙ্গ দেখে আর বাঁচি নি! তবু যদি না হ'ত একটা ছ' পয়সা দামের খেলো হুঁকো!"

রাখালচন্দ্র ততক্ষণ হুঁকাটা উদ্ধার করিয়া বহির্দ্দেশাভিমুখে গমনোন্মুখ হইয়াছিল, পশ্চাতে ফিরিয়া হঠাৎ বলিল, "ছ' পয়সাই হোক্, আর ছ' টাকাই হোক, দিতে হয় ত সবই আমায়। ছেলেকে এত আস্কারা দেওয়া ভাল না, জেনে রেখো।"

দালান শুদ্ধ লোক অবাক্। যদি সেই মুহূর্ত্তে কক্ষে বজ্রপতন হইত, তাহা হইলেও বোধ হয় তাহারা এত চমকিত হইত না। গৃহিণী ত বিশ্বাসই করিতে পারিলেন না, তিনি যাহা এইমাত্র শুনিলেন, তাহা সত্য সত্যই তাঁহার স্বামীর মুখ হইতে উচ্চারিত হইয়াছে। মেয়েরা ভাবিল, এই যে লোকটা এতগুলা কথা একসঙ্গে বলিয়া গেল, হয় ত সে তাহাদের জনক নহে। বাড়ীর গোমস্তা, সরকার বা চাকর-বাকর যে হঠাৎ একলম্ফে কর্ত্তার পদে উঠিয়া বসিতে পারে, এ বিশ্বাস কি সহজে হয়? গৃহিণীর অন্তরের অন্তস্তল মুহূর্ত্তে কাঁপিয়া উঠিল কি?

অন্তরের ভাব যথাসাধ্য গোপন করিয়া গৃহিণী কর্কশ স্বরে বলিলেন, "তোমার সঙ্গে বাজে তর্ক করবার আমার সময় নেই। বাড়ীতে কায, কোমর বেঁধে এলেন কোঁদল করতে! যাক্, সনকাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, চারটে টাকা এখনই চাই।"

"টাকা? টাকা কবে আমার কাছে থাকে? মাইনে পেলেই ত ফেলে দিই তোমাদের।"

"বটে? আর বাড়ীভাড়াটা?"

রাখালচন্দ্র পৈতৃক ভিটার কতকাংশ ভাড়া দিত। সে বলিল, "সে ত ১৪টি মাত্র টাকা, তারও ১০ টাকা তুমি কেটে নাও।"

"বাকী ৪টে?, যাও, যাও, নিয়ে এস টাকা। বিকেলে কুটুম-সাক্ষেৎ থৈ-থৈ করবে। এদ্দিনে যা জমিয়েছ, তারই থেকে নিয়ে এস।"

রাখালচন্দ্র নিতান্ত বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া বলিল, "সত্য বলছি, হাতে কাণাকড়িটি পর্য্যন্ত নেই। সে দিন তোমরা থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলে যখন, তখন ঝেড়ে-ঝুড়ে সব দিয়ে দিয়েছি।"

"রাখ তোমার নেকামি! কাঁড়ি-কাঁড়ি বই কেনবার বেলা, খবরের কাগজ কেনবার বেলা টাকা বেরোয় কোত্থেকে? আকাশ ফুঁড়ে, না?"

মেনকা ও সনকা হাসিয়া উঠিল, বিভূতিভূষণও তাহাতে যোগদান করিল, পিতার অবস্থা দেখিয়া তাহাদের আনন্দ-তরঙ্গ উথলিয়া উঠিতেছিল। মেনকা ব্যঙ্গের সুরে বলিল, "তামাক-টিকেটি বাবার দু' বেলা আসা চাই, তা আকাশই ভেঙ্গে পড়ুক, আর জলেই দেশ ভেসে যাক্। হাঁ বাবা, ছুটীর দিন, তুমি যে বড় বড় বাবুর বাড়ী একবার হাজরে দিয়ে এলে না?"

রাখালচন্দ্র গম্ভীর স্বরে বলিল, "ইচ্ছে নেই।" সে যে ইচ্ছাপূর্ব্বক আজ বড় বাবুর নিমন্ত্রণও অগ্রাহ্য করিয়াছিল, তাহা কয় জন জানিত?

গৃহিণী মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন, "ইচ্ছে নেই বলে কি গো এরা। চাকরীর ভয় নেই?"

রাখাল বলিল, "তাও বোধ হয় আর নেই।"

রাখালচন্দ্র এইবার যথার্থই চলিয়া যাইতেছিল। গৃহিণী বাধা দিয়া বলিলেন, "শোন শোন। বলি, আজ কি হয়েছে তোমার? নেশাভাঙ্গ করেছ বুঝি!"

রাখাল বলিল, "তা হবে।"

গৃহিণী বলিলেন, "যা কর, ফল ভুগবে তুমি, আমার কলা। টাকা কিন্তু চাই বলছি। ধার ক'রে হোক্, জিনিষ বাঁধা রেখে হোক্, বেচে হোক্, চুরি-বাটপাড়ি ক'রে হোক্—টাকা আমার চাই-ই। জান, আজ মেজদি, সেজদি, গোলাপ, আতর আর গঙ্গাজলদের সবাইকে বলেছি খেতে। হুঁস নেই তোমার? আক্কেল নেই তোমার? উনি আবার পুরুষ-মদ্দ!"

রাখাল কিছুক্ষণ নীরব থাকিল, তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল, "আমিও তাই ভাবছি, আমি কি পুরুষ-মদ্দ? তাই যদি হব, তবে—তবে—"

মেনকা পূর্ব্বের মত ব্যঙ্গের স্বরে বলিল, "তবে ছেলে-মেয়েরা একটা কোন জিনিষ চাইলে বাইরে বাইরে পালিয়ে বেড়াও কেন ? কদ্দিন ধ'রে বলছি, আমার আর সনকার জন্যে একটা ফনোগ্রাফ কিনে দাও, গুরুমা বলেছে, বাড়ীতে গান প্র্যাক্‌টিস করতে।"

মা মেয়ের কথায় সায় দিয়া বলিলেন, "তোদের যেমন বরাত—এলি হাড়হাভাতে ওড়োনচড়ের ঘরে জন্মাতে !"

রাখাল ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "তবু ভাল, নতুন কথা শুনলুম, পঞ্চাশ টাকা মাইনের কেরাণীও হয় ওড়োনচড়ে !"

গৃহিণী কঠোর স্বরে বলিলেন, "ও সব নেকামি রাখ এখন। যেথান থেকে পার, টাকা এনে দাও, জিনিষপত্র কিনতে এখনও অনেক বাকী।"

এতক্ষণ বিভূতিভূষণ তাহার পিতার জামা-কাপড় ধরিয়া টানাটানি করিতেছিল, উদ্দেশ্য—হুঁকাটির পুনরুদ্ধার-সাধন। হঠাৎ সে পিতার পকেট হইতে একটা নেকড়ার ফালিবাঁধা পুঁটুলীর মত কি একটা জিনিষ টানিয়া বাহির করিল এবং ছুটিয়া মা'র কাছে গিয়া বলিল, "দেখ্ মা, দেখ্, বাবার পকেটে টাকা।"

রাখালচন্দ্র ছুটিয়া "কি করিস, কি করিস" বলিতে বলিতে পুঁটুলীটির উদ্ধারসাধন করিতে গেল, গৃহিণী চিলের মত ছোঁ মারিয়া তাহা তৎপূর্ব্বেই হস্তগত করিয়া লইলেন।

পুঁটুলী খুলিয়া গৃহিণীর মুখখানা বর্ষার বারিভরা মেঘের মত কাল আঁধার হইয়া গেল। তিনি ক্রোধ-কম্পিত স্বরে বলিলেন. "তবে রে মিথ্যেবাদী ! এর নাম টাকা নেই ? বাড়ীতেও জুচ্চুরি ?"

রাখালচন্দ্র মিনতিপূর্ব্বক বলিল, "যথার্থ বলছি, ও আমার টাকা না, এইমাত্র বিনোদের কাছ থেকে ধার ক'রে আনছি। ছাত দিয়ে জল ঝরছে, তাই খানিকটা বিলিতী মাটী আর গোবর কিনে আনব মনে করেছি—ছুটীর দিন, নিজেই সেরে নেব।"

"বটে ! ওরে আমার আহ্লাদে ! ঘরে লোক খাওয়াবার ঘটা করেছেন, চেগে উঠলো এখন ঘর সারান ! একটি পয়সা যদি দিই এথেকে ত আমার নামই নেই।"

মাছের মা যেমন জলে পোনা চরাইয়া লইয়া বেড়ায়, গৃহিণী ঠিক তেমনই ভাবে পুত্র-কন্যাগুলিকে লইয়া ভাঁড়ার-ঘরে প্রবেশ করিলেন, রাখালচন্দ্র হতভম্ব হইয়া চলন্ত মূর্ত্তি-গুলির দিকে তাকাইয়া তথায় ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিল।

৪

ছুটীর পর আফিস, কাযেই একটু সকাল সকাল রাখাল বাড়ীর বাহির হইয়াছিল। সেণ্ট্রাল এভেনিউর একটা ফাঁকা যায়গায় সে দেখিল, খুব লোকের ভিড়, এক পয়সায় দেশী সার্কাস হইতেছে। একটা লোক মুখে কালিঝুলি মাখিয়া, মাথায় টুপী পরিয়া, নানা অঙ্গভঙ্গী করিয়া লোক হাসাইতেছে আর দর্শক আহ্বান করিতেছে এবং চুণো-গলির দেশী ব্যাণ্ড ভ্যাঁপু ভ্যাঁপু করিয়া জোর বাজনা বাজাইতেছে।

কি জানি, কি মনে করিয়া রাখালচন্দ্র একটি পয়সা দিয়া সার্কাসে প্রবেশ করিল। মধ্যে ফাঁকা, কানাত-ঘেরা খানিকটা স্থানে খেলা দেখান হইবে, আর দর্শকরা কানাতের তিন দিকে দাঁড়াইয়া দেখিবে, একটা দিক্ কেবল গ্রীণ-রুমের জন্য রিজার্ভ ছিল।

মুহূর্ত্ত পরেই 'খেল' আরম্ভ হইল। "মাদারে খেলোয়াড়ে !" রূপ প্রশ্নোত্তরের পর সার্কাসের এক খেলোয়াড় এক বানর ও ছাগল লইয়া 'খেল' আরম্ভ করিল। মানুষের শিক্ষা দিবার কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখিয়া রাখাল বিস্মিত হইল। তাহার পর ম্যাজিক, তাসখেলা, ছোরাখেলা, গোলা লোফালুফি। তাহার পর কুকুরের খেলা। কুকুর কি প্রভুভক্ত ! তাহার প্রভু তাহাকে বলিতেছে "উঠো", সে অমনই দাঁড়াইতেছে ; প্রভু বলিতেছে "বৈঠ্ যাও", সে অমনই বসিতেছে ; প্রভু একটা গোলা ছুড়িয়া দিতেছে, কুকুর দৌড়িয়া মুখে করিয়া কুড়াইয়া আনিতেছে। কুকুর প্রভুর ইঙ্গিতে কখনও দুই পায়ে ভর দিয়া হাঁটিতেছে, কখনও ডিগবাজী খাইতেছে, কখনও পাকের উপর পাক দিয়া গড়াগড়ি দিতেছে। শেষ পাখীর খেলা। পাখী তীর ছুড়িল, বন্দুক ছুড়িল, ছুরি ঘুরাইল। প্রভু বলিল, "উঠাও পানি", অমনই পাখী জলপূর্ণ বাটি ঠোঁটে ধরিয়া শূন্যে তুলিল। প্রভু বলিল, "ঢালো পানি", অমনই পাখী শূন্য পেয়ালায় জল ঢালিয়া দিল। শেষে সে একটি পা তুলিয়া সকলকে সেলাম ঠুকিয়া মধুরেণ সমাপয়েৎ করিল। রাখালচন্দ্র আফিসে চলিল।

রাখালচন্দ্রের মনে হইল, যেন শিক্ষিত জীব খেলোয়াড় মানুষকে বলিতেছিল, "হে প্রভু! তুমি জন্ম জন্ম আমার প্রভু হও। হে শক্তিমান্! হে আশ্চর্য্য জীব! হে শিক্ষাদাতা, হে অন্নদাতা, হে ভয়ত্রাতা মানুষ! তুমি আমার প্রভু হও, আমি জন্ম জন্ম তোমায় ভালবাসিব, তোমার আদেশ পালন করিব!"

কিসের জন্য, কোন্ শক্তির বলে, কি যাদুমন্ত্রে কুকুর বা পক্ষী মানুষের এমন পদানত হয়? মানুষ কিসে এমন শ্রেষ্ঠ জীব? সিংহের মত শক্তিশালী জন্তু—হস্তীর মত বিরাটাকার বন্যজন্তু কিসে মানুষের বশ্যতা স্বীকার করে?

যেন রাখালের অন্তরের অন্তস্তল হইতে কে বলিয়া উঠিল,—মনুষ্যত্ব!

মনুষ্যত্ব! মনুষ্যত্ব! মানুষ ত সামান্য নহে, মানুষ বড়, মানুষ মহান্, মানুষ বিরাট। ছোট বলিয়া অন্তরের মনুষ্যত্বকে ছোট করিয়া রাখিলে, আমি ক্ষুদ্র বলিয়া জগতের সকলকে বৃহৎ মনে করিয়া ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া থাকিলে মানুষ ছোটই থাকিয়া যায়। মনে পড়িল তখন আর এক দিনের কথা। রাখাল শুনিল, যেন হ্যারিসন রোডের সেই স্বদেশী বক্তার কণ্ঠে উদাত্ত স্বরে ধ্বনিত হইতেছে,—ভয়কে ভয় বলিয়া দূরে ভয়ে সরিয়া গেলে ভয়ই থাকিয়া যায়!

*   *   *   *

রাখাল আফিসে গিয়া কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিল না, জিজ্ঞাসিত হইয়াও নিরুত্তর রহিয়া গম্ভীরভাবে আপনার কায করিয়া যাইতে লাগিল। ঘণ্টাখানেক পরে বড় বাবু তাহাকে তলপ দিলেন। এবার বড় বাবুর ঘরে যাইতে তাহার বুকে হাতুড়ির ঘা পড়িল না।

"কি হে রাখাল, পরশু জমীদারীমহালে সফর করতে বেরিয়েছিলে না কি হে! খাওয়ানর দিন আমার ওখানে দেখলুম না যে?"

কথাটা ব্যঙ্গের স্বরে উচ্চারিত হইলেও তাহার পশ্চাতে ক্রোধ ও বিরক্তির বিশেষ আমেজ ছিল।

রাখালের কণ্ঠস্বর বিন্দুমাত্র কম্পিত হইল না, তাহার বক্ষোদেশ হিমাচলেরই মত অটল রহিল,—সে দৃঢ়স্বরে সহজ সরল ভাষায় বলিল, "নেমন্তন্ন হয় নি, তাই যাই নি, হ'লে অবশ্যই যেতুম।"

বড় বাবু চমকিত হইয়া চেয়ার হইতে পড়িয়া যাইবার উপক্রম করিলেন। এ কি রাখাল তাঁহার সহিত কথা বলিতেছে—তাঁহার আফিসের সামান্য কেরাণী রাখাল! বিস্ময়ে তাঁহার কিছুক্ষণ বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

বড় বাবু ক্ষণপরে যথাসম্ভব প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন, "কি রকম? আমি নিজে তোমায় বলেছিলুম ছুটীর আগের দিন—বাজারও সে দিন ক'রে দিয়ে এলে—"

রাখাল তাঁহার কথা শেষ হইতে না দিয়া বলিল, "হাঁ, বাজার ক'রে দিয়ে এসেছিলুম বটে, সেটা ভদ্রতার খাতিরে। এক জন আমার উপর নির্ভর ক'রে আছেন, আর আমি কথামত বাজারটা না ক'রে দিয়ে তাঁকে বিপদে ফেলবো, এটা আমি পছন্দ করি নি।"

বড় বাবু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আর খেতে যাবার কথা দিয়ে কথা না রাখাটা কেমন ভদ্রতা?"

রাখালও সমান তেজে বলিল, "না, ওতে আমি কথা দিই নি। ভদ্রলোক ভদ্রলোককে নেমন্তন্ন করতে তার বাড়ী যায়, অন্ততঃ আমাদের বাঙ্গালী সমাজে। বিশেষ, ওপরওয়ালা মনিব যদি তা না করেন, তা হ'লে বুঝতে হবে, তিনি নেমন্তন্ন করেন নি, আফিসের মত মনিবানা হুকুম চালিয়েছেন। সে হুকুম আফিসের গণ্ডীর মধ্যে ন্যায্য হ'লে আমি মানতে বাধ্য বটে, কিন্তু বাইরে নয়, তা ন্যায্যই কি আর অন্যায্যই কি।"

বড় বাবুর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি গম্ভীর হইতে গম্ভীরতর ভাব ধারণ করিলেন। ক্ষণপরে বলিলেন, "হুঁ। আচ্ছা, যেতে পার এখন।"

রাখাল কেরাণীদের কক্ষে যাইবার সময় মনে করিল, তাহার মনটার উপর হইতে যেন দশ মণ জগদ্দল পাথরের একটা গুরুভার নামিয়া গেল, যেন একটা নবীন মদিরার উত্তেজনায় তাহার অন্তর ভরপূর হইয়া গেল, তাহার চরণদ্বয় যেন মৃত্তিকাস্পর্শ করিতেছিল না। সে বুঝিল, সে এই কথাবার্ত্তায় তাহার আফিসের কাযের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া আসিল, হয় ত তাহার ফলে তাহাকে পুত্র-পরিবারের হাত ধরিয়া পথে দাঁড়াইতে হইবে,—তথাপি উৎসাহের মদিরা তাহার মনটাকে একটা অভূতপূর্ব্ব অনাস্বাদিতপূর্ব্ব আনন্দরসে ভরাইয়া দিল।

*   *   *   *

আফিসের পর বাড়ী ফিরিয়া রাখাল বেশ-পরিবর্ত্তন করিয়া হস্ত-পদাদি প্রক্ষালন করিতেছে, এমন সময়ে একখানা গাড়ী আসিয়া দ্বারে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে একটি ভদ্রলোক বাহিরের কক্ষে পদার্পণ করিয়া বিদ্রূপের ভঙ্গীতে বলিলেন, "কি হে বাবুজী, চন্নির (চমৎকারিণীর) সঙ্গে না কি ঝগড়া করেছ? সে আমাদের ওখানে যাবার জন্যে গাড়ী নিয়ে আসতে লিখে পাঠিয়েছে। ব্যাওরাখানা কি?"

বক্তা রাখালচন্দ্রের শ্যালক রাধানাথ বাবু।

রাখাল বলিল, "আমি ত কিছুই জানিনে তার। তিনি যেতে চান যান, আমার তাতে কোনও বাধা নেই।"

রাধানাথ বলিলেন, "শুনলুম, ছুটীর দু'দিন তাকে নাকের জলে চোখের জলে করেছ। কেন, হয়েছে কি? এ সব আবার কবে থেকে হ'ল?"

রাখাল মুখ ধুইতে ধুইতে বলিল, "কি সব? তু ব'লে ডাকলে আর ছুটে যাই নি—এই ত?"

রাধানাথ বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে বলিলেন, "আশ্চর্য্য ক'রে দিলে যে হে রাখাল বাবু! তুমি,—তুমি রাখাল, তুমি ত এমন ছিলে না—কার মন্তর পেলে বল ত? উড়ের দেশ থেকে যে বন্ধুটি—"

কথাটা শেষ হইল না; যাহাকে ইঙ্গিত করিয়া মন্তব্য করা হইতেছিল, স্বয়ং সেই বিনোদ বাবুই তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি রাধানাথের অসমাপ্ত কথাটার সূত্র ধরিয়া বলিলেন, "উড়ে দেশের বন্ধুটির কথা কি বলছিলেন মশাই? আমিই সেই। মশাইকে জানি না বটে, তবে—"

রাধানাথ বাধা দিয়া ক্রোধ-কম্পিত স্বরে বলিলেন, "আপনিই সেই? বলুন ত, কোত্থেকে উড়ে এসে আপনি স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে এমন মন-ভাঙ্গাভাঙ্গি করছেন?"

রাখাল দীপ্তকণ্ঠে একটা কড়া জবাব দিতে যাইতেছিল, কিন্তু বিনোদ বাধা দিয়া স্বয়ং বলিলেন, "আমি কি করি না করি, তার কৈফিয়ৎ আপনার কাছে দেবার আগে জানতে পারি কি, কোন্ অধিকারে আপনি উড়ে দেশের বন্ধুর অসাক্ষাতে তার নিন্দা করছিলেন?"

রাধানাথ বাবু একটু নরম হইয়া বলিলেন, "দেখুন, রাখাল বাবু আমার নিকট-আত্মীয়—আমার ভগিনীপতি। এত কাল এঁরা স্ত্রী-পুরুষে মিলে-মিশে কাটিয়ে এসেছেন। বৈষ্ণবরা যাকে বলে তৃণের মত নীচু হয়ে থাকা, ইনি তাই ছিলেন, আজ হঠাৎ দু'দিন—"

বিনোদ বলিল, "বলুন,—দু'দিন উড়ের দেশের বন্ধু এসে সেই তৃণকে অশ্বত্থগাছ ক'রে তুললে কি ক'রে? দেখুন, আপনারা গোড়ার দিকটা খুব পাখীপড়ার মত মুখস্থ করেছেন,—তৃণাদপি সুনীচেন, কিন্তু শেষের দিকটা—তরোরিব সহিষ্ণুণা কথাটা চাপা দেন কেন? তৃণের মত নীচ হওয়া কি সহজ কথা? তরুর মত সহিষ্ণু না হ'লে তৃণের মত নীচু হওয়া যায় না। কত শক্তি ধারণ করলে এমন সহ্য করবার ক্ষমতা পাওয়া যায়? কত বড় শক্তিধর তৃণের মত নীচু হ'তে পারে, তা ভেবে দেখেছেন কি?"

রাখাল বাধা দিয়া বলিল, "আহা, যেতে দাও ভাই—"

বিনোদ সে কথা শুনিল না, তখন তাহার হৃদয় ভাবের আবেগে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে সে কোন বাধা মানিতে চাহিল না। সমান তেজে সে বলিয়া যাইতে লাগিল, "না, যেতে দেবো না। শক্তিমান্ যদি নীচু হয়, তাতে দোষ স্পর্শ করে না; কিন্তু ভয়ে বা গোলামীর মোহে যে নীচু হওয়া, তাকে নীচু হওয়া বলে না, সেটা মনুষ্যত্ব নয়,—কাপুরুষতা। আমরা বাঙ্গালী জাত সে কথা ভুলে যাই ব'লে আমাদের কেরাণীর জাত ব'লে নাম হয়েছে। যাক্, মিথ্যে তর্ক করতে চাই নি। রাখাল, আজ আমি আসবো গিয়ে। আজ রাতে আমার ওখানে তোর নেমন্তন্ন রইলো। আর যা বলেছিলুম, ভেবে দেখিস—উড়ের দেশে আমার যদি দু' মুঠো অন্ন জোটে, তোরও জুটবে নিশ্চয়—একলা এত বড় কারবার আর চালাতে পারছি নি। যে দিন ঠিক করবি, আমায় তার করিস। আর আমার ঘরে তোর মেয়ে দেবার কথা এর পর না হয় চিঠিতেই হবে। আমি চল্লুম, বাজার-হাট কিছু করতে হবে।"

বিনোদ উত্তরের প্রতীক্ষা না রাখিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল। রাধানাথ বাবু কিছুক্ষণ একদৃষ্টে দ্বারের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া উচ্চহাস্যের সহিত বলিলেন, "পাগল একটা!"

গোলযোগ শুনিয়া বহির্ব্বাটীতেই রাখালচন্দ্রের পত্নী ও পুত্র-কন্যারা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। তাহারা অন্তরালে থাকিয়া সকল কথাই শুনিয়াছিল। রাখাল শ্যালকের

অবজ্ঞার হাসি ও কথা শুনিয়া ক্রোধে প্রায় ধৈর্য্যচ্যুত হইয়াছিল, সে বলিল, "পাগল ও, না তুমি ?"

রাধানাথ বিনোদ বাবুর নিকট মুখের মত জবাব পাইয়া তাহার উত্তরে কিছু বলিবার না পাইয়া মনে মনে গর্জ্জন করিতেছিলেন, এইবার সুযোগ পাইয়া বলিলেন, "দেখ রাখাল, বাড়াবাড়ি ভাল না। কোথাকার একটা হতচ্ছাড়া লোক এসে কানে কি মন্তর আওড়ালে, আর অমনই তুমি নেচে উঠে মাগ-ছেলের সঙ্গে কাওয়া-মুচির ঝগড়া আরম্ভ ক'রে দিলে—"

রাখালচন্দ্র উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "জান, কাকে তুমি হতচ্ছাড়া বলছ ?"

রাধানাথ সমান ওজনে বলিলেন, "জানি, একটা ভবঘুরে জোচ্চোর—"

রাখালচন্দ্রের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল, সে চীৎকার করিয়া বলিল, "নিকাল যাও আবি! আমার বাড়ীতে ব'সে আমার বন্ধুর অপমান! যাও, চ'লে যাও এখান থেকে। ও সব নবাবী মেজাজ আমার বাড়ীতে চলবে না। জান, আমি যে হই, এ আমার বাড়ী!"

গৃহিণী চমৎকারিণী মাঝে পড়িয়া বলিলেন, "ওগো, তোমরা করছ কি, ছেলেপুলেরা ভাবছে কি ?"

রাখাল অবিকম্পিত কণ্ঠে বলিল, "যে নিজের মান নিজে রাখতে পারে না, তার আবার মান-অপমান কি ?"

রাধানাথ ভগিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আয় চন্নি, আমরা চ'লে যাই। এই গোঁয়ার চাষার সঙ্গে তর্ক করা মিছে।"

"দাদা!"

চমৎকারিণীর কণ্ঠে যে সুর বাজিয়া উঠিল, রাধানাথ তাহাতে চমকিত হইলেন। তিনি সবিস্ময়ে দেখিলেন, তাঁহার ভগিনীর নয়নযুগল আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে, ওষ্ঠাধর স্ফুরিত হইতেছে, অঙ্গযষ্টি থর থর কম্পিত হইতেছে। তিনি বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রাখানাথ মৃদুহাস্যের সহিত একবার পত্নীর প্রতি, একবার শ্যালকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। সে অবজ্ঞার হাসি রাধানাথকে আবার পাগল করিয়া তুলিল।

তখন রাধানাথ ক্রোধ-কম্পিত স্বরে ভগিনীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তবে যাবি নি ?"

মেনকা এতক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া ছিল। সে এইবার অগ্রসর হইয়া রাখালচন্দ্রের হস্তধারণ করিল, স্নিগ্ধকণ্ঠে আদরের স্বরে ডাকিল, "বাবা!"

সেই ডাকে চমৎকারিণীর ক্ষণিকের মোহ অপসারিত হইল। একবার স্বামীর মুখের দিকে তাকাইয়া তিনি নয়নপল্লব অবনমিত করিলেন। তিনি কি স্বামীর মুখ-চক্ষুতে নবজীবনের নব-উষার রক্তরশ্মিপাত প্রতিফলিত হইতে দেখিয়াছিলেন ?

ধীরে দৃঢ়স্বরে চমৎকারিণী বলিলেন, "দাদা, তুমি ফিরে যাও; আমি যাব না।"

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

হিমালয়ে

সেথা মেঘে মেঘে লুকোচুরি আঙিনা-মাঝে,
রক্তরবির ঘটা সকাল সাঁঝে।
সেথা দেবদারু দ্রুমদল উন্নত শীর্ষ,
তুষারের স্তুপে স্তুপে উজ্জ্বল দৃশ্য।
সেথা বেণুবনে গান গায় পবন দুরন্ত,
ঝর্ঝর নির্ঝরধারা অফুরন্ত।
সেথা অকাল সন্ধ্যা জাগে গৈরিক বর্ণে,
বহে বায়ু দ্বিধাকৃত ময়ূরের পর্ণে।
সেথা কিন্নরী গান গায় কিন্নর সঙ্গে,
লিখে প্রণয়ের প্রতিলিপি ভূর্জ্জের অঙ্গে।
সেথা মহাযোগী দ্রুমতলে তপাচার লগ্ন,
প্রিয় লাগি পার্ব্বতী মহাধ্যান-মগ্ন।
সেথা ভস্মিল স্মরদেহ ত্রিনয়ন-নেত্র,
সে যে যুগে যুগে সাধকের সাধনার ক্ষেত্র।

শ্রীঅমীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়

থলে প্রস্তুতের উপাদান

ব্যবসায়-বাণিজ্যে, দ্রব্যাদি সংরক্ষণ ও বহনে ও গৃহকর্ম্মে কোন না কোন প্রকারে থলে নিত্য আবশ্যক। পাটের চট অথবা থলে এ পর্য্যন্ত আমাদিগের এতদ্বিষয়ে অভাব পূরণ করিয়া আসিতেছে। পাটফসল বঙ্গদেশ ভিন্ন অন্যত্র অতি সামান্যই জন্মিয়া থাকে। পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদির দেশে ও বিদেশে কাটতিতে বঙ্গদেশে প্রচুর ধনাগম হয়, যদিও তাহার সামান্য অংশই প্রকৃত পাট-চাষীর ঘরে যায়। গত বৎসর পাট চাষিগণের যে দুরবস্থা হইয়াছিল, তাহা সকলেই জানেন; সে দুরবস্থার এখনও সম্যক্ প্রতীকার হয় নাই। অন্য দিকে স্বদেশ-হিতৈষী কতিপয় বিশেষজ্ঞের মত এই যে, পাটই বাঙ্গালার দুঃখ-দৈন্যের কারণ; ইহার দ্বারা বিদেশীয় বণিক ও মাড়ওয়ারী-গণের লাভ হয় বটে, কিন্তু বঙ্গসন্তানগণ খুব কমই পায় এবং পাইলেও সেরূপ ভাবে অর্জ্জিত অর্থে বিদেশীয় বিলা-সিতার দ্রব্যাদি ক্রয়ে নিঃশেষিত হয়; সর্ব্বোপরি পাট-চাষের অতিবিস্তারে খাদ্যফসলের জমী কমিয়া যাইতেছে। এই সমুদয় কারণে আবশ্যক মাত্রার অধিক পরিমাণে পাট-চাষ হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে।

অপরাপর তন্তু-ফসল

আজকাল পাটের প্রচলন এত অধিক হইয়া পড়িয়াছে যে, অনেকেই ইহা ভুলিয়া যান যে, এক শত বৎসর পূর্ব্বে পাটের চাষ কমই হইত। বিগত শতাব্দের প্রথম দশকেই রপ্তানী করিবার উপযুক্ত পরিমাণে পাট বাজারে আসিতে আরম্ভ করে। তদ্দর্শনে নানাপ্রকার বৃক্ষগুল্মাদির ত্বক অথবা পত্র হইতে থলে প্রভৃতি প্রস্তুত হইত। এখনও সে সকল উদ্ভিদ গ্রামে ও বন-জঙ্গলে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় এবং তৎসমুদয় হইতে প্রস্তুত থলে প্রভৃতি চটের থলের সহিত সমান না হইলেও সাধারণ কার্য্যের পক্ষে খুবই উপযুক্ত। ব্যবসায়িক হিসাবে একত্র অধিক সংখ্যায় তৈয়ারী করিলে উহাদের মূল্যও অনেক কম হইতে পারে। বস্তুতঃ এই প্রকার থলে প্রস্তুতের সুলভ উপাদানের সন্ধানে দুই একটি বিলাতী কোম্পানী নিযুক্ত হইয়াছেন। ব্যবসায়-ক্ষেত্রে সস্তা থলের যথেষ্ট কাটতিরও সম্ভাবনা আছে। আমরা এ স্থলে এই শ্রেণীর কতিপয় উপাদানের উল্লেখ করিতেছি। উপযুক্ত যন্ত্রাদি সাহায্যে কার্য্য করিলে উক্ত উপাদানসমূহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম্য অথবা আরণ্য শিল্পের ভিত্তি হইতে পারে এবং দ্রব্যাদি সংগ্রহ ও কারখানায় কায করিয়াও অনেক দরিদ্র লোকের অন্ন-সংস্থান হইতে পারে।

কেতকী

কেতকী অথবা কেয়ার সহিত সকলেই সুপরিচিত আছেন; কেওড়ার জল ও আতর এবং কেতকী-সুবাসিত খদিরের এখনও যথেষ্ট আদর আছে। কিন্তু গন্ধ উৎপাদন ব্যতীত অন্য উপায়ে কেয়ার কমই সদ্ব্যবহার হয়। ভারতে সাত জাতীয় কেতকী আছে; তন্মধ্যে Pandanus Odoratissimus অন্যতম। ভারতের নানা স্থানে, বিশেষতঃ দক্ষিণ-ভারতের বালুকাময় সমুদ্রতটে এবং ব্রহ্ম ও আন্দামান দ্বীপ উপকূলে কেতকী প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। সুন্দরবনে এক এক স্থানে কেয়ার জঙ্গল এত ঘন যে, উহার মধ্যে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য। কেতকী-পত্রের তন্তু সূক্ষ্ম এবং সুদৃঢ়; দড়ি, সুতলী ও জাল প্রস্তুতে ইহা স্থানে স্থানে ব্যবহৃত হয়। ইহার মূলও টুকরী এবং ব্রুস প্রস্তুতের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযুক্ত। আমরা এ স্থলে পত্রের কথাই বিশেষ করিয়া বলিতেছি। কেয়া-গাছ ১০ হাত পর্য্যন্ত বড় হয়; কিন্তু খুব বড় গাছের পত্র মোটা হইয়া যায়। অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক গাছের পত্র চিক্কণ ও সহজে নমনীয়। এই প্রকারের পাতা কাটিয়া তাহার প্রান্ত ও পৃষ্ঠদেশের কাঁটা চাঁছিয়া ফেলা হয়। তৎপরে সরু অথবা মোটা যেরূপ চেটাই আবশ্যক, সেই অনুসারে পাতাগুলিকে লম্বালম্বিভাবে

ফালি করা দরকার। ফালিগুলি প্রথমে রৌদ্রে শুকাইয়া পরে এক খণ্ড তক্তা ও ছুরীর মধ্য দিয়া টানিয়া লইলে উহা বেশ মসৃণ হইয়া যায় এবং বুনিবার উপযুক্ত অবস্থায় আইসে। দক্ষ লোক হইলে এক জনই আট জন বুনিবার লোককে পাতা যোগাইতে পারে। নয় জন লোকে দিনে অন্ততঃ ২৬টি থলে প্রস্তুত করা খুবই সম্ভবপর। অরণ্য-সান্নিধ্যে, যেখানে মজুরীর হার কম, সেরূপ স্থলে কেয়ার পাতা হইতে থলে তৈয়ারী করিলে প্রত্যেকটির দাম ছয় কিংবা আট পয়সার অধিক হইতে পারে না। এইরূপ থলে যে বেশ মজবুদ হয়, তাহা পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে। মরিচ দ্বীপ, ফিলিপাইন প্রভৃতি দেশে কাফি, চিনি, খাদ্য-শস্য ও অন্যান্য দ্রব্যাদি বহনে কেয়ার থলের ব্যবহার এখনও আছে; এমন কি, কেয়ার ডবল থলে সমুদ্রপথে মাল রপ্তানীর জন্যও নিযুক্ত হয়।

কেয়া গাছ

তাল-শ্রেণীর বৃক্ষাদি

তাল, খেজুর, নারিকেল ও সমশ্রেণীর ভারতীয় উদ্ভিদের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। তালবর্গীয় অনেক উদ্ভিদ হইতেই তন্তু পাওয়া যায়। তাল ও খেজুর-পাতার থলে এখনও বোম্বাই, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, পঞ্চনদ প্রভৃতি অঞ্চলে খুব প্রচলিত। বঙ্গদেশের কোন কোন জিলায় তাল ও খেজুর-পাতার চেটাই ও থলে প্রস্তুত হয়; কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কমিয়া গিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গে ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বেও ১শত বর্গ-গজ খেজুর-পাতার চেটাইয়ের মূল্য মাত্র ৬৲ টাকা ছিল। অনেক প্রদেশের অরণ্যবিভাগ খর্জ্জুর ও তালপত্র বিক্রয় করিয়া নিতান্ত সামান্য আয় করেন না। অবশ্য এই প্রকারের থলে ২।৩ বারের অধিক ব্যবহার করা চলে না; কিন্তু তাহা হইলেও তাহাদের স্বল্পমূল্য বিবেচনাযোগ্য। এই প্রকার থলে প্রস্তুত গ্রাম্য শিল্প-সংগঠনেরও অনুকূল।

এই প্রসঙ্গে দুইটি তাল-বর্গীয় উদ্ভিদ বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। উপসাগু বৃক্ষ (Caryota ureus) কলিকাতার বাগান-বাগিচায় অনেকে দেখিয়াছেন। ইহাদের স্থূল স্তম্ভাকৃতি কাণ্ড ৬০ ফুট পর্য্যন্তও উচ্চ হইয়া থাকে। পূর্ব্ববঙ্গ, আসাম ও দাক্ষিণাত্যের আর্দ্র জঙ্গলসমূহ ইহার বাসস্থান। পার্ব্বত্যজাতিরা ইহাকে 'ভেড়োয়া' বলিয়া থাকে। ভেড়োয়ার পত্রবৃন্তের মূলে যে নগ্ন তন্তুগুচ্ছ থাকে, তাহার বাজার-নাম 'কিত্তল ছোবড়া' (Kittul fibre)। মালয় ও সিংহল হইতে এই মূল্যবান্ তন্তু বহু পরিমাণে রপ্তানী হয়; কিন্তু ভারত হইতে ইহার রপ্তানী নাই বলিলেই চলে। ইহার দীর্ঘ পত্র চেটাই বুনিবার পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী এবং উক্তরূপ চেটাই হইতে কম দরের থলেও প্রস্তুত হইতে পারে। এখনও পর্য্যন্ত ভারতীয় বনসমূহের অসংখ্য ভেড়োয়া গাছের কোন সদ্ব্যবহার হয় নাই। কেবলমাত্র স্থানীয় লোকরা ইহা হইতে মোটা রশী, দড়ি, জাল, ডোর এবং টুকরি সামান্য মাত্রায় প্রস্তুত করে। ভেড়োয়া গাছের কাণ্ডের মধ্যে যে শ্বেতসার সঞ্চিত থাকে, তাহা প্রকৃত সাগুদানার ন্যায় উৎকৃষ্ট না হইলেও পুষ্টিকর। মালাবার অঞ্চলের দরিদ্র লোকরা উহা সংগ্রহ করিয়া খাদ্যরূপে ব্যবহার করে। তাল-খেজুরের মত ভেড়োয়া গাছও প্রচুর পরিমাণে রস উৎপাদনক্ষম এবং উক্ত রসের

গুড়ও বেশ ভাল হয়। একাধারে শর্করা, শ্বেতসার ও তন্তু উৎপাদক ফসলের সংখ্যা অধিক নহে ; উপসাগুদানার গাছ সেই জন্য সাধারণের মনোযোগ প্রদানের উপযুক্ত বস্তু।

গোলপাতার সহিত কলিকাতা ও নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের অধিবাসিগণ বিশেষ পরিচিত আছেন। সুন্দরবনে ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে এবং প্রতি বৎসর প্রায় দেড় লক্ষ টন পাতা তথা হইতে দেশমধ্যে চালান আইসে। গোলপাতা প্রধানতঃ ঘর ছাওয়ার জন্যই ব্যবহৃত হয়। পাতার বোঁটা সুঁদরী, গরাণ প্রভৃতি ও জাল ভাসাইবার উদ্দেশ্যেই নিযুক্ত হইয়া থাকে। গোলপাতার উপর ভিত্তি করিয়া দড়ি, দড়া, থলে, চেটাই প্রভৃতি প্রস্তুতের একটি আরণ্যশিল্প প্রতিষ্ঠিত করা আদৌ অসম্ভব নহে। এ স্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, গোলপাতাগাছের কাণ্ড অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইলেও ইহা হইতে যথেষ্ট পরিমাণে রস পাওয়া যায়। এইরূপ রস হইতে সুরা অথবা শর্করা প্রস্তুত হইতে পারে। বস্তুতঃ গোলপাতার সুরা ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের সম্প্রতি একটি বিশিষ্ট শিল্প হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এতদ্দেশে কি সরকারী বনবিভাগ, কি জনসাধারণ কেহই এ বিষয়ে মনোনিবেশ করেন নাই।

কুম্ভী ও জঙ্গলী বাদাম

ভারতীয় অরণ্যসমূহে এরূপ কতিপয় বৃক্ষ দৃষ্ট হয়, যাহাদের কাণ্ডত্বক সামান্য প্রয়াসের সহিতই থলেতে পরিণত করিতে পারা যায়। ইহাদের ত্বকের বাহ্যাংশ স্বাভাবিক অবস্থাতেই জালের ন্যায় বুননযুক্ত এবং কোন কোন স্থলে এইরূপ তন্তুজাল আপনা আপনিই কাণ্ড হইতে বিচ্যুত হয়। কুম্ভী বৃক্ষ এই শ্রেণীর গাছের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কুম্ভী বৃহদাকার গাছ এবং উত্তরবঙ্গ, মধ্য ও দক্ষিণ-ভারতেই ইহার প্রসার অধিক। ইহার তন্তু রক্তাভ ও সুদৃঢ় এবং সহজেই ত্বক্ হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় ; সুতরাং এইরূপ তন্তু সংগ্রহ করিয়া থলে প্রস্তুত করিতে অধিক খরচ পড়ে না। বস্তুতঃ জঙ্গলাঞ্চলে কুম্ভী ত্বকজাত যে সকল থলে দেখা যায়, তৎসমুদয় সুদৃশ্য না হইলেও বেশ মজবুদ এবং অরণ্যজাত দ্রব্যাদি বহনের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযুক্ত। কুম্ভীর বৈজ্ঞানিক নাম Careya arborea.

Steruliaগণের অনেক জাতীয় গাছ হইতে উৎকৃষ্ট তন্তু পাওয়া যায়। সাধারণতঃ ইহাদিগকে জঙ্গলী বাদাম বলা যায়। S. villoso ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। ইহার শ্বেতাভ গোলাপী বর্ণের তন্তুজাল বড় বড় টুকরার আকারে স্বভাবতঃই কাণ্ড হইতে বিচ্যুত হইয়া যায়। এই প্রকার বিচ্ছিন্ন তন্তুজাল হইতে গবাদি পশুর 'গলাসি' (halter) প্রস্তুত হয়। জঙ্গলী বাদাম-তন্তু যে কত শক্ত, তাহা এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ব্রহ্ম, পূর্ব্ববঙ্গ ও মালাবার অঞ্চলে হাতী বাঁধার কাছি সাধারণতঃ ইহা হইতেই প্রস্তুত হয়। ভারতের অনেক স্থলেই আরণ্যশিল্পরূপে নানা জাতীয় জঙ্গলী বাদাম হইতে থলে প্রস্তুতের কার্য্য চলিতে পারে।

থলের গাছ

ইংরাজী সাহিত্যাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ Upas treeর নাম শুনিয়াছেন। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Antiaris toxicaria। পূর্ব্বকালে ইহার বিষপ্রভাব সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল ; এমন কি, লোক মনে করিত যে, ইহার সান্নিধ্যে মানব, ইতর জন্তু এবং উদ্ভিদ কেহই প্রাণধারণ করিতে পারে না। এখন ইহা অতিরঞ্জন বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে ; অবশ্য বয়স, ঋতু ও স্থানভেদে ইহার দুগ্ধবৎ আঠার অল্পবিস্তর বিষক্রিয়া আছে। ত্রিবাঙ্কুরে Upas tree থলের গাছ বলিয়াই পরিচিত। ইহার ত্বক্ হইতে অতি সহজেই থলে প্রস্তুত করা যায় বলিয়া সম্ভবতঃ এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। কুর্গ, কঙ্কণ, কানাডা প্রভৃতি অঞ্চলে মহাকায় থলের গাছের ত্বক্ হইতে পশমবৎ সূত্র সংগ্রহ করিয়া পরিধেয় প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। বিশেষতঃ অরণ্যের উপকণ্ঠবাসী জাতিগণের মধ্যে এই প্রকার গাত্রাবরণের প্রচলন দৃষ্টিগোচর হয়। যে প্রথায় দাক্ষিণাত্যে এই গাছ হইতে থলে তৈয়ারী হয়, তাহা অতি প্রাচীন হইলেও স্থানীয় লোকের পক্ষে সুবিধাজনক। সচরাচর যেরূপ ব্যাসের থলে হইবে, সেই অনুসারে আন্দাজ করিয়া একটি ডাল কাটিয়া লওয়া হয়। ডাল বড় হইলে থলের মাপের মত কয়েকটি খণ্ডে উহাকে বিভক্ত করিয়া জলে কিছু দিন ভিজাইয়া রাখিলে ত্বক্ নরম ও আল্‌গা হইয়া যায়। তৎপরে লাঠির আঘাতে ত্বক্ একবারে আল্‌গা করিয়া দিয়া ও উহাকে জল দিয়া পরিষ্কৃত করিয়া উল্টাদিকে প্রায়

কাষ্ঠখণ্ডের প্রান্ত পর্য্যন্ত টানিয়া আনা হয়। পরে প্রান্তের সামান্য অংশ বাদ দিয়া অবশিষ্ট কাঠ করাত দিয়া কাটিয়া ফেলিলে ত্বক্-সংলগ্ন কাঠই থলের তলায় কার্য্য করে। অতঃপর আবার একবার ভাল করিয়া জলে ধুইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইলেই খুব দৃঢ় থলে প্রস্তুত হইল। সাধারণতঃ এইরূপ থলে ধান্য ও চাউল বহনের জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু একটু উন্নত প্রথায় প্রস্তুত করিলে এই প্রকারের থলে নানাবিধ কার্য্যে লাগিতে পারে।

এ পর্য্যন্ত প্রাদেশিক অথবা ভারতীয় বনবিভাগসমূহ কাঠের কয়লা, খদির, তার্পিণ, কাষ্ঠ চোলাই ও বিশেষ বিশেষ দারুনির্ম্মিত বস্তু ইত্যাদি কতিপয় শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ভারতের বিশাল অরণ্যসমূহে এখনও বিরাট-পরিমাণ গৌণ আরণ্য ফসল অবহেলায় নষ্ট হইতেছে। এই প্রকার ফসলের মধ্যে তন্তু-উৎপাদক ফসলের মাত্রা নিতান্ত কম নহে। ভারতের ন্যায় দেশে এই শ্রেণীর ফসলজাত দড়ি-দড়া, থলে, চট ইত্যাদির যে কত অভাব আছে, তাহা সকলেই বিশেষরূপে জ্ঞাত আছেন। জঙ্গলের মধ্যে কিংবা তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে উক্ত প্রকারের কাঁচা মালকে বাণিজ্যের দ্রব্যে পরিণত করাও দুঃসাধ্য ব্যাপার নহে। কিন্তু যত দিন জনসাধারণ এই সকল দ্রব্যের প্রকৃত গুণ বুঝিয়া উহাদিগকে ব্যবসায়ে আনিতে চেষ্টা না করিবে, তত দিন এতদ্দেশের শিল্প-সংগঠনের আশা সুদূরপরাহত বলিয়া বোধ হয়।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

নববর্ষের শুভ কামনা

১

পুরাতন হ'ল অবসান,
নববর্ষ হর্ষভরে,
আসিয়াছে ধরা পরে,
মহাকাল সিন্ধুনীরে লহরী সমান—
এক গত, অন্য আগুয়ান!

২

এক দিনে কি পরিবর্ত্তন!
জন্ম-মৃত্যু এক দিনে,
এক দিনে হারে-জিনে,
এক দিনে পুরাতন হইল নূতন।
এক দিনে উত্থান পতন!

৩

প্রবীণে নবীন অভ্যুদয়,
সেই পুরাতন ধরা,
আজি নব স্বপ্ন-ভরা,
নব রবি নব ছবি করেছে উদয়!
নব আশা নব ভাষা কয়!

৪

আজি দিন শুভ কামনার—
জীবনের অভিশাপ,
মুছে যাক্ পাপতাপ,
বিমল স্বর্গীয় শান্তি করুক বিহার!
ক্ষিতি হ'ক্ প্রীতির আধার!

কণ্ঠে কণ্ঠে হ'ক্ রামকৃষ্ণ নামগান,
বাজুক মোহন বেণু,
ধূলা হ'ক্ স্বর্ণ-রেণু,
স্বর্ণ-ধেনু আরাধনা হ'ক্ অবসান!
কাম-কাঞ্চনের চিতা হউক নির্ব্বাণ!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিবি স্মিটের উইল পাঠ

বৃদ্ধা বিবি স্মিটের আকস্মিক মৃত্যুতে তাহার পারিবারিক শান্তি ও শৃঙ্খলা বিলুপ্ত হইল এবং অল্পদিনের মধ্যেই তাহার সংসারে যে সকল পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল, তাহার আমূল বৃত্তান্ত প্রকাশের স্থান নাই। তাহার আশা ছিল, সে আরও বহু বৎসর জীবিত থাকিবে এবং সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ বহুগুণ বর্দ্ধিত করিবে; তাহার ইচ্ছা ছিল, কারবারটিকে এরূপ অবস্থায় রাখিয়া যাইবে, যেন ভবিষ্যতে তাহা কোন কারণে নষ্ট হইতে না পারে; কিন্তু কালের কঠোর দণ্ডাঘাতে এই সকল আশা অপূর্ণ রাখিয়াই তাহাকে ইহজগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইল। ধূলার দেহ ধূলায় মিশিল। তাহার মৃত্যুশোকে বার্থাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কাতর হইল। কয়েক দিন সে শোকাভিভূত হইয়া শয্যায় পড়িয়া রহিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া কেহ তাহাকে সান্ত্বনাদানের চেষ্টা করিল না; তাহাকে বিরক্ত করিতে কাহারও সাহস হইল না। অনেকে মনে করিল—বার্থা এই শোক সংবরণ করিতে না পারিয়া হয় ত পরলোকে তাহার স্নেহময়ী জননীর অনুসরণ করিবে। কিন্তু কালে সকল শোকই সহিয়া যায়, বার্থাও শোক সংবরণ করিয়া ধীরে ধীরে প্রকৃতিস্থ হইল। তথাপি যেন বিষাদের একখানি স্থায়ী যবনিকা তাহার হৃদয়কে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিল; সেই যবনিকা ভেদ করিয়া তাহার মুখে কোন দিন হাসি ফুটিল না।

বিবি স্মিটের মৃতদেহ মহাসমারোহে সমাধি-ক্ষেত্রে অপসারিত হইল। জুরিচের প্রধান প্রধান অধিবাসিবর্গ বহুমূল্য কৃষ্ণ পরিচ্ছেদে ভূষিত হইয়া, অবনতমস্তকে মৃতদেহের অনুসরণ করিয়া যথানিয়মে শোক প্রদর্শন করিলেন। কিন্তু বৃদ্ধার মৃত্যুতে তাহার পুত্র-কন্যা ও তাহার অনুগ্রহপুষ্ট কয়েক জন অন্তরঙ্গ আত্মীয় ভিন্ন অন্য কাহারও হৃদয় ব্যথিত বা শোকে কাতর হয় নাই; বরং তাহার মৃত্যুতে অনেকেই আনন্দ অনুভব করিয়াছিল; কারণ, তাহার ঐশ্বর্য্যের হিংসা করিত এবং তাহার দর্প, দম্ভ ও বাহ্যাড়ম্বরের জন্য তাহাকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করিত—এরূপ লোকের সংখ্যা জুরিচে অল্প ছিল না। যাহারা নানা কারণে তাহাকে ভয় করিত, তাহারা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'আপদ গিয়াছে, বাঁচা গেল!'—অথচ তাহারাই অশ্রুপূর্ণ-নেত্রে বিমর্ষ-বদনে তাহার শবের অনুসরণে শোকযাত্রার গাম্ভীর্য্য বর্দ্ধিত করিল! অবশেষে গৃহহীন নিরন্ন ভিক্ষুকের ও তাহার পরিণামে কোন পার্থক্য রহিল না। যমের পক্ষপাত নাই; তাঁহার নিকট উচ্চ-নীচ, ক্ষুদ্র-বৃহৎ সব সমান।

বিবি স্মিটের মৃত্যুতে বার্থার মানসিক অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ করিয়াছি; তাহার পুত্রদ্বয়ও স্নেহময়ী জননীর বিয়োগ-শোকে কাতর হইয়াছিল বটে, কিন্তু মাতার অভাবে বৈষয়িক কার্য্যের সুব্যবস্থা করিবার জন্য তাহাদের ঘাড়ে এতই চাপ পড়িল যে, সেই চাপে মাতৃশোক তাহাদের হৃদয় হইতে অবিলম্বে পলায়ন করিতে বাধ্য হইল। বিবি স্মিট তাহার বিস্তীর্ণ কারবারের পরিচালনভার স্বহস্তে রাখিয়াছিল, যথেচ্ছাচার সম্রাটের মত সকল ক্ষমতা স্বয়ং পরিচালিত করিত; তাহার পুত্রদ্বয় তাহার দায়িত্বের অংশ লাভ করিতে পারে নাই। এই জন্য বৃদ্ধার মৃত্যুতে সকল কার্য্যেই ঘোর বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হইল। তাহারা কারবার রক্ষা করিবে, না তাহাদের মাতার উইলের ব্যবস্থা সম্বন্ধে ব্যবহারাজীবদের সহিত পরামর্শ করিয়া স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করিবে—কোন্‌টা প্রধান কর্ত্তব্য, তাহা স্থির করিতে পারিল না। বহু চিন্তার পর তাহারা সিদ্ধান্ত করিল—কারবার থাক্ আর যাক্, নগদ টাকা যে যাহা পারে সংগ্রহ করিবে; কারণ, অর্থই বল। নগদ টাকা প্রচুর

পরিমাণে হাতে থাকিলে ভবিষ্যতে তাহাদিগকে অভাবের কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না।

কিন্তু বার্থার অবস্থা স্বতন্ত্র, সে তাহার সহোদরদ্বয়ের ন্যায় অর্থ-চিন্তায় ব্যাকুল হইল না। সংসারে মাতাই তাহার একমাত্র অবলম্বন ও অদ্বিতীয় আশ্রয় ছিল। তাহার মৃত্যুতে বার্থা আপনাকে নিতান্ত অসহায় ও নিরাশ্রয় মনে করিল। মনের কষ্টে সে হঠাৎ পীড়িত হইয়া কিছু দিন রোগশয্যায় পড়িয়া রহিল; সে সময় যদি সে তাহার স্বামীর সহানুভূতি লাভ করিত, কাউণ্ট যদি তাহার সহিত সদ্ব্যবহার করিতেন, তাহার দুঃখ-কষ্ট প্রশমিত করিবার চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে স্বামীর সহিত তাহার পুনর্মিলনের সম্ভাবনা থাকিত, সে কতকটা সুখী হইতে পারিত; কিন্তু গর্ব্বিত কাউণ্ট তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিলেন না; এ জন্য স্বামীর প্রতি তাহার অশ্রদ্ধা ও বিরাগ বর্দ্ধিত হইল। বার্থা চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল এবং তাহার মাতার মৃত্যুতে তাহার হৃদয়ের যে স্থান শূন্য হইয়াছিল, আর তাহা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা রহিল না। পিতামাতার পাপে পুত্র-কন্যাকে দণ্ডভোগ করিতে হয়, এই উক্তি বার্থা সম্বন্ধে অব্যর্থ হইল। তাহার মাতা কৌলীন্যের লোভে ও অদূরদর্শিতাবশতঃ কাউণ্ট ভন আরেনবর্গের ন্যায় মহাপাপিষ্ঠ, প্রতারক, নরাধমের হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিয়া যে অন্যায় কার্য্য করিয়াছিল, বার্থাকে তাহার ফলভোগ করিতে হইল। কঠিন মর্ম্মপীড়া হইতে তাহার নিষ্কৃতিলাভের কোন উপায় রহিল না। এক এক দিন তাহার মনে হইত, রোগে মৃত্যু হইলে তাহার সকল জ্বালা জুড়াইত, সে শান্তিলাভ করিত। কিন্তু তাহার সে আশা পূর্ণ হইল না; কৃতান্ত তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন না, বার্থা ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করিল।

বার্থা আরোগ্য লাভ করিলে কাউণ্টের যেন হঠাৎ স্বপ্নভঙ্গ হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, বার্থা তাঁহার প্রতি বিমুখ হইলে তিনি নিরুপায়; আর ত শাশুড়ী নাই, কে তাঁহাকে অর্থ-সাহায্য করিবে? বার্থা তাঁহার ভরণ-পোষণের, তাঁহার বিলাসিতায় ব্যয় নির্ব্বাহ না করিলে তাঁহার দুঃখ-দুর্গতির সীমা থাকিবে না, সুতরাং তিনি মদের বোতল এবং চাটুকারবর্গের ব্যূহ ত্যাগ করিয়া শ্বশুরবাড়ী আসিয়া পত্নীর মনোরঞ্জনে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তিনি জানিতেন, বার্থা তাঁহাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করে। তিনি কিরূপ স্বার্থপর, কপট ও অসচ্চরিত্র, তাহা সে জানে; সুতরাং কপট বাক্যে তাহাকে মুগ্ধ করা অসাধ্য বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইল।

দীর্ঘকাল রোগে ভুগিয়া বার্থার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল; এই জন্য চিকিৎসক তাহার দেশভ্রমণের ব্যবস্থা করিলেন। কাউণ্ট বার্থাকে ভুলাইবার অন্য কোন উপায় না দেখিয়া, অবশেষে তাহাকে বিদেশের কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। নিজের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য বার্থার বিন্দুমাত্র আগ্রহ না থাকিলেও, মাতৃহীন মাতৃগৃহে বাস করিয়া সে হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল, সেই গৃহের বায়ুমণ্ডল তাহার দুঃসহ হইয়াছিল; তখন যে কোনও পরিবর্ত্তন বাঞ্ছনীয় মনে করিয়া বার্থা দেশভ্রমণের প্রস্তাবে সম্মত হইল এবং অন্য লোকের সহিত দেশান্তরে যাত্রা করা সঙ্গত হইবে না মনে করিয়া, কাউণ্টের প্রতি আন্তরিক ঘৃণা ও অবজ্ঞা সত্বেও তাঁহার সহিত দেশভ্রমণে যাইতে সম্মতি প্রকাশ করিল। কাউণ্ট ইহাতে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন; তাঁহার আশা হইল, বিদেশে নানা কৌশলে তিনি পত্নীকে তাঁহার পক্ষপাতিনী করিয়া তুলিতে পারিবেন; তাঁহার চেষ্টা-যত্নে ও ব্যবহারে বার্থার ভাঙ্গা মন আবার জোড়া লাগিবে; বার্থাকে পুনর্ব্বার তিনি বশীভূত করিয়া ইচ্ছামত পরিচালিত করিতে পারিবেন।

এই সকল কথা চিন্তা করিয়া বার্থার নিকট ইংলণ্ড ও ফ্রান্স ভ্রমণের প্রস্তাব করিলেন; বার্থা তাঁহার এই প্রস্তাব মঞ্জুর করিলে, কাউণ্ট বিদেশ-যাত্রার আয়োজনে রত হইলেন। তিনি বহুদিন দেশভ্রমণের সুযোগ লাভ করিতে পারেন নাই; এই সুযোগ অপ্রত্যাশিতভাবে উপস্থিত হওয়ায়, তাঁহার আনন্দের ও উৎসাহের সীমা রহিল না। কিন্তু বার্থা দেশভ্রমণের সম্ভাবনায় বিন্দুমাত্র আনন্দ বা উৎসাহ প্রকাশ করিল না। তাহার সুখের দীপ নির্ব্বাপিত হইয়াছিল, হৃদয় মরুময় হইয়াছিল; সে যেখানেই যাউক, সর্ব্বস্থান সমান বলিয়াই তাহার মনে হইল। কোন কার্য্যেই তাহার আগ্রহ বা উৎসাহ ছিল না।

উদ্যোগ-আয়োজন শেষ হইলে কয়েক সপ্তাহ পরে এক দিন কাউণ্ট তাঁহার বাসভবনের মহামূল্য আসবাব-পত্রাদি 'প্যাকবন্দী' করিয়া গৃহের সকল দ্বার রুদ্ধ করিলেন এবং এক জন প্রহরীকে সেই অট্টালিকার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত করিয়া, এক জন পরিচারিকা ও একটি ভৃত্য সঙ্গে লইয়া

পত্নীসহ প্যারিসে যাত্রা করিলেন। জুরিচের সহিত কিছু দিনের জন্য তাঁহাদের সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল।

যথাসময়ে বিবি স্মিটের উইল খুলিয়া দেখা হইল। সেই উইলের একটি 'কডিসিলে' এইরূপ লিখিত ছিল যে, যে হেতু তাহার একমাত্র কন্যার বিবাহ হইয়াছিল এবং তাহার পুত্রদ্বয়েরও শীঘ্র বিবাহের সম্ভাবনা বর্ত্তমান, অতএব তাহার বাসভবন 'বো সিজোর' তাহাদের কাহারও ব্যবহারের জন্য না রাখিয়া তৎসংলগ্ন সমুদয় বাগ-বাগিচার সহিত উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় হইবে এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ সাধারণ সম্পত্তির উপস্বত্বের সহিত মিলিত হইবে। সেই অর্থ তাহার উইলের বিধান অনুসারে বিভক্ত হইবে। কিন্তু তাহার গাড়ী, ঘোড়া, সঞ্চিত মদ্যরাশি, বহুমূল্য চিত্রাদি, অন্যান্য আসবাব ও তৈজসপত্রাদি দুই পুত্রকে সমভাবে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে।

বিবি স্মিটের এই বিধানানুসারে তাহার সুরম্য বাসভবন বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইল। তখন তাহা ক্রয়ের অভিপ্রায়ে দলে দলে লোক প্রত্যহ তাহা দেখিতে আসিতে লাগিল। যাহাদের তাহা ক্রয় করিবার সামর্থ্য বা ইচ্ছা ছিল না, তাহারাও কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া সেই মহামূল্য সুশোভন অট্টালিকার বিভিন্ন কক্ষে ঘুরিয়া তাহার সমালোচনা করিতে লাগিল। যাহারা কোন দিন সেই অট্টালিকার ছায়া স্পর্শ করিতেও সাহস করে নাই, তাহারাও তাহাদের পদধূলিতে বিভিন্ন কক্ষের মসৃণ মর্ম্মরাচ্ছাদিত মেঝে ধূলি-ধূসরিত করিয়া তাহার মর্য্যাদা নষ্ট করিতে কুণ্ঠিত হইল না। ইহাই নিয়তির বিধান। পৃথিবীতে এরূপ ঘটনা নিত্য সংঘটিত হইতেছে। তথাপি মানুষ মনে করে, তাহাদের কীর্ত্তি 'যাবচ্চন্দ্রদিবাকর' অক্ষুণ্ণ থাকিবে। তাহাদের নাম ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। কিন্তু তাহাদের মৃত্যুর পর তাহাদের অস্তিত্বের মহিমা বিস্মৃতির অতলস্পর্শ গর্ভে সমাহিত হয়। মনুষ্যের চেষ্টা, যত্ন, পরিশ্রম, প্রাণপণ সাধনা সকলেরই পরিণাম যখন এইরূপ শোচনীয়, তখন কেনই বা দর্প, অভিমান, আড়ম্বর? কি কারণেই বা পরস্পর মারামারি-কাটাকাটি, বিরোধ, আর কি জন্যই বা হিংসা-দ্বেষ, প্রতারণা-প্রবঞ্চনা এবং দুর্ব্বলের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া সবলের আত্মপ্রসাদ?—এই জটিল প্রশ্নের উত্তর এ কাল পর্য্যন্ত কেহই দিতে পারে নাই; অথচ সকলেই অন্ধ আবেগে সেই পথে ছুটিয়া চলিয়াছে—যাহার পরিণাম কেবল এক মুষ্টি ধূলি!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রতিহিংসার আয়োজন

মানুষ কোন অবস্থাতেই স্বাধীন নহে; সকলেই স্ব স্ব কর্ম্মফল ভোগ করে, তথাপি এক জনের কার্য্যের সহিত আর এক জনের জীবনের সুখদুঃখ এরূপ জটিলভাবে বিজড়িত যে, মনে হয়, বিধাতা তাহাদের ভাগ্য এক সূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন;—অথচ কোথা হইতে কি ভাবে এক জন অন্যের সংস্রবে আসিয়া পড়ে, এবং তাহার ফল কেবল ব্যক্তিবিশেষের নহে,—সময়ে সময়ে বৃহৎ সমাজের ও সুবিস্তীর্ণ দেশের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। কোথায় ইংলণ্ড, আর কোথায় ভারতবর্ষ, কোথায় ক্লাইভ আর কোথায় মীর্জ্জাফর! সেই ক্লাইভ মীর্জ্জাফরের উপর যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহার ফলে হতভাগ্য সিরাজউদ্দৌলাকে সিংহাসন হারাইয়া মরিতে হইল, সোনার বাঙ্গালা ইংরাজ 'কোম্পানীর' হাতে পড়িল। বাঙ্গালীর সমাজ আর এক ছাঁচে পড়িয়া নূতন ভাবে গড়িয়া উঠিল। শত বর্ষ পরে নানা ধুন্দুপন্থের কুচক্রান্তে ও পৈশাচিক নিষ্ঠুরতায় শ্বেতাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গিনীর শোণিত-স্রোতে ভারতের বহু গ্রাম-নগরের রাজপথ প্লাবিত হইল; ফলে সুবিস্তীর্ণ ভারতের শাসনদণ্ড কুইন ভিক্টোরিয়ার হস্তগত হইল। কোম্পানীর রাজত্বের অবসান হইল। ভারতে নূতন যুগের আবির্ভাব হইল।

এখন এই উপন্যাসের নায়ক কাউণ্ট ভন আরেনবর্গের কথা চিন্তা করুন। শয়তান তাহার দোষগুলি বাছিয়া বাছিয়া তাঁহাকে উপহার দিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার জীবনে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, এরূপ লোকের সংখ্যা অল্প নহে। রুসিয়ার এক প্রান্তে রেবেকা কোহেন তাহার পিতার নিভৃত গৃহে বসিয়া সুখ-শান্তিতে জীবনের দিনগুলি অতিবাহিত করিতেছিল; কাউণ্ট ভন আরেনবর্গ ছদ্ম নামে সেণ্টপিটার্সবর্গে উপস্থিত হইয়া, কোহেন-পরিবারের বন্ধু মোজের সহিত পরিচিত হইলেন, তাহার সাহায্যে সলোমনের গৃহে প্রবেশ করিয়া কপট প্রেমে রেবেকাকে মুগ্ধ করিলেন,

গোপনে তাহাকে বিবাহ করিলেন, অবশেষে তাহার জীবনের সুখশান্তি নষ্ট করিয়া, সেই সরলা প্রেমবিহ্বলা তরুণীকে অনন্ত দুঃখের সাগরে নিক্ষেপ করিয়া দেশান্তরে পলায়ন করিলেন। আবার মোজে তাঁহার হস্তে অপমানিত হইয়া, তাঁহার সর্ব্বনাশসাধনের জন্য সেই রেবেকারই সহায়তা গ্রহণ করিল। রেবেকা যখন তাহার নিকট কাউন্টের বিশ্বাসঘাতকতা ও শঠতার কথা জানিতে পারিল, তখন তাহার হৃদয়ে প্রতিহিংসার অনল প্রচণ্ডবেগে জ্বলিয়া উঠিল; সে কাউন্টের সর্ব্বনাশসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইল। সে সেই বিশ্বাসঘাতক প্রতারককে স্বহস্তে চূর্ণ করিবে, তাঁহার উন্নত মস্তক ধূলায় লুণ্ঠিত করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল। তাহার পিতা কাউন্টের ব্যবহারে বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হইলেও, তাঁহাকে নষ্ট করিবেন, এরূপ তাঁহার ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তনে তিনি তাঁহার দীর্ঘজীবনের কর্ম্মক্ষেত্র সেণ্টপিটার্সবর্গ হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন; রুসিয়ায় তাঁহার যে বিস্তীর্ণ কারবার ছিল, তাহা নষ্ট করিয়া কন্যার সহিত তাঁহাকে বহু দূরবর্ত্তী জুরিচে আসিতে হইল। একমাত্র কন্যাকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার স্থানান্তরে গমনের শক্তি ছিল না; বিশেষতঃ নিহিলিষ্ট অপবাদ লইয়া রুস সম্রাটের রোষ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য সুইট্জারল্যাণ্ড ভিন্ন আর কোন্ দেশে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করিবেন? তিনি বার্দ্ধক্যে ভগ্নহৃদয়ে সেণ্টপিটার্সবর্গ হইতে জুরিচে উপস্থিত হইলেন। কালনকির শোচনীয় অপমৃত্যুর জন্যই তাঁহাকে পথিমধ্যে বিপন্ন হইতে হয় নাই, কারণ, নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ আছে, এ সংবাদ কালনকি ভিন্ন অন্য কেহই জানিত না এবং কালনকিও রেবেকাকে লাভ করিবার আশায় সেই সংবাদ অন্য কাহারও নিকট প্রকাশ করে নাই; তাহার পর সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত-ভাবেই তাহার কণ্ঠ চিরদিনের জন্য নীরব হইয়াছিল।

জুরিচে উপস্থিত হইয়া সলোমন কোহেনের দেহ ভগ্ন হইল; রুসিয়া ত্যাগ করিতে বাধ্য হওয়ায় এবং তাঁহার সোনার কারবার নষ্ট হওয়ায় তিনি হৃদয়ে যে আঘাত পাইয়াছিলেন, সেই আঘাত সহ্য করা তাঁহার অসাধ্য হইল। তিনি বুঝিলেন, তাঁহার আয়ু পলে পলে হ্রাস হইতেছে, আর অধিক দিন তাঁহাকে অন্তর্বেদনা সহ্য করিতে হইবে না, ধূলার দেহ অচিরে ধূলায় পরিণত হইবে। কিন্তু ভবিষ্যতে রেবেকার কি উপায় হইবে, সে কোথায় কাহার আশ্রয় লাভ করিবে, অবশিষ্ট জীবন সে কি করিয়া অতিবাহিত করিবে, এই চিন্তায় বৃদ্ধ সলোমনের মানসিক অশান্তি দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তিনি জানিতেন, রেবেকাকে কোন দিন অন্নাভাবে কষ্ট পাইতে হইবে না, কারণ, যদিও তাঁহার সেণ্টপিটার্সবর্গের ব্যবসায়টি নষ্ট হইয়াছিল, তথাপি তাঁহাকে নিঃসম্বল হইতে হয় নাই। তিনি দরিদ্র ছিলেন না; রুসিয়া-ত্যাগের বহু পূর্ব্ব হইতেই তিনি য়ুরোপের নানা দেশের ব্যাঙ্কে যে অর্থ গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন, তাহাতেই রেবেকার অবশিষ্ট জীবন স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত হইবে, ইহা জানিয়াও অর্থনাশের জন্য ক্ষোভে দুঃখে অধীর হইয়াছিলেন। অর্থ তাঁহার হৃদয়-শোণিতের ন্যায় প্রিয় ছিল; সুতরাং প্রচুর অর্থ নষ্ট হওয়ায় টাকার শোকে তাঁহার জীবনের গ্রন্থি প্রতিদিন শিথিল হইতে লাগিল।

সলোমন কোহেন রেবেকাকে লইয়া জুরিচে উপস্থিত হইবার কয়েক দিন পূর্ব্বেই কাউণ্ট ভন আরেনবর্গ বার্থাকে লইয়া দেশান্তরে যাত্রা করিয়াছিলেন। কাউণ্ট কোন দিন কল্পনাও করেন নাই যে, রেবেকা সেণ্টপিটার্সবর্গ হইতে জুরিচে আসিয়া তাঁহাকে বিপন্ন করিবে, তাঁহার বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিফল প্রদান করিবে। বহুদিন হইতে মোজের কোন সংবাদ না পাওয়ায় তাঁহার ধারণা হইয়াছিল, মোজে তাঁহাকে যে ভয়প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহা কার্য্যে পরিণত হইবার সম্ভাবনা নাই; সে ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বিপদের আশঙ্কাও বিদূরিত হইয়াছে। সুতরাং কাউণ্ট সকল দুশ্চিন্তার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সুখস্বপ্নে বিভোর হইয়া ছিলেন। অবশিষ্ট জীবন তিনি সুখে ও শান্তিতে অতিবাহিত করিতে পারিবেন, এই আশায় উৎফুল্ল হইয়া ছিলেন। যদিও তাঁহার শাশুড়ীর মৃত্যু হইয়াছিল, তথাপি অর্থাভাবে তাঁহার কষ্টভোগের আশঙ্কা ছিল না। কারণ, তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন, বিবি স্মিটের উইলের সর্ত্তানুসারে বার্থা অল্পদিন পরেই তাহার বিপুল বিত্তের অধিকার লাভ করিবে, সুতরাং সেই অর্থ তাঁহারই হস্তগত হইবে। যদিও বার্থার সহিত তাঁহার মনান্তর চলিতেছিল, এবং তাহাকে বশীভূত করা তাঁহার দুঃসাধ্য হইয়াছিল, তথাপি এই কার্য্য তাঁহার অসাধ্য

মনে হইল না। তাঁহার আশা হইল, দেশভ্রমণ উপলক্ষে বার্থাকে তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হইবে; সেই সুযোগে তিনি ধীরে ধীরে তাহার মন ফিরাইয়া তাহাকে তাঁহার পক্ষপাতিনী করিয়া তুলিতে পারিবেন। নারীর মনোরঞ্জনের শক্তি ও কৌশল তাঁহার কিরূপ অসাধারণ ছিল, তাহা তিনি কোন দিন ভুলিতে পারেন নাই। তাহারই সাহায্যে তিনি কার্য্যোদ্ধারের আশা করিতেছিলেন। তিনি জানিতেন, দেশভ্রমণোপলক্ষে তাঁহাকে বহু অর্থ ব্যয় করিতে হইবে, কিন্তু বার্থা যত দিন তাঁহার সঙ্গে থাকিবে, তত দিন অর্থের অভাব হইবে না—ইহাও তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন এ জন্য তিনি নিঃশঙ্কচিত্তে মহা আড়ম্বরে দেশভ্রমণে যাত্রা করিলেন। বিদেশযাত্রা করিয়া তিনি তাঁহার পদমর্য্যাদার উপযোগী অর্থ-ব্যয়ে কুণ্ঠিত হইলেন না। তিনি নিঃস্ব হইলেও অপব্যয়ের শক্তি ও প্রবৃত্তি তাঁহার অসাধারণ ছিল। এত দিন পরে তিনি জীবনের খেলায় জয়ী হইয়াছেন, এই বিশ্বাসে তাঁহার হৃদয় আত্মপ্রসাদে পূর্ণ হইল। তিনি জীবনে যে সকল মহাপাপ করিয়াছেন, এক দিন তাঁহাকে হৃদয়ের রক্ত ঢালিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, এ সন্দেহ মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই।

কাউণ্টের সহিত বার্থার যথারীতি বিবাহ হইয়াছিল, সুতরাং বার্থা জানিত, সে কাউণ্টের বৈধ পত্নী। বার্থা জানিত না, সেণ্টপিটার্স বর্গে তাহার স্বামী আর একটি যুবতীকে বিবাহ করিয়া গোপনে জুরিচে পলাইয়া আসিয়াছেন, এবং তাহাকে বিবাহ করিয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণার সাহায্যে তাহাকে বৈধ পত্নীর অধিকারে বঞ্চিত করিয়াছেন। পত্নী বর্ত্তমানে কাউণ্টের সহিত তাহার বিবাহ অসিদ্ধ। কিন্তু বার্থা এই দুঃসংবাদ জানিতে না পারিলেও কাউণ্টের দুর্ব্ব্যবহারে তাহার জীবন বিষময় হইয়া উঠিয়াছিল, স্বামীর প্রতি সে বিশ্বাস হারাইয়াছিল। ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সূচিভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে সে আলোকের ক্ষীণরশ্মিও দেখিতে পাইল না। জুরিচ-বাসের সকল সুখ তাহার স্নেহময়ী জননীর সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে বুঝিয়াই সে বিদেশ-ভ্রমণের প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিল; মনে করিয়াছিল, বৎসরাবধি য়ুরোপের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করিয়া, প্রাকৃতিক দৃশ্য-বৈচিত্র্যে এবং বিভিন্ন দেশের নরনারীবর্গের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণে তাহার অশান্তিপূর্ণ দুঃখময় হতাশ জীবনের দিনগুলি দারুণ ব্যর্থতার মধ্যেও কোন প্রকারে কাটাইতে পারিবে। জুরিচের নিরানন্দময়, বৈচিত্র্যবিহীন কারাবাস অপেক্ষা সদা পরিবর্ত্তনশীল প্রবাস তাহার বাঞ্ছনীয় মনে হইয়াছিল।

কাউণ্ট ভন আরেনবর্গের প্রবাস-যাত্রার কয়েক দিন পরে সলোমন কোহেন জুরিচে উপস্থিত হইয়া টাকার শোকে কিরূপ কাতর হইয়াছিলেন, পূর্ব্বেই তাহা বলিয়াছি। সেণ্টপিটার্স বর্গ হইতে কন্যাসহ পলায়নকালে প্রতি পদক্ষেপে তাঁহার ধরা পড়িবার আশঙ্কা ছিল, তাহার উপর বার্দ্ধক্যে দীর্ঘপথভ্রমণে তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। কয়েক দিন বিশ্রামের পর তিনি কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলেও অর্থচিন্তায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, মনে মনে বলিলেন, "আমার গুণধর জামাই বাবাজী আমার বহু অর্থ নানা কৌশলে আত্মসাৎ করিয়া এখানে পলাইয়া আসিয়াছে এবং একটি ধনি-কন্যাকে 'নিকা' করিয়া রাজার হালে আছে; এবার আমার পাওনা টাকাগুলি তাহার নিকট হইতে আদায় না করিয়া ছাড়িতেছি না।" তিনি 'গুণধর' জামাই বাবাজীর নিকট হইতে প্রাপ্য অর্থ সংগ্রহের স্বপ্নে বিভোর হইলেন বটে, কিন্তু রেবেকার চিন্তা অন্যরূপ। সে কিরূপে সেই শঠ, বিশ্বাসঘাতক, প্রতারককে পদতলে নিষ্পেষিত করিয়া প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবে, দিবানিশি তাহারই উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। কিন্তু সে শীঘ্র এই আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা দেখিতে পাইল না; কারণ, সে সন্ধান লইয়া জানিতে পারিল, তাহার স্বামীর বাসভবনের দ্বার তালাচাবী দ্বারা রুদ্ধ করা হইয়াছে, বাড়ী নির্জ্জন ও অন্ধকারাচ্ছন্ন; তাহার স্বামী দেশভ্রমণে যাত্রা করিয়াছেন, এক বৎসরের মধ্যে তিনি জুরিচে প্রত্যাগমন করিবেন না। দেশে ফিরিতে তাঁহার এক বৎসরেরও অধিক বিলম্ব হইতে পারে।

রেবেকা এই সংবাদে অত্যন্ত অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল। সে সঙ্কল্প করিল,—সেই নরাধম প্রবঞ্চকের প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় সময় নষ্ট না করিয়া তাহার বিশ্বাসঘাতকতা, শঠতা ও প্রতারণার কথা সংবাদপত্রের সাহায্যে জনসমাজে প্রচারিত করিবে এবং তাহার বিরুদ্ধে বিচারালয়ে অভিযোগ

আনয়ন করিবে, সমাজে তাহার মুখ দেখাইবার পথ বন্ধ করিবে; কিন্তু তাহার পিতা কূটবুদ্ধি ও বহুদর্শী ব্যক্তি, সকল দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সতর্কভাবে কায করাই তাঁহার অভ্যাস। তিনি রেবেকার এই সঙ্কল্পের সমর্থন করিলেন না। তিনি রেবেকার মনের কথা শুনিয়া ঈষৎ উত্তেজিত-স্বরে বলিলেন, "রেবেকা, তোমার এই অসহিষ্ণুতা ও চাপল্য পরিহার করিয়া মন সংযত কর। যদি তুমি তোমার বিশ্বাসঘাতক স্বামীর কীর্ত্তিকাহিনী জনসমাজে প্রচারিত কর, কিংবা তাহার বিরুদ্ধে বিচারালয়ে অভিযোগ কর, তাহা হইলে সে ভয় পাইয়া কোথায় অন্তর্দ্ধান করিবে, তাহা কোন দিন জানিতে পারিবে না; এমন কি, য়ুরোপের বিখ্যাত গোয়েন্দারাও তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে না এবং কোন দিন সে এখানে ফিরিয়া আসিবে না। তোমার সকল চেষ্টা বিফল হইবে; তোমার ক্রোধে তাহার কিছুমাত্র ক্ষতি হইবে না। অতএব যত দিন পর্য্যন্ত সে এখানে ফিরিয়া না আসে, তত দিন পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধরিয়া অপেক্ষা কর; যত দিন তাহার সহিত তোমার সাক্ষাৎ না হইবে, তত দিন কেহই যেন তোমার মনের কথা জানিতে না পারে। সুযোগের প্রতীক্ষা কর, মা, সুযোগের প্রতীক্ষা কর। এক দিন নিশ্চয়ই তুমি সুযোগ পাইবে; তখন তুমি তাহার মাথা ধূলায় লুণ্ঠিত করিয়া পদাঘাতে তাহা চূর্ণ করিও। শুনিয়াছি, এখানে বহু অর্থ তাহার দখলে আসিয়াছে; সেই বিপুল অর্থের মায়া কাটাইয়া সে যে দীর্ঘকাল দেশান্তরে বাস করিবে, এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। হাঁ, সে কিছু দিন পরেই এখানে ফিরিয়া আসিবে; তখন আমার সমস্ত টাকা চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ সমেত তাহার নিকট আদায় করিব। তাহার সম্পত্তির অধিকাংশই আমার হস্তগত হইবে। আমার টাকাগুলা আগে আদায় করাই চাই; তুমি বুদ্ধির দোষে আমার স্বার্থহানি করিও না। হাঁ, টাকা চাই, টাকাই আমার আরাধ্য দেবতা; রুসিয়ায় কি বিপুল অর্থ বিসর্জ্জন করিয়া আসিয়াছি, সে কথা স্মরণ হইলে আমার বুক ভাঙ্গিয়া যায়। তোমার বিশ্বাসঘাতক প্রবঞ্চক স্বামীর কাছে যাহা পাইব, আগে তাহা আদায় করিব, তাহার পর তুমি শূন্য মাটীর ভাঁড়ের মত পদাঘাতে তাহাকে চূর্ণ করিও। উঃ, টাকার শোকে আমার বুকে আগুন জ্বলিতেছে। অর্থই আমার হৃদয়-শোণিত।"

অগত্যা রেবেকাকে পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিতে হইল। পিতার প্রতি তাহার অসাধারণ ভক্তি ছিল, সে কোন দিন তাঁহার অবাধ্য হয় নাই। তাহার জীবনের এই মহা-সঙ্কটকালেও সে তাঁহার অবাধ্য হইল না বটে, কিন্তু এই আদেশের বিরুদ্ধে তাহার অসহিষ্ণু হৃদয় বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সে উদ্বেলিত ক্রোধ ও জিঘাংসা অতি কষ্টে দমন করিতে সমর্থ হইল।

এই সময় জোসেফ কুরেটের কথা নূতন করিয়া রেবেকার মনে পড়িল এই দীর্ঘকালেও সে তাহাকে বিস্মৃত হয় নাই; তাহার চিন্তা বিসর্জ্জন করা তাহার সাধ্যের অতীত ছিল। তথাপি নানা বিভিন্ন চিন্তাভারে তাহার চিন্তা সময়ে সময়ে চাপা পড়িত; কিন্তু জোসেফ কুরেট জুরিচ হইতে রুসিয়ায় গিয়াছিল, জুরিচেই তাহার প্রথম যৌবন অতিবাহিত হইয়াছিল, জুরিচেই তাহার জীবনের পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছিল, এ কথা স্মরণ হওয়ায় তাহার চিন্তাই রেবেকার প্রধান চিন্তা হইল। জোসেফ তখনও জীবিত ছিল কি না, তাহা সে জানিত না; তথাপি তাহার দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ হইলে সেই চিরনির্ব্বাসিত হতভাগ্যের প্রতি করুণায় তাহার হৃদয় প্লাবিত হইত; তাহার নয়ন অশ্রুতে ভরিয়া উঠিত। সে জানিত, জুরিচে সে আবাল্য প্রতিপালিত হইয়াছিল এবং সেখানে তাহার পিতামাতা জীবিত আছে। এই জন্য রেবেকা জোসেফের পিতামাতার সহিত সাক্ষাতের জন্য অধীর হইয়া উঠিল। জোসেফ সম্বন্ধে সে যাহা জানিত, তাহাদিগকে তাহা জানাইবার জন্য সে অত্যন্ত ব্যাকুল হইল এবং বহু চেষ্টায় তাহাদের বাড়ীর সন্ধান করিয়া এক দিন তাহাদের সহিত দেখা করিতে চলিল। সে মনে করিল, যদি সে জোসেফের শোকাতুর পিতামাতাকে যৎকিঞ্চিৎ সান্ত্বনাদান করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার মনের ভার লঘু হইবে।

রেবেকা মিঃ কুরেট ও তাহার পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রথমেই তাহাদিগকে জানাইল, সে কার্য্যোপলক্ষে রুসিয়া হইতে জুরিচে আসিয়াছে। রুসিয়ায় জোসেফের সহিত তাহার পরিচয় হইয়াছিল এবং চরিত্রগুণে সে তাহার স্নেহাকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিল। তাহার কথা শুনিয়া বৃদ্ধ কুরেট ও তাহার স্ত্রী পরম সমাদরে রেবেকার অভ্যর্থনা করিল। রেবেকা তাহাদের সাংসারিক অবস্থা দেখিয়া

বুঝিতে পারিল,—তাহারা চাষী গৃহস্থ হইলেও অসভ্য বা মূর্খ নহে। এই পরিবার পরিশ্রমী, মিতব্যয়ী এবং ধর্ম্মভীরু। সে তাহাদের উভয়কে পুত্র-বিরহে অত্যন্ত কাতর দেখিয়া অতি কষ্টে অশ্রু দমন করিল। তাহারা রেবেকাকে বলিল, জোসেফ রুসিয়ায় গিয়া তাহাদিগকে একখানিমাত্র সংক্ষিপ্ত পত্র লিখিয়াছিল; কিন্তু সে নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়ে যোগদান করায় তাহারা তাহার সন্ধান লইবার চেষ্টা করে নাই। জোসেফ সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত হইয়াছে শুনিয়া তাহারা উভয়েই রোদন করিতে লাগিল; তাহারা জোসেফকে ফিরিয়া পাইবে, এ আশা ত্যাগ করিল।

জোসেফ রেবেকার হৃদয়ের কতখানি অংশ অধিকার করিয়াছিল, তাহা সে জোসেফের পিতামাতার নিকট প্রকাশ না করিলেও তাহার কথার ভাবে তাহারা বুঝিতে পারিল—এই অপরিচিতা সদাশয়া যুবতী জোসেফের প্রকৃত হিতৈষিণী ছিল। তাহারা প্রথম দিন রেবেকার সহিত তেমন মন খুলিয়া আলাপ না করিলেও তাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিবার জন্য রেবেকার প্রবল আগ্রহ হইল। এই জন্য রেবেকা তাহাদের সহিত এক দিনমাত্র আলাপ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারিল না; সে অবসর পাইলেই মধ্যে মধ্যে তাহাদের কুটীরে উপস্থিত হইত এবং নানা গল্পে দুই এক ঘণ্টা কাটাইয়া আসিত।

এই ভাবে কুরেট-পরিবারের সহিত রেবেকার ঘনিষ্ঠতা হইলে কথাবার্ত্তায় তাহাদের সঙ্কোচের আর কোন কারণ রহিল না। এক দিন রেবেকা প্রসঙ্গক্রমে তাহাদের নিকট প্রকাশ করিল, কি উদ্দেশ্যে রুসিয়া হইতে সে জুরিচে আসিয়াছে এবং কাউণ্ট ভন আরেনবর্গ কিরূপে তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। তাহা শুনিয়া বিবি কুরেট অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল এবং কাউণ্ট ভন আরেনবর্গ বার্থা স্মিটের বৈধ স্বামী নহেন, ইহা জানিতে পারিয়া সে তাহার মনের আনন্দ আর গোপন রাখিতে পারিল না। সে আত্মসংবরণে অসমর্থ হইয়া, বিকট মুখভঙ্গী করিয়া, হাত নাড়িয়া বলিল, "সেই সর্ব্বনাশী—সেই ভিজে বিড়ালটা (অর্থাৎ বার্থা) ঐ কাউণ্ট-টার বৈধ স্ত্রী নয়; তাহার উপপত্নী ভিন্ন আর কিছু নয়! হো, হো, কি মজা! ঠিক হইয়াছে। সে যেমন পাপিষ্ঠা, তার উপযুক্ত ফল হইয়াছে পরমেশ্বর ঠিক বিচারই করিয়াছেন। তাহার বড় দেমাক; কামারের ঘরে জন্মিয়া কিছু টাকার মুখ দেখিয়াছে বলিয়া আমার ছেলেকে সে বাতিল করিয়া দিল; বলিল, 'ছোটলোকের ছেলে তাহাকে বিবাহ করিবে? বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার সাধ!'—ছুঁড়ীকে সে বড়ই ভালবাসিয়াছিল। মনের ঘৃণায় বাছা আমার বিবাগী হইয়া দেশত্যাগ করিল; কিন্তু সেই রাক্ষসী, তার মা, আর তার বংশের যে যেখানে আছে তারা কেহই জানে না যে, তারা সাত গোষ্ঠী জোসেফের পায়ের ক'ড়ে আঙ্গুল স্পর্শ করিবার যোগ্য নয়!"

মিঃ কুরেটও সেই স্থানে বসিয়া ছিল। স্ত্রীর কথা শুনিয়া সে ব্যগ্রভাবে বলিল, "আহা, চুপ কর গিন্নি! তুমি কি শেষে ক্ষেপিয়া উঠিলে?"

বিবি কুরেট কণ্ঠস্বর দ্বিগুণ চড়াইয়া বলিল, "চুপ করিব? এত কাল চুপ করিয়া ছিলাম, মুখ বুজিয়া অনেক সহিয়াছি; আর চুপ করিয়া থাকিব না। যদি ঠিক সময়ে মুখ খুলিতাম, তাহা হইলে আজ এ ভাবে জোসেফকে হারাইতাম না; সাইবেরিয়ায় তাহাকে চিরদিনের জন্য নির্ব্বাসিত হইতে হইত না। আমরা নিতান্ত বোকা, আমাদের বুদ্ধির দোষেই আজ আমাদের এই অবস্থা আজ জোসেফের এই দুর্গতি। এখনও চুপ করিয়া থাকিব?"

রেবেকা এ সকল কথা শুনিয়া আর আত্মসংবরণ করিতে পারিল না; সে অশ্রুপূর্ণ-নেত্রে আবেগভরে বলিয়া উঠিল, "সেই হতভাগা, বিশ্বাসঘাতক, প্রবঞ্চক কাউণ্ট আরেনবর্গ-টাই আমার কাল! যদি সে কৌশলে আমার সর্ব্বনাশ না করিত, তাহা হইলে আমি জোসেফকে বিবাহ করিয়া সুখী হইতে পারিতাম।"

বৃদ্ধা বলিল, "তুমিও জোসেফকে ভালবাসিয়াছিলে? আহা, জোসেফকে বিবাহ করিতে পারিলে তুমি সত্যই সুখী হইতে। জোসেফের মত স্বামী পাওয়া বড়ই ভাগ্যের কথা। আর জোসেফ কোন দিক্ দিয়াই তোমার বা কোন সম্ভ্রান্ত-ঘরের মেয়ের স্বামী হইবার অযোগ্য ছিল না; কারণ, জোসেফের সম্বন্ধে আমি যে গুপ্ত কথা জানি, তাহা শুনিলে তোমাকে স্তম্ভিত হইতে হইবে। সে সকল কথা আমি আর আমার ঐ বুড়া ছাড়া আর কেহ জানে না। সে বড় অদ্ভুত কথা! শুনিবে?"

[ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ভারতে পাশ্চাত্য চিত্রকর

ভারতবাসীর লিখিত ভারতের ভাল প্রাচীন ইতিহাস নাই, এই কথা বরাবর শুনিয়া আসিতেছি। হিন্দু ও মুসলমান সময়ের সুন্দর সুন্দর পুরাতন চিত্র দেখিতে পাওয়া যাইলেও, প্রাচীন দ্রষ্টব্য হিসাবে স্থানবিশেষের নৈসর্গিক ও ঐতিহাসিক ঘটনা বা পুরাতন প্রথাদির আলেখ্য খুব কমই দেখা যায়। এ বিষয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ও গত শতাব্দীর প্রারম্ভে যে সব পাশ্চাত্য চিত্রশিল্পিগণ ভারতে আসিয়া বহু চিত্র আঁকিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, সেই সকলের মধ্যে আজ অনেকগুলিই অমূল্য। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ এমন অনেক স্থান—যাহার পূর্ব্বশ্রী লুপ্ত হইয়াছে, অনেক প্রাসাদদুর্গাদ—যাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত আজ ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া গিয়াছে, তাহার কোন কোনটির ছবি আজ শুধু ঐ সকল চিত্র-শিল্পীর কল্যাণেই এখনও আমাদের দেখিবার সুযোগ হইতেছে। ইতিহাসলেখক তাঁহার লেখনীমুখে দেশের প্রাচীন কাহিনী, বীরকীর্ত্তি, রাজ্যশাসনপ্রণালী প্রভৃতির বর্ণনা করিয়া যেমন আমাদের পূর্ব্বগৌরব জাগাইয়া রাখিবার সুযোগ দেন, চিত্রকরের কাযও সে হিসাবে কম নহে, বরং সুচিত্রকর তাঁহার তুলিকাস্পর্শে বর্ণ-সম্পাতে যে ছবি রাখিয়া যান, অনেক ক্ষেত্রে সপ্তপৃষ্ঠাব্যাপী বিবরণেও ঐতিহাসিক তাঁহার পাঠকের মনে বাস্তবের তেমন ছবি ফুটাইয়া তুলিতে পারেন না। তেমন চিত্রকর দেশীয় হউন আর বিদেশীয় হউন, আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

স্যার এলাইজা ইম্পে শিল্পী—কেটল্

এমনই কতিপয় বৈদেশিক চিত্রকর—যাঁহারা এ দেশে কার্য্য-ব্যপদেশে বা দেশ-ভ্রমণোদ্দেশে আসিয়া তাঁহাদের অতুল্য অমূল্য শিল্প-কার্য্য দ্বারা এ দেশের প্রাচীন স্মৃতি-নিদর্শন চির-জাগরূক রাখিয়া গিয়াছেন, আজ তাঁহাদের অঙ্কিত চিত্র-প্রতিলিপিসহ অতি সংক্ষিপ্ত কথা বলাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

বৈদেশিক খ্যাতনামা চিত্র-শিল্পীদের মধ্যে যিনি সর্ব্বপ্রথম এ দেশে আগমন করেন, তাঁহার নাম টিলি কেটল্ (Tilly Kettle)। তিনি ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তিনি মাত্র ৪ বৎসর ভারতে অবস্থিতি করিয়াছিলেন এবং এই অল্পসময়ের মধ্যেই প্রচুর ধনসঞ্চয়ে সমর্থ হইয়াছিলেন। মনুষ্যপ্রতিকৃতি অঙ্কনেই তিনি অধিক সময় ব্যাপৃত থাকিতেন। স্যার এলাইজা ইম্পের একখানি চিত্র তিনি অঙ্কিত করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্য চিত্রের

মধ্যে "মোগল বাদশাহ কর্ত্তৃক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সৈন্য পরিদর্শন" নামক একখানি ঐতিহাসিক চিত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই চিত্রখানি ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে প্রদর্শিত হইয়াছিল। কেটল্ স্বদেশপ্রত্যাবর্ত্তনের পর ১০ বৎসরের বিখ্যাত শিল্পীর কোন চিত্র সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। *

ভারতাগত পাশ্চাত্য চিত্রকরদের মধ্যে হজের (William Hodges) নাম বিশেষ খ্যাত। তিনি প্রথম
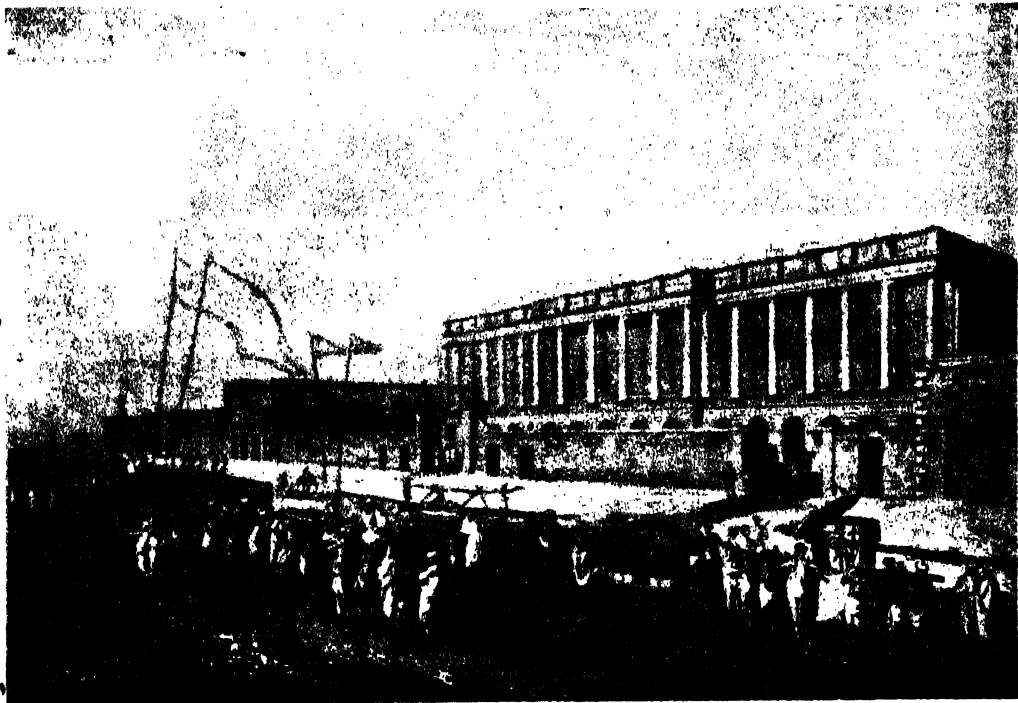
সুপ্রীম কোর্ট—কলিকাতা, ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দ শিল্পী—ড্যানিয়্যাল

পূর্ব্বদিক হইতে ট্যাঙ্ক স্কোয়ারের দৃশ্য—কলিকাতা, ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দ শিল্পী—বেলি

মধ্যে বিশেষ অভাবগ্রস্ত হইয়া পড়েন এবং পুনরায় বাঙ্গালায় আসিবার মনস্থ করিয়া পথিমধ্যেই প্রাণ হারান। এই

* The Good Old Days of Honourable John Company Vol II.
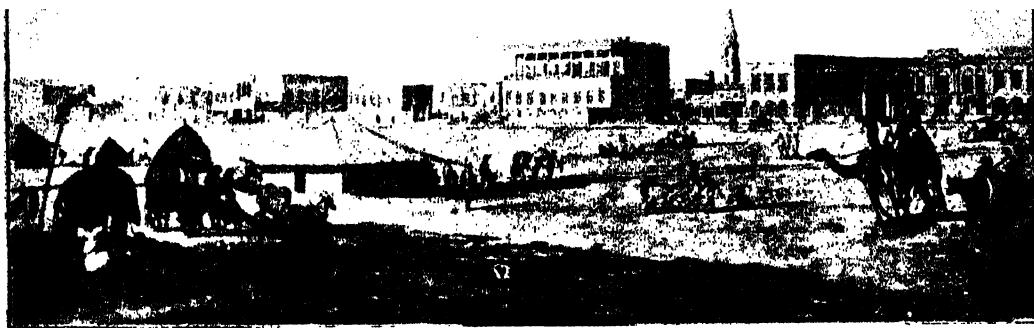
এস্‌প্লানেড রো—১৭৮৮ খৃষ্টাব্দ শিল্পী—টমাস্ ও উইলিয়ম্ ড্যানিএল্

কলিকাতার পশ্চিম দিকের দৃশ্য—১৮০৫ খৃষ্টাব্দ শিল্পী—মোফাত
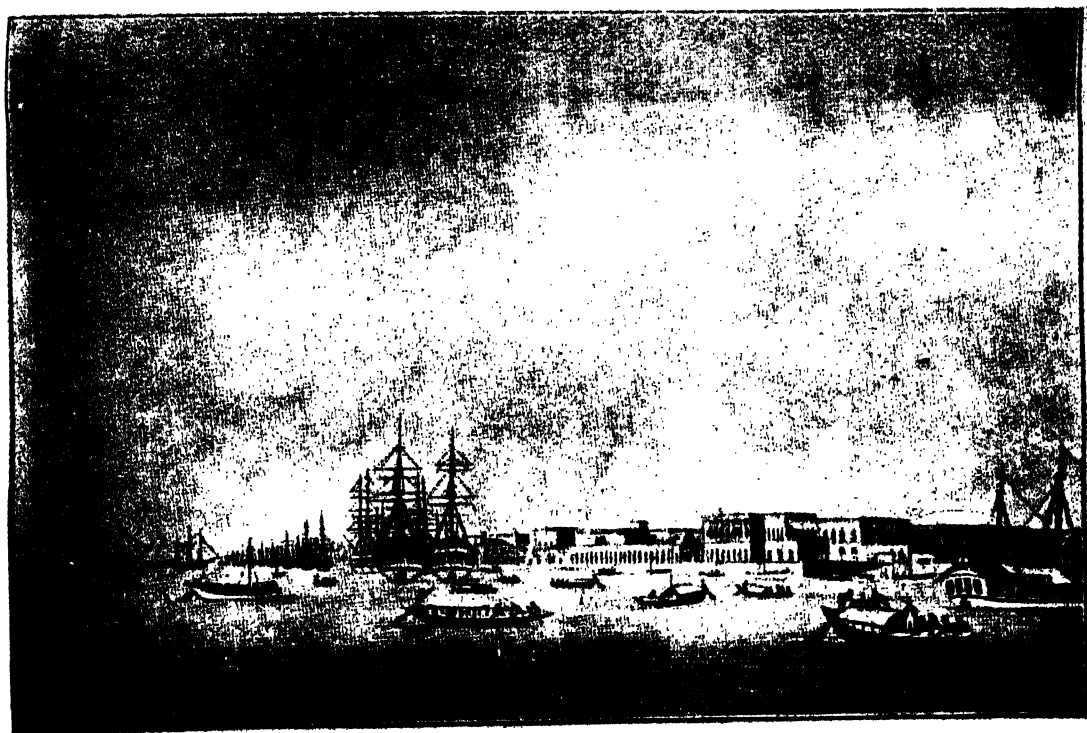
কিছুকাল ডার্ব্বিতে নাট্যশালার পট অঙ্কনের কাযে নিযুক্ত থাকার পর ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন কুকের দ্বিতীয় অভিযানে ড্রাফটস্‌ম্যানের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইংরাজী ১৭৮০ অব্দে * ওয়ারেণ হেষ্টিংসের চেষ্টায় তিনি ভারতে আগমন করেন। তখন তাঁহার বয়স ৩৫ বৎসর। তিনি প্রথম মাদ্রাজে অবতরণ করিয়া পর বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতায় পৌছেন। এখানে অল্পকাল থাকিয়া হেষ্টিংসের অভিপ্রায় অনুসারে স্থলপথে মুঙ্গের পর্য্যন্ত যাইয়া ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে জলপথে কলিকাতায় ফিরিয়া আইসেন। প্রত্যাগমনকালে তিনি হেষ্টিংসের সহযাত্রী হয়েন এবং কলিকাতায় ফিরিতে ভাগলপুর পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত ছিলেন। সেই সময় ক্লেভল্যাণ্ড (Augustus Cleveland) ভাগলপুরে কলেক্টর ছিলেন। তিনি হজের এক জন শুভানুধ্যায়ী ছিলেন এবং তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে তিনি এই জিলার অনেক ছবি আঁকিয়াছিলেন। ক্লেভল্যাণ্ড নিজের জন্য তদঙ্কিত বহু ভারতীয় দৃশ্যাবলী খরিদ করিয়াছিলেন। এই ভদ্রলোকের মৃত্যুর পর ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে হজের অঙ্কিত তাঁহার যে সমস্ত (২১খানি) চিত্র ছিল, তাহা সাধারণ নীলামে বিক্রয় হইয়া যায়।
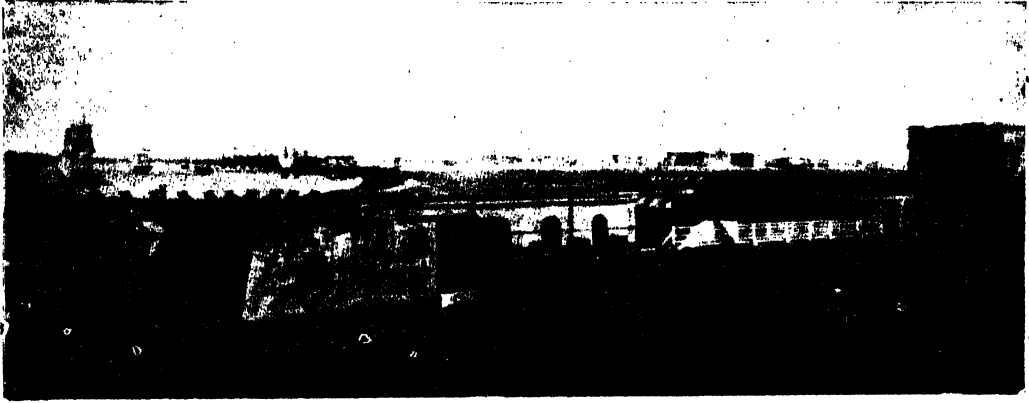
কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়মের দৃশ্য—১৮০৭ খৃষ্টাব্দ শিল্পী—স্যামুয়েল্ ডেভিস্

দুর্গ হইতে কলিকাতার দৃশ্য শিল্পী—হজ

কলিকাতায় ফিরিয়া আসার পর তিনি পুনরায় পরবৎসর জানুয়ারী মাসে গভর্ণর জেনারেলের আদেশে উত্তর-ভারতের দৃশ্যাবলী অঙ্কনের জন্য বিশেষভাবে প্রেরিত হন। এই সময় তিনি শিবিকা-যোগে এলাহাবাদ, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, ঢোলপুর এবং গোয়ালিয়ার ভ্রমণ করিয়া বিস্তর চিত্র ও পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করেন। হেষ্টিংস ও ক্লেভল্যাণ্ডের কৃপায় তিনি বিশেষ সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়া ইংরাজী ১৭৮৪ সালে স্বদেশে প্রতিগমন করেন তথায় তাঁহার গুণের পুরস্কার-স্বরূপ তিনি R. A উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি Travels in India, a Comparative View of the ancient

* Bengal Past and Present Vol V এর ২৬১ পৃষ্ঠায় ১৭৭৮ এবং Carey's Good Old Days Vol IIতে ১৭৭৭-৭৮ লেখা আছে।

Monuments in India নামক তিনখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। *

জোহান জোফানি (Johann Zoffany) নামে আর এক জন বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন জার্মাণ চিত্র-শিল্পী ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে যখন রয়েল একাডেমি খোলা হয়, তখন তিনি তাহার এক জন সভ্য মনোনীত হয়েন। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ৩৬ জন প্রতিষ্ঠাতা সভ্যের প্রতিমূর্ত্তিসহ The Life School of the Royal academy নামে

ওল্ড কোর্ট হইতে কলিকাতার দৃশ্য শিল্পী—ডিওলি
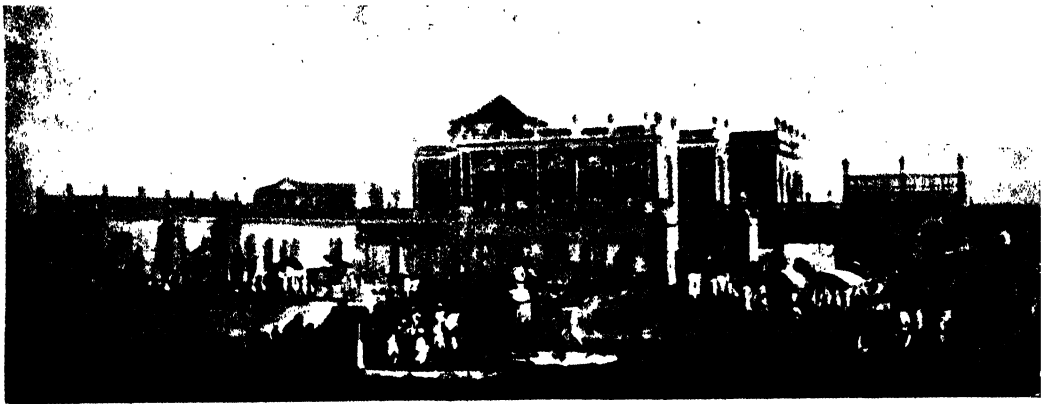
পুরাতন লাটভবন—১৭৮৮ খৃষ্টাব্দ শিল্পী—টমাস্ ও উইলিয়ম্ ড্যানিয়াল্

ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। এখানে আসিবার পূর্ব্বে তিনি য়ুরোপের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিলেন। একখানি চিত্র অঙ্কিত করেন। এই চিত্র শেষে ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জ্জ খরিদ করিয়াছিলেন। উহা এক্ষণে বাকিংহাম নামক রাজপ্রাসাদে রাজকীয় চিত্রসংগ্রহের মধ্যে রক্ষিত আছে।

* European Painter in the days of John Company—The Illustrated Pioneer Mail Vol. III No. 6

জোহান জোফানি কলকাতায় আগমনের পর লক্ষ্ণৌ যাত্রা করেন। তথায় ৩।৪ বৎসর থাকিয়া আগরা হইয়া পুনরায় কলিকাতায় আইসেন এবং ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এখানে থাকেন। তাঁহার লক্ষ্ণৌ অবস্থিতিকালেই তিনি লক্ষ্ণৌএ তথাকার তদানীন্তন প্রসিদ্ধ দেশীয় ও বিদেশীয়ের প্রতিকৃতি আছে। মূল চিত্রখানি খুব সম্ভব এখনও লক্ষ্ণৌএ আছে।

সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ চিত্র তিনি যাহা ভারতবর্ষে অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তাহার বিষয় ওয়ারেণ হেষ্টিংসের দরবারে
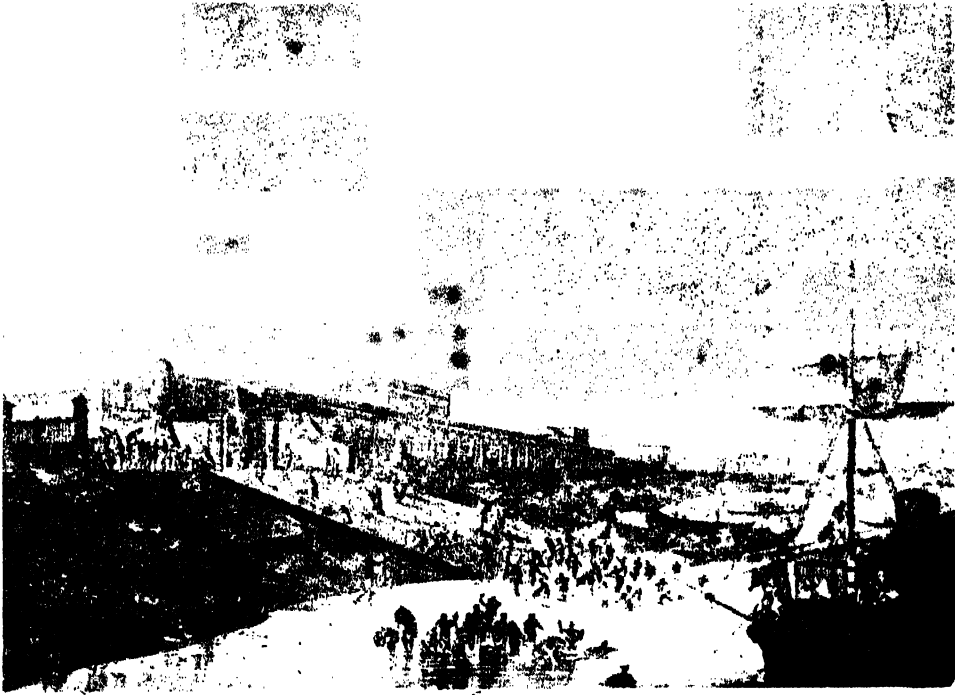
পুরাতন ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ—১৭৮৭ খৃষ্টাব্দ শিল্পী—ড্যানিয়েল্‌স্‌

হাওড়া হইতে কলিকাতার দৃশ্য শিল্পী—মোকাত

মোরগের লড়াই-সংক্রান্ত একখানি চিত্র অঙ্কিত করেন। ইহার মধ্যে নবাব আসফুদ্দৌলা, জেনারেল ক্লড মার্টিন্‌, এডওয়ার্ড হুইলার, ক্যাপ্টেন মরডণ্ট প্রভৃতি চতুর্ব্বিংশতি জন হাইদার বেগ খাঁর দৌত্য। ইহার মধ্যে ১ শতেরও উপর প্রতিকৃতি আছে। তাঁহার অঙ্কিত কোন নৈসর্গিক চিত্রের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। মনুষ্যপ্রতিকৃতি ও

ঘটনা বিশেষের চিত্রকর হিসাবে তাঁহার ন্যায় যশস্বী চিত্রকর এ দেশে আর কেহ আইসেন নাই। তিনি স্যার এলাইজা ইম্পে, ওয়ারেণ হেষ্টিংস, ম্যাণ্ডাম গ্রাণ্ড, মাধোজী সিন্ধিয়া প্রভৃতি বহু প্রধান প্রধান ব্যক্তির প্রতিকৃতি চিত্রিত করিয়াছিলেন।
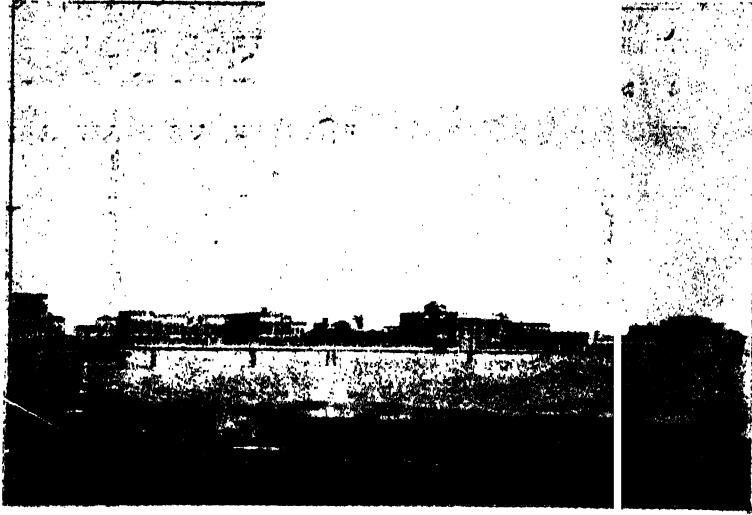
কাউন্সিল হাউস্ ও লাটভবনের দক্ষিণ দিকের দৃশ্য—কলিকাতা শিল্পী—বেলি

১৭৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি অগাধ সম্পত্তি লইয়া বিলাত পৌছেন এবং তথায় ২০ বৎসর জীবিত থাকিয়া ১৮১০ খৃষ্টাব্দে কিউ-নগরে প্রাণ-ত্যাগ করেন। এই সুদীর্ঘ-কালের মধ্যে তিনি তাঁহার শিল্প-সাধনা

জন্ পামারের বাটীর বিপরীত পার্শ্ব, লালবাজার, কলিকাতা শিল্পী—ফ্রেজার

প্রথম ও তৃতীয়খানি যথাক্রমে কলিকাতা হাইকোর্টে ও শ্রীরামপুর কলেজে রক্ষিত আছে। *

ত্যাগ করেন নাই; কিন্তু তাঁহার সেই সিদ্ধহস্তের পরিচয় তথায় আর পাওয়া যায় নাই। *

* শ্রীরামপুর কলেজে আডাম গ্রাণ্ডের যে ছবি আছে বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়, সে ছবির চিত্রকর সম্বন্ধে মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়।

* The Good Old Days of Honourable John Company Vol. II.

টমাস্ লংক্রফ্ট (Thomas Long croft) নামে আর এক জন চিত্রকরের পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি এক জন নীলকর, পূর্ব্বোক্ত জোফানির সহিত একত্র ভারতে আইসেন। তাঁহার চিত্রবিদ্যায় অনুরাগ দেখিয়া জোফানি তাঁহাকে শিক্ষা দেন। পরে তিনি বেণারস, আগ্রা, দিল্লী প্রভৃতি বহু স্থানে ভ্রমণ করিয়া অনেক চিত্র অঙ্কন করিয়াছিলেন এবং ঐ সকল মধ্যে মধ্যে বিলাতে তাঁহার বন্ধুর নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি বহুসংখ্যক হিন্দু ও মুসলমান সময়ের স্থাপত্য ও বৃক্ষ-লতাদির চিত্র অঙ্কিত প্রায় ৫ বৎসর এখানে ছিলেন। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে জরাক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। *

হেনরী সল্ট (Henry Salt) ভাইকাউণ্ট ভেলেন্সিয়ার ভারত এবং প্রতীচ্য ভ্রমণকালে তাঁহার সঙ্গে এ দেশে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের জান্মুয়ারীতে কলিকাতায় পৌছেন এবং গভর্ণর জেনারেলের অতিথিরূপে এখানে অবস্থিত ও ভ্রমণ করেন। তিনি বাঙ্গালার বহু স্থানে এবং লক্ষ্ণৌ ও বেণারসে ভ্রমণ করিয়া অনেক দৃশ্য অঙ্কিত ও পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করেন। এই
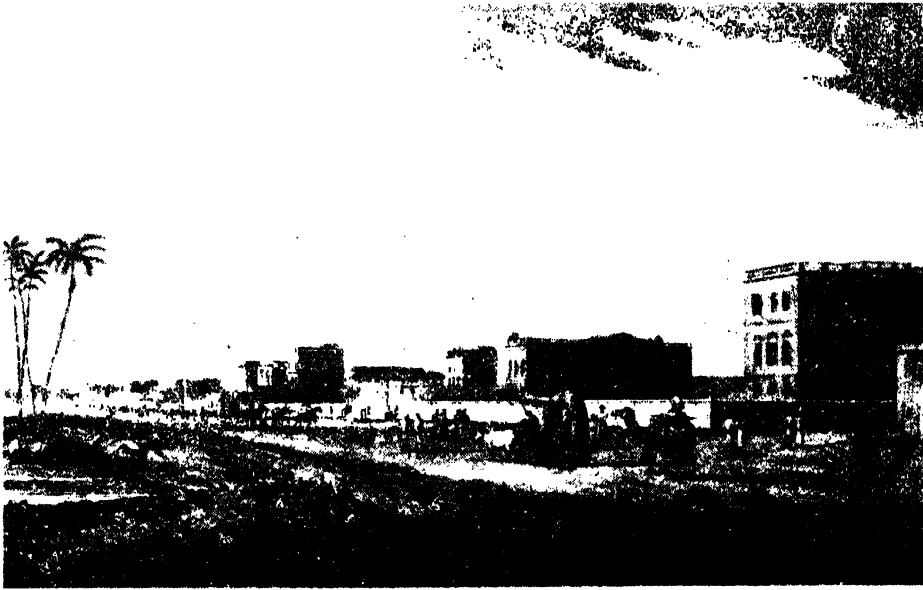
চৌরঙ্গীর একাংশ—১৮১২ খৃষ্টাব্দ শিল্পী—টমাস্ ও উইলিয়ম্ ড্যানিয়েল্

করিয়া ১৮১১ খৃষ্টাব্দে এই দেশেই প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর অঙ্কিত বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থানের প্রায় ৭ শতখানি ছবি বিক্রীত হইয়াছিল। *

জোফানির সমসাময়িক জর্জ্জ ফরিংটন্ (George Farinton) নামক আর এক জন উৎকৃষ্ট চিত্র-শিল্পীর বিষয় জানা যায়। তিনি ম্যাকবেথের ছবি আঁকিয়া একেডেমি হইতে সুবর্ণপদক পাইয়াছিলেন। এখানে তাঁহার দ্বারা চিত্রিত চিত্রের কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। তিনি

সকলের মধ্যে কতকগুলি ভ্যালেনসিয়ার Voyages and Travels গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। সল্ট মাদ্রাজ, পণ্ডিচারী, ম্যাঙ্গালোর প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের বহু স্থান এবং পুনা, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানেও ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বদেশ-প্রত্যাবর্ত্তনের পর মিশরের কনসল্ জেনারেলের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। †

ডেভিস্ নামে দুই জন আলেখ্যকারের কথা

* The Good Old Days of Honourable John company, Vol V.

* The Good Old Days of Honourable John Company, Vol. II.

† European Painter in the days of John Company—The Illustrated Pioneer Mail, Vol. III No. 10

জানা যায়। প্রথম আর্থার ডেভিস (Arthur William Davis), তিনি বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ড্রাফটস্‌ম্যানের কর্ম্মে নিযুক্ত হয়েন। ইংরাজী ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় আগমন করেন এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নব-নির্ম্মিত সেণ্ট-জন্ গীর্জ্জার সৌষ্ঠব-সাধনে নিযুক্ত হয়েন। তৎপরে কিছুকাল তিনি শান্তিপুরে থাকিয়া বাঙ্গালার ব্যবসাদি বিষয়ক চিত্রাদি অঙ্কিত করেন। তিনি টিপু সুলতানের সহিত ইংরাজদের যুদ্ধবিষয়ক কয়েকখানি চিত্রও অঙ্কিত করিয়াছিলেন।

হুগলী নদী হইতে কলিকাতা ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দ শিল্পী—টমাস্ ও উইলিয়ম্ ড্যানিয়েল্

তাঁহার দ্বারা চিত্রিত প্রতিকৃতির মধ্যে লর্ড কর্ণওয়ালিসের একখানি পূর্ণ আকারের প্রতিকৃতির কথা জানা যায়। তিনি এখানে থাকিতে ৩০খানিরও অধিক ভারতীয় বিষয়ের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে প্রায় ২০খানি ভারতীয় ব্যবসা ও কারখানাদির এবং অবশিষ্ট কয়খানি ফকির, ঋষি, রমণী এবং দুই তিনখানি ঐতিহাসিক চিত্র।

ডেভিস্ এখান হইতে চীনদেশে গমন করেন এবং তথা হইতে বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিয়া তৎপরে বিলাত গমন করেন। তিনি তথায় ফিরিয়া "বাবিংটন্ ষড়যন্ত্র", "ম্যাগ্নাচার্টা স্বাক্ষর" প্রভৃতি চিত্র অঙ্কন দ্বারা বিশেষ যশস্বী হইয়াছিলেন। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। *

দ্বিতীয় স্যামুয়েল্ ডেভিস্ও (Samuel Davis) এক জন প্রসিদ্ধ চিত্রকর ছিলেন। তিনি এক জন এঞ্জিনিয়ারের কর্ম্মচারিরূপে বাঙ্গালায় আগমন করেন। ভারতে আসিয়া তিনি কতকগুলি ভাল ভাল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে তিনি তিব্বত যাত্রা করিয়াছিলেন, তৎপরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন এবং পরে কোম্পানীর ডিরেক্টর হয়েন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার অপরাপর চিত্রের মধ্যে ফোর্ট উইলিয়ম হইতে কলিকাতার দৃশ্য একখানি উল্লেখযোগ্য চিত্র। †

টমাস্ বেকন্ (Lieut Thomas Bacon) বেঙ্গল আর্টিলারির রেজিমেণ্টের সমর-শিক্ষার্থিরূপে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ভারতে আইসেন। তিনি প্রথম দমদমায়, তৎপরে মিরাটে প্রেরিত হয়েন এবং কার্য্যস্থলে তাঁহার ভারতের

* Carey's Good Old Days Vol. II

† Some more Prints of Calcutta—Bengal Pas and Present Vol. V.

বহু স্থান দর্শনের সুযোগ পায়েন। তিনি কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তনকালে যমুনাবক্ষে আসিতে আসিতে বহু পুরাতন নগর দর্শন করেন এবং তাহার অনেকগুলির চিত্র অঙ্কন করিয়াছিলেন। এই সকল চিত্র তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার পরিচায়ক তিনি ৫ বৎসরের পর ইংলণ্ডে ফিরিয়া যান এবং তথায় তাঁহার স্বহস্তাঙ্কিত বহু চিত্র শোভিত করিয়া "Fiist Impression and Studies from Nature in Hindostan" নামে গ্রন্থ প্রকাশ করেন। *

মোফাত্ (James Moffat) নামে এক জন চিত্র-শিল্পীর নাম পাওয়া যায়। তিনি কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী বহু স্থানের ও ভারতের অনেক স্থানের চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার অঙ্কিত চিত্র-প্রতিলিপি কোথাও কোথাও দেখা যাইলেও, দুঃখের বিষয়, এই চিত্রকলাবিদের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। Some more prints of old Calcuttaর লেখক মহাশয় অনুমান করেন, তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সৈন্যবিভাগে কার্য্য করিতেন। ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধে অঙ্কিত জল রংয়ে লাটপ্রাসাদের ছবি এবং সেণ্ট জন্ গির্জ্জার দক্ষিণ-পশ্চিম দিক্ হইতে অঙ্কিত উক্ত গির্জ্জার একখানি ছবি আছে। *

বারাকপুর হাউস্ শিল্পী—মোফাত

ভাগীরথীতীরে রাজমহলের নিকট সঙ্গি দালান শিল্পী—বেকন্

* The Illustrated Pioneer Mail 24th Feb. 1923.

* Bengal Past and Present Vol. V.

একে একে কতিপয় প্রাচীন পাশ্চাত্য চিত্রকরের কথা বলা হইল, কিন্তু ড্যানিয়েল্-বংশের যে চিত্রকরত্রয় এ দেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের কথা ভিন্ন এ প্রবন্ধ শেষ করা যায় না। সত্য বলিতে হইলে এ কথা স্বীকার করিতেই

লক্ষ্ণৌয়ের নূতন প্রাসাদ ও রুমি দরজা শিল্পী—সট

হইবে যে, ইঁহাদের নিকট বর্ত্তমান ভারত অনেক অংশে ঋণী। তাঁহারা ইংলণ্ডে প্রচারার্থ এখানকার রীতিনীতি ও দৃশ্যাদি বহুলরূপে অঙ্কিত করিয়া অনেক প্রাচীন বিষয় তাঁহাদের চিত্রের মারফতে আজিও আমাদের দেখিবার সুযোগ করিয়া দিয়াছেন।

জ্যেষ্ঠ টমাস্ ড্যানিয়েল (Thomas Daniell) তাঁহার চতুর্দ্দশ বৎসরবয়স্ক ভ্রাতুষ্পুত্র উইলিয়মকে সঙ্গে লইয়া প্রথম এ দেশে আইসেন। ইংরাজী ১৭৮৪ হইতে ৯৪ পর্য্যন্ত দশ বৎসর ধরিয়া তাঁহারা ভারতের বহু দেশ ভ্রমণ করিয়া সেই সকল স্থানের চিত্র গ্রহণ করেন। ইঁহাদের পূর্ব্বে এই সকল স্থানের ছবি অন্য কেহ অঙ্কিত করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। ইঁহারা চীন ও পূর্ব্ব-দেশীয় দ্বীপপুঞ্জে যাত্রা করেন।

ইঁহাদের দ্বারাই ছয় খণ্ডে সমাপ্ত ১৪৪ খানি চিত্রসম্বলিত "Oriental Scenery" নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। বিলাত প্রত্যাগমনের পর ইঁহারা অশেষ পরিশ্রম সহকারে এই কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন। "Oriental annual" নামক গ্রন্থ উইলিয়ম দ্বারাই প্রকাশিত হইয়াছিল।

কোন কোন প্রাচীন মুদ্রিত চিত্রের তলে সামুয়েল্ ড্যানিয়েল্ (Samuel Daniell) নামে যে শিল্পীর নাম পাওয়া যায়, তিনি উক্ত উইলিয়মের ভ্রাতা ছিলেন। তিনি ১৮০৬ খৃষ্টাব্দের পর ভারতে আসিয়া ভুটান প্রদেশে পরিভ্রমণ করেন। তিনিই পরে "Views of Bhootan" নামে তদীয় চিত্রসম্বলিত গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে লঙ্কাদ্বীপে ম্যালেরিয়া জ্বরে তাঁহার মৃত্যু হয়।*

ডেওলি (Sir Charles D'oyly) নামেও এক জন প্রতিভাবান্ শিল্পী ভারতে আসিয়া কলিকাতা ও নিকটবর্ত্তী স্থানের বহু উৎকৃষ্ট ছবি অঙ্কিত করিয়াছিলেন। ঐ সকল চিত্র তাঁহার মৃত্যুর পর 'Views in Calcutta and its environs' নাম দিয়া ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। ডেওলি ভাগলপুরে একটি লিথো ছাপা প্রেস স্থাপিত করিয়া তথা হইতে তাঁহার বহু চিত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিশপ হিবার তাঁহার গ্রন্থে † এই চিত্রকরের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন। ‡

১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌয়ে মোরগের লড়াই শিল্পী—জোফানি

বেলি (William Baillie) ও বেলি ফ্রেজার (Jas.

* Good Old Days Honourable John Company Vol II.

† Narrative of a Journey through the Upper Provinces of India.

‡ Bengal Past and Present Vol. V.

Baillie Fraser) নামে দুই জন চিত্রকলাবিদের নাম পাওয়া যায়। ইঁহারা উভয়েই কলিকাতার অনেকগুলি প্রসিদ্ধ স্থান ও অট্টালিকাদির ছবি অঙ্কিত করিয়াছিলেন। কি

মথুরা শিল্পী—বেকন্

সূত্রে ইঁহারা এ দেশে আইসেন, তাহা জানা যায় না। প্রথমোক্ত শিল্পী গৌড় এবং রাজমহলেরও ৮ খানি ছবি প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৩ নং চিৎপুর রোড সে সময় তাঁহার ঠিকানা ছিল। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতার ফ্রি স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন বলিয়াও প্রকাশ আছে।

শেষোক্ত ব্যক্তি সম্বন্ধে জানা যায়, তিনি এক জন বড় পরিব্রাজক ও লেখক ছিলেন এবং অবৈতনিক ভাবে চিত্রাঙ্কন করিতেন। তিনি হিমালয় পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং 'Twenty Views of the Himalaya' Mountains নাম দিয়া একখানি গ্রন্থে তথাকার অঙ্কিত চিত্রসকল প্রকাশ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে হিমালয়-ভ্রমণের পর তিনি কলিকাতায় আগমন করেন। এই চিত্রকরদের অঙ্কিত প্রাচীন কলিকাতার চিত্রগুলি হইতে তখনকার রাজধানীর সৌধ-সৌষ্ঠবের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। *

বৃন্দাবন শিল্পী—বেকন্

উক্ত কয়জন যশস্বী চিত্র-শিল্পী ভিন্ন হোম্ (Robert Home), চিনেরি (George Chinnery), হিকি (Hickey), হাম্‌ফ্রে (Ozias Humphery), স্মার্ট (John Smart), চার্লস্ স্মিথ্ (Charles Smith), ওয়েল্‌স্ (James Wales), এল্‌ফাউণ্ডার (John Alefounder), সোয়েন্ ওয়ার্ড (Francis Swain Ward), ওয়েষ্টাল্ (William Westall), জন হাগিন্‌স (William John Huggins), বিচে (George Beechey), কার্টার (Carter), ডিন্ (Dean), হাউইট্

কাশীর দৃশ্য শিল্পী—স্মার্ট

* Some more prints of Calcutta—Bengal Past and Present Vol. V.

অযোধ্যার উজীর কর্ত্তৃক লর্ড কর্ণওয়ালিসের দরবারে প্রেরিত হাইদার বেকের দৌত্য শিল্পী—জে: ফানি

(Samuel Howit) প্রভৃতি আরও কয়েক জনের নাম পাওয়া যায়। ইঁহারা সকলেই প্রতিভাবান্ চিত্রকর, প্রায় সকলেই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এ দেশে আসিয়াছিলেন। প্রবন্ধের কলেবরবৃদ্ধির আশঙ্কায় ইঁহাদের বিষয় স্বতন্ত্র ও বিস্তৃতভাবে বলিতে বিরত রহিলাম; নচেৎ ইঁহাদের দ্বারা অঙ্কিত প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের প্রতিকৃতি, যুদ্ধাদি-সংক্রান্ত ঐতিহাসিক ঘটনা এবং বহু নগর ও অট্টালিকাদির চিত্র পূর্ব্বোক্ত শিল্পীদের কৃত চিত্রাদির তুলনায় কম মূল্যবান্ নহে। *

শ্রীহরিহর শেঠ।

* Carey's Good Old Days Vol. II. গ্রন্থে ইঁহাদের বিষয় লেখা আছে।

ছোট

নয়নের এক ফোঁটা জলে
কত ব্যথা হয় অবসান,
মিলনের আশাটুকু নিয়ে
বেঁচে থাকে বিরহি-পরাণ।

মুহূর্ত্তের এতটুকু ভুলে
ব্যর্থ হয় সকল সাধনা,
'আদমের' নিমেষের দোষে
মানবের আজিও লাঞ্ছনা।

মহতের বিন্দুমাত্র ভুলে
মুছে যায় সকল মহিমা,
জীবনের ক্ষণিকের ভুলে
লুপ্ত হয় সকল গরিমা—

ছোট ব'লে অবহেলা করে দেখি হায়!
জীবনের খাতাখানা পূর্ণ ব্যর্থতায়॥

শ্রীজিতেন্দ্রকুমার বসু।

অন্নদামঙ্গল

"অন্নদামঙ্গল" লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছি, এমন সময়ে বন্ধুবর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার ঘোষ মহাশয় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহার মুণ্ডপাত হইতেছে?" পরে বইয়ের নাম দেখিয়া বলিলেন, "এই বয়সে?" কোন উত্তর করিলাম না। "অর্চ্চনার" কামসূত্র সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া একটু হাস্যাস্পদ হইয়াছিলাম। তবুও সে সংস্কৃত গ্রন্থ—এ একে বাঙ্গালা, তদুপরি "অন্নদামঙ্গল।" সুতরাং বন্ধুবরের হাস্যোদ্রেকের কারণ অবশ্যই ছিল।

কিন্তু আমার মনে হয় যে, যদি বাঙ্গালার ইতিহাস—খাঁটী ইতিহাস কোন দিন লিখিত হয়, যদি যথার্থ সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক অবস্থা পরিজ্ঞাত হইতে হয়, যদি দেশের প্রকৃত আভ্যন্তরীণ বৃত্তান্ত জানিবার কাহারও ইচ্ছা হয়, তবে এই শ্রেণীর পুস্তক অবশ্য পাঠ করিতে হইবে। অন্নদামঙ্গলের আপত্তিজনক অংশটুকু বাদ দিয়া অন্যাংশ হইতে বাঙ্গালার তৎকালীন অবস্থার অনেক উপাদান পাওয়া যায়। অন্নদামঙ্গল, কবিকঙ্কণের চণ্ডী প্রভৃতি গ্রন্থ এই হিসাবে অত্যন্ত উপাদেয় এবং অবশ্যপাঠ্য।

অন্নদামঙ্গল অষ্টাদশ শতাব্দীর গ্রন্থ। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমাদের দেশের অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। মুসলমান-রাজত্বের অবসান হইতেছিল; দেশে রাষ্ট্রবিপ্লবের অন্ত ছিল না। ঔরংজীবের মৃত্যুর সময় হইতে ইংরাজরাজ-প্রতিষ্ঠার কাল পর্য্যন্ত বিবাদ, বিপ্লব, অশান্তি ইহার কিছুরই অভাব ছিল না। রাজা, প্রজা, উচ্চ নীচ সকলেই একই প্রকৃতিবিশিষ্ট হইয়া পড়িতেছিল। রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন যে, তৎকালীন প্রায় সকল প্রসিদ্ধ ব্যক্তিই দুর্নীতিপরায়ণ ছিলেন। ঘোর নৃশংসতা, অদমনীয় লোভ এবং দুশ্চরিত্রতার জন্য দেশে অশান্তির প্রবল বন্যা আসিয়া পড়িয়াছিল। ফলে খুব কম ব্যক্তিরই চরিত্র সাধু ছিল এবং সর্ব্বত্রই কামুকের প্রতিপত্তি আসিয়াছিল। অন্নদামঙ্গল এই যুগের গ্রন্থ। শুধু এই যুগের গ্রন্থ নহে—অন্নদামঙ্গলে এই যুগের খুব পরিস্ফুট চিত্র পাওয়া যায় এবং বিদ্যা ও সুন্দরসম্বন্ধীয় যে সকল অপঠনীয় অশ্রাব্য চিত্র ইহাতে চিত্রিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা দেশের লোকের নৈতিক অবস্থার আভ্যন্তরীণ বিবরণ বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। কেবল ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দরে নহে, এই জাতীয় অনেকগুলি গ্রন্থে এইরূপ অবস্থার বিবরণ প্রকটিত হইয়াছে।

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল বাদশাহ জাহাঙ্গীরের ঘটনাবলম্বন করিয়া লিখিত—প্রতাপাদিত্য ও মানসিংহের যুদ্ধের কথা, প্রতাপাদিত্যের পরাজয়—কৃষ্ণনগরের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ মজুমদারের সাহায্যে মানসিংহের জয়—এই সকল বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। ইতিহাস-সংক্রান্ত ঘটনার চিত্র চিত্রিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে ভারতচন্দ্র যে সময়ে জীবিত ছিলেন, পুস্তকে সেই সময়েরই সমসাময়িক বিষয়ের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তৎকালে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কৃষ্ণনগরাধিপতি ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রকে তৎকালীন যুগের এই হিসাবে প্রধান ব্যক্তি বলা যাইতে পারে। তিনি সাহিত্যের উৎসাহদাতা ছিলেন; তাঁহার দরবারে তৎকালীন প্রধান সাহিত্যিকগণ বাস করিতেন। তিনি গুণানুরাগী ছিলেন এবং শিল্প ও সাহিত্যের সেবারত ব্যক্তিগণকে অনুপ্রাণিত করিতেন। ইংরাজ কোম্পানীর তিনি যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। এবম্প্রকারে তিনি রাজনীতি, সাহিত্য এবং সমাজের সহিত বিশেষরূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কিন্তু এ হেন কৃষ্ণচন্দ্রও সমসাময়িক দোষ হইতে নির্লিপ্ত থাকিতে পারেন নাই। তিনি স্বীয় খুল্লতাতকে কৃষ্ণনগরের গদী হইতে নিষ্কাশিত করিয়া রাজা হইয়াছিলেন। কালের দোষ! সে সময়ে সাধু চরিত্র বা নৈতিক সুশিক্ষায় কোন পৌরুষ ছিল না; বরং বিপরীত গুণ (?) গুলিই প্রশংসাভাজন হইত। ভারতচন্দ্র এই যুগের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন এবং এই অবস্থায় তিনি অন্নদামঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং অন্নদামঙ্গলে যে অনেক বীভৎস চিত্র চিত্রিত হইয়াছে, তাহাতে আর বিচিত্র কি?

অন্নদামঙ্গল তিন অংশে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে দেবদেবীর কথা, দ্বিতীয়ে বিদ্যাসুন্দরের আখ্যান এবং শেষাংশে রাজা মানসিংহ কর্ত্তৃক প্রতাপাদিত্যের পরাজয় বর্ণিত হইয়াছে। দেশের তৎকালীন জল-বায়ুর গুণে গ্রন্থের দ্বিতীয়াংশ সম্পূর্ণ ও তৃতীয়ের অংশবিশেষে অশ্লীলতা যথেষ্ট পরিমাণে স্থান পাইয়াছে। এই জন্য অনেকে অন্নদামঙ্গল স্পর্শ করিতে চাহেন না বা পাঠ করিলেও তাহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইয়া থাকেন। কিন্তু অশ্লীলতার মধ্য দিয়া যে সকল বৃত্তান্ত পাওয়া যায়, তাহাতে বঙ্গদেশের, বাঙ্গালী ঘরের বেশ একটা চিত্র পরিলক্ষিত হয়, সমসাময়িক কালের আহার, বিহার, বাসস্থান, রীতি-নীতির যথেষ্ট আভাস পাওয়া যায়; তৎকালীন ও বর্ত্তমানের আমাদের অবস্থার তুলনা সম্ভবপর হয়। এই জন্যই বলিয়াছি যে, বঙ্গদেশের অষ্টাদশ শতাব্দীর যথাযথ বৃত্তান্ত জানিতে হইলে অন্নদামঙ্গলজাতীয় পুস্তক অধ্যয়ন ও পর্য্যালোচন অত্যাবশ্যক।

দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের আলোচ্য গ্রন্থের মালিনীর বাজার ও সুন্দরের নিকট তাহার ব্যাখ্যানের কথা ধরুন। সুন্দর মালিনী মাসীকে তাঁহার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার জন্য টাকা দিয়াছেন; মাসী বাজার করিয়া আনিয়া হিসাব-নিকাশ দিতেছেন। দেশে তখন রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন থাকিলেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রয়-বিক্রয় কড়িতে সম্পাদিত হইত। (মেকী টাকার অভাব তখনও ছিল না)। অষ্টাদশ শতাব্দীর ধনী ব্যক্তির প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির তালিকা দেখুন। অবশ্য সুন্দর কাঞ্চীর রাজপুত্র হইলেও ছদ্মবেশে—পড়ুয়ার বেশে বর্দ্ধমান পৌঁছিয়াছেন, সুতরাং বাজারটা ঠিক রাজারাজড়ার হিসাবে নাই। তথাপি সন্দেশ, শর্করা, ঘৃত দুগ্ধ, ফল এবং তাম্বুল ও তৎসরঞ্জামী চুয়া, সুপারী, দারুচিনি, জায়ফল হাট হইতে আনীত হইয়াছিল। গাত্রে মর্দ্দনের জন্য চন্দন এবং রন্ধনের কাষ্ঠও ক্রয় করিতে হইয়াছিল। দ্রব্যাদির মূল্য সম্বন্ধে ভারতচন্দ্র মালিনীকে বিশেষ কিছু জানান নাই; তবে মাসীর বিশেষ লাভ করা সত্ত্বেও দ্রব্যাদির মূল্য যে মহার্ঘ ছিল না, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সুন্দর ছদ্মবেশে বর্দ্ধমানে আসিয়াছিলেন। এখনকার দিন হইলে অবশ্য একখানি চেক-বুক সঙ্গে থাকিলেই যথেষ্ট হইত। কিন্তু তখন এ প্রথা ততটা চল ছিল না। দাক্ষিণাত্যের কাঞ্চী হইতে উত্তরাপথের বর্দ্ধমানে একাকী প্রচুর অর্থ সমভিব্যাহারে আনয়ন করাও নিশ্চয়ই সমীচীন ছিল না; সুতরাং আমরা অনুমান করিয়া লইতে পারি যে, সুন্দর বেশী কিছু সঙ্গে আনেন নাই এবং সেই জন্য আহারাদির বেলাও প্রচুর ব্যয় সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু অন্য চিত্র দেখুন। কৃষ্ণনগর রাজপ্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দের আহারের দৃশ্যটা দেখুন। অন্নদার বরপুত্র দিল্লী হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন এবং তাঁহার কনিষ্ঠা রাজ্ঞী তাঁহার জন্য রন্ধন করিতেছেন। অতিশয়োক্তি হইলেও এ চিত্র পাঠে তৎকালীন বঙ্গদেশের প্রাচুর্য্যের প্রমাণ পাওয়া যায়, লক্ষপতির পত্নীও যে রন্ধনশালায় যাইয়া স্বামি-পুত্র-পরিজনের জন্য হাত পোড়াইতে দ্বিধাবোধ করিতেন না, সে সম্বন্ধে দ্বিধা হয় না। বিভিন্ন প্রকারের শাক-সব্জী, সাত রকমের ডাল, ছয় রকমের ভাজা, দ্বাদশ প্রকারের মৎস্যের ঝোল ব্যতীত বিভিন্ন প্রকারে রাঁধা মৎস্যের তরকারী, মাংসের ভিন্ন ভিন্ন জিনিষ, টক, পঞ্চদশ প্রকার পিষ্টক—এ সকল তালিকা দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তখনকার বাঙ্গালীর আহারে স্পৃহা ছিল, তাঁহারা আমাদের ন্যায় অজীর্ণরোগী ছিলেন না এবং ইহাও অবশ্য বলা যাইতে পারে যে, অভাবও কম ছিল। বিদ্যাসুন্দর হইতে কতিপয় ছত্র উদ্ধৃত করিয়া দিলে বোধ হয় নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

ভারতচন্দ্রের বর্ণনা দেখুন :—

"ডালি রান্ধে ঘনতর ছোলা অড়হরে।
মুগ মাষ বরবটী বাটুলা মটরে॥
বড়া বড়ী কলা মূলা নারিকেল ভাজা।
দুধ থোড় ডালনা শুক্তানি ঘণ্ট তাজা॥
কাঁটালের বীজ রান্ধে চিনি রসে বুড়া।
তিল-পিটালিতে লাউ বার্ত্তাকু কুমুড়া॥

একবার মৎস্যের তালিকাটা দেখুন :—

"কাতলা ভেকুট কই ঝাল ভাজা কোল।
সীকপোড়া ঝুরা কাঁটালের বীজে ঝোল॥
ঝাল ঝোল ভাজা রান্ধে 'চন্তল ফলই।
কই মাগুরের ঝোল ভিন্ন ভাজে কই॥
মায়া সোনা খড়কীর ঝোল ভাজা সার।
চিঙ্গড়ীর ঝাল বাগা অমৃতের তার॥
কঠা রান্ধি রান্ধে কই কাতলার মুড়া।
তিক্ত দিয়া পচা মাছে রান্ধিলেক গুঁড়া॥
আম্র দিয়া শোলমাছে ঝোল চড়চড়ী।
আড়ি রান্ধে আদারসে দিয়া ফুলবড়ী॥
রুই-কাতলার তৈলে রান্ধে তৈল-শাক।
মাছের ডিমের বড়া মৃতে দেয় ডাক॥
বাটার করিলা ঝোল খয়রার ভাজা।
অমৃত অধিক বলে অমৃতের রাজা॥
সুমাছ বাছের বাছ আর মাছ যত।
ঝাল ঝোল চড়চড়ী ভাজা কৈল কত॥
বড়া কিছু সিদ্ধ কিছু কাছিমের ডিম।
গঙ্গাজল তার নাম অমৃত অসীম॥"

তালিকাটা কিছু দীর্ঘ হইয়া গেল; কিন্তু আমরা আজকাল এ সব মাছ চোখেই দেখি না, আর অন্নদামঙ্গলও পড়ি না।

অতঃপর গ্রন্থকার মাংস ও অম্বল রাঁধাইয়া ছোটরাণীকে দিয়া পিষ্টক রাঁধাইয়াছেন। এ তালিকাটা বেশী বড় নহে। বিশেষতঃ আজকাল আমরা হোটেলের সহজলভ্য বাসী কেক-বিস্কুট খাইতে অভ্যস্ত হইয়াছি; সুতরাং পিষ্টকের তালিকা উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। পাঠকবর্গের কাহারও গৃহে যদি পদ্মমুখীর ন্যায় দ্রৌপদী থাকেন, তবে তিনি একবার দুই শত বৎসরের পূর্ব্বের তালিকা দৃষ্টে পিঠাপুলী খাইয়া দেখিবেন।

"বড়া এলো আসিকা পীযুষী পুরী পুলী।
চুষী রুটী রামরোট মুগের সামুলী॥
কলাবড়া ঘিয়ড় পাপড় ভাজাপুলী।
সুধারুচি মুচমুচি লুচি কতগুলি॥"

অতঃপর পরমান্ন ও পরে নানারূপ অন্নের তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। গড়ে হিসাব করিয়া বলা যাইতে পারে যে, ৬০ প্রকার ব্যঞ্জন-তরকারী ব্যতীত খিচুড়ী, রুটী ও লুচির ব্যবস্থা হইয়াছিল।

অন্নদামঙ্গল খুটিনাটি করিয়া পড়িলে অনেক বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়। সাধারণভাবে পড়িয়া আমরা আর ২।১টি বিষয় উল্লেখ করিব। রাজদরবারে দেওয়ান, বৈদ্য, জ্যোতিষী, মুন্সী, বক্সী, উকীল, পেশকার খাজাঞ্চী, পোদ্দার, বিভিন্ন দপ্তরের বিভিন্ন মুহুরী, দপ্তরী, ঘড়েল, আমীন, কানুনগু চাকুরী করিতেন। তদ্ব্যতীত অধ্যাপক, নকীব ও কাজী এবং কোতোয়াল দরবারে হাজির হইতেন। বিদ্যার বিবাহ বেশী বয়সেই হইয়াছিল এবং বিদ্যা সুশিক্ষিতা ছিলেন; কিন্তু তৎকালীন সমাজে কন্যার বিবাহ অধিক বয়সে হইত কি না এবং কন্যা সাধারণতঃ সুশিক্ষিতা হইতেন কি না, তাহা বিদ্যাসুন্দরে পাওয়া যায় না। কুলীনত্বের প্রভাব পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত ছিল, তাহার প্রমাণ বিদ্যাসুন্দরে পাওয়া যায় এবং "সুতা বেচা কড়ী" দিয়া যে কুলীনের ব্রাহ্মণীকে স্বামীর রুষ্ট মুখকে মিষ্ট করিতে হইত, তাহাও দৃষ্ট হয়। বিবাহের সময়ে যৌতুকের ব্যবস্থাও ছিল।

খুটিনাটি করিয়া পড়িতে পারিলে, অন্নদামঙ্গলে উল্লিখিত বিষয় ব্যতীত হয় ত আরও অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ের কথা পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারিতাম। তবে যেটুকু দেখাইয়াছি, মনে হয়, তাহা হইতেই বুঝা যাইবে যে, বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিতে হইলে অন্নদামঙ্গল শ্রেণীর পুস্তক বাদ দিলে চলিবে না। উহাদের ব্যবহার বাঙ্গালার ইতিহাসলেখকগণের অবশ্য কর্ত্তব্য।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার (অধ্যাপক)।

কবিরঞ্জন—রামপ্রসাদ সেন।

এই সেই গ্রাম—যেখানে পৃথিবীর কোলাহল হইতে দূরে বসিয়া বাঙ্গালার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি মাতৃ-সাধনায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালাদেশে তীর্থসংখ্যা বেশী নাই, কিন্তু শাক্ত ও বৈষ্ণব ভাব-প্রবাগ ঈশ্বরপুরী ও রামপ্রসাদের কর্ম্মভূমি কুমারহট্টকে তীর্থস্বরূপ গ্রহণ করিলে বাঙ্গালীজাতির দৈন্য যে অনেকটা ঘুচিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাঙ্গালার এই স্নিগ্ধ পল্লী—যার প্রতি ধূলিকণা রামপ্রসাদের পবিত্র স্মৃতি-বিজড়িত—যার আকাশে বাতাসে রামপ্রসাদের প্রাণের নিবিড় ব্যথার সুর চিরন্তরে গাঁথা রহিয়াছে, সমস্ত বাঙ্গালীজাতির ইতিহাসে সেই পল্লী চির-আদরের। সমস্ত জাতির অন্তরাত্মা খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই অভিমানী পল্লীকবির স্নেহার্দ্র ভাষায় ধ্বনিত হইয়াছিল।

এ কথা বলিলে কোনমতেই সত্যের অপলাপ হইবে না যে, রামপ্রসাদ এক জন খাঁটী বাঙ্গালী ছিলেন। আধুনিক বহু কবি ও গল্প-লেখকদিগের মত তিনি মূক জনসমাজ হইতে বহুদূরে তাঁহার সাহিত্যের ও ভাবের তাজমহল গড়িয়া তুলেন নাই। তিনি যাহা লিখিয়াছেন,

তিনি যে ভাবে ভাবিয়াছেন, তাহার সমস্তের ভিতরেই যেন বাঙ্গালার মূর্ত্তিটি পূর্ণভাবে ভাসিয়া উঠিয়াছে। এই জন্ম রামপ্রসাদ বাঙ্গালা মায়ের চির-আদরের ছেলে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রামপ্রসাদ যে মায়ের মূর্ত্তি-সম্মুখে নিজ হৃদয় নিবেদিত করিয়াছিলেন সমস্ত বাঙ্গালী জাতি তাঁহাকে মা বলিয়া চিনে। তাই আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার কুটীরে কুটীরে, চাষীর গৃহে গৃহে বারো মাস ভরিয়া বাঙ্গলার ছেলে-মেয়েরা রামপ্রসাদের গান গাহিয়া গাহিয়া যে কোন এক স্বপ্নময় রাজ্যে আলুলায়িত-কুন্তলা বিদ্যুদ্দামবিভাসিতা অসীম ভালবাসা মাখান অপলক নেত্রে উপবিষ্টা এক পাগলিনী জননীর বক্ষ ও ক্রোড় হইতে সমস্ত স্নেহভাণ্ডার লুঠিয়া লইবার আনন্দে উন্মত্ত। এখানে শিশু ও যুবক, কাঙ্গাল ও রাজা, স্ত্রী ও পুরুষ সকলে একাকার হইয়া আনন্দের ভাণ্ডারে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া যায়।

রামপ্রসাদকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে তাঁহার মাতৃসাধনার পশ্চাতে যে সমগ্র জগতের বহুযুগ-বিস্তৃত এক বিরাট সাধনার ইতিহাস আছে, তাহার অবগুণ্ঠন উন্মুক্ত করিয়া দেখা দরকার। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, রামপ্রসাদ এক জন খাঁটী বাঙ্গালী কবি ছিলেন। বাঙ্গালার জলবায়ু, বাঙ্গালার আকাশ, বাঙ্গালার তরুলতা, পুকুরঘাট, তাহার স্নেহময় শ্যামাঞ্চল—এই সবই যেমন একটি বিশেষ রূপ আমাদের মনের মধ্যে জাগাইয়া দেয়, রামপ্রসাদের মাতৃমূর্ত্তিও তেমনই আমাদের বহুপুরাতন অথচ নিত্যনবীনা ও শাশ্বতযৌবনা বাঙ্গালী জাতির 'মা'কে চিত্রিত করিয়া দেয়। আমার এই কথার একটা দৃঢ় ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে, সেটা দুই এক কথায় আপনাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিব। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের যে কিছু নিদর্শন জীর্ণ পুথির পাতায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে শক্তি-সাধনার অনেক কথা পাওয়া যায়। বৌদ্ধ মহাযান ও উদীয়মান হিন্দুধর্ম্মের প্রভাবে পুরুষ ও প্রকৃতিবাদ লইয়া ভারতে খুব বড় রকম একটা আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল। সেই আন্দোলনের ফলে ভারতের অধিকাংশ স্থলে এই ভাবটি গৃহীত হইল যে, পুরুষ নিষ্ক্রিয় ও শান্ত, প্রকৃতি ক্রিয়াশীলা ও লীলাময়ী। এই ভাবটি অশিক্ষিত জনসমাজের মধ্যেও একটা দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। ফল এই দাঁড়াইল যে, ভক্ত দেবতাকে তাঁহার প্রাপ্য ফুলচন্দন দিয়াই ক্ষান্ত হইল, কিন্তু হৃদয়ের প্রেম, ভয়, ভক্তি ও কুসংস্কার দিয়া যাঁহার নৈবেদ্য রচনা করিল, তিনি দেবী। বাঙ্গালার যত পুরাতন লৌকিক ধর্ম্ম, কথা-উপকথা এই নূতন ভাবের বন্যায় প্লাবিত হইয়া দিকে দিকে দেবীর মন্ত্র ও দেবীর জয় ঘোষণা করিতে লাগিল। এইরূপে বিষহরী মনসা, শীতলা প্রভৃতি কত শত দেবী আবির্ভূত হইয়া ভক্তের হৃদয়বেদীতে অধিষ্ঠিত হইলেন। নাগ আমাদের বিশেষ পরিচিত, শিবের গলায়, বিষ্ণুর শয্যায় তাহার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া এককালে আমরা রক্ষা পাইয়াছিলাম, কিন্তু এই যুগে ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইলেন মনসা—শিব বা বিষ্ণুর ক্ষমতা মনসা দেবীর কাছে অনেকটা খাট হইয়া পড়িল। পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি বিজয় গুপ্তের পদ্মপুরাণে দেখিয়াছি, মহাদেব নিজ গলায় সাপকে মালা করিয়া পরিলেও সর্পের বিষাক্ত স্বভাব জয় করিতে পারেন নাই। এই প্রাণিজগতের সমস্ত গরল নিজ দৃষ্টিতে যিনি পলকে সংগ্রহ করিতে পারেন, তিনি মনসা দেবী, এবং এই করাল দৃষ্টির এক পলকপাতে মহাজ্ঞানী মহাদেব জ্ঞান হারাইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছেন। বাঙ্গালী জাতি কখনও ভক্তিপ্রেমোজ্জ্বল অন্তরপথ ধরিয়া দেবীমঙ্গল গাহিতে গাহিতে দুর্গম পার্থিব পথ মুখরিত করিতেছে, কখনও বা ভয়ার্ত্ত শিশুর মত কাঁপিয়া ও চোখের জল ফেলিয়া মায়ের বুকে আত্মরক্ষা করিবার জন্য ছুটাছুটি করিতেছে। কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্যে দেবীপূজার এক সনাতন রাগিণী বাজিয়া উঠিয়াছে। ইহা এক স্বতঃসিদ্ধ সত্য যে, মানুষ যে যুগে বাস করে, সেই যুগের পারিপার্শ্বিক চিন্তা ও কর্ম্মধারা হইতে সে কি দৈনন্দিন, কি আধ্যাত্মিক ব্যাপারে একেবারে মুক্ত থাকিতে পারে না। যে যুগে বাঙ্গালী স্বাধীন ছিল, যে যুগে সে ডিঙ্গা ভাসাইয়া সাগর অতিক্রম করিয়া বিদেশের সহিত আত্মীয়তা রক্ষা করিত, সে যুগে বাঙ্গালী এক বিশিষ্টভাবে ভাবিত, এক বিশিষ্টভাবে কায করিত, তাহার স্বপ্ন, তাহার চিন্তা ও কর্ম্মপদ্ধতি এই স্বাধীনতা ও সাহসিকতার দুর্জ্জয় প্রভাবে স্বতঃস্ফূর্ত্ত ও বেগবতী ছিল। ইহাই খুব স্বাভাবিক—তাই ব্যাধ কালকেতু ও বেণে চাঁদ সদাগরের মত দৃঢ়চরিত্র শক্তি-সাধক পুরুষের ছবি প্রাচীন সাহিত্যে পাই। কিন্তু কালক্রমে আমরা যখন সবই হারাইতে বসিলাম, আমরা যখন পৃথিবীর হাটবাজারে রিক্ত কাঙ্গাল হইয়া পড়িতে লাগিলাম, তখন স্বভাবতঃই ভয় ও কুসংস্কার আমাদের জাতির অলঙ্কার হইয়া পড়িল। ভীরু ছেলের কাছে শক্তিময়ী দেবীর সত্যলীলা প্রকাশ পায় না। বাঙ্গালী এই যুগে নিজের ঘরে যে মা'র মূর্ত্তি সর্ব্বদা দেখিত, যে মা এক পা ঘরের বাহির হইলে সন্তানের জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া কাতর হইতেন—সকল মায়ের মা বিশ্বজননীর মূর্ত্তিকেও সেই চোখেই সে দেখিল—চারিদিকে কুসংস্কার জটিল হইয়া আসিয়া আধ্যাত্মিক সাধনার আঁধার পথ আরও তিমির-মগ্ন করিয়া তুলিল—জননীর প্রকৃত মূর্ত্তি কিছুকালের জন্ম ঢাকা পড়িয়া গেল। কিন্তু সমগ্র জাতি যে সাধনা একবার জীবনের ব্রতরূপে সমস্ত প্রাণ দিয়া গ্রহণ করিয়াছে, তাহা সে কঠিন জীবন-সংগ্রামের ভারে প্রপীড়িত হইয়া কিছুকালের জন্ম ভুলিয়া থাকিতে পারে বটে, কিন্তু সকলের অগোচরে জাতির প্রাণ সেই অনাদৃত অন্তর্লক্ষ্মীর জন্য তাহারই অজ্ঞাতে যে গুমরাইয়া গুমরাইয়া কাঁদিতে থাকে, তাহার ইতিহাস কয় জনের কাছে প্রকটিত? পরবর্ত্তী যুগের সাহিত্যিক অবতারদিগের প্রতি একবার ফিরিয়া তাকাইলেই আমার কথাটা পরিষ্কার হইবে। পরাধীনতার কি গৌরব নাই, ব্যর্থতার মধ্যেও কি কবিত্বের প্রস্রবণ ছুটিতে পারে না, আঁধারের মধ্যেও কি আলো নাই, অমানিশার কি রূপ নাই, মিথ্যা ফাঁকিফুকির মধ্যেও কি প্রাণের বেদনা—অনুতাপ নাই? ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ এই নূতন মন্ত্র লইয়া সাহিত্যভাব-আসরে উপস্থিত হইলেন—বাঙ্গালী জাতি তাহা নিস্তব্ধ হইয়া শুনিল এবং পরমুহূর্ত্তেই তাহা গ্রহণ করিল। কারণ, এ যে তাহাদেরই প্রাণের কথা, কিছুকালের জন্ম ভুলিয়াছিল মাত্র।

ভারতচন্দ্র যে অন্নপূর্ণার মূর্ত্তি আঁকিলেন, তাহা এই ভিক্ষাজীবী, অনাহারী পরাধীন বাঙ্গালীর ঠিক উপযুক্তই হইল। সে দেব বা দেবীর দরকার নাই যিনি এই দীন জাতির মুখে অকাতরে অন্নদান করিতে পারেন না। পোষাকী দেবদেবীর প্রয়োজন নাই। ভারতচন্দ্রের কবিতায় অন্নপূর্ণা নামিলেন—নামিলেন তাঁহার অজস্র অন্নের ডালি লইয়া, কোথাও কোন্ ভিখারী আছ এস, শ্মশানচারী দিগম্বর স্বামী ভোলানাথ, তুমি এস এই মরা জাতির সহিত একত্র বসিয়া অন্ন আহার কর। মায়ের প্রাণে এত স্নেহ আছে, যুগ যুগ ভরিয়া লাঞ্ছিত, অবমানিত, ক্ষুধার্ত্ত আমরা, অন্ন দিয়া আমাদের বাঁচাইলে! তাহার পরে ভারতচন্দ্র জননীর আর এক মূর্ত্তি দেখিলেন—যে অন্ন অবিরাম পাইতেছি, সে ত শুধু অন্ন নহে, এ যে মুক্তির অন্ন, অমৃত! ভারতচন্দ্রের কাব্য এই পরাধীন জাতির সমস্ত বিশ্বকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছে হে অগণিত নরনারী, বিচিত্র জনসমাজ! এই মায়ের বুকে আসিয়া আশ্রয় লও।

রামপ্রসাদ এই মায়েরই আদুরে ছেলে। রামপ্রসাদের গানে যেন বাঙ্গালার পল্লীযুগের অপূর্ব্বশ্রী, স্নেহে ঢল ঢল শ্যামল ছবিটি স্পষ্ট করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই পল্লীরই চিরমাধুর্য্য ও রহস্যপূর্ণ বকুল ও চাঁপা-গাছের তলা, পুকুরঘাটের দৃশ্য দেখিয়া বাঙ্গালার কবিকুল যমুনার লীলা এমন স্পষ্টভাবে, এমন নিবিড়ভাবে অন্তরের পর্দ্দায় পর্দ্দায় অনুভব করিয়াছেন, সমগ্র বিশ্বের বিরহ ও মিলন সুর তাঁহাদের কবিতাকুঞ্জেও বাজিয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালার এক রূপ শ্যামকৃষ্ণ—আর এক রূপ শ্যামা জননী। এক রূপকে চণ্ডীদাস অমর করিয়াছেন, অপর জনকে অমর

করিয়াছেন রামপ্রসাদ। রামপ্রসাদ পৌরাণিক আবর্জ্জনা আনিয়া এই মাতৃমূর্ত্তি দেখাইতে চেষ্টা করেন নাই। শিশু যেমন করিয়া মাতৃ-ক্রোড়ের জন্য ক্রন্দন করে, কোন শাস্ত্র পাঠ করিয়া তাহার এই ব্যাকুলতা জন্মে না, তেমনই রামপ্রসাদ এই মায়ের জন্য কখনও কাঁদিয়াছেন, কখনও তাঁহার দিগন্তবিস্তৃত ক্রোড়ের দিকে ধাবমান হইয়াছেন।

রামপ্রসাদের গানে ভাবের সহিত প্রকাশের অপূর্ব্ব মিলন ঘটিয়াছে, এখানে কোন ঢাক-ঢোল নাই, বৃথা পাণ্ডিত্য নাই, ভাষার ঐশ্বর্য্য নাই। এ গান প্রাণের অতলস্পর্শ সাগর হইতে উত্থিত হইয়া এক চিন্ময়ী প্রেমময়ী শ্যামামূর্ত্তির বুকে আছড়াইয়া পড়িতেছে। বোধ হয়, বাঙ্গালীই ঠিক এমনই ভাবে তাহার প্রাণের প্রাণকে মজাইতে পারে। শক্তিসাধক বাঙ্গালী অদূরভবিষ্যতে এক দিন যখন পৃথিবীতে এক নূতন ভাব-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবে, সে দিন রামপ্রসাদের 'মা'র কাছে সমস্ত বিশ্ব ছুটিয়া আসিবার জন্য ব্যগ্র হইবে। সে দিন বাঙ্গালীর বাঁশী ও বাঙ্গালী কবি রামপ্রসাদের গান বিশ্বমানবের কাণে নূতন মুক্তিমন্ত্র শুনাইবে। রামপ্রসাদ যে মন্ত্র গাহিয়াছেন, যাহার রেশ আজ কেবলই কাণে বাজিতেছে, যে মন্ত্রে সাধনার শিখরদেশে উঠিয়া তিনি বিশ্ববাসীকে আহ্বান করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি—

"মন তোর এত ভাবনা কেনে ?
একবার কালী ব'লে বস্ রে ধ্যানে ॥
জাঁকজমকে করলে পূজা অহঙ্কার হয় মনে।
তাই লুকিয়ে তাঁরে করবি পূজা, জানবে না রে জগজ্জনে ॥
ধাতু পাষাণ মাটীর মূর্ত্তি কায কি রে তোর সে গঠনে ॥
তুমি মনোময় প্রতিমা গড়ি, বসাও হৃদি-পদ্মাসনে ॥

শ্রীবিনয়চন্দ্র সেন।

বিহার বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন

(সম্মিলনসম্পাদকের মন্তব্য)

স্বাগত স্বাগত রবে হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত করিয়া প্রবাসী বাঙ্গালী আজ আপনাদের বীণাপাণির বরপুত্রগণের অভ্যর্থনা করিতেছে। আজ আমি ধন্য, আজ মজঃফরপুরপ্রবাসী ধন্য, আজ প্রবাসী বাঙ্গালী ধন্য। আজ আপনাদের সমাগমে মজঃফরপুর সারস্বততীর্থ বলিয়া গণ্য। সরস্বতীর প্রিয়পুত্র সাহিত্যিকগণ! আসুন! এই বৈশালীর রাজনৈতিক লীলাভূমি—অশোকের বিশ্বব্যাপী প্রেমময় ভূমি—পালরাজদিগের শিল্প ও সাহিত্য-সেবিত ধর্ম্মভূমি—রাজর্ষি জনকের আদর্শ রাজ্যের যজ্ঞভূমি—পৌরাণিক ভারত, বৈদিক ভারত, ঐতিহাসিক ভারতের মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড প্রদীপ্ত পুণ্যভূমি এই সদাপূত, ঐতিহ্যচুম্বিত ভূমিতে মাত্র "তৃণানি" বিস্তীর্ণ করিয়া আপনাদিগকে অভ্যর্থনা করিতেছে—প্রবাসের নানা অসুবিধা অভাবের মধ্যে ক্লিষ্ট হইয়াও যে আপনারা এখানে পদার্পণ করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা কৃতার্থ বোধ করিতেছি। আমরা দরিদ্র—প্রকৃত সাহিত্য-সেবার উপচারে অনভ্যস্ত। আমাদের অভ্যর্থনা আপনাদের উপযুক্ত নয়। আমাদের ন্যায় অসাহিত্যিকের নিকট আপনাদের কতই অনাদর, কতই অসুবিধা ও কষ্ট হইতে পারে, আশা করি, আপনাদের স্বভাবসিদ্ধ ঔদার্য্যগুণে আমাদের আবেগপূর্ণ হৃদয়ের কাকুতি মিনতিতে পূর্ণ জানিয়া, আমাদের সকল ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

আর প্রবাসী বন্ধুগণ! আপনারা ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে নানাবিধ ক্লেশ স্বীকার করিয়া বাণীর পদসেবার জন্য আজ এই মণ্ডপে সমবেত হইয়াছেন, ইহা আপনাদের বাগ্বাদিনী বীণাপাণির প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি এবং তাঁহার সেবার জন্য তীব্র অনুরাগেরই পরিচয়। বীণাপুস্তক-রঞ্জিত-হস্তা ভগবতী ভারতীর বীণা সপ্তস্বরা—ভক্তগণ কেহ কোন সুর, কেহ কোন স্বর লইয়া উন্মত্ত। সেই সকল স্বরের ঐকতানিক মিলনই সাহিত্য। ভক্ত যখন সেই মাতৃমন্দিরে পূজার উপকরণ লইয়া উপস্থিত হয়, তখন তাহার বাহ্যসুখ-স্বচ্ছন্দতার প্রতি লক্ষ্য থাকে না, এই কথা জানিয়া আমাদের আয়োজন ক্ষুদ্র জানিয়াও সপ্তস্বরা মাতার পূজা-মণ্ডপে আপনাদিগকে আহ্বান করিতে সাহস করিয়াছি। অতিথি নারায়ণ, বিদুরের ক্ষুদেও নারায়ণ সন্তুষ্ট হইবেন, তাহা আমরা ভক্তির সহিত ও আনন্দের সহিত বলিতে পারি।

বর্ত্তমানকালে বঙ্গসাহিত্য ও বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন সম্বন্ধে সাধারণতঃ যে সকল আলোচনা হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে স্পষ্ট বোধ হয় যে, চিন্তাশীল ও দায়িত্ববোধসম্পন্ন সমাজ-নেতৃগণের মধ্যে অনেকেই বলেন, বাঙ্গালী কিছু বেশী মাত্রায় সাহিত্য ও ললিতকলার চর্চ্চা করিয়াছে। এখন কিছু দিন কাব্য, উপন্যাস, সঙ্গীতচর্চ্চা বন্ধ রাখিয়া ইতিহাস, বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক শিল্পচর্চ্চা করিলে সমাজের ও দেশের কল্যাণ। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই এই কথার অল্পাধিক পরিমাণে সায় দিতেছেন। সাহিত্য ও শিল্প ক্রমশঃ এক প্রকার সৌখীন চিত্তবিনোদনের সামগ্রী বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। বাঙ্গালীর প্রাত্যহিক জীবনের ও ব্যবহারিক জীবনের সহিত সুকুমার সাহিত্য ও শিল্পের যে কোনরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাহা ক্রমশঃই অস্বীকৃত হইতেছিল। এমন কি, বিশেষতঃ প্রবাসী বাঙ্গালীর মধ্যে এ কথা এখন জিজ্ঞাস্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, জাতীয় জীবনে সুকুমার শিল্প ও সাহিত্যের স্থান আছে কি না? একটু ভাবিলেই বুঝা যায় যে, এ অবস্থাটা ক্রমশঃ অস্বাভাবিক হইয়া উঠিতেছে। এত দিন ধরিয়া সভ্য মানব-সমাজমাত্রেই যে ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন, তাহার সহিত ইহার মিল নাই। সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে, সভ্য মানব-সমাজমাত্রেই সাহিত্য ও শিল্প প্রাত্যহিক জীবনের নিত্য সহচর ছিল। সমাজের উপর কাব্য, চিত্র ও সঙ্গীতের প্রভাব প্রবলভাবেই কায করিত। সামাজিক জীবনে উচ্চ আদর্শে প্রতিষ্ঠিত কার্য্যে সাহিত্য ও শিল্পই প্রধান সহায় ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রাচীন গ্রীস, মধ্যযুগের য়ুরোপ এবং বর্ত্তমান যুগের সভ্যতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইবার পূর্ব্বকালীন ভারতবর্ষ, চীন, জাপান প্রভৃতি প্রাচ্যদেশের উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রাচীন গ্রীসে ভাস্কর্য্য শিল্প, নাট্যাভিনয় ও সঙ্গীত আদর্শ পৌর চরিত্র গঠনের প্রধান উপাদানস্বরূপ বিবেচিত হইত। G. Lewes Dickinson. তাঁহার প্রণীত "Greek view of life" নামক গ্রন্থে গ্রীকদিগের সঙ্গীত-চর্চ্চা প্রসঙ্গে গ্রীকসভ্যতার এই বিশেষত্বটুকু লক্ষ্য করিয়াছেন। গ্রীকরা চরিত্রগঠনের দিক দিয়া সঙ্গীত-শাস্ত্রের অনুশীলন করিতেন। বিভিন্ন প্রকার সুর ও mode অর্থাৎ রাগরাগিণী শ্রোতার মনে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে ও শ্রোতার মনে কিরূপ বিভিন্ন ভাবের উদ্রেক করে, তাঁহারা তাহার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। আমাদের দেশেও আবহমান কাল ধরিয়াই সাহিত্য দ্বারা সমাজ-সংস্কার চলিয়া আসিয়াছে। আমাদের দেশে যাত্রা, কথকতা, পাঠ-আবৃত্তি, পাঁচালি, কীর্ত্তন প্রভৃতি নানা উপায়ে সাহিত্যের আদর্শ সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণোক্ত কাহিনী এবং বৌদ্ধ-বিহারাদিতে বুদ্ধদেবের ও জাতকাদির চিত্রাবলী ভারত-সমাজের সর্ব্বোচ্চ আদর্শগুলিকে লোকচক্ষুর সম্মুখে সর্ব্বদা জীবন্ত রাখিয়া দিত। আদর্শ পুত্র, আদর্শ পত্নী, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ পরিবার, আদর্শ রাজা, আদর্শ বণিক, আদর্শ ক্ষত্রিয়, আদর্শ গৃহী, আদর্শ ত্যাগী ও ভক্ত সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের আদর্শগুলিই সাহিত্য ও শিল্পের সাহায্যে সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। ভারতীয় রাজদরবারে কবি, শিল্পী ও পুরাণপাঠক সঙ্গীতাচার্য্যদের স্থান সুনির্দ্দিষ্ট ছিল মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে রাজধর্ম্ম সম্বন্ধে যে উপদে

দিতেছেন, তন্মধ্যে অমাত্যসভা-গঠন প্রসঙ্গে ব্যবস্থা দিতেছেন যে, রাজার অমাত্যদিগের ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্র অমাত্যের পার্শ্বে এক জন করিয়া সূত বা পুরাণপাঠককে স্থান দিতে হইবে। প্রাচীন সভ্যসমাজমাত্রেই সাহিত্যের শক্তি ও শিল্পের শক্তি ব্যক্তিগত ও সামাজিক চরিত্র-গঠনে নিয়োজিত হইয়া আসিয়াছে এবং সমাজনেতৃগণ এই সমাজ-ব্যবস্থার সুপরিচালনকার্য্যে প্রধান সহায়স্বরূপ অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন।

আধুনিক কালেও দেখুন, সমাজচিত্র দ্বারা আমাদের সামাজিক ব্যবস্থার অনেক ভালমন্দ সহজেই আমাদের চোখে পড়ে—যেমন, "বাল্য-বিবাহ।" বাল্যবিবাহ হিন্দু-সমাজের মজ্জাগত। দ্বিজেন্দ্রলাল "বঙ্গনারী" নাটকে বাল্যবিবাহের ভালমন্দ দুইটি দিকই প্রদর্শন করিয়াছেন। তার পর যে পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে অনেক বঙ্গযুবকের মস্তক এরূপ বিকৃত হইয়াছে যে, "বিবাহ-বিভ্রাটের" "এন, সরকার" খুব অতিরঞ্জিত চিত্র বলিয়া মনে হয় না এবং বরপণ সম্বন্ধেও গিরিশচন্দ্র ঘোষের "বলিদান", শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের অরক্ষণীয়া, শ্রীমতী নিরুপমা দেবীর অন্নপূর্ণার মন্দির প্রভৃতি আমাদের যথেষ্ট চিত্ত আকর্ষণ করে। আবার স্বামী কর্ত্তৃক অনাদৃতা সতী স্ত্রীর মনোভাব শ্রীমতী নিরুপমা দেবীর 'দিদি,' ইন্দিরা দেবীর "স্পর্শমণি", শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর 'পোষ্যপুত্র' ও 'মা' ইত্যাদিতেও যত সহজে আমাদের চিত্ত স্পর্শ করে, তেমন প্রবন্ধের দ্বারা হয় না। আবার ধর্ম্মসম্পর্ক-শূন্য শিক্ষা আমাদের স্ত্রীজাতির মধ্যে একটি উচ্ছৃঙ্খল স্বতন্ত্রপ্রিয়তা জন্মিয়া যে সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সুখশান্তি নষ্ট করিয়া দিতে পারে, অমৃতলালের বঙ্গনারী ইংরাজী শিক্ষা ও স্বাধীনতা লাভের ফলে স্ত্রীপুরুষ সম্বন্ধে বিপর্য্যয় কল্পনা করিয়া কৌতুকের "তাজ্জব ব্যাপার" সৃষ্টি করিয়াছেন যে, তাহাও সে সময় খুব অতিরঞ্জিত মনে হয় নাই। বিশেষতঃ স্বনামখ্যাতা শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর "মা" উপন্যাস পাঠ করিয়া এই সে দিনও জনৈক অপরিচিত ভদ্রলোক সুদূর রঙ্গপুর হইতে তাঁহাকে লিখিয়াছেন যে, তিনি তাঁর "মা" পড়িয়া তাঁহার দশবৎসরের পরিত্যক্তা বিরহ-কাতরা গৃহলক্ষ্মীকে গৃহে ফিরাইয়া আনিয়াছেন, তাঁহার পত্রের মর্ম্ম এইরূপ :—

"অর্থের গরমে অমানুষিক কার্য্যে রত ছিলাম; আপনার "মা" পড়িয়া আমার জ্ঞান-চক্ষু ফুটিয়াছে—আমি আবার পথে ফিরিয়া আসিয়াছি। আপনার "মা" উপন্যাসের নায়ক অরবিন্দ পিতৃবাক্যে স্ত্রী ত্যাগ করিয়াছিলেন—আমি নিজের খেয়ালে দশবৎসরকাল স্ত্রীত্যাগ করিয়াছিলাম—একেবারে বিনা কারণেই; আপনার "মা" পড়িয়া আবার ঘরের লক্ষ্মীকে ঘরে ফিরাইয়া আনিয়াছি।"

তিনি দীর্ঘপত্রের পরিশেষে আরও লিখিয়াছেন যে, তবে আপনার "মা" পড়িয়া যে আমার মনুষ্যত্ব লাভ ঘটিয়াছে, এ জন্য আপনার শ্রীচরণে সংখ্যাতীত প্রণিপাত জানাইতেছি।"

শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন সিংহ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট—সম্মিলনীর প্রধান কর্ম্ম-সচিব ও সম্পাদক

তাহা হইলে কথা-সাহিত্যে সমাজসংস্কার কি প্রমাণিত হইতেছে না? ইহার অপেক্ষা আর বড় প্রমাণ কি আছে?

সমাজের ক্ষেত্র হইতে শিল্প-সাহিত্য যেমন জীবনী-রস সংগ্রহ করে, অপর দিকে তেমনই সমাজের পুনরুজ্জীবন কার্য্যে ও শিল্প-সাহিত্যে সহায়তা করিতে পারে। ইহারা দেশের শিক্ষিত সমাজের সুপ্ত সমাজ-বোধকে জাগ্রত করিয়া দিউক। এই ব্যবসাদারী যুগে ক্ষীণপ্রাণ সমাজ-শরীরে প্রাণ-শক্তি সঞ্চার করিয়া ইহাকে পুনরায় সবল করিয়া দিউক। যেন আমরা শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলে মিলিয়া সাংসারিক জীবনে ভাবের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারি। সামাজিক ভাবের মধ্যে আপন ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ডুবাইয়া দিয়া যেন আবার সামাজিক সাহিত্য ও শিল্পের রসাস্বাদন করিতে সমর্থ হই।

দেশের যাহা কিছু ভাল, তাহার যত্ন করা, তাহার উন্নতির চেষ্টা করা, তাহার বিশুদ্ধতা রক্ষা করা, অপর কোন ব্যক্তি সেই বিশুদ্ধতাকে নষ্ট করিতে চেষ্টা করিলে তাহার প্রতিবাদ ও প্রতীকার করা এবং দেশের যাহা কিছু মন্দ, তাহা প্রাকৃতিকই হউক বা সামাজিকই হউক, তাহা ভাল করিতে চেষ্টা করা বা স্থানবিশেষে তাহা সমূলে দূর করিতে চেষ্টা করাই প্রকৃত দেশানুরাগ। প্রত্যেক দেশের লোক উত্তরাধিকারসূত্রে দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা, সমাজগত আচার-ব্যবহার প্রভৃতি যে সকল বস্তু লাভ করে, দেশের ভাষা তাহার অন্যতম। সুতরাং নিজ নিজ দেশের ভাষার প্রতি অনুরাগ, ভাষার শ্রীবৃদ্ধিসাধন ও বিশুদ্ধতা-সংরক্ষণ, ভাষার যে যে অঙ্গ দুর্ব্বল, তাহা সবল করিবার চেষ্টা করা, যে অঙ্গ নাই, তাহা পূরণ করা, শিক্ষিত লোক অসাবধানে বা ইচ্ছাপূর্ব্বক যখন অশুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করেন, যাহা সাধারণে অনুকরণ করিতে পারে, তখন তাহার প্রতিবাদ করা প্রত্যেক শিক্ষিত ভদ্রলোকের কর্ত্তব্য। বাঙ্গালীমাত্রেরই এই সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত হওয়া উচিত নহে।

প্রবাসী ভ্রাতৃগণ অনেকেই এ কথার সত্যতা বোধ হয় অনুভব করেন—ছেলেকে যখন "কেমন আছ" বুঝাইতে হইলে "কেমন ছিলি" না বলিলে হয় না, আবার ছেলে ফিরিয়া আসিয়া যখন বলে, "বাবা, বাঙ্গালা পড়ার ব্যবস্থা স্কুলে নেই", তখন এই সত্য সকলেই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেন বোধ হয়। তবে আমাদের অবস্থাতে আমাদেরই বা দোষ কি? মাতৃ-দুগ্ধ-পালিত শিশু ও Horlick প্রভৃতি পায়ী শিশুতে প্রভেদ আছে। শিক্ষার প্রথম অবস্থায় যদি বাঙ্গালা না শিখিয়া অন্য ভাষা শিখিবার ও বলিবার জন্য আমরা সকলেই প্রাণপণ প্রয়াসী হই, তাহা হইলে শিখিবার শক্তি কত অপচয় হয়? আমাদের শিক্ষায় এখানে একটি মৌলিক দোষ। প্রবাসী বাঙ্গালীর এই জন্য একনিষ্ঠতা লাভ করিবার আশা স্বল্পমাত্র। নিজের দেশের ভাষার অর্থ যতখানি বুঝাইবার, পরের ভাষাতে তাহা বুঝাইতে পারা যায় না। বিমাতা মাতা হইয়াও মাতা নহেন।

সাহিত্য-সম্মিলন কেবলমাত্র কতকগুলি সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তির একত্র সমাবেশ এবং পরস্পর পরিচয় এবং তদ্দ্বারা আনন্দবর্দ্ধনই ইহার উদ্দেশ্য, এরূপ মনে করিলে সাহিত্য-সম্মিলনকে বড় ছোট করা হয়। বঙ্গভাষাকে নানা উপায়ে পরিপুষ্ট এবং বর্দ্ধিত করিয়া ভাষার এবং বঙ্গ-সাহিত্যের উন্নতিকল্পেই বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু কলিকাতায় বসিয়া জনকতক মাত্র সাহিত্য-অনুরাগী ব্যক্তির পক্ষে সে উন্নতি সম্ভব নহে, সেই জন্যই প্রতিবৎসর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সাহিত্য-সম্মিলনের আয়োজন হইতেছে। এই বিষয়ে সর্ব্বপ্রদেশস্থ বাঙ্গালীরা যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। বেণারস, এলাহাবাদ, দিল্লী, ভাগলপুর, বঙ্গবাসীমাত্রেরই—যাঁহারা ঘটনাচক্রে সাহিত্যজগতে অপরিচিত অথচ প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যের উন্নতি কামনা করেন, তাঁহাদিগকে সম্মিলনের উপযুক্তরূপ স্থান প্রদর্শন করিতে হইবে।

প্রত্যেক বাঙ্গালীকে তাহার মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ জাগাইয়া দিবার জন্ত তাহার রুদ্ধদ্বারে উপস্থিত হইয়া আঘাত করিতে হইবে। যথন এমন দিন আসিবে যে, প্রবাসী বাঙ্গালীর মায়ের পূজার মঙ্গল-শঙ্খ ভক্ত সাধকগণকে আহ্বান করিবে এবং একই সময়ে নগরে নগরে সকল বাঙ্গালীই একমনে নানাবিধ পূজাসম্ভার সহ সমবেত হইবেন, তথন মনে করিব, বাঙ্গালী প্রকৃতপক্ষেই জাগিয়া উঠিয়াছে। ভগবতী

বঙ্গীয়-বিহার সাহিত্য-সম্মিলন

মূল সভাপতি, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিদ্বয়—শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ চক্রবর্ত্তী এবং যতীন্দ্রকুমার রায় কমিশনার ও সম্পাদক শ্রীমনোরঞ্জন সিংহ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও সম্পাদক, শ্রীযুক্ত ভূপতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীহরিসাধন ভাদুড়ী সহকারী সম্পাদক ও প্রতিনিধি ও সদস্যবর্গ

পাটনা সকলেই পথ দেখাইয়াছেন। আমরা সর্ব্বদাই নিজ নিজ বিষয়-কর্ম্মে এতই বিব্রত যে, সাহিত্য-সেবানুরাগ আমাদের হৃদয়ে স্থান পায় না এবং যাঁহারা ভগবতী ভারতীর সেবানুরক্ত, তাঁহাদিগেরও উপযুক্তরূপ সুযোগ ঘটিয়া উঠে না। বাঙ্গালার বাহিরেও বাঙ্গালীর মধ্যে কত নীরব সাহিত্যিক অজ্ঞাতভাবে কাল কাটাইতেছেন, যাঁহাদিগের বীণা একটু আঘাতপ্রাপ্ত হইলেই মুখরিত হইয়া উঠিতে পারে; অতীত গৌরবের কতই না পুঞ্জীকৃত স্মৃতিচিহ্ন নানা স্থানে নিহিত রহিয়াছে, যাহা হইতে বহু ঘটনাবলীর প্রকৃত ইতিহাস উপাদান সংগ্রহ করা যাইতে পারে; কত মূল্যবান্ সামগ্রী নানা স্থানে ছড়াইয়া রহিয়াছে, যাহাকে একত্র করিয়া কেন্দ্রীভূত করিলে ভাষা এবং বঙ্গসাহিত্যকে নানা অলঙ্কারে সুশোভিত করা যাইতে পারে। সেই জন্ত সকল প্রদেশের ভারতীর পূর্ব্বাশিস্ আমরা লাভ করিয়াছি। এই উদ্দেশ্যে এই সাহিত্য-সম্মিলন। যাহার উদ্দেশ্য লোকশিক্ষা, তাহার দ্বার অবারিত থাকিবে, ক্ষুদ্রকে তাহাতে স্থান দান দিতে হইবে। এরূপ না করিলে প্রবাসী বাঙ্গালীর সাধনা চিরকাল একটি ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে, কখনও সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি হইবে না।

আমরা অন্তরের সহিত কামনা করি, সুধী-সমাজে প্রবাসী বাঙ্গালীর সাহিত্যোদ্যম মজঃফরপুরনিবাসী বাঙ্গালী কর্ত্তৃক দৃষ্টান্তস্বরূপ পরিগণিত হউক। সকল বাঙ্গালী মজঃফরপুরবাসী সাহিত্যিকগণের এই সম্মিলনে আনন্দের সহিত যোগদান করিয়াছে। বিদ্যালয়ের ছাত্র হইতে আরম্ভ করিয়া নানা-বিষয়ে লিপ্ত বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই এক নবীন উৎসাহের সহিত সাহিত্যিকগণের অভ্যর্থনার জন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম

করিতেছেন। ভগবৎসমীপে প্রার্থনা করি, আমাদিগের এই উদ্যম সফলতা লাভ করুক।

রাজসম্মানে, জনসাধারণের পরিচালনে, বঙ্গ-মাতনে যিনি শিক্ষিত সমাজে অনন্ত পুষ্পবৃষ্টি করিয়া আসিয়াছেন, যিনি নটকুল-ধুরন্ধর, সেই সোম্যমূর্ত্তি, চিরপ্রবীণ, চিরনবীন রসরাজ আহুত, আজ আমাদের সম্মিলনকে অমৃত সেচন করিবেন। তাঁহার নায়কত্বে এই সম্মিলনে উপস্থিত নানা স্থানের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকগণের নিকট সকলে বহু জ্ঞান লাভ করিবার আশায় উদগ্রীব হইয়া রহিয়াছে। ভগবতী ভারতী আমাদের দীর্ঘকাল পোষিত আশাকে ফলবতী করুন। আমাদের এই সম্মিলন ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্যিকবর্গের মধ্যে প্রীতির বন্ধন দৃঢ়তর করিয়া মাতৃভাষার সাধনারূপ একই মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া তাঁহাদিগের সমুদায় চেষ্টা, তাঁহাদিগের সর্ব্বপ্রকার সাহিত্যোদ্যম উন্নতির পথে লইয়া যাউক, ইহাই ভগবৎসমীপে আমাদিগের আন্তরিক প্রার্থনা।

শ্রীমনোরঞ্জন সিংহ।

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব।

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব শকাব্দ ১৪০৭ শক, ফাল্গুন মাস, পূর্ণিমা তিথি, সন্ধ্যা, চন্দ্রগ্রহণসময়ে। এ বিষয়ে কোন গ্রন্থেই মতভেদ নাই। মতভেদ কেবল তারিখ ও বার লইয়া। যথা:—

(১) প্রভুপাদ শ্যামলাল গোস্বামিকৃত "শ্রীগৌরসুন্দর" গ্রন্থে (১২ পত্রাঙ্কে) লিখিত আছে—শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাব ১৪০৭ শক, ২০শে ফাল্গুন শুক্রবার।

(২) "শ্রীশ্রীনিত্যানন্দচরিত গ্রন্থে" (২য় খণ্ড ২২ পত্রাঙ্কে) আছে—১৪০৭ শক, ১৯শে ফাল্গুন, শুক্রবার প্রভুর জন্ম।

(৩) স্বর্গীয় হারাধন দত্ত মহাশয়ের অভিমত (পুরাতন "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া" পত্রিকাতে) সন ৮৯৩ সাল, ২০শে ফাল্গুন, শনিবার।

(৪) মহামহোপাধ্যায় প্রভুপাদ ভাগবতকুমার শাস্ত্রী "বংশীশিক্ষা" গ্রন্থের ভূমিকাতে লিখিয়াছেন—ইংরাজী ১৪৮৬ খৃঃ অঃ ১৪ই ফেব্রুয়ারী প্রভুর আবির্ভাব।

(৫) রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার ইংরাজী গ্রন্থে লিখিয়াছেন:—ইং ১৪৮৬ খৃঃ অঃ ১৮ই ফেব্রুয়ারী।

(৬) "প্রবাসী" পত্রিকাতে (১৩২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৭২ পৃঃ) শ্রীযুক্ত অমৃতলাল শীল মহাশয়ের প্রবন্ধে আছে:—

প্রভুর জন্মশকাব্দ ১৪০৭, ফাল্গুন ২৫শে এবং ইংরাজী ১৪৮৬ খৃঃ অঃ ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে।

(৭) "মানসী ও মর্ম্মবাণী" পত্রে আছে (১০ম বর্ষ ২য়, ৩৩৪ পৃঃ) ইং ১৪৮৬ খৃঃ অঃ ১৯শে মার্চ্চ তারিখে।

(৮) "শ্রীচৈতন্যসঙ্গীতা" নামক একখানি প্রাচীন গ্রন্থে দৃষ্ট হয়:—

"ফাল্গুনের দ্বাবিংশতি, পৌর্ণমাসী শুভতিথি
তারা পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্র।"

অর্থাৎ ২২শে ফাল্গুন প্রভুর আবির্ভাব।

(৯) "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ পত্রিকায়" শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পিতৃব্যবংশীয় প্রভুপাদ শ্রীরামদয়াল মিশ্র মহোদয়ের প্রবন্ধে আছে:—

"শকনরপতেরতীতাব্দ ১৪০৭ ফাল্গুনস্য ত্রয়োবিংশতিবাসরে সিংহলগ্নে রাহুগ্রস্তনিশাকরে উত্তরফল্গুনী সিংহরাশৌ চন্দ্রে শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনপুরন্দরঃ শচীমন্দিরমাবিরাসীৎ।" অর্থাৎ ২৩শে ফাল্গুন।

(১০) প্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর মতে ঐ ২৩শে ফাল্গুন তারিখই দৃষ্ট হয়। অধিকন্তু তাঁহার মতে শনিবারে প্রভুর আবির্ভাব।

(১১) 'শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবক' পত্রিকায় (১৩২৯ ভাদ্র আশ্বিন ২৩২ পৃঃ) শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ দত্ত মহাশয় "শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মদিন" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহার মতে প্রভুর আবির্ভাব তারিখ:—

১৪০৭ শক, ২৩শে ফাল্গুন, শনিবার, মহম্মদীয় ৮৯০ হিজরী এবং ইংরাজী জুলিয়ান ক্যালেণ্ডারমতে (যাহা বর্ত্তমানে রুসিয়ারাজ্যে প্রচলিত) ১৪৮৬ খৃঃ অঃ ১৮ ফেব্রুয়ারী এবং গ্রেগরিয়ান ক্যালেণ্ডারমতে (যাহা বর্ত্তমানে সমগ্র খৃষ্টীয়ান জগতে ও ভারতে প্রচলিত) ১৪৮৬ খৃঃ অঃ, ২৭ ফেব্রুয়ারী ইত্যাদি।

তাহা হইলে প্রভুর জন্ম তারিখ সম্বন্ধে মতভেদ দাঁড়াইয়াছে—ফাল্গুনমাসের ১৯শে, ২০শে, ২২শে, ২৩শে ও ২৫শে।

ইংরাজী তারিখেও ভিন্ন ভিন্ন মত, যথা—ফেব্রুয়ারী ১৪ই, ১৮ই, ১৯শে ও ২৭শে ("মানসী ও মর্ম্মবাণীতে" ১৯শে মার্চ্চ লিখিত আছে, উহা হইতেই পারে না)।

বারসম্বন্ধে কাহারও মতে শুক্রবার এবং কাহারও মতে শনিবার। ইহা ভিন্ন মহাপ্রভুর জন্মপত্রিকার রাশি-চক্র যে যে স্থানে লিখিত আছে, তাহাতেও একের সহিত অন্যের ঐক্য নাই।

(১) "ভারতবর্ষ" (১৩২২ শ্রাবণ ৩২৮ পত্রাঙ্কে) প্রভুর রাশিচক্র এইরূপ আছে:—

চন্দ্র সিংহ— ২১
বুধ মীন ৬
মঙ্গল—৭
শনি বিছা— ২১
য়ুরেনস ধনু ১৫

(২) "শ্রীগৌরাঙ্গসেবক পত্রিকায়" (১৩২৯ ভাদ্র আশ্বিন ২৩২ পৃঃ) কিন্তু এইরূপ আছে:—

৭	১১	১৮
১৫	১৬	• •
৩১	•	•
•	•	২৩

কালনা সংস্করণ "শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের" ৬৫ পত্রাঙ্কে এবং ৪১০ গৌরাঙ্গ অব্দের "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকাতেও" ঐরূপ রাশিচক্র আছে।

ভারতগৌরব শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের সঠিক তারিখ ও বার নির্ণীত হওয়া কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞ বুধমণ্ডলীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্ট।

বিজিতা

"মামাবাবু!"

উচ্ছ্বসিত আহ্বানে নগেন্দ্রনাথ মুখ ফিরাইয়া চাহিলেন। দ্বারদেশে হাস্যাননা শেফালী—তাঁহার পরম স্নেহপাত্রী, আবদারিণী ভাগিনেয়ী দাঁড়াইয়া। তাহার আননে, বেশ-ভূষায় দীর্ঘপর্য্যটনের ক্লান্তি ও বিশৃঙ্খলার চিহ্ন দেদীপ্যমান। প্রসন্নহাস্য-রেখা নগেন্দ্রনাথের আননে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

"এই যে বুড়ী, তুই এসেছিস্! বেশ, বেশ! জামাই বাবাজী এসেছেন ত?"

মাতুলের পদধূলি লইতে লইতে শেফালী ঘাড় নাড়িয়া জানাইয়া দিল, তাহার স্বামীও আসিয়াছেন।

তখন আসন্ন বিবাহের উৎসব-কোলাহলে বাড়ীটি মুখরিত হইতেছিল। নগেন্দ্রনাথ কিছু অর্থ বাহির করিবার জন্য শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন। একমাত্র কন্যার বিবাহে নানা স্থান হইতে আত্মীয়-স্বজন সকলেই আসিয়াছিলেন, শুধু শেফালী শ্বশুরালয় হইতে তখনও আসিয়া পৌঁছে নাই; এ জন্য নগেন্দ্রনাথ সত্যই ব্যাকুলভাবে তাহাদের আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। শেফালী তাঁহার সহোদরার একমাত্র সন্তান। উহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি, প্রতিভা এবং নানাবিধ গুণের পরিচয় পাইয়া বাল্যাবধি নগেন্দ্রনাথ তাহাকে আপনার সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিতেন। প্রকৃতই সে মাতুলের স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের অধিকাংশ অধিকার করিয়াছিল।

"যাও মা, কাপড়-চোপড় ছাড় গে। বেলা গড়িয়ে গেছে; সন্ধ্যার পরই বর আস্‌বে। আমি যাই, যতীশকে বাড়ীর মধ্যে পাঠিয়ে দিই।"

"যাচ্ছি; কিন্তু আপনার সঙ্গে আমার ঝগড়া আছে, মামাবাবু!"

নগেন্দ্রনাথ শিক্ষিতা, প্রগল্‌ভা ভাগিনেয়ীর দিকে চাহিয়া মৃদুহাস্য করিলেন।

"আচ্ছা, পাগ্‌লী, এখন একটু ঠাণ্ডা হয়ে নে, তার পর ঝগড়া করিস্।"

"না, মামাবাবু, আগে ঝগড়া, তার পর অন্য কায।"

শেফালীর কল-কণ্ঠের ঝঙ্কারে সমগ্র কক্ষটি মুখরিত হইয়া উঠিল। তাহার মাতুলানী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

নগেন্দ্রনাথ পত্নীর দিকে ফিরিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ওগো, তোমার শেফালী ধুলা-পায়েই আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে চায়।"

"না, মামীমা। সত্যি দেখুন, মামাবাবুর কি অন্যায়। বেছে বেছে এই পাত্রটি অমন চমৎকার মেয়ের জন্য পছন্দ করলেন। কেন, দেশে আর কি পাত্র ছিল না?"

শেফালীর অভিযোগ শুনিয়া স্বামী ও স্ত্রী পরস্পর দৃষ্টিবিনিময় করিলেন।

মাতুলানী বলিলেন, "তা আর এখন উপায় কি বাছা? যা হবার, হয়ে গেছে। এখন সে আলোচনার ফল নেই।"

শেফালী থামিল না; সে বলিল, "আচ্ছা মামীমা, আপনি মত দিলেন কি ক'রে? মামাবাবু সে সময় এ দেশে ছিলেন না, তিনি সব কথা জান্‌তেন না। কিন্তু আপনি ত সব শুনেছিলেন? সব জেনে-শুনে আপনি সোনার মেয়েটাকে জলে ফেলে দিতে রাজী হলেন কেন?"

নগেন্দ্রনাথের প্রসন্ন আননে মৃদুহাস্যের রেখা ক্রমেই

উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিতেছিল। তিনি নীরবে শেফালীর আরক্ত আননে ক্রোধ ও বিরক্তির চপল নৃত্য দেখিতেছিলেন।

মাতুলানী শেফালীর চূর্ণালকগুচ্ছ ধীরে ধীরে সরাইয়া দিয়া বলিলেন, "তোমার যোগ্য হয় নি ব'লে এ পাত্রটিও ত ফেলবার মত নয়, মা। ঘর-বর সবই ভাল, শুধু পাশ করে নি। তা তোমার বোন্‌টি ত তোমার মত আই, এ পাশ করে নি। ঘরেই সামান্য পড়া-শুনা করেছে। ওর ভাগ্যে এর চেয়ে ভাল বর আর জুট্‌লো কৈ?"

"না, মামীমা, ও সব বাজে কথা। মামাবাবু নিজে পণ্ডিত হয়ে, অমন মূর্খ পাত্রে রমার মত মেয়ে দেওয়া উচিত হয় নি। ও স্কুলে পড়ে নি বটে; কিন্তু লেখা-পড়া, শিল্প-কর্ম্ম, গান-বাজনা ত কম জানে না। আর অমন চমৎকার রূপ!"

শেফালীর উত্তেজনা দেখিয়া নগেন্দ্রনাথ স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "ঝগড়া ত হ'ল; এখন কাপড়-চোপড় ছেড়ে ফেল গে। তোমার মত সকল রকমে শিক্ষিতা মেয়ের যোগ্য বর অবশ্য শিশির নয়; কিন্তু রমার পক্ষে নেহাৎ বে-মানান হয় নি, মা। তার পর আর ক' ঘণ্টা বাদে বিয়ের লগ্ন, এখন এ আলোচনা ক'রে ফল ত কিছু হবে না, বুড়ী!"

শেফালী তাহা বুঝিল; সুতরাং অপ্রসন্নমনে সে কক্ষান্তরে চলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে নগেন্দ্রনাথের পত্নীও তাহার অনুবর্ত্তিনী হইলেন।

নগেন্দ্রনাথ কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন বাহিরে অপরাহ্নের আলোক সম্মুখস্থ আম্রবৃক্ষের শীর্ষে বিদায়ের অভিনয় করিতেছিল। নিম্নে আত্মীয় স্বজনের কর্ম্ম-কোলাহল বাতাসে ভর করিয়া উঠিতেছিল।

সত্যই কি তিনি ভুল করিয়াছেন? শিশিরচন্দ্র প্রবেশিকা পর্য্যন্ত অগ্রসর হয় নাই, সে কথা সত্য। মহাত্মা গন্ধীর অসহযোগ মন্ত্র যখন নিদ্রামগ্ন আসমুদ্র হিমাচলের জড়দেহে চৈতন্যের বিদ্যুৎস্পর্শ অনুভূত করাইয়া সমগ্র দেশকে মাতাইয়া তুলিয়াছিল, সেই সময় কিশোর শিশির বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে অসহযোগ করিয়া কর্ম্ম-সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিল। বাঙ্গালা—ভাবপ্রবণ বাঙ্গালী জাতি তখন পরিণাম বিষয়ে উদাসীন হইয়া সমগ্র দেশের সম্মুখে যে আদর্শ স্থাপন করিয়াছিল, ইতিহাস তাহার স্মৃতি মুছিয়া ফেলিতে পারিবে না। তরুণ দলের সঙ্গে, পিতার আদরের দুলাল—সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর অঙ্কে লালিত শিশির—হাস্যমুখে সে দিন কারা-কক্ষের শত লাঞ্ছনাকে বরণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল। সে দিন তাহার পিতা, মাতা, পিতামহ তাহার জন্য আনন্দের অশ্রুই বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন।

সেই দিন হইতে—দলের অনেকেই আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ পাতাইলেও—শিশির আর সে দিকে দৃষ্টি ফিরায় নাই। তাহার পিতাও সে জন্য মনঃক্ষুণ্ণ হয়েন নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিরোপা না পাইলে দেবী ভারতীর আরাধনা হয় না, ইহা দেশবাসীর সংস্কার হইলেও বোধ হয়, শিশিরের শিক্ষিত ধনী পিতা তাহা বিশ্বাস করিতেন না; সম্ভবতঃ শিশিরও পিতার মনোবৃত্তির অধিকারী হইয়া থাকিবে।

কিন্তু এই ত্রুটিবশতঃই ভাগিনেয়ীর সহিত শিশিরের সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, পরে নগেন্দ্রনাথ তাহা শুনিয়াছিলেন। তিনি তখন ব্যবসায় উপলক্ষে ব্রহ্মদেশে পর্য্যটন করিতেছিলেন। তিনিও শুনিয়াছিলেন যে, শেফালীর পিতৃভবনের সম্পর্কিত যে সকল উচ্চশিক্ষিত তরুণ ও প্রবীণ ব্যক্তি পাত্র দেখিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সর্ব্বাংশে প্রশংসনীয়া শেফালীর পক্ষে শিশির সম্পূর্ণ অযোগ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। ধনী পিতার, সুগঠিত বলিষ্ঠ-দেহ সুশ্রী সন্তান হইলেও সে মূর্খ এবং অত্যন্ত রক্ষণশীল। আধুনিকতার কোনও গুণই না কি তাহার নাই। বিশেষতঃ শেফালী মূর্খ পাত্রকে কোনও মতেই স্বামিত্বে বরণ করিতে পারে না, এমন কথাও রটিয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের চাপরাশের মূল্য বর্ত্তমান যুগে অর্থনীতির দিক্ দিয়া যত সামান্যই হউক না কেন, তাহার যে একটা মর্য্যাদা আছে, ইহা অস্বীকার করা চলে না। কাযেই শেফালীর তরফ হইতে শিশির উপেক্ষিত হইয়াছিল।

সকল কথা পরিশেষে জানিয়া শুনিয়াও, সতীর্থের এই চাপরাশবিহীন, রক্ষণশীল মতানুবর্ত্তী পুত্রের হস্তে নগেন্দ্রনাথ কন্যা-সম্প্রদান করিতেছেন! তাঁহার ভগিনীপতি ও ভগিনী আপত্তি তুলিয়াছিলেন; ভাগিনেয়ী তাঁহার মুখের উপর এইমাত্র তাহার অভিমত দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত করিয়া গেল। একমাত্র কন্যা রমাকে—যাহাকে তিনি বুকের রক্ত দিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন, নিজের মনের মত করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন, জাতীয় ভাবধারার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া,

অশনে-বসনে, শিক্ষায়-দীক্ষায় যাহাকে বাঙ্গালার কন্যারূপে গড়িয়া তুলিয়াছেন, সত্যই কি তিনি সেই সংযতভাষিণী, বুদ্ধিমতী, গুণবতী কন্যাকে অপাত্রে অর্পণ করিতেছেন ?

নীল আকাশের বক্ষোদেশে ত একটিও কৃষ্ণ চিহ্ন দেখা যাইতেছে না ! অস্তগামী তপনের মুখে অসন্তোষের ভ্রূকুটী ত নাই !

নগেন্দ্রনাথ যুক্তকর উর্দ্ধে তুলিয়া মুহূর্ত্ত নিমীলিত-নেত্রে কি চিন্তা করিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

২

বিদ্যুদালোকদীপ্ত, সুসজ্জিত, প্রশস্ত কক্ষমধ্যে সুন্দরী তরুণীর দল সমবেত হইয়াছিল। তাহাদের বিচিত্র বেশের বাহারে, অলঙ্কারের নিক্কণে, কলকণ্ঠের ঝঙ্কারে বাসর জমিয়া উঠিয়াছিল। বরের সহিত যে সকল মহিলার অন্যবিধ সম্পর্ক, নারীজনোচিত কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারাও গা-ঢাকা দিয়া এ-পাশে ও-পাশে উঁকি দিতেছিলেন। বাসরে আজ শেফালীর বিচিত্র কণ্ঠের অপূর্ব্ব সঙ্গীত শ্রবণের লোভ কেহই সংবরণ করিতে পারেন নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতীছাত্রী বলিয়া তাহার যতটুকু সুখ্যাতি রটিয়াছিল, তাহার অনেক অধিক যশঃ তাহার কিন্নরীদুর্লভ কণ্ঠস্বরের জন্য চারিদিকে প্রচারিত হইয়াছিল।

প্রথম হইতেই শেফালী তাহার ভগিনী রমার অদৃষ্টের কথা ভাবিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিল। সে প্রকৃতই রমাকে অত্যন্ত ভালবাসিত, তাহার নম্র, মধুর প্রকৃতির ভক্ত ছিল। আত্মশক্তির উপর শেফালীর অত্যধিক প্রত্যয় ছিল—সে আপনাকে কাহারও অপেক্ষা ছোট মনে করিত না ; কিন্তু রমার কাছে তাহার আত্মগর্ব্ব যেন আপনা হইতেই মাধুর্য্য-রসে অভিষিক্ত হইয়া নমনীয় আকার ধারণ করিত। তাহার চরিত্রগত স্বাধীনতা, দ্বিধা ও কুণ্ঠাবিরহিত স্পষ্টবাদিতার জন্য সকলেই তাহাকে ভয় করিত, এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করিত ; কিন্তু রমা তাহার অপেক্ষা কয়েক মাসের ছোট হইলেও, তাহার সান্নিধ্যে থাকিলে শেফালী যেন আর এক জগতের প্রাণী বলিয়া বোধ হইত। রমার সদানন্দ প্রকৃতির সহিত তাহার হাস্যচপল চরিত্রের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য থাকিলেও, তাহার মধুর গাম্ভীর্য্য শেফালীতে ছিল না। এ জন্য শেফালী মনে-প্রাণে তাহাকে শ্রদ্ধা করিত। শিক্ষায় ও সঙ্গীতে সে শ্রেষ্ঠা হইলেও শিল্প ও গৃহস্থালীর কার্য্যে রমার অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠত্ব সে স্বীকার করিত। এ হেন গুণশালিনী ভগিনীর অযোগ্য স্বামিনির্ব্বাচনব্যাপারে প্রকৃতই সে মর্ম্মাহতা হইয়াছিল এবং সমগ্র অন্তর দিয়া সে বিবাহের আনুষঙ্গিক কার্য্যে যোগ দিতে পারে নাই। এমন কি, স্ত্রী-আচারের সময় বিরক্তিবশতঃ সে বরের সান্নিধ্যকে পর্য্যন্ত এড়াইয়া চলিয়াছিল।

বহির্ব্বাটীতে নিমন্ত্রিত অভ্যাগতের কলরব তখন থামিয়া গিয়া বাসর-গৃহকে উৎসবমুখর করিয়া তুলিয়াছিল। অনুরুদ্ধ হইয়া শেফালী সগর্ব্ব চরণক্ষেপে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। নিমন্ত্রিতা সুন্দরীর দল তাহার গান শুনিবার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। রত্নাভরণা, চেলাঞ্চলা শেফালী বাসরকক্ষে প্রবেশ করিয়া সমালোচকের তীক্ষ্ণদৃষ্টিপাতে বরকে নিরীক্ষণ করিল। এতক্ষণ সত্যই সে বিরাগবশে ভগিনীপতির মূর্ত্তি লক্ষ্য করে নাই। এক জন তরুণী শেফালীর পরিচয় শিশিরকে বুঝাইয়া দিল। বর মুখ তুলিয়া প্রশংসমান দৃষ্টিতে শেফালীর দিকে চাহিল।

বাহিরের রূপ অনেক সময়েই অন্তরের সৌন্দর্য্যের দ্যোতক নহে, ইহা শেফালী নানা গ্রন্থে পড়িয়াছিল, সুতরাং শিশিরের সুগঠিত অঙ্গসৌষ্ঠব এবং দিব্য কান্তি তাহার মনকে অনুকূলভাবে আকৃষ্ট করিল না। তাহার স্বামী রূপবান্ নহে ; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি এবং অজস্র প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছেন, এখন কোন মফঃস্বল কলেজের অধ্যাপক। তাঁহার কাছে শিশিরের মূল্য কতটুকু ! না, মাতুলের এই নির্ব্বাচন সে কখনও ক্ষমা করিতে পারিবে না।

চারিদিক্ হইতে শেফালীকে গান গাহিবার জন্য তরুণীর দল ধরিয়া বসিল। হাঁ, সে গান গাহিবে। এই শিশিরের পক্ষ হইতে ছয় মাস পূর্ব্বে যে প্রস্তাব আসিয়াছিল, তাহা যে কিরূপ অশোভন এবং বামনের হাত বাড়াইয়া আকাশের চাঁদ ধরিবার মত উপহাসের বিষয়, আজ প্রত্যক্ষ পরিচয় দিয়া সে শিশিরকে তাহা বুঝাইয়া দিবে। এখন শিশির তাহার পরম স্নেহপাত্রী ভগিনী রমার স্বামী, সে হিসাবে তাহাকে আঘাত করা তাহার কর্ত্তব্য নহে ; কিন্তু নারী-প্রকৃতির বিজয়িনী স্পৃহাকে দমন করাও ত সহজ নহে। বিশেষতঃ তাহার অন্তরের ব্যর্থ বিদ্রোহভাব এইরূপ ভাবেই আত্মপ্রকাশ করিয়া যদি কিছু উপশমিত হয়।

"শেফালী দি, তোমার সেই 'আজি পরমোৎসব রাতি' গানটা গাও না।"

চারিদিক্ হইতে কলকণ্ঠে সমর্থনসূচক প্রতিধ্বনি উত্থিত হইল।

হারমোনিয়মটা টানিয়া লইয়া বরের ঠিক সম্মুখেই রাজ্ঞীর ন্যায় বসিয়া শেফালী গান ধরিল। সুরের মাধুর্য্যে, গমক, মীড় ও মূর্চ্ছনায় সে রাগিণীকে যেন মূর্ত্তি প্রদান করিল। তাহার পরিপূর্ণ, মধুর, শিক্ষিত কণ্ঠের লীলায়িত সঙ্গীততরঙ্গ স্তব্ধ শ্রোতৃবৃন্দকে মন্ত্রমুগ্ধ ও অভিভূত করিল।

গান শেষ হইলে সকলে শেফালীকে পুনঃ পুনঃ আর একটা গান গাহিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। বিজয়-গর্ব্বে শেফালী একবার বরের মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাস্য করিল।

শিশিরচন্দ্র নীরবে, একান্তমনে সঙ্গীত-সুধা পান করিতেছিল। সম্ভবতঃ এমন গান নারীকণ্ঠে সে শুনে নাই।

শ্যালিকা-সম্পর্কীয়া এক জন সুন্দরী বলিয়া উঠিল, "কেমন শুন্‌লেন, শিশির বাবু? চমৎকার নয় কি?"

শিশিরচন্দ্র মাথা তুলিয়া একবার শেফালীর দিকে চাহিল, তাহার পর মৃদুস্বরে বলিল, "ওঁর গানের খ্যাতি বাঙ্গালা দেশের অনেক দূর ছড়িয়ে পড়েছে। বাস্তবিক ওঁর শিক্ষা ও কণ্ঠস্বর অনুপম।"

শেফালী শিশিরের ভব্য ব্যবহার সম্বন্ধে বোধ হয় একটু সন্দিহান ছিল। উচ্চশিক্ষিত না হইলে আলাপ-ব্যবহারেও মার্জ্জিতরুচির পরিচয় পাওয়া যায় না, ইহাই তাহার ধারণা। কিন্তু শিশিরের সংযত ও সুষ্ঠু সমালোচনায় ভব্যতার অভাব না দেখিয়া সে মনে মনে বোধ হয় একটু খুসী হইল।

শেফালীকে যখন সকলে আরও গাহিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল, তখন সে পরিষ্কার মন্তব্য প্রকাশ করিল; আজিকার বাসরের যিনি নায়ক, তাঁহাকে একটি গান আগে গাহিতে হইবে, নহিলে সে আর গান করিবে না। সম্ভবতঃ এই প্রস্তাবের অন্তরালে শেফালীর একটু দুষ্টামী ছিল।

শেফালী জানিত, সমবেত নারী-দলের অনেকেই সুশিক্ষিতা এবং সঙ্গীতবিদ্যায় নিপুণা। শিশিরচন্দ্র এই তরুণী-সঙ্ঘে গান গাহিয়া নিশ্চিতই সকলের বিদ্রূপ অর্জ্জন করিবে। তাহাতে তাহার অন্তর হয় ত কিছু তৃপ্তি লাভ করিতে পারে। প্রথম হইতেই শিশিরের প্রতি তাহার মনের নিভৃত প্রদেশে, ঠিক বিদ্বেষ না হইলেও, বিরুদ্ধভাবের একটি প্রেরণা সে অনুভব করিতেছিল। রমার মত সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ নারীকে বিবাহ করিয়া এই অযোগ্য যুবক যে মহা অপরাধ করিয়াছে, ইহা সে কোনও মতেই ভুলিতে পারিতেছিল না; কিন্তু প্রতীকারের কোনও উপায়ই যে নাই, তাহাও সে বিশেষ-রূপে অবগত ছিল। মাতুল ও মাতুলানীর অবিবেচনায় বহুমূল্য গজমতিহার যে একটা জীববিশেষের গলদেশে বিলম্বিত হইয়াছে, এ দুঃখ রাখিবার স্থান নাই। তাই ব্যর্থ আক্রোশ শিশিরচন্দ্রের উপর চরিতার্থ করিতে পারিলেই সে যেন কিছু সান্ত্বনা লাভ করিতে পারে।

চারিদিক্ হইতে অনুরুদ্ধ হইয়া বর বিশেষ বিব্রত হইয়া পড়িল। সুন্দরী তরুণী-দলের মিষ্ট অনুরোধে উপেক্ষা প্রকাশ করাও ত কঠিন। শিশির বলিল, "যে চমৎকার কণ্ঠের গান আপনারা এখন শুন্‌লেন, তার পর আমার গান আপনাদের কর্ণপীড়াই উৎপাদন করবে—তৃপ্তি পাবেন না। তা ছাড়া, অন্য গানের পদ মনেও আসছে না। তবে একান্তই যদি আমায় অব্যাহতি না দিতে চান, তা হ'লে শ্রীমতী শেফালী দিদি যে গানটি গাইলেন, ঐটাই আপনাদের শোনাতে পারি।"

শিশিরচন্দ্র পূর্ণ দৃষ্টিতে শেফালীর দিকে চাহিল। তরুণী-দিগের কেহ কেহ বলিল, "তা, বেশ ত!"

কিন্তু বর বুঝিল, সর্ব্বান্তঃকরণে তাহারা এ প্রস্তাবে অনুমোদন করিতেছে না। সুরের ঝঙ্কারে ও মাধুর্য্যে অপরূপ গানটি তাহাদের কানে ও প্রাণে তৃপ্তির যে অমৃত-ধারা ঢালিয়া দিয়াছে, শিশিরের পুরুষকণ্ঠে তাহার অবমাননাই হইবে বুঝিয়া সুন্দরীরা সায় দিতে চাহিতেছে না।

কিন্তু শেফালী এ প্রস্তাবে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। এই নির্ব্বোধ যুবক যাচিয়া পরাজয় ও লাঞ্ছনার সুযোগ যখন আপনিই বরণ করিয়া লইতেছে, তখন উহা পরিত্যাগ করা সঙ্গত নহে। সে বলিল, "হাঁ, ঐ গানটাই আপনার মুখে শোনা যাক না। আপনি নিজে বাজিয়ে গাইবেন, না আমরা সুর দেব?"

শিশির আর একবার এই গর্ব্বিতা তরুণীর দিকে চাহিল। তাহার পর মৃদুস্বরে বলিল, "দেখি চেষ্টা ক'রে।"

শিশিরচন্দ্র একবার অপাঙ্গে তাহার নববিবাহিতা পত্নীর দিকে চাহিল। ঘর্ম্ম-বিন্দুতে তরুণী বধূর আনন সিক্ত

হইয়া উঠিয়াছে। শিশির একটু সরিয়া বসিয়া হারমোনিয়মটা টানিয়া লইল।

"আমার ধৃষ্টতা, আপনিই বিশেষ ক'রে মার্জ্জনা করবেন। কিন্তু আপনারা ত গান না শুনেই ছাড়বেন না!"

শেফালীর ওষ্ঠপ্রান্তে বিজলী-দীপ্তি খেলিয়া গেল। উহাতে কি তাহার অন্তরের বিদ্রূপবহ্নি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল?

সহসা কক্ষমধ্যে সুরের তড়িত্তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। অনভ্যস্ত, অনিপুণ অঙ্গুলিতাড়নে যন্ত্র হইতে এমন বিচিত্র সুরের বিকাশ সম্ভবপর নহে। কিন্তু পরিপূর্ণ, মধুরতম, বহুদূরপ্রসারী কণ্ঠস্বরে শিশির যখন বিচিত্র ভাববিন্যাসের সহিত গাহিতে লাগিল—"আজি পরমোৎসব রাতি!" তখন বাসরঘরের সুন্দরীরা পূর্ণ বিস্ময়ে পরস্পর দৃষ্টি-বিনিময় করিতে লাগিল। সঙ্গীতের প্রতি ছত্রে শিশির এমনই সুকৌশলে রোমাঞ্চকর ভাব-প্রবাহের সঞ্চার করিতে লাগিল, যাহা শেফালীর মধুর কণ্ঠেও বিকশিত হইয়া উঠে নাই। অভিজ্ঞা নারীরা বুঝিলেন, দীর্ঘকাল শ্রেষ্ঠ গায়কগুরুর শিক্ষাধীনে থাকিয়া সমাহিতচিত্তে সাধনা না করিলে কণ্ঠ হইতে এমন গমক, মীড়, মূর্চ্ছনা নির্গত হয় না—তান ও লয়ের উপর এমন অধিকার জন্মে না।

মুগ্ধ, স্তব্ধ, পুলকিতচিত্ত নারীর দল সঙ্গীতসুধাতরঙ্গে ডুবিয়া ভাসিয়া যেন এক অভিনব সঙ্গীতরাজ্যে প্রবেশ করিল। সত্যই এমন অপূর্ব্ব সঙ্গীত তাহারা বহু দিন শুনে নাই। শেফালীর আনন হইতে বিদ্রূপের হাস্য কখন্ অন্তর্হিত হইয়া তথায় বিস্ময়রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা নিজেই সে বুঝিতে পারে নাই।

অর্দ্ধঘণ্টা ধরিয়া, ফিরাইয়া ঘুরাইয়া, নানারূপে গাহিয়া শিশির গানটা শেষ করিল। প্রশংসার কোনও বাণী স্তব্ধকণ্ঠ কোনও তরুণীর তরফ হইতে উত্থিত হইল না। এমন কি, মুহূর্ত্তের জন্য শেফালীও মস্তক নত করিয়া তাহার অজ্ঞাতসারে যেন সঙ্গীতের শেষ তানকে অভিনন্দিত করিল।

আত্মস্থ হইয়া শেফালী বলিল, "আপনি বুঝি অনেক দিন থেকে গান শিখে আসছেন? আপনার গুরু কে?"

স্মিতমুখে শিশির বলিল, "গোস্বামী মশাই—রাধিকা গোস্বামীর নাম শুনেছেন? তিনি আমার বাবার সঙ্গীতগুরু ছিলেন। তাঁর কাছ থেকেই আমিও একটু একটু শিখেছিলাম মাত্র।"

শেফালী অর্দ্ধাবগুণ্ঠনবতী ভগিনীর পার্শ্বে সরিয়া বসিয়া তাহার কানে কানে কি একটা কথা বলিল। সূক্ষ্ম ওড়নার অন্তরাল ভেদ করিয়া রমার আরক্ত আননের উজ্জ্বল দীপ্তি শিশিরের দৃষ্টিকে মুগ্ধ করিল।

শেফালী বলিল, "অগ্রহায়ণমাসে মামাবাবু দেওঘরের বাড়ীতে যাবেন। সেখানে আমরা সবাই যাব—মাস চারেক থাকা হবে। আপনাকে যেতে হবে, শিশির বাবু।"

শিশির বিনম্র স্বরে বলিল, "আমার মত অমার্জ্জিত লোকের সঙ্গ আপনাদের ভাল লাগবে কি? সে শিক্ষিত সমাজে আমার মত লোক ত হংসমধ্যে—"

শিশির কথাটা অসমাপ্ত রাখিয়া মৃদু হাস্য করিল।

কথাটার মধ্যে বোধ হয় ছোট একটি তীক্ষ্মমুখ কণ্টকের সমাবেশ ছিল। শেফালী বলিল, "আপনি ত কথা জানেন বেশ, দেখছি।"

শিশির বলিল, "আপনি আর একটা গান করুন না; বড় চমৎকার গলা আপনার।"

শেফালী বলিল, "রাত আর বেশী নেই। আমি একা গান গেয়ে সব প্রশংসাটা নিজে নেব, সেটা সঙ্গত নয়! অনেকেই এখানে আছেন—তাঁরা খুব ভাল গান জানেন। সুরমা দি, এবার তোমার পালা।"

কিন্তু গান গাহিবার উৎসাহ সকলের মধ্যেই যেন সহসা নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছিল।

৩

"চলুন যতীশ বাবু, একটু ঘুরে আসা যাক্।"

শিশিরের প্রস্তাবে কিন্তু অধ্যাপক যতীশচন্দ্র তেমন মনোযোগ প্রদান করিল না। পৌষের প্রভাতে শীতের জড়তা তখনও তাহার দেহ হইতে অন্তর্হিত হয় নাই। সাঁওতাল পরগণার ধূলিলেশবর্জ্জিত আকাশপথে সূর্য্য যে কিরণধারা বর্ষণ করিতেছিল, তাহাতে শীতস্তব্ধ পবনের অমূর্ত্ত অঙ্গে তখনও উষ্ণতা সঞ্চার করিতে পারে নাই। যতীশচন্দ্র র‍্যাপারখানা সর্ব্বাঙ্গে ভাল করিয়া জড়াইয়া সোফার উপর আসনপিঁড়ি হইয়া বসিল। আসল কথা, চায়ের দ্বিতীয় সংস্করণের সেবা না করিয়া সে নড়িতে চাহিতেছিল না।

একটা সিগারেট কোনও মতে ধরাইয়া লইয়া যতীশ বলিল, "বসুন না, শিশির বাবু। কর্ত্তা বাইরে গেছেন, একটু নির্ব্বিবাদে গল্প করা যাক্। তার পর যতদূর যেতে চান, বেড়িয়ে আসা যাবে।"

শিশির তাহার নিয়মিত ব্যায়ামের অভ্যাস অনুসারে প্রত্যুষেই রুদ্ধদ্বার গৃহে খানিকক্ষণ ডন্ ফেলিয়া শরীরকে কিছু উত্তপ্ত করিয়া লইয়াছিল, কিন্তু শ্বশুরালয়ে সে তাহার চির-প্রিয় ডাম্বেল ও মুগুর-জোড়া আনিতে পারে নাই বলিয়া এক ঘণ্টাব্যাপী ব্যায়ামের অভাব অনুভব করিতেছিল। ভায়রার অনুরোধে সে একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল; কিন্তু তাহার প্রাণ তখন বাহিরের মুক্তবাতাসে দীর্ঘভ্রমণের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল।

বড় দিনের অবকাশে যতীশচন্দ্র নিমন্ত্রিত হইয়া মামা-শ্বশুরের দেওঘর পুরনদহস্থিত ভবনে বেড়াইতে আসিয়াছিল। শিশিরও মাত্র আজ দুই দিন হইল, পিতা-মাতার অনুমতি অনুসারে প্রবাসে কয়েকটা দিন আরামে যাপন করিবার অভিপ্রায়ে পৌঁছিয়াছে।

সমবয়স্ক পুরুষ-সঙ্গীর প্রাচুর্য্য না থাকিলেও নগেন্দ্রনাথের প্রবাসভবনে জামাতাদিগের নারীসঙ্গিনীর অভাব ছিল না। শেফালী ও রমা ব্যতীত নগেন্দ্রনাথের শ্যালক-কন্যারা স্বাস্থ্যনিবাসে আনন্দ ও স্বাস্থ্যসঞ্চয়ের জন্য আসিয়াছিল। সুরমা ও সুপ্রভা বিদুষী ও পরিহাসরসিকা; সুতরাং যতীশ ও শিশির সাহচর্য্যের অভাব অনুভব করিতে পারে নাই।

"কি শিশির বাবু, ওখানা কি পড়ছেন?"

সুরমা চায়ের সরঞ্জাম অদূরবর্ত্তী টেবলের উপর সাজাইয়া রাখিতেছিলেন। শেফালী শিশিরচন্দ্রের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার আননে স্বাভাবিক কৌতুকদীপ্তি।

শিশির একখানা বাঙ্গালা মাসিক লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল।

উত্তরের অবকাশ না দিয়াই শেফালী বলিয়া উঠিল, "শুনেছিলুম, ও সব পড়তে আপনার ভাল লাগে না—এখন লাগছে কি?"

মৃদু হাসিয়া শিশির শেফালীর দিকে চাহিয়া বলিল, "আমার সম্বন্ধে আপনি ত অনেক সংবাদ রাখেন! আমি নিজে যা জানি না, সে খবরও আপনার জানা আছে দেখছি।"

বলিয়া ফেলিয়াই শিশির উভয় কর যুক্ত করিয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "অপরাধ নেবেন না, দিদি; আপনার সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ, সেই বিচার করেই কথাটা ব'লে ফেলেছি। ওটা নিছক অসার কথা।"

যতীশচন্দ্র হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে বলিল, "কে বলে শিশির বাবু বেরসিক—কথা কইতে জানেন না? ওঁর কথায় রস ও ঝাঁঝ দুই-ই আছে।"

ঘরের মধ্যে তখন রমা ও সুপ্রভাও প্রবেশ করিয়াছিল। তরুণীদিগের সকলেরই মুখে মৃদু হাস্যের তরঙ্গ উচ্ছলিত হইয়া উঠিল।

আরক্ত আননে শেফালী একবার স্বামীর দিকে চাহিল। তাহার পর একখানা চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িয়া সে সহজভাবে বলিল, "সুরমা দি, শিশির বাবুকে আর এক পেয়ালা চা দাও।"

শিশিরচন্দ্র কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "একই বেলাতে দু'বার চা, আমার পক্ষে পরিপাক করা কঠিন হবে, দিদি।"

তথাকথিত সমীহ বা লজ্জার পথ শেফালী কোনও দিন মাড়ায় নাই। বিশেষতঃ সে ঘরের মধ্যে কুণ্ঠা করিবার মত কেহই ছিল না।

পরিহাসের তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপের সুযোগ পাইয়া শেফালী মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিল না। সে বলিল, "ছটাক তিনেক গরম জল, চা'র রস ও চিনিদুধে আপনার ঐ পরিপুষ্ট দেহের কি অনিষ্ট হ'তে পারে, শিশির বাবু?"

"তা জানি না, স্বাস্থ্যতত্ত্ব অথবা রসায়নশাস্ত্র সম্বন্ধে আমার কোন জ্ঞান নেই। তবে শরীরে সয় না, বুঝতে পারি।"

রমার পক্ষেও লজ্জা করিবার মত সে ঘরে কেহ ছিল না, তথাপি সে শেফালীর মত সহজ ও কুণ্ঠাহীনভাবে আলাপ করিতে পারিতেছিল না। সে ধীরে ধীরে যতীশচন্দ্রের সন্নিহিত একটি মোড়ার উপর বসিল। যতীশচন্দ্র তখন চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়া আরামসূচক একটি শব্দ উচ্চারণ করিল।

শিশির বলিল, "চা শেষ হলে, চলুন, সবাই মিলে একটু বেড়িয়ে আসা যাক্।"

শেফালী বলিল, "এ বেলা নাই বা গেলেন। মামা বাড়ী নেই। মা ও মামী-মারা রান্নার তদ্বিরে আছেন। এখন

আমরা ব'সে ব'সে, আসুন, অন্য নানা রকম গল্প-গুজব করা যাক। বিকেলের দিকে সবাই মিলে খুব খানিকটা বেড়িয়ে আসব।"

যতীশচন্দ্র বলিল, "অতি চমৎকার প্রস্তাব।"

সুরমা ও সুপ্রভাও তাহাতে মত দিল। শুধু রমা কোন কথাই বলিল না।

"তা হ'লে আপনারা বসুন, আমি একাই একটু ঘুরে আসি।"

শেফালী বলিল, "তা কি হয়? আপনাকে ছেড়ে দিতে পারি নে। আচ্ছা শিশির বাবু, আমাদের সঙ্গ আপনি এত এড়িয়ে চল্‌তে চান কেন, বলুন ত?"

"সে কি, দিদি, আপনাদের সঙ্গ ত আমার পক্ষে স্পৃহণীয়। ও কথা ব'লে আমায় অপরাধী করবেন না।"

যতীশ বলিল, "শুধু স্পৃহণীয় নয়, লোভনীয়ও বটে।"

জিহ্বা দংশন করিয়া শিশির বলিল, "সেটা কি আমার বলা সাজে? আপনি বরং ও কথা বল্‌তে পারেন।"

তরুণীদিগের মুখে চাপা হাসির বহর দেখিয়া শেফালীরও আনন আরক্ত হইয়া উঠিল।

কথাটার স্রোত অন্য দিকে বহাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে শেফালী বলিল, "শিশির বাবু, আপনি বাঙ্গালা বেশী ভাল বাসেন, না ইংরাজী?"

মৃদু হাসিয়া শিশির বলিল, "বাঙ্গালীর ছেলে যখন, মাতৃভাষার প্রতি আকর্ষণ স্বাভাবিক।"

অধ্যাপক যতীশচন্দ্র বলিল, "কিন্তু শিশির বাবু, আমার ইংরাজীর দিকে ঝোঁক বেশী।"

"তা ত হবেই, আপনারা পণ্ডিত লোক।"

সুরমা বলিলেন, "আমাদের বাড়ীর কিন্তু সবাই বাঙ্গালার ভক্ত। শেফালীরাণী ইংরাজী, বাঙ্গালা দুইয়েরই সমান ভক্ত, শিশির বাবু।"

শেফালী মৃদুস্বরে বলিল, "আপনি কার লেখা বেশী পছন্দ করেন—অবশ্য আধুনিক ইংরাজ লেখকের কথাই বল্‌ছি?"

"পছন্দ? তা ঠিক বল্‌তে পারিনে। বাবার একটা লাইব্রেরী আছে, খুব বড় নয়। তবে দেশী ও বিদেশী বই বোধ হয় হাজার দশেক হবে। সেকেলে ডিকেন্স, থ্যাকারে, মেরিডিথ্‌ প্রভৃতির লেখাই যেন মনটাকে আকর্ষণ করে।"

যতীশ বলিল, "ফ্রেঞ্চ বই-টই পড়া আসে?"

শিশির একবার বাতায়নের বাহিরে দৃষ্টিপাত করিল। তাহার পর মুখ ফিরাইয়া বলিল, "কন্টিনেণ্টাল লেথকদের বই কিছু কিছু পড়েছি বটে; তবে ফরাসীগ্রন্থের ইংরাজী তর্জ্জমা বড় একটা পড়িনি। মূল ফরাসী ভাষায় মোপাঁসা, হুগো, বালজাক, মুসেঁ প্রভৃতির কিছু কিছু পড়বার চেষ্টা করেছি। রস যেন তাতে বেশী পাওয়া যায়।"

শেফালী স্থিরদৃষ্টিতে শিশিরের দিকে চাহিল। তাহার নয়নে কি বিস্ময়রেখা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল? যতীশচন্দ্রও ভায়রার দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন।

"আপনি ফরাসীভাষা জানেন?"

"জানি, এ কথা বলতে সাহস হয় না। তবে বছর সাতেক ধ'রে চেষ্টা ক'রে আস্‌ছি। বাবা যখন বিলেতে ছিলেন, এক জন ফরাসী অধ্যাপকের সঙ্গে আলাপ হয়। তিনি মাঝে কলকাতায় এসে আমাদের ওখানে উঠেছিলেন। তিনি সময় সময় আমাকে ফরাসীভাষায় পত্র লেখেন। আমাকেও ঐ ভাষাতেই জবাব দিতে হয়।"

আসরটা যেমন গল্পগুজবে জমিয়া উঠিবে বলিয়া শেফালী মনে করিয়াছিল, কাযে তাহা বোধ হয় হইল না। শেফালী চঞ্চল হইয়া উঠিল। সহসা বাহিরের দিকে চাহিয়া সে বলিয়া উঠিল, "ঐ মামা বাবু আস্‌ছেন, আমরা ভিতরের দিকে যাই।"

মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া শেফালী দ্রুতচরণে চলিয়া গেল। রমাও তাহার অনুসরণ করিল।

শিশির বলিল, "নাঃ, সকালবেলাটা বেড়ান হ'ল না। এখন ত বেলা হয়ে গেছে।"

যতীশচন্দ্র নিঃশেষ-পীত চুরুটিকার ভগ্নাংশ বাতায়নপথে নিক্ষেপ করিল।

৪

দিগ্‌ড়িয়া পাহাড়ের অন্তরালে সূর্য্য ঢলিয়া পড়িলেও দাড়োয়ার অর্দ্ধসিক্ত বালুকাবিস্তার এবং মুক্ত প্রান্তরের বক্ষোদেশে অপরাহ্লের আলোক-রেখা তখনও ম্লান হইয়া আইসে নাই। যতীশ ও শিশির অগ্রে অগ্রে গল্প করিতে করিতে যশিদির দিকে অগ্রসর হইতেছিল। তাহাদের পশ্চাতে মাতা ও মাতুলানীর সহিত শেফালী চলিতেছিল; রমা, সুরমা ও সুপ্রভা কলকণ্ঠে প্রকৃতির অনবদ্য সুষমা সম্বন্ধে মৃদুস্বরে নানা আলোচনা করিতেছিল।

পথের এক পার্শ্বে উচ্চাবচ পাহাড় ভেদ করিয়া রেল-লাইন বিসর্পিত। স্থানে স্থানে শাল, মহুয়া ও আরণ্য গুল্মের স্তূপ—মুক্তপ্রান্তরে শীতের বাতাস হুহু করিয়া বহিতেছিল। পথ প্রায় জনহীন। পুরনদহ, বেলাবাগান প্রভৃতি স্বাস্থ্য উপনিবেশ হইতে ভ্রমণার্থীরা বেড়াইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। কিন্তু শেফালীর প্ররোচনায় এবং যতীশচন্দ্রের উৎসাহে অনুপ্রাণিত ক্ষুদ্র দলটি সোজা যশিদি ষ্টেশন পর্য্যন্ত বেড়াইয়া সন্ধ্যার গাড়ীতে দেওঘরে ফিরিবে বলিয়া পদব্রজে চলিতেছিল।

কিছু দূর অগ্রসর হইয়া সন্নিহিত একটি অতি ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর বেউড়-বাঁশের একটি ঝোপ দেখিতে পাইয়া শিশির বলিল, "যতীশ বাবু. আপনি ওঁদের নিয়ে এগিয়ে যান, আমি একটা বাঁশের লাঠি কেটে নেই।"

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই শিশির পকেট হইতে একখানি তীক্ষ্ণধার ছোরা বাহির করিয়া বাঁশের ঝোপের দিকে অগ্রসর হইল। দলটি ধীরমন্থরগতিতে যতীশের অনুবর্ত্তী হইল।

শিশিরচন্দ্র ক্ষুদ্র ঝোপের মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া একখানা পাকা বাঁশ কাটিয়া ফেলিল। কঞ্চিগুলি ছাড়াইয়া চারিহাত দীর্ঘ বাঁশের লাঠিখানি লইয়া সে ঝোপের মধ্য হইতে প্রফুল্ল অন্তরে পথে আসিয়া দাঁড়াইল।

সহসা মিশ্রিত কণ্ঠের আর্ত্ত চীৎকার শুনিয়া শিশির চমকিয়া উঠিল। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সে সম্মুখে চাহিয়া দেখিবামাত্র তাহার দেহের শোণিতপ্রবাহ চঞ্চল হইয়া উঠিল। অস্পষ্ট আলোকে সে যাহা দেখিল, তাহাতে কিছু বুঝা না গেলেও অনুমানে যাহা বুঝিল, তাহাতে তাহার ব্যায়ামপুষ্ট বলিষ্ঠ দেহ অকস্মাৎ স্ফীত হইয়া উঠিল। নিমেষমধ্যে সে কোঁচাটি পশ্চাতে গুঁজিয়া অভ্যস্ত লাঠিয়ালের ন্যায় দ্রুতগতিতে লাঠির উপর ভর দিয়া উল্কাবেগে অগ্রসর হইল। স্কুলে পড়িবার সময় সে 'বয় স্কাউট' দলের সঙ্গে অনেকবার যশিদি, মধুপুর, গিরিডি প্রভৃতি স্থানে সৈনিক জীবন-যাপন করিয়া গিয়াছে। শীতকালে সময়ে সময়ে গোরা সৈনিকদল যশিদিতে শিবিরস্থাপন করিয়া থাকে, তাহাও তাহার অজ্ঞাত ছিল না।

নিকটে আসিয়া অস্পষ্টালোকে শিশির দেখিল, তাহার অনুমান মিথ্যা নহে। এক জন সৈনিক ভূপতিত যতীশকে চাপিয়া ধরিয়াছে, আর এক জন মহিলাদিগের পথ আগুলিয়া সন্নিহিত শেফালীকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। ভয়ার্ত্তা মহিলারা চীৎকার করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের কণ্ঠ হইতে স্বর নির্গত হইতেছে না। শেফালী গোরার আক্রমণ হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে গিয়া পদস্খলিত হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া গেল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে শিশির গোরার পৃষ্ঠদেশে প্রচণ্ড পদাঘাত করিল। সে আঘাতবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া গোরাটা ঠিকরাইয়া অন্য দিকে পড়িল। রমা তাড়াতাড়ি আসিয়া শেফালীকে তুলিয়া ধরিল। তাহার মাতা, মাতুলানী, সুরমা ও সুপ্রভা ঊর্দ্ধশ্বাসে শিশিরের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাদের দেহ বেপথুমান, কণ্ঠস্বর রুদ্ধপ্রায়।

মুহূর্ত্তমধ্যে গোরাটা উঠিয়া দাঁড়াইয়া শিশিরকে আক্রমণ করিতে আসিল। দ্বিতীয় যে গোরাটা যতীশকে ভূমিতলে চাপিয়া ধরিয়াছিল, সে-ও ছুটিয়া আসিল।

"কাপুরুষ, পশু!"

বজ্রনাদে শিশির সদ্যঃকর্ত্তিত লাঠি তুলিয়া উভয়ের দিকে ধাবিত হইল; কিন্তু কি ভাবিয়া সে লাঠিখানা পল্লীর দিকে ফেলিয়া দিল। ওভারকোটটা মুহূর্ত্তমধ্যে খুলিয়া ফেলিয়া সে উভয়কে একসঙ্গে আক্রমণ করিল। দ্বিতীয় গোরাটা আগেই আসিয়া পড়িয়াছিল। অপূর্ব্ব কৌশলে শিশির তাহার কর্ণমূলে এমন প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিল যে, 'ও গড়' (ভগবান্!) বলিয়া সেইখানে সে বসিয়া পড়িল। অপর গোরাটা তাহার প্রথম পদাঘাতে একটু কাবু হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং অবলীলাক্রমে শিশির তাহাকে ধরাশায়ী করিয়া তাহার বক্ষোদেশে চাপিয়া বসিল। দুই চারিটি অতিরিক্ত মুষ্ট্যাঘাত লাভ করিয়া কাতরকণ্ঠে গোরাটা বলিল, "বস্, বাবু! আমি হার মান্‌ছি।"

শিশির তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া দ্বিতীয় গোরার সন্নিহিত হইয়া বলিল, "কেমন, আর চাই?"

"যথেষ্ট হয়েছে, ক্ষমা কর, বাবু।"

শিশির দেখিল, যতীশ অতি কষ্টে কোনও মতে ভূমিশয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে।

"খুব লেগেছে, যতীশ বাবু?"

"উঃ! হাতখানা যেন ভেঙ্গে দিয়েছে! ষাঁড়ের ডাল্‌না-খেকো পাপিষ্ঠ!"

ওভারকোটটা গায় চড়াইয়া শিশির গোরা দুইটাকে ভূমি হইতে তুলিল। তাহার পর দৃঢ়স্বরে বলিল, "তোমরা বীরের জাত ব'লে গর্ব্ব কর, অথচ নারীর সম্মানরক্ষা করতে জান না? যাক্, আমার কাছে ক্ষমা চাইলে হবে না। যে মহিলাদের অপমান করতে গিয়েছিলে, তাঁদের কাছে ক্ষমা না চাইলে চল্‌বে না।"

গোরা দুইটা এই বলিষ্ঠ যুবকের মুষ্টির বহর দেখিয়া তাহার শক্তির সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়াছিল। বাঁশের লাঠির স্বাদ তখনও তাহারা লাভ করে নাই। সুতরাং শিশির যখন উভয়কে একরূপ টানিয়া লইয়া কম্পমানা নারীর দলের সম্মুখে হাজির করিল, তখন অশুদ্ধ ইংরাজীতে গোরা দুই জন তাহাদের অশিষ্ট আচরণের জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করিল।

সন্ধ্যার অন্ধকারে গোরা-যুগলের মূর্ত্তি যশিদির দিকে অগ্রসর হইলে শিশির সকলকে দেওঘরের দিকে ফিরিতে বলিল। সে সর্ব্বপশ্চাতে থাকিয়া চলিতে লাগিল।

পথিমধ্যে কেহ কোন কথা কহিল না। শুধু অগ্রগামী যতীশের মুখ হইতে মাঝে মাঝে যন্ত্রণাসূচক দুই একটি শব্দ বাহির হইতেছিল।

বাড়ী ফিরিয়া শিশির যতীশকে লইয়া বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিল। নগেন্দ্রনাথ করণীবাগে এক বন্ধুর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন, তখনও ফিরেন নাই। আলো জালিয়া শিশির সর্ব্বাগ্রে যতীশের আহত স্থান পরীক্ষা করিল। না, তেমন বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই। কাঁকর ও বালুকার ঘর্ষণে স্থানে স্থানে ছড়িয়া গিয়াছে মাত্র। ভালরূপে পরিষ্কার করিয়া দিয়া শিশির ক্ষতস্থানে খানিকটা 'টিংচার আইডিন্' লাগাইয়া দিল।

রমা ও শেফালী নির্ব্বাক্‌ভাবে কক্ষমধ্যে দাঁড়াইয়া ছিল। শেফালীর সমগ্র আনন পাংশুবর্ণ। কি একটা উত্তেজনায় তাহার বক্ষোদেশ ক্ষণে ক্ষণে আন্দোলিত হইয়া উঠিতেছিল।

হাত ধুইয়া শিশির একখানি আসনে বসিয়া পড়িয়া স্ত্রীর দিকে চাহিয়া বলিল, "যতীশ বাবুর জন্য চা নিয়ে এস, আমারও এক পেয়ালা চাই।"

শেফালী নীরবে কি ভাবিতেছিল। তাহার স্বভাবসুলভ প্রগল্‌ভতা আজ যেন কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছিল।

সহসা সে গলদেশে বস্ত্রাঞ্চল রাখিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "শিশির বাবু, বয়সে আপনি বড়, কিন্তু সম্পর্কে আমার বড়ত্ব আপনি স্বীকার করেন। আমি আজ আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি, আমার সকল অপরাধ ভুলে যাবেন কি? রমা সত্যই ভাগ্যবতী।"

তাহার নয়নযুগল উজ্জ্বল আলোকে চক্‌চক্ করিয়া উঠিল।

শিশির নতনেত্রে বলিল, "কি যে আপনি বলেন দিদি!"

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

বিবাহ

এ নহে লালসা-তিয়াসা-তৃপ্তি যৌবন-প্রভাত-পবনে,
বিলাস-ব্যসন-ভঙ্গী নহে এ প্রমোদ-রঙ্গ ভবনে;
এ যে পিরীতির অপ্সরী-লীলা মধু অমিয়ার প্রবাহ
ধর্ম্ম-কর্ম্ম সাধন পন্থাঃ এ যে হিন্দুর বিবাহ।

এ নহে শিশির-মুক্ত ফাগুন নিশির আগুন বরষি'
মত্ত মলয়-হিল্লোলাহত পুষ্প-মধুর-সরসী;
আবেশ আকুল মত্ত মধুপ মধু আহরণ চাতুরী
হিন্দু-বিবাহ ভরপুর এ যে কেবলি পুণ্য মাধুরী।

এ নহে মোহের চপলা দীপ্তি তীব্র তামস-যোজনা
যৌবন-রূপ-মুগ্ধ আঁখির মিথ্যা মৈত্রীর যোজনা;
শক্তি-সাধন-সিদ্ধ-মন্ত্রলীলার ললিত লহরী,
কর্ম্মযোগের অঙ্গ, প্রাণের পুণ্য প্রবীণ প্রহরী।

এ নহে কাব্য, কল্পনা-মাখা কবির স্বপ্ন-কবিতা,
মৌন প্রেমের সৌধ যেমন গড়েছে পদ্মসবিতা;
সত্যদেবের মানস লীলা-সিন্ধুর সুধাপ্রবাহ,
গঙ্গা-সাগর-সঙ্গম এ যে হিন্দুর শুভ বিবাহ।

শ্রীরুদ্রচন্দ্র ধর

কুকুর
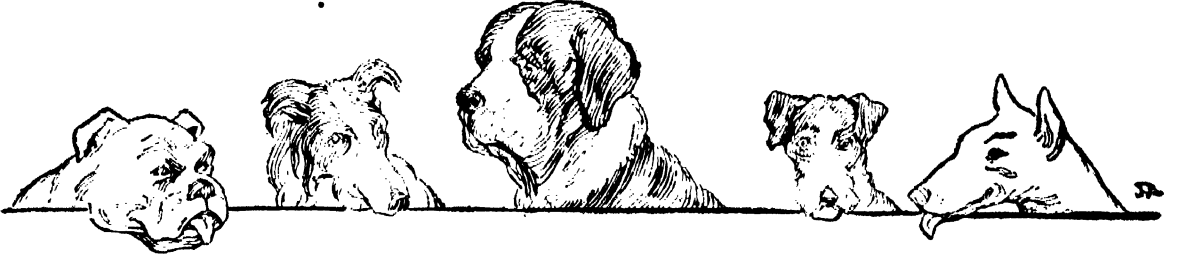
মাসিক ও বার্ষিক বসুমতীর পাঠকবর্গের নিকট কুকুর সম্বন্ধে নানা ইতিবৃত্ত ও চিত্র মধ্যে মধ্যে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। কুকুর মানবের নিত্য সহচর ও অবশ্য প্রয়োজনীয় জন্তু হিসাবে ইহার সম্বন্ধে বক্তব্য যথেষ্টই রহিয়া গিয়াছে।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে য়ুরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন প্রকার কয়েকটি কুকুরের চিত্র ও বিবরণ পাঠকবর্গের নিকট উপস্থাপিত করা হইল।

আমাদের দেশে—দেশবাসীর নিকট কুকুর উপেক্ষিত, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কালের গতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যদি দেশবাসীর মধ্যে এই অবশ্যপ্রয়োজনীয় বিশ্বাসী ও উপকারী জীবের সম্বন্ধে দেশবাসীর আগ্রহ বর্দ্ধিত হয় এবং গো-মেষ-মহিষাদি পালনের ন্যায় কুকুরপালন সম্বন্ধে আমাদের প্রবৃত্তি জন্মে, তাহা হইলে ফল যে নিরর্থক হইবে, এমন মনে হয় না।

বিধাতার সৃষ্ট, মানবের প্রকৃত বন্ধু এই জীব প্রত্যেক বাঙ্গালীর গৃহপ্রাঙ্গণে অযাচিতভাবে পড়িয়া থাকে; উপেক্ষার অন্নমুষ্টিলাভে কোনও মতে জীবন ধারণ করে। ইহাদিগকে যদি য়ুরোপের আদর্শে প্রতিপালন করা যায়; তাহা হইলে নানাবিধ বিপদ্ হইতে আমরা রক্ষা পাইতে পারি। কিন্তু এ বিষয়ে কি বঙ্গবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে?

আইরিশ উল্‌ফ্ হাউণ্ড

সেণ্ট বার্ণার্ড জাতীয় কুকুরের ন্যায় আইরিশ উল্‌ফ হাউণ্ডগুলি ভারী না হইলেও অপেক্ষাকৃত দীর্ঘাকার। পৃথিবীতে যত প্রকার দীর্ঘাকার কুকুর আছে, তন্মধ্যে ইহারাই আকারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। উচ্চতায় ইহারা ৩৬ ইঞ্চ। বড় জাতীয় ডেন কুকুর যদি তাহার পালকের স্কন্ধদেশে চরণযুগল স্থাপন করিয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে সে তাহার পালকের সমান দীর্ঘ বলিয়া স্বীকৃত হইবে। কিন্তু একটা উল্‌ফ্ হাউণ্ড যদি দীর্ঘাকার কোন মানুষের স্কন্ধদেশে পা তুলিয়া দিয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে মাথায় সে মানুষকে ছাড়াইয়া যাইবে। এই সংখ্যায় যে চিত্র প্রদত্ত হইল, তাহা হইতে দেখা যাইবে কুকুরটির আকার কিরূপ ভীষণ ও দীর্ঘ।

এই জাতীয় কুকুর যেমন লোমশ ও দীর্ঘাকার, তেমনই সাহসী ও মৃদুস্বভাব। ইহারা অত্যন্ত স্নেহ-পরায়ণ ও প্রভুভক্ত। পূর্ব্বে নেকড়ে বাঘের আক্রমণ হইতে মেষপালকে রক্ষা করিবার জন্য এই জাতীয় কুকুর ব্যবহৃত হইত। বাস্তবিক এই কার্য্যে ইহার অপেক্ষা যোগ্য পশু পৃথিবীতে দুর্লভ, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

অনেকে মনে করেন যে, স্কটিশ ডিয়ার হাউণ্ড অপেক্ষা, আইরিশ হাউণ্ডগুলি অধিকতর উপকারী। এই জাতীয় কুকুর অতি প্রাচীন এবং মানবের জীবন-যাত্রার বিবিধ অধ্যায়ে ইহাদের স্মৃতি বিজড়িত আছে। আয়র্লণ্ডে নেকড়ে বাঘের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবার পর ইহাদের প্রয়োজনও হ্রাস পাইতে থাকে। ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ কাপ্তেন জি, এ, গ্রাহাম বিশেষ চেষ্টা না করিলে এই জাতীয় কুকুরের অস্তিত্বও পৃথিবী হইতে এত দিন বিলুপ্ত হইয়া যাইত। নেকড়ে বাঘের দৌরাত্ম্য হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আয়র্লণ্ডে এই জাতীয় কুকুরের বংশ রক্ষা সম্বন্ধেও তদ্দেশবাসিগণ অনবহিত হইতে থাকে। প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বে এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল যে, দেশমধ্যে মাত্র কতিপয়

তথাকথিত আইরিশ হাউণ্ড অতি শোচনীয় এবং ক্ষীণকায় অবস্থায় বিদ্যমান ছিল।

কিন্তু কাপ্টেন গ্রাহাম বিশ্বাস করিতে পারেন নাই যে, ইতিহাসপ্রসিদ্ধ উল্ফ হাউণ্ড সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তিনি অনুমান করেন, আয়র্লণ্ড হইতে নেকড়ে বাঘ সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত হওয়ায়, অপেক্ষাকৃত লঘু পরিশ্রমে এই জাতীয় কুকুর আকারে হ্রাস ও শক্তিতে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া তিনি আইরিশ উল্ফ হাউণ্ড নামে অভিহিত কতিপয় কুকুর সংগ্রহ করিয়া ডিয়ার হাউণ্ড, গ্রেট ডেন এবং পরিশেষে রুসীয় উল্ফ হাউণ্ড প্রভৃতি বৃহদাকার শক্তিশালী কুকুরের সংমিশ্রণে একটি বিরাটদেহ কুকুরের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই কুকুরের সহিত, প্রাচীন যুগের আইরিস রাজাদিগের পার্শ্বচর উল্ফ হাউণ্ড কুকুরের যে সকল বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে, তাহার ঘনিষ্ঠ সামঞ্জস্য দেখা যায়, প্রাচীন চিত্রে অঙ্কিত কুকুরের সহিত সাদৃশ্যও বুঝিতে পারা যায়।

ডিয়ার হাউণ্ডের ন্যায় এই উল্ফ হাউণ্ডের মুখাবয়বে বুদ্ধিমত্তা ও বন্ধুত্বের আভাস সুস্পষ্ট। প্রথম দৃষ্টিপাতেই এই কুকুরের উপর সশ্রদ্ধ বিশ্বাস ও নির্ভরতা আপনা হইতে মানুষের মনে হইয়া থাকে।

আইরিশ উল্ফ হাউণ্ড সম্বন্ধে নানা কথা ও কাহিনী আয়র্লণ্ডে প্রচলিত আছে। জেলার্ট নামক একটি কুকুর ইংলণ্ডের রাজা জন ১২০৫ খৃষ্টাব্দে ওয়েলসের প্রসিদ্ধ নৃপতি লিওলিনকে উপহার দিয়াছিলেন। কথিত আছে, এক দিন মৃগয়াকালে মাঠের মধ্যে জেলার্ট লিওলিনকে পরিত্যাগ করিয়া প্রাসাদে ফিরিয়া গিয়াছিল। রাজা লিওলিন, মৃগয়া হইতে ক্রুদ্ধ অন্তরে প্রত্যাবর্তন করেন। দুর্গে ফিরিবামাত্র রাজা দেখিলেন, জেলার্ট তাঁহার পুত্রের শয়নকক্ষ হইতে রক্তাপ্লুতদেহে তাঁহার কাছে ছুটিয়া আসিল। রাজা কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, পুত্রের শয্যা বিশৃঙ্খল—তাহাতে রক্তের দাগ। পুত্রের নাম ধরিয়া ডাকিয়া যখন তাহার কোন সাড়া পাওয়া গেল না, তখন তিনি মনে করিলেন, কুকুরটা তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছে। লিওলিন ক্রোধান্ধ হইয়া কুকুরের দেহে শাণিত তরবারি প্রবিষ্ট করাইয়া দিলেন।

পরে অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইল, শিশুপুত্র শয্যার নিম্নে নিরাপদে নিদ্রা যাইতেছে। তাহার পার্শ্বে এক প্রকাণ্ড নেকড়ে বাঘ পড়িয়া আছে। সাহসী প্রভুভক্ত কুকুর তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছিল। প্রভুভক্ত কুকুরের শোকে রাজা লিওলিন অভিভূত হইয়া পড়েন এবং পরিশেষে তাহাকে সসম্মানে সমাহিত করিয়া তদুপরি একটি মন্দির ও প্রস্তরফলক স্থাপন করিয়াছিলেন। এখনও পর্যন্ত সেই মন্দির ও প্রস্তরফলক বিদ্যমান আছে।

চেসাপিক্ রিট্রিভার

এই জাতীয় কুকুর আমেরিকায় পাওয়া যায়। পূর্বাঞ্চলে, সমুদ্রকূলবর্তী প্রদেশে ইহাদের যথেষ্ট উৎকর্ষ হইয়াছে। জলাভূমিতে হংসশিকারে ইহারা অদ্বিতীয়। প্রধানতঃ অটার হাউণ্ড ও লাব্রাডর জাতীয় কুকুরের সংমিশ্রণেই ইহাদের উৎপত্তি। কিন্তু অন্য জাতীয় কুকুরের রক্ত ইহাদের দেহে নাই, এমন কথা বলা যায় না।

অন্য কোনও শ্রেণীর কুকুর ইহাদের মত তুষারশীতল সলিলের শৈত্য সহ্য করিতে পারে না। ইহাদের শরীর দীর্ঘ ঘন লোমে আবৃত। এই জন্য শীত ইহাদিগকে কষ্ট দিতে পারে না। একবার ঝাড়া দিলেই সমস্ত জল ঝরিয়া পড়িয়া যায়। শিকারী জলাশয়ে কোনও হংসকে গুলী করিলে ঈষৎ আহত পক্ষী জলের মধ্যে অথবা বরফের অন্তরালে আত্মগোপন করে, তখন এই কুকুর ইহার পশ্চাতে ধাবিত হয় এবং তাহাকে শিকার করিয়া ফিরিয়া আইসে।

ইহাদের শরীরের ওজন ৩০সের হইতে একমণ এবং দৈহিক উচ্চতা ২২ হইতে ২৫ ইঞ্চ পর্য্যন্ত।

চেসাপিক রিট্রিভার

আইরিশ ওয়াটার স্প্যানিয়েল

পুলিস কুকুর

বেলজীয় 'সেফার্ড'

নেকড়ে ও কয়োট

পারস্যদেশীয় গেজেল হাউণ্ড বা 'শ্লুঘি'

ইহাদের কাণ অত্যন্ত খর্ব্ব এবং উপরের দিকে সোজা হইয়া থাকে। গাত্রবর্ণ পাংশুবর্ণ। অন্যান্য বর্ণের রিট্রিভারও দেখিতে পাওয়া যায়, তবে সেরূপ বর্ণের কুকুর সহজপ্রাপ্য নহে।

আইরিশ ওয়াটার স্পেনিয়েল

রিট্রিভার জাতীয় কুকুরের সহিত ইহাদের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। ইহারাও হংস শিকারের কাযে লাগে। এই জাতীয় কুকুর বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। পৃথিবীতে বোধ হয় আর কোনও জাতীয় কুকুরের এত শাখা প্রশাখা নাই।

ওয়াটার স্পেনিয়েল অত্যন্ত বুদ্ধিমান, সুদর্শন; ইহাদিগকে দেখিলেই ভালবাসিতে ইচ্ছা করে। সেটার জাতীয় কুকুরের দ্বারা হংস প্রভৃতি শিকারে সুবিধা হয় বলিয়া ইদানীং এই জাতীয় কুকুরের আদর অনেকটা কমিয়া গিয়াছে।

ইহাদের শরীরের ওজন সাধারণতঃ ২৫ সের। স্থলচর স্পেনিয়েলের সহিত ইহাদের আকারের পার্থক্য বেশ বুঝিতে পারা যায়। আইরিশ ওয়াটার স্পেনিয়েলগুলি সদানন্দ, সদয়, স্নেহপ্রবণ; কিন্তু অপরিচিত ব্যক্তির নিকট হইতে দূরে থাকিতে ভালবাসে। বয়স বেশী হইলে ইহাদের স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

জার্ম্মাণ সেফার্ড বা পুলিস কুকুর

য়ুরোপে নানাশ্রেণীর কুকুর মেষপাল রক্ষায় ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আমেরিকায় যে সকল কুকুর ব্যবহৃত হয়, তাহাদিগকে জার্ম্মাণ বা বেলজীয় মেষরক্ষক কুকুর বলে। বিগত ৫।৬ বৎসরের মধ্যে এই জাতীয় কুকুর আমেরিকায় বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে; কারণ, বিগত মহাযুদ্ধের সময় রণক্ষেত্রে মার্কিণ রেডক্রশ সেবাসমিতি এই জাতীয় কুকুরের সাহায্যে ফ্রান্স ও বেলজিয়মে বিশেষ ফললাভ করিয়াছিল।

এই জাতীয় কুকুর যেমন দেখিতে সুন্দর, তেমনই চিত্তাকর্ষক। ইহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন বলিষ্ঠ, দৃষ্টি তেমনই তীক্ষ্ণ। বুদ্ধিমত্তায় এবং স্মৃতিশক্তিতে ইহারা অতুলনীয়। এই জাতীয় কুকুর মানবের বিশেষ প্রয়োজনীয়। উচ্চতায় ইহারা ২২ হইতে ২৬ ইঞ্চ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এই সর্ব্বগুণান্বিত কুকুর বিগত রণক্ষেত্রে সেনাদলের কিরূপ সাহায্য করিয়াছিল, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না।

সাধারণতঃ ইহাদের গাত্রবর্ণ নেকড়ে বাঘের মত। তবে অন্য বর্ণের এই জাতীয় কুকুরও পাওয়া যায়। নেকড়ের সহিত ইহাদের আকৃতিগত ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে।

পুলিস বিভাগে এই জাতীয় কুকুরের প্রাদুর্ভাব ঘটিতেছে। উত্তমরূপে শিক্ষিত হইলে ইহাদের দ্বারা যে ফললাভ ঘটে, অন্য কোনও জাতীয় কুকুরের দ্বারা তাহা হয় না।

বেলজীয় মেষরক্ষক (সেফার্ড) কুকুর

য়ুরোপে বিভিন্ন শ্রেণীর মেষরক্ষক কুকুর আছে। এখনও নানা শ্রেণীর সারমেয়ের উদ্ভব হইতেছে। কিন্তু বেলজীয় মেষরক্ষক কুকুরের মত সর্ব্বাংশে প্রয়োজনীয় কুকুরের সংখ্যা অল্প। বিগত যুদ্ধে এই কুকুর অসাধ্য সাধন করিয়াছিল। আহতদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া ইহারা তাহাদের প্রাণরক্ষা বিষয়ে যেরূপ সাহায্য করিয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত।

জার্ম্মাণ সেফার্ড বা পুলিস কুকুরের অপেক্ষা ইহারা আকারে কিছু ছোট এবং গাত্রবর্ণ সাধারণতঃ ঘোর কৃষ্ণ। জার্ম্মাণ কুকুরের ন্যায় ইহারা বলবান্ ও দুর্দ্ধর্ষ না হইলেও বুদ্ধিমত্তায় তাহাদের সমতুল্য।

নেকড়ে ও কয়োট

ধূসরবর্ণের নেকড়ে বাঘগুলি দেশীয় মার্কিণ ও এস্কিমো জাতীয় কুকুরগুলির প্রজননে সহায়তা করিয়া থাকে। পূর্ব্বে ইহারা আমেরিকার সমগ্র উত্তরভাগে বসতি করিত। এই জাতীয় নেকড়েগুলি আকারে বৃহৎ এবং অত্যন্ত বলশালী। ইহাদের দেহের ওজন সওয়া মণের কিছু অধিক। প্রকৃত কুকুরের সহিত ইহাদের দেহগত পার্থক্য অত্যন্ত সামান্য।

জার্ম্মাণ সেফার্ড জাতীয় কুকুরের সহিত ইহাদের দেহগত সাদৃশ্য ঘনিষ্ঠ। ইহাদের গায়ের লোম দীর্ঘ

'সামোয়েড্' ও সাইবিরিয়ার 'রেণ্ডিয়ার' কুকুর
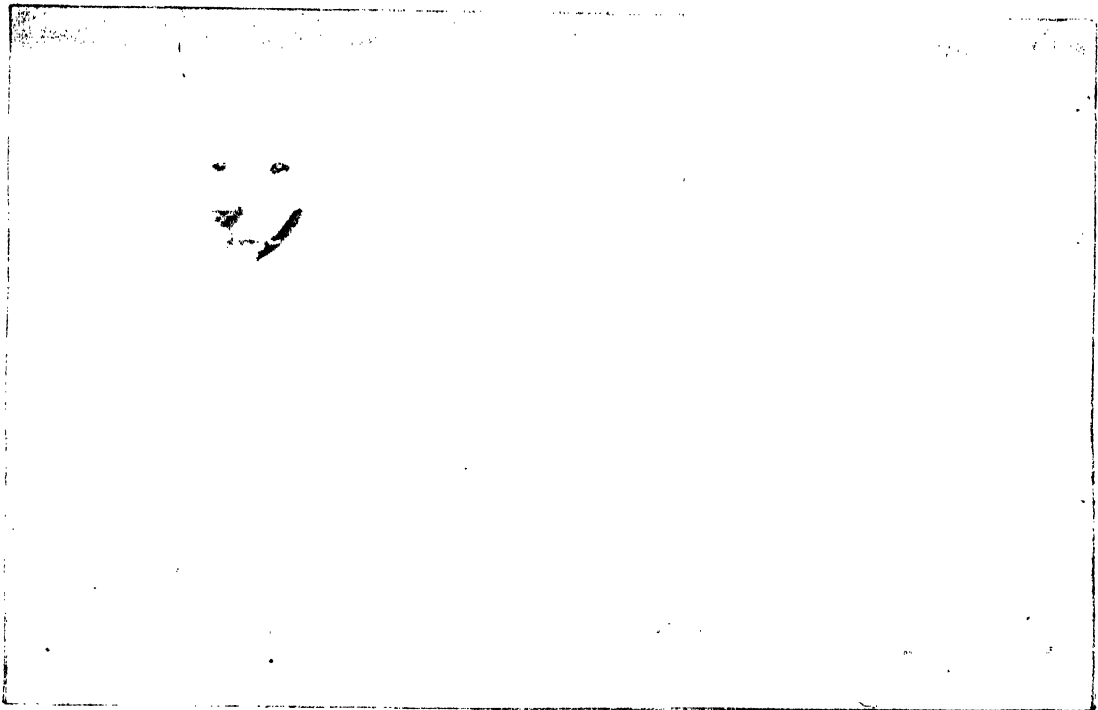
এবং কর্কশ—বিশেষতঃ কণ্ঠ, স্কন্ধ এবং পশ্চাদ্ভাগের রোমরাজি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ এবং কর্কশ। আর্কটিক প্রদেশের নেকড়েগুলির বর্ণ শুভ্র, ফ্লোরিডায় কৃষ্ণবর্ণ। সাধারণতঃ ইহারা ধূসর বর্ণের হইয়া থাকে।

কয়োটগুলিও নেকড়ে বাঘের বর্ণবিশিষ্ট এবং জ্ঞাতিভ্রাতৃবর্গের সহিত অনেক বিষয়েই তাহাদের আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে। ইহারা ওজনে সাধারণতঃ অর্দ্ধ মণের অধিক হয় না। তবে ৩০সের ওজনের কয়োটও দেখিতে পাওয়া যায়। শৃগালের সহিতও কয়োটের সাদৃশ্য ঘনিষ্ঠ। ইহাদের লাঙ্গুলের রোম আরও পরিপুষ্ট ও ঘন সন্নিবিষ্ট। দ্রুতধাবনে ইহারা অদ্বিতীয় বলিলেই হয়।

পারস্যদেশীয় গেজেল হাউণ্ড বা 'শ্লুঘি'

এই জাতীয় কুকুর অতি প্রাচীন কালের। ইহারা দেখিতে অতি সুন্দর ও বিচিত্র। মানবের চেষ্টায় কুকুরকে কিরূপ সুন্দর সৃষ্টিতে পরিণত করা যাইতে পারে, এই জাতীয় কুকুর দেখিলে তাহা অনুমিত হইবে। প্রাচীন যুগের মানবগণ যে ললিত-কলার কিরূপ অনুরাগী ছিল, গেজেল হাউণ্ডই তাহার পরিচয়। বাস্তবিক অন্য কোনও জাতীয় কুকুর অদ্যাবধি এমনভাবে বিবর্ত্তিত হয় নাই।

ইহার গায়ের ক্ষুদ্র রোমরাজি, বিলম্বিত কর্ণ এবং লাঙ্গুলের তরঙ্গায়িত দীর্ঘ চামরবৎ কেশ সর্ব্বপ্রথমেই দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করে। উল্লিখিত পার্থক্য ব্যতীত গেজেল হাউণ্ডের সহিত গ্রে হাউণ্ডের অন্য বৈসাদৃশ্য নাই।

শ্লুঘি কুকুরগুলির দেহ অনেকটা সরল; কিন্তু চরণচতুষ্টয় অত্যন্ত দীর্ঘ। বর্ত্তমান কালের অন্য কোনও বিভিন্ন জাতীয় কুকুরের সংমিশ্রণে শ্লুঘি-জাতীয় কুকুরের উৎপাদন সম্ভবপর নহে বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; ইহা হইতেই এই কুকুরের প্রাচীনতা প্রমাণিত হয়।

গেজেল হাউণ্ড নানাবর্ণের দেখিতে পাওয়া যায়। মধ্যমাকৃতি গ্রে হাউণ্ডের ন্যায় ইহারা দীর্ঘ হইয়া থাকে।

আলাস্কার 'এস্কিমো' কুকুর

খাঁটি এস্কিমো জাতীয় কুকুর ক্রমেই দুর্ল্লভ হইয়া পড়িতেছে। আর্কটিক প্রদেশের অত্যন্ত নিভৃত প্রদেশে না গমন করিতে পারিলে অবিমিশ্র এস্কিমো কুকুর দেখিতে পাওয়া যাইবে না। শ্বেতাঙ্গদিগের কুকুরের সংমিশ্রণে সঙ্কর জাতীয় এস্কিমো কুকুরের প্রাধান্যই অধিক। এই জাতীয় কুকুরের নামও অনেক, শ্রেণীও বিবিধ। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এস্কিমো কুকুরের যে চিত্র প্রদত্ত হইল, তাহাতে নানাপ্রকার কুকুরের প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাওয়া যাইবে।

প্রত্যেক প্রকার এস্কিমো কুকুর বলিষ্ঠ ও আত্মনির্ভরশীল। ইহাদের দৃষ্টিশক্তি যেমন তীক্ষ্ণ, শ্রবণশক্তিও তদনুরূপ। তাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিও ঋতুর উপযোগী করিয়া গঠিত। ইহাদের শরীরের ওজন প্রায় ৩৫ সের। এস্কিমোরা ইহাদিগকে শ্লেজগাড়ীতে জুড়িয়া দিয়া গাড়ী চালায়। মেরু-প্রদেশস্থ ভল্লুক অথবা মৃগ সম্মুখে পড়িলে ইহারা তাহাদিগকে পলায়ন করিবার অবকাশ দেয় না। শিকারী না আসা পর্য্যন্ত তাহাদের গতিরোধ করিয়া থাকে।

'সাময়েড' বা সাইবিরীয় 'রেণ্ডিয়ার' কুকুর

এই জাতীয় কুকুর দেখিতে অনেকটা শ্বেত স্পিট্জ্ ও শ্বেত এস্কিমো কুকুরের অনুরূপ। ইহাদের স্বভাব অত্যন্ত সুন্দর। ইহারা মধ্যমাকার এবং ইহাদের শরীরের ওজন প্রায় অর্দ্ধমণ হইবে। আর্টিক অঞ্চলের অন্যান্য কুকুরের ন্যায় ইহারা চন্দ্রমল্লিকা পুষ্পের মত লাঙ্গুল পৃষ্ঠদেশে রক্ষা করে। কৃষ্ণতারক নয়ন, উন্নত কর্ণ এবং ঘন, কোমল শ্বেত রোমাবলী আছে বলিয়া ইহারা সহসা মানবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সাময়েড নামক রাসিয়ায় এক শ্রেণীর অর্দ্ধ যাযাবর সম্প্রদায় এই জাতীয় কুকুরের সাহায্যে শ্লেজ গাড়ী ব্যবহার করে বলিয়া কুকুরের নামও সাময়েড হইয়াছে।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

পাশ্চাত্য-প্রসঙ্গ
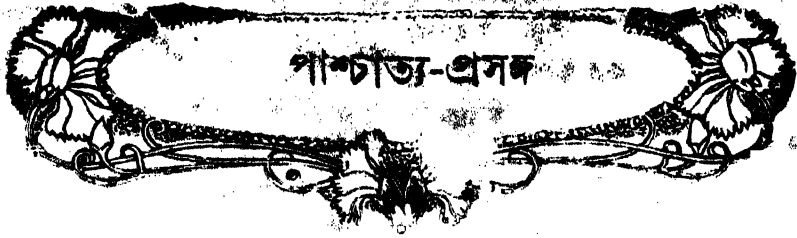
নারীদস্যু সোনিয়া সার্লিংএর আত্মকাহিনী।

১

আধুনিককালে যে সকল নারীদস্যুর অত্যাচারে য়ুরোপ ও আমেরিকার বহু দেশের ধনাঢ্য সমাজে মহাত্রাসের সঞ্চার হইয়াছিল এবং যাহারা অদ্ভুত সাহসে, অনন্যসাধারণ বুদ্ধিকৌশলে, চাতুর্য্যে য়ুরোপ ও আমেরিকার বহুদর্শী, সুদক্ষ ও সুচতুর পুলিসের চক্ষুতে ধূলা নিক্ষেপ করিয়া অবাধে দীর্ঘকাল পরস্বাপহরণ করিয়া আসিয়াছে, সোনিয়া সার্লিং তাহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। অল্পদিন পূর্ব্বে নিউইয়র্কে সোনিয়া সার্লিংএর যে আত্মকাহিনী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে তাহার অদ্ভুত সাহস ও বুদ্ধির পরিচয়ে স্তম্ভিত হইতে হয়। মনে হয়, ইহার তুলনায় ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস-লেখক-কল্পিত গোয়েন্দা কাহিনীগুলি কি তুচ্ছ! কুপথগামিনী নারী আত্মশক্তিতে নির্ভর করিয়া সাহস ও বুদ্ধির বলে একাকিনী কিরূপ অসাধ্যসাধন করিতে পারে, সোনিয়া সার্লিংএর আত্মকাহিনীতে তাহার প্রচুর দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান। 'মাসিক বসুমতী'র পাঠকপাঠিকাবর্গের মনোরঞ্জনের আশায় সোনিয়া সার্লিংএর 'আত্মকাহিনী' তাহার নিজের কথায় নিম্নে প্রকাশিত হইল। এই সুদীর্ঘ কাহিনী ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

* * * *

"লোক যে ভাবে আত্মজীবন-বৃত্তান্ত লিখিয়া থাকে, ঠিক সেই ভাবেই আমার আত্মকাহিনীতে আমার বিচিত্র ও বহু বিপৎসঙ্কুল কর্ম্মজীবনের অনতিরঞ্জিত বিবরণ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে। কিন্তু আমার আত্মকাহিনীর প্রারম্ভভাগেই আপনাদিগকে বলা আবশ্যক যে ফ্লরিডার দীপ্ত সূর্য্যালোকিত স্বচ্ছ নীলাকাশের তলে, তালীকুঞ্জের শ্যামল ছায়ায় আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। আমার জন্মস্থান ক্ষুদ্র রোমানো (Romano) নগর কোটিপতি ব্যবসায়িগণের কর্ম্মক্ষেত্র মিয়ামীর (Mimi) অদূরে অবস্থিত। অনেকেই বোধ হয় অবগত আছেন, বিপুল ধনধান্যপূর্ণ, কমলার পীঠতল তুল্য এই শোভাসম্পন্ন নগর ভীষণ ঘূর্ণাবর্ত্তে ধরাপৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গিয়াছে। সে খুব বেশীদিনের ঘটনা নহে।

য়ুরোপ ও আমেরিকার অজেয় নারী-দস্যু সোনিয়া সার্লিং

আমার পিতা স্থানীয় ব্যবহারাজীব ছিলেন; তিনি যেরূপ অসাধারণ পরিশ্রম করিতেন, সেইরূপ পিপে-বোঝাই মদও উদরস্থ করিতেন। আমি জন্মগ্রহণ করার প্রথম হইতেই তিনি আমাকে একটা বিষম আপদ্ বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। আমি অতি শৈশবেই মাতৃহীনা হইয়াছিলাম; সুতরাং লালনপালনের জন্য আমার পিতাকে যে অনেক ঝঞ্ঝাট সহ্য করিতে হইয়াছিল, এ কথার উল্লেখ বাহুল্যমাত্র। আমার পিতার অনাদরে ও উপেক্ষায়, তাঁহার নিষ্ঠুর ব্যবহারে আমার প্রকৃতির ঘোর পরিবর্ত্তন না হইলে আপনারা আমার এই আত্মকাহিনী শুনিতে পাইতেন না। আমার পারিবারিক ইতিহাস সম্বন্ধে আর

অধিক কিছুই বলিবার নাই এবং যাহা বলিলাম, তাহা শুনিয়াও কেহ সুখী হইবে না।

আমার বাল্যজীবন কি ভাবে কাটিয়াছিল, তাহা না লিখিলে ক্ষতি নাই; দুঃখময় শৈশব এবং বৈচিত্র্যহীন কৈশোর অতিবাহিত করিয়া আমি যখন সতের বৎসরে পড়িলাম, সেই সময় নগরের রোমান 'সেরিফ' আমাকে লক্ষ্য করিয়া এক দিন বলিয়াছিলেন, 'বেসায়েন্তা দুর্দ্দান্ত ধাড়ী মেয়ে।' কিন্তু সেই বয়সেই সংসার সম্বন্ধে আমি সকল অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলাম। এই সময় নিউইয়র্কের এক জন লোক ব্যবসায় উপলক্ষে রোমানো নগরে আসিয়াছিল; লোকটি সুপুরুষ। সে আমাকে দেখিয়া আমার সঙ্গে ভাব করিয়া ফেলিল। কিছু দিন পরে সে নিউইয়র্কে প্রস্থান করিল; কিন্তু সে আমার নিকট বিদায় লইবার পূর্ব্বে এক দিন তালীকুঞ্জ-চ্ছায়ায় আমার পাশে বসিয়া নিউইয়র্ক সম্বন্ধে এমন অদ্ভুত মজার গল্প বলিল যে, রোমানো নগর পরিত্যাগ করিয়া নিউ-ইয়র্কের 'অকূলপাথারে' আমার জীবনতরণী ভাসাইবার জন্য আমি ব্যাকুল হইয়া উঠিলাম।

নিউইয়র্কের হোয়াইটওয়ে নামক রাজপথে অবস্থিত—সোনিয়া সার্লিংএর বাসভবন

আঠার বৎসর বয়সে সম্পূর্ণ নিঃসম্বল অবস্থায় নিউইয়র্কে আমি পলায়ন করিলাম। কত আশায়, কত সুখের স্বপ্নে তখন আমার হৃদয় পরিপূর্ণ! নরনারীর জীবনের বৈচিত্র্য পর্য্যবেক্ষণের জন্য কি আকুল আগ্রহ! আমার সেই আগ্রহ পূর্ণ করিবার সুযোগও আমি পাইয়াছিলাম। নিউইয়র্কে কিছু দিন বাস করিবার পর হঠাৎ এক দিন একটি ভদ্রলোক বন্ধুর (a gentleman friend) সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। পরে জানিতে পারিলাম, পুলিস যে সকল ভদ্রলোকের গতি-বিধির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে, সে তাহাদেরই এক জন। লোকটি মার্জ্জিতরুচিসম্পন্ন, মিষ্টভাষী, সুচতুর তস্কর। বাল্যকাল হইতেই আমার নীতিজ্ঞান এরূপ টন্‌টনে হইয়াছিল যে, আমার দশ বৎসর বয়সের সময়েও যদি কাহাকেও ফৌজদারী আইন অগ্রাহ্য করিয়া, কোন নীতিবিরুদ্ধ কায করিতে দেখিতাম, তাহা হইলে তাঁহাকে একটা মানুষের মত মানুষ বলিয়া মনে করিতাম; তাহার প্রতি শ্রদ্ধায় আমার হৃদয় ভরিয়া উঠিত। সুতরাং জিমি পুলিসের চিহ্নিত লোক, ইহা জানিয়াও তাহার সংস্রব ত্যাগ করিতে আমার প্রবৃত্তি হইল না। সে সুদক্ষ তস্কর বলিয়াই আমি তাহার পক্ষপাতী হইলাম; তাহাকে দেবতার ন্যায় সম্মান করিতে লাগিলাম। জিমি কিন্তু সাধারণ তস্কর ছিল না; যে সকল লোক যৌথ কারবারের সেয়ারের ব্যবসায় করিত, জিমি তাহাদিগকে প্রতারিত করিয়া বেশ মোটা মোটা দাঁও মারিত। নিউইয়র্কের ওয়াল ষ্ট্রীটে যে সকল 'মহাজন-হাঙ্গর' বৈধ উপায়ে সাধারণের বিত্ত গ্রাস করিত, সে তাহাদেরই মুখের গ্রাস কাড়িয়া খাইত। তবে তাহার এই প্রক্রিয়াটি বৈধ বলিয়া পরিগণিত হইত না। কিন্তু আইনের গণ্ডী সকলে মানিয়া চলিবে, ইহা আশা করা অন্যায়। জিমির বয়স তখন ৩০ বৎসরের অধিক হয় নাই; তাহার বেশভূষার পারিপাট্য নিখুঁত ছিল; নগরের যে সকল স্থানে শিকার মিলিত, সেই সকল স্থান সম্বন্ধে তাহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল; সকল বড় কারবারীকেই সে চিনিত। আমার সঙ্গে আলাপ করিয়া সে-বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছিল, আমি তাহার হাতের খুব ভাল 'সিঁধকাঠী' হইতে পারিব। তাহার আশা হইয়াছিল, আমি তাহার শিকারগুলাকে ভুলাইয়া তাহার ফাঁদে ফেলিতে পারিব; তখন তাহাদিগকে দোহন করা সহজ হইবে।

জিমির সহিত আমার প্রথম পরিচয়ও ঔপন্যাসিক ঘটনার ন্যায় অদ্ভুত। রাস্তায় চলিতে চলিতে সে ও আমি দৈবক্রমে এক গাড়ীতে উঠিয়াছিলাম। সেই গাড়ীতেই আমাদের আলাপ জমিয়া গেল। তাহার সহিত আমার মনের মিল হইতে অধিক বিলম্ব হইল না। অবশেষে আমরা

একসঙ্গেই গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলাম। একটা ভোজনাগারে প্রবেশ করিয়া তাহার সঙ্গে খাইতে বসিলাম। সেই সময় জিমি প্রস্তাব করিল, আমরা উভয়ে বখরাদারীতে ব্যবসায় চালাইব। আমার তখন সম্বল চারিটি ডলার মাত্র; তাহা নিঃশেষিত হইলেই অনাহারে মৃত্যু রহিত করিবার কোন উপায় ছিল না। এ অবস্থায় নরহত্যা ভিন্ন অন্য যে কোন প্রস্তাবে আমি সম্মত হইতাম, প্রতারণা-প্রবঞ্চনার সাহায্যে অর্থোপার্জ্জন ত সামান্য কথা

সেই সময় আমার অঙ্গে যে পরিচ্ছদ ছিল, তাহা ভদ্র-সমাজে অচল। তাহা দেখিয়া জিমি আমাকে নিউইয়র্কের পঞ্চম এভিনিউএ লইয়া গেল, এবং আমার জন্য কয়েক শত ডলার মূল্যের উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ ক্রয় করিল। সে বলিল, ভবিষ্যতের জন্য ইহাই আমার ব্যবসায়ের মূলধন।

অতঃপর জিমি আমাকে তাহার আড্ডায় লইয়া গিয়া কয়েক দিন ধরিয়া শিখাইয়া-পড়াইয়া ঠিক করিয়া লইল। আমি তাহার সাহায্যে সেয়ারের বাজারে জুয়াচুরী করিবার অনেক কৌশল শিখিয়া ফেলিলাম। সেয়ারের বাজার-প্রচলিত অনেক নূতন কথা আমাকে মুখস্থ করিতে হইল। এই ভাবে মোটামুটি সকল বিষয় আয়ত্ত করিয়া আমি ব্যবসায়-ক্ষেত্রে নামিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম এবং নিউইয়র্কের সপ্তম এভিনিউএ একটি বাসা ভাড়া লইয়া জুয়াচুরীর আফিস খুলিয়া বসিলাম। অল্পকাল পরেই একটা বড় দাঁও জুটিল। জিমির সাহায্যে আমি 'টি অয়েল ষ্টক কর্পোরেশন' নামক এক ঝুটা কারবারের দালাল হইলাম। স্থির হইল, আমাদিগকে কয়েক লক্ষ ডলারের সেয়ার বিক্রয় করিতে হইবে। সেয়ার বিক্রয় করিয়া যে টাকা সংগৃহীত হইবে, আমরা উভয়ে তাহার এক-তৃতীয়াংশ পাইব; এতদ্ভিন্ন এক হাজার ডলার এই ঝুটা কারবারের মূলধনরূপে আমাদিগকে অগ্রিম দেওয়া হইবে। আরও স্থির হইল, এই ব্যবসায়ের সেয়ার বিক্রয়ের জন্য আমাদিগকে নিউইয়র্কের বিভিন্ন অংশে, পেন্‌সিলভেনিয়ায় ও মেইনে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে। আমার রূপ ছিল, যৌবন ছিল, অনেক বড় লোকের অকালকুষ্মাণ্ড বংশধরকে মিষ্ট কথায় ভুলাইয়া বিস্তর টাকার সেয়ার বিক্রয় করিতে পারিব, এ বিষয়ে জিমি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হইয়াছিল। আত্মশক্তিতে আমারও তখন বিশ্বাস হইয়াছিল।

অতঃপর শিকার জুটাইবার জন্য আমি চিকাগো যাত্রা করিলাম; জিমিও আমার সঙ্গে চলিল। ট্রেণের 'ডাইনিং কারে' ঐ শ্রেণীর দুইটি ধনিনন্দনের সহিত আমার পরিচয় হইল। জিমি কথায় কথায় তাহাদের কাছে সেয়ার বিক্রয়ের কথা পাড়িল; কোম্পানীর সেয়ার ক্রয় করিলে প্রচুর লভ্যাংশ মিলিবে, এ কথাও তাহাদের বুঝাইয়া দিল; কিন্তু তাহারা জিমির বক্তৃতায় ও সেয়ারের প্রচুর লভ্যাংশের লোভে মুগ্ধ না হইলেও আমার রূপে হইয়াছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। রূপের বঁড়শীতে আমি শিকার দুইটাকে গাঁথিয়া ফেলিলাম। ইহার ফলে আমরা ট্রেণ হইতে নামিবার পূর্ব্বেই তাহাদের নিকট ১৪ শত ডলারের সেয়ার বিক্রয় করিলাম। কিন্তু আমাকে অঙ্গীকার করিতে হইল, সেই রাত্রিতেই আমাকে তাহাদের প্রত্যেকের বাগান-বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া তাহাদের সহিত পানাহার করিতে হইবে। আমি তাহাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম, এবং ঠিক একই সময়ে তাহাদের উভয় বাগানবাড়ীতে উপস্থিত হই-বার অঙ্গীকার করিলাম। আমি একই সময়ে সেই দুইটি ভদ্রসন্তানের দুইটি স্বতন্ত্র বাগান-বাড়ীতে কিরূপে উপস্থিত হইব, তাহা বুঝিতে না পারিয়া আপনারা বিস্মিত হইতে-ছেন; কিন্তু বিস্ময়ের কারণ নাই। সেয়ারের টাকা নগদ আদায় হইয়াছিল, সুতরাং আমি অঙ্গীকার পালন করা প্রয়োজন মনে করি নাই। আমার প্রতীক্ষায় তাহাদের রাত্রিজাগরণই সার হইয়াছিল।

'তেলের দালাল' জিমির বিশ্বাস ছিল, বাহ্যাড়ম্বর ভিন্ন কোনও ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারা যায় না, বিশেষতঃ প্রবঞ্চনাই যে ব্যবসায়ের মূলধন অর্থাৎ নির্ব্বোধদের ঠকাইয়া অর্থোপার্জ্জনই যে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য, সেই ব্যবসায় যথেষ্ট সমারোহের সহিত আরম্ভ না করিলে চলে না। এই জন্য আমরা চিকাগোর 'কন্‌গ্রেস্ হোটেলে' কয়েকটি সুপ্রশস্ত সুসজ্জিত কক্ষ ভাড়া লইয়া সেখানে আমীরী চালে বাস করিতে লাগিলাম এবং একখানি মূল্যবান্ 'মোটরকার' ভাড়া করিয়া শিকারের সন্ধানে চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

দুই সপ্তাহ ধরিয়া চিকাগো ও তাহার সন্নিহিত নগর-সমূহে আমরা ঝুটা কারবারের সেয়ার বিক্রয়ের চেষ্টা করিলাম। ফল মন্দ হয় নাই। দুই সপ্তাহের মধ্যেই সাত

সহস্রাধিক ডলার আমাদের হস্তগত হইল। জিমি 'খদ্দের পটাইবার' জন্য 'মোটর-কারে' বাহিরে চলিয়া যাইত; আমিও শিকার জুটাইবার আশায় বড় বড় হোটেলে ঘুরিতাম। আমার পরিচ্ছদের ঘটায় ও রূপের ছটায় রসলিপ্সু, ধনবান্ যুবকের দল আকৃষ্ট হইয়া আমার ফাঁদে পড়িত, এবং আমাকে খুসী করিবার জন্য বিস্তর টাকার সেয়ার কিনিয়া ফেলিত; তবে আমি স্বয়ং তাহাদের নিকট সেয়ার বিক্রয়ের চেষ্টা করিয়া নিজেকে খেলো করিতাম না। তাহারা আমাদের হোটেলে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলে, আমি আমার ব্যবসায়ের বখরাদার জিমির সহিত তাহাদের পরিচয় করিয়া দিতাম। জিমিও বাগ্‌বিভূতি দ্বারা তাহাদের মনোরঞ্জন করিয়া সেয়ার বিক্রয়ের টাকাগুলি হস্তগত করিত। ইহা ভিন্ন আমার উপরি লাভও নিতান্ত অল্প হইত না। আমার রূপমুগ্ধ প্রেমিকরা মূল্যবান্ জহরতের অলঙ্কার, উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদাদি উপহার দিয়া আমার মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিত।

কিন্তু জিমি অত্যন্ত লোভী ছিল; আমি অনেকগুলি জহরতের অলঙ্কার উপহার পাইয়াছি দেখিয়া, সে আমার নিকট তাহারও অর্দ্ধেক বখরা চাহিয়া বসিল। আমি তাহার প্রস্তাবে অসম্মতি জানাইয়া বলিলাম, 'আমরা স্ব স্ব রূপের চটকে বোকাগুলাকে ভুলাইয়া যাহা উপার্জ্জন করিব, তাহা আমাদের নিজস্ব সামগ্রী। তোমার রূপে ভুলিয়া যদি কেহ তোমাকে কোন মূল্যবান্ উপহার প্রদান করে, আমি তাহার বখরা চাহি না; আমি যাহা উপহার পাইব, তুমিও তাহাতে লোভ করিও না। তুমিও ত রূপবান্ পুরুষ, ধনাঢ্য পরিবারের সুরসিকা প্রেমিকা যুবতীদিগকে মুগ্ধ করিয়া নানাপ্রকার মূল্যবান্ উপহার তুমিও সংগ্রহ করিতে পার, তাহা তোমারই থাকিবে।' আমার যুক্তি শুনিয়া জিমি নির্ব্বাক্ হইল।

আমি চিকাগো নগরে বাসকালে সুপ্রসিদ্ধ তস্করগণের নিকট চুরী বিদ্যাটা চমৎকার আয়ত্ত করিয়া লইলাম; সেখানে চুরী, ডাকাতী, বাটপাড়ী ও প্রবঞ্চনার যে সকল কৌশল শিখিয়াছিলাম, অন্য কোনও স্থানে এই বিদ্যায় তেমন নৈপুণ্য লাভ করিতে পারি নাই। চিকাগোতে নানা শ্রেণীর দস্যু-তস্করের যেরূপ বড় বড় আড্ডা আছে এবং সেই সকল আড্ডায় যেরূপ শক্তিশালী, প্রতিভাসম্পন্ন, সুচতুর দস্যু, তস্কর, ঠক, বাটপাড় দেখিতে পাওয়া যায়, পৃথিবীর অন্য কোন নগরে সেরূপ নাই। চুরী-ব্যবসায়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য আমাকে রাত্রিকালে বড় বড় আড্ডায় ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত; অনেক দস্যু-তস্করের সহিত ঘনিষ্ঠতা না করিলে চলিত না। এই সকল স্থানে যাইবার সময় আত্মরক্ষার জন্য আমাকে টোটাভরা পিস্তল পরিচ্ছদের মধ্যে লুকাইয়া রাখিতে হইত। বিপদের সম্ভাবনা ঘটিলে আমাকে তাহা কখন কখন ব্যবহারও করিতে হইত। সেই পিস্তলটি জিমি আমাকে কিনিয়া দিয়াছিল, এ জন্য সে আমার ধন্যবাদের পাত্র। গত ছয় বৎসরের মধ্যে আমি কোন দিন সেই পিস্তলটি কাছ-ছাড়া করি নাই।

আমরা মনে করিয়াছিলাম, চিকাগো সহরে আরও কিছু দিন কাটাইয়া যাইব; কিন্তু চিকাগোর কোনও কুস্থানে একটা নাচের মজলিসে হঠাৎ এক দিন এরূপ একটি দুর্ঘটনা ঘটিল যে, 'যঃ পলায়তি, স জীবতি' এই মহাজনবাক্যের অনুসরণ না করিলে আমাদের পরিত্রাণের কোন উপায় দেখিলাম না।

'টি-অয়েল ষ্টক কর্পোরেশনের' সেয়ার বিক্রয়ের কার্য্যে সারাদিন ঘুরিয়া পরিশ্রান্ত হওয়ায় একটু আমোদ ও বিশ্রামের আশায় সন্ধ্যার পর আমরা সেই নাচের মজলিসে যোগদান করিলাম। আমরা 'নাচের হলে' (dance hall) প্রবেশ করিয়া আসনগ্রহণের পর এক এক গ্লাস পানীয়ের 'ফরমাস' করিয়াছি, এমন সময় একটা কালো কুৎসিত বিকটাকার নিগ্রো আমার সম্মুখে আসিয়াই আমাকে তাহার সঙ্গে নাচিবার জন্য অনুরোধ করিল। নিগ্রোটার আকারপ্রকার দেখিয়াই আমার চক্ষুস্থির।

এখানে বলা আবশ্যক, আমি আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলের সামাজিক শিক্ষা লাভ করিয়াছিলাম; সেই সমাজের আবহাওয়ায় বর্দ্ধিত হইয়াছিলাম। সেই সমাজে নিগ্রো প্রভৃতি কৃষ্ণবর্ণ জাতিকে এরূপ ঘৃণা করা হয় যে, বিষাক্ত কীটপতঙ্গগুলিও ততদূর ঘৃণার বস্তু নহে। এইরূপ একটা নিগ্রো নাচের মজলিসে আসিয়া আমার ন্যায় শ্বেতাঙ্গীকে তাহার নৃত্যসঙ্গিনী হইবার জন্য অনুরোধ করিতে সাহস করিল! তাহার ধৃষ্টতায় আমার রক্ত গরম হইয়া উঠিল। জিমি তাহার এই অসঙ্গত আবদারের প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু আমি তাহার সহায়তা অনাবশ্যক মনে

করিলাম এবং তৎক্ষণাৎ টেবল হইতে হুইস্কি-পূর্ণ একটা বোতল তুলিয়া লইয়া, তাহা সেই কালা দৈত্যটার পশমী কেশাবৃত মস্তকে চূর্ণ করিলাম। সেই প্রচণ্ড আঘাতে সে ষাঁড়ের মত গর্জ্জন করিয়া আমার দিকে রুখিয়া আসিল। তখন আমি বুকের পকেট হইতে পিস্তলটা বাহির করিয়া তাহার বুকে গুলী মারিলাম। সেই গুলী তাহার বক্ষঃস্থলে প্রবেশ করিল, সে তৎক্ষণাৎ সশব্দে মেঝের উপর সটান পড়িয়া গেল।

নিগ্রোটার অবস্থা দেখিয়া তাহার সঙ্গী কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রোর দল ক্ষিপ্ত কুকুরের মত আমাকে তাড়া করিল; মুহূর্ত্ত পরেই আমার অবস্থা নিশ্চয়ই অত্যন্ত সঙ্গীন হইয়া উঠিত, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্ত্তে কে চীৎকার করিয়া বলিল, 'ষাঁড়! ষাঁড়!' অর্থাৎ 'পুলিস আসিয়া পড়িয়াছে; সতর্ক হও।' বোধ হয়, পিস্তলের আওয়াজে আকৃষ্ট হইয়াই পুলিসের প্রহরীরা সেখানে আসিয়া পড়িয়াছিল। পুলিস আসিয়াছে শুনিয়া কে এক জন মুহূর্ত্তমধ্যে সেই কক্ষের সমুদয় বৈদ্যুতিক দীপ নির্ব্বাপিত করিল। সেই সুযোগে আমি জিমির সাহায্যে সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন কক্ষ হইতে পলায়ন করিলাম। আমাদের মোটর-গাড়ী পথে দাঁড়াইয়া আমাদের প্রতীক্ষা করিতেছিল; অবিলম্বে তাহাতে উঠিয়া সেই স্থান হইতে চম্পট দান করিলাম।

পরদিন প্রভাতে আমরা চিকাগো নগরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া অন্য নগরে প্রস্থান করিলাম এবং ক্রমাগত ৩ মাসকাল বহু গ্রাম ও নগর পরিভ্রমণ করিয়া বিস্তর সেয়ার বিক্রয় করিলাম। অবশেষে ডিট্রয়িটে আসিয়া আমাদের সংগৃহীত অর্থরাশি সামলাইয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করিলাম। এই সময় আমরা 'টি-অয়েল ষ্টক কর্পোরেশনে'র অধ্যক্ষের এক টেলিগ্রাম পাইলাম। সেয়ার বিক্রয় করিয়া যে টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা লইয়া অবিলম্বে নিউইয়র্কে উপস্থিত হইবার জন্য তিনি আদেশ করিয়াছিলেন। যথাসময়ে সংগৃহীত অর্থের হিসাব হইলে দেখা গেল, অংশানুসারে আমাদের উভয়ের ১৮ হাজার ডলার প্রাপ্য হইয়াছে। তাহা হইতে জিমি ১০ হাজার ডলার গ্রহণ করিল, অবশিষ্ট ৮ হাজার ডলার অর্থাৎ ১৬ শত পাউণ্ড আমি পাইলাম। জিমি তাহার টাকাগুলা লইয়া ব্রড্‌ওয়েতে নূতন ব্যবসায় আরম্ভ করিল; কিন্তু আমি তাহার কারবারে যোগদান না করিয়া আমার অংশের টাকাগুলি ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিলাম। নানা কারণে জিমির সহিত আমার মনান্তর চলিতেছিল; এই জন্য আমি স্থির করিলাম, অতঃপর তাহার সঙ্গে বখরায় কায না করিয়া একাকিনী স্বাধীনভাবে ব্যবসায় আরম্ভ করিব। কারণ, সে সময় জিমি বা অন্য কাহারও সহায়তা না পাইলেও আমার ক্ষতি ছিল না; তখন ব্যাঙ্কে আমার কয়েক সহস্র ডলার মজুত, নানাবিধ উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদে আমার পরিচ্ছদাগার পূর্ণ, আসল হীরা-জহরতের অলঙ্কারও নিতান্ত অল্প ছিল না; এ অবস্থায় আমি অন্যের সহায়তা ব্যতীত একাকী উন্নতির পথ প্রশস্ত করিতে পারিব, এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না।

আমি জিমির সহিত বখরায় ব্যবসায় চালাইতে অসম্মত হইয়া তাহার সংস্রব ত্যাগ করায় তাহার অত্যন্ত রাগ হইল। হইবার কথা, সে জানিত, আমার সহিত বখরাদারীতে ব্যবসায় করিয়া তাহার যেরূপ লাভ হইতেছিল, আমার সাহায্যে বঞ্চিত হইয়া নিজের চেষ্টায় সে সেরূপ লাভবান্ হইতে পারিবে না। তাহাকে ত্যাগ করায় আমার কোন ক্ষতি হইবে না—ইহাও সে বুঝিতে পারিয়াছিল; কিন্তু গরজ বড় বালাই! সে আমাকে তাহার দলে পুনর্ব্বার ভিড়াইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিল; অবশেষে ক্রোধান্ধ হইয়া আমাকে ভয় দেখাইতে লাগিল। আমার সর্ব্বনাশ করিবে বলিয়া সক্রোধে তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে লাগিল। আমি বিরক্ত হইয়া স্যাম্পেনের একটা বোতল লইয়া তাহাকে এক ঘা বসাইয়া দিলাম। তাহার পর সে আর কোনও দিন আমাকে বিরক্ত করিতে সাহস করে নাই।

আমি ভাবিয়া দেখিলাম, যে নারীর রূপ আছে, যৌবন আছে এবং সেই সঙ্গে নির্ব্বোধ পুরুষগুলাকে বশীভূত করিবার শক্তি আছে, তাহার অর্থোপার্জ্জনের পন্থা স্বতন্ত্র; নিউইয়র্কের ব্রডওয়েতে বাসা লইয়া সে যদি প্রজাপতি সাজিতে পারে, তাহা হইলে অল্পদিনেই বিপুল অর্থ তাহার হস্তগত হইবার সম্ভাবনা আছে।

অতঃপর আমি এই পন্থা অবলম্বনে কৃতসঙ্কল্প হইলাম। ভাবিলাম, এই উপায়ে পুরুষবিহঙ্গগুলিকে ধরিয়া পিঞ্জরাবদ্ধ করিব; তাহারা আমার জন্য "স্বর্ণ-ডিম্ব প্রসব করিবে।" আমার এই সঙ্কল্পানুসারে কায আরম্ভ করিতে বিলম্ব হইল না। তিন সপ্তাহের মধ্যে আমার রূপ-যৌবন ও বিদ্যা-বুদ্ধির প্রশংসায় চতুর্দ্দিক্ মুখরিত হইয়া উঠিল। ব্রডওয়ে পল্লীতে আমি একটি দর্শনীয় বস্তু

হইয়া উঠিলাম এবং যে সকল ধনাঢ্য যুবক ব্রডওয়ের হোয়াইটওয়েস্থিত প্রমোদাগার-সমূহে আমোদ-প্রমোদ করিতে গিয়া এক এক রাত্রিতে সহস্র সহস্র মুদ্রা জলস্রোতের মত ব্যয় করিয়া আইসে, তাহারা আমার মনোরঞ্জনের আশায় বিপুল অর্থরাশি আমার পদমূলে ঢালিয়া দিতে লাগিল। আমার একটু মিষ্ট হাসি, আমার একটি বিলোল কটাক্ষের জন্য তাহারা যেন ক্ষেপিয়া উঠিল! তাহারা আমাকে তাহাদের আরাধ্য দেবতা মনে করিতে লাগিল। কিন্তু আট সপ্তাহের মধ্যেই ব্রডওয়ে আমার পক্ষে দুঃসহ হইয়া উঠিল; অতঃপর সেখানে বাস করা আমার অসাধ্য হইল। সে সকল কথা আর এক দিন বলিব; আজ এই পর্য্যন্ত।" [ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

বৈশাখ

হে বৈশাখ,—নির্ম্মেঘ নির্ম্মল,
হে উজ্জ্বল,
হে রুদ্র সুন্দর।
শুভ্র শঙ্খ বাজে তব ভরিয়া অম্বর
উচ্ছ্রিত দীপকে—
তপস্তপ্ত রৌদ্রের পুলকে।
তমোহর
তব শঙ্খস্বর
দিকে দিকে দেয় আনি'
নবীন দিবার নব দীপ্তিময়ী অগ্নিময়ী বাণী,
নব বরষের ডাক,—
"ওরে মুগ্ধ! ওরে মূঢ়! ওরে ভীরু! ওঠ্, তোরা
অন্তরের অন্ধকার
বন্ধ দ্বার
অর্গল হরিয়া,
দলে-দলে, সারি-সারি, আয় বাহিরিয়া
আত্মার শক্তির স্পন্দে,
প্রাণের আনন্দে,
জীবনের, যৌবনের, আলোকের পথে—
দৃঢ়, দ্রুতপদে।"

বসন্তের স্নিগ্ধশ্যাম কুঞ্জ-ছায়া দিয়ে,
ফেনোচ্ছল সুরা-পাত্র নিয়ে,
বিলাসের, কামনার অভিসার
নহেক এবার;
এবার চলিতে হবে
সাধনার বেদনা-আহবে
তপস্যার সরণি বাহিয়া,
অগ্নি-শুদ্ধ-হিয়া
সূর্য্যমুখী সূর্য্যমুখী সাথে
সম পদ-পাতে;—
ঐ দেখ্,—চম্পকের চলা
রৌদ্র-জলা
নগ্ন মুক্ত তপ্ত নভস্তলে,
বিকশিয়া চিত্ত-দলে,
জাগ্রত গৌরবে—
উগ্রতম মর্ম্মের সৌরভে;
চলে' চল্, চলে' চল্ তবে।

অতীতের ক্ষয়-ক্ষতি যত—
শুকান' ফলের ব্যথা, হারাণ' মণির স্মৃতি-ক্ষত,
ভুলে' যা রে আজি সব
বিগত বৈভব;
ভুলে' যা—সুধার পাত্র পান লাগি' অধরে তুলিতে
হাত কেঁপে পড়ে' যাওয়া পথের ধূলিতে।
সারা বরষের যত শ্রান্তি,
যত গ্লানি, ভুল-ভ্রান্তি,
পথ-চলা
চরণের—ধূলি-মাটী-মলা,
কালের নির্ঝর-স্রোতে আজি ধৌত করি'
আয় তোরা নববস্ত্র পরি'।

হে বৈশাখ,—দেবতা সুন্দর!
ওগো ভয়ঙ্কর!
তব আবাহন-শঙ্খ-রবে
তবু যারা বসি' রবে
রুদ্ধ করি' দ্বার,
নিস্পন্দ অসাড়;
তুমি তাহাদের দ্বারে
কাল-বৈশাখীর হাহাকারে
কর' কর' রুদ্র পদ-পাত,—
ভয়ঙ্কর ভৈরবের বেশে
হান' এসে
প্রচণ্ড আঘাত,—
দ্বার ভেঙে' আনো তারে ঘরের বাহিরে
আলোকের তীরে।
হে বৈশাখ,—হে রুদ্র সুন্দর!
প্রাণ দাও, আলো দাও, দাও মুক্তি, শক্তির নির্ভর!

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী।

প্রাচীন ভারতে মন্ত্রি-মণ্ডলী

আজকাল অজ্ঞতার এবং কুশিক্ষার প্রভাবে আমাদের মধ্যে অনেকের মনেই কেমন একটা ধারণা জন্মিয়াছে যে, প্রাচীন ভারতে কেবল ধর্ম্মেরই চর্চ্চা হইয়াছিল, ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মচিন্তা লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন, তাঁহারা দেশ শুদ্ধ লোককে কেবল ধর্ম্মভাবেই ভাবিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবে দেশের লোক ধর্ম্মভাবে এতই বিভোর হইয়া উঠিয়াছিল যে, এ দেশে রাজনীতিচর্চ্চা কখনই বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হয় নাই। এ দেশের ব্যুরোক্রেশীও বলিয়া থাকেন যে, রাজনীতিক আলোচনা এ দেশের লোকের ধাতু-প্রকৃতির সহিত খাপ খায় না,—সুতরাং উঁহাদের রাজনীতিচর্চ্চা বন্ধ করাই কর্ত্তব্য। বলা বাহুল্য, তাঁহাদের এই উক্তি একেবারেই অজ্ঞতাসূচক ও মিথ্যা। অতি প্রাচীনকালে ভারতে রাজনীতিচর্চ্চা বিশেষভাবে বিকাশ লাভ করিয়াছিল এবং ঐহিক ব্যাপারে উহার প্রাধান্য এবং প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে স্বীকৃত হইত। অতি প্রাচীনকালে রাজনীতি রাজধর্ম্ম নামে অভিহিত ছিল। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে,—"যেরূপ ক্ষুদ্র জন্তু সকলের পদচিহ্ন সকল হস্তিপদচিহ্নমধ্যে বিলীন হয়, সেইরূপ সকল প্রকার ধর্ম্মই রাজধর্ম্ম (Politics)-মধ্যে লীন বলিয়া জানিবে।" অপি তু, "সকল বিদ্যাই রাজধর্ম্মযুক্ত এবং সকল লোকেই রাজধর্ম্মে প্রবিষ্ট।" (মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ৬৩ অধ্যায়)। * শুক্রনীতিও প্রাচীন রাজনীতিক গ্রন্থ। উহাতে উক্ত হইয়াছে,—"অন্য সকল শাস্ত্রই ক্রিয়ৈকদেশবোধী অর্থাৎ তাহাতে মানুষের বিশিষ্ট কতকগুলি কার্য্যের কথাই আলোচিত হইয়া থাকে, কিন্তু নীতিশাস্ত্র অর্থাৎ রাজনীতিশাস্ত্র সকলেরই সর্ব্বক্ষেত্রে প্রয়োজনসাধক (সর্ব্বোপজীবক), উহা সমাজরক্ষার উপায়স্বরূপ।" (শুক্রনীতি ১ম অধ্যায় ৮-৯)। কামন্দক, কৌটিল্য প্রভৃতি ঐ কথাই বলিয়াছেন। সুতরাং রাজনীতির (Politics) প্রয়োজনীয়তা প্রাচীন ভারতে অস্বীকৃত ছিল না। বাহুল্য-বোধে আমি এ স্থলে আর অধিক প্রমাণ উদ্ধৃত করিলাম না।

কিন্তু লোকের মনে স্বতঃই এই প্রশ্ন উদিত হইতে পারে যে, যদি প্রাচীন ভারতে রাজনীতির চর্চ্চা এতই উচ্চস্থান অধিকৃত করিয়াছিল, তাহা হইলে এই বিষয়ের কোন বিশিষ্ট গ্রন্থ পাওয়া যায় না কেন? প্রাচীন ভারতীয় হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র, কাব্য, দর্শন, জ্যোতিষ প্রভৃতি সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ পাওয়া যায়, কিন্তু রাজধর্ম্ম বা রাজনীতি সম্বন্ধে কোন বিশিষ্ট গ্রন্থই মিলে না কেন? উহা মহাভারতের একদেশে বা রামায়ণের এক কোণে একটু সামান্য স্থান পাইয়াছে কেন? এই প্রশ্নগুলি লোকের মনে স্বতঃই উদিত হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা আলোচনা করিয়া দেখিলে ইহার কারণ সহজেই বুঝা যায়। ইতঃপূর্ব্বে আমি "ইতিহাস ও পুরাণ" শীর্ষক সন্দর্ভে দেখাইয়াছি যে, আমাদের দেশের বহু মূল্যবান্ গ্রন্থই রাষ্ট্রবিপ্লবকালে এবং কালের প্রভাবে কীটদষ্ট হইয়া বিস্মৃতির করালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। কিন্তু ঐরূপ গ্রন্থ যে অনেক ছিল, তাহার যথেষ্ট জলন্ত প্রমাণ এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নিতান্ত অধিক না হইলেও একেবারে অল্প নহে। আবার সেই সকল গ্রন্থে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের যে সকল প্রামাণ্য গ্রন্থের ও গ্রন্থকারের উল্লেখ দেখা যায়, তাহাতে বুঝা যায় যে, বৌদ্ধ যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী কালেও রাজনীতিক বিষয়ে ভারতে একটা বিস্তীর্ণ সাহিত্য ছিল। কেবল তাহাই নহে। রাজনীতিক্ষেত্রে নানা মতাবলম্বী লোক ছিলেন এবং অনেক মনস্বী রাজনীতিক আপনাদের প্রতিভাবলে এক একটি স্বতন্ত্র রাজনীতিক চিন্তার ধারা প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন। এক এক জন বিশিষ্ট ব্যক্তির মতাবলম্বন করিয়া

* মহাভারতের সকল সংস্করণে অধ্যায়ভাগ এবং শ্লোকসংখ্যা সমান নহে। সেই জন্য এইখানে শ্লোকসংখ্যা প্রদত্ত হইল না। অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণের নিকট যে সংস্করণ আছে, তাহাতে ইহা দেখিয়া লইবেন।

বা চিন্তার ধারা বাহিত হইয়া এক একটি রাজনীতিক দল বা সম্প্রদায় রচিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে যে সকল রাজনীতির গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে,তাহা বিশেষ মনোযোগের সহিত আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, এইরূপ বহু সম্প্রদায়ভুক্ত রাজনীতিক প্রাচীনকালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র আলোচনা করিলে কতকগুলি রাজনীতিক সম্প্রদায়ের (Schools of politicians) নাম পাওয়া যায় যথা —

(১) "মানবাঃ" অর্থাৎ মনুর মতাবলম্বী সম্প্রদায়।

(২) "বার্হস্পত্যাঃ" অর্থাৎ বৃহস্পতি এবং তাঁহার সহিত একমতাবলম্বী রাজনীতিক সম্প্রদায়।

(৩) "ঔশনসঃ" অর্থাৎ উশনা এবং তাঁহার সমমতাবলম্বী রাজনীতিক দল।

(৪) "পারাশরাঃ" অর্থাৎ পরাশর এবং তাঁহার মতাবলম্বী রাজনীতিক সম্প্রদায়।

এইরূপ আরও কয়েকটি দল ছিল। শুক্রাচার্য্যের প্রবর্ত্তিত রাজনীতিকদিগেরও একটি গণ বা সঙ্ঘ ছিল। উহা ভার্গবগণ নামে আখ্যাত হইত। বর্ত্তমানকালে "শুক্রনীতিসার" নামক যে রাজনীতিক গ্রন্থ আছে, তাহা শুক্রাচার্য্য প্রণীত আসল রাজনীতিক সন্দর্ভ নহে, উহা তাঁহারই compendium বা সিদ্ধান্তগুলির সংগ্রহমাত্র। তাহাদের হেতুবাদ বা তর্ক বিস্তৃতভাবে উহাতে প্রদত্ত হয় নাই, অতি সংক্ষিপ্তভাবে দুই এক স্থলে উহা প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার প্রমাণ উক্ত গ্রন্থমধ্যেই পাওয়া যায়।

শুক্রনীতির প্রথমেই লিখিত হইয়াছে যে, স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা প্রথমে রাজনীতি সম্বন্ধে ১ কোটি শ্লোকাত্মক একখানি নীতিশাস্ত্রগ্রন্থ অর্থাৎ রাজনীতিক গ্রন্থ রচনা করেন। বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য্য এবং অন্যান্য আরও কয়েক জন রাজনীতিক লেখক তাহা হইতে সারসংগ্রহ করিয়া এক একখানি নীতিশাস্ত্রগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। রাজগণের এবং যাঁহারা সর্ব্বলোক-ব্যবহার (universal occupations of men) জানিতে চাহেন, যাঁহারা সমস্ত লোকের স্থিতি বা সমাজস্থিতি (maintenance of society) কামনা করেন, তাঁহাদের এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করা একান্তই কর্ত্তব্য। সুতরাং সাংসারিক অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান লাভের এবং মনের সঙ্কীর্ণতা বর্জ্জনের জন্য যে রাজনীতির চর্চ্চা করা কর্ত্তব্য, তাহা এ দেশের প্রাচীন চিন্তাশীল মহাত্মগণ কর্ত্তৃক মুক্তকণ্ঠে স্বীকৃত হইয়াছে। কৌটিল্যও তাঁহার প্রণীত অর্থশাস্ত্রে ঠিক ঐ কথাই বলিয়াছেন। সুতরাং প্রাচীনকালে হিন্দু জাতি যে রাজনীতিজ্ঞানের মর্য্যাদা উপলব্ধি করিতে পারিতেন না, বা উহার আলোচনা করিতেন না, এইরূপ ধারণা করিয়া যাঁহারা বসিয়া আছেন, তাঁহারা যে ভ্রান্ত, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র আলোচনা করিলে তাঁহার পূর্ব্বজ কতকগুলি রাজনীতিক সন্দর্ভ-লেখকের নাম পাওয়া যায়। যথা —

(১) ভারদ্বাজ; অর্থাৎ ভরদ্বাজ ঋষির পুত্র দ্রোণাচার্য্য। ইনি কৌরব এবং পাণ্ডবদিগের শিক্ষাদাতা গুরু এবং কৌরব সভায় এক জন প্রধান সভাসদ ছিলেন। কুরুক্ষেত্র-সমরে ইনিই ভীষ্মের পর কৌরব সেনা পরিচালিত করেন। ইঁহার প্রণীত রাজধর্ম্মগ্রন্থ পাওয়া যাইলে প্রায় চারি পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতের শাসনপদ্ধতি এবং রাজনীতিক জ্ঞান কিরূপ ছিল, তাহা জানিতে পারা যাইত। যদি উহা কোথাও আবিষ্কৃত হয়, তাহা হইলে সাহিত্যক্ষেত্রে সেই আবিষ্কার হারাপ্পা বা মহেন্দ্রজোড়োর আবিষ্কারের ন্যায় চমকপ্রদ হইবে। কিন্তু সে আশা বৃথা।

(২) বিশালাক্ষ; এই ব্যক্তির প্রকৃত পরিচয় পাইবার উপায় নাই। তবে ইনি যে এক জন বিশিষ্ট রাজনীতিক ছিলেন, তাহা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারাই স্বীকার করিবেন। ইঁহার লিখিত গ্রন্থও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কৌটিল্য ইঁহার মত স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিয়াছেন,তবে ইনি যে দ্রোণাচার্য্যের পরবর্ত্তী কালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ইহা কৌটিল্য কর্ত্তৃক উদ্ধৃত ইঁহার উক্তি হইতেই বুঝা যায়। পরে আমাদের ইঁহার মত আলোচনা করিবার প্রয়োজন হইবে।

(৩) পিশুন; দেবর্ষি নারদের অন্য এক নাম ছিল পিশুন। কেহ কেহ অনুমান করেন, এই পিশুনই দেবর্ষি নারদ। কারণ, কলহকর্ত্তা বলিয়া তাঁহার একটি অপবাদ আছে। রাজনীতিক ব্যাপারে ঐহিক স্বার্থ লইয়া কাড়াকাড়ি করিবার অনেক বিষয় আছে। কাযেই ঐ শাস্ত্র যাঁহারা আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা কলহেরও উৎসাহদাতা বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন। ফ্লোরেন্সের

সুপ্রসিদ্ধ রাজনীতিক ও ঐতিহাসিক বিদ্যাবিশারদ নিকলো মেকিয়াভেলীরও (Niccolo Machiavelli) সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া ঐরূপ অপবাদ রটিয়াছে। মেকিয়াভেলী তাঁহার Princes নামক গ্রন্থে বলিয়া গিয়াছেন যে, রাজাদিগকে স্বার্থরক্ষার জন্য ন্যায়-ধর্ম্মের বিচারবুদ্ধি বিসর্জ্জন দিতে হইবে। পিশুন সেরূপ কোন কথা বলিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। কারণ, কৌটিল্যের গ্রন্থে পিশুনের উদ্ধৃত উক্তি হইতে বুঝা যায় যে, পিশুন বলিয়াছেন, রাজভক্তিই মন্ত্রীর যোগ্যতার পরিচায়ক বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত নহে। প্রখর বুদ্ধি এবং রাজস্ব-সংগ্রহ-বিদ্যায় পারদর্শিতাই মন্ত্রিগণের প্রধান গুণ বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত। যাঁহাদের কর ধার্য্য করিবার এবং সেই সংগৃহীত অর্থ দ্বারা রাজ্যের উন্নতিসাধনের বিশেষ ক্ষমতা আছে, সেইরূপ লোকদিগকেই বাছিয়া রাজমন্ত্রীর পদ প্রদান করা কর্ত্তব্য। রাজ্যের উন্নতিসাধনই যাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য, তাঁহার ঐরূপ কলঙ্ক হওয়া উচিত নহে। যাহা হউক, ব্রহ্মার মানস পুত্র দেবর্ষি নারদ এই গ্রন্থের প্রণেতা নহেন। প্রাচীন কালে নারদ নামে বহু লোক আবির্ভূত হইয়াছিলেন, পুরাণে তাহার প্রমাণ আছে। আমার অনুমান হয়, অতি প্রাচীন কালে নারদ একটি উপাধি ছিল। নারং অর্থাৎ জ্ঞানং দদাতীতি নারদ, যিনি জনসমাজকে জ্ঞানদান করিতেন, তিনিই নারদ নামে অভিহিত হইতেন। কোন্দলের প্রশ্রয় ও উৎসাহদাতা বলিয়া দেবর্ষি নারদের যে কলঙ্ক রটিয়াছে, তাহা অন্য নারদের কৃত কর্ম্মের জন্য, এরূপ মনে করিবার কারণ আছে। পৈশুন কৌণপদন্তের পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, এরূপ মনে করিবার যথেষ্ট হেতু বিদ্যমান। কারণ, কৌণপদন্ত পৈশুনের দুই একটি সিদ্ধান্তের খণ্ডন করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। পৈশুনের গ্রন্থও এখন আর নাই।

(৪) কৌণপদন্ত। ত্রিকাণ্ডশেষে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভীষ্মের আর একটি নাম কৌণপদন্ত। কৌরবদিগের অভিভাবক ও তত্ত্বাবধায়ক ভীষ্মের পক্ষে একখানি রাজনীতিক গ্রন্থ রচনা করা অসম্ভব নহে,—পরন্তু বিশেষ সম্ভব। কিন্তু এই ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে ভীষ্ম কি না, তাহা বলা অসম্ভব। ইনি কৌটিল্যের অর্থাৎ চাণক্যের পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

(৫) বাতব্যাধি। এক জন প্রামাণিক রাজনীতিক গ্রন্থপ্রণেতা বলিয়া চাণক্য ইঁহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। দুই সহস্র বৎসরের বহু পূর্ব্বে ইনি যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

(৬) বহুদন্তী পুত্র। প্রামাণিক অর্থশাস্ত্র-গ্রন্থপ্রণেতা বলিয়া ইঁহার নামও চাণক্য কর্ত্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে।

খৃষ্ট জন্মিবার প্রায় ৩ শত ২৫ বৎসর পূর্ব্বে চাণক্য নন্দবংশের ধ্বংসসাধনপূর্ব্বক মগধে মৌর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। চাণক্য বা কৌটিল্য এই মৌর্য্যবংশের প্রথম রাজা চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী ছিলেন। সুতরাং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র প্রায় সওয়া ২ হাজার বৎসরের পুরাতন। কৌটিল্যের আবির্ভাব-কালের প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধদেব দেহরক্ষা করেন (খৃঃ পূঃ ৪৭৭)। সুতরাং কৌটিল্য যে সকল রাজনীতিবিদ্যা-বিশারদ ব্যক্তির এবং সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই না হউন, অনেকেই বুদ্ধদেবের দেহগ্রহণের বহু পূর্ব্বেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এরূপ ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতে যে রাজনীতিক চর্চ্চা হইত না, রাজনীতিক গ্রন্থ প্রণীত হয় নাই, এ কথা বলিলে অজ্ঞতারই পরিচয়মাত্র দেওয়া হয়।

এখন প্রশ্ন, পূর্ব্বকালে শাসনপদ্ধতি কিরূপ ছিল? যে শাসনপদ্ধতি বর্ত্তমান কালে Democracy বা রাজতন্ত্র নামে অভিহিত, পুরাকালে তাহা ছিল কি না? আজকাল য়ুরোপে যেরূপ ডেমোক্রেসী বা জনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও হইতেছে, প্রাচীন ভারতে অবিকল সেইরূপ কোন শাসনপদ্ধতি ছিল কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। তবে যাহাতে শাসনকার্য্যপরিচালনে পুরবাসী এবং জনপদবাসীদিগের মত গৃহীত এবং সেই গৃহীত মত অনুসারে কার্য্য করা হয়, তাহার প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা ছিল। বর্ত্তমান সময়ে য়ুরোপে যে জনতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে, তাহার অনেক দোষও দেখিতে পাওয়া যায়। ইদানীং দেখা গিয়াছে যে, যে সকল লোক জনসাধারণের ভোটে রাষ্ট্রীয়-পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হয়েন, তাঁহারা অনেক সময়ে যোগ্যতা অপেক্ষা যোগাড়ের জোরেই নির্ব্বাচনে সাফল্যলাভ করিয়া থাকেন। যোগ্য ব্যক্তিরা অনেক সময় আবশ্যক যোগাড় করিতে পারেন না বলিয়াই নির্ব্বাচিত হইতেও পারেন না। Canvassingএর অর্থই (ভোট)

যোগাড় করা। উপযুক্ত লোক নির্ব্বাচিত হয় না বলিয়াই য়ুরোপে এখন বহু লোক প্রজাতন্ত্রের উপর বিরক্ত এবং উহার সাফল্যবিষয়ে সন্দিহান হইয়া পড়িতেছেন। অল্পদিন পূর্ব্বে মিষ্টার এইচ. জি, ওয়েলস্ এক বক্তৃতায় স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, বর্ত্তমান সময়ে ডেমক্রেসীতে দেশের কার্য্যনির্ব্বাহে সাধারণ ভোটদাতাদিগের অজ্ঞতাই প্রকট হইয়া পড়িতেছে। ঐ কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার পক্ষে তাহাদের অক্ষমতা, ঔদাসীন্য এবং অসামর্থ্যই প্রকাশ পাইতেছে। পৃথিবীর যেখানে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেইখানেই এই দোষ দেখা দিতেছে। মিষ্টার ওয়েলস্ স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, রাজনীতিক ব্যাপারে ধর্ম্মের প্রেরণা দিয়া লোকের কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে উদ্‌বুদ্ধ করিতে হইবে এবং সমস্ত পৃথিবীস্থ মানবজাতির সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় একতা সংসাধিত করিবার জন্য অল্পসংখ্যক যোগ্য লোককেই এই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করাইতে হইবে। মিষ্টার ওয়েলসের কথায় এক জন বিশিষ্ট ব্যক্তি এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন,—We feel in this, with a little difference, the call of the old Aryans, to establish a rule of law, made by selfless Rishis solely for the good of the society, and carried out by the young and efficient for the same goal, both doing their work as a sacred duty devolved on them. ইহার ফলিতার্থ এই যে, "প্রাচীনকালে স্বার্থলেশমাত্রশূন্য ঋষিগণ কেবলমাত্র সমাজের হিতসাধনকল্পে যে বিধিনিষেধের শাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, মিষ্টার ওয়েলসের এই উক্তিতে প্রায় অনেকটা সেই প্রাচীন আর্য্যগণের আহ্বানই শুনা যাইতেছে; ইহার লক্ষ্য এই যে, যুবকদল এবং যোগ্য ব্যক্তির দল উভয় দলকে পবিত্র কর্ত্তব্যবোধে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া একমাত্র সমাজের হিতসাধন উদ্দেশ্যে নিয়মের রাজত্বই প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।"

ইহাতে বুঝা যায় যে, প্রাচীন ঋষিগণ যে শাসনব্যবস্থা ধার্য্য করিয়াছিলেন, তাহাতে ধর্ম্মের বন্ধন থাকায় তাহার অপব্যবহার ঘটিবার সম্ভাবনা অতি অল্পই ছিল। তখন রাষ্ট্রপরিচালকগণের এবং কর্ম্মচারিবৃন্দের ধর্ম্মবুদ্ধিই তাহাদের প্রধান যোগ্যতা বলিয়া বিবেচিত হইত। বর্ত্তমান সময়ে স্বার্থবুদ্ধিই য়ুরোপীয়দিগের এবং য়ুরোপীয়ভাবে ভাবুক ব্যক্তিদিগের কার্য্যের প্রয়োজক। কাযেই তাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত ক্ষমতার অপব্যবহারাশঙ্কা অধিক হইয়া থাকে। এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, যাহারা ঐকান্তিক ধর্ম্মবুদ্ধির প্রেরণায় কার্য্য করে, তাহাদের কার্য্য সংসারে লোকের যত কল্যাণসাধক হইয়া থাকে, যাহারা সম্প্রদায়গত বা ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধি লইয়া কার্য্য করে, তাহাদের কার্য্য কখনই লোকের তাদৃশ হিতসাধক হইতে পারে না। সেই জন্যই প্রাচীন আর্য্য শাসনপদ্ধতির উৎকর্ষ অধিক ছিল। আমরা ক্রমে তাহাই দেখাইব।

ঋষিদিগের মতে শাসনকার্য্য প্রবর্ত্তনের এবং পরিচালনের এই সাতটি অপরিহার্য্য অঙ্গ বিদ্যমান। উহার একটির অভাব হইলেই রাজকার্য্য অচল হইবে। সেই সাতটি অঙ্গ এই—(১) স্বামী, (২) অমাত্য, (৩) সুহৃৎ, (৪) কোষ, (৫) দুর্গ, (৬) রাষ্ট্র এবং (৭) বল। সর্ব্বপ্রথম স্বামী অর্থাৎ রাজা বা গণতন্ত্র সভার প্রেসিডেণ্ট। ইতঃপূর্ব্বে মিষ্টার যশোয়াল প্রাচীন ভারতে রাজগণ সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র পাল থিওসফিক্যাল হলে প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি প্রাচীন ভারতের রাজগণ বা রাষ্ট্রস্বামিগণের কথা অতি সুন্দরভাবেই বিবৃত করিয়াছেন। "মাসিক বসুমতী"তে উহা প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং রাজ্যস্বামী সম্বন্ধে অর্থাৎ রাজা সম্বন্ধে আমি আর কোন কথাই বলিব না।

কিন্তু রাজ্যপরিচালনকার্য্যে নিযুক্ত অন্যান্য ব্যক্তির প্রয়োজনীয়তা রাজা অপেক্ষা অল্প নহে, বরং অত্যন্ত অধিক। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই বিষয়টির কেহ বড় একটা আলোচনা করেন না। প্রকৃতপক্ষে এ দেশে চিরকালই অমাত্যদিগের হস্তেই রাজ্যপরিচালনার ভার ছিল। সুতরাং অমাত্যের কথা আলোচনা না করিলে প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রতন্ত্রের স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব হইবে না। কারণ, মন্ত্রীর পরামর্শ ব্যতীত রাজার পক্ষে কোন কার্য্যই করা অসম্ভব। শুক্রনীতিসারে কথিত হইয়াছে—

যদ্যপ্যল্পতরং কর্ম্ম তদপ্যেকেন দুষ্করম্।
পুরুষেণাসহায়েন কিমু রাজ্যং মহোদয়ম্।
সর্ব্ববিদ্যাসু কুশলো নৃপো হ্যপি সুমন্ত্রবিৎ।
মন্ত্রিভিস্তু বিনা মন্ত্রং নৈকোঽর্থং চিন্তয়েৎ কচিৎ।

সভ্যাধিকারি-প্রকৃতি-সভাসৎসুমতে স্থিতঃ।
সর্ব্বদা স্যান্নৃপঃ প্রাজ্ঞঃ স্বমতে ন কদাচন॥
(শুক্র, ২ অ, ১-৩

অসহায় পুরুষের পক্ষে একাকী অতি অল্পকার্য্য করাই কঠিন, সুতরাং মহোদয় (অতিশয় বিস্তীর্ণ এবং সমৃদ্ধিশালী) রাজ্যের কার্য্যপরিচালনা একমাত্র রাজার দ্বারা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। রাজা যদি সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ এবং বিশেষ মন্ত্রকুশলও হয়েন, তাহা হইলেও তিনি মন্ত্রিগণকে সঙ্গে না লইয়া কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত করিবেন না। বুদ্ধিমান রাজা সভ্য, অধিকারী, প্রকৃতি, সভাসদ্‌দিগের মতানুসারে কার্য্য করিবেন, কখনই আপনার মত অনুসারে কোন কার্য্য করিবেন না।

এই ক্ষেত্রে রাজকার্য্যপরিচালনে মন্ত্রিগণের প্রভাব কিরূপ, তাহা বুঝা যায়। রাজা স্বমতে অর্থাৎ আপনার খোসখেয়াল অনুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন না, তাঁহাকে বহু মন্ত্রীর সহিতই পরামর্শ করিয়া তবে আবশ্যক কার্য্য করিতে হইবে। রাজার স্বীয় মন্ত্রী অন্ততঃ সাত আট জন ত থাকা চাই-ই, অধিকন্তু তাঁহাকে সভ্য, অধিকারী, প্রকৃতি এবং সভাসদ্ এই চতুর্ব্বিধ লোকের মত লইয়া কার্য্য করিতে হইত।

(১) সভ্য অর্থে সাধু, সজ্জন এবং বিদ্বান্। সুতরাং যাঁহারা সুসভ্য ও বিদ্বান্, তাঁহাদিগের সহিত রাজাকে পরামর্শ করিয়া কায করিতে হইবে।

(২) অধিকারী অর্থাৎ বিশেষজ্ঞ (expert); রাজা যে বিষয় লইয়া আলোচনা করিবেন, সেই বিষয়ে যাঁহাদের বিশেষ জ্ঞান আছে, তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া কায করিবেন। মনে করুন যে, রাজার মুদ্রানীতির পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে ইতিকর্ত্তব্যতার অবধারণ করিবার প্রয়োজন উপস্থিত। তখন তাঁহাকে এই বিষয়ে যাঁহারা বিশেষভাবে জানেন, তাঁহাদিগকেও সঙ্গে লইয়া মন্ত্রণা করিতে হইবে। অর্থাৎ তখন মন্ত্রণা-সভাতে বার্ত্তাবিদ্যায় (economics) ব্যুৎপন্ন লোককে লওয়া চাই। এখনও এই নির্ব্বাচনের যুগে সকল সুসভ্য দেশের সরকার এইরূপ বিশেষজ্ঞ লোকদিগকে ব্যবস্থা-পরিষদের বা পরামর্শ-পরিষদের (executive council) অতিরিক্ত সদস্য মনোনীত করিয়া লয়েন।

(৩) প্রকৃতি অর্থে সাধারণ প্রজাদিগের মধ্যে যাহারা মুখ্য ব্যক্তি, যথা মোড়ল, মাতব্বর, গ্রামণী, পটেল প্রভৃতি, ইহাদের সহিতও রাজা সকল বিষয়ে মন্ত্রণা করিবেন।

(৪) সভাসদ্ অর্থে যাহারা সভায় গমন করিয়া থাকে। ইহাতে বুঝা যায় যে, পূর্ব্বে রাজগণের একটা মন্ত্রণা-সভা ছিল, আর সেই সভাতে মন্ত্রী ভিন্ন অন্য সভাসদ্‌ও থাকিত। এই সকল সভাসদ্ জনসাধারণের ভোটে নির্ব্বাচিত হইত কি না, তাহা বলা কঠিন। অবশ্য পূর্ব্বকালে শলাকা প্রভৃতির দ্বারা ভোট লইবার একরূপ ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু সভাসদ্‌গণ সেইরূপ ভোট দ্বারা নির্ব্বাচিত হইতেন, এরূপ প্রমাণ আমি কুত্রাপি পাই নাই। তবে যাঁহারা সভাসদ্ নিযুক্ত হইতেন, তাঁহারা যে জনসাধারণের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন, এবং রাজার মন্ত্রণাসভায় জনমত প্রতিবিম্বিত করিতেন, এইরূপ অনুমান করিবার যথেষ্ট হেতু আছে। কারণ, পূর্ব্বে যে সকল পল্লীসমাজ (village community) ছিল, তাহাতে যাঁহারা গ্রামণী বা গ্রামের নিয়ন্তা ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা বিচক্ষণ ও বিশেষ বিবেচক ছিলেন, তাঁহারাই রাজসভায় সভাসদ্ হইতেন। এখানে বলা আবশ্যক যে, ঐ সকল গ্রামণীই গ্রামস্থ বা সমাজস্থ ব্যক্তিগণের বিশ্বাসভাজন ছিলেন। তাঁহারাই গ্রামের বা সমাজের সকল সামাজিক এবং আর্থিক বিষয়ের মীমাংসা করিতেন। যাঁহারা প্রাচীন পল্লীসমাজের ব্যবস্থার বিষয় আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই সে কথা স্বীকার করিবেন। এই ব্যবস্থার দ্বারা যে রাজসভায় লোকমত বিশেষভাবে প্রতিবিম্বিত হইত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যে রাজসভায় লোকমত প্রতিবিম্বিত হয়, সেই রাজসভার দ্বারা যে ডেমক্রেসীর বা প্রজাতন্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য সাধিত হয়, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কারণ, জনসাধারণের প্রতিনিধিস্থানীয় এবং বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিগণকে সভাসদ্ নির্ব্বাচিত করা এবং তাঁহাদের দ্বারা রাজসভায় লোকমত প্রতিফলিত করাই নির্ব্বাচনের মুখ্য লক্ষ্য। গ্রামের বা সমাজের যাঁহারা প্রতিনিধিস্থানীয়, সকল বিষয়ে যাঁহারা গ্রামের এবং সমাজের লোকদিগকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকেন, মেধা, বুদ্ধি, প্রতিভা, মনস্বিতা এবং ধার্ম্মিকতার প্রভাবে যাঁহারা গ্রামের ও সমাজের নিয়ন্তা হইতেন, তাঁহারাই রাজসভার সভাসদের আসন পাইতেন। পাশ্চাত্য প্রথামতে ভোট দ্বারা নির্ব্বাচন অপেক্ষা এই নির্ব্বাচন

অনেক ভাল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ভোট দ্বারা নির্ব্বাচন মতের হিসাবে (theoretically) যতই ভাল বলিয়া মনে হউক না কেন, কাযের হিসাবে (practically) উহা তত ভাল হয় না। নির্ব্বাচনের সময় নির্ব্বাচনপ্রার্থীরা যে মূর্ত্তি গ্রহণ করেন, নির্ব্বাচনের পর তাঁহারা আর সেই মূর্ত্তিতে দেখা দেন না। নির্ব্বাচন-ব্যবস্থা যদি ভালই হইত, তাহা হইলে প্রজাতন্ত্রপরিচালিত ফ্রান্সে sabotage হইত না, জনতন্ত্রবাদী মার্কিণেও ধর্ম্মঘট ঘটিত না।

এখানে জিজ্ঞাস্য, এই চারি শ্রেণীর লোকই মন্ত্রী নামে অভিহিত হইতেন কি না? যত দূর বুঝা যায়, ইঁহারা ঠিক মন্ত্রী নহেন। মন্ত্রীদিগের কয়েকটি শ্রেণী ছিল। যথা—সচিব, মন্ত্রী, অমাত্য এবং সুমন্ত্রক। ইহা ভিন্ন প্রতিনিধি, প্রধান, পুরোধা, প্রকৃতি প্রভৃতি কতকগুলি সভাসদ্ ছিলেন। ইঁহারা ঠিক অমাত্য বা রাজকর্ম্মচারী ছিলেন না।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, রাজা এক জন মন্ত্রীর সাহায্যে কখনই কার্য্য করিতে সমর্থ হইতেন না। তাঁহাকে অন্ততঃ সাত আট জন মন্ত্রী রাখিতেই হইত। ইহা ধর্ম্মশাস্ত্রের আদেশ। মনু বলিয়াছেন, প্রত্যেক রাজার সাত আট জন মন্ত্রী রাখা নিতান্তই কর্ত্তব্য। যাঁহারা পুরুষপুরুষানুক্রমে রাজ-কর্ম্মচারী, যাঁহারা বেদাদি শাস্ত্রে পারদর্শী, যাঁহারা স্বয়ং শূর, যুদ্ধবিদ্যায় নিপুণ, সৎকুলোদ্ভব এবং পরীক্ষিত (tried man), বাছিয়া বাছিয়া সেইরূপ লোকদিগকেই রাজা মন্ত্রীর পদে বরণ করিবেন। (মনু ৭ অ, ৫৪ শ্লোক)। মন্ত্রিনির্ব্বাচন সম্বন্ধে মহাভারতেও কতকগুলি অতি সুন্দর কথা আছে। যাঁহারা কুলীন (অর্থাৎ সাধুবংশে জন্মিয়াছেন), সৎস্বভাব, ক্ষমাশীল, আত্মশ্লাঘাবিরহিত, শূর, আর্য্য (অর্থাৎ জনসমাজের সম্ভ্রমভাজন), কার্য্যাকার্য্যবিবেককুশল, সর্ব্বকর্ম্মে অবহিত, লোকমান্য, সংবিভক্ত (অর্থাৎ প্রতিভায় ও মনীষায় সাধারণ লোক হইতে স্বতন্ত্র), সুসহায় (অর্থাৎ যাঁহার দলে অনেক লোক আছে) এবং সৎকর্ম্মশালী, সেইরূপ লোক-দিগকে অমাত্যপদে বরণ করা কর্ত্তব্য। (মহাভারত শান্তি-পর্ব্ব ৮০ অধ্যায়)

এখানে একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে। প্রাচীন ভারতে রাজা শাসনকর্ত্তা বা দণ্ডধর (Head of the executive government) ছিলেন। বিধি-প্রণয়নের কোন ক্ষমতাই রাজার বা রাজসভার ছিল না। রাজসভা Legislative Council ছিল না। বিধিপ্রণয়নের ভার ঋষিদিগের এবং ব্রাহ্মণদিগের হস্তেই ছিল। সেই আইন কিরূপ ভাবে প্রণীত ও পরিবর্ত্তিত হইত, সে বিষয়টি স্বতন্ত্র-ভাবে আলোচিত হইবে। তবে রাজা ও রাজমন্ত্রীরা যে একবারেই বিধি প্রণয়ন করিতেন না, তাহা নহে। শাসন-কার্য্যপরিচালনের সৌকর্য্যার্থ অনেক সময় তাঁহাদিগকে রাজবিধি (Regulation) প্রণয়ন করিতে হইত। সেই রাজবিধিগুলি ঋষিপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রের অবিরোধী হইত। কারণ, রাজার বা রাজপরিষদের ধর্ম্মশাস্ত্রবিধির উল্লঙ্ঘন করিবার ক্ষমতা ও অধিকার ছিল না। ধর্ম্মশাস্ত্র লঙ্ঘন করিলে রাজাকে অনেক সময় রাজ্যচ্যুত হইতে হইত, প্রাচীন সাহিত্যে তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং রাজপরিষদ অনেকটা আধুনিক executive councilএর ন্যায়ই ছিল। প্রাচীন ভারতে বিধিপ্রণয়ন এবং শাসনকার্য্যপরিচালন এই উভয় কার্য্যই সম্পূর্ণ পৃথক্ করা হইয়াছিল। একে অন্যের অধি-কারে হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ হইতেন না।

রাজসভায় সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর সভ্য থাকিত।

প্রথম রাজা। ইনি শাসনকার্য্যনির্ব্বাহক প্রধান ব্যক্তি। ইনি প্রজাসাধারণের দণ্ড-মণ্ডের কর্ত্তা ছিলেন। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনই রাজার কর্ত্তব্য ছিল।

দ্বিতীয় মন্ত্রিমণ্ডলী। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, রাজা বহু মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়াই রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করি-তেন। মনু বলিয়াছেন যে, রাজার অন্ততঃ সাত আট জন মন্ত্রী থাকা চাই-ই। কিন্তু অনেক স্থলে মন্ত্রিসংখ্যা আরও অধিক ছিল। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ৮৫ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, রাজা তাঁহার মন্ত্রিমণ্ডলীতে ৪ জন বেদজ্ঞ, প্রগল্‌ভ, স্নাতক ও পবিত্র ব্রাহ্মণ, ৮ জন বলবান্ ক্ষত্রিয়, ২১ জন, ধনাঢ্য বৈশ্য, ৩ জন নিত্যকর্ম্মনিরত বিনীত শূদ্র এবং এক জন পুরাণজ্ঞ সূতকে মন্ত্রী নিযুক্ত করিবেন। সুতরাং এই হিসাবে মন্ত্রিমণ্ডলের মন্ত্রিসংখ্যা ৩৭ জন হয়। সর্ব্ববর্ণের মধ্য হইতেই মন্ত্রী গৃহীত হইত। রাজা সর্ব্বদা ব্রাহ্মণ ৪ জন এবং ৪ জন শূদ্র মন্ত্রীর সহিত মধ্যবর্ত্তী হইয়া মন্ত্রণা স্থির করিবেন। যাঁহারা বলেন যে, প্রাচীনকালে শূদ্রদিগকে কোন অধিকারই দেওয়া হইত না, তাঁহারা যে ভ্রান্ত, তাহা বেশ বুঝা যায়।

রাজার রাজ্যাভিষেকসময়ে চাতুর্ব্বর্ণ্য মন্ত্রীদিগের বিশেষ বিশেষ কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট আছে। ঐ সময়ে রাজার মস্তকে যে জলসেচন করিতে হয়, তাহাতে ব্রাহ্মণমন্ত্রী প্রথমে পূর্ব্বদিক্ হইতে সুবর্ণকলসে করিয়া রাজমস্তকে বারিদান করিবেন, পরে যথাক্রমে ক্ষত্রিয় মন্ত্রী দক্ষিণদিক্ হইতে রজতনির্ম্মিত কলস হইতে, বৈশ্য মন্ত্রী পশ্চিমদিক্ হইতে তাম্রনির্ম্মিত কলস হইতে এবং শূদ্রমন্ত্রী উত্তরদিক্ হইতে মৃন্ময় কলস হইতে রাজমস্তকে তীর্থবারি ঢালিয়া দিবেন। ইহা ধর্ম্মকার্য্য, সুতরাং রাজার যদি শূদ্র মন্ত্রী না থাকে, তাহা হইলে ঐ কার্য্যের অঙ্গহানি ঘটে। শূদ্র মন্ত্রী কর্তৃক অভিষেচন হইলে পর ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণ রাজমস্তকে মধু এবং সামবেদী ব্রাহ্মণ রাজমস্তকে সম্পাতবান কুম্ভ হইতে কুশাগ্র দ্বারা জলসেচন করিতেন। অভিষেকের সময় রাজার পার্শ্বেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারি বর্ণের মন্ত্রিগণের আসন নির্দ্দিষ্ট থাকিত। সুতরাং সকল সম্প্রদায়ের মধ্য হইতেই যে মন্ত্রী গ্রহণ করা হইত, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

য়ুরোপীয় লেখকগণ অনুমান করিয়া থাকেন যে, শূদ্রগণ বিজিত জাতি ছিল, প্রাচীন ভারতে তাহাদিগের কোন প্রকার অধিকার ছিল না। এ অনুমান একান্তই ভ্রমসঙ্কুল। শূদ্র চরণ হইতে উৎপন্ন, অতএব তাহারা "পদদলিত দাস" (trodden-down serfs), এ কথা মূর্খতাবিজৃম্ভিত। শূদ্রই সমাজের চলচ্ছক্তি। শূদ্রকে পুরাকালে শাসনযন্ত্রের উচ্চতম পদ প্রদান করা হইত।

রাজা ও মন্ত্রিমণ্ডলী ব্যতীত রাজসভায় পৌরজানপদবর্গ স্থান পাইতেন। ইঁহারা মন্ত্রী হইতে স্বতন্ত্র ছিলেন। শুক্রাচার্য্য যে সভ্য, অধিকারী, প্রকৃতি এবং সভাসদের কথা বলিয়াছেন, তাঁহারাই এই শ্রেণীর সদস্য ছিলেন। যেমন "যুক্তাচারং স্ববিষয়ে সন্ধিবিগ্রহকোবিদম্, রাজস্ত্রীবেত্তায়ঞ্চ পৌরজানপদপ্রিয়ম্" লোকদিগকে মন্ত্রী করিবার নিয়ম ছিল, তেমনই রাজসভায় এই তৃতীয় শ্রেণীর সভাসদ হইতে হইলে নিম্নলিখিত গুণ থাকা আবশ্যক। যথা—

"পৌরজানপদা যস্মিন্ বিশ্বাসং ধর্ম্মতো গতাঃ।
যোদ্ধা নয়বিপশ্চিচ্চ স মন্ত্রং শ্রোতুমর্হতি ॥"

মহা, শান্তিঃ, ৮৩ অঃ।

পৌর ও জনপদবাসীরা যাঁহাকে ধর্ম্মতঃ বিশ্বাস করে, যিনি যোদ্ধা, নীতিজ্ঞ (রাজনীতিজ্ঞ) এবং সুপণ্ডিত, তিনিই মন্ত্রণা শ্রবণের অধিকারী।

ইঁহারা যে কেবল মন্ত্রণা শ্রবণ করিতেন, তাহা নহে, ঐ সভায় ইঁহারা আপন আপন মতামত ব্যক্তও করিতে পারিতেন।

নানা কার্য্যের জন্য নানা প্রকারের মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত হইত। কামন্দকীয় নীতিসারে কথিত হইয়াছে যে,—

"দ্বাদশেতি মনুঃ প্রাহ ষোড়শেতি বৃহস্পতিঃ।
উশনা বিংশতিরিতি মন্ত্রিণাং মন্ত্রমণ্ডলম্ ॥"

মনু বলিয়াছেন, মন্ত্রীদিগের মন্ত্রমণ্ডল দ্বাদশ প্রকার, বৃহস্পতি বলিয়াছেন ষোড়শ প্রকার এবং উশনা বলিয়াছেন, বিংশতি প্রকার। এক এক প্রকারের সভায় সদস্যশ্রেণীর অধিকারের তারতম্য হইত বলিয়াই মনে হয়। কতকগুলি মন্ত্রমণ্ডল বা মন্ত্রণাসভা বোধ হয় আধুনিক কমিটী এবং সব্‌কমিটীর ন্যায় ছিল। নিয়মনিয়ন্ত্রিত, রাজতন্ত্র এবং গণতন্ত্রভেদে মন্ত্রমণ্ডলীর গঠনের তারতম্য হইত বলিয়াও মনে করা যাইতে পারে।

এ ক্ষেত্রে আর একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে। প্রাচীনকালে মন্ত্রিগণের ক্ষমতা এবং অধিকার রাজগণের ক্ষমতা অপেক্ষা অল্প ছিল না। প্রাচীন রাজনীতিশাস্ত্রে এ কথা স্পষ্টই লিখিত আছে যে, মন্ত্রীদিগের ক্ষমতা এবং অধিকার রাজগণের অধিকারের তুল্য, কেবল রাজার মস্তকোপরি ছত্র ধৃত থাকিবে আর মন্ত্রিমণ্ডলী পরামর্শ করিয়া যে সিদ্ধান্ত স্থির করিবেন, সেই সিদ্ধান্তের অনুযায়ী আদেশ রাজা স্বয়ং মুখ দিয়া প্রকাশ করিবেন। ইহা ভিন্ন রাজার ও মন্ত্রীদিগের ক্ষমতার ও অধিকারের বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। (মহা, শান্তি, ৫৭ অ, ২৫)

প্রাচীন ভারতের মন্ত্রিমণ্ডলী বা শাসনপরিষদ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে। এক প্রবন্ধে সকল কথা বলা সম্ভবে না। তবে আমরা যতটুকু আলোচনা করিয়া দেখিলাম, তাহাতে বুঝা গেল যে, শাসন-পরিষদের সদস্যগণের দেশের লোকের একান্ত বিশ্বাসভাজন হওয়া আবশ্যক ছিল। তাহা না হইলে কেহ মন্ত্রী বা সভাসদ্ হইতে পারিতেন না। সর্ব্বশ্রেণীর ও সর্ব্বজাতির মধ্য হইতেই মন্ত্রী এবং সভাসদ্ গৃহীত হইত। সুতরাং শাসনপরিষদে যে

লোকমতের সম্মান রক্ষিত হইত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অতএব সেই শাসন-পরিষদ দ্বারা ডেমক্রেসীর উদ্দেশ্য বর্ত্তমানযুগের পার্লামেণ্ট, এসেম্ব্লি প্রভৃতি অপেক্ষা অধিকতর সুচারুভাবে সম্পাদিত হইত।

আর এক কথা, এখনকার রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে যেমন আত্মস্বার্থরক্ষার জন্য ব্যাকুলতা এবং প্রচেষ্টাই আধুনিক রাজনীতিকদিগের কার্য্যের প্রেরণাদাতা (driving force), পূর্ব্বকালে তেমনই ধর্ম্মজ্ঞানই রাজনীতিকদিগের কার্য্যকে প্রেরণা দান করিত। ধর্ম্মবুদ্ধির বা কর্ত্তব্যবুদ্ধির বশেই দশরথ রামচন্দ্রকে বনবাস দিয়া দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন, রামচন্দ্র জানকীকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন, হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্রকে রাজ্য ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদের সেই ধর্ম্মবুদ্ধিসঙ্গত সিদ্ধান্ত আমাদের সহিত না মিলিতে পারে, কিন্তু সেই ধর্ম্মবুদ্ধি যে লোককে দেশের জন্য সর্ব্ববিধ স্বার্থ বিসর্জ্জন করিতে বাধ্য করিতে পারিত, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং সে শাসনব্যবস্থা ও জনতন্ত্রবাদ ভাল ছিল কি বর্ত্তমানের শাসনব্যবস্থা ভাল হইয়াছে, নিরপেক্ষভাবে তাহার বিচার করা কঠিন নহে।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

ভাবের অভিব্যক্তি

স্বামী পাঠবিরতা নিদ্রালসা পত্নীকে তুড়ী দিয়া বিদ্রূপ করিতেছেন।

অভিনেতা—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঘোষ

ত্রিবেণী

চতুর্স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

'নর্ত্তকী-কুলেশ্বরী চন্দ্রকলা' বলিয়া সে দিন স্বয়ং পৌণ্ড্র-বর্দ্ধনাধিপতি মহারাজাধিরাজ যাহার মর্য্যাদা বাড়াইয়াছিলেন, সেই চন্দ্রকলা আজ দুই দিন ধরিয়া বিষম শিরঃপীড়ায় একান্তভাবেই প্রপীড়িতা হইয়া শয্যাশ্রিতা হইয়াছেন। প্রহরে প্রহরে রাজধানী হইতে সাংবাদিক তাঁহার কুশল লইতে আসিয়া সঙ্কুচিতচিত্তে অকুশলই লইয়া ফিরিতেছে। দিবারাত্রিতে অন্ততঃ পাঁচ সাত বার প্রধান রাজবৈদ্য সুদাস ভট্ট তাঁহার খুঙ্গিপুথি-পেটিকাদি সঙ্গে লইয়া রোগিণীর পার্শ্বে বসিয়া নিজের কর্কট-দংষ্ট্রাবৎ শীর্ণ ও শিরা-সঙ্কুল হস্তাঙ্গুলী দ্বারা তাহার নবনীত-সুকোমল এবং শ্বেত-পদ্মপ্রভ হাতখানি ধরিয়া সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম বিচারে নাড়ী পরীক্ষা করিতেছেন। বহু গবেষণানন্তর পাঁচ সাতটা অনুপান পাচনের সহিত মিল করিয়া বড় বড় নামজাদা ঔষধের ব্যবস্থা ত অমন দিনের মধ্যে পাঁচ বারই বদলাইয়া দিতেছেন, কিন্তু কেমন যে ঐ কুগ্রহের ফেরে মাথা ধরিয়াছিল, সে পোড়া মাথা আর কিছুতেই নর্ত্তকীরাণীকে ছাড়িয়া যাইতে রাজী হইল না! অথচ এই রাজ্যেশ্বরের প্রিয়তমার বড় সাধের মাথা, এ মাথাধরা না ছাড়াইতে পারিলে মান-যশ ত দূরেই থাক্, ধন-প্রাণও যে খুবই নিরাপদ থাকিবে না, সে কথাও বৈদ্যকুলশেখরের জানা ছিল।

তাই হাতের নাড়ী রোগিণীর শরীরে রোগের অস্তিত্বকে যতই কেন না অস্বীকার করুক, বৈদ্য ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্নার সত্যবাদিতায় বিষম সন্দিহান হইয়া পড়িয়া ততই কঠিন শিরঃপীড়ার কঠোরতর ব্যবস্থাবিধান করিতে লাগিলেন। ষড়্‌বিন্দু তৈলের নাস, মধ্যমনারায়ণ, হিমসাগর প্রভৃতি কিছুই বাদ পড়িল না।

এ দিকে চন্দ্রকলার মাথার মধ্যে কিছু একটা ঘটিয়াছিল, ইহাও সত্য। তা হউক্ সেটা শিরঃপীড়া, হউক্ সেটা অন্তরপীড়া। মনের মধ্যে তাহার কি যেন কোথাকার কোন্ অশ্রুত গানের রেশ, কোন্ অজ্ঞাত বাঁশীর সুর কোন্ এক নূতন ছন্দে বাজিয়া উঠিয়াছিল, সে বাজনা—সে গানের যেন আর এ কয়দিনে শেষই হইল না। সে যে কি গান, কি যে তাহার মনভুলানো প্রাণমাতানো ছন্দ, সে তাহার কোনই হিসাব মিলাইতে পারে নাই। তাহার সঙ্গে আষাঢ়-মেঘের গুরু-গুরু ধ্বনি, তাহার সঙ্গে বিশ্বের সকল দিনের সকল ঋতুর সব শোভা, সব উৎসবের হাসি, বাঁশীর তান মেশানো, আবার তাহারই মধ্যে মধ্যে কোন্ যেন এক কূলহারা পথহারা নিরুদ্দেশের করুণ সঙ্গীত, বিশ্বের সমুদয় করুণা, বেদনা ও হতাশার সুর লইয়া ইহার সহিত তাল দিয়া চলিয়াছে। একসঙ্গে এই কান্নাহাসির যুগল স্রোতে নর্ত্তকীর লঘু-চপল চিত্ত যেন বাদল-মেঘের মত থম্‌থমে ও বসন্ত-পবনের মত সুরভি-স্নিগ্ধ হইয়া উঠিতেছিল। তাহার হৃদয়-নদীর কূলে কূলে যেন ঘুমন্ত তরঙ্গগুলি মৃদু কাকলীতে কাহার বন্দনা-গান গাহিয়া উঠিতে চাহিতেছে, তাহারা যেন ভরসা না পাইয়া সঙ্কোচে নীরবই রহিয়া গিয়াছে। বুকের ভিতর তাহার আশা—তাহার দুরাশা যেন অতি সন্তর্পণে সঙ্গোপনে নিজেকে লুকাইয়া লইয়া উৎকণ্ঠাভরা চিত্ত উৎসুক দৃষ্টি অথচ নৈরাশ্য-ভীত-ম্লানমুখে কাহার প্রতি নির্নিমেষে চাহিয়া আছে। হঠাৎ যেন কোন্ গভীর বাণী তাহার হৃদয়-গুহার গোপন গহ্বরে সুগম্ভীর প্রতিধ্বনিতে জাগিয়া উঠিয়াছিল। সেই বাণীর স্পর্শ পাইয়া যেন তাহার প্রাণের বীণা এক অজানা সুরেই অশ্রুতপূর্ব্ব রাগিণীতে আলাপ সুরু করিয়া দিয়াছে।

তাহার মনে হইতেছিল, যেন এই নূতন বাণীর নবীন সুর

শুধু তাহারই মধ্যে নয়, সমস্ত ধরার বক্ষেই এক নবীনতার সমাবেশ করিয়া দিয়াছিল। সারা দিগ্‌দিগন্তর যেন সেই নূতনতার মোহনবাঁশীর মোহনীয় স্বরে ভরপুর করিয়া রাখিয়া দিয়াছিল। তাহারই সেই প্রাণমাতানো সুরের খেলায় আকাশে যেন ইন্দ্রধনুর বর্ণবটার সমাবেশে নিখিল বিশ্ব রঙ্গীন হইয়া দেখা দিয়াছিল, তাহারই সেই মনহারানো বাঁশীর তানে নর্ত্তকীর শীতল ও স্থির শোণিত যেন শ্রাবণ-জলধারা-পুষ্ট কল্লোলিনীর মতই উন্মত্ত-পুলকে কলকল্লোলে মাতিয়া উঠিয়াছিল। তাহার মন-প্রাণ যেন গুরুগুরু মেঘ-ডম্বররোলে উৎকণ্ঠিতা উর্দ্ধনেত্রা চাতকীর মত গভীর তৃষ্ণা-বিরামের উন্মত্ত আগ্রহে উৎপ্রেক্ষিত হইয়া উঠিল, তাহার গভীর আশা-নিরাশার বিপুল সংঘাত তাহার বুকের মধ্যে চকিত বিজলীর সঘন স্ফুরণের মতই ক্ষণে-ক্ষণে স্ফুরিত হইতে লাগিল। এমন কি, চারিদিকের সকল বাধার বিরুদ্ধে ঝড়ের সময়ের মেঘের মধ্য হইতে যে প্রলয়ঙ্কর মেঘের ডাক ধ্বনিত হইতে থাকে, তাহারই অনুকরণে তাহারই সমস্ত অন্তঃকরণ যেন গর্জ্জিয়া উঠিতে লাগিল। কোন বাধাকেই আর সে বাধা মনে করিতে পারিল না।

এমনই মানসিক দুর্য্যোগের মধ্যে একমাত্র রক্ষী সঙ্গে লইয়া সে সান্ধ্য-অন্ধকারে আত্মগোপন পূর্ব্বক কুমার রামপালের উদ্যান-মধ্যস্থ বিশ্রাম-গৃহে অভিসার করিল। ভাগ্যক্রমে কুমার সে সময় উপস্থিত ছিলেন। তিনি নিজের গভীর চিন্তাভারে ভারাক্রান্ত মন লইয়া ইদানীং বিজনতারই বিশেষ ভক্ত হইয়াছেন। তাই বড় একটা বাহিরে যানই না। আজও সেই মত বিষাদ-ম্লানমুখে তাঁহারই মত বিষাদসমাচ্ছন্ন-নিরালোকিত সান্ধ্যচ্ছায়াভরা বাতায়নমধ্য হইতে অনির্দ্দেশ্য-নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। শরীরের মধ্যে কোনখানে খুব বড় একখানা ক্ষত জন্মিলে তাহারই তাড়সে সমস্ত শরীরটা যেমন ব্যথায় আড়ষ্ট হইয়া থাকে, রামপালের বুকের ভিতরকার আহত বেদনায় ঠিক তেমনই করিয়া তাঁহার সমস্ত শরীর-মনটাকেই আড়ষ্ট ও অভিভূত করিয়া তুলিয়াছিল। এই জটিল জীবনের নাগপাশ হইতে কোন দিক দিয়াই তাঁহার আর মুক্তির আশামাত্র নাই, ইহাও সর্ব্বপ্রকারেই প্রমাণ হইয়া গিয়াছে।

বৈশাখ-মধ্যাহ্নের অগ্নিকণাবর্ষী গভীর তপ্ত শ্বাস মোচন পূর্ব্বক রামপাল আত্মগতই কহিয়া উঠিলেন, "দুর্ব্বহ! দুর্ব্বহ!"—

পাশের দিকে একটা অস্পষ্ট বিস্ময়ধ্বনি ধ্বনিত হইল। কে যেন আকস্মিক বেদনাহত হইয়া অর্দ্ধস্ফুট স্বরে কি একটা কথা বলিয়া উঠিল।

রামপাল মুখ ফিরাইলেন। অস্ফুট অন্ধকারে বস্ত্রাবৃত মনুষ্য-মূর্ত্তি। মূর্ত্তি নিশ্চয়ই নারীর। কুমার উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার এত কাছে কে এ রহস্যমণ্ডিতা রমণী? পট্ট-মহাদেবীর মহল্লিকা নিশ্চয়ই নয়। তাহারা এ ভাবে তাঁহার সম্মুখীন হইতে পারে না। কে তবে? তাঁহার বিস্ময় সীমাতিক্রম করিতে উদ্যত হইল। তীক্ষ্ণ নেত্রে চাহিয়া এইটুকু মাত্র বুঝিলেন, রমণী সুন্দরী, সর্ব্বালঙ্কারমণ্ডিতা এবং বারাণসীজাত অতি সুদৃশ্য সূক্ষ্ম বস্ত্রধারিণী। তাহার অঙ্গ-সুরভিতে সেই নারী-সংসর্গ-বর্জ্জিত নিরানন্দ কক্ষ-বায়ু যেন স্নিগ্ধ মধুর হইয়া উঠিল। নাগকেশরপরাগ ও অগুরুর গন্ধে উহা মিশ্রিত।

সহসা বারেকের জন্য একটা তীব্র সন্দেহে রামপালের বক্ষ সঘনে দুলিয়া উঠিল। সন্ধ্যাই কি এত বড় দুঃসাহসিকতা করিতে পারিয়াছে? আশ্চর্য্য নহে। মহাদেবীর সহায়তায় সকলই সম্ভব বটে। কিন্তু না, এমন অভিসারিকার বেশে, এই জন-সমাগম-সম্ভাবনাযুক্ত স্থানে রাজকুল-বধূর আবির্ভাব অসম্ভব যে!

একটা মৃদু-মধুর অলঙ্কারশিঞ্জনধ্বনি এক নিমেষে মহাকুমারের অন্তরের দ্বৈধ ভাবটুকুকে বিলোপ করিয়া দিল। সন্ধ্যা নয়। সন্ধ্যার প্রতি অলঙ্কার-শিঞ্জনটুকুই তাঁহার বুকের রক্তের তালে তালে যে তাল দিয়া তাঁহাকে তাহার অস্তিত্ব বুঝাইয়া দেয়। এ শব্দটুকু ধ্বনিমাত্রই, ইহার সঙ্গে তাঁহার অন্তরাত্মার ত কোথাও কোন যোগসূত্রের সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া গেল না?

সন্দেহ-বিরস-কণ্ঠে মহাকুমার প্রশ্ন করিলেন, "কে আপনি?"

জিজ্ঞাসিতা যেন এইটুকুরই জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল। মুহূর্ত্তমধ্যে সে তাঁহার দুই পায়ের তলায়, পা দুইখানার অত্যন্ত নিকটেই নিজের সেই কুসুমস্তবক তুল্য সুকোমল ও তেমনই সজ্জা-সুন্দর দেহলতাকে নামাইয়া দিয়া করযোড়ে সবিনয়ে উত্তর করিল—

"আপনার মহত্ত্বের দাসী—"

এ কি প্রহেলিকা! কুমার রামপালের মহত্ত্ব! আর সেই মহত্ত্বেরই দাসী এই অপরিচিতা নারী? রহস্য বটে! ক্ষণকাল রামপালের মুখ দিয়া বাক্য নিঃসৃত হইল না। কে এ রমণী? উন্মাদিনী কি? সম্ভব বটে! নতুবা যে রামপালের কলঙ্কে আজ দেশ ভরিয়া উঠিল, সমুদয় বরেন্দ্র-ভূমি যাহার নামে আজ গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিতেছে, 'ধিক্ ধিক্ রামপাল দেব!' সেই সময়ে এই একক নারীমূর্ত্তি একটা গভীর দুর্ভেদ্য রহস্যের মতই এই সান্ধ্য অন্ধকারে ডুবিয়া থাকিয়া যেন কোন্ এক অসাধারণ মূর্ত্তির মতই তাঁহাকে আজ যেন ব্যঙ্গচ্ছলেই বলিতে আসিল, 'সে তাঁহার মহত্ত্বের দাসী!' হায়রে! অপযশের—অবমাননার একটা সীমাও কি নাই? অথবা ইহার মধ্যে কিছু ভ্রান্তি থাকাও ত অসম্ভব নয়? চিত্ত ভারাক্রান্ত। গম্ভীরস্বরে তিনি তখন পুনঃ প্রশ্ন করিলেন, "যার সঙ্গে কথা কইছেন, তাকে আপনি ভাল ক'রে জানেন কি? বোধ করি, আপনার ভ্রম হইয়া থাকিবে।"

সেই রহস্যময়ী মূর্ত্তি তেমনই পদানতা অঞ্জলিবদ্ধা থাকিয়াই প্রসন্ন-স্মিতকণ্ঠে প্রত্যুত্তর করিল, "পরম ভট্টারক মহাকুমার রামপাল দেবকেই আমার কায়মনোবাক্যের একমাত্র শ্রদ্ধা প্রদান করতে এসেছি, এ বিষয়ে আমি অভ্রান্ত।"

মহাকুমার একটা বিস্ময়সূচক ধ্বনি করিয়া উঠিলেন, "তবু আপনি তার কাছে নিজেকে এতখানি নত করেছেন! আশ্চর্য্য! কোথায় খুঁজে পেলেন তার এ মহত্ত্ব, মহিমময়ি?"

ক্ষণকাল প্রতীক্ষা করিবার পর তখনও উহাকে বাক্য-বিমুখী দেখিয়া পুনশ্চ আবেগ-উথলিত ভারী গলায় থামিয়া থামিয়া কহিতে লাগিলেন,—"সারা পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের লোক যে কথা জানে, আপনি একাই কি তার খবর রাখেন না? কোথায় থাকেন আপনি? নিশ্চয়ই এদেশী নহেন? আপনার উচ্চারণেও আমি তার প্রমাণ পাচ্ছি। আপনি জানেন না, তাই এ কথা বলছেন। ভীরু, কাপুরুষ, আশ্রিত-জন-পরিত্যাগী রামপাল মহত্তম? একটা নগণ্যতর ক্লীবমাত্র, এই নিশ্চিতবার্ত্তা জেনে রাখবেন।"

রমণী এবার কথা কহিল। একটা গভীর সহানুভূতি-ভরা উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাস সে ধীরে ধীরে মোচন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। হাত তাহার তখনও সেই ভাবেই অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া ছিল, সন্তোগৃহপ্রবিষ্ট স্বল্পমাত্র তরুণ চন্দ্রালোকে সে সমুজ্জ্বল নেত্রে চাহিয়া স্মিত-মধুর-কণ্ঠে কহিল, "কস্তুরী-মৃগ নিজের গন্ধ নিজে পায় না, বনবাসীরাই তাহার গন্ধ পেয়ে তাহাকে অন্বেষণ করে। আপনি যে মহৎ, তা আমার মত অধমারও যখন একটি নিমেষের দেখায় জানতে বাকি থাকে না, তখন দু'চার জন নিতান্তই মূঢ় ব্যক্তি না জানলেও সমস্ত জগৎ জানে, অথবা এক দিন নিশ্চয়ই জানবে। যে সূর্য্যরশ্মি ইচ্ছামাত্রে সমস্ত জগৎকে ভস্ম করতে সমর্থ, তা না ক'রে সূর্য্য যে সেই তেজকে মানব-হিতের জন্য মাত্র আংশিকভাবে প্রদান ক'রে ঝটিকাকে সংবরণ ক'রে রাখেন, সেইখানেই কি তাঁহার মহত্ত্ব নয়? যদি তাঁহার সংহার-শক্তিকে কোন কারণে বা কারণান্তরের জন্য সংহরণ করেন, তাতে কি বুঝায় যে, তাঁহার শক্তির অভাব ঘটেছে? রুদ্রের মধ্যে ধ্বংসশক্তি আছে ব'লেই কি সর্ব্বদাই তিনি তাহাকে ক্রীড়নক ক'রে তুলবেন?"

রামপাল পুনশ্চ গভীরতর বিস্ময়-সাগরে মুগ্ধপ্রায় হইয়া গেলেন। এই নারী, এই বিদুষী ও প্রগল্ভা রমণী ত নিতান্তই সামান্যা নহে! আবার তাঁহার বিস্ময়ে স্খলিত কণ্ঠমধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিল,—"কে আপনি?"

মৃদু-মন্দ হাসির ছটায় মরকতমণিপ্রভ আরক্ত অধর সমধিক সুরঞ্জিত করিয়া তুলিয়া কোমল কণ্ঠে অভিসারিকা এবার সকৌতুকে উত্তর করিল, "মহারাজপুত্র! আমায় চিনতে পারলেন না? আমি কিন্তু সেই এক দিনের কয়েক মুহূর্ত্তের সাক্ষাতেই আপনাকে বোধ করি, এমন কি, আমার পরজন্মেও বিস্মৃত হ'তে পারব না। এ হতভাগীর নাম চন্দ্রকলা।"

সুগভীর বিস্ময়ভরে রামপাল যেন আত্মগতই উচ্চারণ করিলেন, "চন্দ্রকলা! মাগধ-নর্ত্তকী চন্দ্রকলা!"

নর্ত্তকী নীরব-সম্মতিতে তাহার ক্ষুদ্র বদ্ধাঞ্জলি চন্দ্রার্দ্ধবৎ সুগঠিত ললাটে স্পর্শ করাইল।

"আমার নিকট আপনার কি প্রয়োজন?" রামপালের কণ্ঠে একটা বিরস কাঠিন্য প্রকটিত হইল।

"বুদ্ধিমান্‌প্রধান পৌণ্ড্রবর্দ্ধন-যুবরাজ রামপালদেবকে কি সে কথা আরও স্পষ্ট ক'রে ব'লে দিতে হবে?"

কুমার কয়েক পদ সরিয়া দাঁড়াইয়া নীরস-কণ্ঠে কহিলেন,

"ভদ্রে! আপনাকে আমি এক দিন আমার জ্যেষ্ঠের পার্শ্বচারিণীরূপে দেখেছিলেম, আপনি সেই বা যাই হোন, সে সম্বন্ধে আমার মাননীয়া—"

চন্দ্রকলা সহসা যেন সুগভীর লজ্জায় মগ্ন হইয়া পড়িল। প্রবল একটা আত্মগ্লানি ও ধিক্কার সে আপনার মধ্যে অনুভব করিল। সহসা আর সেই চিরব্যাপিকার মুখে বাঙ্নিষ্পত্তি হইল না। তাহার মনে হইল, রামপাল তাহাকে অকথ্য গালি দ্বারা লাঞ্ছনা করিলে, এমন কি, প্রহার করিলেও যেন তাহা তাহার পক্ষে এত বড় অকরুণ ও অসহ্য হইত না। বেদনায় ও হতাশায় তাহার শত আশায় বাঁধিয়া তোলা হৃদয়-বীণা যেন ঐ একটিমাত্র কঠিন ইঙ্গিতের কঠোর ঘায়ে একবারেই খান্ খান্ হইয়া ছিঁড়িয়া পড়িয়া গেল। স্তব্ধ ও অসাড় হইয়া গিয়া সে বেদনা-পাণ্ডুর মুখে ততক্ষণে চন্দ্রালোক-উদ্ভাসিত তাহার একান্ত ঈপ্সিতের অতুল্য সুন্দর গাম্ভীর্য্যময় মুখের দিকে আহতনেত্রে চাহিয়া রহিল। তাহার বুক চিরিয়া, কণ্ঠ ঠেলিয়া, একটা অব্যক্ত আর্ত্তধ্বনি মুহুর্মুহুঃ আপনাকে ফাটাইয়া দিবার জন্য তাহার ভিতরটাকে নির্দ্দয়ভাবে পীড়ন করিতেছিল।

কুমারও হয় ত তাহার সেই হতাশার্ত্ত চোখের দিকে নিমেষের মত চাহিয়াই তাহার অন্তরের যুদ্ধের কথঞ্চিন্মাত্র বার্ত্তা পাইয়াছিলেন। তাই ঈষন্মাত্র কোমলভাবে কথা কহিয়া বলিলেন, "যদি আমারই অনুমান সত্য হয়, তবে ইহা অসম্ভব! আপনি বৃথাই এ কষ্ট স্বীকার ক'রে এসেছেন। দয়া ক'রে ফিরে যান ভদ্রে!"

এতক্ষণে চন্দ্রকলার অপহৃত বাক্‌শক্তি ফিরিয়া আসিল। উপর্য্যুপরি আঘাতের প্রবলতায় তাহার রোদন-বিবশ চিত্ত যেন সহসাই সুগভীর অভিমানে তপ্ত হইয়া উঠিয়া ঈষৎ সবলতা প্রাপ্ত হইল। সে-ও শুষ্ক কঠিন উপহাসের সহিত তীব্রকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "কুমার রামপালদেব কি অর্জ্জুনের পুনরভিনয় করছেন না কি? দুর্ভাগ্যক্রমে আমি দেব-নর্ত্তকী উর্ব্বশী নই, আমার অভিশাপ দেবার মত সামর্থ্য নেই, কিন্তু—" এই পর্য্যন্ত বলিয়াই সহসা সকল বাঁধ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া সহসা সে অশ্রু-আর্ত্ত বিবশা বিহ্বলা হইয়া একেবারে আছাড় খাইয়া রামপালের পায়ের তলায় মাটীতে পড়িয়া গেল। সেখানে পড়িয়া সমুদয় মহামূল্য সজ্জা-প্রসাধন ও রত্নসম্ভারকে তুচ্ছাদপি তুচ্ছ করিয়া দিয়া সে ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতে হইতে দুই হস্তে মহাকুমারের চরণদ্বয় ধারণ করিয়া রোদনরুদ্ধ স্বরে সকাতরে কহিতে লাগিল, "দয়া করুন মহাকুমার! নিষ্ঠুর নির্ম্মমের মত নারীহত্যা করবেন না। আমার সমস্ত জীবনের স্বাদ বদলে গেছে। জীবন আমার ধিক্কারে ভ'রে গেছে। আমি আমার অতীতকে নিঃশেষে মুছে ফেলে নূতন হব। এক দিনের জন্যও এতটুকু একটু স্নেহ, এক বিন্দু প্রেম, একটুখানি—অন্ততঃ একটুখানি মুখেরও আদর যদি আপনার কাছে পাই, আমি তাহার বিনিময়ে আমার সর্ব্বস্ব, এমন কি, এ জীবন শুদ্ধ হাসিমুখে দান করতে প্রস্তুত আছি।"

"আমি একপত্নীব্রতী, অন্য নারী আমার অস্পৃশ্যা, আমায় ক্ষমা করুন।"

"নিষ্ঠুর! শুধু একবারের জন্য ঐ উদার মহান্ মহত্তম বিশাল বক্ষে এই চিরতপ্ত ক্ষুদ্র বক্ষ সংবদ্ধ ক'রে একে জাহ্নবীধারায় অবগাহনের মত কলুষনাশ করতে দিন, একবার একটুখানি হাসিমুখে আমার এই তৃষিত চিত্তকে ধন্য করুন, জীবনের এই একটিমাত্র রাত্রি আমার সার্থক ক'রে দিন, তার পর আর কখনও না হয় আপনার সাক্ষাতে আস্‌ব না। এতেও কি আপনার পবিত্র সংযমে বাধবে? এ স্থলে আমিই যাচিকা, আপনি ত নন, এতে আপনার পাপ কোথায়? বরং যাচকের যাচ্ঞা-পূরণ ক্ষত্রিয়ের ও রাজার মহদ্ধর্ম্ম। দয়া করুন মহাকুমার! বড় আশায় একবারেই নিরাশ করবেন না, একবার মিথ্যা করেও বলুন, 'চন্দ্রকলা! আমিও তোমায় ভালবাসি'!"

কুমার রামপাল অবিচলিত দৃঢ় পদে যথাপূর্ব্ব দাঁড়াইয়া থাকিয়া অনুত্তেজিত স্থির স্বরেই কহিলেন, "বৃথা, ভদ্রে! বৃথাই আপনার এ অযোগ্য আবেদন! রামপাল ক্ষত্রিয় নয়, রাজা নয়, মহৎ নয়! সে যখন তার পিতৃ-প্রজার আর্ত্তনাদে আত্মসমর্পণে, অভিশাপে বধির হয়ে আছে, তখন নারীর প্রেম-নিবেদন গ্রহণ না করার নিষ্ঠুরতা তার কাছে কতটুকু? তার পর শুনুন ভদ্রে! আপনি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুগৃহীতা—আমার সম্মানযোগ্যা, তাই আমি এতক্ষণ আপনার সঙ্গ করলেম, কিন্তু আর নয়। জেনে রাখবেন, রামপাল নিজ পত্নী ব্যতীত অন্য নারীর সঙ্গে এ জীবনে এই প্রথমবার নির্জ্জনে বাক্যালাপ করতে বাধ্য হয়েছে। আশীর্ব্বাদ করুন, এই ঘটনা যেন তার জীবনে এই একবার এবং ইহাই শেষবার হয়। এখন

বিদায় নিন, অথবা তার চেয়ে না হয় আমাকেই বিদায় দিন।"

এই বলিয়া কুমার রামপাল সেই অসামান্য লাবণ্যময়ী সর্ব্বজনসমাদৃতা সুপ্রসিদ্ধা নর্ত্তকীর পদলুণ্ঠিত একান্ত আর্ত্ত-মূর্ত্তির প্রতি বারেক নেত্রপাত পর্য্যন্ত না করিয়াই দৃঢ়সঙ্কল্পে অবিচলিতপদে সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার পরিত্যক্ত সেই কঠিন প্রস্তরময় কক্ষতলে শত রাজেন্দ্রের চির-বাঞ্ছিতা ও রাজধানীর সর্ব্ব-সম্পদস্বরূপা মোহিনী নারী দলিত পুষ্পমাল্যের মতই মূর্চ্ছাহত হইয়া রহিল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

রাজসভায় সে দিন কয়েক দিন পরে মহারাজাধিরাজের শুভাগমন ঘটিয়াছে। সংবাদ পাইয়া প্রায় পঞ্চবিংশতি-সংখ্যক নাগরিক-প্রধান সমুদয় জনসঙ্ঘের প্রতিনিধিত্বে রাজ-সন্দর্শনে আগত হইয়াছেন। রাজ্যের অপালন বা কুপালন সংক্রান্ত অভিযোগ জানাইবার জন্যই ইঁহারা সমাগত হইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে বিশিষ্ট গৃহপতি-পুত্রগণ এবং শ্রেষ্ঠিসম্প্রদায়ই অধিকসংখ্যক। কদাচিৎ রাজ-পদোপসেবি-পুত্র দুই চারি জন মাত্র বর্ত্তমান ছিল।

অভিযোগ শুনিয়া মহারাজাধিরাজ অপ্রসন্নতা-বিরস মুখে ক্ষণকাল কিছু চিন্তা করিলেন, পরে মহাপ্রতীহার কুমার রুদ্রদমনকে লক্ষ্য করিয়া আদেশ দিলেন, "রাম-পালকে ডাকিয়া আনিতে লোক পাঠাও।"

কুমার রুদ্রদমন এক জন প্রতীহারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "মহাকুমার রামপালদেবকে সত্বর যাইয়া পরমেশ্বর পরমভট্টারক পরম সৌগত মহারাজাধিরাজের আহ্বান জানাইয়া এস।"

প্রতীহার প্রস্থান করিলে, মহারাজাধিরাজ নাগরিক প্রধান সঙ্ঘের সঙ্ঘপতিগণের প্রতি দৃষ্টি ফিরাইলেন।

"বুঝিয়াছি, এ সকলই আমার কনিষ্ঠ রামপালদেবের চক্রান্ত। তিনিই আমার রাজভক্ত প্রজাবর্গের চিত্তে বিদ্বেষ-বহ্নি প্রজ্বালিত করিতে সচেষ্ট হয়েছেন এবং তাহারই জন্য নিত্য আমায় এই সকল অশান্তি ভোগ করতে হচ্ছে। বস্তুতঃ, সাম্রাজ্য খুব ভালভাবেই পালিত হচ্ছে। দূত পাঠিয়ে মহাসামন্তের এ সম্বন্ধীয় মতামত জানতে পারবে। আর আপাততঃ মহামাণ্ডলিক, মহাসেনাপতি, মহাপ্রতীহার, মহাকুমার, অমাত্যবর্গ, দণ্ডোপাসিক, চৌরোদ্ধরণিক, ক্ষেত্রপ, প্রান্তপাল, কোট্টপাল, হস্ত্যশ্বোষ্ট্র-নৌবল-ব্যাপৃতক, শৌল্কিক, গৌল্মিক, শৌনিক এ স্থলে সমাগত সাম্রাজ্যনায়কগণ বুদ্ধ ভট্টারকের নামে শপথ লয়ে, কে বলতে পারেন যে, তিনি তাঁহার স্বীয় কর্ত্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ আছেন? আর তাই যদি না থাকেন, তবে আর রাজ্যের অপালন বা কুপালন কোন্‌খান দিয়ে হ'তে পারল? মহাসন্ধিবিগ্রহিক ভদ্রপাল! আমাদের প্রতিবেশী রাজবর্গ হ'তে অথবা সীমান্তবাসী বর্ব্বর জাতি হ'তে আপাততঃ আমাদের সাম্রাজ্যের কোন স্থান আক্রান্ত হওয়ার মত কোন অশান্তি দৃষ্ট হচ্ছে কি?"

মহাসন্ধি-বিগ্রহিক কুমার ভদ্রপাল আনতশিরে বুকে কর স্পর্শ করিয়া সসম্ভ্রমে উত্তর দিলেন, "কোন অশান্তিই ত দৃষ্ট হয় না, মহারাজাধিরাজ! সকলেই এখন মহারাজাধিরাজের মিত্রতাবন্ধনে দৃঢ়বদ্ধ। বিশেষ পাল-সাম্রাজ্যে এখন আর বর্ব্বর আক্রমণের কোন উপায়ই নাই। সে চিন্তা আমাদের নয়। তাহা অপর পাল-নামধারী রাজাদের পক্ষেই চিন্তনীয়।"

মহারাজাধিরাজ প্রসন্নমুখে দণ্ডোপাসিককে প্রশ্ন করি-লেন, "আজকাল বরেন্দ্রীর শাসনতন্ত্র ত কোনক্রমেই শিথিলতা প্রাপ্ত হয় নি, ইন্দ্রসেন?"

ইন্দ্রসেন অঞ্জলিবদ্ধকরে প্রত্যুত্তর করিলেন, "এমন দিন যে দিন এ সাম্রাজ্যে দেখা দিবে, তৎপূর্ব্বে ইন্দ্রসেনের অস্তিত্ব লোপ হয়ে যাবে জানবেন। সুশাসনই পাল-সাম্রাজ্যের মেরুদণ্ড। দাস এ জীবনের শেষ নিশ্বাস গ্রহণ করবার সময়েও তা ভুলে যেতে অসমর্থ, রাজাধিরাজ! আর এ পদে প্রতিষ্ঠা আমাদের আজকার নয়। ভট্টারক-প্রধান পরমকুশলী রাজাধিরাজ ধর্ম্মপালদেবই আমাদের পিতৃপুরুষের নির্ব্বা-চক। সে নির্ব্বাচন ভ্রমযুক্ত হওয়া কি সম্ভব?"

"কর্ণভদ্র! দেশ কি একেবারেই শস্যহীন?"

ক্ষেত্রপ কর্ণভদ্র সবিনয়ে নিবেদন করিলেন, "যদিও বৃষ্টির অপ্রাচুর্য্য হেতু পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি এবার সমুচিত শস্য প্রসব করতে সমর্থ হয় নাই, কিন্তু কর্ব্বট, কোটিবর্ষ, কৌশিকি কচ্ছ, সুহ্ম প্রভৃতি হ'তে বহুল পরিমাণে খাদ্য-শস্যাদির আমদানী করায় পৌণ্ড্রে এক্ষণে প্রকৃত খাদ্যাভাব আছে, এমন কথাটা কখনই বলা যায় না।"

পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহীপালদেব জননায়কগণের প্রতি বিজয়োৎফুল্ল সগর্ব্ব দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক সাহঙ্কারে সম্বোধন করিলেন, "শুনিলে ত? আমার সাম্রাজ্যে কোথাও কোন অভাব দেখা যায় না। বহিঃশত্রু বা প্রতিবেশী দ্বারা আক্রমণের ভয় নেই, অবিচার নেই, খাদ্যাভাব নেই। ইহার চেয়ে বেশী সুশাসন ধর্ম্মপাল, দেবপাল বা বিগ্রহপালের সময়েও দেখা যায় না। আবার বৃথা লোকোত্তেজনা দ্বারা অনর্থক দেশের শান্তিভঙ্গ করা হ'লে রাজদ্রোহীদের বিচার ও শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা হ'তেও বেশী বিলম্ব হবে না। অতএব এখন তোমরা বিদায় নিতে পার, আমার যা কিছু বলবার ছিল, বলা হয়ে গেছে।"

জন-নায়কগণের মধ্য হইতে এক জন সাহস করিয়া প্রতিবাদ করিতে গেলেন, "কিন্তু মহারাজাধিরাজ!—"

মহারাজাধিরাজ মহাপ্রতীহার কুমার রুদ্রসেনের প্রতি কটাক্ষ করিয়া কহিলেন, "আমার কার্য্য সমাধা হয়েছে—এখন তোমার কার্য্য আরম্ভ করতে পার।"

সেই পঁচিশ জন সম্মানিত বিশিষ্ট জননায়ক হতাশা-শঙ্কিত ললাটে ও রোষরক্ত-নেত্রে সভাগৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া গেলেন।

দ্বারের বাহিরেই তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল কুমার রামপালের। কুমার তাঁহাদিগকে দেখিয়াই উদ্দেশ্য বুঝিয়াছিলেন, তাঁহাদের মুখভাবে কার্য্যফলও বিঘোষিত হইতেছিল, তাহাও দেখিলেন। তাঁহার দৃঢ়বক্ষ দীর্ঘশ্বাসে স্ফীত হইয়া উঠিল মাত্র।

জননায়ক ধর্ম্মদেব মহাকুমারকে অভিবাদন জানাইলেন। নিকটে আসিয়া মৃদুকণ্ঠে মিনতিভরা স্বরে কহিলেন, "এখনও বুঝে দেখুন, মহাকুমার! মহারাজাধিরাজের সম্পূর্ণ উৎসন্নকাল উপস্থিত, নতুবা তাঁহার এত বড় কুবুদ্ধি ঘটিত না। যদি আপনাতে রাজ্যের ও পিতৃপুরুষের কিছুমাত্র মঙ্গল-কামনা থাকে, তবে এখনও আমাদের সঙ্গে যোগদান করুন, সমস্ত বরেন্দ্রী আপনাকে সাগ্রহে বরণ ক'রে নেবে। তারা কাতরকণ্ঠে আপনাকে সেই ভিক্ষাই জানাচ্ছে। আপনি তাদের রাজা, শরণাগতদের অভয় দিন। বিখ্যাত পাল-সম্রাটদের পুণ্য নামকে পঙ্ক থেকে উদ্ধার করুন।"

কুমার রামপালদেবের চলনোদ্যত চরণদ্বয় কঠিন ও স্পর্শশক্তিরহিত হইয়া মাটীর উপর অচল হইয়া গেল। তাঁহার সেই শালপ্রাংশু মহাভুজদ্বয় কুঠারছিন্ন লতাবল্লীবৎ দুইপার্শ্বে অসহায়ভাবে ঝুলিয়া পড়িল। দৃষ্টি তাঁহার কি লজ্জার নৃশংস তাড়নায় যে ধরণীগর্ভশায়ী হইয়া গেল, তাহা একবারেই অকথ্য!

"আবার সেই বৃথা সংশয়! ক্ষুদ্র হৃদয়-দৌর্ব্বল্য! সেই অরাজনৈতিক ক্লৈব্য! না না, মহাকুমার! রাজনীতিতে ভ্রাতৃস্নেহের কোন মূল্য নাই! জানেন কি, এই মুহূর্ত্তে মহারাজাধিরাজ কি উদ্দেশ্যে আপনাকে এখানে ডাকিয়ে এনেছেন? জানেন কি সে কথা? বিদ্রোহের—অশান্তির সৃষ্টিকর্ত্তা সন্দেহে আপনাকে হয় ত—খুবই অসম্ভব যে, তাহাও নিঃসংশয়ে বলা যায় না,—হয় ত বন্দী করতে। যে কায আপনি করেন নি, সেই দোষেই যদি বৃথা দণ্ডিত হয়ে দুঃখ পান, তার চেয়ে কি এই শত সহস্রের দ্বারা গৌরবদত্ত অধিকার নিয়ে তাকে সার্থকতামণ্ডিত ক'রে তুলে পূর্ব্ব ও উত্তর পুরুষের মুখোজ্জ্বল করাই শ্রেয় নয়? ভাল ক'রে ভেবে দেখুন মহাকুমার! যে সুযোগ দু' পায়ে ক'রে আজ ঠেলে দিচ্ছেন, হয় ত শত বর্ষের অক্লান্ত চেষ্টায়ও আর তাহা আপনার বংশীয় কেহ কখনও ফিরিয়ে আনতে পারবেন না। হয় ত ইহার জন্য এক দিন—চিরদিন গভীর—গভীরতর অনুতাপের আগুনে আপনার চিরজীবনটাই দগ্ধ হয়ে—ভস্ম হয়ে যাবে, কিন্তু অনায়াসলভ্য এ দিনকে আর তখন বুকের রক্তের ধারা ঢেলে দিয়েও ফেরাতে পারবেন না। অথচ যাহার প্রতি অন্ধস্নেহে এই করতলায়ত্ত মহারত্ন আজ মোহমুক্ত হয়ে পায়ে ঠেলছেন—সেই অকৃতজ্ঞ ভাই আপনার জন্য রাজ্যের সর্ব্বাপেক্ষা কুশলী ঘাতুকের হাতের কুঠার শাণিত করাচ্ছে। প্রতি মুহূর্ত্তেই তাহা, আপনার যে শিরে ভুবন-বন্দিত পাল-রাজবংশের গৌরব-মুকুট সগর্ব্বে শোভা পেতে পারে, তাকে হীন অপরাধীর মত মশান-ক্ষেত্রের ধূলি-রুধির-কর্দ্দমাক্ত ক'রে দিতে সমর্থ! মহাকুমার রামপালদেব! জীবন নয়, যশ ও কীর্ত্তি চিরস্থায়ী, ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্মপালনেই যথার্থ পৌরুষ! শ্রীভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত মহাবাণী একবার স্মরণ করুন—

"ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে॥"

"ক্ষান্ত হোন, ক্ষান্ত হোন ধর্ম্মদেব! বন্ধু! সখা! পালরাজবংশ যে নির্ব্বংশ হয়ে গেছে, ভাই! হতভাগ্যপ্রধান

"আজি নিশ্চল বায় শান্ত উষায় নির্জ্জন নদী-তীরে
স্নান অবসানে শুভ্রবসনা চলিয়াছে ধীরে ধীরে !"—রবীন্দ্রনাথ

বসুমতী প্রেস] [শিল্পী—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মজুমদার

রামপাল যে আজ মৃত! এটা যে তার একটা ঘৃণ্য—ঘৃণ্যতম প্রেতাত্মা মাত্র। এর ক্লীবদেহে নরশোণিতের বিন্দুমাত্র ত অবশিষ্ট নেই! কার কাছে কি আশা করছেন? ওঃ, না না না, চ'লে যান, চ'লে যান, আর না, আর না।" যন্ত্রণা-ব্যথিত হৃদয়ে তীব্র স্বরে এই কথাগুলি উচ্চারণ করিয়াই প্রাণভয়ভীত ব্যাধ-বিতাড়িত পশুর ন্যায় প্রাণপণে ছুটিয়া রামপালদেব সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন, ঝড়ের ঝাপটার মতই তাঁহার সেই উদ্দাম প্রমত্ত গতি, সে পথের মধ্যে যে কেহ আসিয়া পড়িল, তাঁহার গতিবেগে সংঘর্ষিত হইয়া ভূমে পতিত হইল।

মহারাজাধিরাজ তখন তাঁহার অমাত্যমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া দম্ভভরে বলিতেছিলেন, "দেখলে ত অরাতি-মর্দ্দন! শত্রুদমন! দেখলে ত তোমরা, স্বকর্ণেই ত সব শুনতে পেলে? বৈমাত্র ভাইয়ের আমার কত গুণ, তোমরাই এখন তার বিচার ক'রে দেখ! তার প্রশ্রয় না পেলে কখনই ক্ষুদ্র প্রজাবৃন্দের এত বড় ভরসা হ'তে পারে না যে, তারা রাজার কাছে রাজারই বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে পারে! এখন এই রাজদ্রোহী রামপালের সম্বন্ধে কি করা উচিত, তোমরাই সকলে বিবেচনা ক'রে দেখ এবং যদি—"

"এতে আর যদি নাই। আমাদের মতে অবিলম্বে মহাকুমার রামপালদেবকে—"

"বন্দী ক'রে ঘাতুকের হস্তে সমর্পণ করাই কর্ত্তব্য? তাই হোক্, তাই হোক্ রাজাধিরাজ! রামপাল রাজদ্রোহী, রামপাল আপনার জাত-শত্রু, রামপাল আপনার সিংহাসনের কণ্টক, রামপাল জীবিত থাকিতে আপনার জীবন প্রতি ক্ষণেই অনিশ্চিত। বন্দী করুন, বন্দী করুন, রাজা! নির্ব্বিচারে এই মুহূর্ত্তেই তাকে ঘাতুকের শাণিত কুঠারের তলায় সঁপে দিন, আপনার ধনপ্রাণ চির-নিরাপদ হোক্।"

গভীর উত্তেজনায় রুদ্ধপ্রায় শ্বাসে এই কথা কয়টা বলিতে বলিতে শ্বাস গ্রহণ জন্য রামপাল এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইলেন।

সভাস্থল স্তব্ধ! আকস্মিক উল্কাপাতের মতই রামপালদেবের আগমন ও অভিব্যক্তি এ স্থলে উপস্থিত প্রত্যেক জনকেই বিস্ময়-বিহ্বল করিয়া ফেলিয়াছিল। এমন কি, স্বয়ং রাজাধিরাজও বিস্ময়ের সহিত নির্নিমেষে রামপালের প্রেতাত্মার মতই বিরূপদর্শন বিকৃত মুখের দিকে চাহিয়া মনে মনে শঙ্কিত হইতেছিলেন যে, হয় ত এই সব ছদ্ম-বাক্যের অন্তরালে না জানি কি গূঢ় দুরভিসন্ধিই নিহিত হইয়া আছে। হয় ত বা এই মুহূর্ত্তেই তাহা একখানা চক্চকে কৃপাণের মূর্ত্তিতেই বা তাঁহার বক্ষ লক্ষ্যে উত্থিত হইবে! দ্বারের বাহিরে হয় ত বা রামপালের দ্বারা উৎসাহ-প্রাপ্ত সহস্র সহস্র বিদ্রোহী প্রজাও সশস্ত্র হইয়া তাঁহার পলায়ন-পথরোধার্থ প্রস্তুত হইয়াই দাঁড়াইয়া আছে। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। ললাট হইতে স্বেদবারি বহিয়া গণ্ডোপরি পতিত হইতে লাগিল।

রামপাল ঊর্দ্ধমুখে রুদ্ধশ্বাস সবেগে টানিয়া লইয়া পুনশ্চ কহিলেন, "কুমার রুদ্রদমন! কৈ, এখনও আপনি নিশ্চল কেন? এইরূপেই কি আজকাল আপনারা আপনাদের কর্ত্তব্যপালন ক'রে থাকেন? এই দেখুন, আমি আপনাকে নিরস্ত্র ক'রে দিচ্ছি, এবার বোধ করি, আর আপনাদের মনে কোন সংশয় নেই? তবে আসুন, এই নিন, রাজদ্রোহীকে বন্দী করুন।"

যখন রামপালদেব সত্য সত্যই নিজেকে নিরস্ত্র ও উষ্ণীষবিহীন করিয়া সর্ব্বজনসমীপে অপরাধীর ন্যায় নতমস্তকে দাঁড়াইলেন, তখন বজ্রাহত রাজসভায় যেন সকলেরই মৃতপ্রায় জীবনীশক্তি ফিরিয়া আসিল।

মহারাজাধিরাজ মহীপালদেবের সংশয়-কম্পিত হৃদয়ের মধ্য দিয়া একটি উৎকট তীব্র আনন্দের উচ্ছ্বাস সবেগে প্রবাহিত হইয়া গেল। তিনি সাহঙ্কার-বিজয়োৎফুল্ল নয়নে কনিষ্ঠের শব-শুভ্র রক্তহীন মুখে তীব্র কটাক্ষ করিয়া চাপা মৃদুহাস্যের সহিত গর্ব্বিত বাক্যে কহিলেন, "জানই যখন আমার সঙ্গে পেরে উঠবে না, তখন কেনই বা অনর্থক এ সব অনর্থে জড়িত হ'তে গেলে? কুমার রুদ্রদমন! রাজার কায বড়ই কঠিন; আমাদের কর্ত্তব্য বড়ই কঠোর! অথচ রাজনীতিতে স্নেহেরও কোনখানে স্থান নেই, আত্মপর বিচারের উপায়মাত্র নেই, অতএব আমার কর্ত্তব্য আমি এবং তোমার কর্ত্তব্য তুমি পালন করতে একান্তই বাধ্য! রাজদ্রোহীকে বন্দী ক'রে নির্জ্জন কারাগারে প্রেরণ কর। কিন্তু সাবধান, বিদ্রোহীরা যেন বন্দীকে ছিনিয়ে নিতে না পারে, সহস্রাধিক সশস্ত্র সৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত ক'রে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা কর, অথবা—"

কুমার রুদ্রদমন রাজাজ্ঞাপালনার্থ ঈষৎ কুণ্ঠিত মুখে

উঠিয়া রামপালের অভিমুখে অগ্রসর হইতেই তাঁহাদের পশ্চাৎ হইতে সহসা সকলেরই পরিচিত একটি বিস্ময়-স্তম্ভিত-প্রায় কণ্ঠ সাশ্চর্য্যে উচ্চারণ করিয়া উঠিল, "এ কি দৃশ্য দেখিলাম! মহাকুমার রামপালদেব তাঁহার পিতৃ-সিংহাসনতলে কিসের জন্য আজ এই ঘৃণ্য অপরাধীর মূর্ত্তিতে নিগৃহীত?"

মহাপ্রতীহার ত্রস্তে দুই পদ পিছাইয়া গেলেন। সকলেরই মুখের উপর একটা ভীতির ছায়াপাত হইল। রাজাধিরাজ সক্ষোভ বিরক্তিতে পূর্ণ হইয়া আগন্তুকের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। তাঁহার বিস্ময়স্খলিত জিহ্বা হইতে শিথিলভাবে উচ্চারিত হইল, "কে শূরপাল! তুমি এখানে?"

মহাকুমার ও মহাসামন্ত শূরপালদেব আরক্ত মুখে ভ্রুকুটিবদ্ধ-নেত্রে অগ্রসর হইয়া আসিয়া নিজ ভ্রাতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া জ্যেষ্ঠ মহারাজাধিরাজকে যথোচিতভাবে অভিবাদন জানাইলেন, পরে তাঁহার প্রশ্নোত্তরে ঈষৎ রূঢ়কণ্ঠেই প্রত্যুত্তর করিলেন, "মাগধী প্রজার সম্বন্ধে আপনি যে নূতন কর ধার্য্য ক'রে দিয়েছেন, তাতে তারা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছে, সেই সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বক্তব্য আছে বলেই আমায় সহসা চ'লে আসতে হয়েছে, রাজাধিরাজ! কিন্তু এ কি! রামপাল,— মহাকুমার রামপালের এ অবস্থা কেন? সে আপনার ভাই নয়?"

রাজাধিরাজ সক্রোধ কটাক্ষ একে একে ভ্রাতৃদ্বয়ের পরেই নিক্ষেপ করিয়া রোষগম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন, "রামপাল রাজদ্রোহী। রাজধর্ম্মে যে ভ্রাতৃত্ব নেই, এটা তোমারও জানা উচিত ছিল, মহাসামন্ত!"

শূরপাল এই উত্তর পাইয়া সক্ষোভে ঈষৎ হাসিলেন, কহিলেন, "বিশ্বাস করতে পারলেম না, রাজাধিরাজ! রামপাল রাজদ্রোহী!"

মহীপাল যে দৃষ্টি দিয়া তাঁহার দিকে চাহিলেন, বজ্রানলেও ততখানি দাহিকা শক্তি আছে কি না সন্দেহ।

"তবে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ অমাত্যমণ্ডলীকে, স্বয়ং তোমার সহোদর রামপালকেই জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ, সেই বা কি উত্তর দেয়।"

শূরপাল নতমুখ ও আনতমস্তক কনিষ্ঠের স্কন্ধোপরি সস্নেহে করার্পণ করিয়া তাহাকে নিজের নিকটে টানিয়া লইলেন। পরে অপর হস্তে তাঁহার শবশীতল দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়া স্নিগ্ধ-স্মিত মুখে তাঁহাকেই উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, "এস আমরা যাই।"

এই বলিয়াই রাজামাত্যের আজ্ঞা পালন না করিয়াই অপরিসীম ক্রোধে বিবর্ণ ও স্তব্ধ রাজাকে অভিবাদনমাত্র জানাইয়াই যেমন অতর্কিতে আসিয়াছিলেন, তেমনই সহসা কনিষ্ঠের হাত ধরিয়া এক প্রকার তাঁহাকে টানিয়া লইয়াই সভা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। কেহ কোন বাধা দিতে ভরসামাত্র করিল না।

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

অশ্রু

তোমরা ভাবিছ বুঝি, তপনের করে
সিন্ধু-নীর বাষ্প হয়ে মেঘে পরিণত,
জল-ভরা মেঘখানি ভাসে নভ'পরে
অনুকূল বায়ু-স্পর্শে হবে ধারানত!

নয়, নয় কবে কার অসতর্কতায়,
এতটুকু অনাদরে, অথবা বিরহে,
অভিমান-ব্যথা-তপ্ত মনোবেদনায়
প্রিয়ার প্রেমের সিন্ধু এ কাহিনী বহে।

বাষ্প-রূপে উঠি তাই আকুলতাভরে,
আমি দেখি ঢাকিয়াছে নীল আঁখি তার,
একটু সোহাগে আর একটু আদরে
টপ্ টপ্ ঝরিবে তা উরসে আমার!

শ্রীবিজয়মাধব মণ্ডল।

ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ও ধর্ম্মের প্রভাব

পৃথিবীতে মানুষ কোন্ সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিল এবং কোন্ সময়েই বা তাহাদের ধর্ম্মে মতি হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। তবে প্রাচীন যুগের মানবের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ধর্ম্ম সে যুগের মানুষের জীবনের অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়াছিল। তাহার একটি সঙ্গত রাজনীতিক কারণও ছিল। ধর্ম্মে যেমন লোককে একতার বন্ধনে বাঁধে, এমন আর কিছুতে নহে। সুতরাং শত্রুর হস্ত হইতে নিরাপদ হইবার জন্য, সমবেত শক্তিকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য লোক সংঘবদ্ধ হইত এবং সে সংঘের গ্রন্থি ছিল ধর্ম্ম।

ভারতবর্ষের পুরাতন ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, আর্য্যরা এক সময়ে দলবদ্ধ হইয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। এ দেশের অধিবাসীরা বর্ব্বরই থাকুক আর অর্দ্ধসভ্যই থাকুক, তাহাদের শারীরিক বলের অভাব ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তাহাদিগকে পরাভূত বা উৎসাদিত করিয়া এ দেশ দখল করিতে আর্য্যদিগের অনেক সময় লাগিয়াছিল। সমগ্র ভারতবর্ষ আর্য্যরা অধিকার করিতে পারেন নাই। এখনও অনেক অনার্য্যজাতি ভারতের অনেকখানি স্থান জুড়িয়া রহিয়াছে।

আর্য্যরা কোথা হইতে আসিলেন, কবে আসিলেন, অথবা কত দিন ধরিয়া আর্য্যপ্রবাহ ভারতবর্ষে তরঙ্গে তরঙ্গে আসিয়াছিল, তাহা লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রহিয়াছে। আর্য্যরা হয় ত বহু গ্রাম নগর হইতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু সে সংবাদ কেহ রাখে না। আমরা শুধু জানি যে, তাঁহারা আর্য্য ছিলেন। তাঁহাদের ঐক্যগ্রন্থি খুঁজিতে হইলে তাঁহাদের সাহিত্যের মধ্যে অনুসন্ধান করিতে হয়। আপনারা বলিবেন Aryan culture, আমি বলি আর্য্যধর্ম্ম। আমরা সেই প্রাচীনকালের সাহিত্য বলিতে কি বুঝি? বুঝি বেদ, উপনিষৎ, ব্রাহ্মণ, মন্ত্র, আরণ্যক। কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী যুগে বুঝি রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ। সবই ধর্ম্ম-সাহিত্য; ধর্ম্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংসৃষ্ট। প্রাচীন ভারতের যুগবিভাগ করিতে হইলে ধর্ম্ম দিয়াই করিতে হয়। যথা, বৈদিক যুগ, রামায়ণ-মহাভারতের যুগ, এমন কি, বৌদ্ধ যুগ। ঐতিহাসিকরা বলেন যে, বৌদ্ধ যুগ কথাটা ঠিক নহে। ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ বলেন যে, বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্ম্ম এক সময়ে মাথা তুলিয়াছিল এবং অনেক চেলাও হইয়াছিল, কিন্তু ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মকে কোন-ও দিন ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। কালক্রমে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম বৌদ্ধ ধর্ম্মকে ভারতবর্ষ হইতে বিদায় করিয়া তবে ছাড়িল।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে ধর্ম্ম লইয়াই কারবার বেশী। অন্ততঃ যে ইতিহাস আমরা পাই, তাহা ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের ইতিহাস, ধর্ম্ম-বিপ্লবের ইতিহাস। শুধু ভারতে কেন, আমার বোধ হয়, অন্য দেশেও এমনই একটা কিছু হইয়াছিল। প্রাচীন গ্রীক জাতির ইতিহাসে দেখি, ঐ ধর্ম্মের বন্ধনই জাতিটাকে গড়িয়া তুলিয়াছিল। স্পার্টা, এথেন্স, কোরিন্থ, থিব্‌স আর সব বিষয়ে মারামারিই করুক আর কাটাকাটিই করুক, ধর্ম্মে তাহারা সমস্তই এক। ম্যাসিডন গ্রীসের মধ্যে নহে। তথাপি ম্যাসিডনের রাজা গ্রীকদের ধর্ম্ম মানিতেন, অলিম্পিক ক্রীড়ায় যোগদান করিতে পারিতেন। এই জন্য তিনি গ্রীক। ভারতবর্ষের দুয়ারে যখন তিনি আসিয়া হানা দিলেন, তখন তাঁহার গ্রীক সৈন্যকে বাধা দিতে পারে, এমন শক্তি ভারতের ছিল না। ভারতে তখন ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য, ভিন্ন ভিন্ন জাতি, বিভিন্ন ধর্ম্ম। হিন্দু-ধর্ম্ম তখন নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে, বৌদ্ধ-ধর্ম্ম তখনও দিগ্বিজয় করিতে বাহির হয় নাই। আর ৬০।৭০ বৎসর পরে অশোক বৌদ্ধ ধর্ম্মের মধ্যে প্রাণশক্তির সঞ্চার করিয়া দিলেন। মানুষ প্রাণবান্, জৈব পদার্থ। ধর্ম্ম সেই প্রাণদেবতার প্রণব। এখানে Relgion অর্থে ধর্ম্ম শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে। আপনারা প্রাচীন জাতির ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবেন যে, সে কালে ধর্ম্ম একটা মৌখিক জিনিষ ছিল না, একটা পোষাকী কাপড়ের মত তাকের উপর তুলিয়া রাখিবার বস্তু ছিল না। ধর্ম্ম ছিল লোকের প্রাণের সঙ্গে গাঁথা। তাই আমরা দেখিতে পাই যে, জগতের প্রধান ধর্ম্মগুলি সবই প্রায় সেই পুরাতন কালের সৃষ্টি। মুসলমান-ধর্ম্মও বার তেরশ' বৎসর পূর্ব্বেকার। বসুন্ধরা বুঝি এখন বৃদ্ধা,

জরাগ্রস্তা ; তাই আর তেমন নূতন ধর্ম্ম প্রসব করিতে পারেন না। কিন্তু এখনও মানবের মধ্যে ধর্ম্মের বিভাগই প্রধান বিভাগ। যতই চেষ্টা করুন মানবকে আর্য্য ও অনার্য্যের মধ্যে ফেলিবার জন্য, যতই চেষ্টা করুন ককেসীয়, মোঙ্গোলীয় বা ঐরূপ কোনও কাল্পনিক বিভাগে মানবজাতিকে বিভক্ত করিবার জন্য, দেখিবেন, ঐ ধর্ম্মের পরিচয় আর সকল পরিচয়কে ম্লান করিয়া দিবে ; সমস্ত কাল্পনিক বিভাগকে ছাড়াইয়া উঠিবে, হিন্দু, মুসলমান, পার্শী, বৌদ্ধ, জৈন, খৃষ্টান—এই বিভাগ। ধর্ম্ম কথনও দেশকালের বাধা মানে না। জার্ম্মাণ, ইংরাজ, ফরাসীর মধ্যে যতই ব্যবধান থাক্ না—গিরিনদী-সাগরের, তবুও তাহারা খৃষ্টান। আজ তাহাদের মধ্যে যুদ্ধ, কলহ ; কাল সন্ধি, প্রীতি ও ভোজ। চীনার সঙ্গে যখন চটাচটি, তখন ফরাসী ইংরাজ আর ফরাসী ইংরাজ নয়, তাহারা খৃষ্টান। এই খৃষ্টান শক্তিই আজ ধরাকে সরা জ্ঞান করিতেছে, কেন না, পশ্চিমের দিকে চক্ষু ফিরাইলে দেখিতে পাওয়া যায়, খৃষ্টানদের অযুত, নিযুত, কোটি, অক্ষৌহিণী রুসিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া আমেরিকা পর্য্যন্ত গিস্ গিস্ করিতেছে। তাই আজ খৃষ্টান শক্তির নিকট মেদিনী মস্তক নত করিয়াছে।

এসিয়া এখনও ঘুমে নিঝুম। জাপান বিংশ শতাব্দীর প্রথমে বড় রকম একটা সাড়া দিয়া উঠিয়াছিল। এসিয়ার মনে কিছু আশার সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু সমগ্র এসিয়াকে টানিয়া তুলিবে, এমন শক্তি জাপান পাইবে কোথায়? ক্রুজার বা কামানে সে শক্তি দিতে পারে না। জাপান কিছু শক্তিলাভ করিয়াছিল, সে শক্তি সে নিজের স্বার্থের জন্যই লাগাইতেছে। Pan Asiatic movement, Yellow peril প্রভৃতি যে সমস্ত মুখরোচক বুলি মাঝে মাঝে শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে এতটুকু সত্য নাই। বৌদ্ধধর্ম্ম আগে যেমন চীন, তুর্কীস্থান, তিব্বত, জাপানকে জাগাইয়াছিল, আবার যদি তেমনই কোনও সোনার কাঠী পাওয়া যায়, তাহা হইলে এসিয়ার বিরাট প্রাণহীন দেহে আবার হয় ত প্রাণের স্পন্দন ফুটিয়া উঠিতে পারে।

বৌদ্ধধর্ম্মে আর সে প্রাণ নাই। এক দিন এই বৌদ্ধধর্ম্ম দিগ্‌দিগন্তে ছুটিয়া জগতের আধ্যাত্মিক ক্ষুধা মিটাইয়াছিল। সে দিন এ দেশ বাহিরের জগৎকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিতেও ভয় পাইত না। ভারতের কটক তখন বাহিরে রাজ্যস্থাপন করিতে বিজয়যাত্রা করিয়াছিল। শুধু শক্তিতে নহে, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, শিল্পে, সব বিষয়েই ভারতের লোক বিশ্বমানবকে বিস্মিত করিয়াছিল। নালন্দা, বিক্রমশিলা, ওদন্তপুর, তক্ষশিলা এ সকলের নাম কে না জানে? দেশ-বিদেশ হইতে সাধিয়া আসিত লোক আমাদের নিকট শিক্ষালাভ করিতে। নালন্দা খনন করা হইতেছে। সে কালে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে Residential Universityতে দশ হাজার ছাত্র থাকিবার কি অদ্ভুত বন্দোবস্ত ছিল, তাহার কিছু আভাস সম্ভবতঃ আমরা পাইব। তাহার পূর্ব্বেও আমরা যে সকল অদ্ভুত অদ্ভুত কীর্ত্তির পরিচয় পাই, তাহা কেমন করিয়া সম্ভব হইল, তাই ভাবি। অশোকের রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া চীন পরিব্রাজক বলিয়াছিলেন, এ মানুষের কায নহে, দানবেরই সম্ভব। অশোকস্তম্ভগুলি একখানি পাথর কাটিয়া কেমন করিয়া প্রস্তুত করিল, কেমন করিয়া দূরে বহিয়া আনিয়া স্থাপন করিল, তাহা এখনও আমরা বলিতে পারি না। বরাবর পাহাড়ের গুহাগুলির দেয়াল পালিশ করিয়া আয়নার মত করিল কেমন করিয়া, তাহা এখনও কেহ বলিতে পারে কি? সাঁচি, সারনাথ, তক্ষশিলার কথা আর কি বলিব? বৌদ্ধকীর্ত্তি আজ যদি সব থাকিত, তাহা হইলে জগতের লোক ছুটিত শুধু বিমুগ্ধ নেত্রে এ দেশ দেখিবার জন্য। কিন্তু কতক কালক্রমে লয় পাইয়াছে, কতক মুসলমানদের কৃপায় নষ্ট হইয়াছে। যাহা হউক, এ সকল দেখিলে কি মনে হয়? আমার ত মনে হয়, বৌদ্ধ ধর্ম্ম এ দেশের উপর দিয়া একবার প্রাণের হাওয়া বহাইয়াছিল। সে ধর্ম্ম যখন ম্লান হইল, তখন আর এ প্রতিভা, এ সামর্থ্য রহিল না। মুসলমান বিজেতারা হিন্দু মিস্ত্রী-কারিকর ধরিয়া তাঁহাদের মত শিল্পে ইমারৎ করাইয়া লইলেন। কেহ কেহ এই সকল কারিকরকে বন্দী করিয়া নিজ দেশে লইয়া গেলেন। মুসলমান শিল্প বা যাহাকে Indo-Saracenic art বলে, ক্রমে ক্রমে ফুটিয়া উঠিল, তাহার নিদর্শন গৌড়, দিল্লী, আগ্রা, জৌনপুর, ফতেপুর শিক্রিতে দূর-দূরান্তর হইতে এখনও লোক দেখিতে আইসে সে প্রতিভার বিকাশ। এখন আর সে তাজমহল, সে দেওয়ানী আম, দেওয়ানী খাস হয় না কেন? কোথায় গেল মুসলমানদের সে প্রতিভা?

এক দিন মুসলমানরা পঙ্গপালের মত গিরি নদী কন্দর পার হইয়া ছুটিয়া আসিত। সমরকন্দ ফারগানা কি হিরাট হইতে, সে খোঁজ কেহ রাখিত না; তাঁহারা মুসলমান, এই ছিল পরিচয়। মোগল হউন, আফগান হউন, তুর্কী হউন, বা পাঠান হউন, তাঁহারা মুসলমান। অনেক হিন্দুর মধ্যে অল্পসংখ্যক মুসলমান কেবল ধর্ম্মের জোরে আসমুদ্রহিমাচল করতলগত করিয়াছিল।

আমাদের যাহা ছিল, তাহা লইয়া মাথা গরম করিবার প্রয়োজন নাই। বর্ত্তমান অবস্থায় আলোকটা একটু অতীতের দিকে সময়ে সময়ে ফিরাইয়া ধরিলে মন্দ হয় না। ভবিষ্যৎকে বুঝিতে হইলে, অতীতের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করিলে চলিবে না। অতীতের ইতিহাস যদি আমাদের জন্য কিছু জ্ঞাতব্য সঞ্চিত করিয়া রাখিয়া থাকে, তাহা সম্বন্ধে প্রণিধান করা কর্ত্তব্য। ব্যবসায়ীদের মধ্যে একটি সুন্দর কথা আছে, 'যা'তে পড়ে, তা'ই ধ'রে উঠতে হয়।' অর্থাৎ যদি কোনও ব্যবসা করিয়া লোকসানও হয়, তাহা হইলে সেই ব্যবসা পুনরায় অবলম্বন করিলে লাভ হওয়ার সম্ভাবনা। কেন না, অতীতের অভিজ্ঞতাই অত্যন্ত মূল্যবান। ইতিহাসই জাতীয় উন্নতির পথের সম্বল—যাত্রাপথের আলোকবর্ত্তিকা।

আমাদের যে প্রতিভা ছিল, কোথায় গেল সে প্রতিভা? পরাধীনতা সব নষ্ট করিয়াছে, এ কথা সহজে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। স্বাধীনতা বলিতে এখন যাহা বুঝায়, আগে ঠিক তাহা বুঝাইত না। পাশ্চাত্য দেশে স্বাধীনতার অর্থ দ্রুত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। Autocracy, Bureaucracy, Democracy, Communismএর কোনটা স্বাধীনতা, তাহা ঠিক করিয়া বলা কঠিন। Democracyর আদর্শ এ যুগে চলিতেছে; কিন্তু ইহারই মধ্যে লোকের মনে এ আদর্শে সন্দেহ ধরিয়াছে। যাহা হউক, গণতান্ত্রিক শাসন যদি স্বাধীনতার আদর্শ হয়, তবে তাহা ভারতবর্ষে প্রাচীন যুগেও যে বেশী ছিল, এমন মনে হয় না। সুতরাং বহির্বাণিজ্যে কোটি কোটি টাকা লাভ করিয়াও নহে, শাসনতন্ত্রের আধুনকতম সংস্কারের মন্ত্র আবিষ্কার করিয়াও নহে, শুধু ধর্ম্মের তেজে প্রাচীনরা বড় হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান যুগে ধর্ম্মের স্থান অনেক নিম্নে। ধর্ম্মের টানে আর লোকের মন নাচিয়া উঠে না। ধর্ম্মের আহ্বানে 'সপ্ত কোটি কণ্ঠে কল কল করাল নিনাদে' ধ্বনিত হইয়া উঠে না। আমরা আমাদিগকে হারাইয়া ফেলিয়াছি। নিজের ধর্ম্ম ভুলিয়া আমরা পরের কুহকে মজিয়াছি। অনুকরণ আমাদের সর্ব্বস্ব হইয়া উঠিয়াছে। অনুকরণে যে কোনও ফল হয় না, তাহা বলিতেছি না। কিছু ফল হয় বটে, কিন্তু মনোবিজ্ঞানে বলে যে, অনুকরণ শৈশবের ধর্ম্ম। বাল্যকালে অনুকরণ মন্দ নহে; কিন্তু তার পরে আর নহে। আমাদের জাতীয় জীবনে এখনও শৈশব চলিতেছে, শিশুরই মত আমরা অনুকরণ করিতে ভালবাসি, শিশুরই মত আমরা অক্ষম, দুর্ব্বল ও কৃপা-পাত্র।

এ দেশের যাহা কিছু প্রাচীন সম্পত্তি, তাহা অনুকরণের দ্বারা লব্ধ হয় নাই। বেদ-বেদাঙ্গ, বাল্মীকি-ব্যাস, সাংখ্য-পাতঞ্জল-কালিদাস, ভবভূতি-শঙ্কর, দিঙ্‌নাগ কাহারও অনুকরণ করিয়া বড় হয়েন নাই। ইঁহারাই আমাদের গৌরবের জিনিষ। আর কি ছিল না ছিল সেই সুদূর অতীতে, তাহা আমরা জানি না। কালের বন্যায় সব ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। ধর্ম্মের মহাদ্রুমকে আশ্রয় করিয়া যাহা ছিল, তাহাই বহু শতাব্দীর সিঁড়ি বাহিয়া আমাদের কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, আমরা চলিয়া গেলেও, এ সব থাকিবে। এই যে জীবনীশক্তি, ইহা কোথা হইতে আসিল? ধর্ম্মরূপী ভগবান্ প্রলয় হইতে ইঁহাদিগকে বাঁচাইতেছেন! তিনি মীনরূপে বেদ উদ্ধার করিয়াছেন। এ দেশে আর কিছুই থাকে না, অন্ততঃ থাকে নাই। কেবল ধর্ম্মের সহিত যাহার সম্বন্ধ, তাহাই আছে। এ দেশে ইতিহাস নাই, যাহা কিছু আছে, তাহা ঐ ধর্ম্মের সঙ্গে জড়িত, পুরাণের মধ্যে নিহিত। আচার্য্য শঙ্কর দিগ্বিজয় করিয়া যে সাগরান্ত পৃথিবীকে এক ধর্ম্ম-সূত্রে বন্ধন করিলেন, তাহার নিদর্শন হইল ভারতের চারিদিকে চারিটি মঠ—যোশী, শৃঙ্গেরি, সারদা ও ভোগবর্দ্ধন মঠ—সব গুলিই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠান। আমাদের দেশের সাহিত্য বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র, ইতিহাস দর্শন সমস্ত ধর্ম্মের আতপত্রতলে গড়িয়া উঠিয়াছিল। সে সময়ে যে প্রতিভার অধিকারী আমরা হইয়াছিলাম, তাহাতে এখনকার অপেক্ষাও বিশাল উপন্যাস সাহিত্য আমরা গড়িয়া তুলিতে পারিতাম না কি? হয় ত গড়িয়াছিলাম, কিন্তু টিকিল না। ধর্ম্মের গন্ধ না থাকিলে, তাহা জীবনীশক্তি পাইবে কোথায়? তাই জয়দেব তাঁহার

কান্ত কোমল পদাবলীতে আদিরসের ফোয়ারা ছুটাইলেন রাধাকৃষ্ণকে লইয়া। সে দিনও ভারতচন্দ্র তাঁহার বিদ্যা-সুন্দর অন্নদা-মঙ্গলের মাঙ্গলিকে পূতপবিত্র করিয়া রাখিলেন। মাইকেল হিন্দুর দেবতাকে লইয়া তাঁহার শ্রেষ্ঠ কাব্য রচনা করিলেন। শিল্প ও যাহা কিছু কালের ঝঞ্ঝাবাত সহিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহা দেবমন্দিরে, নয় ত বিহারে, নয় ত চৈত্যে। অজন্তা, এলোরা, মথুরা, কাশী, কাঞ্চী, ভুবনেশ্বর, পুরী, আবু পাহাড়, সবই হিন্দু বৌদ্ধ জৈন ধর্ম্মের

হিন্দুর প্রাচীন সভ্যতার কথা বলিতে গেলেই মনে পড়ে বেদ, গীতা, ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত সংহিতা, দর্শন। ইতিহাস আমাদের যতই অসম্পূর্ণ হউক না; দর্শনে যে আমরা উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছিয়াছিলাম, তাহা কেহই অস্বীকার করে না। আমরা বড়াই করিয়া বলিয়া থাকি, জগৎ আমাদের নিকট ঋণী। আমাদের দর্শন হইতে গ্রীকরা ধার করিয়াছে, আমরা গণিত শিক্ষা দিয়াছি জগৎকে, আমাদের হাঁসপাতাল পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, আমাদের চিকিৎসাবিদ্যা আরবরা গুজরাট হইতে বোগদাদে লইয়া যায়। সে এক দিন ছিল যখন এ সকল বিদ্যা, এ সকল ফন্দী হিন্দুর মাথায় খেলিত। কিন্তু সে মাথা এমন অনুর্ব্বর হইয়া গেল কেন?

পাশ্চাত্য দার্শনিকরা বলেন যে, আমাদের দর্শন যতই উন্নত হউক না, ইহাকে গ্রীক দর্শনের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলা যায় না। কেন না, আমাদের দর্শন স্বাধীন নহে, ইহা ধর্ম্মের প্রভাবে প্রভাবান্বিত। গ্রীক দর্শনে ধর্ম্মের তেমন প্রভাব নাই, তাহার কারণ, তাহারা আমাদের মত এমন ধর্ম্মপ্রবণ জাতি ছিল না। আমাদের দেশে ইতিহাসের দিকে যেরূপ ঔদাস্য, তাহাতে দর্শনগুলি যদি ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ হইত, তাহা হইলে আজ তাহাদের অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন হইত। পাশ্চাত্য সমালোচকরা ভুলিয়া যায়েন যে, ধর্ম্মই এ দেশের প্রাণশক্তি। এই প্রাণশক্তির বিস্ফুলিঙ্গে দর্শনগুলি উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে—কালের কুয়াসা ভেদ করিয়া তাহার স্থির দীপ্তি এখনও জগতে আলোক দান করিতেছে।

রাজনীতিতেও হিন্দু, ধর্ম্মের গণ্ডীর বাহিরে যাইতে পারে নাই। আমাদের রাজার আদর্শ ধর্ম্মাবতার রামচন্দ্র, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির, প্রিয়দর্শী ধর্ম্মাশোক, ধর্ম্মগোপ্তা বিক্রমাদিত্য—অন্য রাজাদের নামও মনে পড়ে না। বিজয়নগর সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল হিন্দু-ধর্ম্মকে মুসলমানের কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য। বিজয়নগরের শ্রেষ্ঠ সম্রাট কৃষ্ণদেব রায় দেবতা-ব্রাহ্মণের সেবা করিয়া অতুলনীয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। যত দিন সে সাম্রাজ্য ছিল, তত দিন দেশ-বিদেশ হইতে হিন্দুরা লাঞ্ছিত বিড়ম্বিত হইয়া বিজয়-নগর রাজ্যে গিয়া আশ্রয় লাভ করিত। বিজয়নগরের প্রতাপে এক দিন সমগ্র দাক্ষিণাত্য দেশ কম্পিত ছিল। বিজয়নগরের সমৃদ্ধির বর্ণনায় বিদেশীয় পর্য্যটক্ বলিয়াছিলেন যে, উহার রাজধানীর মত এমন সহর কেহ কখনও দেখে নাই, এমন যে আছে, তাহা কেহ কখনও শুনেও নাই। ইহার শিল্প, ভাস্কর্য্য, চিত্র ও স্থাপত্য এক দিন জগৎকে মুগ্ধ করিয়াছিল। বিজয়নগর রাজ্যে বিখ্যাত বেদটীকাকার সায়ণাচার্য্য ও বিখ্যাত দার্শনিক মাধবাচার্য্য মন্ত্রী ছিলেন।

রাজপুতানায় গেলে দেখিবেন, উদয়পুরের রাজারা ভগবান একলিঙ্গজীর প্রতিনিধিস্বরূপ রাজ্য করেন। এখনও মহারাণার প্রাসাদকে প্রাসাদ বলে না; বলে শিবনিবাস, শম্ভুনিবাস ইত্যাদি। রাণা যখন দর্শন দেন, তখন বন্দী বৃথা যশোগীতি গান করে না; গান করে শিবের স্তোত্র।

মারাঠারা এক দিন উঠিয়াছিল, চৌথ সরদেশমুখী আদায় করিবার জন্য নহে, গো-ব্রাহ্মণ ও হিন্দু-ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য। ছত্রপতি শিবাজীর হৃদয়ে উৎসাহ প্রজ্বলিত করিয়াছিল রামায়ণ, মহাভারত।

এখনও আমরা দেখিতে পাই, আমাদের রাজনীতি-ক্ষেত্রের শ্রেষ্ঠ পুরুষ এক জন সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী। মহাত্মা গন্ধীর দেশ-সেবা কৃতার্থ হইয়াছে ত্যাগের প্রাচীন আদর্শে। দেশের নগণ্য নিরক্ষর লোক যে তাঁহার নামে মস্তক নত করে, সে অন্য কোনও কারণে নহে; তিনি সন্ন্যাসী, তিনি মহাত্মা, তিনি মহাপুরুষ এই কারণে।

এই রাজনীতিক প্রসঙ্গে জাতিভেদ প্রথার বিষয় উল্লেখ করা আবশ্যক। ধর্ম্মের বন্ধন একটি জাতিকে এমন করিয়া কিরূপে বাঁধিল, তাহাই বিস্ময়ের বিষয়। জাতি-ভেদ ভাল কি মন্দ, তাহার বিচার আমি করিতেছি না। জাতিভেদের মূলে যে সুন্দর একটি সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলার চেষ্টা বর্ত্তমান ছিল, তাহা কিরূপে বিকৃত হইয়া গিয়াছে, সে কথাও আমি বলিতে চাহি না। আমি শুধু বলিতে চাহি

যে, Theocratic stateএর স্বাভাবিক ফল এই অত্যাশ্চর্য্য প্রতিষ্ঠান। জড়জগতে যেমন গ্রহ নক্ষত্র একটি অবিচল নিয়মে আবর্ত্তন করিতেছে, হিন্দু-সমাজও সেইরূপ এক অবিচল নিয়মের অধীন। কত রাজারাজড়ার উত্থান পতন হইল, কত দেশী বিদেশী জাতি এই দেশে রাজ্যস্থাপন করিল, কিন্তু হিন্দুর সমাজদেহ যথাপূর্ব্ব তথাপর চলিয়া আসিতেছে। আজ কাল ধর্ম্মের প্রাণ নাই, সুতরাং জাতিভেদের কঙ্কাল কেবল বিভীষিকা দেখাইতেছে।

সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞানের কথা বলিয়াছি, সঙ্গীতের সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। আমাদের দেশে আজ কাল নানা সঙ্গীতের সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু এ সকল টিকিবে কি না, বলা যায় না। শুধু সঙ্গীত সম্বন্ধীয় রুচি সঙ্গীতকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারে কি না, তাহা আমি জানি না। অন্ততঃ আমাদের দেশে যাহা কিছু প্রাচীন সঙ্গীত আছে, তাহা ধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়াই রহিয়াছে। 'কানু ছাড়া গীত নাই,' এই কথাই আমাদের দেশের সঙ্গীতের মূল সূত্র বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। ধর্ম্ম-জীবনে মন্দা পড়িয়াছে, কাযেই আমাদের দেশে সঙ্গীতেও মরিচা ধরিয়া যাইতেছে। কত রকম গান যে আনন্দ যোগাইত, আমাদের দেশে তাহার সংখ্যা করা যায় না। কিন্তু এখন সে সব কথার কথায় দাঁড়াইয়াছে।

আমি এই যে আলোচনা করিলাম, ইহা শুধু অতীতের সমাধিপার্শ্বে দাঁড়াইয়া দুই ফোঁটা অশ্রু ফেলিবার জন্য নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমাদের দেশের নাড়ী কোন ভাবে বহে তাহা না জানিতে পারিলে কোনও প্রতীকারই কাযের হইবে না, কোনও ঔষধই ধরিবে না। আজ কাল এত জিনিষ লইয়া মাতামাতি চলিয়াছে যে, ঢাকের বাদ্যে পূজার মন্ত্র আর শুনা যায় না। যে শক্তি এত দিন আমাদিগকে গঠন করিয়াছে, বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, যে শক্তি অতীতে আমাদের প্রতিভা ফুটাইয়া তুলিয়াছিল, যে শক্তি এখনও আমাদের জীবনে গর্ভাধান সংস্কার হইতে চিতাশয্যা রচনা পর্য্যন্ত প্রভাব বিস্তার করিতেছে, তাহাকে বাদ দিয়া চলিলে কোনও দিকে সুবিধা হইবে বলিয়া বোধ হয় না। 'যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ' ইহা আমাদের দেশের নিতান্ত অন্তরের কথা। মানুষের মধ্যে মানুষে যে প্রীতি, তাহা ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। মনুষ্য-সমাজে যে শৃঙ্খলা, তাহাও ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। জীবনে ধর্ম্মের প্রভাব আসিলে স্বার্থপরতা, সংকীর্ণতা থাকিতে পারে না। নীচতা, দৈন্য, হিংসা, দ্বেষ দূর হইবে কিসে? অত্যাচার, লাঞ্ছনা, সহিবার শক্তি আসিবে কোথা হইতে, অত্যাচার লাঞ্ছনা অপমান, নিষ্ঠুরতার প্রতিবিধান করিব কিসের জোরে? একতা পাইব কোথায়? দেশের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, ধর্ম্ম ব্যতীত এই মেরুদণ্ড দিতে পারে, এমন সাধ্য কিছুরই নাই। অতএব যে জাতি ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া এক দিন বড় হইয়াছিল, সে জাতিকে ইতিহাস হইতেই শিক্ষালাভ করিতে হইবে, ধর্ম্মের মধ্য দিয়াই তাহাকে পুরুষার্থলাভ করিতে হইবে নান্যঃপন্থা 'বিদ্যতে অয়নায়'।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র (অধ্যাপক)

আশিস্

আকাশ হাসুক স্নিগ্ধোজ্জল
শান্ত শ্যামলা ধরণী,
(আজি) মন্দ পবনে দাও, সখে, দাও
ভাসায়ে জীবন-তরণী
চঞ্চল মৃদু উর্ম্মি খেলায়ে
নাচুক তটিনী হরষে,
যেন অম্বর নীলে ইন্দু বিমল
অক্ষয় সুধা বরষে।
যেন হাসিয়া হাসিয়া কুসুম-কলিকা,
পড়ে গো লুটিয়া লুটিয়া,
যেন শূন্য পবনে দিব্য আশিস্
নিত্য উঠে গো ফুটিয়া।

রোজী।

চীনের অদৃষ্ট

প্রাচ্যদেশসমূহের উপর বোধ হয় বিধাতার অভিসম্পাত আছে, নতুবা এই পরাধীন ভারতে আমরা যে গৃহবিবাদের বিষম বিষ সর্ব্বত্র বিসর্পিত হইতে দেখিতেছি, আজ মুক্তির পথের জয়যাত্রী মহাচীনেও সেই বিষ বিসর্পিত হইতে দেখিব কেন? আজ চীনও আমাদের মত ভাগ্যহীন বলিয়া মনে হইতেছে। এত দিন উত্তর ও দক্ষিণ-চীনে গৃহবিবাদ চলিতেছিল, ইহা সকলে দেখিয়া আসিতেছি। আজ দক্ষিণ-চীনের জাতীয় দলের মধ্যেও আত্মকলহের হলাহল ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এত দিন উত্তর-চীনের দস্যু-সর্দ্দার চাঙ্গ সো-লিন ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গকে গোপনে সহায়তা করিয়া সাম্রাজ্যবাদী অর্থলোলুপ পররাজ্যগ্রাসেচ্ছু বৈদেশিক শক্তিপুঞ্জ দক্ষিণের জাতীয় দলের মুক্তির জয়যাত্রায় যথাসম্ভব বাধা প্রদান করিয়া আসিয়াছে। এখন বিধাতার অভিসম্পাতে চীনের ভাগ্যদোষে তাহাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে, জয়যাত্রী দক্ষিণ-চীনের মধ্যেও ঘর ভাঙ্গাভাঙ্গি উপস্থিত হইয়াছে।

সাম-দান ভেদ-দণ্ড—মন্ত্রবলে রাজ্য শাসিত হইয়া থাকে, ইহা অতি প্রাচীনকাল হইতে সকল সভ্যদেশের ইতিহাস আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায়। মহাভারতে নারদযুধিষ্ঠির-সংবাদে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। নারদ যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যশাসন সম্পর্কে যে সকল সারগর্ভ উপদেশ প্রশ্নচ্ছলে প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে এই ভেদমন্ত্রের কথা আছে। সুতরাং ভেদমন্ত্র রাজ্যশাসন সম্পর্কে নিন্দনীয় নহে। তবে নিজ রাজ্যরক্ষার্থ ভেদমন্ত্রের আশ্রয়গ্রহণ এক কথা, আর পররাজ্যগ্রাসেচ্ছায় পররাজ্যে ভেদমন্ত্রের প্রচার করা আর এক কথা। নারদ যুধিষ্ঠিরকে পররাজ্যগ্রাসে উৎসাহিত করিয়া ভেদমন্ত্র অবলম্বন করিতে উপদেশ দেন নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে অর্থগৃধ্নু স্বার্থসর্ব্বস্ব পররাজ্যলোলুপ প্রতীচ্য জাতিসমূহ চীনের প্রতি লালসার লেলিহান রসনা প্রসারণ করিয়া তথায় ভেদমন্ত্র প্রচার করিতে দ্বিধা বোধ করিতেছে না। ফলে যে জাতীয় দল ডাক্তার সান ইয়াটসেনের নবীন মুক্তিমন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রতীচ্যের শকুনি গৃধিনীকুলের রাক্ষস-গ্রাস হইতে মুমূর্ষু চীনের উদ্ধার-সাধনে ব্রতী হইয়াছে, সেই জাতীয় দলের মধ্যেও দলাদলি উপস্থিত হইয়াছে। এখন তাই কাণ্টনের কুওমিণ্টাঙ্গ দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এক দল য়ুরোপীয়দিগের দ্বারা 'মডারেট' আখ্যায় ভূষিত হইতেছে। ইহার দলপতি জেনারল চাঙ্গ কাইসেক; ইহাদের প্রধান আড্ডা এখন নানকিং; সাংহাই ও কাণ্টন ইহাদের এলাকাভুক্ত। আর এক দল কম্যুনিষ্ট আখ্যাপ্রাপ্ত হইয়াছে; ইহাদের দলপতি এক জন অজ্ঞাতনামা চীন হইলেও তাঁহার পশ্চাতে কাণ্টনের পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ ইউজিন চেন রহিয়াছেন বলিয়া শুনা যাইতেছে। হাঙ্কো ইহাদের প্রধান আড্ডা হইয়াছে। ইহারা জেনারল চাঙ্গ কাইসেককে পদচ্যুত করিয়া মঙ্গোলিয়া হইতে খৃষ্টান জেনারল ফেঙ্গ উসিয়াঙ্গকে আনয়ন করিয়া প্রধান সেনাপতির পদে বসাইয়াছে। পরন্তু ইহারা সাংহাই ও নানকিংএ জেনারল চাঙ্গ কাইসেককে পরাজিত করিবার জন্য রণসজ্জা করিতেছে। ইতোমধ্যে উভয় দলে ছোট কয়েকটা সংঘর্ষও হইয়া গিয়াছে। শুনা যায়, কুওমিণ্টাঙ্গের জেনারল চাঙ্গ কাইসেক সাংহাই ও নানকিং অধিকারের পর বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার জাতীয় দলের একাংশ চরমপন্থী; তাহারা বলশেভিক কম্যুনিষ্টদিগের দ্বারা প্রভাবান্বিত, তাহারা আপোষে বৈদেশিকদিগের সহিত সন্ধি-শান্তি করিয়া চীনের মুক্তি-সাধনে সম্মত নহে, বরং তাহারা হাঙ্কোজয়ের পর বৈদেশিকদিগের দূতাবাস ও কাষ্টম কার্য্যালয়াদি বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়া লইয়াছিল। নানকিং ও সাংহাইয়ের বৈদেশিক দূতাবাস, কাষ্টম, ব্যাঙ্ক ইত্যাদিও তাহারা ঐরূপে বলপূর্ব্বক অধিকার করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল। সেই উদ্দেশ্যে তাহারা ঐ সকল স্থানে বিরাট শ্রমিক আন্দোলন ও ধর্ম্মঘট আদির অনুষ্ঠান করিয়াছিল। জেনারল চিয়াঙ্গ এ সকল ব্যাপারের বিরোধী ছিলেন। তিনি প্রথমে এই ভাবের আন্দোলন আইনের সাহায্যে নিষিদ্ধ করিয়া দেন। কিন্তু তাহাতেও ফল না হইলে তিনি আন্দোলনের নেতাদিগকে ধৃত ও দণ্ডিত করিতে লাগিলেন। ইহাতে আন্দোলন উপশমিত না হইয়া দ্বিগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। কুওমিণ্টাঙ্গের এক দল প্রকাশ্যে তাঁহাকে দেশদ্রোহী ও বৈদেশিকগণের গুপ্ত বন্ধু আখ্যায় ভূষিত করিল; এমনও প্রকাশ পাইল যে, তিনি অর্থলোভে দস্যু-সর্দ্দার চাঙ্গসোলিনের সহিত গোপনে সন্ধি করিতেছেন। এমন কি, তাঁহাকে ধরিয়া প্রকাশ্যে বিচার করিবার কথাও উঠিল।

চাঙ্গ কাইসেকের সহকারী জেনারল টাউয়েনকাই

চাঙ্গ বুঝিলেন, সকলকে পার পাওয়া যায়, কিন্তু বিকৃত-মস্তিষ্ককে পার পাওয়া যায় না, তাহার প্রতি কঠোর ব্যবহার না করিলে সে সায়েস্তা হয় না। তখন চাঙ্গ কঠোর মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তিনি

চীনের অভ্যন্তর হইতে পলাতক বৃটিশ নর-নারীকে অভ্যর্থনা করিবার উদ্দেশে সাংহাই বন্দরের জাহাজঘাটায় ইংরাজ নর-নারীর অপেক্ষা।

বুঝিলেন, উত্তরের সঙ্গে গৃহবিবাদকালে বিচ্ছিন্ন চীন যদি বৈদেশিক শক্তিসমূহের বিপক্ষে বলপ্রয়োগ করে, তাহা হইলে কুওমিণ্টাঙ্গের মুক্তি-যুদ্ধের জয়যাত্রা অর্দ্ধপথেই গতিহীন হইবে। আজ যে সকল উত্তপ্ত-মস্তিষ্ক তরুণ চীন কম্যুনিষ্ট-প্রভাবে প্রভাবিত হইতেছে, তাহাদিগের চরমপন্থার আন্দোলন অঙ্কুরে বিনষ্ট করিতে না পারিলে দেশের সর্ব্বনাশ হইবে। তাই তিনি সেই আন্দোলনের মূল মুসিয়ে বোরোডিন প্রমুখ রাসিয়ান মন্ত্রীদিগকে নির্ব্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। পরন্ত গোলা-গুলীর সাহায্যে তরুণ দলের শ্রমিক সভাসমূহ ভঙ্গ করিয়া দিতে লাগিলেন। ফলে ক্যাণ্টন, সাংহাই, নানকিং ও অন্যান্য স্থানের বহু চীনা হতাহত ও কারাদণ্ড প্রাপ্ত হইল। তখন কুওমিণ্টাঙ্গ দলের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে দুইটি দল হইয়া গেল। আমাদের দেশের মত সেই দুই দলকে

অবশ্য, এ সমস্ত সংবাদ প্রতীচ্যের সংবাদদাতাদিগের কল্পনাপ্রসূত কি না, জানিবার উপায় নাই। এ বিষয়ে যতক্ষণ পর্য্যন্ত চীন হইতে চীনের পক্ষীয় কোনও সংবাদ না আইসে, ততক্ষণ এ সকল সংবাদে আস্থাস্থাপন করিতে পারা যায় না। এই ভাবের আর এক সংবাদে প্রকাশ যে, উত্তরের দস্যু-সর্দ্দার চাঙ্গসোলিন হঠাৎ অতর্কিতভাবে পিকিংয়ের রাসিয়ান দূতাবাসের সংশ্লিষ্ট কয়েকটি ইমারত খানাতল্লাসী করিয়া বিস্তর কাগজপত্র দখল করিয়াছেন এবং পিস্তর রাসিয়ান ও চীনাকে তথা হইতে ধরিয়া লইয়া গিয়াছেন। কেবলমাত্র খাস রাসিয়ান দূতাবাসটির মর্য্যাদা রক্ষিত হইয়াছে। তিনি কতক কাগজপত্র পরীক্ষা করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন যে এ সকল কাগজপত্র বলশেভিক ষড়যন্ত্রের বিষে ভরা; বলশেভিকরা যে ক্যাণ্টনীদিগকে অস্ত্র ও অর্থসাহায্য করিতেছে এবং

সাংহাইয়ে ইংরাজ সেনাপতি লেঃ কঃ লরেন্স

নানকিং হাঙ্গামায় নিহত ডাক্তার উইলিয়ামস্

মধ্যপন্থী ও চরমপন্থী নামে অভিহিত করা হইতে লাগিল। চরমপন্থীরা মিঃ ইউজিন চেনের নেতৃত্বাধীনে হাঙ্কোয় প্রধান আড্ডা স্থাপন করিয়া চাঙ্গ কাইসেকের সকল আদেশ অমান্য করিতে লাগিল। বোরোডিন তাহাদের আশ্রয়ে থাকিয়া কম্যুনিষ্ট মন্ত্র প্রচার করিতে লাগিলেন। সকল কার্য্যে তাহারা চাঙ্গকে বাধা প্রদান করিতে লাগিল। তরুণ দল বলশেভিক বা কম্যুনিষ্ট প্রভাবান্বিত হইয়া চাঙ্গের কর্তৃত্ব অস্বীকার করিল। এমনও শুনা যায় যে, সেনাপতি চাঙ্গ কাইসেকের পুত্রও পিতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছে। সে এখন মস্কো সহরের সান-ইয়াটসেন সামরিক বিদ্যালয়ে রণশিক্ষা করিতেছে। সে না কি এক পত্রে লিখিয়াছে,—"চাঙ্গ কাইসেককে নিপাত কর। ঐ ব্যক্তি আমার পিতা এবং বিপ্লববাদীদিগের বন্ধু ছিল সত্য, কিন্তু এখন সে শত্রুপক্ষে যোগদান করিয়াছে; সুতরাং এখন সে দেশের শত্রু—আমারও শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে।" জেনারল চাঙ্গ কাইসেক এখন বৈদেশিকগণের ক্রীড়নক, তাহাদের পরামর্শে ও অর্থে চালিত হইতেছেন, আর হাঙ্কোর জাতীয় দলই এখন প্রকৃতপক্ষে একমাত্র চীনের মুক্তিকামী, ইহা রটিত হইয়াছে।

তাহাদের গুপ্তচর ও এজেণ্টরা যে চীনের সর্ব্বত্র কম্যুনিষ্ট মন্ত্র ছড়াইতেছে, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, ইহাতে মস্কো হইতে ঘোর প্রতিবাদ উত্থিত হইয়াছে। তবে মস্কো কর্তৃপক্ষ বলিতেছেন, "তাঁহারা এই চালবাজীর বড়ে টিপিতেছে কে, তাহা জানেন। যে সকল সাম্রাজ্যবাদী শক্তি চাঙ্গসোলিনকে গোপনে সাহায্য করিতেছে, তাহারাই যে ইহার মূল, তাহা তাঁহারা জানেন। তাহারা যে এই চাল চালিয়া রাসিয়াকে চীনের বিপক্ষে যুদ্ধে নামাইবার সুযোগ খুঁজিতেছে, তাহাও তাঁহাদের অবিদিত নাই। কিন্তু তাঁহারা সে ধূর্ত্ততা বা নষ্টামীর ফাঁদে পা দিবেন না। চীনের মুক্তিসমরে জাতীয় দলের জয়যাত্রায় তাঁহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক কোনও বিঘ্ন ঘটাইবেন না। একবার রাসিয়ার সহিত উত্তর-চীনের যুদ্ধ বাধিলে ধূর্ত্ত শক্তিপুঞ্জ ছিদ্র পাইয়া চীনের যুদ্ধে নামিয়া পড়িবে এবং চীনের মুক্তিলাভে বাধা দিবে, তাহা তাঁহারা বিলক্ষণ বুঝেন। তবে তাঁহারা রাজনীতিক কথাবার্ত্তা দ্বারা তাঁহাদের আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চাঙ্গসোলিনের এই ধৃষ্টতার প্রতিশোধ লইবার উদ্দেশ্যে ক্ষতিপূরণ করিয়া লইতে ছাড়িবেন না।" প্রতীচ্যের শক্তিপুঞ্জ রাসিয়ার এই অপমানে একটি সামান্য প্রতিবাদও

করেন নাই। পিকিংয়ে একটি 'ডিপ্লোম্যাটিক বডি' আছে। সমস্ত শক্তির দূতগণ ইহার সদস্য। কোনও প্রতীচ্য শক্তির বিরুদ্ধে চীন কিছু করিলে এই প্রতিষ্ঠান তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়; কোনও দূতাবাসে চীনের পক্ষ হইতে কোনও খানাতল্লাসাদি করিতে হইলে এই প্রতিষ্ঠানের অনুমতি গ্রহণ করিতে হয়। সুতরাং এই ব্যাপারে চাঙ্গসোলিন যে সেই ডিপ্লোম্যাটিক বডির অনুমতিক্রমে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। তাই রাসিয়া বলিতেছেন, চাঙ্গসোলনের এই স্পর্দ্ধা প্রতীচ্য শক্তিপুঞ্জের কদর্য্য ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের ফল। জার্ম্মাণযুদ্ধকালে যখন ইংরাজ ও ফরাসী কালা সেনা জার্ম্মাণদের বিপক্ষে নিযুক্ত করিয়াছিল, তখন জার্ম্মাণীও এই ভাবের কথা বলিয়াছিল। ফলকথা, সাম্রাজ্যগর্ব্বী অর্থগৃধ্নু প্রতীচ্য জাতিদিগের নিকট স্বার্থই সর্ব্বাপেক্ষা বড়। দরিদ্র শ্রমিক ও কৃষকের বন্ধু রাসিয়ান কম্যুনিষ্ট, ধনবানের স্বার্থের সংরক্ষক শক্তিপুঞ্জের প্রধান শত্রু, এ কথা রাসিয়া বলিয়া থাকে।

সে যাহা হউক, যে সময়ে চাঙ্গসোলিন উত্তর-চীনে রাসিয়ানদূতাবাসে কম্যুনিষ্ট চক্রান্ত খুঁজিয়া বাহির করিলেন, ঠিক সেই সময়ে দক্ষিণ-চীনে কুওমিণ্টাঙ্গদের মধ্যে কম্যুনিষ্ট ষড়যন্ত্র গজাইয়া উঠিল ও তাহার ফলে তথায় দলাদলি হইয়া গেল,—ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের কথা। এতদুভয়ের মধ্যে কার্য্যকারণের সম্বন্ধ নাই ত? হঠাৎ পিকিংয়ে কম্যুনিষ্ট ষড়যন্ত্র প্রকাশিত হইয়া পড়িল, হঠাৎ জাতীয় দলের সেনাপতি হাঙ্কো ও নানকিংয়ে, সাংহাই ও ক্যাণ্টনে কম্যুনিষ্ট প্রভাব আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন, হঠাৎ চারিদিক্ হইতে আসল কথা চাপা দিয়া কম্যুনিষ্ট চীনের উচ্ছেদ-সাধনের যোগাযোগ হইল—এ সকল কথা যেন কেমন সন্দেহজনক বলিয়া বোধ হয়। চীনের জাতীয় দলের মুক্তির যুদ্ধ হইতেছে প্রধানতঃ চীনের স্বার্থের বিরোধী প্রতীচ্যের ও প্রাচ্যের সাম্রাজ্যগর্ব্বী অর্থ-উপাসকদিগের বিপক্ষে। সে দিক্ হইতে চীনের দৃষ্টি কম্যুনিষ্ট-শিকারের খাতে চালাইয়া দেওয়ার অর্থ কি? চীনের অদৃষ্ট অপ্রসন্ন না হইলে ঠিক জয়যাত্রার মধ্যপথে এ সকল ঘটিবে কেন? যদি চীন এই বিষম ষড়যন্ত্রের চাল সামলাইয়া লইয়া আবার সমান তেজে জয়যাত্রার পথে চলিতে পারে, তবেই বুঝা যাইবে, চীনের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন, নতুবা চীন যে তিমিরে, সেই তিমিরেই থাকিয়া যাইবে। তবে একটা সুলক্ষণ দেখা যাইতেছে। নানকিংয়ের অপরাধের (বিদেশীয়দের বিপক্ষে) জাতীয় দলের গোলাগুলী নিক্ষেপ ও লুঠ তরাজের ছুতা ধরিয়া বৃটিশ ও অন্যান্য শক্তি চীনের জাতীয় দলকে চরমপত্র দিয়াছিলেন। চীনের পক্ষ হইতে মিঃ ইউজেন চেন তাহার মোলায়েম জবাবও দিয়াছিলেন। শক্তিপুঞ্জ তাহাতে বিষম ক্রুদ্ধ ও অপমানিত হইয়াছেন, অতএব চীনকে রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হইবে, এই ভাবের ভয় প্রদর্শনের আভাস ইংরাজের সংবাদ পত্রে পাওয়া গিয়াছিল। এমন কি, সার অষ্টেন চেম্বার্লেন বৃটিশপক্ষ হইতে চীনকে স্পষ্টই চোখ রাঙ্গাইয়া ভয় দেখাইয়াছিলেন। তখন মনে হইয়াছিল, বুঝি বা ইংরাজের সহিত একযোগে মার্কিণ ও জাপ চীনকে সায়েস্তা করিবার জন্য আসরে নামেন! কিন্তু এ যাবৎ তাহা হয় নাই। এক ইংরাজের কাগজ ছাড়া অন্য কোথাও 'সাজ সাজ' রব পাওয়া যায় নাই। বরং জাপান চীনদেশ হইতে নিজের রণতরী অপসারণ করিতেছেন বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। পরন্তু মার্কিণের প্রেসিডেণ্ট কুলিজ এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "চীন আমাদের বন্ধু, চীনের ন্যায়সঙ্গত মুক্তি-সময়ের আমরা বিরোধী নহি। চীন পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়, ইহা আমরা দেখিতে ইচ্ছা করি। তবে চীনে আমাদের দেশের লোকের প্রতি অত্যাচার না হয় এবং আমাদের

ক্যাণ্টনী জাতীয়দলের সেনা

জাতীয় সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকে, এটুকু আমরা অবশ্যই দেখিব। কিন্তু ইহা ছাড়া অন্য সকল বিষয়ে চীনের প্রতি আমাদের পূর্ণ সহানুভূতি আছে।" এই হেতু মনে হয়, চীনকে চাপিয়া মারিবার সম্বন্ধে সকল শক্তি নাই, চীনের অদৃষ্ট সে বিষয়ে সুপ্রসন্ন।

চীন ও ইংরাজ

বহু ইংরাজ লেখকের রচনায় যাহা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, চীনের জাতীয় দলের বিপক্ষে ইংরাজের বলডুইন গভর্ণমেণ্টই যে তার আইসে, তাহাতে প্রকাশ,—যখন বিদেশীরা নানকিংয়ের উপর গোলাগুলী বর্ষণ করে, তখন হাজার হাজার চীনা শ্রমিক ও ভদ্রলোক এবং অসংখ্য চীনা নরনারী হতাহত হয়। অথচ বৃটিশ সংবাদপত্রসমূহ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কথা চাপা দিয়া একটি বৈদেশিকের প্রাণনাশের কথায় ঢাক পিটিয়া চীনের জাতীয় দলের বিপক্ষে ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রচার করিতেছে। তাহাদের এই অসাধু কার্য্যে বৃটিশ বলডুইন গভর্ণমেণ্টের কোন কোনও লোক সাহায্য করিতেছে এবং জাপ ও মার্কিণকে মিথ্যা আন্দোলনে ভুলাইয়া চীনের জাতীয় দলের বিপক্ষে নামাইবার চেষ্টা করিতেছে।" মিঃ রাসেল এই হেতু বলিয়াছেন,—"বলডুইন গভর্ণমেণ্ট দূর হইয়া যাউক।" ফরাসী সংবাদপত্র "লে টেমস" দেশবাসীকে সতর্ক
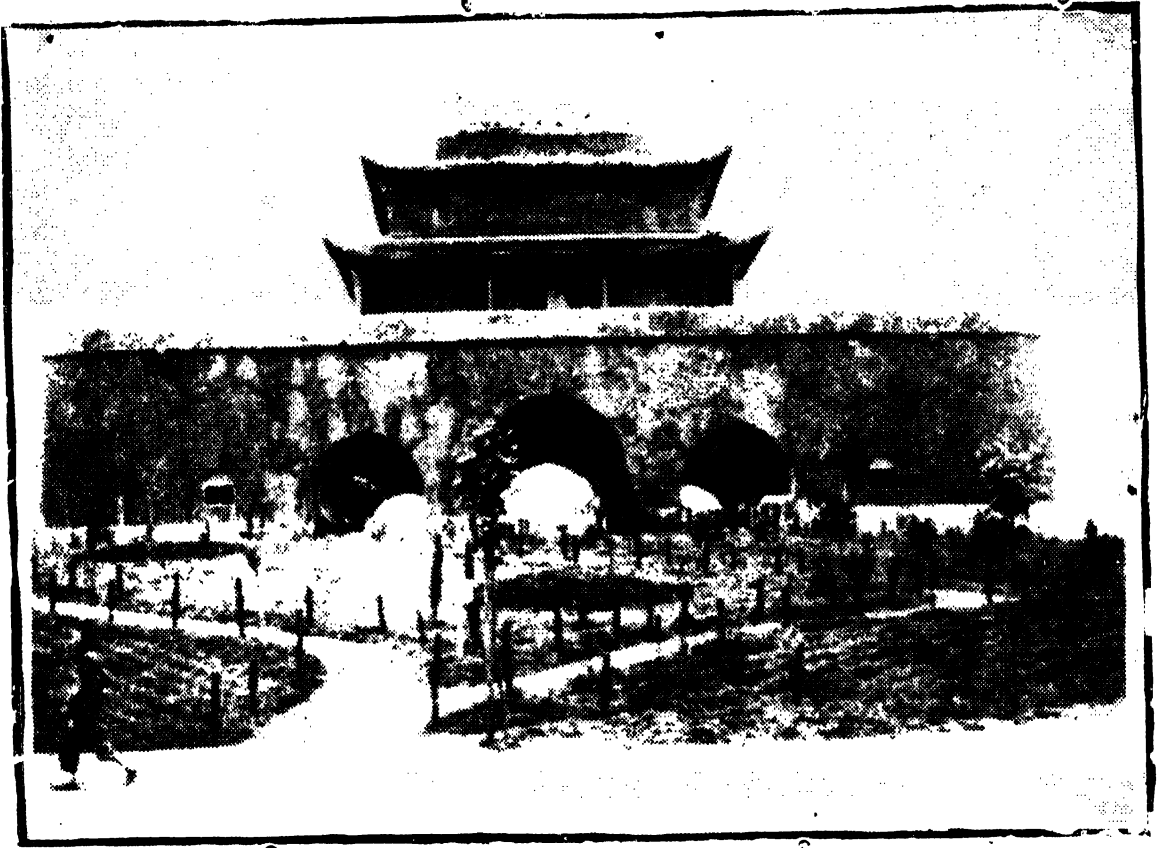
নানকিংয়ের এই স্থানে বিদেশীয়দিগের সহিত চীনাদের সংঘর্ষ হইয়াছিল

প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছেন এবং অন্যান্য শক্তিকেও দাঁড়াইতে উত্তেজিত করিতেছেন। মিঃ বার্ট্রাণ্ড রাসেল কোন শ্রমিক বৈঠকে মুক্তাকাশে বলিয়াছেন, "এই বলডুইন গভর্ণমেণ্ট দূর হইয়া যাউক। এই গভর্ণমেণ্ট জুয়াচুরী করিয়া ক্ষমতা হস্তগত করিয়াছে এবং সেই ক্ষমতা নরহত্যা করিবার জন্য ব্যবহার করিতেছে। যদি শ্রমিকদল সজাগ না হন, তাহা হইলে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে যেমন ইংলণ্ডকে যুদ্ধে নামিতে হইয়াছিল, এখনও তেমনই নামিতে হইবে।" কেন তিনি এরূপ ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তাহার কারণও আছে। বলডুইন সরকারের তরফ হইতে রটিয়াছিল যে, নানকিংয়ে চীনের জাতীয় দল ইংরাজ প্রবাসীর উপর ভীষণ অত্যাচার করিয়াছে, বহু ইংরাজের ধনপ্রাণ নষ্ট হইয়াছে, বৃটিশ পতাকার অপমান করিয়াছে, ইত্যাদি। কিন্তু 'ওরিয়েণ্ট প্রেস' হইতে করিয়াছেন, "বৃটিশ সংবাদপত্রে চীন সম্পর্কে যাহা রটিত হইতেছে, তাহা বিশ্বাস করিও না।" মার্কিণ ও জাপ নানকিংয়ের ব্যাপারে প্রথমে রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া এখন তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়াছেন কেন? সম্ভবতঃ তাঁহারা প্রকৃত ব্যাপার কতকটা অবগত হইয়াছেন। তাঁহারা বোধ হয় বুঝিয়াছেন, নানকিংয়ের ব্যাপারে জাতীয় দল অপরাধী নহে। যাহা জাতীয় দলের সম্বন্ধে রটিয়াছিল, তাহা বহুলাংশে মিথ্যা। বোধ হয়, সেই কারণে তাঁহারা সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। কাযেই ইংরাজ একাকী কিছু করিতে সাহসী হইতেছেন না। তাঁহাদের সংবাদপত্রওয়ালারা স্ফীতকণ্ঠ কপোতের ন্যায় পূর্ব্বে কত 'বকবক' করিয়াছে—বলিয়াছে,—'এইবার ইউজিন চেনকে শক্তিপুঞ্জ সমঝাইয়া দিবেন যে, তাঁহাদের প্রজার বিরুদ্ধে লাগার ফল কি হইতে পারে।' আজ কিন্তু তাহারা

নীরব—আর তাহাদের 'বকবক' নাই। কেন, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। জাপ ও মার্কিণ সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন বলিয়া তাহাদের বুলী হরিয়াছে!

বলড্‌ইন গভর্ণমেণ্ট চীনের ব্যাপারে যে গলদ করিয়াছেন, তাহার ইতিহাস আলোচনা করিলে কি দেখা যায়? যখন কাণ্টনী জাতীয় দল উত্তরমুখে অগ্রসর হইয়া উত্তরোত্তর যুদ্ধজয় করিতে করিতে জেনারল উপেইফুর রাজধানী হাঙ্কো সহর অধিকার করে এবং তথায় কুওমিণ্টাঙের শ্রমিকদল বলপূর্ব্বক বৃটিশ কাষ্টম, মিউনিসিপ্যাল আফিস ইত্যাদি দখল করিয়া ইংরাজ প্রবাসীদিগকে তাড়াইয়া দেয়, তখন চীনদেশের এতটা বুকের মাঝে সৈন্ত প্রেরণ করিয়া যুদ্ধ করা অসম্ভব বুঝিয়া বলডুইন

বিলাতের শ্রমিক দলের হলবরণ শাখার চীনা কর্ম্মচারী মিঃ ফাঙ্গ স

সরকার (অর্থাৎ ঐ সরকারের বৈদেশিক সচিব মিঃ অষ্টেন চেম্বার্লেন) হাঙ্কোর বৃটিশ স্বার্থের ভার জাতীয় দলের উপর অর্পণ করিয়া সাংহাইয়ে ইংরাজ প্রবাসীদিগকে চলিয়া যাইতে বলেন। তখন জাতীয় দলের ইউজিন চেনের সহিত আপোষে কথা কহিতে তাঁহাদের কোন লজ্জা বোধ হয় নাই। কিন্তু সাংহাই সমুদ্রসান্নিধ্যে অবস্থিত, সেখানে বিস্তর রণতরী ও সৈন্ত প্রেরিত হইয়াছিল। কাযেই ঐ স্থানে চীনার গৃহযুদ্ধ উপস্থিত হইলে বলড্‌ইন সরকার তাঁহাদের সাংহাইয়ের কনসেশানের গণ্ডীর বাহিরেও সৈন্তসজ্জা করিয়া চীনাদের উপর গোলাগুলী বর্ষণ করিয়াছিলেন, পরন্তু নানকিংয়ে রীতিমত গোলা চালাইয়া চীনা সহরের কতকাংশ ধ্বংস করিয়াছিলেন। তখন তাঁহাদের কোমরে বল হইয়াছে, নিজেদের অনেক সৈন্ত ও রণসম্ভার পৌঁছিয়াছে, পরন্তু জাপ ও মার্কিণও আত্মরক্ষায় তাঁহাদের দলে ভিড়িয়াছে।

তখন হইতে সার অষ্টেন 'হাঙ্কোর সুর' বদলাইয়া ফেলিয়াছেন। হাঙ্কোর সুর ছিল, "বিশেষ অধিকার ছাড়িয়া দিব, চীনের আইন মানিব" ইত্যাদি। সাংহাইয়ে সুর হইল,—"ক্ষতিপূরণ কর, ক্ষমা চাও, তাহার পর বিবেচনা করিয়া দেখি, তোমাদিগকে কতটুকু অধিকার দিতে পারি।" ঠিক যেমন ভারতে জার্ম্মাণযুদ্ধকালের সুর,—"স্বায়ত্তশাসন দিব, সমান দেখিব, সাম্রাজ্যের অংশীদার করিব," ইত্যাদি, আর জার্ম্মাণযুদ্ধের পরের সুর,—"জালিয়ানওয়ালাবাগ, রাউলাট আইন, ডায়ার-ওডয়ার।"

৬ই এপ্রিল সার অষ্টেন চেম্বার্লেন পার্লামেণ্টের কমন্স সভায় বুঝাইলেন, "নানকিংয়ের যুদ্ধের পর ২৩শে মার্চ্চ রাত্রিতে উত্তরের দল শান্তভাবে নগর ত্যাগ করে। পরদিন প্রত্যূষে জাতীয় দলের হুনানপ্রদেশীয় সেনারা নগরে প্রবেশ করিয়া বৃটিশ দূতাবাস আক্রমণ করে এবং দূতের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে। মার্কিণ দূতাবাসও লুণ্ঠিত হয়। জাপ দূতাবাসও লুণ্ঠিত হয়, পরন্তু জাপ দূত গুলীর আঘাতে আহত হন। দুই জন বৃটিশ প্রজা নিহত হয়। এই আক্রমণের জন্য জাতীয় দল পূর্ব্বাহ্নে প্রস্তুত হইয়া ছিল।" ইহাই হইল প্রথম প্রচারকার্য্য। এই সময় হইতে বলড্‌ইন সরকার কাণ্টনী জাতীয় দলের প্রতি ব্যবহারপরিবর্ত্তনের পরিচয় দিতে লাগিলেন। এই সময়ে জাপ ও মার্কিণও কতকপরিমাণে কাণ্টনীদের বিপক্ষে দাঁড়াইয়াছিলেন। ইহাই সম্ভবতঃ বলড্‌ইন সরকারের হঠাৎ পরিবর্ত্তনের কারণ।

মিঃ ইউয়ার কোনও শ্রমিক পত্রে সার অষ্টেনের মনোভাব-পরিবর্ত্তনের কারণ এই ভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন;—"কেহ কেহ বলেন, বৃটিশ সাম্রাজ্যগর্ব্বী দল চীনের জাতীয় দলের বিপক্ষে চাল চালিতে গিয়া রাজনীতির যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পশ্চাদাবর্ত্তন করিতেছে। অন্য পক্ষ বলেন, না, তাহা নহে, বৃটিশ রাজনীতিক কর্ত্তৃপক্ষ দয়াপরবশ হইয়া চীনকে তাহার ন্যায্য অধিকার ফিরাইয়া দিতেছেন। এই দুই কথার কোনটাই সত্য নহে। বৃটিশ সাম্রাজ্যগর্ব্ব চীনে পরাজয়ও স্বীকার করে নাই, দয়াও দেখায় নাই, সে কেবল ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারিবার প্রতীক্ষায় সাময়িক পশ্চাদাবর্ত্তন করিয়াছিল মাত্র। সার অষ্টেন যে দলের লোক, সে দলের মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। এ দল নিজের স্বার্থ প্রাণ থাকিতে ছাড়ে না, কেবল সুযোগ অন্বেষণ করে—কিসে নিজের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকিবে। এ জন্য এ দল কখনও ধমক দেয়, কখনও পায়ে ধরে, কখনও গলা টিপিয়া ধরে, কখনও পরাজয় স্বীকার করিয়া হঠিয়া আসে—দয়ার কথা কহে, বক্তৃতা দেখায়। এই সার অষ্টেনই এক দিন কাণ্টনী দলপতিদিগকে lawless extremists আইনভঙ্গকারী চরমপন্থী বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। আবার পরে ভালমানুষটির মত তাহাদিগকে চীনের গভর্ণমেণ্ট বলিয়া স্বীকার করিয়া হাঙ্কো সহরে তাহাদের সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন। ইঁহাদের দলের পক্ষে অসাধ্য কায কিছুই নাই—যেন তেন প্রকারেণ সাম্রাজ্যবাদ রক্ষা পাইলেই হইল। কোথাও স্বেচ্ছায় তাঁহারা ন্যায়সঙ্গত বা অন্যায় অধিকার ছাড়িয়াছেন, এমন দৃষ্টান্ত নাই। যে অধিকার রাখা যায় না, যাহা রাখিতে হইলে অসাধ্যসাধন করিতে হইবে, যে অধিকার ছাড়িতেই হইবে, তাহা তাঁহারা 'দয়াপরবশ' হইয়া ছাড়েন, আর সে জন্য জগতে নিজের মহত্ত্বের জয়ঢক্কা নিনাদিত করেন। হাঙ্কো বড় দুর্গম স্থান—নদী বাহিয়া চীনের অভ্যন্তরে গেলে ঐ স্থানে পৌঁছান যায়। ইহার মূল্যের অনুপাতে ইহা রক্ষা করিবার খরচ অনেক বেশী; পরন্তু

হাঙ্কোর সার-ট্যাক্স আদায়ের জিদ ধরিলে আবার সার্ব্বজনীন ধর্ম্মঘট হইবে; অতএব হাঙ্কোর অধিকার ছাড়িয়া দিয়া মহত্ত্ব প্রদর্শন করা হউক,"—ইহাই বলডুইন গভর্ণমেণ্টের মনস্তত্ত্বের নিদর্শন। যতক্ষণ ধনী ইংরাজ ব্যবসাদাররা অল্প মজুরী দিয়া কুলী খাটাইয়া চীনে কড়ি-নাড়াচাড়া করিতে পারে, যতক্ষণ তাহারা চীনা কুলীকে লাথি মারিয়া নিজেদের দূতাবাসের আদালতে বিচারার্থ দাঁড়াইতে পারে, যতক্ষণ বৃটিশ বেয়নেটের আওতায় থাকিয়া তাহারা চীনদেশে নবাবী করিতে পারে, ততক্ষণ হাঙ্কোর মত একটা ছোট ঘাঁটি হস্তচ্যুত হইল না হইল, দেখিবার প্রয়োজন কি?"

বস্তুতঃ লেখকের কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বলডুইন গভর্ণমেণ্ট যে সুবিধাবাদী—ন্যায়ধর্ম্মের জন্য যে তাঁহারা বড় মাথা ঘামান না, তাহা তাঁহাদের প্রতি কার্য্যে দেখা যাইতেছে। শুধু পরের কা কথা, বিলাতের ভূত-পূর্ব্ব শ্রমিক সরকারের সহকারী বৈদেশিক সচিব মিঃ আর্থার পনসনবি 'ডে লি হেরাল্ড' পত্রে তাঁহাদের চীনে যুদ্ধের চিত্রান্বেষণ সম্পর্কে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম পাঠক-বর্গের অবগতির নিমিত্ত এই স্থলে প্রদান করিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন:—

"সাংহাইয়ে বিস্তর অনাবশ্যক সৈন্য ও রণতরী প্রেরণের পর যদি কাণ্টনের জাতীয় দল ইংরাজের যুদ্ধ বাধাইবার ইচ্ছা নাই বলিলে বিশ্বাস না করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে বিশেষ অপরাধে অপরাধী করা যায় কি? যদি কাণ্টনীরা মনে করে যে আমরাই তাহাদের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার একমাত্র শত্রু, তাহা হইলেও কি তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু আছে? চীনের জাতীয় দল আমাদের উপর অনাচার-অত্যাচার আচরণ করিয়াছে, অতএব আমাদের পক্ষ হইতে চীনকে সমুচিত শাস্তি দেওয়া হউক বলিয়া যে রব উঠিয়াছে, তাহার সূত্র অন্বেষণ করিতে বিলম্ব হয় না। সার মইল ল্যাম্পসন এবং মিঃ ওমালী চীনের অবস্থাবিষয়ে অভিজ্ঞ, সুতরাং চীন-সম্বন্ধে কি করা না করা কর্ত্তব্য, তাঁহারা নির্দ্ধারণ করুন। আর যাহারা যুদ্ধ বাধাইয়া আনন্দ পায়, যাহারা বুনো সাম্রাজ্যগর্ব্বী, যাহারা অত্যাচারের গুজব রটাইয়া বেড়ায়, যাহারা ইজ্জত-রক্ষার ছুতা খুঁজিয়া বেড়ায় এবং যাহারা কেবল বৃটিশ পতাকার সম্মান নষ্ট হইল বলিয়া চীৎকার করে,—তাহাদিগের মুখ বন্ধ করা হউক। তাহা হইলে চীনের সহিত আমাদের বন্ধুত্ব অচিরে স্থাপিত হইবে।

"চীনদেশে গৃহযুদ্ধ হইতেছে। এই যুদ্ধের অনলের আঁচে যাহারা আসিবে, তাহাদিগের বিপদের সম্ভাবনা থাকিবেই। এ যুদ্ধের সহিত আমাদের কোনও সম্পর্ক নাই। যদি বলডুইন গভর্ণমেণ্ট নিজের নির্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ বৃটিশ প্রজাকে সেই আঁচের সম্পর্কে ইচ্ছাপূর্ব্বক যাইতে দেয়, তাহা হইলে সে দোষ কাহার? বলডুইন সরকার বুদ্ধির দোষে এই যুদ্ধের সম্পর্কে আসিয়া স্বেচ্ছায় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া যদি দেশের নিকট চীনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার অনুমতি প্রার্থনা করে, তাহা হইলে দেশ কখনই সরকারকে সমর্থন করিবে না। আমি দেশের লোককে বলি, তোমরা মাথা ঠাণ্ডা করিয়া বিবেচনা কর, তোমাদিগকে যে সব অনাচারের গুজব শুনান হইতেছে, তাহার সিকিও বিশ্বাস করিও না; জার্ম্মাণ যুদ্ধকালে কি মিথ্যার বন্যা বহিয়াছিল,
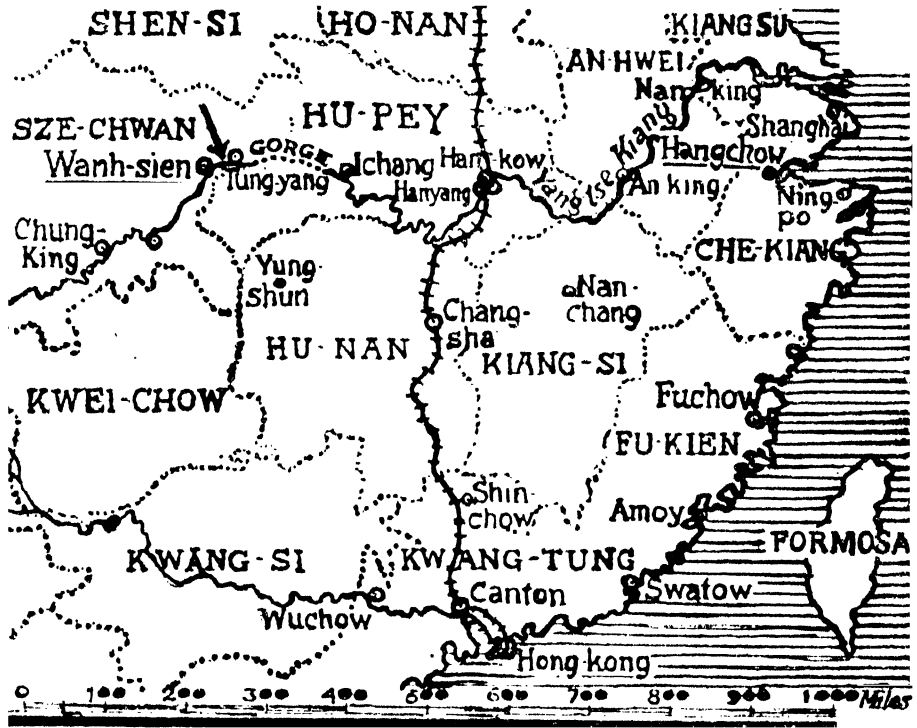
চীনের নানকিং, সাংহাই, হাঙ্কো সহর প্রভৃতির মানচিত্র

তাহা মনে রাখ। সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও, বৃটিশ ধনী ব্যবসাদারদিগের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে বুনো সাম্রাজ্যবাদী ও সমরপ্রিয় কর্ত্তৃপক্ষ কাণ্টনের জাতীয় দলের বিপক্ষে ইংরাজ জাতিকে উত্তেজিত করিতেছে। শ্রমিক কর্ত্তৃপক্ষের এবং সংবাদপত্র-সমূহের মতে নানকিং ঘটনা একটা ছুতা মাত্র। লোকের মুখে মুখে শুনিবে, যদি একটি ইংরাজ চীনের এই গৃহবিবাদের সম্পর্কে জিপ্ত হয়, তাহা হইলে টোরী গভর্ণমেণ্ট কাণ্টনের বিপক্ষে যুদ্ধ না করিয়া ছাড়িবে না। এই গভর্ণমেণ্ট কেবল একটা ছুতা খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। কাযেই চীনের গৃহবিবাদের কোন না কোন সময়ে সে সুযোগ যে মিলিবে, তাহা ত জানাই ছিল। নানকিংয়ে সেই সুযোগ মিলিয়াছে। এক ভরসা, মার্কিণ ও জাপ এই ফাঁদে পা দিবে না,—টোরী গভর্ণমেণ্টের প্ররোচনায় একযোগে চীনকে শায়েস্তা করিতে যাইবে না।"

তাহাই হইয়াছে। মিঃ পনসনবির ভবিষ্যবাণী সফল হইয়াছে.

জাপ ও মার্কিণ নানকিংয়ের ব্যাপারে ইংরাজের সহিত একযোগে চীনের প্রতি কঠোর ব্যবস্থা করিতে শেষ মুহূর্ত্তে সম্মত হন নাই। মার্কিণ স্পষ্টই জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা কঠোর ব্যবস্থার বিরোধী। জাপের ভাবগতিক ঠিক কি, তাহা বুঝা যাইতেছে না বটে, তবে তাহারাও আপাততঃ ইংরাজের সহিত একযোগে কায করিতে অসম্মত। মিঃ পনসনবি ও 'ডেলি হেরাল্ড' পত্র বিশ্বাস করেন যে, নানকিং ও অন্যান্য স্থানের অনাচার সম্পর্কে যাহা রটান হইয়াছে, তাহার এক-চতুর্থাংশও সত্য নহে। জার্ম্মাণ যুদ্ধকালেও এই ভাবের মিথ্যা রটনার দ্বারা ইংরাজ জাতিকে জার্ম্মাণদের বিপক্ষে ক্ষেপাইয়া তুলা হইয়াছিল। সংবাদদাতারা চীন হইতে চীন সম্বন্ধে যে কোন সংবাদ প্রেরণ করিবে, তাহা যেন তাহারা বিশেষ বিবেচনা করিয়া বিশ্বাস করে।

মার্কিণ দেশেও কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ সাবধানতার সহিত চীন সম্বন্ধে কর্ত্তব্য স্থির করিতেছেন। মিঃ ইউজিন চেন মার্কিণ পত্রে নানকিংয়ের যে বিবরণ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহাতে বলিয়াছেন যে, "প্রত্যেক বিদেশীর প্রাণের পরিবর্ত্তে ১ শত চীনার প্রাণ লওয়া হইয়াছে। ইংরাজ ও মার্কিণের গোলাবর্ষণে নানকিংয়ে এই শোচনীয় কাণ্ড ঘটিয়াছে।" সুতরাং যদি ক্ষতিপূরণ দিতে হয়, তাহা হইলে ইংরাজ ও মার্কিণেরই চীনকে দেওয়া উচিত।

চীনা রেড ক্রশ সমিতি

তবে সৌভাগ্যের কথা, এবার মার্কিণ ও জাপ চীনের বিরুদ্ধে আসরে অবতীর্ণ হয়েন নাই। ফরাসী ত পূর্ব্বেই কাণ্টনের জাতীয় দলের দিকে হইয়াছেন। "ডেলি হেরাল্ড" পত্র লিখিয়াছেন, মুসিয়ে ব্রায়াণ্ড ফরাসী পার্লামেণ্টের (Chambar of Deputus) বৈদেশিক বিভাগীয় কমিটীকে বলিয়াছেন,—"আমরা পূর্ব্বে যে গুজব শুনিয়াছিলাম, তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। নানকিংয়ের কোনও ফরাসী প্রবাসীরই বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয় নাই। ফরাসী কনসেশানের মধ্যে যে সকল চীনা সৈন্য প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাদিগকে নিরস্ত্র করা হইয়াছিল।" 'লে টেম্পস' পত্র তাঁহার পাঠকবর্গকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে লণ্ডন হইতে চীন সম্বন্ধে যে কোনও সংবাদ আসিবে অথবা ইংরাজ

আসল কথা, মার্কিণ কি এখন কুওমিণ্টাঙ্গের মুক্তিসমরের উদ্যোগে বাধা দিবেন? মার্কিণ পত্রসমূহে এ কথার আলোচনা হইতেছে। অনেকে বলিতেছেন, যখন চীনের জাতীয়তা এবং বৈদেশিক বিদ্বেষ প্রধানতঃ ইংরাজের বিপক্ষে পরিলক্ষিত হইতেছে, তখন মার্কিণের সে গোলযোগের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িবার কোনও প্রয়োজন নাই। অর্থাৎ ইঁহাদের মনের ভাব—"যা শত্রু পরে পরে।"

ইংরাজ সাম্রাজ্যগর্ব্বীরা তাহা বলিয়া এখনও জাপানের আশা ত্যাগ করেন নাই। চীনে তাঁহাদের দলের লোকরা জাপকে উত্তেজিত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু টোকিও সহরের "টাইমস" পত্রের সংবাদদাতা এ বিষয়ে বিশেষ আশার বাণী দিতে

পারিতেছেন না। গত ৪ঠা এপ্রিল তারিখে তিনি তাঁহার কাগজে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন,—"কয়েক বৎসর পূর্ব্বে চীনদেশের এক দোকানঘরে চীনা সেন্তরা জাপের জাতীয় পতাকার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করিয়াছিল বলিয়া জাপ জাতি ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এবার নানকিংয়ের জাপরা উহার বহুগুণ অধিক অপমান ও অত্যাচার প্রাপ্ত হইয়াছে। তথাপি জাপ জনসাধারণ ও সংবাদপত্রসমূহ এবার তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিয়া আছে। ইহা কি আশ্চর্য্য নহে? ইহার কারণ কি? কারণ আর কিছুই নহে, চীনের বর্ত্তমান জাতীয় আন্দোলনের প্রতি জাপ জনসাধারণের আন্তরিক সহানুভূতি। জাপদিগের দৃঢ়বিশ্বাস যে, এই আন্দোলন সফল হইবে এবং জাপও প্রাচ্যজাতিরূপে নবীন চীনের বন্ধুতা প্রাপ্ত হইবে। জাপ গভর্ণমেণ্ট যে প্রতীচ্যের শক্তিদিগের পোঁ না ধরিয়া চীনের ব্যাপারে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতেছেন, ইহাতে জাপজাতি সন্তুষ্ট।"

সুতরাং জাপানের উপর নির্ভর করাও বিশেষ সুবিধাজনক নহে। এ ক্ষেত্রে ইংরাজ কি করিবেন? জুনা সাম্রাজ্যগর্ব্বীরা টোরী সরকারকে যুদ্ধের জন্য নাচাইতেছে। তাহারা বলিতেছে, "ইয়াংসি নদীর দক্ষিণে আমাদের স্বার্থই প্রবল, জাপ বা মার্কিণের নাই বলিলেই হয়। সুতরাং জাপ বা মার্কিণ সম্মত না হইলেও আমাদের নীরব থাকিলে চলিবে না, নানকিংয়ের ব্যাপারে ক্ষতিপূরণের জন্য চীনকে চাপিয়া ধরিতেই হইবে। যদি চীন নরম হয়, ভালই, আমাদের স্বার্থ পুনরায় ফিরিয়া পাইব; না হয়, চীনের ঘাড় ধরিয়া নরম করিতে হইবে। এ জন্য যদি প্রয়োজন হয়, আমরা এককই যুদ্ধে নামিব। আর একবার যুদ্ধ বাধিলে জাপ ও মার্কিণ নিশ্চেষ্ট বা নিরপেক্ষ থাকিতে পারিবে না।" শয়তানীটা একবার দেখুন! এই স্বার্থসর্ব্বস্ব অর্থলোলুপ সাম্রাজ্যগর্ব্বীরা ন্যায় ও ধর্ম্মের মুখ চাহে না। এমনও শুনা যাইতেছে যে, তাহারা ফরাসী ও ইটালীকে আসরে নামাইবার চেষ্টা করিতেছে। টোরী গভর্ণমেণ্ট ইহাদের কথায় কর্ণপাত করিয়া কুবুদ্ধির পরিচয় না দেন, কি রণমদে মাতিয়া জগতে কালানল জ্বালাইয়া তুলিবার আয়োজন করেন, তাহা অচির-ভবিষ্যৎই বলিয়া দিবে।

জনবুল—(কি বিরাট!)

হামিদের হিম্মৎ

১৩

গণেশের মা ছিল আমাদের পাড়ার বড় মানুষ লাহিড়ীদের বাড়ীর এক জন পুরাতন ঝি। সে কালের ঝিয়েরা ছিল সত্য সত্য-ই ঝি—অর্থাৎ বাড়ীর মেয়ে। তারা ঝাঁটপাট দিত, জল তুলত, বাসন মাজত, ঝগড়া করত, তবু থাকত ঠিক বাড়ীর এক জন মেয়ে হয়ে। তাদের কাণে মাকড়ী হাতে চুড়ী ছিল না, পরণের শাড়ীর মাঝখান দিয়ে একটা চওড়া চক্‌চকে পাড় ঢেউ খেলিয়ে জল্‌জল্‌-ও করত না।-প্রভুপত্নীর পাতের প্রসাদ খেতে তাদের ঘৃণা ছিল না, পুরাণ কাপড় প'রে মাসিক আট আনা থেকে এক টাকা মাইনে পেয়ে সন্তুষ্ট থাকত। আজকালকার ঝি-চাকররা শ্যামবাজার থেকে বিডন ষ্ট্রীটে এক থালা সন্দেশ তত্ত্ব নিয়ে যেতে হ'লে-ও ট্রাম-ভাড়া চায়, আর এঁচে নেয় যদি বিদায়-টা অন্ততঃ এক টাকার কম হবে, তবে ব'লে বসে, "মোর্ কমরে ব্যাদনা হইছেন বাপু, মুই যাতি পারমু নি।" হয় ত শীঘ্রই এমন দিন আসবে যে, বাবুদের বলতে হবে, "কোচোয়ান, গাড়ী তৈয়ার কর, ঝি-বিবি তত্ত্ব লে যাগা।" কিন্তু তখনকার ঝিয়েরা সচরাচর থালায় চার পয়সা ও একটা সন্দেশের আশায় বাগবাজার থেকে হেঁটে বৌবাজার পর্য্যন্ত যেত, আর চার আনা বিদায় পেলে ত আহ্লাদে আটখানা—কুটুমবাড়ীর সুখ্যাত আর তার মুখে ধরে না। ঝিয়ের পাওয়া সন্দেশখানি ত বাড়ীর কোন না কোন ছেলের পাওনা—সে একেবারে নিশ্চয়, পয়সার ভাগ-ও যে ছেলেরা কখন কখন পেত না, তা-ও নয়। সে ঝিয়েরা চুরী করত, সে বড় মজার চুরী; বাজারে তখন কড়ি চলত; শাক-মাছ কিনতে পয়সা হিসেবে যে কয় গণ্ডা কড়ি দোকানীকে দিতে হ'ত, কড়িওয়ালার কাছে পয়সা দিয়ে কড়ি নিলে তার চেয়ে পয়সা পিছু দেড় গণ্ডা দু'গণ্ডা কড়ি বেশী পাওয়া যেত; ঝিয়েরা গিন্নীর কাছে ছ' আনা পয়সা নিয়ে যেত বাজার করতে, সেখানে পয়সাগুলি ভাঙ্গিয়ে কড়ি কিনে বাজার সারলে বাড়তি কড়িগুলি তার লাভ—এই তার চুরী। মনিববাড়ী ছাড়া পাড়াপড়শী দু'চার বাড়ীর বাজার ক'রে দিয়ে সে ঐ গৃহস্থদের কাছ থেকে মাসে দু'আনা হ'তে চার আনা পর্য্যন্ত পেত, তার উপর ঐ বাড়তি কড়িগুলি। এই রকম ক'রে অনেক বুড়ো ঝি বিস্তর টাকা জমিয়ে ফেলত।

সরলার শ্যামা ঝি যে বিধুভূষণকে তার লুকানো ৫ শত টাকা দিয়েছিল, সেটা কবির কল্পনা নয়; বাগবাজারের এক প্রাচীন কায়স্থঘরে ঐ রকম এক ঝি তার হাতে ক'রে মানুষ-করা মনিবের চাকরী যাবার পর ব্যবসা আরম্ভের জন্য হাজারটি টাকা গুণে দিয়েছে, আমি স্বচক্ষুতে দেখেছি।

এখনকার ঠমক-করা ঠিকে ঝিয়েদের মত তারা পাঁচ-বাড়ী দোর ঝেঁটিয়ে বেড়াত-ও না, আর সহজে এ বাড়ী ছেড়ে ও বাড়ী যেত-ও না; তাদের সখের ভগ্‌গিনপোত বা বুন্‌পোর জন্য ঘরভাড়া করা-ও ছিল না; আর দেশ ব'লে হামেসা ছুটী নিয়ে যাবার জন্য কোন নিরুদ্দেশ চুলো-ও ছিল না, সুতরাং তখনকার মিউনিসিপ্যালিটীকে প্রসূতি-কুটীর-ও স্থাপিত করতে হয় নি।

তারা মাইনে উপরি যা কিছু পেত, সব-ই বাড়ীর গিন্নীর কাছে বা অপর কোন বিশ্বাসী লোকের হাতে জমা ক'রে রাখত; আর গিন্নী-টিন্নীরাও সুবিধামত সুদে খাটিয়ে তাদের টাকাটা বাড়িয়ে দিতেন।

ঐ রকম অন্যান্য ঝিয়ের মতন গণেশের মা মাঝে মাঝে কিছু "পুণ্যি কম্ম" করত। গণেশের মা "ফলসংক্রান্তি বত্তো" নিয়েছিল, এবার সে সেই 'বত্তো উজোবে'; কিন্তু বড় মানুষের বাড়ী ব'সে তাঁদের গরদ-পরা পুরুত দিয়ে 'স্বগ্‌গের' সোনার বাগানের চাবি খোলাতে তার সাহস হ'ল না।

বটু চৌধুরীরা লাহিড়ী মশাইদের নিকট-কুটুম্ব এবং প্রতিবেশী গৃহস্থ; গণেশের মা বটুরমাকে গিয়ে ধ'রে বসল যে, তাঁর ছেলেদের ব'লে-কয়ে বামুন ঠিক ক'রে "সামিগ্‌গিরীপত্তর" কিনিয়ে তাঁদের বাড়ীতে ব'সে তার "বত্তোটি উজিয়ে" দিতে হবে। বটুরমা পাড়ার মা, দায়ে

অদায়ে তিনি সবার আপনার—তা কর্ম্ম-কাযে গিয়ে রেঁধে বেড়ে দিয়ে-ই হোক আর শিয়রে ব'সে অষুদ মেড়ে দিয়ে-ই হোক। পাড়ার ছেলেদের দৌড়াদৌড়ি ক'রে খেলবার জন্য ছিল তাঁর বড় উঠানখানি, আর তাঁর বাইরের ছোট ঘরখানি ছিল আমাদের লুকিয়ে তামাক খাবার প্রথম পাঠ পড়বার জন্য।

গণেশের মার জাত ছিল জল-আচরণীয়, নইলে লাহিড়ী মশাইরা তাকে বাড়ীতে রাখতেন না, আর বাড়ী ছিল ঘাঁটাল'না চন্দ্রকোণা, মেদিনীপুর জেলার অমনি কোন্ এক গ্রামে; তার ওপর "বত্তো-উজ্জোনেতেও" সে খরচ করতে রাজী এক পণ "ট্যাকার" উপর, তবু আর পাঁচ জন নবশাক যজমানের ভয়ে পাড়ার কোন পূজারী বামুন এ কাযটা হাতে নিতে চাইলেন না। মহেশ চক্রবর্ত্তীরা এ পাড়ার এক জন পুরাণ ঘর, এক সময় অবস্থা-ও নিতান্ত মন্দ ছিল না; আপাততঃ কিন্তু বহুকালের বাড়ীখানি ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে; ভাঁড়ার ঘরটা চাবীবন্ধ-ই থাকে, চাল আর জালায় উঠে না, কুলো-চাপা দেওয়া ধামায় শোবার ঘরে তক্তাপোষের নীচে-ই রাখা হয়। বড় ভাই এক পিরিলীদের দৌহিত্রের বাড়ী জামাই হয়ে অন্ততঃ ধোপদস্ত কাপড় প'রে আর টেরীটা কেটে নিরক্ষর জীবনের সার্থকতা ক'রে নিচ্ছে। কিন্তু মহেশের অবস্থা বড় সুবিধার নয়; কাপড়খানার কথা দূরে থাক, তাঁর গলায় মালা ক'রে ঝুলান পৈতাগাছটির রং যে কোন অতীত কালে শুভ্রবর্ণ ছিল, সেটা-ও এঁচে নেওয়া শক্ত। মহেশের দু'বেলা একটু একটু আফিম্ খাওয়া অভ্যাস আছে। আলাপী সালাপী অনেকেই বলেছে যে, সে যদি গাঁজাটা ছেড়ে দেয়, তবে নিশ্চয়-ই রক্ত আমাশয় রোগে মরবে, আর বামুনের ছেলে ব'লে ছিরু কাঁসারী কি রাজপুতদের নটো তাকে ডেকে ব'সে খাওয়ালে দু'চার গেলাস দোয়াস্তা-ও খায়; মাদক-নিবারণী সভার সভ্য না হয়ে তার এই একটা লভ্য হয়েছে যে, ক্ষিধেটা সে আর বড় বোধ করতে পারে না। বটু চৌধুরী মহেশকে ডেকে বললে, "চক্কোর, একটা হাতে দাঁও আছে, মারবি ?"

মহেশ। কি দাদা—কি দাদা? ব্যাড সারকমট্যান্স ভেরি ম্যাচ। হোয়াট দাঁও? ব্রাদার, ব'লে ফেল।

বটু। পুরুতগিরি করতে হবে; গণেশের মা বেটী ফলসংক্রান্তির বত্তো উজ্জোচ্ছে, বামুন পাওয়া যাচ্ছে না, দে না গোটাকতক মন্ত্র ব'লে।"

মহেশ। মন্তর! আমি কি রোজা না কি যে ভূত, নামাব?

বটু। বামুনের ঘরের নিরেট! গায়ত্রীটে-ও কি জানিস নি?

মহেশ। গোড়াটা যেন মনে আছে—ভূঃ—ভু—অবন্ধ স্তব—কি—কি ব'লে দাও না বটুদা।

বটু। আমি কি পূজারী বামুন যে, মন্ত্র শেখাব? এক কায করলেই হবে, চোখ বুজে হাতে পৈতে জড়িয়ে ঠোঁট নেড়ে যাবি, তা হলেই মন্ত্র বলা হবে। ভুর্জ্জিটুর্জ্জি দান উচ্ছগ্যগুলো চেঁচিয়ে বলতে হবে। তা একটা ক'রে অনুস্বর দিয়ে ব'লে যেতে পারবি নি? এই ধ'রে নাও যেমন—এষাং বস্ত্রং ব্রাহ্মণং দদে।

মহেশ। ওঃ—তা আমি খুব ব'লে যেতে পারব।

ফল সংক্রান্তির ব্রত, কাযে-ই গণেশের মা কাপড়, গামছা, নৈবেদ্য, ভোজ্য সবই যোগাড় করেছে, তার উপর নানা রকমের গাছের ফল, এ ছাড়া আবার রূপোর বেল, সোনার ডাব, সোনার ছোট ছোট কলা, আরও কত কি। যথাদিনে মহেশ গঙ্গাস্নান ক'রে গঙ্গামাটীর ফোঁটা-টোটা কেটে এসে গণেশের মা'র প্রদত্ত নূতন সাদা ধুতি উড়ানী প'রে আসনে ব'সে পৌরোহিত্যকার্য্যে নিযুক্ত হ'ল। "ওঁ ওঁ নমো নমঃ"-গুলো খুব চেঁচিয়ে বলতে লাগল, একবার আঙ্গুলগুলো মটকায়, হাত জোড় ক'রে মাথার উপর ঘুরায়, কখন বা নাক টিপে ধরে, কখন কাণের ভিতর আঙ্গুল পূরে দেয়। এই সব দেখে গণেশের মা'র ভক্তিতে দু'চক্ষু দিয়ে জল গড়াতে লাগল, সে বার বার ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতে সুরু করলে। শেষ মহেশ তাকে ভোজ্য, বস্ত্র, তৈজস, রজতকাঞ্চনাদি এক একটি দানের উপর হাত রেখে মন্ত্র পড়াতে সুরু ক'রে দিলে।

এখন শৈশবকালেই মহেশ মাতৃহীন হয়েছিল, এক অবীরা পিসী তাকে মানুষ করে; সুতরাং মা কথাটার চেয়ে পিসীটাই তার মুখ দিয়ে সর্ব্বদা বেরিয়ে পড়ত। সে আরম্ভ করলে—"বল, আমি গণেশের পিসীং—"

গণেশের মা বললে, "গণেশ যে আমার ব্যাটার নাম ছ্যাল গো। আহা, ন বছরের হয়ে বাছা আমার—"

মহেশ। আরে, তার উদ্ধ্ গতি হয়েছে, পৃত্তিমীতে ছিল গণেশ, উদ্ধ্ লোকে গিয়ে সে যে এখন শিব হয়েছে রে মাগী,

কাজেই তুই এখন তার পিসী; নে বল—আমিং গণেশের পিসীং।

গণেশের মা ভাবলে, বামুন-ই ত দেবতা, তাঁর মুখ দিয়ে যা বেরুবে, তাই শাস্তর, কাষেই মহেশ ঠাকুর যা বলায়, গণেশের মা তাই বলতে থাকে; যথা :—

"আমিং গণেশের পিসীং, তামা তুলসী গঙ্গাজল হাতে করকেং এই থান কাপড়ং মহেশ ঠাকুরকে দদা, আমিং গণেশের পিসীং, এই রাঙ্গাপেড়ে শাড়ীং তামা তুলসী গঙ্গাজল হাতে করকেং মহেশ ঠাকুরকে দদাং; এই সব ক'খানা নতুন গামছাং মহেশ ঠাকুরকে দদাং; এই সোনারূপোর বেলং ডাবং আমং কাঁঠালং যত কিছু যাং থালা ঘটি গ্লাসং সর্ব্বথাং গোব্রহ্মণ দিব্যি করতং শ্রীমান্ মহেশচন্দ্র ঠাকুরং পাদপদ্মেং সবিনয়ং পুরস্কারং পত্রপাঠং নিবেদনং দক্ষিণাসমেতং গয়া গঙ্গা গদাধর হরিম্।

বটু চৌধুরী ব'লে রেখেছিল যে, গণেশের মা, হীন জাতের মেয়ে তুই, তোর 'বত্ত উজ্জুতে' কোন বামুনই ৫ টাকা দক্ষিণের কম স্বীকার করবে না, তা ছাড়া ফলার করবার জন্য বার আনা আর ভোজন-দক্ষিণা এক টাকা দিতে হবে।

এই ছটি টাকা বার আনা মহেশের পাদপদ্মের কাছে রেখে গণেশের মা ভক্তিগদগদ প্রাণে মাথা ঠুকে ঠুকে প্রণাম করলে; মন্ত্র পড়াতে পড়াতে মহেশের মুখ একেবারে খুলে গেছে, সে নিজের প্রণামের মন্ত্রটা না পড়িয়ে ছাড়লে না; বলিয়ে দিলে—"নমো গোব্রাহ্মণায় গণেশায় থব্বথুলং গলায় গজমোতি বিস্তার ভার, দাও মা সরস্বতী মুক্তোর হার।"

ধর্ম্মকর্ম্মে শ্রমজনিত ঘর্ম্মধারা গণেশেরমা গামছা দিয়ে আপনার মুখখানি থেকে মুছে ফেলতে যতটুকু সময় লাগল, তার মধ্যেই সব ক'খানি নৈবেদ্যর চাল একটা কাপড়ে বেঁধে ফেলে, থালা ঘটি বাটী সোনারূপা ফলটল সব গুছিয়ে নিয়ে, চল্লুম ব'লে মহেশ রওনা হয়, এমন সময় গণেশেরমা বললে, "ও ঠাকুর কর কি, সব যে তুমি একা বেঁধে নে চললে?"

মহেশ। ও বেটি, আমি নেব না-ত আবার কে নেবে?

গণেশের মা। অ বাবা, আমি যে এক থানা নৈবিদ্যি লালবাগানের টোলের বামুনকে দেব ব'লে রেখিছি, সোনার ডাবটি আর গুরুবরণের জোড়, বাবুদের বাড়ীর পুরুত ঠাকুরের, ভুজ্জি দু'খানা আর একটা গেলাস—

মহেশ। আরে বেটি, সর্ব্বনাশ করবি? তাঁবা তুলসী গঙ্গাজল হাতে ক'রে দিব্যি করলি মহেশ ঠাকুরকে দিলুম ব'লে, আর এখন আবার টোলের ভট্‌চায্যি—বাবুদের বাড়ীর পুরুত, ও সব কথা কি?

বললে বলতে-ই মহেশ ঠাকুর একেবারে গলিটুকু ছাড়িয়ে মোড় পার। ঝি মাগী হাউ হাউ ক'রে কাঁদতে ব'সে গেল, বটু চৌধুরীর মা আশ্বাস দিলেন যে, তিনি এর পর মহেশকে ডাকিয়ে বুঝিয়ে সুঝিয়ে যা কিছু পারেন আদায় ক'রে দেবেন।

১৪

প্রয়োজন মত ফরমাসে রাতারাতি পুরোহিত প্রস্তুত কেমন ক'রে হ'তে পারে, সেইটি দেখাবার জন্য উপরি-উক্ত গল্পটি বলা গেল। এইরূপ পুরোহিত যে, কেবল মাত্র হিন্দু ধর্ম্মের সদ্‌গতির জন্যই প্রস্তুত হয়, তা নয়, যেমন যেথানে-ই খাটি টাকার চলন, সেইখানেই মেকী টাকার আবির্ভাব, যেখানে-ই আসল নোট বাজারে চলে, সেখানেই জাল নোট মাঝে মাঝে ধরা পড়ে; তেমনি সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়েরই ধর্ম্ম-যাজক পুরোহিতগণের পূজায় ভাগ বসাতে অথবা ধর্ম্মের নামে ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের ভিতরকার মতলব হাসিল করতে ক্লারজি, রাবি, মৌলবী বামুন ঠাকুর প্রভৃতি তৈরী হয়ে পড়ে।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে কানপুর প্রভৃতি পশ্চিমী কারখানায় প্রস্তুত মৌলবী মার্কামারা নারদীয় মন্ত্রে দীক্ষিত কতকগুলি দরদী এই বঙ্গদেশে আমদানী হ'তে আরম্ভ হয়েছে। যা হউক, তবু তাঁরা জাতিতে মুসলমান এবং সাজতেনই মুসলমানের ধর্ম্মযাজক।

কিন্তু সম্প্রতি মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে কতকগুলি লোকের স্বধর্ম্মপ্রীতি এতদুর বর্দ্ধিত হয়েছে যে, তাঁরা নাসিকানন্দ রশুনগন্ধ অন্ধকারের জিম্বায় আমানত রেখে স্বকার্য্য উদ্ধারের জন্য অপবিত্র আর্য্যসমাজী সাজতেও দ্বিধা বোধ করেন না।

যখন সনাতন ধর্ম্মের মর্ম্মজ্ঞ সমাজ কে কোন্ নামে কোন্ পদ্ধতিতে পরমব্রহ্মের উপাসনা করে, তা নিয়ে গণ্ডগোল না ক'রে ধার্ম্মিক মাত্রকে-ই শ্রদ্ধা করতেন, আর তার ভাবের ঘরে উৎপাত ঘটিয়ে নিজের পটিতে টেনে আনবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হতেন না, তখন বর্ত্তমান হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বীদিগের আদি পুরুষগণ প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত হয়ে কাকেও ধর্ম্মভ্রষ্ট ক'রে স্বদলের পুষ্টিসাধনে প্রবৃত্ত হতেন না। তার পর পৌরোহিত্যের আধিপত্যে ছুৎমার্গাবলম্বী হিন্দুরা

খাদ্যাখাদ্যের বিচার ও স্পর্শদোষরূপ রোষরস ধর্ম্মশাসনের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে পতিতকে আর উন্নীত করতে একেবারে বিরত হলেন। অন্য দিকে কতকগুলি ধর্ম্মসম্প্রদায় কনভার্ট করাটাই যেন তাঁদের নিজ নিজ দেবতাকে প্রসন্ন করবার রাজসূয় যজ্ঞ ব'লে ধার্য্য ক'রে নিলেন। এইরূপে কতক বা গর্দ্দানার ভয়ে কতক বা মর্দ্দানা দেখাতে আবার অনেকেই স্বধর্ম্মীর কাছে থামকা গলাধাক্কা খেয়ে হিন্দুনাম পরিত্যাগ করে। একবার ভয়ে ভুলে লোভে বা ঘৃণায় যে ঘরের বাইরে গেছে, তার কোন পুরুষে কখন আর সে ঘরের দরজা মাড়াতে পারবে না, বামুন ঠাকুরদের এই হুকুম।

সম্প্রতি সেই হিন্দুধর্ম্মান্তর্গত কয়েক জন লোক আর্য্যসমাজ নামে একটি নূতন সম্প্রদায় গঠিত ক'রে শুদ্ধি দ্বারা স্বধর্ম্মত্যাগীর বংশধরদের পুনরায় হিন্দুত্বের মন্দিরে প্রবেশাধিকারের কল্পনা কার্য্যে পরিণত করতে আরম্ভ করেছেন।

মিশনারি মহাশয়দের এ বিষয়ে কোন আশঙ্কার লক্ষণ অদ্যাবধি প্রকাশ পায় নি; তবে তাঁদের কার্য্যক্ষেত্রের জন্য লুসাই পর্ব্বত, গারো হিল, নাগা প্রদেশ আর সাঁওতাল পরগণা খোলা রয়েছে, এতদ্ভিন্ন তাঁদের বিশেষ ভরসা ভারতে দুর্ভিক্ষের ঘন ঘন আবির্ভাব। কিন্তু মুসলমান ভায়াদের ডঙ্কা বাজাবার সাধ্য বোল সংখ্যার উপর; এই সংখ্যায় লঙ্কাভাগ হচ্ছে দেখে তাঁরা বড় আশঙ্কিত হয়ে উঠেছেন, যেমন কেহ কেহ বলেন যে, রাজনীতির খাতিরে কোন হীন কর্ম্মই ঘৃণিত নয়, তেমনই এমন লোকও আছেন, যাঁরা বলেন, ধর্ম্মের জন্য কোন পাপ কর্ম্ম করাও দূষণীয় নয়। অন্যান্য উপায়ের সঙ্গে তাঁরা তাই সুপবিত্র মুসলমানকেও অপবিত্র চিরঘৃণিত হিন্দু সাজাতে কুণ্ঠিত নহে।

* * * *

স্বার্থের খাতিরে ভক্তির গরম জল যতই কেন না বুকের ভিতর ফুটতে থাক, অনবরত দেবনিন্দা কারুর প্রাণে সহ্য হয় না, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের প্রাণে; আবার যে শ্রেণীর স্ত্রীলোকদের উপর পাগলা পীরের সমধিক আধিপত্য স্থাপিত হয়েছিল, তাদের জীবিকার্জ্জনের পথ যতই নিন্দনীয় হ'ক, সমাজের মুখ হ'তে সেই স্ত্রীজাতির উপর ঘৃণার নিষ্ঠীবন যতই পিচ্ছিল শব্দে নিপতিত হ'ক, মনুষ্যজগতে তাদের এক জনও আপনার লোক নেই জেনে জগৎপিতা বা জগন্মাতার দ্বারে যখন তাদের প্রাণের নৈবেদ্য উৎসর্গ ক'রে দেয়, তখন সোপকরণ থালাখানি পর্য্যন্ত দিয়ে দেয়।

পাগলা পীরের হিন্দু দেব-দেবীর প্রতি কুৎসিৎ নিন্দা ও ঘৃণিত কটুবচন ক্রমে ক্রমে সোনাগাছিবাসিনীদের মধ্যে অধিকাংশ মেয়েকেই তাহার বুজরুকীর মায়াজাল কাটিয়ে আস্তানার সীমানা থেকে সরিয়ে দিলে। চোর ছেঁচোড় বদমাস যাই হ'ক, তবু পীতাম্বর বামুনের ছেলে, ভক্তি থাক বা না থাক, দেব-দেবীর দ্বারে অপরাধের ভয় তাহার প্রাণে একটু আছে-ই, আবার ইদানীং ভাগ-বাটারা নিয়ে পীর সাহেব পীতাম্বরের সঙ্গে দিন রাত খিচমিচি করে, মুস্কিল আসান জীবনের সাবেক চাল একেবারে ভুলে গিয়ে পীতাম্বরকে যখন-তখন যা-তা বলে, সুতরাং তার প্রাণে এ দুর্ব্যবহার ক্রমে অসহ্য হয়ে উঠে, পীর সাহেব যাতে একটু শিক্ষা পান, সে বিষয়ে একটা মতলব ঠিক করবার জন্য ব্রাহ্মণের চির-বৈরি—বন্ধু গোয়েন্দা পুলিসের জমাদার নিবারণ বাকৃচীর সঙ্গে সর্ব্বদা পরামর্শ করেন।

যে দিন প্রাতঃকালে সোনাগাছি শুদ্ধ লোক অবাক্ হয়ে দেখলে যে, পাগলা পীর আস্তানা হ'তে অন্তর্দ্ধান হয়েছেন, আর পীর সাহেব বেহেস্তেই যান্ কি দোজোকেই যান—সাত বছরের পাকা গাঁজার কল্কেটি পর্য্যন্ত নিয়ে স'রে পড়েছেন বুঝে এক সিলিম তামাক পর্য্যন্ত না টেনে নিয়ে পীতাম্বর, বাক্‌চী টীকটিকীর বাসার দিকে ছুটল। তিন দিন পরে বেলা আন্দাজ দুটো আড়াইটার সময় একটি নিরীহ লোক আর্য্যসমাজভবনে উপস্থিত হয়ে একেবারে সাষ্টাঙ্গ মেজের উপর ঢেলে দিয়ে ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদতে লাগল।

লোকটির মেদিপাতা-বাটা মাখিয়ে লালকরা বিপুল দাড়ী-ও তার ঠোঁটের উপর কুণ্ডলীপাকান গোখুরার ফণা ঢাকতে পারেনি, তার চোখের জলের ভিতর থেকেও যে গন্ধকের গন্ধ বেরুচ্ছিল, তা যে-কেউ একটু মন দিয়ে নিশ্বাস নিলেই বুঝতে পারত। লোকটি পরিচয় দিলে যে, সে পুর্ব্ব বঙ্গের এক জন কুলুঙ্গী বেরামন, কিন্তু যৈবন কালে এক জোলা জাতীয় অবলা পরীর আয়নাইয়ে বাউরা হয়ে কল্মা প'ড়ে মোছলমান হয়, কিন্তু সেই পরীর বয়েসের বাড়তীর সঙ্গে সঙ্গে ডানা ঝরে গিয়ে এখন সে মদমত্ত করী হয়ে দাঁড়িয়ে খামিনের উপর এতটা মাতব্বরী করতে আরম্ভ করেছে যে, তার বাপ-দাদার পুরোণো ঘরের জন্য এখন কলজেটা একেবারে ফেটে যাচ্ছে; এখন সমাজ যদি খোস মেজাজে মেহেরবাণী ক'রে নেমাজ ছাড়িয়ে হ্যাঁদুদের মাঝে একটু তাঁবেদারী করতে দেন, তা হ'লে তার জানটা কতক ঠাণ্ডা হয়; সে যে মনে মনে ভোলানাথকে বরাবর ভক্তি ক'রে এসেছে, তার সাক্ষ্যস্বরূপ কাপড়ের ভিতর থেকে বার ক'রে একটি গাঁজার কল্কে দেখিয়ে দিলে।

কনভার্টদের পারভার্শনারি মতি-গতি কখন্ কোন্ সময় রাইট-এবাউট ক'রে আবার পরিত্যক্ত পথের দিকে রিভার্ট করে, তার স্থিরতা নেই; এই ভয়ে সমাজ সত্বরেই শুদ্ধিকার্য্য সম্পাদন ক'রে মুস্কিল আসান পীরকে আর্য্য ক'রে নিলেন; —এ বার তার নাম হ'ল শনিচর।

[ক্রমশঃ।

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

রণতরীর পরিণাম

'এম্ফিট্রাইট' নামক একখানি প্রাচীন মার্কিণ রণপোতকে বর্ত্তমানে ভাসমান হোটেল বা পান্থনিবাসে পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে। 'ওয়ার্থ' হ্রদে সম্প্রতি এই চলমান হোটেল রহিয়াছে। বহুসংখ্যক অতিথি অতি আরামে এই হোটেলে

রণতরীর অবস্থা-বিপর্য্যয়—চলমান হোটেল

যাহাতে থাকিতে পারে, বহু অর্থব্যয়ে তাহার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। হোটেলের শীর্ষদেশে অর্থাৎ ছাদে একটি রমণীয় প্রমোদোদ্যানেরও সমাবেশ আছে। আধুনিক ভোগ-বিলাসের যাবতীয় উপকরণ এই চলমান হোটেলে পাওয়া যায়। মার্কিণ সরকারের এইরূপ আরও কতিপয় অব্যবহার্য্য রণতরীকে এইভাবে কাযে লাগাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

বিচিত্র আকারের হর্ম্ম্য

জার্ম্মাণী—হামবার্গে আমেরিকার মত গগনস্পর্শী অট্টালিকা নূতন ধরণে নির্ম্মিত হইতেছে। এই হর্ম্ম্যসমূহ দেখিতে জাহাজের গলুইয়ের মত। অট্টালিকাগুলির পার্শ্বদেশে উচ্চ

বিচিত্র হর্ম্ম্যমালা

ও প্রশস্ত পথের সমাবেশে উহাদের বৈচিত্র্য বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সর্ব্বোচ্চতলগুলিতে সুপ্রশস্ত দীর্ঘ বারান্দা আছে। শ্রমজীবীরা তথায় অবকাশমত বায়ু-সেবন করিতে পারে।

সুপ্তিপ্রদায়ক শব্দাধার

মৃদু, কোমল শব্দ যদি অবিশ্রান্তভাবে একই সুরে কর্ণে ধ্বনিত হয়, তাহা হইলে নিদ্রাহীন ব্যক্তিও সুপ্তিক্রোড়ে ঢলিয়া পড়ে। উক্ত সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া জনৈক জার্ম্মাণ চিকিৎসক এক প্রকার যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই যন্ত্র ঘটিকাযন্ত্রের ন্যায় কলকব্জাযুক্ত। একবার দম দিলে এই নবোদ্ভাবিত যন্ত্র হইতে একাদিক্রমে ৪০ মিনিটব্যাপী শব্দ-তরঙ্গ নির্গত হইতে থাকে। অকস্মাৎ থামিয়া গেলে পাছে

নিদ্রাপ্রদায়ক শব্দাধার

নিদ্রিত ব্যক্তির ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, এ জন্য নির্ম্মাতা শব্দকে এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন যে, শব্দ ধীরে ধীরে ক্ষীণতর হইয়া অবশেষে থামিয়া যায়। সমগ্র যন্ত্রটি একটি কারুকার্য্য-খচিত বাক্সের মধ্যে রক্ষিত। যাহাকে ঘুম পাড়াইতে হইবে, বাক্সটিকে সহজে তাহার সন্নিকটে স্থাপন করা যায়।

ভগ্ন কাচনির্ম্মিত হোটেল

ওহিও প্রদেশের ক্লেভল্যাণ্ড নামক স্থানে এক জন পাচিকা বৈদ্যুতিক আলোকাধারের ভগ্ন কাচ-খণ্ডগুলির সাহায্যে একটি ১৩তলা হোটেলবাড়ীর নমুনা নির্ম্মাণ করিয়াছে। শিরীষের আটার সাহায্যে কাচগুলি পরস্পর সংশ্লিষ্ট। অট্টালিকার মেঝে কাচনির্ম্মিত। ছোট একটি পিয়ানো যন্ত্রও হোটেলের মধ্যে সংরক্ষিত। কতিপয় নরনারীর মূর্ত্তিও আছে। তাহাদিগকে দেখিলে মনে হইবে, মূর্ত্তিগুলি সজীব।
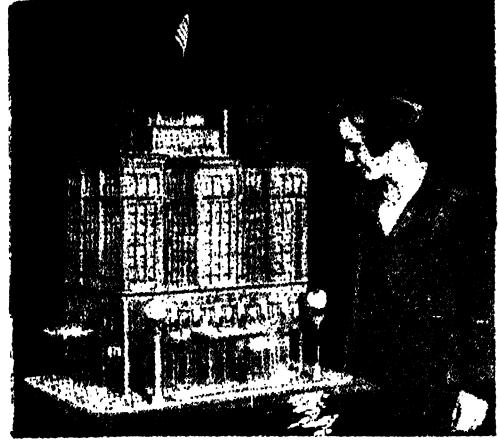
ভগ্ন কাচনির্ম্মিত হোটেলবাড়ী

লতাগুল্মনির্ম্মিত চেয়ার

উইস্কনসিনস্থিত এক জন ভদ্রলোক এগার বৎসর পূর্ব্বে কতিপয় বীজ পুঁতিয়াছিলেন। ঐ বীজ হইতে যে সকল
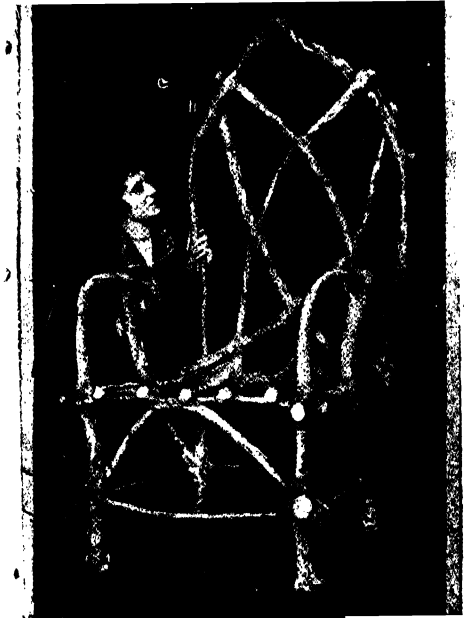
লতাগুল্মনির্ম্মিত চেয়ার

গাছ জন্মিয়াছিল, তাহাদিগকে তিনি এমনই ভাবে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বর্দ্ধিত হইবার অবকাশ দিয়াছিলেন যে, দেখিলেই মনে হইবে, প্রকৃতিজাত একখানি চেয়ার উদ্যানক্ষেত্রে রহিয়াছে। দশ বৎসর পরে উক্ত ভদ্রলোক গাছ কাটিয়া এই চেয়ারখানি বাহির করিয়া লয়েন।

তুষার-হস্তী

সুইজারল্যাণ্ডের আরোসা নামক স্থানে শীতকালে তুষার-ভাস্কর্য্য দিন দিন প্রসিদ্ধি লাভ করিতেছে। সে স্থানের

তুষার-হস্তী

উত্তাপের অবস্থা এমনই অনুকূল যে, তুষারস্তূপ অবিকৃত অবস্থায় থাকে। এ জন্য শিল্পীরা উহার সাহায্যে নানাবিধ মূর্ত্তি গড়িয়া ভাস্কর্য্য বিদ্যার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। আলোচ্যমান চিত্র হইতে দেখা যাইতেছে, কোনও ভাস্কর তুষারস্তূপ হইতে এক বৃহদাকার হস্তী নির্ম্মাণ করিয়াছে। রাত্রিকালে আলোকপাতে তুষার-ভাস্কর্য্যের মাধুর্য্য অত্যন্ত ভাল করিয়া উপলব্ধ হয়।

উত্তেজনা-পরিমাপক যন্ত্র

পিট্‌সবার্গ খনি-সমিতির বৈজ্ঞানিকগণ শ্রমজীবীদিগের দেহে ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে কিরূপ পরিবর্ত্তন হয়, তাহার গবেষণা করিতেছেন। এ জন্য তাঁহারা এক প্রকার পরিমাপক যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। এই তৌল বা পরিমাপক যন্ত্র এমনই কৌশলে নির্ম্মিত যে, খনিগর্ভে নামিয়া শ্রমজীবীরা যখন কাষ করে, সে সময় যদি তাহাদের ললাটে স্বেদবিন্দু নির্গত হয়, তাহা হইলে এই যন্ত্রের সাহায্যে অনায়াসে বলিতে পারা যায়, উল্লিখিত ব্যক্তির কি পরিমাণ শক্তি ব্যয়িত হইয়াছে। সুতরাং মানুষের উত্তেজনার পরিমাণও এই যন্ত্রে ধরা পড়িবে। এই যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ায় অনেক বিষয়ে সুবিধা হইয়াছে। বড় বড় রঙ্গালয় বা সভায় কত লোকের ভিড়ে সে স্থান উত্তপ্ত হইয়া উঠিবে, এঞ্জিনিয়ারগণ এই যন্ত্রের সাহায্যে তাহা নির্ণয় করিয়া তদনুসারে বায়ু-চলাচলের সুব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

'দম্' অর্জ্জনের কৌশল

যাহারা মুষ্টিযোদ্ধা হইবার বাসনা রাখে, তাহাদের অনেকক্ষণ 'দম্' রাখিবার অভ্যাস করিতে হয়। মাঠে দৌড়াদৌড়ি এবং রাজপথে দ্রুতধাবনই মানুষের ফুসফুসের ক্রিয়া বর্দ্ধিত করে, পায়ের মাংসপেশীকে সুদৃঢ় করিয়া তুলে এবং বহুক্ষণ যুঝিবার শক্তিদান করে। ঋতু-বিপর্য্যয়ের জন্য অনেক সময় গৃহের বাহিরে উহা অভ্যাস করিবার সুবিধা
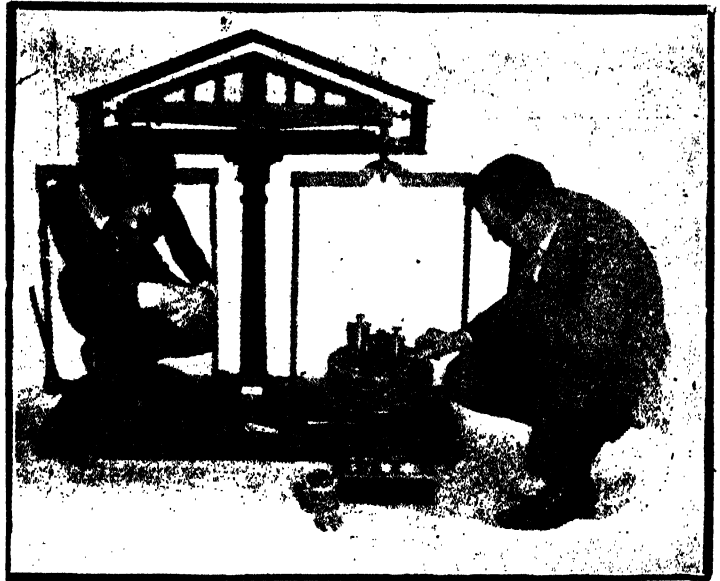
উত্তেজনা-পরিমাপক যন্ত্র

হয় না। এ জন্য ক্যানভাসযুক্ত এক প্রকার স্থিতিশীল যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। চিত্র হইতে এই যন্ত্রের স্বরূপ অবগত হওয়া যাইবে। ব্যায়ামার্থী দুই ধারের হাতল ধরিয়া

ব্যায়ামার্থী স্থিতিশীল যন্ত্রে দৌড় অভ্যাস করিতেছে

ক্যানভাসের উপর দৌড়িবার অভিনয় করিতে থাকে। বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, এই প্রক্রিয়ায় দৌড়জনিত ব্যায়ামের সুফল পূর্ণরূপে লাভ করা যায়।

জীবন-রক্ষার নূতন উপায়

কোনও অট্টালিকায় অগ্নি লাগিলে তথা হইতে সন্তর্পণে ও নিরাপদে অধিবাসীদিগকে উদ্ধার করিবার এক অভিনব উপায় অবলম্বিত হইতেছে। অগ্নির উত্তাপ-প্রতিরোধক
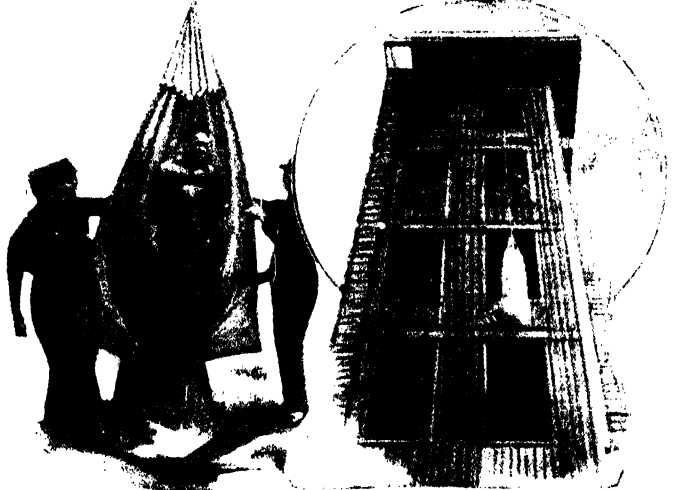
আধারমধ্যে মানুষকে সুদৃঢ়ভাবে বন্ধন করা হইতেছে এবং অত্যুচ্চ অট্টালিকা হইতে নামান হইতেছে

এক প্রকার বস্ত্র দ্বারা আধার নির্ম্মিত হইয়াছে। এই আধারটি ব্যাগ ও খাটিয়ার কায করিয়া থাকে। অগ্নি-নির্ব্বাণকারীরা এই আধারমধ্যে মানুষকে স্থাপন করিয়া উহার সংলগ্ন বন্ধনীর দ্বারা বাহুমূল এবং পদদ্বয়কে আবদ্ধ করিয়া দেয়। ইহাতে আধারস্থিত মনুষ্যটির পড়িয়া যাইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। তাহার পর আধারের মুখ বন্ধ করিয়া উদ্ধারকারীরা রজ্জু-সাহায্যে তাহাকে উপর হইতে নীচে নামাইয়া দেয়।

রোগীর জন্য মোটর-চেয়ার

জার্ম্মাণীতে চিররুগ্নদিগের জন্য চাকা ও মোটরযুক্ত এক প্রকার চেয়ার নির্ম্মিত হইয়াছে। উহার পরিচালন-প্রণালীও

চক্রযুক্ত মোটর-বাহিত চেয়ার

অত্যন্ত সহজ। চিররুগ্ন আরোহী এই চক্রযুক্ত চেয়ারে বসিয়া অনায়াসে মোটর চালাইয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া থাকে।

তাড়িতালোকযুক্ত পেন্‌সিল

প্রতীচ্যে সম্প্রতি এক প্রকার পেন্সিল বাহির হইয়াছে। উহার আকার অনেকটা ফাউণ্টেন পেনের মত। এই পেন্সিলের মুখের কাছে একটি 'বাল্‌ব' বা ফাঁপা কাচ গোলক আছে। পেন্সিলের অভ্যন্তরে ছোট একটি ব্যাটারী বা আলোক-উৎপাদক যন্ত্র আছে। ইচ্ছামত এই ব্যাটারী-নির্গত তাড়িতালোকে পেন্সিলটিকে উদ্ভাসিত করা যায়। রোগীর কক্ষে এইরূপ পেন্সিল বিশেষ উপযোগী।

মূল্যবান্ দরজা

আমেরিকার কালিফের অন্তর্গত সান্ ডায়গো নামক স্থানে একটি অট্টালিকায় ১৫ হাজার টাকার মূল্যের একটি মেহগ্নি কাষ্ঠনির্ম্মিত দরজা বসান হইয়াছে। উল্লিখিত দরজাটি স্পেনের কোনও প্রাচীন প্রাসাদ হইতে ক্রয় করা হইয়াছে। দরজাটি কারুকার্য্য-খচিত এবং প্রাচীনতার হিসাবে ইহার মূল্যও অধিক।

মূল্যবান দরজা

দ্রুতগামী মোটর

নিউ-ইয়র্কের এক জন মহিলার একখানি ত্রিচক্র মোটর-গাড়ী আছে। এই গাড়ীর গতিবেগ অতি দ্রুত। ঘণ্টায় ৮৫ মাইল বেগে এই ত্রি-চক্র মোটর-গাড়ী চলিতে পারে। মোটর-গাড়ীর আকারও অভিনব।

দ্রুতগামী মোটর

বিচিত্র বাদ্যযন্ত্র

কালিফোর্ণিয়ার জনৈক সঙ্গীত-যন্ত্রবিশারদ এক প্রকার নূতন বাদ্যযন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছে। বীণার আকারবিশিষ্ট একটি বাদ্যযন্ত্রের ছিদ্রপথে একটি মুখনল সংলগ্ন। এই মুখনলে ফুঁ দিলে শব্দ উত্থিত হইয়া বীণার তারগুলিকে ঝঙ্কৃত করিয়া তুলে। যন্ত্রে কতিপয় চাবী আছে। সেই চাবীগুলি টিপিয়া তার বাজাইতে হয়। ইহাতে এমন মধুর স্বরলহরী উত্থিত হয় যে, শুধু বীণায় তেমন হয় না। মনুষ্য-কণ্ঠের সহিত এই যন্ত্রসম্ভূত স্বরলহরী মিলিয়া যায়। পাঁচ জন বাদক বিভিন্ন যন্ত্রসংযোগে ঐক্যতান বাদন করিলে যে ফল হয়, এই যন্ত্র দুই জন বাজাইলে সেই ফললাভ করা যায়।

বিচিত্র বাদ্যযন্ত্র

সুধার বিবাহ

(গল্প)

বৃহদায়তন সুন্দর সুসজ্জিত কক্ষ। কর্ত্তা সাটিনমোড়া সোফায় হেলান দিয়া, রূপার গুড়গুড়ি হইতে সোনার মুখ-নলে ধূম আকর্ষণ করিতেছিলেন ; গৃহিণী অদূরে একখানি গদিমোড়া চেয়ারে বসিয়া ছিলেন। কর্ত্তা-গিন্নীতে কথাবার্ত্তা হইতেছিল।

গিন্নী বলিলেন, "আর তুমি দো-মনা করছ কেন? অতুলের সঙ্গেই খুকীর বিয়েটি দিয়ে ফেল। দেখতে দেখতে মেয়ে ডাগর হয়ে উঠল, ষেটের কোলে চৌদ্দ বছরে পা দিয়েছে, আর দেরী হ'লে সমাজে মুখ দেখাব কেমন ক'রে?"

কর্ত্তা বলিলেন, "দেখ, তুমি ও সব সেকেলে মত-টত-গুলো ছাড় দেখি! মেয়ে চৌদ্দ বছরের হয়েছে ত ভারী একবারে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেছে কি না, হ্যাঃ!"

গিন্নী বলিলেন, "আবার কি, হিঁদুর ঘরের আইবুড় মেয়ে চৌদ্দ বছরের হ'লে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না?"

কর্ত্তা বলিলেন, "কূয়োর ব্যাঙ! কূয়োয় ব'সে আছ, দুনিয়ার ত খবর রাখ না! বিলেতের, আমেরিকার—বড় বড় ডাক্তারদের আজকাল মত এই যে, ষোল বছরের কমে কখনই মেয়ের বিয়ে দেওয়া উচিত নয়। ১৬ বছরের কমে মেয়ের আমি কিছুতেই বিয়ে দেবো না—নির্ম্মলার দিইনি। আমার মত, বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কায করবো না, এই আমার প্রতিজ্ঞা।"

গিন্নী বলিলেন, "তা আমরা ত বিলেতেও বাস করিনে, আমেরিকাতেও বাস করিনে। যে সমাজের যা প্রথা—"

কর্ত্তা বাধা দিয়া বলিলেন, "এই কলকাতা সহরে, কত বড় বড় লোকের ঘরে, ১৬।১৭।২০ বছরের পর্য্যন্ত আইবুড় মেয়ে রয়েছে, সে খবর রাখ? সে জন্যে তাদের কি কেউ নিন্দে করছে, না তারা সমাজে মুখ দেখাতে পারছে না? ঐ ওৎলোর হাতে মেয়ে দেবার কল্পনাও করো না,—সে অসম্ভব একেবারে।"

"কেন, অসম্ভব কিসে শুনি? অতুলকে মেয়ে দিলে, মেয়ে কি অজাতে পড়বে, না অঘরে পড়বে?"

"অ-জাতে পড়বে না, তা স্বীকার করছি। কিন্তু অ-ঘরে পড়বে নিশ্চয়। তবে, তোমরা অঘর বলতে যা বোঝ, আমি সে অর্থে বল্‌ছিনে।"

"কি অর্থে বলছ তুমি?"

"তা হ'লে বুঝিয়ে বলি, শোন। তোমার মেয়ে ধনী পিতার গৃহে আজন্ম প্রতিপালিত। ভূমিষ্ঠ হয়ে অবধি এতকাল সে যে ভাবে জীবন-যাপন করতে অভ্যস্ত, যে ঘরে গেলে সে সমস্ত সে না পাবে, সেই ঘরই তার পক্ষে অঘর। তোমার মেয়ে দামী জরিপাড় শান্তিপুরী ভিন্ন অন্য শাড়ী পরে না। একখানা শাড়ী এক দিন পরলেই ধোবাকে ফেলে দেয়। রূপোর থালা-বাসনে খেয়ে খেয়ে এমনই তার অভ্যাস হয়ে গেছে, কাঁসার থালা-বাসনে খেতে হ'লে তার গন্ধ লাগে। বিদ্যুৎপাখার তলায় না শুলে রাত্রিতে তার ঘুমই হয় না। দুটো তিনটে দাসী সারাদিন তার পরিচর্য্যায় ব্যস্ত। সে কি তোমার ঐ দেড়শো টাকা মাইনের অতুল মাষ্টারের ঘরে গিয়ে, মিলের শাড়ী পোরে বঁটী পেতে কুটনো কুটতে পারবে, না শিল পেতে বাটনা বাটতে পারবে, না ধোঁয়ায় ভরা রান্নাঘরে গিয়ে হাঁড়ি ঠেলতে পারবে?"

গিন্নী নীরবে কিয়ৎকাল চিন্তা করিলেন। তাহার পর বলিলেন, "কেন, পারবেই না বা কেন? হলেই বা বড়মানুষের মেয়ে! হিঁদুর মেয়ে ত! নিজের সংসারে, নিজের স্বামী-পুত্তুরকে রেঁধে বেড়ে খাওয়ান, ঘরের কাযকর্ম্ম করা—সেটা ত একটা ভাগ্যের কথা। ও যদি বলে, আমি পারবো, ও যদি বলে, আমি তাতেই সুখী হব, তা হ'লে আমরা কেন

তাতে বাধা দিই? দুটিতে ভাব হয়েছে বড্ড, এ বিয়ে না দিলে মেয়ে কিন্তু আমার অসুখী হবে, তা তোমায় ব'লে রাখলাম। শুধু অসুখীই বা বলি কেন, অধর্ম্ম হবে—মেয়েমানুষের যা প্রধান ধর্ম্ম—সতীধর্ম্ম—তাতে আঘাত লাগবে।"

কর্ত্তা কয়েক মুহূর্ত্ত সবিস্ময়ে স্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে বিরক্তি ও ক্রোধের চিহ্ন পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। তাহার পর বলিলেন, "ওঃ—এতদূর গড়িয়েছে! খুকী তোমাকে বলেছে বুঝি ঐ সব কথা? অ্যাঃ? দুটিতে ভাব হয়েছে বড্ড! তাই না কি?"—বলিয়া বিদ্রূপের ভঙ্গীতে ওষ্ঠযুগল কুঞ্চিত করিয়া মাথাটি নাড়িতে লাগিলেন।

গৃহিণী আনত-নেত্রে, সভয়ে উত্তর করিলেন, "হ্যাঁ।"

কর্ত্তা বলিলেন, "ভাব হয়েছে? অর্থাৎ লভ্ হয়েছে? ওর গুষ্টীর পিণ্ডী হয়েছে! ডাক ত একবার হারামজাদীকে, কোথায় গেল? সব কথা তার নিজের মুখে শুনে একটা বিহিত করি।"

গিন্নী বলিলেন, "নাও, আর বাপগিরি ফলাতে হবে না। ভারী বিহিত করবে তুমি। সে ইস্কুলে চ'লে গেছে। এই ত গাড়ী তাকে রেখে ফিরে এল। এগারোটা বাজে—এখন উঠে স্নানাহার করবে, না আমার সঙ্গে ব'সে ব'সে ঝগড়াই করবে কেবল?"

কর্ত্তা ঘড়ির দিকে চাহিলেন। বলিলেন, "হুঃ—আমিই ত ঝগড়া করছি বটে। কিন্তু তুমি যে ভাবিয়ে দিলে গিন্নি! 'ভাব' হয়েছে, এ আবার কোন্ দেশী কথা?"

গিন্নী বলিলেন, "কেন, এই যে এখনই বলছিলে, বিলেতের আমেরিকার ডাক্তারদের মত অনুসারেই আমাদের চলা উচিত। তা, সে সব দেশে, বিয়ের আগে বর-ক'নের ভাব হয় না? মনের ভিতর এক জনকে ভালবাসবে, আর এক জনকে বিয়ে ক'রে তার ঘর করতে যাবে, এটা কি ধর্ম্ম?"

কর্ত্তা চিন্তান্বিতভাবে বলিলেন, "তা সে জন্যে বিশেষ চিন্তা নেই—লভ্-ফভ্ ও সবগুলো ছেলেমানুষী বৈ ত নয়! দেখাশুনো বন্ধ হ'লে সেটা সময়ে আপনি সেরে যাবেই। আর কিন্তু, খপর্দ্দার, সুধা যেন নির্ম্মলের বাড়ীতে না যায়, বুঝলে? তা হলেই ও সব দু'দিনে চুকে-বুকে যাবে।"

"হ্যাঁ—যাবে! দিনকের দিন যত বুড়ো হচ্ছেন, ততই ভীমরতি ধরছে!" বলিয়া গৃহিণী কর্ত্তার স্নানের জন্য ভৃত্যগণের প্রতি আদেশ প্রচার করিতে উঠিয়া গেলেন।

তা, ব্যাপারটা এই। এই যিনি রূপার গুড়গুড়িতে সোনার মুখনলে তামাক খাইতে খাইতে এতক্ষণ দাম্পত্য-কলহে নিযুক্ত ছিলেন, ইঁহার নাম সারদাকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী। ইনি কলিকাতার এক জন প্রসিদ্ধ এটর্ণী। অগাধ টাকা। ইঁহার দুই কন্যা, একটিমাত্র পুত্র। জ্যেষ্ঠা কন্যা নির্ম্মলহাসিনী বা নির্ম্মলা কলিকাতাতেই স্বামিগৃহে বাস করে। তাহার বয়স ১৮ বৎসর মাত্র, তাহার স্বামী বিনয়ভূষণ প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়নের অধ্যাপক। শ্বশুরের মত না হইলেও বিনয়ভূষণ ধনী লোক, দেশে তার বিষয়-সম্পত্তি আছে। চাকরীটুকুই ভরসা নহে। খুকী অর্থাৎ কনিষ্ঠা কন্যার নাম সুধাংশুনলিনী বা সুধা। তাহার বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বৎসর, বেথুন ইস্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রী। সারদা বাবুর পুত্রটি এখন সপ্তমবর্ষীয় বালক মাত্র। অতুলও রসায়নের অধ্যাপক, কিন্তু বে-সরকারী কলেজের। দেড়শত টাকামাত্র বেতন পায়। অতুল ও বিনয় পূর্ব্বে সহপাঠী ছিল। বন্ধুগৃহেই বন্ধুশ্যালিকা সুধার সহিত অতুলের পরিচয়ের সূত্রপাত। ক্রমে সেই পরিচয় রীতিমত ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। নির্ম্মলা ও বিনয় উভয়েরই ইচ্ছা, অতুলের সঙ্গেই সুধার বিবাহ হয়।

অতুলের যে দিন আসিবার কথা, নির্ম্মলা সে দিন বাপের বাড়ী গিয়া বোনটিকে লইয়া আসে। সুধা আসিলে, অতুলকে খবর দিতে ভুল হয় না।

বস্তুতঃ তাহাদেরই সহযোগিতা বা ষড়যন্ত্রের ফলে ব্যাপারটি এরূপ 'সঙীন' হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ইহারা দুটি বোনেই সুন্দরী, তবে সুধা বেশী সুন্দরী। বিশেষ তাহার গাত্রবর্ণটি অতি চমৎকার, বাঙ্গালী গৃহে দুর্লভ আর্ম্মাণী মেয়ের অপেক্ষা কিছুমাত্র হীনপ্রভ নহে।

তিন মাস পরে, এক দিন সন্ধ্যায় আফিস হইতে ফিরিয়া জলযোগ করিতে করিতে সারদা বাবু পত্নীকে বলিলেন, "ওগো, কালকে খুকীকে দেখতে আসবে।"

"কারা, কোথা থেকে?"

"মৈমনসিং জেলার মুকুন্দনগরের রাজবাড়ী থেকে। রাজা মুকুন্দনাথের নাম শুনেছ ত? মস্ত বড় লোক। যেখানে তাঁর রাজধানী, সেখানকার নাম পূর্ব্বে অন্য একটা

কি ছিল ; এখন এই রাজার নামে সে স্থানের নাম মুকুন্দ-নগর হয়েছে। রাজা টাইটেল হ'লে কি হয়? অনেক মহারাজার চেয়ে টাকা বেশী।"

"রাজা মুকুন্দনাথের নাম ত ছেলেবেলা থেকে শুনছি। তাঁর বয়স হয়েছে নিশ্চয়! বুড়া বয়সে আবার বিয়ে করবেন না কি?"

"দূর পাগলী! রাজা কেন, রাজকুমারের জন্যে। রাজা মুকুন্দনাথের এক মামা, রাজকুমারের গৃহশিক্ষক, তার এক বন্ধু, আর এক জন জ্যোতিষী পণ্ডিত—এই চার জনে রাজ-কুমারের জন্যে পাত্রী খুঁজতে বেরিয়েছে। আমাদের স্বশ্রেণীর লোক যেখানে যিনি আছেন, সকলের বাড়ী বাড়ী গিয়ে তারা মেয়ে দেখছে। তিন মাস হ'ল, তারা এই কাযে বেরিয়েছে। নানা স্থানে ঘুরে এখন তারা কলকাতায় এসে উপস্থিত হয়েছে।"

"রাজকুমারের বয়স কত?"

"কুড়ি একুশ।"

"স্বভাবচরিত্র কেমন? বড় লোকের ঘরের বওয়াটে ছেলে নয় ত? তা যদি হয়, তা হ'লে কিন্তু তাঁকে মেয়ে দেবো না—তা তিনি রাজকুমারই হোন্ আর মন্ত্রিকুমারই হোন।"

এই প্রশ্নে সারদা বাবু একটু বিব্রত হইয়া পড়িলেন। লুচি ছিঁড়িয়া তরকারীতে মাখিতে মাখিতে বলিলেন, "তা, স্বভাব ভাল হবারই সম্ভাবনা। অত বড় রাজার ছেলে!"—

গিন্নী বলিলেন, "যা বল্লে! বড় লোকের ছেলে, রাজার ছেলের স্বভাব-চরিত্র কি আর বেগ্ড়ায়?—যত বেগ্ড়ায় গরীবের ছেলের। গরীবের ছেলেরাই সচরাচর মদ খেয়ে কুস্থানে প'ড়ে থাকে, রাতে বাড়ী আসতে পারে না—নয়?"

কর্ত্তা বলিলেন, "সে কথা বলছিনে। তবে সহবৎ ব'লে একটা জিনিষ আছে ত! সে যা হোক, মেয়ে যদি তাদের পছন্দই হয়, সে সব বিষয়ে খোঁজ-খবর না নিয়েই কি আর বিয়ে দেবো?"

"কখন্ দেখতে আসবে?"

"বিকেলে ৪টে থেকে ৫টার মধ্যে। আমি ৩টের পরই আপিস থেকে ফিরে আসবো।"

"নির্ম্মলকেও ত আনানো উচিত।"

সারদা বাবু যেন অনিচ্ছার সহিত বলিলেন, "হ্যাঁ, তাকে আনিও।"

অতঃপর সারদা বাবু নীরবে জলযোগ সমাপ্ত করিলেন। তিনি যখন উঠিতেছিলেন, গৃহিণী তখন বলিলেন, "হ্যাঁগা, তবে যে বলেছিলে, মেয়ের ষোল বছর বয়স না হ'লে কোন-মতেই বিয়ে দেবে না, তোমার মত-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কায করবে না?"

ভৃত্য রূপার জগ হইতে জল ঢালিতেছিল, প্রকাণ্ড রূপার চিলমচির উপর সারদা বাবু হস্ত প্রক্ষালন করিতে-ছিলেন, সহসা কোনও উত্তর দিলেন না। মুখাদি ধৌত করিয়া, তোয়ালে দিয়া হাত মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "এক সময় তাই বলতাম বটে। এখন ভেবে দেখছি, এ রকম একটা সুযোগ যদি পাওয়া যায়—"

গৃহিণী বলিলেন, "তা হ'লে বল, তোমার মত-বিশ্বাস-ফিশ্বাস কিছুই নয়—ও সব ভণ্ডামীমাত্র—তুমি এক জন সুযোগবাদী!"

সারদা বাবুর মনে হইল, সুযোগবাদী না হইলে তিনি কি এত বড় একটা এটর্ণী হইতে পারিতেন? কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া, মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "দেখ গিন্নি, তোমায় যখন বিয়ে ক'রে এনেছিলাম, তখন তুমি ক-খও চিন্তে না। নিজে রাত জেগে মাষ্টারী ক'রে তোমায় লেখাপড়া শিখিয়েছিলাম, তার কি এই প্রতিফল?"

"কেন?"

"নইলে আজ তুমি আমায় এমন সাধু ভাষায় গালা-গাল দিচ্ছ!"

"কখন্ আবার তোমায় সাধু ভাষায় আমি গালাগাল দিলাম?"

"কেন,—শালা না বল্লে কি গালাগাল হয় না? ঐ যে তুমি আমায় 'সুযোগবাদী' বল্লে!"

"সেটা বুঝি গালাগাল হ'ল?"

"ভয়ঙ্কর! তুমি যদি পরিবার না হয়ে খবরের কাগজ হতে, তা হ'লে আমি তোমার নামে মানহানির নালিশ ক'রে দিতাম।"

সেই রাত্রিতেই সুধা শুনিল, রাজবাড়ীর লোক তাহাকে দেখিতে আসিবে। শুনিয়া তাহার প্রাণে বড় ভয় হইল। এই তিন মাসকাল অতুলের সহিত সাক্ষাৎ নাই,—পিতার আদেশে দিদির বাড়ী যাওয়া তাহার বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তবে দিদি মাঝে মাঝে আসে বটে, এবং দিদির নিকট হইতে

অতুলের সংবাদ পায়। গোপনে দিদির মারফতে অতুলের সঙ্গে সে পত্রব্যবহার করিবার অভিলাষও জ্ঞাপন করিয়াছিল, কিন্তু দিদি তাহাতে রাজি হয় নাই; বলিয়াছিল, "না ভাই, কি জানি, বাবা যদি শেষ পর্য্যন্ত মত না-ই করেন; সে সব তুই ভুলে যাবার চেষ্টাই কর্।" সুধা বলিয়াছিল, "দিদির যেমন কথা! চেষ্টা করলেই বুঝি মানুষকে মানুষ ভুলতে পারে?"

সে রাত্রিতে নিজ শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া, আলো নিবাইয়া, বিছানায় বসিয়া সুধা প্রথমটা খানিক কাঁদিল। তাহার পর আলো জ্বালিয়া, তাহার আলমারী হইতে অতুলের ফোটোগ্রাফখানি বাহির করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া সেখানি দেখিল। শেষে আলো আবার নিবাইয়া, অতুলের ছবিখানি বালিসের তলায় রাখিয়া মনে মনে দেবদেবীগণের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল, "হে মা কালী! হে মা দুর্গা! হে বাবা মহাদেব! হে বাবা জগন্নাথ! তোমাদের চরণে কোটি কোটি প্রণাম। রাজবাড়ীর সেই পাজি ছুঁচোগুলো আমায় যেন পছন্দ না করে—আমায় যেন তারা বিষনয়নে দেখে। আমি তোমাদের সব্বাইকের পূজো দেবো—আমায় তোমরা রক্ষা কর, রক্ষা কর, রক্ষা কর।" আজ রাত্রিতে সুধার ভাল ঘুম হইল না। মাঝে মাঝে জাগিয়া উঠে। দেবদেবীগণের চরণে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রার্থনা করিতে করিতে আবার ঘুমাইয়া পড়ে। অতুলের ছবিখানি দেখিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু ভয়ে আলো জ্বালিতে পারে না, কারণ, পাশের কক্ষেই মাতা শয়ন করেন এবং মাঝের দরজা খোলা থাকে। পূর্ব্বে কতবার রাত্রি জাগিয়া নভেল পড়িতে গিয়া ধরা পড়িয়া মা'র নিকট বকুনি খাইয়াছে। আজ এমনই করিয়াই রাত পোহাইল।

বেলা ১টার সময় নির্ম্মলাকে আনিবার জন্য গাড়ী পাঠানো হইল। ২টার মধ্যেই নির্ম্মলা আসিয়া পৌঁছিল।

রাজবাড়ীর লোকরা যথাসময়ে আসিয়া কন্যা দেখিলেন। জ্যোতিষী মহাশয় প্রথমে সুধার কোষ্ঠীখানি পরীক্ষা করিলেন; তাহার পর সামুদ্রিক শাস্ত্রমতে কন্যাকে অনেকক্ষণ ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া, অভিমত প্রকাশ করিলেন, "মেয়েটি সুলক্ষণা বটে।" রাজমাতুল বলিলেন, "সারদা বাবু, আজ আমাদের ভ্রমণ শেষ হ'ল। চার মাস আমরা নানা স্থানে মেয়ে দেখে বেড়াচ্ছি; কিন্তু আপনার মেয়ের মত এমন সুন্দরী সুলক্ষণা মেয়ে আমরা কোথাও পাইনি। গায়ের রঙটার উপরেই রাজা বাহাদুরের বিশেষ রকম ঝোঁক। আপনার এই মেয়ের মতন বা এর চেয়েও সুশ্রী মেয়ে যে আমরা দেখিনি, তা নয়। তবে গায়ের এমন বর্ণটি আরও কোথাও পাইনি। যাকে শাস্ত্রে আসল গৌরী বলে, এ মেয়ে তাই। এই মেয়েই আমাদের পছন্দ। আজ রাত্রিতেই আমরা দেশে ফিরবো; রাজা বাহাদুরকে, রাণীমাকে গিয়ে সব কথা বলি। কুমার বাহাদুর হয় ত নিজে এসে একবার দেখতে চাইবেন। তার পর শুভকার্য্যের দিন স্থির করা যাবে। যদি অনুমতি করেন, আজ তা হ'লে আমরা উঠি।"

বিবাহ-পরীক্ষায় মেয়ের এই উচ্চ অনার্সের সহিত পাসের সংবাদে সারদা বাবু আনন্দে বিহ্বল হইলেন। কিঞ্চিৎ মিষ্টমুখ করিয়া যাইবার জন্য ইঁহাদিগকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেন। পূর্ব্ব হইতেই বিলক্ষণ আয়োজনাদি চলিতেছিল। শুধু মিষ্টরসে নহে, ষড়রসে রসনা পরিতৃপ্ত করিয়া আগন্তুকরা বিদায় গ্রহণ করিলেন।

গৃহিণীও আনন্দিত হইলেন। এ তিন মাসে তাঁহার মনে ধারণা জন্মিয়াছিল যে, সুধা অতুলকে ভুলিয়াছে। মেয়ে রাজরাণী হইবে, এ সংবাদে কোন্ মাতা না আনন্দিত হইবেন?

সুধার কিন্তু কাঁদিয়া কাঁদিয়াই রাত্রি কাটিল। অবশেষে শেষে মনে মনে স্থির করিল, "দেবদেবীগণ সমস্তই ঝুটা;—হিন্দুধর্ম্ম একেবারেই ফাঁকি।"

কুমার বাহাদুর কবে সুধাকে দেখিতে আসিবেন, এই চিন্তায় সারদা বাবু দিবানিশি ব্যস্ত হইয়া রহিলেন। সপ্তাহান্তে মুকুন্দনগর হইতে পত্র আসিল। রাজমাতুল লিখিয়াছেন, "আমরা ফিরিয়া আসিয়া রাজা বাহাদুর ও রাণী মা'র বরাবর আপনার কন্যার বিষয় সবিশেষ বর্ণনা করিয়াছি। শুনিয়া তাঁহারা অত্যন্ত সুখী হইয়াছেন। কুমার বাহাদুর যাইবেন না, রাজা বাহাদুর তবে স্বয়ং একবার গিয়া আপনার কন্যাকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এখন তিনি রাজকার্য্যে অতিশয় ব্যস্ত থাকা বিধায়, বোধ হয়, আগামী মাসের ১৫ই তক কলিকাতা যাত্রা করিতে পারিবেন।" ইত্যাদি।

সুতরাং রাজা বাহাদুরের শুভাগমনের এখনও প্রায় এক মাস বিলম্ব আছে জানিয়া সারদা বাবু আবার নিজ কাযকর্ম্মে মনঃসংযোগ করিলেন।

অতুল বাবু তাঁহার বন্ধু বিনয় বাবুর মুখে সারদাভবনের সকল সংবাদই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পাইয়া থাকেন। এক মাস পরে রাজা বাহাদুর স্বয়ং কন্যা দেখিতে আসিবেন, সে সংবাদও পাইলেন।

দুই জনে অত্যন্ত গোপনে কি পরামর্শ হইতে লাগিল।

সেই দিন হইতে অতুল বাবু প্রত্যহ নিজ কলেজের পর প্রেসিডেন্সি কলেজে গিয়া বিনয় বাবুর রসায়নাগারে ২।৩ ঘণ্টা করিয়া কাটাইতে লাগিলেন। উভয়েই রসায়ন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত—উভয়ে মিলিয়া কি সব রাসায়নিক পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, তাঁহারাই জানেন।

এক পক্ষকাল দুই জনে প্রেসিডেন্সি কলেজে বসিয়া এইরূপ পরীক্ষা চালাইলেন।

তাহার পর এক দিন নির্ম্মলা কিসের একটা শিশি বস্ত্রমধ্যে লুকাইয়া পিত্রালয়ে গিয়া তাহার কনিষ্ঠাকে দিল; চুপি চুপি কি সব উপদেশও তাহাকে দিয়া আসিল। সুধা শিশিটা আলমারীর মধ্যে লুকাইয়া রাখিল।

ইহার কয়েক দিন পরে সন্ধ্যার পর কর্ত্তা-গিন্নীতে কথাবার্ত্তা হইতেছিল। রাজা বাহাদুরের আসিবার ত আর অধিক বিলম্ব নাই—দুই সপ্তাহ মাত্র। মেয়ে দেখিয়া, কবে বিবাহের দিন স্থির হইবে, সে বিষয়ে যদি মতামত জিজ্ঞাসা করেন, তবে তাঁহাকে কি বলা যাইবে, এই সম্বন্ধে সারদা বাবু পত্নীর সহিত আলোচনা করিতে চাহিলেন।

গৃহিণী বলিলেন, "দিন স্থির ত করবে, কিন্তু মেয়ের ভাবভঙ্গী দেখে আমি মোটেই সাহস পাচ্ছি নে।"

"কেন? কি ভাবভঙ্গী দেখলে?"

"সেই তারা এসে মেয়ে দেখা অবধি ও যেন কেমন মনমরা হয়ে থাকে। মুখে হাসিটি নেই, ভাল ক'রে খায় না,—রাত্রিতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাঁদে,এও আমি টের পেয়েছি। দেখছ না, কি রকম রোগা হয়ে গেছে? ভেবে ভেবে বাছার আমার সোনার বরণ কালী হয়ে যাচ্ছে। মেয়ে ডাগর হয়েছে তার অমতে জোরজবরদস্তি ক'রে বিয়ে দিতে চাইলে শেষে হিতে বিপরীত হয়ে না দাঁড়ায়!"

সারদা বাবু বলিলেন, "হ্যাঁ—ঐ সব ছেলেমানুষী কথা শোন কেন?"—কিন্তু মনে মনে তিনি শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। বলাই যায় কি, কালের যেরূপ গতি, কাপড়ে কেরাসিন ভিজাইয়া আগুনই ধরাইয়া দিবে, না আফিম আনাইয়া ভক্ষণ করিবে, কে বলিতে পারে? গৃহিণীকে অবশেষে তাঁহার আশঙ্কার কথা খুলিয়াই বলিলেন এবং মেয়ে সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিলেন।

পরদিন সারদা বাবু সুধাকে ডাকিয়া মিষ্ট কথায় তাহাকে নানা প্রকারে বুঝাইলেন। কিন্তু সুধা কোনও উত্তর করিল না—কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল।

দিনের পর দিন এই ভাবেই কাটিতে লাগিল। দিনের পর দিন সুধার দেহবর্ণ মলিন হইতে মলিনতর হইতে লাগিল। কন্যার এ অবস্থা দেখিয়া সারদা বাবু শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। রাজার যে ভাবী পুত্রবধূর গাত্রবর্ণের প্রতিই অধিক ঝোঁক!

মুকুন্দনগর হইতে পত্র আসিল, অমুক দিন অমুক সময় স-পারিষদ রাজা বাহাদুর মেয়ে দেখিতে সারদা-ভবনে উপস্থিত হইবেন।

বড় বড় সাহেবী দোকান হইতে সারদা বাবু মেয়ের জন্য দামী দামী ফেসক্রীম, কম্‌প্লেক্সন লোশন প্রভৃতি আনিয়া দিলেন। তাঁহার কড়া আদেশে সে সকল সুধার সর্ব্বাঙ্গে মালিশও হইতে লাগিল, কিন্তু উল্টা উৎপত্তি হইল;—মেয়ে দিন দিন কালো হইতে লাগিল।

রাজা বাহাদুরের আসিবার আর এক দিনমাত্র বিলম্ব আছে। আগামী কল্য প্রভাতের ট্রেণে তিনি কলিকাতায় আসিয়া পৌছিবেন এবং অপরাহ্নে মেয়ে দেখিতে আসিবেন। কি উপায় হইবে, প্রাতঃকালীন চা-পানান্তে দ্বিতলের বৈঠকখানায় বসিয়া ইহাই সারদা বাবু চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার গৃহদ্বারে একখানি মোটর-গাড়ী দাঁড়াইবার শব্দ হইল।

সারদা বাবু জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিলেন, এক জন প্রৌঢ়বয়স্ক ভদ্রলোক একটা ট্যাক্সি হইতে অবতরণ করিতেছেন। দেহটি স্থূল, গায়ে একটা আধ-ময়লা আদ্দির পিরাণ, তাহার উপর অত্যন্ত লাট হইয়া যাওয়া একখানা সিল্কের ময়লা চাদর।

কিয়ৎক্ষণ পরে এক জন দ্বারবান্ আসিয়া নিবেদন করিল, গোকুলনগর রাজবাড়ীর এক জন কর্ম্মচারী দর্শনপ্রার্থী।

"নিয়ে এস"—বলিয়া সারদা বাবু গম্ভীরভাবে ধূমপান করিতে লাগিলেন।

লোকটি দ্বারবানের সহিত আসিয়া, বাহিরে জুতা

খুলিয়া রাখিয়া প্রবেশ করিল। অত্যন্ত সম্ভ্রমের সহিত সারদা বাবুকে নমস্কার করিয়া বলিল, "অসময়ে এসে হুজুরকে বিরক্ত করলাম না ত?"

সারদা বাবু বলিলেন, "না না, বিলক্ষণ! বিরক্ত কেন করবেন? বসুন বসুন।"—বলিয়া একখানি চেয়ার দেখাইয়া দিলেন।

লোকটি হাতযোড় করিয়া বলিল, "আজ্ঞে না, সে গোস্তাকী কি করতে পারি? আজ বাদে কাল হুজুর হবেন আমার মনিবের বৈবাহিক,—সুতরাং আপনিও আমার মনিবস্থানীয়। দুই একটা কথা নিবেদন করবার জন্যে এসেছিলাম, অনুমতি হ'লে বলতে পারি।"

সারদা বাবু বলিলেন, "বলুন না,—আমাদের সঙ্গে ও সব ফর্ম্মালিটির কিছু দরকার নেই। বসুন বসুন, দাঁড়িয়ে থাকবেন কতক্ষণ?"

লোকটি সঙ্কুচিতভাবে বসিয়া বলিল, "আমাদের রাজা বাহাদুর কাল সকালের ট্রেণে আসবেন, এই স্থির ছিল। কিন্তু তিনি হঠাৎ আজকেই এসে পড়েছেন। ল্যান্সডাউন রোডে নাটোর-রাজবাড়ীতে তিনি উঠেছেন। আমাকে আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করতে পাঠালেন, কালকের পরিবর্ত্তে আজ বিকেলে তিনি যদি মেয়ে দেখতে আসেন, তাতে আপনাদের কোনও অসুবিধা আছে কি? কারণ, কাযটা আজ যদি সেরে ফেলতে পারেন, তা হ'লে কাল সকালেই আবার রাজধানী রওয়ানা হতে পারেন, সেখানে বিশেষ কায আছে।"

সারদা বাবু বলিলেন, "রাজা বাহাদুর পৌঁছে গেছেন না কি? বেশ বেশ। তা আজ বিকেলে যদি তিনি আসেন, তাতে আমাদের কোনই অসুবিধে নেই। আমিই বরঞ্চ নাটোর-রাজবাড়ীতে গিয়ে তাঁকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসবো। ক'টার সময় যাব, বলুন দেখি?"

লোকটি বিনীতভাবে বলিল, "আপনি আবার কষ্ট করবেন কেন? আমি ত বাড়ী দেখে গেলাম, আমিই তাঁকে সঙ্গে ক'রে আনবো। আচ্ছা, যদি অনুমতি হয়, এখন তা হ'লে উঠি।" বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

সারদা বাবু বলিলেন, "বসুন বসুন, তাড়াতাড়ি কি? একটু চা খেয়ে যান।"

লোকটি বলিল, "আজ্ঞে, তা আপনার আদেশ অবশ্যই পালন করবো। কিন্তু, তার সঙ্গে আরও একটু প্রার্থনা আছে।"

"কি, বলুন?"

"মাকে—আমাদের বউরাণী মাকে এখন একবার দেখতে পাব না? ওবেলা অবশ্য রাজা বাহাদুরের সঙ্গে এসে ত দেখ্‌বই। কিন্তু মা'র সম্বন্ধে যে রকম শুনেছি,—তাঁকে একটিবার দেখ্‌বার জন্যে মনটা বড়ই উতলা হয়েছে।"

"বেশ, তাও দেখে যান। ওরে, তোদের ছোট দিদিমণিকে ডেকে আন্ ত।"

এক মিনিট পরেই সুধা আসিয়া বলিল, "বাবা, আমায় ডাক্‌ছেন?"

"হ্যাঁ মা! মুকুন্দনগর রাজবাড়ী থেকে এই ভদ্রলোকটি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, তোমার মাকে গিয়ে বল, এঁর জন্যে এক পেয়ালা চা আর কিছু খাবার যেন পাঠিয়ে দেন।"

লোকটি কহিল, "সারদা বাবু, থাক্ থাক্। চা খাব, ওটা ভুলে বলেছি; আমার এখনও যে স্নান-আহ্নিক হয় নি, সেটা খেয়ালই ছিল না। মা লক্ষ্মি, তুমি বাড়ীর ভিতর যাও।"

একে ত মুকুন্দনগর রাজবাড়ীর নাম শুনিয়াই সুধা চটিয়া গিয়াছিল,—কে এ ব্যক্তি যে আদেশের স্বরে তাহার সহিত কথা কহে?—উভয় নেত্র হইতে লোকটার প্রতি অগ্নিবাণ হানিয়া সুধা প্রস্থান করিল।

সে চলিয়া যাইবামাত্র আগন্তুকের মুখ হইতে সেই বিনীত ও নম্রভাব তিরোহিত হইয়া গেল। ব্যঙ্গপূর্ণ স্বরে তিনি বলিলেন, "এইটিই ত আপনার মেয়ে সুধাংশুনলিনী? মুকুন্দনগরের রাজবাড়ীর লোকরা এই মেয়েকেই ত দেখে গিয়েছিল?"

কথা বলার ধরণে সারদা বাবু একটু রুষ্টভাবে বলিলেন, "হ্যাঁ, তাই।"

লোকটি দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, "কেন মশাই, আর কি জুচ্চুরি করবার যায়গা পেলেন না? এই মেয়ে আপনার আস্মাণী বিবির মত সুন্দরী? এ ত রাত্রিতে শ্যামবর্ণ—কালো বল্লেও অন্যায় হয় না। বলি, কি রং-টং আরক-টারক মাখিয়ে রাজবাড়ীর লোকদের সে দিন ঠকিয়েছিলেন, বলুন ত?"

সারদা বাবুও ক্রুদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন,—"মশাই, স'রে পড়ুন। ফের যদি কোনও অপমানসূচক কথা এখানে উচ্চারণ করেন, দারবান্ দিয়ে বের ক'রে দেবো।

আপনার রাজা বাহাদুরকে গিয়ে না হয় বলবেন, আমার মেয়েকে যে রকম দেখে গেলেন,—তাতে তিনি আমার মেয়েকে না নেন, না-ই নেবেন!"

লোকটি বলিলেন, "রাজা বাহাদুরকে কোনও কথা বলবার দরকার হবে না—কারণ, আমিই রাজা মুকুন্দনাথ রায়। আমি ইচ্ছা ক'রেই এক দিন আগে কলকাতায় এসেছি—আর মেয়ের যথার্থ স্বরূপ কি, তাই দেখবার জন্যেই নিজের কর্ম্মচারী সেজে অসময়ে এ ভাবে এসেছি। কারণ, আমি জানি, কলকাতার লোকরা আসল জোচ্চোর। তার উপর, বাঙ্গাল দেশের লোককে তারা গো-গর্দ্দভ বলেই মনে করে—ভাবে, অতি সহজেই বাঙ্গালকে ঠকানো যায়। কিন্তু আপনারা যে কথাটা বিদ্রূপ ক'রে ব'লে থাকেন—'বাঙ্গাল বড় হেঁয়াল'—সেটা জানবেন খুব সত্যি!—বাঙ্গালকে সহজে ঠকানো যায় না। ভাগ্যিস এ ভাবে এসে দেখলাম,—নইলে ও বেলাই ত আবার রঙ-টঙ মাখিয়ে পেত্নীর বাচ্ছাটিকে পরীর বাচ্ছা সাজিয়ে দেখাতেন! উঃ, বাপ রে বাপ—কলকাতার লোকরা কি জোচ্চোর! কি জোচ্চোর!"—বলিয়া গট-গট করিয়া সদর্পে তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

৫

তাহার পর কি হইল? প্রমাণ হইল, হিন্দু দেব-দেবীগণ মিথ্যা নহেন, হিন্দুধর্ম্মও ফাঁকি নহে। সুধার এতদিনকার সকরুণ আবেদনে দেবদেবীগণ কর্ণপাত করিয়াছেন।

সারদা বাবু অবশেষে বুঝিলেন, অতুল ছাড়া অন্য পাত্রে বিবাহ দিলে মেয়ে সুখী হইবে না—হয় ত বাঁচিবেই না। সুতরাং বিবাহে তিনি মত করিলেন।

সুধার মুখে আবার হাসি দেখা দিল। দিদির দেওয়া সেই আরকের শিশিটা খালি হইয়া গিয়াছিল, আর তাহা ভর্ত্তি করিয়া আনানোর প্রয়োজন হইল না।

মলিন বর্ণ দিনে দিনে আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল। পরের মাসে বিবাহ। সুধার দেহবর্ণ তখন আবার পূর্ব্বভাব ধারণ করিয়াছে।

বিবাহ হইয়া গেলে, বিনয় বাবু বরের কানে কানে বলিলেন,—"জয়, রসায়নের জয়।"

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

কৃতী বাঙ্গালী ছাত্র

নদীয়া জিলার অন্তর্গত চাপড়া-নিবাসী ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলের শিক্ষক ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিনয়লাল মজুমদার মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল মজুমদার এবার এলাহাবাদের আই, সি, এস পরীক্ষায় ৬ষ্ঠ স্থান ও বাঙ্গালা হইতে ১ম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইনি আই, এস, সি পরীক্ষার দ্বিতীয় স্থান ও বি, এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

ধনীর স্বপ্নময় নিদ্রা
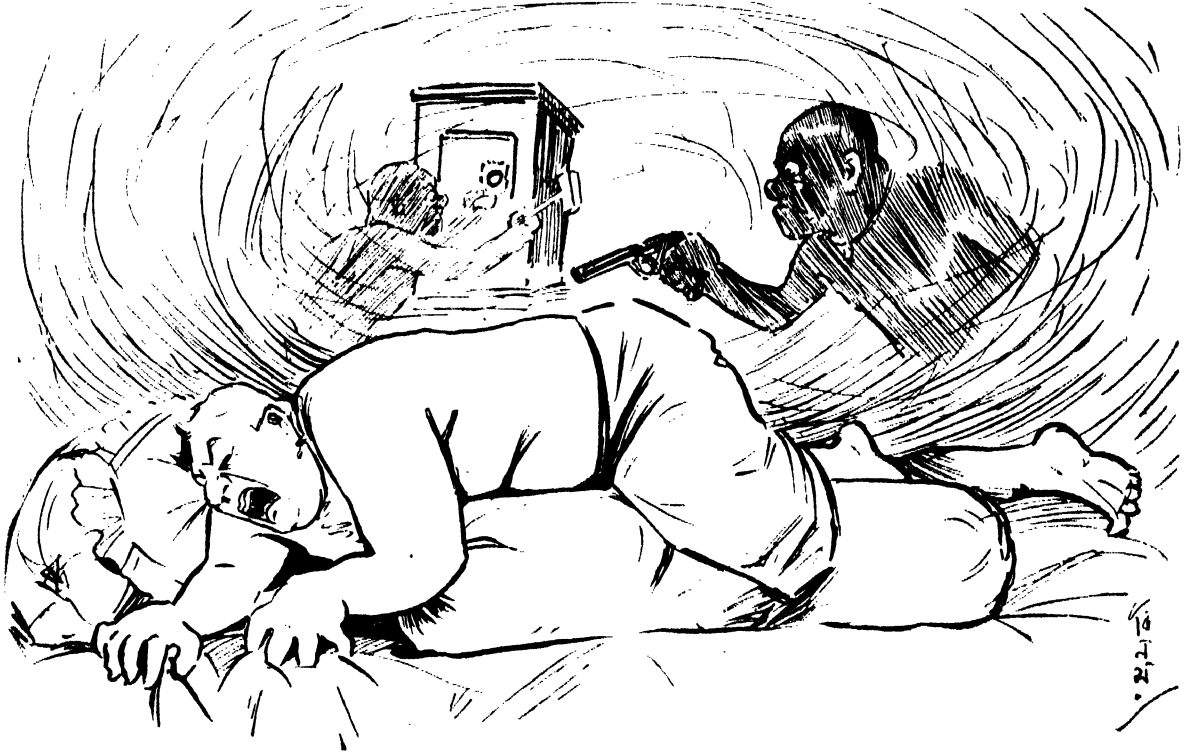
আঃ—এমন কুসুম-সুকোমল— তুষার-ধবল শয্যা—গালে বালিস, পাশে বালিস, মাথায় পালকের বালিস—খাটের উপর বিদ্যুৎপাখা—তবু কি একটু আরামে ঘুমোবার জো আছে? তন্দ্রা এলেই স্বপ্ন, খুট্‌-খাট্‌ দুপ্‌-দাপ্‌, ঐ বুঝি পিস্তল হাতে ডাকাত খুন করলে—চোরে লোহার সিন্দুক ভাঙ্গছে? চেয়ে দেখি, কিছু নেই। চোখ বোজবার কি জো আছে ছাই? চেয়ে থাকাই ভাল। আফিংটা একটু বেশী খেলেই ভাল হতো, নিশ্চিন্ত হয়ে জেগে থাকতে পারতুম!

গরীবের নিদ্রা !

সারাদিনের পরিশ্রমের পর পড়লেই আর সাড়া নেই—মাদুর পাত্‌তেও তর সয় না !

ধনীর রজত-রসায়ন !

কিছুতেই আহারে রুচি হলো না—বামুনটার রান্না মুখে দিতে পারি না ব'লে গিন্নী জবাব দিলেন—৬০৲ টাকা দিয়ে পীরু মিঞা বাবুর্চ্চিকে রাখ্‌লুম—বন্ধুরাও পীরু মিঞার রান্নার সুখ্যাতিতে শতমুখ—নিমন্ত্রণ কর্‌লে গোগ্রাসে গেলেন - ক্ষিদে বাড়াবার জন্যে গেলাস গেলাস হুইস্কি ত সন্ধ্যার পর থেকেই খাচ্ছি, ক্ষিধে কৈ, আহারে রুচি কৈ,—চাকর বেটারা থালা-ভরা ভাত কি ক'রে খায়, আর হজম করে, কে জানে! ডিস্‌পেপ্‌সিয়াতেই মারা গেলাম—বল্লেও শরীর দেখে কেউ বিশ্বাস কর্‌বে না—বলে কুম্ভকর্ণের মত শরীর থাকে কি ক'রে ? আরে, সিলভার-টনিকে যে অগ্নিমান্দ্য রোগ হয়, তা কি বেটারা জানে!

গরীবের ভোজ !

সারাদিন খেটে-খুটে এক পাত পান্তা-ভাত—আর একটা লঙ্কা, একটু নুণ—কি অমৃত !
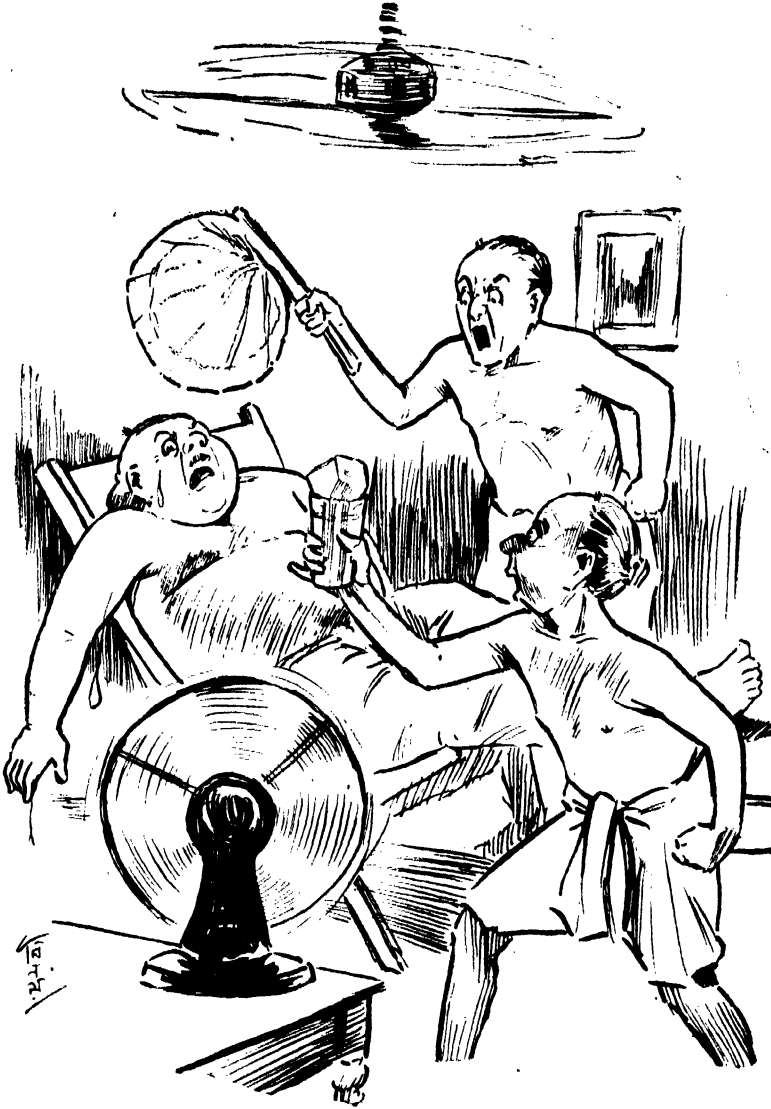
ধনীর গরম !

মাথার উপর পাখা—টেবিলে-পাখা—হাত-পাখা—জানলা-দরজা বন্ধ—ভিজে খস্‌-খস্‌ ঝোলানো—হরদম বরফ—আইসক্রিম, লেমোনেড, ডাব, ঘোল—তবু প্রাণ যায়, বাঙ্গালাদেশে এই জন্যেই কোনও কায করবার জো নেই—টাকার গরমের ওপর আবার এই বিষম গরম !

গরীবের গরম !

মোটটা নামিয়ে একটা গাছতলায় ব'সে গামছাখানা ঘুরিয়ে বাতাস খেয়ে যেন প্রাণটা বাঁচল !

ধনীর গৃহিণী-রোগ !

বাহিরে হাতে মাথা কাটেন—দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে সকলে থরহরি কম্পমান—ভিতরে মেয়ে-জগন্নাথ গিন্নীর কাছে যেন চোরটি—শাসনের দাপটে চক্ষু ছানাবড়া—একেবারে থ' বনেছেন—কি বল্‌বেন, টাক চুল্‌কেও বুদ্ধি যোগাচ্ছে না !

গরীবের সংসার-সুখ !

সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর আপিস থেকে ফিরে হাত-মুখ ধুয়ে ব'সে প্রিয়তমার হাসি-হাসি মুখখানি দেখে তার দেওয়া তামাক টান্‌তে টান্‌তে যেন নন্দনকাননে পরিভ্রমণ করি !

ধনীর চিকিৎসা-বিভ্রাট!

চিকিৎসার ঘটা বটে—যেমন সময়, তেমনই চিকিৎসা—একটা বলবার মত ঘটা বটে—কল্‌কাতার ডাক্তার আর কেউ বাকি নাই—ইন্‌জেকসন্, পিচকিরি, রক্ত, প্রস্রাব, থুতুপরীক্ষা, জিহ্বায় জ্বর দেখা, বুকে বকযন্ত্র বসান—nothing is the বাকি Sir—তার উপরে পরশু থেকে কবিরাজ সরস্বতী, হকিম নকীব সবই আসবেন।

গরীবের চিকিৎসা।

টোটকা-টুট্‌কীতেই সেরে যাবে—নিতান্ত বাড়্‌লে কাযেই হাঁসপাতাল।

শিল্পী—বিনয়কুমার বসু।

বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক

গত ২৮শে এপ্রিল শুক্রবার বাঙ্গালার অন্যতম স্বদেশী প্রতিষ্ঠান বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক সহসা বন্ধ হইয়াছে। যাঁহারা এই ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখিয়া ব্যবসা করিতেন—যাঁহারা এই ব্যাঙ্কের সাহায্যে কারবার করিতেন, ইহাতে তাঁহাদের সমধিক ক্ষতি হইয়াছে। এ দেশে স্বদেশী ব্যবসায়ের প্রধান অন্তরায়—ব্যাঙ্কের সাহায্য না পাওয়া। আমাদের দেশের জমীদার ও ধনিসম্প্রদায় নামমাত্র সুদে বিদেশীর ব্যাঙ্কে টাকা আমানত রাখেন, না হয় কোম্পানীর কাগজ কিনিয়া তাহার যথেষ্ট মূল্য কমিলেও ক্ষতি বোধ করেন না—নিয়মিত সুদ পাইয়া নিজেদের বিলাস-লীলা চরিতার্থ করেন, তথাপি দেশের অর্থাগমের একমাত্র উপায় স্বদেশী ব্যবসায়ে তাহা অপেক্ষা বেশী সুদেও মূলধন কর্জ্জ দিয়া সাহায্য করিতে সাহসী হন না। বাঙ্গালী চাকরীজীবী বলিয়া অনেকে বক্তৃতা দেন সত্য—চাকরীর উমেদাররা হাজারে হাজারে পাশ করিয়া দেশের তথাকথিত বড় বড় নেতাদের—বড় বড় চাকরীওয়ালাদের বাড়ীতে যাতায়াত করিয়া তাঁহাদের বিশ্রামের অবসরে যথেষ্ট বিরক্ত করেন সত্য—প্রতি বর্ষে এত হাজার হাজার পাশ করা বাঙ্গালী যুবককে চাকরী দেওয়াও সম্ভব নহে সত্য, কাযেই সকলেই কার্য্যের বিনিময়ে বাক্য দিয়া—আহার্য্যের পরিবর্ত্তে উপদেশ দিয়া—সকলের ক্ষুন্নিবৃত্তির প্রয়াস পান—চাকরীর আশা ত্যাগ করিয়া ব্যবসা করিতে উৎসাহ দেন—উপদেশ দেন। কিন্তু ব্যবসা করিতে মূলধনের প্রয়োজন—আজ পর্য্যন্ত কোন নেতা কোন কর্ম্মিষ্ঠ যুবককে ব্যবসায়ের জন্য অর্থসাহায্য করিয়াছেন—অল্প সুদে ঋণ দিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই।

আর এ দিকে ধনিসম্প্রদায় অত্যল্প সুদে যে টাকা বিদেশীর ব্যাঙ্কে আমানত রাখেন, বিদেশী ব্যাঙ্করা সেই টাকা স্বদেশী প্রতিষ্ঠানে ধার দেন না—অল্প সুদে বিদেশীর কারবারে ধার দিয়া বিদেশীর সমৃদ্ধিবৃদ্ধির সাহায্য করেন। অথবা মাড়োয়ারী বণিক্ ব্যাঙ্ক হইতে সেই টাকা হুণ্ডিতে বাহির করিয়া লইয়া চোটার দরে উচ্চ-কমিশন লইয়া স্বদেশী কারবারে হুণ্ডিতে ধার দেন। উপায়ান্তরবিহীন দেশী ব্যবসায়ী বাধ্য হইয়া মাড়োয়ারীর নিকট উচ্চহারে সুদ দিয়া হুণ্ডিতে টাকা লয়েন; সে সুদের হার এত অধিক যে, ৩।৪ বৎসরেই সুদের টাকা আসলের সমান হয়—তত উচ্চহারে সুদ দিয়া কোন ব্যবসায়ীর পক্ষে ব্যবসায় পরিচালন সম্ভব হয় না, ক্রমে ঋণ বাড়িলে বাঙ্গালী ব্যবসায়ী মাড়োয়ারীর নিকট ব্যবসায় বন্ধক রাখিয়া হুণ্ডি কাটেন—মাড়োয়ারীকে বথরাদার করেন বা বেনিয়ান লইয়া রোকড়ের ভার প্রদান করিতে বাধ্য হন। মাড়োয়ারীর হাতে একবার কোন ব্যবসায় গেলে আর রক্ষা পাওয়া দায় হয়; কারণ, ব্যবসাদারের যদি পৈতৃক সম্পত্তি বা ভদ্রাসন বাড়ী রহিল, তবেই তিনি বাঙ্গালী মহাজনের গদীতে বন্ধক রাখিয়া সে টাকা বা তাহার কতক অংশ পরিশোধ করিয়া ব্যবসা রক্ষা করিতে পারিলেন, নচেৎ নামে মালিক হইয়া কাযে মাড়োয়ারীর দাসত্ব করিতে লাগিলেন। ক্রমে ব্যবসায়ের রস বুঝিয়া মাড়োয়ারী বাঙ্গালী ব্যবসায়ীকে আরও কিছু টাকা ধার দিয়া লাভে সুদে আসলে ব্যবসা বিক্রয় করিতে বাধ্য করেন। গত কয়েক বৎসরের বাঙ্গালীর ব্যবসায়ের ইতিহাস যদি কোন সংবাদপত্রে বা মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইত, তাহা হইলে দেখিতেন, এইভাবে কত বাঙ্গালীর কাপড়ের ব্যবসা, কাঠের কারবার, তেলের কল, গোলদারী দোকান, চালের আড়ৎ—চুণের গোলা, ইটের খটি, পাটের গুদাম, ইণ্ডেণ্ট আফিস এমন কি জমীদারী পর্য্যন্ত মাড়োয়ারীর কবলিত হইয়াছে। যাহা এখনও বাঙ্গালীর নামে পরিচালিত, তাহারও অনেকাংশের মালিক মাড়োয়ারী বণিক্। অনেক টাকার হুণ্ডিতে অনেক টাকার ঋণে তাহা মাড়োয়ারী গদীওয়ালার নিকট আবদ্ধ। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সকলেই জানেন ও বক্তৃতা করিয়া বলেন, মাড়োয়ারী লোটা-কম্বল সম্বল করিয়া বাঙ্গালায় আসিয়াছে, বাঙ্গালীর গচ্ছিত টাকা হুণ্ডি দিয়া ব্যাঙ্ক হইতে বাহির করিয়া সেই টাকাই বাঙ্গালী ব্যবসায়ীকে কর্জ্জ দিয়া ক্রমে ক্রমে বাঙ্গালার ব্যবসা গ্রাস করিতেছে। বাঙ্গালার এক ঢাকা ব্যতীত বোধ হয় এমন সহর একটিও নাই, যে সহরের ব্যবসা মাড়োয়ারী বণিকের কবলিত নহে।

স্বদেশীযুগে যখন স্বদেশী ব্যবসা প্রতিষ্ঠার জন্য বাঙ্গালী মাত্রেরই মনে ব্যাকুলতা জন্মিয়াছিল—ব্যবসার মূলে স্বদেশী ব্যাঙ্কের অভাব যখন সকলে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলেন—সেই সময়ে বাঙ্গালার ব্যবসায়ের এই দুর্দ্দশা প্রত্যক্ষ

করিয়া—ব্যবসায়ে লক্ষ্মীলাভ না হইলে বাঙ্গালী জাতির উন্নতিলাভ সম্ভব হইবে না—উৎসাহশীল বাঙ্গালী যুবকের উদরান্নের সংস্থান হইতে পারিবে না, ইহা প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াই দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ, মনীষি ভূপেন্দ্রনাথ, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ অগ্রণী হইয়া দ্বার-বঙ্গের মহারাজ প্রভৃতি ধনকুবেরবৃন্দের নিকট অংশ বিক্রয় করিয়া বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করেন। বেশী দিনের কথা নহে, একটি ষ্টীমার পার্টিতে দেশের সম্ভ্রান্ত ধনবান্‌গণকে আহ্বান করিয়া এক দিকে ভূপেন্দ্রনাথ অন্য দিকে চক্রবর্ত্তী মহাশয় অংশ বিক্রয় করিয়া এই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করেন। কোন অশুভ কারণে ব্যাঙ্ক-পরিচালনে উভয়ের মনোমালিন্য হইলে সে মনোবিবাদ হাইকোর্ট পর্য্যন্ত গড়ায়—ব্যাঙ্কের সুনাম রক্ষার জন্য ভূপেন্দ্রনাথ ত্যাগ স্বীকার করিয়া অনেক টাকা নিজে দিয়া মামলা নিষ্পত্তি করেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় ব্যাঙ্ক-পরিচালনভার গ্রহণ করেন।

গত ৫০ বৎসরে এ দেশে ৫টি বড় ব্যাঙ্ক বন্ধ হইয়াছে। মরিসসে ঝড়ের ফলে ওরিয়েণ্টাল ব্যাঙ্ক বন্ধ হইলে অনেক বাঙ্গালী নিঃস্ব হইয়াছিলেন। সে দিন এলায়েন্স ব্যাঙ্ক সহসা ফেল হইয়া অনেকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে, এই ২টি ব্যাঙ্কই ইংরাজের। রূপার ফাটকাবাজী করিতে গিয়া বোম্বাইয়ের স্পেসিব্যাঙ্ক ফেল হয়—বিলাতী ব্যাঙ্কের প্রতিযোগিতায় লালা হরকিষণ লালের পিপল্‌স্‌ ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়—ইহাদের পরিচালক বাঙ্গালী নহেন,—বোম্বাইওয়ালা ও পঞ্জাবী। পঞ্চমটি বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক—দেশবাসীর মূলধনে বাঙ্গালীর পরিশ্রমে পরিচালিত ব্যাঙ্ক।

উপরি-উক্ত বিদেশী ব্যাঙ্ক ২টি হইতে কোন স্বদেশী প্রতিষ্ঠান মূলধন সাহায্য পাইয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই ; সম্ভবতঃ পান নাই। অথচ এই ব্যাঙ্ক ২টি ফেল হইয়া অনেক বাঙ্গালীর সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছে। ব্যাঙ্কের নির্দ্দিষ্ট সুদের হারের উপরে শতকরা এক বা দুই টাকা মাত্র সুদ লইয়া বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক অনেক স্বদেশী ব্যবসায়ীকে মূলধন দিয়া সাহায্য করিয়াছেন, অনেক স্বদেশী ব্যবসায় বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের প্রদত্ত মূলধনে গড়িয়া উঠিয়াছে—মাড়োয়ারীর প্রদত্ত টাকা যে উচ্চ সুদের চক্রবৃদ্ধি হারে বর্দ্ধিত হইয়া ব্যবসা নাশ বা গ্রাস করে, বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক সে নীতি অবলম্বন করিলে হয় ত আজ তাহা বাঙ্গালীর অনেক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের মালিক হইতে পারিত, তাহা না করায় চক্রান্তের ফলে বন্ধ হইয়াছে। এই স্বদেশীয় পরিচালিত ব্যাঙ্ক সহসা বন্ধ হইয়া যাওয়ায় যাঁহারা স্বদেশীর অক্ষমতা ঘোষণা করিতে শতমুখ হইয়াছেন—দেশের সর্ব্বনাশের কল্পনায় আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতেছেন—অনুসন্ধান লইলে জানিতে পারিবেন, তাঁহারা বিদেশীয় ব্যাঙ্ক ব্যতীত কোন দিন স্বদেশীয় ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখেন নাই বা কোন স্বদেশী ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে মূলধন সাহায্য করিয়া স্বদেশের উন্নতির জন্য চিন্তিত হন নাই।

এক দিকে অসীম মূলধনে সরকারী ও বিদেশী ব্যাঙ্কের প্রতিযোগিতা—অন্য দিকে দেশের ধনিসম্প্রদায়ের সহানুভূতির একান্ত অভাব, মজ্জাগত অবিশ্বাস—অন্য দিকে আবার রাজনীতিক চালবাজীর চক্রান্ত—আয়ের দিকে অত্যল্প হারে সুদ গ্রহণ, তাহাও অনাদায়, ইহাতে যদি কোন স্বদেশী ব্যাঙ্ক টাকা আবদ্ধের জন্য এক দিনে বিনা নোটীশে অতর্কিতভাবে লক্ষ লক্ষ টাকার চেকের টাকা সহসা দিতে না পারিয়া বন্ধ হয়, তাহা ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষ ডিরেক্টারগণের অক্ষমতা বলা যাইতে পারে কিন্তু স্বদেশীর অক্ষমতার পূর্ণ পরিচয় বলিয়া তাহা সসম্মানে গ্রহণ করা যায় না—এমনই অনেক অক্ষমতার ভিতর দিয়াই মাড়োয়ারী ও ইংরাজ বণিকের ব্যবসায় গড়িয়া উঠিয়াছে।

এলায়েন্স ব্যাঙ্ক যখন বন্ধ হয়, তখনও এই ব্যাঙ্কে বিশেষ টান পড়ে—চক্রবর্ত্তী মহাশয় ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের সাহায্যে সে সময় ব্যাঙ্কের মান রক্ষা করেন—ব্যাঙ্কের বার্ষিক সভায় তাঁহার বক্তৃতায় তাহা প্রকাশ পাইয়াছিল। তদবধি এই ব্যাঙ্ককে বিশেষ সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের রিজার্ভ ফণ্ডের অনেক টাকা এই ব্যাঙ্কে দেওয়া হয়—তাহা লইয়াও অনেক আলোচনা সময় সময় হইয়াছে। এই সকল জানিয়াও স্বদেশী ব্যাঙ্কটিকে সাহায্য করিতে দেশের লোক কুণ্ঠিত হন নাই। সহসা বিপদ ঘটিতে পারে, এমন আশঙ্কা না করিয়া অনেক গৃহস্থও এই স্বদেশী ব্যাঙ্কে টাকা আমানত করিয়াছিলেন, তাঁহারাই সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন। মফঃস্বলের অনেকগুলি ব্যাঙ্কের টাকা এই ব্যাঙ্কে জমা ছিল—সে সব ব্যাঙ্কও ক্ষতিগ্রস্ত হইল। মফঃস্বলের ব্যাঙ্কের টাকা আর শীঘ্র কলিকাতার স্বদেশী ব্যাঙ্কে আসিবে না। অংশীদারগণের টাকা ত গেলই, আবার অংশের জন্য যাহা

তাঁহাদের দেয় আছে, তাহাও এখনই দিতে হইবে। যে সকল ব্যবসায়ের ক্ষতি হইল, তাহাও শীঘ্র পূর্ণ হইবার নহে—কিন্তু কাহার কার্য্যফলে এই সর্ব্বনাশ হইল?

'ষ্টেটস্‌ম্যান' স্পষ্টই লিখিয়াছেন, ইহা বঙ্গদেশে মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের ফল। বঙ্গদেশে মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইলে ব্যবস্থাপক সভায় পরাভূত স্বরাজ্য দল প্রতিহিংসাপরবশ হইয়া শ্রীযুত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী প্রমুখ প্রতিদানমূলক সহযোগীদিগের পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের প্রতি আক্রমণে প্রবৃত্ত হন। 'ফরওয়ার্ড' পত্রে যে মন্ত্রীর বেতন গৃহীত হইবার পরদিন হইতেই বঙ্গলক্ষ্মী কাপড়ের কলের সম্বন্ধে নানা অভিযোগ প্রকাশিত হইতে থাকে, তাহাতেই লোকের মনে পূর্ব্বোক্ত বিশ্বাস স্থান পাইয়াছে। লোক মনে করিয়াছে, রাজনীতিক কারণে স্বরাজ্য দল এই আক্রমণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাহা না হইলে তাঁহারা মন্ত্রীর বেতন মঞ্জুর হইবার পূর্ব্বেই বঙ্গলক্ষ্মী কাপড়ের কলের হিসাব সমালোচনা উপলক্ষে তাঁহাদের বক্তব্য প্রকাশ করিতেন।

ব্যাঙ্ক ফেল হইবার পর স্বরাজ্য দলের অন্যতম পত্র 'আত্মশক্তি' যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে যেন কতকটা গর্ব্বের ভাব আছে। তাহাতে লোকের সন্দেহ ঘনীভূত হইবে।

স্বরাজ্য দল যদি সত্য সত্যই রাজনীতিক কারণে বঙ্গলক্ষ্মীকে আক্রমণ করিয়া থাকেন এবং তাহার ফল ব্যাঙ্কেও প্রতিফলিত হইবে জানিয়াও তাহাতে বিরত না হইয়া থাকেন, তবে তাহা তাঁহাদের অশেষ কলঙ্কের কথা। যে স্বরাজ্য দল দেশকল্যাণকর নানা কার্য্য করিবেন বলিয়া বারংবার প্রতিশ্রুতি দিয়াও আজ পর্য্যন্ত কোন উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই, যদি তাঁহাদের চক্রান্তের ফলে এই দেশীয় প্রতিষ্ঠানটি নষ্ট হইয়া থাকে, তবে ইহাতে তাঁহাদেরও ক্ষুণ্ণ হওয়া উচিত।

স্বরাজ্য দল-শাসিত কলিকাতা কর্পোরেশন এই ব্যাঙ্কে করদাতৃগণের অনেক টাকা রাখিয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে, চিত্তরঞ্জন যখন মেয়র ছিলেন, তখন এই ব্যাঙ্কে অনুমান ২৫ হাজার টাকা দেওয়া হইয়াছিল, তাহার পর শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্তের সময়ে তাহা অনুমান ৫ লক্ষ টাকায় বর্দ্ধিত হয়। তদ্ভিন্ন স্বরাজ্য দলের লোকের প্রাধান্যে পরিচালিত কোন কোন প্রতিষ্ঠানও এই ব্যাঙ্কে টাকা রাখিয়াছিলেন। কাযেই স্বরাজ্য দল যদি ইচ্ছা করিয়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ব্যাঙ্কের ক্ষতি করিয়া থাকেন, তবে তাহা কতকটা রহস্যসমাচ্ছন্ন হইয়া দাঁড়ায়।

ব্যাঙ্কের পরিচালকগণ এ বিষয়ে তাঁহাদের কথা প্রকাশ করিতে বিলম্ব করিয়াছেন, তাঁহারা এই আঘাতে যেন স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের কথা গত ২৮শে বৈশাখ তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে। গত ১০ই মে মঙ্গলবার এই ব্যাঙ্কের আমানতকারীদিগের একটি সম্মেলনে ব্যাঙ্কটিকে পুনর্গঠিত করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই যে কথা লোকের মুখে প্রচারিত হইতেছে, তাহার সম্বন্ধে স্বরাজ্য দল কি বলিবেন? এখন লোক চঞ্চল, তাহারা অতি অল্পে বিচলিত হয়। তাহাদিগকে এখন কি বলা যাইতে পারে? যাহারা সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, তাহারা বুঝিতেছে, রাজনীতি অপেক্ষা অন্ননীতি অধিক উগ্র। যাহারা অন্নের উপায় নষ্ট করে, তাহারা ব্যক্তিনির্ব্বিশেষে তাহাদিগকে দণ্ডিত করিতে চাহে।

এ দেশে যৌথ কারবার নূতন। দেশের লোক ধীরে ধীরে এই সব প্রতিষ্ঠানে বিশ্বাসস্থাপন করিয়া আপনাদের অর্থ প্রদান করিতেছে। যাহাতে 'ব্যাঙ্কিং হ্যাবিট" বা ব্যাঙ্ক ব্যবহার করিবার অভ্যাস হয়, সে বিষয়ে লোককে অবহিত হইতে হইবে, নহিলে দেশে শিল্পপ্রতিষ্ঠার—কলকারখানাপ্রতিষ্ঠায় জন্য আবশ্যক অর্থ পাওয়া যাইবে না। সেই জন্য আমরা এ দেশে—মফঃস্বলে নানা স্থানে ব্যাঙ্কপ্রতিষ্ঠায় বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। আজ কি সে আনন্দ নিরানন্দে পরিণত হইবে?

আমরা কলিকাতায় যে হাহাকার শুনিতে পাইতেছি, লোকের বিশ্বাস অবিশ্বাসে পরিণতি লাভ করিলে সেই হাহাকার বঙ্গব্যাপী হইবে—বাঙ্গালার আর্থিক উন্নতি অর্দ্ধশতাব্দীর মত স্তম্ভিত হইয়া যাইবে—বাঙ্গালার দারুণ দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধান-সম্ভাবনা সুদূরপরাহত হইবে।

যাহারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক নষ্ট হইবার কারণ—তাহারা বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর শত্রুতাসাধন করিয়াছে, তাহারা বাঙ্গালী-সমাজের কলঙ্ক। প্রকৃত অপরাধী কাহারা, তাহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে—সমাজকেই তাহাদের দণ্ডের উপায় করিতে হইবে। যাহারা বাঙ্গালীর জাতীয় স্বার্থের বক্ষে আপনাদের হীন স্বার্থের জন্য ছুরিকা বিদ্ধ করে, তাহারা আইনের দণ্ড হইতে

অব্যাহতি লাভ করিতে পারে—তাহারা যেন সমাজের দণ্ড হইতে অব্যাহতিলাভ না করে।

গত ২৮শে বৈশাখ বেঙ্গল স্থাশনাল ব্যাঙ্কের ডিরেক্টাররা তাঁহাদের বিবৃতি প্রকাশিত করিয়াছেন। তাহাতে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাবধি ২৮শে এপ্রিল তারিখে ব্যাঙ্ক বন্ধ হওয়া পর্য্যন্ত কালের সংক্ষিপ্ত কথা আছে। তাহাতে দেখা যায়:—

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ৫০ লক্ষ টাকা মূলধনে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রস্তাব হয়। তন্মধ্যে ১৫ লক্ষ ২ হাজার ৩ শত টাকার সেয়ার গৃহীত হয় এবং মূলধন বাবদে আদায় হইয়াছিল—৮ লক্ষ ৫ হাজার ৪ শত ৮৭ টাকা। ৭ বৎসর পরে আভ্যন্তরিক গোলে মামলার ফলে ব্যাঙ্কের ক্ষতি হয় এবং শেষে শ্রীযুত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী বোর্ডের সভাপতি হয়েন। মন্ত্রিত্ব স্বীকারের দিন পর্য্যন্ত তিনি সেই পদে ছিলেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ব্যাঙ্কে মোট জমা টাকা ২৫ লক্ষ হইতে ২ লক্ষ ৭৭ হাজারে পরিণত হইয়াছিল বটে, কিন্তু ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের জমা টাকার পরিমাণ প্রায় ৮৫ লক্ষ দাঁড়ায়। ঐ বৎসর এপ্রিল মাসে এলায়েন্স ব্যাঙ্ক বন্ধ হওয়ায় লোক ভয় পায় এবং এই ব্যাঙ্ককে ৪ দিনে প্রায় ২৪ লক্ষ টাকা দিতে হয়। এই সময় ব্যাঙ্ককে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের নিকট ১০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। তদবধি ব্যাঙ্কে নগদ টাকা কম পড়ে এবং ডিরেক্টাররা বিশেষ চেষ্টা করিয়াও সে অভাব পূরণ করিতে পারেন নাই। গত জানুয়ারী মাসে যত টাকা বাহির করা হয়, ব্যাঙ্কে তদপেক্ষা অধিক ১ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা জমা থাকে। ফেব্রুয়ারী মাসেও ৮৩ হাজার টাকা অধিক জমা হয়। মার্চ্চ মাসে যে টাকা আমানত হয়, তদপেক্ষা ১৪ হাজার টাকা বেশী বাহির করা হয়। এপ্রিল মাসে ব্যাঙ্ককে জমা অপেক্ষা ৬লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা অধিক দিতে হয়। তখনও ৪ লক্ষ টাকা বাহির করিবার নোটিশ ছিল। গত ২৩শে এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হয়, সেই সপ্তাহে ব্যাঙ্কে খুব বেশী টাকা দিতে হইয়াছিল, ইহার ফলে ব্যাঙ্কের নগদ টাকা ফুরাইয়া যায়। ডিরেক্টারগণ টাকা সংস্থানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন, কিন্তু খুব কম টাকাই পাওয়া যায় এবং ২৭শে এপ্রিল সন্ধ্যার সময় দেখা যায় যে, বেশী টাকা পাওয়া না গেলে ব্যাঙ্কের কার্য্য চালান অসম্ভব হইবে। টাকা যোগাড়ের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়, কিন্তু সমস্তই বিফল হয়। উপায়ান্তর না দেখিয়া ২৮শে এপ্রিল প্রাতে ডিরেক্টারগণ টাকা দেওয়া স্থগিত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের কাছে ২টি মর্টগেজে ব্যাঙ্কের ঋণ ২০ লক্ষ টাকা। যে সর্ত্তে সেই ঋণ গৃহীত হইয়াছিল, সেই সর্ত্তের বলে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের তরফ হইতে বিখ্যাত হিসাব-নবীশ লাভলক লুইস কোম্পানীর ৩ জন কর্ম্মচারী রিসিভাররূপে ব্যাঙ্ক দখল করিয়াছেন। বর্ত্তমানে কায়েমী জমা, চলতি হিসাব, সেভিংস ব্যাঙ্ক ও জামিন দেওয়া ঋণ সব ধরিলে—১ কোটি ১ লক্ষ ৮৬ হাজার ১ শত ৮৭ টাকা। ব্যাঙ্ক যে টাকা ঋণ দিয়াছেন, তাহার পরিমাণ ১ কোটি ১৫ লক্ষ ৩৫ হাজার ৯ শত ৮০ টাকা। ইহার মধ্যে ৪০ লক্ষ টাকা সহজে আদায়যোগ্য। কতকগুলি শিল্প-প্রতিষ্ঠানে ২৫ লক্ষ টাকা দেওয়া আছে। আর বিনা জামীনে দেওয়া হইয়াছে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা। এই হিসাব দৃষ্টে দেখা যায়, ব্যাঙ্কের দেনা অপেক্ষা পাওনা সাড়ে ১৩ লক্ষ বেশী। ইহা ব্যতীত প্রয়োজন হইলে ব্যাঙ্কের অংশীদাররা অংশের যে টাকা আদায় দেন নাই, তাহা আদায় হইলে প্রায় ৭ লক্ষ টাকা পাওয়া যাইতে পারে। কারবারে প্রদত্ত টাকার কতটা আদায় হইবে এবং বিনা জামীনে দেওয়া টাকারই বা কি দাঁড়াইবে, তাহা এখন বলা যায় না। তবে এ কথা মনে করা যাইতে পারে যে, ভাল ভাবে আদায় করিলে আমানতী টাকার অর্দ্ধেক অনায়াসেই দেওয়া যাইতে পারিবে।

আমরা আশা করি, ব্যাঙ্কের কাছে যাঁহারা ঋণী, তাঁহারা এই দুঃসময়ে ঋণ পরিশোধ করিবেন এবং যাহাতে লোকের ক্ষতি অধিক না হয়, সে বিষয়ে অবহিত হইবেন। এ দিকে ব্যাঙ্ক পুনর্গঠিত করিবার চেষ্টা হইতেছে। যদি তাহা হয়, তবে তদপেক্ষা সুখের বিষয় আর কিছুই হইতে পারে না।

বিদেশীর নিকট স্বদেশীর অক্ষমতা প্রতিপন্ন না হইয়া বাঙ্গালীর সমবেত চেষ্টায় বাঙ্গালার এই স্বদেশী প্রতিষ্ঠান আবার গড়িয়া উঠুক, ইহাই আমাদের একমাত্র কামনা।
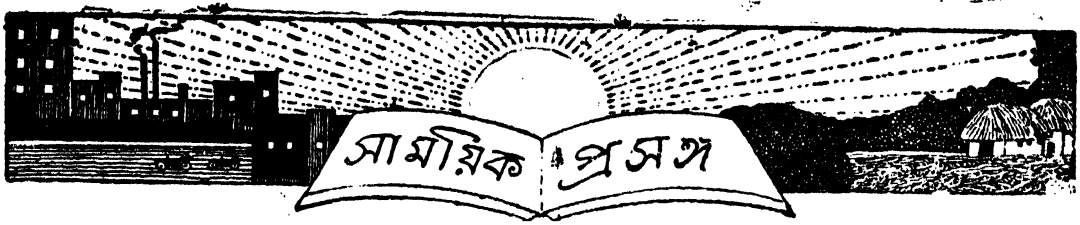
সুভাষচন্দ্রের পত্র

কিছুদিন পূর্ব্বে মিঃ মোবারলি বাঙ্গালা সরকারের পক্ষ হইতে ব্যবস্থাপক সভায় রাজবন্দী সুভাষচন্দ্রের মুক্তি সম্বন্ধে এক প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। সেই প্রস্তাবে বলা হয় যে, সরকার সুভাষচন্দ্রের বর্ত্তমান শারীরিক অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে মুক্ত দিউন। কিন্তু সেই মুক্ত পাইতে হইলে সুভাষচন্দ্রকে কয়টি সর্ত্ত পালন করিতে হইবে,—তাঁহাকে ব্রহ্ম হইতে সরাসরি ডাক্তারী পরামর্শ অনুসারে সুইটজারল্যাণ্ডে স্বাস্থ্যকর স্থানে যাত্রা করিতে এবং বসবাস করিতে হইবে, এমন কি, তিনি আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে যাত্রার পূর্ব্বে একবার দেখা করিবার জন্য কলিকাতা বা ভারতের কোনও স্থানে পদার্পণ করিতে পারিবেন না এবং যত দিন আটক আইন বলবৎ থাকিবে, তত দিন তাঁহাকে ভারতের বাহিরে থাকিতে হইবে। এইটুকু মাত্র সর্ত্ত; কিন্তু তাঁহাকে অপরাধ সম্বন্ধে কোনও স্বীকারোক্তি বা প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে না।

সরকারপক্ষ হইতে যখন এই প্রস্তাব হয়, তখন তাহাতে জনসাধারণের পক্ষ হইতে তীব্র আপত্তি উঠিয়াছিল। জনসাধারণ সরকারের এই ওজন-করা দয়া প্রদর্শনের মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারে নাই। যদি সুভাষচন্দ্রকে বিনা স্বীকারোক্তিতে ও বিনা প্রতিশ্রুতিতেই মুক্তি দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে দেশে আত্মীয়স্বজনের সেবা-শুশ্রূষা হইতে বঞ্চিত করিয়া বিদেশে নির্ব্বাসিত জীবন যাপন করিতে বলা কেন? যদি তাঁহার নষ্ট স্বাস্থ্য উদ্ধার করা সরকারের অভিপ্রেত হয়, তবে এই অবস্থায় চিরদিন আত্মীয়স্বজন হইতে তাঁহাকে বিচ্ছিন্ন রাখিলে কি তিনি মনের শান্তি পাইবেন, না, দেহের সুখ পাইবেন? চিরদিন কেন, তাহারও কারণ আছে, কেন না, এই আটক আইনের ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবন থাকিলেও সরকার যে নিজের মর্জ্জিমত উহার মিয়াদ আরও বাড়াইয়া দিবেন না, বা উহা এ দেশের আইনের কেতাবে কায়েম মোকায়েম করিয়া দিবেন না, তাহা কে বলিতে পারে? সকলই তাঁহাদের ইচ্ছা। কেন না, একটা ভুয়া কাউন্সিলের ঠাট বজায় রাখিলেও তাঁহাদের ইচ্ছাতেই কায হয়। সুভাষচন্দ্রের বর্ত্তমান দেহের অবস্থায় তাঁহার সেবাশুশ্রূষারই প্রয়োজন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক—অন্য কোন কার্য্য করা তাঁহার পক্ষে এখন অসম্ভব। যদি ধরিয়া লওয়া যায়, তিনি যথার্থই রাজদ্রোহী, তাহা হইলেও তাঁহার পক্ষে সরকারের গোয়েন্দা পুলিসের দৃষ্টিতে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া গুপ্ত ষড়যন্ত্র কার্য্যে লিপ্ত হওয়া এ অবস্থায় তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। অতএব তাঁহাকে প্রকারান্তরে নির্ব্বাসনদণ্ড দিয়া সরকার তাঁহার প্রতি দয়াপ্রদর্শন করেন নাই।

যাহা হউক, জনসাধারণের এইরূপ অভিমত হইলেও স্বয়ং সুভাষচন্দ্র সরকারের এই প্রস্তাব কি ভাবে গ্রহণ করেন, তাহা জানিবার জন্য জনসাধারণের একটা ঔৎসুক্য ছিল। এত দিনে সেই ঔৎসুক্যের নিবৃত্তি হইয়াছে। গত ৪ঠা এপ্রেল তারিখে সুভাষচন্দ্র তাঁহার ভ্রাতা শরৎচন্দ্রকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মতামত ব্যক্ত হইয়াছে। এই পত্রে তিনি জানাইয়াছেন যে, তিনি সরকারের এই হৃদয়হীন প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন না, এরূপ অন্যায় প্রস্তাবে সম্মত হওয়া কোনও আত্মসম্মানজ্ঞানবিশিষ্ট লোকের পক্ষে সম্ভব নহে। ইহা সুভাষচন্দ্রের উপযুক্ত কথাই হইয়াছে। তাঁহার এই পত্র যে কোনও জাতির মুক্তির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিবার যোগ্য। ইহাতে তিনি অনন্যসাধারণ মনীষাবলে অকাট্য যুক্তিতর্ক দেখাইয়া সরকারের প্রস্তাব অপমানকর বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

প্রথমেই তিনি বলিয়াছেন যে, তাঁহার ছোট দাদা ডাক্তার সুনীলচন্দ্র বসুর রিপোর্টখানা সরকার অদ্ভুত উপায়ে কাযে লাগাইয়াছেন। রিপোর্ট লিখিবার পূর্ব্বে বা পরে ডাক্তার সুনীলচন্দ্র কি লিখিবেন বা সুভাষচন্দ্রের জন্য কি ব্যবস্থা অনুমোদন করিবেন, সে সম্বন্ধে তাঁহার সহিত সুভাষচন্দ্রের কোনও পরামর্শ হয় নাই। হইলে সুভাষচন্দ্র নিশ্চিতই তাঁহার জন্য সুইটজারল্যাণ্ড যাইবার প্রস্তাবের বিপক্ষে মত দিতেন। সরকার কিন্তু ডাক্তার সুনীলচন্দ্রের প্রস্তাবটিকে রাজনীতিক চাল চালিবার জন্য ব্যবহার করিলেন। তাঁহারা তাঁহার কথিত সুভাষের রোগ বিবরণ গ্রহণ করিলেন না, কিন্তু তাঁহার প্রস্তাবিত সুভাষের স্বাস্থ্য অর্জ্জনের উপায়টি আগ্রহভরে গ্রহণ করিলেন। মিঃ মোবারলি স্পষ্টই বলিলেন, সুভাষচন্দ্র অত্যধিক পীড়িত হন নাই। অর্থাৎ সরকার ডাক্তার সুনীলচন্দ্রের রোগবিবরণটি বিশ্বাস না করিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন, অথচ তিনি যে সুইটজারল্যাণ্ডে বায়ুপরিবর্ত্তনের উপদেশ দিয়াছেন, তাহা আগ্রহভরে লইয়াছেন। কিন্তু ডাক্তার সুনীলচন্দ্র সুইটজারল্যাণ্ডের কথা পাড়িলেও, বলিয়াছিলেন কি, সুভাষচন্দ্রকে বাড়ী যাইতে দেওয়া হইবে না, বা তাঁহাকে আত্মীয়স্বজনের সহিত দেখা করিতে দেওয়া হইবে না? তিনি এ কথাও বলেন নাই যে, সুভাষচন্দ্রকে যে জাহাজে পাঠান হইবে, সে জাহাজ কোন ভারতীয় বন্দরে নোঙ্গর করিতে পারিবে না। পরন্তু তিনি এমন অভিমতও প্রকাশ করেন নাই যে, সুভাষের নষ্ট স্বাস্থ্য উদ্ধার হইলেও যত দিন আটক আইন থাকিবে, তত দিন সুভাষ দেশে ফিরিতে পারিবেন না। তাই সুভাষচন্দ্রের সন্দেহ, সরকার তাঁহার নষ্ট স্বাস্থ্য কামনায় এই 'দয়ার' প্রস্তাব করেন নাই।

তাহার পর সুভাষচন্দ্র বলিয়াছেন, অর্ডিনান্স আইনের মেয়াদ ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ। সে পর্য্যন্ত তাঁহাকে আটক থাকিতে হইবে। কিন্তু ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের পরেও যে ঐ আইন নূতন সাজে ঢালিয়া সাজা হইবে না অথবা চিরস্থায়িভাবে উহাকে ভারতের ফৌজদারী আইনের অন্তর্ভুক্ত করিয়া রাখা হইবে না, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? যদি সে সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে চিরজীবন য়ুরোপে আটক থাকিতে হইবে, দেশে ফিরিতে দেওয়া হইবে না। এ সর্ত্তে তিনি কিরূপে সম্মত হইতে পারেন? বিশেষতঃ প্রবাসে তিনি কিরূপ স্বাধীনতা উপভোগ করিতে পারিবেন, সে সম্বন্ধে কোনরূপ স্পষ্ট আভাস দেওয়া হয় নাই। প্রবাসেও গোয়েন্দা পুলিসের অভাব হইবে না। তাহারা ঝাঁকে ঝাঁকে তাঁহাকে ঘিরিয়া রাখিবে। সুভাষচন্দ্র রাজনীতিক অপরাধী, এই সন্দেহে তাঁহাকে ধরা ও আটক করা হইয়াছে। এই অবস্থায় গোয়েন্দারা তাঁহাকে সন্দেহের দৃষ্টিতেই দেখিবে এবং প্রতি পদবিক্ষেপে তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া বিপদ্‌গ্রস্ত করিবার চেষ্টা করিবে ও জীবন বিষময় করিয়া তুলিবে। আত্মীয়স্বজন হইতে দূরে বিচ্ছিন্ন হইয়া অসহায় অবস্থায় তাঁহার বিপদ পদে পদেই ঘটিতে পারে, বিশেষতঃ যখন গোয়েন্দা পুলিসের অসাধ্য কায কিছুই নাই! গোয়েন্দারা তাঁহার নামে মিথ্যা কথা রটাইয়া তাঁহাকে যে পদে পদে বিপন্ন করিতে পারে, তাহাতে সন্দেহের কি অবকাশ আছে? সুভাষচন্দ্র শান্তভাবে বাস করিলেও তাঁহার বিপক্ষে ভারত সরকারের নিকট ভয়ানক ষড়যন্ত্রের মিথ্যা

রিপোর্ট প্রেরিত হইবে না, তাহাই বা কে বলিতে পারে? হয় ত তাহাদের রটনার ফলে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই সুভাষচন্দ্র সরকারের নিকট একটা ভীষণ বলশেভিক বলিয়া জাহির হইবেন। তখন হয় ত তাঁহার স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের আশা চিরতরে উন্মূলিত হইবে। স্বেচ্ছায় তিনি জন্মভূমি হইতে এই সম্ভাবিত নির্ব্বাসনদণ্ড গ্রহণ করিবেন কেন?

অতঃপর সুভাষচন্দ্র বুঝাইয়াছেন যে, সরকার তাঁহার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য তাঁহাকে প্রবাসে পাঠাইতেছেন, কিন্তু গত ১৯২৩ ও ১৯২৪ খৃষ্টাব্দেই বা তাঁহার গতিবিধি কোথায় ছিল? ঐ দুই বৎসর কাযের মধ্যে তিনি কলিকাতার বাহিরে মোট ২।৩বার গমন করিয়াছেন, তাহাও স্বল্পকালের জন্য, আর বাঙ্গালার বাহিরে ত একবারও যান নাই, বাঙ্গালার বাহিরে রাজনীতিক কোনও কার্য্য করেন নাই, ভবিষ্যতে করিবেন বলিয়াও মনে করেন না। তবে তাঁহাকে বাঙ্গালার বাহিরের অন্যান্য প্রদেশ এবং ব্রহ্ম ও সিংহল হইতে নির্ব্বাসন দণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হইতেছে কেন? গত ছয় বৎসরে তিনি কংগ্রেসের কার্য্য অথবা পারিবারিক কার্য্য ব্যতীত অন্য কোনও কার্য্যে যোগদান করেন নাই। তাঁহার গতিবিধি সামান্যই ছিল, সরকারেরও তাহা অবিদিত ছিল না। তবে কি হেতু অনর্থক তাঁহার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য ৩ বৎসরকাল প্রবাসে প্রেরণ করা হইতেছে?

সরকার তাঁহার প্রতি আরও অন্যায় আচরণ করিয়াছেন। আড়াই বৎসরকাল তিনি নির্ব্বাসিত জীবন যাপন করিতেছেন, অথচ সরকার ইহার মধ্যে তাঁহার কোনও আত্মীয়ের—এমন কি, পিতামাতারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেন নাই। আরও আড়াই কি তিন বৎসরকাল তাঁহাকে প্রবাসে থাকিতে হইবে, সে সময়েও আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে না। প্রাচ্যের লোক আত্মীয়-স্বজনের সহিত কিরূপ গভীর স্নেহের বন্ধনে জড়িত থাকেন, তাহা পাশ্চাত্য জাতিরা ধারণাই করিতে পারেন না বলিয়াই বোধ হয়, এই হৃদয়হীন ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তাঁহাদের সংসার অর্থে নিজে আর স্ত্রী-পুত্র; সুতরাং যে হেতু সুভাষচন্দ্র অবিবাহিত, সেই হেতু তাঁহার সংসার বা পরিবার অথবা আত্মীয়-স্বজন নাই এবং কাহারও প্রতি সুভাষচন্দ্রের স্নেহ-ভালবাসা থাকিতে পারে না!

সরকার সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করিবার পর হইতে তাঁহার পোষ্যদিগের প্রতিপালনের জন্য অথবা তাঁহার সংসারের দৈনন্দিন ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য কোনও রূপ ভাতার ব্যবস্থা করেন নাই। এ বিষয়ে সুভাষচন্দ্র ভারত সরকারকে আবেদন করিলে বাঙ্গালা সরকার সে আবেদন চাপিয়া রাখিয়াছিলেন। ইহার উপর তাঁহাকে প্রায় ৩ বৎসর বিদেশে নির্ব্বাসন করা হইতেছে এবং নির্ব্বাসনকালে তাঁহাকে নিজের খরচ নিজে যোগাইতে বলা হইতেছে। কেমন চমৎকার প্রস্তাব! যদি সরকার তাঁহার প্রতি অন্য কোনও নৈতিক দায়িত্ব অনুভব না-ও করেন, তবে অন্ততঃ তাঁহাকে ধরিবার পূর্ব্বে তাঁহার যে স্বাস্থ্য ছিল, সেই স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দিয়া তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করুন। যদি আটক করিয়া রাখা হেতু তাঁহার স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকে, তবে সে জন্য তাঁহাকে ক্ষতিপূরণ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। অন্ততঃ যে পর্য্যন্ত তিনি নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া না পান, সেই পর্য্যন্ত তাঁহার ব্যয়ভার বহন করা সরকারের কর্ত্তব্য। সরকার কত দিন তাঁহার প্রতি এরূপ হৃদয়হীন ব্যবহার করিবেন?

মিঃ মোবারলি তাঁহাকে ভয় দেখাইয়া বলিয়াছেন, সরকার অডিনান্স আইনের কার্য্যকাল শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে আটক করিয়া রাখিতে পারেন; কিন্তু সুভাষচন্দ্র বলিতেছেন, তাহা কেন, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে সারা জীবন তাঁহাকে আটক করিয়া রাখিতে পারেন, কেন না, ঐ আইনের কার্য্যকাল সাঙ্গ হইলেই তাঁহারা তাঁহাকে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ৩ আইনে অথবা ঐ আইনের কার্য্যকাল [illegible] দিয়া আটক করিয়া রাখিতে পারেন। সে জন্য সুভাষচন্দ্র [illegible] কারণ, তিনি জানেন যে, কবির কথায় গৌরবের পথই মৃত্যুর পথ। তাই সুভাষচন্দ্র সমস্ত ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া সুখ-দুঃখ মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত—তিনি মনে করিতেছেন যে, জাতির অতীত জীবনের পাপের জন্য তিনি কৃচ্ছ্র সাধনা করিতেছেন। তাঁহার সান্ত্বনা, তিনি সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার অধিকার লাভ করিয়াছেন।

হিন্দুর কর্ত্তব্য

আমরা ইতঃপূর্ব্বে বহুবারই ধ্বংসোন্মুখ হিন্দুজাতির রক্ষাকল্পে সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা আলোচনা করিয়াছি। ডাক্তার মুঞ্জে ও লালা লাজপৎ রায় এ কথাটা নানা স্থানে হিন্দুদিগকে বুঝাইতেছেন। বিচ্ছিন্ন হিন্দুকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার নিমিত্ত সংগঠন কত প্রয়োজনীয়, তাহা এক-মুখে বলা যায় না। পাটনার হিন্দু মহাসভার অধিবেশনে সভাপতি ডাক্তার মুঞ্জে বলিয়াছেন,—হিন্দুগণের পরস্পর সহযোগের অভাব হিন্দুর সর্ব্বনাশসাধন করিয়াছে। হিন্দু পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে, অথচ হিন্দু-সমাজ এখনও এ বিষয়ে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতেছে। মুসলমানরা ভারত-বিজয়ের পর হইতে বহু হিন্দুকে শনৈঃ শনৈঃ মুসলমান করিয়াছে। ফলে বাঙ্গালায় মুসলমান সংখ্যায় অধিক হইয়াছে। কিন্তু নৈরাশ্যের কারণ নাই। এখনও সময় আছে। হিন্দু এখনও তিনটি বিষয়ে অবহিত হইলে ধ্বংস হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে।—(১) যে সকল হিন্দু মুসলমান হইয়াছে, তাহাদিগকে পুনরায় হিন্দুধর্ম্মে গ্রহণ, (২) যে সকল হিন্দু-নারী ইচ্ছার বিরুদ্ধে নির্য্যাতিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রতি সদয় ও মনুষ্যোচিত ব্যবহার প্রদর্শন, (৩) অস্পৃশ্য অনুন্নত জাতিদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার প্রদর্শন। যদি হিন্দু এখনও এই সকল বিষয়ে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করে, তাহা হইলে সে যেন স্বরাজের নাম মুখে আনয়ন না করে। মুসলমানের শক্তি ও সঙ্ঘবদ্ধতার তুলনায় হিন্দু যেরূপ অযোগ্যতা প্রদর্শন করিতেছে, তাহাতে ইংরাজ-শাসন ধ্বংস করিয়া স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করিবার স্বপ্ন যেন তাহারা না দেখে।

এই সমস্ত উপদেশ দিয়া ডাক্তার মুঞ্জে শেষে বলিয়াছেন যে, প্যাক্ট ও অধিকার বিসর্জ্জন দ্বারা অন্য সম্প্রদায়ের মনস্তুষ্টি-সাধন করিয়া স্বরাজলাভের স্বপ্ন আমাদিগকে বিসর্জ্জন দিতে হইবেই। যে মুহূর্ত্তে কংগ্রেসে বলা হইয়াছে যে, হিন্দু-মুসলমান একতা ব্যতীত স্বরাজলাভ সম্ভবপর হইবে না, সেই মুহূর্ত্ত হইতে হিন্দু-মুসলমান-একতার দাম বাজারে চড়িয়াছে, আর চাহিদা ও সরবরাহের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হিসাবে বাজারে এই একতার দামের যাচাই চলিতেছে। অর্থাৎ সোজা কথায় মুসলমানরা যখন বুঝিয়াছেন যে, তাঁহাদের সহিত একতা প্রতিষ্ঠা না হইলে স্বরাজ হইবে না, তখন হইতে তাঁহারা হিন্দুদিগের নিকট একতার মূল্যস্বরূপ আব্দারের পর আব্দার, বাহানার পর বাহানা করিয়া নানা অধিকার আদায় করিয়া লইতেছেন। এই হেতু হিন্দুর একাই স্বরাজ সাধনায় তৎপর হওয়া কর্ত্তব্য।

ডাক্তার মুঞ্জের কথাটায় অভিনবত্ব আছে। বোধ হয়, এমন ভাবের স্পষ্ট কথা কোন হিন্দুই এ যাবৎ বলেন নাই। সকল নেতারই মুখে যেন 'চুপ চুপ, মুসলমানরা রাগ করবে'—'দিদিমণি, না জানতে পারে!' এই ভাবের কথাই এ যাবৎ শুনিয়া আসা যাইতেছে। কিন্তু এ যাবৎ হিন্দু মার খাইয়াছে, অপমান সহিয়াছে, কিন্তু পাছে ঘর ভাঙ্গে, এই ভয়ে অথবা সাহসের অভাবে পাল্টা জবাব দেয় নাই। কিন্তু আজ বাহানার পর বাহানা অসহ্য হইয়াছে বলিয়াই ডাক্তার মুঞ্জের মুখে এই কথা শুনা যাইতেছে। বস্তুতঃ যদি মুসলমান স্বরাজসংগ্রামে স্বেচ্ছায় হিন্দুর সহিত যোগদান করিতে না চাহে, তবে হিন্দুর পক্ষে অন্য কোন্ পথ মুক্ত আছে?

ডাক্তার মুঞ্জে বরিশালে হিন্দু-মুসলমানে মিলন ঘটাইবার প্রয়াস পাইয়া ব্যর্থ-মনোরথ হইয়াছিলেন। মুসলমানরা কেবল পটুয়াখালীর ব্যাপারটাকে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করিয়া মিলনের কথা কহিতে

সম্মত হয়েন নাই, সমগ্র হিন্দু-মুসলমান-সমস্যা আলোচনা করিতে চাহিয়াছিলেন। অথচ ডাক্তার মুঞ্জে প্রথমে পটুয়াখালীর ব্যাপারটা মিটাইয়া লইতে চাহিয়াছিলেন। তাই তিনি বলিয়াছেন, এখন আর হিন্দু মুসলমানের মধ্যে আপোষে মিলন হইবার সম্ভাবনা নাই, এখন সরকার যদি জোর গলায় বলেন যে, প্রত্যেক প্রজার সাধারণ পথ দিয়া বাদ্যসহ শোভাযাত্রা লইয়া যাইবার পূর্ণ অধিকার আছে এবং অপর পক্ষের অর্থাৎ শোভাযাত্রার বিরোধী দলের অধিকারও ক্ষুণ্ণ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই, পরন্তু ইহাদের মধ্যে পরস্পর কেহ কাহারও অধিকার ক্ষুণ্ণ করিলে সমুচিত দণ্ড প্রাপ্ত হইবে,—তবেই হিন্দু-মুসলমানে মিলন সম্ভবপর হইবে।

তবেই বুঝিতে হইবে, ডাক্তার মুঞ্জের মতে এখন সরকারের মধ্যস্থতা ব্যতীত হিন্দু-মুসলমান মিলন সম্ভবপর নহে। এই হেতু তিনি হিন্দুকে মুসলমানের তোষামোদ করিয়া স্বরাজ-সাধনায় একতা আনয়ন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তাঁহার মতে হিন্দু একাকী স্বরাজ-যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলে ভাল হয়। বাঙ্গালার হিন্দুগণকে লক্ষ্য করিয়া ডাক্তার মুঞ্জে বলিয়াছেন, "মুসলমান কর্ত্তৃক হিন্দুর দেব-বিগ্রহ ও ধর্ম্মস্থান কলুষিত হইতেছে এবং হিন্দুনারী ধর্ষিত হইতেছে। ইহার একমাত্র প্রতীকারের উপায়,—হিন্দু-সংগঠন। এ জন্য হিন্দু-যুবক ও যুবতীমাত্রেই (১৬ হইতে ২৫ বৎসর পর্য্যন্ত) আত্মরক্ষার্থ লাঠিখেলা ও ব্যায়াম অভ্যাস করিবে, এইরূপ ব্যবস্থা করা আশু কর্ত্তব্য। আর পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুর সংখ্যাল্পতা নিবারণ জন্য শুদ্ধি ও অস্পৃশ্যতা নিবারণের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্ম্ম প্রচারের বিরাট আয়োজন করিতে হইবে। এ বিষয়ে বাঙ্গালার তরুণরাই প্রধান উদ্যোগী হইলে ভাল হয়।"

অনেকে হয় ত ডাক্তার মুঞ্জেকে Militant Hindu অথবা যুযুৎসু হিন্দু বলিয়া নিন্দা করিবেন। কিন্তু যে দিন-কাল পড়িয়াছে, তাহাতে হিন্দুর যুযুৎসু না হইয়াই বা উপায় কি? অপর সম্প্রদায় যুযুৎসু—তাহারা সর্ব্বদা আক্রমণার্থ প্রস্তুত, সে ক্ষেত্রে কলসীর কাণা খাইয়া 'মেরেছ বেশ করেছ' বলা অথবা এক গালে চড় খাইয়া অন্য গাল বাড়াইয়া দেওয়া শান্তিপ্রিয়তার পরিচায়ক হইবে, কিন্তু বুদ্ধিমত্তার বা মনুষ্যত্বের পরিচয়জ্ঞাপক হইবে না। জাতি হিসাবে বাঁচিতে হইলে যে হিন্দুকে আপাততঃ সজীব ও সজাগ হইতে হইবে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। উদারতা খুবই প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু উদারতা অর্থে কাপুরুষতা বুঝায় না। লালা লাজপৎ রায় সে দিন কলিকাতার এলবার্ট হলে বক্তৃতাকালে বলিয়াছেন—"যদি উদারতা অর্থে ইহা বুঝিতে হয় যে, অন্য ধর্ম্ম হিন্দুকে গ্রাস করিলেও—হিন্দুর অস্তিত্ব-লোপ হইলেও হিন্দুকে উদারতা প্রদর্শন করিতে হইবে, তাহা হইলে আমি এমন উদারতা সমর্থন করি না। ইহাকে উদারতা বলে না, ইহাকে বলে আত্মহত্যা! সকল বিষয়ে কর্ম্মহীনতা ও ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিলে জগতে তিষ্ঠিয়া থাকা যায় না। অতীতের ঔদাসীন্যর জন্য হিন্দুকে অনেক ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে। অন্য ধর্ম্ম কর্ম্মকুশলতা দেখাইতেছে, আর হিন্দু ঔদাসীন্য দেখাইতেছে, ইহা কি হিন্দুর পক্ষে পাপ নহে? উন্নতি কাহাকে বলে? জীবন—বাঁচিয়া থাকাই উন্নতি। পরন্তু জীবন অর্থে উন্নতি এবং জীবন-সংগ্রাম বুঝা উচিত। যে কোন শক্তি হিন্দুকে ধ্বংস করিতে অথবা বলহীন করিতে চেষ্টা করিতেছে, তাহার বিপক্ষে সংগ্রামই হইতেছে হিন্দুর জীবন।"

কথা কয়টি হিন্দুর পক্ষে বর্ত্তমান অবস্থায় ভাবিয়া দেখিবার নহে কি? আজ হিন্দুর জীবন-মরণের সমস্যার দিনে হিন্দুকে আপনার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইতে হইবে। সে কর্ত্তব্যের পথ কি, তাহা ডাক্তার মুঞ্জে ও লালা লাজপৎ রায় দেখাইয়া দিয়াছেন। অপরের সহিত অযথা বিরোধ হিন্দু করিতে চাহে না, তবে আত্মরক্ষার অধিকার সকলেরই আছে।

বৃথা জাত্যভিমান

ইডেন হাঁসপাতালে কোনও ভারতীয় আই, এম, এসকে রেসিডেণ্ট সার্জ্জেনের পদে নিযুক্ত করিবার কথায় এক শ্রেণীর য়ুরোপীয় মহলে বিষম আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। যোগ্যতা হিসাবে যদি এই তারতম্যের কথা উঠিত, তাহা হইলে ভারতীয়ের পক্ষ হইতে কোনও কথা উঠিত না। কিন্তু য়ুরোপীয়রা সে আপত্তি তুলেন নাই, তাঁহারা আপত্তি তুলিয়াছেন, জাতিগত পছন্দ অপছন্দের দিক্ হইতে। আপত্তি তুলিয়াছেন য়ুরোপীয় এসোসিয়েশন এবং চা-কর সমিতি, আর তাঁহাদের সুরে পোঁ ধরিয়াছেন চৌরঙ্গীর ভারত-বন্ধু 'ষ্টেটশম্যান।' এই সংবাদপত্র লিখিয়াছেন যে, "য়ুরোপীয় ও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান (ফিরিঙ্গী) নারীরা জাতি হিসাবে য়ুরোপীয় ডাক্তার ব্যতীত অন্য কাহারও দ্বারা চিকিৎসিত হইতে ঘোর আপত্তি করিয়া থাকেন।" এই হেতু "য়ুরোপীয় ডাক্তার ব্যতীত অন্য কাহাকেও ইডেন হাঁসপাতালের রেসিডেণ্ট সার্জ্জেনের পদে নিযুক্ত করিলে য়ুরোপীয় মহলে ঘোর আপত্তি উত্থাপিত হইবে" এবং "য়ুরোপীয় ব্যতীত অন্য কাহাকেও ঐ পদে যদি সরকার নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে তাঁহারা অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য করিবেন", ইত্যাদি।

'ষ্টেটশম্যান' ও য়ুরোপীয় আপত্তিকারীরা ভাবিয়াছেন, বুঝি এখনও ইলবার্ট বিল আন্দোলনের কাল বিদ্যমান আছে, বুঝি ভারতীয়রা এখনও সেইরূপ অজ্ঞতার যুগে অবস্থান করিতেছে! "নেটিভের কাছে হবে মোদের বিচার—নেভার, নেভার" অথবা "গেল রাজ্য গেল মান, হতমান ষিবিজান" রূপ চীৎকার তুলিলেই সরকার ভীত হইবেন, অথবা ভারতীয়রা ভয়ে দশ হাত পিছাইয়া যাইবে, সে যুগ আর নাই। ষ্টেটশম্যান কোম্পানীর এই মিথ্যা আন্দোলনের যে কোনও সারবান্ ভিত্তি নাই, তাহা অবস্থা আলোচনা করিলেই দেখা যাইবে।

প্রথমতঃ ধরিতে হইবে, ভারতীয়ের দেশে ভারতীয় চাকরীয়ার দাবী সর্ব্বাগ্রে ধর্ত্তব্য কি না। সরকার সরকারী চাকুরীসমূহে ক্রমশঃ ভারতীয় নিয়োগের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছেন। সে হিসাবে ইডেন হাঁসপাতালের রেসিডেণ্ট সার্জ্জেনের পদ ভারতীয়েরই প্রাপ্য, এ জন্য সাত সমুদ্র তের নদীর পার হইতে অধিক বেতন দিয়া শ্বেত চাকুরীয়া আনাইবার প্রয়োজন নাই। চিরদিনই যে তাঁহারা চামড়ার জোরে এই সমস্ত চাকুরী দখল করিয়া থাকিবেন, তাহার কোনও অর্থ নাই।

তাহার পর যোগ্যতার কথা। এই পদে অযোগ্য ভারতীয়কে যোগ্য শ্বেতকায়ের পরিবর্ত্তে গ্রহণ করা হউক, এমন কথা ভারতীয়রা বলে না। বর্ত্তমানে বহু ভারতীয় ডাক্তারই যোগ্যতায় শ্বেতাঙ্গ ডাক্তারের সমকক্ষ—কেহ কেহ তাঁহাদের অপেক্ষা অধিকতর উপযুক্ত। এই ইডেন হাঁসপাতালেরই রেসিডেণ্ট সার্জ্জেনের পদে যে কয় জন ভারতীয় কায করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই যোগ্য। তাঁহারা কোনও অংশে য়ুরোপীয় ডাক্তারের অপেক্ষা হীন ত নহেনই, বরং কোন কোন বিষয়ে অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ। তবে এই পদে য়ুরোপীয় ব্যতীত অন্য ডাক্তার নিযুক্ত হইতে পারিবে না, এ আবদারের অর্থ কি?

শেষ কথা, য়ুরোপীয় ও ফিরিঙ্গী মহিলারা দেশীয় ডাক্তারের দ্বারা চিকিৎসিত হইতে চাহেন না, কাজেই তাঁহাদের আত্মীয় শ্বেতকায় পুরুষরাও দেশীয় ডাক্তারের পক্ষপাতী নহেন। এমন কি, ইহাও ভয় দেখান হইয়াছে যে, দেশীয় ডাক্তার রাখিলে য়ুরোপীয় মহিলারা আর হাঁসপাতালের সম্পর্কে আসিবেন না। পরন্তু তাঁহাদের আত্মীয় পুরুষরাও আর এ দেশে চাকুরী লইয়া আসিবেন না। তবে ত গোকুল কাঁদিয়া আঁধার হইবে! কিন্তু সে দিন যে শীঘ্র উদয় হইবে,—য়ুরোপীয়রা যে এ দেশের মোটা দানাপানির লোভ সংবরণ করিবে, তাহার সম্ভাবনা অতি দূর ভবিষ্যতেও দেখা যাইতেছে না। এমন সুখের চাকুরীর দেশ ভূভারতে আর কোথায় পাওয়া যাইবে?

কিন্তু সত্যই কি য়ুরোপীয় বা ফিরিঙ্গী মহিলারা দেশীয় ডাক্তার

আপত্তি করেন না? ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ১৩ই আগষ্ট হইতে ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুন—প্রায় ৭ বৎসরের মধ্যে তিন জন ভারতীয় ডাক্তার ইডেন হাসপাতালের রেসিডেণ্ট সার্জ্জেনের কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের নাম শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন দাস, শ্রীযুক্ত সতীনাথ বাগচী এবং শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র লাহিড়ী। ইঁহাদের কার্য্যকালে উক্ত হাসপাতালে য়ুরোপীয় বা ফিরিঙ্গী মহিলা রোগীর সংখ্যা বিন্দুমাত্র হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই, বরং বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাঁহারা অবাধে এই সকল দেশীয় ডাক্তারের নিকটে সকল প্রকার স্ত্রীরোগের চিকিৎসা করাইয়াছেন, বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই। আরও মজা এই যে, যখন হাসপাতালে য়ুরোপীয় রেসিডেণ্ট সার্জ্জেন থাকেন, তখনও য়ুরোপীয় ও ফিরিঙ্গী রোগিণীরা তাঁহার অধীনস্থ দেশীয় ডাক্তারগণের দ্বারাই চিকিৎসিত হইয়া থাকেন।

ডাক্তার যতীন্দ্রমোহন দাস প্রাইভেট চিকিৎসকরূপে বহুসংখ্যক য়ুরোপীয় ও ফিরিঙ্গী রোগিণীকে চিকিৎসা করিয়া থাকেন, তাঁহারা তাঁহার নিকট আগ্রহভরে চিকিৎসিত হয়েন ও তাঁহাকে আন্তরিক বিশ্বাস করেন।

পরলোকগত ডাক্তার এস, সি, দাস ধাত্রীবিদ্যায় এবং সর্ব্ববিধ স্ত্রী-রোগের চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ ছিলেন, তাঁহার য়ুরোপীয় ও ফিরিঙ্গী রোগিণীর সংখ্যা দেশীয় রোগিণীর অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল। কর্ণেল সিডনি বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমানে কলিকাতায় এমন এক জন স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞ দেশীয় চিকিৎসক আছেন, যাঁহার রোগিণীর মধ্যে শতকরা ৯৭ জন য়ুরোপীয় ও ফিরিঙ্গী মহিলা।

ইহা ছাড়া কলিকাতা ব্যতীত ভারতের অন্য কোনও সহরে য়ুরোপীয়রা য়ুরোপীয় মহিলাদের জন্য য়ুরোপীয় ডাক্তারের দাবী করেন না। বোম্বাই সহরের হাসপাতালের প্রসব বিভাগে নিত্য শত শত য়ুরোপীয় মহিলা দেশীয় ডাক্তারের নিকট সেবা গ্রহণ করিয়া থাকেন। সিংহলের য়ুরোপীয়া মহিলারা দেশীয় ডাক্তারের দ্বারা চিকিৎসিত হইতে কোনও আপত্তি করেন না।

সুতরাং সকল দিক আলোচনা করিলে বুঝা যায়, কলিকাতার এই আন্দোলনের মূলে কোনও প্রেরণা আছে। 'ষ্টেটসম্যান' হউন বা 'য়ুরোপীয় এসোসিয়েশান' অথবা চাকর সমিতি'ই হউন, এই আন্দোলন জাগাইয়া জাতিবিদ্বেষ-বিষ আরও অধিক তেজে বিসর্পিত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন কেন, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। এখন আই, এম, এস কেবল য়ুরোপীয়দের একচেটিয়া নহে, বহু ভারতীয়ও সে পরীক্ষায় যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং য়ুরোপীয় আই, এম, এসদিগের রুটীতে হাত পড়িবার আশঙ্কা হইবে বলিয়াই এই মিথ্যা আন্দোলন জাগাইয়া তুলা হইতেছে। কিন্তু উহাতে কেহই ভুলিবে না, এ কথাটা যেন হুজুগপ্রিয় শ্বেতাঙ্গরা স্মরণ রাখেন।

পাবনার আপীলের রায়

বিগত ১লা জুলাই তারিখে পাবনার হিন্দুরা কলুষিত ও ভগ্ন দেবমূর্ত্তি-গুলি সংগ্রহ করিয়া বিসর্জ্জন দিবার নিমিত্ত শোভাযাত্রা করিয়া নগরের পথে বাহির হইয়াছিলেন, সেই সূত্রে মুসলমানদের সহিত দাঙ্গা হয়। ফলে মুসলমানপক্ষ হইতে পাবনার হিন্দু নেতৃগণের বিপক্ষে স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ হলোর এজলাসে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। মিঃ হলো বিচারে নেতৃবর্গের মধ্যে ১৫ জনকে অপরাধী সিদ্ধান্ত করিয়া কাহাকেও ৫ মাস, কাহাকেও বা ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছিলেন। এই সিদ্ধান্তের বিপক্ষে হিন্দুপক্ষ হইতে পাবনার দায়রায় আপীল হয়। দায়রা জজ মিঃ এস, এন, গুহ বিচারে দণ্ডিত আসামী-দিগকে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করিয়া মুক্তি প্রদান করিয়াছেন।

এই মামলার বিচারফলের জন্য সমগ্র হিন্দুসমাজ উৎসুক হইয়াছিল। যে দিন হইতে স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে এই মামলা দায়ের হয়, সেই দিন হইতে ইহার ফলাফলের জন্য হিন্দুসমাজ উদগ্রীব হইয়াছিল; এই হেতু মামলার শুনানীর দিন আদালতে বিপুল জনসমাগম হইত। দায়রার বিচারকালেও এইরূপ হইয়াছিল। তাহার কারণ এই যে, যাঁহাদের বিপক্ষে দাঙ্গা ও মারপিটের অভিযোগ হইয়াছিল, তাঁহারা সামান্য ব্যক্তি নহেন, তাঁহারা পাবনা অঞ্চলের হিন্দুসমাজের শীর্ষস্থানীয়, তাঁহাদের মধ্যে এক জন শীতলাইয়ের জমীদার বাঙ্গালা কাউন্সিলের সদস্য শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র, আর এক জন প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব শ্রীযুক্ত রণজিৎচন্দ্র লাহিড়ী। আরও এক কারণে এই মামলার ফলাফল জানিবার জন্য হিন্দুসমাজ বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল। বাদ্যাদি করিয়া হিন্দু তাহার ধর্ম্মগত শোভাযাত্রা প্রকাশ্য রাজপথ দিয়া অবাধে এবং আইন অনুসারে লইয়া যাইতে পারে কি না এবং কেহ তাহাতে বলপূর্ব্বক বাধা দিলে আত্মরক্ষার জন্য বাধার প্রত্যুত্তর দিতে পারে কি না,—তাহা এই মামলার বিচারফলের উপর এক হিসাবে নির্ভর করিতেছিল; এই হেতু হিন্দু জনসাধারণের নিকট এই রায়ের মূল্য সমধিক বলিয়া হিন্দু ইহার জন্য উৎকণ্ঠা ও আগ্রহভরে প্রতীক্ষা করিতেছিল। রায়ে হিন্দুর উৎকণ্ঠা দূর হইয়াছে, হিন্দুসমাজ আশ্বস্ত ও আনন্দিত হইয়াছে। জজ স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন, রাজপথে ধর্ম্মগত শোভাযাত্রা বাদ্যাদি সহ লইয়া যাইবার অধিকার হিন্দুর অবশ্যই আছে এবং তাহাতে মুসলমান বাধা দিলে হিন্দুর আত্মরক্ষা করিবার অধিকার আছে। তাঁহার জয় হউক। সমগ্র হিন্দুসমাজ প্রাণ ভরিয়া তাঁহার জয়গান করিতেছে, আর সেই পাবনায় যে সকল স্বার্থত্যাগী নির্ভীক ধর্ম্মবিশ্বাসী নেতা হিন্দুর সনাতন অধিকার সাব্যস্ত করিবার নিমিত্ত স্বেচ্ছায় বিপদ্ ও কষ্ট বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মুক্তিতে আন্তরিক আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। তাঁহারা হিন্দুর ন্যায়-সঙ্গত অধিকার সাব্যস্ত করিতে যে আত্মদান করিয়াছেন, তাহা হিন্দুর ইতিহাসে সুবর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

দায়রা জজ মিঃ এস, এন, গুহ সুদীর্ঘ ৪৮ পৃষ্ঠাব্যাপী রায় দিয়াছেন। তাঁহার রায়ের মূল কথা এই কয়টি :—

(১) স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট কূট আইন তর্কমূলক লক্ষ্যের বিষয়গুলি বিচারকালে ছাড়িয়া দিয়া গিয়াছেন এবং উভয় পক্ষের নিজ নিজ অধিকার কিরূপ, সে সম্বন্ধে তাঁহার আইনজ্ঞানের ভ্রান্ত ধারণার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

(২) মুসলমানরা প্রথম আক্রমণ করিয়াছিল। হিন্দুর শোভা-যাত্রায় বাধা দিবার তাহাদের কোনও অধিকার ছিল না। মুসল-মানরা ঐ শোভাযাত্রায় বাধা দিবার অনুকূলে প্রচলিত কোনও আচার-ব্যবহার সাক্ষ্য দ্বারা সপ্রমাণ করিতে পারে নাই।

(৩) অন্যের অধিকারে বাধা না দিয়া রাজপথ দিয়া শোভাযাত্রা লইয়া যাইবার হিন্দুদিগের সম্পূর্ণ অধিকার ছিল।

(৪) শীতলাইয়ের জমীদারের বাটীতে শোভাযাত্রার পূর্ব্বে হিন্দু-দের সভা হইয়াছিল এবং সেই সভায় উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা হইয়াছিল, ইহা সাক্ষ্য দ্বারা প্রতিপন্ন হয় নাই, সুতরাং ঐ কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে।

(৫) নিম্ন আদালত মামলাটি ভ্রান্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখিয়া বিচার করিয়াছেন ও রায় দিয়াছেন।

(৬) সবাদ্য শোভাযাত্রায় মুসলমানদের আপত্তি থাকিলে তাহারা কর্তৃপক্ষের দ্বারস্থ হইতে পারিত, নিজের হাতে আইন লইয়া হিন্দুদিগের শোভাযাত্রায় বাধা দিয়া তাহারাই প্রথমে আইন ভঙ্গ করিয়াছে। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট শোভাযাত্রা নিয়ন্ত্রিত করিবার অধিকার ফরিয়াদী আবদুল বারির হস্তে প্রদান করেন নাই।

(৭) খাঁ বাহাদুর ওয়াসিমুদ্দীন রণজিৎ বাবুর প্রতি অপ্রসন্ন—তাঁহাকে তিনি শত্রুভাবেই দেখিয়া থাকেন। ১৫১ সাক্ষীর বিবরণ খাঁ বাহাদুর ওয়াসিমুদ্দীনের ব্যবহার হেতু বিশ্বাসযোগ্য নহে।

(৮) শোভাযাত্রা যতক্ষণ পর্য্যন্ত খলিফাপটীর মসজেদের সম্মু-

উপস্থিত হয় নাই, ততক্ষণ শান্তিভঙ্গ করে নাই। ভগ্ন কলুষিত দেবমূর্ত্তিগুলি সংগ্রহান্তে শোভাযাত্রা করিয়া বিসর্জ্জন দিতে যাওয়া হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত। হিন্দুরা তাহাদের ধর্ম্ম পালন করিতেছিল। মুসলমানরা খলিফাপটীর মসজেদের সম্মুখে তাহাদের সেই ধর্ম্মকার্য্যে বাধা দেওয়ার পর হিন্দুরা শান্তি ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিয়াছিল। আত্মরক্ষার্থ উহারা তাহা করিতে সম্পূর্ণ অধিকারী। এ বিষয়ে বিটলি বনাম গিলব্যাঙ্কসের মামলা প্রকৃষ্ট নজীর।

(৯) হামিদের ব্যবহার ভাল নহে, সে সাক্ষীদিগকে শিখাইয়া রাখিয়াছিল, ইহা সম্ভব হইতে পারে।

(১০) খলিফাপটীতে দাঙ্গা ঘটিবার পূর্ব্বে হিন্দুরা আইন ভঙ্গ করে নাই, শান্তভাবে নিরস্ত্র হইয়া শোভাযাত্রা লইয়া রাজপথ অতিক্রম করিয়াছিল। মুসলমানরা প্রথমে আক্রমণ করার পর তাহারা প্রতি-আক্রমণ করিয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ হলো আমূল বৃত্তান্ত বিচার না করিয়া কেবল খলিফাপটীর দাঙ্গার উপর জোর দিয়া ভ্রান্ত বিচার করিয়াছেন।

(১১) গীতবাদ্য হিন্দুর ধর্ম্মানুমোদিত। গীতবাদ্যের সহিত ধর্ম্মগত শোভাযাত্রা লইয়া যাওয়াও হিন্দুর ধর্ম্মকার্য্যমধ্যে পরিগণিত। সুতরাং অন্যের রাজপথ ব্যবহার করিবার সাধারণ অধিকারে ব্যাঘাত না ঘটাইয়া হিন্দুর বাদ্যাদি সহ ধর্ম্মগত শোভাযাত্রা লইয়া যাইবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। ম্যাজিষ্ট্রেট বা পুলিস যদি কোন কারণ বশতঃ ঐ শোভাযাত্রা নিয়ন্ত্রিত করেন, তবে স্বতন্ত্র কথা। সে ক্ষেত্রে সে আদেশ মান্য করিয়া শোভাযাত্রা লইয়া যাওয়া আইনসঙ্গত। কিন্তু যে ক্ষেত্রে সে বিশেষ আদেশ নাই, সে ক্ষেত্রে শোভাযাত্রার খলিফাপটী রোড দিয়া বাদ্যাদি সহ যাইবার সম্পূর্ণ অধিকার ছিল; মাদ্রাজের একটি মামলার (20 Madras 376) রায় ইহার নজীর। মুসলমানরা পূর্ব্বের কোন প্রচলিত আচারের প্রমাণ দেখাইতে পারে নাই, যাহার দ্বারা এই পথে হিন্দুর শোভাযাত্রা যাওয়া নিষিদ্ধ।

(১২) ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ হলো হিন্দুদের দোষ ধরিয়াছেন যে, তাহারা শোভাযাত্রার জন্য লাইসেন গ্রহণ করে নাই। কিন্তু পুলিস আইনের ৩০ ধারা অনুসারে যখন কোনও বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয় নাই, তখন হিন্দুরা লাইসেন লইতে বাধ্য ছিল না। তবে হিন্দুরা যদি ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিসকর্ত্তাকে জানাইত যে, তাহারা ভগ্ন ও কলুষিত দেবমূর্ত্তি শোভাযাত্রা করিয়া বিসর্জ্জন করিতে যাইবে, তাহা হইলে বিবেচনার কার্য্য করিত বটে। কিন্তু বিবেচনার অভাব আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ নহে।

এখন আমরা আশা করি যে, অতঃপর যে সকল মুসলমান মনে করে যে, মসজেদের সম্মুখ দিয়া গীতবাদ্য করিয়া হিন্দুর শোভাযাত্রা অতিক্রম করিলেই তাহারা বলপূর্ব্বক বাধা দিতে পারে, পরন্তু সেই বলপ্রকাশে আইনভঙ্গ হয় না, তাহাদের পক্ষে এই মামলার রায় চৈতন্যদায়ক হইবে।

মুসলমানের আবদার

বাঙ্গালার মুসলমানের আবদার দিন দিন যেন বাড়িয়াই চলিতেছে। যে সার আবদর রহিম বহুকাল সরকারী নকরীতে দিন-গুজরাণ করিয়া বাঙ্গালার মসনদ 'পাই পাই' করিয়াও সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামী বশতঃ না পাইয়া হঠাৎ বাঙ্গালার মুসলমানের নেতা সাজিয়া বসিয়াছেন এবং আলিগড়ে সাম্প্রদায়িক বিরোধের আগুন জ্বালিবার পর হইতে এ যাবৎ নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থসাধনের যূপকাষ্ঠে অন্য সম্প্রদায়ের স্বার্থহানি করিতে দ্বিধা বোধ করিতেছেন না, সেই সার আবদরই প্রথমে পোনাবালিয়া কুলকাটির 'সহিদ' দিগের প্রাণনাশের প্রতিশোধ কামনায় সরকারের দরবারে আবদার ধরিয়া পথিপ্রদর্শন করিয়াছেন। এখন তাঁহার দেখাদেখি মুসলমানরা যথাতথা বিষম আবদার ও বাহানা লইতেছেন, যেন দেশটা একলা তাঁহাদেরই, তাঁহাদের জন্য স্বতন্ত্র আইন, স্বতন্ত্র কানুন, স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান, স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা সরকারের অবশ্য কর্ত্তব্য। সার আবদর বরিশালের য়ুরোপীয় ম্যাজিষ্ট্রেটের মাথা চাহিয়াছিলেন, তাঁহার দেখাদেখি চুণোপুঁটি মুসলমানরাও অন্যান্য স্থানের হিন্দু বিচারকের মাথা চাহিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে!

এরূপ অসম্ভব আবদারের মূল কোথায়, অনুসন্ধান করিলে অনেক দূর যাইতে হয়। কেবল যে বিচ্ছিন্নভাবে নানাস্থানের মুসলমানরা হিন্দু বিচারকের নিকট বিচার চাহিতেছে না, তাহা নহে, এই না চাওয়ার ভিতরে বেশ একটা প্রচ্ছন্ন নিরবচ্ছিন্নতা আছে—সে রহস্যের যবনিকা অপসারণ করিলে দেখা যায় যে, এই আবদারের আন্দোলনের পশ্চাতে বেশ একটা উত্তেজনার আভাস আছে। পশ্চাৎ হইতে কল টিপিবার লোক আছে—পুতুল সেই কল টেপার কলে নড়িতেছে!

এই কলিকাতা সহরে এক ভুঁইফোড় মুসলমান সমিতি কিছুদিন পূর্ব্বে হঠাৎ গজাইয়া উঠিয়াছিল, তাহার নাম "সেণ্ট্রাল মহামেডান এসোসিয়েশান", মন্ত্রী হাজী গজনবী ইহার প্রেসিডেণ্ট। গত কলিকাতা দাঙ্গার সময় ইহার অস্তিত্ব একবার অনুভূত হইয়াছিল। সম্প্রতি বাঙ্গালায় নূতন লাট সার ষ্ট্যানলি জ্যাকসনের আগমনে ইহার অস্তিত্ব আবার অনুভূত হইয়াছে। এই সমিতি লাটের সকাশে ডেপুটেশন পাঠাইয়া জানাইয়াছেন যে, "যেহেতু বহু শতাব্দী ধরিয়া মুসলমানরা দেশ শাসন করিয়া আসিয়াছেন এবং যাহার ফলে তাঁহারা তাঁহাদের উচ্চ শিক্ষা ও অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে গৌরব অনুভব করেন," এবং "যেহেতু বঙ্গদেশে মুসলমান মালীকানের প্রথমাবস্থা হইতে মুসলমানরা উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং দেশ শাসন করিয়াছিলেন" সেই হেতু তাঁহাদের সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। যাহারা এই ভাবের নির্লজ্জ বাহানা করিতে পারে, তাহাদের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া দাঙ্গার মুসলমান আসামীরাও যে বিশেষ বিচারের প্রার্থনা করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

এই ডেপুটেশানের এত মাথা মোটা যে, তাঁহারা এটুকুও জানেন না যে, আজকাল সকলেই একটু আধটু ইতিহাস আলোচনা করিয়া থাকে—বিশেষতঃ নিজের দেশের। বাঙ্গালা দেশের মুসলমানবিজয়ের পর যাহারা দেশ শাসন করিত, তাহারা কাহারা? যে কয় জন মুষ্টিমেয় পাঠান বা মোগল এ দেশ জয় করিতে আসিয়াছিল, তাহারা ত তরবারি লইয়া লড়াই করিত, দেশ শাসন করিত হিন্দু জমীদার ও ভুঁইঞারা, রাজকর্ম্মচারীও অধিকাংশ ছিল হিন্দু। আর সব চেয়ে সেরা কথা, যে কয় জন মুষ্টিমেয় মোগল পাঠান এ দেশে বসবাস করিতে আসিয়াছিল, তাহাদের সহিত বাঙ্গালার মুসলমানের কোনও সম্পর্ক ছিল না, কেন না, তাহারা ছিল হিন্দু, পরে মুসলমানের রাজত্বকালে হইয়াছিল মুসলমান—তাহাদের দেশশাসনে কোন হাত ছিল না, তাহারা কৃষী ও জনমজুরী লইয়াই থাকিত। আরও এক কথা এই যে, মোগল আমলে বাঙ্গালা দেশ জয় করিয়াছিল মোগল বাদশাহদিগের হিন্দু রাজপুত সেনাপতি। পাঠান আমলেও হিন্দু রাজা গণেশের পুত্র যদু মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ সকল জয়-বিজয়ের সহিত বাঙ্গালার জনসাধারণের বিশেষ সম্পর্ক ছিল না। তাহারা তখনও যাহা ছিল, এখনও প্রায় তাহাই আছে। বাঙ্গালার মুসলমানরা কখনও যেন না ভাবেন যে, তাঁহারা মোগল-পাঠানের বংশধর, কেন না, তাঁহারা বাঙ্গালারই বাঙ্গালী।

কিন্তু এই ভাবের ভ্রান্ত ধারণা যদি অজ্ঞ মুসলমান জনসাধারণের মনে বদ্ধমূল করিয়া দিবার গুপ্ত ষড়যন্ত্র চলিতে থাকে, তাহা হইলে তাহার ফল কি হইতে পারে? সম্ভবতঃ এ জন্য তাহারা আপনাদিগকে বাঙ্গালার ভূঁইফোড় 'বাঙ্গালার জাতি' বলিয়া মনে মনে গর্ব্ব অনুভব

করে এবং সে জন্য ইংরাজ প্রজা যেমন বৃটিশজাতের অধিকারে দাবী করিয়া স্বতন্ত্র বিচার চাহে, তেমনই তাহারাও হিন্দু বিচারকের বিচার না চাহিয়া স্বতন্ত্র বিচার চাহে। পাবনায় আবদুল বারি এইরূপ বিচার চাহিয়াছিল। সে হাইকোর্টে বাহানা লইয়াছিল যে, হিন্দু দায়রা জজের নিকট তাহার সুবিচার হইবে না, অতএব মামলা অন্য কোর্টে স্থানান্তরিত করা হউক। মহামান্য হাইকোর্ট অবশ্য এই আবদার রক্ষা করেন নাই। এমন আবদার রক্ষা করিতে হইলে হিন্দু ও মুসলমানের জন্য কেবল য়ুরোপীয় বিচারক সর্ব্বত্র নিযুক্ত করিতে হয়, কেন না, হিন্দুরাও দেখাদেখি বাহানা ধরিবে, মুসলমান বিচারকের নিকট তাহাদের সুবিচার হইবে না। কিন্তু হিন্দুরা তাহা করে নাই। কলিকাতার দাঙ্গার সম্পর্কে মুসলমান বিচারকের এজলাসে বহু হিন্দু অপরাধীর বিচার ও দণ্ড হইয়া গিয়াছে। হিন্দুরা তাহাতে কোনও আপত্তি করে নাই। কেন না, তাহারা সাম্প্রদায়িকতার স্বার্থে অন্ধ নহে, তাহারা জানে, এমন অন্যায় বাহানা লইলে এ দেশে বিচারকার্য্য সম্পাদন করা অসম্ভব হয়, পরন্তু জাতীয়তার দোহাই দিয়া স্বরাজ কামনা করা আমাদের পক্ষে বিড়ম্বনার বিষয় হয়।

এইরূপ ভাবের আরও কয়টি মামলায় মুসলমানের আবদার ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহার মূল লক্ষ্য করিবার এইটুকু যে, পিছন হইতে নাচাইতেছে কে বা কাহারা। যাহারা বাঙ্গালার অজ্ঞ মুসলমানকে বাদশাহী সম্বন্ধের অথবা আরব-তাতারের স্বপ্ন দেখাইয়া স্ফীতকণ্ঠ কপোতের দশায় উপনীত করে, তাহারাই মূলে এই বাহানার জন্য অপরাধী। 'মুসলমান' শ্রেণীর সংবাদপত্র যে বিষ-আন্দোলন জাগাইয়া রাখিয়াছে, তাহা তাহার ফাইল পাঠ করিলে জানা যায়। এই পত্র কোন সংখ্যায় লিখিয়াছে,—"আফিসের বড় বাবুরা হিন্দু, তাহারা ডিপার্টমেণ্টের কর্ত্তা য়ুরোপীয়দিগের কান-ভারী করে, তাই মুসলমানের চাকুরী হয় না!" অথচ লেখকের বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে অধিকাংশই যে দপ্তরীখানার বিদ্যার অধিকারী বলিয়া চাকুরী প্রাপ্ত হয়েন না, তাহা বাঙ্গালা কাউন্সিলে সরকার পক্ষে মিঃ মোবারলি স্বয়ং বলিয়াছেন,—"আমি বলিতে পারি, যে চাকুরীতে মুসলমানের দাবী উপেক্ষিত হইয়াছে, সেই চাকুরীর ইতিহাস পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, সাধারণের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে এইরূপ করা হইয়াছে, অন্য কারণে নহে!" অর্থাৎ অযোগ্য মুসলমানের দাবী গ্রাহ্য করা হয় নাই। মুসলমান যোগ্য হইলে কায পায়েন না, এ কথা মিথ্যা। এই ভাবের মিথ্যা রটাইয়া স্বার্থান্বেষীরা অনর্থ ঘটাইতেছে, মুসলমানের অন্যায় আব্দার ও বাহানার বহর বাড়াইয়া দিতেছে। "মুসলমান" পত্র হিন্দু বিচারকের ন্যায়বিচার ও অপক্ষপাতিতার প্রতিও কটাক্ষপাত করিতে লজ্জানুভব করে নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ আলিপুরের পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, সি, গুপ্তের এবং প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার মিঃ জে, এন, গুপ্তের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। 'মুসলমান' পত্র নীচ কাপুরুষের মত তাঁহাদিগের অপক্ষপাতিতার প্রতি সন্দেহারোপ করিয়াছে এবং কমিশনার জে, এন, গুপ্তকে পদত্যাগ করিয়া হিন্দু-সভার সভাপতি হইতে বলিয়াছে। অন্য সময়ে দেখা যায়, সরকার তাঁহাদের কর্ম্মচারীদিগকে অযথা গ্লানি ও অপবাদ হইতে রক্ষা করিবার কালে একায় দশটা হয়েন, এ সময়ে নীরব কেন?

সে যাহা হউক, এই ভাবে এক শ্রেণীর শিক্ষিত মুসলমান যদি ইন্ধন যোগাইতে থাকে, তাহা হইলে মুসলমানের অন্যায় জিদ ও আব্দারের আগুন যে হু হু বাড়িয়া যাইতে থাকিবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে?

বরিশালে স্যার আবদর রহিম।

বরিশালে মুসলমান প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে এবং স্যার আবদর রহিম তাহার নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। বরিশালে বর্ত্তমানে সাম্প্রদায়িক বিরোধ যে ভাবে দেখা দিয়াছে, তাহাতে ঐ স্থানে ইহার অধিবেশনের আয়োজন করা কর্ত্তব্য ছিল না, এ কথা কেবল হিন্দুপক্ষ হইতে বলা হয় নাই, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সমাজের মুখপত্র 'ইংলিসম্যানও' স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। কেন না, যে বারুদের স্তূপ সঞ্চিত রহিয়াছে, তাহাতে একটি উত্তেজনার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিপতিত হইলেই দাবানলের সৃষ্টি করিতে পারে। যাহা হউক, স্যার আবদর-চালিত বাঙ্গালার মুসলমান সে আপত্তি গ্রাহ্য করেন নাই, অধিবেশন হইয়াছিল এবং স্যার আবদর তাঁহার অনুচর ও পার্শ্বচরবর্গ সহ তথায় উপস্থিত ছিলেন।

স্যার আবদর জীবনের শ্রেষ্ঠাংশ সরকারের সেবায় অতিবাহিত করিয়াছেন, পরিণত বয়সে রাজনীতির আসরে নামিয়াছেন। এ যাবৎ তিনি জনসাধারণের সহিত একরূপ সম্পর্কবিবর্জ্জিত ছিলেন, কায়মনোবাক্যে যাহার 'নুণ খাইয়াছিলেন, তাহার গুণ গাহিয়া আসিয়াছেন।' কিন্তু চাকুরীকালে এবং চাকুরীর অবসানে সরকারের কয়েকটা ব্যবহারে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া শেষ জীবনে হঠাৎ মুসলমান-সমাজের নেতৃত্ব পদের প্রার্থী হইয়াছেন এবং সাম্প্রদায়িক স্বার্থের মূর্ত্ত প্রতীকরূপে দেখা দিয়াছেন। তাহার পর যখন কুলকাঠির ব্যাপারে সরকারের নিকট আঘাতের উপর আঘাত পাইলেন, তখন একবারে হঠাৎ সরকারের বিপক্ষরূপে আসরে নামিলেন। এ জন্য তিনি কাউন্সিলের পদ ত্যাগ করিয়া পুনঃ নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইলেন, অর্থাৎ প্রথম নির্ব্বাচনকালে সরকারের সহিত সহযোগ করিয়া দ্বৈতশাসন সফল করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইয়াছিলেন বলিয়া উহা প্রত্যাখ্যান করিয়া সরকারের কার্য্যে স্বরাজীদের মত বাধা দিবেন, এই কথা ঘোষণা করিয়া পুনঃ নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইয়াছিলেন। মন্ত্রিত্বপদপ্রাপ্তির আশায় বঞ্চিত হওয়া এবং কুলকাঠির ব্যাপারে তাঁহার আবদার প্রত্যাখ্যাত হওয়া সরকারের বিপক্ষে এই ক্রোধের কারণ, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিল। তাই এবার অনেকে মনে করিয়াছিল, বরিশালে তাঁহার অভিভাষণে সরকারের বিপক্ষে দেশের লোকের সহিত একযোগে তাঁহার কার্য্য করিবার আভাস পাওয়া যাইবে। কিন্তু সেই অনুমান সফল হয় নাই। স্যার আবদর সরকারের প্রতি গোসার মুখোস পরিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই মুখোসের মধ্য দিয়াও বরিশালের স্যার আবদরে আলিগড়ের স্যার আবদরের সাম্প্রদায়িকতার ধিক্কারজনক মূর্ত্তি উজ্জ্বলরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

স্যার আবদর আমলাতন্ত্র সরকারের too wooden, too iron, too inelastic অর্থাৎ প্রাণহীন শাসনের প্রতি বিরূপ হইয়া আমলাতন্ত্র সরকারের চালা স্বেচ্ছাচারের (absolute, autocratic offi ial system) জন্য বিরক্ত হইয়া যে সরকারের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, তাহা তাঁহার অভিভাষণে প্রকাশ পায় নাই। বরং তিনি 'কুলকাঠি' ও 'পটুয়াখালীর' ব্যাপারে সরকারের ব্যবহারের তারতম্য দেখিয়া—ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ব্ল্যাণ্ডির সামরিক পুলিসের সহিত পটুয়াখালীর সত্যাগ্রহীর অধ্যাত্ম-শক্তির অপবিত্র মিলন দেখিয়া আত্মহারা হইয়াছেন এবং সেই হেতু একই রহিমী ক্রোধের লক্ষ্য করিয়াছেন,—সরকারকে, হিন্দু সত্যাগ্রহীকে এবং কংগ্রেসকে। সরকার পটুয়াখালীর সত্যাগ্রহীর অপরাধের বিচার করিতেছেন আদালতে, আর কুলকাঠির 'নিরীহ' মুসলমান জনতার বিচার করিয়াছেন বন্দুকের গুলীর মুখে, ইহাতে সরকারের উপর ক্রোধ। আর পটুয়াখালীর সত্যাগ্রহীরা হিন্দু, হিন্দুরা সরকারের এই কার্য্যের প্রতিবাদ করে নাই, কংগ্রেসও করে নাই, অতএব উহারা সকলেই মেদিনীপুরের নাইট রহিমের ক্রোধের পাত্র।

যিনি বাঙ্গালার বাঙ্গালী হইয়াও পটুয়াখালী ও কুলকাঠির মধ্যে প্রভেদ দেখিতে পান না, বাঙ্গালার মুসলমানদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে যাওয়া তাঁহার পক্ষে কেমন শোভন হয়? পটুয়াখালীর সত্যাগ্রহীরা নিরস্ত্র হইয়া কাহাকেও আক্রমণ না করিয়া আপনাদের ধর্ম্মগত অধিকার সাব্যস্ত করিবার অভিপ্রায়ে দুঃখবিপদ বরণ করিতেছে, আর কুলকাঠির মুসলমানরা লাঠি ও লেজা লইয়া দলবদ্ধ হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিসের কর্ত্তব্যপালনে বাধা দিতে গিয়াছিল, ম্যাজিষ্ট্রেটকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল,—এ পার্থক্যটুকুও কি সার আবদরের অনুধাবন করিবার মত বুদ্ধির অভাব হইয়াছিল?

অথচ এই কুলকাঠির কাণ্ডের উপর নির্ভর করিয়া সার আবদর অম্লানবদনে বলিয়াছেন, বরিশালেই যখন এই কাণ্ড ঘটিয়াছে, তখন বরিশালেই মুসলমান বৈঠকের অধিবেশন করা শোভন হইয়াছে। এই মনোবৃত্তি লইয়া তিনি সরকারের বিপক্ষে বাধা প্রদান করিবার জন্য স্বরাজী হিন্দুর সহিত একযোগে কার্য্য করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। এখন স্বরাজ্য দলপতি যতীন্দ্রমোহন ও তাঁহার অনুচররা বিবেচনা করিয়া দেখুন, তাঁহারা এই মিলনে যোগদান করিতে পারেন কি না। তাঁহারা মিলনের আশায় এ যাবৎ নানা প্যাক্ট ও চুক্তি করিয়াছেন, মিলনের আশায় সার আবদরের নির্ব্বাচনে বাধা প্রদান করেন নাই, অন্ততঃ স্বরাজ্য পক্ষ হইতে প্রাণ খুলিয়া এক জন প্রতিদ্বন্দ্বীকেও খাড়া করেন নাই। অথচ যাঁহার সহিত তাঁহারা মিলন প্রার্থনা করিতেছেন, তিনি কি প্রকৃতির লোক, তাহা তাঁহার অভিভাষণেই ব্যক্ত। যে কুলকাঠিতে উত্তেজিত মুসলমান জনতা নিরস্ত্র হিন্দু শোভাযাত্রাকে আক্রমণ করিতে সমবেত হইয়াছিল, সেই কুলকাঠির 'সহিদ'গণের স্বপক্ষে হিন্দুরা সরকারের বিপক্ষে আন্দোলনে যোগদান করে নাই বলিয়া সার আবদর কংগ্রেসের উপর অগ্নিবর্ষণ করিয়াছেন। স্বরাজী কংগ্রেস-কর্ম্মীরা কি তাঁহার এই অগ্নিবর্ষণ সমর্থন করেন? তাঁহারা এত দিন যে ভাবে মুসলমানের অন্যায় বাহানা সমর্থন করিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে হিন্দুর সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। তাঁহারা কি অতঃপর হিন্দুর আরও ক্ষতি করিতে চাহেন?

বাঙ্গালায় এখন সাম্প্রদায়িক বিরোধের মূলে দুইটি বিষয় বিশেষ লক্ষ্য করিবার আছে;—(১) মসজেদের সম্মুখে বাদ্য, (২) মুসলমানের হস্তে হিন্দু নারীনির্য্যাতন। সার আবদর এত দিন পরে এই দুই বিষয়ে নিজের অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। উহাতেও তাঁহার উৎকট সম্প্রদায়-প্রীতির পরিচয় পরিস্ফুট। সার আবদর অভিভাষণে স্বীকার করিয়াছেন যে, অপরের অধিকারে বাধা না দিয়া সকলের রাজপথ ব্যবহার করিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে উহাতে কাহারও বাধা দিবার অধিকার নাই অথচ সরকার বা পুলিস রাজপথ ব্যবহার করিবার বিশেষ ব্যবস্থা বাঁধিয়া দিবার পরেও মুসলমানরা যে বহুক্ষেত্রে হিন্দুর শোভাযাত্রায় বলপূর্ব্বক বাধা দিয়াছিল, তাহার বিপক্ষে সার আবদর সামান্য প্রতিবাদও করেন নাই। রাজরাজেশ্বরীর শোভাযাত্রায়, বরাহনগরের রথযাত্রার শোভাযাত্রায় এবং অন্যান্য কয়টি হিন্দু শোভাযাত্রায় বাধা প্রদানের বিপক্ষে তিনি একবারে নীরব কেন? মুসলমান দুর্ব্বৃত্তের হস্তে হিন্দু নারীর নির্য্যাতন সম্পর্কে সার আবদর যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও অদ্ভুত। পাষণ্ড কামান্ধ পশুর হস্তে যে সকল হিন্দু নারী নির্য্যাতিতা হইয়াছেন, তাঁহাদের ধর্ষণে সার আবদর বিন্দুমাত্র সমবেদনা প্রকাশ করেন নাই—মুসলমানধর্ম্মাবলম্বীর দ্বারা এই অনাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া লজ্জায় অধোবদন হয়েন নাই, কোনওরূপ দুঃখক্ষোভ প্রকাশ করেন নাই, বরং তৎপরিবর্ত্তে যাহারা জঘন্য পশুবৃত্তির পরিচয় দিয়া মুসলমান নামে কলঙ্ক অর্পণ করিতেছে, তাহাদের পক্ষে দুই চারি কথা বলিয়া তাহাদের অপরাধক্ষালনের চেষ্টা করিয়াছেন! ঐ সকল কথার আবৃত্তি করিয়া লেখনীর অমর্য্যাদা করিবার প্রয়োজন নাই। এমন মনোবৃত্তি লইয়া তিনি হিন্দুর সহিত একযোগে দেশের কায করিবার আশা রাখেন, ইহাই আশ্চর্য্য। পুরাকালে নাইটরা নারীর মর্য্যাদা রক্ষা করা ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করিতেন। এখনকার মেদিনীপুরের নাইট নারীধর্ষকের ওকালতী করিতেছেন। কি চমৎকার দৃশ্য!

শুদ্ধি ও সংগঠনে তাঁহার বিশেষ আপত্তি নাই, যত আপত্তি সেইখানে—যেখানে হিন্দুরা বলিতেছে,বাঙ্গালার অধিকাংশ মুসলমানই পূর্ব্বে হিন্দু ছিল, পরে মুসলমান হইয়াছে। তিনি কি তবে ইতিহাস মুছিয়া দিতে চাহেন? হিন্দু কি তাঁহার খাতিরে সত্যের অপলাপ করিয়া বলিবে যে, বাঙ্গালার মুসলমানরা ইরান, তাতার, আরব, তুর্কী হইতে আসিয়াছে?

কলিকাতার দুগ্ধ-সমস্যা

খাস কলিকাতার লোকসংখ্যা ১০ লক্ষেরও উপর। যদি গড়ে লোক প্রতি অর্দ্ধসের পরিমাণ গো-দুগ্ধ প্রয়োজনীয় বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে মোট প্রায় সাড়ে ১৩ হাজার মণ গো-দুগ্ধ কলিকাতায় নিত্য সরবরাহ হওয়া আবশ্যক। অথচ বর্ত্তমানে কলিকাতায় মোট মাত্র ৩ হাজার মণ দুগ্ধ সরবরাহ হয়। ইহার মধ্যে শিয়ালদার রেলে ৮ শত মণ এবং হাওড়ার রেলে ৫০ মণ দুগ্ধ আনীত হয়, অবশিষ্ট ২ হাজার মণের উপর দুগ্ধ কলিকাতা ও সহরতলী সমূহ সরবরাহ করিয়া থাকে। সুতরাং বুঝিতে হইবে, কলিকাতার প্রয়োজনানুরূপ দুগ্ধ কলিকাতায় সরবরাহ হয় না। বর্ত্তমানে যে দুগ্ধ সরবরাহ হয়, তাহাতে লোক প্রতি ১.৭ ছটাক দুগ্ধ সরবরাহ হয়। ফলে কলিকাতার স্বাস্থ্যহানি অবশ্যম্ভাবী। কেন না, গো-দুগ্ধের মত পুষ্টিকর খাদ্য মনুষ্যের আর কিছু আছে কি না সন্দেহ। বিশেষতঃ শিশুর পক্ষে গো-দুগ্ধ অমৃত তুল্য, এ কথা সকলেই জানে। সহরের শিশু মনুষ্যজীবনের প্রথমাবস্থায় এই প্রধান খাদ্য হইতে বঞ্চিত হয় বলিয়া জাতি হিসাবে আমাদের পুষ্টির বিশেষ অভাব ঘটিতেছে।

দুগ্ধ সরবরাহের ভার মূলতঃ গোয়ালাদের উপর অর্পিত। এই গোয়ালাদের অধিকাংশই হিন্দু। হিন্দু গোসেবক বলিয়া গর্ব্বানুভব করে বটে, কিন্তু প্রতীচ্যের গোপাদকরা গোসেবার বিষয়ে তাহাদিগের অপেক্ষা সকল অংশে শ্রেষ্ঠ। আমরা পূর্ব্বে বহুবার বলিয়াছি যে, প্রতীচ্যের গোপাদকরা এমন সুন্দর গো সেবা করে যে, তাহার ফলে তাহাদের দুগ্ধবতী গাভীর দেহ দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়, মনে হয়, যেন প্রাচীনকালে হিন্দু তপোবনের আশ্রমের পালিতা গাভীর বর্ণনা যেরূপ পাঠ করা গিয়াছে, তাহারই প্রতিচ্ছবি দেখা যাইতেছে। তাহাদের গোজাতি অর্দ্ধ-মণ, ৩০ সের পর্য্যন্ত দুগ্ধ দান করিয়া থাকে। আর বাঙ্গালার গোয়ালার গাভী অর্দ্ধসের অথবা বড় জোর ১ সের দুগ্ধ দান করিলে যথেষ্ট বলিয়া মনে হয়। ইহার কারণ এই যে, এ দেশের অধিকাংশ গোয়ালা মুখে হিন্দু হইলেও মূলতঃ ধর্ম্মভাব বর্জ্জিত। তাহারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ধার দিয়া যায় না। তাহাদের দেওয়া দুগ্ধ পান করিয়া লোকের স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হয় কি না, তাহার জন্য তাহারা বিন্দুমাত্র চিন্তা করে না। অতি অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় তাহারা সহরে দুগ্ধ আনয়ন করে। গোলা ভাঁড়ে বা হাঁড়ীতে খেজুরপাতা দিয়া তাহারা দুধ আনয়ন করে, সেই দুগ্ধে তাহারা যখন তখন হাত দেয়, খানাখন্দের অপরিষ্কার জল মিশায়, দুগ্ধের খোলা পাত্রের সম্মুখে বসিয়া তাহারা তামাক খায়, নিষ্ঠীবন পরিত্যাগ করে। ইহার উপর 'ফুঁকা' দেওয়ার প্রথা তাহাদের মধ্যে প্রচলিত। ফুঁকার ফলে গাভীর দুগ্ধদানের ক্ষমতা কালে লুপ্ত হয়, তখন গোয়ালা 'অকর্ম্মণ্য' গাভীকে কসাইয়ের হস্তে বিক্রয় করে। ইহাই অধিকাংশ গোয়ালার ধর্ম্মজ্ঞান!

এ অবস্থার আশু প্রতীকার প্রয়োজন। কলিকাতা কর্পোরেশন সহরে গোদুগ্ধের অভাব নিবারণার্থ নব-প্রতিষ্ঠিত 'মিল্ক সাপ্লাই কর্পোরেশনকে'

সাহায্য দান করিতে মনস্থ করেন। ইতঃপূর্ব্বে পুরাতন কর্পোরেশন একবার এই চেষ্টা করিয়াছিলেন। এতদর্থে ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া প্রত্যহ সহরে ৫০ মণ দুগ্ধ সরবরাহ করিবার প্রস্তাব হয়। সে প্রস্তাব কিন্তু কার্য্যে পরিণত হয় নাই। স্বরাজ্য দল কর্পোরেশনের কর্তৃত্ব হস্তগত করিবার পর নূতন উদ্যমে দুগ্ধ সরবরাহের চেষ্টা করা হয়। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় মিল্ক সাপ্লাই কর্পোরেশনের প্রতিষ্ঠা হয়। কলিকাতা কর্পোরেশন এই প্রতিষ্ঠানকে ৫০ হাজার টাকা বিনা সুদে কর্জ্জ দিবার এবং বৎসরে ৫ হাজার টাকা সাহায্য দিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। সে সাহায্য দেওয়াও হইয়াছে। তবে কর্পোরেশন একটা সর্ত্তও করিয়াছেন যে, ৬ বৎসরে ঋণের টাকা পরিশোধ করিতে হইবে এবং মিল্ক সাপ্লাই কর্পোরেশন প্রতি দিন দুগ্ধ সরবরাহের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া ৫ বৎসরে প্রতি দিন ৫ শত মণ দুগ্ধ সরবরাহ করিবেন, পরন্তু টাকায় ৩ সের হিসাবে দুগ্ধ বিক্রয় করিবেন। বলা বাহুল্য, সেই দুগ্ধ বীজাণু রহিত হইবে, এইরূপ সর্ত্তও ছিল।

দুগ্ধ প্রতিষ্ঠান প্রথমে ৫০ মণ দুগ্ধ সরবরাহ করিতে আরম্ভ করেন। বর্ত্তমানে প্রত্যহ ১ শত ২০ মণ দুগ্ধ সরবরাহ করিতেছেন। কিন্তু ইহা সমুদ্রে শিশির-বিন্দু তুল্য। এই প্রতিষ্ঠানটি বহুবাজার অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এইরূপ বহু প্রতিষ্ঠান সহরের অন্যান্য পল্লীতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে উদ্যোগী ধনীরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইলে ভাল হয়।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন

এ বৎসর এই সম্মেলনের অধিবেশন হইয়াছিল হাওড়ার নিকটবর্ত্তী মাজু গ্রামে। মফঃস্বলের সহরে এ যাবৎ সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া আসিয়াছে, পল্লীগ্রামে এই প্রথম। গ্রামে এত বড় একটা সম্মেলনের আয়োজন করিয়া গ্রামবাসীরা নিশ্চিতই বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন, কেন না, তাঁহারা এ বিষয়ে বাঙ্গালাকে সৎসাহস ও পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহাদের আতিথেয়তাও উল্লেখযোগ্য। আমাদের মনে আছে, এই ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রামের উৎসাহী যুবকবৃন্দ ২০৷২৫ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাদের পাঠাগারের সাংবৎসরিক উৎসবে আমাদিগকে কিরূপ সংবর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদেরই প্রাণপণ পরিশ্রমে মাজু

সম্মিলনশেষে সভাপতির বিদায়গ্রহণ [ফটোগ্রাফার মুখার্জি কোম্পানী।

আদর্শ গ্রামে পরিণত হইয়াছে। আজ তাঁহারা পরিণত বয়সে তাঁহাদের আদর্শ গ্রামে বঙ্গজননীর সেবা করিয়া সমগ্র বাঙ্গালার পল্লীকে দেখাইলেন যে পল্লীর উৎসাহী যুবকগণের আন্তরিকতায় অসম্ভবকেও সম্ভব করা যায়। এই সম্পর্কে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ডাক্তার প্রমথনাথ নন্দীর নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহার ঐকান্তিক যত্নে ও পরিশ্রমে মাজুর মত গ্রামে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশন সম্ভবপর হইয়াছিল।

এ বৎসরের সম্মেলনের আর একটি বিশেষত্ব আছে। এই সম্মেলনের সভাপতিত্ব লইয়া গোল বাধিয়াছিল। শেষ মুহূর্ত্তে দিনাজপুরের খনামখ্যাত উকীল শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। এই গোলযোগের মূলে বাঙ্গালার বর্ত্তমান রাজনীতিক জীবনের অধঃপতন পরিলক্ষিত হইয়াছে। মাজু সেই শোচনীয় অধঃপতনের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দিয়াছে।

গত বৎসর কৃষ্ণনগরে যখন প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশন হয়, তখন হইতেই বাঙ্গলা কংগ্রেসে বিরোধ ও দলাদলি দেখা দেয়। তখন হইতেই স্বরাজ্য দলে ভাঙ্গন ধরে। সেই ভাঙ্গনের পরিণাম কোথায় শেষ হইবে, তাহা এখনও ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। তবে এ বৎসর মাজুতে সেই ভাঙ্গনের প্রভাব যে বিশেষরূপে বিসর্পিত হইয়াছিল, তাহা সভাপতি নির্ব্বাচনের গোলযোগেই অনুভূত হইয়াছিল। বাঙ্গালার স্বরাজ্য দলের নেতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্তকে প্রথমে সম্মেলনের সভাপতির পদে নির্ব্বাচিত করা হয়। কিন্তু তৎপূর্ব্বে কলিকাতার প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্য্যালয়ে যতীন্দ্রমোহনী ও শাসমলী দলে যে সংঘর্ষ হইয়া যায় এবং যে সংঘর্ষের লজ্জাকর দুর্গন্ধে বাঙ্গালাদেশ ভরিয়া যায়,—সেই সংঘর্ষে কংগ্রেসে দল-ভাঙ্গাভাঙ্গি আরও প্রবল আকার ধারণ করে এবং উভয় দলের মধ্যে বাঙ্গালার কংগ্রেসী কর্তৃত্বাধিকার লইয়া ঘোর বিতণ্ডা চলে। কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার মহাশয় স্বয়ং আসিয়াও সে বিতণ্ডার অবসান করিতে অথবা বিরোধ মিটাইতে পারেন নাই। যেখানে নেতার দল ক্ষমতা ও প্রভুত্বের জন্য পরস্পর দ্বন্দ্ব করেন, জন্মভূমির মঙ্গলের উদ্দেশে সামান্য স্বার্থ বর্জ্জন করিতেও সম্মত হয়েন না, আপনার দ্বারা জন্মভূমির মুক্তি সাধিত না হইলে অন্য কাহারও দ্বারা সেই মুক্তি সাধিত হইলে তাহাতে সম্মত নহেন, সেখানে বিরোধ কিরূপে মিটিবে?

এই বিরোধ হেতু মাজুতে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশনে দুর্যোগ উপস্থিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত সভাপতির পদে মনোনীত হয়েন। কিন্তু তিনি বলেন যে, কংগ্রেসে উভয় পক্ষে একটা মিটমাট না হইলে তিনি ঐ পদ গ্রহণ করিবেন না। বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় কমিটীর সদস্য নির্ব্বাচনব্যাপার লইয়া উভয় পক্ষে বিরোধ উপস্থিত হয়, উহার সহিত বাঙ্গালার কংগ্রেসের কর্তৃত্ব ও কংগ্রেস-তহবিলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। উভয় পক্ষই এই দুইটি হস্তগত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর। উভয় দলই নিজ নিজ কংগ্রেস কমিটী নির্ব্বাচন করিয়া ফেলিয়াছেন। কাযেই যখন মাজুতে কংগ্রেসের অধিবেশনের কথা স্থির হইল, তখন দলাদলির একটা মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত যতীন্দ্রমোহনের দল এই অধিবেশন অনুমোদন করিলেন না, যতীন্দ্রমোহনও সভাপতির পদ প্রত্যাখ্যান করিলেন। কিন্তু বাঙ্গালার জনসাধারণ বুঝিতে পারিল না, কংগ্রেসের দুই দলে বিরোধ থাকিলেও কি কারণে কংগ্রেসের অধিবেশন স্থগিত থাকিবে। কংগ্রেস জাতীয় প্রতিষ্ঠান, উহা এ দলের বা ও দলের নিজস্ব সম্পত্তি নহে।

সুতরাং দেশে বর্ত্তমানে যে সঙ্কটসঙ্কুল অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে এই প্রতিষ্ঠানে দেশের প্রতিনিধিগণ সমবেত হইয়া প্রতীকারের সদুপায় চিন্তা করিবেন, ইহা সমীচীন। যাঁহারা অভিমানভরে দূরে রহিলেন, তাঁহারা কি উহা দ্বারা দেশমাতৃকার সেবা করিবার প্রবৃত্তি দেখাইলেন? গৃহবিরোধের অজুহতে দেশের সঙ্কটকালে দেশ-সেবা হইতে বিরতির অপরাধ অমার্জ্জনীয়, এ কথা তাঁহারা কি জানেন না?

যাহা হউক, সুদূর দিনাজপুর হইতে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়া দেশের প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন। তিনি সভাপতিরূপে কংগ্রেসে বিরোধের পরিবর্ত্তে শান্তি আনয়নের যথেষ্ট প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি সফলকাম হইতে পারেন

অভ্যর্থনা-সমিতি। বাম হইতে দণ্ডায়মান—শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ বসু, পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী, সত্যসাধন গায়েন, ডাক্তার অখিলকৃষ্ণ দত্ত, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দত্ত। বাম হইতে উপবিষ্ট—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ বসু, সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরমোহন রায়, সভাপতি ডাক্তার প্রমথনাথ নন্দী, শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য্য, অজিতকুমার মল্লিক, ধাকদাপ্রসাদ নন্দী। বাম হইতে ভূমির উপর উপবিষ্ট—শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র নন্দী, অপ্রকাশ গায়েন। [ফটোগ্রাফার মুখার্জ্জি কোম্পানী।

নাই। তাহাতে তাঁহার দুঃখের কারণ নাই, তিনি যে যথার্থ দেশপ্রেমিকের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার সান্ত্বনা।

অভিভাষণে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র তিনটি প্রধান বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছিলেন,—(১) সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও সংঘর্ষ, (২) কংগ্রেসে বিরোধ ও সংঘর্ষ, (৩) বিনা বিচারে অবরুদ্ধ বঙ্গসন্তান। এই তিনটিই পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ। সাম্প্রদায়িক ও রাজনীতিক বিরোধের ফলে আমরা বিচ্ছিন্ন বিবদমান শক্তিহীন জাতিতে পরিণত হইয়া পড়িয়াছি বলিয়াই সরকার জনমত উপেক্ষা করিয়া দেশের কর্ম্মীদিগকে বিনা বিচারে আটক করিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন, নতুবা ১৯২১ খৃষ্টাব্দে আমরা যেরূপে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছিলাম, সেরূপ থাকিলে ইহা সম্ভবপর হইত না।

কিন্তু "এ সব দৈত্য নহে ত তেমন।" যেমন রোগ, প্রতীকার উপায়ও তেমনই চাই। কেবল মুখের অনুরোধে নিবেদনে কোন ফল হইবে না। ইহা হইতে কড়া উপায় চাই। আমরা চাই, আবার কংগ্রেসের সদস্যমণ্ডলীর এক অধিবেশন হউক। সেই অধিবেশনে অধিকাংশ সদস্যের মতে যাঁহাদিগকে কংগ্রেস কমিটীর সদস্য নির্ব্বাচন করা হইবে, তাঁহারা প্রাদেশিক কংগ্রেসের কার্য্যনির্ব্বাহের ভার গ্রহণ করুন। আবার নূতন ছাঁচে কংগ্রেসকে গড়িয়া তোলা হউক। দেশ কায চাহে, দলাদলি চাহে না। যাঁহারা নীচের দিক হইতে গ্রাম গঠন করিতে আত্মনিয়োগ করিতে প্রস্তুত, তাঁহাদিগকে কংগ্রেসের ভার দেওয়া হউক—কেবল নামের খাতিরে লোক বাছাই করিলে চলিবে না। যাঁহাদের সে অবসর আছে—যাঁহারা গ্রামগঠনের সময় পাইবেন, যাঁহাদের দেশের

মাজু বৈঠকের শিবির [ফটোগ্রাফার মুখার্জ্জি কোম্পানী।

সভাপতি মহাশয় সাম্প্রদায়িক ও রাজনীতিক বিরোধ যে আমাদের সর্ব্বনাশের মূল, তাহা বক্তৃতায় বুঝাইতে ত্রুটি করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, নিজ নিজ সম্প্রদায়ের ও দলের স্বার্থ কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়া লইতে দেশবাসী উদ্যত বলিয়া তৃতীয় পক্ষ লাভবান্ হইতেছে—আর দেশবাসী ভ্রাতৃবিরোধের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ কারাদণ্ড ভোগ করিতেছে। এ কথা তিনি বুঝাইয়াছেন বটে, কিন্তু ইহার প্রতীকারোপায় নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। তিনি দেশবাসীকে কেবল সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছেন, যেন তাঁহাদের সমবেত চেষ্টায় এই বিদ্বেষ ও বিরোধ-বহ্নি নির্ব্বাপিত হয়—উহা আশু প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। কংগ্রেস কমিটীর বিবদমান পক্ষদ্বয়কে তিনি নিবেদন করিয়াছেন,—"দেশই আমাদের একমাত্র কাম্য—দেশ আগে, Constitution পরে—দেশের জন্য আমরা বিবাদ মিটাইয়া সরকারকে দেখাইয়া দিই যে, আমরা নিজেরা বিবাদ মিটাইতে সমর্থ।"

কার্যে একাগ্রতা ও একনিষ্ঠতা আছে, এমন কর্ম্মিগণকে কংগ্রেসের ভার দিতে হইবে।

সাম্প্রদায়িক বিরোধের অবসান করিতে হইলে কেবল মুখে বলিলে হইবে না যে, এস ভাই, আমরা আমাদের বিরোধ মিটাইয়া লই। উহাতে বিরোধের অবসান হইবে না। কায চাই। এমন ভাবে কায করিতে হইবে, যাহাতে উভয় সম্প্রদায় পরস্পর শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইবে। নতুবা এক পক্ষ বলবান্ ও অপর পক্ষ দুর্ব্বল থাকিলে চিরদিন এক পক্ষের আবদার ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইবে, অপর পক্ষ ভয়ে ভয়ে অধিকারের উপর অধিকার হস্তচ্যুত করিতে বাধ্য হইবে। উহাতে প্রকৃত মিলন সম্ভবপর হইবে না। এই হেতু ডাক্তার মুঞ্জে ও লালা লজপৎ রায় যাহা বলিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। হিন্দুসংগঠন ব্যতিরেকে হিন্দু শক্তিসম্পন্ন হইবে না। সেই সংগঠনের সদুপায় নির্দ্ধারণ করিতে

হইবে, তাহাতে একাগ্রচিত্ত হইতে হইবে, তন্ময় হইয়া স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে, তবে সাধনায় সিদ্ধিলাভ সম্ভবপর হইবে। অন্যথা শত অভিভাষণেও প্রকৃত কায হইবে না।

যখন আমরা পরস্পর শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইব, তখন আমাদের মধ্যে প্রকৃত মিলন সংঘটিত হইবে, এবং তখন আমাদের সম্মিলিত দাবী কোন সরকার উপেক্ষা করিতে পারিবে না। তখন রাজনৈতিক বন্দীদিগের মুক্তি বা স্বরাজলাভের জন্য আমাদিগকে ভাবিতে হইবে না।

বীর-পূজা

এবার প্রায় ভারতের সকল প্রদেশেই শিবাজী স্মৃতিপূজা হইয়াছে। শিবাজী ধর্ম্মবীর, কর্ম্মবীরও বটে। তিন শত বৎসর পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রে এই দেশপ্রেমিক স্বাধীনতাসেবক জননীর সুসন্তানের আবির্ভাব হইয়াছিল—তাঁহার পুণ্যস্পর্শে দেশ ও জাতি ধন্য হইয়াছিল। আজ আমরা তাঁহার দেশবাসী তাঁহার স্মৃতিপূজা করিয়া আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিতেছি। শিবাজী উৎসব এ দেশে যে ছিল না, তাহা নহে, তবে তাহা ছিল সীমাবদ্ধ, এবারের স্মৃতিপূজা ব্যাপক। যে জাতি দেশের স্বাধীনতার প্রতীক দেশপ্রেমিকের স্মৃতিসম্মানের মর্য্যাদা বুঝিতে শিখে, সে জাতি মরণোন্মুখ হইলেও তাহার মরণ নাই।

দেশের প্রায় সর্ব্বত্রই নির্ব্বিঘ্নে স্মৃতিপূজা হইয়া গিয়াছে, কেবল বরদারাজ্যে ও বৃটিশ ভারতের দুই এক স্থানে ক্ষুদ্রপ্রাণ মুসলমান এ পূজায় বাধা দিতে অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু বিরাট ব্যাপারের মধ্যে সে অতি তুচ্ছ, তুচ্ছাদপি তুচ্ছ। মাদ্রাজের মুসলমান স্মৃতিপূজার উৎসবে আন্তরিক যোগদান করিয়া সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন।

কেন তাঁহারা এ উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন? শিবাজী হিন্দু, তিনি মুসলমান মোগল সাম্রাজ্যের এবং দাক্ষিণাত্যের মুসলমান রাজ্যসমূহের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। বাদশাহ ঔরঙ্গজেব তাঁহাকে 'পার্ব্বত্য মূষিক', 'চোর', 'বদমাস' আখ্যা দিয়াছিলেন। ইংরাজের ইতিহাসও তাঁহাকে কুটিল চক্রী ও সুবিধাবাদী এবং নীতিজ্ঞানহীন বলিয়া চিত্রিত করিয়াছে। অথচ এ হেন লোকের স্মৃতিসম্মানরক্ষার্থ মাদ্রাজের মুসলমান আজ ব্যগ্র ও উৎসাহান্বিত কেন?

এইখানেই শিবাজীর জীবনের গূঢ় রহস্য নিহিত। মিঃ খোদাবক্সের মত শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত মুসলমান বলিয়াছেন, "শিবাজী ভারতের গৌরব।" তিনি মুসলমান হইয়াও মুসলমান মোগল সাম্রাজ্যের পতনের মূল শিবাজী মহারাজকে ভারত-গৌরব বলিতেছেন কেন, এইটুকু বুঝিতে পারিলেই শিবাজীর পূত পবিত্র চরিত্র শত শতদল-সৌরভে আমাদের সম্মুখে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিবে। মিঃ খোদাবক্স বলিয়াছেন—"আকবর যেমন সকল ধর্ম্মে সহনশীল ছিলেন, ফৈজী যেমন বিদ্যায় অমিততেজস্বী ছিলেন, শিবাজী তেমনই স্বদেশপ্রেমের পূর্ণ অবতার ছিলেন। তিনি মহারাষ্ট্র দেশকে বিদেশীর শাসনশৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার জন্য আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন। সেই 'বিদেশী' মুসলমান বলিয়া, মুসলমানের তাহাতে ক্রুদ্ধ বা বিরক্ত হইবার কারণ নাই। মুসলমানের এমন সঙ্কীর্ণতা হৃদয়ে পোষণ করা কর্ত্তব্য নহে। জাতীয়তার ভিত্তির উপর মুক্তিসৌধ প্রতিষ্ঠিত হয়। শিবাজী তাহাই করিয়াছিলেন। তাঁহার অদম্য উৎসাহ, বিশ্ববিজয়ী সাহস, বজ্রকঠোর প্রতিজ্ঞা, সামান্যভাবে জীবনযাপনের প্রবৃত্তি, কোমল হৃদয়, সকল ধর্ম্মে সহনশীলতা, সর্ব্বোপরি জ্বলন্ত দেশপ্রেম তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।"

বস্তুতঃ এই হেতু শিবাজী যুগমানব। তিনি কেবল মারাঠা বীর বা হিন্দুরক্ষক ছিলেন না। তাঁহার নানা গুণ তাঁহাকে যুগমানব করিয়াছিল, তাঁহার রাজ্য রামরাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। শিবাজী রাজ্য জয় করিয়া স্বয়ং বিলাসের ক্রোড়ে থাকিয়া রাজ্য ভোগ করেন নাই, তাঁহার গুরু রামদাসকে রাজ্য দান করিয়া স্বয়ং ত্যাগী সন্ন্যাসীর ন্যায় বাস করিতেন। তিনি প্রজার সেবক ছিলেন, তাঁহার রাজ্য 'দেবতা-ব্রাহ্মণের' রাজ্য ছিল। কালিদাসের বর্ণিত রঘুবংশীয়দের মত তিনি প্রজার পিতা ছিলেন। তাঁহার নিকট বর্ণ-ধর্ম্মের প্রভেদ ছিল না, তিনি গুণের আদর করিতেন। তাঁহার নৌসেনাপতি ছিলেন মুসলমান সিদ্দি মিস্রি, তাঁহার মুন্সী ছিলেন মুসলমান কোয়াসি হাইদার, তাঁহার বহু মুসলমান সেনানায়ক ও সেনাপতি ছিলেন। তিনি মুসলমানের মসজেদ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন, মুসলমানের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, পরন্তু কেলেসির পীরের মত বহু মুসলমান সাধু-ফকীরকে যথেষ্ট ধনরত্ন ও ভূমি দান করিয়াছিলেন। অধ্যাপক যদুনাথ সরকার শিবাজীর গুণগান করিয়া বলিয়াছেন যে, "শিবাজীকে হিন্দু-রক্ষক বলিলে ভুল করা হয়, ইতিহাসের সত্য অপলাপ করা হয়।"

অধ্যাপক যদুনাথ বলিয়াছেন, শিবাজীর লোক চিনিবার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। এ জন্য তিনি তাঁহার রাজ্যে উপযুক্ত রাজকর্ম্মচারিসমূহ নিযুক্ত করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরেরা তাহা পারেন নাই বলিয়াই তাঁহাদের রাজ্যের পতন হইয়াছিল।

শিবাজীর আর এক গুণ ছিল, তিনি ন্যায়ধর্ম্মের তুলাদণ্ডে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন, প্রজারক্ষা ও প্রজাশাসন করিতেন। তাঁহার কোন মহারাষ্ট্রীয় সেনানী এক পাটলনীর সতীত্ব হরণ করিয়াছিল বলিয়া তিনি তাহাকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। মুসলমান ঐতিহাসিক কাফি খাঁও শিবাজীর সকল ধর্ম্মে সহনশীলতা, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র এবং ন্যায়বিচারের শতমুখে সুখ্যাতি করিয়াছেন,—ইহা অধ্যাপক যদুনাথ তাঁহার শিবাজী স্মৃতির বক্তৃতায় বলিয়াছেন। কথিত আছে, তাঁহার কোনও সেনাপতি এক মোগল সেনাপতির পরমা সুন্দরী যুবতী কন্যাকে বন্দিনী করিয়া তাঁহাকে উপহার দিলে শিবাজী পরম সমাদরে সেই কন্যাকে তাঁহার পিতার হস্তে প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন।

এমন আদর্শ দেশপ্রেমিকের কীর্ত্তিস্মরণে ও কীর্ত্তনেও পুণ্য আছে। আজ আমাদের জাতীয় জাগরণের দিনে এই ভাবের বীরপূজায় জাতি ও দেশ মুক্তির পথের সত্য সন্ধান পাইবে, এমন আশা করা অসঙ্গত নহে।

কলিকাতায় অ-মুসলমান শোভাযাত্রা

এবার কলিকাতায় পর পর তিনটি অ-মুসলমান শোভাযাত্রা নির্ব্বিঘ্নে পথাতিক্রম করিয়াছে। গত বৎসর শিখ-সঙ্গতের মিছিলে বাধা পড়িয়াছিল, এ জন্য উহার দিন পিছাইয়া দিতে হয়। এ বৎসর শিখগুরু নানকের জন্মোৎসব উপলক্ষে ঐ মিছিল ২৯শে চৈত্র হ্যারিসন রোডের বড় শিখ-সঙ্গত হইতে বাহির হইয়া মল্লিক ষ্ট্রীট, কটন ষ্ট্রীট, চিৎপুর রোড, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, সৈয়দসালী লেন ও সেণ্ট্রাল এভেনিউ হইয়া মধ্যি-শিখ-সঙ্গতে উপস্থিত হইয়াছিল। এবার কোন বাধা পড়ে নাই। গত বৎসর চৈত্র-সংক্রান্তির দিন চড়কের সঙ বাহির হয় নাই। মুসলমান ও হিন্দুর মধ্যে বিরোধের অজুহাতে তদানীন্তন পুলিশ কমিশনার উহা বন্ধ করিয়াছিলেন। এবার সঙ বাহির হইয়াছিল, তবে যাত্রার চিরাচরিত পথ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। গত বৎসর আর্য্য-সমাজের মিছিল হ্যারিসন রোডের দীনু চামড়াওয়ালার মসজেদের নিকট পৌছিলে মসজেদের সম্মুখে বাদ্যসমস্যা লইয়া মুসলমানেরা বিবাদ বাধাইয়াছিল। ফলে দাঙ্গা হয়। সেই দাঙ্গা প্রায় দুই মাসকাল স্থায়ী হইয়াছিল। এবার ১৯নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ আর্য্য-সমাজ মন্দির হইতে ঐ মিছিল বাহির হইয়া কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, কলুটোলা ষ্ট্রীট, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, হ্যারিসন রোড, ক্রশ ষ্ট্রীট, চিৎপুর রোড ও মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট দিয়া আর্য্য-সমাজ মন্দিরে ফিরিয়া যায়। পথে দুইটি মসজেদ পড়িয়াছিল,—

একটি চিত্তরঞ্জন এভেনিউ ও হ্যারিসন রোডের মোড়ে অবস্থিত মসজেদ, অপরটি হ্যারিসন রোডের দীনু চামড়াওয়ালার মসজেদ। এবার কোথাও এই মিছিলে বাধা পড়ে নাই, দাঙ্গা-হাঙ্গামাও হয় নাই। অথচ আর্য্যসমাজীর অ-মুসলমান শোভাযাত্রা যখন গত বৎসর সহরের পথে বাহির হইয়াছিল, তখন সহরে রক্তগঙ্গা বহিয়াছিল। এই প্রভেদের কারণ কি? গত বৎসর এক শোভাযাত্রার সম্মুখে মুসলমানরা পথে বসিয়া নমাজ আরম্ভ করিয়াছিল এবং নানা প্রকারে শোভাযাত্রায় বাধা দিয়াছিল। সে অবসর তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল বলিয়াই তাহাদের বুক বলিয়া গিয়াছিল। তাহার পর গত বৎসর একটি শোভাযাত্রা নাই। শুনা যায়, তিনি কোনও মসজেদে লোক জমায়েৎ হইতে দেন নাই। পরন্তু বস্তীর অলিগলিতে কড়া পুলিস পাহারা রাখিয়াছিলেন। শোভাযাত্রা পথাতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইবার পরেও বহুক্ষণ পর্য্যন্ত সে ব্যবস্থা বলবতী ছিল। কাযেই এবার বস্তীর "গরম" লোকরা মানুষের রক্তে আবীর খেলার সুযোগ প্রাপ্ত হয় নাই। যে দীনু চামড়াওয়ালার মসজেদের সম্মুখে গত বৎসর রক্তারক্তি হইয়াছিল, এবার তাহার সম্মুখ দিয়া শোভাযাত্রা বাজনা বাজাইয়া পথাতিক্রম করিয়াছিল। লর্ড লিটন নাখোদা মসজেদের সম্মুখে বাজনা বন্ধ করিয়া মুসলমানের আব্দার রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তাহাতেই বোধ হয়, মুসলমানের বুক বলিয়া

মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটের সম্মুখে শিখ-মিছিলের দৃশ্য

পথাতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইবার পর পুলিস "গরম" বস্তীগুলির উপর নজর রাখা প্রয়োজন বলিয়া মনে করে নাই বলিয়া অনর্থ বাধিয়াছিল, বস্তীর গুণ্ডারা অলিগলি হইতে বাহির হইয়া নিরীহ পথিকের উপর ছোরা চালাইয়াছিল, লাঠী ও ইটপাটকেল লইয়া পথের নিরস্ত্র জনতাকে আক্রমণ করিয়াছিল। পুলিস যখন শোভাযাত্রাকে সশস্ত্র হইয়া বাহির হইতে দেন নাই, পথিককেও আত্মরক্ষার জন্ত অস্ত্র ব্যবহার করিতে দেন নাই, তখন তাঁহাদের উচিত ছিল, বস্তীর "বীরপুরুষদিগকে"ও সঙ্গে সঙ্গে নখদন্তহীন করা। তাহা করেন নাই বলিয়া পুলিস খুন-জখম নিবারণ করিতে পারেন নাই। এবার কমিশনার সার চার্লস টেগার্ট পূর্ব্বাহ্নে সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া কোনও গোলযোগ ঘটে গিয়াছিল। তাই তাহারা সকল মসজেদের সম্মুখে সকল সময়ে বাজনা বন্ধ করিবার আব্দার ধরিয়াছিল। এই অন্যায় আব্দার এবার রক্ষিত হয় নাই। ইহা সার চার্লস টেগার্টের নিরপেক্ষতার পরিচায়ক। যদি এই ভাবে সকল পুলিস-কর্ম্মচারী বাঙ্গালার পল্লী-মফঃস্বলে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিতে পারেন, তাহা হইলে দুষ্ট সমাজদ্রোহীর গড়াপেটা আন্দোলন অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইতে পারে। কাহারা "গরম", কাহারা অন্যায় জিদ ধরিয়া অপরের ন্যায্য ধর্ম্ম কার্য্যে বাধা প্রদান করিতে ছোরা-লাঠী লইয়া পথে দেখা দেয়, তাহা বস্তী চৌকী দেওয়া হইতেই বুঝা যায়। সুতরাং এই সকল আইনভঙ্গকারীর উপর পূর্ব্বাহ্নে নজর রাখিলে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বা শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা থাকে না।

বর্ষ-কথা

১৩৩৩ সাল তাহার সুখ-দুঃখ, সম্পদ-বিপদ এবং আশা-নৈরাশ্যের বোঝা লইয়া কালসাগরের অতল তলে তলাইয়া গেল, আবার নববর্ষ অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ লইয়া আমাদের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইল। যে বৎসর গত হইল, তাহার লাভ-লোকসান খতাইয়া দেখিলে বুঝিতে পারি, জাতি হিসাবে আমরা কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে আমাদের জাতীয় জীবনে যে স্পন্দন আসিয়াছিল, তাহার কাহিনী এখন ইতিহাসের কুক্ষিগত—সে যেন আমাদের জীবনে স্বপ্ন-কাহিনী বলিয়াই এখন অনুমিত হয়। তাহার পর আমাদের জাতীয় জীবনে যে অবসাদ আসিয়াছে, তাহার রেশ গত বৎসরে চরমে উপনীত হইয়াছে। সে হিসাবে আমরা গত বৎসরে যত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি, একটা জাতির সমগ্র জীবনে তত ক্ষতি কখনও দেখা দিয়াছে কি না সন্দেহ। সাম্প্রদায়িক ও রাজনীতিক স্বার্থসংঘর্ষের হলাহলে আমরা জর্জ্জরিত হইয়াছি—সে জন্য আমাদের যে শক্তির অপচয় হইয়াছে, তাহার ফল স্বেচ্ছাচারমূলক আমলাতন্ত্র শাসন উপভোগ করিতেছে। যুগাবতার মহাত্মা গন্ধী আমাদের মুক্তিসমরে অগ্রদূত হইয়া যে ত্যাগের পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে আমরা বিচ্যুত হইয়া ক্ষমতা ও অধিকারের লোভে আকৃষ্ট হইয়াছি এবং তাহার ফলে আমাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক স্বার্থসংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে তাহার চরম পরিণতি গত ১৩৩৩ সাল বক্ষে ধারণ করিয়া আমাদের জাতীয় জীবনের কলঙ্কের কথা ঘোষণা করিতেছে।

তবে আমাদের এই গরল হইতে জগতে অন্যত্র অমৃত উদ্ভূত হইয়াছে। যে সময়ে আমরা পরস্পর স্বার্থ-সংগ্রামে ব্যস্ত রহিয়াছিলাম সে সময়ে সুদূর প্রাচ্যে আর এক বিরাট প্রাচীন সভ্য জাতি মুক্তিসমরে জয়যাত্রার পথিক হইয়াছে—সে মহাচীন। এ যুগে জগতে সর্ব্বাপেক্ষা লক্ষ্য করিবার ঘটনা—গত বৎসরে মহাচীনের জাগরণ। ইহার সহিত বিশ্বব্যাপী জার্ম্মাণ যুদ্ধের অথবা জাপানের ভীষণ ভূমিকম্পেরও তুলনা হইতে পারে না। এ জাগরণ ইতিহাসের পত্রাঙ্কে তাহার অমর ছাপ অঙ্কিত করিয়া যাইবে সন্দেহ নাই। কতকাংশে ইহার সহিত তুলিত হইতে পারে ভারতে মহাত্মা গন্ধীর অসহযোগ আন্দোলন; আর তুলিত হইতে পারে আয়ার্ল্যাণ্ডের ও তুর্কীর মুক্তিসমর, মরক্কো ও পারস্যের অভ্যুত্থান এবং মিশরের জাতীয়তার বিকাশ। কিন্তু চীনের জাগরণ তুলনায় এ সকলকে বহু পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়াছে।

ইহা হইতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সভ্যতার সংঘর্ষ যে অনুসূচিত হইতেছে না, তাহা কে বলিতে পারে? বহু প্রাচীন সভ্য চীনকে যুরোপের সাম্রাজ্যগর্ব্বী শক্তিপুঞ্জ এত দিন ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিতেছিলেন, তাহাকে পদদলিত করিয়া আপনাদের স্বার্থসাধন করিয়া আসিয়াছেন। যুরোপের বাহুবল-দৃপ্ত মদগর্ব্বিত জাতিরা শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, যিশু ও মহম্মদের জন্মভূমি—বহু সভ্যতা ও শিক্ষার আদিস্থান এই প্রাচীন এসিয়ার জনগণকে বর্ব্বর ও অসভ্য বলিয়া অবজ্ঞা ও তুচ্ছ-তাচ্ছীল্যের দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিতেছিল। আজ মহাচীন ভবিষ্যদর্শী যুগপুরুষ ডাক্তার সান ইয়াটসেনের মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া প্রতীচ্যের জুজুর মিথ্যা আতঙ্ক হইতে আপনাকে মুক্ত করিতেছে এবং তাহার দৃষ্টান্তে অন্যান্য নিপীড়িত জাতি অনুপ্রাণিত হইয়া নিজ নিজ পথে মুক্তির সন্ধান করিতে ব্যগ্র হইতেছে,—ইহা জগতের পক্ষে মহা লাভ। আজ তাই মুক্তিকামী চীনের বিপক্ষে ভারতের সেনা ভারতের ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছে বলিয়া ভারত বক্ষের মধ্য হইতেও তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছে।

গত বৎসর আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। এই বৎসর হইতে আমাদের ভাগ্যনিয়ন্তা শাসক জাতি ক্রমশঃ অধিকপরিমাণে জনমতের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যে সাম্প্রদায়িক স্বার্থসংঘর্ষের চরম পরিণতি গত বৎসর স্বামী শ্রদ্ধানন্দের হত্যাকাণ্ডে পর্য্যবসিত হইয়াছে, তাহার এবং জাতীয় দলের মধ্যে রাজনৈতিক স্বার্থসংঘর্ষের সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা উত্তরোত্তর রুদ্র-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, সমগ্র জাতির তীব্র প্রতিবাদের বিরুদ্ধেও তাঁহারা বে-আইনী আইনে আটক রাজবন্দীদিগের মুক্তির প্রার্থনায় কর্ণপাত করেন নাই। অধঃপতিত জাতি আমরা—এ অপমানও গলাধঃকরণ করিয়া পরস্পর রক্তারক্তি করিয়া মরিতেছি!

গত বৎসরের ইহাই আমাদের লাভ-লোকসান। সুতরাং খতাইয়া দেখিলে আমাদের লাভ অপেক্ষা লোকসানই সমধিক বলিতে হইবে। ১৩৩৩ সালের বৈশাখ হইতে বর্ষগণনা করিলে দেখিতে পাই, ঐ মাসে কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিন্দুমাত্র উপশম হয় নাই। এত দীর্ঘকালব্যাপী হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা মুসলমান রাজত্বকালেও কখনও সংঘটিত হয় নাই। ইহা বাঙ্গালা সরকারের পক্ষে কলঙ্কের কথা। আর্য্যসমাজীদের শোভাযাত্রায় যে বিবাদের উৎপত্তি, তাহা হিন্দু-মুসলমান বিরোধে পর্য্যবসিত হইল। এই দাঙ্গায় বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই কয়টি;—(১) অজ্ঞ গুণ্ডাগণের পশ্চাতে চতুর লোকের বুদ্ধিবল আছে, (২) শিক্ষিত বাঙ্গালী হিন্দু তরুণরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া আপনাদের ধর্ম্ম ও মান-ইজ্জত রক্ষার্থ গুণ্ডাদের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছিল—মেছুয়াবাজার পল্লীতে যতীন্দ্রমোহন সুর ও চন্দ্রকান্ত দেব নামক দুইটি বাঙ্গালী যুবক প্রাণ পর্য্যন্ত বলি দিয়াছিল, (৩) গুপ্ত ইস্তাহার বিলি ও সম্প্রদায়বিশেষকে অন্য সম্প্রদায়ের বিপক্ষে সংবাদ-পত্রের রচনা ও বক্তৃতাদির দ্বারা উত্তেজিত করা হইয়াছে। বৈশাখ মাসের ১লা তারিখে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা করেন। এই মাসে দাঙ্গা উপলক্ষে সরকার দেশীয় চালিত সংবাদপত্র সমূহের সম্বন্ধে যেরূপ কঠোরতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাতে মনে হইয়াছিল, বুঝি বা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সঙ্কুচিত করিবার চেষ্টা হইতেছে।

কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর অধিবেশন হইয়াছিল। এই সম্মিলনীতে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার আলোচনা হইয়াছিল। এই সম্মিলনীতেই বাঙ্গালার স্বরাজ্যদলের ভাঙ্গন আরম্ভ হইয়াছিল।

জ্যৈষ্ঠ মাসের ১৮ই তারিখ রাজরাজেশ্বরী প্রতিমা বিসর্জ্জনের শোভাযাত্রা পুলিসের আদেশে বন্ধ হইয়াছিল। এই মাসে আলিপুর জেলে গোয়েন্দা পুলিসের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট রায় বাহাদুর ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় নিহত হয়েন।

আষাঢ় মাসের ১.ই তারিখে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের একমাত্র পুত্র চিররঞ্জন অকালে ইহলোক ত্যাগ করেন। ১১ই ও ২ই আষাঢ় কাঁঠালপাড়ায় 'বঙ্কিম-ভবনে' বঙ্কিমসাহিত্য-সম্মিলনীর চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। ইহা দ্বারা বাঙ্গালার বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ লেখকের স্মৃতিসম্মান রক্ষিত হইতেছে। এই আষাঢ় মাসে হিন্দুদিগের উপর মুসলমানের অত্যাচার চরমে উপনীত হইয়াছিল। দেড় হাজার মুসলমান অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত হইয়া কুচকাওয়াজ করিয়া গ্রামের পর গ্রাম আক্রমণ করিয়াছিল, সম্ভ্রান্ত ধনী হিন্দুর গৃহ লুণ্ঠন ও অগ্নিদগ্ধ করিয়াছিল, হিন্দুকে বলপূর্ব্বক মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিল এবং হিন্দু নারীর লাঞ্ছনা করিয়াছিল।

শ্রাবণ মাসে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভা মন্তব্য গ্রহণ করিয়া মুসলমান কর্ত্তৃক নির্য্যাতিতা হিন্দু নারীকে সমাজের অঙ্কে স্থান দিবার ব্যবস্থা দেন। বাঙ্গালার বর্ত্তমান ইতিহাসে ইহা স্মরণীয় ঘটনা। ২১শে শ্রাবণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা কবিরাজ যামিনীভূষণ রায় মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন।

ভাদ্র মাসে ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদে স্বরাষ্ট্র-সচিব সার আলেকজাণ্ডার মুডিম্যান সংবাদপত্র ও পুস্তক-পুস্তিকার জন্য আর একটি নূতন আইনের

শৃঙ্খল সৃষ্টি করেন। আইনে স্থির হয় যে, সংবাদপত্র ও পুস্তক পুস্তিকায় যদি সম্প্রদায়গত বিদ্বেষ প্রচারিত হয়, তাহা হইলে ঐ সকল সংবাদপত্র ও পুস্তকপুস্তিকা সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে। অর্থাৎ রাজদ্রোহ আইনে সরকার যে ক্ষমতা হস্তগত করিয়াছেন, এই আইনে তাঁহার উপর সম্প্রদায়গত বিরোধ সম্পর্কে সেই ক্ষমতার অনুরূপ ক্ষমতা হস্তগত করিলেন। মহাত্মা গন্ধীকে কয় জন নেতা রাজনীতিক্ষেত্রে নির্লিপ্ততা হইতে মুক্ত হইয়া আবার রাজনীতিক্ষেত্রে নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলে তিনি বলেন যে, তিনি রাজনীতিক্ষেত্র পরিত্যাগ করেন নাই, নীচের দিক হইতে নীরব সাধনা দ্বারা দেশকে স্বরাজের উপযুক্ত করিয়া তুলিতেছেন। এই মাসে কারেন্সী কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়।

আশ্বিন মাসে মেদিনীপুরের বন্যায় বহু লোক গৃহহীন এবং নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছিল তাহাদের সাহায্যার্থ বাঙ্গালাদেশের নানা স্থানে চাঁদা আদায়ের চেষ্টা হয়। মেদিনীপুরের তমলুক ও কাঁথি মহকুমায় প্রায় ৩ শত বর্গমাইল জলমগ্ন হইয়াছিল। উল্লিখিত নানা স্থানে প্রায় ৩০ হাজার লোকের বাস। অধিকাংশ লোকের অবস্থা বন্যাপীড়নে শোচনীয় হইয়াছিল। ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে বেরিবেরি ও রক্তামাশয় রোগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব ঘটে; তাহাতে বহু নরনারীর প্রাণবিয়োগ হয় এবং অনেকে স্থানান্তরে স্বাস্থ্যান্বেষণে পলায়ন করে।

কার্ত্তিক মাসে বাঙ্গালা সরকার প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যে একটি মন্তব্য প্রকাশ করেন। উহাতে তাঁহারা বলেন, "প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের সংখ্যা পর্য্যাপ্ত নহে, স্কুলে ছাত্রের উপস্থিতিও অল্প; শিক্ষাদানের পদ্ধতিও নিন্দনীয়। সরকার এ যাবৎ ছাত্র প্রতি ১ টাকা ১৪ আনা শিক্ষার্থ ব্যয় করিয়া আসিয়াছেন এবং বাঙ্গালায় লোকসংখ্যার শতকরা ৯৯ জন লিখিতে পড়িতে জানে না—ইহা অত্যন্ত দুঃখের কথা।" সরকারের এই প্রকার ত্রুটিস্বীকার এই প্রথম। বিগত এপ্রিল ও জুলাই মাসে কলিকাতায় দাঙ্গা সম্পর্কে পুলিস-কমিশনার মিঃ আর্মষ্ট্রংএর একটি রিপোর্ট এই সময়ে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের মূল কথা, মুসলমানরা পূর্ব্বাহ্নে প্রস্তুত হইয়া হিন্দুদিগের রাজরাজেশ্বরী প্রতিমার শোভাযাত্রায় বাধা দিয়াছিল।

তাহার পর ৩ বৎসর পরে বাঙ্গালায় কাউন্সিল নির্ব্বাচন হয়। উহাতে কংগ্রেস পক্ষেরই প্রায় সর্ব্বত্র জয় হয়। এই মাসে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু তাঁহার বসু বিজ্ঞানাগারে নবম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে জীব ও উদ্ভিদজগতে জীবন ও মৃত্যুর সংঘর্ষ সম্বন্ধে যন্ত্র-সাহায্যে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা করেন। সেণ্ট এণ্ড্রুজ ভোজের বক্তৃতায় লর্ড লীটন বলেন, বিশ্বাসের অভাবই শাসন-সংস্কারের অসাফল্যের কারণ। বাঙ্গালায় মানচিত্র ও ভূগোল-প্রকাশকদিগের অগ্রণী শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের এই মাসেই লোকান্তর হয়। ঔপন্যাসিক হারাণচন্দ্র রক্ষিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় নিয়ামক রায় বাহাদুর অবিনাশচন্দ্র বসু এবং সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের দৌহিত্র সুরেন্দ্রসুন্দর এই মাসেই পরলোকগমন করেন।

পৌষ মাসে বঙ্গীয় মোসলেম মহিলাসঙ্ঘের দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। উল্লিখিত অধিবেশনের সভানেত্রী শ্রীমতী নুরন্নেছা খাতুন বাঙ্গালা ভাষাই যে বাঙ্গালী মুসলমানগণের মাতৃভাষা এবং বঙ্গদেশের মুসলমানরা যে বাঙ্গালী, এই বলিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করেন। এই মাসে গৌহাটীতে কংগ্রেস ও নানা জাতীয় সম্মিলনের অধিবেশন হয়। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ প্রতীচ্যের নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া বাঙ্গালাদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই মাসে দিল্লীতে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্যের পঞ্চম অধিবেশন হয় শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় উক্ত সভার পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। এই মাসে আবদুল রসির নামক এক জন মুসলমান স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে হত্যা করে।

মাঘ মাসে ভারতের নব নিযুক্ত বড় লাট লর্ড আরউইন তাঁহার শাসননীতির প্রথম আভাস প্রদান করেন। তাহাতে নূতন কথা কিছুই ছিল না। এই মাসেই দিল্লীর এক মহতী সভায় হিন্দু-মুসলমান প্রতিনিধিরা ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের প্রতিনিধিগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ও বিনা অনুমতিতে চীনে ভারতীয় সৈন্য প্রেরণের তীব্র প্রতিবাদ করেন। লর্ড লীটন বিদায়ের পূর্ব্বাহ্নে বাঙ্গালাদেশে আবার দ্বৈত শাসন পুনঃ প্রবর্ত্তিত করেন। ব্যবস্থা-পরিষদে রাজবন্দীদিগের মুক্তি বা বিচারের দাবী করিয়া পণ্ডিত মতিলাল নেহরু এক সংশোধন প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন। তাহাতে ভোটে সরকার পক্ষের পরাজয় ঘটে। পটুয়াখালী সত্যাগ্রহ আন্দোলন এই সময়ে প্রবল আকার ধারণ করে। প্রসিদ্ধ ডাক্তার সার কৈলাসচন্দ্র বসু এই মাসে পরলোকগমন করেন।

ফাল্গুন মাসে পাবনার রায়ত বৈঠকে ঢাকার নবাব খাজা হবিবুল্লা সাহেব বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন, মুসলমান সম্প্রদায়ের লোক অশিক্ষিত, এই হেতু তাহারা সহজেই সমাজ-ধ্বংসকারী, কুপরামর্শদাতার দ্বারা প্রতারিত হইয়া থাকে। ভিক্ষু উত্তম ৩ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের পর মুক্তিলাভ করেন। দক্ষিণ-আফ্রিকাপ্রবাসী ভারতীয়দিগের সম্বন্ধে রাউণ্ডটেবল কনফারেন্সের সিদ্ধান্তের ফলে ভারত সরকার ও দক্ষিণ-আফ্রিকার সরকার একটা আপোষ বন্দোবস্তে সম্মত হয়েন।

চৈত্রমাসে লর্ড লীটন বিদায় গ্রহণ করেন, বাঙ্গালার মসনদে সার ষ্টান্‌লী জ্যাকসন আরোহণ করেন। নেপালী যুবক খড়্গবাহাদুর সিং নেপালী বালিকার ধর্ষণের প্রতিশোধ-কামনায় হীরালাল আগরওয়ালাকে হত্যা করে; এই মাসে বিচারে তাহার ৮ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ও গল্প-লেখক নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এই সময়ে ইহলোক ত্যাগ করেন। মুসলমান সাহিত্য-সমাজের বার্ষিক সম্মিলনে সভাপতি খাঁ বাহাদুর মৌলভী তসদ্দুক আহম্মদ বাঙ্গালা ভাষার গুণগান করেন। এই মাসে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন মজঃফরপুরে হইয়াছিল নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং প্রসিদ্ধ উপন্যাস-রচয়িত্রী শ্রীমতী অনুরূপা দেবী সাহিত্য-শাখার সভানেত্রীর আসন অলঙ্কৃত করেন। ৩০শে চৈত্র হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভ মেলার স্নানের দিন ছিল। এই বৈশাখের শেষে সরকার সুভাষচন্দ্রকে কলিকাতায় আনয়ন করাইয়া তথা হইতে আলমোড়ায় স্বাস্থ্যোন্নতি-কামনায় প্রেরণ করেন।

হরিদ্বারে কুম্ভমেলা

হরিদ্বারে পূর্ণ কুম্ভমেলা মহা সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এবার প্রায় ৮ লক্ষাধিক মুক্তিকামী নরনারী মাসাধিক পূর্ব্ব হইতে সমবেত হইয়া পুণ্যতোয়া জাহ্নবী-বারিতে স্নাত হইয়া জীবন সার্থক জ্ঞান করিয়াছেন। বিনা আহ্বানে—বিনা প্রচারে আসমুদ্র হিমাচল সমগ্র ভারতের মুক্তিকামী নরনারীর এমন অভাবনীয় সম্মেলন—এমন সাধুর মেলা—সংসারত্যাগী সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের মহামিলন বোধ হয় ভারত ব্যতীত বিশ্বের অন্য কোনও দেশে ধর্ম্মের নামে হয় না। কবে—অতীতের বিস্মৃতপ্রায় কোন্ যুগে স্কন্দপুরাণের এক অধ্যায়ের একটি শ্লোকে লিখিত হইয়াছে :—

"মকরস্থো যদা ভানুস্তদা দেবগুরুর্যদি।
পূর্ণিমায়াং ভানুবারে গঙ্গা পুষ্কর ঈরিতঃ॥
গঙ্গাদ্বারে প্রয়াগে চ কোটিসূর্য্যগ্রহৈঃ সমঃ।
সিংহসংস্থে দিনকরে তথা জীবেন সংযুতে॥
পূর্ণিমায়াং গুরোর্বারে গোদাবর্য্যাং তু পুষ্করঃ।
মেষসংস্থে দিননাথে দেবানাঞ্চ পুরোহিতে।
সোমবারে সিতাষ্টম্যাং কাবেরী পুষ্করো মতঃ॥
কর্কটস্থে দিননাথে জীবে চেন্দুদিনে তথা।
অমায়াং পূর্ণিমায়াং বা কৃষ্ণা পুষ্কর ঈরিতঃ॥"

এই বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া শতাব্দীর পর শতাব্দীর দীর্ঘতা ভেদ করিয়া ধর্ম্মবিশ্বাসী হিন্দু আজও প্রতি দ্বাদশ বর্ষ অন্তে হরিদ্বারে কুম্ভযোগে স্নাত হইয়া পাপ-তাপ নাশ করিয়া জন্মজনিত অপার দুঃখ হইতে মুক্তিলাভের আশা করিতেছেন। ধন্য হিন্দুর মজ্জাগত ধর্ম্মবিশ্বাস—ধন্য ঋষি-বাক্যের মহিমা—ধন্য শাশ্বত ঋষিবাক্য!

এই পাশ্চাত্য শিক্ষা-বিস্তারের পরিবর্ত্তনের যুগেও স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দু নরনারী যে শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট ঋষিবাক্যে আস্থাহীন হন নাই—ধর্ম্মের ভিতরেই যে তাহার প্রাণশক্তি নিহিত আছে—আজও যে ধর্ম্মের নামে ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর প্রাণে স্পন্দন অনুভূত হয়—হিন্দুসমাজ যে ধর্ম্ম ও শাস্ত্রকে দীপকের মত অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে—ধর্ম্ম-লাভের জন্য মোক্ষপ্রাপ্তির আশায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশাগত ৮ লক্ষ মানবের বিরাট জনতা—বিপুল জন-সঙ্ঘের মধ্যে নিষ্পেষিত হইয়া ৫৫ জনের অতর্কিত মৃত্যু প্রত্যক্ষ করিয়াও পুণ্যস্নানের জন্য বিপুল আগ্রহই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

সন্ন্যাসি-মোহান্তগণের মতে শিবাবতার শঙ্করাচার্য্যের পর কুম্ভমেলার প্রবর্ত্তন হয়। আচার্য্য শঙ্কর বেদান্তধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন জন্য শৃঙ্গেরি, পুরী, দ্বারকা, বদরিকাশ্রমে চারিটি মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ভারতে মুসলমান-প্রভাব বর্দ্ধিত হইলে মঠের মোহান্তগণ নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হইয়া সমবেত গৃহস্থ ভক্তগণকে উপদেশাদি প্রদান করিতেন। কিন্তু নবীন সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ের উপর তাঁহাদের অধিকার ক্ষুণ্ণ হইতেছিল। নবসমুদ্ভূত সন্ন্যাসি-গণও তাঁহাদের জ্ঞানগর্ভ অমূল্য উপদেশে জীবন গঠন করিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইবার সুযোগ পাইতেন না। নবীন সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ের সহিত বিশেষ মিলন, উপদেশ প্রদান, শাস্ত্রালোচনা, কর্ত্তব্য নিরূপণের জন্য ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্র-তীর্থসমূহে মহা সম্মেলনের জন্যই মোহান্তগণ কুম্ভমেলার প্রবর্ত্তন করেন। ইহা সন্ন্যাসীর মেলা, সাধু-মোহান্তের মহা সম্মেলন।

আচার্য্য শঙ্কর-প্রবর্ত্তিত ১। অদ্বৈতবাদী দশনামী সম্প্রদায় (গিরি, পুরী, ভারতী, সরস্বতী, তীর্থ, বন, অরণ্য, সাগর, পর্ব্বত, আশ্রম) ২। নানকপন্থী, ৩। কবীরপন্থী, ৪। বৈরাগী, ৫। দাদুপন্থী, ৭। রামসনেহী, ৭। কবীর দাসী, ৮। খুল্লে সাধু, ৯। নাথ সম্প্রদায়, ১০। জঙ্গল সম্প্রদায় এই দশ সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিগণই কুম্ভমেলায় সমবেত হন। কোন্ সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিগণ প্রতাপ-প্রাধান্যে প্রথমে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানের অধিকারী, ইহা লইয়া মারামারি, কাটা-কাটি, মামলা-মোকর্দ্দমা হইয়া গিয়াছে।

এ বারের কুম্ভমেলায় পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের শোভাযাত্রা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কনখলে দক্ষ-মন্দির হইতে পণ্ডিত মালব্যজী স্বর্ণালঙ্কারসজ্জিত হস্তিপৃষ্ঠে যাত্রা করেন। প্রধান প্রধান সাধু ও পণ্ডিতগণ সুসজ্জিত হস্তিপৃষ্ঠে ও সুশোভন বিভিন্ন যানে তাঁহার অনুসরণ করেন। শোভা-যাত্রার প্রথমে মহাবীর বৈজয়ন্তী, মহাবীর দলের ব্যাণ্ড-বাদ্য, উৎকৃষ্ট রজতদণ্ডধারী স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী, সমস্বরে বেদমন্ত্র গান করিতে করিতে জোয়ালপুর মহাবিদ্যালয়ের

ছাত্রবৃন্দ, ভাটিণ্ডা ও জৈণ্ডার মহাবীর-বাহিনী-বাহিত রজতশিবিকায় বেদ ভগবান, মীরাট অনাথ আশ্রমবাসী অনাথ বালকদল, অশ্বশ্রেণী, রজত-সোটাধারী জুনো আখড়ার সাধুর দল, রজত-শিবিকারূঢ় হরিহর আশ্রমের পরমহংস স্বামী পরমাত্মানন্দ, তাহার পর উলঙ্গ সাধু ও মহাত্মগণ, সর্ব্বপশ্চাতে সুসজ্জিত বারণশ্রেণী। এই বিরাট রাজসিক শোভাযাত্রার তিন মাইল পথ অতিক্রম করিতে প্রায় তিন ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল। ইহার পর বিভিন্ন সজ্জিত মণ্ডপে বিভিন্ন সম্মেলনের অধিবেশন হয়।

আয়ুর্ব্বেদ গাছ-গাছড়াপ্রদর্শনী ব্রহ্মকুণ্ডের সেতুর উপর শ্বেতাঙ্গগণের জুতা পায়ে গমন ও ফটো গ্রহণ নিবারণ—ভারত সেবাসঙ্ঘের সেবাব্রতের অনুষ্ঠান—শিখ-সঙ্গত-সঙ্ঘের অন্নসত্রের ভাণ্ডারা দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কুম্ভমেলায় লক্ষ লক্ষ সাধু-মোহান্তের গঙ্গাস্নানের বিরাট শোভাযাত্রার রাজোচিত সমারোহ—বিপুল ঐশ্বর্য্যের বিচিত্র বিকাশ। স্বর্ণ-রৌপ্য অলঙ্কারে সুসজ্জিত অসংখ্য হয়, হস্তী, পাল্কী মণিমুক্তা-খচিত বহুমূল্য কিংখাপ আচ্ছাদনে আবৃত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। সাধুরাই রথী, সারথি,

হরিদ্বারের প্রসিদ্ধ স্নানের ঘাট—এইখানে ৫৫ জন মুক্তিকামী স্নানার্থী ভীড়ের চাপে প্রাণ হারাইয়াছেন

এবারের কুম্ভমেলার বৈশিষ্ট্য পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের নেতৃত্ব—নিখিল বঙ্গীয় সম্মেলন স্বেচ্ছাসেবকগণের আত্মনিবেদন সেবা—সিংহাসনচ্যুত নাভা মহারাজের সংবর্দ্ধনা ও ওজস্বিনী বক্তৃতা—শিখ স্বেচ্ছাসেবকগণের জন্য ওঙ্কারানন্দ স্বামীর ত্যাগ—নিখিল ভারত তীর্থ মন্দির-সংস্কার সমিতির অধিবেশন—অনাচারী মোহান্তগণের চরিত্রসংশোধন প্রস্তাব, খাদি প্রতিষ্ঠান-প্রদর্শনী—চরকাপ্রবর্ত্তন ও খাদিপ্রচার-প্রচেষ্টা হিন্দু মহাসভার অধিবেশন—হরিদ্বার ঋষিকুলের সংস্কৃত সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশন—

অশ্বারোহী, গজারোহী, পদাতিক। এ যেন পৌরাণিক যুগের রাজা দুর্য্যোধনের ঐশ্বর্য্য-স্পর্দ্ধিত প্রভাসযাত্রা—বৌদ্ধযুগের ধর্ম্মাশোকের বিরাট সন্ন্যাসি-সংহতির মহাধর্ম্মযাত্রা—সম্রাট আরঙ্গজেবের সমর অভিযান। অসংখ্য নাগা ও উলঙ্গ সন্ন্যাসীর অপূর্ব্ব সমাবেশ। তাহার পর ভৈরবী ও সন্ন্যাসিনীর দল—তাঁহাদের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে। সকল সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিগণ মহাসমারোহে পর্য্যায়ক্রমে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া প্রমত্ত পদভরে নৃত্য করিতে করিতে হর্ষোল্লাসে মন্ত্রগানে গগনপবন মুখরিত করিতে করিতে ব্রহ্মকুণ্ডে পুণ্যস্নান করিতে

গিয়াছিলেন। স্নানকালে যিনি যে সম্প্রদায়ভুক্ত, তিনি সেই সম্প্রদায়ের কল্যাণ কামনা করিয়াছেন। রাজপথে জনকল্লোল-উচ্ছ্বসিত জলস্রোতের মত মহীয়সী শোভাযাত্রা সন্দর্শনের জন্য লক্ষ লক্ষ নরনারী সোৎসুকনেত্রে আকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। স্নানের ঘাটেও নরমুণ্ডের সমুদ্র—ঘাটও অনেকগুলি। আত্মপ্রাণ তুচ্ছজ্ঞানে সেই বিপুল জনতা ভেদ করিয়া পুণ্যস্নানের জন্য যে ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা—ভক্তি-উচ্ছ্বসিত স্বর্গীয় মাধুরী-দীপ্তি মোক্ষকামী নরনারীর নয়নে বদনে প্রতিভাত হইয়াছিল, তাহার বর্ণনার যোগ্য ভাষা সাহিত্যের ভাণ্ডারে নাই।

উঠে। নয় জন পাঞ্জাবী যুবক ঘাটের এই বিপুল জনতাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার জন্য গুরুশ্রমে অকাতরে আত্মপ্রাণ দান করিয়াছিলেন—তবুও কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হন নাই। বাঙ্গালী যুবকবৃন্দের রেল-ষ্টেশনের সুব্যবস্থা, পরিচর্য্যা, অনুসন্ধান, সেবা, শবদাহ, প্রভৃতির প্রশংসায় শ্বেতাঙ্গ 'পাইওনিয়ার'-সম্পাদক এবং পুলিস কর্ত্তৃপক্ষ শতমুখ হইয়াছেন। বাঙ্গালার ভবিষ্যতের আশা-ভরসা বাঙ্গালী যুবক স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর কার্য্যে বাঙ্গালার মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে।

কুম্ভমেলা হইয়া গেল—স্মৃতি রহিল। দ্বাদশবর্ষ অন্তে আবার এই মহাসম্মেলন হইবে। ধর্ম্মপ্রাণ ভারতে ধর্ম্মের
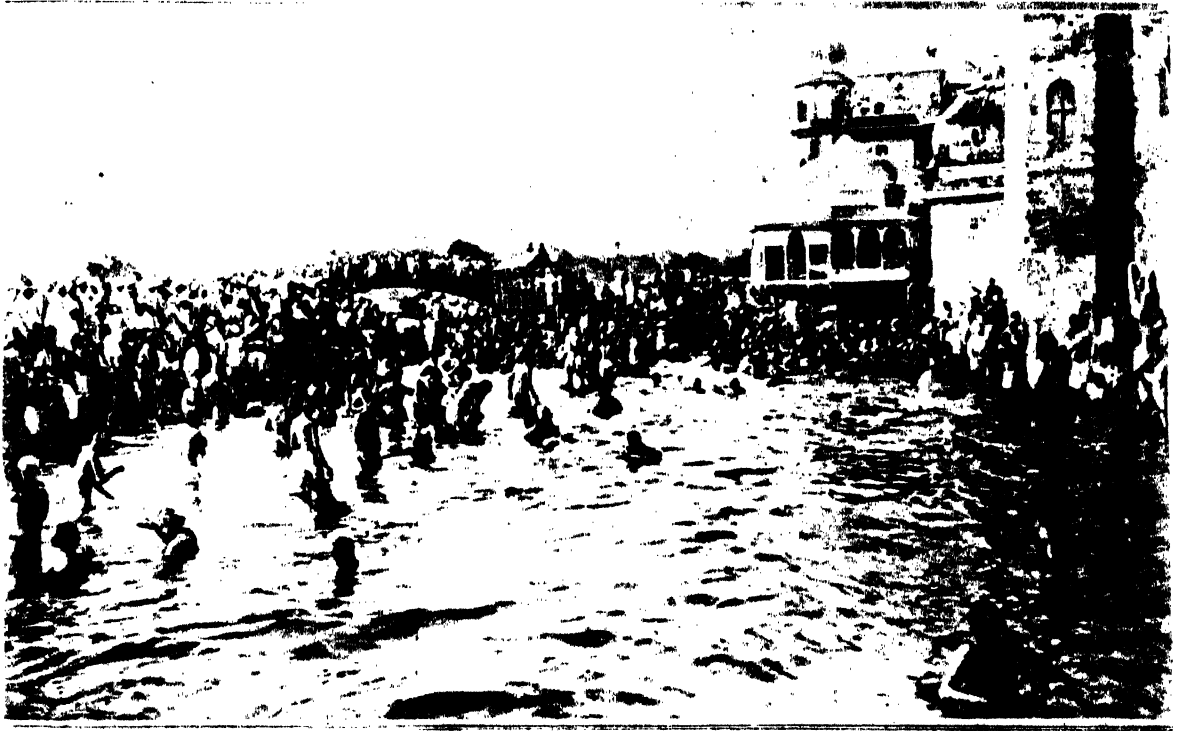
হরিদ্বার স্নানের ঘাটের অপর দৃশ্য—গঙ্গাদ্বার মন্দিরের একাংশ

হরিদ্বারের মত ক্ষুদ্র সহরে এই বিরাট জনতার সকল সুবিধা—সকল সেবার ভার যাঁহারা সানন্দে মাথা পাতিয়া লইয়াছিলেন, সেই উৎসাহী যুবকবৃন্দের কথা না বলিয়া এ প্রসঙ্গের উপসংহার করা যায় না। এই বিপুল জনতা সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য বাঙ্গালী পাঞ্জাবী যুবক স্বেচ্ছাসেবকগণের অক্লান্ত চেষ্টা ও অদম্য উৎসাহের কথা স্মরণ করিলেও হৃদয় আনন্দে গৌরবগর্ব্বে উদ্দীপিত হইয়া

জন্য—মোক্ষলাভের জন্য আত্মনিবেদনের এ স্মৃতি ভারতের জাতীয় ইতিহাসে সুবর্ণাক্ষরে চির-দেদীপ্যমান রহিবে। শত পরিবর্ত্তনের ভিতরেও হিন্দুধর্ম্ম-গৌরবের অভ্রভেদী হিমালয় চির-অপ্রতিহত—কালজয়ী। এ বিরাট বিপুল জ্ঞান-বিজ্ঞান-কল্পবৃক্ষের স্নিগ্ধচ্ছায়ায় সমবেত হইয়া ভারত-বাসী—তথা বিশ্ববাসী চিরদিনই জ্ঞান-কাম্যফল আহরণ করিয়া শান্তি ও তৃপ্তি লাভ করিতে পারিবে।

সতীর পতি

(উপন্যাস)

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

হোটেলে

হরি সিং দ্বারবান্ ট্যাক্সি ডাকিয়া আনিয়াছিল উভয়ে তাহাতে আরোহণ করিলে, বিপিন বাবু হুকুম দিলেন, "লালদীঘি—বড়া তার-ঘর।"

ট্যাক্সি গলি অতিক্রম করিয়া চিৎপুর রোডে আসিয়া পড়িল। হীরালাল জিজ্ঞাসা করিল, "এত রাত্রিতে বড়া তার-ঘর কেন?"

বিপিন বাবু একটু শ্লেষের স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেশে তোমার একটা বুড়ো মা, একটা মুখ্যু বউ প'ড়ে আছে—তাদের কথা তোমার মনে আছে কি? না মথুরায় এসে, কুবুজা সুন্দরীকে নিয়ে সিংহাসনে ব'সে তাদের অস্তিত্ব একদম ভুলেই গেছ?"

হীরালাল বলিল, "কেন, ভুলে যাব কেন কিন্তু কুবুজা সুন্দরী এখানে তুমি কোথায় দেখলে?"

বিপিন বাবু হাসিয়া বলিলেন, "না হয়, রেবতী সুন্দরী। তোমার বুড়ো মা, তোমার পরিবার তোমার খবর না পেয়ে কেঁদে কেটে খুন হচ্ছে,—তুমি কুশলে আছ, এই সংবাদটা পাঠিয়ে তাদের কষ্টটা লাঘব করবার জন্যে তার-ঘরে যাওয়া—আর কেন?"

হীরালাল বলিল, "ওঃ—তা বটে।" বলিয়া সে একটু লজ্জিত হইল। বিপিন বাবু তাহার যে ত্রুটিটা ধরিয়া দিলেন, সেটা ত যথার্থ বটে। প্রথম সাক্ষাতের মুহূর্ত্তেই ত তিনি জানাইয়াছিলেন, তাহার কোনও চিঠিই বাড়ীতে পৌঁছে নাই, তাহার মা ও স্ত্রীর কান্না দেখিয়া, বিপিন বাবু থাকিতে না পারিয়া, তাহাকে খুঁজিবার জন্য কলিকাতায় ছুটিয়া আসিয়াছেন। এ কথা তাহার নিজে-তৎক্ষণাৎ উদিত হওয়া ত উচিত ছিল যে, এখনই বাড়ীতে টেলিগ্রাম করিয়া দেওয়া আবশ্যক। রেবতীকে জানাইয়া, বিপিন বাবুর সেই ট্যাক্সিতেই ত লালদীঘি যাওয়ার প্রস্তাব করা উচিত ছিল। তা নয়, সে গেল বন্ধুকে লইয়া রেবতীসুন্দরীর সহিত পরিচিত করিতে এবং হাস্য পরিহাস খানাপিনায় এতটা সময় অতি-বাহিত করিল। হীরালাল লজ্জাবনত বদনে নীরবে ট্যাক্সিতে বসিয়া রহিল।

ট্যাক্সি লালদীঘিতে পৌঁছিলে হীরুকে বসাইয়া রাখিয়া বিপিন বাবু নামিয়া তার পাঠাইয়া আসিলেন। লিখিলেন, —"হীরুকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছি, সে ভাল আছে, কোনও চিন্তা নাই, কাল সে পত্র লিখিবে।"

হোটেলে আসিয়া হীরুকে বিপিন বাবু নিজ শয়নকক্ষে লইয়া গিয়া বিদ্যুৎপাখা খুলিয়া দিলেন। পরিচারক আসিয়া সেই কক্ষে নেওয়ারের খাট আনিয়া একটি অতিরিক্ত শয্যা রচনা করিয়া দিল। উভয়ের বাহুল্য বস্ত্রাদি উন্মোচন করা হইলে বিপিন বাবু নিজে একটি সিগারেট ধরাইয়া হীরালালকে একটি দিয়া বলিলেন, "হীরুদা, এইবার আমায় সব কথা বল দেখি। বাড়ী ছাড়ার পর থেকে কি কি হ'ল, কুবুজা সুন্দরীর কবলে কি রকম ক'রে পড়লে, সব কথা আমায় খুলে বল।"

চিৎপুর রোডেই ট্যাক্সিতে যখন বিপিন বাবু কুব্জা-সুন্দরীর উল্লেখ করিয়াছিলেন, তখন হইতেই কথাটা হীরালালের বুকে বিঁধিয়া ছিল, বুকের ভিতরে যেন খচখচ করিতেছিল। পুনরায় ঐ পরিহাসে হীরালাল একটু চটিয়া বলিল, "দেখ, রেবতীকে নিয়ে আমার যদি তুমি ও রকম ঠাট্টা করবে, তা হ'লে সে সব কোন কথাই আমি তোমায় বলবো না। আমি কি প্রথমেই তোমার প্রশ্নের উত্তরে বলিনি যে—"

ঠিক কথাগুলো হীরালালের মুখে যোগাইল না। বিপিন বাবু উহা সম্পূরণ করিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, তুমি বলেছ যে, তুমি

এখনও জাহান্নমে যাও নি। কিন্তু সেই পথেই যে পদার্পণ করেছ দাদা! ফেরো—তোমায় ফিরতেই হবে।"

হীরালাল বলিল, "পথে পদার্পণ করেছি না কি?"

"আমার ত আশঙ্কা তাই!"

"কেন বল দেখি?"

"এক জন যুবা পুরুষ, আর এক জন যুবতী স্ত্রীলোকের মধ্যে এতটা মাথামাখি থাকলে,—আশঙ্কা বিলক্ষণ আছে বৈ কি—বিশেষ সে যুবতী যদি—কি বল্‌বো? স্বৈরিণীটা খারাপ কথা – স্বাধীনা হয়।"

"মাথামাখিটা কি দেখলে? আমি বোধ হয়, আজ পর্য্যন্ত এমনি ক'রে রেবতীকে স্পর্শও করি নি।" বলিয়া হীরালাল বিপিন বাবুর বাহুমূলে দুইটি অঙ্গুলি স্থাপন করিল।

বিপিন বাবু বলিলেন, "দেহের দ্বারা স্পর্শ কর নি। কিন্তু মনের দ্বারা?"

হীরালাল বলিল, "এ আবার কি হেঁয়ালি? মনের দ্বারা স্পর্শ আবার কি রকম,—তা ত বুঝলাম না। অত মনস্তত্ব-ফনস্তত্বের জ্ঞান আমার নেই ভাই!"

বিপিন বাবু বলিলেন, "মনস্তত্বে জ্ঞান না থাকলে কেউ কি কখনও বড় অভিনেতা হ'তে পারে? তুমি আছ হীরু, তোমায় সাজতে হবে নগেন্দ্র। সূর্য্যমুখী আর কুন্দনন্দিনী এই দোটানায় প'ড়ে নগেন্দ্রনাথের মনের অবস্থাটি কি রকম হয়েছিল, এটা তুমি সুদক্ষ মনস্তত্ত্ববিদের মত যতক্ষণ নখদর্পণে না বুঝতে পারবে, ততক্ষণ কি ক'রে তুমি নগেন্দ্রের ভূমিকা নিখুঁৎভাবে অভিনয় করবে?"

হীরালাল হাসিয়া বলিল, "তা হ'লে বড় অভিনেতা হওয়া আমার কপালে নেই দেখছি! রাত কত হ'ল বল দেখি?"

বিপিন বাবু তাঁহার হাতঘড়ি দেখিয়া বলিলেন, "দুটো দশ।"

"আজ ত রাত প্রায় কাবার—আমার ইতিহাস কি আজই শুনবে, না কাল সকালের জন্যে মুলতুবী রাখবে?"

কথাটা বলিবামাত্র হীরালালের স্মরণ হইল যে, রেবতীর মুখের ভাষাই সে অবিকল ব্যবহার করিয়াছে এবং বেশী রাত না জাগা সম্বন্ধে তাহার অনুরোধটি পালন করিবার ইচ্ছাও তাহার মনে বলবতী। মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করিল, "কি হে, রেবতীর কথাই তোমার গুরুবাক্য না কি? জাহান্নমের পথে সত্যিই পা দিয়েছ?"

ইতোমধ্যে বিপিন বাবু প্রশ্নের উত্তর দিলেন—"কেন, তোমার কি ঘুম পাচ্ছে না কি? আমার ত এখনও মোটেই ঘুম পায়নি। যদি এখন বলতে কষ্ট হয়, তা হ'লে কালই না হয় বোলো।"

জাহান্নমের পথে পা দেয় নাই, রেবতীর অনুরোধ স্বচ্ছন্দে সে অবহেলা করিতে পারে, আপনার বিবেকের কাছে এই সাফাই গাহিবার হিসাবেই যেন হীরালাল বলিল, "নাঃ—ঘুম আমার পায়নি। তা হ'লে বলি শোন।"

অতঃপর হীরালাল গ্রামের ষ্টেশনে আসিয়া কলিকাতার ট্রেণ ধরিবার সময় হইতে সমস্ত ঘটনা একে একে বিপিন বাবুর কাছে বর্ণনা করিতে লাগিল।

বর্ণনা শেষ হইলে বিপিন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "রেবতী ওখানে গিয়ে পৌছল কি ক'রে, তা শুনেছ?"

হীরালাল রেবতীর নিকট যেরূপ শুনিয়াছিল, তাহাই বলিল। সতীশ-ঘটিত বৃত্তান্ত, রেবতীর গৃহে আসিয়া হীরালালের সহিত তাহার মারামারি, করিম গুণ্ডাকে সতীশের চিঠি লেখা, করিমের রেবতীর গৃহে আগমন প্রভৃতি বৃত্তান্তও প্রসঙ্গক্রমে বর্ণনা করিল।

সমস্ত শুনিয়া বিপিন বাবু কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। শেষে বলিলেন, "অতি বুদ্ধি ক'রে আবু হোসেনের পোষাক যদি না পরতে, তা হ'লে এ সব কোনও ল্যাঠাই হ'ত না।"

হীরালাল বলিল, "কেন, রেবতীরা ত আর মুসলমান সেজে হাওড়া ষ্টেশনে নামেনি, তবে তাদের ও ল্যাঠা হ'ল কেন?"

বিপিন বাবু বলিলেন, "না, আমি সে কথা ভেবে বলিনি। আবু হোসেন সেজে তুমি যদি না নামতে, তা হ'লে বোধ হয়, রেবতীর সঙ্গে তোমার দেখা হ'ত না।"

"রেবতীর সঙ্গে দেখা হয়ে অন্যায়টা কি হয়েছে শুনি! ওর সঙ্গে দেখা না হ'লে, ওর ঐ উপকারটুকু করতে না পেলে আজ কি এই কলকাতা সহরে আমার একশো টাকা মাইনের চাকরীটা জুটতো?—আপিসে আপিসে কেরাণীগিরির উমেদারীতে ঘুরে ঘুরে এত দিন জান্-হায়রাণ হয়ে যেতাম।"

বিপিন বাবু বলিলেন, "তা বটে। কিন্তু ঐ রেবতীর সঙ্গে মিশে তুমি যদি উচ্ছন্ন যাও দাদা, তা হ'লে সেটা বড়ই দুঃখের বিষয় হবে। এখন ত কলকাতা বেশ ঠাণ্ডা হয়েছে—তবে তুমি এখনও ওখানে প'ড়ে আছ কি জন্যে শুনি? একটা মেসের বাসা-টাসা ঠিক ক'রে নাওনি কেন?"

হীরালাল যে বাসা খুঁজিতে বাহির হইতে চাহিয়াছিল, রেবতীর অনুরোধেই যা তাহা সে করিতে পারে নাই, এ কথাটা হীরালাল বন্ধুর কাছে লুকাইল। বলিল, "এইবার একটা বাসা ঠিক ক'রে নিতেই হবে।"

"হাঁ দাদা—আমি থাকতে থাকতেই সেটি তোমায় করতে হবে—আমি নিজের চোখে দেখে যেতে চাই।"

হীরালাল হাসিয়া বলিল, "তোমার মনটা বড় সন্দিগ্ধ।"

বিপিন বাবু বলিলেন, "মনটা সন্দিগ্ধ হয় কি সাধে হে? কি জান, ঐ সেই বুড়ো চাণক্য পণ্ডিত যা ব'লে গেছে—ঘি আর আগুন,—একসঙ্গে থাকলেই বিপদ। আজ দু' ঘণ্টা রেবতীর বাড়ীতে থেকে দুটো জিনিষ আমি লক্ষ্য করেছি। প্রথম, রেবতী তোমাকে একটি বারও 'হীরালাল বাবু' কিংবা 'হীরু বাবু' ব'লে কথা কয় নি। সে তোমাকে 'তুমি' বলে—তুমিও তাকে তাই বল। এত ঘনিষ্ঠতাই বা কেন? পরস্পরকে ডাকতে হ'লে তোমরা কি ব'লে ডাক?"

"স্রোতের ফুল" পাতানোর কথাটাও হীরালাল গোপন করিল। বলিল, "ডাকি না। শুনে খুসী হ'লে ত? দ্বিতীয় জিনিষটা কি লক্ষ্য করেছ, বল।"

"আমি তোমায় হোটেলে নিয়ে আসতে চাইলে, তোমার খাওয়া হয়নি ব'লে রেবতী ভারী ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌লো।—কেন হ্যা—কে তুমি মাসীমার কুটুম তার? তোমার খাওয়া হ'ল না হ'ল, সে জন্যে তার অত মাথাব্যথাই বা কিসের?"

হীরালাল বলিল, "আমি যে তার অতিথি। আমার খাওয়া হ'ল না হ'ল, তা সে দেখ্‌বে না?"

বিপিন বাবু শ্লেষভরে বলিলেন, "বটে! আমি অতিথি তোমারই দ্বারে—ওগো বিদেশিনী! না হে হীরুদা, এ সব কোনও কাযের কথা নয়, বুঝলে?"

ঘড়িতে ঠং ঠং করিয়া তিনটা বাজিয়া গেল।

হীরালাল বলিল, "ওহে, তিনটে বেজে গেল যে!—এবার শোয়া যাক্, কি বল?"

"হাঁ—শোও। কার মুখখানি ভাবতে ভাবতে ঘুমবে, সত্যি ক'রে বল দেখি? গেরস্ত ঘরের পাঁচপাচি, হলুদের দাগ, খুকীর কাজলের দাগ-ধরা আধ-ময়লা মিলের শাড়ী পরা আমার সেই গরীব পাড়াগেঁয়ে বউদিদিটার, না সেই 'প্রভাতশুক্রতারাবৎ'—রোহিণীর বর্ণনায় বঙ্কিম বাবু আর আর কি সব বিশেষণ দিয়েছেন হে? ভুলেও গেলাম ছাই—আচ্ছা, বানিয়ে বানিয়েই বলা যাক—রত্নাভরণা, সিল্কশাটী-পরিহিতা, হাব-ভাব-লাস্যলীলাচতুরা, রুজ্-পাউডার-বিমণ্ডিতমুখী, 'ফ্রান্স-দেশ-জাত-মদ্য-লোভিনী' রেবতী-সুন্দরীর?—হ্যা হীরুদা, রেবতী মদ খায়?"

হীরালাল বলিল, "একেই বলে from sublime to the ridiculous! যে গুরুগম্ভীর ভাষায় বর্ণনা আরম্ভ করেছিলে, তার পর হঠাৎ ঐ খেলো প্রশ্ন!"

বিপিন বাবু বলিলেন, "নিশ্চয়ই খায়। কালও খেয়েছিল, খাবার টেবলে আমি তার চোখ দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু আমার সাম্‌নে খায় নি—ঝানু মেয়েমানুষ! তোমায় খেতে বলে না?"

হীরালাল হাসিয়া বলিল, "বলে বৈ কি! এমন কি, তুমি যখন কাল মুখ ধুতে গিয়েছিলে, তোমার এ সব চলে কি না, আমায় জিজ্ঞাসা করেছিল। খায়—তবে সামান্য পরিমাণে। খেতে বস্‌বার আগে, ক্ষিধে ক'রে নেবার জন্যে দুই এক পেগ খায় মাত্র।"

"তুমিও ধরেছ না কি—ক্ষিদের ওষুধটি?"

হীরালাল এইখানটায় সম্পূর্ণভাবে খাঁটি ছিল, তাই সগর্ব্বে উত্তর দিতে পারিল—"রাম কহো!"

বিপিন বাবু বলিলেন, "খুব সাবধান! খুব সাবধান! অমন কার্য্যটি যেন কখনও করো না। তা হলেই পাঞ্জাব মেলের গতিতে জাহান্নম নগরে গিয়ে পৌঁছবে—রিটার্ণ টিকিট পর্য্যন্ত থাক্‌বে না।"—ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তিনটে পাঁচ। যাও, শুয়ে পড় গিয়ে।"

হীরালাল তাহার নির্দ্দিষ্ট শয্যায় গিয়া শয়ন করিল। বিপিন বাবুও বিদ্যুৎ-বাতি নিবাইয়া, পাখা কমাইয়া, শয্যাশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

———

বিংশ পরিচ্ছেদ
দাদা ও ভাই

প্রাতে উভয়ের নিদ্রাভঙ্গ হইতে বেলা ৮টা বাজিয়া গেল। মুখ হাত ধুইয়া আসিয়া, চা পান করিতে করিতে বিপিন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ তোমাদের থিয়েটরে কি প্লে আছে হে?"

হীরালাল বলিল, "বিল্বমঙ্গল আর রাজা বাহাদুর।"

"রেবতী নামবে?"

"চিন্তামণি সাজবে।"

"তোমার কোনও পার্ট আছে না কি?"

"না, আমার কিছু নেই। যাবে না কি বিল্বমঙ্গল দেখতে?"

"গেলে হয় রেবতীর চিন্তামণি দেখ্‌তে। ক'টায় আরম্ভ?"

"বিকেলে সাড়ে চারটেয়।"

"বেশ, তাই যাওয়া যাবে। এখন কাযের কথা বলি। আমি আর ২।১ দিনের বেশী এখানে থাকতে পারবো না। এরই মধ্যে তোমায় একটা মেসের বাসায় থিতু ক'রে দিয়ে যেতে চাই। কিছু জিনিষপত্তরও তোমায় কিন্‌তে হবে। একখানা তক্তপোষ চাই, বিছানাপত্র চাই,—যা ছিল, সব ত গুণ্ডাদের সেলামি দিয়ে এসেছ।"

হীরালাল বলিল, "এ সব কিনতে হবে, কিন্তু হাতে টাকা ত বেশী নেই। মাইনে না পেলে—"

"আমি তোমায় কিনে দিয়ে যাব হে। তার পর মাইনে পেলে তুমি আমার টাকা পাঠিয়ে দিও। ঐ অজুহাতে যে মাইনে না পাওয়া পর্য্যন্ত রেবতীর কুঞ্জে অধিষ্ঠান করবে, সেটি হচ্ছে না দাদা!"

হীরালাল চটিয়া বলিল, "কে আর রেবতীর কুঞ্জে অধিষ্ঠান করবার জন্যে লালায়িত হয়ে রয়েছে?"

"না হলেই ভাল। এখন একটা কায কর দেখি। বাড়ীতে একখানা চিঠি লিখে ফেল। আমি ততক্ষণ স্নান ক'রে আসি।"—বলিয়া বিপিন বাবু তাঁহার পেটক হইতে খাম, কাগজ, ফাউণ্টেন পেন বাহির করিয়া দিয়া স্নান করিতে গেলেন।

চিঠি লিখিতে বসিয়া হীরালালের প্রথম সমস্যা হইল—উপরে ঠিকানা কি লিখিবে। কেয়ার অব শ্রীমতী রেবতী—সেটা ত আর লেখা যায় না। কেবলমাত্র বাড়ীর নম্বর ও জয় মিত্রের গলি, কলিকাতা—এইটুকু লিখিল। জয় মিত্রের গলিটারও যে খুব সুনাম আছে তাহা নয়—তবে তারা পাড়াগাঁয়ের লোক, অত কি জানে?

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল ধরিয়া হীরালাল পত্র লিখিল। গুণ্ডার হস্তে পড়ার কথা লিখিল, কিন্তু রেবতী-উদ্ধারের বিষয় উল্লেখ করিল না। থিয়েটরে চাকরী হওয়ার কথা প্রকাশ করিল, কিন্তু কার সহায়তায় ঐ চাকরী জুটিয়াছে, তাহা চাপিয়া গেল। মনে পাপ না থাকিলে আত্মীয়-বন্ধুজনের কাছে লুকোচুরির প্রয়োজন হয় না; কিন্তু হীরালাল মনকে এই বলিয়া বুঝাইল যে, সে কোনও মন্দ কায করিয়াছে বলিয়াই যে এ সকল কথা গোপন করিল, তাহা নহে, রেবতীর কথা শুনিলে অকারণ তাহারা একটা মন্দ আশঙ্কা করিয়া মনে ক্লেশ পাইতে পারে।

বিপিন বাবু যখন স্নান করিয়া ফিরিলেন, তখনও হীরালালের পত্র লেখা সমাপ্ত হয় নাই। বলিলেন, "কি হে, আর দেরী কত?"

হীরালাল বলিল, "এই শেষ করছি।"

"হোটেলের বাইরেই লেটারবক্স আছে, চিঠিখানা ফেলে এসে স্নানে যাও।"

"স্নানেই যাচ্ছি। তুমি আগে এ চিঠিখানা প'ড়ে দেখ, তার পর ফেলবো।"

"কেন, আমি প'ড়ে কি করবো?"

"দরকার আছে।"—বলিয়া হীরালাল চিঠি শেষ করিয়া সেখানি খোলা অবস্থায় টেবলের উপর ফেলিয়া স্নান করিতে গেল।

স্নান সারিয়া আসিয়া হীরালাল বলিল, "পড়লে?"

"হ্যাঁ।"

"দেখ, রেবতীর কোনও কথা কিন্তু প্রকাশ করিনি।"

"ভালই করেছ।"

"অনর্থক তাঁদের মনে একটা সন্দেহ জন্মাতে পারে।"

"পারেই ত!"

"তুমিও কিন্তু দেশে গিয়ে রেবতীর কোনও কথা কাউকে বোলো না ভাই।"

"তা বলবো না। কিন্তু আমি দেশে ব'সে ব'সে অন্য লোকের মুখে তোমার আর রেবতীর কোনও কেচ্ছা যেন না শুনতে পাই। এ সব কিছু ঘটলে, কথা হাওয়ায় উড়ে আসে জানই ত!"

"তা শুনতে পাবে না।"

"তা হলেই আমি খুসী। যাও, চিঠিখানা পোষ্ট ক'রে এস।"

হীরালাল কেশসংস্কারকার্য্য সমাধা করিয়া, একটা সিগারেট ধরাইয়া, খাম বন্ধ করিয়া চিঠি ফেলিতে গেল।

গল্প-গুজবে বেলা ১০টা বাজিল। বিপিন বাবু বলিলেন, "ওহে, এবার তা হ'লে বেরিয়ে পড়া যাক চল। পথে একটু ঘুরেও যেতে হবে।"

"আর কোথায় যাবে ?"

"মার্কেটে।"

"মার্কেটে কেন ?"

"চল না, দেখতেই পাবে।"

উভয়ে তখন সাজ-সজ্জা করিয়া, রাস্তায় নামিয়া ট্যাক্সি লইল। মার্কেটে ট্যাক্সি পৌছিলে বিপিন বাবু হীরালালকে লইয়া ফুলের বীথিকায় প্রবেশ করিলেন। বলিলেন, "রেবতী কি কি ফুল ভালবাসে, তুমি জান হীরুদা ?"

হীরু বলিল, "না, আমি কি ক'রে জান্‌বো ?"

বিপিন বাবু নিজ পছন্দমত কয়েক টাকার ফুল কিনিয়া লইলেন। গাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া হুকুম দিলেন, "চিৎপুর রোড।"

গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলে হীরালাল মুচ্‌কি হাসিয়া বলিল, "বিপিন, এবার আমার পালা, ভায়া !"

"কিসের পালা ?"

হীরালাল বলিল, "রেবতী কে তোমার পিসে মশায়ের কুটুম্বিনী হা—যে, তার পূজোর জন্যে এত ফুল কিনলে ?—সাবধান ভায়া; বড়লোকের ছেলে কলকাতায় এসে এই রকম করেই বেগড়ায় !"

শুনিয়া বিপিন বাবু হা হা করিয়া হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন, "তুমি দাদা গার্জ্জেন উপস্থিত থাক্‌তে আমি যদি বিগড়ে যাই ত সে দোষ আমার না তোমার ? আর, তা হ'লে সুন্দ ও উপসুন্দের যুদ্ধ বাধবে যে !"

এইরূপ হাস্য-পরিহাস করিতে করিতে উভয়ে গিয়া রেবতী-গৃহে উপস্থিত হইল। [ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

শিশু-বাদ্যকর

ভবানীপুর বারোয়ারির নবম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে আহূত সামাজিক মিলন-সভায় বিগত ২রা বৈশাখ শুক্রবার এক ব্রাহ্মণবংশীয় চারি বৎসর বয়স্ক বালক বিশুদ্ধ তানলয়ের সহিত ঢোল এবং তবলা বাজাইয়া সমবেত জনমণ্ডলীকে চমৎকৃত ও মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছিল। বালকের নাম "ফুলু।" চারি বৎসর বয়সের শিশু সহস্রাধিক ভদ্রমহোদয় ও মহিলার সম্মুখে তন্ময়তার সহিত বিশুদ্ধ তানলয়ে যেরূপ অপূর্ব্ব বাদ্যনৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহাতে পূর্ব্বজন্মবাদই প্রমাণিত হয়। উৎসবের সভাপতি নাট্যাচার্য্য শ্রীযুত অমৃতলাল বসু মহাশয় বালকের অদ্ভুত ক্ষমতাদর্শনে মোহিত হইয়াছিলেন। উৎসবের সভাপতি ও দর্শকগণ বালককে ধন্য ধন্য করিয়াছিলেন। ক্ষণজন্মা বালক দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া সঙ্গীতে অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করুক। শ্রীমান্ ফুলুর প্রতিকৃতি আমরা "বসুমতী"র পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম।

শিশু বাদ্যকর—শ্রীমান্ ফুলু

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু সম্পাদিত

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেশিনে" শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যা[illegible] প্রকাশিত।

৬ষ্ঠ বর্ষ] জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪ [২য় সংখ্যা

সাহিত্যে শ্রীরাধা

এই কৃষ্ণপ্রেমময়ী বিরহভীতিবিহ্বলা রাধিকা গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সাহিত্যে কি ভাবে আধ্যাত্মিক রাধারূপে পরিণত হইয়া পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-ভক্তমণ্ডলীর পরম উপাস্যরূপে হৃদয়রাজ্য অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাই দেখা যাক। গোবিন্দলীলামৃতে দেখিতে পাওয়া যায়, এই আধ্যাত্মিক রাধার প্রাথমিক স্ফুরণ :—

"সখ্যঃ শ্রীরাধিকায়া ব্রজকুমুদবিধোর্হ্লাদিনী নাম শক্তেঃ
সারাংশপ্রেমবল্ল্যাঃ কিশলয়দলপুষ্পাদিতুল্যাঃ স্বতুল্যাঃ।
সিক্তায়াং কৃষ্ণলীলামৃতরসনিচয়ৈরুল্লসন্ত্যামমুষ্যাং
জাতোল্লাসাঃ স্বসেকাৎ শতগুণমধিকং সন্তি যত্তন্ন চিত্রম্॥"

ব্রজবাসিজনরূপ কুমুদসমূহের পক্ষে সুধাকর সদৃশ শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের যে জগদানন্দদায়িনী হ্লাদিনী নামক শক্তি বিদ্যমান আছে, সেই শক্তির সারস্বরূপ যে প্রেমলতিকা, তাহা হইলে শ্রীরাধার স্বরূপ। সেই প্রেমলতিকার কিশলয়, পত্র ও পুষ্প প্রভৃতির স্থানাভিষিক্ত ললিতা ও বিশাখা প্রভৃতি সখীগণ, ইহারা সকলে রূপে, গুণে, বেশে ও ভূষায় রাধিকারই অনুরূপ। রাধিকারূপ এই প্রেমলতিকা কৃষ্ণলীলারূপ অমৃতরসধারায় সিক্ত হইয়া উল্লসিত হইলে, ঐ সখীগণ কৃষ্ণলীলামৃত-রসের ধারায় নিজে সিক্ত হওয়া অপেক্ষা শতগুণ অধিকভাবে যে সমুল্লসিত, তাহাতে কোন বিস্ময়ের কারণ নাই।

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণরূপ ভগবানের স্বরূপশক্তি যে হ্লাদিনী, সেই হ্লাদিনীর সাররূপ যে প্রেম, রাধা সেই প্রেমেরই স্বরূপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। হ্লাদিনী শক্তির ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া চৈতন্যচরিতামৃতকার বলিয়াছেন :—

"কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম আহ্লাদিনী।
সেই শক্তিদ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি॥
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥"

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দার্শনিকগণের মতে ভগবান্ সচ্চিদানন্দ

ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও, তিনি অদ্বৈতবাদিসম্মত ভোগ্যভোক্তৃভাব-বর্জ্জিত অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই নহেন। তিনি নিজ স্বরূপ-শক্তির প্রভাবে স্বয়ং আনন্দস্বরূপ হইয়াও সর্ব্বদা সেই আনন্দের স্বয়ং উপভোক্তা এবং সেই আত্মানন্দের অনুভূতির দ্বারা নিখিল জীবকে আনন্দময় করিয়া, এই মায়িক দুঃখময় প্রপঞ্চকে সুখ-সাম্রাজ্যে পরিণত করিয়া স্বীয় অনন্ত বৈচিত্র্যময় লীলাশক্তির পূর্ণবিকাশ করেন, ইহাই তাঁহার স্বভাব। এই স্বভাবেরই নামান্তর হ্লাদিনী শক্তি। এই শক্তি মানব-হৃদয়ে প্রেমরূপে বিকশিত হইয়াই প্রপঞ্চকে আনন্দময় করিয়া থাকে, ইহাই হইল গৌড়ীয় ভক্ত দার্শনিক আচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তকেই অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণব কবিগণ কল্পনা-তুলিকার সাহায্যে ব্রজগোপিকা-কুলললামভূতা প্রেমময়ী শ্রীরাধিকার যে অপূর্ব্ব চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়। এ রাধায় প্রেম মহাভাবরূপে পরিণত হইয়াছে, কামবাসনাবাসিত লৌকিক দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ইহা হইতে একবারে দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। রসরাজ শ্রীকৃষ্ণে রস-সঞ্চারিণী বৃত্তির চিন্ময় বিবর্ত্তগুলি এই চিন্ময়ী বিশ্বপ্রেমাত্মিকা শ্রীরাধার সখীরূপে পরিণত হইয়াছে। রস ও মাধুর্য্যের মধুর মিলনে চিন্ময় পরিণতি দিব্য সৌরভে পৃথিবীকে অলকা-রাজ্যে পরিণত করিয়াছে। তাই চরিতামৃতকার বলিয়াছেন :—

"প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেমে বিভাবিত।
কৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠা জগতে বিদিত॥
সেই মহাভাব হয় চিন্তামণি সার।
কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য্য যার॥
মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী তার কায়ব্যূহরূপ॥"

এ রাধা আত্মসুখার্থিনী রক্ত-মাংসের রাধিকা নহেন। ইনি চৈতন্যময় কৃষ্ণের চৈতন্যময়ী হ্লাদিনী শক্তির বিশ্বজনীন প্রেমবিবর্ত্ত, আত্মভাবে তিনি আত্মমহিমার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া জ্ঞানী ও কর্ম্মীর অদ্বয় জ্ঞানবাদ ও পরিচ্ছিন্ন ভোক্তৃবাদকে সমূলে উন্মূলিত করিবার জন্য সাধকের সদ্ভাবময় হৃদিবৃন্দাবনে সমুদিত হইয়া থাকেন। এ রাধিকার বেশ-ভূষা বর্ণন করিতে যাইয়া তাই ভক্ত কবি কবিরাজ গোস্বামী গাহিয়াছেন :—

"রাধা প্রতি কৃষ্ণস্নেহ সুগন্ধি উদ্বর্ত্তন।
তাতে অতি সুগন্ধি দেহ উজ্জ্বল বরণ॥
কারুণ্যামৃত-ধারায় স্নান প্রথম।
তারুণ্যামৃতধারায় স্নান মধ্যম॥
লাবণ্যামৃতধারায় তদুপরি স্নান।
নিজ লজ্জা শ্যাম পট্টশাড়ী পরিধান॥
কৃষ্ণ অনুরাগ রক্ত দ্বিতীয় বসন।
প্রণয় মান কঞ্চুলিকায় বক্ষ আচ্ছাদন॥
সৌন্দর্য্য কুঙ্কুম সখী প্রণয় চন্দন।
স্মিত-কান্তি কর্পূর তিন অঙ্গে বিলেপন॥
কৃষ্ণের উজ্জ্বল রস মৃগমদভর।
সেই মৃগমদে বিচিত্রিত কলেবর॥
প্রচ্ছন্নমান বাম্য ধম্মিল্ল বিন্যাস।
ধীরাধীরাত্ব গুণ অঙ্গে পট্টবাস॥
রাগ তাম্বূলরাগে অধর উজ্জ্বল।
প্রেম কৌটিল্য নেত্রযুগলে কজ্জল॥
সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাব হর্ষাদি সঞ্চারী।
এই সব ভাব ভূষণ প্রতি অঙ্গে ভরি॥
কিলকিঞ্চিতাদি ভাব বিংশতি ভূষিত।
গুণশ্রেণী পুষ্পমালা সর্ব্বাঙ্গে পূরিত॥
সৌভাগ্যতিলক চারু ললাটে উজ্জ্বল।
প্রেমবৈচিত্ত্য রত্ন হৃদয়ে তরল॥
মধ্যবয়স্থিতা সখী স্কন্ধে করন্যাস।
কৃষ্ণলীলা মনোবৃত্তি সখী আশ-পাশ॥
নিজাঙ্গ-সৌরভালয়ে সৌভাগ্য পর্য্যঙ্ক।
তাতে বসি আছে সদা চিন্তে কৃষ্ণসঙ্গ॥
কৃষ্ণ-নাম-গুণ-যশ অবতংস কানে।
কৃষ্ণ-নাম-গুণ-যশ প্রবাহ যতনে॥
কৃষ্ণকে করায় শ্যামরস মধুপান।
নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ব্বকাম॥
কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেম রত্নের আকর।
অনুপম গুণগান পূর্ণ কলেবর॥"

প্রিয়তম আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার মিলনের অনুকূল বেশ ও ভূষার অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ এই কয়টি পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে। ভক্তের প্রতি ভগবানের প্রীতিরূপ যে স্নেহ, তাহাই হইল শ্রীরাধার উদ্বর্ত্তন, অর্থাৎ স্নানের পূর্ব্বে

সুগন্ধবাসিত হরিদ্রাদিরূপ উদ্বর্ত্তন। এই উদ্বর্ত্তন অঙ্গে মাখিয়া দেহকে নির্ম্মল করিয়া তবে স্নান করিতে হয়। সাধনার পথে কৃষ্ণ-মিলনের জন্য অগ্রসর ভক্তের ভাবময় দেহকে প্রথমে ভগবানের ভক্তের প্রতি ভালবাসারূপ যে উদ্বর্ত্তন আছে, তাহার দ্বারা লেপন করিতে হয়, অর্থাৎ ভগবৎপ্রীতির প্রতি আত্যন্তিক বিশ্বাস ও নির্ভর ব্যতিরেকে কোন ভক্তই ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের অনুকূল বিশুদ্ধতা লাভ করিতে সমর্থ হয় না। এই বিশ্বাসরূপ উদ্বর্ত্তনের সেবনে ভক্তের ভাবময় দেহ ভগবৎপ্রেমের সৌরভে সুরভিত হয়। দুরাকাঙ্ক্ষার দুরন্ত তাপে ক্লিষ্ট বিবর্ণ ভৌতিক দেহ বিলীন হইয়া যায়, সেই সঙ্গে সমুজ্জ্বল বর্ণবিশিষ্ট কৃষ্ণসঙ্গমের অনুকূল সিদ্ধ দেহ সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে। তাহার পর স্নান। এ স্নান একবার নহে, দুইবার নহে, কিন্তু তিনবার। ইহা কোন ভৌতিক স্বচ্ছসলিলা শীতল নদীতে অবগাহন নহে। আশে-পাশে, সম্মুখে, পশ্চাতে, উপরে, নীচে কৃষ্ণের অদর্শনে অহ-নিকার দুরন্তরূপে স্বকৃতকর্ম্মের বিপাকরূপ ভীষণ বিপদের আবর্ত্তে পড়িয়া মুহ্যমান হইয়া অসংখ্য জীব যখন অধীর হইয়া রহিয়াছে, তাহাদিগের দুঃখ দেখিয়া আপনারই পূর্ব্বা-বস্থা স্মরণ নিবন্ধন যে বিশ্বজনীন করুণা হৃদয়কে প্লাবিত করিয়া থাকে, সেই করুণাময় অমৃতবারির দ্বারা ভক্তের ভাবময় স্নান, তাহাই হইল তাহার প্রথম স্নান। জীবের দুঃখে যাহার হৃদয় গলিয়া অমৃত-সাগরের সৃষ্টি করে, সে হৃদয়ে জীব-দুঃখনিচয়ের নিরাকরণসমর্থ অনন্ত অপরিসীম উৎসাহের উদয় হয়, সেই উৎসাহের প্রভাবে জরা বিদূরিত হয়, অবসাদ গলিয়া পড়ে, নূতন তারুণ্যের ছটায় নব-জীবনের আলোকপ্রভায় জগৎ আলোকিত হইয়া যায়, এই তারুণ্যের অমৃতধারায় কৃষ্ণসমাগমার্থিনী শ্রীরাধার দ্বিতীয় স্নান সমাধা হইয়া থাকে। তাহার পর লাবণ্যরূপ যে অমৃতধারা, সেই অমৃতধারায় সেই প্রেমময় বিশুদ্ধ সিদ্ধদেহের তৃতীয় স্নান সাধিত হইয়া থাকে। এ লাবণ্য কিসের প্লাবন? ইহা পার্থিব দেহের প্রাপঞ্চিক সৌন্দর্য্য নহে, কিন্তু ইহা সাধনসিদ্ধ বিশুদ্ধ অন্তঃকরণরূপ দর্পণে প্রতিফলিত সচ্চিদানন্দস্বরূপ রসঘনমূর্ত্তি ভগবানের অলৌকিক সৌন্দর্য্যরূপ লাবণ্য। এই লাবণ্যের অনুভূতি হইল ভক্তের পক্ষে ভগবৎসমাগমের অনুকূল তৃতীয় স্নান। এই স্নানের পর ভক্তহৃদয়ে নিজের অকিঞ্চনত্ব-স্মরণ-নিবন্ধন যে সঙ্কোচ বা লজ্জার অনুভূতি, তাহাই শ্রীরাধার শ্যামবর্ণ পট্টবস্ত্র। এ পট্টবস্ত্রে আবৃত না হইলে প্রেমের সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে না। সেই পট্টবস্ত্রের উপর উত্তরীয়বস্ত্ররূপে ভগবদনুরাগরূপ রক্তবস্ত্র। নীল শাড়ীর উপর লোহিতবর্ণের উত্তরীয় শোভাবিধান করিয়া থাকে, তাহার পর প্রণয়ের স্বভাবসিদ্ধ যে অহেতুক অভিনয়, তাহাই তাহার বক্ষে আবরণরূপে কঞ্চুলিকার শোভা ধারণ করিয়াছে। এইবার এই ভাবে স্নাত ও রাগবস্ত্রাবৃত প্রেমময়ী শ্রীরাধার শ্রীঅঙ্গে বিলেপনের বর্ণন করা হইতেছে। সে বিলে-পন কি? লৌকিক বিলেপনে সাধারণতঃ চন্দন, কুঙ্কুম ও কর্পূরচূর্ণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রাধার অঙ্গের বিলেপনে গাঢ়তাপ্রাপ্ত প্রেমরূপ প্রণয় চন্দনের স্থান অধিকার করি-য়াছে। প্রেমরসে সমুচ্ছলিত চৈতন্যময় দেহের অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্য কুঙ্কুমের কার্য্য করিতেছে, আর অনুপম আনন্দে উদ্ভাসিত মুখমণ্ডলের মৃদুমধুর হাস্য কর্পূরচূর্ণরূপে পরিণত হইয়াছে। এই অপূর্ব্ব অলৌকিক বিলেপনে বিভূষিত শ্রীরাধার অঙ্গে নিখিল-সুন্দর শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিরূপ যে উজ্জ্বল রস, তাহাই কস্তুরীরূপে পরিণত হইয়াছে। সেই কস্তুরীর দ্বারা বিরচিত যে অলকা-তিলকারূপ চিত্ররচনা, তাহার শ্রী-অঙ্গে বিচিত্রিত হইয়াছে। সুগভীর প্রণয়-সমুদ্রের ভাবময় তরঙ্গরূপ অন্তঃপ্রচ্ছন্ন মান ও বামতা সেই শ্রীঅঙ্গে কবরীর স্থান অধিকার করিয়াছে। ধীরা ধীরা স্বভাবরূপ গুণরাজি সেই শ্রীঅঙ্গে পটবাস বা সুগন্ধিচূর্ণের অর্থাৎ পাউডারের কার্য্য করিতেছে। সে চিদানন্দময় দেহে লৌকিক তাম্বূলের রাগ সম্ভবপর নহে, তাই ভগবৎ-প্রেমরূপ তাম্বূলরাগে সেই অধর উজ্জ্বল হইয়াছে। আর প্রেমস্বভাববশতঃ সমুদ্ভূত কৌটিল্য তাহার নয়ন-যুগলে কজ্জলের স্থান অধিকার করি-য়াছে। স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাব-নিচয় ও হর্ষ প্রভৃতি প্রীতি-সঞ্চারী ভাবনিচয় একাধারে এক-কালে আবির্ভূত হইয়া শ্রীরাধার ভাবময় অঙ্গসমূহে বিচিত্র ভূষণের কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। অহেতুক হাস, রোদন প্রভৃতি যে বিংশতি প্রকার ভাব আছে, তাহাও সেই সকল ভূষণের মধ্যে সমাবিষ্ট হইয়াছে। রমণীর বরণীয় গুণগণ পুষ্পমালার আকার ধারণ করিয়া শ্রীরাধার সকল অঙ্গে অপূর্ব্ব শোভাবিধান করিতেছে। সৌভাগ্যের সমুজ্জ্বল তিলকে সে চারুললাট অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করিয়াছে। প্রেমবৈচিত্ত্যরূপ রত্নহার হৃদয়ের সৌন্দর্য্যকে শতগুণে বর্দ্ধিত

করিতেছে। এ হেন প্রেমময়ী রাধা মধ্যবয়ঃস্থিতা সখীর স্কন্ধে হস্ত বিন্যস্ত করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার আশে-পাশে সম্মুখে-পশ্চাতে কৃষ্ণলীলারূপ মনোবৃত্তি-নিচয় প্রিয়-সখীর কার্য্য করিতেছে। কৃষ্ণপ্রেমপূত নিজাঙ্গের সৌরভে পরিপূর্ণ বিশ্বপ্রপঞ্চই তাঁহার আবাসগৃহ, সেই আবাসগৃহে সৌভাগ্যরূপ পর্য্যঙ্কে তিনি উপবেশন করেন। সে সময়ে কৃষ্ণসঙ্গ-চিন্তা ভিন্ন অন্য কোন চিন্তা সে হৃদয়ে স্থান পায় না। কৃষ্ণের নাম, কৃষ্ণের গুণ এবং কৃষ্ণের যশ তাঁহার কর্ণের বিভূষণ। কৃষ্ণের নাম, কৃষ্ণের গুণ এবং কৃষ্ণের যশঃপ্রবাহ তাঁহার বচনে প্রবাহরূপে বহিতে থাকে। এই ভাবে স্নাত, সজ্জিত ও বিভূষিত হইয়া রাধা আত্মশক্তির প্রভাবে সচ্চিদানন্দ নিরাকার নির্ব্বিকার কৃষ্ণকেও নিজ-হৃদয়ে অভিব্যক্ত শ্যামরসরূপ সুধা পান করাইয়া থাকেন, অকাম পুরুষকে সর্ব্বকামের আধার করিয়া তাঁহার আকাঙ্ক্ষাকে পরিপূর্ণ করিয়া থাকেন। ইহাই হইল রাধার স্বরূপ। কৃষ্ণপ্রেমরূপ বিশুদ্ধ রত্নের ইহাই হইল রত্নাকর। লোকাতীত অনুপম গুণগণে ইঁহার কলেবর সর্ব্বদা পরিপূর্ণ রহিয়াছে।

এই ভাবে রাধার স্বরূপ বর্ণন করিয়া চরিতামৃতকার বলিয়াছেন :—

"যাহার সৌভাগ্য-গুণ বাঞ্ছে সত্যভামা।
যার ঠাঞি কলা-বিলাস শিখে ব্রজরামা॥
যার সৌন্দর্য্যাদি-গুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মীপার্ব্বতী।
যার পতিব্রতা-ধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী॥
যার সদ্‌গুণগণের কৃষ্ণ না পান পার।
তার গুণ গণিবে কেমনে জীব ছার॥"

ইহাই হইল বঙ্গীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যে বর্ণিত শ্রীরাধার ভাবময় অপূর্ব্ব রূপ। এ রাধায় প্রেম আছে, কাম নাই; সৌন্দর্য্যের অনুভূতি আছে, কিন্তু তন্মূলক অভিনয় নাই। এ অপূর্ব্ব রাধাতত্ত্ব কোন প্রাচীন কবির কাব্যে উপলব্ধ হয় না। দর্শনে ইহার তত্ত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বাঙ্গালী ভক্ত কবির ভগবৎপ্রেমবিশুদ্ধ অন্তঃকরণে এই রাধার ছায়া যে ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে, বাঙ্গালার অমর কবি চৈতন্য-চরিতামৃতকার শ্রীকবিরাজ গোস্বামী তাহাই উক্ত কয়টি পয়ারে চিত্রিত করিয়াছেন। রাধার এই তত্ত্ব প্রচার করিবার জন্যই কাঙ্গালের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ দেব অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহাই হইল গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত। তাই রূপগোস্বামী বলিয়াছেন :—

"রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥"

সচ্চিদানন্দ রসঘন শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বজীবের প্রতি যে প্রীতি বা প্রণয়, শ্রীরাধা তাহারই পরিণতি। তিনি শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তি। এই কারণে রাধা এবং কৃষ্ণ স্বরূপতঃ একই, ভিন্ন নহেন। কিন্তু তাহা হইলেও এই রাধা এবং কৃষ্ণ সৃষ্টির প্রথম সময় হইতে বিভিন্ন দেহকে আশ্রয় করিয়া সংসারে লীলা করিয়া আসিতেছেন, সেই অভিন্ন হইয়াও ভিন্নদেহ শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ অদ্য আবার ঐক্যকে প্রাপ্ত হইয়া শ্রীচৈতন্যরূপে প্রকট হইয়াছেন। রাধার ভাবদ্যুতির দ্বারা সমাবৃত সেই সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণস্বরূপ শ্রীচৈতন্যকে আমি নমস্কার করিতেছি।

ভক্ত ও ভগবান্ এই দুইএর মধ্যে যে পর্য্যন্ত দেহগতভেদ বিদ্যমান থাকে, সে পর্য্যন্ত প্রেমভক্তি পূর্ণতা লাভ করিতে সমর্থ হয় না। যেখানে ভেদ, সেখানেই সঙ্কোচ বা আবরণ; লেশমাত্র আবরণ বিদ্যমান থাকিলে প্রেমের পূর্ণতা প্রকটিত হয় না। এই প্রেমের পূর্ণতার জন্য ভগবান্ প্রেমের পাত্র হইয়াও—প্রেমের বিষয় হইয়াও প্রেমের আধাররূপে যত দিন আবির্ভূত হন নাই, তত দিন পর্য্যন্ত মানব প্রেমকে পূর্ণভাবে আস্বাদন করিতে সমর্থ হয় নাই। পরিপূর্ণ প্রেমের আস্বাদন ব্যতিরেকে মানব-জনমের সাফল্য কথনই সম্ভবপর নহে। সেই পরিপূর্ণ প্রেমের অনাবিল আদর্শ শ্রীরাধা। এ হেন রাধাতত্ত্ব যিনি রাধা হইয়া জগতের আরাধনার পথ সুগম করিয়া গিয়াছেন, সেই বাহিরে রাধা ভিতরে কৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যদেবকে ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম করিয়া শ্রীরাধাতত্ত্বের উপসংহার করা যাইতেছে।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।
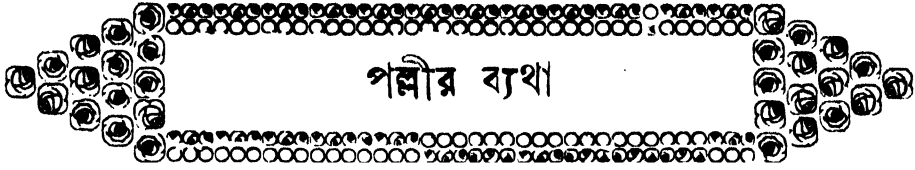
পল্লীর ব্যথা

কলিকাতার রম্য হর্ম্ম্যবাসী সুখসেবী জমীদার ও ব্যারিষ্টার-বর্গ পল্লীগ্রামের দুর্দ্দশা কল্পনার নেত্রে দেখেন বটে, কিন্তু তাহার প্রকৃত অবস্থা অতি অল্প লোকই বুঝিতে পারেন। খুলনা জিলার এমনই দুর্দ্দশা যে, ২।১ ঘর জমীদার ব্যতীত—যেমন সাতক্ষীরা ও নকীপুর—সকলেই প্রায় বারো মাস সহর-তলীতে বাস করেন। গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে, খুলনা জিলার এই প্রকার অন্যূন এক শত জমীদার, তালুকদার, গাঁতিদার প্রভৃতি বিদেশে অবস্থান করেন। সুতরাং তাঁহাদের সঙ্গে প্রজাবর্গের সম্বন্ধ শুধু নায়েব, গোমস্তা প্রভৃতি কর্ম্মচারীর ব-কলম। মাত্র তিন সপ্তাহ হইল সাতক্ষীরা মহকুমার অন্তর্ভূত কতকগুলি স্থানে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইয়াছি। সেগুলি আবার লবণাক্ত প্রদেশ; দেখিলাম, নৌকাযোগে জালা পূর্ণ করিয়া প্রায় এক 'গণের' পথ হইতে একটু মিষ্ট পানীয় জল আনিয়া লোক প্রাণধারণ করিতেছে। কোথাও বা দেখি যে, কাহারও জমীদারীর অন্তর্ভূত একটি উচ্চ প্রাইমারী স্কুল কোন রকমে অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আসিতেছে। এক জন জমীদার মাসে এক টাকা চাঁদা দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাও কয়েক বৎসর দিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। এই শ্রেণীর জমীদার যখন ফসলের সময় মফঃস্বলে পদার্পণ করেন, তখন প্রজাগণের থর-হরি কম্প—'বর্গী এল দেশে' এইরূপ আতঙ্ক উপস্থিত হয়। আবার বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম, এই শ্রেণীর এক জমীদারের বিরুদ্ধে তাঁহার প্রজাগণ ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত করিয়াছে, তিনি যেন আর তাঁহার জমীদারীতে সশরীরে না আইসেন। বাকী-বকেয়া খাজনার উপর নজর ও সেলামী দিতে প্রজাগণের প্রাণান্ত হয়। অবশ্য, এ বিবরণ জমীদার সাধারণের উপর প্রযোজ্য, এমন আমি বলিতেছি না। তবে এ প্রকার নমুনা নিতান্ত বিরল নহে। সুখের বিষয়, সাতক্ষীরার জমীদারগণের প্রজারঞ্জক বলিয়া পুরুষানুক্রমে খ্যাতি আছে এবং তাঁহাদের জমীদারীর ভিতর অন্যায় অত্যাচার একবারে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

কয়েক মাস হইল, কৃষি-কমিশনে সাক্ষ্য দিবার সময় বলিয়াছিলাম যে, জমীদার যদি দেশবাসী হইয়াও প্রজাপীড়ক হন, তাহা হইলেও দেশের মঙ্গল। কেন না, পুষ্করিণী খনন, পুরাতন দীঘির পঙ্কোদ্ধার প্রভৃতি তাঁহাদের নিজ ব্যবহার্য্য জলের জন্য করিতেই হয়। তাহা ছাড়া বারো মাসে তের পার্ব্বণে যে টাকা ব্যয় হয়, সে টাকা দেশেই থাকিয়া যায়। কিন্তু কলিকাতাবাসী জমীদারগণ প্রজার অর্থ শোষণ করিয়া চৌরঙ্গীতে বিলাস-ভবনে বাস করেন; তাঁহাদের গৃহসজ্জা ও নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য, মোটর-গাড়ী, বিজলী বাতি ও পাখা, আরাম-কেদারা প্রভৃতি বিলাসের অঙ্গ, সমস্তই বিদেশী। এই সকল জমীদারকে আমি জিজ্ঞাসা করি, তোমরা জমীদারীর আয়ের কত ভগ্নাংশ প্রজাবর্গের উন্নতিকল্পে ব্যয় কর? এই ত গেল অনুপস্থিত জমীদারদিগের কথা। তাহার পর পল্লীগ্রামের আর এক সর্ব্বনাশ, যিনি একটু লেখাপড়া শিখিয়া মাথা তুলিয়াছেন, তিনি একবারে দেশছাড়া। শরৎ চট্টোপাধ্যায় 'পল্লী-সমাজে' যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালার সকল পল্লীর উপর প্রযোজ্য। যত অকর্ম্মা অশিক্ষিত 'রদী মাল', তাহারাই গ্রামে থাকিয়া যত রকম কোন্দল, মামলা-মোকর্দ্দমা, বিবাদ-বিসংবাদ কুড়াইতে ব্যস্ত। গ্রাম হইতে নৈতিক বা অর্থ-নৈতিক উন্নতি একবারে তিরোহিত হইয়াছে। জমীদার ও শিক্ষিত লোকমাত্রই দেশত্যাগী বলিয়া প্রাচীন কালের বড় বড় সরোবর প্রায় মজিয়া আসিতেছে। জল-নিঃসরণের পথ ও জঙ্গল কাটার অভাবে ম্যালেরিয়া, কলেরা প্রভৃতি ভীষণ আকার ধারণ করে। এই খুলনারই কয়েকটি গ্রামে ঘুরিয়া খবর পাইলাম যে, বন্য শূকরের অত্যাচারে কৃষিকর্ম্ম করা দায়; বিশেষতঃ আলু-কচুর চাষ অসাধ্য হইয়া দাঁড়ায়। এই ত দেশের অবস্থা; অথচ দেশে টাকা ছড়ান রহিয়াছে। বিদেশীরা আসিয়া ইহা মুঠা মুঠা কুড়াইয়া লইয়া যাইতেছে। সামান্য দুই একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি; তাহা সাতক্ষীরার লোক বুঝিবেন। খুলনার সদর ও সাতক্ষীরা মহকুমার দক্ষিণ ভাগে 'নোনা গাঙ্গে' অনেক স্থানে ঘুসো চিংড়ী ধরিবার খটী আছে।

এই সমস্ত নদীর জলকর আমাদের; যে জেলেরা এই মাছ ধরে, তাহারাও আমাদের প্রজা; যেখানে মাছ শুকায়, সে-ও আমাদের নিজের জমী। অথচ বাল্যকাল হইতে দেখিতেছি, বোম্বাই অঞ্চলের নাখোদা বণিক্‌গণ এই জেলেদিগকে

বড় বড় ডেক্‌চী কিনিয়া দেয় ও টাকার দাদন দেয় এবং শুক্‌না মাছ প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী করে। কিন্তু আমরা কি এতই অর্ব্বাচান যে, এই ঘরের দুয়ারে যে ব্যবসাটা চলিতেছে এবং যাহা হইতে বিদেশীরা লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিতেছে, তাহা হইতে আমরা সামান্য জলকর ভিন্ন আর কিছুই পাই না? আর একটি দৃষ্টান্ত দিই, আপনারা সকলেই জানেন যে, কপোতাক্ষতীরবর্ত্তী এই সাতক্ষীরা মহকুমারই অন্তর্ভূত 'বড় দলে'র বিরাট হাট আছে, এখানে বৎসরে লক্ষ লক্ষ টাকার মাল আমদানী-রপ্তানী হয়। কিন্তু ইহার প্রধান লভ্যাংশ মাড়োয়ারীগণ করায়ত্ত করিয়াছে; তাহারা লোটা-কম্বল সম্বল করিয়া কত দূরদেশ হইতে আসিয়া অতর্কিতভাবে এখানকার সমস্ত ব্যবসায় হস্তগত করিয়াছে। অথচ আমরা আমাদের ছেলেদিগকে ৫ বৎসর বয়স হইতেই বিদ্যালয়ে পাঠাই, পাঠের তাড়নায় তাহাদের স্বাস্থ্য ভঙ্গ করি—একটার পর আর একটা, তাহার উপর আর একটা পাশ করাই। ফলে হীনবীর্য্য অস্থিকঙ্কালসার যুবকগণ চাকরীর অভাবে হা-অন্ন হা-অন্ন করিয়া হৃদয়-বিদারক চীৎকার করিতেছে।

তুমি সহরের দিকে যতই দৃষ্টিনিক্ষেপ কর না কেন, আদমসুমারীর বিবরণে জানা যায়, শতকরা ৫।৬ জন মাত্র সহরে বাস করে। আর বাকী ৯৪।৯৫ জন ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ম্যালেরিয়াগ্রস্ত হইয়াও পল্লীগ্রামে বাস করিতে বাধ্য। এই জনসঙ্ঘ লইয়াই ত বাঙ্গালী জাতি। আমরা কলিকাতায় বসিয়া যতই রাজনৈতিক আন্দোলন করি না কেন, যত দিন না আমরা এই বিপুল জনসংঘের মধ্যে লোকশিক্ষা বিস্তার করিতে পারিব, তত দিন রাজপুরুষদের নিকট হইতে কোন প্রকার অধিকার আদায় করিতে পারিব, তাহা মনে হয় না। এখন আর এক অদ্ভুত নেশা জাতিকে অভিভূত করিয়াছে,অর্থাৎ কাউন্সিলে প্রবেশ। এই উন্মত্ততায় কাহাকেও বা ২০।২৫।৩০ হাজার, এমন কি, লাখ টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় করিতে দেখা গিয়াছে। সে দিন এক জন বিশিষ্ট এবং অভিজ্ঞ সংবাদপত্রসেবীর সহিত আলাপ করিতে করিতে আমি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলাম যে, এই নির্ব্বাচনব্যাপারে সমগ্র বাঙ্গালায় অন্যূন ১২।১৫ লাখ টাকা ব্যয় হইয়াছে। তিনি হাসিয়া বলিলেন, ৫০ লাখ টাকার এক পয়সা কম নহে। কাউন্সিলে ঢুকিয়া বড় বড় গগন-ফাটান ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা করিয়া দেশোদ্ধার করা বড়ই সহজ ব্যাপার। কিন্তু এই যে পল্লীতে কোটি কোটি অজ্ঞ বর্ণজ্ঞানশূন্য নরনারী আছে, তাহাদের সহিত তোমার কি সংযোগসম্বন্ধ রহিয়াছে? আমি নিজে রসায়নাগারের গবেষণা তুচ্ছ করিয়াও দেশহিতকর নানা কার্য্যে কাউন্সিলপদপ্রার্থী অনেকের কাছে ভিক্ষাপাত্র লইয়া দ্বারস্থ হইয়াছি; কিন্তু যিনি অম্লানবদনে কাউন্সিলে প্রবেশ করিবার জন্য ২০।৩০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন, তিনিই আবার আমাকে রিক্তহস্তে ফিরাইয়া দিয়াছেন। এখন আবার বড় বড় নেতার 'বোলচাল' শুনি, কাউন্সিলে ঢোকা বিড়ম্বনা মাত্র। গভর্ণমেণ্টকে হারাইয়া দিলেও যদিচ্ছাচারী সার্টিফিকেসন করিবে। যদি সত্য সত্যই ইহার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হয়, তবে পল্লীসংস্কার কি সংগঠন মুখের কথা না হইয়া কার্য্যে পরিণত করা হয় না কেন?

তুমি সহরতলীতে থাক, আবার গ্রীষ্ম পড়িলেই শৈলবিহারে যাইয়া অর্থের শ্রাদ্ধ কর। অথচ তুমি নেতা বলিয়া সাধারণের কাছে মানসম্ভ্রম চাও। ইহা কি প্রহসন নহে? আজ হিন্দু-মুসলমান সমস্যা, ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ সমস্যা জটিল হইতে জটিলতর হইয়া দাঁড়াইতেছে। হিন্দু বল, মুসলমান বল, ব্রাহ্মণ বল, অব্রাহ্মণ বল, সকলেই ত এই বাঙ্গালার মাটী, বাঙ্গালার জল ও বাঙ্গালার হাওয়ায় পরিপুষ্ট। সকলেই ইহার সমান অধিকারী। তবে এ গৃহ-বিবাদে আজ দেশ জর্জ্জরিত কেন? আমার মনে হয়, বাঙ্গালার গ্রামই প্রকৃত মিলন-মন্দির। যদি অনুন্নত শ্রেণী বা তথাকথিত অস্পৃশ্য শ্রেণী বুঝিত যে, জমীদার ও শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রকৃতপক্ষে তাহাদের হিতাকাঙ্ক্ষী, তাহা হইলে কখনই এই আত্মকলহরূপ বহ্নি ইন্ধন পাইত না। জমীদার ও প্রজায়, শিক্ষিতে ও অশিক্ষিতের মধ্যে এমন এক প্রাচীর ব্যবধান রহিয়াছে যে, কখনই জনসাধারণ ভাবিতে পারে না যে, উহারা তাহাদের বন্ধু। এই যে ঝগড়া, ইহার কারণ গূঢ়তর—মনোবৃত্তিমূলক। আজ যদি আমরা প্রকৃতপ্রস্তাবে দেশকে তুলিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইতাম, তাহা হইলে অগ্রে এই বিপুল জনসংঘকে আমাদের সহিত একতাসূত্রে আবদ্ধ করিতাম; তাহাদিগের অভাব-অভিযোগে কর্ণপাত করিতাম। কিন্তু তাহাদের সহিত আমাদের একবারে ফারখৎ!

এই সাতক্ষীরা ও সদর মহকুমার লবণাক্ত অঞ্চলের বড়ই দুর্দ্দশা। এখানকার মালিক অসংখ্য; এই জন্য মলিয়া মিশিয়া বাঁধ-বন্দী সুচারুরূপে হয় না। এই কারণে নোণা জল ঢুকিয়া অনেক ক্ষেত্র পর পর অজন্মাগ্রস্ত হইয়া থাকে। কেবল বরুণদেবের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়; ষোল আনা ফসল ত এক প্রকার উপন্যাসের কথা হইয়াছে। ৩।৪ বৎসর অন্তর ৮ আনা ৬ আনা ফসল জন্মিয়া থাকে। এই কারণে জমীদার, গাঁতিদার, প্রজা সকলেই দুর্দ্দশাগ্রস্ত। এই দক্ষিণাঞ্চলের একমাত্র উপজীবিকা আমন ধান্য। এই জন্য এই অঞ্চলকে একফসলা বলা যায়। যদি ফসল না হইল, তাহা হইলেই হাহাকার। অনেক লোকের মাদুর বুনিয়া কোন রকমে গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান হয়। কিন্তু তাও বঙ্গদেশের একটি প্রাকৃতিক নিয়ম দেখিতে পাই, যে অঞ্চলের লোক যতই অভাবগ্রস্ত, সে অঞ্চলের লোক আবার ততই অলস ও উদ্যমশূন্য। এই 'একফসলা' অঞ্চলে বছরে ৯ মাস লোকের কোন প্রকার কাযকর্ম্ম থাকে না। কিন্তু ইহারা অযথা এই সময় আলস্যে যাপন করে। ইহাদের ভিতর যদি এমন কোন গৃহশিল্প প্রবর্ত্তন করা যায়, যাহাতে এই অবসরকালে ইহারা কিছু কিছু রোজগার করিতে পারে, তাহা হইলে দুঃখ-দৈন্যের অনেক উপশম হয়। তাঁত ও চরকা স্থানে স্থানে প্রচার করিয়া অনেক অর্থ ব্যয় করা গিয়াছে; কিন্তু দুঃখের সহিত জানাইতে হইতেছে যে, আমাদের প্রচেষ্টা তাদৃশ সফলতা লাভ করে নাই, কিন্তু আবার পুরাতন অভিজ্ঞতার উপর দাঁড়াইয়া নবীন উদ্যোগের সহিত কয়েকটি কেন্দ্রে কায আরম্ভ হইয়াছে। সাধারণ লোক পরিশ্রম করিতে নারাজ; এমন কি, ধান একবার পাকিয়া উঠিলে ঘর হইতে নড়িতে চাহে না। পরদেশী আসিয়া ধান কাটিয়া, মলিয়া গোলায় তুলিয়া দিবে এবং কৃষকগণ পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া থাকিবে এবং বাজারের ভাল মাছ ও বিলাসদ্রব্য কিনিবে।

বিলাসিতার স্রোত কলিকাতা হইতে পল্লীগ্রামের অন্তস্তম প্রদেশকেও প্লাবিত করিতেছে। যেথানে সেথানে হুঁকার পরিবর্ত্তে সিগারেট; আবার যে যে স্থানে জিলা বোর্ডের রাস্তা আছে, সেইখানেই মোটরবাস চলিতে আরম্ভ হইয়াছে। সে দিন বাগেরহাটে দেখিলাম, সহর হইতে ষাটগম্বুজ মাত্র ৪ মাইল দূরে অবস্থিত। চাষীরা বাঁকে করিয়া তরি-তরকারী বিক্রয় করিতে আনে। কিন্তু ঘরে ফিরিয়া যাইবার সময় ২ আনা ৩ আনা দিয়া মোটরে চড়িয়া বসে। আসামের শিলচরে গিয়াও এই প্রকার দৃশ্য দেখিয়াছি। পাহাড়ীরা পিঠে করিয়া দ্রব্যসম্ভার বেচিতে আসে। ঘরে ফিরিবার সময় মোটর চড়িয়া আরামে যায়, অথচ এই সমস্ত কৃষিজীবী জমীদার ও মহাজনের নিকট ঋণে ডুবিয়া আছে এবং শিশুসন্তানদিগকে একটু দুধও যোগাইতে পারে না। আর তাহারা প্রতিদিন সিগারেট ও মোটরে বেশ ৷৴ পয়সা ব্যয় করে। আমি অনেকবার বলিয়াছি, হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার ও বিলাত-ফেরত জাতি-মাত্রই সর্ব্বাপেক্ষা স্বদেশদ্রোহী। কেন না, স্বদেশজাত দ্রব্য-ব্যবহার তাঁহাদের নিকট অসভ্যতার পরিচায়ক। হুঁকা, আলবোলা ও ফুরসীতে ধূমপান করিলে তাঁহাদের জাতি যায়। আর তাঁহারাই ফ্যাসানের উৎস! সুতরাং জন-সাধারণকেই বা কি দোষ দিব? বাবুরা যাহা করেন, তাহারা তাহারই অনুকরণ করে। ইহাতে দেশের যে কি সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহা ২।১টি দৃষ্টান্তে উপলব্ধ হইবে। ১০ বৎসর আগে বাঙ্গালা দেশে ৫০ লক্ষ টাকার সিগার আমদানী হইত। ২ বৎসর পূর্ব্বে যে রপ্তানী দ্রব্যের তালিকা প্রচা-রিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, উহা দেড় কোটিতে উঠিয়াছে। কিন্তু গত বৎসর হইতে বিলাতের অনেক ফার্ম্ম যে প্রকার নানা রকমের ও নানা মার্কার চুরুটের বিজ্ঞাপন প্রচার করিতেছে এবং ইহার ফলে পাড়াগাঁয়ে পর্য্যন্ত বিদেশী চুরুট যে প্রকার ছড়াইয়া পড়িতেছে, তাহাতে বেশ বুঝা যায় যে, ১৯২৭-২৮ খৃষ্টাব্দে এই আমদানী চুরুটের পরিমাণ অন্যূন ৩ কোটি টাকা হইবে। এ কি বিড়ম্বনা! এই বাঙ্গালা দেশ তামাকের আকর বলিলেও হয়। আর এই সাতক্ষীরার সন্নিকট কালোরোয়া চিটাগুড়ের একটি প্রধান আড়ত; অথচ 'দা-কাটা' তামাক খাওয়া এক প্রকার ধীরে ধীরে উঠিয়া যাইতেছে। মোটর-গাড়ীর আমদানীতেও দেখা যাইতেছে যে, এই কয়েক বৎসরে উহার পরিমাণ কয়েক কোটি টাকা বাড়ি-য়াছে। একবার ভাবিয়া দেখুন, আমেরিকার দৈনিক মাথা পিছু আয় পৌনে ১৩ টাকা। ইংরাজ জাতির মাথা পিছু আয় পৌনে ৭ টাকা। আর আমাদের মাথা পিছু আয় না হয় বড় জোর ২ আনা। অথচ আমরা বিলাতী নেশায়

বিভোর হইয়া বিলাতী জাতির অনুকরণে কোটি কোটি টাকা অকারণে বিদেশে পাঠাইতেছি, আর দিন দিন হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া অকূল-পাথারে ডুবিতেছি।

কলিকাতাবাসী খুলনার জমীদারবর্গ—যাঁহাদের প্রজার মা-বাপ হওয়া উচিত—তাঁহারা যে তাঁহাদের কর্ত্তব্যপালন করেন না, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এবং তাঁহাদের উপর কিছু তীব্র ভাষা প্রয়োগ করিতেও বাধ্য হইয়াছি। তবে এ কথা বলা আমার উচিত যে, এমনও অনেক জমীদার আছেন, যাঁহারা ন্যায্য খাজানা পাইলে নিজেদের সৌভাগ্যবান্ মনে করেন। কিন্তু এখন দেখিতেছি, প্রজাবর্গের আর এক ভীষণ বিপদ্ উপস্থিত। যাহারা তাঁহাদের স্বগ্রাম, এমন কি, স্বশ্রেণী ও পাড়া-পড়শীর মধ্যে গণ্য, তাহাদের মধ্যে অনেকে এখন প্রকৃতপক্ষে তাহাদের প্রধান শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কোন কোন প্রজা, যাহারা একটু হিসাবী ও মিতব্যয়ী হইয়া একটু শ্রীমন্ত, তাহারা এখন তাহাদের প্রতিবেশীদিগকে এমন কড়া সুদে ও সর্ত্তে টাকা দাদন করিতেছে যে, বন্ধকী জমীজমা সমস্ত ডিক্রী দ্বারা সহজেই পাওনাদারের করতলস্থ হয় এবং এই জমী এক প্রকার খাস হইয়া তাহারা বর্গাদার হিসাবে যে সমস্ত প্রজার সর্ত্ত উচ্ছেদ হইয়াছে, তাহাদের দ্বারা চাষ করায়। ফসল হইলে তাহারা সুদে আসলে এবং চাষের খরচার বাবদ প্রায় সমস্ত ফসলই নিজ নিজ গোলায় তুলে। হতভাগ্য জোতহীন প্রজাগণ এ প্রকার দাসখত লিখিয়া এই বর্গাদারদিগের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সুদূরের জমীদার অপেক্ষা এই বর্গাদারগণই ভীষণ অত্যাচারী। ইহাদের কবল হইতে প্রজাসাধারণকে রক্ষা করা নিতান্ত দরকার।

এই ব্যাধির মূল নিরাকরণ করিতে হইলে লোকশিক্ষা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার হওয়া দরকার। ইহারা হিতাহিতজ্ঞানবিবর্জ্জিত; ফসল হইলেই কি করিয়া উৎপন্ন কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া টাকা উড়াইয়া দিবে, সে জন্য ব্যতিবস্ত হইয়া পড়ে। বাজারে ৩ গুণ চতুর্গুণ দরে মাছ কিনিবে; তাহার পর চোখের তৃপ্তিকর 'দেখনাই' বিলাতী মাল কিনিবার জন্য পাগল হইয়া উঠে; এমন কি, সাইকেল, কলের গান বাদ্ পড়ে না। আবার একবার অজন্মা হইলেই দিশাহারা হইয়া এই সমস্ত বিলাসদ্রব্য নামমাত্র মূল্যে বেচিয়া ফেলে। তাহার পর বৃটিশ রাজত্বের প্রারম্ভ হইতেই মামলা-মোকর্দ্দমায় দেশ উচ্ছন্ন হইল; এখন প্রজাবর্গের মধ্যেও এই মামলাস্পৃহা বলবতী হইতেছে। আবার দেখা যায়, একটু ভাল ফসল হইলেই মোকর্দ্দমার সংখ্যা বেজায় বাড়ে; বৃটিশ রাজত্বের পূর্ব্বে জমীদারই নিজ নিজ অধিকারে সমস্ত মামলা নিষ্পত্তি করিতেন এবং গ্রামে পঞ্চায়েৎ কর্তৃক সালিশী বিচারে অনেক বিবাদ-বিসংবাদ মিটিয়া যাইত। কিন্তু এখন সে সমস্ত প্রাচীন সনাতন প্রথা লোপ পাইয়াছে। গভর্ণমেণ্টেরও যত কোর্ট-ফি বাড়ে, ততই সুবিধা। রাজনৈতিক আন্দোলনকারীর মধ্যে আমাদের দেশে ব্যবহারাজীবগণই শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে। মামলা-মোকর্দ্দমা কমিলে উকীল, ব্যারিষ্টার, মোক্তার, টাউট প্রভৃতির অন্ন যাইবে। সুতরাং তাঁহারা স্বার্থের মূলে কুঠারাঘাত করিবেন কেন? পূর্ব্বে গ্রামের মাতব্বর বা পঞ্চায়েৎ বিবাদী বিষয় নখদর্পণের মত দেখিতেন; সুতরাং অতি সহজেই ন্যায়বিচার হইত। এখন মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, ধাপ্পা দিয়া আদালতের চোখে ধূলা দেওয়াই প্রধান উপায়। এই জন্য প্রবল পক্ষেরই জয়। যে দুর্ব্বল, বৃটিশ-প্রতিষ্ঠিত আদালতে তাহার সুবিচার আশা করা বৃথা। এক দিকে কোর্ট-ফি, উকীলের ফি, মুলতুবীর পর মুলতুবী, নিম্ন আদালত হইতে উচ্চ আদালত, আবার উচ্চ হইতে উচ্চতর বিচারালয়—এই প্রকারে এক একটা মোকর্দ্দমা বছরের পর বছর চলিতে থাকে। ইহাতে বাদী প্রতিবাদী উভয়েই সর্ব্বস্বান্ত হয়। মুসলমান বাদশাহের সময়েও দীনদুঃখী সাক্ষাৎভাবে আসিয়া আবেদন-নিবেদন করিতে পারিত। কাবুলের বর্ত্তমান আমীর আমানুল্লা খাঁ পূর্ব্বকার এই প্রথার অনুবর্ত্তী হইয়া বিচারপ্রার্থী দরিদ্র প্রজাদের দুঃখের কাহিনী শুনানীর জন্য সপ্তাহে সপ্তাহে এক দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু আমাদের দয়ার্দ্রচিত্ত গভর্ণমেণ্ট কোর্ট-ফি ভিন্ন কাহারও আবেদন গ্রাহ্য করেন না।

৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে গ্রামে গ্রামে গোয়াল-ভরা গরু থাকিত। গোচারণেরও অনেক মাঠ ছিল এবং বর্ষাকালে গরুর খাদ্যোপযোগী যথেষ্ট পল, বিচালী সংগ্রহ থাকিত। এখন পাটের চাষ-বাহুল্য হওয়ায় এবং সকল শ্রেণীর একমাত্র উপজীব্য কৃষি হওয়ায় সমস্ত গোচারণের মাঠ ঘেরাও হইয়াছে। এখন আর ধর্ম্মের ষাঁড় দেখা যায় না। উপযুক্ত

দুধের অভাবে গোজাতি দিন দিন অবনতি প্রাপ্ত হইতেছে। গোজাতি যেমন আকারে খর্ব্ব, তেমনই অস্থিকঙ্কালসার। খুলনা সহরে বর্ষাকালে টাকায় দেড় সের দুই সের দুধ, তাহাও মিলা ভার। পাড়াগাঁয়ে অনেক সময় টাকায় ৩।৪ সের দুধ, তাহাও আবার দুষ্প্রাপ্য। ফল কথা, দুধের অভাবে শিশু-সন্তান পুষ্টিলাভ করিতে পারে না এবং বাঙ্গালী জাতি ক্রমশঃই হীনবীর্য্য হইয়া পড়িতেছে।

যাহা হউক, আর পল্লীগ্রামের দুর্দ্দশার কাহিনী বিবৃত করিয়া আপনাদিগের ধৈর্য্যচ্যুতি করিতে চাহি না। সকলের অপেক্ষা দুঃখের বিষয় এই যে, আমরা সংঘবদ্ধ হইয়া কোন কায করিতে পারি না। দেশের যাহা কিছু অভাব-অভিযোগ, দুর্দ্দশা, তাহার বিমোচনের জন্য আমরা হা করিয়া গভর্ণমেণ্টের দিকে তাকাইয়া থাকি। হয় গভর্ণমেণ্ট, না হয় বিধাতাপুরুষ আমাদের সমস্ত অভাব কুলাইয়া দিবেন। আমরা নিজে কিছু করিব না; হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিব। জলকষ্ট? ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের ঘাড়ে সমস্ত ভার চাপাইয়া দিব, কিন্তু ভুলিয়া যাই যে, জিলাবোর্ডের আয় মাত্র ৪ লক্ষ টাকা। তাহা হইতে নিম্নশিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাস্তা মেরামত প্রভৃতি বাদ দিলে অতি অল্প টাকাই থাকে। তাহা দ্বারা এই ১৪ লক্ষ লোকের অভাবমোচন কিছুতেই হইতে পারে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই খুলনার অধিকাংশ স্থানই এক ফসলের দেশ; ৯ মাস যদি নিরবচ্ছিন্ন আলস্যে না কাটাইয়া আমরা 'গাঁতা' দিয়া কায করিতে আরম্ভ করি, তাহা হইলে যে কত শত শত পুষ্করিণীর ও দীঘির পঙ্কোদ্ধার হয়, তাহা বলা যায় না। ফল কথা এই, উদ্যমহীনতাই আমাদের সর্ব্বনাশের মূল হইয়াছে। আমরা সমস্তই বুঝি, কিন্তু কায করিবার ক্ষমতা নাই। আমরা কি প্রকার অলস ও উদ্যমহীন, তাহার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ দিতেছি। প্রায় পাঁচ সপ্তাহ হইল, বাগেরহাট কলেজের সন্নিকটে এক জন চাষী গৃহস্থের বাটীতে দেড় কাঠা পরিমাণ একটি পুকুর দেখিলাম। আমার এক জন সঙ্গী দেখাইলেন যে, পুকুরটি কচুরীপানার চাপে বুজিয়া গিয়াছে। শুধু যে জল দূষিত হইতেছে, তাহা নহে, ইহাতে মাছও বাঁচিতে পারিবে না। প্রত্যেক দিন স্নানের সময় যদি কাস্তে হাতে করিয়া এক জন দুই জন মিলিয়া আধ ঘণ্টাকাল এই দাম কাটে, তাহা হইলে এক সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত পানা নির্ম্মূল হয় কিন্তু এই "একফসলী" দেশে দিব্য হাত-পা কোলে করিয়া গৃহস্থ সুখে নিদ্রা যায়। ফলতঃ এ প্রকার উদ্যমহীন অলস জাতির পরিণাম বড়ই শোচনীয়।

আমরা বৎসরের পর বৎসর প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, খুলনা জিলায়, এমন কি, সমগ্র বাঙ্গালার হিন্দু-সমাজের মেরুদণ্ড ধোপা, নাপিত, কুমার, কামার প্রভৃতি শ্রেণী একবারে লোপ পাইতেছে। কায়স্থ, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি শ্রেণীর মধ্যে যেমন মেয়ের বিবাহ দেওয়া একটি দায়স্বরূপ হইয়াছে, উপরিলিখিত নিম্নশ্রেণীর মধ্যে অধিক পণে আবার কন্যা ক্রয় করিয়া বিবাহ করিতে হয়। কাযেই ৪০।৪৫ বছর বয়সে ২ শত হইতে ৪ শত টাকা পণে ৯।১০ বর্ষ বয়স্ক মেয়ে ক্রয় করিতে হয়। ইহারা অল্পদিন পরেই যুবতী বিধবা রাখিয়া ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করে। এই সমস্ত কারণে সমাজের কি বিষময় ফল হইতেছে, তাহা বলা যায় না; আর ইহাদিগেরই বা দোষ দিব কি? আমি গোষ্ঠীপতি মৌলিক, আমার বংশমর্য্যাদা রক্ষার জন্য আমাকে কুলীনকে কন্যাদান করিতে হইবে এবং কুলীনের মেয়ে ভিন্ন আমার বিবাহ করিবার সাধ্য নাই। অথচ এ প্রকার ব্যবস্থা মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, এমন কি, রঘুনন্দনেও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তবে কেন এ শৃঙ্খল আমি পায়ে পরি? নৈতিক দুর্ব্বলতাই আমাদের সর্ব্বনাশের মূল। দৈহিক পক্ষাঘাত অপেক্ষা মানসিক পক্ষাঘাত অধিকতর ক্ষতিকর; কিন্তু বুঝিয়া সুঝিয়াও আমাদের সমাজের নানাবিধ অনিষ্টকর প্রথা নিরাকরণ করিতে অগ্রসর হইতে পারি না। তাই বলিতেছি, এই মানসিক দুর্ব্বলতা পরিহার করিতেই হইবে,—যদি আমরা টিকিয়া থাকিতে চাই।

পরিশেষে একটু আশার বাণী বলিয়া উপসংহার করিব। এই সাতক্ষীরার সন্নিকটে অর্থাৎ আশাশুনি, বুধহাটা, মিত্র তেঁতুলিয়া প্রভৃতি কেন্দ্রে খুলনার দুর্ভিক্ষের পর হইতেই বাজিতপুরের আশ্রমের সেবকবৃন্দ কয়টি সেবাশ্রম খুলিয়াছেন। তাঁহারা অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা করিতেছেন এবং ম্যালেরিয়া, কলেরা, এমন কি, গোমড়ক উপস্থিত হইলে যথাসাধ্য ঔষধ বিতরণ করিতেছেন এবং নিজেরা যাইয়া জীবনসংশয় করিয়া আর্ত্তের সেবা করিতে ত্রুটি করেন না।

খুলনার পয়পারেও তাঁহারা আর একটি সুন্দর সেবাশ্রম স্থাপন করিয়াছেন এবং নরনারায়ণের কল্যাণে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন।

খালিসপুরের ত্যাগী অক্লান্তকর্ম্মী একনিষ্ঠ সাধক শ্রীযুত যামিনীভূষণ মিত্র খালিসপুরে আশ্রম খুলিয়া পার্শ্ববর্ত্তী অনেকগুলি গ্রামে চরকা চালাইতেছেন, এবং চরকার সুতার কাপড় সেই অঞ্চলে বুনাইয়া খদ্দর প্রস্তুত করিতেছেন। যাহাতে এই সদনুষ্ঠানগুলি বাঁচিয়া থাকিতে পারে, তাহার জন্য খুলনাবাসিমাত্রেরই যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। যদি অর্থাভাবে এই অনুষ্ঠানগুলি মুমূর্ষু অবস্থায় পতিত হয়, তাহা হইলে বড়ই গ্লানির বিষয় হইবে। মহেশ্বরপাসার এক জন কৃতী সন্তান—শ্রীযুক্ত হরিচন্দ্র ঘোষ—এই মহৎ উদ্দেশ্যে অনেক অর্থ-সাহায্য করিতেছেন। তিনি স্বগ্রামে যাহাতে এক হাজার চরকা নিয়মিত চলে, তাহার ব্যবস্থা করিতে সংকল্প করিয়াছেন। এই শ্রেণীর আশ্রম যতই নানা কেন্দ্রে স্থাপিত হয় এবং যাহাতে এই শ্রেণীর ত্যাগী যুবক দেশের কল্যাণব্রতে জীবন সমর্পণ করিতে পারেন, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। পল্লীর ব্যথানিবারণের এইগুলিই প্রকৃত ও প্রকৃষ্ট পন্থা।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

পূজা-স্মৃতি

বৈশাখের অপরাহ্ণ বেলা ;
ছেলেরা করিছে খেলা
শান্তিময়ী ভাগীরথীতীরে।
ধীরে অতি ধীরে
বহিছে সমীর শান্ত কাঁপাইয়া তীরতরুদল।
নগরীর শ্রান্ত কোলাহল
মন্দিরের ঘণ্টাসাথে ধীরে ধীরে হইল বিলীন।
সন্ধ্যার কোলের 'পরে নিদ্রা গেল দীর্ঘতম দিন।

একটুকু গোধূলির আলো
গঙ্গাতীরে নীরবে মিলালো।
সেই শান্ত, প্রাণারাম আধ আলো আধ অন্ধকারে
সোপান কিনারে
হেরিলাম তরুণীর ভক্তিনত, শান্ত মুখচ্ছবি।
করুণ আনন—যেন দিন শেষে ক্লান্ত, ম্লান রবি।

জীবনে আমার
সে পরম, সে সুন্দর, অপূর্ব্ব উদার,
চির অভিনব দৃশ্য ভুলিব না সহস্র ঝঞ্ঝায় ;
প্রাণ-রসায়ন মন্ত্র দিয়ে গেছে প্রশান্ত সন্ধ্যায়।
সে ত কহে নাই কথা, হাসেনি ত মুখখানি তুলি' ?
পূজা ভুলি'
আনমনে
চাহে নাই কোনো দিকে সহাস আননে।
তবু তার ছবি
ধন্য হ'ল স্মৃতি মোর বক্ষতলে লভি'।

এ জীবনে প্রভু,
যদি কভু
নেমে আসে গ্লানিহীন, শান্ত, শুভক্ষণ,
প্রশান্ত নয়ন পাতে ধন্য যদি কর গো জীবন,
অনাবিল প্রীতিভরে
তোমার ও চরণের 'পরে
রাখি যদি ভক্তি-উপহার,
তবে চিরসখা হে আমার!
তা'রি সাথে তব পদে দিব আমি ডালি
ক্ষণতরে দেখা মোর সেই স্তব্ধ পূজা-স্মৃতি ঢালি—
শান্ত সেই মুখখানি, শান্ত গোধূলির আলো, শান্ত বটতল—
প্রশান্ত শঙ্খের ধ্বনি, সুতীব্র সে একাগ্রতা, স্থির, অবিচল!

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী।

ফরাসী সাহিত্য *

[চন্দ]নগরের মেয়র মহোদয় এবং সভ্যমণ্ডলী !

আপনাদের নিমন্ত্রণ পেয়ে আমরা যে নিজেদের কতদূর [ধন্য] ও মান্য বোধ করছি, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই যে, [আ]মরা কোনরূপ ওজর আপত্তি না করে, আপনাদের ডাক [শু]নবামাত্র এ সভায় এসে উপস্থিত হয়েছি, যদিচ জ্যৈষ্ঠ [মা]সটা বিদেশে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাবার ঠিক উপযুক্ত [স]ময় নয়। আমরা গরম দেশের লোক হলেও গ্রীষ্মকাতর। এই দারুণ গ্রীষ্মে আমাদের অন্তরের সকল রস শুকিয়ে [যা]য়, ফলে এ দেশে এ সময়ে আমাদের ভিতরে বাইরে [কো]নও ফুলই ফোটে না—এক বিয়ের ফুল ছাড়া

আমরা নিজেদের বিশেষ করে ধন্য মনে করছি, এই কারণে যে, আমাদের এই সমিতি বাস্তবিকই একটি কচি [স]ংসদ্। এ সংসদের বয়েস এখন ছমাস মাত্র। মহীরাবণের পুত্র অহিরাবণের মত যে সকল সভাসমিতি ভূমিষ্ঠ হবামাত্র যুদ্ধং দেহি বলে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়, আমাদের এ সমিতি সে জাতীয় নয়। সুতরাং এর নাম-ধাম সাধারণের অগোচরই থাকবার কথা। এ সমিতির উদ্দেশ্য একটা নূতন culture আত্মসাৎ করা। Latin culture জিনিষটে অবশ্য নতুন নয়, বহু পুরাতন। কিন্তু ও বস্তু আমাদের কাছে অপরিচিত এবং সেই হিসাবেই নূতন। আমরা Latin culture বলতে সে শিক্ষাদীক্ষা বুঝিনে, যে শিক্ষাদীক্ষা Latin ভাষার মারফৎ আয়ত্ত করতে হয়। এ Latin cultureএর অর্থ অত [স]ঙ্কীর্ণ নয়; কিন্তু এর চাইতে ঢের উদার। য়ুরোপের যে সকল ভাষা লাটিন-বংশীয়, সেই সব ভাষার সাহিত্যচর্চ্চা করাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। Culture জিনিষটে ধীরে ধীরে অন্তরঙ্গ করতে হয়। সুতরাং আমাদের এই [সদ্য]ঃপ্রসূত সমিতির যা উদ্দেশ্য, সে উদ্দেশ্য-সাধন করা সময়-[সা]পেক্ষ এবং তাও নির্ভর করবে ততটা পাঁচজনের মিলিত [চে]ষ্টার উপর নয়, যতটা ব্যক্তিগত সাধনার উপর।

এখন Indo-latin এই সদ্যঃকল্পিত সমাসটির অর্থ আমরা, অন্ততঃ আমি কি বুঝি, সে সম্বন্ধে দু'চার কথা [ব]লা প্রয়োজন মনে করি। আমার বিশ্বাস, Indo এবং Latinএ দুই সভ্যতার ভিতর ততটা বিরোধ নেই, যতটা আছে মিল। ভারতবর্ষের উত্তরাপথের এবং কতক অংশ দক্ষিণাপথের লোকদের ভাষা সংস্কৃত-বংশীয়। প্রাকৃত আগে কি সংস্কৃত আগে, সে সমস্যার দিকে পিঠ ফিরিয়েই আমরা বিশ্বাস করি যে, বাংলা হিন্দু উড়ে ইত্যাদি ভাষা সব সংস্কৃতের বংশধর। কথাটা ঠিক বৈজ্ঞানিক না হলেও লৌকিক হিসেবে মিথ্যা নয়। ফরাসী ইতালীয় প্রভৃতি ভাষা সব বনেদি ঘরের সন্তান, যেমন বাংলা হিন্দী প্রভৃতি সব বনেদি ঘরের সন্তান। আমাদের ভাষার যেমন সংস্কৃতের সঙ্গে নাড়ীর যোগ আছে, ফরাসী প্রভৃতিরও তেমনি ল্যাটিনের সঙ্গে নাড়ীর যোগ আছে। এই উভয় শ্রেণীর ভাষাই এক হিসেবে অতীতের বাণীর জের টেনে নিয়ে আসছে এবং এ দেশের সাহিত্যিক ভাষা যেমন সংস্কৃতের প্রভাবে গড়ে উঠেছে, ফ্রান্স ইতালীর সাহিত্যিক ভাষাও তেমনি ল্যাটিন সাহিত্যের প্রভাবে গড়ে উঠেছে। মনে রাখবেন—আমি বলেছি প্রভাব, নকল বলিনি। নকল করে মানুষে সজ্ঞানে কিন্তু প্রভাবের ফল ফলে আমাদের অজ্ঞাত-সারে। আমরা যেমন আমাদের দেশের অতীত সভ্যতার প্রভাবমুক্ত নই—ফরাসী প্রভৃতি জাতরাও তেমনি য়ুরোপের অতীত সভ্যতার প্রভাবমুক্ত নয়। য়ুরোপের ক্লাসিক সভ্যতা ও ক্লাসিক ভাষা আর ভারতবর্ষের ক্লাসিক সভ্যতা ও ক্লাসিক ভাষা এক নয়। কিন্তু এক বিষয়ে উভয়ের ভিতর মস্ত মিল আছে। উভয়ই ক্লাসিক। সুতরাং এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, ফরাসী ও ইতালীয় সাহিত্য ক্লাসিক-মনোভাব-বঞ্চিত নয় এবং আমাদের সাহিত্যও তা হওয়া উচিত নয়।

আমার পক্ষে এ বিষয়ে বেশী কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। কারণ, ফরাসীভাষায় সুপণ্ডিত আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই সমিতির উদ্দেশ্য ও ক্রিয়া-কলাপের আনু-পূর্ব্বিক বিবরণ আপনাদের কাছে সুমিষ্ট ফরাসী ভাষায় বিবৃত্ত করবেন। তা করবার শক্তি আমার দেহে নাই।

এ স্থলে আপনারা জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে, তবে কেন আমাকে এ সমিতির President করা হল। এ প্রশ্ন অবশ্য আপনাদের মনে হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক যে, যে

---

* ভারত-রোমক সমিতির চন্দননগরে বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

ব্যক্তি ফরাসীভাষা বলতেও পারেন না, লিখতেও পারেন না, তিনি কি হিসাবে এ সমিতির president elected হলেন। এর প্রথম উত্তর electionএর কৃপায় কে যে কোন্ পদ লাভ করবে, তা কেউ বলতে পারে না। ইংরাজরা বলে, mysterious are the ways of providence আর election জিনিষটি providenceএর চাইতেও mysterious। সে যাই হোক্, এ ক্ষেত্রে আমার পক্ষে এ পদ লাভ করবার একটা প্রত্যক্ষ কারণ আছে। আমার বাড়ীতে ফরাসী সাহিত্যের একটি লাইব্রেরী আছে, যে লাইব্রেরীকে ঐ জাতীয় কলিকাতা নগরীর অন্যান্য লাইব্রেরীর তুলনায় বড় বলা যায়। যাঁর গৃহে ফরাসী-সরস্বতী আলমারিতে চাবি বন্ধ হয়ে রয়েছেন, তিনি যে উক্ত সরস্বতীর গুণগ্রাহী, লোকের পক্ষে এরূপ অনুমান করা তেমনি স্বাভাবিক, যাঁর ঘরে লক্ষ্মী সিন্দুকের ভিতর চাবি বন্ধ হয়ে থাকেন, তিনি যে লক্ষ্মীর গুণগ্রাহী, এরূপ অনুমান লোকের পক্ষে যেমন স্বাভাবিক। তবে অনেকে যেমন লক্ষ্মার কেবলমাত্র রক্ষক হতে পারে, সরস্বতীরও যে তাই হতে পারে, এ কথা লোকে সহজে বিশ্বাস করতে চায় না।

আমি অবশ্য নিজেকে আপনাদের কাছে ফরাসী পুস্তকের ভারবাহী বলীবর্দ্দ ব'লে পরিচিত করবার জন্য ব্যগ্র নই। ফরাসী সাহিত্যের সঙ্গে আমার আকৈশোর পরিচয় আছে এবং এ সাহিত্যের প্রতি আমার আন্তরিক অনুরাগ কালক্রমে পরিবর্দ্ধিত হয়েছে। এই 'মনের' টান বশতঃই আমি ফরাসী পুস্তক সংগ্রহ করেছি। এই ক্রমবর্দ্ধমান পুস্তকাবলীই বর্ত্তমানে লাইব্রেরীর আকার ধারণ করেছে। এই পুস্তকাবলীর বহিরঙ্গ দেখে যদি কেউ অনুমান করেন যে, তার মর্ম্মের সঙ্গেও আমার পরিচয় আছে, তা' হলে সে অনুমান অসঙ্গত নয়। আমি কি সূত্রে কত দূর পর্য্যন্ত সে সাহিত্যের পরিচয় লাভ করেছি, সে বিষয়ে দুটো ব্যক্তিগত কথা বলা, আশা করি, এ ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

আপনারা সকলেই love at first sight বলে একটা কথা শুনেছেন এবং কারও কারও বা এ উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও আছে। ফরাসী সরস্বতীর সঙ্গে আমার love at first sight হয়। কথাটা একটু খুলে বলি। আমি সেকালে যখন স্কুল পেরিয়ে কলেজে প্রবেশ করি, তখন হঠাৎ কঠিন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ি। সে রোগের কুফলের জের অনেক দিন যাবৎ ছিল। সুতরাং বহুকালের জন্য কলেজ যাওয়া আমার বন্ধ ছিল। লেখা নেই, পড়া নেই, খেলা নেই, ধুলো নেই, একা একা দিবারাত্র ঘরে ব'সে থাকা আমার পক্ষে অতি কষ্টকর হয়ে উঠেছিল। তাই আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা—স্বর্গীয় আশুতোষ চৌধুরীর অনুরোধে আমি, এই home internmentএর অবস্থায় ফরাসী ভাষা শিক্ষা করি। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই ছিলেন আমার শিক্ষক।

তার পর হঠাৎ এক দিন একখানি ফরাসী নভেল আমার হাতে এল। সে নভেলখানি পড়াবামাত্রই আমি ফরাসী সাহিত্যের প্রতি ভালবাসায় পড়ে গেলুম।

সে নভেলের লিপিচাতুর্য্য, ভাষার সৌন্দর্য্য, বর্ণনার যাথার্থ্য আমাকে একেবারে মুগ্ধ ক'রে ফেল্‌লে। খালি মনে হ'তে লাগল, লেখকের কি চোখ, কি কান, কি নাক, কি বাক্। সে মোহ আজও কাটেনি। সে বইখানির নাম করতে ঈষৎ ইতস্ততঃ করছি, কারণ, সে নভেল কোনও অষ্টাদশবর্ষ দেশীয় বাঙ্গালী যুবকের পাঠ্য নয়। কিন্তু তার নাম গোপন করলে আমার মনের ইতিহাসের একটা বড় ঘটনার বিষয় চেপে যাওয়া হবে। তাই তার নাম করতে বাধ্য হচ্ছি। বইয়ের নাম হচ্ছে Bel-Ami আর তাহার লেখকের নাম Guy-de-Maupassant। দাদা আমাকে পড়াচ্ছিলেন, Fenelonর Telemacque, আর আমি নিজগুণে পড়ে বসলুম Bel-Ami। সে যাই হোক্, উপস্থিত যুবকবৃন্দকে আমি ঐ জাতীয় নভেল থেকে ফরাসী সাহিত্যের চর্চ্চা সুরু করতে পরামর্শ দিইনে। ঐ লেখা কাব্যামৃত নয়—কাব্যমদিরা।

Bel-Ami প'ড়ে যে আমি মুগ্ধ হয়েছি, সে কথা দাদাকে বলি। তাতে আমার ভ্রাতা, আমার উপর অপ্রসন্ন হন নি, বরং আমার এই অকাল-পক্ক রসজ্ঞানের পরিচয় পেয়ে খুসিই হয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে, আমি Bel-Amiর চরিত্রের প্রতি অনুরক্ত হইনি, চমৎকৃত হয়েছিলুম Guy-de-Maupassantর প্রতিভার পরিচয় পেয়ে। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আমার সাহিত্য-চর্চ্চায় বাধা ত দেনই নি,—আমার সাহিত্যপ্রীতিকে কোনও একটা বিশেষ বাঁধা-ধরা পথে চালাতেও চেষ্টা করেন নি। এটি আমি একটি

মহাসৌভাগ্যের বিষয় মনে করি; কেন না, আমার বয়েসের ছোকরার কোন্ বই পড়া উচিত, আর কোন্ বই পড়া উচিত নয়, সে বিষয়ে তাঁর যদি একটা দৃঢ় মত থাক্‌ত, তা হ'লে খুব সম্ভবতঃ ফরাসী-সাহিত্যের চর্চ্চায় আমাকে অচিরে ক্ষান্ত দিতে হ'ত। কেন না, ও সাহিত্যের যে সব বই আমাদের বাড়ীতে ছিল, তাদের মধ্যে সম্ভবতঃ একখানিও সুকুমারমতি বালক-বালিকার পাঠ্য নয়, একমাত্র Fenelonর Telemacque ছাড়া। দাদার লাইব্রেরীতে যে সব পুস্তক ছিল, তাদের নাম করলেই ফরাসী সাহিত্যের বিশেষজ্ঞরা বুঝতে পারবেন যে, সে সব বই কতদূর যুবজন-পাঠ্য।

Daudetএর Saphö, Lotiর Marriage de Loti, Flaubertএর Madame Bovery, Gautierএর Mademoiselle de Maupin প্রভৃতি গ্রন্থ আমি অবাধে গলাধঃকরণ করি, Zolaর Nana যে পাতা পঞ্চাশেকের বেশী পড়িনি, তার কারণ, তাঁর লেখা আমার মোটেই মুখরোচক হয়নি। এ সব পূর্ব্বকাহিনী আপনাদের কাছে বলবার উদ্দেশ্য এইটুকু আপনাদের জানানো যে, ছেলেবেলা থেকেই আমি ফরাসী-সাহিত্যের ভক্ত, বিশেষতঃ সেই সাহিত্যের যা পুরোমাত্রায় ফরাসী। আর ও-সাহিত্যের সঙ্গে বিশেষতঃ উক্ত গ্রন্থগুলির সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে, তিনিই বুঝবেন যে, আমি ফরাসী-সাহিত্যের গাছে না চড়তেই তার এক কাঁধি নামাই। এ কথা বল্‌বার আর একটি উদ্দেশ্য আছে। বই বয়কট করায় কোন লাভ নেই, কারণ, বই পড়ার ফল কার পক্ষে সু হবে, কার পক্ষে কু হবে, আর কার উপর কিছুই হবে না, তা আগে থাক্‌তে বলা অসম্ভব।

আমি ফরাসী সাহিত্য যতদূর জানি, ফরাসী ভাষা ততদূর জানি নে। কথাটা শুনতে একটু অদ্ভুত শোনালেও, মিথ্যা নয়। সাহিত্যজ্ঞান অবশ্য ভাষাজ্ঞানসাপেক্ষ। আজকালকার ভাষায় বলতে গেলে ও দুই জ্ঞানের ভিতর অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছে। তৎসত্ত্বেও উক্ত দুই জ্ঞান—দুই এক নয়। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ এবং অমরকোষ অভিধান কণ্ঠস্থ করবামাত্র যে লোকে সংস্কৃত-সাহিত্যরসের রসিক হয়ে ওঠে, তা অবশ্য নয়। তা যে হয় না, সে কথা সংস্কৃত আলঙ্কারিকরা স্পষ্টাক্ষরে লিখে গিয়েছেন। সুতরাং ব্যাকরণ অভিধানের সামান্য জ্ঞানের সাহায্যেও সাহিত্যের রস গ্রহণ করা সম্ভব। এ সত্যের পরিচয় নিত্যই পাওয়া যায় যে, অনেক সঙ্গীত-অনুরাগী লোক দিবারাত্র গান বাজনা শুনেই সঙ্গীত-রসের রসিক হয়ে উঠেন, যদিও তাঁরা না পারেন গাইতে, না পারেন বাজাতে, না পারেন সঙ্গীতশাস্ত্রের ব্যাকরণ সম্বন্ধে বক্তৃতা করতে। সঙ্গীতের এতাদৃশ গুণগ্রাহীদের গুণীরা বলেন সমজদার। আমি ফরাসী সাহিত্যের ঐ জাতীয় একটি সমজদার মাত্র। আর ফরাসী ভাষা যে আমি যথেষ্ট জানি নে, তার প্রমাণ নবীন ফরাসী লেখকদের লেখা আমি বিনা আয়াসে বুঝতে পারিনে। তাঁদের লেখা পড়্‌তে গেলে আমাকে ক্রমান্বয়ে অভিধানের শরণ গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু যে দুই ভাষা আমি সত্য সত্যই জানি অর্থাৎ বাঙলা ও ইংরাজী, সে দুই ভাষার কোন পুস্তকই পড়তে আমার অভিধানের শরণাপন্ন হতে হয় না, সে পুস্তকের লেখক যতই নবীন হোক্ না কেন। এতাদৃশ বিদ্যে নিয়ে আপনাদের কাছে ফরাসী সাহিত্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করা আমার পক্ষে ধৃষ্টতামাত্র। তবে যে আমি এ সভায় মুখ খুলতে সাহসী হয়েছি, তার কারণ যে, যে সাহিত্য চর্চ্চা ক'রে আমি যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ করেছি, সে আনন্দের ভাগ অপরকে দেবার প্রবৃত্তি আমার পক্ষে স্বাভাবিক আনন্দ। জিনিষটে ত আর টাকা নয় যে, তার ভাগ অপরকে দিতে গেলে নিজের পুঁজি কমে যাবে। তাই যে সাহিত্যের প্রতি আমার অনুরাগ আছে, সে সাহিত্যের প্রতি পাঁচ জনেও যাতে অনুরক্ত হন, এ আমার অন্তরের বাসনা।

আমরা বাঙ্গালীরা স্বভাবতঃ এবং শিক্ষার গুণে সাহিত্যানুরাগী; সুতরাং যে সাহিত্যের সঙ্গে নানা কারণে অপরের পরিচয় ঘটেনি, সে সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হবার আকাঙ্ক্ষা আপনাদের মনে জাগরূক করা যেমন বাঞ্ছনীয়, তেমনি সঙ্গত—বিশেষতঃ এই চন্দননগরে। এ সহরে ফরাসী ভাষার সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচয় সকলেরই আছে, সুতরাং ফরাসী সাহিত্যের চর্চ্চা করা আপনাদের পক্ষে যতটা সহজসাধ্য, বাদবাকী বাঙ্গালীর পক্ষে ততটা নয়। কলিকাতা সহরে নিত্য দেখতে পাই যে,বইপড়া যুবকের দল Anatole Franceএর গ্রন্থাবলী এক মনে গলাধঃকরণ করছেন, কিন্তু তা ইংরাজী ভাষায়! আপনাদের মধ্যে সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিরা যে কেন উক্ত

গ্রন্থাবলী ফরাসী ভাষায় পড়বেন না, তা আমি বুঝতে পারিনে।—এ কথা বলা বাহুল্য যে, মূল এবং অনুবাদের মধ্যে প্রভেদ বিস্তর। কোনও গ্রন্থ এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় রূপান্তরিত করলেই তার রূপ অন্তরিত হয়। কথাটা যে ঠিক, তার প্রমাণ হাতে হাতেই দেওয়া যায়। রঘুবংশ প্রথমে সংস্কৃত পড়ুন, তার পর তার বাংলা অনুবাদ পড়ুন, তা হলেই দেখতে পাবেন, বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত করতে গিয়ে আমরা তার রূপ ও প্রাণ দুই হারিয়ে ফেলেছি, রক্ষা করেছি শুধু তার কঙ্কাল মাত্র। অনূদিত সাহিত্য প্রায়ই হাড় বার করা সাহিত্য। এ স্থলে আর একটি কথার উল্লেখ করা প্রয়োজন। আমরা বাঙ্গালীরা কেবলমাত্র সাহিত্যের ভোক্তা নই, তার কর্ত্তাও বটে। আমরা স্বভাষায় এখন নব বঙ্গ সাহিত্য সৃষ্টি করতে ব্রতী হয়েছি। এই নব-সাহিত্য যে, ইংরাজী ভাষা ও ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাবে গড়ে উঠছে, তা অস্বীকার করায় কোনও সুসার নেই। কারণ, সকলের কাছেই তা প্রত্যক্ষ সত্য। ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাব আমাদের সাহিত্যসৃষ্টির পক্ষে কতক অংশে অনুকূল কতক অংশে প্রতিকূল। উপরন্তু সে সাহিত্যের কোনও নূতন ধাক্কা আমাদের মনকে নূতন করে নড়িয়ে দেবে না, ও-সাহিত্য আমাদের গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে।

ইংরাজরা যাকে বলে style আর আলঙ্কারিকরা বলেন রীতি; প্রথমতঃ সেই রীতির কথাই ধরা যাক্। এ যুগ প্রধানতঃ গদ্য-সাহিত্যের যুগ। এখন এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, ইংরাজী গদ্যের রীতি বাংলার রচনার পক্ষে অনুকূল নয়। কারণ, প্রথমতঃ ইংরাজী গদ্যের কোনও একটা স্পষ্ট মার্কা মারা রীতি নেই। ইংলণ্ডের প্রত্যেক বড় গদ্য লেখকের একটি ক'রে নিজস্ব রীতি আছে। উদাহরণ স্বরূপ দু'টি বড় ইংরাজ লেখকের কথা ধরা যাক্। Thackeray এবং Ruskin।…এঁদের এক জন লিখেছেন নভেল, আর এক জন লিখেছেন প্রবন্ধ। দুজনেরই style ইংরাজী সাহিত্য সমাজে অতি প্রশংসিত। এখন এ দুই রীতি যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, আগে Emondএর এক পাতা, তার পর Modern paintersএর এক পাতা পড়লে সকলের কাছেই তা স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে। ইংরাজী সাহিত্যে অনেক প্রতিভার সাক্ষাৎ মেলে, কিন্তু গুণীর সাক্ষাৎ বড় একটা মেলে না। প্রতিভাবান্ লেখকের প্রভাব সাধারণ লেখকদের উপর বড় একটা হয় না, কারণ, ও হচ্ছে এক রকম ঐশীশক্তি। ও-শক্তি শিক্ষার ফলে আয়ত্ত করা যায় না। Talent হচ্ছে পুরো মাত্রায় মানবী শক্তি। সে শক্তি একে কতক পরিমাণে কতক অপরের মনে সঞ্চারিত করতে পারে। গদ্য-সাহিত্য মুখ্যতঃ—মানুষের talent-এরই সৃষ্টি। এখন ফরাসী গদ্য পৃথিবীতে অতুলনীয়। এই কারণে আমি মনে করি যে, ফরাসী গদ্যের প্রভাব বাঙ্গালা গদ্যের স্ফূর্ত্তির অনুকূল।

ভাষার চরিত্রের উপর সাহিত্যের চরিত্র অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। এখন একটি কথা আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিই। ইংরাজী ভাষা এবং ফরাসী ভাষার মধ্যে মস্ত একটা তারতম্য আছে। ইংরাজীর ভাণ্ডারে যত শব্দ আছে, ফরাসীর ভাণ্ডারে তত নেই। Websterএর ডিক্সনারির সঙ্গে Litire ডিক্সনারি তুলনা করে দেখলেই দেখতে পাবেন যে, ফরাসী কোষখানি ইংরাজী কোষের তুলনায় আকারে কত ছোট। এরূপ হবার একটি ঐতিহাসিক কারণ আছে।—ইংরাজী হচ্ছে য়ুরোপের উর্দ্দু। ব্রজ ভাষার উপর ফার্সি শব্দ আরোপ করে যেমন উর্দ্দুর সৃষ্টি করা হয়েছে, Anglo Saxon ভাষার উপর Norman French শব্দ আরোপ করে তেমনি ইংরাজী ভাষার সৃষ্টি করা হয়েছে। আর এ দুয়ের সৃষ্টি হয়েছে একই ঐতিহাসিক কারণে। ইংরাজী তারপর নানা ভাষা থেকে বে-পরোয়াভাবে শব্দ সংগ্রহ করেছে। ফলে এই পাঁচ মিশলী ভাষা অক্ষর-ডম্বর, ফরাসী ভাষা ততটা নয়। এ বিষয়ে বাংলা ভাষার সঙ্গে ফরাসী ভাষার একটা আকৃতিগত মিল আছে। উভয় সরস্বতীই কৃশাঙ্গী।—উক্ত কারণে ইংরাজদের ধারণা যে styleএর ঐশ্বর্য্য, শব্দের প্রাচুর্য্যের উপর নির্ভর করে। আমরা ইংরাজের শিষ্য, তাই আমরা যখন বাংলা ভাষার দারিদ্র্যের জন্য দুঃখ করি, তখন আমরা ইংরাজী ভাষার শব্দসম্ভারের দিকে নজর দিয়েই মাতৃভাষার দৈন্যের কথা ভেবে নিরাশ হই। এখন যে ভাষার অসংখ্য কথা আছে, সে ভাষার সাহিত্য অমিতভাষী হয়ে ওঠে। অপর পক্ষে যার হাতে সে ঐশ্বর্য্য নেই—সে মিতভাষী হতে বাধ্য। ফরাসী গদ্যের প্রধান গুণ এই যে, সে গদ্য সংযতভাষী। মৃচ্ছকটিক নাটকে চারুদত্ত, বসন্তসেনা সম্বন্ধে বলেছেন—প্রগল্‌ভং।

ন বদতি যদ্যপি ভাষতে বহুনি॥

ফরাসী লেখকদের সম্বন্ধেও এ কথা বলা যায়। মিতব্যয়ী ও অমিতব্যয়ীর মধ্যে প্রধান প্রভেদ এই যে, একজন ব্যয়সম্বন্ধে হিসেবী, আর একজন বেহিসেবী। সাহিত্যে শব্দের খরচ সম্বন্ধে ইংরাজী সাহিত্য বেহিসেবী আর ফরাসী সাহিত্য হিসেবী। ফরাসী সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হ'লে আমরা এ বিষয়ে সতর্ক হব।

ফরাসী সাহিত্য শব্দাড়ম্বরে ভারাক্রান্ত নয় বলে অনেকে মনে করেন, ইংরাজী সাহিত্যের তুল্য এ সাহিত্যের গৌরব নেই। গৌরবের অর্থ যদি হয় গুরু-ভারাক্রান্ত, তা হলে অবশ্য ফরাসী সাহিত্য ইংরাজী সাহিত্যের তুলনায় লঘু, অসি যেমন লগুড়ের চাইতে লঘু। আমি চাই যে বাংলা গদ্য এই হিসেবে লঘু হয়। তাতে তার ক্ষিপ্রতা ও তীক্ষ্ণতা বাড়বে, এ সাহিত্য-সাধনার উপযুক্ত উত্তরসাধক হচ্ছে ফরাসী সাহিত্য।

ফরাসী সাহিত্যের প্রধান গুণ যে, প্রসাদ গুণ, এ কথা সর্ববাদিসম্মত। ফরাসী গদ্য শুধু জলবত্তরল নয়, জলবৎ স্বচ্ছ। এ স্বচ্ছতা, আসলে ভাষার গুণ নয়, মনের গুণ। মানুষের মনোভাব যদি পরিষ্কার হয়, তা হলে তার প্রকাশও পরিষ্কার হতে বাধ্য। মনোভাবকে সাকার করবার কৌশল ফরাসী জাত যুগ যুগ ধরে সাধনার ফলে লাভ করেছে। আমি এ গুণকে সাহিত্যের মহাগুণ মনে করি। আমরা মনোভাবকে কখনই স্পষ্ট করে ব্যক্ত করতে পারিনে, যদি না সে ভাব আগে আমাদের মনে স্পষ্ট হয়। আমাদের মনোভাব যদি নিরাকার হয়, ত তাকে কথায় সাকার করা অসম্ভব। মনের ভিতর ভাবগুলো সব এলোমেলো ভাবে আসে, সেই এলোমেলো ভাবগুলোকে মনে মনে গুছিয়ে না নিতে পারলে, তাদের আমরা অপরের কাছে ধরে দিতে পারিনে। মনোভাবকে প্রকাশ করবার কৌশল হচ্ছে, আসলে সে ভাবকে মনে মূর্ত্ত করবার কৌশল; তাকে ভাষার কাপড় পরাবার ওস্তাদী নয়; মনের কথা গুছিয়ে বলবার আর্ট ফরাসী লেখকদের তুল্য আর কোনও দেশের লেখকের আয়ত্ত নয়। একে এক হিসেবে লেখার logical গুণ বলা যায়, কিন্তু সেই সঙ্গে আমি এ গুণকে aesthetical গুণ বলতে কুণ্ঠিত নই। ফরাসী সাহিত্যের এই প্রসাদ গুণ পাঠকের মনকে বিশেষ করে আনন্দ দেয়। অনেকের মতে এই গুণই ফরাসী সাহিত্যের দোষ। তাঁরা বলেন, ফরাসী সাহিত্যে আছে শুধু আলোক আর নেই তাতে ছায়া। ও একটা কৃত্রিম সৃষ্টি, কেন না, যা প্রকৃত তা আলোছায়ার মিশ্রিত। ফরাসী সাহিত্যে যে সবই ব্যক্ত—তার অন্তরে যে অব্যক্ত বলে কোনও পদার্থ নেই—এ কথা আমি মানতে প্রস্তুত নই। কারণ, এই ভগবানের সৃষ্টি কতক ব্যক্ত, আর অনেকখানি অব্যক্ত। ফরাসী সাহিত্যিকরা যে, ভগবানের চাইতেও বড় গুণী, ও-মত আমি গ্রাহ্য করতে পারিনে। সে যাই হোক, মনোরাজ্যে শুধু ছায়ার চাইতে, শুধু আলোক ঢের বেশী কাম্য। কাব্য বাদ দিয়ে সাহিত্যের অপরাপর প্রদেশে এই প্রসাদ গুণ যে মহাগুণ, তা কোন মানসিক ছায়াপ্রিয় লোকও অস্বীকার করতে পারবেন না। ইতিহাস বলো, আইন বলো, দর্শন বলো, বিজ্ঞান বলো, সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রেই ফরাসী প্রতিভা উজ্জ্বল করে রেখেছে।

এ সভায় আমার বিশ্বাস এমন অনেকে উপস্থিত আছেন, যাঁদের ইংরাজী আইনের সঙ্গে সম্যক্ পরিচয় আছে। ইংরাজী আইন ভাল কি ফরাসী আইন ভাল, সে বিচার এ ক্ষেত্রে আমি করতে যাচ্ছি নে। আমার বিশ্বাস, ইংরাজী আইন ইউরোপের অপর সকল আইনের চাইতে প্রবৃদ্ধ ও সমৃদ্ধ। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইংরাজী আইনের বই পড়া অতি কষ্টকর, লেখবার দোষে। অপর পক্ষে ফরাসী ভাষার আইনের সবই অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী সুখপাঠ্য, লেখবার গুণে। এ জাতীয় পুস্তকের অন্তরেও ফরাসী গদ্য লেখকের হাত স্পষ্টই দেখা যায়।

আর দর্শন? যিনি কখনও শাস্ত্রের চর্চ্চা করেছেন, তিনিই স্বীকার করতে বাধ্য যে, Bergsonএর লেখার যাদু আছে। এ দর্শনকে কাব্য বলতে আমি দ্বিধা করি নে। এমন প্রসন্ন, এমন উজ্জ্বল, এমন মনোমুগ্ধকর রচনা কাব্যজগতেও বিরল। Bergsonএর লেখার ভিতর জড়তার লেশমাত্র নাই। এমন মুক্ত স্বচ্ছন্দসলিল ভাষায় আর কেউ কখনো দর্শন লিখেছেন বলে আমি জানি নে। Plato দর্শন আমি গ্রীক ভাষায় পড়ি নি। আর শঙ্করের রচনায় লেখাগুলি যেমন পরিস্ফুট তেমনি পরিচ্ছন্ন আর তেমনি সুশ্লিষ্ট। ও একরকম সাহিত্যিক ইউক্লিড। ওতে বিন্দুমাত্র রঙ নেই। আমরা যাকে সত্ত্বগুণ বলি, এই ফরাসী দার্শনিকের রচনায় তার পূর্ণ প্রকাশ দেখা

যায়। যে গুণ ফরাসী গদ্যের নিজস্ব গুণ, সেই গুণেরই চরম বিকাশ Bergsonএর রচনায় পাওয়া যায়। সুতরাং Bergsonএর মোহ ফরাসী গদ্য সাহিত্যের মোহ। আমরা লেখকই হই, আর পাঠকই হই—ফরাসী সাহিত্যের প্রভাব আমাদের মনকে অনেকটা জড়তামুক্ত করবে। এই বিশ্বাস বশতঃই আমি স্বজাতিকে ফরাসী সাহিত্যের চর্চ্চা করতে অনুরোধ করি। ফরাসী সাহিত্যের আর এক মহাগুণ এই যে, তা সার্ব্বজনীন বাণী; ইংরাজীতে যাকে বলে universal। এ সাহিত্য দোষে গুণে বিশ্বমানবের মনের জিনিষ। আমি কল্পনা করতে পারি নে যে, পৃথিবীতে এমন কোন জাত থাকতে পারে, যাদের কাছে Moliere, কিম্বা Foltaireএর লেখা বিদেশী মনোভাবের পরিচায়ক বলে মনে হতে পারে। তাঁদের ভাষাও যেমন সহজবোধ্য, তাঁদের মনোভাবও তেমনি সর্ব্বমানবগ্রাহ্য। শুনতে পাই যে, ফরাসী দেশেও এমন লেখক আছেন, যাঁর লেখার রস শুধু ফরাসীরাই উপভোগ করতে পারে, আর কেহই পারে না। এ জাতীয় সাহিত্যিক যদি ফরাসী দেশে থাকে, তা হলে তারা দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখক। ও দেশের প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যই সকলের সমান উপভোগ্য। আমরা ভারতবর্ষীয় লোকরা নানা জাতের ও নানা দেশের লোক। সুতরাং সেই মনোভাবের চর্চ্চা করা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক এবং সঙ্গত, যে মনোভাব কোনরূপ সঙ্কীর্ণ জাতীয় কিংবা স্থানীয় সীমাবদ্ধ নয়। সংস্কৃতে যাকে বলে "সামান্য"—মনোভাব, তার প্রতি স্বভাবতঃই আমাদের মন অনুকূল। জর্ম্মাণী প্রভৃতি দেশের সাহিত্য "বিশেষ" মনোভাবের চর্চ্চা করাটাই তাদের সাহিত্যিক বিশেষত্ব মনে করে। এই কারণে ফরাসী সাহিত্যের এই সার্ব্বজনিক ভাবটা আমাদের ভারতবর্ষীয় মনের কুটুম্ব।

আমাদের এই ভারত-রোমক-সমিতি যদি উভয় জাতির এই মানসিক কুটুম্বিতা-চর্চ্চায় সহায় হয়, তা হলেই তার জন্ম সার্থক।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

মুক্তি

রিপু যা'র বলবান্, সন্ন্যাসে কি ফল তা'র,
যোগীর যোগিত্ব নহে রক্তবস্ত্র জটাভার!
কামনা যে নাহি পারে করিবারে বিসর্জ্জন,
কামনা বাড়িবে তা'র যত হ'বে সে নির্জ্জন।

ব্রত পূজা বৃথা সব একাগ্রতা নাহি যা'র,
সাধনা যে নাহি জানে কিসে হ'বে সিদ্ধি তা'র!
শিলা ভাবি শিলা পূজা যে করিবে হতাদরে,
শিলারূপী নারায়ণ সে পা'বে কেমন ক'রে!

জ্ঞান, ভক্তি ও বিশ্বাস, প্রীতি, প্রেম, ভালবাসা,
প্রাণে প্রাণে আছে যা'র পূরে তা'র মন-আশা।
নিবৃত্তির পথে যা'র মন প্রাণ ধাবমান,
সে মহাপুরুষ যোগী, সেই পায় ভগবান্।

প্রবৃত্তির দাস যা'রা শৃঙ্খলিত তা'রা—দীন,
নিবৃত্তি যা'দের মন্ত্র, তা'রা মুক্ত, কর্ম্মহীন!

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।

নারী-দস্যু সোফিয়া স্যার্লিং-এর আত্মকাহিনী

২
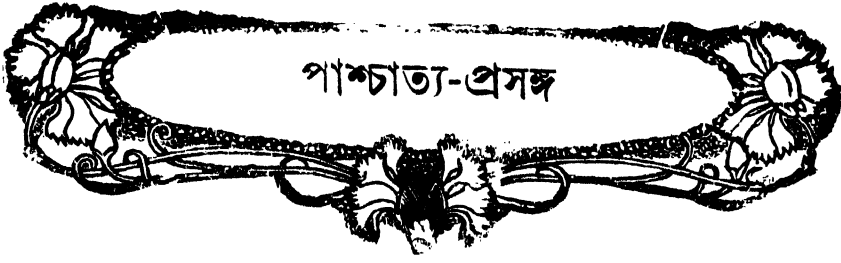
"নিউইয়র্কের ব্রডওয়েতে আট সপ্তাহ বাস করিবার পর বুঝিতে পারিলাম, শীঘ্র নিউইয়র্ক ত্যাগ না করিলে আমাকে বিষম বিপদে পড়িতে হইবে; সুতরাং নূতন কার্য্যক্ষেত্র খুঁজিয়া লইবার জন্য আমার প্রবল আগ্রহ হইল।

এক দিন রাত্রিকালে নিউইয়র্কের ষষ্ঠ এভিনিউস্থিত কে—থিয়েটারে একখানি গীতি-নাট্যের অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। রঙ্গমঞ্চে যখন গান চলিতেছিল, সেই সময় ছয় জন গুণ্ডা কতকগুলি দর্শককে আক্রমণ করে। আমিও সেই গুণ্ডার দলে যোগদান করিয়া আক্রান্ত দর্শকগণকে স্যাম্পেনের বোতল দ্বারা ঠেঙ্গাইতে আরম্ভ করিলাম এবং কোন কোন নারীর হীরক-রত্নাদির অলঙ্কার লুণ্ঠন করিয়া থিয়েটার হইতে অদৃশ্য হইলাম।

এই ঘটনার পরদিন রাত্রিকালে আমি 'এষ্টর রুফে'র ভোজনাগারে ভোজন করিতে গিয়াছিলাম; পূর্ব্বরাত্রিতে যে সকল হীরকালঙ্কার লুণ্ঠন করিয়াছিলাম, তন্মধ্যে মহামূল্য হীরক-খচিত 'ব্রেস্‌লেট' ছিল। আমার দুর্ব্বুদ্ধি,—সেই ব্রেস্‌লেটই পরিধান করিয়া আমি সেই ভোজনাগারে উপস্থিত হইয়াছিলাম। যাহার ব্রেস্‌লেট অপহরণ করিয়াছিলাম, সেই যুবতীও সেই সময় সেখানে ভোজন করিতে আসিয়াছিল। সে তাহার ব্রেস্‌লেট দেখিবামাত্র চিনিতে পারিল এবং পুলিসের সাহায্যে আমাকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা করিল। ভোজনাগারে ভীষণ গণ্ডগোল আরম্ভ হইল; আমি ধরা পড়িবার ভয়ে সেই ভোজনাগারের যুবতী অধিকারিণীর শরণাপন্ন হইলাম। আমি তাহাকে সেই ব্রেস্‌লেট এবং কয়েক সহস্র ডলার উৎকোচস্বরূপ দান করিলে, সে আমাকে গুপ্তপথে তাহার ভোজনাগার হইতে বাহির করিয়া দিল। আমার কষ্টার্জ্জিত অর্থের কিয়দংশ এই ভাবে আমাকে ত্যাগ করিতে হইল বটে, কিন্তু পুলিসের কবল হইতে রক্ষা পাইলাম; আমার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রহিল। আমার এই শোচনীয় পরাজয়ের কথা জীবনে বিস্মৃত হইব না।

পরদিন প্রত্যুষে আমার গোলাপী রঙ্গে রঞ্জিত শয়ন-কক্ষের সুকোমল শয্যায় বসিয়া, কোথায় যাই, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলাম। অবশেষে স্থির করিলাম, আমার অস্তিত্ব অনুভব করাইয়া এবার য়ুরোপকে সম্মানিত করিব। আমার চরিত্রের বিশেষত্ব এই যে, আমি যখন যে সঙ্কল্প করি, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে তিলার্দ্ধ বিলম্ব করি না। আমার শয্যার পার্শ্বেই টেলিফোন ছিল; আমি তৎক্ষণাৎ 'ইউনাইটেড ষ্টেটস্ জাহাজ কোম্পানী'র আফিসে টেলিফোন করিয়া 'জর্জ্জ ওয়াসিংটন' নামক জাহাজে পরদিন নিউইয়র্ক-ত্যাগের বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিলাম এবং এক দিনের মধ্যে আমার জিনিষপত্র তাড়াতাড়ি গুছাইয়া লইয়া যথাসময়ে জাহাজের জেটীতে উপস্থিত হইলাম। আমার সঙ্গে যে সকল জিনিষপত্র ছিল, তন্মধ্যে সাতটি প্রকাণ্ড ট্রাঙ্ক কেবল পরিচ্ছদেই পূর্ণ হইয়াছিল। আমার অভিনব কার্য্যক্ষেত্র প্যারিসে উপস্থিত হইয়া সেখানে কিরূপ অভিনয়-কৌশল প্রদর্শন করিব, সে কথা চিন্তা করিয়া আনন্দে ও উৎসাহে আমার বক্ষঃস্থল স্পন্দিত হইতে লাগিল। অবশেষে আমাদের জাহাজ যখন ষ্টেশনদ্বীপ (Station Island) অতিক্রম করিয়া অসীম নীলিমার অভিমুখে অগ্রসর হইল, তখন নিউইয়র্কের বিরহ-বেদনায় আমার হৃদয় হাহাকার করিয়া উঠিল। নিউইয়র্ক আমার জন্মভূমি-সন্নিহিত প্রথম কার্য্য-ক্ষেত্র, তাহার সহিত আমার বহু সুখ-দুঃখের স্মৃতি বিজড়িত; তাহার কথা কি আমি সহজে ভুলিতে পারি? বিশেষতঃ, এই ক্ষুদ্র পৃথিবীতে আমাদের জন্মভূমির ন্যায় মনোহর স্থান আর কোথাও নাই।

যাহা হউক, জন্মভূমির জন্য আমার সেই আকুল উচ্ছ্বাস দমন করিয়া, জাহাজের উপর যে সকল আমোদ-প্রমোদের আয়োজন ছিল, তাহাতে যোগদান করিলাম। সময় কিরূপ মূল্যবান্, তাহা আমি জানিতাম এবং সময়ের সদ্ব্যবহারের সুযোগ কখন ত্যাগ করি নাই। আমার বুদ্ধির দোষে নিউ-ইয়র্কে আমার অনেকগুলি টাকা নষ্ট হইয়াছিল; আমি ভাবিলাম, জাহাজে থাকিতে থাকিতে জাহাজের ভাড়ার টাকাগুলি যে কোন উপায়ে সংগ্রহ করিতেই হইবে। সে জন্য যদি কোন অসৎ উপায় অবলম্বন করিতে হয়, তাহাতেও আপত্তি নাই। অর্থোপার্জ্জনই যখন আমার উদ্দেশ্য, তখন কোন্‌টি সদুপায় আর কোন্ উপায়টি অসৎ, তাহার আলোচনা আমি অনাবশ্যক মনে করিতাম।

আমার প্রতি ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্না ছিলেন। সেই রাত্রিতেই নিউইয়র্কের কয়েক জন মহাধনাঢ্য ব্যক্তি তাস খেলিবার কামরায় বাজি রাখিয়া 'পোকার' খেলিবার জন্য আমাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। নিউইয়র্কে থাকিতে 'পোকার' খেলায় আমি অসাধারণ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিলাম। তৈল-ব্যবসায়ের 'সেয়ার' বিক্রয়-উপলক্ষে আমার বখরাদার জিমির সঙ্গে যখন রেল-পথে ইউনাইটেড ষ্টেটসের বিভিন্ন অংশে ঘুরিয়া বেড়াইতাম, সেই সময় গাড়ীর ভিতর অনেক আরোহীর সহিত 'পোকার' খেলিবার সুযোগ হইত। এই জুয়াখেলায় জয়লাভ করিতে হইলে নানাপ্রকার কৌশল জানা আবশ্যক। জিমি সুদক্ষ জুয়ারী ছিল এবং 'পোকারে' জয়লাভের নানা কৌশল, ফন্দী-ফিকির তাহার জানা ছিল; সেগুলি সে আমাকে সযত্নে শিখাইয়াছিল বলিয়া আমার পরাজয়ের আশঙ্কা ছিল না।—সেই ধনাঢ্য লোকগুলির সহিত 'পোকার' খেলিতে বসিয়া সারারাত্রি খেলায় কাটাইলাম; পরদিন প্রত্যূষে খেলা ভাঙ্গিয়া উঠিবার সময় দেখিলাম, প্রায় হাজারখানেক ডলার আমার হস্তগত হইয়াছে; সুতরাং এই রাত্রির উপার্জ্জন ভালই হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, খেলিতে বসিয়া কৌশলের (প্রতারণার) সাহায্য গ্রহণ না করিলে আমি এই টাকাগুলি উপার্জ্জন করিতে পারিতাম না।

সেই এক রাত্রিতে একটি মহিলার নিকট পরাজিত হইয়া ভদ্রলোক কয়টির জিদ্ বাড়িয়া গেল; কয়েক শত ডলার তাঁহাদের নিকট নিতান্ত তুচ্ছ পদার্থ হইলেও ক্রীড়া-যুদ্ধে আমার নিকট পরাজয়—তাঁহাদের মর্ম্মান্তিক ক্ষোভের কারণ হইয়াছিল। পরদিন রাত্রিকালে পুনর্ব্বার 'পোকার' খেলিবার নিমন্ত্রণ পাইলাম। তাঁহারা সকলে এক দিকে, আর আমি একাকিনী রমণী তাঁহাদের প্রতিপক্ষ; কিন্তু জিমির নিকট যে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলাম, তাহা অব্যর্থ। সেই রাত্রিতেও আমি পুনর্ব্বার ৫ শতাধিক ডলার জিতিয়া লইলাম। উপর্য্যুপরি দুই দিন আমাকে এই ভাবে জয়লাভ করিতে দেখিয়া তাঁহারা ঈর্ষ্যানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। কিন্তু আমার আত্মপ্রসাদের কারণ এই যে, আমি প্রতারণার সাহায্যে জয়লাভ করিয়াছিলাম—ইহা তাঁহাদের কেহই বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহাদের ধারণা হইয়াছিল, ভাগ্যবলেই আমি তাঁহাদিগকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। কিন্তু আমার এই আত্মপ্রসাদ দীর্ঘকালস্থায়ী হয় নাই, কারণ, এক দিন হঠাৎ জানিতে পারিলাম, আমি ধরা পড়িয়া গিয়াছি!—ইহাতে আমার মন বড়ই দমিয়া গিয়াছিল। কথাটা এখানে খুলিয়াই বলি।

জাহাজ নিউইয়র্কের বন্দর হইতে যাত্রা আরম্ভ করিবার পঞ্চম দিন রাত্রিকালে বায়ু-সেবনের জন্য জাহাজের ডেকের উপর পদচারণ করিতেছিলাম। তাহার অল্পকাল পূর্ব্বে আমি তাস খেলিবার কামরা ত্যাগ করিয়াছিলাম এবং সেই রাত্রিতেও 'পোকার' খেলায় আমার প্রায় ৪ শত ডলার লাভ হইয়াছিল। পুনঃপুনঃ এই ভাবে জয়লাভ করিয়া আমি প্রচুর আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিতেছিলাম। সেই সময় কে নিঃশব্দে আমার পশ্চাতে আসিয়া আমার স্কন্ধ স্পর্শ করিল। আমি চমকাইয়া উঠিয়া সবিস্ময়ে পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিতেই ডেকের আলোকে যাহাকে দেখিতে পাইলাম, সে 'পোকার' খেলায় আমার প্রতিদ্বন্দ্বিগণের অন্যতম।

লোকটা তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, 'মিস্ সার্লিং, তোমার সঙ্গে আমার দুই একটি কথা আছে, তাহা তোমাকে বলিতে পারি কি?'

আমি বলিলাম, 'কি বলিবেন বলুন, শুনি।'

আগন্তুক বলিল, 'তবে ঐ দিকে চল, এখানে হঠাৎ কেহ আসিয়া পড়িলে অসুবিধা হইতে পারে।'

লোকটা কি বলে, শুনিবার জন্য একটু কৌতূহল হইল;

আমি তাহার সঙ্গে ডেকের এক প্রান্তে উপস্থিত হইলে সে এমন কটমট করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিতে লাগিল যে, আমি তাহাতে ভয় না পাইলেও অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করিলাম। লোকটা প্রকাণ্ড জোয়ান, বয়স প্রায় ৪৫ বৎসর, জাহাজে সে নিজের যে পরিচয় দিয়াছিল, তাহা হইতে জানিতে পারা গিয়াছিল, সে সদাগর, নিউইয়র্কের ৫৪ নং রাস্তায় তাহার না কি প্রকাণ্ড আফিস।

সে আমাকে হঠাৎ বলিয়া বসিল, 'এই অল্পবয়সে তুমি ত জুয়াচুরীতে বেশ পরিপক্ক হইয়া উঠিয়াছ, মিস্!'

আমি বিরক্তিভরে বলিলাম, 'আপনার কথা বুঝিতে পারিলাম না। আমার অপমান করিবার জন্যই কি এখানে আমাকে ডাকিয়া আনিলেন?'

লোকটা বলিল, 'আমার কাছে তোমার চালাকী খাটিবে না। তুমি কি রকম পাকা জুয়ারী, তাহা কি আমি বুঝিতে পারি নাই মনে কর? ও কাযে আমি আনাড়ী নহি।'

বুঝিলাম, ধরা পড়িয়া গিয়াছি। আমি তাহার কথার প্রতিবাদ না করিয়া নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। সে আমাকে নির্ব্বাক্ দেখিয়া বলিল, 'আমার কথা শুনিয়া তোমার ভয় পাইবার কারণ নাই; আমিও যে ঐ পথের পথিক। আমি স্বয়ং জুয়ারী না হইলে তোমার প্রতারণা ধরিতে পারিতাম না। আমি বহুদিন হইতে জুয়া খেলিয়া আসিতেছি; জুয়াখেলায় কি কৌশলে অন্য খেলোয়াড়দিগকে প্রতারিত করিয়া তাহাদিগের সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিতে হয়, তাহা আমার বেশ জানা আছে। হাঁ, সকল কৌশলই আবার সুবিদিত।'

তাহার কথা শুনিয়া স্বস্তি বোধ করিলাম; নিম্নস্বরে বলিলাম, 'কি মতলবে আপনি আমাকে এ সকল কথা বলিতেছেন? আপনি এখন কি করিতে চাহেন?'

সে হাসিয়া বলিল, 'কি করিতে চাহি? তাহাই বলিবার জন্য ত তোমাকে এখানে ডাকিয়া আনিলাম। আমার ইচ্ছা, তোমাতে আমাতে মিলিয়া দিগ্বিজয়ে বাহির হই। আমরা উভয়ে দল বাঁধিয়া জুয়াখেলা আরম্ভ করিলে কেহই আমাদিগকে পরাজিত করিতে পারিবে না; অল্প-দিনেই আমরা বিস্তর টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিব। আমার প্রস্তাবে তুমি রাজী কি না?'

আমি বলিলাম, 'রাজী।'

লোকটা সোৎসাহে বলিল, 'উত্তম, আজ হইতে আমাদের স্বার্থ অভিন্ন।'

তখন আর কোন কথা হইল না। আমি সন্ধান লইয়া জানিতে পারিলাম, জাহাজে পি, জনসন বলিয়া নিজের পরিচয় দিলেও, সে নিউইয়র্কের এক জন বিখ্যাত দস্যু;—নিউইয়র্কের পুলিস ও তাহার দলভুক্ত দস্যুগণের নিকট সে 'ডবলডেক পিট' নামে সুপরিচিত। পুলিসের ভয়েই সে নাম ভাঁড়াইয়া দেশান্তরে পলায়ন করিতেছিল। সমব্যবসায়ী লোকরা সহজেই পরস্পরকে চিনিতে পারে, কয়েক দিনের মধ্যেই পিট আমাকে চিনিয়া ফেলিয়াছিল।

সপ্তম দিন আমরা চারবর্গে অবতরণ করিয়া প্যারিসে যাত্রা করিলাম। পিটের সহিত পরামর্শ করিয়া পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছিলাম, ফরাসী রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া জুয়ায় প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে হইবে।

আমরা 'জর্জ্জ ওয়াসিংটন' জাহাজে 'পোকার' খেলিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলাম, তাহাতে প্যারিসে কিছু দিন পরম সুখে বাস করিতে পারিব বুঝিয়া 'রিজ্ হোটেলে' বাস করিবার জন্য কয়েকটি কক্ষ ভাড়া লইলাম এবং পিট আমার সহোদর ভ্রাতা—এই পরিচয় দিয়া উভয়ে মহা আড়ম্বরে সেখানে বাস করিতে লাগিলাম। আমি পূর্ব্বে কখন প্যারিস দর্শন করি নাই। প্যারিস বিলাসীদের মনের মত স্থান। প্যারিসে আসিয়া প্রথম সপ্তাহটা আমোদ-প্রমোদে কাটাইলাম। সে সময় অর্থোপার্জ্জনের অবসর ছিল না; অথচ বিলাসের স্রোতে ভাসিয়া যাওয়ায় প্রতিদিন রাশি রাশি অর্থব্যয় হইতে লাগিল, বিশেষতঃ 'রিজ্ হোটেলে' বাসের ব্যয়ও অপরিমিত।

আমাদের অর্থাভাব লক্ষ্য করিয়া পিট আমাকে এক দিন গোপনে বলিল, 'ভাঁড় যে কর্পূরশূন্য! আর ত এ ভাবে আমোদ-প্রমোদে মত্ত থাকিলে চলে না। কিছু উপার্জ্জন করা দরকার।'

আমি বলিলাম, 'তা বটে, কিন্তু অর্থোপার্জ্জনের জন্য জুয়ারীগিরি করিবে, না অন্য কোন পন্থা স্থির করিয়াছ?'

পিট বলিল, 'ও পন্থা ত আছেই, কিন্তু রাতারাতি বড়-লোক হইবার একটি চমৎকার ফন্দী আমার মাথায় আসিয়াছে। গত রাত্রিতে চেটাম হোটেলের 'আমেরিকান বারে'

একটি লোক দেখিয়াছি, সে নিউইয়র্কের সুপ্রসিদ্ধ রত্নবণিক বি—র এজেণ্ট হইয়া য়ুরোপে বিস্তর হীরা-জহরত ক্রয় করিতেছে।—খুব বড় শিকার।'

আমি হাসিয়া বলিলাম, 'হাঁ, ফন্দীটা বেশ ভালই বটে! কিন্তু কেবল ফন্দীতেই ত কার্য্যোদ্ধার হয় না। সে হীরা-জহরত কিনিয়া রাখে কোথায়?'

পিট বলিল, 'সেগুলা সে নিশ্চয়ই পকেটে লইয়া ঘুরিয়া বেড়ায় না। আমি সন্ধান লইয়া জানিতে পারিয়াছি, সে যে সকল হীরা-জহরত কিনিয়াছে, তাহা 'আমেরিকান এক্সপ্রেসে'র ধনভাণ্ডারে গচ্ছিত রাখিয়াছে। সেখানে দন্তস্ফুট করা সহজ নহে; তবে যে দিন সে সেগুলি লইয়া প্যারিস ত্যাগ করিবে, সে দিন ট্রেণ হইতে তাহা আত্মসাৎ করা বোধ হয় তেমন কঠিন হইবে না।'

আমি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলাম, 'সে এখন কোথায় বাসা লইয়াছে?'

পিট বলিল, 'হোটেল ক্রিলোঁ।'

আমি বলিলাম, 'তাহার সঙ্গে পরিচয় না হইলে কার্য্যোদ্ধার করা অসম্ভব হইবে; এ কথা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? তাহার সহিত পরিচিত হইবার উপায় কি?'

হোটেল ক্রিলোঁর সম্মুখে সোনিয়া সার্লিং

পিট বলিল, "হাঁ, চিন্তার কথা বটে; কিন্তু এ কায তোমাকেই করিতে হইবে। তাহার সহিত পরিচিত হইবার ফন্দীটা তুমিই আবিষ্কার কর, আমার তাহা অসাধ্য।'

*   *   *   *   *

পিটের সহিত যখন আমার এই সকল পরামর্শ চলিতেছিল, তখন বেলা অধিক হয় নাই। আমি সেই দিন প্রভাতেই হোটেল ক্রিলোঁর রেস্তরাঁয় উপস্থিত হইয়া ভোজন শেষ করিলাম। সেই সময় হোটেলের এক জন খানসামার সহিত আলাপ করিয়া কথায় কথায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'নিউইয়র্কের রত্ন-ব্যবসায়ী বি, কোম্পানীর যে এজেণ্টটি এই হোটেলে থাকিয়া জহরত্যাদি ক্রয় করিতেছে, তাহার নাম কি?' খানসামা বলিল, 'তাহার নাম—মিঃ রিচার্ড হোপ।' মিঃ হোপকে পূর্ব্বে আমি না দেখিলেও খানসামার সাহায্যে তাহাকে চিনিয়া রাখিলাম। কিন্তু লোকটির চেহারা দেখিয়া আমার বড়ই অশ্রদ্ধা হইল। লোকটি খর্ব্বকায়, কিন্তু দেহ এরূপ স্থূল যে, দেখিয়া মনে হইল—একটা প্রকাণ্ড জালার মুখে একটি ফুটবল রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে! হাঁ, অবিকল ফুটবলের মত মাথা, কারণ, তাহার মাথায় একগাছিও চুল ছিল না, মাথা ভরা টাক। চোখে মস্ত এক জোড়া চসমা, তাহা শিং দিয়া বাঁধানো।

লোকটি অন্য টেবলে কিছু দূরে বসিয়া আহার করিতেছিল। আহারান্তে সে উঠিয়া প্রস্থান করিবামাত্র আমি তাহার অনুসরণ করিলাম। আমি তাহার ঘরে গিয়া বলিলাম—'আমি অল্পদিন পূর্ব্বে আমেরিকা হইতে প্যারিসে আসিয়া বড়ই বিপদে পড়িয়াছি; ফরাসী ভাষা জানি না, কাহারও কথা বুঝিতে পারিতেছি না, কাহারও নিকট মনের ভাব প্রকাশ করাও আমার অসাধ্য হইয়াছে; কোন্ অভিধান কিনিলে লোকের সহিত আলাপ-পরিচয় করিবার অসুবিধা দূর হইতে পারে, তাহা বলিয়া দিলে আমি বড়ই উপকৃত হইব।' আমার কথা শুনিয়া, বিশেষতঃ আমি তাহার স্বদেশবাসিনী, ইহা জানিতে পারায় আমার প্রতি তাহার যথেষ্ট দয়া হইল। সে দিন কাযকর্ম্ম লইয়া সে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকিলেও আমাকে নৈশ ভোজনের নিমন্ত্রণ করিল। বলা বাহুল্য, আমি তাহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম এবং এই সুসংবাদ পিটকে জানাইবার জন্য অবিলম্বে 'রিজ হোটেলে' প্রত্যাগমন করিলাম।

রাত্রিকালে মিঃ হোপের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়া তাহার সহিত একটু ঘনিষ্ঠভাবেই আলাপ-পরিচয় হইল; প্রথম পরিচয়ে লোকটার উপর আমার যে অশ্রদ্ধা হইয়াছিল, তাহা স্থায়ী হইল না। দেখিলাম, লোকটি সুরসিক ও সদালাপী। সে তাহার ব্যবসায়-সংক্রান্ত কোন কথাই আমার নিকট গোপন করিল না। সে কোথায় কোথায় কিরূপ সুন্দর সুন্দর হীরকালঙ্কার ক্রয় করিয়াছিল, তাহাও আমার নিকট প্রকাশ করিল। কাহারও নিকট সুদৃশ্য ও মূল্যবান্ অলঙ্কার থাকিলে তাহা দেখিবার জন্য নারী-জাতির কৌতূহল ও আগ্রহ কিরূপ স্বাভাবিক, মিঃ হোপের তাহা অজ্ঞাত ছিল না; সুতরাং আমি তাহার সংগৃহীত অলঙ্কারগুলি দেখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলে সে বিস্মিত হইল না; কয়েকখানি অত্যুৎকৃষ্ট মহার্ঘ্য হীরকালঙ্কার দেখাইয়া আমার আগ্রহ পূর্ণ করিতে সম্মত হইল। আহারাদি শেষ হইলে মিঃ হোপ আমাকে সঙ্গে লইয়া তাহার খাস-কামরায় প্রবেশ করিল এবং আমাকে সেই কক্ষে বসিতে বলিয়া কক্ষান্তরে অদৃশ্য হইল। আমি বুঝিতে পারিলাম, সে শয়নকক্ষ হইতে অলঙ্কারগুলি আনিতে গেল।

কয়েক মিনিট পরে সে চর্ম্মনির্ম্মিত একটি চৌকা বাক্স লইয়া তাহার খাস-কামরায় উপস্থিত হইল এবং সেই বাক্সটি খুলিয়া কতকগুলি হীরার আংটী, হীরক-খচিত ব্রেস্‌লেট, মুক্তার কণ্ঠহার প্রভৃতি বহুমূল্য অলঙ্কার আমার সম্মুখে টেবলের উপর রাখিল। আমি মুগ্ধনেত্রে সেই অলঙ্কারগুলির দিকে চাহিয়া রহিলাম, ইহা দেখিয়া সে বড়ই কৌতুক বোধ করিল এবং কোন কোন অলঙ্কার আমাকে পরিয়া দেখিতে বলিল। আমি অত্যন্ত সন্তর্পণে কয়েকখানি অলঙ্কার পরিধান করিলে সেই কদাকার মাংসপিণ্ডটা মুগ্ধনেত্রে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, 'বাঃ, তোমাকে ঠিক পরীর মত দেখাইতেছে।' বুঝিলাম, রসিক পুরুষের মুণ্ড ঘুরিয়া গিয়াছে!

যাহা হউক, কয়েক মিনিট পরে আমি তাহার অলঙ্কারগুলি খুলিয়া রাখিয়া বলিলাম, 'এই সকল মহামূল্য হীরকালঙ্কার আপনি কোন্ সাহসে নিজের কাছে রাখিয়াছেন?'

মিঃ হোপ কোন কথা না বলিয়া বুকের পকেট হইতে পাঁচটা টোটাভরা একটা পিস্তল বাহির করিল এবং সহাস্যে তাহা আমার মুখের উপর উদ্যত করিয়া পুনর্ব্বার পকেটে রাখিল। আমার মনে হইল, সে কি আমার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াছে? আমার বুকের ভিতর দুরু দুরু করিয়া উঠিল; কিন্তু মুহূর্ত্তে মনের ভাব গোপন করিয়া হাসিয়া বলিলাম, 'আপনি যে অসাধারণ সাহসী পুরুষ, তাহার প্রমাণ পাইলাম; কিন্তু এই সকল অলঙ্কার কোন ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখাই কি অধিকতর নিরাপদ নহে?'

মিঃ হোপ বলিল, 'তোমার প্রস্তাব অসঙ্গত নহে; আমি আমার সংগৃহীত অলঙ্কারগুলি 'আমেরিকান এক্সপ্রেসে' গচ্ছিত রাখিয়াছিলাম; কিন্তু কাল সকালের ট্রেণেই আমাকে বার্লিনে যাত্রা করিতে হইবে বলিয়া অলঙ্কারগুলি আজই ব্যাঙ্ক হইতে লইয়া আসিয়াছি।'

এই সংবাদটি আমার নিকট কিরূপ মূল্যবান্, তাহা বুঝিতে পারিলে এ সংবাদ কি সে আমার নিকট প্রকাশ করিত? কিন্তু সংবাদটা জানিতে পারায় আমার মন আনন্দে পূর্ণ হইল। এই সকল হীরা-জহরত আত্মসাৎ করিতে হইলে আর আমাদের বিলম্ব করিলে চলিবে না বুঝিয়া আমি একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। কি কৌশলে ইহার চক্ষুতে ধূলা নিক্ষেপ করিয়া কার্য্যসিদ্ধি করিব? হঠাৎ একটা ফন্দী আমার মাথায় আসিল। আমি বলিলাম, 'আপনি ঐ সকল অলঙ্কারের কিয়দংশ এ দেশে বিক্রয় করিবেন?'

মিঃ হোপ বলিল, 'হাঁ, খরিদ্দার জুটিলে কোন কোন অলঙ্কার এ দেশেও বিক্রয় করিতে পারি। বিক্রয়ের জন্যই ত এগুলি সংগ্রহ করিয়াছি। যেখানে লাভ পাইব, সেইখানেই বিক্রয় করিব। ও কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? তুমি কি কিছু কিনিবে?'

আমি বলিলাম, 'না, কিনিব না বটে, কিন্তু আমার এক জন ধনাঢ্য বন্ধু কয়েকখানি অলঙ্কার কিনিতে পারেন। আপনার আদেশ পাইলে আমি এখনই তাঁহাকে টেলিফোন করিতে পারি।'

লাভের আশায় মিঃ হোপের চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; সে বলিল, 'এ ত খুব ভাল কথা, এখনই তাঁহাকে টেলিফোন কর।'

আমি তৎক্ষণাৎ সেই হোটেলের বাহিরে আসিয়া অদূরবর্ত্তী টেলিফোনের আড্ডায় উপস্থিত হইলাম এবং

পিটকে টেলিফোনে ডাকিয়া সংক্ষেপে সকল কথা তাহাকে বুঝাইয়া দিলাম; অবশেষে বলিলাম, 'তুমি এখানে আসিবার পূর্ব্বেই ইটালীগামী কোন এরোপ্লেনের টিকিট কিনিয়া রাখিবে, যেন সেই এরোপ্লেনে আমরা অবিলম্বে ফ্রান্স হইতে প্রস্থান করিতে পারি।'

আমি টেলিফোনে সংবাদ দেওয়ার পর আধ ঘণ্টার মধ্যেই পিট 'হোটেল ক্রিলো'য় উপস্থিত হইল। আমি তাহাকে মিঃ হোপের সহিত পরিচিত করিলাম, বলিলাম, 'ইনি আমার স্বদেশীয় বন্ধু, বিপুল ঐশ্বর্য্যের মালিক।'

মিঃ হোপ পিটকে অলঙ্কারগুলি দেখাইবার পূর্ব্বে আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া 'আমেরিকান বারে' প্রবেশ করিল এবং সুপেয় মদ্য দ্বারা আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করিল। অনন্তর হোপ পিটকে অলঙ্কারগুলি দেখাইবার জন্য তাহার উপবেশনকক্ষে লইয়া চলিল। আমি একটা ওজর করিয়া সেখান হইতে সরিয়া পড়িলাম এবং অদূরবর্ত্তী টেলিফোনের আড্ডায় প্রবেশ করিয়া 'হোটেল ক্রিলো'তে মিঃ রিচার্ড হোপকে টেলিফোনে ডাকিবার ব্যবস্থা করিলাম।

আমি জানিতাম, মিঃ হোপের শয়নকক্ষে টেলিফোন আছে। আমি তাহাকে টেলিফোনে ডাকিলে সে পিটকে অলঙ্কারগুলি পরীক্ষা করিতে দিয়া উপবেশনকক্ষ হইতে উঠিয়া আসিয়া শয়নকক্ষে প্রবেশ করিবে, ইহাও বুঝিতে পারিয়াছিলাম। বস্তুতঃ আমার ফন্দী ব্যর্থ হইল না। মিঃ হোপ তাহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া টেলিফোনে সাড়া দিতেই আমি তাহাকে বলিলাম, 'আপনি টেলিফোনের রিসিভারটা ধরিয়া রাখুন, যিনি আপনার সঙ্গে কথা কহিবেন, তিনি এখনই আসিতেছেন; তাঁহার কি একটা জরুরী কথা আছে।' মিঃ হোপকে তিন চারি মিনিট সেই কক্ষে রাখিতে পারিলে পিট তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া চম্পটদান করিতে পারিবে, এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

আমি পরমুহূর্ত্তে টেলিফোনের ঘর হইতে বাহির হইয়া পথে আসিতেই সম্মুখে একখানি ট্যাক্সি দেখিতে পাইলাম; সেই ট্যাক্সিতে উঠিয়া হোটেল ক্রিলোর দেউড়ীতে উপস্থিত হইতে আমার বোধ হয় তিন মিনিটের অধিক বিলম্ব হয় নাই। দেউড়ীতে ট্যাক্সি যাইবার পূর্ব্বেই পিট হোটেলের দরজা ঠেলিয়া দ্রুতবেগে দেউড়ীতে আসিল, সে এক লাফে ট্যাক্সিতে উঠিয়া আমার পাশে বসিবামাত্র সোফেয়ার আমার আদেশে তৎক্ষণাৎ প্লেস্ ভেঁদোমে চলিল। প্লেস্ ভেঁদোম হোটেল ক্রিলোর অল্প দূরে অবস্থিত। সেই স্থানে আমরা ট্যাক্সি লইতে নামিয়া ট্যাক্সিওয়ালাকে তাড়াতাড়ি বিদায় করিলাম। সেই ট্যাক্সি অদৃশ্য হইবামাত্র আমরা আর একখানি ট্যাক্সিতে উঠিয়া 'লে বুর্জে এরোড্রোমে' উপস্থিত হইলাম। এই পথটুকু আমরা বোধ হয় ঘণ্টায় ৬০ মাইল বেগে অতিক্রম করিয়াছিলাম!

সেখানে তখন যাত্রিবাহী একখানি প্রকাণ্ড এরোপ্লেন উড়িবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, এমন কি, তাহার এঞ্জিন পর্য্যন্ত চালাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। পিট 'রিজ্ হোটেল' হইতে এই এরোপ্লেন কোম্পানীর ম্যানেজারকে পূর্ব্বেই টেলিফোনে সংবাদ দিয়াছিল—রোমে তাহার মাতা কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়াছে, তাহাকে ও তাহার ভগিনীকে (অর্থাৎ আমাকে) যেন রোমগামী এরোপ্লেনে অবিলম্বে তুলিয়া লওয়া হয়।—সৌভাগ্যক্রমে এরোপ্লেন গগন-পথে উধাও হইবার পূর্ব্বমুহূর্ত্তেই আমরা সেখানে আসিয়া পড়িয়াছিলাম।

চুরীর পর ৪৫ মিনিটের মধ্যেই আমরা আকাশের ৩ হাজার ফুট উর্দ্ধে উঠিয়া ইটালী অভিমুখে ধাবিত হইলাম। আমরা উভয়ে এরোপ্লেনের একটি কেবিন ভাড়া করিয়াছিলাম; সেই কেবিনে বসিয়া আমরা অপহৃত হীরা-জহরতগুলি পরীক্ষা করিলাম। কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় বহু সহস্র ডলার মূল্যের হীরকালঙ্কার আমাদের হস্তগত হইয়াছিল। প্যারিসের জুয়ার আড্ডায় আড্ডায় ঘুরিয়া আর আমরা কত টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিতাম? অপহৃত অলঙ্কারগুলি আমারই জিম্মায় থাকিল।

তেল ফুরাইয়া যাওয়ায় এরোপ্লেনখানি পথিমধ্যে দুই বার নীচে নামিয়াছিল; তথাপি প্যারিসত্যাগের ঠিক ৯ ঘণ্টা পরে আমরা সিভিটা ভেক্‌সিয়ার অদূরবর্ত্তী ইটালিয়ান নৌ-বিমান ষ্টেশনে অবতরণ করিলাম। সেই ষ্টেশন হইতে একখানি বেগবান্ মোটর-শকটে আমরা অল্পকাল পরে রোমে উপস্থিত হইয়া 'হোটেল ব্রিষ্টলে' বাসা লইলাম। 'হোটেল ব্রিষ্টল' রোমের একটি প্রসিদ্ধ হোটেল।

হোটেল ব্রিষ্টলে আসিয়া আহার ও বিশ্রামের পর চোরা মালের বথরা লইয়া পিটের সহিত আমার তুমুল বচসা আরম্ভ হইল। পিট বলিল, চুরীটা যখন সে নিজেই করিয়াছে, তখন অপহৃত অলঙ্কারগুলির তিন ভাগের দুই ভাগ সে লইবে, আমাকে অবশিষ্ট এক ভাগ লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।

তাহার কথা শুনিয়া আমি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলাম। পিটকে বলিলাম, সে স্বহস্তে চুরী করিয়াছিল বটে, কিন্তু আমার বুদ্ধি ও কৌশল ভিন্ন তাহার চেষ্টা সফল হইবার কি কোন আশা ছিল? আমার সাহায্যের মূল্য কি এতই অল্প? চোরা মাল আমারই কাছে ছিল, আমি তাহাকে অর্দ্ধাংশের অধিক দিতে সম্মত হইলাম না।

আমার কথা শুনিয়া পিট ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিল। আমাকে গুলী করে আর কি! বুঝিলাম—সে আমাকে মিথ্যা ভয় প্রদর্শন করিতেছে না, আমাকে হত্যা করিয়া অলঙ্কারগুলি সমস্তই আত্মসাৎ করিবার জন্য সে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে! কিন্তু সে পিস্তলের ঘোড়া টিপিবার পূর্ব্বেই আমি আমার সম্মুখস্থ টেবল হইতে একটা ভারী কাগজ-চাপা খপ করিয়া তুলিয়া লইয়াই সবেগে তাহার মুখে নিক্ষেপ করিলাম। সেই আঘাতে সে ঘুরিয়া পড়িল, তাহার পিস্তলের গুলী অন্য দিকে ছুটিয়া গেল। পিস্তলের আওয়াজ শুনিয়া হোটেলের ম্যানেজার ও অন্যান্য কর্ম্মচারী সেই কক্ষে দৌড়াইয়া আসিল; তখন আমি পিটের সঙ্গে আপোষ করিয়া একটা বাজে কৈফিয়তে তাহাদিগকে শান্ত করিলাম। তাহারা আর কোন গোলমাল না করিয়া চলিয়া গেল।

সোনিয়া সার্লিং প্যারিস হইতে পলায়নের পর এরোপ্লেন-ষ্টেশনে উপস্থিত

অতঃপর পিটকে আমার প্রস্তাবেই সম্মত হইতে হইল; আমি চোরা-মালের অর্দ্ধেক তাহাকে দিয়া অপরার্দ্ধ নিজের জন্য রাখিলাম। তাহার পর পিটের সহিত বথরায় কারবার (?) চালাইতে অসম্মত হইয়া আমি তাহার সংস্রব ত্যাগ করিলাম। পরদিন আমি নেপল্‌সে যাত্রা করিলাম; পিট উত্তরাঞ্চলে প্রস্থান করিল।

কিন্তু নেপল্‌সে আমার সেই যাত্রাটা শুভযাত্রা কি না সন্দেহ; কারণ, সেখানে এক মেয়ে বাটপাড়ের পাল্লায় পড়িয়া আমাকে বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। সেই বিস্ময়কর কাহিনী পরে বলিব।"

[ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।
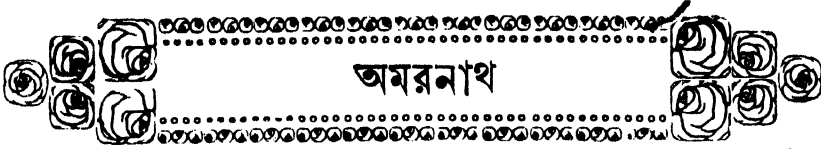
অমরনাথ

১

চন্দননগর ফরাসী রাজ্য। কলিকাতা হইতে ১০ ক্রোশ উত্তরে। সহরটি ক্ষুদ্র হইলেও বড় সুন্দর। এই সুন্দর নগরের এক প্রান্তে একটি সুন্দর বাটী। বাড়ীখানি বেশী দিন নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তাহার চারি পাশে ফল-ফুলের বাগান, সম্মুখে লোহার ফটক, পিছনে পুষ্করিণী।

একদা প্রভাতে গৃহস্বামী কৃষ্ণনাথ সুসজ্জিত বৈঠকখানায় বসিয়া একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন। তাঁহার দ্বাদশ বর্ষীয় পুত্র নরেন্দ্রনাথ হাসিতে হাসিতে ঘরের ভিতর আসিয়া কহিল, "বাবা, তোমাকে যদি একটা জিনিষ দি, তা হ'লে তুমি আমাকে কি দেও?"

পুস্তক হইতে চক্ষু উঠাইয়া পিতা সহাস্যে কহিলেন, "সেটা নির্ভর করে তোমার জিনিষের উপর।"

বালকের একখানি হাত পিছনে ছিল—মুঠার ভিতর এক টুকরা কাগজ লুকানো। বালক সকৌতুকে কহিল, "এটা খুব ভাল জিনিষ, তুমি পেলে ভারী খুসী হবে।"

"কেমন ক'রে জান্‌লে জিনিষটা খুব ভাল?"

"নইলে মা লুকিয়ে রাখবেন কেন?"

পিতা চুপ করিয়া গেলেন; মুহূর্ত্ত পরে কহিলেন, "জিনিষটা কি, দেখি?"

"তুমি কি দেবে, আগে বল?"

"তুমি কি চাও?"

"একখানা কলের জাহাজ।"

"সে ত তুমি চাইলেই পেতে। এখন কাগজখানা দেও।"

"কেমন ক'রে জান্‌লে বাবা, এটা কাগজ?"

বালক তখন হাসিতে হাসিতে কাগজখানা বাপের হাতে দিল। কৃষ্ণনাথ পড়িয়া দেখিলেন, সেখানি তাঁহার বাল্যবন্ধু অমরনাথের পত্র। পত্রে লেখা ছিল,—

"রাজমহল, শুভ বৈশাখ।

ভাই কৃষ্ণনাথ,

নূতন বৎসর আসিল; কিন্তু মন সেই পুরাতন। পুরাতন বৎসরকে ডুবাইয়া নূতন বৎসর প্রভাত হইতে না হইতে পুরাতন স্মৃতি আসিয়া মনের কপাটে ধাক্কা মারিল। কৈ, সে সব স্মৃতি ত পুরাতন বৎসরের সঙ্গে ডুবিয়া যায় নাই?

বুঝিয়াছি, পুরাতন লইয়াই আমাদের থাকিতে হইবে, যতক্ষণ না আমরা নূতন কিছু গড়িতে পারি। সময়ের রেখা কিছুই নয়—সময়ের বুকে রেখা কেহ টানিতে পারে না—আমাদের কাযের রেখাই বড়। আমি কায করিতে চলিলাম, পুরাতন লইয়া আর বসিয়া থাকিব না।

পুরাতন চলিয়া গেল মাকে লইয়া; নূতনকে আহ্বান করিতে আছি আমি ও ছোট বোন্ লতা। আমাকে বাঁধিয়া রাখিতে আছে শুধু সেই। তুমি আসিয়া তাহাকে লইয়া যাও—আমাকে মুক্তি দেও ভাই। আমি আর কাহারও কাছে তাহাকে রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিব না।

মায়ের মৃত্যুসংবাদ দিয়া তোমাকে ব্যথিত করিতে ইচ্ছা ছিল না, তাই এত দিন তোমার পত্রের কোনও উত্তর দিই নাই। তুমি আসিবে—যত শীঘ্র পার আসিবে। ইতি

তোমার অমর।"

পত্র পড়িতে পড়িতে কৃষ্ণনাথের চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। কিন্তু তিনি পুত্রের সম্মুখে আত্মসংবরণ করিয়া লইলেন। বালক জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে কলের জাহাজ দেবে, বাবা?"

"দেবো।"

"আমি ত বলেছিলুম, জিনিষটা পেলে তুমি খুব খুসী হবে।"

"চিঠিখানা কবে এসেছে, নরু?"

"দশ বারো দিন হ'ল। সেই যে দিন তুমি দাদামশাইকে দেখতে ওতরপাড়ায় গিছলে, সে দিন চিঠিখানা ডাকে আসে।"

"তুমি এত দিন চিঠিখানার কথা আমাকে বল নি কেন?"

"বলতে মা বারণ ক'রে দিয়েছিলেন।"

"তবে আজ বললে কেন?"

"আজ মা আমাকে বকেছে।"

"তুমি এ চিঠি এখন কোথায় পেলে?"

"মা'র দেরাজে ছিল, আমি চুপি চুপি বার ক'রে নিয়েছি।"

"ছি, কাযটা ভাল কর নি।"

"তোমার চিঠি তোমাকে দিলুম, তাতে দোষ কি হ'ল ?"

"তুমি ত এখন চিঠিখানা চুরি ক'রে এনেছ।"

"আমি যদি দোষী হই, মাও ত তবে দোষী। মা কেন তোমার চিঠি চুরি ক'রে রেখেছিল ?"

"তাঁর কথা হচ্ছে না, তোমার কথা হচ্ছে।"

"মা যা করেছে, আমিও তাই করেছি।"

"তুমি বড় তর্ক শিখেছ ; এখন যাও, পড় গে।"

বালক বাপকে যত ভালবাসিত, তত ভয়ও করিত। একবার ইচ্ছা হইল, জাহাজের কথাটা আর একবার বলে, কিন্তু পিতার গম্ভীর বদন দেখিয়া সাহস করিতে পারিল না—নীরবে প্রস্থান করিল। কৃষ্ণনাথ পত্রখানা পুনরায় পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এবার আর চোখের জল বারণ মানিল না। নীরবে অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিলেন। মন একটু শান্ত হইলে চক্ষু মুছিয়া উঠিলেন এবং অন্দরমহলে আসিয়া ডাকিলেন, "পিসীমা !"

"কি বাবা ?"

"ভাত হয়েছে, পিসীমা ?"

"এই হ'ল ব'লে, তুমি চান ক'রে নেও।"

"চান করবার সময় হবে না—"

"কেন, কোথায় যাবে ?"

"রাজমহলে।"

গৃহিণী হিরন্ময়ী অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পিসীমা দয়াময়ী কহিলেন, "তুমি একবার রান্নাবাড়ীতে যাও ত বউমা, ভাতের তাগাদা দেও।"

হিরন্ময়ী রান্নাবাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু বেশী দূর গেলেন না, অন্তরালে গিয়া দাঁড়াইলেন। কৃষ্ণনাথ তাহা বুঝিলেন। দয়াময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজমহলে কেন যাচ্ছ, বাবা ?"

"আমার রাজমহলের মা মারা গেছেন।"

বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। দয়াময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবে মারা গেলেন ?"

"তা জানি না।"

"অমরের চিঠি পেয়েছ ?"

"হাঁ, এই যে চিঠি। সে এত দিন আমায় চিঠি দেয় নি, পাছে আমি মনে কষ্ট পাই।"

"আহা, বাছার আমার বড় কষ্ট ! বিয়েও করলে না।"

"তার ছোট বোন্ লতাকে মনে আছে, পিসীমা ?"

"আছে বৈ কি ; তবে তাকে ক'দিনই বা দেখেছি।"

"আমি তাকে আন্‌তে চললুম। মাতৃহীনার মা হবে পিসীমা ?"

"বেশ—নিয়ে এস ; ফির্‌তে তোমার ক'দিন হবে ?"

"তা ত ঠিক বলতে পাচ্ছি না—পাঁচ সাত দিন হ'তে পারে।"

"আমি দেখি গে তোমার ভাতের কত দেরী।"

দয়াময়ী প্রস্থান করিলে হিরণ আসিয়া কহিল, "আহা, অমর বাবুর ত বড় কষ্ট হয়েছে !"

"হুঁ।"

"তাঁর ছোট বোন্‌টিকে নিয়ে এস, আমি মানুষ করব।"

"ভাল।"

"আমার ননদ নেই, মেয়ে নেই, আমার কত দুঃখ হয় ; তাকে পেলে আমার বড় আনন্দ হবে।"

"উত্তম।"

"দেখ, অমর বাবুর চিঠিখানা আমি লুকিয়ে রেখে দিয়েছিলেম ; প'ড়ে পাছে তোমার মনে কষ্ট হয়, তাই।"

"আর মিথ্যা বোলো না। দুঃখ এই, ছেলেটাও তোমার দেখে নীচ হচ্ছে।"

পিসীমা ঠাঁই করিয়া দিয়া বউকে ভাত আনিতে বলিলেন। আহার করিতে করিতে কৃষ্ণনাথ কহিলেন, "দেখ পিসীমা, ছেলেটা বড় খারাপ হয়ে যাচ্ছে—"

"কে, নরু ? সে কি বাবা !"

"তুমি রামায়ণ-মহাভারতের অনেক গল্প জান, সেই সব গল্প তাকে বলবে।"

"ছেলেটা খারাপ হচ্ছে কি রকম ?"

"ওদের কাদার মত কোমল মন, যা দেখবে শুনবে, তারই ছাপ পড়বে। এই বয়েসটা সাবধানে রাখা উচিত।"

ইঙ্গিতটুকু পিসীমা যে বুঝিলেন, এমত বোধ হইল না ; তিনি নীরবে গরম ভাতে বাতাস দিতে লাগিলেন।

আহারাদি সমাপ্ত করিয়া কৃষ্ণনাথ ঘরে আসিলে হিরন্ময়ী কাপড়, জামা, জুতা সব ঠিক-ঠাক যোগাইয়া দিলেন—

ভৃত্যকে কাছে আসিতে দিলেন না। কতকগুলি পাণ সাজিয়া একটা কৌটায় ভরিয়া ব্যাগের ভিতর দিলেন। দু' তিনখানি কাপড়, জামা, রুমাল, টোয়ালে, মোজা, চিরুণী প্রভৃতি কতকগুলি জিনিষ একটা স্লটকেসে পুরিয়া দিলেন। সব গুছাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আরও কাপড়-জামা দেব কি ?"

বেশভূষা করিতে করিতে কৃষ্ণনাথ উত্তর করিলেন, "না, আর দরকার নেই।"

"বিছানা সঙ্গে দেব কি ?"

"না।"

"তুমি যে কারুর বিছানায় শুতে চাও না।"

"যাদের প্রবৃত্তি কুৎসিত, তাদের বিছানায় শুই না বটে।"

"তা হ'লে সেখানে ত বিছানা দরকার হ'তে পারে।"

"না, আমি অমরের কাছে শোব।"

"শুনছি, মদ খেয়ে না কি তিনি অনেক টাকা উড়িয়ে দিয়েছেন।"

"সে সব কথার আলোচনা করবার তোমার কোন প্রয়োজন আছে ব'লে মনে হয় না ; ভবিষ্যতে এ সব কথা আর তুলো না।"

রূঢ়ভাবে কথা কয়টি বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। হিরন্ময়ী হর্ম্ম্যতলে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "আমি যা কিছু বলি না কেন, উনি আমার উপর চ'টে উঠেন ; কখন একটা মিষ্টি কথা পাই না। তিনি জানেন না, আমি তাঁকে কত ভালবাসি। কেউ তাঁকে ভালবাসে, তিনি কাউকে ভালবাসেন, এ আমি পছন্দ করি না। অমর ওঁকে ভালবাসে, উনি অমরকে ভালবাসেন, এ আমার সহ্য হয় না। অমরটা আবার মাতাল; তার সঙ্গে ওঁকে মিশতে দিতেই ইচ্ছা করে না। কিন্তু কি করব ? অমরের নামে কোন কথা বলতে গেলে উনি আমাকে মারতে উঠেন। আহা, চিঠিখানা যদি পুড়িয়ে ফেলতাম ! কে জানে যে হতভাগা ছেলে চিঠিখানা বার ক'রে এনে ওঁর হাতে দেবে ?"

"মা, আমাকে ভাত দেবে না ? স্কুলের যে বেলা হয়েছে।"

"তুই আমার দেরাজ হ'তে চিঠিখানা নিয়ে গিছলি ?"

"হ্যা।"

"কেন আমাকে জিজ্ঞেস না ক'রে নিয়েছিলি ?"

"বাবার চিঠি বাবাকে দিয়েছি।"

"তুই নেবার কে ?"

'তুমিই বা তাঁর চিঠি নেবার কে ?"

"বটে ! আচ্ছা থাকো।"

"ভয় দেখাচ্ছ কি ? আমি আজই দাদা মশায়ের কাছে চ'লে যাব—বাবা এলে ফিরব।"

"দেখ্ নরু, আমি তোর ভালর জন্যেই সব করি। চিঠিখানা ওঁকে দিয়ে কি কাণ্ডটাই করলি বল্ দেখি ?"

"কেন, কি করলুম ?"

"উনি সেই মেয়েটাকে আনতে ছুটলেন।"

"কোন্ মেয়েটা, মা ?"

"সেই একটা আদুরে জ্যেঠা মেয়ে আছে।"

"তা, তাকে আনলেই বা। বেশ মজা হবে, আমি তাকে আমার কলের জাহাজ দেখাব।"

"আঃ বোকা ছেলে ! সে এলে কি তোর আর আদর থাকবে ?"

"ইস্ ! তোমার যেমন কথা। বাবা তাকে আদর করুন না।"

"তখন দেখিস্।"

নেপথ্যে "নরু, স্কুল যেতে হবে না ? ভাত খাবি কখন্ ?"

"যাই ঠাক্-মা।"

নরু প্রস্থান করিল।

রাজমহল সহরের এক প্রান্তে গঙ্গার ধারে এক ছোট পাহাড় বা টিলার উপর একখানি সুন্দর ছোট বাড়ী। চারিদিকে ফুলের বাগান। বাগানের নীচে ভাগীরথী, উপরে পাহাড়। নিকটে লোকালয় নাই। বাড়ীখানির নাম অমরালয়; অমরনাথ এই গৃহে বাস করেন।

কৃষ্ণনাথ যখন গভীর রাত্রিতে রাজমহল ষ্টেশনে নামিলেন, তখন চারিদিকে ভয়ানক দুর্য্যোগ। বৃষ্টি তত বেশী নয়, ঝড়টাই প্রবল। ষ্টেশনে একখানিও ঘোড়ার গাড়ী বা মোটর নাই, কাযেই তাঁহাকে বিশ্রামাগারে আশ্রয় লইতে

হইল। রাত্রিশেষে ঝড়-বৃষ্টি থামিলে একখানি গাড়ী আসিল; কৃষ্ণনাথ তাহা ভাড়া করিয়া অমরালয়ে আসিলেন। তখন রজনী প্রভাতপ্রায়, কিন্তু আকাশ পরিষ্কার নয়—মানব-হৃদয়ের ছিন্নতার অসংখ্য চিন্তার ন্যায় ছিন্ন মেঘ গগনময় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। ফটক খুলিয়া গৃহ-সান্নিধ্যে আসিয়া সবিস্ময়ে দেখিলেন, ঘরের ভিতর হইতে উজ্জ্বল আলোক গবাক্ষপথ দিয়া আসিতেছে। ডাকিবা-মাত্র সাড়া পাইলেন, অবিলম্বে দ্বার খুলিয়া গেল। গৃহ-বাসী কহিলেন, "কে, কৃষ্ণ এয়েছ? এই দুর্য্যোগে!"

"কৃষ্ণ দুর্য্যোগেই দেখা দেন; তা' তুই আলো জেলে এখনও ব'সে কেন?"

"ভাই, একটু মুস্কিলে পড়েছি—একা কিছু ক'রে উঠতে পাচ্ছি নে—তুই চট ক'রে কাপড়-জামা বদ্‌লে আয়।"

"কি হয়েছে, বল্ দেখি?"

"একটু আগে একখানা নৌকো ডুবে গিছল। তা'তে দু'জন যাত্রী ছিল; এক জন বাঁচবে ব'লে মনে হয়, আর এক জন—তুই চট্ ক'রে পাশের ঘরে আয়—আমি আর দেরী করতে পাচ্ছি নে।"

কৃষ্ণনাথ পাশের ঘরে আসিয়া দেখিলেন, অমরনাথের শয্যার উপর এক প্রৌঢ় ব্যক্তি শয়ান রহিয়াছেন। তাঁহার জ্ঞান আছে বলিয়া মনে হইল না। কক্ষের অপর প্রান্তে ভগ্নী স্নেহলতার শয্যার উপর একটি বালক শায়িত। দুই জনেই সম্ভ্রান্তবংশোদ্ভব—তাঁহাদের মুখাবয়বেই তাহা ব্যক্ত হইতেছিল। নবমবর্ষীয়া বালিকা লতা, বালকের পদতলে বসিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতেছিল। কৃষ্ণনাথকে দেখিবা-মাত্র লতার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; কহিল, "এই যে বড়দা এয়েছে—বেশ হয়েছে।"

"কেন রে লতি, কি হয়েছে?"

"এই দেখ না, দাদা কোথা হ'তে দুজনকে ঘাড়ে ক'রে নিয়ে এসেছেন। কত সেক-তাপ দিলাম, দাদা কত কি করলেন, তবু এঁরা কথা কচ্ছেন না।"

শায়িত বালক কহিল, "এই যে আমি" ক্ষীণকণ্ঠে এই কয়টি কথা বলিয়া নীরব হইল। লতা, বালকের মুখের কাছে ছুটিয়া গিয়া কহিল, "ও আমার দাদা, কথা কইছ! ওষুদ খাও, আমি যে অনেকক্ষণ হ'তে তোমার জন্যে ওষুদ নিয়ে ব'সে আছি।"

দুই বন্ধু তখন বালকের ভার লতার উপর অর্পণ করিয়া প্রৌঢ়ের সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন। অনেক সেবা করিতে করিতে—অনেক ফুৎকার মুখের ভিতর দিতে দিতে সংজ্ঞা-হীনের নিশ্বাস সহজভাবে বহিতে লাগিল। তবে অতি ধীরে। ভৃত্য আসিয়া দ্বার-জানালা খুলিয়া দিয়াছে, কোমল সূর্য্য-কিরণ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া সকলের মনে আশা ও আনন্দের সঞ্চার করিয়াছে।

মধ্যাহ্নে প্রৌঢ় ব্যক্তি শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া বালককে বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিলেন। বালক 'বাবা' 'বাবা' বলিয়া কত ডাকিল, কত অশ্রু বিসর্জ্জন করিল। তদ্দৃষ্টে অমরনাথের প্রাণ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল; তিনি চক্ষু মুছিতে মুছিতে বাহিরে উঠিয়া আসিলেন। লতা বারান্দায় বসিয়া একখানা বই পড়িতেছিল; অমর-নাথ তাহা ফেলিয়া দিয়া লতাকে কোলে তুলিয়া লইলেন এবং চুম্বনে চুম্বনে তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া ফেলিলেন। লতা কহিল, "কেন দাদা, এমন করছ?"

"তোকে ছেড়ে যে আমায় যেতে হবে দিদি!"

"কেন যাবে?"

"রোজগার করতে, নইলে খাব কি?"

"এত দিন কি ক'রে আমাদের চলছিল?"

"সে সব কথা তুই এখন বুঝবি নি—আগে বড় হ'।"

"আমি একা কি ক'রে এখানে থাকব? আমিও তোমার সঙ্গে যাব, দাদা।"

"আমি যে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াব, কেমন ক'রে তোকে সঙ্গে নেব দিদি? আমার চেয়েও যে তোকে আদর-যত্ন করবে, তার কাছে তোকে রেখে যাচ্ছি।"

"এমন ত আর কেউ নেই, দাদা?"

"আছে, তোর বড়দা—কৃষ্ণনাথ।"

"আমার কথা কি বলছ অমর?" বলিয়া কৃষ্ণ দর্শন দিলেন।

অমর উত্তর করিলেন, "তোমার তা শোনবার দরকার নেই।"

কৃষ্ণ। বেশ, নাই বললে; এখন দেখছি, আমার নিকট হ'তে লুকোবার তোমার অনেক কথা হয়েছে।

অমর। (সহাস্যে) তুমি তেমনই দুষ্টু আছ, কৃষ্ণ। বল রে লতি, আমি কি বলছিলাম।

লতা বলিল। শুনিয়া কৃষ্ণনাথের মুখ গম্ভীর হইল। ক্ষণমধ্যে সামলাইয়া লইয়া লতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই আমার কাছে থাক্‌তে পারবি, লতি ?"

লতা কোন উত্তর করিল না—রোদনোন্মুখ মুখ লইয়া নীরবে বসিয়া রহিল। কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমাকে ভালবাস না, লতা ?"

"বাসি।"

"তবে আমার কাছে কেন থাক্‌তে চাইছ না ?"

"দাদাকে ছেড়ে থাকতে আমার বড় কষ্ট হবে।"

"কেন, আমিও ত তোমার দাদা।"

"দাদার মত আমাকে কেউ ভালবাসে না, আমিও দাদার মত কাউকে ভালবাসি না। সে দিন—"

"সে দিন কি, লতি ?"

"সে দিন একটা বড় কুকুর আমাকে তাড়া করেছিল ; দাদা ছুটে এসে আমাকে ঠেলে ফেলে কুকুরের সামনে দাঁড়ালেন। কুকুরটা দাদাকে কত আঁচড়ে কামড়ে দিলে—"

লতার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। কৃষ্ণনাথ বন্ধুর পানে জিজ্ঞাসু নয়নে চাহিলেন। অমর হাসিয়া কহিলেন, "পাগ-লীর কথা শোন কেন ? কুকুরটাকে তথনই আমি গলা টিপে মেরে ফেলেছিলাম, আমাকে বড় কিছু করতে পারে নি।"

লতা। পারে নি বৈ কি ? রক্ত পড়ল, ওষুদ দিতে হ'ল। কিন্তু আমার গায় দাদা একটা আঁচড়ও লাগতে দেন নি।

কৃষ্ণ। আমিও তোমার গায়ে একটা আঁচড়ও লাগতে দেব না, লতি, তোমার দাদার মত ক'রে তোমাকে রাখব।

লতা। তুমি তা পারবে না বড়দা ; দাদার মত তোমার গায়ে জোর নেই। তুমি ষাঁড়ের শিং ধ'রে ঠেলে নিয়ে যেতে পার, না দুটো মানুষকে কাঁধের উপর ফেলে গঙ্গা হ'তে এই পাহাড়ে তুলতে পার ? তোমাকে তা আর পারতে হয় না।

কৃষ্ণ। তা না পারি, তোমাকে যাতে কুকুরে না তাড়া করে, ষাঁড়ে না ভয় দেখায়, সে বিষয়ে আমি সতর্ক হ'তে পারি।

লতা। ইস্, দাদার মত আর পারতে হয় না, দাদার মত কেউ কিছু করতে পারে না। আমি দাদাকে ছেড়ে থাকতে পারব না।

অমরনাথ ভগিনীকে কোলে টানিয়া বিষাদিত অন্তরে কহিলেন, "তুমি যদি আমাকে না ছেড়ে দেও লতি, তা হ'লে আমার যাওয়া হবে না।"

লতা। তোমার যাওয়াটা কি একান্ত দরকার, দাদা ?

অম। হাঁ দিদি, নইলে কি তোমাকে ছেড়ে যাচ্ছি।

লতা। তবে তুমি যাও দাদা ; আমি বড়দার কাছে থাক্‌ব। কিন্তু দাদা, বেশী দিন তোমার লতিকে ফেলে থেকো না, তা হ'লে সে কেঁদে কেঁদে ম'রে যাবে।

অম। দু' তিন বছরের ভিতরই ফিরব ; কেমন লতি ?

লতা। এত দিন ?

বলিতে বলিতে তাহার নয়ন হইতে জল ঝরিয়া পড়িল। অমর কহিলেন, "এখন দেখ গে লতি, অতিথি দু'জনের খাওয়া হ'ল কি না, তাঁদের খাওয়া হ'লে আমাদের ভাত দিতে বোলো।"—লতা প্রস্থান করিল।

৩

কৃষ্ণনাথ কহিলেন, "এমন শান্ত মেয়ে ত দেখি নি।"

অম। এমন দুষ্টুও আবার দেখা যায় না।

কৃষ্ণ। আমার ভাবনা ছিল, আমার সঙ্গে বুঝি যেতে রাজি হবে না ; আমাকে অনেক দিন দেখে নি।

অম। তুমি চার মাস আস নি ; সেই বড়দিনের বন্ধে এসেছিলে। তুমি চ'লে যাবার কয়েক দিন পরেই মা মারা যান।

কৃষ্ণ। কি হয়েছিল ?

অম। কিছু বুঝা গেল না। অল্প জ্বর, হঠাৎ নাড়ী দুর্ব্বল হয়ে পড়্‌ল। ডাক্তারে বললে, হার্টফেল করেছে, অর্থাৎ বুঝতে না পেরে যা ব'লে থাকে।

কৃষ্ণ। আমাকে 'তার' করলে না কেন ? কাকীমা'র অসুখ শুনলে আমি সকল কায ফেলে চ'লে আসতুম।

অম। আসতে, তা জানি ; কিন্তু রোগটা গুরুতর ব'লে আমরা ত মনে করি নি।

কৃষ্ণ। কাকীমা আমাকে খুঁজেছিলেন ?

অম। মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে তোমাকে দেখতে চেয়ে-ছিলেন ; আমি 'তার' করতে আর সময় পেলাম না।

কৃষ্ণ। আমি শৈশবে বাপ-মা হারিয়ে তোমার বাপ-মাকে পেয়ে তাঁদের অভাব ভুলেছিলাম। সকলে চ'লে গেলেন, এখন রইলাম তুমি আর আমি।
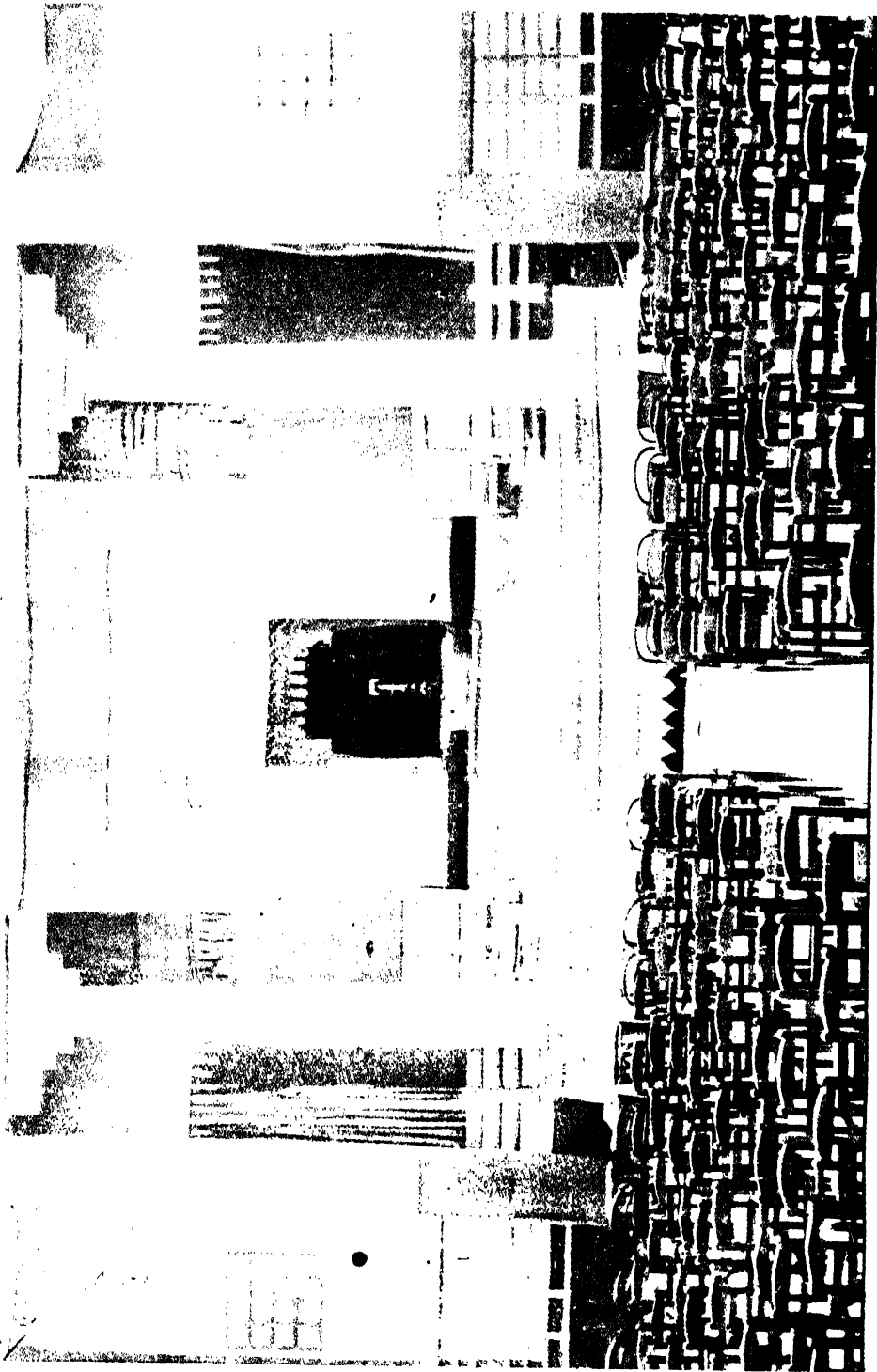
ঠাকুর-বাড়ীতে নটীর পূজার অভিনয়ে সুসজ্জিত রঙ্গমঞ্চ

[ফটো-শিল্পী—শ্রীঅলকেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

অম। আর লতা।

কৃষ্ণ। লতা ত আর তোমার আমার সঙ্গে মানুষ হয় নি, সে তখন জন্মায় নি। তোমার বাবা আমাকে মানুষ ক'রে চুণারে পাথরের ব্যবসায় ঢুকিয়ে দিলেন, তার ছু' চার বছর পরে লতা জন্মাল। লতা বোধ হচ্ছে নরুর চেয়ে তিন বছরের ছোট।

অম। আমি ভাই, সময়ের অত হিসেব রাখতে পারি নে, ঘটনাগুলিই শুধু মনে রাখি। তুমি বি-এ ফেল ক'রে ব্যবসায় ঢুকলে, আমি পড়া চালালাম। পরীক্ষা কয়টা দিয়ে বাবার কাঠের ব্যবসা হাতে নিলাম। বাবা ভাবলেন, পণ্ডিত ছেলের হাতে প'ড়ে ব্যবসা বুঝি ফলাও হয়ে উঠবে। বাবা চোখ বুজতে না বুজতে আমার চোখ খুলল, শীঘ্রই ব্যবসা গুটুতে হ'ল। এত দিন বেচে কিনে চলছিল, এখন আর চলে না।

কৃষ্ণ। আচ্ছা, তুই যে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ স্কলারসিপের দরুণ এক গাদা টাকা পেলি, তা'র কি হ'ল?

অম। তা কি আজও আছে মনে কর?

কৃষ্ণ। আট দশ হাজার টাকা, কি করলি শুনি?

অম। শুনে কাষ নেই।

কৃষ্ণ। দান-টান ক'রে থাকৃবি! ওঃ, বুঝেছি, একবার কাগজে দেখেছিলাম, যদুনাথের নামে এক বৃত্তি স্থাপন ক'রে কোন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি কতকগুলো টাকা সরকারের হাতে দিয়েছে। তখন বুঝি নি, তুমিই এ টাকাটা তোমার বাপের নামে দিয়েছ।

অম। আমার সকলই ত বাবার; তাঁর জিনিষ তাঁকে দিয়েছি।

কৃষ্ণ। যাক, এখন কি করবি মনে করেছিস?

অম। ইচ্ছা আছে বিলেত যেতে।

কৃষ্ণ। পয়সা কোথা পাবি?

অম। প্রবল ইচ্ছা উপায় উদ্ভাবন ক'রে নেবে। আমার এক সহপাঠী কোনও জাহাজে ডাক্তার হয়ে যাচ্ছেন; আমি তাঁর কম্পাউণ্ডার হয়ে যাব মনে করেছি।

কৃষ্ণ। সেখানে গিয়ে খাবি কি?

অম। হাত-পা আছে, উপায় ক'রে নেব।

কৃষ্ণনাথ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "বিলেত ত যেতে চাচ্ছ, উদ্দেশ্যটা কি বল দেখি?"

অম। গাছ-গাছড়া হ'তে ওষুদের আরক করতে শিখে আসব, এই রকম মনে করেছি; যেমন চালমুগরা, কুচলে, ফেণিমনসা—

কৃষ্ণ। কথাটা ভাল; কিন্তু দেশে থেকে কি শেখা যায় না?

অম। বোধ হয় না।

কৃষ্ণ। তা হ'লে আমেরিকায় যাও।

অম। সেখানেও যাব জার্ম্মাণী হয়ে।

কৃষ্ণ। কিন্তু পয়সা ত চাই।

অম। চাই ত, কিন্তু হাতে ত কিছু নেই।

কৃষ্ণ। মহেশপুরের জঙ্গলটা বেচলে ছু' দশ হাজার হ'তে পারে।

অম। মায়ের শ্রাদ্ধে আর দেনা মেটাতে তা চ'লে গেছে।

কৃষ্ণ। তবে বাড়ীখানা বেচে ফেল।

অম। না, এ বাড়ী বেচব না, মা ও বাবা এখানে দেহ রেখেছেন।

কৃষ্ণ। তবে বাড়ীটা ভাড়া দে।

অম। ভাড়া হ'লে ত ভালই হয়, খালি প'ড়ে থাকলে বাড়ীটা নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু এখানে ভাড়া নেবে কে?

কৃষ্ণ। কোন সাহেব-সুবো নিতে পারে। আমি রেল আফিসের সাহেবদের ব'লে দেখব। এখন তোর জাহাজ ভাড়ার কি করা যায়? আমার কাছে ধার নিবি?

অম। না।

কৃষ্ণ। তা আমি জানি। তা হ'লে টাকাটা কি ক'রে যোগাড় হবে?

অম। সে আমি ঠিক ক'রে নেব; তার জন্যে তুই ভাবিস নে।

কৃষ্ণ। তুমি ত সব ঠিক ক'রে নেবে, যেমন কাকার এত বড় কাঠের ব্যবসা ঠিক করলে।

অম। যাক্ ও সব কথা, এখন তোর বাড়ীর খবর বল্। নরু কি পড়ছে?

কৃষ্ণ। আমারই মত একটা পণ্ডিত হবে ব'লে মনে হয়।

অম। তা হলেই যথেষ্ট।

কৃষ্ণ। কিন্তু লেখাপড়া শেখা-ই ত যথেষ্ট নয়। শিক্ষার

যা উদ্দেশ্য, সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হচ্ছে। ভদ্রসন্তান ব'লে পরিচয় দিতে হ'লে আগে চরিত্র চাই।

অম। এর মধ্যেই তার চরিত্র বেগড়াল কি রকম?

কৃষ্ণ। চরিত্র-সংগঠন দরকার দু' বছর বয়স হ'তেই। ঘরের শিক্ষাই প্রধান শিক্ষা; গর্ভধারিণী বালককে নষ্ট করলে কেউ তাকে রক্ষা করতে পারে না। ভেবেছিলাম, তোমার কাছে তাকে রেখে দি, কিন্তু তুমি ত চ'লে যাচ্ছ।

অম। বউদিদি কিন্তু তোমাকে খুব ভালবাসেন।

কৃষ্ণ। সময় সময় তার ভালবাসায় আমার সন্দেহ হয়। মনে হয়, সব তার ভণ্ডামী।

অম। তোমার শ্বশুরের খবর কি?

কৃষ্ণ। তিনি ঠিক তেমনই আছেন। কীর্ত্তনের চীৎকারে ভাই শ্বশুরবাড়ীতে পা দেবার যো নেই। সন্ধ্যা হ'ল ত কতকগুলো ছাপমারা বাবাজী এসে বাড়ী সরগরম ক'রে তুললেন। পাড়ার লোকরা পর্য্যন্ত ঘুমুতে পায় না।

অম। যাঁর যে পথে রুচি, তাঁকে সেই পথে থেকে ভগবান্‌কে ডাকতে দেও।

কৃষ্ণ। দূরে থেকে কথাটা বলা সহজ, একবার সেখানে গিয়ে দেখ না। লাফালাফি, গড়াগড়ি, কান্নাকাটি, পায় ধরাধরি, জড়াজড়ি—দেখ্‌লে তুমিও পালাই পালাই ডাক্ ছাড়বে। আমি ত এ রকম ভজনের কোন সার্থকতা দেখতে পাই না। ভগবান্‌কে আমরা যখন দেখতে পাচ্ছি না, তখন ধ'রে নিতে হবে, তিনি আমাদের চক্ষুর্গোচর হ'তে ইচ্ছে করেন না। তবে চেল্লাচিল্লি ক'রে কেন তাঁকে বিরক্ত করা? যাতে তাঁর তৃপ্তি হয়, সেই রকম কায ক'রে চল। ব্যস্, নাচা-কাঁদা, জপ-তপ, এ সবের কোন দরকার নেই।

অম। তুমি যে দেখছি ধর্ম্মতত্ত্বেও মহাপণ্ডিত হয়ে উঠেছ; এ পরীক্ষাটা কবে দিলে?

কৃষ্ণ। পরীক্ষাটা আজও দেওয়া হয় নি, শিক্ষা পেয়েছি সম্প্রতি। একবার চুণার হ'তে ফিরতে পথে দেবঘরে নামলাম। অতি পবিত্র স্থান; দেবগিরির কিছু দূরে দেবঘর, মধ্যে নন্দনপদাশ্রয়ী ধারোয়া। সেখানে শুনলাম, এক সাধু এক মিশন খুলেছেন শুনে দেখতে গেলাম। দেখলাম, মস্ত দোতলা বাড়ী, বিজলীর আলো, সাজসজ্জা অট্টালিকারই উপযোগী। সন্ধ্যার পরে দেখলাম, মেয়ে-পুরুষে মিলে কীর্ত্তন ও নাচ আরম্ভ ক'রে দিলে। কীর্ত্তন ত বুঝা গেল না, বিরক্ত হয়ে ঘরের ভিতর চ'লে এলাম। সেখানে বিছানার উপর কয়েকখানা বই বিক্রয়ার্থ প'ড়ে ছিল। একখানি উঠিয়ে দেখি, তাহাতে মঠস্বামীর শিক্ষা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তিনি তাহাতে লিখেছেন, মাছ-মাংস যাহা ইচ্ছা খাও এবং যাহা ইচ্ছা কর, ক্ষতি নাই, কিন্তু মায়ের নাম ছেড়ো না। আরও বলেছেন, কামিনী-কাঞ্চন বর্জ্জন না করলে যদি ধর্ম্ম না হয়, তা হ'লে জগতে কাহারও ত ধর্ম্ম হয় নি, হ'তে পারে না। এই রকম শিক্ষা পাঠ ক'রে আমার মন জ্ব'লে উঠল; আমি উপরে গিয়ে স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি আমার কথা শুনে বললেন, "অনাসক্তভাবে যা ইচ্ছে ক'রে যাব।" আমি তাঁকে বল্‌লুম, "কি ক'রে রোজ মদমাংস অনাসক্তভাবে খেয়ে যাব? যা সম্ভব নয়, সে সব শিক্ষা দিয়ে লোকের মাথা খাচ্ছেন কেন? মহাপুরুষরা ব'লে গেছেন, সংসারত্যাগীরা কখন স্ত্রীলোকের সংসর্গে আসবে না; আর আপনি এক পাল যুবতী স্ত্রীলোক বাড়ীতে রেখে যেন ডাকছেন, আমার চারে চ'লে আয় কে আছিস কামিনী-কাঞ্চনকামী—"

অম। পরের নিন্দা করো না; তাঁর উদ্দেশ্য হয় ত বোঝ না।

কৃষ্ণ। বেশ বুঝি; একটা লোভনীয় আমোদ-প্রমোদের আড্ডা ক'রে রেখেছেন—

অম। ছি ছি, ও সব কথার আলোচনা ত্যাগ কর।

কৃষ্ণ। আলোচনা দরকার সমাজের জন্যে। নিজে যা ইচ্ছা করুন, কিন্তু ধর্ম্মের নাম নিয়ে পরের যথাসর্ব্বস্ব—

এমন সময় লতা আসিয়া কহিল, "দাদা, তোমাদের ভাত দেওয়া হয়েছে; আজ রান্না হ'তে বড় দেরী হয়ে গেল, কাল সকলে রাত জেগেছে কি না—"

"অতিথিদের খাওয়া হয়েছে?"

"তাঁদের খাওয়া না হ'লে কি আমি তোমাদের ডাকতে এসেছি? এখন চল—"

উভয়ে উঠিলেন।

অমরালয় গঙ্গার ধারে, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে; কিন্তু বাড়ীটি ঠিক ভাগীরথীর কিনারায়। বর্ষাকালে জাহ্নবীর

জল গৃহসংলগ্ন উদ্যান স্পর্শ করে, কিন্তু বৈশাখে জল অনেকটা সরিয়া যায়। সরিয়া গেলেও এখানকার গঙ্গা খুব চওড়া, জলও অনেক।

অপরাহ্নে উদ্যানে বসিয়া গঙ্গাপানে চাহিতে চাহিতে অতিথি পশুপতিনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদের নৌকো কোন্‌খানটায় ডুবেছিল বাবা?"

অমরনাথ উত্তর করিলেন, "আমি ত তা' জানি না; কখন্ আপনাদের নৌকো ডুবেছিল, তাও আমি দেখি নি।"

পশুপতি। তবে তুমি কি ক'রে আমাদের সাহায্যে ছুটে গিছলে?

অমর। আমি চীৎকার শুনতে পেয়েছিলাম। ঝড় উঠেছে দেখে আমি জেগে সতর্ক ছিলাম।

পশু। অন্ধকারে কি ক'রে আমাদের দেখতে পেলে বাবা?

অম। আপনারা জলে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন, শব্দ হচ্ছিল, আমি সেই শব্দ লক্ষ্য ক'রে—

পশু। আমি আর পারছিলাম না, কোন রকমে ছেলেটাকে পিঠে ফেলে দশ পনর হাত সাঁতার কেটে এসেছিলাম। যে মুহূর্ত্তে মনে মনে বললাম, ভগবান্, আর পারলাম না, তুমি যা হয় কর, সেই মুহূর্ত্তে তুমি আমাকে ধরলে। তার পর আর জ্ঞান ছিল না, কি হ'ল, কিছুই জানি না।

অম। আপনি কোথায় যাচ্ছিলেন?

পশু। তোমারই কাছে আসছিলাম বাবা।

অম। আমার কাছে? কেন?

পশু। তা বলছি। এখন আমাদের বাড়ী ফেরবার ব্যবস্থা কর, ভোরে রওনা হ'তে হবে।

অম। তা হ'তেই পারে না, দু' তিন দিন পরে যাবেন।

পশু। আমি গায়ে বেশ বল পেয়েছি।

অম। সেটা পরে বুঝব। অনুমতি হয় যদি, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

পশু। স্বচ্ছন্দে কর।

অম। আপনি আমার সকল পরিচয় অবগত আছেন, বাবার সঙ্গেও আপনার বিশেষ আলাপ ছিল বলছেন। কিন্তু আমি এখনও আপনাকে চিন্‌তে পারলাম না।

পশু। আমার নাম পশুপতিনাথ রায়, নিবাস কালিন্দীর উপর মীরপুর গ্রামে।

অম। এইবার আপনাকে চিন্‌তে পেরেছি, আপনি এক জন বড় জমীদার।

পশু। বাবা, আমার চেয়েও অনেক বড় জমীদার আছেন, তবে আমি বড় হলাম কিসে?

অম। আবার আপনিও ত অনেকের চেয়ে বড়।

পশু। সেটা মনে করা উচিত নয়; যখন নিজেকে দুঃখী ব'লে মনে করবে, তখন নীচের দিকে চেয়ে দেখবে—দেখবে, কত শত অনাথ আতুর তোমাকে বড়, তোমাকে সুখী মনে করছে। আবার যখন অহঙ্কার এসে তোমার কানে কানে বলবে, তুমি কত বড়, তখন তুমি উপর দিকে চেয়ে দেখবে—দেখবে, কত শত তোমার চেয়ে বড় রয়েছে।

অম। কথাটি বেশ। এখন জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, আপনি কোন্ প্রয়োজনে আমার মত লোকের কাছে এসেছিলেন?

পশু। কথাটা গোপনীয়। এখন এখানে কেউ নেই—ছেলেরা ও-দিকে খেলছে। বলছি কি, আমি তোমার বাপের কাছে ঋণী আছি—তা প্রায় বিশ পঁচিশ হাজার টাকা হবে।

অম। বাবা ত কখন কাউকে টাকা ধার দেন নি—দেবার সঙ্গতিও বোধ হয় তাঁর ছিল না।

পশু। আহা, আগে আমার কথাটাই শোন না।

অম। বলুন।

পশু। একটা কয়লার খনি কিন্‌তে তোমার বাবা আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। আমি একা সব টাকা দিয়ে কিন্‌তে রাজী হইনি। তখন তোমার বাবা কিছু টাকা দিয়ে অংশীদার হলেন। তাঁর চার আনা, আর আমার বারো আনা। মনে করো না, আমি বড় স্বার্থপর, তিনি যেমন টাকা দেবেন, তেমনই ত অংশ পাবেন। এই অল্পমূল্যের ছোট খনিটা এখন খুব ফালাও হয়ে উঠেছে—ক' বছর উপরি উপরি অনেক লাভ হয়েছে। আমি কত দিন থেকে মনে ক'রে আসছি, তোমার বাবার অংশের টাকাটা তোমাকে দিয়ে যাব, তা ঘর থেকে টাকাটা চট্ ক'রে বার করতে ইচ্ছে হয় না।

অম। কোন খনিটনিতে বাবার কোন অংশ ছিল ব'লে শুনিনি।

পশু। সব কথা যে তোমাকে শুনতে হবে, এমন ত কোন কথা নেই।

অম। কোন লেখা-পড়া হয়েছিল?

পশু। তাঁর আমার মধ্যে আবার লেখা-পড়া কি? কথার চেয়ে কাগজ কি কখন বড় হয়? সেই টাকাটা আমি তোমাকে কোথায় কি রকমে পাঠাব, তাই জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলাম। আর বছর বছর যে টাকাটা লাভ হবে, সে টাকাটাই বা ভবিষ্যতে কোথায় পাঠাব?

অম। কত টাকা জমেছে?

পশু। খাতা না দেখে তা ঠিক বলতে পারিনে—তবে পঁচিশ ত্রিশ হাজারের কম হবে না।

অম। আর বছর বছর কত লাভ হয়?

পশু। তা পাঁচ সাত হাজার হবে তোমার অংশে।

অমরনাথ চিন্তামগ্ন হইলেন। জাহ্নবী-বক্ষে সূর্য্যদেব ঢলিয়া পড়িয়াছেন। অদূরে কৃষ্ণনাথ ছিপ উঠাইয়া লইয়া রিক্তহস্তে গৃহে ফিরিতেছেন। হংসকুল গঙ্গার উপর দিয়া কোন্ অজানা দেশে আশ্রয়ান্বেষণে উড়িয়া যাইতেছে। অমরনাথ একে একে সব দেখিলেন। অবশেষে কহিলেন, "আমি আপনার কোন টাকাই লইতে পারিব না।"

পশু। কেন বাবা?

অম। কোন টাকাই আমার পাওনা নেই, আপনি আমাকে দান করছেন।

পশু। দান? আমার মত কৃপণ লোকের এত টাকা দান! অসম্ভব!

অম। শুনেছি, আপনি নিজের খাওয়া-পরায় কৃপণ, কিন্তু পরকে দিতে আপনি চিরদিন মুক্তহস্ত।

পশু। যখন আধলাটা-পয়সাটা দিতে হয়, তখন আমি মুক্তহস্ত। তাই ব'লে এতগুলো টাকা কেউ প্রাণ ধ'রে দিতে পারে? আর আমি তোমাকে শুধু শুধু দান করবই বা কেন?

অম। আপনি হয় ত মনে করেছেন, আপনার—আপনার একটু উপকার করতে পেরেছি।

পশু। কি আর উপকার করেছ? জল থেকে টেনে তুলেছ, এই? এ ত মানুষ মানুষের জন্যে করেই থাকে, তুমি আর বেশী কি করেছ?

কৃষ্ণনাথ আসিয়া কহিলেন, "কথাটা কি অমর?"

অমর সকল কথা বলিলেন। শুনিয়া কৃষ্ণ কহিলেন, "পশুপতি বাবুর কথাটা অবিশ্বাস করবার কোন হেতু পেয়েছ কি, অমর?"

অম। আমার মনে হচ্ছে, উনি টাকাটা আমাকে দান করছেন।

পশু। তোমাকে দান করতে যাব কেন? তোমার অভাব কি?

অম। অভাব আমার খুব।

পশু। তোমার অভাবের কথা তুমি জান, আমার পক্ষে সেটা জানা সম্ভব নয়।

অম। সম্ভব হয়েছিল দুপুর বেলায়, যখন আমি পাশের বারান্দায় ব'সে কৃষ্ণনাথের সঙ্গে কথা কইছিলুম।

কৃষ্ণ। দেখ অমর, এর পরে যদি তুমি সত্যই মনে কর, এ টাকাটা তোমাকে উনি দান করেছেন, তা হ'লে তুমি সুবিধামত টাকাটা ফেরত দিও। এখন তোমার দরকার পড়েছে, টাকাটা নেও।

পশু। এ কথা মন্দ নয়—

অম। আমি বুঝে দেখব।

৫

বাগানের অন্য দিকে একটি লজ্জাবতী লতার পাশে বসিয়া স্নেহলতা, পশুপতি বাবুর পুত্র সুকুমারকে কহিতেছিল, "দেখ ভাই, এ গাছের পাতায় হাত দিলেই পাতা কুঁকড়ে যায়।"

বালক কহিল, "সত্যি না কি? আমি হাত দিয়ে দেখব?"

"দেও।"

বালক যেমন পাতায় হাত দিল, অমনই পাতাগুলি কুঞ্চিত হইল। বালক সাতিশয় বিস্মিত হইয়া পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিতে লাগিল। যখন দেখিল, এই ব্যাপারের মধ্যে কোনরূপ তঞ্চকতা নাই, তখন সে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন এমনটা হয়, লতা?"

লতা সহাস্যে কহিল, "তুমি কি বোকা সুকু! এমনটা হওয়াই যে ওর স্বভাব।"

সুকু। ওরই বা এমন স্বভাব কেন? এত গাছপালা রয়েছে, তারা ত কুঁচকে যায় না।

লতা। স্বভাব কি সকলের এক রকমের হয় সুকু? এই দেখ না কেন, কুকুর-বেরাল মাছ খায়, কিন্তু গরু-ছাগল মাছ খায় না।

সুকু। তোমার কথাটা আমার মনে লাগল না, আমি বাবাকে জিজ্ঞেস করব।

লতা। দাদাকে জিজ্ঞেস কর না কেন; এমন কোন জিনিষ নেই, যা' দাদা জানেন না।

সুকু। আমার সব জিনিষ জান্‌তে ইচ্ছে করে, কিন্তু উপায় নেই।

লতা। কেন ভাই?

সুকু। আমাদের গাঁয়ের স্কুল ছোট, কলকাতার স্কুলে পড়তে আমার ইচ্ছা করে, কিন্তু বাবা সেখানে আমাকে যেতে দেন না।

লতা। কেন?

সুকু। আমি বাবার এক ছেলে কি না, তাই তিনি আমাকে চোখের আড়াল করেন না। এই দেখ না কেন, বাবা একটা দরকারে কলকাতায় যাচ্ছিলেন, আমাকেও সঙ্গে নিয়েছিলেন— ছাড়েন নি।

লতা। তোমাদের চাকররা কোথা গেল ভাই?

সুকু। বাবা তাদের অন্য যায়গায় বাসা নিতে ব'লে দিয়েছেন। এ বাড়ী ছোট কি না।

লতা। তাদের নৌকো বুঝি ডোবে নি?

সুকু। তাদের নৌকা ছোট, ঝড় উঠ্‌বার আগেই তারা এসে পৌঁছেছিল।

লতা ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বয়স কত ভাই?"

সুকু। তের চোদ্দ বছর হবে। তোমার?

লতা। ন' বছর। চার বছর বয়স থেকে দাদার কাছে পড়ছি; তিনি কত বই পড়িয়েছেন, কত গল্প বলেছেন; গাইতে বাজাতেও শিখিয়েছেন।

সুকু। আমি ভাই বড় একটা কিছু শিখতে পারি নি; কিছু কিছু ইংরিজী বাঙ্গালা পড়েছি।

লতা। আমিও ইংরিজী পড়েছি। আচ্ছা, তুমি এক কায কর, দাদার মত—দাদার মত যদিও পাবে না— এক জন পণ্ডিত মাইনে ক'রে কাছে রেখে দাও; সে তোমাকে পড়াতে শেখাবে, গল্প বলবে—

সুকু। বেশ বলেছ, লতা, আমি বাবাকে তাই বলব।

লতা। আর দেখ ভাই সুকু, আমি বোধ হয় এখানে থাকব না।

সুকু। কোথা যাবে?

লতা। বড়দার সঙ্গে চন্দননগরে; তার পর আমি একটু বড় হ'লে কলকাতায় মেয়েস্কুলে ভর্ত্তি হব।

সুকু। তুমি সকলকে ছেড়ে একা সেখানে থাক্‌তে পার্‌বে?

লতা। কি করব ভাই? লেখা-পড়া ত শিখতে হবে। দাদার ইচ্ছা, আমি স্কুলে পড়ি, তুমিও কেন সুকু, কলকাতায় থেকে স্কুলে পড় না?

সুকু। আমার ত তাই ইচ্ছা করে, কিন্তু বাবা আমাকে ছেড়ে দিতে রাজী হন না। আমি কি বার বার তাঁকে বলতে পারি? তিনি নিশ্চয়ই আমার চেয়ে ভাল বোঝেন।

লতা। আচ্ছা, চল দেখি তাঁর কাছে; তুমি না বলতে পার, আমি বলব।

সুকু। না ভাই, বোলো না; তিনি হয় ত মনে করবেন, আমি তোমাকে শিখিয়ে দিয়েছি।

লতা। মনে করলেই বা; আমরা বাপ-দাদার কাছে আব্দার করব না ত কার কাছে আব্দার করব?

বলিয়া লতা উঠিল এবং উদ্যানের যে অংশে বসিয়া পশুপতি প্রভৃতি বাক্যালাপ করিতেছিলেন, সেই অংশে দ্রুতপদে আসিয়া কহিল, "জ্যেঠামশাই!"

"কি মা?"

"আমি একটা কথা বলব, রাগ করবেন না?"

"মা'র উপর কি রাগ করতে পারি?"

অমরনাথের পানে চাহিয়া লতা কহিল, "দাদা, আমি বলি?"

"তুমি কি বলবে, তা ত আমার জানা নেই।"

"এই সুকুর কথা। তার পড়াশুনা করবার খুব ইচ্ছে, কিন্তু-

পশুপতি। কিন্তু কি মা?

লতা। কিন্তু ঘ'টে উঠছে না।

পশু। যাতে ঘটে, তুমি সেই রকম ব্যবস্থা কর।

লতা। আপনি তাতে রাজী হবেন জ্যেঠামশাই ?

পশু। আমি কি মায়ের ব্যবস্থা ঠেলতে পারি ?

লতা আরও দুই পা অগ্রসর হইয়া কহিল, "সুকুর জন্যে বাড়ীতে এক জন বিদ্বান্ দেখে মাষ্টার রেখে দেবেন; সুকুকে সব কথা বুঝিয়ে দেবে। লজ্জাবতী পাতাতে হাত দিলে কেন যে সে কুঁচকে যায়, তা-ও সুকু জানে না।"

পশু। তুমি জান, মা ?

লতা। জানি বই কি—কুঁচকে যাওয়া যে তার স্বভাব।

পশু। বাঃ, তুমি ত সব জান দেখছি। আচ্ছা, আমি সুকুর জন্যে একটা খুব বিদ্বান্ দেখে মাষ্টার রেখে দেব।

লতা। তার পর আমি যখন বড় হয়ে মহাকালী পাঠশালায় পড়ব, তখন সুকুও কলকাতায় থেকে পড়বে।

পশু। আগে তুমি বড় হও মা, তার পর সে কথা।

লতা। বড় হ'তে আমার আর বেশী দেরী নেই।

পশু। সত্যি না কি! আমি এ খবরটা জানতাম না মা—তুমি কবে বড় হবে ?

লতা। দাদা যখন বলবেন, আমি বড় হয়েছি, তখন আমি কলকাতায় পড়তে চ'লে যাব।

পশু। তুমি এখন কি পড়, মা ?

লতা। রামায়ণ শেষ হয়েছে, মহাভারতও শেষ হয়ে এল। ইংরাজী বেশী পড়ি নি—দু'খানা বই সবে শেষ হয়েছে।

পশুপতিনাথ বিস্মিত হইয়া অমরের পানে চাহিলেন। অমর কহিলেন, "আমি ওকে বেশী পড়তে দিই না একটু চেপে রাখি। ওর ইচ্ছে, দিন রাত পড়ে; পাছে শরীর খারাপ হয়, তাই গান-বাজনার দিকে ঝোঁকটা ঠেলে দিয়েছি।"

পশু। তুমি গাইতে পার, মা ?

লতা। দাদার কাছে একটু একটু শিখেছি।

পশু। আচ্ছা, একটা গান কর দেখি, মা।

লতা তাহার দাদার পানে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হারমোনিয়মটা আন্‌তে বলব, দাদা ?"

"অত বড় যন্ত্রটা এখানে আনা সুবিধে হবে না; তুমি বেহালাটা আন, তুমি না পার, আমি বাজাব।"

লতা ছুটিয়া গিয়া বেহালাটা আনিল। বেহালাটা দাদার হাতে দিয়া আবার ছুটিল। যেখানে বসিয়া সুকুমার লজ্জাবতীর লজ্জা পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিতেছিল, সেখানে আসিয়া লতা রুদ্ধশ্বাসে কহিল, "ভাই, আমি গান করব, তুমি শীগ্‌গির এস।"

সুকু উঠিল। দুই জনে হাত ধরাধরি করিয়া আসিতে লাগিল। পথ চলিতে চলিতে সুকু জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার গান গাইতে লজ্জা করবে না, লতা ?"

লতা। গান গাইতে লজ্জা কি ? তা হ'লে পড়া দিতেও লজ্জা হবে ?

সুকু। না, তা কেন ?

লতা। আমি দাদার কাছে শুনেছি, ভাল কায করতে লজ্জা করা ঠিক নয়। ঠাকুর-দেবতার নাম করব, তাতে আবার লজ্জা কি ?

সুকু। কি জানি ভাই, আমার কেমন লজ্জা করে—বাবার সাম্‌নে আমি কখন গাইতে পারি নে।

লতা। ও মা, সে কি! বাপের সাম্‌নে লজ্জা! আমার ত ভাই, দাদাকে একটুও লজ্জা করে না।

উভয়ে আসিয়া পৌঁছিল। লোহার বেঞ্চ কয়েকখানা ছিল, তাহার একখানাতে লতা বসিয়া পাশে সুকুকে বসাইল। অমর কহিলেন, "বেহালা বাজাতে পারবি, লতি ?"

লতা। বেশ যা হোক; আমি বাজাতে পারব কি না, তোমার চেয়ে আমি ভাল জানি না কি ?

অম। তুই কোন্ গানটা গাইবি, বল্ দেখি ?

লতা। মোর মোহন রে—

অম। আচ্ছা, তুই গা, আমি বাজাই।

লতা গান ধরিল—

"মোর মোহন রে।

নীল আকাশ-তলে, নীল সাগর-জলে,

নীল কমল ঐ ফুটেছে রে।

দিবানিশি বাঁশীর গানে, ডাক মোরে প্রাণে প্রাণে,

সব মোর ধ্যানে জ্ঞানে ভাসিছে রে।

সুন্দর নীল তনু, করেতে মোহন বেণু,

নয়নে ফুলধনু শোভিছে রে।

সব দৃশ্যে সব ধ্যানে, কে ফুটেছে সব খানে,

কে আমার মনঃ-প্রাণে জাগিছে রে।

সে যে মাতা, সে যে পিতা, সে যে বন্ধু পরিত্রাতা,
সে আমার প্রাণদাতা প্রাণরঞ্জন রে।
আমি ভুলে যাই তারে, সে কভু ভুলে না মোরে,
বিরহ-ব্যাকুল স্বরে ডাকিছে রে।
মনে হয় সব ফেলে, ছুটি ওই চরণতলে,
মনঃ-প্রাণ সঁপে দি ওই চরণে রে॥"

গান শেষ হইলে পশুপতিনাথ লতাকে কাছে ডাকিয়া কোলে বসাইলেন.; কহিলেন, "মা, তুমি আমাকে বড় আনন্দ দিলে—তুমি সুখী হও। আর একটা গান গাইবে, মা?"

"এবার সুকু একটা গান করুক, জ্যেঠামশাই।"

"তুমি গান জান, সুকু?"

সুকু ঘাড় হেঁট করিয়া কহিল, "জানি।"

"বটে! আচ্ছা, গাও দেখি।"

সুকু সলজ্জভাবে গান ধরিল—

"তোমার করুণা যেন দীনদয়াল ভুলি না কখন,
বিপদে-সম্পদে প্রভু তোমায় করি যেন স্মরণ।
তুমি মুখেতে আহার দিতেছ তুলিয়া,
তুমি ক্লান্তিতে সুপ্তি দিতেছ আনিয়া,
কিসে মোর ভাল হয় দয়াল ভাবিতেছ অনুক্ষণ,
না চাহিলেও তুমি করিছ নিত্য দান ওগো দীনশরণ॥"

পশুপতি বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "আমি ত জানতাম না সুকু, তুমি গাইতে পার—বেশ গেয়েছ।"

লতা কহিল, "আমার চেয়ে ভাল, না জ্যেঠামশাই?"

পশু। তোমার চেয়ে ভাল নয়।

লতা। কিন্তু আমার গলার চেয়ে সুকুর গলা মিষ্টি।

অমরনাথ কহিলেন, "তোমার কি সুকু ব'লে ডাকা উচিত, লতা?"

লতা। না, উচিত নয়; কি ব'লে ডাকব দাদা?

অম। কি ব'লে ডাকা উচিত তোমার মনে হয়?

লতা। দাদা—সুকু দাদা—কেমন?

অম। হাঁ।

লতা আবার গান করিল, সুকুও করিল। ক্রমে রাত্রি বাড়িল; তখন সকলে আহার করিতে উঠিয়া গেলেন।

[ক্রমশঃ।

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

নিদাঘে

গৃহ-কুট্টিম-জাত নিদাঘেরি দহনে
বিবশ তনু যে আনমনা,
দূর,—বহু দূরাগত—বীণা অনুরণনে
অন্তরে জাগিল চেতনা।

তন্ত্রী-সনাথ বীণা-ঝঙ্কারে মধুরে
বেহাগ রাগিণী ভেসে আসে,
নর্ত্তিত হিয়া মোর—ধায় কোন সুদূরে
রহে সদা কোন্ নিদিধ্যাসে?

তেয়াগি' কক্ষ, মন্দু উপবনে—বাহিরে
শ্রান্ত-চরণ ধীরে চলে—
গন্ধ-মোদিত চারু মলয়জ সমীরে
নিমেঘ নীলাকাশ-তলে।

চন্দ্র-ময়ূখ-কর-পরশিত এ হিয়া
চাহে কোন্ মর্ম্ম-সখায়?
ব্যবধান! ব্যবধান!—বহুদূর ব্যাপিয়া—
তাই প্রাণ কাঁদে নিরাশায়!

পুষ্পামোদিত ভূমি অতস-প্রবাহিত
অতন্দ্র দুটি মোর আঁখি,
সুপ্তা ধরণী, শুধু চন্দ্র অতন্দ্রিত—
আর জাগে নীড়হারা পাখী।

সেথা কি বহে না বায়ু মলয়জ-শীতল,
পুষ্প হাসে না সেথা সুখে?
ফিরে না কি অলিকুল চুম্বিতে কমল—
ব্যথা কি বাজে না সেই বুকে?

সেথা কি গাহে না পিক—অকুল-শাখেতে,
কৌমুদী ঢালে না কি বিধু?
ফুটে না কি পঙ্কজ লাক্ষারি রাগেতে
বিতরিয়া সৌরভ-সীধু?

সেথা কি নাচে না শিখী—প্রসারিত কলাপে
নিরখি' নব-নীল বারিদে?
বাজে না কি বাঁশী সেথা—বাগেশ্রী-আলাপে
যাচে না চাতকী—? "দে—বারি দে!"

বাহিরে,—চন্দ্র-কর-প্লাবিত এ দেহ
অন্তর ভরা সিতিমায়,
ক্রন্দিছে যারে স্মরি—এ অন্তর গেহ—
সে হিয়া কি কাঁদে না ব্যথায়?

হে অনুপ! সুন্দর! বৃথা সকলি আজি—
বাড়ে দাহ—গন্ধানুলেপে,
হৃদয়-তটিনী চলে—অভিসারিণী সাজি'
সিন্ধু-সকাশে—কেঁপে কেঁপে!

শ্রীমতী বীণাপাণি রায়।

প্রকৃতি

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

চন্দ্র

চন্দ্র-কিরণ-স্নাতা ধরিত্রীর অপূর্ব্ব শ্রীদর্শনে মন অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-রসে আপ্লুত হয়। পূর্ণিমা-রজনীতে চন্দ্রের শোভা অতুলনীয় বলিয়া চন্দ্রের রূপবর্ণনা বহু কবির অমর কাব্যে স্থান পাইয়াছে। চন্দ্রের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ বৈজ্ঞানিক ভাবাবেগ সংযত করিয়া চন্দ্রের প্রকৃত পরিচয় অবগত হইতে সচেষ্ট হইলেন; বৈজ্ঞানিকের জীবনব্যাপী গবেষণার ফলে চন্দ্র-সম্বন্ধীয় বহুবিধ তথ্য আবিষ্কৃত হইতে লাগিল। চন্দ্র অপেক্ষা আকারে বহু কোটি গুণ বৃহৎ, স্বীয় আলোকে ভাস্বর, কোটি কোটি জ্যোতিষ্ক আকাশে অবস্থান করিতেছে, কিন্তু পৃথিবীবাসী জীবদিগের নিকট চন্দ্রের তুলনায় ইহাদিগের উপযোগিতা অকিঞ্চিৎকর। বিধির অলঙ্ঘ্য বিধানে যদি সূর্য্য, চন্দ্র ও পৃথিবী ব্যতীত অপর সকল জ্যোতিষ্কের এক-কালীন ধ্বংস হয়, তাহা হইলে আমরা কোন বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইব না; নিশীথে নক্ষত্রখচিত নভোমণ্ডলের সৌন্দর্য্য কিয়ৎপরিমাণে হ্রাস

১ নং চিত্র—চন্দ্র ও পৃথিবীর তুলনামূলক আকার

হইবে মাত্র। কিন্তু চন্দ্রের তিরোধানে পৃথিবীব্যাপী এক মহা চাঞ্চল্যের প্রবল স্রোত প্রবাহিত হইবে। অন্যান্য জ্যোতিষ্ক অপেক্ষা চন্দ্র পৃথিবীর অধিকতর নিকটে অবস্থিত; দূরত্বের অল্পতাই চন্দ্রের এরূপ প্রাধান্যের প্রকৃত কারণ। পৃথিবী হইতে চন্দ্রের দূরত্ব মাত্র ২ লক্ষ ৩৮ সহস্র ৮ শত ৪০ মাইল। পৃথিবীর এত নিকটে অন্য কোন স্থায়ী জ্যোতিষ্ক আগমন করে না; কাযেই চন্দ্রের পৃষ্ঠভাগ অন্যান্য গ্রহের পৃষ্ঠভাগ অপেক্ষা আমাদের নিকট অধিকতর পরিচিত। চন্দ্র ও পৃথিবীর তুলনামূলক আকার চিত্রে অঙ্কিত হইল (চিত্র নং ১)। চন্দ্রের প্রকৃত ব্যাস ২ হাজার ১৬৩ মাইল; অর্থাৎ চন্দ্রের ব্যাস অপেক্ষা পৃথিবীর ব্যাস ৪ গুণ অধিক দীর্ঘ। চন্দ্রের সমগ্র পৃষ্ঠভাগ পৃথিবীপৃষ্ঠের এক-চতুর্দ্দশাংশ অর্থাৎ উত্তর ও দক্ষিণ-আমেরিকা যে পরিমাণ স্থান অধিকার করিয়া আছে, প্রায় সেই পরিমাণ চন্দ্র কর্ত্তৃক অধিকৃত। অন্যান্য গ্রহের তুলনায় তাহাদিগের উপগ্রহের আকার অপেক্ষা পৃথিবীর তুলনায় চন্দ্র বহু গুণে বৃহৎ। সুতরাং পৃথিবী ও চন্দ্র দূর হইতে দুইটি স্বতন্ত্র গ্রহরূপে পরিলক্ষিত হয়; চন্দ্র যে পৃথিবীর উপগ্রহ, ইহা তাহাদিগের পরস্পরের আকার হইতে বোধগম্য হয় না। শুক্রগ্রহ যখন পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে অবস্থান

করে, তখন পৃথিবী শুক্রগ্রহাপেক্ষা দ্বিগুণ উজ্জ্বল গ্রহরূপে এবং পৃথিবীর অগ্রে ও পশ্চাতে দোলায়মান, উজ্জ্বলতায় সিরিয়স্ নক্ষত্রের সমতুল্য চন্দ্র, শুক্রগ্রহের অধিবাসীদিগের নিকট প্রতীয়মান হইতে থাকে। *

৪৯টি চন্দ্র একত্রে আয়তনে পৃথিবীর সমকক্ষ। পৃথিবী হইতে চন্দ্রের দূরত্ব অল্প হইলেও, চন্দ্রের সঠিক ওজন নিরূপণ করা সহজসাধ্য নহে। বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিয়াছেন যে, ৮১টি চন্দ্র একত্রে পৃথিবীর ওজনের সমতুল্য। চন্দ্রের আপেক্ষিক গুরুতা ৩·৪ অর্থাৎ চন্দ্র সমপরিমাণ জল অপেক্ষা প্রায় সাড়ে ৩ গুণ অধিক ভারী। পৃথিবীর আপেক্ষিক গুরুতা ৫·৫৮। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, চন্দ্র যদি পৃথিবী হইতেই সৃষ্ট হইয়া থাকে, তবে ইহার আপেক্ষিক গুরুতা পৃথিবীর আপেক্ষিক গুরুতা হইতে এত অল্প কিরূপে সম্ভবপর? ইহার উত্তরে বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে, পৃথিবীপৃষ্ঠের প্রস্তরস্তরাদির আপেক্ষিক গুরুতা কিঞ্চিৎ অধিক ৩·৪; সুতরাং পৃথিবীর বহিরাবরণ হইতে চন্দ্র বিচ্ছিন্ন হওয়ায়, ইহার আপেক্ষিক গুরুতা স্বভাবতঃই অল্প হইবে। বৈজ্ঞানিকগণ ইহাও স্থির করিয়াছেন যে, পৃথিবীর ৬ মণ ওজনের কোন বস্তু চন্দ্রপৃষ্ঠে ওজন করিলে, ওজন হ্রাস হইয়া মাত্র ১ মণে পরিণত হইবে; কারণ, চন্দ্রের আকর্ষণ করিবার ক্ষমতা অপেক্ষা পৃথিবীর আকর্ষণ করিবার ক্ষমতা ৬ গুণ অধিক। এই কারণেই পৃথিবীর আগ্নেয় গহ্বর হইতে প্রস্তরাদি যত দূর ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হয়, তাহা অপেক্ষা বহু ঊর্দ্ধে চন্দ্রের আগ্নেয় গহ্বর হইতে প্রস্তরাদি উৎক্ষিপ্ত হয়।

অর্থাৎ ঐ সময়ে চন্দ্র পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। যদি শূন্যপথে সূর্য্যকে পৃথিবী প্রদক্ষিণ না করিত, তাহা হইলে প্রতি ২৭ দিন, ৭ ঘণ্টা, ৪৩ মিনিট, সাড়ে ১১ সেকেণ্ড অন্তর অমাবস্যা তিথির আবির্ভাব হইত। কিন্তু চন্দ্র পৃথিবীকে প্রদক্ষিণকালীন পৃথিবী স্থির হইয়া শূন্যে অবস্থান করে না; ইহা সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণিত হয়। সুতরাং অমাবস্যা তিথির পরে পুনরায় অমাবস্যা তিথি লাগিতে চন্দ্রকে আরও একটু অগ্রসর হইতে হয় এবং ফলে দুইটি অমাবস্যা তিথির মধ্যে ব্যবধান ২৯ দিন, ১২ ঘণ্টা ৪৪ মিনিট, [illegible] সেকেণ্ড; এই সময় চান্দ্রমাস নামে অভিহিত।

বিভিন্ন তিথিতে চন্দ্রের বিভিন্ন আকারপ্রাপ্তি হইয়া থাকে; অমাবস্যা তিথিতে চন্দ্র অদৃশ্য হইয়া যায়; কয়েক দিন পরে সূর্য্যাস্তের কিয়ৎক্ষণ পরে ক্ষীণ চন্দ্র পশ্চিম আকাশে দৃষ্টিপথে পতিত হয় এবং অল্পক্ষণ পরেই অস্ত যায়। ইহার আকার ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং অপেক্ষাকৃত বিলম্বে অস্তাচলে গমন করে। সপ্তমী তিথিতে চন্দ্রপৃষ্ঠের অর্দ্ধাংশ দৃষ্টিগোচর হয় এবং চতুর্দ্দশ অথবা পঞ্চদশ দিবসে পূর্ণিমা তিথিতে পূর্ণচন্দ্র আকাশে অবস্থান করে। পরদিবস চন্দ্রের পশ্চিম প্রান্ত অল্প ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; ক্রমেই ক্ষয়ের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং দ্বাবিংশতি দিবসে চন্দ্র পুনরায় অর্দ্ধাকারে পরিলক্ষিত হয় এবং প্রায় অষ্টবিংশতি দিবসে সূর্য্যের এত নিকটে আগমন করে যে, কিছু দিনের জন্য অদৃশ্য হইয়া যায় এবং পূর্ব্বের মত পুনরায় পশ্চিম আকাশে
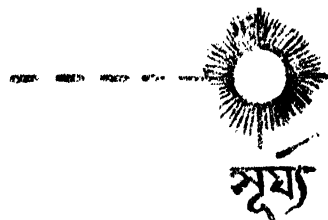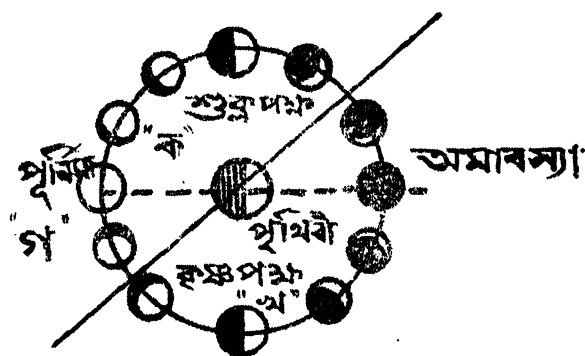
২নং চিত্র—সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে চন্দ্রের পরিভ্রমণ ও পৃথিবী হইতে চন্দ্রের বিভিন্ন কলা

চন্দ্রের উদয় ও অস্ত অবশ্য পৃথিবীর চক্রাকারে ঘূর্ণনের ফলে সংঘটিত হয়। কিন্তু চন্দ্রের যে প্রকৃত গতি আছে, ইহা একটু লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। সাধারণতঃ বলা যাইতে পারে যে, নক্ষত্রগণ আকাশে স্থির হইয়া আছে; চন্দ্র গতিহীন হইলে চতুষ্পার্শ্বস্থ নক্ষত্র হইতে ইহার দূরত্বের পরিবর্ত্তন কখনও হইত না। যে কোন তিথিতে রাত্রিকালে চন্দ্র যদি একটি নির্দ্দিষ্ট নক্ষত্রের নিকটে অবস্থান করে, তাহা হইলে পরের রজনীতে চন্দ্রকে পূর্ব্বোক্ত নক্ষত্র হইতে দূরে, পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইতে দেখা যায়। একটি নির্দ্দিষ্ট নক্ষত্র হইতে যাত্রা করিয়া পুনরায় সেই নক্ষত্রের নিকট আগমন করিতে চন্দ্রের ২৭ দিন, ৭ ঘণ্টা, ৪৩ মিনিট, সাড়ে ১১ সেকেণ্ড সময় লাগে;

ক্ষীণ আকারে উদিত হয় (চিত্র নং ২) চন্দ্রের এরূপ পরিবর্ত্তনের প্রধান কারণ চন্দ্রের নিজস্ব আলোক নাই; সূর্য্য হইতে আলোক চন্দ্রে পতিত হইয়া প্রতিফলিত হইতে থাকে এবং ফলে চন্দ্রকে উজ্জ্বল দেখায়, পূর্ণিমা রজনীতে চন্দ্রের জ্যোতি দেখিয়া সহজে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না যে, চন্দ্রের নিজের আলোক নাই। কিন্তু দিবাভাগে দৃষ্ট চন্দ্রের সহিত সূর্য্যালোকে উদ্ভাসিত মেঘখণ্ডের তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, চন্দ্র অপেক্ষা মেঘখণ্ড অধিকতর উজ্জ্বল। কাজেই সূর্য্যালোকে উদ্ভাসিত চন্দ্রপৃষ্ঠের যে অংশ আমাদিগের অভিমুখে অবস্থান করে, মাত্র সেই অংশ আমরা দেখিতে পাই। অমাবস্যা তিথিতে সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যে চন্দ্র আগমন করে; ফলে চন্দ্রের অন্ধকার পৃষ্ঠ আমাদিগের অভিমুখে অবস্থান করায় আমরা চন্দ্রকে দেখিতে পাই না। পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্র ও সূর্য্যের মধ্যে পৃথিবী অবস্থান করে;

---

* Prof Young.

সে সময় সূর্য্যালোক সমগ্র চন্দ্রপৃষ্ঠ আলোকিত করে; ফলে আমরা পূর্ণ চন্দ্র দেখিতে পাই। অনেকে মনে করিতে পারেন যে, পূর্ণিমায় চন্দ্র ও সূর্য্যের মধ্যে পৃথিবী অবস্থান করায় সূর্য্য-রশ্মি কিরূপে চন্দ্র-পৃষ্ঠে পতিত হইবে? পৃথিবী প্রতিবন্ধক হইবে না কি? ইহার উত্তর যে সমতলে চন্দ্র পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে, পৃথিবী সেই সমতলে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে না। পৃথিবী ও চন্দ্রের গতির বিচ্ছিন্ন সমতলদ্বয় একটি সরল রেখা দ্বারা বিভক্ত; এই সরল রেখা চন্দ্র-কক্ষকে দুইটি বৃত্তার্দ্ধে বিভক্ত করিয়াছে (চিত্র নং ২)। এখন চন্দ্রের কক্ষ যদি উর্দ্ধে অল্পমাত্রায় উত্থিত হয়, তাহা হইলে উপরিস্থ বৃত্তার্দ্ধ (ক চিহ্নিত) কাগজের সমতল হইতে অল্প উপরে এবং অপর বৃত্তার্দ্ধ (খ চিহ্নিত) অল্প নিম্নে অবস্থান করিবে। সুতরাং পূর্ণিমায় চিত্রে (গ চিহ্নিত) নির্দ্দিষ্ট স্থানে চন্দ্র আগমন করিলে, সূর্য্য ও পৃথিবীর সংযোগকারী রেখা হইতে উর্দ্ধে চন্দ্র নিশ্চিতই অবস্থান করিবে। ফলে, সূর্য্যরশ্মি পৃথিবীর উপর দিয়া চন্দ্রপৃষ্ঠে সহজেই আসিতে পারায় চন্দ্রের পূর্ণাবয়ব আমরা দেখিতে পাই। অমাবস্যা তিথিতে পৃথিবী ও সূর্য্যের সংযোগকারী রেখার নিম্নে চন্দ্র অবস্থান করিবে। চন্দ্রলোক হইতে চন্দ্রের ন্যায় পৃথিবীরও বিভিন্ন কলা দৃষ্টিগোচর হয়। অমাবস্যার পূর্ব্বে বা পরে
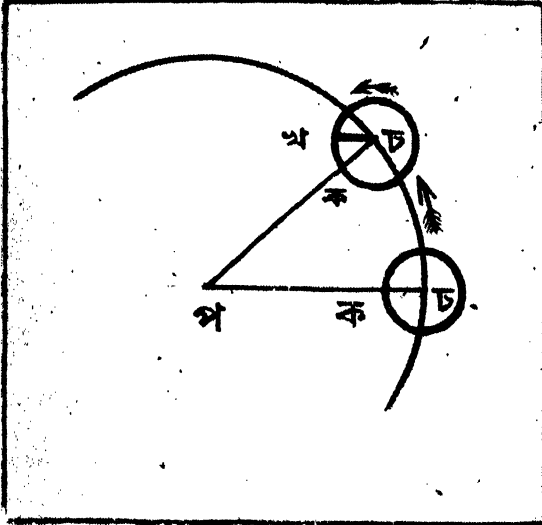
৩নং চিত্র

যখন ক্ষীণ চন্দ্র আকাশে উদিত হয়, সেই সময়ে চন্দ্র হইতে পৃথিবীর পূর্ণাবয়ব দেখিতে পাওয়া যাইবে এবং পৃথিবীর আলোকে চন্দ্রলোকের রজনী উদ্ভাসিত হইবে চন্দ্র আমাদিগকে যে পরিমাণ আলোক প্রদান করে, তাহা অপেক্ষা ১৩ গুণ অধিক আলোক পৃথিবী চন্দ্রকে প্রদান করে; পৃথিবী হইতে প্রতিফলিত আলোক চন্দ্রে পতিত হওয়ায় ক্ষীণচন্দ্রের মধ্যে চন্দ্রের অবশিষ্ট অবয়ব অস্পষ্ট লোহিতাভবর্ণে রঞ্জিত হইয়া আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হয়।

অন্যান্য গ্রহ ও উপগ্রহাদির ন্যায় চন্দ্রের অন্য এক প্রকার গতি অর্থাৎ চক্রাকার গতি আছে। কিন্তু চন্দ্রপৃষ্ঠের চিহ্নাদির স্থান পরিবর্ত্তিত না হওয়ায় বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিয়াছেন যে, চন্দ্রের মাত্র অর্দ্ধ-গোলক পৃথিবীর অভিমুখে সর্ব্বদা অবস্থিত; চন্দ্রের অপরার্দ্ধ আমাদিগের বিপরীত দিকে অবস্থান করায় আমাদিগের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত রহিয়াছে। চন্দ্র যেন একটি দণ্ডের এক প্রান্তে অবস্থান করিতেছে এবং সেই দণ্ডের অপর প্রান্ত পৃথিবীর কেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণিত হইতেছে; ফলে চন্দ্রের অর্দ্ধগোলক আমাদিগের সম্মুখে অবস্থিত। অনেকের ধারণা, চন্দ্রের চক্রাকার গতি নাই; কারণ, চন্দ্রের অর্দ্ধগোলক কখনও দৃষ্টিগোচর হয় না। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, পূর্ব্বোক্ত ধারণা সঠিক নহে। পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতে চন্দ্রের যে সময় লাগে, সেই সময়ে চন্দ্র চক্রাকারে একবার ঘূর্ণিত হয়; ফলে চন্দ্রের অর্দ্ধাংশ পৃথিবীর অভিমুখে আগমন করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয় না। চিত্র-সাহায্যে এই বিষয়টি অধিকতর পরিস্ফুট করিতে পারা যায়। "গ" চিহ্নিত স্থান (চিত্র নং ৩) পৃথিবী কর্ত্তৃক অধিকৃত এবং আপন কক্ষে পরিভ্রমণ করিবার সময় চন্দ্র "চ" ও "চ" চিহ্নিত স্থানে যথাক্রমে উপনীত হয়। চন্দ্র যখন "চ" চিহ্নিত স্থানে অবস্থান করে, তখন চন্দ্রের ব্যাসার্দ্ধ "চক" পৃথিবীর অভিমুখে অবস্থিত এবং চন্দ্র পৃষ্ঠের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান "ক" কর্ত্তৃক অধিকৃত। চন্দ্র যদি চক্রাকারে ঘূর্ণিত না হইত, তাহা হইলে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিবার সময় "চ" চিহ্নিত স্থানে আগমনকালীন "চক" রেখা নিশ্চিতই সমান্তরালে অবস্থিত হইত, অর্থাৎ "চখ" রূপে অবস্থান করিত। কিন্তু চন্দ্র প্রথম স্থানে অবস্থানকালীন "ক" চিহ্নিত স্থানের কোন দৃশ্য, চন্দ্রের দ্বিতীয় স্থানে অবস্থানকালে "ক" চিহ্নিত স্থানে পৃথিবী হইতে দূরবীক্ষণ যন্ত্রসাহায্যে দৃষ্টিগোচর হয়। সুতরাং যে সময়ে চন্দ্র "চ" হইতে "চ" স্থানে, "চ প চ" কোণ অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইয়াছে, সেই সময়ে চন্দ্রের ব্যাসার্দ্ধ "চক" নিশ্চিতই "খ চ ক" কোণ অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু খ চ ক কোণ = চ প চ কোণ; অতএব চন্দ্র যেরূপ গতিতে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে, সেই পরিমাণ গতিতে চন্দ্র চক্রাকারে ঘূর্ণিত হয়; ফলে চন্দ্রের অর্দ্ধাংশ আমাদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা। *

প্রকৃতপক্ষে চন্দ্রকক্ষের দোলন-ফলে চন্দ্রপৃষ্ঠের কিঞ্চি-অধিক অর্দ্ধাংশ আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হয়। এই দোলন তিন প্রকার। চন্দ্র বৃত্তাভাসিক কক্ষে পৃথিবীকে আবেষ্টন করিতেছে; সুতরাং চন্দ্রকক্ষের যে স্থানদ্বয় পৃথিবী হইতে সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে এবং সর্ব্বাপেক্ষা দূরে অবস্থিত, সেই দুইটি স্থানে চন্দ্র আগমন করিলে ইহার গতিবেগের যথাক্রমে বৃদ্ধি ও হ্রাস হইয়া থাকে; কিন্তু মেরুদণ্ডের চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণিত হওয়া কালীন চন্দ্রের গতিবেগের হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় না; সুতরাং প্রথম ক্ষেত্রে চন্দ্রের পশ্চিম প্রান্তের ৭ ডিগ্রী ৫৩ মিনিট পরিমাণ স্থান এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পূর্ব্ব প্রান্তের ৭ ডিগ্রী ৫৩ মিনিট পরিমাণ স্থান আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হয় এবং এইরূপে অজ্ঞাত চন্দ্রপৃষ্ঠের দ্বাদশাংশের পরিচয় আমরা লাভ করিয়া থাকি।

চন্দ্রের বিষুব রেখা ও চন্দ্রকক্ষ বিভিন্ন সমতলে অবস্থিত; অর্থাৎ চন্দ্রের মেরুদণ্ড চন্দ্র-কক্ষের সমতলের উপর দণ্ডায়মান হইয়া যে সন্নিহিত কোণদ্বয় সৃষ্ট করে, তাহারা সকল সময়ে পরস্পরের সমান হয় না; ফলে কোন সময় চন্দ্রের উত্তর-মেরুর অপর পার্শ্বস্থ কিয়ৎপরিমাণ স্থান এবং কোন সময় চন্দ্রের দক্ষিণ-মেরুর অপর পার্শ্বস্থ কিয়ৎপরিমাণ স্থান আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এইরূপ দোলনফলে অজ্ঞাত চন্দ্রপৃষ্ঠের ৩ অংশের পরিচয় আমরা প্রাপ্ত হই। চন্দ্রোদয় ও চন্দ্রাস্তকালে পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে চন্দ্রের যথাক্রমে পশ্চিম ও পূর্ব্ব প্রান্তের বিপরীত পার্শ্বস্থ অল্পপরিমাণ স্থান আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হয়। চন্দ্রকক্ষের উপরি-উক্ত তিন প্রকার দোলনফলে পৃথিবীর বিপরীত দিকে অবস্থিত চন্দ্রপৃষ্ঠের কিয়দংশের পরিচয়লাভে আমরা সমর্থ হই।

তুষার-ধবল চন্দ্রপৃষ্ঠে কতিপয় কৃষ্ণ ও ধূসর বর্ণের চিহ্ন আমাদিগের নয়নসমক্ষে প্রতিভাত হইতে থাকে; ইহারাই সাধারণের নিকট চন্দ্রলোকে "বুড়ীর চরকায় সূতা কাটা" বা "চন্দ্রকলঙ্ক" বা অন্য কোন নামে পরিচিত। ইহাদিগের যথার্থ পরিচয় অবগত হইতে হইলে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য লইতে হয়। দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা গ্যালিলিও

* Ball

সর্ব্বপ্রথম দেখিতে পান যে, পৃথিবীর ন্যায় চন্দ্রলোকেও অভ্রভেদী পর্ব্বতমালা, ভয়াবহ আগ্নেয় গহ্বর, মনোরম উপত্যকা ইত্যাদি অবস্থান করিতেছে; চন্দ্রপৃষ্ঠস্থ পর্ব্বত, গহ্বর ইত্যাদি পৃথিবী হইতে বহু দূরে অবস্থিত বলিয়া চর্ম্মচক্ষুতে মাত্র কয়েকটি চিহ্নরূপেই পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু দূরবীক্ষণ সাহায্যে প্রত্যেক পর্ব্বত, উপত্যকা ইত্যাদি সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায় এবং বহু বৈজ্ঞানিকের জীবনব্যাপী গবেষণার ফলে চন্দ্রের মানচিত্র অঙ্কন করা সম্ভবপর হইয়াছে (চিত্র নং ৪)। বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে ল্যান্‌গ্রেনস্ (Langrenus) সর্ব্বপ্রথম চন্দ্রের প্রাকৃতিক ভূগোল অবগত হইবার জন্য সারা জীবন পরিশ্রম করেন এবং চন্দ্রের বিভিন্ন পর্ব্বত ও গুহাকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করেন। ১৬৫১ খৃঃ অঃ রিসলি (Riccioli) এবং ১৬৯২ খৃঃ অঃ ক্যাসিনি (Cassini) পূর্ণচন্দ্রের মানচিত্র অঙ্কন করেন।
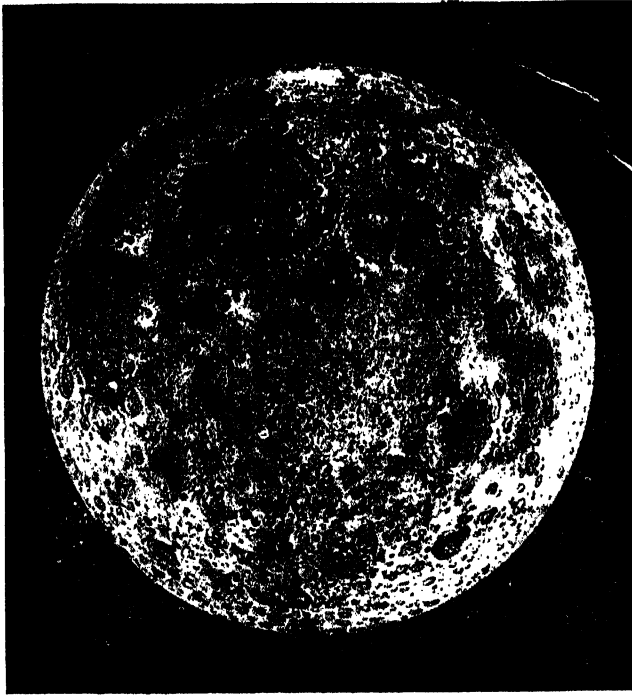
৪নং চিত্র—চন্দ্রের মানচিত্র

তৎপরে শ্রয়টার (Schrooter), বিয়ার (Beer), ম্যাডলার (Madler) এবং এথেন্সবাসী স্মিট্ (Schmidt), প্রত্যেকেই স্বীয় পর্য্যবেক্ষণ অবলম্বনে চন্দ্রের বিভিন্ন মানচিত্র প্রণয়ন করেন। স্মিটের অঙ্কিত চন্দ্রের ব্যাসের দৈর্ঘ্য ৭ ফুট এবং ইহা ১৮৭৮ খৃঃ অঃ জার্ম্মাণী হইতে প্রকাশিত হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে লিক ও প্যারিস মানমন্দির হইতে গৃহীত আলোকচিত্র অবলম্বনে চন্দ্রের দুইটি মানচিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। উপরে লিখিত চন্দ্রের মানচিত্রগুলির মূল্যাধিক্যের জন্য সাধারণের পক্ষে ক্রয় করা সম্ভবপর নহে; কিন্তু চন্দ্রের মানচিত্রের বহু ক্ষুদ্র সংস্করণ মুদ্রিত হইয়া স্বল্পমূল্যে বিক্রীত হইতেছে: শিক্ষার্থিগণ অনায়াসে তাহা ক্রয় করিতে পারেন। পৃথিবীর অভিমুখে অবস্থিত চন্দ্রপৃষ্ঠের স্থূল বিষয়গুলি চিত্রে প্রদর্শিত হইল (চিত্র নং ৪)। একটি ক্ষুদ্র দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা চন্দ্রপৃষ্ঠ অবলোকন করিয়া উপরি-উক্ত চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। চন্দ্রের উত্তর ভাগ চিত্রে নিম্নভাগে এবং দক্ষিণ ভাগ চিত্রে উপরিভাগে অবস্থিত; কারণ, জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত কর্তৃক ব্যবহৃত দূরবীক্ষণ যন্ত্রে প্রত্যেক বস্তু বিপরীতমুখী হইয়া দৃষ্টিগোচর হয়। পূর্ণিমা-রজনীতে চন্দ্রপৃষ্ঠে দৃষ্ট কৃষ্ণবর্ণের অপেক্ষাকৃত সমতল চিহ্নাদি চিত্রে পরিলক্ষিত হইতেছে। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারের পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিকগণ কর্তৃক, ইহারা বিভিন্ন সমুদ্র বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারের পর, চন্দ্রসম্বন্ধীয় বহুবিধ তথ্য আবিষ্কৃত হওয়া কালীন, চন্দ্রপৃষ্ঠে বিন্দুমাত্র জলের সন্ধান না পাইয়া বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিলেন যে, চন্দ্রে কোন প্রকৃত সমুদ্র থাকিতে পারে না। এই তথাকথিত সমুদ্রদিগের মধ্যে দুইটি—উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত বিপদ-সাগর (Mare Crisium) ও দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত রস-সাগর (Mare Humorum) অপর সাগর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একক অবস্থান করে। কিন্তু চন্দ্রপৃষ্ঠের অন্যান্য তথাকথিত সমুদ্র, পৃথিবীস্থ সমুদ্রাদির ন্যায় পরস্পরের সহিত সংযুক্ত। ঈষৎ ধূম্রবর্ণের তথাকথিত মহাসমুদ্রগুলি চন্দ্রপৃষ্ঠের বিস্তর স্থান অধিকার করিয়া আছে: ইহাদিগের মধ্যে পূর্ব্বদিকে অবস্থিত তুফান-মহাসমুদ্র (Oceanus) Procellarum) প্রধান। উত্তর-পূর্ব্বে বৃষ্টি-সাগর (Mare Imbrium) ও বিপদসাগর অবস্থিত। চন্দ্রপৃষ্ঠের মধ্যভাগে বাষ্পসাগর (Mare Vaporum) অবস্থান করে; ইহার সন্নিকটে প্রশান্তসাগর (Mare Tranquillitatis) ও নির্ম্মল সাগর (Mare Serenitatis) অবস্থান করিতেছে। চন্দ্রের দক্ষিণ-পশ্চিমে উত্তর-সাগর (Mare Foecunditatis) দক্ষিণপূর্ব্বে মেঘ-সাগর (Mare Nubium) ও রস-সাগর (Mare Frigoris) অবস্থিত। উপরি-উক্ত তথাকথিত সাগরগুলি শুষ্ক ভূমিখণ্ড মাত্র, ইহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। চন্দ্রের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা ইহাদিগের পৃষ্ঠভাগ সমতল হইলেও সমুদ্র-পৃষ্ঠের ন্যায় নহে; দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইহাদিগের মধ্যে ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু পর্ব্বত ও আগ্নেয় গহ্বর অবস্থান করিতেছে। নির্ম্মল-সাগরের উত্তর হইতে দক্ষিণে বক্রাকারে বিস্তৃত পর্ব্বতমালা সাধারণ দূরবীক্ষণ সাহায্যেও দৃষ্টিগোচর হয়। স্থানে স্থানে ইহার উচ্চতা ৮ শত ফুট্। তথাকথিত সমুদ্রসম্বন্ধীয় আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহাদের চতুর্দ্দিকে অবস্থিত আগ্নেয় গহ্বরের বৃত্তাকার মুখপ্রদেশের সমুদ্রতীরবর্ত্তী প্রাচীরগাত্র ভগ্নাবস্থায় দৃষ্টিগোচর হয়; ইহা হইতে অনেকে অনুমান করেন যে, চন্দ্রপৃষ্ঠের প্রাচীন প্রকৃত সমুদ্রগুলি শুষ্ক হওয়ায় উপরি-উক্ত সমতল ভূ-খণ্ড সৃষ্ট হয় নাই; পরন্তু চন্দ্রের আভ্যন্তরিক কোন চাঞ্চল্যফলে প্রভূত গলিত প্রস্তরাদি রন্ধ্রমুখ দিয়া নিঃশব্দে উপরে আগমন করিয়াছিল এবং ফলে প্রাচীরগাত্র ভগ্ন ও প্রাচীন ক্ষুদ্র বৃহৎ পর্ব্বতাদি আবৃত হওয়ায় অসমতল স্থানগুলি অধুনা সমতল বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। সহস্রাধিক মাইল বিস্তৃত গিরিশ্রেণী চন্দ্রে বিরল। হিমালয় পর্ব্বতের ন্যায় বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত পর্ব্বত চন্দ্রলোকে দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে পৃথিবীর পর্ব্বতের সহিত চন্দ্রের পর্ব্বতের সৌসাদৃশ্য আছে। চন্দ্রের পর্ব্বতের উচ্চতা ও আগ্নেয় গহ্বরের গভীরতা তাহাদিগের ছায়া হইতে স্থিরীকৃত হয়। চন্দ্রলোকের অধিকাংশ পর্ব্বতাদির নামকরণ পৃথিবীর বিভিন্ন পর্ব্বতের নামানুসারে হইয়াছে; মাত্র কয়েকটি জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতদিগের নামে পরিচিত। চন্দ্রমধ্যস্থ প্রধান প্রধান পর্ব্বতাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে লিখিত হইল। বৃষ্টি-সাগরের দক্ষিণ

তীরে চন্দ্রের উত্তরপশ্চিম হইতে দক্ষিণ-পূর্ব পর্য্যন্ত অ্যাপেনাইন পর্ব্বত-মালা প্রসারিত। ইহার দৈর্ঘ্য কিঞ্চিৎ অধিক ৪ শত মাইল; উচ্চতা ১৮ সহস্র ফুট। শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথিতে ইহার দৃশ্য অতীব সুন্দর (৫ নং চিত্র)। ইহার নিকটে ৪টি আগ্নেয় গহ্বর—হ্যাডলে, ব্র্যাডলে, হিউজিন্স ও ইর‍্যাটোস্থিনিস অবস্থিত। 'ককেসস' ও 'আল্পস' পর্ব্বত-মালা আপেনাইন্ পর্ব্বতের নিকটে অবস্থিত (চিত্র নং ৫)। 'ককেসস' পর্ব্বতের উচ্চতা ১৮ সহস্র ৩ শত ফুট; ইহা নির্ম্মল-সাগরের উত্তরপূর্ব্ব তীরে অবস্থান করে; ইহার নিকটে ২টি আগ্নেয় গহ্বর লিনে (Linne) ও ক্যালিপসং (Calippus) দৃষ্টিগোচর হয়। বৃষ্টি-সাগরের উত্তর-পশ্চিম তীরে 'আল্পস' পর্ব্বত অবস্থিত; ইহার উচ্চতা ২১ সহস্র ৯ শত ফুট; প্রায় ৮০ মাইল দীর্ঘ একটি উপত্যকা 'আল্পস' পর্ব্বতের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়; প্রস্থে এই উপত্যকাটি কোথাও মাত্র ২ মাইল এবং কোথাও ৫ মাইল। উপত্যকার উভয় পার্শ্বে প্রাচীরের ন্যায় ঋজু পর্ব্বত দণ্ডায়মান। প্লেটো, আর্কিমেডিস্ ইত্যাদি আগ্নেয় গহ্বরগুলি আল্পস্ পর্ব্বতের নিকট অবস্থিত। তুফান-মহাসমুদ্রের পশ্চিমে 'কার্পেথিয়ান্' পর্ব্বত; উচ্চতা ৬ সহস্র ৪ শত ফুট; এই পর্ব্বতের নিকটে দুইটি আগ্নেয় গহ্বর—মেয়ার (Mayer) ও কোপার-নিকস্ (Copernicus) অবস্থিত। পাইরিনীজ (Pyrenees), কর্ডিলেরা, অল্টাই, রিফ ইত্যাদি আরও কয়েকটি পর্ব্বত চন্দ্রলোকে দৃষ্টিগোচর হয়। চন্দ্রলোকের সর্ব্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গগুলি 'লাইবনিজ' (Leibnitz) ডর্ফেল (Doerfel) পর্ব্বতে অবস্থিত।

চন্দ্রে পর্ব্বতবেষ্টিত বৃত্তাকার সমতল ভূমিখণ্ডের সংখ্যা এত অধিক যে, তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টি প্রথমেই আকৃষ্ট হয়। ইহারা সাধারণতঃ আগ্নেয় গহ্বর নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অধিকাংশ আগ্নেয় গহ্বরের মধ্যভাগে এক বা একাধিক পর্ব্বত অবস্থান করে। তথাকথিত প্রত্যেক আগ্নেয় গহ্বর দূরবীক্ষণ সাহায্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে; ইহাদিগের সংখ্যা প্রায় ৩৩ সহস্র। জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতদিগের নামানুসারে ইহাদের নাম-করণ করা হইয়াছে। ইহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গুরীয়ক আকারে—চন্দ্রের সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হইতেছে (চিত্র নং ৪)। ন্যাস্‌মিথ একটি সাধারণ আগ্নেয় গহ্বরের দৃশ্য অঙ্কন করিয়াছেন (চিত্র নং ৬)। এই বৃহৎ গহ্বরটির ব্যাস শতাধিক মাইল; গহ্বরমধ্যস্থ পর্ব্বতটির উচ্চতা সহস্রাধিক ফুট। গহ্বরটিকে বৃত্তাকারে বেষ্টন করিয়া যে পর্ব্বত রহিয়াছে, তাহার উচ্চতা কোথাও মাত্র ১ সহস্র ফুট এবং অপর কোন স্থানে ২০ সহস্র ফুট। বলা বাহুল্য, দূরবীক্ষণ সাহায্যে চন্দ্রের 'আগ্নেয়-গহ্বরের' দৃশ্য এত সুস্পষ্টভাবে দেখা সম্ভবপর নহে; কারণ, সর্ব্বোত্তম দূরবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে অবলোকন করিলেও চন্দ্র-পৃষ্ঠ পৃথিবী হইতে ২ শত ৫০ মাইল দূরে অবস্থিত চর্ম্ম-চক্ষুতে দৃষ্ট বস্তু অপেক্ষা অধিক স্পষ্টাকারে দেখা যাইতে পারে না। চন্দ্রমধ্যস্থ কয়েকটি প্রধান আগ্নেয় গহ্বরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত হইল। টোলিমস (Ptolemaus): চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতবেষ্টিত সমতল ক্ষেত্রটি চন্দ্রের মধ্যভাগ অধিকার করিয়া আছে; ইহার এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্য ১ শত ১৫ মাইল। 'পোসিডোনিয়স্' (Posidonius);—এই গহ্বরের ব্যাস ৬০ মাইল এবং ইহা ২ সহস্র ফুট গভীর। 'লিনে' (Linne),—নির্ম্মলসাগরমধ্যে ইহা অবস্থিত। প্রথমে ইহার ব্যাস ৬। মাইল স্থিরীকৃত হয়। ১৮৬৬ খৃঃ অঃ স্মিট (Schmidt) প্রচার করেন যে, ইহা অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। পরে একটি ক্ষুদ্র অগভীর গহ্বর দৃষ্টিগোচর হয়। ইহা হইতে অনেকে অনুমান করিলেন যে, চন্দ্রে নিত্য নূতন পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে। কিন্তু 'লিনে'র পূর্ব্বোক্ত পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে সকল বৈজ্ঞানিক একমত নহেন; চন্দ্রে বর্ত্তমান কালে কোন প্রকার চাঞ্চল্যের প্রকৃত প্রমাণ নাই। 'এ্যারিস্‌টটল' (Aristotle)—এই সুন্দর গহ্বরটির ব্যাস ৬০ মাইল; বেষ্টিত পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গের উচ্চতা প্রায় ১১ সহস্র ফুট। আর্কিমেডিস্ (Archimedis);—ইহার ব্যাস প্রায় ৫০ মাইল এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ পর্ব্বত বক্রাকারবিশিষ্ট। মধ্যভাগ অপেক্ষাকৃত

৫নং চিত্র—চন্দ্রে আপেনাইন, আল্পস্ ও ককেসস্ পর্ব্বতমালা

সমতল এবং সপ্তাংশে বিভক্ত। এ্যারিসটাইলস্ (Aristillus);—গহ্বরের গভীরতা ১০ সহস্র ফুট, প্রস্থে ইহা ৩৪ মাইল। প্লেটো (Plato);—ইহা এত বৃহৎ যে, ক্ষুদ্র দূরবীক্ষণ সাহায্যেও দৃষ্টিগোচর হয়; পূর্ব্বপ্রান্তের পর্ব্বতের গড়ে উচ্চতা প্রায় ৪ সহস্র ফুট, কিন্তু পশ্চিম প্রান্তের পর্ব্বতের গড়ে উচ্চতা অধিক নহে। এই গহ্বরটির ব্যাস ৬০ মাইল এবং ইহার মধ্যভাগে পর্ব্বতের পরিবর্ত্তে ৩১টি ক্ষুদ্র আগ্নেয় গহ্বর আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইর‍্যাটোস্থিনিস্ (Eratosthenes):—ইহা 'আপেনাইন' পর্ব্বতমালার এক প্রান্তে অবস্থিত; ইহার ব্যাস ৩৭ মাইল; অনুমান করা হয় যে, এই গহ্বর হইতে উত্থিত প্রস্তর কর্ত্তৃক অ্যাপেনাইনের অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গগুলি সৃষ্ট হইয়াছে। কোপারনিকস্ (Copernicus);- চন্দ্রমধ্যস্থ গহ্বরদিগের মধ্যে সৌন্দর্য্যে ইহা অদ্বিতীয়:—ব্যাস প্রায় ৬০ মাইল; পশ্চিম প্রান্তে বহু ক্ষুদ্র গহ্বর দৃষ্টিগোচর হয়, মধ্যস্থ পর্ব্বতটি বহু শৃঙ্গসমন্বিত, ইহাদিগের উচ্চতা ২ হাজার ৪ শত ফুট। পর্ব্বত-প্রাচীর বৃত্তাকারবিশিষ্ট নহে; পশ্চিম প্রান্তে ইহার উচ্চতা

প্রায় ১৫ সহস্র ফুট। 'কোপারনিকসের' মধ্য হইতে আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত হইতে থাকে।

কেপলার্ (Kepler) ;—গহ্বরের গভীরতা প্রায় ১০ সহস্র ফুট; পর্ব্বত-প্রাচীর অত্যুচ্চ। এ্যারিস্টার্কস্ (Aristarchus); চন্দ্র-মধ্যস্থ গহ্বরদিগের মধ্যে উজ্জ্বলতায় ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। গ্রিমালডি (Grimaldi); পরিধি ১৩ সহস্র বর্গমাইল। এই শ্রেণীর গহ্বরদিগের মধ্যে অনুজ্জ্বলতায় ইহা অদ্বিতীয়।

এটনা ইত্যাদি পৃথিবীর আগ্নেয় গহ্বরের উৎপত্তি যে কারণে হইয়াছে, চন্দ্রস্থ গহ্বরগুলি সেই একই কারণে উদ্ভূত হইয়াছে; তবে ইহা অনুমান মাত্র; প্রমাণ করা দুষ্কর।

চন্দ্রপৃষ্ঠের পূর্ব্বোক্ত বর্ণনা হইতে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, চন্দ্রলোকের বহু বিষয় আমরা অবগত; বাস্তবিক, আফ্রিকা মহাদেশের বহু স্থান আমাদিগের না জানা থাকিতে পারে, কিন্তু চন্দ্রলোকের ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেক ভূমিখণ্ডের বিষয় আমাদিগের জানা আছে। ইচ্ছা করিলে
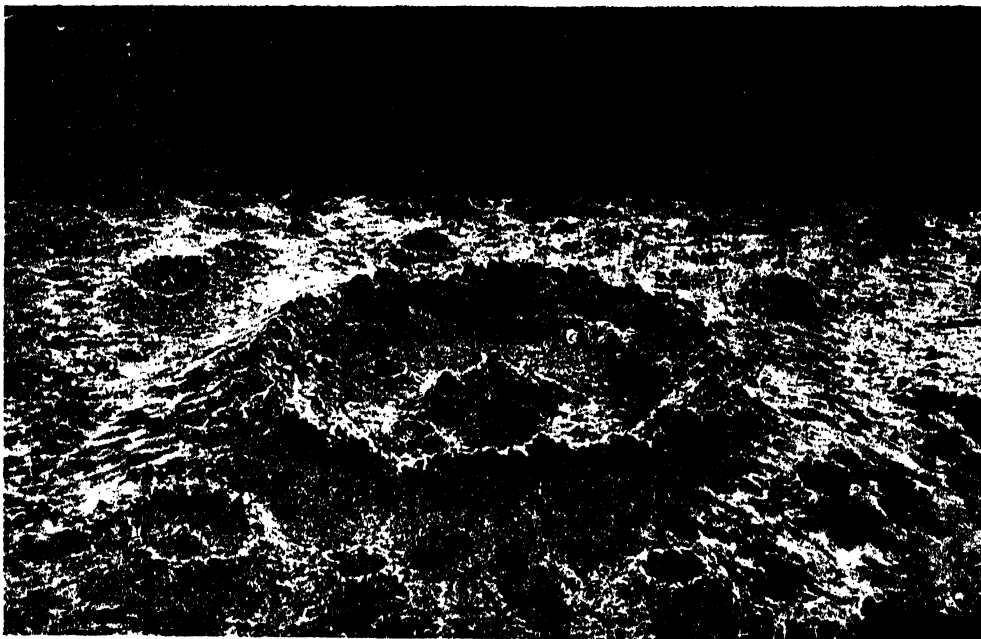
৬ নং চিত্র—চন্দ্র মধ্যে একটি সাধারণ আগ্নেয় গহ্বরের দৃশ্য (স্মাস্মিথ্)

ক্লেভিয়স্ (Clavius) ;—চন্দ্রের দক্ষিণ মেরুর নিকটে অবস্থিত। পরিধি ১৫ সহস্র ৫ শত বর্গমাইল; ব্যাস ১৪২ মাইল। ইহার মধ্যভাগে বহু ক্ষুদ্র গহ্বর দৃষ্টিগোচর হয়; মধ্যবর্ত্তী ও চতুষ্পার্শ্বস্থ পর্ব্বতে বহু শৃঙ্গ বিদ্যমান; একটি শৃঙ্গের উচ্চতা ২৭ সহস্র ফুট। সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত-কালীন ক্লেভিয়সের দৃশ্য অতীব সুন্দর।

টাইকো (Tycho) ;—দূরবীক্ষণ সাহায্যে পূর্ণচন্দ্র অবলোকন করিলে দক্ষিণ মেরুর নিকটে ইহা দৃষ্টিগোচর হয়; ইহার মধ্য ও চতুষ্পার্শ্ব হইতে প্রচুর পরিমাণে আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত হইতে থাকে। ইহার ব্যাস প্রায় ৬০ মাইল। গহ্বরের গভীরতা ১৭ সহস্র ফুট। গহ্বরমধ্যস্থ পর্ব্বতশৃঙ্গের উচ্চতা ৬ সহস্র ফুট। 'টাইকোতে' সূর্য্যোদয়কালে আলোকচ্ছটা অদৃশ্য থাকে, কিন্তু ইহার দিগন্ত বৃত্তের ৩০ ডিগ্রী উপরে সূর্য্য আগমন করিলে ক্ষীণ আলোকচ্ছটা নির্গত হইতে আরম্ভ করে এবং ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণিমা তিথিতে পূর্ণ মাত্রায় বিচ্ছুরিত হইতে থাকে। (চিত্র নং ৭) আলোকচ্ছটার দৈর্ঘ্য শত মাইল হইতে ৩ সহস্র মাইল; অত্যুচ্চ পর্ব্বত, গভীর গহ্বর, বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি ইত্যাদি ভেদ করিয়া আলোকচ্ছটা প্রসারিত। 'টাইকোর' ন্যায় 'কোপারনিকস্' ও 'কেপলার' হইতেও আলোকচ্ছটা বিকীর্ণ হইতে থাকে। আলোকচ্ছটার যথার্থ প্রকৃতি আমরা অবগত নহি এবং ইহার উৎপত্তিবিষয়ক বহু মতবাদ প্রচলিত। ভিন্নভিন্ন,

সকলেই তাহাদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পারেন। অবশ্য একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্র ও চন্দ্রের একখানি মানচিত্র প্রথমে সংগ্রহ করিতে হইবে। বিভিন্ন রজনীতে চন্দ্রপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থান সুন্দররূপে দেখিতে পাওয়া যায়, পূর্ণিমায় বিশেষ কিছু দেখা যায় না, কারণ, সে সময়ে অধিকাংশ গহ্বর ও গিরিশ্রেণী তীব্র আলোকচ্ছটার অন্তরালে অবস্থান করে। (চিত্র ৭নং)

কেপলারকৃত গ্রহাদিবিষয়ক নিয়ম অনুসারে চন্দ্র পৃথিবীর বৃত্তাভাসিক কক্ষে প্রদক্ষিণ করিবে এবং চন্দ্রকক্ষের একটি অক্ষে পৃথিবী অবস্থান করিবে। কিন্তু চন্দ্রের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, চন্দ্র-কক্ষ প্রকৃত বৃত্তাভাস নহে এবং কক্ষ-তল সর্ব্বদা স্থির থাকে না। অবশ্য চন্দ্র ও পৃথিবী উভয়ই সূর্য্য কর্ত্তৃক আকর্ষিত হয়; কিন্তু অমাবস্যা বা সমসাময়িক তিথিতে সূর্য্য হইতে পৃথিবীর দূরত্ব অপেক্ষা সূর্য্য হইতে চন্দ্রের দূরত্ব অল্প (চিত্র নং ২); সুতরাং সূর্য্যের অপেক্ষাকৃত নিকটে অবস্থানের জন্য সূর্য্য কর্ত্তৃক পৃথিবী যে পরিমাণ আকর্ষিত হয়, তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে চন্দ্র আকর্ষিত হওয়ায় পৃথিবী হইতে চন্দ্রের দূরত্ব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; এই কারণেই পূর্ণিমা বা সমসাময়িক তিথিতে পৃথিবী হইতে চন্দ্রের দূরত্ব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; সে সময়ে সূর্য্য হইতে চন্দ্রের দূরত্ব অপেক্ষা সূর্য্য হইতে পৃথিবীর দূরত্ব অল্প; কাজেই সূর্য্যের অপেক্ষাকৃত নিকটে অবস্থানের জন্য সূর্য্য কর্ত্তৃক চন্দ্র যে পরিমাণ আকর্ষিত হয়, তাহার

৭নং চিত্র—শুক্লা ত্রয়োদশীর চন্দ্র

অধিক পরিমাণে পৃথিবী আকর্ষিত হয়; শুক্ল বা কৃষ্ণ পক্ষের সপ্তমী তিথি পর্য্যন্ত সূর্য্য হইতে পৃথিবী ও চন্দ্র উভয়েই প্রায় সমদূরে অবস্থিত বলিয়া সূর্য্য কর্ত্তৃক সমবেগে আকর্ষিত হওয়ায় চন্দ্র হইতে পৃথিবীর দূরত্বের হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় না। ইহা হইতে আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি যে, চন্দ্রকক্ষের আকারবৃদ্ধির মূল কারণ সূর্য্যাকর্ষণ। পৃথিবী-কক্ষের যে বিন্দু সূর্য্যের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে অবস্থিত, সেই বিন্দুতে পৃথিবী আগমন করিলে সূর্য্য হইতে পৃথিবী ও চন্দ্র, উভয়ের দূরত্ব হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং ফলে পৃথিবী ও চন্দ্রের উপর সূর্য্যের আধিপত্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং পৃথিবী হইতে চন্দ্র অপেক্ষাকৃত অধিক দূরে অবস্থান করে। সুতরাং পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণকালীন বৎসরের বিভিন্ন আকার প্রাপ্ত হয়।

৮নং চিত্রে "ব ব।" যেন নভোমণ্ডলের বিষুবরেখা (celestial equator) অর্থাৎ এমন একটি মহাবৃত্ত, যাহা পৃথিবীস্থ বিষুবরেখার সমতলের নভোমণ্ডল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায় সৃষ্ট হইয়াছে; এবং 'ক খ গ ঘ' যেন অয়ন বৃত্ত (Ecliptic) অর্থাৎ নভোমণ্ডল পর্য্যন্ত পরিবর্দ্ধিত ভূ-কক্ষ-তল। চন্দ্রকক্ষ প্রথমে "চ" বিন্দুতে ৫ ডিগ্রি কোণে অয়নবৃত্তের সহিত মিলিত হইয়াছে এবং পরে, নভোমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়া অয়নবৃত্তের সহিত পূর্ব্বোক্ত "চ" বিন্দুতে মিলিত হয় নাই; পরন্তু "চ" বিন্দুতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। সুতরাং চন্দ্রকক্ষ অত্যন্ত জটিল। ইহা অয়নবৃত্তের উভয় পার্শ্বে ৫ ডিগ্রী ৯ মিনিট স্থানের মধ্যে পেঁচান আকারে বিস্তৃত। পূর্ব্বোক্ত যে দুইটি বিন্দুতে অয়নবৃত্তের সহিত চন্দ্র-কক্ষ আসিয়া মিলিত হইয়াছে, সেই বিন্দুদ্বয় অর্থাৎ "চ" ও "চ" চন্দ্র-কক্ষের বিশিষ্ট বিন্দু (Node) নামে পরিচিত। চন্দ্র-কক্ষের চাঞ্চল্যফলে অয়ন-বৃত্তের উপর অবস্থিত বিশিষ্ট বিন্দুও সর্ব্বদাই স্থান পরিবর্ত্তন করে। সুতরাং, চন্দ্র যে দিকে ভ্রমণ করিতেছে, তাহার বিপরীত দিকে "চ" বিন্দু সমভাবে অয়নবৃত্তের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। অয়নবৃত্তের চতুর্দ্দিকে একবার পরিভ্রমণ করিয়া আসিতে "চ" বিন্দুর কিঞ্চিৎ-অধিক ১৮ বৎসর সময় লাগে।

অয়নবৃত্তের উপরিস্থ পূর্ব্বোক্ত বিশিষ্ট বিন্দুর নিকটে পূর্ণচন্দ্র আগমন করিলে চন্দ্রগ্রহণ হইয়া থাকে, কারণ, সে সময়ে পৃথিবী হইতে পতিত ছায়ার মধ্য দিয়া চন্দ্রকে যাইতে হয় এবং ফলে কিছু সময়ের জন্য চন্দ্র অদৃশ্য হইয়া যায়। নিম্নলিখিত চিত্র সাহায্যে এই বিষয়টি সহজেই বোধগম্য হইবে (চিত্র নং ৯)। "স" চিহ্নিত বৃত্ত সূর্য্য; "প" ও "চ" চিহ্নিত বৃত্তদ্বয় যথাক্রমে পৃথিবী ও চন্দ্র। সূর্য্য ও পৃথিবীর এক শ্রেণীর সাধারণ স্পর্শ-জ্যা-দ্বয় (common tangent) "ক গ" ও "ক খ" "গ" বিন্দুতে মিলিত হইয়াছে, "খ গ থ" স্থান পূর্ণচ্ছায়া (umbra) নামে অভিহিত হয় অর্থাৎ পৃথিবী প্রতিবন্ধক হওয়ায় কিছুমাত্র সূর্য্যরশ্মি এই স্থানের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না এবং ফলে স্থানটি ঘন তমসাবৃত 'খ গ ঘ' ও 'খ গ ঘ' স্থান ঈষচ্ছায়া' নামে পরিচিত অর্থাৎ সূর্য্যরশ্মির কতকাংশ এই স্থানের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না এবং ফলে স্থানটি আলো-ছায়ামিশ্রিত। পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ-কালীন 'খ গ ঘ' স্থানে প্রবেশ করিলে চন্দ্রের কতকাংশ অদৃশ্য হইয়া যায় এবং 'খ গ' রেখা অতিক্রম করিবার সময় পৃথিবী হইতে আংশিক চন্দ্রগ্রহণ দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু "খ গ ঘ"

৮নং চিত্র
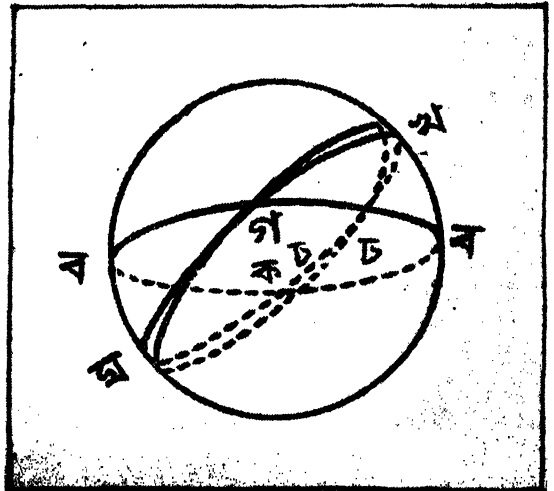
ায়ানের মধ্যে পূর্ণচন্দ্র সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ করিলে সর্ব্বগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ হইয়া থাকে। সাধারণতঃ পূর্ণচন্দ্র পৃথিবীর ছায়াকে স্পর্শ না করিয়া উত্তর বা দক্ষিণদিক দিয়া অগ্রসর হয় এবং ফলে চন্দ্রগ্রহণ হয় না।

বর্ত্তমান বৎসরের পাঞ্জিকায় দেখা যায় যে, ৩২শে জ্যৈষ্ঠ ও ২২শে অগ্রহায়ণ এই দুই তারিখে চন্দ্রগ্রহণ হইবে। জ্যোতির্ব্বিদ কর্ত্তৃক ভবিষ্যদ্বাণী করা কিরূপে সম্ভবপর হইল? প্রতিবৎসর এক সময় চন্দ্রগ্রহণ হয় না; অথচ পূর্ব্ব হইতে তাঁহারা কিরূপে জানিতে পারেন? ইহার উত্তর:—বৈজ্ঞানিকগণ বহু প্রাচীনকাল হইতে চন্দ্রের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিতেছেন; সুতরাং এখন চন্দ্রের গতির সহিত তাঁহারা সম্যক্‌রূপে পরিচিত অর্থাৎ অধুনা কিরূপ গতিতে চন্দ্র স্বীয় কক্ষে পরিভ্রমণ করিতেছে বা ভবিষ্যতে কিরূপ গতিতে পরিভ্রমণ করিবে, তাহা সঠিকরূপে অবগত আছেন; কাযেই গণনা করিয়া অনায়াসে তাঁহারা ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারেন। এ স্থলে গণনার প্রক্রিয়া বিশদভাবে লিখিত হইতে পারে না; তবে সাধারণভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে। পূর্ণিমা তিথিতে যদি চন্দ্র স্বীয় কক্ষের বিশিষ্ট বিন্দুর (Node) উপর আগমন করে,

যে, প্রতি ১৮ বৎসর ১১ দিন অন্তর প্রত্যেক গ্রহণের পুনরাবির্ভাব হইয়া থাকে। এই হিসাবে ১৩১৬ সালের ২১শে জ্যৈষ্ঠ সর্ব্বগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ হওয়া উচিত। কারণ, ১৩১৬ + ১৮ = ১৩৩৪ সালের ২১ + ১১ = ৩২ এ জ্যৈষ্ঠ সর্ব্বগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ হইতেছে; বাস্তবিক ঐ সময়ে চন্দ্র-গ্রহণ হইয়াছিল, ঐ সালের পঞ্জিকা হইতে আমরা অবগত হই। সকল ক্ষেত্রে, এই নিয়ম অবশ্য প্রযুজ্য নহে; নিয়মের ব্যতিক্রম হইতেও দেখা যায়। ১৮ বৎসর ১১ দিন পরে কোন কোন আংশিক চন্দ্র-গ্রহণের পুনরাবির্ভাব না হইতে পারে অথবা ১৮ বৎসর ১১ দিন পূর্ব্বে কোন চন্দ্র-গ্রহণ না হইলেও অধুনা চন্দ্র-গ্রহণ হইতে পারে; এই জন্যই বর্ত্তমান বৎসরের ২২এ অগ্রহায়ণের ১৮ বৎসর ১১ দিন পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৩১৬ সালের ১১ই অগ্রহায়ণ কোন চন্দ্র গ্রহণ হয় নাই। সূক্ষ্ম গণনা সাহায্যে অবশ্য সঠিক রূপে বলিতে পারা যায়, কবে কোন্ গ্রহণের পুনরাবির্ভাব হইবে বা হইবে না।

সর্ব্বগ্রাস চন্দ্র-গ্রহণ অপেক্ষা সূর্য্য-গ্রহণ চিত্তাকর্ষণে অধিকতর সমর্থ। গ্রহণকালীন যখন পৃথিবীর ছায়ার মধ্যে পূর্ণ চন্দ্র অবস্থান করে, তখনও ইহা অদৃশ্য না হইয়া ক্ষীণ তাম্রবর্ণে রঞ্জিত হইয়া দৃষ্টি-
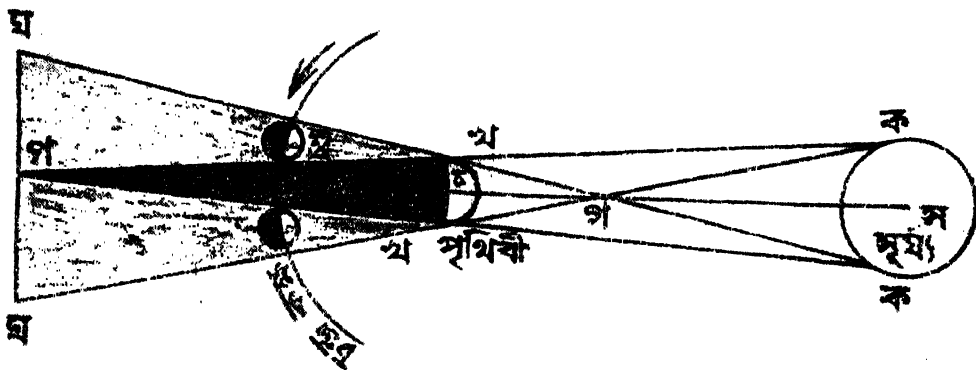
৯নং চিত্র—সর্ব্বগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ

তাহা হইলে পুনরায় বিশিষ্ট বিন্দু সূর্য্য হইতে ১৮০ ডিগ্রী কোণ দূরে অবস্থিত হইবে। প্রতি ১৮ বৎসর ১১ দিন অন্তর চন্দ্রের বিশিষ্ট বিন্দু স্বস্থানে প্রত্যাগমন করে, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে; এখন ঐ বিশিষ্ট বিন্দুর পশ্চাদ্গতি থাকার জন্য সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে একবার ঘূর্ণিত হইতে এক বৎসরের কম সময় অর্থাৎ প্রায় সাড়ে ৪৬ দিন লাগে; সুতরাং প্রথম চন্দ্রগ্রহণের ১৮ বৎসর ১১ দিনের পরে বিশিষ্ট বিন্দু সূর্য্যকে পূর্ণ ১৯বার প্রদক্ষিণ করিয়া পুনরায় সূর্য্য হইতে ১৮০ ডিগ্রী কোণ দূরে অবস্থিত হইবে। প্রায় ১৮ বৎসর ১১ দিনে ২ শত ২৩টি চান্দ্রমাস (lunation) হইয়া থাকে, ইহা আমরা জানি। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ১৮ বৎসর ১১ দিন পরে চন্দ্রের বিশিষ্ট বিন্দু স্বস্থানে প্রত্যাগমনকালীন পূর্ণিমা তিথির আবির্ভাব হয় ও ফলে সর্ব্বগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ হইয়া থাকে। পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্র-কক্ষের বিশিষ্ট বিন্দুর উপরে চন্দ্র অবস্থান না করিয়া সন্নিহিত কোন স্থানে অবস্থান করিলেও চন্দ্রগ্রহণ হইয়া থাকে এবং ১৮ বৎসর ১১ দিন পরে পুনরায় ঐরূপ গ্রহণের পুনরাবির্ভাব হইয়া থাকে। সুতরাং সাধারণতঃ বলা যাইতে পারে

গোচর হয়। ইহার কারণ—যে সকল সূর্য্য-রশ্মি পৃথিবীর নিকট দিয়া গমন করে, তাহার দিক্ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল কর্ত্তৃক পরিবর্ত্তন হওয়ায় ছায়ার মধ্যে বক্রাকারে তাহারা প্রবিষ্ট হয় ও চন্দ্র-পৃষ্ঠ পূর্ব্বোক্ত বর্ণে রঞ্জিত করে।

কবি সমুদ্রপৃষ্ঠের উত্থান ও পতনের সহিত নিদ্রিত যুবতীর বক্ষস্পন্দনের তুলনা করিলেন; বৈজ্ঞানিক সমুদ্রবক্ষ-স্পন্দনের নাম রাখিলেন জোয়ার-ভাটা। জোয়ারের সময় বর্দ্ধিত জল-রাশি মহা কল্লোলে অগ্রসর হইয়া তটভূমি প্লাবিত করিয়া দেয়, এবং ভাটার সময় সিক্ত ভূমি পরিত্যাগ করিয়া স্বস্থানে প্রত্যাগমন করে। সাধারণতঃ প্রতি ২৪ ঘণ্টা ৫১ মিনিট অন্তর জোয়ারের পুনরাবির্ভাব হইয়া থাকে। চন্দ্রের সহিত জোয়ার-ভাটার যে নিকট সম্বন্ধ আছে, ইহা নিউটনকৃত মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম আবিষ্কারের বহু পূর্ব্বেই স্থির হইয়াছিল। নিউটন প্রচার করিলেন যে, জগতের প্রত্যেক বস্তু অপর বস্তু কর্ত্তৃক একটি বিশিষ্ট নিয়ম অনুসারে আকর্ষিত হইতেছে; মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম, "জড় পদার্থদ্বয় তত্ত্বস্তুর পরিমাণানুসারে এবং তাহাদের দূরতার বর্গবিপর্য্যয়ে পরস্পরের

অভিমুখে সরল পথে আকর্ষিত হয়।" এখন চন্দ্রাভিমুখে পৃথিবী আকর্ষিত হইলেও পৃথিবীর সকল স্থান সম-বেগে আকর্ষিত হয় না। পৃথিবীর যে পরিমাণ স্থান চন্দ্রের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে অবস্থান করে, তথায় আকর্ষণের মাত্রা অপেক্ষাকৃত অধিক হওয়ায় সমুদ্রস্থিত জলরাশি স্ফীত হইতে থাকে এবং আমরা বলি জোয়ার আসিতেছে। কেবলমাত্র সেই স্থানেই যে তখন জোয়ার, তাহা নহে; পৃথিবীর বিপরীত পার্শ্বস্থ সমুদ্রপৃষ্ঠেও সেই সময়ে জোয়ার হয়, কারণ, চন্দ্র কর্ত্তৃক আকর্ষিত হওয়ায় জলভাগের স্থায় স্থলভাগও স্ফীত হইতে থাকে এবং বিপরীত পার্শ্বস্থ তরল জলরাশি অপেক্ষা দৃঢ় স্থল ভাগ অপেক্ষাকৃত নিকটে অবস্থান করায় চন্দ্র কর্ত্তৃক অধিকতর বেগে আকর্ষিত হয় এবং বিপরীত পার্শ্বস্থ জলরাশি পশ্চাতে পরিত্যক্ত হইয়া জোয়ার সৃষ্টি করিয়া থাকে। কাযেই আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, চন্দ্রের সহিত সমরেখায় অবস্থিত পৃথিবীর বিপরীত পার্শ্বস্থ স্থানে জোয়ার ও অন্যান্য স্থানে ভাটা হয় (চিত্র নং ১০)। দৈনিক আবর্ত্তনের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইয়াও পূর্ণ জোয়ার সৃষ্ট করে, কিন্তু শুক্ল বা কৃষ্ণ পক্ষের সপ্তমী তিথিতে সূর্য্য চন্দ্রের সহিত সমকোণে অবস্থান করায় চন্দ্রাকর্ষণের পরিমাণ সূর্য্যাকর্ষণ দ্বারা অল্পমাত্রায় হ্রাস প্রাপ্ত হওয়ায় সমুদ্র হইতে জলরাশি তাদৃশ উর্দ্ধে উত্থিত হয় না এবং ফলে মন্দ জোয়ার হইয়া থাকে (চিত্র নং ১০)। জোয়ারভাটার জন্যই সমুদ্রপৃষ্ঠে তরঙ্গপ্রবাহ সঞ্চারিত হয় এবং সমুদ্র হইতে উত্থিত প্রবাহ নদীমধ্যে প্রবেশ করে; কাযেই কলিকাতার ন্যায় সমুদ্রসন্নিহিত স্থানে নদীগর্ভেও জোয়ার-ভাটা হইয়া থাকে। বৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করেন যে, জোয়ার ভাটার জন্য পৃথিবীর দৈনিক আবর্ত্তনগতির হ্রাস হওয়ায় দিন ক্রমশঃই বড় হইতেছে। চন্দ্র পৃথিবী হইতে ক্রমশঃ দূরে চলিয়া যাইতেছে, ইহাও জোয়ারভাটার অন্যতম পরিণাম।

মনুষ্যাদি প্রাণিগণ বা তরুলতাদি উদ্ভিদবর্গ চন্দ্রমণ্ডলে আছে কি নাই, এই প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে উদিত হয়। যদি চন্দ্রমণ্ডলের উদ্ভিদমাত্রেই সংরক্ষ হয় এবং প্রাণিমাত্রেই অতিকায় জন্তুর তুল্য
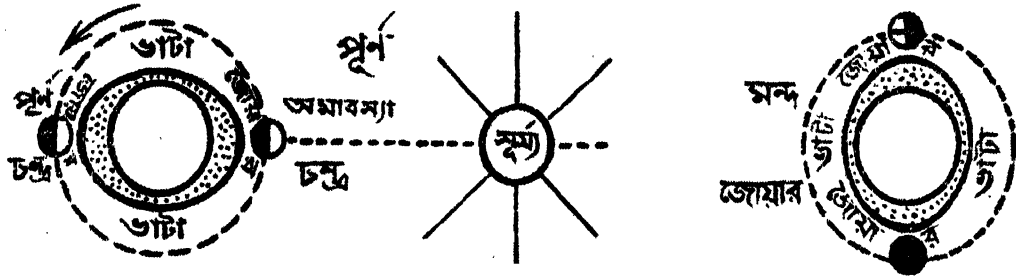
১০নং চিত্র—সমুদ্রে জোয়ার-ভাটা

চন্দ্রাভিমুখে অবস্থান করায় প্রত্যেক বিভিন্ন স্থানে প্রতি দিন দুই বার জোয়ারভাটা হয়, চন্দ্রের ন্যায় পৃথিবীর একই পৃষ্ঠভাগ যদি চন্দ্রাভিমুখে অবস্থিত হইত, তাহা হইলে পৃথিবী পৃষ্ঠের প্রত্যেক স্থান বিভিন্ন সময়ে চন্দ্র কর্ত্তৃক বিভিন্ন বেগে আকর্ষিত হইত না এবং ফলে যে স্থানে জোয়ার, তথায় চিরকাল জোয়ার এবং যে স্থানে ভাটা তথায় চিরকালই ভাটা হইয়া থাকিত। অবশ্য সূর্য্য কর্ত্তৃক পৃথিবী আকর্ষিত হওয়ায় যে জোয়ারভাটা হয় না, তাহা নহে; কিন্তু পৃথিবী হইতে সূর্য্য বহু দূরে অবস্থিত বলিয়া জোয়ারভাটার পরিমাণ অত্যন্ত অল্প। জোয়ার দুই প্রকার;—পূর্ণ জোয়ার ও মন্দ জোয়ার। প্রতি মাসে অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে পূর্ণ জোয়ার হইয়া থাকে, কেন না, সে সময়ে সূর্য্য, চন্দ্র ও পৃথিবী সম রেখায় অবস্থিত থাকায় সূর্য্যাকর্ষণ চন্দ্রাকর্ষণের সহিত যুক্ত বৃহদাকার বিশিষ্ট হয়, তাহা হইলেও ধরাপৃষ্ঠ হইতে, সর্ব্বোৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণযন্ত্র সাহায্যেও তাহাদিগকে দেখা সম্ভবপর নহে। তবে জল ও বায়ু ব্যতীত কোন প্রাণী বা তরু জীবিত থাকিতে পারে না এবং এই দুই অত্যাবশ্যকীয় বস্তুর চন্দ্রমণ্ডলে অবস্থান করার বিশেষ কোন প্রমাণ না পাওয়ায় বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিয়াছেন যে, অন্ততঃ পৃথিবীস্থ প্রাণী বা তরুর ন্যায় কোন প্রাণী বা তরু চন্দ্রমণ্ডলে নাই। সম্প্রতি কয়েক জন রুস বৈজ্ঞানিক চন্দ্রমণ্ডলে যাইবার উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন; ভবিষ্যতে তাঁহাদিগের প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইলে চন্দ্রমণ্ডলের রহস্যদ্বার উদ্ঘাটিত হইবে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীশিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

লুৎফ-উল্লা

প্রথম পরিচ্ছেদ

কুজার বন্ধু

এক প্রহর বেলায় রৌদ্রে বসিয়া লুৎফ-উল্লা তামাক টানিতে টানিতে আপন মনে বিড় বিড় করিয়া বকিতেছিল। আর তামাকের মালিক কাবুলী মেওয়াওয়ালা গোলামদীন প্রত্যাশী কুকুরের মত তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। লুৎফ-উল্লার হাতে হুঁকার নল গেলে বড় সহজে আর কেহ পাইত না বলিয়া গোলামদীন বেচারা অতি করুণভাবে একবার লুৎফ-উল্লা শাহ ফকিরের দিকে আর একবার কলিকার দিকে চাহিতেছিল।

লুৎফ-উল্লা বলিতেছিল, "এমন রাজার রাজ্য থাকার চাইতে যাওয়া ভাল। আজ তিন দিন সহরে না আছে দুধ, না আছে রাবড়ী, মৌতাতী লোক বাঁচে কিসে, সে দিকে রাজার নজর নেই।"

গোলামদীন অত্যন্ত কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কলকেটায় আর কিছু আছে ভাই?" সে কথা কানে না তুলিয়াই লুৎফ-উল্লা বলিয়া গেল, "এমন বাদশাহী আমিও করতে পারি, বাবা; আমার কাছে মহম্মদ শাহও যে, নাদির শাহও সেই। ভিজে শোলা চুষে চুষে গলার ভেতরটা চিংড়ী মাছের মত তিড়িং তিড়িং ক'রে লাফাচ্ছে।"

গোলামদীন অতি দীনভাবে বলিল, "নলচেটায় আগুন ধ'রে গেল যে, ভাই!"

এইবারে লুৎফ-উল্লা চটিল, সে বলিয়া উঠিল, "বেটা ছোটলোক সুদখোর কাবুলী কি না, তোর দোকানে ব'সে তোর শটকায় তামাক খাচ্ছি, এটা তোর বাবার ভাগ্যি।"

অভিসম্পাতের ভয়ে গোলামদীন শিহরিয়া উঠিল বটে, কিন্তু হুঁকার নলটা লুৎফ-উল্লার হাতেই রহিয়া গেল। এমন সময়ে অতি মোলায়েম মিহি আওয়াজে পিছন হইতে কে ডাকিল, "বন্দেগী শাহ সাহেব।" আওয়াজ শুনিয়া কান খাড়া করিয়া গোলামদীন তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু লুৎফ-উল্লা একটা অশ্রাব্য কটু গালি দিয়া বলিয়া উঠিল, "কে রে হারামজাদী—বেরো এখান থেকে!"

রমণী সহজে হটিবার পাত্রী নহে, সে নানা ছন্দে বিনাইয়া বিনাইয়া নিজের কাহিনী শুনাইতে আরম্ভ করিল। তাহার খসম তিন বৎসর হইল নিকা করিয়াছে, সে কুজা বলিয়া তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহে না, তাহার জীবন-যৌবন বৃথা হইয়াছে। দিল্লী সহরের পাড়ায় পাড়ায় সে ফকির লুৎফ-উল্লা শাহের সুখ্যাতি শুনিয়া তাহার চরণতলে আশ্রয় লইতে আসিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা নূতন টাকার আওয়াজ হইল, লুৎফ-উল্লা মুখ ফিরাইয়া দেখিল যে, মোটে একটা টাকা পড়িয়াছে। তখন সে রাগিয়া বলিয়া উঠিল, "ভাগ বেটী, এই দুর্দ্দিনে একটা টাকা! আজ তিন দিন ধ'রে পাহাড়গঞ্জে গয়লারা দুধ আনে নি। রাবড়ীর চেহারা যে কি রকম, তা ভুলেই গিয়েছি। বেটী জাতে বেণে বুঝি?"

রমণী উত্তর দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই ছিল, সে বলিয়া উঠিল, "খোদা কসম, হজরৎ যদি আমার খসমকে বশ করিবার জন্য একটা জোর তাবিজ লিখে দেন, তা হ'লে নগদ এক আসরফি নজর দেব।"

আসরফির কথা শুনিয়া লুৎফ-উল্লা শাহের মেজাজ একটু নরম হইল। সে রমণীর দিকে ফিরিয়া বলিল, "কৈ, দেখি তোর আসরফির রং কি রকম?" রমণীর জুতার পাশ দিয়া তাহার চম্পক-বিনিন্দিত বর্ণের আভা ফুটিয়া বাহির হইতেছিল এবং গোলামদীন কাবুলী তাহা শুষ্ক রক্তবর্ণ নেত্র দিয়া গিলিবার চেষ্টা করিতেছিল; সুতরাং লুৎফ-উল্লা যে হুকার নল ছাড়িয়াছে, তাহা সে দেখিতে পাইল না। রমণী একখানি ছোট সবুজ রেশমী রুমালের কোণে একটা নূতন মোহর রাখিয়া তাহা লুৎফ-উল্লার পায়ের কাছে ধরিল, লুৎফ-উল্লা তাহা দেখিয়া একবারে নরম হইয়া গেল।

সে বলিল, "চল্ বেটী চল্, তাবিজ লিখে দিই। তাবিজের জোরে তোর কুঁজ কি সোজা হবে ?"

রমণী সেলাম করিয়া বলিল, "হুজরতের মেহেরবাণী হ'লে সব হবে।" লুৎফ-উল্লা আগে আগে চলিল, রমণী তাহার অনুসরণ করিল, আর গোলামদীন তাহাদের দিকে চাহিয়া তামাকের কথা ভুলিয়া গেল। অনেক আঁকা-বাঁকা সরু পথ ধরিয়া চলিতে চলিতে অনেকক্ষণ পরে একটা দুর্গন্ধময় অন্ধকার গলিতে একটা ভাঙ্গা তিনতলা বাটীর সম্মুখে আসিয়া তাহারা দাঁড়াইল। লুৎফ-উল্লা দুয়ার খুলিয়া, চকমকী ঠুকিয়া, একটা প্রদীপ জ্বালিল এবং রমণীকে ভিতরে আসিতে বলিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। বাড়ীটা জনশূন্য, অনেকগুলি দরজা-জানালা নাই, ভিতরের উঠানে কখনও রৌদ্র আসিয়া পৌঁছায় না। উঠানের এক কোণে একটা কুয়া, রমণীকে তাহার ধারে বসিতে বলিয়া লুৎফ-উল্লা নিজে একটা ভাঙ্গা কুঠরীর তালা খুলিয়া ভিতরে গেল। ফকির ভিতরে গিয়াছে দেখিয়া রমণী সোজা হইয়া দাঁড়াইল, তাহার কুঁজ ঢাকিয়া গেল, সে মুখের কাপড় খুলিয়া ফেলিল, দেখিতে দেখিতে সেই কুব্জা রমণী এক দীর্ঘাকার গৌরবর্ণ যুবাপুরুষ হইয়া দাঁড়াইল। যে ঘরের ভিতরে বসিয়া ফকির লুৎফ-উল্লা শাহ একমনে তাবিজ লিখিতেছিল, যুবা সেই ঘরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিল, "তসলিমাৎ শাহ সাহেব !" তাহার গলার আওয়াজ শুনিয়া ফকির সাহেবের হাত হইতে কলম পড়িয়া গেল, সে তাড়াতাড়ি মুখ তুলিয়া চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "তুমি কে বাবা জীন, দানা না ভূত ? আমি যে দরজায় তালা দিয়ে এসেছি।" সহসা যুবা গলার আওয়াজ বদলাইয়া ফেলিয়া বলিল, "মেরী খসম নেকা কিহিন্ হ্যায় জনাব !"

লুৎফ-উল্লা সভয়ে বলিয়া উঠিল, "ও বাবা !" তাবিজের কাগজখানা তাহার হাত হইতে উড়িয়া গেল। যুবা হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, "বাড়ীতে দুই একখানা ঘর ভাড়া দেবে, ফকির সাহেব ?" এই বলিয়া সেই রুমালে বাঁধা আসরফিটা ছুড়িয়া দিল। লুৎফ-উল্লা সে দিকে না চাহিয়া ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "আসরফি-টাসরফি চাই না বাবা, খোদার কসম, গায়ে ঠাণ্ডা জল দিস্ নি, একেবারে ম'রে যাব, এক লহমায় দুশোবার ম'রে যাব বাবা।" যুবা দেখিল, লুৎফ-উল্লা বড়ই ভয় পাইয়াছে, তখন সে আর একটা নূতন আসরফি তাহার দিকে ছুড়িয়া দিল। দুইটা আসরফি পাইয়া লুৎফ-উল্লার কতকটা আশা হইল, সে আনন্দে বলিয়া উঠিল, "তবে শুধু শুধু গায়ে ঠাণ্ডা জল দিতে আস নি ? আমি মৌতাতী লোক ব'লে পাড়ার ছোঁড়া শালারা বড় জ্বালাতন করে।"

যুবা তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিল, "না ফকির সাহেব, আমি কোন বদমতলবে তোমার বাড়ী আসি নি। অনেক দিন ধ'রে সন্ধান ক'রে তবে তোমার আড্ডা খুঁজে বার করেছি। দেখ, তোমার এই ভাঙ্গা পড়ো বাড়ীটা আমার বড়ই দরকার হয়ে পড়েছে। যে দুটা আসরফি দিয়েছি, তা বায়না। আর কত ভাড়া চাই, বল ?"

আনন্দে গদগদ হইয়া পাকা আফিমঠী ফকির লুৎফ-উল্লা শাহ বলিয়া উঠিল, "ভাড়া আর কি দিবে, বাপ ? ফকিরের একখানা রুটী, দিনান্তে কাঁচ্চা ভোর ছিটে, আর যদি পারিস বেটা, এক পোয়াটাক লচ্ছেদার রাবড়ী।"

"সব মঞ্জুর শাহ সাহেব, কিন্তু আর একটি সর্ত্ত আছে, তোমার ঐ বাহারে পোষাকটি আমাকে ছেড়ে দিতে হবে, আর তোমাকে কিছু দিন এই বাটীর ভিতর আটক থাকতে হবে।"

"মঞ্জুর বাবা মঞ্জুর, যদি কাঁচ্চার উপর দেড় কাঁচ্চা ছিটে ছাড়তে পার, তা হ'লে কি আর লুৎফ-উল্লা শাহ উঠতে পারবে ? চার জোড়া পরীর কাঁধে চেপে সটান বেহেস্তে চ'লে যাবে।"

"দেড় কাঁচ্চা কেন ফকির সাহেব, দরকার হ'লে রোজ আধ ছটাক ছিটে পাবে।"

নিজের গায়ের সবুজ আলখাল্লাটা খুলিতে খুলিতে লুৎফ-উল্লা বলিল, "আর বলিস্ নি বাবা, জান্‌টা যেন এখনই কেমন উড়ু উড়ু করছে। এই নে আলখাল্লা, আর এই নে বাড়ীর চাবি। দেখ বাপজান্, লচ্ছেদার রাবড়ীর একটু নমুনা ছাড়তে পার বাবা ?"

"আজ বিকালেই পাবে।"

যুবা সেই সংকীর্ণ দুর্গন্ধময় গলিতে দাঁড়াইয়া যখন দুয়ারে চাবি দিল, তখন সে আবার কুব্জা রমণী, কিন্তু তাহাকে দেখিয়া পাড়ার লোক কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাঙ্গালার উকীল

দিল্লী সহরের মাঝখানে বাদশাহ আওরঙ্গজেবের উজীর আসদ খাঁর প্রাসাদ। এখন সে আওরঙ্গজেবও নাই, সে আসদ খাঁও নাই, সুতরাং প্রাসাদের সে কালও নাই। বাড়ীর মালিক বাড়ীটি অনেকগুলি খণ্ড করিয়া ভাড়া দিয়াছেন। তাহারই একটা খণ্ডের সম্মুখে বসিয়া গয়ারাম বাগ্দী একটি ছোট ঁকায় তামাক টানিতেছিল। পৌষমাস, দিল্লীতে বিষম শীত, দ্বিতীয় প্রহর বেলাতেও রৌদ্রের জোর হয় নাই। গয়ারামের সম্মুখে তাহার পুরাতন সঙ্গী পাকা ছয় হাত বাঁশের লাঠিগাছটি পড়িয়া ছিল। এমন সময় পূর্ব্বপরিচিতা রমণী বা যুবা তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। নানা কারণে গয়ারাম মুসলমান জাতির উপর বিষম চটিয়াছিল, সে রমণীকে দেখিয়া নিষ্ঠীবন পরিত্যাগ করিয়া মুখ ফিরাইল। রমণী তখন ক্রন্দনের সুরে বলিতে আরম্ভ করিল, "বাবু সাহেব, খোদা তোমার ভাল করুন, আমি বড়ই দুঃখিনী।"

গয়ারাম বিষম চটিয়া বলিল, "আ মর্ আবাগের বেটী, তুই দুঃখিনী, তা আমি কি করব? আমাকেই কোন্ রাজা-বাদশা পেলি?"

রমণীবেশী যুবা ছাড়িবার পাত্র নহে, সে আবার বিনাইয়া বিনাইয়া সুর করিয়া বলিতে আরম্ভ করিল, "বাবুজী, আল্লা তোমার তরক্কী করবেন, আমি বড়ই দুঃখিনী, আমার খসম দোস্‌রা নিকা করেছে, সে আমার দিকে ফিরেও চায় না।"

গয়ারাম বিষম চটিয়া হুঁকা রাখিয়া বলিয়া উঠিল, "তবে রে হারামজাদী, শালার দেশে এসে শীতে ম'রে গেলুম, বেটী, এত লোক থাকতে আমার পিছনে লাগলি কেন?"

"বাবুজী, আমি বড় আশা ক'রে তোমার দুয়ারে এসেছি। শুনেছি, বাঙ্গালা মুলুকের সুবাদারের উকীল এইখানে থাকেন, তিনি না কি বড় মেহেরবাণ্, তিনি হুকুম করলেই আমার স্বামী বশ হয়—"

"বেটী জ্বালালে। তুই আবাগের বেটী সহজে যাবি না না কি?"

"বেটা তেঁতুলে বাগ্দী কি না!"

যুবা অতি অস্পষ্টভাবে শেষের কথা কয়টি পরিষ্কার বাঙ্গালায় বলিল। গয়ারাম তাহা শুনিয়া পড়িতে পড়িতে রহিয়া গেল।

যুবা আবার বলিতে আরম্ভ করিল, "বাবুজী, আমি বড়ই দুঃখিনী, তুমি একবার আমার উপর দয়া কর। আমি দরখাস্ত লিখে এনেছি, উকীলের হাতে দেব। ওরে বেটা ভূত, শীগ্‌গির যা না, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব? এখনই কে দেখে ফেলবে? এখনও চিনতে পারলি না?"

গয়ারাম লাঠি ও কম্বল ফেলিয়া বিদ্যুদ্বেগে ঘরের ভিতর ঢুকিয়া গেল এবং নিমিষের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া রমণীবেশী যুবাকে প্রবেশ করিতে আদেশ করিল।

গৃহে প্রবেশ করিয়া যুবা গয়ারামকে কহিল, "দুয়ারটা দে। বাহিরের লোক কেউ আছে না কি?"

গয়ারাম বলিল, "আজ্ঞে না হুজুর।" যুবা তখন মুখের অবগুণ্ঠন বা বোর্খা উঠাইয়া দিয়া দ্বিতলে চলিয়া গেল।

তখন মোগল সাম্রাজ্যের শেষ দশা। বাদশাহ মহম্মদ শাহ নামে মাত্র সম্রাট্। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্ত্তারা প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন হইয়া উঠিয়াছেন। বাঙ্গালাদেশে মুরশিদকুলী খাঁ তাঁহার জামাতা শুজাউদ্দীন খাঁকে রাজ্যভার দিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন এবং যে দিন রমণীবেশী যুবা লুৎফ উল্লার ঘর ভাড়া করিতে গিয়াছিল,তাহার পূর্ব্বেই শুজাউদ্দীন খাঁর মৃত্যু হইয়াছে। স্বাধীন হইলেও মোগল সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সুবাদাররা দিল্লীতে এক জন প্রতিনিধি বা উকীল রাখিতেন। বাদশাহী দরবারে তখনও যাহা কিছু সামান্য কাযকর্ম্ম ছিল, তাহা এই উকীলরাই করিতেন। বাঙ্গালার সুবাদার শুজাউদ্দীন খাঁর উকীল এনায়েৎউল্লা খাঁ তখন খাস বৈঠকে বসিয়া তাম্রকূট সেবন করিতেছিলেন। তাঁহার নিবাস পূর্ব্ববঙ্গে, বয়ঃক্রম আন্দাজ পঞ্চাশ পঞ্চান্ন, কিন্তু দিল্লীতে অবস্থানকালে তিনি এক ষোড়শী দরিদ্রকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া সম্প্রতি কিঞ্চিৎ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। এনায়েৎউল্লা খাঁ ভীষণ স্থূল, বর্ণটি ঘন-কৃষ্ণ, ক্ষুদ্র মস্তকটি কেশশূন্য, সম্মুখের চারিটি দন্ত তাঁহার মায়া পরিত্যাগ করিয়াছে, বাদশাহের দরবারে তিনি "আকারসদৃশঃ প্রাজ্ঞঃ" বলিয়া পরিচিত। দিল্লীর লোক এনায়েৎউল্লাকে বড় দূর নির্ব্বোধ বলিয়া মনে করিত, তিনি প্রকৃতপক্ষে তাহা ছিলেন না। তিনি পূর্ব্ববঙ্গের দরিদ্র

কৃষকের পুত্র, বুদ্ধিবলে বিদ্যার অভাব পূরণ করিয়া নবাব সরকারে চাকুরী পাইয়াছিলেন এবং ৩ টাকা বেতনের দারোগাগিরি হইতে ক্রমে ক্রমে বাদশাহ-দরবারের উকীল নিযুক্ত হইয়াছেন।

জীবন-সংগ্রামে এনায়েৎ-উল্লা খাঁর প্রথম পরাজয় দিল্লীর এক দরিদ্র চুড়িওয়ালার রূপসী ষোড়শী কন্যার নিকট—কিন্তু সে পরের কথা।

যুবা যখন বোর্খাটা কাঁধের উপর ফেলিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিল, তখন খাঁ সাহেব সম্মুখযুদ্ধে পরাজয় লাভ করিয়া হুঁকার নলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। যুবা তাঁহার প্রতি বিশেষ সম্ভ্রম প্রদর্শন না করিয়া একবারে তাঁহার ফরাশের উপর গিয়া বসিল এবং বৃদ্ধের পিঠ চাপড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাচা, কেমন আছ?" চাচা অথবা খাঁ সাহেব সম্প্রতি সুন্দর যুবা-পুরুষ দেখিলেই চটিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, সুতরাং আগন্তুকের সম্ভাষণে প্রীত না হইয়া তিনি পূর্ব্ববঙ্গের ভাষায় বলিয়া উঠিলেন, "বেয়াদবী কর কেন?"

যুবা কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হইয়া হাসিতে আরম্ভ করিল, খাঁ সাহেব বিষণ্ণবদনে দাড়ি চুলকাইতে আরম্ভ করিলেন।

অল্পক্ষণ পরে যুবা বলিয়া উঠিল, "চাচা, সাহেবজাদার জন্য একটি বাসা ঠিক ক'রে এসেছি, যদি ভাল চাও, তা হ'লে চাচীকে চুড়িওয়ালার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে আমাদের সঙ্গে সেইখানে চল, এখানে থাকলে চাচীও যাবে, জান্‌ও যাবে।"

বৃদ্ধ খাঁ সাহেব যুবার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তাই কি পারা যায় বাপু, ইজ্জৎ যাবে যে?"

"আর এখানে থাকলে দৌলত, ইজ্জৎ আর জান্ এক-সঙ্গে যাবে।"

খাঁ সাহেব উত্তর দিলেন না দেখিয়া যুবা আবার জিজ্ঞাসা করিল, "চাচা, সেই ওদিক্‌কার ঘরের ফুট্‌ফুটে পাঠান ছোঁড়াটা আছে না গেল?"

খাঁ সাহেবের প্রাণে ভীষণ আঘাত লাগিল। তিনি কালো মুখখানা আরও ঘোর করিয়া রাগিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুমি ত বড়ই বেয়াদব ছোকরা, আমার ঘরের এ সকল খবর দেয় কে?"

"দেয় এই পাড়ার লোক। চট কেন চাচা, আমি ত ভাল কথাই বলছি।"

"ভাল আমার মাথায় থাক।"

"তবে তুমি যাবে না?"

"কেমন ক'রে আর যাই? আর দেখ, সে বাসাও সহরের মধ্যে, এ বাসাও তাই। বিশেষ ভয়ের কারণ নাই, কারণ, বাদশাও স্বয়ং লড়াই করতে যাচ্ছেন।"

"তবে তুমি থাক, কিন্তু চাচা, এর পর আমার দোষ দিও না।"

খাঁ সাহেব কিঞ্চিৎ নরম হইয়া বলিলেন, "আমিও এক-বার মনে করি, তোমার সঙ্গে যাই, আবার মনে হয়, ইজ্জ-তের চাইতে জান্ দেওয়া ভাল।"

"চাচা, তোমাদের ধর্ম্মে স্ত্রী পরিত্যাগ করা চলে, এ বেটী চাচীকে তাল্লাক দাও না?"

"তাই বা পারি কৈ রে বাপ? ছোটলোকের বেটীর তরে পাঠান ছোঁড়াটা হাঁ ক'রে ব'সে আছে।"

"চাচা, এক দিকের মায়া ছাড়, সব দিক্ রক্ষা হয় না।"

"আরও দু'চার দিন ভেবে দেখি, বাপজান্। তুমি তত দিন সাহেবজাদার উপায় কর, তাহার পর আমাদের যাহা হয় হবে।"

"মুর্শিদাবাদের খবর কিছু পেয়েছ?"

"কিছু না, নবাবের খুব শক্ত ব্যায়রাম, এই পর্য্যন্ত শুনেছি।"

"তা ত আমিও জানি। তবে আর তুমি খবর দিলে কৈ?"

কূটবুদ্ধি এনায়েৎ-উল্লা খাঁ তখন জানিতে পারিয়াছিল যে, মুর্শিদাবাদে নবাব শুজাউদ্দীন খাঁর মৃত্যু হইয়াছে এবং বাদশাহের হুকুমের অপেক্ষা না করিয়াই তাহার পুত্র সরফরাজ খা সুবাদারের মসনদ দখল করিয়াছেন, কিন্তু দীর্ঘকাল বাদশাহের দরবারে ওকালতী করিয়া মিথ্যা কথা বলাটা খাঁ সাহেবের এত বেশী অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল যে, তিনি স্বচ্ছন্দে সত্য কথাটা গোপন করিলেন। রমণীবেশী যুবা তখন আর একবার খাঁ সাহেবের পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, "চাচা, আমরাও মানুষ, আমাদেরও চোখ-কান আছে। বুড়া নবাব ম'রে গিয়েছে, আর সরফরাজ সুবাদার হয়েছে, এ কথা আমাকে জানালে কি ক্ষতি হ'ত?"

খাঁ সাহেব বিস্ময়ের ভাণ করিয়া বলিয়া উঠিল, "হায় হায়, বল কি? বল কি আনন্দ—বুড়া নবাব নেই? হায় হায়!"

তখন দুয়ারে দাঁড়াইয়া মাথার বোর্খা টানিয়া একটা লম্বা সেলাম করিয়া আনন্দ বলিল, "বাহবা কি বাহবা—চাচা, কত ঢঙই জান! কিন্তু ঢঙে দুনিয়া ভোলে না চাচা, এই চাচী কি ভুলছে?"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নাদির শাহ

সেটা মোগলের অধঃপতনের যুগ। তৈমুরের বংশের শেষ প্রকৃত বাদশাহ মহম্মদ শাহ তখন ময়ূর-সিংহাসনে উপবিষ্ট, কিন্তু গুজরাট ও মালব দেশ তখন মরাঠারা জয় করিয়া লইয়াছে। বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, আহমদনগর, বুরহানপুর, এলিচপুর, খান্দেশ প্রথম নিজাম উল-মুল্ক চিনকিলীচ খাঁর অধীনে স্বাধীন হইয়া গিয়াছে। এই সময়ে ভাগ্যচক্রের বিপর্য্যয়ে পারস্যের প্রবলপ্রতাপ অধিপতি নাদির শাহের কতকগুলি আফগান প্রজা পরাজিত হইয়া মোগল সাম্রাজ্যের কাবুল সুবায় আশ্রয় লইল। আফগানরা যাহাতে মোগল সাম্রাজ্যে আশ্রয় না পায়, এই অনুরোধ করিয়া নাদির শাহ ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে কান্দাহার জয় করিবার পুর্ব্বেই দিল্লীতে দুই জন দূত পাঠাইয়াছিলেন এবং বাদশাহ মহম্মদ শাহও নাদির শাহের অনুরোধ রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রতিশ্রুতি অনুসারে পরাজিত আফগানদিগকে কাবুল ও গজনী চাকলায় প্রবেশ করিতে না দিবার আদেশ প্রেরণ করিবার অবসর বাদশাহ মহম্মদ শাহের ছিল না, কারণ, নর্ত্তকী নূরবাঈ তখন বড় সুন্দর নাচিত।

আফগানরা মোগল সাম্রাজ্যে আশ্রয় পাইলে নাদির শাহ মহম্মদ শাহের কাছে তৃতীয় দূত পাঠাইলেন। মোগল বাদশাহের পরামর্শদাতারা বুঝিলেন যে, পারস্য সম্রাটের দূতকে উত্তর না দিয়া দিল্লীতে আবদ্ধ রাখিলেই রাষ্ট্রনীতি-জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা হইবে। এক বৎসর কাটিয়া গেল, দূত ফিরিয়া আসিল না দেখিয়া নাদির শাহ মোগল সাম্রাজ্য আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল।

তখনও নূরবাঈ অতি সুন্দর নাচিতেছিল, কোকীজীউ গোপনে বাদশাহকে প্রেমের গান শিখাইতেছিল, সুতরাং গোলন্দাজরা কামান ছোড়া ভুলিয়া গিয়াছিল, বারুদ তৈয়ারী করা একরূপ উঠিয়া গিয়াছিল, আওরঙ্গজেব-আলমগীরের প্রেমের দায়ে হিন্দুরা অনেক দিন পুর্ব্বে মোগলের রাজধানী ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছিল, সুতরাং আফগানিস্থান জয় করিতে নাদিরের বিশেষ বিলম্ব হইল না। কাবুল সুবার সুবাদার পাঁচ বৎসর নিজের সৈন্যদলের বেতন দিতে পারেন নাই, তিনি বাদশাহের নিকট টাকা চাহিয়া পাঠাইলেন। বাদশাহের উজীর খান্ দৌরান আমীর-উল্-উমরা বলিয়া পাঠাইলেন যে, বাঙ্গালার সুবাদারের কাছে টাকা চাহিয়া পাঠাইতেছি, সেই টাকা আসিলেই কাবুলে পাঠান হইবে। উত্তর আসিবার পুর্ব্বে নাদির শাহ কাবুল জয় করিয়া বসিল।

লাহোরের সুবাদার জাকারিয়া খাঁ উজীরের প্রিয়পাত্র ছিলেন না। নাদির শাহ পেশাওর জয় করিয়া লাহোরের দিকে অগ্রসর হইলে তিনি লাহোর-দুর্গ অবরোধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। জাকারিয়া খাঁ উজীরের মনের অবস্থা জানিতেন, তিনি বিংশতি লক্ষ রজতমুদ্রা দিয়া লাহোর নগর ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিলেন।

লাহোর জয় করিয়া নাদির শাহ শুনিতে পাইলেন যে, মোগল বাদশাহ মহম্মদ শাহ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। পেশাওর জয় হইয়াছে শুনিয়া মহম্মদ শাহ ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দের ২রা নবেম্বর তারিখে সাম্রাজ্যের তিন জন প্রধান কর্ম্মচারী—ইতিমাদ্-উদ্-দৌলা, কমর্-উদ্-দীন খাঁ উজীর, নিজাম-উল্-মুল্ক আসফজাহ উকীল, সম্সাম-উদ্ দৌলা খান-দৌরানকে এক ক্রোর টাকা দিয়া নাদির শাহের বিরুদ্ধে পাঠাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইঁহারা এক মাসের মধ্যে দিল্লী নগর পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। দুর্দ্দশায় পড়িয়া বাদশাহ রাজপুত রাজাদের নিকট সাহায্যভিক্ষা করিয়া পাঠাইলেন, এমন কি, মোগলের চিরশত্রু পেশবা বা প্রথম বাজীরাওএর নিকটেও দূত গেল, কিন্তু কেহই আসিল না। ১৮ই জানুয়ারী তারিখে মোগল সাম্রাজ্যের প্রধান কর্ম্মচারী তিন জন পাণিপথ নগরে পৌছিলেন এবং বাদশাহের আগমনপ্রতীক্ষায় ৯ দিন নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলেন। ২৭শে জানুয়ারী তারিখে বাদশাহ মহম্মদ শাহ যখন পাণিপথে পৌছিলেন, তখন লাহোর নাদির শাহের হস্তগত। নিজামের অনুরোধে

বাদশাহ পারসিক সেনার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য কর্ণাল নগরের নিকট একটি মৃন্ময় দুর্গ তৈয়ার করিবার আদেশ দিলেন। ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মাত্র ৪০ হাজার অশ্বারোহী লইয়া নাদির শাহ কর্ণালে পৌঁছিলেন। তখন মোগল শিবিরে ৭৫ হাজার সৈন্য সমবেত হইয়াছিল। নাদির মোগল-সৈন্য মৃন্ময় দুর্গের মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া দিল্লীর রাজপথ অধিকার করিয়া বসিলেন, তখন বাধ্য হইয়া মোগল বাদশাহকে দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ করিতে হইল।

অনেক দিন তোপ তৈয়ারী হয় নাই, সুতরাং মহম্মদ শাহের ৮ হাজার তোপ নাদির শাহের সৈন্য পর্য্যন্ত পৌঁছিল না, সাদৎ খাঁ অযোধ্যা হইতে আসিবার পথে নিজের তৈজসপত্র পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছিলেন, তিনি কর্ণালে পৌঁছিবার পরে পারসিক সৈন্য তাঁহার অরক্ষিত আস্‌বাবপত্র লুঠিয়া লইল। উপদেশ না শুনিয়া তিনি নিজের সম্পত্তিরক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতে বাহির হইলেন, বাদশাহের আদেশে খান্-দৌরান তাঁহার সাহায্য করিতে গেলেন; অবশেষে বাদশাহ স্বয়ং মৃন্ময় দুর্গের বাহিরে আসিলেন। এই অবসরে নাদির শাহ দুর্গের বাহিরে মোগলদিগকে আক্রমণ করিলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে সাদৎ খাঁ বন্দী, খান্-দৌরান আহত ও বাদশাহ মহম্মদ শাহ পরাজিত হইলেন। নাদির শাহের সহিত মোগলের যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল।

সম্রাটের পরাজয়সংবাদ যখন দিল্লীতে পৌঁছিল, তখন দিল্লীর চারিদিকে লুঠ-তরাজ আরম্ভ হইল, পথ-ঘাট বন্ধ হইয়া গেল। দিল্লীর মত বড় সহরে খাদ্যদ্রব্য অধিক পরিমাণে সঞ্চিত থাকে না; সুতরাং দ্বিতীয় দিন হইতেই দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইল। আহীর গোয়ালারা দুধ আনা বন্ধ করিল, সবজীমণ্ডীর বাজার বন্ধ হইয়া গেল, বণিয়ারা এক দিনে চাউল ও আটার দর দশগুণ চড়াইয়া বসিল। যে সমস্ত লোক দিল্লীর নগরপ্রাচীরের বাহিরে বাস করিত, তাহারা আত্মরক্ষার জন্য বারুদ ও গুলী সঞ্চয় করিতে লাগিল। দিল্লী সহরের কোতোয়াল হাজী ফুলাদ খাঁ সহরের পাহারা বাড়াইয়া দিলেন। লোকজন বাহিরে যাওয়া এবং বাহির হইতে আসা বন্ধ করিয়া দিলেন। দিল্লী-সুবার সুবাদার লুৎফ-উল্লা খাঁ সাদিক নগর রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এইরূপে কর্ণালের যুদ্ধের পরে ১২ দিন কাটিয়া গেল।

দিল্লীর লোক শুনিল যে, সাদৎ খাঁর বিশ্বাসঘাতকতায় বাদশাহ নাদির শাহের বন্দী হইয়াছেন। নাদির শাহ ৫০ লক্ষ টাকা লইয়া কর্ণাল হইতে পারস্যে ফিরিয়া যাইতে প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু বাদশাহের দরবারে নিজামের প্রতিপত্তি দেখিয়া ঈর্ষ্যাপরবশ সাদৎ খাঁ পারস্য-রাজকে মহম্মদ শাহকে বন্দী ও দিল্লী অধিকার করিতে পরামর্শ দিলেন। সাদৎ খাঁর পরামর্শে নাদির শাহ মহম্মদ শাহকে বন্দী করিয়া দিল্লী যাত্রা করিলেন।

তখন দিল্লীর লোক স্তম্ভিত হইয়া গেল। চোগতাই সম্রাটের সৈন্যদল যে এত অন্তঃসারশূন্য, মোগল সম্রাটের মুসলমান সেনাপতিরা যে এতদূর বিশ্বাসঘাতক, তুলনায় পারস্যরাজের কিজিলবাশ অশ্বারোহী যে এত প্রবল, তাহা দিল্লীর লোক একবারেই বুঝিতে পারে নাই। মারাঠা সৈন্য যখন দিল্লীর নগরদ্বারে দেখা দিয়াছিল, তখনও হিন্দুস্থানী মুসলমানদের চৈতন্য হয় নাই। তাহারা ভাবিয়াছিল যে, মারাঠা দস্যু, তাহারা লুঠ করিতে আসিয়াছে, লুঠ করিয়া চলিয়া যাইবে। যদি বেশী দিন থাকিতে চাহে, তাহা হইলে বাদশাহী ফৌজ নিশ্চয়ই তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিবে। যখন গুজরাট গেল, তখন গুজরাটে যে কয় জন মুসলমান আমীরের জায়গীর ছিল, তাহারাই কিছু দিন হা-হুতাশ করিয়া বেড়াইল। ১৭৩১ খৃষ্টাব্দে যখন মালব গেল, তখন দিল্লীতে অন্নহীন আমীরের সংখ্যা বাড়িল বটে, কিন্তু হিন্দুস্থানী মুসলমানের চৈতন্য হইল না।

যখন নাদির শাহ কাবুল আক্রমণ করিল, তখন হিন্দুস্থানের মুসলমান ভাবিল যে, বাদশাহী ফৌজ দুই দিনেই ইরাণের বাদশাহকে তাড়াইয়া দিবে। ক্রমে কাবুল গেল, পেশাওর গেল, লাহোর গেল, তখন হিন্দুস্থানী মুসলমান সাজিতে আরম্ভ করিল। বুদ্ধির সহিত যে পাশব বলের যুদ্ধ চলে না, কামানের সহিত যে তীর-ধনুক লইয়া যুদ্ধ হয় না, অষ্টাদশ শতাব্দীর শত্রু যে তলোয়ার ছাড়িয়া বাহুযুদ্ধ করে না, হিন্দুস্থানের মুসলমানের স্থূল মস্তিষ্কে এ কথা প্রবেশ করে নাই। তখনও নূরবাঈ নাচিত, মৌলাব খান্ খেয়াল গাহিত, প্রাসাদে নিত্য প্রভাতে দরবার ও সন্ধ্যাকালে মজ্‌লিস্ বসিত। তামাকের দোকানে, সরবতের দোকানে, কস্‌বীর দেওয়ানখানায় হিন্দুস্থানী মুসলমান জওয়ান মর্দ্দরা মুখে ইরাণ, তুরাণ, শাণ ও রুম ফতে করিত আর বলিত,

নাদির শাহকে জুতাপেটা করিয়া বাহির করিয়া দিব, আর সঙ্গে সঙ্গে লাহোর ও পেশাওর বেড়াইয়া আসিব।

মহম্মদ শাহের পরাজয়বার্ত্তা ও নাদির শাহ কর্ত্তৃক তাহার বন্ধন-সংবাদ দিল্লীর নাগরিককে স্তম্ভিত করিয়া দিল। আওরঙ্গজেব—আলমগীরের মৃত্যুর বত্রিশ বৎসর পরে মহানগরী দিল্লী শত্রুর হস্তগত হইবে, এ কথা হিন্দুস্থানের মুসলমান স্বপ্নেও ভাবে নাই। দিল্লীর নাগরিকরা শুনিল যে, কিজিলবাশ হিন্দুর স্ত্রী ও মুসলমানের স্ত্রীতে কোন প্রভেদ দেখে না, তখন বাক্যের ছটা ভুলিয়া হিন্দুস্থানী মুসলমান আত্মরক্ষার জন্য আকুল হইয়া উঠিল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

মন্ত্র

আজিকার এই বরষের প্রাতে ভারতের পূজাঘরে,
নিবেদিবে যেই অর্ঘ্য তোমার দেবীর চরণ'পরে,
শাশ্বত তার মন্ত্রের বাণী যেয়ো নাক' কভু ভুলে,—
মনে রেখো ভাই সাধনা তোমার ভারতীর বেদীমূলে!
জাহ্নবীতীরে পুণ্যপ্রভাতে, অতীতের তপোবনে,
মন্দার-ফুল-গন্ধে আকুল মন্থর সমীরণে,
ঋষির কণ্ঠে ফুটেছিল যেই সুমধুর সামগান,
সেই সুর তব, তরুণ পূজারী! মর্ম্মবীণার প্রাণ!
সাগরের পার হইতে যে সুর আসিয়াছে দ্বারে আজ,
শঙ্খ বাজায়ে বরিও না তারে তোমার কুটীর-মাঝ!
পূজ্য অতিথি নহে ত' সে কভু, সে যে রিপু, মহাভয়,
ভারতের বুকে ধূমকেতুসম সে যে অভিশাপ লয়!
দেবতা তোমার ভারতেরি—তুমি ভুলো না এ কথা ভাই-
মন্ত্র তাহার ভারতেরি সুরে—বিদেশের সুরে নাই!

২

কর্ম্মী পূজারী, জানিও তোমার ত্যাগের মন্ত্র সার,
"কর্ম্মে কেবল অধিকার তব, ফলে নাহি অধিকার।"
দেশের দশের উন্নতিতরে করিবে জীবনপাত,
হাসিমুখে সব সহিবে বিপদ, জীবনের প্রতিঘাত।
স্তুতির সমুখে লক্ষ্য তোমার হারায়ো না কভু ধীর,
ধৈর্য্য তোমার রাখিও অটুট নিন্দার মাঝে বীর!
প্রেরণার নব ছন্দে তোমার নাচিয়া উঠুক প্রাণ,—
দেবীর চরণে সেই ত' সাধনা—শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যদান!

৩

ওই যে গোপনে গাঁথিয়া হিয়ার বন্দনাগীতিহার,
ভাবুক পূজারী বাণীর চরণে এনে দিবে উপহার,
ছত্রে ছত্রে ঝরিবে তাহার, পুণ্যপীযূষসম,
পল্লীর মাঠে ফোটে যেই সুর, সেই সুর অনুপম!
ক্লান্তির মাঝে শান্তির ধারা বহাইবে তুমি কবি,
ভারতের প্রাণ, ভারতের দান ছন্দে আঁকিবে সবি!
ভ্রান্তির বশে দিয়ো নাক' কবি প্রশ্রয় কুরুচির;—
কল্পকলার অমর মূরতি লজ্জায় নতশির!
দেবী ভারতীর শুভ্র মূরতি, শুভ্র চরণতল,
কেমনে করিবে কালিমা-লিপ্ত সুন্দর শতদল?
ভীষ্মের বাণী গৌরব-ধ্বনি, নিমাইয়ের প্রেমগান,
ত্যাগের উজল ভাণ্ডারে চির বুদ্ধের অবদান,—
ধর্ম্মের সাথে কর্ম্মের এই মহামিলনের গান—
মন্ত্র তোমার, হে কবি পূজারী! কবিতার চির-প্রাণ!

৪

বিশ্বহিয়ার মাধুরী-বিকাশ তুলিকার প্রতি টানে,—
মন্ত্র তোমার, শিল্পী পূজারী! চিত্রিত সুরে গানে!
পূজামন্দিরে ধ্যানের মূরতি, আরতি হোমের শিখা,
প্রকৃতির শ্যামসুন্দরবেশ, দীপ্ত-ললাট-টীকা,
সীতার বিরহবিধুর বেদনা, শৈব্যার আঁখিনীর,
ত্যাগের গরিমাদীপ্ত সাধনা সতী ও সাবিত্রীর,
জননীর স্নেহকাতরতা আর ভগিনীর প্রীতিধার,
বিরহী বধূর প্রণয় মধুর, শঙ্কিত ব্যথাভার,
বুকের রক্তে মূর্ত্ত করিয়া ফুটায়ে তুলিতে হবে,—
ভারতের নব শিল্পসাধনা সার্থক হবে তবে!

৫

আজি এ পুণ্যপ্রভাতলগনে সবে মিলি' এক ঠাঁই
এস এস এস শিল্পী পূজারী, কর্ম্মী ও কবি ভাই!
ভারতের পূত মন্ত্রের সাথে ভারতীর জয়গান
মর্ম্মবীণায় উঠুক বাজিয়া—জাগুক নবীন প্রাণ!

শ্রীবিমলকৃষ্ণ সরকার।

মুদ্রিত বস্ত্র-শিল্প

অতীতের ইতিহাস অধ্যয়ন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভারতজাত বহুবিধ রঞ্জিত ও মুদ্রিত কার্পাসবস্ত্র তদানীন্তন সভ্য জগতের প্রায় সর্ব্বত্রই চালান যাইত। কালক্রমে এতদ্দেশের কার্পাস-শিল্প অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছে এবং দেশীয় বস্ত্রের স্থান বিদেশীয় পণ্য অনেক পরিমাণে অধিকার করিয়াছে। কিন্তু তাহা সত্বেও ভারতীয় বস্ত্রের রপ্তানী একবারে উঠিয়া যায় নাই। এখনও গড়ে সাড়ে ছয় কোটি টাকার নানাপ্রকার কার্পাসজাত বস্ত্র বিদেশে রপ্তানী হয়। ইহার মধ্যে রঞ্জিত ও মুদ্রিত বস্ত্রের অনুপাতই সমধিক—অর্থাৎ প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা। বলা বাহুল্য যে, দেশমধ্যে ব্যবহৃত উক্ত শ্রেণীর বস্ত্রের পরিমাণ রপ্তানীর পরিমাণ অপেক্ষা আদৌ কম হইবে না। বঙ্গদেশে দেশীয় প্রথায় রঞ্জিত ও মুদ্রিত বস্ত্রের ব্যবহার অনেক পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু অন্যান্য প্রদেশে এরূপ বস্ত্রের চলন খুবই আছে। বস্ত্রকলসমূহে কিয়ৎ-পরিমাণে রঞ্জিত বস্ত্র প্রস্তুত হয়, কিন্তু রঞ্জন ও মুদ্রণ প্রধানতঃ কুটীর-শিল্পিগণের হস্তেই ন্যস্ত। অন্যান্য কুটীর-শিল্পের ন্যায় মুদ্রিত বস্ত্র প্রস্তুত শিল্পেও শৃঙ্খলার ও সংগঠনের একান্ত অভাব। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সংগঠন ও উন্নতি-সাধন করিতে পারিলে মুদ্রিত বস্ত্রশিল্প যে প্রচুর ধনাগমের উপায় হইতে পারে, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

বস্ত্র-মুদ্রণের কেন্দ্র

উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতের সর্ব্বত্রই ক্ষুদ্র বৃহৎ বস্ত্র-মুদ্রণের কেন্দ্র রহিয়াছে। বঙ্গদেশে বাঁকুড়া, হুগলী, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জিলায় এখনও মুদ্রণ-শিল্প উঠিয়া যায় নাই, বরং খদ্দরের অধিকতর প্রসারের সহিত উন্নত ধরণের নক্সায় (pattern) বস্ত্রাদি প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু এক কলিকাতার কথা বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, মোটের মাথায় বাঙ্গালায় মুদ্রিত বস্ত্র উৎপাদনের মাত্রা অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। কলিকাতা সহরের চোরবাগান, মেছুয়াবাজার ও তন্নিকটবর্ত্তী পল্লী-সমূহে যে কাপড় ছোবান ও ছাপান'র বহুসংখ্যক দোকান ছিল, সেগুলির অধিকাংশই অদৃশ্য হইয়াছে এবং যে কয়েকটি আছে, সে সমুদয়ও ভদ্রমহিলাগণের ব্যবহারোপযোগী রঞ্জিত অথবা মুদ্রিত বস্ত্র প্রস্তুত করে না। কলিকাতায় যে একটু ভাল ধরণের বস্ত্র পাওয়া যায়, সেগুলি প্রায়ই অন্য দেশ হইতে আমদানী করা। বাঙ্গালার মুদ্রিত বস্ত্রের ব্যবসায়ে যুক্তপ্রদেশজাত দ্রব্যের প্রাধান্য অধিক। কাশী, কানপুর, ফরক্কাবাদ, লক্ষ্ণৌ, জাহাঙ্গিরাবাদ, টাণ্ডা, মথুরা ও জয়পুর মুদ্রিত বস্ত্র প্রস্তুতের প্রধান কেন্দ্র। এই সকল স্থানে কুটীর-শিল্প হিসাবে বহুকাল হইতে বস্ত্ররঞ্জন ও মুদ্রণ-কার্য্য চলিয়া আসিতেছে। সকল স্থানের মুদ্রণ-প্রথা কিন্তু একই রূপ নহে।

মুদ্রণ-প্রণালী

যে সকল প্রণালীতে বস্ত্র মুদ্রিত হয়, তৎসমুদায়কে মোটামুটি তিনটি ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়; ১ম অম্লজান-ঘটিত পরিবর্ত্তন; ইহাতে বস্ত্রে aniline black দ্বারা ছাপ দিয়া কিছু দিবস রাখিয়া দেওয়া হয়; তদ্দারা বায়ুমণ্ডলস্থিত অক্সিজেন উহার উপর ক্রিয়া করিয়া বর্ণ ঘন-কৃষ্ণে পরিণত করে। শুধু কাল রং ছাপাইতে হইলে এই প্রণালী অনেক স্থলেই অবলম্বিত হয়। ২য় মেদি অর্থাৎ কটা রং ছাপিতে হইলে তোলা প্রথার (raised) সাহায্য লওয়া হইয়া থাকে। ইহাতে প্রথমে হীরাকস দ্বারা ছাপ দেওয়া হইলে পর বস্ত্রকে চুণের জলে ভিজান নিয়ম। তাহাতে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া ferric oxide অধঃস্থ হয়। একই বস্ত্রে দুই রং মুদ্রণ করিতে হইলে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রণালীর সংযোগ করা হয়। ইদানীন্তন মেদি রং-এর পরিবর্ত্তে পীত বর্ণের অধিক প্রচলন হইতেছে;

কিন্তু এতদ্দ্বারা আঠার সহিত রং দিয়া ছাপ দেওয়া হয় মাত্র। উষ্ণ বাষ্পপ্রয়োগ অথবা অন্য কোন উপায়ে রং পাকা করিবার চেষ্টা করা হয় না। সুতরাং এরূপ স্থলে রং শীঘ্রই ধৌত হইয়া যায়। ৩য় প্রণালীকে রঞ্জিত প্রণালী বলিতে পারা যায়; এই প্রণালীতে যে বস্ত্র ছাপাইতে হইবে, তাহার উপর বর্ণসংরক্ষক (mordant) দ্রব্যের ছাপ দেওয়া হয় ও বিশেষ প্রক্রিয়া দ্বারা উহাকে পাকা করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। অতঃপর বস্ত্রখণ্ড রংএর জলে ভিজাইলে যে যে স্থানে বর্ণসংরক্ষক পদার্থ আছে, সেই স্থানগুলি রঞ্জিত হইয়া যায়। সাধারণতঃ অন্য স্থানের রং ধুইয়া ফেলা প্রচলিত প্রথা।

রঞ্জিত মুদ্রণের প্রক্রিয়া

রঞ্জিত প্রণালীতে বস্ত্র মুদ্রিত করিতে হইলে কয়েকটি বিশেষ প্রক্রিয়ার আবশ্যক। সাধারণের অবগতির জন্য সেগুলির এ স্থলে সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা যাইতেছে।

১। কষ অথবা তৈল কিংবা উভয় দ্রব্য সহযোগে বস্ত্রকে মুদ্রণোপযোগী করিয়া লওয়া। কোন কোন স্থলে কেবলমাত্র হরীতকীর জলে কাপড় ভিজাইয়া শুষ্ক করিয়া লওয়া হয়। এতদ্দ্বারা পরে লৌহঘটিত দ্রব্য গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ উৎপাদন করে। মথুরায় এই সহজ প্রক্রিয়া প্রচলিত। কিন্তু জয়পুরের প্রসিদ্ধ 'সঙ্গনের' নামক মুদ্রিত বস্ত্র প্রস্তুতে তৈল ও কষ উভয়ই ব্যবহৃত হয়। তৈলের প্রধান গুণ এই যে, ইহা অধিকতর গাঢ় ও পাকা রং প্রদান করিতে পারে। রেড়ীর তৈলের জলীয় মিশ্রণ এতদর্থে অধিক ব্যবহৃত হয়; ইহাকে সবুজ দ্রাবণ বলে; উক্ত দ্রাবণ প্রয়োগের পর কাপড় রৌদ্রে শুকাইয়া 'শ্বেত দ্রাবণ' অর্থাৎ ক্ষার-জলে ধুইয়া লওয়া হইয়া থাকে। তাহাতে অসংযুক্ত তৈল ধুইয়া বাহির হইয়া যাওয়ার এবং যে তৈল বসিয়া গিয়াছে, তাহা আরও দৃঢ়রূপে সংযুক্ত হওয়ার সহায়তা হয়। লক্ষ্ণৌ, ফরক্কাবাদ প্রভৃতি স্থলেও তৈল প্রয়োগের প্রথা প্রচলিত আছে। মথুরাতেও একটি কারখানায় সম্প্রতি Turkey Red Oil ব্যবহৃত হইতেছে।

২। বর্ণ-সংরক্ষক পদার্থ মুদ্রণ:—প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর বর্ণ-সংরক্ষক দ্রব্য প্রয়োগ করা হয়;—আলুমিনা ও লৌহঘটিত লবণ। পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর মধ্যে ফটকিরি সচরাচর চলিত; শেষোক্ত শ্রেণীর বর্ণের জন্য উৎসেচনশীল মাৎগুড়ে লৌহচূর্ণ ফেলিয়া এক প্রকার অবিশুদ্ধ Iron acetate প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। উভয় শ্রেণীর রংই যথেষ্ট পরিমাণে ঘনীভূত আঠার সহিত মিশ্রিত করিয়া বস্ত্রে লাগান হয়। শুধু ফট্‌কিরি-মিশ্রণ এরূপভাবে লাগাইলে বস্ত্রের আঠাযুক্ত স্থান ঠিক দেখা যায় না। উহা সুস্পষ্ট করিবার জন্য গিরিমাটী আঠার সহিত মিশ্রিত করিয়া দেওয়ার প্রথা উদ্ভাবিত হইয়াছে। এরূপ বস্ত্রে যেখানে যেখানে ফট্‌কিরি আছে, পরে alizarineএর জলে ভিজাইলে সে সকল স্থান গাঢ় রক্তবর্ণ হইয়া উঠে। লৌহঘটিত লবণ দ্বারা বিশুদ্ধ কৃষ্ণবর্ণ উৎপাদিত হয়। বস্ত্র পূর্ব্ব হইতে হরীতকীর জলে ভিজান থাকায় বর্ণ খুবই কাল হইয়া উঠে এবং ছাপের দাগ দেখিবার জন্য আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়া আবশ্যক হয় না।

বর্ণসংরক্ষক দ্রব্যের ছাপ দিবার জন্য 'গাদিয়া' নামক গোলাকার রংএর বাক্স, খাটিয়া অর্থাৎ ছাকনী; রংযুক্ত কয়েক খণ্ড কম্বলের টুকরা ও নক্সার কাঠ সচরাচর ব্যবহৃত হয়। পূর্ব্ব হইতে কষ করা কাপড় মসৃণভাবে একটি টেবলের উপর বিছাইয়া নক্সার কাঠ প্রথমতঃ কম্বলের টুকরার উপর রাখিয়া একটু চাপ দিলেই নক্সার গাত্রে আঠাযুক্ত সংরক্ষক পদার্থ লাগিয়া যায়। পরে উক্ত কাঠ দিয়া মোহর দেওয়ার মত বস্ত্রখণ্ডে ছাপ দেওয়া হয়। শুধু পাড় ছাপা অপেক্ষাকৃত সহজ। ফরক্কাবাদের ছাপান কাপড়ের পাড় চিত্রিত। উভয় পৃষ্ঠে একই অথবা বিভিন্ন নক্সাযুক্ত বস্ত্র প্রধানতঃ বৃন্দাবনে প্রস্তুত হয়।

৩। সংরক্ষক পদার্থের ছাপ দিবার পর বস্ত্র কিছু দিবস রাখিয়া দেওয়ার নিয়ম সর্ব্বত্র প্রচলিত। বস্ত্র ও সংরক্ষক পদার্থবিশেষে এক সপ্তাহ হইতে এক মাস কিংবা ততোধিক কাল রাখিয়া বস্ত্র পুরাতন করা আবশ্যক হইতে পারে। এই প্রথার উপকারিতা এই যে, এতদ্দ্বারা সংরক্ষক দ্রব্য দৃঢ়ভাবে বস্ত্রতন্তুর সহিত সংলগ্ন হইয়া যায় এবং যে স্থলে লৌহঘটিত পদার্থ ব্যবহৃত হয়, সে স্থলে বায়ুমণ্ডলের অম্লজানের কার্য্য দ্বারা বর্ণের উন্নতি সাধিত হয়।

৪। বস্ত্র যথেষ্ট সময় তুলিয়া রাখার পর যে প্রক্রিয়া প্রয়োজনীয়, তাহার নাম 'পাচ্ছাদা' অর্থাৎ ধৌতকরণ। ইহার উদ্দেশ্য—বস্ত্র হইতে আঠা ও অসংযুক্ত সংরক্ষক দ্রব্যাদি অপসৃত করিয়া দেওয়া। বিশেষ দক্ষতা ও সাবধানতার

সহিত এই প্রক্রিয়া এরূপ ভাবে করিতে হয় যে, কাপড়ের অমুদ্রিত স্থানসমূহ 'ধপ্‌ধপে' সাদা হইয়া যায়। অনেক স্থলেই স্রোতের জলে এই কার্য্য সমাধিত হয় এবং ইহাতে যে অল্পবিস্তর কৌশল নাই, তাহা বলা যায় না। নদীর জল যেখানে ২।৩ হাত গভীর, সেখানে ৭।৮ হাত ব্যবধানে ২টি বাঁশ ঋজুভাবে দৃঢ় করিয়া পুঁতিয়া দেওয়া হয়; তৎপরে প্রস্থভাবে আর একখানি বংশদণ্ড এরূপ ভাবে উক্ত দুইটি বাঁশের সহিত বাঁধিয়া দেওয়া হয় যে, উহা জলের উপরিভাগ হইতে সামান্য নীচে থাকে। (চিত্র নং ১) অতঃপর শেষোক্ত বাঁশের উপর দিয়া মুদ্রিত কাপড়ের থান এক দিকের দুইটি 'খুঁট' ধরিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়া থাকে। স্রোতের বেগে থান আপনা-আপনিই খুলিয়া যায়। তখন থানের অর্দ্ধাংশ টানিয়া প্রস্থে অবস্থিত বাঁশের নীচে দিয়া ভাসাইয়া দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য যে, এরূপ অবস্থায় বস্ত্র কোনরূপে স্থানচ্যুত হইতে পারে না এবং সর্ব্বত্র সমভাবে প্রসারিত হইয়া স্রোতের জলে ভাসিতে থাকে। যতক্ষণ না কাপড় সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কৃত হয়, ততক্ষণ এই-রূপ অবস্থায় রাখিয়া দেওয়া হয়।
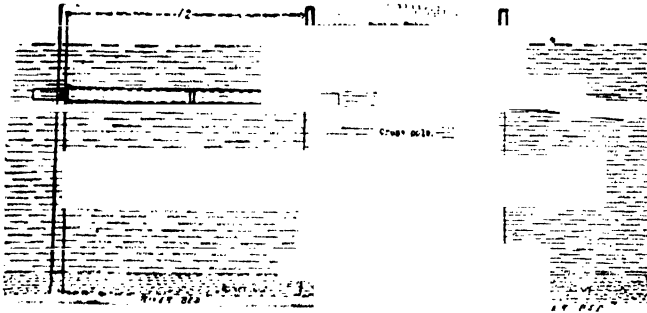
চিত্র নং ১—পাছাদা—নদীর জলে মুদ্রিত বস্ত্র ধৌত করিবার কৌশল

৫। রঞ্জন—নদীর জলে ধুইয়া শুকাইয়া লইলে বস্ত্র রঞ্জন করিবার উপযুক্ত হইল। রং করিবার জন্য তামিয়া নামক তাম্রপাত্র ব্যবহৃত হয়। উহার ব্যাস ৪ ফুট এবং গভীরতা ৩ ফুট। উক্তরূপ একটি পাত্রে দশটি 'বিশ-গজী' থান, অথবা মোট ২ শত গজ বস্ত্র রঞ্জন করা যাইতে পারে। পাত্রে উপযুক্ত পরিমাণ অ্যালিজারিণ রংএর জল দিয়া উনুনে চড়াইয়া কাপড়গুলি প্রথমতঃ ঠাণ্ডা জলেই দেওয়া হয়। পরে তাপ দিয়া উক্ত জল ফোটান হইয়া থাকে। উপযুক্ত সময়ে তাপ বন্ধ করিয়া দেওয়া আবশ্যক। অ্যালিজারিণ সহযোগে ফটকিরিযুক্ত অংশ লোহিত ও লৌহযুক্ত অংশ বেগুণি আভা-বিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণে পরিণত হয়। বস্ত্রের অবশিষ্টাংশ এক প্রকার মলিন রক্তাভ পীতবর্ণ হইয়া যায়।

৬। সফেদি—রঞ্জিত বস্ত্রকে আবার ধুইয়া অমুদ্রিত অংশ হইতে বর্ণ অপসৃত করার প্রথার নাম 'সফেদি।' এতদর্থে বস্ত্র আবার নদীর ধারে লইয়া গিয়া জলের অব্যবহিত নিকটে তটের আর্দ্র বালুকার উপর বিছাইয়া দেওয়া হয়; কিন্তু তাহার পূর্ব্বে বস্ত্রকে ছাগল-বিষ্ঠার জলে ভিজাইয়া লওয়ার প্রথা বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। অন্যান্য পশ্বাদি অপেক্ষা ছাগল-বিষ্ঠাই বস্ত্র পরিষ্করণের অধিক উপযুক্ত বলিয়া লোকের বিশ্বাস। যাহা হউক, বায়ু ও শৈত্য সহযোগে সূর্য্যোত্তাপ অনেক পরিমাণে অমুদ্রিত অংশ সাদা করিবার সহায়তা করে। ছাগল-বিষ্ঠার অণু-লাল-শ্রেণীর উপাদান অসংযুক্ত বর্ণ নষ্ট করিতে এবং উক্ত বিষ্ঠার সোডা, ফস্ফেট, ট্যানিক, এসিড অপসৃত করিতে বিশেষ উপযোগী। এই সমুদয় অবস্থার সংযোগে কাপড় বেশ সাদা হইয়া যায়। ঋতুবিশেষে রৌদ্রের প্রাখর্য্যের তারতম্যে সফেদি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হইতে ৭ হইতে ১৫ দিন পর্য্যন্ত সময় লাগিতে পারে।

৭। 'কুণ্ডি' (Calendaring); সফেদি করা বস্ত্র এক এক খণ্ড লইয়া উহাকে যৎসামান্যভাবে আর্দ্র করিয়া ভাঁজ করা হয়। সূক্ষ্ম জলধারা মুখ-নিঃসৃত 'কুলীর' দ্বারা প্রয়োগ করাই শিল্পিগণের অভ্যাস। অতঃপর ভাঁজ করা কাপড়কে অর্দ্ধচক্রাকৃতি মসৃণ কাষ্ঠখণ্ড অথবা ২½ ফুট × ২ ফুট প্রস্তরের উপর রাখিয়া কাঠের মুগুর দ্বারা পেটা হয়। মুগুরগুলির মাথা গোল, ব্যাস প্রায় ৮ ইঞ্চি এবং দৈর্ঘ্য ১০ ইঞ্চি; উহার মধ্যস্থলে ৬ ইঞ্চি লম্বা দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত হাতল আছে। কাষ্ঠ অথবা প্রস্তরখণ্ডের দুই পার্শ্বে দুই জন লোক বসিয়া পর্য্যায়ক্রমে মুগুর চালাইতে থাকে। বস্ত্রখণ্ড যথেষ্ট নরম ও মসৃণ হইয়া গেলে আর কুণ্ডির আবশ্যক হয় না।

মুদ্রণ শিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বর্ত্তমান সময়ে মুদ্রণ-শিল্প বিক্ষিপ্ত, শৃঙ্খলারহিত ও নিরক্ষর শিল্পিগণের হস্তে ন্যস্ত

রহিয়াছে। উন্নত প্রথা প্রবর্ত্তনের এবং আবশ্যক জ্ঞান-প্রচারের কোন ব্যবস্থাই এখন নাই। ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, চলিত প্রথায় মুদ্রিত বস্ত্র একই স্থানে এক দল শিল্পী দ্বারা প্রস্তুত হয় না। বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন শ্রেণীর লোক দ্বারা সম্পাদিত হয়। যথা—সফেদি, কুণ্ডি ও ছাগল-বিষ্ঠা প্রয়োগ রজকের কার্য্য; কষাণ ও রাঙ্গান চামারগণই করে; মুদ্রণের কার্য্য জৈন ও চিপিজাতির প্রায় একচেটিয়া। এতদ্দ্বারা শুধুই যে অনর্থক অনেক সময় নষ্ট হয়, তাহা নহে। এক শ্রেণীর শিল্পীর সহিত আর এক শ্রেণীর কোন সম্বন্ধ না থাকায়, উৎপাদিত বস্ত্রও উৎকৃষ্ট এবং নির্দ্দিষ্ট গুণবিশিষ্ট হয় না। পূর্ব্বে যে সকল প্রক্রিয়ার উল্লেখ করা হইয়াছে, সেগুলির একটি না ভাল হইলে তৎপরবর্ত্তী প্রক্রিয়া দক্ষ শিল্পীর দ্বারা সম্পাদিত হইলেও যে ভাল হইবে না, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। ঠিক এই স্থানেই মুদ্রণ-শিল্পের উন্নতিসংঘটনের প্রধান অন্তরায়। যদি সকল শ্রেণীর কারিগরগণকে এক কারখানায় সমাবেশ করিতে পারা যায় এবং কারখানার তত্ত্বাবধানের ভার বস্ত্র-মুদ্রণ বিদ্যায় বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তির উপর অর্পণ করা যায়, তাহা হইলে অবশ্য মুদ্রণ-শিল্প অনেক উন্নতি লাভ করিতে পারে। কিন্তু শৃঙ্খলাস্থাপন ও সংগঠনের উপর এতদ্দেশীয় অনেক কারিগরেরই মজ্জাগত বিতৃষ্ণা আছে। কিছু দিন পূর্ব্বে মথুরায় প্রায় ৪ শত জৈন ও চিপি কারিগরকে একত্র করিয়া কয়েক জন ধনী একটি কারখানা স্থাপনের চেষ্টা করেন। সচরাচর জৈন ও চিপিগণের মধ্যে বড় একটা সৌহার্দ্দ দেখিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু কারখানার প্রস্তাব হওয়া মাত্রেই উভয় জাতিতে মিলিয়া স্থির করিল যে, তাহারা কারখানায় যাইবে না। ধনিগণ স্থানীয় লোক না পাইয়া অন্য স্থান হইতে লোক আমদানী করিতে বাধ্য হইলেন। তাহাতে খরচের মাত্রা বাড়িয়া গেল এবং কারখানাও লাভজনক হইল না।

২০।২৫ অথবা ৫০ জন কারিগর লইয়া ফরক্কাবাদে যে ক্ষুদ্র কারখানা ২।১টি স্থাপিত হইয়াছে, সেগুলির ভবিষ্যৎ বরং অধিক আশাপ্রদ। এরূপ কারখানায় অন্ততঃ আংশিকভাবেও কতিপয় উন্নত প্রথা প্রবর্ত্তিত করা সম্ভবপর। আপাততঃ যে সমস্ত বিষয়ে মনোযোগ প্রদান করা একান্ত প্রয়োজনীয়, এ স্থলে তন্মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করা যাইতেছে;—

(১) পুরাকালের নক্সাগুলি পরিত্যাগ করিয়া নূতন ধরণের ও আধুনিক রুচি অনুযায়ী নক্সা ব্যবহার; পুরাতন নক্সাসমূহের মধ্যে দুই চারিটির সামান্য পরিবর্ত্তন করিলে সুন্দর নক্সা পাওয়া যাইতে পারে।

(২) কাঠের ছাপের পরিবর্ত্তে সূক্ষ্ম কার্য্যের জন্য তাম্র-মণ্ডিত ও সাধারণ কার্য্যের জন্য নামদার ছাপ প্রবর্ত্তন করিলে সুদৃশ্য ছাপ উঠা সম্ভবপর হইবে।

(৩) রঞ্জন প্রক্রিয়ার পূর্ব্বে বিষ্ঠা-প্রয়োগ; এতদ্দ্বারা ট্যানিক এসিড নষ্ট হইয়া অধিকতর উজ্জ্বলবর্ণ উৎপাদিত হইতে পারে।

(৪) সফেদি করার প্রক্রিয়ার পূর্ব্বাংশ ঠিক রাখিয়া উত্তরাংশে বস্ত্রকে বর্ণহীন করিবার দ্রাবণে ধুইয়া লইলে এক দিকে যেমন অনেক সময় বাঁচিয়া যাইবে, অন্য দিকে তেমনই বস্ত্রের অমুদ্রিত অংশ আরও শুভ্র হইয়া মুদ্রিত বস্ত্রের শোভাবর্দ্ধন করিবে। অধিকন্তু বিবর্ণ করিবার দ্রাবণ ব্যবহার করিলে বৎসরের সকল সময়েই সমভাবে মুদ্রণকার্য্য চলিতে পারিবে। জল, হাওয়া ও রৌদ্রের খাম-খেয়ালীর উপর শিল্পীকে নির্ভর করিতে হইবে না।

ইতঃপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বস্ত্রমুদ্রণ ভারতের একটি প্রাচীন শিল্প। শতাব্দীর পর শতাব্দীর নানা পরিবর্ত্তনের মধ্যেও ইহা এখনও জীবিত আছে, যদিও অবস্থা ক্ষীণ। সুখের বিষয় এই যে, ভারতবাসী মুদ্রিত বস্ত্র এখনও ভুলিতে পারে নাই। ভারতের বাহিরে যে যে স্থানে ভারতবাসী আছে, সেই সকল স্থানেই মুদ্রিত বস্ত্র চালান হয়। বৎসরে ১০ লক্ষ টাকার অধিক মূল্যের ভারতীয় মুদ্রিত বস্ত্র কেনিয়া, জাঞ্জিবার, পর্ত্তুগীজ—পূর্ব্ব-আফ্রিকা, মরিচদ্বীপ, শ্যাম, বেরিন দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি দেশে চালান যায়। মেসোপোটেমিয়া, পারস্য, সিংহল ৮০ লক্ষ টাকার অধিক মূল্যের বস্ত্র লয়; কিন্তু ষ্ট্রেট সেট্‌লমেণ্টই ভারতীয় মুদ্রিত বস্ত্রের সর্ব্বপ্রধান ক্রেতা; উক্ত দেশে মুদ্রিত বস্ত্র রপ্তানীর পরিমাণ দেড় কোটি টাকারও বেশী। ফলতঃ ভারতের ভিতরে ও বাহিরে এখনও পর্য্যন্ত মুদ্রিত বস্ত্রের যে চাহিদা আছে, তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, রীতিমতভাবে চেষ্টা করিলে অদূর-ভবিষ্যতে ভারতীয় মুদ্রিত বস্ত্র-শিল্প সুদৃঢ়ভাবে সংস্থাপিত হইয়া ভারতবাসিগণের অন্নসংস্থানের অন্যতম উপায় হইতে পারে।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

জয়যাত্রা

(গল্প)

প্রথম পরিচ্ছেদ

রেলের মোট

বেলা প্রায় ১০টা বাজে। রাণাঘাট-লোক্যাল পল্‌তা ষ্টেশনে থামিতে ইন্‌টার ক্লাশ কম্পার্টমেণ্টে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। স্থূল বপু লইয়া এক ভদ্রলোক কামরার কোণে বসিয়া ছিলেন, তিনি একটা ব্যাগ হাতে লইলেন ও পার্শ্ব-বর্ত্তিনী এক কিশোরীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"ঐ গাঁটরিটা নিয়ে নেমে পড় রে মেনি দেরী করিস্‌নে। গাড়ী এখানে বেশীক্ষণ দাঁড়াবে না।"

যাহাকে সম্বোধন করিয়া কথাটা বলা হইল, সেই কিশোরী গাঁটরিটাকে বিপুল বলে আকর্ষণ করিয়া যখন কামরার দ্বারের কাছে আসিল, তখন সেই স্থূলবপু ভদ্রলোক ব্যাগ হস্তে গাড়া হইতে প্লাটফর্ম্মে নামিয়া পড়িয়াছেন। দ্বারের কাছে এক তরুণ যাত্রী খবরের কাগজের মধ্যে এমন মনঃসংযোগ করিয়া পা ছড়াইয়া বসিয়াছিল যে, কিশোরী মেনি একটু বিপদে পড়িল। গাঁটরি ঠেলিতে গেলে তাঁহার পায়ে আঘাত লাগিবার যথেষ্ট আশঙ্কা। অথচ কি বলিয়া যে এ দিকে তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিবে, তাহাও সে ভাবিয়া পাইল না। সে ভাবিতেছিল চোখের পলকমাত্র। বাহির হইতে স্থূল বপু হাকিলেন, "থমকে দাঁড়িয়ে পড়লি যে! ভ্যালা মেয়ে, বাবা! ও দিকে ঘণ্টা পড়লো—নাম্‌, নাম্‌।"

প্লাটফর্ম্মে গাড়া ছাড়ার ঘণ্টা পড়িল। যে তরুণ যাত্রী খবরের কাগজ পড়িতেছিল, তাহার চমক ভাঙ্গিলে সে দেখিল, কিশোরী সঙ্কোচ ভরে দাঁড়াইয়া, আর তাহার পায়ের কাছেই একটি গাঁটরি। প্লাটফর্ম্ম হইতে হুঙ্কার আসিল,—সঙ্‌ হয়ে দাঁড়িয়ে রৈলি যে, রাণাঘাট যাবি না কি?"

তরুণ যাত্রীটি ব্যাপার বুঝিয়া কিশোরীকে কহিল,—"আপনি নামুন, আমি গাঁটরি নামিয়ে দিচ্ছি।"

কিশোরী নামিল, তরুণও গাঁটরি হাতে লইয়া নামিবামাত্র ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। প্লাটফর্ম্মটি বেশ নীচু—গাঁটরি নামাইয়া ট্রেণে উঠিতে যাইবে, এমন সময় ষ্টেশন-মাষ্টার কহিলেন,—"অমন কায করবেন না, ষ্টেশনে এ্যাসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব এসেছেন ইন্‌স্‌পেক্‌শনে। আমার চাকরীটি যাবে তা হ'লে মশায়!"

"কিন্তু আমার লগেজ যে ট্রেণে রইলো।"

সে কথা কে শোনে! ষ্টেশন-মাষ্টার তখন তাহার হাত-খানি বেশ বাগাইয়া ধরিয়াছেন।

নিরুপায়! ট্রেণ প্লাটফর্ম্ম ছাড়াইয়া গেলে ষ্টেশন মাষ্টার কহিলেন, "আপনি কোথায় যাচ্ছিলেন?"

"রাণাঘাট। আমার একটা হাতব্যাগ রয়ে গেল যে গাড়ীতে। তা ছাড়া লগেজের ফরোয়ার্ডখানা"

ষ্টেশন-মাষ্টার একটু অপ্রতিভ হইলেন; হাসিয়া কহি-লেন,—"আচ্ছা, আমি এখনই তার ক'রে দিচ্ছি ইছাপুর ষ্টেশনে, তারা নামিয়ে রাখবে'খন। তার পর বলেন ত কাঁচড়াপাড়া লোক্যালে পাঠিয়ে দেবে—এক ঘণ্টার ওয়াস্তা!"

তরুণ কহিল,—"বেশ, তাই ক'রে দিন—চলুন।"

ইছাপুরে ব্যাগের জন্য তার করা হইলে তরুণ কহিল,—"দেখুন দিকি, কি মুস্কিলে ফেললেন। তার পর রাণাঘাটের ট্রেণ কখন্‌ পাব জানি না—সেখানে গিয়ে আমায় স্নানাহার করতে হবে।"

ষ্টেশন-মাষ্টার কহিলেন,—"পল্‌তা থেকে রাণাঘাট যেতে হ'লে বিকেল পাঁচটার আগে ট্রেণ পাবেন না।"

তরুণ কহিল—"বলেন কি, মশায়?"

ষ্টেশন-মাষ্টার কহিলেন,—"তবে, হ্যাঁ, নিরুপায় হবার মত অবস্থা নয়। এই যে ডাউন কাঁচড়াপাড়া লোক্যাল আসছে, এতে ক'রে বারাকপুরে যেতে পারেন, তার পর সেখান থেকে বেলা পৌনে দুটোয় যোগবানি-প্যাসেঞ্জারে রাণাঘাট যেতে পারেন।"

"—রাণাঘাটে পৌঁছুবো কখন্?"

দেওয়ালে-আঁটা টাইম-টেবল দেখিয়া ষ্টেশন মাষ্টার কহিলেন,—"বেলা চারটে।"

তরুণ দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া কহিল—"চমৎকার!"

কথাটা বলিয়া ষ্টেশনের বাহিরে বেঞ্চের উপর সে বসিল, ঘড়ীতে তখন দশটা বাজিতে ঠিক ১০ মিনিট।

হঠাৎ ষ্টেশন কম্পাউণ্ডের ওদিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল। সেই স্থূল-বপু পুরুষ ও তাঁহার সঙ্গে সেই কিশোরী বালিকা চলিয়াছে। পুরুষটার হাতে ছোট হাত-ব্যাগ, আর কিশোরী সেই গাঁটরিটা একবার এ-হাতে, পরক্ষণে ও-হাতে লইয়া হেলিয়া অতিকষ্টে ঢিপি-ঢাপা-ওয়ালা বন্ধুর পথ অতিক্রম করিতেছে।

তরুণের মাথায় রক্তস্রোত উছলিয়া উঠিল। পাষণ্ড বর্ব্বর! অতখানি ভুঁড়ি লইয়া জোয়ান পুরুষ অবলীলায় পথ চলিয়াছে, আর ঐ শীর্ণ ক্ষুদ্র বালিকাকে দিয়া একটা কুলীর মোট বহাইতেছে! শুধু তাই? বালিকা বোঝার ভারে মাঝে মাঝে হাঁপাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িতেছে, আর বর্ব্বরটা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মুখ খিঁচাইয়া তাহাকে কর্কশ ভর্ৎসনায় আরও উৎপীড়ন করিতেছে! রাগে তরুণের আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল! এ জাতের কখনও মঙ্গল হইবে? এতখানি স্বার্থপর, আত্মপরায়ণ—পরকে দরদ জানাইতে চায় সভায় বক্তৃতা দিয়া! ঐ হতভাগাটা নিশ্চয় ঐ বালিকার পিতা—যদিও চেহারা দেখিয়া অনুমান করা যায় না। কিন্তু এতখানি আস্ফালন···বাঙ্গালী পুরুষ ফলাইতে পারে এক স্ত্রীর কাছে, নয় কন্যার কাছে, নয় ত আশ্রিতা বিধবা ভগিনীর উপর! ছি! একটা কুলী ক'পয়সা লইত! গাঁটরিটা ভারীও ত কম নয়! সে নিজেই বহিয়া প্লাটফর্ম্মে নামাইতে গিয়া যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছে। আর ঐ ভারী মোট অম্লান অকুণ্ঠিত চিত্তে ঐ একফোঁটা মেয়েটার ঘাড়ে তুলিয়া দিয়া লক্ষ্মীছাড়া আরামে চলিয়াছে!

কিছু দূরে তারের বেড়া। পুরুষ বেড়ার ফাঁক দিয়া গলিয়া ও-ধারে পথে উঠিল। মেয়েটি···? বেচারী! জমীর উপর গাঁটরি নামাইয়া বুঝি দম লইতেছে! তরুণ আর থাকিতে পারিল না। সে দ্রুতপায়ে বালিকার দিকে অগ্রসর হইয়া চলিল। কিশোরী তখন গাঁটরিটা দুই হাতে ধরিয়া তারের বেড়ার মধ্য দিয়া গলাইবার চেষ্টা করিতেছে। আর পুরুষ? সিংহ-বিক্রমে অনেকখানি আগাইয়া গিয়াছে, পিছনে ফিরিয়া তাকায়ও না। আশ্চর্য্য!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মহাত্মা গন্ধীর আদেশ

তরুণ কিশোরীর কাছে আসিয়া কহিল,—"একটা কথা আছে—শুনছো?"

কিশোরী বিস্ময়ে সঙ্কোচ-ভরা দৃষ্টিতে তরুণের পানে চাহিল। তরুণ দেখিল, মেয়েটি—ইহাকে ঠিক বালিকা বলা চলে না—রৌদ্রের ঝাঁঝে মুখখানি রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে, কপালের উপর একরাশ খোলা চুল উড়িয়া পড়িয়া ঘামে ভিজিয়া আঁটিয়া গিয়াছে। মেয়েটির সীঁথিতে সিন্দুরের স্পর্শ নাই। একরাশ লাবণ্য—চোখের দৃষ্টিতে কেমন একটি শ্রী—সুমধুর, আর কি আশ্চর্য্য সরলতা! তরুণ কবি নয়, তবু তাহার মনে হইল, কবিরা যে মৃগ-নয়নার কল্পনা করেন, এ বুঝি এমনই চোখ দেখিয়া! সে কহিল,—"তোমার গাঁটরি দাও। আমি নিয়ে যাচ্ছি,—ছেলেমানুষ, ভারী গাঁটরি নিয়ে যেতে পারবে কেন?"

বালিকা বিপদে পড়িল; সামনের চলন্ত পুরুষটির পানে একবার কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া সে কহিল,—"আমি পারবো।"

তরুণ হাসিল। হাসিয়া কহিল,—"তুমি পারছো না দেখেই আমি বলছি। তা ছাড়া ছেলেমানুষ, তুমি এই ভারী মোট বয়ে নিয়ে যাবে, আর আমি জোয়ান পুরুষ হয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখবো, এ হতেই পারে না।"—বলিয়া সে অগ্রসর হইয়া গাঁটরিটায় হস্তক্ষেপ করিল। বালিকা সরিয়া আসিল। তরুণ কহিল,—"ষ্টেশনে ত কুলী ছিল, এক জন কুলীর মাথায় মোটটা দিলেই ঠিক হতো!"

বালিকা নতমুখে কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিল,—"আমাদের বাড়ী বেশী দূর নয়।" এই কথাটুকু বলিয়াই

সে স্থূল-বপুর দিকে চাহিল। তরুণ সে দৃষ্টি লক্ষ্য করিল; সে দৃষ্টিতে অনেকখানি বিভীষিকা মাখানো ছিল।

তরুণ তবু বিচলিত হইল না। সে কহিল, "দেখো, তুমি মহাত্মা গন্ধীর নাম জানো, নিশ্চয়ই! তুমি ত খবর রাখো, দেশে পরস্পরের পরস্পরকে সাহায্য করার জন্ম মহাত্মা গন্ধী কি রকম সকলকে উপদেশ দিচ্ছেন। আর এই রকম মোট বওয়ার কাযে তিনি আমাদের আরও বেশী সাহায্য করতে বলেছেন। তাঁর কথাটা রেখেও নয়—"

বালিকা তরুণের পানে চাহিয়া আবার মুখ নত করিল। তরুণ কহিল,—"ওঁকে ভয় করছো? তোমার বাবা ত—"

বালিকা আপত্তি তুলিয়া কহিল,—"বাবা নন, আমার মামা।"

তরুণ কহিল,—"তাই বল। বাপ হ'লে কখনও এ কষ্ট মেয়েকে দিতে পারে? তোমার মামা! কিন্তু, তুমি রাগ করো না, আমি সত্যি কথা বলছি, তোমার মামা ভারী স্বার্থপর।"

বালিকার রৌদ্র-রাঙ্গা মুখের উপর ভয়ের এমন কালিমা নিমেষে নামিল যে, সে একবারে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। হাসিয়া তরুণ কহিল,—"ভয় নেই, উনি শুনতে পাবেন না। চলো, তোমার মোট নিয়ে যাই। উনি যদি কিছু বলেন, আমি জবাব দেবো, মহাত্মা গন্ধীর শিষ্য আমি। তাঁর আদেশে আমি দুর্ব্বল ট্রেণ-যাত্রীদের মোট বয়ে দি। উনি বিশ্বাসও করবেন। দেখছো ত আমার পরনে খদ্দর।"

বালিকা দেখিল, তাই বটে। তরুণকে নাছোড়বান্দা দেখিয়া বালিকা অগত্যা নিরুপায় হইয়া হাল ছাড়িয়া দিল। তরুণ গাঁটরিটা পিঠে তুলিয়া লইয়া কহিল,— "এতে কি আছে?"

বালিকা কহিল,—"বই।"

বই! তরুণ বিস্মিত হইল। এই পাড়াগাঁয়ে বইয়ের বোঝা লইয়া এ পাষণ্ড করে কি! এত বড় পণ্ডিত···!

বড় রাস্তায় পড়িয়া সামনেই এক তেমাথা। ধারের সরু পথ ধরিয়া তরুণ বালিকার পিছনে চলিল। চারদিকে একটা ছোট বাগান—বাগানে কতকগুলা আম ও লিচুর গাছ। থলো থলো ফল ধরিয়াছে।

তরুণ কহিল,—"তুমি বুঝি মামার বাড়ীতে থাকো। তোমার বাবা মা—"

বালিকা কহিল, "স্বর্গে।"

ছোট্ট কথাটুকু! কিন্তু কথার পিছনে কতখানি বেদনা! অদূরে গাছে কি একটা পাখী ডাকিতেছিল—বড় করুণ সুর! তরুণের মনে হইল, মুহূর্ত্তে যেন পৃথিবীর বাতাস স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে! একটা স্তম্ভিত হাহাকার যেন ঐ দীপ্ত প্রখর রৌদ্রের রশ্মিতে লাল টক্‌টক্ করিতেছে।

তরুণ এই করুণ স্তম্ভিত ভাবটাকে উড়াইয়া দিবার জন্ম সবিস্ময়ে কহিল,—"এত বই নিয়ে তোমার মামা কি করবেন?"

বালিকা কহিল,—"মামার বইয়ের দোকান ছিল—এখনও পুরোনো বইয়ের ব্যবসা করেন।"

তরুণ কহিল,—"দোকান এখন নেই যদি ত এ পুঁটলি কি হবে?"

বালিকা কহিল,—"এক জন অর্ডার দিয়েছেন, বড়-লোক...তাঁর জন্য—"

তরুণ কহিল,—"ওঃ, তাই কিনে এনেছেন সেই খদ্দেরের জন্মে।"

বালিকা কহিল,—"হাঁ।" একটু স্তব্ধ থাকিয়া পরক্ষণে আবার সে কহিল,—"আপনিও বুঝি পলতায় থাকেন?"

তরুণ কহিল, "না।"

বালিকা কহিল,—"কোথায় তবে যাবেন এখানে? কাদের বাড়ী?"

তরুণ কহিল,—"আমি রাণাঘাট যাচ্ছিলুম। ওখানে আমার এক বন্ধুর বিয়ে হচ্ছে, তারই বৌভাতের খাওয়া আজ—আমার বিশেষ বন্ধু, দু'দিন থাকবার ইচ্ছাও আছে।"

বাধা দিয়া বালিকা কহিল, "তবে এখানে নামলেন যে?"

তরুণ কহিল,—"ইচ্ছা ক'রে নামিনি। তোমার এই মোট নামাতে যেই প্লাটফর্ম্মে নেমেছি, অমনি ট্রেণও ছেড়ে দিলে—উঠতে গেলুম, ষ্টেশন-মাষ্টার উঠতে দিলে না! তার পর শুনলুম, বেলা সেই পাঁচটার আগে আর দ্বিতীয় ট্রেণ নেই রাণাঘাট যাবার। কাযেই এ বেলায় পলতায় অবস্থিতি—"

বালিকা কহিল,—"এখানে কারুও সঙ্গে জানা-শোনা নেই আপনার?"

হাসিয়া তরুণ কহিল,—"তোমার সঙ্গে এই জানা-শোনা ত হলো।"

বালিকা অপ্রতিভভাবে কহিল,—"তা হ'লে কোথায় খাবেন?"

তরুণ হাসিয়া কহিল,—"কেন, তোমাদের বাড়ী! তোমার মামা দুটি খেতে দেবেন না?"

বালিকা কিছুক্ষণ কোন জবাব দিল না।

তরুণ কহিল,—"আমি বেশী খাই না। তোমার মামা ব্রাহ্মণ?"

বালিকা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

তরুণ কহিল,—"ওঁর নাম?"

বালিকা কহিল,—"শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।"

তরুণ কহিল,—"তবে আর কি, অন্ন মিলবেই। আমিও ব্রাহ্মণ।"

বালিকা যেন একটু ভাবনায় পড়িল। অতি কষ্টে কহিল,—"মামা ভারী কৃপণ।"

তরুণ কহিল,—"তোমার ভয় নেই। তোমাদের মোট পৌঁছে দিয়ে আমি কোন দোকানে গিয়ে কিছু খাবার কিনে খাব'খন।"

বালিকা কোন জবাব দিল না। এ সম্বন্ধে প্রতিবাদ বা অনুমোদন করিবার সামর্থ্য তাহার ছিল না। সে নীরবে চলিতে লাগিল। আরও একটা গলি-পথে গিয়া বালিকা কহিল,—"আপনার জিনিষপত্র সঙ্গে নেই?... ষ্টেশনে রেখে এলেন বুঝি?"

তরুণ কহিল,—"না। জিনিষপত্রের মধ্যে একটা ব্যাগ ছিল, আর খবরের কাগজ, সেগুলো গাড়ীতেই প'ড়ে রইল।"

বালিকা বিস্ময়ে চমকিয়া কহিল,—"গাড়ীতে—তা হ'লে উপায়?"

তরুণ কহিল,—"ষ্টেশন-মাষ্টার পরের ষ্টেশনে তার ক'রে দেছেন, তারা পাঠিয়ে দেবে। ব্যাগে আমার নাম লেখা আছে। ভালো কথা, তোমার সঙ্গে এত কথা কয়ে যাচ্ছি, কিন্তু তোমার নামটি এখনও জিজ্ঞাসা করি নি। তোমার মামা ত মেনি ব'লে ডাকলেন,·· তোমার ভাল নাম?"

বালিকা কহিল,—"নীলিমা দেবী।"

তরুণ কহিল,—"বেশ নাম ত।"·········

অদূরে ক্ষুদ্র লোকালয়। বালিকা একখানা একতলা বাড়ীর দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া কহিল,—"ঐ আমাদের বাড়ী। এবারে ওটা আমায় দিন—এটুকু আমি নিয়ে যেতে পারবো।"

তরুণ কহিল,—"চল, তোমার বাড়ী আমি দিয়ে আসি। মোদ্দা, তোমার মামা বেশ লোক ত! একরত্তি মেয়ের ঘাড়ে মোট চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে চ'লে গেলেন!"

নীলিমা কহিল,—"আমি প্রায় মোট নিয়ে যাই ষ্টেশন থেকে। বই পৌঁছে দিয়েও আসি।"

—"বটে! বাড়ীতে ঝি-চাকর নেই বুঝি?"

—"না।"

—"তা হ'লে অন্য কায-কর্ম্মও সব তোমাকেই করতে হয়?"

নীলিমা এ কথার কোনও জবাব দিল না। তরুণ কহিল,—"আজ কোথা থেকে আসছিলে?"

নীলিমা কহিল,—"কলকাতা থেকে।"

তরুণ কহিল,—"তোমায় দিয়ে এই বইয়ের বস্তা কলকাতা থেকে বইয়ে আনিয়েছেন?"

নীলিমা কহিল,—"না।"

—"তবে তোমায় কলকাতায় নিয়ে গেছলেন যে?"

নীলিমা জবাব দিল না। তাহার মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। তরুণ ভাবিল, লজ্জা! কিন্তু এ ব্যাপারে লজ্জার কি আছে!

আর একটু অগ্রসর হইতেই সামনে নীলিমাদের বাড়ী। দেওয়ালের ইট হইতে বালি-চূণ খসিয়া গিয়াছে। নীলিমা বহু মিনতি করিয়া বইয়ের মোট স্বহস্তে লইল, লইয়া দ্বারের সামনে আসিল। দরজার পরেই একটু উঠান, উঠানে বরবটী, লঙ্কা, বেগুনের গাছ, এক কোণে একটা কল্কে ফুলের গাছে হলুদ রঙ্গের অজস্র ফুল ফুটিয়াছে। বাড়ীর সম্মুখে মাতুল দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি হাঁকিলেন,—"তোর রকম কি রে মেনি! এত দেরী! কোন কর্ম্মের নোস্—যা, বইগুলো আমার ঘরে রেখে শীগ্‌গির দোকান থেকে এক পয়সার চিনি নিয়ে আয় দিকিনি—গলাটা শুকিয়ে গেছে, একটু সরবৎ খেতে হবে।"

নীলিমা গৃহমধ্যে ঢুকিলে মামা তাহার অনুগমন করিলেন। তরুণ বাড়ীর সামনে পথে দাঁড়াইয়া এ কথাটুকু শুনিল।

তাহার বুকের মধ্য হইতে একটা নিশ্বাস ছুটিয়া বাহির হইল। মনে মনে সে কহিল, অনাথা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পলতা ষ্টেশন

বিজয় চক্রবর্ত্তীর গৃহের অনতিদূরে পথের বাঁকে মস্ত এক তেঁতুল-গাছ। গাছের তলায় সুদীর্ঘ ছায়া বিস্তারিত হইয়াছে। তরুণ আসিয়া সেই ছায়ায় দাঁড়াইল, দৃষ্টি চক্রবর্ত্তীর সদরে ন্যস্ত।

অনতিকাল পরে নীলিমা দ্বার পার হইয়া পথে আসিল এবং তেঁতুলগাছের সামনে দিয়া যে সরু মেটে পথ পশ্চিমে গিয়াছে, সেই পথে চলিল। সেখানে জন-প্রাণীর চিহ্ন নাই। নীলিমা একটু অগ্রসর হইয়া গেলে তরুণ পথের মোড়ে দাঁড়াইয়া তাহার দিকে চাহিয়া তাহার গতি লক্ষ্য করিল। নীলিমা খানিকটা দূরে গেলে তরুণ ধীর-পায়ে গলির পথে অগ্রসর হইল। একটা উড়ে মালী একখানি গামছায় বাঁধিয়া কতকগুলি জামরুল লইয়া আসিতেছিল। তরুণের কণ্ঠ পিপাসায় শুষ্ক হইয়া উঠিয়াছে। মালীকে কাছে ডাকিয়া তাহাকে পয়সা দিয়া সে কয়েকটা জামরুল কিনিল এবং সেই জামরুল চিবাইতে চিবাইতে নীলিমা যে পথে গিয়াছে, সেই পথে তেমনই ধীর-পায়ে অগ্রসর হইতে লাগিল।

বাঁ-দিকে টিনের ছাদ দেওয়া একটা মেটে ঘর। সেই ঘরে মুদি তাহার দোকান পাতিয়াছে। নীলিমা দোকান হইতে চিনি লইয়া গৃহের পথে ফিরিতেছিল; তরুণকে দেখিয়া একবার চারিদিকে চাহিয়া লইল, তাহার পর কহিল, —"এই রোদে ঘুরছেন এখনও? ও কি, জামরুল?"

তরুণ হাসিয়া কহিল,—"হ্যাঁ, বড্ড তেষ্টা পেয়েছিল, তাই জামরুল কিনে খাচ্ছি।"

নীলিমা কহিল,—"জল এনে দেবো?"

তরুণ হাসিয়া কহিল,—"না, এইতেই বেশ তেষ্টা মিটছে।"

নীলিমা কহিল,—"কোথায় খাবেন আপনি?"

তরুণ কহিল,—"ভগবান্ যেখানে জুটোবেন।"

নীলিমা কহিল,—"ভগবান্ ত মুখে অন্ন তুলে দেবেন না। তিনি হাত-পা দিয়েছেন মানুষকে—মানুষ অন্ন যোগাড় ক'রে নেবে।"

তরুণ কহিল,—"[illegible] করলে হয় না? আমি ঐ তেঁতুলতলায় ব'সে থাকি গে,—তুমি দুটি ভাত এনে দিতে পারবে না?"

নীলিমা ভীত হইল, চকিত হইল। তাহার মত অসহায়ের কাছে অন্ন চাওয়া শুধু তাহাকে বিপদে ফেলা বৈ ত নয়। মামার সজাগ পাহারা, মামীর সতর্ক দৃষ্টি—নহিলে ভাবনা কি ছিল! কোথায় পাইবে? নিজে না খাইয়া সেই অন্ন নয় আনিয়া দিত! যে দরদ—যে মমতার পরিচয় সে এইমাত্র পাইয়াছে, তাহার বিনিময়ে কৃতজ্ঞতা কি তাহার কিছু নাই? কিন্তু সে কতখানি নিরুপায়, কি অসহায়! তাহার বুকটা দুঃখে ক্ষোভে ভাঙ্গিয়া যাইবার মত হইল, চোখের কোণে এক রাশ অশ্রু যেন ঠেলিয়া আসিয়াছিল, অতি কষ্টে সে অশ্রুর বেগ সে রোধ করিল। তরুণ বুঝিল, বুঝিয়া কহিল,—"অন্নদান করতে অসুবিধা হবে, তা আমি বুঝেছি। তুমি ভেবো না, লক্ষ্মি! আমি অন্নের কাঙ্গাল একটুও নই, দোকানে মুড়ি-মিষ্টি যা পাই, খেয়েই কাটিয়ে দেবো।"

নীলিমা কহিল,—"তার পর পাঁচটা অবধি এই পথে পথেই কাটাবেন?"

তরুণ কহিল,—"মন্দ লাগছে না। সহরে থাকি, পল্লীর এই রৌদ্র,ছায়া, পাখীর ডাক, বনের গন্ধ আমার ভাল লাগছে। ঘুরে ঘুরে পলতা গ্রামখানা দেখে ফেলা যাক্, সময় কেটে যাবে।"

নীলিমা কহিল,—"আপনি ষ্টেশনে থাকুন গে,—ষ্টেশন-মাষ্টার বাবুটি লোক ভাল। ওঁর এক মেয়ে আছে মলিনা। আমার সঙ্গে তার খুব ভাব।...ওঁদের বাড়ী খাবেন আপনি?"

তরুণ কহিল, "না না, এত বেলায় কাকেও আমি বিব্রত করতে চাই না। তুমি ব্যস্ত হ'ও না, বাড়ী যাও। তোমার মামার আবার সরবৎ না হ'লে গরম মেজাজ ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। ভারী স্বার্থপর লোক। এই রোদে তুমিও ত কষ্ট পেয়েছ বাপু, তা গ্রাহ্যও নেই, আবার পাঠালে এক পয়সার চিনি আনতে!"

নীলিমা অগ্রসর হইয়া চলিল। তেঁতুলতলায় পৌঁছিলে শুনিল মামার হুঙ্কার—"মেনি, ওরে মেনি!" "ঐ মামা ডাকছেন", বলিয়া নীলিমা ভয়ে নীলমূর্ত্তি হইয়া গতি ক্ষিপ্রতর

নটীর পূজার অভিনয়ের একটি দৃশ্য মহ মহ ভক্ষু শ্রীম চ ও রাজনন্দিনীগণ

ফটো-শিল্পী—শ্রীঅলকেন্দ্রনাথ ঠাকুর

রিয়া দ্বারের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর অতি করুণদৃষ্টিতে তরুণের পানে চাহিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "আপনি চ'লে যান—এখানে দাঁড়াবেন না"—কথাটা বলিয়াই সে উত্তরের জন্য প্রতীক্ষামাত্র না করিয়া গৃহাভ্যন্তরে অদৃশ্য হইয়া গেল।

ঐ নিষেধটুকুর মধ্যে যে কতখানি মিনতি ঝরিয়া পড়িল, তরুণ তাহা বুঝিল। আরও বুঝিল, এ মিনতির অপর দিকে কতখানি বে-দরদ, আর নির্ম্মমতা কঠিন পাষাণ-শিলার মত খাড়া আছে। এখন উপায় কি?—সে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ঘড়ি খুলিল—ডাউন ট্রেণের সময় হইয়াছে। তাহার ব্যাগ—ঐ যে একটা শব্দ—ট্রেণ আসিয়া পড়িয়াছে! তরুণ ষ্টেশনের দিকে চলিল।

ষ্টেশনে আসিয়া যখন সে পৌঁছিল, ট্রেণ তখন প্লাটফর্ম ছাড়াইয়াছে। ষ্টেশন-মাষ্টার তাহাকে দেখিয়া বলিল, "কোথায় গেছলেন আপনি? আপনার ব্যাগ এসেছে।"

তরুণ কহিল, "আপনার জিম্মাতেই দয়া ক'রে আপাততঃ রাখুন।"—বলিয়া সে প্লাটফর্ম্মের বেঞ্চে বসিল। বসিবামাত্র তাহার সমস্ত চিন্তা ঐ নীলিমাকে ঘিরিয়া প্রচণ্ড বেদনায় আর্দ্র হইয়া উঠিল। একটা কথা ঠিক যে, নীলিমা মেয়েটি বেশ, তবে সে বড় কষ্টে আছে। এই বয়সে মা-বাপ হারাইয়া এক বর্ব্বর মাতুলের ঘরে দাসীপনা করিয়া কাল কাটাইতেছে। দাসী কি! দাসীর অধম—নেহাৎ বেচারি! কি করিলে এই মেয়েটির দুঃখ দূর করা যায়? মামাকে দুই কথা শুনাইয়া দেওয়া—তাহাতে ফল বিপরীত দাঁড়াইবে। সে ভাবিল, এ লোকগুলা কি—একটা ছোট অসহায় মেয়েকে একটু দরদের চোখে দেখা কি এতই কঠিন?

ষ্টেশন-মাষ্টার হুঁকা-হাতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কহিলেন, "আপনি কোন্ ট্রেণে যাওয়া স্থির করলেন?"

তরুণ কহিল, "কিছুই স্থির করতে পারি নি—তাই ভাবছিলুম।"

ষ্টেশন-মাষ্টার অবাক্ হইলেন। এই খদ্দরপরা ইয়ংমেনদের সবই কি অদ্ভুত! সব কাযই খেয়ালে করা!

তরুণ কহিল, "আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করতে এলুম, আপনার অবসর আছে?"

ষ্টেশন-মাষ্টার কহিলেন, "আছে।"

তরুণ কহিল, "এই গ্রামের বিজয় চক্রবর্ত্তীকে আপনি চেনেন?"

ষ্টেশন-মাষ্টার কহিলেন, "বিলক্ষণ চিনি।"

তরুণ কহিল, "উনি কি করেন?"

ষ্টেশন-মাষ্টার কহিলেন, "ওঁর বইয়ের দোকান ছিল—দুষ্প্রাপ্য বই ঢের ছিল তাই বেচে কিছু পয়সাও করেছেন—পলতাতেই বাড়ী- এখনও দুষ্প্রাপ্য বই সংগ্রহ ক'রে বেশ চড়া লাভে বিক্রী করেন।"

তরুণ কহিল, "বইয়ের কারবার ক'রেও এমন বর্ব্বর! ঐ এক ফোঁটা মেয়েটাকে এত কষ্ট দেন—ওকে দিয়ে অমন ভারী মোট বইয়ে নিয়ে গেলেন—বামুন, না চামার?"

রাগে তাহার চোখ জ্বলিয়া উঠিল। বেঞ্চের এক পাশে ষ্টেশন-মাষ্টার বসিলেন, হুঁকায় কয়টা টান দিয়া তরুণের পানে চাহিয়া কহিলেন, "তামাক ইচ্ছা করেন?"

তরুণ কহিল,—"তামাক আমি খাই না।"

ষ্টেশন-মাষ্টার আরও দুটা টান দিবার পর আগুনটুকু নির্ব্বাপিত হইলে কুলীর হাতে হুঁকা দিয়া কহিলেন,—"আহা! বেচারি! মেয়েটি বড় ভালো। আমার মেয়ের কাছে আসে। দেড় বছর হলো, মেয়েটির মা-বাপ দুই মারা যায়। বাপ কলকাতার কোন স্কুলে হেড মাষ্টার ছিলেন, বিদ্বান্ লোক। ঐ একটি মেয়ে। মেয়েটিকে খুব যত্নে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন, মেয়েটি ইংরাজী জানে, সংস্কৃত জানে। সংস্কৃত মোহমুদ্গর থেকে এমন সুন্দর বাঙলা তর্জ্জমা করেছে—তাও পয়ারে। খাসা মেয়ে!...তা মেয়েটিকে দিয়ে রান্না-বান্না বাসন মাজানো সবই করান।"

বাধা দিয়া তরুণ কহিল, "দরকার হ'লে কুলীর মোটও তাকে দিয়ে বওয়ান—তাও এই একটু আগে দেখলুম।"

ষ্টেশন-মাষ্টার কহিলেন,—"হাঁ, আমি একবার ষ্টেশনে কুলী দিয়ে মোট নেওয়াচ্ছিলুম, তা চক্রবর্ত্তী মশায় চ'টে গেলেন, বললেন, এইটুকু পথ, কুলীর পয়সা দিতে পারবো না, পয়সা এত সস্তা নয়। মেয়েমানুষ মোট বইবে বৈ কি! না হ'লে শরীর শক্ত হবে কেন? উড়ে আর সাঁওতালদের মেয়েরা বয়—তাদের শরীরও কেমন মজবুৎ! কলকাতার ঐ পুঁয়ে-রোগা অপদার্থ বাবু মেয়ে দু'চোখের বিষ, ওদের জন্তেই ত সমাজ উচ্ছন্ন যেতে বসেছে।"

রাগে তরুণ জ্বলিয়া উঠিল, কহিল,—"বটেই ত

অত বড় দুধো শরীর তুমি না হ'লে গ'ড়ে তোলো! যাক্, তার পর?"

ষ্টেশন-মাষ্টার কহিলেন, "মেয়েটি আমার মেয়ে মলিনার বয়সী, বরং কিছু বড় হ'তে পারে। তা মলিনাই ত এই—হাঁ, চোদ্দ বছর চলছে, দু বছর হলো তার বিয়ে দিয়েছি। এ মেয়েটির বিয়ে দিচ্ছে না, অথচ মেয়ের বাপ হরনাথ বাবুর লাইফ-ইন্সিওর ছিল আড়াই হাজার টাকার। চক্রবর্ত্তী সে টাকাটাও ট্যাকস্থ করেছে। আহা! এই সে দিন একটি পাত্র পাওয়া গেছলো—ন'পাড়ার শম্ভু চাটুয্যের ছেলে। ছেলেটি একটা পাশ ক'রে রেলের চাকরিতে ঢুকেছে। চালাক ছেলে। পরে উন্নতি করবে। তা তারা গহনায় নগদে সবশুদ্ধ দেড়টি হাজার চেয়েছিল—গহনাও ত ওর মা'র কতকগুলো ছিল। তা দিলে না। বললে, এত ছেলেবেলায় ভাগ্নীর বিয়ে দেবে না—স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাবে। নিজে অথচ সাত-আট বছর হলো, পরিবার মারা গেলে দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করেছে। বললে, ছেলেপিলে নেই, বংশটা লোপ পাবে? ছেলে ছিল—ডাগর, ছেলের বিয়েও হয়েছিল, তা সে বছর বসন্ত হয়ে মারা গেল। বিধবা পুত্রবধুর গায়ের গহনাগুলি সব রেখেছে। পুত্রবধুকে আনে না, তার বাপ-মা আছেন, তাঁরা পাঠান না। বলেন, আমার মেয়ে শ্বশুরের ঘরে কিসের প্রত্যাশায় বাস করবে এসে?"

তরুণ কহিল,—"এ স্ত্রীর সঙ্গে ব্যবহার কেমন?"

ষ্টেশন-মাষ্টার চারিদিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন,—"এ স্ত্রী খাণ্ডারী। তাঁর কাছে জুজুটি হয়ে আছেন। যত তম্বি ঐ এক ফোঁটা ভাগ্নীটির উপর।"

তরুণ কহিল,—"বটে!...সে চারিদিকে চাহিল। ট্রেণের লাইনগুলা রৌদ্রের তেজে ঝক্‌ঝক করিতেছে। রেলের মসৃণ গা ফুঁড়িয়া আগুনের রক্ত যেন সাপের জিভের মত লক্‌লক্ করিতেছে। সারা দুনিয়াটা নির্ম্মমতার দাব-দাহে কি দারুণ তপ্ত! কোথাও স্নেহমমতার শীতল ছায়ার চিহ্নও নাই!

ষ্টেশন-মাষ্টার কহিলেন, "আমাদের স্ত্রী-পুরুষে অনেক কথাই হয়। যদি এমন আইন থাকৃত যে, কেউ ভাগ্নী-টাগ্নীর উপর অত্যাচার পীড়ন করলে বাইরের কেউ হাকিমের কাছে দরখাস্ত দিলে প্রতীকার হয়?—তাও ছাই কোন আইন নেই। না হ'লে আমি ছাপোষা মানুষ, তবু মেয়েটিকে আমার বাড়ী এনে মেয়ের মত যত্ন ক'রে ঘরে রাখ্‌তুম।"

তরুণ নির্ব্বাক। ষ্টেশন-মাষ্টার কহিলেন,—"আপনার খাওয়া-দাওয়া হয়েছে ত?"

তরুণ যেন শূন্যে বিচরণ করিতেছিল। কথাটা তাহার কানে গেল না। সে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ষ্টেশন-মাষ্টারের দিকে চাহিয়া কহিল, "কি বল্‌লেন?"

—"আপনার খাওয়া-দাওয়া হয়েছে?"

—"না। তৃষ্ণা পেয়েছিল ব'লে কটা জামরুল কিনে খেয়েছি।"

ষ্টেশন-মাষ্টার কহিলেন,—"বিলক্ষণ! তা এখানে বন্দোবস্ত করি।"

তরুণ বিপুল আপত্তি তুলিয়া কহিল,—"না, না, না। অনর্থক এত বেলায় কাকেও পীড়ন করবেন না।"

ষ্টেশন-মাষ্টার উঠিলেন, কহিলেন,—"তাও কি হয়! আপনি ভদ্রলোক, এ ভাবে এখানে এসে পড়লেন, আমার অতিথি—অভুক্ত থাকবেন!.. তা কি হয়? আমি ত ছেলেপিলে নিয়ে ঘর করি। তা, আপনি—?"

—"ব্রাহ্মণ।"

—"আমিও ব্রাহ্মণ। শুধু ভাতে-ভাত, গাওয়া ঘী একটু আছে। জামাই-বাবাজী এসেছিলেন গেল হপ্তায়, একটু ঘী ঘরেই তৈরী করা হয়েছিল। ট্রেণ ফেল ক'রে—এই রৌদ্রে না খেয়ে—বলেন কি?"

তরুণ কহিল,—"ট্রেণ ফেল ত অনেকে করে, আর ফেল ক'রে ষ্টেশনেই ব'সে থাকে। তাদের সবাইকে যদি আতিথ্যে তৃপ্ত করতে হয়, তা হ'লে লক্ষ্মী যে ষ্টেশন-মাষ্টারের ঘরের দিকে ফিরেও চাইবেন না।"

উদ্দেশে প্রণাম করিয়া ষ্টেশন-মাষ্টার কহিলেন,—"তাও কথনও হয়, মশায়? অতিথিকে তুষ্ট করার বাড়া পুণ্য আর আছে?"

ষ্টেশন-মাষ্টার উঠিয়া নিজের ঘরে গেলেন ও পরক্ষণেই ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন,—"উনুনে আগুন আছে এখনও। কতক্ষণই বা! গিন্নী বললেন, আলু ভাতে, ভাত, আর ডাল ভাতে—ও বেলার জন্য চুণোমাছ ভাজা আছে, আর দুধ আছে। ঘরের গাই—তার উপর কাল ও পাড়ার জগা বেশ ভালো মর্ত্তমান কলা একছড়া দিয়ে গেছলো,...তার এক

ছেলের অসুখ হয়, আমি হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিতে সেরে গেছে—হুঃ! এমনই ক'রে এ'নির্ব্বান্ধব পুরীতে থাকা—বুঝলেন কি না—"

তরুণের বিস্ময়-শ্রদ্ধার সীমা রহিল না। সে কহিল,—"ষ্টেশনের নীরস লক্ষ্মীছাড়া গণ্ডীর মধ্যে এত বড় প্রাণও থাকে, এ যে আমি বিশ্বাস করতুম না, মশায়! দিন, পায়ের ধুলো দিন"—উচ্ছ্বসিত আবেগে তরুণ আভূমিপ্রণত হইয়া ষ্টেশন মাষ্টারের পায়ের ধুলা গ্রহণে উদ্যত হইল।

ষ্টেশন-মাষ্টার শশব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "ছি ছি, করেন কি! আপনাদের ইয়ংমেনদের উচ্ছ্বাস বড় প্রবল!"

তরুণ কহিল,—"না, পায়ের ধুলো দিতেই হবে, না দিলে ছাড়ছি না।"

তাহার পর ষ্টেশন-মাষ্টার কহিলেন,—"যা বলছিলুম, চক্রবর্ত্তী একটি পাত্র পেয়েছেন, ওঁরি বয়সী—পাঁচ-সাত ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনী, দুই পরিবার মারা গেছে, তেজ পক্ষে বিবাহ করবে, ..সংস্কৃত কলেজে না কি পণ্ডিতী করে, তাকে মেয়ে দেখাতে নিয়ে গেছলো কাল বিকেলে। মেয়েটি তাই শুনে ভারী কেঁদেছে আমার পরিবারের কাছে। আহা, কাঁদবে না? বোঝে ত কিছু কিছু, বয়স হয়েছে "

অনেকখানি রহস্য তরুণের কাছে সাফ হইয়া গেল। ওঃ, তাই! তাই বটে, নীলিমা কথাটা শেষ করিতে পারে নাই! কলিকাতায় কেন গিয়াছিল, এ প্রশ্নে দুঃখে ক্ষোভে তার বুক ভরিয়া উঠিয়াছিল, চোখের কোণে জল আসিয়া কণ্ঠের স্বরকে চাপিয়া ধরিয়াছিল!

সে কহিল,—"দেখুন, আমার রাণাঘাট আর যাওয়া হ'ল না। আমি একবার চেষ্টা ক'রে দেখতে চাই, এ অন্যায় রোধ করতে পারি কি না।"

ষ্টেশন-মাষ্টার কহিলেন,—"দেখুন ত চেষ্টা ক'রে। না হ'লে সভা ক'রে, বক্তৃতা দিয়ে, আর চাঁদা তুলে কি ফল! এই যে কন্যাদায়, সমাজের নানা নিষ্ঠুর উৎপীড়ন, এই সবের প্রতীকার করুন দিকি আপনারা, ও ভোট নিয়ে মারামারি আর কৌন্সিলে ঢুকে গলাবাজী—এই সব ক'রে গরীব গৃহস্থকে ত বাঁচানো যাবে না; নিজেদের সখই মেটানো শুধু এ। আপনারা ইয়ংমেন, আপনাদের কাছেই যে আমরা প্রত্যাশা করি ঢের!"

তরুণ উচ্ছ্বসিত স্বরে কহিল,—"এর প্রতীকার যদি না করতে পারি, তা হ'লে হিমাদ্রি বাঁড়ুয্যে ব'লে আমায় যেন কেউ আর না ডাকে।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

চিঠি চুরি

বেলা চারিটা বাজিয়াছে। ষ্টেশন-মাষ্টার ডিউটিতে ব্যস্ত। হিমাদ্রি প্লাটফরমের বেঞ্চে বসিয়া আকাশ-পাতাল কত কি ভাবিতেছিল। তাহার ভাবনা ঐ নীলিমাকে লইয়া—নানা ফন্দী, নানা ফিকির, নানা মতলবের ধাক্কায় মাথা তাহার বিষম দোলে দুলিতেছিল।

জোর করিয়া নীলিমাকে যদি সে তাহার মামার ঘর হইতে তুলিয়া লইয়া যায়? পুলিসের ভয়?.. যদি সে বাঙ্গালোরে চলিয়া যায়? করাচী যায়? কাশ্মীর যায়? কে তাহার পাত্তা পাইবে? পুলিসের সাধ্য নাই, ধরে! দেশের কায, খদ্দর প্রচার, পল্লী-সংস্কার, পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার এ কাযগুলো কিন্তু ···একটা ক্ষুদ্র বালিকাকে উদ্ধার করিতে গিয়া অত বড় ব্রত পণ্ড করিয়া দিবে! এম-এ পাশ করিয়া, ল'এর দুটা পরীক্ষা পাশ করিয়া, শেষেরটা ফেলিয়া সে দেশ সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে। নিজের গৃহ-সংসার প্রতিষ্ঠা করিবার সঙ্কল্প যে একদম ত্যাগ করিল—সে কি এই জন্য? এক দিকে একটি ক্ষুদ্র বালিকা, আর অপর দিকে তাহার দেশ...ভারতবর্ষের গোটা ম্যাপখানা অসংখ্য ঘরবাড়ী, লোকজন, নদ নদী, পর্ব্বতমালা লইয়া তাহার চোখের সামনে একটা জটিল সরীসৃপের মত যেন কিলবিল করিয়া ভাসিয়া উঠিল!—না!

তবে?—ঐ বালিকা এক শীর্ণ, লোলচর্ম্ম, জরাজীর্ণ বৃদ্ধের লালসার বিষে জর্জ্জরিত হইয়া চোখের জলে ভাসিয়া সারা হইবে! একটা জীবন!···ক্ষুদ্র জীবন! হোক্ ক্ষুদ্র, তবু জীবন···ব্যর্থ হইয়া যাইবে! সুখে-দুঃখে সর্ব্বক্ষণ স্পন্দিত একটা জীবন—আর ওগুলা? নিস্পন্দ, জড়, অনির্দ্দিষ্ট, কি সব অপ্রত্যক্ষ অজানার সমষ্টিমাত্র! হিমাদ্রি স্থির করিতে পারিল না, সে কি করিবে! কোন্ পথ গ্রহণ করিবে? নীলিমাকে লইয়া পলাইবে—কিন্তু তাহার পর? আজীবন তাহাকে বাঁধিয়া লইয়া চলাও দুষ্কর! একটি যোগ্য পাত্র দেখিয়া তাহার বিবাহ দিতে হইবে। সে বিবাহ দিতে গেলে ত আর তোমায় বাঙ্গালোরে কিম্বা কাশ্মীরে

পলাইয়া থাকিলে চলিবে না—পাত্র খুঁজিতে গেলে ঐ কলিকাতায়, কি তার আশেপাশেই খোঁজ করিতে হইবে। অথচ এধারে খোঁজ করিতে গেলে পুলিস—শেষে কি মেয়েটাকে আদালতে দাঁড় করাইবে? যে লক্ষ্মী-ছাড়া দেশ।

চিন্তায় হিমাদ্রি এমনই বিভোর যে, নিঃশব্দে নীলিমা আসিয়া কখন্ তাহার কাছে দাঁড়াইয়াছে, সে তাহা জানিতেও পারে নাই। হঠাৎ কি একটা শব্দে হিমাদ্রির চমক ভাঙ্গিলে সে ফিরিয়া দেখে, নীলিমা আসিয়াছে। বেঞ্চের এক পাশে সরিয়া গিয়া হিমাদ্রি কহিল,—"এই যে, নীলিমা এসেছো, বসো।"

নীলিমা বসিল না, কুণ্ঠিতভাবে একধারে দাঁড়াইয়াই রহিল। হিমাদ্রি কহিল,—"কি খবর?"

নীলিমা কহিল,—"আপনার ট্রেণের সময় হয়েছে ব'লে দেখ্‌তে এলুম। রাণাঘাট যাচ্ছেন ত এখন?"

হিমাদ্রি কহিল, "না, যাওয়া হলো না।"

নীলিমা বিস্মিত হইল। সে কহিল,—"যাবেন না?"

হিমাদ্রি কহিল,—"না। অবেলায় এত বেশী খাওয়া হয়েছে যে, আর নড়বার সাধ্য নাই।"

নীলিমা কহিল,—"শুনলুম, মলিনাদের এখানে খেয়েছেন আপনি—"

হিমাদ্রি কহিল, "হাঁ। আর এত বেশী খেয়েছি যে, এ বেলায় না খেলেই ভাল হয়।"

হিমাদ্রি নীলিমার পানে চাহিল, নীলিমা যেন কি বলিতে চায়, এমনই ভাব! হিমাদ্রি তাহা বুঝিল। বুঝিয়া প্রশ্ন করিল,—"আমাকে কোন কথা তুমি বল্‌তে চাও, নীলিমা?"

নীলিমা পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল। হিমাদ্রি কহিল,"—বল, কি বল্‌তে চাও! লজ্জা কি?" নীলিমা মৌন দৃষ্টিতে আর একবার হিমাদ্রির পানে চাহিয়া বস্ত্রাঞ্চল হইতে একখানা কাগজ বাহির করিয়া কহিল,—"আপনি ত কলকাতায় থাকেন। তা, কলকাতায় আমার এক বন্ধু আছে, তার নাম সরসী। তাকে একখানা চিঠি লিখেছি, কিন্তু টিকিট কোথায় পাব, আপনি যদি দয়া ক'রে একটা চার পয়সার টিকিট এঁটে এই চিঠিখানা ডাকে দিয়ে দেন—"

—"দাও চিঠি।"

নীলিমা চিঠি দিল। পাঁচ-ছ পাতা চিঠি। বালির মোটা কাগজ ভাজ করিয়া সে একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে।

হিমাদ্রি কহিল,—"খাম নেই ত!··· তা তোমার বন্ধুর ঠিকানা—"

আর এক টুকরা কাগজ হিমাদ্রির হাতে দিয়া নীলিমা কহিল,—"এইতে লেখা আছে।"

হিমাদ্রি কাগজখানা হাতে লইল। তাহাতে ইংরাজী ও বাঙ্গালায় এমনই লেখা আছে—

"শ্রীমতী সরসীবালা দেবী
C/o, Babu Gopendranath Ganguli.
36 Hiru Haldar Lane.
Bagbazar, Calcutta."

পরিষ্কার ছাঁদের হরফগুলি। কাল মুক্তা নাই, কেহ দেখেও নাই! যদি থাকিত, তাহা হইলে কাল মুক্তা এমনই সুন্দর হইত।

হিমাদ্রি কহিল,—"তোমার হাতের লেখা?"

নীলিমা সলজ্জভাবে কহিল,—"হাঁ।"

হিমাদ্রি কহিল, "খাসা লেখা! বাঃ, চমৎকার!"

হিমাদ্রি নীলিমার পানে চাহিল। অপরাহ্নের সূর্য্যকিরণ তাহার মুখে পড়িয়াছিল, শ্যামলবর্ণ···তা হোক, কিন্তু কি ডাগর চোখ! বসন্তের সবুজ পল্লবে যেন কে আবীর ছিটাইয়া দিয়াছে। হিমাদ্রি কহিল, "তোমার সব কথা শুনেছি, নীলিমা। তোমার সব ভাল, শুধু ঐ মামাটাই যা লক্ষ্মীছাড়া। আর কলকাতায় কেন গিয়েছিলে, তাও শুনলুম। তুমি নিশ্চিন্ত থাক, নীলিমা। সে বুড়ো মর্কটের সঙ্গে তোমার বিয়ে আমি কখনই হ'তে দেব না। এতে যদি দাঙ্গাফ্যাসাদ করতে হয় ত তাতেও আমি প্রস্তুত!"

এ কথা শুনিয়া নীলিমা লজ্জায় জড়সড় হইয়া নিঃশব্দে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

হিমাদ্রি ভাবিল, বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ে ত নীলিমা, ডাগর হইয়াছে। সভ্য সমাজের হাওয়ার পরশ তাহার গায়ে লাগে নাই, কাযেই বিবাহের নাম শুনিয়া লজ্জায় পলাইয়া গেল। সে ভাবিল, না, ও কথা বলিয়া সে ভাল করে নাই। না বলিলে দু'দণ্ড তবু কাছে থাকিত।

কিন্তু এই কাছে থাকা…! চট করিয়া হৃদয়ের কোন্ …পন তল হইতে প্রশ্ন উঠিল, ইহাকে কাছে রাখিতে …হার মন এত লোলুপ কেন? ভালবাসা? ধেৎ! তা …। মমতা—এ শুধু অনুকম্পা।

পরক্ষণেই মন বিদ্রোহী হইয়া কহিল, 'তুমি কে হে …পু, নিজেকে এত বড় ভাবিয়াছ যে, ইহাকে অতি ক্ষুদ্র তুচ্ছ …নে ইহার উপর অনুকম্পা প্রকাশ কর! তোমার চেয়ে … কিসে ছোট? নিজের স্বার্থ, নিজের ইচ্ছা, নিজের নিজত্ব …সর্জ্জন দিয়া একটা বন্য জানোয়ারের মত দুর্দ্ধর্ষ মাতুলের …ছায় যে চলাফেরা করিতেছে, কত বড় হিরোর মত কত- …নি দুঃখ ঐ ক্ষুদ্র বুকে সহ্য করিতেছে, ভাব ত! তুমি …লে নিমেষে ফাটিয়া চূর্ণ হইয়া যাইতে।'

হিমাদ্রি ভাবিল, সে যদি নিজেই নীলিমাকে বিবাহ …বে? কিন্তু না, তাহা হইতেই পারে না। হাইকোর্টের অত … দিগ্‌গজ উকীল নীলাম্বর মুখুয্যের সুন্দরী কন্যা তাহার …ঙ্গে দশ পনেরো হাজার টাকার যৌতুক, সেই সঙ্গে বিধবা …র মিনতি, আগ্রহ, সমস্তই যে বিরূপতার ঠোক্করে সে …ঙিয়া দিয়াছে এই দেশ-সেবার পবিত্র ব্রতপালনের জন্য; …র এখন একটা কিশোরীর রূপের মোহে—রূপমোহ? না… নীলিমার চেয়ে সুন্দরী মেয়ের অভাব ছিল না কোন দিনই এ দেশে। প্রেম নয়, ভালবাসা নয়,…এ শুধু এক …ল অনাথ অসহায় বালিকার প্রতি মমতা—মমতা মাত্র!

রেলের কুলী ঘণ্টা দিল—দুই এক জন লোক টিকিট …নিয়া প্লাটফর্ম্মে পায়চারি করিতে লাগিল এবং ঘট্ ঘট্ শব্দে ট্রেণ আসিয়া দাঁড়াইল—লোক উঠিল, লোক নামিল, ট্রেণ ছাড়িয়া গেল। হিমাদ্রি তখনও বসিয়া চিন্তার মালা গাঁথি- তেছে। ষ্টেশন-মাষ্টার কহিলেন—"গেলেন না?"

হিমাদ্রি কহিল,—"না। আমি ভাবছিলুম…" হিমাদ্রি ষ্টেশন-মাষ্টারের পানে চাহিল।

ষ্টেশনমাষ্টার কহিলেন—"কি?"

হিমাদ্রি কহিল,—"ঐ মেয়েটিকে কি ক'রে উদ্ধার করা যায়? একটি ভাল পাত্র—"

ষ্টেশন-মাষ্টার উচ্ছ্বসিত স্বরে কহিলেন,—"আহা! তা যদি পারেন।"

হিমাদ্রি কহিল, "তাই ভাবছি!…আপনার ডিউটি শেষ হলো?"

ষ্টেশন-মাষ্টার কহিলেন,—"আর দু'খানা গাড়ী পাশ করতে বাকী—একখানা ডাউন—এলো বলে—"

হিমাদ্রি কহিল—"আপনার ডিউটি শেষ হ'লে পরামর্শ করবো।"

—"বেশ" বলিয়া ষ্টেশন-মাষ্টার তাঁহার কামরায় চলিয়া গেলেন।

হিমাদ্রির বুক-পকেটে নীলিমার লেখা চিঠিখানি যেন খাঁচার মধ্যে বদ্ধ পাখীর মত ছট্‌ফট্ করিতেছিল। হিমাদ্রি ভাবিল, চিঠিখানা পড়িয়া দেখিব? নীলিমা তাহার বন্ধুকে কি লিখিয়াছে? কিন্তু বড় গর্হিত কায হইবে! বিশ্বাস- ঘাতকতা! একরত্তি মেয়ে…বিবাহ হয় নাই—তাহার চিঠিতে এমন কোনও গোপন কথা থাকিতে পারে না… দোষ কি? কোন মন্দ অভিসন্ধি ত তাহার নাই। বরং যদি এ চিঠিতে আরও কিছু পরিচয় পাওয়া যায়—নীলিমার মনের অতি গূঢ় কোন ব্যথা!

দুর্ব্বার লোভ! হিমাদ্রি সেই অপরাহ্নের সূর্য্যালোকে চিঠি খুলিল। মস্ত চিঠি—নানা দুঃখ-কষ্টের উল্লেখ করিয়া, সখীর সর্ব্বাঙ্গীন কুশল প্রার্থনা করিয়া—এ কি—নীলিমা এ কি লিখিয়াছে!—

চিঠির একাংশে লেখা আছে,—

"বিয়ের ঠিক করেছেন মামা এক বুড়োর সঙ্গে। দুটিকে পার করেও তাঁর বিয়ের সাধ মেটেনি। এক ঘর ছেলে- মেয়ে, নাতি-নাতনী। তৃতীয় পক্ষে আমাকে গ্রহণ ক'রে তিনি মামার দায়-উদ্ধার করতে উৎসুক। পাকা চুলে কালো কলপ মেখে আমায় দেখতে এসেছিলেন। অসহ্য,

স্নেহলতা কাপড়ে আগুন জ্বেলে তার মা-বাপকে সকল চিন্তার দায় থেকে মুক্ত করেছিল। আমি এ অপ- মান থেকে সেই ভাবেই মুক্তি নেবো। বড় সাধ ছিল, তোমাদের সঙ্গে দেখা করবো, তা—"

এই অবধি পড়া হইতেই বিশ্বের সব আলো হিমাদ্রির চোখের সামনে নিবিয়া গেল। অন্ধকার—অন্ধকার—রাশি রাশি অন্ধকার আসিয়া বিশ্বকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। ভগবান্! ভগবান্! তোমার রচিত এ আলোর দুনিয়ায় এত অন্ধকার! দুর্ব্বহ শোকের অতি গাঢ় এমন অন্ধকারও দুনিয়ায় আছে!

ষ্টেশন-মাষ্টার আসিয়া কহিলেন,"কি পরামর্শ—বলুন ত?"

হিমাদ্রি কহিল,—"অনেক কথাই ভাবলুম, মেয়েটিকে রক্ষা করার একটি উপায় আছে। ভালো পাত্র—না ?"

ষ্টেশন-মাষ্টার কহিলেন, "ঠিক বলেছেন।"

হিমাদ্রি কহিল, "দেখুন, আমি এম, এ পাশ করেছি, ল'য়ের দুটো একজামিন পাশ করেছি এবং তাতে সেকেণ্ড হয়েছি। তার পর নন-কো-অপারেশনের জন্য শেষটি দিইনি। আমরা দু'ভাই। আমি বড়, আমার বাবা ছিলেন ডাক্তার, মারা গেছেন। বাড়ী আছে, মোটর আছে, নগদ টাকা-কড়িও যা আছে, তাতে আমার চাকরী না করলেও চলে। আমার নাম হিমাদ্রি বন্দ্যোপাধ্যায়। ঐ ষণ্ডা ষাঁড় মামা আমার হাতে কি নীলিমাকে দেন না ? আমি এক পয়সাও চাই না। এমন কি, নীলিমার বাবার লাইফ-ইন্সিওরের আড়াই হাজার টাকাও না। তার উপর ওঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে বেণারসী শাড়ী নমস্কারী দেবো, আর মামা যদি বিয়ের খরচপত্র চান ত তাও নগদ দু'তিনশো টাকা তাঁকে দেবো।" উত্তেজনায় হিমাদ্রির নিশ্বাস জোরে বহিতেছিল।

ষ্টেশন-মাষ্টার অভিভূত হইয়া পড়িলেন ; কহিলেন,—"বলেন কি, আপনিই ? আহা ! মেয়েটার এমন ভাগ্য হবে ?"

হিমাদ্রি ষ্টেশন-মাষ্টারের দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, —"আপনি সাহায্য করুন্। আপনার স্ত্রীকে ব'লে দিন, তিনি যদি দয়া ক'রে ঐ মামার দ্বিতীয় পক্ষটিকে লুব্ধ ক'রে তুলতে পারেন,—তা ছাড়া মামাটাকেও বলবেন, আমি হিষ্ট্রীতে এম এ, তাঁর বইয়ের নিয়মিত খদ্দের হ'তে রাজী।"

ষ্টেশন-মাষ্টার কহিলেন,—"বাবা, বাবা, তুমি কি শুভ-ক্ষণেই আজ পল্তা ষ্টেশনে নেমেছিলে।"

* * * *

মামা এ প্রস্তাবে রাজী হইলেন। তবে অনেক তর্কের পর, অন্দর হইতে প্রেরণার তাড়নায়।

হিমাদ্রি রাত্রিতে বাড়ী ফিরিয়া মাকে প্রণাম করিয়া যখন এই সংবাদ সবিস্তারে জানাইল, তখন তিনি এতখানি খুসী হইলেন যে, তাঁহার দুই চোখে অশ্রুর বন্যা নামিল। তিনি বলিলেন,—"তুই আজ আমায় বড় সুখী করলি, বাবা !"

হিমাদ্রি কহিল,—"ভেবে দেখলুম, নন-কো-অপারেশনে কিছু হবে না মা। জাতি গড়তে হ'লে আমাদের নিজেদের মধ্যে কো-অপারেশন চাই। আগে নিজেদের ছোট ছোট গণ্ডী, তার পর বাঙ্গালা দেশ—তার পর গোটা ভারতবর্ষ—অর্থাৎ আগে হেলে ধরতে শিখে তার পর কেউটে ধরা। তা ছাড়া তুমি যে বলতে, সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ।"

মা হাসিয়া কহিলেন, "নে, নে, তোর বক্তৃতা রাখ।"

হিমাদ্রি কহিল,—"বক্তৃতা সত্যিই রাখছি মা। বক্তৃতায় কিছু হবে না। দেশের উন্নতি বল, আর জাতির উন্নতিই বল, কায চাই, কায—হাতে-কলমে কায !"

জ্যোৎস্না-প্লাবিত ফুলশয্যার রাত্রে হিমাদ্রি নীলিমাকে বলিতেছিল,—"অনুকম্পা, নীলিমা, প্রবল অনুকম্পা শুধু··· এর মধ্যে প্রেমের বিন্দু-বিসর্গও ছিল না !"

নীলিমা হাসিয়া কহিল,—"অনুকম্পা যদি ত মোট নামিয়ে দিয়ে তেঁতুলতলায় দাঁড়িয়ে থাকবার কি দরকার ছিল মশায় !"

হিমাদ্রি কহিল,—"একটু বিশ্রাম···"

নীলিমা কহিল,—"তার পরে রাণাঘাট যাওয়া বন্ধ ক'রে প্লাটফর্ম্মে বেঞ্চে ব'সে কার ধ্যান হচ্ছিল ? আমি গিয়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম, তা হুঁস নেই।"

হিমাদ্রি কহিল,—"তোমায় নিয়ে বিলাতী কায়দায় elope করবার সাধ ছিল।"

নীলিমা কহিল,—"যেতুম কি না আমি···ওঃ, কথা শোনো না। অজানা অচেনা লোক, না হয় মোটই বয়ে দিয়েছিলে···কুলী।"

হিমাদ্রি নীলিমাকে বক্ষে টানিয়া আবেগোচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে কহিল,—"আজীবন কুলীগিরি করতেও হলো তাই··· কিন্তু মোট বওয়ার দাম···" বলিয়া অজস্র চুম্বনে নীলিমার মুখখানিকে সে রাঙ্গা করিয়া তুলিল।

"যাও তুমি ভারী দুষ্টু, বেয়াদব কুলী···লজ্জা করে না চিঠি চুরি করে পড়া···বিশ্বাসঘাতক, বেয়াদব।"

"ভাগ্যে সে বেয়াদবি করেছিলুম, তাই ত সেই থুথ্ড়ো বুড়োর পাকা চুলে কলপ লাগানোর দায় থেকে বেঁচে গেছ।"

নীলিমা কহিল,—"ইস্, তাই না কি তুলতুম···তার আগেই মামার ঘরে কেরোসিন তেল ছিল ত···"

আমরা শুনিয়াছি, হিমাদ্রি লএর ফাইনাল একজামিন দিবার জন্য আইনের কেতাবে মন দিয়াছে। তা ঠিক, নীলিমাকে তাই বলিয়া সে এক তিল চোখের আড় করে না। খদ্দর সে ছাড়ে নাই···তবে বক্তৃতা ছাড়িয়াছে।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

সুন্দরবন

গাঙ্গেয় "ব"-দ্বীপের দক্ষিণ সীমায় অবস্থিত বঙ্গোপসাগর-তীরবর্ত্তী বিস্তৃত অরণ্যময় ভূভাগ সুন্দর-বন নামে প্রসিদ্ধ। ইহার পশ্চিমে ভাগীরথী ও পূর্ব্বে মেঘনা নদী অবস্থিত। বর্ত্তমানকালে ইহা ২৪ পরগণা, খুলনা ও বাখরগঞ্জ এই তিনটি জিলার অন্তর্গত। এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ সম্বন্ধে এ যাবৎ বহু আলোচনা হইয়া গিয়াছে এবং ইহার যে প্রদেশ খুলনা ও বাখরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত, তাহার প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধেও অনেক অনুসন্ধান হইয়াছে। কিন্তু ইহার যে অংশ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, যাহার উপর দিয়া পতিতোদ্ধারিণী ভাগীরথী নদী সুদূর অতীত যুগ হইতে সাগরসলিলে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তাহার পুরাবৃত্ত সম্বন্ধে আজিও বিশেষ কোনরূপ অনুসন্ধান হয় নাই। সুন্দরবনের এই অংশ চিরদিন অরণ্যাবৃত ছিল না, এবং সুদুর অতীত যুগ হইতে পুণ্যতোয়া ভাগীরথী নদী ইহার উপর দিয়া সাগরে মিলিত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রাচীনকাল হইতে হিন্দুজাতির নিকট এই প্রদেশ পুণ্যভূমিরূপে পরিচিত হইয়াছিল ও বহু তীর্থক্ষেত্রাদিতে ও জনপদে পূর্ণ ছিল। অধুনা ইহার সমগ্র অংশ ২৪ পরগণা জিলার অধীন সদর ও ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার অন্তর্গত এবং জয়নগর, মথুরাপুর, কাকদ্বীপ ও সাগর এই চারিটি থানায় বিভক্ত। ইহার যে সকল অংশ হাসিল হইয়াছে, তাহা এক্ষণে বাইসহাট্টা, নলিরটাট, নলগোঁড়া, মাধবপুর, দেবীপুর, দেলবাড়ী, গুড়গুড়ীয়া, মৈপিঠ, নালুয়া, খাড়ী, রাধাকান্তপুর, গিলারহাট, লালপুর, জলঘাটা, কৃষ্ণচন্দ্রপুর, মথুরাপুর, ছত্রভোগ, অম্বুলিঙ্গ, মাদপুর, কাশীনগর, বকুলতলা, রামদীঘি, কঙ্কণদীঘি, জটা, পাথরপ্রতিমা, রামাসখালী, বুড়ীরতট, কাকদ্বীপ, ঘুঘুডাঙ্গা, নামখানা, চন্দপিড়ী, নারায়ণীতলা, মনসারদ্বীপ, বামুনখালী, মন্দিরতলা প্রভৃতি নামে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীরূপে ১ নম্বর হইতে ৩৩ নম্বর ও ১১১ নম্বর হইতে ১২৩ নম্বর লাটের A, B, C, G, D, E, F, G, H, I, J, K, L প্লটস্ (Plots)এর, ৩৬০। ১০৬৪।১০৭৬।৩৭৩।৪২৫ ও ৯৩ নম্বর তৌজীর ও সাগরদ্বীপের মধ্যে অবস্থিত। Captain Princeps Morrison, Lt Hodges প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সুন্দরবন জরীপকারিগণের মানচিত্রাদি দেখিলে জানা যায় যে, গত উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল হইতে এই প্রদেশ ক্রমশঃ হাসিল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই হাসিলকার্য্য আজিও শেষ হয় নাই। এখনও রাজব্যাঘ্র ও কুম্ভীর প্রভৃতি 'ভীষণ' হিংস্র জীবের আশ্রয়স্থল হইয়া গভীর অরণ্য ইহার নানা অংশে বিরাজ করিতেছে। গত আদম-সুমারির গণনানুসারে ইহার যে সকল স্থানে লোকালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তথাকার অধিবাসীর সংখ্যা ২ লক্ষ ২১ হাজার ৫ শত ১৫ জন। উহাদের মধ্যে পদ্মরাজ, মুসলমান, কৈবর্ত্ত, বাগ্দী, কাওরা, বড়হাড়ী ও তীয়র জাতীয় লোকের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। পুরাতন পরগণা বিভাগানুসারে কেবলমাত্র ইহার উত্তরাংশপ্রদেশ উত্তর দক্ষিণ ও হাতীয়াঘর ও খাড়ী পরগণার অন্তর্গত। উত্তর হাতীয়াঘর পরগণা বর্ত্তমান সময়ে জয়নগর ও মথুরাপুর থানার অধীন বরিদহাটী পরগণার দক্ষিণে অবস্থিত। ইহার পশ্চিমে মুড়াগাছা, দক্ষিণে সাহাপুর ও পূর্ব্বে খাড়ী পরগণা। সুটীতোদা, বিষ্ণুপুর, সাতঘরা, লালপুর, জলঘাটা, ছত্রভোগ, অম্বুলিঙ্গ, কাশীনগর, মথুরাপুর প্রভৃতি স্থান ইহার অন্তর্ভুক্ত। দক্ষিণে হাতীয়াঘর পরগণা, উক্ত উত্তর হাতীয়াঘর পরগণার দক্ষিণপশ্চিমদিকে অবস্থিত; সাহাপুর পরগণার দক্ষিণ-পশ্চিমে কুলপী ও কাকদ্বীপ থানার মধ্যে বিদ্যমান। ইহার পশ্চিমে হুগলী নদী, উত্তরে সাহাপুর ও সাহানগর পরগণা, পূর্ব্বে সাহাপুর পরগণা ও সুন্দরবন এবং দক্ষিণে সুন্দরবন। ১নং হইতে ১৬ নং লাটের অন্তর্গত কাকদ্বীপ, কাশীনগর, রাজনগর, তক্তীপুর, জগদীশপুর, দুর্গাপুর প্রভৃতি স্থান ইহার মধ্যে অবস্থিত। এই পরগণা দুইটির মোট পরিমাণ ১১৬.৯ বর্গ-মাইল। খাড়ী পরগণা মথুরাপুর থানার অধীন উক্ত উত্তর হাতীয়াঘর পরগণার দক্ষিণপূর্ব্বদিকে অবস্থিত এবং পূর্ব্বদক্ষিণে ও পশ্চিমদিকে সুন্দরবন দ্বারা সীমাবদ্ধ। ইহার পরিমাণ ১০.৯৬ বর্গ-মাইল। নালুয়া, খাড়ী প্রভৃতি স্থান ইহার অন্তর্ভুক্ত।

ইদানীং এই প্রদেশের নানা অংশে যে সকল নদী প্রবাহিত আছে, তন্মধ্যে মাতলা, ঠাকুরাণী বা জামীরা, শতমুখী ও বারাতলা নদী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। মাতলা নদী মাতলা থানার অন্তর্গত ক্যানিং সহরের সন্নিকট হইতে বিদ্যাধরী, কারাতমা ও আঠারবাঁকী এই তিনটি নদীর সংমিশ্রণে

উঠিয়া জয়নগর থানার পূর্ব্বসীমা দিয়া হালীডে দ্বীপের দক্ষিণে সমুদ্রের আকারে বঙ্গোপসাগরে আত্মোৎসর্গ করিয়াছে। উত্তরদিকে বামনঘাটা নামক স্থানের প্রায় ৯ মাইল দক্ষিণে পিয়ালী নামে একটি শাখা-নদী বিদ্যাধরী হইতে উঠিয়া প্রথমে দক্ষিণমুখে ও পরে দক্ষিণপশ্চিমমুখে ধাবিত হইয়া পূর্ব্বমুখে ১২২ নম্বর লাটের উপর দিয়া এই মাতলা নদীতে মিশিয়াছে। জামিরা বা ঠাকুরাণী নদী জয়নগর থানার অন্তর্গত ১২২ নম্বর লাটের উত্তরদিক হইতে উঠিয়া জয়নগর ও মথুরাপুর থানার মধ্য দিয়া বুলচেরী দ্বীপের পশ্চিমাংশে সাগরে পতিত হইয়াছে। ১২২।১১৯।১২০ ও ১১৭ নম্বর লাটের দক্ষিণাংশপ্রদেশে গুয়ানদী, ঢুলীভাসাগাং, চুলকাটীগাং, পার্শ্বেমারীগাং ও গোথলতলীগাং প্রভৃতি নামে কতকগুলী নদী পূর্ব্বপশ্চিমমুখে প্রবাহিত হইয়া ইহাকে উক্ত মাতলা নদীর সহিত সংযুক্ত করিয়াছে। শতমুখী নদী কাকদ্বীপ ও মথুরাপুর থানার অন্তর্গত ঢিবাটী ও গোবাদীয়া গাঙের সংমিশ্রণে ১১২ নম্বর লাটের সন্নিকট হইতে উঠিয়া কাকদ্বীপ ও মথুরাপুর থানার মধ্য দিয়া লোথিয়ান দ্বীপের দক্ষিণে সাগরসঙ্গতা হইয়াছে। বারাতলা বা মড়ীগঙ্গা নদী হুগলী নদীর শাখারূপে ঘোড়ামারা দ্বীপের উত্তরদিক হইতে বাহির হইয়া সাগরদ্বীপ ও কাকদ্বীপ থানার উপর দিয়া সমুদ্রে মিশিয়াছে। ৮।১১।১২।১৪ ও ১৫ নম্বর লাটের দক্ষিণে ঘিবাটীগাং, ১১১ নং লাটের দক্ষিণে নামথানাগাং ও তন্নিম্নে ডি প্লটের দক্ষিণে উডল্যাণ্ড খাল নামে তিনটি নদী পূর্ব্বপশ্চিমমুখে প্রবাহিত হইয়া ইহাকে শতমুখী নদীর সহিত সংযুক্ত করিয়াছে। ঘীবাটীগাং হইতে একটি শাখা নদী ঘুণ্টীগাং নামে ১১০ নং লাটের পূর্ব্বসীমা দিয়া উক্ত নামথানাগাঙে পড়িয়াছে। উডল্যাণ্ড খাল হইতেও পীটসখাল নামে একটি শাখা বাহির হইয়া এ ও বি প্লটের পূর্ব্বসীমা দিয়া সাগরে মিশিয়াছে। উহার পূর্ব্বদিকে এডোয়ার্ডস ক্রীক নামে ঐরূপ অন্য একটি শাখা নদী চন্দনপিঁড়ীর সন্নিকট হইতে উঠিয়া ই প্লটের ও সাবাসনীতলার উপর দিয়া সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। এ স্থানে সুন্দরবন ডেসপ্যাচ ও আসামকাছাড় লাইন প্রভৃতি সুন্দরবন ষ্টীমার সমূহ উক্ত উডল্যাণ্ড খাল, পিটসখাল ও এডোয়ার্ডস ক্রীক দিয়াই মড়ীগঙ্গা নদী হইতে শতমুখী নদীতে আসিয়া থাকে। উহা ব্যতীত নালুয়ারগাং বা সনী নদী, চড়াগঙ্গা নদী, গোবাদীয়াগাং, মিদামডাঙ্গাগাং ও ছাটুয়া নদী নামেও কতকগুলি বড় নদী ৩১।৩০।৩২,৩৩।২৭।২৩।২৪,২২ ও ২১ নম্বর লাটের নানাদিক হইতে উঠিয়া দক্ষিণমুখে প্রবাহিত হইয়াছে ও ক্রমশঃ চতুর্দ্দিকে বহুধা বিভক্ত হইয়া ছুতারভোগ নদী, সরলদুয়ার নদী, পাকা চেরা নদী, নাকা চেরা নদী, কুমারিয়াগাং সরাসংগাং, ছিষপথ নদী, বড়চড়া নদী, সলেমারীগাং, ওয়ালস ক্রীক, জগদ্দলগাং প্রভৃতি নামে বিভিন্ন নদীরূপে উক্ত প্রদেশকে বহু দ্বীপাকারে বিভক্ত করিয়া নানাদিক্ হইতে পূর্ব্বোক্ত মাতলা, ঠাকুরাণী, শতমুখী ও মড়ীগঙ্গা নদীতে পড়িয়া উহাদের দেহপুষ্টি করিতেছে। পুরাতন বিবরণাদি হইতে জানা যায় যে, প্রাচীনকালে ঐ প্রদেশের উপর দিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত ভাগীরথী নদীর যে মূলস্রোত প্রবাহিত ছিল, উহা হইতেই চড়াগঙ্গা নদী, নালুয়ারগাং প্রভৃতি নদীগুলি উত্থিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময় এই ভাগীরথী-প্রবাহের আর অস্তিত্ব নাই। বহুদিন হইল, উহা তথায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিলে জানা যায় যে, ইদানীং কলিকাতার নিম্নে হুগলী নদীর যে অংশ হাওড়া জিলার উপর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে, উহা ভাগীরথীর আদিম প্রবাহ নহে। উহা অধুনা লুপ্ত সরস্বতী নদীর অংশ। প্রবাদ—পূর্ব্বে একটি ক্ষুদ্র খাল ভাগীরথীর শাখারূপে কলিকাতা দুর্গের সন্নিকট হইতে প্রবাহিত হইয়া শাথরেল নামক স্থানে সরস্বতীর সহিত সংযুক্ত ছিল। নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর রাজত্বকালে ইংরাজগণ কলিকাতায় জাহাজ যাতায়াতের সুবিধার জন্য উহা প্রশস্ত করত ভাগীরথীর জলরাশি ঐ পথে চালিত করিয়াছিলেন। গঙ্গার এই অংশ কৃত্রিম বলিয়া আজিও হিন্দুগণ উহার উপর শবদাহ করেন না এবং উহাতে স্নান করিলে গঙ্গাস্নানের ফল হয় না বলিয়া বিশ্বাস করেন। শাথরেল পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত খাল কোন্ সময় কাহার দ্বারা খনিত হইয়াছিল, তাহা আজিও জানা যায় নাই। ডি ব্যারোর মানচিত্র দেখিলে বুঝা যায় যে, খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগেও উহা বিদ্যমান ছিল। অধুনা খিদিরপুরের প্রসিদ্ধ সেতুর নিম্ন দিয়া হুগলী নদীর যে একটি ক্ষীণ প্রবাহ প্রথমে পূর্ব্বমুখে ও তৎপরে ক্রমশঃ দক্ষিণমুখে গিয়া কালীঘাটের উপর দিয়া টালীসনালা বা আদিগঙ্গা নামে প্রবাহিত আছে, উহাই প্রাচীনকালে ভাগীরথীর মূল স্রোত ছিল এবং উহা

তখন কালীঘাটের দক্ষিণপূর্ব্বদিকে অবস্থিত রসা নামক স্থানের পশ্চিমদিক দিয়া বৈষ্ণবঘাটা, রাজপুর, কোদালীয়া, মালঞ্চ, মাইনগর, বারুইপুর, সূর্য্যপুর, মুলটী, হাসগেড়িয়া, জাঙ্গালিয়া, দক্ষিণ বারাসত, সরিষাদহ, খনিয়া সাহাজাদপুর, * জয়নগর, বিষ্ণুপুর, লালপুর, জলঘাটা, ছত্রভোগ ও খাড়ী প্রভৃতি গ্রামের উপর দিয়া সাগরাভিমুখে প্রবাহিত হইত।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত, বিপ্রদাস চক্রবর্ত্তীর "মনসার ভাসান", কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর "চণ্ডীকাব্য" প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বাঙ্গালা গ্রন্থে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের নীলাচলগমন ও চাঁদ, ধনপতি, শ্রীমন্ত প্রভৃতি সওদাগরের বাণিজ্যযাত্রাপ্রসঙ্গে এই ভাগীরথী-প্রবাহের ও উহার উভয় তীরবর্ত্তী তৎকালীন বহু জনপদের উল্লেখ আছে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগেও নিমতানিবাসী কবি কৃষ্ণরাম ব্যাঘ্রের দেবতা দক্ষিণ রায়ের উপাখ্যানপ্রসঙ্গে তাঁহার প্রসিদ্ধ "রায়মঙ্গল" কাব্যে দক্ষিণদিক হইতে উক্ত প্রবাহের ও ঐ সকল গ্রামের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

"গাঠের গাবর যত, বাহিতে বড়ই রত,
ছাড়াইল দুর্জ্জয় মগরা।
গোজানা বাহিয়া চলে, কর্ণধার কুতুহলে,
ধামাই বেতাই করি সারা॥
সারি গাহি জুড়ি জুড়ি, কাকদ্বীপ গজঘড়ি,
ছাড়াইল বণিকের লোক।
টীয়াখালে পাছু আন, গঙ্গাধারায় করি স্নান,
উপনীত হইল ছত্রভোগ॥
অম্বুলিঙ্গ মহাস্নান, নাহি যার উপমান,
তথায় বন্দিল বিশ্বনাথ।
বাজে বাদ্য সুমধুর, বাহিয়া রাজা বিষ্ণুপুর,
জয়নগর করিল পশ্চাত॥
সঘনে দামামাধ্বনি, শুনি রায় গুণমণি,
বড়ুক্ষেত্র বাহিল আনন্দে।
বারাসাতে উপনীত, হইয়া সাধু হরষিত,
পূজিল ঠাকুর সদানন্দে॥
বাহিল মূলটী ছাড়ি, চালাইল সপ্ততরী,
খলটী করিল পাছু আন।
বলি দুর্গা ক্রমে ক্রমে, বাহিয়ে হরিষে ডিঙ্গে,
বাজে কাড়া নাগারা বিসান॥
সাধুঘাটা পাছে করি, সূর্য্যপুর বাহি তরী,
চাপাইল বারুইপুরে আসি।
বিশেষ মহিমা বুঝি, বিশালাক্ষী দেবী পূজি,
বাহে তরী সাধু পুন হাসি॥
মালঞ্চ রহিলা দুর, বাহিয়া কল্যাণপুর,
কল্যাণ-মাধবে প্রণমিল।
বাহিলেক যত গ্রাম, কি কায করিয়া নাম,
বড়দহ ঘাটে উত্তরিল॥"

(রায়মঙ্গল)

সম্প্রতি বারাসাতনিবাসী শ্রীযুক্ত শশিভূষণ পাঠক মহাশয় আমাকে ১৬৪৮ শকাব্দে কবি অযোধ্যারাম-রচিত একখানি 'সত্যনারায়ণে'র পুথি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। উহাতেও রত্নাকর নামক জনৈক সওদাগরের বাণিজ্য-যাত্রা-প্রসঙ্গে এই ভাগীরথী-প্রবাহের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

"কালীঘাট পরিহরি, বেয়ে চলে দ্রুত তরী,
মহা আনন্দিত সওদাগর।
বাজে দামা দড়মাসা, বামে রহে গ্রাম রসা,
গীত গায় গাঠের গাবর॥
সাকু ভাকু সার ভাঁটা, বাহিলা বৈষ্ণবঘাটা,
করি সব হরি হরি রব।
বারুইপুরের পর, রত্নাকর সওদাগর,
সাধুঘাটা করিলা পশ্চাৎ।
বারাসাত গ্রামে গিয়া, নানা উপহার দিয়া,
পূজা কৈল অনাদি বিশ্বনাথ॥
অম্বুলিঙ্গ হাতীয়াঘর, এড়াইলা দড়বড়,
গাঠের গাবর মিলি সব।
তার গঙ্গা পরশিয়া কপিলেরে প্রণমিয়া,
পূজে গঙ্গাসাগর মাধব॥"

* উক্ত খনিয়া সাহাজাদপুর প্রাচীনকালে আদি গঙ্গার উপর একটি সমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল। পূর্ব্বে তথায় ৪।৫ শত ঘর চট্টোপাধ্যায় উপাধিধারী ব্রাহ্মণের বাস ছিল। প্রবাদ, তাঁহাদেরই বংশধরগণ এখন বঙ্গদেশে "খনের চাটুয্যে" নামে প্রসিদ্ধ।

এই ভাগীরথী-প্রবাহের গর্ভ এখনও মজাগঙ্গা বা গঙ্গার বাদা নামে এক বিস্তৃত নিম্নভূমিতে পরিণত হইয়া বারুইপুর, সূর্য্যপুর, মূলটী, দক্ষিণ-বারাসাত, জয়নগর, লালপুর, ছত্রভোগ, খাড়ী, অম্বুলিঙ্গ প্রভৃতি গ্রামের মধ্যে বিদ্যমান আছে। বারুইপুরের ও সূর্য্যপুরের সন্নিকটস্থ কোন কোন স্থানে উহাতে এখনও জল দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্দেশের হিন্দু অধিবাসিগণ গঙ্গা যেখানে অন্তঃসলিলা হইয়া প্রবাহিতা হইতেছে বলিয়া বিখ্যাত, স্মার্ত্ত পণ্ডিতবর রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বিধানমতে * উক্ত গঙ্গার বাদায় উপরে ও উহার উভয় পার্শ্বস্থ স্থানে শবদাহ করে, এবং তথাকার পুষ্করিণীর জল গঙ্গাজল বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে। তজ্জন্য ঐ সকল পুষ্করিণীও 'বোসের গঙ্গা' 'ঘোষের গঙ্গা' প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়। এই গঙ্গার বাদা দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে, প্রাচীনকালে ভাগীরথী নদী সূর্য্যপুরের সন্নিকট হইতে প্রথমে পশ্চিমমুখে মূলটী প্রভৃতি গ্রামের দিকে প্রবাহিত হইয়া তথা হইতে পুনরায় পূর্ব্বদক্ষিণ-মুখে আসিয়া মধ্যম গ্রামের সন্নিকট হইতে ক্রমশঃ দক্ষিণমুখী হইয়া জাঙ্গালীয়া, দক্ষিণ-বারাসাত, জয়নগর প্রভৃতি স্থান পশ্চিমে ও সরিষাদহ, ময়দা, মজিলপুর প্রভৃতি স্থান পূর্ব্বে রাখিয়া, বিষ্ণুপুর হইতে আবার পূর্ব্ব-দক্ষিণ-মুখে ধাবিত হইয়াছিল এবং ছত্রভোগের সান্নিধ্য হইতে পুনরায় দক্ষিণবাহিনী হইয়া কৃষ্ণচন্দ্রপুর, অম্বুলিঙ্গ (বড়াশী), মাদপুর, কাশীনগর, হাতীয়াঘর * প্রভৃতি স্থান পশ্চিমে ও নালুয়া, রাধাকান্তপুর, খাড়ী, বাইশহাট্টা, মণিরটাট, জটা, নলগাঁড়া, রায়দীঘি প্রভৃতি স্থান পূর্ব্বে রাখিয়া, রায়দিঘীর দক্ষিণ হইতে বহুশাখায় বিভক্ত হইয়া সাগরে মিশিয়াছিল। চৈতন্যভাগবত পাঠে জানা যায় যে, ২১।২২।২৪।২৬ নম্বর লাটের দক্ষিণে প্রবাহিত যে সকল নদীর কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, উহারাই খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে ভাগীরথীর এই আদিম প্রবাহের শতমুখ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল এবং মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ছত্রভোগ পথে নীলাচল-যাত্রাকালে অম্বুলিঙ্গের দক্ষিণে ভাগীরথীর ঐ সকল শাখার সৌন্দর্য্য দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন।

সূর্য্যপুরের মজাগঙ্গা

"ছত্রভোগে গেলা প্রভু অম্বুলিঙ্গ ঘাটে।
শতমুখী গঙ্গা প্রভু দেখিলা নিকটে॥"

* "প্রবাহমধ্যে বিচ্ছেদে তু অন্তঃসলিলপ্রবাহিত্বান্ন দোষঃ।
অন্যথা ইদানীং গঙ্গায়া সাগরগামিত্বানুপপত্তেঃ॥"
প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব—গঙ্গাপ্রকরণ।
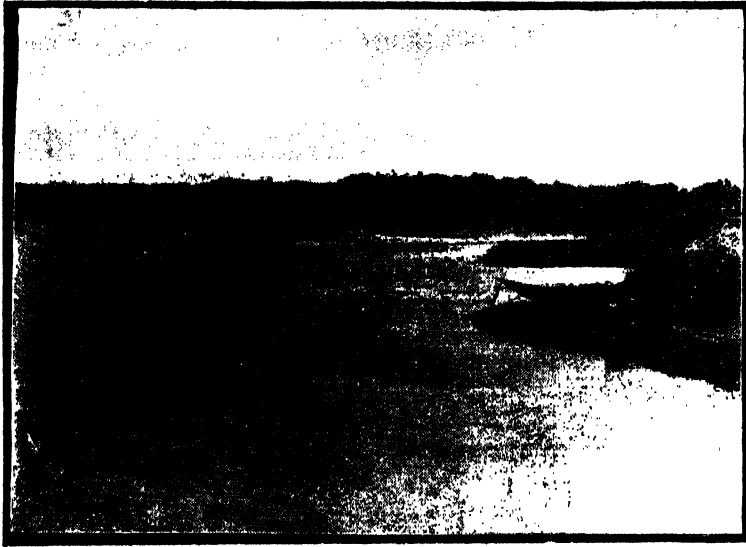
* ইদানীং হাতীয়াঘর বলিয়া কোন স্থানের নাম নাই। বর্ত্তমান কালে ঐ নাম পরগণার নামরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। কবিকঙ্কণের চণ্ডীপাঠে জানা যায় যে, প্রাচীনকালে ভাগীরথীর উপর ছত্রভোগ, অম্বুলিঙ্গ ও মাধবপুর প্রভৃতি স্থানের পর 'হাতীয়াঘর' নামে একটি খুব প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। প্রায় ৭২ বৎসর পূর্ব্বে রচিত রামগোপাল রায় মহাশয়ের 'সারতত্ত্বতরঙ্গিণী' নামক পুথিতে দেখা যায় যে, তথায় বঙ্গেশ্বর প্রতাপাদিত্যের 'হস্তিশালা' ছিল বলিয়া ঐ স্থানের নাম ঐরূপ হইয়াছিল। আমাদের বোধ হয়, উক্ত স্থানের নাম হইতেই এই পরগণার 'হাতীয়াঘর' নাম হইয়াছিল।

"নগর রাজার কত ছিল গড়খানা।
হস্তী ঘোড়া শকটাদি সৈন্য অগণনা॥
হাতীয়াঘরেতে রাজহস্তীর মোকাম।
সেই হ'তে হৈল হাতীয়াঘর নাম॥"
সারতত্ত্বতরঙ্গিণী।

দেখিয়া হইলা প্রভু আনন্দে বিহ্বল।
হরি বলি হুঙ্কারে কয়েন কোলাহল॥
আছাড় খায়েন নিত্যানন্দ কোলে করি।
সর্ব্বগণে জয় দিয়া বলে হরি হরি॥"
[দ্বিতীয় অধ্যায়ে, অন্ত্যখণ্ড।

ওমালী বলেন যে, প্রবাদ, ঐ নদীগুলির মধ্যে বর্ত্তমান ১১, ১২ ও ১৪ নম্বর লাটের দক্ষিণে প্রবাহিত ঘিবাটীগাং বা ঘুঘুডাঙ্গা নদীই তৎকালে ভাগীরথীর মূল প্রবাহ ছিল এবং উহা তখন কাকদ্বীপের নিম্ন দিয়া বর্ত্তমান সাগরদ্বীপের পূর্ব্বে প্রবাহিত মড়ীগঙ্গা নদীতে পড়িয়া তথা হইতে সাগরদ্বীপের অন্তর্গত ধবলাট ও মনসা দ্বীপের মধ্যস্থ কোন নদীর খাড়ী দিয়া প্রথমে পশ্চিমমুখে ও পরে দক্ষিণমুখে সাগরে মিশিয়াছিল।

১৫৪০ খৃষ্টাব্দে অঙ্কিত ডি, ব্যারোসের মানচিত্র দেখিলে বুঝা যায় যে, উক্ত প্রবাদ একেবারে ভিত্তিশূন্য নহে। উহাতেও ভাগীরথী হাতীয়াঘরের দক্ষিণসীমা দিয়া পশ্চিমমুখে সাগরদ্বীপের উপরে মড়ীগঙ্গা নদীতে পড়িতেছে। এই জন্যই বোধ হয়, এক্ষণে ধবলাটের পশ্চিমদিকস্থ নদীর মোহনায় প্রতি বৎসর পৌষ-সংক্রান্তিতে স্নানযাত্রা উপলক্ষে ভারতবিখ্যাত গঙ্গাসাগরের বিরাট মেলা হইয়া থাকে এবং ঘুঘুডাঙ্গা গাঙ্গের উপর কাকদ্বীপের সন্নিকটে আজিও লোক গঙ্গাস্নান ও শবদাহ করে।

ঠিক কোন্ সময় হইতে এই প্রদেশে ভাগীরথী নদীর উক্ত আদিম প্রবাহ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা আজিও নির্দ্ধারিত হয় নাই। রেনেলের ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দের গাঙ্গেয় উপদ্বীপের মানচিত্র দেখিলে বুঝা যায় যে, ঐ সময়ের পূর্ব্বকাল হইতেই ভাগীরথীর জল দক্ষিণমুখে ছত্রভোগ, বড়াশী প্রভৃতি স্থানের দিকে না গিয়া ঐ সকল স্থানের উত্তরপূর্ব্বপার্শ্বস্থ লালুয়ার গাং দিয়া পূর্ব্বমুখে ঠাকুরাণী নদীতে মিশিয়াছিল। তৎকালে উক্ত লালুয়ার গাং পূর্ব্বমুখে ২৮ নং লাটের উত্তরাংশ দিয়া ঠাকুরাণী নদীর সহিত সংযুক্ত ছিল। তখনও ২৮ নম্বর লাট মণিরটাটের পশ্চিম-সীমায় ও ২৯ নম্বর লাট নলগোড়ার পশ্চিম ও দক্ষিণ সীমায় ইদানীং মণি নদী নামে যে নদী প্রবাহিত আছে, উহার সৃষ্টি হয় নাই। ডি ব্যারোস, ভ্যাণ্ডার ব্রুক, রেণেল প্রভৃতি লেখকগণের খৃষ্টীয় ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর মানচিত্র দেখিলে বুঝা যায় যে, ভাগীরথী নদী ব্যতীত তথায় উহার অন্যান্য কয়েকটি শাখানদীও বহুদিন

প্রাচীন ভাগীরথীর মানচিত্র

হইল মজিয়া গিয়াছে এবং তৎপরিবর্ত্তে উক্ত মণি নদী, রায়দীঘির গাং প্রভৃতি কয়েকটি নূতন নদীরও সৃষ্টি হইয়াছে।

কত দিন হইতে গাঙ্গেয় "ব"-দ্বীপের এই অংশ সুন্দরবন দ্বারা পরিবৃত হইয়াছিল, তাহা আজিও ঠিক নির্দ্ধারিত হয় নাই। পূর্ব্বে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তথায় প্রাচীন লোকালয়ের কোনরূপ বিশেষ নিদর্শন পান নাই বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, উহা চিরদিনই ঐরূপ অবস্থায় ছিল এবং কখনও সেখানে গ্রাম নগরাদি ছিল না। তৎকালে উহার স্থানে স্থানে অরণ্য-মধ্য হইতে যে সকল মজা পুষ্করিণী ও ইষ্টক-নির্ম্মিত গৃহ ও ঘাট প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছিল, সেগুলিকে তাঁহারা প্রাচীনকালে আবাদকারী লোক সময়ে সময়ে তথায় যে বসতি করিত, তাহার নিদর্শন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ইদানীং অরণ্য হাসিলের পর উহার বিভিন্ন অংশে প্রাচীন জনপদের যে সকল বহুসংখ্যক ভগ্নাবশেষ ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ নিদর্শনাদি দেখা যাইতেছে, তৎসমুদায় হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, চিরদিন উহা ঐরূপ অরণ্যময় ছিল না এবং প্রাচীনকালে উহার নানা অংশ শত শত দেবালয় ও বহু সমৃদ্ধিশালী জনপদে সুশোভিত এবং বাণিজ্য-গৌরবে গৌরবান্বিত ছিল। প্রাচীন কীর্ত্তিরাশির ঐ সকল ভগ্নাবশেষের ও নিদর্শন সমূহের এবং উহার যে সকল অংশে ঐগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেই সকল স্থানের যথাসম্ভব পরিচয় আমরা নিম্নে ক্রমে ক্রমে প্রদান করিতেছি।

গাঙ্গেয় 'ব'-দ্বীপের মানচিত্র

ছত্রভোগ *

ছত্রভোগ এক্ষণে মথুরাপুর থানার উত্তর-পূর্ব্বাংশে, উত্তর হাতীয়াঘর পরগণায় ৩৭১ নম্বর তৌজীর মধ্যে একখানি ক্ষুদ্র গ্রামরূপে অবস্থিত। 'আইন-ই-আকবরী' হইতে বুঝা যায়, খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে এই সকল স্থান সরকার সাতগার অধীন ছিল। প্রাচীনকালে যখন ইহার পূর্ব্বসীমা দিয়া ভাগীরথী নদী প্রবাহিত হইত, তৎকালে এই স্থান এতদ্দেশের একটি প্রসিদ্ধ জনপদ ছিল বলিয়া জানা যায়। ইদানীং তথায় যে সকল প্রাচীন
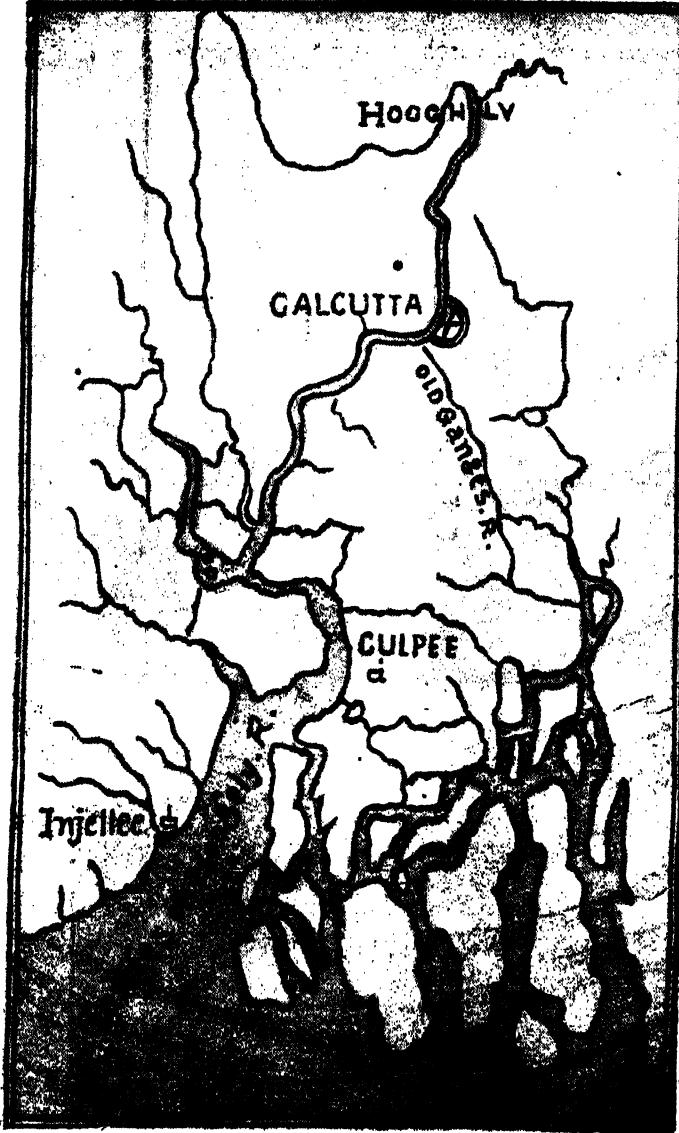
* H. Blochmann's Geographical and Historical Notes on the Burdwan and Presidency Divisions of Lower Bengal, compiled for Hunter's Statistical Account of Bougal.

ত্রিপুরাসুন্দরী তীর্থক্ষেত্র

কীর্ত্তি-কলাপের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ত্রিপুরাসুন্দরী তীর্থক্ষেত্রের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমান সময়ে তথায় ত্রিপুরাবালাভৈরবী নাম্নী এক দারুময়ী দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা আছেন। প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠমাসে তাঁহার 'জাত' উপলক্ষে একটি মেলা হইয়া থাকে। প্রবাদ, এই তীর্থক্ষেত্র একটি পীঠস্থান এবং উক্ত দেবী ত্রিপুরাসুন্দরী শক্তি ও বড়াশী গ্রামের অম্বুলিঙ্গ বা বদরিকানাথ ইঁহার ভৈরব। সাধারণের বিশ্বাস, সেখানে সতী অঙ্গ হইতে দেবীর বুকের ছাতি পড়িয়াছিল। কথিত আছে যে, হাতীয়াঘরের এই প্রাচীনতম তান্ত্রিক তীর্থক্ষেত্রে নরবলি হইত। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত তাঁহার প্রসিদ্ধ চণ্ডীকাব্যে লিখিয়াছেন যে, প্রাচীন যুগে উজানি নগরের বিখ্যাত শ্রীমন্ত ও ধনপতি সওদাগর ভাগীরথীপথে সিংহলযাত্রাকালে এইখানে নামিয়া প্রথমে দেবী ত্রিপুরার ও তৎপরে অম্বুলিঙ্গের ও নীলমাধবের পূজা করিয়াছিলেন। যথা—

"নাচনগাছা বৈষ্ণবঘাটা বামদিকে থুয়্যা।
দক্ষিণেতে বারাসাত গ্রাম এড়াইয়া॥
ডাহিনে অনেক গ্রাম রাখে সাধু বালা।
ছত্রভোগে উত্তরিলা অবসান বেলা॥
ত্রিপুরা পূজিয়া সাধু চলিলা সত্বর।
অম্বুলিঙ্গে গিয়া উত্তরিলা সদাগর॥
শ্রীনীলমাধবপূজা করেন তৎপর।
তাহার মেলানে সাধু পাইলা হাতে ঘর॥"

প্রবাদ যে, দেবীর একটি বহু প্রাচীন উত্তুঙ্গ ভগ্নমন্দির অরণ্যমধ্য হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ১২৭১ সালের ঝড়ে উহা ভূমিসাৎ হইয়া যায়। এক্ষণে সেখানে একটি নূতন দেবীগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। উহার চতুর্দ্দিকে এখনও উক্ত প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান আছে। উহার মধ্য হইতে বড় বড় কয়েকটি প্রস্তরখণ্ড ও জীর্ণ রক্ত-বস্ত্র-পরিহিত দেবীর বহু প্রাচীন একটি যন্ত্রমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই দেবালয়ের মধ্যে এক্ষণে একটি কৃষ্ণপ্রস্তরের নৃসিংহমূর্ত্তি ও একটি শিবলিঙ্গ আছে। ঐ মূর্ত্তি দুইটি উক্ত স্থানের একটি পুষ্করিণীসংস্কারকালে পাওয়া গিয়াছে। উহার দক্ষিণে অরণ্যমধ্য হইতে

জগ কুবেরমূর্ত্তি

একটি বৃহৎ দীর্ঘিকাও বাহির হইয়াছে। এক্ষণে উহা তথায় 'রাঘব দত্তর' দীঘি নামে প্রসিদ্ধ। উহার চারিদিকে চারিটি বড় বড় ইষ্টকনির্ম্মিত ঘাট ছিল। আজিও ঐগুলির ভগ্নাবশেষ চৈত্র-বৈশাখমাসে জলের নিম্নে দেখিতে পাওয়া যায়। ছত্রভোগের দক্ষিণ-পার্শ্বে কৃষ্ণচন্দ্রপুর গ্রাম অবস্থিত। এখানে বহুসংখ্যক গৃহের, মন্দিরের ও ঘাটের ভগ্নাবশেষ এবং কয়েকটি কৃষ্ণ প্রস্তরের দেবদেবীর মূর্ত্তি অরণ্যমধ্য হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহাদের মধ্যে চক্রকীর বাগানে প্রাপ্ত একটি কুবেরমূর্ত্তি উল্লেখযোগ্য। চৌদ্দশত পনের শত বৎসরের যে সকল মনসার ভাসানের ও চণ্ডীর গানের পুথি পাওয়া যায়, তৎসমুদায় হইতে অবগত হওয়া যায় যে, লোক পূর্ব্বকালে এই স্থান দিয়াও সমুদ্রে যাইত এবং ইহা তৎকালে এতদ্দেশের একটি প্রধান বন্দররূপে পরিগণিত ছিল। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবও নীলাচলগমনকালে গঙ্গাতীর দিয়া এখানে আসিয়াছিলেন। তখন এই প্রদেশ রামচন্দ্র খাঁ নামক এক ব্যক্তির শাসনে ছিল। তিনি সে সময় ছত্রভোগে উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহার সহিত মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ হইয়াছিল। চৈতন্যভাগবতে বৃন্দাবন দাস এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এই—

"এইমত প্রভু জাহ্নবীর কূলে কূলে।
আইলেন ছত্রভোগে মহা কুতূহলে॥
সেই ছত্রভোগে গঙ্গা হইয়া শতমুখী।
বহিতে আছয়ে সর্ব্বলোকে করে সুখী॥
জলময় শিবলিঙ্গ আছে সেই স্থানে।
অম্বুলিঙ্গ ঘাট করি বলে সর্ব্বজনে॥
সেই গ্রামে অধিকারী রামচন্দ্র খাঁন।
যদ্যপি বিষয়ী তবু মহাভাগ্যবান্॥
অন্যথা প্রভুর সঙ্গে তান দেখা কেনে।
দৈবগতি আসিয়া মিলিলা সেই স্থানে॥
দেখিয়া প্রভুর তেজ ভয় হইল মনে।
দোলা হইতে সত্বর নামিলা সেইখানে॥
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলা ভূমিতলে।
প্রভুর নাহিক বাহ্য প্রেমানন্দ-জলে॥
কিছু স্থির হৈয়া বৈকুণ্ঠের চূড়ামণি।
রামচন্দ্র খাঁনে জিজ্ঞাসিলেন কে তুমি॥
সম্ভ্রমে করিয়া দণ্ডবত করজোড়।
বলে প্রভু দাস অনুদাস মুঞি তোর॥
তবে শেষে সর্ব্বলোকে লাগিলা কহিতে।
এই অধিকারী প্রভু দক্ষিণরাজ্যেতে॥

দ্বিতীয় অধ্যায়—অন্ত্যখণ্ড।

এই রামচন্দ্র খাঁন গৌড়েশ্বর হুসেন শাহার এক জন বিশেষ অনুগৃহীত ব্যক্তি ছিলেন। বর্ত্তমান খুলনা জিলার বেনাপোলের সন্নিকটে কাগজপুখুরিয়া নামক স্থানে তাঁহার নিবাস ছিল। আজিও সেখানে তাঁহার বিস্তীর্ণ রাজবাটীর ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান আছে। মহাপ্রভুর আদেশমত ইনিই ছত্রভোগ হইতে প্রয়াগঘাটে যাইবার জন্য তাঁহার নৌকা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। মহাপ্রভু এক রাত্রি এখানে এক ব্রাহ্মণের বাটীতে কীর্ত্তনানন্দে যাপন করিয়া পরদিন প্রভাতে উক্ত নৌকাযোগে প্রয়াগঘাটে গমন করিয়াছিলেন। এই সময় উৎকল-সম্রাটের সহিত গৌড়েশ্বরের কলহ চলিতেছিল। সে কারণ গৌড়দেশ হইতে কেহ সহজে উৎকলে যাতায়াত করিতে পারিত না। চৈতন্যভাগবতে এ বিষয়ে বৃন্দাবন দাস যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, নিম্নে তাহারও কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

"প্রভু বলে তুমি অধিকারী বড় ভাল।
নীলাচলে যাই আমি কেমতে সকাল॥
বহয়ে আনন্দধারা কহিতে কহিতে।
নীলাচলচন্দ্র বলি পড়িলা ভূমিতে॥
রামচন্দ্র খাঁন বলে শুন মহাশয়।
যে আজ্ঞা তোমার সেই কর্ত্তব্য নিশ্চয়॥
তবে প্রভু হইয়াছে বিষম সময়।
সে দেশে এ দেশে কেহ পথ নাহি বয়॥
রাজারা ত্রিশূল পুতিয়াছে স্থানে স্থানে।
পথিক পাইলে জাশু বলি লয় প্রাণে॥
কোন্ দিগ দিয়া বা পাঠাঙ লুকাইয়া।
তাহাতে ডরাই প্রভু শুন মন দিয়া।
মুঞি সে নফর হেথাকার মোর ভার।
লাগালি পাইলে আগে সংশয় আমার॥
তথাপিহ যেতে কেনে প্রভু মোর নয়।
যে তোমার আজ্ঞা তাহা করিমু নিশ্চয়॥

শুনিয়া হইলা সুখী বৈকুণ্ঠের নাথ।
হাসি তানে করিলেন শুভদৃষ্টিপাত ॥
দৃষ্টিমাত্র তাঁর সর্ব্ববন্ধ নাশ করি।
ব্রাহ্মণ-আশ্রমে রহিলেন গৌরহরি ॥
ব্রাহ্মণ-মন্দিরে হৈল পরম মঙ্গল।
প্রত্যক্ষ পাইল সর্ব্ব-সুকৃতের ফল ॥
নানা যত্নে দৃঢ় ভক্তিযোগচিত্ত হইয়া।
প্রভুর রন্ধন বিপ্র করিলেন গিয়া ॥
নামমাত্র ঠাকুর সে করেন ভোজন।
নিজাবেশে অবকাশ নাহি তাঁর মন ॥
কিছুমাত্র অন্ন প্রভু পরিগ্রহ করি।
উঠিলেন হুঙ্কার করিয়া গৌরহরি ॥
আবিষ্ট হইলা প্রভু করি আচমন।
কত দূর জগন্নাথ বলে ঘন ঘন ॥
মুকুন্দ লাগিল মাত্র কীর্ত্তন করিতে।
আরম্ভিলা বৈকুণ্ঠের ঈশ্বর নাচিতে ॥
পুণ্যবন্ত যত যত ছত্রভোগবাসী।
সভে দেখে নৃত্য করে বৈকুণ্ঠবিলাসী ॥
অশ্রু, কম্প, হুঙ্কার, পুলক, স্তম্ভ, ঘর্ম্ম।
কত হয় কে জানে সে বিকারের মর্ম্ম ॥
এইমত গেল রাত্রি তৃতীয় প্রহর।
স্থির হইলেন প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর ॥
হেনই সময়ে কহে রামচন্দ্র খাঁন।
নৌকা আসি ঘাটে প্রভু হৈলা বিদ্যমান ॥
সেইক্ষণে হরি বলি শ্রীগৌরসুন্দর।
উঠিলেন গিয়া প্রভু নৌকার উপর ॥
শুভদৃষ্টে লোকেরে বিদায় দিয়া ঘরে।
চলিলেন প্রভু নীলাচল নিজ পুরে ॥"

দ্বিতীয় অধ্যায়,—অন্ত খণ্ড।

উক্ত ভাগবত হইতে আরও জানা যায় যে, এই সময়ের পূর্ব্বকাল হইতেই ছত্রভোগের দক্ষিণাংশপ্রদেশের জনপদ-সমূহ ধ্বংস হইয়া ব্যাঘ্র ও কুম্ভীরাদি হিংস্র জীবের আশ্রয়-স্থানরূপে নিবিড় অরণ্যে পরিণত হইয়া গিয়াছিল ও দস্যু-ভয়ে তৎকালে ঐ প্রদেশ দিয়া সাবধানে যাতায়াত করিতে হইত। তজ্জন্য মহাপ্রভুর পার্ষদ গোস্বামিগণ ভাগীরথী-বক্ষে নৌকার উপর সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলে যতক্ষণ পর্য্যন্ত উড়িয়ার দেশ পাওয়া না যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত মাঝি তাঁহা-দিগকে নীরবে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিল। যথা—

"প্রভুর আজ্ঞায় শ্রীমুকুন্দ মহাশয়।
কীর্ত্তন করেন প্রভু নৌকায় বিজয় ॥
অবুধ নাইয়া বোলে হইলা সংশয়।
বুঝিলাম আজি আর প্রাণ নাহি রয় ॥
কূলে উঠিলে সে বাঘে লইয়া পালায়।
জলে পড়িলে সে বোল কুম্ভীরেই খায় ॥
নিরন্তর এই পানিতে ডাকাইত ফিরে।
পাইলেই ধন-প্রাণ দুই নাশ করে ॥
এতেক যাবৎ উড়িয়ার দেশ পাই।
তাবত নীরব হও সকল গোসাঞি ॥
সঙ্কোচ হইলা সভে নাইয়ার বোলে।
প্রভু সে ভাসে নিরবধি প্রেমজলে ॥"

দ্বিতীয় অধ্যায়,—অন্ত্যখণ্ড।

অম্বুলিঙ্গ ও মাদপুরা

এই ছত্রভোগ গ্রামের প্রায় এক ক্রোশ দক্ষিণে বড়াশী গ্রাম অবস্থিত। এইখানে জলমধ্যে অম্বুলিঙ্গ বা বদরিকানাথ নামে একটি লিঙ্গমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় ৯০ বৎসর পূর্ব্বে উহা ঐরূপ অবস্থায় অরণ্যমধ্য হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। চৈতন্যভাগবত পাঠে বুঝা যায় যে, প্রাচীনকালে এই স্থানকেও ছত্রভোগ বলিত এবং এইখানে উক্ত মহাদেবের নামানুসারে অম্বুলিঙ্গ ঘাট নামে গঙ্গার একটি প্রসিদ্ধ ঘাট ছিল। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ছত্রভোগে আসিয়া তথায় পরমানন্দে ভক্তগণকে লইয়া স্নান করিয়া-ছিলেন।

"ছত্রভোগে গেলা প্রভু অম্বুলিঙ্গ ঘাটে।
শতমুখী গঙ্গা প্রভু দেখিলা নিকটে ॥
আনন্দ-আবেশে প্রভু সর্ব্বগণ লইয়া।
সেই ঘাটে স্নান করিলেন সুখী হৈয়া ॥
অনেক কৌতুক প্রভু করিলেন স্নানে।
বেদব্যাস তাহা সব লিখিবে পুরাণে ॥"

বর্ত্তমানকালে ইহারই সন্নিকটে ভাগীরথীর পূর্ব্বোক্ত শুষ্ক-গর্ভের উপর চক্রতীর্থ নামে একটি তীর্থস্থান আছে। এই

তীর্থস্থান সম্বন্ধে সেথানে এইরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, ভগীরথ গঙ্গাকে লইয়া যাইতে যাইতে এই স্থানে তাঁহাকে আর চিনিতে পারেন নাই। সেই কারণে গঙ্গাদেবী তথায় ভগীরথকে নিজ হস্তস্থিত চক্র দেখাইয়া নিজ স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। এথানে এই চক্রতীর্থে চক্রকুণ্ড, গোপালকুণ্ড ও মণীকুণ্ড নামে তিনটি পুষ্করিণীতে স্নানযাত্রা উপলক্ষে প্রতি বৎসর 'নন্দার মেলা' নামে তিন দিন-ব্যাপী একটি বিখ্যাত মেলা হইয়া থাকে। ইহাতে প্রায় ৩০ হাজার লোকের সমাগম হয়। প্রবাদ, ঐ দিন সেথানে সকল তীর্থ উপস্থিত হন। সে কারণে তথন তথায় স্নান করিলে সর্ব্বতীর্থে স্নান করার ফললাভ হইয়া থাকে। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত কবি কৃষ্ণরামের পূর্ব্বোল্লিখিত রায়মঙ্গল কাব্যেও এই প্রসিদ্ধ স্নানের উল্লেখ দেখা যায়। যথা—

"অম্বুলিঙ্গ মহাস্নান নাহি যার উপমান
তথায় বন্দিল বিশ্বনাথ।
বাজে বাদ্য সুমধুর বাহিয়া রাজা বিষ্ণুপুর
জয়নগর করিলা পশ্চাৎ॥"

উহা হইতে বুঝা যায় যে, প্রাচীনকালেও এই স্নান খুব প্রসিদ্ধ ছিল। আমাদের বোধ হয়, ইহারই কথা বরাহ-পুরাণে ও শ্রীকৃষ্ণ মিশ্রবিরচিত প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে উল্লিখিত হইয়াছে। * চৈতন্য-ভাগবতে উক্ত অম্বুলিঙ্গ শঙ্করের উৎপত্তি সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে যে, পুরাকালে ভগীরথ কঠোর তপস্যা করিয়া নিজ বংশ উদ্ধারের নিমিত্ত স্বর্গ হইতে গঙ্গা দেবীকে বহুদিন ধরিয়া এতদ্দেশে লইয়া আসিলে শঙ্কর তাঁহার বিরহে বিহ্বল হইয়া তাঁহাকে স্মরণ করিতে করিতে নানাদেশ ভ্রমণ করেন এবং অবশেষে ছত্রভোগে আসিয়া তাঁহার সাক্ষাৎপ্রাপ্ত হন। তদবধি তিনি তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া এইথানেই অম্বুলিঙ্গ নামে জলমধ্যে অবস্থান করেন, এবং গঙ্গাশিবপ্রভাবে ছত্রভোগ গ্রাম মহাতীর্থরূপে প্রসিদ্ধ হয়।

অম্বুলিঙ্গের মন্দির—বড়াশী

"অম্বুলিঙ্গ শঙ্কর হইলা সে নিমিত্ত।
সেই কথা কহি শুন হই একচিত্ত॥
পূর্ব্বে ভগীরথ করি গঙ্গা আরাধন।
গঙ্গা আনিলেন বংশ-উদ্ধার কারণ॥
গঙ্গার বিরহে শিব বিহ্বল হইয়া।
শিব আইলেন শেষে গঙ্গা সঙরিয়া॥
গঙ্গারে দেখিয়া শিব সেই ছত্রভোগে।
বিহ্বল হইলা অতি গঙ্গা অনুরাগে॥
গঙ্গা দেখিমাত্র শিব গঙ্গায় পড়িলা।
জলরূপে শিব জাহ্নবীতে মিশাইলা॥
জগন্মাতা জাহ্নবীও দেখিয়া শঙ্কর।
পূজা করিলেন ভক্তি করিয়া বিস্তর॥
শিব সে জানেন গঙ্গা-ভক্তির মহিমা।
গঙ্গাও জানেন শিব-ভক্তির যে সীমা॥
গঙ্গাজল স্পর্শে শিব হইলা জলময়।
গঙ্গাও পাইয়া শিব করিলা বিনয়॥
জলরূপে শিব রহিলেন সেই স্থানে।
অম্বুলিঙ্গ ঘাট বলি ঘোষে সর্ব্বজনে॥

* বরাহপুরাণে দেখা যায় যে, উক্ত তীর্থ ত্রিবেণীর পরে এই চক্রতীর্থ তৎকালে ভাগীরথী তীরে একটি মহাতীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল এবং উহাতে স্নান পরম পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইত। উহা তথন বিখ্যাত সৌকরক্ষেত্রের অন্তর্গত ছিল।
বরাহপুরাণ—ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়

গঙ্গা-শিব-প্রভাবে সে ছত্রভোগ গ্রাম।
হইলা পরম ধন্য মহাতীর্থ নাম॥"

দ্বিতীয় অধ্যায়,—অন্ত্যখণ্ড।

বর্ত্তমান সময় যেখানে অম্বুলিঙ্গের মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়, উহা তথাকার প্রাচীন মন্দির নহে। প্রবাদ, বহুপূর্ব্বে ভূমিকম্পে উহা ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল এবং অরণ্য হাসিলের পর উক্ত প্রাচীন মন্দিরেরই ভগ্নাবশেষের উপর ইদানীন্তন মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। উহার সম্মুখস্থ মাঠের উপর একটি প্রকাণ্ড প্রস্তরের পেনেট পড়িয়া আছে। শুনা যায়, উহাও জঙ্গলমধ্য হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। শাস্ত্রগ্রন্থাদির নির্দ্দেশ হইতে বুঝা যায় যে, উক্ত লিঙ্গমূর্ত্তি কালীঘাট প্রভৃতি স্থানের নকুলেশ্বর-ভৈরবাদির ন্যায় স্বয়ম্ভূ বা অনাদি লিঙ্গ। * শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় এই লিঙ্গমূর্ত্তি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে পরম শৈব নরপতি নরেন্দ্র গুপ্তের রাজত্বকালে অথবা তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী যুগে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া অনুমান করেন। † এই স্থানের প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দক্ষিণে মাদপুর গ্রাম। এইখানে শ্রীযুক্ত ভূতনাথ চক্রবর্ত্তী নামক এক ব্রাহ্মণের বাটীতে একটি জীর্ণ কুটীরের মধ্যে আমরা একটি কষ্টি-পাথরের অপূর্ব্ব বিষ্ণুমূর্ত্তি দেখিয়াছি। শুনা যায়, উহার মন্দিরের ভগ্নাবশেষ পূর্ব্বে ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে দ্বারীর জাঙ্গাল নামক রাস্তার উপর বিদ্যমান ছিল। ঐ মন্দিরের স্থান আজিও তথায় 'মাধবের পুরী' নামে প্রসিদ্ধ। কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্যে দেখা যায়,

মাদপুরের বিষ্ণুমূর্ত্তি

শ্রীমন্ত সওদাগর সিংহলযাত্রাকালে ছত্রভোগে আসিয়া শ্রীশ্রীনীলমাধব নামে এক বিষ্ণুমূর্ত্তির পূজা করিয়াছিলেন। প্রবাদ, ইহাই সেই বিষ্ণুমূর্ত্তি। ইঁহার দক্ষিণোর্দ্ধহস্তে গদা, বামোর্দ্ধ হস্তে চক্র, বামাধঃ হস্তে শঙ্খ ও দক্ষিণাধঃ হস্তে পদ্ম আছে। ইঁহার নাম কিন্তু অগ্নিপুরাণ ও পদ্মপুরাণ অনুসারে ত্রিবিক্রম এবং হেমাদ্রিকৃত সিদ্ধার্থসংহিতার পরিচয়মতে উপেন্দ্র। *

[ক্রমশঃ।

* ষটকর্ম্মদীপিকাতে অনাদি বা স্বয়ম্ভু লিঙ্গের নিম্নোদ্ধৃত রূপ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে :—
"নানাচ্ছিদ্রসমাযুক্তং নানাবর্ণসমন্বিতম্।
অদৃষ্টমূলং যল্লিঙ্গং কর্কশং ভুবি দৃশ্যতে॥"
† যশোহর খুলনার ইতিহাস। প্রথম খণ্ড।

* বিষ্ণুমূর্ত্তির পরিচয়। শ্রীবিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ বিদ্যাবিনোদ।

প্রবোধ

যদি কভু দুখ ললাটে তোমার
　　আঁকে কালিমার রেখা,
যদি আশা-আলো পলকে লুকায়
　　দিয়া ক্ষণেকের দেখা;

যদি আনন্দ মুকুলে মিলায়
　　গোধূলি রঙের সম,
ঊর্দ্ধে চাহিয়ো, সেথা তব তরে
　　আছে সুখ অনুপম।

শ্রীউমানাথ ভট্টাচার্য্য।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মেঘাড়ম্বর

মিসেস্ কুরেট উত্তেজিত হইয়াছিল ; তাহার স্বামী তাহাকে সংযত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিল ; কিন্তু তাহাকে এত দিন পরে আর সামলাইয়া রাখিতে পারিল না। বৃদ্ধা সক্রোধে তাহার স্বামীকে বলিল, "শোন্ বুড়ো ! আমরা নিতান্ত বোকা বলিয়াই এত দিন কোন কথা প্রকাশ না করিয়া মুখ বুজিয়া বসিয়া ছিলাম ; কিন্তু আর আমি বোবা সাজিয়া বসিয়া থাকিব না। আমাদের দোষেই জোসেফ আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে,—ইহা আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। যদি আমরা ঠিক সময়ে তাহার জন্ম-বৃত্তান্ত—তাহার জীবনের সকল বিবরণ খুলিয়া বলিতাম, তাহা হইলে তাহার জীবন ভিন্ন পথে পরিচালিত হইত ; সে সুখী হইতে পারিত। আমাদের দোষেই সে মৃত্যুকে বরণ করিয়াছে ; আমরা চিরদিনের জন্য তাহাকে হারাইয়াছি।—এখনও তুমি আমাকে বোবা সাজিয়া মুখ বুজিয়া বসিয়া থাকিতে বল ? বেহায়া বোকা মিন্‌ষে !"

মিসেস্ কুরেটের এই তীব্র ভর্ৎসনায় তাহার বৃদ্ধ স্বামী বিন্দুমাত্র ক্রোধ বা চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া ধীরভাবে বলিল, "আমরা জোসেফের বাল্যজীবনের সকল কথা গোপন রাখিয়া ভাল করিয়াছিলাম কি না, তাহা এখন তুমি ভুলিয়া গিয়াছ,গিন্নি ! এ জন্য আজ তোমার মনে হইতেছে—আমরা বড়ই নির্ব্বোধের কায করিয়াছি। কিন্তু কথাটা প্রকাশ করিলে জোসেফকে তাহার শৈশবকালেই হারাইতাম, আমাদেরও প্রাণরক্ষা হইত না।"

মিসেস্ কুরেট তাহার স্বামীর যুক্তিসঙ্গত কথা অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া বলিল, "সে কথা মিথ্যা নয় ; কিন্তু সকল কাযেরই একটা সময় আছে ত ? যখনকার যা, তখন তা করিলে পরে পস্তাইতে হয় না। আনা স্মিটের বংশ ত কামারের বংশ ; ছোটলোকের কিছু টাকা হইলে তাহারা মানুষকে মানুষ জ্ঞান করে না। টাকার জোরে 'ছেলে' হইয়াছে 'কুলীন !' আমি এই একপুরুষে কুলীনগুলাকে জানাইতে চাই— যে জোসেফকে তাহারা চিরদিন ছোটলোক ভাবিয়া ঘৃণা করিয়া আসিয়াছে, বুড়ী স্মিট যাহার হাতে বার্থাকে সম্প্রদান করা দারুণ অপমানের বিষয় মনে করিয়া অবজ্ঞাভরে মুখ ফিরাইয়াছিল, আমাদের সেই জোসেফের জন্ম পোলাণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাচীন বংশে। স্মিটদের পূর্ব্বপুরুষ সেই বংশের দরোয়ানী করিতে পাইলেও আপনাদিগকে ধন্য মনে করিত।"

রেবেকা নির্ব্বাক্‌ভাবে, নিবিড় বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া মিসেস্ কুরেটের এই সকল কথা শুনিতেছিল ; কথাগুলি এরূপ অসম্ভব মনে হইতেছিল যে, তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইতেছিল না। এই অবিশ্বাস তাহার চক্ষুতে প্রতিফলিত হইল। মিসেস কুরেট রেবেকার মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিতে পারিল—রেবেকা তাহার কথা বিশ্বাস করিতে পারে নাই। ইহাতে সে ক্ষুব্ধ হইয়া রেবেকাকে বলিল, "আমার কথা বুঝি তোমার বিশ্বাস হইল না ? কিন্তু আমি মিথ্যা কথা বলি নাই ; পরমেশ্বর আছেন—এ কথা যেমন সত্য, আমার কথাও সেইরূপ সত্য।"

কিন্তু বৃদ্ধার এ কথা শুনিয়াও রেবেকার সংশয় দূর হইল না ; সে অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া সন্দিগ্ধ স্বরে বলিল, "তোমার কথা সত্য হইলে আমি কি আজ তোমাদিগকে এই ক্ষুদ্র কুটীরে দীনহীন কৃষকের ন্যায় বাস করিতে দেখিতাম ?"

মিসেস্ কুরেট বলিল, "দরিদ্রের বংশে আমাদের জন্ম, আমরা দরিদ্রই আছি। পুরুষানুক্রমে কৃষিকর্ম্মই আমাদের পেশা ; আমরাও কৃষিজীবী।"

রেবেকা বলিল, "এই জন্যই ত আমার মনে খট্‌কা বাধিয়াছে ! তোমরা পুরুষানুক্রমে কৃষিজীবী, আর তোমাদের পুত্র জোসেফ একটি মহাসম্ভ্রান্ত প্রাচীনবংশের সন্তান !

তোমার এই দুই রকম কথার সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাইতেছি না।"

এইবার বৃদ্ধ কুরেট রাগ করিয়া তাহার স্ত্রীকে বলিল, "তুমি যখন অত কথাই বলিলে, তখন মাদময়সেল রেবেকাকে এ কথাটাও কেন খুলিয়া বলিতেছ না যে, জোসেফের আসল মা-বাপ আমরা নহি?"

এই কথা শুনিয়া রেবেকা সবিস্ময়ে রুদ্ধনিশ্বাসে বলিয়া উঠিল, "জোসেফের আসল মা-বাপ তোমরা নও? জোসেফ কি তোমাদের ছেলে নয়?"

মিসেস্ কুরেট মাথা নাড়িয়া বলিল, "না। যদি আমাদের ঐ বুড়োটা মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিয়া আমার কথায় বাধা না দেয়, আমার শক্তি অনুসারে সকল কথা গুছাইয়া বলিবার চেষ্টা করিলেও, বুড়ো যদি তাহার মনের মত করিয়া বলিতে পারিতেছি না—দেখিয়া মাথা না নাড়ে—তাহা হইলে জোসেফের সকল কথাই তোমাকে বলিতে পারি।"

পত্নীর কথায় বৃদ্ধ কোন মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিল। মিঃ কুরেট তাহার বাক্যস্রোতে বাধা দিবে না, ইহা বুঝিতে পারিয়া মিসেস্ কুরেট বলিতে আরম্ভ করিল,—"জোসেফ যখন দুই বৎসরের শিশু, সেই সময় হইতে আমরা প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিলেও সে আমাদের সন্তান নহে; তাহার সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধও নাই। আমি রুসিয়ান, আর আমার ঐ বুড়োটা পোল; কিন্তু পোল হইলেও আমার স্বামী বাল্যকাল হইতে রুসিয়াদেশেই প্রতিপালিত হইয়াছিল। বিবাহের পর আমরা স্বামি-স্ত্রীতে সুইট্‌জারল্যাণ্ডে চলিয়া আসি এবং জেনিভা নগরে কাউণ্ট মাট্রিস্কির পরিবারে চাকরী লই।"

বৃদ্ধা নীরব হইল।—রেবেকা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আগ্রহভরে বলিল, "কাউণ্ট মাট্রিস্কি!—কে তিনি?"

মিসেস্ কুরেট রেবেকার অজ্ঞতায় দুঃখিত হইয়া বলিল, "তুমি রুসিয়ার মেয়ে—তাঁহার পরিচয় কিরূপে জানিবে? কিন্তু তাঁহার নাম, তাঁহার বংশগৌরবের কথা পোলাণ্ডের কোন লোকের অজ্ঞাত ছিল না। পোলাণ্ডের মহাসম্রান্তবংশে তাঁহার জন্ম; তাঁহার যেমন বংশমর্য্যাদা, সেইরূপ বিপুল ঐশ্বর্য্যেরও তিনি অধিকারী ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর মত রূপবতী ও গুণবতী মহিলা সে সময় য়ুরোপে আর এক জনও ছিলেন না, এ কথা অনেককেই বলিতে শুনিয়াছিলাম।"

পত্নীর কথা শুনিয়া বৃদ্ধ সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, "হাঁ, আমি হলফ করিয়া বলিতে পারি, এ কথা সত্য। বহুভাগ্যে এমন মনিব পাওয়া যায়।" পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া বৃদ্ধ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

বিবি কুরেট বলিল, "হাঁ. মনিবের মত মনিব! যেমন স্বামী—সেই রকম স্ত্রী। কি কারণে জানি না, কাউণ্ট রুসিয়ার জারের অসন্তোষভাজন হইয়া পোলাণ্ড হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন; এই জন্য তিনি রাগ করিয়া নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়ে যোগ দিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার সর্ব্বনাশের মূল।"

রেবেকা বিবি কুরেটের শেষের কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিল, "জোসেফ কি কাউণ্ট মাট্রিস্কির পুত্র?" সকল কথা শুনিবার জন্য তাহার আগ্রহ ও কৌতূহল ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছিল।

বিবি কুরেট বলিল, "হাঁ, জোসেফ এই কাউণ্ট-দম্পতির সন্তান। জোসেফের মত রূপবান্ গুণবান্ ছেলে কি কখন চাষার ঘরে জন্মে? কাউণ্ট যে নিহিলিষ্টদের দলে যোগদান করিয়া রাজরোষ মাথা পাতিয়া লইয়াছিলেন, যাহাদের হিতের জন্য জীবনের সুখ-শান্তি উৎসর্গ করিয়াছিলেন, সেই নিহিলিষ্টরাই বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া জেনিভা নগরে তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিল! কাউণ্ট এই ভাবে নিহত হওয়ায় কাউণ্টেসের মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, তাহা প্রকাশ করা আমার অসাধ্য; তাহার উপর তাঁহার আশঙ্কা হইয়াছিল, নিহিলিষ্টরা সুযোগ পাইলেই তাঁহাকেও হত্যা করিবে। এই জন্য তিনি আমাকে ও আমার স্বামীকে গোপনে বলিয়াছিলেন, নিহিলিষ্টরা যদি তাঁহাকেও হত্যা করে, তাহা হইলে আমরা যেন তাঁহার শিশু পুত্রকে লইয়া পলায়ন করি এবং তাহার প্রকৃত পরিচয় গোপন করিয়া, নিজেদের ছেলের মত তাহাকে প্রতিপালন করি। নির্ব্বাসিত পিতার পুত্র বলিয়া তাঁহার পুত্রের পোলাণ্ডে প্রত্যাগমনের উপায় ছিল না। বিশেষতঃ, কাউণ্টের সমস্ত সম্পত্তি রুসিয়ার রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত হওয়ায় স্বদেশপ্রত্যাগমন করিয়াও তাহার জীবিকার সংস্থান করিবার উপায় ছিল না। আমরা মেরী

মাতার শপথ করিয়া কাউণ্টেস্‌কে বলিলাম,— প্রাণপণে তাঁহার আদেশ পালন করিব। কাউণ্টেস্ জীবিত থাকিলে তাঁহার পুত্র ভদ্রসন্তানের মত প্রতিপালিত হইত। কারণ, জার্ম্মাণীতে তাঁহার যে কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি ছিল, তাহাতে জীবনকাল পর্য্যন্তই তাঁহার স্বত্ব ছিল। সেই আয় হইতে তিনি তাঁহার ছেলেটির লালনপালনের ব্যয়ভার বহন করিতে পারিতেন। কিন্তু কাউণ্টের হত্যাকাণ্ডের পর তিনিও নিহিলিষ্ট-হস্তে নিহত হওয়ায় তাঁহার শিশু পুত্র সেই সম্পত্তির আয়েও বঞ্চিত হইল। যাহা হউক, তাঁহার যে সকল অলঙ্কার ও সঞ্চিত অর্থ ছিল, তাহা তিনি আমাদের হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন, সেই টাকার সুদ হইতে তাঁহার পুত্রের ভরণপোষণ ও শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে। চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাহাকে কোন বিদ্যালয়ে লেখা-পড়া শিখাইয়া পরে সে কোন ব্যবসায় সম্বন্ধে অভিজ্ঞতালাভ করিতে পারে, আমাদিগকে তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। যে টাকা তিনি আমাদের নিকট গচ্ছিত রাখিলেন, আমাদের মৃত্যুর পর সে টাকা তাঁহার পুত্রই ফেরত পাইবে। আমরা তাঁহার সকল আদেশই মাথা পাতিয়া লইয়াছিলাম। কিন্তু জোসেফ সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত হইয়াছে, তাহার আর এ দেশে ফিরিবার আশা নাই; টাকাগুলি আর তাহার কাযে লাগিবে না! আমরা বুড়া হইয়াছি, কবে মরিয়া যাইব; কাউণ্টেসের টাকাগুলির কি ব্যবস্থা করিব, বুঝিতে পারিতেছি না। আহা! জোসেফের কথা মনে হইলে আমার বুক ফাটিয়া যায়। সেই দুই বৎসর বয়স হইতে নিজের ছেলের মত তাহাকে 'মানুষ করিয়া' তুলিয়াছিলাম। সকলেই জানে, জোসেফ আমাদেরই ছেলে।"

বৃদ্ধা নীরব হইয়া নিঃশব্দে রোদন করিতে লাগিল সকল কথা শুনিয়া রেবেকার চক্ষুও অশ্রুপূর্ণ হইল। সে দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "নিহিলিষ্টরা পতিশোকাতুরা অনাথা কাউণ্টেস্‌কেও হত্যা করিয়াছিল? কি নিষ্ঠুর!"

বিবি কুরেট চক্ষু মুছিয়া বলিল, "হাঁ, কাউণ্টকে হত্যা করিবার কয়েক দিন পরে তাহারা কাউণ্টেস্‌কেও খালের ধারে গুলী করিয়া মারিয়াছিল।"

রেবেকা কয়েক মিনিট নতমস্তকে নিস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল; তাহার পর সে মাথা তুলিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "উঃ, কি মর্ম্মভেদী শোচনীয় কাহিনী! তাহার জীবন এই ভাবে ব্যর্থ হওয়া কি দারুণ ক্ষোভের বিষয়! সে কে, কিরূপ সম্ভ্রান্তবংশে তাহার জন্ম, ইহা পর্য্যন্তও সে জানিতে পারে নাই। কি কষ্ট!"

রেবেকা জোসেফের প্রতি সহানুভূতিবশতঃই এ কথা বলিল। তাহার এই আক্ষেপে কুরেট-দম্পতির প্রতি তিরস্কারের আভাসমাত্র ছিল না; কিন্তু বিবি কুরেট রেবেকার মন্তব্যে মর্ম্মাহত হইয়া বলিল, "কিন্তু আমাদের দোষ কি? তাহার প্রতি আমাদের কর্ত্তব্যপালনে মুহূর্ত্তের জন্য আমরা যাহা করিয়াছি—নিজের ছেলের জন্য তাহার অধিক কিছুই করিতে পারিতাম না।"

বৃদ্ধা মনে আঘাত পাইয়াছে বুঝিয়া রেবেকা বলিল, "না, তোমাদের কোন দোষ নাই; তোমাদের যাহা সাধ্য, জোসেফের জন্য তাহা করিয়াছ, ইহা কে অস্বীকার করিবে?"

বুড়া কুরেট বলিল, "জোসেফকে সুখী করিবার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহার দুর্ম্মতি! সেই ডাইনী বেটী বুড়ী স্মিটের মেয়ে বার্থার প্রেমে পড়িয়া ইহকাল পরকাল নষ্ট করিল! বার্থার প্রেমে না পড়িলে আর যাহাই হউক, এ ভাবে তাহার সর্ব্বনাশ হইত না।"

জোসেফ বার্থাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিয়াছিল শুনিয়া রেবেকার হৃদয়ে ঈর্ষ্যানল জ্বলিয়া উঠিল। সে বার্থাকে কোন দিন না দেখিলেও তাহার মন হিংসায় ভরিয়া উঠিল; কিন্তু হিংসার কারণ সে বুঝিতে পারিল না। ইহা যে তাহার মানসিক দুর্ব্বলতা, তাহাও স্বীকার করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না।

রেবেকা বিবি কুরেটের নিকট যে বিস্ময়কর কাহিনী শ্রবণ করিল, তাহা বিশ্বাস করিতে তাহার প্রবৃত্তি না হইলেও তাহা মিথ্যা নহে, ইহা সে বুঝিতে পারিল; তাহার স্বামীর বিশ্বাসঘাতকতায় ও প্রতারণায় দুইটি নারীর জীবন অভিশপ্ত ও ব্যর্থ হইয়াছে বুঝিয়া, কাউণ্ট ভন আরেনবর্গকে চূর্ণ ও বিধ্বস্ত করিবার জন্য তাহার হৃদয় অধিকতর ব্যাকুল হইয়া উঠিল এবং ক্রোধ দমন করিতে অসমর্থ হইয়া নিজের ক্রোধে সে নিজেই দগ্ধ হইতে লাগিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সে প্রথমে সঙ্কল্প করিয়াছিল—বিচারালয়ে অভিযোগ করিয়া কাউণ্টকে দণ্ডিত করিবে; কিন্তু তাহার পিতা এই প্রস্তাবের সমর্থন করেন নাই। ইহার প্রধান কারণ এই যে, রেবেকা ও কাউণ্ট উভয়েই বিদেশী; দ্বিতীয়

কারণ, কাউণ্ট রেবেকাকে রুসিয়ায় এবং বার্থাকে জুরিচে বিবাহ করিয়াছিলেন; সুতরাং কাউণ্টের অপরাধের বিচার-কালে তাঁহার অনুকূলে আইনঘটিত অনেক কূট তর্ক উত্থাপনের আশঙ্কা ছিল। কাউণ্টের বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণার বিবরণ জনসমাজে প্রচারিত হইলে তাঁহার অপদস্থ হইবার সম্ভাবনা ছিল বটে; কিন্তু রেবেকা ভাবিয়া দেখিল—যাহার লজ্জা নাই, আত্মসম্মানজ্ঞান নাই, ভদ্রসমাজের ঘৃণা ও অবজ্ঞা যে তুচ্ছ মনে করে, তাহার কলঙ্ককাহিনী প্রচারিত করিয়া তাহাকে জব্দ করা অসম্ভব। রেবেকা সেইরূপ চেষ্টা করিলে নির্লজ্জ কাউণ্ট তাহাকে মিথ্যাবাদিনী বলিয়া উপহাস করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না; তাঁহার সহিত রেবেকার বিবাহ হইয়াছিল, ইহা সপ্রমাণ করিতে বলিবেন। রেবেকা জুরিচে বসিয়া তাহাদের বিবাহের প্রমাণ কিরূপে সংগ্রহ করিবে? বিশেষতঃ, কাউণ্ট সেণ্টপিটার্সবর্গে ছদ্ম নাম ধারণ করিয়া রেবেকাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই সকল কারণে রেবেকা প্রতিহিংসা গ্রহণের অব্যর্থ উপায় স্থির করিতে না পারিয়া তাহার পিতৃবন্ধু রডল্‌ফ মোজের শরণাপন্ন হইল। কিন্তু মোজে সে সময় জুরিচে ছিল না, সে তাহার কার্য্যক্ষেত্র ফ্রাঙ্কফোর্টে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মহাজনী কার্য্যে মনঃসংযোগ করিয়াছিল। অগত্যা রেবেকা পত্রযোগে তাহাকে সকল কথা জানাইয়া তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিল।

রেবেকার পত্রে সকল সংবাদ অবগত হইয়া মোজে তাহাকে লিখিল, "আর কিছু কাল ধৈর্য্যধারণ কর মা! আমার প্রিয় বন্ধু কাউণ্ট ভন আরেনবর্গ জুরিচে প্রত্যাগমন করিবামাত্র আমাকে সংবাদ দিবে।"

ক্রমে তিন মাস অতীত হইল; কাউণ্ট জুরিচে প্রত্যাগমন করিলেন না। রেবেকা অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়িল; বিশেষতঃ তাহার পিতার অবস্থা দেখিয়া তাহার মানসিক চাঞ্চল্য বৰ্দ্ধিত হইল। টাকার শোকে সলোমন কোহেনের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল; এই কয়েক মাসেই তাঁহার কেশরাশি তুষার-শুভ্র হইল, দুশ্চিন্তায় তাঁহার বয়স যেন দশ বৎসর বাড়িয়া গেল! মেজাজ খিট্‌খিটে হওয়ায় তাঁহার বাক্যের সংযম বিলুপ্ত হইল। তুচ্ছ বিষয় লইয়া রেবেকার মনে আঘাত করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। নিরুপায় হইয়া রেবেকা অশ্রুবর্ষণ করিত।

এই ভাবে আরও কয়েক সপ্তাহ অতিবাহিত হইলে রেবেকা এক দিন সায়ংকালে ভ্রমণোপলক্ষে কাউণ্টের বাসভবনে উপস্থিত হইয়া প্রহরীর নিকট সংবাদ পাইল, কাউণ্ট তাঁহার শাশুড়ীর সম্পত্তি-সংক্রান্ত কি একটা গোলমাল নিষ্পত্তি করিবার জন্য শীঘ্রই জুরিচে প্রত্যাগমন করিবেন। রেবেকা সেই বৃদ্ধ প্রহরীর নিকট কাউণ্টের গতিবিধির সংবাদ জানিবার জন্য মাসে দুই চারিবার তাহার স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিত এবং তাহাদিগকে বশীভূত করিবার জন্য নানাপ্রকার উপহারে পরিতুষ্ট করিত। রেবেকা প্রহরীর নিকট এ সংবাদ জানিতে পারিল যে, বার্থা লণ্ডনে উপস্থিত হইয়া হঠাৎ অত্যন্ত অসুস্থ হওয়ায় স্বামীর সহিত সে জুরিচে আসিতে পারিবে না; কাউণ্ট তাহাকে লণ্ডনে রাখিয়া একাকী জুরিচে প্রত্যাগমন করিবেন এবং জুরিচের কায শেষ করিয়াই লণ্ডনে ফিরিয়া যাইবেন।

এই সংবাদ পাইয়া রেবেকা আশ্বস্ত হইল এবং টেলিগ্রাম-যোগে তাহা মোজের গোচর করিল। মোজে সেই টেলিগ্রাম পাইবার পরদিনই জুরিচে উপস্থিত হইল। কাউণ্টকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য তাহার প্রবল আগ্রহ এই দীর্ঘকালেও বিন্দুমাত্র প্রশমিত হয় নাই। কাউণ্ট তাহাকে যে বেত্রাঘাত করিয়াছিলেন, তাহার স্মৃতি মোজের হৃদয়ে অক্ষুণ্ণ ছিল। কাউণ্টের সর্ব্বনাশসাধনের জন্য সে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল।

মোজে কাউণ্টকে বহুদিন হইতে মহাশত্রু জ্ঞানে ঘৃণা করিয়া আসিতেছিল। কারণ, মোজে অনেকবার তাঁহার দ্বারা প্রতারিত হইয়াছিল এবং কাউণ্টও তাহাকে আন্তরিক ঘৃণা ও ভয় করিতেন। কাউণ্ট রুসিয়া হইতে পলায়ন করিয়া জুরিচে আসিয়া বার্থাকে বিবাহ করিয়াছিলেন; বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া পরম সুখে কালযাপন করিতেছিলেন; আর মোজে গৃহহীন, পারিবারিক সুখে বঞ্চিত, অসচ্চরিত্র, মাতাল, সমাজ-পরিত্যক্ত। কাউণ্টের সুখ-সম্পদের পরিচয় পাইয়া তাহার হৃদয় ঈর্ষ্যানলে দগ্ধ হইতেছিল এবং কাউণ্ট তাহার বন্ধু-কন্যা রেবেকার সর্ব্বনাশ করিয়া বিনা দণ্ডে সেণ্টপিটার্সবর্গ হইতে পলায়ন করায় তাঁহাকে রীতিমত শিক্ষাদানের জন্য সে অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু মোজে অধিকাংশ ইহুদীর ন্যায় অর্থপিশাচ

ছিল; কাউণ্টের নিকট হইতে ধোঁকা দিয়া প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিবে—এই আশায় সে প্রকাশ্যভাবে তাঁহার প্রতি শত্রুতাচরণে বিরত ছিল। কিন্তু সে বার্থার অপমান করিয়া কাউণ্টের বেত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইল, কাউণ্টকে চূর্ণ ও বিধ্বস্ত করিবার যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল—সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিবার জন্য প্রতিদিন সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল, রেবেকার সাহায্যে এত দিন পরে সেই সুযোগ উপস্থিত। সুতরাং ফ্রাঙ্কফোর্ট হইতে জুরিচে আসিতে সে এক দিনও বিলম্ব করিল না। সে বুঝিয়াছিল, কাউণ্ট তাহাঁকে জুরিচে প্রত্যাগমন করিতে দেখিয়া তাহার সহিত সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা করিবেন, তাহার মুখ বন্ধ করিবার জন্য প্রচুর অর্থদানের প্রস্তাব করিবেন। কিন্তু কাউণ্ট তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব তাহাকে দান করিতে চাহিলেও তাঁহার সর্ব্বনাশ না করিয়া সে জুরিচ ত্যাগ করিবে না, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াই সে জুরিচে উপস্থিত হইয়াছিল। সে জানিত, নরপিশাচ কাউণ্ট এবার আর তাহার মুঠার ভিতর হইতে পলায়ন করিতে পারিবে না।

মোজে রেবেকার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে বলিল, "ক্ষুধিত ব্যাঘ্র যে ভাবে ঝোপের আড়াল হইতে পথিকের ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িয়া তাহাকে বধ করে, আমরা এই নরাধমকে সেই ভাবে হত্যা করিব না; সে যতই ইতর, প্রবঞ্চক, বিশ্বাসঘাতক হউক, শোণিতলোলুপ ব্যাঘ্রের ন্যায় তাহার শোণিতপানের জন্য আমাদের আগ্রহ নাই। আমরা তাহাকে অশেষ যন্ত্রণা দিয়া তিল তিল করিয়া হত্যা করিব। তাহার জীবনের সকল আশা, সুখ, শান্তি নষ্ট করিব; গৃহহীন, সম্বলহীন, নিরাশ্রয় ভিক্ষুকের ন্যায় তাহাকে পথে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে, সকলে তাহাকে দেখিয়া ঘৃণায় মুখ ফিরাইবে, তাহার দম্ভোন্নত মস্তক পথের ধুলায় মিশিয়া যাইবে, তবে ত আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। তাহাকে এক মুহূর্ত্তে হত্যা করা কঠিন নহে; কিন্তু এইরূপ নির্য্যাতনই তাহার অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি। তাহাকে এই ভাবে দণ্ডিত করিলে আমাদিগকে ফৌজদারীর আসামী হইতে হইবে না, অথচ আমাদের বহুদিনের আশা পূর্ণ হইবে; আমাদের প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ হইবে। আমরা তাহার ভণ্ডামীর মুখোস উন্মোচিত করিয়া যদি তাহার স্বাভাবিক মূর্ত্তির প্রতি সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে পারি, তাহা হইলে আমরা সমাজের সহানুভূতি লাভ করিব এবং এ দেশের আইনের সাহায্যেও সে বঞ্চিত হইবে। এই সকল কথা চিন্তা করিয়া আমি স্থির করিয়াছি, তোমার প্রেমিক স্বামীটি প্রবাস হইতে বাড়ী ফিরিলে তোমাকে সঙ্গে লইয়া তাহার গৃহে উপস্থিত হইব এবং উভয়ে একত্র তাহার সম্মুখীন হইয়া তাহার সহিত সদালাপ আরম্ভ করিব। আমার এই প্রস্তাবে তোমার অমত নাই ত?"

রেবেকা অবনতমস্তকে কয়েক মিনিট চিন্তা করিল। প্রতিহিংসানলে তাহার হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল; কিন্তু এই ভাবে কাউণ্টের সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাহার সাহসে কুলাইল না। বিশ্বাসঘাতক, প্রবঞ্চক ও নিষ্ঠুর স্বামীর মস্তক লক্ষ্য করিয়া তরবারি উদ্যত করিবার সময় নারীর স্বভাবসুলভ দৌর্ব্বল্য তাহার হৃদয় বিচলিত করিয়া তুলিল। সে ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "না, চাচা সাহেব, আমি প্রথম দিনেই আপনার সঙ্গে যাইব না, আপনি একাকী গিয়া তাহার সঙ্গে দেখা করিবেন। তাহার পর অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিলে ক্ষতি কি?"

মোজে হাসিয়া বলিল, "ওঃ, বুঝিয়াছি, ভয় পাইয়াছ! বেশ, তাহাই হইবে। আমি একাকীই যাইব। তাহাকে চূর্ণ করিবার পূর্ব্বে ভয় দেখাইয়া যদি কিছু টাকা আদায় করিতে পারি, তাহারও চেষ্টা করিব।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বজ্রাঘাত

রেবেকা ও মোজে জুরিচে আসিয়া কাউণ্টকে ধরিবার জন্য কিরূপ ফাঁদ পাতিয়াছে, তাহা তাঁহার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। কাউণ্ট পীড়িতা বার্থাকে লণ্ডনে ফেলিয়া রাখিয়া হৃষ্ট-চিত্তে একাকী জুরিচে প্রত্যাগমন করিলেন। বার্থা অসুস্থ হইয়া লণ্ডনে একাকিনী পড়িয়া থাকিলেও তিনি অকুণ্ঠিতচিত্তে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিলেন, কিছুমাত্র দুশ্চিন্তাও তাঁহার মনে স্থান পাইল না। তিনি মহা স্ফূর্ত্তিতে সেই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিলেন। কাউণ্ট বার্থার টাকা ভালবাসিতেন; বার্থার প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্র স্নেহ ছিল না। প্রবাসে তিনি বার্থার সংস্রব ত্যাগ করিয়া নিজের খেয়ালে চলিতেন, তাহার টাকায় স্ফূর্ত্তি করিয়া বেড়াইতেন;

পর্য্যুপরি দুই চারি দিন বার্থার সহিত সাক্ষাতেরও অবসর পাইতেন না। তাঁহার এইরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার লক্ষ্য করিয়াও বার্থা ইহার প্রতিবাদ করিত না, তাঁহাকে ভাল মন্দ কোন কথা বলিত না; বরং স্বামী তাহার সংস্রব ত্যাগ করিয়া দূরে থাকায় সে স্বস্তি বোধ করিত; স্বামীর ছায়া পর্য্যন্ত সে দুঃসহ মনে করিত। কাউণ্ট মহা উল্লাসে সুখের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে মনে করিতেন, এইরূপ সুখেই তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি কাটিয়া যাইবে। তাঁহার বর্ত্তমান আলোকসমুজ্জ্বল; ভবিষ্যতের অন্ধকারের দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। ভবিষ্যতের তমসাচ্ছন্ন গর্ভে কি আছে, তাহা চিন্তা করিবারও তাঁহার অবসর ছিল না।

কাউণ্ট প্যারিসে কিছু দিন বাস করিয়া, মনের সুখে 'মজা লুটিয়া' বার্থা-সহ লণ্ডনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্যারিসে থাকিতেই বার্থা পীড়িত হইয়াছিল; কিন্তু তাহার স্বাস্থ্যের প্রতি কাউণ্টের লক্ষ্য ছিল না। প্যারিসের আমোদ-প্রমোদে তাঁহার অরুচি ধরিলে তিনি বার্থাকে লইয়া নূতন আমোদের সন্ধানে লণ্ডনে আসিলেন। স্থান-পরিবর্ত্তনে প্রথম কয়েক দিন বার্থার স্বাস্থ্যের কিঞ্চিৎ উন্নতি লক্ষিত হইলেও তাহা স্থায়ী হইল না। বার্থার অজীর্ণ রোগ, দুর্ব্বলতা, মানসিক অবসাদ ও ক্ষুধামান্দ্য দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

কাউণ্ট সস্ত্রীক লণ্ডনে আসিয়া, কিছু দিন সেখানে বাসের পর স্মিট্-পরিবারের উকীলের নিকট হইতে সংবাদ পাইলেন, কোনও বৈষয়িক গোলমাল নিষ্পত্তির জন্য তাঁহাকে অবিলম্বে জুরিচে প্রত্যাগমন করিতে হইবে। কোন কোন দলীল স্বাক্ষরিত করিবার জন্য তাঁহার জুরিচে উপস্থিতি অপরিহার্য্য। কাউণ্ট উকীলের এই অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া অবিলম্বে লণ্ডনত্যাগের সঙ্কল্প করিলেন এবং বার্থাকেও তাঁহার সঙ্গে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন; কিন্তু বার্থা তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইল না। কাউণ্ট যত দিন লণ্ডনে প্রত্যাগমন না করেন, তত দিন সে লণ্ডনে থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। কাউণ্ট বার্থাকে বলিয়া আসিলেন, তিনি জুরিচ হইতে শীঘ্রই লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিবেন এবং কিছু দিন সাউদামটনে বাস করিয়া মাদিরায় যাত্রা করিবেন। কাউণ্ট ভন আরেনবর্গের ন্যায় অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তির বিশ্বাস, তাঁহাদের স্বাধীন ইচ্ছায় বাধা দান করে, এরূপ শক্তি কাহারও নাই; তাঁহাদের ভাগ্যসূত্রপরিচালনভার তাঁহাদেরই হস্তে ন্যস্ত আছে।

কাউণ্টের আদেশে তাঁহার বাসভবনের কয়েকটি কক্ষ তাঁহার বাসের জন্য সজ্জিত রাখা হইয়াছিল। নির্দ্দিষ্ট দিন কাউণ্ট ভৃত্যসহ জুরিচে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আগমন-সংবাদ শ্রবণমাত্র তাঁহার কৃপাকটাক্ষের উমেদার মোসাহেবের দল মধুগন্ধসমাকৃষ্ট লুব্ধ মধুকর-বৃন্দের ন্যায় তাঁহাকে পরিবেষ্টিত করিয়া মধুর গুঞ্জন আরম্ভ করিল। কেহ তাঁহার স্বাস্থ্যোন্নতির 'তারিফ' করিল, কেহ তাঁহার বহুদর্শিতার প্রশংসা করিয়া তাঁহার শ্রবণে সুধাসেচন করিতে লাগিল। দ্বিতীয় দিন সায়ংকালে কাউণ্ট ২০।২৫ জন অন্তরঙ্গ বন্ধুকে 'তীর্থভোজ'দানে আপ্যায়িত করিলেন। পান-ভোজনের পর আমোদ-প্রমোদে অর্দ্ধরাত্রি অতিবাহিত হইল। কাউণ্ট পানানন্দে বিভোর হইয়া গভীর রাত্রিতে শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন; তখনও তিনি জানিতে পারেন নাই যে, তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহার ভাগ্যাকাশে যে নিবিড় মেঘের সঞ্চার হইয়াছে, পরদিন প্রভাতেই তাহা হইতে অশনিপাত হইয়া তাঁহার মস্তক চূর্ণ করিবে।—সেই প্রভাতেই রডলফ মোজে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল।

অধিক রাত্রিজাগরণ নিবন্ধন পরদিন প্রভাতে কাউণ্টের নিদ্রাভঙ্গ হইতে একটু বিলম্ব হইয়াছিল। সে সময় তাঁহার সহিত কাহারও দেখা করিতে আসিবার সম্ভাবনা না থাকায় কাউণ্ট সাধারণ পরিচ্ছদে নীচে আসিলেন; তাঁহার পায়ে চটি-জুতা এবং মাথায় তুর্কী ফেজ। তিনি কফি-পানের জন্য ভোজন-কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার মহাশত্রু মোজে বারান্দা হইতে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া কাউণ্ট প্রায় দুই মিনিটকাল স্তব্ধভাবে বিস্ফারিতনেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; তাহার পর আতঙ্কবিহ্বল স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "তুমি! তোমাকে কোন্ সয়তান কি উদ্দেশ্যে এখানে পাঠাইয়াছে?"

মোজে একখানি গদী-আঁটা চেয়ারে 'ঝুপ' করিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিল, "বন্ধু হে! আমার মত হিতৈষী সুহৃদের অভ্যর্থনায় শিষ্টাচারের যে নমুনা দেখাইলে, তাহা তোমার পদমর্য্যাদার উপযুক্ত—ইহা কে অস্বীকার করিবে?

তুমি আমাকে দেখিয়া সুখী হও নাই, ইহা তুমিও জান, আমিও জানি; তথাপি এক বিন্দু মৌখিক ভদ্রতা প্রকাশ করিলে তোমার কোন ক্ষতি হইত না। আমি তোমার পরম বন্ধু, কত বার কত বিপদে তোমাকে সাহায্য করিয়াছি; আমার প্রতি অকৃতজ্ঞের মত ব্যবহার করা কি তোমার উচিত হইয়াছে?"

মোজের কথাগুলি সুতীক্ষ্ণ বিদ্রূপের ন্যায় কাউণ্টের হৃদয় বিদ্ধ করিল। তিনি টেবলে সবেগে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "দেখ মোজে, তোমার ঐ রকম ন্যাকামী আর ইতর রসিকতা বরদাস্ত করিবার মত সহিষ্ণুতা আমার নাই, এ কথা তোমার জানা উচিত ছিল। তুমি আমার কি রকম বন্ধু, তাহা আমার বিলক্ষণ জানা আছে, তথাপি যদি আশা করিয়া থাক—আমাকে ভাঁড়ামীতে ভুলাইয়া, বা ভয় দেখাইয়া আবার কিছু টাকা আদায় করিবে, তাহা হইলে গোড়াতেই তোমাকে বলিয়া রাখিতেছি, তোমার সেই আশা পূর্ণ হইবে না। আর আমাকে প্রতারিত করিতে পারিবে না। যদি বেশী বাড়াবাড়ি কর, তাহা হইলে তোমাকে অর্দ্ধচন্দ্রদানে বিদায় করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

মোজে অচঞ্চল স্বরে বলিল, "সে পরের কথা পরে হইবে। আপাততঃ তোমার চুরুটের বাক্সটা বাহির কর দেখি। তামাকখোর মানুষ, অনেকক্ষণ মুখাগ্নি হয় নাই। আর দেখ, শুধু শুধু ও রকম মেজাজ খারাপ করিও না, উহাতে অম্বলের ব্যারাম হইতে পারে।"

মোজের কথা শুনিয়া কাউণ্ট ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং তাহাকে অপমানিত করিয়া তাড়াইবার উদ্দেশ্যে লাফাইয়া উঠিয়া, আর্দ্দালীকে ডাকিবার জন্য বৈদ্যুতিক ঘণ্টার দিকে হস্ত প্রসারিত করিলেন; কিন্তু তিনি ঘণ্টা স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই মোজে দৃঢ় স্বরে বলিল, "থামো হে! এত ব্যস্ত কেন? আমি তোমাকে একটা ভারী জরুরী কথা বলিতে আসিয়াছি; তাহা যদি এখন এখানে বলিবার সুযোগ না দাও, তাহা হইলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিব; তখন জুরিচের সমস্ত লোক নাকে কাপড় দিয়া তোমাকেই সেই ময়লা সাফ করিতে বাধ্য করিবে।"

কাউণ্ট হাত টানিয়া লইয়া, চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া বলিলেন, "আবার ভয় দেখাইতে আরম্ভ করিলে? আমি ত আগেই বলিয়াছি—আমাকে ভয় দেখাইয়া তোমার কোন লাভ হইবে না। কিন্তু কথাটা শুনিতে আমার আপত্তি নাই। তোমার কি বলিবার আছে বলিয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়।"

মোজে কাউণ্টের সম্মুখে সরিয়া গিয়া বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইল এবং গম্ভীর স্বরে বলিল, "তোমার বোধ হয় জানা আছে, আমি তোমার যে সকল গুপ্ত কথা জানি, তাহা প্রকাশ করিলে তোমার সর্ব্বনাশ হইবে?"

কাউণ্ট বিকৃত স্বরে বলিলেন, "হাঁ, আমার তাহা জানা আছে। আমি রুসিয়ায় গিয়া একটা বোকামী করিয়া বসিয়াছিলাম; কিন্তু সে ত বহু দিন পূর্ব্বের কথা! সেই সকল কথার আলোচনা করিয়া এখন আমার কি ক্ষতি করিবে? সেই তামাদী দলীলের বলে তুমি আমাকে ভয় দেখাইতে চাও? আর যদি তুমি সত্যই রটাইয়া দাও—বহু কাল পূর্ব্বে আমি রুসিয়ায় গিয়া একটা ইহুদী ছুঁড়ীকে বিবাহ করিয়াছিলাম, তাহা হইলে এ দেশের কোন্ ভদ্র লোক তোমার সে কথা বিশ্বাস করিবে? তুমি ত একটা ফেরারী বদমায়েস, তোমার চালচুলা কিছুই নাই; সকলেই জানেন, কিছু দিন পূর্ব্বে জুরিচে আসিয়া তুমি পেটের দায়ে আমার মোসাহেবী করিতে, আমি তোমার স্পর্দ্ধা সহ্য করিতে না পারিয়া, চাবুক মারিয়া তোমাকে তাড়াইয়া দিয়াছিলাম, এ কথাও অনেকে জানে। তুমি আমার কাছে ভিক্ষা করিতে আসিয়াছ, তাহা না পাওয়ায় আমার মিথ্যা বদনাম রটাইতেছ,—আমি এ কথা বলিলে কে তাহা অবিশ্বাস করিবে? তোমার ও ফন্দী এখানে খাটিবে না; ভাল চাও ত মানে মানে সরিয়া পড়!"

কাউণ্টের কথা শুনিয়া মোজের হাঁড়ির মত গোল মুখ ক্রোধে ও ঘৃণায় লাল হইয়া উঠিল; কিন্তু সে অতি কষ্টে ক্রোধ সংবরণ করিয়া বলিল, "হাঁ, সরিয়া পড়িব; কিন্তু তোমার মস্তকটি চর্ব্বণ না করিয়াই সরিয়া পড়িব, এ আশা তুমি ত্যাগ কর, বন্ধু! তুমি সজীব আগ্নেয় গিরির চূড়ায় বসিয়া মনে করিতেছ, তাহার ভিতরের আগুন নিবিয়া ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে, আর কোন বিপদের আশঙ্কা নাই; কিন্তু শোন কাউণ্ট ভন আরেনবর্গ, ইহা তোমার ভুল ধারণা। তোমার মত মিথ্যাবাদী, বিশ্বাসঘাতক, প্রবঞ্চক কেবল ধাপ্পাবাজির সাহায্যে—"

কাউণ্ট তাহার কথায় বাধা দিয়া সক্রোধে বলিলেন, "রডলফ মোজে, মুখ সাম্‌লাইয়া কথা বল। একবার তুমি আমার অপমান করিয়াছিলে, সে জন্য তোমাকে চাবকাইয়া লাল করিয়া ছাড়িয়াছিলাম; কিন্তু তাহাতে তোমার শিক্ষা হয় নাই, আবার আমাকে অপমানসূচক কথা বলিতেছ! এবার আমাকে চাবুক অপেক্ষাও ধারাল অস্ত্র ব্যবহার করিতে হইবে।"

কাউণ্টের কথায় মোজে ক্ষেপিয়া উঠিল; সে গর্জ্জন করিয়া বলিল, "তুমি কেবল সয়তান নও, তুমি একটি প্রকাণ্ড গর্দ্দভ; গর্দ্দভ না হইলে তুমি বুঝিতে পারিতে, সেই চাবুকের কথা ভুলিয়া যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, ভণ্ডামীর মুখোস তোমার মুখ হইতে খুলিয়া ফেলিয়া জগৎসংসারকে দেখাইব, তুমি কিরূপ নরপিশাচ। আমার সে প্রতিজ্ঞা মুহূর্ত্তের জন্য বিস্মৃত হই নাই। একবার যে চাবুক মারিয়াছিলে, তাহার জের সামলাও, তাহার পর অন্য ধারাল অস্ত্র ব্যবহার করিও। তোমার সর্ব্বনাশ না করিয়া এবার আমি জুরিচ পরিত্যাগ করিব না। যে মুগুরে তোমার মাথা গুঁড়া করিব, তাহা আমি সঙ্গে আনিতে ভুলি নাই।"

মোজের কথায় কাউণ্টের সুর নরম হইল; তিনি বিচলিত স্বরে বলিলেন, "তোমার মত্‌লবটা কি বল শুনি, তুমি কি চাও? যদি তোমার দাবি অসঙ্গত না হয়, তবে তোমার মুখ বন্ধ করিবার জন্য সে টাকা দিতে আমার আপত্তি নাই।"

মোজে হঠাৎ ঠাণ্ডা হইয়া বলিল, "পথে এস বন্ধু! রফা করিতে আমি খুব রাজি। আমাকে ২০ হাজার ফ্রাঙ্ক আনিয়া দাও, তাহা পাইলে তোমার এখানে আর এক মিনিটও কোন্ শা—"

কাউণ্ট তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "তুমি পাগল না কি? হঠাৎ আমি ২০ হাজার ফ্রাঙ্ক কিরূপে সংগ্রহ করিব?"

মোজে বলিল, "যেরূপে পার, সংগ্রহ কর তোমার কামধেনু শাশুড়ী শিঙ্গা ফুঁকিয়াছে বটে, কিন্তু সে তাহার সম্পত্তি ত সঙ্গে লইয়া যায় নাই।"

কাউণ্ট বলিলেন, "সে কথা সত্য, কিন্তু সম্পত্তি আমার স্ত্রীর; সে এখন লণ্ডনে আছে; আমি লণ্ডনে ফিরিয়া গিয়া কোন কৌশলে টাকাগুলি তাহার নিকট হইতে আদায় করিয়া তোমাকে দিতে পারি। এ ত আর অল্প টাকা নয় যে, এখান হইতে সংগ্রহ করিয়া দিব?"

মোজে বিদ্রূপের সুরে বলিল, "তোমার স্ত্রীকে লণ্ডনে রাখিয়া চলিয়া আসিয়াছ?"

কাউণ্ট বলিলেন, "হাঁ, আসিয়াছি; কেন?"

মোজে হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিল, "তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি; তোমার আসল স্ত্রী—যাহাকে রুসিয়ায় রাখিয়া চলিয়া আসিয়াছ—তাহার কোন সংবাদ রাখ?"

কাউণ্ট অবজ্ঞাভরে বলিলেন, "না, তাহার কোন সংবাদ জানি না, জানিতেও চাহি না। আশা করি, এত দিন সে অক্কালাভ করিয়াছে।"

মোজে। উঃ, কি সাংঘাতিক করুণা!

কাউণ্ট। দেখ মোজে, করুণাই হউক, আর যাহাই হউক, সে আমি বুঝিব; তোমার অনধিকারচর্চ্চা নিষ্প্রয়োজন। তাহার প্রলোভনে ভুলিয়া আমি তাহাকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম, কিন্তু আমি তাহাকে আন্তরিক ঘৃণা করি, তাহার নাম পর্য্যন্ত আমার অসহ্য।

কাউণ্টের কথায় মোজে মর্ম্মাহত হইয়া বলিল, "তোমার মত কাপুরুষ, মিথ্যাবাদী, বিশ্বাসঘাতকের মুখে এ কথা শুনিয়া আমি বিস্মিত হই নাই। এত বড় মিথ্যা কথা যে অসঙ্কোচে বলিতে পারে, তাহার মত নির্লজ্জ দুনিয়ায় আর কেহ আছে কি না জানি না। তুমিই তাহাকে নানা মিথ্যা প্রলোভনে ভুলাইয়া বিবাহ করিয়াছিলে, তাহার পর তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া পলাইয়া আসিয়াছ; এখন তাহারই ঘাড়ে দোষ চাপাইতেছ! ধিক্ নির্লজ্জ মিথ্যাবাদী!"

কাউণ্ট ক্রোধ-কম্পিত স্বরে বলিলেন, "মিথ্যাবাদী আমি, না তুমি? তুমি ভিতরের খবর কিছুই জান না, অনর্থক 'ফোঁপরদালালী' করিতেছ! সেই ইহুদী-কন্যা সাপের মত খল, কুহকিনীর মত মায়াবিনী; সে যাদু করিয়া আমাকে ধ্বংসের পথে লইয়া গিয়াছিল।"

মোজে দারুণ উত্তেজনায় টেবলে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বলিল, "এ সকল কথা তাহার সম্মুখে বলিতে তোমার সাহস হইত না।"

কাউণ্ট মাথা ঘুরাইয়া বলিলেন, "কেন সাহস হইবে না? এ সকল কথা আমি অসঙ্কোচে তাহার মুখের উপর বলিতে পারি; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমাকে এ জীবনে

আর তাহার ছায়া স্পর্শ করিতে হইবে না। তুমি কি মতলবে তাহার পক্ষে ওকালতী করিতেছ, বল ত! তাহাকে মুরুব্বী খাড়া করিয়া যদি তাহার পক্ষ হইতে আমাকে ভয় দেখাইতে আসিয়া থাক, তাহা হইলে তুমি ভুল করিয়াছ—ও পথে চলিয়া তোমার কোন লাভ নাই। তুমি আমাকে পুনঃ পুনঃ বিরক্ত করিলে তোমার মুখ বন্ধ করিবার জন্য শক্ত মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

মোজে বসিয়া ছিল; কাউণ্টের কথা শুনিয়া তীরবেগে দ্বারপ্রান্তে সরিয়া গিয়া বলিল, "এই ত তোমার কথা? তুমি যেরূপে পার, আমার শাস্তির ব্যবস্থা করিও; কিন্তু শোন কাউণ্ট ভন্ আরেনবর্গ! আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমি তোমার কি দুর্দ্দশা করি, তাহা দেখিতে পাইবে। তখন আমার পা ধরিয়া দয়া ভিক্ষা করিবে, কিন্তু তোমার প্রার্থনা বিফল হইবে। তোমার চোখের জলে পথের ধূলা কাদা হইবে।"

মোজে কাউণ্টের গৃহ হইতে সবেগে প্রস্থান করিল। কাউণ্ট বিমর্ষভাবে বসিয়া রহিলেন; আতঙ্কে তাঁহার বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল।

প্রায় দুই ঘণ্টা পরে কাউণ্ট মন স্থির করিয়া, যে কাযের জন্য তিনি জুরিচে আসিয়াছিলেন, সেই কায শেষ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাদের পারিবারিক এটর্ণীর আফিসে চলিলেন। তাঁহার শ্যালকদ্বয় ফ্রিজ ও পিটার পূর্ব্বেই সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল। কাউণ্টের ইচ্ছা ছিল, কায শেষ হইলেও তিনি ৫।৭ দিন জুরিচে কাটাইয়া যাইবেন; কিন্তু মোজের কথা শুনিয়া সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন এবং সেই দিনই রাত্রির ট্রেণে জুরিচ হইতে পলায়নের মনস্থ করিলেন। তাঁহার ধারণা হইল—তিনি তাড়াতাড়ি জুরিচ হইতে প্রস্থান করিলে মোজে তাঁহার অনিষ্ট-সাধনের সুযোগ পাইবে না।

কাউণ্ট এটর্ণীর আফিসে প্রস্থান করিলে মোজে রেবেকাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইল। সে কাউণ্টের দ্বারবানের নিকট সংবাদ পাইল—কাউণ্ট এটর্ণীর আফিসে গিয়াছেন।

রেবেকা গাড়ীতেই বসিয়া ছিল। মোজে গাড়ীতে উঠিয়া রেবেকাকে বলিল, "চমৎকার সুযোগ উপস্থিত রেবেকা! চল, আমরাও সেই এটর্ণীর আফিসে যাই। সয়তানটার ভণ্ডামীর মুখোস সকলের সম্মুখেই খুলিয়া বলি।"

রেবেকা এই প্রস্তাবে আপত্তি করিল না। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে এটর্ণীর আফিসের সম্মুখে তাহারা গাড়ী হইতে নামিয়া আফিসে প্রবেশ করিল। এক জন মুহুরী তখন আফিস-ঘরে একাকী বসিয়া কায করিতেছিল। মোজে তাহাকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "এটর্ণী সাহেব কোথায়?"

মুহুরী রেবেকার মুখের দিকে বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া মোজেকে বলিল, "তিনি পাশের ঘরে কয়েক জন মক্কেলের সঙ্গে পরামর্শ করিতেছেন, আপনাদের প্রয়োজন?"

মোজে বলিল, "আমরাও মক্কেল, একটা মামলা সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে যুক্তি-পরামর্শ করিতে আসিয়াছি।"

মুহুরী দেখিল নূতন মক্কেল; সে আগ্রহভরে বলিল, "আপনারা দয়া করিয়া এখানে একটু অপেক্ষা করুন, আমি এটর্ণী মহাশয়কে সংবাদ দিয়া আসি। তিনি শীঘ্রই এখানে আসিয়া আপনাদের সকল কথা শুনিবেন।"

মুহুরী পর্দ্দা ঠেলিয়া পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে প্রবেশ করিল। মোজে ও রেবেকা মুহুরীর অনুরোধে কর্ণপাত না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার অনুসরণ করিল, এবং কেহ তাহাদিগকে বাধা দান করিবার পূর্ব্বেই এটর্ণীর খাস-কামরায় উপস্থিত হইল। সেই সময় সেই কক্ষে কাউণ্টের শ্যালকদ্বয় ফ্রিজ ও পিটার এবং কাউণ্ট তাঁহাদের এটর্ণী ও উকীলের সহিত বৈষয়িক পরামর্শ করিতেছিলেন। তাঁহাদের সেই গুপ্ত পরামর্শ-সভায় ভিন্নদেশীয় দুই জন নরনারীকে বিনা 'এত্তেলায়' প্রবেশ করিতে দেখিয়া সকলেই গভীর বিস্ময়ভরে তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

মোজে সংযতচিত্তে সম্ভ্রমভরে তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিল; কিন্তু রুসিয়াবাসিনী পরিত্যক্তা পত্নী রেবেকাকে চির-শত্রু মোজের সহিত সেই কক্ষে উপস্থিত হইতে দেখিয়া কাউণ্ট ভন আরেনবর্গের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। তাঁহার শ্বাসরোধের উপক্রম হইল।

মোজে কাউণ্টের ভাবান্তর লক্ষ্য না করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, "মহাশয়গণ, কর্ত্তব্যানুরোধেই আমি অশিষ্টের মত আপনাদের এই কক্ষে অনধিকারপ্রবেশ করিয়াছি, আপনারা আমার বেয়াদবি মাফ করুন। আমার নাম রডল্‌ফ মোজে, আমি ফ্রাঙ্কফোর্ট হইতে আসিতেছি; আর এই মহিলাটি ঐ মহাত্মা কাউণ্ট ভন আরেনবর্গের বিবাহিতা।"

[ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পরিপন্থী কতটা ?

স্বাধীনতা বলিতে মোটামুটি দেহ ও মন স্বেচ্ছাধীন থাকা এই অবস্থাটা বুঝায়। সুতরাং দেহ ও মন ইহার মধ্যে কোনটি বা উভয়ই যদি পর ক্ষমতায় বা পর ইচ্ছায় চালিত করিতে বাধ্য হই, তাহাকেই আমরা পরাধীনতা বলি। রাজা বা শাসকের দ্বারা শাসিত জাতির স্বাধীনতা বা পরাধীনতা, রাজা বা শাসকের জাতি হিসাব করিয়া ধরা হয়। ভিন্নদেশীয় বা বিজাতীয় রাজা বা শাসকের শাসনাধীন যে সব জাতির বাস, তাহাদিগকেই পরাধীন জাতি বলা হয়। আর যে মানুষ ব্যক্তিগতভাবে পরেচ্ছাধীন থাকিতে বাধ্য হয়, তাহাকেই পরাধীন মানুষ বলা হইয়া থাকে।

দেশের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার অভাবে অর্থাৎ দেশে বিজাতীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত থাকায় আমরা আমাদের, অর্থাৎ পূর্ব্বে হিন্দুদের যে ভারতবর্ষ ছিল, তাহাকে এখন পরাধীন দেশ বলিতেছি এবং সেই হিসাবে আমরা নিজেদের পরাধীন জাতি বলিয়া জানি। সুদীর্ঘ কালের এই জাতীয় পরাধীনতা হইতে, কি দীর্ঘ দিন ধরিয়া পরাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত বলিয়া বলিতে পারি না। এখন ব্যক্তিগতভাবেও যে আমরা একবারে পরাধীন, অধীনতার শৃঙ্খল আমাদের 'অষ্টে পিষ্টে' বাঁধা, সাধারণভাবে ইহাই আমাদের আজন্ম সংস্কার। সত্যই কি আমরা সম্পূর্ণ বা সকল দিকেই পরাধীন? ইচ্ছামত কাষ করিতে না পারিলেই যে সব সময় পরাধীন, তাহা নহে, ইচ্ছা বিবেকেরও অধীন। সুতরাং মন ও দেহের অধিকার যাহা আছে, বিবেক যাহা করিতে বলে, তাহা করিতে যদি না পারি বা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় তাহা করায় যদি বাধা প্রাপ্ত হয়, তবেই পরাধীনতা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। আমাদের রাষ্ট্রীয় পরাধীনতায় আমাদের বিবেকের বিরুদ্ধে যাইতে কতটা বাধ্য করিতেছে বা সেরূপ কিছু করিতেছে কি না, তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

আমরা কথায় কথায় পরাধীনতার দোহাই দিয়া কত কাঁদেই না নিরত হই। দাসমনোবৃত্তি আমাদের মনের উপর পূর্ণপ্রভাব বিস্তার করা যেন স্বাভাবিক, এমনই মন লইয়া আমরা ঘর করিয়া থাকি। আর সেই মনোভাব ভিন্ন আমাদের আর কিছু রকম হওয়া যেন সম্ভব নয় এবং উহাই স্বাভাবিক, ইহাই আমাদের সাধারণ বিশ্বাস। যদি ইহা একটি সত্য হয় যে,উহা হওয়া স্বাভাবিক, তাহা হইলে ত কথাই নাই, নচেৎ এরূপ মনে বদ্ধমূল হওয়ার জন্য দায়ী কে? আমাদের দাসভাবে, দাসের মত মন লইয়া চলিবার জন্য রাজা এ পর্য্যন্ত একটা প্রকাশ্য উদ্দেশ্য লইয়া শিক্ষাকেন্দ্র খুলিয়াছেন, তাহা শুনা নাই, বরং শুনা আছে, ইংরাজের প্রথম আমলে কোন এক জন খুব বড় ইংরাজ না কি মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তিনি তখনই আমাদের যে মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন, সেটা দাসেরই মূর্ত্তি। এ কথা হয় ত মিথ্যা নাও হইতে পারে, কারণ, এখন আমরা যে দাসমনোবৃত্তি লইয়া আছি, কে জানে, মুসলমান রাজাদের শাসনসময় হইতে তাহার অঙ্কুরোদ্গম না হইয়াছিল। তবে এ কথা ঠিক যে, বৈদেশিকরা এ দেশে আসিয়া অনতিদীর্ঘকাল মধ্যেই আমাদের এখনকারই মত একটা ধাত ধরিয়া লইতে পারিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে আমাদের সেই মতই দেখিতেন। অনেক বৎসর হইতে আমাদের দশা যে এই প্রকারই দাঁড়াইয়াছে, তাহা নিম্নের এই দুই ছত্র কবিতা হইতেই বুঝিতে পারা যায়:—

"Now drink Madeira and in scorn knaves,
Leave continental wines to conquered slaves" *

ইহা সে কালের একটা মদের বিজ্ঞাপনমাত্র হইলেও, প্রকাশ্যে এই ভাবে বিজ্ঞাপনপ্রচার হইতে তখনকার অবস্থাও যে আমাদের এই প্রকার বা ইহাপেক্ষাও হীন না ছিল, তাহা বলা যায় না।

অধিকারমত কার্য্য করিতে বাধা প্রাপ্ত হওয়া পরাধীনতার লক্ষণ। কিন্তু এই অধিকারও দ্বিবিধ;—কতক থাকে জন্মগত, আর কতক অর্জ্জনলব্ধ। কোন কিছু অর্জ্জন করিতে হইলে বিনা আয়াসে যাহা পাওয়া যায়, তাহা খুবই কম; বল, বুদ্ধি, কৌশল প্রভৃতি প্রয়োগেই সাধারণতঃ পাওয়া যায়। জন্মগত অধিকারও যে সবই স্বভাবজ, তাহা নহে। অধিকারও কতক ক্ষেত্রে সমাজের, রাজার বা কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়বিশেষের দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে, যেমন রঘুনন্দনকৃত ব্যবস্থায় বঙ্গদেশে বহু অধিকার-অনধিকারের সৃষ্টি হইয়াছে। অধিকারের মধ্যে আবার ন্যায্য অন্যায্য আছে। সকলে যাহা মানিয়া লয়, তাহার মধ্যে আর অন্যায্যের কথা থাকে না। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অথবা স্বরাজ লাভ করা আমাদের জন্মগত অধিকার—যদি ইহা সত্য হয়, তবে যে অধিকারের বলে যাঁহারা আজ আমাদিগকে এই অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহা ন্যায্য হউক অন্যায্য হউক, তাঁহাদের অর্জ্জিত অধিকার এবং ইহার কাছে আমাদের অধিকার জন্মগত হইলেও পরাস্ত হইয়াছে। আমাদের এই অধিকার ভোগ করিতে হইলে বাধা সরাইবার জন্য উপযুক্ত বল, বুদ্ধি, কৌশল বা আরও কিছু চাই, যেহেতু, দেখা যাইতেছে, স্বাধীনতালাভের জন্মগত অধিকার থাকিলেও অপরের অধীনতাপাশ আমাদের উহা ভোগের পক্ষে বাধাস্বরূপ হইতে পারে। অতএব অপরের বল যখন আমাদের অধিকারের উপর, তখন আমাদের জন্মগত অধিকার কিছুই নয় বা তাহার মূল্য কিছুই নাই, যদি তাহা রক্ষার বল আমাদের না থাকে। অথচ সাহস ও বল থাকিলে নিজের রক্ষা করিয়া পরের স্বাধীনতা অধিকার করাও সম্ভব। সুতরাং জন্মগত অধিকার যে কোন্‌টা, তাহাই বিচারসাপেক্ষ, যেহেতু, জগতের যে কিছু অধিকার অনধিকার, সবই সাহস ও বিক্রমের উপর নির্ভর করিতেছে। ইংরাজী প্রবচন

* The Good old days of honourable John Company.

"None but the brave deserve the fair" অথবা "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা"—এ কথা কখন মিথ্যা নহে।

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার অভাবে জাতীয় স্বাধীনতা সম্ভবপর নহে। কিন্তু যদি জাতির কথা ছাড়িয়া দেওয়া যায়, পরাধীন জাতির মধ্যে ব্যষ্টি বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পথে বাধা কতটা দেখা যাউক। ব্যক্তিমাত্রেরই পথ ও কায এক হওয়া উচিত বা অনুচিত যাহাই হউক, কখন এক নহে, সুতরাং পররাষ্ট্রবাস হেতু অধীনতা রাষ্ট্রের সকলের এক হইলেও, সকলের ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া স্ব স্ব কায করার পথের বাধা সমান নহে। উপস্থিত কালে শাসক সম্প্রদায়কে আমরা যে অসাধু বিশেষণেই অভিহিত করি, তাঁহাদের কোন কায বা শাসন প্রণালীকে আমাদের প্রতি অত্যাচারের হেতু বলিয়া যেমন করিয়াই বর্ণনা করি অথবা বর্ত্তমান শাসকগণের চরিত্র যেরূপ মসীলিপ্ত করিয়াই চিত্রিত করি, তাঁহারা আমাদের সংসারধর্ম্ম প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়েই স্বাধীনতা কাড়িয়া লইয়াছেন, এ কথা কেহই বলিতে পারেন না। আমাদের সামাজিক, সাংসারিক অথবা ধর্ম্মজীবনে আমাদের অধীনতা সেইখানে, যেখানে আমরা কোন অন্যায় অথবা রীতি ও আইন লঙ্ঘন করিয়া থাকি। এই আইনমাত্রই যে আমাদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম সমাজবিরোধী, তাহা নহে, বরং রাজশক্তি এ দিকে আমাদের দিকে চাহিয়াই স্বেচ্ছায় উদাসীন। এই সব নিয়ম বা আইনের কতকগুলি হিন্দু মুসলমান প্রভৃতির জন্য পৃথক্ পৃথক্ হইলেও এবং তাহার কোন কোন বিষয় সেই সেই জাতির পুরাতন আইন লইয়া গঠিত হইলেও উহার মর্য্যাদা-রক্ষার ভার অবশ্য রাজার হাতে। ইহাকেও অধীনতা বলা যাইতে পারে, কিন্তু আজ যদি আমাদের জাতির, এমন কি, আমাদের বাড়ীর পাশের লোক এক জন রাজা হন, তাহা হইলেও অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত হওয়া সাংসারিক লোকের পক্ষে কিরূপে সম্ভবে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। এ কথা অবশ্যই সহস্রবার স্বীকার্য্য যে, সমাজ সংসার-ধর্ম্মকর্ম্মে স্বাধীনতা থাকাই যে যথেষ্ট, ইহা ভিন্ন যে অন্য কিছু স্বাধীনতা মানুষের কাম্য থাকিতে পারে না, তাহা নহে। এমন লোক আছেন, যাঁহার কাছে মাত্র ঐই স্বাধীনতা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। দেশমাতৃকার পরাধীনতা সত্ত্বে তাঁহাদের কিছুতেই তৃপ্তি নাই। অবশ্য এ লোক আমাদের মধ্যে এখনও কম। এই শ্রেণীর লোকের কথা ছাড়িয়া দিলে সাধারণের পক্ষে পররাষ্ট্রে বাস সত্ত্বেও নিজেকে স্বাধীন বলিয়া মনে করিতে পারা যায় বলিয়া বিশ্বাস করি।

দেশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকিলে রাজ্যপরিচালনক্ষমতাশীল জাতির পক্ষে জাতীয় উন্নতিসাধনসম্ভাবনা যে অধিক, সে বিষয়েও কোন ভিন্নমত থাকিতে পারে না এবং ব্যষ্টির উন্নতি সমষ্টিকে উন্নত করিবার পক্ষে যতটা সহজ, এত আর কিছুতে নহে, ইহাও সত্য। জাতিগত স্বাধীনতা নাই, সুতরাং ব্যক্তিগত সামর্থ্য ও স্বাধীনতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া যাহা করিতে পারা যায়, তাহাতে উদাসীন থাকিলে নিজেদেরই ক্ষতি।

যে উন্নতির জন্য যে সুখ সুবিধার জন্য স্বরাজ বা স্বাধীনতা পাইবার আমরা অভিলাষী, সেই স্বরাজ বা স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার, ইহা জানিয়া রাখিয়া শুধু বক্তৃতার দ্বারা যখন উহা পাওয়া যাইতে পারে না, তখন পাইতে হইলে যাহা চাই, তাহা সংগ্রহ করা প্রয়োজন। আর যদি তাহা সংগ্রহ করা সাধ্যাতীত হয়, তবে সে দিক্ ছাড়িয়া কি করিয়া নিজেদের উন্নতি ও সুখ-সুবিধাবিধান করা যাইতে পারে, তাহার উপায় করিতে হইবে। ক্রমবিকাশ বা ক্রমোৎকর্ষসাধন ইহাই জগতের নিয়ম। এ জন্য কাহাকেও কিছু বলিবার বা বুঝাইবার প্রয়োজন হয় না। কোন কোন স্থানে জাতীয় পরাধীনতা সেই উৎকর্ষসাধনের পথের অর্গল হইলেও কেবল ব্যক্তিগত চেষ্টায় আমরা অনেক অভাব দূর করিয়া আমাদের অবস্থা উন্নত করিতে পারি।

রাজা বৈদেশিক, সুতরাং আমরা সর্ব্বাংশে পরাধীন, এটা আমাদের একটা সংস্কার মধ্যে দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহা নহে। যাঁহারা জন্মভূমি বা দেশকে মাতৃজ্ঞানে তাঁহার শৃঙ্খলিতা মূর্ত্তিকল্পনায় কাতর হইয়া উন্মুক্তির জন্য আগ্রহান্বিত, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহাকে যতক্ষণ না তাঁহারা বন্ধনমুক্ত অবস্থায় দেখিতে পাইবেন, ততক্ষণ তাঁহাদের কোন শান্তি থাকিতে পারে না। রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা তাঁহাদের সম্মুখে যে মূর্ত্তিতে প্রকট, এমন আর কাহারও কাছে নহে। দেশে শনৈঃ শনৈঃ এই শ্রেণীর লোক বৃদ্ধি পাইলেও এখনও তাহা নগণ্য। সুতরাং তাঁহাদের কথা ছাড়িয়া দি।

আমরা অধুনা দাসমনোবৃত্তি বলিয়া একটা কথা সর্ব্বদা বলিয়া থাকি। এই মনোবৃত্তিবিশিষ্ট লোক সত্যই অনেক দেখা যায়, কিন্তু ভদ্রলোকদের মধ্যে যাহাদের পেশা চাকরী, তাহাদের প্রতিই এই বিশেষণ বিশেষভাবে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা, চাকুরীজীবী হইলেই তাহার মনোবৃত্তি দাসজনসুলভ হীন হইতে হইবে, এমন কথা আমাদের মনে হয় কেন? কোন এক বা কতিপয় কাযের বিনিময়ে বেতন গ্রহণ করা, ইহাই ত চাকুরী। কোন সামগ্রীর বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করা, ইহা ব্যবসা। যখন ব্যবসায় হীনতা নাই বা নিন্দা নাই, অথবা তাহাতে যদি মনোমধ্যে দাসসুলভবৃত্তি না আসিতে পারে, তখন নির্দ্দিষ্ট কাযের বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করিলেই কি তাহা আসিতে হইবে? কাযের সহিত যাহার সম্পর্ক, তাহা করিতে বাধ্য। এ কর্ত্তব্য-পালনে হীনতার কোন কথা নাই এবং সংসারে থাকিয়া অপরের কাছে অর্থ বা অন্য কিছু গ্রহণ করিতে হইলে পরিবর্ত্তে কিছু দিতেই হইবে, তা কোন দ্রব্য অথবা শরীর-মস্তিষ্কের পরিশ্রম যাহাই হউক। ব্রাহ্মণের সন্তান জুতা বা চর্ব্বির ব্যবসায় করিতে অর্থ-বিনিময়ে জুতা বা চর্ব্বি দিতে কোন সঙ্কোচ, কোন হীনতা মনে করিবে না; আর নিজের দৈহিক বা মানসিক পরিশ্রম দ্বারা অপরের অর্থ বিনিময়ে সাহায্য করায় এত সঙ্কোচ বা হীনতা কেন মনে হইবে? আমার মনে হয়, চাকুরী হইতে ইহা উদ্ভূত নহে। আমাদের মনের স্বাধীনতা—যে মন্ত্র গ্রহণ করার ফলেই হউক শুপ্ত হইয়া থাকা প্রযুক্ত এ দশা হইয়াছে। পরের আফিসে কেরাণীগিরী করাই এ মনোভাবগঠনের কারণ নহে। মন পূর্ব্ব হইতেই দাসভাবাপন্ন হইয়া প্রযুক্ত হয় এবং সেই জন্যই তৎপরে পরের চাকুরীতে সেই ভাববৃদ্ধির সহায়তা করে। আমাদের মাথায় থাকে কবি-বর্ণিত—"আমরা গোলামের জাতি শিখেছি গোলামি," ইহা যতই দিনের দিন আমাদের অস্থিমজ্জার সহিত মনে গ্রথিত হইয়া যাইতেছে, ততই আমরা অধিকতর দাসভাবাপন্ন হইয়া পড়িতেছি। ভুলিয়া যাইতেছি বা মনে আনিতে পারিতেছি না যে, কেরাণীগিরি বা অন্য চাকরী করিয়াও আপনার মনে আপনি স্বাধীন থাকা যায়। মানুষ যখন বিবেকের অধীন, তখন যে কাযের জন্য ভার লইয়া পারিশ্রমিক লওয়া হয়, সে কায পূর্ণ মাত্রায় সম্পাদন করিতে আমরা বাধ্য। অবশ্য ইহাকে অধীনতা সংজ্ঞা দিলে এ বিষয়ে আমরা অধীন। যখন—যে স্থানে বেতনদাতা উহার কর্ম্মস্থলে আসেন না বা তাঁহার কার্য্যের কোন সংবাদ রাখেন না, কর্ম্মচারী যথাকর্ত্তব্য কায করেন, যেখানে মনিবের তিরস্কার শ্রবণের সম্ভাবনা নাই, সেখানেও যখন কার্য্যে অবহেলা করিতে বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তির বাধিয়া থাকে, তখন এ অধীনতা সূক্ষ্ম হিসাব করিয়া দেখিলে বলিতে হয়, ইহাও সেই আত্ম-বিবেকের কাছে অধীনতা।

আমরা যে কারণ হইতে নিজেকে বেশী করিয়া পরাধীন মনে করিয়া থাকি, তন্মধ্যে আমাদের আলস্য ও বিলাসিতাই মূল কারণ। পরিশ্রমবিমুখতা হেতু অর্থোপার্জ্জনের জন্য অন্য পথ গ্রহণ অপেক্ষা আমরা সাধারণতঃ চাকুরীটাই বেশী পছন্দ করি। এই কারণ আবশ্যক অপেক্ষা চাকুরীপ্রার্থীর সংখ্যাধিক্য বশতঃ বেতনদাতা এই অবস্থার সুযোগ লইয়া নিজ সুবিধার জন্য তাঁহার কর্ম্মচারীদের সহিত এরূপ

অযথা ব্যবহার করিয়া থাকেন, যাহাতে কর্ম্মচারীর মর্য্যাদাহানি হয়। এই আত্মসম্মানে জলাঞ্জলি দিয়া প্রভুর মন যোগানর জন্য নিজ বিবেক বিসর্জ্জন দিতে হয় বলিয়াই ইহা দাসত্ব, নচেৎ ইহাতে দাসত্ব কিছুই নাই বা মনোবৃত্তিহীন হইয়া মনুষ্যত্ব যাইবারও কিছু নাই।

একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বেশ বুঝিতে পারা যাইবে, যাহাদিগকে আমরা প্রকৃত দাস বলিয়া থাকি, অর্থাৎ যাহারা আমাদের গার্হস্থ্য ভৃত্যের কায করিয়া থাকে, অধুনা বহু ক্ষেত্রে সচরাচর কেরাণী অপেক্ষা তাহাদিগকে স্বাধীনভাবাপন্ন দেখা যায়। দাসীরা এ বিষয়ে অধিকতর অগ্রসর হইয়াছে। এক জন সাধারণ কেরাণী প্রভুর নিকট হইতে যথা অযথা যে গালি, যে অপমানসূচক বাক্য শুনিয়া বা ব্যবহার পাইয়া নিজকে পরদাস মনে করিয়া নীরবে সহ্য করিতে প্রস্তুত, যাহাদিগকে দাস-দাসী বলিয়া থাকি, তাহারা তাহার অর্দ্ধেক কথা শুনিতেও এখন আর প্রস্তুত নহে। তাহারা নিজ কর্ত্তব্যে অবহেলা করিলে সে জন্য মনিবের কাছে অযথা কথাও শুনিতে চায় না, তাহা বলিলে অনেক সময় তাহারা আর তাহার কাযের প্রত্যাশা রাখে না। তাহারা অনেকে নিজেদের এমন কিছু পরাধীনও ভাবে না। ইহার সত্যতায় যদি সন্দেহ না থাকে, তবে এ কথা ঠিক, পরের কাছে চাকুরী হইতেই যে আমাদের মনোবৃত্তি ক্রমে এতটা হীন হইতেছে, তাহা নহে, কারণ অগরূপ এবং তাহার নিবৃত্তি করা আমাদেরই হাত। আরও মনে হয়, কেরাণী বা বাবু চাকুরে অত্যন্ত সুলভ বলিয়া, অতিরিক্ত সুলভ জিনিষের যাহা দশা, ইহাদের দশাও তাহাই।

আমরা পরাধীন জাতি, এ কথা ঠিক, কিন্তু তাই বলিয়াই আমাদের সর্ব্বস্বাধীনতা গিয়াছে, আমরা সামর্থ্যশূন্য দুর্ব্বল, এ কথা ঠিক নহে। আমাদের মন দুর্ব্বল, কোন যাদুকরের অলীক মন্ত্রে আমরা ইষ্ট মন্ত্রের বিশ্বাসকে পরোক্ষে স্থান দিয়াছি,আজ তাই আমাদের এ দশা ঘটিয়াছে। এই ভ্রান্ত বিশ্বাসেই আমাদের মধ্যে, আমাদের এই বিরাট জাতির মধ্যে মানবোচিত সত্যকার যে অমিত বল লুকায়িত আছে, তাহাতে আজ লক্ষ্যহীন। আমাদের রাজা বিদেশীয়, এই জন্যই কি আমরা পরাধীন? আমাদের মনকে ভুলের পথ হইতে যদি ফিরাইতে না পারা যায়, তাহা হইলে আজ এক জন আমাদের মধ্য হইতে যদি রাজা হন, তাহা হইলেও আমরা এমনই পরাধীন থাকিব না কি? ব্যক্তিগতভাবে আমাদের নিজেদের মধ্যে যে স্বাধীনতা আছে, মনের বল থাকিলে রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা হেতু পররাষ্ট্রীয় শক্তির কাছে দেহের বল পরাস্ত হইলেও তাহার প্রভাব কম নহে। তাহার পক্ষে বিবেক রক্ষা করিয়া চলা অসম্ভব নহে এবং যে বিবেকের মর্য্যাদা রাখিয়া চলিতে পারে, সে পরের চাকর নহে।

পরাধীনতার হাত হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে হইলে, বৈদেশিক রাজা বা রাজশক্তির সহিত সম্বন্ধচ্যুত হইলেই ত হইল না। ফ্রান্স, হলণ্ড, পোর্টুগাল, অষ্ট্রীয়া প্রভৃতি তাহাদের রাজার অধীনতা সহ্য করিতে না পারিয়াই রাজশক্তিকে নির্ব্বাসিত করিয়া প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে। রুসিয়া তাহার রাজা ও রাজবংশ ধ্বংস করিয়াও এখন শান্ত হইতে পারিতেছে না। প্রজাতন্ত্রশাসনও এক শ্রেণীর লোক চাহে না। তাহাদের কাছে কোন প্রজাবিশেষের প্রাধান্যও অসহনীয়। মূল কথা, আমরা আমাদের নিজের মধ্যে স্বাধীন মনে করিতে শিখি নাই বলিয়াই আমাদের এতাদৃশ অধঃপতন। আমাদের সাধনা যেরূপ, সিদ্ধি তদ্বিপরীত হইতে পারে না। আমরা ব্যক্তিগতভাবে আপন আপন গণ্ডীতে স্বাধীন নয় কিসে? রাজা তাঁহার রাজ্য শাসন করিবেন, তাহার ক্রটী তাঁহার নিজ স্বার্থ রক্ষা করিতে যেখানে আমাদের গায়ে লাগে, সেখানে আমাদের ভোগাভোগ আছে সত্য। সেখানে পরাধীনতার তীব্রতা অনুভূত হইলেও আমরা আমাদের অন্তরমধ্যে, আমাদের মনোরাজ্যে বহু বিষয়েই স্বাধীন। এই স্বাধীনতা এক জন স্বাধীন জাতির লোকেরও যেমন, আমাদেরও তেমন। আর যেখানে রাষ্ট্রীয় শক্তির সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষ নাই, সেখানে ত আমরা পূর্ণমাত্রায় স্বাধীন। এই স্বাধীনতাই আমাদের জন্মগত অধিকার। বোধ হয়, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষেরও তাহাই। আর এই স্বাধীনতা কাড়িয়া লইতে পারে, এমন শক্তিমান রাজা কেহ নাই।

শ্রীহরিহর শেঠ।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের রচনাকাল

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থখানি বাঙ্গালা দেশের বাঙ্গালী কবি কর্ত্তৃক বাঙ্গালা ভাষায় রচিত, সুতরাং "পাঠান যুগ" বা "মোগল যুগ" বলিতে "যুগ" শব্দের ব্যাপ্তি সমগ্র ভারতবর্ষে না বুঝিয়া কেবল বাঙ্গালা দেশেই ধরিয়া লইতে হইবে। বাঙ্গালা দেশে পাঠান যুগের অবসান ও মোগল যুগের সূচনা কখন্ হয়, সে বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন না হইতে পারে।

মুসলমান-বিজয়ের পর হইতে ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালাদেশ হাব্‌সীগণের দ্বারা শাসিত হয়। শেষ হাব্‌সী সুলতান নিহত হইলে তাঁহার অন্যতম সেনাপতি হুসেন সৈয়দ আলাউদ্দীন হুসেন শাহ নাম গ্রহণে বাঙ্গালার সুবেদারী করেন। ইঁহার পুত্র মহম্মদ শাহ ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে সের শাহ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হন। এই মহম্মদ যখন বাঙ্গালায় রাজত্ব করিতেছিলেন, সেই সময় বাবর দিল্লী অধিকার করেন। ইহাই হইল ভারতে মোগল যুগের সূচনা। সুরবংশের অধঃপতনের পর আফগান সুলেমান কররাণী ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার সিংহাসন অধিকার করেন। ইঁহার পুত্র দায়ুদই বাঙ্গালার শেষ পাঠান সুবেদার। ইনি প্রথমে মোগলবশ্যতা স্বীকার করিয়া পরে বিদ্রোহাচরণ করিলে মোগল সম্রাট আকবরের সহিত ইঁহার একটি যুদ্ধ হয় (১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে) দায়ুদ ঐ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সন্ধি করেন,—"The terms were that he (Daud) should relinquish all pretensions to Bengal but should retain Orissa and Cuttack. Moonjim Khan was appointed governor of Bengal and removed the seat of government from Khoowaspur Tanda to Gour." (Beveridge, A Comprehensive History of India, P. 133)

কতকগুলি আফগান সর্দ্দারের সহিত মিলিত হইয়া দায়ুদ আবার বিদ্রোহী হইলে পুনরায় পরাজিত এবং নিহত হন ও এইবার "Bengal and Behar were formally incorporated within the Empire of the Great Mogul." (Beveridge, P. 134) সুতরাং প্রকৃতপক্ষে ধরিতে গেলে ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দ হইতেই বাঙ্গালায় মোগল যুগের আরম্ভ। কারণ, ঐ সময় হইতেই মোগলের নিয়োজিত সুবেদার বাঙ্গালার মসনদে উপবিষ্ট হন। অবশ্য মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হইলেও ১৫৯২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে বাঙ্গালা সম্পূর্ণ নিরুপদ্রব হয় নাই।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত কেবলই ষোল আনা রকমের জীবনচরিত না হইলেও গ্রন্থকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী উহাতে যে সকল ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন, সে সবই ঘটিয়াছিল বাঙ্গালায় পাঠান যুগে। কারণ, শ্রীচৈতন্যদেব প্রকট ছিলেন ১৪৮৫ হইতে ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। তখন হোসেন শা ও তাঁহার পুত্র মহম্মদ শা বাঙ্গালার সুবেদার ছিলেন। তাঁহার সহিত উড়ষ্যার স্বাধীন নরপতি প্রতাপরুদ্রের সীমান্তপ্রদেশ লইয়া তুমুল বিবাদ চলিতেছিল, শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ইহার উল্লেখ আছে। শ্রীরূপসনাতন ও সুবুদ্ধিরায়ের আখ্যায়িকার সহিতও হুসেন শাহ সংশ্লিষ্ট।

এখন শ্রীচৈতন্যদেবের অপ্রকটের কত কাল পরে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচিত হয়, তাহা নির্ণয়ে প্রয়াসী হওয়া যাইতে পারে। প্রথমে

বাহ্য প্রমাণগুলি আলোচনা করা যাউক। ইহারা স্থির সত্যে উপস্থিত করিয়া না দিলেও ইহাদের সাহায্যে মোটামুটি সত্যের পথ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে এবং জনৈক ইংরাজ সমালোচক (Shaw) এর কথায় "Where all the recognised tests concur, we may find certainty."

(১) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর অনেক শ্লোক প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে। এই শেষোক্ত গ্রন্থের উত্তর বিভাগের নবম লহরীতে "রামাঙ্গশক্রগণিতে শকে" এই উক্তি দ্বারা রচনার সময় ১৪৬৩ শকাব্দা নির্ণীত হইয়াছে, সুতরাং চরিতামৃত উহার পরের সময়ের রচনা।

(২) কবি কর্ণপূরের শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ১৪৯৪ শকে রচিত হয়। চরিতামৃতে উক্ত নাটকের অনেক শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, সুতরাং শেষোক্ত গ্রন্থের রচনাকাল ১৪৯৪ শকের পর।

(৩) যদুনন্দন দাস বিরচিত কর্ণানন্দের বহু স্থানে চরিতামৃতের উল্লেখ আছে। উদাহরণস্বরূপ চতুর্থ নির্য্যাসের নাম করা যাইতে পারে। ১৫২৯ শকে কর্ণানন্দ সমাপ্ত হয়, যথা—

"পঞ্চদশ শত আর বৎসর উনত্রিংশে।
বৈশাখ মাসেতে আর পূর্ণিমা দিবসে॥
নিজপ্রভু-পাদপদ্ম মস্তকে ধরিয়া।
সমাপ্ত করিল গ্রন্থ শুন মন দিয়া।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভুর দাসের অনুদাস।
তার দাসের দাস এই যদুনন্দন দাস॥"
—৬ষ্ঠ নির্য্যাস।

সুতরাং ১৫২৯ শকের পূর্ব্বে চৈতন্যচরিতামৃত নিশ্চয়ই রচিত হইয়াছিল।

(৪) মোগল কর্ত্তৃক বাঙ্গালা জয়ের পর তোড়রমল্ল বাঙ্গালার রাজস্ব বন্দোবস্ত করেন। বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বির তখনও স্বাধীন থাকিয়া জঙ্গলে দস্যুদলপতিত্ব করিতেন। ১৫৩৬-১৬২১ খৃঃ অব্দ বীর হাম্বিরের রাজত্বকাল। ঐতিহাসিকপ্রবর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় কর্ত্তৃক প্যারিস হইতে সংগৃহীত "বহারিস্তান" নামক ফার্সী হস্তলিপি হইতে জানা যায়, ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে (=১৫৩০ শকে) বীর হাম্বির মোগলবশ্যতা স্বীকার করেন। (ভারতবর্ষ, জৈষ্ঠ ১৩৩১)। সুতরাং গ্রন্থচুরি তাহার পূর্ব্বেই হইয়াছিল। অপহৃত গ্রন্থরাজির মধ্যে চরিতামৃত ছিল, ইহা ধরিয়া লইলে রচনাকাল ১৫৩০ শকের পূর্ব্বে হয়।

(৫) ১৩২৮।২৯ সালের চৈত্র। বৈশাখ সংখ্যা শ্রীগৌরাঙ্গসেবকে দেখা যায়, শ্রীনিবাস আচার্য্য ১৫০৪ শকে অগ্রহায়ণের শুক্ল পক্ষের পঞ্চমী তিথিতে গ্রন্থরাজি লইয়া শ্রীবৃন্দাবন হইতে গৌড়ে যাত্রা করেন, সুতরাং চরিতামৃত তাহার পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল। ভক্তিরত্নাকর, ষষ্ঠ তরঙ্গ, ৪৬৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৬) জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয়ের মতে কবিরাজ গোস্বামী ১৪১৮ হইতে ১৫০৪ শক পর্য্যন্ত প্রকট ছিলেন। সুতরাং গ্রন্থসমাপ্তি ১৫০৪ শকের পূর্ব্বেই হইয়াছিল। অতি বৃদ্ধবয়সে গ্রন্থসমূহের অপহরণ-সংবাদ পাইয়া তাঁহার হৃদয়ে যে গুরুতর আঘাত লাগে, অনেকে বলেন, তাহার অপ্রকটের তাহাই গূঢ় কারণ।

পূর্ব্বপ্রদত্ত ছয়টি বিভিন্ন সাক্ষ্যের আলোচনা করিলে বুঝা যায়, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ১৪৯৪ হইতে ১৫২৯ শকের মধ্যে রচিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ ৫ম ও ৬ষ্ঠ প্রমাণ দুইটি রচনার সময় আরও সুনির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয়। ১৫০৪ শকে গ্রন্থসহ আচার্য্য প্রভুর যাত্রা ও কবিরাজ গোস্বামীর অন্তর্দ্ধান এই দুইটি ঘটনা দ্বারা রচনাকাল ১৫০৪ শকের পরে প্রমাণিত হইতেছে।

(৭) এইবার একটি ভিতরের প্রমাণের উল্লেখ করিব। ইহাতে একদেশদর্শিতা আসিতে পারে না এবং কল্পনা করিবার বা খুঁৎ ধরিবারও কোন আবশ্যক নাই। কবিরাজ গোস্বামী স্বয়ংই গ্রন্থশেষে একটি শ্লোকে সমাপ্তির সময় উল্লেখ করিয়াছেন,—

"শাকেঽগ্নিবিন্দুবাণেন্দৌ
জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্য্যোঽহ্ন্যসিতপঞ্চম্যাং
গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥"

অগ্নি=৩, বিন্দু=০, বাণ=৫, ইন্দু=১; অঙ্কের বামা গতি, সুতরাং গ্রন্থপূর্ণতার শক=১৫০৩। আমরা বঙ্গবাসী সংস্করণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত লইয়া আলোচনা করিতেছি। পত্রিকা আফিস হইতে প্রকাশিত প্রেমবিলাসেও শ্লোকটি এইরূপই প্রদত্ত হইয়াছে। কোন কোন পুস্তকে "শাকে সিন্ধ্বগ্নিবাণেন্দৌ"—অর্থাৎ ১৫৩৭ শক বা ইংরাজী ১৬১৫ অব্দে এইরূপ পাঠ আছে। ইহা লিপিকরপ্রমাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে এবং যাঁহারা প্রাচীন পুথি লইয়া নাড়াচাড়া করেন, তাঁহারা এইরূপ প্রমাদে অভ্যস্ত। কর্ণানন্দের ন্যায় প্রামাণিক গ্রন্থের সাক্ষ্যে ১৫২৯ শকের পর শ্রীচরিতামৃত কিছুতেই রচিত হইতে পারে না। ৪নং সাক্ষ্যও ইহার পোষকতা করে। শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বীর হাম্বির পরম বৈষ্ণব হন ও দস্যুদল পতিত্ব ত্যাগ করেন। তৎপূর্ব্বে তিনি মোগলের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। সুতরাং "চৈতন্যচরিতামৃত ইংরাজী ১৬১৫ অব্দে লিখিত হয়"—শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবুর এইরূপ উক্তি (সরল বাঙ্গালা সাহিত্য, ১৬১ পৃষ্ঠা) চিন্তার বিষয়।

(৮) "শাকেঽগ্নিসিন্দুবাণেন্দৌ" শ্লোকটিকে প্রক্ষিপ্ত বা কোন অজ্ঞাতনামা লিপিকরের কৃত বলাও সঙ্গত হইবে না, কারণ, ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী স্বাভীষ্টবন্দনা কবিরাজ গোস্বামীকেই ধরাইয়া দিতেছে এবং রচনার ভঙ্গীও গোবিন্দলীলামৃতের পাঠকের নিকট নূতন বোধ হইবে না।

(৯) প্রেমবিলাসের পোষকতাও অবহেলার চক্ষুতে দেখিবার নহে। শ্রীনিবাস আচার্য্যের কন্যা শ্রীহেমলতা ঠাকুরাণীর আদেশে শ্রীযদুনন্দন দাস কর্ণানন্দ প্রণয়ন করেন, সেইরূপ শ্রীল জাহ্নবীমাতার আদেশে তদীয় শিষ্য নিত্যানন্দ দাস ১৪২২ শকে প্রেমবিলাস রচনা করেন। ইহাতে চরিতামৃতসমাপ্তির কাল এইরূপ লিখিত আছে,—

"কৃষ্ণদাস কবিরাজ থাকি বৃন্দাবন।
পনর শত তিন শকাব্দের যখন॥
জ্যৈষ্ঠ মাসে রবিবারে কৃষ্ণা পঞ্চমীতে।
পূর্ণ কৈল গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে॥"
—২৪শ বিলাস।

ইহার পর ঐ "শাকেঽগ্নি" শ্লোকটি তোলা আছে। উহা খাঁটী না হইলে শ্রীজাহ্নবীমাতা, শ্রীল বীরভদ্র প্রভু প্রভৃতি উহার অনুমোদন করিতেন না।

প্রবন্ধের আর বিস্তার না করিয়া ১৫০৩ শকে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের রচনা সমাপ্ত হয়, এরূপ ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। ক্রমাগত ৯ বৎসরের অধ্যবসায়ে বৃদ্ধ জরাতুর কবিরাজ গ্রন্থসমাপ্তি করেন, ইহা মানিয়া লইলে ১৪৯৪ শকে গ্রন্থরচনার আরম্ভকাল,—অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৫৭২—১৫৮১ অব্দে চৈতন্যচরিতামৃত রচিত হয়। এই সময়টি বাঙ্গালার ইতিহাসের পরিবর্ত্তনের যুগ, পাঠান রাজত্ব ধ্বংস হইয়া মোগলের প্রভুত্ব বদ্ধমূল হয়। সুতরাং চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থখানি পাঠান যুগেরও বটে, মোগল যুগও ইহাকে আপনার বলিয়া দাবী করিতে পারে। পাঠান যুগের শেষ চারি

বৎসর ও মোগল যুগের প্রথম পাঁচ বৎসর, এই নয় বৎসর শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের রচনাকাল।

শ্রীআশুতোষ হাটী।

শুক্রনীতির কলা ও বিদ্যা

গরুড়পুরাণে কথিত আছে যে, সুরগুরু বৃহস্পতি ইন্দ্রকে নীতিশাস্ত্র উপদেশ দিয়াছিলেন। (১) ঠিক সেই উপদেশ আবার বশিষ্ঠদেব সংক্ষেপে শ্রীরামচন্দ্রকে শিক্ষা দেন। সেইরূপ দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যও অসুরগণকে নীতিসার শিখাইয়াছিলেন (২)। ভগবান্ ব্রহ্মা স্বয়ং লোকহিতের নিমিত্ত শতলক্ষ শ্লোকাত্মক নীতিশাস্ত্র বলিয়াছিলেন (৩)। পরবর্ত্তী কালেও যে সকল নীতিশাস্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার সকলগুলিই ব্রহ্মার উক্তির পুনরুক্তিমাত্র। শুক্র, বৃহস্পতি, বশিষ্ঠ প্রভৃতি সকলেই সেই নীতিশাস্ত্রের সংক্ষেপ বলিয়াছেন মাত্র। ইদানীন্তনকালে চাণক্য প্রভৃতিও অতি সংক্ষেপে তাহারই অনুসরণ করিয়াছেন মাত্র।

শুক্রাচার্য্যের নীতিসার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। উহা শুক্রাচার্য্যের দ্বারা স্বয়ং লিখিত কিম্বা উত্তরকালে তাঁহার কোন শিষ্য-প্রশিষ্য দ্বারা বর্ত্তমানাকারে লিপিবদ্ধ, তাহা সহজে বলিবার উপায় নাই। ভাষা দেখিয়া বোধ হয়, উহা বেদ ও উপনিষদের পরে লিখিত। বিষয়গুলির পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায়, উহা ভারতের কোন সমুন্নত অতীত যুগের লেখা; তখন বেদ, উপনিষদ্, পুরাণ, ইতিহাস ও দর্শন প্রভৃতির উন্নতির পরাকাষ্ঠা হইয়াছে; হিন্দুরাজ্যের প্রাধান্যের তখনও লোপ হয় নাই। কেহ কেহ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, শুক্রনীতি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বের গ্রন্থ; কিন্তু উহা এ দেশে বৌদ্ধপ্রভাবের প্রাদুর্ভাবের পূর্ব্বে কি পরে, তাহা নিশ্চয়রূপে বলেন নাই। খৃষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত এ দেশের নানা স্থানেই অনেক হিন্দু ও বৌদ্ধরাজ্য নির্ব্বিবাদে যুগপৎ বিস্তৃতি ও উন্নতি লাভ করিয়াছিল। মনে হয়, "শুক্রনীতিসার" সেই সময়ে কোন হিন্দুরাজার সাহায্যে প্রচারিত হইয়াছিল। এ কথা নিতান্ত অবিশ্বাস্য নহে। তবে সমালোচ্য 'শুক্রনীতিসার' বৌদ্ধপ্রভাবের পূর্ব্বের কি না, তাহা চিন্তার বিষয়। সে যাহা হউক, কালনির্ণয়ের ব্যাপার ও বিচার আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া আমরা এই নীতিসারের বর্ণিত বিষয়গুলির কিছু কিছু আলোচনা করিব। এই নীতিসারের প্রণয়ন বা প্রচারকালে ভারতবর্ষে বিদ্যাচর্চ্চার গতি কিরূপ ছিল এবং তাহা হইতে যদি ঐ প্রণয়ন বা প্রচারকালের কোন সন্ধান পাওয়া যায়, সেই জন্য আমরা শুক্রাচার্য্যবর্ণিত অনন্ত বিদ্যা ও কলানিচয়ের আলোচনাই সর্ব্বপ্রথমে গ্রহণ করিলাম।

ইতঃপূর্ব্বে আমি প্রবন্ধান্তরে (ক) ভারতীয় কলাবিদ্যার অনুসন্ধান করিতে গিয়া কলাগুলিকেই বিদ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম। প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে যে সকল বিদ্যা (arts and sciences) প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল, তাহাই দেশ, কাল ও পাত্রভেদে কলা নামে অভিহিত হইত বলিয়া বুঝিয়াছিলাম। সুতরাং সেই প্রবন্ধে সেই রকমই আলোচনা করিয়াছিলাম। শুক্রনীতির ধৃত কলা সমূহও সেই প্রবন্ধেই উল্লেখ করিয়াছি এবং তথায় সর্ব্বসমেত ১০টি তালিকা প্রাচীন বৌদ্ধ পালি ও সংস্কৃত গ্রন্থাদি হইতে উদ্ধার করা হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, সেই ১০টি তালিকা হইতেই জানা যায় যে, কলা শব্দ তখন কেবল (Light literature) এই অর্থেই ব্যবহৃত হয় নাই—বরং প্রচলিত সমস্ত বিদ্যার (Arts and sciences) প্রতিশব্দরূপেই উল্লিখিত হইত। কিন্তু শুক্রনীতিতে 'কলা' ও 'বিদ্যা' এই দুইটি শব্দ সম্পূর্ণ পৃথক্‌ভাবে পৃথক্ অর্থবোধক বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অন্যত্র কোথায়ও এই ভাবের প্রয়োগ আছে কি না, জানিতে পারি নাই। শুক্রাচার্য্য সমস্ত শাস্ত্র দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া তন্মধ্যে ৩২টিকে মুখ্য বিদ্যা এবং অবশিষ্ট ৬৪টিকে কলাবিদ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমি প্রাগুক্ত প্রবন্ধে কেবলমাত্র এই শেষোক্ত চৌষট্টি কলারই আলোচনা করিয়াছিলাম; মুখ্যবিদ্যাগুলির কোন উল্লেখই করি নাই। শুক্রাচার্য্যের সময়ে যে কেবল ৩২টি মুখ্যবিদ্যা ও ৬৪টি কলা মাত্র লোকসমাজে প্রচলিত ছিল, তাহাও নহে। তিনি নিজেই বলিয়াছেন— বিদ্যা ও কলা অনন্ত; তাহাদিগের সংখ্যা করা যায় না; তবে শাস্ত্রকারগণের উক্তি অনুসারে তিনিও ঐরূপ বিভাগ করিয়াছেন মাত্র। (১) যে সকল কর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে বাক্য দ্বারা নিষ্পাদিত হইয়া থাকে, তাহাই বিদ্যা এবং বাক্‌শক্তিরহিত ব্যক্তিও যাহা যাহা করিতে সমর্থ, তাহাই কলা, যথা নৃত্যাদি (২)। এই ভাবে শুক্রাচার্য্য সংক্ষেপে বিদ্যা ও কলার লক্ষণ নির্দ্ধারণ করিয়া পরে বিশেষভাবে তাহাদিগের পৃথক্ পৃথক্ নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব—এই চারিটি বেদ; আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববেদ ও তন্ত্রশাস্ত্র এই চারিটি উপবেদ; (৩) শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ ও ছন্দঃ এই ছয়টি বেদাঙ্গ; (৪) মীমাংসা, তর্ক, সাংখ্য, বেদান্ত, যোগ, ইতিহাস, পুরাণ, স্মৃতি, নাস্তিক-মত, অর্থশাস্ত্র, কামশাস্ত্র, শিল্প, অলঙ্কার, কাব্য, দেশভাষা, অবসরোক্তি, যাবনমত, দেশাদি প্রচলিত ধর্ম্ম—এই বত্রিশটি বিদ্যা বলিয়া খ্যাত। এখন দেখা যাউক, শুক্রনীতিসারে এই বত্রিশটি মুখ্যবিদ্যার প্রত্যেকটির কি প্রকার লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

বেদ।—ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব এই চারি বেদই মন্ত্র ও ব্রাহ্মণভেদে দ্বিবিধ। বেদের যে ভাগের উচ্চারণ দ্বারা জপ, হোম ও পূজা দেবতা-গণের প্রীতিপ্রদ হইয়া থাকে, সেই ভাগ "মন্ত্র" এবং তাহা ছাড়া অবশিষ্ট ভাগ অথবা সেই ভাগেরই প্রমাণস্বরূপ অবশিষ্ট ভাগ "ব্রাহ্মণ"। (ক)

(১) ঋগ্বেদ।—যে বেদে ঋক্‌রূপ মন্ত্রসকল পাদপরিমাণে বা অর্দ্ধপরিমাণে পঠিত হইয়া থাকে, যে বেদের মন্ত্রসমূহ হোমকার্য্য

---

(১) নীতিসারং সুরেন্দ্রায় ইদমূচে বৃহস্পতিঃ।
সর্ব্বজ্ঞো যেন চেন্দ্রোঽভূৎ দৈত্যান্ হত্বাপ্যবাপ্দিবম্ ॥
গরুড়পুরাণ, পূর্ব্বার্দ্ধ ১০৮।১০।

(২) সংপূজ্য ভার্গবঃ পৃষ্টো বশিতঃ পূজিতঃ স্তুতঃ।
পূর্ব্বদেবৈর্যথান্যায়ং নীতিসারমুবাচ তান্ ॥
শুক্রনীতি ১।১, ২ ॥

(৩) শতলক্ষশ্লোকমিতং নীতিশাস্ত্রমথোক্তবান্।
স্বয়ম্ভুর্ভগবান্ লোকহিতার্থং…॥
শুক্রনীতি ১।২, ৩ ॥

(ক) এই প্রবন্ধ বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের ত্রয়োদশ অধিবেশনে ইতিহাস শাখায় পঠিত হইয়াছিল।

(১) বিদ্যা হ্যনন্তাঃ কলাশ্চ সংখ্যাতুং নৈব শক্যতে।
বিদ্যা মুখ্যাশ্চ দ্বাত্রিংশৎ চতুঃষষ্টিঃ কলাঃ স্মৃতাঃ ॥
শুক্রনীতি ৪।৩।২৪॥

(২) যদ্ যৎ স্যাদ্ বাচিকং সম্যক্ কর্ম্ম বিদ্যাভিসংজ্ঞকম্।
শক্তো মূকোঽপি যৎ কর্ত্তুং কলাসংজ্ঞন্তু তৎ স্মৃতম্ ॥
ঐ ৪।৩।২৫

(৩) ঋগ্‌যজুঃ সাম চাথর্ব্বা বেদা আয়ুর্ধনুঃক্রমাৎ।
গান্ধর্ব্বশ্চৈব তন্ত্রাণি উপবেদাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। ঐ ৪।৩।২৭

(৪) শিক্ষা ব্যাকরণং কল্পো নিরুক্তং জ্যোতিষং তথা।
ছন্দঃ ষড়ঙ্গানীমানি বেদানাং কীর্ত্তিতানি হি ॥ ঐ ৪।৩।২৮

(ক) মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদ নাম প্রোক্তমৃগাদিষু।
জপহোমার্চ্চনং যস্য দেবতাপ্রীতিদং ভবেৎ ॥
উচ্চারাৎ মন্ত্রসংজ্ঞং তৎ বিনিয়োগে চ ব্রাহ্মণম্ ॥
শুক্রনীতিসার, ৪।৩১, ৩২ ॥

সম্পাদনের নিমিত্তই ব্যবহৃত হয় এবং যেই বেদে নানা আখ্যান সম্যক্‌রূপে কথিত হইয়াছে, তাহাই "ঋগ্বেদ"। (ক)

(২) যজুর্ব্বেদ।—যে বেদের মন্ত্রসমূহ প্রশ্লিষ্টভাবে পঠিত হইয়া থাকে এবং যে বেদের মন্ত্রগুলি ছন্দ ও গীতবিরহিত, যে বেদে অধ্বর্য্যুদিগের বিহিত কর্ম্ম উক্ত হইয়াছে এবং যাহার মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এই উভয়েরই তিনবার পাঠ করাইতে হয়, তাহাই "যজুর্ব্বেদ"। (খ)

(৩) সামবেদ—যাগাদি যজ্ঞে যে বেদের উচ্চৈঃস্বরে গীত বিহিত হইয়া থাকে, তাহাই "সামবেদ"। (গ)

(৪) অথর্ব্ববেদ—যে বেদে আরাধ্য দেবতাগণের উপাসনাক্রম উক্ত হইয়াছে, তাহাই অথর্ব্বাঙ্গিরস নামক বেদভাগ অর্থাৎ "অথর্ব্ববেদ"। (ঘ)

(৫) আয়ুর্ব্বেদ—যাহার বিহিত অনুষ্ঠান সকল পালন করিলে লোক আয়ু লাভ করিয়া থাকে, এবং রোগের আকারপ্রকার ও ওষধির জ্ঞান লাভ করিয়া রোগ ও আয়ুর পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হয়, ঋগ্বেদের উপবেদস্বরূপ তাহাই "আয়ুর্ব্বেদ"। (ঙ)

(৬) ধনুর্ব্বেদ—যে শাস্ত্রের জ্ঞানলাভ করিলে লোক যুদ্ধবিদ্যার, অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োগসংহারে কিংবা ব্যূহাদি রচনায় নৈপুণ্য লাভ করিয়া থাকে, যজুর্ব্বেদের উপবেদস্বরূপ তাহাই "ধনুর্ব্বেদ।" (চ)

(৭) গান্ধর্ব্ববেদ—যদ্দ্বারা উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিতাদি সংযোগে তন্ত্রীকণ্ঠোত্থিত নিষাদাদি সপ্তস্বরে তানলয়সমন্বিত গানের সম্যক্ জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে, সামবেদের উপবেদ তাহাই "গান্ধর্ব্ববেদ।" (ছ)

(৮) তন্ত্র—যেখানে বিবিধ উপাস্য মন্ত্র সকলের উপসংহারের সহিত ছয় প্রকার প্রয়োগ তত্তৎ ধর্ম্মনিয়মের সহিত বিশিষ্ট প্রভেদানুসারে কথিত হইয়াছে, অথর্ব্ববেদের উপবেদ বেদাঙ্গ তাহাই "তন্ত্রশাস্ত্র।" (জ)

বেদাঙ্গ

(৯) শিক্ষা—যে সন্দর্ভে উদাত্তাদি স্বরভেদে কালক্রমে কণ্ঠ, তালু প্রভৃতি স্থানে যথাযথ প্রযত্ন সহকারে উচ্চারণ পূর্ব্বক বর্ণমালার পাঠাভ্যাস শিক্ষা হয়, তাহাই "শিক্ষা-শাস্ত্র।" (ঝ)

(১০) কল্প (শ্রৌত ও স্মার্ত্ত)—বেদের ব্রাহ্মণভাগের শেষাংশে যজ্ঞের প্রয়োগবিধি উক্ত হইয়াছে, ইহাই বৈদিক "কল্পশাস্ত্র" (শ্রৌতকল্প) নামে অভিহিত; ইহা ভিন্ন অন্য সকল "স্মার্ত্তকল্প।" (ঞ)

(১১) ব্যাকরণ—যে গ্রন্থে প্রত্যয়াদি দ্বারা ধাতু, সন্ধি ও সমাসের সাহায্যে পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গভেদে শব্দসমূহ সাধিত হইয়া থাকে, তাহাই ব্যাকরণ। (ট)

(১২) নিরুক্ত—যে শাস্ত্রে প্রকৃতি-প্রত্যয় দ্বারা শব্দসমূহের সম্যক্ অর্থ কথিত এবং বাক্যার্থেরও একমাত্র অর্থ প্রতিপাদিত হইয়া থাকে, তাহাই "নিরুক্ত"; শব্দার্থের সম্যক্ প্রকটন হেতু ইহা 'শ্রোত্র' নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। (ঠ)

(১৩) জ্যোতিষ—যে শাস্ত্রে গ্রহনক্ষত্রের গতি, সংহিতা, হোরা ও গণিত দ্বারা পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে কাল নিরূপিত হইয়া থাকে, তাহা "জ্যোতিষ"। (ড)

(১৪) ছন্দঃ—যে শাস্ত্র দ্বারা লঘু ও গুরু অক্ষরের প্রকৃত পরিমাণানুসারে পদ্য লিখিবার ব্যবস্থা হইয়া থাকে, তাহাই "ছন্দঃশাস্ত্র, ইহা বেদের চরণব্যবস্থাপক। (ঢ)

দর্শন

(১৫) মীমাংসা—যে শাস্ত্রে অনুষ্ঠানভেদে বেদবাক্যের পৃথক্ পৃথক্ অর্থকল্পনা ব্যবস্থাপিত হইয়া থাকে, তাহাই "মীমাংসা।" (ণ)

(১৬) ন্যায় (তর্ক)—(ন্যায় ও বৈশেষিক) যে শাস্ত্রে ভাব ও অভাব পদার্থসমূহের প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদি প্রমাণ দ্বারা বিচার পূর্ব্বক তর্কসিদ্ধান্ত হইয়াছে এবং কণাদাদি বৈশেষিক দার্শনিকদিগেরও যাহা মত, তাহাই "ন্যায়" বলিয়া কীর্ত্তিত। [ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন প্রায়ই একরূপ বলিয়া এখানে একটিমাত্র বিদ্যা বলিয়া উক্ত হইয়াছে।] (ত)

(১৭) সাংখ্য—এক কূটস্থ পুরুষ; প্রকৃতি, মহান্, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্রা; পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনঃ—এই পঞ্চবিংশতিতত্ত্বের সংখ্যা-বৈশিষ্ট্যহেতু "সাংখ্য" দর্শন উক্ত হইয়া থাকে। (থ)

(ক) ঋগ্‌রূপা যত্র যে মন্ত্রাঃ পাদশ অর্দ্ধশোঽপি বা।
যেষাং হৌত্রং স ঋগ্‌ভাগঃ সমাখ্যানং চ যত্র বা ॥
শুক্রনীতি ৪।৩৩

(খ) প্রশ্লিষ্টপঠিতা মন্ত্রা বৃত্তগীতবিবর্জ্জিতাঃ।
আধ্বর্য্যবং যত্র কর্ম্ম ত্রিগুণং যত্র পাঠনম্॥
মন্ত্রব্রাহ্মণয়োরেব যজুর্ব্বেদঃ স উচ্যতে ॥ ঐ ৪।৩৪ ॥

(গ) উদ্‌গীথং যস্ত সত্রাদেযজ্ঞে তৎ সামসংজ্ঞকম্। ঐ ৪।৩৫ ॥

(ঘ) অথর্ব্বাঙ্গিরসো নাম হ্যপাস্যোপাসনাত্মকঃ। ঐ ৪।৩৬ ॥

(ঙ) বিন্দত্যায়ুর্ব্বেত্তি সম্যগাকৃত্যৌষধিহেতুতঃ।
যস্মিন্ন্‌গ্বেদোপবেদঃ স চায়ুর্ব্বেদসংজ্ঞকঃ ॥ ঐ ৪।৩৭॥

(চ) যুদ্ধশস্ত্রাস্ত্রব্যূহাদিরচনাকুশলো ভবেৎ।
যজুর্ব্বেদোপবেদোঽয়ং ধনুর্ব্বেদস্তু যেন সঃ॥ ঐ ৪।৩৮॥

(ছ) স্বরৈরুদাত্তাদিধর্ম্মৈস্তন্ত্রীকণ্ঠোত্থিতৈঃ সদা।
সতালৈঃ জ্ঞানবিজ্ঞানং গান্ধর্ব্বো বেদ এব সঃ ॥ ৪।৩৯॥

(জ) বিবিধোপাস্যমন্ত্রাণাং প্রয়োগাঃ সুবিভেদতঃ।
কথিতাঃ সোপসংহারাস্তদ্ধর্ম্মনিয়মৈশ্চ ষট্ ॥
অথর্ব্বণাং চোপবেদস্তন্ত্ররূপঃ স এব হি ॥ শুক্রনীতি ৪।৪০॥

(ঝ) স্বরতঃ কালতঃ স্থানাৎ প্রযত্নানু প্রদানতঃ।
…সা শিক্ষা বর্ণানাং পাঠশিক্ষণাৎ ॥ ৪।৪১ ॥

(ঞ) প্রয়োগো যত্র যজ্ঞানাম্ উক্তো ব্রাহ্মণশেষতঃ।
শ্রৌতকল্পঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স্মার্ত্তকল্পস্তথেতরঃ ॥ শুক্রনীতি ৪।৪২॥

(ট) ব্যাকৃতাঃ প্রত্যয়াদ্যৈশ্চ ধাতুসন্ধিসমাসতঃ।
শব্দা যত্র ব্যাকরণমেতদ্ধি বহুলিঙ্গতঃ ॥ ৪।৪৩॥

(ঠ) শব্দনির্ব্বচনং যত্র বাক্যার্থৈক্যার্থসংগ্রহঃ।
নিরুক্তং তৎ সমাখ্যানাদ্ বেদাঙ্গং শ্রোত্রসংজ্ঞকম্ ॥
ঐ ৪।৪৪॥

(ড) নক্ষত্রগ্রহগমনৈঃ কালো যেন বিধীয়তে।
সংহিতাভিশ্চ হোরাভির্গণিতৈর্জ্যোতিষং হি তৎ ॥
ঐ, ৪।৪৫॥

(ঢ) ম্যরস্তজভ্রগৈর্লান্তৈঃ পদ্যং যত্র প্রমাণতঃ।
কল্প্যতে ছন্দঃশাস্ত্রং তদ্ বেদানাং পাদরূপধৃক্ ॥ ঐ, ৪।৪৬॥

(ণ) যত্র ব্যবস্থিতা চার্থকল্পনা বিধিভেদতঃ।
মীমাংসা বেদবাক্যানাং সৈব……॥ ঐ ৪.৪৭॥

(ত) ………ন্যায়শ্চ কীর্ত্তিতঃ ॥
ভাবাভাবপদার্থানাং প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণতঃ।
সবিবেকো যত্র তর্কঃ কণাদাদিমতঞ্চ যৎ ॥ ঐ ৪।৪৮॥

(থ) পুরুষোঽষ্টৌ প্রকৃতয়ো বিকারাঃ ষোড়শেতি চ।
তত্ত্বাদিসংখ্যাবৈশিষ্ট্যাৎ সাংখ্যমিত্যভিধীয়তে ॥ ঐ ৪।৪৯॥

(১৮) বেদান্ত—যে শাস্ত্রে একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, এই জগতে নানা ব্রহ্ম নাই এবং তদ্ভিন্ন অন্য সমস্ত মায়াময় মিথ্যাস্বরূপ হইয়াও অজ্ঞানবশতঃ সত্যবৎ প্রতীয়মান হয় বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহাই "বেদান্ত"। (ক)

(১৯) যোগ—ধ্যানসমাধি অর্থাৎ একাগ্রচিন্তাবলে কুম্ভকাদি দ্বারা অভ্যন্তর প্রাণবায়ুসমূহের সংযমন করিয়া যদ্দ্বারা মনোবৃত্তি সকলের বিষয়ান্তর হইতে ব্যাবৃত্তি সাধিত হইয়া থাকে, তাহাই যোগশাস্ত্র বলিয়া কথিত। (খ)

(২০) ইতিহাস (পুরাবৃত্ত)—যাহাতে কোনও নৃপতিবিশেষের চরিতবর্ণনাচ্ছলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৃত্তান্তসমূহের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহাই "ইতিহাস"; ইহা 'পুরাবৃত্ত' নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। (গ)

(২১) পুরাণ—সর্গ (সৃষ্টি), প্রতিসর্গ (প্রলয়), বংশ (মহাপুরুষগণের কুল), মন্বন্তর ও বংশানুচরিত প্রভৃতির সবিশেষ বর্ণনাযুক্ত পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত শাস্ত্রকে "পুরাণ" বলা হইয়া থাকে। (ঘ)

(২২) স্মৃতি—যে শাস্ত্রে বেদানুযায়ী বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ব্যবস্থা ও অর্থশাস্ত্রের তথা ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহাই "স্মৃতি"। (ঙ)

(২৩) নাস্তিকমত—যে গ্রন্থের মতে সমস্ত বস্তুই স্বভাবসিদ্ধ, কোন বস্তুরই সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর নহে এবং বেদও অকিঞ্চিৎকর, অর্থাৎ অপ্রমাণ বলিয়া অতিপ্রবল যুক্তি-তর্কের বলে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তাহাই "নাস্তিক" গ্রন্থ। (চ)

(২৪) অর্থশাস্ত্র—যে শাস্ত্রে রাজগণের আচরণাদি সম্বন্ধে শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রের অবিরোধী উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাই "অর্থশাস্ত্র"। (ছ)

(২৫) কামশাস্ত্র—যে শাস্ত্রে পুরুষদিগের শশক, মৃগ, অশ্ব ও হস্তী প্রভৃতি জাতিভেদে ও অনুকূল, ধৃষ্ট ও শঠ প্রভৃতি প্রকারভেদে এবং স্ত্রীদিগের পদ্মিনী, শঙ্খিনী, চিত্রিণী ও হস্তিনী প্রভৃতি জাতিভেদে ও স্বীয়া, পরকীয়া ও সাধারণী ইত্যাদি প্রকারভেদে পরস্পর অনুরাগের লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাই "কামশাস্ত্র"। (জ)

(২৬) শিল্পশাস্ত্র—রাজভবন কিংবা দেবালয়, প্রতিমা, উদ্যান-গৃহ এবং সরোবরাদির নির্ম্মাণ ও সংস্কার সম্বন্ধে যে শাস্ত্রে মহর্ষিগণ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহাই "শিল্পশাস্ত্র"। (ঝ)

(২৭) অলঙ্কার—যে শাস্ত্রে কম-বেশী বা সমানভাবে সাদৃশ্যাদি-ভেদে পরস্পর গুণবৈচিত্র্য বর্ণিত হইয়া থাকে, তাহাই "অলঙ্কার"। (ঞ)

(২৮) কাব্য—সরস, অলঙ্কারযুক্ত ও দোষরহিত শব্দার্থসমন্বিত গ্রন্থই "কাব্য", উহা পদ্যাদিভেদে অলৌকিক আনন্দদায়ক হইয়া থাকে। (ট)

(২৯) দেশভাষা— লৌকিক সঙ্কেত দ্বারাই যে ভাষার অর্থ অনায়াসে বোধগম্য হইয়া থাকে, তাহাই "দেশভাষা"। (ঠ)

(৩০) অবসরোক্তি,—কৌশিকাদি ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি ও শাস্ত্রসঙ্কেত বিনাও যে সকল কালোচিত বাক্য অর্থবোধক হইয়া থাকে, তাহাই "অবসরোক্তি"। (ড)

(৩১) যাবন মত— যাহাতে অদৃশ্য ঈশ্বরই সমস্ত জগতের কারণ-রূপে বর্ত্তমান আছেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে এবং বেদ ও স্মৃতি ভিন্নও ধর্ম্মাধর্ম্ম আছে, তাহাই যবনগ্রন্থ; ইহাতে বেদাদিবিরুদ্ধ ধর্ম্ম স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া ইহা "যাবন মত" বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। (ঢ)

(৩২) দেশাদিধর্ম্ম—দেশে দেশে কুলে কুলে যে সকল আচরণ বেদমূলক বা অমূলক হইলেও লোক অনুসরণ করিয়া থাকে, তাহাই "দেশাদিধর্ম্ম"। (ণ)

প্রাগুক্ত তালিকা হইতে দেখা যায় যে, শুক্রনীতিসারের সঙ্কলন-সময়ে চারিবেদেরই প্রচলন হইয়াছিল। বেদ তখন ত্রয়ীমাত্রই ছিল না। 'অমরকোষ' অভিধানে অথর্ব্ববেদ বিশেষভাবে উল্লিখিত হয় নাই; যদি খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে অমরকোষ রচিত হইয়া থাকে, তবে শুক্রনীতিসারের সঙ্কলনসময় তাহার পরে বলিয়াই মনে করিতে হইবে। চিকিৎসাবিদ্যা, যুদ্ধবিদ্যা ও সঙ্গীতবিদ্যা তখন যথেষ্ট পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল। আমরা এখন বর্ত্তমানকালে যে ষড়্‌দর্শন সূত্রাকারে বিন্যস্ত দেখিতে পাই, সম্ভবতঃ শুক্রনীতির সঙ্কলনকালে এইগুলি এইরূপ আকার ধারণ করে নাই; কিন্তু ষড়্‌দর্শনের বিষয় ঠিকই ছিল। নীতিসারে সকল দর্শনেরই উল্লেখ আছে। ইতিহাস, পুরাণ, স্মৃতি তখনও বেশ প্রচলিত ছিল। অর্থশাস্ত্র যে ভারতবর্ষের চরম সুখ-সমৃদ্ধির সময়ে অতি সুব্যবস্থায় অনুশীলিত হইত এবং প্রজার মঙ্গল-নিদান কামশাস্ত্রেরও চর্চা হইত, তাহাও উক্ত তালিকা হইতে বুঝা যায়। বর্ত্তমান কালের Eugenics (সুপ্রজননবিদ্যা) সহিত পুরাকালের কামশাস্ত্রের সম্বন্ধ স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আলোচনা করিতে ইচ্ছা রহিল। যে Technical Education কিংবা পূর্ত্তকার্য্য ও ভাস্করবিদ্যার কথা এখন ভারতে দুর্লভ হইয়াছে, তাহা শুক্রনীতিতে উন্নতির উচ্চস্তরে উঠিয়াছিল বলিয়া কথিত আছে। কাব্যালঙ্কার ও প্রচলিত সেশ্বরবাদ-সমন্বিত দর্শনশাস্ত্র ছাড়া নাস্তিক ও যাবন মত তখন খুবই ব্যাপক ছিল; নতুবা প্রধানবিদ্যার মধ্যে উদ্ধৃত হইত না। নাস্তিকমত সুরগুরু বৃহস্পতির প্রবর্ত্তিত; এই জন্য ইহাকে 'বার্হস্পত্য দর্শন'ও বলা হইয়া থাকে। কাশীবাসী আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুত হারাণচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়

(ক) ব্রহ্মৈকমদ্বিতীয়ং স্যাৎ নানা নেহাস্তি কিঞ্চন।
মায়িকং সর্ব্বমজ্ঞানাদ্ ভাতি বেদান্তিনাং মতম্॥
শুক্রনীতিসার, ৪।৫০॥

(খ) চিত্তবৃত্তিনিরোধস্তু প্রাণনং যমনাদিভিঃ।
তদ্ যোগশাস্ত্রং বিজ্ঞেয়ং যস্মিন্ ধ্যানসমাধিতঃ॥ ঐ ৪।৫১॥

(গ) প্রাগ্ বৃত্তকথনং চৈকরাজকৃত্যমিষাদিতঃ।
যস্মিন স ইতিহাসঃ স্যাৎ পুরাবৃত্তঃ স এ হি॥ ঐ ৪।৫২॥

(ঘ) সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতং যস্মিন্ পুরাণং তদ্‌বিকীর্ত্তিতম্॥ ঐ ৪।৫৩॥

(ঙ) বর্ণাদিধর্ম্মস্মরণং যত্র বেদাবিরোধকম্।
কীর্ত্তনং চার্থশাস্ত্রাণাং স্মৃতিঃ সা চ প্রকীর্ত্তিতা॥ ঐ ৪।৫৪॥

(চ) যুক্তির্বলীয়সী যত্র সর্ব্বং স্বাভাবিকং মতম্।
কস্যাপি নেশ্বরঃ কর্ত্তা ন বেদো নাস্তিকং মতম্॥ ঐ ৪।৫৫॥

(ছ) শ্রুতিস্মৃত্যবিরোধেন রাজবৃত্তাদিশাসনম্।
সুযুক্ত্যার্থার্জ্জনং যত্র হ্যর্থশাস্ত্রং তদুচ্যতে॥ ঐ ৪।৫৬॥

(জ) শশাদিভেদতঃ পুংসাং অনুকূলাদিভেদতঃ।
পদ্মিন্যাদিপ্রভেদেন স্ত্রীণাং স্বীয়াদিভেদতঃ॥
তং কামশাস্ত্রং সত্ত্বাদে লক্ষণং যত্রাস্তি চোভয়োঃ॥
ঐ ৪।৫৭॥

(ঝ) প্রাসাদ-প্রতিমারাম-গৃহ-বাপ্যাদিসৎকৃতিঃ।
কথিতা যত্র তচ্ছিল্পশাস্ত্রমুক্তং মহর্ষিভিঃ॥ ঐ ৪।৫৮॥

(ঞ) সমন্যূনাধিকত্বেন সাদৃশ্যাদিপ্রভেদতঃ।
অন্যোন্যগুণভূষা তু বর্ণ্যতেহলঙ্কৃতিশ্চ সা॥ শুক্রনীতিসার ৪।৫৯॥

(ট) সরসালঙ্কৃতাদুষ্টশব্দার্থং কাব্যমেব তৎ।
বিলক্ষণ-চমৎকারবীজং পদ্যাদিভেদতঃ॥ ঐ ৪।৬০॥

(ঠ) লোকসঙ্কেততোহর্থানাং সুগ্রহা বাক্ তু দৈশিকী॥ ঐ ৪।৬১॥

(ড) বিনা কৌশিকশাস্ত্রীয়সঙ্কেতৈঃ কার্য্যসাধিকা।
যথাকালোচিতা বাগ্‌ ব্যবসরোক্তিশ্চ সা স্মৃতা॥ ঐ ৪।৬২॥

(ঢ) ঈশ্বরঃ কারণং যত্রাদৃশ্যোঽস্তি জগতঃ সদা।
শ্রুতিস্মৃতী বিনা ধর্ম্মাধর্ম্মৌ স্তশ্চ যাবনম্।
শ্রুত্যাদিভিন্নো ধর্ম্মোঽস্তি যত্র তৎ যাবনং মতম্॥ ঐ ৪।৬৩॥

(ণ) কল্পিতশ্রুতমূলো বা মূলো লোকৈর্ধৃতঃ সদা।
দেশাদিধর্ম্মঃ স জ্ঞেয়ো দেশে দেশে কুলে কুলে॥ ৪।৬৪॥

ইতঃপূর্ব্বে বারাণসী বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ শাখার মাসিক অধিবেশনে (১৩২৮ জ্যৈষ্ঠ) উক্ত দর্শন সম্বন্ধে এক সুচিন্তিত প্রাঞ্জল প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং সেই প্রবন্ধের সমালোচনায় সভাপতি শ্রীযুত ফণিভূষণ অধিকারী এম, এ মহাশয় যে সকল সার কথা বলেন, তাহাতে নাস্তিক ও বৌদ্ধমতের অনেক তাৎপর্য্যকথা পরিস্ফুট হইয়াছিল। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যও স্বীকার করিয়াছেন যে, বৃহস্পতির মত নিরীশ্বর হইলেও যুক্তিতে হীন নহে; বরং সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে সংস্থাপিত। যাবন মত যবনমুনি দ্বারা প্রবর্ত্তিত কিংবা যবন জাতির মধ্যে পরিপুষ্ট। আজকালকার য়ুরোপীয় Agnosticএর দলও এই মতাবলম্বী। (৩০) 'অবসরোক্তি' কি, তাহা ভাল বুঝিতে পারা যায় নাই; তবে ইহা নিঃসন্দেহ বলিতে পারা যায় যে, ইহা যখন বেদ ও দর্শনাদির সমকক্ষ কোন বিদ্যা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তখন নিতান্ত হেয় নহে। যে সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা দুর্ব্বোধ্য বলিয়া মনে হয়; কিংবা এ কালে তদনুরূপ কিছু না থাকায় বুঝিতে গোল হইতেছে। দেশাদিধর্ম্ম কুলাচার ও জনাচার প্রভৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত। রাজনীতির দেশাচার ও কুলধর্ম্মের অনুশীলন একটা মস্ত কাষ। আজকালকার আইন-আদালতেও কুলক্রমাগত পদ্ধতির উপর নির্ভর করিয়া অনেক বিচারনিষ্পত্তি হইয়া থাকে। একটা কথা এই যে, শুক্রাচার্য্যের নীতিসারসংগ্রহে উপনিষদের নাম আদৌ নাই। বোধ হয়, উহা চারি বেদের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত হয় নাই।

"বিদ্যা" ও "কলা" (science and art) এই দুই ভাগে যদি সমস্ত বিদ্যার ভাগ করিয়া প্রধানগুলিকে বিদ্যার মধ্যে এবং অপেক্ষাকৃত অপ্রধানগুলিকে কলার মধ্যে স্থান দেওয়া যায়, তবে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, তৎকালে মঠাদিতে এই ৩২টি বিদ্যার অধ্যাপনা হইত; বর্ত্তমান কালের এক একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এতদপেক্ষা কিছু অধিক হয় বলিয়া মনে হয় না। আর শুক্রনীতির সংজ্ঞানুসারে 'কলা'গুলি কলিকাতার মূকবধির-বিদ্যালয়ের পাঠ্যজাতীয় বলিয়া মনে হয়। যাহা বাক্য দ্বারা সম্পাদ্য, তাহাই 'বিদ্যা'; আর যাহা বাক্য ব্যতীতও শিক্ষা করিতে পারা যায়, তাহাই 'কলা'—এই সংজ্ঞা অতি সুন্দর; অন্যত্র কোথায়ও আছে কি না, তাহা আমি জানিতে পারি নাই।

শুক্রনীতির ধৃত কলা ও বিদ্যাগুলির প্রসার দেখিলে মনে হয়, তখন এ দেশের কি এক অনির্ব্বচনীয় সুখময় শান্তিপূর্ণ দিন ছিল। যদি সপ্তম শতাব্দীর অল্প পূর্ব্বেই (ষষ্ঠ শতাব্দীতে) এই গ্রন্থ সংকলিত হইয়া থাকে, তবে বুঝা যায়, সেই কালটা মনোজগতের কি এক ভীষণ বিপ্লবকারী যুগ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারই ফলে এক দিকে এসিয়াতে ইসলামধর্ম্মের ও য়ুরোপের বর্ত্তমান সুখসমৃদ্ধির ভিত্তি স্থাপন করিয়া দিয়াছিল।

শুক্রনীতিকারের আর একটি পার্থক্য উল্লেখযোগ্য। 'কলাবিদ্যা' প্রবন্ধে আমি তাহা দেখাইতে পারি নাই; আমার জানা ছিল না।

শুক্রনীতি ভিন্ন অন্যত্র সকল গ্রন্থেই কলা শব্দে art and science এই দুই বুঝায়। পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমি তাহাই বলিয়াছি। কিন্তু শুক্রনীতির মতে art হয় ত কলা; আর science বিদ্যা।

শুক্রনীতিসারে দ্বাত্রিংশৎ (৩২) বিদ্যার এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক উল্লেখ করা হইয়াছে এবং তদ্ভিন্ন কলাসমূহের নামও স্বতন্ত্র লিপিবদ্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু বিস্তারিত লক্ষণ কিছু বলা হয় নাই। শুক্রাচার্য্য বলেন, ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া দ্বারাই ভিন্ন ভিন্ন কলার সৃষ্টি হইয়াছে, অনুষ্ঠানভেদে কলারও জাতিভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

বারান্তরে শুক্রাচার্য্যকথিত চৌষট্টি (৬৪) কলার সমালোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বিদ্যাদিত্য।

বিয়োগ-ব্যথা

আমার প্রাণের বন্ধু সে যে
কৈশোরেরি বন্ধু-ভ্রাতা
প্রাণ যেন আজ তাহার তরে
কইছে কত মর্ম্মব্যথা।
অকালে হায় পড়ল ঝরে'
শুকিয়ে গেল কিসের তরে
আমার প্রাণের মাঝে যেন
কেমন করে—কেমন করে!

আজকে মনে পড়ছে যে তার
হাস্যমাখা বদনখানি
লেগেই ছিল সদাই যে গো
সুধায় ভরা মধুর বাণী—

বন্ধু সে যে আমার প্রাণের
আজকে ওরে তাহার তরে
আমার প্রাণের মাঝে যে হায়
কেমন করে—কেমন করে!

ফিরবে কি সে আর এ দেশে
আমার হৃদয়মাঝে পুন?
পাব কি গো আর তারে হায়
খুজে' পারের দেশে কোন?
পালিয়ে গেল হৃদয় ছিঁড়ে
তাই ত আজি তাহার তরে—
গুমরে ওঠে প্রাণের মাঝে
কেমন করে—কেমন করে!

শ্রীমতী বিদ্যুৎপ্রভা দেবী।

রাসায়নিক জল্পনা

তমসাচ্ছন্ন ঘোরা রজনী কাটিয়া গিয়াছে, ভোরের তারাটি পূর্ব্ব-গগন-ভালে জ্বল-জ্বল করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। নীলিম-আকাশে জ্যোৎস্না লাবণ্য-স্নান করিতেছে। মৃদু-পবনে দূরাগত মধুর-গীতি ভাসিয়া আসিতেছে। সুপ্ত-মানব তন্দ্রাবিজড়িত আঁখির পলকে বিশ্ব-স্পন্দনের অনুভূতি উপলব্ধি করিতেছে।

বসন্তের অবসানে আজি চরাচর বিশ্বে এবং মানব-প্রাণে নবীন স্পন্দন ছুটিয়াছে। আশা ও আকাঙ্ক্ষা দীর্ঘ প্রবাসের বিরহ-ব্যথাকে স্তব্ধ করিয়া মিলন-সুখের স্মৃতিকে আকুল করিয়া দিতেছে। বিশ্বের অণু-পরমাণুতে যেন কি নবীন আনন্দের হিল্লোল খেলিয়া যাইতেছে।

চির-নবীন এই বিশ্ব, সনাতন এই বিশ্ব-লীলা, অনাদি এই মানব, অসংখ্য এই জীবকুল, বিরাট ও মহান্ এই জগৎ। উর্দ্ধে, বহু উর্দ্ধে, বিস্তীর্ণ এই বায়ু-পরিধি, স্তরে স্তরে ক্ষীণ হইয়া বিলীন হইয়াছে মহা-শূন্যদেশে। সেই শূন্যরূপী মহার্ণব-মধ্যে নিমজ্জমানা এই আমাদের সজলা সফলা গিরি নদী-শোভিতা জলধিচুম্বিতা পরম আদরের ধরণী, অদৃশ্য সৌর-প্রেম-রজ্জু অবলম্বন করিয়া ভীমবেগে অনাদি-তীর্থে প্রদক্ষিণ করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে ষড়ঋতুর মোহিনী-মূর্ত্তি মানব-সমক্ষে আবির্ভূত হইয়া কখন ভয়ের, কখন বা প্রেমের তরঙ্গ সৃষ্টি করিতেছে।

উর্দ্ধে, আরও উর্দ্ধে নিশানাথ চন্দ্রমা নিজ-কক্ষে ছুটিতে ছুটিতে শুধুই যে ধরণীকে জ্যোৎস্নাপ্লাবিতা করিতেছেন, তাহা নহে, তাঁহার অদৃশ্য ও অমোঘ আকর্ষণের ফলে ঐ বিশাল বিপুল নীলসিন্ধুও উচ্ছ্বসিত হইয়া তট-সীমা অতিক্রান্ত করিতেছে।

উর্দ্ধে, অসীম উর্দ্ধে, মহাব্যোম-মাঝে একে একে দেখি— গ্রহ, উপগ্রহ যত অনাদিকাল হইতে নিজ নিজ কক্ষায় অসম্ভব বেগে আপন আপন নিয়তিকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। ইহাদের কেন্দ্ররূপী অতি বিপুলকায় অগ্নিময় মার্ত্তণ্ডদেব তদীয় সৌর-জগৎকে সঙ্গে লইয়া অনন্ত-পথের যাত্রী হইয়াছেন। কোথায় তাঁহার গন্তব্য স্থান, কখনও তাহা শেষ হইবে কি না, এই রহস্য আজিও উদ্‌ঘাটিত হয় নাই।

ঐ যে মেঘনির্ম্মুক্ত নীলগগন-পটে অগণিত তারকারাজি মৃদু রশ্মি-বিজড়িত অজ্ঞেয় বার্ত্তা প্রেরণ করিতেছে— বিজ্ঞান বলেন, তাহাদের মধ্যে কোন কোনটি সূর্য্যসদৃশ, অথবা তাহাপেক্ষা বৃহত্তর। তাহাদের দূরত্বের ধারণা করিতে গিয়া ভাষা স্তব্ধ হইয়া যায়। জবা-কুসুম-সঙ্কাশ ঐ তপনদেবের নিকট হইতে আলোক-রশ্মি প্রতি সেকেণ্ডে তিরানব্বই হাজার ক্রোশ বেগে ধাবিত হইয়াও ধরণীর পৃষ্ঠে আসিয়া পৌঁছিতে অন্যূন আট মিনিট সময় লাগে। আর আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী তারকা (Alpha Centauri) হইতে আলোকধারা আসিয়া পৌঁছিতে সাড়ে চারি বর্ষ সময় লাগে।

তাই আজ কাব্যনন্দিনী বিজ্ঞান-সুন্দরীর চরণে বার বার প্রণত হইয়া, ক্ষুদ্র আমি, বিশ্বের মধ্যে আদিহীন অন্তহীন পদার্থের (matter) রহস্য ভেদ করিবার দুরাকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিয়াছি। হে সুন্দরি! যদি তুমি শক্তি-সঞ্চার কর, তবে হয় ত কিয়ৎপরিমাণে সিদ্ধিলাভ করিতে পারি। যাহা শুনাইতে চাই, তাহা অতি প্রাচীনকাল হইতে বিবুধগণের অমূল্য গবেষণার ফলে যে সকল মতবাদের ক্রমবিকাশ হইয়াছে, তাহারই একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতল সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত এই বস্তু (matter) কোথা হইতে আসিল, কিরূপে বা গঠিত হইল? সমগ্র বিশ্বের আধারস্বরূপ এই শূন্য কি পদার্থ? গ্রহ, তারা, উপগ্রহ-সকল কি কি পদার্থে সৃষ্ট? এই পদার্থ নশ্বর অথবা অবিনশ্বর? ইহার ক্ষয় অথবা বৃদ্ধি হয় কি না? এই সুন্দরী ধরণী চিরদিন এইরূপ ছিল, অথবা থাকিবে?

পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, [illegible] "শূন্যদেশ" (space)

আচ্ছন্ন করিয়া আছে Ether (ব্যোম?) নামক এক আধার (medium)। অধ্যাপক Osborne Reynolds বলেন যে, এক ইঞ্চ পরিমিত স্থানের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগে পঞ্চাশ কোটি অতি ক্ষুদ্র বালুকণার ন্যায় Ether-grains পাশাপাশি থাকে এবং যদিও তাহারা অত্যন্ত ঘনীভূতভাবে থাকে, তথাপি তাহারা নিশ্চল নহে। উক্ত আধারের (medium) প্রত্যেক বর্গ-ইঞ্চির উপর প্রায় ১৭ লক্ষ মণ ওজনের চাপ বা নোদন (pressure) আছে। যেখানে এই Ether-স্তূপের স্বাভাবিক পরিমাণের (অথবা সংখ্যায়) ন্যূনতা, সেইখানে ফাঁক gaps or cracks দেখা দেয় এবং "matter consists of these cracks or gaps in space, and these empty cracks are flitting to and for like silent ghosts through the vast stagnant sea of Ether".

অর্থাৎ ঐ ন্যূনতা বশতঃ যে ফাঁক দেখা দেয়, তাহা হইতেই বস্তুর (matter) উৎপত্তি হয়। কাহার কাহার মতে এই ব্যোমরূপী মহার্ণবে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবর্ত্ত (whirlpool) হইতে matterর উৎপত্তি হয়।—সুতরাং এইরূপ মতের যাঁহারা পোষকতা করেন, তাঁহাদের কথায় মনে করা যাইতে পারে যে, বহু যুগের শেষে যখন গতি (Velocity) কমিয়া আসে, তখন ঐ আবর্ত্তগুলির তিরোভাব হইবার সম্ভাবনা থাকে এবং matter পুনরায় Etherএ পরিণত হয়। (Vide, "The Evolution of Matter" by Dr. Gustave Le Bon)। এ ধারণা সত্য হইলে জগৎ ধ্বংসপথে চলিয়াছে বুঝিতে হইবে, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ইহার exprimental proof কিছুই নাই।

Larmorএর মতে Ether-সমুদ্রে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবর্ত্ত (eddies) হয়, তাহা হইতেই মূল-পদার্থ (elements)-গুলির আদি-বস্তু electron সৃষ্ট হয়। প্রত্যেক chemical atom বা পরমাণু electronগুলির সমবায়ে উৎপন্ন। রসায়ন-শাস্ত্রে ৮০।৯০টি মূলপদার্থের (elements) বর্ণনা পাওয়া যায় এবং যাহা কিছু বস্তু (matter) নামধেয়, তাহা উক্ত মূলপদার্থগুলির সংযোগে সৃষ্ট। অবশ্য গ্রহ, উপগ্রহ অথবা তারকানিচয়ে সর্ব্ব[illegible] পরিমাণে উক্ত মূলপদার্থগুলি পাওয়া যায় [illegible] দেখাইল যে, স্থানবিশেষে মূলপদার্থগুলির ন্যূনাধিক্য-হেতু বিশেষ বিশেষ ফলের অনুমান করা হইয়াছে।

উক্ত electron বা corpuscleগুলি তড়িৎপূর্ণ (charged) বলিয়া যোগসংজ্ঞক (positive) এবং বিয়োগসংজ্ঞক (negative)। যোগসংজ্ঞক electronগুলির আপেক্ষিক গুরুত্ব (mass) বিয়োগসংজ্ঞক electron অপেক্ষা ১ হাজার ৮ শত ৪০ গুণ। এক ইঞ্চির দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগে দুই কোটিরও অধিক electron বাস করিতে পারে।

পদার্থমাত্রেরই একটা বিশিষ্ট গুণ mass বা বস্তু-সংহতি। কিন্তু Kaufmann পরীক্ষা দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, ঐ mass সসীম হইতে অসীমে (infinite) পৌঁছিতে পারে, যদি কোন বস্তু প্রতি সেকেণ্ডে ৯৩ হাজার ক্রোশ বেগে ধাবিত হয়। বস্তুতঃ কোন পদার্থই ঐরূপ গতিশীল হয় না; এমন কি, উক্ত গতির এক দশমাংশ গতিশীল কোন পদার্থের massএর তারতম্য বুঝিতে পারা যায় না।

সৃষ্টির প্রাক্কালে যখন মানবের অস্তিত্ব ছিল না, যখন পার্থিব কোন পদার্থ সৃষ্ট হয় নাই, এমন কি, যখন সূর্য্যেরও আবির্ভাব হয় নাই, তখন সমগ্র "দেশ" (space) এক বৈদ্যুতিক কুহেলিকায়(Vast sea of electrical vapour) সমাচ্ছন্ন ছিল। ঐ বাষ্পময় পদার্থ (electrical atoms) বৈদ্যুতিক পরমাণুপুঞ্জের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল, যেহেতু, matter-atoms বা বস্তু-পরমাণুর অস্তিত্ব তৎকালে একবারে অসম্ভব ছিল। অনন্ত শূন্যদেশের নিরবচ্ছিন্ন আধার ভেদ করিয়া এই তড়িৎশালিনী বহু-যোজন-বিস্তীর্ণা কুহেলিকা যেন এক বিশাল অগ্নিময় তরবারির ন্যায় প্রতীয়মান হইত। এই কুহেলিকা অনন্ত শক্তির (Titanic energy) আধার ছিল এবং মহাকবি টেনিসনের ভাষায় যেরূপে গ্রহ, উপগ্রহ এবং elements এই পদার্থ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল:—

"From this great deep, before our world
begins,
Where all that was to be in all that was,
Whirl'd for a million aeons thro the vast
Waste dawn of multitudinous eddying
light".

পাছে কেহ মনে করেন যে,ইহা কবিকল্পনামাত্র,এই জন্ম এ স্থলে Sir. T. T. Thomsonএর মতবাদ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"The vapour was composed of particles both positively and negatively electrified. These attracted each other with very great forces, but the tremendous speed of their motion parted them even as they flashed by each other. Gradually the particles radiated away energy in the form of light and heat, and as a result, their motion became less and less swift until occasionally permanent connections were formed between them, and the first step in granulation took place. Thus the matter-atoms were formed as the price of the gleaming electrical light which the nebula sent forth ceaselessly. These first atoms consisted of only a few electrons grouped together, and were consequently much lighter than any elementary atoms now found upon the earth, the lightest of which consist of many thousands of electrons grouped together. Slowly during ages, this aggregation of electrons continued, the atoms gradually growing and becoming more and more complex, until finally they consisted of aggregations of over a thousand electrons and formed the atoms of the element hydrogen; the lightest atom known to us upon the earth is thus the **end-product of a vast epoch** of evolution. Before hydrogen there came a whole series of lighter elements, which have long since vanishd from our earth, having condensed into heavier elements. All matter still continued passing in a stupendous scheme of slow continuous evolution from the lighter to the heavier forms. Astronomers say upper regions of the sun's vast atmosphere such light elements (unknown to us) still gleam and glow. Many nebulæ, indeed, are entirely composed of them. Even now we often find nebulæ and some very hot stars almost entirely composed of hydrogen. **But hydrogen did not remain long the only element in existence;** the gradual accretion on electrical particles soon caused it to change into other and heavier elements. Elements like Magnesium, calcium, iron, carbon made their appearance and at the same time the quantity of hydrogen diminished. Thus there was a practically continuous increase of atomic mass from the lightest to the heaviest known atom."

পূর্ব্বোক্ত উদ্ধৃত অংশ হইতে এই সার কথা পাওয়া যায় :—

(১) তড়িৎপূর্ণ কুহেলিকায় যোগসংজ্ঞক ও বিয়োগ-সংজ্ঞক অণুগুলি পরস্পর আকৃষ্ট হইলেও প্রচণ্ড গতিশীলতা বশতঃ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইত।

(২) পরে আলোক ও তাপ বিকীর্ণ করিয়া তাহাদের শক্তির অপচয় ঘটিলে, যখন গতি মন্দীভূত হইয়া যাইত, তখনই matter atoms বা বস্তু-পরমাণুর গঠনপ্রক্রিয়া আরম্ভ হইত।

(৩) প্রথমে গুটিকতক electron লইয়া অতি লঘুতর matter-atom ঘটিত হইয়াছিল, কিন্তু কালে কালে তাহা ঘনীভূত হওয়ায় (by a process of condensation) সর্ব্বাগ্রে এক হাজার electronএর সমবায়ে hydrogen atom (উদজ পরমাণু) সৃষ্ট হয়।

(৪) নীহারিকা ও তারকা-নিচয়ে এবং সৌর-বাষ্পস্তরে হালকা matter-atomর অস্তিত্ব এখনও পাওয়া যায়, কিন্তু এখন ক্রমশঃ তাহাদের অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে।

(৫) পরিশেষে উদজ-পরমাণুও পূর্ব্ববৎ নিয়মে বৃহত্তর পরমাণুতে পরিণত হইয়া magnesium. calcium, অঙ্গার ও লৌহাদি পদার্থের পরমাণু হইয়াছে।

উক্ত মতের একটু ত্রুটি আছে, কারণ, এই গঠনপ্রক্রিয়ায় (+) electronর অস্তিত্ব উপেক্ষিত হইয়াছে এবং প্রায় massবিহীন (—) eletron কর্ত্তৃক বস্তু-পরমাণুর গঠন-প্রণালী ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ফলে এক একটি বস্তু-পরমাণু সহস্র সহস্র electron দ্বারা নির্ম্মিত অনুমান করা হইয়াছে। কিন্তু Rutherford এবং Moseley প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বস্তু-পরমাণু (atom) কর্ত্তৃক alpha particles এবং X-rays বিকিরণ-সম্পর্কে এইটুকু জানিতে পারিয়াছেন যে, atomএর ওজনের অর্দ্ধেকের বেশী (—) electronএর সংখ্যা হইতে পারে না। উক্ত মতে—

"The uncharged Hydrogen atom **consists** of a single negative electron of [**charge** (-) e] and a positive nucleus (charge e), the mass of which is about 1840 times **that** of the negative electron. **The Helium** atom (uncharged) consists of only **two** negative electrons and a positive **nucleus** (charge 2e). **The positive** nucleus **carries** the bulk of the **"mass"**, as for **instance**, the mass of **Helium** atom **is about** 7300 times that of a **negative electron. The dimensions of the positive nucleus are also**

extremely small compared to the space occupied by the atom.

"The nucleus of each heavy atom is now considered to be composed of hydrogen nuclei closely packed together with negative electrons.

"The resultant nuclear charge of an atom is equal to its atomic number and varies from 1 "atom" of electricity in the case of hydrogen to 92 atoms in the case of Uranium.

"In the atomic model of Bohr, the negative electrons move in orbits round the central positive nucleus, much as planets move around the sun.

"The weight of the atom of a given element depends mainly on the number of hydrogen nuclei it contains: in other words, it is now believed that all the atoms of our so-called "elements" **are built up of hydrogen atoms** or rather of hydrogen nuclei.

উপরের উদ্ধৃতাংশ হইতে এই সার কথাটুকু পাওয়া যায় :—

(১) ভারী পরমাণুর কেন্দ্রস্থলে Hydrogen nuclei বর্ত্তমান এবং অনেকগুলি বিয়োগসংজ্ঞক electron দ্বারা উক্ত nuclei বেষ্টিত। সূর্য্যকে কেন্দ্রস্থলে রাখিয়া যেমন গ্রহগণ নিজ নিজ কক্ষায় ভ্রমণশীল হয়, ঠিক তদ্রূপ কেন্দ্রবর্ত্তী যোগসংজ্ঞক nucleus লইয়া নিজ নিজ কক্ষায় বিয়োগসংজ্ঞক electronগুলি ভীমবেগে ঘুরিতেছে। ইহাদের বৈদ্যুতিক charge সম্বন্ধেও একটা সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে (*vide* above)।

(২) Hydrogen atoms বা nucleiর সংখ্যা সমবায়ে ভিন্ন ভিন্ন মূল পদার্থের পরমাণু অনুমিত হইয়াছে। এই কথাটি আর একটু বিশদভাবে বলা আবশ্যক পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পদার্থের উৎপত্তিসম্বন্ধে প্রধানতঃ দুইটি মতভেদ দেখা যায়। এই মতে positive atoms of electricity বা protonকে পদার্থের আদি কারণ (primordial) স্বীকার করা হইয়াছে, এবং উক্ত protonগুলিকে কেন্দ্রে রাখিয়া electronগুলি ক্রমশঃ ঘনীভূত হইতেছে।

"The electrons are supposed to condense about the atoms of these "protons" in the form of concentric ring of varying sizes, whose particles are in exceedingly rapid motion". (A.C. and A.E. Jessup. Phil. Mag. 1908 Jany.)

অন্য মতে Hydrogen সর্ব্বাপেক্ষা simple মূল-পদার্থ, কারণ, একটি proton (ওজন = ১) এবং একটি electron ইহার সঙ্গে ঘুরিতেছে। এই electronটি খসিয়া পড়িলে Hydrogen *ion* গঠিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ Fluorine nucleusএ ১৯টি proton এবং ১০টি electron আছে (এবং ১৯-১০ = ৯টি planetary electron)। তজ্জন্য Fluorineর পরমাণুর ওজন (atomic weight) = ১৯ এবং পরমাণুর শ্রেণীগত সংখ্যা (Atomic number) = ৯।

১৮১৬ খৃষ্টাব্দে Prout অনুমান করিয়াছিলেন যে, Hydrogen সকল পদার্থের আদি কারণ এবং সকল পদার্থের পরমাণুগুলি Hydrogen বা উদজ পরমাণুর দুই, তিন, চারি ইত্যাদি গুণ। বস্তুতঃ (o = ১৬) অধিকাংশ পরমাণুর ওজনের গুরুত্বসংখ্যা (Atomic weight) ভগ্নাংশ-বিহীন। বর্ত্তমান যুগে আবার Proutএর মত বিভিন্ন আকারে স্বীকার করা হইতেছে।

এতক্ষণ বস্তু-পরমাণু সম্বন্ধে আধুনিক মতবাদ সকলের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিলাম। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে (১৮০৪) John Dalton যে পরমাণুবাদ (Atomic Theory) প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা এত দিন রসায়নিক শাস্ত্রের মেরুদণ্ডস্বরূপ ছিল। Daltonএর পরমাণু অবিভাজ্য (indivisible) এবং দুই বা ততোধিক ভিন্ন ভিন্ন পরমাণু সংযোগে Molecule বা অণুর উদ্ভব স্বীকৃত হইয়াছিল। এই রাসায়নিক সংযোগ বা বিয়োগের মধ্যে একটা শৃঙ্খলা দৃষ্ট হয়, সেই জন্য Dalton's Law of Constant proportions and Law of Multiple proportions এই শাস্ত্রের সর্ব্বজনসমাদৃত facts. অণু এবং পরমাণু সম্বন্ধে যে প্রভেদ দৃষ্ট হয়, Dalton তাহা পরিষ্কাররূপে ব্যাখ্যা করেন নাই। তাঁহার ত্রুটিটুকু এক জন ইতালীবাসী পণ্ডিত Avogadro (১৮১১) সংশোধন করিয়া Molecule (বা অণু)র স্বরূপ প্রচার করিলেন। তদ্দারা যে সকল জ্ঞানবৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা প্রত্যেক রসায়নবিৎ ব্যক্তির জানা আছে। সম্ভবতঃ Daltonএর মতবাদ নিজস্ব বস্তু নহে, কারণ, রোমদেশীয় Titus Lucretius Carus (98-54 B. C.) এইরূপ মত প্রচার করেন যে, "বস্তু-পরমাণুগুলি ভিন্ন ভিন্ন আকারের এবং ভিন্ন ভিন্ন আয়তনবিশিষ্ট; তাহারা অনাদিকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী এবং ক্ষয়শীল নহে (eternal and indestructible)। তাহারা অতি ক্ষুদ্র,

চক্ষুর অগোচর এবং অতি বেগশালী (swift in motion)।"

এক্ষণে ইতিহাসের সাক্ষ্য হইতে জানা গিয়াছে যে, Lucretius যে মতবাদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন, অন্ততঃ তাহার তিন শতাব্দী পূর্ব্বে গ্রীক দার্শনিক Democritus ঐরূপ পরমাণুবাদ (Atomic Theory) স্বীকার করিয়াছিলেন এবং সূর্য্যের অতি বিশাল আয়তনের কথা, ছায়াপথ (Milky way) বহু সূর্য্য লইয়া গঠিত এবং এই বিপুল বিশ্বে বহু জগৎ আছে, এবংবিধ মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

এতৎসম্বন্ধে ভারতীয় ঋষিগণের কি বলিবার কিছুই ছিল না? এই প্রশ্নের উত্তরে দুইটি প্রাচীন ঋষির নাম উল্লেখযোগ্য। মহামুনি কপিল বলিয়া গিয়াছেন যে, "নাবস্তুনো বস্তুসিদ্ধিঃ" অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী কোন বস্তুর অস্তিত্ব না থাকিলে স্বতঃ কোন বস্তুর উৎপত্তি সম্ভবে না। গীতায় এই মতের অনুসরণ করিয়া বলা হইয়াছে—"নাসতো বিদ্যতে ভাবো" ইত্যাদি। পরমাণু সম্বন্ধে আলোচনা বহু প্রাচীনকাল হইতেই ভারতে চলিয়া আসিতেছে। (Vide Dr, Brajendra Nath Seal's "The Positive Sciences of the Hindus")

পুনশ্চ মহর্ষি কণাদ বলিয়াছেন, "জড়পদার্থের পরমাণুমাত্রই নিত্য, পদার্থ অনশ্বর এবং পরমাণুসমষ্টি দ্বারা গঠিত এবং পরমাণুসমূহের সংযোগে এই বিশ্বসংসার উৎপন্ন হইয়াছে।" কণাদের মতে দুই পার্থিব পরমাণুর সংযোগে এক দ্ব্যণুক এবং তিন দ্ব্যণুকযোগে এক এক ত্রস রেণুর উৎপত্তি হয়। "এইরূপে উত্তরোত্তর স্থূলতর অবয়ব উৎপন্ন হইয়া অবশেষে সমুদয় পদার্থ গঠিত হয়।"

এক্ষণে এই মতবাদের সহিত আধুনিক নিম্নলিখিত কয় ছত্র মিলাইয়া দেখুন, সাদৃশ্য কতটা আছে।

"The atoms of all elements are built up of primordial atoms grouped together in various numbers". (T. Martin Lowry's Inorganic Chemistry ch. xxxi).

পূর্ব্বাপর পরমাণু সম্বন্ধে মতবাদের আলোচনা করিয়া আপাততঃ এই ধারণা জন্মিতেছে যে, Daltonএর সুপ্রসিদ্ধ Atomic Theory আর ঠিক সত্য বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না। মূল পদার্থ পরমাণুসমবায়ে সৃষ্ট, ইহা ঠিক কথা। পরমাণু অতি সূক্ষ্মতম পদার্থ, তাহাও সত্য, কিন্তু অবিভাজ্য (indivisible) অব্যয় (incapable of transmutation) এবং অনশ্বর (indestructible), এ কথা নিশ্চয় বলা যায় না। যেহেতু, Radium প্রভৃতি পদার্থের প্রকৃতি ও Isobaresএর উৎপত্তি, এবং Chlorine, Neon প্রভৃতি পরমাণুর Isotopes প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মতপরিবর্ত্তন হইয়াছে। ইহা ছাড়া হাল্‌কা পরমাণু হইতে ভারী পরমাণুর গঠন-সম্পর্কে পূর্ব্বে যে সকল কথা বলা হইয়াছে, তাহাও প্রণিধানযোগ্য। এই সম্বন্ধে নিম্নোক্ত উক্তি বিশেষ প্রয়োজনীয় :—

"This slow, continuous transmutation of the elements, working for many ages, has produced stupendous effects upon the earth. The majority of light elements have already disappeared from it, the bulk of the interior being composed of heavy elements. Only on the surface there still lingers a thin skin of light elements, such as oxygen, nitrogen, carbon, hydrogen, silicon,—elements composing the bulk of the air, water, living matter and rocks. If in the course of ages, the light elements become converted entirely into heavy ones, which are usually metallic, the whole earth will become a vast metallic ball having the same composition as one of the iron meteorites. The green fields and the rich soft earth which now clothe our planet will vanish and in their place will stretch a vast, hard, metallic desert, lifeless, wasteless, airless, whirling silently in space towards an unknown destination". (Geoffrey Martin, Modern Chemistry, page 46)

যাঁহারা জিজ্ঞাসু, তাঁহারা Sir Norman Lockyer's Inorganic Evolution (1900), Recent developments of Physical Science by Whethom এবং Soddyর The interpretation of Radium নামক চমকপ্রদ গ্রন্থগুলি পাঠ করিতে পারেন।

আধুনিক পরমাণুবাদের সহিত Astronomyর বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্বের একটা সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এক একটি atom যেন এক একটি সৌরজগৎ, তন্মধ্যে proton বা positive nuclei সূর্য্যের ন্যায় কেন্দ্রস্থলে স্থিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন কক্ষায় তীব্রবেগে ভ্রমণশীল electron

গুলিকে লইয়া অনাদি-রাসলীলা করিতেছে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, (chemical-atoms) পদার্থ-পরমাণুগুলি অতি সূক্ষ্ম ultra-atomic বাষ্প (gas) হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। যে ভাবে জলকণাগুলি ইন্দ্রিয়ের অগোচর জলীয় বাষ্প হইতে উৎপন্ন হয়, আবার তাহাতেই বিলীন হইতে পারে (তাপসংযোগে), ঠিক ঐরূপ ভাবেই পরমাণুর উৎপত্তি ও লয় ঘটিয়া থাকে। পুনশ্চ, ভ্রাম্যমাণ কোন খচরের গতির বেগ যদি মন্দীভূত হইয়া আইসে, তৎক্ষণাৎ তাহা কেন্দ্রগত সূর্য্যাভিমুখে ধাবিত হয় এবং সেই সৌরজগতের ধ্বংস সাধিত হয়। ঠিক ঐরূপে ঘূর্ণায়মান electronগুলির গতি মন্দ হইয়া আসিলে অর্থাৎ critical value অপেক্ষা কমিয়া যাইলে, atomএর সৌর-জগৎও তৎক্ষণাৎ ছিন্নভিন্ন হইয়া লুপ্ত হইয়া যায় এবং পরমাণুর কণাগুলি সেকেণ্ডে লক্ষ মাইল বেগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়। অবশিষ্ট corpuscleগুলি ঘুরিতে ঘুরিতে আবার নূতন পদার্থের রচনা করে। পুনরায় শক্তির অপচয়ে আবার ধ্বংসক্রিয়া ঘটে এবং আরও কতকগুলি electron হারাইয়া অন্য আর একটি নূতন পদার্থের জন্ম হয়। Radium প্রভৃতি পদার্থের মধ্যে এই ধ্বংসলীলা বিশেষরূপে লক্ষিত হইয়াছে এবং Radiumর শেষ পরিণাম Helium পাওয়া গিয়াছে। Thomsonএর মতে সাড়ে ১৫ গ্রেণ মাত্র উদজ-(Hydrogen) পরমাণুমধ্যে যে শক্তি নিহিত আছে, তদ্দ্বারা আড়াই কোটি মণ ওজনের বস্তুকে এক শত গজের উর্দ্ধে উত্তোলন করিতে সমর্থ। সুতরাং পরমাণুর মধ্যে যে অন্তর্নিহিত শক্তি আছে, কিরূপে তাহা কাযে লাগাইতে পারা যায়, বর্ত্তমান যুগের রসায়নশাস্ত্রের তাহাই একটা প্রতিপাদ্য বিষয়।

Radium আবিষ্কারের পূর্ব্বে Astronomerগণ অনুমান করিয়াছিলেন যে, বিশ্বজনীন মাধ্যাকর্ষণফলে ধীরে ধীরে পদার্থ-নিচয় আকৃষ্ট হইয়া এক মহা-স্তূপে পরিণত হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। অনন্তকাল ব্যাপিয়া বিরাট সূর্য্য-সম নক্ষত্রগুলি হইতে আলোক ও তাপ নির্গত হইয়া যাওয়ায় বিশালকায় উক্ত সূর্য্যগুলি ক্রমশঃ শীতল হইয়া মরণপথে ধাবিত হইবে, ইহাই তাঁহাদের আশঙ্কা ছিল। কিন্তু এখন সে আশঙ্কা অমূলক বলিয়া মনে হইতেছে। যেহেতু, "The rate of formation and the rate of disintegration (of matter) in the long run balance each other." এবং "the amount of energy set free by the decomposition of these atomic systems is incredibly vast."

ইহা ছাড়া আর একটু নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার হইয়াছে। তেজোময় বিশালকায় সূর্য্যগুলি হইতে বহুদূরে প্রক্ষিপ্ত ধূলি-কণাগুলির (light particles) উপর radiant light and heat (আলোক ও তেজঃশক্তি) নোদন বা চাপ (pressure) প্রয়োগ করিয়া মহাশূন্যগর্ভে তাহাদিগকে তাড়াইয়া (repel) দেয়। যুগযুগান্তের প্রক্রিয়াফলে ঐ ধূলিকণাগুলি জমা হইয়া মহাশূন্যগর্ভে বহুযোজনব্যাপী (nebulae) নীহারিকার সৃষ্টি করে এবং এই নীহারিকা হইতেই নব নব জগৎ ও নবীন তপনের সৃষ্টি হইতে থাকে। সুতরাং অনাদিকাল হইতে বিশাল সূর্য্য সদৃশ তেজোময় গোলক সকল হইতে যে অজস্র তাপ ও আলোকধারা নির্গত হইয়া তাহাদের শক্তির অপচয়সাধন করিতেছিল, সেই radiant heat and lightই আবার নব নব সৃষ্টির সহায়ক হইয়া উঠে। মহাপ্রকৃতির সৃষ্টি ও ধ্বংসলীলার বিপুল-রহস্য ভেদ করা সামান্য মানবের পক্ষে অসম্ভব, যেহেতু, তেজোহীন, অন্ধকারময় উক্ত সূর্য্যগুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট ক্ষিপ্তের ন্যায় প্রচণ্ডবেগে কোন কোন নব-সৃষ্ট মহামণ্ডলের সহিত সংঘর্ষণফলে পুনরায় নীহারিকার সৃষ্টি করে। এই জন্যই "বিশ্বেশ্বরী ত্বং পরিপাসি বিশ্বং বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বং" এবম্প্রকারের স্তুতি স্বতঃই বিস্ময়বিহ্বল ও ভক্তিবিনম্র মানবের কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইতে থাকে।

উপসংহারে Zsigmondy ultramicroscope নামক অণুবীক্ষণযন্ত্রযোগে জলের ভিতর অতি সামান্য পরিমাণে রৌপ্য ও স্বর্ণরেণু ভাসাইয়া (molecule) অণুগুলির নর্ত্তনলীলার যে অপূর্ব্ব পরিচয় পাইয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন :—

"One would never guess what a wonderfully beautiful play of colours is given out by this ordinary looking liquid, when viewed through ultra-microscope. Blue, violet, green and red particles, in different shades and with a rare brilliancy of colour are seen in ceaseless movement. One particle approaches the other, circles round it in a rapid zig-zag movement, and then flies off again. Sometimes several particles group together and dance like flies in the sun-shine especially when for a fraction

of a second, one particle comes near another.

এই গতিশীলতার ফল কিরূপ, তাহা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না, তাহার কারণ, বায়ুমণ্ডলের মধ্যস্থিত সকল বস্তুর উপরে ও নীচে, পার্শ্বে ও পশ্চাতে এবং সম্মুখে সর্ব্বত্র সমান নোদন বা চাপ (pressure) আছে। অথচ যদি এই বায়ুকণাগুলি নিশ্চল হইত, তাহা হইলে অকস্মাৎ আমাদের শিরাগুলি স্ফীতিবশতঃ ফাটিয়া যাইত এবং প্রাণ-বায়ু দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া যাইত। পুনশ্চ, এই বায়ুকণাগুলি শুধু যদি এক দিকেই ধাবমান হইত, তাহা হইলে বায়ুপ্রবাহের গতি ঘণ্টায় ১ শত ২ মাইল হইত এবং বিস্ফোরক বারুদের ন্যায় তাহার অভিঘাতের (impact) ফলে আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্নভিন্ন ও দেহযষ্টি চূর্ণীকৃত হইয়া যাইত। পরমাণুর (atom) মধ্যে যে corpuscleগুলির কথা বলিয়াছি, পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, তাহারা প্রতি সেকেণ্ডে হাজার মাইল বেগে নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট কক্ষায় ঘূর্ণায়মান হইতেছে। ইহা কবি-কল্পনাবিজৃম্ভিত নহে, বিজ্ঞান-সুন্দরীর কঠোর গবেষণার ফল। স্থাবর-জঙ্গম বিশ্বচরাচরে যাহা কিছু দেখা যায় ও আমাদের নিকট নিশ্চল বলিয়া প্রতীতি হয়, বিজ্ঞানের চক্ষুতে দেখিলে তাহাদের অন্তর্নিহিত অণুপরমাণুসমূহ অচিন্তনীয় বেগে আন্দোলিত বলিয়া ধারণা হইবে। বিশ্বকবিগণ যদি বুঝিতেন যে, স্বচ্ছ অচঞ্চল সরোবরের সলিলরাশির অন্তর্নিহিত গূঢ় অবস্থা আর প্রচণ্ড ঝটিকাবর্ত্তের (tornado) উৎক্ষিপ্ত নীলাম্বুরাশির বিকট-মূর্ত্তি তরঙ্গমালার অবস্থা একই প্রকার, তাহা হইলে তাঁহাদের কাব্যসুন্দরী-গণের পেলব দেহ-যষ্টির সলিলে অবতরণচিত্র নিম্নলিখিত-রূপ না হইয়া অন্য প্রকার হইত :—

(১)

"যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ এস ও গো এস
মোর হৃদয়-নীরে।
তল-তল ছল-ছল কাঁদিবে গভীর জল
ওই দুটি সুকোমল চরণ ঘিরে॥

(২)

আজি বর্ষা গাঢ়তম নিবিড়-কুন্তল-সম
মেঘ নামিয়াছে মম দুইটি তীরে।
ওই যে শবদ চিনি নূপুর রিণিকি ঝিনি
কে গো তুমি একাকিনী আসিছ ধীরে॥"

যাহাকে চলিত কথায় জড়পদার্থ বলা হয়, তাহার স্বরূপ বর্ণনার চেষ্টা করিলাম। সঙ্গে সঙ্গে অণুপরমাণু লইয়া নাড়াচাড়া করা গেল। অনেক কথা আরও বলিবার ছিল, সেগুলি সহজবোধ্য নহে, এবং অত্যন্ত technical বলিয়া এই প্রবন্ধে পরিত্যাগ করিয়াছি। যদি রসায়নের রহস্যপুরী সাধারণ পাঠকপাঠিকার নিকট রুচিকর বোধ হয়, তবে ক্ষিতি, অপ্, তেজ প্রভৃতি ভূতের স্বরূপরহস্য বারান্তরে বুঝিবার চেষ্টা করিব।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ (অধ্যাপক)।

পাপিয়া

কে তুমি বিজন বনে নিশীথ নিবিড় মাঝে
গাহিতেছ সকরুণ গান!
মরমে পশিয়া মোর ঝঙ্কারিয়া ওঠে আজি
যৌবনের তাপিত পরাণ।
মনে পড়ে কত কথা ব্যথিতের মর্ম্মব্যথা,
ভগ্নপ্রাণ করে হাহাকার,
দোসর হারায়ে এবে, মরমের সিন্ধুনীরে
জাগিতেছে মুখখানি তাঁর!

জন্ম-মৃত্যু প্রহেলিকা মরুভূমে মরীচিকা,—
জীবনের অহমিকা ভুল!
অনন্ত লহরী বুকে চিন্তা পারাবার এ যে,
কোন দিকে নাহি তার কূল।
পল্লীর শ্যামল কোলে কে তুমি মধুর বোলে
দিবানিশি শুনাও আমায়,
নন্দনের বার্ত্তাবহ এ ধরার জীব নহ
মন তব পিছু পিছু ধায়।

পাপিয়া দেবী।

ত্রিবেণী

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

সে দিন রাজসভায় জনসভার নেতৃবৃন্দের প্রস্থানের পরক্ষণেই রামপালের আকস্মিক আগমন ও নিজেকে মুক্তকণ্ঠে রাজদ্রোহী বলিয়া প্রচার এবং রাজা তাঁহাকে রাজদ্রোহ অপরাধে বন্দী করিবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেই মগধ হইতে সদ্যঃ সমাগত মহাসামন্তোপাধিক দ্বিতীয় মহাকুমার শূরপাল কর্ত্তৃক তাঁহাকে রাজসভা হইতে যথেচ্ছভাবে সরাইয়া লইয়া যাওয়া, এই সকল ঘটনাপরম্পরার দ্বারা মহারাজাধিরাজকে একান্তই বিচলিতচিত্ত করিয়া তুলিয়াছিল। এই দুই বৈমাত্র ভ্রাতার দ্বারা যে এক দিন তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত ও পর্য্যুদস্ত করা সম্ভব, এ আশঙ্কা তাঁহার চিত্তে আজিকার আশ্রিত নহে; তাঁহার সেই সুদূর শৈশবেই তাঁহার জননী ও তাঁহার পারিপার্শ্বিকবৃন্দ সকলেই এ আশঙ্কার আভাস তাঁহার শিশুচিত্তকে প্রদান করিয়া আসিয়াছে। তরুণ বয়সের সকল সুখসম্ভোগের মাঝখানেও এই দুশ্চিন্তা-রাহু তাঁহার সুখের সূর্য্যকে গ্রাস করিয়া যখন তখন আত্মপ্রকাশ করিতে বাধা পায় নাই। আজ এই যৌবনসীমার মধ্যভাগে প্রতিদিনই সে আশঙ্কা দৃঢ় হইতে দৃঢ়তরই হইতেছিল। আজ তাহা আর সংশয়ের সীমার মধ্যে ত আবৃতই নাই; তাহার যথার্থ মুক্ত স্বরূপে সে আত্মপ্রকাশ করিয়াই দেখা দিয়াছে।

এ দুই ভাইএর মধ্যে শূরপাল তেমন জনপ্রিয় নহেন। এই জন্য মহীপালদেবের নিকট তাঁহার রামপালের অপেক্ষা কিছু আদর ছিল। শূরপালকে মহাসামন্তরূপে মগধের শাসনভার দিয়া পূর্ব্বেই তিনি দেশ-ছাড়া করিয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু রামপালকে নিজের চোখের বাহির করিয়া রাখিতেও তাঁহার ভরসা হয় নাই। আজ বিশেষ রাজকার্য্যের প্রয়োজনে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে পদার্পণ করিয়াই শূরপাল যখন নিজ ভ্রাতার পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহাকে রাজ-অনুমতির অপেক্ষামাত্র না রাখিয়াই সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন, তখন রাজাধিরাজের মনে আর অণুমাত্রও সংশয় বাকি রহিল না যে, তাঁহার বৈমাত্রেয়দ্বয় উভয়েই ভিতরে ভিতরে এক এবং তাঁহার উচ্ছেদকামনায় কেহই কম নহেন।

সভা কোন্ সময় আপনা হইতেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সভাসদ্, পাত্রমিত্র, অমাত্য সকলেই আজিকার দিনটাতে ঘোর অশুভের সূচনা দর্শনে যে যাহার ইষ্টস্মরণে নিজ নিজ স্থানে প্রস্থিত হইয়াছে। যে সময় মহাসামন্তোপাধিক মহাকুমার শূরপালদেব অতর্কিতে সভাপ্রবিষ্ট হইয়াই তাঁহার অনুজের হস্ত ধারণ করিয়া রাজাজ্ঞার বিরোধিতাচরণ পূর্ব্বক সভাগৃহ হইতে তাঁহাকে বহিষ্কৃত করিয়া লইয়া গেলেন, সেই মহাসমস্যার কালেই সভাসদ্গণও তাঁহাদিগের পশ্চাতে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন।

ভীষণ ক্রোধে ও অক্ষমতায় মহারাজাধিরাজকে পাশবদ্ধ ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মতই ভয়াবহ বোধ হইতেছিল। তাঁহার মুখখানা শুধু লাল নয়, তামার মত লাল হইয়া যেন তাহা হইতে অনেকখানিই রক্ত ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছিল। রাজদেহরক্ষী সৈন্যগণ ও ছত্র-পতাকা-চামরধারিণী বন্দিনীগণমাত্র সিংহাসনের মর্য্যাদা রক্ষা ও শোভাসম্পাদন পূর্ব্বক যথাস্থানে চিত্রার্পিতবৎ অবস্থিত রহিয়াছিল।

আর পাল-সিংহাসনের সুবর্ণপাদপীঠতলে সুবর্ণ-মণিসমলঙ্কৃত মুক্তকোষ দীর্ঘ কৃপাণ সুগভীর অভিমানভরে আপনার অনাবৃত, লাঞ্ছিত ও নির্জ্জিত বক্ষ পাতিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। বীরের মর্য্যাদায় পদাঘাত করিয়া যে ক্ষত্রিয়াধম আজ সর্ব্বত্র ক্লৈব্যকে বরণ করিয়া লইয়া লক্ষের ধিক্কৃত হইয়াছে, তাহার পরিচ্ছদশোভার সংবর্দ্ধনাপেক্ষা এই সহস্রের পদধূলি-লাঞ্ছিত ধরণীশয্যাও যেন ইহার শ্রেয় হইয়াছিল। সে যেন তাহার অকলঙ্ক ঔজ্জ্বল্যসূর্য্যপ্রভা বিকীর্ণ করিয়া বিদ্রোহ-বিদ্রূপ তীক্ষ্ণতার সহিত বলিতেছিল—"বীরধর্ম্ম হারাইয়া

বীরের সজ্জাবহন—তাহাকে অবমাননা, তুমি তার যোগ্য নও রামপাল।"

মহারাজাধিরাজ বারেক রক্তনেত্রে ঐ মুক্তবক্ষ উলঙ্গ তরবারি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন। কে যেন তাঁহার কানে কানে কথা কহিল, 'ঐ তলোয়ার যে তোমার বুকে সে বসিয়ে দেয়নি, এই তোমার পরম ভাগ্য।'

তাহার পর সহসা আবার কে যেন কোথা হইতে বলিয়া উঠিল—'আচ্ছা, কেন দেয় নাই? দিলেই ত অনায়াসে দিতে পারিত? বাধা দিবার অবসর কেহই পাইত না।'

মনের মধ্যে যেন একটা বিস্ময়ের রেখা ফুটিয়া উঠিল। রামপাল সত্যই যেন বিচিত্র···কিন্তু না না, সে ত নিজেই নিজেকে রাজদ্রোহী বলিয়া স্বীকার করিয়াছে।

ধীর-মৃদু-চরণে প্রবেশ করিলেন বোধিদেব। ভূতপূর্ব্ব মহামাত্য বোধদেবের পুত্র, অধুনা ক্ষুদ্র রাজামাত্য বোধিদেব মহারাজাধিরাজের বিশেষ প্রিয়পাত্র নহেন। তবে বাহুবিক্রমে সুবিখ্যাত ও পুরাতন মন্ত্রিবংশীয় বলিয়া মহারাজাধিরাজ ইঁহাকে মনে মনে কিছু ভয় করিয়া চলিতেন। আজ অন্য কাহাকেও কাছে না পাইয়া অগত্যা এই সময়ে আগত বোধিদেবকেই মনের কথা বলিয়া ফেলিলেন;—"কোথায় ছিলে বোধিদেব! রামপাল যে রাজদ্রোহ স্বীকার করেও সাহঙ্কারে ঘরে ফিরে গেল, এতে রাজ্যশাসন কখন সুশৃঙ্খল থাকতে পারে?"

বোধিদেব সবিস্ময়ে কহিয়া উঠিলেন, "রামপাল—মহাকুমার রামপাল রাজদ্রোহী!—রামপাল!"—

মহীপাল দন্তে দন্তঘর্ষণ পূর্ব্বক ক্রুদ্ধস্বরে কহিয়া উঠিলেন, "অমাত্য বোধিদেব! সকলেই সাধু, শুধু তোমাদের মহারাজাধিরাজ মহীপালদেবই মিথ্যাবাদী!"

বোধিদেব আত্মসংবরণ পূর্ব্বক নম্রকণ্ঠে কহিলেন, "তা নয় রাজাধিরাজ! কিন্তু রামপাল যে রাজদ্রোহী, এ কথা আপনাকে যে বলিয়াছে, সে নিজেই মিথ্যাবাদী। রামপালকে আমি যেমন জানি, সে নিজেও আপনাকে তেমন ক'রে জানে না। রাজদ্রোহ তার ধাতুর সঙ্গে একেবারেই বিরোধী জান্‌বেন। এ তার কোন মহাশত্রুর চক্রান্ত।"

মহীপালদেব কহিলেন, "রামপাল যে রাজদ্রোহী, সে কথা অপর কেহই নয়, সে নিজেই ঐ এইখানে দাঁড়িয়ে এই কয়েক মুহূর্ত্তমাত্র পূর্ব্বেই নিজের মুখে স্বীকার ক'রে গেছে। এই দেখ, তার কোষমুক্ত কৃপাণ। সে ধরা পড়বেই জেনে এই অস্ত্র ও শিরস্ত্রাণ ত্যাগ ক'রে নিজ হতেই ধরা দিতে এসেছিল; এমন সময় শূরপাল এসে তাকে সরিয়ে নিয়ে গেছে। আমারই অন্নপুষ্ট—আমারই দ্বারা মগধের মত বিশাল প্রদেশের রাজসম্মানে প্রতিষ্ঠিত কৃতঘ্নাধম শূরপাল!"

বোধিদেব সবিস্ময়ে দেখিলেন, উষ্ণীষ ও কৃপাণ বাস্তবিক রামপালেরই বটে।

তাঁহাকে বাক্যবিমুখ ও স্তম্ভিত দেখিয়া মহারাজাধিরাজ পুনশ্চ কহিতে লাগিলেন, "এখন আমার কর্ত্তব্য—অবিলম্বে শূরপাল ও রামপালকে বন্দী ক'রে কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়া। তারা বাইরে থাকতে প্রতি মুহূর্ত্তেই আমার রাজ্য ও জীবন বিপন্ন হয়ে উঠছে। বোধিদেব! তোমরা পালবংশের পুরাতন ভৃত্য, তোমার দ্বারা আমার এই বিশেষ কার্য্যটি আমি আশা করি। কোন জনপ্রাণী না জান্‌তে পারে, এমনই ক'রে নিঃশব্দে তুমি রামপালকে বন্দী ক'রে কারাগারে রেখে এস।"

বোধিদেব উত্তেজিতভাবে কি বলিতে গিয়া সহসা আত্মসংবরণ করিয়া লইয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। ইহা দেখিয়া রাজাধিরাজ কহিলেন, "তবে যদি সখা ব'লে রামপালকে বন্দী করায় তোমার অসম্মতি থাকে, আমি তোমায় সে জন্য বলপ্রকাশ করতে চাহি না। তুমি গিয়া মহাপ্রতীহার রুদ্রদমনকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। প্রকাশ্যেই তাকে বন্দী ক'রে আনুক। ব'লে দিও, অন্ততঃ ৫ হাজার সৈন্য সঙ্গে নিয়ে সে এখনই উপস্থিত হোক।"

বোধিদেব স্থিরগম্ভীর স্বরে কহিলেন, "আমায় যে আদেশ করেছেন, তা প্রত্যাহার ক'রে অন্যকে দেবার কোন বিশিষ্ট কারণ আছে কি, রাজাধিরাজ?"

মহীপালদেব ঈষৎ বিস্ময় বোধ করিলেন; কহিলেন, "রামপাল তোমার বাল্যসখা নয়?"

বোধিদেব কহিলেন, "হোক্ সখা। রাজকার্য্যে যখন ভ্রাতৃত্বের স্থান নাই, তখন বন্ধুত্ব কি এতই শ্রেষ্ঠ?"

সপ্রশংস দৃষ্টিতে চাহিয়া রাজাধিরাজ কহিলেন, "তা হ'লে রামপালকে বন্দী করায় তোমার আপত্তি নেই?"

বোধিদেব কহিলেন, "না,—যদি রাজাধিরাজের ইহাই আদেশ হয়।"

সন্তুষ্ট চিত্তে রাজা কহিলেন, "হ্যাঁ, আমার ইহাই আদেশ, তবে যাও, আর বিলম্ব করো না। সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই আমায় তার বন্দিত্বের সংবাদ দিবে। আর যদি সে পালিয়ে থাকে, তা হ'লে মহাপ্রতীহারের সাহায্য নিয়ে সসৈন্যে তার অনুসরণ ক'রে যেখান হ'তে পাও, তাকে ধ'রে আনবে। একসঙ্গে দু'ভাইকে পেলে খুবই ভাল হয়। তাদের আর আমি বাইরে রাখতে পারি না। আচ্ছা, এখন যাও।"

"রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য!" এই বলিয়া রাজাকে অভিবাদন পূর্ব্বক বোধিদেব প্রস্থান করিলেন।

ঈষৎ ভারমুক্ত চিত্তে রাজাধিরাজ মনে মনে বলিলেন "দেখছি, বোধির উপর আমি অবিচার করেছি। মানুষ চেনা যায় না। আচ্ছা, আজ যদি সে রামপালকে বন্দী করতে পারে, সমুচিত পুরস্কার পাবে। মহীপাল অকৃতজ্ঞ নয়। তার পর, অকৃতজ্ঞ শূরপাল! তোমাকেও আমি আর এ জীবনে বিশ্বাস বা ক্ষমা করবো না। তোমায় এত বড় মর্য্যাদা দিয়ে তার বিনিময়ে আমি তোমার কাছে এই পুরস্কার লাভ করলেম! বিশ্বাসঘাতক! তবে তোমারও কার্য্যের উপযুক্ত ফল পেতে আর খুব বেশী দেরি হবে না। ভাই আমার! উভয় ভ্রাতাই এবার একত্র থেকে সৌভ্রাত্রের দৃষ্টান্ত দেখাতে পারবে।"

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

রামপাল রাজসভা হইতে ভগ্নহৃদয়ে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া কোনমতে স্খলিতপদে নিজের বিশ্রামগৃহে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু বিশ্রামলাভ তাঁহার আদৌ তখন উদ্দেশ্য ছিল না, অথবা জীবনের কোন প্রকার উদ্দেশ্যই বোধ করি আর তাঁহার মধ্যে বর্ত্তমান ছিল না। কি যে এ সুগভীর শূন্যতা!

এক মুহূর্ত্ত পরেই দ্বার ঠেলিয়া প্রবেশ করিলেন বোধিদেব। রামপাল তাঁহাকে দেখিয়াই সাগ্রহে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

"আমায় কি বলতে এসেছ বুধ! রাজাধিরাজের কাছ থেকেই তুমি আসছ কি? কিছু বলবার আছে কি আমায় তাঁর হয়ে?"

বোধিদেব ক্ষীণস্বরে উত্তর করিলেন, "তাঁর হয়ে?"

রামপাল যেন ঈষৎ আশ্বস্ত চিত্তে মৃদু হাসিলেন; বলিলেন, "অকারণেই যে তোমার মুখের অবস্থা অমন ভীমগম্ভীর হয়ে উঠেনি, তা আমি বুঝতে পেরেছি। রাজার আদেশটা কি শুনি?"

"রাজাধিরাজ তোমাদের দু'ভাইয়ের উপরেই খুব রেগে আছেন, বোধ করি, তোমায় তা বলাই বাহুল্য এবং-

রামপাল এবার আগ্রহভরে এক পদ অগ্রসর হইয়া আসিয়া নিশ্চিন্তস্মিতমুখে কহিলেন, "এবং শীঘ্রই আমাদের বন্দী করা হবে? কেমন, এই না?"

বোধিদেব রুদ্ধশ্বাস মৃদুভাবে পরিত্যাগ করিয়া সবিষাদে কহিলেন, "তোমার অনুমান মিথ্যা নয়, বন্ধু! রাজচরিত্র তুমি ঠিকই বুঝে নিয়েছ!"

রামপাল মুক্তস্বরে হাসিয়া কহিলেন, "আমিও মনে মনে এই আশাই করেছিলেম। রাজসভায় প্রকাশ্যে যেটা সব সময় জোর ক'রে করা যায় না, সেটা গোপনে করাই সহজ। তা চল, আমি ত প্রস্তুতই আছি। কোথায় যেতে হবে, বল।"—এই বলিয়া তিনি আর এক পদ অগ্রসর হইলেন।

বোধিদেব যথাস্থানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া নীরসকণ্ঠে কহিলেন, "এত ব্যস্ত হয়ো না, রামপাল! একটু ধৈর্য্য ধ'রে থাক, যেতেই যদি হয় ত তার জন্য আর অতই তাড়া কিসের?"

রামপাল তখন ঈষৎ অপ্রতিভভাবে আত্মসংবরণ করিয়া লইয়া ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, "তোমার সময় নষ্ট না ক'রে ফেলি, তাই ভীত হচ্ছি।"

বোধিদেব বলিলেন, "না, সে জন্য ব্যস্ত হয়ো না, আমার হাতে যথেষ্ট সময় আছে। যা হোক, মহাপ্রতীহারের বদলে আমি কেন তোমায় বন্দী করতে এসেছি, এ সম্বন্ধে কি তোমার মনে কোনই কৌতূহল জাগলো না?"

রামপাল ভূতপূর্ব্ব মহামন্ত্রিপুত্র—বর্ত্তমান রাজামাত্য বন্ধুর মুখের দিকে চাহিয়া শান্তস্নিগ্ধ হাস্যের সহিত উত্তর করিলেন, "মহাপ্রতীহারের চেয়ে আমার পক্ষে তোমার হস্তই যে প্রেয় বুধ! এর আর জানবার কি আছে? এইটুকু জানা গেল যে, বরেন্দ্রীর রাজকর্ম্মচারিগণ এখনও রাজভক্ত।"

বোধিদেব এ কথায় কান না দিয়াই বলিলেন, "সে যা হোক রামপাল! আমি এখানে তোমার অপেক্ষা করব, তুমি

একবার সন্ধ্যাদেবীর কাছে, মহাদেবীর কাছে গিয়ে তাঁদের নিকট বিদায় নিয়ে এস। তার পর যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে নাও। এমন কিছু বেশী ব্যস্ত হবার কারণ নেই, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমরা প্রস্তুত হ'তে পারব।"

রামপালের চিত্ত বন্ধুর এই সস্নেহ সহৃদয় বাক্যে বারেক বিমথিত হইয়া উঠিতে গেল, একটা গভীর আবেগ তাঁহার সবল চিত্তকে ঈষৎ আলোড়িত করিতে উদ্যত হইয়া তাঁহার লৌহকঠিন আত্মসংযমে বাধা পাইয়া যথাস্থানে লুক্কায়িত হইল। শান্ত-উদাস কণ্ঠে তিনি কহিলেন, "দেখা-সাক্ষাতের আর ত কোনই প্রয়োজন নেই, বুধ! আর প্রস্তুত হওয়া, তা এ পৃথিবীতে আমার পাওনা-দেনা এত বেশী ছড়ানো নেই যে, এক নিমেষের চাইতেও আমার তার মাঝখান থেকে বেরিয়ে যেতে বেশী দেরি হবে। আমি যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়েই রয়েছি।"

বোধিদেব এক মুহূর্ত্ত কি ভাবিয়া লইয়া মুখ তুলিয়া বলিলেন, "এস তবে যাই।"

"কৈ, তুমি ত আমায় বন্দী করলে না? আচ্ছা, তা হ'লে আমি তোমার আগে আগে যাব, না পিছনে পিছনে?"

বোধিদেব কুমার রামপালের হাত ধরিয়া কহিলেন, "এস, আমরা দু'জনে একত্রই যাই, তা হ'লে আর আগে পরের সমস্যাটা উঠ্‌তে পারবে না।"

এই বলিয়া উভয়ে গৃহের বাহিরে আসিলেন। অপরাহ্ণের স্বর্ণলোহিতাভা গাছের মাথায় পড়িয়া ঝকমক করিতেছিল। বেলাশেষের মৃদুল বাতাস লতায় পাতায় ঝির-ঝির করিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে। দোয়েল-পাপিয়ার মধুর সুর চারিদিকে আনন্দ-কলরব জাগাইয়া তুলিতেছিল। পথে আসিয়া বোধিদেবের জন্য প্রতীক্ষিত রথে উভয়েই আরোহণ করিলে, যানচালক ভূতপূর্ব্ব রাজমন্ত্রীর গৃহোদ্দেশ্যেই যান চালনা করিল। ক্ষণকাল পথচারী নর-নারীগণের প্রতি দৃষ্টি সন্নিবেশিত রাখিয়া তাহার পর রামপাল একটি গভীর তপ্তশ্বাস মোচন পূর্ব্বক দৃষ্টি ফিরাইয়া লইলেন। বাহিরের কোন জনপ্রাণীই জানিল না যে, তাহাদের এক অভাগা রাজপুত্র তাহাদের মাঝখান হইতে নিঃশব্দে সরিয়া যাইতেছে। সংসার-সমুদ্রের একটি ক্ষুদ্র বুদ্‌বুদ্‌মাত্র জলশায়ী হইল, ইহাতে সংসারের ক্ষতিই বা কি?

"এ কি! তুমি কোন্ পথে যাচ্ছ, বুধ! কারাগারের পথে ত তোমার রথ চলছে না। আমার নিশ্চয়ই কষ্টাগারে নিয়ে যাবার আদেশ আছে?"

বোধিদেব সস্নেহে উত্তর করিলেন, "তুমি যেখানে যেতে চাইবে, আমি সেইখানেই তোমায় নিয়ে যেতে প্রস্তুত আছি, রামপাল! বল, কোথায় যেতে চাও?"

বন্ধুর মুখের এই অদ্ভুত উত্তরে মহাকুমার অত্যন্তই বিস্মিত হইলেন, সাশ্চর্য্যে তিনি কহিয়া উঠিলেন, "এ কথার অর্থ কি, বোধি?"

বোধিদেব ঈষৎ হাস্যস্মিতমুখে কহিলেন, "তা হ'লে কি তুমি মনে করেছ যে, বাস্তবিকই মহাকুমার রামপালদেবকে তার আজীবনের চিরসখা সত্য সত্যই কষ্টাগারের অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে নিক্ষেপ করবার জন্যই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এই কায হাতে নিয়েছে? তা যদি হতো, রামপাল, তা হ'লে মহাপ্রতীহারই এ কাযটার গৌরব অর্জ্জন করতে পারতো। এখন যা বলি, শোন, নদীর তীর পর্য্যন্ত আমরা একত্র গিয়ে তোমায় নদী পার ক'রে দিয়ে আমি ফিরে আস্‌বো, আর তুমি তোমার জন্যে রক্ষিত তেজস্বী ঘোড়া—যা আমি 'চৈত্ররথ' বাগানের প্রাচীরের পাশে রাখিয়ে এসেছি, তাইতে চ'ড়ে তোমার যে দিকে ইচ্ছে পালাবে। তার পর কি করতে হবে, তাও কি আমায় রামপালকে উপদেশ দিতে হবে? সমতটের জ্যোতিষিকের গণনা স্মরণ করো, মহারাজাধিরাজ রামপালদেবের প্রতীক্ষায় সমস্ত বরেন্দ্রী আজ উন্মুখ অধীর হয়ে উঠেছে। আর বিলম্ব অবিধেয়।"

আবার একটা পরস্পর-বিরোধী প্রবল দ্বন্দ্বে রামপালের দৃঢ় চিত্তকে ক্ষণকালের জন্য গভীর আন্দোলিত করিয়া রাখিল। অবশেষে তাহাদের সমস্ত শক্তিকে পরাভূত করিয়া দিয়া অবসাদক্ষীণ কণ্ঠে তিনি কোনমতে প্রত্যুত্তর করিলেন, "আমায় কারাগারেই নিয়ে চল।"

"ভাল ক'রে আবার ভেবে দেখ, রামপাল! তুমি বালক নও, মূর্খ নও, এখনও সময় আছে। এ কায আমি না করলে এখনই অন্য লোক সাগ্রহে সম্পন্ন করবে, তাই এত বড় ভয়ানক কাযের ভার স্বেচ্ছায় প্রবৃত্ত হয়ে নিয়ে এসেছি। এ সুযোগ ত্যাগ করো না। তোমার কাছে জীবন-মরণে কোন প্রভেদ নেই, তা আমি জানি, কিন্তু এই অত্যাচারিত দেশের লোকের মুখ চাও, এদের ঐ

রাজবেশী শোষকের হাত থেকে বাঁচাও। তোমার ঐ অর্থহীন রাজভক্তির—ভ্রাতৃভক্তির ভ্রান্ত অভিনয় আমারও আজ অসহ্য হয়েছে! দয়া করো ভাই! নিজের জন্য দরকার না থাকে, না থাক, আমায় এই ভিক্ষা দাও, দেশকে রক্ষা কর, রামপাল! প্রিয়সখা! তোমার আশৈশবের সখাকে এই ভিক্ষা দাও! যোড়-হাতে ভিক্ষা চাইছি। ব্রাহ্মণ আমি, নিজের জাতীয় সম্মান-গৌরব ত্যাগ ক'রে তোমার কাছে নতজানু হচ্ছি, ভিক্ষা দাও!"

রামপালের বুকে যেন আর সহিবার সামর্থ্য ছিল না। তিনি একটা অব্যক্ত ধ্বনি করিয়াই স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। ক্ষণ পরে দুঃখপরিবাদশূন্য ভাবলেশহীন মুখে সহজ স্বরে কহিলেন, "আমার যা পরিণাম, আমায় তা পেতে দাও। তুমি না পার, আমি নিজেই যাচ্ছি। আমার আর উপায়ান্তর নেই—"

"আর একবার ভেবে দেখ, মহাকুমার! সেখানকার অসহ্য যন্ত্রণা, সে কি সইতে পারবে, মনে করছো? হয় ত মৃত্যু ঘটতেও বেশী বিলম্ব হবে না। অন্ততঃ এখান থেকে পালিয়ে গিয়ে নিজেকে নিরাপদ কর।"

রামপাল কহিলেন,—প্রাণহীন পুতুলের মুখ দিয়া যেন সে ভাষা বাহির হইয়া আসিল, এমনই নীরস সে স্বর—"তা হয় না, বোধি! আমায় উদ্ধার করতে গিয়ে তুমি মাত্র বিপন্ন হবে, এতে আর কোনই ফল হবে না। যে জীবন এ জন্মে ব্যর্থই হয়ে গেছে, তার ভার বহন করবার জন্য আমার আর বিন্দুমাত্রও আগ্রহ নেই। আমি আর তা বইতে পারছিনে। ঘাতুকের ছুরির চেয়ে এখন আমার বেশী বন্ধু—এমন কি, তুমিও নও।"

বোধিদেব এই সন্তপ্ত কণ্ঠের এই নিদারুণ হতাশ বাক্যে একান্ত ব্যথিত হইলেন। সুগভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন পূর্ব্বক সবিষাদে তিনি কহিলেন, "কোন্‌খানে কিসের যেন একটা গলদ ঘ'টে আছে, সেটা আমি বরাবরই দেখছি; কিন্তু এতই কি তা দুর্জ্ঞেয়? যা জানি না, তার সম্বন্ধে কেমন ক'রে বিচার করবো? তবে সত্যই কি তুমি কারাগারকেই শেষ-কালে বরণ ক'রে নেওয়া স্থির করলে? আর সেটা আমারই দ্বারা সম্পন্ন করাবে? রামপাল! কি নিষ্ঠুর তুমি!"

"ক্ষতি কি সখা! তোমার রাজাজ্ঞা ত তাই?"

"তুমি পাগল!"—এই বলিয়া ক্রুদ্ধ ও বিষণ্ণ বোধিদেব যাত্রাপথের অপর দিকে রথ-চালনার আদেশ প্রদান পূর্ব্বক স্তব্ধ ও শোকাচ্ছন্ন হইয়া অধোমুখে বসিয়া রহিলেন।

"বোধিদেব! আমার পৃথিবীর শেষ বন্ধু! তুমিও আমার উপরে রাগ করলে?"

"রামপাল!"—বলিয়া বোধিদেব মহাকুমারকে দুই হস্তে দৃঢ়কঠিন আলিঙ্গনে বদ্ধ করিলেন,—"ভগবান্ তোমার এই অতুল্য ত্যাগের মূল্য প্রদান করুন। আর তাঁরই মহা-সাম্রাজ্যের এক দীনাতিদীনও এর জন্য তার যথাসাধ্য চেষ্টায় সচেষ্ট থাকলো। না পারে, অন্ততঃ প্রাণ দিতে পারবে।"

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ

অপরাহ্ণে মহারাজাধিরাজ মহীপালদেব তাঁহার মর্য্যাদা-মুরূপ বেশ-ভূষায় বিভূষিত হইয়া সাংবাদিকের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। চন্দ্রকলার আরোগ্যসংবাদ আসিলেই নর্ত্তকী-কুলরাজ্ঞীকে অভিনন্দিত করিতে স্বয়ং রাজরাজেশ্বরই আজ তাহার গৃহে অভিসারযাত্রা করিবেন স্থির হইয়াছে। ইতো-মধ্যে শূরপালের বন্দিত্ব সংবাদ মহাপ্রতীহারপ্রমুখাৎ জানা গিয়াছে, এখন মাত্র বাকী রামপালরূপ মহাশত্রুর বন্ধন-সংবাদটি পাওয়া, তাহা হইলেই সর্ব্বতোভাবে নিশ্চিন্ত হইয়াই প্রেমাভিনয়ে আনন্দ-শর্ব্বরী যাপন করা যায়। এই বারই যথার্থরূপে অপ্রতিদ্বন্দ্ব সাম্রাজ্যসুখসম্ভোগ ঘটিল!

দ্বারের প্রহরিণী কাহাকে সসম্ভ্রমে দ্বার ছাড়িয়া দিল। সাংবাদিক নিশ্চয়ই নহে, রাজাধিরাজ ত্রস্তে ফিরিয়া বসি-লেন। দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া বোধিদেব।

"অমাত্য বোধিদেব! সংবাদ কি? কার্য্য সম্পন্ন হয়েছে ত?"

বোধিদেব শান্তগম্ভীর স্বরে প্রত্যুত্তর করিলেন, "হয়েছে, রাজাধিরাজ!"

রাজাধিরাজ ক্ষণকালের জন্য আর একটি কথাও কহিতে পারিলেন না। তাঁহার রাজোচিত অহঙ্কার তাঁহাকে কিছু-ক্ষণের জন্য বাক্যবিমুখ করিয়া রাখিতে বাধ্য করিল। রাজারা যখন নিজের মতে কার্য্য করেন এবং সে কার্য্য যদি বিশেষ করিয়া অন্যায় কার্য্য হয়, তাহা হইলে সেটাকে সঙ্গত ও ন্যায্য প্রতিপন্ন করার জন্য তাঁহাদের ও তাঁহাদের সামান্য কর্ম্মচারীর কাছেও একটা ঐকান্তিক প্রচেষ্টা জাগিয়া উঠে।

এ ক্ষেত্রেও মহীপালের চিত্তে রামপালের প্রতি যে বিন্দুমাত্রও অবিচার ঘটে নাই, এই কথাটাকে জোর করিয়া প্রমাণ করিবার জন্য একটা উৎকট লোভ আসিয়া তাঁহাকে আলোড়িত করিতে থাকিলেও, একটা অযথা দ্বিধা যেন কোথা হইতে জাগিয়া উঠিতেছিল। অবশেষে সবলে অন্তরস্থ কুণ্ঠাটুকুকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া সচেষ্টায় কণ্ঠস্বরে যথেষ্ট অনাগ্রহের সুর টানিয়া আনিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কিছু বলেছে?"

"কিছুই বলে নি, রাজাধিরাজ! সে কি তাই বল্‌বার ছেলে?"

"নিশ্চয়ই কিছু আর নিঃশব্দেই নিজেকে সে তোমায় বন্দী করতে দেয় নি?"

"তিনি বরং বল্লেন যে, তিনি বন্দী হবার জন্যই প্রতীক্ষা করছিলেন।"

"ওঃ, সে তা হ'লে তার রাজদ্রোহিতার জন্য ক্ষমা চায় নি? এখনও সেই বিদ্রোহের সুরই ধ'রে রয়েছে!"

"বিদ্রোহী আপনি কাকে বল্‌ছেন, মহারাজাধিরাজ?"—শান্তস্বরে বোধিদেব এই কথা রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। "রাজদ্রোহী কি রাজাজ্ঞায় অবলীলাক্রমে নিজেকে ভীষণ যন্ত্রণাপূর্ণ কষ্টাগার নাম দেওয়া কারাগারে বন্দী ক'রে নিয়ে যেতে দেয়? এমন কি, যে তাকে বাধ্য হয়ে নিয়ে গেল, তার সঙ্গে সম্পূর্ণ বিরোধ ক'রে,—তার ইচ্ছার ও চেষ্টার বিরুদ্ধে! কেউ এমন যায় কি? আর সেই তাকেই বলেন আপনি বিদ্রোহী?"

"কার ইচ্ছার ও চেষ্টার বিরুদ্ধে, বোধিদেব? তুমি কি পাগল হয়েছ?"

বোধিদেব মৃদু হাসিলেন, "না রাজাধিরাজ! পাগল কেন হব?"

"তবে এ সব কি তুমি বল্‌ছো? 'যে তাহাকে নিয়ে গেল, তার সঙ্গে বিরোধ ক'রে' ইত্যাদি এ সবের মানে কি? কে তাকে বাধ্য হয়ে নিয়ে গেল? সে লোকটা কে শুনি?"

"মহারাজাধিরাজ যাকে এ কাযের ভার দিয়েছিলেন, আমি তারই কথা বলছি, রাজাধিরাজ!"

রাজা ক্রুদ্ধ এবং বিমূঢ়বৎ প্রশ্ন করিলেন, "আমি ত তোমার 'পরেই এ কাযের একমাত্র ভার দিয়েছিলেম, বোধিদেব।"

"হ্যাঁ, রাজাধিরাজ! আমার কথাই ত আমি উল্লেখ করেছি। আর কারও কথা বলিনি ত।"

"তুমি কি তা হ'লে আমায় বল্‌তে চাও যে, আমার আদেশের পরও তুমি তাকে বন্দী করতে ইচ্ছুক ছিলে না? সেই রাজদ্রোহীকে? রাজ্যের সেই পরম শত্রুকে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, মহারাজাধিরাজ! আমার যথার্থই তা ইচ্ছা ছিল না। এমন কি, আমি তাকে করতোয়া পার হয়ে অশ্বারোহণে এ রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে যাবার জন্য বিস্তর অনুনয় করেছিলেম। পূর্ব্ব হ'তে নৌকা ও অশ্বাদিও প্রস্তুত রেখেছিলেম। কিন্তু এমনই কঠিন তার পণ, কিছুতে তাকে সম্মত করতে পারলাম না।"

"রামপালের পলায়নের জন্য? বিশ্বাসঘাতক! কৃতঘ্ন!" মহীপাল গর্জ্জিয়া উঠিলেন।

বোধিদেব যথাপূর্ব্ব স্থির কণ্ঠেই কহিলেন, "হ্যাঁ, তার পলায়নের জন্যই ত এত চেষ্টা করেছিলেম, সে কিছুতেই সম্মত হ'ল না। সবই বৃথা হ'ল।"

ক্রোধে ও অপমানে মহীপালদেবের সমস্ত শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল, তথাপি ইহার ধীর স্থির গাম্ভীর্য্য ও অকুতোভয়তা তাঁহার সেই ক্রুদ্ধ চিত্তেও যেন একটা বিস্ময়ের প্রলেপ লেপিয়া দিতে ছাড়িতেছিল না। তিনি ক্ষণকাল ক্রোধাতিশয্যে নির্ব্বাক্ থাকিয়া পরে ক্রোধগম্ভীর স্বরে কহিলেন, "তোমার এ রকম চাতুর্য্য করার অর্থ কি, বোধিদেব? আমি ত জোর ক'রে তোমায় তোমার বাল্যসখাকে বন্দী করবার ভার দিই নি, তুমি নিজেই এ ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলে।"

বোধিদেব নত-নেত্রে উত্তর করিলেন, "তা করেছিলেম, রাজাধিরাজ! আপনি ত সেই সময়েই আমার পরিবর্ত্তে মহাপ্রতীহারকে এই ভার দিতে ইচ্ছুক ছিলেন। আমি এ ভার না নিলেও আমার বাল্যসখা আপনার হাত হ'তে নিষ্কৃতি পেতেন কি? তাই আমি তাঁকে আপনার অকরুণ হাত হ'তে উদ্ধার করবার লোভেই এই মহাভার স্বেচ্ছায় নিজেই চেয়ে নিয়েছিলেম। চেষ্টাও করেছিলেম, কিন্তু অভিমানী বালক আমার কোন কথায়ই কর্ণপাত করলে না, মনের জ্বালায় জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল। উঃ, সাধ ক'রে কি জীবনই বরণ ক'রে নিলে! কি দুর্ব্বহ জীবন!"

"বোধিদেব !"

"রাজাধিরাজ !"

"এই তুমি রাজভক্ত ? এই তুমি বীর ? রাজ্যশাসনের কাছে হৃদয়বৃত্তির কোনই দাম নেই, এই কথাটা কি আমাদের ভুলে গেলে চলে ?"

"বিশেষতঃ যেখানে স্বার্থসংঘর্ষ হ'তে পারে ! বিশেষতঃ যেখানে চরিত্রগত প্রভেদ হিমগিরির পার্শ্বে বল্মীকের মতই সর্ব্বজনগোচরীভূত ! বিশেষতঃ যে মহচ্চরিতের পার্শ্বে হীনতার—"

ক্রোধে পাংশুবর্ণ হইয়া গিয়া রাজাধিরাজ উচ্চকণ্ঠে বাধা দিলেন,—"বোধিদেব। তুমি কি আজ তোমার রাজার ধৈর্য্য পরীক্ষা করতে এসেছ ? আর নয়, শোন—"

বোধিদেব কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়াই শান্ত সংযতভাবে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া রাজাধিরাজকে বাধা দিলেন, বলিলেন—"আপনিই আগে শুনে নিন, রাজাধিরাজ! আমার বক্তব্য বেশী কিছু নয়, শুধু—এই প্রসাদ ভিক্ষা চাইছি যে, আমাকেও আমার সখার সঙ্গে একত্র কষ্টাগারে বাস করবার অনুমতি দান ক'রে কৃতার্থ করুন। আমায় বন্দী করবার জন্য কাকেও কষ্ট ক'রে ডাকতে হবে না। আপনার লিখিত আদেশ পেলেই আমি নিজেই কারারক্ষীদের কাছে চ'লে যাব।"

রাজাধিরাজ ক্রোধে অধর দংশন করিয়া সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। গৃহপ্রান্তে স্বর্ণময় লেখ্যাধার সজ্জিত ছিল। ক্ষণেক সেথানে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

"সাবধান বোধিদেব! হয় ত এ আদেশপত্রে চিরকারাবাসের কথাও লেখা থাকা অসম্ভব নয়।"

বোধিদেব উত্তর করিলেন, "এইটাই বেশী সম্ভব। কারণ, এর পর আর কি কখন আপনি আমার মুখের দিকে চাইতে পারবেন ? না আমায় বাইরে আস্তে দিতে ভরসা করবেন।"

রাজাধিরাজ ভূমিতলে প্রচণ্ড পদাঘাতপূর্ব্বক চীৎকারস্বরে কহিয়া উঠিলেন—"চ'লে যাও, বোধিদেব! আজ হ'তে মন্ত্রিমণ্ডলীতে তোমার স্থান নেই।"

বোধিদেব চলিয়া গেলেন না, এমন কি, এক পদমাত্র নড়িয়া দাঁড়াইলেন না, ধীর স্থির শান্তভাবে দাঁড়াইয়া ক্রোধোন্মত্ত ক্ষিপ্ত সিংহবৎ হিংস্রমূর্ত্তি রাজার প্রতি নির্ভীক নেত্রে চাহিয়া উত্তর করিলেন,—"মন্ত্রিমণ্ডলীতে স্থান থাকতেই বা আমার কতটুকু স্থান আছে, রাজাধিরাজ! তা যদি থাকৃত, তবে আজ পাল-সাম্রাজ্যের এ অধঃপতন অবস্থা আমায় দাঁড়িয়ে দেখতে হতো না। আমি মহামান্য পাল-সম্রাট ধর্ম্মপালমন্ত্রী গর্গদেবাদির বংশধর, আজ আমার মহামন্ত্রিত্বের পরিবর্ত্তে সামান্য অমাত্যপদে নামমাত্র প্রতিষ্ঠা, আসলে আমি বোধদেবাত্মজ বোধিদেব সামান্য এক জন রাজপাদসেবী সেবক মাত্র!—"

রাজাধিরাজ কোনমতে বাক্ সংগ্রহ পূর্ব্বক উচ্চারণ করিলেন, "এই হীনপদ ত্যাগ করতে কোন নিষেধ নাই, বোধিদেব! তা' এখনই করতে পার।"

বোধিদেব কহিলেন,"তা' জানি আমি, রাজাধিরাজ! যাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র মনুষ্যত্ব আজও বর্ত্তমান আছে, আপনার সিংহাসনের পার্শ্বে তাদের কিছুমাত্র প্রয়োজনীয়তা নেই। সে কথা আর আপনি কষ্টস্বীকার ক'রে বলছেন কেন? এই হেয় সত্য আজ সমুদয় আর্য্যাবর্ত্তবিদিত। রাজাধিরাজ! দয়া ক'রে আমায় আমার বন্ধুর পাশে একটু স্থান ক'রে দিন, আমি আপনার সঙ্গে আর বৃথা বাদানুবাদ করতে ইচ্ছা করি না, তার চেয়ে আমার হতভাগ্য বাল্যসখার নিদারুণ দুঃখের সামান্য একটুও যদি লাঘব করতে পারি, তাতেই আমি ধন্য হব। নিন, লেখনী তুলে নিন, আদেশ-পত্র লিখিত হোক—"

"বোধিদেব! কিসের স্পর্দ্ধায় তুমি রাজার উপর আদেশের পর আদেশ চালিত করছ? তোমার ব্যবহারে আমার সন্দেহ হচ্ছে যে, আমাদের মধ্যে রাজা কে? তুমি না আমি?"

"দুর্ভাগ্যক্রমে আপনিই রাজা, রাজাধিরাজ!"

"দুর্ভাগ্যক্রমে?—"

"তাতে আর সন্দেহ কি রাজাধিরাজ! আপনার পরিবর্ত্তে আমি রাজা হ'লে—"

"তুমি বোধ হয় তোমার একটা ক্ষুদ্র অমাত্যের এই রকম ঘোরতর ধৃষ্টতা সহ্য ক'রে তাকে পুরস্কৃত করতে?"

"পুরস্কৃত না করলেও, আমি রাজা হ'লে, রাজাধিরাজ! আমি আমার বংশানুগত মহামাত্যের পুত্রকে এই রকম অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি দিয়ে দগ্ধ করতে চেষ্টা না ক'রে, তাকে মানুষের মতন সহজ দৃষ্টিতে দেখে, নম্রকণ্ঠেই বলতেম,

নটীর পূজার অভিনয়ের শেষ দৃশ্য—ভিক্ষু উপালীর ভূমিকায়
কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের আশীর্ব্বাদ

[ফটো-শিল্পী—শ্রীঅলকেন্দ্রনাথ ঠাকুর

'বোধিদেব! আমি রাজা, তা' ভুলে গেছলেম! রাজ-কর্ত্তব্য অবহেলা ক'রে আমি মহাপাপ করেছি, তার উপর এখন আবার ভদ্রসন্তানের কর্ত্তব্যও লঙ্ঘন ক'রে তোমায় অপমান করাটা আমার সঙ্গত হয় নি। আমায় ক্ষমা কর'।"

বোধিদেবের এই উত্তরে রুষ্ট রাজাধিরাজ অধিকতর রুষ্ট হইতে গিয়া ক্রোধের অপেক্ষা বিস্ময়ানুভবই যেন বেশী করিলেন। ক্ষণকাল তাঁহার মুখ দিয়া কথা সরিল না, তাহার পর রুষ্ট-বিদ্রূপে কহিয়া উঠিলেন, "তবে কি তুমি বলতে চাও যে, তুমি রাজা হ'লে তোমার জাত-শত্রু ও বর্ত্তমানে রাজদ্রোহী ভাইদেরও তুমি ক্ষমা করতে?"

বোধিদেবের গৌর মুখ আরক্ত ও তাঁহার আয়তনেত্র অত্যুজ্জ্বল আভা বিকীর্ণ করিয়া জ্বলিতেছিল। তিনি রাজকীয় এই প্রশ্নোত্তরে মধুর শ্লিষ্ট হাসি হাসিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, "নিশ্চয় রাজাধিরাজ! আমি রাজা হ'লে আমার রামপালের মত সর্ব্বগুণসম্পন্ন, শৌর্য্যবীর্য্যশালী, লোকপূজ্য অথচ অসাধারণ ভ্রাতৃভক্ত ও ত্যাগী ভাইকে আমার সিংহাসনের অর্দ্ধ-অংশ আপনি যাচিয়া আনিয়া বহু পূর্ব্বেই প্রদান করতেম। আমি রাজা হ'লে এই রামপালের সহায়তায় পাল-সাম্রাজ্যকে আবার তাহার পূর্ব্বতন গৌরবের দিনে ফিরিয়ে নিয়ে যেতেম। আমি রাজা হ'লে প্রজারা আজ রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সূচনায় উদ্ধত অবস্থায় তাদের নায়ক খুঁজে বেড়াত না। আমি রাজা হ'লে অনেক কিছুই ভাল হ'তে পারত, রাজাধিরাজ! সে কথা আর তুলছেন কেন? সে ত হবার নয়! এখন ভেবে দেখুন, কি আপনি চাইছেন? যথার্থ সুহৃদ্—বন্ধু—মন্ত্রী? অথবা হীন, তোষামোদকারী, আত্মমর্য্যাদাহীন ক্রীতদাস? আপনি বীর চান, না ক্লীব চান? মহৎ চান, না ক্ষুদ্র চান? আপনি কি চান না যে, আপনার রাজত্ব, যা আপনার পিতৃপুরুষগণের বাহুবলে ও পুণ্যফলে বহু কষ্টে অর্জ্জিত হয়েছিল, তা আপনার হাতে স্থায়ী হয়? অথবা দু-দিন বিলাসে অলসে স্বেচ্ছাচারিতায় যাপন ক'রে নিজের সঙ্গে তাকেও ধ্বংস ক'রে যেতে চান? লোকসাধারণে আপনাকে ভাল না বেসে ঘৃণা করে, প্রকাশ্যে না হয় ভয় করে, এতে কখন কারও রাজত্ব স্থায়ী হয়েছে? বলুন কি চান? যদি যথার্থ ধ্বংসই আপনার কাম্য হয়, তা হ'লে মহাকুমার শূরপাল ও রামপালের বন্দিত্ব ঠিকই হয়েছে। আমি আপনাদের চিরহিতৈষী, চিরমিত্র মন্ত্রিবংশীয়, আমাকেও হয় বন্দী, না হয় নির্ব্বাসিত করুন। বিলম্ব করবেন না রাজাধিরাজ! কারণ, আপনার এই সকল কার্য্যফলে আপনার ধ্বংস আর বিলম্বিত থাকবে না। যে বিষবৃক্ষ রোপণ করেছেন, তার ফলোৎপত্তির কাল এসেছে, এখন আপনার পক্ষে দুটি পথ সাম্‌নে প'ড়ে আছে। এক—যা' করেছেন, তাই ক'রে যাওয়া এবং তার ফলে সমূলে ধ্বংস। আর এক—রামপাল শূরপালকে সম্মাদরে ফিরিয়ে এনে তাঁদের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে মগ্নপ্রায় পাল-সাম্রাজ্য-তরণীর গতি ফিরিয়ে তাকে তার যথার্থ গতিপথে বাহিত করা। আর সময় নেই, রাজাধিরাজ! সত্বর পথ নির্ব্বাচন ক'রে নিন। আর যদি তা না ক'রে এই ধ্বংসের পথেই ছুটে চলতে থাকেন, তা হ'লে আমায় বাধ্য হয়েই বলতে হচ্ছে, রাজাধিরাজ! আপনি রাজ্যের শত্রু! দেশের শত্রু! নিজের বংশের শত্রু! আপনার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী এবং আবশ্যক!"

রাজপদতলে অকস্মাৎ আকাশের বজ্র খসিয়া পড়িলেও হয় ত তাঁহাকে এমন বিস্ময়-বিহ্বল করিতে পারিত না। তিনি শব-বিবর্ণ মুখে, থরকম্পিতদেহে ঘুরিয়া বসিয়া পড়িলেন। ক্ষণকাল তাঁহার ভাল করিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণেরও শক্তি রহিল না, এমনই তাঁহাকে তাঁহার ভূতপূর্ব্ব মহামন্ত্রি-পুত্র ও ইদানীন্তন ক্ষুদ্র অমাত্যের নির্ভীক ও সুস্পষ্ট তেজোগর্ভবাণী এক সঙ্গে ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ, শঙ্কিত ও লজ্জিত করিয়া তুলিতেছিল। বিষাক্ত বাণের ফলার মতই তাহা তাঁহার বুকের ভিতর কাটিয়া তুলিতেছিল। তাঁহার আহত অন্তঃকরণ কাটিয়া রুধিরাক্ত বিবেকবাণী নিমেষেরই জন্য ব্যগ্রমিনতিতে তাঁহার কণ্ঠে ঠেলিয়া উঠিল—"বোধিদেব! চিরমিত্র! তোমার উপদেশই মান্য করলেম—"

বোধিদেব তড়িৎস্পৃষ্টের মতই চমকিয়া একটুখানি অগ্রসর হইয়া আসিলেন—"রাজাধিরাজ!"

রাজাধিরাজ নীরবে স্বর্ণলেখনী ধারণ করিয়া আদেশপত্র লিখিলেন, তাহা নিঃশব্দে বোধিদেবের দিকে প্রসারিত করিতে বোধিদেব উহা গ্রহণপূর্ব্বক মস্তকে স্পর্শ করিলেন, "কিসের আদেশপত্র রাজাধিরাজ?"

"রামপাল ও শূরপালের বন্দিত্বমুক্তির।"

"মহারাজাধিরাজ !"—বোধিদেব আনন্দবিস্ময়ে বাক্যহারা হইয়া গিয়া শুধু নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বহু কষ্টে গভীরান্দোলিত মানসোদ্বেগ কথঞ্চিন্মাত্র রোধ করিয়া লইয়া রুদ্ধকণ্ঠে "জয় হোক রাজাধিরাজ !" এই কথাটি মাত্র উচ্চারণ করিয়াই দ্রুত চঞ্চলপদে কক্ষ ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। ম্রিয়মাণ ও উত্তেজিত জনসাধারণকে এই অপ্রত্যাশিত সুসংবাদে উৎফুল্ল করিয়া তুলিতে, তদপেক্ষাও প্রিয়তম বাল্যসখাকে নিদারুণ দুঃখ ও অবমাননাজনক কষ্টভার হইতে অবিলম্বে মুক্তিদান করিতে তাঁহার সারা চিত্ত তখন বায়ুর সঙ্গে সমান বেগেই ছুটিতে চাহিতেছিল।

বিজয়ীর গৌরববিভা ললাটে অঙ্কিত করিয়া লইয়া আনন্দস্বপ্নে বিভোরচিত্ত বোধিদেব প্রাণপণে ঘোড়া ছুটাইয়া চলিতেছেন। তাঁহার উৎসাহদীপ্ত নেত্রের সম্মুখে সমস্ত বিশ্বজগৎ যেন আজ একখানি আনন্দনাট্য অভিনয়ে নিযুক্ত হইয়া আছে। ধূলিসমাকীর্ণ রাজপথ, তৎপার্শ্বস্থ উচ্চাবচ প্রাসাদশ্রেণী, ফুল-ফলভারাবনত পাদপপরাজি, তৎপরে হরিৎ-শোভায় সুশোভিত বিচিত্র জলহীন শস্যক্ষেত্র—সকলই যেন আজ ভবিষ্যতের মঙ্গলচ্ছবিবৎ প্রতিভাত হইতেছিল বোধিদেবের যৌবন-বলদৃপ্ত, অথচ সুসংযত উদারচিত্তে আগত দিনের সহস্র কর্ত্তব্য ক্ষণে ক্ষণে স্ফুরিত হইয়া উঠিয়া তাঁহাকে আশায়, আনন্দে ও উৎসাহে উৎফুল্লতর করিয়া তুলিতেছিল। যে দিনে এই অস্তমিতপ্রায় পাল-সৌভাগ্য-রবি তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া পাল-সাম্রাজ্যগগনে পুনরুদিত হইবেন ! ওঃ, সে কি আনন্দ ! কি গৌরব !

"পরমভট্টারক, পরমসৌগত মহারাজাধিরাজের আদেশ, অমাত্য বোধিদেব ! দাঁড়ান।" পশ্চাতের এই আহ্বানে সবিস্ময়ে বোধিদেব অশ্ববল্গা সংযত করিলেন।

চারি জন সশস্ত্র রাজসৈনিকের সহিত মহাপ্রতীহার কুমার রুদ্রদমন স্বয়ং আসিয়া বোধিদেবের সম্মুখস্থ হইলেন

"রাজাজ্ঞায় আপনি আমার বন্দী।"

"রাজাজ্ঞায় বন্দী ! আমি ? না আপনার ভুল হইয়াছে, মহাপ্রতীহার

কুমার রুদ্রদমন সবিস্ময়ে উত্তর করিলেন, "ক্ষমা করবেন, বোধিদেব ! এই দেখুন, রাজহস্তের আদেশপত্র।" এই বলিয়া মহাপ্রতীহার রুদ্রদমন বাস্তবিকই রাজার স্বহস্তলিখিত একখানা আদেশপত্র বোধিদেবের বিস্ময়-বিহ্বল নেত্রদৃষ্টির সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন।

সৈনিক চারি জন আসিয়া তাঁহার বাহন অশ্বের চারি পার্শ্বে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল।

নবোদিত অরুণের তরুণ দীপ্তরাগ আকস্মিকোদিত অশনিসম্পাতশীল ঘনঘটায় আচ্ছাদিত করিলে আকাশের যেমন অবস্থা দেখায়, তেমনই মুখে ও হতাশাস্খলিতকণ্ঠে অমাত্য বোধিদেব কহিলেন, "চলুন, কোথায় যেতে হবে ?"

মাত্র কয়েক দণ্ড পূর্ব্বেই তাঁহাকেও তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট আর এক জন বন্দীও ঠিক এই একই কথা বলিয়াছিল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

অভিনেত্রী

কে তুমি দেখিছ মুখ সুন্দর মুকুরে ?
অতি লঘু মৃদু হাসি অধরেতে আঁকা !—
বিনোদ ভ্রূভঙ্গী কিবা দিব্য সুধামাখা—
নয়ন-মুকুরে দিব্য ভাবজ্যোতি স্ফুরে।

কাব্য কামনার কত প্রতিচ্ছবি লয়ে
খেল তুমি হে সুন্দরি নব নব বেশে !
কি সুষমা মনোহরা তব মুক্তকেশে,
কি মাধুর্য্য ফুটে তব হৃদি-নাট্যালয়ে !

কত কামস্বপ্ন দেখ আপনার মাঝে—
সুখে দুঃখে ফুটাও কি বিচিত্র বেদনা !
কাম, প্রেম, রঙ্গময়ী তুমি বরাঙ্গনা—
নন্দন অলকা-গীতি তব কণ্ঠে বাজে।
চিনি তোমা, অভিনেত্রী, তুমি কামরূপা,—
কাব্যপ্রতিচ্ছবি নাট্য-কৌমুদীস্বরূপা।

মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

জ্যামেকা
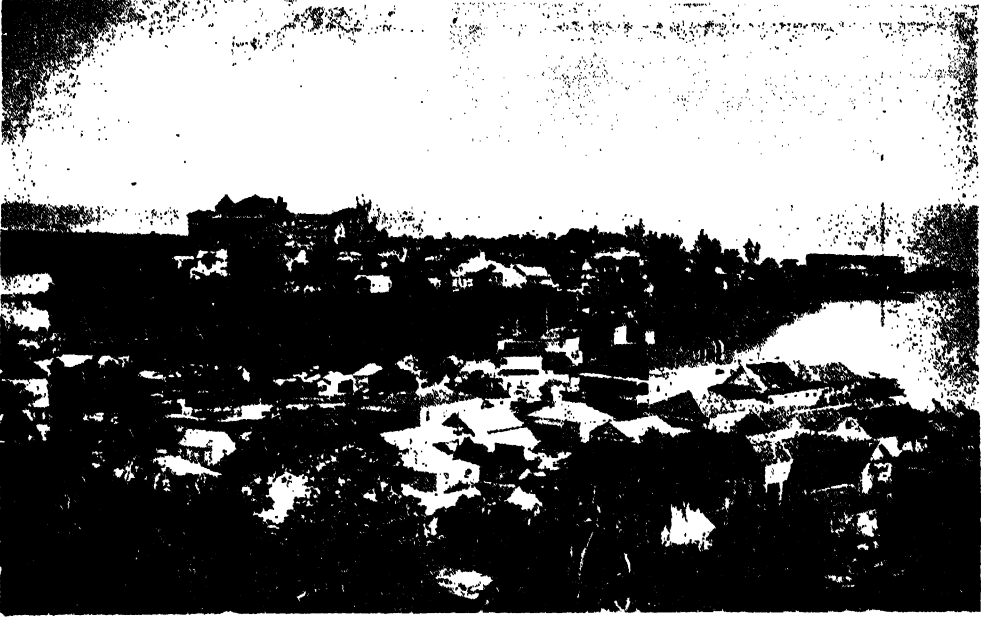
পোর্ট এণ্টোনীয় বন্দর

ক্যারিবিয়ান্ সমুদ্রের অন্তর্গত এই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ জ্যামেকা দ্বীপ সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য আছে। এই দ্বীপের আদিম অধিবাসীরা বর্ত্তমানে বৃটিশ-শাসনের অন্তর্গত থাকিয়া কি ভাবে জীবন যাপন করিতেছে এবং ভারতবাসীর সহিত তাহাদের অবস্থার সাদৃশ্য কতটুকু, তাহা সম্ভবতঃ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। পত্রান্তরে জন অলিভার লা গর্শ নামক জনৈক মার্কিণ সাহিত্যিক জ্যামেকা সম্বন্ধে নানাবিধ বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। 'মাসিক বসুমতীর' পাঠকবর্গের অবগতির জন্য উহা লিপিবদ্ধ করা হইল।

জ্যামেকা দ্বীপটির অবস্থান এমনই বিচিত্র যে, জলপথে যে দিক্ দিয়াই হউক না, ক্যারিবিয়ান্ সমুদ্রে গমন করিতে হইলে জ্যামেকা দ্বীপ অতিক্রম না করিয়া কোনও জলযানের গত্যন্তর নাই। পূর্ব্বকালে জলদস্যুগণ জ্যামেকার আশে-পাশে অনুক্ষণই লুণ্ঠনের জন্য সমবেত হইত।

আমেরিকার কনেক্‌টিকাট্ প্রদেশ দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে যত বড়, জ্যামেকার পরিধিও ঠিক সেইরূপ। এই দ্বীপের এমন কোনও স্থান নাই, যাহার দূরত্ব সমুদ্রকূল হইতে ২৫ মাইলের অধিক। কলম্বস্ ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে নূতন জগতের আবিষ্কারে প্রথমেই বাহামা দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার করেন। তৎপরে কিউবা দ্বীপ তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হয়। কিউবা অতিক্রম করিবার পরই জ্যামেকা দ্বীপ।

জ্যামেকার কিংস্‌টন বন্দর সুপ্রসিদ্ধ। এককালে 'পোর্টরয়াল' বন্দর ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ছিল; কিন্তু নিদারুণ ভূমিকম্পে এই অভিশপ্ত বন্দর সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে। কথিত আছে, উল্লিখিত বন্দর এককালে জলদস্যুদিগের ব্যাবিলন নামে অভিহিত হইত। সে যুগে এরূপ জঘন্য বন্দর কুত্রাপি দৃষ্ট হইত না। পাপের অবিশ্রান্ত প্রবাহ এই ধনৈশ্বর্য্যময় নগরে প্রবাহিত হইত। ১৬৯২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে এই বন্দরের নাম ছিল কনকনগর। ঐতিহাসিক হেণ্ডারসন্ লিখিত বর্ণনায় দেখা যায়, দীর্ঘ শ্মশ্রুসমন্বিত নাবিকগণ মণিমাণিক্যখচিত বেশে—সূক্ষ্ম কারুশিল্প-খচিত রেশমী বস্ত্রে ভূষিত হইয়া মত্তাবস্থায় অনবরত বন্দরের প্রকাশ্য স্থানে সুবৃহৎ স্বর্ণমুদ্রা লইয়া জুয়া খেলিয়া বেড়াইত। সেই স্বর্ণমুদ্রাগুলির মূল্য কত, তাহা নির্ণয় করিবার প্রবৃত্তিও কাহারও হইত না। শৌণ্ডিকালয়সমূহে রৌপ্য ও স্বর্ণপাত্র-পূর্ণ মদিরা-পানোৎসব দিবারাত্রি অবিশ্রান্তভাবে চলিত। সেই সকল স্বর্ণ ও রৌপ্যপাত্র আবার রত্নখচিত—শত শত ধর্ম্মমন্দিরের রত্নরাজি লুণ্ঠিত হইয়া এই সকল পানপাত্রের
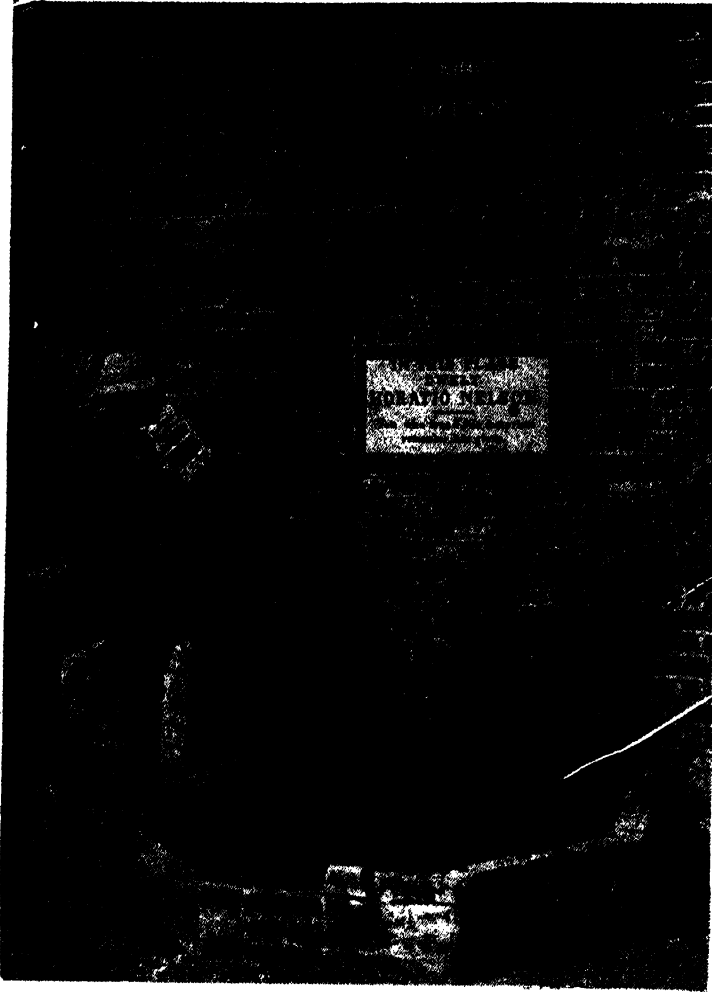
এই স্থানে নেলসন্ বিচরণ করিয়াছিলেন

সৌষ্ঠব সম্পাদিত হইয়াছিল। বন্দরস্থ প্রত্যেক গৃহ এক একটি ধনাগার। বন্দরের অধিবাসীদিগের উপর মূর্ত্তিমান শয়তান প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিল। সাধারণ নাবিকের কর্ণে রত্নখচিত সুবৃহৎ স্বর্ণকুণ্ডল শোভা পাইত। কথায় কথায় মানুষ মানুষের বুকে ছোরা বসাইয়া দিত। নৃত্য-গৃহে নিহত মানবের দেহ পড়িয়া থাকিত—সুরামত্ত পিশাচগণ অট্টরবে অকুণ্ঠিতভাবে নৃত্য ও পানে সারা রজনী অতিবাহিত করিত। মৃতদেহের সান্নিধ্য তাহাদিগের চিত্তে কোনও প্রভাব বিস্তার করিত না। মূল্যবান্ রত্ন ও স্বর্ণ সুলভ হইলেও মানুষের প্রাণ আরও সুলভ ছিল। শাস্তির আশঙ্কা, দণ্ডের ভয় কাহারও প্রাণে

শত্রুপক্ষের জলযানসমূহ আক্রমণ করিবার জন্য স্থানীয় শাসনকর্ত্তৃপক্ষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত বে-সরকারী জলযান ও সেনাবল গঠন করিতেন। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের নিয়োজিত দলের সহিত সাধারণ জলদস্যুদলের পার্থক্য নির্ণয় করা সে সময়ে কঠিন ব্যাপার ছিল। লুণ্ঠন-প্রবৃত্তি একবার স্বভাবগত হইলে তাহাতে বাধাদান করা অসম্ভব। জ্যামেকার তদানীন্তন শাসক মডিফোর্ড এই ব্যাপার উপলক্ষে পদচ্যুত হইয়াছিলেন। পরে প্রকাশ পাইয়াছিল, শত্রুপক্ষের জলযানসমূহ আক্রমণ-ব্যপদেশে তিনি যে বে-সরকারী দল গঠন করিয়াছিলেন, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারাই জলদস্যু ছিল। তাঁহার সমসাময়িক সাহিত্যিক লিখিয়া গিয়াছেন যে, এক এক জন লোক এক রাত্রিতে ২ হইতে ৩ হাজার স্বর্ণমুদ্রা অবলীলাক্রমে সুরা ও ব্যভিচারে ব্যয় করিত।

কিন্তু এমন তাণ্ডবলীলা দীর্ঘকাল চলে নাই। পাপের ভারে রয়ালবন্দর পরিপূর্ণ হইয়াছিল। তাই ১৬৯২ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুন তারিখে ভীষণ ভূমিকম্পে সমগ্র বন্দর আলোড়িত হইল। দুই মিনিটের মধ্যে দ্বীপের যাবতীয় ধর্ম্মমন্দির, বাসগৃহ এবং চিনির কারখানা চূর্ণ হইয়া গেল—বন্দরের ৩ ভাগের ২ ভাগ সমুদ্র গ্রাস করিয়া ফেলিল। দুর্গ, পরিখা কিছুই রহিল না। নগরের অধিবাসীদিগের অধিকাংশই হয় জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, নয় ত বিদীর্ণ মস্তকে ইহধাম হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল।

বৃটিশ নৌ-বিভাগের আডমিরাল সার চার্লস হামিল্টন ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছিলেন যে, সমুদ্রসমাহিত অট্টালিকাগুলি তখনও দৃষ্টিগোচর ছিল। লেফটেনাণ্ট জেফ্রে ১৮২৪ হইতে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত স্থানীয় সমুদ্রের পরিমাপকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তিনি বহু অট্টালিকার অবস্থান নির্ণয় করিয়াছিলেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে কিংস্টন বন্দরে জাহাজ মেরামত

ব্যাপার উপলক্ষে জনৈক ডুবুরী বহুবার জলমগ্ন নগরীর উপর উপনীত হইয়াছিল। অনেক গৃহের ছাদ তখনও বালুকামগ্ন হয় নাই।

পোর্ট রয়ালের স্মৃতি শুধু জলদস্যু ও ভূমিকম্পেই পর্য্যবসিত নহে। ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ নৌ-সেনানীরা এই স্থানে থাকিয়া নাবিকের কার্য্যাদি শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ নৌ-সেনাপতি হোরেসিও নেলসনের স্মৃতি এইখানে বিজড়িত আছে। ২১ বৎসর বয়সে ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে আক্রমণকারী ফরাসী নৌ বাহিনীর প্রতীক্ষায় নেলসন এইখানে দীর্ঘ রজনী উৎকণ্ঠা সহকারে যাপন করিয়াছিলেন। যেথানে দাঁড়াইয়া তিনি শত্রুর প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই স্থান প্রস্তর মণ্ডিত করিয়া রাখা হইয়াছে।

জ্যামেকায় ভারতীয় কুলী-নারী

বর্ত্তমানে কিংসটন জ্যামেকার প্রধান বন্দর ও সহর। এখানকার রাজপথগুলি যেমন পরিচ্ছন্ন—তেমনই সযত্নরক্ষিত। বড় বড় দোকানে বিক্রেয় পদার্থের মূল্য নির্দ্ধারিত—দরদস্তর নাই; কিন্তু অপেক্ষাকৃত ছোট দোকানে ঠিক ইহার বিপরীত। কোন দ্রব্যের মূল্য দোকানদার প্রথমতঃ যাহা বলিবে, ঠিক তাহার অর্দ্ধেক মূল্যে সেই জিনিষ বিক্রীত হইয়া থাকে। খরিদ্দার চালাক না হইলে তাহাকে বিশেষ ঠকিতে হয়; বাজারে বেশীর ভাগ নারীরাই দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া থাকে। নানাবিধ ফল মূল অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে এখানে উৎপন্ন হইয়া থাকে। লঙ্কা, কোকো, নারিকেল, আম্র, তাম্রকুট প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

এক কালে কাঠের কায এই দ্বীপে অতি চমৎকার হইত। দুই এক পুরুষ পূর্ব্বে দারুনির্ম্মিত তৈজস-পত্র অপর্য্যাপ্ত ও সুন্দরভাবে নির্ম্মিত হইত; কিন্তু মার্কিণ যুক্ত রাজ্যের সহিত প্রতিযোগিতায় এই ব্যবসার এখন বিলুপ্তপ্রায়।

জ্যামেকার প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম। সহরতলীর দিকে বেড়াইতে গেলে ফল ও ফুলের ঘন সুগন্ধে প্রাণ ভরিয়া উঠিবে, পাখীর কলগানে কান ভরিয়া যাইবে। এখানে সূর্য্যের উত্তাপ অত্যন্ত প্রখর; কিন্তু প্রত্যহ নীলপর্ব্বতমালা হইতে বায়ুপ্রবাহ উত্থিত হইয়া সমগ্র দ্বীপে প্রবাহিত হয়—বৈদ্যুতিক পাখার অবিশ্রান্ত আবর্ত্তনের ন্যায় এই বায়ুপ্রবাহ শরীরকে স্নিগ্ধ করিয়া দেয়। রাত্রিকালেও শীতল বায়ুপ্রবাহ বহিতে থাকে।

জ্যামেকাদ্বীপের লোকসংখ্যা ৪ লক্ষ ৬০ হাজার। তন্মধ্যে ১৫ হাজার মাত্র শ্বেতকায়, বক্রী নিগ্রো। নিগ্রোদিগের মধ্যে দুইটি বিভাগ আছে। এক দল মিশ্রিত জাতি, অপর দল খাঁটি নিগ্রো।

অশ্বেত জাতির মধ্যে ১ লক্ষ ৬০ হাজার মিশ্র নিগ্রো এবং বক্রী ৬ লক্ষ ৬০ হাজার আফ্রিকাজাত নিগ্রোর বংশধর। সঙ্করজাতীয় নিগ্রোরা দেখিতে শুনিতে অনেকটা ভাল

কিংসটন—বাজারের দৃশ্য

দ্বীপের মধ্যে অশ্বেত জাতির সংখ্যা শ্বেত জাতির অপেক্ষা বহুগুণ অধিক হইলেও শ্বেতকায়গণই দ্বীপটিকে সকল বিষয়ে শাসন করিতেছে। মিঃ অলিভার লা গর্সি লিখিয়াছেন, "বৃটিশ জাতি এই দ্বীপের শাসনসমস্যা অতি সুকৌশলে সমাধান করিয়াছেন। অশ্বেত জাতি সংখ্যাধিক্য

এবং আবলুসকাষ্ঠ-বিনিন্দিত নিগ্রোদিগের অপেক্ষা লেখা-পড়ায়, শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত। শ্বেতজাতীয় লোকগণ দ্বীপের যাবতীয় উচ্চপদ অধিকার করিয়া আছে। ছোটখাট কায-গুলি অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত সঙ্করজাতীয় নিগ্রোরাই পাইয়া থাকে।

মার্কিণের বাজারে কদলী প্রেরিত হইতেছে

নিগ্রোর পল্লী-কুটীর

ইক্ষুক্ষেত্রের দৃশ্য

বশতঃ একবার দ্বীপস্থ শাসন-পদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন করিতে গিয়াছিল। কিন্তু বৃটিশের রাজনীতি-কুশলতায় তাহা ঘটে নাই। সঙ্কর নিগ্রো এবং খাঁটি নিগ্রোগণ ব্যবস্থা-পরিষদে আবেদন-নিবেদন করে; কিন্তু চরম ফল শ্বেতজাতির মুঠার মধ্যে। সুতরাং বৃটিশ শাসন সেখানে কোনও দিন খর্ব্বতা প্রাপ্ত হইবে না।"

দেশীয় ঝুড়িনির্ম্মাতা

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে 'মোরাণ্ট বে' নামক স্থানে নিগ্রো অভ্যুত্থান হইয়াছিল উহার পরে বৃটিশগণ এই স্থির করেন যে, দ্বীপমধ্যে ব্যবস্থাপরিষদ থাকিবে না, সমস্ত ক্ষমতা ইংরাজ সম্রাটের হস্তেই ফিরিয়া যাইবে।

এখন দ্বীপে এক জন শাসনকর্ত্তা আছেন, প্রিভিকাউন্সিল আছে এবং একটা ব্যবস্থা-পরিষদও বিদ্যমান। প্রিভিকাউন্সিলের সদস্য ও শাসনকর্ত্তা ইংলণ্ডেশ্বরের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। ব্যবস্থাপরিষদের প্রেসিডেণ্ট স্বয়ং গভর্ণর। উহার ২৯ জন সদস্যের মধ্যে ৫ জন রাজকর্ম্মচারী, ১০ জন মনোনীত এবং ১৪ জন নির্ব্বাচিত সদস্য। সুতরাং ব্যবস্থাপরিষদে শ্বেতকায়দিগেরই প্রাধান্য, গভর্ণরের 'ভিটো' করিবার ক্ষমতা আছে। যদি ১৪ জন নির্ব্বাচিত সদস্য কালাই হয়, তথাপি ধলাদিগের পরাজয়ের কোনই আশঙ্কা নাই—চাবীকাঠি তাহাদেরই হস্তে থাকিবে।

সুতরাং নিগ্রোরা রাজনীতির খেলায় যত রকম চেষ্টাই করুক না কেন, দ্বীপের শাসনযন্ত্র বিকল হইবে না—নির্ব্বিবাদে ধলা জাতি কালা জাতির উপর প্রভুত্ব করিতে থাকিবে।

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ সরকার দ্বীপ হইতে ক্রীতদাসপ্রথা রহিত করিয়া দিয়াছেন। ইহার ফলে দেশমধ্যে একটা স্বাভাবিক আলস্যের সঞ্চার হইয়াছিল। স্বাধীনতা লাভ করিবার পরে যাহারা ক্রীতদাস ছিল, তাহারা সম্পূর্ণ

কৃষিক্ষেত্রে ভারতীয় শ্রমিক নারী

আলস্যে কাল হরণ করিতে থাকে। ইহাতে দ্বীপের চাষ-আবাদের অত্যন্ত ক্ষতি হয়। বড় বড় ক্ষেত্রস্বামীরা চাষ-আবাদের দুর্দ্দশা পূর্ব্ব হইতে কল্পনানেত্রে দর্শন করিয়া জমীজমা বিক্রয় করিয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

কিন্তু অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ক্ষেত্রস্বামীরা তাঁহাদের পন্থানুসরণ করিতে পারে নাই। সুতরাং তাহাদিগকে অসীম ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল।

ধর্ম্মমন্দিরের প্রসিদ্ধ ঘণ্টা

শ্রমজীবীর কার্য্যে নিগ্রোগণ যখন যোগদান করিল না, তখন জ্যামেকা সরকার অন্য স্থান হইতে শ্রমজীবী আনয়ন করিয়া চাষ-আবাদের কার্য্য আরম্ভ করাইলেন। তাহাদের দৃষ্টান্তে দ্বীপের নিগ্রোগণ ক্রমে আলস্য ত্যাগ করিয়া চাষের কার্য্যে মনঃসংযোগ করে। পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে যে সকল শ্রমজীবী জ্যামেকা দ্বীপে আসিয়াছিল, তাহাদের অনেকেই এখনও তথায় বসবাস করিতেছে।

দাসত্ববন্ধনমুক্ত নিগ্রোগণ কয়েক বৎসর পরে বুঝিতে পারিল যে, জ্যামেকার ন্যায় সুজলা সুফলা নন্দনকাননেও বিনা পরিশ্রমে উদরের অন্নের সংস্থান করা যায় না; কিছু কিছু পরিশ্রম অবশ্য প্রয়োজনীয়। তখন তাহারা ইক্ষু চাষ, ইক্ষু-মাড়াই প্রভৃতি কার্য্যে যোগদান করিল।

বাস্তবিক গ্রাম্য নিগ্রোগণ সহসা কার্য্য করিতে চাহে না। তাহাদের কাছে কোনও বিষয়েরই অভাব অনুভূত হয় না। প্রচুর ফল ও শস্যশালিনী জ্যামেকা তাহাদের সকল অভাবই পূর্ণ করিয়া থাকে, অতি সামান্য পরিশ্রম করিলেই গ্রাম্য নিগ্রোর সকল অভাব দূরীভূত হয়। সারা-বৎসরব্যাপী পরিশ্রম কাহাকেও করিতে হয় না।

নদীবক্ষে জলবিহার

বাড়ীভাড়া বলিয়া কোনও বিষয় পল্লীর নিগ্রো-দিগকে বুঝিতে হয় না। সুদীর্ঘ তৃণ ও কদলীপত্রের সাহায্যে তাহারা কুটীর নির্ম্মাণ করে। কেহ কেহ মাটীর বাড়ীও প্রস্তুত করে। যাহাদের স্বচ্ছল অবস্থা, তাহারা দারুনির্ম্মিত বাসভবন গড়িয়া তুলে। দেবদারু অথবা স্বল্পমূল্য তক্তাভাঙ্গা, টিন প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া তাহারা গৃহ নির্ম্মাণ করে। সুতরাং অল্প খরচেই গৃহের ব্যাপার তাহারা চুকাইয়া লয়।

পল্লী-গৃহিণীর রুটী প্রস্তুত

পরিচ্ছদ-সমস্যাও তাহাদের নাই বলিলেই চলে। বালক-বালিকারা নগ্ন দেহে অনেক দিন কাটাইয়া দিতে পারে। নারীরা কার্পাসজাত সূত্রে প্রস্তুত গাউন পরিধান করে। যত দিন লজ্জা নিবারণ করা চলে, তত দিন কোনও পল্লী নারী তাহা পরিত্যাগ করে না। রবিবার তাহারা একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। পুরুষরা কাপড়ের পাজামা, সার্ট ও টুপী পরিয়া থাকে।

জ্যামেকা দ্বীপ

সমগ্র জ্যামেকা দ্বীপে প্রকৃতির অনবদ্য সুষমা দেখিতে পাওয়া যাইবে। ফল-পুষ্পভরা এমন রমণীয় স্থান সুলভ নহে। সকল বিষয়েই জ্যামেকার প্রাচুর্য্য বিস্ময়কর।
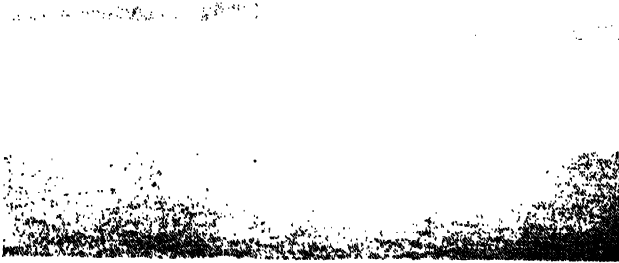
জ্যামেকা দ্বীপ যখন স্পেনের শাসনাধীন ছিল, সে সময়ে এই উপনিবেশের নাম ছিল, 'সান্টিয়াগো ডি-লা-ভেগা'। ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে উহার প্রতিষ্ঠা হয়। ১৫৩৬ খৃষ্টাব্দে জ্যামেকা দ্বীপ লুই কলম্বসকে (ডায়েগো কলম্বসের পুত্র) প্রদত্ত হয়। তিনি মার্কুইস ডি-লা-ভেগা এই উপাধি গ্রহণ করেন।

নারিকেল শস্যসংগ্রহ

স্পেনের অধিকারভুক্ত থাকা সময়ে রাজধানী যেথানে ছিল, এখন তথায় নাই—এখন কিংসটনই প্রধান সহর। কিন্তু দ্বীপমধ্যে স্পেনের স্থাপত্য-শিল্প প্রভৃতির পরিচয় এখনও প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান।

দ্বীপে নারিকেল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। সামান্য চাষ করিলে প্রতি একর ভূমিতে সাড়ে ৩ হাজার বৃহৎ নারিকেল

পণ্যবিক্রেত্রী নিগ্রো নারীর দল

যাইত। এখন ২ শত মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত রেল-পথ হইয়াছে।

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দ হইতে বহু শ্রমজীবী জ্যামেকায় গমন করিয়াছে। এখন পর্য্যন্ত ২৩ হাজার এসিয়াবাসী তথায় বসবাস করিতেছে। রাজপথে তাহাদিগকে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়।

জ্যামেকা নদীমাতৃক দ্বীপ। রায়ো গ্রাণ্ডি অতি রমণীয় ও প্রসিদ্ধ নদী। দর্শকগণ অনেক সময় এই নদীতে ভেলায় চড়িয়া আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। রায়ো গ্রাণ্ডি ব্লু পর্ব্বত হইতে সমুত্থিত হইয়া সমুদ্রবক্ষে মিলিত হইয়াছে। জ্যামেকায় বহু নদী বিদ্যমান। এই নদ-নদী পরিবৃত দ্বীপটি শ্যামশোভায় নয়নানন্দদায়ক। মার্কিণ-পর্য্যটকগণ জ্যামেকাকে স্বর্গোদ্যানের সহিত তুলনা করিয়া ইহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

কাষ্ঠবোঝাই নৌকা

জন্মিয়া থাকে। নানাবিধ মসলাও জ্যামেকায় পাওয়া যায়। 'পাইম্‌নটস্' নামক এক প্রকার মসলার বৃক্ষ আছে। এই গাছ ৩০ ফুট উচ্চ হয় এবং গুঁড়ির ব্যাস ৩ ফুট। এই বৃক্ষের ত্বক্ অত্যন্ত মসৃণ ও উজ্জ্বল—পাতা গাঢ় সবুজ। এই গাছের ফল পাকিবার পূর্ব্বে সংগ্রহ করিতে হয়। যে কোন বালক এই গাছে আরোহণ করিয়া গুচ্ছসহ ফলগুলি পাড়িয়া আনে। তাহার পর ৬ হইতে ১০ দিন রৌদ্রে শুকাইয়া লইলে এই মসলা বাজারে বিক্রীত হইতে পারে। 'পাইম্‌নটস্'-গুলির গন্ধ অনেকটা দারুচিনি ও লবঙ্গের মত।

জ্যামেকা দ্বীপে রেল-পথ আছে। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম রেল-পথ উন্মুক্ত হয়। তখন ১৫ মাইল পর্য্যন্ত রেল চলিত। কিংসটন হইতে পোর্ট আণ্টোনিও পর্য্যন্ত রবিবার ব্যতীত প্রত্যহ একখানি ট্রেণ আসিত, একখানি

নিগ্রো জেলে মাছ লইয়া চলিয়াছে

জ্যামেকা দ্বীপ সকল স্পেনের অধীন ছিল, সেই সময়ে জ্যামেকার প্রধান নগরগুলিতে বহু ধর্ম্মমন্দির ও সমাধিক্ষেত্র নির্ম্মিত হইয়াছিল। স্পেনের ভাস্কর্য্য সেই সকল ধর্ম্মমন্দিরে বিদ্যমান। পর্য্যটকগণ সেই সকল বিচিত্রদর্শন ধর্ম্মমন্দিরগুলি দর্শন করিয়া এখনও পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন। প্রাচীনকালের সেই স্মৃতি মন্দিরগুলি দর্শনীয়।

রজ্জু নির্ম্মাণের কারখানা

সমাধিক্ষেত্রে বহু সম্ভ্রান্ত য়ুরোপীয় নর-নারীর শবদেহ সমাহিত আছে। প্রকৃতির লীলানিকেতন জ্যামেকা দ্বীপ সহজেই দর্শকের মন মুগ্ধ করিয়া থাকে—সমাধিক্ষেত্রের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য আরও বিচিত্র। নানারূপ ফল ফুলে সুশোভিত সমাধিক্ষেত্র রম্যোদ্যানে পরিণত করিয়া স্পেনবাসিগণের সৌন্দর্য্যানুভূতির যে প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছিল, এখনও তাহা বিলুপ্ত হয় নাই।
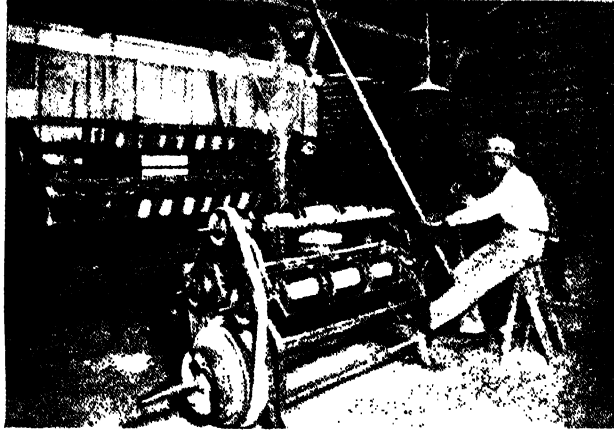
ধর্ম্মমন্দিরসমূহে জন্ম ও মৃত্যুতালিকা সযত্নে সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছে। প্রাচীন খাতাগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিলে ইংলণ্ডের বহু মনীষী ব্যক্তির জন্মদিনের ইতিহাস উদ্ধার করা যায়।

দ্বীপের মধ্যস্থ পাহাড়গুলি সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়দর্শন। আণ্টাক্রুজ পর্ব্বতের মালভারম্ নামক স্থানটি সমুদ্রতট হইতে আড়াই হাজার ফুট উচ্চে অবস্থিত। এই স্থানে আসিলে গ্রীষ্মকালেও গ্রীষ্মের পীড়ন সহ্য করিতে হয় না।

কিংস্টন নগর হইতে সেণ্ট আন্‌স উপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত উচ্চাবচ পথে মোটরযোগে ভ্রমণ পরম রমণীয়। পর্য্যটকদিগের জন্য এই স্থানে ২ হাজার ৩ শত ফুট উচ্চ পাহাড়ের উপর হোটেল বিদ্যমান।

জ্যামেকার গ্রীষ্মাবাস

জ্যামেকা সম্বন্ধে বর্ণনা প্রসঙ্গে মিঃ অলিভার লা গর্শ এক-স্থলে লিখিয়াছেন, "এই দ্বীপে পর্য্যটন কিরূপ চিত্তমুগ্ধকারী, কোনও ব্যক্তি তাহা ভাষার সাহায্যে বর্ণনা করিতে অসমর্থ। সৃষ্টির—প্রকৃতির এমন বৈচিত্র্য কুত্রাপি দৃষ্টি-গোচর হয় না। এই প্রকার দৃশ্য কোথাও নাই। বর্ণপরিবর্ত্তন-বহুল এমন সুন্দর নিসর্গ চিত্র আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। কৃষিপদ্ধতি এবং চাষ আবাদ সম্বন্ধেও এমন বিস্ময়কর বৈচিত্র্য আমেরিকা কেন, অন্য কোথাও আছে বলিয়া মনে পড়ে না।

বেণুবীথি মধ্যস্থ রাজপথ

"পার্ব্বত্য প্রদেশে মোটর গাড়ী চলিবার পথ অজগরের মত আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে। কোনও পাহাড়ের উপর যখন মোটর আসিয়া দাঁড়ায়, তখন এক অভিনব দৃশ্য নয়নে-ন্দ্রিয়কে মুগ্ধ-অভিভূত করিয়া ফেলে। এইমাত্র পশ্চাতে যে বিচিত্র রম্য স্থান ফেলিয়া আসিয়াছি, নূতন দৃশ্যের কাছে তাহা যেন ম্লান হইয়া যায়। সমগ্র দ্বীপের মধ্যে এমনই নিসর্গ দৃশ্য!"

কৃষ্ণকায় জনপূর্ণ বৃটিশ-শাসিত এই দ্বীপ সম্বন্ধে মার্কিণ লেখক যেরূপ নিসর্গচিত্রের বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, প্রকৃতই এমন দ্বীপ পৃথিবীতে অতি অল্পই বিদ্যমান। স্পানিয়ার্ড-গণ বোধ হয় সুজলা-সুফলা জ্যামেকার এই মনোহারিণী মূর্ত্তি এবং শস্য সম্ভারের মোহে আকৃষ্ট হইয়াই এই দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। সম্ভবতঃ প্রচুর শস্যশালিনী দেখিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট জ্যামে-কার কর্ণধার হইয়াছেন। কালা নিগ্রোগণের কতকাংশ জাতীয়-জীবনে উদ্বুদ্ধ হইয়া ভারতবাসীর ন্যায় আবেদন-নিবেদন লইয়া দিন-যাপন করিতেছে। শিক্ষাপদ্ধতি তাহাদের মধ্যে এখনও তেমন ভাবে প্রচারিত হয় নাই।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ

তত্ত্বকথা

গুরু হতে চায় সবে, শিষ্য কেহ নয়।
শিষ্য ছাড়া গুরুগিরি সে কেমন হয়!
শিষ্য হতে শক্তি নাই, গুরু হতে সাধ
বামন হইয়া চায় ধরিবারে চাঁদ॥

শিষ্য হতে যত্ন কর, ছাড় অহঙ্কার।
দুরাকাঙ্ক্ষা ছাড়ি কর গুরুপদ সার।
গুরু যারে কৃপা করে শিষ্য সেই হয়
সচ্চিদানন্দ সে গুরু অন্য কেহ নয়॥

জিজ্ঞাসী।

অন্তরীণের বধূ

অনেক দিন পরে মালদা জিলার একটা গল্প মনে পড়িয়া গেল। গল্পের কোন বৈশিষ্ট্য না থাকিলেও সত্যের মাধুর্য্য আছে। তবে সত্য কথাটা গল্পলেখক ও পাঠকরা মোটেই পছন্দ করেন না। চমকিয়া উঠার মত গল্পে কিছু না থাকিলে নূতন সমালোচকের দল বলিবেন, লেখকের কল্পনাশক্তি অতি সামান্য। তা বলুন, কি করিব।

ঘটনাটি ঘটিয়াছিল নিমগাছি গ্রামে। গ্রামখানি ছোট হইলেও অনেকগুলি সরকারী আফিস সেখানে আছে। গ্রামের নীচে মহানন্দা মন্থর গতিতে বহিয়া চলিয়াছে। এই নদী গ্রামের সম্পদ্।

নদীর ধারে থানা-ঘর। ঘরখানি ছোট, কিন্তু দারোগা আছেন আড়াই—বড়, ছোট ও জমাদার। বড় বনমালী বাবু বিচক্ষণ হইলেও বড় একটা উন্নতি করিতে পারেন নাই; তাঁহার দয়ার শরীর, পরকে পীড়ন করিয়া টাকা লইতে তিনি জানিতেন না। পরের কান্না দেখিলে তাঁহার কান্না আসিত। ছোট যতীন বাবু একবারে উল্টা। পরের কান্না দেখিলে তাঁহার আনন্দ হইত। মফঃস্বলে যখন যাইতেন, তখন প্রজাদের না কাঁদাইয়া তিনি ফিরিতেন না। পরের অশ্রু তাঁহার প্রিয় ছিল। আড়াই নম্বরের জমাদার সাহেব, কড়াই ডালের বড়ীবিশেষ—ঝোলে ঝালে অম্বলে সব-তা'তেই থাকিতেন। যতীন বাবুর সঙ্গে মফঃস্বলে গেলে গরীবদের উপর খুবই তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতেন, আবার বনমালীর সঙ্গে গেলে গরীবদের দুঃখে অশ্রুপাত করিতেন।

থানা-ঘর হইতে কিছু দূরে একখানি ছোট চালা-ঘর ছিল। সেখানিও নদীর ধারে। খুব নিকটে লোকালয় নাই, একটু দূরে রেজিষ্ট্রী আফিস ও বাবুদের বাসা। এই চালা-ঘরখানি নির্ম্মিত হইয়াছিল অন্তরীণের বাসের জন্য।

ণ—না বন্দী, না স্বাধীন—নহুষের ন্যায় আকাশ-
ীর মধ্যে অবস্থান করিতেছে। পুলিস-কর্ম্মচারীর ইচ্ছা হইলে তিনি যাহাকে তাহাকে ধরিয়া অন্তরীণ করিতে পারিতেন। তাহার বিচার হইত না, তাহার পক্ষে বা স্বপক্ষে কোন প্রমাণ লওয়া হইত না—তাহাকে মাতৃক্রোড় হইতে ছিঁড়িয়া আনিয়া দূরদেশে চালান করা হইত। তবে সরকার তাহাকে মাথা গুঁজিবার স্থান দিতেন, পেট ভরিয়া খাইতেও দিতেন। স্বেচ্ছামত গ্রামের ভিতর বেড়াইতে দিতেন, দেশে স্বজনদিগকে পত্র লিখিতে দিতেন, কাগজপত্র পড়িতে দিতেন; গানবাজনায় সরকারের আপত্তি ছিল না, কিন্তু নেশা করিতে দিতেন না।

অন্তরীণের ঘরখানির মেঝে মাটীর, দেয়াল কাঠির, ছাউনি খড়ের। লম্বায় আট হাত, চওড়ায় ছয় হাত। ঘরের সামনে একটুখানি দাওয়া, তাহারই একাংশ ঘিরিয়া রন্ধন-শালার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ঘরখানি বর্ত্তমানে খালি ছিল না—হতভাগ্য ললিতকুমার মিত্র তথায় বাস করিত। তাহার নিবাস খুলনা জিলায়, বয়স ২১ বৎসর, অপরাধ অজ্ঞাত। কলিকাতায় মেসে থাকিয়া ললিত এম, এস-সি পড়িত; পরীক্ষা দিবার উদ্যোগ করিতেছিল, এমন সময় সহসা এক দিন পুলিস তাহাকে ধরিয়া আনিয়া চালান দিল। জলপাইগুড়ীর কোন অস্বাস্থ্যকর স্থানে তাহাকে কিছু দিন থাকিতে হইয়াছিল। তাহার শরীর যখন বেশ ভাঙ্গিয়া গেল, তখন কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে স্বাস্থ্যকর নিমগাছিতে বদলী করিলেন।

নিমগাছিতে আসিয়াই যে তাহার শরীর সারিল, এ কথা বলা যায় না; তবে অনেকটা সুস্থ হইল। নদীবক্ষ ভেদ করিয়া ষ্টীমার, বড় নৌকা, পান্সী যাতায়াত করিত, তাহা সে শয্যায় শুইয়া শুইয়া আগ্রহান্বিত চিত্তে দেখিত, দেখিবার কিছু পাইত বলিয়া তাহার কত আনন্দ। যখন সে শয্যা ছাড়িয়া উঠিতে পারিল, তখন সে সময় সময় নদীর ধারে আসিয়া বসিত। কত চিল জলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া নিরীহ মাছকে লইয়া পলাইত, তাহা সে ব্যথিতচিত্তে দেখিত।

তাহার ইচ্ছা করিত, মাছকে সতর্ক করিয়া দিতে, কিন্তু সতর্ক করিবার অবসর পাইত না—বলবান্ চিল দুর্ব্বল মাছকে ধরিয়া লইয়া মহাবেগে প্রসন্নচিত্তে উড়িয়া যাইত। ললিত এ দৃশ্য আর দেখিতে পারিত না—উঠিয়া ঘরে ফিরিত।

মাঝে মাঝে ললিত থানা-ঘরে বনমালীর পাশে আসিয়া বসিত। তিনি ললিতকে একটু স্নেহ করিতেন। হাসপাতাল হইতে তাহাকে ঔষধ আনাইয়া দিতেন, নিজের ঘর হইতে পথ্যাদি যোগাইতেন, পরিচর্য্যার জন্য এক জন বয়স্কা নারী রাখিয়া দিয়াছিলেন। তাহাকে সাধ্যমত বুঝিতে দিতেন না যে, সে বন্দী। পুলিসের হাতে অন্তরীণ সচরাচর যে ব্যবহার পাইয়া থাকে, বনমালী ললিতের প্রতি সেরূপ ব্যবহার করিতেন না। সরকার বলিয়া দিতেন না, অভাগাদের প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার কর, তাহাদের মস্তিষ্ক বিকৃত কর, তাহাদিগকে ব্যাধিগ্রস্ত কর। যে শক্তিমান্, সে দুর্ব্বলকে পীড়ন করে না; পীড়ন করে ক্ষুদ্রচেতা, ক্ষুদ্র কর্ম্মচারীরা। যাহার শক্তি নাই, সে শক্তি দেখাইতে চেষ্টা করে। সরকারের অজ্ঞাতে অত্যাচার হইলে তাহার প্রতিবিধান সম্ভবপর হইত না। যাহার চক্ষু দিয়া সরকার দেখিবেন, সে ভুল দেখাইলে সরকার কি করিবেন?

যে নারী পরিচর্য্যার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহার নাম নিত্য। সে জাতিতে কৈবর্ত্ত, বয়স চল্লিশ; তাহার রং কালো হইলেও তাহাকে দেখিতে ভদ্রঘরের মেয়ের মত; কথাবার্ত্তা চাল-চলন সব ভাল। দাসীপণা সে কখন করে নাই, করিবার প্রয়োজন হয় নাই। স্বামী কিছু জমীজমা রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতেই নিত্য ও তাহার কন্যা বিনুর এক রকম চলিয়া যাইত। পরের দ্বারে কখন আঁচল পাতিতে হয় নাই। মায়ে ঝিয়ে দুই জনই বিধবা। সাত বৎসর বয়সে কন্যা বিনোদিনীর বিবাহ হইয়াছিল; বৎসর ঘুরিতে না ঘুরিতে হাতের 'নোয়া' খুলিয়া বাপের ঘরে সে ফিরিয়া আসিল। বাপ-মা কাঁদিল, মেয়ে কিন্তু নিশ্চিন্ত হইল,—বাপ-মাকে ছাড়িয়া তাহাকে আর শ্বশুরঘরে যাইতে হইবে না। এখন তাহার বয়স ১৫ বৎসর।

২

ললিতের মাঝে মাঝে প্রবল জ্বর হইত। জ্বরের সখা কম্প অগ্রবর্ত্তী হইয়া জ্বরকে আহ্বান করিয়া আনিতেন। এক দিন বৈকালে কম্পটা কিছু বেশী হইল; অথচ গায়ে দিবার লেপ বা কম্বল ছিল না। গ্রীষ্মকালে গাত্রবস্ত্রের প্রয়োজন অনুভূত হয় না, সুতরাং সরকার কম্পকে দমন করণার্থে কোন উদ্যোগ-আয়োজন করেন নাই। কম্প-দৈত্য নিরস্ত্র প্রজাকে নিঃসহায় পাইয়া পীড়ন আরম্ভ করিল। কাঁপিতে কাঁপিতে ললিত কহিল, "আমার গায়ে কিছু চাপা দাও, নিত্য।"

নি। কি চাপা দেব? কিছুই ত দেখছি না।

ল। কাপড়-চোপড় যা হয়,—

বিনু সেখানে ছিল; কহিল, "আমাদের বাড়ী থেকে কাঁথা এনে দেব, মা?"

নি। আমাদের কাঁথা বাবুর গায়ে? ছি!

ল। আমি বাবু নই, আমি তোমার ছেলে, মাসী,—এক মাস তোমরা আমার যে যত্ন করেছ।

নিত্য মেয়ের দিকে ফিরিয়া কহিল, "যা', দৌড়ে যা'—ভাল কাঁথা আনিস।"

বিনু ছুটিল। ঘর হইতে বাহির হইতে না হইতে যতীন দারোগার সহিত দেখা হইল। তিনি কহিলেন, "কোথা যাচ্ছ, বিনু?"

বিনু মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া অধোমুখে কহিল, "কাঁথা আনতে।"

"কাঁথা কি হবে?"

"বাবুর জন্যে—তাঁর জ্বর হয়েছে।"

"ওরে বাপ রে! যে বেটা আমার চাকরের যুগ্যি নয়, সে হ'ল বাবু! দেখছি, তোরাই ওর মাথা খেলি।"

বিনু কোন উত্তর না দিয়া প্রস্থানোদ্যতা হইল। যতীন কহিল, "দেখ বিনু, তোরা বড় বাড়াবাড়ি ক'রে তুলেছিস্; ওখানে যাওয়া তোদের বন্ধ ক'রে দিচ্ছি।"

সে কথারও বিনু কোন উত্তর করিল না। যতীন ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, "দেখ, আমার কথা যদি না শুনিস্—'

"বাবু, ও সব কথা বলবেন না।"

"কেন, তুমি কি সতীলক্ষ্মী?"

"আমরা গরীব হ'লেও আমাদের ধর্ম্ম আছে।"

সে ক্ষিপ্রপদে প্রস্থান করিল। পশ্চাতে যতীন গজরাইতে লাগিল।

বিনুর ঘর নিকটে—রেজেষ্ট্রী আফিসের পশ্চাতে। বিনু ঘর খুলিয়া দুইখানি কাঁথা বাছিয়া লইল। নিজের একখানি বাসি-করা কাপড় বাহির করিয়া কাঁথা দুইখানি

তাহাতে জড়াইল এবং ঘর বন্ধ করিয়া মায়ের কাছে ফিরিয়া আসিল। আসিয়া দেখিল, তাহার মা রোগীকে কোলে তুলিয়া লইয়া বুক দিয়া চাপিয়া রহিয়াছে। মায়ে ঝিয়ে তাহাকে কাঁথা চাপা দিয়া ভাল করিয়া শোয়াইয়া দিল। ললিত কহিল, "আমি বেশ ছিলাম মাসী-মা, কেন আমাকে শুইয়ে দিলে ?—আমি অনেক দিন মায়ের আদর পাই নি।"

নিত্যর চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। ললিত কহিল, "ঘরে আছে আমার মা, ভাই, বোন্; এখানে আছ তুমি, বনমালী-দা, আর বিনু।"

"তোমার—আপনার—কি বিয়ে হয় নি ?"

"ছেলেকে তুমি বোলো, মাসী-মা।"

"তোমার বিয়ে হয়েছে, বাবা ?"

"না, হয় নি। পাসটা দিয়ে বিয়ে করবার কথা ছিল।"

"তা' এরা তোমাকে ধ'রে আন্‌লে কেন ?"

"তা' ত জানি না, মাসী-মা।"

"বিনা দোষে তোমাকে ধরলে ?"

"রাজার চোখে হয় ত আমি দোষ ক'রে থাকব, কিন্তু আমি আজও তা বুঝতে পারি নি। কালেজে যেতাম, আর ঘরে ব'সে পড়া করতাম। এই করেই আজ আমি একুশ বছর পূর্ণ করেছি। কারুর সঙ্গে মিশি নি, থিয়েটার-বায়স্কোপে যাই নি ; বিকেলে শুধু একটু খেলা করতে যেতাম। সময় সময় ভাবি, কোন্ অপরাধে আমার এই দণ্ড।"

নিত্য ও বিনু নিস্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিল। ললিত একটু জল চাহিল। নিত্য জল দিয়া কহিল, "তুমি অত বোকো না।"

ললি। জ্বর হ'লে বোক্‌তে ইচ্ছে করে। তোমরা আছ, তাই বোক্‌ছি, নইলে গান ধরতুম।

বিনু। ডাক্তার বলেছিলেন, জ্বর বেশী হ'লে মাথায় জলপটী দিতে ; দেব ?

ললি। দেও।

বিনু জলপটী কপালে লাগাইল। মাটীতে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া বাটিতে একটু জল লইয়া রোগীর মাথাটা বিনু দখল করিয়া বসিল। রোগী আরাম পাইল ; কহিল, "তোমারই মত আমার একটি ছোট বোন্ আছে, বিনু। সে তোমার মত সুন্দর নয় বটে, কিন্তু—কিন্তু তোমারই মত অনাথা।"

নিত্য। তোমার ঘরে আর কে আছে, বাবা ?

ললি। আছে বিধবা মা, বোন্, আমার চোখের মণি ছোট ভাই। তার বয়েস হবে সতর আঠার। পড়ছে আই এস-সি, দৌলতপুরে। বাবা জিলা স্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন, কিছু রেখে যেতে পারেন নি। যা ছিল, তা' বেচে কিনে মা আমাদের তিন জনকে মানুষ করেছেন। মা আমারই ভরসা করতেন, তা' আমি ত এখানে।

নিত্য। তা হ'লে তাঁদের কি হবে ?

ললি। কাকা হয় ত দেখবেন।

নিত্য। তিনি কোথায় থাকেন ?

ললি। এলাহাবাদে। সেখানে তিনি এক জন বড় উকীল। জমীদারীও কিছু করেছেন। একটু জল, মাসী-মা।

নিত্য। বিনু, ছুটে যা', কলসীতে জল নেই। আচ্ছা, তুই বোস, আমি যাচ্ছি।

নিত্য কলসী লইয়া প্রস্থান করিল। ললিত জিজ্ঞাসা করিল, "আমার কি খুব বেশী রকম জ্বর হয়েছে, বিনু ?"

"এমন বেশী আর কি।"

"বড় এলোমেলো বোকছি, না ?"

"এলোমেলো ত একটুও নয়।"

"আমার বুকে একটু হাত দেও না বিনু, বুকটা কেমন করছে।"

বিনু হাত দিল। ললিত হাতখানি বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিল, অবশেষে ঘুমাইয়া পড়িল।

৩

স্থান ও বয়সের প্রভাবে ললিত ক্রমে ব্যাধিমুক্ত হইল এবং দেহে বেশ বল পাইল। সে নিজে রাঁধিয়া খাইতে আরম্ভ করিয়াছে। নিত্য বা বিনু তাহাকে সাহায্য করিত। ললিত রাঁধিতে জানিত না, নিত্য দেখাইয়া দিত। তরকারি কোন্ সময় চুলা হইতে নামাইতে হয়, ললিত তাহা জানিত না, বিনু পাশে দাঁড়াইয়া বলিয়া দিত। নিত্য বেতন লইত না, ললিতও মাসীকে বেতন দিতে সঙ্কোচ বোধ করিত। সরকার হইতে ললিত যাহা মাসে মাসে খোরাকিস্বরূপ পাইত, তাহা বনমালী দারোগার কল্যাণে থাকিয়া যাইত—সামান্যই খরচ হইত। যাহা উদ্বৃত্ত থাকিত, তাহা সে ভাইকে পাঠাইয়া দিত। নিত্যর ইচ্ছা করিত, সে-ও মাসে মাসে কিছু পাঠায়, কিন্তু তাহার যে পাঠাইবার মত কিছু নাই। ললিত একবার একজোড়া কাপড় কিনিয়া

নিত্যকে দিয়াছিল। নিত্যর তাহাতে খুব রাগ। কহিয়াছিল, "পয়সাগুলো কেন এ রকম ক'রে নষ্ট কর বল দেখি?"

"মা-মাসীকে কাপড় দিলে কি পয়সা নষ্ট হয়, মাসীমা?"

"টাকা তিনটে থাকলে আমার বোন্‌পো-বোন্‌ঝির কত কাযে লাগত।"

"তোমার বোন্‌পো-বোন্‌ঝির চেয়ে আমার মা-মাসী বড়।"

নিত্য হার মানিয়া পলাইল।

এক দিন সকালে ললিত চুলায় ভাতের জল চড়াইতেছিল। অদূরে বসিয়া বিনু বাট্‌না বাটিতেছিল। জল চাপাইয়া ললিত বাঁশের খুঁটি ঠেস দিয়া চোখ বুজিল। বিনুর হাতে কয়েকখানি রূপার গহনা ছিল, হস্তান্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা ঝঙ্কার তুলিতেছিল। ললিত একাগ্রচিত্তে তাহাই শুনিতেছিল। এমন মধুর ধ্বনি ললিত পূর্ব্বে শুনে নাই। কত রকমের সুর, কত রকমের তাল। সপ্তসুর ঝঙ্কৃত হইতেছিল, ললিতের এমনই মনে হইল। বলয় কঙ্কণের অঙ্গে ঢলিয়া পড়িয়া কহিতেছিল, 'স'রে আয়'; কঙ্কণ তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া কহিতেছিল, 'তুমি কে গা ধনি!' এই সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে ললিত তন্ময় হইল।

বিনু আড়নয়নে মাঝে মাঝে ললিতকে দেখিতেছিল। বুঝিল না, কেন সে চুপ করিয়া মুদ্রিত-নয়নে বসিয়া রহিয়াছে। নীরবতা তাহার অসহ্য হইল, নতমুখে কহিল, "এবার চাল ছেড়ে দিন, জল হয়ে গেছে।"

ললিত হাঁড়িতে চাল ছাড়িয়া দিল। বিনু জিজ্ঞাসা করিল, "জীরে-মরিচ বাট্‌ব?"

"তা ত আমি জানি না।"

"কি রাঁধবেন?"

"তা' তুমি জান, বিনু।"

বিনু চক্ষু উঠাইয়া এই নিঃসহায় যুবকের পানে চাহিল। ললিত কহিল, "আশ্চর্য্য হবার ত কিছুই নেই, বিনু; মাসী-মা যা করতে বলেন, আমি তাই করি, যা খেতে বলেন, তাই খাই। আমি যে এ সব কিছু বুঝি না।"

বি। কলকাতায় কি করতেন?

ল। মা ব'লে দিয়েছিলেন, একমনে লেখাপড়া করতে, আমি তাই করতাম; হোটেলে থিয়েটারে যেতে বারণ ক'রে দিয়েছিলেন, আমি কখন সেখানে যাইনি।

বি। আপনার দেখা-শুনা কে করত?

ল। আমার এক সহপাঠী ছিল, সে আমাকে বড় ভালবাসত। রোগ হ'লে দেখত, অভাব হ'লে টাকা ধার দিত, আমার জন্যে মেসের ঝি-চাকরদের সঙ্গে ঝগড়া করত, আরও কত কি সে করত।

বি। তিনি ত এখন আপনার খোঁজ নেন না—

ল। তাকেও যে পুলিসে ধ'রে নিয়ে গেছে। তার বাক্সে একখানি গীতা, একখানি চণ্ডী, তিলক—দেশবন্ধু প্রভৃতি কয়েক জনের ছবি, এই রকম কি সব পাওয়া যায়। তাতে আমাতে এক ঘরে থাক্‌তাম, সেই জন্যে আমাকেও ছাড়ে নি, ধ'রে এনে এ-দেশ ও-দেশ ঘোরাচ্ছে।

বি। ও মা! বই রাখা দোষের না কি? আমাদের ঘরে যে রামায়ণ-মহাভারত আছে; সে দু'খানা কি ফেলে দেব?

ল। কি করা উচিত, তা আমি বলতে পারি না। হয় ত স্কুল-কালেজের বা ইংরাজী বই ছাড়া অন্য কেতাব রাখা দোষের।

বি। আমাদের ঘরে যে ছবিও আছে—

ল। কার ছবি?

বি। জগন্নাথদেবের ও মা কালীর—

ল। মা কালীর ছবি রাখা হয় ত দোষের—

বি। কেন?

ল। মায়ের হাতে যে খাড়া আছে, গলায় যে মুণ্ডমালা আছে; ওগুলো যে দোষের—

বি। তা মা কালী ত ও সব এখন ফেলে দিতে পারেন না।

নিত্য আসিয়া পড়িল; জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের কি কথা হচ্ছে?"

বি। মা, রামায়ণ-মহাভারত পুড়িয়ে ফেলতে হবে, মা কালীর ছবিখানাও লুকুতে হবে—

নি। কেন বল্ দেখি?

বি। ও সব ঘরে রাখ্‌লে পুলিসে না কি ধ'রে নিয়ে যাবে।

নি। দূর পাগ্‌লী! ঠাকুর-দেবতার ছবি রাখ্‌লে পুলিসে ধরবে কেন?

বি। মা যে জিব মেলে খাঁড়া হাতে দাঁড়িয়ে আছেন—

নি। সকলেই ত মা কালীর ছবি ঘরে রাখে, আমাদের বেলাই দোষের হ'ল?

বি। শোন না—বাবুর বন্ধুকে এই জন্যে ধ'রে নিয়ে গেল, বাবু তাঁর সঙ্গে এক ঘরে ছিলেন ব'লে বাবুকেও ছাড়ে নি।

নি। ও মা, সত্যি না কি! তবে বই দু'খানা তুই এখুনি সরিয়ে ফেল। তুই আবাগী মহাভারত না প'ড়ে যে থাকতে পারিস নে। ছবির কি করবি? রোজ সকালে উঠে ঠাকুরের চরণে পেরণাম করি, সে সুখও ঘুচল। কি যে পোড়া আইন করেছে!

বি। তুমি এক কায কর মা—বড়বাবুর কাছে গিয়ে সব বল গে; তিনি যা বলবেন, সেই মতই করা যাবে।

নি। সেই ভাল, আমি তবে চল্লুম। তুই এই ঝিঙ্গে উচ্ছে ক'টা কুটে দে—কাঁচকলাটা—

বি। তুমি যাও না, আমি যা হয় করছি।

৪

কয়েক দিন পরে ছোট ভাই মোহিতের নিকট হইতে একখানা পত্র আসিল। থানা হইতে পাহারাওয়ালা খোলা চিঠি দিয়া গেল। ললিত পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইল। সেখানে তখন নিত্য ও বিনু বসিয়া আহারাদির উদ্যোগ করিয়া দিতেছিল। পড়িতে পড়িতে ললিতের মুখখানি মলিন হইয়া গেল। নিত্য ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাড়ীর সকলে ভাল ত?"

ল। তা' এক রকম আছে।

নি। তবে আবার কি হ'ল?

ল। হয় নি কিছু। মোহিতের আই এস-সি পরীক্ষা কি না—

নি। সে ত ভাল কথা—

ল। পরীক্ষা দিতে হ'লে আগে টাকা জমা দেওয়া দরকার।

নি। কত টাকা?

ল। ত্রিশ।

নি। টাকা আর ফিরিয়ে দেবে না?

ল। না। ফেরাবে কেন?

নি। টাকাটা কে নেয়?

ল। সরকার।

নি। কেন, তাঁর কি টাকার এতই দুঃখু যে, গরীব ছেলেদের কাছ হ'তে টাকা না নিলে তাঁর চলবে না? স্কুলে মোটা মোটা বেতন নিচ্ছেন, আবার এতগুলো টাকা ছেলেদের কাছ হ'তে নেওয়া! এই বিনুর বাপ ত পাঠশালা করতেন, কে কি দিত? দু' চার আনা মাইনের উপর কখন-সখন মুলোটা বেগুনটা। শুনেছি, সেকালে ভট্‌চাজ্জিরা ঘরে পোড়ো রাখতেন, তাদের খেতে দিতেন, কখন একটা পয়সাও নিতেন না। এখন এ হ'ল কি! বিদ্যে বেচা! তাও আবার এতগুলো টাকা নিয়ে! ছি!

ললিত কোন উত্তর করিল না, বিমর্ষভাবে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বিনু কহিল, "সেখানে মায়ের হাতে হয় ত টাকা আছে—"

ল। না বিনু, কিছু নেই। যা পাঠাই, তাইতে কোন রকমে চলছে।

বি। কাকা কি কিছু দেবেন না?

ল। তাঁর দেবার খুব ইচ্ছে, কিন্তু কাকীমা দিতে দেন না।

বি। কাকার ছেলেদের লিখলে হয় না?

ল। তাঁর ছেলে-মেয়ে কিচ্ছু নেই। কাকীমা'র বোন্ ভাই, তাদের ছেলেপিলে—

বি। বুঝেছি; চিঠিপত্রও বোধ হয় কাকার হস্তগত হয় না?

ল। সময় সময় তাই মনে হয়।

বিনু একটু কি ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কবে টাকা জমা দিতে হবে?"

"দিন পনরের মধ্যে দিতে হবে লিখেছে।"

বিনু ও তাহার মা কাযকর্ম্ম সারিয়া ঘরে চলিয়া গেল। ললিত একাকী বসিয়া ত্রিশ টাকা কিরূপে পাওয়া যায়, তাহার চিন্তা করিতে লাগিল। যখন কোন উপায় তাহার মাথায় আসিল না, তখন ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া টাকার চিন্তাটা একবারেই ছাড়িয়া দিল।

দুই দিন পরে ললিতের পাকঘরের পাশে বসিয়া বিনু যখন মসলা পিষিতেছিল, তখন তাহার হস্ত-তাড়নায় সপ্তসুর আর বাজিয়া উঠিল না। ললিত বিস্মিত ও নিরাশ হইল। সে যে ঐ সময়টার প্রতীক্ষা প্রত্যহ করে। তাড়াতাড়ি নদীতে স্নান সমাপন করিয়া আসিয়া দেখে, বিনু শিল-নোড়া পাতিয়া বসিয়াছে কি না। আজ অনেকখানি আগ্রহ লইয়া ললিত যখন মধুর ঝঙ্কার শুনিতে চুলার সন্নিকটে মুদ্রিতনয়নে বসিল, তখন আর সপ্তসুর বাজিয়া উঠিল

না—নৈরাশ্যের তীক্ষ্ণ শল্যে আহত হইয়া সে চমকিয়া উঠিল—আঁখি মেলিয়া দেখিল, বীণায় তার নাই। জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি বাট্‌না বাট্‌তে বসলে যা' শুন্‌তে আমি ছুটে আসতাম, তা' আজ শুনতে পাচ্ছি না কেন, বিনু?"

বি। আপনি কি শুনতে আসতেন?

ল। তোমার বালা-চুড়ীর শব্দ।

বি। ও মা, আপনি বুঝি চোখ বুজে তাই শুনতেন?

ল। আমি চোখ বুজতাম না, শত চক্ষু খুলে দিতাম—শত চক্ষু দিয়ে সেই সঙ্গীতের মূর্ত্তি দেখতাম—

বিনু চুপ করিয়া গেল—মশলা আর বাটিতে পারিল না। উঠিয়া বাড়ী গেল; মাকে কহিল, "তুমি ওখানে রান্না-বান্নার ব্যবস্থা ক'রে দেও গে।"

"তুই তবে গরুর জাবটা দে।"

নিত্য হাত ধুইয়া প্রস্থান করিল। দণ্ডখানেক পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, বিনু জাব দেয় নাই—দাওয়ায় চুপ করিয়া বসিয়া কি ভাবিতেছে। মা কহিল, "ও মা, তুই চুপ ক'রে ব'সে আছিস। জাব দিলি নে?"

"ভুলে গেছি মা।"

"তুই কি ভাবছিস বল্ দেখি?"

"ভাবছি, হাতের গয়নাগুলো কি ক'রে ফিরিয়ে আনা যায়।"

"এই ত বাঁধা দিলি, এর মধ্যে ফিরিয়ে আনতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিস?"

"আমার গোট ও মল বাঁধা রাখ্‌লে ত্রিশ টাকা হয় না, মা?"

"তা হয় বই কি।"

"তবে তাই কর না; হাতের গয়না ফিরিয়ে নিয়ে এস।"

জননী তাহাই করিল।

৫

কয়েক দিন পরে একদা প্রভাতে বিনু দাওয়ায় বসিয়া মশলা বাটিতেছিল, আর চুলার পাশে বসিয়া ললিত মুদ্রিত-নয়নে কঙ্কণঝঙ্কার শুনিতেছিল। বাটা শেষ হইলে ললিত কহিল, "এমন মিষ্ট শব্দ আর কারুর হাতে হয় না কেন, বিনু? আমি গান শুনেছি, এস্রাজ, সেতার, হারমোনিয়াম শুনেছি, কিন্তু তাদের সুর ত' মূর্ত্তি ধ'রে আমার সামনে কখন দাঁড়াত না। তুমি আমাকে কি শোনাও, কি দেখাও, তা তোমাকে কি ব'লে বোঝাব, বিনু! আমার সমস্ত শিরা আনন্দে নেচে উঠে—আমি আত্মহারা হয়ে যাই।"

"আপনি কি যে বকছেন!"

"আমি বকছি অতি সামান্য—বুকে আছে অনেক—"

"আমি ত কাল হ'তে আর বাটনা বাটতে আসব না।"

"আমিও তবে আর রাঁধব না।"

পরদিবস বিনু ঠিক সময়ে আসিল। ললিত হাসিয়া কহিল, "আমি জানি, তুমি আসবে।"

"কি ক'রে জানলেন?"

"তুমি যে আমাকে ভালবাস, বিনু! আমি না খেলে তুমিও যে উপবাসী থাক্‌তে।"

এমন সময় জনৈক সিপাহী আসিয়া একখানা খোলা চিঠি ললিতের হাতে দিল। ললিত কহিল, এ ত দেখছি মোহিতের চিঠি। পড়তে আর ইচ্ছে করছে না। টাকা জমা দেওয়া হয় নি, পরীক্ষা দিতে পারলে না, এই সব লিখেছে। না, না, এ কি!—শোন, বিনু, আমি না কি তাকে টাকা পাঠিয়েছি; টাকা জমা দিয়ে পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে। এ কি জাল চিঠি! না, এ ত তারই হাতের লেখা। কিন্তু এ কি রকম হ'ল! শুনছ বিনু, আমি না কি তা'কে দশ দিন আগে টাকা পাঠিয়েছি! ত্রিশ পয়সা যা'র সম্বল নেই, সে না কি ত্রিশ টাকা পাঠিয়েছে! তোমরা দুধ দিচ্ছ, তরকারি দিচ্ছ, বনমালী-দা চাল-ডাল দিচ্ছেন, তাই কোন রকমে চ'লে যাচ্ছে।"

বিনু কোন উত্তর করিল না,—অধোমুখে বসিয়া রহিল। নিত্য আসিয়া কহিল, "তুই যে এখনও ব'সে বিনু, জলটল আন্‌তে হবে না?"

ললি। শুনছ মাসী-মা, আমি না কি মোহিতকে টাকা পাঠিয়েছি ফিজের জন্যে—

নিত্য। তাই লিখেছে না কি?

ললি। তবে আর বলছি কি?

বিনু। বড় বাবু আসছেন,—

বনমালী আসিয়া কহিলেন, "আমি বদলী হয়ে যাচ্ছি ললিত—হুকুম এসেছে।"

ললিত স্তম্ভিত হইল। ক্ষণকাল নির্ব্বাক্ থাকিয়া কহিল, "এ দণ্ড আমারই মাথায় পড়ল। এত দিন বড়

ভাইয়ের স্নেহ-যত্নের মধ্যে ছিলাম, সে সুখটুকুও বিধাতার সহ্য হ'ল না।"

বন। আমি সদরে বদলী হয়ে যাচ্ছি; সাহেবকে তোমার কথা বলব, তিনি যদি তোমার মুক্তির কোন উপায় করতে পারেন।

ললি। কাকাও না কি গভর্মেণ্টের সঙ্গে লেখালিখি করছেন।

বন। তা ত আমি মোহিতের চিঠিতে দেখেছি। এখন টাকার কি হ'ল? কি টাকা টাকা লিখেছে, চিঠিখানা পড়বার অবসর হ'ল না।

ললি। লিখেছে, আমি না কি তাকে ফিজের জন্যে ত্রিশ টাকা পাঠিয়ে দিয়েছি। অথচ আমি এক পয়সাও তাকে এর মধ্যে পাঠাই নি। আপনি হয় ত পাঠিয়েছেন—

বন। আমি? আমি টাকা পাঠাব? আমরা পুলিসের লোক, টাকা আমরা কাউকে দিই না, টাকা নিই।

ললি। আপনি তবে আমাকে চাল-ডাল দিতেন কেন?

বন। প্রজারা দিয়ে যেত প্রচুর, আমি ত আর তা বেচতে পারি না, আমাদের খেয়ে দেয়ে যা থাকৃত, তোমাকে তা পাঠিয়ে দিতাম। আমি এখন যাই—অনেক কায আছে।"

ললি। কবে যাবেন?

বন। কবে না কি! পুলিসের চাকরী—আজই রাতে।

ললিত শুষ্কমুখে সজলনয়নে বসিয়া রহিল।

৬

ছোট বড় হইল—যতীন দারোগা থানার ভার পাইয়া হতভাগ্য ললিতকে কষ্ট দিতে লাগিল। পীড়কেরই ক্ষতি, পীড়িতের লাভ। এক জন পাপ আহরণ করে, অপরের পাপক্ষয় হয়। ইহা যেমন নিশ্চিত যে, উৎপীড়িত হিন্দু এক দিন পাপমুক্ত হইয়া অগ্নিশুদ্ধ সুবর্ণের ন্যায় দীপ্যমান হইবে, ইহাও তেমনই নিশ্চিত, পীড়ক এক দিন পাপ-মলিন হইয়া অন্ধকারে আত্মগোপন করিবে। বিধাতার এ অলঙ্ঘনীয় নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই, ঘটিবেও না। ক্ষুদ্র যতীন তাহা না বুঝিয়া ললিতকে আহারে, বিহারে, ভ্রমণে, শয়নে, পীড়া দিতে লাগিল। ললিত একবার একটু প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিল, "রাতে পাহারাওয়ালারা বার বার জাগালে ঘুমের বড় ব্যাঘাত হয়।" একটিনি বড় দারোগা মুখবিকৃতি করিয়া কহিলেন, "ওরে আমার রাজপুত্তুর! এখানে বুঝি ঘুমুতে এসেছ? তোমাকে ঘুম পাড়াচ্ছি! থানায় তোমাকে রোজ রাত্তিরে দাঁড় করিয়ে রেখে দেব!"

ললিত। আইন তা' নয়, আমি সমস্ত দিনের ভিতর থানায় একবারমাত্র হাজির দেব—তোমাদের সঙ্গে আর আমার কোন সম্বন্ধ নেই।

যতীন। আ গেল যা, আমাকে আইন শেখাতে এয়েছে! তোমাকে আবার জলপাইগুড়ি পাঠাচ্ছি।

ললিত। সাধ্য থাকে, পাঠিও।

যতীন তখন গালি আরম্ভ করিল। প্রতিদিনই গালি চলিত; তবে বিনু তথায় উপস্থিত থাকিলে গালির মাত্রাটা কিছু বাড়িত। এ অপমান লাঞ্ছনা স্তব্ধ-হৃদয়ে সে দেখিত, ঘরে গিয়া লুকাইয়া কাঁদিত। গালাগালির তীব্রতা যত বাড়িতে লাগিল, বিনুর হৃদয় ততই আকৃষ্ট হইয়া ললিতের আশে-পাশে ঘুরিতে লাগিল।

এক দিন বিনু ঘর হইতে একটু দুধ আনিতেছিল, যতীন তাহাকে পথের মধ্যে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি নিয়ে যাচ্ছ? দুধ? ঐ বেটার জন্যে বুঝি? আমি তোদের এ সব বন্ধ ক'রে দিচ্ছি।"

বি। কেন, দোষটা কি হ'ল?

য। আ মোলো যা, আমার কথার উপর কথা! সোন্দর মুখ ব'লে দেমাক দেখ।

বি। শুধু শুধু গাল দিচ্ছেন কেন? দোষটা কি, বুঝিয়ে দিন।

য। শীগ্‌গির বোঝাব।

দারোগা প্রস্থান করিল। বুঝাইলও কয়েক দিনের মধ্যে। এক দিন সন্ধ্যার পর এক সিপাহী চীৎকার করিয়া উঠিল, "মদ নিয়ে বিনু আতকের কাছে যাচ্ছিল, আমি ধরেছি।" সিপাহীর এক হাতে বোতল, অপর হাতে বিনুর অঞ্চল। যতীন নিকটেই সাক্ষী সহ উপস্থিত ছিল, ছুটিয়া আসিল। একটা গোলমাল উঠিল। রেজেষ্ট্রী আফিস হইতে বাবুরা ছুটিয়া আসিল। নিত্য আসিল, ললিত আসিল, অনেকেই আসিল; কিন্তু আসিলে কি হইবে? বাঘের হাতে পড়িলে মেষশাবকের পরিত্রাণ নাই। বিনু কৈফিয়ৎ দিল, "এইমাত্র আমি রেজেষ্টার বাবুর বাড়ী হ'তে

আসছি—তাঁকে জিজ্ঞেস ক'রে দেখুন। ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার কহিল, "একটু আগে বোতলটা নিয়ে আসতে আমি এই সিপাইকে দেখেছি।" আরও দুই এক জন এই ভাবে সাক্ষ্য দিল।

যতীন দমিবার লোক নহে—কহিল, "আচ্ছা, কাল আমি তদন্ত করব, আজ আসামী হাজতে থাক।"

বলিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। আসামী ও বোতল লইয়া সিপাহী পশ্চাতে চলিল। নিত্য প্রভৃতি দুই চারি জন অনুবর্ত্তী হইল। দারোগা জামিন লইল না। সকলে হতাশ হইয়া ফিরিল। ফিরিল না শুধু নিত্য—হাজতঘরের দ্বার চোখের উপর রাখিয়া একটা স্তম্ভে পৃষ্ঠ রক্ষা করত বারান্দায় বসিয়া রহিল।

রাত্রি যখন দ্বিতীয় প্রহর অতীতপ্রায়, তখন দুই ব্যক্তি অন্ধকার হইতে আসিয়া আফিস-ঘরে প্রবেশ করিল এবং বাতি জ্বালিয়া হাজতঘরের দ্বারপার্শে আসিয়া দাঁড়াইল। এক ব্যক্তির হাতে চাবি ছিল, সে নিঃশব্দে দ্বার খুলিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। সিপাহী বাতি হস্তে দ্বার-সমীপে দাঁড়াইল। নিত্যর প্রত্যেক লোমকূপ চক্ষু হইয়া ঘটনাটি দেখিতেছিল। যখন সে দেখিল, ভূপৃষ্ঠে শায়িতা বিনুর পার্শ্বে গিয়া যতীন বসিল, তখন সে আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিল না—চীৎকার করিয়া উঠিল। নিস্তব্ধ অন্ধকার রাত্রিতে সে চীৎকার অতি ভীষণ শুনাইল। যতীন ও সিপাহী ঘর ছাড়িয়া বাহিরের বারান্দায় আসিল। নিত্য তখনও চীৎকার করিতেছে, যতীন তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল। নিত্য গোঁ গোঁ করিয়া নিস্তব্ধ হইল।

অকস্মাৎ এক ব্যক্তি ছুটিয়া আসিয়া যতীনকে পদাঘাতে দূরে নিক্ষেপ করিল। সিপাহী যখন বুঝিল, লোক আসিয়া পড়িতেছে, তখন সে আত্মগোপনে সচেষ্ট হইল। হাজত-ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া সে লুকাইয়া পড়িল। এ দিকে নিত্যর হাত ধরিয়া উঠাইয়া আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিল, "খুব লেগেছে, মাসীমা?"

নিত্য একটু সামলাইয়া কহিল, "দারোগা বিনুর ঘরে ঢুকেছিল।"

ললিত বড় বেশী আশ্চর্য্য হইল না। যতীনের ব্যবহারে সন্দিহান হইয়া সে পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক ছিল এবং থানার আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। চীৎকার শুনিবামাত্র ললিত বিদ্যুদ্বেগে ছুটিয়া আসিয়া নিত্যকে রক্ষা করিল। বিনু ঘুমাইতেছিল, চীৎকারে ঘুম ভাঙ্গিলে সে উঠিয়া দেখিল, যতীন তাহার মাকে মারিতেছে, আর সিপাহী আলোকহস্তে অদূরে দাঁড়াইয়া নিঃসহায়কে গালি পাড়িতেছে। তদ্দৃষ্টে বিনু চীৎকার করিয়া উঠিল। পরমুহূর্ত্তে দেখিল, ললিত আসিয়া যতীনকে পদাঘাতে দূরে ফেলিল। আর কিছু দেখিতে পাইল না—সিপাহী হাজতঘর বন্ধ করিয়া আলো লইয়া প্রস্থান করিল।

যতীন দেখিল, লোক আসিয়া পড়িতেছে, তখন সে গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে প্রস্থান করিল। সে দিন কাহাকেও কিছু বলিল না, ঘরের বাহির হইল না। পরদিন প্রভাতে উঠিয়া বিনুকে ছাড়িয়া দিল, তাহার পর ললিত সম্বন্ধে তীব্র রিপোর্ট লিখিতে বসিল। কি লিখিবে, তাহা সমস্ত রাত্রি ভাবিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। হিংসাপরায়ণ ব্যক্তির উদ্ভাবনী শক্তির অভাব হয় না। পুলিসের কোন কোন কর্ম্মচারী প্রয়োজন হইলে কখন এ অভাব অনুভব করিয়াছেন, তাহা মনে হয় না। যতীন অনেকগুলি মিথ্যা অভিযোগ লিপিবদ্ধ করিয়া প্রফুল্লমনে রিপোর্ট প্রেরণ করিলেন। অভিযোগ-গুলি সত্য কি না, তাহা তদন্ত করিয়া দেখা প্রয়োজন বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষের মনে হইল না—তিনি অন্তরীণকে সরাসর রতুয়ায় বদলী করিলেন। রতুয়া এই জিলায়, তবে অন্ত প্রান্তে—রাজমহলের নিকটে।

এই বদলীর হুকুমে তিনটি হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। কেহ চীৎকার করিয়া কাঁদিল না—বুকের কান্না তখনও চোখে উঠে নাই। অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া ললিত কহিল, "মায়ের কোল ছিঁড়ে এনেছিল নিষ্ঠুর পুলিস বিনা অপরাধে, এখন আবার মাসীর কোল হ'তে ছিঁড়ে নিয়ে যাচ্ছে বিনা অপ-রাধে। কর্ত্তৃপক্ষ একবার বিচার ক'রে দেখলেন না, আমি অপরাধী কি না। তিনি তাঁর চাকরকে বিশ্বাস করেন, কিন্তু প্রজাকে বিশ্বাস করেন না, এই যা আমার দুঃখ।"

নিত্য কহিল, "বিধাতা আমাকে ছেলে দিলেন যদি তবে আবার কেড়ে নিলেন কেন?"

বিনু কিছু কহিল না—নীরবে নদীপারে চাহিয়া রহিল।

ললিত কহিল, "আচ্ছা মাসীমা, এরা শুধু শুধু এত [illegible] কেন? আমি ত কখন এদের হিংসাপুকে [illegible]

আমাকে কেন ঘর থেকে টেনে এনে এত কষ্ট দিচ্ছে? আমি একটা মাছি মারতেও পারি নি, একটা পিপড়েকেও মাড়িয়ে যেতে দুঃখ বোধ করেছি; তবে আজ কেন আমার বুকের ভেতর হিংসা জেগে উঠ্‌ছে? একটা কি যেন আমার বুকের ভিতর ঠেলে বলছে— অকারণ উৎপীড়ন যে সহ্য করে, সে মানুষ নয়—"

অদূরে দেখা গেল, যতীন সিপাহীসহ অগ্রসর হইতেছে। মেয়েরা কুটীর হইতে নামিয়া উঠানে দাঁড়াইল—যতীন নীরব ক্রন্দনের ভিতর বন্দীকে লইয়া নৌকায় উঠাইল।

৭

কিন্তু ললিতকে বেশী দিন রতুয়ায় থাকিতে হইল না—তাহার কাকার চেষ্টায় অচিরাৎ সে মুক্ত হইল। মুক্তি পাইয়া ললিত বাড়ী গেল না, বরাবর নিমগাছিতে আসিল। আসিয়া যাহা শুনিল, তাহাতে সে স্তম্ভিত হইল। পথে অনেক কৃষকের মুখে শুনিল, বিনু যতীন কর্ত্তৃক ধর্ষিত হইয়াছে, আর নিত্য প্রহৃত হইয়া শয্যা লইয়াছে। ললিত পথে আর দাঁড়াইল না, দ্রুতপদে নিত্যর গৃহে আসিল। আসিয়া দেখিল, নিত্য বিছানায় পড়িয়া রহিয়াছে, আর বিনু পাশে বসিয়া তাহাকে দুধ খাওয়াইতেছে। তখন মধ্যাহ্ন অতীত হইয়াছে। ললিতকে দেখিয়া নিত্য কাঁদিয়া উঠিল। ললিত জিজ্ঞাসা করিল, "যা শুনছি, তা সত্যি কি মাসী?"

"সত্যি বই কি বাবা।"

ললিত তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিল এবং থানা অভিমুখে দ্রুতপদে চলিল। আফিস-ঘরে আসিয়া দেখিল, রাইটার সাহেব একখানা চৌকীর উপর শুইয়া পড়িয়া বিশ্রাম লইতেছেন। ললিত জিজ্ঞাসা করিল, "যতীন দারোগা কোথা?"

রাইটার। কেন, তাকে মারতে এসেছ বুঝি? এই আসছ? বোস, বোস—ঠাণ্ডা হও। তুমি ছাড়া পেয়েছ শুনিছি। দু' চার দিন আগে আসতে পারলে ভাল হ'ত।

ল। এখন যতীন কোথা বল।

রা। সে এখন তোমার হাতের বাইরে। এখানে নেত্যর ঘরে এই কাণ্ড ক'রে সেই রাতেই মফঃস্বলে পালিয়েছিল। লাটগাঁয়ের প্রজারা আগে হ'তেই যতীনের উপর চটা ছিল, পথের উপর শেষ রাত্রে একা পেয়ে আচ্ছা ক'রে বাছাকে শিক্ষা দিয়েছে। বাছা শেষ রাতে গাঁয়ে যাচ্ছিলেন সাক্ষী রাখতে। সাক্ষীর আর দরকার হবে না—খোদাতালা এ সব সাক্ষী একেবারেই নেবেন না।

ল। ম'রে গেছে না কি?

রা। সে খবরটা এখনও সদর হাঁসপাতাল হ'তে আসে নি। এলেই জোড়া মোরগ—

ল। তুমি সত্যি বলছ?

রা। তোবা তোবা, আমি মিথ্যে বলি নি। পাঁচ বখৎ নেমাজ করি। তবে টাকাটা সিকেটা পেলে তখন যা' হয় করি।

ললিত নিরাশ হইয়া নিত্যর কুটীরে ফিরিল। নিত্য জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা গিছলে বাবা?"

ল। থানায় যতীনকে খুন করতে।

নি। ছি, তোমার মুখে এ কথা শোভা পায় না।

ল। আমি আর সে ললিত নই মাসীমা, আমার ভেতর কি একটা জেগে উঠেছে।

নিত্য শয্যায় উঠিয়া বসিয়া ললিতকে কোলের উপর টানিয়া লইল। তাহাকে কত আদর করিল, কত সান্ত্বনা দিল; কবে মুক্ত হইয়াছে, জিজ্ঞাসা করিল, মাকে দেখা দিতে বাড়ী কেন যায় নাই, তাহার কৈফিয়ত লইল। ললিতের উত্তেজনা নিবিয়া গেল—স্নেহ-প্রীতি আসিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করিল, সে তখন কাঁদিয়া ভাসাইল—নিত্যর কোলে মাথা রাখিয়া খুব খানিকটা কাঁদিল। কেন কাঁদিল, সে বুঝিল না।

বর্ষণের পর মেঘ যখন কাটিয়া গেল, তখন সে নিত্যর পায়ে হাত দিয়া কহিল, "আমাকে একটা জিনিষ দেবে মা?"

মা বলিয়া ললিত পূর্ব্বে আর ডাকে নাই। এই চিরমধুর সম্বোধনে নিত্যর কোমল প্রাণ গলিয়া গেল। মোটা গলায় কহিল, "আমার যা' আছে, সকলই ত তোমার বাবা—পা ছাড়।"

"আগে বল দেবে?"

"এমন পাগল ত দেখি নি—কি চাই, তাই বল না।"

"স্বীকার কর দেবে?"

"দেব।"

"ঠিক?"

"হ্যাঁ রে হ্যাঁ।"

"আমি বিনুকে চাই।"

নিত্য বড় বিস্মিত হইল না। সে জানিত, উভয়ের মধ্যে প্রেম জন্মিয়াছে। জানিয়াছিল যখন, তখন সাবধান হইবার সময় ছিল না। বাধা দিতে গিয়া দেখিয়াছিল, বাধার দিন বহু পূর্ব্বে চলিয়া গিয়াছে। তখন নিরস্ত হইয়া বিনুকে বলিয়াছিল, 'ললিত আমার ছেলে, তাকে তোর দাদা মনে করবি।' এখন ললিতের ভিক্ষার ভঙ্গী দেখিয়া বুঝিয়াছিল, ললিত বিনুকেই চাহিতেছে। নিত্যর হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে এমন একটা বাসনা সুপ্ত ছিল যে, তাহার অস্তিত্ব সে সকল সময় বুঝিয়া উঠিতে পারিত না। যখনই সে সাধ, সে বাসনা মাথা নাড়া দিয়া উঠিত, তখনই নিত্য তাহাকে ধিক্কার দিয়া শান্ত করিতে চেষ্টা করিত। সে সাধ যখন নিত্যর কানে কানে মধুর ঝঙ্কার তুলিয়া বলিত, 'চুলোয় যাক্ দেশাচার, জাতি, সমাজ, ললিতের সঙ্গে মেয়েটার বিয়ে হ'লে সে ত সুখী হ'বে।' এই ঝঙ্কার ডুবাইয়া মেঘ গর্জ্জিয়া কহিত, 'তুমি হিন্দু হয়ে ধর্ম্ম, আচার ভুলছ? ছি!' নিত্যর বাসনা, ধর্ম্মের ধিক্কারে সঙ্কুচিত হইয়া আবার লুকাইয়া পড়িত। নিত্যর মনের যখন এইরূপ অবস্থা, তখন ললিত স্পষ্ট ভাষায় বিনুকে চাহিল। পূর্ব্বে একবার চাহিয়াছিল গোলমেলে ভাষায়। বন্দী ললিতের ভাষাও তখন বন্দী ছিল, এখন মুক্ত ললিতের ভাষাও মুক্ত। এই মুক্ত ভাষার সম্মুখে নিত্য মূক হইল, কোন উত্তর করিতে পারিল না। ললিত কহিল, "বল মা, বিনুকে দেবে? আমার জীবন ব্যর্থ করো না, আমাকে চিরদিনের মত অসুখী করো না।"

বিনু ঘর হইতে চলিয়া গেল। নিত্য কহিল, "বিনু যে বিধবা।"

ললিত উত্তর করিল, "সকল দেশেই ত বিধবার বিয়ে হচ্ছে; তোমার মতে তারা কি সকলে পাপী, বিধবার নিশ্বাসে যে বাঙ্গালা জ্ব'লে যাচ্ছে, বাঙ্গালী মরণোন্মুখ হয়েছে—"

বাধা দিয়া নিত্য কহিল, "আচ্ছা, মেনে নিলাম বিধবা-বিবাহ খুব ভাল, কিন্তু—কিন্তু বিনুর নামে যে কলঙ্ক রটেছে, তা'তে—"

ললিত। সে কথা বুঝব আমি।

নিত্য কহিল, "যতীন দারোগা অত্যাচার বেশী কিছু করতে পারে নি—আমাদের চীৎকারে লোক এসে পড়েছিল।"

ল। শুনলুম—

নি। মন্দ লোকরা কলঙ্ক রটিয়েছে বটে, কিন্তু সে সব মিথ্যে। তুমি বিনুকে ব'লে গিছলে, মাথার শিয়রে অস্ত্র নিয়ে শুতে, সে তাই করে, সে জন্যে রক্ষেও পেয়েছিল। তার হাতে অস্ত্র দেখে যতীনটা ভয়ে স'রে এল আমার কাছে। এ দিকে লোকজনও এসে পড়ল।

ললিত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। নিত্যর মনে হইল, এই নিশ্বাসের ঝড়ে ললিতের মন হইতে অনেক মেঘ উড়িয়া গেল। উড়িয়া গেল সত্যই। লোকের কথায় আস্থাস্থাপন করিয়া দুই দণ্ড পূর্ব্বে ললিত ছুটিয়াছিল যতীনকে হত্যা করিতে। সে উন্মত্ততা কাটিতে না কাটিতে সংসারে আকাঙ্ক্ষা জন্মিল, কিন্তু সে দারুণ কুয়াসার আবরণের মধ্যে থাকিয়া সে সদ্যোজাত আকাঙ্ক্ষা বাড়িতে পাইতেছিল না। নিত্যর কথায় যখন সে মেঘ, সে কুয়াসা কাটিয়া গেল, তখন ললিত আবেগভরে সকাতরে তাহার প্রার্থনা পুনরায় জানাইল, "যা' চেয়েছি, তা' দেবে মা?"

নিত্যর মনের কুয়াসাও ক্রমে কাটিয়া তাহাকে আশায় উৎফুল্ল করিতেছিল; কিন্তু সম্পূর্ণ কাটে নাই। সে কহিল, "আমি দিতে চাইলে কি হবে, বাবা? তোমরা হ'লে কায়স্থ, আর আমরা হলাম মাহিষ্য কৈবর্ত্ত—"

ল। বিধাতা ত আর জাতি সৃষ্টি করেন নি, জাতি সৃষ্টি করেছে মানুষে; যার যা' পেশা, তাই ধ'রে শ্রেণীভাগ হয়েছে। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলেছেন, ভক্ত চণ্ডাল অভক্ত ব্রাহ্মণের চেয়ে বড়।

নি। আর এক কথা আছে, বাবা। বিনুকে দান করবার অধিকার আমার নেই; তাকে একবার দান করেছি, আবার দান করব কিরূপে?

ল। তবে এখন অধিকার কার?

নি। বিনুর তিন কুলে কেউ নেই, এখন অধিকারী সে নিজে।

ললিত আর সেখানে দাঁড়াইল না, বাহিরে চলিয়া আসিল। দোরের পাশে দাওয়ায় বসিয়া বিনু মাটী খুঁটিতেছিল। ললিত কহিল, "সব শুনেছ ত বিনু, এখন বল, সম্মত আছ ত?"

বিনু উত্তর করিল না; দুই তিনবার জিজ্ঞাসিত হইবার পর বিনু কহিল, "না।"

"সে কি, বিন্দু ?"

"আর কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না।"

"আর কিছু জিজ্ঞেস করব না বল্‌লেই হ'ল ! এত বড় কথার এইটুকু জবাব ? তা' হতেই পারে না—বল।"

"আর কিছু আমার বল্‌বার নেই—ক্ষমা করবেন।"

"ক্ষমা নেই বিন্দু, ঘর জ্বালিয়ে স'রে দাঁড়ালে চলবে না—তার কৈফিয়ত দিতে হবে—বল।"

বিন্দু সে কথারও কোন উত্তর করিল না। ললিত ব্যথিত হইল; ভিজা মাটীর উপর বসিয়া পড়িয়া কহিল, "তা হ'লে তুমি আমার কথার উত্তর দেবে না ?" বিন্দু মুখ ফিরাইয়া লইল। ললিত কহিল, "আমি কি বোকা ! ভেবেছিলাম, বিন্দু আমাকে ভালবাসে। কখন ভাবি নি, বিন্দু এ বিয়েতে আপত্তি করবে। মুক্ত হবামাত্র বাড়ী না গিয়ে কত আশা—কত আনন্দ নিয়ে এখানে ছুটে এলুম। হায় হায়, আমার সব আশা গেল—আমি আবার পথের কাঙ্গাল হলাম !"

বিন্দু চোখের জল আর ধরিয়া রাখিতে পারিতেছিল না—দাওয়া হইতে নামিয়া পড়িল। ললিত কহিল, "তোমাকে যেতে হবে না বিনোদিনি, আমিই যাচ্ছি। ভয় নেই, আর দেখা করতে আসব না"

ঘরের ভিতর হইতে নিত্য কহিল, "কি যে বলছ ললিত, তার মাথামুণ্ড নেই—"

ললিত। কেন মাসীমা, আমি কি অন্যায় বলেছি ? বিন্দু আমার জীবনটা শ্মশান ক'রে দিলে, আমি কোন্ সুখের আশায় এখানে আর আসব ? আমি চল্লুম এখন সদরে সাহেবের কাছে; গিয়ে বলব, আমি ঘোর বিদ্রোহী, তোমাদের এক জন দারোগাকে খুন করবার মতলব করেছিলাম; আমাকে তোমরা ফাঁসী দেও, নয় দ্বীপান্তরে চালান দেও।

ললিত উঠিল। বিন্দু গোয়াল-ঘরের দিকে যাইতেছিল, পথিমধ্যে দাঁড়াইল। নিত্য দেওয়াল ধরিয়া কোন রকমে বাহিরে আসিতেছিল, দাওয়ায় পা বাড়াইবার সময় টলিয়া পড়িল। ললিত ধরিয়া ফেলিল—বিন্দু ছুটিয়া আসিল। ললিত তাহার কোলে নিত্যকে দিয়া উঠিয়া পড়িতেছিল, নিত্য তাহার একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "শোন, যেও না।"

"আর শুনব কি ?—সব শোনা হয়েছে—বিনোদিনী সব বলেছে। বড় তাড়াতাড়ি ছুটে এসেছিলাম, বিন্দুর মুখে 'না' শোনবার জন্যে। একটু কোথাও দাঁড়াই নি, সন্ধ্যাবেলা খালাস পেয়ে সমস্ত রাত ছুটে ভোরে মালদায় এসেছি, তার পর ষ্টীমার ধ'রে এখানে।"

"আহা, বাছার আমার কাল থেকে খাওয়া হয় নি ! ওরে বিন্দু, চট্ ক'রে—"

"আর চট্ করতে হবে না; যে মরতে যাচ্ছে, তার আবার খাবার দরকার কি ?"

বিন্দুর ওষ্ঠ কাঁপিয়া উঠিল। নিত্য মনে করিল, বিন্দু বুঝি এইবার কাঁদিয়া ভাসাইবে; তাড়াতাড়ি কহিল, "কাঁদিস নে বিন্দু, কার জন্যে কাঁদবি ? যে তোর কথা বোঝে না—মায়াহীন, গোঁয়ার, তার জন্যে কেন কাঁদবি ?"

ললিত বসিল; জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ কথাটা আমি বুঝি নি ?"

নি। বিন্দুর ছোট্ট কথাটি—যা' নিয়ে তুমি এত গোল করছ। আগে তুমি খাও, তার পর বোঝাব। ভাতে দুটা আলু ফেলে দিস, বিন্দু।

বিন্দু চঞ্চলচরণে উঠিয়া গেল। ললিত কহিল, "আগে বল, মাসীমা।"

নি। আচ্ছা, আগে ত তুমি এমন গোঁয়ার নিষ্ঠুর ছিলে না, এখন এমন হয়েছ কেন ?

ল। তোমরাই করেছ। যার কাছে যাই, সেই আমাকে নিরাশ করে। যত ঘর গড়ি, সব ভেঙ্গে যায়। সকল দিকে ব্যর্থ হয়ে এ আশাশূন্য নির্ব্বাসিত জীবনে তোমাদের অবলম্বন করেছিলাম, তোমরা আমার তৃষ্ণার্ত্ত কণ্ঠে জল না দিয়ে ছাই দিলে। এ বৃথা জীবন নিয়ে তুমি কি আশা কর, আমি হেসে নেচে বেড়াব ?

নি। তোমাকে কেউ ছাই দেয় নি, তোমার জীবনও বৃথা হয় নি। তুমি একটি বদ্ধ পাগল।

ল। পাগল করেছ তোমরা, যে মশা-মাছি মারতে পারত না, সে হয়েছে আজ খুনে—

নি। যে এমন গোঁয়ার, তার হাতে ত বিন্দুকে দেওয়া [illegible] না—তাকেই হয় ত কোন দিন খুন ক'রে [illegible]।

[illegible] স্তব্ধ হইল। বিস্ফারিত নয়নে বিন্দুর পানে

আদর

[শিল্পী—শ্রীযামিনী ভূষণ রায়

চাহিয়া রহিল। নিত্য [illegible] করিতে থাকিল, কিন্তু তাহাকে কিছু বলিল না। অদূরে বিন্নুকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "ভাত হয়ে গেলে ললিতকে ডাকিস—নামিয়ে নেবে।"

নিত্য যে ফলের আশায় ললিতকে খোঁচা দিল, সে ফল পাইল না। ললিত কহিল, "ঠিক বলেছ মাসী-মা, আমি বড় গোঁয়ার। বিন্নুর আমি যোগ্য নই, তাই বলতে চাচ্ছ—"

ললিতের খোঁচার ঘায়ে নিত্য একটু উত্তেজিত হইয়া কহিল, "তোমার যোগ্য ত বিন্নু কোন দিনই নয়। তুমি কেন এই গরীবের বিধবা মেয়েকে বিয়ে করবে? তুমি বড় ঘরের ছেলে, বিদ্বান্, রূপবান্, কত বড় লোক টাকা ও মেয়ে নিয়ে তোমার পায়ে ধরবে, তুমি কোন্ দুঃখে এই ছোট ঘরের কালো মেয়েকে—"

ল। তুমি কি আমাকে পাগল না ক'রে ছাড়বে না, মাসী-মা? আর যে আমি পারি না।

নি। কি করতে হবে বল? কি করলে তুমি সুখী হও?

ল। তুমি বেশ জান, বিন্নুকে ছেড়ে আমি রাজার মেয়েকেও বিয়ে করব না।

নি। তুমি বোকা, তাই বুঝ্‌তে পার নি, বিন্নু তোমাকে কতখানি ভালবাসে। তোমার অসুখ হ'লে তোমার জন্যে সে শরীরপাত করেছে, মোহিতের টাকার দরকার হ'লে সে গয়না বাঁধা দিয়ে টাকা পাঠিয়েছে—

ল। বিন্নু সেই ত্রিশ টাকা পাঠিয়েছিল? তাই বলি, আমার নাম দিয়ে অতগুলো টাকা কে পাঠালে?

বলিতে বলিতে সে ত্রস্তভাবে উঠিয়া দাওয়া হইতে নামিল; রশুইঘরের দ্বারে দর্শন দিবামাত্র বিন্নু বলিয়া উঠিল, "টিপে দেখুন, ভাত হ'ল কি না।"

"চুলোয় যাক্ ভাত।" বলিয়া সেখান হইতে ফিরিল, দাওয়ায় উঠিয়া পায়চারী করিতে লাগিল। নিত্য কহিল, "তুমি আগে চান কর দেখি। বিন্নু, এক কলসী জল আর তেলের বাটি আমার হাতের কাছে দিয়ে যা।"

বিন্নু তাহাই করিল। নিত্য খানিকটা তেল ললিতের মাথায় ঢালিয়া, বুকে পিঠে দিল। ললিত তখন স্নান করিয়া লইল। [illegible] না [illegible] লইল না—[illegible] করিতে হইল।

আহারান্তে মাথাটা একটু স্থির হইলে ললিত কহিল, "এইবার বল, মাসী-মা।"

"বলব আর কি? তুমি একটু ভেবে দেখলে সব বুঝতে পারবে। বিন্নু তোমাকে এতটা ভালবাসে যে, বিয়ে ক'রে তোমাকে সে জাতে সমাজে খাটো করতে চায় না—তোমার মা-ভাইয়ের সঙ্গে যে তুমি তার জন্যে ঝগড়া কর, ইহাও সে ইচ্ছা করে না। কয়েক মাস আগে হয় ত সে এতটা ভেবে দেখত না, কিন্তু এখন যে সে তার নিজের সুখের চেয়ে তোমার সুখশান্তি বড় মনে করে।"

এমন সময় কুটীরের অপর দিক্ হইতে কে ডাকিল, "দাদা, দাদা এখানে আছ?"

ললিতের কানে সে ডাক পৌঁছিল না। বিন্নু ছুটিয়া আসিয়া কহিল, "মোহিত—মোহিত বাবু এসেছেন।"

"মোহিত এয়েছে? তুমি তাকে কি ক'রে চিন্‌লে, বিন্নু?"

বিন্নু উত্তর করিল না, শুধু একটু হাসিল। ললিত ছুটিয়া গিয়া মোহিতকে বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিল—প্রণাম করিতেও তাহাকে অবসর দিল না। হাত ধরিয়া নিত্যর কাছে আনিয়া কহিল, "এই মাসী-মা, প্রণাম কর।"

নিত্য বহু আপত্তি করিল, কিন্তু মোহিত ছাড়িল না।

মো। এই বুঝি বিন্নু?

ল। না, এ তোমার বউদি—প্রণাম কর।

বিন্নু ছুটিয়া পলাইল।

মোহিত। পালালে হবে না, বউদি—

ল। তা' তুই এ সময় এখানে এলি কেন?

মো। আমি গিছলাম রতুয়ায় তোমার সঙ্গে দেখা করতে। সেখানে গিয়ে শুনলাম, তুমি এখানে এসেছ।

ল। আমার সঙ্গে দেখা করবার তোর এত কি দরকার পড়েছিল?

মো। দরকার একটু পড়েছিল বই কি। কাকীমা মারা গেছেন; কাকা তোমাকে ডেকেছেন তাঁর শ্রাদ্ধ করতে। মা'র নামে দু'শো টাকা পাঠিয়ে দিয়ে লিখেছেন, তুমি খালাস পাবামাত্র যেন এলাহাবাদ চ'লে যাও।

ললিত উত্তর করিল না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। মোহিত কহিল, "ভাবছ কি দাদা? কাকা বিধবা-বিবাহ করেছিলেন, তাই বুঝি তুমি ইতস্ততঃ করছ?"

ল। না রে, তা নয়, আমি এই নতুন কাকীকে কখন

দেখিনি, সুতরাং তাঁর জন্যে প্রাণ কাঁদছে না; প্রাণ কাঁদছে কাকার জন্যে। তাঁকে এ বুড়ো বয়সে কে দেখবে?

মো। দেখবে তুমি, বউদি আর আমি। তাঁর মত লোকের সেবা করতে পেলে আমরা তরে যাব।

ল। আমি ত যেতে পারব না ভাই, তুই বরং যা।

মো। সে কি! তাঁর ছেলেপিলে নেই, তোমাকে বরাবর ছেলের মত ভালবাসেন, আর তুমি বলছ যাব না?

ল। আমি যে যেতে পারব না।

মো। কারণটা চট্ ক'রে ব'লে ফেল দেখি।

ল। একটা মস্ত গোল আছে—

মো। আমার পরামর্শ শোন, তুমি বরাবর এলাহাবাদ চ'লে যাও। সেখানে কিছু দিন থেকে কাকার কাছ হ'তে ছুটী নিয়ে দেশে চ'লে এস। তার পর মা'র অনুমতি নিয়ে বিয়েটা ক'রে ফেল—

ল। মা কি বিন্নুকে গ্রহণ করবেন?

মো। নিশ্চয় করবেন। যখন তুমি আমি গ্রহণ করেছি, তখন তিনি গ্রহণ করেছেন জানবে। এরই মধ্যে মাকে ভুলে গেলে! বোন্‌টারও বিয়ে ঠিক করেছি, তুমি গেলেই হবে। তার পর সদলে প্রয়াগ যাত্রা—

ল। তুই আমাকে বাঁচালি মোহিত; কিন্তু তুইও বিন্নুর সব পরিচয় জানিস নি—

মো। খুব জানি, আর জানবার দরকার নেই। বউদিদির পরিচয় বউদিদি।

নিত্যর চক্ষু সজল হইল। কম্পিতকণ্ঠে কহিল, "ললিতের ভাই বটে!"

মোহি। ও সব বাজে কথা রেখে দাও, মাসী-মা। আমি এখন মহাচিন্তায় পড়েছি—

নিত্য। কেন বাবা?

মোহি। আমাকে তুই এক দিনের মধ্যে এ সব বেচে কিনে তোমাদের নিয়ে যেতে হবে।

নিত্য। আমরা কোথা যাব, বাবা?

মোহি। আপাততঃ আমাদের দেশে; বিয়ের পর প্রয়াগে, সেখানে খুব চান করবে মাসী-মা, কিন্তু তোমাকে মাথা স্থাড়া করতে দেব না ব'লে রাখছি—

নিত্যর হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতেছিল; সে কহিল, "তুমি ত দেখছি সব ব্যবস্থা ক'রে ফেলেছ, বাবা!"

মোহি। কৈ দাদা, তুমি এখনও রওনা হ'লে না? চট্‌পট্ বেরিয়ে পড়—এই নেও টাকা—দুর্গা দুর্গা—আমি এ দিকে সব গুছিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। তুমি নিশ্চিন্ত থাক—আর কথা, একটা কথা তোমাকে বলা হয় নি। আমি পরীক্ষায় পাশ হয়েছি, আর লিষ্টের মাথায় আমার নাম—

আনন্দে বিহ্বল হইয়া ললিত ভাইকে বুকে জড়াইয়া ধরিল, এ স্নেহোচ্ছ্বাসে মোহিতের চক্ষু সজল হইলেও সে তাড়াতাড়ি কহিল, "তুমিও দেখছি মা'র মত করলে, এখন ছাড়—যাত্রা কর।"

ল। তোর এই ফিজের টাকা কে পাঠিয়েছিল, জানিস?

মো। কেন, তুমি।

ল। না। পাঠিয়েছিল বিন্নু, তার গয়না বাঁধা রেখে।

মো। কথাটা আমার কাছে নূতন বটে, কিন্তু এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। আমি বরাবর জানি, যিনি আমার বউদিদি হবেন, তিনি এই রকম কাযই করবেন।

নিত্য ও ললিত হাসিয়া উঠিল। মোহিত কহিল, "অ বউদি, তুমি কি সব বাজে কায করছ। আমাকে ভাত দেও না, ক্ষিদেতে নাড়ী জ্বলছে—"

মোহিত আহারাদি শেষ করিয়া স্থির হইয়া বসিলে বিন্নু তাহার মাকে সম্বোধন করিয়া স্পষ্টকণ্ঠে কহিল, "মা, এ দেশ ছেড়ে আমরা কোথাও যাব না।"

মোহিত ও ললিত গোল করিয়া উঠিল। সে গোলমালে বিন্নু একটুও বিচলিত হইল না—গম্ভীরবদনে বসিয়া রহিল। মোহিত কহিল, "বিয়ে হ'লে ত এখানে আর থাক্‌তে পাবে না বউদি।"

বিন্নু। ও সব কথা দয়া ক'রে আর তুলবেন না।

মো। সে কি! বিয়ে করবে না?

বিন্নু। না।

মোহিত স্তম্ভিত হইল। ললিত ধৈর্য্য ধারণ করিয়া আর থাকিতে পারিল না; কহিল, "কারণটা জিজ্ঞেস করতে পারি কি?"

বিন্নু। মা ত তা' বলেছেন।

বিন্নু উঠিল এবং কলসী হস্তে নদীর দিকে চলিয়া গেল।

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ভুবনমোহন নিয়োগী

ভুবন আমার চেয়ে প্রায় বছর পাঁচেকের ছোট ছিল; তা হ'লেও যখন গত ২৫শে বৈশাখ রাত্রিতে সে মহানিদ্রার কোলে চেতনাহারা হয়ে পড়ে, তখন তার বয়স (৬৯) উনসত্তরের সীমা অতিক্রম করে নাই।

যে দেড় শতাধিক লোকের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ চেষ্টা ন্যাশান্যাল ও বেঙ্গল নাম দিয়া বঙ্গের আদি দুটি নাট্যশালা গড়ে তুলেছিল, তাঁদের মধ্যে জীবিত ছিলেন চার জন; এই চার জনের ভিতর গত চৈত্রের মাঝামাঝি গেছেন এক জন;—নাম যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, সেই সেকালের প্রথম 'লীলাবতী' অভিনয়ে ইনি নদেরচাঁদ,—এমন নদেরচাঁদ আজ পর্য্যন্ত হয় নি, তবে অভিনেতারূপে তাঁর বিশেষ নাম নাই; মঞ্চসম্বন্ধীয় নেপথ্যাচার কার্য্যে তিনি ধর্ম্মদাস সুরের সুদক্ষ সহায় ছিলেন; আর ষ্টার থিয়েটারের কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ বর্ত্তমান বাটীই তাঁর স্থপতি বিদ্যার সাক্ষ্য দিতেছে; মন্দিরোপম সুচিত্র কারুকার্য্যভূষিত উক্ত নাট্যশালার গোপুরটি যোগী বাবুর কল্পিত আদর্শে গঠিত। মিস্ত্রিদের জন্য হাতের চেটো দিয়ে একবার চোখটা মুছে নিতে তখনকার এক জন রাজমিস্ত্রীও বেঁচে নাই।

এইবার গেছেন ভুবন নিয়োগী; বাকী আছি দু'জন; আমি আর ক্ষেত্রমোহন গাঙ্গুলী। ক্ষেতুও আমার চেয়ে বছর দুই আড়াইয়ের ছোট হবে, কিন্তু অবস্থা গতিকে যেন জবু থবু হয়ে পড়েছে, বাড়ী থেকে আর বা'র হ'তে পারে না। অভিনেত্রী-যুগ প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে বঙ্গের প্রকাশ্য নাট্যশালার আদি নায়িকা (Heroine) এই ক্ষেতু একদিন সহস্র সহস্র দর্শককে মোহিত করেছিল। পরলোকগতা বা জীবিতা বহু রূপবতী অভিনেত্রীকে আমি দেখেছি, এক এক জনের অভিনয়-কলার ভাব ও ভাষা অক্ষয় অক্ষরে আমার স্মৃতি ও প্রাণে মুদ্রিত আছে, কিন্তু তবু বলছি যে, কৃষ্ণকুমারী, নবীন-তপস্বিনী, কপালকুণ্ডলা এবং আরও দু একটা নারী-চরিত্রে আজ পর্য্যন্ত কোন রঙ্গমঞ্চ-চক্করী-ই অভিনয়ের কথা কি বলছি—সেই অষ্টাদশবর্ষীয় ব্রাহ্মণবালককে রূপ-রূপের ছটাতেও পরাজিত করতে পারে নি।

আমি নাট্যশালার ইতিহাস লিখতে বসি নাই, লেখবার শক্তিও নাই, আর সে কাযে হস্তক্ষেপ করা উচিত কি না, সে বিষয়ে মনে একটা সন্দেহও আছে। তবে নিজের এই ক্ষুদ্র জীবনটা ৫৫ বৎসর ধ'রে ষ্টেজ ও প্রেস সঙ্গে এত জড়িয়ে গেছে যে, পুরোনো কৌটা থেকে এক খেই সুতো টেনে বের করতে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে আরও দু চার খেই তার গায়ে গায়ে মিশে সামনে এসে পড়ে; তাই ভুবনের মৃত্যুর কথা ভাবতে ভাবতে আরও দু-চারটে ভোলা কথার ঘুম ভেঙ্গে গেল।

আজ ১৯ দিন হ'য়ে গেল ভুবন ইহলোক ছেড়ে চ'লে গেছে, কিন্তু তার মৃত্যু-সংবাদ এ পর্য্যন্ত কোন সংবাদপত্রেই প্রকাশিত হয় নাই। এটা কিছু বিচিত্র নয়; কারণ, তখনকার অল্পসংখ্যক বাঙ্গালী-পরিচালিত সংবাদপত্রের মধ্যে যেগুলি ভুবন নিয়োগীর বড় বাড়ী দেখেছে, গাড়ী দেখেছে, জুড়ি দেখেছে, ফেটিং দেখেছে, দালানে দোল নন্দোৎসবের ধুমধাম দেখেছে, কালে তাদের প্রায় সকলগুলিরই অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে। তাঁর বাড়ীর অনতিদূরেই যে প্রাচীন প্রসিদ্ধ পত্রিকাখানি আজ-ও সুস্থ শরীরে জীবিত আছে, তার বর্ত্তমান কর্ত্তৃপক্ষের স্বর্গগত পিতৃ-পিতৃব্যগণ অবশ্য ভুবনকে আদরে নিমন্ত্রণ ক'রে নিজেদের ঘরে বসিয়েছেন, তাঁর বাটীতে ও থিয়েটারে পদার্পণ ক'রে নিয়োগী কুলকে সম্মানিত করেছেন, কিন্তু তখন ছিল আঙ্গুলে হীরের আ টীপরা ভুবন, আর এখনকার এঁরা যদি দেখে থাকেন তো দেখেছেন নেংটীপরা ভুবনকে।

ভুবনের পিতামহ স্বর্গীয় রসিকচন্দ্র নিয়োগীর নামে বাগবাজারের একটি ঘাট এখনও পরিচিত; কিন্তু সমগ্র কলিকাতা সহরের যে ঘাটটি এক দিন তখনকার শোভাময় গঙ্গাতীরের মধ্যে অত্যুৎকৃষ্ট আরামপ্রদ সৌন্দর্য্যপূর্ণ প্রাসাদ ব'লে গণিত হ'ত, তার ঘাটে

নামবার পৈঠা কয়টি মাত্র এখন পূর্ব্ব-গৌরবের সাক্ষ্য দিচ্ছে।

জননী জাহ্নবী হুগলী নাম গ্রহণের পর ক্রমে যখন পতিতপাবনী কার্য্যে ইস্তফা দিয়ে ইংরাজের বাণিজ্য-বাহিনী চাকরী গ্রহণ করলেন, তখন বর্ব্বর-প্রথার প্রশ্রয়দায়ী গঙ্গাযাত্রী রাখার ঘরগুলি ও চাঁদনীর উপরিতলস্থ প্রকাণ্ড হল, সৌন্দর্য্যের শত্রু পোর্টকমিশনার মহাশয়দিগের দ্বারা উৎসারিত ক'রে পাটবাহী রেল ও মহিষ বয়েলের গাড়ী চলবার রাস্তা বানিয়ে দেছেন।

তার পর যে কালে থিয়েটারের পালায় ভুবন নিয়োগীর গলায় নামডাকের মালা দুলেছিল, সে সময়ে বাঙ্গালা নাট্যশালার ব্রজের ভাব ; অর্থাৎ বঙ্গের নব নটকুল গোকুলে গোচারণ ক'রে, কদম ডালের দোলায় দুলে, চাঁদের আলোয় রাসলীলা ক'রেই আনন্দ উপভোগ কত্ত। একটা মনের মত দাঁও পেলেই তাদের হার্ট লাফিয়ে উঠত ; আর্ট কাকে বলে তা তারা একবারে জানত না, তা কি হাত ফেরাবার, চোখ ঘোরাবার, কি মাইনে নেবার, কি মাইনে বাড়াবার, এগ্রিমেণ্ট দেবার কি এগ্রিমেণ্ট ভাঙ্গবার। এখনকার অভিনেতৃদের মত তারা চুড়ো ছেড়ে পাক বাঁধে নি ; তাদের গিরিশ ঘোষ অর্দ্ধেন্দু মুস্তফী বড় জোর রাখালরাজা হয়েছিল ; ভাড়াটে বাড়ীর উঠোনে সামিয়ানা টাঙ্গিয়ে কুঞ্জ রচনা ক'রে তারা লীলায় বিভোর হয়ে থাকত। এমন কি রিহারসল দেবার জন্য কারুর বাড়ীর বাইরে একটা ছোট খাট ঘর, একটা তেলের লণ্ঠন যোগাড় কত্তে পারে এই আমরাই ভয়ানক একটা লাভ করেছি মনে কত্তেম।

এই সময় ভুবনের কাছে উপস্থিত হওয়াতে সে তার উপরি-উক্ত গঙ্গাতীরের দ্বিতলের হল ও একটি কুঠুরী আমাদের ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দেয়। আর দিলে একটি টেবল হারমোনিয়ম। সন্ধ্যার পূর্ব্বে পুরাতন খানসামা নবীন এসে একটা সেজ জেলে দিয়ে যেত, গোটা ৫।৬ হুঁকো কেনা ছিল, নবীন খানিকটা তামাক ও আগুনের বন্দোবস্ত ক'রে রেখে যেত ; সেজে আগুন দিয়ে টানবার ভার আমাদের নিজের নিজের উপর।

জীবমাত্রেই শ্রীকৃষ্ণের রূপান্তর ; সেইরূপ আমাদের ব্রজরাজ যখন প্রথম প্রথম দিন কতক জটিলা-লীলা-রস অনুভব করবার জন্য আমাদের নামে কলঙ্কের গান বেঁধেছিলেন "লুপ্ত বেণী বইছে তেরো ধার। তাতে পূর্ণ অ[illegible] ইন্দু কিরণ সিঁদুর মাখা মতির হার॥" তখন আমরা এ[illegible] ঘাটের বৈঠকখানায় বসেই হাসতে হাসতে কবির অপূর্ব্ব রচনা সুর ক'রে নিজেরা গেয়েই কলঙ্কের কালিমাটুকু জ্যোছনায় উজ্জ্বল ক'রে দিয়েছিলেম। আর কি রাখালরাজ রাখালদের ছেড়ে থাকতে পারে—বাঁশরী বাজল, আবার গোপাল গোঠে ফিরে এল। গিরিশের প্রত্যাগমনে অভিনেতাদের বিষাদ হরিষে পরিণত হ'ল।

রাজা বিক্রমাদিত্য নবরত্নের সৃষ্টি করেছিলেন, তাই কালিদাসের কবিতা-ভাগীরথী তীর্থে স্নান ক'রে আজও জগৎ পুলকিত ও পবিত্র হচ্ছে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় সমাদরে রসিক-সমাগম হ'ত,তাই ভারতচন্দ্রের ছন্দাবলী আজও বাঙ্গালী কবির আদর্শ হয়ে আছে ; কবিরঞ্জনের পদাবলী, গোপাল ভাঁড়ের রসের টুকরা এখনও অনেক রসিকের প্রাণে প্রেরণা পৌছে দেয়। বড় মানুষ ভুবন নিয়োগী একটু আশ্রয় দিয়েছিল, তাই গিরিশের মত অসাধারণ নাট্যকবি কেরাণীগিরিতে জীবন পর্য্যবসিত করে নাই ; স্কুল মাষ্টারের কেদারাই অর্দ্ধেন্দু ও ধর্ম্মদাস সুরের ন্যায় কলাবিদের প্রতিভার রঙ্গমঞ্চ হয় নাই ; তাই নগেন্দ্র, মহেন্দ্র, কিরণ, মতি, বেলবাবু প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ অভিনেতাদিগের নাম বঙ্গনাট্যশালার ইতিহাসে অমর অক্ষরে লিখিত না হ'লে লেখককে অপরাধগ্রস্ত হয়ে থাকতে হবে।

রিহারসেল দিয়ে প্রথম প্রকাশ্য থিয়েটার খুলবার ব্যবস্থা করেই ভুবনের কার্য্য শেষ হয় নি। আমার ঠিক স্মরণ হচ্ছে না ১৮৬৮ বা ৬৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে বিলাতী ব্যবসায়ী থিয়েটারের আমদানী কলিকাতায় হয় নি। ইংরাজী সওদাগরী আফিসের কেরাণী, এটর্ণি কোন্সুলী প্রভৃতি সাহেবরা সখের দল বেঁধে থিয়েটার করতেন ; ছোকরা সাহেবরাই মেয়ে সাজিতেন ; ২ জনকে আমি দেখেছি ও চিনতেম ; এক জন ছিলেন এটর্ণি সি, এফ, পিটার ; আমাদের নগেন বাঁড়ুয্যের বড় ভাই দেব বাড়ুয্যে তাঁর আর্টিকেলড্ ক্লার্ক ছিলেন, আর এক জন এটর্ণি হিউম সাহেব ; তিনি কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কলিকাতা পুলিসে পাবলিক প্রসিকিউটার ছিলেন। এঁদের টিকিট বিক্রিটা খরচা চলবার চাঁদার মধ্যে পরিগণিত হ'ত। আমরাও অভিনয়ে প্রথম টিকিট বিক্রি

আরম্ভ করি ঐ চাঁদা হিসাবে খরচ চালাবার জন্য—আপন আপন উদরপূর্ত্তির জন্য নয়।

ব্যবসায়ী থিয়েটার আসার পর থেকে ইংরাজদের ২টি রঙ্গশালা নির্ম্মিত হয়। একটি লিণ্ডসে ষ্ট্রীটে, একহারা ইটের দেওয়ালের উপর করগেট ছাওয়া ছোটো-খাটো ঘর; সেখানে বক্‌স্ ও ষ্টল ভিন্ন অন্য সিট ছিল না। ঠিক জন্ কোম্পানীর গোড়ার আমলের নবাব না হলেও ৫০।৬০ বছরের আগেকার সাহেবরা এখনকার মত পাকা বেণে ছিলেন না, তাঁদের অনেকটা আমিরী মেজাজ ছিল; প্রায় লাখ টাকার কাছাকাছি চাঁদা তুলে তাঁরা বোধ হয় উপরি উপরি ৫।৬ বছর গ্যারাণ্টি দিয়ে ইটালিয়ান অপেরা সম্প্রদায়কে কল্‌কাতায় আনাতেন ও এই লিণ্ডসে ষ্ট্রীট অপেরা হাউসে অভিনয় করাতেন। সেখানে টিকিটের দাম ১৬৲ টাকা থেকে ৫৲ টাকার কম নয়; বারে, ফাষ্টক্লাশে এক পেগ সোডা ব্রাণ্ডি ৪৲ টাকা সেকেণ্ড ক্লাশে ২৲।

ভুবনমোহন নিয়োগী

ইংরাজী নাটক অভিনয় আমাদের বাঙ্গালীকে ভাল ক'রে দেখিয়ে যান প্রথমে জি, ডাবলিউ, লুইস্ ব'লে এক জন। যখন জেলার হোম ছিল লালবাজারের মোড়ে, তখন বৌবাজার ও বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীটের অনেকটা রাস্তার ধারে য়ুরোপীয়ান ও আমেরিকান শুঁড়ীদের কতকগুলি মদের দোকান ছিল; বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীটে এইরূপ এক শুঁড়ী, তাঁর কানে সোনার মাকড়ী—নাম ছিল সুলতানা, ভাড়া পাবার আশায় গড়ের মাঠে মনুমেণ্টের কাছে একখানি থিয়েটারের ঘর তৈয়ারী ক'রে দেন। করগেটের চাল, করগেটেরই বেড়া; এখনকার মতন ছ্যা ছ্যা হয়ে করগেট তখন ভবীর মা'র গোয়ালের চালায় আশ্রয় পায়নি। ঐ থিয়েটারে লুইসের দল প্রতি শীতকালে এসে মাস ৫।৬ অভিনয় দেখিয়ে চ'লে যেত। এখনকার চৌরঙ্গী অঞ্চলের দর্শকদের মতন তখনকার সাহেবদের নাট্য-প্রীতি নর্ত্তকী শ্রীচরণোত্তোলনভঙ্গীতেই পরিতৃপ্ত হ'ত না, তাঁহারা যথার্থ নাটক এবং উৎকৃষ্ট নট-নটীর অভিনয় দেখতে ভালবাসতেন, তাই লুইসের দল প্রতি বৎসরই সেক্সপিয়ার এবং অন্যান্য খ্যাতনামা নাট্যকারের নাট্যলীলা অভিনয় ক'রে দেখাতেন। স্বামী লুইসের বিশেষ কোন কার্য্য সাধারণ চক্ষুতে পতিত হ'ত না, কিন্তু স্ত্রী লুইস অনন্যসাধারণ শক্তিসম্পন্না ছিলেন। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী, রুসিয়া, আমেরিকা এ সব আমি কিছুই দেখিনি, কিন্তু এই কল্‌কাতায় এক নারাতে অমন সুরূপা, সচ্চরিত্রা শ্রমশীলা অধ্যবসায়-সম্পন্না অভিনেত্রী ও কার্য্য-কর্ত্রী আমি আজ পর্য্যন্ত দেখি নাই। তার প্রৌঢ় বয়সেও আমি যেন তাকে একটি ১৮ বৎসরের সুন্দর ছোকরা সাজতে দেখেছি।

বাঙ্গালা অভিনয়ে গিরিশ বাবু যে নূতন ধরণে শক্তি ও ভাব সঞ্চার করেছিলেন, তার প্রথম প্রেরণা এই লুইস থিয়েটারের অভিনয় দেখাতেই তাঁর মস্তিষ্কে প্রবেশ করে। এই থিয়েটারের প্রদর্শিত প্যান্‌টোমাইমের উজ্জ্বল দৃশ্যপটাদি দেখেই ধর্ম্মদাস সুরের দৈবিশক্তি প্রস্ফুটিত হয়; আমি আর কিছু শিখি না শিখি, লুইস থিয়েটারে অনেকবার অনেক এক্‌টার এক্‌ট্রেসের অভিনয় দেখে এইটে বুঝে নিয়েছিলুম যে, মনুষ্যকণ্ঠে বজ্রগর্জ্জন তত শ্রুতিমধুর নয় আর affectation ও mannerism, acting নয়।

আমরা কভেণ্ট গার্ডেন, ড্রুরীলেন, হেমার্কেট, লাইসিয়ম প্রভৃতি দু পাঁচটা লণ্ডন থিয়েটারের নাম শুনেছিলুম মাত্র; মনে মনে ভাবতেম, গড়ের মাঠের ঐ টিনের বাক্সটি বোধ হয় দেশী কভেণ্ট গার্ডেন। হঠাৎ কোন আলাদিনের প্রদীপের সাহায্যে আমরা যদি বাঙ্গালীটোলায় ঐ রকম একটা বাড়ী

গ'ড়ে তুলতে পারি, এইটে শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখতুম আর যোড়াসাঁকোর স্যাণ্ডেল বাড়ীর (বর্ত্তমান মল্লিকদের ঘড়িওলা বাড়ীর) উঠানের ওপর বাঁধা ষ্টেজে অভিনয়ের অবসরে স্যাঁতসেঁতে আঁধার ঘরে ব'সে পরস্পরে পরস্পরের কাছে বলাবলি করতুম যে, তা হ'লেই আমাদের থিয়েটার করার সোনার স্বপ্ন সফল হয়।

গ্রীষ্ম দেখা দিলে। সে বছর যেন আমাদের পথে বসাবার জন্যই কিছু সকাল সকাল আকাশের মেঘ ঝড় বাদলের ভয় দেখাতে আরম্ভ করলে, ঘরের ভেতর ভায়ে ভায়ের ভিতরও একটু একটু মুখ বাঁকা-বাঁকি সুরু হলো,—কারণ, আত্মীয়তা যেন প্রত্যক্ষফল প্রদর্শন করাবার জন্য নিষ্কর্ম্মা জ্ঞাতি ও গাধাবোট-বোড়ানো গোঁড়ার গতায়াতটা বেশ নিয়মিতরূপেই চল্‌তো; সুতরাং গিরিশচন্দ্র-রচিত :—

"কাতর অন্তরে আমি চাহি বিদায়।
সাধি ওহে সুধীব্রজ ভুল না আমায়॥"

ইত্যাদি বিদায় গীত গেয়ে নিজেরা কেঁদে সমগ্র দর্শককে কাঁদিয়ে পাদ-প্রদীপের আলোক নিবিয়ে দিলুম।

দু'দল হ'লুম ;—(ন্যাশান্যাল, হিন্দু ন্যাশান্যাল) হাবড়া, চুঁচুড়া, বর্দ্ধমান, ঢাকা কত যায়গায় ষ্টেজ ঘাড়ে ক'রে ঘুরলুম ; নাম যশ বেশ ছড়িয়েই পড়লো, কিন্তু কল্‌কেতায় অভিনয় করবার একটা ঘর আর জোটে না।

অনিশ্চিত আশায় ভর ক'রে স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের বাড়ীর একটা হলে রঙ্গমঞ্চ স্থাপনের বাসনায় প্লাটফরম পর্য্যন্ত বাঁধা হ'ল :—বাস্ ঐ পর্য্যন্ত।

সাণ্ডেল-বাড়ীর উঠানে আমাদের ৩।৪ রাত্রি অভিনয়ের পরেই ঠনঠনের কালীতলার নিকট ৺কৃষ্ণ সরকার মহাশয়ের বাড়ীর উঠানে ওরিয়েণ্টাল থিয়েটার নাম দিয়ে ঝামাপুকুর অঞ্চলের কয়েক জন ভদ্রলোক একটি প্রকাণ্ড রঙ্গালয় খোলবার চেষ্টা করেন, কিন্তু দুই বা তিন রাত্রি ব্যতীত সেখানে আর অভিনয় হয়নি, সে সম্প্রদায়ের অনেকের সঙ্গেই আমাদের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ চলছে, আমরা ভেসে বেড়াচ্ছি, এমন সময় আগষ্ট মাসে বিডন ষ্ট্রীটে বেঙ্গল থিয়েটার স্থাপিত হ'ল। এখন যেখানে অনাথ বাবুর বাজার ও বিডন ষ্ট্রীট পোষ্টাফিস, ঐখানে সপুকুর একটি খোলা প্রশস্ত জমী ছিল—যার নাম ছাতু বাবুর মাঠ। বৈকালে বন্ধুবান্ধব নিয়ে বাবুরা ঐখানে বসতেন, আর চৈত্র-সংক্রান্তির দিন খুব ধুম-ধামে চড়ক হ'ত, আর প্রকাণ্ড মেলা বসত ; থিয়েটার ঘর হবার পরেও অনেক দিন চড়ক ও মেলার অস্তিত্ব ছিল, এখনও বোধ হয় ঐ দিনে ধুচুনীটা, কুলোটা, পুতুলটা প্রভৃতি বিক্রয় চলে। শোনা গেছে, সেই অনেক দিন আগে গোড়ায় গোড়ায় যখন জয়রাম বসাকের বাড়ী 'কুলীন কুল-সর্ব্বস্ব', কালী সিংহী মশায়ের বাড়ী 'বিক্রমোর্ব্বসী' (কি ?) প্রভৃতি অভিনয় হয়, সেই সময় ছাতু বাবুর বাড়ীতেও ষ্টেজ বেঁধে 'শকুন্তলা' অভিনয় হয় ; ছাতু বাবুর দৌহিত্র শরচ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় সেই অভিনয়ে দুষ্মন্ত-পুত্র ভরতের ভূমিকা পেয়েছিলেন। শরৎ বাবু নানা কলাদি বিদ্যায় দক্ষ ছিলেন। তাঁর মতন ঘোড়-সওয়ার আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালীতে জন্মেছে কি না সন্দেহ। ইংরাজদের অনুকরণে তাঁরই বিশেষ উদ্যোগে কাশীপুর অঞ্চলে বাঙ্গালীর একটি নিজস্ব রেশকোর্শ খোলা হয় ; পাখোয়াজ বাজানয় তিনি এক জন বড় ওস্তাদ ছিলেন, তাঁর রচিত পাখোয়াজের অনেক বোল এখনও গুণিমহলে প্রচলিত।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের পরামর্শে সবন্ধু শরৎ বাবুর উদ্যোগে ঐ মাঠে বেঙ্গল থিয়েটার নাম দিয়ে মাটীর দেওয়াল সমেত একখানি বড় খোলার চালা প্রস্তুত হয় ; ষ্টেজের প্লাটফরমটি পর্য্যন্ত সিমেণ্টের পলস্তারাযুক্ত মাটীর বেদী—(ভারি ভুল)। এই দলের অনেক অভিনেতাই সখের যুগে প্রশংসিত ও আমাদের সিনিয়র ; যথা :—বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র মজুমদার, গিরিশচন্দ্র ঘোষ (হাস্যরসরসিক ন্যাদারু), প্রভৃতি মহাশয়গণ। শরৎ বাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চারুচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ইংরাজীতে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং সঙ্গীত-বিদ্যায় বিশেষ নিপুণ ছিলেন ; তাঁর মাতুল লাটু বাবুর জ্যেষ্ঠ বংশধর মন্মথনাথ দেব বিখ্যাত চিত্রকর ছিলেন ; তাঁর শিষ্য ও ভ্রাতৃসম্পর্কীয় প্রিয়নাথ বসু মহাশয়ও চিত্রবিদ্যায় নিপুণ ; ইঁহারা দুই জনেই প্রথম ড্রপসিন খানি আঁকেন। যাক, বলিছি আমি নাট্যশালার ইতিহাস লিখছি না, ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকের জন্য একটু একটু বাঁশ-গাড়ি ক'রে, অর্থাৎ (land mark) রেখে যাচ্ছি মাত্র।

যেখানে এখন মিনার্ভা থিয়েটার অবস্থিত, ঐখানে একটা খালি জমী অনেক দিন থেকে পড়েছিল ; কেউ কেউ বলে, ঐখানে নন্দকুমারের বংশধর রাজা গুরুদাসের

বাড়ী ছিল; ঐ জমীটের উপর একটা থিয়েটার বাড়ী করতে পারলে বড় মজা হয়, এটা আমাদের মনে মনে বরাবর আঁচ ছিল।

বেঙ্গল থিয়েটারের অভিনয় চলছে, কিন্তু জমছে না; শেষ বাবা তারকনাথ মুখ তুলে চাইলেন; মোহান্ত মহারাজ এক ষোড়শী এলোকেশী যাত্রীর রূপে মোহিত হলেন, এলোকেশীর স্বামী পত্নীবধ করলেন; কে এক জন বাঙ্গালী (কৃশ্চান বোধ হয়) 'মোহান্তের এই কি কাজ' ব'লে নাটক লিখলেন, সেই নাটকের অভিনয়ে বেঙ্গল থিয়েটারের নাম সারা বেঙ্গলে ছড়িয়ে পড়ল, আমি আর নগেন উপরি-উপরি ৩ রাত্রি টিকিট কিনতে গিয়ে ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে এলাম। মাইকেলের পরামর্শে নারী এক্‌ট্রেস নিয়েও যে বেঙ্গল থিয়েটার খালি বেঞ্চির সামনে প্লে কচ্ছিল, মোহান্ত-মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে সেই বেঙ্গলের দরজা থেকে রাত্রির পর রাত্রি শত শত লোক ফিরে যেতে লাগল।

আমরা দম ফেটে মারা যেতে লাগলুম; টাকার ঝন্‌ঝনানি শুনে নয়, সত্য বল্‌ছি—টাকা তখন ডোণ্ট কেয়ার; খালি বাড়ী নেই—ষ্টেজ নেই, এ্যাক্ট করতে পারছি না ব'লে, হাততালির শব্দে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করতে পারছি না ব'লে।

এই সময়ে সুমতিই হোক আর কুমতিই হোক্, ভুবনকে ভগবান্ না হোক ঐ রকম একটা কিছু দিলেন; "নাও জমীর লিজ, তৈরী কর থিয়েটার, আমি টাকা দেব!" আর আমাদের দেখে কে। তোমার জয় জয়কার হোক ভুবন, ব'লে আমরা লেগে গেলুম।

মানুষের ভিতরে অনেক শক্তি ঘুমিয়ে থাকে, ঘটনার যোগাযোগে অথবা অতি প্রয়োজনে সেই শক্তি জেগে দেখা দেয়।

ধর্ম্মদাস সুর ছিল মামুলী গৃহস্থ ছোকরা, স্কুলে পড়া এন্‌ট্রেন্স অবধি; কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই তার আঙ্গুলগুলির ব্যবহারে একটা পারিপাট্য দৃষ্ট হ'ত; হাতের লেখা অতি পরিষ্কার, খাতায় রুল টানত সুন্দর, ম্যাপ আঁকত চমৎকার, আর সরস্বতী পূজার সময় কুমারটুলী থেকে ঠাকুর কিনে এনে নিজের হাতে সাজিয়ে চৌকীর উপর বাগান রচনা ক'রে, যখন প্রতিমাখানি তার উপর বসাত, তখন বড় বড় কারিগরও তার তারিফ না ক'রে থাকতে পারত না।

আমি পেছন দিকে ফিরে দেখে যত বার-ই ভেবেছি, তত বার-ই আমার মনে হয়েছে যে, সে সময়ে ৪টি লোক না থাকিলে এ দেশে সাধারণ নাট্যশালা স্থাপিত হ'তে পারত না। সেই ৪টি লোক হচ্ছে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—স্বতঃসিদ্ধ জোগাড়ে অর্থাৎ অর্গানাইজ করবার অদ্বিতীয় ক্ষমতাশালী এবং এক জন বিশিষ্ট নট। ধর্ম্মদাস সুর—যোগাড়ে নগেনের সহায় এবং হাতের কাজে বিশেষ পটু। অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী—বিধাতার হাতে গড়া একটা ও অতুলনীয় নাট্যশিক্ষক, অর্দ্ধেন্দু ছিল সেই রকম মাষ্টার, যিনি কখন কোন ছেলেকে বলেন না যে, তোর কিছু হবে না; একটা দু'কথার পার্টের ভিতরেও মনে রাখবার মতন ছবি ফুটিয়ে দিতে সমর্থ। আর ভুবনমোহন নিয়োগী—যার সাহায্যে প্রথম একটা দল বসাবার জায়গা পাই ও পরে যার টাকায় বিডন ষ্ট্রীটে একটি সুদৃশ্য নাট্যশালা স্থাপিত

বলেছি নাট্যশালার আদর্শ ছিল, আমাদের সেই গড়ের মাঠের করগেটের ঘরখানি; তাও টিকিট কিনে আসনে ব'সে যতটুকু মাত্র দেখা; কারণ, আমাদের এই ক'টি বাঙ্গালী ছোকরার মনে এমন সাহস ছিল না যে, সাহেব ম্যানেজারের কাছে গিয়ে বলি, আমাদের একবার ভাল ক'রে থিয়েটার বাড়ীটে দেখিয়ে দিন। ধর্ম্মদাসের একটা বুদ্ধির কথা বলি; অবশ্য ব'লে ফেললে সেটা কলম্বসের হাঁসের ডিমের আগা ফেটে খাড়া ক'রে দাঁড় করানর মত অতি সহজ বোধ হবে; ষ্টেজের সামনেটা কত বড় হবে, তার মাপ ঠিক করবার জন্য ধর্ম্মদাস পিটের একটা সিটে আমার পাশেই ব'সে বেজ্‌কার্টেনের পার্টগুলো সেলাইয়ে সেলাইয়ে গুণে নেয়, পরে বাজারে গিয়ে সেই কাপড়ের বহর মেপে প্রোসিনিয়মের ব্যবস্থা করে।

একটা সুযোগ ঘটে গেল; ৭৩ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি চৌরঙ্গীর রাস্তার উপর লুইস সাহেব লুইস থিয়েটার নাম দিয়ে একখানি বাড়ী তৈরী করেন; ৭৫ খৃষ্টাব্দে সপ্তম এডোয়ার্ড প্রিন্স অফ ওয়েলস রূপে ঐ থিয়েটারে প্রবেশ করবার পর ঐ থিয়েটারের নাম হয় লুইসেস থিয়েটার রয়েল। তার পর শুধু থিয়েটার রয়েল। বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীটের একটা গলির ভিতর সুলতানার বাসাবাড়ী। মাঠের ঘরখানি ভেঙ্গে মালমসলাগুলি ঐ বাসার সংলগ্ন একটা জমীতে

রাখে। সস্তায় সুবিধা হবে মনে ক'রে নগেন, ধর্ম্মদাস আর আমি কাঠকোট পুরানো করগেট আদি কেনবার ইচ্ছায় সুলতানার কাছে যাই, সে একটা অসম্ভব লম্বাচৌড়া দর হেঁকে বসে; তা ছাড়া অভিজ্ঞ লোকে আমাদের পরামর্শ দিলেন যে, ঐ রিবিট মেরে জোড়া করা করগেটে কোন কায হবে না, তাই ওগুলো কিনে লওয়ার মতলব ত্যাগ করলেম কিন্তু সুবিধা হ'ল এই যে, বাড়ীখানির একটি ছোট কাঠের মডেল সেই বাসায় ছিল, ধর্ম্মদাস সেটি নিরীক্ষণ ক'রে নিতে পারিলে।

হাজার তিনেক টাকার সেগুনের চকোর গিলেণ্ডার কোম্পানীর কাছ থেকে কেনা হ'ল,সে রকম নিরেট সারবান্ সুন্দর চকোর এখন আর কলকাতায় দেখা যায় না। আজ ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ, এখনও সেই কাঠের গঠন বিনা ক্ষয়ে ষ্টারের বর্ত্তমান বাটীতে ব্যবহৃত হয়ে মজুত আছে।

নগেনের ছিল তখন একটা আফিসে চাকরী, দল এক-রকম ছিন্ন-ভিন্ন, আমি আর ধর্ম্মদাস সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত, শেষাশেষি মশাল জ্বালিয়ে কায ক'রে, কি খাটনটা খেটেই যে ঐ সালের ৩১শে ডিসেম্বর গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটার খুলতে পেরেছিলুম, তা এখনও মনে হ'লে নিজেই আশ্চর্য্য হয়ে যাই। লুইসের ছিল, দেল ও ছাত দুই-ই করগেটের, আমাদের হ'ল তক্তার বেড়া, করগেটের ছাত; কেন না, তখন করগেটের চেয়ে তক্তা সস্তা ছিল, আর তখন পুরানো রেল বাজারে বিক্রী হ'ত না, তাই পোষ্টগুলিও চকোর কেটে তৈরী হয়েছিল।

ডেভিড গ্যারিক ব'লে এক জন চিত্রকর কলকাতায় ছিলেন; আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপল হয়ে তিনি এ দেশে আসেন, পরে ঐ কায ছেড়ে স্বাধীন ভাবে চিত্রকর ও ফটো-গ্রাফারের কায আরম্ভ করেন। তিনি ৮০ টাকা ক'রে প্রত্যেক খানির মজুরী নিয়ে চারখানি ফ্লাটসিন আমাদের এঁকে দেন, কাঠ, কাপড় রং সব আমাদের; একখানি গৃহাভ্যন্তর, একখানি রাজসভা, একখানি উদ্যান, একখানি পর্ব্বত ও বন। কাশীর গঙ্গাতীরস্থ দৃশ্য নিয়ে আইরিশ ডপ কাপড়ের উপর তিনি একখানি ড্রপসিন এঁকে দেন, এর জন্য তাঁকে মজুরী দিতে হয় সাড়ে ছ'শ টাকার কিছু উপর। সিনে ছাপবার জন্য সোণার পাতই লাগে প্রায় ৭০, ৭৫ টাকা; সেটি গুটাবার জন্য নিরেট কাঠের মোটা রোলার তৈরী করলে ড্রপসিনখানি গুটুতে নাবাতে এঞ্জিন চালাতে হ'ত; ঘুড়ির লাটাই ধর্ম্মদাসের মাথায় অপেক্ষাকৃত হালকা রোলারের প্ল্যান ঢুকিয়ে দিলে। গ্যাসফিটারের অনবধান-তায় প্রথম রাত্রিতেই বাটীর সম্মুখের দেওয়ালে আগুন লাগার সূত্রপাত হয়, দুর্গার ইচ্ছায় সব রক্ষা পায়। কিন্তু দর্শকের আতঙ্ক ও বাজে ভদ্রলোকের অনধিকার প্রবেশে এত গোলমাল হয় যে, অভিনয় আর সে রাত্রিতে শেষ হয় নাই।

যতগুলি অভিনেতা মিলে সাণ্ডেল-বাড়ীতে আমরা প্রথম অভিনয় আরম্ভ করি, তার সবগুলি ভুবন নিয়োগীর থিয়েটার খোলবার সময় একসঙ্গে ছিলাম না। সাণ্ডেল-বাড়ীর পালা শেষ হবার কিছু দিন আগে থেকেই দলের মধ্যে একটু মনান্তরের সূত্রপাত হয়; তার পর দলটি রীতি-মত দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। নগেন, অর্দ্ধেন্দু, বেলবাবু, ক্ষেতু গাঙ্গুলি, আমি প্রভৃতি এক দলে, আর গিরিজা বাবু, মহেন্দ্র বসু, মতি সুর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ অভিনেতারা আর এক দলে। ন্যাশানাল নামটা আমাদের বড় সাধের, আইনজ্ঞ বন্ধুদের পরামর্শে শেষোক্ত দলটি বিনা মূলধনে একটি ন্যাশা-নাল থিয়েটার লিমিটেড নাম দিয়া দলটি রেজেষ্টারী ক'রে নেন, তাই আমরা যখন প্রথমে ঢাকায় যাই, তখন হিন্দু-ন্যাশানাল নাম নিতে বাধ্য হই, পরে ভুবনের থিয়েটারকে গ্রেট ন্যাশনাল নামে অভিহিত করি। এই দলাদলির মূলে অর্থ নিয়ে বিবাদ কিছুমাত্র ছিল না; কারণ, এই ৭৫ বৎসরের প্রবেশদ্বার পার হয়ে, চিতার চিত্র অদূরে প্রধূমিত দেখে আমি স্পষ্টাক্ষরে সত্য কথা ব'লে যাচ্ছি যে, নিজেদের জীবি-কার উপায় ষ্টেজ ক'রে আমাদের মধ্যে এক জনও তখন টিকিট বিক্রয় ক'রে থিয়েটারের অভিনয় করবার কল্পনা মাথায় নেন নি। এখন একটা সখের থিয়েটার বসালে ষ্টেজ, সিন, সাজ-গোজ, পোষাক, হয় চেয়ে নয় ভাড়ায় সহজেই পাওয়া যায়। তখন আর্শি, বুরুষ, চিরুণীখানি পর্য্যন্ত কিনতে হ'ত—নয় নিজেদের বাড়ী থেকে ভুলিয়ে, নয় আব্দার ক'রে চেয়ে নিতে হ'ত, মেয়ে সাজবার শাড়ী ও গয়না ঐ উপায়ে সংগ্রহ করা গেছে। পাড়ার লোকের কাছে বার বার চাঁদা চাইতে গেলে তাঁরা সব বিরক্ত হতেন, এটা একেবারে দোষের কথা নয়। নগেনের মাথাতেই প্রথম মতলব আসে যে, সাহেবরা যেমন টিকিট বেচে সব খরচ চালায়, আমাদের মাইনে পত্তর দেওয়া-টেওয়া নেই,

শুধু সিন, পোষাক, পরচুল প্রভৃতি প্রস্তুত ক'রে আলো জ্বালিয়ে ৫।৭ রাত্রি একখানা বইয়ের অভিনয় চালাবার খরচ কেন আমরা ঐ রকম টিকিট বিক্রি ক'রে চালাতে পারব না। আর একটা কারণেও টিকিট বিক্রীর কল্পনা হয়; সখের থিয়েটারের কর্তৃপক্ষরা অভিনয় দেখাবার জন্য নিজেদের পরিচিত আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদেরই টিকিট পাঠিয়ে নিমন্ত্রণ করতেন, অপর ভদ্রলোক টিকি-টের জন্য প্রার্থনা ক'রে কখনও বা সফল, কখন বা বিফলমনোরথ হতেন, আবার অনেকে দরজা পর্য্যন্ত এসে ফিরে যেতে বাধ্য হতেন, সময়ে সময়ে কেউ কেউ যে অপ-মানিত হতেন না, এ কথা জোর ক'রে বলতে পারি নে; প্রবেশের মূল্য ধার্য্য হ'লে অনেকে অন্ততঃ একটা আধুলি দিয়েও সম্মানের সঙ্গে বসতে পাবেন। সাধারণ থিয়েটার খোলার এও একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল।

গিরিশ বাবুর পরলোকগমনের পর কেউ কেউ ছাপিয়ে প্রকাশ করেছেন যে, তিনি টিকিট বিক্রী করা হবে ব'লে প্রথমে আমাদের সঙ্গে যোগ দেন নি। সে কথাটা একেবারে সত্য নয়। আমাদের নাট্যপরিবারের মধ্যে বয়স ও বিদ্যা হিসাবে তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাঁর চরণে আমরা চিরকাল প্রণাম ক'রে এসেছি এবং এখনও উদ্দেশে করছি। কিন্তু বংশ বা সামাজিক মর্য্যাদায় আমাদের মধ্যে কেহই তাঁর কাছে সামান্য ভগ্নাংশের হিসাবেও হীন ছিল না; আর যদি বেঁচে থাকি এবং শক্তি একেবারে লোপ না হয়, তবে হয় ত সময়ান্তরে ন্যাশান্যাল ও বেঙ্গলের অভিনেতাদের বংশাদির পরিচয় দেব।

গিরিশ বাবু আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে প্রথম অভিনয় করবার সময় বিজ্ঞাপনে তাঁর নাম ছাপিয়ে পাশে "এমেচার" কথাটা লেখা হয়, তার কারণ আমি এখানে উল্লেখ করছি। ইংরাজী থিয়েটার চালাবার অনেক প্রথারই অনুকরণ আমরা আরম্ভ করেছিলাম বটে, তবে বাদ দিয়েছিলাম দুটি, এক—থিয়েটারের সঙ্গে মদ বিক্রীর বার খোলা, সে মর্য্যাদাটুকু দেশীয় নাট্যশালাগুলি আজও পর্য্যন্ত রক্ষা ক'রে আসছেন; দুই—ইংরাজরা অভিনেত্রীদের নাম বিজ্ঞাপিত করতেন, আমরা সেটি করিনি। ষ্টারেও কদাচ কখন বিশেষ কারণ ভিন্ন আমাদের সময় আমরা নট-নটীদের নাম বিজ্ঞাপিত করতাম না। গোড়ায় গিরিশ বাবু আমাদের দলে নাই, এ ক্ষোভটা আমাদের মনে বড়ই আঘাত করত, পুনর্ম্মিলনের পর আমরা বড় আহ্লাদে তাঁর নামটি ছাপাবার অনুমতি প্রার্থনা করলুম, তাতে তিনি বলেন যে, আমার কোন আপত্তি নাই, তবে অফিসে একটা ভাল কর্ম্ম করি, টিকিট বিক্রী থিয়েটারে এক্টু কচ্ছি, এই ব'লে আমার নাম প্রচার হ'লে তাঁরা হয় ত কিছু মনে করতে পারেন; তাতেই আমরা বলি যে, এমে-চার কথাটা তাঁর নামের পাশে দিলে আর লজ্জার কোন কথা থাকবে না; নইলে পর্দ্দার আড়ালে সকল এক্টারই এমেচার।

এই দলাদলির মূল কারণ এক সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক-গুলি উৎকৃষ্ট অভিনেতার একত্র সমাবেশ। বর্ত্তমান কালে ম্যানেজারদের মধ্যে যিনি প্রতিযোগী থিয়েটারকে হীনবল করবার জন্য বেতন ও বোনাশের পরিমাণ বৃদ্ধি ক'রে নিজের দলে নামজাদা অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সংখ্যাবৃদ্ধির চেষ্টা পান, তিনি রোকের মাথায় এই কথাটা ভুলে যান যে, সাপ অন্য জীবকে দংশন ক'রে, তাকে কালের কবলে পাঠাবার সঙ্গে সঙ্গে নিজেও জর্জ্জরিত হয়ে মৃত্যুর দ্বারে উপস্থিত হয়। খুব কম নাটকই কোন ভাষায় আছে, যাতে ৪টা বা ৫টার বেশী বড় এক্টর বা একট্রেস তাঁদের মনের মতন পার্ট পেতে পারেন। 'নীলদর্পণ' নাটক অভিনয়ই ন্যাশানাল থিয়েটারে সর্ব্বসাধারণকে প্রথম অভিবাদন করে। নাটকের রচনার গুণে এবং তার চেয়েও বেশী অর্দ্ধেন্দুর শিক্ষা-কৌশলে ঐ নাটকে অতি বড় থেকে অতি ছোট পর্য্যন্ত প্রতি পার্টে অভিনেতারা আপনাদের কৃতিত্বে একটা একটা বিশিষ্ট ছবি ফুটিয়ে দেখাবার সুবিধা পেয়েছিলেন, কিন্তু পরে আর যত নাটক অভিনয় হয়েছে, তাতে গিরিশচন্দ্র বেরুলে হয় ত নগেন্দ্র রইল ব'সে; নগেন বেরুল ত' মহেন্দ্রের ভাগ্যে একটা ছোট পার্ট, আর একখানায় হিরোটা মহেন্দ্রকে দেওয়া যায় কি মতিকে দেওয়া যায়; তার পর আমার মতন ইতরে জনার মিষ্টান্ন লাভের ত' কথাই নাই; অথচ এক্ট ক'রে বাহাদুরী দেখিয়ে ক্লাপ নেওয়া মাত্র এই পেশা-দারী কলঙ্কের পশরা মাথায় নেবার একমাত্র বাসনা ও উদ্দেশ্য।

এই দলাদলির দ্বিতীয় কারণ ছিল প্রভুত্ব নিয়ে মতভেদ। 'লীলাবতী' রিহার্শলের সময়েই টিকিট বিক্রী ক'রে থিয়েটার করবার কল্পনাটা প্রথমে সকলের মাথায় প্রবেশ করে; কিন্তু নানা কারণে সেটা কার্য্যে পর্য্যবসিত হয় নি; 'লীলাবতীর' অভিনয় সখের ভাবেই প্রদর্শিত হয় শ্যামবাজারে বৃন্দাবন বসাকের লেনে উক্ত বসাক মহাশয়ের অন্যতম উত্তরাধিকারী রাজেন্দ্রনাথ পালের প্রাঙ্গণে। কলা ফলার সঙ্গে কোন সম্পর্ক না থাকলেও স্বার্থশূন্য হয়ে বাটীর উঠান ছেড়ে দেওয়া ছাড়া রাজেন্দ্র বাবু ঐ সময়ে বহুবিধ বিষয়ে সম্প্রদায়কে সাহায্য করেন; বিষয়বুদ্ধি ও যোগাড় করবার ক্ষমতা তাঁর একটা ভাল রকমই ছিল। ভুবনের আশ্রয়ে তার ঘাটের বৈঠকখানায় রিহার্শাল দিতে আরম্ভ ক'রে নগেন প্রভৃতি রাজেন্দ্র পালের খাতিরটা বলতে গেলে একবারেই রাখেনি, যে কারণেই হ'ক এটা ভাল কাজ হয় নি; রাজেন বাবু এবং তাঁর অনুগত লোকরা এ জন্য বড়ই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। এ দিকে টিকিট বিক্রী ক'রে 'নীলদর্পণ' খোলবার সম্বন্ধে গিরিশ বাবুর প্রকাশ্য আপত্তি যে, তিনি একটা ভাল করম বাড়ীটাড়ী তৈরী না ক'রে সাধারণ নাট্যশালায় অভিনয়ের ব্যবস্থা করতে নারাজ।

প্রকাশ্য থিয়েটারে যাঁরা অভিনয় করেছেন, তাঁরাই জানেন যে, আর এক জন ষ্টেজে দাঁড়িয়ে ক্লাপ নিয়ে যাচ্ছে, আর আমি সাজঘরে চুপ ক'রে ব'সে আছি, সে জ্বালা কি জ্বালা! নগেন বাঁড়ুজ্যে অবশ্য বড় রকম একটা এক্টার, আর বুদ্ধিকুশল, পরিশ্রমী, যোগাড়ে, অমন আর দ্বিতীয় নাই, কিন্তু তা'র বড় ভাই দেব বাঁড়ুজ্যে কোথাকার কে যে, সে এসে কর্ত্তা হ'য়ে বসবে, এটা যদি গিরিশ ঘোষের অসহ্য হয়, তা'তে কিছু নিন্দা করা যায় না। কিন্তু আমাদের মধ্যে আমি শুদ্ধ এক জন এ কথাটা ঠিক ও ভাবে তখন দেখিনি। মনে করতাম যে, এই থিয়েটারের জন্য বাঁড়ুজ্যে পরিবাররা স্ত্রী পুরুষ যতটা অত্যাচার সহ্য করে, ততটা আর কে করে? নেহাৎ দরকারে বিশ পঁচিশ পঞ্চাশ টাকা ঘর থেকে বের ক'রে দিতে, শ্যামাচরণ মুস্তফি পুত্র অর্দ্ধেন্দুকে বাড়ীতে আট্‌কে রাখলে তাঁকে বাগিয়ে জুগিয়ে ছেলের ছাড়পত্র নিতে, মেয়ে সাজাবার জন্য টুক্‌টুকে ছোকরাদের হপ্তার পর হপ্তা ধ'রে বাড়ীতে বসিয়ে খাইয়ে দাইয়ে আট্‌কে রাখতে আর কারও বাড়ীতে ত' আমাদের প্রবেশাধিকার নাই, তবে গিরিশ বাবুতে দেব বাবুতে মিলে-জুলে কায করতে পারবেন না কেন?

দ্বিতীয় কারণের চেয়ে প্রথম কারণটাই বেশী প্রবল; অনেকগুলি বড় এক্টার, যাঁদের যথার্থ অভিনয় করবার সখ আছে, রজতমূল্য অপেক্ষা দর্শককে আনন্দ দিয়ে আনন্দিত হওয়ার লোভটা বেশী, তাঁরা একসঙ্গে এক সম্প্রদায়ে সন্তুষ্ট হয়ে থাকতে পারেন না।

সেকালের বিলাতী পার্লামেণ্টে একবার টোরী, একবার হুইগ দলের আধিপত্য হ'ত; ভুবনের সময়ে আমাদের থিয়েটারে ঠিক সেই রকম এক দল ৪।৫ মাস ধ'রে রঙ্গমঞ্চে আধিপত্য ক'রে গেল, তার পর কোন একটা খুঁটিনাটি নিয়ে মনান্তর হওয়ায় তাঁরা গেলেন চ'লে, অন্য দল এসে কায আরম্ভ করলেন, আবার এ দলের দু-পাঁচ জন এ দলে, ও দলের দু'চার জন এ দলে যে মেশামিশি হ'ত না, তা' নয়।

৭৪ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি আমরা স্ত্রীলোক অভিনেত্রী নিতে বাধ্য হলাম। প্রথম কারণ, যাঁরা এতদিন মেয়ে সেজে খুব সুখ্যাতি নিয়ে আসছিলেন, তাঁদের প্রায় সকলেরই বয়স বেড়ে উঠল, সাজলে মানায় না, সাজতেও আর তাঁরা চান না; বাইরের ছোকরা দেখতেও ভাল, অভিনয়ও মন্দ করে না, এমন কয়েক জন যোগাড় করা গেছল বটে, কিন্তু দায়িত্ব বোধ ব'লে জিনিষটার কোন ভাবই প্রায় তা'দের মধ্যে দেখা যেত না; অভিনয়ের দিন বিকেল অবধি দেখা নেই, দশটা আড্ডা খুঁজে খবর পাওয়া গেল না, ঘুরতে ঘুরতে দেখা গেল, গড়পার ছাড়িয়ে খালধারের এক গাছতলায় মূর্ত্তি চুপ ক'রে বসে আছেন। এর চেয়েও মুস্কিল হ'ল নাটকের অভাব, মাইকেল, দীনবন্ধু, মনোমোহন, রামনারায়ণ প্রভৃতির যে সব নাটক তখন সাধারণের আদরের ছিল 'তা' সবই আমরা অভিনয় ক'রে ফেলেছি। এক রাত্রিতে জগদ্‌-বিখ্যাত হবার আশায় অনেক বালখিল্য নাট্যকার গম্ভীর গণ্ডস্থলে মুরুব্বীয়ানা মাখিয়ে পাণ্ডুলিপি হস্তে, এমন কি কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বেঙ্গল থিয়েটারের জন্য মধুসূদন জীবনের শেষ লেখা 'মায়াকানন' লিখে দেহ রক্ষা করেছেন জেনে 'সঙ্কেত-কানন' ব'লে একখানি নাটক লিখে আমাদের দিয়েছিলেন এবং আমার একটি ইঙ্গিতের শ্লেষার্থ না বুঝতে পেরে

'কেওড়া-কানন' নাটক পর্য্যন্ত লিখে এনেছিলেন। কিন্তু নাটকের আইন-কানুন রস-কসের সঙ্গে এ সব কাননের একটুও সম্পর্ক ছিল না।

এক সময়ে অনেকের বিশ্বাস ছিল যে, গিরিশ ঘোষ থিয়েটারের কর্ত্তামি হাতে পেয়ে কেবল নিজের লেখা নাটকই সেখানে চালিয়েছে, আর অন্যান্য "জগদ্বিখ্যাতদের" প্রত্যাখ্যান ক'রে দেবে রেখেছে; এটা একবারে সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। গিরিশ বাবু বা অভিনেতাদের মধ্যে আর কেউ-ই তখন নাট্যকার হবার উচ্চাশা করেন নি। গিরিশ বাবু প্রথম থেকেই আবশ্যক মত ভাল ভাল গীত রচনা করেছেন, বঙ্কিম বাবুর 'কপালকুণ্ডলা' ও 'মৃণালিনী' নাটকাকারে গঠিত ক'রে দিয়েছেন, কিন্তু নিজে যে আস্ত একখানা নাটক লিখবেন, এ কথা তখন একবারও মনে করেন নি। তিনি নটপ্রধান, অভিনয়-কলার সাধনাই তাঁহার ধ্যান, অনুবর্ত্তী নট আমরা ঐ ভাবে অভিনয় করবার পিপাসায় একখানি ভাল নাটকের জন্য হা-হা ক'রে বেড়িইছি; প্রমাণ, যেই সংবাদ পেলাম যে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 'পুরু-বিক্রম' নাম দিয়ে একখানি নাটক লিখেছেন, অমনি নগেনেতে আমাতে ছুটে গিয়ে তাঁর কাছ থেকে সবিনয়ে অভিনয়ের অনুমতি এনেছি। একটা কথা ব'লে রাখি, তখন অভিনয় স্বত্ব কপিরাইট আইনের ভিতরে আসে নি, কিন্তু তখনকার আমাদের মত দুষ্ট নটরাও শিষ্টতা বর্জ্জন করত না

নাটকের অভাবে গীতপ্রধান অপেরা না চালালে আপাততঃ উপায় নেই মনে ক'রে অভিনেত্রী নিতে আমরা বাধ্য হলেম। আমার নিজের একটা ভয়ানক ভুল ধারণা ছিল যে, যে শ্রেণীর নারীর মধ্য হ'তে অভিনেত্রী নির্ব্বাচন করা হবে, তারা নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল এবং নাচতে গাইতে পারলেও উচ্চাঙ্গের স্ত্রীচরিত্র সকল অভিনয় করতে কখনই সমর্থ হবে না। আমার আবার কেশব বাবুর চরণে একান্ত ভক্তি ছিল, আর সকল কথায় "বোধ হয়" বলা অভ্যাস ক'রে ফেলেছিলাম, তাই দলের অনেকেই আমাকে ঠাট্টা ক'রে 'বেহ্মজ্ঞানি' বলত। কিন্তু অভিনেত্রীরা রিহার্সালে আস্‌তে আরম্ভ করার দু' সপ্তাহের মধ্যেই আমার সে সব ভ্রম দূর হয়ে গিছল। এখনকার হিসাবে তখন বেতন অতি অল্প, অথচ যে পাঁচটি অভিনেত্রী প্রথমে আমাদের কাছে এল, তাদের সকল বিষয়েই নিয়মানুবর্ত্তিতা শিক্ষালাভের পিপাসা ও যত্ন এবং কর্ম্মস্থলে শীলতা রক্ষা, সহজভাব দেখে আমাদের মধ্যে অনেক পুরুষকেও নিজ নিজ চরিত্র সম্বন্ধে সাবধান হ'তে হয়েছে। স্পষ্টই তারা আমাদের কাছে বলেছে যে, উৎপীড়িতাদের জন্য এই নূতন পথ খুলে আমাদের আশ্রয় দিয়ে যে কত যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিলেন, তা' বলতে পারি না। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেক জেরাতেও তাদের মুখ থেকে বের করতে পারি নি যে, তাদের বাহ্য ছটা, সুখের জীবনের ঘটার জ্যোতিঃ। হায়! সমাজের ব্যবস্থায় যদি এদের সংসারী করবার উপায় থাকত, তবে আমি জোর ক'রে বলতে পারি যে, জন্মশাপে পতিতা কতকগুলি অভাগিনীর উদ্ধারসাধন হ'তে পারত। আরও তাদের শুদ্ধির পথে এগুতে দিলে না সমাজ বিশেষের লৌহ-সিন্দুক-উদ্গারিত বন্দুকের আওয়াজ।

যা হ'ক এই রকম ক'রে ভুবনের গ্রেট্ ন্যাশান্যাল চল্‌ল ৭৭ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত।

ভুবন সাহস ক'রে প্রথম থিয়েটার-বাটী নির্ম্মাণের জন্য অর্থব্যয় করেছিল বটে, কিন্তু ঐ থিয়েটারও তাকে অনেক অর্থ দিয়েছে। স্ত্রীলোক প্রবেশের পূর্ব্বে যে সব যুবকরা অভিনয় কত্তেন, বেতন তাঁদের মধ্যে কেহই নিতেন না। বেতন শব্দটা উচ্চারণ মাত্রেই অনেকে অপমানিত মনে কত্তেন; তবে কখন কদাচ কেউ একটু স্ফূর্ত্তি করবার উদ্দেশে ৫।৭ টাকা নিতেন। তার পর যখন এক্‌ট্রেস এল, তখন দু'চার জন গাইয়ে বাজিয়েকে কিছু দিতে হ'ল, তখনও থিয়েটার চালাবার মাসিক খরচা শ' আষ্টেক টাকার উপর উঠেনি, বিজ্ঞাপনের মধ্যে মোড়ে মোড়ে এক শ' খানা পোষ্টার; কখন কোন বিশেষ অভিনয় উপলক্ষে 'ইংলিশ ম্যানে' ইঞ্চি দুই বিজ্ঞাপন, আর পাঁচশ' হ্যাণ্ডবিল।

দীনের এই পঞ্চান্ন বৎসরব্যাপী নাট্য-জীবনের স্রোত একবার এক বছরের জন্য একটু অন্য পথগামী হয়; সেটা যৌবনস্বপ্নের একটা রোমান্স। ৭৭ অব্দের এপ্রেল মাসে আমি পুলিসে একটা কর্ম্ম নিয়ে পোর্ট ব্লেয়ারে যাই! ৭৮এর মার্চ্চে ফিরে আসি। অবন্দী বাঙ্গালীদের মধ্যে আমিই বোধ হয় দ্বিতীয় অবতার রূপে এণ্ডামানে পদার্পণ করি; আমার ছয় মাস পূর্ব্বে সেথায় যান আমার বন্ধু বিহারীলাল, মিনার্ভার বর্ত্তমান খ্যাত অভিনেতা হীরালাল চট্টোপাধ্যায়ের পিতা। ফিরে এসে দেখি, কলিকাতার

নাট্যজগতে এই এক বৎসরের মধ্যে যেন একটা বিপ্লব ঘটে গেছে। বেঙ্গল থিয়েটারের পরিচালকরা প্রায় সবাই প্রবীণ, তাঁরা নির্দ্দিষ্ট পথে মন্থরগতিতে সুস্থ শরীরে খোস্ মেজাজে চলতেন। আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন গিরিশ বাবু, তাঁরও বয়স তখন ৩৪ পার হয় নি, সুতরাং উদ্দাম উৎসাহ ও রোখারুখির ঝড় যা কিছু, তা আমাদের দলেই দেখা দিত। একদিকে দেখলাম, বেঙ্গল থিয়েটার আগে 'মেঘনাদ' অভিনয় করলেও, গিরিশ বাবুর দ্বারা নাট্যাকারে পরিণত হ'য়ে এবং তাঁর নিজের অভিনয়শক্তি ও শিক্ষাদান-ক্ষমতার বিকাশে তখনকার বিদ্বজ্জনসমাজ মুগ্ধ হয়ে গেছে; তাঁর 'মেঘনাদ', 'পলাসীর যুদ্ধে' ক্লাইভ, 'মৃণালিনীতে' পশুপতি প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের ভূমিকা সকল দেখেই সে যুগের সমালোচকশ্রেষ্ঠ অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁর 'সাধারণীতে' লিখেছিলেন, "কোন্ দেশের কোন্ গ্যারিকের কাছে আমাদের বঙ্গের গিরিশ অভিনয়-কলা প্রদর্শনে হীন!" ঐ সময়েই চিরস্মরণীয় অভিনেতা অমৃত মিত্র থিয়েটারে যোগ দেন ও সঙ্গে সঙ্গে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

কিন্তু আর এক মজাও দেখলাম, ভুবনমোহন নিয়োগী গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটারের সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকারী হ'য়েও নিজের থিয়েটারে নিজে ঢুকতে পায় না। যে সকল কৌশলে ভুবনের কাছ থেকে থিয়েটার লিজ্ নিয়ে তা' হস্তান্তরের পর হস্তান্তর ক'রে ভুবনকে ভূমিকম্পে দুলিয়ে উল্‌টে ফেলে দেওয়া হয় শোনা গেল, তার বর্ণনায় আমি অনেক বিবেচনা ক'রে ধামা চাপা দিলাম।

এইখানেই ভুবনের কর্ম্মজীবনাভিনয়ের শেষ;—যবনিকা পতন।

তার পর এই দীর্ঘ আটচল্লিশ বৎসরের উপর তার দেহে প্রাণ ছিল, উদরে ক্ষুধা ছিল, মাথাভরা ভাবনা, বুকভরা জ্বালা, আশার পিপাসা সবই ছিল, কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রের সঙ্গে তার আর কোন সম্পর্ক ছিল না।

আশ্চর্য্য কি এক অভিসম্পাত ছিল এই প্রাচীন প্রসিদ্ধ নিয়োগী পরিবারের ধনভাণ্ডারের উপর!

ভুবন যখন পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়, তখন উহা চারি অংশে বিভক্ত হয়ে যায়। বিধবা মাতা এক অংশ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিবাহের কিছুদিন পরেই অল্প বয়সে লোকান্তরিত হয়, তার বিধবা এক অংশ, ভুবন এক অংশ; উহার কনিষ্ঠ এক অংশ; আবার ঐ কনিষ্ঠ বিবাহের অনতিকাল বিলম্বে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় তার বালবিধবা এক অংশ।

ভুবন অর্থ কর্জ্জ ক'রে থিয়েটার করায় তার মাতা বিরক্ত হয়ে কনিষ্ঠ ভাইকে নিয়ে একটি ভাড়াটে বাড়ীতে বাস করেন। আমার চক্ষুর উপর অন্ততঃ ছয় বৎসর কাল ভুবনের সংসার চলেছে স্বচ্ছন্দে, নিত্য দেবসেবা ও পার্ব্বণাদিতে ধুমধাম সব হয়েছে ঘটা ক'রে, পৈতৃক প্রথা অনুযায়ী পূজায় বার্ষিক বিতরণ, ব্রাহ্মণবিদায়, সামাজিক ক্রিয়া কর্ম্ম, বাড়ী মেরামত, গাড়ী জুড়ী ইয়ারকি সবই চ'লেছে, কিন্তু কি জমিদারীর কি কলিকাতার বিষয়ের আয়ের কোনোদিন কোনো অংশ ভুবনের হাতে আস্‌তে দেখিনি; এ সব খরচ চলেছে হয় থিয়েটারের আয়ে নয় কর্জ্জ ক'রে; বিষয়ের আয় শুনেছি মা'র কাছেই পৌঁছাত।

ভুবন যেন উড়নচুড়ে টাকা উড়িয়েছে ধ'রে নেওয়া যায়; মা বড়মানুষী ত করেননি, ধর্ম্মকর্ম্মেও যে বেশী কিছু খরচ করেছেন, তাও শোনা যায়নি, অথচ যখন ভুবনের অংশ বিক্রী হয়ে যায়, তাও তিনি কিনে নেন; রসিক নিয়োগীর বিষয়ের অর্দ্ধাংশ যে কি ক'রে কোথা দিয়ে উড়ে গেল, তা আজও কেউ বুঝতে পারেনি। ছোট ভাই বয়ঃপ্রাপ্তির পর বছর ২।৩ বোধ হয় একটু বাবু হয়ে বেড়িয়েছিল, তার সখের মধ্যে ছিল গাড়ী ঘোড়া; তার পর তার বকলা বের ক'রে নিয়ে বোয়ের বাপভাই তাকে নিয়ে গিয়ে কাশীতে নিজের বাড়ীতে রাখে, শুনতে পাই তিনিও বেশ স্বচ্ছল নেই। জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ এখনও জীবিতা এবং হাটখোলায় পিত্রালয়ে বাস করছেন; তিনি গত হ'লে সম্ভবতঃ ভুবনের ছেলেরা সে অংশটা পেলেও পেতে পারে। এই পরিবারের আর দুই সরিক ছিল; এক সরিকের বিধবা ত দীনার ন্যায় দিনপাত ক'রে অনেকদিন গত হয়েছেন, আর এক সরিক ভুবনের খুল্লপিতামহ কৃষ্ণকিশোর নিয়োগী মহাশয় উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন, আর খরচপত্র সম্বন্ধে এত সাবধানী যে পাড়ার লোক প্রাতঃকালে তাঁর নাম মুখে আনতো না। কিন্তু আমি বরাবর তাঁর নাম করেছি ও করি, কেন না, যে মহাপুরুষ কীটের পরিপুষ্টির জন্ম লক্ষাধিক

মুদ্রার বই কিনে রেখে যেতে পারেন, সখে একটা দশ হাজার টাকার দূরবীণ কিন্‌তে পারেন, তাঁরে যে কৃপণ বলে, সে একান্ত কৃপার পাত্র।

অতি অল্প বয়সে প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী, বিদ্যাশিক্ষা একরকম কিছুই হয়নি, কোনরূপ অভিভাবকের অভাব, আত্মীয় কুটুম্ব যাঁরা মাঝে মাঝে দেখা দিতেন, তাঁরা যা কিছু পেতেন নিয়ে স'রে পড়তেন, এই সব অবস্থার সংযোগে যে এক জন তরুণ যুবকের প্রকৃতি কতকটা উচ্ছৃঙ্খল হবে, সেটা কিছু বিচিত্র নয়; কিন্তু ইচ্ছা ক'রে ভুবন কারুর কিছু অনিষ্ট করেছে, এ আমি কখন দেখিনি বা শুনিনি। আর যে নিজের অনিষ্টসাধনে অষ্টপ্রহর ব্যতিব্যস্ত, সে পরের অনিষ্ট করবার সময় পাবে কখন?

বুদ্ধিহীনতাবশতঃ তার এক বিষম দোষ ছিল, যে প্রাণপাত ক'রে থিয়েটারের কায করছে, অথচ অভাবজনিত বাড়ীতে অর্থের প্রয়োজন, তাকে হাত তুলে ভুবন কখন কিছু দেবে না; কাযেই থিয়েটারের সখও ছাড়তে পারে না, সংসার বা নিজের খরচও চলে না, এই অবস্থায় কেউ কেউ পারিশ্রমিকটা "না ব'লে" নিতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু বাইরের ভদ্রলোক, কবি, সাহিত্যিক, কন্যাদায়গ্রস্ত ঋণভারে বিপন্ন, এমন লোক ভুবনের কাছে এসে প্রায় নিরাশ হয়ে যায়নি। শেষ বয়স পর্য্যন্ত ভুবনের মনে সেই বালকভাব বিদ্যমান ছিল।

একে ত বুড়ো ম'লে কেউ কাঁদে না, তাতে কর্ম্মহীন ধনহীন বৃদ্ধের ঊর্দ্ধগতিতে চোখের জল আর কে ফেলবে! অতীতের স্মৃতি আমায় যে কটা কথা লেখালে, তাই উপহার দিয়ে গেলাম বাঙ্গালার নাট্যশালার সেকালের কথা যাঁরা শুনতে চান—তাঁদের।

বঙ্গের বর্ত্তমান নাট্যশালাগুলির যাঁরা পরিচালক, অভিনেতৃরূপে যাঁরা আজ নাট্যগগনে জ্যোতিষ্কস্বরূপ, নাট্যকলার প্রতি যাঁদের কোনরূপ অনুরাগ আছে, তাঁরা এই প্রবন্ধ হ'তে বুঝতে পারবেন যে, এ দেশে নাট্য-সংসারের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে ভুবনমোহন নিয়োগীর তরুণ জীবনের প্রয়োজন কতটা অপরিহার্য্য ছিল।

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

অখণ্ড

হে দাদু! খণ্ড করি' ব্রহ্মকে
এরা করে' নিলে বণ্টন,
জীবিত ব্রহ্ম তেয়াগি' যে এরা
বাঁধিল ভ্রমেরি বন্ধন।
আপন আপন জাতি ল'য়ে এরা
পৃথক্ পংক্তি গড়ে,
প্রেমিক রামের সেবক দাদু—এ
সীমায় হিয়া না ভরে।
পূর্ণব্রহ্ম—বিচারি দেখিলে
সকল আত্মা একই,
কায়ার গুণের দিক্ দিয়ে চেয়ে
নানাবর্ণই দেখি।
পূর্ণ সত্য না দেখিলে ভাই
লোচনই মোদের নাই,
বন্ধনাতীত ছাড়ি' বন্ধনে
হে দাদু না যেন যাই।
ধরা ও আকাশ, বারি ও পবন,
দিন-রাত, চাঁদ-রবি,
কোন্ পন্থার এরা?—জগতের
সেবক যে এরা সবি।
মহম্মদের কোন্ পন্থা বা,
কোন্ পথ জীবরাইলের,
মুরসীদ-পীর এঁদের কে?—জানো?—
রাখো সন্ধান এ সবের?
কাদের দলের এরা সব?—ওগো,
দাদু জানে এটা স্থির,
আমরা ও ওঁরা সবাই জগৎ-
গুরু সেই ইলাহীর!

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী।

চীনের কপাল

চীনের জাতীয় কুওমিণ্টাঙ্গ দলে ভাঙ্গন ধরিয়াছে। যেমন আমাদের দেশে, তেমনই চীনে রাজনীতিক দলাদলি দেখা দিয়াছে। বোধ হয়, পরাধীন দুর্ব্বল জাতিদিগের ইহাই স্বাভাবিক অবস্থা।

ডাক্তার সান ইয়াটসেন বুকের রক্ত দান করিয়া চীনে যে কুওমিণ্টাঙ্গ দল গড়িয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহার পত্নী, জামাতা, চাঙ্গ-কাই-সেক, ইউজিন চেন, বোরোডিন, গালেন প্রভৃতি দলপতিরা যাহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন, আজ বিধাতার অভিসম্পাতে সেই দল ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ছারেখারে যাইতে বসিয়াছে। এতদিন যখন দল সঙ্ঘবদ্ধ ছিল, তখন কাণ্টন হইতে হাজার মাইল উত্তরে তাহার জয়যাত্রায় কেহ বাধা দিতে পারে নাই। ইয়াংসি তটে কুওমিণ্টাঙ্গের পতাকা প্রোথিত হইল, মুক্তিযুদ্ধে বাধা দিতে গিয়া উত্তরের স্বার্থপর সর্দ্দার উপেইফু ও সান-চুয়ান-ফেঙ্গ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন, জগতের সকল নিরপেক্ষ জাতিই প্রোৎফুল্ল নয়নে চীনের মুক্তির প্রতীক্ষা করিতে লাগল। ইয়াংসি তট হইতে ইয়েলো নদীর তট, তাহার পরেই পিকিং ও টিণ্টসিন। তাহা হইলেই কুওমিণ্টাঙ্গের বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত হয়।

এমনই সময়ে সাংহাই ও নানকিংয়ে—চীনের পূর্ব্বপ্রান্তে—উত্তর ও দক্ষিণ চীনে সংঘর্ষ বাধিল। জেনারল চাঙ্গ-কাই-সেক উত্তরের দলকে আক্রমণ করিয়া সাংহাই ও নানকিং অধিকার করিলেন। এ সকল কথা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু এই সাংহাই ও নানকিং অধিকার কালে উভয় স্থানেই অনাচার সংঘটিত হইল। চীনের জাতীয় দল বলিলেন, বৈদেশিক শক্তিপুঞ্জ (বিশেষতঃ ইংরাজ ও মার্কিণ) গোলাবর্ষণে বহু চীনার প্রাণ সংহার করিয়াছেন—বিশেষতঃ নানকিংয়ে তাঁহারা চীনার ধনপ্রাণ অযথা নষ্ট করিয়াছেন। বৈদেশিকরা বলিলেন, জাতীয় দলের সৈন্য বিশৃঙ্খল হইয়া বহু বৈদেশিকের ধনপ্রাণ নষ্ট করিয়াছে। ইংরাজ ও মার্কিণ ক্ষতিপূরণের জন্য চীনকে চাপিয়া ধরিলেন। সৌভাগ্যক্রমে ইউজিন চেনের যুক্তিযুক্ত প্রতিবাদে ফল হইল, মার্কিণ অন্য অন্য শক্তির সহিত একযোগে চীনের উপর চাপ দিতে সম্মত হইলেন না, জাপও পিছাইয়া গেলেন, ফরাসীর ত কথাই নাই। তখন ইংরাজ একাই চীনকে সায়েস্তা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। কিন্তু বক্সার যুদ্ধ কালের মত সকল শক্তি একমত হইতে না পারায় ইংরাজ একা বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। চীনের ব্যাপার ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় অবস্থান করিল।

এই সময়ে জেনারল চাঙ্গ-কাই-সেক ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তিনি স্বীকার করিলেন যে, জাতীয় দলের বিশৃঙ্খল সেনা অনাচার আচরণ করিয়াছে, অতএব তিনি তাহাদিগের অনাচার সম্বন্ধে বিশেষ তদন্ত করিয়া অপরাধীর সমুচিত দণ্ড প্রদান করিবেন। এমন কি, তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করিলেন যে, জাতীয় দলের একাংশ কম্যুনিষ্ট প্রভাবান্বিত হইয়াছে, অতএব তিনি জাতীয় দল হইতে কম্যুনিষ্টদিগের উচ্ছেদসাধন করিবেন এবং অত্যাচারিত বৈদেশিক শক্তিসমূহের ক্ষতিপূরণ করিয়া দিবেন।

তখন তাঁহার কার্য্যে একদিকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের মধ্যে যেমন ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল, তেমনই জাতীয় দলের মধ্যে তাঁহার অশেষ দুর্নাম রটিল, এমন কি তাঁহার পুত্রও মস্কো হইতে পিতার বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। ইউজিন চেন, বোরোডিন, গ্যালেন প্রভৃতি জাতীয় দলের নেতারা তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতে চাহিলেন না। চাঙ্গ-কাই-সেক তাঁহাদের দণ্ডবিধানের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তখন কুওমিণ্টাঙ্গ দলে ঘর ভাঙ্গাভাঙ্গি আরম্ভ হইল। চাঙ্গ-কাই-সেক তাঁহার প্রধান আড্ডা নানকিংয়ে প্রতিষ্ঠা করিলেন, ইউজিন চেন হ্যাঙ্কো সহরে জাতীয় দলের আড্ডা স্থাপন করিলেন। এমনও রটিল যে, চাঙ্গ-কাই-সেক উত্তরের দস্যু-সর্দ্দার চাঙ্গ-সো-লিন, সানচুয়ান ফেঙ্গ প্রমুখ সেনাপতিগণের সহিত যোগদান করিয়া হ্যাঙ্কোর কম্যুনিষ্টদিগকে বেড়াজালে ঘিরিয়া পরাস্ত করিবেন। ইউজিন চেন চীনের উত্তর-পশ্চিমের খৃষ্টান জেনারল ফেঙ্গ উসিয়াঙ্গকে সেনাপতিপদে বরণ করিয়া উত্তর চীনের বিরুদ্ধে জয়যাত্রায় আত্মনিয়োগ করিলেন।

অবশ্য যতটা রটে, তাহার সবটা সব সময়ে সত্য হয় না। চাঙ্গ-কাই-সেক যতই কম্যুনিষ্টবিরোধী হউন না কেন, অন্তরে তিনি চীনের মুক্তিকামী, তিনি ডাক্তার সান-ইয়াটসেনের মন্ত্র-শিষ্য। তিনি যে সহজে তাঁহার মূলনীতি বিস্মৃত হইয়া স্বার্থপর দস্যুসর্দ্দারদিগের সহিত যোগ দিয়া চীনের মুক্তির অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইবেন, তাহা সম্ভব নহে। শুনা যাইতেছে, তিনি এখনও সংশয়-দোলায় দোদুল্যমান হইতেছেন। তিনি নাকি কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করেন না, নিজের ঘরে ক্রমাগত একাকী কি করিবেন ভাবিতেছেন, তিনি প্রত্যহ সান-ইয়াট-সেনের প্রতিকৃতির সম্মুখে মুদিত নেত্রে কি চিন্তা করেন। তিনি নাকি স্পষ্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে, উত্তরের দলপতিরা যদি ডাক্তার সানের তিনটি মূলনীতি মানিয়া চলেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া চীনের মুক্তিযুদ্ধে অগ্রণী হইবেন।

এইরূপ নানা কথা রটিতেছে। কিন্তু যে নানকিং ও সাংহাইয়ের ব্যাপার উপলক্ষ করিয়া কুওমিণ্টাঙ্গ দলের মধ্যে এই সর্ব্বনাশকর ঘর ভাঙ্গাভাঙ্গি হইয়াছে, তাহার বিবরণ যতটুকু প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া ত মনে হয় না, এই গৃহবিবাদের কোনও প্রকৃত কারণ আছে।

যখন বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিব সার অষ্টেন চেম্বারলেন নানকিংয়ের অনাচারের জন্য চীনের জাতীয় দলকেই অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া কোনও নিরপেক্ষ তদন্তে সম্মত হইতে চান নাই, তখন মার্কিণের এক সংবাদদাতা স্বদেশে এই পত্র লিখিয়াছিলেন,—

"নানকিংয়ের ঘটনার বিবরণ যাহা ইংরাজী পত্রসমূহে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বাংশে সত্য নহে এবং এ জন্য নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া কর্ত্তব্য,—এই পরামর্শে সার অষ্টেন কিছুতেই কর্ণপাত করিতে সম্মত হয়েন নাই। ইহা বড় আশ্চর্য্যের কথা। কারণ, ঘটনার বিবরণ নানারূপ নানা দেশে প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রী বলিয়াছেন যে, নানকিংয়ে জাতীয় দলের লোক বিদেশীর ধনপ্রাণ নষ্ট করিয়াছে, ফলে ৬ জন বিদেশী লোক নিহত হইয়াছে। এ দিকে

য়ুরোপের নানা দেশের নানা কাগজে প্রকাশ পাইয়াছে যে, আমাদের গোলাবর্ষণের ফলে নানকিংয়ে ও সাংহাইয়ে ২।৩ হাজার চীনা হতাহত হইয়াছে। আরও প্রকাশ পাইয়াছে যে, জাতীয় দল বিদেশীয়ের হত্যার জন্য দায়ী নহে।

জাতীয় দলের পররাষ্ট্রসচিব মিঃ ইউজিন চেন নানকিংয়ে এক তদন্ত কমিটী প্রেরণ করিয়া যে তথ্য অবগত হইয়াছেন, তাহা এই :—"আমাদের বিপক্ষদল এই সকল অনাচার আচরণ করিয়াছে। যুদ্ধের গোলযোগে পলায়মান উত্তর দলীয় সৈন্য ও শ্বেত রাসিয়ানরা জাতীয় দলের পোষাক পরিয়া বৈদেশিকগণের সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়াছে ও বৈদেশিকগণকে আক্রমণ করিয়াছে। এ দিকে জাতীয় দলের সেনাপতি জেনারল চিং চিয়েন নানকিংয়ে পদার্পণ করিয়াই এই সকল লুণ্ঠনকারীর মধ্যে যাহারা ধৃত হইয়াছিল, তাহাদের সকলের প্রাণদণ্ডের আদেশ করিয়াছিলেন। আরও অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে, প্রত্যেক বিদেশীর প্রাণের পরিবর্ত্তে এক শতের উপর চীনা বিদেশীর শক্তিপুঞ্জের গোলায় হতাহত হইয়াছে।"

ইহা ছাড়া এক জন মার্কিণ সংবাদপত্রসেবী স্বয়ং তথ্যসংগ্রহ করিয়া লিখিয়াছেন যে, "উত্তর চীনের পরাজিত সেনারাই বিদেশীয়ের সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়াছিল। তবে হয় ত ইহাও সম্ভব হইতে পারে যে, দক্ষিণ চীনের সেনাদলের মধ্যে যাহারা নিয়ন্ত্রিত নহে, তাহারা প্রথমে নানকিংয়ে প্রবেশ করিয়া উক্ত লুণ্ঠনকারীদিগের সহিত যোগদান করিয়াছিল। ইংরাজী সংবাদপত্রসমূহে প্রচারিত হইয়াছে যে, কেবলমাত্র দক্ষিণ চীনারাই লুণ্ঠন ও হত্যা করিয়াছে; এ কথা আদৌ সত্য নহে। তাহারা যে লিখিয়াছেন, দক্ষিণীরা সহরে পদার্পণ করিবার পুর্ব্বেই উত্তরের দল নগর পরিত্যাগ করিয়াছিল, এ কথারও কোন ভিত্তি নাই; কেন না, দক্ষিণীরা নগরে প্রবেশ করিবার পর ২৭ হাজারের উপর সাণ্টাং সেনাকে বন্দী করিয়াছিল। আমি লুণ্ঠিত জাপানী ও বৃটিশ দূতাবাসে গিয়া স্বয়ং দেখিয়া আসিয়াছি যে, তথায় সাণ্টাং সেনার অনেক লাল ফিতা বাঁধা শিরস্ত্রাণ পড়িয়া রহিয়াছে। আরও এক প্রকার নেকড়ার জুতা সেখানে পড়িয়া ছিল, সেগুলা দক্ষিণীরা কখনও ব্যবহার করে না।"

ইহাতেই বুঝা যায় যে, লুণ্ঠন কার্য্যে উত্তরের শৃঙ্খলাহীন সৈন্যরা লিপ্ত ছিল। তাহার পর এই লেখকের বর্ণনায় প্রকাশ যে, দক্ষিণীরা সহরে প্রবেশ করিবার পর কিরূপ সুব্যবস্থা ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন,—

"দক্ষিণের জাতীয় সেনাদলের কর্তৃপক্ষ যে দিন অপরাহ্নে নানকিংএ প্রবেশ করে, সেই দিনই তাঁহার এক দল বিশেষ রক্ষিসেনাকে বিশ্ববিদ্যালয় গৃহ রক্ষা করিতে প্রেরণ করেন, কারণ, ঐ স্থানে ৫০ জন বিদেশী একরূপ অসহায় অবস্থায় অবস্থান করিতেছিল। পরদিন প্রভাতে তাহারা ঐ বিদেশীয়গণকে সঙ্গে লইয়া ৫ মাইল দূরে নদীতটে গমন করেন এবং যতক্ষণ না তাহাদিগকে তাঁহাদের স্বজাতীয়ের জাহাজে তুলিয়া দেন, ততক্ষণ তাহাদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই।

"এইরূপ আরও অনেক ঘটনা আছে। এই সব দেখিয়া শুনিয়া আমার মনে হয় যে, পরাজিত উন্মত্ত চীনা সৈন্যরাই বিদেশীয়গণকে আক্রমণ ও তাহাদের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়াছিল। হয় ত তাহাদের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া কতকগুলি দক্ষিণী সেনাও লুণ্ঠনকার্য্যে যোগদান করিয়াছিল। বিশেষতঃ নানকিংয়ে যখন কতকগুলি 'শ্বেত' রাসিয়ান (অর্থাৎ সোভিয়েটের বিপক্ষদল) উপস্থিত ছিল, তখন মনে হয়, তাহারাই ইচ্ছাপূর্ব্বক কম্যুনিষ্ট জাতীয় দলের উপর দোষ চাপাইবার জন্য বিদেশীয়গণকে আক্রমণ করিয়া শক্তিপুঞ্জের ক্রোধ উদ্দীপ্ত করিবার চক্রান্ত করিয়াছিল।"

অবশ্য এই মার্কিণ লেখকের সিদ্ধান্ত যে বেদবাক্য বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। যখন কোন নিরপেক্ষ নিয়ন্ত্রিত তদন্ত হয় নাই, তখন কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা মিথ্যা নিরূপণ করা কষ্টসাধ্য। কিন্তু মিঃ ইউজিন চেন যাহা চাহিতেছেন, তাহা করিতে আপত্তি কি বুঝা যায় না। জাপ সরকারও একটা নিরপেক্ষ তদন্ত করিবার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, এ কথা 'টাইমস' পত্রের টোকিওস্থ সংবাদদাতা গত ৩রা এপ্রেল তার যোগে তার করিয়াছিলেন। তবেই দেখা যাইতেছে শক্তিপুঞ্জের মধ্যে যাঁহাদের চীনে ঘনিষ্ঠ স্বার্থ নিহিত আছে, তাঁহারা নিরপেক্ষ তদন্তের পক্ষপাতী। কেবল ইংরাজ ইহাতে সম্মত হয়েন নাই। সার অষ্টেন চেম্বারলেন কড়া চিঠি দিয়া ক্ষতিপূরণের দাবী পেশ করিয়াছিলেন। অথচ মজা এই, সাংহাই, সামীন এবং ওয়ানসিয়েনে ইংরাজ পক্ষ হইতে যে গোলাগুলী বর্ষিত হইল, যাহার ফলে বহু চীনার ধনপ্রাণ নাশ হইল, তাহার জন্য সার অষ্টেন চীনকে কোন ক্ষতিপূরণ করিয়া দেন নাই।

নানকিংয়ের ব্যাপারের প্রকৃত তদন্ত হইল না, অথচ তাহাই উপলক্ষ করিয়া চীনের জাতীয় দলে ঘর ভাঙ্গাভাঙ্গি হইল, ইহাই আশ্চর্য্যের কথা। ইহার ফলে পাশ্চাত্য Diplomacy কূটরাজনীতি ও propaganda প্রচারকার্য্য কতটা কার্য্য করিয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। তাহা না হইলে জেনারল চাঙ্গ কাই-সেক আজ সংশয়-দোলায় দোদুল্যমান হইবেন কেন? এখনও চীনের মুক্তি সাধিত হয় নাই। এ সময়ে তিনি আপন দলে ঘর ভাঙ্গাভাঙ্গি করিলেন, ইহা কি চীনের অদৃষ্ট নহে?

তবে একটা সুসংবাদ, যতই ঘর ভাঙ্গাভাঙ্গি হউক, হ্যাঙ্কোর জাতীয় দল লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েন নাই। কয়েক দিন পূর্ব্বে চীনের 'বন্ধুরা' তারস্বরে রটাইয়াছিলেন যে, "হ্যাঙ্কোর আর কোনও ক্ষমতা নাই, ইউজিন চেন এখন কূপমণ্ডুক হইয়া আছেন; চাঙ্গসোলিন, উপেইফু, সান চুয়ান চেঙ্গ ও চাঙ্গ কাই-সেক—এই কয়জন তিন দিক্ হইতে হ্যাঙ্কোর জাতীয় দলকে ঘিরিয়া ফেলিয়া শ্বাসরুদ্ধ করিয়া মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। হ্যাঙ্কোর কম্যুনিষ্টরা ধ্বংসমুখে পতিত হলে পর চীনে যথার্থ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। তখন চীনের সহিত শক্তিপুঞ্জের প্রকৃত সন্ধি শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইত্যাদি।" অর্থাৎ তাহা হইলে চীন যে চীন ছিল, তাহাই থাকিবে আর বিদেশীয়রা চীনে যে স্বার্থসাধন করিতেছিলেন, তখন অবাধে তাহা করিয়া যাইতে সমর্থ হইবেন।

কিন্তু পরে সংবাদ আসিয়াছে যে, হ্যাঙ্কোর 'কম্যুনিষ্ট' মরিয়াও মরে নাই। তাহারা নানা যুদ্ধে উত্তরের দলকে পরাজিত করিয়া দ্রুতগতি ইয়েলো নদীর দিকে অগ্রসর হইতেছে। পরন্তু পশ্চিমপ্রান্তের হোনান প্রদেশ হইতে জেনারল ফেঙ্গ উসিয়াঙ্গ তাহাদিগকে সাহায্যদানে ধাবমান হইয়াছেন। উত্তরের দল ইয়েলো নদীর উত্তর তটে পলায়ন করিয়াছে।

সংবাদটি যে সত্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। কেন না, ইংরাজ ও জাপ তাড়াতাড়ি সাংহাই হইতে উত্তরে টিণ্টসিন সহরে আড্ডা সরাইয়া লইয়া যাইতেছেন—জাপও পিকিংয়ের দূতাবাসসমূহ রক্ষার জন্য তথায় সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন। মার্কিণও সৈন্য বোঝাই জাহাজ টিণ্টসিনের নিকটে টাকু বন্দরে প্রেরণ করিয়াছেন। সুতরাং শীঘ্রই যে দাক্ষিণী হ্যাঙ্কোর দলের দ্বারা টিণ্টসিন ও পিকিং আক্রান্ত হইবে, তাহার সূচনা দেখা যাইতেছে। সেই যুদ্ধের পরিণাম কি হইবে, তাহার জন্য সারা জগৎ আগ্রহভরে অপেক্ষা করিতেছে।

স্বাধীন মিশর

মহাযুদ্ধ জয়ের পর যখন সকল দুর্ব্বল জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের কথা উঠিল, তখন একদিন ইংরাজ হঠাৎ মুহূর্ত্তের খেয়ালে মিশরকে স্বাধীন বলিয়া 'ঘোষণা' করিলেন। সে ১৯২২ খৃষ্টাব্দের কথা। তাহার পূর্ব্বে মিশর protected বা রক্ষিত—আশ্রিত রাজ্য বলিয়া গণ্য ছিল। মিশরের জাতীয় দলের নেতা জগলুল পাশা এই রক্ষিত রাজ্যের পরিবর্ত্তে স্বদেশকে স্বায়ত্তশাসিত দেশের পদবীতে উন্নীত করিবার নিমিত্ত বিরাট আন্দোলন করিয়াছিলেন, সে জন্য তিনি নানা দুঃখ বিপদ বরণ করিয়াছিলেন, জন্মভূমি হইতে নির্ব্বাসিতও হইয়াছিলেন। সেই আন্দোলনের ফলে মিশর স্বাধীন হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, এ স্বাধীনতা ইংরাজের পেটেণ্ট মার্কামারা স্বাধীনতা, ইহার ভোগের জন্য যেমন অধিকারও নির্দ্দিষ্ট হইয়া ছিল, তেমনই কতকগুলি বন্ধন-কষণও ছিল। অর্থাৎ এই পেটেণ্ট স্বাধীনতার ফলে মিশরবাসীদের গলদেশের বগলসটা একটু ঢিলা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, শিকলটাও খুলিয়া রাখা হইয়াছিল, তবে বগলসও ছিল, বগলসের দাগও ছিল।

হঠাৎ সেই শিকলটা বগলসে লাগাইয়া বৃটেনের খোঁটায় বাঁধিয়া রাখিবার প্রয়োজন হইয়াছে। মিশরের ইংরাজ হাই কমিশনার লর্ড লয়েড (যিনি পূর্ব্বে বোম্বাইয়ের গভর্ণর সার জর্জ্জ লয়েড ছিলেন) মিশর পারলামেণ্টের প্রধান মন্ত্রী সারোয়াৎ পাশাকে এক কড়া পত্র দিয়া ধাতুস্থ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে মিশরবাসী দর চৈতন্যোৎপাদনের নিমিত্ত মাণ্টা হইতে তিনখানা বৃটিশ রণপোত মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে আনাইয়াছেন। মিশরের অপরাধ, সে হঠাৎ অতিরিক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্তির উৎকট মদিরায় উন্মত্ত হইয়া বগলসের শিকল ছাড়া পাইয়া খোঁটা ছাড়িয়া যথা ইচ্ছা চরিতে উদ্যত হইয়াছিল গলদেশের বগলস বা বগলসের দাগের কথা একবারে ভুলিয়া গিয়াছিল।

মিশর যখন ১৯২২ খৃষ্টাব্দে স্বাধীন sovereign state হইল, তখন তাহার রাজা হইল (ফাউদ), এক পারলামেণ্ট হইল, এক মন্ত্রি-মণ্ডল হইল, আদলি পাশা তাহার প্রধান মন্ত্রী। আমাদের দেশে যেমন রাজবংশীয় ডিউক অফ কনট আসিয়া মহা ধুমধামে ভারতের 'পারলামেণ্টের' উদ্বোধন করেন, তদপেক্ষা অধিক ধুমধামে মিশরের পারলামেণ্ট বসিল, মিশরীয়রা আপন দেশ শাসন করিতে লাগিলেন—তাঁহাদের নিজের সেনা, নিজের আইন, নিজের আদালত, নিজের শাসনকর্ত্তা, নিজের সব। কেবল বগলসের চিহ্নস্বরূপ ইংরাজ মাত্র ৪টি সর্ত্ত রাখিলেন—(১) সুয়েজ খালের কর্তৃত্ব, (২) সুদানের কর্তৃত্ব, (৩) বিদেশীয়ের বিচারের কর্তৃত্ব, (৪) দেশরক্ষার কর্তৃত্ব। এই কয়টি ছাড়া আর সকল বিষয়েই ইংরাজ মিশরের বগলসের শিকল খুলিয়াছিলেন।

আদলি পাশার মন্ত্রিত্বকালে মিশরের Notables অর্থাৎ মোড়লদের দল প্রবল হইয়া উঠিল, সুতরাং জাতীয় দলের উহা মনঃপূত হইল না। আদলি পাশার মন্ত্রিত্ব শেষ হইল, সারোয়াৎ পাশার মন্ত্রিত্ব আরম্ভ হইল। এই মন্ত্রিমণ্ডলের পৃষ্ঠপোষক জগলুল পাশার দল। সুতরাং যখনই সারোয়াৎ পাশার মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হয়, তখনই মিশরের শান্তি সম্বন্ধে অনেকে সন্দিহান হইয়া ছলেন। আজ সন্দেহ সত্যে পরিণত হইয়াছে।

হঠাৎ যে মাসের শেষভাগে সংবাদ আসিল,—"হঠাৎ আদেশ পাইয়া তিনখানি বৃটিশ রণপোত মাণ্টা হইতে মিশর অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে।" রয়টার ইহার সহিত আর একটু সংবাদ জুড়িয়া দিলেন, "কাইরোর রাজনীতিক জগতে যে বিশেষ অশান্তি দেখা দিয়াছে, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সেখানে মিশর গভর্ণমেণ্টের সহিত বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রীতিসম্বন্ধ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। এই হেতু পূর্ব্বাহ্ণে সতর্ক ও প্রস্তুত হইবার উদ্দেশ্যে মিশরে রণতরী প্রেরিত হইয়াছে।"

এ যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। কোথাও কিছু নাই, হঠাৎ মিশরে অশান্তি দেখা দেয় কেন? ইংরাজে ও মিশরীয়দলে প্রীতিসম্বন্ধ হঠাৎ ক্ষুণ্ণ হয় কেন? হঠাৎ কিসের জন্য প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন মনে করিয়া মিশরে রণতরী প্রেরিত হয়? তবে কি সারোয়াৎ পাশার মন্ত্রিমণ্ডল হঠাৎ জগলুলকে কর্ত্তা মনে করিয়া হাই কমিশনার লর্ড লয়েডকে পদচ্যুত করিয়াছেন, না মিশরীয় সৈন্য হঠাৎ ইংরাজের বিপক্ষে বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে? সকলেরই মন সংশয়-দোলায় আন্দোলিত হইয়া উঠিল।

কিন্তু সংশয় শীঘ্রই দূর হইল। বৃটিশ বেতার বার্ত্তায় খবর রটিল যে, লর্ড লয়েডের সহিত মিশর গভর্ণমেণ্টের মিশরীয় সৈন্যদল সম্পর্কে নূতন ব্যবস্থা লইয়া মনোমালিন্য উপস্থিত হইয়াছে। লর্ড লয়েড কি কড়া চিঠি লিখিয়াছেন, তাহা প্রকাশ পায় নাই, তবে চিঠির ভাবটা জানিতে পারা গিয়াছে। লর্ড লয়েড খুবই 'বন্ধু'র মত সারোয়াৎ পাশাকে তাঁহার 'কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন; তবে 'বাপু বাছা' বলিয়া পত্র দেন নাই, যাহাতে চৈতন্যোদয় হয়, এমন ভাবের কড়ামিঠা চিঠি দিয়াছেন। যেমন পরমাত্মীয় রোগীকে জোর করিয়া তিক্ত বড়ী খাওয়ায় রোগ আরামের জন্য, তেমনই ভাবে লর্ড লয়েড সারোয়াৎকে চিনির মোড়কে পুরিয়া নিমের বড়ী খাওয়াইয়া দিয়াছেন, তাঁহার 'রোগ' আরামের জন্য। রোগটা কি, বোধ হয় আর বুঝাইবার প্রয়োজন নাই; শিকল ছাড়া পাইয়া খোঁটা ছাড়াইবার চেষ্টা,—ইহাই রোগ।

লর্ড লয়েডের পক্ষের কথাটা হইতেছে এই—কিছুদিন হইতে মিশরীয় সেনাদলের সম্পর্কে মিশর মন্ত্রিমণ্ডলের সহিত লর্ড লয়েডের একটা মনোমালিন্য চলিয়া আসিতেছিল। মিশর পারলামেণ্টের এক War committee বা সমর সম্পর্কিত ব্যবস্থা করিবার প্রতিনিধি সভা আছে। এই কমিটী বহুদিন যাবৎ সেনাদলের কর্ম্মকুশলতা ক্ষুণ্ণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। সেনাদল যাহাতে দেশরক্ষার্থ উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়, যাহাতে সেনাদলে শৃঙ্খলা নিয়মিত থাকে, তাহা না করিয়া রাজনীতিক দলাদলি উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সেনাদলকে ব্যবহার করা হইতেছে। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে সর্দ্দার সার লি ষ্টাক নিহত হইবার পর হাড্লুসষ্টন পাশা অস্থায়ী সর্দ্দারের পদে নিযুক্ত হয়েন। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে যখন তিনি সুদানের কমিশনার সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হন, তখন স্পিন্ক্স পাশা তাঁহার স্থানে মিশর সেনাদলের সর্দ্দার পদে নিযুক্ত হয়েন। মিশরের সমর কমিটী এখন যে নূতন ব্যবস্থা করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাহাতে এই 'সর্দ্দারের' পদটি তুলিয়া দিবার চেষ্টা হইতেছে।

মিশরের চরমপন্থী ওয়াফদ দল মিশর গভর্ণমেণ্টের উপর চাপ দিয়া সর্দ্দার পদের পুনরুদ্ধারে বাধা প্রদান করিতেছে। যাহাতে হাড্লুষ্টন পাশার পর স্পিন্ক্স পাশা আর সর্দ্দার পদে বসিতে না পারেন, কেবল তিনি কেন, অতঃপর আর যাহাতে কোনও ইংরাজপক্ষীয় লোকই সর্দ্দারের পদে বসিতে না পায়েন, তাহার জন্য এই চক্রান্ত করা হইয়াছে। কিন্তু বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তাহা হইতে দিতে পারেন না। ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে মিশরকে যে স্বাধীনতা দিবার সঙ্কল্প করা হইয়াছে, তাহা হইতে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বিচ্যুত হইবেন না। যাহাতে মিশর এই নূতন স্বাধীনতার অধিকারের উপযুক্ত হইতে পারে, বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তাহার সকল সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। কতকগুলি মিশরীয় নেতা মন খুলিয়া এই গঠনকার্য্যে যোগদান না

করিয়া বরং বাধাপ্রদান করিয়াছে। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তাহাও উপেক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু তাহা বলিয়া মিশরে রক্ষিত বৃটিশ স্বার্থের প্রতিকূল ব্যবস্থা বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কিছুতেই অনুমোদন করিতে পারেন না। সুয়েজ খাল ও বিদেশীয় স্বার্থ রক্ষা করিবার অধিকার বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট সংরক্ষিত রাখিয়াছেন। ইহার জন্য মিশরীয় সৈন্যদলের কর্মকুশলতা বিশেষ প্রয়োজনীয়; যাহাতে সেনাদল হঠাৎ রাজনীতিক দলাদলির ভৈরবী চক্রে পড়িয়া অকর্মণ্য হইয়া না যায় এবং দুষ্ট লোকের পরামর্শে বিদ্রোহী হইয়া বৈদেশিকগণের ধনপ্রাণের হন্তারক না হয়, তাহা বৃটেনকে দেখিতেই হইবে এবং সেজন্য মিশরীয় সৈন্যদলের উপর একজন বৃটিশ সর্দারের কর্তৃত্ব অতীব প্রয়োজনীয়। এ অধিকার বৃটেন কিছুতেই ছাড়িতে পারেন না। যাহাতে মিশরের মন্ত্রিমণ্ডল এ বিষয়ে কর্তব্য বিস্মৃত না হয়েন, তাহারই জন্য কড়া চিঠির ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ব্যাপার এই। খাও দাও বেড়াও, কিন্তু বগলদেব শিক্ষার কথা ভুলিও না। সর্দার তোমাদের সেনাদলের ইংরাজ থাকিবেই, না হইলে সুয়েজ খাল (ভারতের পথ) রক্ষা করা যাইবে না, বিদেশীয় ধনপ্রাণ নিরাপদ হইবে না। বস্তুতঃ মিশরের ওয়ার কমিটির স্পর্দ্ধাটা একবার দেখুন। ২৪শে মে কাইরো হইতে তারের সংবাদ আসে যে, ওয়ার কমিটি এই কয়টি প্রস্তাব করিয়াছেন :—

(১) মিশরের যে সৈন্য আছে, তাহার সংখ্যা আরও ১৬ শত বৃদ্ধি করিতে হইবে।

(২) আরও ৩৬ জন সেনানী নিযুক্ত করিতে হইবে।

(৩) একটি নৌসামরিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বাবদে এবং একখানি নৌসমর-শিক্ষার উপযোগী রণপোত সংগ্রহ বাবদে ৩১ হাজার পাউণ্ড মুদ্রা ব্যয় মঞ্জুর করিতে হইবে।

(৪) প্রাচীন প্রথায় গোলন্দাজ সেনার সংস্কারসাধন করিতে হইবে।

এতগুলি প্রস্তাব হইল, অথচ উহার সহিত সৈন্যদলের সর্দারের পদ রাখা হইবে কি না, সে কথা কিছুই বলা হইল না ইহাতে বৃটিশ সরকার ক্রুদ্ধ না হইয়া পারেন কি? লর্ড লয়েড তৎক্ষণাৎ সারোয়াৎ পাশাকে জানাইলেন যে, "The post must be held by a British officer of high rank, সর্দারের পদ অবশ্যই একজন উচ্চপদস্থ ইংরাজ সেনানীকে দিতে হইবেই।" কেন 'অবশ্য' রাখিতে হইবে, তাহার কারণ দেখাইয়া লর্ড লয়েড বলিলেন, "যখন বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণ হইতে মিশরকে রক্ষা করিবার অধিকার ইংরাজ স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন, তখন সীমান্ত জিলা সমূহের উপর ইংরাজের কিছু কর্তৃত্ব রক্ষা করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়—বিশেষরূপে মিশর সৈন্যদলের উপর একজন বৃটিশ সেনানীর কর্তৃত্ব রাখা চাই-ই।"

কাযেই যখন মিশর ইংরাজ সর্দার রাখিবার সম্বন্ধে কোনও উচ্চবাচ্য করিলেন না, তখন ইংরাজ চটিয়া আগুন ত হইবেনই। কোথায় প্রবল প্রতাপ বৃটিশ সিংহ, অর্দ্ধধরণী যাঁহার কবলগত, জগতের শত শত জাতির ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করিবার অধিকার যিনি বিধাতার নিকট ইজারা করিয়া লইয়াছেন, সেই ইংরাজ—আর কোথায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মেষশাবক মিশর! সে আবার জল ঘোলা করে নাই বলিয়া কৈফিয়ৎ দিতেছে—পরস্পরের অধিকারের কথা তুলিয়া তর্ক করিতেছে—বিড়ম্বনা আর কি!

মিশর বলিতেছে,—"যখন ১৯২০-২২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আমাদের সহিত আপনাদের (ইংরাজ) গভর্ণমেণ্টের মিশরের ভবিষ্যৎ স্থান লইয়া নানা বাদানুবাদ চলিয়াছিল, তখন মিশরের সৈন্যের উপর কাহার কর্তৃত্ব থাকিবে,—এ সম্বন্ধে কোন কথা হয় নাই। তাহার পর যখন ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ঘোষণা পত্রে মিশরের Sovereign state রূপে স্বাধীনতা প্রকাশিত হয়, তখনও তাহাতে এমন কথা উল্লিখিত হয় নাই যে, মিশরের সৈন্যের উপর বৃটিশের কর্তৃত্ব থাকিবে। সে কথা থাকিলে মিশরের স্বাধীনতা ভুয়া স্বাধীনতায় পর্যবসিত হয়। অবশ্য ইংরাজ সুয়েজ খালের উপর কর্তৃত্বাধিকার রাখিবেন এবং বৈদেশিক আক্রমণের বিপক্ষে মিশর রক্ষার অধিকার উপভোগ করিবেন, ঘোষণাপত্রে এ কথা ছিল; কিন্তু তাহার দ্বারা মিশরের সৈন্যের উপর কর্তৃত্বাধিকার রাখা বুঝায় না। মিশরে যে শাসননীতির (Constitution) খসড়া প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহার প্রথম সর্ত্তে আছে—"Egypt is a sovreign state, free and independent." যদি মিশরের সৈন্যদলের উপর অপরের কর্তৃত্বাধিকার স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে এই সর্ত্তের সার্থকতা কোথায় থাকে? আবার উহার ১৪৭ এই সর্ত্তে আছে,—"The method of recruiting for the army, its organisation as well as the rights and the duties of soldiers are determined by the Law." এই Law অথবা আইন গঠন করিবেন কে?—মিশরের পার্লামেণ্ট। তবে মিশরের সৈন্যদলের উপর কর্তৃত্ব করিবার অধিকার মিশরের পার্লামেণ্ট ব্যতীত অপর কেহ উপভোগ করিবে কিরূপে?"

এইখানেই সমস্যা। মিশরের "সিয়াসৎ" পত্র বলিয়াছেন,—বৃটেন শক্তিশালী, তিনি মিশরে যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। তবে ন্যায়-ধর্মের মুখ চাহিলে বাহুবলকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া যায় না। কিন্তু "সিয়াসৎ" ভুলিয়া গিয়াছেন সনাতন কথা,—বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। দুর্ব্বলের যুক্তিতর্ক ও রোদনই সার!

বৃটেন ও রাসিয়া—প্রলয়ের সূচনা?

লণ্ডন সহরের রাসিয়ান ট্রেড ডেলিগেশান যে গৃহে অবস্থিত, সেই গৃহের একাংশে অবস্থিত আর্কস কোম্পানী নামক ব্যবসায়ীর কার্য্যালয় খানাতল্লাস করিয়া বিলাতের কর্তৃপক্ষ কয়েকপ্রকার সন্দেহজনক কাগজপত্র ও অস্ত্রশস্ত্র বাহির করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ করেন। গত ১৫ই মে তারিখে এই খানাতল্লাসী হইয়াছিল। তৎপরদিন বিলাতের বল্ডুইন গভর্ণমেণ্টের রাষ্ট্রসচিব সার উইলিয়াম জয়েনসন হিক্স্ পার্লামেণ্টে বলেন যে, এই খানাতল্লাসীর ফলে রাসিয়ান সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের নানারূপ ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ পাইয়াছে; এই ষড়যন্ত্রের দ্বারা রাসিয়া জগতে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সর্ব্বনাশসাধনের চেষ্টা করিতেছে। সার উইলিয়ামের এই ঘোষণার পর বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট রাসিয়ান গভর্ণমেণ্টের সহিত রাজনৈতিক সম্বন্ধের বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছেন এবং সোভিয়েট দূতকে ইংলণ্ড ত্যাগ করিতে আদেশ করিয়াছেন।

ব্যাপারটা নিতান্ত সহজ নহে। পাশ্চাত্য রাজনীতির গূঢ়তত্ত্ব যাঁহারা বিশেষরূপে অনুধাবন করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, এই ভাবে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করার কি ফল হইয়া থাকে। বৃটেনের মন্ত্রিসমাজ যতই বলুন, এই রাজনৈতিক সম্বন্ধ-বিচ্ছেদের ফলে রাসিয়ার সহিত ইংলণ্ডের বাণিজ্য সম্বন্ধের কোনও ক্ষতি হইবে না, প্রকৃতপক্ষে কিন্তু এক রাজ্যের সহিত অপর রাজ্যের রাজনৈতিক সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে সঙ্গে সঙ্গে অন্য সকল সম্বন্ধেরই বিচ্ছেদ ঘটিয়া থাকে। সুতরাং রাসিয়ান সোভিয়েটের সহিত বৃটেনের এই সম্বন্ধবিচ্ছেদ এবং সোভিয়েট দূতের বহিষ্করণ নিতান্ত সামান্য ব্যাপার নহে, বলিতে হইবে। কারণ, এই ব্যাপার হইতে উভয় পক্ষের মধ্যে শত্রুতা এবং যুদ্ধ যে অতি শীঘ্র সংঘটিত হইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অবশ্য ইংলণ্ডের সহিত রাসিয়ার শত্রুতা যে এই প্রথম, তাহা নহে। রাসিয়া ইংলণ্ডের মামুলী শত্রু। ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত
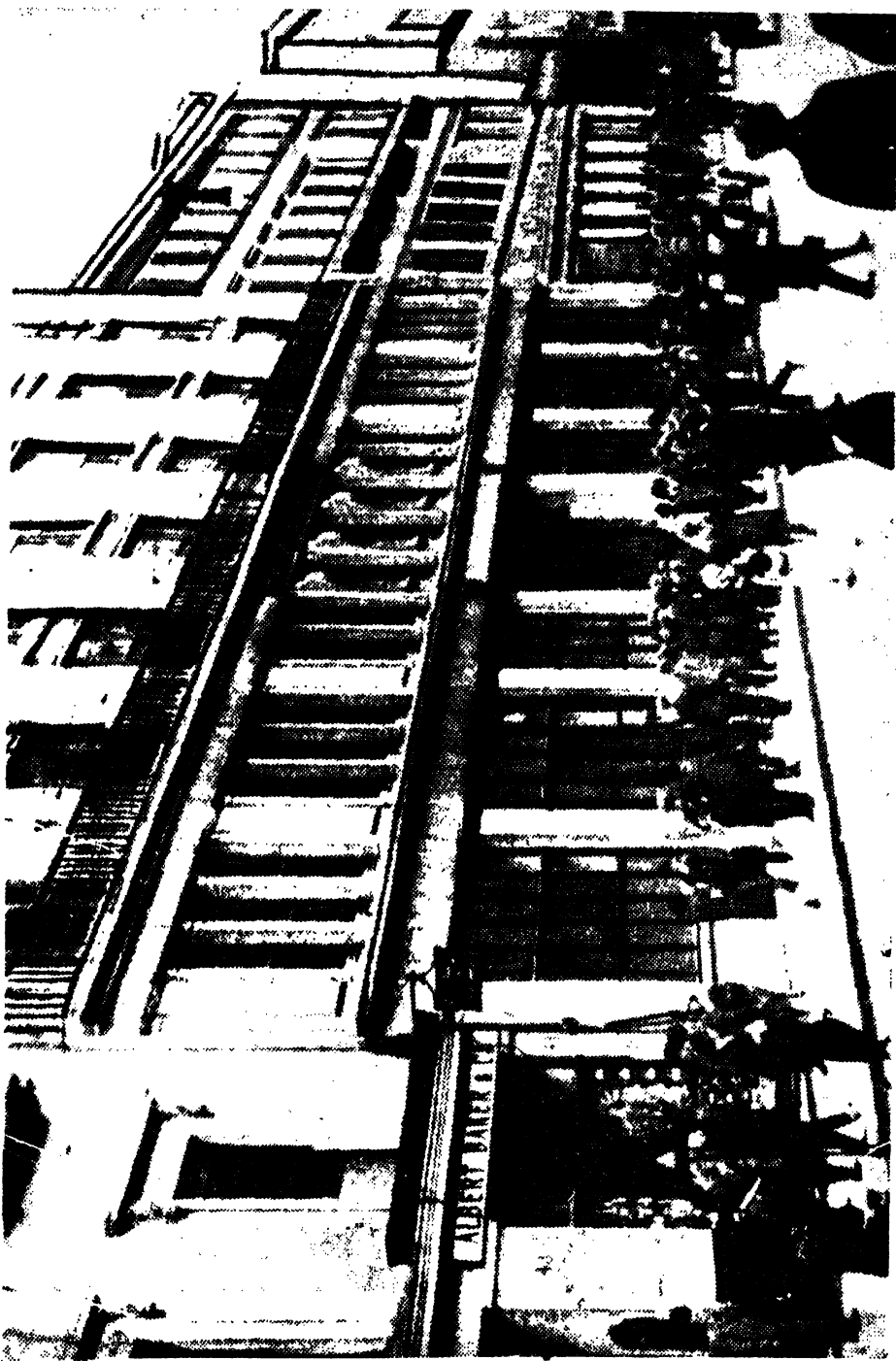
মুরগেটস্থিত আর্কস কোম্পানীর কার্য্যালয়

হইবার পর হইতে রাসিয়ার সহিত ইংলণ্ডের শক্রতা এতাবৎকাল বদ্ধমূল হইয়া আসিতেছে। 'রুষ-ভল্লুকের' ভয় ইংরাজের চিরদিনই একটা মস্ত ভয় ছিল। ক্রাইমিয়ার যুদ্ধের মূল কারণ এই রুষ-ভল্লুকের ভয়। পাছে 'উত্তরের ভল্লুক' কনষ্টাণ্টিনোপলে থাবা গাড়িয়া বসে, এই ভয়ে ইংরাজ ফরাসীর সহিত যোগদান করিয়া রাসিয়ান ভল্লুককে বাধা প্রদান করিয়াছিল। আফগান সীমান্তে, পারস্তে, তুর্কিস্থানে,—মধ্য এসিয়ার নানা স্থানেই রুষ-ভল্লুকের থাবা দেখিয়া ইংরাজ চিরদিন আতঙ্কিতই ছিলেন এবং সেই অজুহতে দরিদ্র ভারতীয়ের কষ্টার্জ্জিত রাশি রাশি অর্থ

'সীমান্ত' রক্ষায় অপব্যয় করিয়াছেন। সে সকল ইতিকথার আলোচনা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন।

ফল কথা, রাসিয়া চিরদিনই 'ভারতের জুজু' রূপে ইংরাজের নিকট প্রতিভাত হইয়াছেন। অথচ বিধাতার এমনই আশ্চর্য্য খেলা যে, এই রাশিয়াই ইংরাজ সাম্রাজ্যের ঘোর বিপদের দিনে বন্ধুরূপে তাঁহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছে। বিশ্বজয়ী ফরাসী বীর নেপোলিয়ান যেন সমগ্র য়ুরোপ-গ্রাসে সমুদ্যত, যখন ইংরাজের ভাগ্য সামান্য সূক্ষ্ম সূত্রের উপর নির্ভর করিতেছে, তখন এই বিরাট রাসিয়া দুর্ভেদ্য প্রাচীরের ন্যায় নেপোলিয়ানের প্রচণ্ড আক্রমণ বুক পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। নেপোলিয়ান ৫ লক্ষ সুদক্ষ সুশিক্ষিত বিশ্বজয়ী সৈন্য লইয়া রাসিয়া আক্রমণ করিয়াছিলেন; কিন্তু মাত্র ২০ সহস্র সৈন্য লইয়া তাঁহাকে হতাশহৃদয়ে ফ্রান্সের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। রাসিয়ার দুরন্ত শীত, হিংস্র বন্য জন্তু এবং দুর্দ্ধর্ষ রাসিয়ান সেনা অবশিষ্ট ফরাসী সেনার ধ্বংসসাধন করিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে রাসিয়ায় নেপোলিয়ানের উচ্চাকাঙ্ক্ষা সমাহিত হইয়াছিল। নেপোলিয়ানের অসাধারণ রণপাণ্ডিত্য এবং নেতৃত্ব যদিও ইহার পর আবার নূতন সেনাদল গঠন করিতে সমর্থ হইয়াছিল, যদিও নেপোলিয়ান নামের উন্মাদনা কিশোর ও তরুণ ফরাসীকে রণমদে উন্মত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তথাপি নেপোলিয়ানের সেই প্রাচীন শিক্ষিত অভিজ্ঞ দক্ষ সেনাদলের অভাব কেহ পূর্ণ করিতে পারে নাই। অতঃপর লায়েপজিগ, কোয়াটার ব্রাস বা ওয়াটারলুর যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে নেপোলিয়ানের অষ্টার্লিজ অথবা ম্যারেঙ্গো-জয়ী অদম্য সেনাদলের অস্তিত্ব ছিল না। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে রাসিয়াই ইংরাজকে নেপোলিয়ানের ভয় হইতে ত্রাণ করিয়াছিল।

আবার যদি জার্ম্মাণ যুদ্ধের কথা আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে দেখা যায়, রাসিয়াই সর্ব্বপ্রথমে বিরাট প্রাচীরের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া প্রচণ্ড জার্ম্মাণ শক্তিকে বাধা দিয়া অন্যান্য য়ুরোপীয় শক্তিকে রক্ষা করিয়াছিল। জার্ম্মাণী পূর্ব্বপ্রান্তে রাসিয়ার বিরাট বাধা না পাইলে প্রথম যুদ্ধের মুখে নিশ্চিতই ফরাসী ও ইংরাজকে রণে পরাস্ত করিয়া ফ্রান্স ও ইংলণ্ড গ্রাস করিত। পূর্ব্ব প্রান্তে বাধা সত্ত্বেও জার্ম্মাণবাহিনী ফরাসীর কালে বন্দরাভিমুখে অগ্রসর হইবার নিমিত্ত যে হনা দিয়াছিল, তাহার গতিরোধ করিতে ইংরাজ ও ফরাসীকে কি প্রাণান্তপণ বেগ পাইতে হইয়াছিল, তাহা ইতিহাস পাঠকের অবিদিত নাই। শেষে এমন হইয়া ছিল যে, নানা উপায়ে মার্কিণ জাতিকেও জার্ম্মাণীর বিপক্ষে যুদ্ধে নামাইতে হইয়াছিল, তবে ইংরাজ ও ফরাসী রক্ষা পাইয়াছিলেন। আর আজ যে ইটালী মত্ত জাতি বলিয়া আস্ফালন করিতেছেন, তিনি ত সে সময়ে জার্ম্মাণ জেনারল ম্যাকেনসেনের হাতুড়ীর ঘা খাইয়া একবারে কাবু হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই সময়ে রাসিয়া পূর্ব্বপ্রান্তে হামলা না দিলে ম্যাকেনসেনকে ইটালীর কারসো প্লেটো প্রান্ত ত্যাগ করিয়া তাড়াতাড়ি পূর্ব্ব প্রান্তে ছুটিতে হইত না।

আর্কস কোম্পানীর কার্য্যালয়ের গৃহদ্বারের সতর্ক পুলিস প্রহরী

তাই বলিতেছিলাম, প্রকৃতপক্ষে রাসিয়া ইংরাজ ও অন্যান্য য়ুরোপীয় জাতির ঘোর বিপদের দিনে বন্ধুর কার্য্যই করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু বিধাতার বিচিত্র খেলায় রাসিয়া আজ ইংরাজের ঘোর শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জার-শাসিত রাসিয়া ইংরাজের ভারত সাম্রাজ্যের শত্রু বলিয়া অতীতে ইংরাজের শত্রু রুষ-জুজুরূপে বর্ণিত হইত, পাঁচদের ঘটনা, তুরাণ অভিযান, আফগান-যুদ্ধ, পারস্য অভিযান, তিব্বত অভিযান,—এ সকলেরই মূল কোথায়, তাহা ইতিহাসপাঠক জানেন। রুষ-ভীতিই ইংরাজের এই সমস্ত চাঞ্চল্য-প্রকাশের মূল। সদাই ভয়,—রাসিয়া বুঝি ভারত আক্রমণ করে! এখন সে ভয় গিয়াছে। জারের রাসিয়া আর নাই। একেই প্রাচ্যের জাপশক্তির নিকট বিরাট রাসিয়ান শক্তির পরাজয়ের পর হইতে প্রাচ্যে রাসিয়ার আতঙ্ক হ্রাস হইয়া গিয়াছিল, তাহার উপর জার্ম্মাণ যুদ্ধকালে রাসিয়ার জারের স্বেচ্ছাচার শাসনের উচ্ছেদ সাধিত হওয়ায় এবং রাসিয়ায় বিষম গৃহবিবাদ ও আত্মযুদ্ধ সংঘটিত হওয়ায় রাসিয়া হীনবল ও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। কাযেই তখন রাসিয়া হইতে আক্রমণ-ভীতি একবারেই দূর হইয়াছিল। ইংরাজ নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, রাসিয়া নিজের ঘর সামলাইতেই ব্যস্ত, এ অবস্থায় তাহার ভারত সাম্রাজ্যের বিপক্ষে রণসজ্জা করা একবারেই অসম্ভব।

কিন্তু বিপদ্ কোন দিক্ হইতে আসে, মানুষ যদি বুঝিতে পারিত, তাহা হইলে সে বিধাতাপুরুষ হইত। একচক্ষু হরিণ জমীর দিকে

বিলাতের রাষ্ট্র-সচিব স্যার উইলিয়াম জয়েনসন হিক্স্

তাহাদিগকে একই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে, ইহার দৃষ্টান্ত রোমই প্রথম প্রদর্শন করে। রোম কেবল তরবারি দ্বারা অপর জাতিকে জয় করিত না, তাহার উপরে সে তাহার cultural conquest প্রতিষ্ঠিত করিত। সে তাহাকে তাহার ভাব, ভাষা, সাহিত্য, শাস্ত্র, আইন, সভ্যতা, শিক্ষা প্রভৃতিতে দীক্ষিত করিত, তাহার দেশে নিজের দেশের মত পথঘাট, বিদ্যালয়, আদালত, ঔষধালয়, হাঁসপাতাল, হর্ম্ম্য-ইমারত, বাজার গঞ্জ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করিত এবং সেই প্রভাবের দ্বারা অলক্ষ্যে তাহাকে আপনার করিয়া লইত। অপর জাতি মনে করিত, সেও রোমের সাম্রাজ্যের দশ জনের এক জন। তখন সেও রোমের বিবাদকে আপনার বিবাদ বলিয়া মনে করিত এবং রোমের শত্রুর বিপক্ষে সাম্রাজ্যের দশজনের একজন হইয়া যুদ্ধ করিতে যাইত। অর্থাৎ অপর জাতি ক্রমে নিজের অস্তিত্ব ও অধীনতার কথা ভুলিয়া যাইত, সঙ্গে সঙ্গে exploitation চলিত। অর্থাৎ অপর জাতিকে রোম তাহার সভ্যতা ও শিক্ষা দান করিয়া তৎপরিবর্ত্তে তাহার নিকট হইতে যাহা সম্ভব, তাহা নিজের স্বার্থের জন্য আদায় করিয়া লইত। কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প,—যে দিক্ দিয়া হউক, রোমের লাভ হইলেই হইল। ইহাই সাম্রাজ্যিকতা।

এখন প্রাচীন রোমের অনুকরণে য়ুরোপের বাহুবলদৃপ্ত কয়েকটি প্রধান শক্তি সেই সাম্রাজ্যিকতার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহাদের colonisation and conquest ইহার প্রধান অস্ত্র। প্রথম দফায় উপনিবেশ স্থাপন এবং দ্বিতীয় দফায় পররাজ্য গ্রাস,—এতদুভয়ের দ্বারা তাঁহাদের সাম্রাজ্যের expansion বা বিস্তৃতি হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিজিতগণের exploitation দ্বারা নিজ নিজ সাম্রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করা হইতেছে। ইহাতেও রোমের মত cultural conquest দ্বারা exploitation এর পথ প্রশস্ত করা হইতেছে।

সাম্রাজ্যিকতার মেরুদণ্ড একটা privileged class. নামে অনেক সাম্রাজ্যে democracy অথবা গণতন্ত্রশাসন প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জ্ঞাত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একটি privileged class-এর উপরেই সাম্রাজ্যশাসনের ভার ন্যস্ত থাকে। ফরাসীর ত্রিবর্ণ পতাকায় 'সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা' লিখিত থাকে বটে, কিন্তু ফরাসীও অধুনা সাম্রাজ্যবাদীদিগের মধ্যে অন্যতম। মার্কিণ দেশের star and stripes তারকালাঞ্ছিত পতাকা স্বাধীনতার লীলাভূমির জাতীয় পতাকা বলিয়া সগর্ব্বে উড্ডীয়মান হয়, কিন্তু মার্কিণও অধুনা সাম্রাজ্যবাদীদিগের মধ্যে অন্যতম। ফরাসীর মরক্কো, এলজিরিয়া, ইন্দোচীন এবং মার্কিণের ফিলিপাইন, পানামা এবং বর্ত্তমানে মধ্য-আমেরিকা তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। ফরাসী অথবা মার্কিণের জনসাধারণ হয় ত অপর জাতির conquest ও exploitation পছন্দ না করিতে পারে, কিন্তু উহাদের ruling class অর্থাৎ শাসক-সম্প্রদায় তাহা বিলক্ষণ পছন্দ করে এবং

রাখিত, পাছে ঐ দিক্ দিয়া ব্যাধ আসিয়া তাহাকে হত্যা করে; কিন্তু নদীর দিক্ হইতে ব্যাধ যে নৌকায় চাপিয়া তাহাকে শিকার করিতে আসিতে পারে, এ কল্পনা তাহার মনে উদয়ই হয় নাই। এ ক্ষেত্রেও হইয়াছিল তাহাই। ইংরাজের ভয়, পাছে রাসিয়া অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ভারত আক্রমণ করে। সে ভয় যখন অন্তর্হিত হইল, তখন ইংরাজ নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্তু এক নূতন ভয় জুটিল, এক নূতন দিক্ হইতে জুজু দেখা দিল। এই জুজুটির স্বরূপ বুঝিতে হইলে আধুনিক Imperialism এবং Bolshevismএর পরস্পর কি সম্বন্ধ, তাহা বুঝিতে হইবে।

আমরা যাহাকে সাম্রাজ্যিকতা বলি, ইংরাজীতে যাহা Imperialism, উহার আদর্শ প্রাচীন রোমক সাম্রাজ্যের শাসন ইতিহাসে দেখা যায়। প্রাচীন Imperial Rome ই জগতে এই সাম্রাজ্যিকতার সৃষ্টি করিয়াছিল। এক জাতি অপর জাতিকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া রাজ্য গ্রাস করিত, ইহার দৃষ্টান্তের প্রাচীনকালে অসদ্ভাব ছিল না। কিন্তু এক জাতি, নানা জাতি নানা দেশ বাহুবলে জয় করিবার পর তাহার নিজের ভাষা, ভাব, আইন-কানুন, আচার-ব্যবহার, ধর্ম্মকর্ম্ম আদির দ্বারা সেই সকল বিজিত জাতিকে প্রভাবান্বিত করিয়া

বলে যে, উহা বিজিতগণের মঙ্গলের জন্যই করা হইতেছে। এই ruling class কেই priviliged class বলা যায়। ইহাদের মধ্যে ধনী ব্যবসাদার, জমীদার, মধ্যবিত্ত শ্রেণী আছে। যাহারা যথার্থ মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া ভূমি কর্ষণ করিয়া জনগণের খাদ্য উৎপাদন ও সংগ্রহ করে অথবা ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইবার সহায়তা করে, তাহারা এই privileged classএর মধ্যে নাই। অথচ এই ধনী ও মজুরের (Labour and Capital) মধ্যে বিরোধ ও মনোমালিন্য ক্রমশঃ গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতেছে। উহা হইতে যে অসন্তোষের হলাহল উদ্ভূত হইয়াছে, তাহাতে জগতে প্রকৃত শান্তি বিরাজিত হইবার সম্ভাবনা নাই।

রাসিয়ার রোমানফ রাজবংশের উচ্ছেদ-সাধনের পর যখন উপর্য্যুপরি কয়েকটা বিপ্লবে রাসিয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তখন রাসিয়ায় ভীষণ অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু রাসিয়ার যুগমানব লেনীন এই অরাজকতার মধ্য হইতে যে শৃঙ্খলা আনয়ন করেন, তাহা হইতে রাসিয়ায় আবার দৃঢ়মূল শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। উহার নাম বলশেভিক সোভিয়েট শাসন, এবং লেনীন উহার মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। এই বলশেভিক কথার অর্থ—great majority অর্থাৎ বহু বা গণতন্ত্র। অল্পসংখ্যক লোক privileged অর্থাৎ বিশেষ অধিকার বাজেয়াপ্ত করিয়া বহুর উপর মর্জ্জিমত শাসন করে, ইহা বলশেভিক শাসনের অভিপ্রেত নহে। বলশেভিকদিগের শাসনকেন্দ্রের নাম হইল সোভিয়েট। বলসেভিকরা এক এক কম্যুনে বিভক্ত হইয়া এক এক কেন্দ্রে সোভিয়েট শাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, এজন্য ইহাদের শাসনযন্ত্রের নাম হইল কম্যুনিজম্। ইহারা অন্যের অন্যায় অধিকার দূর করিয়া বহুর ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় যত্নবান্ হইল। ইহাতে পৃথিবীতে আতঙ্ক উপস্থিত হইল। কেন উপস্থিত হইল, তাহা বুঝিতে হইলে Capitalism ও Imperialism মন্ত্রের গূঢ় রহস্য পূর্ব্বে বুঝিতে হয়।

স্কটলাণ্ড ইয়ার্ডের বড়কর্ত্তা মেজার জেনারল সার উইণ্ডহাম চাইল্ডস্

অধুনা প্রায় সকল সভ্য দেশেই ধনসম্পদ কয়েকটি মুষ্টিমেয় লোকের হস্তে ন্যস্ত। কোথাও বা ব্যষ্টিরূপে, কোথাও বা সমষ্টিরূপে এই সকল ধনী ব্যবসায়ী ধনসম্পদের একচেটিয়া অধিকার উপভোগ করে। ব্যষ্টিরূপে Compan এবং সমষ্টিরূপে Trast বা Combine; ইহাই ধন-দৌলৎ আপনাদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করিয়া লইয়াছে। যাহাদের হস্তে পৃথিবীর নানা দেশের শাসনভার ন্যস্ত, তাহারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইহাদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং ইহাদের স্বার্থের মুখ চাহিয়া জগতের নানা দেশে শাসনপ্রথা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। এই ভাবে বহুকাল চলিয়া আসিতেছে। যাহারা এই ভাবে সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হইয়াও বিশেষ অধিকার ভোগ করিয়া আসিতেছে, তাহারা বহুর মন আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত তাহাদের শাসনপ্রথার সহিত একটা জাত্যভিমান অথবা দেশাত্মবোধ জুড়িয়া দিয়াছে। নানা অধীন জাতিকে exploit করিবার পক্ষে যাহাতে কোনও বাধা-বিঘ্ন না পড়ে, এতদুদ্দেশ্যে তাহারা নিজের দেশের বহুর মনে সাম্রাজ্য-গর্ব্বের বীজ বপন করিয়াছে। 'আমি সাম্রাজ্যের এক জন, আমার সাম্রাজ্যের পতাকার সম্মান আমি প্রাণ দিয়া রক্ষা করিব',—এই মনোবৃত্তির উদ্ভবের জন্য প্রত্যেক নাগরিকের বাল্যশিক্ষার কাল হইতে সকল বিষয়ে প্রচারকার্য্য চলিয়া থাকে। পাঠ্য পুস্তকে, স্কুলে কলেজে, খেলার মাঠে, রণশিক্ষাকালে, রণক্ষেত্রে, গৃহে মাতাপিতার নিকটে, ক্লাবের জীবনে, হোটেলে, পথঘাটে, সর্ব্বত্র এই সাম্রাজ্যগর্ব্বের প্রচারকার্য্য অজ্ঞাতসারে চলিয়া থাকে। ইহার প্রভাব হইতে কেহ মুক্ত নহে। এই হেতু Capitalism ও Imperialism ওতঃপ্রোতভাবে বিজড়িত। রাডিয়ার্ড কিপলিং শ্রেণীর লেখক এই সাম্রাজ্যিকতা সুন্দররূপে জাগাইয়া রাখিয়াছে।

সুতরাং যখন লেলিনের বলশেভিক মন্ত্র প্রচারিত হইল, তখন জগতের যাবৎ Capitalist ও Imperialist শক্তি আতঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। রাসিয়ায় জনগত আন্দোলন দমন করিবার জন্য কোলচাক, কেরেনস্কি, র‍্যাঙ্গেল,—কত কি বিরুদ্ধ শক্তিকে দাঁড়

করান হইল। কিন্তু Imperialistদের দুর্ভাগ্য বশতঃ লেনীনের মন্ত্র মরিল না, উহা রক্তবীজের মত এক কোঁটা হইতে সহস্র কোঁটা হইয়া দেখা দিল। তখন হইতে উহার বিরুদ্ধে রীতিমত প্রচারকার্য্য আরম্ভ হইল। বলশেভিকরা যে নররাক্ষস, রাসিয়ায় যে তাহারা মানুষ মারিয়া খায়, রাসিয়ায় যে আইন-কানুন লোপ পাইয়াছে, সেখানে যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেছে,—ধনীর আর ধন থাকে
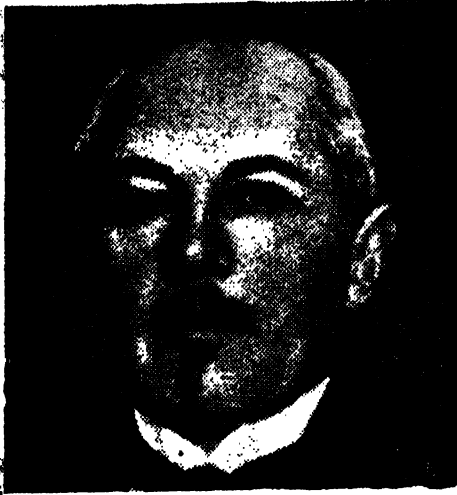
বৃটেনস্থিত সোভিয়েট রাসিয়ার বাণিজ্য এজেন্ট মঃ খিনচুক

না, নারীর আর সতীত্ব থাকে না, গৃহস্থের আর ঘরসংসার থাকে না, ব্যবসায়ীর আর ব্যবসায়বাণিজ্য থাকে না, পুরোহিতের আর ধর্ম্ম থাকে না,—সব ওলটপালোট হইয়া রাসিয়ায় তাণ্ডবলীলা আরম্ভ হইয়াছে আর তাহার প্রভাবে আশপাশের দেশগুলাও বুঝি উৎসন্ন যায়। বলশেভিক কম্যুনিষ্টদিগকে Red অথবা রক্তরঞ্জিত আখ্যা দেওয়া হইল। যেন উহারা সর্ব্বদা রক্ত মাখিয়াই আছে! জগৎ যাহাতে উহাদের প্রভাব হইতে দূরে থাকে, তাহার জন্য Imperialist জাতিদিগের খবরের কারখানায় অনবরত খবর manufacture হইতে লাগিল। সে প্রচারকার্য্যের তুলনা জগতে নাই। ফলে সত্যই এমনই হইল যে, জগতের অধিকাংশ লোকই বলশেভিকদিগকে নররাক্ষস বলিয়া মনে করিতে লাগিল। য়ুরোপের 'সভ্য' সমাজ হইতে বলশেভিক রাসিয়ার নাম কাটিয়া দেওয়া হইল, রাসিয়া য়ুরোপে 'একঘরে' হইয়া রহিল। এমন কি, রাসিয়ার সহিত ভাবের আদান-প্রদান করা দূরে থাক, ব্যবসায় বাণিজ্য করাও একরূপ নিষিদ্ধ হইল। রাসিয়া য়ুরোপের 'পারিয়া'রূপে পরিগণিত হইল।

কিন্তু 'মরিয়াও রাম মরিল না,' বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতে লাগিল। সে য়ুরোপের শত্রুতায় বিরক্ত হইয়া য়ুরোপকে বর্জ্জন করিয়া এসিয়াকে আপনার জন বলিয়া আলিঙ্গন করিতে বাহু প্রসারণ করিল। প্রথমে প্রাচ্য বিস্মিত হইল, কিন্তু পরে রাসিয়ার যথার্থ সদুদ্দেশ্য বুঝিয়া সেই বাহু সাদরে গ্রহণ করিল। প্রাচ্যে ও রাসিয়ায় তখন যে বিরাট মিলন হইল, তাহাতে য়ুরোপের Imperialist দিগের প্লীহা চমকিত হইল, তখন তাহারা একে একে রাসিয়ার সহিত বাণিজ্যসম্বন্ধ স্থাপন করিতে অগ্রসর হইল; বাণিজ্যসম্বন্ধ হইতে রাজনীতিক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইতে অধিক দিন লাগিল না। কিন্তু এ মিলনে আন্তরিকতা ছিল না। মূল যাহার স্বার্থ, তাহাতে আন্তরিকতা থাকিতে পারে না। সুতরাং শীঘ্রই আবার এ মিলনে বাধা পড়িল।

যখন বলশেভিক রাসিয়া মহাচীনে জার-শাসিত রাসিয়ার সমস্ত বিশেষ অধিকার ছাড়িয়া দিয়া সমকক্ষরূপে, প্রকৃত বন্ধুরূপে চীনের দিকে প্রীতির হস্ত প্রসারণ করিয়া দিল, তখন বিস্ময়ে জগৎ স্তম্ভিত হইল। প্রাচ্যের বিস্ময়,—গর্ব্বিত প্রতীচ্য এই প্রথম সমকক্ষরূপে প্রাচ্যকে গ্রহণ করিল। প্রতীচ্যের বিস্ময় ও ক্রোধ,—সর্ব্বনাশ! গেল ইজ্জৎ, গেল মান! প্রতীচ্যের শ্বেতজাতি জগতে শ্রেষ্ঠ, আর সব নিকৃষ্ট। শ্রেষ্ঠকে নিকৃষ্ট এত দিন ভয় করিয়া চলিয়া আসিয়াছে, আজ সে ভয় ভাঙ্গিল! কোথাকার অর্ব্বাচীন, এই রাসিয়া? কেবল কি ইজ্জৎ, কেবল কি মান? ভয় দেখাইয়া এত দিন প্রাচ্যে যে সকল অন্যায় অধিকার উপভোগ করিয়া আসা হইতেছে, তাহা বুঝি যায়! এই অর্ব্বাচীন রাসিয়ার অবিমৃষ্যকারিতার ফলে এত কালের একচেটিয়া স্বার্থ ও বিশেষ অধিকার বুঝি হস্তচ্যুত হয়! হংকং, সাংহাই হ্যাঙ্কো, হ্যানকিং, ক্যাণ্টন,—সকল স্থান হইতে ধনী ব্যবসায়ী বিদেশী Imperialist তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, রাসিয়া—Red Russia, কম্যুনিষ্ট রাসিয়া, বলশেভিক রাসিয়া যত অনিষ্টের মূল। উহারাই ক্যাণ্টনের কুওমিণ্টাঙ্গকে Red কম্যুনিষ্টে পরিণত করিতেছে, নিকৃষ্ট প্রাচ্য চীন আজ শ্রেষ্ঠ পাশ্চাত্য য়ুরোপীয়ের সহিত সমান অধিকার চাহিতে স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিতেছে, চীনদেশ হইতে য়ুরোপীয়ের বিশেষ অধিকার দূর করিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছে, চীনের আইনে, চীনের আদালতে য়ুরোপীয়ের ও চীনার সমান বিচার হইবে বলিয়া স্থির করিতেছে। বাহুবলদৃপ্ত সাম্রাজ্যমদগর্ব্বিত য়ুরোপের শক্তিপুঞ্জের পক্ষে ইহা অসহ্য হইল। সাম্রাজ্যগর্ব্বী (Imperialist) দের মধ্যে ইংরাজ অগ্রণী, বড়দাদা; তাহার পর মেজদাদা সেজদাদা, ছোটদাদা আছেন, যথা,—ফরাসী, ইটালী, জাপ, মার্কিণ। এই কয় ভ্রাতার মধ্যে বড়দাদার স্বার্থ চীনে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, সেখানে তাঁহার ব্যবসাবাণিজ্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক—তাহার পরিমাণ কোটি কোটি টাকা। তাহার উপর চীনে সহর বন্দর গঠনে, কলকারখানা প্রতিষ্ঠায়, রেল-ষ্টীমারে,—নানা বাবদে তিনি কোটি কোটি টাকা ফেলিয়াছেন।
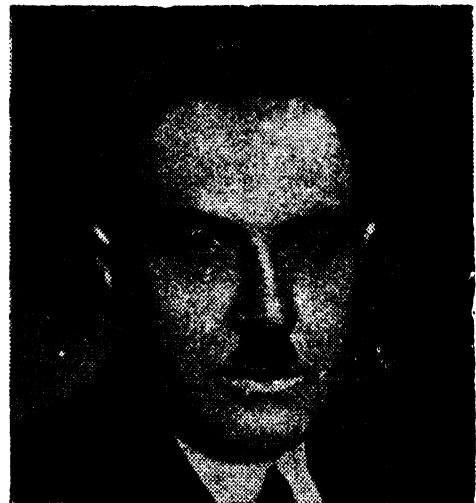
সোভিয়েট রাসিয়ার বৈদেশিক সেক্রেটারী মঃ রোসেনগল্‌জ্‌

...বার চূড়ার উপর ময়ূরপাখা, তাঁহার ভারতে জমীদারী। তাঁহার ...ত্বের উপর প্রাচ্যের এই জমীদারী নির্ভর করিতেছে। যদি চীনে ...ড়ে যায়, তাহা হইলে সমগ্র প্রাচ্যদেশে যাইবে,—এই আশঙ্কাই ...হাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে।

এখন পাঠক বুঝিলেন, কেন Imperial বৃটেনের সহিত Bolshevic কম্যুনিষ্ট রাশিয়ার মনোবাদ? চীনের ক্যাণ্টন কুওমিণ্টাঙ্গ বা জাতীয় দল যখন উত্তর-চীনের দস্যুসর্দারগণের বিপক্ষে জয়যাত্রা করে, তখন হইতেই এই হেতু Imperialist জাতিরা চীৎকার করিতেছে, সর্বনাশ হইল, চীনও রাশিয়ার মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া বুঝি Red হইয়া গেল, ক্যাণ্টনের রাশিয়ান মাইকেল বোরোডিন চীনের সর্বনাশ করিল, ইত্যাদি। দক্ষিণ চীন যতই জয়লাভ করিতেছে, ততই এই চীৎকার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, পরন্তু রটিত হইতেছে যে, রাশিয়ান আদালতে বিচার হউক।" চাঙ্গ সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। কোমরে বল না থাকিলে যে চাঙ্গ রাশিয়ার বিপক্ষে এরূপ করিতেন না, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার পশ্চাতে অনেক গুপ্ত বল ছিল, তাহা সকলেই বুঝিল। রাশিয়া প্রতিবাদ করিলেন বটে, কিন্তু ততোধিক ভয় প্রদর্শন করিলেন না। Imperialist দলের কাগজ-ওয়ালারা টিট্‌কারী দিতে লাগিল, রাশিয়া মুখে গর্জ্জন করে বটে, কিন্তু কাযে বর্ষণ করে না! অর্থাৎ তাঁহাদের ইচ্ছা, যেন তেন প্রকারেণ রাশিয়াকে রণাঙ্গনে নামান। তাহা হইলেই তাঁহাদের মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। কেন না, তাহা হইলেই জগতের তাবৎ Imperialist শক্তিরা বক্সার যুদ্ধকালের ন্যায় একযোগে চীনের আসরে নামিয়া চীন ও রাশিয়াকে একসঙ্গে চূর্ণ করিয়া দেয়, আর তাহা হইলেই আরও কিছু কাল Imperialist এর রাজত্ব চলে। কিন্তু রাশিয়া এ ফাঁদে পা

আর্কস কার্য্যালয়ে খানাতল্লাসীকালে দ্বারে পুলিস প্রহরী

বলশেভিকরা জগতের সর্বত্র চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র করিয়া বিপ্লব ঘটাইবার চেষ্টা করিতেছে। বিশেষতঃ ইংরাজের মন্ত্রিমণ্ডলের মধ্যে কেহ কেহ ক্রমাগত বক্তৃতা দ্বারা বুঝাইতে লাগিলেন যে, রাশিয়ান বলশেভিকরা ইংরাজ সাম্রাজ্যের উচ্ছেদসাধনের জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছে।

ইহার পরেই উত্তর চীনের সামরিক নেতা চাঙ্গ-সো-লিনের আদেশে অল্প কয় জন রাশিয়ানের সহিত মিসেস্ বোরোডিন ধৃত হইলেন। তাঁহারা জাহাজে হাঙ্কো হইতে মাঞ্চুরিয়া এবং তথা হইতে রাশিয়ায় যাইতেছিলেন। তাঁহাদিগকে ধরিয়া আটক করিয়া রাখা হইল। রাশিয়ানদের বিচার হইল, কাহারও বিচারে প্রাণদণ্ড হইল, কাহারও কারাদণ্ড হইল, মিসেস্ বোরোডিন বন্দিনী হইলেন। রাশিয়ান কর্তৃপক্ষ ইহার বিরুদ্ধে পিকিং সরকারের নিকট তীব্র প্রতিবাদ করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু কোনও ফল হইল না, বরং চাঙ্গ-সো-লিন উদ্ধত স্বরে জবাব দিলেন, যাহারা ষড়যন্ত্রকারী, তাহাদের ষড়যন্ত্রের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, সুতরাং দণ্ড হইয়াছে। রাশিয়া বলিলেন, "বেশ, নিরপেক্ষ দিল না। রাশিয়ার বর্ত্তমান রাজনীতিকরা যে বিলক্ষণ ধীমান, বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ, তাহা এই ব্যাপারেই প্রমাণ হইল। তাঁহারা হঠাৎ ক্রোধভরে যুদ্ধে নামিয়া উদীয়মান মুক্তিকামী চীনের জয়যাত্রার পথে বিঘ্ন ঘটাইতে চাহিলেন না। এ বিষয়ে তাঁহারা ইংরাজ ও অন্যান্য Imperialist জাতির রাজনীতিকগণকে রাজনীতি-বিদ্যায় পরাস্ত করিলেন। ইহাও Imperialistদের রাশিয়ার উপর ক্রোধের অন্যতম কারণ।

এ কাণ্ডের এইখানেই যবনিকাপাত হইল না। হঠাৎ চাঙ্গ-সো-লিন পিকিংয়ের রাশিয়ান দূতাবাস-সংলগ্ন কয়েকটা গৃহ ঘিরিয়া খানাতল্লাসী করিলেন এবং বিস্তর চীনা ও রাশিয়ানকে গ্রেপ্তার করিলেন, আর গাড়ী গাড়ী দলিল-দস্তাবেজ ও গুপ্ত পত্র তথায় আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। অমনই পৃথিবীর চারিদিকে রটিল যে, পিকিংয়ে রাশিয়ান বলশেভিকদের এক প্রকাণ্ড ষড়যন্ত্র ধরা পড়িয়াছে; উহাতে এমন সব কাগজ-পত্র পাওয়া গিয়াছে, যাহাতে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, 'রাশিয়া চীনের কম্যুনিষ্ট-

দিগকে সমস্ত বিদেশীর ধন প্রাণ হরণ করিতে উত্তেজিত করিতেছে। অমনই ধৃত কয়েকজন চীনা ও রাসিয়ানের বিচার ও দণ্ড হইল। রাসিয়ান কর্তৃপক্ষ এ ক্ষেত্রেও নিরপেক্ষ তদন্ত চাহিলেন, তীব্র প্রতিবাদ করিলেন, কিন্তু তাহার অধিক কিছুই করিলেন না। তাঁহারা কেবল নিরপেক্ষ জাতিসমূহের দ্বারে জানাইয়া রাখিলেন, Imperialistদের পরামর্শে তাঁহাদের প্রজার উপর অযথা অত্যাচার হইতেছে। Imperialist সংবাদপত্ররা যাহা চাহিতেছিল, তাহা হইল না, রাসিয়া চীনে যুদ্ধ ঘোষণা করিল না, কাযেই ক্ষোভে রোষে তাহারা রাসিয়াকে কাপুরুষ বলিয়া গালি পাড়িতে লাগিল। রাসিয়া এ ক্ষেত্রেও শ্রেষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিলেন, তাঁহাদের উপর জগতের নিরপেক্ষ জাতি মাত্রেরই শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হইল, তাঁহারা যে নররাক্ষস নহেন, তাহা প্রতিপন্ন হইয়া গেল।

কর্ম্মচারীদিগের নিকট আমাদের এমন একখানি দলিল লুক্কায়িত আছে, যাহা পাইলে অন্যান্য শক্তি বিলক্ষণ লাভবান হইতে পারে, আমাদের বিশেষ ক্ষতি হইতে পারে। সে দলিলখানি আমাদের রাজার গভর্ণমেণ্টের, উহাতে সেই ছাপ অঙ্কিত আছে, উহা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাজার সরকারী কর্ম্মচারী ব্যতীত কাহারও দখলে থাকিবার কথা নহে। এই দলিলখানি অন্য লোক চুরি করিবার চেষ্টা করিতেছে, এ খবর আমরা পাইয়াছিলাম। খবর পাইয়া আমি প্রধান মন্ত্রী ও পররাষ্ট্র সচিবের সহিত পরামর্শ করিয়া আর্কস কোম্পানীর কার্য্যালয় খানাতল্লাসী করিবার আদেশ দিই। খানাতল্লাসী করিয়া ঠিক সেই দলিল খানি পাওয়া যায় নাই বটে, তবে অন্যান্য এমন অনেক গুপ্ত দলিল দস্তাবেজ পাওয়া গিয়াছে, যাহার জোরে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা আইনসঙ্গত হইয়াছে।"

খানাতল্লাসীরকালে যাহারা আর্কাস কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইয়াছিল, একজন পুলিস কর্ম্মচারী তাহাদিগকে প্রশ্ন করিতেছে

কিন্তু Imperialist মতাবলম্বীরা তৃপ্তি পাইল না। এই মতাবলম্বী শক্তিপুঞ্জের দেশে বলশেভিক ষড়যন্ত্রের উৎস খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা চলিল। ফ্রান্সে, ইটালীতে, জাপানে এবং বৃটেনে নিত্য বলশেভিক ষড়যন্ত্রের সংবাদ প্রকাশ পাইতে লাগিল। ফ্রান্সে ও জাপানে বলশেভিক (কম্যুনিষ্ট) বহিষ্কার চলিতে লাগিল। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বড় দরের আবিষ্কার হইল বৃটেনে। সেখানে বলডুইন টোরি গভর্ণমেণ্ট যে বেড়াজাল পাতিলেন, তাহাতে প্রকাণ্ড দেড়মণি বলশেভিক কাতলা গ্রেপ্তার হইল।

১৩ই পার্লামেণ্টের কমন্স সভায় স্বরাষ্ট্র-সচিব সার উইলিয়ম জয়েনসন হিকস কাতলা গ্রেপ্তারের বিবরণ দাখিল করিবার সময় বলেন যে,—"আমরা খবর পাইয়াছিলাম, আর্কস লিমিটেড কোম্পানীর কার্য্যালয়ের

এই সংবাদে বিলাতে হুলস্থুল পড়িয়া যায়। তাহার বর্ণনা এ স্থলে নিষ্প্রয়োজন। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই আবিষ্কারের ফলে রাসিয়ার সহিত বৃটেনের রাজনৈতিক সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিবার কথা উঠে। সে সম্বন্ধে পার্লামেণ্টে ঘোর তর্ক-বিতর্ক হয়। শ্রমিক সদস্যরা রাসিয়ার সহিত বাণিজ্য চুক্তি (Tade Agreement) এবং রাজনৈতিক সম্বন্ধ (Diplomatic relations) রদ করিবার প্রস্তাবের বিপক্ষে ঘোর আপত্তি উত্থাপন করেন। কিন্তু তাঁহাদের আপত্তি টিকিল না, ২ শত ৪৬ ভোটের জোরে কনজারভেটিবদের প্রস্তাব গৃহীত হইল। ফলে রাসিয়ার সহিত বাণিজ্য চুক্তি এবং রাজনৈতিক সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল।

তর্ক-বিতর্ককালে অনেক রহস্য প্রকাশ পাইয়াছে। সার উইলিয়ম

রেমেনসন হিকসকে যখন শ্রমিক সদস্যরা চাপিয়া ধরেন যে, "পুলিস যে অপহৃত দলিলের জন্য খানাতল্লাস করিতে গিয়াছিল, তাহা আর্কস লিমিটেড কোম্পানীর কার্য্যালয়ে ছিল এবং ঐ কার্য্যালয় রাসিয়ান ট্রেড ডেলিগেশানের সহিত একই ইমারতে অধিষ্ঠিত, এ কথা সত্য, কিন্তু সেই দলিল কি পাওয়া গিয়াছে?" তখন সার উইলিয়াম বলেন যে, "না, দলিলখানা পাওয়া যায় নাই বটে, তবে উহার একখানা ফটো-কাপি ঐ স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে, ঐখানা আমার কাছে আছে।"

কথাটা কেমন কেমন বোধ হওয়ায় লিবারল দলের মিঃ লয়েড জর্জ্জ এবং লেবার দলের মিঃ আর্থার পনসনবি প্রমুখ সদস্যরা নানারূপ বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণ করিয়াছিলেন। মিঃ লয়েড জর্জ্জ বলেন, "যদিই ধরা যায়, দলিলখানা রাসিয়ান সোভিয়েট সরকার সামরিক প্রয়োজনে চুরি (military espionage) করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও বলা যায়, এমন চুরি বৃটেনের বন্ধু আরও অনেক গভর্ণমেণ্ট করিয়া থাকেন। আমরাও কি এমন চুরি করি না? যদি আমাদের সমর-কার্য্যালয় (War Office) নৌ-কার্য্যালয় (Admiralty) এবং উড়োকল বিভাগ (Air Force) যে উপায়েই হউক, অন্যান্য দেশের সংবাদ সংগ্রহ না করিতে পারে, তাহা হইলে তাহারা এ দেশের রক্ষার বিষয়ে কর্ত্তব্যে অবহেলা করিতেছে বলিতে হইবে।"

শ্রমিক সদস্য মিঃ আর্থার পনসনবি আরও চমৎকার বলিয়াছেন,—"আমি নোংরা কাযের পক্ষপাতী নহি। কিন্তু নোংরা কায অপেক্ষা আমি ভণ্ডামীকে অধিক ঘৃণা করি। আমরা যে নেকামি করি, আমরা যুদ্ধের সময়ে এইভাবের নোংরা কায করি না, ইহাতে আমার পিত্ত চটিয়া যায়। যুদ্ধের সময় এ সকল 'চুরি-চাপাটির' কায যুদ্ধের অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয়। তোমরা মিথ্যা, প্রচারকার্য্য, শত্রুর অত্যাচারের কথা রটাইবার কারখানা, টেলিফোঁযোগে গড়াপেটা সংবাদ আদান-প্রদান, চিঠি খুলিয়া পড়া, জাল বিভাগ, মিথ্যা ফটোচিত্র তুলিবার বিভাগ এবং এইরূপ নানা নোংরা কাযের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাক, প্রত্যেক গভর্ণমেণ্টই করে। যখন আমরা বড় দরের নৈতিক ও ধার্ম্মিক সাজি, তখন আমাদের এটা মনে রাখা উচিত যে, জাল, জুয়াচুরী, মিথ্যা, চুরি, ঘুষ ইত্যাদি জগতের প্রত্যেক সরকারেরই প্রধান অস্ত্র। যুদ্ধের সময় এই অস্ত্র মহা মূল্যবান বলিয়া ইহা ব্যবহৃত হয়। শান্তির সময়েও এই অস্ত্র ব্যবহৃত হয়, তাহার কারণ, আগামী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইবার প্রয়োজনে ইহার ব্যবহার প্রয়োজন।"

বোধ হয়, যদি কনজারভেটিব মন্ত্রিমণ্ডলের হায়া থাকিত, তাহা হইলে ইহার পর তাঁহারা আর তর্কে অগ্রসর হইতেন না। কিন্তু বোধ হয় তাঁহাদের তাহাও নাই, তাই পররাষ্ট্র-সচিব সার অষ্টেন চেম্বারলেন ইহার পরেও মিঃ পনসনবিকে জিজ্ঞাসা করেন, "এ সকল কথার প্রমাণ কি?"

মিঃ পনসনবি তৎক্ষণাৎ মুখের উপর বলেন, "আমি যে সময়ে শ্রমিক সরকারের সহকারী পররাষ্ট্র-সচিব ছিলাম, তখন পররাজ্য হইতে আমাদের দ্বারা অপহৃত এমনই এক দলিল দেখিয়াছিলাম!"

এই সমস্ত ঘৃণাজনক বিষয়ের এই স্থানেই যবনিকাপাত করিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু কনজারভেটিব গভর্ণমেণ্টের ভণ্ডামী আর নেকামীর মুখোস আরও খুলিয়া দেওয়া আবশ্যক। জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময় লর্ড নর্থক্লিফ ও লর্ড রেডিং কোম্পানী জার্ম্মাণদের বিপক্ষে আমেরিকায় মিথ্যার কি কারখানা বানাইয়াছিলেন, তাহা কি কাহারও অবিদিত আছে? জার্ম্মাণরা মানুষের চর্ব্বির কারখানা বানাইয়াছে বলিয়া যে সংবাদ যুদ্ধের সময় রটিয়াছিল, তাহা যে মিথ্যা, তাহা কিছুদিন পূর্ব্বে যিনি মিথ্যা অপবাদ রটাইয়াছিলেন, সেই ইংরাজ সত্যবাদী স্বীকার করিয়াছেন। শত্রুর বিপক্ষে জাল জুয়াচুরী, চুরি, মিথ্যা যে 'অঙ্গের ভূষণ করিতে হয়, তাহা লর্ড হার্ডিঞ্জও তাঁহার কোনও প্রবন্ধে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি রাসিয়ায় ইংলণ্ডের দূতরূপে অবস্থানকালে রাসিয়ান রাজকর্ম্মচারীদিগকে ঘুষ দিয়া গুপ্ত সংবাদ ও ফটোগ্রাফ-আদি সংগ্রহ করিতেন, এ কথা প্রবন্ধে স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং মিঃ বলডুইন ও সার অষ্টেন যে রাসিয়ার ব্যাপারে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া 'ছ্যাঃ ছ্যাঃ' করিতেছেন, উহার বারো আনাই লোক-দেখানো বলিয়া মনে হওয়া আশ্চর্য্যের কথা নহে।

যাহা হউক, পার্লামেণ্ট এই মন্তব্য গ্রহণ করিবার পর বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বৃটেনস্থ রাসিয়ান প্রতিনিধি মুসিয়ে রোসেনগোলজকে সদলবলে বৃটেন ত্যাগ করিয়া যাইবার পত্র দিয়াছেন। সেই পত্রে বলা হইয়াছে যে, গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখে একবার সোভিয়েট সরকারকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হয়; কিন্তু এ বার বৃটেনের সহ্য করিবার সীমা অতিক্রান্ত হইয়াছে। সুতরাং এখন হইতে রাসিয়ার সহিত বৃটেনের বাণিজ্যচুক্তি এবং রাজনীতিক সম্বন্ধ ভঙ্গ হইল। তবে বৃটেন এইটুকু দয়া করিতেছেন যে, ইংরাজ ও রাসিয়ার বাণিজ্যে তাঁহারা হস্তক্ষেপ করিবেন না, অর্থাৎ সাধারণভাবে রাসিয়ান বণিকরা ইংলণ্ডে ব্যবসায়-বাণিজ্য করিতে পারে বটে, তবে তাহাদিগকে আর কোনওরূপ বিশেষ অধিকার দেওয়া হইবে না।

এখন দেখিতে হইবে, ইহাতে ক্ষতি কাহার অধিক। রাসিয়া যদি ইংলণ্ডের সহিত কোনও সম্বন্ধই রাখিতে না চাহে, যদি সাধারণ বাণিজ্যও তাহারা উঠাইয়া দেয়, তাহা হইলে কে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে? রাসিয়া ভারতের মত কাঁচা মালের আকর-ভূমি, সে অন্যান্য দেশকে পণ্যের উপকরণ কাঁচা মাল যোগান দেয়, এবং অন্যান্য দেশ হইতে পণ্য আমদানী করে। বৃটেনের সহিত এ বিষয়ে তাহাদের লেনদেনের কারবার খুব বড় রকমের। তাহার কাঁচা মাল খরিদ করিবার অনেক দেশ আছে, সেও অন্যান্য দেশ হইতে পণ্য আমদানি করিতে পারে। সুতরাং বৃটেনের সহিত বাণিজ্যসম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিলে তাহার বিশেষ ক্ষতি হইবে না। কিন্তু বৃটিশ পণ্য কাটাইবার একটা বাজার বৃটেনের হাতছাড়া হইবার সম্ভাবনা। তাহা হইলে বিলাতে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধিই হইবে। তখন? বিলাতের প্রজা ভারতের প্রজা নহে যে, খাইতে না পাইলেও অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া মরণের পথে ধীরে অগ্রসর হইবে। John Bull will carry his beef and beer even unto the gates of paradise, জনবুল স্বর্গের দ্বারে গেলেও সঙ্গে খাবার লইয়া যায়। সে তাহার সরকারের নিকট রুটি চাহিতে ছাড়িবে না। তখন কনজারভেটিভ গভর্ণমেণ্ট টিকিয়া থাকিবে ত?

বর্ত্তমান সোভিয়েট রাসিয়ার বাণিজ্য-ব্যবসায়ের পরিমাণ বড় অল্প নহে। সংপ্রতি জার্ম্মাণীর বার্লিন সহরে যে অর্থ-নৈতিক বৈঠক বসিয়াছিল, তাহাতে রাসিয়ান প্রতিনিধি মুসিয়ে অবোলেন্স্কি বলিয়াছেন,—"জার্ম্মাণ যুদ্ধের পূর্ব্বে রাসিয়ায় শ্রম-শিল্পজাত পণ্যের পরিমাণ যেরূপ ছিল, বর্ত্তমানে তাহার অপেক্ষা ন্যূন ত নহেই, বরং কোন কোন বিভাগে সে পরিমাণও ছাড়াইয়া গিয়াছে। কিন্তু বিদেশের সহিত রাসিয়ার পণ্যের আদানপ্রদানের পরিমাণ যুদ্ধের পূর্ব্বাবস্থার মত হয় নাই। ইহার মূল কারণ এই যে, ব্যবসায়ের বাজারে রাসিয়ার সুনাম (credit) এখনও তেমন হয় নাই। যুদ্ধের পূর্ব্বে জগতের ব্যবসায়-বাণিজ্যে রাসিয়ার অংশ ছিল শতকরা ৪ ভাগ, বর্ত্তমানে শতকরা ১|৹ ভাগের অধিক নহে। য়ুরোপ ও মার্কিণের ধনী মহাজনদের একচেটিয়া পণ্য উৎপাদনের এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য হস্তগত করিবার ফলে আজ ১ কোটি লোক বেকার বসিয়া আছে। পরন্তু উহার ফলে চীন ও রাসিয়া

ব্যবসায় জগতে একঘরে (economic boycott) হইয়া আছে। অথচ রাসিয়া ও চীনকে যদি আর্থিক স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তাহা হইলে ঐ দুই দেশের প্রচুর পণ্য জগতের অনেক বেকারের অন্ন-সংস্থানের উপায় বিধান করিতে পারে।"

যদিও বা অল্পে স্বল্পে শনৈঃ শনৈঃ রাসিয়াকে "জাতে" তুলিয়া লওয়া হইতেছিল, এইবার তাহাতেও বাধা পড়িল। ইহাতে ক্ষতি ইংরাজেরই অধিক হইবে। কনজারভেটিভ গভর্ণমেন্ট কেবলমাত্র রাসিয়ার উপর ক্রোধের বশে নিজদেশের সমূহ ক্ষতি করিলেন।

অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন যে, ইহা হইতে রাসিয়া ও বৃটেনের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হইবে; কিন্তু লর্ড ব্যালফোর প্রমুখ রাজনীতিকের অভিমত এই যে ইহাতে যুদ্ধের আশঙ্কা নাই। রাসিয়া ও বৃটেন নিজ নিজ স্বার্থের কথা বিস্মৃত হইবে না; সুতরাং রাজনীতিক সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলেও এবং বাণিজ্যচুক্তি তুলিয়া দিলেও উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্যের আদানপ্রদান বন্ধ হইবে না; কারণ সে বাণিজ্যে উভয়েই লাভবান্ হইবে। যুদ্ধ যে বাধিবে না, রাসিয়ান রাজনীতিক কর্তৃপক্ষের ভাবগতিক দেখিয়া বলা যায়। তাঁহারা এ যাবৎ নানারূপে উত্যক্ত হইয়াও অসাধারণ ধৈর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন। সাম্রাজ্যগর্ব্বীদিগের নানা টিটকারীতেও তাঁহারা বিচলিত হয়েন নাই। তাঁহারা রক্তলোলুপ অরাজকতাপ্রিয় সমাজধ্বংসী হইলে এতদিন কবে ধরা নররক্তে রঞ্জিত হইত—বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়া যাইত। বৃটেন তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিলেও তাঁহারা ধীরভাবে সে আঘাত সহ্য করিয়াছেন। উচ্চপদস্থ রাসিয়ান রাজপুরুষরা বলিতেছেন, পূর্ব্বে "জিনোভিয়েফ" পত্র যে ভাবে জাল বলিয়া প্রমাণ হইয়াছিল, এ বারও নিরপেক্ষ তদন্ত হইলে ঐরূপ অনেক রহস্য প্রকাশ পাইবে। তাঁহারা বলিতেছেন, বর্ত্তমানে রাসিয়া গঠনকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। যাহাতে বিপ্লবের ধ্বংসস্তূপ হইতে নবীন রাসিয়া নূতন শক্তিতে দণ্ডায়মান হয়, তাহার জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করা হইতেছে। এ সময়ে এই ভাবের ষড়যন্ত্র—চক্রান্ত করা রাসিয়ার অভিপ্রেত বা কাম্য হইতে পারে না, যাহার ফলে তাহাদের ব্যবসায়-বাণিজ্যে ও গঠনকার্য্যে বিঘ্ন ঘটিতে পারে। রাসিয়া জগতের সকল নিপীড়িত জাতির বন্ধু, দরিদ্র মজুরের বন্ধু। তাই সে অনেকের চক্ষুশূল হইয়াছে। তাই তাহাকে নানারূপ চাপিয়া মারিবার চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু তাহাতেও রাসিয়া তাহার কর্ত্তব্যপথ হইতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবে না।

রাসিয়ার পররাষ্ট্র সচিব মুসিয়ে লিটভিনফ মস্কো সহরে সংবাদপত্র প্রতিনিধিগণকে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, "পিকিংয়ের রাসিয়ান দূতাবাস হইতে যে গাড়ী গাড়ী গুপ্ত ষড়যন্ত্রের কাগজ 'আবিষ্কার' করা হইয়াছে, তাহা বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই শ্বেত রাসিয়ানরা (অর্থাৎ সোভিয়েটের শত্রু রাজভক্ত রাসিয়ানরা) প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে এবং চাঙ্গসোলিন বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী ধনী ব্যবসাদারদের নিকট বিস্তর অর্থ পাইয়া শ্বেত রাসিয়ানদের সহায়তায় সেই সব কাগজপত্র 'আবিষ্কার' করিয়াছে। এইভাবে আমাদের বিপক্ষে প্রচারকার্য্য চলিতেছে।"

লিটভিনফের কথা সত্য হইলেও হইতে পারে, বিলাতের আর্কস কোম্পানীর ষড়যন্ত্রের কথা সত্য, কিন্তু এমনভাবের জাল-জুয়াচুরী ও চুরী যে সকল দেশের দূতাবাসেই করা হয়, তাহা ত ইংরাজপক্ষেরই লোক স্বীকার করিয়াছেন। তবে রাসিয়াই কি কেবল চোর-দায়ে ধরা পড়িল? যাহাই হউক, এই ব্যাপারের এই খানেই ইতি হইলে মঙ্গল। কিন্তু ইহা হইতে যদি ইংরাজ ও রাসিয়ার মনোমালিন্য আরও অধিক বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে অচির ভবিষ্যতে জগতে কালানল জ্বলিবার সম্ভাবনা।

অভিজ্ঞান

তর্কেরও দেখি রয়েছ বাহিরে,
যুক্তিরও দেখি বাহিরে তুমি;
বিজ্ঞানো দেখি সাজিল অবোধ,
পাইল না খুঁজি তোমারে স্বামী!
দর্শনও তব পেল না দর্শন;
বেদান্ত, সাঙ্খ্য সূক্ষ্মতত্ত্বে—
রহিয়াছ তুমি অনন্ত, অজ্ঞেয়,
(তারা) পড়িল তর্ক-ঘূর্ণাবর্ত্তে।
জটিল হইতে জটিলতর
যুক্তিপূর্ণ নিঃস্ব তথ্যে
পেল না তোমায়;—করিল আরও যে
জটিল তোমায় মহান্ সত্যে।

ভেদি' সে দীর্ঘ জটিলতা-জাল
তর্ক-শাস্ত্র তীব্র বেগে,
হইয়ে ব্যর্থ আসিল ফিরিয়া,
নারিল যাইতে তোমারি আগে!
তর্ক, বিজ্ঞান, দর্শন আদি
মরুক্ যুঝিয়া অযুত বর্ষ,
তথাপি নারিবে ধরিতে তোমার
গন্ধ, রূপ, রস অথবা স্পর্শ।
এই বিশ্বমাঝে তোমারি সত্তা
এ-হেন নিবিড় কুহেলি-ভরা,
ভক্তি আর প্রেমে মানস-নয়নে
প্রভু শুধু তুমি পড় হে ধরা!

শ্রীমতী হেমনলিনী দেবী।

নারীর প্রতিভা

মিস্ এল্. ওয়াই, পাল্মেন নাম্নী কোনও রুশীয় নারী রুস সরকারের জন্য বিমান-পোতের উপযোগী এক প্রকার

মিস পাল্মেন—অভিনব মোটর-উদ্ভাবনকারিণী

মোটর উদ্ভাবন করিয়াছেন। এই মোটর-এঞ্জিনের গতি-বেগ ২০ ঘোড়ার শক্তিবিশিষ্ট। রুস-কর্ত্তৃপক্ষ এই মোটরের উপকারিতা বুঝিতে পারিয়া উদ্ভাবনকারিণী নারীকে উপযুক্ত রূপ পারিশ্রমিক ও পুরস্কার দিয়াছেন। বর্ত্তমানে মিস পাল্মেন রুসগবর্ণমেণ্টে স্থায়ী ভাবে এঞ্জিনিয়ার বিভাগে কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার এই সাফল্যে নারী-সমাজ নিশ্চিতই গর্ব্বানুভব করিবেন।

উচ্চতম হাঁসপাতাল

হডসন্ নদের তীরে নিউইয়র্ক নগরে একটি ২২ তলা অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে, হাঁসপাতালের কার্য্যের জন্যই এই-

সর্ব্বোচ্চ হাঁসপাতাল
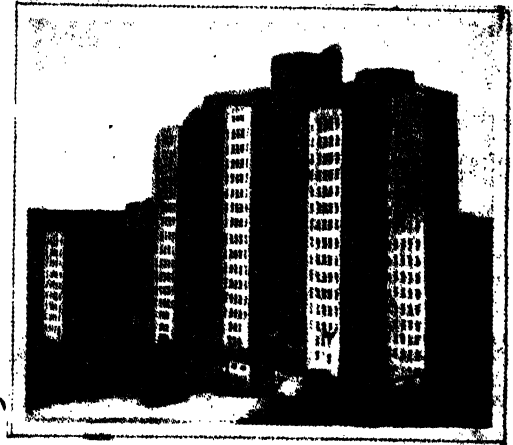
রূপ সুউচ্চ প্রসাদোপম অট্টালিকা বিরচিত হইয়াছে। প্রত্যেক তলায় রোগীদিগের যাবতীয় ব্যবহার্য্য তৈজসপত্র, ঔষধ পথ্য, চিকিৎসক প্রভৃতির সুবন্দোবস্ত আছে; অর্থাৎ ২২ তলা অট্টালিকার প্রত্যেক তলাই স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। এই হাঁসপাতালের নির্ম্মাণকার্য্য এখনও সমাপ্ত হয় নাই। সকল ব্যবস্থা শেষ হইলে সম্ভবতঃ পৃথিবীর মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হাঁসপাতাল বলিয়া গণ্য হইবে।

তৃণনির্ম্মিত সুদৃঢ় নৌকা

রটারডামে "ক্যালিষ্টো" নামক ষ্টীমারে তৃণনির্ম্মিত জীবনরক্ষক তরণী ব্যবহৃত হইতেছে। সোলা ও তৃণের

তৃণ ও সোলা-বিনির্ম্মিত নৌকা
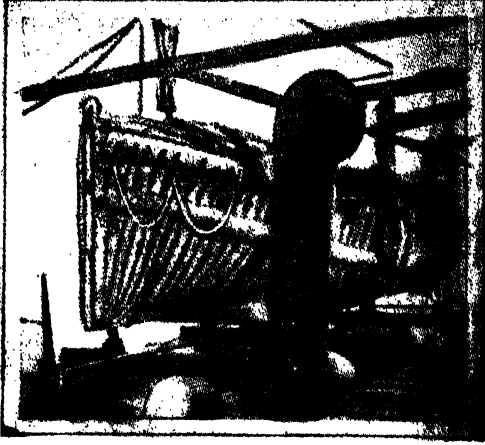
সাহায্যে এই তরণীগুলি নির্ম্মিত হইয়াছে। লঘুভার ও সুদৃঢ় এই তরণীগুলি জলে ডুবিবার সম্ভবনাবিরহিত এবং কোনও কঠিন পদার্থে প্রতিহত হইলে ইহাদের কোনও অনিষ্ট হয় না। এইরূপ নৌকায় চড়িয়া আরোহীরা বিপদ্ হইতে নিরাপদে উত্তীর্ণ হইতে পারে।

বিজ্ঞানের বাহাদুরী

মেসাচুসেট্‌স্‌এর জনৈক উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্ বৈজ্ঞানিকপ্রণালীতে দীর্ঘকাল পরীক্ষার পর পাতি বা কাগজী জাতীয় লেবুর

বৃহদাকার লেবু

বিশেষ উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন। ঘরের মধ্যে টবের গাছে তিনি প্রায় ১ সের হইতে ২ সের ওজনের এই জাতীয় লেবু উৎপাদন করিয়াছেন। ফলের সংখ্যাও কম হয় নাই। নানা প্রকার গবেষণা ও পরিশ্রমের পর দীর্ঘকাল পরে তিনি এইরূপ সাফল্যলাভ করিয়াছেন। কি প্রণালীতে ক্ষুদ্র বৃক্ষের ক্ষুদ্রজাতীয় ফলকে তিনি এমন বৃহৎ আকার দান করিতে পারিয়াছেন, তাহা এই বৈজ্ঞানিক এখনও সাধারণে প্রকাশ করেন নাই।

চূড়ান্ত ফ্যাসন

বিলাসিনীর বস্ত্রে শিল্পী রঙ্গ ফলাইতেছে

বর্ণবৈচিত্র্যবহুল বস্ত্র এখন মার্কিণ বিলাসিনীদিগের মনোহরণ করিতে পারিতেছে না। এ জন্য অধুনা ভেল-ভেট গাউনের উপর শিল্পীরা বর্ণ ও তুলিকার সাহায্যে নানা-বিধ বর্ণরাগ ফুটাইয়া তুলিতেছে। এই বর্ণানুলেপ অতি অল্প সময়ের মধ্যে শুকাইয়া যায় এবং দীর্ঘকালস্থায়ী হইয়া থাকে। মার্কিণ বিলাসিনীরা এখন সখ মিটাইবার জন্য এই বিচিত্র পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন।

অভিনব কাফে গৃহ

আমেরিকায় লস্ এঞ্জেলেসে অভিনব আকৃতিবিশিষ্ট একটি কাফেখানা নির্ম্মিত হইয়াছে। ডার্ব্বি টুপীর আকারে এই
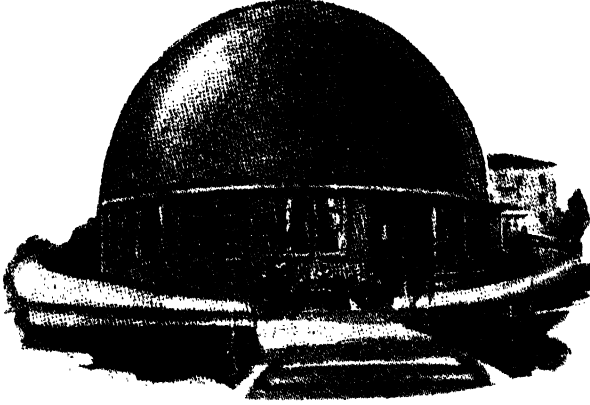
গোলাকার কাফিখানা

পানালয় বিনির্ম্মিত। এই গোলাকার গৃহ বিচিত্রদর্শন হেতু দর্শকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে এবং গৃহমধ্যে আরামদায়ক বসিবার আসনের সংখ্যাবৃদ্ধিরও অনুকূল। আলো বাতাসের সুবিধাও এইরূপ গৃহে অধিক পাওয়া যায়।

অস্ত্রোপচারে সঙ্গীত

আমেরিকার কোন কোন হাঁসপাতালে চিকিৎসকগণ অস্ত্রোপচারের সময় রোগীকে সঙ্গীত শুনাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহাতে না কি রোগীর অস্ত্রোপচারযন্ত্রণা বহুলাংশে হ্রাস পাইয়া থাকে। দুরবর্ত্তী কক্ষে গ্রামোফোন প্রভৃতি

অস্ত্রোপচারে সঙ্গীত

রাখিয়া রোগীর মস্তকে বিশেষভাবে নির্ম্মিত শব্দবহ যন্ত্র সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হয়। অস্ত্রোপচারের সময় রোগীর কর্ণে সুমধুর সঙ্গীত-তরঙ্গ প্রবেশ করে, অথচ চিকিৎসক বা তাঁহার সহকারিগণ সে শব্দ শুনিতে পান না। সুতরাং তাঁহারা নিবিষ্টমনে অস্ত্রোপচার করিতে পারেন এবং রোগীও সঙ্গীত-তরঙ্গে মনকে ভাসাইয়া দেয়। সে সময় সাধারণ অস্ত্রোপচারের যন্ত্রণা রোগী তেমনভাবে অনুভব করিতে পারে না।

অভিনব মোটর দ্বিচক্রযান

আমেরিকার পুলিস বিভাগের জন্য একপ্রকার মোটর দ্বিচক্রযান নির্ম্মিত হইয়াছে। উহার পার্শ্বে একখানি
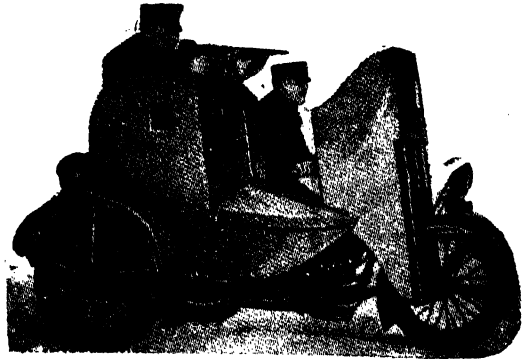
পুলিসের গতিশীল দুর্গ—বর্ম্মাবৃত মোটর দ্বিচক্রযান

গাড়ী সংলগ্ন। চক্রপরিচালকের সম্মুখভাগ সুরক্ষিত, পার্শ্বস্থ গাড়ীখানিও বর্ম্মাবৃত। দস্যুতস্কর গুলী ছুড়িয়া বা অন্য-বিধ অস্ত্রের দ্বারা যাহাতে চালক ও পার্শ্বস্থ গাড়ীর আরোহীকে কোনমতে সহসা আক্রমণ করিতে না পারে, এমনই ভাবে এই অভিনব দ্বিচক্রযানকে সুরক্ষিত করা হইয়াছে। পার্শ্বস্থ গাড়ীর মধ্যে যে পুলিসপ্রহরী গুপ্তভাবে অবস্থান করিবে, সে ইচ্ছা মত ছোট কলের কামান বা বন্দুক ব্যবহার করিতে পারে। সভ্যতা ও বিজ্ঞানের উৎকর্ষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য দেশে যেরূপ দ্রুতগতিতে বৈজ্ঞানিক অপরাধীর সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহাতে এই শ্রেণীর মোটর দ্বিচক্রযান পুলিসের পক্ষে অপরিহার্য্য।

'এক্স-রে'র শক্তি

মার্কিণ বৈজ্ঞানিকগণ 'এক্স-রে' সাহায্যে অতি পৌরাণিক যুগের নানা অজ্ঞাত বিষয়ের আবিষ্ক্রিয়ায় মন দিয়াছেন। খৃষ্টজন্মের ২ শত বৎসর পূর্ব্বে চীনারা একপ্রকার ঢালাই লৌহ নির্ম্মাণ করিয়াছিল; তাহার প্রান্তদেশে আঘাত করিলে ব্রোঞ্জ-নির্ম্মিত ঘণ্টার ন্যায় শব্দ উত্থিত হইত; ঐ লৌহের নির্ম্মাণ-কৌশল 'এক্স-রে' সাহায্যে আবিষ্কৃত হইবার সম্ভাবনা। মিশরীয় মমিগুলি সম্প্রতি এক্স-রে সাহায্যে পরীক্ষিত হইতেছে। উপরের আচ্ছাদন না খুলিয়াও ভিতরের শবদেহ পরীক্ষা করা হইতেছে। অধুনা, ৪ হাজার বৎসর পূর্ব্বের জনৈক মিশরীয় রাজার শবদেহ এক্স-রে সাহায্যে

এক্স রে সাহায্যে মমিপরীক্ষা

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, বাতরোগে (গেঁটে বাত) তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। শবের আচ্ছাদন না খুলিয়াও জানিতে পারা গিয়াছে, অভ্যন্তরে কি কি মূল্যবান্ অলঙ্কার রহিয়াছে। এক্স-রে সাহায্যে বৈজ্ঞানিকগণ অতীত যুগের নানা রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া জগতের লোককে বিস্ময়-চকিত করিয়া তুলিবেন।

হস্তহীন চিত্রকর

কালিফোর্ণিয়ায় উইলিয়ম্ জোন্‌স নামক এক জন চিত্রকর আছেন। এই শিল্পীর হস্ত নাই। তিনি কৃত্রিম হস্তসাহায্যে

হস্তহীন চিত্রকর

নিসর্গ ও প্রতিমূর্ত্তি চিত্র রচনা করিয়া সাফল্যলাভ করিয়াছেন। প্রতিভা ও অধ্যবসায়ের এই দৃষ্টান্ত অনুকরণযোগ্য। মিঃ জোনসের চিত্রগুলি কলাবিদ্‌গণের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে।

চলন্ত বিদ্যালয়

কানাডার যে সকল অংশে বসতি অল্প—অধিবাসীর সংখ্যা কম, তথায় এখনও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু বালক-বালিকার লেখাপড়ার ব্যবস্থা ত করিতে হইবে।

চলন্ত বিদ্যালয়

কর্তৃপক্ষ এ জন্য রেল-গাড়ীর মধ্যে তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। গাড়ীর কক্ষমধ্যে বোর্ড, মানচিত্র এবং অন্যান্য সরঞ্জাম প্রচুর পরিমাণে থাকে। যে যে অংশে রেলপথ নির্ম্মিত হইয়াছে, তথায় এইরূপ গাড়ী প্রেরিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক গাড়ীতে শিক্ষক অবস্থান করেন। তাঁহারা স্থানীয় বালক-বালিকাদিগকে এই গাড়ীর মধ্যে বিদ্যাদান করেন। স্কুলগৃহ নির্ম্মিত না হওয়া পর্য্যন্ত এইরূপ ভাবেই দেশবাসীকে শিক্ষা দেওয়া চলিবে। ভারতবর্ষে এ সকল কথা যেন স্বপ্নের কাহিনীর মতই মনে হইবে।

পাশ্চাত্য অনুসন্ধিৎসা

কালিফোর্ণিয়া অঞ্চলের এক ব্যক্তি ঐতিহাসিক স্মৃতি-বিজড়িত ঘণ্টাসমূহ সংগ্রহ করিয়া রাখিতেছেন। ইহাতেই

ঘণ্টা-গৃহ

না কি তাঁহার পরম আনন্দ। শুধু আনন্দলাভই যে তাঁহার উদ্দেশ্য, তাহা নহে। যাঁহারা ঐতিহাসিক বিষয়ের গবেষণা করেন, এই সংগ্রহের দ্বারা তাঁহারাও উপকৃত হইবেন। উল্লিখিত ভদ্রলোক ঘণ্টা সংগ্রহ করিয়াই নিরস্ত হন নাই। সেই ঘণ্টার জন্ম তারিখ এবং তৎসংশ্লিষ্ট যাবতীয় কাহিনীও তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন। অনেকগুলি ঘণ্টা একটি বৃহদায়তন গম্বুজাকৃতি অট্টালিকায় তিনি সাজাইয়া রাখিয়াছেন। দর্শকগণ উহা দর্শন করিয়া ধন্য হইতেছেন।

এসকিমোগণের পিতৃভূমি

স্মিথসোনিয়ন ইনষ্টিটিউসনের সুপ্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিদ্ ডাক্তার এলেস্ হৃদলিকা (Dr. Ales Hrdlicka) আলস্কার উত্তর প্রান্ত পর্য্যটন ও পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, নূতন জগতের প্রথম ঔপনিবেশিকগণ পূর্ব্বে এসিয়া মহাদেশে বাস করিত। নানাবিধ তৈজসপত্র, হস্ত-নির্ম্মিত হাতীর দাঁতের দ্রব্য এবং অন্যান্য নিদর্শন মৃত্তিকা-নিম্ন হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহা পরীক্ষা করিলে নিশ্চিতই প্রতীয়মান হইবে যে, ১৫ হইতে ২০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে এসিয়াবাসাদিগের কোন একটি শাখা উত্তর আমেরিকা মহাদেশের অভিমুখে বসবাসের জন্য অগ্রসর হইয়াছিল, সম্ভবতঃ তখন এসিয়া ও উত্তর আমেরিকা স্থল-সেতু দ্বারা যুক্ত ছিল, অথবা উভয় মহাদেশের মধ্যে যে সামান্য জল-বিস্তার ছিল, তাহা অতিক্রম করা সে যুগের লোকের পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল না। আমেরিকবাসী ইণ্ডিয়ান ও এসিয়া-বাসী কোন কোন সম্প্রদায়ের শারীরিক গঠনের সৌসাদৃশ্য আছে। ইতঃপূর্ব্বে বৈজ্ঞানিকগণ প্রমাণ পাইয়াছেন যে, এসিয়াবাসীরা আলাস্কা দেশে বিগত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে উত্তর দিক্ দিয়া প্রবেশ করিয়াছিল। উল্লিখিত কারণসমূহ পর্য্যালোচনা করিয়া মার্কিণ বৈজ্ঞানিক স্থির করিয়াছেন যে, এসিয়া হইতে প্রকৃতই একদল লোক আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল।

পথিক

ওহে পথিক সাবধানেতে
চল তোমার পথে,
দেখে চল, ভুল কর' না
যেন কোন মতে।

পথের মাঝে, পথটি যদি
হারিয়ে তোমার যায়,
ভুলো নাক' ডাকতে তখন
হৃদয় দেবতায়।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

)

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

থিয়েটরে

রেবতীর আলয়ে আহারাদি সমারোহেই সম্পন্ন হইল। আহার যখন শেষ হইল, তখন বেলা ১টা বাজিয়াছে। রৌদ্রে কাঠ ফাটিয়া যাইতেছে। সেই স্থানেই মধ্যাহ্ন বিশ্রামের জন্য রেবতী বিপিন বাবুকে অনুরোধ জানাইয়াছিল, কিন্তু বিপিন বাবু কিছুতেই সম্মত হইলেন না। আজ সন্ধ্যার ডায়মণ্ড থিয়েটরে গিয়া তার চিন্তমণি-অভিনয় দেখিবেন, সান্ত্বনা স্বরূপ রেবতীকে এই কথা বলিয়া, হীরালালকে সঙ্গে লইয়া বেলা ২টার মধ্যে তিনি নিজ হোটেলে ফিরিয়া আসিলেন। বাহুল্য বস্ত্রাদি উন্মোচন করিয়া, বিশ্রামার্থ প্রস্তুত হইতে হইতে বলিলেন, "হীরুদা, আজকের দিনটা ত মাঠেই মারা গেল।"

হীরু বলিল, "কেন?"

"তোমার জন্যে মেস টেস কিছুই খোঁজা হ'ল না।"

হীরালাল শ্লেষভরে বলিল, "চল না, এখন বেরিয়ে পড়া যাক্।"

"না দাদা,—এখন আর শরীর বইবে না। তোমার রেবতীসুন্দরীর টেবলে বসে' বোম্বাইটি যা নেওয়া হয়েছে—এখন আর নড়বার শক্তি নেই। এখন একটু ঘুমানো বিশেষ দরকার।"

"ঘুমিয়ে উঠে?"

"ঘুমিয়ে উঠে হাত মুখ ধুতে কাপড় বদলাতে ত সন্ধ্যা হয়ে আস্‌বে। থিয়েটরে যাব রেবতীকে ব'লে এসেছি। কাল সকালে উঠে চা-টা খেয়েই দু'ভাইয়ে বেরিয়ে পড়বো—মেস একটা কাল ঠিক করে' ফেলতেই হবে;—কারণ, পশু আমি বাড়ী যেতে চাই।"

বাহিরে তখনও প্রবল রৌদ্র। জানালায় খড়খড়িগুলা বন্ধ করিয়া দিয়া, ঘর অন্ধকার করিয়া, পাখায় পূর্ণবেগ চড়াইয়া বিপিন বাবু শয়ন করিলেন। দশ মিনিট মধ্যেই তাঁহার নাক ডাকিতে সুরু করিল। হীরালালও কিয়ৎক্ষণ আপনার অদৃষ্ট চিন্তা করিতে করিতে, ক্রমে ঘুমাইয়া পড়িল।

বিপিন বাবু যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল। উভয়ের যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন দিনদেব অস্ত গিয়াছেন। চা-পানের পর মুখাদি প্রক্ষালন সমাধা করিতে সন্ধ্যার বাতি জ্বলিয়া উঠিল।

ট্রাঙ্ক হইতে ধৌত বস্ত্রাদি বাহির করিতে করিতে বিপিন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "ক'টায় ভাঙ্গবে হে?"

"এই—সাড়ে বারোটা আন্দাজ।"

বিপিন বাবু হোটেলের ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমরা থিয়েটরে যাচ্ছি; রাত একটার সময়, আমাদের দু'জনের খাবার যেন প্রস্তুত থাকে।"

"যে আজ্ঞে"—বলিয়া ভৃত্য প্রস্থান করিল।

শুনিয়া হীরালাল মনে মনে হাসিল। ভাবিল, "থিয়েটরের পর রেবতী পাছে আমায় ছোঁ মেরে নিয়ে যায়, এই হয়েছে ভায়ার ভয়।"

যথাসময়ে দুই জনে ডায়মণ্ড থিয়েটরে গিয়া উপনীত হইল। বিপিন বাবু একটা বক্স লইয়া, হীরালালের সহিত তথায় গিয়া বসিলেন। তখন "প্যাঁ-পোঁ" পুরা দমে চলিতেছে। বিপিন বাবু বলিলেন, "আচ্ছা, ওরা কি ক'রে জানতে পারে যে, ভিতরে সব প্রস্তুত, এইবার কনসার্ট থামাতে হবে?"

নবলব্ধ অভিজ্ঞতার ফলে হীরালাল উত্তর করিল, "ওদের সামনে ষ্টেজের গায়ে একটা বিদ্যুৎ বাতি রয়েছে দেখছ,—নিবে রয়েছে, এখন জ্বলছে না।"

"হাঁ দেখছি।"

মাছিক ছাইত্য !

। শিল্পী—শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

"সময় হ'লে, ওটা দপ্ ক'রে একবার জ্বলে উঠে' আবার নিবে যাবে। ঐটি হ'ল সঙ্কেত যে, এবার শেষ কর; ওরা তাড়াতাড়ি শেষ করবে, তখন ড্রপ উঠবে।"

"তাই বুঝি?"—বলিয়া বিপিন বাবু সেই বাতিটার পানে চাহিয়া রহিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই উহা দপ্ করিয়া একবার জ্বলিয়া উঠিল। ঐক্যতান বাদকরাও জলদে সুরু করিল। শীঘ্রই বাদন থামিয়া গেল। প্রেক্ষাগৃহ অন্ধকার হইল, ড্রপ উঠিল; অভিনয় আরম্ভ হইল।

বিপিনবাবু কঠিন কঠিন ভূমিকাগুলির অভিনয় অতি অভিনিবেশ সহকারে দেখিতে লাগিলেন। নিজ গ্রামে সখের দলের দ্বারা বিল্বমঙ্গল অভিনয় করানোর আকাঙ্ক্ষা তাঁহার চিত্তে জাগিয়া উঠিল রেবতীর চিন্তামণি দেখিয়া তিনি বিশেষরূপ মুগ্ধ হইলেন। হীরালালের কাণে কাণে বলিলেন, "এ ত বর্ণ আর্টিষ্ট হে!" শুনিয়া হীরালাল খুসী হইল।

প্রথম অঙ্ক শেষ হইলে হীরালাল বলিল, "আমি একবার ভিতর থেকে আসি, ভাই।" বলিয়া সে প্রস্থান করিল। বিপিনবাবু মনে মনে বলিলেন, "রেবতীর সঙ্গে দেখা করতে গেল। ছোঁড়াটা মরেছে!" মনটা তাঁহার অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল।

দ্বিতীয় অঙ্ক আরম্ভ হইবার পর হীরালাল বক্সে ফিরিয়া আসিল। বিপিনবাবু অনুচ্চস্বরে শ্লেষভরে বলিলেন, "দেখা হ'ল?"

হীরালাল ন্যাকামির ভাণ করিয়া বলিল, "কার সঙ্গে?"

"তার সঙ্গে?"

"রেবতীর কথা বলছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"দেখা হ'ল বৈকি। ব'লে এলাম তাকে।"

"কি ব'লে এলে?"

"তুমি তার অভিনয় দেখে তাকে বর্ণ আর্টিষ্ট বলেছ।"

"খুসী হ'ল? কি বল্লে?"

হীরালাল একটু অপ্রতিভ ভাবে বলিল, "বিশেষ কিছু বল্লে না বটে,—তবে খুসী হয়েছে নিশ্চয়।"

উভয়ে বসিয়া আবার অভিনয় দেখিতে লাগিলেন। আবার চিন্তামণি আসিল, তাহার অভিনয় দেখিয়া দর্শকরা অত্যন্ত প্রীত হইলেন, প্রেক্ষাগৃহে, বাঃ, কি সুন্দর!—কি চমৎকার! ইত্যাদি গুঞ্জন উঠিল এবং কোন্ একটা বক্স হইতে বস্ত একটা ফুলের তোড়া রেবতীর পায়ের কাছে ষ্টেজের উপর পড়িল।

নিম্ন হইতে অনেকেই পুরস্কারদাতার সন্ধানে উপরের দিকে চাহিল। বিপিনবাবু বলিলেন, "কে তোড়া ফেল্লে হে?"

হীরালাল ইতস্ততঃ নেত্রচালনা করিতে করিতে বলিল, "ওহে, ওদিকের ঐ বক্সটার দিকেই সবাই তাকাচ্ছে, বোধ হয় ঐ বক্স থেকেই।"

বিপিনবাবু বলিলেন, "হ্যাঁ। মানুষটি কে, অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না? আলো জ্বললে দেখা যাবে, কে ঐ গুণ-গ্রাহী ব্যক্তি।"

ক্রমে যখন অঙ্ক শেষ হইল, আলো জ্বলিয়া উঠিল, তখন সেই বক্সের পানে চাহিয়া হীরালাল বলিল, "ঐ করিম গুণ্ডা। আমার বোধ হয়, ওই ফুলের তোড়া ফেলেছিল।"

করিমের পার্শ্বে এক জন এবং পশ্চাতে ফেজ্ টুপীধারী আর দুই জন মুসলমানও বসিয়া আছে। তবে তাহাদের বেশবাস করিমের মত জমকালো নহে, সাধারণ। বিপিন-বাবু কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে করিমের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ওই করিম গুণ্ডা বুঝি? দিব্যি সম্ভ্রান্ত লোকের মত সেজে এসেছে ত, যেন একটা নবাব টবাব!"

হীরু বলিল, "সব রকম ছদ্মবেশই ওদের থাকে কি না।"

রেবতীর গৃহে তাহার প্রতি করিমের শেষ সম্ভাষণের গল্প বিপিনবাবু হীরালালের মুখে শুনিয়াছিলেন। বলিলেন, "যাও না, তোমার পুরাণো বন্ধু, দেখা ক'রে এস না।"

হীরালাল বলিল, "হ্যাঁ, আমার বুকে ছোরা বসিয়ে দিক্ আর কি!"

বিপিনবাবু বলিলেন, "ওসমান মিঞা যোদ্ধা, খুনী ত ন'ন। তোমায় দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করতে পারেন—বুকে ছুরি বসাবেন না।"

হীরালাল বলিল, "আমায় বুঝি তুমি জগৎসিংহ ঠাওরালে? আঃ—তোমার ঠাট্টার জ্বালায় আমি অস্থির হলাম যে!"

এমন সময় থিয়েটারের এক জন ঝি আসিয়া চুপি চুপি হীরালালকে কি বলিয়া চলিয়া গেল।

হীরালাল উসখুস করিতে লাগিল। ব্যাপারটা অনুমান করিয়া বিপিন বাবু হাসিয়া বলিলেন, "তলব হয়েছে—যাও।"

হীরু বলিল, "হ্যাঁ, কি বিশেষ প্রয়োজন আছে, তোমাকে আমাকে দু'জনকেই ডেকে পাঠিয়েছে।"

কলিকাতার পাবলিক থিয়েটরের গ্রীণরুমের চেহারাটা কিরূপ, তাহা দেখিবার একটা কৌতূহল বিপিন বাবুর মনে ছিল। তিনি বলিলেন, "প্রয়োজন তোমাকে, লক্ষ্য তুমিই, আমি উপলক্ষ মাত্র। আচ্ছা, চল তা হ'লে রাস্তা দেখাও।"

হীরালাল, বিপিন বাবুকে সঙ্গে লইয়া, গ্রীণরুমে গিয়া প্রবেশ করিল। সাজ পরা অভিনেতা অভিনেত্রী, কেহ বসিয়া, কেহ দাঁড়াইয়া,—কেহ চা পান করিতেছে, কেহ সিগারেট টানিতেছে। রেবতী একখানা চেয়ারে বসিয়া ছিল, তার মুখে চোখে ভয়ের স্পষ্ট চিহ্ন। ইহাদিগকে দেখিয়া রেবতী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "একটু ও দিকে চলুন!" বলিয়া সে অগ্রগামিনী হইল। একটু নির্জ্জন স্থান দেখিয়া সেখানে দাঁড়াইয়া, হীরালালের পানে চাহিয়া চুপি চুপি বলিল, "খানিক আগে এক জন আমায় ফুলের তোড়া দিলে দেখেছ?"

হীরালাল বলিল, "হ্যাঁ, তা দেখেছি বৈকি!"

"কে সে, তা চিনতে পেরেছ?"

"পেরেছি—আমাদের পরম বন্ধু করিম সাহেব।"

"বক্সে বসে' বসে' চাঁদির ফ্ল্যাস্ক মুখে দিয়ে দিয়ে মদ গিলছে, তা দেখেছ?"

"না, তা লক্ষ্য করিনি।"

"আমি করেছি! যখন ড্রপ ওঠে, অধিকাংশ আলো নিবে গিয়ে অন্ধকার মত হয়, তখন খায়। চাঁদির ফ্ল্যাস্ক চকচক ক'রে ওঠে। আমি ৩।৪ বার ওকে খেতে দেখেছি।—ওর সঙ্গে বক্সে যারা আছে, তারা ওরই দলের লোক নিশ্চয়ই—তারাও গুণ্ডা। কি হবে? আমার যে বড় ভয় করছে!"

হীরালাল বলিল, "কেন, তোমার ভয় কি? থিয়েটর থেকে যখন বেরুবে, তোমায় ধরে' নিয়ে যেতে পারে, এই ভয় হচ্ছে?"

রেবতী বলিল, "[illegible] প্রকাশ্য স্থানে এত লোকের মাঝে তাও যদি সাহস না করে, আমার বাড়ী যে ও চেনে গো! আর, এও সে জানে যে, আমার বাড়ীতে এক ছাতুখোর দরোয়ান ভিন্ন দ্বিতীয় পুরুষমানুষ কেউ নেই। ও যদি রাত দুটোর সময় ঐ সব দলবল নিয়ে আমার বাড়ীতে গিয়ে হানা দেয়, তা হ'লে আমি কি করবো? কে আমায় রক্ষা করবে?"—বলিতে বলিতে রেবতী প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল।

রেবতীর এই ভাব দেখিয়া বিপিন বাবুর মনে কষ্ট হইল। সত্যই বিপদের সম্ভাবনা থাকুক আর না থাকুক, এ রমণী নিজেকে বিপন্না মনে করিতেছে। বিপন্না রমণীকে রক্ষা করাই ত পুরুষের কর্ত্তব্য। তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, আপনার যদি এত ভয়ই হয়ে থাকে, আমরা দু'জনে আপনার সঙ্গে আপনার বাড়ীতে গিয়ে আপনাকে পাহারা দেবো এখন। তা হ'লে ত নিশ্চিন্ত হবেন? যদিও আপনি যা আশঙ্কা করেছেন, তা আমি সম্ভব ব'লে মনে করিনে হাজার হোক এ কলকাতা সহর—ইংরেজের রাজ্য।"

রেবতী বলিল, "পনেরো দিন আগে কি ইংরেজের রাজ্য ছিল না, তবে অত সব কাণ্ড হ'ল কেন?"

বিপিন বাবু এ কথার উত্তর দিতে পারিলেন না। রেবতী বলিল, "আমাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আপনারা চ'লে যেতে পাবেন না কিন্তু—কখন তারা এসে আমার দরজা ভাঙ্গবে, তা কি ঠিক আছে? সারা রাত সেখানে থেকে আমাকে আগলাতে হবে। নইলে আমি আপনাদের পিছু পিছু আপনাদেরই ট্যাক্সিতে আপনাদের হোটেলে গিয়ে উঠবো, তা বলে' রাখছি।"

বিপিন বাবু হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, সারা রাত থেকেই আমরা আপনাকে আগলাব—তার জন্যে আর কি?"

ড্রপ উঠিবার সময় নিকটবর্ত্তী হইল। রেবতী বলিল, "শেষ হলেই, আপনারা এক জন এখানে আমার কাছে আসবেন, এক জন করিমের গতিবিধি লক্ষ্য করবেন। (হীরালালের প্রতি)—ওগো, তোমাকে যে করিম আবার চেনে ছাই! তুমিই ভিতরে এস, বিপিন বাবু দয়া ক'রে করিমের দিকে নজর রাখবেন। তার পর তিনি এসে আমাদের যেমন খবর দেবেন, আমরা সেই রকম করবো।"—বলিয়া রেবতী গমনোদ্যতা হইল।

"আচ্ছা তাই হবে,—আপনি নিশ্চিন্ত হোন।"—বলিয়া বিপিন বাবু হীরালাল সহ বক্সে ফিরিয়া আসিলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

আদর্শ প্রেমিক

ড্রপ উঠিল, প্রেক্ষাগৃহ তরল অন্ধকারে নিমজ্জিত হইল। বিপিন বাবু করিমের বক্সের পানে নজর রাখিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই দেখিলেন, রেবতী যাহা বলিয়াছিল, তাহাই সত্য—সেই বক্সের ভিতর চাঁদির জিনিষ চক্‌চক্‌ করিয়া উঠিল। বিপিন বাবু হীরালালকেও উহা দেখাইলেন। হীরালাল রেবতীর কথাবার্ত্তা শুনিয়া একটু চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিল—ইহা দেখিয়া তাহার ভয় বাড়িল বৈ কমিল না।

অভিনয় চলিতে লাগিল। বিপিন বাবুর মন চঞ্চল—হীরালালের তদধিক। অভিনয় উপভোগ করা আর কাহারও ভাগ্যে হইল না। রেবতী আবার ষ্টেজে আসিল, অ্যাক্ট করিল, কিন্তু পূর্ব্বের মত আর জমিল না।

চতুর্থ অঙ্ক শেষ হইল। আবার ঝি আসিয়া হীরালালকে ভিতরে ডাকিল।

পাঁচ মিনিট পরে হীরালাল ফিরিয়া আসিয়া, বক্সের দ্বারে দাঁড়াইয়া বলিল, "বিপিন, একবার বাইরে এস।"

"কি খবর?" বলিয়া বিপিন বাবু বাহির হইলেন। বারান্দায় লইয়া গিয়া হীরালাল তাঁহার হাতে এক টুক্‌রা কাগজ দিয়া বলিল, "পড়।"

বিপিন বাবু, অশিক্ষিত হস্তের এই ক্ষুদ্র লিপি পাঠ করিলেন,—

"প্রানেশ্বরি,
দয়া কি হইবা না। বড় ভুখ। হুকুম পাইলা আসী। ঝির মুখে উত্তর দিবা।"

হীরালাল বলিল, "এ চিঠি নিয়ে থানায় গেলে হয় না?"

বিপিন বাবু বলিলেন, "তাতে ফল কি হবে? কোনও দর্শক যদি থিয়েটরের কোনও নটীকে দেখে', তার প্রেমভিক্ষাই ক'রে থাকে,—তা হ'লে পুলিস তার কি করবে? ঝির মারফতে থিয়েটরের নটীদের কাছে এ রকম প্রস্তাব পাঠানো ত নিত্য ঘটনা। রেবতী কি উত্তর পাঠিয়েছে?"

"উত্তর পাঠিয়েছে—তা হবে না। কিন্তু একে দুর্দান্ত গুণ্ডা,—তার উপর ক্রমাগত মদ খাচ্ছে—কি কাণ্ড যে করবে পাজিটা, তাই বা কে জানে? রেবতী ভারি ভয় পেয়েছে।"

বিপিন বাবু বলিলেন, "ভয় পাবারই ত কথা। আচ্ছা, এই বেলা ওকে বাড়ী নিয়ে গেলে হয় না?"

হীরালাল বলিল, "শেষ পর্য্যন্ত যে ওর পার্ট রয়েছে—সেই উজ্জ্বল দৃশ্য পর্য্যন্ত।"

"আচ্ছা, তা হ'লে রেবতীর যা পরামর্শ, তাই করা যাবে। শেষ হলেই তুমি ভিতরে গিয়ে ওর কাছে থেক, আমি করিমের গতিবিধি লক্ষ্য করবো।"

অর্দ্ধঘণ্টা পরে অভিনয় শেষ হইল। উজ্জ্বল দৃশ্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই লোক ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল। জেনানা সিঁড়িতে—"ও—কুড়ি নম্বর নারাণ বিশ্বেসের গলি!"—"ও সিমলের যোগেশ বাবুর বাড়ী" ইত্যাদি কাণ্ডকাটি ঝিয়ের চীৎকার আরম্ভ হইল।

উজ্জ্বল দৃশ্যের পর ড্রপ পড়িল, আলো সমস্ত জ্বলিয়া উঠিল। বিপিন ও হীরালাল উভয়ে দেখিল, করিমের বক্স শূন্য—কখন্ তাহারা প্রস্থান করিয়াছে।

বিপিন বাবু বলিলেন, "গেল কোথা?"

হীরালাল বলিল "কি জানি! থিয়েটরের বাইরে দাঁড়িয়ে বোধ হয় অপেক্ষা করছে!"

"আচ্ছা তুমি ভিতরে যাও—আমি বাইরে গিয়ে দেখি। আমি এসে খবর দেবো।"—বলিয়া বিপিন বাবু সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইলেন।

বিপিন বাবু বাহিরে আসিয়া করিম বা তাহার দলস্থ কাহাকেও কোথাও দেখিতে পাইলেন না। প্রায় পাঁচ মিনিট কাল এদিক্ ওদিক্ ঘুরিলেন। কাছাকাছি দুই তিনটা গলির ভিতর পর্য্যন্ত প্রবেশ করিলেন, তাহারা কোথাও নাই।

দর্শকগণ অধিকাংশই তখন প্রস্থান করিয়াছে। থিয়েটরের আলো সকল নিবিতে আরম্ভ হইয়াছে। বিপিন বাবু ধীরে ধীরে ষ্টেজ ডোর দিয়া ভিতরে গিয়া দেখিলেন, হীরালাল ম্লান মুখে দাঁড়াইয়া আছে। বিপিন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "রেবতী কৈ?"

হীরালাল বলিল, "সাজ পোষাক খুলছে। ওদিকের খবর কি?"

বিপিন বাবু বলিলেন, "তাদের কেউ কোথাও নেই।"

হীরালাল বলিল, "নেই ত? যাক্ বাঁচা গেল।"

"আপাততঃ বাঁচা গেল। কিন্তু যদি তারা আগে ভাগেই রেবতীর বাড়ী গিয়ে হাজির হয়ে থাকে?"

"হ্যা তা বটে। মুস্কিল! কি করা যায়?"

"সে আমি মনে মনে একটা মৎলব ঠিক করেছি। রেবতী আসুক, তার পর বলবো।"

প্রায় পাঁচ মিনিট পরে রেবতী আসিল। সকল কথা শুনিয়া বলিল, "বিপিন বাবুর যা আশঙ্কা, আমারও কিন্তু তাই মনে হয়। প্রথম বার করিম যখন আমার বাড়ীতে গিয়েছিল ওস্তাদজী সেজে—আমি ত বাড়ী গিয়ে দেখলাম, পোড়ারমুখো আমার ড্রয়িং রুমে ব'সে আছে!"

হীরালাল বিপিন বাবুর পানে চাহিয়া বলিল, "তা হ'লে, এখন উপায়?"

বিপিন বাবু বলিলেন, "আচ্ছা, এ অঞ্চলে এমন কোনও বাঙ্গালী 'হোটেল' অর্থাৎ খাবার জায়গা আছে—যা এত রাত্রে খোলা পাওয়া যাবে?"

রেবতী বলিল, "হ্যা আছে। চিৎপুর রোডে অ্যালেন হোটেল আছে—অনেক রাত অবধি খোলা থাকে।"

বিপিন বাবু বলিলেন, "আচ্ছা, তবে চলুন আমরা তিন জনে প্রথমে সেখানে যাই। আপনাদের সেখানে রেখে, আমি আপনার বাড়ী গিয়ে দেখে আসবো সেখানকার অবস্থা কি। তার পর যেমন ব্যবস্থা হয় করা যাবে।"

রেবতী বলিল, "এ খুব ভাল পরামর্শ। চলুন তবে।"

বাহির হইয়া তিন জনে ট্যাক্সি লইল। রেবতী হুকুম দিল—"চিৎপুর রোড—অ্যালেন হোটেল।"

ট্যাক্সি যখন ষ্টার্ট দিয়াছে, থিয়েটরের ঝি ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "দিদিমণি, চিঠি।"

রেবতী চিঠি লইয়া বলিল, "কে দিয়েছে?"

ঝি বলিল, "কে আবার, সেই পোড়ারমুখো নবাব মিন্সে।"

ট্যাক্সিকে "সবুর" করিতে বলিয়া, তিনজনে একসঙ্গে চিঠিখানি পড়িল। তাহাতে মাতালের তেড়া-বেঁকা হস্তাক্ষরে লেখা আছে—

"বড় ভুখ লেগিয়াছিল। তোমার হাঁতের দুখান পুরী তেরকারী আবার খেইতে বড় ইসছা হোইয়াছিল। কিন্তু আমার তগ্‌দির খাবাব তোমার মেহেরবানী হোইল না। আল্লা কসম কইছি, কোন বদ মৎলব আমার ছিল না। এখন চোলিলাম কসুর মাফ করিবা।"

আদেশ মত ট্যাক্সি ছাড়িল। বিপিন বাবু বলিলেন, "'চলিলাম' ত! কোথা 'চলিলাম'? গেঁড়াতলা না জয় মিত্তিরের গলি?"

হীরালাল বলিল, "গেঁড়াতলাই বোধ হয়। নইলে ওরকম দুঃখিতভাবে চিঠি লিখ্‌তো না। কি বল রেবতী, তবে কি বাড়ীই যাবে?"

রেবতী বলিল, "নাঃ ওকে বিশ্বাস নেই! আদশ প্রেমিক সেজে আমায় ধাপ্পা দিয়ে, হয় ত আমার বাড়ীতে ঢুকেই বসে' আছে। আগে হোটেলেই যাই। সেখানে আমরা খাওয়া দাওয়া করিগে চল। ঘণ্টা খানেক পরে, বিপিন বাবু আমার বাড়ী দেখে আসবেন। তার পর যা হয় করা যাবে।"

"বেশ। তাই চল।"

কয়েক মিনিট পরেই ট্যাক্সি চিৎপুর রোডের অ্যালেন হোটেলে গিয়া পৌছিল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

প্রাণের দেবতা

নিরাশ হৃদয়ে ভকত ফুকারে
'কোথা আছ প্রভো, তুমি!'
মনের মাঝারে দেবতা কহিছে
'এখানে রয়েছি আমি।'

শ্রীফণিভূষণ সরকার।
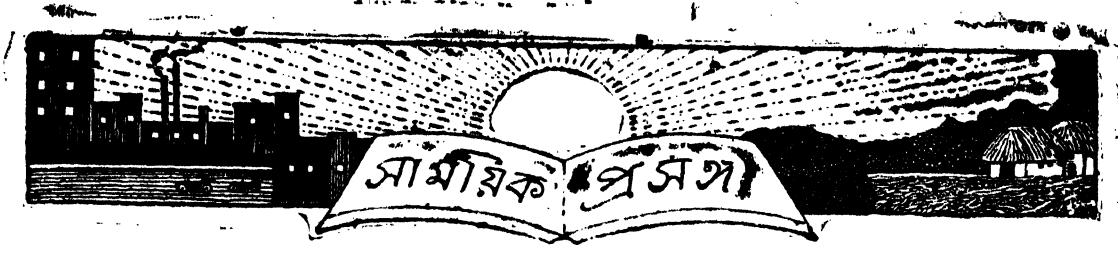
মিলনের চেষ্টা

বর্ত্তমান কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার হিন্দু-মুসলমানে ও কংগ্রেসের নানা দলে মিলন-চেষ্টা করিতেছেন। এ জন্য তিনি নানা স্থানে ঘুরিয়া শারীরিক ও মানসিক যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া নানা জনের নানাভাবে মনস্তুষ্টিসাধন করিয়া মিলন ঘটাইবার চেষ্টা করিতেছেন। বস্তুতঃ এ যাবৎ কোনও কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট অধিবেশনের পরে সারা বৎসর এ ভাবে দেশের কাযে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। এ জন্য তিনি নিশ্চিতই দেশবাসীর কৃতজ্ঞতার পাত্র, এবং ধন্যবাদভাজন।

কিন্তু তাঁহার উদ্যম ও চেষ্টা যতই প্রশংসনীয় হউক, তিনি যে ভাবে মিলন ঘটাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন, আমাদের আশঙ্কা হয়, সে ভাবে মিলন সংঘটিত হইবার কোনও আশা নাই। বাঙ্গালায় কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের মধ্যে দলাদলি দূর করিবার নিমিত্ত তিনি স্বয়ং বাঙ্গালা দেশে আসিয়াছিলেন এবং সেই দলাদলির অবসান করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টাও করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যে পন্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা ভ্রান্ত, এ জন্য তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। বাঙ্গালায় এখনও কংগ্রেসের দলাদলি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান রহিয়াছে। লজ্জার বিষয়, আমাদের বিষ নাই, অথচ কুলপানা চক্র আছে। বাঙ্গালার কংগ্রেস এখন নামমাত্র সার,—তাহার না আছে কেন্দ্র, না আছে শাখা, না আছে তহবিল, না আছে কর্ম্মী, না আছে কর্ম্মপদ্ধতি। আছে কেবল কলহ আর পদ ও প্রতিপত্তি লইয়া রেষারেষি ও দ্বন্দ্ব! এমনভাবে বাঙ্গালা কখনও ভারতে সকল প্রদেশের নিকট অবনতমস্তক হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই। কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট এ অবস্থার প্রতীকার করিতে সমর্থ হয়েন নাই, ইহা তাঁহার নেতৃত্বের পক্ষে প্রশংসার কথা নহে। বাঙ্গালারও দুর্ভাগ্য যে, তাহার ঘরের ঝগড়া মিটাইবার জন্য 'ভিন্-দেশীকে' এখানে আসিয়া মধ্যস্থতা করিতে হয়! বাঙ্গালার এখন যে অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, এখন কোন শক্তিশালী নেতা যদি বাঙ্গালার কংগ্রেসকে ঢালিয়া সাজিতে পারেন, তবেই বাঙ্গালার রাজনীতিক মরা গাঙ্গে আবার বান ডাকে, অন্যথা এখন বহুকাল বাঙ্গালা যে তিমিরে, সেই তিমিরেই থাকিয়া যাইবে।

হিন্দু-মুসলমানের মিলনের চেষ্টার একটু ইতিহাস আছে। জাতীয় কংগ্রেসের ৪০শ অধিবেশনে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবটি এই :—

"এই কংগ্রেস তাহার কার্য্যকরী সমিতিকে বর্ত্তমান হিন্দু-মুসলমান বিরোধের মীমাংসা করিবার উপায় অবলম্বনের জন্য হিন্দু-মুসলমান নেতাদের সহিত পরামর্শ করিতে বলিতেছেন এবং ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ্চের পূর্ব্বে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর নিকট তাঁহাদের রিপোর্ট দাখিল করিতে বলিতেছেন। এই কংগ্রেস নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীকে ঐ সম্পর্কে দেশের কংগ্রেস-কর্ম্মিগণকে প্রয়োজনানুরূপ উপদেশ প্রদান করিবার ক্ষমতা দিতেছেন।"

এই প্রস্তাব অনুসারে কার্য্যকরী সমিতির কলিকাতায় এক অধিবেশন হয়। তাহাতে স্থির হয় যে, দিল্লীতে ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণের এক সভা আহ্বান করিয়া হিন্দু-মুসলমান মিলনের উপায় উদ্ভাবন করা হইবে এবং সেই সভা আহ্বান করিবার জন্য কংগ্রেস প্রেসিডেণ্টকে ক্ষমতা প্রদান করা হইবে। তদনুসারে কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার সভা আহ্বান করিতে মনস্থ করেন। কিন্তু সভা আহ্বানের পূর্ব্বে তিনি ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের ও রাষ্ট্রীয় পরিষদের প্রধান প্রধান সদস্যগণের এবং মিঃ মহম্মদ আলি ও কয়েকজন হিন্দু নেতার সহিত ঐ বিষয়ে কথোপকথন করিয়াছিলেন।

ইহার পর ২০শে মার্চ্চ তারিখে দিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর এক সভা আহূত হয়; কিন্তু ঐ সভা নানা অসুবিধা হেতু রহিত করা হয়। ব্যবস্থা পরিষদের মুসলমান নেতৃবৃন্দ ২০শে মার্চ্চ তারিখে দিল্লীতে এক সভা আহ্বান করিয়া মিঃ জিন্নার মারফতে তাঁহাদের প্রস্তাব কংগ্রেস কমিটীকে নিবেদন করেন। মুসলমান পক্ষ হইতে প্রস্তাব হয় যে :—

(১) যেখানে সংখ্যায় অল্প সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষা করা সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইবে, সেখানে তাহাদের জন্য ব্যবস্থাপক সভায় কয়েকটি সদস্যপদ সংরক্ষিত করিয়া রাখা হইবে,

(২) যেখানে সংখ্যায় অল্প সম্প্রদায়ের বিশেষ অধিকারের প্রয়োজন হইবে, সেখানে পরস্পর পরস্পরের জন্য স্বার্থত্যাগ করিবেন,

(৩) সিন্ধু প্রদেশকে বোম্বাই বিভাগ হইতে পৃথক্ করিয়া স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করা হইবে এবং তথায় স্বতন্ত্র ব্যবস্থাপক সভায় সংখ্যায় অল্প হিন্দুদিগের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হইবে,

(৪) বেলুচিস্থান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশকেও অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় স্বতন্ত্র ব্যবস্থাপক সভা দিতে হইবে এবং সেখানেও সংখ্যায় অল্প হিন্দুদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হইবে,

(৫) এই সকল সর্ত্ত অনুসৃত হইলে পর মিশ্র নির্ব্বাচন প্রথা সর্ব্বত্র গৃহীত হইবে, অর্থাৎ কোনও প্রদেশে সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন প্রথা প্রচলিত থাকিবার প্রয়োজন হইবে না।

(৬) ব্যবস্থা পরিষদে বর্ত্তমানে হিন্দু-মুসমানে সর্ত্ত আছে যে, উভয় সম্প্রদায়ের বিরোধমূলক স্বার্থ-সম্পর্কিত কোনও বিষয় যদি কোনও সম্প্রদায়ের সদস্যগণের মধ্যে বারো আনা ভাগ পরিষদে উত্থাপিত হইতে আপত্তি করেন, তাহা হইলে কোন পক্ষ তাহা উত্থাপন করিতে পারিবেন না। এই নিয়ম সকল প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত হইবে।

মিঃ জিন্না ও তাঁহার মুসলমান দল মোটামুটি এই কয়টি মিলন প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কংগ্রেসের কার্য্যকরী কমিটী এই প্রস্তাবে সন্তোষ প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে কি করা কর্ত্তব্য, তাহা আলোচনা করিবার নিমিত্ত শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ও মিঃ মহম্মদ আলিকে লইয়া একটি সাব-কমিটী গঠিত হয়। উক্ত সাব-কমিটী মিলনের প্রস্তাব সমীচীন বলিয়া বিবেচনা করেন। তাঁহারা প্রস্তাব করেন,—

"কার্য্যকরী সমিতি মুসলেম সম্মিলনের ২০শে মার্চ্চ তারিখের অভিমত এবং হিন্দু সভা ও অন্যান্য হিন্দু প্রতিষ্ঠানের মতামত বিবেচনা পূর্ব্বক নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন :—

(১) প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় ও ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে মিশ্র নির্ব্বাচন প্রথা প্রচলিত হইবে।

(২) বর্ত্তমান ব্যবস্থাপক সভাসমূহে উভয় সম্প্রদায়ের

স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে। সংখ্যায় অল্প সম্প্রদায়ের ব্যবস্থা পরিষদে লোকসংখ্যার অনুপাতে সদস্যপদ পৃথক্ রাখিতে হইবে। আবশ্যক হইলে পঞ্জাবে শিখ প্রভৃতিদের জন্য তাহাদের লোকসংখ্যার অনুপাতের অতিরিক্ত সদস্যপদও পৃথক রাখা হইবে।

(৩) বেলুচিস্থান ও উত্তর-পশ্চিমসীমান্ত প্রদেশে শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তন করা হইবে।

(৪) সিন্ধু প্রদেশকে বোম্বাই হইতে স্বতন্ত্র প্রদেশে গঠিত করিতে হইবে।

এই প্রস্তাবগুলি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীকে বিচার আলোচনা করিতে দেওয়া হয়। বোম্বাই সহরে কমিটীর অধিবেশন হইল। বহু তর্ক-বিতর্কের পর কমিটী মূলতঃ মুসলমান পক্ষের প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করিয়াছেন।

ইহাতে এক শ্রেণীর রাজনীতিক মহা আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের আনন্দের মূল কারণ এই যে, এতদিনে দেশের লোক পরস্পর বিরোধে নিজেদের শক্তিক্ষয়ের কথা বুঝিতে পারিয়াছে এবং পারিয়াছে বলিয়াই উভয় পক্ষে নানা ত্যাগস্বীকার করিয়া একযোগে আমলাতন্ত্র সরকারের বিপক্ষে স্বরাজলাভের নিমিত্ত দণ্ডায়মান হইতে প্রস্তুত হইয়াছে।

কিন্তু সত্যই কি এই কাগুজে চুক্তির ফলে আমাদের উভয় সম্প্রদায়ের মনের ময়লা ধুইয়া যাইবে? হয় ত উহা দ্বারা জমী প্রস্তুত হইবার আশা করা হইতেছে। কিন্তু লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট হইতে আরম্ভ করিয়া এ যাবৎ মিলনের অনেক চেষ্টা হইল, ফল কিছু হয় নাই। এক পক্ষে কেবল আবদার ও বাহানা, অপর পক্ষে কেবল ঘুষ দেওয়া,—এইভাবেই চলিয়া আসিতেছে, প্রকৃত মিলন কখনও হয় নাই। একবার মহাত্মা গন্ধীর অসহযোগ আন্দোলনকালে প্রকৃত মিলন প্রায় সম্ভবপর হইয়াছিল, কিন্তু পরে বুঝা গিয়াছে, সে মিলনও স্বার্থের বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত, খিলাফতের জন্য সে মিলন সম্ভবপর হইয়াছিল, তাহার পর খিলাফতের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে আবার স্বার্থ বিকট বদন ব্যাদান করিয়াছে।

স্বরাজ্যদল কংগ্রেসে কাউন্সিল-প্রবেশের কল্পনা আনয়ন করিবার পর হইতে অনেক বিষয়ে মুসলমানের আবদার রক্ষা করিয়া কাউন্সিলে solid front দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। সে পথে স্বরাজের আশা সফল হয় নাই, পরন্তু মসজেদের সম্মুখে গীতবাদ্যাদি উপলক্ষ করিয়া উভয় পক্ষে মনোমালিন্য, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, লুঠ-তরাজ ও গুপ্ত-হত্যাদি অশান্তির উদ্ভব হইয়াছে। আবার খিলাফত রক্ষার জন্য হিন্দুর সহায়তায় মুসলমানরা যে শক্তি ও অর্থ নিয়োজিত করিয়াছিলেন, তাহা সেই উদ্দেশ্যসাধনের পর তবলিগে পরিণত করিয়া হিন্দুর বিরুদ্ধে নিযুক্ত হইতেছে। বর্ত্তমানে দেখা যায়, অধিকাংশ মুসলমানই সাম্প্রদায়িক স্বার্থে অন্ধ হইয়া কংগ্রেসের সংস্রব বর্জ্জন করিয়াছেন। মোস্লেম লীগ আবার নূতন করিয়া গজাইয়া উঠিয়াছে। অর্থাৎ যত রকমে হিন্দুর বিরুদ্ধাচরণ করা যায়, মুসলমান পক্ষে তাহার চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। অবশ্য হাকিম আজমল খাঁ, ডাক্তার আনসারি, মওলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ মুসলমান নেতৃবর্গ প্রকৃত দেশহিতকামী, তাঁহারা জাতীয়তায় অনুপ্রাণিত, তাঁহাদের কথা এই সম্পর্কে ধরা হইতেছে না। কিন্তু তাঁহারা সংখ্যায় কয়জন? এই যে দিল্লীতে মিঃ জিন্নার নেতৃত্বে কয়জন মুসলমান নেতা (ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য) হিন্দুর সহিত একটা রফার সর্ত্ত করিলেন, ইহাতে এ যাবৎ কয়জন মুসলমান সাড়া দিয়াছেন? খিলাফৎ কমিটী, মোস্লেম লীগ, উলেমা কমিটী বা তবলিগ ও তাঞ্জিম আন্দোলনের নেতৃবর্গরা এ যাবৎ এ বিষয়ে নীরব কেন?

অথচ স্বরাজী হিন্দুদলের শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার ও পণ্ডিত মতিলাল নেহরু প্রমুখ নেতৃবর্গ মিঃ জিন্নার প্রস্তাব আগ্রহভরে গ্রহণ করিয়া উহা দ্বারাই ভারতের হিন্দু-মুসলমান মিলন-সমস্যার সমাধান করিবেন বলিয়া আশায় উৎফুল্ল হইয়াছেন। কিসে তাঁহারা এমন উল্লসিত হইয়া উঠিলেন, তাহা বুঝা যাইতেছে না। মুসলমান পক্ষে মনোভাব পরিবর্ত্তনের কি কোনও পরিচয় তাঁহারা পাইয়াছেন? মিঃ জিন্নার মিশ্র নির্ব্বাচন গ্রহণ করিলেই কি মুসলমানরা মসজেদের সম্মুখে বাদ্যসম্পর্কে আন্দোলন বন্ধ করিয়া দিবেন, না গো-কোরবানী সম্পর্কে তাঁহাদের নির্ব্বন্ধ ত্যাগ করিবেন?

তাহার পর যে ভাবে চুক্তি করা হইয়াছে, তাহা সকল হিন্দুর অনুমোদিত হইবে কি? সিন্ধু, বেলুচিস্থান ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে পূরা মুসলমান প্রদেশে পরিণত করা হইতেছে। অবশ্য এ জন্য মুসলমানরা যুক্তপ্রদেশ, মান্দ্রাজ, বোম্বাই ও বিহারে হিন্দুপ্রাধান্য রাখিতে সম্মত হইয়াছেন। উভয়েই পরস্পরকে ঐ সকল স্থানে সংখ্যার অনুপাতে বিশেষ অধিকার দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, পঞ্জাব ও বাঙ্গালায় তাঁহারা সংখ্যার অনুপাতে নির্ব্বাচনাধিকার রক্ষা করিতে চাহিয়াছেন। এই দুই প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহারা মুসলমানপ্রাধান্য রক্ষা করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। কিন্তু এ ব্যবস্থা কি ন্যায়সঙ্গত? গুণানুসারে ও যোগ্যতানুসারে যদি নির্ব্বাচনাধিকার দেওয়া হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালার মুসলমানরা কোথায় দাঁড়ান? মুসলমানরা বাঙ্গালায় সংখ্যায় হিন্দুর অপেক্ষা অধিক। তবে তাঁহারা বিশেষ সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন সত্ত্বেও হিন্দুর অপেক্ষা অধিক পরিমাণে নির্ব্বাচিত হন না কেন? ইহাতে কি বুঝা যায় না, অনেক স্থলে মুসলমান ভোটাররাও মুসলমান প্রার্থীকে ভোট দিতে নারাজ? ইহা কি তাঁহাদের গুণের বা যোগ্যতার অভাবের পরিচায়ক নহে? তবে হিন্দুরা কিরূপে বাঙ্গালার সম্পর্কে চুক্তি স্বীকার করিয়া লইতে পারে?

পণ্ডিত মতিলাল বলিয়াছেন, কংগ্রেস ভাষাগত বিভাগ হিসাবে প্রদেশ ভাগ করিবার পক্ষপাতী; এই হেতু সিন্ধুদেশকে বোম্বাই হইতে স্বতন্ত্র করা যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু উড়িষ্যা, আসামের শ্রীহট্ট জিলা এবং বিহারের সিংহভূম অঞ্চলকে ভাষাগত পার্থক্য অনুসারে বিভক্ত করার পক্ষে তিনি বা তাঁহার মতাবলম্বী এতদিন কোন অভিমত প্রকাশ করেন নাই কেন? উড়িষ্যা উড়িয়া-ভাষাভাষী, অথচ তাহার কতকাংশ মান্দ্রাজের সহিত এবং অবশিষ্টাংশ বিহারের সহিত যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। শ্রীহট্ট ও সিংহভূম বাঙ্গালা ভাষাভাষী, অথচ ঐ দুইটিকে অন্য দেশের সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল কেন? সে বিষয়ে হিন্দু স্বরাজীরা এতদিন কোনও আপত্তি উত্থাপন করেন নাই কেন?

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, হিন্দু স্বরাজীরা কেবল মুসলমানের মনস্তুষ্টির জন্য সিন্ধুকে স্বতন্ত্র মুসলমান প্রদেশে পরিণত করিবার পক্ষে মত দিয়াছেন। কিন্তু এইভাবে অন্যায় আবদার রক্ষা করিয়া প্রকৃত মিলন সংগঠন করা সম্ভবপর হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না। তাঁহাদের মিলনের চেষ্টা প্রশংসনীয়, কিন্তু তাহা বলিয়া 'ঢাকের কাড়তে মনসা বিকানর' মত হিন্দু ত মুসলমানের মনস্তুষ্টির জন্য নিজের জন্মগত অধিকার বিসর্জ্জন করিতে পারে না। হিন্দু সে স্বার্থও ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইতে পারে, যদি বুঝে তাহার বিনিময়ে মুসলমান পক্ষ হইতেও মসজেদের সম্মুখে বাদ্য নিষিদ্ধ করার মত অন্যায় নির্ব্বন্ধও বিসর্জ্জিত হইবে।

আসল কথা, উভয় পক্ষেই মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তনের নিদর্শন চাই। তাহা না হইলে কেবল যোড়া-তোড়া দিয়া প্রকৃত মিলন সম্ভবপর হইবে না।

সাম্রাজ্যের সমান অংশীদার

ইংরাজের জগৎজোড়া সাম্রাজ্যের নাম British commonwealth of nations, অর্থাৎ নানা জাতির সমবায়ে সকলের সমান অধিকারের এক বিরাট রাজ্য। এ রাজ্যের সকল অধিবাসীর সাম্রাজ্যে সমান অধিকার আছে। অন্ততঃ এই কথা বৃটিশ রাজবংশ ও রাজপুরুষদিগের মুখে নানা ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে।

ভারত এই সাম্রাজ্যের অঙ্গভুক্ত; সুতরাং ধরিতে হইবে যে, ভারতেরও এই সাম্রাজ্যে অন্যান্য জাতির সঙ্গে সমান অধিকার আছে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায় ঠিক ইহার বিপরীত। বৃটিশ উপনিবেশসমূহে এবং রাজার খাস কলোনিতে ভারতবাসী ইংরাজ রাজপুরুষের এবং ইংরাজ প্রবাসীর হস্তে যে ব্যবহার প্রাপ্ত হয়, তাহাতে সমতার ত কোন চিহ্নই থাকে না, বরং ভারতবাসী তাহাদের অপেক্ষা অপকৃষ্ট বলিয়াই ব্যবহৃত হয়। ভারতবাসীর খাস জন্মভূমি ভারতেও প্রবাসী শ্বেত-কায়ের নিকট এবং বিদেশী শাসকের নিকট প্রায় অনুরূপ ব্যবহারই প্রাপ্ত হয়। যাহারা নিজের দেশে 'পারিয়া' অস্পৃশ্যরূপে শাসকজাতির নিকট ব্যবহার প্রাপ্ত হয়, তাহারা শাসকের নিজের দেশে কিরূপ ব্যবহার পাইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। আসল কথা commonwealth of nations বলিতে যাহাদিগকে লইয়া commonwealth গঠিত হয়, তাহাদের মধ্যে যে ভারতবাসীর স্থান নাই, ইহা সহজেই বোধগম্য; বস্তুতঃ ইংরাজ ও তাহার সাগরপারের জ্ঞাতিকুটুম্বকে লইয়াই এই common-wealth গঠিত।

তবে ইহাও শুনা যায় যে, বৃটিশ জাতির স্বদেশে যে কেহ পদার্পণ করে, তাহার অধীনতার শৃঙ্খল খসিয়া যায়, যে মুহূর্ত্তে সে সেখানে বসবাস করিতে আরম্ভ করে, সেই মুহূর্ত্ত যে জাত যে বর্ণ যে ধর্ম্মই হউক না কেন, সে ফ্রি বা মুক্ত বলিয়া পরিগণিত হয়। এই জন্যই কৃষ্ণকায় ভারতবাসী বৃটেনে শিক্ষার্থ গমন করিয়া, তথায় শাসকজাতির হস্তে সদ্ব্যবহার পাইয়াছে বলিয়া, এ যাবৎ শুনিয়া আসা গিয়াছে। সম্প্রতি বিধি বাম সাধিয়াছেন বলিয়া, সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

পারলামেণ্টের সদস্য মিঃ শাকলাতওয়ালা গত ১১শে মে তারিখে কমন্স সভায় এডিনবরা সহরে ভারতবাসীর প্রতি অপমানের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ প্রসঙ্গে ঐ সহরে প্রবাসী ভারতবাসীদের প্রতি শ্বেতকায়দিগের ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক রহস্য প্রকাশ পাইয়াছিল। সহরে কতকগুলি নাচঘর ও রেস্তোরাঁ আছে। গত ১২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে এক নাচঘরের ম্যানেজার ভারতীয় ছাত্রগণকে লিখিয়াছিল,—

"স্থানীয় খরিদদারগণের মনস্তুষ্টির জন্য আমার ডাইরেক্টাররা আমায় আদেশ দিয়াছেন যে, অতঃপর আমি যেন ওয়েষ্ট টৌলক্রশের মার্কিমন নাচঘরে অশ্বেত জাতিদিগকে প্রবেশ করিতে না দিই। অশ্বেত জাতিরা পূর্ব্বে নাচঘরে কোনও অভদ্রতা করিয়াছে এবং সেই হেতু তাঁহাদিগকে নাচ-ঘরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইতেছে না, এই আদেশের কারণ তাহা নহে; তাঁহারা শ্বেতকায় নহেন বলিয়া তাঁহাদিগের প্রবেশ নিষিদ্ধ হইতেছে।"

২০শে এপ্রিল তারিখে "ক্যাপিটাল রেস্তোরাঁর" ম্যানেজার ভারতীয় ছাত্র সমিতির সম্পাদককে লিখিয়াছিলেন—

"আগামী ২৩শে তারিখ হইতে কোম্পানীর ডাইরেক্টারগণের আদেশে এই রেস্তোরাঁয় ভারতীয় ছাত্রগণের প্রবেশ নিষিদ্ধ হইল। আপনি সকল ভারতীয় ছাত্রকে এ কথা জানাইবেন। আপনার মারফতে আদেশের কথা সকলকে জানাইয়া প্রত্যেককে প্রবেশকালে নিষেধ করার দায় হইতে আমি অব্যাহতি লাভ করিব।"

কেবল অঙ্গের বর্ণের অপরাধে সাম্রাজ্যের সমান অংশীদার সাম্রাজ্যের একাংশে অস্পৃশ্য অপাংক্তেয় হইয়া রহিল। এদিকে লর্ড সিংহ সেদিন বিলাতের এক ভোজের বক্তৃতায় বলিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই যে, "দেশপ্রেমিক হইয়াও আমরা ভারতবাসীরা সাম্রাজ্যের নাগরিক হইতে পারি। দেশপ্রেম ও সাম্রাজ্যপ্রেমে কোনও অসামঞ্জস্য থাকিতে না পারে।"

বলিতে পারেন কি লর্ড সিংহ কি জন্য ভারতবাসীর সাম্রাজ্যপ্রেম তাঁহার মত উছলিয়া উঠিবে? এডিন্‌বরায় ভারতীয় ছাত্রদের প্রতি বৃটেনের অধিবাসীর ব্যবহারের যে পরিচয় পাওয়া গেল, কেবল বার্কেণহেড রেডিং কোম্পানীর মুখের কথায় সে কথা ভারতবাসী ভুলিতে পারিবে? তাঁহারা ত কথায় কথায় ভারতবাসীকে আকাশের চাঁদ ধরিয়া দিতেছেন, সহযোগ করিলে মোণ্ডা দিবেন বলিতেছেন, স্বয়ং রাজা হইতে রাজবংশের অনেকেই ভারতবাসীকে সাম্রাজ্যের অন্যান্য প্রজার সঙ্গে সমান বলিয়া বার বার ঘোষণা করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে ভারতবাসী স্বদেশে ও সাম্রাজ্যের অন্যত্র শ্বেতকায় নাগরিকের নিকট কি ব্যবহার প্রাপ্ত হইতেছে? এডিন্‌বরায় স্কটরা ভারতীয় ছাত্রদের কোমল মনে কি ব্যথা প্রদান করিল, তাহা বার্কেনহেড উইণ্টার্টন কোম্পানী বুঝিয়াছেন কি? বুঝিলে উইণ্টার্টন পারলামেণ্টে তর্ককালে কিছুই করিবার নাই বলিয়া নীরবে থাকিবেন না।

যদি এডিন্‌বরার শ্বেতাঙ্গরা ভারতীয় ছাত্রগণকে নিকৃষ্ট জাতি বলিয়া মনে না করিত, তাহা হইলে এমন ব্যবহার করিতে পারিত কি? পারলামেণ্টে তর্কবিতর্ককালে শ্রমিক সদস্য মিঃ দিয়েলস আমতা আমতা করিয়া বলেন,—"দেখুন এটা কর্ত্তব্য নহে। কতকগুলা নাচঘর ও রেস্তোরাঁ ব্যবসায়ের জন্য চালানো হয়। যদি উহাদের মালিকরা মনে করে যে, কতকগুলা লোককে তাহাদের প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করিতে না দিলে খরিদদারের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে তাহারা তাহা করিতে পারে, তাহাদের সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অধিকার আছে।"

ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধির খাতিরে হোটেলওয়ালারা 'কালা আদমী'কে তাড়াইতে পারে—তাহাদের সে অধিকার আছে, তাহা সকলেই জানে। কিন্তু ইহা দ্বারা কি বুঝা যায়? কালা আদমী তাড়াইলে তাহাদের খরিদদার বাড়ে কেন? তবেই কি বুঝা যায় না যে, এডিন্‌বরার শ্বেতাঙ্গরা কালা আদমীর সঙ্গ পছন্দ করে না, তাহাদিগকে পারিয়া অস্পৃশ্য বলিয়া মনে করে? আশ্চর্য্য এই, যাহারা মাত্র ৪ শত বৎসর পূর্ব্বে উপাধানে মস্তক ন্যস্ত করিয়া শুইতে জানিত না, তাহাদের বংশধররা কেবল গায়ের চামড়ার রঙ্গের পার্থক্যের অজুহতে প্রাচীন ভারতীয়দিগকে নিকৃষ্ট অসভ্য বলিয়া মনে করিতে লজ্জানুভব করে না! একদিন যে জাতির পূর্ব্বপুরুষ কেবল ভারতের প্যাগোডা বৃক্ষ নাড়া দিয়া ফল কুড়াইবার আশায় এ দেশে আসিয়া মোগল শাসনকর্ত্তার কর্ম্মচারীর চরণ-চুম্বন করিয়াছিল, একদিন যে জাতির দূত মোগল দরবারে কুর্ণিশ করিয়া মোগলের দয়াপ্রার্থী হইয়াছিল,—সেই জাতি আজ এ দেশের লোককে নিকৃষ্ট দেখিতেছে, অসভ্য বলিয়া দূরে রাখিতেছে। ইহা অপেক্ষা অদৃষ্টের পরিহাস আর কি হইতে পারে?

পারলামেণ্টে যখন এ বিষয় বাদানুবাদ হয়, তখন সরকারপক্ষে জবাব হইয়াছিল,—'এ বিষয়ে সরকারের কোন হাত নাই; হোটেলের বা নাচ-ঘরের মালিকরা যদি ব্যবসায়ের খাতিরে এমন ব্যবস্থা করে, তাহা হইলে তাহাতে বাধা দিবার সরকারের অধিকার নাই।' বৃটিশ উপনিবেশে যখন প্রবাসী ভারতীয়ের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করা হয়, যখন তাঁহাদিগকে কোনও কোনও উপনিবেশে ট্রামে চাপিতে দেওয়া হয় না, কোন কোন পথে বা সরকারী বাগানে যাইতে দেওয়া হয় না, তখনও বৃটিশ সরকার এই জবাব দিয়া থাকেন,—"কি করিব,

আমাদের হাত নাই।" অথচ তাঁহারা মুখে বলেন, বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে বৃটিশ প্রজামাত্রেরই সমান অধিকার। 'পাইওনিয়ার' বলিতে পারেন, "এডিনবরার লোকের ভারতীয় ছাত্রের প্রতি এই ব্যবহার অপরাধ বলিয়া নিশ্চিতই গণ্য হইবে।" কিন্তু তাহাতে কি আইসে যায়? সরকার যদি এ অপরাধের দণ্ডবিধান করিতে না পারেন, তাহা হইলে অপরাধ কিসে অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে?

সকল দেশেই কিন্তু এমন ব্যবহারের তারতম্য অগ্রাহ্য করা হয় না। ফ্রান্সও ইংলণ্ডের মত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিতে পরিণত হইয়াছে। এই ফ্রান্সেরও বিস্তর উপনিবেশ আছে। তন্মধ্যে মরক্কো ও এলজিরিয়া আফ্রিকার উত্তরাংশে অবস্থিত। এখানে ফ্রান্সের বিস্তর অশ্বেত প্রজা আছে। গত জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময় এই সকল অশ্বেত প্রজার মধ্য হইতে সৈন্যদল আনাইয়া ফ্রান্স য়ুরোপের রণক্ষেত্রে (ভারতীয় সৈন্যকে ইংরাজের মত) ব্যবহার করিয়াছিলেন। ফ্রান্সের হোটেল ও রেস্তোরাঁ সমূহে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে অশ্বেত জাতিদিগের প্রতি ঠিক এডিনবরার মত ব্যবহার করা হইয়াছিল। তাহাতে ফরাসী সরকার বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া এই সাবধানবাণী ঘোষণা করিয়াছিলেন,—

"কতকগুলি বিদেশী পর্য্যটক ভুলিয়া যায় যে, তাহারা ফরাসীর অতিথি। অতিথিরূপে তাহাদের কর্ত্তব্য ফরাসীর আইন ও আচার-ব্যবহারের মর্য্যাদা রক্ষা করা। কিন্তু তাহারা তাহা না করিয়া হোটেলে রেস্তোরাঁয় ফরাসীর উপনিবেশ হইতে আগত অশ্বেত ফরাসী প্রজার সহিত একত্র পান-ভোজন করিতে ঘৃণাবোধ করে এবং হোটেল-ওয়ালাদিগকে বলিয়া দেয় যে, অশ্বেত জাতিদিগকে না তাড়াইলে তাহারা হোটেলে আসিবে না। যদি ভবিষ্যতে তাহারা অশ্বেত জাতিদিগকে এইভাবে অপমান করে, তাহা হইলে আমরা তাহাদের সম্বন্ধে কঠিন ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইব।"

ব্যাপারটি হইয়াছিল এই। কতকগুলি মার্কিণ পর্য্যটক ফরাসী দেশে ভ্রমণ করিতে আসিয়াছিল। তাহারাই হোটেলে রেস্তোরাঁয় অশ্বেত জাতিদিগের প্রতি একরূপ অন্যায় ব্যবহার করিয়াছিল। মার্কিণ পর্য্যটকরা মোটরযোগে ফরাসী দেশের জার্ম্মাণ যুদ্ধের রণস্থল পর্য্যবেক্ষণ করিবে বলিয়া প্যারিস সহরের হোটেলে উঠিয়াছিল। তাহারা যে গাড়ীতে রণস্থল যাত্রা করিবে বলিয়া প্রস্তুত হইয়াছিল, ঘটনাক্রমে ফরাসীদের দুইটি অশ্বেত আলজিরীয় সেনানী সেই গাড়ীতে স্থান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উভয়েরই পোষাকে ফরাসীর সর্ব্বোচ্চ রণসম্মানসূচক (Legion of Honour and Military Cross) নিদর্শন গ্রথিত ছিল। তথাপি মার্কিণ পর্য্যটকরা তাঁহাদের সহিত এক গাড়ীতে ভ্রমণ করিতে আপত্তি উত্থাপন করিল। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর স্থির হইল যে, অশ্বেত ফরাসী সেনানীরা অন্য গাড়ীতে কেবল ফরাসী যাত্রীর সহিত ভ্রমণ করিবেন। আর এক ক্ষেত্রে কয়েকজন মার্কিণ পর্য্যটক এক রেস্তোরাঁ হইতে একজন উচ্চপদস্থ আলজিরীয় ফরাসী প্রজাকে তাড়াইয়া দিবার নিমিত্ত দাবী করিয়াছিল।

মার্কিণ দেশে বিস্তর নিগ্রোর বাস। মার্কিণ যুক্তপ্রদেশের দক্ষিণাংশে নিগ্রোর সংখ্যা অত্যধিক। মার্কিণ জাতি পূর্ব্বে ক্রীতদাসপ্রথার অনুরাগী ছিল এবং পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং আফ্রিকা হইতে বিস্তর ক্রীতদাস আনয়ন করিয়া নিজেদের কৃষিকর্ম্মে নিয়োজিত করিত। যুক্তপ্রদেশের দক্ষিণাংশে কৃষিকার্য্যে বহু নিগ্রো ক্রীতদাস নিযুক্ত হইয়াছিল। মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট এবাহাম লিন্‌কন ক্রীতদাসপ্রথা উচ্ছেদের মূল। ক্রীতদাস প্রথা উঠাইয়া দেওয়ার সম্পর্কে যুক্তপ্রদেশে গৃহবিচ্ছেদ পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়াছিল, উত্তর ও দক্ষিণে ঘোর যুদ্ধ বাধিয়াছিল। যাহা হউক, ইহাতেই বুঝা যায়, মার্কিণরা আফরিকাবাসীদিগের প্রতি কিরূপ সদয়। তাহারা এখনও নিগ্রোদিগকে নিকৃষ্ট জাতি বলিয়া মনে করে। এখনও তাহারা [illegible] নিগ্রোদের Lynch করিয়া থাকে; Lynch করা অর্থে কোন অপরাধে কেহ অপরাধী হইলে তাহাকে পুলিসের হস্তে না দিয়া অথবা বিচারালয়ে তাহার বিচারের প্রতীক্ষা না করিয়া দল বাঁধিয়া স্বহস্তে তাহার শাস্তিবিধান করা। সে শাস্তি পৈশাচিক। এখনও আমেরিকায় 'সুসভ্য' মার্কিণ পৈশাচিক উপায়ে নিগ্রোর উপর প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া থাকে। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি।

আরকানসাস মার্কিণ যুক্তপ্রদেশের একটি প্রদেশ। সেখানে লিটল্ রক নামক একটি জনপদ আছে। কিছুদিন পূর্ব্বে এই স্থানে জন কার্টার নামক একটি নিগ্রো দুইটি শ্বেতাঙ্গিনীর উপর অনাচার আচরণ করে বলিয়া প্রকাশ পায়। তখনই ৩।৪ শত শ্বেতাঙ্গ মার্কিণ তাহাকে ধরিয়া পৈশাচিক তাণ্ডব নৃত্য করিতে করিতে এক বৃক্ষতলে লইয়া যায় এবং অট্ট অট্ট হাসিয়া সেই হতভাগাকে যৎপরোনাস্তি প্রহার করিয়া সেই গাছে লটকাইয়া দেয়। যখন নিগ্রোর দেহ গাছে ঝুলিতে থাকে, তখন এই নরপিশাচরা তাহার উপর অস্ততঃ ৩ শত গুলী ছুড়ে; তাহাতেও তাহাদের আত্মার তৃপ্তি হয় নাই। তাহারা তাহার পর সেই দেহ নামাইয়া লইয়া দড়ী বাঁধিয়া জনপদের সমস্ত পথ দিয়া টানিয়া লইয়া চলিল, সেই উদ্দাম আনন্দ-তাণ্ডবে জনপদের সমস্ত নরনারী যোগদান করিল এবং পরিশেষে সেই দেহ ভস্মীভূত করিয়া তাহারা শান্তিলাভ করিল।

এই পিশাচদেশের পিশাচপ্রকৃতির নরনারী ফরাসী দেশে পদার্পণ করিয়াও যে কৃষ্ণকায় আফরিকাবাসী ফরাসী প্রজাকেও নিগ্রোর মত নিকৃষ্ট বলিয়া মনে করিবে, তাহাতে বিচিত্র কি? সে সময়ে তাঁর বিলাতের 'টাইমস' পত্র লিখিয়াছিলেন, "প্যারিস সহরে মার্কিণের ধনী নিগ্রোরা শ্বেতাঙ্গীর সহিত একত্র বুক মিলাইয়া বেড়াইতে দেখিয়াই ঐ পর্য্যটকরা ক্ষেপিয়া গিয়াছিল। তাই তাহারা আলজিরীয় ফরাসী প্রজাকেও বিষনয়নে দেখিয়াছিল।" আহা হা! কি দরদ! শ্বেতাঙ্গী যদি কৃষ্ণাঙ্গের রূপগুণের চাকচিক্যে মোহে তাহার প্রতি স্বেচ্ছায় আকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে কৃষ্ণাঙ্গের অপরাধ কি? আজকাল ত বহু শ্বেতাঙ্গী অশ্বেত স্বামীই পছন্দ করিতেছে। সে দোষ কাহার? সুতরাং সে কথা তুলিয়া শ্বেতাঙ্গের পশুত্বের দোষক্ষালনের চেষ্টা করিলে চলিবে কেন?

কিন্তু সে যাহা হউক, ফরাসী কর্তৃপক্ষ নিশ্চেষ্ট থাকেন নাই, তাঁহারা এই প্রকৃতির উদ্ধত শ্বেতাঙ্গ পশুর প্রতি কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেই ব্যবস্থার ফলেই ফরাসী দেশে এই ব্যবহারের তারতম্য উঠিয়া যায়। বৃটিশ পার্লামেণ্ট এডিনবরায় সেই ব্যবস্থার অনুসরণ করিতে পারিলেন না কেন? তাঁহাদেরও ত ফরাসীর আলজিরীয় কৃষ্ণাঙ্গ প্রজার মত অসংখ্য কৃষ্ণাঙ্গ ভারতীয় প্রজা আছে।

আসল কথা,—মনোবৃত্তি। ফরাসীর যেটুকু উদার প্রকৃতি আছে, বৃটিশ জাতির তাহা নাই। তাহা না হইলে ফরাসী যখন মার্কিণদের প্রতি কঠোর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তখন ইংরাজের 'অবজার্ভার' কাগজের বিচক্ষণ ও ধীর সম্পাদক মিঃ গার্ডিনার ধৈর্য্যহারা হইয়াছিলেন কেন? তিনি তাঁহার কাগজে স্পষ্টই লিখিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, "ফরাসী য়ুরোপে তাঁহার কৃষ্ণাঙ্গ ভাড়াটিয়া সৈন্য সাহায্যে কর্তৃত্ব করিতে চাহেন বলিয়া এইরূপ করিয়াছেন।"

এই লেখকের মত চিন্তাশীল মনীষী ইংরাজও যদি এইভাবে বর্ণ-বিদ্বেষের বশে ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করেন, তাহা হইলে সাধারণ ইংরাজ স্বচের নিকট কি আশা করা যাইতে পারে? এই কৃষ্ণাঙ্গ ভাড়াটিয়া ভারতীয় সেনা ইংরাজ স্বচকে জার্ম্মাণ-ভীতি হইতে এক দিন পরিত্রাণ করিয়াছিল, এখনও চীনে ইংরাজ স্বচকে রক্ষা করিতেছে, এ কথাটা যাহারা বিস্মৃত হইয়া তাহাদের প্রতি অভদ্র আচরণ করিতে পারে, তাহাদের অকৃতজ্ঞতা ইতিহাসের পত্রাঙ্কে চিরাঙ্কিত হইয়া থাকিবে, সন্দেহ নাই।

উইণ্টার্টন ও আটক আসামী

বাঙ্গালার মসনদে উপবেশন করিবার পর গভর্ণর সার ষ্টানলি জ্যাকসন এমন একটি সৎকার্য্য করিয়াছেন, যাহার জন্য তিনি সমগ্র বাঙ্গালী জাতির হৃদয় জয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি আসিবার অল্প দিন পরেই তিনি আটক রাজবন্দী সুভাষচন্দ্রকে মুক্তিদান করিয়াছেন। সুভাষচন্দ্র সর্ব্বজনপ্রিয়, সুতরাং তাঁহার মুক্তিতে সমগ্র দেশে আনন্দ দেখা দিয়াছে। তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গের কারণেই হউক, আর অন্য যে কারণেই হউক, তাঁহাকে মুক্তিদান করিয়া সার ষ্টানলি তাঁহার উদারহৃদয়ের ও বিচক্ষণ রাজনীতিকতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

তিনি স্বয়ং রাজবন্দীদের আটকের জন্য দায়ী নহেন, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তীরা সে জন্য দায়ী। তাঁহার আগমনের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তীরা কিছুতেই সুভাষচন্দ্র ও অন্যান্য রাজবন্দীকে মুক্তি দিবেন না বলিয়া বার বার ঘোষণা করিয়াছিলেন। এমন কি, রাজবন্দী সুভাষচন্দ্র বসু অসুস্থ হইয়া দিন দিন মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতেছেন শুনিয়াও তাঁহারা বিনা সর্ত্তে তাঁহাকে মুক্তি দিতে সম্মত হয়েন নাই। সে সব কথার পুনরালোচনা এখন নিষ্প্রয়োজন। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সকলেই সুভাষচন্দ্র-প্রমুখ রাজবন্দীদের—বিশেষতঃ সাংঘাতিকরূপে পীড়িত সুভাষচন্দ্রের মুক্তির বিষয়ে একেবারে নিরাশ হইয়াছিল। এমন সময়ে সার ষ্টানলি যেন জলদের মত বাঙ্গালার রাজনৈতিক আকাশে উদয় হইলেন। তিনি সমস্ত কাগজপত্র দেখিয়া সুভাষচন্দ্রের ঘোর অসুস্থতার বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়া তাঁহাকে বিনা সর্ত্তে মুক্তি প্রদান করিলেন। সমস্ত বাঙ্গালার হৃদয় হইতে—বিশেষতঃ বাঙ্গালী সন্তানের জননীগণের অন্তরের অন্তস্তল হইতে উত্থিত হইল বাণী,—'তোমার জয় হউক!'

শাসকের পক্ষে ইহা কত গৌরবের কথা, তাহা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। এই একটি কার্য্যের ফলে বাঙ্গালার স্বরাজ্য দলপতি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সার ষ্টানলির প্রতি সহযোগের হস্ত প্রসারণ করিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন—যদিও সে অবস্থার উদয় হইয়াছিল বলিয়া লোক মনে করে নাই। লোকে আশান্বিত হইয়াছিল, বুঝি বা সার ষ্টানলি এই উদারনীতিই অনুসরণ করিয়া বাঙ্গালার আটক রাজবন্দীদিগকে একে একে মুক্তিদান করিবেন এবং এইরূপে বাঙ্গালার হৃদয় জয় করিয়া রয়াল কমিশন আসিবার কালে সহযোগের পথ প্রশস্ত করিয়া দিবেন।

কিন্তু সে আশা সফল হয় নাই। পার্লামেণ্টে ভারতের 'বিধাতা পুরুষের' পক্ষ হইতে সাফ বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, সুভাষচন্দ্রের মুক্তি একান্ত বিশেষ বিধান, অতঃপর রাজবন্দীদিগকে বন্দী হইবার কারণ দূর না হইলে মুক্তি দেওয়া হইবে না। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, বলডুইন গভর্ণমেণ্টের মনোবৃত্তির বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই। কেবল সুভাষচন্দ্র নিতান্ত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া এবং তাঁহার জীবনের আশঙ্কা ছিল বলিয়া তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে বলডুইন গভর্ণমেণ্টের মনের উদারতার বিন্দুমাত্র পরিচয় পাওয়া যায় না, কেবল দায় এড়াইবার উদ্দেশে যে এই কায করা হইয়াছে, তাহা

সুভাষচন্দ্র বসু

এখন সকলেই বুঝিতেছে। যে অবস্থায় সুভাষচন্দ্রের মুক্তি দেওয়া হইয়াছে সেই অবস্থায় সুভাষচন্দ্র আনীত হইলেন কেন? যখন তাঁহাকে আটক করা হয়, তখন তিনি সুস্থ সবল বলিষ্ঠ কান্তিমান যুবক ছিলেন। আর এখন?

তাহার পর 'কাটা ঘায়ে নুণের ছিটা' দেওয়া আছে। সহকারী ভারত-সচিব আরল উইণ্টার্টন পার্লামেণ্টে বলিয়াছেন,—"সুভাষচন্দ্র রাজনীতিক অপরাধে অপরাধী নহেন, তিনি ভারতীয় দণ্ডবিধির আইন অনুসারে বিপ্লবমূলক অপরাধ করিয়া আইন ভঙ্গ করিয়াছেন।" আরল

উইন্টার্টন আরও বলিয়াছেন যে, "সরকার যে সকল যুবককে বিনা বিচারে আটক করিয়া রাখিয়াছেন, তাহারা এমন অপরাধে অপরাধী, যাহা পাগল ব্যতীত অন্য কোনও লোক সমর্থন করিবে না।"

কি প্রমাণে আরল উইন্টার্টন আজ জগতের সমক্ষে দাঁড়াইয়া বিনা বিচারে আটক রাজবন্দীদের বিপক্ষে এমন কঠিন মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ নাই। তিনি যে প্রমাণ দাখিল করিয়াছেন, তাহার কোনও মূল্য নাই, সে প্রমাণ মামুলী, এ যাবৎ আমলাতন্ত্র সরকার সেই ভিত্তিহীন প্রমাণ দাখিল করিয়া আসিতেছেন। এই প্রমাণ কেবল পুলিসের কথার প্রমাণ, পুলিস সরকারকে যে রিপোর্ট দিয়াছে, তাহাই সরকার বেদবাক্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন, প্রকাশ্য আদালতের বিচারে তাহার সত্যাসত্য এ যাবৎ নির্দ্ধারিত হয় নাই। স্বেচ্ছাচারমূলক শাসনের লক্ষণই এই যে, প্রকাশ্য আদালতে বিচারের পরিবর্ত্তে শাসকের হুকুমই গৃহীত হয়।

কিন্তু আরল উইন্টার্টন যাহাদের বিপক্ষে এই সব কথা বলিয়াছেন, তাহাদের জবাব দিবার উপায় নাই, কেন না তাহারা আটক আসামী। সুতরাং তিনি যাহা ইচ্ছা তাহা বলিতে পারেন এবং ভিত্তিহীন কথা বলিয়া জগতের সমক্ষে আপন কোট বজায় রাখিতে পারেন। তবে একটা অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে, শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু মুক্তিলাভ করিয়া অসুস্থ অবস্থাতেও এই ভিত্তিহীন যুক্তি খণ্ড বিখণ্ড করিয়া দিয়াছেন। সুভাষচন্দ্র নিজের জন্য এ অবস্থায় কলম ধরিতেন না, তবে উপায়হীন অন্যান্য রাজবন্দীদিগের জন্য তিনি আরল উইন্টার্টনের অন্যায় উক্তির প্রতিবাদ করিয়াছেন।

সুভাষচন্দ্র বিপ্লববাদমূলক অপরাধ করিয়া আইন ভঙ্গ করিয়াছেন, আরল উইন্টার্টন এই কথা বলিয়াছেন। সুভাষচন্দ্র বলিতেছেন, তিনি কোন আইন ভঙ্গ করেন নাই। কোন উচ্চপদস্থ পুলিস কর্ম্মচারীর তাঁহার প্রতি ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ছিল বলিয়াই তাঁহাকে আটক করা হইয়াছিল। অবশ্য এই পুলিস কর্ম্মচারীর নাম সুভাষচন্দ্র প্রকাশ করেন নাই। আরল উইন্টার্টন ইচ্ছা করিলে তাঁহার নিকট নাম জানিতে পারেন। সুভাষচন্দ্র অতঃপর বলিয়াছেন যে, তাঁহার অপরাধই যদি কিছু হইয়া থাকে, তবে সে সম্বন্ধে কোনও বিচারও হয় নাই। তাঁহাকে কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের বা জজের সম্মুখে হাজির করা হয় নাই। তাঁহার বিপক্ষে তাঁহার অপরাধ সম্পর্কিত যে সব কাগজপত্র তৈয়ার করা অথবা মিথ্যা রচনা করা হইয়াছে, তাহা তাঁহার ধৃত হইবার পূর্ব্বে কাহার দ্বারা পরীক্ষিত হইয়াছিল অথবা ধৃত হইবার পরে কাহার দ্বারা পরীক্ষিত হইবে, তাঁহাকে জানিতে দেওয়া হয় নাই। তবে কিরূপে আরল উইন্টার্টন বলিতে পারেন যে, তাঁহার অপরাধের কাগজপত্র উপযুক্ত বিচারকের দ্বারা পরীক্ষিত হইয়াছে?

ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্রসচিব পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, যখন সুভাষচন্দ্রকে অন্যান্য রাজবন্দীকে তাঁহাদের অপরাধের কথা জানানো হয়, তখন তাঁহারা কোন জবাব দেন নাই। সুভাষচন্দ্র বলিতেছেন, এ কথা সত্য নহে। স্বরাষ্ট্রসচিব বলিয়াছিলেন, রাজবন্দীদিগকে তাঁহাদের অপরাধের সম্বন্ধে প্রমাণের কথাও জানানো হইয়াছিল। সুভাষচন্দ্র বলিতেছেন, তিনি জেলে অনেক রাজবন্দীর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছেন যে, স্বরাষ্ট্রসচিবের এ কথা ও সত্য নহে। তাঁহাদের বিপক্ষে যে সকল অভিযোগ করা হইয়াছিল, তাহা দ্বারা পুলিস তাঁহাদের বিপক্ষে কি প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহা জানা যায় নাই। সুতরাং তাঁহারা কিসে বিপ্লবমূলক অপরাধ করিয়া আইন ভঙ্গ করিয়াছেন, তাহা উহাতে জানা যায় না।

তাহার পর সুভাষচন্দ্র বলিয়াছেন, ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে একজন পুলিস কর্ম্মচারী তাঁহার সহিত মান্দালে জেলে সাক্ষাৎ করিয়া বলেন যে, তাঁহার অপরাধ সম্বন্ধে কাগজে কলমে সাক্ষ্য প্রমাণ আছে। সুভাষচন্দ্র তাঁহাকে উহা দেখাইতে আহ্বান করেন এবং বলেন যে, যদি তিনি জিদ করিয়া বলেন যে তাঁহার বিরুদ্ধে কাগজে-কলমে প্রমাণ আছে, তাহা হইলে তিনি বলিতে বাধ্য যে, ঐ প্রমাণ জাল।

সুভাষচন্দ্রের এই উত্তরের উত্তরে আরল উইন্টার্টন কি বলেন, দেখিতে ইচ্ছা করে। সরকার পক্ষ এমনও বলিয়াছেন যে, সাক্ষ্যপ্রমাণের কথা প্রকাশ করা অনেকের পক্ষে বিপজ্জনক হইতে পারে, কেন না যাহারা উহা সংগ্রহ করিয়াছে, তাহাদের পরিচয় প্রকাশিত হইলে বিপ্লববাদীদের হস্তে তাহাদের জীবনের আশঙ্কা আছে। সুভাষচন্দ্র পর পর কয়টি বিপ্লববাদঘটিত মামলার দৃষ্টান্ত উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সে সকল মামলায় প্রকাশ্য সাক্ষীর অভাব হয় নাই অথবা কাহারও জীবনের আশঙ্কা হয় নাই। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হইবে। মিঃ ডের হত্যাকারীর বিপক্ষে অনেকে সাক্ষ্য দিয়াছিল। পুলিস সন্দেহ করে যে, হত্যাকারী গোপীনাথ একক ছিল না, তাহার পশ্চাতে বিপ্লববাদী দলের অনেকে ছিল। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে গোপীনাথের বিপক্ষে সাক্ষ্যদানকারীদের জীবনের আশঙ্কা অদ্যাপি হয় নাই কেন? সুতরাং প্রকাশ্য বিচার হইলে কাহারও জীবনের আশঙ্কা থাকে, এ কথা প্রমাণাপেক্ষ নহে।

সরকার পক্ষ যদি যথার্থ দেশে শান্তিপ্রতিষ্ঠার কামনা করেন, তাহা হইলে সুভাষচন্দ্রের এ সকল যুক্তির সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া রাজবন্দীদিগকে মুক্তিদান করিয়া তাঁহাদের প্রকাশ্য বিচারের ব্যবস্থা করিবেন। অন্যথা শত রয়্যাল কমিশনেও দেশের অসন্তোষানল নির্ব্বাপিত হইবার সম্ভাবনা নাই।

ভারতের বস্ত্র-শিল্প

বোম্বাই ও অন্যান্য ভারতীয় কাপড়ের কলওয়ালাদের অতি দুঃসময় উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া সরকার তাহাদের ব্যবসায়ের অবস্থা সম্বন্ধে প্রতীকার বিধানের চেষ্টায় তথ্য সংগ্রহার্থ একটি টেরিফ বোর্ড নিযুক্ত করিয়াছিলেন। টেরিফ বোর্ড প্রায় এক বৎসরকাল বহু পরিশ্রম করিয়া নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়া অবস্থা প্রতীকারের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া সরকারের সকাশে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছিলেন। অবশ্য রাজা হরিকিষণ কৌল ও মিঃ শুভারাও এই সদস্যদ্বয়ের সহিত বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মিঃ নইস সকল বিষয়ে একমত হইতে পারেন নাই, এ জন্য একটি মেজরিটি রিপোর্ট ও একটি মাইনরটি রিপোর্ট দাখিল হইয়াছিল; পরন্তু বোর্ড সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে আর একটি রিপোর্ট দাখিল করিয়াছিলেন। তবে প্রেসিডেন্ট ও সদস্যদ্বয় ইহা স্বীকার করিয়াছেন যে, জাপানের সহিত অসম প্রতিযোগিতার ফলে বোম্বাইয়ের বস্ত্রশিল্পের দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে এবং এই হেতু বোম্বাইয়ের কলজাত পণ্য রক্ষা করা প্রয়োজন। দুই জন ভারতীয় সদস্য বলিয়াছেন, ৩২ নং এবং তাহার উর্দ্ধতন নম্বরের জন্য পাউণ্ড প্রতি ২ আনা হিসাবে বাউন্টি দেওয়া কর্ত্তব্য।

প্রেসিডেণ্ট মিঃ নইস ইহার সহিত একমত হইতে পারেন নাই। তিনি জাপানী কার্পাস পণ্যের উপর বর্ত্তমানে নির্দ্ধারিত শুল্কের উপর শতকরা আরও ৪ টাকা শুল্ক বৃদ্ধি করিতে বলিয়াছেন। আর প্রেসিডেণ্ট ও সদস্যরা একযোগে বলিয়াছেন যে, কার্পাস শিল্পের কল-কব্জা ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যসম্ভারের আমদানী শুল্ক একেবারে উঠাইয়া দিতে হইবে। আশ্চর্য্যে কথা, ভারত-সরকার ইহার মধ্যে কোনও পরামর্শ গ্রহণ করেন নাই। কেবল দয়াপূর্ব্বক এইটুকু করিয়াছেন যে, মাত্র ৩ বৎসর কালের জন্য বস্ত্র-শিল্পের কল-কব্জা ও দ্রব্যসম্ভারের উপর আমদানী শুল্ক উঠাইয়া দেওয়া হইবে!

পর্ব্বত মূষিক প্রসব করিল। এই যে বোর্ড বসান হইল, ইহার খরচ হইবে অনুমান দেড় লক্ষ টাকা। সাধারণের এত টাকা খরচ করিয়া এই বোর্ড তাহা হইলে বসান হইল কেন? সরকার নিশ্চিতই বুঝিয়াছিলেন যে, বোম্বাইয়ের কলজাত পণ্যের অবস্থা শোচনীয়, তাহার উন্নতির উপায়-বিধান করা আশু কর্ত্তব্য। এই জন্য তদন্ত বোর্ড বসাইয়াছিলেন। কিন্তু বোর্ড যে প্রতীকারোপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন, তাহা গ্রহণ করিলেন না। এ অদ্ভুত খেলার অর্থ কি?

সম্ভবতঃ সার বেসিল ব্লাকেটের কারেন্সী নীতির বিপক্ষে বোম্বাইয়ের ধনী মহাজনদিগের চীৎকার বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে এই বোর্ড বসান হইয়াছিল। ইহা যেন কতকটা মোয়া দিয়া ছেলে ভুলানর মত। হয় ত বা প্রথমে সরকার বোম্বাইয়ের কার্পাস-শিল্পের শোচনীয় অবস্থার উন্নতিবিধানে অভিলাষী হইয়াছিলেন। ইহা সত্য যে, বোম্বাইয়ের বস্ত্র-ব্যবসায়ীদের দোষে এমন অবস্থা উপস্থিত হয় নাই। বিদেশী ব্যবসায়ের অন্যায় প্রতিযোগিতার ফলে যে এই অবস্থা উপনীত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। জাপানের কলওয়ালারা কারখানা আইন মানেন না, কাজেই শ্রমিক নিয়োগে তাঁহাদের যে সুবিধা আছে, অপরের পক্ষে সে সুবিধা নাই। তাহার উপর জাপ-সরকার নানারূপে তাঁহাদের দেশের ব্যবসাদারকে সাহায্য করিয়া থাকেন। সুতরাং সে প্রতিযোগিতায় ভারতীয় ব্যবসাদাররা দাঁড়াইতে পারেন না। সে ক্ষেত্রে যদি ভারত-সরকার প্রথমে সত্যই তাঁহাদিগের সাহায্যকল্পে বোর্ড বসাইয়া থাকেন, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। বোর্ডের রিপোর্ট যদি ন্যায়-সঙ্গত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পরেই গত ফেবরারি মাসে সরকার উহা অগ্রাহ্য করিতে পারিতেন। এমন কি, ভারতীয় কল-ওয়ালা সমিতির সহিত সরকার পক্ষীয় সার জর্জ্জ রেনী যখন পরামর্শ বৈঠকে বসেন, তখনও তিনি আশা দিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের বিষয় সরকার সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। তবে হঠাৎ আজ সরকার বোর্ডের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিলেন কেন? ইহাতে কি মনে হয় না, সরকারের এই মনোভাব পরিবর্ত্তনের মূলে কিছু গূঢ় রহস্য নিহিত আছে? আজ চীনে অশান্তির উদ্ভব হইয়াছে, এই হেতু সরকার কি জাপানকে অসন্তুষ্ট করিতে চাহেন না বলিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন?

ধরিতে গেলে কার্পাস শিল্পই ভারতের ব্যবসায় ক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রধান। টাটার লৌহের কারখানা কয়দিন হইয়াছে? কিন্তু বোম্বাইয়ের বস্ত্রশিল্প বহুদিন নানা বাধা বিঘ্নের সহিত যুদ্ধ করিয়া টিকিয়া রহিয়াছে। এই ব্যবসায়ে মূলতঃ ভারতীয় মূলধন ব্যবহৃত হয় এবং ইহাতে ভারতীয়রা কর্ত্তৃত্ব করে, ভারতীয় শ্রমিকরা উদরান্ন সংস্থান করে। এই ব্যবসায় অন্তঃশুল্ক বাবদ সরকারকে কোটি কোটি টাকা এ যাবৎ প্রদান করিয়া আসিয়াছে। সুতরাং সরকার ও প্রজা, উভয় পক্ষের নিকট হইতে এই ব্যবসায় নিশ্চিতই সহানুভূতি ও সাহায্যের প্রত্যাশা করে। এই ব্যবসায়ের বর্ত্তমান সঙ্কট-কালে উহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করা কি সরকারের কর্ত্তব্য ছিল না?

এই সকল কারণ বিদ্যমান ছিল বলিয়াই সরকার নিশ্চিতই টেরিফ বোর্ড বসাইয়াছিলেন। টেরিফ বোর্ডও এই ব্যবসায়ের সঙ্কটজনক অবস্থা বুঝিয়াই প্রতীকারোপায় নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। কোন কোন ব্যবসায়ী বোম্বাই-ওয়ালা বলেন যে, টেরিফ বোর্ডের পরামর্শও সঙ্কট-মোচনের পক্ষে যথেষ্ট নহে। কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহারা যতটুকু প্রতীকার-পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তাহাও যে বিশেষ বিবেচনার পর করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। অথচ সরকার এক কলমের আঁচড়ে তাঁহাদের পরামর্শ উড়াইয়া দিলেন।

লৌহ-শিল্প রক্ষণের সম্পর্কিত আইনের পাণ্ডুলিপির

আলোচনা কালে সরকারের শিল্পবাণিজ্য সদস্য বলিয়াছেন যে, তদন্ত বোর্ডের সদস্যগণ বিশেষজ্ঞ, অতএব পরিষদ্ যেন তাঁহাদের পরামর্শ বিশেষ বিবেচনার সহিত আলোচনা করিয়া দেখেন। এ কথা কি বস্ত্রশিল্পের জন্য নিয়োজিত টেরিফ বোর্ডের সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইতে পারে না? তাঁহারা বিশেষজ্ঞ না হইলে সরকার তাঁহাদিগকে বাছিয়া নিয়োগ করিতেন না। এই বিশেষজ্ঞরা প্রায় এক বৎসর ধরিয়া বিশেষ যত্ন সহকারে তথ্য সংগ্রহ করিবার পর অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। অথচ সরকার অনায়াসে এক নিঃশ্বাসে তাঁহাদের পরামর্শ উড়াইয়া দিলেন! যদি সরকার বুঝিয়া থাকেন যে, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত কোন কোন বিষয়ে ভ্রান্ত, তাহা হইলে সরকার ত সেই সেই বিষয়ে তাঁহাদের উপর পুনর্বিচারের ভার দিলে পারিতেন। তাহা না করিয়া সরাসরি সমস্ত সিদ্ধান্ত উড়াইয়া দেওয়া হইল কেন, জনসাধারণ সরকারকে তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারে কি? ইহার পর জনসাধারণ যদি ধারণা করে যে, সরকার টেরিফ বোর্ডের সিদ্ধান্তের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়গুলির কোনও দোষ বাহির করিতে পারেন নাই, কেবল সাম্রাজ্যের সুবিধা দেখিবার জন্য জাপানের ও ল্যাঙ্কাশায়ারের মন যোগাইয়া বোর্ডের সিদ্ধান্ত নাচক করিয়াছেন, তাহা হইলে তাহাদিগকে বিশেষ অপরাধে অপরাধী করা যায় কি?

কলকব্জা ও দ্রব্য সম্ভারের উপর ৩ বৎসরের জন্য শুল্ক উঠাইয়া দিয়া ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের কি উন্নতি হইবে, তাহাও বুঝা যায় না। ইহা দ্বারা বিলাতের কলকব্জার কারখানা ওয়ালাদের সুবিধা হইবে বটে। এই শুল্কের পরিমাণ ৪৫ লক্ষ টাকা, তন্মধ্যে কলকব্জার দরুণ ৩৫ লক্ষ ও দ্রব্য সম্ভারের দরুণ ১০ লক্ষ টাকা। কলকব্জার উপর আমদানি শুল্ক উঠাইয়া দিলে বোম্বাইয়ের কলওয়ালাদের বিশেষ লাভ নাই। কেন না, যাহাদের কল আছে, তাহারা নূতন কল-কব্জা কিনিতে যাইবে না। বিশেষতঃ বোম্বাইয়ের বস্ত্রশিল্পের কলওয়ালাদের বর্ত্তমান অবস্থায় নূতন কল-কব্জা কিনিয়া কল চালানো অসম্ভব। সূক্ষ্ম সূতার ও মোটা সূতার কাপড় প্রস্তুতের কারবার সম্পূর্ণ বিভিন্ন। একের জন্য যে কল প্রয়োজন হয়, অপরের জন্য তাহা হয় না। ভারতের পক্ষে সূক্ষ্ম সূতার কাপড় প্রস্তুতের কারবার সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া ধরিতে হইবে। বোম্বাইয়ের কলওয়ালাদের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থা যেরূপ, তাহাতে নূতন কারবারে হাত দেওয়া তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং মনে হয়, কলকব্জার উপরে ৩ বৎসরের জন্য শুল্ক উঠাইয়া দিলে লাভবান্ হইবে এ দেশের বিদেশী ব্যবসাদাররা। তাহারা সস্তায় কলকব্জা আনিয়া এই নূতন কারবার প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে। আর একটা কথা। এ দেশের কোন কোন ব্যবসায়ী কল-কব্জার নানা অংশ এদেশে প্রস্তুত করিয়া ব্যবসায় চালাইতেছে। বিলাতের আমদানি কলকব্জা সস্তা হইলে তাহাদের কারবার মাটী হইবে।

অতএব যে দিক দিয়াই দেখা যাউক, সরকারের সিদ্ধান্ত এ দেশের পক্ষে কোন মতেই ফলদায়ক হইবে না। সরকার সাম্রাজ্যের স্বার্থের খাতিরে ভারতের স্বার্থকে অনাদর করিয়া যে মনোবৃত্তির পরিচয় প্রদান করিলেন, তাহা এদেশের ব্যবসায়ের পক্ষে শুভ নহে।

সম্পাদক—শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, বসুমতী 'রোটারী মেসিনে' শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
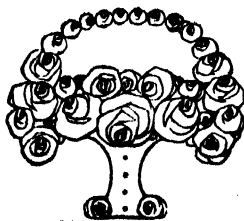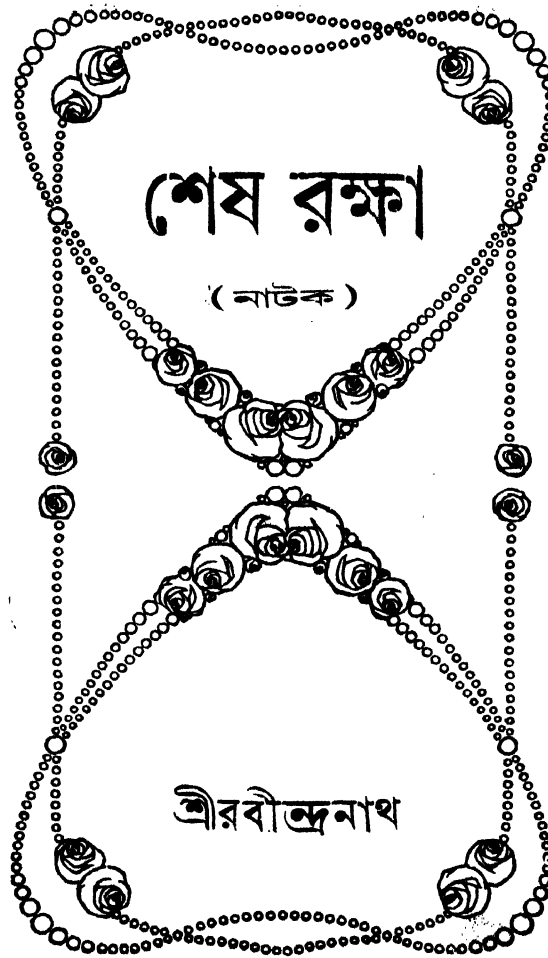
শেষ রক্ষা

(নাটক)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ

শেষ রক্ষা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নিবারণ বাবুর বাসা

ক্ষান্তমণি ও ইন্দু

ক্ষান্ত

কি আর বলব আমি তোকে, আমার ত হাড় জ্বালাতন! আমার ঘরে যতগুলো লোক জোটে সব চেয়ে লক্ষ্মীছাড়া হচ্চে ঐ বিনোদ।

ইন্দু

সেই জন্যেই লক্ষ্মীদের মহলে সব চেয়ে তার পসার ভারী —লক্ষ্মী যে ছাড়ে, লক্ষ্মী তারি পিছনে পিছনে ছোটে।

ক্ষান্ত

কেন ভাই তোর ওকে পছন্দ না কি?

ইন্দু

আরেকটু হলেই হ'তে পারত, কিন্তু সে ফাঁড়া কেটে গেছে।

ক্ষান্ত

কী করে কাটল।

ইন্দু

দিদি আগেই তাকে পছন্দ করে বসে আছে। আমাকে আর সময় দিলে না।

ক্ষান্ত

বলিস্ কি? কমল না কি? সে ওকে দেখলে কখন?

ইন্দু

দেখে নি। সেইটেই তো বিপদ। শব্দভেদী বাণের কথা রামায়ণে শোনো নি?

ক্ষান্ত

শুনেচি।

ইন্দু

সব চেয়ে শক্ত বাণ হোলো সেইটে। শব্দের রাস্তা বেয়ে কখন এসে বুকে বেঁধে, কেউ দেখতেই পায় না।

একটু ভাই বুঝিয়ে বল। তোদের মতো আমার অত পড়াশুনো নেই।

ইন্দু

সেইটেতেই তোমার রক্ষে। নইলে কেবল পড়াশোনার জোরেই মরণ হতে পারত, দেখাশোনার দরকার হ'ত না। তোমার বিনোদ বাবু যে কবি তা জানো না!

ক্ষান্ত

তা হোক্ না কবি, হয়েচে কি?

ইন্দু

কমল দিদি ওর বই লুকিয়ে পড়ে। সেইটেই খারাপ লক্ষণ। বিনোদ বাবুর "আঙুরলতা" বইখানা ওর বালিশের নীচে থাকে। আর তাঁর "কানন-কুসুমিকা" রেখেচে ধোবার বাড়ির হিসেবের খাতার তলায়।

ক্ষান্ত

কিন্তু ওর মুখে তো বিনোদ বাবুর নামও শুনিনি।

ইন্দু

নামটা বুকের মধ্যে বাসা করেচে, তাই মুখে বের হতে চায় না।

ক্ষান্ত

কী যে বলিস্, বুঝতে পারি নে—ওর লেখায় এমন কী মন্ত্র আছে বলত। আমাকে একটু নমুনা দে দেখি!

ইন্দু

তবে শোনো—

রসনার ভাষা নাই, থাকি চুপে চুপে,
অন্তরে জোগায় সে যে বাণী;
সময় পায়না আঁখি মজিবারে রূপে,
গোপনে স্বপনে তারে জানি।

ক্ষান্ত

হায় রে, কি শব্দভেদী বাণেরই নমুনা!

ইন্দু

কমল দিদি খাতায় লিখে রেখেচে, এই ওর জপের মন্ত্র। শব্দভেদী বাণের যে জোর কত, তা প্রত্যক্ষ দেখতে চাও?

চাই বই কি, জেনে রাখা ভালো।

ইন্দু

(নেপথ্যে চাহিয়া) দিদি দিদি!

(শেলাই হাতে কমলের প্রবেশ)

কমল

কেন? হয়েছে কি?

ইন্দু

এখনো বিশেষ কিছু হয় নি, কিন্তু হতে কতক্ষণ! বিধাতা আমাদের চেয়েও পর্দ্দানশীন, আড়ালে বসে বসে তোমার সাধের স্বপনকে মূর্ত্তি দিচ্চেন।

কমল

সে খবর দেবার জন্যে তোমায় ডাকাডাকি করতে হবে না।

ইন্দু

তা জানি ভাই, খবর পাকা হলে বিধাতা আপনিই দূত পাঠিয়ে দেবেন। আমি সে জন্যে ভাবিও নি। সখী-পরিষদে আমাকে গান গাইতে ধরেচে। স্বরলিপি থেকে তুমি যে নতুন গানটি শিখেচ, আমাকে শিখিয়ে দাও। ক্ষান্ত দিদিও সেই জন্যে বসে আছেন—আমি জানি, তোমার গান উনি চন্দ্রবাবুর চটি জুতোর আওয়াজের প্রায় সমতুল্য বলেই জানেন।

ক্ষান্ত

ইন্দুর কথা শোনো একবার! এ আবার আমি কবে বললুম।

ইন্দু

তা হলে সমতুল্য বলাটা ভুল হয়েচে, তার চেয়ে না হয় কিছু নীরসই হোলো। সে তর্ক পরে হবে, তুমি গান গাও।

কমল। (গান)

ডাকিল মোরে জাগার সাথী।
প্রাণের মাঝে বিভাস বাজে
প্রভাত হোলো আঁধার রাতি।
বাজায় বাঁশী তন্দ্রাভাঙা,
ছড়ায় তারি বসন রাঙা,
ফুলের বাসে এই বাতাসে
কি মায়াখানি দিয়েছে গাঁথি।
গোপনতম অন্তরে কি
লেখন রেখা দিয়েছে লেখি?
মন তো তারি নাম জানে না,
রূপ আজিও নয় যে চেনা,
বেদনা মম বিছায়ে দিয়ে
রেখেছি তারি আসন পাতি।

ইন্দু

ক্ষান্ত দিদি ঐ চেয়ে দেখ, বাণ পৌঁচেছে।

ক্ষান্ত

কোথায়?

ইন্দু

আমাদের এই গলির আকাশ পার হয়ে, ঠেকেচে গিয়ে তোমাদের বাড়ির ঐ দরজাতে।

ক্ষান্ত

ইন্দু, তুই স্বপ্ন দেখচিস না কি?

ইন্দু

ঐ দেখোনা তোমাদের বন্ধ দরজার খড়খড়ে খুলে গেচে।

ক্ষান্ত

তা তো দেখচি।

ইন্দু

কমল দিদি, বুঝতে পেরেচ?

কমল

আঃ কি যে বকিস, তার ঠিক নেই।

ইন্দু

ঐ খোলা খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে কবি-কুঞ্জবনের দীর্ঘ নিশ্বাস উচ্ছ্বসিত। ঐ খড়খড়ির পিছনে একটা ধড়ফড়ানি দেখতে পাচ্চ ?

কমল

কিসের ধড়ফড়ানি ?

ইন্দু

সেই খবরটাই তো চোখের আড়ালে রয়ে গেল।

হায়রে,

ওরে যায় না কি জানা ?
নয়ন ওরে খুঁজে বেড়ায়
পায় না ঠিকানা।
অলখ পথেই যাওয়া-আসা,
শুনি চরণধ্বনির ভাষা,
গন্ধে শুধু হাওয়ায় হাওয়ায়
রইল নিশানা ॥
কেমন করে জানাই তারে
বসে আছি পথের ধারে ?
প্রাণে এলো সন্ধ্যাবেলা,
আলোয় ছায়ায় রঙীন খেলা,
ঝরে-পড়া বকুলদলে বিছায় বিছানা ॥

ক্ষান্ত

ওলো ইন্দু, দেখ দেখ, খড়খড়ে আরো ফাঁক হয়ে উঠলো যে।

ইন্দু

এবার তুমি যদি গান ধরো, তা হলে দেয়ালসুদ্ধ ফাঁক হয়ে যাবে।

ক্ষান্ত

আর ঠাট্টা করতে হবে না, যাঃ। তোর কথা শুনে ভেবেছিলুম একা কমলই বুঝি শব্দভেদী বাণের তীরন্দাজ। বিধাতা কি তোদের সকলেরই গলায় বাণ বোঝাই করে-চেন ? হাতের কাছে এত বিপদ জমা হয়ে আছে এতো জানতুম না।

সৃষ্টিকর্ত্তা সঙ্কল্প করেচেন পুরুষমেধ যজ্ঞ করতে—তারি সহায়তায় নারীদের ডাক পড়েচে। সবাই ছুটে আসচে, কেউ কণ্ঠ নিয়ে, কেউ কটাক্ষ নিয়ে, কারো বা কুটিল হাস্য, কারো বা কুঞ্চিত কেশকলাপ, কারো বা সর্ষের তেল ও লঙ্কার বাটনাযোগে বুক-জ্বালানী রান্না।

ক্ষান্ত

কিন্তু তোদের সব বাণই কি ঐ একটা খড়খড়ে দিয়ে গল্‌বে না কি ?

ইন্দু

কবির হৃদয়টা দরাজ, বড়ো বোনের পাকা হাত আর ছোটো বোনের কাঁচা হাত কারো লক্ষ্যই ফসকায় না।

ক্ষান্ত

তা যেন হোলো তার পরে অংশ নিয়ে তোদের মাম্‌লা বাধবে না ?

ইন্দু

তাই তো বলে রেখেছি, আমি দাবী করব না।

কমল

এত নিঃস্বার্থ হবার দরকার কি ?

ইন্দু

কমল দিদি, জীবনের অঙ্কশাস্ত্রে পুরুষরা আছে গুণের কোঠায়, মেয়েরা ভাগের কোঠায়। ওদের বেলায় দুইয়ের দ্বারা হয় দ্বিগুণ, আমাদের বেলায় দুইয়ের দ্বারা হয় দু'ভাগ। তাই তোমাকে রাস্তা ছেড়ে দিয়েছি—নইলে দুই বোনে মিলে ঐ খড়খড়েটার কব্‌জা এতদিনে ঝর্‌ঝরে করে দিতুম।

কমল

কেন, রাস্তা কি আমি ছাড়তে জানিনে ?

ইন্দু

আমি ওঁর কবিতা-বিছানো রাস্তায় এক পা চল্‌তে পারব না। মানেই বুঝতে পারিনে—হুঁচট খেয়ে মরব।

ক্ষান্ত

তোরা দুজনে মিলে রফা-নিষ্পত্তি করে নে—আমার কাজ আছে যাই।

ইন্দু

বেলা গিয়েচে, এখন আবার তোমার কাজ ?

যত বেকারের দল, কখন কি খেয়াল যায় ঠিক নেই—হয় তো হঠাৎ হুকুম হবে তপসী মাছ ভাজা চাই—নয় তো কড়াইশুটির কচুরী—নয়তো হাঁসের ডিমের বড়া।

ইন্দু

একটু দাঁড়াও, আমরাও যাচ্চি। তোমার সঙ্গে কর্ম্মবিভাগ করে নেব। আমরা লাগব চেয়ে দেখবার কঠিন কাজে। কমল দিদি, ঐ দেখ, খড়খড়েটা লুব্ধ চকোরের চঞ্চুর মত এখনো হাঁ করে রয়েছে। দেখে দুঃখ হচ্চে।

কমল

এত দয়া যদি, তো সুধা তুমিই ঢালোনা। আমি চল্লুম।

ইন্দু

না দিদি,

যাবার বেলা শেষ কথাটি যাও বলে,
কোন্‌খানে যে মন লুকানো দাও বলে।
চপল লীলা ছলনা ভরে
বেদনখানি আড়াল করে,
যে-বাণী তব হয়নি বলা নাও বলে॥
হাসির বাণে হেনেচ কত শ্লেষকথা,
নয়নজলে ভরো গো আজি শেষকথা।
হায়রে অভিমানিনী নারী
বিরহ হোলো দ্বিগুণ ভারী
দানের ডালি ফিরায়ে নিতে চাও বলে॥

আচ্ছা ভাই, ক্ষান্তদিদি, ঐ খড়খড়ের পিছনে কোন্ মানুষটি ব'সে আছে আন্দাজ করো দেখি? চন্দর বাবু?

ক্ষান্ত

না ভাই, তার আর যাই দোষ থাক্, তোদের শব্দভেদী বাণ তাকে পৌঁছয় না, সে আমি খুব দেখে নিয়েচি।

ইন্দু

অর্থাৎ আমাদের চন্দ্রের যা কলঙ্ক সেটা কেবল মুখের উপরে, তার জ্যোৎস্নায় কোন দাগ পড়ে না। তোমাদের লক্ষ্মীছাড়া দলে আর কে আছে নাম করো দেখি?

ক্ষান্ত

আর এক জন আছে, তার নাম গদাই।

ইন্দু

আরে ছি ছি ছি ছি। অমন নাম যার তার খড়খড়ে চিরদিন বোজা থাকে।

ক্ষান্ত

নাম শুনেই যে তোর—

ইন্দু

নামের দাম কম নয় দিদি। ভেবে দেখো তো, দৈব-দুর্যোগে গদাই যদি কাননকুসুমিকার কবি হ'ত, তা হ'লে কবির নাম জপ করবার সময় দিদি কি মুস্কিলেই পড়ত! ভক্তি হোতো না সুতরাং মুক্তিও পেতো না।

কমল

দিদির মুক্তির জন্যে তোমাকে অত ভাবতে হবে না। এখন নিজের কথা চিন্তা করবার সময় হয়েচে।

ইন্দু

সেই জন্যেই তো নাম বাছাই করতে লেগে গেছি। সময় নষ্ট করতে চাইনে। আমার স্বয়ম্বর সভায় নিমন্ত্রণের ফর্দ্দ থেকে গদাই নামটা কাটা পড়ল।

কমল

তা হলে এই বেলা তোমার পছন্দসই নামের একটা ফর্দ্দ করা যাক্। কুমুদ কি রকম?

ইন্দু

চলে যায়।

কমল

নিকুঞ্জ?

ইন্দু

চল্‌তেও পারে, কিন্তু উপবাসের মুখে, অর্থাৎ দ্বাদশী তিথিতে।

কমল

পরিমল?

ইন্দু

মালা-বদলের সময় নাম-বদল করতে হবে, সে হবে ইন্দু, আমি হব পরিমল। যা হোক্ এগুলো চল্‌তেও পারে—কিন্তু গদাই? নৈব নৈবচ।

কান্ত

কি যে পাগলামি করচিস্ ইন্দু! চল্ আমার কাজ আছে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

চন্দ্রবাবুর বাসা

চন্দ্র

ভাই বিন্‌দা, তোমাকে দেখে বোধ হচ্চে, আজ তোমার ভালোমন্দ একটা কিছু হোলো বলে, কিম্বা হয়েই বসেচে।

বিনোদ

তাই না কি?

চন্দ্র

আজ তোমার দৃষ্টিটা ছুটেচে যেন কোন্ মায়ামৃগীর পিছু পিছু। গেছে তার পথ হারিয়ে। ওহে আজকের হাওয়ায় তোমার গায়ে কারো ছোঁয়াচ লাগচে না কি?

বিনোদ

কিসে ঠাওরালে?

চন্দ্র

মুখের ভাবে।

বিনোদ

ভাবটা কি রকম দেখচ?

চন্দ্র

যেন ইন্দ্রধনু উঠেচে আকাশে, আর তারি ছায়াটা শিউরে উঠচে নদীর ঢেউএ।

বিনোদ

বলে যাও,—

চন্দ্র

যেন আষাঢ়-সন্ধেবেলায় যুঁইগাছের গাঁঠে গাঁঠে কুঁড়ি ধরল বলে; আর দেরী নেই।

বিনোদ

আরো কিছু আছে?

চন্দ্র

যেন "নব জলধরে বিজুরী রেহা
দ্বন্দ্ব পসারি গেলি।"

বিনোদ

থামলে কেন, বলে যাও।

চন্দ্র

যেন বাঁশীটি আজ ঠেকেচে এসে গুণীর অধরে। সত্যি করে বল্ ভাই, লুকোস্‌নে আমার কাছে।

বিনোদ

তা হতে পারে। একটা কোন্ ইসারা আজ গোধূলিতে উড়ে বেড়াচ্চে, তাকে কিছুতে ধরতে পারচিনে।

চন্দ্র

ইসারা উড়ে বেড়াচ্চে? সেটা প্রজাপতির ডানায় না কি?

বিনোদ

যেন অন্ধ মৌমাছির কাছে রজনীগন্ধার গন্ধের-ইসারা।

চন্দ্র

হায় হায়, হাওয়াটা কোন্ দিক্ থেকে বইচে, তার ঠিকানাই পেলে না?

বিনোদ

পোষ্টআপিসের ঠিকানাটা পাওয়া শক্ত নয় চন্দরদা। কিন্তু স্বর্ণরেণু কোথায় আছে লুকিয়ে, সেই ঠিকানাটাই—

চন্দ্র

সর্ব্বনাশ করলে! এরি মধ্যে স্বর্ণের কথাটা মনে এসেচে? সাদা ভাষায় ওর মানে হচ্চে পণের টাকা—তোমার রজনীগন্ধার গন্ধটা তা হ'লে ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীটের দিক্ থেকেই এলো বুঝি?

বিনোদ

ছি ছি চন্দ্র, এমন কথাটাও তোমার মুখ দিয়ে আজ বেরোলো! আমি তুচ্ছ টাকার কথাই কি ভাবচি?

চন্দ্র

আজকালকার দিনে কোন্‌টা তুচ্ছ, কন্যাটা, না পণটা, তার হিসেব করা শক্ত নয়। যুবকরা তো সোনার মৃগ দেখেই ছোটে, সীতা পড়ে থাকেন পশ্চাতে।

বিনোদ

যুবক যে কে, সে কি তার বয়স গুণে বের করতে হবে, আর সোনার রেণু যে কাকে বলে, সে কি বুঝবে তার ভরি ওজন করে?

চন্দ্র

এটা বেশ বলেচ, তোমার কবিতায় লিখে ফেল হে, কথাটা আজ বাদে কাল হারিয়ে না যায়। আমার একটা লাইন মনে এলো, তুমি কবি, তা'র পাদপূরণ করে দাও দেখি—

ও ভোলা মন, বল্ দেখি ভাই,
কোন্ সোনা তোর সোনা ?

বিনোদ

কেনাবেচার দেনা-লেনায়
যায় না তারে গোণা।

চন্দ্র

ভ্যালা মোর দাদা। আচ্ছা, আরেক লাইন,

ও ভোলা মন, বল্ সে সোনা
কেমন করে গলে ?

বিনোদ

গলে বুকের দুখের তাপে
গলে চোখের জলে।

চন্দ্র

বহুৎ আচ্ছা। আরেক লাইন,

ও ভোলা মন, সেই সোনা তোর
কোন্ খনিতে পাই ?

বিনোদ

সেই বিধাতার খেয়ালে, যার
ঠিক-ঠিকানা নাই।

চন্দ্র

ক্যা বাৎ! আচ্ছা আর এক লাইন—

ও ভোলা মন, সোনার সে ধন
রাখবি কেমন করে ?

বিনোদ

রাখব তারে ধ্যানের মাঝে
মনের মধ্যে ভরে।

চন্দ্র

বাস, আর দরকার নেই ফুল মার্ক পেয়েছ—পাস্ড্ উইথ অনার্স। আর ভয় নেই সন্ধানে বেরিয়ে পড়া যাক্—

সোনার স্বপন ধরুক না রূপ
অপরূপের হাটে,
সোনার বাঁশি বাজাও রসিক
রসের নবীন নাটে।

বিনোদ

চন্দর দা, কে বলে তুমি কবি নও ?

চন্দ্র

ছায়ায় পড়ে গেছি ভাই, চন্দ্রগ্রহণ লেগেছে—তোমরা না থাক্‌লে আমিও কবি বলে চ'লে যেতে পারতুম, কবি সম্রাট নাও যদি হতুম অন্তত কবি-তালুকদার হওয়া অসম্ভব ছিল না। দেখেছি, প্রাণের ভিতরটাতে মাঝে মাঝে রস উছলে ওঠে—কিন্তু তার ধারাটা মাসিক পত্র পর্য্যন্ত পৌঁছয় না!

বিনোদ

ঘরেই আছে রস-সমুদ্র, সেইখানেই লুপ্ত হয়ে যায়।

চন্দ্র

একসেলেণ্ট! কবি না হলে এই গূঢ় খবর আন্দাজ করতে পারত কে বলো? ঐ যে আস্‌চে আমাদের মেডিকাল ষ্টুডেণ্ট!

(গদাইয়ের প্রবেশ)

চন্দ্র

এই যে গদাই! শরীরতত্ত্ব ছেড়ে হঠাৎ কবির দরবারে যে। তোমার বাবা জান্‌লে যে শিউরে উঠবেন।

গদাই

না ভাই, প্যাথলজি ষ্টাডি করবার পক্ষে তোদের সংসর্গটা একেবারেই ব্যর্থ নয়। তোদের হৃদয়টা যে সর্ব্বদাই আই ঢাই করচে, সেটা অজীর্ণ রোগের একটি নামান্তর তা জানিস। বেশ ভাল করে আহারটি করলে এবং সেটি হজম করতে পারলে কবিত্ব-রোগ কাছে ঘেঁষতে পারে না। আধপেটা করে খাও, অম্বলের ব্যামোটি বাধাও, আর অমনি কোথায় আকাশের চাঁদ, কোথায় দক্ষিণের বাতাস,

কোথায় কোকিল পক্ষীর ডাক, এই নিয়ে প্রাণ আনচান করতে থাকে—জানলার কাছে বসে বসে মনে হয় কি যেন চাও—যা চাও সেটি যে বাইকার্ব্বোনেট-অফ-সোডা তা কিছুতেই বুঝতে পার না।

চন্দ্র

হৃদ্‌যন্ত্রটির বাসা পাকযন্ত্রের ঠিক উপরেই এ কথা কবিরা মানে না, কিন্তু কবিরাজরা মানে।

গদাই

ঐ যে যাকে ভালবাসা বল সেটা যে শুদ্ধ একটা স্নায়ুর ব্যামো তার আর সন্দেহ নেই। আমার বিশ্বাস অন্যান্য ব্যামোর মত তারো একটা ওষুধ বের হবে।

চন্দ্র

হবে বই কি। কাগজে বিজ্ঞাপন বেরবে—"হৃদয় বেদনার জন্য অতি উত্তম মালিশ,উত্তম মালিশ,উত্তম মালিশ। বিরহনিবারিণী বটিকা। রাত্রে একটি সকালে একটি সেবন করিলে বিরহভার একেবারে নিঃশেষে অবসান।"

আচ্ছা, ভাই বিনু এক কথায় বলে দে দেখি কি রকম মেয়ে তোর পছন্দ!

বিনোদ

আমি কি রকম চাই জান? যাকে কিছু বোঝবার যো নেই। যাকে ধরতে গেলে পালিয়ে যায়—পালাতে গেলে যে ধরে টেনে নিয়ে আসে।

চন্দ্র

বুঝেছি। যে কোন কালেই পুরোণো হবে না। মনের কথা টেনে বলেচ ভাই! পাওয়া শক্ত। আমরা ভুক্তভোগী, জানি কি না, বিয়ে করলেই মেয়েগুলো দুদিনেই বহুকেলে পড়া পুঁথির মত হয়ে আসে; মলাটটা আধখানা ছিঁড়ে ঢল্‌ ঢল্‌ করচে, পাতাগুলো দাগী হয়ে খুলে আস্‌চে—কোথায় সে আঁটসাঁট বাঁধুনি, কোথায় সে সোনার জলের ছাপ। আচ্ছা সে যেন হল আর চেহারা কেমন?

বিনোদ

ছিপ্‌ছিপে, মাটির সঙ্গে অতি অল্পই সম্পর্ক, যেন সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব।

চন্দ্র

আর বেশি বল্‌তে হবে না, বুঝে নিয়েচি। তুমি চাও পদ্যের মত চোদ্দটি অক্ষরে বাঁধাসাঁধা, চল্‌তে ফির্‌তে ছন্দটি রেখে চলে; এ দিকে মল্লিনাথ, ভরত শিরোমণি, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন তার টীকে ভাষ্য করে থই পায় না। বুঝেছ বিন্দা, চাইলেই ত পাওয়া যায় না—

বিনোদ

কেন তোমার কপালে ত মন্দ জোটেনি!

চন্দ্র

মন্দ বল্‌তে সাহস করিনে—কিন্তু ভাই সে গদ্য, তাতে ছাঁদ নেই, ঢীল কলমে লেখা।

গদাই

আর ছাঁদে কাজ নেই ভাই। আবার তোমার কি রকম ছাঁদ সেটাও ত দেখতে হবে!

চন্দ্র

তোরা বুঝবিনে গদাই, ভিতরে গীতগোবিন্দের অল্প একটু আমেজ আছে; সুযোগ ঘটলে ললিতলবঙ্গলতার সঙ্গে ছন্দের মিল হতেও পারত। চাঁদের আলোয় মুখের দিকে চেয়ে বেলফুলের মালা হাতে প্রেয়সী যদি বল্‌ত,—

জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল—

নেহাৎ অসহ্য হ'ত না। প্রেয়সী সর্ব্বদা এসেও থাকেন, কিছুই যে বলেন না এত বড় বদনাম দিতে পারব না। কিন্তু বাক্যগুলো, বিশেষত তার সুরটা এমনটি হয় না

"গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।"

গদাই

দেখ চন্দর দা, বিয়ে করবার প্রসঙ্গে পছন্দ করার কথাটা একেবারেই খাটে না। বিয়েটা হোলো Monotheism আর পছন্দটা হল Polytheism। দুটোর থিয়লজি একেবারে উল্টো। বিয়ের ডেফিনিশনই হচ্চে জন্মের মতো পছন্দ বায়ুটাকে খতম্‌ করে দেওয়া। তেত্রিশ কোটিকে একের মধ্যে নিঃশেষে বিসর্জ্জন করা।

(পাশের বাড়ী হইতে গানের শব্দ।)

বিনোদ

ঐ শোন, গান।

গদাই

কার গান হে?

চন্দ্র

চুপ করে খানিকটা শোনই না। পরে পরিচয় দেব।

নেপথ্যে গান

কাছে যবে ছিলো, পাশে
হোলোনা যাওয়া
চলে যবে গেলো, তারি
লাগিল হাওয়া ॥
যবে ঘাটে ছিল নেয়ে
তারে দেখি নাই চেয়ে
দূর হতে শুনি স্রোতে
তরণী বাওয়া ॥
যেখানে হোলোনা খেলা
সে খেলাঘরে
আজি নিশিদিন মন
কেমন করে।
হারানো দিনের ভাষা
স্বপ্নে আজি বাঁধে বাসা,
আজ শুধু আঁখিজলে
পিছনে চাওয়া ॥

চন্দ্র

বিন্দা আজকাল রাধিকার দলই বাঁশি বাজাতে শিখেচে, কলির কৃষ্ণগুলোকে বাসা থেকে পথে বের করবে। দেখ না, নাড়ীটা বেশ একটু দ্রুত চলচে।

বিনোদ

চন্দ্র, আজ কি কর্‌ব ভাবছিলুম, একটা মৎলব মাথায় এসেছে।

চন্দ্র

কি বল দেখি!

বিনোদ

চল—যে মেয়েটি গান গায় ওর সঙ্গে আজই আমার বিয়ের সম্বন্ধ করে আসি গে।

চন্দ্র

বল কি!

বিনোদ

আর ত বসে বসে ভাল লাগচে না।

চন্দ্র

কিন্তু দেখা শুনা ত করবে, আলাপ পরিচয় ত করতে হবে? আমরা বিয়ে করেছিলুম চোখ বুজে বড়ি গেলার মত, মুখে স্বাদ পেলুম না, পেটের মধ্যে পৌঁছে খুব কষে ক্রিয়া করতে লাগল, কিন্তু তোদের তা তো চলবে না।

বিনোদ

না, তাকে দেখতে চাইনে। আমি ঐ গানরূপটিকে বরণ করব।

চন্দ্র

বিনু, এ কথাটা তোর মুখেও একটু বাড়াবাড়ি শোনাচ্চে! তার চেয়ে একটা গ্রামোফোন কেন্‌ না? এ যে ভাই মানুষ, দেখে শুনে নেওয়া ভালো।

বিনোদ

মানুষকে কি চোখ চাইলেই দেখা যায়? তুমিও যেমন? রাখ জীবনটা বাজি, চোখ বুজে দান তুলে নাও, তার পরে হয় রাজা নয় ফকীর; একেই ত বলে খেলা।

চন্দ্র

উঃ! কি সাহস! তোমার কথা শুন্‌লে আমার মরচে-পড়া বুকেও ঝলক মারে, ফের আর একটা বিয়ে করতে ইচ্ছে করে। না দেখে বিয়ে ত আমরাও করেছি কিন্তু এমনতর মরিয়া করে তোলে নি।

গদাই

তা বলি, যদি বিয়ে করতে হয় নিজে না দেখে বিয়ে করাই ভাল। ডাক্তারের পক্ষে নিজের চিকিৎসা করাটা কিছু নয়। মেয়েটি কে বল ত হে চন্দর দা!

চন্দ্র

আমাদের নিবারণ বাবুর বাড়িতে থাকেন, নাম কমল-মুখী। আদিত্য বাবু আর নিবারণ বাবু পরম বন্ধু ছিলেন। আদিত্য মরবার সময় মেয়েটিকে নিবারণ বাবুর হাতে সমর্পণ করে দিয়ে গেছেন।

গদাই

তুমি তোমার প্রতিবেশিনীকে আগে থাকৃতেই দেখ নি ত?

চন্দ্র

আমার কি আর আশে পাশে দৃষ্টি দেবার জো আছে! আমার এ দুটি চক্ষুই একবারে দস্তখতা শিলমোহর করা, অন্ তার ম্যাজিষ্ট্রিস্ সার্ভিস! তবে শুনেছি বটে দেখতে ভাল এবং স্বভাবটিও ভাল।

গদাই

আচ্ছা এখন তা হলে আমরা কেউ দেখব না, একেবারে সেই বিবাহের রাত্রে চমক লাগবে।

চন্দ্র

তোমরা একটু বোস ভাই আমি অম্‌নি চট করে চাদরটা পরে আসি। এই পাশের ঘরেই।

[প্রস্থান।

পাশের ঘরে

চন্দ্র ও ক্ষান্তমণি

চন্দ্র

বড় বৌ, ও বড় বৌ! চাবিটা দাও দেখি!

ক্ষান্ত

কেন জীবনসর্ব্বস্ব নয়নমণি, দাসীকে কেন মনে পড়ল?

চন্দ্র

ও আবার কি! যাত্রার দল খুল্‌বে না কি? আপাততঃ একটা সাফ দেখে চাদর বের করে দাও দেখি, এখনি বেরতে হবে—

ক্ষান্ত

(অগ্রসর হইয়া) আদর চাই! প্রিয়তম! তা আদর কয়চি!

চন্দ্র

(পশ্চাতে হঠিয়া) আরে ছি ছি ছি! ও কি ও!

ক্ষান্ত

নাথ, বেলফুলের মালা গেঁথে রেখেচি এখন কেবল চাঁদ উঠলেই হয়—

চন্দ্র

ওঃ! গুণবর্ণনা আড়াল থেকে সমস্ত শোনা হয়েচে দেখচি! বড় বৌ কাজটা ভাল হয়নি! ওটা বিধাতার অভিপ্রায় নয়—তিনি মানুষের শ্রবণশক্তির একটা সীমা ঠিক করে দিয়েচেন—তার কারণই হচ্চে পাছে অসাক্ষাতে যে কথাগুলো হয় তাও মানুষ শুন্‌তে পায়; তাহলে পৃথিবীতে বন্ধুত্ব বল, আত্মীয়তা বল কিছুই টিক্‌তে পারে না!

ক্ষান্ত

ঢের হয়েচে গোসাই ঠাকুর, আর ধর্ম্মোপদেশ দিতে হবে না! আমাকে তোমার পছন্দ হয় না, না?

চন্দ্র

কে বল্লে পছন্দ হয় না?

ক্ষান্ত

আমি গণ্ড, আমি পণ্ড নই, আমি শোলোক পড়িনে, আমি বেলফুলের মালা পরাইনে—

চন্দ্র

আমি গললগ্নীকৃতবস্ত্র হয়ে বল্‌চি দোহাই তোমার, তুমি শোলোক পোড়োনা, তুমি মালা পরিয়োনা, ওগুলো সবাইকে মানায় না—

ক্ষান্ত

কি বল্লে?

চন্দ্র

আমি বল্লুম যে, বেলফুলের মালা আমাকে মানায় না, তার চেয়ে সাফ চাদরে ঢের বেশী শোভা হয়—পরীক্ষা করে দেখ!

ক্ষান্ত

যাও যাও আর ঠাট্টা ভাল লাগেনা।

চন্দ্র

(নিকটে আসিয়া) কথাটা বুঝলেনা ভাই! কেবল রাগই করলে। শোন, বুঝিয়ে দিচ্চি :—

ভালোবাসার থার্ম্মোমিটারে তিনমাত্রার উত্তাপ আছে। মানুষ যখন বলে ভালোবাসিনে সেটা হোলো ৯৫ ডিগ্রী, যাকে বলে সাব্-নর্ম্মাল্। যখন বলে ভালোবাসি সেটা হোলো নাইন্টিএইট্ পয়েন্ট ফোর্, ডাক্তাররা তাকে বলে নর্ম্মাল, তাতে একেবারে কোনো বিপদ নেই। কিন্তু প্রেমজ্বর যখন ১০৫ ছাড়িয়ে গেছে, তখন রুগী আদর করে বল্‌তে সুরু করেচে, পোড়ারমুখী,—তখন চন্দ্রবদনীটা একেবারে সাফ ছেড়ে দিয়েছে। যারা প্রবীণ ডাক্তার, তারা বলে এইটেই হোলো মরণের লক্ষণ। বড় বৌ, নিশ্চয় জেনো, বন্ধুমহলে আমিও যখন প্রলাপ বকি,

...মাকে যা না বল্‌বার তাই বলি, তখন সেটা প্রণয়ের ...রিয়ম্‌, তখন বাঁধা আদরের ভাষায় একেবারে কুলোয় না—গাল দিতে না পারলে ভালবাসার ইষ্টিমের চাপে বুক ...টে যায়—বিশ্রী রকমের এক্‌সিডেণ্ট হ'তে পারে। নাড়ী ...য় হলে তাতে ভাষা যে কি রকম এলোমেলো হয়ে ওঠে ... সেই ডাক্তারই বোঝে রসবোধের যে একেবারে ...ডি।

ক্ষান্তমণি

রক্ষে করো, আমার অত ডাক্তারি জানা নেই।

চন্দ্র

সে তো ব্যবহারেই বুঝতে পারি—নইলে লয়াল্‌টিকে ...শন বলে সন্দেহ করবে কেন ? কিন্তু নিশ্চয় রুগীর দশা তোমাকেও মাঝে মাঝে ধরে। আচ্ছা কলতলায় দাঁড়িয়ে তুমি কখনো পদ্ম ঠাকুরঝিকে বলনি—"আমার এমনি কপাল যে বিয়ে করে ইস্তিক সুখ কাকে বলে একদিনের তরে জানলুম না ?" আমার কানে যদি সে কথা আস্‌ত তা হলে আনন্দে শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠত।

ক্ষান্ত

আমি পদ্ম ঠাকুরঝিকে কখ্‌খনো অমন কথা বলিনি !

চন্দ্র

আচ্ছা তা হলে সাফ চাদরটা এনে দাও।

ক্ষান্ত

(চাদর আনিয়া দিয়া) তুমি বাইরে বেরুচ্ছ যদি, চুলগুলো কাগের বাসার মত করে বেরিয়োনা। একটু বোসো তোমার চুল ঠিক করে দিই। (চিরুণী ক্রস লইয়া আচড়াইতে প্রবৃত্ত)।

চন্দ্র

হয়েচে, হয়েচে !

না হয়নি—একদণ্ড মাথা স্থির করে রাখ দেখি !

চন্দ্র

তোমার সাম্‌নে আমার মাথার ঠিক থাকে না, দেখতে দেখতে ঘুরে যায়—

ক্ষান্ত

অত ঠাট্টার কাজ কি ! না হয় আমার রূপ নেই গুণ নেই—একটা ললিতলবঙ্গলতা খোঁজ করে আন গে—আমি চল্লুম।

[চিরুণী ক্রস ফেলিয়া দ্রুত প্রস্থান।

চন্দ্র

এখন আর সময় নেই, ফিরে এসে রাগ ভাঙ্গাতে হবে।

বিনোদ

(নেপথ্য হইতে) ওহে ! আর কতক্ষণ বসিয়ে রাখবে ? তোমাদের প্রেমাভিনয় সাঙ্গ হল কি ?

চন্দ্র

এইমাত্র যবনিকা পতন হয়ে গেল ! হৃদয়বিদারক ট্র্যাজেডি !

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

নিবারণের বাড়ী

নিবারণ ও শিবচরণ

নিবারণ

তবে তাই ঠিক রইল ? এখন আমার ইন্দুমতীকে তোমার গদাইয়ের পছন্দ হলে হয়।

শিব

সে বেটার আবার পছন্দ কি ! বিয়েটা ত আগে হয়ে যাক্‌, তারপর পছন্দ সময়মত পরে করলেই হবে !

নিবারণ

না ভাই, কালের যে রকম গতি সেই অনুসারেই চল্‌তে হয়।

শিব

তা হোক্‌ না কালের গতি—অসম্ভব কখনো সম্ভব হতে পারে না। একটু ভেবেই দেখনা, যে ছোঁড়া পূর্ব্বে একবারো বিবাহ করেনি সে স্ত্রী চিনবে কি করে ? পাট না চিনলে পাটের দালালি করা যায় না, আর স্ত্রীলোক কি পাটের চেয়ে সিধে জিনিষ ! আজ পঁয়ত্রিশ বৎসর হ'ল আমি গদাইয়ের মাকে বিবাহ করেচি, তার থেকে পাঁচটা বৎসর বাদ দাও—তিনি গত হয়েচেন সে আজ বছর পাঁচেকের কথা হবে—যাহোক তিরিশটা বৎসর তাকে

নিয়ে চালিয়ে এসেচি—আমি আমার ছেলের বৌ পছন্দ করতে পারব না আর সে চোঁড়া ভূমিষ্ঠ হয়েই আমার চেয়ে পেকে উঠল! তবে যদি তোমার মেয়ের কোনো ধনুর্ভঙ্গ পণ থাকে, আমার গদাইকে যাচিয়ে নিতে চান সে আলাদা কথা!

নিবারণ

নাঃ, আমার মেয়ে কোন আপত্তিই করবে না, তাকে যা বলব সে তাই শুনবে। আর একটি কথা তোমাকে বলা উচিত। আমার মেয়েটির কিছু বয়স হয়েচে।

শিব

আমিও তাই চাই। ঘরে যদি গিন্নি থাক্‌তেন, তা হলে বৌমা ছোট হলে ক্ষতি ছিল না।—এখন এই বুড়োটাকে যত্ন করে আর ছেলেটাকে কড়া শাসনে রাখতে পারে, এমন একটি মেয়ে না হলে সংসারটি গেল।

নিবারণ

তা হলে তোমার একটি অভিভাবকের নিতান্ত দরকার দেখচি।

শিব

হাঁ ভাই, মা ইন্দুকে বোলো আমার গদাইয়ের ঘরে এলে এই বুড়ো নাবালকটিকে প্রতিপালনের ভার তাঁকেই নিতে হবে। তখন দেখব তিনি কেমন মা।

নিবারণ

তা ইন্দুর সে অভ্যাস আছে। বহুকাল একটি আস্ত বুড়ো বাপ তারই হাতে পড়েচে। দেখতেই ত পাচ্চ ভাই, খাইয়ে দাইয়ে বেশ একরকম ভাল অবস্থাতেই রেখেচে।

শিব

তাই ত। তাঁর হাতের কাজটিকে দেখে তারিফ করতে হয়। যাহোক্ আজ তবে আসি। গুটিদুয়েক রোগী এখনো মরতে বাকী আছে।

[প্রস্থান।

(ইন্দুমতীর প্রবেশ)

ইন্দু

ও বুড়োটি কে এসেছিল বাবা—

নিবারণ

কেন মা বুড়ো বুড়ো কর্‌ছিস—তোর বাবাও ত বুড়ো।

ইন্দু

(নিবারণের পাকা চুলের মধ্যে হাত বুলাইয়া) তুমি ত আমাদের আদ্যিকালের বদ্যি বুড়ো, তোমার সঙ্গে কার তুলনা! কিন্তু ওকেত কখনো দেখিনি।

নিবারণ

ওর সঙ্গে ক্রমে খুবই পরিচয় হবে—

ইন্দু

আমি খুব পরিচয় করতে চাইনে।

নিবারণ

তোর এ বাবা পুরোণো ঝর ঝরে হয়ে এসেছে, একবার বাবা বদল করে দেখবিনে ইন্দু?

ইন্দু

তবে আমি চল্লুম।

নিবারণ

না না, শোন না। তোরই যেন বাবার দরকার নেই আমার একটি বাপের পদ খালি আছে—তাই আমি একটি সন্ধান করে বের্ করেচি মা।

ইন্দু

তুমি কি বকচ বুঝতে পারচিনে!

নিবারণ

নাঃ, তুমি আমার তেমনি হাবা মেয়ে কি না। সব বুঝতে পেরেছিস কেবল দুষ্টুমি।

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য

তিনটি বাবু এসেচে দেখা করতে।

ইন্দু

তাদের যেতে বলে দে! সকাল থেকে কেবলই বাবু আসচে!

নিবারণ

না, না, ভদ্রলোক এসেচে, দেখা করা চাই!

ইন্দু

তোমার খেনাবার সময় হয়েচে।

নিবারণ

একবার শুনে নিই কি জন্যে এসেচেন, বেশী দেরী হবে না—

ইন্দু

তুমি একবার গল্প পেলে আর উঠতে চাইবে না,আবার কালকের মত খেতে দেরী করবে। আচ্ছা আমি ঐ পাশের ঘরে দাঁড়িয়ে রইলুম, পাঁচ মিনিট বাদে ডেকে পাঠাব।

নিবারণ

তোর শাসনের জ্বালায় আমি আর বাঁচিনে। চাণক্যের শ্লোক জানিস ত! প্রাপ্তে তু ষোড়শেবর্ষে পুত্রেমিত্রবদাচরেৎ। তা আমার কি সে বয়স পেরয়নি?

[ইন্দুর প্রস্থান।

নিবারণ

(ভৃত্যের প্রতি) বাবুদের ডেকে নিয়ে আয়।

(চন্দ্রকান্ত, বিনোদবিহারী ও গদাইয়ের প্রবেশ)

নিবারণ

এই যে চন্দ্র বাবু! আস্‌তে আজ্ঞা হোক্। আপনারা সকলে বসুন। ওরে তামাক্ দিয়ে যা!

চন্দ্র

আজ্ঞে না, তামাক্ থাক্।

নিবারণ

তা, ভাল আছেন চন্দ্রবাবু?

চন্দ্র

আজ্ঞে হাঁ, আপনার আশীর্ব্বাদে একরকম আছি ভাল।

নিবারণ

আপনাদের কোথায় থাকা হয়?

বিনোদ

আমরা কলকাতাতেই থাকি।

চন্দ্র

মহাশয়ের কাছে আমাদের একটি প্রস্তাব আছে।

নিবারণ

(শশব্যস্ত হইয়া) কি বলুন!

চন্দ্র

মহাশয়ের ঘরে আদিত্যবাবুর যে অবিবাহিত কন্যাটি আছেন তাঁর জন্যে একটি সৎপাত্র পাওয়া গেছে—যদি অভিপ্রায় করেন—

নিবারণ

অতি উত্তম কথা। পাত্রটি কে?

চন্দ্র

বিনোদবিহারীবাবুর নাম শুনেছেন বোধ করি।

নিবারণ

বিলক্ষণ! তা আর শুনিনি! তিনি আমাদের দেশের একজন প্রধান লেখক। জ্ঞানরত্নাকর ত তাঁরি লেখা!

চন্দ্র

আজ্ঞে না! সে বৈকুণ্ঠ বসাক বলে একটি লোকের লেখা!

নিবারণ

তাই বটে! আমার ভুল হয়েছে। তবে "প্রবোধ লহরী?" আমি ঐ দুটোতে বরাবর ভুল করে থাকি!

চন্দ্র

আজ্ঞে না! প্রবোধলহরী তাঁর লেখা নয়—সেটা কার বল্‌তে পারিনে!

নিবারণ

তবে তাঁর একখানা বইয়ের নাম করুন দেখি!

চন্দ্র

"কানন-কুসুমিকা" দেখেছেন কি?

নিবারণ

"কানন-কুসুমিকা", না, দেখিনি! নামটি অতি সুললিত। বাঙ্গালা বই কবে সেই বাল্যকালে পড়তেম—তখন অবশ্যই কানন-কুসুমিকা পড়ে থাক্‌ব, স্মরণ হচ্চে না। তা বিনোদ-বাবুর পুত্রের বয়স কত হবে, ক'টি পাশ করেচেন তিনি?

চন্দ্র

মশায় ভুল করচেন। বিনোদবাবুর বয়স অতি অল্প। তিনি এম-এ পাশ করে সম্প্রতি বি-এল্ উত্তীর্ণ হয়েচেন। বিবাহ হয় নি। তাঁরই কথা মহাশয়কে বল্‌ছিলুম। তা আপনার কাছে প্রকাশ করে বলাই ভাল—এই এর নাম বিনোদবাবু।

নিবারণ

আপনি বিনোদবাবু! আজ আমার কি সৌভাগ্য! আমি মেয়েদের কাছে শুনেছি আপনি দিব্যি লিখতে পারেন।

চন্দ্র

তা, এর সঙ্গে আপনার ভাগ্নির বিবাহ দিতে যদি আপত্তি না থাকে—

নিবারণ

আপত্তি! আমার পরম সৌভাগ্য!

চন্দ্র

তা হলে এ সম্বন্ধে যা যা স্থির করবার আছে কাল এসে মহাশয়ের সঙ্গে কথা হবে!

নিবারণ

যে আজ্ঞে। কিন্তু একটা কথা বলে রাখি—মেয়েটির বাপ টাকা কড়ি কিছু রেখে যেতে পারেন নি। তবে এই পর্য্যন্ত বল্‌তে পারি এমন লক্ষ্মী মেয়ে আর পাবেন না।

চন্দ্র

তবে অনুমতি হয় ত, এখন আসি।

নিবারণ

এত শীঘ্র যাবেন? বলেন কি? আর একটু বসুন না!

চন্দ্র

আপনার এখনো নাওয়া খাওয়া হয় নি

নিবারণ

সে এখন ঢের সময় আছে! বেলা ত বেশী হয় নি—

চন্দ্র

আজ্ঞে বেলা নিতান্ত কম হয় নি—এখন যদি আজ্ঞা করেন ত উঠি।

নিবারণ

তবে আসুন। দেখুন চন্দর বাবু, মতি হালদারের ঐ যে কুসুমকানন, না কি বইখানা বল্লেন ওটা লিখে দিয়ে যাবেন ত—

চন্দ্র

কাননকুসুমিকা? বইখানা পাঠিয়ে দেব কিন্তু সেটা মতি হালদারের নয়—

নিবারণ

তবে থাক্। বরঞ্চ বিনোদবাবুর একখানা প্রবোধলহরী যদি থাকে ত একবার—

চন্দ্র

প্রবোধলহরী ত—

বিনোদ

আঃ থাম না। তা, যে আজ্ঞে, আমিই পাঠিয়ে দেব। আমার প্রবোধলহরী, বারবেলাকথন, তিথিদোষখণ্ডন, প্রায়শ্চিত্তবিধি, এবং নূতন পঞ্জিকা আপনাকে পাঠিয়ে দেব।

নিবারণ

দেখুন বিনোদবাবুর একখানি ফটোগ্রাফ পাওয়া যায় কি? তা হলে কমলকে একবার—

চন্দ্র

ফটোগ্রাফ সঙ্গেই এনেচি, কিন্তু এতে আমাদের তিনজনেরই ছবি আছে।

নিবারণ

তা হোক, ছবিটি দিব্যি উঠেচে, এতেই কাজ চল্‌বে।

চন্দ্র

তা হলে আজ্ঞা হয় তো আসি।

[প্রস্থান।

নিবারণ

নাঃ লোকটার বিদ্যে আছে। বাঁচা গেল, একটি মনের মত সৎপাত্র পাওয়া গেল। কমলের জন্য আমার বড় ভাবনা ছিল!

(ইন্দুর প্রবেশ)

ইন্দু

বাবা তোমার হল?

নিবারণ

ও ইন্দু, তুই ত দেখলিনে—তোরা সেই যে বিনোদবাবুর লেখার এত প্রশংসা করিস্, তিনি আজ এসেছিলেন।

ইন্দু

আমার ত আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, তোমার এখানে যত রাজ্যির অকেজো লোক এসে জোটে আর আমি আড়াল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে তাদের দেখি! আচ্ছা বাবা, চন্দ্রবাবু বিনোদবাবু ছাড়া আর একটি যে লোক এসেছিল—বদ্ চেহারা লক্ষ্মীছাড়ার মত দেখতে, চোখে চশমাপরা, সে কে?

নিবারণ

তুই যে বলছিলি আড়াল থেকে দেখিস্‌নে? বদ্ চেহারা

...বার কার দেখলি ? বাবুটি ত দিব্যি বেশ ফুটফুটে কার্ত্তিক-...র মত দেখতে। তাঁর নামটি কি জিজ্ঞাসা করা হয় নি!

ইন্দু

তাকে আবার ভাল দেখতে হল ? দিনে দিনে তোমার ...কে যে পছন্দ হচ্চে বাবা। এখন নাইতে চল।

(নিবারণের প্রস্থান)

...ওঁর নামটা জানতেই হচ্চে—নিশ্চয় ক্ষান্ত দিদি বলতে ...রবেন।

ইন্দু

বাবা, শোন শোন। (নিবারণের পুনঃপ্রবেশ) ...রা তোমাকে বিনোদবাবুর একটা ফটোগ্রাফ দিয়ে ...ল না?

নিবারণ

...া, এতে তিন বন্ধুরই ছবি আছে।

ইন্দু

তাতে ক্ষতি নেই। ওটা আমাকে দাও না, আমি দিদিকে দেখাব।

নিবারণ

ভেবেছিলুম আমিই নিজে দেখাব।

ইন্দু

না, বাবা, আমি দেখাব, বেশ মজা হবে।

নিবারণ

এই নে মা, কিন্তু ওকে নিয়ে বেশী ঠাট্টা করিস্‌নে।

ইন্দু

বাবা, আমার সঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টা বাস করচে, আর যাই হোক্, ঠাট্টায় ওর আর বিপদের আশঙ্কা নেই।

[নিবারণের প্রস্থান।

ইন্দু

কমল দিদি, কমল দিদি।

(কমলের প্রবেশ)

কমল

কি ইন্দু?

ইন্দু

আর দেরী কোরোনা।

কমল

কেন, কি করতে হবে বল্‌না।

ইন্দু

এখন কাব্যশাস্ত্রমতে কমলকে বিকশিত হয়ে উঠতে হবে।

কমল

কেন বল্‌ত?

ইন্দু

খড়খড়ের ফাঁক দিয়ে যাঁর অরুণ রেখার আভাস পাওয়া যাচ্ছিল, সেই দিনমণি উঠে পড়েচেন তোমার ভাগ্য-গগনে।

কমল

তুই খবর পেলি কোথা থেকে।

ইন্দু

স্বয়ং দিনমণির কাছ থেকে।

কমল

একটু স্পষ্ট ভাষায় কথা ক'।

ইন্দু

আমার চেয়ে ঢের বেশি অস্পষ্ট ভাষায় যিনি কথা ক'ন সেই কবি স্বয়ং এই ঘরে পরিদৃশ্যমান হয়েছিলেন।

কমল

কি কারণে?

ইন্দু

তোমার উপর করক্ষেপ করবার দাবী জানিয়ে যেতে। এতদিন যিনি ছিলেন তোমার কানের সোনা, এখন তিনি হবেন তোমার নয়নের মণি, বাবার কাছে স্বয়ং দরবার জানিয়ে গেছেন। তোমার মনের মানুষ এখন থেকে তোমারই কোণের মানুষ হবার উমেদার, কথাবার্ত্তা ঠিক-ঠাক হয়ে গেছে। সুখবর কিনা বলো, দিদি।

কমল

এখনো বলবার সময় হয় নি।

ইন্দু

বলিস্ কি, ভাই? কাব্যের চেয়ে কবির দাম বেশি নয়?

কমল

দামের তুলনা করব কি করে? দুটো জিনিষ এক জাতের নয় যেমন মধু আর মধুকর।—

ইন্দু

সে কথা মানি, যেমন বাঁশ আর বাঁশি। বাঁশি যে রকম করে বাজে বাঁশ ঠিক তার বিপরীত ভাবে অন্তরে বাহিরে বাজতে পারে। তাহলে কি করা কর্ত্তব্য এই বেলা বলো। এখনো সময় আছে। না হয় বাবাকে বলে আসি, যে, কাব্যের মধ্যে শুধু কথার মিল চাই,সেটাতে ভুল হলেও চলে, কিন্তু কবির মধ্যে চাই প্রাণের মিল, সেটাতে ভুল হলে সাংঘাতিক। কাজ নেই দিদি, স্বয়ং দেখে শুনে পছন্দ করে নাও। ছবিটা দেখে তার ভূমিকা করতে পারো।

কমল

এর মধ্যে ত এক জন দেখচি চন্দর বাবু।

ইন্দু

বাকি দুজনের মধ্যে কে বিনোদ বাবু আন্দাজ কর্ দেখি। এর মধ্যে কেইবা কোকিল কেইবা কাক, কেই বা কবি কেইবা অকবি বল্ দেখি ?

কমল

তোর মত এমন সূক্ষ্ম দৃষ্টি আমার নেই ভাই।

ইন্দু

আচ্ছা এই নে, তোর ডেস্কের উপর রাখ্, চেয়ে দেখতে দেখতে ভক্তের ধ্যানদৃষ্টিতে সত্য আপনি প্রকাশিত হবে। দময়ন্তী ছ'জনের মধ্যে নলকে চিনে নিয়েছিলেন, তোর তো কেবল দু'জন।

কমল

অত চিন্তায় অত ধ্যানে আমার দরকার নেই।

ইন্দু

বলিস্ কি দিদি ?

কমল

আমি ত আর স্বয়ম্বরা হতে যাচ্চিনে বোন। তা আমার আবার পছন্দ! দুটো একটা কাপড় চোপড় ছাড়া জীবনের ক'টা জিনিষই বা নিজের পছন্দ অনুসারে পাওয়া গেছে! আপনাকেই আপনি পছন্দ করে নিতে পারিনি।

ইন্দু

তুই ভাই কথায় কথায় বড় বেশি গম্ভীর হয়ে পড়িস্, বিনোদের কাছে যদি অমনি করে থাকিস্ তা হলে সে তোর সঙ্গে প্রেমালাপ করতে সাহস করবে না—

কমল

সে জন্য না হয় তুই নিযুক্ত থাকিস্।

ইন্দু

তাহলে যে তোর গাম্ভীর্য্য আরো সাতগুণ বেড়ে যাবে। দেখ ভাই, তুই ত একটা পোষা কবি হাতে পেলি এবার তাকে দিয়ে তোর নিজের নামে কবিতা লিখিয়ে নিস্— যতক্ষণ পছন্দ না হয় ছাড়িস্নে। নিজের নামে কবিতা দেখলে কি রকম লাগে কে জানে!

কমল

মনে হয় আমার নাম করে আর কাকে লিখচে। তোর যদি সখ থাকে, আমি তোর নামে একটা লিখিয়ে নেব।

ইন্দু

তুমি কেন, সে আমি নিজে করে নেব। আমাদের যে সম্পর্ক আমি যে কান ধরে লিখিয়ে নিতে পারি। তুমি ত তা পারবে না। আপাতত ছবিটা তোর কাছে রাখ।

কমল

ছবিতে আমার দরকার নেই।

ইন্দু

নেই দরকার? তবে ওটা আমার রইল? সর্ব্বস্বত্ব ত্যাগ করলে?

কমল

কেন বল দেখি? এত উৎসাহ কেন তোর?

ইন্দু

সেদিন নাম খুঁজছিলুম, রূপও তো খুঁজতে হবে। এই ছবির মধ্যে যদি নামে রূপে মিল হয়ে যায়?

কমল

অর্থাৎ?

ইন্দু

অর্থাৎ (গদাইয়ের ছবি দেখাইয়া) এর নাম যদি গদাই না হয়, যদি কুমুদ কিম্বা পরিমল, কিম্বা কিশলয়, কিম্বা কোকনদ কিম্বা কপিঞ্জল হয়ে দাঁড়ায়?

কমল

তা হলেই চুকে যাবে?

ইন্দু

একেবারে চুকে না যাক্, মিউজিয়মে একটা প্রথম স্পেসিমেন্ পাওয়া যাবে তো?

কমল

আচ্ছা তোর স্পেসিমেন্ জমা কর্—আপাতত তোর চুল বেঁধে দিইগে চল্।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

চন্দ্রের অন্তঃপুর

ক্ষান্তমণি ও ইন্দুমতী

ইন্দু

তোমার স্বামী আদর করেই ঠাট্টা করে, সে কি আর সত্যি ?

ক্ষান্ত

না ভাই, ঠাট্টা কি সত্যি ঠিক বুঝতে পারিনে। আর সত্যি হবারই বা আটক কি। নিজে ত জানি নিজের গুণ কত!

ইন্দু

তোমার স্বামীর আবার তেমনি সব বন্ধু জুটেছে, তারাই পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলে তাঁর মন উতলা করে দেয়। বিশেষ সেদিন বিনোদ বাবু আর তোমার স্বামীর সঙ্গে আর একটি কে বাবু আমাদের বাড়ীতে গিয়েছিল, তাকে দেখে আমার আদবে ভাল লাগল না। লোকটা কে ভাই ?

ক্ষান্ত

কি জানি ভাই! বন্ধু একটি আধটি ত নয়, সবগুলোকে আবার চিনিও নে।

ইন্দু

এই দেখ্ না তার ছবি। (কাপড় খুঁজিয়া) একি হল ? এই যাঃ, কোথায় ফেললুম ?

ক্ষান্ত

কি ফেললি ?

ইন্দু

ফোটোগ্রাফ।

ক্ষান্ত

কার ?

ইন্দু

বিনোদ বাবুর! নিশ্চয় তোমাদের এই গলি পার হয়ে আসবার সময় রাস্তায় পড়ে গেছে। আমি যাই, খুঁজে আনি গে।

ক্ষান্ত

ছি ছি রাস্তার মাঝে ছবি খুজতে গিয়ে লোক দাঁড় করিয়ে দিবি যে? সে ছবির এতই কিসের কদর ?

ইন্দু

হায় হায়, দিদি যদি কেঁদে কেটে অনর্থপাত করে ?

ক্ষান্ত

তোর দিদি, কমল ?

ইন্দু

হাঁ গো, তার হৃদয় তো পাষাণ নয়, সে যে বড় কোমল, কি জানি আজ থেকে যদি সে হাঙ্গার-ষ্ট্রাইক সুরু করে ?

ক্ষান্ত

সে আবার কি ?

ইন্দু

যাকে সংস্কৃত ভাষায় বলে প্রায়োপবেশন।

ক্ষান্ত

আর জ্বালাস নে, বাংলা ভাষায় কি বলে তাই বলনা।

ইন্দু

তাকে বলে উপোষ করে মরা।

ক্ষান্ত

আমি যেন কমলকে জানিনে—তুই হলেও বা সম্ভব হোত। কেন ভাই আসল জিনিষ যখন ধরা দিয়েছে, তখন ছবিটার এত খোঁজ কেন ?

ইন্দু

আসল জিনিষকে ডেস্কে বসিয়ে রাখা যায় না, দেরাজে বন্ধ করা চলে না। আসল জিনিষের মেজাজের ঠিক নেই—বেশি ক্ষিধে পেলে ভালোবাসার কথা তার মনে থাকে না, বেশি ভালোবাসা পেলে অস্থির করে তোলে—কিন্তু—

ক্ষান্ত

আচ্ছা আচ্ছা, তোর সেই "কিন্তু" এতো বেশি দুর্লভ নয়।

ইন্দু

ক্ষান্ত দিদি, তোমার সেই বন্ধু তিনটির মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তিটি কে বল না ?

ক্ষান্ত

খুব সম্ভব গদাই। সে ওদের সঙ্গে প্রায়ই থাকে বটে।

ইন্দু

বাজি রাখতে পারি সে গদাই নয়। তার নাম যদি গদাই হয় তা'হলে আমার নাম মাতঙ্গিনী।

ক্ষান্ত

তা'হলে ললিত।

ইন্দু

এই এতক্ষণে নামটা পাওয়া গেল। ললিত তার আর সন্দেহ নেই।

ক্ষান্ত

চেহারাটা সুন্দর তো ?

ইন্দু

সুন্দর বই কি।

ক্ষান্ত

পাৎলা, চোখে চশমা আছে ?

ইন্দু

হাঁ হাঁ চশমা আছে। আর সব কথাতেই মুচকে মুচকে হাসে।

ক্ষান্ত

তবে আমাদের ললিত চাটুজ্জে, তাতে আর সন্দেহ নেই।

ইন্দু

ললিত চাটুজ্জে না-হয়ে যায় না। বাজি রাখ্তে পারি।

ক্ষান্ত

কলুটোলার নৃত্যকালী চাটুজ্জের ছেলে। ছোকরাটি কিন্তু মন্দ নয় ভাই। এম, এ পাস করে জলপানী পাচ্চে।

ইন্দু

জলপানী পাবার মতোই চেহারা বটে। তা ওদের ঘরে স্ত্রী পুত্র পরিবার কেউ নেই না কি ? লক্ষ্মীছাড়ার মতো টো টো করে বেড়ায় কেন ?

ক্ষান্ত

স্ত্রী পুত্র থেকেই বা কি হয়। ওরতো তবু নেই। বলে যে রোজগার না করে বিয়ে করবে না।

ইন্দু

জানিস ক্ষান্ত দিদি, ওদের তিনজনের ছবিতে যেন তিন কাল মূর্ত্তিমান। চন্দ্র বাবু অতীত, বিনোদ বাবু বর্ত্তমান, আর ললিত বাবু ভাবী।

ক্ষান্ত

ভাবী ? কার ভাবী লো ?

ইন্দু

সে কথাটা রইল ভবিষ্যতের গর্ভে।

ক্ষান্ত

দেখ্ ভাই ইন্দু, তোকে সত্যি করে বলি। তোরা তো আমাকে বঙ্কিম বাবুর বইগুলো পড়ালি, ভেবেছিলুম একটুও বুঝতে পারব না—কিন্তু বেশ লাগছে।

ইন্দু

এই দেখ্ মুস্কিলে ফেললি তো। তোর মনটা এখন আয়েষা হয়ে দাঁড়িয়েচে—কিন্তু ওজনমত জগৎ সিংহ পাবি কোথা ?

ক্ষান্ত

তা বলিসনে ইন্দু। আমি যে রকম মাপের আয়েষা, সে রকম মাপের জগৎ সিংহও ঘরে মজুদ আছে। কিন্তু—

ইন্দু

চালচলনটা দোরস্ত হয় নি। মনে মনে আয়েষা হয়েচ, ব্যবহারে আয়েষাগিরি করে উঠতে পারচ না।

ক্ষান্ত

কতকটা তাই বটে।

ইন্দু

প্র্যাকটিকাল এডুকেশনটা হয় নি আর কি। কিছু দিন প্র্যাকটিস চাই।

ক্ষান্ত

তোর ইংরিজি আমি বুঝতে পারিনে ভাই।

ইন্দু

আমার বক্তব্য হচ্চে, বঙ্কিমের কাছে মন্ত্র পেয়েচ, আমার কাছ থেকে তার সাধনা পেতে হবে।

ক্ষান্ত

তোমার কাছ থেকে ?

ইন্দু

আমার কাছ থেকে হলেই নিরাপদ হবে। মনুসংহিতার সঙ্গে বঙ্কিমবাবুর মিল রক্ষা করেই আমি তোমাকে শিক্ষা দেব। আজ এখনি হোক্ হাতে খড়ি। আচ্ছা এক কাজ করা যাক। মনে কর আমি চন্দ্রবাবু; আপিস থেকে ফিরে এসেচি, ক্ষিধেয় প্রাণ বেরিয়ে যাচ্চে—তার পর তুমি কি করবে বল দেখি ?—রোস ভাই, চন্দ্রবাবুর ঐ চাপকান আর শামলটা পরে' নিই, নইলে আমাকে চন্দ্রবাবু মনে হবে না। (আপিসের বেশ পরিধান ও ক্ষান্তের উচ্চহাস্য)

ইন্দু

ক্ষান্তমণি, স্বামীর প্রতি পরিহাস অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য। পতিব্রতা রমণী কদাপি উচ্চহাস্য করেন না। কোন কারণে হাস্য অনিবার্য্য হইলে সাধ্বী স্ত্রী প্রথমে স্বামীর অনুমতি লইয়া পরে বদনে অঞ্চল দিয়া নয়ন নত করিয়া ঈষৎ স্মিতহাস্য হাসিতে পারেন। এই গেল মনুসংহিতা, এবার এসো নবীন কবির গীতিকাব্যে। আমি আপিস থেকে ফিরে এসেচি—এখন তোমার কি কর্ত্তব্য বল!

ক্ষান্ত

প্রথমে তোমার চাপকানটি এবং শামলাটি খুলে দিই, তার পরে জল খাবার,—

ইন্দু

নাঃ, তোমার কিছু শিক্ষা হয় নি। আচ্ছা, তুমি তবে চন্দ্রবাবু সাজো, আমি তোমার স্ত্রী সাজচি—

ক্ষান্ত

না ভাই, সে আমি পারব না—

ইন্দু

আচ্ছা, তবে আর একবার চেষ্টা করো। বড় বৌ, চাপকানটা খুলে আমার ধুতি চাদরটা এনে দাও ত!

ক্ষান্ত

(উঠিয়া) এই দিচ্চি।

ইন্দু

ও কি করচ! তুমি ঐখানে হাতের উপর মাথা রেখে বসে থাক—বল—নাথ, আজ সন্ধেবেলায় কি সুন্দর বাতাস দিচ্চে! আজ আর কিছুতে মন লাগচেনা, ইচ্ছে করচে পাখী হয়ে উড়ে যাই।

ক্ষান্ত

(যথাশিক্ষামত) নাথ, আজ সন্ধেবেলায় কি সুন্দর বাতাস দিচ্চে। আজ আর কিছুতে মন লাগ্‌চেনা, ইচ্ছে করচে পাখী হয়ে উড়ে যাই!

ইন্দু

কোথায় উড়ে যাবে? তার আগে আমায় লুচি দিয়ে যাও, ভারি ক্ষিদে পেয়েচে—

(তাড়াতাড়ি উঠিয়া) এই দিচ্চি—

ইন্দু

এই দেখ, সব মাটি করলে! অস্থানে মনুসংহিতা এসে পড়ে।—তুমি যেমন ছিলে তেমনি থাকো—বল, লুচি? কই, লুচি ত আজ ভাজি নি! মনে ছিল না। আচ্ছা, লুচি কাল হবে এখন! আজ, এস, এখানে এই মধুর বাতাসে বসে—

চন্দ্র

(নেপথ্য হইতে) বড় বৌ!

ইন্দু

ঐ চন্দ্রবাবু আস্‌চেন! আমাকে দেখ্‌তে পেয়েচেন বোধ হল! তুমি বোলো ত ভাই, বাগবাজারের চৌধুরীদের কাদম্বিনী। আমার পরিচয় দিয়ো না লক্ষ্মীটি মাথা খাও।

(পলায়ন)

পাশের ঘর

গদাই আসীন

(চাপকান শামলাপরা ইন্দুর ছুটিয়া প্রবেশ)

গদাই

এ কি!

ইন্দু

ছি ছি আর একটু হলেই চন্দ্রবাবুর কাছে এই বেশে ধরা পড়তুম। তিনি কি মনে করতেন? আমাকে বোধ হয় দেখতে পান নি? (হঠাৎ গদাইকে দেখিয়া) ওমা, এযে সেই ললিতবাবু। আর ত পালাবার পথ নেই! (সামলাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে চাপকান-শামলা খুলিয়া গদাইয়ের প্রতি)

তোমার বাবুর এই শাম্‌লা, আর এই চাপকান। সাবধান করে রেখো, হারিওনা। আর শীগ্‌গির দেখে এসো দেখি বাগবাজারের চৌধুরী বাবুদের বাড়ি থেকে পাল্কী এসেচে কি না!

গদাই

(হাসিয়া) যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

ইন্দু

ছি ছি! ললিতবাবু কি মনে করলেন! যা হোক্ আমাকে ত চেনেন না। ভাগ্যিস্ হঠাৎ বুদ্ধি যোগাল, বাগবাজারের চৌধুরীদের নাম করে দিলুম। চন্দ্রবাবুর এ বাসাটিও হয়েচে তেম্‌নি। অন্দর বাহির সব এক! এখন আমি কোন্ দিক্ দিয়ে পালাই! ওই আবার আস্‌চে, মানুষটি ত ভাল নয়!

(গদাইয়ের প্রবেশ)

গদাই

ঠাকরুণ, পাল্কী ত আসে নি। এখন কি আজ্ঞা করেন!

ইন্দু

এখন তুমি তোমার কাজে যেতে পার। না, না, ঐ যে তোমার মনিব এ দিকে আস্‌চেন! ওঁকে আমার খবর দেবার কোনো দরকার নেই, আমার পাল্কী নিশ্চয় এসেচে। [প্রস্থান।

গদাই

কি চমৎকার রূপ! আর কি উপস্থিত বুদ্ধি! বা, বা! আমাকে হঠাৎ একদম চাকর বানিয়ে দিয়ে গেল — সেও আমার পরম ভাগ্যি! বাঙালীর ছেলে চাকরি করতেই জন্মেছি; কিন্তু এমন মনিব কি অদৃষ্টে জুটবে! নির্লজ্জতাও ওকে কেমন শোভা পেয়েছে। আহা, এই শাম্‌লা আর এই চাপকান চন্দরকে ফিরিয়ে দিতে ইচ্ছে করচেনা। বাগবাজারের চৌধুরী! সন্ধান নিতে হচ্ছে!

(চন্দ্রের প্রবেশ)

চন্দ্র

তুমি এ ঘরে ছিলে না কি? তবে ত দেখেছ?

গদাই

চক্ষু থাক্‌লেই দেখ্‌তে হয়—কিন্তু কে বল দেখি?

চন্দ্র

বাগবাজারের চৌধুরীদের মেয়ে কাদম্বিনী। আমার স্ত্রীর একটি বন্ধু।

গদাই

ওর স্বামী বোধ করি স্বাধীনতাওয়ালা?

চন্দ্র

ওঁর আবার স্বামী কোথায়?

গদাই

মরেচে বুঝি? আপদ গেছে। কিন্তু বিধবার মত বেশ নয় ত—

চন্দ্র

বিধবা নয় হে—কুমারী। যদি হঠাৎ স্নায়ুর ব্যামো ঘটে থাকে ত বল, ঘটকালি করি।

গদাই

তেমন স্নায়ু হলে এতদিনে গলায় দড়ি দিয়ে মরতুম!

চন্দ্র

তা হলে চল একবার বিনোদকে দেখে আসা যাক্। তার বিশ্বাস সে ভারি একটা অসমসাহসিক কাজ করতে প্রবৃত্ত হয়েছে, তাই একেবারে সপ্তমে চড়ে রয়েচে—যেন তার পূর্ব্বে বঙ্গদেশে বাপ পিতামহর আমল থেকে বিবাহ কেউ করে নি!

গদাই

মেয়েমানুষকে বিয়ে করতে হবে তার আবার ভয় কিসের?

চন্দ্র

বল কি গদাই? বিধাতার আশীর্ব্বাদে জন্মালুম পুরুষ হয়ে, কি জানি কার শাপে বিয়ে করতে গেলুম মেয়েমানুষকে, এ কি কম সাহসের কথা? গদাই যেয়ো না হে। তোমাকে দরকার আছে, এখনি আস্‌চি।

[প্রস্থান।

গদাই

(পকেট হইতে নোটবুক ও পেন্সিল বাহির করিয়া)

আর তো পারচি নে। মাথার ভিতরটা যে রকম ঘুলিয়ে গেছে। আজ বোধ হয় একটা দুষ্কর্ম্ম করব। কবিতা লিখে

ফেলব। বুদ্ধি পরিষ্কার থাকলে কবিতার ব্যাকটিরিয়া জন্মাতেই পারে না। চিত্তের অবস্থাটা খুব অস্বাস্থ্যকর হওয়া চাই। আজ আমার মগজের ভিতরে ঐ কীটাণুগুলি কেবলি চোদ্দ অক্ষর খুঁজে কিল্‌বিল্ করে বেড়াচ্চে। (লিখিতে প্রবৃত্ত)

কাদম্বিনী যেমনি আমায় প্রথম দেখিলে,
কেমন করে ভৃত্য বলে তখনি চিনিলে!

ভাবটা নতুন রকমের হয়েছে, কিন্তু হতভাগা ছন্দটাকে বাগাতে পারচিনে। (গণনা করিয়া) প্রথম লাইনটা হয়েচে ষোলো, দ্বিতীয়টা হয়েছে পনেরো। কিন্তু কা'কে ফেলে কাকে রাখি? (চিন্তা) "আমায়" কে "আমা" বল্লে কেমন শোনায়?—"কাদম্বিনী যেমনি আমা প্রথম দেখিলে"— কানে ত নেহাৎ খারাপ ঠেক্‌চেনা! তবুও একটা অক্ষর বেশী থাকে। কাদম্বিনীর "নী" টা কেটে যদি সংক্ষেপ করে দেওয়া যায়। পুরো নামের চেয়ে সে ত আরো আদরের শুন্‌তে হবে! "কাদম্বি"—না; ঠিক শোনাচ্চে না। "কদম্ব"—ঠিক হয়েছে—

কদম্ব যেমনি আমা প্রথম দেখিলে
কেমন করে ভৃত্য বলে তখনি চিনিলে!

উঁহুঁ, ও হচ্চেনা। "কেমন করে" কথাটাকে ত কমাবার যো নেই—"কেমন করিয়া" তাতে আরো একটা অক্ষর বেড়ে যায়? "তখনি চিনিলে"র জায়গায় "তৎক্ষণাৎ চিনিলে" বসিয়ে দিতে পারি, কিন্তু সুবিধে হয় না। দূর হোক্ গে! ছন্দে লেখাটা বর্ব্বরতা। যে সময় পুরুষ মানুষ কানে কুণ্ডল হাতে অঙ্গদ পরত পদ্য জিনিষটা সেই যুগের— ডিমক্রাটিক যুগের জন্যে গদ্য। হওয়া উচিত ছিল:—"বলি ও কাদম্বিনী, যেমনি আমার উপর নজর পড়ল, অম্‌নি আমাকে গোলাম বলে চিনে নিলে কেমন করে খুলে বলতো!" এর মধ্যে বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার শিল মোহরের ছাপ নেই—একেবারে খাস শ্রীযুক্ত গদাইচন্দ্রের গোমুখীবিনির্গত।

(শিবচরণের প্রবেশ)

শিব

কি হচ্চে গদাই?

গদাই

আজ্ঞে ফিজিয়লজির নোটগুলো একবার দেখে নিচ্চি।

শিব

ফিজিয়লজির কোন্ জায়গাটাতে আছ?

গদাই

হার্টের ফাংশন্ নিয়ে।

শিব

দেখি তোমার নোটবইটা। আমি তোমাকে হয়তো কিছু-

গদাই

আজ্ঞে, এ একেবারে লেটেস্‌ট্ থিয়রি নিয়ে—বোধ হয় মাস খানেক হল এর ডিস্‌কভারি হয়েচে। এখনো সকলে জানে না।

শিব

সত্যি না কি? আমি আবার চশমাটা আনিনি। সব্‌জেক্টটা ইণ্টারেষ্টিং, পরে শুনে নেব তোর কাছ থেকে। কিন্তু এখানে করচিস্ কি!

গদাই

একজামিন খুব কাছে এসেছে—চন্দ্রবাবুর বাসাটা নিরিবিলি আছে, তাই এখানে –

শিব

দেখ বাপু, একটা কথা আছে। তোমার বয়স হয়েছে, তাই আমি তোমার জন্যে একটি কন্যা ঠিক করেছি।

গদাই

কি সর্ব্বনাশ!

শিব

নিবারণ বাবুকে জান বোধ করি—

গদাই

আজ্ঞে হাঁ জানি!

শিব

তাঁরই কন্যা ইন্দুমতী। মেয়েটি দেখ্‌তে-শুন্‌তে ভাল। বয়সেও তোমার যোগ্য। দিনও এক রকম স্থির।

গদাই

একেবারে স্থির করেছেন? কিন্তু এখন ত হ'তে পারে না?

শিব

কেন বাপু ?

গদাই

একজামিন কাছে এসেছে—

শিব

তা হোক্ না একজামিন ! বৌমাকে বাপের বাড়ি রেখে দেব, একজামিন হয়ে গেলে ঘরে আনা যাবে।

গদাই

ডাক্তারিটা পাশ না করেই কি—

শিব

কেন বাপু, তোমার সঙ্গে ত একটা শক্ত ব্যায়ারামের বিয়ে দিচ্ছিনে। মানুষ ডাক্তারি না জেনেও বিয়ে করে। কিন্তু আপত্তিটা কিসের জন্যে ?

গদাই

উপার্জ্জনক্ষম না হয়ে বিয়ে করাটা—

শিব

উপার্জ্জন ? আমি কি তোমাকে আমার বিষয় থেকে বঞ্চিত করতে যাচ্চি ? তুমি কি সাহেব হয়েছ যে, বিয়ে করেই স্বাধীন ঘরকন্না করতে যাবে ? (গদাই নিরুত্তর) তোমার হ'ল কি ? বিয়ে করবে তার আবার এত ভাবনা কি ? আমি কি তোমার ফাঁসির হুকুম দিলুম ?

গদাই

বাবা, আপনার পায়ে পড়ি, আমাকে এখন বিয়ে করতে অনুরোধ করবেন না !

শিব

(সরোষে) অনুরোধ কি বেটা ? হুকুম করব। আমি বলছি তোকে বিয়ে করতেই হবে !

গদাই

আমাকে মাপ করুন, আমি এখন কিছুতেই বিয়ে করতে পারব না।

শিব

(উচ্চস্বরে) কেন পারবি নে ? তোর বাপ-পিতামহ তোর চোদ্দপুরুষ বরাবর বিয়ে করে এসেছে, আর তুই বেটা দুপাতা ইংরিজি উল্টে আর বিয়ে করতে পারবি নে !

গদাই

আমি মিনতি করে বলছি বাবা—একবারে মর্ম্মান্তিক অনিচ্ছে না থাকলে আমি কখনই এ প্রস্তাবে—

শিব

তুমি বেটা আমার বংশে জন্মগ্রহণ করে হঠাৎ এক দিনে এত বড় বৈরাগী হয়ে উঠলে কোথা থেকে ! এমন সৃষ্টিছাড়া অনিচ্ছেটা হ'ল কেন, সেটা ত শোনা আবশ্যক।

গদাই

আচ্ছা, আমি মাসীমাকে সব কথা বল্‌ব, আপনি তাঁর কাছে জান্‌তে পারবেন।

শিব

আচ্ছা।

[প্রস্থান।

গদাই

আমার ছন্দমিল ভাব সমস্ত ঘুলিয়ে গেল, এখন যে আর এক লাইনও মাথায় আসবে এমন সম্ভাবনা দেখি নে।

(চন্দ্রের প্রবেশ)

চন্দ্র

আজ বিনোদের বিয়ে, মনে আছে ত গদাই ?

গদাই

তাই ত, ভুলে গিয়েছিলুম বটে !

চন্দ্র

তোমার স্মরণশক্তির যে রকম অবস্থা দেখছি, একজামিনের পক্ষে সুবিধে নয় ! এইখানে বৈঠক হবে, চলো ওদের ধরে নিয়ে আসি গে।

গদাই

আজ শরীরটা তেমন ভাল ঠেকছে না, আজ থাক্—

চন্দ্র

বিনোদের বিয়েটা ত বছরের মধ্যে সদাসর্ব্বদা হবে না গদাই ! যা হবার আজই চুকে যাবে। অতএব আজ তোমাকে ছাড়ছি নে চল।

গদাই

চল।

[প্রস্থান।

(ক্ষান্ত ও ইন্দুর প্রবেশ)

ইন্দু

বর ত তোমাদের এখান থেকেই বেরোবেন ? তাঁর তিন কুলে আর কেউ নেই না কি ?

ক্ষান্ত

বাপ-মা নেই বটে, কিন্তু শুনেছি দেশে পিসী-মাসী সব আছে—তাদের খবরও দেয় নি ! বলে, যে, বিয়ে করছি হাট বসাচ্ছি নে ত ! আবার বলে কি—এ ত আর শুম্ভ-নিশুম্ভর যুদ্ধ না, কেবল দুটিমাত্র প্রাণীর বিয়ে, এত সোর-সরাবৎ লোক-লস্করের দরকার কি ?

ইন্দু

একবার আমাদের হাতে পড়ুক না, দুটিমাত্র প্রাণীর বিয়ে যে কি রকম ধুন্দুমার ব্যাপার, তা তাঁকে এক রকম মোটামুটি বুঝিয়ে দেব।—আজ যে তুমি বাইরের ঘরে ?

ক্ষান্ত

এই ঘরে সব বরযাত্রী জুটবে। দেখ না ভাই ঘরের অবস্থাখানা, তারা আস্‌বার আগে একটুখানি গুছিয়ে নেবার চেষ্টায় আছি !

ইন্দু

তোমার এক্‌লার কর্ম্ম নয়, এস ভাই দু'জনে এ জঞ্জাল সাফ করা যাক্। এগুলো দরকারী না কি ?

ক্ষান্ত

কিচ্ছু না। যত রাজ্যির পুরোণো খবরের কাগজ জুটেছে ! কাগজগুলো যেখানে পড়া হয়ে যায়, সেইখানেই পড়ে থাকে !

ইন্দু

এগুলো ?

ক্ষান্ত

এগুলো মকদ্দামার কাগজ—হারাতে পারলে বাঁচেন বোধ হয়। কেন যে হারায় না, তাও ত বুঝতে পারি নে। কতকগুলো গদীর নীচে গোঁজা, কতক আলমারীর মাথায়, কতক ময়লা চাপকানের পকেটে। যখন কোনটার দরকার পড়ে বাড়ি মাথায় করে বেড়ান, আঁস্তাকুড় থেকে আর বাড়ির ছাত পর্য্যন্ত এমন জায়গা নেই যেখানে না খুঁজতে হয়।

ইন্দু

এর সঙ্গে যে ইংরেজী নভেলও আছে—তারো আবার পাতা ছেঁড়া। কতকগুলো চিঠি—এ কি দরকারী ?

ক্ষান্ত

ওর মধ্যে দরকারী আছে অদরকারীও আছে, কিচ্ছু বলবার যো নেই ! খুব গোপনীয়ও আছে, সেগুলো চারিদিকে ছড়ানো। খুব বেশী দরকারী চিঠি সাবধান করে রাখবার জন্যে বইয়ের মধ্যে গুঁজে রাখা হয়, সে আর কিছুতেই খুঁজে পাওয়া যায় না।

ইন্দু

এ সব কি ? কতকগুলো লেখা - কতকগুলো প্রুফ, খালি দেশালাইয়ের বাক্স, কানন-কুসুমিকা, কাগজের পুঁটুলির মধ্যে ছাতাধরা মসলা, একখানা তোয়ালে, গোটাকতক দাবার ঘুঁটি, একটি ইস্কাবনের গোলাম, ছাতার বাঁট,—এ চাবির গোছা ফেলে দিলে বোধ হয় চলবে না—

এই দেখ ? এই চাবির মধ্যে ওঁর যথাসর্ব্বস্ব। আজ সকালে একবার খোঁজ পড়েছিল, কোথাও সন্ধান না পেয়ে শেষে উমাপতিদের বাড়ী থেকে সতেরোটা টাকা ধার করে নিয়ে এলেন। দাও ত ভাই, এ চাবি ওঁকে সহজে দেওয়া হবে না ! ঐ ভাই, ওরা আস্‌ছে—চল্ ও-ঘরে পালাই।

[প্রস্থান।

(বিনোদ, চন্দ্রকান্ত, গদাই, নলিনাক্ষ, শ্রীপতি, ভূপতির প্রবেশ)

বিনোদ

(টোপর পরিয়া) সং ত সাজলাম, এখন তোমরা পাঁচ জনে মিলে হাততালি দাও—উৎসাহ হোক্, মনটা দমে যাচ্ছে।

চন্দ্র

এরি মধ্যে ? এখনো তো রঙ্গমঞ্চে চড়ো নি।

বিনোদ

আচ্ছা চন্দর, অভিনয়ে আমার পার্ট কি হবে বুঝিয়ে দাও দেখি ?

চন্দ্র

মহারাণীর বিদূষক।

বিনোদ

সাজটিও যথোপযুক্ত হয়েছে! ইংরেজ-রাজাদের যে "ফুল"গুলো ছিল, তাদেরও টুপীটা এই টোপরের মত।

চন্দ্র

সেজের বাতি নিবিয়ে দেবার ঠোঙাগুলোরও ঐ রকম চেহারা। এই পঁচিশটা বৎসরের যত কিছু শিক্ষা-দীক্ষা, যত কিছু আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভারতের ঐক্য, বাণিজ্যের উন্নতি, সমাজের সংস্কার, সাহেবের ছেলে পিটোনো প্রভৃতি যে সকল উঁচু উঁচু ভাবের পল্‌তে মগজের ঘি খেয়ে খুব উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠেছিল, সেগুলি ঐ টোপর চাপা পড়ে একদম নিবে যাবে।

শ্রীপতি

চন্দরদা, তুমি ত বিয়ে করেছ, বল না কি করতে হবে— হাঁ করে সবাই মিলে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে কি বিয়ে-বিয়ে মনে হয়?

চন্দ্র

সে তো ভাই ষ্টোন্ এজ, আইস্ এজের কথা, সে যুগে না ছিল পূর্ব্বরাগের কোমলতা, না ছিল অপূর্ব্ব অনুরাগের উত্তাপ। কেবল বিবাহের যিনি আদ্যাশক্তি সেই মহামায়াই আজো আছেন অন্তরে-বাহিরে, আর সমস্তই ভুলেছি।

ভূপতি

শ্যালীর হাতের কানমলা?

চন্দ্র

হায় পোড়াকপাল! শ্যালী থাক্‌লে তবু বিবাহের সঙ্কীর্ণতা অনেকটা কাটে, ওরি মধ্যে একটুখানি পাশ ফেরবার জায়গা পাওয়া যায়—শ্বশুরমশায় একেবারে কড়ায়-গণ্ডায় ওজন করে দিয়েছেন, সিকি পয়সার ফাউ দেন নি!

বিনোদ

বাস্তবিক—বর পছন্দ করবার সময় যেমন জিজ্ঞাসা করে ক'টি পাশ আছে, ক'নে পছন্দ করবার সময় তেমনই খোঁজ নেওয়া উচিত ক'টি ভগিনী আছে।

চন্দ্র

চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে—ঠিক বিয়ের দিনটিতে বুঝি চৈতন্য হল? নিতান্ত বঞ্চিত হবে না, তোমার কপালে একটি আছে, নামটা হচ্চে ইন্দুমতী।

গদাই

(স্বগত) যাঁকে আমার স্কন্ধের উপর উদ্যত করা হয়েছে —সর্ব্বনাশ আর কি!

শ্রীপতি

বিনোদ, একটুখানি বোসো।

বিনোদ

না, ভাই, তা হ'লে আর উঠতে পারব না, মনটা দেহের উপর যেন পাথরের কাগজচাপা হয়ে চেপে রাখবে।

ভূপতি

এস তবে বর ক'নের উদ্দেশে থ্রী চিয়ার্স দিয়ে বেরিয়ে পড়া যাক্। হিপ্ হিপ্ হুরে—

চন্দ্র

দেখ, আমার প্রিয়বন্ধুর বিয়েতে আমি কখনই এ রকম অনাচার হ'তে দেব না; শুভকর্ম্মে অমন বিদিশী শেয়াল ডাক ডেকো না। তার চেয়ে সবাই মিলে উলু দেবার চেষ্টা কর না!

নলিনাক্ষ

এই তবে আমাদের অবিবাহিত বন্ধুত্বের শেষ মিলন। জীবনস্রোতে তুমি এক দিকে যাবে আমি এক দিকে যাব। প্রার্থনা করি তুমি সুখে থাকো! কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্যে ভেবে দেখো বিনু, এই মরুময় জগতে তুমি কোথায় যাচ্চ—

চন্দ্র

বিনু তুই বল্, মা, আমি তোমার জন্যে দাসী আন্‌তে যাচ্চি। তা হ'লে কনকাঞ্জলিটা হয়ে যায়!

শ্রীপতি

এইবার তবে উলু আরম্ভ হোক্!

[সকলে উলুর চেষ্টা ও প্রস্থান।

(ইন্দু ও কান্তর প্রবেশ)

কান্ত

শুনলি ত ভাই, আমার কর্ত্তাটির মধুর কথাগুলি?

কেন ভাই, আমার ত মন্দ লাগে নি!

ক্ষান্ত

তোর মন্দ লাগবে কেন? তোর ত আর বাজেনি! যার বেজেচে সেই জানে—

ইন্দু

তুমি যে আবার একেবারে ঠাট্টা সইতে পার না। তোমার স্বামী কিন্তু ভাই তোমাকে সত্যি ভালবাসে। দিনকতক বাপের বাড়ি গিয়ে বরং পরীক্ষা করে দেখ না—

ক্ষান্ত

তাই একবার ইচ্ছা করে, কিন্তু জানি থাক্‌তে পারব না। তা যা হোক—এখন তোদের ওখানে যাই। ওরা তো বৌবাজারের রাস্তা ঘুরে যাবে, সে এখনো ঢের দেরি আছে।

ইন্দু

তুমি এগোও ভাই, আমি তোমার স্বামীর এই বই-গুলি গুছিয়ে দিয়ে যাই। (ক্ষান্তর প্রস্থান) ললিতবাবু তাঁর এই খাতাটা ফেলে গেছেন, এটা না দেখে আমি যাচ্ছিনে।

(খাতা খুলিয়া)

ওমা! এ যে কবিতা! কাদম্বিনীর প্রতি! আ মরণ! সে পোড়ারমুখী আবার কে!

জল দিবে অথবা বজ্র, ওগো কাদম্বিনী,
হতভাগ্য চাতক তাই ভাবিছে দিনরজনী!

ভারি যে অবস্থা খারাপ। জলও না বজ্রও না, হতভাগ্য চাতকের জন্যে কবিরাজের তেলের দরকার!

আর কিছু দাও বা না দাও, অয়ি অবলে সরলে,
বাঁচি সেই হাসিভরা মুখ আর একবার দেখিলে।

আহা হা হা হা! অবলে সরলে! পুরুষগুলো ভারি বোকা! মনে করলে ওঁর প্রতি ভারি অনুগ্রহ করে সে হেসে গেল—হাস্‌তে না কি সিকি পয়সার খরচ হয়। কই আমাদের কাছে ত কোন কাদম্বিনী সাত পুরুষে এমন করে হাস্‌তে আসে না! অবলে সরলে! সত্যি বাপু, মেয়ে জাতটাই ভাল নয়! এত ছলও জানে! ছি ছি! এ কবিতাও তেমনি। আমি যদি কাদম্বিনী হতুম ত এমন পুরুষের মুখ দেখ্‌তুম না! যে লোক চোদ্দটা অক্ষর সাম্‌লে চল্‌তে পারে না, তার সঙ্গে আবার প্রণয়! এ খাতা আমি ছিঁড়ে ফেল্‌ব—পৃথিবীর একটা উপকার করব—কাদম্বিনীর দেমাক্ বাড়তে দেবনা!

পুরুষের বেশে হরিলে পুরুষের মন,
(এবার) নারীবেশে কেড়ে নিয়ে যাও জীবন মরণ।

এর মানে কি!

কদম্ব যেমনি আমা প্রথম দেখিলে,
কেমন করে ভৃত্য বলে তখনি চিনিলে!

ওমা! ওমা! ওমা! এ যে আমারই কথা! এই-বার বুঝেছি পোড়ারমুখী কাদম্বিনী কে! (হাস্য) তাই বলি, এমন করে কাকে লিখলেন! ওমা, কত কথাই বলেচেন। আর একবার ভাল করে সমস্তটা পড়ি! কিন্তু কি চমৎকার হাতের অক্ষর! একেবারে যেন মুক্তো বসিয়ে গেছে!

(নীরবে পাঠ)

(পশ্চাৎ হইতে খাতা অন্বেষণে গদাইয়ের প্রবেশ)

কিন্তু ছন্দ থাক্ না থাক্ পড়তে ত কিছুই খারাপ হয়নি। সত্যি, ছন্দ নেই বলে আরো মনের সরল ভাবটা ঠিক যেন প্রকাশ হয়েচে। আমার বেশ লাগ্‌চে। আমার বোধ হয় ছেলেদের প্রথম ভাঙ্গা কথা যেমন মিষ্টি লাগে, কবিদের প্রথম ভাঙ্গা ছন্দ তেমনি মিষ্টি। (খাতা বুকে চাপিয়া) এ খাতা আমি নিয়ে যাব—এ ত আমাকেই লিখেচেন! আমার এমনি আনন্দ হচ্ছে! (প্রস্থানোদ্যম; পশ্চাতে ফিরিয়া গদাইকে দেখিয়া) ওমা! (মুখ আচ্ছাদন)—

গদাই

ঠাক্‌রুণ, আমি একখানা খাতা খুঁজ্‌তে এসেছিলুম। (ইন্দুমতীর দ্রুত পলায়ন) জন্ম জন্ম কেবলই আমার খাতাই হারাক্—কবিতার বদলে যা পেয়েছি কালিদাস তাঁর কুমার-সম্ভব শকুন্তলা বাঁধা রেখে এমন জিনিষ পায় না!

[মহাউল্লাসে প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বাগবাজারের রাস্তা

গদাই

আহা এই বাড়িটা আমার শরীর থেকে আমার মনটুকুকে যেন শুষে নিচ্চে—ব্লটিং যেমন কাগজ থেকে কালি শুষে নেয়! কিন্তু কোন্ দিকে সে থাকে এ পর্য্যন্ত কিছুই সন্ধান করতে পারলুম না! ঐ যে পশ্চিমের জানলার ভিতর দিয়ে একটা শাদা কাপড়ের মতন যেন দেখা গেল না, না ও ত নয়, ও ত একজন দাসী দেখ্‌চি—ওকি করচে? একটা ভিজে শাড়ি শুকুতে দিচ্চে। বোধ হয় তাঁরি শাড়ি! আহা, নাগাল পেলে একবার স্পর্শ করে নিতুম! তা হলে এতক্ষণে তাঁর স্নান হল। পিঠের উপরে ভিজে চুল ফেলে সাফ কাপড়টি পরে এখন কি করচেন?

(এই বাড়ির চৌকাঠ পার হইতে হুঁচট খাইয়া একজন বুড়ির কক্ষ হইতে তরকারীর ঝুড়ি পড়িয়া গেল)

গদাই

(ছুটিয়া নিকটে গিয়া ধরিয়া উঠাইয়া) আহা হা হা, কি তোমার নাম গো?

বুড়ি

আমার নাম ঠাকুরদাসী, এই বাড়ির ঝি।

গদাই

এই বাড়ির ঝি! আহা, লাগেনি তো?

বুড়ি

না, কিছু লাগেনি।

গদাই

আলুগুলো সব যে ছড়িয়ে পড়েচে। রসো, কুড়িয়ে দিচ্চি। তুমি বুঝি এই বাড়ির ঝি!

বুড়ি

হাঁ বাবু।

গদাই

চৌধুরীদের বাড়ির ঝি?

বুড়ি

হাঁ গো, গঙ্গামাধব চৌধুরী।

গদাই

আহা হা, ভাঁড়টা উল্টে গিয়ে তেল যে সব গড়িয়ে গেচে! তোমার দিদি ঠাকরুণ হয় তো রাগ করবেন।

বুড়ি

না, দিদি ঠাকরুণ কথাটি কবেন না কিন্তু গিন্নি মা—

গদাই

কথাটি কবেন না! আহা। (দীর্ঘ নিশ্বাস) তা এক কাজ করো। এই টাকাটি দিচ্চি—না হয় বাজার থেকে তেল কিনে আনো, আমি ততক্ষণ তোমার তরকারী আগ্‌লাচ্চি। তোমার দিদি ঠাকরুণ বুঝি কথাটি কবেন না, অ্যাঁ, ঠাকুরদাসী?

বুড়ি

তিনি বড়ো লক্ষ্মী।

গদাই

লক্ষ্মী! আহা, তা তোমার দিদি ঠাকরুণ কি খেতে ভালোবাসেন বল দেখি।

বুড়ি

ছাতাওয়ালা গলির মোড়ে ভরু ফুলুরিওয়ালা গরম গরম বেগ্‌নী ভেজে দেয়, তাই দিয়ে আমের আচার দিয়ে খেতে তাঁর খুব সখ।

গদাই

বটে! তা এই নাও ঠাকুরদাসী একটাকার বেগ্‌নি কিনে আনোতো।

ঠাকুরদাসী

এক টাকার বেগ্‌নি! সে যে অনেক হবে।

গদাই

তা হোক্, না হয় কিছু বেশিই হেলো।

ঠাকুরদাসী

তা আমি কিনে না হয় আন্‌ব পরে, তুমি এই দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকবে কতক্ষণ।

গদাই

তাতে ক্ষতি নেই, ওটা আমার একটা সখ।

ঠাকুরদাসী

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা?

গদাই

না, না, ঐ যে তোমার বেগ্‌নি—ঐ যে তুমি বল্‌লেবা—

ঠাকুরদাসী

না হয় দিদি ঠাকরুণকে বেগ্‌নি খাওয়াব, তাই বলে কি—

গদাই

আমি এই রকম খাওয়াতে বড়ো ভালোবাসি, ওটা আমার একটা বাতিক বল্‌লেই হয়। বিশেষত গরম গরম বেগ্‌নি। বেগ্‌নির ঝুড়ি চক্ষে দেখে তবে নড়ব।

ঠাকুরদাসী

তা হলে দাঁড়াও, দেরি করব না।

[প্রস্থান।

(মোড়ক হস্তে এক ব্যক্তির প্রবেশ)

ঐ ব্যক্তি

সরকার মশায় বুঝি ?

গদাই

কেন বলো ত ?

ব্যক্তি

এই বাড়ির কোন্ মা ঠাকরুণ সাত জোড়া সিল্কের মোজা রিফু করতে আমাদের দোকানে পাঠিয়েছিলেন, সেগুলি এনেচি।

গদাই

অ্যাঃ, পায়ের মোজা! ঐ জন্যেই তো এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি। দাও দাও।

দরজি

দামটা নগদ চুকিয়ে দিতে হবে।

গদাই

কত ?

দরজি

আড়াই টাকা।

গদাই

এই নিয়ে যাও! তোমার রেট তো খুব শস্তা হে! (দরজির প্রস্থান) হায়, হায়, আজ কি শুভক্ষণেই বেরিয়েছিলুম! (বুকের কাছে চাপিয়া) সেই পা দুখানির অদৃশ্য চলন দিয়ে দলন দিয়ে এই মোজার ফাঁকগুলি ভরা। আহা হা, গা শিউরে উঠচে, কবিতা লিখতে ইচ্ছে করচে—

ওগো শূন্য মোজা—

মেলানো বড় শক্ত—এই সময়ে থাকৃত বিন্দা!

আমার শূন্য হৃদয়ের মতো ওগো শূন্য মোজা
অনুপস্থিত কোন্ দুটি চরণ
সদাই করিতেছ খোঁজা!

কথা আস্‌চে। কিন্তু গুলিয়ে যাচ্চে—

বিনা পায়েই প্রাণের ভিতরে
চলে গিয়েচ সোজা।

আইডিয়াটা ওরিজিনাল।

তিনটে লাইন হোলো, সাত জোড়া মোজা আছে; ঠিক সপ্তপদীর নম্বর। আরো চারটে লাইন চাই।

(উপরতলার বারান্দার দিকে চাহিয়া) অনুদ্দেশকে উদ্দেশ করে এই লাইনগুলি আবৃত্তি করতে ইচ্ছে করচে—য়ুরোপের ট্রুবেডোরদের মতো।

(আপন মনে)

আমার শূন্য হৃদয়ের মতো ওগো শূন্য মোজা
অনুপস্থিত কোন্ দুটি চরণ
সদাই করিছ খোঁজা!

কিন্তু আর তো মিল দেখচিনে, এক আছে "মুসলমানের রোজা"— মোজাকে বল্‌লে দোষ নেই যে ইদের দিনে প্রতিপদের চাঁদ। না, না, ওতে আমার লেখার ক্ল্যাসিক্যাল প্রেস্‌টা চলে যাবে। তা ছাড়া দিন খারাপ—হয়তো সামান্য মোজার জন্যে শান্তিভঙ্গ হতেও পারে—ওটা থাক্।

(নেপথ্যে) হিঁয়া রোখো।

(শিবচরণের প্রবেশ)

শিব

বেটার তবু হুঁস নেই! দেখ না, হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে দেখ না! যেন খিদে পেয়েছে, এই বাড়ির ইটকাঠগুলো গিলে খাবে! ছোঁড়ার হল কি? খাঁচার পাখীর দিকে বেড়াল যেমন তাকিয়ে থাকে, তেমনি করে উপরের দিকে তাকিয়ে আছে। হতভাগা কালেজে যাবার নাম করে রোজ বাগবাজারে এসে ঘুর্ ঘুর্ করে। (নিকটে

আসিয়া) বাপু, মেডিকেল কালেজটা কোন্‌দিকে একবার দেখিয়ে দাও দেখি।

গদাই

কি সর্ব্বনাশ! এ যে বাবা!

শিব

শুনচো? কালেজ কোন্ দিকে। তোমার অ্যানাটমির নোট কি ঐ দেয়ালের গায়ে লেখা আছে? তোমার সমস্ত ডাক্তারিশাস্ত্র কি ঐ জানলার গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলচে? (গদাই নিরুত্তর) মুখে কথা নেই যে! লক্ষ্মীছাড়া এই তোর একজামিন! এইখানে তোর মেডিকেল কালেজ।

গদাই

খেয়েই কালেজে গেলে আমার অসুখ করে তাই একটুখানি বেড়িয়ে নিয়ে—

শিব

বাগবাজারে তুমি হাওয়া খেতে এস? সহরে আর কোথাও বিশুদ্ধ বায়ু নেই! এ তোমার দার্জ্জিলিং সিমলে পাহাড়। বাগবাজারের হাওয়া খেয়ে খেয়ে আজকাল যে চেহারা বেরিয়েচে, একবার আয়নাতে দেখা হয় কি? আমি বলি ছোঁড়াটা একজামিনের তাড়াতেই শুকিয়ে যাচ্চে, তোমাকে যে ভূতে তাড়া করে বাগবাজারে ঘোরাচ্চে, তা' ত জান্‌তুম না।

গদাই

আজ কাল বেশি পড়তে হয় বলে রোজ খানিকটা করে এক্সেসাইজ করে নিই—

শিব

রাস্তার ধারে কাঠের পুতুলের মত হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকে তোমার এক্সেসাইজ হয়, বাড়িতে তোমার দাঁড়াবারও জায়গা নেই!

গদাই

অনেকটা চলে এসে শ্রান্ত হয়েছিলুম, তাই একটু বিশ্রাম করা যাচ্চিল।

শিব

শ্রান্ত হয়েচিস, তবে ওঠ আমার গাড়ীতে! যা এখনি কালেজ যা! গেরস্তর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে শ্রান্তি দূর করতে হবে না।

গদাই

সে কি কথা! আপনি কি করে যাবেন?

শিব

আমি যেমন করে হোক্ যাব, তুই এখন গাড়ীতে ওঠ! ওঠ বলচি।

গদাই

অনেকটা জিরিয়ে নিয়েচি—এখন আমি অনায়াসে হেঁটে যেতে পারব।

শিব

না, সে হবে না—তুই ওঠ, আমি দেখে যাই—

গদাই

আপনার যে ভারি কষ্ট হবে।

শিব

সে জন্য তোকে কিছু ভাবতে হবে না—তুই ওঠ গাড়ীতে। এ ঝুড়িটা কিসের? তুই কি বাগবাজারে তরকারি ফেরি করে বেড়াস না কি?

গদাই

তাই তো, ওটা তরকারীই তো বটে! কি আশ্চর্য্য! কেমন করে এলো? এ তো মূলো দেখচি—নটেশাকও আছে। এক কাজ করি বাবা। গেরস্তর জিনিষ, ঘরের ভিতরে পৌঁছে দিয়ে আসি না।

শিব

আর তোমার পরোপকার করতে হবে না। ও ঝুড়ীর কিনারা আমি করে দিচ্চি, তুই এখন গাড়ীতে ওঠ।

গদাই

সর্ব্বনাশ! বুড়িটা এর মধ্যে বেগনি নিয়ে উপস্থিত না হলে বাঁচি। আজ সকাল বেলাটা বেশ জমে আস্‌ছিল, মাটি করে দিলে। সাত জোড়া মোজা নিয়ে করি কি? কাল দোকানদার সেজে ফিরিয়ে দিতে হবে।

শিব

তোর হাতে ওটা কিসের মোড়করে?

গদাই

আজ্ঞে ওটা—

শিব

দেখি না। (হাত টানিয়া লইয়া) এ কি ব্যাপার!

গদাই

আজ্ঞে উপহার দেবার জন্যে।—

শিব

কাকে উপহার দিবি?

গদাই

আমার একটি ক্লাশ-ফ্রেণ্ড্—

শিব

ক্লাশ-ফ্রেণ্ডকে মেয়েদের মোজা দিবি?

গদাই

তার বিয়ে হচ্চে কিনা, তাই—

শিব

তাই, কার অনেক দিনের পরা পুরোনো ময়লা মোজা তাকে দিবি? তাও আবার সাত জোড়া।

গদাই

সেকেণ্ডহাণ্ড নিলেম থেকে সস্তায় কিনেচি। আপনার কাছ থেকে টাকা চাইতে ভয় করে।

শিব

চাইলেই পেতিস্ কিনা! ফিরিয়ে দে। ছি ছি! ঐ নোংরা মোজাগুলো নিয়ে বেড়াচ্চিস্, কি জানি কোন্ ব্যামোর ছোঁয়াচ আছে ওর মধ্যে—

গদাই

আমারো সে ভয় আছে বাবা—ছোঁয়াচ যে কোথায় কি থাকে কিচ্ছু বলবার যো নেই। এখনো ফিরিয়ে দিতে পারব—কালই না হয়—

শিব

সেই ভালো। এই নে, তোকে দেড় টাকা দিচ্চি—পাকপ্রণালী দু খণ্ড কিনে তাকে দিস্। এখন গাড়ীতে ওঠ! (সহিসের প্রতি) দেখ, একেবারে সেই পটলডাঙার কালেজে নিয়ে যাবি, কোথাও থামাবি নে!

গদাই

(জনান্তিকে সহিসের প্রতি) মির্জাপুর চন্দ্রবাবুর বাসায় চল্, তোদের এক টাকা বক্‌সিস দেব, ছুটে চল।

[প্রস্থান।

শিব

আজ আর রুগী দেখা হল না! আমার সকাল বেলাটা মাটি করে দিলে!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

চন্দ্রকান্তের বাসা

চন্দ্র

নাঃ! এ আগাগোড়া কেবল ছেলেমানুষী করা হয়েচে; আমার এমন অনুতাপ হচ্চে! মনে হচ্চে যেন আমিই এ সমস্ত কাণ্ডটি ঘটিয়েচি। ইদিকে এত কল্পনা, এত কবিত্ব, এত মাতামাতি, আর বিয়ের দু'দিন না যেতে যেতেই কিছু আর মনে ধরচে না।

(গদাইয়ের প্রবেশ)

গদাই

কি হচ্চে চন্দর দা!

চন্দ্র

না, গদাই, তোরা আর বিয়ে থাওয়া করিস নে!

গদাই

কেন বল দেখি—তোমার ঘাড়ে ম্যালথসের ভূত চাপল না কি?

চন্দ্র

এখনকার ছেলেরা তোরা মেয়েমানুষকে বিয়ে করবার যোগ্য নস্। তোরা কেবল লম্বা চওড়া কথা ক'বি আর কবিতা লিখ্‌বি, তাতে যে পৃথিবীর কি উপকার হবে ভগবান্ জানেন।

গদাই

কবিতা লিখে পৃথিবীর কি উপকার হয় বলা শক্ত, কিন্তু এক এক সময় নিজের কাজে লেগে যায় সন্দেহ নেই! যা হোক্, এত রাগ কেন?

চন্দ্র

শুনেচ ত সমস্তই! আমাদের বিনুর তাঁর স্ত্রীকে পছন্দ হচ্চে না!

গদাই

বাস্তবিক, এ রকম গুরুতর ব্যাপার নিয়ে খেলা করাটা ভাল হয় নি!

চন্দ্র

বিনুটা যে এত অপদার্থ তা কি জানতুম? একটা স্ত্রীলোককে ভালবাসার ক্ষমতাটুকুও নেই?

গদাই

আমি জানি কবিতা লেখার চেয়েও সেটা সহজ কাজ!

চন্দ্র

আমি ওর মুখ দর্শন করচি নে!

গদাই

তুমি তাকে ছাড়লে সে যে নেহাৎ অধঃপাতে যাবে!

চন্দ্র

না, তার সঙ্গে কিছুতেই মিশ্‌চি নে, পায়ে এসে ধরে পড়লেও না। তুমি ঠিক বলেছিলে গদাই, আজকাল সবাই যাকে ভালবাসা বলে, সেটা একটা স্নায়ুর ব্যামো—হঠাৎ চিড়িক মেরে আসে, তার পরে ছেড়ে যেতেও তর্ সয় না।

গদাই

সে সব বিজ্ঞানশাস্ত্রের কথা পরে হবে, আপাততঃ আমার একটা কাজ করে দিতে হচ্চে।

চন্দ্র

যে কাজ বল তাতেই রাজি আছি, কিন্তু ঘটকালি আর করচি নে!

গদাই

ঐ ঘটকালিই করতে হবে!

চন্দ্র

(ব্যগ্রভাবে) কি রকম শুনি।

গদাই

বাগবাজারের চৌধুরীদের বাড়ির কাদম্বিনী, তার সঙ্গে আমার—

চন্দ্র

(উচ্চস্বরে) গদাই, তোমারও কবিত্ব! তবে তোমারও স্নায়ু বলে একটা বালাই আছে!

গদাই

তা আছে ভাই! বোধ হয় একটু বেশি পরিমাণেই আছে। অবস্থা এমনি হয়েচে যে শীগ্‌গির আমার একটা সদগতি না করলে—

চন্দ্র

বুঝেচি। কিন্তু গদাই, আর স্ত্রীহত্যার পাতকে আমাকে লিপ্ত করিস্ নে!

গদাই

কিছু ভেবোনা ভাই! পাপ করেছে বিনোদ, তার redemption আমার দ্বারা।

চন্দ্র

ভ্যালা মোর দাদা! আমি এখ্‌খনি যাচ্চি। চাদরখানা নিয়ে আসি। অমনি বড় বৌয়ের পরামর্শটাও জানা ভাল।

[প্রস্থান।

(অনতিবিলম্বে ছুটিয়া আসিয়া)

চন্দ্র

বড় বৌ রাগ করে বাপের বাড়ি চলে গেছে। তোদের সংসর্গ লাভ করতে আসি, আর হারাই আমার স্ত্রীর সংসর্গ—আমার ঘটল মুকুতার বদলে শুকুতা।

(বিনোদের প্রবেশ)

বিনোদ

চন্দর দা, তুমি আমার উপর রাগ করে চলে এলে ভাই, আমি আর থাক্‌তে পারলুম না।

চন্দ্র

না ভাই, তোদের উপর কি রাগ কর্‌তে পারি? তবে দুঃখ হয়েছিল তা স্বীকার করি।

বিনোদ

কি করব চন্দরদা! আমি এত চেষ্টা করচি কিছুতেই পেরে উঠচিনে—

চন্দ্র

কেন বল্ দেখি? ওর মধ্যে শক্তটা কি? মেয়েমানুষকে ভালবাসতে পারিস্‌নে?

বিনোদ

চন্দরদা, কি জানি ভাই, বিয়ে না করাটাই মুখস্থ হয়ে গেছে!

চন্দ্র

তোর পায়ে পড়ি বিনু! তুই আমার গা ছুঁয়ে বল, নিদেন আমার খাতিরে তোর স্ত্রীকে ভালবাসবি! মনে কর্ তুই আমার বোনকে বিয়ে করেচিস।

বিনোদ

চন্দরদা, যাকেই হোক্ বিয়ে যে করেচি, সেটা বুঝতে তো বাকি নেই, মুস্কিল হয়েচে সেটা কিছু অধিক পরিমাণেই বুঝতে পারচি। তার প্রধান কারণ টাকার টানাটানি। যতদিন একলা রাজত্ব করেছিলেম অমর্য্যাদা ছিল না। আরেকটিকে পাশে বসাবামাত্র দেখি ভাঙা সিংহাসন মড় মড় করে উঠচে। আজ অভাবগুলো চারদিক থেকে বড়ো বেআব্রু হয়ে দেখা দিলো—সেটা কি ভালো লাগে ?

গদাই

তুমি বলতে চাও, তোমার ভালবাসার অভাব নেই, অভাব কেবল টাকার ?

বিনোদ

ভালবাসা আছে বলেই তো বুঝতে পারচি যথেষ্ট টাকা নেই। পাত্র যে ফুটো সেটা ধরা পড়ল যখন তাতে সুধা ঢালা গেল। ঝাঁঝরি দিয়ে মধু খেতে গিয়ে সমস্ত গা যে যায় ভেসে। হালকা ছিলুম দারিদ্র্যের উপর দিয়ে সাঁতার কেটে গেছি—আর-একজনকে কাঁধে নেবামাত্র তার তলার দিকে তলাচ্চি—যেখানটাতে পাঁক।

গদাই

বিনোদ তোমার কবিতা যেমন, তোমার ব্যবহারটাও তেমনি, একেবারে দুর্ব্বোধ।

বিনোদ

রেগেচ বলেই সহজ কথাটা বুঝতে পারচ না। ভেবে দেখ না, আমার ছিল এক মামুলি ছাতা, রোদবৃষ্টির দুঃখ ভোগ করতে হয় নি, এমন সময় হিসেবের ভুলে ডেকে আন্‌লুম ছাতার আর এক সরিক—আজ আমার কাঁধেও জল পড়চে, তার কাঁধেও। জিনিষটা ঘোরতর অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠেচে।

গদাই

কিন্তু ভুলটা তো তোমারি।

বিনোদ

ভুলটা হচ্চে ভুল আর অভুলটা হচ্চে অভুল, তা সে আমারি হোক আর তোমারি হোক্। মোজাটা হচ্চে মোজা, পাগ্‌ড়িটা হচ্চে পাগ্‌ড়ি। ভুল করে মোজাটাকে যদি পাগ্‌ড়ি করেই পরি, তাহলে আমি ভুল করেচি বলেই মোজাটা কি পাগ্‌ড়ি হয়ে উঠবে ?

গদাই

(স্বগত) সর্ব্বনাশ ! এ আবার হঠাৎ মোজার কথা তোলে কেন, খবর পেয়েছে নাকি ? সেদিন যখন মোজা জোড়া মাথায় জড়িয়ে বসেছিলুম হয়ত কোথা দিয়ে দেখে থাক্‌বে ! (প্রকাশ্যে) ওহে মোজা নিয়ে ভুল করলেও তাতে মোজার বুক ফাটে না, বড়ো জোর সেলাই ফেঁসে যেতে পারে—কিন্তু মানুষকে নিয়ে ভুল করে তারপরে "ঐ যাঃ" বলে স'রে দাঁড়ালে তো চলে না।

চন্দ্র

বকাবকি করে লাভ কি গদাই ? এখন বলো বিনোদ, কর্ত্তব্য কি ?

বিনোদ

আমি তাঁকে তাঁর বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েচি।

চন্দ্র

তুমি নিজে চেষ্টা করে ? না তিনি রাগ করে গেছেন ?

বিনোদ

না, আমি তাঁকে একরকম বুঝিয়ে দিলুম—

চন্দ্র

যে, এখানে তিনি টিকতে পারবেন না ! তুমি সব পারো—বিনু, আজ আমার মনটা কিছু অস্থির আছে, আজ আর থাকৃতে পারচিনে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

নিবারণের বাসা

ইন্দু ও কমল

কমল

না ভাই ইন্দু, ওরকম করে তুই বলিসনে।

ইন্দু

কি রকম করে বলতে হবে ? বলতে হবে, স্ত্রীর ভারটুকুও সইতে পারেন না, বিনোদবিহারী এত বড়োই সৌখীন কবি ! তাঁর বড়ো জোর সহ্য হয় ফিকে চাঁদের আলো, কিম্বা

ঝরা ফুলের গন্ধ। আমি ভাবচি তোর মত মেয়েকেও সইতে পার্‌ল না, ওর রুচিটি এতই ফিন্‌ফিনে, আর তুই যে ওর মতো পুরুষকেও সহ্য করতে পার্‌চিস, তোর রুচিকে বাহাদুরী দিই!

কমল

তুই বুঝিসনে ইন্দু, ওরা যে পুরুষ মানুষ। আমাদের এক ভাব ওদের আর এক ভাব। মেয়েমানুষের ভালোবাসা সবুর করতে পারে না, বিধাতা তার হাতে সে অবসর দেন নি। পুরুষ মানুষ অনেক ঠেকে' অনেক ঘা খেয়ে তার পরে ভালবাস্‌তে শেখে, ততদিন পৃথিবী সবুর করে' থাকে, কাজের ব্যাঘাত হয় না!

ইন্দু

ইস্! কি সব নবাব! আচ্ছা, দিদি, তুই কি বলিস্ গদাই গয়লার সঙ্গে আজই যদি আমার বিয়ে হয় অম্‌নি কাল ভোর থেকেই তাড়াতাড়ি তার চরণ দুটো ধরে' সেবা করতে বসে' যাব—মনে করব ইনি আমার চিরকালের গয়লা, পূর্ব্বজন্মের গয়লা, বিধাতা এঁকে এবং এর অন্য গোরু-গুলিকে গোয়ালসুদ্ধ আমারই হাতে সমর্পণ করে দিয়েচেন!

কমল

ইন্দু, তুই কি যে বকিস্ আমি তোর সঙ্গে পেরে উঠিনে। গদাই গয়লাকে তুই বিয়ে করতে যাবি কেন—সে একে গয়লা তাতে আবার তার দুই বিয়ে।

ইন্দু

আচ্ছা না হয় গদাই গয়লা না হল—পৃথিবীতে গদাই-চন্দ্রের তো অভাব নেই।

কমল

তা তোর অদৃষ্টে যদি কোন গদাই থাকে তা হলে অবিশ্যি তাকে ভালবাস্‌বি—

ইন্দু

কখ্‌খনো বাস্‌ব না! আচ্ছা তুমি দেখো! বিয়ে করেচি বলেই যে অমনি তার পরদিন থেকে গদাই গদাই করে গদগদ হয়ে বেড়াব, আমাকে তেমন মেয়ে পাওনি! আমি দিদি তোর মতন না ভাই!

কমল

আসল জানিস্ ইন্দু, ওদের না হলে আমাদের চল্‌তে পারে কিন্তু আমাদের না হলে পুরুষ মানুষের চলে না, সেই জন্যে ওদের আমরা ভালোবাসি।

(নিবারণের প্রবেশ)

নিবারণ

মা, তোমাকে দেখ্‌লে আমি চোখের জল রাখতে পারি নে। আমার মার কাছে আমি অপরাধী—তোমার কাছে আমার দাঁড়ানো উচিত হয় না।

কমল

কাকা, আপনি অমন করে বলবেন না, আমার অদৃষ্টে যা ছিল তাই হয়েছে—

ইন্দু

বাবা, আসলে যার অপরাধ তাকে কিছু না বলে তার অপরাধ তোমরা পাঁচজনে কেন ভাগ করে নিচ্চ, আমি ত বুঝতে পারি নে।

নিবারণ

থাক্ মা, সে সব আলোচনা থাক্—এখন একটা কাজের কথা বলি, কমল মন দিয়ে শোন। তোমাকে এতদিন গরীবের মেয়ে বলে পরিচয় দিয়ে এসেচি, সে কথাটা ঠিক নয়। তোমার বাপের সম্পত্তি নিতান্ত সামান্য ছিল না—আমারই হাতে সে সমস্ত আছে ইতিমধ্যে অনেক টাকা জমেছে এবং সুদেও বেড়েচে; তোমার কুড়ি বছর বয়স হলে তবে তোমার পাবার কথা। সময় হয়েচে, এখন নাও তোমার বিষয়। সেই টানে হয় তো স্বামীও এসে পড়্‌বে।

কমল

কাকা, তাঁকে আপনি এ সংবাদ দেবেন না! কথাটা যাতে কেউ টের না পায়, আপনাকে তাই করতে হবে।

নিবারণ

কেন বল দেখি মা?

কমল

একটু কারণ আছে। সমস্তটা ভেবে আপনাকে পরে বল্‌ব।

নিবারণ

আচ্ছা।

[প্রস্থান।

ইন্দু

তোর মৎলবটা কি আমাকে বলত !

কমল

আমি আর একটা বাড়ি নিয়ে ছদ্মবেশে ওঁর কাছে অন্য স্ত্রীলোক বলে পরিচয় দেব।

ইন্দু

সে ত বেশ হবে ভাই! ওরা ঠিক নিজের স্ত্রীকে ভালোবেসে সুখ পায় না। কিন্তু বরাবর রাখতে পারবি ত?

কমল

বরাবর রাখ্‌বার ইচ্ছে তো আমার নেই বোন্—

ইন্দু

ফের আবার একদিন স্বামী স্ত্রী সাজ্‌তে হবে না কি?

কমল

হাঁ ভাই, যতদিন যবনিকা পতন না হয়। ঐ শিবচরণ বাবু বোধ হয় আস্‌চেন, চল পালাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

(গদাই ও শিবচরণের প্রবেশ)

শিব

দেখ্‌ নিবারণকে আজ শেষ কথা বল্‌ব বলেই এখানে এসেচি। এখন তোর মনের কথাটা স্পষ্ট করেই বল্।

গদাই

আমি ত সব কথা স্পষ্ট করেই বলেচি। বিয়ে করবার কথায় এখন মন দিতেই পারচিনে।

শিব

এই বুড়ো বয়সে তুই যে একটা সামান্য বিষয়ে আমাকে এত দুঃখ দিবি তা কে জানৃত !

গদাই

বাবা, এটা কি সামান্য বিষয় হল?

শিব

আরে বাপু, সামান্য না ত কি! বিয়ে করা বৈ ত নয়। রাস্তার মুটে-মজুরগুলোও যে বিয়ে করচে। ওতে ত খুব বেশি বুদ্ধি খরচ করতে হয় না, বরঞ্চ কিছু টাকা খরচ আছে, তা সেও বাপমায়ে যোগায়। তুই এমন বুদ্ধিমান্ ছেলে, এতগুলো পাশ করে' শেষকালে এইখানে এসে ঠেক্‌ল?

গদাই

আপনি ত সব শুনেচেন—আমি ত বিয়ে কর্‌তে অসম্মত নই—

শিব

আরে তাতেই ত আমার বুঝতে আরো গোল বেধেচে! যদি বিয়ে করতেই আপত্তি না থাকে, তবে না হয় একটাকে না করে' আর একটাকেই কর্‌লি! নিবারণকে কথা দিয়েচি—আমি তার কাছে মুখ দেখাই কি করে'!

গদাই

নিবারণবাবুকে ভাল করে' বুঝিয়ে বল্লেই সব—

শিব

আরে, আমি নিজে বুঝ্‌তে পারিনে, নিবারণকে বোঝাব কি! আমি যদি তোর মাকে বিয়ে না করে' তোর মাসীকে বিয়ে কর্‌বার প্রস্তাব মুখে আন্‌তুম, তা হলে তোর ঠাকুরদাদা কি আমার দু'খানা হাড় একত্র রাখত! পড়েচিস্ ভাল মানুষের হাতে—

গদাই

শুনেচি আমার ঠাকুর্দা মশায়ের মেজাজ ভাল ছিল না—

শিব

কি বলিস্ বেটা! মেজাজ ভাল ছিল না! তোর বাবার চেয়ে তিনশো গুণে ভালো ছিল! কিছু বলিনে বলে' বটে! সে যাহোক্, এখন যা হয় একটা কথা ঠিক করেই বল!

গদাই

আমি ত বরাবর এক কথাই বলে আস্‌চি।

শিব

(সরোষে) তুই ত বল্‌চিস্ এক কথা। আমিই কি এক কথার বেশি বল্‌চি! মাঝের থেকে কথা যে আপনিই ছুটো হয়ে যাচ্চে! আমি এখন নিবারণকে বলি কি? তা সে যাহোক্, তুই তা হলে নিবারণের মেয়ে ইন্দুমতীকে কিছুতেই বিয়ে কর্‌বিনে? যা বল্‌বি এক কথা বল্!

গদাই

কিছুতেই না বাবা

শিব

একমাত্র বাগবাজারের কাদম্বিনীকেই বিয়ে করবি? ঠিক করে' বলিস! এক কথা!

গদাই

সেই রকমই স্থির করেচি—

শিব

বড়ো উত্তম কাজ করেচ—এখন আমি নিবারণকে কি বল্‌ব!

গদাই

বল্‌বেন, আপনার অবাধ্য ছেলে তাঁর কন্যা ইন্দুমতীর যোগ্য নয়।

শিব

কোথাকার নির্লজ্জ! আমাকে আর তোর শেখাতে হবে না। কি বল্‌তে হবে তা আমি বিলক্ষণ জানি। তবে ওর আর কিছুতেই নড়চড় হবে না? এক কথা!

গদাই

না বাবা, সে জন্যে আপনি ভাববেন না।

শিব

আরে মোলো! আমি সেই জন্যেই ভেবে মর্‌চি আর কি। আমি ভাব্‌চি নিবারণকে বলি কি!

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সুসজ্জিত গৃহ

বিনোদ

এরা বেছে বেছে এত দেশ থাক্‌তে আমাকে উকিল পাক্‌ড়ালে কি করে' আমি তাই ভাব্‌চি! আমার অদৃষ্ট ভাল বল্‌তে হবে। এখন টিক্‌তে পার্‌লে হয়।

(ঘোম্‌টা পরিয়া কমলের প্রবেশ)

বিনোদ

আহা, মুখটি দেখ্‌তে পেলে বেশ হত! আপনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েচেন?

কমল

হাঁ। আপনি বোধ হয় আমার অবস্থা সবই জানেন!

বিনোদ

কিছু কিছু শুনেচি। গলাটা যে তারি মতন শোনাচ্চে। সব মেয়েরই গলা প্রায় এক রকম দেখ্‌চি। কিন্তু তার চেয়ে কত মিষ্টি!

কমল

সে কথা থাক্। আমার যা-কিছু সমস্তর কর্ত্তৃত্বভার আপনাকে নিতে হবে।

বিনোদ

আপনি যে আমাকে এত বড়ো বিশ্বাসের যোগ্য মনে করলেন, এতেই আমাকে যোগ্যতা দেবে। আপনার বিশ্বাসই আমাকে মানুষ করে তুলবে।

কমল

আপনাকে আর বেশিক্ষণ আবদ্ধ করে রাখতে চাইনে, আপনার বোধ করি অনেক কাজ আছে—

বিনোদ

না, না, সে জন্যে আপনি ভাব্‌বেন না। আমার সহস্র কাজ থাক্‌লেও সমস্ত পরিত্যাগ করে' আমি—

কমল

কাল পয়লা তারিখ, কাল থেকে তা হলে আমার কর্ম্মচারীদের কাছ থেকে আপনি বুঝে পড়ে নিন্। নিবারণবাবু এখনি আসবেন, তিনি এলে তাঁর কাছ থেকেও অনেকটা জেনে শুনে নিতে পারবেন!

বিনোদ

নিবারণবাবু?

কমল

আপনি তাঁকে চেনেন বোধ হয়, কারণ, তিনিই প্রথমে আপনার জন্যে আমার কাছে অনুরোধ করে দিয়েচেন।

বিনোদ

(স্বগত) ছি ছি ছি বড় লজ্জা বোধ হচ্চে। আমি কালই আমার স্ত্রীকে ঘরে নিয়ে আস্‌ব। এখন ত আমার কোন অভাব নেই!

কমল

আপনি বরঞ্চ নীচের ঘরে একটু অপেক্ষা করুন, নিবারণ-বাবু এলেই খবর পাঠিয়ে দেবো। আর একটা কথা,

আমি যে কাল আপনাকে চিঠিতে জানিয়েছি, আপনার বন্ধু ললিত চাটুর্য্যেকে একবার এখানে আন্‌তে, সেটার কিছু ব্যবস্থা হয়েচে ?

বিনোদ

সব ঠিক আছে। তিনি এলেন বলে, আর দেরি নেই।

কমল

তবে আমি আসি।

[প্রস্থান।

বিনোদ

হায় হায় এতটাই যখন বিশ্বাস করলেন, তখন কেবল আর তিন ইঞ্চি পরিমাণ বিশ্বাস করে ঘোমটা খুল্‌লে বাঁচা যেত। তা হলেই চোখ দুটি দেখতে পেতুম। কিন্তু নিবারণ বাবুকে নিয়ে কি করা যায়!

[প্রস্থান।

(নিবারণ ও কমলমুখীর প্রবেশ)

কমল

আমার জন্যে আপনি আর কিছু ভাববেন না—এখন ইন্দুর এই গোলটা চুকে গেলেই বাঁচা যায়!

নিবারণ

তাই ত মা, আমাকে ভারি ভাবনা ধরিয়ে দিয়েছে। আমি এ দিকে শিবু ডাক্তারের সঙ্গে কথাবার্ত্তা এক রকম স্থির করে বসে আছি, এখন তাকেই বা কি বলি, ললিত চাটুয্যেকেই বা কোথায় পাওয়া যায়, আর, সে বিয়ে করতে রাজি হয় কি না তাই বা কে জানে!

কমল

সে জন্যে ভাববেন না কাকা। আমাদের ইন্দুকে চোখে দেখলে বিয়ে করতে নারাজ হবে, এমন ছেলে কেউ জন্মায় নি।

নিবারণ

ওদের দেখা শোনা হয় কি করে ?

কমল

সে আমি সব ঠিক করেছি।

নিবারণ

তুমি কি করে ঠিক কর্‌লে মা ?

কমল

আমি ওঁকে বলে দিয়েছি ওঁর বন্ধু ললিত বাবুকে এখানে নিয়ে আস্‌বেন। তার পর একটা উপায় করা যাবে।

নিবারণ

তা সব যেন হল, আমি ভাবছি শিবুকে কি বল্‌ব!

কমল

ঐ উনি আস্‌ছেন। আমি তবে যাই।

[প্রস্থান।

(বিনোদের প্রবেশ)

বিনোদ

এই যে, আমি আপনার কথাই ভাবছিলুম।

নিবারণ

কেন বাপু, আমি ত তোমার মক্কেল নই।

বিনোদ

আজ্ঞে, আমাকে আর লজ্জা দেবেন না—আপনি বুঝতেই পারছেন—

নিবারণ

না বাপু, আমি কিছুই বুঝতে পারি নে। আমরা সেকালের লোক।

বিনোদ

আমার স্ত্রী আপনার ওখানে আছেন—

নিবারণ

তা অবশ্য—তাঁকে ত আমরা ত্যাগ করতে পারি নে—

বিনোদ।

আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে তাঁকে যদি আমার ওখানে পাঠিয়ে দেন—

নিবারণ

বাপু, আবার কেন পাল্কী ভাড়াটা লাগাবে ?

বিনোদ

আপনারা আমাকে কিছু ভুল বুঝেছেন। আমার অবস্থা খারাপ ছিল বলেই আমার স্ত্রীকে—তা যাই হোক—তাঁকে ত্যাগ করবার অভিপ্রায় ছিল না। এখন আপনারই অনুগ্রহে তো—তা এখন তো অনায়াসে—

নিবারণ

বাপু, এ ত তোমার পোষা-পাখী নয়। সে যে মানুষ

তোমার ওখানে যেতে রাজি হবে—এমন আমার বোধ হয় না।

বিনোদ

আপনি অনুমতি দিলে আমি নিজে গিয়ে তাঁকে অনুনয় বিনয় করে নিয়ে আস্‌তে পারি।

নিবারণ

আচ্ছা, সে বিষয় বিবেচনা করে পরে বল্‌ব।

[প্রস্থান।

বিনোদ

বুড়োও ত কম একগুঁয়ে নয় দেখছি। যা হোক্ এ পর্য্যন্ত রাণীকে কিছু বলে নি বোধ হয়।

(চন্দ্রের প্রবেশ)

বিনোদ

কি হে চন্দর! তুমি এখানে যে!

চন্দ্র

নিবারণ বাবু এই বাড়ীতে কি কাযে এসেছেন শুন্‌লুম। আজ তাঁরই ওখানে আমার খাওয়ার পালা পড়েছে, বুড়ো ভুলে গেছেন কি না খবর নিতে এসেছি। ক্ষিদে পেয়েছে। তুমিও বুঝি নিবারণ বাবুর খোঁজে এখানে এসেছ?

বিনোদ

সে কথা পরে হবে। কিন্তু তুমি পালা করে খাচ্ছ, তার মানে ত বুঝতে পারছি নে চন্দরদা!

চন্দ্র

আর ভাই মহা বিপদে পড়েছি।

বিনোদ

কেন কি হয়েছে?

চন্দ্র

কি জানি ভাই, কখন তোদের সাক্ষাতে কথায় কথায় কি কতকগুলো মিছে কথা বলেছিলুম, তাই শুনে ব্রাহ্মণী বাপের বাড়ী এমনই গা-ঢাকা হয়েছেন যে, কিছুতেই তাঁর আর নাগাল পাচ্ছিনে।

বিনোদ

বল কি দাদা! তোমার বাড়ীতে ত এ দণ্ডবিধি পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল না!

চন্দ্র

না ভাই, কালক্রমে কতই যে হচ্ছে, কিছু বুঝতে পারছি নে!

বিনোদ

এখন তা হ'লে তোমার ছুটী চল্‌ছে বলো। জীবনে এই বোধ হয় ডোমেষ্টিক্ সার্ভিসে তোমার প্রথম ফার্লো।

চন্দ্র

হাঁ রে, কিন্তু without pay। বিনু, আমার দুঃখ তোরা বুঝতেই পারবি নে। তুই সে দিন বলছিলি বিয়ে না করাটাই তোর মুখস্থ হয়ে গেছে। আমার ঠিক তার উল্টো। ঐ স্ত্রীটিকে এমনই বিশ্রী অভ্যেস করে ফেলেছি যে, হঠাৎ বুকের হাড় কখানা খসে গেলে যেমন একদম খালি ঠেকে, ঐ স্ত্রীটি আড়াল হলেই তেমনই জগৎটা যেন ফাটা বেলুনের মত চুপসে যায়।

বিনোদ

এখন উপায় কি?

চন্দ্র

মনে করছি আমি উল্টে রাগ করব। আমিও ঘর ছেড়ে তোর এখানেই থাক্‌ব। আমার বন্ধুদের মধ্যে তোকেই সে সব চেয়ে বেশী ভয় করে। তার বিশ্বাস, তুই আমার মাথাটি খেয়েছিস্।

বিনোদ

তা বেশ কথা। কিন্তু আমাকে যে আবার শ্বশুরবাড়ী যেতে হচ্ছে।

চন্দ্র

কার শ্বশুর বাড়ী?

বিনোদ

আমার নিজের, আবার কার!

চন্দ্র

(সানন্দে বিনুর পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিয়া) সত্যি বলছিস্ বিনু?

বিনোদ

স্ত্রীকে আন্‌তে চলেছি, নিতান্ত লক্ষ্মীছাড়ার মতো থাক্‌তে আর ইচ্ছে করছে না।

চন্দ্র

কিন্তু এত দিন তোর এ আক্কেল ছিল কোথায়? যত কাল আমার সংসর্গে ছিলি, এমন সব সৎসঙ্কল্পের প্রসঙ্গ তো শুনতে পাই নি, দু'দিন আমার দেখা পাস্ নি, আর তোর ধর্ম্মবুদ্ধি এত দূর পরিষ্কার হয়ে এল?

বিনোদ

কিন্তু চন্দর দা, বিপদ কি হয়েচে জানো। নিবারণবাবুর যে রকম মেজাজ দেখলুম, সহজে কমলকে আমার কাছে পাঠাতে রাজি হবেন না। তুমি তো তাঁর ওখানে খেতে যাচ্চ, আমার হয়ে একটু ওকালতি করতে হবে।

চন্দ্র

নিশ্চয় করব। কিন্তু ওরা যে বল্‌লে নিবারণবাবু এখানে এসেচেন।

বিনোদ

এই খানিকক্ষণ হল তিনি চলে গেছেন, তুমি আর দেরি কোরো না।

[প্রস্থান।

(ইন্দু ও কমলের প্রবেশ)

কমল

তোর জ্বালায় ত আর বাঁচিনে ইন্দু! তুই আবার একি জটা পাকিয়ে বসে আছিস্! ললিতবাবুর কাছে তোকে কাদম্বিনী বলে উল্লেখ করতে হবে না কি?

ইন্দু

তা কি করব, দিদি! কাদম্বিনী না বল্লে যদি সে না চিন্‌তে পারে, তা হ'লে ইন্দু বলে পরিচয় দিয়ে লাভটা কি?

কমল

ইতিমধ্যে তুই এত কাণ্ড কখন করে তুল্‌লি, তা ত জানিনে! একটা যে আস্ত নাটক বানিয়ে বসেচিস্!

ইন্দু

তোমার বিনোদবাবুকে বোলো, তিনি লিখে ফেল্‌বেন এখন, তারপর মেট্রপলিটান থিয়েটারে অভিনয় দেখতে যাব! ঐ ভাই, তোমার বিনোদবাবু আস্‌চেন, আমি পালাই।

[প্রস্থান।

(বিনোদের প্রবেশ)

বিনোদ

মহারাণী, আমার বন্ধু এলে কোথায় তাঁকে বসাব?

কমল

এই ঘরেই বসাবেন।

বিনোদ

ললিতের সঙ্গে আপনার যে-বন্ধুর বিবাহ স্থির করতে হবে—তাঁর নামটি কি?

কমল

কাদম্বিনী। বাগবাজারের চৌধুরীদের মেয়ে।

বিনোদ

আপনি যখন আদেশ করচেন আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। কিন্তু ললিতের কথা আমি কিছুই বল্‌তে পারিনে। সে যে এ সব প্রস্তাবে আমাদের কারো কথায় কর্ণপাত করবে এমন বোধ হয় না—

কমল

আপনাকে সে জন্যে বোধ হয় বেশি চেষ্টা করতেও হবে না—কাদম্বিনীর নাম শুনলেই তিনি আর বড়ো আপত্তি করবেন না।

বিনোদ

তা হলে ত আর কথাই নেই।

কমল

মাপ করেন যদি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।

বিনোদ

এখনি। (স্বগত) স্ত্রীর কথা না তুললে বাঁচি!

কমল

আপনার স্ত্রী নেই কি?

বিনোদ

কেন বলুন দেখি? স্ত্রীর কথা কেন জিজ্ঞাসা করচেন?

কমল

আপনি ত অনুগ্রহ করে এই বাড়িতেই বাস করচেন, তা আপনার স্ত্রীকে আমি আমার সঙ্গিনীর মত ক'রে

রাখতে চাই। অবিশ্যি যদি আপনার কোন আপত্তি না থাকে।

বিনোদ

আপত্তি! কোন আপত্তিই থাকতে পারে না। এ ত আমার সৌভাগ্যের কথা!

কমল

আজ সন্ধ্যের সময় তাঁকে আনতে পারেন না?

বিনোদ

আমি বিশেষ চেষ্টা করব।

[কমলের প্রস্থান।

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য

একটি সাহেব বাবু এসেচেন।

বিনোদ

এইখানেই ডেকে নিয়ে আয়।

(সাহেবী বেশে ললিতের প্রবেশ)

ললিত

(শেকহ্যাণ্ড করিয়া) Well! How goes the world? ভাল ত?

বিনোদ

এক রকম ভালয় মন্দয়। তোমার কি রকম চলচে?

ললিত

Pretty well! জান, I am going in for studentship next year.

বিনোদ

ওহে, আর কত দিন একজামিন দিয়ে মরবে। বিয়ে থাওয়া কর্‌তে হবে না, না কি? এদিকে যৌবনটা যে ভাঁটিয়ে গে"।

ললিত

Hallo! You seem to have queer ideas on the subject। কেবল যৌবনটুকু নিয়ে one can't marry। I suppose first of all you must get a girl whom you—

বিনোদ

আহা তা ত বটেই। আমি কি বলচি তুমি তোমার নিজের হাত পা গুলোকে বিয়ে করবে? অবিশ্যি মেয়ে একটি আছে।

ললিত

I know that! একটি কেন? মেয়ে there is enough and to spare! কিন্তু তা নিয়ে ত কথা হচ্চে না।

বিনোদ

আহা তোমাকে নিয়ে ত ভাল বিপদে পড়া গেল! পৃথিবীর সমস্ত কন্যাদায় তোমাকে হরণ করতে হবে না। কিন্তু যদি একটি বেশ সুন্দরী সুশিক্ষিত বয়ঃপ্রাপ্ত মেয়ে তোমাকে দেওয়া যায়, তা হলে কি বল!

ললিত

I admire your cheek বিনু। তুমি wife select করবে আর আমি marry করব! I don't see any rhyme or reason in such co-operation। পোলিটিক্যাল ইকনমিতে division of labour আছে কিন্তু there is no such thing in marriage।

বিনোদ

তা বেশ ত, তুমি দেখ, তার পরে পছন্দ না হয়, বিয়ে কোরো না।

ললিত

My dear fellow, you are very kind! কিন্তু আমি বলি কি, you need not bother yourself about my happiness। আমার বিশ্বাস আমি যদি কখনো কোনো girlকে love করি, I will love her without your help এবং তারপরে যখন বিয়ে করব you'll get your invitation in due form!

বিনোদ

আচ্ছা ললিত, যদি সে মেয়েটির নাম শুনলেই তোমার পছন্দ হয়?

ললিত

The idea! নাম শুনে পছন্দ! যদি মেয়েটিকে বাদ দিয়ে simply নামটিকে বিয়ে করতে বল, that's a safe proposition!

বিনোদ

আগে শোনো, তারপর যা বলতে হয় বোলো—মেয়েটির নাম—কাদম্বিনী।

ললিত

কাদম্বিনী! She may be all that is nice and good কিন্তু, I must confess, তার নাম নিয়ে তাকে congratulate করা যায় না। যদি তার নামটাই তার best qualification হয়, তা হলে I should try my luck in some other quarter!

বিনোদ

(স্বগত) এর মানে কি! তবে যে রাণী বললেন, কাদম্বিনীর নাম শুনলেই লাফিয়ে উঠবে! দূর হোক্ গে! একে খাওয়ানটাই বাজে খরচ হল—আবার এই ম্লেচ্ছটার সঙ্গে আরও আমাকে নিদেন দুঘণ্টা কাটাতে হবে দেখছি!

ললিত

I say, it's infernally hot here—চল না বারান্দায় গিয়ে বসা যাক্।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কমলমুখীর অন্তঃপুর

কমল ও ইন্দু

ইন্দু

দিদি, আর বলিস্‌নে, দিদি, আর বলিস্‌নে। পুরুষ মানুষকে আমি চিনেচি! তুই বাবাকে বলিস্ আমি আর কাউকে বিয়ে করব না।

কমল

তুই ললিত বাবু থেকে সব পুরুষ চিন্‌লি কি করে ইন্দু!

ইন্দু

আমি জানি ওরা কেবল কবিতায় ভালবাসে তা ছন্দ মিলুক আর না মিলুক। ছি ছি ছি ছি, দিদি, আমার এমনি লজ্জা করচে! ইচ্ছে করচে মাটির সঙ্গে মাটি হয়ে মিশে যাই। কাদম্বিনীকে সে চেনে না? মিথ্যেবাদী! কাদম্বিনীর নামে কবিতা লিখেচে, সে খাতা এখনো আমার কাছে আছে।

কমল

যা হয়ে গেছে তা নিয়ে ভেবে আর কি করবি। এখন কাকা যাকে বলচেন্, তাকে বিয়ে কর্।

[ইন্দুমতীর প্রস্থান।

(নিবারণের প্রবেশ)

নিবারণ

কি করি বল ত মা! ললিত চাটুয্যে যা বলেচে সে ত সব শুনেছ? সে বিনোদকে কেবল মারতে বাকী রেখেচে। অপমান যা হবার তা হয়েচে—

কমল

না কাকা, তার কাছে ইন্দুর নাম করা হয়নি, আপনার মেয়ের কথা হচ্চে, তাও সে জানে না।

নিবারণ

ইদিকে আবার শিবুকে কথা দিয়েচি, তাকেই বা কি বলি। তুমি মা, ইন্দুকে বলে কয়ে ওদের দুজনে দেখা করিয়ে দিতে পার ত ভাল হয়।

কমল

গদাইয়ের মনের ইচ্ছে কি সেটাও ত জান্‌তে হবে কাকা! আবার কি এই রকম একটি কাণ্ড বাধানো ভাল।

নিবারণ

সে আমি তার বাপের কাছে শুনেচি; সে বলে আমি উপার্জ্জন না করে বিয়ে করব না। সে ত আমার মেয়েকে কখনো চক্ষে দেখে নি। একবার দেখলে ও সব কথা ছেড়ে দেবে।

কমল

তা ইন্দুকে আমি সম্মত করাতে পারব।

[নিবারণের প্রস্থান।

(ইন্দুর প্রবেশ)

কমল

লক্ষ্মী দিদি আমার, আমার একটি অনুরোধ তোর রাখতে হবে।

ইন্দু

কি বলনা ভাই?

কমল

একবার গদাই বাবুর সঙ্গে তুই দেখা কর।

ইন্দু

কেন দিদি, তাতে আমার কী প্রায়শ্চিত্তটা হবে !

কমল

তোর যখন যা ইচ্ছে তাই করেছিস ইন্দু, কাকা তাতে বাধা দেন নি। আজ কাকার একটি অনুরোধ রাখবিনে ?

ইন্দু

রাখব ভাই—তিনি যা বলবেন তাই শুনব।

কমল

তবে চল, তোর চুলটা একটু ভাল করে দিই। নিজের উপরে এতটা অযত্ন করিস নে।

[প্রস্থান।

(গদাইয়ের প্রবেশ)

গদাই

চন্দর যখন পীড়াপীড়ি করচে তা না হয় একবার ইন্দু-মতীর সঙ্গে দেখা করাই যাক্। শুনেচি তিনি বেশ বুদ্ধিমতী সুশিক্ষিতা মেয়ে—তাঁকে আমার অবস্থা বুঝিয়ে বল্লে তিনি নিজেই আমাকে বিবাহ করতে অসম্মত হবেন। তা হলে আমার ঘাড় থেকে দায়টা যাবে—বাবাও আর পীড়াপীড়ি করবেন না।

(মুখে ঘোমটা টানিয়া ইন্দুর প্রবেশ)

ইন্দু

বাবা যখন বলচেন তখন দেখা করতেই হবে ; কিন্তু কারো অনুরোধে ত পছন্দ হয় না। বাবা কখনোই আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে দেবেন না।

গদাই

(নত শিরে ইন্দুর প্রতি) আমাদের মা বাপ আমাদের পরস্পরের বিবাহের জন্যে পীড়াপীড়ি করচেন, কিন্তু আপনি যদি ক্ষমা করেন ত আপনাকে একটি কথা বলি—

ইন্দু

এ কি ! এ যে ললিত বাবু ! (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) ললিত বাবু, আপনাকে বিবাহের জন্যে যাঁরা পীড়াপীড়ি করচেন, তাঁদের আপনি জানাবেন, বিবাহ এক পক্ষের সম্মতিতে হয় না। আমাকে আপনার বিবাহের কথা বলে কেন অপমান করচেন ?

গদাই

এ কি ! এ যে কাদম্বিনী ! (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) আপনি এখানে আমি তা জানতুম না। আমি মনে করে-ছিলুম, নিবারণবাবুর কন্যা ইন্দুমতীর সঙ্গে আমি কথা কচ্চি—কিন্তু আমার যে এমন সৌভাগ্য হবে—

ইন্দু

ললিত বাবু, আপনার সৌভাগ্য আপনি মনে মনে রেখে দেবেন, সে কথা আমার কাছে প্রচার করবার দরকার দেখিনে।

গদাই

আপনি কাকে ললিতবাবু বল্‌চেন ? ললিতবাবু বারান্দায় বিনোদের সঙ্গে গল্প করচেন—যদি আবশ্যক থাকে তাঁকে ডেকে নিয়ে আসি।

ইন্দু

না, না, তাঁকে ডাকতে হবে না। আপনি তা হলে কে ?

গদাই

এর মধ্যেই ভুলে গেলেন ? চন্দ্রবাবুর বাসায় আপনি নিজে আমাকে চাকরি দিয়েচেন, আমি তৎক্ষণাৎ তা মাথায় করে নিয়েচি—ইতিমধ্যে বরখাস্ত হবার মত কোন অপরাধ করিনি ত !

ইন্দু

আপনার নাম কি ললিতবাবু নয় ?

গদাই

যদি পছন্দ করেন ত ঐ নামই শিরোধার্য্য করে নিতে পারি কিন্তু বাপ মায়ে আদর করে আমার নাম রেখেছিলেন গদাই।

ইন্দু

গদাই ?—ছি ছি, এ কথা আমি আগে জান্‌তে পারলুম না কেন ?

গদাই

তা হলে কি চাকরি দিতেন না ? এখন কি আদেশ করেন ?

ইন্দু

আমি আদেশ করচি, ভবিষ্যতে যখন কবিতা লিখবেন, কাদম্বিনীর পরিবর্ত্তে ইন্দুমতী নামটি ব্যবহার করবেন আর ছন্দ মিলিয়ে লিখবেন।

গদাই

দুটোই যে আমার পক্ষে সমান অসাধ্য ।

ইন্দু

আচ্ছা, ছন্দ মেলাবার ভার আমি নিজেই নেব এখন, নামটা আপনি বদলে নেবেন—

গদাই

এমন নিষ্ঠুর আদেশ কেন করচেন ? চোদ্দটা অক্ষরের জায়গায় সতেরোটা বসানো কি এম্‌নি গুরুতর অপরাধ যে, সে জন্যে ভৃত্যকে একেবারে—

ইন্দু

না, সে অপরাধ আমি সহস্র বার মার্জ্জনা করতে পারি, কিন্তু ইন্দুমতীকে কাদম্বিনী বলে ভুল করলে আমার সহ্য হবে না—

গদাই

আপনার নাম তবে—

ইন্দু

ইন্দুমতী

গদাই

হায় হায়, এত দিন কি ভুলটাই করেচি ! বাগবাজারের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছি, বাবা আমাকে উঠতে বস্‌তে দু'বেলা বাপান্ত করেচেন, তার উপরে কাদম্বিনী নামটা ছন্দের ভিতর পুরতে মাথা ভাঙ্গাভাঙ্গি করতে হয়েচে ।—

(মৃদুস্বরে)

যেমনি আমার ইন্দু প্রথম দেখিলে
কেমন করে চকোর বলে তখনি চিনিলে—

কিম্বা

কেমন করে চাকর বলে তখনি চিনিলে—

আহা, সে কেমন হত !

ইন্দু

তবে, এখন ভ্রমসংশোধন করুন—এই নিন্ আপনার খাতা । আমি চল্লুম ।

[প্রস্থান ।

গদাই

(উচ্চস্বরে) শুনে যান, আপনারও বোধ হচ্চে যেন একটা ভ্রম হয়েছিল—সেটাও অনুগ্রহ করে সংশোধন করে নেবেন - সুবিধে আছে, আপনাকে সেই সঙ্গে ছন্দ বদলাতে হবে না । হায় রে, সেই মোজার কবিতাটা যে অপরাধের বোঝা হয়ে আমার আনাটামির নোট-বইটা চেপে রইল । মেজর অপারেশন করলেও যে ওটাকে ছাঁটা যাবে না । আর সেই রিফু করা মোজা ক'জোড়া ! আজও যে প্রাণ ধরে সেগুলো ফিরিয়ে দিতে পারি নি ! তার উপরে সেদিন থেকে ভরু ফুলুরিওয়ালার তেলে-ভাজা বেগ্‌নি খেয়ে খেয়ে অম্লশূল হবার যো হোলো ! ঠাকুরদাসীকে খুঁজে বের করতে হবে । সে বুড়ীটাকে—ইচ্ছে করচে থাক্ সে আর বলে কাজ নেই !

(নিবারণের প্রবেশ)

নিবারণ

দেখ বাপু, শিবু আমার বাল্যকালের বন্ধু—আমার বড় ইচ্ছে তাঁর সঙ্গে আমার একটা পারিবারিক বন্ধন হয় । এখন তোমাদের ইচ্ছের উপরেই সমস্ত নির্ভর করচে ।

গদাই

আমার ইচ্ছের জন্যে আপনি কিছু ভাববেন না, আপনার আদেশ পেলেই আমি কৃতার্থ হই ।

নিবারণ

(স্বগত) যা মনে করেছিলুম তাই । বুড়ো বাপ মাথা খোঁড়াখুড়ি করে যা করতে না পার্‌লে, একবার ইন্দুকে দেখবামাত্র সমস্ত ঠিক হয়ে গেল । বুড়োরাই শাস্ত্র মেনে চলে — যুবোদের শাস্ত্রই এক আলাদা । - (প্রকাশ্যে) তা বাপু, তোমার কথা শুনে বড় আনন্দ হল ! তা হ'লে একবার আমার মেয়েকে তার মতটা জিজ্ঞাসা করে আসি । তোমরা শিক্ষিত লোক, বুঝতেই পার, বয়ঃপ্রাপ্ত মেয়ে, তার সম্মতি না নিয়ে তাকে বিবাহ দেওয়া যায় না ।

গদাই

তা অবশ্য ।

নিবারণ

তা হ'লে আমি একবার আসি । চন্দ্রবাবুদের এই ঘরে ডেকে দিয়ে যাই ।

[প্রস্থান ।

(শিবচরণের প্রবেশ)

শিব

তুই এখানে ব'সে রয়েচিস্, আমি তোকে পৃথিবী-সুদ্ধ খুঁজে বেড়াচ্ছি।

গদাই

কেন বাবা?

শিব

তোকে যে আজ তারা দেখ্‌তে আস্‌বে।

গদাই

কা'রা?

শিব

বাগবাজারের চৌধুরীরা।

গদাই

কেন?

শিব

কেন! না দেখে-শুনে অম্‌নি ফস্ করে বিয়ে হয়ে যাবে? তোর বুঝি আর সবুর সইচে না?

গদাই

বিয়ে কার সঙ্গে হবে?

শিব

ভয় নেই রে বাপু, তুই যাকে চাস্ তারই সঙ্গে হবে! আমার ছেলে হয়ে তুই যে এত টাকা চিনেচিস্, তা ত জান্‌তুম না; তা, সেই বাগবাজারের ট্যাকশালের সঙ্গেই তোর বিয়ে স্থির করে এসেচি।

গদাই

সে কি বাবা? আপনার মতের বিরুদ্ধে আমি বিয়ে করতে চাইনে—বিশেষ আপনি নিবারণ বাবুকে কথা দিয়েচেন—

শিব

(অনেকক্ষণ হাঁ করিয়া গদাইয়ের মুখের দিকে নিরীক্ষণ) —তুই ক্ষেপেচিস না আমি ক্ষেপেচি আমাকে কে বুঝিয়ে দেবে। কথাটা একটু পরিষ্কার করে বল্, আমি ভাল করে বুঝি।

গদাই

আমি সে চৌধুরীদের মেয়ে বিয়ে করব না।

শিব

চৌধুরীদের মেয়ে বিয়ে করবিনে। তবে কা'কে করবি!

গদাই

নিবারণ বাবুর মেয়ে ইন্দুমতীকে।

শিব

(উচ্চৈঃস্বরে) কী! হতভাগা পাজি লক্ষ্মীছাড়া বেটা! যখন ইন্দুমতীর সঙ্গে সম্বন্ধ করি, তখন বলিস্ কাদম্বিনীকে বিয়ে করবি, আবার যখন কাদম্বিনীর সঙ্গে সম্বন্ধ করি, তখন বলিস্ ইন্দুমতীকে বিয়ে করবি - তুই তোর বুড়ো বাপকে একবার বাগবাজার একবার মির্জ্জাপুর ক্ষেপিয়ে নিয়ে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াতে চাস্!

গদাই

আমাকে মাপ কর বাবা, আমার একটা মস্ত ভুল হয়ে গিয়েছিল—

শিব

ভুল কিরে বেটা, তোর সেই বাগবাজারে বিয়ে কর্‌তেই হবে। তাদের কোনো পুরুষে চিনিনে, আমি নিজে গিয়ে তাদের স্তুতি মিনতি করে এলুম, যেন আমারি কন্যে-দায় হয়েচে, তারপরে যখন সমস্ত ঠিকঠাক হয়ে গেল, আজ তা'রা আশীর্ব্বাদ কর্‌তে আস্‌বে, তখন বলে কি না বিয়ে কর্‌ব না। আমি এখন চৌধুরীদের বলি কি!

(চন্দ্রের প্রবেশ)

চন্দ্র

(গদাইয়ের প্রতি) সমস্ত শুনলুম। ভাল একটি গোল বাধিয়েচ যা হোক্। এই যে ডাক্তারবাবু, ভাল আছেন ত?

শিব

ভাল আর থাকতে দিলে কই? এই দেখ না চন্দর, ওঁর নিজেরই কথামত একটি পাত্রী স্থির করলুম—যখন সমস্ত ঠিক হয়ে গেল, তখন বলে কি না, তাকে বিয়ে করব না! আমি এখন চৌধুরীদের বলি কি?

গদাই

বাবা, তুমি তাদের একটু বুঝিয়ে বললেই—

শিব

তোমার মাথা! তাদের বোঝাতে হবে আমার ভীমরতি ধরেচে আর আমার ছেলেটি আস্ত ক্ষেপা—তা তাদের বুঝতে বিলম্ব হবে না।

চন্দ্র

আপনি কিছু ভাববেন না। সে মেয়েটির আর একটি পাত্র জুটিয়ে দিলেই হবে।

শিব

সে তেমন মেয়েই নয়। তার টাকা আছে ঢের কিন্তু চেহারা দেখে পাত্র এগোয় না। আমার বংশের এই অকাল কুষ্মাণ্ডের মত হঠাৎ এত বড় বাঁদর দ্বিতীয় আর কোথায় পাবে যে তাকে বিয়ে করতে রাজি হবে!

চন্দ্র

সে আমার উপর ভার রইল। আমি সমস্ত ঠিকঠাক করে দেব। এখন নিশ্চিন্ত মনে নিবারণবাবুর মেয়ের সঙ্গে বিবাহ স্থির করুন।

শিব

যদি পার চন্দর ত বড় উপকার হয়। এই বাগবাজারের হাত থেকে মানে মানে নিস্তার পেলে বাঁচি। এদিকে আমি নিবারণের কাছে মুখ দেখাতে পারচিনে, পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্চি।

চন্দ্র

সে জন্যে কোন ভাবনা নেই। আমি প্রায় অর্দ্ধেক কাজ গুছিয়ে এসে তবে আপনাকে বলছি। এখন বাকিটুকু সেরে আসি।

[প্রস্থান।

(নিবারণের প্রবেশ)

শিব

আরে এস ভাই এস।

নিবারণ

ভাল আছ ভাই?—যা হোক শিবু, কথা ত স্থির?

শিব

সে ত বরাবরই স্থির আছে, এখন তোমার মর্জ্জি হলেই হয়।

নিবা

আমারো ত সমস্ত ঠিক হয়ে আছে এখন হয়ে গেলেই চুকে যায়।

শিব

তবে আর কি দিনক্ষণ দেখে—

নিবারণ

সে সব কথা পরে হবে—এখন কিছু মিষ্টিমুখ করবে চল।

শিব

না ভাই, আমার অভ্যাস নেই, এখন থাক্—অসময়ে খেয়েচি কি, আর আমার মাথা ধরেচে—

নিবারণ

না, না, সে হবে না, কিছু খেতে হচ্ছে! বাপু তুমিও এস।

[প্রস্থান।

(কমল ও ইন্দুর প্রবেশ)

কমল

ছি, ছি, ইন্দু তুই কি কাণ্ডটাই করলি বল দেখি?

ইন্দু

তা বেশ করেচি! ভাই, পরে গোল বাধার চেয়ে আগে গোল চুকে যাওয়া ভাল।

কমল

এখন পুরুষ জাতটাকে কি রকম লাগচে?

ইন্দু

মন্দ না ভাই, একরকম চলনসই!

কমল

তুই যে বলেছিলি ইন্দু, গদাই গয়লাকে তুই কখখনো বিয়ে করবিনে!

ইন্দু

না ভাই, গদাই নামটি খারাপ নয়, তা তোমরা যাই বল। তোমার কল্লোলকুমার, লাবণ্যকিশোর, কাকলীকণ্ঠ, সুস্মিত-মোহনের চেয়ে সহস্রগুণে ভাল। গদাই নামটি খুব আদরের নাম অথচ পুরুষমানুষকে বেশ মানায়। রাগ করিস্ নে দিদি, তোর বিনোদের চেয়ে ঢের ভাল—

কমল

কি হিসেবে ভাল শুনি!

ইন্দু

বিনোদবিহারী নামটা বাণভট্টের কাদম্বরীতেই চলে, আঠারো গজী সমাসের মধ্যে। গদাই নামটি বেশ সাদা-সিধে, ওর মধ্যে বোপদেবের হস্তক্ষেপ করবার যো নেই।

আমি তোমাকে নিশ্চয় বলচি মা দুর্গা কার্ত্তিকের চেয়ে গণেশকেই বেশী ভালোবাসেন। গদাই নামটি আমার গদাইগণেশ, তোমার বিনোদকার্ত্তিকের চেয়ে ভালো।

কমল

কিন্তু যখন বই ছাপাবে, বইয়ে ও নাম ত মানাবে না।

ইন্দু

আমি ত ছাপতে দেব না, খাতাখানি আগে আটক করে রাখব। আমার ততটুকু বুদ্ধি আছে দিদি—

কমল

তা যে নমুনা দেখিয়েছিলি!—তোর সেটুকু বুদ্ধি আছে জানি, কিন্তু শুনেচি বিয়ে করলে স্বামীর লেখা সম্বন্ধে মত বদলাতে হয়।

ইন্দু

আমার ত তার দরকার হবে না। আমার কবি কেবল আমারই কবি, পৃথিবীতে তাঁর কেবল একটিমাত্র পাঠক।

কমল

ছাপবার খরচ বেঁচে যাবে—

ইন্দু

সবাই তাঁর কবিত্বের প্রশংসা করলে আমার প্রশংসার মূল্য থাকবে না।

কমল

সবাই প্রশংসা করবে ঐ আশঙ্কাটা তোকে করতে হবে না! যা হোক্, তোর গয়লাটিকে তোর পছন্দ হয়েছে, তা নিয়ে তোর সঙ্গে ঝগড়া করতে চাইনে। তাকে নিয়ে তুই চিরকাল সুখে থাক্ বোন্! তোর গোয়াল দিনে দিনে পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক!

ইন্দু

ঐ বিনোদ বাবু আসচেন। মুখটা ভারি বিমর্ষ দেখচি।

[ইন্দুর প্রস্থান।

(বিনোদের প্রবেশ)

কমল

তাঁকে এনেচেন?

বিনোদ

তিনি তাঁর বাপের বাড়ী গেচেন, তাঁকে আন্‌বার তেমন সুবিধে হচ্চে না!

কমল

আমার বোধ হচ্চে তিনি যে আমার সঙ্গিনীভাবে এখানে থাকেন, সেটা আপনার আন্তরিক ইচ্ছে নয়।

বিনোদ

আপনাকে আমি বল্‌তে পারিনে, তিনি এখানে আপনার কাছে থাক্‌লে আমি কত সুখী হই! আপনার দৃষ্টান্তে তাঁর কত শিক্ষা হয়!

কমল

আমার দৃষ্টান্ত হয় ত তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। শুনেচি আপনি তাঁকে অল্পদিন হ'ল বিবাহ করেচেন, হয় ত তাঁকে ভাল করে জানেন না।

বিনোদ

তা বটে। কিন্তু যদিও তিনি আমার স্ত্রী তবু এ কথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে, আপনার সঙ্গে তাঁর তুলনা হতে পারে না।

কমল

ও কথা বল্‌বেন না। আপনি হয় ত জানেন না আমি তাঁকে বাল্যকাল হ'তে চিনি। তাঁর চেয়ে আমি যে কোন অংশে শ্রেষ্ঠ এমন বোধ হয় না।

বিনোদ

আপনি তাঁকে চেনেন?

কমল

খুব ভাল রকম চিনি।

বিনোদ

আমার সম্বন্ধে তিনি আপনার কাছে কোন কথা বলেচেন?

কমল

কিছু না। কেবল বলেচেন, তিনি আপনার ভালোবাসার যোগ্য নন। আপনাকে সুখী করতে না পেরে এবং আপনার ভালবাসা না পেয়ে তার সমস্ত জীবনটা ব্যর্থ হয়ে আছে।

বিনোদ

এ তাঁর ভারি ভ্রম! তবে আপনার কাছে স্পষ্ট স্বীকার করি, আমিই তাঁর ভালবাসার যোগ্য নই। আমি তাঁর প্রতি বড় অন্যায় করেচি, কিন্তু সে তাঁকে ভালোবাসিনে বলে নয়।

কমল

তবে আর একটি সংবাদ আপনাকে দিই। আপনার স্ত্রীকে আমি এখানে আনিয়ে রেখেচি।

বিনোদ

(আগ্রহে) কোথায় আছেন তিনি, আমার সঙ্গে একবার দেখা করিয়ে দিন্!

কমল

তিনি ভয় করচেন পাছে আপনি তাঁকে ক্ষমা না করেন—যদি অভয় দেন—

বিনোদ

বলেন কি, আমি তাঁকে ক্ষমা কর্‌ব! তিনি যদি আমাকে ক্ষমা করতে পারেন—

কমল

তিনি কোনকালেই আপনাকে অপরাধী করেন নি, সে জন্যে আপনি ভাববেন না—

বিনোদ

তবে এত মিনতি করচি তিনি আমাকে দেখা দিচ্চেন না কেন?

কমল

আপনি সত্যই যে তাঁর দেখা চা'ন, এ জান্‌তে পারলে তিনি এক মুহূর্ত্ত গোপনে থাক্‌তেন না। তবে নিতান্ত যদি সেই পোড়ার মুখ দেখতে চান ত দেখুন।

(মুখ উদ্ঘাটন)

বিনোদ

আপনি! তুমি! কমল! আমাকে মাপ করলে!

(ইন্দুর প্রবেশ)

ইন্দু

মাপ করিসনে দিদি! আগে উপযুক্ত শাস্তি হোক্, তার পরে মাপ!

বিনোদ

তা হলে অপরাধীকে আর একবার বাসর-ঘরে আপনার হাতে সমর্পণ করতে হয়।

ইন্দু

দেখেচিস ভাই, কত বড় নির্লজ্জ! এরি মধ্যে মুখে কথা ফুটেচে। ওঁদের একটু আদর দিয়েচিস কি আর ওঁদের সাম্‌লে রাখবার যো নেই। মেয়েমানুষের হাতে পড়েই ওঁদের উপযুক্ত শাসন হয় না। যদি নিজের জাতের সঙ্গে ঘরকন্না করতে হত তা'হলে দেখতুম ওঁদের এত আদর থাক্‌তো কোথায়!

বিনোদ

তা'হলে ভূভারহরণের জন্যে মাঝে মাঝে অবতারের আবশ্যক হতো না; পরস্পরকে কেটেকুটে সংসারটা অনেকটা সংক্ষেপ করে আন্‌তে পারতুম।

ইন্দু

গান

এবার মিলন হাওয়ায় হাওয়ায় হেলতে হবে।
ধরা দেবার খেলা এবার খেলতে হবে।
ওগো পথিক পথের টানে
চলেছিলে মরণ পানে
আঙিনাতে আসন এবার মেলতে হবে॥
মাধবিকার কুঁড়িগুলি আনো তুলে—
মালতিকার মালা গাঁথো নবীন ফুলে।
স্বপ্ন স্রোতের ভিড়বি পারে,
বাঁধবি দুজন দুইজনারে,
সেই মায়াজাল হৃদয় ঘিরে ফেলতে হবে।

এখন কবি সম্রাট, এর একটা জবাব দিতে হবে তোমাকে।

বিনোদ

এখনি? হাতে হাতে?

ইন্দু

হাঁ, এখুনি।

বিনোদ

আচ্ছা, দুটো মিনিট সময় দাও।

(নোট বই লইয়া লিখিতে প্রবৃত্ত)

কমল

এ আবার তুই কি খেলা বের করলি, ইন্দু।

ইন্দু

কমল দিদি, তুমি যে খেলা খেলে নিলে, এ তার চেয়ে

অনেক বেশি নিরাপদ। উনি বাঁধচেন কাব্য, তুমি বেঁধেছ কবিকে।

কমল

ওগো লীকারী তুমি আর কথা কোয়ো না—তোমার নিজের কবিটির কাহিনী ভুলে গেছ বুঝি? একবার তাকে হোলো অস্বীকার, আবার হোলো স্বীকার,—মানুষটাকে কি কম নাকাল করা হয়েচে?

ইন্দু

আমার অকবিটিকে আমি কবি বানিয়েচি, এর বেশি কিছু না—কিন্তু তোমার মানুষটি আদিতে ছিলেন কবি, মধ্যে হলেন অকবি, আবার অন্তে উল্টো রথে ফিরচেন কবিত্বে—এ কি কম কথা? আমাদের কমল অধিকারীর এই পালাটির নাম দিয়েচি কবি-জগন্নাথের রথযাত্রা। মন্দির থেকে বেরোনো, আবার মন্দিরে ফিরিয়ে আনা। দু'দিন বাদেই দেখবি, থিয়েটার-ওয়ালারা ঝুলোঝুলি করবে, এটা অভিনয় করবার জন্যে। লেখা হোলো, কবিবর?

বিনোদ

হয়েচে।

(ইন্দু ও কমলে মিলিয়া নোটবই লইয়া মনে মনে পাঠ)

ইন্দু

পাকা আম নিঙড়োলে রসের সঙ্গে আঁটি বেরিয়ে আসে। এও যে তাই।

বিনোদ

অর্থাৎ?

ইন্দু

অর্থাৎ এতো শুধু কাব্যরস নয় এ যে রসতত্ত্ব। দিদি তোমার এ কবিটি যে-সে কবি নয়—কাব্যকুঞ্জবনে এই মানুষটি নারিকেল জাতীয়—তোমার ভাগ্যে শাঁসও জুটবে, রসও জুটবে।

কমল

আর তোর ভাগ্যে, ইন্দু?

ইন্দু

শুধু ছোবড়া।

বিনোদ

ছি ছি ভাই, আমার মধ্যে এমন রসের সঙ্কীর্ণতা দেখলে কোথায়?

ইন্দু

কবিবর সঙ্কীর্ণতার দর বেশী, ঔদার্য্যেই সস্তা করে। হীরের টুকরো সঙ্কীর্ণ, পাথরের চাঁই মস্ত। আমরা চাই তুমি একলা আমার দিদির কণ্ঠহারে একটি মাত্র মধ্যমণি হয়ে থাকো—সরকারী হোটেলের রান্নাঘরে মস্ত শিল-নোড়ার কাজে বিশ্বজনীন হয়ে না ওঠো।

বিনোদ

তাই সই, কিন্তু ঐ যে গানটা তৈরি করলেম, ওটাকে সুরের হারে গেঁথে একলা তোমার কণ্ঠে কি স্থান দেবে না?

ইন্দু

আচ্ছা, আজ তোমার good conductএর প্রাইজ স্বরূপে এই অনুগ্রহ করতে রাজি আছি। কোন্ সুর তোমার পছন্দ বলো!

বিনোদ

তোমার পছন্দেই আমার পছন্দ।

ইন্দু

আচ্ছা, সখা তবে শ্রবণ করো।

(গান)

লুকালে বলেই খুঁজে বাহির-করা।
ধরা যদি দিতে তবে যেত না ধরা।
পাওয়া ধন আনমনে
হারাই যে অযতনে,
হারাধন পেলে সে যে হৃদয়-ভরা।
আপনি যে কাছে এলো দূরে সে আছে,
কাছে যে টানিয়া আনে সে আসে কাছে।
দূরে বারি যায় চলে
লুকায় মেঘের কোলে
তাই সে ধরায় ফেরে পিপাসাহরা॥

কমল

ঐ ক্ষান্ত দিদি আসচেন। (বিনোদের প্রতি) তোমার সাক্ষাতে উনি বেরবেন না।

[বিনোদের প্রস্থান।

(ক্ষান্তর প্রবেশ)

ক্ষান্ত

তা বেশ হয়েচে ভাই, বেশ হয়েচে! এই বুঝি তোর নতুন বাড়ি। এ যে রাজার ঐশ্বর্য্য। তা বেশ হয়েচে। এখন তোর স্বামী ধরা দিলেই আর কোনো খেদ থাকে না।

ইন্দু

সে বুঝি আর বাকি আছে! স্বামী রত্নটিকে আগে ভাগে ভাঁড়ারে পুরেছেন!

আহা, তা বেশ হয়েচে, বেশ হয়েচে। কমলের মত এমন লক্ষ্মীমেয়ে কি কখনো অসুখী হতে পারে!

ইন্দু

ক্ষান্ত দিদি, তুমি যে ভর সন্ধ্যের সময় ঘরকন্না ফেলে এখানে ছুটে এসেচ?

ক্ষান্ত

আর ভাই ঘরকন্না! আমি দু'দিন বাপের বাড়ি গিয়েছিলুম, এই ওঁর আর সহ্য হল না। রাগ করে ঘর ছেড়ে শুনলুম, তোদের এই বাড়িতে এসে রয়েছেন! তা ভাই, বিয়ে করেচি বলেই কি বাপ মা একেবারে পর হয়ে গেচে। দু'দিন সেখানে থাক্‌তে পাব না। যা হোক খবরটা পেয়ে চলে আসতে হল।

ইন্দু

আবার তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে বুঝি!

ক্ষান্ত

তা ভাই, একলা ত আর ঘরকন্না হয় না। ওদের যে চাই, ওদের যে নইলে নয়। নইলে আমার কি সাধ ওদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখি।

ইন্দু

ঐ যে ওঁরা আসচেন। এসো এই পাশের ঘরে।

[প্রস্থান।

(শিবচরণ, গদাই, নিবারণ ও চন্দ্রের প্রবেশ)

সমস্ত ঠিক হয়ে গেচে!

শিব

কি হল বল দেখি।

চন্দ্র

ললিতের সঙ্গে কাদম্বিনীর বিবাহ স্থির হয়ে গেল।

শিব

সে কি! সে যে বিবাহ করবে না, শুনলুম?

চন্দ্র

সহধর্ম্মিণীকে না। বিয়ে করচে টাকা-কল্পলতিকাকে; সে ওকে সাতপাকে ঘিরে বিলেত যাবার পাথেয়-পুষ্পবৃষ্টি করবে। যা হোক্, এখন আর একবার আমাদের গদাই বাবুর মত নেওয়া উচিত—ইতিমধ্যে যদি আবার বদল হয়ে থাকে।

শিব

(ব্যস্তভাবে) না, না, আর মত বদলাতে সময় দেওয়া হবে না! তার পূর্ব্বেই আমরা পাঁচজনে পড়ে চেপে চুপে ধ'রে কোন গতিকে ওর বিয়েটা দিয়ে দিতে হচ্চে। চল গদাই, অনেক আয়োজন করবার আছে। (নিবারণের প্রতি) তবে চল্লেম ভাই।

নিবারণ

এস। (গদাই ও শিবচরণের প্রস্থান) চন্দর বাবু, আপনার ত খাওয়া হ'ল না, কেবল ঘুরে ঘুরেই অস্থির হলেন—একটু বসুন, আপনার জন্যে জলখাবারের আয়োজন করে আসি গে।

[প্রস্থান।

(ক্ষান্তর প্রবেশ)

ক্ষান্ত

এখন বাড়ি যেতে হবে না কি?

চন্দ্র

(দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া) নাঃ আমি এখানে বেশ আছি!

ক্ষান্ত

তা ত দেখতে পাচ্চি। তা চিরকাল এইখানেই কাটাবে না কি?

চন্দ্র

বিন্নুর সঙ্গে আমার ত সেই রকমই কথা হয়েচে!

ক্ষান্ত

বিন্নু তোমার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী কি না; বিন্নুর সঙ্গে কথা হয়েচে! এখন ঢের হয়েচে চল!

চন্দ্র

(জিব কাটিয়া মাথা নাড়িয়া) সে কি হয়! বন্ধু-মানুষকে কথা দিয়েচি এখন কি সে ভাঙ্‌তে পারি!

ক্ষান্ত

আমার ঘাট হয়েচে, আমাকে মাপ কর তুমি। আমি আর কখনো বাপের বাড়ি গিয়ে থাক্‌ব না! তা তোমার ত অযত্ন হয় নি—আমি তো সেখান থেকে সমস্ত রেঁধে তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েচি।

চন্দ্র

বড়বৌ, আমি কি তোমার রান্নার জন্যে তোমাকে বিয়ে করেছিলুম? যে বৎসর তোমার সঙ্গে অভাগার শুভ-বিবাহ হয়, সে বৎসর কল্‌কাতা সহরে কি রাঁধুনি বামুনের মড়ক হয়েছিল?

ক্ষান্ত

আমি বল্‌চি আমার একশো'বার ঘাট হয়েছে, আমাকে মাপ করো, আমি আর কখনো এমন কাজ কর্‌ব না! এখন তুমি ঘরে চল!

চন্দ্র

তবে একটু রসো! নিবারণ বাবু আমার জল খাবারের ব্যবস্থা কর্‌তে গেচেন—উপস্থিত ত্যাগ করে যাওয়াটা শাস্ত্রবিরুদ্ধ!

ক্ষান্ত

আমি সেখানে সব ঠিক্ করে রেখেচি, তুমি এখনি চল!

চন্দ্র

বল কি নিবারণ বাবু—

বন্ধুগণ

(নেপথ্য হইতে) চন্দরদা!

ক্ষান্ত

ঐ রে, আবার ওরা আস্‌চে! ওদের হাতে পড়্‌লে আর তোমার রক্ষে নেই।

চন্দ্র

ওদের হাতে তুমি আমি দুজনে পড়ার চেয়ে একজন পড়া ভাল। শাস্ত্রে লিখ্‌চে, "সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ", অতএব এ স্থলে অর্দ্ধাঙ্গের সরাই ভাল।

ক্ষান্ত

তোমার ঐ বন্ধুগুলোর জ্বালায় আমি কি মাথমোড় খুঁড়ে মর্‌ব?

[প্রস্থান।

(বিনোদ, গদাই ও নলিনাক্ষের প্রবেশ)

চন্দ্র

কেমন মনে হচ্চে বিনু?

বিনোদ

সে আর কি বল্‌ব দাদা!

চন্দ্র

গদাই, তোর স্নায়ুরোগের বর্ত্তমান লক্ষণটা কি বল্ দেখি!

গদাই

অত্যন্ত সাংঘাতিক। ইচ্ছে করচে দিগ্বিদিকে নেচে বেড়াই।

চন্দ্র

ভাই নাচ্‌তে হয় ত দিকে নেচো, আবার বিদিকে নেচোনা। পূর্ব্বে তোমার যে রকম দিগ্‌ভ্রম হয়েছিল, কোথায় মির্জ্জাপুর—কোথায় বাগবাজার!

গদাই

এখন ঠিক পথেই চলেচি, যাচ্চি বাসর ঘরের দিকে; এই যে সামনেই। [প্রস্থান।

চন্দ্র

সদ্দৃষ্টান্ত দেখে আমারো ঠিক পথে যাবার ইচ্ছে প্রবল হল। এখানেও আহার তৈরি ঘরেও আহার প্রস্তুত—কিন্তু ঘরের দিকে ডবল টান পড়েচে!

বিনোদ

ওহে চন্দরদা, চুপ্ চুপ্।

চন্দ্র

কেন হে?

বিনোদ

ঐ যে সুর বেজে উঠ্‌ল বাসরঘর থেকে।

চন্দ্র

তাই তো, বিপদ কাছে আস্‌চে। ছিল গলির ওপারে, এখন এল পাশের ঘরে—ক্রমে আরো কাছে আসবে।

বিনোদ

চন্দ্রদা, বেরসিকের মতো কথা বোলো না, বিপদ বারো বেশি ছিলো, যখন সেটা গলির ওপারে ছিলো—তই কাছে আসচে, ততই হৃদয় ভেঙে যাবার আশঙ্কা মচে।

(নেপথ্যে গান)

মুখপানে চেয়ে দেখি, ভয় হয় মনে,
ফিরেচ কি ফেরো নাই, বুঝিব কেমনে ?
আসন দিয়েচি পাতি, মালিকা রেখেচি গাঁথি,
বিফল হোলো কি তাহা ভাবি খনে খনে।
গোধূলি-লগনে পাখী ফিরে আসে নীড়ে,
ধানে-ভরা তরীখানি ঘাটে আসে ভীড়ে।
আজো কি খোঁজার শেষে
ফেরো নি আপন দেশে,
বিরাম-বিহীন তৃষা জ্বলে কি নয়নে ?

চন্দ্র

ওরে বিনু, এখনো মাম্‌লা চোকে নি, প্রিভিকৌন্সিলে নালিশ চল্‌চে। তোর তরফের কৌন্‌সুলির কোনো জবাব তৈরি আছে ? Plead guilty না কি ?

বিনোদ

এক রকম তাই। কিন্তু দাদা, আমাদের মোটা কণ্ঠে কথা জোটে তো সুর জোটে না।

চন্দ্র

তা হোক হার মানতে পারব না। আচ্ছা দে দেখি কথাটা—কোনো মতে সবাই মিলে চেঁচামেচি করে চালিয়ে দিতে পারব।

বিনোদ

এই যে আমার বইয়ে ছাপানো আছে।

চন্দ্র

ধন্য কবি ধন্য,—দিনের কালের উপযুক্ত সকল রকম বটিকা আগে থাকতেই তৈরি করে রেখেচ। কাজে জুরে ঠিক লাগবে—

গান

জয় ক'রে তবু ভয় কেন তোর যায় না,
হায় ভীরু প্রেম হায় রে !
আশার আলোয় তবুও ভরসা পায় না,
মুখে হাসি তবু চোখে জল না শুকায় রে ॥
বিরহের দাহ আজি হোলো যদি সারা,
ঝরিল মিলন রসের শ্রাবণ-ধারা,
তবুও এমন গোপন বেদন তাপে
অকারণ দুখে পরাণ কেন দুখায় রে ॥
যদিবা ভেঙেচে ক্ষণিক মোহের ভুল,
এখনো প্রাণে কি যাবে না মানের মূল ?
যাহা খুঁজিবার সাঙ্গ হোলো তো খোঁজা,
যাহা বুঝিবার শেষ হয়ে গেলো বোঝা,
তবু কেন হেন সংশয় ঘন ছায়ে
মনের কথাটি নীরব মনে লুকায় রে ॥

তৃতীয় দৃশ্য

বাসরঘরের বাহিরে।

লোকারণ্য। শঙ্খ, হুলুধ্বনি। শানাই।

নিবারণ

কানাই ! ও কানাই ! কি করি বল দেখি ! কানাই গেল কোথায় ?

শিব

তুমি ব্যস্ত হয়োনা ভাই ! এ ব্যস্ত হবার কাজ নয় ! আমি সব ঠিক করে দিচ্চি। তুমি পাত পাড়া হল কি না দেখে এস দেখি !

ভৃত্য

বাবু, আসন এসে পৌচেছে, সে-গুলো রাখি কোথায় ?

নিবারণ

এসেচে ! বাঁচা গেচে ! তা সেগুলো ছাতে—

শিব

ব্যস্ত হচ্ছ কেন দাদা ! কি হয়েছে বল দেখি ? কি যে

বেটা, তুই হাঁ করে দাঁড়িয়ে রয়েচিস্ কেন? কাজ-কর্ম্ম কিছু হাতে নেই না কি!

ভৃত্য

আসন এসেচে, সে-গুলো রাখি কোথায় তাই জিজ্ঞাসা কর্‌চি

শিব

আমার মাথায়! একটু গুছিয়ে গাছিয়ে নিজের বুদ্ধিতে কাজ করা তা তোদের দ্বারা হবে না! চল আমি দেখিয়ে দিচ্চি! ওরে বাতিগুলো যে এখনো জ্বালালে না! এখানে কোনো কাজেরই একটা বিলি-ব্যবস্থা নেই—সমস্ত বে-বন্দোবস্ত! নিবারণ, ভাই, তুমি একটু ঠাণ্ডা হয়ে বস দেখি —ব্যস্ত হয়ে বেড়ালে কোন কাজই হয় না। আঃ বেটাদের কেবল ফাঁকি! বেহারা বেটারা সবাই পালিয়েচে দেখ্‌চি, আচ্ছা করে তাদের কানমলা না দিলে—

নিবারণ

পালিয়েচে না কি! কি করা যায়!

শিব

ব্যস্ত হয়ো না ভাই—সব ঠিক হয়ে যাবে। বড় বড় ক্রিয়া-কর্ম্মের সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখা ভারি দরকার। কিন্তু এই রেধো বেটার সঙ্গে ত আর পারিনে! আমি তাকে পই পই করে বল্লুম তুমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে লুচি ভাজিয়ো, কিন্তু কাল থেকে হতভাগা বেটার চুলের টিকি দেখবার যো নেই! লুচি যেন কিছু কম পড়েচে বোধ হচ্চে।

নিবারণ

বল কি শিবু! তা হলে ত সর্ব্বনাশ!

শিব

ভয় কি দাদা! তুমি নিশ্চিন্ত থাক, সে আমি করে' নিচ্ছি! একবার রাধুর দেখা পেলে হয় আচ্ছা করে' শুনিয়ে দিতে হবে।

(চন্দ্র বিনোদ প্রভৃতির প্রবেশ)

নিবারণ

আহার প্রস্তুত, চন্দ্রবাবু, কিছু খাবেন চলুন।

চন্দ্র

আমাদের পরে হবে, আগে সকলের হো ।

শিব

না, না, একে একে সব হয়ে যাক্! চল চন্দর তোমাদের খাইয়ে আনিগে। নিবারণ তুমি কিছু ব্যস্ত হোয়োনা, আমি সব ঠিক করে নিচ্চি। কিন্তু লুচিটা কিছু কম পড়বে বোধ হচ্চে।

নিবারণ

তা হলে কি হবে শিবু?

শিব

ঐ দেখ! মিছামিছি ভাব কেন? সে সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন কেবল সন্দেশগুলো এসে পৌঁছলে বাঁচি। আমার ত বোধ হচ্চে ময়রা বেটা বায়না নিয়ে ফাঁকি দিলে।

নিবা

বল কি ভাই!

শিব

ব্যস্ত হোয়োনা আমি সব দেখে শুনে নিচ্চি।

[শিব ও নিবারণের প্রস্থান।

চন্দ্র

ওরে বিনু খাবার লোভে চলেচিস্ বুঝি?

বিনু

কেন তোমার লোভ একেবারে নেই না কি?

চন্দ্র

কাজ আছে যে!

বিনু

কাজ তো ফতে হয়ে গেছে আবার কি?

চন্দ্র

যে কাজ হয়ে গেচে সে তো ব্যক্তিগত। এখন লড়াই বাকি আছে humanityর জন্যে।

বিনু

বাস্‌রে, এই অর্দ্ধেক রাত্তিরে শেষকালে humanity নিয়ে পড়তে হবে?

চন্দ্র

হিউম্যানিটির জন্যে যত ষড়যন্ত্র সে তো অর্দ্ধেক রাত্তিরেই।

বিনু

কোন্ দুঃসাধ্য কাজ করতে হবে বলো শুনি !

চন্দ্র

বাসরঘরের রুদ্ধ দুর্গ আজ আমরা storm করব।

বিনু

আমরা ভীরু, সামান্য পুরুষজাত মাত্র—আমাদের দ্বারা কি এত বড়ো বিপ্লব ঘটতে পারবে ?

চন্দ্র

নিজেকে ক্ষুদ্র জ্ঞান কোরোনা বিনোদ, ভেবে দেখ, ত্রেতাযুগে যারা সেতুবন্ধন করেছিল, জীব হিসাবে তারাও যে আমাদের চেয়ে খুব বেশী শ্রেষ্ঠ ছিল তার প্রমাণ নেই এমন কি এক-আধটা বাহু বাহুল্য ছাড়া অনেক বিষয়েই মিল ছিল ;—মহৎ লক্ষ্য হৃদয়ে রেখে তারাও হেঁটে সমুদ্র পার হ'ল। আর আমাদের কেবলমাত্র এই দরজাটুকু পার হতে হবে। এত কাল এই বাসরঘরের সামনে স্ত্রীপুরুষের যে বিচ্ছেদ-সমুদ্র বিরাজ করেচে কেবল একটি মাত্র মহাবীর বরবেশে সেটা লঙ্ঘন করবার অধিকারী ; কিষ্কিন্ধ্যার বাকি সকলকেই এপারে পড়ে থাকতে হয়, এই অগৌরব যদি আমরা মোচন করতে না পারি, তা হলে ধিক্ আমাদের পৌরুষ।

বিনু

হিয়ার্ হিয়ার্ !

চন্দ্র

এতদিন সেখানে কেবল ভুজমৃণালের শাসনই বলবান ছিল। আজ বঙ্গোপসাগরের উত্তর তীর থেকে হিমালয়ের দক্ষিণপ্রান্ত পর্য্যন্ত সকল পুরুষে এককণ্ঠে বলো দেখি, "নাহি কি বল এ ভুজ অর্গলে ?'

বিনু

আছে আছে।

চন্দ্র

নবযুগে পুরুষদের কারখানাঘর আফিসঘরের সামনে feminismএর আক্রমণ চলচে, আজ বাসরঘরের সামনে আমরা masculinism প্রচার করব। আমরা যুগান্তরের পাইওনিয়ার।

বিনু

জয় পুরুষজাতিকী জয়।

চন্দ্র

অত্যাচারকারিণীদের সিংহাসন আজ বিচলিত হোক্ —আবার বলো—জয় পুরুষজাতিকী জয়। গদাই, গদাই, গদাই, গদাধর, ভীরু, trait r, এসো তুমি খোলো রুদ্ধদ্বার, ভাঙো পুরুষজাতির অপমানের বাধা !

বিনু

চন্দর দা, ওকে special concession দিয়ে এরা কিনে নিয়েচে—divide and rule পলিসি। ওকে সহজে পাওয়া যাবে না।

চন্দ্র

সে কিছুতেই হচ্চে না। আজ অসম্মানিত পুরুষজাতির আহ্বান তার মুগ্ধ হৃদয়ে গিয়ে পৌঁছিবেই। গদাই, গদাধর, বিশ্বাসঘাতক, স্বজাতিবিদ্রোহী কাপুরুষ !

(গদাই, ইন্দু ও কমলের প্রবেশ)

কমল

এখানে দাঁড়িয়ে আপনারা করচেন কি ?

চন্দ্র

সিডিশন।

ইন্দু

আপনাদের সাহস তো কম নয় ?

চন্দ্র

শর্টহাণ্ড-লিখিয়ে রিপোর্টার কেউ উপস্থিত ছিল না, তাই ভাষাটা হয়তো কিছু অসংযত হয়েছিল। আর কিছুই নয়, আমরা বলছিলুম, ভাগ্যদেবীগণ রুদ্ধদ্বার খোলো—পাপীদের ক্ষমা করবার প্রত্যক্ষ আনন্দটা ভোগ করে' নাও, তাতে স্বর্গেরও গৌরব, মর্ত্ত্যেরও পরিত্রাণ।

ইন্দু

যারা ক্ষমা করবার যোগ্য তাদের তো ক্ষমা হয়ে গেচে।

চন্দ্র

এত বড়ো নিষ্ঠুর কথাটা বলতে পারলেন দয়াময়ী ? দেবী, আমিই কি পাপিষ্ঠতম ? এদের দুজনের চেয়েও অধম ?

ইন্দু

তিনি আপনাকে উদ্ধারের আশা ছেড়ে দিয়েচেন।

চন্দ্র

দেখি, সেটা কি তাঁর পক্ষে আমার চেয়ে কম শোচনীয়? যিনি তারিণী তাঁর জন্যে যদি একটা বাঁধা-পাপীর বরাদ্দ না থাকে, তবে তো একেবারে বেকার তিনি। যাকে বলে, unemployment problem। বড় বৌ তোমার অনুপস্থিতিতে যদি দৈবাৎ আমার সংশোধন হয়ে যায়—যদি তোমার জন্যে সবুর করতে না পারি—যদি পরিত্রাণের সোজা পথ জুটে যায়, তা হলে সেটাতে কি তোমারি দুঃখ, না আমারি?

(ক্ষান্তর প্রবেশ)

ক্ষান্ত

আঃ কী মিছেমিছি চেঁচাচ্চো!

চন্দ্র

মিছেমিছি নয় দেবি! পৃথিবী-সুদ্ধ লোক চেঁচাচ্চে—পরিত্রাণের দরবারে, কেউ বা ধর্ম্মে, কেউ বা কর্ম্মে, কেউ বা পলিটিক্‌সে—আর আমিই যদি চুপ করে থাকব, তা হলে নিতান্তই ঠক্‌ব যে। এই দুটি ভাগ্যবানের দিকে তাকিয়ে আমি আর থাক্‌তে পার্‌লুম না। একটু চেঁচিয়েচি, ফলও পেয়েচি—এখন যবনিকা পতনের পূর্ব্বে দয়াময়ীদের বন্দনাটা সেরে নিই।

(গান)

প্রথমে চন্দ্র পরে সকলে মিলিয়া

বাউলের সুর

যার অদৃষ্টে যেমনি জুটেচে
সেই আমাদের ভালো!
আমাদের এই আঁধার ঘরে
সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালো!
কেউবা অতি জ্বল জ্বল, কেউবা ম্লান ছল-ছল,
কেউবা কিছু দহন করে, কেউবা স্নিগ্ধ আলো।
নূতন প্রেমে নূতন বধূ, আগাগোড়া কেবল মধু
পুরাতনে অম্ল-মধুর, একটুকু ঝাঁঝাঁলো।
বাক্য যখন বিদায় করে, চক্ষু এসে পায়ে ধরে,
রাগের সঙ্গে অনুরাগে সমান ভাগে ঢালো।
আমরা তৃষ্ণা তোমরা সুধা,
তোমরা তৃপ্তি আমরা ক্ষুধা,
তোমার কথা বল্‌তে কবির কথা ফুরালো।
যে মূর্ত্তি নয়নে জাগে সবই আমার ভাল লাগে,
কেউবা দিব্যি গৌরবরণ, কেউবা দিব্যি কালো!

যবনিকা পতন

সম্পাদক—শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু
কলিকাতা, ১০৬ নং [illegible] বসুমতী 'রোটারী মেশিনে' শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৬ষ্ঠ বর্ষ] আষাঢ়, ১৩৩৪ [৩য় সংখ্যা

রথযাত্রা

রথে শ্রীবামন-মূর্ত্তি দেখিয়া পুনর্জন্ম হইতে নিষ্কৃতি-লাভের আশায়, আজ আহিমাচল আসমুদ্র ভারতের সকল প্রদেশের সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী জনগণ নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। যাঁহার অধিষ্ঠানে সমগ্র জীব-নিবহের দেহ-রথ চলিয়া থাকে, সেই সচ্চিদানন্দ রসঘন প্রেমের ঠাকুরকে দারুব্রহ্মমূর্ত্তিতে বাহিরের ভৌতিক রথে দেখিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় বিশাল ভারতে আজ এক বৎসর পরে আবার আকুল প্রাণের মধ্যে একটা বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। দর্শনোৎসুক অবিরাম জনস্রোতের প্রবল বন্যার তীব্র আঘাতে রেল কোম্পানীর শৃঙ্খলাবদ্ধ নিয়ম-প্রাচীরও ভাঙ্গিবার উপক্রম করিতেছে। নীলাচলের অভিমুখে ধাবমান অগণিত যাত্রীর "জয় জগন্নাথ" ধ্বনিতে উড়িষ্যার আকাশ-পবনও প্রতিক্ষণ মুখরিত হইয়া উঠিতেছে। এই বিরাট হিন্দু-মহোৎসবের বিরাট সমাবেশের বিস্ময়াবহ বিরাট আরম্ভ দেখিলে, সত্য সত্যই মনে হয়, এখনও হিন্দু বাঁচিয়া আছে; কে বলে তাহার জীবনীশক্তি নির্ব্বাণোন্মুখ হইতেছে? যে বলে সে ভ্রান্ত, তাহার এই নৈরাশ্যের ভয়াবহ অবসাদ কল্পিত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

সমগ্র ভারতবাসী হিন্দু এ রথযাত্রা মহোৎসবকে কি ভাবে দেখিয়া থাকে, তাহার আলোচনা আজ করিব না, চারি শত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গের বৈষ্ণব-সম্প্রদায় কেমন করিয়া কি ভাবে এই রথযাত্রা দেখিয়া আপনাকে ধন্য বলিয়া বিবেচনা করিত, আজিকার প্রবন্ধে তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

নীলাচলে রথযাত্রা মহোৎসব দর্শনব্যপদেশে শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবের চরণারবিন্দ দর্শন করিয়া চরিতার্থ হইবার আশায় শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও শ্রীবাস প্রভৃতি গৌরাঙ্গ-প্রাণ গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দ সমবেত হইয়াছেন, এবার সৌভাগ্য-ক্রমে শ্রীবৃন্দাবন হইতে ভক্তকুল-শিরোমণি শ্রীরূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী সেই সময় নীলাচলে উপস্থিত, সুতরাং এবার রথযাত্রায় ভক্তবৃন্দের আনন্দের আর সীমা নাই। রথযাত্রার দিনে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের বিরাট নাম-সঙ্কীর্ত্তন-মহাযজ্ঞে ভাবোদ্বেগ-বিহ্বল উন্মাদনাময় উদ্দণ্ড নৃত্য হইতেছে, হঠাৎ ক্ষণকালের জন্য কিন্তু সে নৃত্য থামিয়া গেল, রথারূঢ় দারুব্রহ্মময় শ্রীমূর্ত্তির বিশাল সমুজ্জ্বল মনোহর নয়ন-দ্বয়ে নিজ নয়নদ্বয় স্থিরভাবে বিন্যস্ত করিয়া দরদরিত অশ্রু-ধারায় বিশাল বক্ষঃ প্লাবিত করিয়া ধরাতল সিক্ত করিতে করিতে করুণাকাতর কণ্ঠে বদ্ধাঞ্জলি শ্রীমহাপ্রভু

উদাসভাবে এই শ্লোকটি পাঠ করিতে লাগিলেন—

"যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরত-ব্যাপার-লীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥"
(সাহিত্যদর্পণে উদ্ধৃত শ্লোক)

ইহার তাৎপর্য্য এই—

"মর্ম্মন্তুদ তীব্র বিরহের জ্বালাময় সন্তাপে যাহার ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে সুখের কৌমারজীবন জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক্ হইয়া গিয়াছে, সেই কান্ত আজ আবার বরবেশে অভাগিনীর নয়নপথের পথিক হইয়াছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে বড় সাধের সেই সুধাকর-কররাজিসমুজ্জ্বল মধুযামিনীও দেখা দিয়াছে, নববিকসিত মালতীকুসুম-সৌরভসুবাসিত—প্রস্ফুটিত কদম্বরাজির প্রাণমাতান সুগন্ধভারে মন্দ বহনশীল স্নিগ্ধশীতল মারুতও তেমনই করিয়া আকাশ-পবন প্লাবিত করিয়া তেমনই ধীরভাবে আবার বহিতে আরম্ভ করিয়াছে, আর আমিও—মনে হয়, এখনও সেই আমিই রহিয়াছি। কিন্তু, মন কিছুতেই মানিতেছে না, কেবলই মনে পড়িতেছে, সেই নর্ম্মদাতীর আর সেই নর্ম্মদাতীরের সেই বেতসীলতার নিভৃত স্নিগ্ধ শান্তকুঞ্জ আর সেই কুঞ্জে প্রিয়তমের প্রীতিমাখা মুখ দেখিতে দেখিতে বিশ্বসংসার ভুলিয়া গিয়া তাঁহারই অঙ্কে মস্তক বিন্যস্ত করিয়া আমি সেই আমিই আবার আত্মহারা হইয়া প্রেম-সুষুপ্তির মোহন মদিরাবেশে, মুগ্ধভাবে বিলীন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছি; হায়, অবশ মনের এই উৎকণ্ঠা কি শান্ত হইবার নহে!"

হঠাৎ মহাপ্রভুর নৃত্য বন্ধ, আর সেই সময় তাঁহার মুখে প্রাকৃত কাব্যের এই শোকের ভাবাবেশময় আবৃত্তি, ইহার তাৎপর্য্য কি, তাহা না বুঝিতে পারিয়া কিন্তু ভক্তগণ যেন একটু উন্মনায়মান হইয়া উঠিলেন, রসরাজ শ্রীগৌরাঙ্গের অকস্মাৎ সমুদ্ভূত এই নবীন রসতরঙ্গ অনাস্বাদিতপূর্ব্ব, ইহার গভীরতা বুঝিতে না পারায় রসিক ভক্তগোষ্ঠী ক্ষণকালের জন্য যেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন, অন্তর্য্যামী প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গদেব, ইহা দেখিলেন, ব্যাপার কি তাহাও বুঝিলেন, কিন্তু কাহাকেও ইঙ্গিতে কিছু বুঝাইবার চেষ্টা না করিয়া তিনি আবার নৃত্যারম্ভ করিলেন—আবার নৃত্যরসপ্রবাহের বন্যায় যাত্রী ও ভক্তবৃন্দকে ভাসাইয়া অনাবিল আনন্দের গোলোক এ মরজগতে সৃষ্টি করিয়া যথাসময়ে নৃত্য করিয়া ধূল্যবলুণ্ঠিত দেহে নীলাচলনাথকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া মধ্যাহ্ন স্নানের জন্য পার্ষদগণ সমভিব্যাহারে গম্ভীরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। রসরাজ রসিক-শেখরের লীলাশক্তির এক নবীন বিবর্ত্ত অব্যাখ্যাতভাবেই রহিয়া গেল।

মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন স্নান করিবার জন্য যাত্রা করিয়াছেন, এমন সময় শ্রীরূপ গোস্বামীর সহিত দেখা হইল, যথারীতি অভিবাদনের পর গোস্বামী তাঁহার অনুসন্ধিৎসু নয়নদ্বয় শ্রীগৌরাঙ্গদেবের শ্রীমুখারবিন্দে সন্নিবেশিত করিবামাত্র গোস্বামীকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন—

কৃষ্ণকে বাহির না করিহ ব্রজ হইতে।
ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যায় কাহাতে॥
চৈতন্য-চরিতামৃত, অন্ত্যখণ্ড—১ম পরিচ্ছেদ।

এই বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গদেব স্নান করিতে চলিয়া গেলেন, শ্রীরূপ গোস্বামী কিন্তু তাঁহার অনুগমন না করিয়া চিন্তাকুল মানসে গম্ভীরায় প্রবেশ করিলেন, সেদিনকার রথযাত্রার ঘটনা তাঁহার মনে জাগিয়া রহিয়াছে, তাহার পর স্নানের পথে মহাপ্রভু "কৃষ্ণকে কখনও ব্রজ হইতে বাহির করিবার চেষ্টা করিও না, কৃষ্ণ কখনও ব্রজ ছাড়িয়া যাইতে পারেন না"; এইরূপ কথাই বা হঠাৎ কেন আমাকে তিনি শুনাইয়া কহিলেন, এই সকল বিষয় ভাবিতে ভাবিতে শ্রীরূপ গোস্বামী কি এক নূতন ভাবে বিভোর হইয়া উঠিলেন, সম্মুখে একখানি তালপত্র পড়িয়া ছিল, তাহা হাতে করিয়া উঠাইয়া লইয়া তাহাতে ভাবময় স্বপ্নের আবেশে একটি শ্লোক লিখিয়া ফেলিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেব যে কুটীরে অবস্থান করিতেন, তাহারই খড়ের চালায় প্রবেশদ্বারের ঊর্দ্ধদিকে সেই তালপত্রখানি গুঁজিয়া রাখিলেন।

এই কার্য্য সমাধা করিয়া তাড়াতাড়ি তিনি স্নানের জন্য সমুদ্রতীরে গমন করিলেন, তাহার পর কি হইল, তাহা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের পদে এইভাবে ব্যক্ত হইয়াছে—

হেনকালে আইলা প্রভু তাঁহারে মিলিতে।
চালে গোঁজা শ্লোক পাঞা লাগিলা পড়িতে॥

শ্লোক পড়ি সুখে প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
সেইকালে রূপ গোঁসাঞি স্নান করি আইলা॥
প্রভু দেখি দণ্ডবৎ প্রাঙ্গণে পড়িলা।
প্রভু তারে চাপড় মারি কহিতে লাগিলা॥
গূঢ় মোর হৃদয় তুঞি জানিলি কেমনে।
এত বলি রূপে কৈল দৃঢ় আলিঙ্গনে॥
সেই শ্লোক লইয়া প্রভু স্বরূপে দেখাইল।
স্বরূপের পরীক্ষা লাগি তাহারে পুছিল॥
মোর অন্তর্বার্ত্তা রূপ জানিল কেমনে।
স্বরূপ কহে জানি কৃপা করিয়াছ আপনে॥
প্রভু কহে এহো মোরে প্রয়াগে মিলিল।
যোগ্যপাত্র জানি ইহায় মোর কৃপা হইল॥
তবে শক্তি সঞ্চারিয়া কৈল উপদেশ।
তুমিও কহিও ইহার রসের বিশেষ॥
স্বরূপ কহে যবে এই শ্লোক দেখিল।
তুমি করিয়াছ কৃপা তবহি জানিল॥

চৈতন্য-চরিতামৃত, অন্ত্যখণ্ড—১ম পরিচ্ছেদ।

তাহার পর ভক্তমণ্ডলীকে একত্র করিয়া এক দিন মহাপ্রভু দুই ভ্রাতার সহিত পরিচিত করিবার জন্য হঠাৎ শ্রীরূপের নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন সেখানে কি করিলেন?

"ভক্ত সঙ্গে প্রভু আইলা দেখি দুই জন।
দণ্ডবৎ হইয়া কৈল চরণ বন্দন॥
ভক্ত সঙ্গে কৈল প্রভু দুঁহাকে মিলন।
পিণ্ডার উপরে বসিলা লইয়া ভক্তগণ॥
রূপ হরিদাস দুঁহে বসিলা পিণ্ডাতলে।
সভা অগ্রে না বসিলা পিণ্ডার উপরে॥"

তাহার পর কি হইল?

"পূর্ব্বশ্লোক পড় যবে প্রভু আজ্ঞা দিল।
লজ্জাতে না পড়ে রূপ মৌন ধরিল॥"

তখন মহাপ্রভুর ইঙ্গিতানুসারে—

স্বরূপ গোসাঞি তবে সেই শ্লোক পড়িল।
শুনি সভাকার চিত্তে চমৎকার হইল॥

সেই শ্লোকটি এই—

প্রিয়ঃ কৃষ্ণঃ সোঽয়ং সহচরি কুরুক্ষেত্র মিলিত-
স্তথাহংসা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চম জুষে—
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি॥

ইহার তাৎপর্য্য—

শ্রীরাধা সখীকে বলিতেছেন,—"সহচরি, এই সেই কান্ত কৃষ্ণ, আজ আবার কুরুক্ষেত্রে (রথারূঢ় হইয়া) আমাদিগের সহিত মিলিত হইয়াছেন, আমিও সেই রাধা আজ এখানে, এখন শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাধার ইহাই সুখের মিলন! এ মিলনও বটে, ইহাতে আনন্দ নাই, তাহাও বলিতে পারি না; তথাপি সখি, সেই যমুনার পুলিনে নিভৃত নিকুঞ্জকানন—যেখানে শ্যামের অধর-সুধার আস্বাদনে উন্মত্ত হইয়া ক্রীড়াশীল মুরলী মধুর পঞ্চম স্বরে দিঙ্মণ্ডলকে মধুময় করিয়া তুলিত, সেই নিকুঞ্জ-কাননের জন্য এক অতৃপ্ত তৃষা আমার মনকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছে।"

এই শ্লোক শুনিয়া ভক্তবৃন্দের হৃদয়ের সকল সংশয় দূর হইল, রথযাত্রাকালে শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া অকস্মাৎ উদ্দণ্ডনৃত্য পরিহার পূর্ব্বক শ্রীগৌরাঙ্গদেব কেন যে সাহিত্য-দর্পণ-ধৃত "যঃ কৌমারহরঃ" ইত্যাদি শ্লোক আবিষ্ট ভাবে পাঠ করিয়াছিলেন, শ্রীরূপের মধুর কবিতা শুনিয়া এক্ষণে তাঁহারা তাহা বিশদভাবে বুঝিতে সমর্থ হইয়া অসীম আনন্দ উপভোগ করিলেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতানুসারে ইহাই হইল—রথযাত্রার শ্রীমদ্ভাগবতসম্মত গূঢ়রহস্য, এ রহস্য ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে—শ্রীমদ্ভাগবতের শরণ লওয়া আবশ্যক, তাহাই এখন দেখাইব।

শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে বিরাশী অধ্যায়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সূর্য্যগ্রহণ-স্নানপ্রসঙ্গে কুরুক্ষেত্র যাত্রা বর্ণিত হইয়াছে, এই যাত্রাই শ্রীকৃষ্ণের রথযাত্রার সূত্রস্থানীয়। এই যাত্রায় সকল যাদববন্ধু সমভিব্যাহারে মহার্হ রথে আরূঢ় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহার এই আগমন-সংবাদ জনমুখে পূর্ব্ব হইতে অবগত হইয়া ব্রজবাসী গোপ ও গোপীগণকে সঙ্গে করিয়া শ্রীনন্দ একবার চোখের দেখা দেখিবার আশায় বৃন্দাবন হইতে কুরুক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন, ইহাও শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে। শুধু আসিয়া দূর হইতে ব্রজনাথকে দেখিয়াই যে তাঁহারা শূন্যমনে ব্রজে ফিরিয়া গিয়াছিলেন, তাহা নহে—অনেক সাধ্যসাধনার ফলে ব্রজগোপীগণ গোপীনাথের সহিত সাক্ষাৎও

করিতে পারিয়াছিলেন, সাক্ষাৎকার পাইয়া বিদায়ের সময় গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে যে প্রাণের কথা বলিয়া অনন্তকালের জন্য অনন্তের নিকট হইতে বিদায় লইয়াছিলেন, সেই কথা গোপীর মুখেই শোভা পায়; তাঁহারা বলিয়াছিলেন কি, তাহা ভাগবতের ভাষাতেই শ্রবণযোগ্য—

"আহুশ্চ তে নলিননাভপদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ॥"

"গোপীগণ বলিয়াছিলেন, হে নলিননাভ! অগাধবোধ যোগেশ্বরগণ সর্ব্বদা যাহা হৃদয়ে ধ্যান করিবার জন্য তৎপর হইয়া থাকেন, যাহা সংসার-কূপে নিপতিত প্রাণিসমূহের একমাত্র উদ্ধারের হেতু, তোমার সেই পদারবিন্দ যেন আমাদের মনে সর্ব্বদা সমুদিত হয়, যদি কখনও আমাদের গৃহে মন আসক্ত হয়, তখনই যেন ঐ চরণারবিন্দ হৃদয়ে উদিত হয়। ইহাই শ্রীচরণে আমাদিগের ঐকান্তিক প্রার্থনা।" ইহাই শ্রীধরস্বামী ও অন্যান্য টীকাকারগণের উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা, শ্রীগৌরাঙ্গদেব কিন্তু এ ব্যাখ্যায় পরিতোষলাভ করিতে পারেন নাই, এরূপ ব্যাখ্যা অঙ্গীকার করিলে ব্রজদেবী গোপীগণের রাগানুগা ভক্তির স্বরূপ সঙ্কোচপ্রাপ্ত হয়, তাই শ্রীগৌরাঙ্গদেব ভাবোন্মাদের প্রেরণায় ভাগবতের এই সুপ্রসিদ্ধ শ্লোকটির যেরূপ তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন, তাহা চৈতন্য-চরিতামৃতের মধুর ভাষায় বড়ই সুন্দরভাবে ফুটিয়াছে।

অন্যের যে অন্য মন আমার মন বৃন্দাবন
মনে বনে এক করি জানি।
তাঁহা তোমার পদদ্বয় করাহ যদি উদয়
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি॥
প্রাণনাথ শুন মোর সত্য নিবেদন।
ব্রজ আমার সদন তাহাতে তোমার সঙ্গম
না পাইলে না রহে জীবন॥
পূর্ব্বে উদ্ধব দ্বারে এবে সাক্ষাৎ আমারে
যোগজ্ঞানের কহিলে উপায়।
তুমি বিদগ্ধ কৃপাময় জান আমার হৃদয়
আমায় ঐছে কহিতে না যুয়ায়॥
চিত্ত কাড়ি তোমা হইতে বিষয়ে চাহি লাগাইতে
যত্ন করি, নারি কাড়িবারে।
তারে জ্ঞানদান কর লোক হাসাইয়া মার
স্থানাস্থান না কর বিচারে॥
নহে গোপী যোগেশ্বর তোমার পদ-কমল—
ধ্যান করি পাইবে সন্তোষ।
তোমার বাক্য পরিপাটী তার মধ্যে কুটি নাটি
শুনি গোপীর বাঢ়ে আরও রোষ॥
দেহ-স্মৃতি নাহি যার সংসার-কূপ কাঁহা তার
তাহা হৈতে না চাহে উদ্ধার।
বিরহ-সমুদ্র জলে কাম তিমিঙ্গিলে গিলে
গোপীগণে লহ তার পার॥
বৃন্দাবন গোবর্দ্ধন মাতা-পিতা বন্ধুজন
বড় চিত্র! কেমনে পাসরিলা।
বিদগ্ধ মৃদু সদ্‌গুণ সুশীল স্নিগ্ধ করুণ
তুমি, তোমার নাহি দোষাভাস।
তবে যে তোমার মন নাহি স্মরে ব্রজজন
সে আমার দুর্দ্দৈব বিলাস॥
না গণে আপন দুখ দেখি ব্রজেশ্বরীমুখ
ব্রজজন হৃদয় বিদরে।
কিবা মার ব্রজবাসী কিবা জীয়াও ব্রজে আসি
কেনে জীয়াও দুঃখ সহিবারে॥
তোমার সে অন্য বেশ অন্য সঙ্গ অন্য দেশ
ব্রজজনে কভু নাহি ভায়।
ব্রজভূমি ছাড়িতে নারে তোমা না দেখিলে মরে
ব্রজজনের কি হবে উপায়॥
তুমি ব্রজের জীবন তুমি ব্রজের প্রাণধন
তুমি ব্রজের সকল সম্পদ্।
কৃপার্দ্র তোমার মন আসি জীয়াও ব্রজজন
ব্রজে উদয় করাহ নিজ পদ।

(চৈতন্য-চরিতামৃত, মধ্য পঃ ১৩)

ইহাই হইল গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের নীলাচলে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-সার-রহস্য।

হৃদয়-বৃন্দাবন শূন্য করিয়া রসঘন চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবান্ বাহিরে ঐশ্বর্য্যের লীলা প্রকট করিতেছেন, এ দৃশ্য গোপীর প্রাণে সহে না, প্রাণারাম প্রাণগেহ দেহ

উপেক্ষা করিয়া প্রপঞ্চের মর্য্যাদাবিধান করিতে ব্যগ্র, আর তাঁহার সাধের লীলাক্ষেত্র ভক্তের হৃদয়-বৃন্দাবনে অদর্শনের নিবিড় অন্ধকার উত্তরোত্তর পুঞ্জে পুঞ্জে জমিয়া আসিতেছে, ইহাতে ভক্ত বাঁচিবে কেমনে? প্রাকৃত-বাহ্য চকচিক্যময় নীরস শুষ্ক প্রপঞ্চ-রথে তাঁহার দারুব্রহ্ম মূর্ত্তি দেখিয়া ভক্তের ভাবসমুদ্র তীব্র বিরহের প্রলয়ঙ্করী অনুভূতি-বাত্যাতে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিতেছে, সেই তরঙ্গাবলীর বহির্বিবর্ত্তরূপ অশ্রুধারা নদীর আকার ধরিয়া নয়নপথ দিয়া প্রবল বেগে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাই ভক্তের আকুল প্রাণ কান্দিয়া কান্দিয়া শ্রীভগবানের চরণে এই শেষের সম্বল নিবেদন করিতেছে, আর বলিতেছে,

"তোমার সে অন্য বেশ অন্য সঙ্গ অন্য দেশ
ব্রজজনে কভু নাহি ভায়।
ব্রজভূমি ছাড়িতে নারে তোমা না দেখিলে মরে
ব্রজজনের কি হবে উপায়?"

তাই প্রার্থনা করি,—

"তুমি ব্রজের জীবন তুমি ব্রজের প্রাণধন,
তুমি ব্রজের সকল সম্পদ।
কৃপার্দ্র তোমার মন আসি জিয়াও ব্রজজন,
ব্রজে উদয় করাহ নিজ পদ॥"

চারিশত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ভাবপ্রবণ বাঙ্গালীর হৃদয়সর্ব্বস্ব নদীয়ার প্রেম-বন্যার প্রবর্ত্তক কাঙালের বাউল ঠাকুর গৌরহরি এই ভাবেরই আবেগে বিহ্বল হইয়া নীলাচলের রথে বামনদর্শন করিয়াছিলেন, ইহা নিশার স্বপন নহে, কবিকল্পনার ভিত্তিহীন বিলাস নহে, ইহা বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনেতিহাসের সার সত্য, এ কথা যে দিন বাঙ্গালী ভুলিবে, সে দিন হইতে বাঙ্গালীর অস্তিত্ব অনন্ত কালসাগরে চিরবিস্মৃতির মোহময় অতল গর্ভে চিরদিনের জন্য ডুবিয়া যাইবে।

স্বরাজ-সাধনার দিগন্তব্যাপী ডিণ্ডিমনিনাদে বাঙ্গালার আকাশ-পবন ও ভূমি মুখরিত হইয়া উঠিতেছে, বাঙ্গালার অনন্যসাধারণ বিরাট জাতীয় জীবনের পুনঃপ্রতিষ্ঠার আশাময়ী ঘোষণা আজ বাঙ্গালীর অবসন্ন জীবনে বিজয়িনী উষার আলোক ছড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে, এই জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠার মঙ্গল মুহূর্ত্তে, আজ দলে দলে বাঙ্গালী হিন্দু নরনারী বাহিরের রথে আরূঢ় জগন্নাথকে আবার নিজ মনোময় রথে চড়াইয়া আন্তর বৃন্দাবনে ফিরাইয়া আনিবার জন্য ব্যাকুলভাবে নীলাচলের পথে ধাবমান্ হইতেছে—শ্রীভগবানের চরণারবিন্দে প্রার্থনা এই যে, বাঙ্গালী নরনারীবৃন্দের এই রথ-যাত্রা দর্শন সফল হউক, স্বরাজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে প্রেমের ডোরে বাঁধিয়া তাহাদের শূন্যহৃদয়-রূপ বৃন্দাবনে সদ্ভাবময় নিকুঞ্জকাননে বিশ্বজনীন প্রীতির শান্তিময় সিংহাসনে বসাইয়া স্বরাজ-সাধনায় মহীয়সী সিদ্ধি লাভে বাঙ্গালীর জীবন চরিতার্থ করুক।

ভক্তিভরে বিশুদ্ধ চিত্তে রথারূঢ় শ্রীভগবানের নিকট এই ভাবে আমাদের প্রার্থনা কখনই নিষ্ফল হইতে পারে না, এই দৃঢ় বিশ্বাস প্রত্যেক দর্শনার্থী বাঙ্গালীর হৃদয়কে যেন পরিত্যাগ না করে। কুরুক্ষেত্রে দর্শনলালস ব্রজগোপিকাগণের প্রার্থনায় তিনি যাহা উত্তর দিয়াছিলেন, তাহাই যেন আমাদের চিরবিক্ষুব্ধ সংসার-সমুদ্রে দিগ্‌বিদিগ্-জ্ঞানহারা ভাসমান জীবনতরীর ধ্রুবনক্ষত্ররূপে অভিমানের মেঘ হইতে নির্ম্মুক্ত হৃদয়াকাশে ধ্রুব জ্যোতিঃ বিকীরণের জন্য সর্ব্বদা সমুদিত থাকে। কুরুক্ষেত্রের তড়িদ্বিকাশবৎ অচিরস্থায়িমিলনের অন্তিমক্ষণে বিরহ-ভাবনায় ব্যাকুল ব্রজবাসিনী গোপিকাগণকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছিলেন,—

বায়ুর্যথা ঘনানীকং তৃণং মূলং রজাংসি চ।
সংযোজ্যাক্ষিপতে ভূয়স্তথা ভূতানি ভূতকৃৎ॥
ময়ি ভক্তির্হি ভূতানাং অমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্ মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ।
অহং হি সর্ব্বভূতানামাদিরন্তোঽন্তরং বহিঃ।
ভৌতিকানাং যথা খং বা ভূর্বায়ুর্জ্যোতিরঙ্গনাঃ॥

(শ্রীমদ্‌ভাগবত ৮২ অধ্যায় দশমস্কন্ধ)

হে ব্রজগোপীগণ! বায়ু যেমন মেঘাবলী, তৃণ, মূল ও ধূলিনিচয়কে কিয়ৎকালের জন্য সংযুক্ত করিয়া আবার বিযুক্ত করিয়া থাকে, সেইরূপ ভূতস্রষ্টা সেই সনাতন পুরুষই প্রাণিনিচয়কে এই সংসারে মিলিত ও বিযুক্ত করিয়া থাকেন।

এই সংযোগ-বিয়োগরূপ জন্মমরণের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভের একমাত্র উপায়, আমার প্রতি প্রেমলক্ষণা ভক্তিই হইয়া থাকে, সেই ভক্তি বা ভালবাসাই তোমাদিগকে অনন্ত কালের জন্য আমার সহিত মিলিত করিয়াছে; এ মিলনে বিরহের সম্ভাবনা নাই। ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিও, আমিই সকলের আদি, আমিই সকলের অন্ত, আমিই সকলের

বাহিরে, আবার সেই আমিই সকলের অন্তরে সর্ব্বদা এক-রূপে বর্ত্তমান রহিয়াছি। যেমন ভৌতিক প্রপঞ্চের সহিত তাহার উপাদান আকাশ, অগ্নি, বায়ু, জল ও পৃথিবীর কখনও বিয়োগ হয় না—প্রপঞ্চের অন্তর ও বাহিরে প্রপঞ্চের উপাদান ও আশ্রয়রূপে ইহারা সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকে, আমিও সর্ব্বপ্রপঞ্চে সেই রূপে সর্ব্বদা বিদ্যমান রহিয়াছি।"

রথযাত্রায় শ্রীভগবানের এই চিদানন্দময় বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া বাঙ্গালী নরনারীর স্বরাজ-সাধনার অক্ষয় সিদ্ধি হউক, ইহাই রথারূঢ় বামনদেবের শ্রীচরণে অকিঞ্চনের প্রার্থনা।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।

ভুবনেশ্বর

অতীত-গৌরব-সাক্ষী ভুবন-ঈশ্বর!
তব পাদ-তটস্পর্শী হৃদয়-কন্দর
কভু হর্ষে উঠে ভরি'
অতীত-গৌরব স্মরি,
কভু নিরানন্দ-নীরে ডুবে বা অন্তর!

বক্ষে ধরি কঙ্কালাস্থি হিন্দু-গরিমার
বুঝাইছ জগজনে
জ্ঞান বুদ্ধি ধনে জনে
ছিল হিন্দু শ্রেষ্ঠ কভু—এই চিহ্ন তার!

কোথা সেই রাজপাট কলিঙ্গ নগর?
বনে ঢাকা ধ্বংস-স্তূপ
বলে সবে "চুপ! চুপ!
কীর্ত্তি শুধু বেঁচে রয়—সকলি নশ্বর!"

কোথা আছে হেন কারুশোভিত মন্দির?
সু-উচ্চ বিশাল-কায়
কত ছবি আঁকা তায়,
প্রস্তরে ক্ষোদিত কাব্য—হেরি চক্ষুঃস্থির!

এক নয় দুই নয় পঞ্চশতাধিক!
কত ঝঞ্ঝা বুকে বহি'
কত অত্যাচার সহি,
রক্ষিলে রতন সব—কে বলিবে ঠিক।

ধন্য পুণ্যশ্লোক রাজা যযাতি কেশরী,
কিবা শক্তি ধর্ম্মবল,
কিবা সাধনার ফল,
শ্রদ্ধায় নমিত শির তাঁর গুণ স্মরি!

প্রকৃতির লীলাভূমি শত রম্যস্থান
ত্যজিয়ে কৈলাসপুর
সাধে কি রে চন্দ্রচূড়
তপস্যার হেতু হেথা কৈলা অবস্থান!

বট-অশ্বত্থের মূলে আম্রকুঞ্জ মাঝে,
বাজে ওঁকারের হেন,
সামধ্বনি শুনি যেন,
ঋষিকণ্ঠ-বি[illegible] সকালে ও সাঝে!

মাঝে বিন্দু-সরোবর শোভার আধার,
সকল তীর্থের বারি
আনি যেথা ত্রিপুরারি
মিটাইলা রণক্লান্তা পিপাসা উমার!

হৈমবতী পাদোদ্ভূতা "দেবীপাদহরা"
আজিও ঘোষিছে তথা—
দানব-দলন-কথা—
কৃত্তিবাস-ত্রাস হ'তে মুক্ত হ'ল ধরা।

দক্ষিণে বহিয়ে যায় ক্ষীণা গন্ধবতী,
টলমল কলকল
বারি তাহে সুশীতল
রজতের উপবীত যেমন প্রতীতি!

অদূরে শোভিছে ধৌলি গিরি মনোহর,
অশোকের স্মৃতি বুকে
আজিও ধরিছে সুখে
সে বাণী করিল পূত কত নারী-নর!

আরো কত শৈলরাজে ঘিরি চারিধার
শ্যামল কেহ বা লাল,
ধূসর ঈষৎ কাল,
'খণ্ড' 'উদয়ে'র নাম বিদিত সবার!

তুলনা না খুঁজে পাই "কেদার-গৌরীর"
স্নানে পানে হরে শ্রান্তি
আনে প্রাণে কি যে শান্তি,
দুষ্টাশ্ব চঞ্চল মন হেথা এলে স্থির!

শৈব বৈষ্ণবের মত করি সমন্বয়,
এক করি হরি-হরে,
একত্ব বুঝালে নরে,
স্পর্শদোষ নাশি কীর্ত্তি লভিলে অক্ষয়!

ভুবন-ঈশ্বর! তুমি ত্রিবেণী-সঙ্গম,
হিন্দু-বৌদ্ধ জৈন তিন
তোমাতে রয়েছে লীন,
সভ্যতা-ত্রিধারা মিলে তুমি অনুপম!

শ্রীনিরঞ্জন সেন
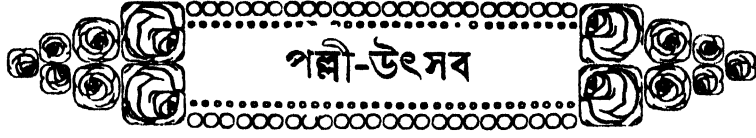
পল্লী-উৎসব

নাগরিক আড়ম্বরপূর্ণ বিলাসীর প্রমোদ-উৎসব অপেক্ষা পল্লীজীবনের আনন্দ আয়োজন যে মধুরতর, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু যে ব্যক্তির ভাগ্যে নাগরিক কিংবা প্রাদেশিক কোন উৎসবই ঘটে না, তাহার পক্ষে নগর অপেক্ষা পল্লীর আবেষ্টন যে অধিকতর আকর্ষণের বস্তু, তাহা বলাই বাহুল্য। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমরা শৈশবের সদা-জাগ্রত কৌতূহল হারাইয়া বসি, সোনার স্বপন আর দেখা দেয় না, তাই ক্রমে জীবনের আনন্দসম্ভোগ-ক্ষমতা হ্রাস হইয়া আইসে। মন উপবাসী থাকিয়া ক্ষীণ হইয়া পড়ে। তবে এমন মানুষও দুর্লভ নয়, যাঁহারা শরতের জীর্ণ পত্রের অন্তরালে বসন্তের প্রসূনের মত প্রৌঢ়ত্বের দিনেও অন্তরে তারুণ্যের লাবণ্য সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারেন, তাঁহাদের মনে আনন্দের উৎস কখনই শুষ্ক হইয়া যায় না।

কিশলয়ের প্রবালশ্রী, সমীরণের স্নিগ্ধস্পর্শ ও স্বচ্ছন্দগতি উষার অরুণ চরণপাতে উদয়শৈলের কুবলয় আরক্তিমা আলো ছায়ার আল্পনা আঁকা অরণ্যের আঙ্গিনা বর্ণগৌরবে সমুজ্জ্বল কোনও বিশেষ পুষ্পশ্রেণীকে ঘেরিয়া দিনের পর দিন মধুপের অশ্রান্ত স্তব-স্তুতি ও আনাগোণা, চারিদিকে জীবনের উদ্বেল প্রবাহ কালনির্ব্বিশেষে ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে চিরকালই সমান আনন্দদায়ক থাকিয়া যায়।

প্রখর রৌদ্রে ঘনসন্নিবিষ্ট তৃণগুচ্ছের মধ্য দিয়া পদে পদে প্রতিহতগতি পথিক যখন নূতন কিছু আবিষ্কার করেন, কোন প্রাকৃতিক সমস্যা পূরণ করিতে পারেন, রহস্যময়ী মায়াবিনী প্রকৃতির কোন একটি রহস্য ভেদ করিতে সমর্থ হন, তখন তাঁর সকল ক্লেশ সার্থক বোধ হয়। দেখেন এবং দেখিয়া বুঝিতে পারেন, বর্ণের সঙ্কেত ও ইঙ্গিত স্মরণে রাখিয়া সঙ্গীবিহীন বোল্‌তা আপন গৃহ-নির্ম্মাণের নির্দ্দিষ্ট স্থানটির চৌহদ্দি কেমন করিয়া মনে বসাইয়া লয়, বিশেষত্বযুক্ত প্রত্যেক বস্তুটিকে বারংবার আবর্ত্তন করিয়া তাহার গঠন ও বর্ণ আবৃত্তির ন্যায় একবারে এমন অভ্যাস করিয়া লয় যে, ভুলিবার কোন সম্ভাবনাই থাকে না। কুকুরের কিম্বা অন্য গৃহপালিত জন্তুর বারংবার বৃত্তাকারে ঘুরিবার সার্থকতা এখন আর নাই, পূর্ব্বে বন্য অবস্থায় তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যখন দীর্ঘ তৃণাচ্ছাদিত ভূমিতে বাস করিত, তখন এই বৃত্তগতির অর্থ ছিল—এই উপায়ে দলিত তৃণের দ্বারা আপন আপন শয্যা রচনা করিত। এখন নাগরিকজীবনের লোষ্ট্র-কাষ্ঠ-নির্ম্মিত গৃহে এরূপ শয্যারচনার আবশ্যকতা চলিয়া গিয়াছে, তবুও সংস্কার বশতঃ পূর্ব্বপিতৃপিতামহ-আচরিত অভ্যাস ছাড়িতে পারে না।

এই আকাশ-যানের যুগে যখন বহুদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টিচালনা-সহায়ক যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, হংসাদির অনুসরণ করিয়া অসম্ভব দূর হইতে তাহাদিগকে শিকার করা কিছুই আশ্চর্য্য ব্যাপার নয়। তাই আজকালকার দিনে যথার্থ ভাল শিকারীর আদর্শ যে কি, তাহা বলা যায় না। এ ক্ষেত্রে তাঁহাদিগকে পরখ করিয়া লইবার নিকষমণি, তাঁহাদের অরণ্য-প্রীতি, পশুপক্ষীর স্বভাব ও প্রকৃতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা, অধ্যবসায়সহকারে হিংস্র জন্তুর অনুসরণ ও ধীরভাবে আহত জন্তুর উদ্ধারসাধন,—বলিয়াই মনে করি। গুলী-গোলার অপব্যয় করিয়া নৃশংসের মত শিকারের ঝুলিটির অঙ্গস্ফীতি-সাধনই মৃগয়াবিহারীর প্রকৃষ্ট পরিচয় নহে।

পলাশ তাহার অনল-উজ্জ্বল শোভায় শৈলসানু ও বন-প্রান্তরে যেন আগুন লাগাইয়া দিয়াছে, মাদল ও বাঁশরীর ধ্বনি দূরতার ব্যবধানে মধুরতর হইয়া কানে কানে বলিতেছে, হোলি আসিয়াছে, বসন্ত-উৎসব সমাগত, শীতের শীতল নিশ্বাস তখনও বনভূমির শ্যামল অঞ্চল ঈষৎ আন্দোলিত করিয়া তাহার আকর্ষণী শক্তি দ্বিগুণ বাড়াইয়া তুলিয়াছে। পূর্ব্ব হইতেই পাহাড়ের উপর প্রায় ১০শ ফুট উচ্চে পূর্ণিমার দিনের উৎসবের আয়োজন করা হইয়াছিল। এত উচ্চে ও অসম পথে সুস্থ, সবল, দৃঢ় মাংসপেশীবহুল যুবক ভিন্ন বৃদ্ধ স্থবিরের গতায়াত অসম্ভব। পথ সঙ্কীর্ণ ও সঙ্কটসঙ্কুল, বন্ধুরগাত্র প্রস্তরস্তূপসমাকুল, তবে একবার ক্লেশ স্বীকার করিয়া এই পথ অতিক্রম করিতে পারিলে, পর্ব্বতের উপরে সমভূমিতে তাম্বু ও সামিয়ানার সম্মুখে উপস্থিত হওয়া যায়। চন্দ্রালোকে চারিদিকের দৃশ্য দ্বিগুণ সুন্দর হইয়াছে, দূরে প্রকাণ্ড অগ্নি-কুণ্ড হইতে উর্দ্ধমুখী অনলপ্রবাহ উৎসের মত উৎসারিত হইতেছে, বাতাসের প্রাবল্যে তাহার সঞ্চরমান সৌন্দর্য্য

নিম্নভূমির চারিদিক্ হইতে সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। আতস-বাজী শব্দসহকারে জ্বলিয়া উঠিতেছিল, চারিদিকে তুব্ড়ী, হাউই, পটকার ছড়াছড়ি, নিজের পদযুগল বাঁচান দায় হইলেও কেহই তাহাতে ব্যস্ত হইয়া উঠে নাই, সকলেই আমোদ করিবে বলিয়াই আসিয়াছিল। সামিয়ানার মধ্যে বিগত-যৌবনা বাইজী হোলি গাহিতেছিল, যৌবন গেলেও তাহার সৌন্দর্য্য একবারেই বিদায় লয় নাই, গৌরবর্ণ তন্বীর দেহ-লাবণ্যে তখনও এমন দুই একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ত্তমান ছিল, যাহার স্পর্শে উৎসুক মনে অগ্নি ধরিতে পারে। অনিন্দ্য-রূপলাবণ্য সকল দেশেই সকল কালেই নিন্দার স্পর্শ এড়াইতে পারে নাই। সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রূপজীবিনী প্রকৃতির দান, কবির ন্যায় তাহাকে কেহ গড়িতে পারে না, সে জন্ম গ্রহণ করে। পুরাণ কথায় বলে, উর্ব্বশী পরিপূর্ণ যৌবন লইয়াই সমুদ্রমন্থনে আবির্ভূতা হইয়াছিল। এই অপূর্ব্ব লাবণ্যময়ী নারী যদিও কবির কথায়:—

"নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ সুন্দরী রূপসি
হে নন্দনবাসিনী উর্ব্বশী"

তবুও তাহারই নৃত্য-ছন্দে

"ছন্দে ছন্দে নাচি ওঠে সিন্ধুমাঝে তরঙ্গের দল,
শস্য-শীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি ওঠে ধরার অঞ্চল।
তব স্তনহার হ'তে নভস্তলে খসি' পড়ে তারা,
অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা।
নাচে রক্তধারা।"

হরপার্ব্বতীর কোন্দল অপেক্ষা রাধাশ্যামের মান-অভিমান মিলন-বিরহ চিরদিনই আমাদের মুগ্ধ করিয়াছে এবং করিবে, এ কথা বলাই বাহুল্য। এই দুঃখের পৃথিবীতে প্রণয়-কাহিনী যদি বিরল হইত, তবে যে জীবনপথের অনেকখানি সৌন্দর্য্যের হানি হইত, তাহা কল্পনা করা কঠিন নয়।

সঙ্গীতের ক্ষেত্রে নারী চিরদিনই প্রাধান্য ও স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে। খুব সম্ভবতঃ তাহার কারণ শাপভ্রষ্ট অপ্সরাগণই পৃথিবীতে স্বর্গের সঙ্গীত আনিয়াছিল। পুরুষ যদি কাপুরুষ না হয়, তবে এই সকল রমণীকে তাহার কল্পনার রাজ্যে সৌন্দর্য্যের নির্ম্মল আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া দেখিয়া তৃপ্তি বোধ করে, আমরাও যদি গীত-চর্চ্চারতা এই সঙ্গিহীনা রমণীটিকে সে অধিকার দান করি, তবে এ সংসারে কাহারও কোন ক্ষতি হইবে না। Huxly বোধ হয় বলিয়াছিলেন, পুরুষের কল্পনার শ্রেষ্ঠ সম্পদ নারীর সতীত্বে বিশ্বাস—আমরাও তাঁহারই মতের অনুমোদন করিতাম।

উপস্থিত সকলেই আমোদে মত্ত, রাত্রিশেষ পর্য্যন্ত নৃত্য চলিল, স্থানীয় রাজা সাহেব সব আমোদেই অবাধে যোগ দিলেন, রসিকতার স্রোত সকলকেই ভাসাইয়া লইয়া চলিল, রাজা-প্রজার ব্যবধান ছিল না। প্রজাগণ আপনাদের রাজাকে কত প্রীতির দৃষ্টিতে দেখে, তাহা দেখিতে আমাদেরও আনন্দ বোধ হইল। অগ্নিকুণ্ডের উজ্জ্বলতা প্রভাতকিরণে ক্রমশঃ ম্লান হইয়া আসিতেছিল, জনতার বিরাম ছিল না, স্ক্রুর মত পাক দেওয়া ঘোরান পথে দর্শকরা যষ্টির সাহায্যে ক্রমে গ্রামের পথে নামিয়া যাইতেছিল, অবতরণ-পথ সুখ-সাধ্য ছিল না, তাই সকলকেই সচেতন ও সতর্কভাবে চলিতে হইয়াছিল।

তখনও পাখী শিকারের দিন ফুরায় নাই, অতিথিবৎসল রাজা সাহেবের যত্নে, আমাদের থলিও একেবারে শূন্য ফিরিয়া আসিল না। বনপথে বায়ুরথ অবাধ গতিতে চলিয়াছিল আমরাও অনায়াসে আমাদের মনস্কামনা ও শিকারের ঝুলি পূর্ণ করিয়াছিলাম। দুইবার সন্ধ্যার প্রাক্কালে মহুয়া-পুষ্পলোভী ঋক্ষরাজের সাক্ষাৎ লাভ হইয়াছিল, অকস্মাৎ রোষহুঙ্কার শুনিয়া চালক যেমন রথখানি একটু পিছাইয়া লইয়াছে, অমনই ভল্লুকপ্রবর পর্ব্বতাভিমুখে দৌড় দিলেন। তাঁহার বিরক্তিসূচক বিবিধ প্রকার শব্দ বহুদূর পর্য্যন্ত শ্রুতিগোচর হইল। এক জন আমাদের সম্মুখের পথ দিয়া চলিয়াছিল; বায়ুরথ কাছে আসিয়া পড়ায় এক লাফে নালায় পড়িয়া আত্মরক্ষা করিল। এই সময়েই সপরিবারে এক নীলগাই কর্ত্তা, গৃহিণী ও বৎসের সহিত সাক্ষাৎ। তাহারা নিরাপদ দূরতার সুযোগ পাইয়া ধীর-মন্থর গতিতে অন্তর্দ্ধান করিল।

আমরা যখন গ্রামের মধ্য দিয়া যাইতেছিলাম, মধুর বংশী-ধ্বনি ও একত্র চরণপাতের শব্দে বুঝা গেল, নাচ হইতেছে। এই শব্দে মোহিনী রাজা সাহেবকে এমনই আকর্ষণ করিল যে, তিনি তাহাতে যোগ না দিয়া পারিলেন না। উচ্চ নীচ নির্ব্বিচারে তিনি সকলেরই সঙ্গে নৃত্যরস সম্ভোগ করিলেন। আমরা যখন ফিরিলাম, তখন মালায় ও ফুলে আমাদের

নিঃশ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল, তবে রাজা সাহেবের অভাবনীয় আবির্ভাবে প্রজাবর্গের মনে যে আনন্দের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহাও অপূর্ব্ব।

স্মৃতি সচেতন হইয়া আর একটি গ্রাম্য ছবি মানস চক্ষুর সম্মুখে প্রসারিত করিতেছে। পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যের প্রতিমূর্ত্তি ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা মহানন্দে আমাদের স্বাগত জানাইতে আসিয়াছে—সকলেরই চোখের চাহনি হাসির আলোকে উজ্জ্বল, মুখে হাস্য-কলরব। পথে গৃহদ্বারে জানালায় ছাদে ভিড় জমিয়া গিয়াছে। সকলেরই অলকে বনফুলগুচ্ছ, অঞ্জলিতে বনফুলরাশি। এই জনতার মধ্যে একটি কিশোরী সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, স্বর্ণচম্পার মত তাহার গায়ের বর্ণ, মুখখানি ফুলের মত সুকুমার ও সুগঠিত, হাসিলে কালো চোখে আলো দেখা দেয়, গাল দুটিতে টোল ফুটিয়া ওঠে। বনের সীমান্ত গ্রামে কখন কখন এমনই অপূর্ব্ব সুন্দর দুই একটি ফুল বিকশিত হইতে দেখা যায়।

বয়সের সঙ্গে আশ্চর্য্য হইবার শক্তি তিরোহিত হয় শুনিতে পাই, যদিও এ কথা আমি মানি না। এই পুষ্পপেলব বালিকা-মূর্ত্তি আমার মনে আনন্দের ছবি আঁকিয়া দিয়াছিল। আমার সঙ্গীদের মনে হয় ত আরও কিছু যোগ করিয়াছিল, বিশেষতঃ একটি যুবকের; যিনি ভাণ করিতেন, রক্ত-মাংসের মানুষের মত তাঁহার হৃৎপিণ্ডের স্থান একখণ্ড জড় উপল অধিকার করিয়া আছে—কোন দাগ সেখানে বসে না। কিশোরী ফুল পত্রপুটের আবেষ্টনের মত করিয়া ঘেরিয়া শাড়ীখানি জড়াইয়া পরিয়াছিল, গাল দুটিতে স্বাস্থ্যের উজ্জ্বল রক্তিম আভা, চোখের কোলে কাজলের ক্ষীণ রেখায় টানা চোখের শোভা আরও বাড়াইয়া দিয়াছিল। এ কাজল কেন পরা? রৌদ্রের তীব্রতাকে মোলায়েম করিবার জন্য চোখে কাজল আঁকিয়া দিয়াছিল কি? এ কাজল পরিবার পদ্ধতি কবে কোন্ যুগে সুরু হইয়াছে, কে জানে!

রাজা সাহেব এখানেও গ্রাম্য নৃত্যে যোগ দিলেন। ছোট ছোট লাঠী পরস্পর আঘাত করিয়া তাল রাখা হইতেছিল, কাঠের করতাল বাজাইলে যেরূপ শব্দ হয়, চারিদিক্ যেন তেমনই শব্দ মুখর হইয়া উঠিল। রাজা-প্রজা প্রভু-ভৃত্য ধনি-দরিদ্র সকলেরই মন এক আনন্দের সুরে সাড়া দিল, কৃত্রিম ব্যবধান ঘুচিয়া গিয়া মানব-মনের চিরন্তন আনন্দ-সঙ্গীত জাগ্রত হইয়া উঠিল।

শ্রীকুমুদনাথ চৌধুরী।

বর্ষা এলো

(Tennyson হইতে)

আষাঢ়ের এই প্রথম দিনে অঝোর ধারায় বর্ষা এলো
সোনার স্বপন দিয়ে তারে বরে' নে লো—বরে' নে লো।
কীচক বনের কন্দরে ঐ
ছুটলো নীপের গন্ধ যে সই,
কল্প বনে স্বপ্ন-ভ্রমর কোমর বেঁধে ছুটলো যে লো।

দেয়ার ডাক্ ঐ গুরু-গুরু সই লো হৃদয় কেমন করে,
নবীন আশার কুঞ্জবনে বাদল-ধারা আজকে ঝরে।
পাগলা-হাওয়ার ভৈরবী তান
মত্ত করে আজকে যে প্রাণ,
চমকে উঠে অশোক পলাশ বকুল বনে থমকে গেল।

ব্যাপার-খানা দেখে যে আজ দামিনী ঐ রইল থেমে,
বহুকালের জমাট্ তুষার হঠাৎ যে আজ আসল নেমে,
শিখীরা সব পুচ্ছ তুলে
নাচ্ছে যে আজ আপনা-ভুলে,
জলদ্-জালে গগন সীমা ছাইল যে লো—ছাইল যে লো।
আষাঢ়ের এই প্রথম দিনে বর্ষা এলো – বর্ষা এলো॥

শ্রীমতী বিদ্যুৎপ্রভা দেবী।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মুখোস উন্মোচন

মোজের ও তাহার সঙ্গিনীর পরিচয় শুনিয়া সেই কক্ষের সকলেই স্তম্ভিতভাবে বসিয়া রহিলেন; কিন্তু কাউণ্টের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিল। তাঁহার মুখ নীল হইয়া গেল এবং শ্বাসরোধের উপক্রম হইল। ইহার উপর, রেবেকা আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া, অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইল। কিন্তু সেই কক্ষস্থিত ভদ্রমহোদয়রা তাঁহাদের পুরোবর্ত্তিনী অপরিচিতা নারীর এইরূপ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না; মোজে রেবেকাকে তাড়াতাড়ি একখানি কোচের উপর শয়ন করাইল এবং এক গ্লাস জল চাহিয়া লইয়া তাহার চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিতে লাগিল। তখনও সকলে নির্ব্বাক্!

সর্ব্বপ্রথমে ফ্রিজ কথা কহিল। সে কাউণ্টের মুখের দিকে চাহিয়া বিরক্তিভরে বলিল, "এ সকল কি ব্যাপার, কাউণ্ট! এই লোকটা পাগল, না, আমাদের সঙ্গে ধাপ্পাবাজি করিতেছে? উহার কথা সত্য কি না জানিতে চাই।"

কিন্তু কাউণ্টের মুখ হইতে একটি কথাও বাহির হইল না, তিনি পূর্ব্ববৎ আড়ষ্টভাবেই বসিয়া রহিলেন। কাউণ্টকে নিরুত্তর দেখিয়া মোজে ফ্রিজকে বলিল, "আপনারা না জানিতে পারেন, কিন্তু আপনাদের ভগিনীপতি ঐ কাউণ্ট জানেন, আমি পাগল নহি, আপনাদের সঙ্গে ধাপ্পাবাজিও করি নাই। ঐ যে কাউণ্ট, যাঁহাকে আপনারা ভগিনীপতি বানাইয়া বনিয়াদী বংশের শ্যালক হইবার গৌরব উপভোগ করিতেছেন, উনিই ধাপ্পাবাজ, নিজের চাল-চুলো ত কটু আছে, কেবল দমবাজী করিয়া দেশ-বিদেশের ধনাঢ্য লোকের নিকট 'দাঁও' মারাই উহার পেশা। তবে এখানকার দাঁওটাতে উনি বোধ হয় মৌরুসি স্বত্ব লাভ করিয়াছেন; কিন্তু আসলে তাহা উটবত্তী। এই মহিলাটি কাউণ্টের বৈধ পত্নী, অর্থাৎ বিবাহিতা স্ত্রী, কাউণ্ট ইহাকে সেণ্টপিটার্শবর্গে বিবাহ করিয়াছিলেন।"

মোজের শ্লেষপূর্ণ কথাগুলিতে সঙ্কোচের চিহ্ন মাত্র ছিল না; কেহ কি এরূপ নির্ভীকভাবে মিথ্যা কথা বলিতে পারে? ফ্রিজ ও পিটার সন্দিগ্ধচিত্তে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল। কথাটা সত্য হইলে জুরিচে যে তাহাদের কলঙ্কের 'ডিনামাইট' ফাটিবে; সমাজে তাহারা আর মুখ দেখাইতে পারিবে না; এবং বার্থা কাউণ্টের অবৈধ পত্নী—এ কথা জানিতে পারিলে সে বেচারা ঘৃণায় লজ্জায় আত্মহত্যা করিবে না?—উভয় ভ্রাতার মনে এই চিন্তার উদয় হইল।

রেবেকার চেতনা সঞ্চার হইলে সে ম্লানমুখে অবজ্ঞাপূর্ণ নেত্রে কাউণ্টের মুখের দিকে চাহিল। তাহার ক্রুদ্ধ চক্ষু দুটি যেন নিদাঘাপরাহ্নের বিজলীভরা মেঘ! তাহার সেই বিস্ফারিত নেত্রনিঃসৃত অদৃশ্য বিদ্যুৎপ্রবাহে কাউণ্টের মোহ অপসারিত হইল, তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া শুষ্কস্বরে বলিলেন, "আমি কয়েক মিনিটের জন্য এই স্ত্রীলোকটার সঙ্গে গোপনে আলাপ করিতে চাহি।"

কাউণ্টের কথা শুনিয়া রেবেকা অপমানে আহতা ব্যাঘ্রীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া লাফাইয়া উঠিল, তীব্রস্বরে বলিল, "নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতক! আমাকে 'এই স্ত্রীলোকটা' বলিয়া সম্বোধন করিতে তোমার লজ্জা হইল না? স্ত্রীলোকটা! আমি তোমার বিবাহিতা পত্নী নহি? তোমার নামেও খেতাবে আমার অধিকার নাই? আমি স্ত্রীলোকটা?"

রেবেকার তিরস্কারে কাউণ্ট হতবুদ্ধি হইয়া অধোমুখে বসিয়া রহিলেন; তিনি অত্যন্ত চতুর হইলেও, এইভাবে আক্রান্ত হইয়া তাঁহার মুখে কথা ফুটিল না। তাঁহাকে অবনতমস্তকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া রেবেকার অভিযোগ সত্য বলিয়াই সকলের ধারণা হইল। রেবেকা তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "মহাশয়গণ, এই কাউণ্ট কতগুলি নারীর সর্ব্বনাশ করিয়াছে জানি না, কিন্তু ও যাহাদের

মাথা খাইয়াছে, আমি সেই অভাগীদেরই একজন। কাউণ্ট সেণ্টপিটার্শবর্গে গিয়া ওপেনহেম নামে আমাদের সহিত পরিচিত হয়, প্রেমের অভিনয়ে আমাকে মুগ্ধ করে। সেখানে আমাকে বিবাহ করিয়া আমার পিতার বহু অর্থ অপহরণ করিয়া কোথায় সরিয়া পড়িল—তাহা কোন দিন জানিতে পারি নাই। অবশেষে মিঃ মোজের নিকট উহার সন্ধান পাইয়াছি। মিঃ মোজেই আমাকে উহার প্রকৃত পরিচয় জানাইয়াছেন।"

রেবেকার কথা শুনিয়া ফ্রিজ ও পিটার উভয়েরই মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর হইল। রেবেকার অভিযোগের প্রতিবাদে কাউণ্ট কি বলিয়া আত্মসমর্থন করেন, তাহা শুনিবার জন্য তাহারা উভয়েই অধীরভাবে কাউণ্টের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কিন্তু কাউণ্টের মুখ হইতে একটি কথাও বাহির হইল না, রেবেকার উক্তির প্রতিবাদ করিতে তাঁহার সাহস হইল না। তাঁহার সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য, ইহা বুঝিতে পারায় তাঁহার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছিল। তাঁহার মুখমণ্ডল মৃতব্যক্তির মুখের ন্যায় বিবর্ণ হইল।

কাউণ্টের হতাশভাব লক্ষ্য করিয়া গৃহস্বামী রেবেকাকে বলিলেন, "মাদাম, আপনি হঠাৎ এখানে আসিয়া বিষম বিভ্রাট ঘটাইলেন; ইহা অত্যন্ত অপ্রীতিকর ব্যাপার! আপনার অভিযোগ যে সত্য, ইহার প্রমাণ কোথায়? বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ ভিন্ন আপনার কথা গ্রাহ্য হইতে পারে না। আপনি বোধ হয় জানেন, কাউণ্ট অন্য একটি সম্ভ্রান্ত মহিলার বৈধ স্বামী, ইহা আমাদের সকলেরই সুবিদিত। সেই মহিলাটি এখন এ দেশে নাই এবং তিনি এরূপ অসুস্থ দেহে—"

এতক্ষণ পরে কাউণ্টের মুখে কথা ফুটিল; তিনি তাঁহাদের এটর্ণীর কথায় বাধা দিয়া উত্তেজিতস্বরে বলিলেন, "থামুন মহাশয়, আমার যাহা বলিবার আছে—তাহা আগে বলিয়া লই—এই র-র—মহিলাটির সহিত আমার একটু সম্বন্ধ আছে—তাহা স্বীকার করিতে আমার আপত্তি নাই; কিন্তু উহার মুখ হইতে অন্য কোন কথা বাহির হইবার পূর্ব্বে আমি উহাকে গোপনে দুই একটি কথা বলিব। কোন নির্জ্জন কক্ষে কয়েক মিনিটের জন্য উহার সহিত আলাপ করা আবশ্যক মনে করিতেছি। উহার সহিত গোপনে আলাপ করিতে পারি—আমার এটুকু অধিকার আছে।"

কাউণ্টের কথা শুনিয়া সকলেই বুঝিতে পারিলেন—সেই অজ্ঞাতকুলশীলা অপরিচিতা মহিলাটি কাউণ্টের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করিয়াছেন, তাহা অমূলক নহে, কাউণ্ট প্রকারান্তরে তাহা স্বীকার করিয়া লইলেন। বস্তুতঃ নিরুপায় কাউণ্ট তখন "মরিয়া" হইয়া উঠিয়াছিলেন; তাঁহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া ও কথা শুনিয়া রেবেকার মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিল, সে শুষ্কস্বরে বলিল, "যে কোন অপকর্ম্মেই কুণ্ঠিত নহে, এই মুহূর্ত্তে আমার মৃত্যু হইলে যে নিশ্চিন্ত হইতে পারে—কোন্ ভরসায় তাহার সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিব? আমি এই প্রস্তাবে সম্মত নহি।"

মোজে বলিল, "উনি সঙ্গত কথাই বলিয়াছেন। কাউণ্ট আমি কি তোমাকে চিনি না, না তোমার স্বভাব আমার অজ্ঞাত? তুমি আমাকে অসহায় অবস্থায় পাইয়া একদিন চাবুক মারিয়াছিলে—তাহা কি তোমার স্মরণ নাই? রেবেকা একাকিনী নির্জ্জনকক্ষে তোমার সঙ্গে দেখা করিলে, তুমি উহার গলায় ছুরী দিবে না—ইহা কি করিয়া বিশ্বাস করা যায়?"

কাউণ্ট ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় তীব্র দৃষ্টিতে মোজের মুখের দিকে চাহিলেন, তাঁহার চক্ষু হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষিত হইতে লাগিল, কিন্তু মোজে তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইল না! সে অবজ্ঞাভরে বলিল, "চক্ষু ও-রকম রক্তবর্ণ করিয়া কোন লাভ নাই কাউণ্ট! তোমার ভ্রূকুটিতে আমার কোন ক্ষতি হইবে না; অতএব ক্রোধ সংবরণ কর।"

কাউণ্ট শ্লেষভরে বলিলেন, "যে নারী আমার পত্নীত্বের দাবী করিতেছে, তাহার প্রতি তোমার দরদ আমার অপেক্ষা অনেক বেশী দেখিতেছি যে! জানি না, কোন্ অধিকারবলে তুমি তাহার রক্ষক হইয়াছ; যদি তাহাকে আমার কাছে একাকী ছাড়িয়া দিতে তোমার আপত্তি থাকে, আর সে তোমাছাড়া হইয়া গোপনে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সাহস না করে—তাহা হইলে তুমি তাহার দেহরক্ষী হইয়া তাহার সঙ্গে যাইতে পার।"

মোজে কাউণ্টের বিদ্রূপে আহত হইয়া বলিল, "তোমার মত নিষ্ঠুর কাপুরুষ স্বামীর অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্যই আমাকে আমার এই বন্ধুকন্যার রক্ষক হইতে হইয়াছে। যে স্বামীর সহিত তাহার স্ত্রী গোপনে সাক্ষাৎ

করিতে ভয় পায়—সেই স্বামী কোন্ শ্রেণীর জীব—তাহা বুঝিতে অধিক বিলম্ব হয় না। তুমি কিরূপ বিশ্বাসঘাতক ও নিষ্ঠুর কাপুরুষ, তাহা জানি বলিয়াই—উহাকে একাকী তোমার কাছে ছাড়িয়া দিতে সাহস হইতেছে না।"

কাউণ্ট বুঝিতে পারিলেন, মোজেকে খোঁচা দিয়াছেন বলিয়াই তাঁহাকে এই খোঁচা সহ্য করিতে হইল। মোজের তীব্র কটূক্তি তিনি নিঃশব্দে পরিপাক করিয়া, সেই কক্ষস্থিত ভদ্রলোকগুলিকে বলিলেন, "আপনারা আমার বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগ সম্বন্ধে প্রতিকূল অভিমত প্রকাশ করিবেন না, ইহাই আমার অনুরোধ। এই লোকটি আমাকে নরপশু প্রতিপন্ন করিবার জন্য কিরূপ ব্যাকুল হইয়াছে, তাহা আপনারা বুঝিতে পারিয়াছেন। কিন্তু এই 'রাস্কেল' কিরূপ মিথ্যাবাদী দম্‌বাজ, তাহা আপনাদের নিকট শীঘ্রই সপ্রমাণ করিতে পারিব।"

কাউণ্ট আত্মসমর্থনের জন্য এ কথা বলিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার কথায় কেহই আস্থা স্থাপন করিলেন না। ফ্রিজ ও পিটার আতঙ্কে ও উদ্বেগে অবসন্ন হইয়া পড়িল। তাহারা বুঝিল, এই কলঙ্কের কথা গোপন থাকিবে না; এ কথা লইয়া শীঘ্রই নগরের ঘাটে-পথে, ক্লাবে, মজলিসে, সর্ব্বস্থানে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইবে। তাহাদের ভগিনী একটা মিথ্যাবাদী শঠ প্রতারকের প্রতারণায় ভুলিয়া তাহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, অথচ সে তাহার বৈধ স্বামী নহে! এ সংবাদ প্রচারিত হইলে শত্রুরা বিদ্রূপ করিবে, তাহাদের উন্নত মস্তক ধূলায় লুটাইবে, সমাজে তাহারা মুখ দেখাইতে পারিবে না—এই সকল কথা চিন্তা করিয়া তাহারা অবনত মস্তকে হতাশভাবে বসিয়া রহিল। তাহাদের এটর্ণী ও উকীল বুঝিতে পারিলেন—কাউণ্টের বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগ সত্য, কারণ—কাউণ্ট তাহা অস্বীকার করিতে সাহস করেন নাই। অপরাধী বলিয়াই তিনি সন্ত্রস্ত ও কুণ্ঠিত হইয়াছেন।

গৃহস্বামী কয়েক মিনিট নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "এখন আমাদের সভা ভঙ্গ করাই কর্ত্তব্য। এই শোচনীয় বিভ্রাট সম্বন্ধে আমাদের কর্ত্তব্য কি, স্থানান্তরে তাহার আলোচনা করিলেই চলিবে। এখন এখানে উপস্থিত থাকা আমাদের সকলের পক্ষেই কষ্টকর।"

এই কথা শুনিয়া ফ্রিজ ও পিটার সেই কক্ষ ত্যাগ করিল, গৃহস্বামী এবং তাঁহার উকীল-বন্ধুও সরিয়া পড়িলেন। কাউণ্ট একাকী রেবেকা ও মোজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

এতক্ষণে কাউণ্টের সঙ্কোচ দূর হইল। তিনি অত্যন্ত মোলায়েম সুরে রেবেকাকে বলিলেন, "রেবেকা, তুমি কৌশল করিয়া আমাকে মুঠায় পুরিয়াছ; তোমার কবল হইতে আমার মুক্তিলাভের উপায় নাই। আমি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতেছি, তোমার প্রতি আমি বড়ই নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছি; আমার অশিষ্টাচরণে তুমি মনে কিরূপ আঘাত পাইয়াছ, তাহাও আমি বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্তু তুমি বিশ্বাস কর, এ সকলই আমার নির্ব্বুদ্ধিতার ফল। আমি অত্যন্ত বদলোক, ইহা অস্বীকার করিতে পারি না; কিন্তু লোক আমি যতই মন্দ হই, আমি তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক নির্ব্বোধ। সত্যই আমি কাণ্ডজ্ঞান হারাইয়াছিলাম, ক্ষেপিয়াছিলাম, আমি যে ভ্রম করিয়াছি—তাহা আমার মস্তিষ্ক-বিকারেরই ফল, আমার হৃদয়হীনতা তাহার কারণ নহে। এখন আমার যে অবস্থা, তাহাতে তোমাকে মুখ দেখাইতে লজ্জা হইতেছে। তুমি হয় ত বিশ্বাস করিবে না, কিন্তু সত্যই আমি চক্ষুলজ্জা ত্যাগ করিতে পারি নাই, এই জন্য তোমার মুখের দিকে চাহিতে পারিতেছি না; মাথা গুঁজিয়া তোমাকে আমার মর্ম্মবেদনা জানাইতেছি। আমি জানি, তোমার নিকট ক্ষমা-ভিক্ষা করাও আমার পক্ষে ধৃষ্টতা; যদি কেবল আমার নিজের কথা হইত, তাহা হইলে আমি তোমার নিকট এরূপ ব্যাকুলভাবে কাতরতা প্রকাশ করিতাম না, তোমার ক্ষমাপ্রার্থী হইতাম না; আমার নির্ব্বুদ্ধিতার সকল দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে লইয়া অপকর্ম্মের ফলভোগ করিতাম। কিন্তু এই শোচনীয় ব্যাপারের সহিত আর একটি সম্ভ্রান্ত মহিলার ভাগ্যসূত্র বিজড়িত। আমার প্রতি তোমার আচরণের উপর তাহার সুখ-দুঃখ, শান্তি-অশান্তি, মান-অপমান সমস্তই নির্ভর করিতেছে। সে এখন কঠিন রোগে শয্যাশায়িনী; সে যদি এই সকল 'কেলেঙ্কারী'র কথা শুনিতে পায়, তাহা হইলে তাহার হৃদয় ক্ষোভে দুঃখে বিদীর্ণ হইবে। এই ধাক্কা সে সামলাইতে পারিবে না, বেচারা মারা যাইবে। রেবেকা, তুমি নারী-হত্যা করিও না; দোহাই তোমার, তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আমাকে দয়া কর; তুমি মুখ বুজিয়া—"

কাউণ্ট তাঁহার উচ্ছ্বাসপূর্ণ বক্তৃতা শেষ করিবার অবসর পাইলেন না; এই দুর্দ্দিনে তাঁহার স্থায় বুদ্ধিমান্ চতুর 'বচন-বাগীশের'ও পদে পদে ভ্রম হইতেছিল; ভ্রম না হইলে যাহার প্রসঙ্গ রেবেকার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অপ্রীতিকর, যাহার নাম পর্য্যন্ত তাহার অসহ্য এবং যাহার জন্য তাহার স্বামী তাহাকে পর করিয়াছেন—সেই বার্থার ভগ্নস্বাস্থ্যের দোহাই দিয়া তিনি তাহার করুণা প্রার্থনা করিতেন না। বার্থার মুখের দিকে চাহিয়া কাউণ্ট রেবেকাকে তাঁহার অপরাধ মার্জ্জনা করিতে অনুরোধ করায় রেবেকার হৃদয়-নিহিত ধুমায়মান ক্রোধানল 'দপ করিয়া' জ্বলিয়া উঠিল; সে কাউণ্টের বাক্যস্রোতে বাধা দিয়া তীব্র স্বরে বলিল, "কে সেই মাগী, যাহার সুখ-শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য আমার কাছে আবদার করিতেছ?"

কাউণ্ট রেবেকাকে লক্ষ্য করিয়া, 'এই স্ত্রীলোকটা' বলিয়া তাহার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছিলেন; এইবার রেবেকা সেই অপমানের শোধ লইল। কাউণ্ট তাহা বুঝিতে পারিলেও রেবেকাকে কটূক্তি করিতে সাহস পাইলেন না। তিনি নরম সুরে বলিলেন, "না, সে মাগী-টাগী নয়, সম্ভ্রান্ত মহিলা সে,—লেডী; আমার স্ত্রী—কাউণ্টেস।"

রেবেকা সক্রোধে ভূতলে পদাঘাত করিয়া বিকৃত স্বরে বলিল, "মিথ্যাবাদী, তুমি মিথ্যা কথা বলিতেছ; তোমার একাধিক স্ত্রী থাকিতে পারে না, আমিই তোমার স্ত্রী, আমিই কাউণ্টেস

তাড়া খাইয়া কাউণ্ট আরও নরম হইলেন; ঢোক গিলিয়া হতাশভাবে বলিলেন, "আচ্ছা, আচ্ছা, তুমিই আমার স্ত্রী, তুমিই কাউণ্টেস। কিন্তু তুমি আমার স্ত্রী হইলেও তোমার প্রতি যেরূপ আচরণ করিয়াছি—তাহা সহ্য করিয়া তুমি যে আমাকে ভালবাসিবে, শ্রদ্ধা করিবে বা স্বামী বলিয়া আমাকে গ্রহণ করিবে, সে আশা নাই। আমার সহিত তোমার স্বামি-স্ত্রীর সম্বন্ধ চুকিয়া গিয়াছে। আমি জানি, তুমি এখন ইচ্ছা করিলে আমার সর্ব্বনাশ করিতে পার, ক্ষুদ্র কীটের ন্যায় আমাকে পদদলিত করিতে পার; কিন্তু তাহাতে তোমার কি লাভ হইবে? না, আমাকে চূর্ণ করিয়া তোমার স্বার্থসিদ্ধি হইবে না। আমি পাপিষ্ঠ, কিন্তু আমার পাপের জন্য যদি একটি নিরপরাধ সরলা অবলা বালাকে কঠোর দণ্ড ভোগ করিতে হয়—তবে তাহা বড়ই ক্ষোভের বিষয় হইবে। এই জন্যই তোমাকে অনুরোধ করিতেছি—এই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গের আলোচনা বন্ধ কর, সকল কথা চাপিয়া যাও। তুমি ইহুদীর মেয়ে, টাকা ভালবাস; এই উপকারের বিনিময়ে যদি টাকা চাও, যত টাকা চাহিবে, তাহাই দিব।—তুমি—"

রেবেকা কাউণ্টের মুখের উপর হাত তুলিয়া সরোষে এরূপ গর্জ্জন করিল যে, কাউণ্টের মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল! রেবেকা ক্রোধকম্পিত স্বরে বলিল, "তোমার মত বেহায়ার অধম পৃথিবীতে আর কেহ আছে কি? তুমি আমাকে কি মনে করিয়াছ বলিতে পার? তুমি কি ভাবিয়াছ, অন্য যে হতভাগিনীকে লজ্জা সরম বিসর্জ্জন দিয়া প্রতারিত করিয়াছ, আমার আত্মসম্মান—আমার নারীত্বের গর্ব্ব তাহার অপেক্ষা অল্প? তাহার তুলনায় আমি হীন? না, টাকা ঢালিয়া তুমি আমাকে কিনিতে পারিবে না। টাকা দিয়া তুমি তাহাকে কিনিতে পার, টাকার লোভ দেখাইয়া আমার মুখ বন্ধ করিতে পারিবে না। আমার বাবার টাকা চুরি করিয়া এ দেশে পলাইয়া আসিয়া ধরা পড়িবার ভয়ে এখন আমাকে টাকার লোভ দেখাইতে তোমার লজ্জা হইতেছে না, হতভাগা বিশ্বাসঘাতক প্রতারক!"

এই মর্ম্মভেদী চাবুকেও কাউণ্ট বিচলিত হইলেন না; তাঁহার মাথার উপর সরু সূতায় কি সাংঘাতিক খাঁড়া ঝুলিতেছিল—তাহা লক্ষ্য করিয়া তিনি কাতর স্বরে বলিলেন, "রেবেকা, তোমার এক বিন্দুও দয়া মায়া নাই?"

রেবেকা উন্মাদিনীর ন্যায় হো হো করিয়া হাসিয়া ঘৃণাভরে বলিল, "দয়া মায়া? না, আমার দয়া মায়া নাই। তোমাকে দয়া করিব? তুমি যখন প্রতারণা করিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছিলে, আমার শোভাময় যৌবনকুঞ্জ বিকশিত কুসুমরাশিতে ভরিয়া উঠিলে, তুমি যখন তাহা পদাঘাতে চূর্ণ করিয়া আমার সকল সুখ, সকল আশা বিনষ্ট করিয়াছিলে, আমার জীবন মরুভূমিতে পরিণত করিয়াছিলে, তখন আমাকে কি বিন্দুমাত্র দয়া বিতরণ করিয়াছিলে? দয়া! দয়ার কথা বলিতে তোমার লজ্জা হইতেছে না? আমি তোমাকে বিশ্বাস করিয়াছিলাম; তোমার প্রেম অকপট, নির্ম্মল ভাবিয়া তোমার হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম; আর তুমি ইতর তস্কর, আমার

সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া, আমাকে অনন্ত দুঃখের সাগরে নিক্ষেপ করিয়া, দেশান্তরে পলায়ন করিয়াছিলে—সে কথা কি আজ ভুলিয়া গিয়াছ? আমি তোমাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তোমার সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিতে, তোমার বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিফল দিতে উদ্যত হইয়াছি। তোমার পরিত্রাণ লাভের আর কোন উপায় নাই দেখিয়া প্রাণভয়ে আজ তুমি আমার দয়া ভিক্ষা করিতেছ! তুমি আমার সর্ব্বনাশ করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পার নাই, এ দেশে আসিয়া আর একটি অভাগিনীর মাথা খাইয়াছ; আর একটি পরিবারের সর্ব্বনাশ করিয়াছ। এখন সেই কলঙ্ক-কাহিনী ঢাকিয়া রাখিবার জন্য, আমি তোমার বৈধ পত্নী—আমাকে মুখ বুজিয়া থাকিতে অনুরোধ করিতেছ; এক জনের মানরক্ষার জন্য অসঙ্কোচে আমার অপমান করিতেছ! তোমার মত ঘৃণিত জীবকে দয়া করিলে দয়ার ব্যভিচার হইবে। তোমার মত বিশ্বাসঘাতক, পত্নীদ্রোহী প্রবঞ্চককে আমি কিরূপ ঘৃণা করি—তাহা প্রকাশ করিবার উপযুক্ত ভাষা আমি খুঁজিয়া পাইতেছি না।"

নির্লজ্জ কাউণ্ট এই কঠোর ভৎর্সনা শুনিয়াও বিন্দুমাত্র ক্রোধ বা বিরক্তি প্রকাশ করিলেন না, অবনত মস্তকে বিনীতভাবে বলিলেন, "রাগ করিও না রেবেকা, একটু দয়া কর, দয়ার তুল্য ধর্ম্ম আর নাই; আমার নিকট দয়া পাও নাই বলিয়া, নারী তুমি, তোমারও কি নির্দ্দয় হওয়া উচিত? আমি নিজের জন্য তোমার দয়ার প্রার্থী নহি। সর্ব্বসুখবঞ্চিতা যে মহিলাটির বিশ্বাস, আমি তাহার বৈধ স্বামী, তাহার এ বিশ্বাস নষ্ট না হয়, যে সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাহার জন্ম—সেই পরিবারের মান সম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ থাকে—এই উদ্দেশ্যে আমি তোমার দয়া প্রার্থনা করিতেছি। আমার অপরাধে একটি নিরপরাধিনী রোগশয্যাশায়িনী মহিলার জীবন ব্যর্থ করিও না।"

রেবেকা মাথা নাড়িয়া অবজ্ঞাভরে বলিল, "উঃ কি দরদ! যখন আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছিলে—তখন এ দরদ কোথায় ছিল? তুমি যে সম্ভ্রান্ত মহিলাটিকে উপপত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ করিয়াছ, তোমার গুণের কথা শুনিয়া সে যদি বুক ফাটিয়া মরে, তাহার কলঙ্কে যদি তাহার আত্মীয়-স্বজনের মান-সম্ভ্রম নষ্ট হয়, তাহাতে আমার কি ক্ষতি? তাহাদের সঙ্গে আমার কি খাতির? তাহাদের মানরক্ষার জন্য তোমার সহিত আমার সম্বন্ধ গোপন করিয়া কলঙ্কের পশরা নিজের মাথায় তুলিয়া লইব—আমাকে কি তুমি এতই নির্ব্বোধ ও হীন মনে কর? তুমি আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছ, আমাকে প্রতারিত করিয়াছ, আমার নারীজীবন ব্যর্থ করিয়াছ, তোমার অপরাধের শাস্তিবিধান করিতে তোমার ভণ্ডামীর মুখোস উন্মোচন করিয়া তোমার স্বরূপ সকলকে দেখাইতে, তোমার ধন-মান, সুখ-শান্তি, প্রভাব-প্রতিপত্তি ধূলিসাৎ করিতে—পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে আমি এখানে আসিয়াছি। তোমার কাতর প্রার্থনায় আমার সঙ্কল্প ত্যাগ করিব, এরূপ আশা করিও না। বিশ্ববাসী বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া দেখুক—তুমি কিরূপ নরপিশাচ, কত বড় শয়তান!"

কাউণ্ট আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না; তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, মূর্চ্ছার উপক্রম হইল। তিনি পড়িতে পড়িতে দুই হাতে একখানি চেয়ারে ভর দিয়া সাম্‌লাইয়া লইলেন। তিনি চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিলেন; তাঁহার চক্ষুর সম্মুখ হইতে উজ্জ্বল দিবালোক অপসৃত হইল, যেন নিবিড় নৈশ অন্ধকারে তিনি সমাচ্ছন্ন হইলেন। আতঙ্কে বিহ্বল হইয়া তিনি চক্ষু নিমীলিত করিলেন; তাঁহার পাণ্ডুর মুখে যেন মৃত্যুচ্ছায়া ঘনাইয়া আসিল।

কাউণ্ট দুই তিন মিনিট সেই ভাবে অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অবশেষে রেবেকাকে অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "আমার হিতৈষী বন্ধু মোজের সাহায্যেই আশা করি তুমি আমার সন্ধান পাইয়াছ?"

মুহূর্ত্তমধ্যে কাউণ্টের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল; তিনি অধর দংশন করিয়া, উভয় হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া, আরক্ত নেত্রে মোজের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, যেন ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় তাহার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িবেন।

তাঁহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া মোজে সভয়ে সরিয়া দাঁড়াইল, এবং আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইল; কিন্তু কাউণ্ট তাহাকে আক্রমণ করিলেন না, পিশাচের ন্যায় শুষ্ক অট্টহাস্যে সেই কক্ষ প্রতিধ্বনিত করিয়া বলিলেন, "ভয় নাই বন্ধু! এখনও সময় হয় নাই; তোমার মনস্কামনা এখনও পূর্ণ হয় নাই, অগত্যা আমাকেও বিলম্ব করিতে হইবে। তুমি বড়ই ধার্ম্মিক ব্যক্তি, আমাকে বিস্তর ধর্ম্মোপদেশ দান করিয়াছ। আমি তোমার নিকট নানাভাবে ঋণী, ঋণের বোঝা ক্রমেই

...রি হইয়া উঠিতেছে ; এক দিন এই ঋণ সুদে আসলে পরিশোধ করিব। সেই শুভদিনের জন্য প্রস্তুত থাকিও।"

মোজে বলিল, "হাঁ, আমি সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত আছি ; তুমি কিরূপ 'বচন-বাগীশ', তাহা আমার জানা আছে; ঋণ পরিশোধের সামর্থ্য তোমার কতটুকু আছে—তাহাও আমার অজ্ঞাত নহে। মনে করিও না, মরিবার ভয় তোমার অপেক্ষা আমার অধিক। অন্তত: মাথা বাঁচাইবার আগ্রহ যে তোমার অনেক অধিক, তাহার পরিচয় যথেষ্টই পাইলাম ; তবে আর ভয় দেখাইয়া লাভ কি?"

কাউণ্ট দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত করিয়া বিকৃত স্বরে বলিলেন, "আচ্ছা, দেখা যাইবে।"

অতঃপর তিনি রেবেকার মুখের দিকে চাহিয়া সঙ্কোচে বলিলেন, "তোমার সহিত আর অধিক তর্ক-বিতর্কে সময় নষ্ট করা অনাবশ্যক। আমার শরীর অবসন্ন হইয়াছে, মাথা ঘুরিতেছে। তোমার মুখ হইতে ঐরূপ তীব্র হলাহল আর দুই চারি বিন্দু নিঃসারিত হইলে আমাকে তোমার পদপ্রান্তে পড়িয়া পঞ্চত্ব লাভ করিতে হইবে। আমার এইরূপ মৃত্যু তোমার প্রার্থনীয় হইলেও ঐ ভাবে মরিতে আমার আগ্রহ নাই। আমার শেষ কথা এই যে, আমাকে এক বিন্দু দয়া ভিক্ষা দান করিতে পার কি না,' তাহা ভাবিয়া দেখিও।"

রেবেকা প্রস্তর-মূর্ত্তির ন্যায় স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া অচঞ্চল স্বরে বলিল, "তুমি আমাকে এক বিন্দু দয়া ভিক্ষা দিয়াছিলে কি না, তাহাও ভাবিয়া দেখিও।"

কাউণ্ট বলিলেন, "তুমি আমার বিন্দু পরিমাণও দয়া লাভ করিতে পার নাই ; মিথ্যাকথা কেন বলিব?"

রেবেকা,—"কারণ তুমি বুঝিয়াছ—মিথ্যা কথায় আর আমাকে ভুলাইতে পারিবে না। আমাকে তুমি দয়া কর নাই, আমার কাছেও দয়ার আশা করিও না।"

কাউণ্ট,—"তোমার কথা সত্য। তোমার নিকট দয়া প্রার্থনা করিয়া ভুল করিয়াছি। আমরা যেখানে বাস করি, সেখানে সাধুতা দ্বারা অসাধুতাকে জয় করা নির্ব্বুদ্ধিতা ; লাঠী খাইয়া লাঠী না মারা কাপুরুষতা ; বেশ তাহাই হউক। আমার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিবার জন্য তোমার ছুরী শাণাইয়া রাখ। তোমার সহিত আমার সম্বন্ধের কথাটা প্রকাশ করিতেই কৃতসঙ্কল্প হইয়াছ?"

রেবেকা,—"হাঁ, নিশ্চয়ই, এই জন্যই ত এত কষ্ট করিয়া এখানে আসিয়াছি। তোমার অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি না দিলে আমি শান্তিলাভ করিতে পারিব না।"

কাউণ্ট,—"তোমার এই সঙ্কল্প বিচলিত হইবে না? কিছুতেই কি তোমার মুখ বন্ধ হইবে না?"

রেবেকা,—"আমার জীবন থাকিতে না।"

কাউণ্ট সহসা মাথা তুলিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন, তিনি তাঁহার দক্ষিণ হস্ত সবেগে রেবেকার মুখের দিকে প্রসারিত করিয়া তাহাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাইলেন এবং ক্রোধ-কম্পিত স্বরে বলিলেন,—"আমি তোমার চোখ্ রাঙ্গানীর তোয়াক্কা রাখি না। তুমি কেমন মেয়েমানুষ, তাহা দেখিয়া লইব। আমি তোমার সঙ্কল্প ব্যর্থ করিব। কিন্তু তখন আর আপোষ করিবার পথ থাকিবে না। মোজে তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না।"

কাউণ্ট এক ধাক্কায় রেবেকাকে সরাইয়া দিয়া, সশব্দে দ্বার খুলিয়া সেই কক্ষ পরিত্যাগ করিলেন। দুই তিন মিনিট পরে ফ্রিজ্ ও পিটার, তাহাদের এটর্ণীর সহিত সেই কক্ষে পুনঃ প্রবেশ করিয়া ব্যগ্রভাবে রেবেকাকে ও মোজেকে প্রশ্নবর্ষণে বিব্রত করিয়া তুলিল। কাউণ্টের সহিত রেবেকার যে সকল কথার আলোচনা হইয়াছিল, মোজেই তাহা তাহাদের গোচর করিল। সকল কথা শুনিয়া পিটার ঘৃণায় লজ্জায় মনস্তাপে অধীর হইয়া উঠিল, কারণ, তাহাদের পরিবারে সেই মিথ্যাবাদী শঠ ও প্রবঞ্চকের আবির্ভাবের জন্য সে স্বয়ং দায়ী। সে ক্ষোভে দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া বলিয়া উঠিল, "মা খেতাবের মোহে ভুলিয়া তাড়াতাড়ি বার্থার বিবাহ না দিলে, আজ আমাদিগকে এই কলঙ্কের পশরা মাথায় তুলিয়া লইতে হইত না। বার্থার এরূপ সর্ব্বনাশ হইবে, ইহা স্বপ্নেরও অগোচর! উঃ কি লজ্জা, কি ঘৃণার কথা! বার্থা কাউণ্টের বৈধ পত্নী নহে, কাউণ্টের স্ত্রী বলিয়া তাহার পরিচয় দেওয়ার অধিকার নাই!—সৌভাগ্যক্রমে মা আজ বাঁচিয়া নাই ; মৃত্যুর পূর্ব্বে এই কলঙ্কের কথা শুনিতে পাইলে ঘৃণায় লজ্জায় ও অপমানে তাঁহার মাথা মাটীর সঙ্গে মিশিয়া যাইত, তিনি ক্ষেপিয়া উঠিতেন ; শেষে হয় ত নিজের গলায় ছুরী দিতেন।"

[ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

উড়োকলে আটলাণ্টিক
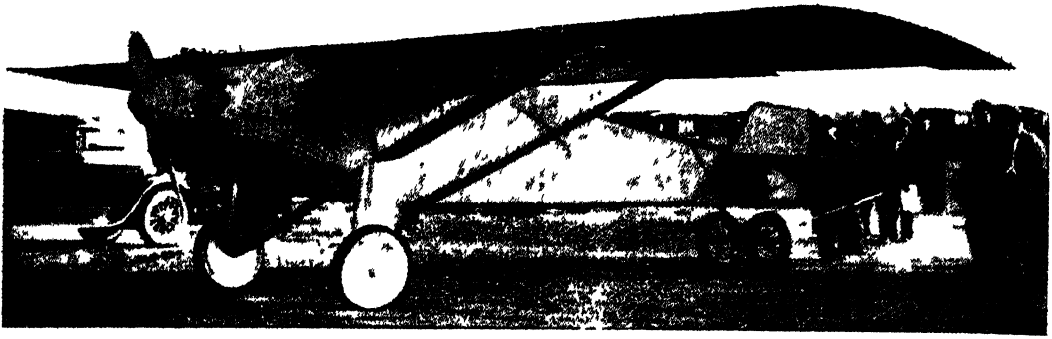
মার্কিণের উড়োকল বিভাগের সেনানী ক্যাপ্টেন চার্লস লিণ্ডবার্গ একাকী নিউ ইয়র্ক হইতে কোথাও বিশ্রাম না করিয়া তাঁহার "স্পিরিট অফ সেণ্টলুই" নামক উড়োকলে প্যারিস সহরের লেবুর্গে নামক বিমান পোতাশ্রয়ে পৌঁছিয়াছেন। এই যাত্রায় তাঁহাকে একাকী পাইলট ও মেকানিকের কাজ করিয়া ন্যুনাধিক ৩৮০০ মাইল আকাশ পথ সাড়ে ৩৩ ঘণ্টায় অতিক্রম করিতে হইয়াছে। তাঁহার বয়স মাত্র ২৫ বৎসর। তাঁহার পিতা সুইডেন দেশীয় এবং মাতা মার্কিণ জাতীয়া। পিতা সুইডিস হইলেও মার্কিণ হইয়া গিয়াছেন, এবং মাতার পূর্ব্বপুরুষ বৃটিশজাতীয় হইলেও মাতা এক্ষণে মার্কিণজাতীয়া, সুতরাং তিনিও এক্ষণে মার্কিণজাতীয় বলিতে হইবে। এই আশ্চর্য্য অসমসাহসিক কার্য্যের সাফল্য গৌরবে মণ্ডিত হইয়া তিনি য়ুরোপ ও মার্কিণে যে অভিনন্দন প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা মুকুটধারী রাজার পক্ষেও দুর্লভ। তাঁহাকে দেশের লোক 'আমাদের ফরাসীদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দূত' বলিয়া অভিহিত করিতেছে, কেন না তাঁহার এই কার্য্যে ফরাসীরা তাঁহাকে বাহুপ্রসারণ করিয়া বক্ষে ধারণ করিয়াছে। ৮ বৎসর পূর্ব্বে রেমন অর্টিগ নামক ধনী, নিউ ইয়র্ক হইতে না থামিয়া প্যারিসে উড়োকল যাত্রায় যিনি সফল হইবেন, তাঁহাকে ২৫ হাজার ডলার মুদ্রা পুরস্কার দিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। লিণ্ডবার্গ সেই পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। যিনি উড়োকলে প্রথম সমুদ্র (ইংলিশ চ্যানেল) পার হইয়াছিলেন, সেই ফরাসী বিমানবীর ব্লিরিয়ট তাঁহাকে সাদরে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন।

ক্যাপ্টেন লিণ্ডবার্গ ও তাঁহার জননী
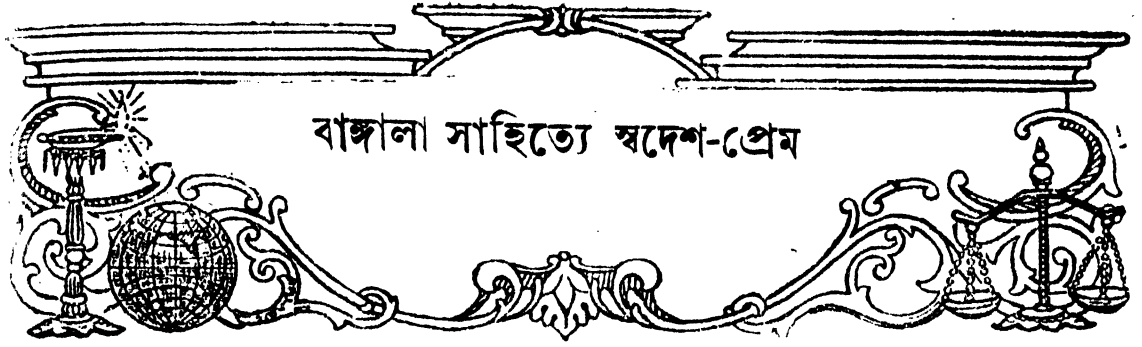
বাঙ্গালা সাহিত্যে স্বদেশ-প্রেম

রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে নবীনচন্দ্র পর্য্যন্ত বাঙ্গালার লেখকগণ স্বদেশবাসীকে নিজেদের দুর্দ্দশার কথা শুনাইয়াছেন। ইংরাজী শিক্ষার প্রথম অবস্থায় নব্যতন্ত্রে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ একটু উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিলেন। দেশের আচার, ব্যবহার, শাস্ত্র, কাব্য ও দর্শন, এমন কি, দেশের ভাষা সমস্তই নিন্দনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। মাইকেল প্রমুখ পণ্ডিতগণ ইংরাজী কায়দা, ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য প্রচারের দ্বারা দেশের উপকার হইবে এবং ইংরাজী ভাষাই জনসাধারণের ভাষা হইয়া উঠিবে, এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। তাঁহারা বাঙ্গালাকে শ্বেতদ্বীপে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রই আমাদের উদ্ধারকর্ত্তা। তিনিই বাঙ্গালীকে নিজের ঘরের দিকে চাহিতে ডাক দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও বলিয়াছিলেন যে, ইংরাজী ভাষারূপ রজ্জুতে "ভারতীয় ঐক্যের গ্রন্থি বাঁধিতে হইবে।" কারণ,"ভারতবর্ষীয় নানা জাতি একমত, একপরামর্শী, একোদ্যোগী না হইলে ভারতবর্ষের উন্নতি নাই, অতএব যতদূর ইংরাজী চলা আবশ্যক, ততদূর চলুক্। কিন্তু একবারে ইংরাজ হইয়া বসিলে চলিবে না। বাঙ্গালী কখন ইংরাজ হইতে পারিবে না।" বঙ্কিমচন্দ্রের কথার সত্যতা বাঙ্গালী উপলব্ধি করিল। সংবাদপত্রে, বক্তৃতায়, কবিতায় ও সাহিত্যে একতাস্থাপনের প্রচেষ্টা চলিতে লাগিল। মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইবার পর বহুসংখ্যক পুস্তক মুদ্রিত হইতে লাগিল। দেশে জ্ঞানবিজ্ঞানের পন্থা উন্মুক্ত হইল। ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত প্রতিভাবান্ ব্যক্তিগণ বাঙ্গালা রচনায় নিপুণ হইয়া উঠিলেন। শিক্ষিত সম্প্রদায় এই সমস্ত কবিতা ও প্রবন্ধ পাঠ করিয়া নিজেদের দোষ বুঝিতে পারিলেন। দেশের ভাষা ও দেশের প্রতি সকলে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। তবে ইহা কেবল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ ছিল।

ভিক্টোরিয়াকে সম্বোধন করিয়া কবি মনোমোহন বসু ইংরাজ আমলে ভারতের দুর্দ্দশার কথা শুনাইয়াছিলেন। এক সময় ভারত পৃথিবীপূজ্য ছিল। তখন ভারতে ঐশ্বর্য্য, শৌর্য্য, বীর্য্য, বাণিজ্য, ধন সকলই ছিল। মুসলমান আমলে অত্যাচার ও দৌরাত্ম্য ছিল বটে—

কিন্তু মা এমন ক'রে অন্নের তরে,
কাঁদ্‌তো না লোক এখন যেমন॥

এখন শাসনদোষে "সোনার দেশে, ধনে মানে প্রজার মরণ" হইতেছে। রোগ, ট্যাক্স ও মাম্‌লা দেশকে অন্তঃসারশূন্য করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু—

বল্‌তে মা শঙ্কা করে, পাছে ধ'রে
জেলে পোরে চোরের মতন।
কিন্তু মা তোরে ভিন্ন কারে অন্য
বল্‌বো মোদের হিদের বেদন॥
দিশী লুট গেছে উঠে, সত্য বটে,
তার বদলে ইংলিস্ ফ্যাসন॥
অসাড়ে জোঁকের মতন, রক্ত শোষণ,
বিলিতী লুট চলছে এখন॥

* * * *

ধ'লো পায় লাথির চোটে, রক্ত উঠে,
কালো আদমী মরে যখন।
বলে মা পিলে ফাটা, চুকোয় ল্যাঠা
স্বাক্ষী স্বয়ং সিবিল সার্জ্জন॥

অন্নে সন্তুষ্ট ভারতবাসী অদৃষ্টের দোহাই দিয়া সকল অত্যাচার অকাতরে সহ্য করে। শাসকগণ শক্তের ভক্ত। কবি বলিতেছেন—

আমরা মা শান্ত শিষ্ট, অন্নে তুষ্ট,
অদৃষ্টে তাই কষ্ট লিখন।

যারা মা দ্রোহী দুষ্ট, ঘোর অশিষ্ট
স্পষ্ট দেখায় রুষ্ট বদন।
কষ্টে তায় অসন্তুষ্ট, দিতে কষ্ট,
সাহস পায় না শাসকের মন॥

সহজ কথায়, সরল ভাষায় ভারতের রাজনৈতিক দাসত্বের ফল কবি সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ভারতবাসী সকল বিষয়ে, এমন কি, তাহার দৈনন্দিন জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের উপযোগী সামান্য অথচ প্রয়োজনীয় বস্তুর জন্য পরের ও বিদেশীর মুখাপেক্ষী হইয়া রহিয়াছে। তাহার আত্মনির্ভরতা লোপ পাইয়াছে। চোখে আঙ্গুল দিয়া কেহ দেখাইয়া না দিলে আমরা নিজের দোষ দেখিতে পাই না এবং নিজের দোষ বুঝিতে না পারিলে তাহা সংশোধন করিবার প্রবৃত্তি বা ইচ্ছা আইসে না। বাঙ্গালী কবিগণ স্বদেশবাসীদিগকে ডাক দিয়া তাহাদের পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান অবস্থার কথা শুনাইয়াছেন। তাঁহারা বাঙ্গালার জাতীয়তা মন্ত্রের প্রধান পুরোহিত। তাঁহারা কখনও বা জ্বালাময়ী ভাষায়, কখনও বা করুণ মর্ম্মস্পর্শী ছন্দোবন্ধে উত্তেজিত করিয়াছেন, কিংবা আমাদের কোমল হৃদয়-তন্ত্রীতে আঘাত করিয়া অন্তর্নিহিত অশ্রুরাশির দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। "দিনের দিন সবে দীন হয়ে পরাধীন" নামক গানটিতে কবি দেশের আপামর জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা সুন্দরভাবে চিত্রিত করিয়াছেন।

কবি আনন্দচন্দ্র মিত্র ভারতবাসীর বর্ত্তমান প্রাণহীনতার কথা স্মরণ করিয়া ভারত-ভূষণ ভীষ্ম ভীমার্জ্জুন প্রভৃতি বীরপুঙ্গবগণের প্রেতাত্মাকে আহ্বান করিতেছেন এবং ভারত-ভাগ্যাকাশের ঘোর অন্ধকারের মধ্যে আশার ক্ষীণালোক না দেখিয়া ব্যথিত হইয়াছেন—

অজ্ঞানতা-অন্ধকারে, অধীনতা-পারাবারে
ভাসিছে ভারত ঐ, ভরসা নাহি সংসারে;
জননীর এ যাতনা, কেউ দেখেও দেখে না,
পথিক বলে সবে মোহ-নিদ্রায় মগন॥

ভারতভূমি অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন; সকলেই মোহান্ধ ও পরদ্রোহ-মত্ত। মহৎ ও ক্ষুদ্র, ধনী ও দরিদ্র সকলের মধ্যে শত্রুভাব। সুযোগ বুঝিয়া ভীষণদর্শন পিঙ্গলনয়নবিশিষ্ট ক্রূর দৈত্য ভারতবাসীর শোণিত শোষণ করিতেছে।

বিক্রমপুরের কবি গোবিন্দচন্দ্র রায়ের দুইটি গান তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। কার্য্যোপলক্ষে তিনি আগ্রানগরে বাস করিতেছিলেন। ইতিহাস-পুরাণ-প্রসিদ্ধ যমুনা-লহরী ভারতের পূর্ব্বগৌরবকাহিনী যুগযুগান্তর হইতে কুলুকুলু রবে বহন করিয়া তাঁহার সুকোমল কবি-হৃদয়কে গভীর বিষাদভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল। নির্ম্মল সলিল-বাহিনী যমুনা—গোষ্ঠরজোলাঞ্ছিত-পদ-ধৌতকারিণী যমুনা—লতা-কুঞ্জ-পরিশোভিতা বনমালি-বেণু-রব-মুখরা তটশালিনী যমুনা—যুগান্তরকারী কত ঘটনা, কত রাজ্য ও সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের অভিনয় দর্শন করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক সময় তাহার কেলি-কুঞ্জে কত আমোদ-উৎসব সংঘটিত হইয়াছিল, নন্দপুরচন্দ্রের মোহন-মুরলী-ঝঙ্কারে রাগ-রাগিণী যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া স্বভাবললাম-ভূতা ব্রজাঙ্গনাদিগকে দিব্য প্রেমোন্মাদে আকুল করিয়া তুলিত এবং তাহার নীল বারিরাশি যেন নাচিয়া গাহিয়া উজান বহিয়া যাইত। কিন্তু হায়, এখন সে নীরব, কেবলমাত্র অতীতের মর্ম্মন্তুদ কাহিনীর স্মৃতি বহন করিয়া, কৃত্রিম ঐশ্বর্য্যের ধ্বংসাবশেষ বক্ষে ধারণ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। কালের করাল-কবল সমস্ত গ্রাস করিয়াছে। যে দিন পাঠান, আফগান ও মোগলের বিপুল বাহিনী ভারতকে শৃঙ্খলে বন্ধন করিয়াছিল, সেই দিন তাহার সমস্ত গৌরব লুপ্ত—ভারত এখনও সেই শৃঙ্খল পরিধান করিয়া আছে। তিনি বলিতেছেন—

অহো! কি কু-দিবসে গ্রাসিল রাহু
মোচন হইল না আর ও।
ভাঙ্গিল চূর্ণিল, উলটি পালটি,
লুঠি নিল যা ছিল সার ও॥

প্রবল কাল সমস্ত নষ্ট করিয়া দিয়া মানুষের গর্ব্বকে উপহাস করিতেছে। ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা আরও শোচনীয়। অবসাদ-হিমে নিমজ্জিত ভারতবাসী নিজ বাসভূমিতে প্রবাসী হইয়াছে। তাহার দুঃখ-নিশায় প্রভাত নাই। তাহার অতীত গৌরবোজ্জ্বল, তাহার বর্ত্তমান দুঃখভারাক্রান্ত, তাহার ভবিষ্যৎ অন্ধতমিস্রাচ্ছন্ন। সে যে তিমিরে, সেই তিমিরে নিমগ্ন।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গ-অঙ্গ ব্যবচ্ছেদের সময় বাঙ্গালায় যে বিরাট্ আন্দোলন হয়, তাহার ফলে দেশে জাতি-বৈরতার ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকটিত হইয়াছিল। দেশাত্মবোধের ভাব এত দিন শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, কিন্তু এখন তা দেশের আপামর জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। তখন বাঙ্গালার যুবকগণ বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ স্থাপন করিয়া, বোমা ও বন্দুকের সাহায্যে বিদেশীর হস্ত হইতে দেশমাতার মুক্তিসাধন করিবেন, বিদেশী কর্ম্মচারী এবং এমন কি, স্বরাজের পরিপন্থী উচ্চ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত দেশী কর্ম্মচারীর রক্তপাত করিয়া শাসনযন্ত্র শিথিল করিয়া স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তিত করিবেন, এই দুরাশা তাঁহাদের কল্পনা অধিকার করিয়াছিল। বিদেশ হইতে বন্দুক ও কামান আমদানী করিবার ব্যবস্থা চলিতে লাগিল; ভারতের বাহিরে ইংরাজ-বিদ্বেষী জাতিগণের সহানুভূতি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা হইতে লাগিল; প্রকাশ্য রাজপথে অবাধে হত্যা চলিতে লাগিল। "যুগান্তরের" উদ্দীপনাপূর্ণ প্রবন্ধ ও কবিতা এবং ব্রহ্মবান্ধবের "সন্ধ্যা" জনসাধারণকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। এই আন্দোলনের সময় কালীপ্রসন্ন, কান্তকবি, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বহু কবি গান, কবিতা, নাটক ও প্রবন্ধের সাহায্যে দেশভক্তির প্রবাহে সমস্ত দেশ প্লাবিত করিতে লাগিলেন।

স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের স্বদেশী গান তাঁহাকে সুপরিচিত করিয়া রাখিয়াছে। বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জন করিবার জন্য তিনি দেশবাসীকে আহ্বান করিয়াছিলেন। দেশের কায করিতে প্রাণপাত করিলেও তাহা সার্থক। লাল টুপী বা কালো কোর্ত্তা, জুজুর ভয় আর চলিবে না। মোহ-নিদ্রার আবেশে অচেতন বাঙ্গালী তাহার নিজ অবস্থা, তাহার স্বরূপভাব বুঝিয়া দেখুক। জীবনধারণোপযোগী সহজলভ্য অথচ খাঁটি জিনিষ ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালী পাশ্চাত্য সভ্যতার আপাত-মনোরম চাক্‌চিক্যে মোহিত হইয়া গিয়াছে। সে নিজের মরাই শূন্য করিয়া বিদেশে খাদ্যদ্রব্য রপ্তানী করে—তাহার গাভী দুগ্ধহীনা—বিলাতী জমাট দুগ্ধ ব্যতিরেকে তাহার রোগী ও বালক পথ্য পায় না—গো-শূকর-শোণিত-রক্তে পরিষ্কৃত শর্করা ও লবণ ব্যতীত তাহার জিহ্বার তৃপ্তিসাধন হয় না। কাব্যবিশারদ সোজা কথায় বাঙ্গালীকে তাহার বর্ত্তমান অবস্থা বুঝাইয়া আর্থিক উন্নতি করিতে তাহার মনোযোগ আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। কাব্য-বিশারদের "এস, দেশের অভাব ঘুচাও দেশে" শীর্ষক গানটিতে দেশবাসীকে বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জন করিতে বলিতেছেন :—

নিজের বলে হও না বলী,
　　আস্‌বে আর কোন্ সাহসে
যখন ঘরের পেলে, কার্য্য চলে
　　কেন যাবে পরের পাশে॥

ঈশ্বর গুপ্তের ন্যায় কাব্যবিশারদ নিজের দেশের কুকুরকেও মাথায় লইতে বলিতেছেন :—

ঘরে, নাইকো আহার,　　বেশের বাহার,
　　যাহার তাহার ঘাটে পথে।
হায় রে নিজের দেশে,　　যায় না অভাব,
　　অশন বসন সব বিলাতে।
ছেড়ে পরের ঠাকুর,　　ঘরের কুকুর,
　　ইচ্ছা করে মাথায় নিতে।

স্বদেশপ্রেমের স্নিগ্ধ-ধারা তাঁহার হৃদয়-মরুপ্রান্তরে শুষ্ক আশালতাকে মুঞ্জরিত করিয়াছিল। তিনি এই জন্য বলিতে-ছেন—

এবার, মন্ত্রসাধন, করেছি পণ,
　　ছাড়বো না তা প্রাণবিয়োগে,
প্রাণে যখন আবেগ আসে,
　　শত্রুভাবে "হুজুগ চাগে"।
বিশারদ কয়, সেই ত সময়,
　　কার্য্য সার সেই সুযোগে॥

কাব্যবিশারদের অকৃত্রিম স্বদেশপ্রীতি ও স্বজাতিবাৎসল্য, বিদেশী পণ্যবর্জ্জনে তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টা, গোলামী ও ভিক্ষার প্রতি তীব্র ঘৃণা এবং স্বদেশের ভাবী উন্নতির আশা, তাঁহার তেজস্বিতা ও অকপট ভাব প্রকাশ করে।

অশ্বিনীকুমার দত্তের কোন কোন গানে এই আশার বাণী শুনিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে যদিও ভারতের মান, বিভব, কৃষি ও বাণিজ্যগৌরব ছিল—যদিও ভারত এখন ভাগ্যহীনা, দ্বারে দ্বারে ভিখারিণী, তথাপি—

হেথা হোথা ছুটি, ঘুরি নানাস্থান,
ইংলণ্ড জার্ম্মাণ মার্কিণ জাপান,
শিখি নানাবিধ শিল্প-বিজ্ঞান,
আনিব জীবন নবীন,　　আবার ফিরিবে গো দিন॥

জনসাধারণের মধ্যে ত ঐক্য নাই, যাহাদিগকে আমরা বড়লোক বলি, তাহাদের মধ্যেও সেই ঐক্যের অভাব।

স্বদেশী যুগে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রসিদ্ধ গান "মিলে সব ভারত-সন্তান" বহু সভায় শত শত কণ্ঠে গীত হইয়াছিল। সুকবি প্রমথনাথ রায় চৌধুরীর গান "নমঃ বঙ্গভূমি শ্যামাঙ্গিনী" বঙ্গদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিতেছে।

তখন বিলাতী পণ্য বর্জ্জনের দিন। বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জন করিতে গিয়া ইংরাজের প্রতি উৎকট বৈরভাব আসিয়া পড়িয়াছিল। দেশের গ্রামে গ্রামে বক্তৃগণ লোকমত গঠন করিতে লাগিলেন। রুসিয়ার নিহিলিষ্টগণের আদর্শে গুপ্তদল গঠিত হইতে লাগিল। ম্যাট্‌সিনী, গ্যারিবল্ডী, ওয়ালেস্, রাণা প্রতাপ, শিবাজী প্রভৃতি মহাপুরুষগণের জীবনী পঠিত হইতে লাগিল। সময়োপযোগী করিয়া গীতার নূতন ব্যাখ্যা হইতে লাগিল। তরুণবয়স্ক যুবকগণ বোমা ও গোলাগুলী-সাহায্যে প্রবল পরাক্রান্ত ইংরাজরাজকে ভারত হইতে তাড়াইয়া দিবার অসার কল্পনা করিতে লাগিলেন। "মা'ই আমাদের রাজা, মা'ই আমাদের রাণী, আমরা আর কারেও না জানি", "এস সুদর্শনধারী মুরারে" প্রভৃতি বহু উদ্দীপনা-পূর্ণ গান রচিত হইয়া শত শত যুবককণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া আকাশ প্রকম্পিত করিতে লাগিল। বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দে মাতরম্" গান জাতীয় সমর-সঙ্গীতে পরিণত হইল। গিরিশ-চন্দ্রের "সিরাজদ্দৌলা" "মীরকাশিম" প্রভৃতি নাটক রঙ্গালয়ে অভিনীত হইয়া সহস্র সহস্র দর্শকের মনে নূতন ভাবের উদ্রেক করিতে লাগিল। স্বদেশ-প্রেমের প্রবল বন্যা রঙ্গালয়ে জনসাধারণকে প্লাবিত করিতে লাগিল। এই বিরাট্ আন্দোলনের সময় কান্তকবি রজনীকান্ত বাঙ্গালীকে তাহার ঘরের দিকে লক্ষ্য করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। তিনি সাময়িক উত্তেজনায় বিচলিত না হইয়া তাঁহার শান্ত-মধুর সঙ্গীতে দেশবাসীকে আনন্দ দান করিতেছিলেন। হিন্দু-মুসলমানকে জাতীয়তার সূত্রে আবদ্ধ হইতে আহ্বান করিয়া জন্মভূমির নয়নের জল মুছিয়া দিতে তিনি বলিতেছেন,—

আয় ছুটে ভাই, হিন্দু-মুসলমান।
ঐ দেখ ঝরছে মায়ের দুনয়ান।
আজ, এক ক'রে দে সন্ধ্যা-নমাজ,
মিশিয়ে দে আজ, বেদ-কোরাণ।

দুঃখিনী মায়ের সন্তান বাঙ্গালী "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়" মাথায় তুলিয়া লইয়া লজ্জা নিবারণ করুক।

তাই ভালো মোদের
মায়ের ঘরের শুধু-ভাত ;
মায়ের ঘরের ঘি সৈন্ধব

মা'র বাগানের কলার পাতে ঢালিয়া জঠর-জ্বালা নিবারণ করুক। ইহাই তাহার আত্মমর্য্যাদা ও আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবে। কারণ—

ভিক্ষার চালে কায নাই—সে বড় অপমান ;
মোটা হোক্—সে সোণা মোদের মায়ের ক্ষেতের ধান।

* * * * *

ও ভাই চাষী, ও ভাই তাঁতী, আজকে সুপ্রভাত
কসে লাঙ্গল ধর ভাই রে, ক'সে চালাও তাঁত,
কসে চালাও ঘরের তাঁত।

যদিও "আমরা নেহাৎ গরীব, আমরা নেহাৎ ছোট—
তবু আছি সাত কোটি ভাই— জেগে ওঠ!

ঘরে তাঁত জুড়িয়া দে, দোকান সাজিয়ে ফেল, গোলার ধান বিদেশে যাইতে দিস্ না, মোটা খাও, মোটা পর, ল্যাভেণ্ডার অটোতে কায নাই, এমন সুদিন হারাইও না, এমন সুবাতাস ছাড়িও না, জাতীয় উন্নতির তরীখানি জোয়ারে ছাড়িয়া দাও—"স্বদেশের ধূলি, স্বর্ণরেণু বলি" মাথায় তুলিয়া লও, সেখানকার সলিলে মন্দাকিনী প্রবাহিত হয়—তথাকার "অনিলে মলয় সদা বহমান"—নন্দনকাননের অতুলনীয় সৌন্দর্য্য ইহার নিকট ম্লান হইয়া যায়।

রজনীকান্ত বাঙ্গালাকে ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখেন নাই। তিনি 'যমুনা-সরস্বতী গঙ্গা বিরাজিত', 'সিন্ধু-গোদাবরী-মাল্য বিলম্বিত', 'ধূর্জ্জটি-বাঞ্ছিত হিমাদ্রি-মণ্ডিত', 'রাম-যুধিষ্ঠির-ভূপ-অলঙ্কৃত', 'অর্জ্জুন-ভীষ্ম-শরাসন-টঙ্কৃত', বিশাল ভারতভূমির অতীত গৌরবকাহিনী গাহিবার সময় স্বীয় শক্তির অভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন—কারণ, সেখানে এক সময় "গভীর ওঙ্কারে সাম-ঝঙ্কারে কাঁপিত দূর বিমান।" রজনীকান্তের দেশাত্মবোধের বিশেষত্ব শুধু সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা দোয়েল-শ্যামা-পিকবরমুখরিত বাঙ্গালাকে ভালবাসিয়া নহে, তিনি হিমাদ্রি-কিরীটী সাগর-মেখলা ভারতমাতার বিজয়িনী মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন এবং

হৃদয়ের অন্তরতম প্রকোষ্ঠে তাঁহাকে ভক্তিভরে পূজা করিয়াছিলেন।

যিনি মাতৃভাবের 'মোহন-মূরতি'কে স্বদেশভক্তির মন্দাকিনীজলে স্নাত করিয়াছেন, যিনি ব্যঙ্গ-কবিতায়, নাটকে, সঙ্গীতে বাঙ্গালী জাতির দেশাত্মবোধ উদ্বোধিত করিয়াছিলেন, যিনি স্বদেশকে "সকল দেশের রাণী সে যে মোদের জন্মভূমি" বলিয়া "এই দেশেতে জন্ম আমার এই দেশেতে মরি" এইরূপ আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই দ্বিজেন্দ্রলালের অগ্নিগর্ভ কবিতা ও গানের ঝঙ্কার এখনও আমাদের কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। স্বদেশপ্রেমিক নিজ সমাজের দূষণীয় আচার-ব্যবহার "প্রেমের উচ্ছ্বসিত ধারায়" ধৌত করিতে সমর্থ বটে, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল তাহাকে যথার্থ স্বদেশহিতৈষণা বলিতেন না। তাঁহার পক্ষে উহা ছিল সঙ্কীর্ণতা। সামাজিক ব্যাধি খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, যদি প্রয়োজন হয়, অস্ত্রোপচার করিতে হইবে, উপযুক্ত ঔষধ প্রলেপ দ্বারা ক্ষতস্থান আরোগ্য করিতে হইবে। ইহাতে সমাজের মঙ্গল হইবে, জাতি উন্নত হইবে। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি নিদ্রিত অচেতন সমাজকে কখনও কশাঘাত করিয়াছিলেন, আবার কখনও বা তীব্রভাষায় তাহার নিন্দাবাদ করিয়াছিলেন। তিনি 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে দেখাইয়াছেন যে, অপর জাতিকে বঞ্চিত করিয়া ব্রাহ্মণ সমস্ত বিদ্যাবুদ্ধি ও ক্ষমতা আত্মসাৎ করিয়াছিল। সমাজের ঊর্দ্ধতন অংশ স্ফীত ও গুরুভার হইয়াছিল। ব্রাহ্মণের অধঃপতনের মূল কারণ এইখানে— তাহার নেতৃত্ব হারাইবার গোড়ার কথা এই। 'অচলায়তন' হিন্দু সমাজের দোষ ও সঙ্কীর্ণতা—তিনি দেখাইয়াছেন তাঁহার 'নুরজাহান' নাটকে। আবার তিনি 'প্রতাপসিংহ' নাটকে দেখাইয়াছেন যে, আভিজাত্যের গণ্ডী অতিক্রম করিতে হইবে—ক্ষুদ্র রাজ্যের সঙ্কীর্ণ প্রাচীর পার হইতে হইবে—বৃহত্তর দেশকে ভালবাসিতে হইবে। নতুবা প্রতাপের ন্যায় মহাবীরেরও দেশপ্রাণতা বিফল হয়। 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে সেকেন্দারের মুখ দিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল দেশমাতার অপরূপ সৌন্দর্য্যের কথা শুনাইয়াছেন। এই দেশে দিনে প্রচণ্ড সূর্য্য গাঢ় নীল আকাশে অগ্নিবর্ষণ করে, তামসী রাত্রিতে নক্ষত্রপুঞ্জ চক্ষু ঝলসাইয়া দেয়—প্রাবৃটে তথায় ঘনকৃষ্ণ মেঘরাশি গুরুগম্ভীর গর্জ্জনে আকাশ ছাইয়া দেয়—যেথানে "অভ্রভেদী ধবল তুষারমৌলি নীলহিমাদ্রি" দণ্ডায়মান আছে—বিশাল নদনদী ফেনিল উচ্ছ্বাসে উদ্দাম-বেগে সাগরের দিকে ছুটিতেছে—সেই দেশ কত মহান্! কত সুন্দর! কত মহিমময়! দেশপ্রাণতার যে অমৃতরস বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয় মহাসঙ্গীতে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহা দ্বিজেন্দ্রলালের "আমার দেশ" শীর্ষক গানে পরিণতি লাভ করিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলাল সত্য সত্যই দেশকে ভালবাসিতেন, দেশের জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিত। ইহা তাঁহার অমৃতনিস্যন্দী স্বদেশী গানে পরিস্ফুট। জাতিকে বড় করিতে হইলে হৃদয়কে উদার করিতে হইবে, সঙ্কীর্ণতা দূর করিতে হইবে। তিনি বলিয়াছেন—জাতীয় উন্নতির পথ শোণিত-প্রবাহের মধ্য দিয়া নহে—জাতীয় উন্নতির পথ আলিঙ্গনের মধ্য দিয়া, বিদ্বেষ বর্জ্জন করিয়া—নিজের কালিমা, দেশের কালিমা বিশ্বপ্রেমে ধৌত করিয়া দিয়া।

কিসের শোক করিস ভাই ?— আবার তোরা মানুষ হ'।
গিয়েছে দেশ দুঃখ নাই—আবার তোরা মানুষ হ'॥
ভুলিয়ে যা রে আত্মপর, পরকে নিয়ে আপন কর,
বিশ্ব তোর নিজের ঘর, আবার তোরা মানুষ হ'॥

'মেবার-পতন' নাটকে কবি দেখাইয়াছেন, জাতীয় প্রেম হইতে বিশ্বপ্রেম গরীয়সী। স্বর্গীয় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন—"হাসির গানে বাঙ্গালী জাতির প্রতি মমত্ববোধের প্রথম বিকাশ হইয়াছে, সে মমত্ববোধ 'আমার দেশ' ও 'আমার জন্মভূমি' এই দুইটি গানে পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে। এই মমত্ববোধের স্ফুরণ দেশাত্মবোধে; 'দুর্গাদাস' ও 'রাণা প্রতাপ' নাটকে এই দেশাত্মবোধ ষোল-কলায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'নুরজাহান', 'সাহাজান' প্রভৃতি নাটকে জগদ্ব্যাপিনী প্রীতির সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। * * * প্রীতির এই জগন্ময়তাকে আত্মময়রূপে প্রকাশ করিয়া বুঝাইবার অবসর দ্বিজেন্দ্রলালের হয় নাই।"

বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জনকে স্বদেশপ্রেমের প্রতিকূল বলিয়া তাহা তিনি অনুমোদন করেন নাই। যদি দেশবাসী বিজাতি-বিদ্বেষ ভুলিয়া কল্যাণের পথে ধাবিত হয়, অন্ধ বিদ্বেষের বশবর্ত্তী না হইয়া নিজ উন্নতির দিকে লক্ষ্য করে, তাহা হইলে তাহাদের উদ্ধার হইবে, নতুবা নহে। বৃথা গর্ব্ব ও আস্ফালন জাতীয় উন্নতির পরিপন্থী। দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশ-প্রীতি কোন জাতির প্রতি ঘৃণার উদ্রেক করে না। তাঁহার

দেশভক্তি মৈত্রী ও করুণার উৎসে উচ্ছ্বসিত। ইহাই তাঁহার বিশেষত্ব—ইহাই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। এই আদর্শ স্বদেশ-প্রেমসাধনা তাঁহার জীবনের পরম লক্ষ্য ছিল। তাঁহার সেই সাধনা সফল হইয়াছে। আজ বাঙ্গালার হাটে ঘাটে মাঠে, নিভৃত দূর পল্লীতে ও বিদ্যুতালোকশোভিত প্রাসাদে, মহানগরীর রাজপথে, তাঁহার উদ্দীপনাপূর্ণ স্বদেশী গান গীত হইতেছে। বিদ্রোহের যে ভীম ভৈরব নাদ হেমচন্দ্রের ভেরীতে বাজিয়া উঠিয়াছিল, তাহা নবীনচন্দ্রের খণ্ড ভারতে ধর্ম্মরাজ্যস্থাপনরূপ আদর্শের মহামন্ত্রে পূত হইয়া দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে ও গানে জগদ্ব্যাপিনী প্রীতির আভাসে পর্য্যবসিত হইয়াছে। আমরা দেখিব, এই বিশ্ব-প্রীতির সুস্পষ্টপ্রকাশ, বিশ্বজনীনতার পূর্ণ অভিব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের স্বাভাবিক ধীর, সংযত ও উচ্চতম কবিস্বপ্নময় কবিতার মধ্যে।

এখন আমরা কবিবর রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধের উল্লেখ করিব। যখন সমগ্র বাঙ্গালা দেশভক্তির তরঙ্গে উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল, তখন রবীন্দ্রনাথের ভাবপ্রবণ কবিহৃদয় নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে নাই। এক্ষণে যদিও রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধ বিশ্বপ্রেমে পরিণতি লাভ করিয়াছে, কিন্তু তাঁহার যৌবনে যে মনের অবস্থা দেশাত্মবোধে মশগুল ছিল, তাহা তাঁহার তখনকার অতুলনীয় কবিতাগুলি হইতেই বুঝা যায়। দেশবাসীর হৃদয়ে দেশপ্রাণতা জাগাইয়া তুলিবার জন্য তিনি ভারতের অতীত ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল পৃষ্ঠার উপকরণ সংগ্রহ করিতেছিলেন। তিনি শিখবীরের আত্ম-ত্যাগের কথা শুনাইলেন শিবাজীর মহাপ্রাণতার উল্লেখ করিয়া ভারতের সনাতন রাজধর্ম্মের পরিচয় দিলেন। স্বদেশ-বাসীর উদাসীনতা ও নিশ্চেষ্টতা দর্শন করিয়া কবি গভীর দুঃখে বলিয়াছেন—

কে জাগিবে আজ, কে করিবে কাজ,
কে ঘুচাতে চাহে জননীর লাজ,
কাতরে কাঁদিবে, মায়ের পায়ে দিবে
সকল প্রাণের কামনা।

এমন একদিন ছিল, যখন ভারতলক্ষ্মীর ক্রোড়ে বসিয়া বাল্মীকি পুণ্য রামায়ণ গান গাহিয়াছিলেন, সেই গানের ঝঙ্কারে সমস্ত বিশ্ব রোমাঞ্চিত ও পুলকিত হইয়াছিল, তখন মায়ের অশ্রুবিন্দু মুছাইয়া দিতে তাঁহার সন্তানগণ হৃদয়ের রক্ত ঢালিয়া দিতে কুণ্ঠিত হইত না, কিন্তু তিনি আজ অভাগিনী, আজ অনাথা।

রবীন্দ্রনাথ ভারতমাতার নির্ম্মল সূর্য্যকরোজ্জ্বল ভুবন-মোহিনী মূর্ত্তি কল্পনা নয়নে দেখিয়া দেশবাসীকে তাঁহার বন-ভবনে "প্রথম প্রচারিত জ্ঞানধর্ম্ম কত পুণ্যকাহিনী"র কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। তাহা হইলেও বাঙ্গালার নয়নাভিরাম শোভাসম্পৎ তিনি ভুলিয়া যান নাই। বাঙ্গালার আকাশ, বাঙ্গালার বাতাস তাঁহার প্রাণে বাঁশী বাজায়, ফাল্গুনে আমের বনের সুন্দর আঘ্রাণ তাঁহার মন পাগল করে, আশ্বিনে বাঙ্গালার ভরাক্ষেতে তিনি কি সুন্দর মধুর হাসি দেখিতে পান। আবার সেই "সাম-গান-নিনাদিত জাহ্নবী-যমুনা-বিগলিত-করুণা" মাতার করাল ভীমমূর্ত্তি তিনি ভীতি-বিহ্বল-হৃদয়ে দর্শন করেন। তাঁহার এক হস্তে অসি, অপর হস্ত অভয় প্রদান করিতেছে। এই মূর্ত্তি যেন আলো ও ছায়া, শান্ত ও ভয়ঙ্কর, রুদ্র ও করুণ ভাবের সংমিশ্রণ। দেশবাসীর সাহস হীনতা ও দুর্ব্বলতার কথা ভাবিয়া তিনি সকলকে আগে চলিতে উপদেশ দিতেছেন। পশ্চাতে পড়িয়া থাকা বৃথা, অগ্রসর হও, কার্য্যোদ্ধার করিয়া যশোমণ্ডিত হও। আশা-ভরসাহীন উদ্যমবিহীন ভীরু মনকে আশ্বস্ত করিয়া তিনি স্বাধীনতার দিনের অতুলনীয় সৌন্দর্য্যের কথা শুনাইয়া-ছেন :—

সে দিন প্রভাতে নূতন তপন
নূতন জীবন করিবে বপন
এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন
আসিবে সে দিন আসিবে।

যথার্থ স্বদেশপ্রেম প্রাণে নূতন বল আনিয়া দেয়, ভেদ-কলহ-দ্বন্দ্ব দূর করিয়া দেয়, আত্মসম্মান জাগাইয়া তুলে।

জননীর মন্দিরে শঙ্খঘণ্টা বাজিতেছে; পূর্ব্ব গগনে জ্যোতির্ম্ময়ী ঊষার আভা দেখা যাইতেছে; নবজীবনের উন্মেষ হইতেছে; ভাইএর সঙ্গে ভাই মিলিত হইয়াছে, মায়ের দুঃখরজনী প্রভাত হইবে। স্বাধীনতার সেই শুভদিন নিশ্চ-য়ই আসিবে, কিন্তু শুধু আবেদন-নিবেদন দ্বারা তাহা আসিবে না। স্বার্থত্যাগ চাই, ভিক্ষুকের সাজ ছাড়িতে হইবে, প্রাণদান করিতে হইবে। সর্ব্বগ্রাসী আধুনিক

সভ্যতা ও নাগরিক জীবনের কৃত্রিম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পরিত্যাগ করিয়া পর্ণকুটীরে বাস করিতে হইবে। জননীর গৃহ রত্ন-রাজী পরিপূর্ণ। দেশমাতার পদতলে মনপ্রাণ সর্ব্বস্ব সঁপিয়া দিতে হইবে, বলিতে হইবে :—

নব বৎসরে করিলাম পণ, লব স্বদেশের দীক্ষা।
তব আশ্রমে, তোমার চরণে হে ভারত লব শিক্ষা॥

তাহা হইলে জাতীয় উদ্যমহীনতা বালসূর্য্যের রশ্মিপাতে রজনীর অন্ধকারের ন্যায় অপসারিত হইবে এবং দেশবাসী জাতীয়তার ভাবে অনুপ্রাণিত হইবে। জাতির অন্তর্নিহিত শক্তির প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী কবিতার প্রাণস্বরূপ। দৈন্যের মধ্যেও স্বর্গীয় মাধুর্য্যপূর্ণ বিশ্বাসের ছবি হৃদয়ে আঁকিয়া লইয়া দৃঢ়পণ করিয়া বলিতে হইবে—

অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহস-বিস্তৃত-বক্ষপট!

কিন্তু হঠাৎ যবনিকা পড়িয়া গেল। কবি দেশাত্ম-বোধের গণ্ডী হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন এবং বিশ্বপ্রেমের বস্তুতন্ত্রহীন মনোজ্ঞ আদর্শ তাঁহার কবিকল্পনায় স্থান লাভ করিল। তিনি ভুলিয়া গেলেন যে, প্রকৃত জ্ঞানীর পক্ষে জীবনিবহ এক বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও প্রাকৃত জনের নিকট দেশ, কাল ও পাত্র ভেদ চিরকালই আছে ও থাকিবে। যিনি সর্ব্বজীবে ব্রহ্মদর্শন করেন, সেইরূপ জ্ঞানীর পক্ষে বিচিত্রতাময় জগতের সত্তা নাই। বহু সাধনার ফলে তিনি সর্ব্বভূতে একত্ব দর্শন করেন। কেবল তাঁহার পক্ষেই বিশ্ব-প্রেম সম্ভব; কিন্তু একত্ব দর্শন হইলে বিভিন্নতা উপলব্ধি হইতে পারে না। তখন এক অখণ্ড একরস চৈতন্যসত্তা মাত্র বর্ত্তমান থাকেন। অতএব জ্ঞানীর পক্ষে বিশ্বপ্রেম কাঁঠালের আমসত্ত্বের ন্যায় এবং যাঁহার সেরূপ জ্ঞান হয় নাই, তাঁহার পক্ষে ইহা কেবল মুখের কথা ও আত্ম-প্রতারণা।

স্বদেশীযুগের রঙ্গমঞ্চ হইতে রবীন্দ্রনাথের অপ্রত্যাশিত অন্তর্দ্ধান এবং তাঁহার কবি-কল্পনাপ্রসূত বিশ্বপ্রেমের জয়গান বাঙ্গালার স্বাদেশিকতার বন্যার মধ্যে ভাটা আনিয়াছিল ও জাতীয় জীবনে অবসাদ সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহা বাঙ্গালার স্বদেশপ্রেমের সমাধি রচনা করিয়াছিল। অনেকে ভাবিয়া-ছিলেন যে, তিনি নূতন গানে, নূতন ছন্দে, নূতন ভাবে দেশ-মাতৃকার অর্চ্চনা করিবেন; কিন্তু বাঙ্গালা দেশের দারুণ দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা ঘটিয়া উঠে নাই।

শ্রীহরিপদ ঘোষাল।

রথ

রথের রশি ধর্‌বি কে, আয়,
ঠাকুর হ'লেন বাহির এবার;
পঞ্চপ্রদীপ বৃথাই জ্বলে,—
দেবল, তোমার দেউল আঁধার।
বাহির এবার ডাক দিয়েছে,
ভিতরে সেই ডাক গিয়েছে;
কি যে ধ্যানেই রইলে তুমি!—
মুক্ত হ'ল রুদ্ধ দুয়ার,
পাতা-আসন রইল পড়ে',
পাত্‌ল আসন পথ ও পাথার!

শয়ন ছাড়ি' ঠাকুর এবার
বাহির হ'লেন কাদায়-ঝড়ে;
আসাঢ়েরি আর্দ্র দিবস—
বাদর-বারি মাথায় পড়ে।
এবার নাহি জাতের বিচার,
ছাই শুচি-বাই—ছাইয়ের আচার;
ভাইয়ের সাথে ভাই মেলে আজ—
সেবার দাবী সমান সবার;
ঠাকুর এবার দীনের ঠাকুর,
আমরা এবার দীন-দেবতার!

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী।

৬
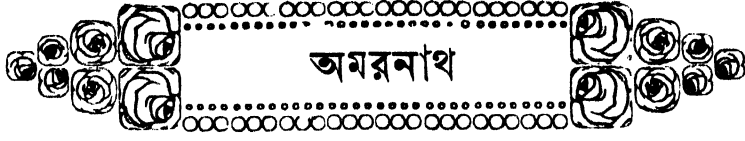
পরদিন অপরাহ্নে পশুপতি কহিলেন, "আমি এখানে একটি বাড়ী করব মনে করেছি—বেশ জায়গা। আপাততঃ একটা বাড়ী ভাড়া নিলেই চলবে। গঙ্গার ধারে কি ছোট-খাটো বাড়ী পাওয়া যায় না?"

অমর। তা পাওয়া যেতে পারে—বেড়াতে ত যাচ্ছি, অমনি দেখে আসা যাবে।

পশু। আমি তিন শ' টাকা পর্য্যন্ত ভাড়া দিতে প্রস্তুত, কিন্তু গঙ্গার ধারে হওয়া চাই।

অমর। গঙ্গার ধারের বাড়ীগুলো সাহেবরা দখল ক'রে বসেছে; পাওয়া যাবে কি না বলতে পারি না।

কৃষ্ণ। আচ্ছা অমর, তুমি ত চ'লে যাচ্ছ, তোমার এ বাড়ীটা পশুপতি বাবুকে ভাড়া দাও না কেন?

অম। এ ছোট বাড়ী ওঁর বাসের যোগ্য নয়।

পশু। এ বাড়ী পেলে ত খুব ভাল হয়, বাড়ীটি বেশ—আমার খুব পছন্দ। কিন্তু বাবা, আমি তিন শ' টাকার বেশী ভাড়া দিতে পারবো না।

অম। তিন শ' টাকা ভাড়ার উপযুক্ত এ বাড়ী নয়—আমি দু'শো টাকার বেশী নিতে পারবো না।

কৃষ্ণ। তুমি ত কখন বাড়ী ভাড়া দেও নি অমর, সুতরাং এ বাড়ীর ভাড়া কত হ'তে পারে, তা' তুমি জান না। এত বড় কম্পাউণ্ড, এমন বাগান, পাহাড়ের উপর গঙ্গার ধারে এমন সুন্দর বাড়ী কোথাও নেই। এর ভাড়া তিন শ', বড় বেশী হবে না।

পশু। আরও বেশী ভাড়া হওয়া উচিত, কিন্তু আমি তা' দিতে পারব না।

কৃষ্ণ। বাড়ীটা ভাড়া দিবার ভার যখন আমার উপর দিয়েছ, তখন আমি যা' হয় করব।

পশু। বেশ, কৃষ্ণবাবুর সঙ্গে সে কথা পরে হবে। আমি এখানে ছেলে-পিলে নিয়ে বেশ আরামে থাকব। মাসে মাসে তিন শ' টাকা কৃষ্ণ বাবুর নিকট দেব। ছ' মাসের ভাড়া আগামও দিতে পারি।

অম। এখন চলুন বেড়াতে যাই, সহর দেখবেন বলছিলেন যে—

পশু। চল।

তিন জনে উঠিলেন। ঘর হইতে নামিতে নামিতে শুনিলেন, উদ্যানমধ্যে বালক-বালিকা গাহিতেছে। উদ্যানের যে স্থান হইতে সুর আসিতেছিল, তিন জনে ঘুরিয়া সেইখানে উপস্থিত হইলেন, একটু অন্তরালে থাকিয়া শুনিলেন, লতা ও সুকু একযোগে গাহিতেছে—

"ভুবন ভূষিত সদা বক্তৃতার বশে,
শত্রু মিত্রে পরিণত রসনার রসে,
মিথ্যার কাননে কভু ভ্রমে নাহি ভ্রমে,
কদাচ প্রতিজ্ঞাভঙ্গ নহে কোন ক্রমে,
অমৃত নিঃসৃত হয় প্রতি বাক্যে যার,
মানুষ তারেই বলি মানুষ কে আর?"

পশুপতি বাবু গান শুনিতে শুনিতে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন; যষ্টি দ্বারা মৃত্তিকায় রেখাপাত করিতে লাগিলেন। সুর উঠিল—

"সতত গলায় পরে করুণার হার,
মানুষ তারেই বলি মানুষ কে আর?"

পশুপতি বাবু, অমরের পানে ফিরিয়া কহিলেন, "দেখ বাবা, আমার বাসনা, এই দু'টিকে একত্র করি। তোমার কি মত?"

অম। এরা ত এখন খুব ছোট—

পশু। ছোট হলেও কথাটা হয়ে থাকতে পারে ত। তোমরা আমাদের পাল্টি ঘর।

অম। লতা বেশ বড় না হ'লে তা'র বিয়ে দিতে আমার ইচ্ছে নেই।

পশু। বেশ; মেয়ে বড় হোক, আমি অপেক্ষা করব। তুমি এখন কথা দিলেই হ'ল।

সুর উঠিল—

"বিপন্নে দেখিবামাত্র আয় আয় ডাকে,
পরিশ্রম প্রতিজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে থাকে।"

অমরনাথ কহিলেন, "লতাকে নেবার কি আপনার এতই ইচ্ছা?"

পশু। ভাল জিনিষের লোভ লোক করে।

অম। এতই যদি তাকে ভাল ব'লে আপনার মনে হয়ে থাকে—

কৃষ্ণনাথ বাধা দিয়া কহিলেন, "বুঝে কথা দিও অমর, তোমার কথা যে আবার নড়ে না।"

অম। বোঝবার কি আছে? মেয়ের জন্য আমরা উত্তম ঘর বর খুঁজি। এমন ঘর বর কোথায় আর জুটবে, বলুন?

কৃষ্ণ। লতাকে বড় ক'রে তার বিয়ে দিতে ইচ্ছে করেছ; সে যদি বড় হয়ে আর কাউকে বিয়ে করতে চায়?

অম। সে ভাব তা'র হৃদয়ে আসবার পূর্ব্বেই বিয়ে দেব, আমি আপনাকে কথা দিলাম, পশুপতি বাবু।

পশু। বেশ, বাবা, বেশ; তুমি সুখী হও।

বলিয়া তিনি দ্রুতপদে নামিয়া লতাকে ধরিলেন এবং তাহাকে বুকে তুলিয়া লইয়া কহিলেন, "আমাদের বাড়ীতে যাবে, মা?"

লতা বুঝিতে না পারিয়া দাদার পানে চাহিল। দাদার ওষ্ঠে শুধু হাসি—বাক্য নাই। লতা কোন দিক হইতে সাহায্য না পাইয়া কহিল, "দাদা বল্‌লেই যাব।"

"তোমার দাদা বলেছেন।"

"তবে আমিও যাব।"

সুকুমার একমুখ হাসিয়া কহিল, "বাবা, আমাদের সঙ্গে লতা যাবে ত?"

পশু। তোমার কি লতাকে ভাল লাগে, সুকু?

সুকু। খুব ভাল লাগে; আমাদের খুব ভাব হয়েছে।

পশু। তোমারও ওকে ভাল লাগে, লতা?

লতা। লাগে—বেশ ছেলে; তবে লেখাপড়া কিছু শেখেনি।

অমর গম্ভীরকণ্ঠে কহিলেন, "তোমার এ কথা বলা কি উচিত হয়েছে, লতা?"

লতা। কেন দাদা, আমি ত সত্যি কথা বলেছি।

অম। সত্যি হ'লেও সকল সময়ে সকল কথা বলা উচিত নয়।

লতা। কেন দাদা? কোন্ সময়ে সত্যি বলা উচিত নয়?

অম। তোমাকে কেউ কি জিজ্ঞেস করেছিল, সুকু কেমন লেখাপড়া করে?

লতা। না।

অম। তবে তুমি উপযাচক হয়ে বলতে গেলে কেন? প্রশ্নটুকুরই উত্তর দিয়ে তোমার ক্ষান্ত থাকা উচিত ছিল; আর কোন মন্তব্য প্রকাশ করা তোমার কর্ত্তব্য হয় নি।

লতা। আমার অন্যায় হয়েছে, আর করব না, দাদা।

অম। আর যে তোমার চেয়ে সকল বিষয়ে বড়—বড় হো'ক বা না হো'ক, কোন লোকের সম্বন্ধে অযাচিতভাবে কোন মন্তব্য প্রকাশ করা অন্যায়। তুমি ছোট, বুড়োর মত এই রকম কথা বললে লোকে তোমাকে জেঠা মেয়ে বলবে।

লতা। কি জানি দাদা, আমার মনে যা আসে, তা' আমি টপ্ ক'রে ব'লে ফেলি।

সকলে হাসিয়া উঠিলেন। অমর না হাসিয়া কহিলেন, "যখন কোন কথা বলবার ইচ্ছে হবে, তখন সহসা কিছু বলবে না; আগে একটু ভেবে দেখবে, তোমার বলা উচিত কি না, তোমার মন তোমাকে ঠিক ব'লে দেবে, কোন্ কথাটা বলা উচিত, কোন্ কথাটা বলা অনুচিত। সন্দেহস্থলে কথাটা না বলাই ভাল।"

লতা। আচ্ছা দাদা, এবার থেকে তাই করতে চেষ্টা করব; আমার ভুল হ'লে ব'লে দিও।

পশুপতিনাথ লতার মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন, "তোমার মা, যখন যা মনে আসবে, তখন তা' এ বুড়োকে বোলো, কোন সঙ্কোচ করো না। যাও, এখন তোমরা গান করগে, আমরা বেড়াতে যাই।"

বালক-বালিকা প্রস্থান করিল। পশুপতিনাথ চলিতে চলিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার সে কথাটার আজও কোন জবাব দিলে না ত, বাবা!"

অম। কোন্ কথাটার, আজ্ঞা করুন।

পশু। তোমার বাবার অংশের টাকাটা—

অম। ক্ষমা করবেন, আমি তা নিতে পারব না।

কৃষ্ণ। অমর, তুমি ভুল করছ; পাওনা না থাকলে এতগুলো টাকা কেউ কাউকে সখ্ ক'রে দিতে আসে না।

অম। দিতে আসে, যার মন বড়। আমি পশুপতি বাবুকে চিনেছি; তাঁর দান গ্রহণ করতে পারব না—তুমি আমাকে আর অনুরোধ ক'র না।

কৃষ্ণ। না হয় ওঁর কাছে কিছু কর্জ্জ নেও।

অম। তাও আমি নিতে পারব না।

কৃষ্ণ। কেন ?

অম। এ কথার আমি কোন উত্তর দিতে পারব না, ভাই। আমি জানি, অন্য লোকের নিকট এখনই আমাকে কর্জ্জ নিতে হবে, তবু আমি পশুপতি বাবুর নিকট হ'তে কিছু নিতে পারব না।

পশু। তা হ'লে দেখছি এ টাকাটা নিয়ে আমাকে কিছু মুস্কিলে পড়তে হ'ল।

অম। আপনি দয়া ক'রে এ প্রসঙ্গ আর উত্থাপন করবেন না; আমি দরিদ্র বটে, কিন্তু ভিখারী নই।

পশুপতিনাথ নিরুত্তর রহিলেন।

উত্তরপাড়ার হরনাথ মুখোপাধ্যায় হুগলী জিলায় অনেকের নিকট পরিচিত। তিনি বুড়া মানুষ, কোন কায-কর্ম্ম করেন না—জমীদারী আছে, তাহাতে সংসার সুখে-স্বচ্ছন্দে চলিয়া যায়। পৈতৃক বাস্তু খুব বড় না হইলেও হরনাথ বাবুর বৃহৎ সংসারের কোনরূপ অসুবিধা বা অসঙ্কুলান হয় না। পুত্র তিনটি; জ্যেষ্ঠ পুত্র মতিলাল হাওড়ায় ওকালতি করেন, মধ্যম শঙ্কর একটা সদাগর আফিসের মুৎসদ্দি; কনিষ্ঠ কি করিবেন, তাহা এখনও স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই; এখন শুধু টপ্পাই গাহিতেছেন।

হরনাথ বাবুর বয়স ৬০ বৎসর হইলেও তিনি আজও বেশ হৃষ্টপুষ্ট। কীর্ত্তন গাইতে, খোল বাজাইতে, সময়মত নাচিতে তিনি সম্পূর্ণ সমর্থ। সাধারণ লোক বলিত, তিনি এক জন পাকা বৈষ্ণব। যাঁহারা লোকের ত্রুটি ধরিয়া বেড়ান, তাঁহারা হরনাথের অনেক ত্রুটি দেখিতেন। তাঁহারা বলিতেন, হরনাথের শিখা সূক্ষ্ম—গোপুচ্ছের ন্যায় মোটা নয়; হরনাথের অঙ্গে প্রচুর পরিমাণে নামের ছাপ থাকে না; তাঁহার কণ্ঠে তুলসীমালার সংখ্যাও যথেষ্ট নয়। এই সব সমালোচক অবগত ছিলেন না যে, হরনাথের এক মনিব ছিলেন, আর সেই মনিবের মতে তাঁহাকে অনেক সময় চলিতে হইত; নতুবা সংসারে অশান্তি কলহ লাগিয়া থাকিত। এই মনিব হইতেছেন সংসারের কর্ত্রী, গৃহের গৃহিণী, হরনাথের অর্দ্ধাঙ্গিনী—নাম পার্ব্বতী দেবী।

একদা অপরাহ্নে হরনাথ তাঁহার শয়নকক্ষে মেঝেতে বসিয়া মালা-জপ করিতেছিলেন; সহসা পার্ব্বতী দেবী ঝড়বেগে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "তোমার মালা রাখ, সকল সময় ভাল লাগে না।"

হর। কি বলবে বল না।

পার্ব্ব। তুমি ত কিছু দেখবে না, আমি কোন্ দিক সামলাই বল।

হর। তোমাকে কিছুই সামলাতে হবে না; যিনি সামলাবার একমাত্র কর্ত্তা, তিনি সামলাবেন।

পার্ব্ব। ও সব বাজে কথা রেখে দেও। এই যে বামুন-ঠাকুর ছেড়ে গেছে, তোমার কেষ্টঠাকুর এসে রেঁধে দিন্ দেখি।

হর। কোন্ প্রাণে তুমি এ কথা বল্লে, পার্ব্বতি ?

পার্ব্ব। নেও আর ফোঁপাতে হবে না; তোমার কেষ্টঠাকুরের যা মোরদ, তা জানা গেছে। কত মাথা খুঁড়লুম, কত তুলসীতলার মাটী বড় বউমাকে খাওয়ালুম, বলি, মতির একটি ছেলে দেও। কেষ্টঠাকুর তা পারেন না, কেবল গণ্ডায় গণ্ডায় মেয়ে দিতে পারেন।

হর। তুমি এ সব তুচ্ছ বিষয় তাঁর কাছে কি ব'লে চাইলে ?

পার্ব্ব। চাইব না ত কি? তিনি কি জন্যে ঘরে আছেন? শুধু পূজো নিতে? কাক-পক্ষী উঠতে না উঠতে ননী-মাখন আরম্ভ হ'ল, সমস্ত দিন ধ'রে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ভোগ চলতে লাগল, রাতে লুচি-মোণ্ডা খেয়ে একটু বিশ্রাম নিলেন। এত যে আমরা সেবা করছি, খাওয়াচ্ছি, তা তিনি কি আমাদের জন্যে কিছু করবেন না ?

হর। হা কৃষ্ণ, অবলাকে ক্ষমা কর—

পার্ব্ব। আর কাঁদতে হবে না, ঢের হয়েছে! আমার কি কম জ্বালা! সোয়ামীর কাছেও দুটো কথা বলবার যো নেই, অমনই উনি নাক ঝাড়তে লাগলেন।

হর। আমার একটা অনুরোধ রক্ষা কর পার্ব্বতি,—কৃষ্ণের কাছে কখন কিছু চেও না।

পার্ব্ব। কেন, শুনি ?

হর। তুমি যা চাও, তিনি তা দিতে না পারলে, তাঁর প্রাণে বড় ব্যথা লাগে।

পার্ব্ব। লাগে লাগুক, তিনি আমাকে বড় সুখ দিচ্ছেন কি না!

হর। তুমি যেটাকে সুখ মনে করছ, সেটা সুখ নয়—দুঃখ; আর যেটাকে দুঃখ মনে করছ, সেটা সুখ।

পার্ব্বতী। থামো, আর ভণ্ডামী করতে হবে না। যখন বেদনায় ছট্‌ফট্ করছিলে, তখন বদ্যি এনে দেখালে কেন? বদ্যি তোমার ছট্‌ফটানীর সুখটুকু নষ্ট ক'রে দিয়ে গেল দিলে; আমি এমন জান্‌লে বদ্যিকে ওষুদ দিতে দিতাম না।

হর। কি বলব পার্ব্বতি, রোগে বিপদে কত সুখ। রোগে প'ড়ে আমি যন্ত্রণায় কাতর হয়ে কাঁদতাম না, তাঁর দয়া স্মরণ ক'রে কাঁদতাম। মনে হ'ত, রোগ দিয়ে দয়াল আমাকে স্মরণ করেছেন।

পার্ব্বতী। আচ্ছা, এবার যখন দয়াল তোমাকে স্মরণ করবেন, তখন আর বদ্যি আনতে দিচ্ছি নে। কেন মিছে পয়সা খরচ ক'রে তোমার সুখ নষ্ট করি? আমি ত আর তোমার শত্রু নই। এখন যা বলতে এসেছিলাম শোন—

হর। বল।

পার্ব্বতী। চন্দননগর হ'তে হিরণ এক চিঠি লিখেছে—শুনছ?—না কেষ্ট কেষ্ট করছ?

হর। শুনছি বই কি। দাদা আমার ভাল আছে?

পার্ব্বতী। নরু ত ভাল আছে, কিন্তু এ দিকে যে তোমার মেয়ের কপাল পুড়তে বসেছে।

হর। কেন?

পার্ব্বতী। জামাই না কি রাজমহল হ'তে এক মেয়ে আন্‌তে গেছে; তাকে না কি ঘরে রেখে হিরণকে বিদেয় করবে।

হর। ছি ছি, এ সব কথা মনেও ঠাঁই দিও না। আমি কৃষ্ণনাথকে চিনি, সে এ রকম ছেলে নয়।

পার্ব্বতী। তুমি ত বল্লে কেষ্ট এ রকম ছেলে নয়, এখন হিরণ যে লিখেছে।

হর। দেখ, তোমার মেয়ের চেয়ে জামাই অনেক ভাল।

পার্ব্বতী। তার নাম কেষ্ট কি না, অমনই তোমার ভাব এসে গেল! এখন মেয়ে যে চ'লে আসতে চায়, তা'র কি করি বল?

হর। না, তা'র চ'লে আসা হবে না।

পার্ব্বতী। তাই ব'লে লাথি-ঝাঁটা খেয়ে তাকে প'ড়ে থাকতে হবে না কি?

হর। আগে দেখ না কেন লাথি ঝাঁটা—

এমন সময় দ্বিতীয়া কন্যা শোভাময়ী আসিয়া কহিলেন, "দিদিকে আন্‌তে কে যাচ্ছে, বাবা?"

হর। কেউ না।

শোভা। ওমা! দিদি কি তবে একা আস্‌বে?

হর। তোমার দিদি এখন আসবে না।

শোভা। সে কি! দিদি কি তবে সেখানে ব'সে ব'সে মার খাবে?

হর। তোমরা এখন ওঠ—সন্ধ্যে হয়ে এল, আমার কায আছে।

পার্ব্বতী। তোমার কায ত খোল ঘাড়ে ক'রে চেঁচান? ছেলেগুলো রাতে ঘুমুতে পায় না, আঁৎকে ওঠে, শোভির ছেলেটার ত জর ছাড়ছেই না।

শোভা। বামুন ঠাকুর সে দিন বলছিল, তরকারিতে নুণ হবে না কেন, চেঁচানির জ্বালায় মাথা কি ঠিক থাকে!

তৃতীয়া কন্যা রূপময়ী আসিয়া কহিলেন, "হ্যাঁ বাবা, দিদি নাকি মার খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে?"

হর। তোমার গর্ভধারিণীকে সে কথা জিজ্ঞেস কর।

কনিষ্ঠা কন্যা জ্যোতির্ম্ময়ী আসিয়া কহিলেন, "সন্ধ্যে হয়ে এল যে বাবা, আরতি করবে কখন?"

হর। এই যে, যাই মা, সব যোগাড় করেছ?

জ্যোতি। আজ সকাল সকাল সব ঠিক ক'রে ফেলেছি। শুনলুম তুমি চানের ঘরে এখনও যাও নি, তাই ছুটে এখানে এলুম—যাও চান করগে।

শোভা। সুয়ো মেয়ে এলেন বাপের খোসামোদ করতে।

হর। ও ত আমার সুয়ো বটেই; মন্মী আমাকে ভাগবত শোনায়, আমার গোপীনাথের কত সেবা করে—

শোভা। সুয়ো যদি, তবে ওর বিয়ে দিচ্ছ না কেন? তের বছরের ধাড়ি হ'ল যে।

হর। বিয়ে দেবার মালিক আমি নই, কৃষ্ণ যখন বিয়ে দেবেন, তখন ওর বিয়ে হবে। আমি আশীর্ব্বাদ করছি, ওর খুব ভাল বর হবে।

শোভা। আর আমাদের বুঝি শাপ দিচ্ছ?

জ্যোতির্ম্ময়ী পিতার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল। বুড়া যাইতে যাইতে মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, "ভ্যালা জপ

করতে বসেছিলাম! জপ ত হ'লই না—কৃষ্ণ, তোমার ইচ্ছা!"

চন্দননগরে আসিয়া লতা বড় মুস্কিলে পড়িল। সব নূতন লোক, নূতন দৃশ্য। একে দাদার জন্য প্রাণ কাঁদিতেছিল,তাহার উপর স্বল্প পরিচিত লোকের মধ্যে প'ড়িয়া তাহার প্রাণ হাহাকার করিয়া উঠিল। কৃষ্ণনাথ সর্ব্বদা তাহাকে কাছে কাছে রাখিয়া ভুলাইতে চেষ্টা করিতেন। গঙ্গার ধারে মাঝে মাঝে তাহাকে লইয়া বেড়াইতে যাইতেন, কথন কথন নৌকায় উঠিতেন; কিন্তু লতার মন দাদার বিচ্ছেদে সতত কাতর থাকিত। আগে সে কত কথা বলিত, এথন কয়টা কথাই বা সে বলে! সদা প্রফুল্লময়ী এক্ষণে বিষাদময়ী। কৃষ্ণনাথ চিন্তিত হইলেন। নরেনকে স্কুলে না পাঠাইয়া তাহাকে বাড়ীতে লতার কাছে রাখিয়া দিলেন। নরু কলের জাহাজ দেখাইল, লতা ভুলিল না। তাহার জন্য কৃষ্ণনাথ কলের গাড়ী, কলের পাখী, বেলুন প্রভৃতি কিনিয়া আনিলেন; লতা খেলনাগুলি লইয়া একটু নাড়াচাড়া করিল, কিন্তু বিশেষ আগ্রহের সহিত খেলা করিল না। কৃষ্ণনাথ তাহাকে কলিকাতায় লইয়া গিয়া যাদুঘর চিড়িয়াথানা দেথাইলেন; লতা ক্ষণেকের জন্য তাহার ব্যথা ভুলিল,—ঘরে ফিরিয়া আবার কাতর হইয়া পড়িল। কৃষ্ণনাথ উপায়ান্তর না দেখিয়া অবশেষে অমরকে 'তার' করিলেন। অমর তথন দিল্লীতে কোন বন্ধুর গৃহে থাকিয়া বিলাত যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। 'তার' পাঠান্তে তিনি একটু চিন্তা করিলেন; অতঃপর বিলাত যাইবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া দেশে ফিরিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

তাহার কয়েক দিন পরে একদা প্রভাতে কৃষ্ণনাথ যথন বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া লতাকে ছবি দেখাইতেছিলেন, তথন একখানা ঘোড়ার গাড়ী আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল। কৃষ্ণনাথ কহিলেন, "কে এল!"

"হয় ত দাদা।"

"তোমার দাদাই বটে, লতি!" বলিয়া অমর কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। লতা ছুটিয়া গিয়া অমরের বুকের উপর পড়িল; এবং ক্ষণকাল তদবস্থায় থাকিয়া বুক হইতে নামিয়া পড়িল। পরে কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি ফিরে এলে যে দাদা?"

অম। আমার লতিকে ছেড়ে বেশী দিন থাকতে পারলাম না বুঝে ফিরে এলাম।

লতা। আমিও থাকতে পারব না, দাদা।

অম। একদিন তোর জন্যে মন বড় অস্থির হয়েছিল, সেই দিন সন্ধ্যার সময় কৃষ্ণনাথের নিকট হ'তে 'তার' পাই।

লতা। তুমি বুঝি 'তার' করেছিলে, বড়দা?

কৃষ্ণ। না ক'রে করি কি? তুই যে রকম ভেঙ্গে পড়্‌লি।

লতা। আবার কবে তুমি যাবে, দাদা?

অম। বিলেত আর যাব না—

লতা। বেশ হয়েছে। তুমি বিলেত গেলে, ফিরে এসে তোমার লতিকে আর দেখতে পেতে না।

অম। অমন বড়দা পেয়েও তোর দুঃখু!

লতা। বড়দাকে আমার খুব ভাল লাগে; কিন্তু তোমাকে—

অম। আমাকে আরও তোমার ভাল লাগে, কেমন? বেশ, যাদের তোমার ভাল লাগে, তারা তোমার কাছে কাছেই থাকবে।

লতা। দাদা, দেখ, বড়দা আমাকে কত খেলনা এনে দিয়েছেন—আন্‌ব? দেখবে?

অম। নিয়ে এস।

লতা ছুটিল—বিদ্যুল্লতার ন্যায় ছুটিল—মুখে হাসি, অন্তরে আনন্দ। কিন্তু ফিরিতে তাহার কিছু বিলম্ব হইল। যথন খেলনাগুলি কাপড়ে বাঁধিয়া দাদার কাছে আসিতেছিল, তথন তাহার গতি মন্থর, বদন চিন্তাক্লিষ্ট। ঘরের ভিতর আসিয়া দাঁড়াইলে কৃষ্ণনাথ তাহার মুখের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে লতি?"

লতা। বড়দা, আমার সে ভাল খেলনাটা নেই।

কৃষ্ণ। কোন্ খেলনাটা?

লতা। সেই যে ময়ূরটা—দম দিলে প্যাখম ছড়িয়ে নাচত।

কৃষ্ণ। কোথা সেটা রেখেছিলে?

লতা। সকল খেলনাগুলো যেথানে ছিল—তোমার ঘরে দেরাজে—তুমিই ত রেখেছিলে।

কৃষ্ণ। আচ্ছা, আমি খুঁজে দেখব।

নরু, অমরের পাশে বসিয়াছিল; কৃষ্ণনাথ তাহার পানে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি নেও নি, নরু?"

লতা তাড়াতাড়ি কহিল, "ও নেবে না বড়দা; আমার থাকলেই ত ওর হ'ল, ওর থাকলেই আমার হ'ল।"

কৃষ্ণ। বটে! আচ্ছা আমি খুঁজে দেখব; না পাওয়া গেলে, আর একটা তোমাকে কিনে দেব। এখন তোমরা খেলা কর গে।

লতা, নরু প্রস্থান করিল। কৃষ্ণনাথ তখন বন্ধুর পানে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিলেত যাওয়া ত ঘটছে না, তবে এখন করবে কি মনে করেছ?"

অম। দু' চার দিন বাদে তোমাকে সে কথা ঠিক ক'রে বলব।

কৃষ্ণ। বলবে মাথা আর মুণ্ড। তুই এক কায কর্—চাকরী কর্—একটু চেষ্টা করলে ডিপুটীগিরি অনায়াসে তোর জুটে যাবে।

অম। জুটেছিলও বিপিনের চেষ্টায়, কিন্তু আমি চাকরীটা নিলাম না।

কৃষ্ণ। কেন, শুনি?

অম। চাকরী করতে আমার প্রবৃত্তি নেই।

কৃষ্ণ। এ করবে না, ও করবে না বললে ত চলবে না।

অম। আমি আপাততঃ হাজারিবাগে যাব মনে করেছি।

কৃষ্ণ। সেখানে কেন?

অম। দু' চার দিন বাদে তোমাকে তা বলব।

কৃষ্ণ। তা হবে না, তোমাকে এখুনি তা বলতে হবে।

অম। তুই বড় দুষ্টু, তবে শোন্—আমি একটা খনির সন্ধান পেয়েছি।

কৃষ্ণ। কিসের খনি?

অম। অভ্রের।

কৃষ্ণ। কোথা?

অম। দিল্লী হ'তে কিছু দূরে—পাহাড় অঞ্চলে।

কৃষ্ণ। কি ক'রে তুই বুঝলি স্থানটায় মাইকা আছে?

অম। সে জ্ঞান, সে শিক্ষা আমার কিছু আছে।

কৃষ্ণ। আহা, আমি তা বলছি নে; তোর হঠাৎ সন্দেহ হ'ল কেন ঐ যায়গাটায় মাইকা আছে?

অম। আমি এক দিন শিকার করতে পাহাড়ে গিয়েছিলাম। ফেরবার সময় ক্লান্ত হ'য়ে এক গাছতলায় বসি। মাটী দেখে আমার সন্দেহ হ'ল। খুঁড়ে দেখি অভ্র—যত খুঁড়ি, তত অভ্র। দূরে দূরে কয়েক স্থান খুঁড়লাম—অভ্র ছিল না, ছোরা দিয়ে যতটা পারলুম খুঁড়লাম—সব অভ্র থানিকটা মাটী তুলে এনে দিল্লীতে ব'সে পরীক্ষা করেছি—উৎকৃষ্ট অভ্র বেরিয়েছে।

কৃষ্ণ। তার পর কি হ'ল?

অম। যে দিন পরীক্ষা শেষ করলাম, সেই দিন তোমার 'তার' এল। আমি কিন্তু তখুনি চ'লে আসতে পারি নি—জমীটা নেবার বন্দোবস্ত আমাকে ক'রে আসতে হ'ল।

কৃষ্ণ। কি বন্দোবস্ত করলি?

অম। আমি আর কি করব? বিপিনই সব করলে। মালিক জমীটা বিক্রি করতে রাজি হয়েছেন, তবে মূল্য আজও স্থির হয় নি। বিপিন সেটা ঠিক ক'রে সত্বর আমাকে জানাবে বলেছে। বেশী দাম হ'লে নিতে পারব না।

কৃষ্ণ। কত জমী?

অম। তা প্রায় হাজার একর হবে।

কৃষ্ণ। আচ্ছা, বিপিন বিপিন করছিস্—বিপিনটা কে?

অম। তাকে ভুলে গেছিস্? তার সঙ্গে তুই যে কিছু দিন পড়েছিলি—আমি অনেক দিন পড়েছিলাম। সে এখন দিল্লীতে লাটসাহেবের দপ্তরে বড় চাকরী করছে বেশ লোক, তোকে সে আজও ভুলে নি।

কৃষ্ণ। তা সে যেমনই লোক হোক্ না কেন, বিনা পয়সায় তুমি যে অতটা জমী পাবে, তা ত সম্ভব নয়।

অম। বিনা পয়সায় না হোক্, বেশী যে দাম পড়বে, তা মনে হয় না। বিপিনের প্রাধান্য খুব, তা ছাড়া পাহাড়ে জমী—

কৃষ্ণ। জমীতে মাইকা আছে প্রকাশ করিছিস্ না কি?

অম। তা কি করে! তা হ'লে জমীর দাম যে চড়ে যাবে।

কৃষ্ণ। তা হ'লে তুই এখন কি করবি?

অম। জমীটা হ'য়ে গেলে হাজারিবাগে যাব।

কৃষ্ণ। সেখানে কেন?

অম। সেখানে অভ্রের খনি আছে ; কায শিখে নিয়ে পরে মহাজন যোগাড় করব।

কৃষ্ণ। যোগাড় হবে ব'লে মনে হয়?

অম। নিশ্চয় হবে ; আমার ভেতর থেকে কে এক জন বলে দিচ্ছে, এই খনি হ'তে আমার বিপুল অর্থ হবে।

কৃষ্ণ। তোমার ভেতর থেকে যে বলছে, সে কুহকিনী আশা।

অম। না, সেই আমার নিত্য সাথী ভগবান্, অথ... সেই আমি—

কৃষ্ণ। আচ্ছা, আর বক্তৃতায় কায নেই—ধর্ম্মসম্ব... বক্তৃতা আমার একেবারেই সহ্য হয় না। তুই এখন ও... স্নান কর গে যা।

অম। আগে বউদি ও পিসীমার সঙ্গে দেখা ক'রে আসি, আর দিল্লীর লাড্ডুগুলো দিয়ে আসি।

বলিয়া অমর উঠিলেন।

[ক্রমশঃ।

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

পিয়াসীর—"সুখ"

চির-ব্যবধান যবনিকাখানি মোদেরি মাঝে—
পড়িল সে কোন্ অশুভ-লগনে, জানি না তা যে!
সহসা শুনিনু, ছিল যে আপন নাহি সে আর!
বহে গেল মাঝে চিরবিরহের এ পারাবার!
দুই পারে তার চক্রবাক্ আর চক্রবাকী,
ডাকে উভরায় গভীর নিশায় দুকূলে থাকি!
সেই পারাবার—নিল ভাসাইয়া বাসনারাশি,
সঞ্চিত সুখ যত ছিল মোর মুখের হাসি!
এক লহমায় ছাইল ভুবন অন্ধকারে!
ছিন্ন-পত্র সম, হিয়াখানি পথেরি ধারে—
উড়িল রে হায় পবনপ্রবাহে প্রবলতম,
কখনো ভাসিছে স্রোতোমুখে পুনঃ তৃণেরি সম!
ভাসিছে প্রবল লহরে লহরে সকল-হারা,
কভু বা আবার সম্বল তার গৃহেরি কারা।
সুখ? তাও আছে ছোট এতটুকু কণিকা প্রায়-
একই বিশ্বে দুটি পিয়াসীর বসতি হায়!

একটি তাহার করিছে বসতি কোন্ সুদূরে—
ওই তারা মাঝে? নাহি জানি কোন্ অচিন্ পুরে!
সুখ? তাও আছে একটি কুন্দ কলিকা সম,
শিশুটি তাহার কিবা হাসি তার কি মনোরম!
বুকে ল'য়ে তারে যাপি' সারাদিন সারাটি রাতি,
দীর্ঘ-যাত্রা—পথেতে সেই ত আমারি সাথী!
ছিল তারি' দুটি কপোত-কপোতী মোদেরি ছাদে,—
অঙ্কে তুলিয়া দিই চুমা তারে কত না সাধে!
তারি' মেনি পুষি ছিল যে পালিত সে গেছে ফেলে,
দুগ্ধ পিয়াই—ভালবাসি তারে পরাণ ঢেলে!
তারি 'কুন্তল' গন্ধ বহিয়া সমীর আসে,
হিয়া চঞ্চল কাঁদি বেদনায় সেই সুবাসে!
তটিনীর তীরে সন্ধানি' ফিরি' সে পদ-রেখা,
হিয়ার মাঝারে নামটি যাহার যতনে লেখা!
কভু সন্তরি'—আপনার মনে সরসী-জলে,
রহি' আশে—প্রিয়া, আসিবে বুঝি বা সিনান-ছলে!

তরু-মর্ম্মরে শিহরি'—তারি' বা চরণ-ধ্বনি!
ফুকারে পাপিয়া উঠি নিঃশ্বসি'—প্রহর গণি!
হেরি তারকায়—ভাবি কোন্‌টিতে সে দিঠি জ্বলে?
হেরিছে কি মোরে প্রেম-আঁখিপাতে পলে-বিপলে?
সুখ? তাও আছে—নিশায় প্রকৃতি নীরব হ'লে,
সিক্ত-শিথান গোপন আমার চোখেরি জলে!

শ্রীমতী বীণাপাণি রায়।

ভারতীয় স্যাণ্ডহার্ষ্ট কমিটী

[illegible]ত ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে ভারত সরকার ভার-[illegible] স্যাণ্ডহার্ষ্ট কমিটী ওরফে স্কীন কমিটী গঠিত করিয়া-ছিলেন। ভারতবাসীকে সামরিক শিক্ষা প্রদান এবং সমর-বিভাগের উচ্চপদে নিয়োগ সম্বন্ধে বহু দিন ধরিয়া এ দেশে আন্দোলন এবং আলোচনা হইয়া আসিতেছে। কিন্তু সরকার এ পর্য্যন্ত ভারতবাসীদিগের সেই প্রার্থনা পূর্ণ করিতে সম্মত হইতেছেন না। দেশের লোকের উপর দেশরক্ষার ভার দেওয়া কর্ত্তব্য এবং ন্যায়সঙ্গত। কারণ, দেশ দেশবাসীর। যাহারা এক দেশ হইতে ঋতুপক্ষীর ন্যায় আহারের ও ধনের সন্ধানে অন্য দেশে আইসে ও যায়, শেষোক্ত দেশ তাহাদের নহে। প্রবাস-ভূমির উপর তাহাদের মমতা অস্বাভাবিক। সুতরাং তাহার আশা করিতে নাই। যাহারা পুরুষ-পুরুষানুক্রমে কোন দেশবিশেষে জন্মগ্রহণ করিতেছে, দেশের আকাশ বাতাস যাহাদের প্রাণের ও হৃদয়ের উপর যুগযুগান্তর ধরিয়া একটা বিশিষ্ট প্রভাব বিস্তৃত করিয়া আসিতেছে, দেশের উপর তাহাদের মমতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে। সেই জন্যই দেশবাসীর হস্তে দেশরক্ষার ভার ন্যস্ত করা যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু বিদেশী বিজেতা জাতি অনেক সময় বিজিত দেশবাসীকে দেশরক্ষার ভার প্রদান করিতে সম্মত হয়েন না। তাহার কারণ, তাঁহারা বিজিত দেশ-বাসীদিগকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারেন না। তাঁহাদের বিশ্বাস, বিজিত দেশবাসীরা যদি পূর্ণ মাত্রায় সামরিক শিক্ষা পায়, তাহা হইলে বিজেতৃগণের পক্ষে বিজিত জাতিকে অধীন করিয়া রাখা অসম্ভব হইবে।

ইংরাজ জাতি বলেন, তাঁহারা ভারতবাসীর হিতসাধন করিবার জন্য ভারতের শাসনদণ্ড পরিচালিত করিতেছেন। এই দেশকে চিরদিন অধীনে রাখা তাঁহাদের অভিপ্রেত নহে। ভারতবাসী যখন বর্ত্তমান সময়ের পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবে, তখন ইংরাজ ভারতবাসীকে পূর্ণমাত্রায় স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিবেন এবং ভারতবর্ষকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত স্বায়ত্তশাসনাধিকার-সম্পন্ন রাষ্ট্রমণ্ডলীর অন্য-তম রাষ্ট্রস্বরূপ করিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের বল এবং পুষ্টি বর্দ্ধিত করিবেন। তাঁহাদের এই উক্তি যদি ঐকান্তিক হয়, তাহা হইলে কার্য্যক্ষেত্রে হাতে-হাতিয়ারে তাঁহাদের তাহার পরিচয় দেওয়া কর্ত্তব্য। সে পরিচয় দিতে হইলে তাঁহাদের ভারতবাসীদিগকে অবাধে সামরিক শিক্ষাপ্রদান করাই একান্ত আবশ্যক। তাঁহারা তাহা করিতেছেন না দেখিয়া ভারতের জনসাধারণ তাঁহাদের উক্তিতে গভীর সন্দেহ প্রকাশ এবং ভারতবাসীকে উচ্চ অঙ্গের সামরিক শিক্ষাদানের জন্য তীব্র আন্দোলন করিয়া আসিতেছেন।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বাতাস একটু ঘুরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। এ পর্য্যন্ত সমর-বিভাগে ভারতীয় শিখ এবং সিপাহীরা সাধারণ সৈনিকরূপেই গৃহীত হইত। ঐ বৎসরে সরকারের স্থলচর সৈন্যগণের মধ্যে দেশীয়দিগের জন্যই দেশীয় সেনাদলে একটা নায়কের পদ সৃষ্ট হয়। যাঁহারা ইণ্ডিয়ান ক্যাডেট কোরের পূর্ণ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই কেবল সেই পদ পাইবেন, এরূপ ব্যবস্থা হয়। উহা এক প্রকার রাজকীয় কমিশন। কিন্তু ঐ সকল দেশীয় সেনানায়ককে এক কোম্পানী সৈন্যের অধিনায়কত্ব ভিন্ন আর কোন উচ্চপদই প্রদান করা হয় না। সুতরাং তদ্দ্বারা সমর-বিভাগে ভারত-বাসীর ভবিষ্যৎ উন্নতি-পথ যে বিশেষ প্রশস্ত করা হইয়াছে, তাহা নহে। এরূপ অবস্থায় ভারতবাসীরা ঐ পদপ্রাপ্তির জন্য বিশেষ লালায়িত হইতেছেন না। তাঁহারা সমর-বিভা-গের কার্য্য তাঁহাদের পক্ষে রুদ্ধ বলিয়াই গণ্য করিয়া আসিতেছেন।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে য়ুরোপে মহাসমর উপস্থিত হয়। সেই যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যগণ বিশেষ শৌর্য্য ও রণকৌশল প্রদর্শন করে। ইহা ভিন্ন সাম্রাজ্যের সেই দুর্দ্দিনে ভারতবাসীরা সাম্রাজ্যরক্ষার্থ বিশেষ ত্যাগস্বীকারও করিয়াছিলেন। ইংরাজ জাতি যে তাঁহাদের সেই ত্যাগস্বীকারের মহত্ত্ব মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা প্রদর্শনের জন্য ভারতবাসীদিগকে সামরিক বিভাগে কতকগুলি উচ্চপদ প্রদান করা কর্ত্তব্য মনে করিয়াছিলেন। সেই জন্য তখন তাঁহারা মনের আবেগে সমরবিদ্যায় সুশিক্ষিত ভারতবাসীদিগকে ইংরাজ যুবকদিগের

সমকক্ষ করিয়া সমর-বিভাগে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য মনে করেন। তখনও যুদ্ধ চলিতেছিল। সেই সময়ে অর্থাৎ ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে সরকার ইন্দোরে ভারতীয় সামরিক শিক্ষার্থীদিগের জন্য একটি ছোটখাট সামরিক বিদ্যালয় খুলেন। উহাতে ৫০ জন সামরিক শিক্ষানবীশকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়; তদ্ভিন্ন বিলাতের স্যাণ্ডহার্ষ্ট রাজকীয় সামরিক বিদ্যালয়ে প্রতি বৎসর দশ জন করিয়া সামরিক বিদ্যার্থী গৃহীত হইবে, ধার্য্য হয়। যুদ্ধকালে সামরিক বিভাগের জন্য প্রয়োজন হইয়াছিল বলিয়া অস্থায়িভাবে ইন্দোরের সামরিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়; সেই জন্য যুদ্ধের অবসান হইলেই উহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এক বৎসরকালমাত্র উহার অস্তিত্ব ছিল। ইন্দোর কলেজে ৪৯ জন শিক্ষার্থী গৃহীত হইয়াছিল, তন্মধ্যে ৩৯ জন সম্রাটের কমিশন অর্থাৎ সমর-বিভাগে অধিনায়কের কায পাইয়াছিল। তদবধি যে সকল ভারতীয় শিক্ষার্থী স্যাণ্ডহার্ষ্ট কলেজে সামরিক বিদ্যা অর্জ্জন করিয়া আপনাদের কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিতে পারিতেছেন, তাঁহারাই ভারতীয় সমর-বিভাগে চাকুরী পাইতেছেন।

পরলোকগত মিষ্টার মণ্টেগু এবং লর্ড চেমস্‌ফোর্ড ভারতীয় শাসনপদ্ধতির সংস্কারকল্পে যে রিপোর্ট দাখিল করেন, তাহাতে তাঁহারা অধিক সংখ্যক ভারতবাসীকে সমর-বিভাগে গ্রহণ করিবার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া যায়েন। সেই জন্য ১৯২১, ১৯২৩ এবং ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে এই সম্বন্ধে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। তন্মধ্যে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল, তাহার মর্ম্ম এইরূপ :—

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে অনুসন্ধান এবং রিপোর্ট করিবার উদ্দেশ্যে অবিলম্বে একটি কমিটী নিযুক্ত করিতে এই পরিষদ্ সকৌন্সিল বড় লাটকে অনুরোধ করিতেছেন; এই কমিটীতে ব্যবস্থা পরিষদের ভারতীয় সদস্যদিগের মধ্যে কয়েকজনকে সদস্যরূপে গ্রহণ করিতে হইবে :—

(ক) ভারতবাসীদিগকে ভারতীয় সৈন্য দলের অধিনায়করূপে গ্রহণ করিতে হইলে তাহাদিগকে যেরূপ শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক, সেইরূপ শিক্ষা দিবার জন্য ভারতে একটি সামরিক কলেজ প্রতিষ্ঠাকল্পে কি কি করা আবশ্যক?

(খ) ভারতীয় সেনানায়কদিগকে শিক্ষাদানার্থ ভারতে সামরিক কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে তদ্দারাই কি উলউইচ ও স্যাণ্ডহার্ষ্ট সামরিক কলেজের কার্য্য সিদ্ধ হইবে? না উক্ত ভারতীয় কলেজে অধ্যয়নের পর অন্তেবাসীদিগকে উক্ত দুইটি বিলাতী কলেজে অধিকতর বিদ্যা শিক্ষা করিতে হইবে? এবং

(গ) কিরূপ হারে ভারতবাসীদিগকে সামরিক বিভাগের উচ্চপদে গ্রহণ করিলে শিক্ষিত ভারতবাসীরা সামরিক বিভাগে কার্য্য করিতে আকৃষ্ট হইবে?

এই প্রস্তাবে কতকটা ফল হইয়াছিল। কারণ, ঐ বৎসর ১৪ই মার্চ্চ তারিখে বাজেট সম্বন্ধে আলোচনাকালে সার আলেকজাণ্ডার মুডিম্যান প্রকাশ করেন যে, সরকার সুযোগ্য ভারতীয় যুবকদিগকে সামরিক বিভাগে আকৃষ্ট করিবার এবং তাহাদিগকে সামরিক শিক্ষা দিবার উপায় নির্দ্ধারণকল্পে একটি কমিটী নিয়োগের কথা আলোচনা করিতেছেন। ভারত-সচিবের সহিত একমত হইয়া ভারত সরকার কমিটী নিয়োগ করিবেন, সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ভারতীয় সমর-বিভাগের প্রধান কর্ত্তা লেফটনাণ্ট জেনারল সার এণ্ড্রু স্কীন ঐ কমিটীর চেয়ারম্যান বা নিয়ামক হইবেন।

তাহার পরে ভারত সরকার এই কমিটীর সদস্য নিয়োগ করেন এবং তাঁহাদের বিচার্য্য বিষয়গুলির নির্দ্দেশ করিয়া দেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কমিশনের সদস্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন :—

(১) স্বরাজ্যদলের নায়ক পণ্ডিত শ্রীযুত মতিলাল নেহরু এম, এল, এ।

(২) মিষ্টার এম, এ, জিনা। ইনি মুসলমান সম্প্রদায়ের অধিনায়ক ও এসেমব্লীর সদস্য।

(৩) অনারেবল সর্দ্দার যোগেন্দ্র সিং; ইনি পঞ্জাব সরকারের কৃষিবিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

(৪) অনারেবল সার ফিরোজ সেঠ্‌না; ইনি রাষ্ট্রীয় সভার সদস্য।

(৫) দেওয়ান বাহাদুর শ্রীযুত রামচন্দ্র রাও। ইনি এসেমব্লীর সদস্য।

(৬) নবাব সার সাহিবজাদা আবদুল কোইয়াম কে, সি, আই, ই, এম, এল, এ।

(৭) সুবেদার মেজর এবং অনারারী কাপ্তেন শ্রীযুত হীরা সিং সর্দ্দার বাহাদুর এম, বি, ই; এম, এল,

ইনি পূর্ব্বে ১৬ সংখ্যক রাজপুত সেনাদলভুক্ত ছিলেন।

(৮) ডাক্তার জিয়াউদ্দীন আমেদ সি, আই, ই, এম, এল, সি আলিগড় মুস্লিম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চান্সলার।

(৯) কাপ্তেন শ্রীযুত জে, এন, ব্যানার্জ্জি বার-এট-ল।

(১০) মেজর ঠাকুর জোরবার সিং এম, সি, ভবনগর রাজ্যের শাসন পরিষদের প্রধান সেক্রেটারী। ইনি ভারতীয় দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিস্বরূপ নির্ব্বাচিত হয়েন।

(১১) রিসলদার মেজর এবং অনারারী কাপ্তেন হাজি গুল মাওয়াজ খাঁ সর্দ্দার বাহাদুর; ইনি পূর্ব্বে ১৮শ লান্সার সৈন্যদলভুক্ত ছিলেন।

(১২) মেজর বালা সাহেব ডাফলে, ৭ম রাজপুত দল।

(১৩) মিষ্টার ই, বার্ডন সি, এস, আই; আই, সি, এস, ভারত সরকারের সেনা-বিভাগের সেক্রেটারী।

ইঁহাদের মধ্যে পণ্ডিত শ্রীযুত মতিলাল নেহরু ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের মে মাসে কমিটীর সদস্যপদ পরিত্যাগ করেন।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি কমিটীর বিচার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল :—

(১) সম্রাটের রাজকীয় কমিশনের (ভারতীয় সেনানী পদের) জন্য বর্ত্তমান সময়ে সংখ্যায় এবং গুণবত্তায় যেরূপ ভারতবাসী পাওয়া যায়, তাঁহাদের অপেক্ষা অধিকতর সংখ্যায় এবং অধিক গুণবান্ ভারতবাসী প্রার্থী পাইবার জন্য কিরূপ উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে?

(২) ভারতীয় সেনাবিভাগে উচ্চপদ (commissioned ranks) প্রাপ্তির যোগ্য করিবার নিমিত্ত শিক্ষাপ্রদানকল্পে ভারতে সামরিক কলেজ প্রতিষ্ঠিত করা বাঞ্ছনীয় এবং সম্ভব কি না?

(৩) যদি উহা বাঞ্ছনীয় এবং সম্ভব হয়, তাহা হইলে কত শীঘ্র উহার কার্য্যারম্ভ করা কর্ত্তব্য হইবে এবং উহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে কি কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

(৪) যদি ভারতে সামরিক কলেজ প্রতিষ্ঠিত করিতেই হয়, তাহা হইলে ভারতবাসীকে সেনানায়কের কার্য্য শিক্ষাপ্রদানব্যাপারে উক্ত কলেজ স্যাণ্ডহার্ষ্ট ও উলউইচ সামরিক কলেজের স্থলাভিষিক্ত হইবে কিম্বা উক্ত ভারতীয় কলেজে বিদ্যা-শিক্ষা করিয়া পরে ভারতীয় পদপ্রার্থীদিগকে বিলাতের স্যাণ্ডহার্ষ্ট ও উলউইচ কলেজে অধিকতর-শিক্ষা লাভ করিতে হইবে?

সরকার এই কমিটীকে তথ্যের অবধারণ করিয়া এই চারি দফা প্রশ্নের উত্তর দিতে অনুরোধ করেন। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে শিমলা শৈলে এই কমিটীর প্রথম অধিবেশন হয়। প্রথম দশ দিন কিরূপ ভাবে কার্য্য করা হইবে, কিরূপ ভাবে প্রশ্নাবলী রচিত হইবে, ইত্যাদি বিষয় লইয়াই আলোচনা হইয়াছিল। প্রশ্নাবলী রচনা করিবার সময় কমিটীর সদস্যগণ কয়েকজন সামরিক ও সাধারণ বিশেষজ্ঞের সহিত এই বিষয়ের পরামর্শ করিয়াছিলেন। কমিটী নিম্নোক্ত ব্যক্তিদিগের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন—

বিশেষ সাক্ষী	১৬ জন
জনসাধারণের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত সাক্ষী	৩২ "
শিক্ষা-বিভাগের সাক্ষী	১৯ "
দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি	৪ "
রাজার কমিশনপ্রাপ্ত ভারতীয় সেনানীদিগের অধিনায়ক	১০ "
ভারতীয় কমিশণ্ড অফিসারের পিতামাতা	৫ "
ইন্দোরে শিক্ষাপ্রাপ্ত ভারতীয় কমিশন অফিসার	১১ "
স্যাণ্ডহার্ষ্ট শিক্ষাপ্রাপ্ত ভারতীয় কমিশণ্ড অফিসার	২০ "
বড় লাটের কমিশণ্ড অফিসার	৫ "

সর্ব্বসাকল্যে কমিটী ১ শত ২২ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ভারতীয় জনসাধারণের অধিনায়কও কয় জন ছিলেন। ইহা ভিন্ন কমিটী একটি ছোট সাব কমিটী নিযুক্ত করিয়া তাহাদের দ্বারা ইংলণ্ড, ফ্রান্স, কানাডা এবং মার্কিণ হইতে সামরিক শিক্ষাপ্রদান সম্বন্ধে তথ্য সংগৃহীত করিয়াছিলেন। মিষ্টার জিনা, সার ফিরোজ সেথনা এবং মেজর জোরবার সিংহ এই সাব-কমিটীর সদস্য হইয়াছিলেন। ইতোমধ্যে এই কমিটী সার এণ্ড্রু স্কীন, ডাক্তার জিয়াউদ্দীন আমেদ এবং মেজর বালা সাহেব ডাফলেকে লইয়া আর একটি সাব-কমিটী গঠিত করেন। এই সাব-কমিটী বোম্বাই, পুণা, মাদ্রাজ, কলিকাতা, কাশী এবং এলাহাবাদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন করিয়াছিলেন। গ্রীষ্মের ছুটীতে আলিগড় এবং পঞ্জাবের বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ ছিল, সেই জন্য তাঁহারা উহা দেখিতে পারেন নাই।

সুতরাং তথ্যসংগ্রহে কমিটী বিশেষ কার্পণ্য করেন

নাই। অতঃপর তাঁহারা যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা হইল :

(১) ভারতীয় সেনাবিভাগের উচ্চপদে ভারতবাসীদিগকে অধিক সংখ্যায় নিযুক্ত করিতে হইবে এবং ভারতবাসীদিগকে কমিশণ্ড পদে নিযুক্ত করিবার জন্য শিক্ষাদান ও অন্যান্য বিষয়ের বিশেষ সুবিধা করিয়া দিতে হইবে। বর্ত্তমান সময়ে সামরিক বিভাগের কর্ম্মচারীদিগের যে যোগ্যতা আছে, সেই যোগ্যতা সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সমর-বিভাগে ক্রমশঃ অধিক সংখ্যায় ভারতবাসী নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগকে যোগ্যতা অর্জ্জনের জন্য শিক্ষা দিতে হইবে। বর্ত্তমান সময়ে স্যাণ্ডহার্ষ্ট কলেজে যে ১০টি ভারতীয় ছাত্র লইবার ব্যবস্থা আছে, তাহার পরিবর্ত্তে তথায় ২০ জন ভারতীয় ছাত্র লইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ঠিক এইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। তৎপরে প্রতি বৎসর ৪ জন করিয়া অধিক ছাত্র গ্রহণ করতঃ ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে স্যাণ্ডহার্ষ্ট কলেজে ৩৮ জন করিয়া ভারতীয় ছাত্র গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(২) ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে ১ শত সামরিক শিক্ষার্থী ছাত্র লইবার উপযুক্ত একটি ভারতীয় স্যাণ্ডহার্ষ্ট বা সামরিক কলেজ প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক। উহাতে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বৎসরে ৩৩ জন করিয়া সামরিক ছাত্র গ্রহণ করিতে এবং ছাত্রগণকে এই বিদ্যালয়ে ৩ বৎসর অধ্যয়ন করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যখন ভারতে স্যাণ্ডহার্ষ্ট কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং ভারতীয় সামরিক ছাত্রগণ বিলাতের স্যাণ্ডহার্ষ্ট কলেজে উচ্চতর শিক্ষাপ্রাপ্তির জন্য প্রবেশ করিতে চাহিবেন, তখন বিলাতের স্যাণ্ডহার্ষ্ট কলেজে প্রতি বৎসর ২০ জন করিয়া সামরিক ছাত্র গ্রহণের ব্যবস্থা থাকিবে।

(৩) ভারতবাসীদিগকে ভারতীয় সরকারী তোপখানা, ইঞ্জিনিয়ারী, সিগনাল বা সঙ্কেত বিভাগ, ট্যাঙ্ক বা সামরিক রথ এবং রণবিমান বিভাগে নিয়োগ করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তাহাদিগকে উলউইচের রয়াল মিলিটারী একাডেমিতে এবং ক্র্যান্‌ওয়েলের রয়েল এয়ার ফোর্স কলেজে প্রবেশ করিতে দিতে হইবে। এক্ষণে প্রকাশ থাকে যে, ইংরাজ ছাত্রগণ যেরূপ যোগ্যতার পরীক্ষা দিয়া উক্ত কলেজে প্রবেশ করিবে, ভারতীয় ছাত্রদিগকে ঠিক সেইরূপ যোগ্যতার পরীক্ষা দিয়া ঐ কলেজে প্রবেশ করিতে হইবে। ভারতে যতদিন ঐরূপ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা না হইবে, ততদিন ঐরূপ ব্যবস্থা বহাল রাখা আবশ্যক। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দ হইতে উলউইচ কলেজে ভারতীয় ৮ জন শিক্ষানবীশের এবং ক্র্যান্‌ওয়েল কলেজে ২ জন করিয়া ভারতীয় ছাত্র গ্রহণের জন্য স্থান খালি রাখিতে হইবে। ক্রমশঃ উহার সংখ্যা বর্দ্ধিত করিতে হইবে।

(৪) কলেজ হইতে পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে সম্রাটের স্থলচর সেনাদলে রাজার কমিশন (উচ্চপদ) দিতে হইবে। উহারা য়ুরোপীয় ও দেশীয় সৈন্যদলেই কায করিতে পারিবে।

(৫) এই ব্যবস্থায় ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে সেনাবিভাগের অর্দ্ধেক সেনানী ভারতবাসী হইবেন।

(৬) বৃটিশ সৈনিক ও কমিশণ্ড অফিসারের আনুপাতিক সংখ্যা বজায় রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৭) ভারতীয় সামরিক বিদ্যালয়ে যাহারা শিক্ষালাভ করিবে, তাহাদিগকে বিলাতে যাইয়া তাহাদের শিক্ষার পরিসমাপ্তি করিতে হইবে।

স্থূলতঃ ইহাই কমিটীর মূল পরামর্শ। ইহা ভিন্ন কমিটী আরও কতকগুলি গৌণ পরামর্শ দিয়াছেন। সেগুলির আলোচনা আমরা পরে করিব। আপাততঃ মূল পরামর্শ সম্বন্ধে কয়েকটি মাত্র কথা বলিব।

আমাদের প্রথম কথা, রিপোর্টখানি ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ১৪ই নবেম্বর তারিখে দাখিল করা হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত উহা সাধারণের নিকট প্রকাশিত করা হইল না কেন? বাজারে গুজব, ভারত-সচিব প্রথমে উহা ক্ষিপ্রতার সহিত প্রকাশিত করিতে সম্মত হয়েন নাই। সমর-বিভাগে ভারতবাসীদিগকে গ্রহণ করিতে বৃটিশ জাতির যে স্বাভাবিক অরুচি আছে, তাহা তাঁহারা এ পর্য্যন্ত পরিহার করিতে সমর্থ হয়েন নাই। সেই জন্য এই রিপোর্ট লইয়া বৃটিশ জাতির মধ্যে বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। লেফটেনাণ্ট জেনারল সার জর্জ্জ ম্যাকমান্‌ প্রমুখ ব্যক্তিরা পর্য্যন্ত বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, এত বড় প্রয়োজনীয় বিষয়টির তদন্ত করিবার ও পরামর্শ দিবার ভার যে কমিটীর হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল, সেই কমিটীতে দুই জন মাত্র বৃটিশ অফিসার আর ১২ জন ভারতবাসী ছিল, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। ইহাতে ইংরাজ জাতির মধ্যে ভারতবাসী সম্বন্ধে একটু কুসংস্কার আছে, তাহা বুঝা যায়।

প্রায় ৫ মাস পূর্ব্বে এই রিপোর্টখানি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। ইহা যদি ক্ষিপ্রতার সহিত প্রকাশিত হইত, তাহা হইলে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থা-পরিষদ্ বিগত সেসনে ঐ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে পারিতেন। উহা বিলম্বে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া আগামী সেপ্টেম্বর সেসন ব্যতীত ইহা আর ব্যবস্থাপক সভায় আলোচিত হইতে পারিবে না। ইতোমধ্যে ভারত সরকার এই বিষয়ে যে ইস্তাহার প্রচারিত করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক। কমিটী যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তদনুসারে সরকার বিষয়টির পুনরালোচনা করিয়া দেখিবেন। লর্ড বার্কেনহেডের কথা এই যে, এই রিপোর্ট সম্বন্ধে ভারত-সরকারের মন্তব্যপ্রাপ্তির পর 'ইম্পিরিয়াল ডিফেন্স কমিটী' সরকারের বিশেষ প্রয়োজনীয় সামরিক নীতির সহিত সাকল্যভাবে রিপোর্টখানির আলোচনা করিয়া দেখিবেন। ইহাতে স্বতঃ ভারতবাসীর মনে সন্দেহ জন্মিতেছে যে, সরকার এই রিপোর্ট অনুসারে কার্য্য করিতে সহসা সম্মত হইবেন না।

কমিটী ভারতে উচ্চ অঙ্গের সামরিক কলেজ প্রতিষ্ঠার যে পরামর্শ দিয়াছেন, তাহা অবশ্য ভারতবাসীর অনুমোদিত। তবে সে জন্য আরও ৬ বৎসর কাল কেন অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে, তাহা আমরা বুঝি না। যাহা ন্যায়সঙ্গত এবং আবশ্যক, তাহা করিতে বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে। ইহার জন্য অবশ্য অর্থব্যয় করিতে হইবে; কিন্তু ঐ ব্যয় অপব্যয় হইবে না। জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সর্ব্বশ্রেণীর সেনাদলে ভারতবাসী সেনানীদিগকে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত ও পক্ষপাতবিবর্জ্জিত; সুতরাং উহাতে আপত্তি করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত হেতু খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন হইবে। তবে কতকগুলি ইংরাজের ভারতবাসীর উপর উপেক্ষা ও অবজ্ঞা যদি উহার কারণ হয়, তবে উহাতে বৃটিশ জাতির কলঙ্কই ঘোষিত করিবে।

যেরূপ গতিতে ভারতবাসীদিগকে সামরিক বিভাগের উচ্চপদে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত মন্থর। ২৫ বৎসর পরে, সমর-বিভাগের অর্দ্ধেক পদ ভারতবাসীর হস্তগত হইবে। দেশের লোক যেরূপ ব্যাকুলতার সহিত সমর-বিভাগে ভারতবাসীদিগকে প্রবেশ করাইবার চেষ্টা করিতেছে, তাহাতে এই মন্থর পদ্ধতিতে তাহারা সন্তুষ্ট হইতে পারিবে না। মিষ্টার জিনা, দেওয়ান বাহাদুর রামচন্দ্র রাও এবং মেজর জোরবার সিংহ ১৫ বৎসর কালে কার্য্য সম্পাদনে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু কমিটী সে মত গ্রহণ করেন নাই। সার ফিরোজ সেথনা এবং মেজর ডাফলে ২০ বৎসরে সমর-বিভাগে ভারতবাসী গ্রহণের কার্য্য সম্পাদন করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু সে প্রস্তাবও গ্রাহ্য হয় নাই। ইহাতে বুঝা যায়, কমিটী অতি ধীর ভাবেই এই কার্য্যে অগ্রসর হইবার জন্য সরকারকে পরামর্শ দিয়াছেন। সরকার যদি এই প্রস্তাব গ্রাহ্য না করেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, সমর-বিভাগে ভারতবাসীদিগকে গ্রহণ করিতে তাঁহাদের ইচ্ছা নাই।

কমিটী কতকগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা বলিয়াছেন। যথা (১) ভারতে এ পর্য্যন্ত সামরিক এবং অসামরিক জাতি বলিয়া বিভিন্ন জাতির মধ্যে সরকার যে পার্থক্য করিয়া আসিতেছিলেন, তাহা উঠাইয়া দিতে হইবে। (২) কতকগুলি লোক বরাবরই বলিয়া আসিতেছেন যে, ভারতবাসীর ধর্ম্ম এবং বর্ণ তাহাদিগকে সামরিক কার্য্যে যোগ্যতাদানে বঞ্চিত করে। কমিটী ঐ যুক্তি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন। যাঁহারা বলেন যে, ভারতে শৌর্য্য নাই, সাহস নাই, তাঁহারা হয় নিতান্ত ভ্রান্ত, না হয় অত্যন্ত নীচতার সহিত সত্যের অপলাপ করিয়া থাকেন। ভারতবাসীরা সেনানায়কের দায়িত্ব গ্রহণে অসমর্থ, এই সিদ্ধান্ত ঐতিহাসিক তথ্য দ্বারাই খণ্ডিত হইয়া যায়। এই ভারতে বহু যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, বহু সেনানায়ক সহস্র সহস্র সৈনিক লইয়া রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং অসাধারণ দক্ষতার সহিত তাহাদিগকে রণক্ষেত্রে পরিচালিত করিয়াছেন। সত্য বটে, যুদ্ধকার্য্য এখন বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হইতেছে। কিন্তু জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষায় ভারতবাসী কখনই পশ্চাৎপদ নহে। আর এই ৩০ কোটি লোক-অধ্যুষিত ভারতে যে সেনানায়ক হইবার যোগ্য লোক একবারেই মিলিবে না, ইহা মনে করাই ভ্রান্তি; কমিটী এ কথাও স্বীকার করিয়াছেন। ভারতবাসী এখন সামরিক শক্তির ও প্রতিভার বিকাশ-সাধন-পথ পাইতেছে না বলিয়া তাহাদের ঐ শক্তি ও প্রতিভা সুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, উহা লুপ্ত হয় নাই। অনুশীলন দ্বারা আবার উহা সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

মহাভারত ও ভারতবর্ষের ইতিহাস *

নলোপাখ্যানে দ্যূতক্রীড়ার কথা আছে। মহাভারতে বনপর্ব্বে এ উপাখ্যানটি বর্ণিত হইয়াছে, অর্জ্জুন অস্ত্রলাভার্থ ইন্দ্রের নিকট গমন করিয়াছেন; চারি ভাই ও দ্রৌপদী একান্ত মনঃকষ্টে বনমধ্যে বাস করিতেছিলেন, এমন সময় বৃহদশ্ব নামে এক ঋষি তাঁহাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ কথোপকথনের পর যুধিষ্ঠির তাঁহাকে নিজেদের দুঃখের কথা জানাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, আমা অপেক্ষা কোন অধিক দুঃখী রাজাকে আপনি কি কখন দেখিয়াছেন কিংবা তাঁহার কথা শুনিয়াছেন? বৃহদশ্ব তাঁহাকে নল রাজার উপাখ্যান বলিলেন। নল-উপাখ্যান সকলের সুপরিচিত, তথাপি পরে বুঝিতে সুবিধা হইবে, এই নিমিত্ত গল্পটি এ স্থলে লিখিত হইল।

নিষধ দেশে বীরসেন নামে এক রাজা ছিলেন. তাঁহার পুত্রের নাম নল; অশ্ববিদ্যায় ও অশ্বপরিচালনায় তাঁহার বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি বেদজ্ঞ, ব্রহ্মনিষ্ঠ, সত্যবাদী, সাক্ষাৎ মনুরূপে বিরাজমান ছিলেন; অক্ষক্রীড়ায় তাঁহার বিলক্ষণ আসক্তি ছিল। সেই সময়ে বিদর্ভ দেশে ভীমসেন নামে এক নরপতি ছিলেন; দমন নামে এক ঋষি তাঁহাকে তিন পুত্র ও এক কন্যা হইবে বলিয়া বর দিয়াছিলেন। তাহার ফলে তাঁহার দময়ন্তী নামে এক কন্যা ও দম, দান্ত ও দমন নামক তিন পুত্র জন্মে। নল ও দময়ন্তী উভয়ে সুরূপ ছিলেন এবং লোকমুখে তাঁহারা পরস্পরের সৌন্দর্য্যের কথা শুনিয়া উভয়ে উভয়কে বিবাহ করিতে উৎসুক হন। এক হংসকে নল রাজা দময়ন্তীর সমীপে দূতরূপে প্রেরণ করেন।

ভীমসেন নিজ কন্যাকে বিবাহার্থিনী বুঝিয়া তাহার স্বয়ম্বরের নিমিত্ত আয়োজন করিলেন। সকল দেশের নরপতিগণ সেই স্বয়ম্বরে আসিতে উৎসুক হইলেন; এমন কি ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, যম, দময়ন্তীর স্বয়ম্বর সভায় গমন করিতে স্থির করিলেন। এই সকল লোকপাল স্বয়ম্বর সভায় যখন আসিতেছিলেন, তখন তাঁহারা পথে নলকে দেখিতে পাইলেন। ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ তাঁহাকে নিজেদের দূত করিয়া দময়ন্তীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন; তাঁহারা নলকে বলিয়া দিলেন, তুমি দময়ন্তীর নিকট গিয়া বল যে, আমাদের চারি জনের মধ্যে এক জনকে সে যেন বরণ করে। নল দময়ন্তীর নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে সকল কথা জানাইলেন। কিয়ৎক্ষণ কথোপকথনের পর দময়ন্তী কহিলেন, আপনি লোকপালদিগের সভায় থাকিবেন, তাঁহাদের সম্মুখে আপনাকে বরণ করিলে আপনার কোন অনিষ্ট হইবে না। পরে স্বয়ম্বর সভায় কন্যার্থিগণ আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন; দময়ন্তী সভামধ্যে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, নলের রূপধারী পাঁচ জন ব্যক্তি সমাসীন রহিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে কোন্ জন নল, না বুঝিতে পারিয়া দময়ন্তী মনে মনে দেবতাগণের শরণ লইলেন। দিকৃপালগণ তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া সামর্থ্যানুসারে যথা প্রসিদ্ধ স্ব স্ব চিহ্ন ধারণ করিলেন। তখন দময়ন্তী নলকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার বস্ত্রের অগ্রভাগ ধারণপূর্ব্বক গলদেশে মালা প্রদান করিলেন; লোকপালরা সন্তুষ্ট হইয়া প্রত্যেকে নল রাজাকে দুইটি করিয়া বর দিলেন। ইন্দ্র নলকে যজ্ঞে প্রত্যক্ষ দর্শন প্রদান ও উত্তম শুভগতি বর দিলেন; হুতাশন নলরাজা যেখানে ইচ্ছা করিবেন, সেই স্থানে অগ্নির আবির্ভাব এবং অগ্নি সদৃশ দীপ্যমান লোক সকল বর প্রদান করিলেন, যম অন্নের বিশিষ্ট রস ও ধর্ম্মে উৎকৃষ্ট মতি বর প্রদান করিলেন এবং বরুণদেব নলরাজা যেখানে মানস করিবেন; সেই স্থানেই জলের আবির্ভাব হইবে এবং উত্তম গন্ধান্বিত মাল্য সকল বর দিলেন।

সভা ভঙ্গ হইলে রাজগণ স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া গেলেন, যখন লোকপালরা ফিরিতেছিলেন, তখন তাঁহারা দেখিলেন, কলি দ্বাপরের সহিত আসিতেছেন। দময়ন্তী দেবগণকে উপেক্ষা করিয়া মনুষ্যের গলায় মালা দিয়াছেন শুনিয়া কলি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন; বলিলেন, এই কারণে

---

* যে স্থলে টীকা ও অনুবাদ আছে, তাহা নীলকণ্ঠের টীকা ও বর্দ্ধমান রাজসংস্করণ অনুবাদ।

তাঁহার বিপুল দণ্ডভোগ করা ন্যায্য। তিনি দ্বাপরকে কহিলেন, আমি নলকে রাজ্যভ্রষ্ট করিব ও দময়ন্তী-সঙ্গ-বিরহিত করিব। তুমি অক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া আমার সাহায্য করিতে যত্নবান্ হইও; এ স্থলে কলি ও দ্বাপরের সন্ধি হইল। কলি নলের ছিদ্রান্বেষী হইয়া দ্বাদশ বর্ষকাল তাঁহার রাজধানীতে বাস করিল। এক দিন সামান্য ছিদ্র পাইয়া কলি নলের শরীরে প্রবেশ করিল, তখন সে অন্য এক রূপ ধারণ করিয়া নলের ভ্রাতা পুষ্করের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে বলিল, তুমি নলের সহিত দ্যূতক্রীড়া কর এবং আমার সাহায্যে নলকে জয় করিয়া নিষধ দেশের রাজত্ব লাভ কর।

অক্ষদ্যূতে নলং জেতা ভবান্ হি সহিতো ময়া।

(৬-৫৯ বনপর্ব্ব)

পুষ্কর নলের নিকট গমন করিয়া বলিল, আসুন, এই বৃষকে পণ রাখিয়া আমরা দ্যূতক্রীড়া করি। নল স্বীকৃত হইলে ক্রমে ক্রমে সুবর্ণ, রজতযান ও বস্ত্র পণ রাখিয়া পরাজিত হইতে লাগিলেন। নলের সহিত পুষ্করের বহুতিথ মাস দ্যূতক্রীড়া হইল, কিন্তু তাহাতে নলই পরাজিত হইলেন। দময়ন্তী ও অমাত্যগণ এবং পুরবাসিগণ নিবারণ করিলেও নল কাহারও কথা শুনিলেন না, কিংবা দ্যূতক্রীড়া হইতে বিরত হইলেন না। তখন দময়ন্তী, সূত বার্ষ্ণেয়কে ডাকাইয়া বলিলেন, তুমি আমার পুত্র ইন্দ্রসেন ও কন্যা ইন্দ্রসেনাকে উহাদের মাতুলালয় কুণ্ডিন নগরে লইয়া যাও। বার্ষ্ণেয় রাজপুত্র-কন্যাকে বিদর্ভ নগরে রাখিয়া স্বয়ং অযোধ্যার নৃপতি ঋতুপর্ণ নামে রাজার নিকট সারথ্যের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

নল যখন দ্যূতক্রীড়ায় তাঁহার সকল সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইলেন, পুষ্কর তাঁহাকে হাসিয়া বলিল, এখন দময়ন্তী অবশিষ্ট আছে, তাহাকে পণ রাখিয়া পুনরায় ক্রীড়া কর। নল এই কথা শুনিয়া ক্রোধে অন্ধ হইয়াও কিছু বলিলেন না, তিনি অঙ্গের সমস্ত ভূষণ পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র বসন পরিধান করিয়া রাজভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। দময়ন্তীও একবসনা হইয়া তাঁহার সহগামিনী হইলেন; তাঁহারা উভয়ে আশ্রয়হীন হইয়া অনাহারে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এক দিন নল সুবর্ণ-সদৃশ পক্ষযুক্ত কতকগুলি পক্ষী দেখিতে পাইলেন; তিনি লাভইচ্ছায় নিজ পরিধেয় বস্ত্র দ্বারা সেই পক্ষীদিগকে আবৃত করিলেন। পক্ষীরা সেই বস্ত্র লইয়া আকাশে উড়িয়া গেল, যাইবার সময় নলকে বলিল, তুমি যে অক্ষ দ্বারা পরাজিত হইয়াছিলে, আমরাই সেই অক্ষ।

বয়মক্ষাঃ সুদুর্ব্বুদ্ধে তব বাসো জীহির্ষবঃ।
আগতা ন হি নঃ প্রীতিঃ সবাসসি গতে ত্বয়ি॥

(১৬-৬১ বনপর্ব্ব)

হে অতি দুর্ব্বুদ্ধে! আমরা সেই অক্ষ, তুমি বস্ত্র পরিধান করিয়া গমন করাতে আমাদিগের সন্তোষ না হওয়া প্রযুক্ত তোমার বস্ত্র হরণ করিবার মানসে আগমন করিয়াছিলাম।

নল ও দময়ন্তীর অশেষ যন্ত্রণা হইতে লাগিল, ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া তাঁহারা এক দিন পথিমধ্যে এক সভা অর্থাৎ পথিকদিগের উপবেশন স্থান দেখিতে পাইলেন, পথশ্রান্তা দময়ন্তী তথায় নিদ্রিতা হইলে, নল দেহাবিষ্ট কলির প্ররোচনায় দময়ন্তীকে সেই স্থানে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন, কলিস্পৃষ্ট হওয়াতে তাঁহার বুদ্ধি একান্ত বিনষ্ট হইয়াছিল। দময়ন্তী জাগ্রত হইয়া নলকে দেখিতে না পাইয়া শোকে ও ভয়ে উন্মত্তাপ্রায় হইলেন, তাঁহার দুঃখের অবধি রহিল না। বনমধ্যে নলের অন্বেষণে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, একবার এক অজগর সর্পের মুখে পতিত হয়েন; এক ব্যাধ তাঁহাকে রক্ষা করে। পরে তাঁহার প্রতি ব্যাধের কু-অভিসন্ধি বুঝিয়া তিনি তাহাকে শাপ প্রদান করিলেন, তাহার ফলে সেই ব্যাধ মৃত হইয়া ভূমিতে পতিত হইল।

দময়ন্তী উন্মত্তার ন্যায়, সেই বনমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন; নলের সংবাদ জানিবার নিমিত্ত কখন বা বৃক্ষদিগকে কখন বা বিচরণশীল শার্দ্দূলদিগকে কখন বা বনমধ্যস্থিত গিরিরাজকে সম্বোধন করিতেছিলেন। তিনি বিলাপ করিতে করিতে নল-অন্বেষণে অহোরাত্র উত্তরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন; পরে তাপসগণের একটি আশ্রম দেখিতে পাইলেন; তিনি আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া নলের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন; তাপসগণ বলিলেন, আমরা তপস্যা দ্বারা দেখিতেছি, তোমার উত্তর কালে কল্যাণ হইবে; তুমি শীঘ্র নল রাজাকে দেখিতে পাইবে, তাপসগণ এই বলিয়া আশ্রমের সহিত অন্তর্হিত হইলেন। দময়ন্তী সেই স্থান হইতে স্থানান্তরে গিয়া এক প্রকাণ্ড অশোকবৃক্ষ

দেখিতে পাইলেন; তিনি তাহাকেও নিজ স্বামীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। যাইতে যাইতে এক বিস্তীর্ণ নদী দেখিতে পাইলেন, একদল সার্থ (অর্থের সহিত বাণিজ্য-ব্যবসায়ী) হস্তী, অশ্ব, রথ ও জনসমূহে সমবেত হইয়া ঐ নদী উত্তীর্ণ হইতেছিল। বণিকৃদলের পতির নাম ছিল শুচি। বণিকরা বলিল, এই সার্থ লাভের নিমিত্ত সত্যদর্শী চেদিরাজ সুবাহুর জনপদে শীঘ্র গমন করিবে। রাত্রিতে বণিকৃদল সেই স্থানে থাকিতে স্থির করিল, কিন্তু নিশীথ সময়ে একদল বন্যহস্তী আসিয়া সেই সার্থ ও তাহাদের বাহনদিগকে নষ্ট করে। দময়ন্তী একান্ত দুঃখিত হইয়া কতকগুলি বেদপারগ ব্রাহ্মণের সহিত গমন করিতে লাগিলেন। তিনি সত্যদর্শী চেদিরাজ সুবাহুর রাজধানীতে পৌঁছিলেন, তথায় রাজকন্যা সুনন্দার সখীভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এ দিকে নল রাজা দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করিয়া দুঃখার্ত্ত হৃদয়ে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে কাননমধ্যে এক প্রজ্বলিত দাবানল দেখিলেন ও রক্ষার নিমিত্ত আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলেন। নল সেই অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিয়া তথায় এক মহানাগ দেখিতে পাইলেন, সেই নাগ বলিল, আমি কর্কোটক নাগ, নারদকে প্রতারণা করিবার নিমিত্ত তিনি আমাকে শাপ দিয়াছেন যে, যত দিন পর্য্যন্ত তোমাকে নল রাজা লইয়া না যাইবেন, তত দিন পর্য্যন্ত তুমি এই স্থানে জড়ের ন্যায় থাকিবে। যে স্থানে তোমাকে তিনি লইয়া যাইবেন, সেই স্থানে তুমি আমার শাপ হইতে মুক্ত হইবে। নল তাহাকে অগ্নির বাহিরে লইয়া গেলে সেই নাগ তাঁহাকে দংশন করিল ও তাহার ফলে তখনই নল রাজা বিকৃতরূপ ধারণ করিলেন এবং নাগও পূর্ব্বের ন্যায় নিজরূপ প্রাপ্ত হইল। নাগ বলিল, আপনাকে লোক যাহাতে চিনিতে না পারে, আমি সেই হেতু আপনাকে দংশন করিলাম এবং যত দিন কলি আপনার দেহে থাকবে, তত দিন সে আমার বিষে সাতিশয় যন্ত্রণা ভোগ করিবে। আমার প্রসাদে দংষ্ট্রী, শত্রু ও বেদবিৎ ব্যক্তিগণ হইতে আপনার ভয় থাকিবে না, আপনি অযোধ্যার রাজা ঋতুপর্ণের নিকট বাহুক নামে তাঁহার সারথি হইয়া বাস করিবেন। সেই রাজার অক্ষক্রীড়ায় বিশেষ নৈপুণ্য আছে, তিনি আপনার স্থানে অশ্বপরিচালনা-রহস্যপরিজ্ঞান গ্রহণ করিয়া আপনাকে অক্ষক্রীড়া-রহস্য-পরিজ্ঞান শিক্ষা দিবেন। আপনি যখন অক্ষক্রীড়ায় কুশল হইবেন, তখন শ্রেয়োলাভ করিবেন; অতএব শোকে আর মনোনিবেশ করিবেন না। আপনার যখন নিজ রূপ লাভ করিতে ইচ্ছা হইবে, তখন আমাকে স্মরণ করিবেন এবং এই বস্ত্র পরিধান করিবেন, তাহা হইলে নিজরূপ পুনঃ প্রাপ্ত হইবেন। এই বলিয়া তিনি তাঁহাকে বস্ত্রযুগল প্রদান করিলেন এবং সেই স্থলেই অন্তর্হিত হইলেন। নল ঋতুপর্ণের নিকট গমন করিয়া বাহুকনামে তাঁহার সারথি হইলেন। তাঁহার পূর্ব্ব সারথি বার্ষ্ণেয় ও জীবল নামে আর এক জন ঋতুপর্ণ রাজার সারথি তাঁহার অধীনে রহিল।

এ দিকে কন্যা ও জামাতার দাসত্ব শুনিয়া বিদর্ভাধিপতি ভীমসেন ব্রাহ্মণদিগকে বলিলেন, যদি কেহ নল ও দময়ন্তীকে আনয়ন করিতে অথবা তাহাদের সংবাদ আনিতে পারে, তিনি তাহাকে পুরস্কার দিবেন। সুদেব নামে এক ব্রাহ্মণ ভ্রমণ করিতে করিতে চেদিরাজগৃহে দময়ন্তীকে দেখিতে পাইলেন। দময়ন্তীর ভ্রূযুগলের মধ্যে এক পিপলু অর্থাৎ তিলচিহ্ন ছিল, সুদেব সেই তিল দেখিয়া দময়ন্তীকে চিনিতে পারিলেন। তিনি দময়ন্তীকে বলিলেন, তোমাকে অন্বেষণ করণার্থ শত শত ব্রাহ্মণ পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতেছেন। এই সকল কথা চেদিরাজ-মহিষী জানিতে পারিলেন। সুদেব তাঁহাকে বলিলেন, দময়ন্তীর তুল্য সুন্দরী স্ত্রী আর নাই; লক্ষণ দ্বারা ইহাকে শ্যামা বলা যায়। দময়ন্তী চেদিরাজ-মহিষীর নিকট নিজ পিতৃগৃহে যাইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং তথায় পৌঁছিয়া মাতাকে নলের অন্বেষণ করিতে অনুরোধ করিলেন। ভীমসেনের আজ্ঞানুক্রমে ব্রাহ্মণগণ সেই কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন; ব্রাহ্মণগণ যাইবার পূর্ব্বে দময়ন্তী তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, তোমরা যে যে স্থানে যাইবে, সেই সেই স্থানে আমি তোমাদিগকে যে শ্লোকটি বলিয়া দিতেছি, সেই শ্লোকটি পাঠ করিবে; যদি কেহ সেই শ্লোকের উত্তর প্রদান করে, তাহা হইলে আমাকে আসিয়া জানাইবে।

ব্রাহ্মণরা দেশ, নগর, গ্রাম, আভীর পল্লী ও ঋষিদিগের আশ্রম সকল অন্বেষণ করিলেন; কিন্তু নল রাজার কোন অনুসন্ধান পাইলেন না। পরে পর্ণাদ নামে এক জন ব্রাহ্মণ বলিলেন, আমি অযোধ্যার রাজা ঋতুপর্ণের সভায়

গিয়া এক জন বিকৃতাকৃতি হ্রস্ববাহু বাহুক নামে ঋতুপর্ণ রাজার সারথিকে দেখিলাম, সেই ব্যক্তি কেবল আপনার প্রশ্নের উত্তর দিল। দময়ন্তী নিজ মাতার সহিত পরামর্শ করিয়া সুদেব ব্রাহ্মণকে ঋতুপর্ণ রাজার রাজধানীতে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি তাঁহাকে বলিয়া দিলেন, আপনি ঋতুপর্ণ রাজাকে বলিবেন, দময়ন্তীর পুনর্ব্বার স্বয়ম্বর হইবে, আপনি যদি তথায় উপস্থিত থাকিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে এক দিনের মধ্যেই সেই সভায় গমন করিবেন; কারণ, কালই দময়ন্তীর স্বয়ম্বর হইবে। ঋতুপর্ণ বাহুককে সারথি করিয়া বার্ষ্ণেয়ের সহিত বিদর্ভ নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে তিনি নলকে নিজের অদ্ভুত গণিতবিদ্যার পরিচয় দিলেন; তিনি বলিলেন, আমি অক্ষক্রীড়ায় পারদর্শী, সেই হেতু আমি এই বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। নল তাঁহার নিকট হইতে অক্ষবিদ্যা গ্রহণ করিয়া অক্ষবিদ্যার বিনিময়ে তাঁহাকে অশ্বতত্ত্ব বিদ্যা শিক্ষা দিলেন।

নল অক্ষ বিদ্যা লাভ করিলে, তাঁহার দেহাবিষ্ট কলি, ক্লিষ্ট হইয়া তাঁহার দেহ হইতে নির্গত হইল এবং বিভীতক বৃক্ষে প্রবেশ করিল। ঋতুপর্ণ রাজা বাহুক ও বার্ষ্ণেয়ের সহিত সেই দিন সন্ধ্যাকালে ভীমসেনের আলয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; বাহুক অশ্বশালায় রথ লইয়া রাখিলেন। দময়ন্তী ঋতুপর্ণের সারথি বাহুককে নল সন্দেহ করিয়া তাঁহার নিকট কেশিনী নামে এক জন দাসীকে পাঠাইয়া দিলেন। কেশিনী নলের নিকট প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকিয়া যাহা দেখিয়াছিল, আসিয়া দময়ন্তীকে পরিচয় দিল, কেশিনীর কথায় দময়ন্তী বুঝিলেন যে, এই ব্যক্তি নল। দময়ন্তী বাহুককে নিজ সমীপে ডাকাইয়া আনাইলেন ও তাঁহাকে নল সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন; বলিলেন, আমি পূর্ব্বে সাক্ষাৎ দেবগণকে পরিত্যাগ করিয়া যাঁহাকে বরণ করিয়াছি, তিনি আমাকে কি প্রকারে পরিত্যাগ করিলেন।

বাহুক বলিল, আমি যে রাজ্যভ্রষ্ট হই, আমি যে তোমাকে পরিত্যাগ করি, এ সকল আমি স্বয়ং করি নাই, কলি করিয়াছে। কলি আমার তপস্যায় নির্জ্জিত হইয়া আমাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে; আমি তোমার নিমিত্ত এ স্থানে আসিয়াছি। দময়ন্তীর চরিত্র সম্বন্ধে যখন নলের সকল আশঙ্কা দূর হইল, তখন তিনি কর্কোটকপ্রদত্ত বসনযুগল পরিধান করিলেন এবং তাহার ফলে নিজের পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন। নল তিন বৎসর কাল ব্যসন ভোগ করিয়া চতুর্থ বর্ষে ভার্য্যার সহিত মিলিত ও সমস্ত কামনা পরিপূরণ পূর্ব্বক সুসিদ্ধার্থ হইয়া পরমানন্দ অনুভব করিলেন। নল নিষধপুরীতে প্রত্যাগমন করিয়া পুষ্করকে পুনর্ব্বার দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান করিলেন; তিনি রত্ন, কোষ ও প্রাণের সহিত পুষ্করকে পরাজিত করিলেন; পরে কৃপাপরবশ হইয়া তাহাকে জীবন দান ও তাহার পূর্ব্বভুক্ত রাজ্যাংশ প্রদান করিলেন।

এই হইল সংক্ষেপে নলোপাখ্যান। যুধিষ্ঠিরের অক্ষক্রীড়ার সহিত নলের অক্ষক্রীড়ার অনেক সাদৃশ্য আছে। যুধিষ্ঠির শকুনির সহিত অক্ষক্রীড়া করেন; নল নিজ ভ্রাতা পুষ্করের সহিত অক্ষক্রীড়া করেন। নলের দেহে কলি আবিষ্ট হয়; দুর্য্যোধন কলির অংশে জন্মগ্রহণ করেন। নলোপাখ্যানে দ্বাপর অক্ষ মধ্যে প্রবেশ করে, মহাভারতে দ্বাপর শকুনি হইয়া জন্মে। যুধিষ্ঠির সমস্ত হারিয়া দ্রৌপদীকে পণ রাখেন, কিন্তু নল রাজা সমস্ত হারিলে যখন পুষ্কর তাঁহাকে দময়ন্তীকে পণ রাখিতে বলে, তিনি তাহা করেন নাই। নল যখন ঋতুপর্ণ রাজার নিকট হইতে অক্ষবিদ্যা লাভ করেন, কলি তাঁহার দেহ পরিত্যাগ করে। বৃহদশ্ব মুনি যুধিষ্ঠিরকে অক্ষবিদ্যা প্রদান করেন, কিন্তু তাহাতে যুধিষ্ঠিরের দুঃখের অবসান হয় নাই।

নল-উপাখ্যান যে সম্পূর্ণ রহস্যপূর্ণ, একটু পড়িলেই তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়, অনেক স্থলে মনে সন্দেহ হয়, ইহা দুই অর্থযুক্ত একটি আখ্যায়িকা। ধর্ম্ম লইয়া অথবা সম্বন্ধে মতভেদ লইয়া এই উপাখ্যানটি রচিত হইয়াছে, একটু পড়িলেই তাহা বুঝা যায়। পুষ্কর কলির কথায় নলকে দ্যূতে আহ্বান করিতে স্থির করেন।

এবমুক্তস্তু কলিনা পুষ্করো নলমভ্যয়াৎ।
কলিশ্চৈব বৃষোভূত্বা গবাং পুষ্করমভ্যগাৎ ॥

(৬-৫৯ বনপর্ব্ব)

টীকাকার গোবৃষ শব্দের অর্থ করিতেছেন ;—

গবাং বৃষঃ অত্র গো-শব্দো লক্ষিত-লক্ষণয়াঽক্ষশব্দবাচ্যেষু পাশেষু বর্ত্ততে, বৃষঃ শ্রেষ্ঠঃ পাশশ্রেষ্ঠো ভূত্বা।

অনুবাদক কিন্তু অন্য প্রকার অর্থ করিতেছেন—কলি পুষ্করকে এরূপ কহিলে, পুষ্কর নলের অভিমুখে গমন করিলেন এবং কলিও গোবৃষ হইয়া পুষ্করের সন্নিহিত হইল।

পরশ্লোকে কবি লিখিতেছেন,—

আসাদ্য তু নলং বীরং পুষ্করঃ পরবীরহা।
দিব্যাবেত্যব্রবীদ্‌ভ্রাতা বৃষেণেতি মুহুর্মুহুঃ॥

(৭-৫৯ বনপর্ব্ব)

এ স্থলেও টীকাকার, বৃষেণ শব্দের অর্থ করিতেছেন—অক্ষমুখ্যেন, অনুবাদকও এ শ্লোকের পূর্ব্বের ন্যায় অর্থ করিতেছেন, মহাবীরহন্তা ভ্রাতা পুষ্কর বীর নলের নিকট উপস্থিত হইয়া পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিলেন, আসুন আমরা উভয়ে বৃষকে পণ রাখিয়া দ্যূতক্রীড়া করি।

টীকা ও অনুবাদ হইতে মূলের অর্থ কিন্তু স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে না, টীকাকারের মতে পাশা হইল গোবৃষ অথবা উৎকৃষ্ট পাশা। অনুবাদকের মতে কলি বৃষরূপ ধারণ করিল এবং সেই বৃষই হইল পণের সামগ্রী। অনুবাদক যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা গ্রহণ করিতে অনেকেই অসম্মত হইবেন, কারণ, বৃষ (ষাঁড়) লইয়া যে পাশা খেলা হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ কোথাও নাই। পরের শ্লোকে কবি লিখিতেছেন—

ন চ ক্ষমে ততো রাজা সমাহ্বানং মহামনাঃ।
বৈদর্ভ্যাঃপ্রেক্ষমাণায়াঃ পণকালমমন্যত॥

(৮-৫৯ বনপর্ব্ব)

টীকাকার লিখিতেছেন, পণকালং—দ্যূতকালং, তাঁহার মতে পণকাল কথার অর্থ হইল, পণ রাখিবার কাল অথবা দ্যূতকাল। অনুবাদক অর্থ করিতেছেন, অনন্তর মহাত্মা নল নৃপতি দময়ন্তীর সমক্ষে পুষ্করের পুনঃ পুনঃ আহ্বান সহ্য করিতে পারিলেন না; সুতরাং সেই সময়কেই দ্যূতক্রীড়ার কাল বলিয়া বিবেচনা করিলেন।

হিরণ্যস্য সুবর্ণস্য যানযুগ্যস্য বাসসাম্।
আবিষ্টঃ কলিনা দ্যূতে জীয়তে স্ম নলস্তদা॥

(৯-৫৯ বনপর্ব্ব)

কলি কর্ত্তৃক আবিষ্ট নল তখন দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়া পুষ্করের নিকট ক্রমে ক্রমে সুবর্ণ, রজত, যান ও বস্ত্র পণ রাখিয়া পরাজিত হইতে লাগিলেন।

এ স্থলে বৃষ পণ রাখিয়া পাশা খেলায় কাহার হার-জিত হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ নাই। সেই কারণে অনুবাদক যে অর্থ করিতেছেন, তাহা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। টীকাকার গো-বৃষ শব্দের অর্থ উৎকৃষ্ট পাশা বলিয়াছেন, সে অর্থও গ্রহণ করিতে অনেকে ইতস্ততঃ করিবেন। তিনি গো-শব্দের অর্থ পাশা, এ কথা স্পষ্ট বলেন নাই, তবে প্রকারান্তরে পাশাপদবাচ্য হইতে পারে, তাহাই বলিয়াছেন।

গো আর বৃষ, এই দুইটি শব্দ মহাভারতে অসংখ্য স্থানে লিখিত আছে এবং কথা দুইটির অর্থেরও ইঙ্গিত যথেষ্ট দেওয়া আছে। গো, সুরভী, বাণী, বেদ এ সকলগুলিই সদৃশ অর্থবাচক। বৃষ অর্থে ধর্ম্ম; যেমন কপি অর্থে যোগজ ধর্ম্ম; রামচন্দ্র কপিবাহন; মহাদেব বৃষবাহন; যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতেছেন—

কৃষ্ণধর্ম্মস্ত্বমেবাদির্বৃষদর্ভো বৃষাকপিঃ।

(১০-৪৩, শান্তিপর্ব্ব)

কৃষ্ণধর্ম্মঃ—যজ্ঞাদিরূপঃ বৃষা ইন্দ্রস্তং দৃভ্নাতি স্তভ্নাতি ইতি।
বৃষদর্ভঃ—ইন্দ্রদর্পহন্তা
বৃষাকপিঃ—হরিহররূপী।

তাহা হইলে বৃষ অর্থে ষাঁড় নয়, পাশাও নয়, ধর্ম্ম অথবা ধর্ম্মসংক্রান্ত বিশেষ মত লইয়া বিচার—ইহাই হইল নল-উপাখ্যানের দ্যূতক্রীড়া। এ স্থলে কলি, বৌদ্ধ অথবা অবৈদিক মত পুষ্করের দেহে আবিষ্ট হইয়া ও পুষ্কর নলের সহিত অক্ষক্রীড়া অর্থাৎ বিচার করিল।

উপাখ্যানটি যে রহস্যপূর্ণ, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না; প্রধানতঃ কতকগুলি শব্দের পশ্চাতে এ রহস্যটি লুক্কায়িত আছে। অশ্ব, অশোক, ব্রাহ্মণ, দ্বিজ, শকুনি, অক্ষ, কলি প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ অবলম্বন করিয়া একটি গূঢ় ঘটনা অথবা দেশের এক সময়ের অবস্থা চিত্রিত বা আলোচনা হইতেছে, তাহা স্পষ্টই দেখা যায়। কিন্তু সে তত্ত্বটি কি, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন।

প্রথমে বলিয়াছি যে, কোন একটি স্বাভাবিক ঘটনা, দৃশ্য বা সামগ্রী আশ্রয় করিয়া মহাভারতে সকল আখ্যান লিখিত হইয়াছে। এ স্থলেও সেইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। নল হইলেন বীরসেনের পুত্র, তাঁহার ভ্রাতার নাম পুষ্কর।

ন্যাদ্বীরণং বীরতরং ; আর বীর অর্থে পুষ্কর মূল ও নল।
নলাদয়স্তৃণং গণ্ডূর্চ্ছামাক প্রমুখা অপি। (অমরকোষ)

এ স্থলে আমরা একটি তরু ও তাহার অংশ পাইলাম। এগুলিকে আশ্রয় করিয়া উপাখ্যানটি রচিত হইয়াছে; বীর, নল ও পুষ্কর এই তিনটিই একার্থবাচক অথচ উপাখ্যানে লিখিত আছে যে, নল ও পুষ্কর বীরসেনের পুত্র। এ স্থলে আমরা পুত্র কথা কি ভাবে ব্যবহৃত হয়, তাহারও উদাহরণ পাইলাম; পুত্র অর্থে ছেলে নয়, পুত্র অর্থে স্বরূপ ; এই ব্যাখ্যা পূর্ব্বে দেখিয়াছি শ্রুতিমূলক।

নল কথার আর এক অর্থ গন্ধ, ইহা হইতে নলিনী কথা উৎপন্ন হইয়াছে। ব্যাসমাতা সত্যবতী হইলেন গন্ধবতী এবং যোজনগন্ধা; দ্রৌপদী হইলেন ক্রোশগন্ধা; গন্ধ ও সুরভী উভয় অর্থই একভাবার্থক, বেদের সহিত ইহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। নলের পিতার নাম বীরসেন অর্থাৎ বীর-চিহ্ন; আর কলি যখন নির্য্যাতিত হইয়া নলের দেহ পরিত্যাগ করে, তখন সে এক বিভীতক বৃক্ষে পলায়ন করে। তাহা হইলে বীর শব্দের সহিত ধর্ম্ম ও ভীত শব্দের সহিত কলি অথবা পাপের সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায়। পুষ্করের বিশেষণ হইল পরবীরহন্তা, আর নল হইলেন বীর। (বয়ড়া গাছকে বিভীতক বলে)

নল ও পুষ্কর কথার যদি এক অর্থ হয়, তবে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ বা বিবাদ কেন ? আমরা পরে পাপলিপ্ত ভাব প্রকাশ করিতে শোণিত, পুঁয কথা পাইব। তথাপি পূতিকর অথবা পুঁষকর শব্দ হইতে পুষ্কর কথা সাধিত হইয়াছে, তাহা বলা কঠিন; অথচ নল ও পুষ্কর এই দুইটি শব্দের মধ্যে প্রভেদ যে আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মনে হয়, প্রথমে দুই ভ্রাতায় একমতাবলম্বী ছিলেন; পরে কলির অর্থাৎ অবৈদিক মতের প্ররোচনায় পরস্পরের বিরোধ হয়। কিন্তু এ স্থলে রহস্যটি স্পষ্ট দেখা গেল না; বোধ হয়, আরও কিছু কথা আছে। নল ও দময়ন্তী এই দুইটি শব্দেই পরস্পরবিরোধী দুইটি ভাবের ইঙ্গিত আছে, এখনই দেখিতে পাইব।

নলকে নিষধ দেশের রাজা করা হইয়াছে, নিষধ কথা নি+সদ্+অল্ হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। নিষাদ নি+সদ্ ধাতু ঘঞ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই দুইটি কথার সাদৃশ্য দেখিয়া মনে হয়, যেন পরস্পরের মধ্যে কোন সম্বন্ধ আছে। নিষাদ অর্থে চণ্ডাল, পরে দেখিব অবৈদিক অথবা বৌদ্ধমতাবলম্বীদিগকে চণ্ডাল বলিত। অপর পক্ষে সদ্ অর্থে পাপ, এই অর্থে পুণ্যশ্লোক নামে নিষ্পাপ কথার ইঙ্গিত আসে; তাহা হইলে নিষধরাজ কথায় দুই প্রকার অর্থের ইঙ্গিত পাওয়া যায় নিষ্পাপ ও চণ্ডাল, বৈদিক ও অবৈদিক।

নিষধ দেশ সম্বন্ধে আর এক স্থানে আমরা যেন একটু ইঙ্গিত পাই। "ইন্দ্র শত্রুগণের বিনিগ্রহার্থে নিষধ দেশ প্রাপ্ত হইয়া তখন গিরিপ্রস্থ আশ্রমে প্রচ্ছন্নরূপে বাস করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন।" ইন্দ্র, নিষধ দেশ ও কৃতকার্য্য এই তিনটি কথা একত্র করিলে নিষধ দেশ যজ্ঞের অনুকূল বলিয়াই মনে হয়।

দময়ন্তী কথার মূলে যে রহস্য আছে, তাহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার মাতামহের নাম দামন, দমন নামে এক ঋষির বরপ্রভাবে তাঁহার পিতার তিন পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। পুত্র কন্যাগুলির সকলেরই নামে দম কথা আছে; কি ভাব অবলম্বন করিয়া দময়ন্তী কল্পিত হইয়াছে, তাহা অনুমান করা প্রথমে কঠিন বলিয়া মনে হয় না।

বেদানাং উপনিষৎ সত্যং, সত্যস্য উপনিষৎ দমঃ।

অন্তর ও বহিরিন্দ্রিয় নিগ্রহের নাম দম, তাহা হইলে মনে হয় দময়ন্তী বেদাভিমানিনী দেবতার কল্পনা; কিন্তু নল সম্বন্ধে যে প্রশ্ন উঠে, দময়ন্তী সম্বন্ধেও মনে সেইরূপ প্রশ্ন উদয় হয়। নলের সহিত নিষাদ কথার একটু দূর সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে সন্দেহ হয়। দময়ন্তী সম্বন্ধেও এইরূপ সন্দেহের কারণ আছে। দময়ন্তী হইলেন বিদর্ভ-রাজকন্যা, মধ্য-ভারতবর্ষে বর্ত্তমান বেরার প্রদেশকে অনেকে বিদর্ভ বলিয়া মনে করেন। বিদর্ভ শব্দ অনেক প্রকারে নিষ্পন্ন করা যাইতে পারে। বিদ্+অর্ভ=বিদর্ভ; জ্ঞানে শিশুসদৃশ অর্থাৎ জ্ঞানহীন। পূর্ব্বে অম+বালিকা= অম্বালিকা নামেও এই ভাব দেখিতে পাওয়া গিয়াছে; তাহা হইলে দময়ন্তী নামের সহিত অজ্ঞানতা অথবা অবৈদিকতার সহিত যেন একটু সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে সন্দেহ হয়। কিন্তু এ যুক্তির বিপক্ষেও বলিবার কথা আছে; বি+দর্ভ এইভাবে বিদর্ভ কথা সাধিত হইতে পারে।

দর্ভ অর্থাৎ কুশলক্ষণ হেতু যজ্ঞের সহিত বিদর্ভ কথার সম্বন্ধ থাকিতে পারে ; পর্ব্বতের নিকট দময়ন্তী নিজ পিতার পরিচয় দিতেছেন, 'সম্যক্ গোপ্তা বিদর্ভানাং' ; তিনি বিদর্ভদিগের সম্যক্ পালনকর্ত্তা। বিদর্ভের আর এক নাম কুণ্ডিন নগর, কুণ্ডিন কথা হইতে যজ্ঞ-কুণ্ড কথা মনে আসে ; চার্ব্বাকের নাম কুণ্ডকীট ; তাহা হইলে দময়ন্তী নামের সহিত যজ্ঞপন্থার কিছু সম্পর্ক আছে, তাহা বেশ বুঝা যায়। স্থানান্তরে লিখিত আছে :—

কুণ্ডোদঃ পর্ব্বতো রম্যো বহুমূলফলোদকঃ।
(২৫-৮৭, বনপর্ব্ব)
নৈষধস্তৃষিতো যত্র জলং শর্ম্ম চ লব্ধবান্॥
(২৬-৮৭, বনপর্ব্ব)

বহুমূল ফল, জলসম্পন্ন ও মনোরম্য কুণ্ডোদ নামে এক পর্ব্বত রহিয়াছে, যেথানে নিষধাধিপতি নল তৃষিত হইয়া জল প্রাপ্ত হন এবং স্বাস্থ্যলাভ করেন। এ স্থলে জল, তৃষ্ণা ও স্বাস্থ্যলাভ এই সকল কথা যে সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই, তাহা এক প্রকার নিশ্চয় ; কি ভাবের তৃষ্ণা নিবারিত হইয়াছিল, তাহারও যেন কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

নল-দময়ন্তীর অনুরূপ আমরা আর দুইটি নাম পাই, বশিষ্ঠ-মদয়ন্তী। দময়ন্তী হইল ইন্দ্রিয়নিগ্রহের প্রতিমূর্ত্তি, মদয়ন্তী হইল তাহার বিপরীত। বশিষ্ঠ-কথা হইতে ইন্দ্রিয়-বিজয়ের অর্থ প্রকাশ পায় ; মদয়ন্তী কথা হইতে ইন্দ্রিয়-সেবার ভাব আসে। দময়ন্তী শব্দ হইতেও বশিষ্ঠ ভাবের সাদৃশ্য আসে। তাহা হইলে নল কথা হইতে ইন্দ্রিয়সেবার কল্পনা মনে হয়। স্থানান্তরে আমরা অক্ষ শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়গণ শোভন দেখিতে পাই, নল রাজার দ্যূতে আসক্তি ছিল, তাহা যদি হয়, কুণ্ডোদ পর্ব্বতে নল কি প্রকারে জল পান করিয়া স্বাস্থ্যলাভ করিয়াছিলেন, তাহার এক প্রকার অর্থ ইন্দ্রিয়সেবারূপ তৃষ্ণানিবারণ এইরূপ অর্থ অসম্ভব নয়। আমার বোধ হয়, কুণ্ডোদ পর্ব্বতের সহিত যজ্ঞপন্থার সম্বন্ধ আছে। নল-দময়ন্তীর পুত্র-কন্যার নাম ছিল ইন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেনা ; উপরে নিষধ দেশের সহিত ইন্দ্রের সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। দময়ন্তী সম্বন্ধে আরও একটু কথা আছে, দক্ষপ্রজাপতির ক্রোধ, অশ্ব, দম প্রভৃতি সাতটি পুত্র ছিল। অশ্ব কথার অর্থ কি, তাহা এখনই দেখিতে পাইব। দক্ষপুত্র দমের সহিত যদি দময়ন্তী নামের কোন সম্বন্ধ থাকে, তাহা হইলে দময়ন্তীর উপর যেন একটু অবৈদিকতার ছায়া পড়ে। দক্ষ কল্পনা পরে বুঝিতে চেষ্টা করিব, নল ও দময়ন্তী উভয়েরই সহিত অবৈদিক ভাবের সম্পর্ক আছে, এ সন্দেহ এককালে মন হইতে দূর হয় না। নল যখন রাজা ঋতুপর্ণের নিকট থাকিতেন, তখন তিনি বাহুক নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন ; দময়ন্তী চেদিরাজ সুবাহুর গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বাহু কথার সহিত দময়ন্তী শব্দের একটু সম্বন্ধ আছে। "ভুজ বাহুপ্রবিষ্টৌ দোঃস্বাং" এই দোঃ শব্দ দম ধাতু দোস্ প্রত্যয় করিয়া হইয়াছে, দমন করা !

বলা বাহুল্য, নল ও পুষ্করের অক্ষক্রীড়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিচারের রূপান্তর মাত্র। গো ও বৃষ লইয়া অর্থাৎ বেদ ও ধর্ম্ম লইয়া বিবাদ চলিতেছিল। ত্রেতা ও দ্বাপরের সন্ধিকালে পরশুরাম পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেন ; দ্বাপর ও কলির সন্ধির সময় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয় ; আর যখন নল ও পুষ্করের সহিত অক্ষক্রীড়া হইতেছিল, তখন দ্বাপরের সহিত কলির সন্ধি হইয়াছিল।

নল-দময়ন্তীর উপাখ্যান হইতে সে সময়ে দেশের অবস্থা সম্বন্ধে যথেষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আমরা পূর্ব্বে বেদ অনধ্যায়ী ব্রাহ্মণের কথা পাইয়াছি, স্বশাখা পরিত্যাগী ব্রাহ্মণ দেখিয়াছি। পরিত্যাগের ফলে অনাবৃষ্টি হয়, তাহাও দেখিয়াছি ; বিবিধ বেদবাদ (বিবাদ) কুৎসিৎ বৈরিতা (কুবের) তাহাও দেখিয়াছি। নল-দময়ন্তী উপাখ্যানে সমাজ সম্বন্ধে আরও অধিক পরিচয় পাইব। কর্কোটক নাগ নলকে বর প্রদান করেন, তিনি বলিয়াছিলেন, বেদবিদ্‌গণের নিকট হইতে তোমার কোন ভয় থাকিবে না।

ন তে ভয়ং নরব্যাঘ্র দংষ্ট্রিভ্যঃ শত্রুতোঽপি বা।
ব্রহ্মবিদ্ভ্যশ্চ ভবিতা মৎ প্রসাদান্নরাধিপ॥
(১৮-৬৬, বনপর্ব্ব)

হে নরাধিপ ! আমার প্রসাদাৎ দংষ্ট্রী, শত্রু ও বেদবিৎ ব্যক্তিগণ হইতে আপনার ভয় থাকিবে না।

নলরাজা সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ পাঠ করিয়াছিলেন, অশ্বমেধ প্রভৃতি নানা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ; বেদবিদ্‌গণ

ইতে তাঁহার ভয়ের কারণ কি ছিল? এ প্রশ্ন একটু আলোচনা করিলে সে সময়ে দেশে বৈদিক মত লইয়া ... প্রকার বিবাদ ও সম্প্রদায়-ভেদ হইতেছিল, তাহা কিছু বুঝা যায়।

'ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি', ইহা হইল শ্রুতির কথা। যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি নিজেই ব্রহ্ম হন। কিন্তু ব্রহ্মবিৎ শব্দের অর্থ বেদবিৎ হইতে পারে, যেমন ব্রহ্মঘোষ, ব্রহ্মবিন্দু ইত্যাদি। তাহা হইলেও প্রশ্ন উঠিতে পারে, বেদবিদ্‌গণ হইতে নলের ভয়ের কারণ কি? যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন বেদ জানিলেও সম্পূর্ণ অথবা শুদ্ধ জ্ঞান হইত না। বেদের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে মতভেদ হইত, সেই মতভেদের ফলে বিবাদ ও বিরোধ চলিত। বোধ হয় সম্প্রদায়েরও গঠন হইত। জনক সম্বন্ধে ভীষ্ম বলিতেছেন :—

সন্ন্যাসফলিকঃ কশ্চিদ্বভূব নৃপতিঃ পুরা।
মৈথিলো জনকো নাম ধর্ম্মধ্বজ ইতি শ্রুতঃ॥
(৪-৩২০, শান্তিপর্ব্ব)

পুরাকালে মিথিলা দেশে সন্ন্যাসফলদর্শী জনক নামে কোন ভূপতি ছিলেন, তিনি ধর্ম্মধ্বজ বলিয়া বিখ্যাত আছেন। পরে তাঁহার সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন :—

তস্য বেদবিদঃ প্রাজ্ঞাঃ শ্রুত্বা তাং সাধুবৃত্ততাম্।
(৬-৩২০, শান্তি পর্ব্ব)

প্রাজ্ঞ পুরুষগণ সেই বেদবিদ্ ভূপতির সাধুবৃত্ততা শ্রবণ করিয়া সকলেই তাঁহার সেই চরিত্রের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিল।

এ স্থলে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, জনক বেদবিৎ অথচ ধর্ম্মধ্বজী; তাঁহার আর এক বিশেষণ—"সন্ন্যাসফলিকঃ অর্থাৎ সন্ন্যাসফলদর্শী।" জনকের মুখে প্রায়ই "মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে লাভোঃ ন মে ক্ষতিঃ" মিথিলা পুড়িয়া গেলেও আমার লাভ কিংবা ক্ষতি নাই এই কথা শুনিতে পাওয়া যাইত। জনক মিথিলার অধিপতি হইয়াও নিজেকে নির্লিপ্তের ন্যায় জ্ঞান করিতেন। তিনি বলিতেন, রাজা হইয়াও সন্ন্যাসিতুল্য হওয়া যায়। যে অধ্যায়ে উপরের শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই অধ্যায়ে জনক সুলভা নামে একটি স্ত্রীলোকের নিকট এইরূপ মতের জন্য বিশেষ লাঞ্ছনা প্রাপ্ত হন এবং সুলভা যুক্তি দ্বারা জনকের ভ্রম দেখাইয়া দেন। এখানে একটু রহস্য আছে, সুলভা কথাটি বোধ হয়, সুরভী কথার রূপান্তর। "রলয়োরভেদাৎ" তার পর স্ত্রীত্বাৎ ঈপ না করিয়া আপ করিলে বোধ হয় সুরভী ও সুলভা একই কথা বলিয়া নিষ্পন্ন হইতে পারে। তাহা হইলে বোধ হয় এই ভাবে অর্থ করা যায় যে, জনক বেদজ্ঞ হইলেও ভ্রান্তমতাবলম্বী ছিলেন, বেদের প্রমাণ দ্বারা তাঁহার ভ্রান্তমত খণ্ডিত হইল। এই হইল এক প্রকার বেদবিৎদিগের উদাহরণ।

যানঙ্গিরাঃ ক্ষত্রধর্ম্মানুতথ্যো ব্রহ্মবিত্তমঃ।
মান্ধাত্রে যৌবনাশ্বায় প্রীতিমানভ্যভাষত॥
(১-৯০, শান্তিপর্ব্ব)

ব্রহ্মবিত্তম উতথ্য যুবনাশ্ব-পুত্র মান্ধাতার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অঙ্গিরা সম্বন্ধীয় যে সকল ক্ষাত্রধর্ম্ম কহিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে যে প্রকারে অনুশাসিত করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত আমি তোমাকে সম্পূর্ণরূপে কহিতেছি। এ স্থলে উতথ্যের বিশেষণ হইল ব্রহ্মবিত্তম, উতথ্যের পরিচয় পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। ইনি বৃহস্পতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ইঁহার স্ত্রী মমতা (অবিদ্যা); তাঁহার গর্ভে ভরদ্বাজ ও দীর্ঘতমার জন্ম হয়। উ বিতর্কে তথ্যং সত্যং; সত্য সম্বন্ধে সন্দেহ আছে, সেই প্রকার মতের অভিমানী পুরুষের নাম উতথ্য। উতথ্যের বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে ব্রহ্মবিত্তম বেদজ্ঞ অথচ বেদের প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে সন্দেহ হয়। উতথ্য বর্ণনায় বোধ হয়, সেই ভাব প্রকাশ পায়। এই হইল আর এক প্রকার ব্রহ্মবিদের উদাহরণ।

বেদবিদ্বেদ ভগবান্ বেদাঙ্গানি বৃহস্পতিঃ।
ভার্গবো নীতিশাস্ত্রং তু জগাদ জগতো হিতম্॥
(২০-২১০, শান্তিপর্ব্ব)

বেদবিৎ ভগবান্ ব্রহ্মা বেদ এবং বৃহস্পতি বেদাঙ্গ সমুদয় বিজ্ঞাত হইয়াছিলেন, অসুরাচার্য্য ভার্গব জগতের হিতকর নীতি-শাস্ত্র কহিয়াছেন।

এ স্থলে বৃহস্পতিকে বেদাঙ্গবিৎ বলা হইয়াছে, বেদবিৎ নহে, অথচ বৃহস্পতি হইলেন দেবগণের আচার্য্য। ভারতবর্ষের ইতিহাস বুঝিতে হইলে বৃহস্পতি-রহস্যের মর্ম্ম বুঝা

প্রয়োজন। যিনি বৃহস্পতি তিনিই শুক্র, অর্থাৎ যিনি দেবগণের গুরু তিনি আবার দৈত্যগণের গুরু ; এখনই দেখিব, অসুররাও বেদজ্ঞ হইত। যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে বৃত্র সম্বন্ধে বলিতেছেন :—

"ধার্ম্মিকো বিষ্ণুভক্তশ্চ তত্ত্বজ্ঞশ্চ পদান্বয়ে"।

(৪-২৮০, শান্তিপর্ব্ব)

বৃত্র ধর্ম্মিষ্ঠ, বিষ্ণুভক্ত এবং বেদান্তবাক্যার্থবিচার-বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞ।

পদান্বয়ে—ব্যক্তদর্শন বেদান্তবাক্যার্থবিচারে। এ স্থলে আমরা আর এক প্রকার বেদবিৎ দেখিতে পাইলাম।

যেন তৃপ্যত্যভুঞ্জানো যেন তৃপ্যত্যবিত্তবান্।
যেনাস্নেহো বলং ধত্তে যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥

(১৮-২৫০, শান্তিপর্ব্ব)

অভুঞ্জান মানব যাঁহার দ্বারা তৃপ্ত হন, বিত্তহীন ব্যক্তি যাঁহার দ্বারা বলবান হয়, যিনি সেই ব্রহ্মকে জানেন, তিনিই বেদবিৎ। এ স্থলে বেদপাঠের সহিত বেদবিৎ কথার কোন সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না। এই হইল আর এক শ্রেণীর বেদবিৎ।

বজ্রহস্তশ্চ বিক্ষন্তী চমুস্তম্ভন এব চ।
বৃত্তাবৃত্তকরস্তালো মধুর্নধুকলোচনঃ ॥

(৭৩-১৭, অনুপর্ব্ব)

"তালঃ সংসারসিন্ধোস্তলমাধারং স্থানং বেত্তীতি তালঃ শুদ্ধব্রহ্মবিৎ" তল শব্দ হইতে তাল শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। তল, গাধ, পার এ তিন শব্দই অনুরূপ অর্থবাচক, এই তিন শব্দ হইতেই সীমা ভাবের ইঙ্গিত আসে—সসীম ভাবকে আসুরিক ভাব বলে।

এ স্থলে শিবের বিশেষণ তাল ; টীকাকার তাল শব্দের অর্থ করিয়াছেন শুদ্ধব্রহ্মবিৎ। তাল বেতাল উভয়েই পরিচিত শব্দ ; শিবের অনুচর শ্মশানবিহারী প্রেতযোনি। ব্রহ্মবিৎ শব্দের অর্থ করিলে নলের ব্রহ্মবিদ্গণ হইতে ভয়ের কারণ কতকটা বুঝা যায়। তবে সন্দেহ হয়, উহা অপেক্ষা নিগূঢ় অর্থ থাকিতে পারে। শৈবদিগের সহিত বৌদ্ধমতের নিকটসম্বন্ধ ছিল, সে কথা পরে আলোচনা করিব। মহাভারতের সময়ে দেশে বেদ লইয়া কিরূপ বিরোধ চলিতেছিল, উপরে উদ্ধৃত শ্লোকগুলি হইতে তাহার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। এ স্থলে কোন প্রকার বেদজ্ঞ, কর্ত্তৃক শৈব সম্প্রদায়ের প্রতি কটাক্ষ বলিয়া মনে হয়।

পূর্ব্বে লিখিয়াছি, নল-দময়ন্তী উপাখ্যানের রহস্য গুটিকতক কথার পশ্চাতে লুক্কায়িত আছে। সে কথাগুলির মধ্যে অশ্ব অশোক কথা দুইটি প্রধান। অশ্ব ও অশোক ইহাদের মধ্যে অতি নিকট সম্পর্ক আছে, যখন দেবাসুরগণ পৃথিবীতে আসিতে স্থির করিলেন, তখন অশ্ব অসুর, অশোক নামে নরপতি হইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিলেন।

অশোকনামো রাজাভূন্মহাবীর্য্যোঽপরাজিতঃ।

(৭-৪, শান্তিপর্ব্ব)

শ্রীমান্ মহাসুর অশ্ব অশোক নামে মহাবলপরাক্রান্ত দুর্জ্জয় নরপতি হইয়া জন্মিলেন।

এই নরপতি অশোক কে? এ বিষয়ে দুই প্রকার মত হইতে পারে, প্রথম এই অশোক স্বনামখ্যাত সম্রাট্ অশোককে উদ্দেশ্য করিয়া লিখিত হইয়াছে ; দ্বিতীয় অশোক অর্থে বৌদ্ধ অথবা অবৈদিক মতের অভিমানী কল্পিত পুরুষ, এই প্রকার সাধারণ ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। আমার বোধ হয়, উভয় ভাবেই কথাটার প্রয়োগ হইয়াছে। যেমন কাশী কথায় ঐ নামের প্রসিদ্ধ পুরী বুঝায় এবং ঐ কথায় যজ্ঞাভিমানী স্থানকেও বুঝায় ; সেইরূপ অশোক শব্দ অশোক নামে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধসম্রাট্ ও অবৈদিক মত উপলক্ষিত কল্পিত পুরুষ এই দুই ভাবেই গ্রহণ করা যায়। সম্রাট্ অশোকের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচয় মহাভারতে নাই, তবে অশোকের নাম কোথাও কোথাও পাওয়া যায়। কোন সময়ে পৃথিবীর শত শত রাজা কলিপ্রদেশে রাজা চিত্রাঙ্গদের রাজধানী সৌভাগ্য রাজপুর নামক নগরে কন্যালাভার্থী হইয়া স্বয়ম্বর স্থলে সমাগত হইলেন। সেই সভায় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে জনকয়েকের নামের উল্লেখ প্রয়োজন। দুর্য্যোধন কর্ণকে লইয়া উপস্থিত হন, আর সে স্থানে উপস্থিত ছিলেন জরাসন্ধ, শিশুপাল, ভীষ্মক, বক্র কপোতরোমা, নীল, রুক্মী, মহারাজ শৃগাল, শতধন্বা, অশোক, ভোজরাজ, তদ্ভিন্ন দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও উত্তরদেশীয় বহুসংখ্যক ম্লেচ্ছাচার্য্য রাজগণ।

স্মরণ রাখিতে হইবে, কলিপ্রদেশে এই ঘটনা ঘটিতেছিল।

এ স্থলে অশোককে যে দলে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে অনেককেই অবৈদিক না বলিলেও অবৈদান্তিক মতাভিমানী বলা যাইতে পারে। জরাসন্ধ কথার ব্যুৎপত্তি বুঝিবার সময় মতের সহিত অসুর দৈত্য সম্বন্ধ বুঝিতে পারিব।

উপরে লিখিত হইয়াছে, অশ্বাসুর অশোক হইয়া জন্মগ্রহণ করেন; অশ্বাসুরের বিশেষ পরিচয় মহাভারতে নাই; তবে যেটুকু আছে, তাহা হইতে কল্পনার মূল কি, তাহা কতকটা বুঝা যায়। আমরা অশ্বাসুরকে উদ্দেশ করিয়া হয়গ্রীব অসুরকে দেখিতে পাই; এই অসুর হইল বেদ-অপহারী হয়গ্রীব। (৫০-১৩০, উদ্যোগপর্ব্ব)

অশ্বগ্রীব বিষ্ণুদ্বেষ্টা অসুর ছিল; আমরা স্থানান্তরে সুমহাস্বনঃ বেদগর্জ্জিতঃ হয়গ্রীবঃ দেখিতে পাই। (১৩৮-১৭, অনুপর্ব্ব)

আমরা হৈহয় দেখিতে পাই "হৈহয়স্যৈব নামান্তরং বীতহব্য" ইতি। (১০-১৩, শান্তিপর্ব্ব)

হৈহয় কথার নামান্তর বীতহব্য; বীতহব্য কথার অর্থ যজ্ঞত্যাগী। এই হৈহয়গণের সহিত কলহসূত্রে পরশুরাম ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস করেন। সহস্র অশ্বমেধ করিলে ইন্দ্রত্ব লাভ হয়, অর্থাৎ বৌদ্ধ অথবা অবৈদিক কিংবা যজ্ঞবিরোধী মত খণ্ডন করিলে ইন্দ্রত্ব প্রাপ্তি হয়। ব্রহ্মহত্যা করিলে অশ্বমেধযজ্ঞ করিতে হয়, অর্থাৎ বেদ নষ্ট করিলে অথবা বৈদিকমত খণ্ডন করিলে অশ্বমেধ অর্থাৎ বৌদ্ধমত খণ্ডন করিতে হয়। সগর রাজার পুত্রেরা কপিল মুনির পশ্চাতে অশ্ব লুক্কায়িত রাখেন; বাস্তবিক কপিল মুনি অশ্ব চুরি করেন নাই। ইহা একটি সুন্দর দার্শনিক কল্পনা। সাগর হইল অসুরালয়, অনেকে বলেন, বৌদ্ধমত সাঙ্খ্যমতের রূপান্তর, এই কল্পনা হইতে মনে হয়, উহা আরোপণ মাত্র—প্রকৃত নয়। সাঙ্খ্যমত নিরীশ্বর হইতে পারে, কিন্তু উহা বেদবিরোধী নয়; বৌদ্ধদিগের সহিত নিরীশ্বরতা লইয়া সম্বন্ধ থাকিতে পারে, কিন্তু অপর কোন অংশে সম্পর্ক নাই। স্থানান্তরে আমরা দেখিব, কপিল মুনি হায় গো অর্থাৎ হায় বেদ বলিয়া আক্ষেপ করিতেছেন। হয়শিরারূপে পরমাত্মা কল্পিত হইয়াছেন।

অহং হয়শিরা ভূত্বা সমুদ্রে পশ্চিমোত্তরে।
পিবামি সুহুতং হব্যং কব্যঞ্চ শ্রদ্ধয়ান্বিতম্॥

(১০।৩৩৭, শান্তিপর্ব্ব)

এ স্থলে একটু রহস্যের কথা মনে হয়। ব্রহ্মের রূপ হয়শিরোধর বলিয়া কল্পিত আছে; হয়শিরা হয়শীর্ষ এই দুই কথার প্রায় এক অর্থ হয়, কিন্তু হয়শিরোধর কথার ভিন্ন তাৎপর্য্যও হইতে পারে। হয়শিরোধর শব্দটি বোধ হয় কথার লেখার উদাহরণ, এক অর্থ হয়শিরের মূর্ত্তিধারী আর এক অর্থ যিনি হয়শিরকে ধারণ করিয়া আছেন।

কালী কথার অর্থ পরমাত্মা, কালীপ্রতিমার হাতে নরমুণ্ড থাকে, ঐ নরমুণ্ড ধারণ হয়শিরোধারী পরমাত্মার অনুকরণ কি না, তাহা চিন্তা করিবার বিষয়। অশ্বসম্বন্ধে কথা পরে বলিবার আছে।

উপরে বলিয়াছি, নলোপাখ্যান পড়িতে পড়িতে সন্দেহ হয় যে, ইহা একখানি দুই অর্থবাচক রচনা; কবি প্রথম শ্লোকেই বলিতেছেন :—

আসীদ্রাজা নলো নাম বীরসেনসুতো বলী।
উপপন্নো গুণৈরিষ্টৈ রূপবান্ অশ্বকোবিদঃ॥

(১-৫৩, বনপর্ব্ব)

বীরসেনের পুত্র নল নামে এক মহীপাল ছিলেন। তিনি রূপ,বল ও উৎকৃষ্ট গুণসমূহে উপপন্ন হইয়াছিলেন এবং অশ্বের পরীক্ষা ও পরিচালনবিষয়ে তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল।

বীর, বলী এই দুই কথার দুই প্রকার অর্থ হয়, তাহা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। ইষ্ট কথা ইজ ধাতু এবং ইষ ধাতু হইতে সাধিত হইতে পারে, এক অর্থে নল হইলেন অভিলষিত গুণের দ্বারা অর্থাৎ সদ্‌গুণের দ্বারা ভূষিত; অপর অর্থে যজ্ঞাদি ক্রিয়ারূপ গুণের দ্বারা ভূষিত। রূপবান্ বলিলে দেহের রূপ বুঝায়, কিন্তু রূপবান্ শব্দের অন্য প্রকার অর্থও হইতে পারে।

কুবেরের কুরূপ ও সুপর্ণের সুরূপ স্মরণ হয়, নল রাজা কুরূপ হন। অশ্ববিদ্ ও অশ্বকোবিদ শব্দে একটু রহস্য আছে, ইহা দুই ভাবে লিখিতে পারা যায়। অশ্বকোবিদ এবং অশ্বকো—বিদ্; প্রথম ভাবে দেখিলে শব্দটির অর্থ হয়, অশ্বশাস্ত্রবিশারদ; দ্বিতীয় ভাবে দেখিলে অন্য পর্য্যায় অশ্বকঃ অর্থে অশ্বতুল্য দেববিশেষ। পূর্ব্বে অশ্বক শব্দের অর্থ দেখিয়াছি; অশ্ব শব্দে স্বার্থে ক প্রত্যয় করিলে অশ্বক কথা সাধিত হইতে পারে।

নলরাজা যজ্ঞকারী বেদজ্ঞ ছিলেন, অথচ অশ্বকোবিদ ছিলেন ; ইহা তৎকালের দেশের চিত্রের এক অংশ। উপাখ্যানমধ্যে নলের অশ্বজ্ঞানের কথা বিশেষরূপে ও বারংবার লিখিত আছে। যখন বাহুকরূপে তিনি বিদর্ভ-নগরে রাজা ঋতুপর্ণের সারথি হইয়া গমন করেন, কবি লিখিতেছেন—

স মোক্ষয়িত্বা তানশ্বান্ পরিচর্য্য চ শাস্ত্রতঃ।

(৩১ ৭৩, বনপর্ব্ব)

নলরাজা স্বয়ং অশ্ব সকলের মোক্ষণ, যথাশাস্ত্রতঃ পরিচর্য্যা ও তাহাদিগকে আশ্বাসিত করিয়া রথ-ক্রোড়ে উপবেশন করিলেন। সহিসে ঘোড়া দলা-মলা করে, যন্ত্রতঃ বলিলে কথাটা সহজে বুঝা যাইত, শাস্ত্রতঃ কথা কবি কেন ব্যবহার করিলেন ?

যখন দময়ন্তী উন্মাদিনীর ন্যায় বনমধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন, তখন তিনি যাহাকে দেখিতেছেন, তাহাকে নিজের ও নলের পরিচয় দিতেছেন, এই পরিচয়ে দময়ন্তী যে কি কল্পনা আশ্রয় করিয়া চিত্রিত হইয়াছে, তাহার যেন কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। দময়ন্তী নলকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন—

কং নু পৃচ্ছামি দুঃখার্ত্তা ত্বদর্থে শোককর্ষিতা।

(২৮-৬৪, বনপর্ব্ব)

ইহার দুই অর্থ হইতে পারে, এক অর্থ হে মদীয় শোকবর্দ্ধন মহারাজ! তুমি কোথায় গমন করিয়াছ; তাহা জানিবার নিমিত্ত আমি কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব। দ্বিতীয় অর্থ হইতে পারে, তোমার কারণে অশোকের দ্বারা ক্লিশ্যমানা (ত্বদর্থে অশোককর্ষিতা) অতএব দুঃখার্ত্তা যে আমি কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব। ত্বদর্থে শোককর্ষিতা ও ত্বদর্থে অশোককর্ষিতা এই দুই ভাবেই দেখিতে পারা যায়।

দময়ন্তী বনমধ্যে এক পর্ব্বত দেখিলেন, উহাকে তিনি গিরিরাজ অচলশ্রেষ্ঠ, পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ বলিয়া সম্বোধন করিলেন ; তিনি বলিলেন—

গিরা নাশ্বাসয়স্যদ্য স্বাং সুতামিব দুঃখিতাম্।
বীরবিক্রান্ত ধর্ম্মজ্ঞ সত্যসন্ধ মহীপতে॥

(৫৬-৬৪, বনপর্ব্ব)

হে গিরিবর! আমি দুঃখিত হইয়া একাকিনী বনমধ্যে বিহ্বলচিত্তে বিলাপ করিতেছি, তুমি আমাকে স্বীয় দুহিতার ন্যায় কি জন্য আশ্বাস প্রদান করিতেছ না ?

গিরিরাজ কিম্বা গিরিশ্রেষ্ঠ হইল হিমালয়ের নাম, হিমালয়ের অর্থ পূর্ব্বে দেখিয়াছি ; যিনি অচেতনকে সচেতন করেন, তাঁহার নাম গিরি। এ স্থলে হিমালয়ের বিশেষণ ধর্ম্মজ্ঞ ও সত্যসন্ধ ; সত্য ও বেদ প্রায় একই কথা। হিমালয়ের কন্যার নাম উমা, 'উমা চ ব্রহ্মবিদ্যা' ; ব্রহ্মবিদ্যার নাম উমা। তাহা হইলে দময়ন্তী হইলেন ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিমূর্ত্তি। স্থানান্তরে দেখিতে পাই, দময়ন্তীর বিশেষণ হইল—"সুদ্বিজাননা" (৬৬-৬৪, বনপর্ব্ব) ইহার এক অর্থ হয় চন্দ্রাননা, আর এক অর্থ সুব্রাহ্মণ যাহার মুখস্বরূপ। "দময়ন্তী উন্মত্তারূপা শোকার্ত্তা" অথবা "উন্মত্তারূপা অশোকার্ত্তা", অশোক কর্ত্তৃক উৎপীড়িতা, অতএব উন্মত্তরূপা। চেদিরাজকন্যা সুনন্দা নিজ-মাতাকে বলিতেছেন—

জনিত্র্যাঃ কথয়ামাস সৈরিন্ধ্রী রুদতী ভৃশম্।
ব্রাহ্মণেন সমাগম্য তাং বেদ যদি মন্যসে॥

(৩৪-৬৮, বনপর্ব্ব)

মাতঃ সৈরিন্ধ্রি! এক ব্রাহ্মণকে দেখিয়া তাঁহার নিকট অত্যন্ত রোদন করিতেছেন, যদি আপনার মত হয়, তাহা অবগত হউন।

টীকাকারক বেদ কথার এই ভাবে অর্থ করিতেছেন—

বেদ বিচারয়। বেদয়তে বিদং রূপং নিজভাব আর্ষঃ। আর্ষ-প্রয়োগের সাহায্য লইয়া টীকাকার বেদ অর্থের বিচার করিয়াছেন। মহাভারতে অনেক স্থলে বেদ কথার এরূপ ভাবে প্রয়োগ আছে যে, উহা দুই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে সন্দেহ হয়, সেরূপ উদাহরণ পরে অনেক পাইব। "সৈরিন্ধ্রী ব্রাহ্মণেন সমাগম্য ভৃশং রুদতী, তাং বেদ ইতি মন্যসে জানাসি" এইরূপ অর্থ করিলে দময়ন্তী ও বেদ উভয়ের একতাৎপর্য্য হয়।

নল-উপাখ্যানে ব্রাহ্মণের কিছু বাড়াবাড়ি দেখিতে পাওয়া যায় ; হংস, শকুনি ইহারা উভয়েই দ্বিজ ; এ কথাটি ব্রাহ্মণ নামের রূপান্তর। তবে হংসের চেষ্টায় নল দময়ন্তীর মিলন হয় আর শকুনির চেষ্টাফলে তাহার বিপরীত হয়, হংস শব্দের পশ্চাতে যে রহস্য আছে, কবি তাহার ইঙ্গিত অনেক স্থলে দিয়াছেন।

হংস মোক্ষবিৎ।

হংস ধীরবাদী। (৪১৫-২৯৯, শান্তিপর্ব্ব)

হংস সাধু শব্দ।

এ স্থলে সাধু শব্দ বিশেষ লক্ষ্য করিবার সামগ্রী, ইহা ...ব কথার অবিকল বিপরীত। এরূপ বর্ণনা করিবার বিশেষ কারণ আছে, ব্রাহ্মণগণ লুপ্তপ্রায় বৈদিক-ধর্ম্ম অন্বেষণ করিতেছেন। কিন্তু তখন বেদত্যাগী ব্রাহ্মণও ছিল। "নির্মন্ত্রে ব্রাহ্মণে" "ব্রাহ্মণে ব্রহ্মবর্জ্জিতে" শকুনি কথার সহিত বিবোধ কথার সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে হয়, পক্ষ অর্থে বিবোধ। (৪৭-৩৬, শান্তিপর্ব্ব)

ঋষিগণ বনমধ্যে দময়ন্তীকে বলিয়াছিলেন যে, উত্তর কালে নলের সহিত তাঁহার মিলন হইবে; নল দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করিয়া উত্তর দিকে যাইতেছিলেন। উত্তর কথার দুই অর্থ হয়, উত্তর দিক্ বা দেশ; উত্তর শব্দের আর এক অর্থ উৎকৃষ্ট, বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ দময়ন্তীকে সুবাহুর গৃহে লইয়া যায়েন। সুদেব প্রভৃতি অসংখ্য ব্রাহ্মণ নলের অন্বেষণে গমন করেন; পর্ণাদ ব্রাহ্মণ দময়ন্তীর নিকট নলের সংবাদ লইয়া আসেন। মহাভারতে সভাতে যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে পরাজয় করেন, নল-দময়ন্তী উপাখ্যানে সভাতে নল দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করেন। পথে দময়ন্তীর সহিত শুচি নামে সার্থের সাক্ষাৎ হয়, পর্ণাদ, সভা, শুচি, সার্থ এ সকল কথা দুই অর্থপূর্ণ।

কর্কোটক নাগের সাহায্যে নল কলিমুক্ত হন। কর্কোটক কল্পনার মূল কি? কর্ক: অর্থে শ্বেত অশ্ব—সিতঃ কর্কো, বথ্যো বোড়া রথস্ত যঃ। (অমরকোষ) উট্ অর্থে তৃণ "উটঃ স্থাৎ তৃণপলাদিরিতি বিশ্বঃ" তৃণানাং সংহতিস্তৃণ্যা নড্যা তু নড়সংহতিঃ (অমরকোষ) নড় ও নল একই কথা, তাহা হইলে আমরা তিনটি কথা পাইলাম; শ্বেতাশ্ব তৃণ ও নল। শ্বেতাশ্ব হইল অর্জ্জুনের নাম, আবার তৃণ অর্থেও অর্জ্জুন বুঝায়। কর্কোটক নাগ পূর্ব্বজন্মে নারদকে প্রতারণা করিয়াছিল; নারদের অভিশাপে তাহার নাগরূপ হয়, নল আসিয়া তাহাকে উদ্ধার করে। নারদ হইলেন ব্রহ্মার পুত্র, অর্থাৎ বেদের স্বরূপ। সেই বেদ-প্রতারণার ফলে তাহার নাগরূপ হয়। অর্জ্জুন ও নল উভয়ে এক অর্থবাচক, নল অর্থে গন্ধ, সেই সম্বন্ধে উহার বেদের সহিত সম্পর্ক, আর অর্জ্জুন নারায়ণের অংশ, ঋধাতু হইতে অর্জ্জুন শব্দ নিষ্পন্ন হইতে পারে। ঋধ গতৌ, সর্ব্বে গত্যর্থাঃ শব্দাঃ জ্ঞানার্থাশ্চ। (অমরকোষ) তাহা হইলে এ স্থলে অর্জ্জুন অর্থাৎ জ্ঞান কর্ত্তৃক কলির অর্থাৎ অজ্ঞানতা অথবা অবৈদিকতার নিগ্রহের অর্থ বুঝা যায়। কর্ক নামে এক জন প্রসিদ্ধ মুনি ছিলেন, তাঁহার সহিত কর্কোটক শব্দের সম্বন্ধ আছে কি না বলা যায় না।

শ্বেতাশ্ব কথা সম্বন্ধে অনেক রহস্য আছে, যখন অমৃতের নিমিত্ত সাগর মন্থন হয়, তখন উচ্চৈঃশ্রবাঃ অশ্ব প্রথমে উঠে। "শ্বেত এব অশ্বরাজোঽয়ং" এই অশ্বের বর্ণ লইয়া গরুড়ের মাতা বিনতা ও তাঁহার ভগিনী কদ্রুর মধ্যে মতভেদ হয়, ও তাহার ফলে বিনতা কদ্রুর দাসী হয়। গরুড় অমৃত আনিয়া মাতাকে দাসীত্ব হইতে মোচন করেন। অমৃতমন্থনের কথা পরে বুঝিতে চেষ্টা করিব। অশ্ব যদি অবৈদিক মতের প্রতিমূর্ত্তি হয়, শ্বেতাশ্ব কথায় তাহার বিপরীত ভাব প্রকাশ পায়।

দ্রৌপদী একবস্ত্রা ছিলেন, দময়ন্তীও একবস্ত্রা হইয়া গৃহ হইতে বনে গমন করেন; তথায় শকুনিদিগের শত্রুতায় ফলে অর্দ্ধবস্ত্রা হন। দ্রৌপদী সম্বন্ধে বস্ত্রের সহিত ধর্ম্মের যে সম্বন্ধ আছে, দময়ন্তী-পক্ষেও বস্ত্রকথার সেই তাৎপর্য্য মনে হয়। নল যখন ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের দূত হইয়া দময়ন্তীর নিকট যান, তখন তিনি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, যদি তুমি লোকপালদিগের মধ্যে কাহাকেও বিবাহ কর, তাহা হইলে "বিরজাংসি বাসাংসি" প্রাপ্ত হইবে। এক ভাবে ইহার অর্থ তুমি নির্ম্মল বস্ত্র পরিধান করিবে; অন্য ভাবে ইহার অর্থ তুমি রজোগুণহীন অর্থাৎ সাত্ত্বিক ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইবে। প্রশ্ন উঠিতে পারে, দেবতারা হইলেন সকাম ধর্ম্মাভিমানী, অতএব রজোগুণপ্রধান; তাঁহাদের সহিত মিলন অর্থাৎ স্বর্গপ্রাপ্তি সকাম ধর্ম্মের পুরস্কার। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, "বিরজাংসি" কথায় যে বি উপসর্গ আছে, তাহার কোন বিশেষ অর্থ না থাকিলেও থাকিতে পারে, যেমন বিনিশ্চয়, নিশ্চয়, বিগত, গত ইত্যাদি। এখানে আর একটা কথা মনে হয়, দময়ন্তী চারি জন লোকপালকে বরণ না করিয়া নলকে বরণ করিলেন। দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী পূর্ব্বজন্মে পঞ্চ-ইন্দ্র ছিলেন, তিনি স্বয়ং স্বর্গলক্ষ্মী শচী ছিলেন। এ স্থলে যজ্ঞাভিমানিনী দেবতা ইন্দ্রদিগকে বরণ করিল, কিন্তু দময়ন্তী কেবল কর্ম্মকাণ্ডের

অভিমানিনী ছিলেন না, তিনি সমগ্র বৈদিকধর্ম্মের প্রতি-মূর্ত্তি। তিনি নল সুরভী অর্থাৎ বেদকে রজোগুণপ্রধান দেবতাগণকে উপেক্ষা করিয়া বরণ করিলেন। আরও একটু রহস্য আছে। দিক্পালগণের সহিত কুবের অর্থাৎ কুৎসিত বিরোধ আসেন নাই।

বনমধ্যে দময়ন্তাকে এক অজগর গ্রাস করিতে চেষ্টা করে। এ স্থলে অজগর শব্দের মধ্যে কথার খেলা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। অজ অর্থে বেদ, তাহার গর—গর এব গরলং; স্বার্থে লচ্; অর্থাৎ বেদের বিষ স্বরূপ সর্প বৈদিক-ধর্ম্ম-অভিমানিনা দময়ন্তীকে গ্রাস করিতে উদ্যত হয়; এক ব্যাধ সেই অজগরকে বধ করে, পরে সেই ব্যাধ দময়ন্তীকে কামনা করিলে সে দময়ন্তীর কোপে ভস্মীভূত হয়। এ ব্যাধ-কল্পনার মূল কি? সকলের মনে রামায়ণের নিষাদ কথা মনে হইবে। নিষাদ হইল চণ্ডাল, বেদ-বিরোধীদিগকে চণ্ডাল বলিত। শাশ্বতা সমা প্রতিষ্ঠার অর্থ মোক্ষ হইতে পারে। 'কামমোহিতং ক্রৌঞ্চ-মিথুনম্' সকাম যজমান ও তাহার পত্নী অর্থাৎ যজ্ঞ পন্থা, এইরূপ অর্থ হইতে পারে; পরে এ কথা পুনঃ আলোচনা করিব।

নল-উপাখ্যানের এ নিষাদ অথবা ব্যাধ প্রথমে বৈদিক মতের সহায়তা করে, পরে তাহার প্রতিকূলতা করে। এই-রূপ একটা ভাবের আবছায়া যেন দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারতে যে যে স্থানে ভস্মীকরণ কথার উল্লেখ আছে, সেই সেই স্থানে মত-খণ্ডনের ইঙ্গিত আছে; এরূপ উদা-হরণ পরে দেখিব।

সুদেব ব্রাহ্মণ দময়ন্তীর ভ্রূ-যুগলের মধ্যে পিপ্লু চিহ্ন দেখিয়া তাঁহাকে চিনতে পারেন। এই পিপ্লু কথার মধ্যে বোধ হয় রহস্য আছে। এই কথাটি ব্যাকরণের সাধারণ নিয়ম অতিক্রম করিয়া গঠিত হইয়াছে। প্লুঙ্ গতৌ, পিপ্লুঃ-পৃষোদরাদিত্বাৎ-সাধু; অপর পক্ষে সকল গত্যর্থ শব্দ জ্ঞান-বাচক। যোগশাস্ত্রে নাসিকা মূল ও ভ্রূযুগলের মধ্যস্থানকে হিমালয় বলে; এ স্থানে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয়।

(৮-১৯২, শান্তিপর্ব্ব)

উত্তরে হিমবৎপার্শ্বে পুণ্যে সর্ব্বগুণান্বিতে।
পুণ্যঃ ক্ষেম্যশ্চ কাম্যশ্চ স পরো লোক উচ্যতে॥

(৮-১৯২, শান্তিপর্ব্ব)

উত্তরে আম্নোপলক্ষিস্থানত্বাদুৎকৃষ্টতরে হিমবৎপার্শ্বে হিমবৎতুল্যোঽত্যন্ত মেরুশব্দোদিতো নাসাবংশস্তস্য পা… সমীপে ভ্রূঘ্রাণমধ্যে, পুণ্যে বহুপুণ্যগম্যে। সর্ব্বগু… রমণীয়ত্বাদিভির্যুতে দেশে পুণ্যঃ অপহতপাপ্মা ক্ষেম্যঃ সত… কামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ কাম্যঃ সর্ব্বকামোপভোগযোগ্যশ্চ পরো লোকঃ পরমাত্মাস্তীত্যুচ্যতে। তথা হি মন্ত্রশাস্ত্রে ভ্রূমধ্য-দেশস্য রম্যত্বাদিকমুক্তম্। "হেমরূপো ভ্রুবোর্মধ্যে মেরু-স্তিষ্ঠতি পর্ব্বতঃ।"

দময়ন্তীর নাসিকামূলে এবং ভ্রূ-যুগলের মধ্যে অর্থাৎ হিমালয়প্রদেশে ব্রহ্মজ্ঞানবাচক পিপ্লু (অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান) দেখিয়া সুদেব ব্রাহ্মণ দময়ন্তীকে চিনিতে পারিয়াছিলেন। কেবল বেদমধ্যে ব্রহ্মজ্ঞানের দর্শন পাওয়া যায় এ স্থলে ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মজ্ঞান, নাসিকামূল ও বেদ এই কথাগুলির যেন পরস্পর সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয়।

পূর্ব্বে শোক আর অশোক এই দুই শব্দ লইয়া কথার খেলার উদাহরণ দেখিয়াছি, এরূপ কথার খেলা মহাভারত-মধ্যে নানা স্থানে পাওয়া যায়। কবি এক স্থলে লিখিতে-ছেন :—

পুণ্যে ভাগীরথীতীরে শোকব্যাকুলচেতসম্।

(৮০১, শান্তিপর্ব্ব)

এ স্থলে ভাগীরথীতীরে শোকব্যাকুলচেতসম্ দুই ভাবে পড়িতে পারা যায়, তীরে শোকব্যাকুলচেতসম্ এবং তীরে অশোকব্যাকুলচেতসম্। আর এক স্থলে কবি লিখিতে-ছেন :—

"মা মজ্জিঃ শোকসাগরে"

তুমি দুঃখ-সাগরে নিমগ্না হইও না, এ স্থলে মজ্জিঃ কিরূপে সাধিত হইয়াছে, বলা যায় না। কিন্তু ছত্রটি যে দুই ভাবে পড়া যায়, তাহা সহজেই দেখিতে পাওয়া যায়। মা শোক-সাগরে মজ্জিঃ ও মা অশোক সাগরে মজ্জিঃ।

দময়ন্তী বনমধ্যে অশোক বৃক্ষ দেখিতে পাইলেন,—

"দৃষ্ট্বাশোকতরুং ততঃ।"

(১০১-১৪, বনপর্ব্ব)

ইহার দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে, যে তরু হইতে তাঁহার শোক জন্মিয়াছিল, এই এক অর্থ হইতে পারে; আর "দৃষ্ট্বাঅশোকতরুং ততঃ" অর্থে অশোক তরু দেখিয়া হইতে পারে।

কর্কোটক নাগ নলকে বলিতেছে,—

সমমেষ্যসি দারৈস্ত্বং মা স্ম শোকে মনঃ কৃথাঃ।

(২৩-৬৬, বনপর্ব্ব)

তুমি তোমার স্ত্রীর সহিত মিলিত হইবে, দুঃখে মনোনিবেশ করিও না। মা স্ম শোকে মনঃ কৃথাঃ; এ অংশটি দুই ভাবে পড়া যায়। মা স্ম শোকে মনঃ কৃথাঃ, ও মা অশোকে মনঃ কৃথাঃ। কৃথাঃ এই শব্দ লিখিতে কবিকে বৈদিক-ব্যাকরণের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে; কৃথাঃ ইতি বচন-ব্যত্যয়ং ছান্দসঃ।

দময়ন্তী অশোক তরুকে বলিতেছেন,—

বিশোকাং কুরু মাং ক্ষিপ্রমশোকপ্রিয়দর্শন।

বীতশোকভয়াবাধং কচ্চিৎ ত্বং দৃষ্টবান্নৃপম্॥

(১০৪-৬৪, বনপর্ব্ব)

হে প্রিয়দর্শন অশোক। তুমি আমার শোকাপনয়ন কর, তুমি কি রাজাকে শোক-ভয়রহিত ও স্বচ্ছন্দ দেখিয়াছ।

এ স্থলে অশোকের বিশেষণ কবি প্রিয়দর্শন দিয়াছেন। সম্রাট্ অশোকের স্থাপিত স্তম্ভে সকল স্থানেই অশোকের বিশেষণ আছে, "প্রিয়দর্শন" এই প্রিয়দর্শন কথাটি মহাভারতে দুই এক স্থলে একটু আবরিত করিয়া লিখিত আছে। যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "কি করিলে অসৌম্য-দর্শন সৌম্য-দর্শন হয়" উপরে নলের বিশেষণ কবি দিয়াছেন—"বীতশোকভয়াবাধং" বীতশোক কথাতে বোধ হয়, একটু রহস্য আছে। পূর্ব্বে দেখিয়াছি 'শান্তনু' কথা হইতে 'শান্তনু' কথার উৎপত্তি হইয়াছে। কি নিয়ম অনুসারে তকারের লোপ হইল বলা যায় না। যদি সেই নিয়ম এ স্থলে অবলম্বন করা যায়, তাহা হইলে কথাটা হয় 'বিশোকভয়াবাধং'। বিশোক কথার অশোকের স্থানে প্রয়োগ অন্যত্রও পাওয়া যায়। এ স্থলে মনে হয় যেন বৌদ্ধগণ কর্ত্তৃক প্রপীড়িত ও নির্ব্বাসিত ব্রহ্মবিদ্যা, অথবা বৈদিক-ধর্ম্ম বৌদ্ধ-সম্রাটের নিকট কাঁদিতেছেন। স্মরণ রাখিতে হইবে, দময়ন্তী তখন পতি অর্থাৎ পালক রক্ষক অন্বেষণ করিতেছেন। দময়ন্তী পুনরায় অশোককে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

"যথা বিশোকা গচ্ছেয়মশোকনগ তৎ কুরু।

সত্যনামা ভবাশোক অশোকঃ শোকনাশনঃ॥"

(১০৭-৬৪, বনপর্ব্ব)

হে অশোক নগ! আমি যেরূপে বিশোক হইয়া গমন করিতে পারি—তুমি এরূপ কর, তোমার শোকনাশক নাম সার্থক কর।

দময়ন্তী অশোককে বলিতেছেন, "সত্যনামা ভবাশোক" ইহা বিলক্ষণ কৌতুকের কথা। "বেদানাং উপনিষৎ সত্যং সত্যস্য উপনিষৎ দম" বেদ সকলের রহস্য সত্য, আর সত্যের রহস্য দম। এ স্থলে দময়ন্তী অর্থাৎ বৈদিক রহস্য অথবা বেদাভিমানিনী দেবতা অশোককে বলিতেছে, তুমি সত্যনামা হও অর্থাৎ বৈদিক পথাবলম্বী হও। আর এক স্থলে কবি ধৃতরাষ্ট্র সম্বন্ধে বলিতেছেন—

"ভূয় এবাভবদ্রাজা শোকসন্তপ্তমানসঃ।

(২৪-৪২, আদিপর্ব্ব)

রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুনরায় শোকসন্তপ্ত চিত্ত হইলেন, এ স্থলেও দুই ভাবে পড়িতে পারা যায়। রাজা শোকসন্তপ্তমানসঃ, আর রাজা অশোকসন্তপ্তমানসঃ। দময়ন্তী নলকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন:—

"আনৃশংস্যং পরোধর্ম্মস্তত্ত এব হি মে শ্রুতঃ।"

(৪৩-৬৯, বনপর্ব্ব)

অনিষ্ঠুরতাই পরম ধর্ম্ম, ইহা বৌদ্ধদিগের উক্তি ছিল। ইহা আমি আপনার নিকটেই শুনিয়াছি। যজ্ঞে হিংসার প্রয়োজন হয়, এই কারণে তাঁহারা যজ্ঞের বিপক্ষে নানা কথা বলিতেন। দময়ন্তী নলের নিকট শুনিয়াছিলেন, অহিংসা পরম ধর্ম্ম, "ইতি মে শ্রুতঃ" ইহার দুই অর্থ হইতে পারে, ইহা আমার শ্রুত আছে, এই অর্থ হইতে পারে; কিন্তু শ্রুত কথার অপর অর্থও আছে। শ্রুতঃ-শাস্ত্র।

তাহা হইলে ইতি মে শ্রুতঃ অর্থে অহিংসা, বৈদিকী ধর্ম্ম, কেবল বৌদ্ধধর্ম্ম নয়। আর এক স্থলে নারদ যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন—

কচ্চিচ্চ নিহতামিত্র প্রীণাসি সুহৃদো নৃপঃ।

কচ্চিচ্ছ্রিয়মিমাং প্রাপ্য ন ত্বাং শোকঃ প্রবাধতে॥

আমার বোধ হয় "নত্বাশোক প্রবাধতে" ইহাই মৌলিক পাঠ। ত্বা কথায় অনুস্বার যোগ করিলে ছন্দ সম্বন্ধে কোন প্রভেদ হয় না। ত্বাং স্থলে ত্বা কথার প্রয়োগ মহাভারতমধ্যে বিরল নয়, যেমন—

অসংশয়ং ভগবন্নাদিদেবং দ্রক্ষ্যামি ত্বাহং শিরসা সম্প্রসাদ্য।

(১৯-৬৪, শান্তিপর্ব্ব)

এ স্থলে স্থাং অতং স্থলে স্থাহং লিখিত হইয়াছে।

উপরে যে সকল উদাহরণ দেওয়া হইল, সকল স্থানেই সন্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অশোক ও শোক কথার খেলা রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু সন্ধির আশ্রয় ব্যতীত অশোক কথার স্থলে যে শোক কথার প্রয়োগ হইতে পারে না, তাহা বলা যায় না। "বর্ণলোপ আর্ষঃ" এরূপ বিধি অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়।

"উপরিষ্টোপরিষ্টাত্ প্রজ্বলদ্ভিঃ স্বয়ম্প্রভৈঃ।"

নিরুদ্ধমেতদাকাশমপ্রমেয়ং সুরৈরপি॥

(২৬১-৮২, শান্তিপর্ব্ব)

এই শ্লোকে উপরিষ্ট কথা উপরিষ্টেতি স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহা হইল সহজ বর্ণলোপ। তদ্ভিন্নঃ ছান্দসঃ বর্ণলোপেরও উদাহরণ পাওয়া যায়।

হৈরণ্যাংস্ত্রিনলোৎসেধান্ পর্ব্বতানেকবিংশতিম্।

ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ রাজা যোঽশ্বমেধে মহামখে॥

(১৪৩-২৯, শান্তিপর্ব্ব)

এই শ্লোকে ত্রিনলোৎসেধান্ (এক সহস্র দ্বিশত হস্ত উচ্চ) "নল ইত্যত্র ছান্দসঃ বর্ণলোপঃ।"

বর্ণলোপ আর্ষ, অথবা বৈদিক প্রয়োগের সাহায্যে না করিলেও যে হয়, তাহা বলা যায় না। এক স্থলে—

"এতান্যয়োক্তাংশ্চর রাজধর্ম্মান্ নৃপাঞ্চ গুপ্তৌ মতিমাদধৎস্ব।
অবাপ্স্যসে পুণ্যফলং সুখেন সর্ব্বো হি লোকো নৃপধর্ম্মমূলঃ॥"

(৫৬-১২০, শান্তিপর্ব্ব)

আদধৎস্ব স্থলে আধৎস্ব কথার প্রয়োগ হইতে পারে, বিললাপ্য স্থলে অন্যত্র কবি লালপ্য প্রয়োগ করিয়াছেন। নিম্নে যে উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইতে মনে হয়, আদি-অকার-লোপ নিয়মবিরুদ্ধ নয়।

নাতিগাধে জলাধারে সুহৃদঃ শকুলাস্ত্রয়ঃ।

(৩-১৩৭, শান্তিপর্ব্ব)

কোন প্রভূত মৎস্যপরিপূর্ণ অল্পজল জলাশয়ে শকুল নামক তিনটি মৎস্য সৌহৃদ্য সহকারে পরস্পর সহচর হইয়া বাস করিত।

এ স্থলে অনুবাদক নাতিগাধে কথার অর্থ করিতেছেন, অল্প জলাশয়ে; তাহা হইলে গাধ শব্দ অগাধ শব্দের অর্থে বসিয়াছে।

অশোক কথা লইয়া রহস্য কেবল নলোপাখ্যানে পাওয়া যায়, এমন নহে। বাল্মীকি সীতাকে অশোক-বনে বসাইয়াছেন।

মহাভারতের সময় বৌদ্ধ-প্রতাপ অনেক অংশে হ্রাস হইয়াছে, তখন বৈদিক ও অবৈদিকদিগের মধ্যে যজ্ঞ লইয়া প্রধানতঃ বিরোধ হইতেছে, অনেক স্থলে উভয়-ধর্ম্ম মিশ্রিত ভাব ধারণ করিয়াছে।

দ্রৌপদী এক স্থলে শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন,—

"যেষাং বিপ্রকৃতাং ক্ষুদ্রৈরুপেক্ষধ্বং বিশোকবৎ।

(১২৬-১২, বনপর্ব্ব)

তোমরা কেহ আমার পক্ষে থাকিলে ক্ষুদ্রব্যক্তিদিগের কৃত আমার এই অবমান কি এরূপ বিশোকের ন্যায় হইয়া উপেক্ষা করিতে পারিত? এ স্থলে বিশোক শব্দ অশোক স্থলে বসিয়াছে, তাহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন বিচেতন, অচেতন। তদ্ভিন্ন অশোক-বৃক্ষের নাম বিশোক।

আর একটি সুন্দর কৌতুকপূর্ণ রহস্য আছে।

দ্রৌপদী বলিতেছেন:—বিপ্রকৃতাং মাং, বিপ্রকৃতা শব্দের অর্থ বিড়ম্বিত অবমানিত; কিন্তু আর এক অর্থ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। "বিপ্রৈঃকৃতাং অনুষ্ঠিতাং মাং" ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত যে আমি যজ্ঞ অথবা যজ্ঞাভিমানিনী দেবতা, সেই আমাকে দ্রৌপদীর অবমাননা যজ্ঞপন্থার অবমাননা। বিশোক অর্থাৎ অশোক ভিন্ন উদাসীন ভাব কে দেখিতে পারে? সময় গণনা অনুসারে রামায়ণ প্রথমে, নলোপাখ্যান তাহার পরে ও মহাভারত শেষ রচিত হয়, নলোপাখ্যানে দময়ন্তী অর্থাৎ বেদাভিমানিনী দেবী অশোকের অর্থাৎ অবৈদিক-মতের কৃপা ভিক্ষা করিতেছেন।

নলোপাখ্যানে বৈদিক-ধর্ম্মপতি অর্থাৎ রক্ষক অন্বেষণ করিতেছে, মহাভারতের সময় দ্রৌপদীর অর্থাৎ যজ্ঞাভিমানিনী দেবতার পাঁচ জন পতি অর্থাৎ রক্ষক ছিলেন। তাঁহারা সকলেই রজোগুণপ্রধান দেবতার পুত্র অর্থাৎ স্বরূপ। দময়ন্তী দেবতাগণকে পতি না করিয়া নল অর্থাৎ বেদকে পতি করিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই নল অশ্বকোবিদ্ অবৈদিক-মতদুষ্ট ছিল, সেই কারণে কলি বৌদ্ধমত অর্থাৎ পাপ তাহাতে আবিষ্ট হয়, কর্ক, শ্বেতাশ্ব অথবা জ্ঞানের প্রভাবে নল কলিশূন্য হয়। বেদে দোষ আবিষ্ট হইবার উদাহরণ আমরা পরেও পাইব।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

নর্ত্তকী চন্দ্রকলার প্রমোদ-ভবনে বিলাস-উপাদানের কোনখানেই কোন অপ্রতুলতা ছিল না, সুন্দর হর্ম্ম্যমালা, উদ্যানবাটিকা, লতাকুঞ্জ, কৃত্রিম স্ফটিকনির্ঝর এবং আর্য্যাবর্ত্তসারভূত ঐশ্বর্য্যসম্ভারে ভারাক্রান্ত প্রমোদগৃহ। রাত্রি প্রায় প্রহরাধিক কাল অতীত হইয়াছিল, এমন সময় ত্রস্তগতি মহল্লিকা আসিয়া গৃহাধিকারিণীর নিকট বিস্ময়-উল্লাসে মহারাজাধিরাজের আগমন-সংবাদ জ্ঞাপন করিল। গৃহস্বামিনী চন্দ্রকলা চন্দ্রকলারই মত মলিনশ্রী মৃদুভাবে বিকীর্ণ করিয়া এলাইত শিথিল শরীরে শয্যাশ্রিতা রহিয়াছিল। তাহার সুকোমল পর্য্যঙ্ক-শয্যাপার্শ্বে দুই জন সেবাপরায়ণা মহল্লিকা এবং বৈদ্যরাজপ্রদত্ত ঔষধপাত্রাদি সংরক্ষিত।

রাজাধিরাজ দুঃখিতচিত্তে বিষণ্ণমুখে গৃহপ্রবেশ করিলেন। "কেমন আছ, নাগরি?"

রাজাধিরাজের জন্য প্রদত্ত সুবর্ণখচিত আসন গ্রহণ না করিয়া রাজাধিরাজ চন্দ্রকলার রোগশয্যার একপার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন।

"বড়ই অসুস্থ, রাজাধিরাজ!"

"কতদিনে আমার কলকণ্ঠী পাপিয়ার কলরবে সর্ব্বদা অসন্তোষপূর্ণ প্রজাদের অভিযোগের জ্বালায় উত্তপ্ত কর্ণকুহরযুগল জুড়াতে পারবো, মোহিনি? আমার যে আর সহ্য হচ্ছে না প্রেয়সি! একবার উঠে ব'সে, মধুর হেসে আমার তাপিত প্রাণ শীতল ক'রে দাও।"

চন্দ্রকলাকে আজ বাস্তবিকই বড় অসুস্থ, বড়ই ক্লান্ত দেখাইতেছিল। তাহার ভ্রমরলাঞ্ছিত কৃষ্ণ কেশপাশ রুক্ষ ও অযত্নশিথিল, তাহার সযত্ন-প্রসাধিত চারু দেহ ভূষণমাত্রবিহীন। তাহার সূক্ষ্ম অধরের স্বাভাবিক রক্তরাগটুকু পর্য্যন্ত পাটলপুষ্পের ন্যায় বিবর্ণ ও বিশুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। কষ্টে মাথা তুলিয়া সেই বিরাগ-শুষ্ক অধরে ঈষৎ ক্ষীণ হাস্যরেখা ফুটাইয়া তুলিবার জন্য বারেকমাত্র চেষ্টা করিয়া পুনশ্চ ফিরিয়া শয্যাগ্রহণপূর্ব্বক রাজনর্ত্তকী কহিল, "শিরঃপীড়ায় প্রাণ যায়, রাজাধিরাজ! হাস্‌বার আজ সাধ্য কোথায়?"

মহারাজাধিরাজ তাঁহার এই নবীনা প্রেয়সীকে হয় ত বা ঈষৎ ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিলেন। ইহার রূপ, গুণ, বিদ্যা, বিনয় এবং অন্তরের কোমলতা তাঁহার চির স্বার্থপর মদান্ধ স্বভাবের উপর ঈষৎ যেন প্রভাব বিস্তৃত করিতেছিল। নারীকে তিনি নরের কামনা পরিতৃপ্তির উপাদান ভিন্ন অন্য দৃষ্টিতে কোন দিনই দেখিতে পারেন নাই; তাহা পারেন নাই বলিয়াই তাঁহার বিবাহিতা ধর্ম্মপত্নী পট্টমহাদেবী লজ্জাদেবীর সঙ্গ তিনি সহ্য করিতেও পারেন না। লঘুচরিত্রা বারনারী অথবা রূপসী নবযৌবনা বন্দিনী, এই সকল নারীসঙ্গই তাঁহার ঈপ্সিত ও পরিচিত। এই নারীসম্ভোগ-প্রবৃত্তির জন্য কতই না পাপানুষ্ঠান তাঁহার দ্বারা ঘটিতে আরম্ভ হইয়াছে। সুন্দরী দরিদ্রবধূ ও কন্যাগণ কোথাও প্রলোভনে, কোথাও বা বলপ্রকাশে তাঁহার পাদোজীবিগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদাই অপহৃত হইয়া তাঁহাকে দিনে দিনে সর্ব্বসাধারণের ঘৃণা ও বিরাগভাজন করিয়া তুলিতেছিল। আর সেই সব হতভাগিনী নারী? ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ রাজানুগ্রহে রাজ-বিলাসভবনের শোভা সম্পাদন করিতেছে। আবার অনেকেই ভগ্ন ক্রীড়নকের মতই রাজানুগ্রহে বঞ্চিতা হইয়া নিরুপায়ে তাঁহার দাসাদির অনুগ্রহজীবিনী হইতেছে। ইহাই মহীপালদেবের নারীজাতির প্রতি ব্যবহার! এ অবস্থায় তাঁহার প্রেমলাভ, সে যে কত বড় দুর্লভ বস্তু লাভ, তাহা অতি সহজেই অনুমেয়।

চন্দ্রকলার কাতরোক্তিতে মহারাজাধিরাজ দুঃখিত ও ক্ষুণ্ণ হইলেন। ক্ষণকাল বিরসমুখে নীরব থাকিয়া পরে বিষণ্ণস্বরে কহিলেন—"তুমি আমায় আর পূর্ব্বের মত ভালবাস না, চন্দ্রা! তা যদি বাসতে, তা হ'লে

আমায় দেখেই তোমার শিরঃপীড়া প্রশমিত হ'তে পারতো।"

বিলাসিনী রাজ-অভিমান হৃদয়ঙ্গম করিল। বুঝিল, এইবার বাঁধন একটু ঢিলা না দিলে হয়ত একবারেই ছিঁড়িয়া পড়িবে। তাই নিতান্ত অনিচ্ছায় ও অনাগ্রহের সহিতই সে তাহার শিথিলিত মৃণালভুজে নৃপতির স্বেচ্ছানত কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া মধুর হাসি হাসিল। হাস্যস্মিতমুখে কহিল, "কে বল্লে যে, আপনার উপস্থিতিতে আমার শিরঃপীড়ার উপশম ঘটেনি? আজ তিন দিন কি আমি কাহারও সঙ্গে কথা কইতে পেরেছি? এই আপনাকে স্পর্শ ক'রে বলছি, রাজেন্দ্র! আজ সারাদিন আমি জল-বিন্দুও গ্রহণ করতে পারিনি।"

রাজাধিরাজ মুহূর্ত্তেই গলিয়া পড়িলেন। চন্দ্রকলার উপবাস-শুষ্ক মুখ সাগ্রহে সপ্রেমে তুলিয়া ধরিয়া তাহা অজস্র চুম্বনধারায় অভিষিক্ত করিয়া দিতে দিতে কাতর স্বরে উত্তর করিলেন, "বড় দুঃখিত হলেম, নাগরি! বড়ই কষ্ট বোধ করলেম! কি ভয়ানক অবিচার এই শিরঃপীড়ার! এত বৃদ্ধা, কুৎসিতা, গৃহপতি-বধূবর্গ জীবিতা থাকতে সে নির্দ্দয়-ভাবে আমার সুকুমারী চারুশীলার 'পরে এত বড় অত্যাচার করতে এলো কেন বল দেখি! কি বলবো, এ যদি আজ আমার শাসনাধীন হতো ত তাকে শূলে চড়িয়ে জীবন্ত দগ্ধ ক'রে এর প্রতিফল দিতেম—যা হোক, তুমি যখন এত অসুস্থ, তখন তোমায় আর বিব্রত করবো না, আজ বিদায় নিই, কিন্তু আগামী কল্য তোমায় আমি আমার কাছে পেতেই চাই। শূরপাল ও রামপালের ব্যাপারে মনটা আমার একেই একটু উত্যক্ত হয়ে আছে, এ সময়ে অন্য কা'কেও আমার ভাল লাগছে না। তুমি ত জানো নাগরী, আমি তোমায় কত ভালবাসি।"

এই বলিয়া রাজাধিরাজ পুনশ্চ সুগভীর আগ্রহভরে চন্দ্রকলার মুখচুম্বন করিলেন ও শয্যা হইতে উত্থিত হইলেন। মল্লিকা তাঁহার পদদ্বয়ে রত্নখচিত উপানহ পরাইয়া দিল।

"রাজাধিরাজ!"

পশ্চাৎ হইতে এই সুস্পষ্ট ও সাগ্রহ আহ্বানে মহীপাল দেব পিছন ফিরিয়া দেখিলেন, এতক্ষণকার শয্যালীনা রোগিণী অত্যন্ত স্বাভাবিক ভঙ্গীতে শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়াছে এবং তাহার ইতঃপূর্ব্বের সেই ক্ষীণ অস্পষ্ট স্বর পরিত্যাগ পূর্ব্বক আগ্রহভরে তাঁহাকে উচ্চকণ্ঠেই আহ্বান করিতেছে, "রাজাধিরাজ!"

বিজয়পূর্ণ আনন্দের একটা উৎকট হর্ষচ্ছটায় মহারাজাধিরাজের আশাহত মলিন মুখ সুখোদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। চন্দ্রকলা আর্য্যাবর্ত্ত-প্রসিদ্ধ রূপসী বিদুষী চন্দ্রকলা, তাঁহার প্রেমে বাঁধা পড়িয়াছে ইহা নিঃসন্দেহ! নতুবা নিজের রোগযন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়া সে তাঁহার বিরহচিন্তায় ব্যাকুল হইত কি? উৎফুল্ল স্মিতহাস্যে আশা-প্রমোদিতচিত্ত নৃপতি ফিরিয়া আসিয়া ব্যগ্র আলিঙ্গনের জন্য উভয় বাহু বিস্তৃত করিয়া দিয়া ডাকিলেন,—"প্রেয়সি!"

কিন্তু তাঁহার সেই প্রেমোৎফুল্ল চিত্তের সাগ্রহ অভিনন্দনে দৃক্‌পাতাবধি না করিয়াই নর্ত্তকী রুদ্ধশ্বাসে কহিল, "রাজাধিরাজ যে মহাসামন্ত ও মহাকুমারদ্বয়ের সম্বন্ধে চিত্তোদ্বেগের উল্লেখ করলেন, এ কথার অর্থ কি! কি ঘটেছে?" চন্দ্রকলার স্বরে গভীর আবেগ ও আশঙ্কা ধ্বনিত হইল।

রাজাধিরাজ তাঁহার উন্মুখ আলিঙ্গন-লাভেচ্ছুক ভুজদ্বয়কে প্রত্যাবর্ত্তিত করিয়া বিরক্তিতে অধর দংশন করিলেন।

"শূরপাল ও রামপাল যে আমার জাত-শত্রু, এতো নূতন তত্ত্ব নয়, চন্দ্রকলা!"

"মহাকুমার রামপাল আপনার সঙ্গে কবে কি শত্রুতা প্রকাশ করেছেন, রাজাধিরাজ?"

রূপজীবিনীর স্বর অনুচ্চ-দৃঢ়।

রাজাধিরাজ এই প্রশ্নে ঈষৎ যেন কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া কিন্তু তখনই আবার প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিলেন; কহিলেন, "সুন্দরি! শত্রুতা প্রকাশ না করলেও যে শত্রুতা পোষণ করা যায়, এ কথা কি কোনমতে অস্বীকার করতে পারো? তা' ভিন্ন শত্রুতা প্রকাশেরই বা আর বাকি কি আছে, চন্দ্রকলা? তুমি জানো কি, আজ সমুদয় পৌণ্ড্রবর্দ্ধন-প্রজাদের তাদের রাজার বিরুদ্ধে কে উত্তেজিত ক'রে তুলছে? তুমি খবর রাখ কি, যে, রামপালের অধিনায়কত্বে যে বিদ্রোহী দলের সৃষ্টি হয়েছে, তারা প্রকাশ্য সভায় এসে আমার মুখের সামনে দাঁড়িয়ে আমারই বিরুদ্ধে ভীষণ অভিযোগ উপস্থিত ক'রে আমারই কাছে বিচার চাইতেও কুণ্ঠাবোধ করে নি? এ সব কথা তুমি শুনেছ কিছু?"

চন্দ্রকলা নিজের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে শয্যাত্যাগ করিয়া পর্য্যঙ্ক হইতে নামিয়া

রাজাধিরাজের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার অযত্ন-রক্ষিত অসম্বদ্ধ শিথিল কেশপাশ বন্ধনমুক্ত হইয়া আষাঢ়ের বর্ষার ঘন মেঘজালের মতই পশ্চাদ্‌ভাগকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত করিয়া দিয়াছিল। উহারই কয়েকটি গুচ্ছ শিথিলীভূতভাবে তাহার পূর্ণ বিকশিত শতদল পদ্মের মতই অপরূপ সুন্দর মুখের আশে-পাশে গুঞ্জনরত লুব্ধ ভ্রমরের মতই ঘুরিয়া ফিরিতেছিল ও তেমনই সুশোভন দেখাইতেছিল। তাহার আয়ত বিশাল নেত্রে বিস্ময় ও ঈষৎ আশঙ্কার ছায়া মধ্যাহ্ন সূর্য্যে মেঘচ্ছায়াবৎ ক্ষণে ক্ষণে প্রস্ফুট হইয়া উঠিতেছিল। উত্তেজনায় বক্ষোবাস মৃদু মৃদু কম্পিত হইতেছিল, উদ্বেগাকুল কণ্ঠে সে উত্তর করিল, "এ সব সংবাদ নাগরিক ও নাগরিকা মাত্রেই শুনেছে। কিন্তু এর জন্য কেহই ত কই মহাকুমারদের দায়ী করছে না, রাজাধিরাজ! বরং এমনও শুনা গেছে যে, বিদ্রোহী দলের অধিনায়কত্ব নে'বার জন্য বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ ও এমন কি, না নে'ওয়ার জন্যে ধিক্কৃত হয়েও মহাকুমার রামপাল দেব একান্ত সুযোগ সত্ত্বেও আপনার বিরুদ্ধে তা' নিতে সম্মত হন নি। তাঁকে আপনার সমক্ষে অনর্থক শত্রুতার বশে এ রকম মসিবর্ণে চিত্রিত যে করেছে, সে ব্যক্তি—ক্ষমা করবেন রাজাধিরাজ! সে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী এবং ভণ্ড।"

চন্দ্রকলার দুই চক্ষু যাহা এত দিন কেবলমাত্র পুষ্পধন্বার ফুলশরের অধীনতায় পরিচালিত হইয়া দ্রষ্টার শরীরে প্রাণে পুলক শিহরণ দিয়াই বিঁধিয়া আসিয়াছে, তাহা আজ সহসা জ্বলন্ত অগ্নিবর্ষণ করিল, তাহার অসম্বদ্ধ বেশবাস উত্তেজনার দ্রুতশ্বাসে সমধিক স্খলিত হইয়া পড়িল, তাহার শারদ জ্যোৎস্নার মত সুগৌরমুখকান্তি অগ্নিতাপতপ্ত লোহিতাভা ধারণ করিল, গভীর উত্তেজনার বশে আত্মবিস্মৃতা ব্যাপিকা পুনশ্চ তীব্রকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "রামপাল দেবের সম্বন্ধে যে পামর এ সকল হেয় কুৎসা রচনা করেছে, আমার সাধ্য হ'লে তাকে শূলে দিই।"

"তবে এই দণ্ড তার নিজেরই প্রাপ্য! প্রকাশ্য রাজসভায় সহস্রের মাঝখানে সে নিজেই স্বীকার করেছে যে, সে রাজদ্রোহী।"

চন্দ্রকলার কণ্ঠ চিরিয়া একটা বিস্ময়ার্ত্ত রব নির্গত হইল, "মহাকুমার নিজেই স্বীকার করেছেন যে তিনি রাজদ্রোহী?"

চন্দ্রকলার আহত পাণ্ডুর মুখের দিকে সাশ্চর্য্যে চাহিয়া রাজাধিরাজ গভীর বিস্ময়ে ডুবিয়া গিয়াছিলেন, তাহার এই সংবাদে এতটাই বিচলিত হওয়ার কারণ না পাইয়া ঈষৎ বিরক্ত স্বরে তিনি গম্ভীর মুখে সবিদ্রূপে উত্তর করিলেন, "এ কথা সভাসদ্‌মাত্রেই জ্ঞাত আছে, ইচ্ছা হয় সংবাদ নিতে পার। তাদের ক'জনকে তোমার গৃহে পাঠিয়ে দেবো?"

চন্দ্রকলা এ বিদ্রূপে কর্ণপাতও করে নাই, সে এই সংবাদের তীব্রতায় সহসা যেন কেমন অভিভূতাবৎ হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর ধীরে ধীরে নিজের ছড়াইয়া পড়া চিত্তবৃত্তিকে কোনমতে সংগ্রহ করিয়া লইয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, "হয় ত আপনারই অবিচারের নিদারুণ অভিমানেই এমন কথা তিনি হঠাৎ রাগ ক'রে ব'লে ফেলেছেন! রাজাধিরাজ! রাজাধিরাজ! যদি চন্দ্র সূর্য্য সত্য হয়, তবে মহাকুমার রামপালদেব রাজদ্রোহী নন। বিশ্বাস করতে পারবেন কি এ কথা? কিন্তু এর চেয়ে সত্যকথা আমি আমার এই সমস্ত জীবন ধ'রে আর কখন বলিনি।"

রাজাধিরাজ এবার একান্তই সাশ্চর্য্য দৃষ্টিতে সেই দুর্জ্ঞেয় রহস্যময়ী নারীর আশ্চর্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত স্থির গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া প্রকৃতই বিস্ময়াপ্লুত কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, "তুমি? তুমি রামপালের সম্বন্ধে কি জানো যে, তাকে এত বড় জোরের সঙ্গে সমর্থন করছো?"

চন্দ্রকলা এই প্রশ্নে সহসা বারেকের জন্য মাথা নত করিল, তাহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহার রক্তশূন্য বিবর্ণ মুখে ঈষৎ লজ্জার একটা উত্তপ্ত আরক্ত আভা ক্ষণকালের জন্য ক্ষীণ আভায় বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সে ঈষৎ গুঞ্জন স্বরে মৃদু মৃদু উচ্চারণ করিল,—

"আমি জানি—আমি তাঁকে, তাঁর অন্তরের—অন্তরের মধ্য থেকেই ভাল ক'রে জানি। তিনি মহৎ! শুধু তাই নয়—তিনি মহত্তম!"

নৃপতির দুই চক্ষু একই মুহূর্ত্তে রুদ্রতেজে বিদ্যুতের শিখার ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। কঠোর ঈর্ষার ঘন কালো ছায়া তাঁহার গৌর মুখকে মেঘ-মেদুর বর্ষার আকাশের সহিতই সম-তুলিত করিয়া তুলিল, সন্দেহকঠিন কণ্ঠে তিনি সবেগে বলিয়া উঠিলেন,—"তুমি তাকে জানো? তাকে জানো? তার

অন্তরের অন্তস্তলের সংবাদ জানো? এ কথার অর্থ কি চন্দ্রকলা? আমার সঙ্গে তুমি কি আজ রহস্য কচ্ছো?"

চন্দ্রকলা ক্ষণকাল বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে পারিল না। কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া জড়পিণ্ডবৎ সে স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহাকে বাক্যবিমুখী দেখিয়া রাজাধিরাজ যেন মনের মধ্যে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া উঠিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিলেন, কিন্তু সংযত ও স্বচ্ছন্দ স্বরে কথা কহিয়া বলিলেন, —"রামপাল আমার মহাশত্রু, ইহা সর্ব্বজনবিদিত সত্য! সেই মহাশত্রুকে হাতে পেয়ে আমি যদি না ছাড়তে পেরে থাকি, কোন বিচক্ষণ ব্যক্তিই আমায় তার জন্য দোষী করবে না। চাণক্য তাঁর নীতিশাস্ত্রে স্পষ্টই ব'লে গেছেন, শত্রুকে ছলেবলে বা কৌশলে ধ্বংস করবে। এ নীতি আমারই সৃষ্টি করা নয়, ইহাই শাস্ত্রীয় রাজনীতি। রাজা আমি, তা' পালন করতে বাধ্য এবং তা' করবোও।"

চন্দ্রকলার সর্ব্বশরীর প্রবল কম্পনে কাঁপিয়া উঠিল। সে সহসা আত্মসংযম হারাইয়া ফেলিয়া উচ্চ স্বরে ডাকিয়া উঠিল, "রাজাধিরাজ!"

"কেন প্রিয়ে? রামপালের সম্বন্ধে তোমায় আজ এতই অধীরা দেখছি কেন! আমার শত্রু—সে কি তোমারও পরম শত্রু নয়?"

চন্দ্রকলার শুষ্ক কণ্ঠ নীরব রহিয়া গেল।

রাজাধিরাজ বোধ করি তাহার মানসোদ্বেগ তাহারই মুখের উপর হইতে তীক্ষ্ণ নেত্রে পাঠ করিলেন, আবার তাঁহার ঈষৎ প্রসন্ন মুখমণ্ডল মেঘাচ্ছন্নবৎ কালো দেখাইল। কথার উপরে পরে ঈষৎ জোর দিয়া বলিলেন, "আমার পরম শত্রু যে আজ আমার করকবলিত হয়েছে, এই আমার পক্ষে পরম লাভ। শূরপাল রামপালকে কষ্টাগারে রেখে এতদিনে আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পেরেছি।"

চন্দ্রকলার মনে হইল, যেন সহসা তাহার পায়ের তলা হইতে কক্ষভূমি সরিয়া চলিয়া গিয়াছে, একটা প্রকাণ্ড গহ্বরের মধ্যে সে যেন পতনোন্মুখ! সত্য সত্যই সে বোধ করি পড়িয়া যাইতেছিল, রাজাই তাহাকে হাত বাড়াইয়া ধরিয়া ফেলিলেন।

"রাজাধিরাজ! এ কি সত্য? কুমার রামপাল আজ কারাগারে? দোহাই রাজাধিরাজ! এত বড় অধর্ম্ম, এত বড় অবিচার, এত বড় ভুল কর্ব্বেন না। আমি জানি, রামপাল আপনার শত্রু নন, আপনার 'পরেও তাঁর বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধা নেই, বরং জ্যেষ্ঠত্ব হিসাবে তিনি আপনাকে যথেষ্ট সম্মানই করেন।"

"চন্দ্রকলা! তুমি আমার বিপক্ষের সপক্ষ হয়েই কি আজ আমায় সর্ব্বক্ষণ উপদেশ দেবে ব'লে স্থির করেছ? কুমার রামপাল তোমায় এর জন্য কোন্ বিশিষ্ট পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছেন শুনি?"

এই নির্ম্মম রাজ-পরিহাসে দৃক্‌পাত না করিয়াই অশ্রু-আবিল-নেত্রে নর্ত্তকী সকাতরে কহিল, "রাজাধিরাজ! আমি তাঁর জন্য যত না হোক্, আপনারই জন্য আপনাকে এই মহাপাপ থেকে নিরস্ত করতে চাইছি! নির্দ্দোষ, নিষ্পাপ পুরুষশ্রেষ্ঠকে দণ্ডিত ক'রে ধর্ম্মে পতিত হবেন না। রামপালের মত হিতৈষী ও ভক্ত আপনার আর এক জনও কেউ নেই, এর চেয়ে সত্য আর হয় না।"

"এ নূতন তত্ত্ব সহসা আজ কোথায় ব'সে শিক্ষা করলে রসিকা?"

"কোথায় শিখ্‌লেম? কোথায়? তাঁরই পদপ্রান্তে তাঁর আপন মুখে শুনে! তাঁর পায়ের তলায় ব'সে এই মহাতত্ত্ব আবিষ্কার করেছি, রাজন্! যে, কুমার রামপাল, নরদেহে দেবতা। আর নিশ্চিত জান্‌বেন, দেবতা কারও ক্ষতি করেন না।"

"চন্দ্রকলা!"

রাজাধিরাজের গূঢ় ব্যঙ্গভরা উজ্জ্বল মুখ সহসা শবশুভ্র হইয়া গেল। অত্যন্ত ক্রোধে তাঁহার বিবর্ণ অধর-ওষ্ঠ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। বিলম্বে ও কষ্টে বাক্য সংগ্রহপূর্ব্বক তিনি কহিলেন, "এতদূর স্পর্দ্ধা সেই নরাধমের যে, সে তোমার কাছেও অগ্রসর হয়ে আসতে ভরসা করে? আমার মনে আর তার জন্য এক বিন্দুও অনুতাপের লেশ বাকি রৈলো না।"

এ কথা শুনিয়া চন্দ্রকলা ত্রস্তে জিভ কাটিল।

"ছি ছি ছি রাজাধিরাজ! এ কি অসঙ্গত অন্যায় কল্পনা করছেন! আপনি কি আমায় এতই সৌভাগ্যবতী মনে করেন যে, আমার গৃহে তাঁর মত লোকের পদধূলিদান করাও সম্ভব ব'লে বোধ করেছেন?—"

রাজা ক্রোধারক্তনেত্রে কঠোর হৃদয়ভেদী দৃষ্টিতে চন্দ্রকলার সলজ্জ সুন্দর মুখের দিকে বারেক মাত্র চাহিয়া

দেখিলেন। চন্দ্রকলা তখন আপন মনের উচ্ছ্বাসে পূর্ণ রহিয়াই বলিতে লাগিল, "তা নয় রাজাধিরাজ! তা' নয়! ততদূর সৌভাগ্য এই বার-বিলাসিনীর জন্মে ঘটবার সম্ভাবনা মাত্র ছিল না। তাঁর গুণমুগ্ধা আমিই দুঃসাহসে নির্ভর করে তাঁর কৃপাকণামাত্র লাভের আশায় তাঁরই গৃহে সে দিন রাত্রে অভিসারযাত্রা করেছিলাম; কিন্তু—"

রাজাধিরাজ প্রলয় বিষাণের ভীমনাদে গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "বিশ্বাসঘাতিনী!"

চন্দ্রকলার কর্ণরন্ধ্রে বোধ করি বা সে গর্জ্জনধ্বনি প্রবিষ্টও হইল না। সে তখন যেন সকল সঙ্কোচমুক্ত হইয়া স্মৃতিসুখ-বিহ্বলতায় আত্মহারা হইয়া গিয়া হর্ষগদগদকণ্ঠে কহিতে-ছিল, "কিন্তু গিয়ে কি পেলেম? কি পেলেম? যা' চেয়েছিলেম, তার কণামাত্রও পেলেম না! পুরুষের কাছে যা' আমাদের চিরদিনের প্রাপ্য, তাই পেতেই ত লুব্ধ হয়ে—মুগ্ধ হয়ে তাঁর কাছে ছুটেছিলেম। কিন্তু তার বদলে পেলেম, এ জীবনে যা চিরদিন স্বপ্নের অতীত ছিল,—সেই প্রত্যাখ্যান! শুদ্ধ সংযত ভাষায় সুস্পষ্ট প্রত্যাখ্যান! জানেন, রাজেন্দ্র; এই রাজ-রাজেন্দ্র-বাঞ্ছিতা রূপসীপ্রধানা চন্দ্রকলা, নির্লজ্জ, উপযাচিকা হয়ে তাঁর পায়ের তলায় তার সর্ব্বস্ব উজাড় ক'রে দিয়েও তার বদলে এতটুকু একটি সোহাগের বাণী শুন্‌তে পেলে না! এ ত আপনার বিশ্বাস হয়! শুধু শুনে এলো, 'ভদ্রে!'—নাগরী নয়,—প্রেয়সী নয়,—শুধু মাত্র—নিরস, শুষ্ক 'ভদ্রে!' 'ভদ্রে! জ্যেষ্ঠের উপভোগ্যতায় তুমি আমার মাননীয়া', শুনে এল, 'তুমি যেই হও, যাই হও, আমার সম্মানযোগ্যা' আর শুনে এলো, 'একপত্নীব্রতী রামপালদেবের সে অস্পৃশ্যা!' কিন্তু এইতেই তার জীবন ধন্য হ'ল, পূর্ণ হ'ল রাজাধিরাজ! মানুষ, বিশেষতঃ পুরুষ মানুষ শুধুই,—মাপ কর্ব্বেন, আপ-নার মতই হয় না, আপনার ভাইয়ের মতও হয়, এই দেখে মানুষের 'পরে আজ এই প্রথমবারই আমার মনে শ্রদ্ধার উদয় হয়েছে। আর এই মানুষকেই আপনি আপনার মহাশত্রু ব'লে ভয় পাচ্ছেন! আশ্চর্য্য! এ লোক কি কখন কারো ক্ষতি করতে পারে? কখন না।"

চন্দ্রকলা নীরব হইল। আবেগে, আনন্দে, উত্তেজনায় তাহার কণ্ঠ সঘনে স্পন্দিত হইতেছিল, তাহার সমস্ত শরীর মন যেন একটা অননুভূত ভাবের বশে মুহুর্মুহু শিহরিয়া শিহরিয়া উঠিতেছিল, তাহার নটী-জীবনে এমন অপূর্ব্ব অনুভূতি সে যে আর কখন কোন দিনই লাভ করিতে পারে নাই! কিন্তু তাহার বর্ণিত এই অভিসার-কাহিনী যে রাজাধিরাজকে কি প্রকার উত্তেজিত ও ক্রোধ-ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল, সে তাহার আত্মবিস্মৃতিবশে তাহার কোনই ধারণাও করিতে পারে নাই। অগ্ন্যুৎপাতের পূর্ব্বক্ষণেও লোক যেমন ধারণা করিতে পারে না যে, সেই প্রচণ্ড অগ্নিশিখা এতক্ষণ বাহ্য-স্তব্ধ শ্যামায়মান গিরি-কোটরে নিবদ্ধ ছিল, তেমনই অগ্নিগর্ভ গিরিশৃঙ্গের মতই বাহ্যস্থৈর্য্যের সহিত নৃপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "রামপালের গৃহে এ অভিসারযাত্রা কবেকার কথা, নায়িকা?"

চন্দ্রকলা অকপটেই উত্তর করিল, "গত রাত্রে সেই তীর্থযাত্রা করেছিলেম রাজাধিরাজ।"

রাজা ইতঃপূর্ব্বেই ফিরিয়া আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, এখন সেখান হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বজ্রপাতরবের মতই নির্ম্মম কঠোর হাস্যের সহিত উত্তর করিলেন, "এই তবে তোমার শিরঃপীড়ার প্রকৃত নিদান? উত্তম! চন্দ্রকলা! তোমার প্রেমপাত্র রামপালের ছিন্নশিরই এ রোগের একমাত্র প্রতিষেধক এবং শীঘ্রই তা' তুমি তোমার এই প্রত্যাখ্যাত রাজবন্ধুর নিকট হ'তে উপহার-স্বরূপে লাভ করবে। আমিই এবার তোমার চিকিৎসা-ভার গ্রহণ ক'রে রাজবৈদ্যকে তাঁর পণ্ডশ্রম হ'তে মুক্তি দিলেম! এখন তবে বিদায় হচ্ছি, সখি! আবার দেখা হবে।"

চন্দ্রকলা গভীর আর্ত্তনাদ করিয়া দ্বারাভিমুখে উল্কার মতই ছুটিয়া আসিল, "রক্ষা কর! রক্ষা কর! রাজাধিরাজ! রাজাধিরাজ! আমার অপরাধে নির্দ্দোষের প্রতি এ কি ভয়ঙ্কর দণ্ডবিধান! উঃ, দয়া,—দয়া,—দয়া কর,—দয়া কর!"

একটা মায়া-দয়া-ক্ষমাহীন কঠোর উপহাসের বিকৃত উচ্চ হাসি মাত্র এই মর্ম্মাহত যন্ত্রণাপীড়িত আর্ত্তনাদের প্রত্যুত্তর প্রদান করিল। রাজাধিরাজ কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।
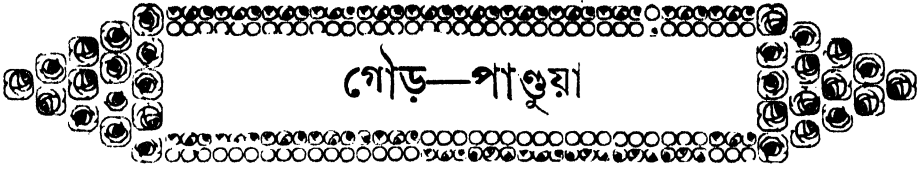
(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

নিমাসরাই

মহানন্দার পূর্ব্বপারে পুরাতন মালদহ ও পশ্চিমপারে যে স্থানে কালিন্দী নদী মহানন্দায় মিশিয়াছে, ঐ সঙ্গমস্থলের নিকটে নিমাসরাই নামক গ্রাম অবস্থিত। নিমাসরাইয়ে একটি উচ্চ মিনার আছে, উহা পুরাতন মালদহের পশ্চিমপ্রান্ত হইতে স্পষ্ট দেখা যায়। মিনারটির একটি বিশেষত্ব আছে—ইহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে চতুর্দ্দিকে প্রস্তরখণ্ড সকল বহির্গত হইয়া আছে, এইভাবেই ইহা নির্ম্মিত। ইহার পাদদেশের ব্যাস ১৮ ফুট এবং ইহার উচ্চতা ৫৫ ফুট। কথিত আছে যে, বিপদকালে রাত্রিতে ইহার উপরে অগ্নি জ্বালিয়া পাণ্ডুয়া ও গৌড়ের মধ্যে সঙ্কেত আদান-প্রদানের জন্য ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহা আবার মৃগয়ার জন্য মঞ্চরূপেও ব্যবহৃত হইত।

আমাদিগের গাড়ী মহানন্দার পূর্ব্ব পাড় দিয়া চলিল। ক্রমে নদীর ধার ত্যাগ করিয়া দুই পার্শ্বে আম্রবাগানশোভিত পথ ধরিয়া অগ্রসর হইলাম। এই অঞ্চলে রাস্তার দুই পার্শ্বে নদীর দহের ন্যায় কতকগুলি খাত আছে, সেগুলি দেখিয়া বুঝা যায় যে, পূর্ব্বে এই স্থানে নদী ছিল।

পাণ্ডুয়া

জালাল পারস্য দেশের তাব্রিজ সহরের অধিবাসী ছিলেন; পরে তিনি বঙ্গদেশে বাস করেন। কেহ বলেন যে, তিনি ১৩২৭ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন; অপর কাহারও মতে তিনি ১৪২২ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। তাঁহার মৃত্যুর প্রকৃত স্থান সম্বন্ধেও সন্দেহ আছে। কেহ বলেন যে, মালয় দ্বীপে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। র‍্যাভেন-শ এইরূপ একটি প্রবাদ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, দক্ষিণ দেশে তাঁহার মৃত্যু হয় এবং এই কবর তাঁহার আসল কবরের নকল বা জবাব মাত্র। এই দরগার উঠানের তিন দিকে উল্লেখযোগ্য ইমারতগুলি অবস্থিত আছে। ইহার জাম-ই-মসজেদ নামক মসজেদের একটি প্রকোষ্ঠে শাহ জালাল উপাসনা করিতেন। সুলতান আলি মোবারক ১৩৪৫ খৃষ্টাব্দে উক্ত মসজেদ নির্ম্মাণ করেন এবং ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দে ফকির সা নিয়ামতুল্লা ইহার সংস্কার করেন। কথিত আছে যে, এই মসজেদের মধ্যে শাহ জালাল যে স্থানে বসিতেন, নবাব সিরাজউদ্দৌলা উহার চতুর্দ্দিক্ রূপার রেলিং দ্বারা ঘিরিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু উক্ত রেলিং চুরি গিয়াছে। এককালে গৌড়ের কদম রসুল মসজেদের প্রস্তর-নির্ম্মিত পদচিহ্ন এই স্থানের দরগার পূর্ব্ব দিকে রক্ষিত ছিল, পরে উহা গৌড়ে লইয়া যাওয়া হয়।

এই দরগার উঠানে কতকগুলি কবর আছে। একটি একগুম্বজ-বিশিষ্ট মসজেদের ন্যায় গৃহে সপুত্র চাঁদ খাঁর কবর আছে। এই দরগায় ফকির শাহ নিয়মাতুল্লা কর্ত্তৃক খনিত যে পুষ্করিণী আছে, উহার উত্তর দিকে লক্ষ্মণসেনী দালান নামক একটি দালানের ধ্বংসাবশেষ আছে। লক্ষ্মণসেনের নাম শুনিয়া হিন্দুদিগের ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে, এই গৃহটির সহিত লক্ষ্মণ সেনের সম্পর্ক ছিল। কিন্তু মুসলমানগণ তাহা স্বীকার করেন না, পরন্তু তাঁহারা বলেন যে, লক্ষ্মণ সেন নামক জনৈক মাতোয়ালীর সময় উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া উহার ঐরূপ নামকরণ হইয়াছে। ইহার পশ্চিমদিকের দেওয়ালের খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে, হায়বাতুল্লা মাতোয়ালীর সময় এই ইমারত ভগ্নোন্মুখ হওয়ায় রাজপুত্র রামরাম ইহার সংস্কারের জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন।

এই দরগায় দক্ষিণদ্বারী যে ভাণ্ডারখানা আছে, উহা ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্বোক্ত চাঁদ খাঁ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। একটি তন্দুরখানার ঘর আছে, উহাতে সাহ জালালের চুল্লী বা উনান রক্ষিত আছে। প্রবাদ আছে যে, সাহ জালাল সেখ সিহাবুদ্দীন সুরবর্দ্দীর শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। দোকানের প্রস্তুত আহার্য্যে সিহাবুদ্দীনের পেটের অসুখ হইত বলিয়া সাহ জালাল তাঁহাকে উষ্ণ আহার্য্য যোগাইবার জন্য এই প্রজ্বলিত চুল্লীটি মস্তকে করিয়া লইয়া সিহাবুদ্দীনের সঙ্গে যাইতেন।

এই দরগায় হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দিরাদি হইতে সংগৃহীত প্রস্তরাদি দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতি বৎসর মুসলমানদিগের রজব মাসের প্রথম হইতে ২২ দিবস পর্য্যন্ত এখানে মুসলমান ফকির ও মোল্লাদিগের সমাগম হয়। শুনিলাম যে রজব মাসের ২২শে সাহ জালালের মৃত্যু তারিখ। ঐ তারিখে এই স্থানে ২২টি গরু ও ২২টি ছাগল বা খাসি জবাই করা হয় ও ২২ মণ চাউলের ভাত রন্ধন করা হয়। সেই সময় এবং সাবান মাসে এখানে মেলা হয়। এই স্থানের ইমারতগুলি দেখিয়া বোধ হইল যে, তৎপ্রতি কাহারও বিশেষ যত্ন নাই। শুনিলাম যে, এই দরগায় সংস্কৃত ভাষায় লিখিত সাহ জালালের একখানা জীবন-চরিত আছে, উহার নাম 'পুঁথি মবারক'। কেহ কেহ বলেন, সাহ জালালের

শুভোদয়া" নামক একখানি পুস্তক এই মসজেদে দেখিতে পাওয়া যায়।

সাহ জালালের বাইশ হাজারী বড় দরগার প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে উত্তর-পশ্চিম দিকে পথিপার্শ্বে পথের পশ্চিম দিকে "ছোট দরগা" নামক আর একটি দরগা আছে। এই দরগায় নুর কুতুবউল আলম নামক জনৈক ফকিরের কবর বিদ্যমান, সে জন্য কেহ কেহ ইহাকে "কুতুব সাহেব আস্তানা" কহিয়া থাকে। এই দরগার ৬ সহস্র বিঘা নিষ্কর ভূমি আছে বলিয়া ইহার আর এক নাম "ছয় হাজারী"। নুর কুতুব উল-আলমের মৃত্যুর ১২ বৎসর পরে ১৪৫৮ খৃষ্টাব্দে এই দরগাটি নির্ম্মিত হয়। ইহার পূর্ব্বদিকে পথিপার্শ্বে প্রস্তরনির্ম্মিত প্রবেশদ্বার আছে। যখন আমাদিগের মোটর গাড়ী এই দরগার সম্মুখে দাঁড়াইল, তখন অপরাহ্ণ প্রায় ৩ ঘটিকা। আমরা যে সদর রাস্তা দিয়া পাণ্ডুয়ার মধ্যে এই পর্য্যন্ত আসিয়াছি, এই রাস্তাটি প্রায় সোজা ভাবে পাণ্ডুয়ার মধ্যভাগ দিয়া উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। ডাক্তার বুকানন হ্যামিল্টন এই রাস্তা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, ইহা ১২ হইতে ১৫ ফুট প্রশস্ত, ৬ মাইল দীর্ঘ ও ইহার তলদেশ ইষ্টক দিয়া বাঁধান। ইহার দুই পার্শ্বে ইষ্টক-নির্ম্মিত অট্টালিকার সারি শোভা পাইত। এক্ষণে অট্টালিকার সারি আর নাই, কিন্তু রাস্তার দুই পার্শ্বে উহার স্তূপগুলি বনাকীর্ণ হইয়া আছে। উচ্চ ভূমিখণ্ডের উপরে অবস্থিত এই দরগায় প্রবেশ করিবার বৃহৎ দরওয়াজার প্রস্তরনির্ম্মিত বাজুতে দাগ দেখাইয়া মুসলমানগণ নবাগত পথিককে বলিয়া থাকে যে, ছকারপোষ নামক জনৈক ফকির ক্ষুধার্ত্ত হইয়া এই স্থানে আশ্রয় ভিক্ষা করিতে আসিলে তাহাকে এই বাটীতে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই। ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত ফকির দরওয়াজার প্রস্তরের উপরে পড়িয়া যাওয়ায় ফকিরের হস্ত, পদ ও স্কন্ধের দাগ প্রস্তরে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। দরওয়াজা দিয়া বাটীতে প্রবেশ করিলে দেখা যায় সম্মুখে বিস্তৃত উঠান। উঠানের মধ্যস্থলে একটি পুষ্করিণী আছে, উহার চারি ধারে জলের রেখা পর্য্যন্ত (এবং সম্ভবতঃ জলের নীচে পর্য্যন্ত) প্রস্তর দ্বারা বাঁধান ছিল, এখনও তাহার ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই পুষ্করিণীর পশ্চিম পারে একটি বিস্তৃত স্থানে অনেকগুলি কবর আছে, ঐ স্থানের প্রত্যেক দিকের মাপ প্রায় ১০০ গজ। পুষ্করিণীর পশ্চিম পাড়ের দক্ষিণাংশে একটি দীর্ঘ স্থান আছে, উহা প্রস্তর দ্বারা বাঁধান ও উঠান হইতে কিঞ্চিৎ উচ্চ। এই বাঁধান স্থানটির উত্তরাংশে রাজমহলের কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর (Basalt stone) দ্বারা নির্ম্মিত একটি সুশ্রী কবর আছে। ইহা প্রায় ২ ফুট উচ্চ ও ৬ ফুট দীর্ঘ। ইহার গাত্রে লিখিত আছে যে, ইহা তাহির মহম্মদের পুত্র বালক ইনায়াতুল্লা মাহমুদের কবর, তারিখ ১লা রমজান ১০১৭ হিজিরা (অর্থাৎ ২৯শে নবেম্বর ১৬০৮ খৃষ্টাব্দ) ইনি খোরাসানবাসী জনৈক ওমরাহের পুত্র।

এই স্থানের পশ্চিমদিকের উঠানের মধ্যস্থলে উন্মুক্ত আকাশের নীচে ফকির নুর কুতুব আলমের শান-বাঁধান কবর আছে। কবর হইতে সামান্য দূরে চারি কোণে চারিটি ও কবরের মস্তকের দিকে একটি রক্তাভ প্রস্তরের উচ্চ স্তম্ভ আছে। এই কবরের উপরে একটি চাঁদোয়া খাটাইয়া রাখা হইয়াছে। নুর কুতুব আলম ৮২৮ হিজিরায় (১৪২৪ খৃষ্টাব্দে) মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন, কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে, তাঁহার মৃত্যু ৮৫১ হিজিরা (১৪৪৭ খৃষ্টাব্দে) বা ৮০০ হিজিরা (১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে) হইয়াছিল। এই কবরের পশ্চিম দিকে একটি একতলা প্রাচীন গৃহ আছে। কথিত আছে যে, এই গৃহে কুতুব আলম উপাসনা করিতেন। এই গৃহটি সুলতান সামসুদ্দীন আবুল মজফ্‌ফর ইউসুফ সা ৮৮৪ হিজিরায় ২০শে রজব শুক্রবারে নির্ম্মাণ করেন, ইহাকে "চিল্লাখানা" কহে। ইহার পূর্ব্বদিকে ৩টি আলকাতরা-রঞ্জিত দ্বার আছে।

কুতুব আলমের কবরের সম্মুখে তাঁহার পিতা আলা উল-হকের কবর বিদ্যমান। কথিত আছে যে, ৭৮৬ হিজিরায় (১৩৮৪ খৃষ্টাব্দে) ইঁহার মৃত্যু হয়। খাঁ লতিফ খাঁ কর্ত্তৃক এই সমাধি নির্ম্মিত হইয়াছিল।

কুতুব আলমের কবরের দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে "বেহেস্তকা দরওয়াজা" নামক একটি স্থান আছে। এই স্থানে এক-গুম্বজ-শোভিত একটি ঘর দেখা গেল। এই স্থানে কুতুব আলমের পৌত্র সা-জাহিদের জন্ম হয়। মুসলমানদিগের বিশ্বাস, ভূতাবিষ্ট লোকদিগকে এখানে আনিলে ভূত ছাড়িয়া যায়।

উক্ত পুষ্করিণীর উত্তর-পশ্চিম কোণে একটি তিন গুম্বজবিশিষ্ট ভগ্ন মসজেদ আছে, উহা অযত্নে ধ্বংসপথে চলিয়াছে। ইহার নাম "মসজেদ কাজিমুর"। ইহার সন্নিকটে আলাউল হকের কবর। কাজিমুর এই মসজেদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন, উহার আয় বাৎসরিক ৫ শত মুদ্রা, এইরূপ শুনিলাম। মসজেদটির সংস্কার হয় না।

পূর্ব্বোক্ত পুষ্করিণী, মসজেদ ও কবরাদিশোভিত প্রাচীরবেষ্টিত এই দরগা বা মকবরার বাটীর উত্তরদিকে একটি বিস্তৃত পতিত ভূমিখণ্ড আছে, উহাতে জঙ্গলের মধ্যে ভগ্ন গৃহের স্তূপ, ইষ্টক ও প্রস্তরাদি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। এই স্থানটিকে "বিবি-মহল" কহে। এখানে এক স্থানে খনন করিয়া চারিটি সুন্দর কারুকার্য্যখচিত চতুষ্কোণ কষ্টি-পাথরের স্তম্ভ ও কাচের ন্যায় চাকচিক্যবিশিষ্ট কটা বর্ণের বৃহৎ প্রস্তর-খণ্ড সকল বাহির হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কয়েকটি গোলাকার কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তরাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এগুলি গোসলখানায় স্নানের আসন-রূপে ব্যবহৃত হইত। এই স্থানের সন্নিকটে বনের মধ্যে পুষ্করিণী আছে।

উক্ত বিবি-মহলের জমীর পূর্ব্বদিকে ও ছোট দরগার উত্তরদিকে "মুসাফির খানার" বাটী। এই বাটীর একটি ঘরে বর্ত্তমানে "কুতুব সহর" পোষ্টাফিস অবস্থিত। এখানে "মুরিদখানায়" হিন্দুদিগকে প্রকাশ্যে মুসলমান করা হইত। শুনা যায় যে, রাজা গণেশের পুত্র স্বধর্ম্ম-ত্যাগী নিষ্ঠুর যদু এই স্থানে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া জালালুদ্দীন নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পরবর্ত্তী কালে বহু প্রকারে হিন্দু-দিগের সর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন।

মুসাফিরখানার বাটীর পূর্ব্বদিকের দরওয়াজার বহির্দ্দেশে দুইটি বৃহৎ তাম্রনির্ম্মিত ডঙ্কার খোল পড়িয়া আছে। পূর্ব্বকালে আহারের সময় এই ডঙ্কা বাজাইয়া ফকিরদিগকে আহ্বান করা হইত। ডঙ্কাদ্বয়ের একটিতে মুর্শিদাবাদের নবাব মীর কাশিমের নাম ক্ষোদিত আছে, তিনিই এই ডঙ্কা দুইটি উপহার দিয়াছিলেন।

এই স্থানের সন্নিকটে উত্তরদিকে "বড় সোনা মসজেদ" বা "কুতুব সাহী মসজিদ" নামক একটি মসজেদের ভগ্নাবশেষ দণ্ডায়মান। ইহার পূর্ব্বদিকে ৫টি খিলান করা প্রস্তর-নির্ম্মিত দ্বার আছে। এই দ্বারগুলি দিয়া পশ্চিমদিকের প্রধান উপাসনা-গৃহে প্রবেশ করিতে হয়। এই গৃহের মধ্যভাগ দিয়া উত্তর হইতে দক্ষিণদিকে ৪টি প্রস্তরস্তম্ভ আছে। এই স্তম্ভ কয়টি গৃহটিকে উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে, প্রত্যেক ভাগের ঊর্দ্ধদেশে ৫টি করিয়া মোট ১০টি গুম্বজ এই মসজেদের উপরে শোভা পাইত। বর্ত্তমানে কোন গুম্বজ নাই, সমস্তই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মসজেদের অভ্যন্তরে পশ্চিমদিকের দেওয়ালের মধ্যে কারুকার্য্যখচিত ৫টি প্রস্তরমণ্ডিত কুলুঙ্গী বা মিম্বর আছে এবং খুতবা পড়িবার জন্য একটি প্রস্তরমণ্ডিত ছাদ-বিশিষ্ট প্রকোষ্ঠের ন্যায় আছে। উত্তর ও দক্ষিণদিকে দুইটি করিয়া ৪টি জাফরি করা জানালা। এই মসজেদটির মাপ ৮২'×৩৭' ফুট। ইহার পূর্ব্বদিকের মধ্যস্থলের দ্বারের ঊর্দ্ধদেশে কষ্টিপ্রস্তর-নির্ম্মিত একটি স্মৃতিফলকে লিখিত আছে যে, মহম্মদ আল কাবেরির পুত্র মখদুমের সেখ ইহার ভিত্তি স্থাপন করেন, এই মখদুম উবেদ কাজি ৯৯০ হিজিরায় (১৫৮২ খৃষ্টাব্দে) ইহা নির্ম্মাণ করেন। এই মসজেদের পূর্ব্বদিকের
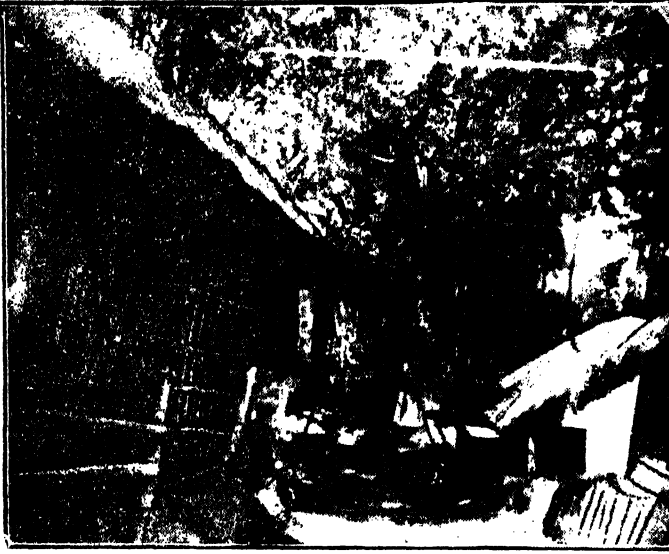
সদুল্লাপুর ঘাটের পার্শ্বস্থ অতি প্রাচীন ও বৃহৎ বটগাছ ও বাজারের একাংশ

এক্ষণে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মসজেদের অভ্যন্তরে মধ্য-স্থলে তিনটি কবর আছে, তন্মধ্যে একটি অপর দুইটি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চ। এই কবর তিনটির মধ্যে সর্ব্বোচ্চটি রাজা গণেশের পুত্র স্বধর্ম্মত্যাগী হিন্দুদ্বেষী অত্যাচারী যদুর বা সুলতান জালালুদ্দীনের। যদু তাঁহার পিতার নাম ডুবাইয়াছিলেন। "তবকাৎ-ই-আকবরীর" মতে যদু রাজ্যলোভে মুসলমান হয়েন। দুর্গাচরণ সান্যালের "বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসের" মতে তিনি মুসলমানীর প্রেমে পড়িয়া মুসলমান হয়েন এবং "রাজ-উস-সালা-তিন" অনুসারে তিনি বহু হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেন ও বহু হিন্দুকে মুসলমান করেন এবং ব্রাহ্মণদিগকে গোমাংস ভক্ষণ করিতে বাধ্য করেন। "বাঙ্গালার ইতিহাসে" বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন যে, চন্দ্রদ্বীপের কায়স্থ রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা দনুজমর্দ্দন দেব জালালুদ্দীনকে পাণ্ডুয়া হইতে দূরীভূত করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। পরে তাঁহার বংশধর মহেন্দ্রদেবের সময় পাণ্ডুয়া তাঁহার হস্তচ্যুত হয়। যাহা হউক, এই মসজেদাভ্যন্তরে জালালুদ্দীনের কবরের পার্শ্বের কবরটি তাঁহার বেগমের ও তৎপার্শ্বেরটি তৎপুত্র সুলতান আহম্মদ সাহের কবর। জালালুদ্দীনের ও আহম্মদ সাহের কবরের মস্তকের নিকটে দুইটি প্রস্তরের স্তম্ভের ন্যায় আছে, তন্মধ্যে আহম্মদ সাহের মস্তকের স্তম্ভটি তাঁহার কবরের উপরে কিঞ্চিৎ হেলিয়া রহিয়াছে। ইহা দ্বারা অনুমিত হয় যে, তিনি নিহত হইয়াছিলেন। কিন্তু র‍্যাভেনশ লিখিয়াছেন যে, এই কবরগুলি সুলতান গিয়াসুদ্দীনের, তাঁহার বেগম ও তাঁহার পুত্রবধূর, কিন্তু ঐতিহাসিকগণ এই মত গ্রহণ করেন না। কানিংহামের মতে এই মসজেদ বঙ্গদেশীয় পাঠান স্থাপত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। ইহাকে মসজেদ না বলিয়া মকবরা বা সমাধিস্থান বলাই বোধ হয় সঙ্গত। ইহার নির্ম্মাণে লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল বলিয়া ইহাকে একলাখী বলা হয়। ইহার বহির্দ্দেশের মাপ ৭৮' × ৭৮' ফুট, ইহার দেওয়াল ১৩' ফুট স্থূল। ইহার গৃহাভ্যন্তর অষ্টকোণবিশিষ্ট, এবং এক কোণ হইতে অপর কোণের মাপ প্রায় ১৮ ফুট। গৃহাভ্যন্তরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তের মাপ ৪৮ ফুট। ইহার গুম্বজের নিম্নভাগের

উঠানের পূর্ব্বদিকে ভগ্ন দরওয়াজা আছে, এই দরওয়াজা ৯৯৩ হিজিরায় (১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে) নির্ম্মিত হইয়াছে। এই মসজেদ ও ইহার দরওয়াজা দেওয়ালের ভিতরে চূণ-সুরকী দিয়া ইষ্টক গাঁথিয়া তাহার উপরে প্রস্তরের গাঁথনি করিয়া ইষ্টকের গাঁথনি ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা এক্ষণে পুর্ত্তবিভাগ কর্ত্তৃক সংস্কৃত ও সংরক্ষিত।

বড় সোনা মসজেদের অল্প দূর উত্তর-পূর্ব্বদিকে পথিপার্শ্বে বৃহৎ "একলাখী" মসজেদ অবস্থিত। ইহা ইষ্টকনির্ম্মিত, কিন্তু ইহার গাত্রে স্থানে স্থানে প্রস্তরের গাঁথনি আছে। মসজেদের উপরে একটি মাত্র বিশাল কিন্তু চূড়াবিহীন গুম্বজ। এই গুম্বজটি দেখিতে গৌড়ের চিকা ও গোটন মসজেদের গুম্বজের ন্যায়। দক্ষিণদিকে মসজেদের সম্মুখভাগ, দক্ষিণদিকে একটি প্রবেশদ্বার আছে, উহার চৌকাঠ প্রস্তরনির্ম্মিত। মসজেদের অপর তিন দিকে এক একটি করিয়া প্রবেশদ্বার। দক্ষিণদিকের প্রধান প্রবেশদ্বারের উপরের ও পার্শ্বের প্রস্তরে হিন্দু মূর্ত্তিসকল ক্ষোদিত। এই সকল প্রস্তরের মধ্যে কতকগুলি কষ্টি প্রস্তর ও সেগুলিতে সুন্দর কারুকার্য্য ও মূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে। দ্বারের উপরের প্রস্তরের চৌকাঠে একটি মূর্ত্তির চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, উহা সম্ভবতঃ কোন হিন্দু বা বৌদ্ধমূর্ত্তি ছিল, কিন্তু তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে। শ্রীযুত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার বাঙ্গালার ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে, এই কৃষ্ণশিলা-নির্ম্মিত তোরণ কোন বৌদ্ধ বা হিন্দু মন্দিরের দ্বার ছিল এবং কোন হিন্দু বা বৌদ্ধ মন্দির ধ্বংস করিয়া এই একলাখী মসজেদ নির্ম্মিত হইয়াছে। মসজেদের দক্ষিণদিকের দেওয়ালের বহির্গাত্রে ইষ্টকের উপরে নক্সা, লতাপাতা ও পুষ্পাদি ক্ষোদিত আছে। অন্যান্য দিকের দেওয়ালের বহির্গাত্রেও সামান্য কারুকার্য্য ক্ষোদিত। মসজেদের ছাদে চারি কোণের চারিটি মিনার ছিল, তাহা

বল্লাল সেনের প্রাচীন রাজপ্রাসাদের স্তূপ

বাহ্যে প্রায় ৪৮।• ফুট। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন যে, ইহা ১৪১৪ হইতে ১৪২৮ খৃষ্টাব্দ মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সমাধিগৃহ হিন্দু ও জৈন মন্দিরাদির মাল-মসলা দ্বারা নির্ম্মিত বলিলেও চলে। ইহা এক্ষণে পূর্ত্তবিভাগ কর্ত্তৃক সংস্কৃত ও সংরক্ষিত।

পাণ্ডুয়ার এই অঞ্চল নির্জ্জন। এখানে চতুর্দ্দিকে নিবিড় বন, উহাতে ব্যাঘ্র ও শূকরাদি হিংস্র জন্তুর বাস আছে। আমরা দিনাজপুর রোড দিয়া উত্তর-পূর্ব্বদিকে চলিলাম। একলাখী মসজেদ হইতে প্রায় ১ মাইল দূরে এই রাস্তার মধ্যে একটি প্রাচীন ইষ্টকনির্ম্মিত সাঁকো আছে। সাঁকোর নীচে গেলে দেখা যায় যে, উহাতে যে সকল প্রস্তর ব্যবহৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে হিন্দুর দেবমূর্ত্তি আছে। দেবমূর্ত্তিগুলির মধ্যে একটি গণেশের মূর্ত্তি আছে। সেকালে হিন্দুবিদ্বেষী মুসলমান রাজাদিগের সময় হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের মন্দিরাদির উপকরণ লইয়া ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারা যায়।

আদিনা

পাণ্ডুয়ার সীমা অতিক্রম করিয়া আমরা আদিনায় প্রবেশ করিলাম, দুই পার্শ্বে নিবিড় অরণ্য-শোভিত জনমানবহীন নিস্তব্ধ রাস্তা দিয়া চলিতেছি। এই রাস্তার দক্ষিণ দিকে একটি পথ গিয়াছে। এই পথ দিয়া প্রায় ১ মাইল গেলে একটি বনাকীর্ণ নির্জ্জন স্থানে উপস্থিত হওয়া যায়। এই স্থানটি বিখ্যাত আদিনা মসজেদের প্রায় ১ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। ইহার নাম "সাতাইশ গড়"। এখানে একটি পুষ্করিণীর তীরে, উহার একটি কোণে দুইটি ক্ষুদ্র গৃহের ধ্বংসাবশেষ আছে। এই পুষ্করিণীর মাপ অনুমান ১২০×৮০ গজ, ইহা উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, ইহা তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন কর্ত্তৃক খনিত হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত গৃহ দুইটির দেওয়ালের মধ্যে পোড়া মাটীর দ্বারা নির্ম্মিত সরু জলের নল বা পাইপ আছে। এই গৃহদ্বয় হামাম বা গোসলখানা ছিল বলিয়া কথিত হয়। কতকটা এই প্রকারের হামাম মহারাজা প্রতাপাদিত্য তাঁহার রাজধানী যশোহরে (বর্ত্তমানে খুলনা জিলার ঈশ্বরীপুরে) ও ঈশ্বরীপুর হইতে কালীগঞ্জ যাইবার পথে দুদলে ডকের পর্ত্তুগীজ নৌসৈন্যদিগের জন্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। আজিও তাহার ভগ্নাবশেষ ঐ দুই স্থানে আছে। শুনা যায় যে, সাতাইশ গড়ের এই স্থানে সেকেন্দর সাহের রাজপ্রাসাদ ছিল, এগুলি সেকেন্দর সাহের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ।

সাতাইশ গড়ের পূর্ব্বদিকে একটি পুষ্করিণী আছে, উহার নাম "রোগাতবাঁক"। এই পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে দুইটি অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ আছে এবং তথায় যাইবার জন্য দুইটি সাঁকোর ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান। সম্ভবত: এই স্থানে সেকেন্দর সাহের গ্রীষ্মাবাস ছিল। ইহার সন্নিকটে নাসিরসাহী দীঘি নামক একটি দীঘি আছে। ইহা সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে সুলতান মজফ্‌ফর মহম্মদ সাহের রাজত্বকালে খনিত হইয়াছিল।

দিনাজপুর রোডের পার্শ্বে পূর্ব্বোক্ত গণেশের মূর্ত্তিযুক্ত প্রাচীন সাঁকোর ১ মাইল দূরে আদিনার বিখ্যাত আদিনা মসজেদের ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত। ইহা একটি বৃহৎ চতুষ্কোণ মসজেদের বাড়ী। এই বাটীর মধ্যস্থলে অতি বৃহৎ মাঠের ন্যায় একটি উন্মুক্ত উঠান আছে। ঐ উঠানের চতুর্দ্দিকে খিলান ছাদ ও গুম্বজবিশিষ্ট গৃহের শ্রেণী ছিল। এক্ষণে পশ্চিমদিকের উত্তরার্দ্ধ অংশ বাদে আর সকল অংশের ছাদ বা গুম্বজ পড়িয়া গিয়াছে। (১) পশ্চিমদিকের দ্বিতল সমান উচ্চ গৃহের সারি উপাসনার জন্য ব্যবহৃত হইত। (২) উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকের খিলান করা ব্যারাকের ন্যায় গৃহগুলি পশ্চিমদিকের গৃহগুলির সহিত সমকক্ষতা করিতে পারে না, এগুলি অপেক্ষাকৃত নগণ্য।

এই মসজেদ বাটী হুগলীর ইমামবাড়ী ও মুর্শিদাবাদের কাটরা মসজেদ অপেক্ষা অনেক বড়। ইহার বহির্দ্দেশের মাপ উত্তর-দক্ষিণে ৫০০'+ পূর্ব্ব পশ্চিমে ৩০০'× উচ্চতা ৬০ ফুট। ফারগুসন বলেন যে, ইহা দামাস্কাসের বৃহৎ মসজেদের অনুকরণে নির্ম্মিত এবং ইহার গঠনপ্রণালী ও বিস্তৃতি তদনুরূপ। কথিত আছে যে, এই স্থানে পূর্ব্বে যে, হিন্দু মন্দির ছিল, উহা ধ্বংস করিয়া আদিনা মসজেদ নির্ম্মিত হয়। ভারতের এতদঞ্চলে এরূপ ইমারত আর একটিও নাই বলিয়া বিবেচিত হয়।

আদিনা মসজেদ রাস্তার পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। ইহা ইষ্টক ও প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত। ইহার পশ্চিমাংশের মধ্যস্থলের কতকাংশ দ্বিতল ছিল। ঐ দিকের বাকী অংশ একতলা হইলেও উহা দ্বিতল সমান উচ্চ ছিল। মসজেদের বাকী সমুদয় অংশ একতলা। এই মসজেদের নিম্নভাগ ও রোয়াক প্রস্তর দ্বারা বাঁধান। ইহার উর্দ্ধভাগ ইষ্টক-নির্ম্মিত।

(১) মসজেদের পশ্চিম দিকের বহির্গাত্র হইতে (ক) একটি গাড়ী-বারান্দার ন্যায় প্রকোষ্ঠ বাহির হইয়া আছে। ইহার পূর্ব্ব দিকে অর্থাৎ মসজেদবাটীর মধ্যস্থলের উঠানের পশ্চিম দিকে খিলান করা অত্যুচ্চ ব্যারাকের ন্যায় গৃহের যে ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়, উহা এত বড় যে, উহাতে এক সঙ্গে কয়েক সহস্র ব্যক্তি নমাজ পড়িতে পারিত। এই গৃহ ৩৮ ফুট প্রশস্ত। ইহা দুইটি অংশে বিভক্ত, যথা—(খ) উত্তর ও (গ) দক্ষিণাংশ। এই দুইটি অংশ দেখিতে বহু খিলানবিশিষ্ট দুইটি বৃহৎ হলঘরের ন্যায়। এই দুই অংশের মধ্যস্থলে (ঘ) একটি কষ্টি প্রস্তর-মণ্ডিত বৃহৎ প্রকোষ্ঠ আছে, ইহাই মসজেদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকোষ্ঠ ও প্রধান মোল্লার উপাসনার স্থান। এই প্রকোষ্ঠের উত্তর-পশ্চিম কোণে কষ্টি প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত একটি ক্ষুদ্র (ঙ) হিন্দু মন্দিরের ন্যায় আছে, ঐ মন্দিরে দাঁড়াইয়া প্রধান মোল্লা আজান দিত বা খোতবা পড়িত। মসজেদের পশ্চিমাংশের পূর্ব্বোক্ত (খ) বর্ণিত উত্তরার্দ্ধ অংশের গৃহমধ্যে দ্বিতলে একটি অনুচ্চ হল বা প্রকোষ্ঠের ন্যায় আছে, ইহাকে (চ) "বাদসা-কি-তক্ত" কহে।

(১) মসজেদবাটীর পশ্চিম দিকের বর্ণনা এইরূপ—

উক্ত (ক) অংশের পশ্চিম দিকের দেওয়ালের বহির্দ্দেশের প্রায় মধ্যস্থল হইতে একটি বৃহৎ প্রকোষ্ঠ মসজেদের গাত্র হইতে বাহির হইয়াছে। এই প্রকোষ্ঠটি দূর হইতে দেখিলে গাড়ী-বারান্দা বলিয়া ভ্রম হয়। ইহার প্রত্যেক দিকের মাপ ৩৮ ফুট। ইহার উপরে ৯টি গুম্বজ ছিল, কিন্তু সেগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এই প্রকোষ্ঠের উত্তর দিকে একটি অনুচ্চ প্রবেশদ্বার, উহার চৌকাঠ কষ্টিপ্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত ও তাহাতে নয়ন-বিমোহন সূক্ষ্ম কারুকার্য্য, লতা, পুষ্প, সর্প ও নানা প্রকারের মূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে। এগুলি সমস্তই কোন হিন্দু বা বৌদ্ধ মন্দিরের উপকরণ। এই প্রকোষ্ঠে মসজেদনির্ম্মাতা সেকেন্দর সাহের কবর ছিল, কিন্তু এই প্রকোষ্ঠের ছাদ পড়িয়া যাওয়ায় উহার যে সমাটী ও আবর্জ্জনা সরাইয়া ফেলিবার সময় অসাবধনাতাবশতঃ সেকেন্দর সাহের কবরটি পর্য্যন্ত ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই প্রকোষ্ঠের পূর্ব্ব দিকের দেওয়ালে দুইটি ক্ষুদ্র দ্বার আছে, তদ্দ্বারা মসজেদের পূর্ব্ববর্ণিত (খ) লিখিত অংশের মধ্যস্থ দ্বিতলস্থিত "বাদসা-কি-তক্ত" নামক (চ) লিখিত প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করা যায়।

পূর্ব্বোক্ত গাড়ী-বারান্দার ন্যায় প্রকোষ্ঠের গুপ্ত পথ দিয়া ওমরাহগণ-সহ বাদসাহ এই স্থানে উপবেশন করিতেন। পূর্ব্বোক্ত (ক) লিখিত প্রকোষ্ঠ এবং "বাদসা-কি-তক্ত" পূর্ব্বে একই সমতলে অবস্থিত ছিল। যে ভিত্তির উপরে (ক) লিখিত প্রকোষ্ঠ নির্ম্মিত, উহা ভূমি হইতে ৮ ফুট উচ্চ।

(খ) মসজেদের পশ্চিম দিকের পূর্ব্বোক্ত (খ) লিখিত উত্তর দিকের যে গৃহ আজিও অক্ষয় আছে, উহার মধ্যে উত্তর হইতে দক্ষিণদিকে প্রত্যেক

সারিতে ৮টি করিয়া চারি সারিতে মোট ৩২টি প্রস্তরের স্তম্ভ আছে। এই উত্তর দিকের গৃহের উত্তরাংশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে। স্তম্ভগুলির মধ্যে কতকগুলি গোল ও কতকগুলির মধ্যাংশ অষ্টকোণবিশিষ্ট চারি সারি স্তম্ভ থাকায় গৃহাভ্যন্তর উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ পাঁচটি অংশে বিভক্ত হইয়াছে। এই পাঁচটি অংশের প্রত্যেকটির উপরে ৯টি করিয়া মোট ৪৫টি গুম্বজ অবশিষ্ট আছে, এই গৃহের উত্তরাংশ যাহা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে, উহার মধ্যেও পূর্ব্বোক্তরূপ চারি সারি স্তম্ভ ছিল এবং উহাও উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ ৫টি অংশে বিভক্ত এবং তাহার উপরে ৪৫টি গুম্বজ ছিল; অর্থাৎ মসজেদের পশ্চিমদিকের গৃহের উত্তরাংশের উপরে মোট ৯০টি গুম্বজ ছিল, তন্মধ্যে পূর্ব্বে বর্ণিত মাত্র ৪৫টি অবশিষ্ট আছে। পশ্চিমদিকের দেওয়ালের মধ্যে ৭টি প্রস্তরমণ্ডিত মিম্বর বা কুলুঙ্গী ও চাকচিক্যশালী কৃষ্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত চৌকাঠযুক্ত একটি ছোট দ্বার আছে। আদিনা মসজেদের ন্যায় অতি বৃহৎ মসজেদের পক্ষে এরূপ একটি ক্ষুদ্রদ্বার অত্যন্ত অশোভন। এই গৃহের দক্ষিণাংশে মেঝের উপরে ইষ্টকনির্ম্মিত একটি কবর আছে। উত্তরদিকের প্রায় ৮০´×৪০´ ফুট স্থানের মেঝে হইতে প্রায় ৫ হাত উপরে, কিন্তু গৃহাভ্যন্তরে কষ্টিপ্রস্তরনির্ম্মিত কয়েকটি মোটা কড়ির উপরে পূর্ব্বোক্ত (চ) লিখিত "বাদসা-কি-তক্ত" নামক প্রকোষ্ঠ বা অনুচ্চ হলঘর আছে, তাহার উপরিভাগে মসজেদের ছাদে গুম্বজ আছে। পূর্ব্বোক্ত কষ্টিপ্রস্তরের কড়িগুলির নিম্নভাগে গোলাপপুষ্প ক্ষোদিত। এই গৃহের পশ্চিমদিকের দেওয়ালের ঊর্দ্ধভাগে কারুকার্য্য ক্ষোদিত আছে এবং পূর্ব্ব দিকে অর্থাৎ উঠানের দিকে ৯টি খিলান করা দ্বার বিদ্যমান। এই দিকের যে অংশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে, উহারও পূর্ব্বদিকে আর ৯টি বৃহৎ খিলান ছিল।

আদিনা মসজেদের পূর্ব্বদিকের দৃশ্য

(চ) লিখিত "বাদসা-কি-তক্তের" ঘরে, ইহার নীচের তলার পূর্ব্ব-বর্ণিত চারি সারি স্তম্ভের মধ্যে তিন সারির ২১টি স্তম্ভের উপরে তিন সারি স্তম্ভ অবস্থিত। উপরতলার স্তম্ভ ও খিলানগুলি হাল্কা। এই তিনটি সারির মধ্যের দুইটি সারির প্রত্যেকটিতে তিনটি করিয়া মোট ছয়টি বিট তোলা কষ্টি পাথরের ছোট গোল স্তম্ভ, সেগুলির গাত্র দর্পণের ন্যায় মসৃণ। যে স্থান জুড়িয়া "বাদসা-কি-তক্ত" আছে, উহার উপরে মসজেদের ১৮টি গুম্বজ আছে। "বাদসা-কি-তক্তের" পশ্চিম দিকের দেওয়ালের মধ্যে ৩টি কারুকার্য্যখচিত কষ্টিপ্রস্তরমণ্ডিত কুলুঙ্গী বা মিম্বর আছে এবং দেওয়ালে কোরাণের বয়েৎ লিখিত আছে। এইগুলির সম্মুখে বোধ হয় বাদশাহ ও ওমরাহগণ নমাজ পড়িতেন। "বাদসা-কি-তক্ত" নামক প্রকোষ্ঠের মাপ ৮০×৪০ ফুট, ইহার উচ্চতা ১২ ফুট।

(ঘ) লিখিত উপাসনার প্রধান প্রকোষ্ঠটি মসজেদবাটীর পশ্চিমদিকস্থ উত্তরার্দ্ধ অংশের (ক) লিখিত "বাদসা-কি-তক্ত" শোভিত ঘরের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। এই (ক) লিখিত অংশ হইতে উক্ত (খ) লিখিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকোষ্ঠে যাতায়াতের জন্য পাঁচটি খিলান আছে। এই প্রকোষ্ঠের পশ্চিমদিকের দেওয়াল মেঝে হইতে বহু দূর ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত কৃষ্ণবর্ণের মার্ব্বেল প্রস্তর দ্বারা মণ্ডিত। এই দেওয়ালের পাদদেশের মধ্যস্থলে, দেওয়ালের ভিতরে একটি অতি বৃহৎ কুলুঙ্গী বা কিবলা আছে, উহা দেওয়ালের বহু দূর পর্য্যন্ত জুড়িয়া রহিয়াছে। ইহার ঊর্দ্ধদেশে একটি কারুকার্য্যখচিত নয়ন-বিমোহন কষ্টিপ্রস্তরের দণ্ড বা স্তম্ভ শায়িত অবস্থায় গাঁথা আছে, উহা দেখিলেই বুঝা যায় যে, উহা কোন হিন্দু মন্দির হইতে সংগৃহীত। উহা এই কুলুঙ্গী বা কিবলার উপরে 'যেন তেন প্রকারেণ' গাঁথিয়া দেওয়া হইয়াছে মাত্র। দেওয়ালের ঊর্দ্ধভাগে এই বড় কুলুঙ্গীটির দুই পার্শ্বে দুইটি সুশ্রী ও বৃহৎ গোলাপপুষ্প ক্ষোদিত আছে। এই কুলুঙ্গীটির ঊর্দ্ধদেশে দেওয়ালের বহুদূর পর্য্যন্ত জুড়িয়া বৃহৎ তোগরা অক্ষর দ্বারা কোরাণের যে বয়েৎ প্রস্তরের উপর ক্ষোদিত আছে, তাহা এই—"হে বিশ্ববাসিগণ! তোমরা মস্তক অবনত করিয়া ভূমিতে পতিত হইয়া তাঁহার উপাসনা কর।" প্রস্তরে ক্ষোদিত অক্ষরগুলির প্রত্যেকটি ৯ ইঞ্চি দীর্ঘ। নীচে দাঁড়াইয়া দেখিলে লেখাগুলি অতি বৃহৎ বলিয়া মনে হয়। উক্ত বড় কুলুঙ্গীটির দক্ষিণপার্শ্বে দেওয়ালের মধ্যে অনুরূপ কিন্তু অপেক্ষাকৃত ছোট

সেন রাজগণের উচ্চ প্রাকার

আর একটি কুলুঙ্গী বা মিম্বর আছে। এই কুলুঙ্গী দুইটি ও পূর্ব্বোক্ত কুলুঙ্গীটি কষ্টিপ্রস্তরমণ্ডিত ও সূক্ষ্ম কারুকার্য্যখচিত। কুলুঙ্গীত্রয়-শোভিত এই গৃহের মাপ পূর্ব্ব ও পশ্চিমে ৬৪´ × উত্তর দক্ষিণে ৩২´ ফুট। এই প্রকোষ্ঠের উপরে একটিমাত্র বৃহৎ গুম্বজ ছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে। মেঝে হইতে এই গুম্বজের উচ্চতা র‍্যাভেনশর মতে ৮০ ফুট ও মালদহের গেজেটিয়ারের মতে ৬২ ফুট ছিল।

এই প্রকোষ্ঠের উত্তর পশ্চিম কোণে কষ্টিপ্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত পূর্ব্বোক্ত (ঙ) লিখিত প্রধান মোল্লার উপাসনার বেদী বা মঞ্চ আছে। উহা দেখিতে একটি ক্ষুদ্র হিন্দু মন্দির বা রথের ন্যায়। কলাবিদ্যা-বিশারদ হ্যাভেলের মতে ইহা একটি হিন্দু মন্দির। ইহাকে মুসলমানরা পোস্তবা বা ঐরূপ আর কিছু বলিয়া থাকে, তাহা অবগত নহি; মোট কথা, প্রধান মোল্লা ইহার মধ্যে দাঁড়াইয়া নমাজ পড়িতেন। ইহার সিঁড়ি, স্তম্ভ ও ছাদের খিলান প্রভৃতি সকলই কষ্টিপ্রস্তর নির্ম্মিত। এই ক্ষুদ্র মন্দিরের ছাদে এক খানি কষ্টিপাথরের দ্বারা নির্ম্মিত যে খিলান ছিল, উহার উপরে মসজেদের গুম্বজ ভাঙ্গিয়া পড়ায় উহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ছয়টি কষ্টিপাথরের সিঁড়ি বা পৈঁঠা বহিয়া উক্ত মন্দিরে উঠিতে হয়। সর্ব্ব উপরের সিঁড়ির গাত্রে ভয়াবহ বদনমণ্ডল ও কয়েকটি বাহু শোভিত একটি মূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ গাঁথা আছে। ইহা হিন্দুর নৃসিংহ মূর্ত্তি বা কোন বৌদ্ধ মূর্ত্তি হওয়া সম্ভব। এক কালে মোল্লা সাহেব ইহার উপরে অনুগ্রহ করিয়া দাঁড়াইয়া নমাজ পড়িতেন। র‍্যাভেনশ লিখিয়াছেন যে, তিনি দেখিয়াছিলেন, এই মন্দিরের সিঁড়ির নীচে একটি প্রস্তর পড়িয়া ছিল, উহাতে হিন্দুর দেবমূর্ত্তি ক্ষোদিত ছিল। হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের দেবস্থান ও দেবমূর্ত্তিসকল ধ্বংসকরারূপ মহাব্যাধি গোঁড়া মুসলমানদিগের গৌরবের বিষয় ছিল। ইহারই নিদর্শন পাটনা জিলার রাজগীর (রাজগৃহ), শিলাও (প্রাচীন বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান বিক্রমশিলা), বিহার সেরিফ (প্রাচীন বিহার) ও কাশী প্রভৃতি স্থানে দেখিয়াছি।

পূর্ব্বোক্ত (খ) লিখিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকোষ্ঠের দক্ষিণ দিকে উক্ত (গ) লিখিত মসজেদের পশ্চিমদিকের দক্ষিণাংশের হলঘর অবস্থিত আছে। ইহা বাহির হইতে দেখিতে পূর্ব্বে বর্ণিত উত্তরদিকের (খ) অংশের ন্যায়, কিন্তু ঐ অংশ অপেক্ষা দৈর্ঘ্যে ছোট। এই অংশ উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ। এই অংশের উপরে যে সকল গুম্বজ ছিল, তাহা সমস্তই ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে। এই হলঘরের মধ্যে উত্তর হইতে দক্ষিণদিকে চারি সারি প্রস্তরের স্তম্ভ ছিল, বর্ত্তমানে উহাদিগের নিম্ন ভাগের সামান্য অংশ মাত্র আজিও দণ্ডায়মান আছে। প্রত্যেক সারিতে ১৭৷০ জোড়া স্তম্ভ ছিল, তাহার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। স্তম্ভগুলি এই হলঘরকে উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ চারিটি অংশে বিভক্ত করিত। স্তম্ভগুলিকে আশ্রয় করিয়া প্রত্যেক অংশের উপরে ১৮টি করিয়া অর্থাৎ চারিটি অংশের উপরে মোট ৭২টি গুম্বজ ছিল। হলের পশ্চিমদিকের দেওয়ালের ভিতরে ১৮টি প্রস্তরমণ্ডিত কুলুঙ্গী বা মিম্বর আছে। এই কুলুঙ্গীগুলির উপরে দেওয়ালের ইষ্টকে সুন্দর কারুকার্য্য ক্ষোদিত। এই হলের পূর্ব্বদিকে অর্থাৎ মসজেদ বাটীর মধ্যস্থলের উঠানের দিকে ১৮টি দ্বারের খিলানের ভগ্নাবশেষ দণ্ডায়মান। উত্তরদিকে পূর্ব্বোক্ত (ঘ) লিখিত প্রকোষ্ঠে যাইবার জন্য ৫টি খিলান করা দ্বার আছে।

মসজেদবাটীর মধ্যস্থলের অতি বৃহৎ উঠানের পূর্ব্বদিকের মধ্যস্থলে সাধারণের জন্য এই বৃহৎ মসজেদবাটীর এক মাত্র নগণ্য প্রবেশদ্বার অবস্থিত। উঠানের পূর্ব্বদিকের গৃহ বা হলঘরগুলি মায় দেওয়াল ৩৮ ফুট প্রশস্ত। এই হলঘরগুলির মধ্যে উত্তর হইতে দক্ষিণদিকে দুই সারি স্তম্ভ ছিল। স্তম্ভগুলি হলগুলিকে উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ তিনটি অংশে বিভক্ত করিয়াছিল। উক্ত প্রস্তর-নির্ম্মিত স্তম্ভগুলির উপরে ইষ্টকনির্ম্মিত খিলান ছিল—আজিও স্থানে স্থানে আছে,—এবং উপরে গুম্বজ ছিল। মসজেদবাটীর পূর্ব্বদিকের হলের উপরে ১২৭টি গুম্বজ ছিল। মেঝে হইতে গুম্বজগুলির উচ্চতা ২০ ফুট বলিয়া শুনা যায়। মসজেদবাটীর বহির্দ্দেশে পূর্ব্বদিকে একটি কৃষ্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত কারুকার্য্যখচিত হিন্দু যুগের বৃহৎ হাঙ্গরের মূর্ত্তি আছে, ইহাকে মুসলমানগণ ড্রেণরূপে দেওয়ালের নীচে গাঁথিয়াছে।

মসজেদবাটীর উত্তর এবং দক্ষিণদিকেও পূর্ব্বদিকের ন্যায় দুই সারি স্তম্ভশোভিত হলঘর আছে। এই দুই দিকের হলঘরের উপরে ৩৯টি গুম্বজ ছিল। অন্য দিকের হলঘরগুলির ন্যায় এই হলঘরগুলিরও উঠানের দিকে খিলান করা দ্বার আছে।

আদিনা মসজেদের গাত্রে যে সকল প্রস্তর ব্যবহৃত হইয়াছে ও যে সকল প্রস্তর ভাঙ্গিয়া পড়িয়া আছে, উহাদের কয়েকটিতে গণেশ ও অন্যান্য হিন্দু মূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে। অনেকে অনুমান করেন যে, বর্ত্তমানে যেখানে আদিনা মসজেদ বিদ্যমান, তথায় পূর্ব্বে হিন্দু মন্দির ছিল। উক্ত হিন্দু মন্দির ও অন্যান্য স্থানের হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির ধ্বংস করিয়া উহাদিগের মাল-মসলা দ্বারা এই বৃহৎ মসজেদ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই মসজেদের নিম্নভাগ প্রস্তরমণ্ডিত ও উর্দ্ধভাগ ইষ্টকনির্ম্মিত। নিম্নভাগের যে অংশ প্রস্তরমণ্ডিত, উহার ভিতরে প্রস্তরের টুকরা সকল চূণ ও বালিমিশ্রিত সিমেণ্টের ন্যায় এক প্রকার মসলা দ্বারা গাঁথা হইয়াছে। উর্দ্ধভাগের ইষ্টকের গাঁথনিও এই মসলা দ্বারা করা হইয়াছে। এই গাঁথনি আজিও বজ্রের ন্যায় শক্ত আছে। বঙ্গবীর প্রতাপাদিত্য তাঁহার রাজধানীর ইমারতগুলিতে গৌড় ও পাণ্ডুয়ার অনুকরণে এই প্রকারের ঝিনুকের চূণ ও বালিমিশ্রিত গাঁথনির মসলা ব্যবহার করিয়াছেন। কলাবিদ্যাবিশারদ হ্যাভেলের মতে গৌড় ও আদিনার মসজেদাদি হিন্দুস্থাপত্যের সামান্য পরিবর্ত্তন মাত্র, উহাদের মধ্যে হিন্দু স্থপতি শিল্পের আদর্শই অধিক। আদিনা মসজেদে কষ্টিপাথর, চাকচিক্যযুক্ত কৃষ্ণবর্ণের পাথর ও শ্বেত ও লাল বর্ণমিশ্রিত এক প্রকার পাথর এবং সাধারণ কালো পাথর ও রক্তবর্ণের ইষ্টক ব্যবহৃত হইয়াছে। পাথরগুলির মধ্যে লৌহ কীলক প্রবেশ করাইয়া উহাদিগের গাঁথনি মজবুত করা হইয়াছে। এই মসজেদ ইলিয়াস সাহের পুত্র সুলতান সেকেন্দর সাহ ৭৭০ হিজিরা (১৩৭৪ খৃষ্টাব্দে) নির্ম্মাণ করেন।

আদিনা মসজেদের গাত্রে, এবং উহার চতুষ্পার্শে কিয়ৎদূর পর্য্যন্ত বনজঙ্গল বা একটি ক্ষুদ্র গাছ পর্য্যন্ত নাই—গবর্ণমেণ্ট পূর্ত্তবিভাগের যত্নে ইহা অতীব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অবস্থায় রাখা হইয়াছে। পূর্ত্তবিভাগের এলাকার বাহিরে চতুর্দ্দিকে নিবিড় দুর্ভেদ্য জঙ্গল আছে; বলা বাহুল্য যে, জঙ্গলে ব্যাঘ্র ও শূকরাদি আছে। স্থানটি অত্যন্ত নির্জ্জন। এইরূপ একটি প্রবাদ আছে যে, আদিনার উপকণ্ঠে কোন স্থান খনন করিয়া পূর্ব্বে সীসা উত্তোলন করা হইত।

আদিনা মসজেদের পশ্চিমদিকে দিনাজপুর রোডের পার্শ্বে পরিষ্কৃত বিস্তৃত ভূমিখণ্ডের মধ্যে ডাকবাঙ্গলোর একটা এক কোঠা ঘর, ভৃত্যদিগের থাকিবার ঘর ও একটি ইন্দারা আছে। য়ুরোপীয়গণ ও অবস্থাপন্ন দেশীয় পর্য্যটকগণ অনেক সময় আদিনা মসজেদ দেখিতে আসেন বলিয়া এখানে ডাকবাঙ্গলোর সুব্যবস্থা আছে।

আদিনা দেখা সমাপ্ত করিয়া অপরাহ্ণ ৪৷০ টার পরে আমরা মোটর যোগে ফিরিয়া চলিলাম। আদিনা ও পাণ্ডুয়ার রাস্তার দুই পার্শ্বে পতিত ভিটার উচ্চ ভূমিতে নিবিড় অরণ্য।

বঙ্গদেশে তিনটি পাণ্ডুয়া আছে, একটি হুগলী জিলায়, একটি মানভূম জিলায় ও অপরটি মালদহ জিলায়। আমাদিগের বর্ণনার বিষয় মালদহের পাণ্ডুয়া অতি প্রাচীন স্থান। অনেকে অনুমান করেন যে, ইহাই প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বা "পাণ্ডুনগর"। চৈনিক পরিব্রাজক হিউ-য়েন সাংএর ভ্রমণকাহিনীতে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের উল্লেখ আছে। "বিশ্বকোষে" লিখিত আছে যে, খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে জয়ন্ত গৌড়ের রাজা ছিলেন

ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে তাহার রাজধানী ছিল। পাণ্ডুয়া বারেন্দ্রভূমে অবস্থিত। পুরাতন মালদহ হইতে উত্তর পূর্ব্বদিকে ইহার দূরত্ব তিন ক্রোশ। ইংলিশ বাজার হইতে আদিনার দূরত্ব ১৪ মাইল। বর্ত্তমানে ইহার কয়েকটি নাম আছে, যথা—"পেঁড়ো, পাঁরুয়া, ও পাণ্ডুয়া"। এই স্থান ঐতিহাসিকদিগের প্রিয় স্থান—মহাস্থান গড়ের অন্তর্গত। মুসলমান রাজাদিগের সময় ইহার নাম "ফিরোজাবাদ" হয়। পাণ্ডুয়ার বড় দরগার পীর জালালুদ্দীন তাব্রেজীর মৃত্যুতারিখ ৬৪১ হিজিরা (১২৪৪ খৃষ্টাব্দ)। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ঐ সময় মুসলমানরাজত্বকালে পাণ্ডুয়ার অস্তিত্ব ছিল। ইলিয়াস সাহের রাজত্বকালে পাণ্ডুয়ার নাম পাওয়া যায়। সেকন্দর সাহ ইহাকে স্থায়ী রাজধানী রূপে ব্যবহার করেন এবং তৎকর্তৃক আদিনা মসজেদ ও সাতাইস গড়ের রাজপ্রাসাদ নির্ম্মিত হয়। শ্রীযুত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "বাঙ্গালার ইতিহাসে" উল্লেখ করিয়াছেন যে, ১৩৩৯ শকাব্দে—১৪১৭ খৃষ্টাব্দে—৮১৯-২০ হিজিরায় পাণ্ডুয়া বা পাণ্ডুনগর চন্দ্রদ্বীপের বিখ্যাত কায়স্থ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা শাক্ত বীর দনুজমর্দ্দন দেবের অধিকারভুক্ত ছিল। তৎকালে রাজা গণেশের পুত্র স্বধর্ম্মত্যাগী ও নৃশংস যদু বা জালালুদ্দীন মহম্মদ সাহ গৌড়ের সুলতান ছিলেন। দনুজমর্দ্দন দেব উক্ত জালালুদ্দীনকে পাণ্ডুয়া হইতে বিতাড়িত করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন ও পাণ্ডুয়ায় নিজ নামে মুদ্রাঙ্কন করেন। পরে দনুজমর্দ্দনের পুত্র মহেন্দ্র দেবের রাজত্বকালে পাণ্ডুয়া পুনরায় জালালুদ্দীনের হস্তগত হয়। "রিয়াজের" মতে লিখিত আছে যে, জালালুদ্দীন ৮২২ হিজরায় পাণ্ডুয়া হইতে রাজধানী গৌড়ে স্থানান্তরিত করেন। তাহার ফলে ক্রমে পাণ্ডুয়া নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে। পাণ্ডুয়ায় সাহ জালাল ও কুতুব সাহের দরগা থাকায় উহা মুসলমানদিগের তীর্থস্বরূপ হইয়াছে। উক্ত দরগাদ্বয়ের সন্নিকটে অল্পসংখ্যক মুসলমানের বাস আছে, তাহা ছাড়া আর সকল স্থানে নিবিড় জঙ্গল। পাণ্ডুয়ার বাহিরে পুরাতন মালদহে যাইবার রাস্তার দুই পার্শ্বে স্থানে স্থানে সাঁওতাল ও হিন্দুস্থানী কৃষকগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লী আছে। ইহারা বন জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া চাষ আবাদ করিতেছে। পূর্ব্বে পাণ্ডুয়া দিনাজপুর জিলাভুক্ত ছিল, এক্ষণে ইহা মালদহ জিলাভুক্ত হইয়াছে। গৌড় ও পাণ্ডুয়া অঞ্চলের নিম্নশ্রেণীর লোক যে ভাষা কহে, উহা শুনিতে বাঙ্গালার সহিত হিন্দুস্থানী মিশ্রিত বলিয়া মনে হয়।

আমরা সন্ধ্যাকালে প্রায় ৫। টার সময় মহানন্দা তীরে উপস্থিত হইয়া ৬৷৷০ টার সময় রামনগরের কাছারীতে ফিরিলাম। পরের দিন মোটরযোগে পূর্ব্বে বর্ণিত "বল্লাল-বাড়ী" দেখিয়া বৈকালের ট্রেণে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলাম ও তৎপর দিবস ২৮শে ডিসেম্বর প্রাতে কলিকাতায় পঁহুছিলাম। চাঁচলের রাজার রামনগর কাছারীর কর্ম্মচারিগণ, বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত পূর্ণব্রহ্ম পাঁড়ে মহাশয় যেরূপ যত্ন করিয়াছিলেন, সেরূপ বর্ত্তমানকালে সচরাচর দেখা যায় না। রাজকাছারীতে আশ্রয় ও যত্ন পাওয়ার জন্য আমরা চাঁচলের রাজা ও রাজকর্ম্মচারিগণের নিকট কৃতজ্ঞ।*

শ্রীসুজননাথ মিত্র মুস্তৌফী।

* এই প্রবন্ধের আলোক-চিত্রগুলি শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্ত, এম, আর, এ, এস্ কর্ত্তৃক গৃহীত।

ভীম

হে বৃকোদর, তুমিই এসো
আজকে তোমায় বরণ করি,
বঙ্গভূমির যাজ্ঞসেনী
কাঁদছে তোমায় স্মরণ করি।
বিরাটপুরের অজ্ঞাতবাস
আনুক নূতন আলোর আভাস
আজকে এসো ভয়াল দয়াল
শঙ্কা নারীর হরণ করি।

বুক ফুলায়ে বেড়ায় কীচক
নিত্য উপকীচক সাথে,
ললনাকুল-লাঞ্ছিত আজ
যেথায় সেথায় পশুর হাতে।
এসো তুমি হে নির্ম্মম
অজার দলে বৃকের সম
লম্পটেরা লুটাক ধরায়
গদাঘাত আর পদাঘাতে।

রুদ্র এসো, অনাচারীর
মন্মথেরে মথন করো,
ঘৃণ্য পাপের রাজ্যে তুমি
পুণ্যে পুন বোধন কর।
ভাঙ্গো দুর্য্যোধনের উরু
ভণ্ডকে দাও শাস্তি গুরু
দুঃশাসনের শোণিতধারায়
ধরায় তুমি শোধন কর।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

কথা ও সুরের ব্যাকরণ

ব্যাকরণ যে নিতান্ত ভয়াবহ, তাহা আমি স্বীকার করি না। সরল ভাষায় গল্পচ্ছলে তাহার সার মর্ম ব্যক্ত করিলে প্রীতি-কর হইয়া পড়ে।

বাইবেলের মতে ব্যাকরণের আরম্ভ মানবসৃষ্টি অর্থাৎ ইডেনগার্ডেন হইতে। আমরা ইংরাজি-ব্যাকরণপ্রিয়, সুতরাং সেই পবিত্র স্থান হইতে আরম্ভ করিলাম।

ইডেনগার্ডেনে প্রথম পুরুষ—Adam = আমি
" দ্বিতীয় পুরুষ—Madam = তুমি
" তৃতীয় পুরুষ—Unknown = তিনি,

টীকা

আমাদের শাস্ত্রে first person = উত্তম পুরুষ,
second person = মধ্যম পুরুষ,
third person = প্রথম কিংবা
তৃতীয় পুরুষ।

আমাদের শাস্ত্রে প্রথম মানবযুগল কে, তাহার ইতিহাস নাই। বিজ্ঞানের মতে প্রকৃতিই তৃতীয় পুরুষ। তিনি শব্দের অর্থ 'ঈশ্বর' বলিলে তাঁহার অবমাননা করা হয়; সুতরাং পরমাত্মার কোন উল্লেখ করিলাম না।

"আমি"র আকার পুরুষের। "তুমি"র আকার স্ত্রী-জাতির। 'তিনি' অশব্দ, অরূপ, অব্যয়। Madamএর নাম Eve। তৃতীয় পুরুষের নাম কেহ কেহ দিয়াছেন—Governor। তিনি লিঙ্গহীন। উদাহরণ,—'হুজুর মা-বাপ', এই বচনের উদ্দেশ্য হুজুর ক্লীবলিঙ্গ, কিংবা পুংলিঙ্গ, কিংবা স্ত্রীলিঙ্গ, কিংবা সকলই। যথা—He, She, it, they প্রভৃতি। they শব্দে বিশ্বকে বুঝায়।

ইডেনগার্ডেন খুব মনোরম্য স্থান। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের আধার। আমরা তাহাকে 'ইন্দ্রিয়' বলিয়া থাকি।

অর্থগ্রাফি (Orthography)

বর্ণের উৎপত্তির নাম অর্থগ্রাফি। ইহার দ্বারা অর্থ লিখিতে পারা যায়। অর্থ = meaning, গ্রাফি = I write। খালি বকিয়া গেলে তাহার কোন অর্থ পাওয়া যায় না। এই জন্য লেখার দরকার।

বর্ণ দুই প্রকার—Vowel ও Consonant। কেবল গলা ছাড়িয়া দিলে যে শব্দ হয়, তাহার নাম Vowel = স্বর-বর্ণ। গলা কিঞ্চিৎ চাপিয়া মুখের নানাবিধ স্থানে জিহ্বা সংলগ্ন করিলে যে শব্দ হয়, তাহার নাম Consonant = ব্যঞ্জন বর্ণ। আর এক প্রকার বর্ণ আছে, তাহার নাম সানু-নাসিক। তাহা নাসিকা টিপিয়া ধরিলে বাহির হয়।

সা রি গ ম প্রভৃতি স্বর ও ব্যঞ্জনের যুক্তাবস্থা। ছাড়ি-বার ও চাপিবার তারতম্যে তাহাদের ঊর্দ্ধ কিংবা অধোগতি হয় = আরোহী ও অবরোহী। কেবল নিষাদ সানুনাসিক, অর্থাৎ কাঁদুনি সুর।

প্রথম পুরুষ যদি আরোহীর দিকে যান, দ্বিতীয় পুরুষ অবরোহীর দিকে না গিয়া, তাহারও চড়াসুরে যাওয়ার নাম কসরৎ। উদাহরণ—Adam এবং Madamএর বচসা। ক্রমে Madam সানুনাসিক পর্য্যন্ত পৌঁছিলে Adamকে বাধ্য হইয়া অবরোহীর দিকে আসিতে হয়।

সা রি গ ম প ধ নি = আরোহী
নি ধ প ম গ রি সা = অবরোহী

ইংরাজি ব্যাকরণের Alphabetএর মধ্যে ত প্রভৃতি অর্থাৎ দন্ত্যবর্গের সংস্রব নাই। যথা—ত = T, থ = Th, দ = Th, ধ = Dh, ন, ণ = Nh। ইহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, Adam ও Madamএর দাঁত ছিল না। হয় নিতান্ত শিশু, কিংবা বার্দ্ধক্যের শেষ অবস্থাপন্ন।

Etymology

কথার ভাগকে Parts of speech কহে। যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তব, তাহাকে Noun = বিশেষ্য কহে। যথা, Eden Garden এবং তাহার অন্তর্গত যত পদার্থ এবং তাহাদের গুণসমষ্টি। তানপুরা, পিয়ানো, তবলা, মৃদঙ্গ, বাঁশী, গান, সঙ্গত, বাহবা ইত্যাদি সকলই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, অতএব Noun।

যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, তাহা Pronoun = সর্ব্বনাম। যেমন—আমি, তুমি, তিনি। আয়ুর্ব্বেদের মতে ইঁহারা আত্মার ত্রিবিধাবস্থা—বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মাঘটিত।

সঙ্গীতশাস্ত্রে এই অবস্থাত্রয়ের নানাবিধ বিকাশের নাম রাগ ও রাগিণী (melody)।

প্রথম পুরুষের বায়ুবিকারের নাম 'রাগ' (oratoris)

দ্বিতীয় পুরুষের পিত্তবিকারের নাম রাগিণী (sonata)

তৃতীয় পুরুষের কফবিকারের অর্থাৎ সুষুপ্তির ও নাসিকাধ্বনির নাম ঐক্যতানবাদন (concert)।

বিশেষ্য হইতে যে শব্দ বাহির হয়, তাহা কেবল জাতীয় শব্দ, যেমন—কোকিল, ময়ুর, গণ্ডার, খরগোস প্রভৃতির ধ্বনি। ইহার মধ্যে কোন বিকারাবস্থা কিংবা harmony নাই। Spencer এবং Darwin প্রভৃতি মনীষিগণ ইহাকে generative music বলেন অর্থাৎ প্রজননপ্রবৃত্তির সুর। Ethicsএর মতে এগুলি non-moral সুর। সারিগমর কসরৎ moral, কিংবা স্থানবিশেষে immoral হইতে পারে, যদি পিত্তঘটিত প্রেম থাকে।

বিশেষ্যের তারিফ কিংবা নিন্দা করার ভঙ্গীকে বিশেষণ বলা যায়। যেমন হেঁড়ে-গলা রাম, মিষ্টস্বরা কনকলতা, ফাজিল প্রবন্ধলেখক ইত্যাদি। সকল প্রকার সমালোচনার উদ্দেশ্য বিশেষণকে ফেনাইয়া তোলা Adjective analysis।

হস্তপদাদি চালন, গলাবাজি প্রভৃতি শারীরিক ও মানসিক যত রকম গতিবিধিকে ক্রিয়া = verb কহে।

বিশেষ্যের তারিফ না করিয়া যদি ক্রিয়ার তারিফ কিংবা নিন্দা করা যায়, তাহার নাম ক্রিয়া-বিশেষণ = adverb।

চড়িয়া বসার কিংবা নামিয়া যাওয়ার কিংবা উপস্থিত হওয়ার কথা preposition নামক অব্যয় দ্বারা প্রকাশিত হয়। যেমন সা 'হইতে' প 'তে' ওঠ। দেশের 'দিকে' তাকাও।

দুই কিংবা অনেক বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্ব্বনাম প্রভৃতি একত্র হইয়া গোলোযোগ বাধাইলে তাহার নাম conjunction, যেমন Adam ও Madam এবং তাঁহাদের প্রেমিক বন্ধু-বান্ধব। সা + প + ম + মী + ধ ইত্যাদি।

ভাবের হিক্কা-(হেঁচকি)-কে interjection বলা যায়। যেমন বাঃ, কেয়াবাৎ, করিমৎ।

Number.

সংখ্যার নাম Number. যেমন এক হইতে যত দূর—গণিতে পারা যায়; কিন্তু ব্যাকরণে এক হইতে তিনের অধিক 'বচনের' মধ্যে আসে না, অতএব নাম হইয়াছে একবচন (Singular), দ্বিবচন (dual এটা ইংরাজিতে নাই) এবং বহুবচন (plural)। ইংরাজিতে দ্বিবচন নাই; কারণ, Adam ও Madam একাত্মা, যতদিন পর্য্যন্ত divorce (বিভক্তি) না ঘটে, (বিভক্তি) বি = বিশেষ রূপে) + ভজ (ভজিবার) + কর্ম্ম—ক্তি (কর্ম্মফল)। কিন্তু আমরা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, অতএব অবস্থানুসারে দ্বিবচন মানি, এবং Divorce হয় না। উদাহরণ—'তুমি আমারই' = আমরা দুজনে এক = একবচন। 'বাটী হইতে বাহির হইয়া যা পোড়ামুখি!' এই যে কটুবচন, ইহা দ্বিবচন = দ্বিজের বচন (দ্বিজস্য বচনং,) অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতির মধ্যেই Divorce নাই। শূদ্রের বিভক্তি আছে ইংরাজি ব্যাকরণের মত।

পুত্র কলত্র ও সংসারের বাকী আত্মাগুলি বহুবচন। সঙ্গীতাচার্য্যগণ অদ্বৈতবাদী শাক্ত। অর্থাৎ একই সুর 'সা' হইতে শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি হইলে (কণ্ঠের মাংসপেশীর আকুঞ্চন ও প্রসারণের অনুপাতে) রি, স, ম প্রভৃতি নানাপ্রকার শব্দ বাহির হইয়া পড়ে। উহার প্রক্রিয়া যাঁহাদের কোষ্ঠবদ্ধের ব্যায়াম আছে, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন। সাধারণ ভাষায় ইহা বেগসাপেক্ষ। আয়ুর্ব্বেদের মতে আত্মার বহুত্ব 'ইচ্ছাভেদী বটিকা' সেবনে প্রমাণ হইয়া পড়ে। কিন্তু কণ্ঠবদ্ধ বায়ু ও কোষ্ঠবদ্ধ বায়ুর তুলনা আমাদের মতে অসভ্যতা ও ঘৃণাকর।

ইংরাজি ব্যাকরণে একবচনের পশ্চাদ্ভাগে শিস্ দেওয়ার মত শব্দ করিলে বহুবচন হইয়া পড়ে, যথা—

Hindu + হুস্—স্ = Hnidus

Box + হুস্—স্ = Boxes

ইহাই সাধারণ নিয়ম, অন্যান্য নিয়মও আছে। আমরা 'রা,' 'বৃন্দ', 'গণ', 'সমূহ' প্রভৃতি বাক্য দ্বারা প্রকাশ করি। যেমন বালকবৃন্দগণসমূহসকল = স্কুলে যত রকম বালক আছে। বিভাষ-ভৈরবী-খটযোগিয়া = সকালবেলার কতকগুলি সম্মিলিত রাগিণী।

বহুবচন মাত্রেই জংলা। কারণ, ঠিক এক রকমের দুটি কিংবা তিনটি ও অধিক পদার্থ সংসারে থাকিতে পারে না। সুতরাং অদ্বৈতবাদীর মতই বিজ্ঞানসম্মত, অর্থাৎ একই পদার্থের নামাদিক্ ও নানাভাগ মুহুর্মুহুঃ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। রাগরাগিণী মাত্রেই জংলা। এক রকম রাগিণীও ঠিক এক রকম ভাবে কেহ প্রকাশ করিতে পারে না।

GENDER.

Gender আসলে দুই প্রকার

Pa—gender = Adam = Pa—pa

Ma—gender = Madam = Ma—ma

আমরা স্ত্রী ও পুরুষ বলিয়া থাকি। ম্যা-জেণ্ডারই gender, কারণ, প্যা-জেণ্ডার ম্যা-জেণ্ডার হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকেন।

Neuter gender বলিয়া কোন নূতন জেণ্ডার প্রাকৃতিক Laboratoryর মধ্যে দাঁড় করান' বিজ্ঞানসম্মত নহে। বরঞ্চ যতক্ষণ Gender স্থির না হয়, ততক্ষণ কুমার ও কুমারী বলিলেও চলে।

যথা,—বৃক্ষকুমার, প্রস্তরকুমারী, বিদ্যুৎকুমারী, বজ্র-কুমার, অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি।

সুতরাং বুঝিতে হইবে, রাগ ও রাগিণী উভয়েই ক্লীব, কিংবা কুমার ও কুমারী এবং তাহাদের পুত্র-কন্যা বন্ধ্যা-পুত্রের মত, অথচ মিশাইলে খুব সুন্দর হয়। সুতরাং খাটি রাগরাগিণী কিংবা রাগিণীর স্ত্রীস্বাধীনতা, কিংবা রাগ-রাগিণীর জাতিভেদ সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক করা কেবল Orthographyর অবমাননা ও সময় নষ্ট মাত্র।

ইডেনগার্ডেনে Genderএর তত্ত্বব্যাখা করিয়াছিল, একটা বদমায়েস লোক (Satan = শয়তান)। সে বুঝাইতে চাহিয়াছিল যে, প্রেম ও প্রজনন-প্রবৃত্তি একই জিনিষ। সে দর্শনশাস্ত্রের ভ্রমাত্মক ব্যাখ্যা (জ্ঞান) দ্বারা সাব্যস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল যে, 'মম যোনি র্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্' বচনের অর্থ যে, বিধাতা কামপরবশ হইয়া সৃষ্টি নামক প্রজনন-ক্রিয়ারত। আমরাও কালক্রমে সেই জ্ঞানবৃক্ষস্থিত সর্পের বাণী শিরোধার্য্য করিয়া শা' কোম্পানী ও মেটেরলিংক কোম্পানীর মন্ত্রপাম করিয়া কামবিহ্বল হইয়া পড়িতেছি। সেই জন্যই বর্ণসঙ্করত্বের ভয়, জাতিভেদের ভয়, স্ত্রীস্বাধীনতার ভয়।

বরং Common gender ব্যবহার করা ভাল। যেমন স্ত্রীকে আদর করিয়া 'Dear, child, sovereign, freind' প্রভৃতি বলা ব্যাকরণসঙ্গত ও স্বামীকে আদর করিয়া 'child, dear, friend, servant, sheep, dunce, dog' প্রভৃতি বলা যাইতে পারে।

আমার বিবেচনায় রাগরাগিণীগুলি সবই common gender; উহাদের 'জাতি' উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু আধুনিক সমাজের মত ভেদ উঠিয়া যায় নাই। রাগিণীকে ব্যাকরণের গণ্ডীর মধ্যে' অবরোধ করিয়া রাখা দুর্দ্ধর্ষ ব্যাপার, কারণ, রাগ যখন ব্যাকরণের গণ্ডী পদাঘাতে ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, তখন সদর ও খিড়কীর সাম্যাবস্থা সংস্থাপন হাস্যকর।

রাগকে রাগিণী করিতে গেলে মুখব্যাদানপূর্ব্বক 'আ' কি 'ঈ' লাগাইয়া দিতে হয়। যেমন-

প্রেমবিহ্বল + আ = প্রেমবিহ্বলা,

নাগর + ঈ = নাগরী।

ইংরাজি ব্যাকরণের সাধারণ নিয়ম অনুসারে Ess লাগাইলেই চলিয়া যায়। যেমন, poet—poetess।

এই প্রথা অনুবর্ত্তিত আমরা বলিতে পারি—

রামের স্ত্রী = রাম + এশ = রামেশ,

প্রাণের স্ত্রী = প্রাণ + এশ = প্রাণেশ,

অপরের স্ত্রী = অপর + এশ = অপরেশ,

ইহাতে স্ত্রীর মর্য্যাদা বৃদ্ধি হয় এবং স্বামীরও আহ্লাদ বাড়ে।

চরিত্রহীন হইলে কিম্বা চরিত্র বিগড়াইয়া গেলে ইংরাজি ব্যাকরণানুসারে তাহারা Dam (Damn),

যেমন—চরিত্রহীন Adam = dam

" " Madam = dam.

তখন স্ত্রী-পুরুষের পার্থক্য থাকে না। সেইজন্য 'পতিতা' ক্লীবলিঙ্গ এবং সমাজত্যক্তা। পুরুষ কেবল জাতি গেলে পতিত হয়,কিন্তু চরিত্র গেলে হয় না, কারণ, সে Pa-gender অর্থাৎ প্রথম পুরুষ।

PERSON

Person = পুরুষ সম্বন্ধে প্রথমেই বলিয়াছি। প্রথম পুরুষই উত্তম পুরুষ। Madam অধম কিম্বা মধ্যম পুরুষ। ইহাতে বোধ হয়, সৃষ্টির প্রাক্কালে যাহারা অধোদেশে, অর্থাৎ হীন ও অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকিত, তাহারাই Madam। ক্রমবিবর্ত্তনে ও কর্ম্মফলে মধ্যমপুরুষেরই উত্তম হইবার কথা।

এই সূত্রানুসারে রাগিণী ক্রমশঃ রাগ হইয়া পড়িবে ও রাগ ক্রমে নীচের Octaveএ চলিয়া গিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিবে। যেমন ভৈরবীর টপ্পা ও ভৈরবের ধ্রুপদ।

CASE

Case—কারক। আইনের ভাষায় ইহার নাম মামলা। গ্রাম্য ভাষায় ইহার নাম সংগঠন। ইংরাজি ব্যাকরণে মোটে তিনটি মামলা।

Nominative case = কর্ত্তৃকারক = আসামী,
Objective case = কর্ম্মকারক = ফরিয়াদী,
Possessive case = সম্বন্ধকারক = ঘটক।

ইহার মর্ম্ম এই; 'আমার', তোমার', 'আমার সম্পত্তি' 'তোমার অনধিকার' এই সকল স্বত্ব বিবাদ লইয়া সংঘটন হয়। তাহার ফলে কর্ত্তা কোনো কর্ম্ম করিয়া বসেন। সেই কর্ম্মের ফল যাহাকে ভোগ করিতে হয়, তিনি কর্ম্মকারক এবং তাঁহার অধিকার আছে মামলা করিবার।

উদাহরণ।

Ram loves Sham's wife এ স্থলে শ্যাম রামের নামে মামলা করিতে পারে। কারণ, শ্যামের স্ত্রী রামের স্বত্ব নহে।

Ram sang a song এ স্থলে যদি গানটি অন্য লোকের হয়, তিনি মামলা করিতে পারেন।

Ram cut a tree, এ স্থলে গাছ যদি শ্যামের হয়, তবে রামই আসামী।

'Ram's' 'Sham's' ('রামের' 'শ্যামের' = possessive case)। Possessive case লইয়া তকরার হইলে দেওয়ানী কিম্বা ফৌজদারী আদালতে বিচার হয়। বিচারকর্ত্তার নাম 'ব্যা'—কর্ত্তা, অর্থাৎ যিনি ব্যাকরণের "ব্যা" নামক রায় দিতে পারেন।

আদালতে যাহারা (উকীল) বক্তৃতা করিয়া 'ব্যা—কর্ত্তার' রায় বাহির করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদের বচনে case of address ব্যবহৃত হয়। যথা—'হে হুজুর! হে আদালত! হে সমাজ! হা ধর্ম্ম।' ইত্যাদি।

নায়ক-নায়িকার পত্রে সম্বোধন-কারক ও প্রথম পুরুষ যত কম ব্যবহার করা যায়, ততই সুন্দর হয়, যেমন—

'প্রিয়তমে বিমলা!

ফুটবল খেল্‌তে আমার পা ভেঙ্গে গিয়েছে, একবার শিগ্‌গির থিয়েটর হ'তে এসে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়ে যাও।

জীবনে মরণে তোমারই গোবিন্দ বসাক।"

এই চিঠিখানা inartistic। কেবল ইহা লিখিলেই হইত—

'ফুটবলে তোমারই পা ভেঙ্গে চৌচির হয়েছে। একবার পায়ের ধূলো দিলে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিই'।

শ্রীগোবিন্দ!

এ স্থলে 'শ্রীগোবিন্দ!' এই সম্বোধনে মনোভাব সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশ করা হইল। বাকিটুকু সকল স্ত্রীলোকেই বুঝিতে পারে। ইতি।

সেই রকম গানের মধ্যে শ্রীগোবিন্দের মত একটা খোঁচ মারিয়া দিলেই মনের ভাব প্রকাশ হয়। নচেৎ, gender, number, person, case সবই বৃথা। এখনকার সমঝদার লোক কেবল ইশারা ও খোঁচটাই appreciate করে।

PRONOUN

সর্ব্বনামের বিকাশ দ্বারা কথা ও সুর Dramatic হয়। উদাহরণ—

'আমি যে তোমার তাকি জান না?' (বাউল)

'তারা আসে তারা চলে যায়' (Demonstrative pronoun) (রাগিণী কেদারা)

'আমি যাহা চাই, তুমি তাই—তাই' (খাম্বাজ) Compound relative.

'কে তুমি গো বরাননে?' (Interrogative)

Interrogative অর্থাৎ প্রশ্নজিজ্ঞাসাস্থলে যদি অজ্ঞানের ভাব থাকে, তবে তাহার রাগিণী হয় না। যেমন ব্রহ্মজিজ্ঞাসাস্থলে, 'কোথায় তোমার বাস পতিতপাবন?' এ স্থলে পতিতপাবন কোথায় তাহাই জানি না, অতএব ভাবের উদয় সম্বন্ধে কোনো আশা নাই।

কিন্তু Interrogative pronounএ রাগ হয়। যেমন, "Who are you? get out", "Who is that fellow", "Why are you talking nonsense" ইত্যাদি।

'আমিই কর্ত্তা' এই ভাব দেখাইলে 'Reflexive pronoun' হয়, যেমন 'আমারই প্রদত্ত সুর, আমারই হাতের তৈরী চা কিংবা সন্দেশ, কচুরি' ইত্যাদি। অর্থ, did it myself। কিন্তু যদি কোনো বিপদ ঘটে, তবে বলিতে হয়—"Madam did it herself!"

VERB

Verb = ক্রিয়া—দ্বিবিধ। Transitive (সকর্ম্মক) ও Intransitive (অকর্ম্মক)।

১। সকর্ম্মক (অর্থাৎ কর্ম্ম হইতে উৎপত্তি যাহার)।

২। অকর্ম্মক (অর্থাৎ অকর্ম্ম হইতে উদ্ভূত)।

ইহা ছাড়া আর এক প্রকার ক্রিয়া আছে, তাহাকে নিষ্কর্ম্মক, যেমন গালে হাত দিয়া সংসারের অবস্থা চিন্তা করা। ইহার নাম জ্ঞানমার্গ। ভক্তিমার্গ ব্যাকরণের বিষয় নহে, পরন্তু Ethicsএর অন্তর্গত।

সকর্ম্মক ক্রিয়ার একটা উদ্দেশ্য আছে, যেমন—Adam loves madam, উদ্দেশ্য বংশরক্ষা। James loves his father, উদ্দেশ্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়া, I salam (salute) Huzoor, উদ্দেশ্য চাকুরি পাওয়া, He praises Mr. Jones, উদ্দেশ্য দু পয়সা লাভ, He sings a song, উদ্দেশ্য ওস্তাদি দেখান।

অকর্ম্মক ক্রিয়ার উদ্দেশ্য নাই, সুতরাং নিঃস্বার্থপর। যেমন—I love, I sing, I sleep, I run।

প্রকৃতিবশে, কিংবা জঠরানলের তাড়নায়, কিংবা লোক-নিন্দার ও রাজদণ্ডের ভয়ে কিম্বা সহৃদয়তা প্রকাশ করিয়া যে সব কর্ম্ম করিতে হয়, বাস্তবিক পক্ষে তাহা সকলই নিষ্কর্ম্মক, যেমন আহার, বিহার, মলমূত্রত্যাগ, বস্ত্রপরিধান, মিথ্যাকথন, সত্যকথন, চাঁদা দেওয়া, লোকের সঙ্গে দেখা হইলে দেশের জন্য দুঃখপ্রকাশ করা ইত্যাদি।

সকর্ম্মক ক্রিয়ার ফল আছে, অর্থাৎ উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে কিংবা নিষ্ফল হইতে পারে। সফল হইলে তাহা কর্ত্তার পুরুষকার। নিষ্ফল হইলে বিধাতার নির্ব্বন্ধ, অর্থাৎ অদৃষ্ট। এক জন ক্রমাগত সফল হইলে অন্য কেহ ক্রমাগত নিষ্ফল হইবেই। যদি আমরা সফল হই, তবে বিধাতা নিষ্ফল ও বিধাতা সফল হইলে আমরা নিষ্ফল। অতএব উভয়ের মধ্যে একটা চুক্তি করিতে হয়, তাহার নাম Compromise অর্থাৎ 'হে বিধাতা, ফলাফল আধাআধি ভাগ করিয়া লও'। কিন্তু ইহা নীতিবিরুদ্ধ, সুতরাং জীবজগতের মধ্যে হুড়াহুড়ি, মারামারি, কাটাকাটি, রেশারিশি, মহাসংগ্রাম। অর্থাৎ কর্ম্মের ফল কেহই ঈশ্বরকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করে না, সুতরাং তিনিও যথাযোগ্যভাবে বাঁচিতে পারেন না

অকর্ম্মক ক্রিয়ার ফল নাই। সুতরাং ভগবানের পরিবর্ত্তে নিজেই তাহার ষোলআনা লইতে পারেন। যেমন—I love, I sing, I sleep; ইহাতে কাহারও কিছু আসে যায় না যদি অন্যের স্বত্বাধিকার আক্রমণ না করে।

সকর্ম্মক ক্রিয়ার নাম বিবাদী সুর।

অকর্ম্মক ক্রিয়ার নাম সম্বাদী সুর।

নিষ্কর্ম্মক ক্রিয়ার নাম বাদী সুর, অর্থাৎ ঢাকের বাদ্যের মত, অকর্ম্মক ক্রিয়া (গান) পরিপোষণ করে।

কোন ক্রিয়ারই আদি, মধ্যম ও অন্ত নাই। Newton's Law of motion অনুসারে বাধা না প্রাপ্ত হইলে কোন ক্রিয়া অনন্তকাল চলিবে, যেমন এক জন ওস্তাদ তানপুরা ধরিয়া গান আরম্ভ করিলে কখন শেষ করিতে চাহে না, যদি নানাবিধ শব্দ করিয়া তাহাকে কেহ থামাইয়া না দেয়।

ঠিক কি করিতেছে, তাহা Indicative verbএ বুঝায়। এক জন গান করিতেছে কি সংসারের ভীতি প্রকাশ করিতেছে, তাহা He sings বলিলে বুঝায়, নচেৎ বুঝা যায় না।

Subjunctive moodএ যদিস্যাৎ অর্থাৎ পুরুষকারের খর্ব্বতা প্রকাশ করে। 'যদি গলাটা ভাল থাকৃত, তবে একবার গোপেশ্বর বাবুকে দেখিয়ে দিতুম ধ্রুপদ কাহাকে বলে'। 'যদি এবার না বাঁচাও দাদা, তবে কুপোকাৎ জানিহ' ইত্যাদি।

নিজে কোন সকর্ম্মক ক্রিয়ার উদ্দেশ্যে, অন্যকে অকর্ম্মক ক্রিয়ার হুকুম দিলে, তাহার নাম Imperative;—যেমন Go away, Do it please, Get me that coat, একটা গান কর না অলকা! তোমার গলাবাজি থামাও বাবা রামচন্দ্র!

উপরি-উক্ত ব্যাখ্যা হইতে বুঝিতে পারিবেন যে, উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন থাকিলে, যদি তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাহাকে Gerandial Infinitive verb বলে। যেমন—'রাম শ্যামের বাটীর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়' হয় ত চুরি করিতে (to steel), 'রাম সন্ধ্যা হইলেই প্রেমের টপ্পা গাইতে বসে' = কে জানে কেন বাবা!

TENSE

কাল বুঝাইতে গেলে ক্রিয়া রূপান্তরিত হয়। এই Tense দ্বারা কর্ম্ম ও অকর্ম্মের তফাৎ গীতাপাঠ করিয়া বুঝা যাইতে পারে। ইহা অতি দুরূহ দার্শনিক সমস্যা।

যাহার ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সবই অনিশ্চিত তাহার নাম Present indefinite,

Adam loves madam,

Ram sings.

যাহার বর্ত্তমানটা বাহ্যদৃষ্টিতে নিশ্চিত, তাহা Present imperfect, যেমন Adam is loving madam, Ram is singing a song। তবে শেষে কি দাঁড়াইবে বলা শক্ত, যেমন 'গিরিবালা আজকাল রামকে ভাল বাস্‌ছে (অর্থাৎ শেষে উভয়ের কপালে কি আছে বিধাতা জানেন) 'রাম আজকাল গাচ্ছে ভাল, লিখ্‌ছেও বেশ।' 'আপাততঃ আমি ইমনকল্যাণে দুটো মধ্যম দিচ্ছি,' অর্থাৎ শেষে দুটোর মধ্যে একটাও থাকে কি না সন্দেহ। 'শ্যাম, মালকোষে আজকাল পুরো ধৈবত লাগাচ্ছেন।'

কর্ম্মের ফল শেষ না হইলে Present-perfect হয়। যেমন—'তানের চোটে রামের গলা বসিয়া গিয়াছে।' 'আজ তোমারে দেখ্‌তে এলাম অনেক দিনের পরে' (I have come to see madam after a long time)। যদি Continuous হয়, তবে সর্ব্বনাশ। যেমন 'পাঁচদিন ধ'রে ব'সে আছি, কিংবা ধ্রুপদ গাচ্ছি। শেষ হয়ে গেলেই রক্ষা, তখন দশ জন জান্‌তে পারে যে ব্যাপারখানা কি। যেমন 'রাম তাকে ভাল বেসেছিল, কিন্তু কাজে কিছুই হ'ল না,' কিংবা 'তিন দিন ধ'রে গান ও বক্তৃতা করেছিল' এগুলো সব ভূতের ব্যাপার (Past tense); ভূতের আগে যদি আর একটা ভূত থাকে, তাকে বলে Pluperfect; যেমন —I had loved madam X, before I loved madam Y, Z, Etc. ইহাকে ইংরাজি ব্যাকরণে বলে Perfect অর্থাৎ সম্পূর্ণ Tense.

VOICE

অকর্ম্মক ক্রিয়ার কোন Voice (উচ্চবাচ্য) নাই। যেমন Councilএর বাহিরের লোকের আস্ফালন। ইহাতে কর্ত্তা আছে, কিন্তু কর্ম্ম নাই।

অন্যান্য উদাহরণ, I cry, I sing, I laugh ইহার অর্থ 'আমার দ্বারা গান করা হইল,' 'আমার দ্বারা হাস্য করা হইল।' এ স্থলে বুঝিতে হইবে, 'বিধাতা আমাকে হাসাইলেন, কিংবা কাঁদাইলেন, কিংবা গান করাইলেন'। ক্রিয়া ও কর্ম্ম এখানে একই, অর্থাৎ কর্ম্মের ফল নিজের না হইয়া বিধাতার হস্তে বর্ত্তে। কিন্তু যদি কোন object থাকে অর্থাৎ ক্রিয়া সকর্ম্মক হয়, তবে দুইটি বাচ্য আসিয়া উপস্থিত হয়।

১। কর্ত্তৃবাচ্য— Active voice,

২। কর্ম্মবাচ্য— Passive voice;

যেমন,—Adam loves madam কর্ত্তৃবাচ্য,

Madam is loved by Adam কর্ম্মবাচ্য।

সংস্কৃত ব্যাকরণে সকর্ম্মক ও অকর্ম্মক উভয়বিধ ক্রিয়াতেই কর্ত্তৃবাচ্য হইতে কর্ম্মবাচ্য হয়। কর্ত্তা তৃতীয়া বিভক্তি ও ক্রিয়া আত্মনেপদী হইয়া পড়ে। যেমন 'ময়া গম্যতে' অর্থাৎ আমার দ্বারা যাওয়া হইতেছে। ইহা অতি বিনয় ভাব। অর্থাৎ সংসারে আমি নিমিত্তমাত্র। ভগবান্ আমার দ্বারা কর্ম্ম চালাইতেছেন (নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্!) কিন্তু ইংরাজীতে 'It is going by me' এবং I go এক নহে।

যাহা হউক, সকর্ম্মক ক্রিয়ায় কর্ত্তৃবাচ্যকে কর্ম্মবাচ্য করিলেই কর্ম্মকর্ত্তা Passive হইয়া পড়েন। যেমন Madam is loved by Adam, এ স্থলে Madam হন Passive, এবং Adam is loved by Madam, এ স্থলে Adam হন Passive, সুতরাং উভয়ে উভয়কে ভালবাসিলে কর্ত্তা ও কর্ম্মের বিরোধ থাকে না।

সেই প্রকার 'Ram is beaten by Sham & others', 'Sham is beaten by Ram & others' কিংবা Adam is loved by madam & others and Madam is loved by Adam & others; এ স্থলেও পরস্পরের কর্ম্মফল সম্পূর্ণ। ফৌজদারি আইনে এগুলি Cross case of rioting.

ADVERB

ক্রিয়া-বিশেষণ নানা প্রকার।

১। কালবাচক, যেমন 'কখন,' 'তখন,' 'পূর্ব্বে' 'পরে'।

২। স্থানবাচক, যেমন 'কোথায়,' 'সেথায়,' 'ভিতরে' 'বাহিরে'।

৩। স্বীকার ও অস্বীকার, যেমন 'নিশ্চয়,' 'বোধ হয়'।

৪। পরিমাণবাচক, যেমন 'খুব,' 'খানিকটা'।

৫। কারণবাচক, যেমন 'কেন,' 'সেই জন্য'।

৬। ভাব ও গুণবাচক, যেমন 'ধীরেধীরে', 'প্রীতি-প্রকারে'।

৭। কিন্তু।

সবগুলিই বিশেষরূপে আবশ্যক ও অনাবশ্যক। কারণ, সবাই প্রবীণ জানোয়ার, ও জ্ঞানপিপাসু। কালবাচকের মধ্যে তালের মাত্রা ও রূপ উল্লেখযোগ্য। কোন ঘটনারই পূর্ব ও পর নাই, কেবল একটা পদার্থই বাহ্য দৃষ্টিতে কিংবা মনের বিক্ষিপ্তাবস্থায় কাল বিভাগে আসিয়া পড়ে। একটা গান যদি একাদিক্রমে গাহিয়া যান, তবে বিরক্তিজনক হয়, সুতরাং 'সমের' তোফা বন্দোবস্ত আছে। চারিটি মাত্রার পরে অমুক স্থানে 'সম'। ইহাতে কাল ও স্থান ভাগ হইয়া যায়, আমরাও হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচি। সেই প্রকার নিশিদিন Madamকে ভালবাসিলে তিনি নিতান্ত বিরক্তা হইয়া পড়েন, সুতরাং leisurely অর্থাৎ 'অবসর মতো' নামক ক্রিয়া-বিশেষণের বিশেষ দরকার। স্বীকার ও অস্বীকার, হাঁ কিংবা না, সত্য কি মিথ্যা, সেটা ভগবানই জানেন, সুতরাং সত্যবাদী হইয়া মিথ্যাবাদী ও মিথ্যাবাদী হইয়াও সত্যবাদীর Certificate সকলে সচরাচর পাইয়া থাকে। ইহার কোন আইন নাই, কারণ, ফল বিধাতার হাতে। পরিমাণের বেলাও তাহাই। কেহ স্থূলকে সূক্ষ্ম বলে, ও সূক্ষ্মকে স্থূল।

কেন? এ কথার উত্তর হয় না, সুতরাং ইহার উত্তরে বলিতে হয়, 'আমি জানি না', কিংবা 'সম্ভবতঃ বোধ হয়'। 'কিন্তু' ও 'কেন', পরস্পরের মধ্যে শ্যালক ও ভগিনীপতি সম্বন্ধ। সংসারে সকল পদার্থের মধ্যে একটা 'কিন্তু' আছে। যেমন,—

'ঈশ্বর থাকিতে পারেন, কিন্তু প্রমাণাভাব'।

'দেশের মঙ্গল বাঞ্ছনীয়, কিন্তু internationalism-টাও ফেলা যায় না'।

'মনুষ্য জানোয়ার, কিন্তু লাঙ্গুলহীন'।

'তাঁর গান বেশ, কিন্তু ভৈরবীতে কড়িমধ্যম দিয়ে মাটী ক'রে ফেলেছেন'।

'ডাক্তার মহাশয়! আমি দুবেলা পেট ভ'রে খাই, জলখাবারও দশবিশখানা কচুরী, কিন্তু কোষ্ঠ সাফ্ হয় না।'

'কিন্তু'র প্রতিষেধক 'যাহোক'।

PREPOSITION

কোন পদার্থের স্কন্ধে, কিংবা পৃষ্ঠে, কিংবা ল্যাজে কিংবা কোন স্থানে ক্রিয়ার ফল গিয়া বর্ত্তে, তাহার নাম Preposition.

যেমন, Ram sat *on* Sham's shoulders.

Madam laughed *at*, or was angry at Adam.

The tail wagged *at* the dog, or the dog wagged his tail *at* Sham's face.

The great Ostad sang and simultaneously spat *at* the audience, hence the latter fled *from* the room *in* disgust.

CONJUNCTION

শাস্ত্রমতে একটা পদার্থ অন্য একটার সহিত যুক্ত হইলেই দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, অতএব যুক্তাবস্থার নাম দ্বন্দ্ব সমাস।

রামশ্চ লক্ষ্মণশ্চ = রামলক্ষ্মণৌ।

হ্রদশ্চ, তড়াগশ্চ, পল্লবানি চ সরাংসি চ = হ্রদতড়াগ-পল্লবসরাংসি।

সেই রকম কিন্তু রাগ-রাগিণী মিশিলে হয় না। যেমন, মেঘশ্চ, মল্লারশ্চ, মেঘমল্লারৌ হয় না, কেবল মেঘমল্লার বলিতে হয়।

খাম্বাজশ্চ, মালকোষশ্চ, বাহারশ্চ, কেদারশ্চ = খাম্বাজ-মালকোষ-বাহার-কেদারা।

ইহার প্রকরণ এইরূপ,—

খাম্বাজ,	সা	রি	গ	ম	প	ধ	নো	নি
মালকোষ,	সা	×	গো	ম	×	ধো	নো	
বাহার,	সা	রি	গো	ম	প	ধ	নো	নি
কেদারা,	সা	রি	×	মমী	প	ধ	নো	নি

সবগুলি মিলাইলে—

সা রি গোগ মমী প ধোধ নো নি

আপনারা বোধ হয় বিলাতীগানে Pianoতে শুনিয়া থাকিবেন যে, এক তরফ হইতে সাদা ও কালো যতগুলি Key আছে, তাহার উপর অঙ্গুলি চলিয়া যায়। আমাদের কানে সেটা দ্বন্দ্ব সমাসের মত লাগে, যেমন এক সঙ্গে টিকি, নামাবলি, খদ্দর, ওয়েষ্টকোট, রিষ্টওয়াচ, চটি জুতা ও কানে কুণ্ডল। কিন্তু ইহা কেবল পছন্দ-সাপেক্ষ, 'There is

no accounting for taste, as the man said, who kissed his mother-in-law'।

INTRJECTION.

Interjectionএ ব্যাকরণের শেষ।

আমাদের ব্যাকরণে Ex-terjection আছে, অর্থাৎ জন্মিবার পূর্ব্বে শিশু যখন কাঁদিয়া উঠে এবং মরিবার সময় যখন শ্বাস উঠে। কিন্তু

'Tell me not in mournfull numbers.
Life is but an empty dream.'

সুতরাং জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে যে সকল Ejaculatio. তাহার সার্থকতা যেমন 'হায়! হায়! ছি! ছি! সাবাস' এবং সর্ব্বশেষে

Farewell!

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

প্রিয়ার দেশে

কত দূর কত দূর কোথা সেই মধুপুর,
প্রিয়ার জনম স্মৃতি-সুখে ভরপুর!
চিরদিন যেইখানে সুখস্মৃতি উঠে গানে
ছন্দে বাজে কাঁকনের সুর!
ওগো কোথা মধুপুর!

ওই যে সরিষা ক্ষেতে সোনালী উঠেছে মেতে
ওই কি প্রিয়ার দেশ প্রেমপুত-পুর!
পাখী ডাকে কুহু কুহু দোলে তরু মুহু মুহু
সঙ্কেতে বুঝি বা কয়—'এই মধুপুর'।
ওগো সেই চেনা পুর!

ওই যে পথের ভীড়ে গাঁয়ের বধূরা ফিরে
সুধানু তাদের আজ আর কতদূর!
চলে পথে গলাগলি কত করে বলাবলি
কেউ না তাকায় ফিরে,—চ'লে গেল দূর!
ওগো আর কত দূর!

কহিল সজল হেসে বালিকা একটি এসে
ওই যে পথের বাঁকে, আর নহে দূর!
বড় আশা বুকে লয়ে সুধাইনু ভয়ে ভয়ে
চেন কি "বেলাকে" কেউ,—কই সেই পুর!
ওগো কোথা সেই পুর?

কহিল সে কোন্ 'বেলা'—নেমে আসে সন্ধ্যাবেলা,
'নদীর বেলায় বেলা, প্রেম-তৃষ্ণাতুর,'—
আসিয়াছি বহুদূর আঁখি বড় তৃষাতুর,
সুরহীন নয় এ যে গীতিভরা পুর!
ওগো বড় তৃষাতুর।

পুনঃ আশা হ'ল মনে, ছুটিলাম কেয়াবনে,
যেথা সেই সুরধাম সুখে ভরপুর।
বুঝি তবে আছে বেঁচে, দরশন আশা যেচে,
এসেছি পাশের বাড়ী, আর নহে দূর!
ওগো সেই মধুপুর!

সেই ঘর, সেই গেহ সবাকার নিতিস্নেহ
পশিল কানের মাঝে কত চেনা সুর,
উঠিল রোদন-ধ্বনি 'এসেছ তবে কি 'মণি',
তোমার নয়নমণি···গেছে "মণিপুর"!
ওগো কত চেনা সুর।

নদীর বালুর পরে' শিথিল বকুল ঝরে
সেথায় পেয়েছি তারে—আর নহে দূর!
শুধুই বাতাস ফিরে সাঁঝের বুকটি চিরে
কানের ভিতর যেন পশিল সে সুর!
ওগো সেই চেনা সুর!

পাপিয়া দেবী।

চতুর্থ-পরিচ্ছেদ

লচ্ছেদার রাবড়ী

চারি হাজার সওয়ার লইয়া বিশ্বাসঘাতক অযোধ্যার নবাব সাদৎ খাঁ যে দিন নাদির শাহের আদেশে দিল্লী-সহরের বাহিরে ছাউনি করিল, সেই দিন দিল্লীর লোক প্রভাতে ফকির সুলতান লুৎফ-উল্লা শাহের আচরণ দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেল। পাহাড়গঞ্জ হইতে চাঁদনীচক পর্য্যন্ত সকলেই লুৎফ-উল্লাকে চিনিত এবং তাহার তাবিজের জোর ছিল বলিয়া ভয় করিত। প্রভাতে ফতেপুরী বাজারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া একটা বড় ভাঁড় হাতে করিয়া লুৎফ-উল্লা যখন চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "ইন সা আল্লাহ, দীন্, দীন্—ভাই সকল, আমার কথা শোন, পয়গম্বর আমাকে স্বপ্ন দিয়াছেন। যেমন করিয়া হউক ধর্ম্ম-রক্ষা করিতে হইবে" তখন দিল্লীর লোক চমকিত হইল। লুৎফ-উল্লাকে সকলেই আফিমচী বলিয়া জানিত, নেশা ছুটিয়া যাইবার ভয়ে সে কখনও উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিত না, সুতরাং ফতেপুরী মস্জেদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যে সমস্ত মুসলমান তাহার কথা শুনিল, তাহারা আশ্চর্য্য হইয়া গেল। লোক জানিত যে, লুৎফ-উল্লা তাবিজ ও দোয়া বেচিয়া খায়, তাহার লচ্ছেদার রাবড়ী ও আফিমের খরচ চলিয়া গেলে সে রোজগার করিতে চাহে না। যাহারা লুৎফ-উল্লাকে চিনিত, তাহারা ঠাহর করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; যাহারা চিনিত না, তাহারা ভাবিল যে, আল্লা দিল্লীর নাগরিকের দুর্দ্দিনে সত্য সত্যই বুঝি দয়া করিয়াছেন।

সে দিন ফতেপুরী বাজার প্রায় পরিষ্কার। কেবল দুই একখানা দোকান খুলিয়াছিল, তাহাতে ক্রেতা ছিল না। যে দুই চারিজন লোক পথে চলিতেছিল, তাহারাও ভয়ে আড়ষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু লোকের মন এত খারাপ হইয়াছিল যে, তাহারা লুৎফ-উল্লার কথা শুনিয়া ছুটিয়া আসিল। এসে ভয়ে দিল্লীর লোক তখন এক মনে ঈশ্বরকে ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সুতরাং সকলেই ভাবিল যে, ঈশ্বর বা আল্লাহ এই গুলিখোর ফকিরের মুখ দিয়া নিজের কথা বলাইতেছেন। চারিদিকের লোক আসিয়া ফতেপুরী মস্জেদের পূর্ব্ব দরওয়াজায় লুৎফ-উল্লাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। বিদ্যুদ্‌বেগে ফতেপুরী বাজারের চারিদিকে প্রচার হইয়া গেল, "আল্লাহ রহম করিয়াছেন, লুৎফ-উল্লা শাহ ফতেপুরী মস্জেদের উপরে দৈববাণী করিতেছে।" দেখিতে দেখিতে দোকান-পসার, বাজার, কাটরা ও কুটীরের দুয়ার খুলিয়া গেল, দলে দলে ভীত ত্রস্ত নর-নারী লুৎফ-উল্লাকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। তখন লুৎফ-উল্লা বলিতে আরম্ভ করিল,—

"তোরা এত দিন বাদশাহের বাদশাহকে ভুলেছিলি, তাই আল্লাহ মহম্মদ শাহের দুর্দ্দশা দেখাইয়া তোদের চেতনা ফিরাইয়া আনিলেন। এখন অনুতাপ কর, মনের মলা ধুয়ে ফেল, ঈশ্বর এক জন, মহম্মদ তাঁর নবী। আল্লাহের দয়া অপরিসীম, তিনি তোদের কাতর প্রার্থনা শুনে দয়া করেছেন। আমাকে স্বপ্ন দিয়েছেন। ইরাণী মুসলমান শীয়া—শীয়াকে কাফের বল্লেও চলে।"

চারিদিকের সুন্নীয়া উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল, উৎসাহ পাইয়া লুৎফ-উল্লা শাহ বলিতে আরম্ভ করিল,—"বাদশাহ কে? ঈশ্বরের দাসানুদাস মাত্র। যে বাদশাহ প্রজাকে রক্ষা করতে পারে না, সে বাদশাহ হবার যোগ্য নয়, খোদা তালা সেই জন্য মহম্মদ শাহের বাদশাহী ঘুচিয়ে দিয়েছেন। আজ দিল্লীতে বাদশাহ নাই, দিল্লীর বাদশাহী আল্লা আমাকে দিয়েছেন।"

যাহারা লুৎফ-উল্লা-শাহকে আফিমচী বলিয়া জানিত, তাহারা ভয়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল, দুই এক জন অস্পষ্ট স্বরে বলিল, "শাহ সাহেব আফিমের মাত্রা চড়িয়েছে দেখ্‌ছি।"

তাহাদের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াই যেন লুৎফ-উল্লা বলিয়া উঠিল, "মনে করছ আমি আফিমের মাত্রা চড়িয়েছি, ভুল, তোমাদের ভয়ানক ভুল। তিন দিন বাজারে দুধ আসে নি, সোনার টাকা দিলে রাবড়ী পাওয়া যায় না, তা আর খাব কি? খোদাকে তোমরা যেমন প্রাণভরে ডেকেছিলে, আমিও রাবড়ীর অভাবে সেই রকম প্রাণভরেই ডেকেছিলুম, সুতরাং আজ আর আমার রাবড়ীর অভাব নেই।" লুৎফ-উল্লা হাতের ভাঁড় হইতে এক মুষ্টি সরেস লচ্ছা লইয়া নিকটের একটা কুকুরের সম্মুখে ফেলিয়া দিল, তাহার হাতে রাবড়ীর রস দেখিয়া দিল্লীর লোক আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

দিল্লী শহরের কোতোয়াল ফুলাৎ খাঁ তখন কোতোয়ালীর সওয়ার লইয়া সহরে বাহির হইয়াছিলেন, ফতেপুরী মস্‌জেদের সম্মুখে লোকারণ্য দেখিয়া, তিনি পথের লোককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে কি হচ্ছে?"

নাগরিক উত্তর দিল, "ফকির শাহ লুৎফ-উল্লা দৈববাণী করছেন।" ফুলাৎ খাঁ লুৎফ-উল্লা শাহকে চিনিতেন না, কিন্তু দিল্লীর ইতর ভদ্র সকলেই তাঁহাকে চিনিত। দৈববাণী শুনিবার জন্য ফুলাৎ খাঁ ভিড় ঠেলিয়া ঘোড়া চালাইলেন, পথের লোক সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিল। ফুলাৎ খাঁকে নিকটে আসিতে দেখিয়া লুৎফ-উল্লা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "ওরে ফুলাৎ খাঁ, তোর বাদশাহের বাদশাহী ফুরিয়েছে, আজ আল্লাহের রহমে আমি দিল্লীর বাদশাহ।" ফুলাৎ খাঁ দিল্লীর মুসলমান ফকিরদের চিনিতেন, মোগল সাম্রাজ্যের সেই দুর্দ্দিনে প্রকাশ্য রাজপথে লোকপ্রিয় ফকিরকে অপমান করিতে তিনিও ভরসা করিলেন না। ফুলাৎ খাঁ দূর হইতে অপরিচিত লুৎফ-উল্লা শাহকে সসম্ভ্রমে সেলাম করিয়া অন্য পথে অশ্ব চালাইয়া দিলেন।

এক ঘণ্টা বক্তৃতা করিয়া লুৎফ-উল্লা যখন থামিল, তখন দিল্লীর মুসলমানরা "দীন্-দীন্" বলিয়া চীৎকার করিয়া পুরাতন ফতেপুরী মস্‌জেদ কাঁপাইয়া তুলিল। সে যখন গৃহে ফিরিল, তখন দলে দলে মুসলমান তাঁহার সঙ্গে ছুটিল, তাহাকে গৃহদ্বারে পৌঁছাইয়া দিয়া দিল্লীর লোক নূতন উৎসাহে গৃহে ফিরিয়া গেল।

আনন্দরাম যখন ফকির শাহ সুলতান লুৎফ-উল্লার বেশ ধরিয়া আসল লুৎফ-উল্লার গৃহের দুয়ার বন্ধ করিয়া দিল, তখন আসল লুৎফ-উল্লা নকলটিকে চিনিতে না পারিয়া কহিল, "আদাব, কি হুকুম?"

আনন্দরাম হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি ফকির সাহেব, একেবারে চিনতেই পারলে না যে?"

তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া আসল লুৎফ-উল্লা ভয়ে ও আশ্চর্য্যে পড়িতে পড়িতে রহিয়া গেল। তাহা দেখিয়া আনন্দরাম বলিল, "হাতে কি বল দেখি?"

লুৎফ-উল্লা সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কি?"

"লচ্ছেদার রাবড়ী।"

"মাইরি?"

আনন্দরামের অনুমতি না লইয়াই লুৎফ-উল্লা ভাড়টা কাড়িয়া লইয়া একটা চুমুক দিল এবং মুখ তুলিয়া বলিয়া উঠিল, "তোফা, ইয়া আল্লা। জিতা রহো বাঙ্গালী রাজা।"

আনন্দে লুৎফ-উল্লা শাহ সে দিন দাঁতন করিতে ভুলিয়া গেল। জলে বরাবরই আফিমচীর বিশেষ ভয়, সুতরাং স্নান বা শৌচ পরিত্যাগ করিতে তাহার বিশেষ কোন আপত্তি ছিল না। আনন্দরামকে বিশেষ কথা কহিবার অবসর না দিয়া আদৎ লুৎফ-উল্লা রাবড়ীর ভাঁড়টি লইয়া ধীরে ধীরে তাহার অন্ধকার কোটরে প্রবেশ করিল। তাহা দেখিয়া আনন্দরাম তাহার সঙ্গে সঙ্গে গেল। লুৎফ-উল্লা আফিমের ধূমপানের চেষ্টা করিতেছে দেখিয়া সে বলিয়া উঠিল, "ফকির সাহেব, ইরাণের বাদশা শুন্নী ফকির দেখিলেই জবাই করবার হুকুম দিচ্ছেন। তুমি সাবধান, যেন খবরদার বেরিও না।" উভয় উরুতে প্রচুর পরিমাণে রস মাখাইয়া লম্বা বাঁশের নলটি মুখে দিয়া লুৎফ-উল্লা তখন চিমটায় করিয়া একটা জ্বলন্ত অঙ্গার ছিটার উপরে ধরিতেছিল, সে নলটি নামাইয়া বলিল, "বহুৎ আচ্ছা, মাশা আল্লা, রাবড়ীটুকু খতম হলেই বাস্। তার পর ইরাণী সুলতান জবা করুক বা কোরবানি করুক, আমার কোনই আপত্তি নাই।" আনন্দরাম দ্বিতীয় কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই প্রজ্বলিত কালাচাঁদের প্রভাবে শাহ সাহেবের মাথাটা লুটাইয়া পড়িল। আনন্দরাম বুঝিল যে, বিষম বিপদ উপস্থিত হইলেও ফকির শাহ সুলতান লুৎফ-উল্লা দুই এক দিনের মধ্যে নড়িতে পারিবে না। সে তখন নিশ্চিন্ত মনে বেশপরিবর্ত্তন করিতে গেল।

দাড়ি খুলিয়া হাত মুখ ধুইয়া বাঙ্গালী সাজিয়া আনন্দ-রাম আবার যখন বাহির হইল, তখন দিল্লীর পথে পথে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। সকলেরই মুখে এক কথা, বাদশাহ কয়েদ হইয়াছেন, ইরাণী ফৌজ আসিতেছে, ইরাণী বাদশাহ আসিতেছেন। মুসলমানরা বিশেষতঃ শীয়ারা আনন্দে অধীর, হিন্দুদের মুখ শুষ্ক, হিন্দুদের মধ্যে মারাঠারা ভয়ে পথের বাহির হইতে চাহে না। আনন্দরাম চাঁদনী চৌক ছাড়াইয়া গোলাপ বাঈয়ের বাড়ীতে প্রবেশ করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বাঙ্গালার নবাব-পুত্র

যে যুগে মুসলমানমাত্রেই বিশ্বাসঘাতক ছিল, সে যুগে মুসলমান কর্ম্মচারী মুসলমান বাদশাহের সর্ব্বনাশ করিয়াছিল। লক্ষ্ণৌয়ের বিশ্বাসঘাতক সাদৎ খাঁ মনে করিয়াছিল যে, সে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ইরাণী বাদশাহের প্রিয় হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রতিদ্বন্দী নিজাম উল-মুল্‌কের সর্ব্বনাশ করিবে। কিন্তু নিমকহারাম এবং নিমকহালালের ঈশ্বর এক হওয়ায় সাদৎ খাঁর সুবর্ণমুষ্টি ধূলিমুষ্টি হইয়া গেল। বৃদ্ধ নিজাম উল্-মুল্‌ক্ নাদির শাহকে বুঝাইয়া পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দিয়া কর্ণাল হইতে ইরাণ দেশে ফিরাইয়া দিবার চেষ্টায় ছিলেন, কিন্তু নিমকহারাম সাদৎ খাঁ তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, দিল্লীতে গেলে তিনি অর্দ্ধ ক্রোরের পরিবর্ত্তে শত ক্রোর পাইবেন। নাদির শাহ বন্দী মহম্মদ শাহকে লইয়া দিল্লী চলিলেন, আগে আগে চার হাজার সওয়ার ছাতি ফুলাইয়া দিল্লীতে প্রবেশ করিল। দিল্লীর ফৌজদার লুৎফ-উল্লা খাঁ প্রথমে দিল্লী রক্ষা করিবেন স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু নিমকহারাম সাদৎ খাঁ তাঁহাকে বুঝাইয়া দিল যে, জগদ্‌বিজয়ী নাদির শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। হঠাৎ দিল্লীর সমস্ত মুসলমান একমত হইয়া উঠিল। শীয়া ও শুন্নী হনফী সুফী একত্র হইয়া সকল বাদশাহের বাদশাহ ইরাণের বাদশাহকে রাজধানীতে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুস্থানে যে হিন্দু বলিয়া একটা জাতি আছে, তাহা ভুলিয়া গেল। কোতোয়াল ফুলাৎ খাঁ ও ফৌজদার লুৎফ-উল্লা খাঁ চেষ্টা করিয়া এতদিন দিল্লী সহরের মধ্যে গোলমাল হইতে দেন নাই, সাদৎ খাঁ আসিয়া পৌছিলে তাঁহাদের সাহস বাড়িয়া গেল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুরা ভয় পাইয়া পলাইতে আরম্ভ করিল। সহরের প্রাচীরের বাহিরে যাহারা বাস করিত, তাহারা মুসলমান গুণ্ডাদের ভয়ে ঘর-দুয়ার বন্ধ করিয়া বারুদগুলী কিনিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। নিকটে অর্থাৎ আগরা, মথুরা, ঢোলপুর বা গোয়ালিয়রে যাহাদের আশ্রয় ছিল, তাহারা পলাইয়া বাঁচিল কিন্তু দিল্লী সহরের প্রাচীরের ভিতর হইতে হিন্দুরা অধিক সংখ্যায় পলাইতে পারিল না। তখন মুসলমান গুণ্ডারা তাহাদের পাইয়া বসিল।

হিন্দু বণিয়া দোকান খুলিলে চারিদিক্ হইতে মুসলমান গুণ্ডারা আসিয়া অনুগ্রহ করিয়া তাহার জিনিষপত্র যতদূর পারিত, বিনামূল্যে লইয়া যাইত এবং অবশিষ্ট আল্লার নাম করিয়া পথের ধূলায় ছড়াইয়া দিত। গরুটা মহিষটা পথে বাহির হইলে আর ফিরিত না। ক্রমে ডুলি করিয়া মহিলাদের পথে বাহির হওয়া বন্ধ হইয়া গেল। মুসলমান গুণ্ডাদের অত্যাচারে মুসলমান ভদ্রলোকরা পর্য্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। বাজারে দোকান-পাঠ বন্ধ, খাদ্যদ্রব্য কিনিতে পাওয়া যায় না, ঘৃত বা দুগ্ধ অনেক দিন হইতেই সহরে আইসে না। ক্রমে মৎস্য ও মাংসও বন্ধ হইয়া গেল। তখন বাধ্য হইয়া ফৌজদার লুৎফ-উল্লা খাঁ এবং বিশ্বাসঘাতক সাদৎ খাঁ মুসলমান গুণ্ডাদের শাসন করিতে আরম্ভ করিলেন।

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, চাঁদনী চকের পশ্চাতে একটা প্রকাণ্ড কাট্‌রার সম্মুখে ত্রিশ চল্লিশ জন মুসলমান গুণ্ডা মশাল জ্বালিয়া হল্লা করিতেছিল, তাহাদের "দীন্ দীন্" রবে পুরাতন কাট্‌রা কাঁপিয়া উঠিতেছিল। কাট্‌রার দুয়ার তখনও বন্ধ এবং তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছয় হাত লম্বা একখানা পাকা বাঁশের লাঠী লইয়া এক জন দীর্ঘকায় কৃষ্ণবর্ণ বাঙ্গালী লাঠীয়াল পাহারা দিতেছিল, আর ত্রিতলের বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া তলোয়ার হাতে লইয়া বৃদ্ধ কালে খাঁ ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল। দূর হইতে এই দৃশ্য দেখিয়া আনন্দরাম বুঝিল যে, গুণ্ডারা গোলাপীর গৃহ লুঠ করিতে আসিয়াছে। ফকিরের বেশ ছাড়িয়া আসিয়াছে বলিয়া তাহার মনে এক বার দুঃখ হইল, কিন্তু সে দুঃখ ক্ষণেকের জন্য। সে তখনই একটা সরু গলির ভিতরে গিয়া কাপড়টা আটিয়া পরিয়া লইল এবং উড়ানীখানা

পাগড়ী করিয়া মাথায় বাঁধিল। কাপড়ের ভিতরে একখানা বড় ছোরা ছিল, আনন্দরাম সেখানা দাঁতে ধরিয়া গলি দিয়া কাট্‌রার পিছনে চলিয়া গেল। সে দিকে একটা ছোট দুয়ার ছিল, সে দুয়ারে আঘাত করিবামাত্র একটি রমণী ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। কণ্ঠস্বরে তাহাকে চিনিতে পারিয়া আনন্দরাম অতি ধীরে ধীরে কহিল, "ওরে আমি আনন্দরাম।" কিন্তু ফল বিপরীত হইল, রমণী চীৎকারের মাত্রা বাড়াইয়া দিল। তখন দুয়ারের পিছনে পায়ের শব্দ শোনা গেল, আনন্দরাম বুঝিল যে, আর এক জন কেহ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সে ভরসা পাইয়া বলিল, "আমি আনন্দরাম, ভয় নেই, তুমি কে?" যে আসিয়াছিল, সে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি যে আনন্দরাম, তা' কেমন ক'রে বুঝবো?" আনন্দরাম বলিল, "গোলাপী দিদি, সত্য সত্যই আমি আনন্দরাম। তুমি দুয়ার খোল, ভয় নাই।" দুয়ার খুলিতেই আনন্দরাম ভিতরে ঢুকিয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া দিল। গোলাপী ভয়বিহ্বলা হইয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল, আনন্দরামের ছোরা লাগিয়া তাহার একটা কানের খানিকটা কাটিয়া গেল। আনন্দরাম তাহাকে শান্ত করিয়া উপরে লইয়া গেল, কিন্তু দুয়ারের পাশে বসিয়া প্রথম রমণী একটি মুসলমানী বাঁদী পূর্ব্বের মত চীৎকার করিতে লাগিল। গুণ্ডারা তখনও দুয়ার ভাঙ্গিবার চেষ্টা করে নাই, কারণ, অন্ধকার তখনও ঘন হয় নাই। বারান্দার নীচে হইতে আনন্দরাম অস্ফুট স্বরে কালে খাঁকে বলিল, "খাঁ সাহেব, এদের কতক্ষণ রুখ্‌তে পারবে?" কালে খাঁ কাঁপিতে কাঁপিতে উত্তর দিল, "রুখতে পারবো এক লহমাও নয়। ফটকটা যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ আশা, তার পর খোদা-তালার মরজী।" গোলাপীকে দুইটি মুসলমানী স্ত্রী ও দুইটা পুরুষের পোষাক স্থির করিতে বলিয়া আনন্দরাম নীচে নামিয়া গেল, তাহার পায়ের শব্দ পাইয়াই লাঠিয়াল জিজ্ঞাসা করিল, "কে রে?" আনন্দরাম অতি ধীরে ধীরে কহিল, "আমি আনন্দরাম। কতক্ষণ রাখতে পারবি?" লাঠিয়াল কহিল, "দুয়ারটা যদি না ভাঙ্গতে পারে, তা হ'লে দু দণ্ড লড়তে পারি, বাপু।"

"বাহাদুর বনমালী, আজ নিমকের পরিচয় দিতে হবে। আমি সকলকে নিয়ে খিড়কী দরজা দিয়ে স'রে পড়ছি। পিছনের গলি থেকে একটা শীস্ দেব, তখন লাঠিখানা নিয়ে স'রে আসিস্।"

এই সময়ে এক জন মুসলমান কাট্‌রার প্রাচীরের উপরে উঠিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু বনমালীর অব্যর্থ লাঠির আঘাত তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধরাশায়ী করিল। বাহিরে গোলমাল বাড়িয়া উঠিল, আনন্দরাম ধীরে ধীরে সর্পের মত অন্ধকারে মিশিয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

নূর বাঈ

কর্ণালের যুদ্ধে মোগল সম্রাট্ মহম্মদ শাহের পরাজয়ের প্রধান কারণ নর্ত্তকী নূর বাঈ। নূর বাঈ তন্বী, অপরূপ সুন্দরী, পূর্ণ যুবতী। লোক বলিত যে, তাহার বর্ণ গোলাপের মত, তাহার সূক্ষ্ম চর্ম্মের ভিতর হইতে যৌবন-চঞ্চল রক্তধারা স্পষ্ট প্রবাহিত হইতে দেখা যায়। তাহার কণ্ঠে সৃষ্টিকর্ত্তা সুধা ও মদিরার অফুরন্ত ভাণ্ডার নিবেশ করিয়া দিয়াছেন, সুতরাং সুন্দরী যুবতী নূর বাঈ সুগায়িকা। সে তাহার নৃত্য ও গীতের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে বাদশাহ মহম্মদ-শাহ হইতে দিল্লীর রাজপথের ভিখারী পর্য্যন্ত সকলকে সমানভাবে তাহার গোলাম করিয়া রাখিয়াছিল।

দুষ্ট লোক বলে যে, নূর বাঈকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে বলিয়া শম্‌শম্-উদ্দৌলা দুই মাসের মধ্যে দিল্লী ছাড়িয়া লড়াই করিতে বাহির হইতে পারিলেন না। প্রাসাদে সে দিন নূর বাঈয়ের মুজরা হইতেছিল বলিয়া লাহোরের সুবাদার জাকারিয়া খাঁ সাহায্য পাইল না; সুতরাং সে বেচারা হতাশ হইয়া নাদির শাহকে লাহোর সহর ছাড়িয়া দিল। সেই দিন সন্ধ্যার পরে রূপসী নূর বাঈ তাহার ত্রিতল প্রাসাদের বারান্দায় বসিয়া সেতারে আলাপ করিতেছিল। সহসা তাহার বাঁদী আগন্তুকদের ডাকিয়া আনিল, মুসলমানী বেশে গোলাপী, স্ত্রীবেশে সাহেবজাদা আকরম্ জমান্ খাঁ ও মুসলমানবেশী আনন্দরাম ও বনমালী গৃহে প্রবেশ করিল। গোলাপী আত্মবিস্মৃতা হইয়া নূর বাঈয়ের পা জড়াইয়া ধরিয়া বাঙ্গালায় যাহা বলিল, কাশ্মিরী নর্ত্তকী তাহা বুঝিতে পারিল না। তাহা দেখিয়া আনন্দরাম ফার্সীতে সকলের পরিচয় দিয়া গোলাপীর কথা বুঝাইয়া দিলেন।

সেটা ইংরাজী ১৭৩৯ সাল। তখন বাঙ্গালার সুবাদার মুর্শিদকুলী খাঁর জামাতা সুজাউদ্দৌলার মৃত্যু হইয়াছে। সুজাউদ্দৌলা মৃত্যুর পূর্ব্বে দীর্ঘকাল মুর্শিদকুলী খাঁর কন্যার মুখদর্শন করেন নাই। তাঁহার মৃত্যুকালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সরফরাজ খাঁ পিতার নিকট মুর্শিদাবাদেই ছিলেন, কিন্তু তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র আকরমজমান খাঁ প্রাণভয়ে দিল্লীতে পলাইয়া আসিয়াছিলেন। আসিবার সময় সুযোগ্য সাহেবজাদা মুর্শিদাবাদের উপকণ্ঠ হইতে রূপবতী ব্রাহ্মণ বিধবা গোলাপীকে হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন।

আগন্তুকদের পরিচয় পাইয়া নূর বাঈ স্তম্ভিত হইয়া গেল। মোগল বাদশাহ কর্ণালের যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু ইহারই মধ্যে মোগল সাম্রাজ্যের রাজধানী দিল্লীতে বাঙ্গালার সুবাদারের পুত্র আকরমজমান খাঁর এইরূপ দুরবস্থা হইতে পারে, তাহা সে বিশ্বাস করিতে পারিল না। আনন্দরাম অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া সাহেবজাদা ও গোলাপীর জন্য আশ্রয়ভিক্ষা করিলেন এবং অনেক কষ্টে নূর বাঈকে রাজী করিয়া বনমালীর সহিত পথে বাহির হইয়া পড়িলেন।

সেই রাত্রিতে দিল্লীতে রাজপথের অবস্থা দেখিয়া বাঙ্গালী আনন্দরামও স্তম্ভিত হইয়া গেল। সমস্ত দিল্লীর রাজপথ জনশূন্য ও অন্ধকার, স্থানে স্থানে লুণ্ঠিত দোকানের সমস্ত দ্রব্য পথে ছড়াইয়া পড়িয়া আছে। গুণ্ডারা কোন কোন স্থানে ঘরে আগুন লাগাইয়া দিয়াছে, ভস্মাবশেষ তখনও ধীরে ধীরে জ্বলিতেছে, দূরে সময়ে সময়ে উন্মত্ত গুণ্ডাদের চীৎকার শুনা যাইতেছে। কিয়দ্দূর চলিতে চলিতে আনন্দরাম বুঝিল যে, বনমালী চলিতে পারিতেছে না, সে জিজ্ঞাসা করিল, “কি রে বনমালী, চল্‌তে পারছিস্ না কেন? জখম হয়েছিস্ না কি?” বনমালী খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে বলিল, “আজ্ঞা না, পোষাকটা কামুড়ে ধরেছে বটে।” আনন্দরাম ফিরিয়া দেখিল যে, সাহেবজাদার বহুমূল্য চুড়িদার পায়জামা বনমালীর পদদ্বয় ভীষণভাবে আক্রমণ করিয়াছে। আনন্দরাম জিজ্ঞাসা করিল, “ওরে, বাসায় কি হচ্ছে বুঝতে পারা গেল না, তুই আর একটু জোরে চল্।” বনমালী খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে বলিল, “আজ্ঞে সেটি ত আমারও ইচ্ছে, কিন্তু ইনি দেন কই? দা-ঠাকুর, অনুমতি কর ত এনাকে ছেড়ে এক বার রণপায়ে লাফিয়ে চলি?”

বনমালীর অবস্থা বুঝিয়া তাহার দীর্ঘদেহের যে যে অংশ সাহেবজাদার বহুমূল্য চুড়িদার পায়জামা প্রবলভাবে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহা ছুরি দিয়া কাটিয়া দিল, বনমালীর পদদ্বয় মুক্তি পাইয়া বাঁচিল এবং সে একটা লম্ফ দিয়া হুঙ্কার করিয়া উঠিল। বনমালীকে দ্রুতপদে চলিতে বলিয়া আনন্দরাম অর্দ্ধ দণ্ডের মধ্যে নিজের বাসস্থানে উপস্থিত হইল। তাহাদের মহল্লায় তখনও কোনরূপ গোলমাল আরম্ভ হয় নাই দেখিয়া আনন্দরাম নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিল।

অনেকক্ষণ দুয়ারের কড়া নাড়িয়া এবং নিজের পরিচয় দিয়া তবে আনন্দরাম নিজের বাসায় ঢুকিতে পাইল। তাহারই এক ভৃত্য একটা মশাল হাতে লইয়া দুয়ার খুলিয়া দিতে আসিয়াছিল। সে আনন্দরামের পশ্চাতে সম্ভ্রান্ত মুসলমানবেশী বনমালীকে দেখিয়া অভ্যাসবশতঃ একটা দীর্ঘ সেলাম করিল। বনমালী রাগিয়া বলিয়া উঠিল, “আরে সদাই, তু নাপিতের ছেলে, আর আমি বাগ্দী, তু আমাকে পেন্নাম করিস্ কেনে?” কথার আওয়াজে বনমালীকে চিনিতে পারিয়া সদানন্দ বলিয়া উঠিল, “বনমালীই ত বটে। তু বহুরূপী সেজেছিস্, তা আমি কেমন ক’রে জানব?” বাড়ীর ভিতরে ঢুকিয়া আনন্দরাম দেখিল যে, বিস্তৃত প্রাঙ্গণ নানা প্রকারের গাভী ও বৎসে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। সে সদানন্দকে জিজ্ঞাসা করিল, “সদাই, এত গরু বাছুর কোথা থেকে এল রে?” সদানন্দ বলিল, “আজ্ঞে, সহরে মুসলমান ক্ষেপেছে শুনে পাড়ার যত গরীব হিন্দু এই বাড়ীটাই মজবুত ব’লে এখানে জিম্মা ক’রে গিয়েছে।”

সদানন্দ তাহার গৃহে বসিয়া সবে মাত্র তামাকু টানিতে আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময়ে লক্ষ্মীর পিতামহী আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি বলিলেন যে, তিনি আনন্দরামের ভরসাতেই পল্লীবাসীর গো-বৎস আশ্রয় দিয়াছেন। আনন্দরাম উপায় না পাইয়া বলিল যে, সে কি করিবে, তাহা প্রভাতে জানাইবে। গোলাপী, আকরমজমান খাঁ, লক্ষ্মী, তাহার দিদি ও পিতামহীর সহিত শতাধিক গাভীর চিন্তা আনন্দরামকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

রথোৎসব

রথযাত্রা হিন্দুর মহোৎসব। দোল ও দুর্গোৎসব হইতে ইহা কোন অংশে ন্যূন নহে। দুর্গোৎসবে যেমন হিন্দুর সর্ব্বসম্প্রদায় আনন্দে মাতোয়ারা হয়,—রথোৎসবেও জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে আপামর সাধারণ যোগদান করিয়া থাকে। আমরা শিশুকালে জননীর মুখে আনন্দে গদগদ হইয়া—আমাদের পর্ব্বগাথা শুনিতাম—

"জষ্টিমাসে ষষ্ঠীবাটা জামাই আনতে দড়।
আষাঢ় মাসে রথখানিতে লোক হয়েছে জড়।"

ইহা কেবল শুনা কথা নহে, পরন্তু শিশুকাল হইতেই রথের উৎসব নিরীক্ষণ করিয়া আসিতেছি এবং পুরুষোত্তম দর্শনের জন্য আনন্দোন্মত্ত জনগণের সম্মর্দ্দ দেখিয়া নয়ন ও মন চরিতার্থ করিয়াছি।

আষাঢ়ের এমন দিনে—নূতন মেঘের সঞ্চারে—যখন অম্বরতল মেদুর হইয়া উঠে, যখন প্রখর গ্রীষ্মের তীব্র উত্তাপের পর—শীতল বারিধারা অমৃতধারার মত ভূতলে পতিত হইয়া ধরিত্রীর সর্ব্বত্র একটা সঞ্জীবতা,—একটা শ্যামলতা—একটা স্নিগ্ধতা উৎপাদন করিয়া দেয়,—তখন নব মেঘের গম্ভীর নিনাদের মতই হৃদয়ের মধ্যেও একটা উল্লাসের দুরু দুরু ধ্বনি শুনা যায়। তখন শিখিকুলের মত হৃদয়ের একটা নৃত্য—একটা তরঙ্গ—একটা স্পন্দন প্রত্যেক হৃদয়বান্ ব্যক্তিই উপলব্ধি করিয়া থাকেন। এই নব মেঘকালে প্রিয়জনের জন্য বিরহী পথিকের চিত্তে একটা আকুলতার সাড়া পাওয়া যায়। আমরা জীবরূপে উদ্‌ভ্রান্ত পথিকের মত কত পথ ঘুরিয়া বেড়াইতেছি—লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বৎসর আমাদের প্রিয়তম—ধ্যেয়ধন সেই পরম পুরুষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কতভাবে ঘুরিতেছি,—আমাদের এ ভ্রমণের অন্ত নাই,—বিশ্রাম নাই। তাই বৎসরান্তে একবার এমনই মেঘমেদুর দিনে প্রাণটা সেই প্রিয়তমের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। এই ব্যাকুলতার পরিণতিই রথযাত্রা উৎসব। প্রাণের সেই টান—সেই দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার জন্যই হিন্দুসমাজে পুরুষানুক্রমে পুরুষোত্তমের এই উৎসব অগণিত সম্বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। বিরহী জীবের পরম পুরুষের প্রতি ধাবনই এই বর্ষার প্রারম্ভে আমাদের রথযাত্রোৎসবের বিশিষ্ট অর্থ বলিয়া মনে হয়।

বৃন্দারণ্যবাসী বৈষ্ণবদিগের যে মাসভেদে শ্রীকৃষ্ণের উৎসবের কথা আছে,—তাহার মধ্যে রথোৎসবের উল্লেখ নাই বটে,—তবে আষাঢ়ে ঘনোৎসবের কথা আছে। যথা—

"মাসভেদেষু দেবস্য নামভেদানি পূর্ব্বতঃ। বৈশাখে পুষ্পদোলঞ্চ, জলকেলিঞ্চ জ্যৈষ্ঠকে।—শুচৌ ঘনোৎসবং দিব্যং হিন্দোলং শ্রাবণে তথা।"

অর্থাৎ মাসভেদে শ্রীকৃষ্ণের পর্ব্বের নামভেদ আছে—বৈশাখে শ্রীকৃষ্ণের পুষ্পদোল, জ্যৈষ্ঠমাসে জলকেলি,—'শুচি' বা আষাঢ়মাসে ঘনোৎসব—এবং শ্রাবণে—ঝুলন। এই ঘনোৎসব বিহিত ধ্যান 'শ্রীবৃহদ্‌ধ্যানরহস্যে' উক্ত হইয়াছে। যথা—

ওঁ মেঘাগমে সুঘোরে চ ঘোরসত্ত্বনিষেবিতে।
শ্রীশ্রীবৃন্দাবনে রম্যে মঞ্জুকুঞ্জৈঃ সুশোভিতে।
নিত্যকিশোররূপং হি কৃষ্ণং বৃন্দাবনেশ্বরম্।
প্রিয়য়া রাধয়া সার্দ্ধং সখীভিঃ পরিমণ্ডিতম্।
শ্রুতিভির্মৃগ্যমজং নিত্যং গোপীজনমনোহরং ভজে॥

দেখুন এই ধ্যানটি কিরূপ সময়োচিত। মাথার উপর বিশাল আকাশ জুড়িয়া শ্যাম মেঘ, নিম্নে শ্যামল—বিস্তীর্ণ বৃন্দারণ্য,—মধ্যে নবনীরদশ্যামতনু—শ্রীশ্যামসুন্দর—তড়িল্লতার মত রাধালতিকা তাঁহার শ্রীঅঙ্গে বেষ্টিত। এই ধ্যানটি বর্ষাকালের উপযোগী হইলেও—উক্ত ঘনোৎসবের সহিত রথোৎসবের কোনই সম্বন্ধ নাই,—কেন না, রথোৎসবে শ্রীরাধা ও গোপীকাগণের কোনই প্রসঙ্গ নাই।

প্রবাদের মত একটি বচন প্রচলিত আছে—

"দোলায়মানং গোবিন্দং মঞ্চস্থং মধুসূদনম্।
রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।"

এই বচনের 'গোবিন্দ', 'মধুসূদন' ও 'বামন' শব্দ শ্রীবিষ্ণুরই বাচক। এই নামভেদের বিশেষ সার্থকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। ব্রহ্মপুরাণে ইহা একটু বিশদভাবে উক্ত হইয়াছে। রঘুনন্দন তাঁহার "পুরুষোত্তমতত্ত্বে" ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"নরো দোলাগতং দৃষ্ট্বা গোবিন্দং পুরুষোত্তমম্।
ফাল্গুন্যাং সংযতো ভূত্বা—গোবিন্দস্য পুরং ব্রজেৎ॥
কৃত্বা মঞ্চগতং কৃষ্ণং দৃষ্ট্বা তত্রাথ ভো দ্বিজাঃ
নরঃ সমস্তযজ্ঞানাং ফলং প্রাপ্নোতি দুর্লভম্॥
তথা— স্নাতং পশ্যতি যঃ কৃষ্ণং ব্রজন্তং দক্ষিণামুখম্।
গুণ্ডিকামণ্ডপং যান্তং যে পশ্যন্তি রথস্থিতম্।
কৃষ্ণং, বলং, সুভদ্রাঞ্চ—তে যান্তি ভবনং হরেঃ॥

ব্রহ্মপুরাণের বচনের অর্থ এই যে—ফাল্গুনে গোবিন্দকে দোলাগত দেখিয়া মানব—গোবিন্দের পুর বা বৈকুণ্ঠে গমন করে, আবার তাঁহাকে মঞ্চস্থ নিরীক্ষণ করিয়া যজ্ঞের দুর্লভ ফল প্রাপ্ত হয় এবং স্নানযাত্রার রথে আরোহণপূর্ব্বক গুণ্ডিকামণ্ডপাভিমুখে গমনকারী শ্রীকৃষ্ণ, বলদেব ও সুভদ্রাকে দর্শন করিয়া শ্রীহরির ভবনে গমন করে।

সুতরাং পূর্ব্বোক্ত "দোলায়মানং গোবিন্দং" ইত্যাদি প্রচলিত বচনের সহিত ব্রহ্মপুরাণের বচনের একার্থতাই হইতেছে। অতএব এই উৎসব যে পৌরাণিক যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে—তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। অনেকে এই রথযাত্রাটিকে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন হইতে মথুরা যাত্রার অনুকৃতি বলিয়া মনে করেন। শ্রীমদ্ভাগবত ও হরিবংশ পর্য্যালোচনা করিলে ঐরূপ মতের অসারত্বই প্রতিপন্ন হয়। কেন না, উক্ত পুরাণদ্বয়ে কংস-বধার্থ শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেবের অক্রূরচালিত

রথে বৃন্দাবন হইতে মথুরা প্রয়াণের বর্ণনা আছে—তাহাতে সুভদ্রার কোনই উল্লেখ নাই। সুতরাং উহার সহিত প্রচলিত রথযাত্রার কোনই সম্পর্ক নাই।

আমাদের মনে হয়—প্রচলিত রথোৎসব দেবলোকের উৎসবের অনুকরণে প্রতিষ্ঠিত। স্বর্গস্থ দেব ও দেবীগণ সতত রথে আরোহণ করিয়া বিহার করেন। বেদে এইরূপ বর্ণনা আছে। ঋগ্বেদে উষাদেবী 'চন্দ্ররথা' বা সুবর্ণবর্ণরথযুক্তা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। আবার ইন্দ্র ও বায়ুকে—"রথেন পৃথুপাজসা উপগচ্ছতম্" প্রভৃতি বেগশালী রথারোহণে আগমন করুন বলিয়া আহ্বান করা হইয়াছে। এবং পুষা সম্বন্ধে প্রার্থনা করা হইতেছে—"আ পুষণম্ রথে বহন্তু"—দেবপুষাকে তাঁহার বাহনগণ রথে বহন করুক। অপর স্থলে—তাঁহাকে 'রথিতমঃ'—রথিগণের শ্রেষ্ঠ (৬ষ্ঠ মণ্ডল ৫৬ সূক্ত) বলা হইয়াছে।

এইরূপে বেদে প্রতি দেবতাকেই রথযুক্ত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। আবার পুরাণের বচন প্রমাণ দেখুন—

> সর্ব্বদা সর্ব্বদেবৈস্তু শঙ্করাদ্যৈঃ প্রতিষ্ঠিতা।
> রথযাত্রা—তদা শক্র সুরৈঃ স্বর্গে সদা কৃতা।
> রথযাত্রাপ্রভাবেণ মোদন্তে দিবি দেবতাঃ ॥
> আদিত্যো রথযাত্রাকৃৎ রথেন নভসঃ ক্রমেৎ ॥

শঙ্করাদি দেবগণ কর্ত্তৃক স্বর্গে রথযাত্রা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই রথযাত্রা প্রভাবে দেবগণ স্বর্গে আমোদ উপভোগ করেন। রথযাত্রাকারী আদিত্যদেব রথে আরোহণপূর্ব্বক নভস্তল অতিক্রম করেন।

দেবীর রথযাত্রা

আবার শ্রীকৃষ্ণ বা পুরুষোত্তমের রথযাত্রা দেশে প্রচলিত বা প্রসিদ্ধ থাকিলেও—দেবী ভগবতীরও রথযাত্রা উৎসবের কথা দেবীপুরাণে উল্লিখিত আছে।—দেবীপুরাণ—রথযাত্রাবিধিমাহাত্ম্য—৩৯ অধ্যায়। যথা, ব্রহ্মোবাচ—

> "ভূয়স্তেঽহং প্রবক্ষ্যামি দেব্যারাধনমুত্তমম্।
>
> * * *
>
> রথং তৈঃ কারয়েদ্দেব্যাঃ সাপ্তভৌমং মনোহরম্।
> সুগন্ধধূপিতং কৃত্বা দেবীং তত্র নিবেশয়েৎ ॥
> প্রতিমাং শোভনাং বৎস! মহাসুরভয়ঙ্করীম্।
> পূজয়েদ্রথবিন্যস্তাং সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলাম্ ॥

দেবীর উত্তম আরাধনার কথা বলিব। সপ্তভূমি বা সাততলা মনোহর রথ দেবীর জন্য প্রস্তুত করিয়া তাহাতে গন্ধধূপাদি দ্বারা ধূপিত করিয়া তথায় দেবীকে স্থাপন করিবে এবং সেই রথস্থিতা সর্ব্বমঙ্গলা মহাসুরনাশিনী দেবীর শোভনা প্রতিমা সংস্থাপিত করিয়া পূজা করিবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ভগবতী দুর্গারও রথযাত্রা পুরাণে উক্ত হইয়াছে।

শিবের রথযাত্রা

একাম্রপুরাণে ৬৬-৬৭ অধ্যায়ে শ্রীশ্রীশিবের রথযাত্রার উল্লেখ আছে। শিবের রথযাত্রার নাম অশোকাখ্যা মহাযাত্রা। ইহা শিবের অতীব সন্তোষদায়িনী। যথোক্ত নিয়মে রথ প্রস্তুত করিবে। ব্রহ্মা সেই রথের সারথি হইবেন। এই রথযাত্রা চৈত্রমাসের শুক্লাষ্টমীতে শুভলগ্নে করিতে হয়। যিনি রথস্থ শিব দর্শন করেন—তাঁহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। যিনি এই রথযাত্রার অনুষ্ঠান করেন—তিনি সকল পাপমুক্ত হইয়া শিবলোকে গমন করেন।

সূর্য্যদেবের রথযাত্রা

ভবিষ্যপুরাণে সূর্য্যদেবের রথযাত্রার কথা বর্ণিত হইয়াছে—"মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমীতে সূর্য্যদেবের রথযাত্রা করিতে হয়। সূর্য্যকে রথে আরোহণ করাইবার পূর্ব্বে রথের সম্মুখে অগ্নিক্রীড়া (আতস বাজি—মেড়া পোড়ান ইত্যাদি) করিতে হয়। রাত্রিকালে সূর্য্যদেবকে রথে আরোহণ করাইয়া সারারাত্রি নানারূপ উৎসবে রাত্রি জাগরণ করার ব্যবস্থা আছে। পর দিন অষ্টমীতে প্রাতঃকালে নানাবিধ বাদ্যাদিসহ রথ ভ্রমণ করা বিধেয়। সূর্য্যদেবের রথ সংবৎসরের অবয়ব দ্বারা কল্পনা করিতে হয়। রথচক্রের তিনটি নাভি হইবে—ঐ নাভিত্রয় ত্রিকালসূচক। ছয় ঋতু ইহার নেমি,—ইহার দুইটি বেদী—উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ ইত্যাদি। ইহাতে জ্যোতিশ্চক্রোক্ত সমুদয় নক্ষত্রাদি সমাবেশ করা বিধেয়। * এইরূপে সূর্য্যদেবের রথ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ ভবিষ্যপুরাণে ৫৫ অধ্যায় হইতে ৬২ অধ্যায় পর্য্যন্ত বর্ণিত আছে। কৌতূহলী পাঠক তাহা পাঠ করিয়া অবগত হইতে পারেন।

পাশ্চাত্যদেশে রথযাত্রা

য়ুরোপের সিসিলী দ্বীপে খৃষ্ট-মাতা মেরীর উদ্দেশ্যে রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সূর্য্যদেবের রথে যেরূপ জ্যোতিশ্চক্র ও নবগ্রহের মূর্ত্তি অঙ্কিত হইত, সিসিলী দ্বীপের সুবৃহৎ রথেও সূর্য্যচন্দ্রাদি নবগ্রহ ও জ্যোতিশ্চক্র অঙ্কিত হইয়া থাকে। এই সিসিলীর রথ সম্বন্ধে শ্রীমতী হেনরিটা কারাসিওলো লিখিয়াছেন—

"A colossal car is dragged by a long team of buffaloes through the irregular and illpaved streets. Upon this are erected a great variety of objects such as sun, moon, principal planets set in rotation motion. This erection is in itself really imposing—sumptuously decorated and put in movement in honour of her who gave birth to the God of charity. But its functions recall to mind the famed car of Joggnurnath.

সুতরাং বর্ত্তমানকালে আমাদের দেশে শ্রীশ্রী৺জগন্নাথদেবের বা শ্রীকৃষ্ণের রথযাত্রা প্রচলিত থাকিলেও পূর্ব্বকালে দেবী দুর্গা, মহাদেব, সূর্য্যদেব প্রভৃতির রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হইত। এমন কি, এই ভারতের অনুকরণে পাশ্চাত্য দেশেও রথযাত্রা অনুষ্ঠানের উল্লেখ পাইলেন। আবার বৌদ্ধগণ যে বুদ্ধদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে রথযাত্রা উৎসব করিত, তাহা খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে চীন পরিব্রাজক 'ফা হিয়ান'—তাঁহার 'Fo kwo ki' পুস্তকের ২য় অধ্যায়ে বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিয়াছেন। তবেই দেখা যাইতেছে—কি সৌর, কি শাক্ত, কি শৈব, কি বৈষ্ণব, কি বৌদ্ধ, কি জৈন—সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে স্ব স্ব উপাস্য দেবের উৎসববিশেষে রথযাত্রা প্রচলিত ছিল।

শ্রীশ্রী৺জগন্নাথদেব বা শ্রীকৃষ্ণের রথযাত্রা

পূর্ব্বোক্ত নিয়ম অনুসারে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবেরও উৎসবসমূহের মধ্যে রথযাত্রা অন্যতম। শ্রীরঘুনন্দন—তাঁহার "দ্বাদশযাত্রাতত্ত্ব" নামক গ্রন্থে স্কন্দপুরাণ হইতে ইন্দ্রদ্যুম্ন ও জৈমিনী-সংবাদ উদ্ধৃত করিয়া বৈশাখাদি দ্বাদশমাসে শ্রীভগবানের দ্বাদশযাত্রা ও উৎসবের উল্লেখ করিয়াছেন।—

> "বৈশাখে চান্দনীযাত্রা জ্যৈষ্ঠে স্নাপমুদীরিতা।
> আষাঢ়ে রথযাত্রা স্যাৎ শ্রাবণে শয়নী তথা ॥ ইত্যাদি

* সংবৎসরস্যাবয়বৈঃ কল্পিতানি যথাক্রমম্। নাভ্যস্ত্রিস্রস্তু ত্রয়ঃকালাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। নেম্যঃ ষড়্ ঋতবঃ স্মৃতাঃ রথবেদী স্মৃতে তস্য অয়নে দক্ষিণোত্তরে। ইত্যাদি।

বৈশাখে চন্দনযাত্রা, জ্যৈষ্ঠমাসে স্নানযাত্রা, আষাঢ়ে রথযাত্রা ও শ্রাবণে শয়নী বা ঝুলন। এই রথযাত্রা সম্বন্ধে রঘুনন্দন স্কন্দপুরাণের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, (১) তাহার ভাবার্থ এই—"আষাঢ় মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়া তিথি পুষ্যা নক্ষত্রযুক্ত হইলে বলরাম, শ্রীকৃষ্ণ ও সুভদ্রাকে রথে আরোহণ করাইয়া উৎসব করিবে এবং বহু ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। ঐ দিন নক্ষত্র না পাইলেও কেবল শুক্লা দ্বিতীয়াতেই রথ-যাত্রা হইতে পারে।

পদ্মপুরাণেও উক্ত হইয়াছে (২) আষাঢ়ের দ্বিতীয়া তিথিতে রথোৎসব করিবে। এই রথোৎসব অপেক্ষা শ্রীভগবানের আর কোনও উৎসব শ্রেষ্ঠ নহে।

শ্রীভগবান্ রথে আরোহণ পূর্ব্বক প্রতি বৎসর গমনকালে দর্শক, অনুগমনকারী প্রভৃতি সকলের সর্ব্বপাপ বিনাশ করেন। রথস্থিত শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রাকে দেখিয়া মুক্তি হয়। এই প্রসঙ্গে এই উৎসবে যোগদানকারী ব্যক্তিগণের বিবিধ শুভ ফলের কথা বর্ণিত হইয়াছে,—

যথা (ক)—"শ্রীভগবানের রথরেণু গাত্রে সংসক্ত হইলে পাপমুক্তি, রথানুগমনকালে বৃষ্টি-জল-সিক্ত হইলে স্বর্গঙ্গা স্নানের ফল, তৎকালে প্রণামের ফল—মোক্ষ,—অনুগমনের ফল দেবত্বলাভ,—স্তবকারীর পাপ হইতে পরিত্রাণ,—নর্ত্তন ও গানের ফল মুক্তিলাভ,—নামকীর্ত্তনের ফল যমভয়নিষ্কৃতি। শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রার জয়শব্দোচ্চারণে পুনর্জ্জন্মজয়। চামরাদি দ্বারা বীজনের ফলে দেব ও গন্ধর্ব্বের মত অপ্সরা-সেবিত হইয়া অশেষ ভোগের অধিকার লাভ।

অতএব দেশের আবালবৃদ্ধ-বনিতা বর্ষে বর্ষে শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমের পুরাণপ্রথিত পুণ্য রথোৎসবে যোগদান পূর্ব্বক—এই সকল শুভ ফলের অধিকারী হইয়া ধন্য হউন।

শ্রীভববিভূতি বিদ্যাভূষণ।

অভিভাষণ *

আমার স্বদেশবাসী, শ্রদ্ধাভাজন এবং স্নেহাস্পদ ভাই বোনেরা! আপনারা যে আমায় আজ এই অকৃত্রিম স্নেহ, শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত আপনাদের মধ্যে আহ্বান করিয়াছেন, ইহার জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা আপনারা সকলেই যথাযোগ্যভাবে গ্রহণ করুন। আপনাদের দ্বারা আহ্বানিত হইয়া আমি আপনাকে সম্মানিত বোধ করিতেছি, ইহা বোধ করি, আপনাদের নিকট বলাই আমার বাহুল্য।

আপনারা আমার স্বদেশবাসী, অতি নিকটতম আত্মীয়, আমার ভাই বোন, পুত্র পুত্রী এবং পিতৃমাতৃস্থানীয়। আপনারা বাঙ্গালী, আমার সহিত আপনাদের শুধু সমভাষাই নহে, পরন্তু আকাঙ্ক্ষা এবং আশাও এক, তাই আপনাদের সঙ্গে আমার অন্তরের যোগ এতই নিকটতর এবং নিবিড়তর। তাই আজ আমি আপনাদের যে আন্তরিক সহানুভূতিপূর্ণ সমবেদন লাভ করিলাম, ইহা আমাকে শুধু চির গৌরবান্বিতই নহে—অপরিসীম আনন্দিতও করিয়াছে। আপনাদের মধ্যে আসিয়া আমার মনে হইতেছে, এ যেন আমার ঘরের দ্বারেই আমি আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, আর আমার চিরাত্মীয় জনরাই আমাকে তাঁদের চিরপরিচিত সুরে ডাকিয়া আমায় তাঁদের মধ্যের আমার চিরাধিষ্ঠিত স্থানটিতেই সাগ্রহে ফিরিয়া লইতেছেন। এর মাঝে চির-অপরিচয়ের অনাত্মীয়তার কোনই কুণ্ঠা দ্বিধা নাই, তাই আমার মনে এক মুহূর্ত্তের জন্যও ছায়াপাত করিতে পারে নাই। তাই আমিও আপনাদের মধ্যে নিজের স্থানকে এতটুকুও সঙ্কুচিত বোধ করিয়া সংশয়ের দৃষ্টিতে দেখিতে সমর্থ হই নাই এবং আপনারাও আপনাদের এই বাঙ্গালীত্বের অলঙ্ঘ্য আকর্ষণেই আমার প্রতি আপনাদের শ্রদ্ধা এবং স্নেহ-প্রীতির উৎস এতই সহজে উৎসারিত করিয়া দিতে পারিয়াছেন। আপনাদের এ দান শুধু এক জন সামান্য গ্রন্থ লেখিকার প্রতি সম্মাননার মত শুষ্ক বস্তুই নয়; এর মধ্যে স্বদেশীয়ের প্রতি স্বীয় সমানভুক্তের সমভাষাভাষীর প্রতি একটা আন্তরিকতাও আমি আপনাদের মধ্যে আপনাদের অনেকের সঙ্গে সেই প্রথম দেখার দিন হইতেই লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি এবং আমার বাঙ্গালা মায়ের সন্তানদের মধ্যের একপ্রাণতায় আমি মুগ্ধ ও কৃতার্থ হইয়াছি। বাঙ্গালীর মধ্যে নাকি একতার অভাবের কথাটাই আমরা সর্ব্বদা শুনিতে পাইয়া থাকি, শুনিয়া মনে প্রাণে আহত ও ক্ষুব্ধ হই; তাই তার ব্যতিক্রমে চিত্ত আবার অপার আনন্দের উত্তাল তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে। মনে ভবিষ্যতের জন্য সুগভীর আশা সঞ্চিত হইতে থাকে।

আপনাদের সঙ্গে এ কয়দিনের দেখা-শুনা মেলা-মেশায় আমি যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছি। বাহিরের দিক্ হইতে দেখিলে, আপনাদের নিকটে যে সকল সাহায্য লাভ করিতে পারিয়াছি, বাস্তব জগতে তার উপকারিতার মূল্য নিতান্ত অল্প নহে, কিন্তু ইহার উপর, উপরি পাওনার স্বরূপে আরও যেটুকু লাভ করিয়াছি সেটুকু উপরি পাওনার মতই আমার কাছে লোভনীয়। সেটুকু আমার বাঙ্গালীচরিত্রের বিকাশ ও তাঁহাদের মধ্যে স্বজাতি-প্রীতির নিদর্শন দৃষ্টে গভীরতর আশা। অদূর ভবিষ্যতে বাঙ্গালী যে আর "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই" থাকিলেও নিজেদের মধ্যে "ভেদ নাই, ভেদ নাই"—এই কথাটাকে জোর করিয়া দশের মাঝখানে উঁচুগলায় বলিতে পারিবেন এবং শুধু মুখেরই বলা নয়, কাজেও ইহা জগৎ সভায় প্রামাণ্যরূপে উপস্থিত করিতে পারিবেন, এমন আশা করাকে আমি আকাশ কুসুমের দ্বারায় মালা-রচনা মনে করিতে পারি না, পরন্তু রাত্রিশেষের নির্ম্মল উষালোকের মতই নিত্য প্রতীক্ষিত সত্য বস্তু বলিয়াই মনে করি। যেহেতু মনে হয়, রক্তের বন্ধন বা নাড়ীর টানের মতই জাতীয়তার দৃঢ়বন্ধন, শিথিল হইলেও একেবারেই ছিন্ন হইতে পারে না। ইহার কোনখানটায় টান পড়িলেই এ সজাগ হইয়া উঠে। এরা সারা জাতটাই যে পরস্পরের মা'র পেটের ভাই, মা'র পেটের বোন, আর এই সহজাত সম্পর্কের চেয়ে বড় ও নিকটতম সম্বন্ধ কোন জাতির কোন সমাজেই বোধ করি কোনদিনই সৃষ্টি হইয়া উঠে নাই।

---

(১) আষাঢ়স্য সিতে পক্ষে দ্বিতীয়া পুষ্যাসংযুতা। তস্যাং রথে সমারোপ্য রামং মাং ভদ্রয়া সহ। যাত্রোৎসবং প্রবৃত্তাথ প্রীণয়েচ্চ দ্বিজান্ বহূন্। ঋক্ষাভাবে তিথৌ কার্য্যা সদা সা প্রীতয়ে মম॥ স্কন্দপুরাণ।

(২) পদ্মপুরাণ "আষাঢ়স্য দ্বিতীয়ায়াং রথং কুর্য্যাদ্বিশেষতঃ। নাতঃ পরং হি কৃষ্ণস্য যাত্রান্তরমপেক্ষতে॥ অত্র স্বয়ং ত্রিলোকেশঃ স্যন্দনেন কুতূহলাৎ। নাশয়ন্ সর্ব্বপাপানি বর্ষে বর্ষে ব্রজেদসৌ॥ মহাবেদীং ব্রজন্তং তং রথস্থং পুরুষোত্তমম্। বলভদ্রং সুভদ্রাঞ্চ দৃষ্ট্বা মুক্তির্ন চান্যথা॥

(ক) তদ্রেণু-সংসক্ততনুস্ত্যজেদ্বৈ পাপসংহতিম্। ঘনাম্বুবৃষ্টিসিক্তেন স্বর্গঙ্গা স্নানজং ফলম্॥ যে প্রণামং প্রকুর্ব্বন্তি তেঽপি মোক্ষমবাপ্নুয়ুঃ॥ অনুগচ্ছন্তি যে কৃষ্ণং তে দেবতুল্যবিগ্রহাঃ॥ ইতিহাসপুরাণাদ্যৈঃ স্তোত্রৈর্ব্বাপি সুসংস্কৃতৈঃ। স্তুবন্তি পুণ্ডরীকাক্ষং যে বৈ বিগতকল্মষাঃ॥ নর্ত্তনং কুর্ব্বতে বাপি গায়ন্ত্যথ নরোত্তমাঃ। বৈষ্ণবোত্তমসংসর্গান্মুক্তিং প্রাপ্স্যন্ত্যসংশয়ম্। নামানি কীর্ত্তয়িষ্যন্তি ন তে যান্তি যমালয়ম্। জয় রামকৃষ্ণেতি জয় ভদ্রেতি যো বদেৎ। ন মাতৃগর্ভে বাসোঽস্য স চ দেবত্বমাপ্নুয়াৎ॥ চামরৈর্ব্বীজনৈঃ পুষ্পস্তবকৈশ্চীনচেলকৈঃ। রথস্যাগ্রে স্থিতো যো বৈ বীজয়েৎ পুরুষোত্তমম্। সংবীজ্যমানোঽপ্সরোভির্দেবগন্ধর্ব্বযোজিতান্। ভুঙ্‌ক্তে তু ভোগান্ অখিলান্ যাবদাহূতসংপ্লবম্॥

* দেরাদুন বাঙ্গালা সাহিত্য সমিতির বিশেষ অধিবেশনে লেখিকা কর্ত্তৃক পঠিত।

আমি আপনাদের প্রবাসী বাঙ্গালী নামে অভিহিত করিতে পারি নাই। বেহারের কয়েক স্থানে আজিকার মত তৎস্থানীয় বঙ্গীয় নরনারীগণ আমায় তাঁদের নিজগুণে স্নেহ করিয়া আদর করিয়া ডাকিয়াছেন। তাঁহারা নিজেদের প্রবাসী বাঙ্গালী নামে পরিচিত করিলেও আমি তাঁহাদের এ মতের সমর্থন কোনদিনই করিতে পারি নাই। নিজের ঘরের বাহিরে আসিয়া আপনারা "ঘরছাড়া" বাঙ্গালী হইয়াছেন, কিন্তু আপনাদের আমি "প্রবাসী" বলিতে পারি না। বেহারী এবং উড়িষ্যাবাসীরা বলিয়া থাকেন, "Bihar for Biharees" অথবা "Orissa for Orias" অর্থাৎ কিনা বেহার ও উড়িষ্যা তত্তৎ দেশবাসিগের জন্য, ইহাতে অন্যের কোন অধিকারই নাই। আমরা বাঙ্গালীরা কিন্তু কোন দিনই বাঙ্গালার উপর বাঙ্গালীর সম্পূর্ণ দাবী দাওয়া তুলিয়া চীৎকার শব্দ করিয়া উঠি নাই। এ বিষয়ে আমাদের মুসলমান ভ্রাতারা বরং কিছু অগ্রসর হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারা বাঙ্গালাকে নিজেদের মাতৃভূমি বলিয়া স্বীকৃতি না দিয়াও তার দাবী দাওয়াটা ষোল আনার উপর আঠার আনাই করিয়া থাকেন। কিন্তু আমি মনে করি, যে যাহাই বলুন, বাঙ্গালা বাঙ্গালীর ঘর হইলেও শুধু বাঙ্গালার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীটুকুই তাঁদের স্বদেশ বলিতে বুঝায় না। এই সুবিস্তৃত, সুবিশাল ভারতভূমির সমস্তটাই তাঁহাদের স্বদেশ, তাঁহাদের মাতৃভূমি, তাঁহাদের জনক-ভূ। এই সারা ভারত যে বাঙ্গালী, মারাঠী, মাদ্রাজী, হিন্দু, পার্শী, জৈন মুসলমান ও খৃষ্টান সকলকারই স্বদেশ এবং সবারই বন্দনীয়া, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই ভারত আসমুদ্র হিমাচলাবধি সর্ব্বত্রই সতীদেহাবচ্ছিন্ন মহাপীঠসমূহ দ্বারা পবিত্রীকৃত ও তীর্থীকৃত। এখনও ধর্ম্মপ্রাণ সনাতনধর্ম্মী হিন্দু তীর্থযাত্রা উপলক্ষে হিংলাজ হইতে কুমারিকাবধি পর্য্যটন করিয়া আসেন, তবে ভারতবর্ষের মধ্যে ভারতবাসী মাত্রেই "প্রবাসী" কেমন করিয়া হইতে পারেন? তাই বলি, হে আমার বঙ্গের বাহিরের বাঙ্গালী ভাইভগিনীগণ! আপনারা নিজেদের কোন দিন প্রবাসী মনে করিয়া নিজেদের দেশপ্রীতিকে খর্ব্বীকৃত করিয়া ফেলিবেন না, এবং এই সুপবিত্র বাহান্ন মহাপীঠ-সমন্বিত সুবিশাল ভারতবর্ষকে নিজের স্বদেশ জানিয়া শুধু বাঙ্গালা মায়ের প্রতি ভক্তি ও বাঙ্গালী ভাই বোনেদের প্রেমমাত্র দিয়াই নিশ্চিন্ত হইলে চলিবে না, আমাদের বাঙ্গালা মায়েরও যিনি মা, সেই 'জনকজননী-জননী'কে সমান শ্রদ্ধায় তাঁহার সমুদয় পুত্রকন্যাদের সমান স্নেহভরে ভক্তিভরে কোল দিয়া বুকে ধরিয়া, মাথা নত করিয়া দিয়া আপন করিয়া লইতে হইবে। আমরা অযোধ্যার রামচন্দ্রকে যুগযুগান্তরাবধি পূজা করি, দিল্লী ইন্দ্রপ্রস্থের যুধিষ্ঠিরাদি আমাদের চির আদর্শ, মথুরা, বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ আমাদের উপাসনার ধন, এই সুদূর হিমাচলপাদপ্রান্তে আমরা যে প্রাণের আবেগবশে আত্মহারা হইয়া ছুটিয়া আইসি, সে কিসের মোহে? কোন্ অচ্ছেদ্য আকর্ষণ-পাশ আমাদের বাঙ্গালা মায়ের স্নেহনীড় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া এতদূরে টানিয়া লইয়া আইসে? এই দেবতাত্মা নগাধিরাজ হিমালয় এবং তাহাতেই উৎপন্ন শৈলজা-হিমজা জাহ্নবী, যমুনা—সে যে আমাদের চিরজীবনের সাধনার স্বপ্ন, অগতির গতি, মরণের সম্বল। পতিতকে যিনি উদ্ধার করেন, সেই কলুষনাশিনী গঙ্গার সূতিকাগার ও শৈশবের লীলারঙ্গের রঙ্গভূমি, এ কি কখন গঙ্গাতীরবাসী এবং গঙ্গাতীর বাসলোভী বাঙ্গালীর পরবাস হইতে পারে? তবে এখন আমাদের অবস্থা সঙ্কটের কাল, আমাদের দশা দেখিয়া এখন স্বজাতিবৎসল কবিকে কাঁদিয়া বলিতে হয়, "নিজ-বাসভূমে, পরবাসী হলে—" সে হিসাবে আমরা নিয়তই এখন প্রবাসবাসী প্রবাসী। তা' সে কি বঙ্গভূমির শ্যামল অঙ্কে, আর কি উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের কঙ্কর-কর্কশ ধূসর ক্ষেত্রে, কিন্তু বাস্তবিক ভারতের মধ্যে ভারতবাসী মাত্রেই তাঁহার স্বদেশবাসী, প্রবাসী নহেন। আমাদের মধ্যে এই ভাবটিকে দিনে দিনে বর্দ্ধিততর করিতে হইবে, পুষ্ট করিতে হইবে, বিকশিত করিতে হইবে। মা'কে ভালবাসি, সে খুব ভাল কথাই; কিন্তু তাই বলিয়া মায়ের মা'কে তুচ্ছ করাও তো সঙ্গত নয়। বাঙ্গালার বাহিরের ভারত, সে যে আমাদের দিদিমায়ের ঘর, আমাদের ঠাকুরমায়ের পূজাগৃহ। বাঙ্গালার বাহিরের ভারতীয় আমাদের মামাত, খুড়তত, বা মাসতুত, পিসতুত ভাই, সহোদর নাই বা হইল তবু ভাই যে, সে ভাইই। আর রক্তের সম্বন্ধ ও নাড়ীর টান এদের সঙ্গে আমাদের খুবই সুদূর অথবা শিথিলও নয়। তাই আজ আমি আপনাদের সমীপে আপনার জনের হিসাবেই এই কথাটি বলিতে ভরসা করিতেছি যে, আপনারা ভাল, কিন্তু তাই বলিয়া আপনাদের স্নেহের সরিৎকে গণ্ডী ঘেরিয়া যেন সীমাবদ্ধ রাখিবেন না, সমগ্র ভারতবর্ষকেই এই প্রেম-মন্দাকিনীর পীযূষ-ধারায় পরিপ্লাবিত করিয়া দিবার জন্য গঙ্গোত্রীর মতই উদার বক্ষে উন্নত হিমালয়ের মত সমুচ্চ-শিখরে আপনাপন চিত্তকে তুলিয়া ধরুন! ভারতীয় ভারতীর সকল সেবক সেবিকাই যেন আপনাদের নিকট আজ আমি যে জন্যতা ও আত্মীয়তা লাভ করিতে সমর্থ হইয়া ধন্য হইয়াছি, সেই একই আত্মীয়ভাবাপন্ন হইতে পারেন। সপ্তকোটি নহে, পরন্তু "তেত্রিশকোটি মোরা নহি কভু ক্ষীণ," এই ভাবটিই আমাদের মনের হিসাবের খাতায় নিয়তই জমা হইয়া উঠিতে থাকে।

আপনারা আমার কাছে কিছু শুনিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু আমি জানি, আপনাদের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন, যিনি বিদ্যাবুদ্ধি-জ্ঞানে ও চিন্তাশক্তিতে আমার অপেক্ষা অনেক উচ্চে। তাঁহাদের মধ্যে আমার কথা উপদেশের বাণীর মত যদি শোনায়—সেটা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা। আপনাদের এতখানি সৌজন্যের পরিবর্ত্তে আমি অন্ততঃ সেই অসৌজন্যটুকু আপনাদের বিনিময় করিতে ইচ্ছা করি না। অথচ আপনারা যখন এতখানি আগ্রহের সহিত আমায় আপনাদের এই পবিত্র সাহিত্যসভায় ডাকিয়া আনিয়া আমায় এতবড় একটা উচ্চাসন দিয়াছেন, তখন অগত্যাই আমি দুই একটা কথা আমার যথাসাধ্য না বলিয়া তো নীরব থাকিতেও পারিব না। আপনারা নিজগুণে নীর হইতে ক্ষীর মাত্র গ্রহণ করিতে পারিবেন, এই আশা আছে।

আমার সাহিত্যিক মতামতের জগতে একটা কিছু মূল্য আছে বলিয়া আমি কোনদিনই মনে করি নাই, কিন্তু আমার দেখিতেছি সেই "কম্বলীর" দশা হইয়াছে, আমি ছাড়িলেও আপনারা পাঁচজনে ছাড়েন না, কাজেই বিদ্যাবুদ্ধি আমার যতই অল্প হউক, মতামতের দাম আমার সাহিত্যজগতে কাণাকড়িব যোগ্যও না থাক্, তথাপি এ ধৃষ্টতা আমাকে বারে বারেই দেখাইতে হয়। ইহাতে ফলাফল যা হয়, সে দিকে চোক কাণ না দিতে পারিলেই ভাল এবং তা বড় একটা দিইও না। যেহেতু আর যত যাই কিছু আমার না পড়া থাক, সস্তায় পাওয়া গীতাখানা ত আছেই। সেখানে শ্রীভগবান্ "মা ফলেষু কদাচন" বলিয়া আমাদের শুধু কর্ত্তব্যেরই অধিকারমাত্র দিয়া ফলানুসন্ধানকে খণ্ডিত করিয়া গিয়াছেন। তাই আমার পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা জানিয়াও আমার মতামতকে আমায় সুধীজন-সমাজে ব্যক্ত করিতেই হয়! আমার •সম্প্রতিকার মজঃফরপুর সাহিত্য সভার অধিবেশনে পঠিত অভিভাষণ চৈত্র মাসের "মাসিক বসুমতী"তে প্রকাশিত হইয়াছে, আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক উহা পাঠ করিলেই আমার এ বিষয়ের যা মতামত, তাহা জানিতে পারিবেন। মোট কথা এই যে, চলতি ভাষা বলিয়া আজকাল চারিদিকে সমস্ত বাঙ্গালার সকল জিলার যে সকল ভাষার খিচুড়ি, এবং সেই সঙ্গে ছাঁকা ইংরাজীর অনূদিত যে এক অচল ভাষাও বঙ্গ সাহিত্যের রাস্তা-পথে ট্রাম-মোটরের গতি-বেগকে হার মানাইয়া উদ্দাম প্রবাহে ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহার ভীড়ে ঐ পথের পথিকদের মধ্যে মাথা ঠোকাঠুকির সম্ভাবনাটাই যেন অত্যন্ত বেশী বোধ হইতেছে। আমরা আমাদের চলিত ভাষায় লিখিয়া থাকি, "গেলুম, মলুম, খেলুম।" কেহ তাঁহাদের চলিত ভাষায় লিখিয়া রাখেন, "চল্লো, মল্লো, বল্লো"

আবার কেহ লেখেন, "গেলাম, মলাম, খেলাম"। আমরা আপত্তি করিলে এঁরা বলেন—"আপনাদের ঐ হালুম হুলুমের চাইতে এ ঢের ভাল"। "বলিল" "করিল", যখন সাহিত্যে চলিতেছিল, তখনকার দিনে সকলে একসঙ্গেই মরিত বা বাঁচিত। সাহিত্যিকদের মধ্যে তখন "মলো বাঁচলোর" ঝগড়া ছিল না। মোট কথা, কি সংসার-ক্ষেত্রে কি সাহিত্য-জগতে পরস্পরের মধ্যে একতাটা যতই বৃদ্ধি পায়, জাতির পক্ষে ততই মঙ্গল। সেটা যদি হ্রস্ব হইতে থাকে, তবে কাউন্সিলে, মিউনিসিপ্যালিটীতে, অথবা সাহিত্যে চলতি ভাষায় কোনখানটাতেই সুবিধা নাই। এই সব দরবারেই আমাদের এখন যে জিনিষটিকে সকলের চাইতেই বিশেষভাবে পাওয়ার দরকার, ঠিক সেই জিনিষটিকে গড়ার চেয়ে ভাঙ্গার ব্যবস্থাটাই বেশী। অবশ্য যতটা সম্ভব মোলায়েম ভাবেই পরিশুদ্ধ বাঙ্গালায় বই লিখিলে সেটা সুপাঠ্য ভিন্ন অপাঠ্য হয় না। আমার পিতামহদেব, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'পারিবারিক প্রবন্ধ', কবিবর রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশ' এমন কি, তাঁর 'নৌকাডুবি' 'গোরা' ইত্যাদি উপন্যাসের ভাষা যেরূপ শ্রুতিসুখকর, কোন ইদানীন্তন নব ভাষায় লিখিত পুস্তক কি তাহাদের সহিত তুলনীয় হইতে পারে? তবে নূতন কিছু করিবার উদ্দেশ্যে যদি এটা করা হয়, সে কথা অবশ্য স্বতন্ত্র।

আর একটি কথা আমি সে দিনের অভিভাষণে বলিয়াছি, এটি আমার বড় প্রাণের কথা বলিয়াই আমি বড় তীব্র আবেগের সঙ্গেই এ সম্বন্ধে আমার মন্তব্য প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছি, তাহা আর্টের দোহাই দিয়া সাহিত্যে যথেচ্ছচারিতা। আর্ট বা সৌন্দর্য্যসৃষ্টি সাহিত্যের উদ্দেশ্য হইলে ইহার মধ্যে পাপ-পঙ্কিল বহুতর ভদ্রাভদ্রের নয়নে রুচি-বিগর্হিত, দেশপ্রচলিত নীতি-ধর্ম্ম ও আইনের সম্পূর্ণ বিরোধী উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের প্রশংসনীয়ভাবে চিত্রাঙ্কনের স্থান কোথায়? সৌন্দর্য্য কাহাকে বলে? যাহাতে সকলেরই নয়ন মন পরিতৃপ্ত হয়, চিত্ত প্রাণ জুড়াইয়া যায়, তাহাই সৌন্দর্য্য। এই যে আপনাদের চতুষ্পার্শ্বে অভ্রভেদী হিমাচলের স্থির-গম্ভীর মহান্ রূপরাশি, এই যে তাহার সেই নীলাকাশ-চুম্বিত ভীমকান্ত নীলাভ অঙ্গে ধূসর শুভ্র ও শ্যামলতার ক্রম-বিবর্ত্তন, সুদূরপ্রসারী উচ্চ গিরিশৃঙ্গে ঘন তুষারে সূর্য্যকিরণের রজতালোকপাতে "ধবল তুষার জিনি সিতশুভ্র কলেবরের" বা "রজত-গিরিসন্নিভ" কৈলাস-পতির প্রতীক ভাব প্রকাশে অন্তরে অসীম ভক্তির অনির্ব্বচনীয়তার সমাবেশ করিয়া দেয়, এই যে আপনাদের আশে পাশে অসংখ্য বৃক্ষলতা অজস্র পুষ্পসম্ভারে আপনাদের শান্ত স্মিত পবিত্র মূর্ত্তিগুলি সাজাইয়া লইয়া যেন অনন্ত সুন্দরের পাদপদ্মে অর্ঘ্য রচনা করিতেছে, ওই দিকে দিকে বিরাট শুভ্র চিরঘনানী তাহাদের ধ্যানমগ্ন-চিত্ত-প্রাণ, কোন চিরসুন্দরের মধ্যে সমর্পণ করিয়া দিয়াছে, এ সবের মধ্যে যে অসীম সৌন্দর্য্যের সমাবেশ, ইহা চক্ষুষ্মান মাত্রেরই চক্ষুকে সার্থক করিয়া তুলিবে কিন্তু এদের পাশে যদি একটা পঙ্কিল পল্বলে কতকগুলা পানা ভাসিয়া থাকে ও তাহাতে ভেক-কলরব শ্রুত হয়, তাহাতে দৈবাৎ কাহারও চক্ষু ফিরিতে পারে। তবে মানুষের দেহের পিপাসার কাছে তাহার অন্তরের ক্ষুধা পরাস্ত হইয়া যায়। তৃষ্ণার্ত্ত পথিক ফুলের গন্ধের চেয়ে বিষবাষ্পোদ্গারী পঙ্কিল জল বোধ হয় প্রেয় বোধ করিয়া থাকে, তাই আমাদের কর্ত্তব্য এমন রম্যভূমে ওই পঙ্কিল সলিলের পরিবর্ত্তে যাহাতে নির্ম্মল জলধারা সুপ্রাপ্য হয়, তাহারই ব্যবস্থা করা এবং সৌন্দর্য্যের দিক্ দিয়াও তাহাতেই সৃষ্টির সার্থকতা। নরনারীর অনাচার বা ব্যভিচারের মধ্যে যে সৌন্দর্য্য বা আর্ট সেটা ব্যক্তিগত সম্পত্তি। তার জন্য চকচকে মরক্কোয় বাঁধান খাতার পৃষ্ঠাই সর্ব্বোত্তম স্থান। ছাপার মেসিনে চড়িয়া বাজারে আসিয়া দাঁড়াইলেই সেটা আর জন-অ-সাধারণের থাকে না, সে তখন জনসাধারণেরই সম্পত্তি হইয়া যায়। পাঁচ জনকে দিতে গেলে সকলের পক্ষে যাহা সুপাচ্য, তাহাই দেওয়া উচিত, এক জনের হজম-শক্তির উপরে নির্ভর করিয়া পরিবেশন করিয়া গেলে আর চার জনের পক্ষে সেটা নিতান্ত অবিচার হইয়া পড়ে এবং ইহার দ্বারা নিমন্ত্রণের সকল সৌন্দর্য্যই অসৌন্দর্য্যসাগরে মগ্ন হইয়া যাইতে পারে। নিমন্ত্রকের সর্ব্ব প্রথম সেই কথাটাই মনে রাখা প্রয়োজনীয়।

কেহ কেহ আর্টকে ফুলের সঙ্গে তুলনীয় করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, ফুল যেমন সৌন্দর্য্য বিলাইবার জন্য ফুটিয়া উঠে, অপর কোন গূঢ় উদ্দেশ্যে নহে, আর্টের পক্ষেও সেই একই কথা। আর্ট কাহারও কোন বাঁধা নিয়মের অধীন হইতে পারে না, যেহেতু ইহা নীতিশাস্ত্র নয়। শিক্ষার জন্য নীতিপথ, কথামালা ইত্যাদি অনেক কিছুই লেখা হইয়া গিয়াছে, উপন্যাসে আর ও জিনিষটাকে তৈরী করা অনাবশ্যক। তাঁহাদের আমি সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করি, যে ফুল শুধু সৌন্দর্য্য দান করে, তার চেয়ে, যে তার সঙ্গে মধুভরা বুকে সৌরভও বিলায়, তার কাছেই কি মধুপ এবং মানুষ উভয়েই সমধিক আকর্ষিত হয় না? আর নীতি-শিক্ষার কালটা কি শুধু আমাদের শৈশবের গণ্ডীতেই সীমাবদ্ধ? তবে গীতায় অত বড় শিক্ষিত বীর অর্জ্জুন—তিনি মানবচিত্তকে বায়ুর মত সুদুষ্কর বলিয়া অতখানি চমকাইয়া উঠিলেন কেন? এই যে যুক্তিটা তিনি দিলেন,—

"চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ! প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্।"

এটাতো আমরা আত্মানুসন্ধান দ্বারাই অনুভব করিতে সহজেই পারি! এ প্রশ্নের উত্তর আমাদের কি বলে? শৈশব-সীমার বাহিরে যথার্থই কি মনের প্রাচীর আমাদের সকলেরই হিমাচলের তুঙ্গ শৃঙ্গের মতই অভেদ্য হইয়া উঠিয়াছে! এর মধ্যে আর সকলেরই প্রয়োজনীয়তা আছে, নাই কি শুধুই সুনীতির ও সুরুচির?

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, সামাজিক ক্ষতগুলিকে ঢাকাঢুকি দিয়া চাপিয়া রাখার দরুণ আমাদের সমাজ-দেহে গলিত কুষ্ঠের উদ্ভব হইয়াছে। সমাজ ইহার বিষে পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে, মরিতে বসিয়াছে। ক্ষতকে কষ্টজনক প্রোব দিয়া খোঁচাইয়া, আপাত জ্বালাকর আইডিন ও হাইড্রোজেন পেরকসাইড দিয়া ধুয়াইয়া কার্ব্বলিক বা বোরিক লিণ্ট না ভরিয়া দিলে কখন সারিতে পারে কি? এ সব করিতে রোগীর যন্ত্রণাকে লক্ষ্য করা চলে না এবং চলানও সঙ্গত বা সুযুক্তি নহে। বুঝিলাম, কিন্তু ঘা বলিলেই তো সকল ঘাই কিছু এক নহে এবং তার চিকিৎসার প্রণালীও বিভিন্নতর হওয়া অনাবশ্যক হইতে পারে না। ঘা যদি পুরাতন নালী ঘা হয়, তার চিকিৎসা আইডিনের চাইতে চাঁদসীর ক্ষত-চিকিৎসকের হাতে দেওয়া অসমীচীন বোধ হয় না। নূতন জখ্মান ফোড়াটাকেই ফাড়াফাড়ি করা দরকার। পুরাতনের জন্য হোমিওপ্যাথি, হাইড্রোপ্যাথি, কবিরাজী, কি অবশেষে টোটকা ও দৈবাৎ দৈবেরও অধীনস্থ হওয়া যায়, শুধু ওই ছেঁড়া ফাড়া, ব্রিগার আইডিন ও পূঁয পোচানটাই চলে না। যেটার অনেক দিনের প্রশ্রয়ে বা আলস্যে শোণিত-সংস্রব ঘটিয়াছে, সেটাকে সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের আশ্রয়ে ধীরে ধীরে ভিতরের দিক্ হইতে ঔষধ সেবন করাইয়া রক্ত-শুদ্ধির দ্বারা ঘটাইয়া তুলিবার জন্যই অবহিত চিত্ত হইতে হইবে। নতুবা উহাকে আরোগ্যকরার পরিবর্ত্তে সেপটিক্ (Septic) করিয়া সমূলে বিনষ্ট করাও অসম্ভব নয়। যেমন মানুষের রোগে, তেমনই সমাজের রোগেও আনাড়ী হাতুড়ের চিকিৎসাটা কোথাও কলদায়ী এবং তজ্জন্য প্রার্থনীয়ও নহে। বিশেষ ভাবে নির্ব্বাচিত বিশেষজ্ঞেরই মাত্র ইহাতে অধিকার আছে, আর কাহারও না! কিন্তু ও যেন গেল সামাজিক দুষ্ট ক্ষতের কথা, কিন্তু আধুনিক তরুণ রাসায়নিকবৃন্দ যে সকল বৈদেশিক বিষকে এক্সপেরিমেণ্টের হিসাবে আমাদের সাহিত্য-সমাজের অঙ্গে ইন্জেক্ট করিতেছেন, তার কুফলের জন্য দায়ী হইতেছে কে! পুরাণ যাহা

ছিল, তাতো থাকিয়াই গেল, বা উল্টা চিকিৎসাই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, আবার এই নূতন বিষেও শরীর মন জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল। নীলকণ্ঠের মত এ গরল বাষ্প-স্রোতকে কি আমাদের বৃদ্ধ সমাজ গ্রহণ করিয়া লইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে? তা থাকাও কিছু অসম্ভব নয়! এর উপর দিয়া যে সকল মহাপ্লাবন যুগেযুগেই প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, তাহাদের সেই মত্ত উদ্দাম ভীম তরঙ্গরাশিকে যিনি অগস্ত্যের মত শোষণ করিয়াছিলেন, কপিলের মত শুষ্ক করিয়াছিলেন, জাহ্নবীর মত পান করিয়াছিলেন, সেই অপ্রতিহতশক্তি মহাশক্তিধরই এই বিষম স্বদেশী বিদেশী বিষের আক্রমণ হইতে তাঁর অমৃতবর্ষী করুণাকর পল্লবামর্ষণ দ্বারাই তাহার মুমূর্ষু শরীরে নব জীবনী-ধারা ঢালিয়া দিলেও দিতে পারেন না যে—তাও তো নয়। তাই আমি তাঁরই কাছে আমাদের সবার হইয়া, জাতির হইয়া, এই জাতীয়তার প্রধানতম পথিপ্রদর্শক, আমার স্বদেশবাসী ভারতবাসী সমুদয় লেখক-লেখিকার হইয়া এবং আমার স্বদেশের বহির্ভাগের সমস্ত সুসভ্য এবং অসভ্য জগতের প্রত্যেক অধিবাসী আমার প্রতিবাসীর হইয়া আমাদের এবং তাঁহাদের সাহিত্য এবং তাহারই অনিবার্য্য ফল স্বরূপ সমাজের পক্ষে প্রকৃত উন্নতির যাহা পরিপন্থী, সেই যথার্থ জ্ঞান ও তদ্দ্বারা পরিচালিত কর্ম্মশক্তির প্রার্থনা করিয়া বলিতেছি—

"জ্ঞানঞ্চ মহ্যং জগদীশ দেহি,
কৃত্যো যথা মে ন ভবেৎ প্রমাদঃ।"

সেই জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান, সেই নির্ম্মলা বুদ্ধিই প্রকৃত বুদ্ধি, সেই শক্তিই উত্তমা শক্তি—যাহার দ্বারা বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইয়া সাহিত্য-সমাজ আত্ম-সমাজের ভ্রম-প্রমাদ বিদূরিত ও বিশোধিত করিতে পারে, তাহাদের ভ্রমপ্রমাদসঙ্কুল কুটিল ও জটিল বিপথের পথ প্রদর্শন করে না। আমার চোখে জনকের এবং লেখকের এ দুজনকার কর্ত্তব্যই এক। উভয়েই তাঁহাদের সৃষ্টির দ্বারা যাহাতে সমাজের ও জগতের উপকার-সাধন করিয়া ধন্য হইতে পারেন, তাহারই জন্য সচেষ্ট থাকিতে বাধ্য। ইহাই তাঁহাদের দেশ-ঋণ-পরিশোধের একমাত্র উপায়।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

তরণী-রমণ চণ্ডীদাস

তরণী রমণকে এ যাবৎ আমরা এক জন বিখ্যাত বৈষ্ণব পদকর্ত্তা বলিয়াই জানিতাম, কিন্তু তাঁহার যে চণ্ডীদাস উপাধি ছিল, তাহা আমাদের জানা ছিল না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা পুথিশালার ১১১১ নম্বরে রত্নসার নামে একখানা বৃহৎ পুথি আছে। তাহার লিপিকার ১২৬৭ সালে তাহা সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। ইহাতে দুই পৃষ্ঠে লেখা ১৯১ পত্র আছে। ঐ পুথির ১৮৭ পত্রে লিখিত আছে—

ইহা জানি চণ্ডীদাস তরণী-রমণ।
গীত-ছন্দে গাহিলেন পিরীতি সে ধন॥

তথাহি পদং—

পিরীতি বলিয়া　　　　তিনটি আখর
বিদিত ভুবন-মাঝে।
জাহারে পসিল　　　　সেই সে মজিল
কি তার কলঙ্ক লাজে॥
দুহার অধর　　　　সুধারস-পানে
তাহে উপজিল পি।
নয়ানে নয়ানে　　　　বাণ বরিখানে
তাহে উপজিল রি॥
হিআয় হিআয়　　　　পরস করিতে
তাহে উপজিল তি।
এ তিন আখর　　　　অতি মনোহর
ইহার তুলনা কি॥
তাহে দুখ সুক　　　　হয় পরত্তেক
সদাই সুখের পারা।
তরণী রমন　　　　করে নিবেদন
মরিলে না যায় ছাড়া॥

এই ত পিরীত ধর্ম্ম জ[ন]ম জাহাতে।
রাধাকৃষ্ণ নিত্যস্থানে রমণ করিতে॥

ইত্যাদি।

ইহা হইতে আমরা দেখিতেছি যে, চণ্ডীদাস তরণী-রমণ গীতচ্ছন্দে পিরীতি সম্বন্ধে যে গান গাহিয়াছিলেন, তাহা "তথাহি পদং" এই মুখবন্ধের পর ঐ পুথিতে উল্লিখিত হইয়াছে। সেই পদটি তরণী-রমণের ভণিতায় পাওয়া যাইতেছে। যদি এই স্থানে চণ্ডীদাসের ভণিতায় আর একটি পদ উদ্ধৃত থাকিত, তবে আমরা বুঝিতে পারিতাম যে, চণ্ডীদাস ও তরণী-রমণ এই উভয় কবিকে লক্ষ্য করিয়াই প্রথম ছত্র দুইটি লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু গানটির পরেই যে অন্য প্রসঙ্গ আরম্ভ হইয়াছে, তাহা শেষের দুই চরণ হইতে জানা যায়। অতএব এই স্থানে "চণ্ডীদাস" শব্দটি তরণীরমণের বিশেষণ রূপেই আমরা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলাম। কিন্তু একটি অতি প্রয়োজনীয় কথা এই যে, প্রায় এই রূপই একটি পদ আমরা সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত চণ্ডীদাসের পদাবলীতে চণ্ডীদাসের ভণিতায় পাইতেছি।

পিরীতি বলিয়া　　　　এ তিন আঁখর
বিদিত ভুবন-মাঝে।
তাহে যে পশিল　　　　সেই সে জানিল
কি তার কুলভয় লাজে॥
বেদ বিধিপর　　　　সব অগোচর
ইহা কি জানে আনে।
রসে পর গর　　　　রসের অন্তর
সেই সে মরম জানে॥
দুহুক অধর　　　　সুধারস বাণী
তাহে উপজিল পি।
হিয়ায় হিয়ায়　　　　পরশ করিতে
তাহার তুলনা কি॥
কহে চণ্ডীদাস　　　　শুন বিনোদিনী
পিরীতি রসের ভোর।
পিরীতি করিয়া　　　　ছাড়িতে নারিবে
আপনি হইবে চোর॥

পদ নং ৩৮৫।

চণ্ডীদাসের ভণিতায় এই যে পদাংশ পাওয়া যাইতেছে, ইহাতে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, এই পদটি বিখ্যাত পদকর্ত্তা চণ্ডীদাসের না তরণী-রমণের? কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৮৩৫ নম্বরের পুথিতেও আমরা এইরূপ একটি পদ তরণীরমণের ভণিতায় পাইতেছি।

পিরিতি বলিয়া　　　　এ তিন আঁখর
বিদিত ভুবন মাঝে।
জাহারে পসিল　　　　সেই সে মজিল
কি তার কলঙ্ক লাজে।

বেদ বিধি পর সব অগোচর
ইথে কি জানবে আনে।
রসে গর গর রসের অন্তর
সেই যে মরম জানে॥
দোহার অধর সুধারস পানে
তাহে উপজিল পি।
নঞানে নঞানে বান বরিখনে
তাহে উপজিল রি॥
হিয়াএ হিয়াএ পরস করিতে
তাহে উপজিল তি॥
ই তিন আখর মুনি মনহর
ইহার তুলনা কি॥
তাহে সুখ দুখ সদাই অনুমুখ
সকলি সুখের পাড়া।
তরুনি রমন করে নিবেদন
মরিলে না জায় ছাড়া।

২৮৬৫ নং পুথির ২ নং গান।

বোধ হইতেছে যে, এই পুথিতেই এই পদটির পূর্ণ অবয়বের সন্ধান আমরা পাইতেছি। ১১১১ নং পুথিতে—

বেদ বিধি পর সব অগোচর
ইথে কি জানিবে আনে।
রসে গর গর রসের অন্তর
সেই যে মরম জানে॥

এই চারিটি চরণ আমরা পাইতেছি না; এবং মুদ্রিত পদাবলীতেও—

দোহার অধর সুধারস পানে
তাহে উপজিল পি।

হইতে আরম্ভ করিয়া,

ই তিন আখর মুনি মনহর
ইহার তুলনা কি॥

পর্য্যন্ত আট চরণের পরিবর্ত্তে, কেবল মাত্র নিম্নলিখিত চারিটি চরণ পাওয়া যাইতেছে—

চুম্বক অধর সুধারস বাণী
তাহে উপজিল পী।
হিয়ায় হিয়ায় পরশ করিতে
তাহার তুলনা কি॥

কাযেই বুঝা যাইতেছে যে, ২৮৬৫ নম্বরের পুথিতেই যে পদটি পাওয়া যাইতেছে, তাহাই গোটা পদ। সেখানে পী, রি ও তি এই তিনটি অক্ষর কি প্রকারে জন্মিয়াছিল, তাহার বিবরণ আছে, কিন্তু মুদ্রিত পুস্তকে কেবল মাত্র পী অক্ষরটির উৎপত্তি স্থল নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, রি ও তি'র উৎপত্তির বিষয় বাদ দেওয়া হইয়াছে। ইহা ভ্রমাত্মক, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব পূর্ণ পদটিতেও আমরা তরুণীরমণের ভণিতা পাইতেছি। যখন দুইখানা পুথিতেই তরুণীরমণের ভণিতা পাওয়া যাইতেছে, তখন এই পদটি যে তরুণীরমণের, তাহাই আমরা বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইতেছি। অতএব রত্নসারের কবি "চণ্ডীদাস তরুণীরমণের" পদ বলিয়া যাহা আমাদিগকে প্রদান করিতেছেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে তরুণীরমণের, বিখ্যাত পদকর্ত্তা চণ্ডীদাসের নহে। এই অবস্থায় "চণ্ডীদাস" শব্দটি "তরুণীরমণের" বিশেষণরূপে এখানে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া আমরা ধরিয়া লইতে পারি।

চণ্ডীদাস নান্নুরের না ছাতনার, ইহা লইয়া আজকাল বেশ আলোচনা চলিতেছে। যাঁহারা এইরূপ অনুসন্ধানে ব্যাপৃত আছেন, তাঁহারা এক চণ্ডীদাসকে লইয়াই টানাটানি করিতেছেন। তাঁহাদের নিকট আমাদের অনুরোধ এই যে, কোন্ চণ্ডীদাস নান্নুরের, আর কোন্ চণ্ডীদাস ছাতনার, তাহাই স্থির করিতে তাঁহারা যত্নবান্ হউন। একাধিক চণ্ডীদাস যে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহা সাহিত্যসেবিমাত্রেই সন্দেহ করিয়াছেন। তরুণীরমণও চণ্ডীদাস পর্য্যায়ে পড়িয়া যাইতেছেন। ইহা ব্যতীত 'দীন চণ্ডীদাস' ও কৃষ্ণকীর্ত্তন-প্রণেতা বাসুলী-সেবক "বড়ু চণ্ডীদাসের" অস্তিত্বও আমরা জানিতে পারিতেছি। ইঁহাদের কে কোথায় ছিলেন, তাহা জানিতে পারিলেই সাহিত্যসেবিমাত্রেই উপকৃত হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু।

রবীন্দ্র-সমীপে

সম্প্রতি শিলং বেড়াইতে যাইয়া পূজনীয় রবীন্দ্রনাথের সহিত এক দিন সাক্ষাতের সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। আমরা তিন জন ছিলাম, আমাদের কৃষ্ণভাবিনী নারী-শিক্ষামন্দিরের শিক্ষয়িত্রী শ্রীযুক্তা চারুলতা সেন, চন্দননগরের সার শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র দে ও আমি। তাঁহার সহিত সাক্ষাতে অনেক বিষয় আমাদের কথোপকথন হয়। পরে উহা স্মরণ করিয়া যতটা পারিয়াছি তাহাই লিখিতেছি।

আমরা যখন যাই, তখন বৈকাল প্রায় ৫টা। বহিঃপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া যে ভদ্রলোকের সহিত দেখা হইল, তাঁহাকে কবিবরের সহিত সাক্ষাতের অভিলাষ জানাইলে তিনি বলিলেন,—"এখন তিনি কায করিতেছেন।" ইহা শুনিয়া আমরা একটু নিরাশ হইলেও আমাদের নাম লেখা কার্ড তাঁহার হাতে দিয়া কবিবরকে দিবার জন্য অনুরোধ করিলাম। ভদ্রলোক ভিতরে প্রবেশের অনতিবিলম্বেই একটি সুন্দর ছোট বালিকা ঘর হইতে বাহির হইয়া অঙ্গুলী-নির্দ্দেশে বাটীর অপর পার্শ্বস্থ বারাণ্ডায় যাইতে বলিল। আমরা তথায় যাইতেই দেখি, কবিবর কক্ষাভ্যন্তর হইতে বাহির হইয়া সহাস্য বদনে—"তোমরা এখানে এলে কবে? এই সেদিন চন্দননগরে দেখা হ'ল।" বলিয়া আমাদের সম্ভাষণ করিয়া বসিতে বলিলেন।

অভিবাদনান্তে বলিলাম,—"আমরা তিন দিন এসেছি। আপনি কায করছিলেন, আমরা আপনার সময় নষ্ট করলাম।"

"নষ্ট কিছু নয়, এ ভালই লাগে"—এই বলিয়া আমাদের সঙ্গিনীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"এটি কে, চিনিতে পারছি না যে।"

"ইনি আমাদের স্কুলের একজন শিক্ষয়িত্রী। ইনিই সেদিন শিক্ষামন্দিরে আপনার কাছ থেকে কবিতা লিখিয়ে নিয়েছিলেন।"

"তুমিই আমার কাছ থেকে আদায় ক'রে নিয়েছিলে বটে! সেদিনের সে বক্তৃতাটা 'বঙ্গবাণীতে' পাঠিয়ে দিয়েছি। স্মৃতিমন্দিরে যা বলেছিলুম, কোন সংবাদপত্রের রিপোর্টার লিখে এনেছেন ব'লে আমাকে দেখাতে এসেছিলেন। দেখলুম, সে আমার ভাষাই নয়, আবার নূতন ক'রে যতটা মনে পড়ল লিখে দিয়েছি। অনেক সময় যারা রিপোর্ট করে, তারা নিজেদের ভাষা বসিয়ে দিয়ে যা বলেছি তা বাদ দিয়ে দেয়, আর যা বলিনি তা বসিয়ে দেয়; বিশেষ ক'রে তিনি যদি আবার একটু লিখতে পারেন। এ ক্ষেত্রেও আমি দেখলুম, সংবাদপত্রের ভাষা, আমার ভাষা নয়। ভাষার দিকে আমার বড় ঝোঁক।"

"প্রবাসীতে প্রবর্ত্তকের অভিনন্দন সম্বন্ধে যা লিখেছে, পড়েছেন?"

"হাঁ দেখেছি। আমি যখন শুনেছিলাম, তখন কই আমার কানেও লাগে নি। আর তার পর উহারা গান্ধী, অরবিন্দ ও আমাকে bracketএ ফেলেছেন। উঁহারা দুজন public men আর আমি

বসন্ত যে লেখা লেখে বনে বনান্তরে
নামুক তাহারি মন্ত্র লেখনীর পরে।
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২১ বৈশাখ
১৩৩৪

এক জন কবি। আমি leader হবার লোককে lead করবার দাবী কখনই করিনি, সুতরাং তাতে আমাকে ছোট করা হয় না। তুলনাও আমাদের সঙ্গে এঁদের হয় না; কেন না, আমাদের কার্য্যের ক্ষেত্র সম্পূর্ণ পৃথক। আমি mathematics জানি না, আমাকে অমুক mathematicianএর চেয়ে কম mathematics জানি যদি কেউ বলেন, তাতে আমার নিন্দা করা হয় না। কেউ যদি এক জন 3rd grade কবিকে আমার চেয়ে বড় বলেন, তাতে অবশ্য দুঃখ হয়, তখন বলব যে, আমার প্রতি অবিচার করা হয়েছে।"

"প্রকৃতপক্ষে অভিনন্দনপত্রে আপনার সঙ্গে তাঁহাদের তুলনার কথাই আসে নাই, পর পর যাঁহাদের কাছে উঁহারা আশ্রমের সম্বন্ধে lead পাইয়াছেন, তাঁহাদের নাম করিয়াছেন। 'বেঙ্গলী' কাগজে একটি editorial প্যারা বাহির হইয়াছিল। তাহাতে লেখা ছিল যে, চন্দননগরে প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ রবীন্দ্রনাথকে তৃতীয় স্থান দিয়াছে, "It is indeed an acquisition for Rabindranath"; মনে হয় এই par টির উপর নির্ভর করিয়াই প্রবাসী লিখিয়াছেন। অভিনন্দনপত্রখানি দেখেন নাই।"

"আমারও তাহাই মনে হয়। প্রবাসী আসল অভিনন্দনখানি দেখেন নাই।"

"আপনি যখন স্কুলে ব'সে কবিতা লিখে দিচ্ছিলেন, সে সময় আপনার একখানা snapshot আপনার অলক্ষ্যে লওয়া হয়েছিল। উহার নীচে আপনার সেই দু লাইন কবিতা দিয়া আপনার ছবিখানি একটু লেখার সহিত ভারতবর্ষে ছাপিতে দিয়াছি। জলধর বাবু বলেছেন যে, তিনি সেটি নিজের ভাষায় সাময়িকে ছাপিবেন।"

শ্রীযুক্তা সেন বলিলেন,—"আপনার সে ছবিখানার এক এক খানা আমরা পেয়েছি।"

"ওঃ, ওঁর কাছ থেকে নিয়েছ, তোমরাই সব আপনারা ভাগ ক'রে নেবে, আমায় কিছু দেবে না?"

"আপনি কত ছবি রাখবেন? এ ছবি কি আর কাযে আপনার লাগবে!"

"ছবি কি আর সব আছে, কেউ কেউ চায়, তাদের সব দিতে হয়।"

"শিলং আপনার কেমন লাগে?"

"শিলং আমার ভাল লাগে, যায়গাটা বেশ নির্জ্জন, quiet। দার্জ্জিলিংএ পাঁচজনের সঙ্গে দেখা হবে—আপনি এটা দেখবেন আসুন, এখানে চা খেতে হবে, এই করে ভারি উৎপাত করে।"

"আপনি জাভা কবে যাবেন?"

"জাভায় আমাকে নিমন্ত্রণ করেছে; সেখানে এখনও হিন্দু রাজত্বের নিদর্শন সব আছে, এমন বাহিরে আর কোথাও নাই। আমাদের সভ্যতা ও ভাস্কর্য্যের এখনও অনেক নিদর্শন সেখানে যা আছে, যা কেউ এখনও জানে না, তাই এ সুযোগ ছাড়তে পারছি না। এইটার জন্য একটু ভাবছি; মনে করছি, এক জন scholarকে নিয়ে যাব। জুন মাসের শেষাশেষি যাব।"

"য়ুরোপে যাবার আর কোন নিমন্ত্রণ আছে কি ?"

"য়ুরোপে যাবার কোন নিমন্ত্রণ নাই, কিন্তু জাভা থেকে ফিরে এসে যাব। এখানকার কাজও করেছি, একটু দীর্ঘকাল য়ুরোপে থাকব, কাজ করব। সূর্য্য পশ্চিমেই অস্ত যাবে।

"আচ্ছা, প্রবর্ত্তক সম্বন্ধে কি ব্যাপার বল ত, আমি ত ওদের সম্বন্ধে কিছুই জানি না, সেই সেদিন কয়েক ঘণ্টা শুনেছি যা মাত্র।"

"তাঁহাদের সম্বন্ধে বিশেষ ক'রে কিছু বলতে পারব না। উঁহারা যা বলেন, তাও শুনেছেন, একটা সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম তাঁরা করতে চান, সেটা সকল ধর্ম্মকে embrace করবে, সঙ্গে সঙ্গে একটা complete community গড়ে তোলবার জন্ত industrial ও cultural শিক্ষাও দেন।"

"আমার একটা impression উঁহাদের সম্বন্ধে হয়েছে এবং সে কথা অনেককে বলিচি যে, এতগুলি লোক যে সব ছেড়ে এইটা নিয়ে পড়ে আছে, এতগুলি লোকের যে loyalty পেয়েছেন মাত্র, এইটাই একটা বড় জিনিষ, পয়সা দিয়ে এ সব পাবার জিনিষ নয়। সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের কথা ত ভাল কথা, কাহারও আপত্তি থাকতে পারে না। আমাকে বললেন যে, আমি যা বলি তাই ওঁরা করতে চান; বাঁধা হয়ে পড়ে থাকতে চান না, বাঁধন কেটে কেটে চলতে চান।"

"হাঁ, সে ওঁদের সত্য কথা এবং কার্য্যে সেইমত করতে চেষ্টা করেন, সামাজিক কোন বিশেষ নিয়ম তাঁরা মানতে বাধ্য নন। বিবাহ ব্যাপারে তাঁরা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ব্যবস্থা মেনে চলেন না।"

"একটা কথা তখন আমি জানতুম না, জানলে আমি খুব ঝগড়া করতাম। ওরা নাকি celibacy preach করে। আমাকে বললেন —আমি সময়ের সঙ্গে খাপ্ খাইয়ে যাচ্ছি। প্রথম একরকম ঠিক করেছিলাম, তার পর তাদের মনের গতি দেখে ব্যবস্থাটা একটু বদলে দিলাম। এটা খুব wise ব্যবস্থা বটে, কিন্তু বিবাহ দিয়া celibacyতে থাকা preach করাটা আমি মস্ত ভুল মনে করি। সাধারণ জীবনের মধ্যে spiritual ক'রে তোলবার শিক্ষা দাও—ভাল; কিন্তু physical বাদ দিয়া spiritualটা হতেই পারে না, এটা annihilation, এটা সৃষ্টি নয়। জগতের ব্যবস্থাটাকে অমান্ত ক'রে যাওয়া এটা একটা অধর্ম্ম আমি মনে করি। আমার নিজের জানা একটা ঘটনা আছে;—বোলপুরে একটি অধ্যাপক—বেশ সর্ব্ব রকমে ভাল একটি যুবতী মেয়েকে বিয়ে করেছিল। তার পর সে মহাত্মা গান্ধীর কাছে গেলে গান্ধী celibacyর life যাপন করতে বলেন। আমি শুনেই বললুম, ভারি অন্যায়, এটা মস্ত অধর্ম্ম। তাহাদের ইচ্ছা ও প্রবৃত্তিটাকে একেবারে অগ্রাহ্য ক'রে যাওয়ায় জীবনটা কিছুতেই পূর্ণতা পেতে পারে না। সে মেয়েটি পরে পাগল হয়ে গেল। এরা কেন এমন ভুল করছে, বুঝতে পারছি না, এটা progress নয়, এটা going backward."

"আমার মনে হয়, পূর্ব্বে ছেলে-মেয়েদের ব্রহ্মচর্য্য complete celibacy preach করতেন। এখন তাদের মধ্যে বিবাহ দিতে বাধ্য হয়ে খানিকটা পূর্ব্বের কথার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে ইচ্ছে হচ্ছে ব'লে এই কথা বলতে বাধ্য হয়েছেন।"

"আমারও তাই মনে হয়, কিন্তু মনে হয় শীঘ্র ওরা এ ভুলটা বুঝতে পারবে এবং correct করে নেবে।"

"ওরা আমাকে একটু ফাঁকি দিয়েছে, আমাকে যেতে হবে বলাতে আমি বললুম যে, ডাক্তার আমায় বারণ করেছে—আমি কোন সভা সমিতিতে বক্তৃতা করতে পারব না, আমি যাব না। যারা এসেছিল, তারা বললে যে, না আপনাকে কিছু করতে হবে না, আপনি কেবল মেলা open করে দেবেন। আমি নির্ব্বোধ, আমি তাদের কথায় বিশ্বাস করেছিলাম, ভিতরে ভিতরে একেবারে চার চারটা সভার ব্যবস্থা ক'রে রেখেছে।"

"আমরাও সেই কথাই জানতাম। আপনার শরীর ভাল নয়, আপনি অন্ত কোন functionএ যোগ দিতে পারবেন না, সেই জন্ত একটা public reception দেওয়া সম্বন্ধে ইতস্ততঃ করছিলাম। আপনি বোধ হয় জানেন না যে, আর একটা influence work করেছিল। গৌর আমাদের কাছে গিয়ে বলে যে, সে আপনার পক্ষ থেকে কি কি functionএ যোগ দিতে হবে, সেটা স্থির করতে এসেছে।"

"দেখছি গৌর তা হ'লে ঘরের ঘরে পিসী কনের ঘরে মাসীর কাজ করেছে। সে আমাকে বললে যে, আপনাকে প্রবর্ত্তক আশ্রম গ্রাস ক'রে থাকবে, তাতে চন্দননগরের সকলে দুঃখ করছে। আমি বললুম, —আমি ত সে সব জানি না, তবে চন্দননগরের লোকেরা দুঃখিত হবে, এটা ত ভাল নয়।"

"এটা কিন্তু সত্য যে, আপনি শুধু প্রবর্ত্তক মেলার উদ্বোধন ক'রে ঐখানেই থাকলে চন্দননগরের লোকেরা ক্ষুণ্ণ হ'ত। গৌর আমাদের বলেছিল যে, আপনার জন্ত আলাদা একটা বাড়ীর ব্যবস্থা করতে, পূর্ব্বদিন এসে সেখানে থাকতে পারেন।"

"হাঁ, গৌরকে আমি বলেছিলাম যে, ওখানে সারাদিনটা থাকতে পারবো না, অন্ত বাড়ী একটা পেলে ভাল হয়। গৌর বলেছিল, আমি ব্যবস্থা ক'রে দেব।"

"আপনার স্মৃতিমন্দিরের বক্তৃতাটা সকলের খুব ভাল লেগেছিল।"

"সেটা অনেকটা reminiscence; সে সময়টা আমার বেশ ভাল কেটেছিল সেটা আমার বেশ মনে আছে। তখন আমার বয়স ১৫।১৬ বৎসর হবে, চন্দননগরে পাঁচ সাত মাস বোধ হয় ছিলাম। অনেক কবিতা সেখানে ব'সে লিখেছি। 'এইখানে বাঁধিয়াছি ঘর, তোর তরে কবিতা আমার' সেখানে ব'সেই লেখা। সন্ধ্যা সঙ্গীতের কবিতাগুলি প্রায় সব সেখানে লেখা। অনেক গান লিখেছি, সে গানগুলো মনে আছে। বেশীদিন সেখানে ছিলাম না, কবিতার ভাণ্ডার দেখে মনে হয়। সে মরান্ সাহেবের বাড়ী আমার এখনও বেশ মনে আছে। সেই উপরের দোতালার ঘরে আমি থাকতুম, প্রভাতের সূর্য্য প্রথমেই আমার চোখে লাগত। সেই উপরের ঘরে বসেই কবিতা লিখতুম। মনে আছে, দাদা ও আমি একখানা নৌকা ক'রে নৌকা ছেড়ে দিয়ে মাঝ গঙ্গায় বসে, দাদা বেহালা বাজাতেন, আমি পূরবীতে গান ধরতাম। তখন গলা বেশ মিষ্ট ছিল, জোরও ছিল। মনে হয় প্রত্যহ আমরা গঙ্গার দুপাশের লোকেদের মুগ্ধ করে দিতুম।

"সে কি নদীই দেখেছি, এখন এই নদীর পাড়ে এই যে চটকলগুলো হ'য়ে গঙ্গাকে বেঁধে ফেলেছে, এটা দেখে ভারি দুঃখ হয়। গঙ্গা নদীর উপর দিকটা বালি, উত্তরপাড়া থেকে হুগলীর মধ্যে এইখানকার গঙ্গা খুব সুন্দর ছিল। দু'ধারে লোকের বাস, এই সব লোকরা গঙ্গায় স্নান, শুব ইত্যাদি করে, তাহাদের জীবনটা গঙ্গাজলের সঙ্গে একটা সংযোগ ক'রে রেখেছিল, সেটা কেমন সুন্দর। এটা কেবল sentiment নয়। সেই গঙ্গাকে বেঁধে ফেলা কি অন্যায়। যাদের জমী, তারা পয়সা বেশী পেয়েছে, সেইজন্ত জমী হয় ত দিয়েছে, কল হয়েছে। কিন্তু আমি তাদের কিছুতেই ক্ষমা করতে পারি না। জর্ম্মন দেখি Rhine নদীর দু'পারে কল। যদিও Rhine তাদের sacred নদী নয়, তবু কিছুতেই তারা Rhine নদীকে বাঁধতে দেবে না। Rhineএর সঙ্গে তাদের যা কিছু জড়িয়ে আছে, তাই যথেষ্ট।"

"আমাদের স্কুলে যে আপনি অত কথা বলবেন, তা আমরা ভাবি নাই; আপনার বক্তৃতাটা ধরবার ব্যবস্থা না রেখে আমাদের বড় আপশোষ হচ্ছে।"

"তোমাদের স্কুলে তোমরা ফুলের মালা দিলে, বলতে হবে আগে ত ভাবিনি, অমনি বললুম, কি যে বললুম, তা'ও মনে নাই এখন।"

"আমরা গৌরকে বলেছিলাম, যদি মনে ক'রে একটু লিখে দিতে পারেন।"

"কে, গৌর ত কিছু বলে নি, সে কেবল ফুটবল খেলতে জানে, আর জানে engineering।

"আপনার লেখাগুলো সাধারণে পেতে এত দেরী হয় কেন, আপনি এক বৎসর পূর্ব্বে য়ুরোপে ব'সে যে কবিতা লিখেছিলেন, সেটা মাত্র এ মাসের 'বসুমতীতে' বাহির হইয়াছে।"

"বাহির হইয়াছে? আমি মনে করেছিলাম, সেগুলো তারা হারিয়ে ফেলেছে। 'বার্ষিক বসুমতীর' জন্ম নাটক লিখে দিন, গল্প লিখে দিন, এই অনুরোধ ক'রে দুবার cable করলে। ভদ্রলোকেরা তার ক'রে পয়সা খরচ করছে, কিন্তু আমি কি ক'রে তখন লিখি, কিছু দিন পূর্ব্বের লেখা ক'টা পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।"

"আপনি কায করছিলেন, আমরা আপনার কাযের ব্যাঘাত করলুম।"

"এখন তাড়াতাড়ি লিখতে পারি না, অনেকক্ষণ ধ'রে লিখতে পারি না। লিখতে ব'সে একটু একটু ক'রে লিখি আর হয় ত একটু ব'সে থাকি। কবিতা অবশ্য একেবারে শেষ করতেই হয়। গোরা লিখেছিলাম খুব তাড়াতাড়ি, আর যেমন লেখা হয়েছে, অমনি 'প্রবাসী' অফিসে মাসে মাসে পাঠিয়ে দিয়েছি। তার পর দেখবার সময় কেটে ছেঁটে দিয়েছি, এত বদলে দিয়েছি, সেটা আর একখানা বই হয়ে গেছল। রামানন্দ বাবু দুঃখ করেন যে, সে manuscript খানা রাখা হয় নাই; বাস্তবিক সেখানা থাকলে interesting হ'ত। কবিতা লিখতেও আজকাল একটু সময় লাগে। এখন criticsও হয়েছি, তাথার দিকে লক্ষ্য রাখি।

"তোমাদের হলটা বেশ বড়, অনেক লোক ধরে, বক্তৃতা করা যায়। কলকাতার ভাল হলই নাই; আমার বক্তৃতার কথা বললে আমি বলি বক্তৃতা নয়, কেবল ঠেলাঠেলি, মারামারি, গণ্ডগোল, কবাট ভাঙ্গাভাঙ্গি; লোক দেখতে পায় না, শুনতে পায় না। তোমাদের লাইব্রেরীটা কি রকম।"

"৫৪ বৎসরের উপর এই লাইব্রেরী হয়েছে। বই আছে অনেক রকমের। আমরা বাঙ্গালা দেশের সম্বন্ধে ইতিহাসের বই ও বাঙ্গালা ভাষায় যে সব বই বাহির হইয়াছে, সেগুলো সব রাখবার চেষ্টা করছি।"

"আমার বইয়ের first edition আছে কি তোমাদের? আমিই খুঁজে পাচ্ছি না, দু একখানা তোমাদের থাকতে পারে।"

শ্রীযুক্তা সেন বলেন,—"আপনি এখানে রয়েছেন, একটা বক্তৃতা দেবেন না, আমরা শুনব।"

"না—কিছুতেই নয়, বক্তৃতা দিইয়ে আমার সময় নষ্ট করাবে কেন। সে সময় যে অনেক ভাল জিনিষ পাবে।"

ইহার পর সন্ধ্যা সমাগতপ্রায় দেখিয়া একঘণ্টাধিককাল কথোপকথনের পর আমরা কবিবরের নিকট বিদায় লইয়া চলিয়া আসিলাম। পথে আসিতে আসিতে তাঁহার কথাগুলিই শুধু কানের মধ্যে ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল।

শ্রীহরিহর শেঠ।

দর্শনে

গগন হইতে এক নেমেছে গো নবঘন
বিজুরী মাখান তার অঙ্গ—
কেহ তারে বলে কালা, কেহ বলে নীলচাঁদ
কেহ শ্যাম—কেহ বা ত্রিভঙ্গ।

নয়নের দিঠি তার কি ভাব-ভঙ্গিমা-মাখা
কেমন সে বাঁকা নাহি জানি—
হেরি তার সে চাহনি মরমে মরিনু গো
সঁপি পায় এ পরাণখানি!

পদে মণি-মঞ্জীর রুণুঝুণু কিবা বাজে
নাচিয়া নাচিয়া সে যে চলে—
সাধ হয় মোর মনে বুক পেতে দিই সখি
তার সে রাতুল পদতলে!

কদমতলায় সেই বাঁশীতে কি ফুকারিল
চকিতে ছিনায়ে নিল মন—
দ্বিজ দেবদাস কহে মন চিনে লয় মনে
নহে কেন মিলন এমন!

শ্রীদেবকণ্ঠ বাগচী

চীন
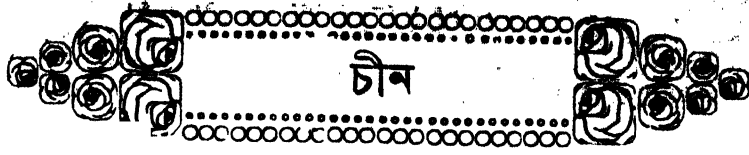
চীনাদের মাছধরা

এই বিরাট পৃথিবীর যাবতীয় সভ্যদেশ অধুনা চীন মহাদেশের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। কেন? পীত জাতি দীর্ঘ নিদ্রার পর জাগিয়া উঠিয়া, দীর্ঘ শতাব্দীর জড়তা পরিহার করিয়া আত্মনিয়ন্ত্রণ করিতেছে; তাদের সংবাদ কত কথাই দেশে দেশে প্রচার করিতেছে; সকলগুলি হয় ত সত্য নহে—অতিরঞ্জনের বর্ণলেপে হয় ত অনেক কথা অস্পষ্ট, কোথাও হয় ত খানিকটা স্পষ্ট। এই বিরাট দেশের বিরাট জনসংঘ সত্য সত্যই আপনার জাতি, সমাজ, অবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্য,—বিশৃঙ্খলতার মধ্যে শৃঙ্খলা আনয়ন ও সংহতি শক্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কিরূপ ব্যবস্থা করিতেছে, তাহার আভাস সাময়িক পত্রাদিতে আলোচিত হইতেছে। 'মাসিক বসুমতীর' পৃষ্ঠে এ সম্বন্ধে বহু আলোচনা ও বহু ঘটনার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে; কিন্তু তথাপি আমরা সমস্ত কথা কি জানিতে পারিয়াছি?

বর্ত্তমান প্রবন্ধে চীন জাতির ইতিহাস ও চরিত্রের উপর চীনের পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন—ভৌগোলিক সংস্থান প্রভৃতির প্রভাব কিরূপ, তাহা আলোচিত হইল। প্রতীচ্য দেশের নানা ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক এবং প্রত্নতত্ত্ববিৎ অধুনা চীন মহাদেশ সম্বন্ধে নানা প্রত্যক্ষ বিবরণ প্রকাশ করিতেছেন। চল্লিশ কোটি লোক-অধ্যুষিত এই মহাদেশের আলোচনায় অন্যান্য দেশের অধিবাসীদিগেরও লাভবান্ হইবার সম্ভাবনা অল্প নহে।

চীন মহাদেশের মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দেখা যাইবে, ইহার পর্ব্বতমালার অবস্থান পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম-প্রসারী। ইহাতে তত্রত্য প্রায় সমুদয় নদ-নদীই মধ্য-এশিয়া হইতে উত্থিত হইয়া পূর্ব্বদিকে প্রশান্ত মহাসমুদ্রের কোন না কোন উপসাগরে নিপতিত হইয়াছে। নদ-নদীগুলির মধ্যে উত্তরে ইয়োলো বা পীত নদ, মধ্যে ও পশ্চিমে ইয়াংসী নদীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সঞ্চিত তুষারস্তূপ বিগলিত হওয়ায় এই নদীগুলি বিশেষতঃ ইয়াংসী নদী মাঝে মাঝে পরিপ্লাবিত হইয়া যায়—বন্যাপ্রভাবে ইহার দুই কূল ভাসিয়া যায়। বন্যা চলিয়া গেলে নদীকূলবর্ত্তী স্থানসমূহে এমন ভাবে পলিমাটী সঞ্চিত হয় যে, জমীর উর্ব্বরা-শক্তি আশাতীত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

চীনদেশে বর্ষাকালে প্রচুর বারিবর্ষণ হইয়া থাকে। বর্ষার বায়ু-প্রবাহ যখন চীনদেশের উপর দিয়া প্রবাহিত না হয় (দক্ষিণ দিক্ হইতেই বর্ষাপ্রবাহ আসিয়া থাকে), সে সময় পশ্চিম বা উত্তর-পশ্চিম দিক্ হইতেই বায়ু বহিতে থাকে। ইহাতে সে সময় আদৌ জলকণার অস্তিত্ব থাকে না। এ জন্য চীনদেশের শীত অত্যন্ত প্রখর এবং বাতাস সম্পূর্ণ শুষ্ক। আগষ্ট মাসের শেষ হইতে এপ্রেল মাস পর্য্যন্ত চীন দেশে বারিপাত হয় না; বিশেষতঃ উত্তর চীনে জুলাই মাসই প্রকৃত বর্ষাকাল। অত্যন্ত গ্রীষ্মের সময়ই বর্ষা প্রবল বেগে নামিয়া আইসে।

জলপথ—সংযোগস্থলে সেতু—নগরের প্রাচীরের একাংশ

অত্যধিক গ্রীষ্ম ও বর্ষার সময়েই কৃষিকার্য্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। চীনদেশের ন্যায় কৃষিকার্য্য পৃথিবীর কুত্রাপি নাই। চীনের ভৌগোলিক অবস্থানহেতু, এই দেশ কৃষির বিশেষ অনুকূল। পর্ব্বতমালাও চীন দেশকে এমন ভাবে বিভক্ত করিয়াছে যে, উত্তর চীন ও দক্ষিণ চীন স্বতন্ত্রভাগে বিভক্ত। চীন ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায় যে, উত্তর ও দক্ষিণ চীন রাজনীতির দিক্ দিয়াও স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত ছিল। বিগত আড়াই শত বৎসরের মধ্যে—মাঞ্চুবংশ সিংহাসনাধিরোহণ করিবার পর—এই দুই বিভাগ সম্মিলিত হইয়াছিল। কিন্তু চীন ইতিহাস পাঠকগণ জানেন যে, এই সম্মিলন নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র।

যে সকল প্রতীচ্য পরিব্রাজক চীনদেশে পরিভ্রমণ করিয়া তত্রত্য গ্রাম ও নগর পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহারা লিখিয়াছেন যে, চৈনিক জীবনের অর্থনৈতিক মূলভিত্তি কৃষিজাত পণ্য—ধাতব বা খনিজ পদার্থ নহে। পশুপালও তাহাদের অর্থাগমের কোন সহায়তা করে না। পৃথিবীর অন্যান্য সুসভ্য দেশে যে সকল দ্রব্য ধাতুঘটিত, চীনের ব্যবহার্য্য সেই সকল পদার্থ কৃষিজাত পদার্থ হইতেই নির্ম্মিত হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে—তৃণ সংগ্রহের জন্য চীন দেশে এক প্রকার তিন কাঁটা বিশিষ্ট যন্ত্র ব্যবহৃত হয়; এইরূপ যন্ত্র ধাতু দ্বারা অন্য দেশে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। কিন্তু চীনারা তদ্বিনিময়ে গাছকে এমন ভাবে গড়িয়া তুলে যে, তাহা হইতে তিন কাঁটা বিশিষ্ট উদ্ভিজ্জ-যন্ত্র প্রস্তুত হয়। তৃণাদি সংগ্রহের জন্য বহু কাঁটাযুক্ত এক প্রকার যন্ত্রও চীনারা ব্যবহার করিয়া থাকে, উহা বংশবিনির্ম্মিত।
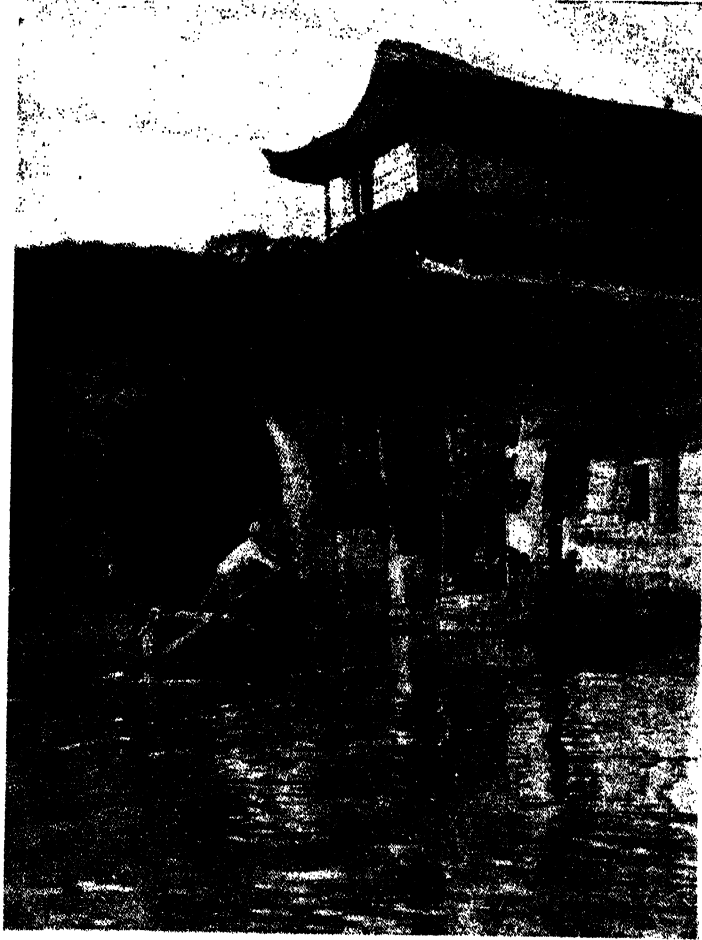
ধাতুঘটিত যন্ত্র চীনদেশে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যাইবে। উত্তর চীনে যে সকল গাড়ী সাধারণতঃ ব্যবহৃত
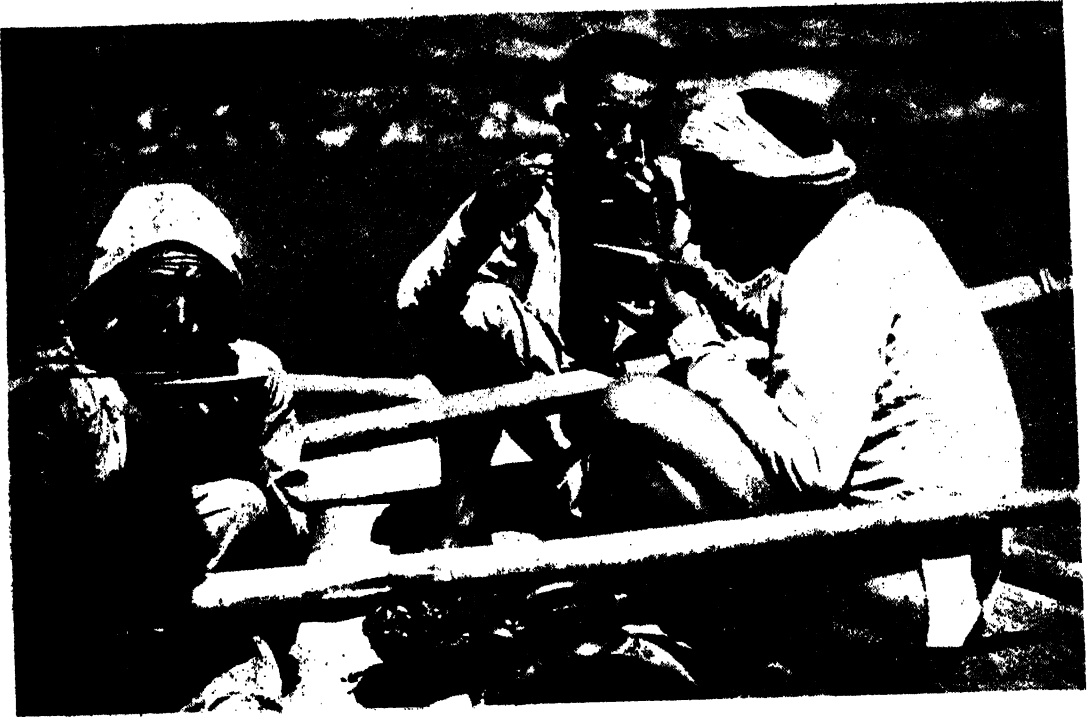
চীনা মাঝিরা ভোজন করিতেছে

হংকোর রেস্তোর।

ঐতিহাসিক প্রাচীরের একাংশ—ধ্বংসাবস্থায়

হু-চোর একটি জলপথ—উভয় পার্শ্বে চীনাদের গৃহ

হয়, তাহার কুত্রাপি লৌহ বা অন্য কোন ধাতুর সমাবেশ নাই—সবই দারুনির্ম্মিত।

উদ্ভিজ্জাত পদার্থের উপর চীনারা অত্যন্ত নির্ভর করিয়া থাকে। চীনদেশের যে যে স্থানে কয়লা আছে, সেখানেও চীনারা উহার পরিবর্ত্তে শুষ্ক তৃণগুল্ম ব্যবহার করিয়া থাকে। শীত ঋতুতে অথবা হেমন্ত ঋতুর প্রাক্কালে চীনা-বালকগণ বহু-দন্তবিশিষ্ট উল্লিখিত বংশনির্ম্মিত যন্ত্র লইয়া মাঠে মাঠে ঘুরিতে থাকে। যাহা কিছু শুষ্ক তৃণ-গুল্ম থাকে, সমস্তই সংগৃহীত করিয়া তাহারা ইন্ধনরূপে ব্যবহার করিয়া থাকে। উত্তর চীন অঞ্চলে কয়লা থাকা সত্ত্বেও উহা তাহারা ব্যবহার করিবে না। উত্তরাঞ্চলে শীতের প্রকোপ অত্যধিক; কিন্তু এইরূপে সংগৃহীত তৃণগুল্ম দ্বারা গৃহ উত্তমরূপে উত্তপ্ত রাখা যায় না। এ জন্য চীনারা শীতনিবারণ-ব্যপদেশে এক কালে অনেকগুলি পরিচ্ছদ অঙ্গে ধারণ করিয়া থাকে। একবার কোনও চিকিৎসক জনৈক চীনার দেহ পরীক্ষা করিতে গিয়া ১৪ দফা জামা ও কোট নামাইয়া তবে তাহার দেহের চর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতে পারিয়াছিলেন।

সংকীর্ণ পথ ও লৌহকীলক সন্নিবিষ্ট তোরণ-দ্বার

চীনাদের শীত-পরিচ্ছদও কার্পাস তুলাজাত। ইহাদের বিশ্বাস, মানুষের জীবনই সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্। এ জন্য মানুষের জীবনধারণের উপযোগী দ্রব্যাদি উৎপাদনেই তাহারা ব্যস্ত। পশুর খাদ্য চীনদেশে নাই বলিলেই চলে। শুধু নিকৃষ্ট জাতীয় পশু অর্থাৎ শূকরদিগকে তাহারা কিছু খাদ্য দিয়া থাকে। পশুর জন্য কোন খাদ্য না থাকার ফলে চীনদেশে পশুর চাষ নাই। সুতরাং পশুলোমজাত বস্ত্র তথায় উৎপন্ন হয় না। খাদ্যাভাবে চীনদেশে মেষ নাই, কাযেই পশমও সে দেশে নাই। চর্ম্ম পাদুকা চীনদেশে দুর্লভ, কারণ, যে সকল পশুর চর্ম্ম দ্বারা পাদুকা বিনির্ম্মিত হইতে পারিবে, সেরূপ পশু তথায় অত্যন্ত অল্প।
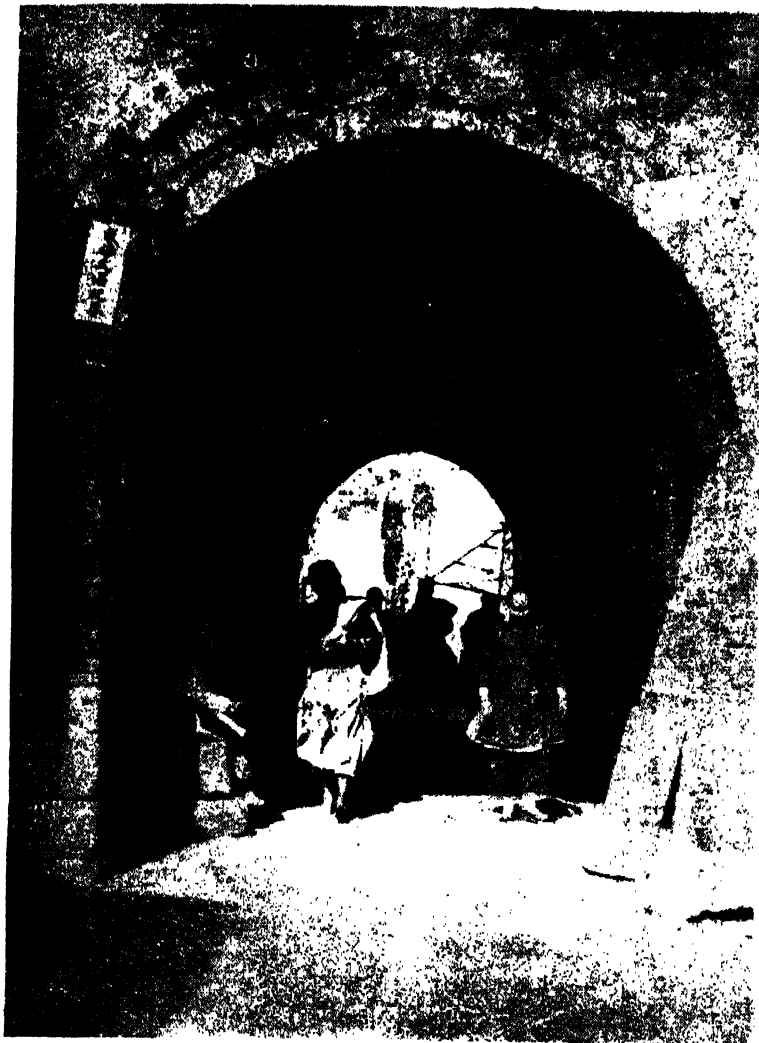
এ জন্য চাষ-ই চীনাদের একমাত্র সম্বল। জমীর উপরই তাহারা সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকে। চীনসভ্যতা এমনই ভাবে নিয়ন্ত্রিত যে, তাহাদের ব্যবহার্য্য প্রত্যেক দ্রব্যই

উচ্চ সেতুর নিম্ন দিয়া চীন-নৌকা জলপথে চলিয়াছে

কৃষিজাত পণ্য ব্যতীত অন্য কোন শিল্পজাত পণ্য চীন দেশে এত অল্প যে, সে জন্য সামাজিক সহযোগিতার প্রয়োজনই হয় না। পাশ্চাত্যদেশসমূহে শ্রম-শিল্পের অভ্যুদয়—এ জন্য তথায় সামাজিক সহযোগিতা অপরিহার্য্য। চীনদেশে সে বালাই নাই।

পাশ্চাত্য দেশে কয়লা ও লৌহ না হইলে কোন শ্রমশিল্পই টিকিতে পারে না। সুতরাং এ জন্য উচ্চ শ্রেণীর সামাজিক সহযোগিতার প্রয়োজন। কৃষিজীবী চীনাদের সে সহযোগিতার কোনই প্রয়োজন নাই।

চীন-সভ্যতার মূলভিত্তি কৃষি। কৃষিজীবনে অভ্যস্ত চীনারা এমনই ভাবে আপনাদিগকে কৃষিজীবনের সহিত গড়িয়া লইয়াছে যে, সহসা তাহাদের সে জীবনের অবসান হইবে না। প্রতীচ্য দেশে যদি কয়লা ও লৌহের সম্পূর্ণ তিরোভাব ঘটে, তাহা হইলে সে দেশের সভ্যতার মূলভিত্তি টলিয়া যাইবে; কিন্তু চীনের সে বিপদের আশঙ্কা নাই। তাহারা এখনও যে সভ্যতা বজায় রাখিয়া বাঁচিয়া আছে, অনির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত সেই সভ্যতাকে তাহারা জীবিত রাখিতে পারিবে।

কৃষিক্ষেত্র হইতেই প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হইয়া থাকে। কর্দ্দম ও প্রস্তরের ন্যায় এই সকল উদ্ভিজ্জ পণ্য সুলভ এবং সহজেই উৎপাদিত হয়।

আপাত-দৃষ্টিতে ভিন্ন দেশীয় ব্যক্তির পক্ষে চৈনিক জীবন যেন রহস্যময় বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। কিন্তু অভিনিবেশ সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, কৃষিজাত পণ্য উৎপাদন ব্যাপারে উচ্চশ্রেণীর সামাজিক সহযোগিতার প্রয়োজন নাই। অধিকাংশ চীনাই চাষ-বাস করিয়া থাকে। জমী খণ্ডাংশে বিভক্ত। এক জন অথবা পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তি সেই জমী আবাদ করিয়া থাকে।

চীনদেশের সভ্যতা অতি প্রাচীন কালের বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। কিন্তু সে প্রাচীনতার প্রকৃত মর্ম্ম, অর্থ কয় জন বুঝে। এ বিষয়ে হপ্‌কিন্‌স বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্ট এফ, জে, গুডনো একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, কং নামক জনৈক চীনার সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। সেই ব্যক্তি কনফুসসের জ্যেষ্ঠভ্রাতার সাক্ষাৎ ৭৬ পর্য্যায়ের বংশধর। কনফুসস্ ৫৫০ হইতে ৪৭৯ খৃঃ-পূর্ব্বাব্দে জীবিত ছিলেন। প্রাচীনতার এই দাবী বড় সাধারণ নহে। এইরূপ প্রাচীন বংশ পৃথিবীতে সুদুর্লভ নহে কি?

কনফুসস্ নামের প্রকৃত অর্থ শ্রেষ্ঠ কং। সুান্টংএ কং বংশের স্থাপিত মন্দিরে খৃঃ-পূঃ ৫৫০ অব্দ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত উক্ত বংশের প্রত্যেক বংশধরের নাম ক্ষোদিত আছে। কনফুসস্ যখন জীবিত ছিলেন, তখন তিনিও বলিতেন যে, তিনি এক প্রাচীন বংশের সন্তান। তিনিও ৭ শত হইতে সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের ধারাবাহিক নামের উল্লেখ করিয়া গিয়াছিলেন।

সু-চোর শ্রেষ্ঠ প্যাগোডা

চীনদেশের সভ্যতা শুধু প্রাচীন নহে, প্রতীচ্য দেশের সভ্যতার সহিত তুলনা করিলে ঐ সভ্যতা অভগ্ন, অটুট বলিয়াই প্রতীতি হইবে। প্রতীচ্য সভ্যতার মূলভিত্তি গ্রীক ও রোমক সভ্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত। রোমসাম্রাজ্যের পতনের পর জার্ম্মাণগণ দেশ জয় করিতে থাকে। ক্রমে খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাবে গ্রীক ও রোমক সভ্যতার বহু পরিবর্ত্তনসাধন হয়। কিন্তু চীনদেশের সভ্যতায় তাহা ঘটে নাই। অবশ্য প্রতীচ্যের ন্যায় তাহারও সম্মুখে নানা সমস্যার উদ্ভব হইয়াছিল এবং হয় ত নূতনের প্রভাবে পুরাতনকে সংস্কৃত করিয়া লইতেও হইত ; কিন্তু চীন সে প্রলোভন দমন করিয়াছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, চীনের উত্তর সীমান্তে বর্ব্বর মোঙ্গলগণের বাস। ইহারা দুই বার চীনদেশ জয় করিয়াছিল। এক বার ত্রয়োদশ শতাব্দীতে, দ্বিতীয় বার ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে। সে সময় মাঞ্চুবংশ চীনের সিংহাসনে উপবিষ্ট। মোঙ্গল-আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্যই খৃষ্টজন্মের ২ শত বৎসর পূর্ব্বে চীনের মহাপ্রাচীর বিনির্ম্মিত হয়। এই প্রাচীর ১ হাজার ৫ শত মাইল পর্য্যন্ত প্রসৃত।

জার্ম্মাণগণ গ্রীক ও রোমক সভ্যতার উপর যেরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, মোঙ্গলগণ চীনাদের উপর সেরূপ কোন প্রভাব বিস্তার করে নাই। মাঞ্চুরাও এইরূপ কোন প্রভাবের বশবর্ত্তী ছিল না। ইহারা জাতীয় ভাষা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল এবং মোঙ্গলগণের ন্যায় চীনাদিগের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। চৈনিক সভ্যতাই তাহারা অবশেষে অবলম্বন করিয়াছিল। এখন তাহারা চীনা ভাষায় কথা কহে, চীনাদিগের যাবতীয় রীতিনীতি পালন করে—অর্থাৎ তাহারা এখন খাটী চীনা।

গ্রীক ও রোমক সভ্যতা খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। চীনারাও বিপরীত ধর্ম্মমতের সম্মুখীন হইয়াছিল।

চীন-কৃষক শীত-যাপন করিতেছে

হাঙ্চোর ১৩ তলা প্রসিদ্ধ প্যাগোডা

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম্ম চীনদেশে প্রচারিত হয়। মোঙ্গল বিজেতারা যেমন চীনদেশের সভ্যতায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, বৌদ্ধধর্ম্মের অবস্থাও ঠিক তাহাই ঘটিয়াছিল। ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের যে গতি-প্রকৃতি দেখা যায়, চীনদেশের

দ্বাদশ শতাব্দীর দুই জন শান্তিকামী মন্ত্রীর মূর্ত্তি। এই দুই লৌহ-মূর্ত্তিকে হ্যাংচোর চীনারা ভাল দৃষ্টিতে দেখে না।

হ্যাংচোর ভাসমান রাজপথ

হাংচোর হ্রদতীরে অবস্থিত বৌদ্ধমূর্ত্তি—এখানে বহু যাত্রী সমবেত হইয়া থাকে

প্রাদেশিক প্রতিনিধিরা সেই কর্ত্তব্য পালন করিতেন।

উল্লিখিত মতবাদ বা ধর্ম্মবাদে পৌত্তলিকতার কোন সংস্রব নাই। উহাকে কতকটা একেশ্বরবাদ বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। কোনও কনফুসস্-ধর্ম্মমন্দিরে গমন করিলে দেখা যাইবে, তথায় কোন প্রতিমূর্ত্তি নাই। শুধু কনফুসস্-প্রচারিত মতবাদ ফলকে উৎকীর্ণ আছে। এই উৎকীর্ণফলক কেহ পূজা করে না। শুধু যে মহাপুরুষ জনসাধারণের উপর প্রভুত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশের জন্যই উহা মন্দিরে রক্ষিত হইয়াছে।

চীনদেশে আর একটি ধর্ম্মমত আছে, তাহার নাম 'তাও' ধর্ম্ম। ইদানীং তাহা ইন্দ্রজাল-বিদ্যার অন্তর্গত হইয়া পড়িয়াছে। কাহারও একটি অঙ্গুরীয় হারাইয়া গিয়াছে, সে তাওধর্ম্মের কোনও পুরোহিতের কাছে যাইবে। তিনি তাহাকে বলিয়া দিবেন, কি উপায়ে স্বর্ণাঙ্গুরীয় পুনরায় প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। যাহার ভবিষ্যৎ গণাইবার প্রয়োজন, সে তাঁহার কাছে ভাগ্যফল জানিয়া আসিবে। তাও পুরোহিতগণ চিকিৎসা-বিদ্যারও পরিচয় দিয়া থাকেন। নানারূপ অসাধারণ উপায় অবলম্বন করিয়া তাঁহারা পীড়িতকে রোগমুক্ত করিবার চেষ্টা করেন। বিনিময়ে তাঁহাদের প্রচুর অর্থলাভও হয়। অধুনা বৌদ্ধ অথবা তাওধর্ম্ম চীনাদিগের উপর সাধারণভাবে কোনও প্রভাব বিস্তার করে না।

বৌদ্ধধর্ম্মে তাহার সাদৃশ্য নাই। উহা রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে।

চীন-সভ্যতা অত্যন্ত প্রাচীন এবং আঘাতসহনশীল। কনফুসসের সময় চীন-সভ্যতা পরিপুষ্ট হইয়াছিল। কেহ কেহ মনে করেন, মানবজাতির উপর কনফুসসের অত্যন্ত প্রভাব ছিল। অথচ তিনি সঙ্কলয়িতা মাত্র। যাহা তিনি যথার্থ ও সঙ্গত বলিয়া মনে করিতেন, সেই মতগুলিকে তিনি জনসমাজে প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন।

কনফুসসের সংগৃহীত মতবাদ কতকটা ধর্ম্মের প্রকৃতি-বিশিষ্ট হইলেও ইহার কোন পুরোহিত সম্প্রদায় নাই। পুরোহিতের কার্য্য চীন সম্রাটই করিতেন, অথবা তাঁহার

কনফুসস্বাদের নীতির দিক্‌টা ধর্ম্মের দিক্ অপেক্ষা প্রয়োজনীয়। নীতির বিধানগুলির উপর কনফুসস্ বিশেষ জোর দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে মানুষকে বিশেষভাবে নীতিপরায়ণ হইতে হইবে। তিনি বলিয়া গিয়াছেন যে, মানুষের প্রতিষ্ঠিত যাবতীয় প্রতিষ্ঠান, মনুষ্যসমাজ এবং সভ্যতা, আইন, রীতিনীতি প্রভৃতি সমস্তই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। নৈতিক জীবনের উন্নতিই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

কনফুসসের শিক্ষাই চীনের অধিবাসীদিগের জীবনের

উপর অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে। শত শত বৎসর ধরিয়া দেশের শিশুগণ কনফুসসের প্রবর্ত্তিত বিধানানুসারে শিক্ষিত হইয়া আসিতেছে—তাঁহার সংগৃহীত মতবাদপূর্ণ সাহিত্য তাহাদিগের মর্ম্মে মর্ম্মে অনুপ্রবিষ্ট এবং কণ্ঠস্থ।

অতিলৌকিক ঘটনার উপর কনফুসস্ বিন্দুমাত্র আস্থাস্থাপন করিতেন না। তাঁহার সংগৃহীত মতবাদ হইতে বুঝা যায় যে, অলৌকিক বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। যাহা মানবজীবনে অভিজ্ঞতার দ্বারা সত্য বলিয়া প্রতিভাত না হইবে, তাহাতে মানবের আস্থাস্থাপন করিতে নাই। যে বিষয়ে মানবের আস্থা থাকিবে না, তাহা পালন করিতে মানব বাধ্য নহে। সুতরাং মানবের নীতিসংক্রান্ত বিধানগুলি মানবের বিবেকবাণীর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে এবং সাধারণ জীবনের অভিজ্ঞতার দ্বারা তাহার সত্যাসত্য নির্ণয় করিয়া লইতে হইবে।

কনফুসাসের নীতিশাস্ত্র-পদ্ধতি কল্পনামূলক নহে। জাগতিক ব্যাপারে মানুষ যাহা সাধারণতঃ করিয়া থাকে, কনফুসাস তাহারই উপর জোর দিয়া গিয়াছেন। পিতা মাতার প্রতি সন্তানের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাঁহার মতবাদ অতি অপূর্ব্ব। সন্তানের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ চীন ভাষায় সংগৃহীত হইয়াছে। তাহার ইংরাজী অনুবাদও পাওয়া যায়। সেই গ্রন্থে বর্ণিত আছে, একবার কনফুসাসের এক শিষ্য তাঁহাকে নৈতিক ব্যবহারের প্রথম বিধান সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিল। উত্তরে তিনি বলেন,—

৪র্থ শতাব্দীতে ভারতীয় সন্ন্যাসি-প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ-মঠ

"পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্যপালনরূপ উৎস হইতে মানবের অন্যান্য সদ্‌গুণের উদ্ভব হয়। এই ব্যাপার হইতেই মানব-জীবনের প্রথম শিক্ষার সূত্রপাত। তুমি বস, আমি ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইতেছি।

"আমাদের দেহ, কেশরাজি, চর্ম্ম সমস্তই আমাদের জনক-জননীর নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি, সুতরাং এই সকল পদার্থের কোনও ক্ষতি করিবার আমাদের অধিকার নাই। ইহাই শিশুর প্রথম কর্ত্তব্য। ন্যায়পথে বিচরণ, মনুষ্যত্বের পরিচায়ক আচরণ করিতেই হইবে। যাহাতে সুনাম বজায় থাকে, তাহা সর্ব্বতোভাবে আচরণীয় এবং জনক-জননীর প্রতি শ্রদ্ধা-সম্পন্ন থাকিতে হইবে। ইহাই সন্তানের শেষ কর্ত্তব্য। অতএব সন্তানকে প্রথমতঃ পিতামাতার অভাব-অভিযোগের প্রতীকার বিষয়ে সযত্নে মনোনিবেশ করিতে হইবে। তৎপরে দেশের প্রচলিত শাসন-বিধানের অনুবর্ত্তী হইতে হইবে। সর্ব্বশেষে নিজের নাম যাহাতে কলঙ্কবিহীন হয়, তৎপ্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে।"

মলিন জলে হ্যাংচো নারীরা বস্ত্র ধৌত করিতেছে

পিতৃমাতৃভক্তি সম্বন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থে অনেকগুলি কাহিনীর উল্লেখ আছে। প্রত্যেক গল্পই পবিত্র অবদান। এরূপ পিতৃমাতৃভক্তির দৃষ্টান্ত হিন্দুর পুরাণ-কাহিনীতেও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।

হ্যাংচোর প্রাচীন সেতু

হ্যাংচো—টিন্‌ট্যাং নদের মোহানার বাঁধ

পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্যপালন সম্বন্ধে চীনাগণ অতি-মাত্র উৎসুক। চীনদেশে কোনও পিতা ৫০ বা ৫৫ বৎসর বয়স প্রাপ্ত হইলেই সাধারণতঃ কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া থাকে। সে প্রত্যাশা করে যে, তাহার সন্তানগণ তাহার প্রতিপালনের সমুদয় ভার গ্রহণ করিবে।

মিঃ জন্‌সন্ গুড্‌নো একবার কোনও চীন-ভদ্রলোককে
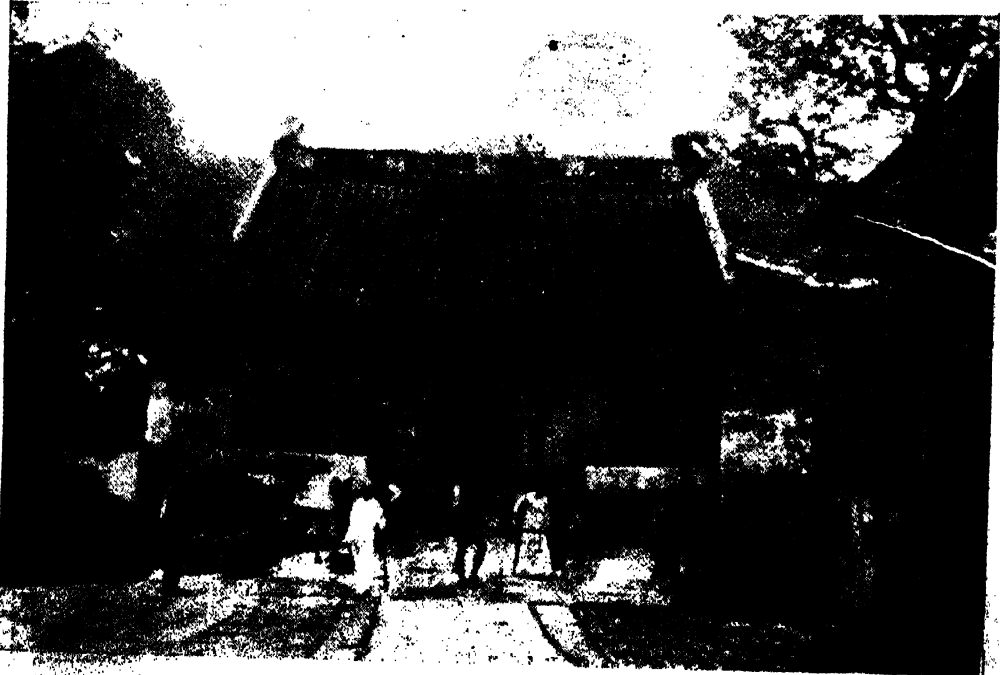
হ্যাংচোর প্রসিদ্ধ বৌদ্ধমন্দির
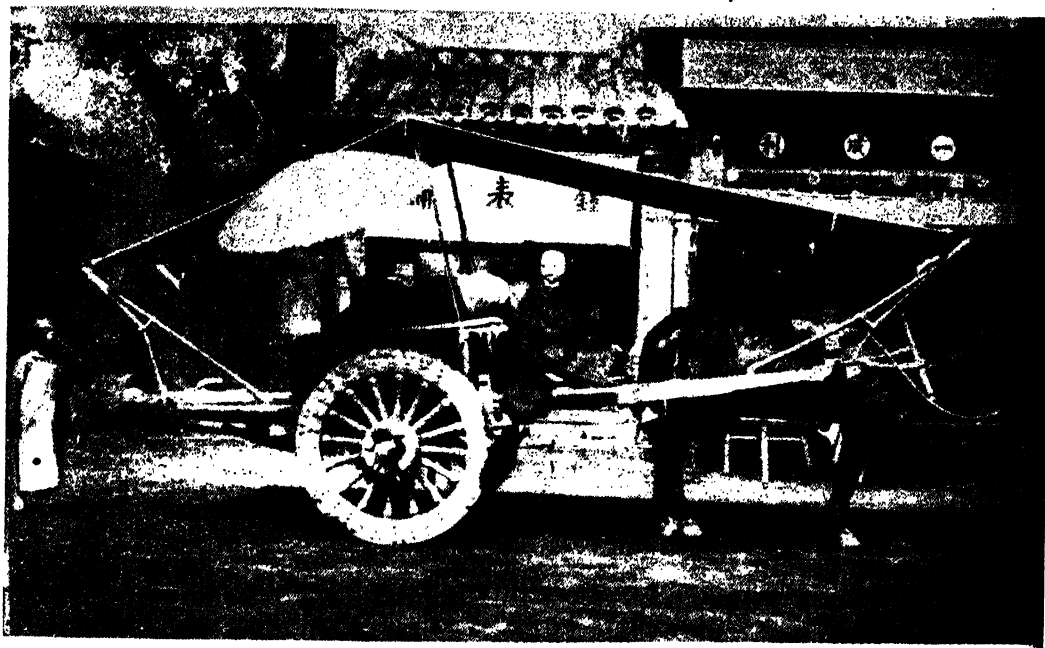
চীনদেশীয় গাড়ী

প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, যদি তাঁহার পিতা তাঁহার নিকট কিছু অর্থ চাহিয়া না পান, তাহা হইলে সমাজে কি তিনি অপমানিত হইবেন ? উত্তরে ভদ্রলোক বলিয়াছিলেন, "অপমান ত তুচ্ছ কথা, সম্ভবতঃ আমার স্কন্ধে মাথা থাকিবে না।"

ইন্ধন-সংগ্রহকারী চীনা
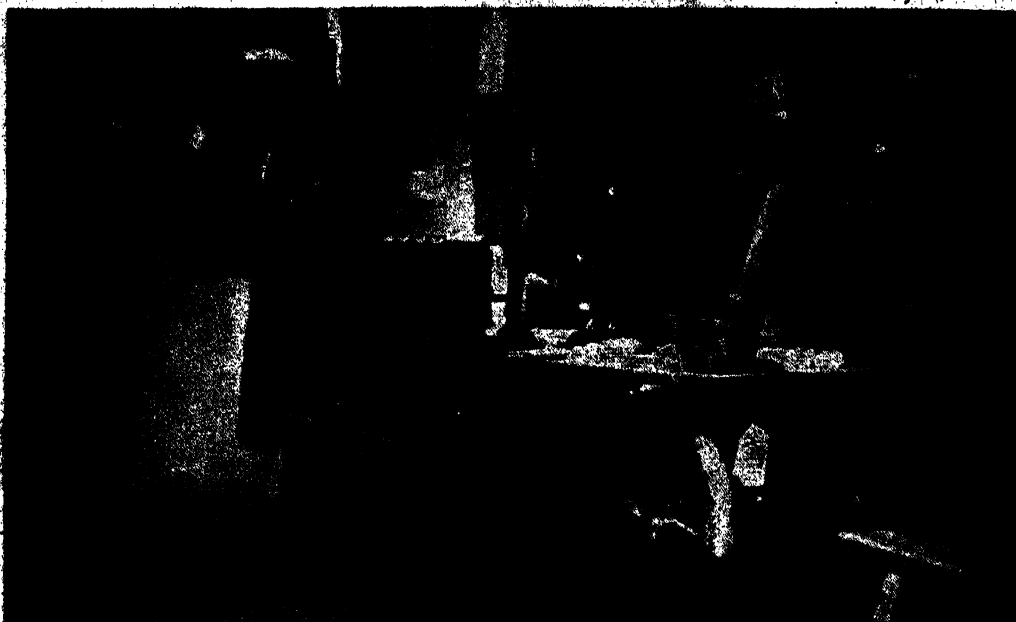
রেস্তোরাঁর ধারে চীনা-যুবক জুয়া খেলিতেছে

কথাটা আদৌ অতিরঞ্জিত নহে। এখনও চীনদেশে সন্তানের উপর পিতামাতার অসাধারণ প্রভাব। সন্তানের জীবন ও মৃত্যু পিতামাতার উপর নির্ভর করে। অবশ্য য়ুরোপীয় উপনিবেশের সন্নিহিত প্রদেশে পিতার শক্তি কিছু হ্রাস পাইয়াছে

শ্রমজীবী ধূমপান করিতেছে

তুলার পোষাকপরিহিত চীনা-বালক

এক একটা বৃহৎ পরিবার দেখিতে পাওয়া যায়। পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তিই একান্ত চিত্তে এই একান্নবর্ত্তী পরিবারপ্রথাকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকে।

য়ুরোপীয়দিগের সংস্পর্শে আসিয়া চীনারা সম্মিলিতভাবে কোন কোন কার্য্য করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে; কিন্তু তাহাদের এই প্রচেষ্টা সাফল্য লাভ করে নাই। কারণ, স্ব স্ব পরিবারের প্রতি তাহারা এমনই অনুরক্ত যে, নিজ পরিবারের লোকদিগকেই কোনও যৌথ কারবারের সকল বিভাগে সর্ব্বাগ্রে নিযুক্ত করিবে। এ বিষয়ে অন্য লোকের স্বার্থ সম্বন্ধে তাহারা সম্পূর্ণ উদাসীন। তাহারা মনে করে, নিজ বংশ বা পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্য পালনই তাহাদের ধর্ম্ম; সুতরাং এইরূপ মনোবৃত্তিকে তাহারা প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে। কাযেই যৌথ কারবার সম্বন্ধে তাহারা সাফল্যলাভ করিতে পারিতেছে না।

চীনদেশে রাজপথের বালাই বড় একটা নাই। দক্ষিণ চীনে কোন পশু দেখা যায় না। প্রত্যেক জিনিষই মানুষ পৃষ্ঠদেশে বহন করে। সুতরাং সঙ্কীর্ণ পথের উপর দিয়া গমনাগমনে তাহাদের কোন কষ্ট হয় না। উত্তর চীনে অধিবাসীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প। সেখানে অশ্বতর বা টাটু ঘোড়া বাহিত কতিপয় যান দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রশস্ত রাজপথের অস্তিত্ব সেখানেও বিরল। গাড়ী চালাইয়া চালক যে কোনও স্থানে যাইবার অধিকারী। যদি কোনও কৃষকের ক্ষেতের উপর দিয়া সে গাড়ী চালাইয়া যায়, তাহাকে বাধা দেওয়া যায় না। আবার চলতি পথের উপর যদি কোনও কৃষক লাঙ্গল দেয়, চালকও তাহাকে বাধা দিতে পারে না। এ বিষয় লইয়া আবহমান কাল চালক ও কৃষকের মধ্যে বাদপ্রতিবাদ চলিয়া আসিতেছে।

বৃষ্টির জলস্রোত যে স্থানের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া পথের সৃষ্টি করে, চীনদেশে উহাই স্থায়ী পথ। চীন দেশের কোন কোন অংশে বৃষ্টিধারা ধৌত হইয়া এবং গাড়ী চলিয়া

বিগত দুই তিন সহস্র বৎসরের মধ্যে চীনদেশে কোনও যুবক পিতার আদেশের বিরুদ্ধে কোনও কার্য্য করিতে সমর্থ হয় নাই। হয় পিতা নহে ত পিতামহের আদেশ অনুসারে তাহাকে জীবনপথে চলিতে হইবে। কদাচিৎ কেহ প্রাপ্তবয়স্ক হইবার পূর্ব্বে স্বাধীন মতানুসারে চলিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়। চীন সভ্যতা যে রক্ষণশীল ইহা তাহার আংশিক কারণ।

একান্নবর্ত্তী পরিবারপ্রথা চীনদেশে অত্যন্ত প্রবল। কোনও বংশের যাবতীয় পুরুষ বংশধর ও তাহাদিগের পত্নী লইয়া এক একটা পরিবার গঠিত। বংশের কোনও প্রাচীন পুরুষ যত দিন জীবিত থাকিবে, সেই পরিবারের কেহই বিচ্ছিন্ন হইতে পারিবে না। ইহার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই

চলিয়া সাধারণ জমীর সমতল হইতে প্রায় ৫০ ফুট নিম্নে এইরূপ গলিপথ রচিত হইয়াছে। দেশের শাসকগণ কোনও রাজপথ নির্ম্মাণ করেন নাই, এ জন্য বিদ্যালয়ও তথায় ছিল না এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থারও অভাব ছিল। ইদানীং সে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতেছে। স্থানে স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা চলিয়াছে,স্বাস্থ্য-সম্বন্ধেও চীন সরকার অবহিত হইয়াছেন।

চীনদেশে কর আদায়ের প্রথা এবং দেওয়ানী বিচার বিভাগও ছিল। কর আদায় করিতে গেলেই ক্রমে সেই পদ্ধতি দূষিত হইয়া উঠে। দেওয়ানী বিচার সংক্রান্ত শাসনপদ্ধতির প্রতি চীনারা কখনও বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করে নাই। জনৈক প্রসিদ্ধ মাঞ্চু সম্রাটের রাজত্বকালে (সম্রাট্ কাঙসি) আদালতের অনাচার ও অত্যাচার সম্বন্ধে দেশবাসীর নিকট হইতে একটা আবেদন সম্রাটের দরবারে উপস্থাপিত করা হয়। সম্রাট্ আবেদনকারীদিগের সকল কথা শ্রবণ করিবার পর এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন, "দেশের আয়তন যেরূপ বিস্তৃত, জনসাধারণের সংখ্যাও যেরূপ অধিক এবং চীনারা যেরূপ মামলাবাজ, তাহাতে আদালতে সর্ব্বদা সুবিচার পাইলে মামলা-মোকদ্দমার সংখ্যা এরূপ বাড়িয়া যাইবে যে, অর্দ্ধেক সাম্রাজ্য দ্বারাও তাহার মীমাংসা করা সম্ভবপর হইবে না। সুতরাং আমার ইচ্ছা, যাহারা আদালতে আসিয়া বিবাদ নিষ্পত্তি করিতে চাহিবে, তাহাদের প্রতি কোন প্রকার দয়া প্রকাশ করা হইবে না। অত্যাচারিত ও উৎপীড়িত হইয়া সেরূপ ব্যক্তি যেন মামলা-মোকদ্দমায় হতশ্রদ্ধ হইতে পারে, পরে সে আর কখনও আদালতে আসিতে সাহস করিবে না। এই-রূপ উপায়ে মামলা-মোকদ্দমারূপ মন্দ আচরণ হইতে লোক মুক্তি পাইতে পারিবে। যাহারা সুনাগরিক, তাহারা আপোষে আপনাদের বিবাদ নিষ্পত্তি করাইয়া লইবে, কখনও আদালতে আসিবে না। যাহারা প্রকৃত মামলাবাজ, গোঁয়ার এবং কলহপরায়ণ, তাহারা মোকদ্দমা করিয়া উৎসন্ন যাউক—কারণ, তাহাদের তাহাই প্রাপ্য।"

শীতনিবারক তুলার পোষাকে শিশু ও নারী

এ জন্য চীনদেশে দেওয়ানী আদালতের প্রাধান্য কোন দিন স্বীকৃত হয় নাই।

একগোষ্ঠী বা পরিবার ব্যতীত চীনারা বৃহত্তর সামাজিক সঙ্ঘ সংগঠনে কোন দিন সাফল্যলাভ করে নাই, এ কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এইরূপ পারিবারিক সঙ্ঘ আবার পরস্পর স্বেচ্ছা-সম্মিলিত হইয়া কতকগুলি নিয়মাধীন হয়। এই নিয়মে চীনের ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালিত হইয়া

পথিপার্শ্বস্থ পান্থশালা।

থাকে। ঐ সকল নিয়মের অধীন না হইয়া যদি কেহ কোন কায করে, তাহা হইলে তাহাকে স্বেচ্ছাচারী বলিয়া গণ্য করা হয়। তখন সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে জনসাধারণ সংঘবদ্ধ হইয়া তাহাকে যে কোন প্রকার শাস্তিদান করিতে পারে। দেশের সরকারও তাহাকে তখন আশ্রয় পর্য্যন্ত দিতে পারেন না। উল্লিখিত নিয়ম-শৃঙ্খলার দ্বারা ব্যবসায় বাণিজ্য সংক্রান্ত যে কোনও বিরোধ মীমাংসিত হয়। কাহাকেও আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না।

চীনের শিক্ষা ব্যবস্থা শুধু সাহিত্য-বিষয়ক। সম্প্রতি তাহার কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। চীনারাই এতদঞ্চলে সর্ব্বপ্রথম লিখিত ভাষার আবিষ্কার করিয়াছিল। এ জন্য চীনদিগের সাহিত্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ। বাহিরের যে সকল অসভ্য জাতির সহিত চীনাদিগের সংস্রব ঘটিয়াছিল, তাহাদের কাহারও লিখিত ভাষা ও সাহিত্য ছিল না। চীনারা মনে করে, তাহাদের সাহিত্য যাহার অধিকৃত, সেই ব্যক্তিই জ্ঞানী। সাহিত্যে জ্ঞানলাভ হইলেই মানবের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি-শক্তির উৎকর্ষ হইল।

একবার কোনও মার্কিণ পণ্ডিত কোনও শিক্ষিত চীন রাজকর্ম্মচারীর সহিত আলোচনা প্রসঙ্গে বলিতেছিলেন যে, তাঁহারা যে প্রণালীতে রাজকর্ম্মচারী মনোনয়ন করেন, তাহার সহিত প্রতীচ্য দেশের নির্ব্বাচন-পদ্ধতির পার্থক্য আছে। চীনারাও তাঁহাদের ন্যায় পণ্ডিত ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা লইয়া কর্ম্মচারী নির্ব্বাচন করে। চীন রাজকর্ম্মচারী উত্তরে বলিয়াছিলেন,—"আপনারা মস্তক গণনার সংখ্যা দ্বারা লোক বাছিয়া লয়েন, আমরা মস্তিষ্কের পরিপুষ্টি দেখিয়া লোক বাছিয়া লই।"

সাহিত্য ব্যতীত অন্য কোনও বিষয়ে চীনারা অবহিত নহে। চীন ভাষায় ও সাহিত্যে যাঁহার অধিকার, চীনদেশে তিনিই পণ্ডিত। পূর্ব্বে ভাষা-সাহিত্যের মাপকাঠিতে পাণ্ডিত্যের পরিমাপ হইত। এ জন্য দেশে শিক্ষিত ধর্ম্ম-যাজক, পণ্ডিত, চিকিৎসক বা ব্যবহারাজীব ছিল না। চীন দেশের জনসাধারণ শুধু সাহিত্য লইয়াই মাতিয়াছিল বলিয়া তথায় বিজ্ঞানের কোনও উন্নতি ঘটে নাই বলিলেই চলে। চীনের শিক্ষাপদ্ধতি মূলতঃ কল্পনামূলক।

কিন্তু বর্ত্তমানে তথায় দ্রুত পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইতেছে। ১৬শ শতাব্দীতে খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারকগণ চীনদেশে

কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত করেন। রোমানক্যাথলিক সম্প্রদায় দক্ষিণ চীনে—ক্যান্টনে প্রবেশ লাভ করিয়া পিকিং পর্য্যন্ত তাঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্রকে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রোটেষ্ট্যান্ট ধর্ম্মপ্রচারকগণ আসেন। এই ধর্ম্মপ্রচারকগণের সংস্রবে আসিয়া চীনের অবস্থা ও মতের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ১৮৯৪—৯৫ খৃষ্টাব্দে চীন-জাপান যুদ্ধের সময় হইতেই চীনারা উপলব্ধি করিয়াছে যে, পাশ্চাত্য প্রণালী সম্বন্ধে তাহাদের অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। মাঞ্চু রাজবংশ সিংহাসনচ্যুত হওয়ার পর হইতেই চীনের জীবনে অনেক ওলট-পালট হইয়া গিয়াছে। য়ুরোপের কুরুক্ষেত্র সময়ের দ্বারাও চীনের জীবনগতির ধারা কোন কোন বিষয়ে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।

চীনদেশের কতিপয় নগর ও নাগরিকগণের জীবনযাত্রার সম্বন্ধে বর্ত্তমান প্রবন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।

চীনদেশে সু-চো একটি প্রসিদ্ধ নগর। ইহার চারিদিকে সহস্র বৎসরের পুরাতন প্রাচীর আছে। প্রাচীরের স্থানে স্থানে পাহারা-কক্ষ—অধুনা অনেকগুলি ধ্বংস-পথের পথিক।

সু-চোর তরুণীরা সুন্দরী বলিয়া গণ্যা। তাহাদের কণ্ঠস্বরও মধুর। চীন দেশের গায়িকারা প্রধানতঃ সু-চোর অধিবাসিনী। যাহারা ঐ নগরের অধিবাসিনী না হইয়া গায়িকা বলিয়া খ্যাত, তাহারাও আপনাদিগকে সু-চোবাসিনী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে।

সু-চো নারীর সৌন্দর্য্যের খ্যাতি যেমন প্রসিদ্ধ, তত্রত্য পণ্ডিতগণের পাণ্ডিত্য-খ্যাতিও তদনুরূপ। পিকিংসহরে সু-চোর বহু খ্যাতনামা পণ্ডিত আছেন। চীনাদের মধ্যে একটা প্রবাদ আছে, 'স্বর্গ উপরে, আর মর্ত্ত্যে সু-চো এবং হ্যাংচো।' বাস্তবিক দক্ষিণ চীনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্যাগোডার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ একটি প্যাগোডা সু-চো নগরে আছে। এই নগরের রাজপথ অতি সঙ্কীর্ণ—তথায় কোন চক্রসংযুক্ত গাড়ী চলিতে পারে না। ভিনিস সহরের পথগুলি যেমন জলপূর্ণ, সু-চোও ঠিক সেইরূপ। নগরের সর্ব্বত্রই প্রায় খাল। যেখানে একটা খাল অপরের সহিত মিশিয়াছে, সেই সংযোগস্থলে অত্যুচ্চ বৃত্তাকার সেতু। উহাদের তলদেশ দিয়া গণ্ডোলা জাতীয় চীন নৌকাগুলি স্বচ্ছন্দে গতায়াত করিয়া থাকে।

নগরের গৃহগুলির সম্মুখ অপ্রশস্ত পথের দিকে, পশ্চাদ্ভাগ খালের দিকে। নগরের মন্দির ও প্যাগোডাগুলি স্থলপথ ও জলপথ উভয় দিক্ হইতেই সমানভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। পথগুলি এরূপ অপ্রশস্ত যে, এক বাড়ীর ছাদ হইতে অপর ঘরের ছাদের উপর মাদুর বিছাইয়া রাখা যায়। নগর-প্রাচীরের স্থানে স্থানে লৌহকীলক-শোভিত তোরণদ্বার।

হ্যাংকো চীন দেশের আর একটি প্রসিদ্ধ নগর। নারী-সৌন্দর্য্যের জন্য এই নগরের খ্যাতি নাই। প্রসিদ্ধ হাত-পাখা এখানে নির্ম্মিত হইলেও সে জন্য হ্যাংকোর প্রসিদ্ধি নাই। এই নগরের অধিবাসীরা অত্যন্ত গোঁয়ার। বিদেশীয়দিগকে ইহারা দেখিতে পারে না বলিয়া শুনা যায়। খৃষ্টান পাদরীরা ছাড়া কোনও বৈদেশিক নগরের অভ্যন্তরে বাস করে না। এই নগরে সুদৃশ্য পুরাতন প্যাগোডা সংগৃহীত রহিয়াছে। অনেকগুলি কীটদষ্ট বজ্রশৃঙ্গ প্যাগোডা অতুলনীয়। সম্ভবতঃ ১ হাজার বৎসর পূর্ব্বে উহা নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। পুরাতন হইলেও আরও এক সহস্র বৎসরের মধ্যে উহার ধ্বংস হইবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া বিশেষজ্ঞরা মত প্রকাশ করেন। সবুজ মৎস্য এবং শ্বেত সর্পসমূহ এই প্যাগোডার নিম্নে সঞ্চিত হইয়া আছে বলিয়া চীনারা প্রকাশ করে। ঐ সকল জীব প্যাগোডার নিম্নে অবস্থিতি করিতেছে। এখন যদি প্যাগোডা ধ্বংস হয়, তাহা হইলে ঐ সকল রাক্ষস মুক্তিলাভ করিয়া পশ্চিম হ্রদে প্রবেশ করিবে। তাহা হইলে হ্রদের জল উচ্ছ্বসিত হইয়া হ্যাংকো ও তত্রত্য জনসাধারণকে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। এই প্যাগোডার নিকটে কেহ গমন করে না। পাছে শ্বেতসর্প বাহির হইয়া পড়ে।

ধনী চীনারা পশ্চিম হ্রদের তীরে গ্রীষ্ম যাপন করিয়া থাকে। গ্রীষ্মনিবাস হিসাবে ইহা সুপ্রসিদ্ধ। ইহার তীরে মনোরম উদ্যানসমূহ বিদ্যমান। অষ্টম পূর্ণিমার সময়ে ১৫ই তারিখে উল্লিখিত হ্রদের তীরে আলোক-উৎসব সম্পন্ন হয়। চন্দ্র যে একাই আলোক দান করেন না, ইহা বুঝাইবার জন্যই এই আলোকোৎসব।

হ্যাংচোর কোনও পাহাড়ের উপর প্রাচীন যুগে জনৈক ভারতীয় বৌদ্ধ সন্ন্যাসী একটি মন্দির স্থাপন করেন এবং এক রজনীর মধ্যে বুদ্ধের এক শত মূর্ত্তি ক্ষোদিত করেন। ঐ সকল মূর্ত্তি পাহাড়গাত্রে এখনও বিদ্যমান।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

ষষ্ঠ রিপু

গ্রহনক্ষত্রের ফল কি না জানি না, কিন্তু এমন এক একটা মুহূর্ত্ত আসে, যে সময় এক একটা মানুষের সহিত প্রথম দৃষ্টিবিনিময় অথবা পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সহিত জন্মের মত বিরোধের সৃষ্টি হয়। তাহার সহিত আমারও ঠিক এই অবস্থা ঘটিয়াছিল।

মুকুন্দপুর ও সৈদপুরের মধ্যে মাত্র একখানি গ্রাম ব্যবধান; কিন্তু এই দুইটি গ্রামেই সুপরিচালিত উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল। উল্লিখিত দুইটি গ্রামেই বহু ভদ্রলোকের বাস। গ্রামের উন্নতির জন্য স্থানীয় অধিবাসীদিগের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা ছিল বটে; কিন্তু সে জন্য এক গ্রামের লোক অন্য গ্রামের অধিবাসীদিগের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিতেন না। বড় হইবার প্রতিযোগিতার বিনিময়ে সামাজিক ভদ্রতা ক্ষুণ্ণ হইত না।

সৈদপুর গ্রামের স্কুলে আমি সকল বিষয়েই ভাল ছেলে ছিলাম। শিক্ষক মহাশয়গণ আমার উপর অনেক আশা করিতেন। তখন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা প্রচলিত হয় নাই। সাবেক আমলের প্রবেশিকা পরীক্ষারই ব্যবস্থা ছিল। ইংরাজী, গণিত, সংস্কৃত, ইতিহাস— সকল বিষয়েই আমার সমান পারদর্শিতা সাধারণ গণ্ডীর বাহিরে ছিল বলিয়া শিক্ষক মহাশয়রা আশা করিতেন, আমার দ্বারা গ্রামের মুখোজ্জ্বল হইবে।

সহর হইতে ফুটবল, ক্রিকেট প্রভৃতি খেলার বন্যাপ্রবাহ পল্লীর নিভৃত প্রাঙ্গণেও তরতর বেগে প্রবাহিত হইয়া পল্লীতরুণ ও কিশোরদিগকেও ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছিল। পড়াশুনার সঙ্গে সঙ্গে এই সকল পাশ্চাত্য ক্রীড়ার সহিতও আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইয়াছিল।

শৈলেশ মুখোপাধ্যায় মুকুন্দপুরের স্কুলে পড়িত। আমাদের উপাধি বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে পৈতৃক জমীদারী থাকায় আমরা সৈদপুরের রায় বলিয়াই পল্লীসমাজে প্রসিদ্ধ ছিলাম। আমার অপুত্রক জ্যেষ্ঠতাত কোন বড় জিলায় এডিশানাল সেসন জজ ছিলেন। বাবা গ্রামে থাকিয়া জমীদারী দেখা শুনা করিতেন। শৈলেশের সহিত আমার পূর্ব্বে আলাপ ছিল না। সেবার ফুটবল ম্যাচ উপলক্ষে পরিচয় হয়।

সৈদপুরের দলের সহিত মুকুন্দপুরের দলের ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা আমাদের গ্রামের মাঠেই অনুষ্ঠিত হইল। আমি সেণ্টার ফরোয়ার্ড—বিরুদ্ধ দলের সেণ্টার হাফব্যাক্ শৈলেশ।

উভয় দলই প্রাণপণ যত্নে জয়লাভের জন্য চেষ্টা করিতেছিল। প্রথম অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে কেহ কাহাকেও পরাজিত করিতে পারিল না। দ্বিতীয়ার্দ্ধের ১৫ মিনিট সময় অনিশ্চিত সংশয়ে কাটিয়া গেল। জয়লাভ করিতে না পারিলে গ্রামের মুখ উজ্জ্বল হইবে না,—একটা দুর্দ্দমনীয় আবেগে মনটা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

সৌভাগ্য ক্রমে একটা ফাঁকা বল পাইলাম। দ্রুতধাবনে আমার সুযশ ছিল। কৌশলে বলটিকে প্রায় গোলের কাছাকাছি আনিয়া ফেলিয়া প্রবলবেগে তাহাকে জালের মধ্যে পাঠাইতে যাইব, এমন সময় একটা প্রচণ্ড ধাক্কায় আমি পড়িয়া গেলাম। বলটি তখন শৈলেশের পদাঘাতে শূন্যপথে আমাদের গোলের দিকে যাত্রা করিয়াছে! আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম, "ফাউল।" কিন্তু রেফারী বাঁশী বাজাইলেন না। আমাদের স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক মহাশয়ই বিচারকের কার্য্য করিতেছিলেন।

নিষ্ফল আক্রোশে আমার হৃদয় পূর্ণ হইল। ভূমি হইতে দীপ্তনেত্রে একবার শৈলেশের দিকে চাহিলাম। পর

মুহূর্তেই ঘনঘন করতালিধ্বনিতে বুঝিলাম মুকুন্দপুরের দল আমাদের ঘাড়ে একটা গোল চাপাইয়াছে।

আর বেশী সময় নাই—'গোল' শোধ না দিলে অপমানের সীমা থাকিবে না। আমাদের দল তৎপরতার সহিত খেলিতে লাগিল। আবার একটা সুযোগ পাইলাম। এবার মান রক্ষা করিতেই হইবে। মুহূর্তে লক্ষ্য স্থির করিয়া বলে আঘাত করিলাম, সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড ধাক্কা। বলটা কোণের দিকে চলিয়া গেল—আমিও মাটীতে পড়িয়া গেলাম। গোলরক্ষক বলটি আনিয়া যেমন ভূমিতলে রাখিয়াছে, অমনিই খেলা সমাপ্তির বাঁশী বাজিয়া উঠিল।

বিরুদ্ধ পক্ষের জয়ধ্বনি আমার অসহ্য হইল। সমস্ত আক্রোশ শৈলেশের উপর পড়িল। সে হাসিতে হাসিতে মাঠ পার হইতেছিল। আমি ছুটিয়া তাহার পার্শ্বে গমন করিলাম। ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিলাম, "ইতরের মত চেঁচাচ্ছ কেন? ছোট লোক!"

শৈলেশ হাসিয়া বলিল, "এটা কোন্‌দেশী ভদ্রতা?"

আর আমি আপনাকে সংবরণ করিতে পারিলাম না। ঘুষি তুলিলাম। কিন্তু ক্ষিপ্রহস্তে সে আমার মুষ্টিবদ্ধ দক্ষিণ হস্ত চাপিয়া ধরিয়া উচ্চরবে হাসিয়া উঠিল—"ছিঃ ভাই!"

কিন্তু হাত আমি ছাড়াইয়া লইতে পারিলাম না। লজ্জা অথচ দুর্ব্বলতার জন্য? তাহার শরীর-গঠন মন্দ নহে; কিন্তু বিশ্বাস ছিল আমি তাহার অপেক্ষা বলিষ্ঠ।

প্রধান শিক্ষক মহাশয় কাছে আসিয়া পড়িলেন। সে হাত ছাড়িয়া দিল; কিন্তু সেই মুহূর্ত্ত হইতে সে আমার কাছে যেন বিষ হইয়া গেল।

২

ছুটীর পর বাড়ী যাইবার জন্য বইগুলি লইয়া সিঁড়ির কাছে আসিয়াছি, এমন সময় লাইব্রেরী ঘর হইতে প্রধান শিক্ষক মহাশয় ডাকিলেন, "সুরেন, শুনে যাও।"

ঘরের মধ্যে প্রধান শিক্ষক ও পণ্ডিত মহাশয় ছিলেন। আমি অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইলাম। প্রধান শিক্ষক মহাশয় বলিলেন, "বড় দুঃখের কথা, বাঙ্গালা প্রতিযোগী পরীক্ষায় আমাদের স্কুল নীচে নেমে গেছে—তুমি প্রথম হ'তে পারনি, সুরেন।"

আমার মুখ ম্লান হইয়া গেল। প্রধান শিক্ষক মহাশয় মুকুন্দপুর, সৈদপুর এবং বাজিতপুর—এই তিন বিদ্যালয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রগণকে লইয়া বাঙ্গালা রচনার একটা প্রতিযোগী পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যাহার রচনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে, তাহাকে একটি সুবর্ণ পদক পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। আমার পিতামহীর নামে পিতাঠাকুর এই সুবর্ণপদক দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পরীক্ষা আমাদিগের স্কুলের হল ঘরেই হইয়াছিল। আমরা সর্ব্বশুদ্ধ ৩০ জন ছাত্র পরীক্ষার্থী ছিলাম। ৩টি বিদ্যালয় হইতে পরীক্ষক বাছিয়া একটি বোর্ড গঠিত হইয়াছিল। আমাদের বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয় তাহার সভাপতি ছিলেন।

বিবর্ণ মুখে বলিলাম, "কে প্রথম হয়েছে, স্যার?"

"মুকুন্দপুর স্কুলের শৈলেশ মুখোপাধ্যায়। এমন চমৎকার সে লিখেছে!"

আমার সম্মুখে বজ্রপাত হইলেও আমি ততদূর চকিত ও বিস্মিত হইতাম না।

হেড পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "তার রচনা এমন মৌলিকতাপূর্ণ, নির্ভুল ও চমৎকার যে, তাকে পুরা নম্বর দেওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু বোর্ড তাকে ৯৭ নম্বর দিয়াছেন। তুমি দ্বিতীয়স্থান অধিকার করেছ সত্য; কিন্তু তোমার সঙ্গে তার ২৫ নম্বরের তফাৎ।"

পৃথিবী, তুমি দ্বিধা বিভক্ত হও—এ লাঞ্ছনা অসহ্য। কিন্তু পরাজয়ের গ্লানি লইয়া অখণ্ড ভূমির উপর দিয়া বাড়ীতে ফিরিতে হইল।

প্রতিজ্ঞা করিলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় জয়পরাজয় নির্ণীত করিয়া তবে নিরস্ত হইব।

অখণ্ড মনোযোগ, প্রচণ্ড উৎসাহ এবং অতুল অধ্যবসায়ের পুরস্কার আছেই। সে বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষায় আমি দ্বিতীয়স্থান অধিকার করিলাম। শৈলেশ শুধু প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। সৈদপুর গ্রামের মুখোজ্জ্বল হইল। প্রেসিডেন্সী কলেজে আমি ভর্ত্তি হইলাম। শুনিলাম, শৈলেশ রিপন কলেজে প্রবেশ করিয়াছে।

জয়যাত্রা সুরু হইল। আমার মন হইতে পরাজয়ের গ্লানি বিশ্ববিদ্যালয় মুছাইয়া দিল। পূজার সময় বাবা আমার সাফল্যলাভের আনন্দকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিলেন। কয়গ্রামের বিশিষ্ট ভদ্রলোক এবং ছাত্রদিগকে প্রীতিভোজে নিমন্ত্রণ করা হইল। শৈলেশও বাদ পড়ে নাই। সে আসিয়া আমাকে বিশেষ ভাবে অভিনন্দিত করিল। তাহার ব্যবহারে

বুঝিতে পারিলাম না, তাহার এ আনন্দ আন্তরিক না মৌখিক। প্রসন্ন হাস্য তাহার আননকে এমনভাবে সমুদ্ভাসিত করিয়াছিল যে, আমার মনে হইল, সে চমৎকার অভিনয় করিতে পারে। সে দিন আমি সকলের নিকট হইতে যে প্রশংসা লাভ করিয়াছিলাম, তাহাতে আমার গর্ব্বস্ফীত হৃদয় যে পরিতৃপ্ত হইয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিতে পারিব না। শৈলেশ আমার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে আসে, কিন্তু সে যে কত নগণ্য, তাহা কি সে সেই রাত্রিতে আমার স্তুতিবাদ শুনিয়া অনুভব করিতে পারে নাই?

কিন্তু আমার পূর্ণ জয়যাত্রার পথে সে দুষ্টগ্রহের মত অনিষ্ট করিবার জন্যই বোধ হয় জন্মগ্রহণ করিয়াছিল! ফার্ষ্ট আর্টস্ পরীক্ষায় আমি সর্ব্বোচ্চ আসন অধিকার করিলেও 'বঙ্কিমচন্দ্র রৌপ্য পদক' পুরস্কারটি সে অবহেলায় কাড়িয়া লইয়া গেল। সকল বিষয়েই আমি অপ্রতিদ্বন্দ্বী; কিন্তু বাঙ্গালাভাষায় সে কি প্রতিবারই আমাকে পরাজিত করিবে? সে কি আমাকে বুঝাইতে চাহে যে, মাতৃভাষা চর্চ্চায় সে আমার অনেক উর্দ্ধের আসন অধিকার করিয়া থাকিবে? না, এ অসহ্য। আমার বিরূপ মন উদ্যত খড়্গের মতই তাহাকে আঘাত করিবার জন্য যে সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিল, তাহা গোপন করিবার প্রয়োজন নাই।

শুধু তাহাই নহে। সে প্রবেশিকা পরীক্ষার পর হইতেই ছোট ছোট মাসিক-পত্রে প্রবন্ধ ও গল্প লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিল। আমার সতীর্থদিগের অনেকেই তাহার রচনার প্রশংসা করিত; কিন্তু সত্য বলিতে কি, আমি তাহার কোন রচনাতেই মৌলিকতার সন্ধান পাইতাম না। আমার বিশ্বাস ছিল, গল্পগুলি সে কোনও ফরাসী, রুসীয় বা অন্য কোন বিদেশী গল্পের ভাবাবলম্বনে রচনা করিয়া পাঠক ও সম্পাদকবর্গকে প্রতারিত করিতেছে। অনেকের নিকট আমি আমার সন্দেহের কথা আভাসে জানাইতেও ইতস্ততঃ করিতাম না। তবে প্রমাণ প্রয়োগ করিবার মত কিছুই কিন্তু আমি সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

বি, এ পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া গেলাম। ইংরাজী সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্রে আমার নাম সকলের উপরে শোভা পাইল। "বঙ্কিমচন্দ্র" সুবর্ণ পদকলাভে মনের জ্বালা জুড়াইয়া গেল। শৈলেশের নাম গেজেটে নাই। শুনিলাম, পিতৃবিয়োগ-ব্যথায় কাতর হইয়া সে নাকি চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণী হইতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক ছাড়িয়া দিয়াছিল। কথাটা বিশ্বাসযোগ্য নহে। অসাফল্যের মনোবেদনা মানুষ নানা অবান্তর কৈফিয়তের আবরণে ঢাকিয়া রাখিতে চাহে। এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব আছে কি?

সাফল্যের রথ জীবনপথে অপ্রতিহতগতিবেগে চলিতে লাগিল—তাহার চক্রনির্ঘোষ আমার জয়যাত্রার বার্ত্তা দিক্‌দিগন্তে প্রচার করিতেছিল।

কলিকাতা হাইকোর্টের কোন প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীবের একমাত্র বিদুষী ও সুন্দরী কন্যা আমার জয়শ্রীকে পরিপূর্ণ করিবার জন্য বোধ হয় তপস্যা করিতেছিলেন। পৃথিবী যে শুধু শ্যাম-শোভাময়ী—শুধু বর্ণগন্ধ ও আলোকমালাময়ী; এখানে যে কেবল বিচিত্র, মধুর পবিত্র পুষ্পেরই সমাবেশ—বিবাহ-রজনীতে শুধু তাহাই অনুভব করিয়াছিলাম।

বাবা তাঁহার একমাত্র পুত্রের বিবাহে আমার ও তাঁহার পরিচিত, আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব সকলকেই নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। আমার সেই পরম আনন্দময় মুহূর্ত্তে, বিবাহ-সভায় এক বার শৈলেশের মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়াছিলাম। তাহার মুখের প্রসন্ন হাসিটি যেন অবিকৃত অবস্থাতেই ছিল, সে এক বার চকিতে আমার দিকে উজ্জ্বল দৃষ্টিপাত করিয়াই ভিড়ের ভিতর চলিয়া গেল। শৈলেশকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাবা ভালই করিয়াছিলেন। সে আমার জয়শ্রী দেখিয়া আমাকে মর্য্যাদা করিতে শিখিতে পারে। আমার সৌভাগ্য ও সাফল্য সম্ভবতঃ তাহাকে বিচলিত করিয়া থাকিবে।

ক্রমে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষাগার উত্তীর্ণ হইয়া গেলাম। জয়মাল্য আমারই গলদেশে বিলম্বিত রহিয়া গেল। অপ্রতিহতগতিতে, অপ্রতিদ্বন্দ্বী সুরেন্দ্রনাথ আইন পরীক্ষায় জয়টীকা লাভ করিল। আইন পরীক্ষারও সর্ব্বোচ্চ উপাধি আমারই জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল। এইবার শান্তি—আর পরীক্ষা দিবার প্রয়োজন নাই। সৈদপুর গ্রামবাসী প্রকৃতই আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছিল। মাঝে মাঝে জন্মভূমির ক্রোড়ে বসিয়া সে অযাচিত প্রশংসার কূজন শুনিয়া পরিতৃপ্ত হইতাম।

কিন্তু তথাপি আমার মনে প্রকৃত শান্তি যেন ছিল না। আমাদের অঞ্চলে শৈলেশের সাহিত্যিক-খ্যাতি অত্যন্ত প্রসারলাভ করিয়াছিল। প্রায় সকলের কাছেই শুনিতাম,

বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ কথা-সাহিত্যিকগণের মধ্যে তাহার একটা সম্মানজনক আসন আছে। তাহার অনুরক্ত ভক্তগণ তাহার সম্বন্ধে অসঙ্গত খ্যাতি প্রচার করিয়া সত্যের মর্য্যাদা যে রক্ষা করিতেছে না, তাহা বুঝিতে পারিতাম। ইহার প্রতিকার—তীব্র প্রতিবাদ কর্ত্তব্য।

আলিপুর জজ আদালতে যোগ দিয়াছিলাম। শ্বশুর মহাশয় তাহাতে বাধা দেন নাই। হাইকোর্টে পরে আসিলেও চলিবে। জিলা কোর্টের মামলা পরিচালন সম্বন্ধে আমার নিজেরই একটা খেয়াল ছিল। বাবা ও জ্যেঠা মহাশয়েরও ইহাতে সম্মতি পাইয়াছিলাম। আসল কথা, তিন বৎসর ওকালতী করিয়া একটি মুন্সেফী পদ অধিকার করাই আমার উদ্দেশ্য। ব্যবহারাজীবের পেশা লোভনীয় হইলেও বড়ই বিঘ্নবহুল। অর্থ উপার্জ্জনই আমার চরম লক্ষ্য নহে। সরকারী কার্য্য—বিশেষতঃ হাকিমী কার্য্যে একটা ইজ্জত আছে। আমার জ্যেঠা মহাশয়ের রাজদ্বারে সম্মান দেখিয়া আমিও প্রবুদ্ধ হইয়াছিলাম।

৩

উকীল-বন্ধু অবিনাশচন্দ্র বলিলেন, "আপনি যে এক জন রসজ্ঞ সাহিত্যিক, এ কথাটা গোপন রেখেছিলেন কেন, সুরেন বাবু?"

আমি বিস্ময়ের ভাণ করিয়া বলিলাম, "কেন বলুন ত?"

চুরুটিকা ধরাইতে ধরাইতে অবিনাশ বাবু বলিলেন, "এক মাসের দু'খানা বড় মাসিকে আপনার গল্প ও প্রবন্ধ বেরিয়েছে দেখলাম।"

দেবী ভারতীর চরণ-সরোজের মধুগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া আমি সঙ্গোপনে সাহিত্য-চর্চ্চা আরম্ভ করিয়াছিলাম। কথা-সাহিত্যের পাঠক-পাঠিকা অনেক বেশী। যশোলাভ করিতে হইলে ইহাদের কাছে নূতনত্ব দেখাইতে হইবে। পাশ্চাত্য গল্প ও উপন্যাস-সমুদ্রে অবগাহন করিলে অনেক রত্ন অনায়াসে আহরণ করা যায়, একটু পরিবর্ত্তন করিয়া ধুতি ও শাড়ী পরাইয়া দিলে কাহার সাধ্য বিদেশী বলিয়া চিনিতে পারে? নায়ক-নায়িকা তখন বাঙ্গালী বলিয়াই পাঠক-পাঠিকাসমাজে অবাধে চলিয়া যাইবে। গল্প ও উপন্যাসভক্ত পাঠকসমাজকে চমৎকৃত করিয়া দিব বলিয়াই আমার নিভৃত সাধনার কথা কাহারও কাছে প্রকাশ করি নাই। এমন কি আমার বিদুষী পত্নীও তাহার পূর্ব্বাভাস পান নাই।

অবিনাশ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেমন লাগল?"

আমার নামের পশ্চাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ উপাধির বর্ণমালা সংযুক্ত থাকিলেও সাহিত্য-সাধনার প্রথম অর্ঘ্য সম্বন্ধে অভিমত শুনিবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা আমার চিত্তকে বিচলিত করে নাই, এ কথা কখনই অস্বীকার করিতে পারিব না। প্রথম স্বামিসম্ভাষণে নবোঢ়া কিশোরীর হৃদয় যেমন স্পন্দিত—আলোড়িত হয়, কবিবর্ণনায় তাহা পড়িয়াছি, সম্ভবতঃ আমার চিত্ত তেমনই সঘনে স্পন্দিত হইতেছিল।

চুরুটিকার ধূম ছাড়িয়া অবিনাশ বাবু মৃদু-স্বরে বলিলেন, "মন্দ না।"

"না, না, ঠিক করে বলুন, অবিনাশ বাবু, আপনাদের মন্তব্যের দাম আছে।"

অবিনাশ বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "দেখুন, আপনার গল্প প'ড়ে আমার এক বন্ধু বল্‌ছিলেন যে, ছোট গল্প ঠিক হয় নি, আর নীতির দিক্‌টা কেমন কেমন যেন!"

আমার হৃদয় উত্তেজিত হইয়া উঠিল। বলিলাম, "দেখুন, কথা-সাহিত্যিক ত স্কুলমাষ্টার নন। আর বর্ত্তমান যুগে আপনাদের সীতা সাবিত্রীর আদর্শ দেখিয়ে নারী-সমাজের ভুয়া সতীত্বের বড়াই করা কেউ পছন্দ করে না, বুঝেছেন অবিনাশ বাবু!"

অবিনাশ বাবু এমনই উচ্চরবে হাসিয়া উঠিলেন যে, আমিও চমকাইয়া উঠিলাম। তিনি বলিলেন, "দেখুন বিংশ শতাব্দীতে জন্মালেও আমাদের মনটা এখনও একটু সেকেলে রকমের। তাই ভিক্টর হুগো, ডিকেন্স, টলষ্টয়, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতিকেই ভাল লাগে। নূতন দলের ইজম্‌তত্ত্ব ভাল বুঝতে পারি নে, যদিও মেটরলিঙ্ক, বার্ণার্ডশ, ইবসেন প্রভৃতি কিছু কিছু পড়েছি, সুরেন বাবু। নূতন আমদানী রসটা যেন তাড়ির মতই বোধ হয়।"

আমি অত্যন্ত চটিয়া গিয়াছিলাম। একটু উষ্মার সহিত বলিলাম, "ও সব পচা মাল আর এ যুগে চল্‌বে না, মশাই।"

অবিনাশ বাবু বলিলেন, "কিন্তু যাই বলুন আপনি, যে সকল কথা-সাহিত্যিক আমাদের দেশে যশঃ অর্জ্জন করেছেন,

...রা কিন্তু কেউ আপনাদের মতাবলম্বী নন। আমাদের শৈলেশ চমৎকার গল্প লিখ্‌ছে, সে—"

রুক্ষস্বরে আমি বলিয়া উঠিলাম, "রেখে দিন আপনার শৈলেশ! সে আবার গল্প লেখে! আর্টের সে জানে কি?—আচ্ছা, এখন আসি। আমাকে একবার কালীঘাটের দিকে যেতে হবে।"

তাড়াতাড়ি কালীঘাটগামী গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলাম। শৈলেশের স্তুতিবাদ সহ্য করিবার মত সহিষ্ণুতা আমাতে নাই। ঐ অবিনাশটা দেখিতেছি শৈলেশের ভক্ত! ইহারা লেখাপড়া শিখিয়া যে এমন 'গাড়ল' হইবে, ইহা কল্পনা করিতেও মনে ব্যথা লাগে। 'আর্ট' কাহাকে বলে, আর্টের স্বরূপ কি, তাহা এই সকল ডিগ্রিধারী তথাকথিত শিক্ষিতরাও যে জানে না, ইহা বাঙ্গালা দেশের দুর্ভাগ্য। কিন্তু আমি ছাড়িতেছি না, রসতত্ত্ব—অপরিমেয়, রহস্যময়, মধুর রসের ফোয়ারা সাহিত্যের মধ্য দিয়া, গল্প ও উপন্যাসের খাতে বহাইয়া দিব। এমন মধুচক্র নির্ম্মাণ করিব "গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।" অবশ্য মধুসূদনের এই ছত্রটি আমার মনে পড়িল বটে, কিন্তু আমি তাঁহার বিকট রচনার পক্ষপাতী নহি। তাঁহার 'কড়মড়ায়মান' শব্দগুলি আমার প্রাণের কোমল তন্ত্রীগুলিকে ব্যথায় ভারী করিয়া তুলে!

বিপুল উদ্যমে সাহিত্যচর্চ্চা চলিতে লাগিল। আইনের গোলক-ধাঁধায় ঘুরিয়া মরিবে কে? কথাসাহিত্য আমাকে মাতাইয়া তুলিয়াছে। এক একটা গল্প লিখিতে দুই ঘণ্টার অধিক সময় লাগিত না। এক একখানা উপন্যাস রচনায় বড় জোর এক সপ্তাহ লাগিত। প্রতীচ্য সাহিত্যের অপরিমেয় ভাণ্ডারের জয় হউক! রসদের অভাব হইবে কেন?

বঙ্কিমচন্দ্র কুক্ষণে আনন্দমঠ লিখিয়াছিলেন, অতি অশুভ মুহূর্ত্তে তিনি দেশবাসীর প্রাণে স্বদেশভক্তির অনুপ্রেরণা জাগাইয়া দিয়া গিয়াছিলেন। দেশের লোক শুধু বাঙ্গালার প্রাণের সন্ধান পাইতে চাহে। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রামপ্রসাদের গুণগানে পঞ্চমুখ হইতে চাহে। স্বদেশ-প্রেমের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া আত্মহত্যায় উদ্যত! বিরাট অনন্ত বিশ্বে যে অপূর্ব্ব প্রেমপ্রবাহ চলিতেছে, তাহার সন্ধান রাখে না—খালি সঙ্কীর্ণ কূপমধ্যে—কূপমণ্ডূকের মত স্ফীতকণ্ঠে আপনার জয়গান গাহিয়া জগতের সমক্ষে আপনাকে হেয় করিয়া তুলিতেছে। তীব্র কশাঘাতে এই শ্রেণীর পেশাদার দেশনেতাকে লক্ষ্য করিয়া একটা জমকাল প্রবন্ধ লিখিলাম। বাঙ্গালার কোনও প্রসিদ্ধ মাসিকপত্রে তাহা প্রকাশিত হইল।

আমার মতাবলম্বীরা বাহবা দিল। কতিপয় ব্যক্তির করতালি লাভে হৃদয় আনন্দ ও গর্ব্বে স্ফীত হইয়া উঠিল। এস হে, সবুজ! আমার চিত্ত-সরোজে তোমার চিরনন্দিত শ্যাম-শোভা বিকশিত করিয়া তোল। তোমার জয় হউক, তুমি বিশ্বপ্রেমের উদারবার্ত্তা লইয়া আসিয়াছ—তুচ্ছ, ক্ষুদ্র, স্বদেশ-প্রেমের সমাধি হউক! বাঙ্গালার প্রাণ চাহি না—বিশ্বপ্রাণে তাহার আবিল মূর্ত্তি শুচিশুভ্র শোভা ধারণ করিয়া চরিতার্থতা লাভ করিবে।

সে দিন কবি-যশঃপ্রার্থী এক জন নবীন সাহিত্যিক আসিয়া আমার স্বপ্নবিবশচিত্তে বড়ই বেদনা দিয়া গেল।

রবিবার। বাহিরের ঘরে বসিয়া একখানি উপন্যাসের অর্দ্ধেকটা লিখিয়া ফেলিয়াছি। রসের ঘনায়িতরূপ ক্রমেই ফুটিয়া উঠিতেছে।

"নমস্কার! সুরেন বাবু! আপনার লেখায় বাধা দিলাম না ত?"

"কিছু না, আসুন।"

"আপনার প্রবন্ধটার সমালোচনা বেরিয়েছে, পড়েছেন?"

"তাই না কি? কোন কাগজে?"

"এই যে আমি সঙ্গেই এনেছি।"

আগ্রহভরে যে আমি মাসিক পত্রিকাখানা তুলিয়া লইলাম, তাহা তাঁহাকে বুঝিতে দিলাম না। না, সম্পাদকীয় মন্তব্য নহে। স্বতন্ত্র প্রবন্ধাকারে আলোচনা—লেখক শৈলেশ মুখোপাধ্যায়।

পড়িতে পড়িতে আমার কর্ণমূল পর্য্যন্ত যে আরক্ত হইয়া উঠিতেছিল, তাহা অন্তর্নিহিত উষ্ণার আবির্ভাবে আমি নিজেই বেশ বুঝিলাম। ক্রোধে ক্ষোভে আমার হৃদয় ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিল।

সে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ খেতাব, পাণ্ডিত্য প্রভৃতির প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছে। স্বদেশ-প্রেম কি মহৎ, তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছে। কোনও প্রসিদ্ধ দেশনেতাকে কূপমণ্ডূক বলায়

এবং কোনও প্রসিদ্ধ আধুনিক কবির গুণ ব্যাখ্যায় চণ্ডীদাসকে হেয় প্রতিপন্ন করিয়াছি বলিয়া এমন তীব্রভাবে বিদ্রূপের কশা চালাইয়াছে যে, দারুণ বিদ্বেষভরে আমার চিত্ত তাহার প্রতি বিমুখ হইয়া উঠিল। কিন্তু এমন যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়া সে আমার প্রতিপাদ্য বিষয়কে বিশ্লেষণ দ্বারা পাঠক-সমাজে আমার অর্ব্বাচীনতা প্রতিপন্ন করিয়াছে যে,নিষ্ফল আক্রোশে আমার চিত্ত পূর্ণ হইয়া উঠিল। না, তাহাকে কোনও দিন আমি ক্ষমা করিতে পারিব না। সে আমার চিরশত্রু। তাহাকে চূর্ণ করিতে পারা যায় না?

বন্ধু বিদায় লইলেন। তাঁহাকে আমার ক্ষোভের আভাসমাত্র জানিতে দিলাম না। কিন্তু সে দিন উপন্যাসখানায় আর হাত দিতে পারিলাম না। সন্ধ্যার অন্ধকারে বাহিরের ঘরে নীরবে অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলাম।

৪

জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়ের চেষ্টায় আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছিল—আমি সরকারী কার্য্য পাইয়াছিলাম। মুন্সেফ হইয়া সাহিত্যচর্চ্চার যথেষ্ট অবকাশ লাভ করিয়াছি। পরিশ্রমশক্তি আমার অসাধারণ ছিল তাহা মিথ্যা নহে। মোকদ্দমাগুলি অল্প সময়ের মধ্যেই শেষ করিয়া ফেলিতাম। উপরওয়ালারা আমার উপর খুসীই ছিলেন। হাইকোর্টের কয়েকজন বিচারপতির সহিত শ্বশুর মহাশয়ের হৃদ্যতা এবং জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়ের সহিত উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীদিগের অনুকূল ঘনিষ্ঠতার প্রভাবে রাজদ্বারে আমারও সম্মান এবং প্রতিপত্তি বাড়িতেছিল। আমি এক জন খ্যাতনামা সাহিত্যিক, সে সংবাদও তাঁহারা রাখিলেন; কিন্তু আমার রচনার মধ্যে শ্বেত জাতির প্রতি কোন প্রকার কটাক্ষপাত ছিল না, বিশেষতঃ রাজার জাতির সম্বন্ধে। দেশাত্মবোধ সম্বন্ধে ইঙ্গিতে সামান্য আলোচনাও করিতাম না। অবশ্য বেশভূষায় আমি ইংরাজ সাজিতে ভালবাসি না সত্য; কিন্তু আমার মনটা যে প্রতীচ্য সাহিত্য ও সভ্যতার একান্ত পক্ষপাতী ছিল, তাহা অস্বীকার করিব না। বর্ত্তমান যুগে নর-নারী সম্বন্ধে যে মতবাদ প্রতীচ্যকে মহিমমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে, আমি তাহার একান্ত ভক্ত। প্রাচ্যের সনাতন এবং অস্থিমজ্জাগত সংস্কার আমাদের জীবনযাত্রাকে বৈচিত্র্যহীন করিয়া রাখিয়াছে; কু-সংস্কারের আওতায় মনোবৃত্তিসমূহ পল্লবিত হইতে পারিতেছে না—রসহীন শুষ্ক লতার ন্যায় তাহারা ক্রমেই শুকাইয়া উঠিতেছে—পুষ্পভারে মনোরঞ্জন করিবার শক্তি কোথায়?

উপন্যাস ও গল্পসম্ভারে বাঙ্গালা সাহিত্যকে ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত করিয়া তুলিতেছি। কিন্তু সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষকদিগের তীব্র সমালোচনা ক্রমেই শক্তিসঞ্চয় করিতেছিল। তাহারা পাঠক সমাজকে বুঝাইতে চাহে, আমার রচনায় দুর্নীতির পূতিগন্ধ—বাঙ্গালার অন্তঃপুর পর্য্যন্ত ইহাতে কলুষিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রতীচ্যের ধার করা, বস্তুতন্ত্রহীন গলিত কুষ্ঠব্যাধির ন্যায় রোগের বীজাণু মানব-দেহে নাকি আমি ছড়াইয়া দিতেছি। অচিরে কদর্য্য পুরীষপূর্ণ সাহিত্য ভাগীরথীগর্ভে নিক্ষিপ্ত না করিলে দেশের কল্যাণ নাই। বাঙ্গালী নরনারীর দেহে কুৎসিৎ ব্যাধি ফুটিয়া উঠিবে!

এই সকল স্বয়ংসিদ্ধ স্বাস্থ্যরক্ষককে কে গ্রাহ্য করে? নারীর সতীত্ব? উহা ত একটা ভুয়া কথা—মায়া মাত্র। নারীত্বের কাছে সতীত্ব? কে এক জন লেখক আমাকে বিদ্রূপ করিয়া একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছে। আবার আর এক জন বিকৃতমস্তিষ্ক সাহিত্যিক 'সতীত্বের বোটকা' গন্ধ বলিয়া আমার রচনাকে মর্ম্মান্তিক কশাঘাত করিয়াছে। শৈলেশটা দেখিতেছি আমার জীবনের শনিগ্রহ। সেও প্রবন্ধ ও গল্পে আমার রচনাগুলি লইয়া এমন অসাহিত্যিক গালাগালি দিয়াছে যে, মৃত্যুর পরপারেও আমি তাহাকে ক্ষমা করিতে পারিব না।

এক জন প্রসিদ্ধ গ্রন্থরচয়িত্রী সবুজ দলকে এমন চাবুক মারিয়াছেন যে, উহার আঘাত-বেদনা যেন আমারই অঙ্গে অনুভব করিতেছি। এই সকল সঙ্কীর্ণচেতা সাহিত্যিক কি মনে করেন, আমার উৎসাহবহ্নি এই সকল মিথ্যার সম্মার্জ্জনী আঘাতে নির্ব্বাপিত হইবে? ভ্রম! বেদান্তের মায়া!—আমার গাত্রচর্ম্ম এত সূক্ষ্ম নহে।

অনেক চেষ্টা করিয়া আলিপুর সদরে বদলী হইয়াছি। এখন কিছুকাল কলিকাতায় বাস করিতে পাইব।

দেশের মধ্যে দশের কাছে আমি এখন সাহিত্যিক সুরেন্দ্রনাথ বলিয়া সুপরিচিত। আমার গুণমুগ্ধ বহু সাহিত্যিক অনুক্ষণই আমাকে ঘিরিয়া থাকেন। স্বাস্থ্যরক্ষকের দল আমার কি করিবে?

প্রবল উৎসাহে নব ভাবের অবতারণা করিয়া আরও কয়েকখানি উপন্যাস লিখিয়া ফেলিয়াছি। অন্দের অন্তঃপুরের

...িতা রক্ষিত না হইল, আমার কি ক্ষতি? আমার ...অন্তঃপুর অক্ষুণ্ণ থাকিলেই হইল। পরকীয়া-তত্ত্ব যাহারা ...ঝে, তাহারা আমারই জয়গান করিবে। অন্ততঃ অর্থ ও ...হিত্যিক যশঃ ত প্রচুর পরিমাণে পাইব!

মাসিকপত্র ছাড়াও খান কয়েক দৈনিক বাঙ্গালা ও ...রাজী সংবাদপত্রও আমার পশ্চাতে লাগিয়াছে। দুঃখ ...য়, ইহারাও আমার মর্য্যাদা বুঝিল না! কিন্তু ক্ষতি নাই, আমিও প্রতিশোধ লইতে জানি।

"মন্দাকিনী" সম্পাদক ও কার্য্যাধ্যক্ষ উভয়েই আমার ...পরিচিত। আমি তাঁহাদের পত্রিকার এক জন বিশিষ্ট লেখক। তাঁহাদের ইচ্ছা মাসিক পত্রের সমালোচনার ভার আমি গ্রহণ করি। সম্পাদক মহাশয় নিজের রচনা লইয়া ...ব্যস্ত, তিনি নিজে কিছু করিতে পারিবেন না। আমার পাণ্ডিত্যে তাঁহাদের অনন্ত বিশ্বাস। এই অপ্রত্যা-...শিত সুযোগলাভে আমি ধন্য হইলাম। আমার চির শত্রু-...দেরকে এইবার দেখিয়া লইব।

সে দিন একটা নিমন্ত্রণ ছিল। বহু সাহিত্যিকের শুভা-গমনে উৎসব সভা বেশ জমিয়াছিল। আমি একটু আগেই গিয়াছিলাম। বহুদিন সহরের বাহিরে ছিলাম। সাহিত্যিক সম্মিলনের মোহ আমাকে মুগ্ধ করিল। শৈলেশও আসিয়া-ছিল। সে আমাকে দেখিতে পাইয়া কাছে উঠিয়া আসিল। তাহার সান্নিধ্য আমার প্রীতিপদ নহে; কিন্তু ব্যবহারিক জগতে মনের কথা প্রকাশ করিবার উপায় নাই।

ছাড়া ছাড়া ভাষায় কথা কহিতেছি, এমন সময়, আরও কয়েকজন আমাদের কাছে আসিয়া বসিলেন। ভদ্র-পরিচ্ছদধারী এক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত শৈলেশ আমার পরিচয় করিয়া দিল। শুনিলাম, তিনি এক জন বিখ্যাত ব্যবসায়ী এবং সাহিত্যরসিক। ভদ্রলোক সহসা বলিয়া উঠিলেন, "দেখুন, একটা কথা বল্‌ব, কিছু মনে করবেন না। আপনি শিক্ষিত ও ভদ্রসন্তান; কিন্তু ঐ সব ছাই পাঁশ লেখেন কেন?"

অপমানে আমার মুখ আরক্ত হইল। আশে পাশে যাহারা বসিয়া ছিলেন, মুখ টিপিয়া তাঁহারা হাসিতে লাগি-লেন। সে হাস্য যেন বৃশ্চিকদংশনের মত জ্বালাপূর্ণ। আমি প্রত্যুত্তরের কোন ভাষা খুঁজিয়া পাইলাম না।

শৈলেশ বলিয়া উঠিল, "দেখুন, এ আপনার বলা ঠিক হল না। দেশের লোক যা চায়, সাহিত্যিক তাই লেখেন। এতে সুরেন বাবুর অপরাধ কোথায়? আপনারা ঐ রকম জিনিষ না চাইলে উনিও লিখতেন না।"

ভদ্রলোক হাসিয়া বলিলেন, "এ যুক্তি আপনার নিরর্থক। কেউ যদি গলিত বিষ্ঠা ভোজনের স্পৃহা প্রকাশ করে, কোন ভদ্রলোক কি ভদ্রসমাজের মধ্যে তার পাতে সেই পুরীষ পরিবেষণ করবেন? সৎসাহিত্যিক মানুষ গড়বেন—তাদের মনকে সমুন্নত করে তুলবেন। তাদের অধঃপতনে সাহায্য করবেন না। কই আপনি ত ও-রকম লেখেন না।"

শৈলেশ মৃদুস্বরে বলিল, "আমাদের কথা ছেড়ে দিন; আমরা আবার সাহিত্যিক!"

পার্শ্বেই একজন সম্পাদক বসিয়া ছিলেন, তিনি বলি-লেন "শৈলেশ বাবুর বিনয় প্রশংসনীয়।"

একটা হাসির ঘটা পড়িয়া গেল।

আমি অমন প্রচণ্ড শীতেও ঘামিয়া উঠিতেছিলাম। আজিকার অপমানের মূলই শৈলেশ। ইহার চরম প্রতি-শোধ যদি না লইতে পারি, তবে আমি সুরেন রায় নহি।

আহারের আহ্বানে আলোচনা সে যাত্রা থামিয়া গেল। কিন্তু ভোজনশেষে আর মুহূর্ত্তমাত্র আমি সেখানে অপেক্ষা করিলাম না।

৩

"মন্দাকিনী"র মাসিক সাহিত্য সমালোচনা সাহিত্যিক সমাজকে চকিত করিয়া তুলিল। সমাজপতি "সাহিত্যে" প্রচণ্ড কশাঘাত চালাইতেন। তাঁহার অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে সমালোচনা বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে প্রায় নির্ব্বা-সিত হইয়াছিল। কদাচিৎ দুই একখানি সাময়িক পত্রে যে আলোচনা হইত, তাহার মূল্য কতটুকু?

সব্যসাচীর ন্যায় আমি উভয় হস্তেই অব্যর্থ বাণ নিক্ষেপ করিতে পারিতাম। কাব্য, সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, চিত্রকলা—কথাসাহিত্যের ত কথাই নাই—সকল বিষয়েই আমার অপ্রতিহত অধিকার। অসংখ্য মাসিক-পত্রে প্রকাশিত অসংখ্য প্রবন্ধাদির কি সব পড়িয়া উঠা সম্ভবপর? কিন্তু সমালোচনা তাহাতে বন্ধ থাকে না। মামুলী মন্তব্য চালাইলে কে বুঝিবে যে, না পড়িয়া সমালোচনার খড়্গা সঞ্চালিত হইতেছে। কোন কবি লিখিয়াছেন, "ঘোষণা।" দেখিলাম, লেখকটি আমার

দলের নহেন। লেখনী অবাধে বিষ বর্ষণ করিল—রাস্তায় ঢেঁড়া দেওয়ারই মত, ঢোলের আওয়াজ কাণে আসিতেছে, কিন্তু কথা বুঝা যাইতেছে না। কেহ লিখিয়াছেন, "ভাঙ্গা!" ভাঙ্গাকে ভয় করিও না, এই সূত্রটুকু পাকাইয়া পাকাইয়া শত হস্ত লম্বিত করিয়া কবি নিরস্ত হইয়াছেন! এমনই ভাবে সমাজপতি অপেক্ষাও যে আমি রসজ্ঞ সমালোচক, তাহার পরিচয় দিতে লাগিলাম। চিত্র সমালোচনায় আমি কত বড় ওস্তাদ, তাহারও পরিচয় সমালোচনায় পরিস্ফুট হইতে লাগিল। প্রত্যেক শিল্পীকে উপদেশ দিতাম, এখনও শিল্পীকে দীর্ঘকাল ড্রয়িং শিখিতে হইবে। বর্ণ ও তুলিকার সাহায্যে পট আঁকা যায়; কিন্তু চিত্র হয় না। সম্পাদকগণ কেন যে অর্থ ব্যয় করিয়া এই সকল চিত্র মুদ্রিত করেন, তাহা বিশেষজ্ঞগণের অনুসন্ধানের যোগ্য।

"মন্দাকিনীর" সমালোচক যে সর্ব্ববিদ্যাপারদর্শী, এ খ্যাতি অল্প দিনেই রটিয়া গেল। কথা-সাহিত্যের সমালোচনার সময় আমি অননুভূতপূর্ব্ব উৎসাহ অনুভব করিতাম। যে সকল লেখক গণিকাতন্ত্র সাহিত্যের বিরোধী—ইজ্‌ম্‌দোষদুষ্ট বলিয়া নবযুগের সাহিত্যকে যাহারা ঘৃণা করে, তাহাদের রচনাকে নির্ম্মমভাবে সমালোচনা করাই আমার ব্রত হইয়াছিল। সহস্র সহস্র পাঠক সে সকল কথা-সাহিত্যের প্রশংসা করিলেও আমার লেখনী ও মন তাহা কখনই স্বীকার করিতে পারিত না। আমার মতের বিরুদ্ধ দলের কোন প্রবীণ ঔপন্যাসিকের একটা ছোট গল্প পড়িয়া আমার স্ত্রী অত্যন্ত প্রশংসা করিলেন। তাঁহার সম্মুখে কোন মন্তব্য প্রকাশ করিলাম না; কিন্তু সমালোচনায় বাহির হইল,—গল্পের আরম্ভ অনবদ্য, কিন্তু শেষটা অত্যন্ত কাঁচা। গল্পলেখককে উপদেষ্টায় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলায় অস্বাভাবিক পরিসমাপ্তিতে গল্পের সমাধি হইয়াছে। বাস্তবিক সমাধি না হইলেও এ গল্পের সমাধি দেওয়া যে আমার ব্রত।

কিন্তু আমার চির বৈরী শৈলেশকে কায়দা করিতে পারিতেছি না। তাহার কতকগুলি গল্প ও প্রবন্ধ সাধারণে প্রশংসিত হইলেও আমি বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছি বটে; কিন্তু মনের মত করিয়া তাহাকে অপদস্থ করিতে পারি নাই। কারণ, তেমন সুযোগ বা ফাঁক পাই নাই। কিন্তু হাল ছাড়ি নাই। এক দিন তাহাকে আমার কবলে পড়িতে হইবেই।

সুযোগ শীঘ্রই ঘটিয়া গেল। সম্পাদক মহাশয় আমার উপর সে মাসের সম্পাদন ভার দিয়া কিছুদিনের জন্য স্থানান্তরে গিয়াছিলেন। এবার আর তাঁহার সহিত আলোচনা করিয়া সমালোচনা বাহির করিতে হইবে না। একখানা প্রসিদ্ধ মাসিকে শৈলেশের একটা গল্প বাহির হইয়াছিল। নির্ম্মমভাবে তাহার আলোচনা করিলাম। লেখক যে পরের নকল করিয়া গল্প লেখে—মৌলিকতার অপবাদ তাহাকে অতি বড় মিত্রও দিতে পারিবে না, এ সকল মন্তব্য সরস করিয়া সন্নিবিষ্ট করিলাম। শৈলেশটা এমনই কাপুরুষ যে, মহিলাদিগকে কয়েকজন গোরার আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে গিয়া তাহাদিগকে নিষ্ঠুর ভাবে প্রহার করার বর্ণনা করিয়াছিল। গোরার অঙ্গে বাঙ্গালীর হস্তার্পণ! সর্ব্বনাশ, আমি সরকারের নিমকভোজী—প্রতীচ্য ভক্ত, আমি ইহার তীব্র প্রতিবাদ না করিলে নিরয়গামী হইব যে! মন্তব্য লিখিলাম—পথে ঘাটে যেখানে সেখানে যখন বাঙ্গালীরা সাহেব দেখিয়া এখনও ভয়ে মরে, সেখানে কেবল ঘরে বসিয়া কালির আঁচড়ে এমন বীরত্ব দেখান একটা লজ্জাকর কাপুরুষতা! বেশ জমকাল গালাগালি হইল না কি? শৈলেশ যে আর্টের নামে শিহরিয়া উঠে, বিদ্রূপভরে তাহারও উল্লেখ করিতে ইতস্ততঃ করিলাম না। এরূপ রচনা যে কূপমণ্ডুক বাঙ্গালীর গুলীর আড্ডার আসর জমাইবার উপযুক্ত, কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে অপাংক্তেয়, তাহাও লিখিয়া দিলাম।

এত দিনে মনের ক্ষোভ অনেকটা জুড়াইল। কাগজের অর্ডার দিয়া পরম নিশ্চিন্ত মনে গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। আজ আমার তখন নৃত্য করিতে ইচ্ছা হইতেছিল। একটা গানের চরণ গুনগুন করিয়া সুরে গাহিয়া ফেলিলাম।

গৃহে বিদ্যুতের আলো জ্বলিতেছিল। ঝির ঝির করিয়া বাতাস খোলা জানালা দিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল। গৃহিণী নিবিষ্ট মনে কি পড়িতেছিলেন। আমার গৃহপ্রবেশ তিনি লক্ষ্যই করিলেন না।

মনটা অত্যন্ত প্রফুল্ল ছিল। দুঃশাসনের রক্তপান

দিয়া দ্বাপরে ভীমসেনও বোধ হয় এমন প্রসন্নতা লাভ করেন নাই! বস্ত্র ত্যাগ করিয়া নিঃশব্দে পশ্চাতে গিয়া তাহার চক্ষু যুগল চাপিয়া ধরিলাম।

গৃহিণী বলিলেন, "আঃ কি কর! পড়তে দাও।"

"কি এমন পড়্‌ছ যে, একটুতেই বিরক্ত হ'লে?"

"যাও—এখন বাধা দিও না। বড় চমৎকার লিখেছে।"

মাসিক পত্রখানার দিকে চাহিয়াই চমকিয়া উঠিলাম। এই মাত্র শৈলেশের রচিত যে গল্পটাকে ব্যর্থ, অপদার্থ রচনা বলিয়া মন্তব্য ছাপিতে দিয়া আসিলাম, আমারই সহ-ধর্ম্মিণী রুদ্ধনিঃশ্বাসে তাহাই পাঠ করিতেছেন!

"ও সব রাবিশ কেন পড়ছ!"

"রাবিশ!" গৃহিণীর সুন্দর তনুলতা আন্দোলিত হইয়া উঠিল। তিনি গাঢ়স্বরে বলিলেন, "এমন চমৎকার গল্প অনেকদিন পড়িনি। তুমি না পড়েই সমালোচক। কি আর বলব!"

পড়া বোধ হয় সমাপ্ত হইয়াছিল। কয়েক মুহূর্ত্ত বাহিরের অন্ধকারের দিকে স্তব্ধভাবে চাহিয়া থাকিয়া পত্নী বলিলেন, "তোমার একটা লেখাও যদি এই রকমের হ'ত!"

লজ্জা ও ক্ষোভের তিক্ততায় আমার হৃদয় যেন বিষাইয়া উঠিল। কিন্তু তাঁহাকে কিছু বলিবার উপায় ছিল না। তিনি প্রকৃত সাহিত্যরসিকা এবং বিদুষী। সাধারণ নারীর পর্য্যায়ে তাঁহাকে ফেলা চলে না। সংস্কৃত, ইংরাজী ও বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার অনুরাগ ও অধিকার উপেক্ষার যোগ্য নহে। তাঁহার যুক্তিসঙ্গত স্বাধীন মতের বিরুদ্ধে আমি কোনও দিন কথা বলিতে সাহস করি নাই। রুদ্ধবীর্য্য ভুজঙ্গের ন্যায় নিঃশব্দে রহিলাম। আজিকার অর্জ্জিত আনন্দটা, উপভোগ করিবার পূর্ব্বেই, ইন্দ্রধনুর ন্যায় মেঘের কোলেই মিলাইয়া গেল!

৬

আজ আদালত বন্ধ ছিল। সারাদিন সাহিত্য-সেবা করিয়াছি। সন্ধ্যার সময় মোটরে চড়িয়া একটু বেড়াইয়া আসিব বলিয়া বাহির হইতেছি, এমন সময় সম্পাদক মহাশয় দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত।

ফিরিয়া বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিলাম। ভৃত্য আলো জ্বালিয়া দিল। তাহাকে চা আনিতে বলিলাম।

কিন্তু বন্ধুবরের মুখ এত গম্ভীর কেন?

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কবে ফিরলেন?"

"আজ সকালে।"

"আপনার শরীরটা কি ভাল নেই?"

"না, শরীর ভালই আছে; কিন্তু মনটা বড়ই খারাপ হয়ে গেছে। আপনি আমাকে বড় বিপদে ফেলেছেন।"

"সে কি? আমি আপনাকে বিপদে ফেল্‌লাম?"

একটা চুরুট ধরাইয়া লইয়া গম্ভীরপ্রকৃতি সম্পাদক মহাশয় গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "দেখুন, শৈলেশ বাবুর যে গল্পটা সম্বন্ধে আমি অন্ততঃ দশ জন সাহিত্যিক বন্ধুর কাছে উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করেছি, আমারই সম্পাদিত কাগজে তার নির্লজ্জ সমালোচনা বেরিয়েছে। আপনাকে আমি বিশ্বাস কর্ত্তাম; কিন্তু দায়িত্বটা ত আমার!"

প্রকৃতিস্থ হইতে একটু সময় লাগিল। চেষ্টা করিয়া ওষ্ঠপ্রান্তে হাসির রেখা টানিয়া আনিলাম বটে, কিন্তু স্থায়ী হইল না, তাহা বুঝিলাম।

স্খলিতকণ্ঠকে যথাসাধ্য স্বাভাবিক রাখিয়া বলিলাম, "নির্লজ্জ সমালোচনা আপনি কাকে বলেন? গল্পের আর্ট সম্বন্ধে—"

বাধা দিয়া সম্পাদক মহাশয় বলিলেন, "দেখুন ও কথা ছেড়ে দিন। আপনি বোধ হয় ভাল ক'রে না প'ড়ে সমালোচনা করেছেন। সেটা অসম্ভব নয়; কিন্তু ও সমালোচনাকে দয়া ক'রে সমর্থন করবেন না। বর্ত্তমান যুগে—বাঙ্গালী যখন নির্ভীকতা ও বীরত্বের সহস্র প্রমাণ দিয়েছে, তখন সামান্য গোটা দুই তিন গোরাকে একটা মল্লবীর, মুষ্টিযোদ্ধা বাঙ্গালীর পক্ষে কাবু করা খুবই সোজা কথা। অন্ততঃ আমি নিজেই অমন দু একটা দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছি।"

ইহার উপর আর তর্ক চলে না। সম্পাদক বন্ধু চা পান করিয়া চলিয়া গেলেন। নাঃ, আজ আর বেড়াইতে যাওয়া হইল না।

* * * *

পূজার ছুটী আসিয়া পড়ায় দেশে চলিয়াছি। দুই বৎসর যাই নাই। বাবা ও জ্যেঠা মহাশয় বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন, গৃহিণী ও দুইটি পুত্রকন্যা সঙ্গে আছে। চাপরাশি রামদীনকেও সঙ্গে লইয়াছি। সে আমার বিশেষ অনুরক্ত।

সঙ্গে লট-বহরও যথেষ্ট ছিল। ষ্টীমার হইতে নামিয়া প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে খাল। নৌকায় চড়িয়া সৈদপুরে পৌঁছিতে হইবে।

শরতের অপরাহ্ণে ষ্টীমার হইতে নামিলাম। আজিকার ইংরাজী কাগজ ষ্টীমারে উঠিবার সময় সকালেই কিনিয়া লইয়াছিলাম। উহাতে সাহিত্যসংক্রান্ত আলোচনা স্তম্ভে আমাকে আক্রমণ করিয়া তীব্র মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল। লেখক আমাকে দুর্নীতির প্রচারক, লম্পটতার প্রশ্রয়দাতা প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছিল। এ জন্য সারাদিন আমি কেবিনের মধ্যেই আবদ্ধ ছিলাম। প্রকৃতির মনোহারিণী শোভা আমার ক্ষুব্ধ চিত্তকে শান্ত করিতে পারে নাই।

ষ্টীমার হইতে নামিয়া রামদীনকে কুলীর সন্ধান লইতে বলিলাম। খালের নৌকার মাঝিরা নমঃশূদ্র জাতীয়। তাহারাই মোট নৌকায় বহিয়া লইয়া যায়।

কিয়ৎক্ষণ পরে রামদীন ফিরিয়া আসিয়া জানাইল যে, কোন মাঝি বা কুলী মোট লইবে না, নৌকাও ভাড়া দিবে

না। অনেকদিন আমি দেশে আসি নাই, সুতরাং এ দিকের কোন সন্ধান রাখিতাম না। রামদীনের সংবাদ হেঁয়ালীর মতই লাগিল। ব্যাপার কি জানিবার জন্য অগ্রসর হইলাম। রামদীন তাহার প্রকাণ্ড বাঁশের লাঠিটা ঘাড়ে ফেলিয়া অনুবর্ত্তী হইল। গৃহিণীও সঙ্গে চলিলেন।

একস্থানে কয়েকজন নমঃশূদ্র মাঝি দাঁড়াইয়াছিল। তাহারা নৌকার যাত্রীর সন্ধানেই আসিয়াছিল। আমি নৌকা ভাড়া করিতে চাহিলে, একজন প্রশ্ন করিল, "আপনারা ব্রাহ্মণ?"

নিশ্চয়। কিন্তু সে কথা কেন?

তাহারা জানাইল যে, সম্প্রতি তাহারা সভা করিয়া স্থির করিয়াছে, কোনও নমঃশূদ্র কোনও ব্রাহ্মণ যাত্রীকে নৌকায় লইবে না বা তাহার মোট বহিবে না।

আমার হাকিমী মেজাজ তাহাদের এই প্রগল্‌ভতা সহ্য করিতে পারিল না। কঠোরস্বরে তাহাদিগকে জানাইলাম যে, আমি হাকিম। কথা না শুনিলে তাহাদিগকে জেলে পাঠাইব।

একজন যুবক বিদ্রূপভরে হাসিয়া উঠিল।

স্বনামধন্য শক্তিমান্ সরকারের আমি একজন হাকিম—বিচারক! সঙ্গে চাপরাশযুক্ত আর্দ্দালী! যুবকের বিদ্রূপে পিত্ত জ্বলিয়া গেল। গৃহিণীর সম্মুখে, ভৃত্যের সম্মুখে এ উপেক্ষা সহ্য করিতে হইবে?

"রামদীন উস্‌কা কান্ পাকাড়্‌কে লাও।"

রামদীন লাঠি বাগাইয়া অগ্রসর হইল। তাহার মুখ দিয়া তখন গালাগালি বর্ষিত হইতেছিল।

৪।৫ জন যুবক রুদ্রমূর্ত্তিতে ছুটিয়া আসিল। রামদীন তাহাদের একজনকে আঘাত করিতেই ক্রুদ্ধ শার্দ্দূলের ন্যায় তাহারা তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। বৃহৎ বংশযষ্টি মুহূর্ত্তে তাহার হস্তচ্যুত হইল। আমি সক্রোধে তাহাদের দিকে ধাবিত হইলাম। তখন তাহারা "মারো হাকিম শা—" বলিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিল।

সহসা একটা অভাবনীয় ঘটনা ঘটিয়া গেল। বিদ্যুতের ন্যায় এক ব্যক্তি আমাদের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল। তাহার উদ্যত বজ্রমুষ্টির আঘাতে মুহূর্ত্তে দুইজন ধরাশায়ী হইল। তৃতীয় ব্যক্তিকে শূন্যে তুলিয়া সে ফেলিয়া দিল।

কয়েকজন মাতব্বর মাঝি ছুটিয়া আসিয়া আগন্তুককে বলিল, "দাদাঠাকুর আপনি! ওরে সব থামা দে; আমাদের দাদাঠাকুর!"

মুহূর্ত্তমধ্যে এত কাণ্ড ঘটিয়া গেল।

রক্ষাকর্ত্তার দিকে কৃতজ্ঞ ভাবে চাহিতেই দেখিলাম, আমার চিরশত্রু শৈলেশ!

এ কি হইল? শৈলেশ কোথা হইতে আসিল! সে-ও কি পূজার সময় দেশে চলিয়াছে!

মাঝির দল ধূলা ঝাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। শৈলেশ বলিল, "তোরা এমন অধঃপাতে গেছিস! আচ্ছা মধুসর্দার, তোমরা আমাদের গ্রামের নাম হাসাবে?"

মধু অগ্রসর হইয়া বলিল, "দাদা ঠাকুর, মিটিং ক'রে মোড়লরা যে খবর পেঠিয়েছে, বামুন দেখলি নায়ে নেবা না—মোট বইবা না। তা আমাগোর কি কসুর কন্ তো?"

"আরে সে সভায় ত আমিও ছিলাম। তোরা কি বুঝতে পারিস নি। যে ঠাকুর মশাইরা তোদের ঠাকুর-বাড়ীতে ঢুকতে দেবে না, তাদের সঙ্গেই ও রকম করার কথা। নে, এখন মোটগুলো তুলে নে। দেখছিস নে ভদ্র লোকের মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। হাকিম বাবুর কষ্ট হচ্ছে। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের কোলে ক'রে নে।"

"তা দাদাঠাকুর, এর জন্যি সমাজে দণ্ড দিতি হবে না?"

"আরে না না, সে আমি বুঝব। এখন চল।"

বুঝিলাম শৈলেশ ইহাদের দলেও নেতৃত্ব করে। ও আমার চিরশত্রু বটে; কিন্তু আজ শৈলেশ না থাকিলে অদৃষ্টে নানা লাঞ্ছনাই ছিল।

মোট প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া সে রামদীনকে মাঝিদের সঙ্গে পাঠাইল। তার পর আমার পার্শ্বে আসিয়া বলিল, "চল ভাই।"

মনে অত্যন্ত সঙ্কোচ অনুভব করিতেছিলাম। বোধ হয়, শৈলেশ তাহা অনুমানও করিয়া থাকিবে। সে মৃদু হাসিয়া বলিল, "এখানে গোরা ২।৪ জন নেই, থাকলে তোমাকে একটা খেলা দেখিয়ে দিতুম, ভাই। তবে এই নমঃশূদ্ররাও কম যায় না। এদের লাঠিখেলা তুমি দেখ নি বোধ হয়?"

আমি কথা কহিতে পারিতেছিলাম না। জিহ্বা যেন আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছিল। শৈলেশ বলিল, "সাহিত্যক্ষেত্রে আমাদের মতের পার্থক্য থাকতে পারে। কিন্তু আমি তোমার শত্রু নই। হ'তে পারি না।"

"ছোট মামা!"

আমার স্ত্রী নীলিমা এতক্ষণে কথা কহিল।

আমি সবিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিলাম। শৈলেশ হাসিয়া বলিল, "হাঁ, আমি তোমার স্ত্রীর সম্পর্কে মামা। তোমার শাশুড়ী ও আমি মামাত পিসতুত ভাই। কিন্তু তুমি আমার প্রতি বিমুখ ব'লে এ সম্বন্ধের কথা তোমাকে জানাতে আমি সকলকে নিষেধ করে দিয়েছিলুম। সম্পর্কের দাবী দ্বারা বন্ধুত্ব করার আমি বিরোধী।"

নৌকায় তুলিয়া দিয়া শৈলেশ বলিল, "আচ্ছা, তবে আসি। আমার আলাদা নৌকা আছে।"

সজোরে হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম, "সে হবে না, দু'জনে এক নৌকায় যাব।"

ষড়রিপুর প্রাধান্য ত্যাগ করিতে পারিব কি?

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

চীনের বর্ত্তমান অবস্থা

যাঁহারা চীনের জাতীয়দলের অভ্যুত্থানের ইতিহাস পূর্ব্বাপর আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতেছেন, চীনের স্বাধীনতার শত্রুগণের ভবিষ্যবাণী একটিও সফল হয় নাই। ইঁহারা হ্যাঙ্কো ও সাংহাই পতনের কালে বলিয়াছিল যে, য়ুরোপীয় ও মার্কিণ শক্তিপুঞ্জ একযোগে চীনকে সমুচিত দণ্ড দিবে, জাতীয়দলের উত্তরোত্তর জয়যাত্রায় বাধা পড়িবে। তাহাদের সে কথা সত্য হয় নাই, কারণ, মার্কিণ, জাপ ও ফরাসী চীনের জাতীয় দলের বিপক্ষে কঠিন ব্যবস্থা করিতে সম্মত হয়েন নাই। তাহার পর তাহারা রটাইল যে, ইংরাজ যদি চীনের জাতীয়দলের নিকট উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ না পান, তাহা হইলে তিনি একাই চীনের দণ্ডবিধানে অগ্রসর হইবেন। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, তাহাদের এই ভবিষ্যবাণীও সফল হয় নাই।

কিন্তু তাহারা নিশ্চিন্ত থাকিবার নহে। তাহারা আবার রটাইল যে, জাতীয়দলের মধ্যে দল-ভাঙ্গাভাঙ্গি হইয়াছে। জাতীয়দলের প্রধান সেনাপতি জেনারল চিয়াঙ্গ কাইসেক নানকিংয়ে নিজের আড্ডা স্থাপন করিয়া হ্যাঙ্কোর কম্যুনিষ্টদলের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়াছেন এবং কম্যুনিষ্টদিগের দণ্ডবিধানে উদ্যোগী হইয়াছেন। আরও রটিল যে, হ্যাঙ্কোর কম্যুনিষ্ট কর্ত্তা ইউজিন-চেন এবং রাসিয়ান বোরোডিন ও গ্যালেনকে ধরিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে, পরন্তু চিয়াঙ্গ কাইসেক এ জন্য উত্তরের দস্যু সর্দ্দার চাঙ্গ সো লিন ও সান-চুয়ান-ফেঙ্গের সহিত মিলিত হইবেন এবং বৈদেশিকদিগের সকল ক্ষতিপূরণ করিয়া দিবেন। কিন্তু এ রটনাও সত্য হইল না। আজিও বৈদেশিকেরা ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত হয়েন নাই, আজিও চাঙ্গ-সো-লিন ও চাঙ্গ-কাইসেকে মিলন হয় নাই, আজিও ইউজিন-চেন ও বেরোডিন বাঁচিয়া আছেন ও হ্যাঙ্কোর কর্ত্তৃত্ব করিতেছেন।

ফল কথা, জাতীয়দল পূর্ব্ববৎই প্রভাব ও প্রতিপত্তিশালী রহিয়াছে। এই সমস্ত রটনার পরেও তাহারা উত্তরে পীত নদীর তটপ্রান্ত পর্য্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী দস্যুসর্দ্দারদিগকে হটাইয়া লইয়া গিয়াছে। শীঘ্র পিকিং ও টিয়েণ্টসিনে যুদ্ধ হইবে বলিয়া সংবাদও পাওয়া গিয়াছে। তাহা হইলে চীনের জাতীয়দল যে এখনও বিলক্ষণ জীবন্ত রহিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কেবল তাহাই নহে, খৃষ্টান সেনাপতি জেনারল ফেঙ্গ উসিয়াং—যিনি এতদিন চাঙ্গ সো-লিন ও উপেইফুর সম্মিলিত শক্তির ভয়ে মঙ্গোলিয়ায় পলাইয়া আত্মগোপন করিয়াছিলেন, সেই খৃষ্টান সেনাপতি ফেঙ্গ এখন পশ্চিম সীমানা হইতে বাহির হইয়া জাতীয়দলের সহিত মিলিত হইয়াছেন। তাহা হইলেই বুঝা যায়, জাতীয়দল চাঙ্গ সো লিনকে এত বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল যে, চাঙ্গের পক্ষে ফেঙ্গকে বাধা দিবারও শক্তি ছিল না। ফেঙ্গ এখন ইউজিন-চেন ও বোরোডিন কর্ত্তৃক হ্যাঙ্কোর জাতীয়দলের সেনাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন, কারণ তাঁহার পূর্ব্বে চাঙ্গ কাইসেকের সহিত হ্যাঙ্কোর বিচ্ছেদ হইয়াছে, এ কথা বলিয়াছি।

বর্ত্তমানে চাঙ্গ কাইসেকের সম্বন্ধে দুই ভাবের কথা শুনা যাইতেছে। আমরা পূর্ব্বে প্রবন্ধান্তরে বলিয়াছিলাম যে, চাঙ্গ বিষম দোটানায় পড়িয়াছেন, কি করিবেন ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছেন না। পরবর্ত্তী সংবাদ যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে এ কথা সত্য বলিয়া মনে হয়। কেন না, চাঙ্গ-সো-লিন প্রকাশ করিয়াছেন যে, চাঙ্গ কাইসেকের সহিত তাঁহার মিলনের সম্ভাবনা নাই, কারণ চাঙ্গ কাইসেক বাহিরে যতই কম্যুনিষ্ট-বিদ্বেষ প্রকাশ করুন, ভিতরে তিনি আদৌ কম্যুনিষ্ট বিদ্বেষী নহেন; অতএব চাঙ্গ-সো-লিন একাই সমস্ত কম্যুনিষ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করিবেন। চাঙ্গ সো-লিনের এ কথা সত্য হইলে বুঝিতে হইবে, কুওমিণ্টাঙ্গের ঘর-ভাঙ্গাভাঙ্গি হয় নাই, চাঙ্গ কাইসেক নানকিং ও সাংহাই অধিকারের পর একটা রাজনীতিক চাল চালিয়াছিলেন মাত্র। তাহাই যেন সম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে। কেন না, খৃষ্টান সেনাপতি ফেঙ্গ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন বলিয়াও সংবাদ আসিয়াছিল। ফেঙ্গ এখন হ্যাঙ্কোর কম্যুনিষ্টদিগের প্রধান সেনাপতি। তিনি যখন চাঙ্গ কাইসেকের সহিত সাক্ষাৎ ও কথাবার্ত্তা কহেন, তখন নিশ্চিতই হ্যাঙ্কোর ও নানকিংয়ের মধ্যে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় নাই। চাঙ্গ-সো-লিন সত্য কথাই বলিয়াছেন।

হ্যাঙ্কোর জাতীয়দলের পতন হয় নাই, হইবে বলিয়াও মনে হয় না, কেন না, তাহাদের পথ ন্যায় ও সত্যের পথ, দেশের মুক্তি তাহাদের লক্ষ্য। তবে যদি ভবিষ্যতে ইহাতে দোষ ও স্বার্থ স্পর্শ করে, তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা। মাত্র কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে সাংহাইয়ের ইংরাজ সম্পাদিত সংবাদপত্রসমূহ জগৎ জুড়িয়া রাষ্ট্র করিয়াছিল যে, হ্যাঙ্কোর পতন প্রতি মুহূর্ত্তেই সম্ভবপর, বিলাতের পত্রসমূহও অমনই সে কথার প্রতিধ্বনি করিয়াছিল। একদিন খবর আসিল, তিন দিক হইতে তিনটি শক্তি (চাঙ্গ-সো লিন, চাঙ্গ কাইসেক ও টিং ইয়েন-সেন) হ্যাঙ্কোর জাতীয়দলকে ঘিরিয়া টিপিয়া মারিবার জন্য যাত্রা করিয়াছে; পরন্তু ইউজিন চেন ও বোরোডিন উড়োকলে চড়িয়া হ্যাঙ্কো হইতে পলাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। কোন পত্রে এমনও রটিল যে, বোরোডিন বে-গতিক দেখিয়া ইতোমধ্যেই হ্যাঙ্কো পরিত্যাগ করিয়াছেন! আবার অন্য পত্র রটাইলেন যে, চাঙ্গ-সো-লিন আর দুই চারি দিনের মধ্যেই হ্যাঙ্কো আক্রমণ ও অধিকার করিবেন।

এই সাম্রাজ্যবাদী সংবাদ প্রচারকের দল মিথ্যা রটনায় কিরূপ সিদ্ধহস্ত, তাহার আরও নিদর্শন আছে। যখন চিয়াঙ্গ কাইসেকের সহিত হ্যাঙ্কোর জাতীয়দলের বিচ্ছেদ হইল, তখন অতর্কিতভাবে জেনারল ফেঙ্গ চীনের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইলেন, হ্যাঙ্কোর জাতীয়দল তাঁহাকে সেনাপতির পদে বরণ করিলেন। অথচ ইহার পূর্ব্বে সাম্রাজ্যবাদীরা রটাইয়াছিল যে, ফেঙ্গ মঙ্গোলিয়ায় লুকাইয়া আছেন বটে, কিন্তু তিনি চাঙ্গ সো-লিনের তাড়া খাইয়া মঙ্গোলিয়া ছাড়িয়া শীঘ্রই রাসিয়ায় পলাইতে বাধ্য হইবেন। কি সত্যবাদিতা! যিনি রাসিয়ায় পলাইতে উদ্যত, তিনি কি 'বন থেকে টিয়ার' মত 'সোনার টোপর মাথায় দিয়া' বাহির হইলেন? এই সত্যবাদীর দল তাহার পরেই রটাইলেন, ফেঙ্গ, চিয়াঙ্গ কাইসেক ও চাঙ্গ-সো-লিনের সহিত যোগদান করিয়া হ্যাঙ্কোয়

বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহাদের এই সংবাদও মিথ্যা বলিয়া পরে প্রতিপন্ন হইল। ফেঙ্গের শত্রুপক্ষে যোগদান করার কথা দূরে থাকুক, এখন লণ্ডনের সংবাদপত্রসমূহও অস্বীকার করিতে পারেন না যে, ফেঙ্গ, চিয়াঙ্গ কাইসক এবং টিং-ইয়েন-সেনের সম্মিলিত বাহিনী দ্রুতগতি পিকিং আক্রমণ ও অধিকার করিতে ধাবমান হইয়াছে। তাঁহাদের জয়যাত্রা সফল হউক, চীনের স্বাধীনতার স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হউক, ইহাই নিরপেক্ষ মাত্রেরই কামনা।

১৬ বৎসর পূর্ব্বে চীনের মুক্তিমন্ত্রের পুরোহিত ডাক্তার সান ইয়াটসেন চীনদেশের স্বেচ্ছাচারী মাঞ্চু রাজবংশকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া সাধারণতন্ত্র শাসন প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগ করিয়া ইউয়ান-সি-কাইকে আপনার অপেক্ষা অধিক উপযুক্ত মনে করিয়া প্রথম প্রেসিডেণ্ট-পদে বরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইউয়ানের স্বার্থপরতায় সানের আন্তরিক কামনা পূর্ণ হইল না, সান নানা বিপদ ও কষ্টের পর দক্ষিণে কাণ্টনে তাঁহার মনের মত এক সাধারণতন্ত্র গভর্ণমেণ্ট গড়িয়া তুলিলেন। আজ তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তাঁহার 'হাতে-গড়া' জাতীয় কুওমিণ্টাঙ্গদল চীনের মুক্তির পথে জয়যাত্রা করিয়াছে। তাহাদের সহায় (১) ছাত্র আন্দোলন, (২) শ্রমিক আন্দোলন, (৩) রাসিয়ার সহানুভূতি ও সাহায্য। তাহাদের লক্ষ্য, (১) চীন হইতে সামরিক দস্যুদলপতিদের উচ্ছেদসাধন, (২) চীন হইতে বৈদেশিকের প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বের অবসান, (৩) সকল প্রকার অন্যায় সন্ধি ও অধিকারের বিলোপসাধন।

এই ন্যায়ধর্ম্মের যুদ্ধে ভগবান নিশ্চিতই চীনের জাতীয়দলের সহায় হইবেন।

রাসিয়ার সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছেদ

বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট রাসিয়ার সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিয়াছেন কেন, ইহার কারণ তাঁহারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই কারণের পরিচয় আমরা পূর্ব্বের সংখ্যায় প্রদান করিয়াছি।

কিন্তু এখন কোন কোন ইংরাজই বলিতেছেন যে, রাসিয়ান সোভিয়েট শান্তিকামী, সোভিয়েট সকল জাতির মুক্তির পক্ষপাতী এবং জগতের শ্রমিক ও নিপীড়িতদিগের বিপক্ষে যে সকল সাম্রাজ্যবাদী ধনী চক্রান্ত করিতেছে, তাহারা তাহাদের মঙ্গলকামনা করে না বলিয়া তাহাদের নামে এই ষড়যন্ত্রের অপবাদ দিতেছে। তাঁহারা বলেন, সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়া অধিকার প্রয়াসী ধনীর দল রাসিয়া ও চীনের বিপক্ষে আর এক বিশ্বযুদ্ধের অবতারণা করিবার উদ্দেশ্যে নানা চক্রান্ত করিতেছে।

বিলাত হইতে সোভিয়েট রাসিয়ার যে দূত সম্প্রতি নির্ব্বাসিত হইয়াছেন, সেই মুসিয়ে রোসেনগল্জ্ বিলাত ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে বলিয়াছেন,—"মুখে সকল জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের কথা স্বীকার করিয়া এবং চীনদেশে অন্যায় অধিকার (Exta-territorial rights) ছাড়িয়া দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া বৃটিশ রাজনীতি পূর্ব্বাপর চীনদেশের জাতীয়দলের বিপক্ষদলের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছে। তাহার ভয়, পাছে চীনের জাতীয়দলের জয়ের প্রভাব ভারতে ও মিশরে বিস্তৃত হয়!"

রোসেনগল্জ্ 'নিউ লিডার' পত্রে 'আমার বিদায়' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "রাসিয়ান বাণিজ্য কার্য্যালয়ে সরকারী দলিল চুরী করিয়া রাখা হইয়াছিল এবং তাহার ছায়াচিত্র তথায় পাওয়া গিয়াছে, এই অজুহতে রাসিয়ার সহিত বৃটিশ সরকার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়াছেন। এই মিথ্যা কথার কোনও ভিত্তি নাই। রাসিয়ার সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছেদ ঘটানই উদ্দেশ্য ছিল, তাই এই গল্প রচনা করা হইয়াছে। আসল কথা, চীনের বর্ত্তমান অবস্থাই এই সম্বন্ধ-বিচ্ছেদের মূল কারণ। চীনের জাতীয়দল জয়যুক্ত হইলে ভারতে ও মিশরে তাহার ফল অনিষ্টকর হইবে, এই আশঙ্কায় অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ন্যায় বৃটিশ গভর্ণমেণ্টও মুখে চীনের অন্যায় অধিকার ছাড়িবার কথা বলিলেও কার্য্যক্ষেত্রে জাতীয়দলের বিপক্ষদলের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছেন। রাসিয়ান সোভিয়েট কিন্তু অন্তরেও চীনের মুক্তিযুদ্ধে জাতীয়দলের জয়ের পক্ষপাতী। বৃটিশ বৈদেশিক-সচিব এই হেতু চীনদেশে রাসিয়ার প্রভাব ক্ষুণ্ণ করিবার এবং রাসিয়াকে প্রাচ্যে হেয় প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে আর্কস আফিসে খানাতল্লাসী করিয়াছিলেন। পরন্তু এই হেতু আমাদের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়াছেন। প্রাচ্যের লোক বৃটিশ সরকারের এই দৃঢ়চিত্ততা ও সাহস দেখিয়া তাহার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইবে, এই আশায় এই কার্য্য করা হইয়াছে।

"আরও এক কারণে বৃটিশ সরকার রাসিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়াছেন। আজ ১০ বৎসর যাবৎ রাসিয়ার শ্রমিকদল ক্ষমতা উপভোগ করিতেছে এবং জগতের এক-ষষ্ঠাংশে এক নূতন শাসনতন্ত্র ধীরে ধীরে গড়িয়া তুলিতেছে। এখন যাঁহারা বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এখনও ভুলিতে পারেন নাই যে, তাঁহারা সোভিয়েটের প্রথমাবস্থায় সোভিয়েট শাসন প্রতিষ্ঠায় হস্তক্ষেপ করিতে গিয়া বিফল মনোরথ হইয়াছেন। নব-প্রতিষ্ঠিত সোভিয়েট ধীরে ধীরে যে নূতন অর্থনীতিক শাসনতন্ত্র গড়িয়া তুলিতেছিল, তাহা অবস্থাপন্ন রাসিয়ানদের মনঃপূত হইবে না এবং তাহার ফলে সোভিয়েটের পতন ও অবস্থাপন্ন রাসিয়ানদের কর্ত্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে, বহু বৃটিশ রাজনীতিক এই আশা করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সে আশা পূর্ণ হয় নাই। রাসিয়ার শ্রমিক ও কৃষক অধিক পরিমাণে বিদেশের ধনের সাহায্য না লইয়াও কেবল নিজের পরিশ্রম ও অধ্যবসায় দ্বারা ধ্বংসোন্মুখ রাসিয়ার ভাগ্য-পরিবর্ত্তনে কৃতকার্য্য হইয়াছে। এখন রাসিয়ার আর্থিক অবস্থা যুদ্ধের পূর্ব্বের আর্থিক অবস্থার সমতুল। সোভিয়েট এক্ষণে এই অবস্থারও উন্নতিসাধনে সচেষ্ট রহিয়াছে। শ্রমিক ও কৃষকের এই Socialism সাম্রাজ্যবাদীদের চক্ষুশূল। তাই রাসিয়ার সহিত সাম্রাজ্যবাদীরা সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়াছে।"

মুসিয়ে রোসেনগল্জ্ এই উপলক্ষে সাম্রাজ্যবাদীদিগের আর এক বিশ্বযুদ্ধের আয়োজনের আভাস দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"ইংলণ্ডের বর্ত্তমান কনজারভেটিব গভর্ণমেণ্ট রাসিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাধাইবার জন্য তিন দিক দিয়া চেষ্টা করিতেছেন,—(১) সোভিয়েট য়ুনিয়নের শত্রু রুমানিয়া ও অন্যান্য য়ুরোপীয় রাজ্যের সেনাদলকে অর্থসাহায্য দিয়া ও উৎসাহিত করিয়া। তাঁহারা হয় ত বলিবেন, বৃটিশ সরকার রুমানিয়াকে অর্থ কর্জ্জ দেন নাই, লণ্ডন সহর দিয়াছে। কিন্তু যাহারা অবস্থাভিজ্ঞ, তাহারা জানে, এরূপ ঋণদানের উদ্দেশ্য কি। (২) সোভিয়েট সরকারকে কূপবদ্ধ করিবার চেষ্টায় য়ুরোপীয় ও মার্কিণ রাজ্যসমূহে প্রচার কার্য্য চালাইয়া। তাঁহাদের এ চেষ্টা বিফল হইয়াছে। (৩) প্রাচ্যে চীনের সম্পর্কে সোভিয়েট সরকারের বিপক্ষে অন্যান্য শক্তিকে দণ্ডায়মান করাইয়া। হয় ত ইহাতে তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারেন।"

তর্জ্জার লড়াইয়ে চিতেন ও উতোর আছে। এক দিকে সাম্রাজ্যবাদীর দল, অন্যদিকে সোভিয়েট রাসিয়া, উভয় পক্ষে এখন তর্জ্জার লড়াই হইতেছে। রোসেনগল্জ্ যে 'চিতেন' দিয়াছেন, বৃটিশ সরকার তাহার কি 'উতোর' দেন, তাহা দেখিবার বিষয়। ফল কথা, উভয় পক্ষের মনোমালিন্যের ফলে জগতে অশান্তির মেঘ যেন আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিল। ইহার প্রতীকার, মনোভাবের পরিবর্ত্তন, নতুবা শত লোকার্ণো ও জেনিভা জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইবে না।

বাঙ্গালীর স্মৃতিপূজা

এ পর কয়টি বাঙ্গালীর সাম্বৎসরিক স্মৃতিপূজা হইয়া গেল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, মহাকবি মধুসূদন,—ইহার মধ্যে কোন নামই বাঙ্গালীর গৌরব ও গর্ব্বের বস্তু। তিন জন যুগপুরুষ তিন দিক্ হইতে বাঙ্গালীকে অমূল্য সম্পদের অধিকারী করিয়া গিয়াছেন, আবার তিন জনেই একই দিক্ হইতে বাঙ্গালীকে একই মন্ত্রে একতাসূত্রে বন্ধন করিয়া গিয়াছেন। এক জন রাজনীতির মধ্য দিয়া বাঙ্গালীর অন্তরে স্বরাজের আলোক প্রজ্বালিত করিয়াছেন; আর এক জন উপন্যাসের মধ্য দিয়া বাঙ্গালীকে মাতৃভাষার মোহন-মন্ত্রে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন; অবশিষ্ট জন মহাকাব্যের মধ্য দিয়া বাঙ্গালীকে নূতন গান শুনাইয়াছেন। আবার তিন জনেই স্বদেশ-প্রেমের মদিরায় বাঙ্গালীকে উন্মত্ত করিয়া গিয়াছেন। মধুসূদন যে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে যুগে শিক্ষিত তরুণ সম্প্রদায় বিদেশীয় ভাবে অনুপ্রাণিত, মাতৃভাষায় বিরূপ। মধুসূদন সেই যুগে নিজে 'সাহেব' হইয়াও মাতৃভাষার সেবায় মনঃপ্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন, দেশজননীকে উদ্দেশ করিয়া 'শ্যামা জন্মদে' বলিয়া প্রাণ ভরিয়া ডাকিয়া দেশত্যাগের সময় বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে গাহিয়াছিলেন,—

"রেখো মা দাসেরে মনে এ মিনতি করি পদে—"

তিনি বাঙ্গালীকে বাঙ্গালা ভাষায় অমূল্য সম্পদ দান করিয়া গিয়াছেন,—'গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।' বঙ্কিমচন্দ্র 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের ঋষি, ভবিষ্যদর্শী যুগপুরুষ—বাঙ্গালীকে জাতীয়তা শিখাইয়া গিয়াছেন, কমলাকান্তপ্রভৃতি বঙ্গভূমিকে চিনাইয়া গিয়াছেন,—তাঁহার ঋণ বাঙ্গালীর পক্ষে অপরিশোধ্য। চিত্তরঞ্জন বঙ্কিমচন্দ্রের সেই মাতৃমূর্ত্তির কল্পনাকে প্রাণ দিয়াছিলেন—নিজে 'মৃত্যুহীন-প্রাণ' লইয়া বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন, 'মরণে' বাঙ্গালীকে তাহাই দান করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালী তাঁহার কাছেই যথার্থ দেশজননীকে চিনিতে শিখিয়াছিল—এ চেনা কেবল দূর হইতে মানস-পূজার চেনা নহে, এ চেনা অতি নিকটে মনের মন্দিরে প্রাণ দিয়া ত্যাগের পথে চেনা।

আজ বাঙ্গালী যে তাহার এই সকল যুগপুরুষকে চিনিতে শিখিয়াছে, বীরপূজা করিতে অভ্যস্ত হইতেছে, ইহাও শুভ লক্ষণ।

মনুষ্যত্বের অপমান

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ অধুনা রাজনীতিক্ষেত্রে বড় একটা দর্শন দেন না—সাহিত্যের পূজারী তিনি, তিনি সেই বিশ্ব-ভারতীর পূজাতেই তন্ময় হইয়া থাকেন। কিন্তু প্রাচীন, আধ্যাত্মিকতায় উন্নত, সুসভ্য মহাচীনের প্রতি সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজের ব্যবহারে তিনি নীরব থাকিতে পারেন নাই। এক দিন জালিয়ানওয়ালায় পিশাচ ডায়ারের নৃশংস নরহত্যাকাণ্ডে রবীন্দ্রনাথ অন্তরে ব্যথা পাইয়া যেমন মেঘমন্দ্রে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া রাজদত্ত সম্মান দূরে পরিহার করিয়াছিলেন, আজিও তেমনই তিনি ভারতের প্রাচীন মিত্র—ভারতের সভ্যতা, ভাব ও ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত মহাচীনের প্রতি সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজের হৃদয়হীন ব্যবহারে এবং সহায়হীন দুর্ব্বল আজ্ঞাধীন হতভাগ্য ভারতকে সেই ব্যবহারে যন্ত্রে পরিণত করিবার নিমিত্ত প্রাণের মধ্য হইতে তীব্র প্রতিবাদের ধ্বনি উত্থিত করিয়াছেন। মার্কিণ দেশের 'সিকাগো' সহরের 'য়ুনিটি' পত্রে লিখিয়াছেন,—বর্ত্তমানে ইংরাজ মহাচীনের বিরুদ্ধে যে ভাবে অভিযান প্রেরণ করিয়াছেন, উহাতে মনুষ্যত্বের বিরুদ্ধে পাপাচরণ করা হইয়াছে, আর আমাদের লজ্জার কথা যে, আমাদিগকে ইংরাজ তাঁহার এই চীনের দাবাখেলার বলের মত নাড়াচাড়া করিতেছেন!

বস্তুতঃ সমগ্র দেশের ইচ্ছার বিরুদ্ধে চীনের বিরুদ্ধে ভারতীয় সৈন্য যে ভাবে প্রেরিত হইল, তাহাতে ভারতের আর জগতে মুখ দেখাইবার উপায় রহিল না। চীন ভারতের শত্রু নহে, মিত্র। চীনের আধ্যাত্মিকতার সহিত ভারতের আধ্যাত্মিকতার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। বহু প্রাচীন কাল হইতে চীনে ও ভারতে ভাবের আদান প্রদান হইয়া আসিতেছে; হিউয়েন-সাং, ফাহিয়ান প্রমুখ চীন পরিব্রাজক এ দেশে তীর্থ করিতে আসিয়াছেন, এ দেশ হইতেও ধর্ম্ম-প্রচারক চীনদেশে গিয়াছেন। অথচ চীনে ভারতীয় সেনা ইংরাজ এমন ভাবে নিযুক্ত করিয়াছেন, যাহাতে সাধারণ চীনা ভারতীয়কে শত্রু বলিয়া মনে করিতেছে এবং শত্রু বলিয়া ঘৃণা করিতে অভ্যস্ত হইতেছে। এ লজ্জা রাখিবার স্থান কোথায় আছে?

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, চীনারা আমাদিগকে দানব আখ্যা দিয়াছে। দিবে না কেন? ভারতীয় সেনাই ইংরাজ প্রভুর জন্য চীনাদের নিকট হংকং কাড়িয়া লইয়াছিল। কিন্তু ভারতীয়ের উপায়ান্তর কি? রবীন্দ্রনাথ ক্ষোভে দুঃখে ভারতের এই অসহায় অবস্থার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, বলিয়াছেন,—আমরা পরাধীন শৃঙ্খলাবদ্ধ জাতি,—অন্য জাতির হস্তপদে শৃঙ্খল পরাইবার নিমিত্ত আমাদিগকে যন্ত্রের ন্যায় ব্যবহার করা হইতেছে—ইহা কি আমাদের পক্ষে কম লজ্জার কথা! তাই তিনি কাতরে ইংরাজের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন যে, তাঁহারা প্রভুরূপে যেন ভারতের মধ্যে ভারতীয়ের প্রতি যথা ইচ্ছা ব্যবহার করেন, তাহাদিগকে জগতের লোকের নিকট যেন আর হেয় ও উপহাসাস্পদ না করেন। কত দুঃখে ক্ষোভে প্রাচ্যের এই শ্রেষ্ঠ কবির মুখ দিয়া এমন কথা বাহির হইয়াছে, তাহা কি সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ এক বার ভাবিয়া দেখিবেন?

একতাই উন্নতির মূল

কানাডার ষষ্ঠ বার্ষিক স্বাধীনতার উৎসব উপলক্ষে প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকেঞ্জি কিং বলিয়াছেন,—"জাতির একতাই কানাডার যত উন্নতি ও বিভব সম্পদের মূল।" কানাডায় বহু জাতির বাস। ফরাসী, ইংরাজ এবং অন্যান্য অনেক য়ুরোপীয় জাতির সমবায়ে 'কানেডিয়ান' জাতির উদ্ভব হইয়াছে। অথচ তথায় সবাই একতাবদ্ধ। যখন তাহারা জন্মভূমি কানাডার কথা মনে করে, তখন কেহ তাহার পূর্ব্বপুরুষের জন্মভূমি ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতির কথা স্মরণ করে না। কানাডার সম্মান তাহাদের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য। এসিয়া বা য়ুরোপে বৃটিশ বা ফরাসী জাতির শত স্বার্থ-সংঘর্ষ উপস্থিত হইলেও তাহারা এই লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয় না। কানাডার উন্নতি ও পুষ্টিই তাহাদের জীবনের ব্রত। কানাডায় রোমান

ক্যাথলিক, প্রোটেষ্টাণ্ট প্রভৃতি নানা ধর্ম্মবিভাগ আছে, অথচ ধর্ম্মের বিরোধ থাকিলেও তথায় কাহারও দেশপ্রেমের অভাব হয় না। আফগানিস্থানেও মুসলমানদের মধ্যে ও নানা শ্রেণীবিভাগ আছে। অথচ মহামান্য আমীর বাহাদুর সে দিন তাঁহার প্রজাবর্গকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন, "তোমরা ধর্ম্মমত সম্বন্ধে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইলেও সর্ব্বদা মনে রাখিও যে তোমরা আফগান।" মহাচীনেও বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও মুসলমান চীনা আছে; কিন্তু জাতীয় মুক্তিযুদ্ধে তাহারা সবাই এক। আর আমাদের এই অভাগা দেশে নানা জাতি নানা ধর্ম্মে সর্ব্বদাই বিরোধ, সর্ব্বদাই সংঘর্ষ, একতা আদৌ নাই। আমাদের দেশপ্রেমের অভাবই কি ইহার মূল কারণ নহে? আমরা ভারতীয়,—মুসলমান, খৃষ্টান, হিন্দু, পার্শী আমরা যাহাই হই, আমরা ভারতীয়—এই গর্ব্ব-হর্ষের কথা আমরা স্ফীতবক্ষে বলিতে পারি না কেন?

রাজবন্দীর সুখ

সহকারী ভারত-সচিবে আরল উইণ্টার্টনের রসবোধ বিলক্ষণ আছে। বাঙ্গালার রাজবন্দীদের সম্বন্ধে মাঝে মাঝে তিনি যে অভিমত প্রকাশ করেন, তাহাতে তাঁহার এই রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। একদিন পার্লামেণ্টে প্রশ্নের চাপাচাপিতে তিনি বলিয়া ফেলিলেন, রাজবন্দীদিগকে তাহাদের অপরাধের কথা জানান হইয়াছে এবং তাহাদিগকে উপযুক্ত বিচারকের নিকট উপস্থিত করা হইয়াছে। যখন কারামুক্ত সুভাষচন্দ্র রোগকাতর অবস্থাতেও এই সরল কথার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া প্রমাণ করিলেন যে, উহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, তখন আরল উইণ্টার্টন অম্লানবদনে বলিলেন, "তিনি যে কথা বলিয়াছেন, তাহাতে যদি পার্লামেণ্টের সদস্য ঐরূপ বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি দুঃখিত।" বস্! সকল দায়ে খালাস! এত বড় একটা কথা জগতের সম্মুখে জাহির করিলেন কে?—যিনি সহকারী ভারত সচিবের দায়িত্বপূর্ণ পদে বসিয়াছেন। অথচ কথাটা মিথ্যা বলিয়া যখন প্রমাণ হইল, তখন তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন,—তিনি যে কথা বলিয়াছেন, তাহার ভিন্ন অর্থ আছে, যে ভাবে পার্লামেণ্টের প্রশ্নকর্ত্তা সদস্য লইয়াছেন, তাহা তিনি মনে করিয়া বলেন নাই; যদি তিনি তাহা ঐভাবে বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি দুঃখিত। ইংরাজীতে Sorry, Regret, Thanks প্রভৃতি কথাগুলি অনেক অপরাধ ঢাকা দেয় বটে! সম্প্রতি আরল উইণ্টার্টন জগতের সমক্ষে জাহির করিয়াছেন যে, রাজবন্দীদিগকে টেনিস্ ও ব্যাডমিণ্টন খেলিতে দেওয়া হয়, ইহাতে জেলের অন্যান্য কয়েদীদের উপর মন্দ প্রভাব বিস্তৃত হয়; সুতরাং এ সম্বন্ধে যথাকর্ত্তব্য বিবেচনা করা হইতেছে। এতদ্বারা জগতের লোককে জানান হইল যেন বাঙ্গালার রাজবন্দীদিগকে জেলে 'জামাই-আদরে' রাখা হয়, তাহারা জেলের ভিতর কেবল খেলাধূলা করিয়াই কাটায়! কিন্তু প্রকৃতই কি তাই? তবে শুনা যায় কেন, রাজবন্দীদিগকে বিড়ালছানার মত আজ এ মুলুকের জেলে কাল সে মুলুকের জেলে টানাটানি করিয়া বেড়ান হইতেছে?—কখন ব্রহ্মে, কখনও মাদ্রাজে, কখনও যুক্তপ্রদেশে। জেলে রাজবন্দীরা প্রায়শঃ প্রায়োপবেশন করে কেন? জামাই-আদর প্রাপ্ত হয় বলিয়াই কি? রাজবন্দীদের আত্মীয় স্বজন প্রায় সংবাদপত্রের মারফতে রাজবন্দীদের প্রতি অন্যায় ব্যবহারের জন্য অভিযোগ উপস্থিত করেন কেন—সরকারের নিকট প্রায়ই আবেদন-নিবেদন করেন কেন? কেহ কেহ আবেদনেরও উত্তর প্রাপ্ত হয়েন না, কেহ বা রাজবন্দী আত্মীয়ের নিকট হইতে পত্রোত্তর প্রাপ্ত হয়েন না। আবার কেহ বা জেলে বন্দী আত্মীয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া বিফলমনোরথ হয়েন কেন? সকলের অপেক্ষা সেরা কথা,—রাজবন্দীদের মধ্যে অনেকের একবারে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে কেন? কেহ পাগল হইয়া যায়, কেহ যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হয়, কেহ ক্রমে ক্রমে, প্রত্যহ জ্বর ভোগ করে,—এ সকলেরই বা সদুত্তর কি? এক জন রাজবন্দীকে যদি স্বাস্থ্যভঙ্গের ভয়ে মুক্তি দেওয়া হয়, তবে অপর রাজবন্দী ভগ্নস্বাস্থ্য হইলেই বা মুক্তি পায় না কেন? আরল উইণ্টার্টন কি বলিতে চাহেন, জেলে রাজবন্দীরা 'জামাই-আদরে' ব্যাডমিণ্টন টেনিস খেলিতে পায়েন বলিয়া এইরূপ হয়?

সাম্প্রদায়িক বিরোধ

ভারতের কোন কোন স্থানে সাম্প্রদায়িক বিরোধ ক্রমশঃ যেন বর্দ্ধিত আকারে ফুটিয়া উঠিতেছে। বাঙ্গালায় এই বিরোধের ফলে হিন্দুকে বহুস্থানে রথযাত্রার শোভাযাত্রা বন্ধ করিতে হইয়াছিল। এলাহাবাদে মহরমের সময় মুসলমানরা হিন্দুদিগের বিবাহের শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করিবারও বাহানা ধরিয়াছিল। কিন্তু পঞ্জাবের ব্যাপারই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। সেখানে রাজপাল নামক এক জন আর্য্যসমাজী 'রঙ্গিলা রসুল' নামে এক পুস্তিকার প্রচার করিয়া রাজদ্বারে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচারের অপরাধে অভিযুক্ত হয়। অভিযোগ,—সে মুসলমান ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হজরৎ মহম্মদের নামে কুৎসিত গ্লানি প্রচার করিয়াছিল। হাইকোর্টের বিচারক কুমার দলীপ সিংহ তাহার এই গ্লানি প্রচারকে অতীব গর্হিত কার্য্য বলিয়া নিন্দা করেন বটে, কিন্তু আইনের ধারা অনুসারে উহা অপরাধ দণ্ডবিধির মধ্যে পড়ে না বলিয়া উহাকে মুক্তিদান করেন। ইহাতে মুসলমান সমাজে আগুন জ্বলিয়া উঠে। গভর্ণর সার ম্যালকম হেলি এক মুসলমান ডেপুটেশানের সম্মুখে এসম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহাতে মুসলমানদের উত্তেজিত হইবার ও প্রশ্রয় পাইবার যথেষ্ট কারণ ছিল। উত্তেজনার ফলে 'মুসলিম আউটলুক' কাগজের সম্পাদক জজের রায়ের প্রতিবাদ করিয়া তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে বলেন এবং সে জন্য আদালত অবমাননার অভিযোগে দণ্ড প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু উহাতে মুসলমানরা আরও উত্তেজিত হইয়া উঠে, লাহোর দিল্লী প্রভৃতি নানা স্থানে তাহারা সভা সমিতি করিয়া সোরগোল পাকাইয়া তুলে। কোন কোন ধীর স্থির মুসলমান বলেন, বিচারকের অপরাধ নাই, আইনের ধারায় যদি উক্ত রচনার মত রচনা দণ্ডনীয় না হয়, তবে আইন সংশোধনের জন্য আন্দোলন করা উচিত। কিন্তু সাধারণ মুসলমান এ হিতকথা শুনিল না, তাহারা জজের বিপক্ষে আন্দোলন এমন ভাবে জাগাইয়া তুলিল যে, লাহোরে শান্তিরক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিল। এজন্য লাহোরে ১৪৪ ধারা জারি করা হইল। ফলে এই ব্যাপার হইতে পঞ্জাবে হিন্দুমুসলমানে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বৃদ্ধির সমস্যা পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া উঠিল।

যে ভাবে বিদ্বেষ বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে হিন্দু মুসলমানের মিলনের যতই চেষ্টা হউক না কেন, শীঘ্র উহা সফল হইবে না বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। কারণ বহু স্বার্থপর নেতা গুপ্ত উদ্দেশ্য-সিদ্ধির নিমিত্ত এই বিদ্বেষ-বহ্নি নানা উপায়ে জাগাইয়া রাখিতেছে। এই হেতু মহাত্মা গন্ধী 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রে লিখিয়াছেন,—"আমরা তথাকথিত ভারতীয় নেতারা যদি আমাদের স্ব স্ব সম্প্রদায়ের বিবদমান জনসাধারণকে সংযত করিতে না পারি, তাহা হইলে দিল্লী বা বোম্বাইয়ে আমরা যত আপোষ নিষ্পত্তি করি, তাহা সফল হইবে না। প্রকৃত স্বরাজপ্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করিবার পূর্ব্বে আমাদিগকে আমাদের জনসাধারণের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, অন্যথা স্বরাজ কখনও লভ্য হইবে না। বকরীদের দিনে সরকারকে আমাদের মধ্যে শান্তিরক্ষা করিতে হইয়াছিল, ইহা আমাদের পক্ষে লজ্জার বিষয় নহে কি? অথচ ইহার পূর্ব্বে দিল্লীতে নেতারা আপোষ সন্ধি করিয়াছিলেন।"

কথাটি খাঁটি সত্য। জনসাধারণকে নিয়ন্ত্রিত করিতে না পারিলে

শের মুক্তি কখনও সাধিত হয় না। প্রথমে একতা প্রতিষ্ঠা, তাহার পর দেশের মুক্তি। মহাচীনে যত দিন ডাক্তার সান-ইয়াটসেন শ্রমিক ও ...কের মনোবাঞ্ছা জয়ের ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই, তত দিন চীনের ...যুদ্ধ জয়যুক্ত হয় নাই। মহাত্মা গন্ধী ১৯২১ খৃষ্টাব্দে জনসাধারণকে ...ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া অসম্ভবকেও সম্ভব করিয়া-...লেন। মহাত্মার চরকার আন্দোলন জনসাধারণের জাগরণের এক ...ান ভিত্তি বলিয়াই কৃষি-কমিশন বসান হইয়াছে, এ কথা লর্ড ...ডিংও প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন। চরকায় যে শিক্ষিত ...ের সহিত অশিক্ষিত জনসাধারণের মিলনের সম্ভাবনা হয়, এ কথা ...রেডিং বিলক্ষণ বুঝেন বলিয়াই এ কথা বলিয়াছেন।

সুতরাং এখন কিসে শিক্ষিত স্বার্থান্ধ প্রচারকের দ্বারা উত্তেজিত ... নিরক্ষর জনসাধারণকে ভারতের প্রকৃত অবস্থা বুঝাইয়া দিতে পারা ...য়, সর্ব্বাগ্রে তাহার উপায়বিধান করা কর্ত্তব্য। ইহারই নাম ...ম-গঠন বা জাতিগঠন করা। সে উপায় অবলম্বিত না হইলে নেতৃবর্গ ... কাগজে কলমে মিলনের খসড়া প্রস্তুত করুন, ততই তাঁহারা ...মনোরথ হইবেন।

কংগ্রেসের আপোষ

বাঙ্গালায় কংগ্রেসের কর্তৃত্ব লইয়া দুই দলে গজকচ্ছপের যুদ্ধ সংঘটিত ...য়াছিল, এ কথা সকলেই জানেন। স্বয়ং কংগ্রেসের সভাপতি ...নিবাস আয়েঙ্গারও বাঙ্গালায় আসিয়া এ বিবাদের অবসান করিতে পারেন নাই। সে কীর্ত্তিকলাপ দেখিয়া জগতের লোক হাসিয়াছিল, ...র বাঙ্গালার জনসাধারণ লজ্জায় মস্তক অবনত করিয়াছিল। অবশেষে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী এই বিবাদ মীমাংসা করিয়া দিবার নিমিত্ত একটি সালিসি সমিতি নিয়োগ করেন; শ্রীযুক্ত নির্ম্মল চন্দ্র চন্দ্র, অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ, এবং মিঃ আক্রাম খাঁ সমিতির সভ্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সমিতি বহু বিবেচনার পর সিদ্ধান্ত করেন যে,—উভয় দলের নির্ব্বাচিত স্বতন্ত্র দুইটি কার্য্যকরী সভার (Executive Council) অস্তিত্ব বিলুপ্ত করা হইবে, উভয় দলের কার্য্যনির্ব্বাহকগণ সঙ্গে সঙ্গে সভার কার্য্য করিতে নিরস্ত হইবেন এবং যত শীঘ্র সম্ভব বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর একটি সভা আহ্বান করা হইবে ও ঐ সভায় একটি নূতন কার্য্যকরী সভা নির্ব্বাচন করা হইবে।

সালিসি সমিতি উভয় দলের কার্য্যকরী সভার কার্য্য-নির্ব্বাহকগণকে ... প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভা আহ্বান করিবার ভার প্রদান না করিয়া নিজেই সভা আহ্বানের বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন এবং যে কয়জন কংগ্রেস সদস্যকে কার্য্যকরী সভার সভ্য নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নামের একটা ফিরিস্তি সভার সভাপতিকে প্রদান করিয়াছিলেন। সালিসি সমিতির স্বহস্তে এ ভার গ্রহণ করা সমীচীন হয় নাই। তৎপরিবর্ত্তে যদি তাঁহারা উভয় দলের সম্পাদকগণকে একযোগে সভা আহ্বানের জন্য অনুরোধ করিতেন, তাহা হইলে শোভন হইত।

যাহা হউক, সভা আহূত হইয়াছিল এবং সভায় শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র ...ত্ত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং অন্যান্য কয়জন সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

যেরূপেই হউক, এই 'ছেঁড়া কাঁথার' বিবাদের যে এতদিনে অবসান ...ইল, ইহাতে আমরা সন্তুষ্ট, বাঙ্গালার লোক এইবার ঘুমাইয়া বাঁচিবে। বাঙ্গালায় কংগ্রেস ত মৃতকল্প, তাহাতেও আবার দলাদলি, কাযও কিছুই হয় না। জিলা ও অন্যান্য কেন্দ্রগুলি প্রায় লুপ্ত হইয়াছে, কর্ম্মীর দলের 'কর্ম্ম' নাই। এ অবস্থায় এখন আবার কংগ্রেসকে বাঁচাইয়া তুলিতে হইবে। জাতি ও গ্রামগঠন, জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, সালিসি আদালত প্রতিষ্ঠা, সেবাসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা, খদ্দর ও চরকার উন্নতি সাধন, জনসাধারণের মধ্যে স্বরাজের ও কংগ্রেসের মন্ত্র প্রচার,—বিস্তর কার্য্য পড়িয়া রহিয়াছে। নবগঠিত কংগ্রেস কমিটী সেদিকে অবহিত হইলে দেশের উপকার এখনও সাধিত হইতে পারে।

সরকার ও দেশীয় সংবাদপত্র

প্রতি বৎসর যেমন সরকারের শাসনকার্য্যের সমর্থন করিয়া বাৎসরিক সরকারী শাসন-বিবরণী প্রকাশিত হয়, এবারও তেমনই বাঙ্গালা সরকারের ১৯২৫-২৬ খৃষ্টাব্দের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। এই 'চূর্ণকার্য্য' ব্যাপারের দুইটি প্রধান অঙ্গ,—(১) সরকারী কর্ম্মচারী ও পুলিসের যোগ্যতার রামায়ণ-গান, (২) দেশীয় সংবাদপত্রের বিপক্ষে তরজার গান। যে সিবিলিয়ানের উপর রচনার ভার পড়িয়াছিল, তিনি এ বিষয়ে প্রথম বিভাগের ডবল অনার্সে এম, এ, পাশ করিয়াছেন।

মামুলী প্রথায় পুলিসের গৌরব-গান করিয়া যদি তিনি ক্ষান্ত হইতেন, তাহা হইলে ক্ষতি ছিল না। কেন না, উহাতে এ দেশের লোক অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। যে কলিকাতার মত প্রধান সহরে মুহূর্ত্তে সহস্র সহস্র পুলিস ও ফৌজ জড় করা যায়, সেই কলিকাতায় দুই মাস যাবৎ দাঙ্গা ও রক্তারক্তি চলিল, অথচ রিপোর্ট লেখক—সরকারের গুণগায়ক অম্লানবদনে বলিলেন, এ ভাবের দাঙ্গা-হাঙ্গামা অল্প সময়ের মধ্যে বন্ধ করা অসম্ভব! বরিশালের মত প্রায় অরক্ষিত জিলায় যদি সরকারী রাজপুরুষ কড়া হইলে দাঙ্গা-হাঙ্গামার আশঙ্কা নিমিষে অন্তর্দ্ধান করে, তাহা হইলে এই ফোর্ট উইলিয়ামের খাস রাজত্ব রাজধানী কলিকাতায় তাহা সম্ভব হয় না? পুলিসের সেই আমলের পরে সার চার্লস টেগার্টের আমলেই বা পর পর কয়টা পার্ব্বণ ও উৎসবে দাঙ্গা-হাঙ্গামার আশঙ্কা দূর হওয়া সম্ভব হইল কিরূপে?

যে লেখক অকর্ম্মণ্যতা ও ঔদাসীন্যের এমন হায়াহীন সমর্থন করিতে পারেন, তিনি যে কোর্ট বজায় রাখিবার জন্য সেই অকর্ম্মণ্যতা অপরাধের বোঝা ভিন্ন আকারে দেশীয় সংবাদপত্রের স্কন্ধে চাপাইবার প্রয়াস পাইবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

সরকারী গুণব্যাখ্যাকারীর মতে দেশীয় সংবাদপত্রগুলি নাকি বিপ্লববাদের প্রতি ক্রমাগত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া এবং বিপ্লববাদীদিগকে আকাশে তুলিয়া বিপ্লববাদীদিগকে তাহাদের দুষ্ট কার্য্যে উৎসাহিত করিয়াছে এবং ভাবপ্রবণ যুবকগণকে তাহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে প্ররোচিত করিয়াছে! এত বড় নির্জ্জলা মিথ্যা কথা বোধ হয় ক্লাইভ বা মেকলেও কখনও বলিয়াছেন কি না সন্দেহ। আলোচ্য বৎসরে অন্যূন ৮০টি অভিযোগ দেশীয় সংবাদপত্রের বিপক্ষে আনয়ন করা হইয়াছিল। তাহার মধ্যে কয়টি উক্ত অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হইয়াছিল? তবে একটা কথা আছে। সরকারের খাতায় যাহাদিগকে বিপ্লববাদী বলিয়া বিনা বিচারে ধরিয়া জেল দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের স্বপক্ষে দেশীয় সংবাদপত্রসমূহ একযোগে আন্দোলন করিয়াছে, এ কথা সত্য। তাহাদের অপরাধ, তাহারা গোয়েন্দা পুলিসের রচা কথায় আস্থাবান সরকারী রাজপুরুষদিগের মুখের কথায় আস্থাস্থাপন করে নাই, বরং সন্দেহক্রমে ধৃত ও আটক রাজবন্দীদের প্রকাশ্য বিচার চাহিয়াছিল। এ বিষয়ে তাহারা একাকী অপরাধী নহে, দেশের আপামর জনসাধারণই অপরাধী; কেন না, তাহা না হইলে তাহারা আটক রাজবন্দীদের মধ্যে দুই জনকে ব্যবস্থা-পরিষদের ও বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত করিত না।

তবে কি এই 'নিরপেক্ষ' সমালোচক সমগ্র দেশের লোককেই দেশীয় সংবাদপত্রের সহিত অপরাধের একাসনে বসাইয়া ফাঁসী দিতে চাহেন? ইহাই যদি বিপ্লববাদকে ও বিপ্লববাদীকে উৎসাহ দেওয়া হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালা দেশ সে অপরাধে অপরাধী।

পরলোকে পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

বাঙ্গালীর জীবনে ও সাহিত্যে যাঁহারা নব জীবনের প্রেরণা আনিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম সাধক পণ্ডিত ক্ষীরোদ-প্রসাদ অকস্মাৎ ইহলোক হইতে তিরোহিত হইয়াছেন। বাঙ্গালার সাহিত্যগগনের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক খসিয়া পড়িয়াছে। দীর্ঘকাল ভাষা-জননীর সেবা করিয়াও এই একনিষ্ঠ সাধকের সাহিত্য সাধনার বিরাম ছিল না। নব নব ভাবের প্রেরণা তাঁহার শুভ্রকেশ মস্তকের অন্তরালে চির নবীনতার আশ্রয়ে পরিপুষ্ট হইয়া প্রমাণ করিত, বয়সে মানুষ যৌবনের সজীবতা হারাইয়া ফেলে না। বসুমতী "সাহিত্য-মন্দিরে"—মাসিক বসুমতীর কক্ষে প্রায়ই তাঁহার সাক্ষাৎ পাওয়া যাইত। তিনি কথাপ্রসঙ্গে আমাদিগকে বলিতেন, নব নব রসমাধুর্য্যপূর্ণ উপন্যাস ও নাটক রচনা করিয়া তিনি অবশিষ্ট জীবনে প্রমাণ করিবেন, সাধকের সাধনা কখনও পুরাতন হয় না।

পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ

১২৭০ সালে ক্ষীরোদপ্রসাদ খড়দহের এক ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের উপাধি বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি লইয়া ক্ষীরোদপ্রসাদ তদানীন্তন জেনারেল এসেম-ব্লীজ ইনষ্টিটিউশনে রসায়ন বিদ্যার অধ্যাপকরূপে কিছু কাল অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। তিনি একাধারে কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক ও বাগ্মী ছিলেন। প্রথম যৌবনে সাহিত্যের তপোবনে ক্ষীরোদ-প্রসাদ অতি সঙ্কোচে সাধনার জন্য প্রবেশ করিয়াছিলেন, এক-নিষ্ঠ সাধনবলে তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন; বাঙ্গালীকেও ধন্য করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত "ফুলশয্যা" "আলিবাবা" "প্রতাপাদিত্য" "প্রমোদরঞ্জন" "রঙ্গাবতী" "দাদা ও দিদি" "পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত" "নন্দকুমার" প্রভৃতি নাটক ও গীতিনাট্য, "গুহামুখে" "গুহামধ্যে" "পতিতার সিদ্ধি" "নারায়ণী" "পুনরাগমন" "নিবেদিতা" প্রভৃতি উপন্যাস বাঙ্গালা সাহিত্যের অতুল সম্পদ। দেশজননীর ভক্তসন্তান, মাতৃমন্ত্রের উপাসক ক্ষীরোদপ্রসাদ নানা ভাবে বাঙ্গালীর জীবনে জাহ্নবীধারার পুণ্য স্রোতোধারা প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন, ধর্ম্ম ও কর্ম্ম-জীবনের সমন্বয়ে অপূর্ব্ব অবদান কথা বাঙ্গালীকে শুনাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচনা সম্বন্ধে সমালোচনার স্থান ও ক্ষেত্র ইহা নহে—তবে তাঁহার শ্মশান-চুল্লীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া এ কথা অসঙ্কোচে বলিতে পারা যায়, তাঁহার রচনায় ভারতীয় ভাব-ধারার অনাবিল প্রবাহ যেমন তরঙ্গভঙ্গে প্রবাহিত হইয়াছে, অতি অল্পসংখ্যক সাহিত্যিকের রচনায় তাহার গতিবেগ অনুভূত হয়।

৬৪ বৎসর বয়সে ক্ষীরোদপ্রসাদের লেখনী চির বিশ্রাম লাভ করিয়াছে—"মাসিক বসুমতী"র তিনি চির শুভানুধ্যায়ী ছিলেন, তাঁহার প্রতিশ্রুত নূতন রচনার অর্ঘ্যভার লইয়া "মাসিক বসুমতী" পাঠক সমাজে উপস্থিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিল না। ক্ষীরোদপ্রসাদের স্থান সাহিত্যক্ষেত্রে কখনও পূর্ণ হইবে কি না, ভবিতব্যই তাহা বলিতে পারে। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্তা স্ত্রী ও পিতৃশোক বিহ্বল সন্তানগণকে সান্ত্বনা দিবার কোন ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না। যে ভগবানের উপর এই নিষ্ঠাবান্, উদারচিত্ত ব্রাহ্মণের চির নির্ভরত ছিল, তিনিই তাঁহাদিগকে এই প্রচণ্ড শোকে সান্ত্বনা দান করিবেন।

শ্মশানে পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ

খেলা আরম্ভ হল !

মোহনবাগান বল নিয়ে গেল !

মোহনবাগান ফস্কাল !

ক্যালকাটা বল নিয়ে এল

ক্যালকাটা চেপে ধরেছে !

ক্যালকাটা খুব জোর খেলছে !
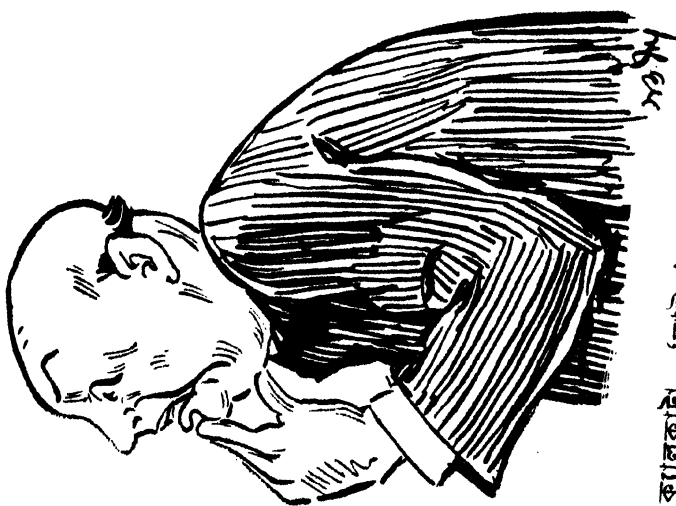
ক্যালকাটা 'ফাউল' করলে।—মোহন-বাগানের এক জন মাঠে পড়ে!

ফাউল! ফাউল!!

ক্যালকাটা মোহনবাগানের গোলে বল মারলে !

রেফারি ফাউল দিলে না !

মোহনবাগান খেলে বুঝি—!

ওঃ ! মোহনবাগান বল নিয়ে রাম-দৌড় দিলে—**go-on** ! **go-on** !!

আবার মারলে আবার ফস্কাল—
আর দেখা যায় না।

মোহনবাগান গোলে বল মারলে—ফস্কাল!

মেরে দাও ভাই—মেরে দাও—
আর কায়দা করো না !

মোহনবাগান গোলে বল মারলে !

গো—ল্ !!!—গোল !!!

হাস্যমুখে গৃহে গমন।

৬ষ্ঠ বর্ষ] শ্রাবণ, ১৩৩৪ [৪র্থ সংখ্যা

সাক্ষিচৈতন্য

অদ্বৈতবাদী দার্শনিকগণ বলিয়া থাকেন,—'আমাদের অজ্ঞান যাহা দ্বারা প্রকাশিত হয়, তাহারই নাম সাক্ষিচৈতন্য'; অদ্বৈতবাদী দার্শনিকের এই কথা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, অজ্ঞান বলিলে বেদান্তিগণ কি বুঝিয়া থাকেন, অগ্রে তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে, তাই সাক্ষিচৈতন্যের পরিচয় পাইবার পূর্ব্বে অজ্ঞানের স্বরূপ যে কি, তাহাই বুঝিবার চেষ্টা করা যাক।

সংসারে আমরা যাহা কিছু ব্যবহার করি, সেই সকল ব্যবহারই অজ্ঞান বা অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহাই হইল অদ্বৈতবাদীর সিদ্ধান্ত। ব্যবহার কাহাকে বলে? এই প্রতিক্ষণ পরিবর্ত্তনশীল প্রপঞ্চে প্রত্যেক জীবের যাহা কিছু কার্য্য, তাহাই ব্যবহার, ইহাই হইল এ প্রশ্নের বেদান্তাভিমত উত্তর। আমার খাওয়া, আমার বেড়ান, আমার ভোজন, আমার কথা কওয়া, আমার হাসি, আমার কান্না এই সকলই আমার ব্যবহার ছাড়া আর কিছুই নহে, এই সকল ব্যবহারের মূল কিন্তু আমারই অজ্ঞান—এ অজ্ঞান জ্ঞানের অভাব নহে, কিন্তু ইহা যথার্থজ্ঞানের বিরোধী জ্ঞান অর্থাৎ বিপরীত জ্ঞান বা ভ্রান্তি, আমার যাহা যথার্থ স্বরূপ—তাহা না বুঝিয়া যখন আমি আমাকে অন্যরূপে বুঝিয়া থাকি, তখনই আমি এই অজ্ঞানের দ্বারা আক্রান্ত বা অভিভূত হই, এবং যখনই আমি এই প্রকারে অজ্ঞান দ্বারা আক্রান্ত বা অভিভূত হই, তখনই আমি ব্যবহারিক জীব হইয়া পড়ি অর্থাৎ তখনই আমার খাওয়া পরা চলা বসা হাসা নাচা গাওয়া কান্না প্রভৃতি ব্যবহারের ধারা অবিশ্রান্ত প্রবাহে বহিতে আরম্ভ করে। এই ব্যবহারের অপ্রতিবার্য্য প্রবাহের এক টানা স্রোতে পড়িয়া তখন আমার স্বরূপ যে কি, তাহা আমি একবারে ভুলিয়া যাই। অপ্রাপ্ত সুখের আশায় অপার অতল সংসার-সাগরে দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ভাসিয়া যাই; বর্ত্তমান বা অনাগত—কাল্পনিক চিরবিভীষিকাময় দুঃখের কবল হইতে কাল্পনিক উদ্ধার পাইবার জন্য আমারই ন্যায় দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য কত ভ্রান্ত জীবকে সহায় করিবার জন্য প্রাণপাতী পরিশ্রমে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াই, আবার সেই সঙ্গে কত নিরপরাধ আমারই ন্যায় উদ্‌ভ্রান্ত মূঢ় ব্যক্তিনিচয়কে শত্রু ভাবিয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হই—আর প্রবল দল বাঁধিবার চেষ্টা করি, ইহারই নাম আমার ব্যবহার। মানবের গর্ব্বিত সভ্যতা এই ব্যবহার-রাজ্যের সীমা লঙ্ঘন করিতে পারে না; মানবের জ্ঞান, বিজ্ঞান,

জ্যোতিষ, কলা, শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষি প্রভৃতি এই ব্যবহার-রাজ্যেরই পুষ্টিসাধনের জন্য উৎপন্ন হইয়াছে এবং ইহারই পুষ্টির জন্য প্রতিদিন উৎকর্ষ বা অপকর্ষ লাভ করিতেছে। এই ব্যবহার—এই বিশ্বব্যাপী অনন্ত শক্তিশালী ব্যবহার, এই—তোমার আমার—সকলের দুঃখের সহচর, সকল সুখ-স্বপ্নের চির-বিশ্বস্ত সুহৃদ্—অনাদি অপরিমেয় ও অনন্ত এই ব্যবহার যে ভিত্তিকে আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহারই নাম অজ্ঞান অর্থাৎ তাহা প্রতি জীবের আত্মবিষয়ক ভ্রান্তি-জ্ঞান ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে, ইহাই হইল অদ্বৈত-দর্শনের চরম সিদ্ধান্ত। তাই ভগবৎপাদ আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের আরম্ভেই বলিয়াছেন—

"তমেতমবিদ্যাখ্যমাত্মানাত্মনোরিতরেতরাধ্যাসং পুরস্কৃত্য সর্ব্বে প্রমাণ-প্রমাণ-প্রমেয়ব্যবহারা লৌকিকা বৈদিকাশ্চ প্রবৃত্তাঃ। সর্ব্বাণি চ শাস্ত্রাণি বিধিপ্রতিষেধ-মোক্ষপরাণি।"

এই সেই আত্মা ও অনাত্মার পরস্পরাধ্যাসরূপ অবিদ্যা, এই অবিদ্যা বা ভ্রান্তিজ্ঞানকে অবলম্বন করিয়াই সকল প্রকার 'প্রমাতৃ-প্রমাণ-প্রমেয় ব্যবহার' (তাহা) লৌকিকই হউক বা বৈদিকই হউক, প্রবৃত্ত হইয়া থাকে; বিধি, প্রতি-ষেধ ও মোক্ষ প্রতিপাদক সকল শাস্ত্রই এই অজ্ঞানমূলক।

এই ব্যবহার-রাজ্যের প্রমাণ, প্রমাতা বা প্রমেয়—সকলই এই অজ্ঞানের পরিণতি মাত্র, ইহাই হইতেছে আচার্য্য শঙ্করের উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য। সভ্যতাভিমানী পাণ্ডিত্য-গৌরবে সমুদ্দীপ্ত সাংসারিক মানব ইহা মানিতে চাহে না, সে আপনাকে প্রমাতা বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকে; তাহার চক্ষুরাদি প্রত্যক্ষ হেতু ইন্দ্রিয়নিচয়কে সে তাহার যথার্থ জ্ঞানলাভেরই উপায় বা প্রমাণ বলিয়া মানিতে আজন্ম অভ্যাস করিয়া আসিয়াছে, তাহার ব্যাপ্তিজ্ঞান, তাহার আপ্তবাক্য তাহার নিকটে চিরদিনই যথার্থ জ্ঞান-লাভের অবিসম্বাদিত উপায় বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ ও অসন্দিগ্ধ; এই সকল প্রমাণের সাহায্যে স্বয়ং প্রমাতা, সে যাহা কিছু বুঝিয়া থাকে, তাহাই ত প্রমেয়,—বা অখণ্ডনীয় সত্য! মানবের এই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসিদ্ধ প্রমেয়রাজ্য, ইহা কি কখনও ভ্রান্তিজ্ঞানের বিজৃম্ভণ হইতে পারে? এই পৃথিবীর মধ্যে সকল জীবের শ্রেষ্ঠ জীব মানব, তাহার প্রমাতৃত্ব ভ্রান্তত্বেরই নামান্তর, ইহা মানব হইয়া কি কেহ কখনও মানিতে পারে? সমগ্র বিজ্ঞান ও জ্যোতিষ মিলিত হইয়া তাহার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে প্রমাণ বা অভ্রান্ত জ্ঞান-সাধন বলিয়া যে প্রশংসাপত্র দিতেছে, তাহা যে একবারে মিথ্যা—নিদাঘমধ্যাহ্নের ক্ষণিক সুখস্বপ্ন মাত্র! ইহা কি করিয়া সে প্রমাতা মানব বিশ্বাস করিবে? প্রমাতৃত্ব-ভিমানী মানবের এই দুরপনেয় সংশয় আচার্য্য বুঝেন নাই, তাহা নহে; তাই তিনি তাহাদের মনের কথা ব্যক্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

কথং পুনঃ অবিদ্যাবদ্ বিষয়াণি প্রত্যক্ষাদীনি
প্রমাণানি শাস্ত্রাণি চ?"

প্রত্যক্ষাদি সর্ব্ববাদিসিদ্ধ প্রমাণসমূহ ও শাস্ত্রনিচয় কি প্রকারে 'অবিদ্যাবদ্বিষয়' অর্থাৎ অজ্ঞানমূলক হইবে?

প্রমাতা মানবের এই প্রমাতৃত্ব যে আভিমানিক—বস্তুতঃ ইহার মূল অজ্ঞান বা ভ্রান্তি ব্যতিরেকে আর কিছুই হইতে পারে না, তাহাই বিশদভাবে বুঝাইবার জন্য আচার্য্য শঙ্কর বলিতেছেন—

"উচ্যতে—দেহেন্দ্রিয়াদিষ্বহং মমাভিমানরহিতস্য প্রমাতৃত্বা-নুপপত্তৌ প্রমাণপ্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ নহীন্দ্রিয়াণি অনুপাদায় প্রত্যক্ষাদিব্যবহারঃ সম্ভবতি। নহ্যধিষ্ঠানমন্তরেণ ইন্দ্রিয়াণাং ব্যবহারঃ সম্ভবতি। ন চ অনধ্যস্তাত্মভাবেন দেহেন কশ্চিদ্ ব্যাপ্রিয়তে। ন চ এতস্মিন্ সর্ব্বস্মিন্ অসতি অসঙ্গস্য আত্মনঃ প্রমাতৃত্বমুপপদ্যতে। তস্মাদবিদ্যাবদ্‌বিষয়াণি এব প্রত্যক্ষা-দীনি প্রমাণানি শাস্ত্রাণি চ ইতি।"

এই প্রশ্নের উত্তররূপে ইহা বলা হইতেছে যে, দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি অনাত্মবস্তুতে যাহার 'আমি বা আমার' এই প্রকার অভিমান নাই, সে প্রমাতা হইতে পারে না। এই অভিমানমূলক প্রমাতৃভাব যখন আমাদের থাকে না, তখন আমাদের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়রূপ প্রমাণগুলি কোন কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না, সুতরাং সেই অবস্থায় ইন্দ্রিয়াদির সাহায্য না পাওয়ায় প্রত্যক্ষাদি কোন ব্যবহারই সম্ভবপর হয় না। প্রমাতৃভাবের আবেশ যাহাতে হয়, সেই আত্মার দ্বারা প্রেরিত না হইলে ইন্দ্রিয়াদি প্রমাণনিচয় কখনই কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে পারে না। দেহাদির উপর আত্মভাব অধ্যস্ত না হইলে কোন আত্মাই প্রমারূপ কার্য্য করিবার অনুকূল যে ব্যাপার, তাহাকে লাভ করিতে পারে না। এই সকল অজ্ঞানমূলক ব্যাপার ছাড়া অসঙ্গ আত্মাতে প্রমাতৃত্ব

কিছুতেই সম্ভবপর নহে; ইহা যদি স্থিরই হইল, তখন ফলতঃ ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, আমাদের প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসমূহ ও শাস্ত্রনিচয় সকলই 'অবিদ্যাবদ্‌বিষয়' অর্থাৎ ভ্রান্তিমূলক।

আচার্য্য শঙ্কর যাহা বলিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য এই যে, এ সংসারে আপনাকে প্রমাতা বা অভ্রান্ত বলিয়া যে বুঝিয়া থাকে, সে যে সর্ব্বথা ভ্রান্ত, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কেন তাহা বলি—জাগরণ বা স্বপ্ন এই দুইটি অবস্থাতেই আমাদের প্রত্যক্ষাদিমূলক সকল ব্যবহার হয়, ইহা সকলেই জানে। এই জাগরণে বা স্বপ্নে যে নিজেকে প্রমাতা বলিয়া বুঝে—সে কে? প্রতিক্ষণ পরিণামশীল, অন্ন ও রসের বিকার জড়পিণ্ডরূপ এই দেহকে যে আমি বলিয়া বুঝে, এই দেহসংসৃষ্ট চক্ষুঃ কর্ণ নাসা রসনা ও ত্বক্ এবং মনকে যে আমার বলিয়া বুঝে, সেই ত আপনাকে প্রমাতা বলিয়া বিশ্বাস করে। এই যে জ্ঞান বা বিশ্বাস, ইহা ত ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নহে; এই ভ্রান্তি-কল্পিত প্রমাতৃভাব যতক্ষণ স্ফুরিত হইতে থাকে, সেই পর্য্যন্তই তাহার ইন্দ্রিয় বিষয়ের দিকে ধাবিত হয়; সেই সেই বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইলে তাহার অন্তঃকরণ বিষয়াকারে পরিণত হয়, সেই পরিণতি বা অন্তঃকরণবৃত্তিতে নিত্যসিদ্ধ চৈতন্যের যে স্ফুরণ বা অভিব্যক্তি অথবা প্রতিবিম্ব, তাহাই হইল আমাদের বিষয়ানুভূতি বা প্রমাজ্ঞান। এই জ্ঞানের মূলে যে প্রমাতা, তাহা সত্য নহে; শুক্তিতে প্রতিভাত রজতের ন্যায় ইহার সত্তা কাল্পনিক; তাহাই যদি হইল, তবে প্রমাণ, প্রমেয় ও প্রমাতা এই তিনটিই ভ্রান্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত, ইহাদের উৎপত্তিও ভ্রান্তি হইতে, ইহাদের স্থিতিও ভ্রান্তির উপর; সুতরাং ভ্রান্তিরই পরিণাম ছাড়া ইহা বা আর কিছুই হইতে পারে না, এ হেন জাজ্বল্যমান ভ্রান্তির উপর প্রতি-ষ্ঠিত ব্যবহারকে সত্য বলিয়া যাহার বিশ্বাস, সে স্বয়ং কখনই যথার্থভাবে প্রমাতা বা অভ্রান্ত পুরুষ হইতে পারে না। এই কারণেই আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন, 'তস্মাৎ অবিদ্যাবদ্‌-বিষয়াণি এব প্রত্যক্ষাদীনি প্রমাণানি শাস্ত্রাণি চ।'

অজ্ঞান বা অবিদ্যা কাহাকে বলে?—যে বস্তু যাহা নহে, সেই বস্তুকে তাহা বলিয়া বুঝা এবং যেখানে যে বস্তু নাই বা থাকিতে পারে না, সেখানে সেই বস্তু রহিয়াছে এইরূপ যে জ্ঞান, তাহাকেই অজ্ঞান বা অবিদ্যা বলা যায়।

এই অজ্ঞান দ্বারা দুই প্রকার কার্য্য হইয়া থাকে; এক আবরণ, দ্বিতীয় বিক্ষেপ। একগাছি রজ্জুকে আমরা যখন সর্প বলিয়া বুঝি, তখন আমরা এই অজ্ঞানের এই আবরণ ও বিক্ষেপরূপ দুইটি কার্য্যেরই সত্তা দেখিতে পাই। অজ্ঞান রজ্জুর স্বরূপের আবরণ করে অর্থাৎ রজ্জুর যে সেখানে সত্তা আছে, এইরূপ জ্ঞান বা ব্যবহারকে তাহা প্রতিরুদ্ধ করিয়া থাকে—ইহারই নাম আবরণ; তাহার পর যাহা বাস্তব রজ্জুর স্বরূপ নহে, তাহারই প্রকাশ করিয়া দিয়া সেই অজ্ঞান ইহা সর্প এই প্রকার ব্যবহারের হেতু হয়, ইহারই নাম বিক্ষেপ।

এই দ্বিবিধ কার্য্যের যাহা কারণ, তাহাকেই বেদান্তি-গণ অজ্ঞান বলিয়া থাকেন; এই অজ্ঞান যাহা দ্বারা প্রকাশিত হয়, তাহাকেই জীবসাক্ষী বা সাক্ষিচৈতন্য বলা যায়।

দেহ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ এই তিনটি বস্তুর নাম 'সংঘাত'। এই সংঘাতকে যে আত্মা বা আমি বলিয়া বুঝে, তাহাই হইতেছে জীব, এই সংঘাতাত্মভাবাপন্ন যে চেতন বা চেতনাবভাস, তাহাই আমার আত্মা; এই আত্মাকেই আমরা কর্ত্তা ও ভোক্তা বলিয়া বুঝি। এই ভোক্তা, কর্ত্তা ও জ্ঞাতা বলিয়া যাহা প্রসিদ্ধ, ইহারই নাম সংসারী জীব। এই সংসারী জীবই আমাদের লোকব্যবহারসিদ্ধ আত্মা। এই আত্মাকে লইয়াই আমরা সংসারের সকল ব্যবহার নির্ব্বাহ করিয়া থাকি, কিন্তু এই আত্মাও আমাদের বাস্তব আত্মা হইতে পারে না; কারণ, ইহা জ্ঞেয় বা দৃশ্য প্রপঞ্চেরই অন্তর্গত। যাহা দৃশ্য, তাহা আত্মা নহে, দৃশ্য বস্তু চেতন হইতে পারে না, আত্মা কিন্তু চেতন—চেতনের স্বভাবপ্রকাশ ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে; আমাদের লোকব্যবহারসিদ্ধ যখন আমার নিকটে আমি বলিয়া প্রকাশিত হইয়া থাকে, তখন ইহা বাহিরের ঘট-পটাদি বস্তুর ন্যায় প্রকাশ্য বস্তু, সুতরাং ইহা জড়বস্তুরই অন্তর্গত, ইহাতে আত্মার আভাসমাত্র আছে, যথার্থ আত্ম-রূপতা ইহাতে কিছুতেই সম্ভবপর নহে। এই প্রকাশ্য বা জ্ঞেয় আমার কল্পিত আত্মার প্রকাশ যাহার দ্বারা হয়, সেই হইল আমার যথার্থ আত্মা, তাহাকেই বেদান্তশাস্ত্রের আচার্য্যগণ জীবসাক্ষী বা সাক্ষিচৈতন্য শব্দের দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই জীবসাক্ষীর দ্বারাই আমি ও আমার অজ্ঞান

এই দুই বস্তু প্রকাশিত হইয়া থাকে, ইহাই হইল বেদান্তশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত।

এই আমি ও আমার অজ্ঞান—জাগরণ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি, এই তিন অবস্থাতেই প্রকাশিত বা অনুভূত হইয়া থাকে। 'আমি আমাকে বুঝি না' 'আমি আমাকে বা তোমাকে জানি না' 'আমি কিছুই বুঝি না' এত কাল পর্য্যন্ত 'আমার কোন জ্ঞানই ছিল না' এই প্রকার যে সকল ব্যবহার আমরা সকলেই করিয়া থাকি, এই ব্যবহারসকলের নিদানভূত যে অজ্ঞান, তাহাকে নৈয়ায়িক প্রভৃতি দ্বৈতবাদী দার্শনিকগণ জ্ঞানের অভাব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, সুষুপ্তি বা গাঢ় নিদ্রার অবস্থায় আমাদের সকল প্রকার জ্ঞানেরই অভাব হইয়া থাকে। সুষুপ্তি ভাঙ্গিয়া গেলে আমরা অনুমান করিয়া লই যে, এত কাল পর্য্যন্ত আমার কোন জ্ঞানই ছিল না; কারণ, তৎকালে জ্ঞান হইবার সামগ্রী বা অপেক্ষিত কারণনিচয় ছিল না, এইরূপ অনুমানের সাহায্যে আমরা আমাদের সুষুপ্তিকালে জ্ঞানসামান্যের অভাব বুঝিয়া থাকি, এই জ্ঞানসামান্যের অভাবই অজ্ঞান, এইরূপ স্বীকার করিলে, কোন প্রকার অনুপপত্তি যখন হয় না, তখন আবার নূতন এক আবরণ ও বিক্ষেপশক্তিযুক্ত অজ্ঞান বা অবিদ্যা নামক ভাববস্তু অঙ্গীকার করিবার আবশ্যকতা কি? এই প্রকার যুক্তির সাহায্যে নৈয়ায়িক প্রভৃতি দার্শনিকগণ অজ্ঞান বা অবিদ্যার ভাববস্তুরূপতা খণ্ডন করেন এবং তাহার জ্ঞানাভাবরূপতাকে ব্যবস্থাপিত করিয়া থাকেন।

বেদান্তিগণ কিন্তু নৈয়ায়িকগণের এইরূপ সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত নির্য্যুক্তিক, তাহাই প্রতিপাদন করিবার জন্য বলিয়া থাকেন যে, সুষুপ্তি দশায় আমাদের যে অজ্ঞতা আমরা সকলেই বুঝিয়া থাকি, সেই অজ্ঞতা বা অজ্ঞান জ্ঞানসামান্যের অভাব নহে এবং তাহাকে আমরা যে অনুমানরূপ প্রমাণের দ্বারা বুঝি, ইহাও সম্ভবপর নহে,—কেন যে নহে, তাহাও বলি, জ্ঞানসামান্যের অভাব যে এই অজ্ঞান হইতে পারে না, তাহা বাধ্য হইয়া নৈয়ায়িকগণকেও স্বীকার করিতেই হইবে; কারণ, জ্ঞানসামান্যের অন্তর্গত কোন একটি জ্ঞান যখন বিদ্যমান থাকে, তখন জ্ঞানসামান্যের অভাবজ্ঞান সম্ভবপর নহে, ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। জ্ঞানাভাবের জ্ঞান এবং যে আত্মাতে সেই জ্ঞানাভাবের জ্ঞান হইতেছে, তাহার জ্ঞান না থাকিলে আমার কোন জ্ঞান নাই, এই প্রকার জ্ঞানও সম্ভবপর নহে; অভাববস্তুর জ্ঞান হইতে হইলে সেই অবস্থায় এবং তাহার পূর্ব্বে অভাববস্তুর যাহা আশ্রয় এবং অভাববস্তুর যাহা প্রতিযোগী (অর্থাৎ যাহার অভাব সেই বস্তু), এই দুইটি পদার্থের জ্ঞান যে অবশ্যই থাকে, নহিলে অভাবের জ্ঞান হইতেই পারে না, ইহা ত নৈয়ায়িকও স্বীকার করিয়া থাকেন। তাহাই যদি হইল, তবে জ্ঞানসামান্যের অভাবজ্ঞান কোন অবস্থাতেই যে আমাদের হইতে পারে, ইহা সম্ভবপর নহে, সুতরাং সুষুপ্তিকালে আমাদের যে অজ্ঞান, তাহা জ্ঞানসামান্যের অভাব এবং সেই জ্ঞানাভাবের জ্ঞান আমাদের পরে অনুমানের দ্বারা প্রতিভাত হয়, এইরূপ যে উক্তি নিতান্ত যুক্তিহীন, তাহা কে অস্বীকার করিবে? জ্ঞান কি বস্তু, তাহা যে জানে না এবং জ্ঞানাভাব যে আত্মাতে ঘটিয়াছে, সেই 'আমি'কে যে জানে না, তাহার 'আমি জানি না' এই প্রকার জ্ঞানাভাবের জ্ঞান কি প্রকারে হইবে বল দেখি, আর যে সময় তাহার আমি বলিয়া জ্ঞান আছে, সে জ্ঞানের অভাবকে সে বুঝিতে যাইতেছে, সেই জ্ঞানের জ্ঞানও তাহার আছে, ইহা যদি মানিয়া লও, তাহা হইলে তাহার জ্ঞানসামান্যের অভাবরূপ বিষয়ই নাই, ইহা মানিতেই হইবে; কারণ, জ্ঞানাভাবরূপ বিষয়ের প্রতিযোগী জ্ঞানমাত্রই হইয়া থাকে, একটিমাত্র ঘটও যেখানে বিদ্যমান আছে, সেখানে ঘটসামান্যের অভাব থাকিতে পারে না, ইহা ত সকলেই স্বীকার করেন, সুতরাং যে কালে আমার 'আমি' এইরূপ জ্ঞান এবং সামান্যতঃ জ্ঞান কাহাকে বলে, তাহার জ্ঞান রহিয়াছে, সেই সময় আমাতে জ্ঞানসামান্যের অভাবরূপ বস্তু বা বিষয় থাকিতেই পারে না। বিষয়ই যদি না রহিল, তবে বিষয়ী যে জ্ঞানসামান্যের অভাবজ্ঞান, তাহা কেমন করিয়া হইবে, সুতরাং আমাতে আমি যে জ্ঞানসামান্যাভাবের অনুভব করি, তাহাই আমার অজ্ঞানের অনুভব, এইরূপ যে নৈয়ায়িকগণের উক্তি, তাহা সর্ব্বথা যুক্তিবিরুদ্ধ, তাহা কে অস্বীকার করিবে? তাই বেদান্তশাস্ত্রের আচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন, সর্ব্ব মানবের অনুভবসিদ্ধ যে অজ্ঞান, তাহা জ্ঞানাভাব নহে—তাহা ভাবপদার্থ, যে চৈতন্যের দ্বারা তাহা প্রকাশিত হয়, তাহারই নাম জীবসাক্ষী বা সাক্ষিচৈতন্য। আরও দেখ, নৈয়ায়িকগণ বলিয়া থাকেন, সুষুপ্তিকালে আমাদের আত্মাতে যে কোন জ্ঞান থাকে না, তাহা আমরা

সুষুপ্তিকালে বুঝি না ; কারণ, তৎকালে যদি তাহা বুঝিতাম, তবে তাহা সুষুপ্তিই হইতে পারিত না, কিন্তু সেই সময়ে আমরা তাহা না বুঝিলেও সুষুপ্তির পর আমাদের জাগরণ দশায় আমরা অনুমান করিয়া থাকি যে, সুষুপ্তিকালে আমাদের কোন প্রকার জ্ঞানই ছিল না। জ্ঞান যখন কার্য্য, তখন তাহা যে কারণের অধীন, তাহা ত মানিতেই হইবে। জ্ঞানের কারণ কি ? ত্বগিন্দ্রিয়ের সহিত অন্তঃকরণের সংযোগই জ্ঞানসামান্যের কারণ, সুষুপ্তির ঠিক্ পূর্ব্বক্ষণে আমাদের অন্তঃকরণ 'পুরীতত্তি' বা 'পুরীতৎ' এই নামে প্রসিদ্ধ একটি সূক্ষ্ম নাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে। এই 'পুরীতৎ' নাড়ী নিস্ত্বক্ অর্থাৎ ত্বগিন্দ্রিয়শূন্য। এই নাড়ীর মধ্যে অন্তঃকরণ প্রবিষ্ট হইলে ত্বগিন্দ্রিয়ের সহিত অন্তঃকরণের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, সুতরাং সেই সময়ে ত্বগিন্দ্রিয়ের সহিত অন্তঃকরণের সংযোগরূপ জ্ঞানসামান্যের কারণ থাকে না, এই কারণে তখন আমাদের কোন জ্ঞানই হইতে পারে না, সুতরাং জ্ঞানসামান্যের কারণ না থাকায় সুষুপ্তিকালে আমার কোন জ্ঞানই হয় নাই, এইরূপ জাগরণকালে যে আমাদের অনুমানরূপ প্রমাণ, সেই প্রমাণের দ্বারা আমরা আমাদের সুষুপ্তিকালীন জ্ঞানাভাবের উপলব্ধি করিয়া থাকি, এইরূপ কল্পনা দ্বারা যখন সকলই উপপন্ন হইতে পারে, তখন আবার সাক্ষিচৈতন্যসিদ্ধ ভাবরূপ পৃথক্ অজ্ঞান বস্তু অঙ্গীকার করিবার কোন আবশ্যকতা নাই, নৈয়ায়িকগণের এই প্রকার মতও যুক্তিসঙ্গত নহে, তাহাই বুঝাইবার জন্য বেদান্তাচার্য্যগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, অনুমানরূপ প্রমাণের দ্বারা আমরা আমাদের সুষুপ্তি অবস্থার জ্ঞানাভাবকে বুঝিতে পারি, ইহা কিছুতেই সম্ভবপর নহে ; কারণ, অনুমান করিতে হইলে যে পক্ষে বা আশ্রয়ে সাধ্যের জ্ঞান করিতে হইবে, সেই পক্ষের জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক। যে পর্ব্বতে বহ্নিরূপ সাধ্যের অনুমান করিতে হইবে, সেই পর্ব্বতেরই জ্ঞান যদি না থাকে, তবে পর্ব্বতে বহ্নি আছে, এই প্রকার অনুমানজ্ঞান কখনই হইতে পারে না, ইহাই যদি সর্ব্ববাদীর সিদ্ধান্ত হয়, তবে আমার সুষুপ্তিকালীন আত্মাতে জ্ঞানাভাবের অনুমান হইবে কিরূপে বল দেখি ? বহ্নির অনুমানস্থলে পর্ব্বত যেমন পক্ষ বা অনুমানের ধর্ম্মী হয়, সুষুপ্তিকালে আমার জ্ঞানাভাবের অনুমান করিতে হইলে সেই কালীন আমার আত্মাকেই পক্ষ বা অনুমানের ধর্ম্মী বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইবে ; সেই সুষুপ্তিকালীন আমার আত্মাকে আমি কিরূপে জানিব বল দেখি ? সুষুপ্তির সময় যদি আমার কোন জ্ঞানই না থাকে, তবে সেই সময় আমার আত্মারও জ্ঞান ছিল না, আত্মার জ্ঞান যদি থাকিত, তবে তোমাদের মতে তাহা সুষুপ্তিই হইতে পারিত না ; কারণ, জ্ঞানসামান্যের অভাবকেই ত তোমরা সুষুপ্তি বলিয়া থাক, সুষুপ্তি যদি আমার জ্ঞানসামান্যের অভাবই হয়, তাহা হইলে ইহাও অবশ্য অঙ্গীকার করিতে হইবে যে, সুষুপ্তিযুক্ত আমার আত্মা আমার জ্ঞানের বিষয় নহে, সুতরাং সেই অবস্থার আত্মা আমার নিকট একান্ত অজ্ঞাত, সেই অজ্ঞাত আমার আত্মাকেই পক্ষ করিয়া তাহাতে জ্ঞানাভাবরূপ সাধ্যের অনুমান করিতে যাওয়া প্রমাতার পক্ষে একপ্রকার বিড়ম্বনা ছাড়া আর কি হইতে পারে ? ফলে হইতেছে এই যে, ন্যায়মতে সুষুপ্তিকালীন আত্মা যে হেতু অজ্ঞাত, সেই সেই অজ্ঞাত আত্মাকে পক্ষ করিয়া তাহাতে জ্ঞানাভাবের অনুমান আমাদের জাগরণকালে হইয়া থাকে, এইরূপ যে ন্যায়মত, তাহা নিতান্ত অসার ; এই কারণেই বেদান্তাচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন যে, আমাদের সুষুপ্তিকালীন যে আত্মা বা জীব এবং তাহার উপাধি যে সর্ব্ববিষয়াবরক অজ্ঞান, এই দুইটি বস্তুই আমাদের নিকটে অজ্ঞাত নহে—যে জ্ঞান বা স্বয়ংপ্রকাশ চৈতন্যের সৌষুপ্ত জীব ও তাহার উপাধিস্বরূপ অজ্ঞান প্রকাশিত হয়, তাহারই নাম জীবসাক্ষী বা সাক্ষিচৈতন্য। এই সাক্ষিচৈতন্য বা জীবসাক্ষী দ্বারা প্রকাশিত অজ্ঞান বা অবিদ্যা সম্বন্ধে আরও যাহা জ্ঞাতব্য আছে, তাহা বারান্তরে বলা যাইবে।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।

কুম্ভের ঝঙ্কার

[বড় গল্প]

ময়মনসিংহ জেলার এক প্রান্ত দিয়া যমুনা নদী বিপুল জলভার বক্ষে ধারণ করত গর্ব্বভরে বহিয়া চলিয়াছে।

একদা অপরাহ্নে মৌরাপুর গ্রামের নীচে যমুনা-জলে নামিয়া দুইটি কিশোরী গা ধুইতেছিল। যে বড়, সে বিবাহিতা—তার নাম রাণী। যে ছোট, সে কুমারী—তার নাম রমা। এক জনের বয়স ষোল বৎসর, আর এক জনের বয়স পনর। উভয়েরই পিত্রালয় এই মৌরাপুর গ্রামে। উভয়েই ভদ্র কায়স্থ-ঘরের মেয়ে। তবে গরীব।

রাণী। তোরা কি সত্যি হরিদ্বারের মেলায় যাবি?

রমা। মেলায় যাব না—স্নানে যাব।

রাণী। কথার ভুল ধরতে হবে না—লেখাপড়া না হয় একটু-আধটু শিখেছিস্—

রমা। একটু-আধটু নয়, অনেক শিখেছি—সংস্কৃত, বাঙ্গালা—

রাণী। না হয় দু'খানা বই পড়েছিস্, কিন্তু বিশখানা বই পড়েছে এমন লোকও ত আছে। তবে এত দেমাক কেন?

রমা। দেমাক তোমার কাছে দেখাব না ত কা'র কাছে দেখাব? আমার কি দেমাক দেখাবার যায়গা হয়েছে?

রাণী। বিয়ে করছিস্ না কেন বল্ দেখি?

রমা। আমার যোগ্য মানুষ আগে জন্ম নিক্, তার পর দেখা যাবে।

রাণী। বাপ রে, দেমাক দেখ!

রমা। দেমাক কর্‌বার মত রূপ থাক্‌লেই লোকে দেমাক করে।

রাণী। দেখ, অত বাড়াবাড়ি ভাল নয়।

একখানি ছোট নৌকা ঘাটের কাছ দিয়া বহিয়া চলিয়াছে। নৌকার মাঝি এক জন, আরোহীও এক জন। দুই জনই তরুণবয়স্ক। মাঝি গাহিতেছিল—

"মেওয়া মিশ্রী সকল মিঠ্যা, মিঠ্যা গঙ্গাজল।
তার থাক্যা মিঠ্যা দেখ শীতল ডাবের জল॥
তার থাক্যা মিঠ্যা দেখ দুঃখের পর সুখ।
তার থাক্যা মিঠ্যা যখন ভরে খালি বুক॥
তার থাক্যা মিঠ্যা যদি পায় হারাণো ধন।
সকল থাক্যা অধিক মিঠ্যা বিরহে মিলন॥"

আরোহী তন্ময়চিত্তে গান শুনিতেছিল। সহসা ঘাটের উপর তাহার নজর পড়িল। দেখিল, জলের উপর একটি পদ্ম ভাসিতেছে। রাণীর মুখে মাথায় কাপড়, রমার মুখ অনাবৃত। সে আকণ্ঠ জলে দাঁড়াইয়া নৌকা পানে ফিরিয়া মাঝির গান শুনিতেছিল। নৌকা যখন কাছাকাছি আসিল, তখন আরোহীর পানে তাহার দৃষ্টি পড়িল। দেখিল, তিনি ভদ্র, তরুণবয়স্ক ও সুন্দর। রমা নয়ন ফিরাইয়া পিছন করিয়া দাঁড়াইল। নৌকা দূরে সরিয়া গেল।

পরদিন অপরাহ্নে আবার নৌকা আসিল। আজ মাঝি গাহিতেছিল না—আরোহী গাহিতেছিল,—

"জলের না পদ্মফুল শুকনায় ফুটে রইয়া,
আস্‌মানের তারা ফুটে মঞ্চেতে ভরিয়া।"

ধীরে ধীরে নৌকা চলিতেছিল ; কিন্তু আরোহী বড় ...ার। নৌকা যখন রমার নিকটবর্ত্তী হইল, তখন আরোহী ...হিল,—

"কার ঘরের উজল বাতি চুরি করল মন।"

পরদিন অপরাহ্ণে রমা গা ধুইতে আসিল না। কিন্তু নৌকা আরোহীকে লইয়া যথাসময়ে আসিল। আরোহী যখন দেখিল, ঘাটে কেহ নাই, তখন সে বড় নিরাশ হইল। অদূরে নৌকা ভিড়াইল, ক্রমে সন্ধ্যা হইল, অন্ধকারে ঘাট ভরিয়া গেল ; 'উজল বাতি' সে অন্ধকার আলো করিতে আসিল না। ঘাটের অন্ধকার হৃদয়ে ভরিয়া আরোহী নৌকা ফিরাইল ; গাহিতে গাহিতে চলিল,—

"কার ঘরের সুন্দর নারী কার পরাণের ধন।"

২

রমার পিতা কেশবচন্দ্র একদা প্রভাতে চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া তামাকু সেবন করিতেছিলেন। তামাকু নিঃশেষ করিয়া হুঁকাটি রাখিতেছেন, এমন সময় কুলাচার্য্য কাশীপতি আসিয়া দর্শন দিলেন। তিনি আসিয়াছিলেন সেই নৌকা-রোহী নবকুমারের পক্ষ হইতে। কিন্তু মুখ্য উদ্দেশ্য প্রকাশ করিলেন না ; জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল আছেন সরকার মশায় ? অনেক দিন এ পথে আসি নি।"

কেশব। ভাল আর কি ! সংসারী জীবের মঙ্গল আর কোথা ? নারায়ণ, নারায়ণ—

ঘটক। কেন, কেন, কি হয়েছে ?

কেশব। কি না হয়েছে তাই বলুন। গিন্নী ধরেছেন হরিদ্বারে কুম্ভস্নানে যাবেন ; এ দিকে—

ঘটক। গিন্নী সাক্ষাৎ ভগবতী, এ রকম ধর-বেনই ত—

কেশব। বটে ! আচ্ছা, আপনার ঘরের ভগবতী যাতে আপনাকে ধরেন, তার ব্যবস্থা আমি করছি।

ঘটক। আজ্ঞে ওটা আর করবেন না, আমি বড় গরীব।

কেশব। আর আমি বুঝি বড়লোক ! কষ্টে-ছিষ্টে চণ্ডীমণ্ডপটুকু পাকা করেছি। তা' এখন হরিদ্বারে যাবার পয়সাই বা পাই কোথা, আর মেয়ের বিয়েই বা দি কি দিয়ে। এখন ত আর বাবুদের সেরেস্তায় সরকারের চাকরি নেই।

ঘটক। মেয়ের বিয়ে যাতে খুব কম খরচে হয়, তার ব্যবস্থা আমি করছি।

কেশব। মেয়ে ত আর রাখা যায় না। কিন্তু কি করব, টাকা নেই, সব ব্যাটাই টাকা চেয়ে বসে।

ঘটক। আমাকে এত দিন বলেন নি কেন ? আমি পারি না কি ? এই হাতুর মা আমাকে ধরলে—

কেশব। ভাল পাত্রটাত্র সন্ধানে আছে কি ?

ঘটক। কত গণ্ডা আছে। এই হাতের মাথায় বড়্সি গ্রামের নবকুমার—তাকে চেনেন বোধ হয় ? তার মত ভাল ছেলে এ তল্লাটে নেই। অবস্থাও বেশ ; মরাইভরা ধান, গোলাভরা চাল, মাঠভরা ফসল, গোয়ালভরা গরু, পুকুরভরা মাছ, বাগানভরা—

কেশব। তা' থাকুক, আমি ও-ঘরে মেয়ে দেব না।

ঘটক। কেন, কেন, আপনাদের পাল্টি ঘর ত ?

কেশব। তা' জানি। নবুর বাপ সত্যচরণের সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল। যে দিন নবু জন্মাল, সে দিন আমি সত্যর বাড়ীতে। সূর্য্যগ্রহণ তখন লেগেছে, আমরা চান্ করতে যাচ্ছি, এমন সময় আঁতুড়-ঘরে শাঁক বেজে উঠল। সন্তানহীন আমি অনেক আশা ক'রে ব'লে ফেল্লুম, আমার মেয়ে হ'লে তার সঙ্গে আমি এই ছেলের বিয়ে দেব। সত্যও ব'লে ফেল্লে, বিনাপণে সে আমার কন্যা নেবে। এ সব কথা আর কেউ জানে না।

ঘটক। তা' হ'লে ত বেশ হয়েছে।

কেশব। বেশ হয় নি—কথাটা শেষ করতে দিন্। তার কয়েক বৎসর পরে আমার এক মেয়ে হ'ল—চমৎকার সুন্দরী। যখন সে দশ এগার বছরের, তখন রূপে গাঁ আলো করলে। এক বড়লোকের ছেলে নৌকায় চ'ড়ে সুন্দর মেয়ে খুঁজে দেশ-বিদেশে বেড়াচ্ছিল। যেমন আমার মেয়েকে নদীর ঘাটে দেখা, তার অমনই পছন্দ ক'রে ফেলা। বল্লে, 'আমি বিশ বছর মেয়েকে পরীক্ষাধীনে রাখব ; বিশ বছর পরে পছন্দ হয় বিয়ে করব, নইলে ফেরৎ দেব।' আমি বল্লুম, 'কি দেবে ?' বাবুটি বল্লে, 'বার মাসে বার হাজার, এখন নগদ দশ।' টাকাটা আর একটু বাড়াবার অভি-প্রায়ে আমি চট্ ক'রে রাজি হ'লাম না—দু'দিন পরে ভেবে বলব এই কথা জানালাম। এর মধ্যে সত্য ভাংচি দিয়ে

বসলে। বাবুটির কাছে গিয়ে বল্লে, রমা বাগ্‌দত্তা, আমার মাস-শাশুড়ী দুশ্চরিত্রা। এই রকম কত কি ব'লে বাবুটির মন ভাঙ্গালে—তিনি দশ হাজার নিয়ে বাড়ী ফিরে গেলেন। যে মানুষের এমন হিংসে, তার ঘরে আবার মেয়ের বিয়ে দেব! প্রাণ থাকৃতে নয়।

ঘটক। তিনি ত এখন আর বেঁচে নেই; তাঁর ছেলের উপর আর রাগ কেন?

কেশব। ওর বাড়ার পিঁপড়েটার উপরে আমার রাগ। আমার টাকা হয়, দোতলা বাড়ী হয়, তা' হতভাগার একেবারে সহ্য হ'ল না। বলে কি না বাগ্‌দত্তা! কিসের বাগ্‌দত্তা? একবার একটা কথা ব'লে ফেলেছিলাম ব'লে? কথা ত লোকে অনেক কয়, তার আবার মূল্য কি? আর তখন আমার মেয়েই হয় নি। বুঝুন ত ঘটক মশাই!

ঘটক। বুঝছি বই কি। তা' সত্য বাবু ত এখন নেই—

কেশব। থাকবে কি ক'রে! তিনটে বছর পেরুল না, যমে ঘাড় ধরলে। ধর্ম্ম ত আছেন, যমুনা ত আজও শুকিয়ে যান নি, চন্দ্র-সূর্য্যি—

ঘটক। তা' ঠিক, তবে কি জানেন—

কেশব। আর জানাতে হবে না—আমি ঢের জেনেছি। অন্য কোথাও ভাল পাত্র বিনা খরচায় পান্ ত দেখ্‌বেন। এখন উঠি, বেলা হ'ল।

উঠি বলিলেই ত কুলাচার্য্য আর উঠিতে পারেন না। এই বিবাহ ঘটাইতে পারিলে তিনি নগদ এক শত মুদ্রা পাইবেন, এরূপ আশ্বাস ব্যক্তিবিশেষের নিকট হইতে পাইয়াছেন। যে প্রকার অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, টাকাটা বুঝি বাক্সেই থাকিয়া যায়, ঘটকের হস্তে আসিবার সম্ভাবনা কম। তবু তিনি নিরাশ হইলেন না, পরদিন আবার আসিবেন বলিয়া মধ্যাহ্নকালে অনাহারে প্রস্থান করিলেন।

৩

ঘটক মহাশয় যাতায়াত করিতে লাগিলেন, কিন্তু বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অবশেষে ভাবে বুঝিলেন, কেশব এমন কোন অর্থসম্পন্ন ব্যক্তির হাতে তাঁহার সুরূপা কন্যাকে দিবেন যে, তাঁহাকে কিছু নগদ টাকা দিবে। সুন্দরী কন্যার পিতার পক্ষে এরূপ আশা করা যে অসঙ্গত নয়, তাহা ঘটক মহাশয় স্বীকার করিলেন এবং পাঁচ শত টাকা নগদ দিবেন, এ কথাও জানাইলেন। কন্যাপক্ষ তাহাতে সম্মত হইলেন না। কুলাচার্য্য যখন এক হাজার টাকায় উঠিলেন, তখন প্রস্তাবটা শ্রবণযোগ্য হইল। কেশব দন্তরাজি বাহির করিয়া ঘটককে বুঝাইতে প্রয়াস পাইলেন যে, তাঁহার কন্যাতুল্যা সুন্দরী পৃথিবীতে নাই, স্বর্গে আছে কি না, সে বিষয়েও তাঁহার সন্দেহ আছে; বক্তৃতান্তে কহিলেন, এক হাজার টাকা বড়ই অল্প হইবে, দুই হাজারের কম তিনি কন্যা সম্প্রদান করিতে পারিবেন না। অতঃপর দুই হাজারই স্থির হইল। নন্দকুমার সম্বন্ধে তাঁহার যে সকল আপত্তি ছিল, তাহা মুহূর্ত্তে নিরাকৃত হইল। পাত্রের সুখ্যাতিতে তিনি পাড়া মাতাইয়া তুলিলেন। এ দিকে ঘটকের সহিত তাঁহার এই কথা রহিল যে, টাকার কথাটা প্রকাশ করা হইবে না। প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে কেশব কন্যা দান করিতেছেন, ইহাই লোক জানিবে। উক্ত সর্ত্ত ভঙ্গ হইলে কেশব বিবাহ ভাঙ্গিয়া দিবেন, এইরূপ শাসাইয়া রাখিলেন। বৈশাখে টাকা আদান-প্রদান হইবে, তাহার পর বিবাহের উদ্যোগ হইবে, এইরূপ স্থির হইল।

রমা বিবাহের কথা শুনিল। রমার মন যে নৌকারোহীর প্রতি একটুও ঝুঁকে নাই, এ কথা বলা যায় না। কিন্তু যখন সে শুনিল যে, সেই নৌকারোহীই তাহার ভবিষ্যৎ স্বামী, তখন মনটাকে ছাড়িয়া দিল। বন্ধনমুক্ত মন, রমাকে আবার নদীর ধারে টানিয়া লইয়া চলিল; রমা কলসীকক্ষে একাই গেল—প্রতিবেশিনী রাণীকেও ডাকিয়া লইয়া গেল না। ঘাটে আসিয়া এ-দিক্ ও-দিক্ চাহিয়া দেখিল, কোথাও নৌকা নাই। রমা আকণ্ঠ জলে ডুবাইয়া গাত্র মার্জ্জনা করিতে লাগিল। একে একে ঘাটে অনেকে আসিল, তাহারা জল লইয়া ঘরে ফিরিল। সন্ধ্যা হইয়া আসিলে রমা উঠিল। কূলে উঠিয়া একবার নদীপানে চাহিয়া দেখিল। সে নৌকা, সে আরোহীকে কোথাও দেখা গেল না।

পরদিন রমা আবার ঘাটে আসিল, কিন্তু কাহাকেও তথায় দেখিল না। দূরে একখানি জাহাজ যাইতেছে দেখিল; বড় বড় নৌকা ফাল্গুনে হাওয়ায় বাদাম উড়াইয়া যাইতেছে দেখিল। কিন্তু সে ছোট নৌকাকে আসিতে

...খিল না। সে বিরক্ত, ব্যথিত, ক্রুদ্ধ হইল।—অবশেষে ...য়া পড়িল। উপরে উঠিয়া দেখিল, সেই নৌকাখানি ...িয়া আসিতেছে; তখন সে আর নড়িতে পারিল না। ...কি করিয়া জলে আবার নামে? রমা তাহার চরণ ...নে চাহিয়া দেখিল, একখানি চরণ তুলিয়া ভাল করিয়া দেখিল। দূরের লোকরা মনে করিল, অপবিত্র কোন পদার্থ ...চরণে দলিত করিয়া থাকিবে। রমা আবার জলে নামিল। পা রগড়াইতে লাগিল, চরণ তুলিয়া পুনঃ পুনঃ দেখিল; পরে আকণ্ঠ জলে নামিয়া গেল।

তখন নৌকা কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। তরণী যত ...কটবর্ত্তী হইতে লাগিল, রমার বুকের উপর কে যেন ...োরে জোরে তত আঘাত করিতে লাগিল। যখন দেখিল, ঘাটের নিকটেও কেহ নাই, তখন তাহার ভয় হইল—উঠিয়া পড়িবার বাসনা হইল; কিন্তু অবসর পাইল না—কানের কাছে ঝঙ্কৃত হইল, "রমা!"

গর্ব্বিতা বালিকা নতনয়নে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। যুবক ডাকিলেন, "শোন রমা।"

রমা এবার নয়ন ফিরাইয়া দেখিল—চারি চক্ষুর মিলন হইল। কিন্তু সে অল্পক্ষণের জন্য—নৌকা সরিয়া গেল—স্রোতে তাড়িত হইয়া নৌকা সরিয়া গেল। কালস্রোতে তাড়িত হইয়া যৌবন যেমন সরিয়া যায়, নৌকাও তেমনই সরিয়া গেল। নবকুমার কহিল, "রমা, অনেক কষ্টে, অনেক কৌশলে তোমাকে পেয়েছি—"

নৌকা দূরে সরিয়া গেল, আর শোনা গেল না। নৌকা কিয়দ্দূর গিয়া আবার ঘুরিল, কাছে আসিল; আরোহী কহিল, "সত্যপালনার্থে তোমার পিতা আমার হস্তে কন্যাদান করতে বাধ্য—আমি তোমার স্বামী। তুমি আমার হবে, রমা?"

"না।"

"না বল্‌ছ কি?"

রমা উঠিয়া পড়িল। তাহার বদন ক্রোধরঞ্জিত। নবকুমার ডাকিল, কিন্তু রমা ফিরিয়াও দেখিল না।

পরদিন রমা, রাণীকে লইয়া ঘাটে আসিল। এ সতর্কতার প্রয়োজন ছিল না—তাহাকে রমা বলিয়া ডাকিতে ঘাটে কেহ আসিল না। পাঁচ দিন কাটিয়া গেল, সে নৌকা এ দিকে আসিল না। রমা সতর্কতা ছাড়িয়া একাই আসিতে আরম্ভ করিল। সপ্তম দিবসে একাকী আসিয়া জলে নামিতেই দেখিল, সেই নৌকাখানি ছুটিয়া আসিতেছে। রমা নৌকার পানে ফিরিয়া দেখিল না। নৌকা কাছে আসিলে আরোহী কহিল, "রমা থাকৃতে পারলাম না। ভেবেছিলাম আর আসব না; কিন্তু থাকৃতে পারলাম না—তোমাকে দেখবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।"

রমার মুখ প্রসন্ন হইল। আরোহীর পানে বারেক নয়ন তুলিয়া চাহিয়া দেখিল। নবকুমার চরিতার্থ হইল। কহিল, "এ কয়দিন তোমার মুখখানি ছাড়া আর কিছু ভাবি নি; তুমি কি সুন্দর, রমা!"

রমার অধর হাসিতে কাঁপিয়া উঠিল, চক্ষু আনন্দে নাচিয়া উঠিল। এবার নবকুমার আসে নাই তাহার দাবী প্রতিষ্ঠা করিতে; এবার আসিয়াছে দীনভাবে ভিক্ষাপাত্র লইয়া। রমা প্রীত হইল। নৌকা দাঁড়াইতে পারিল না—দূরে সরিয়া গেল। দূর হইতে নবকুমার কহিল, "এই সময় কাল আবার আসব, তুমিও এসো, রমা—দয়া করে একবার দেখা দিয়ে যেও।"

৪

চৈত্রের শেষ। হরিদ্বারে খুব ধূম লাগিয়াছে। এবার কুম্ভযোগে স্নানার্থীর সংখ্যা খুব বেশী। বাঙ্গালা দেশে এমন হিন্দুপল্লী কমই আছে, যেথান হইতে কেহ না কেহ কুম্ভস্নানে না আসিয়াছেন। হিমালয়ের শিখর হইতে মহাযোগীরা স্নানার্থে নামিয়া আসিয়াছেন, কুমারিকার প্রান্ত হইতে ধর্ম্মার্থীরা পাপনাশিনী ভাগীরথীর দ্রবীভূত করুণা স্পর্শ করিতে ছুটিয়া আসিয়াছেন। পশ্চিম হইতে গুজরাটী, পঞ্জাবী, মহারাষ্ট্র হইতে মারাঠী, পূর্ব্ব হইতে বাঙ্গালী, বিহারী পুণ্য সঞ্চয়ের নিমিত্ত ছুটিয়া আসিয়াছেন।

ক্ষুদ্র সহর হরিদ্বার কোলাহলে পূর্ণ। এত মানুষ ভারতের কোন স্থানে কোন ঘটনা উপলক্ষে এক উদ্দেশ্য লইয়া সম্মিলিত হইতে শুনা যায় নাই। দক্ষিণে কঙ্খল হইতে উত্তরে ভীমগড়া পর্য্যন্ত এই দীর্ঘ তিন ক্রোশব্যাপী ভূখণ্ড নরমুণ্ডে সমাচ্ছাদিত। কত লোক সমাগত হইয়াছিল, তাহা সরকার ঠিক গণনা করিতে পারেন নাই, গণনা করিবার উপায় ছিল না। রেলের টিকিট গণিয়া মানুষ গণনা হয় না। কত বিভিন্ন দেশের, কত বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন ভাষায় সহরটি মুখরিত হইয়াছিল, তাহা সরকার নির্ণয়

করিতে পারেন নাই। সরকার পারিয়াছিলেন শুধু স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করিতে, সহরটি পরিষ্কার রাখিতে, সে ব্যবস্থা কিন্তু অপূর্ব্ব; এরূপ ব্যবস্থা পূর্ব্বে কেহ ভারতবর্ষে করিতে পারিয়াছেন বলিয়া শুনা যায় নাই। একটু ময়লা, একটু নিষ্ঠীবন রাস্তার কোথাও নাই। সহর অপরিষ্কার করিবার যো নাই—অগণিত প্রহরী সতত সতর্ক রহিয়াছে।

ভারতের নানা দেশ হইতে আসিয়াছিলেন মহাপ্রাণ যুবকবৃন্দ যাত্রীদের সেবা করিতে। উড়িষ্যা হইতে কেহ গিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায় নাই; উৎকলবাসীদিগের অনেকে আজও বাঙ্গালীকে বা বিহারীকে ভাই বলিয়া গ্রহণ করিতে শিখেন নাই, তাঁহারা শিখিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী জ্ঞানে অবজ্ঞা করিতে, ঘৃণা করিতে। প্রয়াগের সেবাসমিতি, পঞ্জাব ও বাঙ্গালার স্বেচ্ছাসেবক এবার হরিদ্বার ক্ষেত্রে যে মহাপ্রাণতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সরকার লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন; লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সাহায্য ব্যতীত এই বিরাট ব্যাপার সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়া সম্ভব ছিল না। নিঃস্ব কাঙ্গালদের বুকে করিয়া তাহাদের শুশ্রূষা করিতে, পীড়িতদের ঔষধ ও আশ্রয়দান করিতে, ক্ষুধার্ত্তের মুখে আহার্য্য ধরিতে, এই সম্ভ্রান্তবংশীয় ভদ্রসন্তানরা একটুও ইতস্ততঃ করেন নাই। অস্পৃশ্য বলিয়া কাহাকেও ঘৃণা করেন নাই, অসুস্থ বলিয়া কাহাকেও অবজ্ঞা করেন নাই– ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করিয়াছিলেন।

পাহারা দিয়াছিলেন, তাঁহারা রেল ষ্টেশনে, পথে-ঘাটে, গলিতে-গলিতে, সেতুমুখে, সেতুর উপর, সর্ব্বত্র। ব্রহ্মকুণ্ড ঘাটের পাশে এক কাষ্ঠ-সেতু নির্ম্মিত হইয়াছিল, পারাপার হইবার জন্য। এই সেতুর উপর বহু পুলিস কর্ম্মচারী দাঁড়াইয়াছিল জনতা দমন করিতে। হিন্দু সে সাহায্য চাহিল না—পুলিস সরাইয়া দিল। ভলণ্টিয়ার সে স্থান অধিকার করিল। অধিকার করিয়া ইঞ্জিনিয়ারকে কহিল, "এ সেতু টিঁকিবে না।" ইঞ্জিনিয়ার সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। স্বেচ্ছাসেবক হরদয়াল কহিলেন, "হেসে উড়িয়ে দিলে চলবে না, এ সেতু মানুষের ভার সইতে পারবে না।"

ইঞ্জি। খুব পারবে।

হর। কত মানুষ এর উপর উঠবে তা' জানেন?

ইঞ্জি। যতই উঠুক না কেন, ভয় নেই।

হর। আপনি ত বললেন ভয় নেই, কিন্তু যদি ভেঙ্গে পড়ে—

ইঞ্জি। তখন আপনাদের বিশেষ সুবিধা হবে।

হর। কি রকম।

ইঞ্জি। ওয়াটার্লু ক্ষেত্রে যে বড় যুদ্ধ হয়েছিল, তার ইতিহাস পড়েছেন? মার্শাল নে যখন নেপোলিয়নের খাস অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে ইংরাজকে আক্রমণ করতে ছুটল, তখন সহসা সাম্‌নে দেখ্‌লে এক গভীর খাদ। পেছুবার বা দাঁড়াবার তখন আর উপায় নেই—পিছনের দল আগের দলকে ঠেলে নিয়ে চলেছে। সৈন্য অগ্রসর হয়ে তাদের দেহ দিয়ে খাদ ভরাট করলে, পেছনের অশ্বারোহীরা মানুষ ও ঘোড়ার দেহের উপর দিয়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে চলে গেল—সেতুর আর প্রয়োজন হ'ল না। কেমন সুবিধে হ'ল না কি?

হর। বা! আপনি কি মহৎ। কি উদারচিত্ত!

ইঞ্জি। তোমাদের কোটি কোটির মধ্যে দু' দশটা গেল বা থাকল তা'তে কি এসে যায়? এত ছাগল মুর্গি প্রতিদিন জবাই হচ্ছে, তা'তে কি তাদের বংশ লোপ পেয়ে গেল?

জনৈক বাঙ্গালী স্বেচ্ছাসেবক তথায় উপস্থিত থাকিয়া সকল কথা শুনিতেছিলেন। তাঁহার নাম বিজয়, বাড়ী কলিকাতায়, বয়স পঁচিশ বৎসর। তিনি রূপবান্, ধনশালী ও শিক্ষিত; দেহেও বিপুল শক্তি। তিনি অগ্রসর হইয়া কহিলেন, "ঠিক বলেছ সাহেব, দু' দশ জন ম'লে বংশ লোপ পায় না; আমাদেরও তাই দুঃখ। তা নইলে—"

বলিতে বলিতে বিজয় ইঞ্জিনিয়ারকে পদাঘাত করিলেন। তিনি শূন্যপথে ঘুরিতে ঘুরিতে নীলধারার তুষার-শীতল জলে গিয়া পড়িলেন। চারিদিকে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। কিন্তু বিজয়কে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। ইঞ্জিনিয়ার ইংরাজ নহেন, প্রাণেও মরেন নাই; সুতরাং আসামীকে ধরিবার জন্য প্রবল চেষ্টা হইল না।

২৫এ চৈত্র। রাত্রি ৩টা। একখানা ট্রেণ আসিয়া হরিদ্বার ষ্টেশনে ভিড়িল। অসংখ্য যাত্রী। আসিয়াছে কেহ গাড়ীর জানালায় বসিয়া, কেহ বা মেঝেতে বসিয়া; লোকের হাঁটুর উপর বসিয়াও কেহ কেহ আসিয়াছিল; তাহা ছাড়া দাঁড়াইয়া আসিয়াছিল বহু যাত্রী। যখন ট্রেণ-রাক্ষসী তাহার পেটের বোঝা উদ্গীর্ণ করিল, তখন ষ্টেশন প্লাবিত হইল।

এই ভিড়ের ভিতর কেশব ছিলেন তাঁহার পত্নী হৈম-
া ও কন্যা রমাকে লইয়া। গ্রামের আরও কেহ কেহ
সিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা যে এই লোক-সমুদ্রের মধ্যে
োথায় অবস্থান করিতেছেন, তাহা সরকার মহাশয় নির্ণয়
রতে পারিলেন না। মাঝে মাঝে তাঁহাদের উদ্দেশে এক
টা চীৎকার ছাড়িতেছেন, কিন্তু সে চীৎকার কামান-
নের মধ্যে পট্‌কার আওয়াজ তুল্য—পাশের লোক ছাড়া
র কাহারও শ্রুতিগোচর হইল না। গলা ফাটিবার উপক্রম
লে তিনি হাল ছাড়িয়া দিলেন এবং জনস্রোতে দেহ ভাসা-
য়া দিলেন। কেশবের কাপড়ের খুঁটে হৈমবতীর অঞ্চল বাঁধা,
বার হৈমর অপর এক অঞ্চল রমার অঞ্চলে বাঁধা। সুতরাং
স্পর বিচ্ছেদের সম্ভাবনা খুব কম ছিল। কখন্ যে তাঁহারা
েলের ফটক পার হইয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন,
াহা তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন না। কেশবের মাথায় এক
িছানার বাণ্ডিল, হৈমর কাঁকে এক গাঁটরি, রমার হাতে
এক পুঁটলি। মুটে নাই, গাড়ী নাই, পথ নাই—শুধু জন-
োত। সেই বিপুল জনতার মধ্যে পড়িয়া কেশবের কান্না
আসিল। যখন একটু অবকাশ পাইলেন, তখন স্ত্রীর উপর
মহা গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন,—"তোর জন্যেই ত এই হায়-
রাণি। এ সব যায়গায় কি মানুষ আসে!"

স্ত্রী। চার পাশে যাদের দেখছ, তারা কি মানুষ নয়?

স্বামী। তারা আর আমি! আচ্ছা তোর বিবেচনা!
এক ছিলিম তামাক যে সেজে খাব, তারও উপায় নেই। কি
বিড়ম্বনা!

স্ত্রী। আচ্ছা মিত্তিররা গেল কোথা?

স্বামী। চুলোয় গেছে, যমের বাড়া গেছে। তাদের
কথা ছেড়ে দেও, এখন আমরা যাই কোথা?

পশ্চাৎ হইতে এক ব্যক্তি কহিল, "তুমিও সেখানে
যাও।"

কেশব ঝটিতি ফিরিয়া দেখিলেন, যাঁহাদের বাসের
জন্য ক্ষণপূর্ব্বে যমালয় ব্যবস্থা করিতেছিলেন, বক্তা সেই
দলেরই কর্ত্তা। মহা অপ্রতিভ হইয়া কেশব কহিলেন, "এই
যে মিত্তির-জা! আমি মনে করলুম—"

"আমরা যমালয়ে গিয়েছি।"

"না, তা' কেন—এই কি জান—"

"আর জানাতে হবে না, তুমি তোমার পথ দেখ।"

"রাগ কর কেন ভাই? তোমারই ভরসায় এসেছি।
তোমার যে কে এখানে আছে।"

"সে ম'রে গেছে; তুমি তোমার পথ দেখ।"

এমন সময় একটা ধাক্কা খাইয়া কেশব প্রভৃতি পতনো-
ন্মুখ হইলেন। বিছানার বাণ্ডিল তাঁহার মাথা হইতে
ছিটকাইয়া পড়িল। কিন্তু মাটীতে পড়িল না, এক ব্যক্তির
মাথায় পড়িল। যাহার মাথায় পড়িল, সে চীৎকার করিয়া
জিজ্ঞাসা করিল, "কার বিছানা?"

কেশব। আমার গো আমার।

আগন্তুক বিজয়; তাঁহার পরিচ্ছদের উপর ভলন্টিয়ার বা
স্বেচ্ছাসেবকের ব্যাজ ছিল। তিনি কেশবকে জিজ্ঞাসা
করিলেন, "আপনারা কোথা যাবেন?"

কেশব। চুলোয় যাব।

বিজয়। সে পথ আমার জানা নেই।

কেশব। এই মাগীর জন্যে যত জ্বালা; কেন যে বিয়ে
করলুম!

বিজয়। সে অনুতাপ পরে করবেন। এখন থাকবার
যায়গা আছে কি না, তাই বলুন।

কেশব। থাকবে কি ক'রে? এখানে ত আর বিয়ে
করি নি।

বিজয়। স্থান না থাকে, আমার সঙ্গে আসুন।

কেশব। কোথা নিয়ে যাবে? কেড়ে-টেড়ে নেবে
না কি? মতলবটা কি বল দেখি?

বিজয়। ছি, ও সব কথা বলবেন না। আমি এক জন
স্বেচ্ছাসেবক, আমার নাম বিজয়; ইচ্ছা হয় সঙ্গে আসুন।

কেশব। চল তবে। রামে মারলেও মরব, রাবণে
মারলেও মরব; তা' রামের হাতেই মরি—রাস্তায় প'ড়ে
মরি কেন?

বিজয়। আপনার যদি এতই অবিশ্বাস, তা হ'লে
আপনি নিজের পথ দেখুন।

হৈমবতী তাড়াতাড়ি কহিলেন, "না বাবা, না;
তোমাকে আমাদের একটুও অবিশ্বাস নেই। তুমি আমা-
দের যেখানে নিয়ে যাবে সেখানে যাব।"

"নিয়ে যাবার স্থানও বড় নেই, সহর ভ'রে গেছে।"

তখন আকাশ পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে। বিজয়
দক্ষতার সহিত ভিড় কাটাইয়া একটা দোকানের আশ্রয়ে

তাঁহাদের দাঁড় করাইলেন। তখন সহসা রমার মুখপ্রতি বিজয়ের দৃষ্টি পড়িল। বিজয় তৎক্ষণাৎ নয়ন ফিরাইয়া লইলেন। রমা তাহা লক্ষ্য করিল।

হৈম। হ্যাঁ বাবা, আমাদের এখানে দাঁড় করালে কেন?

বিজয়। একখানা টাঙ্গা দেখছি; এতটা পথ হেটে যাবেন কি ক'রে?

টাঙ্গা কি বস্তু, তাহা তাহারা কখন দেখে নাই, সুতরাং দেখিবার কৌতূহল হইল। বিজয় বাঁশী বাজাইয়া অপর এক সেবকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। তাহাকে চীৎকার করিয়া কহিলেন, "একখানা টাঙ্গা পাঠিয়ে দেও।" কিছু পরে টাঙ্গা আসিল। গাঁটরি-পুটলি গাড়ীর ভিতরে তুলিয়া সকলে সাবধানে বসিলেন। হৈম বুঝিলেন, টাঙ্গা নৌকা নয়—এক রকম গাড়ী, ঘোড়ায় টানে। তাঁহার ভয় হইল, বলদের গাড়ীতে চড়িয়াছেন, কিন্তু ঘোড়ার গাড়ীতে কখন চড়েন নাই। তিনি বিজয়ের বাহু চাপিয়া বসিলেন। বিজয় চালককে কহিলেন, "কঙ্খাল—সতীঘাট—চালাও।"

"দশ রূপেয়া ভাড়া দেনে পড়ে গা।"

"মিলে গা—চালাও।"

কেশব মনে মনে স্থির করিলেন, "এ টাকা আমি কিছুতেই দেব না।" হৈম ভাবিলেন, "ভাড়ার টাকা নিয়ে দেখচি ফ্যাসাদ বাধবে—কর্ত্তা ত দেবেন না।" রমা ভাবিল, "গাড়োয়ান বুঝি ঠাট্টা করলে। দশ টাকায় আমাদের দেশে এক মাস সংসার চলে যায়।" যাই হো'ক, গাড়ী চলিতে লাগিল। তবে অতি ধীরে। ভাগীরথীর বক্ষ চিরিয়া যে খাল সরকার বাহাদুর রুড়কীতে লইয়া গিয়াছেন, সেই খালের উপর এক সুন্দর সেতু আছে, সেতু পার হইয়া গাড়ী চলিল। কেশব দেখিলেন, পথের দুই ধারে অনেক সাধু সন্ন্যাসীর আখড়া। বিজয় বুঝাইয়া দিলেন, কোন্ সম্প্রদায় নির্ম্মলি, কোন্ সম্প্রদায় নিরঞ্জনি। সতীঘাটের উপরে গুরু নানকের মন্দিরে উদাসী সম্প্রদায় অবস্থান করিতেছিলেন, তাহা বলিলেন। নীলধারা ও গঙ্গার মধ্যে চরভূমিতে ত্যাগী সম্প্রদায় অবস্থান করিতেছিলেন, তাহা জানাইলেন। এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে তাঁহারা কঙ্খলের বাজারে আসিয়া উপনীত হইলেন।

গাড়ী হইতে নামিয়া বিজয় দশটাকা ভাড়া গণিয়া দিলেন। ভাড়া দিবার সময় কেশব একটু দূরে সরিয়া গিয়া একটা দোকানের আটা-ময়দা অতীব মনোযোগসহকারে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। ভাড়া দেওয়া হইয়া গেলে তিনি নিকটস্থ হইলেন। হৈমবতী যখন দেখিলেন, কোন ফ্যাসাদ বাধিল না, তখন তিনি আনন্দিত হইয়া কর্ত্তার নিকটে সরিয়া গেলেন এবং তাঁহাকে চোখের ইঙ্গিতে আনন্দবার্ত্তা জানাইলেন। কর্ত্তা চুপি চুপি কহিলেন, "আমি বুঝে উঠতে পারচি নে লোকটা খামকা দশ টাকা আমাদের জন্যে খরচ করলে কেন? নিশ্চয় কোন মতলব আছে।"

৬

সতীঘাটের কাছে একটা ঘর পাওয়া গেল। ঘরখানি ছোট, তারই ভাড়া পঞ্চাশ টাকা। বিজয় টাকা গণিয়া দিয়া ঘরওয়ালার নিকট হইতে রসিদ লইলেন; এবং কেশবকে সতত সতর্ক থাকিতে উপদেশ দিয়া প্রস্থান করিলেন। প্রস্থিত বিজয়ের উদ্দেশে কেশব কহিলেন, "আমি এ লোকটাকে বুঝে উঠতে পারছি না, নিশ্চয় কোন মতলব আছে। যা' হোক্, তোমরা সতর্ক থেকো।"

হৈমবতী। তোমার যেমন বুদ্ধি, সকলকেই মন্দ দেখ।

কেশব। তোমার মত আমি ত আর মেয়েমানুষ নই যে, যার তার কথায় ভুলে যাব! বিদেশে একটু হুঁসিয়ার থাকতে হয়।

হৈমবতী। ছেলেটি তোমার করলে কি যে, তোমাকে এত হুঁসিয়ার হ'তে হচ্ছে?

কেশব। এত গুণো টাকা সে আমাদের জন্যে খরচ করছে কেন? জানা নেই, শুনো নেই, একেবারে ষাট ষাট টাকা!

হৈমবতী। তীর্থক্ষেত্রে এমন অনেকে দান ক'রে থাকেন। আমার থাকলে আমি কি দিতাম না?

কেশব। আমি ত ষাট পয়সাও দিতাম না; তা' তীর্থই হোক্, আর স্বর্গই হোক্।

বলিয়া তিনি তামাক সাজিতে বসিলেন। রমা কহিল, "তুমি যাই বল বাবা, বিজয় বাবু লোকটি বেশ।"

কেশব। আরে, আমি কি বলছি লোকটা মন্দ? ভাল হোক্, মন্দ হোক্, আমাদের হুঁসিয়ার থাকতে হবে। আমার কাছে কেউ যে চালাকি ক'রে যাবেন সে যো নেই; কত চোর-বাটপাড়, উকীল-মোক্তার দেখে নিলুম—

এমন সময় জনৈক পৈতাতিলকধারী পাণ্ডা জাতীয় ... ব্যক্তি আসিয়া কহিলেন, "বাবুজী, দক্ষেশ্বর মহাদেব ...ন করেছেন ?"

কেশব। এই ত আস্‌ছি বাপু, দর্শন-টর্শন হ'ল আর কখন্ ?

পাণ্ডা। আগে দর্শন ক'রে আসুন, পরে অন্য কায ...রবেন।

কেশব। তামাক-টামাক খেয়ে, চান-টান করে, তার পর।

পাণ্ডা। সে নিয়ম এখানে নেই ; আগে দর্শন করতে ...য়, নইলে নন্দী মহারাজ কুপিত হ'ন। তাঁর কোপে পড়লে ...লোক বিধবা হয়, পুরুষের স্ত্রী মরে, কুমারী অবিবাহিত ...কে যায়। নন্দীমহারাজ বরাবর এই রকম ব্যবস্থা ক'রে ...সছেন।

কেশব। ব্যবস্থাটা যে খুব ভাল তা' মনে হয় না। এক ...ছিলিম তামাক খেয়ে যাবারও যে তিনি অবসর দেন না, এটা বড় কঠিন নিয়ম। যাই হৌক্, তিনি এখন থাকেন কোথা ?

পাণ্ডা। কে, নন্দীমহারাজ ?

কেশব। না, না, দক্ষেশ্বর মহাদেব।

পাণ্ডা। এই ত চলেন না, দেড় মিনিটের পথ।

কেশব। তা' আমরা চ'লে গেলে আমাদের জিনিষ-পত্র আগলাবে কে ?

পাণ্ডা। সে জন্যে কুচ্ছু চিন্তা করবেন না—হামার লোক আছে।

বলিয়া তিনি 'হরদৎ' 'হরদৎ' রবে ঘন ঘন ডাক ছাড়িতে লাগিলেন। অচিরে এক খর্ব্বকায় বলিষ্ঠ যুবক আসিয়া দাঁড়াইল। পাণ্ডা তাহাকে একটা তালা-চাবি আনিতে কহিলেন ; তালা যেন মজবুত হয় ইহাও বলিয়া দিলেন। হরদৎ অবিলম্বে এক তালা চাবি আনিয়া হাজির করিল। দ্বারে তালা লাগাইয়া পাণ্ডা চাবিটা কেশবের হাতে দিলেন। কেশব তখন নিশ্চিন্ত মনে স্ত্রী-কন্যাসহ পাণ্ডার অনুসরণ করিলেন।

তাঁহারা পথ চলিতে চলিতে কোথায় যে পাণ্ডাঠাকুরকে হারাইয়া ফেলিলেন, তাহা তাঁহারা স্থির করিতে পারিলেন না, তাঁহারা হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। সে স্থানটায় খুব ভিড়, চারিদিকে ছোট-বড় রাস্তা, অনেক দোকান। পাণ্ডাকে দেখিতে না পাইয়া কেশব চারিদিকে শঙ্কিত-নয়নে চাহিতে লাগিলেন এবং উচ্চকণ্ঠে তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলেন,—"পাণ্ডাঠাকুর, ও পাণ্ডাঠাকুর !" অনেক পাণ্ডা যাতায়াত করিতেছিলেন ; তাঁহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি চীৎকার শুনিয়া কেশবের পানে ফিরিয়া চাহিলেন এবং অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার পাণ্ডা কে আছে ?"

"তার কপালে তেলক, কাঁধে পৈতে—"

"ও ত হামারও আছে।"

"মাথায় মস্ত টিকি—"

"ওভি হামার আছে।"

"তবে আর কি ক'রে বোঝাব ছাই ! তুমি যেমন বোকা !"

"তার নাম কি বল না।"

"নাম জানি না।"

"তবে বাসায় যান, রাস্তায় মেয়েছেলে নিয়ে দাঁড়িয়ে চিল্লাবেন না—চাপা পড়বেন।"

"বাসায় যাব কোন্ পথে ?"

"আপনার বাসা কোন্‌খানে আছে ?"

"এ দিকে কোথা।"

"তা হ'লে বাসাও চেনেন না। দেখছি আপনি বড় বোকা।"

হৈম কহিলেন, "হ্যাঁ বাবা, আমরা বড় বোকা বনে গেছি। তুমি আমাদের উপায় কর।"

"উপায় আর কি করব ? বুঝতে পারছি তোমরা কোন জোচ্চোরের হাতে পড়েছিলে। তোমাদের কাছে কিছু আছে ?"

"কাছে নেই, বাসায় আছে।"

"বাসায় গিয়ে দেখবে সেখানে কিচ্ছু নেই।"

বলিয়া পথবাহী প্রস্থান করিল। কেশব কোমরে হাত দিয়া দেখিলেন, তাঁহার টাকার গেঁজে নাই। হৈম এ দিকে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ওগো, পুঁটলির ভেতর যে আমার সর্ব্বস্ব আছে।"

রমা ভাবিল, "এ বিপদে বিজয় বাবু কোথা ?"

একখানা মোটর বাস্ আসিতেছিল। লোক সকল এ-দিক্ ও-দিক্ ছিটকাইয়া পড়িয়া আত্মরক্ষা করিল। হুড়াহুড়িতে কে কোন্ দিকে গেল তার ঠিক নাই। কেহ বা লোকের ধাক্কায় পড়িয়া গেল। পথের কঙ্করে আহত হইয়া কেশব যখন উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তখন তিনি সভয়ে দেখিলেন, তাঁহার পার্শ্বে স্ত্রী-কন্যা নাই। আশঙ্কা উদ্বেগে স্তম্ভিত হইলেন। পরে চীৎকার করিতে লাগিলেন, আর চারিদিকে

ছুটাছুটি আরম্ভ করিলেন। ছুটাছুটি করার ফল এই হইল যে, স্ত্রী-কন্যার সান্নিধ্য হইতে তিনি ক্রমে দূরে গিয়া পড়িলেন।

৭

হৈম ও রমা পথের ধারে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এক জন স্বেচ্ছাসেবক তাহা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাঁদছ কেন মা?" হৈম উত্তর করিলেন, "বাবা, আমরা সব হারিয়েছি। কর্ত্তা ছিলেন, তাঁকেও আমরা খুঁজে পাচ্ছি না।"

সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সেবক ফণি কহিল, "আপনারা কোন্ পথ দিয়ে এসেছিলেন বল্‌তে পারেন কি?"

হৈম। না বাবা, সব গোল হয়ে গেছে।

ফণি। তা হ'লে চলুন এখন আমাদের তাঁবুতে; পরে যা হয় করা যাবে।

এ প্রস্তাবে হৈমর মন প্রসন্ন হইল না; রমার ত নয়ই। পিতাকে ছাড়িয়া অপরিচিত লোকের সহিত সে দূরে যাইতে চাহিল না। তাহার চক্ষু বহিয়া অশ্রু ছুটিতেছিল, সে স্রোত বন্ধ করিবার ব্যর্থ প্রয়াস না করিয়া রমা অসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি বিজয় বাবুকে চেনেন?"

"কোন্ বিজয়?"

"তাঁর চোখে চশমা, দেখতে খুব সুন্দর।"

"তা বল্‌লে এখানে ত কাউকে চেনা যায় না, দিদি!"

"এই আপনারই মত পোষাক-পরিচ্ছদ পরা।"

"ওঃ বিজয় মিত্র ভলণ্টিয়ার; তা'কে কে না চেনে? সে খুব বড়ঘরের ছেলে। সে আমাদের দলে কায করে না—অন্য দলে—"

হৈম ব্যগ্র হইয়া কহিলেন, "তার কাছে আমাদের নিয়ে চল না বাবা!"

"সে কোথা ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে তা' ত আমি জানি না মা। আর এ জঙ্গলের ভেতর ছেঁড়া বোতামটি কোথা খুঁজে বেড়াব? তবে আমি তার আড্ডায় খবর পাঠাতে পারি।"

রমা চমকিয়া কহিল, "ঐ যে তিনি!" বলিয়া ছুটিল; এবং দুই তিন ব্যক্তিকে ঠেলিয়া পথ করিয়া বিজয়ের সমীপস্থ হইল। বিজয় তখন একটি বালকের হাত ধরিয়া যাইতেছিলেন। সে তাহার আত্মীয়-স্বজনকে হারাইয়া আকুল নয়নে কাঁদিতেছিল। রমাকে দেখিয়া বিজয় কহিলেন, "তুমি একা এখানে কেন?"

"বড় বিপদে পড়েছি, আপনি এ দিকে একবার আসুন।"

হৈম বিজয়কে দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। তাঁহা[illegible] বিপদের পরিচয় পাইয়া বিজয় ফণিকে কহিলেন, "ফ[illegible] তুমি এঁদের দু'জনকে নিয়ে যাও, আমি পরে যাচ্ছি।"

"তুমিও চল না কেন, বিজয়!"

"এই ছেলেটিকে আগে ওর বাপের কাছে পৌঁছে [illegible] আর কেশব বাবুকেও খুঁজে দেখি।"

মেয়েদের কোথায় লইয়া যাইতে হইবে, বিজয় তা[illegible] বলিয়া দিলেন। তাঁহারা স্বল্পকাল মধ্যে বাসায় আসিয়া দেখিলেন, ঘরের দ্বারে তালা নাই, শুধু শিকল বন্ধ। ক[illegible] প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, বিছানা ছাড়া ঘরে বড় এক[illegible] কিছু নেই। হুঁকো-কল্‌কেতে তস্কররাজ হাত দেন নাই, ইহা কেশবের পক্ষে শুভ সমাচার হইতে পারে, কিন্তু হৈমর পক্ষে একবারেই নয়। তিনি চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, আর কান্নার সহিত সুর করিয়া বলিতে লাগিলেন, পুঁটলির ভিতর তাঁহার কি কি মূল্যবান্ দ্রব্য ছিল। লুকান কতগুলি টাকা ছিল, তাহাও তিনি বলিলেন।

কান্নাকাটির মধ্যে ফণি বিদায় লইল। যাইবার সময় তাঁহাদের সাবধানে থাকিতে বলিয়া গেল। হৈম কহিলেন, "আর সাবধান! সব গেল এখন সাবধান হয়ে কি হবে?" রমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ফণি কহিল, "এখনও সাবধান হ'বার দরকার আছে, মা। কারুর কথায় ঘর ছাড়বেন না, তার পর বিজয় এসে যা হয় করবে।"

ফণি বিদায় হইলে মায়ে-ঝিয়ে আক্ষেপ অনুতাপ ক্রন্দন চালাইতে লাগিলেন। মধ্যাহ্ন অতীত-প্রায়, মুখে একবিন্দু জলও পড়ে নি। ঘরে জল নাই, জলের পাত্রও নাই। আহার্য্য নাই, পয়সা নাই। তার উপর মহা উদ্বেগ। কন্যা কহিল, "বিজয় বাবুকে না পেলে আমরা কি করতুম, মা?"

"কি আর করতুম; এখন ঘরে আছি, তখন না হয় রাস্তায় দাঁড়াতুম। বিপদের আর বাকি কি? টাকা-কড়ি, কাপড়-চোপড় সব গেল—এখন আমরা খাবই বা কি আর পরবই বা কি?"

"বিজয় বাবু একটা কোন ব্যবস্থা করবেন।"

"পরের ছেলে সে আমাদের জন্যে কেন অত করতে যাবে? যা' করেছে ওই ঢের।"

"যাঁর দয়ার শরীর, তাঁর করুণার ধারা কোথা গিয়ে থামবে, তা'ত কেউ বলতে পারে না, মা।"

"তাই ব'লে কি আমাদের দশ দিন খেতে দেবে, না গাড়ী ভাড়া দিয়ে দেশে পাঠিয়ে দেবে।"

"তুমি বিজয় বাবুকে চিন্‌তে পার নি, মা।"

"আমাদের যেমন পোড়াকপাল, তাই মিত্তিরদের কথা শুনে চলে এলুম।"

"দুঃখু করো না মা—যিনি মতি দিয়ে আমাদের এখানে এনেছেন, তিনি কখন কষ্ট দেবেন না।"

"তুই এত কথা শিখ্‌লি কবে?"

"একটু আগে বিপদে পড়ে শিখেছি।"

"কে জানে বাপু তোদের কথা। এখন কর্ত্তা এলে বাঁচি।"

"বিজয় বাবু যখন বাবাকে খুঁজছেন, তখন ভাবনা নেই।"

বলিতে বলিতে কেশবের কণ্ঠস্বর শুনা গেল। ঘরে ঢুকিয়াই তিনি উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বেটারা সব নিয়ে গেছে না কি?"

হৈম। না, রেখে গেছে। তোমার যেমন বুদ্ধি, একটা গুণ্ডাকে রেখে গেলে ঘর আগ্‌লাতে।

কেশব। কি ক'রে জান্‌ব তীর্থে পাণ্ডারা ডাকাতি করে?

হৈম। ও আবার পাণ্ডা কোথা? একটা জোচ্চোর, পাণ্ডা সেজে এসেছিল।

কেশব। আমি ত আর গাঁটরিতে টাকা রাখি নি, গেঁজেতে বেঁধে কোমরে রেখেছিলাম—

হৈম। আঃ বাঁচা গেল। তোমার টাকাগুলো তা হ'লে নিতে পারে নি?

কেশব। সে গুলোও যে গেছে গো! আমার কোমর থেকে কেটে নিয়েছে—হায় হায়!

হেম। কি সর্ব্বনাশ! আমরা তবে কি কর্‌ব গো!

কেশব। বসে বসে কাঁদ।

হৈম। খাব কি?

কেশব। ভিক্ষে ক'রে খাও, আর এক কাপড়ে থাক।

হৈম। দেশে ফিরবে কি ক'রে?

কেশব। হেঁটে।

একটা গভীর বিষাদ সকলকে আচ্ছন্ন করিল। রমা জিজ্ঞাসা করিল, "বিজয় বাবু কোথা বাবা?"

"তিনি আমাকে পৌঁছে দিয়ে জোচ্চোরটাকে ধর্‌তে গেছেন।"

হৈম। তাকে আর ধরা গেছে।

দণ্ড-দুই পরে বিজয় ফিরিল। আসিয়া দেখিল, মায়ে ঝিয়ে মাটীর উপরে পড়িয়া রহিয়াছে, আর কেশবলাল দেয়ালে ঠেস দিয়া তামাকু সেবন করিতেছেন। কেশব জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাটাদের পেলে?"

"না।"

কেশবের বুক ফাটিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। একশত টাকার একখানা নোট গেঁজেতে বাঁধা ছিল। গাঁটরির ভিতরেও কিছু রূপা তামা ছিল। তিনি যে জামাটা ছাড়িয়া নন্দীমহারাজের ভয়ে দক্ষেশ্বর দর্শনে ছুটিয়াছিলেন, সে জামার পকেটেও যৎকিঞ্চিৎ ছিল; কিন্তু এক্ষণে কোথাও একটি তামার পয়সা নাই। পরিধানে তাঁহাদের যে কাপড় কয়খানি আছে, তাহা ছাড়া তাঁহাদের অন্য বস্ত্র রহিল না। এই সব বৈষয়িক চিন্তা কেশবকে বড়ই পীড়া দিতে লাগিল; ধর্ম্মচিন্তা তাঁহার অন্তরে প্রবেশ করিতে সাহস পাইল না। ভগবানের ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা যে একটু শান্তিলাভ করিবেন, মনের বা শরীরের অবস্থা তদনুকুল নহে। মন কাতর, দেহ অবসন্ন। ক্ষুধায় নিদ্রায় তাঁহারা অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন। রমা একবার বিজয়ের পানে অনেক আশা লইয়া চাহিল, কেশব কাতরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হবে বাবা?" হৈম অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিলেন, "তুমি একটা উপায় কর, বাবা!" বিজয় অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া নীরব রহিলেন।

এমন সময় দুই ব্যক্তি কক্ষদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। অগ্রবর্ত্তীর বগলে কাপড়ের বাণ্ডিল, হাতে খাবারের চ্যাঙ্গারি। পশ্চাতে যে লোকটা ছিল, তাহার মাথায় একটা ঝোড়া। বিজয় ইঙ্গিত করিতে তাহারা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল এবং দ্রব্যাদি হর্ম্ম্যতলে রক্ষা করিয়া বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল বিজয় কহিলেন, "আমি এখন যাই, সুবিধামত আসব। দিনু এখানে রইল, সে আপনাদের চান্‌ টান্‌ করিয়ে আনবে। ওকে বিশ্বাস কর্‌তে পারেন—অনেক দিন হ'তে আমাদের সংসারে আছে—একটা ভাল তালা-চাবি এনেছ দিনু?—বেশ করেছ—এই বাড়ীর ঠিকানা এঁদের বলে দেবে, পথ চিনিয়ে দেবে—তুমি বুঝি পান আন নি? যাও, আন গে। আপনারা কোনও গোলে পড়্‌লে বা পথ হারালে কোনও সেবককে বল্‌বেন।

তাঁদের প্রত্যেক গলিতে রাস্তায় ঘাটে সর্ব্বত্র দেখতে পাবেন—তাঁরা সেবা করবার জন্যে ব্যাকুল।”

বিজয় প্রস্থান করিলে হৈম ঝোড়াটা পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার ভিতর ঘি, আটা, চাল, ডাল সব ছিল। হৈমর মুখ একটু প্রসন্ন হইল। খাইতে না পাইয়া মরিবার সম্ভাবনা এক্ষণে নাই বুঝিলেন। কাপড়ের বাণ্ডিল খুলিয়া কেশব দেখিলেন, এক জোড়া গামছা ও কয়েক জোড়া খদ্দরের ধুতি সাড়ী। খদ্দরের কাপড় তিনি একেবারেই পছন্দ করিতেন না—বড় মোটা, কিন্তু এ কাপড় ভাল। সাড়ী দুই জোড়া হৈমর খুব পছন্দ হইল, অনেক নক্সা। খাবারের চ্যাঙ্গারিতে যে সকল অত্যুপাদেয় আহার্য্য ছিল, তাহার নাম ও স্বাদ সম্বন্ধে কোন পরিচয় ইঁহাদের জানা ছিল না। নাড়িয়া চাড়িয়া কর্ত্তা-গিন্নী সব দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু রমা কোন জিনিষ স্পর্শ করিল না—সে শুধু চিন্তা করিতে লাগিল।

কেশব। আপাততঃ আমাদের কোন অসুবিধায় পড়তে হ'ল না। কাপড়-গামছা, খাবার-দাবার—

হৈম। বিজয় ছেলেটিকে না পেলে আমাদের কি দুর্গতি হ'ত।

কেশব। আমি বিজয়কে এখনও চিন্‌তে পারছি নে—

হৈম। তোমার চিনে কায নেই। ভারি ত বুদ্ধি, উনি আবার লোক চিন্তে যান! একটা জোচ্চোরকে পাণ্ডা ব'লে চিনলেন। ঘটে কানাকড়ির বুদ্ধি নেই, ভাবেন আমি কত বড় বুদ্ধিমান্। কেমন অহঙ্কার চূর্ণ হয়েছে! দর্পহারী মধুসূদন—

কেশব। ও কথা কেন আবার তুলছ? বিজয়ের কথা হচ্ছে। আমার মনে হয়, ওর কোন মতলব আছে।

হৈম। দেখ, একবার ওই কথা বলেছিলে ব'লে সেই পাপে সব গিয়েছে; আবার যদি বল—

কেশব। না, না, আমি কিছু বলছি নে।

রমা একটা কথাও বলে নাই। তাহার মনের ভিতর কি একটা ভাব ঠেলিয়া উঠিতেছিল, রমা সেই নবজাত ভাবের স্পন্দনে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ছিল। ইত্যবসরে ভৃত্য দিনু পান সুপারি সহ ফিরিয়া আসিল এবং হৈমবতীর সম্মুখে রক্ষা করত কহিল, “আপনারা চানে চলুন।”

হৈম। এই যে বাবা যাই; কাপড় ক' জোড়া কেটে নি, নইলে পরব কি? কি দিয়ে কাটব?

দিনু। এই যে একটা ছোট বঁটি এনিছি।

কাপড় কাটা চলিতে লাগিল। দিনুকেও তাহার মনিব সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইল। দিনু সকল প্রশ্নের উত্তর একে একে দিল। কহিল—“বাবুর বাপ নেই, মা আছেন। বিয়ে করেন নি—কেন তা' আমি কি জানি। কোলকাতায় মস্ত বাড়ী—বাঙ্গালা দেশে এমন জেলা নেই যেখানে বাবুর জমীদারী নেই। কত আয়? লাখ লাখ টাকা হবে। লোকজন গাড়ী জুড়ি মোটর বহুত। এখানেই আমরা বিশ জন এসেছি, আর একখানা মোটর এসেছে। হ্যাঁ, বাবুর মা এসেছেন। মস্ত বাড়ী, দেড় হাজার টাকায় ভাড়া নিয়েছেন। বাবুর টাকার দুঃখু কি? তিনি মনে করলে গোটা সহরটা কিনে নিতে পারেন। আপনাদের ক' টাকার জিনিষইবা তিনি দিয়েছেন—এই দেখেই আপনারা আশ্চয্যি হচ্ছেন? বাবু আর তাঁর মা কত লোককে যে খাইয়ে পরিয়ে বেড়াচ্ছেন তার ঠিকানা নেই। ইত্যাদি।

কেশব সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। এত বড় লোককে তিনি সন্দেহ করিয়াছিলেন! ছি ছি! তিনি মনে মনে নাকে কানে খৎ দিলেন। এবার তাঁহার দেখা পাইলে কেশব কি করিবেন, কি বলিবেন, তাহার একটা মুসবিদা মনে মনে গড়িয়া রাখিলেন।

[ক্রমশঃ।

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
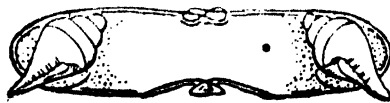
মানসার

মানসার বাস্তুশিল্পরূপে পরিচিত বাস্তুশিল্প বা বাস্তুবিদ্যা বলিতে কোন্ কোন্ বিষয় বুঝিতে হইবে, তাহা মানসারে বর্ণনীয় বিষয়সমূহ হইতে বুঝিতে পারা যায়। মানসারের প্রথম অধ্যায়ে ইহার সপ্ততি সংখ্যক অধ্যায়ের তালিকা দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে শিল্পীর লক্ষণ ও মানোপকরণ বা পরমাণু হইতে আরম্ভ করিয়া অঙ্গুলি, হস্ত ও দণ্ড প্রভৃতি নানা প্রকারের মাপের নিয়মাদি দেওয়া হইয়াছে। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে ধরা, হর্ম্ম্য, যান ও পর্য্যঙ্ক এই চারি ভাগে বাস্তুর ভেদ স্বীকার করা হইয়াছে। হর্ম্ম্যের আবার প্রাসাদ, মণ্ডপ, সভা, শালা, প্রপা ও রঙ্গ এই ষড়্বিভাগ আছে। যানের আদিক, স্পন্দন, শিবিকা এবং রথ নামক চারি বিভাগ। পর্য্যঙ্কেরও পঞ্জর, মঞ্জনী, মঞ্চ, কাকাষ্ঠ, ফলমাসন প্রভৃতি বিভাগ আছে। ভূমিপরীক্ষা ও ভূমিসংগ্রহ নামক চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে গ্রাম, নগর, দুর্গ, প্রাচীর, প্রাসাদ, মন্দির, গোপুরাদি নির্ম্মাণোপযোগী ভূমি, স্থলবিশেষের বর্ণাকৃতি, গন্ধ, স্পর্শ ও উদ্ভিদাদির উৎপাদিকা শক্তি প্রভৃতির পরীক্ষা দ্বারা কিরূপে নির্ণয় করিতে হয়, তাহার বিশদ বর্ণনা আছে। শঙ্কু নামক যন্ত্রের সাহায্যে দিক্ নির্ণয় করিয়া কোথায় কোন্ মুখী গৃহাদির নির্ম্মাণ করিলে স্বাস্থ্য, সম্পদ্ বৃদ্ধি হয়, তাহা ষষ্ঠাধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। সপ্তমাধ্যায়ে দ্বাত্রিংশবিধ গৃহের নক্সা (plan) আলোচিত হইয়াছে। অষ্টমাধ্যায়ে বাস্তুদেবতা ও অন্যান্য গৃহ-দেবতার বর্ণনা ও পূজাবিধি আছে।

নবম অধ্যায়ে দণ্ডক, সর্ব্বতোভদ্র, নন্দ্যাবর্ত্ত, পদ্মক, স্বস্তিক, প্রস্তর, কার্ম্মুক ও চতুর্মুখ এই অষ্টবিধ গ্রামের স্থান, মাপ, নক্সা, রাস্তা, প্রাচীর, জলাশয়, মন্দির, উদ্যান, গোচারণ স্থান, ক্রয়-বিক্রয়ের স্থান, সর্ব্বসাধারণের মিলনের স্থান, নানা জাতির ও শ্রেণীর লোকের বাসস্থানাদির সুবিস্তারিত বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় এই-ভাবেই পরবর্ত্তী অধ্যায়ে নগরাদির বর্ণনা আছে। তাহাতে রাজধানী, নগর, পুর, পত্তন, খেট, খর্ব্বট ও কুব্জক নামক অষ্টবিধ নগর এবং গিরিদুর্গ, বনদুর্গ, জলদুর্গ, রথদুর্গ, দেবদুর্গ, পঙ্কদুর্গ ও মিশ্রদুর্গ এই সপ্ত শ্রেণীতে বিভক্ত শিবির, বাহিনীমুখ, স্থানীয়, দ্রোণক, সংবিদ্ধ বা বর্দ্ধক, কোলক, নিগম ও স্কন্ধাবার নামক অষ্টবিধ দুর্গের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

ভূমিলম্ব নামক পরবর্ত্তী অধ্যায়ে একতল হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ তল পর্য্যন্ত বাসগৃহ ও মন্দির এবং অষ্টাদশ তল পর্য্যন্ত গোপুর নামক মন্দিরদ্বার-গৃহের তলসমূহের কিরূপ উচ্চতা হওয়া উচিত, বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে গৃহসমূহকে জাতি, ছন্দ, বিকল্প বা সংকল্প এবং আভাস এই চারি শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। সাধারণতঃ ছন্দ, বিকল্প ও আভাস শ্রেণীস্থ গৃহোচ্চতার যথাক্রমে ত্রি-চতুর্থাংশ, অর্দ্ধেক ও চতুর্থাংশ। উচ্চতাকে আবার শান্তিক, পৌষ্টিক, পার্ষ্ণিক বা জয়দ, অদ্ভুত এবং সর্ব্বকামিক এই পঞ্চ শ্রেণীতে বিভাগ করা হইয়াছে। গৃহের উচ্চতা যখন বিস্তারের ২¼ গুণ, তখন তাহাকে শান্তিক বলে; দ্বিগুণ হইলে পৌষ্টিক; ১¾ গুণ হইলে পার্ষ্ণিক বা জয়দ, ১½ গুণ হইলে অদ্ভুত এবং ১¼ গুণ হইল সর্ব্বকামিক বলা হয়। প্রসঙ্গক্রমে কত তলযুক্ত গৃহে কোন্ কোন্ শ্রেণীর লোকের বাস করা উচিত, তাহার আলোচনা করা হইয়াছে। গর্ভন্যাস নামক ত্রয়োদশ অধ্যায়ে কোন্ কোন্ তলযুক্ত গৃহের কিরূপ ভিত্তি হওয়া উচিত, তাহার আলোচনা আছে।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সর্ব্বত্রই প্রাচীনকালে স্তম্ভই গৃহের নিয়ামক ছিল, অর্থাৎ স্তম্ভকেই প্রধানতম বিষয়রূপে গ্রহণ করিয়া তদনুসারে গৃহের ভিত্তি, প্রাচীর ও শীর্ষদেশ প্রভৃতি নির্দ্ধারিত হইত। সে প্রথানুসারে মানসারেও স্তম্ভের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির বিশদ বিবরণ বিভিন্ন অধ্যায়ে প্রদত্ত হইয়াছে। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে উপপীঠ বা স্তম্ভপাদের বর্ণনা আছে। বেদ-ভদ্র, মঞ্চভদ্র ও প্রতিভদ্র এই তিন শ্রেণীর উপপীঠের প্রত্যে-কটি আবার চারিভাগে বিভাগ করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে স্তম্ভের অধিষ্ঠানসমূহ অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে। চতুঃষষ্টি প্রকারের অধিষ্ঠানের বর্ণনা ও মাপ উনবিংশ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে; যথা—পাদবন্ধ, উরগবন্ধ, প্রতিক্রম, কুমুদবন্ধ, পদ্মকেসর, পুষ্পপুষ্কল, শ্রীবন্ধ, মঞ্চবন্ধ, শ্রেণীবন্ধ, পদ্মবন্ধ, কুম্ভবন্ধ, বপ্রবন্ধ, বজ্রবন্ধ, শ্রীভোগ, রত্নবন্ধ, পট্টবন্ধ, কুক্ষিবন্ধ, কম্পবন্ধ, ও শ্রীকান্ত।

পঞ্চদশ অধ্যায়ে স্তম্ভবপুর আকৃতি, পরিমাপ ও অলঙ্করণাদির বিবরণ আছে। আকৃতি অনুসারে স্তম্ভসমূহ পঞ্চ শ্রেণীতে বিভক্ত। চতুরস্র স্তম্ভকে ব্রহ্মকান্ত বলে, পঞ্চাস্র শিবকান্ত, ষড়স্র স্কন্দকান্ত, অষ্টাস্র বিষ্ণুকান্ত এবং ষোড়শাস্র রুদ্রকান্ত। পরিমাপ ও অলঙ্করণ অনুসারেও স্তম্ভসমূহ পঞ্চভাগে বিভক্ত, যথা, চিত্রকর্ণ, পদ্মকান্ত, চিত্রস্কন্ত, পালিকাস্তম্ভ ও কুম্ভস্তম্ভ। আকৃতি অনুসারে এক প্রকারের দ্ব্যস্র বা চেপ্টা রকমের স্তম্ভ আছে, যাহাকে কোষ্ঠস্তম্ভ ও কুড্যস্তম্ভ বলে। ষোড়শ অধ্যায়ে প্রস্তর বা স্তম্ভশীর্ষের বর্ণনা আছে। প্রসঙ্গ ক্রমে এই অধ্যায়ে গৃহের ছাদসমূহ বর্ণিত হইয়াছে।

সন্ধিকর্ম্ম নামক সপ্তদশ অধ্যায়ে গৃহনির্ম্মাণে কিরূপে কাষ্ঠের সংযোজনা করিতে হয়, তাহার বর্ণনা আছে। কাষ্ঠ-সন্ধি নানাবিধ ; যথা, নন্দ্যাবর্ত্ত,স্বস্তিক ও সর্ব্বতোভদ্র প্রভৃতি আকৃতিবিশিষ্ট। বিমান নামক অষ্টাদশ অধ্যায়ে এক হইতে দ্বাদশ পর্য্যন্ত তলযুক্ত গৃহের তলসমূহের আপেক্ষিক পরিমাপ, গৃহাদির ও প্রতিমাদির নাগর, বেসর ও দ্রাবিড় এই তিন প্রধান পদ্ধতিতে (style) বিভাগ এবং গৃহের স্তূপিকা লুপা ও মুখভদ্রের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

পরবর্ত্তী দ্বাদশ অধ্যায়ে এক হইতে দ্বাদশ তল পর্য্যন্ত দ্বাদশ শ্রেণীস্থ ৯৮ প্রকারের গৃহের বিস্তারিত বর্ণনা আছে। একতলবিশিষ্ট গৃহ আট শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা জয়ন্তিক, ভোগ, শ্রীবিশাল, স্বস্তিবন্ধন, শ্রীকর, হস্তিপৃষ্ঠ, স্কন্ধতার ও কেশর। দ্বিতল গৃহও আট শ্রেণীতে বিভক্ত—শ্রীকর, বিজয়, সিদ্ধ, পৌষ্টিক, কান্তিক, অদ্ভুত বা প্রভূতক, স্বস্তিক ও পুষ্কল। ত্রিতল গৃহও আট প্রকারের, যথা, শ্রীকান্ত, আসন, সুখালয়, কেশর, কমলাঙ্গ, ব্রহ্মকান্ত, মেরুকান্ত, ও কলশ। চতুস্তল গৃহের আট শ্রেণী – বিষ্ণুকান্ত, চতুর্মুখ, সদাশিব, রুদ্রকান্ত, ঈশ্বরকান্ত, মঞ্চকান্ত, বেদিকান্ত ও ইন্দ্রকান্ত। অষ্টবিধ পঞ্চতল গৃহের নাম ঐরাবত, ভূতকান্ত, বিশ্বকান্ত, মূর্ত্তিকান্ত, যমকান্ত, গৃহকান্ত, যজ্ঞকান্ত ও ব্রহ্মকান্ত। ষট্‌তল গৃহ ত্রয়োদশ শ্রেণীতে বিভক্ত—পদ্মকান্ত, কান্তার, সুন্দর, উপকান্ত, কমল, রত্নকান্ত, বিপুলাঙ্গ, জ্যোতিষ্কান্ত, সরোরুহ, বিপুলাকৃতি, স্বস্তিকান্ত, নন্দ্যাবর্ত্ত ও ইক্ষুকান্ত। সপ্ততল গৃহ আট প্রকারের, যথা, পুণ্ডরীক, শ্রীকান্ত, শ্রীভোগ, ধারণ, পঞ্জর, আশ্রমাগার, হর্ম্ম্যকান্ত ও হিমকান্ত। অষ্টতল গৃহের আট প্রকারের নাম, ভূকান্ত, ভূপকান্ত, স্বর্গকান্ত, মহাকা..., জলকান্ত, তপস্কান্ত, সত্যকান্ত ও দেবকান্ত। নবতল গৃহ সপ্তশ্রেণীতে বিভক্ত—সৌরকান্ত, রৌরব, চণ্ডিত, ভূষণ, বিবৃত, সুপ্রতিকান্ত ও বিশ্বকান্ত। দশতল গৃহ ছয় প্রকারের, যথা, ভূকান্ত, চন্দ্রকান্ত, ভবনকান্ত, অন্তরিক্ষকান্ত, মেঘকান্ত ও অব্জকান্ত। একাদশতল গৃহও ছয় প্রকারের - শম্ভুকান্ত, ঈশকান্ত, চন্দ্রকান্ত, সমকান্ত, বজ্রকান্ত ও অর্ককান্ত। দ্বাদশতল গৃহ দশ শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা, পাঞ্চাল, দ্রাবিড়, মধ্যকান্ত, কলিঙ্গকান্ত, বিরাট, কেরল, বংশকান্ত, মাগধকান্ত জনককান্ত ও গুর্জরকান্ত।

প্রাকার নামক একত্রিংশ অধ্যায়ে বাস্তগৃহের পরিসরভূমিকে পঞ্চপ্রাঙ্গণে ভাগ করা হইয়াছে। প্রথম প্রাঙ্গণের নাম অন্তর্মণ্ডল, দ্বিতীয় প্রাঙ্গণের নাম অন্তর্হার, তৃতীয়ের নাম মধ্যমহারা, চতুর্থের নাম প্রাকার এবং পঞ্চমের নাম মহামর্য্যাদা। এই পঞ্চপ্রাঙ্গণের কোথায় কোন্ কোন্ প্রকারের গৃহ নির্ম্মাণ করা উচিত, তাহার বিশদ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। পরবর্ত্তী পরিবার নামক অধ্যায়ে দেবালয়স্থ পঞ্চপ্রাঙ্গণের নানাবিধ পরিবার দেবালয় বর্ণিত হইয়াছে। গোপুর নামক দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ে এক হইতে ষোড়শ পর্য্যন্ত তলযুক্ত মন্দিরদ্বারগৃহসমূহের বিবরণ আছে। অন্তর্মণ্ডল নামক প্রাঙ্গণস্থ গোপুরের নাম দ্বারশোভা; অন্তর্হার নামক প্রাঙ্গণস্থ গোপুরের নাম দ্বারশালা; তৃতীয় প্রাঙ্গণের গোপুরকে দ্বারপ্রাসাদ বলে; চতুর্থ প্রাঙ্গণের গোপুরের নাম দ্বারহর্ম্ম্য এবং মহামর্য্যাদা নামক পঞ্চম প্রাঙ্গণের গোপুরের নাম মহাগোপুর। স্তূপিকা, গলকূট ও ক্ষুদ্র নাসীভেদে গোপুর আবার আট শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা, শ্রীভোগ, শ্রীবিশাল, বিষ্ণুকান্ত, ইন্দ্রকান্ত, ব্রহ্মকান্ত, স্কন্ধকান্ত শিখর ও সৌম্যকান্ত। পরবর্ত্তী দুই সুদীর্ঘ অধ্যায়ে যথাক্রমে মণ্ডপ ও শালা নামক গৃহসমূহের বিবরণ আছে। হিমজ, নিষধজ, বিজয়, মাল্যজ, পারিযাত্র, গন্ধমাদন, হেমকূট, মেরুজ, পদ্মক, সিচ, পদ্ম, ভদ্র, কুলধারণ, শিব, বেদ, সুখাঙ্গ, দার্ব্ব, কৌশিক, সৌখ্যক, জয়াল, দণ্ডক নামক দ্বিমুখ, স্বস্তিক ও লাঙ্গল নামক ত্রিমুখ, চতুর্মুখ, সর্ব্বতোভদ্র নামক পঞ্চমুখ এবং মৌলিক নামক যমুখ প্রভৃতি নানা শ্রেণীর মণ্ডপ বর্ণিত হইয়াছে। দণ্ডক, স্বস্তিক, মৌলিক, চতুর্মুখ, সর্ব্বতোভদ্র ও বর্দ্ধমানাদি নামে

...লাসমূহও নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়ে গৃহের মান ও স্থান সাধারণভাবে বর্ণিত হইয়াছে। গৃহ-প্রবেশ নামক পরবর্ত্তী অধ্যায়ে নবগৃহে প্রথম প্রবেশকালীন সংস্কারাদির বর্ণনা আছে।

অষ্টত্রিংশ ও ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়ে দ্বারস্থান ও দ্বারমান বর্ণিত হইয়াছে। ত্রয়োত্রিংশ অধ্যায়ের অন্তিমভাগে নানা প্রকারের গবাক্ষ পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। সেরূপ ত্রিংশ অধ্যায়ের অন্তিমভাগে সচল ও অচল প্রভৃতি নানাবিধ সোপান বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

পরবর্ত্তী অধ্যায়ত্রয়ে চক্রবর্ত্তী, মহারাজ বা অধিরাজ, মহেন্দ্র বা নরেন্দ্র, পার্ষ্ণিক, পট্টধর, পট্টভাক্, মণ্ডলেশ, প্রাহারক ও অস্ত্রগ্রাহী এই নয় শ্রেণীতে বিভক্ত ভূপতি-সমূহের নানাবিধ রাজহর্ম্ম্য, সৈন্যাদি রাজাঙ্গব ও গুণাবলী বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে। ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়ে রাজা ও দেবগণের নিত্য ও নৈমিত্তিক ব্যবহারোপযোগী সপ্তবিধ রথের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আছে। এই সপ্তবিধ রথ সাধারণতঃ আকৃতি অনুসারেই বিভক্ত, যথা, বর্গক্ষেত্রাকৃতি, নভস্বানভদ্রক, ষট্‌কোণাকৃতি প্রভঞ্জনভদ্রক, দ্বিভদ্রযুক্ত নিবাতভদ্রক, ত্রিভদ্রাবশিষ্ট পবনভদ্রক, দশভদ্রযুক্ত পৃষদ-ভদ্রক এবং ইন্দ্রক বা চন্দ্রকভদ্রক এবং দ্বাদশভদ্রবিশিষ্ট অনিলভদ্রক। শয়ন নামক পরবর্ত্তী অধ্যায়ে নানাবিধ পর্য্যঙ্কের বিশদ বিবরণ আছে। সিংহাসন নামক পঞ্চ-চত্বারিংশ অধ্যায়ে নানাবিধ রাজসিংহাসন ও দেবসিংহা-সনের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম, মঙ্গল, বীর ও বিজয় নামক চারি প্রকারের সিংহাসন রাজাভিষেকের সময় ব্যবহৃত হয়। নিত্যার্চ্চন, নিত্যোৎসব, বিশেষার্চ্চন ও মহোৎসব নামক চারি প্রকারের সিংহাসন নিত্য-নৈমিত্তিক দেবার্চ্চনের সময় ব্যবহৃত হয়। কিন্তু রাজা ও দেবতা-দিগের ব্যবহারোপযোগী সিংহাসনসমূহ আকৃতি অনুসারে সাধারণতঃ দশ শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা, পদ্মাসন, পদ্মকেসর, পদ্মভদ্র, শ্রীভদ্র, শ্রীবিশাল, শ্রীবন্ধ, শ্রীমুখ, ভদ্রাসন, এবং পাদবন্ধ। তোরণ নামক পরবর্ত্তী অধ্যায়ে সিংহাসন ও গৃহা-দির জন্য তোরণসমূহের বিশদ বর্ণনা আছে। অলঙ্করণাদি অনুসারে তোরণ সাধারণতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা, পত্রতোরণ, পুষ্পতোরণ, রত্নতোরণ এবং চিত্রতোরণ। যক্ষ, বিদ্যাধর ও কিন্নরাদির মূর্ত্তিযুক্ত তোরণেরও উল্লেখ আছে।

মধ্যরঙ্গ নামক সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়ে দেবালয়ের চত্বর ও প্রাঙ্গণস্থ নাট্যশালাদির বিস্তারিত বিবরণ আছে। কল্পবৃক্ষ নামক পরবর্ত্তী অধ্যায়ে সিংহাসনাদিতে চিত্ররূপে ব্যবহৃত বৃক্ষবিশেষের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আছে।

অভিষেক নামক ঊনপঞ্চাশৎ অধ্যায়ে রাজাভিষেক বর্ণনা ও প্রসঙ্গক্রমে রাজমুকুট, দেবমুকুট ও নানাবিধরূপে কেশবন্ধন-পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে। শিরোভূষণ সাধারণতঃ দ্বাদশ শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা, জটা, মৌলি, কিরীট, করণ্ড, শিরস্ত্রক, কুণ্ডল বা কুন্তল, কেশবন্ধ, ধম্মিল্ল, অলক চূড়া, মুকুট এবং পট্ট। পট্ট বা পাগড়ী তিন প্রকারের, যথা, পত্রপট্ট, পুষ্পপট্ট, ও রত্নপট্ট। ভূষণ নামক পরবর্ত্তী অধ্যায়ে 'অঙ্গভূষণ' বা নানাবিধ অলঙ্কার এবং 'বহির্ভূষণ' বা গৃহোপকরণসমূহের বিস্তারিত বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। অঙ্গভূষণের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে,—কিরীট, শিরোভূষণ, চূড়ামণি, কুণ্ডল, তাটঙ্ক, মকরভূষণ বা মকরাঙ্কিত কুণ্ডল, কঙ্কণ, কেয়ুর, মণিবন্ধকলাপ, কিংকিণীবলয়, অঙ্গুলীয়ক, রত্নাঙ্গুলীয়ক, হার, অর্দ্ধহার, মালা, বনমালা, নক্ষত্রমালা, দাম, স্তনসূত্র, সুবর্ণসূত্র, পুরসূত্র, কটিসূত্র, উদরবন্ধ, মেখলা, স্বর্ণ কঞ্চুক, নূপুর এবং পাদজাল ইত্যাদি। গৃহোপকরণের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য – দীপদণ্ড, ব্যজন, দর্পণ, মঞ্জুষা অর্থাৎ তোরঙ্গ, আলমারি ইত্যাদি, দোলা, তুলা, অর্থাৎ দাঁড়ি-পাল্লা, পঞ্জর এবং নীড়। নীড় নানা রকমের, যথা, মৃগনাভি, বিড়ালের, শুক, চাতক, চকোর, মরাল, পারাবত, নীলকণ্ঠ, কুঞ্জরীয়, খঞ্জরিত, কুক্কুট, কুলাল, নকুল, তিত্তিরি, গোধার এবং ব্যাঘ্র ইত্যাদির জন্য। পর্য্যঙ্ক ও আসনাদি পূর্ব্বেই স্বতন্ত্রভাবে আলোচিত হইয়াছে।

ত্রিমূর্ত্তি নামক একপঞ্চাশদ্ অধ্যায়ে স্বীয় স্বীয় ধ্যানানু-সারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের প্রতিমা-নির্ম্মাণ বর্ণিত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে মূর্ত্তিনির্ম্মাণোপযোগী বিবিধ দ্রব্যের আলোচনা আছে, যথা, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, প্রস্তর, কাষ্ঠ, সুধা, শর্করা, মৃত্তিকা ও আভাস। আভাস বা শ্বেতপ্রস্তর তিন প্রকারের, যথা, চিত্র, অর্দ্ধচিত্র ও প্রকৃত আভাস। পরবর্ত্তী অধ্যায়দ্বয়ে শিবলিঙ্গ ও দেবীপীঠের সুদীর্ঘ বর্ণনা আছে। অধুনা ভারতবর্ষে তিন শত লক্ষেরও অধিক শিবলিঙ্গের যথারীতি পূজা হয়। ইহা হইতে লিঙ্গপূজার লোকপ্রিয়তা প্রমাণিত

হয়। বর্ত্তমান অধ্যায়েও নানাবিধ শিবলিঙ্গের উল্লেখ আছে, যথা, শৈব, পাশুপত, কালমুখ, মহাব্রত, বাম, ভৈরব, সমকর্ণ, বর্দ্ধমান, শিবাঙ্গ, স্বস্তিক, জাতি, ছন্দ, বিকল্প, আভাস, নাগর, দ্রাবিড়, বেসর; দৈবিক, মানুষ, গাণব ও আর্ষ নামক চতুর্বিধ উদ্ভূত বা স্বয়ম্ভুলিঙ্গ; আত্মার্থ ও পরার্থ; একলিঙ্গ ও বহুলিঙ্গ; স্বর্ণ, রৌপ্য ও বজ্রাদি নির্ম্মিত লিঙ্গ; ক্ষণিক ও স্থায়ী লিঙ্গ ইত্যাদি। শিবলিঙ্গ অনুসারে দেবী-পীঠেরও নানা ভেদ আছে। কিন্তু পীঠসমূহ সাধারণতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা, ভদ্রপীঠ, শ্রীভদ্র, শ্রীবিশাল এবং উপপীঠ। শক্তি নামক চতুঃপঞ্চাশদ্ অধ্যায়ে নানাবিধ দেবী-মূর্ত্তির বর্ণনা আছে, যথা, সরস্বতী, সাবিত্রী, মহী, মনোন্মনী, সামান্যা ও মহালক্ষ্মী এবং সপ্তমাতৃ অর্থাৎ বারাহী, কৌমারী, চামুণ্ডী, ভৈরবী, মাহেন্দ্রী, বৈষ্ণবী ও ব্রহ্মাণী।

পরবর্ত্তী অধ্যায়দ্বয়ে যথাক্রমে জৈন ও বৌদ্ধ দেবদেবীর বর্ণনা আছে। জৈনদের চতুর্বিংশতি তীর্থঙ্করেরও উল্লেখ আছে, যথা, আদিনাথ, অজিতনাথ, শম্ভুনাথ, অভয়ানন্দ-নাথ, সুমতিনাথ, সুপদ্মনাথ, সুপার্শ্বনাথ, চন্দ্রপ্রভ, পুষ্পদন্ত, শীতলনাথ, শ্রী-অংশনাথ, বসুপদ্ম, বিমলনাথ, অনন্তনাথ, ধর্ম্মনাথ, শান্তনাথ, কুন্থনাথ, অরনাথ, মল্লিনাথ, মুনিসুব্রত, নমিনাথ, নেমিনাথ, পার্শ্বনাথ এবং বর্দ্ধমান বা মহাবীর।

সপ্ত পঞ্চাশদ্ অধ্যায়ে অগস্ত্য, কাশ্যপ, ভৃগু, বশিষ্ঠ, ভার্গব, বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজ প্রভৃতি ঋষিদের মূর্ত্তির বর্ণনা আছে। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে যক্ষ, বিদ্যাধর, কিন্নর, কিন্নরী, গন্ধর্বাদির মূর্ত্তি বর্ণিত হইয়াছে। ভক্তলক্ষণ নামক একাষষ্টিতম অধ্যায়ে সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্যকামী মহাপুরুষদের মূর্ত্তির বর্ণনা আছে। পরবর্ত্তী চারি অধ্যায়ে দেববাহনসমূহ বর্ণিত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ ব্রহ্মবাহন হংস, বিষ্ণুর বাহন গরুড়, শিবের বাহন নন্দী এবং দেবীর বাহন সিংহের বর্ণনা আছে। কার্ত্তিকের বাহন ময়ূর, গণেশের বাহন মূষিক, ইন্দ্রের বাহন ঐরাবত, যমের বাহন মহিষ, সূর্য্যের বাহন সপ্তাশ্ব চালিত রথ, বরুণের বাহন মকর এবং কুবেরের বাহন নর সুপ্রসিদ্ধ। এই প্রকরণে প্রতিমা নামক চতুঃ-ষষ্টিতম অধ্যায়ে সর্ব্বপ্রকার প্রতিমার কতকগুলি সাধারণ বিবরণ আলোচিত হইয়াছে।

ভাস্কর্য্য শিল্প বা মূর্ত্তিনির্ম্মাণের মূলতত্ত্ব বাস্তবিক তাল-মান। স্থাপত্য শিল্প বা গৃহ নির্ম্মাণে যেমন স্তম্ভের উচ্চতাই অন্যান্য বিষয়ের নিয়ামক, সেরূপ মুখের দীর্ঘতাই প্রতিমার অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নিয়ামক। প্রতিমার দৈর্ঘ্য যখন মুখের আটগুণ হয়, তখন তাহা অষ্টতাল নামে পরিচিত। সেরূপ সপ্ততাল মূর্ত্তির দৈর্ঘ্য মুখমানের সাতগুণ। এরূপ আপেক্ষিক পরিমাণাদির দ্বারাই ভারতীয় আর্য্য ও অনার্য্য এবং পাশ্চাত্য গ্রীসীয়, ফরাসী, জার্ম্মাণ, ওলন্দাজ, দিনেমার, ইংরাজ ও জাপানী, ব্রহ্মদেশীয়, চীনদেশীয় প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় লোক বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, আর্য্য পুরুষের দেহের দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ মুখমানের অষ্টগুণ এবং স্ত্রী দেহের দৈর্ঘ্য মুখমানের সাত হইতে সাড়ে সাত গুণ। এই বিষয়ে কেশ ও দেহের বর্ণ এবং কপাল, ভ্রূ, নাসিকা, ও ওষ্ঠাদির আকৃতিও লোক সমূহের জাতীয় বিভিন্নতার অন্যতম কারণ। বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়ামের বিম্বমান নাম পাণ্ডুলিপিতে দ্বাদশবিধ তালমানের উল্লেখ আছে। তদনুসারে একতালে বন্ধুক নামক কীট পরিমাপিত হয়; দ্বিতালে পক্ষী; ত্রিতালে কিন্নর, চারিতালে ভূত, পঞ্চতালে গণেশ, ষট্‌তালে ব্যাঘ্র, সপ্ততালে যক্ষ, অষ্টতালে মনুষ্য, নবতালে দানব, দশতালে বুদ্ধাদি অবতার, একাদশতালে দেবতা, এবং দ্বাদশতালে রাক্ষসের মূর্ত্তি পরিমাপিত হয়। মানসারে দশতালের বিস্তারিত বিবরণ আছে। পঞ্চষষ্টিতম ও ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়ে দশতালের বর্ণনায় ১৫৪ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাপ দেওয়া হইয়াছে।

প্রলম্ব নামক সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়ে শিরঃ, কণ্ঠ, পৃষ্ঠ ও বাহুমূল প্রভৃতি স্থান হইতে কতকগুলি কাল্পনিক রেখা অঙ্কিত করিয়া মূর্ত্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহের আপেক্ষিক দূরত্ব পর্য্যা-লোচিত হইয়াছে। ভাস্কর্য্য শিল্পে এনাটমি (Anatomy) বা শারীরতত্ত্বের আভাস এই অধ্যায়ে পাওয়া যায়। মধু-চ্ছিষ্ট নামক পরবর্ত্তী অধ্যায়ে মধুচ্ছিষ্ট বা মোমের সাহায্যে তাম্রপত্র বা তামার পাত লেপন করিয়া কিরূপে ধাতুনির্ম্মিত মূর্ত্তি অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া সংশোধন করিতে হয়, তাহার বিস্তারিত বিবরণ আছে। এতদিন পর্য্যন্ত লোকের এক ভুল ধারণা ছিল যে, খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর পূর্ব্বে সির পেড্রু (Cire perdue) নামক পদ্ধতিতে ভারতবর্ষে মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইতে পারিত না; সুতরাং এই পদ্ধতি য়ুরোপ হইতেই ভারতীয় শিল্পীরা ধার করিয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে এই মধুচ্ছিষ্ট বিধান হইতে সে ভুল ধারণা অপসারিত হইয়াছে।

উনসপ্ততিতম অধ্যায়ে অঙ্গদূষণ বা মূর্ত্তি ও গৃহাদির [illegible]গে যাহাতে কোনরূপ দোষ থাকিতে না পারে, তাহার [illegible] আলোচনা আছে। চক্ষুরুন্মীলন নামক গ্রন্থের শেষ [illegible]য়ে মূর্ত্তিনির্ম্মাণের শেষ কার্য্য চক্ষুদান আলোচিত হই-[illegible]। প্রসঙ্গ ক্রমে রত্নশুদ্ধি ও মূর্ত্তিতে হীরা মুক্তা প্রভৃতি [illegible] সংযোজনার বিধিও বর্ণিত হইয়াছে।

মানসারের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে বাস্তুবিদ্যা বা [illegible]পত্য ও ভাস্কর্য্য শিল্পের ব্যাপকতার উপলব্ধি হইতে পারে। এই গ্রন্থের প্রথম অষ্টাধ্যায়ে শিল্পীর লক্ষণ হইতে আরম্ভ করিয়া মান, প্রমাণ, পরিমাণ, লম্বমান, উন্মান, উপমান [illegible]মান, তালমান, ঘনমান, ও অঘনমানাদি নানাবিধ [illegible]; রূপ, আকৃতি, প্রবণতাদি দ্বারা গৃহনির্ম্মাণোপযোগী ভূমির পরীক্ষা; পদবিন্যাস বা নক্সা; এবং সাঙ্কু সাহায্যে দি[illegible]নির্ণয় প্রভৃতি আনুষঙ্গিক বিষয়সমূহ আধুনিক বৈজ্ঞানিক রীতি অনুসারে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। পর-[illegible]র্ত্তী দ্বিচত্বারিংশদ্ অধ্যায়ে ভিত্তিস্থাপন হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্ববিধ গ্রাম, নগর, দুর্গ, প্রাকার, কূপ, তড়াগ, [illegible]কাদি জলাশয়; শালা, মণ্ডপ, গোপুর, অট্টালিকা, রাজ-[illegible]াদির তলপীঠ, উপপীঠ, অধিষ্ঠানাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আছে। প্রসঙ্গক্রমে যান, রথ, শয্যাসন, পেটিকা ও দীপদণ্ডাদি গৃহোপকরণ এবং সর্ব্ববিধ হার, বলয়, কেয়ুর, কঙ্কণ, পাদুকা ও শিরোভূষণাদি অলঙ্কার-সমূহ আলোচিত হইয়াছে। শেষ বিংশতি অধ্যায়ে দেব, দেবী, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, যক্ষ, বিদ্যাধর, নর, নারী, ঋষি ও মহাপুরুষাদি; এবং পশু, পক্ষী, মৎস্য, কীট ও পতঙ্গাদির মূর্ত্তিনির্ম্মাণপদ্ধতি এরূপ বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, অশিক্ষিত শিল্পীরাও ইহার সাহায্যে নির্দ্দোষ ও একরূপ চিরস্থায়ী প্রতিমা নির্ম্মাণে সমর্থ হইয়াছে। গৃহাদি নির্ম্মাণ বিষয়েও প্রাচীন পদ্ধতি আধুনিক পদ্ধতি অপেক্ষা শ্রেয়ঃ স্বীকার করিতে হইবে; কেন না, আধুনিক গৃহ সাময়িক সংস্কার সত্ত্বেও শতাধিক বৎসরের অধিক স্থায়ী হয় না, পক্ষান্তরে প্রাচীন গৃহাদি বিনা সংস্কারেও সহস্র সহস্র বৎসর দণ্ডায়মান থাকিয়া আধুনিক পদ্ধতির ব্যর্থতা সপ্রমাণ করিতেছে। গ্রন্থ, তামিল, তৈলঙ্গ বা ত্রিকলিঙ্গ, মলয়ালম, ও নাগরী, এই পঞ্চবিধ অক্ষরে লিখিত এবং ভারতবর্ষ ও য়ুরোপের নানাস্থানে রক্ষিত মানসারের একাদশাধিক জীর্ণশীর্ণ পাণ্ডুলিপি বা হাতের লেখা পুথি অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধ লেখকের দ্বারাই ইহার প্রথম সংস্করণ প্রণীত হইয়াছে। সরকার বাহাদুরের ব্যয়ে অক্স্‌ফোর্ড্ ইউনিভারসিটী প্রেস হইতে তাহা প্রকাশিত হইতেছে। উহা দুর্বোধ্য কঠিন। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত এবং সহস্র সহস্র পারিভাষিক শব্দে পরিপূর্ণ। হিন্দুশিল্পের অভিধান ও "ভারতীয় বাস্তুশিল্প" নামক লেখক-প্রণীত দুইখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ায় মানসার অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য হইয়াছে। মদীয় অভিধানের পরিশিষ্টে উল্লিখিত দ্বিশত-পরীক্ষিত অমুদ্রিত শিল্পগ্রন্থের পুথি; মৎস্য, অগ্নি, গরুড়, স্কন্দ, বায়ু, ভবিষ্য প্রভৃতি পুরাণ; ও কারণ, কামিক, সুপ্রভেদ, অংশুমদাদি আগমে বিস্তারিত ভাবে অলোচিত শিল্পসমূহ; এবং নানাবিধ অর্থশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, জ্যোতিষ-শাস্ত্র, নিরুক্ত ব্যাকরণ, কোষ, কাব্য, নাটক, ইতিহাস, জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহ, ঋগথর্ববাদি বেদ, ঐতরেয়াদি ব্রাহ্মণ, বৌধায়ন ও আপস্তম্ভাদি সূত্র প্রভৃতিতে উল্লিখিত শিল্পের সহিত মানসারে বর্ণিত শিল্পের এক আদান প্রদানের সম্বন্ধ রহিয়াছে। বিট্রুবিয়াস নামক রোমক শিল্পীর খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে প্রণীত য়ুরোপের প্রাচীনতম ও নিয়ামক শিল্পগ্রন্থের সহিতও মানসারের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় এবং মানসার নামক গ্রন্থ কখন, কাহার দ্বারা, কোথায়, কিরূপে প্রণীত হইয়াছিল ইত্যাদি বিষয়ও বারান্তরে আলোচিত হইবে।

শ্রীপ্রসন্নকুমার আচার্য্য।
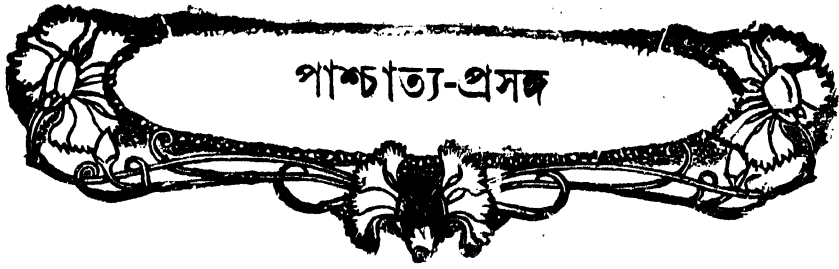
নারীদস্যু সোফিয়া স্যালিংএর আত্মকাহিনী

৩

ইটালিয়ানদের একটা চলিত কথা এই যে, 'নেপলস দেখবে, তবে মরবে।' এ কথার তাৎপর্য্য বোধ হয় এই-রূপ যে, নেপলসের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভাময় নগর দেখিয়া নয়ন মন পরিতৃপ্ত করিবার পর মৃত্যু হইলে আক্ষেপের কোন কারণ থাকিবে না। সমুদ্র হইতে নেপল্‌স নগরের দৃশ্য যে অতি মনোহর, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে; কিন্তু আমার বিশ্বাস, ঐ চলিত কথাটির অর্থ এই যে, যাহারা নেপল্‌স দেখিবার জন্য তাহার পথে বাহির হইবে, দুর্গন্ধের উৎপাদক দুর্গন্ধে তাহাদিগকে মরিতেই হইবে। উঃ, সে কি ভীষণ দুর্গন্ধ! তবে দৃশ্য-গৌরবে নেপল্‌স্ ভুবনবিজয়ী সন্দেহ নাই।

"আমার ব্যবসায়ের সহযোগী পিট রোমনগরে আমাকে গুলী করিয়া মারিতে উদ্যত হইলে আমি তাহার সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া নেপল্‌স নগরে আসিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম; কারণ নেপল্‌স দেখিবার জন্য বহুদিন হইতেই আমার প্রবল আগ্রহ ছিল। নেপল্‌সে কিছুদিন বাস করিতে হইলে অর্থব্যয় অপরিহার্য্য; কিন্তু আমি সেখানে অর্থোপার্জ্জনের কোনও একটা পন্থা আবিষ্কার করিতে পারিব, আমার এই বিশ্বাস মুহূর্ত্তের জন্য শিথিল হয় নাই।

"প্যারিসে আমি যে সকল জহরত অপহরণ করিয়াছিলাম, তাহার অধিকাংশ রোমের এক জন জহুরীর নিকট বিক্রয় করি। এই জহুরীটা চোরা মাল সওদা করিত। কিন্তু সে আমাকে ঠকাইতে পারে নাই; ঐ সকল জহরতের বিনিময়ে আমি তাহার নিকট বহু সহস্র 'লিরা' (ইটালী দেশের মুদ্রা) আদায় করি। এই সময় প্যারিসের পুলিস আমাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য চারি দিকে গোয়েন্দা পাঠাইয়াছিল। গোয়েন্দাগুলা দেশদেশান্তরে মহা উৎসাহে আমাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল; কিন্তু ইহাতে আমি বিন্দুমাত্র ভীত বা উৎকণ্ঠিত হইলাম না। তাহারা আমার অপেক্ষা চতুর হইলে হয় ত আমার সন্ধান পাইত; কিন্তু তাহাদিগকে আমি মানুষ বলিয়া গণ্য করিতাম না।

"রোম নগরে উপস্থিত হইবার অব্যবহিত পরে আমি রোমের এক জন 'বেশকারীর' দোকানে উপস্থিত হইলাম; তাহার সাহায্যে প্রথমে আমার কেশগুলির বর্ণ পরিবর্ত্তিত করিলাম। তাহার পর আমার চেহারারও এরূপ পরিবর্ত্তন করিলাম যে, যদি আমি ফ্লরিডায় গিয়া আমার বৃদ্ধ পিতার সম্মুখে উপস্থিত হইতাম, তাহা হইলে তিনিও আমাকে চিনিতে পারিতেন না, অন্য লোক ত দূরের কথা!

"এই ভাবে কেশ ও আকৃতির পরিবর্ত্তন করিয়া আমি দৃশ্যগৌরবপূর্ণ, দুর্গন্ধের আধার নেপল্‌স নগরে উপস্থিত হইলাম, এবং 'সাস্তালুসিয়া' নামক হোটেলে একটি শয়ন কক্ষ ও একটি উপবেশন কক্ষ ভাড়া করিয়া আমোদ-প্রমোদে মত্ত হইলাম।

"নেপল্‌স নগরের দর্শনীয় সকল স্থানই প্রথমে দেখিয়া লইলাম। বিখ্যাত আগ্নেয় গিরি বিসুভিয়সে আরোহণ করিলাম, পম্পিয়াই সন্দর্শন করিলাম, মোটরবোটে কাপ্রিতে গিয়া জল-বিহার করিলাম। অবশেষে কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য একদিন রাত্রিকালে নেপলসের দস্যুতস্করের আড্ডাগুলি দেখিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। আমি যখন ইউনাইটেডষ্টেটসে ছিলাম—সেই সময় সূর্য্যালোক সমুদ্ভাসিত ইটালীর সন্তানগণের নিকট গল্প শুনিয়াছিলাম, নেপলস নগরের দস্যুতস্করগুলির আড্ডাসমূহের ন্যায় ভয়াবহ স্থান য়ুরোপের অন্য কোন নগরে নাই; এবং য়ুরোপের অন্যান্য নগরের দস্যুতস্করের আড্ডাগুলি

...পসের ঐ শ্রেণীর আড্ডাগুলির তুলনায় 'ভজনালয়' ...লেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং তাহা দেখিবার জন্য ...মার কৌতূহল হইলে, আশা করি, কেহ তাহা অমার্জ্জ...য় মনে করিবেন না। যাহা হউক, আমি কয়েকটি ...ড্ডায় প্রবেশ করিয়া যে সকল কাণ্ড প্রত্যক্ষ করিয়া...লাম, তাহাতেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম—পূর্ব্বে যাহা ...নয়াছিলাম, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। এই আড্ডার মত ভীষণ ...ন অন্য কোন নগরে নাই!

"এক দিন সন্ধ্যার পর আমি ঘুরিতে ঘুরিতে 'কুয়াই পার্টিনোপে'র একটি নোংরা 'কাফে'র ভিতর প্রবেশ করিলাম। এই 'কাফে' কতকগুলা দুর্দ্দান্ত বদমায়েসের আড্ডা, এ সংবাদ আমি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলাম; এ জন্য, যদি হঠাৎ কোন বিপদ ঘটে, তাহা হইলে আত্মরক্ষার প্রয়োজন হইতে পারে ভাবিয়া টোটাভরা একটি পিস্তল সঙ্গে লইয়াছিলাম। পিস্তলটি না লইয়া সেখানে নিরস্ত্র ভাবে যাইলে আমার বিপদের সীমা থাকিত না।

"যাহা হউক, আমি 'কাফে'র ভিতর প্রবেশ করিয়া, একটা নোংরা মদ্যসিক্ত টেবলে বসিয়া এক গ্লাস 'ভারমথ' আনিবার জন্য আদেশ করিয়াছি, ঠিক সেই সময় একটা প্রকাণ্ড জোয়ান গুণ্ডা মদমত্ত অবস্থায় টলিতে টলিতে 'কাফে'র ভিতর প্রবেশ করিয়া, আমার ঠিক সম্মুখের চেয়ারখানি দখল করিয়া বসিল। তাহার মুখ দিয়া 'ভক্ ভক্' করিয়া মদের গন্ধ বাহির হইতেছিল; আমার মন ঘৃণায় ভরিয়া উঠিল, কিন্তু মাতাল গুণ্ডাটাকে আমি দেখিয়াও দেখিলাম না।

"আর্দ্দালী আমাকে 'ভারমথ' আনিয়া দিলে গ্লাসটি আমি মুখের কাছে তুলিয়া ধরিয়াছি, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে সেই জানোয়ারটা হাত বাড়াইয়া আমার হাত হইতে পাত্রটা কাড়িয়া লইল, তাহার পর হা হা করিয়া হাসিয়া এক নিশ্বাসে তাহা সাবাড় করিল! অন্য কেহ এরূপ অবস্থায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া হতভম্ব ভাবে বসিয়া থাকিত; কিন্তু বিপদের সময় আমার বুদ্ধি যোগাইতে বিলম্ব হয় না; আত্মরক্ষায়ও আমি পরাঙ্মুখ হই না। নিউইয়র্কের নানা স্থানে পদার্পণ করিয়া, এবং নানা কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আমি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলাম, তাহার সাহায্যে আমি যে কোন বিপদে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিতাম।

"গুণ্ডাটা এক চুমুকে সেই এক গ্লাস মদ সাবাড় করিয়া খালি গ্লাসটা টেবলে নামাইয়া রাখিবামাত্র, আমি গ্লাসটা সক্রোধে তুলিয়া লইয়া সবেগে তাহার চক্ষুর উপর নিক্ষেপ করিলাম। সেই আঘাতে গ্লাসটা চূর্ণ হইল. গ্লাসের ভাঙ্গা কাচ তাহার চক্ষুতে বিঁধিয়া তাহাকে চির-জীবনের মত অন্ধ করিল কি না, তাহা আমার জানিবার সুযোগ হয় নাই; কিন্তু সেই গুণ্ডাটার ললাটে পড়িয়া গ্লাসটি চূর্ণ হইবামাত্র সে ক্ষিপ্ত ষাড়ের মত গর্জ্জন করিয়া লাফাইয়া উঠিল, তাহার মুখ দিয়া তখন রক্তের ধারা বহিতেছিল। সে যে চেয়ারে বসিয়াছিল—সেই চেয়ারখানা দুই হাতে উচু করিয়া তুলিয়া, চক্ষুর নিমেষে আমার মস্তক লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিল।

"কিন্তু তাহার মতলব বুঝিয়া, সে চেয়ারখানি নিক্ষেপ করিবার পূর্ব্বেই, আমি এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। চেয়ারখানি আমার পশ্চাতস্থিত দেওয়ালে পড়িয়া চূর্ণ হইল; কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই পিস্তলের গম্ভীর নির্ঘোষ শুনিয়া আমি সবিস্ময়ে সেই গুণ্ডাটার দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। তাহার হাত দুইখানি দুই পাশে ঝুলিয়া পড়িল, এবং সে টলিতে টলিতে মেঝের উপর চিৎ হইয়া পড়িয়াই অজ্ঞান।

"পিস্তলের গুলীটা যে দিক হইতে আসিয়াছিল—আমি বিস্ফারিত নেত্রে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র দ্বার প্রান্তে আমার সমবয়স্কা একটি সুন্দরী যুবতীকে দেখিতে পাইলাম; তাহার হাতে একটি পিস্তল, পিস্তলের নলের মুখ হইতে তখনও ধূম নিঃসারিত হইতেছিল!

"আমি সেই অপরিচিতা যুবতীকে সম্বোধন করিয়া আমার প্রাণরক্ষার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে উদ্যত হইয়াছি, সেই মুহূর্ত্তে দুই জন পুলিস প্রহরী সেই কক্ষে প্রবেশ করিল, এবং সেই যুবতীকে এক ধাক্কায় সরাইয়া দিয়া, তাহার অবৈধ কার্য্যের জন্য কৈফিয়ত চাহিল; সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে উদ্যত হইল।

"দেখিলাম, আমার প্রাণদাত্রীর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব অসাধারণ! সে ইতালীয় ভাষায় নিম্নস্বরে সেই প্রহরিদ্বয়কে কি বলিয়া, তাহাদের প্রত্যেকের হাতে এক শত লিরার এক একখানি নোট গুঁজিয়া দিল, তাহার পর এক

লক্ষে আমার পাশে আসিয়া 'খপ্' করিয়া আমার হাত চাপিয়া ধরিল, এবং আমি কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই, পাশের একটি দরজা দিয়া আমাকে টানিয়া আনিয়া রাজপথে উপস্থিত হইল। নোংরা গুণ্ডার আড্ডা আমাদের পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। বলা বাহুল্য, পুলিসের প্রহরিদ্বয় আর আমাদের অনুসরণ করিল না।

"রাজপথ তখন উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে আলোকিত। সেই আলোকে আমার সঙ্গিনীর মুখ পরীক্ষা করিলাম। তাহার মুখের রঙ্গ দক্ষিণাঞ্চলের রমণীগণের মুখের রঙ্গের মত লোহিতাভ। চক্ষুতারকা গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ; তাহার পরিচ্ছদ মূল্যবান্ না হইলেও সুরুচিসঙ্গত। তাহাকে ইংরাজী ভাষায় কথা বলিতে শুনিয়া আমি অধিকতর বিস্মিত হইলাম। আমেরিকানদের ইংরাজী উচ্চারণে যেমন একটু টান থাকে—তাহার কথাতেও সেইরূপ মার্কিণী টান ছিল।

"যুবতী হাসিয়া বলিল, মাতাল গুণ্ডাটা তোমাকে প্রায় সাবাড় করিয়াছিল! খুব বাঁচিয়া গিয়াছ ভাই, কি বল?

"আমি বলিলাম, তোমার কথা সত্য; কিন্তু এই ভাবে বিপন্ন হওয়া আমার পক্ষে নূতন নহে, আমি ইহাতে অভ্যস্ত। কিন্তু তুমি আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছ, এ জন্য আমি তোমার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম। এই উপকার কখন ভুলিব না।

"সঙ্গিনী আমার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, "ও কিছুই নয়; বদমায়েস গুণ্ডার আক্রমণ হইতে নারী নারীকে রক্ষা করিবে না? আমার বিশ্বাস—তুমি আমেরিকান, সত্য কি না?

"আমি বলিলাম, হাঁ, তোমার অনুমান সত্য; কিরূপে বুঝিলে?

"যুবতী বলিল, আমার জন্মই যে আমেরিকায়। বোষ্টন আমার জন্মস্থান।

"আমি বলিলাম, আমি হোটেল সান্তা লুসিয়ায় বাসা লইয়াছি, নিকটেই আমার হোটেল। আমার সঙ্গে চল ভাই, আমি তোমাকে না খাওয়াইয়া ছাড়িয়া দিব না। কেমন যাইবে ত?

"সে তৎক্ষণাৎ আমার প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিল; আমার সঙ্গে যাইবার জন্য এরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিল যে, তাহার আগ্রহ দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম—তাহার মুখ সাদা হইয়া গিয়াছে; মনে হইল সে বড় অবসন্ন। আমার সন্দেহ হইল, দীর্ঘকাল সে অভুক্ত আছে, এবং ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছে!

"কিন্তু এ সম্বন্ধে আমি তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না। আমি তাহাকে সঙ্গে লইয়া হোটেলে উপস্থিত হইলাম, এবং তাহাকে আমার বসিবার ঘরে বসাইয়া, সেই স্থানেই তাহার জন্য খাবার আনাইলাম। হোটেলে যতদূর উৎকৃষ্ট খাবার মিলিতে পারে, তাহাই তাহাকে দেওয়া হইল।

"কি আগ্রহের সঙ্গে সে খাইতে লাগিল! ছুঁড়ি গিলিলও অনেক; শেষে সে যখন এক গ্লাস 'সির্‌ঁাতি' পান করিল, তখন তাহার মুখের বিবর্ণতা দূরে গিয়া স্বাভাবিক লাবণ্য ফিরিয়া আসিল। আহার শেষ করিয়া তৃপ্তিভরে সে একটা নিশ্বাস ছাড়িল। বুভুক্ষু দীর্ঘকাল পরে আহার করিয়া যেরূপ তৃপ্তিলাভ করে, তাহার ভাব দেখিয়া মনে হইল, সে সেইরূপ পরিতৃপ্ত হইয়াছে। আহারান্তে আমি তাহাকে এক পেয়ালা কফি ও একটি চুরুট দিলাম। সে চুরুটটা মুখে গুঁজিয়া হঠাৎ উঠিয়া গেল। জানালার নিকট একখানি গদী আঁটা চেয়ার ছিল, সেই চেয়ারে সে হতাশ ভাবে বসিয়া পড়িল। বিস্মিত ভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিলাম; দেখিলাম অশ্রুধারায় তাহার গাল দু'খানি ভাসিয়া যাইতেছে!

"আমি মনে মনে বলিলাম, 'আহা, বেচারার জীবন বোধ হয় দুঃখময়! কে জানে হঠাৎ উহার মনে কি কষ্ট হইয়াছে। মনস্থির হইলে হয় ত উহার মনের কষ্ট আমার নিকট প্রকাশ করিবে। এখন উহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করাই ভাল।'—আমি সহানুভূতিভরে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম, তাহাকে সান্ত্বনাদানের চেষ্টা করিলাম না।

"কয়েক মিনিট পরে তাহার মনের ভার লঘু হইলে, সে তাহার আত্মকাহিনী আমার নিকট প্রকাশ করিল। এরূপ অদ্ভুত কাহিনী যে, তাহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইল না; কিন্তু সংসারে কিছুই অসম্ভব নহে। মনে হইল, আমাকে

মিথ্যা কথা বলিয়া তাহার লাভ কি? তাহার কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করাই উচিত।

"যুবতী বলিল—তাহার নাম লুইসা কন্টিনেনি। শৈশবে সে মাতৃহীনা হইয়াছিল; তাহার বিমাতা একটি রাক্ষসী; বিমাতার কঠোর শাসনে তাহার জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছে। রাক্ষসী তাহাকে উঠিতে বসিতে লাঞ্ছনা করে, পেট ভরিয়া খাইতে দেয় না। দিবারাত্রি তাহাকে কঠোর পীড়ন ও বাক্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বোষ্টন নগরেই তাহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুকালে তাহার পিতা তাহার জন্য কিছু নগদ টাকা রাখিয়া গিয়াছিল, তাহার পরিমাণ কয়েক হাজার ডলার। তাহার বিমাতা ইতালীয় রমণী। তাহার বিমাতা স্বামীর মৃত্যুর পর জন্মভূমি নেপল্‌স নগরে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। পিতা তাহার জন্য যে টাকাগুলি রাখিয়া গিয়াছিল, তাহার বিমাতা সেই টাকাগুলি আত্মসাৎ করিয়া, নেপল্‌স নগরের কয়েক মাইল দূরবর্ত্তী একটি মঠের সন্ন্যাসিনীদের হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিয়াছিল। সন্ন্যাসিনীরাই তাহার প্রতিপালন ভার গ্রহণ করিয়াছিল। অথচ তাহার টাকাগুলি লইয়া তাহার বিমাতা সুখে স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতেছে। বিমাতার নিকট হইতে তাহার এক "লিরাও" পাইবার আশা নাই।

"মঠেও লুইসার দিনগুলি অতি কষ্টে অতিবাহিত হইতেছিল। সেখানে তাহাকে বন্দিনীর ন্যায় কালযাপন করিতে হইত; কোন বিষয়ে তাহার বিন্দুমাত্র স্বাধীনতা ছিল না। মঠের সন্ন্যাসিনীগণের যথেচ্ছাচার সহ্য করিতে না পারিয়া, তিন দিন পূর্ব্বে সে মঠ হইতে গোপনে পলায়ন করিয়াছিল। সে মঠ হইতে নেপল্‌স নগরে আসিয়া তাহার বিমাতার সহিত সাক্ষাৎ করে এবং তাহার পিতৃপ্রদত্ত টাকাগুলির দাবী করে। কিন্তু তাহার বিমাতা তাহাকে টাকা দিতে সম্মত হয় নাই; তাহাকে অবিলম্বে গৃহত্যাগ করিতে আদেশ করে। লুইসা টাকা না লইয়া নড়িবে না বলায়, তাহার বিমাতা চাবুক আনিয়া তদ্দ্বারা তাহাকে প্রহার করিতে আরম্ভ করে। প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া লুইসা আর ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিল না। সে সেই কক্ষের এক কোণে একটি পিস্তল দেখিয়া তাহা কুড়াইয়া লইল; পিস্তলটি টোটাভরা। লুইসা সেই পিস্তলের সাহায্যে তাহার বিমাতাকে গুলী করিল। তৃতীয় গুলীতে তাহার বিমাতা অজ্ঞান হইয়া মাটীতে পড়িয়া যায়।

"লুইসা ভয় পাইয়া তাহার বিমাতার বাড়ী হইতে পলায়ন করে, পুলিসের ভয়ে নেপল্‌সের দুর্গম অংশে চোর ডাকাতের আড্ডায় লুকাইয়া ছিল। এই ভাবেই তাহার দিন কাটিতেছে। সকল দিন আহার জুটে না; তাহার দুর্দ্দশার সীমা নাই।

"লুইসার শোচনীয় কাহিনী শুনিয়া আমার হৃদয় সমবেদনায় পূর্ণ হইল। আমি তাহাকে বলিলাম, 'বড়ই দুঃখের কাহিনী; কিন্তু তুমি কোন্ বিবেচনায় তোমার বিমাতাকে তিনবার গুলী মারিলে? কি নিষ্ঠুর তুমি! তুমি কি তাহাকে হত্যা করিয়াছ?'

"লুইসা বলিল, 'তাহা বলিতে পারি না; গুলী খাইয়া তাহাকে ঢলিয়া পড়িতে দেখিয়া ভয়ে চম্পট দিয়াছিলাম কি না, মরিল কি না তাহা জানিবার জন্য অপেক্ষা করিতে সাহস হইল না।'

"নেপল্‌স নগরের একখানি দৈনিক সংবাদপত্রের নাম 'ইল গ্লোরনো।' সেই দিনেরই একখানি কাগজ আমার টেবিলে পড়িয়াছিল। আমি টেবল হইতে সেই কাগজখানি লইয়া গিয়া লুইসার হাতে দিলাম। তাহাকে বলিলাম, 'কাগজখানি খুলিয়া দেখ—তুমি যে কুকর্ম্ম করিয়া আসিয়াছ—তাহার বিবরণ এই কাগজে থাকিতেও পারে।' ইতালীয় ভাষায় আমার তেমন ব্যুৎপত্তি না থাকায় আমি তাহা খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিলাম না।

"লুইসা কাগজখানি খুলিয়া আগ্রহভরে তাহার প্রত্যেক স্তম্ভ পরীক্ষা করিতে লাগিল। কয়েক মিনিট পর্য্যন্ত সে কাগজ হইতে মুখ তুলিল না; আমিও আর কোন কথা বলিলাম না। প্রায় দশ মিনিটের পরে লুইসার মুখ হইতে বিস্ময়সূচক অস্ফুটধ্বনি নির্গত হইল। আমি তৎক্ষণাৎ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আগ্রহভরে বলিলাম, 'পাইয়াছ না কি?'

"লুইসা বলিল, 'হাঁ, খবরটা বাহির হইয়াছে দেখিতেছি; কিন্তু প্রকৃত ঘটনার সহিত এই বিবরণের ঐক্য নাই!'

"আমি বলিলাম, 'তা না থাকে, কাগজে কি লিখিয়াছে পড়—তাহা আমি বুঝিতে পারিব।'

"লুইসা ধীরে ধীরে অস্ফুটস্বরে যে বিবরণ পাঠ করিল,

—তাহার মর্ম্ম এই যে, তাহার বিমাতা ঘরের ভিতর বন্দুকের গুলীতে আহত হইয়াছিল; কিন্তু আঘাত সাংঘাতিক হয় নাই। আহতা রমণীর কণ্ঠে মূল্যবান এক ছড়া মুক্তার মালা ছিল, তাহাই অপহরণ করিবার উদ্দেশ্যে চোর তাহাকে আক্রমণ করিয়াছিল; স্ত্রীলোকটি পুলিসের নিকট বলিয়াছিল—সে তাহার আততায়ীকে চিনিতে পারে নাই; সে তাহার সপত্নীকন্যার অপরাধ গোপন করিবার জন্যই সম্ভবতঃ সত্য কথা গোপন করিয়াছিল।

"সকল কথা শুনিয়া আমি একটি সিগারেট ধরাইয়া লইয়া ধূমপান করিতে করিতে ভাবিতে লাগিলাম,—লুইসা মহা সঙ্কটে আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল; কি উপায়ে তাহাকে সাহায্য করিব?—কয়েক মিনিট চিন্তার পর আমি একটি উপায় স্থির করিলাম। লুইসাকে বলিলাম, 'আমি তোমার বিমাতার সঙ্গে দেখা করিতে যাইব। আশা করি তোমার দুঃখ কষ্ট দূর করিতে পারিব।'

"আমার কথা শুনিয়া লুইসা প্রচণ্ড বেগে মাথা নাড়িয়া আপত্তি জানাইল। মুখ ভার করিয়া বলিল, 'দরকার কি? সে আমার শত্রু; আমি আর কখন তাহার মুখ দেখিব না।' কিন্তু আমি তাহার কথায় দমিলাম না। নানা কথায় বুঝাইয়া তাহাকে রাজী করিলাম। শেষে সে বলিল, 'বেশ, তুমি যাও, সে কি বলে শুনিয়া আসিয়া আমাকে বলিও। আমি তোমার সঙ্গে যাইব না, তুমি যতক্ষণ ফিরিয়া না আসিবে ততক্ষণ তোমার ঘরে থাকিব। আমাকে এখানে রাখিয়া যাইতে কি তোমার আপত্তি আছে? যদি আপত্তি থাকে, তাহা হইলে আমি এখনই চলিয়া যাইতেছি; তোমার সঙ্গে আর কখন আমার দেখা হইবে না।'

"আমি বলিলাম, 'না লুইসা, তুমি এ ভাবে চলিয়া যাইও না; আমি যতক্ষণ ফিরিয়া না আসি, ততক্ষণ তুমি এখানেই থাক; আমার ঘর খোলা থাকিল।'

"আমি লুইসার নিকট তাহার বিমাতার বাড়ীর ঠিকানা লইয়া জানিতে পারিলাম, সে ভায়া রোমার সন্নিহিত একটি সম্রান্ত পল্লীতে বাস করে। আমি একখানি ট্যাক্সি লইয়া স্ত্রীলোকটির সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলাম।

"লুইসার বিমাতার বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করিতে অধিক বিলম্ব হইল না। একটা চাকর দ্বার খুলিয়া দিলে আমি তাহার ঘরে প্রবেশ করিলাম; কিন্তু আহতা রমণীর উত্থানশক্তি না থাকায় তাহার সাক্ষাৎ পাওয়া কঠিন হইল। যাহা হউক চাকরটা আমাকে নানা রকম জেরা করিয়া অবশেষে গৃহকর্ত্রীর শয়নকক্ষে লইয়া গেল। দেখিলাম, স্ত্রীলোকটি ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া শয্যায় পড়িয়া আছে। এইরূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থাতেও সে আমাকে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি প্রদান করায় তাহার সম্বন্ধে আমার ধারণা একটু ভালই হইল।

"আমার ধারণা হইয়াছিল—একটা কোপনস্বভাব, কলহপটু, কটুভাষিণী, উগ্রমূর্ত্তি নারী দেখিতে পাইব; কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে কোমলমুখশ্রীসম্পন্না, পক্ককেশী একটি বৃদ্ধা মহিলাকে দেখিয়া আমার মনে হইল—তিনি কোন কারণে লুইসাকে প্রহার করিতে পারেন—ইহা বিশ্বাসের অযোগ্য। তাঁহার প্রকৃতি কোমল, কথাগুলি মিষ্ট, তিনি শান্ত শিষ্ট ভদ্রমহিলা। তবে কি তাঁহার বিরুদ্ধে লুইসার অভিযোগ মিথ্যা?

"আমি দুই একটি কথার পর তাঁহাকে জানাইলাম, আমি তাঁহার সপত্নীকন্যার লুইসার সংবাদ জানি, এবং তাহাকে সেই সংবাদ দিতে আসিয়াছি। আমার কথা শুনিয়া তিনি উৎসাহভরে উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বসিতে পারিলেন না; উৎকণ্ঠিত চিত্তে ও আগ্রহভরে লুইসার কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তাঁহাকে জানাইলাম, লুইসা ভালই আছে; তিনি লুইসার প্রতি অকথ্য উৎপীড়ন করিয়া, তাহাকে তাড়াইয়া দিয়া, কি জন্য তাহার কুশল সংবাদ জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন—একটু শ্লেষের সহিত এ কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি কোন কথা না বলিয়া প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিলেন। আমি লুইসার নিকট তাহার প্রতি তাঁহার দুর্ব্ব্যবহার সম্বন্ধে যে সকল কথা শুনিয়াছিলাম, তাহা তাঁহাকে বলিলাম। একটি কথাও গোপন করিলাম না।

"বৃদ্ধা নিস্তব্ধভাবে আমার সকল কথা শুনিলেন; তাহার পর দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া ব্যাকুলভাবে রোদন করিতে লাগিলেন, যেন দুঃখে কষ্টে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল। তাঁহার অন্তর্বেদনার পরিচয় পাইয়া

আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। এ কি অভিনয়, না উনি দুঃখে কষ্টে অভিভূত হইয়াছেন? এই হৃদয়োচ্ছ্বাস কি আন্তরিক?

"আমি তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলাম। কয়েক মিনিট পরে তিনি রোদন সংবরণ করিয়া আমার দিকে মুখ ফিরাইলেন, এবং আমার হাতখানি কোলের কাছে টানিয়া লইয়া কোমল স্বরে বলিলেন, 'মা তুমি বড়ই প্রতারিত হইয়াছ! তুমি যে সকল কথা শুনিয়াছ, তাহার ষোল আনাই মিথ্যা! আমি তোমাকে সত্য কথা বলিতেছি শোন।'

"তিনি আমাকে লুইসা সম্বন্ধে যে সকল বলিলেন, তাহা শুনিয়া আমি যেন আকাশ হইতে পড়িলাম।—লুইসা তাঁহারই গর্ভজাত কন্যা! সে গোপনে তাঁহার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল, এবং নেপল্‌সের বদমায়েসদের দলে মিশিয়া কুপথগামিনী হইয়াছে। তিনি তাহার অধঃপতনে মর্ম্মাহত হইয়া মাসের পর মাস ধরিয়া বহুস্থানে তাহার অনুসন্ধান করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা সফল হয় নাই; সে বাড়ীতে ফিরিয়া আসে নাই।

"অবশেষে একদিন রাত্রিকালে লুইসা তাহার বৃদ্ধা জননীর গৃহেই চুরী করিতে আসিল। তিনি তাহাকে দেখিয়া, তাহার পদপ্রান্তে জানু নত করিয়া তাহাকে তস্করবৃত্তি ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন, তাহাকে ঘরে থাকিবার জন্য কত অনুনয় বিনয় করিলেন। কিন্তু সে তাহার অনুরোধে কর্ণপাত না করিয়া, তাঁহার নিকট অনেক টাকা চাহিয়া বসিল, এবং টাকা না পাইলে তাঁহাকে খুন করিবার ভয় দেখাইল। তিনি তাহাকে টাকা দিতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন; তখন লুইসা তাঁহার গলা হইতে মুক্তার মালা ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করিল। এই মালা তাঁহার স্বামী জীবিত থাকিতে তাঁহাকে উপহার দিয়াছিলেন, এবং তাহা তাঁহার স্বামীর স্মৃতিচিহ্ন

"লুইসা সেই মালা ছড়াটি যাহাতে জোর করিয়া কাড়িয়া লইতে না পারে, সে জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তিনি বার্দ্ধক্যবশতঃ দুর্ব্বল হইয়াছিলেন। লুইসা তখন মদের নেশায় চুর। সে নিষ্ফল আক্রোশে গর্জ্জন করিয়া পিস্তল তুলিল, এবং তাঁহাকে গুলী মারিয়া হার ছড়াটা কাড়িয়া লইয়া প্রস্থান করিল। পিস্তলের গুলীতে আহত হইয়া তিনি শয্যায় পড়িয়া আছেন।

"তাঁহার নিকট এই কাহিনী শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম। হাঁ, আমি তস্কর, দস্যুবৃত্তিই আমার উপজীবিকা; লুইসার প্রবৃত্তির পরিচয় পাইয়া আমারও মন ঘৃণায় ভরিয়া উঠিল। সে আমার জীবন রক্ষা করিয়াছিল বটে, কিন্তু যে মেয়ে মায়ের প্রতি এরূপ ব্যবহার করিতে পারে, সে পিশাচী ভিন্ন আর কি! নারীর এতদূর অধঃপতন—এরূপ হৃদয়হীনতা আমার কল্পনারও অতীত। আমি কোথায় কি ভাবে তাহার দেখা পাইয়াছিলাম, তাহা তাঁহাকে জানাইলাম; অবশেষে বলিলাম, লুইসাকে আমার হোটেলে লইয়া গিয়াছি, এখন সে আমার ঘরে বসিয়া আছে।

"আমার কথা শুনিয়া বৃদ্ধা অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বলিলেন, 'লুইসা কুসংসর্গে মিশিয়া একবারেই অধঃপাতে গিয়াছে; কখন কি বিপদে পড়িবে ভাবিয়া আমি বড়ই ব্যাকুল হইয়াছি। মা, তোমার বড় দয়া, তুমি তাহাকে তোমার ঘরে বসাইয়া রাখিয়া, আমাকে তাহার সংবাদ দিতে আসিয়াছ। দয়া করিয়া আর একটু উপকার কর, তাহাকে বুঝাইয়া সঙ্গে আনিয়া আমার কাছে রাখিয়া যাও। তাহাকে বলিও, আমি তাহার সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়াছি। সে ঘরে ফিরিয়া আসুক।'

"মাতৃহৃদয়ের অপার্থিব স্নেহের পরিচয় পাইয়া আমার চোখে জল আসিল। আমার দুর্ভাগ্য, শৈশবে মাতৃহীন হইয়াছি, কখন মাতৃস্নেহের আস্বাদন পাই নাই, যদি আমার মা থাকিত, তাহা হইলে আমার এরূপ অধঃপতন হইত না।—আমি বৃদ্ধাকে বলিলাম, 'আমি লুইসাকে আপনার কাছে রাখিয়া যাইব, আপনি নিশ্চিন্ত হউন।

"আমি ট্যাক্সি লইয়া দ্রুতবেগে আমার হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম। ঘরে আসিয়া লুইসাকে দেখিতে পাইলাম না। কক্ষদ্বার উন্মুক্ত, লুইসা ঘরে নাই। বুঝিলাম, তাহার সকল কীর্ত্তি জানিতে পারিব বুঝিয়া সে পলায়ন করিয়াছে; কিন্তু—হঠাৎ আমার সন্দেহ হইল, সে আমার অনুপস্থিতির সুযোগে—

"আমি ব্যগ্রভাবে আমার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলাম, আমার সন্দেহ মিথ্যা নহে। সে আমার বাক্স, আলমারি তোরঙ্গ ভাঙ্গিয়া আমার হীরকালঙ্কার, টাকা, মোহর, সমস্তই

চুরী করিয়া চম্পট দিয়াছে! আমার অলঙ্কারের বাক্সে দশ হাজার 'লিরার' স্বর্ণমুদ্রা ছিল, তাহার একটি সে রাখিয়া যায় নাই! আমি চোর, সে চোরের উপর বাটপাড়ি করিল। চিরদিন পরের দ্রব্য অপহরণ করিয়াছি; নিজের জিনিষ কেহ চুরী করিলে কিরূপ দুঃখ হয়, তাহা সেই দিন প্রথম জানিতে পারিলাম।

"অবশেষে মনে এই সান্ত্বনা লাভ করিলাম—পরের জিনিষ চুরী করিয়া ঐশ্বর্য্যশালিনী হইয়াছিলাম, আর একজন সেগুলি চুরী করিল; কিন্তু উপায় কি? চেষ্টা করিলে অল্পদিনেই পুনর্ব্বার ঐরূপ ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারিব; কিন্তু সেই পক্ককেশা স্থবিরা জননীর নিকট যে অঙ্গীকার করিয়াছিলাম—তাহা পালন করিতে না পারায় আমি বড়ই ক্ষুব্ধ হইলাম। পিশাচী লুইসা তাহার মাতাকে গুলী করিয়াছিল, তথাপি তাহার প্রতি তাহার মাতার হৃদয়ে কি গভীর অবিচলিত স্নেহ! আর সেই রাক্ষসী এমন স্নেহময়ী মায়ের দিকে ফিরিয়াও চাহিল না! নারীর হৃদয় এত কঠিন! আমিও ত দস্যু।

"ক্ষুব্ধ হৃদয়ে একটা সিগারেট মুখে গুঁজিয়া আমি বারান্দায় বসিলাম। সম্মুখেই নেপলস উপসাগরের বিপুল বিস্তার, তাহার তরঙ্গমালা উজ্জ্বল চন্দ্রকিরণে উদ্ভাসিত হইয়া নৃত্য করিতেছিল। বিসুভিয়স তাহার ধূসর মস্তক উর্দ্ধে তুলিয়া আকাশ চুম্বন করিতেছিল। নৈশ-প্রকৃতি নিস্তব্ধ, স্থির; তথাপি সেই স্নেহান্ধ বৃদ্ধার আকুল ক্রন্দনোচ্ছ্বাস বহুদূর হইতে যেন নৈশ বায়ুতরঙ্গে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। তখন আমার মনে হইল, আমার সৌভাগ্য যে, ঐ ভাবে কাঁদিবার জন্য আজ আমার মা জীবিত নাই!"

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

শ্রাবণ-সন্ধ্যা

আজি শ্রাবণ-সন্ধ্যা ঘনায়ে এসেছে
মরণ-সন্ধ্যা সম!
এই শ্রান্ত-বিবশ-ক্লান্ত-অলস
জীবন-প্রান্তে মম!

দূরে করুণা-শান্ত সন্ধ্যার তারা
অন্ধকারেতে হয়ে গেছে হারা,
কোথা পূর্ণিমা-চন্দ্র-কিরণ
মাধুরিমা অনুপম!
হায়, শ্রাবণ-সন্ধ্যা ঘনায়ে যে এলো
মরণ-সন্ধ্যা সম!

কোন্ সুখ-বঞ্চিত-বিরহ-আলয়ে
বাঞ্ছিতা কাঁদে মোর?
ওগো, সুধাসিঞ্চিত সে আনন কই
বাহু-বন্ধন-ডোর?

এ যে ক্রন্দন-ঘন-মেঘ-সম্ভার
উদ্বেল আঁখি-দিগ্‌বালিকার
কোথায় হর্ষ-উচ্ছ্বাস-ভরা
উচ্ছল-রস-লোর?
হায়, কোথা কমনীয় কম মৃণালের
প্রেমবন্ধন ডোর!!

আজি শূন্য-হৃদয়-মন্দির-মাঝে
রচি ক্রন্দন গান!
তব বিচ্ছেদে হলো বন্দনা মোর—
দুঃখে জাগিল প্রাণ!

বুঝি মৃত্যু আজিকে অতিথির রূপে
চিত্ত ভরিয়া এলো চুপে চুপে
হৃদয়পদ্মে সে বঁধু-ভ্রমর
কি মধু করিবে পান?
এই বসন্ত-হারা জীবনে এলো কি
নব-যৌবন-বান?

তবে, আনো মৃদঙ্গ, বাজাও শঙ্খ
গাহ আনন্দ-গীতি।
শুধু ছন্দে ছন্দে নৃত্য করিয়া
সঞ্চার' সুখ-স্মৃতি?

ওরে, সুখ যদি গেছে, আছে তো মরণ—
আছে মহাকাল শঙ্কাহরণ
যূথীর মাল্য রচি এই রাতে
বন্ধু রে দাও প্রীতি!
আজ মৃত্যুরে দাও প্রেম-উপহার
গাহি মল্লার গীতি!

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

প্রকৃতি

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মঙ্গল গ্রহ

বর্ণিত গ্রহাদির ন্যায় মঙ্গল গ্রহও প্রাগৈতিহাসিক যুগে আবিষ্কৃত হইয়াছে। চন্দ্র ব্যতীত অন্যান্য জ্যোতিষ্ক অপেক্ষা মঙ্গল গ্রহ আমাদিগের নিকট অধিকতর পরিচিত। পৃথিবী হইতে দূরত্বের তারতম্যানুসারে ইহার উজ্জ্বলতার হ্রাস ও বৃদ্ধি এত অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে যে, আমাদিগের দৃষ্টি সহজেই ইহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। পৃথিবী ও মঙ্গল গ্রহ যথাক্রমে ৩৬৫ ও ৬৮৭ দিনে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে (চিত্র নং ২, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ); মঙ্গল ও সূর্য্যের মধ্যভাগে সমসূত্রপাতে পৃথিবী আগমন করিলে পৃথিবী হইতে মঙ্গল গ্রহের দূরত্ব হ্রাস হইয়া সময়বিশেষে মাত্র ৩ কোটি ৩৫ লক্ষ মাইলে পরিণত হয়; সে সময়ে ইহা একটি প্রথম শ্রেণীর নক্ষত্ররূপে অর্থাৎ উজ্জ্বলতায় বৃহস্পতি গ্রহের প্রায় সমকক্ষ হইয়া আকাশে প্রতিভাত হইতে থাকে। ১৫ লক্ষ মাইল অর্থাৎ পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্ব অপেক্ষা প্রায় দেড় গুণ অধিক; কিন্তু গ্রহকক্ষের কেন্দ্রচ্যুতি এত অধিক যে, সূর্য্যের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে অবস্থিত কক্ষবিন্দুর সূর্য্য হইতে দূরত্বের অপেক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা দূরে অবস্থিত কক্ষবিন্দুর সূর্য্য হইতে দূরত্ব প্রায় ২ কোটি ৬০ লক্ষ মাইল অধিক। মঙ্গল গ্রহের আয়তন ও পৃষ্ঠভাগ, পৃথিবীর আয়তনের ও পৃষ্ঠভাগের যথাক্রমে এক-সপ্তমাংশ ও দ্বি-সপ্তমাংশ। ইহার যথার্থ ব্যাস প্রায় ৪৩ শত মাইল, কিন্তু পৃথিবী হইতে দূরত্বের তারতম্যানুসারে আপাতদৃষ্টিতে ব্যাস ৩৷০ ইঞ্চি হইতে ২৪৷০ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

মঙ্গল গ্রহ যখন পৃথিবীর নিকটে আগমন করে, সে সময়ে ইহার পৃষ্ঠভাগে উজ্জ্বল ও অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বল চিহ্নাদি সাধারণ দূরবীক্ষণ সাহায্যেও সম্পূর্ণরূপে পরিলক্ষিত হয় (চিত্র নং ১, ২); অধিকাংশ চিহ্ন স্থিতিশীল; ক্ষণস্থায়ী কয়েকটি ক্ষুদ্র চিহ্ন ভাসমান মেঘখণ্ড বলিয়া বিবেচিত হয়। স্থায়ী চিহ্নগুলি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত।
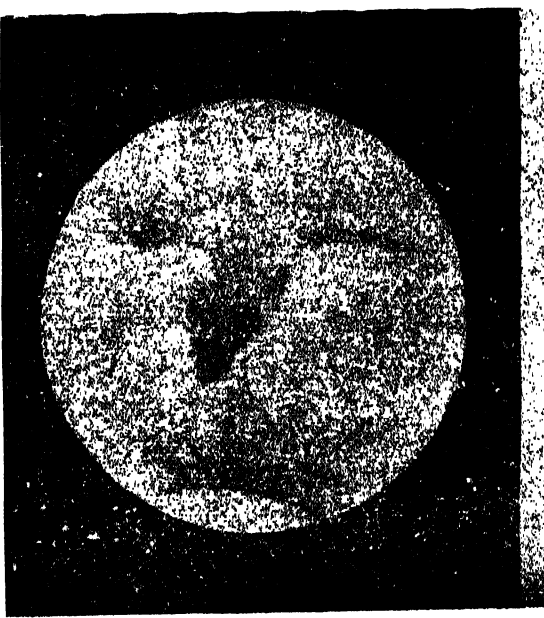
চিত্র নং ১ — মঙ্গল গ্রহের আলোকচিত্র — চিত্র নং ২
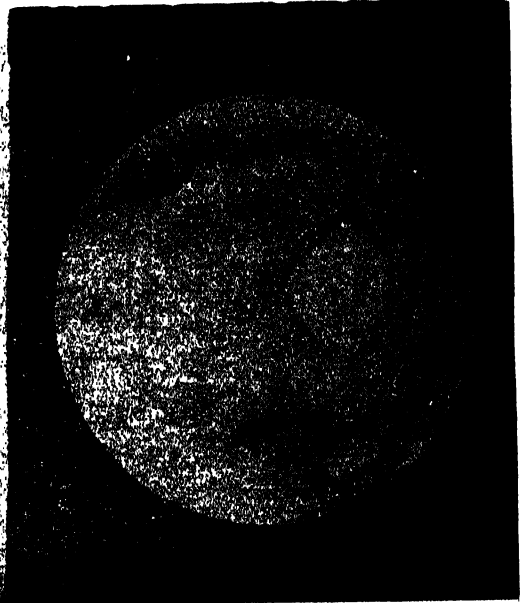
গত ১৯২৪ খৃঃ অঃ ২২শে আগষ্ট ও ১৯২৬ খৃঃ অঃ ৪ঠা নবেম্বর, এই দুই তারিখে সূর্য্য ও মঙ্গল গ্রহের মধ্যভাগে পৃথিবী আগমন করায় পৃথিবী হইতে মঙ্গল গ্রহের দূরত্ব যথাক্রমে ৩ কোটি ৪৬ লক্ষ মাইল এবং ৪ কোটি ২৬ লক্ষ মাইল ছিল। সাধারণতঃ প্রতি ১৫ বা ১৭ বৎসর অন্তর আগষ্ট মাসের শেষে মঙ্গল ও সূর্য্যের মধ্যে সমসূত্রপাতে পৃথিবী আগমন করিলে পৃথিবী হইতে মঙ্গল গ্রহের দূরত্বের অত্যন্ত হ্রাস হয়। কিন্তু যখন পৃথিবী ও মঙ্গল গ্রহের মধ্যভাগে সমসূত্রপাতে সূর্য্য অবস্থান করে, তখন স্বভাবতঃই পৃথিবী হইতে মঙ্গল গ্রহের দূরত্ব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে; সময় বিশেষে এই দূরত্ব ২৪ কোটি ৯৫ লক্ষ মাইলে পরিণত হয় এবং তখন ধ্রুবতারকা অপেক্ষাও অনুজ্জ্বলরূপে মঙ্গল গ্রহ দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে। সূর্য্য হইতে মঙ্গল গ্রহের গড়ে দূরত্ব ১৪ কোটি

গ্রহের উত্তর- ও দক্ষিণমেরু সন্নিহিত শ্বেতবর্ণের গোলাকার দুইটি চিহ্ন প্রথম শ্রেণীভুক্ত। মিরাল্‌ডি সর্ব্বপ্রথম স্থির করেন যে, উল্লিখিত চিহ্নদ্বয় পরিবর্ত্তনশীল। হার্শেল প্রমুখ বৈজ্ঞানিকের মতে ইহারা শুভ্র বা তুষার বরফস্তূপ মাত্র; শীত ঋতুতে জল সহজেই বরফে রূপান্তরিত হওয়ায় ইহাদিগের আকার বর্দ্ধিত হয়; কিন্তু গ্রীষ্ম ঋতুর আগমনে বরফ দ্রবীভূত হইতে থাকে এবং ফলে ইহারা ক্ষুদ্রাকারে পরিলক্ষিত হয়। উত্তরমেরু সূর্য্যাভিমুখে অবস্থানকালীন উত্তরমেরু সন্নিহিত শ্বেত বরফ স্তূপ ক্রমশঃ অদৃশ্য হইতে থাকে; সেই অবসরে দক্ষিণমেরু সন্নিহিত বরফ স্তূপ দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কারণ দক্ষিণ গোলার্দ্ধে তখন শীতকাল। নীলাভ ধূসর বা ঈষৎ সবুজ বর্ণের কতিপয় চিহ্ন মঙ্গল গ্রহের প্রায় এক-নবমাংশ স্থান অধিকার করিয়া

আছে; ইহারাই দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহারা পূর্ব্বে জলাশয় বলিয়া বিবেচিত হইত, কিন্তু ঋতু পরিবর্ত্তনের সহিত ইহাদিগের প্রাকৃতিক দৃশ্যের পরিবর্ত্তন হওয়ায় অনেকের মতে ইহারা বৃক্ষলতাচ্ছাদিত ভূমিখণ্ড। তৃতীয় শ্রেণীস্থ হরিদ্রা বর্ণের চিহ্নাদি মঙ্গল গ্রহের অবশিষ্টাংশ বিস্তীর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। উল্লিখিত তিন প্রকার চিহ্ন হইতে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন অন্য এক প্রকার চিহ্ন ইতালীয় শিয়া-প্যারেলি কর্তৃক ১৮৭৭ খৃঃ অঃ আবিষ্কৃত হইয়াছে; সাধারণতঃ ইহারা সরল রেখাকারে মঙ্গল গ্রহের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং 'খাল' নামে অভিহিত হইয়া থাকে (চিত্র নং ৩)। তথাকথিত
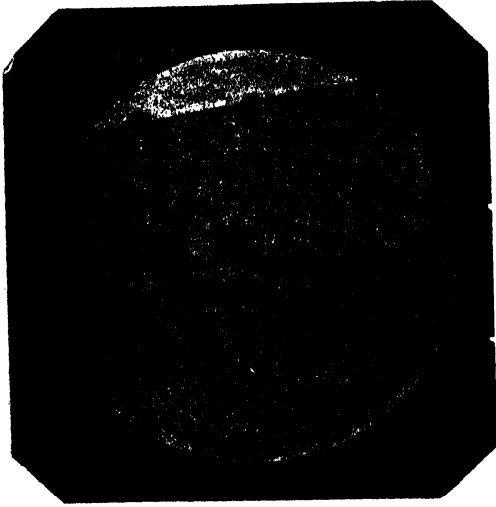
চিত্র নং ৩—মঙ্গল গ্রহমধ্যস্থ চিত্র

খালগুলি প্রস্থে ১৮ হইতে ১৮৫ মাইল। একটি সমুদ্র হইতে অন্য সমুদ্র পর্য্যন্ত প্রসারিত বিভিন্ন খালের প্রস্থ সর্ব্বত্র সমান। দৈর্ঘ্যে কোনটি মাত্র ৩০০ মাইল এবং অপর কোন খাল মঙ্গল গ্রহের সমগ্র পরিধির এক-তৃতীয়াংশ মাইল দীর্ঘ। ইহা স্বতঃই মনে হয় যে, ইহারা কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মঙ্গল গ্রহে অবস্থান করিতেছে। ইহাদিগের উৎপত্তি ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে এখনও মতভেদ আছে। লোয়েল প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকের মতে মঙ্গল গ্রহে যথেষ্ট জল না থাকায় এই সকল খাল কাটিয়া এক স্থান হইতে অপর স্থানে জল আনা হইয়া থাকে; তাঁহারা বলেন যে, গ্রীষ্মাগমে মেরুপ্রদেশের বরফ যখন দ্রবীভূত হইতে আরম্ভ করে, তখন খালগুলি জলে পূর্ণ হইতে থাকে এবং খালের উভয় পার্শ্বে বৃক্ষলতাদি উদ্ভিদ্বর্গ সঞ্জীবিত হইয়া উঠে; শীতকালে মেরুপ্রদেশের বরফ জলে রূপান্তরিত না হওয়ায় খালে জল থাকে না এবং চতুর্দ্দিকে জলের অভাব ঘটিয়া থাকে। যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে মঙ্গল গ্রহে মনুষ্য অপেক্ষাও উন্নত প্রাণী যে বসবাস করে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। শত শত মাইলব্যাপী অগণ্য খাল কাটিয়া জলের এরূপ সুন্দর সদ্ব্যবহার আর কোথাও দেখা যায় না। বাঙ্গালা দেশে শান্তিপুর ইত্যাদি বহু স্থানে বর্ত্তমান খালের সংস্কারের অভাব আমরা বহু দিন হইতে অনুভব করিয়া আসিতেছি, কিন্তু অর্থাভাব প্রভৃতি নানা কারণবশতঃ সংস্কার কার্য্য সাধিত হয় নাই; কিন্তু মঙ্গল গ্রহের অধিবাসিগণ নিজ দেশের উন্নতির জন্য প্রভূত অর্থব্যয় করিয়া শান্তিপুরের খাল হইতে বহু সহস্র গুণ বৃহৎ অসংখ্য খাল খননে তাঁহাদের পূর্ত্তবিদ্যার যে প্রকার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার তুলনায় আমাদিগের বিদ্যা অকিঞ্চিৎকর। শিয়া-প্যারেলি খাল আবিষ্কার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; ১৮৮২ খৃঃ অঃ তিনি প্রথম দেখিতে পান যে, কয়েক সপ্তাহের মধ্যে খালগুলি সংখ্যায় দ্বিগুণ হইয়া গিয়াছে; সে সময়ে গ্রহের প্রাকৃতিক দৃশ্যের পরিবর্ত্তন ঘটে। এই ঘটনা বহু বার সংঘটিত হইতে দেখা গিয়াছে; বৎসরের এক বিশিষ্ট সময়ে প্রতি একটি খালের স্থানে দুইটি খাল দৃষ্টিগোচর হয়; পুনরায় তাহারা অদৃশ্য হইয়া যায়। বৎসরের এক বিশিষ্ট সময়ে খালের দ্বিগুণিত হওয়ার প্রকৃত কারণ এখনও সঠিক স্থিরীকৃত হয় নাই।

১৮৩০ খৃঃ অঃ মেডলার মঙ্গল গ্রহের মানচিত্র সর্ব্বপ্রথম অঙ্কন করেন। ১৮৬৯ খৃঃ অঃ ডইজ কর্তৃক অঙ্কিত মঙ্গল গ্রহের মানচিত্রে বহু বিষয় সন্নিবেশিত করা হইয়াছিল। তাহার পর হইতে বহু মানচিত্র বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক অঙ্কন করিয়াছেন। মানচিত্র অঙ্কনের বহু পূর্ব্বে বিভিন্ন সময়ে দৃষ্ট বিভিন্ন স্থায়ী চিহ্ন Hooke, Huyghens, Herschel, Arago ইত্যাদি জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত কর্তৃক অঙ্কিত হইয়াছে। প্রায় ২৬০ বৎসর পূর্ব্বে অঙ্কিত চিহ্নের সহিত অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে অঙ্কিত চিহ্নের তুলনা করিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, প্রায় ২৪ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট ২২ সেকেণ্ডে মঙ্গল গ্রহ আপন মেরুদণ্ডের চতুর্দ্দিকে এক বার ঘূর্ণিত হয়। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ন্যায় বায়ুমণ্ডল মঙ্গল গ্রহে আছে, কিন্তু সম্ভবতঃ আমাদিগের বায়ু অপেক্ষা মঙ্গল গ্রহের বায়ু লঘুতর। মঙ্গল গ্রহের বায়ুমণ্ডলের বর্ণচ্ছত্র পরীক্ষা করিয়া তথায় জলীয় বাষ্পের উপস্থিতি Huggins, Jansseu ও Vogel স্থির করিয়াছিলেন। Campbell ইত্যাদি বৈজ্ঞানিকের মতে তথায় অতি সামান্য জলীয় বাষ্পের প্রমাণ পাওয়া যায়।

তদানীন্তন কালের (১৮৭৭ খৃঃ অঃ) সর্ব্ববৃহৎ দূরবীক্ষণ সাহায্যে এশফ হল, ওয়াশিংটন সহরে মঙ্গলগ্রহের দুইটি উপগ্রহ আবিষ্কার করেন। ইহারা আকারে এত ক্ষুদ্র যে, সুবৃহৎ দূরবীক্ষণের সাহায্য না গ্রহণ করিলে দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহাদিগের ব্যাস মাত্র ৬ বা ৭ মাইল। ইহারা ডিমোস্ ও ফোবোস্ নামে অভিহিত হয়। মঙ্গল গ্রহ হইতে ফোবোস্ ও ডিমোসের দূরত্ব যথাক্রমে ৫ সহস্র ৮ শত এবং ১৪ সহস্র ৬ শত মাইল। ডিমোস্ ও ফোবোস্ যথাক্রমে ৩০ ঘণ্টা ১৮ মিনিট এবং ৭ ঘণ্টা ৩৯ মিনিটে মঙ্গলগ্রহকে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। মঙ্গলগ্রহের দিন সাড়ে ২৪ ঘণ্টা স্থায়ী, ইহা উল্লিখিত হইয়াছে। এখন ফোবোস মাত্র সাড়ে ৭ ঘণ্টায় মঙ্গলগ্রহকে পরিভ্রমণ করায় মঙ্গলগ্রহের অধিবাসিগণ ইহাকে পশ্চিমে উদিত হইয়া পূর্ব্বে অস্ত যাইতে দেখে।

ক্ষুদ্র গ্রহপুঞ্জ

হার্শেল কর্তৃক ইউরেনাস গ্রহের আবিষ্কারের পূর্ব্বেই ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে বোড (Bode) গ্রহদিগের সূর্য্য হইতে আপেক্ষিক দূরত্ব সম্বন্ধীয় এক নিয়ম আবিষ্কার করেন। বোড নিয়ম;—প্রতি গ্রহের নামের পার্শ্বে ৪ লিখিয়া যথাক্রমে ০, ৩, ৬, ১২, ২৪, ৪৮, ৯৬, ১৯২ ইত্যাদি সংখ্যা দ্বারা যোগ করিলে বিভিন্ন যোগফল বিভিন্ন গ্রহের সূর্য্য হইতে দূরত্বের সংখ্যার সমান হইবে।

বুধ	৪ + ০ = ৪	বৃহস্পতি	৪ + ৪৮ = ৫২
শুক্র	৪ + ৩ = ৭	শনি	৪ + ৯৬ = ১০০
পৃথিবী	৪ + ৬ = ১০	ইউরেনাস	৪ + ১৯২ = ১৯৬
মঙ্গল	৪ + ১২ = ১৬		
?	৪ + ২৪ = ২৮	নেপচুন (?)	৪ + ৩৮৪ = ৩৮৮

যদি সূর্য্য হইতে বুধ গ্রহের দূরত্ব ৪ মাইল হয়, তাহা হইলে এই নিয়ম অনুসারে ৭,১০,১৬ ইত্যাদি মাইল অন্তর এক একটি গ্র

অনুমান করিবে ; বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, এই পাঁচটি গ্রহের সূর্য্য হইতে দূরত্ব, এই অনুপাতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা বোড্ দেখাইলেন। তখন পর্য্যন্তও ইউরেনাস্, নেপচুন বা কোন ক্ষুদ্র গ্রহ (মঙ্গল ও বৃহস্পতির কক্ষের ভিতর) আবিষ্কৃত হয় নাই, যদিও মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে একটি গ্রহের অবস্থানের সম্ভাবনা বৈজ্ঞানিকদিগের মনে বহু দিন পূর্ব্বেই উদিত হইয়াছিল। পরে হার্শেল কর্তৃক আবিষ্কৃত ইউরেনাস গ্রহের সূর্য্য হইতে দূরত্ব বোড্ নিয়মানুসারে যাহা হওয়া উচিত, তাহাই হইতে যখন দেখা গেল, তখন মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে কোন গ্রহ আত্মগোপন করিতেছে, এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহ রহিল না। এই গ্রহের অনুসন্ধান করিবার জন্য ২৪ জন জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত লইয়া জার্ম্মাণীতে একটি সমিতি গঠিত হইল। উক্ত সমিতির কোন সদস্য কর্তৃক গ্রহ আবিষ্কারের পূর্ব্বেই পিয়াজি ১লা জানুয়ারী ১৮০২ খৃষ্টাব্দে মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে সেরিস্ (ceres) গ্রহ আবিষ্কার করিলেন। ২৮শে মার্চ্চ ১৮০২ খৃষ্টাব্দে অলবার্স কর্তৃক দ্বিতীয় গ্রহ প্যালাস্ (Pallas) আবিষ্কৃত হইল। তৃতীয় গ্রহ জুনো (Juno) চতুর্থ ভেস্‌টা (Vesta), পঞ্চম এ্যাস্‌ট্রিয়া (Astraea), যথাক্রমে Harding, Olbers ও Encke কর্তৃক ১৮০৪, ১৮০৭ ও ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার পর হইতে প্রতি বৎসর নিয়ত নূতন ক্ষুদ্র গ্রহ আবিষ্কৃত হইতেছে ; বিশেষতঃ ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার ম্যাক্স উলফ্ কর্তৃক আলোক চিত্র সাহায্যে কিরূপে বিভিন্ন জ্যোতিষ্ক আবিষ্কার করিতে পারা যায়, তাহার উপায় উদ্ভাবনার পর হইতে ক্ষুদ্র গ্রহের সংখ্যা আমাদিগের নিকট দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। ক্ষুদ্র গ্রহগুলি ৮ শত সংখ্যা বহু দিন পূর্ব্বেই অতিক্রম করিয়াছে। অধিকাংশ গ্রহের ব্যাস ৫০।৬০ মাইল অপেক্ষা অধিক নহে, এই গ্রহপুঞ্জের অন্তর্গত সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ গ্রহ সেরিসের ব্যাস মাত্র ৪ শত ৮৫ মাইল ; প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ১১ মাইল গতিতে ইহা সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে।

বৃহস্পতি গ্রহ

আজ সহসা যদি সূর্য্য অন্তর্হিত হয়, তাহা হইলে সৌরজগতের অন্তর্গত গ্রহাদি বৃহস্পতি গ্রহকে প্রদক্ষিণ করিতে আরম্ভ করিবে ; কেন না, গ্রহদিগের মধ্যে আকারে ইহাই বৃহত্তম। বৃহস্পতি গ্রহ তীব্র হরিদ্রাভ শুভ্র আলোক বিকীর্ণ করিতে থাকে ; ফলে আমরা সহজেই ইহাকে চিনিতে পারি। উজ্জ্বলতায় গ্রহদিগের মধ্যে ইহা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিলেও সময় বিশেষে অত্যুজ্জ্বল শুক্রগ্রহ অপেক্ষাও অধিক উজ্জ্বলরূপে দৃষ্টিগোচর হয়। সূর্য হইতে বৃহস্পতি গ্রহের গড়ে দূরত্ব ৪৮ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল অর্থাৎ পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্ব অপেক্ষা প্রায় ৫ গুণ অধিক। বৃহস্পতি ও সূর্য্যের মধ্যভাগে, সম সূত্রপাতে, পৃথিবী আগমন করিলে পৃথিবী হইতে ইহার দূরত্ব সাধারণতঃ ২৯ কোটি মাইল হইয়া থাকে, কিন্তু যখন পৃথিবী ও বৃহস্পতির মধ্যভাগে, সমসূত্রপাতে, সূর্য্য অবস্থান করে, তখন পৃথিবী হইতে ইহার দূরত্ব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ৬০ কোটি মাইলে পরিণত হয়। ইহার ব্যাস ৮৭ সহস্র ৫ শত মাইল। পৃথিবী হইতে দূরত্বের তারতম্যানুসারে আপাতদৃষ্টিতে বৃহস্পতি গ্রহের ব্যাস ৩২ ইঞ্চি হইতে ৫০ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ইহার পৃষ্ঠভাগ ও আয়তন, পৃথিবীর পৃষ্ঠভাগ ও আয়তন অপেক্ষা যথাক্রমে ১ শত ১৯ ও ১৩ হাজার গুণ অধিক বৃহৎ। বৃহস্পতি গ্রহের পৃষ্ঠভাগের দৃশ্য নিয়তই পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। একটি সুবৃহৎ দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিলে বৃহস্পতি গ্রহমধ্যস্থ নানা বর্ণে রঞ্জিত বহু চিত্র আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হয় ; দৃষ্ট চিহ্নগুলি সাধারণতঃ অধিক দিন স্থায়ী হয় না ; তবে অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল চিহ্নও বিরল নহে। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে (Cassini) একটি বৃহৎ গোলাকার চিহ্ন আবিষ্কার করেন। উপরিউক্ত চিহ্ন বহু বার অদৃশ্য হইয়া পুনরায় দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিল ; ক্যাসিনি কর্তৃক আবিষ্কৃত চিহ্নের ন্যায় অন্যান্য চিহ্ন আবিষ্কারের বৈজ্ঞানিকগণ কৃতসঙ্কল্প হইলেন, ফলে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে অপর একটি চিহ্ন Niesten, Pritchett ও Tempel কর্তৃক আবিষ্কৃত হইল, ইহাই সুপ্রসিদ্ধ "বৃহৎ লোহিত চিহ্ন"। প্রথম কয়েক বৎসর ইহা উজ্জ্বল ছিল, কিন্তু ক্রমেই ইহার উজ্জ্বলতা হ্রাস পাইতে থাকে।

অধুনা ক্ষুদ্র বৃহৎ গোলাকার বহু চিহ্ন আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হয় (চিত্র নং ৪,৫,৬,৭)। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে ক্যাসিনি বৃহস্পতি গ্রহমধ্যস্থ চিহ্নদিগকে পূর্ব্বে উদিত হইয়া পশ্চিমে অস্ত যাইতে দেখেন, ইহা হইতে তিনি স্থির করেন যে, পৃথিবীর ন্যায় বৃহস্পতি চক্রাকারে ঘূর্ণিত হয়। একবার আবেষ্টন করিতে বৃহস্পতি গ্রহের মাত্র ৯ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট সময় লাগে। অন্য কোন গ্রহ এত দ্রুত আবর্ত্তিত হয় না। বৃহস্পতি গ্রহের বিষুবরেখার সমান্তরালে প্রসারিত অপর কতিপয় চিহ্ন উল্লেখযোগ্য (চিত্র নং ৪,৫,৬,৭) ইহারাই বৃহস্পতি গ্রহের তথাকথিত "কোটিবন্ধ"। হার্শেলের মতে উপরিউক্ত 'কোটিবন্ধ'গুলি বৃহস্পতি গ্রহেরই অংশবিশেষ ; কোটিবন্ধের লঘু অংশ ভাসমান মেঘখণ্ড মাত্র। গোলাকার চিহ্নগুলিও বৃহস্পতি গ্রহের বায়ুমণ্ডলে ভাসমান মেঘখণ্ড ব্যতীত আর কিছুই নহে। মেঘখণ্ডের সংখ্যাধিক্য, পরিবর্ত্তন ও অন্যান্য দৃশ্য হইতে বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিয়াছেন যে, বৃহস্পতি গ্রহের বহিরাবরণ এখনও উত্তপ্ত রহিয়াছে ; কাজেই পৃথিবীর ন্যায় শীতল অবস্থা বৃহস্পতির গ্রহের প্রাপ্ত হইতে অনেক বিলম্ব আছে। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব এত অল্প যে, অনেকে অনুমান করেন, ইহার মধ্যে কোন কঠিন অবস্থা-প্রাপ্ত বস্তু নাই ; সম্ভবতঃ বাষ্প ও মেঘে আবৃত তরল পদার্থই বৃহস্পতি গ্রহের উপাদান।

বৃহস্পতি গ্রহের নয়টি উপগ্রহ আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে ; ইহার মধ্যে চারটি এত বৃহৎ যে, ১৬১০ খৃষ্টাব্দে Galileo তাঁহার নব আবিষ্কৃত দূরবীক্ষণ সাহায্যে তাহাদিগকে আবিষ্কার করিয়াছিলেন। গ্রহ হইতে দূরত্ব অনুসারে তাহারা প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ উপগ্রহ নামে পরিচিত। ইহাদিগের মধ্যে আকারে ও উজ্জ্বলতায় তৃতীয় উপগ্রহ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। উপগ্রহদিগের কক্ষ, গ্রহ কক্ষের সমতল হইতে অধিক আনত না হওয়ায় গ্রহকে আবেষ্টন কালীন প্রায় প্রতিবারেই উপগ্রহগুলি অদৃশ্য হইয়া যায়। অর্থাৎ উপগ্রহ গ্রহণ (চন্দ্রগ্রহণ) হয়। লিক্ মানমন্দিরে Barnard কর্তৃক ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে পঞ্চম উপগ্রহ ও Perrine কর্তৃক ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ষষ্ঠ ও সপ্তম উপগ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। শেষোক্ত দুইটি উপগ্রহ, অষ্টম ও নবম উপগ্রহ আলোক চিত্র সাহায্যে আবিষ্কার করা সম্ভবপর হইয়াছে। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে Melotte গ্রীণউইচ মানমন্দিরে অষ্টম উপগ্রহ ও ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে Nicholson লিক মানমন্দিরে নবম উপগ্রহ আবিষ্কার করিয়াছেন।

শনিগ্রহ

গ্রহদিগের মধ্যে শনিগ্রহ সূর্য্য হইতে সর্ব্বাপেক্ষা দূরে অবস্থান করে, ইহা প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত কর্তৃক বিবেচিত হইত। সূর্য্য হইতে ইহার গড়ে দূরত্ব ৮৮ কোটি ৬০ লক্ষ মাইল হওয়ায় ইহার গতি প্রতি সেকেণ্ডে মাত্র ৬ মাইল ; ফলে আকাশের এক স্থানে দৃষ্ট হইলে বহুদিন পর্য্যন্ত সেই স্থানেই ইহাকে আমরা দেখিতে পাই। গ্রহ-কক্ষের কেন্দ্রচ্যুতি এত অধিক যে, সূর্য্যের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে অবস্থিত কক্ষ বিন্দুর সূর্য্য হইতে দূরত্বের অপেক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা দূরে অবস্থিত কক্ষ বিন্দুর সূর্য্য হইতে দূরত্ব ১০ কোটি মাইল অধিক। শনি ও সূর্য্যের মধ্যভাগে, সমসূত্রপাতে পৃথিবীর আগমনকালীন পৃথিবী হইতে ইহার দূরত্ব ৭৭ কোটি ৪০ লক্ষ মাইল হইয়া থাকে ; কিন্তু যখন পৃথিবী ও শনি গ্রহের
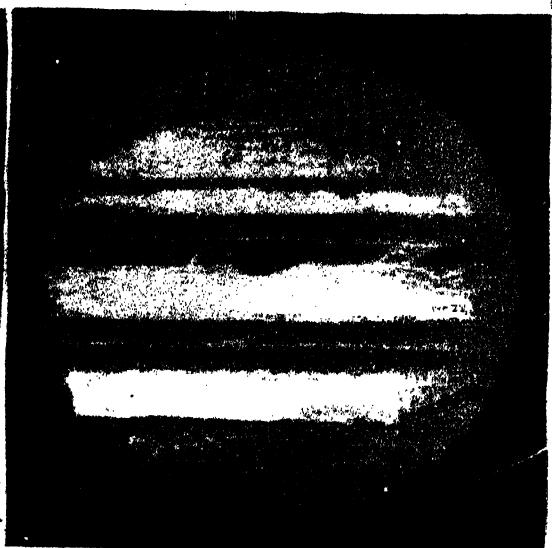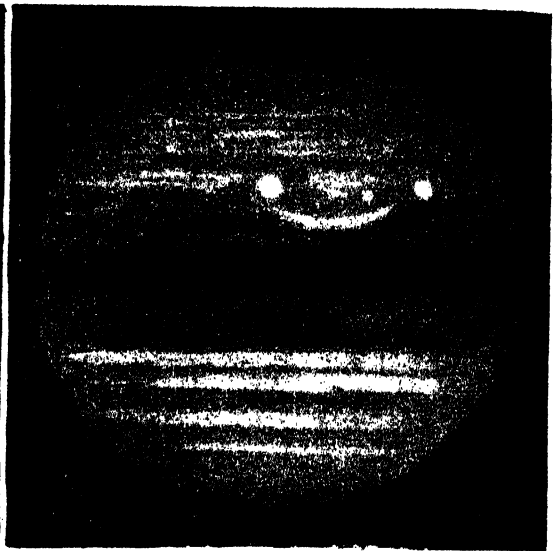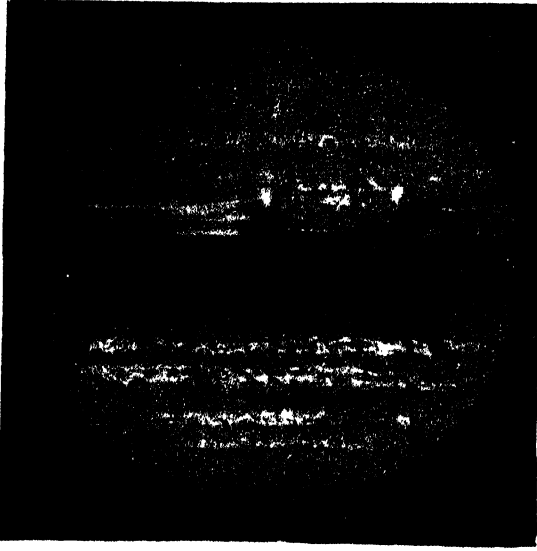
চিত্র নং ৪ চিত্র নং ৫

চিত্র নং ৬ বৎসরের বিভিন্ন সময়ে বৃহস্পতি গ্রহের প্রাকৃতিক দৃশ্য চিত্র নং ৭

মধ্যভাগে, সমসূত্রপাতে শুধু অবস্থান করে, তখন পৃথিবী হইতে ইহার দূরত্ব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ১ শত ২ কোটি ৮০ লক্ষ মাইলে পরিণত হয়। পৃথিবী হইতে দূরত্বের তারতম্যানুসারে, আপাতদৃষ্টিতে, ইহার ব্যাস ১৪ ইঞ্চি হইতে ২০ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ইহার যথার্থ ব্যাস প্রায় ৭৩ সহস্র মাইল, অর্থাৎ পৃথিবীর ব্যাস অপেক্ষা প্রায় ৯ গুণ অধিক। পৃথিবীর পৃষ্ঠভাগ ও আয়তন অপেক্ষা শনি গ্রহের পৃষ্ঠভাগ ও আয়তন যথাক্রমে ৮৪ ও ৭ শত ৭০ গুণ অধিক বৃহৎ। বৃহস্পতি গ্রহের সহিত শনিগ্রহের বহু বিষয়ে সৌসাদৃশ্য আছে। বৃহস্পতি গ্রহের ন্যায় শনি-গ্রহেও কয়েকটি 'কোটিবন্ধ' আবিষ্কৃত হইয়াছে (চিত্র নং ৮)। গ্যালিলিও তাঁহার দূরবীক্ষণ সাহায্যে দেখিতে পাইলেন যে, কোন এক পদার্থ দ্বারা শনি গ্রহ বেষ্টিত; কিন্তু ইহার আকার তিনি কিছু স্থির করিতে পারেন নাই। পরে ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে Huyghens প্রথম আবিষ্কার করেন যে, শনি গ্রহ একটি অঙ্গুরীয়ক দ্বারা বেষ্টিত (চিত্র নং ৯)। ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে Cassini অপর একটি অঙ্গুরীয়ক আবিষ্কার করেন। তৃতীয় অঙ্গুরীয়ক ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে Bond কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হয়। অঙ্গুরীয়ক তিনটির সমতল ও গ্রহের বিষুবরেখার সমতল বিভিন্ন নহে; পৃথিবী হইতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আকারে ইহা পরিলক্ষিত হয়; সময়ে সময়ে ইহা পৃথিবী হইতে দৃষ্টিগোচর হয় না ১৯২১ খৃষ্টাব্দে
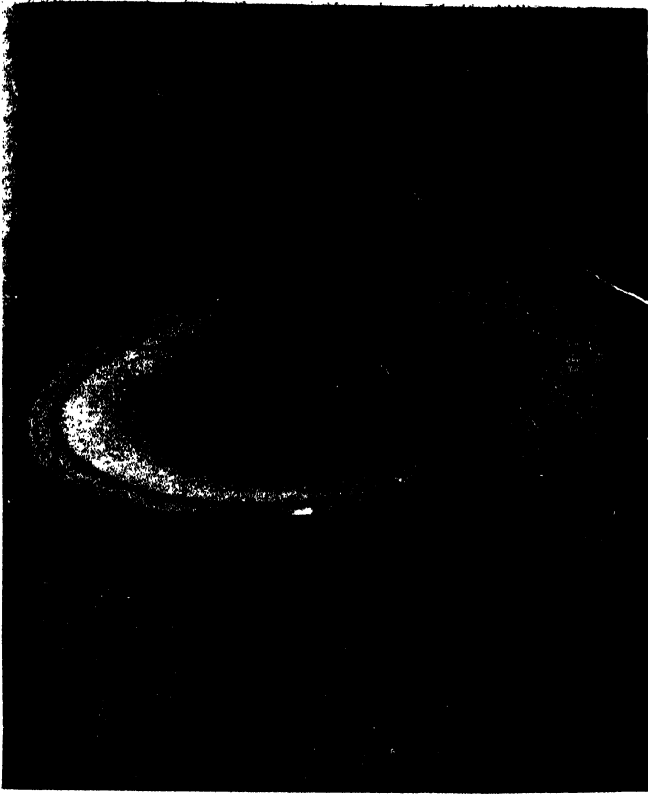
চিত্র নং ৮—অঙ্গুরীয়কবেষ্টিত শনিগ্রহে বিভিন্ন চিহ্ন
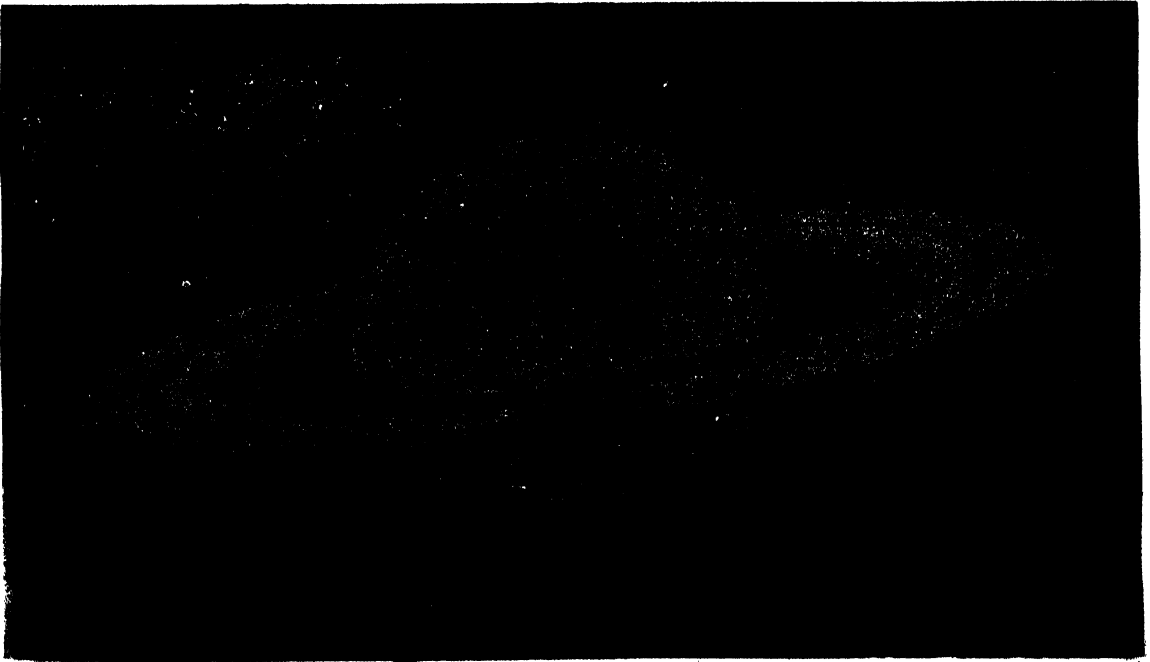
ইহা অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল এবং আগামী বৎসর ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে অঙ্গুরীয়কের উত্তর প্রান্ত সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টিগোচর হইবে। পুঞ্জীভূত অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থই অঙ্গুরীয়কের উপাদান, ইহা বৈজ্ঞানিক কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত হইয়াছে। অঙ্গুরীয়কের অন্তর্গত প্রত্যেক ক্ষুদ্র পদার্থ গ্রহের চতুর্দ্দিকে আপন আপন কক্ষে পরিভ্রমণ করিতেছে। শনি গ্রহের দশটি উপগ্রহ বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক কর্ত্তৃক বিভিন্ন সময়ে আবিষ্কৃত হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ উপগ্রহ Huyghens ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কার করিয়াছেন। গ্রহ হইতে দূরত্ব অনুসারে উপগ্রহদিগের নাম নিম্নে লিখিত হইল; যথা, মিমাস্ (Mimas), এন্সিলেডস্ (Enceledus), টেথিস (Tethys), ডায়োনী (Dione), রি (Rhea), টাইট্যান্ (Titan), থেমিস্ (Themis), হাইপেরিয়ান্ (Hyperion), আয়াপিটস্ (Iapetus) ও ফিব (Rhoebe)।

ইউরেনাস গ্রহ

১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ১৩ই মার্চ্চ তারিখে সার উইলিয়ম হার্শেল নভোমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন, সে সময়ে একটি নক্ষত্রের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল; প্রকৃত নক্ষত্রের আকার অপেক্ষা ইহার আকার বৃহৎ হওয়ায় তিনি স্থির করিলেন যে, ইহা পৃথিবীর অপেক্ষাকৃত নিকটে অবস্থিত একটি ধূমকেতু মাত্র। তথাকথিত ধূমকেতু যে একটি গ্রহ হইতে পারে, এ সন্দেহ তাঁহার মনে তখন উদিত হয় নাই।

উপরিউক্ত জ্যোতিষ্কের গ্রহ হইবার সম্ভাবনা Lexellএর মনে প্রথম উদিত হইয়াছিল। ১৭৮৩

চিত্র নং ৯—শনিগ্রহের অঙ্গুরীয়ক

খৃষ্টাব্দে লাপ্লা প্রমাণ করেন যে, ইহা একটি নূতন গ্রহ। আবিষ্কারক হার্শেলের নামানুসারে ইহা হার্শেল গ্রহ নামে পরিচিত হউক, ইহা তদানীন্তনকালের কয়েকজন বৈজ্ঞানিক স্থির করেন। কিন্তু হার্শেল রাজার নাম অনুসারে ইহার নাম রাখিলেন জর্জিয়ম সিডস্ (Georgium Sidus)। Bode উপরিউক্ত নাম পরিবর্ত্তন করিয়া ইউরেনাস্ নাম প্রদান করিলেন; তাহার পর হইতে ইহা সর্ব্বসাধারণের নিকট ইউরেনাস গ্রহ নামে পরিচিত। সূর্য্য হইতে ইহার দূরত্ব পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্ব অপেক্ষা ১৯ গুণ অধিক। দূরবীক্ষণ সাহায্যে ইহার ব্যাসকে মাত্র ৪ ইঞ্চি হইতে দেখা যায়, যদিও কয়েকজন বৈজ্ঞানিকের মতে ইহার প্রকৃত ব্যাস ৩২ সহস্র মাইল। ইউরেনাস গ্রহের চারিটি উপগ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে; যথা, এরিয়েল্ (Ariel), অম্ব্রিয়েল্ (Umbriel), টাইটেনিয়া (Titania) ও (Oberon)। উপগ্রহদিগের বিশেষত্ব এই যে, তাহারা ইউরেনাস গ্রহের গতির বিপরীত দিকে অর্থাৎ পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে আবর্ত্তিত হয়।

নেপচুন্ গ্রহ

সৌরজগতের অন্তর্গত অন্যান্য গ্রহ অপেক্ষা নেপচুন্ গ্রহ সূর্য্য হইতে অধিক দূরে অবস্থিত। উনবিংশ শতাব্দীতেই গণিত জ্যোতিষ কতদূর উন্নতিলাভ করিয়াছিল, তাহা নেপচুন্ গ্রহের আবিষ্কার হইতেই সম্যক্ বুঝিতে পারা যায়। ইউরেনাস গ্রহের কক্ষান্দোলন ... দেখিয়া অনেকে স্থির করেন যে, নিশ্চিতই অন্য কোন গ্রহ আরও ... দূরে অবস্থান করিয়া ইউরেনাস গ্রহের কক্ষকে আকর্ষণ করিতেছে, ... এ্যাডামস্ (Adams) ও ফরাসী লেভরিয়ে (Leverrier) পৃথক ... গণনা করিয়া অজ্ঞাত গ্রহের যথার্থ স্থান উভয়েই স্থির করিলেন। ... করিয়া আকাশের যে স্থানে অজ্ঞাত গ্রহের অবস্থান করা উচিত, ... স্থানের কথা লিখিয়া অধ্যাপক গ্যালের নিকটে ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে লেভরিয়ে এক পত্র প্রেরণ করেন; উক্ত তারিখের রাত্রিকালে সেই স্থানেই নূতন গ্রহ নেপচুন্‌কে অধ্যাপক গ্যালে ... দেখিতে পান।

গ্রহ আবিষ্কারের এক মাস পরে Lassel কর্ত্তৃক ইহার একমাত্র উপগ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে; ইউরেনাসের উপগ্রহের ন্যায় এই উপগ্রহও পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে নেপচুন্ গ্রহকে বেষ্টন করিয়া পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। সূর্য্য হইতে নেপচুন্ গ্রহের গড় দূরত্ব ২৮০ কোটি মাইল, যদিও বোড্ নিয়ম অনুসারে ৩৬০ কোটি মাইল হওয়া উচিত। যদি বোড্ নিয়ম সত্যই অভ্রান্ত হয়, তাহা হইলে ইউরেনাস্ ও নেপচুন গ্রহের মধ্যে নিশ্চিতই অন্য কোন গ্রহ অবস্থান করিতেছে; পিকারিং ইত্যাদি বহু বৈজ্ঞানিকের এই গ্রহ আবিষ্কারের সকল চেষ্টা আজ পর্য্যন্ত ব্যর্থ হইয়াছে।

শ্রীশিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

ক্ষীরোদপ্রসাদ

বাদল মাদল না বাজিতে মেঘে মেঘে,
উঠিয়াছে হাহাকার,
আঁধার বঙ্গ, নাই সে কোবিদ্ কবি
নাই সে নাট্যকার।
নূতন দরদ আনিল যে জন সঙ্গীতে
নৃত্যে করিল অভিরাম নব ভঙ্গীতে,
ভাবের জোয়ার আসিল যাহার ইঙ্গিতে
সে যে আজ নাহি আর।

২

নয়নের জলে তিতে 'রঘুবীর' আজি
'আলমগীরে'র সাথে,
কাহার মন্ত্রে তারা জেগেছিল আহা
মধু-জ্যোৎস্না রাতে।
কাঁদে 'মরজিনা' সহসা থামায়ে নৃত্য রে
'কিন্নরী' আজ বিয়োগবিধুর-চিত্ত রে,
কবির শ্মশান আজি মিলনের তীর্থ রে
দৃশ্য চমৎকার!

৩

জলদেবীগণ কোথা হ'তে আসি হায়
কোন্ দিকে যায় চলি,
অশ্রু নীহারে বক্ষ ভিজায়ে যায়
ভিজায়ে বনস্থলী।
উঠি রামধনু দুখে ডোবে নভ অঙ্গনে,
বনদেবী কেশ করে না শোভিত রঙ্গনে;
নাহি সুর আজ নাহি কিঙ্কিণী কঙ্কণে
দুখে মূক চারিধার।

৪

পুরাণের যুগ পুরাণো অতীত স্মৃতি
পরশে জাগিল যার,
আরব রজনী সমুদিত হ'ল পুনঃ
কুহকীর ভাণ্ডার!
গঙ্গার জল জোটালে যে দীন পল্বলে
নূপুরের ধ্বনি সাগরের ভীম কল্লোলে,
পরীর নৃত্য ঘন সহজের হিল্লোলে
বিশ্ব আপন তার।

৫

পূর্ণিমা তার সুধা ঝারি লয়ে আসি
শিয়রে রয়েছে জাগি,
'নরনারায়ণ' উদিত নয়ন-পথে
তাঁহার কবির লাগি।
বসেছেন কবি হাসিয়া পুষ্প-স্যন্দনে
ঝরে মন্দার শত টান পড়ে নন্দনে
মর্ত্ত্য ভূষিয়া যশের শরীর চন্দনে
করিছে নমস্কার।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

চলচ্চিত্রে নায়ক-নায়িকা
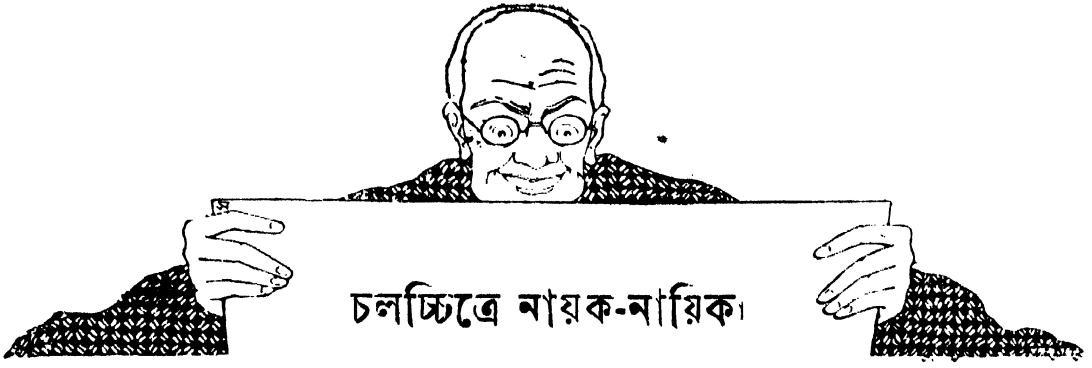
মাত্র পঞ্চাশৎবর্ষ পূর্ব্বে জগতে চলচ্চিত্রের নাম কেহ জানিত না; কিন্তু এই পঞ্চাশৎ বৎসরের মধ্যে চলচ্চিত্রের কি অভাবনীয় উন্নতি হইয়াছে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার গড়ের মাঠে পরলোকগত মিঃ জে, এফ, ম্যাডান যখন এক তাম্বুর মধ্যে প্রথম চলচ্চিত্রের প্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তখন কে মনে করিয়াছিল, ভারত ও ব্রহ্ম মাত্র ১৫।২০ বৎসরের মধ্যে ম্যাডানের চলচ্চিত্রের প্রদর্শনীতে ছাইয়া যাইবে? এত দ্রুত উন্নতি অন্য কোনও আমোদের ব্যবসায়ে হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

চলচ্চিত্র বিলাসীদের জন্য, এখন আর এ কথা বলিয়া উহার সংস্রব বর্জ্জনের উপদেশ দিলে চলে না। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ত কথাই নাই, এ দেশেও এখন আবালবৃদ্ধবনিতা চলচ্চিত্র দেখিতে উন্মত্ত। যাহার সঙ্গতি আছে, যে অবস্থাপন্ন, তাহার ত কথাই নাই, দরিদ্র পিতার স্কুলে পড়া পুত্র পিতার কষ্ট-দত্ত অর্থে ক্রীত স্কুল-পাঠ্য বিক্রয় করিয়া চলচ্চিত্র দেখিতে যায়; অতি সামান্য অবস্থার দিনমজুর ও কারিগর যেমন সন্ধ্যার পর একবার নেশার আড্ডায় না গেলে আকুলিবিকুলি করে, তেমনই সপ্তাহে অন্ততঃ একবারও চলচ্চিত্র না দেখিলে পেটের ভাত হজম করিতে পারে না। ধারাবাহিক (serial) চিত্র যে একবার দেখিতে আরম্ভ করে, সে তাহার শেষ না দেখিয়া থাকিতে পারে না। চলচ্চিত্র দর্শনের এমনই নেশা জন্মিয়াছে যে, ইহার কল্যাণে দেশের অনেক রঙ্গালয় দর্শকশূন্য হইতে আরম্ভ হইয়াছে। জনসাধারণ এখন যাত্রা তর্জ্জা ছাড়িয়া চলচ্চিত্র দেখিতে রুদ্ধশ্বাসে ছুটিয়া থাকে। টিকিট কিনিতে অঙ্গের এক প্রস্থ চর্ম্ম উঠিয়া গেলেও নেশাখোর চিত্রদর্শনে বিরত হয় না, অনেকে জামা-কাপড় ছিঁড়িয়া ঘরে ফিরিয়া আইসে, তথাপি চিত্র দর্শনের মোহ ত্যাগ করিতে পারে না। আজকাল ১০।১২ বৎসরের বাঙ্গালী বালকের মুখে যেমন ইতিহাসের আকবর জাহাঙ্গীর বা ভিক্টোরিয়া জর্জ্জের নামের মত মোহনবাগানের বলাই চাটুয্যে, গোষ্ঠ পালের অথবা ডান্‌কান, নাইটের নাম অহরহ শুনা যায়, তেমনই লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালীর মুখে চার্লি চ্যাপলিন, ডাগলাস্ ফেয়ারব্যাঙ্কস অথবা লিলিয়ান গিস, নরমা টালমাজ প্রভৃতির নাম অহরহ শুনিতে পাওয়া যায়।

সুতরাং কালের স্রোতে যে নূতন পণ্য এ দেশে ভাসিয়া আসিয়াছে, তাহার গতিরোধ করিবার কাহারও সাধ্য নাই। এ প্রদর্শনী যে এই দরিদ্রদেশের পক্ষে আদৌ শোভন নহে, তাহা বলিয়া আক্ষেপ করিয়াও কোন ফল নাই। বরং এই অবস্থায় এই নূতন ব্যবসায়কে আমাদের দেশে বাণিজ্যের দিক হইতে কিরূপে ফলপ্রসূ করিতে পারা যায়, তাহাই এখন এ দেশের ব্যবসায়ক্ষেত্রের মনীষিগণের চিন্তা করা কর্ত্তব্য। ম্যাডান থিয়েটার কোম্পানী এ বিষয়ে এ দেশে পথিপ্রদর্শক। তাঁহারা এ দেশেও বিদেশের অনুকরণে দেশী চিত্র (film) তুলিয়া দর্শকগণের তৃপ্তিসাধন করিতেছেন। সেই ব্যবসায়ে তাঁহারা ভারতীয় অর্থের সঙ্গে ভারতীয় মস্তিষ্ক, ভারতীয় অভিনেতা অভিনেত্রী, ভারতীয় দৃশ্য, ভারতীয় কারিগর ও শিল্পীর সাহায্য নিযুক্ত করিতেছেন। ইহা অবশ্যই প্রশংসার কথা।

কিন্তু এখনও আরও দুই চারিটি ভারতীয় ব্যবসায়ী কোম্পানীর এই ব্যবসায়ে অবতরণ করা প্রয়োজন। অবশ্য দুই একটি নূতন কোম্পানী যে হয় নাই, তাহা নহে। কিন্তু এই বিরাট ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। ভারতবাসী সময় থাকিতে ইহাতে অবতীর্ণ হইলে পরে লাভবান হইবেন। তবে যেমন বিরাট ব্যবসায়, আয়োজনও তেমনই বিরাট না

হইলে, ব্যবসায়ে অবতরণ করা পণ্ডশ্রম ও ক্ষতিকর হইবে সন্দেহ নাই।

এই ব্যবসায় যে কত বড় বিরাট আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা মার্কিণের লস্ এঞ্জেলস্, হলিউডের চলচ্চিত্রের প্রধান আড্ডাগুলির ব্যবস্থা ও আয়োজনের কথা শুনিলেই কতকটা ধারণা হয়। এই সকল চিত্রাগারের সংলগ্ন ভূখণ্ডে সঙ্কর করিয়া রাখা হয় নাই, জগতে বোধ হয় এমন দৃশ্য বা প্রাণী নাই। এখানে পাহাড় আছে, সমুদ্র আছে; নদ-নদী, জলপ্রপাত, জঙ্গল, মরুভূমি, গ্রাম-নগর, মন্দির-গির্জ্জা মস্জেদ প্যাগোডা, কৃষিক্ষেত্র, জলা, ফল ফুলের বাগান, স্কুল-কালেজ, ডাক্তারখানা হাঁসপাতাল, বাণিজ্যপোত রণপোত, কামান-বন্দুক, পুলিস, জেল, আদালত, হোটেল, জুয়ার আড্ডা, ধনী বিলাসীর সৌধ, বাগানবাড়ী, চোরডাকাতের বস্তী,—কি নাই? ইংরাজ, ফরাসী, মার্কিণ, ভারত, চীনা, কাফ্রি, আরব, তুর্ক, মুর,—সকল জাতির লোক এখানে আনিয়া রাখা হইয়াছে। এক কথায়, এই চিত্রাগার যেন একটি ক্ষুদ্র জগৎ।

সিড চ্যাপলিন "ওল্ডবিলের" ভূমিকায়

সিড চ্যাপলিন

রোণাল্ড কোলম্যান

এরূপ আয়োজনে কত কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয় করিতে হইয়াছে, তাহার কল্পনাও আমরা করিতে পারি না। অভিনেতা অভিনেত্রী, গল্পলেখক, চিত্রকর, গল্প চিত্রে সাজাইবার শিল্পী প্রভৃতিকে কি পরিমাণ পারিশ্রমিক দিতে হয়, তাহা শুনিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। যেমন ব্যয়, তেমনই আয়ও বিরাট। একখানি চিত্র একবার বাহির হইলে তাহা পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র ঘুরিতে থাকে। তাহাতে হাত-ফিরাফিরিতে প্রতি ক্ষেপে কত ভাড়া আদায় হয়, অথবা চিত্র বিক্রীত হইলে তাহা কত উচ্চ দরে ক্রয় করিতে হয়, তাহার ধারণাও আমরা করিতে পারি না। সে সকলের বিস্তৃত বিবরণ সময়ান্তরে দেওয়া যাইতে পারে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে জগতের বিখ্যাত চলচ্চিত্র অভিনেতা ও অভিনেত্রীদিগের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিতেছি।

হলিউডের মেট্রো-গোল্ডউইন-মেয়ার চিত্রাগারই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহার যাঁহারা মালিক, তাঁহারা জগতের যেখানে সুশ্রী ও সুন্দর এবং অভিনয়-কলা-কুশল

নারী পাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে বেতন দিয়া নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। অত্যধিক বেতন, ভাড়া ইত্যাদি দিবার একনামা সহি করিয়া ইঁহাদিগকে নিযুক্ত করা হয়; সুতরাং চুক্তির নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে অভিনেতা অভিনেত্রীর অন্যত্র অধিক বেতনে যাইবার উপায় থাকে না। এত দেশের এত লোক হলিউডে এইভাবে নিযুক্ত আছেন যে, শুনিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। বিস্তর কলাবিদ্ ইংরাজ অভিনেতা ও অভিনেত্রীরূপে হলিউডে রহিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে চার্লি-চ্যাপলিন, (অনেকের ধারণা ইনি মার্কিণ, কিন্তু তাহা সত্য নহে) সিড চ্যাপলিন, রোণাল্ড কোলম্যান, রেজিনাল্ড ডেনা, এইচ, বি, ওয়ার্ণার, ক্লাইভ ব্রুক, আর্নেষ্ট টরেন্স, ভিক্টর ম্যাকল্যাগলেন, পার্সি মার্মণ্ট, হেনরি ভিক্টর, লুপিনো লেন, মণ্টেগু লাভ, কনওয়ে টারল, র‍্যাল্‌ফ ফর্বস, ফিলিপ ষ্ট্রেঞ্জ, জর্জ্জ আর্থার, ডোনাল্ড ষ্টুয়ার্ট, হেনরি ভাইবার্ট, ওয়ালটার টেনিসন, ওয়ালেস লুপিনো, ডেভিড টরেন্স, হোমস হার্বার্ট, নর্ম্মাণ ট্রেভর, চার্লস লেন এবং ডোরিস লয়েড সমধিক প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। মেরি পিকফোর্ড (যাঁহাকে চলচ্চিত্র জগতে World's Sweetheart নামে অভিহিত করা হয়) এবং নর্ম্মা সিয়ারার কানাডাবাসিনী। জ্যাক বুকানান আর এক জন ইংরাজ কলাবিৎ। ইঁহার ন্যায় প্রতিভাশালী অভিনেতা অতি অল্পই আছেন। ইনি শীঘ্রই লণ্ডন ত্যাগ করিয়া হলিউড যাত্রা করিবেন বলিয়া স্থির হইয়াছে। হলিউডে সকল জাতের প্রতিভাশালী অভিনেতা ও অভিনেত্রী সাদরে গৃহীত হইয়া থাকেন, এমন কি জাপানী ও চীনা অভিনেতা ও অভিনেত্রীও হলিউডের বেড়াজাল অতিক্রম করিতে পারেন নাই।

বর্ত্তমানে রিচার্ড বার্থেলমেস, রোণাল্ড কোলম্যান, জন গিলবার্ট ও র‍্যামন নাভারো জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র অভিনেতা। রিচার্ড বার্থেলমেস মার্কিণ জাতীয়। যাঁহারা Way Down East চিত্রে নায়িকা লিলিয়ান গিসের সহিত ইঁহাকে নায়করূপে অভিনয় করিতে দেখিয়াছেন, তাঁহারাই ইঁহার প্রতিভার পরিচয় নিশ্চিতই প্রাপ্ত হইয়াছেন। লিলিয়ান যেমন সুন্দরী, তেমনই অপূর্ব্ব কলাকৌশলময়ী। তিনি মার্কিণ-জাতীয়া।

মেরী পিকফোর্ড

গ্রেটা গার্বো

নর্ম্মা সিয়ারার

রোণাল্ড কোলম্যান ইংরাজ, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তিনি পূর্ব্বে লণ্ডনের প্রসিদ্ধ অভিনেতা ছিলেন। এখন তিনি হলিউডে সাপ্তাহিক এক হাজার পাউণ্ড বেতনে (১৫ হাজার টাকা) চলচ্চিত্রে অভিনয় করিতে নিযুক্ত রহিয়াছেন। আমাদের দেশের লোক এই বেতনের কথা শুনিয়া নিশ্চিতই বিস্ময়ান্বিত হইবেন। কিন্তু ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। কেন না, মাত্র ৮ মাস পূর্ব্বে যে বিখ্যাত অভিনেতা রুডলফ ভ্যালেনটিনোর

মৃত্যু হইয়াছে, তিনি ইহা অপেক্ষা আরও অনেক অধিক বেতন পাইতেন।

র‍্যামন নাভারো পূর্ব্বে এক জন পেশাদার নর্ত্তক ছিলেন। এখন ইনিও কোলম্যানের ন্যায় সাপ্তাহিক এক হাজার পাউণ্ড বেতন লইয়া চলচ্চিত্রের অভিনয় দেখাইয়া লক্ষ লক্ষ লোকের মনস্তুষ্টিসাধন করিতেছেন। জন গিলবার্টও সাপ্তাহিক এক হাজার পাউণ্ড বেতন পাইয়া থাকেন।

যে রুডল্ফ ভ্যালেন্টিনোর কথা বলিতেছিলাম, তিনি কয়েকমাস পূর্ব্বে জগতের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র অভিনেতা বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। তিনি জাতিতে ইটালীয়ান হইলেও বহু দিন হইতে মার্কিণবাসী। তাঁহার "শেখ", "শেখের পুত্র" প্রভৃতি চিত্রের অভিনয় যে দেখিয়াছে, সে-ই মুগ্ধ হইয়াছে। গভীর করুণরসাত্মক অভিনয়ে, দর্শকের চিত্ত আলোড়নে, ভাবাভিনয়ের ঘাত-প্রতিঘাতে, হর্ষে শোকে চিত্তকে মুগ্ধ করিতে তাঁহার ন্যায় চলচ্চিত্রে সফলকাম হইয়াছিলেন আর এক জন কলাবিৎ—তিনি মার্কিণ জাতীয়, তাঁহার নাম হ্যারল্ড লকউড, তিনি ভ্যালেন্টিনোর ন্যায় সুদর্শন যুবক। তিনি অল্প বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাকে হারাইয়া মার্কিণের চলচ্চিত্র এক অমূল্য সম্পদে বঞ্চিত হইয়াছে।

রেক্স ইনগ্রাম

ভ্যালেন্টিনোও প্রায় ৮ মাস পূর্ব্বে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। তাহারই অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি "সেলিনি" চিত্রের রিহার্সাল দিতেছিলেন। সেই চিত্রে যদি তিনি বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহার শ্রেষ্ঠ অভিনয় দেখাইয়া যাইতে পারিতেন বলিয়া অভিজ্ঞগণের বিশ্বাস।

ভ্যালেন্টিনোর মৃত্যুর দৃশ্য এক অভাবনীয় ব্যাপার। তাঁহার হঠাৎ রোগের কথা যখন ব্যক্ত হইয়া পড়িল, তখন হইতে সহস্র সহস্র লোক তাঁহার গৃহদ্বারে ও হাঁসপাতালের সম্মুখে সমবেত হইয়া দারুণ উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করিয়াছিল। বোধ হয়, কোন রাজা বা বিশিষ্ট রাজনীতিক অথবা লেখক বা যোদ্ধার মৃত্যুতে কখনও এমন চিন্তা ও উৎকণ্ঠা দেখা গিয়াছে কি না সন্দেহ। আরও আশ্চর্য্যের বিষয়, জনতার মধ্যে নারীর সংখ্যাই অধিক। মার্কিণ সংবাদপত্রের লেখাতেই জানা গিয়াছিল যে, ভ্যালেন্টিনো তাঁহার রূপে ও গুণে বহু নারীর চিত্ত হরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহাকে এক বার শেষ দেখা দেখিবার জন্য লক্ষ লোক সমবেত হইয়াছিল, তন্মধ্যে নারীর সংখ্যা ৫০সহস্রেরও অধিক। ভিড়ের চাপে অনেক নারী মূর্চ্ছা গিয়াছিল, অনেকে দলিত

র‍্যামন নাভারো

অ্যালিস টেরী

পিষ্ট হইয়া প্রাণ হারাইয়াছিল। অভিনেতার এমনই কলা-কৌশলের অজেয় প্রভাব!

ভ্যালেন্টিনোর সম্পর্কে আর একটি কলাবিদের নামোল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। পোলা নেগ্রি প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী, তিনি ভ্যালেন্টিনোর বাগ্দত্তা হইয়াছিলেন। মৃত্যুসংবাদে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন, তাঁহার সেই মূর্চ্ছা তিন দিন স্থায়ী ছিল। সেই সময়ে তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, She was his one and only fiancee, ভ্যালেন্টিনোর তিনি একমাত্র প্রণয়িনী এবং ভ্যালেন্টিনোও তাঁহার একমাত্র প্রণয়পাত্র; পরন্তু তাঁহার জীবনের সমস্ত সুখ সমস্ত আনন্দ ভ্যালেন্টিনোর জীবনের সহিত অন্তহিত হইল। অথচ গত ১৪ই মে তারিখে পোলা প্যারী সহরে রাসিয়ান প্রিন্স সার্জি মিডিয়াভালির সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। প্রিন্স তাঁহার অপেক্ষা ২ বৎসরের ছোট। পোলা পূর্ব্বে আর একবার বিবাহিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সেই স্বামীও অভিজাতবংশীয় ছিলেন। সে যাহা হউক, পোলা অতি উচ্চ শ্রেণীর অভিনেত্রী। রাসিয়ান ও ইটালিয়ান নৃত্যে তিনি অত্যধিক পারদর্শিনী।

রুডলফ ভ্যালেনটিনো

'সার্কাস' চিত্রের নায়ক-নায়িকা চার্লি চ্যাপলিন ও মার্ণা কেনেডি

র‍্যালফ ফর্বস

বস্তুতঃই উপভোগ্য। কিন্তু আমাদের মনে হয়, হ্যারল্ড লয়েডের humour তাঁহার অপেক্ষাও subtle সূক্ষ্ম। তাঁহার অঙ্গভঙ্গি অপেক্ষা expression যেন আরও অধিক পরিস্ফুট। এ কথা বলিয়া আমরা জনসাধারণের নিকট অপরাধীও হইতে পারি, কেন না,

চার্লস চ্যাপলিন, হ্যারল্ড লয়েড, বাষ্টার কীটন প্রভৃতি হাস্যরসাবতারের নাম সকলেই শুনিয়াছেন। চার্লি ও লয়েড কত বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করেন, তাহা আমরা ধারণাই করিতে পারি না। চার্লির নাম জানে না, এমন লোক বোধ হয় য়ুরোপ ও আমেরিকায় নাই বলিলেই হয়। তাঁহার অপরূপ অঙ্গভঙ্গি ও হাস্যোদ্দীপক অবস্থা-সৃষ্টির কৌশল চার্লির মত সর্ব্বজনপ্রিয় হাস্যরসিক অভিনেতা আর নাই বলিয়াই শুনা যায়। বাষ্টার কীটন অল্পবয়স্ক, কিন্তু পরিহাস রসিকতায় বিশেষ অভিজ্ঞ। তাঁহার The man with the frozen face আখ্যা তাঁহার বিশেষত্ব ফুটাইয়া দেয়। তিনি অপরকে হাসাইবার সময়ে নিজে এমন অসম্ভব গাম্ভীর্য্য ধারণ করিতে পারেন যে, এই

জন্য তাঁহার নাম এইরূপ অপরূপ বিশেষণে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

জ্যাকি কুগান আর একটি অদ্ভুত অভিনেতা। জ্যাকি বালকমাত্র। শুনা যায়, তাহার পিতা তাহার ৯ বৎসর বয়ঃক্রম কাল হইতে তাহার অদ্ভুত অনুকরণশক্তি লক্ষ্য করিয়া তাহাকে চলচ্চিত্রের অভিনয়ে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সে ১২ বৎসর বয়স হইতে যে অদ্ভুত অভিনয় দেখাইয়া আসিতেছে, তাহা বর্ণনীয় নহে—উপভোগ্য। এমন অসাধারণ প্রতিভাশালী বালক অভিনেতা জগতে আছে বলিয়া সন্দেহ হইবারই কথা, বিশেষতঃ যাহারা

লন চ্যানে

তাহার অভিনয় দেখে নাই, তাহারা ত এ কথা বিশ্বাসই করিবে না। 'লিটল' পেগিও এক আশ্চর্য্য অভিনেত্রী। পেগি জ্যাকি অপেক্ষা বয়সে আরও ছোট। সেও বহু অভিনয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে। তবে জ্যাকির মত প্রতিভা তাহার আছে বলিয়া মনে হয় না।

ক্লাইভ ব্রুক, রেমণ্ড গ্রিফিথ, টম মিক্স, লন চ্যানে, এণ্টোনিও মরেণো, লিও মরেণো, লিউ কোডি, কনরাড ন্যাগেল, উইলিয়াম হেনস, ট্রিম ম্যাকয়, জন ব্যারিমোর, বার্ট লিটেল প্রভৃতি বহু অভিনেতার নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতে পারা যায়। অভিনেত্রীগণের মধ্যে নর্ম্মা টালমাজ ও তাঁহার ভগিনী কনষ্টান্স টালমাজ, লিলিয়ান গিসের ভগিনী ডোরোথি গিস, নর্ম্মা সিয়ারার, ম্যারিয়ন ডেভিস, ডোরোথি ফিলিপস, রেণী এডোরী, গ্রেটা গারবোর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অভিনেতাগণের মধ্যে লন চ্যানে অতীব প্রতিভাবান কলাবিদ্যাবিশারদ। গার্হস্থ্য জীবনে তিনি অতি ধীর স্থির প্রকৃতির মানুষ, তিনি রহস্যপ্রিয় বটে, কিন্তু এমনই তাঁহার ভাগ্য যে, জগতের যত উদ্ভট আশ্চর্য্য ও দুরূহ চরিত্র তাঁহাকেই অভিনয় করিতে হইয়াছে ও হইতেছে। যাঁহারা "নটর ডেম" চিত্রে তাঁহার কুব্জের চরিত্র চিত্রের অভিনয় দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বলিবেন, কি অসাধারণ প্রতিভা লইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন! বস্তুতঃ সহজ মানুষ যে এমন সুন্দররূপে পূর্ব্বাপর একাধারে কুব্জ, চক্ষুরোগগ্রস্ত, বামন ও বিকৃতদেহ মানুষের অভিনয় করিতে পারে, এ বিশ্বাস তাঁহার অভিনয় না দেখিলে কেহ ধারণা করিতে পারে না। "মিঃ উ" নামক চিত্রে তিনি এমন হুবহু চীনা সাজিয়া থাকেন যে, তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুরাও বুঝিতে পারেন না, কিরূপে তিনি চীনার ন্যায় ক্ষুদ্র চক্ষু ও উচ্চ গণ্ডাস্থি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

নানা বেশে অভিনয়ে তিনি এত দূর দক্ষ যে, তাঁহার শক্তি সম্বন্ধে নানা অদ্ভুত গল্প শুনিতে পাওয়া যায়।

এক দিন দুই জন অভিনেতা হলিউডের এক পথে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন যে, একটা পোকা তাঁহাদের পায়ের সম্মুখে পথাতিক্রম করিতেছে। তখন এক জন অপরকে পদক্ষেপে বাধা দিয়া বলিলেন, "উহু, পা ফেলিও না। কি জানি যদি লন চ্যানে পোকা সাজিয়া থাকে!"

আর একটা গল্প এইরূপ। এক বালিকা তাহার পীড়িতা মাতামহীর জন্য বাজারে দুধ কিনিতে যাইতেছিল। পথে এক জঙ্গলের মধ্য হইতে হঠাৎ এক প্রকাণ্ড ভল্লুক নির্গত হইল। তাহার বড় বড় নখ, ভাটার মত গোল গোল রাঙ্গা চোখ, মূলার মত প্রকাণ্ড ধারাল দাঁত!

বালিকা কিন্তু ভয় পাইল না। ভল্লুক জিজ্ঞাসা করিল, "বুড়ী, কোথায় যাচ্ছ চুবড়ী নিয়ে?"

বালিকা বলিল, "দিদিমার জন্য দুধ কিনতে, মিঃ চ্যানে!"

কিছু দিন পূর্ব্বে য়ুরোপের এক রাণী মার্কিণদেশে পর্য্যটন করিতেছিলেন। এক সংবাদপত্র লিখিল,—"সাধারণ সাবধান! হয় ত এই রাণী লন চ্যানে হইতে পারেন।"

এইরূপ অনেক গল্প আছে। বস্তুতঃ লন চ্যানেকে নেকে ভেল্কীবাজ বলিয়া থাকেন।

চলচ্চিত্রের আর একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, অভিনেতা-অভিনেত্রীরা কেবল এই কলাবিদ্যায় পারদর্শিতা দেখাইতে পারেন এমন নহে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকের অন্য কলাবিদ্যায়ও কৃতিত্বের নিদর্শনের অভাব নাই। পূর্ব্বে বলিয়াছি, র‍্যামন নাভারো সুদক্ষ নর্ত্তক ছিলেন। তিনি কেবল নর্ত্তক নহেন, তিনি সুগায়ক ও সঙ্গীতরচনায় সিদ্ধহস্ত। রোণাল্ড কোলম্যান রঙ্গালয়েরও সুদক্ষ অভিনেতা। রিউ কোর্ডি ও কনরাড স্থাগেল উৎকৃষ্ট গল্পকুশল ব্যক্তি (Raconteur)। রেজিনাল্ড ডেনী উড়োকল চালাইতে বিশেষ দক্ষ। এ জন্য তিনি অনেক ক্ষেত্রে জীবন বিপন্ন করিয়া থাকেন। চলচ্চিত্রের কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে নিতান্ত অনুনয় বিনয় করিয়া জীবন রক্ষা করিতে বলেন বলিয়া, তিনি এখন এ দিকের নির্ব্বন্ধ সংযত করিয়াছেন। এডি ক্যান্টর চলচ্চিত্রের অভিনয়ে যেমন দক্ষ, তেমনই গীতিনাট্যের অভিনয়ে মার্কিণদেশে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। লুপিনো লেন ব্যায়ামক্রীড়ায়, বিশেষতঃ জিমন্যাষ্টিকে বিশেষ কৃতী। উচ্চ তারের উপর নৃত্যে তাঁহার সমকক্ষ কেহ নাই বলিলে হয়। প্যাটসি রুথ মিলার, ক্লাইভ ব্রুক ও পার্সি মার্মণ্ট উচ্চাঙ্গের টেনিস খেলোয়াড়। ভিক্টর ম্যাকলাগলেন মুষ্টিযুদ্ধে বিশেষ পারদর্শী। জন ব্যারিমোর, জন গিলবার্ট, র‍্যামন নাভারো এবং ডাগলাস ফেয়ার-ব্যাঙ্কস অসিযুদ্ধে অতীব পারদর্শী। ডাগলাস ফেয়ার-ব্যাঙ্কস দৌড়ে, উল্লম্ফনে, অশ্বারোহণে এবং নানা বিদ্যায় পারদর্শী। তাঁহার "বোগদাদের চোর", "মার্ক অফ জোরো", প্রভৃতি অভিনয়ে তাঁহার নানা অদ্ভুত শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

এভেলিন ব্রেণ্ট, নাজিমোভা, উইলিয়াম হেনস্ প্রভৃতি অভিনেতা ও অভিনেত্রী সন্তরণবিদ্যায় পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন। নাজিমোভা জাতিতে রাসিয়ান, করুণরসাত্মক অভিনয়ে তিনি সিদ্ধহস্ত। তাঁহার "পুনর্জ্জন্ম", "কুহেলিকার অন্তরাল হইতে" ইত্যাদি অভিনয় পরম উপভোগ্য। বেসি লাভ মার্কিণের উচ্চাঙ্গের নর্ত্তকী।

রেড গ্রাঞ্জ এক জন উৎকৃষ্ট ফুটবল খেলোয়াড়। আরও অনেক অভিনেতা ফুটবলে ও ক্রিকেটে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

অভিনেত্রীদের মধ্যে বর্ত্তমানে এ্যালিস টেরীর সর্ব্বাপেক্ষা গৌরাঙ্গী সুন্দরী বলিয়া নাম আছে। গৌরাঙ্গী ও নীলনয়নাগণকে ইংরাজীতে Blonde বলিয়া থাকে। এ্যালিস টেরী গৌরাঙ্গী ও নীলনয়না। তিনি অতীব ভাবপ্রবণা অভিনেত্রী, রঙ্গালয়ে তাঁহার নাম বিশ্ববিশ্রুত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি বহুদিন যাবৎ চলচ্চিত্রে সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই। তাহার মূল কারণ এই যে, তাঁহার সুন্দর মসৃণ কেশরাশি কিছুতেই চিত্রিত হইতে চাহিত না। এই হেতু তিনি সোনার বরণ পরচুলা ভাড়া করিয়া চিত্র তুলাইয়া তবে চলচ্চিত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি রেক্স ইংগ্রামকে বিবাহ করিয়াছেন। রেক্স ইংগ্রাম ইংরাজ; তিনি চলচ্চিত্র প্রস্তুতকারদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

একটা রহস্যের কথা এই যে, যাঁহারা দেখিতে পরমা সুন্দরী, তাঁহাদের কাহাকেও কাহাকেও চলচ্চিত্রে এ্যালিস টেরীর মত বিফলমনোরথ হইতে হইয়াছে; অথচ যাহারা বাহিরে দেখিতে কুৎসিত, এমন নারীকে চলচ্চিত্রে সুন্দর মানাইয়াছে! লুপিনো লেনের নায়িকারূপে যে সুন্দরী যুবতী "Music Box Revue" গীতিনাট্যে অভিনয় করিয়া মার্কিণদেশকে মুগ্ধ করিয়াছেন, বহু চেষ্টার পরেও তিনি চলচ্চিত্রে কিছুতেই সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই। ফটোগ্রাফে তাঁহার চিত্র তুলিতে গেলেই তাঁহাকে অতি সাধারণ নারীর ন্যায় দেখায়।

কোন কোন নারী নানা রূপ পাউডার, রঙ্গ, কস্মেটিক ইত্যাদির সাহায্যে নিজ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়া ফটো তুলাইয়া থাকেন। কেহ কেহ পোষাক-পরিচ্ছদের ঘটায় সৌন্দর্য্যের নানা খুঁত ঢাকিয়া ফেলেন। মার্কিণদেশে ম্যারিয়ন ডেভিসের সর্ব্বাপেক্ষা সুপরিচ্ছদে ভূষিতা অভিনেত্রী বলিয়া খ্যাতি আছে। তিনি নিজের পরিচ্ছদ নিজে প্রস্তুত করিয়া থাকেন। এ বিদ্যাতেও তিনি বিশেষ পারদর্শিনী। পোলা নেগ্রী কখনও রঙ্গ-পাউডার মাখেন না।

১৯২৭ খৃষ্টাব্দে যে সকল নূতন চিত্র হলিউডে প্রস্তুত হইতেছে, তন্মধ্যে চার্লি চ্যাপলিনের "সার্কাস" উল্লেখযোগ্য। চার্লি এই চিত্রের জন্য ৩ মাস কাল দড়ির উপর নৃত্যবিদ্যায় তালিম দিয়াছেন, কারণ, কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য এই চিত্রে তাঁহাকে দড়ির উপর নাচিতে হইবে। আর একখানি নূতন চিত্রের নাম 'হিডেলবার্গ'; র‍্যামন নাভারো

ইহার নায়ক এবং নর্ম্মা সিয়ারার নায়িকা সাজিবেন। 'কারমেন' আর একখানি নূতন চিত্র; ভিক্টর মাকলাগ্লেন ও ডোলোরিস ডেল রিও ইহার নায়ক-নায়িকা। সিসিল বি ডি মিলের 'রাজরাজেশ্বর' (King of Kings'), 'রোমান্স', 'কিং অফ সোহো (নায়ক এমিল্ জ্যানিংস), 'উইণ্ড' (নায়িকা লিলিয়ান গিস), 'নোয়াস আর্ক' ও 'কোয়ালিটি ষ্ট্রীট' (নায়িকা ম্যারিয়ন ডেভিস), 'অর্ডিয়াল' (নায়ক লন চ্যানে), 'উওম্যান ডিসপিউটেড' (নায়িকা নর্ম্মা টালমাজ), 'টুয়েল্ভ মাইল্স আউট' (নায়ক জন গিল্বার্ট), 'জেলি নিও' (নায়িকা লিলিয়ান্ গিস্), 'সো বোট', 'আঙ্কল টম্স্ কেবিন', 'রিসারেক্সান', 'এনি লরি', 'ব্যাণ্ডিং আবরণ', 'এ্যানা ক্যারানিনা', 'উইংস', 'রোজ অফসাণ্টা ফে', 'বিগ প্রিজ', 'গ্রে হ্যাট, 'বিউগল্ কল্' প্রভৃতি নূতন চিত্র এই ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে প্রদর্শিত হইবে। মার্কিণে প্রদর্শিত হইবার পর য়ুরোপ হইয়া একে একে ঐ গুলি এ দেশেও আসিবার সম্ভাবনা।

কি বিরাট ব্যবসায়! ৫০ বৎসরে কি বিরাট পরিবর্ত্তন! আমোদ-প্রমোদে অর্থার্জ্জন এ দেশেও বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু আমোদ-প্রমোদে এমন টাকার ছিনি-মিনি খেলা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি।

এই সমস্ত চিত্রের প্রাণপ্রতিষ্ঠায় জগতের শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা, শ্রেষ্ঠ গল্পলেখকরা, শ্রেষ্ঠ চিত্রকররা, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা অভিনেত্রীরা, শ্রেষ্ঠ কারিগর ও মজুররা নিযুক্ত হইয়াছে সন্দেহ নাই। তাহাদের ভরণপোষণে কি অসম্ভব অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা সহজে অনুমেয়, অথচ এখনও ঐ সকল চিত্র বাজারে অর্থার্জ্জন করিয়া ব্যয়-সঙ্কুলান করিয়া লাভ দেখাইতে পারিবে ।ক না, তাহার নিশ্চয়তা নাই। এ ক্ষেত্রে কি অকুতোভয়তা ও একাগ্রতা পরিলক্ষিত হইতেছে।

লিউপিনো লেনের নিকট একখানা প্রাচীন চিত্র আছে, উহার নাম "To save her soul"; প্রায় ১৮ বৎসর পূর্ব্বে চলচ্চিত্রের প্রদর্শনীর জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছিল। ইহার প্রস্তুতকারক ডেভিড ওয়ার্থ গ্রিফিথ। ইনিই পরে 'Way down East' এবং 'Birth of a Nation' প্রভৃতি চূড়ান্ত চলচ্চিত্র (Super-film) প্রস্তুত করিয়াছেন। সেই পুরাতন ।চত্রে মেরি পিকফোর্ড নায়িকা এবং ম্যাক্ সেনে দুর্দ্দান্ত পীড়করূপে অভিনয় করিয়াছিলেন। এই চিত্রখানি প্রস্তুত করিতে গ্রিফিথের মাত্র ৫ শত ডলার খরচ পড়িয়াছিল। এক ডলার প্রায় ৩৵০ আনা। আর আজকাল এক একখানি চিত্র প্রস্তুত করিতে লক্ষ লক্ষ ডলার ব্যয় হয়। 'বেন হুর' নামক চিত্র প্রস্তুত করিতে ৭০ লক্ষ ডলার ব্যয় হইয়াছিল। আবার উহাতেও চিত্র সম্পূর্ণ হয় নাই! কোথায় ৫ শত, আর কোথায় ৭০ লক্ষ। মাত্র ১৮ বৎসরের ব্যবধানে কি অসম্ভব পরিবর্ত্তনই না ঘটিয়াছে!

কিন্তু ৫০ বৎসর একটা নূতন আবিষ্কারের পক্ষে দীর্ঘজীবন নহে। চলচ্চিত্রের এই ত শৈশবকাল, এখনও তাহার সম্মুখে দীর্ঘ উন্নতির জীবন পড়িয়া রহিয়াছে; যদি ভাবিয়া দেখা যায়, কত শতাব্দী যাবৎ মানুষ রঙ্গালয়ের অভিনয়ের অনুশীলন করিয়া আসিতেছে, অথচ এখনও রঙ্গালয়ের চরমোন্নতি সাধিত হইয়াছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করা যায় না, তাহা হইলে মাত্র ৫০ বৎসরে চলচ্চিত্রের কতটুকু উন্নতি সাধিত হইতে পারে, তাহা কি অনুমান করা যায় না? ভরত মুনির কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত কত যুগ-যুগান্তর চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু রঙ্গালয়ের অবস্থার উন্নতি সম্যক পরিমাণে হয় নাই। কালিদাসের সময়ে একবার রঙ্গালয়ের উন্নতির যুগ আসিয়াছিল, সে সময়ে অপ্সরা মিশ্রকেশী উদভ্রান্তক নৃত্যের সহিত ব্যোম-পথে প্রয়াণ করিয়াছিল, মাতলির রথ আকাশে উড়িয়াছিল। কাযেই বলিতে হয়, সে সময়ে রঙ্গালয়ের কারিগরির বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। গ্রীক ও রোমাণ রঙ্গালয়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া বহু পরবর্ত্তী যুগের ইংলণ্ডের রঙ্গালয়ের সমালোচনা করিলে দেখা যায়, রাণী এলিজাবেথের রাজত্বকালে সেক্ষপিয়ারের Midsummer nights dream নাটকের অভিনয়ে মানুষ লণ্ঠন লইয়া আড়ার কাঠে উঠিয়া চন্দ্র সাজিত। আর আজ? ইংলণ্ডের রঙ্গালয় উন্নতির কত উচ্চ স্তরে আরোহণ করিয়াছে! তথাপি এই উন্নতিতেও লোক সন্তুষ্ট নহে।

ইহা ছাড়া রঙ্গালয়ের পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডের লোক অবজ্ঞার দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিত। এখন সুর ফিরিয়াছে। আমাদের দেশেও মাত্র ৫০ বৎসর পূর্ব্বে রঙ্গালয়ের কি অবস্থা ছিল, আর এখন কি হইয়াছে? নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল তাঁহার ৫০ বৎসরের

ভজ্ঞতার কথা এ যাবৎ যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায়, কত কষ্ট, কত লাঞ্ছনা ও কত অবজ্ঞাবিদ্রূপের মধ্য দিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার সহকর্ম্মীদিগকে বাঙ্গালার রঙ্গালয়কে আধুনিক উন্নত প্রথায় গড়িয়া তুলিতে হইয়াছে। তথাপি এখনও বাঙ্গালায় রঙ্গালয়ের সম্যক্ উন্নতি সাধিত হইয়াছে বলা যায় না। এখনও অনেকে রঙ্গালয়ের পারিপার্শ্বিক অবস্থা শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করেন না।

কিন্তু রঙ্গালয়ের প্রভাব সমাজের উপর অল্প নহে। পাদরী ডাক্তার র‍্যাণ্ডল্ফ রে প্রতীচ্যের আধুনিক রঙ্গালয়ের সম্পর্কে লিখিয়াছেন, "খৃষ্টান ধর্ম্মমন্দিরের অপেক্ষা রঙ্গালয়ের প্রভাব সমাজের উপর বহুদূরবিসারী। ধর্ম্ম-বক্তা শত শত লোককে প্রভাবান্বিত করিতে পারেন, কিন্তু রঙ্গালয়ের অভিনেতা-অভিনেত্রী সহস্র সহস্র লোকের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকেন। রঙ্গালয় সমসাময়িক অবস্থা ও নীতির প্রতিচ্ছবি লোকলোচনের সম্মুখে ধরিয়া থাকে। যদি এই প্রভাব সমাজের উন্নতির দিকে ধাবিত হয়, তাহা হইলে সমাজ উপকৃত হয়, রঙ্গালয় সমাজ-গঠনে সহায়তা করে।"

যদি রঙ্গালয় সমাজের উপর এরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে চলচ্চিত্র কত অধিক পরিমাণে সেই প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, তাহা অনুমান করা কষ্টসাধ্য নহে। বিবাহ-বিভ্রাট, বলিদান, প্রফুল্ল প্রভৃতি প্রহসন ও নাটকের অভিনয় সমাজের উপর কিছু না কিছু প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, এ কথা সকলকে স্বীকার করিতে হইবে। সিরাজউদ্দৌলা, রাণাপ্রতাপ, মেবারপতন, প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি নাটক দেশপ্রেম শিখাইবার পক্ষে সহায়তা করিয়াছে, অথবা চৈতন্যলীলা, প্রহ্লাদচরিত্র, জয়দেব, শঙ্করাচার্য্য, চণ্ডিদাস, তুলসীদাস প্রভৃতি ভক্তিমূলক নাটক বাঙ্গালীকে ধর্ম্মের ক্ষেত্রে প্রভাবান্বিত করিয়াছে, এ কথাও স্বীকার করিতে হইবে। তেমনই চলচ্চিত্রের দ্বারা সমাজ নানা ভাবে নানা দিকে প্রভাবান্বিত হইতেছে, এ কথাও স্বীকার করা অসঙ্গত নহে। সুতরাং চলচ্চিত্র বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশেও অনাদরণীয় নহে। আমরা যেরূপ দিন দিন চলচ্চিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছি, তাহাতে ইহার কর্ম্মক্ষেত্র প্রশস্ত ও পবিত্র করিবার পক্ষে আমাদিগকে সমগ্র থাকিতে যত্নবান্ হইতে হইবে। চলচ্চিত্রের ভাল বা মন্দ করিবার অপার অপরিমেয় ক্ষমতা আছে। আমাদের যেমন এখন হইতে এই ব্যবসায়কে আমাদের দেশের পক্ষে লাভজনক করিবার চেষ্টা করিতে হইবে, তেমনই চলচ্চিত্রের রুচি ও নীতির দিকেও খর-দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অন্যথা উহার মন্দ প্রভাব আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণের পক্ষে কখনই শুভদায়ক হইবে না। যাহাতে আমাদের কোমলমতি বালক ও যুবক-সম্প্রদায় উহার প্রভাবে অসংযম ও অবাধ স্বেচ্ছাচারিতায় অভ্যস্ত না হয়, বরং উহার প্রভাবে সুশিক্ষা লাভ করে, এমন ভাবের চিত্রের অভিনয়কে প্রশ্রয় দিতে হইবে। দর্শকের সহানুভূতি চিত্রের সাফল্যের মূল কারণ। এ দেশের চলচ্চিত্রের শৈশবাবস্থায় এ কথাটা আমাদিগকে এখন হইতে স্মরণ রাখিতে হইবে।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

আজ—কাল

যে মুখে হাসির রাশি, সেই মুখে চিন্তাভার,
আলোক যেথায় আজ, কাল সেথা অন্ধকার!
একে একে ঋতু আসে, একে একে চ'লে যায়,
রবি, শশী, উদে, মুদে, ফুটে ফুল ও শুকায়!
আজ যা'রে মিত্র বলি' করা গেল সম্ভাষণ,
কাল সে করিতে পারে শত্রুবৎ আচরণ!
নগর বিপিন হয়, বিপিনে নগর হাট,
নদী আজ বহে যেথা, কাল সেথা মরুমাঠ!

ভালবাসি আজ যা'রে, কাল তা'রে ভুলে যাই,
দেখিলাম আজ যা'রে, হয় ত সে কাল নাই।
মিলন যেথায় আজ, কাল সেথা ঘৃণা দ্বেষ,
আজ যেথা মহাসিন্ধু, কাল সেথা মহাদেশ!
নাহি জানি কি রহস্য আছে এই 'আজ-কালে',
আজ কাল যত করি, তত পড়ি মায়াজালে!

শ্রীমুণীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ঋণ-পরিশোধ

মন্দ সংবাদ বাতাসের আগে দৌড়ায়, স্মিট পরিবারের কলঙ্ককাহিনী হাটে-মাঠে প্রচারিত হইতে বিলম্ব হইল না। জুরিচ নগরে এই ধনাঢ্য পরিবারের শত্রুসংখ্যা অল্প ছিল না; অনেকে তাহাদিগকে ব্যবসায়ের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করিত, এই সংবাদ লইয়া তাহারা মহা উৎসাহে ঘোঁট করিতে লাগিল। সকলেরই ধারণা হইল, কাউণ্ট ভন আরেনবার্গ নরপিশাচ অথবা রাক্ষস; সেই প্রতারক আনা স্মিটকে ভুলাইয়া তাহার সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছে এবং তাহার কন্যা সুন্দরী বার্থাকে উপপত্নী করিয়াছে। এমন কি, বৃদ্ধা আনা স্মিট পরলোকে প্রস্থান করিয়াও কুৎসার কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিল না! ফ্রিজ ও পিটার ক্ষোভে-দুঃখে অভিভূত হইয়া তিন দিন ঘর হইতে বাহির হইল না এবং কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিল না।

কিন্তু যাহাকে লইয়া এত কাণ্ড—সেই কাউণ্ট কোথায়? ফ্রিজ ও পিটার মনে করিয়াছিল, কাউণ্ট উকীলের বাড়ী হইতে নিজের বাড়ীতেই ফিরিয়া যাইবেন; কিন্তু তাহারা লোক পাঠাইয়া জানিতে পারিল, তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করেন নাই। তিন দিনের মধ্যে কেহই তাঁহাকে জুরিচ নগরে দেখিতে পাইল না; তখন জনরব সহস্র কণ্ঠে ঘোষণা করিল—কাউণ্ট ঘৃণায় ও লজ্জায় আত্মহত্যা করিয়াছেন; কেহ বলিল, তিনি দড়ি লইয়া অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন; কেহ বলিল, বন্দুক লইয়া তাঁহাকে পাহাড়ের দিকে যাইতে দেখা গিয়াছে; কিন্তু তাঁহার আত্মহত্যার কোন প্রমাণ সংগৃহীত হইল না।

ফ্রিজ ও পিটার দারুণ উৎকণ্ঠায় কালযাপন করিতে লাগিল; চারি দিন অতীত হইল, কাউণ্টের সন্ধান মিলিল না। পঞ্চম দিন তাহারা পরামর্শ করিয়া স্থির করিল, সেই বিশ্বাসঘাতক প্রবঞ্চকটার ভাগ্যে যাহা ঘটে ঘটুক, বার্থাকে লণ্ডন হইতে আনাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। দেশ-ভ্রমণে পিটারেরই অধিক অনুরাগ ছিল; সে এই ভার গ্রহণে সম্মত হইয়া অবিলম্বে ইংলণ্ডে যাত্রা করিল।

পিটার যথাসময়ে লণ্ডনে উপস্থিত হইয়া বার্থার নিকট জানিতে পারিল, কাউণ্ট লণ্ডন ত্যাগের পর তাহার সংবাদ লইবার চেষ্টা করেন নাই। পীড়িতা পত্নীর প্রতি কাউণ্টের এই প্রকার উপেক্ষায় পিটারের ক্রোধ শতগুণ বর্দ্ধিত হইল। কিন্তু সে বার্থাকে কাউণ্টের বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদ জ্ঞাপন করা সঙ্গত মনে করিল না, কেবল বলিল, কাউণ্টকে কোন জরুরি কাযে হঠাৎ জার্ম্মাণীতে যাইতে হইয়াছে—এই জন্য সে বার্থাকে জুরিচে লইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে লণ্ডনে আসিয়াছে। এ কথা শুনিয়া বার্থা কোন মন্তব্য প্রকাশ করিল না; তাহার স্বামীর সম্বন্ধে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করিল না। বার্থার স্বাস্থ্যের অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয়; লণ্ডনের কোন বিখ্যাত চিকিৎসক তাহার চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেইরূপ অসুস্থ অবস্থায় বার্থাকে দেশান্তরে লইয়া যাওয়া সঙ্গত হইবে কি না বুঝিতে না পারিয়া পিটার ডাক্তারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার অভিমত জিজ্ঞাসা করিল।

ডাক্তার বার্থাকে জুরিচে লইয়া যাইবার প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন না। তিনি বলিলেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যই তাহার প্রধান রোগ এবং তাহাই তাহার শারীরিক ও মানসিক অবসাদের কারণ; কিছুকাল ভূমধ্যসাগরে ভ্রমণ করিলে রোগিণীর স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতে পারে। পিটার ডাক্তারের এই উপদেশই গ্রহণযোগ্য মনে করিল। সে আরও ভাবিয়া দেখিল, বার্থাকে যদি তিন চারি মাস জুরিচে লইয়া যাওয়া না হয়, তাহা হইলে কাউণ্টের বিরুদ্ধে যে সকল অপ্রীতিকর আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা বার্থার কর্ণগোচর হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না এবং সেই সময়মধ্যে বার্থার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থাও নির্দ্ধারিত হইতে পারিবে।

পিটার বার্থাকে ডাক্তারের অভিমত জানাইল। বার্থা এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করিলে, পিটার ফ্রিজকে সকল কথা লিখিয়া তাহাদের পাথেয় ব্যয়-নির্ব্বাহের ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিল। ফ্রিজ তাহাদের উকীলের সহিত পরামর্শ করিয়া পিটারের সঙ্কল্পিত ব্যবহার অনুমোদন করিল এবং তাহাকে জানাইল—কাউন্টের সহিত বার্থার দাম্পত্য-সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য আদালতে শীঘ্র দরখাস্ত দাখিল করা হইবে।

ফ্রিজের পত্র পাইয়া পিটার নিশ্চিন্ত হইল এবং বার্থাকে লইয়া ভূমধ্যসাগর ভ্রমণে যাত্রা করিল। বার্থা কাউন্টের বিচিত্র ব্যবহার সম্বন্ধে পিটারকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না, দীর্ঘকাল যাবৎ স্বামীর অনুপস্থিতির কারণ জানিবার জন্যও আগ্রহ প্রকাশ করিল না। স্থানপরিবর্ত্তনে সে একটু প্রফুল্ল হইল।

কিন্তু কাউন্ট কোথায়? জুরিচে যে সকল লোকের সহিত কাউন্টের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল, তাহারা তাঁহার অদর্শনে ব্যাকুল হইয়া নানা স্থানে তাঁহার অনুসন্ধান আরম্ভ করিল। কিন্তু তাহাদের চেষ্টা সফল হইল না। তখন অনেকেরই বিশ্বাস হইল, তিনি কলঙ্কপ্রচারের ভয়ে আত্মহত্যাই করিয়াছেন।

এক মাস পরে এক শনিবারের প্রভাতে রডলফ মোজে তাহার ফ্রাঙ্কফোর্টের আফিসে একখানি ক্ষুদ্র পত্র পাইল; পত্রখানির নীচে স্বাক্ষর ছিল,"রেবেকা কোহেন—কাউন্টেস ভন আরেনবার্গ।" সেই পত্রে এই কথাগুলি লিখিত ছিল:—

“এই পত্রে যে ঠিকানা দেওয়া হইল, সেই ঠিকানায় আজ রাত্রি আটটার সময় আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিবেন। আপনি এই বাড়ীর দরজায় আসিলে একটি স্ত্রীলোক দ্বার খুলিয়া দিবে। আপনি তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া কেবল আপনার নামটি বলিলেই সে আপনাকে আমার নিকট লইয়া আসিবে। কোন জরুরি কাযের জন্য আমি আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থিনী; কাযটি কি, তাহা এখানে আসিলেই জানিতে পারিবেন। এখানে আসিবার সময় চারি হাজার ‘মার্ক’ সঙ্গে লইবেন, আমি উহা আপনার নিকট ঋণস্বরূপ গ্রহণ করিব; দুই সপ্তাহের মধ্যে এই ঋণ পরিশোধ করিব।”

মোজে এই পত্র পাইয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল। রেবেকা জুরিচ হইতে ফ্রাঙ্কফোর্টে আসিয়াছে, অথচ পূর্ব্বে তাহাকে সে কথা জানায় নাই, ইহার কারণ কি? ফ্রাঙ্কফোর্টে আসিয়াও সে তাহার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া এই পত্রখানি লিখিয়া পাঠাইল, ইহারই বা কারণ কি? মোজে রেবেকার এই বিচিত্র ব্যবহারের কারণ বুঝিতে না পারিয়া মনে মনে নানা তর্ক-বিতর্কের পর এই সিদ্ধান্ত করিল যে, রেবেকা সম্ভবতঃ জানিতে পারিয়াছে, তাহার স্বামী কাউন্ট ভন আরেনবার্গ কার্য্যোপলক্ষে ফ্রাঙ্কফোর্টে আসিয়াছে; এই সংবাদ পাইয়া সে প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্য গোপনে এখানে উপস্থিত হইয়াছে। মোজে রেবেকার প্রার্থিত টাকাগুলি লইয়া সেই দিন সন্ধ্যার পর নির্দ্দিষ্ট স্থানে তাহার সহিত দেখা করিতে চলিল।

রাত্রি ঠিক আটটার সময় মোজে নির্দ্দিষ্ট গৃহের দ্বার-দেশে উপস্থিত হইল। সেই অট্টালিকা নগরের এক প্রান্তে একটি নির্জ্জন বাগানের ভিতর অবস্থিত; নিকটে অন্য কোন ঘর-বাড়ী ছিল না। বাড়ীখানি তেতলা। রেবেকা সেই তেতলা বাড়ীর কোথায় আছে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া মোজে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইল; কিন্তু এতদূর আসিয়া রেবেকার সহিত দেখা না করিয়া চলিয়া যাওয়াও সে সঙ্গত মনে করিল না। সে দুই এক মিনিট দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ঘণ্টাধ্বনি করিল। মুহূর্ত্ত পরে একটি শীর্ণাঙ্গী বৃদ্ধা দ্বার খুলিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল, কিন্তু তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না।

মোজে নিঃশব্দে একটি সুদীর্ঘ হলঘরে প্রবেশ করিল, সেই হলের এক প্রান্তে একটি গ্যাস জ্বলিতেছিল; গ্যাসের আলোকে মোজে কিছু দূরে কাঠের সিঁড়ি দেখিতে পাইল। বৃদ্ধা দ্বার রুদ্ধ করিয়া সেই সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইল এবং মোজেকে তাহার অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিল। মোজে কাঠের সিঁড়ি দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্রমে তেতলার একটি কক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইল। কক্ষটি বৃহৎ, কিন্তু সেই কক্ষে তেমন কোন আসবাবপত্র ছিল না; দ্বারের অদূরে একটি ল্যাম্প জ্বলিতেছিল। বৃদ্ধা মোজেকে সেই কক্ষে রাখিয়া, কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রস্থান করিল। মোজে কক্ষের মধ্যস্থলে একখানি কোচ দেখিয়া তাহার উপর বসিয়া পড়িল এবং ওয়েষ্ট কোটের বোতাম ও গলার কলার

খুলিয়া দিয়া জোরে জোরে হাঁপাইতে লাগিল। সেই স্থূল-দেহ এবং জালার মত বিশাল উদর লইয়া, তিনতলার সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া সেই কক্ষে উপস্থিত হইতে তাহার শ্বাস-রোধের উপক্রম হইয়াছিল। রেবেকা তাহাকে অনর্থক কষ্ট দিল ভাবিয়া সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল এবং রেবেকা সেই কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র তাহাকে কি বলিয়া তিরস্কার করিবে, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল।

প্রায় পাঁচ মিনিট পরে সেই কক্ষের দ্বার খুলিবার শব্দ হইল। রেবেকা আসিতেছে মনে করিয়া মোজে মুখ তুলিয়া দ্বারের দিকে চাহিল, কিন্তু রেবেকার পরিবর্ত্তে একটি দীর্ঘকায় পুরুষমূর্ত্তি তাহার দৃষ্টিগোচর হইল! মোজে বিস্ফারিতনেত্রে দেখিল—সেই পুরুষ আর কেহ নহে—তাহার চিরশত্রু কাউণ্ট ভন আরেনবার্গ।

কাউণ্ট ভন আরেনবার্গকে দেখিবামাত্র মোজে ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। তাহার মুখ শুকাইয়া গেল, বুক ধড়ফড় করিতে লাগিল। কাউণ্ট যখন সেই কক্ষে প্রবেশ করেন—তখন তাঁহার দক্ষিণ হস্ত কোটের পকেটে ছিল। তিনি মোজের সম্মুখে আসিয়া পকেট হইতে হাত বাহির করিলেন, তাঁহার হাতের পিস্তলটি দীপালোকে ঝক্‌মক্ করিতে লাগিল।

মোজে আতঙ্ক-বিহ্বল দৃষ্টিতে সেই পিস্তলের দিকে চাহিয়া জড়িতস্বরে বলিল, "তুমি! তোমার মতলব কি? আমাকে খুন করিবে না কি?"

কাউণ্ট পাগলের মত হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "খুন? হাঁ বন্ধু, তুমি ঠিকই অনুমান করিয়াছ; আমি তোমাকে আজ স্বহস্তে হত্যা করিব। আমি কি জুরিচে তোমাকে বলি নাই—তোমার পাওনাটা ক্রমেই ভারি হইয়া উঠিতেছে, এক দিন তাহা পরিশোধ করিব? আজ সেই দিন। আমি যে এত সহজে তোমাকে ভুলাইয়া এখানে আনিয়া ফেলিতে পারিব—ইহা মুহূর্ত্তের জন্য আশা করি নাই। রেবেকাকে টাকা ধার দিয়া কিছু সুদ পাইবে—সেই লোভেই বোধ হয় আসিয়াছ। আমি তোমাকে যেরূপ নির্ব্বোধ মনে করিতাম, এখন দেখিতেছি, তুমি তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক নির্ব্বোধ!"

কাউণ্টের কথা শুনিয়া ও ভাবভঙ্গি দেখিয়া মোজের বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইল, সে কাউণ্টের কবল হইতে মুক্তিলাভের আশায় হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া সেই কক্ষ হইতে দ্রুতবেগে পলায়নের চেষ্টা করিল; কিন্তু সে দ্বারের নিকট উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই কাউণ্ট তাহার সম্মুখে গিয়া গতিরোধ করিলেন এবং পিস্তলটা তাহার ললাটে উদ্যত করিয়া বলিলেন, "পলাইবে কোথায়? যমের কবল হইতে কি নিস্তার আছে? আমি তোমার যম, তোমার আয়ুশেষ হইয়াছে। এই ঘরে তুমি ও আমি ভিন্ন আর কেহ নাই; তোমাকে খুন করিব স্থির করিয়া সেই বুড়ীকে তফাতে পাঠাইয়াছি। কে আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে? আমি যে সময় এই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলাম, সেই মুহূর্ত্তেই তোমাকে গুলী করিতে পারিতাম, এতক্ষণ তুমি নির্ব্বিঘ্নে যমালয়ে পৌঁছিতে পারিতে; কিন্তু তোমাকে তাড়াতাড়ি হত্যা করি নাই কেন জান? তোমার মৃত্যুযন্ত্রণা দীর্ঘস্থায়ী হয়, ইহাই আমার ইচ্ছা; আমি তোমাকে যেরূপ ঘৃণা করি—মানুষ মানুষকে তাহা অপেক্ষা অধিকতর ঘৃণা করিতে পারে না। আজ আমার প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ হইবে, কি আনন্দ!"

মোজের সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মধারায় সিক্ত হইল, সে কাতরভাবে কাউণ্টের মুখের দিকে চাহিয়া ব্যাকুল স্বরে বলিল, "দোহাই তোমার, আমাকে কুকুরের মত গুলী করিয়া মারিও না। আমি জানি তুমি টাকা ভালবাস, তুমি যত টাকা চাহিবে, তাহাই দিব; দয়া করিয়া আমার প্রাণ—"

কাউণ্ট মোজেকে ধমক দিয়া বিকৃত স্বরে বলিলেন, "মুখ বুজিয়া গুলী হজম কর্ মূর্খ! দয়া করিব?—কাহার কাছে দয়া চাহিতেছিস্? দয়া ভিক্ষা করিতে তোর লজ্জা হইতেছে না? তুই আমাকে টাকার লোভ দেখাইতেছিস্? হাঁ, আমি টাকা ভালবাসি, টাকা পাইলে আমার আনন্দ হয়; কিন্তু তুই সুদী কারবার করিয়া যত টাকা সঞ্চয় করিয়াছিস্, সেই টাকাগুলি সমস্তই যদি পাই, তাহা হইলেও আমার তত আনন্দ হইবে না—যত আনন্দ হইবে তোকে কুকুরের মত গুলী করিয়া মারিয়া, তোর ঐ ভুঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া নাচিতে পাইলে। স্মরণ নাই তোর, কি ভাবে তুই আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছিস্? তুই আমার সকল সুখ, সকল আশা নষ্ট করিয়াছিস্, সমাজে আমার মুখ দেখাইবার পথ বন্ধ করিয়াছিস্; অতুল ঐশ্বর্য্যের স্বর্ণবেদী হইতে টানিয়া আনিয়া আমাকে দারিদ্র্যের রসাতলগর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছিস্; আমার জীবন মরুভূমিতে পরিণত

করিয়াছিস্। তাহা জানিয়াও এখন আমার দয়া ভিক্ষা করিতেছিস্? তোকে দয়া করিব? আমার ধমনীতে আমার দেহের প্রতি শিরায় যে শোণিতের স্রোত বহিতেছে—তাহা শোণিত নহে, তাহা প্রতিহিংসার তরল অনলের স্রোত! সেই অনল আমার হৃদয়ে দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে; সেই অনলে পুড়িয়া মর।"

কাউণ্ট মোজের মস্তক লক্ষ্য করিয়া গুলী করিলেন। মোজে সরিয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সতর্ক হইবার পূর্ব্বেই আহত হইয়া কোচের উপর ঢলিয়া পড়িল; তাহার মস্তক হইতে শোণিতের স্রোত বহিল। গুলী মস্তিষ্কে প্রবেশ না করায় আঘাত সাংঘাতিক হয় নাই; মোজে কোচের উপর মুহূর্ত্তকাল পড়িয়া থাকিয়া, পলায়নের আশায় শোণিতাপ্লুত মুখে উঠিয়া দাঁড়াইল; তাহা দেখিয়া কাউণ্ট পুনর্ব্বার তাহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া গুলী করিলেন; কিন্তু দারুণ উত্তেজনায় তাঁহার হাত কাঁপিতেছিল; গুলী মোজের মাথার উপর দিয়া বিপরীত দিকের দেওয়ালে বিদ্ধ হইল।

মোজে স্থূলকায় হইলেও তাহার দেহে যথেষ্ট বল ছিল; আহত হওয়ায় সে জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া 'মোরিয়া' হইয়া উঠিল। কিন্তু সে নিরস্ত্র, আত্মরক্ষার কোন উপায় না থাকায় হতাশভাবে সেই কক্ষের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিল; টেবিলের পাশে একখান চেয়ার দেখিয়া সে ক্ষিপ্রহস্তে তাহা তুলিয়া লইল এবং কাউণ্টের মস্তক লক্ষ্য করিয়া সবেগে নিক্ষেপ করিল। কাউণ্ট সেই আঘাতে ধরাশায়ী হইলেন; তিনি আহত হইলেও তৎক্ষণাৎ উঠিয়া উভয় জানুর উপর ভর দিয়া বসিয়া মোজেকে পুনর্ব্বার গুলী করিলেন। কাউণ্টের গুলী এবার মোজের বাম বগলের নিম্নে বিদ্ধ হইল; কিন্তু সে পড়িল না, কাউণ্টকে পুনর্ব্বার আঘাত করিবার জন্য টলিতে টলিতে চেয়ারের দিকে অগ্রসর হইল।

চেয়ারের আঘাতে কাউণ্টের মাথা ফাটিয়া শোণিতের স্রোত বহিতেছিল; রক্তধারায় তাঁহার উভয় চক্ষু ও মুখমণ্ডল প্লাবিত হইল। তাঁহার দৃষ্টি অবরুদ্ধ হইল; আঘাত-যন্ত্রণায় ও ক্রোধে তিনি উন্মত্তপ্রায় হইলেন, তিনি মোজেকে চেয়ারের দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া পিস্তল তুলিয়া পুনর্ব্বার গুলী করিলেন; কিন্তু লক্ষ্য ব্যর্থ হইল।

মোজে আর চেয়ারের দিকে অগ্রসর না হইয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল। সে অদূরবর্ত্তী দেওয়ালের কাছে 'পোরসিলেন' নির্ম্মিত একটি বৃহৎ 'ষ্টোভ' দেখিতে পাইল, সেই ষ্টোভের উপর একটি মদের বোতল ছিল, খালি বোতল। মোজে টলিতে টলিতে ষ্টোভের নিকটে গিয়া সেই বোতলটি তুলিয়া লইল, তাহার পর কাউণ্টের সম্মুখে লাফাইয়া পড়িয়া, বোতলটা দুই হাতে মাথার উপর তুলিয়া তদ্দারা কাউণ্টের মস্তকে সবেগে আঘাত করিল। সেই আঘাতে বোতল চূর্ণ হইল, কাউণ্টের মস্তক বিদীর্ণ হইল; কাউণ্ট মুখ গুঁজিয়া টেবলের কাছে মৃতবৎ পড়িয়া রহিল। সেই সুযোগে মোজে পলায়নের আশায় দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল; কিন্তু তখন তাহার দ্রুতবেগে পলায়নের শক্তি ছিল না; অতি কষ্টে সে দ্বারের নিকট উপস্থিত হইল। সেই সময় কাউণ্ট কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, দ্বারের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, মোজে পলায়নের চেষ্টা করিতেছে। তিনি মরণাহত ব্যাঘ্রের ন্যায় অন্তিম শক্তিতে নির্ভর করিয়া সেই দিকে লাফাইয়া পড়িলেন এবং মোজেকে বাম-হস্তে জড়াইয়া ধরিয়া, দক্ষিণ-হস্তে পিস্তলের অগ্রভাগ তাহার বুকের উপর চাপিয়া পিস্তলের ঘোড়া টিপিবেন, সেই মুহূর্ত্তেই মোজে তাঁহার দক্ষিণ-হস্তে প্রচণ্ডবেগে ধাক্কা দিল; পিস্তলের নল উর্দ্ধমুখ হইল এবং গুলী কড়ি-কাঠে বিদ্ধ হইল। তখন কাউণ্ট ক্রোধান্ধ হইয়া পিস্তলের চোঙ দ্বারা মোজের মস্তকে প্রচণ্ড বেগে আঘাত করিলেন। মোজেও দুই হাতে তাঁহাকে জড়াইয়া মেঝের উপর তাঁহার মাথা ঠুকিয়া দিল। কয়েক মিনিট ধরিয়া উভয়ের ধস্তাধ্বস্তি চলিল। উভয়ের শোণিত স্রোতে সেই কক্ষ প্লাবিত হইল। অবশেষে উভয়ে গড়াইতে গড়াইতে একখানি চেয়ারের নিকট আসিবামাত্র মোজে চেয়ারখানি উচু করিয়া তুলিয়া তাহার পায়া দ্বারা কাউণ্টের মস্তকে সজোরে আঘাত করিল। সেই আঘাতে কাউণ্ট ভূতলশায়ী হইলেন, মোজে পুনর্ব্বার দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল; কিন্তু কাউণ্টের পিস্তল তখনও তাঁহার হস্তচ্যুত হয় নাই, তিনি মেঝের উপর পতিত থাকিয়াই মোজের পিঠ লক্ষ্য করিয়া গুলী করিলেন। সেই গুলীর আঘাতে মোজে দ্বারপ্রান্তে ঘুরিয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার মৃত্যু হইল।

শত্রু নিহত হইয়াছে বুঝিয়া কাউণ্ট উৎসাহভরে উঠিয়া

দাঁড়াইলেন ; কিন্তু দ্বারের দিকে দুই এক পা অগ্রসর হইয়া আর চলিতে পারিলেন না ; তাঁহারও তখন অন্তিম মুহূর্ত্ত, তিনি যেমন পড়িলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল। কয়েক মিনিট পরেই নগরের কোন ঘড়িতে নয়টা বাজিল। মোজে রেবেকার সহিত সাক্ষাতের আশায় রাত্রি আটটার সময় সেই অট্টালিকায় প্রবেশ করিয়াছিল। এক ঘণ্টার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিদ্বয়ের হৃদয়-শোণিতে তাহাদের সকল দেনা-পাওনা নিষ্পত্তি হইল।

প্রায় পনের মিনিট পরে পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধা কাউণ্টের আদেশ পালন করিয়া, সেই অট্টালিকায় প্রত্যাগমন করিল। সে সেই কক্ষের দ্বার খুলিয়া কাউণ্টের ও মোজের শোণিত প্লাবিত মৃতদেহ দেখিতে পাইল ; সে কয়েক মিনিট স্তম্ভিত ভাবে দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া থাকিয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল এবং পথে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

বৃদ্ধার চীৎকার শুনিয়া অনেক লোক সেখানে আসিয়া তাহার আর্ত্তনাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। দুই এক জন কনষ্টেবলও আসিয়া জুটিল। তাহারা বৃদ্ধার নিকট সকল কথা শুনিয়া ব্যগ্রভাবে সেই অট্টালিকায় প্রবেশ করিল; কিন্তু মৃতদেহ অপসারিত করা ভিন্ন তাহাদের তখন আর কিছুই করিবার ছিল না। [ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

যমুনা-দোল

আজি বরষা এলো—
ধারা বাদর ঢেলে,
এস যমুনা জলে
শ্যাম—কুঞ্জ ফেলে।
নদী দুকূল ভরা,
হৃদি আকুল করা
বায়ু বকুল-ঝরা
নীল—দুকূলে খেলে॥

রচে দোলন দোলা
হের যমুনা আজি,
বন গোঠের খেলা
এবে—আর কি সাজে ?
নাচে তাথৈ থিয়া
নীল লহরী রাজি
দূরে থেকো না পিয়া
নাচ—তা'দের মাঝে।

থাক্ তটের শিলা
'পরে নটের লীলা,
তোমা যমুনা ডাকে
বাহু—হাজার মেলে॥
এস সুরভি কর'
রবি তনয়া-নীরে
ফুট' ইন্দীবর-ও
রাজ—হংসদলে।

মোরা কলস ভরি'
ঢালি তোমার শিরে
পাণি মৃণাল ধরি'
টানি—রভসে বলে।
পিয়ে ফেনিল সুধা,
যাবে তিয়াসা ক্ষুধা,
যাবে কূলের দ্বিধা
জলে—তোমায় পেলে॥

লভি' বৃষ্টিধারা
হ'য়ে দৃষ্টিহারা,
হবে সৃষ্টিছাড়া
কেলি—আঁধার স্রোতে।
চাঁদ জাগিবে তুমি
ঢালি জ্যোৎস্নাধারা,
নিব' ও-মুখ চুমি
তোমা—হৃদয়-পোতে।

মোরা সাঁতার জানি
তবু পাথার পাণি,
বঁধু বাঁচায়ো টানি
কভু—ডুবিয়া গেলে।

শ্রীকালিদাস রায়

প্রাচীন ভারতে বিবাহ-প্রথার বিবর্ত্তন

বিবাহ সভ্য সমাজের একটি অঙ্গ। মানব যখন অসভ্য অবস্থায় থাকে, তখন তাহাদের মধ্যে বিবাহপ্রথা থাকে না বা শিথিল অবস্থায় থাকে। তার পর সমাজ যতই সভ্যতার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, ততই স্ত্রী-পুরুষের এই পবিত্র বন্ধন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতে থাকে। তখন সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলার আবির্ভাব হয়। সকল দেশে সকল সমাজেই মানব এইরূপ আদিম অবস্থা হইতে ক্রমশঃ উন্নত হইয়া সভ্যতার সোপানে পদার্পণ করিয়াছে। প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যগণও এই নিয়মের অধীন ছিলেন। কারণ, তাঁহারাও মানব। তাঁহাদিগের বিবাহ-প্রথা কিরূপে স্তরে স্তরে মার্জ্জিত ও সংস্কৃত হইয়া উন্নত অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল, বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব।

মহাভারতের আদিপর্ব্বে আমরা দেখিতে পাই, মহারাজ পাণ্ডু স্বীয় পত্নী কুন্তীকে কহিতেছেন, "ধর্ম্মবিৎ মহাত্মা মহর্ষিগণ যাহা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে আমি সেই পুরাণ ধর্ম্মতত্ত্ব তোমাকে কহিতেছি শ্রবণ কর। হে বরাননে! হে চারুহাসিনি! পূর্ব্বকালে মহিলাগণ অনাবৃত ছিল। তাহারা ইচ্ছামত গমন ও বিহার করিতে পারিত। তাহাদিগকে কাহারও অধীনতায় কালক্ষেপ করিতে হইত না। কৌমারাবধি এক পুরুষ হইতে পুরুষান্তরে আসক্ত হইলেও তাহাদের অধর্ম্ম হইত না। ফলতঃ তৎকালে ঈদৃশ ব্যবহার ধর্ম্ম বলিয়া প্রচলিত হইয়াছিল। তির্য্যগ যোনিগত কামদ্বেষবর্জ্জিত প্রজাগণ অদ্যাপি ঐ ধর্ম্মানুসারে কার্য্য করিয়া থাকে। তপঃস্বাধ্যায়সম্পন্ন মহর্ষিগণ এই প্রামাণিক ধর্ম্মের প্রশংসা করিয়া থাকেন।" আদিপর্ব্ব ১২২। ইহাই হইল সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন যুগের কথা। আমাদের দৃষ্টিতে এখন যাহা ব্যভিচার, তখন তাহাই ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইত। তপঃস্বাধ্যায়সম্পন্ন মহর্ষিগণ এই ধর্ম্মের প্রশংসা করিতেন। ইহা আর্য্যজাতির সভ্যতার প্রথম পৃষ্ঠা। ইহাই সত্যযুগ ও বিবাহ-প্রথার পূর্ব্ববর্ত্তী স্তর।

এইরূপে বহুকাল গত হইবার পর অল্পে অল্পে বিবাহপ্রথা সমাজে প্রবিষ্ট হয়। কিন্তু বিবাহ-প্রথা প্রচলিত হইবার পরও মহাভারতে অনেক স্থলে স্বেচ্ছা বিহার দৃষ্ট হয়। বিশ্বামিত্র ঋষি যখন কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন, তখন অপ্সরা মেনকা তাঁহার সম্মুখে যাইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল। মহর্ষি "তাহাকে পাইয়া জপ তপ প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম্ম-কর্ম্মে জলাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক দিন-যামিনী কেবল সেই কামিনীর সহিত ক্রীড়া করতঃ পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।" আদিপর্ব্ব ৭২। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে মেনকা হিমালয় প্রস্থে এক কন্যা প্রসব করিয়া তাহাকে মালিনী নদীতীরে নিক্ষেপ করিয়া দেবরাজ সভায় চলিয়া গেল। এই কন্যাই শকুন্তলা। এই সকল অপ্সরা স্বেচ্ছাচারিণী। তাহাদের গর্ভজাত কন্যা অনায়াসে রাজমহিষী হইতে পারিত। এ ক্ষেত্রে বিশ্বামিত্রের সহিত মেনকার বিবাহের নাম-গন্ধও নাই! মেনকা কিছুদিন মাত্র বিশ্বামিত্রের নিকট থাকিয়া আবার কোথায় চলিয়া গেল।

অন্যত্র,—

"একদা পরাশর ঋষি তীর্থ-পর্য্যটনক্রমে যমুনায় উপস্থিত হইয়া অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী মুনিজনমনোহারিণী, সুচারুহাসিনী দাস-নন্দিনীকে দেখিবামাত্র মনোবেদনায় অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, 'হে কল্যাণি! তুমি আমার মনোভিলাষ পূর্ণ কর।'" আদিপর্ব্ব ৬৩। তার পর সত্যবতী ঋষির অভিলাষ পূর্ণ করিলেন। ইহারই ফলে ভারত-বিখ্যাত ঋষি ব্যাসদেবের জন্ম হয়। এখানেও বিবাহের নাম-গন্ধ নাই।

পুনশ্চ,—

"নরবাহন বৈশ্রবণের আবাসস্থান লঙ্কা। তিনি পুষ্পোৎকটা, রাকা ও মালিনী নাম্নী তিন জন রাক্ষসীকে স্বীয় পিতা বিশ্রবার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ঐ রাক্ষসীত্রয় নৃত্য ও গীতে সাতিশয় সুনিপুণ। উহারা সকলেই স্ব স্ব শ্রেয়োলাভের নিমিত্ত পরস্পর স্পর্দ্ধা সহকারে মহর্ষি বিশ্রবার সন্তোষ সম্পাদনে যত্ন করিতে লাগিল। মহর্ষি বিশ্রবা তাহাদের অবস্থা দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া অভিলাষানুসারে তিন জনকেই লোকপাল সদৃশ অপত্য প্রদান করিলেন।" বনপর্ব্ব ২৭৪।

মহর্ষি ভরদ্বাজ ও ঘৃতাচীর সংযোগে শ্রুতাবতী নাম্নী ভারদ্বাজ কন্যার জন্ম হয়। শল্যপর্ব্ব ৪৯। মহাভারতে ঘৃতাচীর গর্ভে শ্রুতাবতী জন্মিয়াছিলেন, এরূপ কোন কথার স্পষ্ট উল্লেখ নাই। এক অতিপ্রাকৃত বিবরণ দেওয়া আছে। অতিপ্রাকৃত বিবরণ আমরা ত্যাগ করিলাম। ত্যাগ করিবার কারণও পরে দেখাইব।

মহর্ষি দধীচ ও অলম্বুষা নাম্নী অপ্সরার সংযোগে মহর্ষি সারস্বতের জন্ম হয়। শল্যপর্ব্ব ৫২। এখানেও একটি অতিপ্রাকৃত ঘটনার উল্লেখ আছে।

ব্যাসদেব ও ঘৃতাচী অপ্সরার সংযোগে মহর্ষি শুকদেবের জন্ম হয়। শান্তিপর্ব্ব ৩২৫।

মহর্ষি গৌতমের অপর নাম ছিল শরদ্বান। এই শরদ্বান ঋষি ও জানপদী নাম্নী দেব-কন্যার সংযোগে কৃপাচার্য্য ও কৃপা এই দুই ভ্রাতা-ভগিনীর জন্ম হয়। আদিপর্ব্ব ১৩০।

মহর্ষি ভরদ্বাজ ও ঘৃতাচীর সংযোগে দ্রোণাচার্য্যের জন্ম হয়। আদিপর্ব্ব ১৩০।

এই যে মহর্ষিগণের সহিত অপ্সরাগণের সংযোগ উপরে উদ্ধৃত হইল, ইহার কোনও স্থলেই বিবাহের কোন নাম-গন্ধ নাই। ইহা স্বেচ্ছা-বিহার। তবে এই আখ্যায়িকাগুলি একটু অদ্ভুত রকমের। দ্রোণাচার্য্য একটি কলসীতে জন্মিয়াছিলেন, কৃপা ও কৃপী শরস্তম্বে, সারস্বত সরস্বতী নদীতে জন্মিয়াছিলেন। অপ্সরাগণ কেবল ঋষিদিগের

সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইত মাত্র। এ গুলির অর্থ কি? মহাভারতকার নিজেই প্রকৃত কথা এক স্থলে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন এবং পূর্ব্বোক্ত ঋষিকুমার বা ঋষিকুমারীগণের জন্ম বৃত্তান্ত গোপন করিবার কারণও তাহাতে পাওয়া যায়। পাঠক মনোযোগ সহকারে নিম্নলিখিত উদ্ধৃত অংশটি পাঠ করুন।

পরাশর কহিলেন, "বিদেহরাজ! জন্ম নিবন্ধন মহর্ষিদিগের অপকৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহারা তপোবলেই আত্মার উৎকর্ষ-সাধন করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ তাঁহাদের পিতারা যে কোন স্থানে তাঁহাদিগকে উৎপাদন করিয়া তপোবলে তাঁহাদিগের ঋষিত্ব বিধান করেন। আমার পিতামহ বশিষ্ঠ, বিভাণ্ডক পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ, বেদ, তাণ্ড্য, কৃপ, কাক্ষীবান, কমঠ, যবক্রীত, দ্রোণ, আয়ু, মতঙ্গ, দ্রুমদ ও মাৎস্য প্রভৃতি মহর্ষিগণ অপকৃষ্ট ক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াও তপোবলে ঋষিত্ব লাভ পূর্ব্বক বেদ-বিদ্যাগ্রগণ্য ও দমগুণসম্পন্ন হইয়াছিলেন।" শান্তিপর্ব্ব ২৯৭।

এ স্থলে দেখা যাইতেছে, দ্রোণ ও কৃপ উভয়েই অপকৃষ্ট ক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; অর্থাৎ উভয়েরই মাতা নীচজাতীয়া ছিল। পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশগুলির মধ্যে অতিপ্রাকৃত অংশ সমুদায় যে মিথ্যা, তাহা ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। ঋষিদিগের মাতা সকল নীচজাতীয়া ছিল বলিয়াই প্রকৃত কথা গোপন করা হইয়াছে, এবং অপ্সরা নামক এক প্রকার জীবের কল্পনা করা হইয়াছে। মহাভারতে যেখানে অনৈসর্গিক উপায়ে সন্তান উৎপাদনের বিষয় লিখিত আছে বা অপ্সরার উল্লেখ আছে, সেখানেই এইরূপ কিছু আছে বলিয়া মনে করিতে হইবে।

মহর্ষি বিশ্বামিত্রের গালব নামে এক জন শিষ্য ছিল। গালব গুরু-দক্ষিণা প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলে বিশ্বামিত্র তাঁহাকে আট শত শুক্লবর্ণ অশ্ব আনিতে বলিলেন। গালব বহু স্থানে অন্বেষণ করিয়া অবশেষে কাশীশ্বর মহারাজ যযাতির নিকট গমন করিলেন। রাজা যযাতি তাঁহাকে একটিও অশ্ব দিতে পারিলেন না। তবে তাঁহার মাধবী নামে একটি কন্যা ছিল, তাহাকেই গালবের হস্তে সমর্পণ করিলেন ও তাঁহাকে বলিয়া দিলেন, "যে রাজার নিকট ইহাকে লইয়া যাইবেন, সেই ইহাকে গ্রহণ করিয়া শত শত অশ্ব প্রদান করিবে।" গালব সেই কন্যা লইয়া রাজা হর্য্যশ্বের নিকট গমন করিলেন। রাজা হর্য্যশ্ব ঐ কন্যা গ্রহণ করিয়া গালবকে দুই শত অশ্ব প্রদান করিলেন। ঐ কন্যা কিছু দিন রাজার নিকট বাস করিয়া একটি পুত্র প্রসব করিল। গালব তখন পুনরায় ঐ কন্যাকে লইয়া কাশীর অধীশ্বর দিবোদাসের নিকট গমন করিলেন।

এখানে বোধ হইতেছে, কাশী দুইটি ছিল। কন্যার পিতা যযাতির রাজ্যও কাশী, আবার দিবোদাসের রাজ্যও কাশী। দুইটি কাশী না হইলে উপাখ্যানটি একবারে মিথ্যা হইয়া পড়ে। দিবোদাস দুই শত অশ্বের বিনিময়ে ঐ কন্যাকে কিছু দিন নিজ গৃহে রাখিলেন ও যথাসময়ে তাহার একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। তখন গালব তাহাকে লইয়া ভোজরাজ উশীনরের সমীপে গমন করিলেন সেখানেও পূর্ব্ববৎ তিনি দুই শত অশ্ব পাইলেন ও মাধবী কিছুদিন রাজার নিকট থাকিয়া রাজাকে একটি পুত্র উপহার দিল। তখন গালব উক্ত ছয় শত অশ্ব ও মাধবীকে লইয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্রের নিকট গমন করিলেন। ঐ কন্যা কিছুদিন বিশ্বামিত্রের আশ্রমে বাস করিয়া যথাকালে এক পুত্র প্রসব করিল। বিশ্বামিত্র ঐ কন্যার পরিবর্ত্তে গালবকে বাকী দুই শত অশ্ব হইতে অব্যাহতি দিয়াছিলেন। উদ্যোগ পর্ব্ব, ১০৫-১১৮।

এ স্থলে একই কন্যাকে পর পর চারি জন ব্যক্তি গৃহে স্থান দিলেন, অথচ কেহই উহাকে বিবাহ করিলেন না! আর বিবাহ এ ক্ষেত্রে সিদ্ধই নহে। এক জন অপরের স্ত্রীকে বিবাহ করিবে কি করিয়া? ... দেখিবার বিষয় এই যে, রাজা যযাতি অম্লান বদনে স্বীয় ক... এইরূপ কার্য্যে নিয়োজিত করিলেন! তাৎকালিক সামাজিক... দৃষ্টিতে এরূপ কার্য্য দোষাবহ বলিয়া বোধ হইত না! ফলতঃ তৎ... বিবাহ বা স্ত্রীলোকের সতীত্ব বলিয়া কোন পদার্থ ছিল না। কো... পুত্রলাভ করিতে পারিলেই হইল।

"অপ্সরা মিশ্রকেশীর গর্ভে রাজা রৌদ্রাশ্বের দশ পুত্র জন্মে।" আ... পর্ব্ব, ৯৪।

"গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসুর সহযোগে অপ্সরা মেনকার এক কন্যা জ... ঐ কন্যার নাম প্রমদ্বরা। ইনি মহর্ষি স্থূলকেশের আশ্রমে পালি... হইয়াছিলেন। আদিপর্ব্ব, ৮।

মহাভারত হইতে এইরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যা... পারে। বিবাহপ্রথা প্রচলিত হইবার পরও দাম্পত্য বন্ধন অত... শিথিল অবস্থায় আমরা দেখিতে পাই। কেহ বিবাহ করিত, কে... করিত না, আবার হয় ত একের বিবাহিতা পত্নী অন্যের নিকট ... গমন করিত। এই সময় গান্ধর্ব্ব-বিবাহ সমাজে প্রবেশ করে। গান্ধ... বিবাহটি বিবাহই নহে। ইহা কেবল স্ত্রী-পুরুষের মিলন মাত্র। যাহা... হউক, সমাজে যখন ভাসা ভাসা বিবাহ চলিতে থাকে, সেই সময়ক... কতকগুলি দৃষ্টান্ত পাঠককে উপহার দিতেছি। ইহাকে বিবাহপ্রথা... দ্বিতীয় স্তর বলা যাইতে পারে।

ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন, "যদি কেহ কন্যার পাণিগ্রহণার্থ কন্যার পিতাকে শুল্ক প্রদান করে, তাহা হইলে কন্যার পিতা কখনই অন্যকে ঐ কন্যা প্রদান করিতে পারেন না। শুল্কদাতাই তাহার সম্পূর্ণ অধিকারী। ঐরূপ স্থলে ঐ কন্যা শুল্কদাতার উপকারার্থ ন্যায়ানুসারে অন্য পুরুষ দ্বারা সন্তান উৎপন্ন করিয়া লইতে পারে। কিন্তু অন্য কেহই বিধিপূর্ব্বক উহার পাণিগ্রহণ করিতে পারে না।" অনুশাসন, ৪৫।

সমাজে 'নীতি'র সৃষ্টি তখনও হয় নাই; তবে আইনের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, আগে 'আইন' হইয়াছিল, তারপর 'নীতি'।

ব্যাসদেব কহিতেছেন, "অভিযাচিত হইয়া পরস্ত্রীসম্ভোগ করিলে পাপভাগী হইতে হয় না।" শান্তিপর্ব্ব ৩৪। এখানে দেখুন, এক জন আর এক জনের স্ত্রী, সমাজ ইহা স্বীকার করিতেছে, কিন্তু সেই সম্বন্ধ কত শিথিল!

কুন্তীদেবী যখন সূর্য্যকে আহ্বান করিলেন, তখন সূর্য্য কুন্তীসমীপে সমুপস্থিত হইয়া কুন্তীকে কহিতেছেন, "হে চারুহাসিনি! তোমার পিতামাতা বা অন্যান্য গুরুজন তোমার প্রভু নহেন, অবিবাহিতা নারীগণ যাহাকে ইচ্ছা হয়, তাহাকেই কামনা করিতে পারে বলিয়া উহাদিগকে কন্যা কহে। হে নিতম্বিনি, কন্যা স্বতন্ত্রা, পরতন্ত্রা নহে। ...... বৈবাহিকাদি নিয়ম কেবল মানবগণের কল্পনা মাত্র।" বনপর্ব্ব, ৩০৬। সূর্য্য বিবাহকে একটা কল্পনা মাত্র বলিয়া উড়াইয়া দিতেছেন ও কন্যাগণ যে স্বতন্ত্রা, তাহারই বরাবর উল্লেখ করিতেছেন, অর্থাৎ এ সময় বিবাহের নিয়ম সবে মাত্র সমাজে প্রবেশ করিয়াছে। সকলে তাহা মানিতে প্রস্তুত নহেন।

মহারাজ যযাতি দেবযানীকে বিবাহ করিলেন, কিন্তু শর্ম্মিষ্ঠাকে বিবাহ করিলেন না। অথচ শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভজাত পুত্রই ভবিষ্যতে রাজা হইল।

দক্ষ-দুহিতা স্বাহাদেবী অগ্নির প্রতি আসক্ত হইয়া তাঁহার নিকট গমন করিয়া কহিলেন, "হে হুতাশন! আমি অঙ্গিরার ভার্য্যা, আমার নাম শিবা, আমি কামশরে সাতিশয় কাতর হইয়া তোমার নিকট আগমন করিয়াছি, আমার কামনা পরিপূর্ণ কর।" বনপর্ব্ব ২২৪। এইরূপে তিনি ছয় বার ছয় রকম পরিচয় দিয়া অগ্নির নিকট গমন করিলেন। এখানেও আমরা দেখিতেছি স্ত্রীগণ স্বেচ্ছাচারিণী।

কর্ণ মদ্রাধিপতি শল্যকে কহিতেছেন যে, মদ্রদেশের স্ত্রীলোকগণ পান করিয়া ও মাংসভোজন করিয়া "স্ব-পর-পুরুষ-বিবেকবিহীন স্বেচ্ছাক্রমে বিহার করত উচ্চৈঃস্বরে পুরুষগণের প্রতি আহ্লাদজনক প্রয়োগ করে।" কর্ণপর্ব্ব, ৪৫।

এই অধ্যায়েই অন্য স্থানে তিনি বলিতেছেন, "তাহাদের (মদ্র-লোকগণের) কাহারই পিতার নির্ণয় নাই।" এই মদ্রদেশ ভারতের অন্তর্গত একটি প্রদেশ ছিল ও মদ্রদেশের রাজা শল্য মহারাজ পাণ্ডুর মাতুল ছিলেন।

অর্জ্জুন যখন নিয়ম পালনের জন্য বনগমন করেন, তখন নাগ-কন্যা উলূপীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। উলূপী তাঁহাকে কহিলেন, "হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমি তোমাকে অভিষেকার্থ গঙ্গায় অবতীর্ণ দেখিয়া কন্দর্পশরে জর্জ্জরিত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি আত্মপ্রদান দ্বারা এই অশরণা অবলার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।" আদিপর্ব্ব, ২১৪। অর্জ্জুন তাহার মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ করিলেন। উলূপীর গর্ভে যে পুত্র হইল, তাহা অর্জ্জুনের পুত্র বলিয়াই গণ্য হইল। এ স্থলে বিবাহ বলিয়া কোন পদার্থের উল্লেখ নাই।

মাহিষ্মতীবাসী নীল রাজার সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী এক কুমারী ছিল। সে অগ্নির উপাসনা করিত। অগ্নি কন্যার রূপে মোহিত হইয়া "ব্রাহ্মণরূপ পরিগ্রহ করিয়া সেই পদ্মপলাশ-লোচনা সুদর্শনা কন্যার সহিত স্বেচ্ছা-ক্রমে বিহার করিতে লাগিলেন।" সভাপর্ব্ব, ৩০। তার পর রাজা ঐ ব্রাহ্মণের সহিত ঐ কন্যার বিবাহ দিলেন। এখানে অগ্রে বিহার, তার পর বিবাহ।

এই সময়ে স্ত্রীলোকগণ নিজের ইচ্ছায় স্বামীকে পরিত্যাগ করিত। মহর্ষি অত্রির পত্নী অনসূয়া ভর্ত্তাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক 'আর আমি তোমার বশবর্ত্তী হইব না' স্থির করিয়া মহাদেবের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত তিন শত বৎসর অনাহারে মুষলে শয়ন করিয়াছিলেন।" অনুশাসন, ১৪। পরে মহাদেবের বরে তাঁহার এক পুত্র হয়। তিনি স্বীয় স্বামী পরিত্যাগ করিয়া অন্য পুরুষের নিকট বাস করিতেছিলেন, ইহাই বোধ হইতেছে।

এইবার আমরা একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি, যাহা হইতে পাঠক বুঝিতে পারিবেন কোন্ সময় হইতে পতি-পত্নীত্ব সম্বন্ধ একটু স্থায়ীর আকার ধারণ করিল।" পূর্ব্বকালে উদ্দালক নামে এক মহর্ষি ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম শ্বেতকেতু। একদা তিনি পিতামাতার নিকট বসিয়া আছেন, এমন সময়ে এক ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহার জননীর হস্তধারণপূর্ব্বক কহিলেন, 'আইস আমরা যাই'। ঋষিপুত্র পিতার সমক্ষেই মাতাকে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতে দেখিয়া সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। তখন উদ্দালক পুত্রকে তদবস্থ দেখিয়া কহিলেন, "বৎস ক্রোধ করিও না; ইহা নিত্যধর্ম্ম, গাভীগণের ন্যায় স্ত্রীগণ স্বজাতীয় শত সহস্র পুরুষে আসক্ত হইলেও উহারা অধর্ম্মে লিপ্ত হয় না।" ঋষিপুত্র পিতার বাক্য শ্রবণ করিয়াও ক্ষান্ত হইলেন না, প্রত্যুত পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া মনুষ্যমধ্যে বলপূর্ব্বক এই নিয়ম স্থাপন করিয়া দিলেন যে, অদ্যাবধি যে স্ত্রী পতি ভিন্ন পুরুষান্তর সংসর্গ করিবে এবং যে পুরুষ কৌমার ব্রহ্মচারিণী বা পতিব্রতা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য পত্নীতে আসক্ত হইবে, ইহাদের উভয়কেই ভ্রূণহত্যা সদৃশ ঘোরতর পাপ-পঙ্কে লিপ্ত হইতে হইবে। আর স্বামী পুত্রোৎপাদনার্থ নিয়োগ করিলে যে স্ত্রী তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবে তাহারও ঐরূপ পাপ হইবে। আদি-পর্ব্ব ১২২। শ্বেতকেতু এই নিয়ম স্থাপন করিলেন, কিন্তু সমগ্র সমাজ সর্ব্বাংশে এই নিয়ম গ্রহণ করে নাই। আর এক কথা, শ্বেতকেতুর নিয়মে স্ত্রীগণকে স্বামীর অধীন হইতে হইল। স্বামী ইচ্ছা করিলে স্ত্রীকে অন্যের নিকটে পাঠাইতে পারিত। ইহাতে স্ত্রী স্বামীর একটা সম্পত্তির মধ্যে পরিগণিত হইল। স্বামী স্ত্রীকে পাশা খেলার সময় বাজী রাখিত, এক জন বলপূর্ব্বক অন্যের পত্নী গ্রহণ করিত, স্ত্রী ক্রয়-বিক্রয় করা চলিত, ইত্যাদি। কলতঃ এই তৃতীয় স্তরেও সতীত্বের মর্য্যাদা ছিল না, তবে এই স্তরে বিবাহ-বন্ধন পূর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়তর হইয়া-ছিল। শ্বেতকেতুর ন্যায় আর এক মহাত্মা বিবাহ সম্বন্ধে নিয়ম স্থাপন করেন। মহর্ষি উতথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা ঋষি প্রদ্বেষী নাম্নী এক ব্রাহ্মণ-তনয়ার পাণিগ্রহণ করেন। স্বামীর বৃদ্ধ বয়সে ব্রাহ্মণী তাঁহাকে যত্ন করিতেন না। তাঁহার স্বামী অন্ধ ছিলেন। প্রদ্বেষী তাঁহার স্বামীকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিবার ইচ্ছা করিলে দীর্ঘতমা কহিলেন, "আমি অদ্যাবধি পৃথিবীতে এই নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিলাম যে, স্ত্রী জাতিকে যাবজ্জীবন একমাত্র পতির অধীন হইয়া কালযাপন করিতে হইবে। পতি জীবিত থাকিতে অথবা পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলে, নারী যদি পুরুষান্তর ভজনা করেন, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই পতিত হইবেন সন্দেহ নাই।" আদিপর্ব্ব ১০৪। এই শ্বেতকেতু ও দীর্ঘতমা ঋষি পৃথিবীর নিয়ম-কর্ত্তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন পাইবার যোগ্য। এই সময় আর্য্যসমাজ সভ্য ও উন্নত অবস্থায় আসিবার চেষ্টা করিতেছিল। এই সমস্ত নিয়মকর্ত্তার নিয়ম সমাজ এক কথায় মানিয়া লয় নাই। যেমন, অন্ধতমার পত্নী এই নিয়ম করার পরও অন্ধতমাকে আপনার পুত্র-গণের দ্বারা গঙ্গায় নিক্ষেপ করাইলেন। আর ইঁহাদের নিয়মের একটি দোষ থাকিয়া গেল। স্বামী কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইলে স্ত্রী অন্যের নিকট গমন করিতে পারিত। এইবার আমরা এই স্তর হইতে কতক-গুলি দৃষ্টান্ত পাঠককে উপহার দিব।

দীর্ঘতমা ঋষি গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত হইলে ভাসিতে ভাসিতে তিনি বলি-রাজার রাজ্যে গিয়া উঠিলেন। বলিরাজা অপুত্রক ছিলেন। তিনি পুত্রলাভের ইচ্ছায় স্বীয় পত্নী সুদেষ্ণাকে দীর্ঘতমা ঋষির নিকট পাঠাইলেন। "রাণী ঋষিকে অন্ধ ও বৃদ্ধ দেখিয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন না। আপন ধাত্রেয়িকাকে তাঁহার নিকট পাঠাইলেন। ঋষি সেই দাসী গর্ভে কাক্ষীবৎ প্রভৃতি একাদশ পুত্র উৎপাদন করি-লেন। আদিপর্ব্ব ১০৪। বলি রাজা এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রাণীকে ভৎসনা করিয়া পুনরায় তাঁহাকে ঋষির নিকট পাঠাইলেন। ঋষির ঔরসে তাঁহার গর্ভে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম (সুহ্ম?) এই পাঁচ পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। এই পাঁচ পুত্র যে যে প্রদেশে ভবিষ্যতে রাজা করিয়াছিলেন, অদ্যাবধি সেই সেই প্রদেশ তাঁহাদের নামানুসারে কথিত হইতেছে। আদিপর্ব্ব ১০৪। ইঁহারা হইল বলিরাজার ক্ষেত্রজ পুত্র, আর দাসী গর্ভে যে একাদশ পুত্র জন্মিয়াছিল, তাহারা হইল অন্ধতমার পুত্র। কারণ দাসী রাজার বিবাহিতা স্ত্রী ছিল না। স্ত্রী ঐ কালে ঠিক ক্ষেত্রের ন্যায় বিবেচিত হইত। যাহার ক্ষেত্র তাহার শস্য, ইহাই ছিল মনুর নিয়ম ও ভারতের একটি প্রাচীন প্রথা।

রাজা বিচিত্রবীর্য্য পুত্র বিহীন হইয়া পরলোকগমন করিলে ব্যাসদেব "মাতার আজ্ঞায় বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর এই তিন পুত্র উৎপাদন করিলেন। আদিপর্ব্ব ৯৫। ইহার মধ্যে বিদুর দাসী পুত্র। এই দাসীগণ প্রভুর বিবাহিতা পত্নী নহে। ইহারা ক্রীতদাসী মাত্র। ইহারা প্রভুর উপপত্নী স্বরূপে ব্যবহৃত হইত। কখন কখন ইহাদের গর্ভজাত পুত্র প্রভুর পুত্র বলিয়া পরিগণিত হইত।

"যৎকালে গান্ধারী গর্ভবতী ছিলেন, তখন তিনি গর্ভভারাক্রান্ত হইয়া নিতান্ত ক্লিশ্যমানা হন। সেই সময় এক জন বৈশ্যা ধৃতরাষ্ট্রের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিল। ঐ বৈশ্যা যথাকালে এক পুত্রসন্তান প্রসব করে; ঐ পুত্রের যুযুৎসু নাম হইয়াছিল।" আদিপর্ব্ব ১১৫।

মহারাজ পাণ্ডু যখন কুন্তীকে 'অপত্যোৎপাদনের আজ্ঞা দিলেন, তখন "কুন্তী স্বামীর আজ্ঞা পাইয়া ধর্ম্ম, মরুৎ ও ইন্দ্র এই তিন জন

হ'য়া যথাক্রমে যুধিষ্ঠির, ভীমসেন ও অর্জ্জুন এই তিন পুত্র উৎপাদন করিলেন।" আদিপর্ব্ব ৯৫।

কুন্তীর দেখা দেখি "মাদ্রী সপত্নীদত্ত বিদ্যাবলে অশ্বিনীকুমার নামক দুই দেবতাকে স্মরণ করিবামাত্র তাঁহারা উপনীত হইয়া তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর মাদ্রী, নকুল ও সহদেব এই দুই পুত্র লাভ করিলেন।" আদিপর্ব্ব ৯৫।

কুন্তী এক স্থলে পাণ্ডুকে বলিতেছেন, "স্ত্রীলোক আপদকাল উপস্থিত হইলে তিন বার পর্য্যন্ত পর-পুরুষ দ্বারা সন্তানোৎপাদন করিতে পারে, তিন বারের অধিক কোনক্রমেই পুরুষান্তর সংসর্গ করিতে পারে না। যে নারী চারিবার পরপুরুষের সহিত সংসর্গ করে, তাহাকে স্বৈরিণী কহে। পাঁচ বার উক্ত কার্য্য করিলে বেশ্যা পদবাচ্য হইয়া থাকে।" আদিপর্ব্ব ১২৩।

পাণ্ডু কুন্তীকে বলিতেছেন, "দেখ, পূর্ব্বে শরদাণ্ডায়ন স্বীয় পত্নীকে পুত্রোৎপাদনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী শারদাণ্ডায়নী স্নান সমাপন করিয়া বিচিত্র পুষ্পমালা ধারণপূর্ব্বক রজনীযোগে চতুষ্পথে উপস্থিত হইলেন। তথায় এক সিদ্ধ দ্বিজবরকে বরণ-পুরঃসর অনলে পুংসবন হোম সম্পাদন করিলেন। হোমক্রিয়া সমাপ্ত হইলে ঐ বৃত ব্রাহ্মণ দ্বারা দুর্জ্জয়াদি মহাবল পরাক্রান্ত মহারথ পুত্রত্রয় উৎপাদন করিয়া লইলেন।" আদিপর্ব্ব ১২০।

ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা কল্মাষপাদ সন্তানের নিমিত্ত আপনার মহিষীকে বশিষ্ঠের নিকট প্রেরণ করিলেন ও "মহর্ষি সন্তানোৎপাদনে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া দিব্য বিধান অনুসারে মহিষীর সহবাস করিলেন। অনন্তর তাঁহার গর্ভলক্ষণ আবির্ভূত হইলে মুনি প্রজানাথ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া পুনরায় আশ্রম প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।" আদিপর্ব্ব ১৭৭।

স্ত্রীলোকও তৎকালে পুরুষের ন্যায় বহুবিবাহ করিতে পারিত। নিম্নে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"জটিলা নাম্নী গৌতমবংশীয়া এক কন্যা সাত জন ঋষিকে বিবাহ করেন।" আদিপর্ব্ব ১৯৬।

"বার্ক্ষী নাম্নী মুনি-কন্যা প্রাচেতা নামক ভ্রাতৃদশের সহধর্ম্মিণী হয়েন।" আদিপর্ব্ব ১৯৬।

"পরে বেদব্যাসদেব বহু ব্যক্তির এক-পত্নীত্ব যে ধর্ম্মবিরুদ্ধ নহে, এই বিষয় রাজাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন।" আদিপর্ব্ব ১৯৮।

পঞ্চ পাণ্ডব বিধিমতে দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করিলেন। আদিপর্ব্ব ১৯৮।

আবার বলবান লোক এই সময় অপরের ভার্য্যা বলপূর্ব্বক হরণ করিত।

প্রহ্লাদ বলিকে কহিতেছেন, "প্রেষ্য, পুত্র, ভৃত্য ও উদাসীন সকলেই ঈদৃশ ক্ষমাশীল স্বামীকে কটুবাক্য প্রয়োগ করে। তাঁহাকে পরাভব করিয়া সকলেই তদীয় ভার্য্যাকে গ্রহণ করিতে অভিলাষ করিয়া থাকে ও তাহার ভার্য্যাও স্বেচ্ছাচারিণী হয়।" বনপর্ব্ব ২৮।

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, "এই দুরাত্মা (শিশুপাল) নিতান্ত অননুরক্তা সৌবীরদেশগামিনী বভ্রু-পত্নীকে এবং করূষের নিমিত্ত মায়া পূর্ব্বক স্বীয় মাতুল বিশালাধিপতির কন্যা ভদ্রাকে অপহরণ করিয়াছিল।" সভাপর্ব্ব ৪৪। এ স্থলে শিশুপাল অপরের বিবাহিতা পত্নীকে হরণ করিয়াছিল।

ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "যিনি সৌবীর রাজের মহতী সেনা প্রমথিত করিয়া তাঁহার মহিষী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ভোজকন্যাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন.........কোন্ বীর সেই যুযুধানকে দ্রোণের নিকট হইতে নিবারণ করিয়াছিলেন? দ্রোণপর্ব্ব ১০। এ স্থলেও বলপূর্ব্বক অপরের স্ত্রীগ্রহণ।

"জলাধিপতি বরুণ মহর্ষি উতথ্যের ভার্য্যাকে দেখিয়া তাঁহার রূপে মুগ্ধ হয়েন এবং একদা ঐ কন্যাকে যমুনাজলে অবগাহন করিতে দেখিয়া তথায় আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া স্বীয় পুরমধ্যে আনয়ন করিলেন।" অনুশাসনপর্ব্ব ১৫৪। তাহার পর উতথ্য বহু কষ্টে বহু দিন পরে স্বীয় পত্নীকে পুনরায় প্রাপ্ত করেন।

পূর্ব্বকালে মগধদেশে অম্বুবীচ নামে এক রাজা ছিলেন। মহাকর্ণি নামে তাঁহার এক মন্ত্রী ছিল। ঐ মূর্খ মন্ত্রী রাজ্যমধ্যে এক প্রভুতালাভ ও আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা বলসম্পন্ন অনুমান করিয়া নানা প্রকারে অবনীপালকে অবমাননা করিতে লাগিল এবং ভূপালের ভোগ্য অঙ্গনা, দ্রব্য ও ধন-সম্পত্তির সমুদয় স্বয়ং সর্ব্বতোভাবে অধিকার করিল। আদিপর্ব্ব ১০৪।

মহর্ষি যবক্রীতের সহিত মহর্ষি রৈভ্যের বিবাদ ছিল। এই জন্য যবক্রীত মহর্ষি রৈভ্যের পুত্রবধূকে একদা একাকিনী পাইয়া "তাঁহাকে নিভৃত প্রদেশে আনয়নপূর্ব্বক স্বীয় নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিলেন।" বনপর্ব্ব ১৩৬। এরূপ নিকৃষ্ট চরিত্রের লোককেও মহর্ষি বলা হইত।

পাণ্ডবরা বনগমন করিলে জয়দ্রথ এক দিন তথায় গমন করেন ও কুটীর মধ্যে দ্রৌপদীকে একাকিনী দেখিয়া তাঁহাকে কহিলেন, "হে নিতম্বিনী! সাতিশয় কষ্ট স্বীকার করিয়া রাজ্যভ্রষ্ট শ্রী-বিহীন পাণ্ডুতনয়গণের প্রতি ভক্তি করার কোন আবশ্যক নাই। উহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আমার ভার্য্যা হও।" বনপর্ব্ব ২৬৬। ইহাতে দেখা যাইতেছে, এক জনের স্ত্রী অপরের ভার্য্যা হইতে পারিত!

"সুগ্রীব কহিলেন 'হে মহারাজ! তুমি আমার ভার্য্যা ও রাজ্য অপহরণ করিয়াছ, সুতরাং আমার জীবনের আর গৌরব কি?" বনপর্ব্ব ২৭৯। বালী সুগ্রীবের ভার্য্যাকে বলপূর্ব্বক বিবাহ করিয়াছিল।

লঙ্কেশ্বর রাবণ শত শত ব্যক্তির পত্নী ও কন্যা বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া বিবাহ করিয়াছিল। বনপর্ব্ব ২৮০। কেবল রাবণ নহে, প্রাচীনকালে যে কোন দৈত্য, অসুর বা রাক্ষস প্রবল পরাক্রান্ত হইত, সেই ভদ্রলোকদের স্ত্রী কন্যাদিগকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া যাইত। ইহা ভারতের বড়ই কলঙ্কের কথা।

ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিতেছেন, "যাঁহারা দেশ বিপ্লব নিবন্ধন হৃতদার ও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া অর্থ লাভের নিমিত্ত আশ্রয় গ্রহণ করেন... .....তাঁহাদিগকেই দেবতা ও পিতৃগণের তৃপ্তি সাধনোদ্দেশে দান করিলে মহাফল লাভ হইয়া থাকে।" অনুশাসনপর্ব্ব ২৩। তখনও দেশ-বিপ্লব হইত ও বহু ব্যক্তি তাহাতে হৃতদার ও হৃতসর্ব্বস্ব হইত। যুদ্ধে স্ত্রীলোক বন্দী হইত। ঘোষযাত্রাকালে চিত্রসেন গন্ধর্ব্ব, দুর্য্যোধনাদিকে পরাস্ত করিয়া তাহাদের পত্নীদিগকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। বনপর্ব্ব ২৪১।

বেশ্যাকেও লোক বিবাহ করিত। মহারাজ পরীক্ষিৎ সুশোভনা নামক ভেকরাজ কন্যাকে বিবাহ করেন। এই কন্যা পূর্ব্বে অনেক ভূপতি সন্নিধানে বাস করিয়াছিল। পরীক্ষিৎ জানিয়া শুনিয়া তাহাকে বিবাহ করিলেন এবং ঐ কন্যার গর্ভে মহারাজের পুত্রাদি জন্মিল ও তাহারাই রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইল। বনপর্ব্ব ১৯২।

মনু-সংহিতায় আমরা নানারূপ বিবাহ দেখিতে পাই। তন্মধ্যে গান্ধর্ব্ব, আসুর ও রাক্ষস বিবাহ দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরে উদ্ভূত হয়। কেবল বর ও কন্যার মতানুসারে অন্যের অজ্ঞাতে যে বিবাহ হয়, তাহাকে গান্ধর্ব্ব বিবাহ কহে। কন্যার পরিবারবর্গকে লোভ প্রদর্শন করিয়া বা অর্থ দ্বারা বশীভূত করিয়া অথবা কন্যাকে মদ্যপান করাইয়া প্রমত্তাবস্থায় যে বিবাহ তাহাকে আসুর বিবাহ কহে। কন্যার পরিবারবর্গকে প্রহার বা তাহাদের মস্তকচ্ছেদন করিয়া বলপূর্ব্বক কন্যা হরণ করিয়া যে বিবাহ তাহাকে রাক্ষস বিবাহ কহে। আদিপর্ব্ব ১০২ ও অনুশাসনপর্ব্ব ৪৪ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। আসুর ও রাক্ষস বিবাহ যে আদিম অসভ্য অবস্থার বিবাহপ্রথা, তাহা ইহাদের সংজ্ঞা হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। গান্ধর্ব্ব বিবাহ ইহাদের অপেক্ষা অনেকাংশে

...হইত। কিন্তু ইহার একটি দোষ ছিল। এই বিবাহ সর্ব্বস্থানে ...বের স্থায়ী হইত না। এই বন্ধন বড়ই শিথিল। এইরূপ কাঁচা ...হইয়াছিল বলিয়াই রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করিতে ...য়াছিলেন। শেষে রাজা দুষ্মন্ত কি বলিতেছেন শুনুন, "আমিও ...কুমারকে আমারই আত্মজ বলিয়া জানি, কিন্তু যদি সহসা ইহাকে ...করি, তাহা হইলে লোক আমাকে দোষী করিবে এবং পুত্রটিও ...হইবে, এই ভয়ে শকুন্তলার সহিত বিতণ্ডা করিতেছিলাম।" ...৭৪। বিবাহিতা স্ত্রীর পুত্রকে গ্রহণ করিলে সমাজ দোষী করিবে ...গান্ধর্ব্ব বিবাহ যে পাকা বিবাহ নয়, তাহা ইহা হইতেই ...তে পারা যাইতেছে।

...এখন বিবাহ যদি নানা প্রকারের হয়, তাহা হইলে পুত্রও নানা প্রকারের হইবে। সেই জন্য মনুসংহিতায় ও মহাভারতে নানা ...পুত্রের উল্লেখ দেখা যায়। তাহার মধ্যে নিরুক্তজ, প্রসৃতিজ, ...কানীন ও কৃতক এই কয় প্রকার পুত্র এই যুগের সমাজে প্রচলিত ...প্রথা হইতে উদ্ভূত হয়।

যে স্ত্রী স্বামীর আজ্ঞানুসারে অন্য পুরুষ দ্বারা পুত্র উৎপাদন করে, ...সেই পুত্র নিরুক্তজ এবং যে স্ত্রী স্বামীর অনুমতি নিরপেক্ষ হইয়া ...দ্বারা পুত্র উৎপাদন করে, তাহার সেই পুত্র প্রসৃতিজ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। এই উভয়ই ক্ষেত্রজ পুত্র। মহাভারতে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়—ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও পাণ্ডবগণ প্রভৃতি এই ক্ষেত্রজ পুত্র।

যদি কেহ গর্ভবতী বা পুত্রবতী স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করে, তাহা হইলে ...স্ত্রীর উক্ত পুত্র বা গর্ভজাত পুত্রকে অধ্যূঢ় কহে। ইহা আসুর ও রাক্ষস বিবাহের ফল।

অবিবাহিতা কুমারীর গর্ভজাত পুত্রকে কানীন পুত্র কহে। কর্ণ ...কানীন পুত্র।

যে পুত্রকে তাহার উৎপাদক বা জননী গুপ্তভাবে পরিত্যাগ করে, সেই পুত্রকে যদি কেহ দয়াপরবশ হইয়া গ্রহণ ও লালনপালন করে, তাহা হইলে ঐ পুত্র গ্রহীতার কৃতক পুত্র হয়। ইহা বিবাহ প্রথার পূর্ব্ববর্ত্তীকালের অবস্থা বা গান্ধর্ব্ব বিবাহের ফল। শকুন্তলা, ব্যাসদেব, কার্ত্তিক ও প্রমদ্বরা প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্তস্থল। অনুশাসনপর্ব্ব ৪৯ অধ্যায়ে এই সমস্ত পুত্রের বিবরণ বর্ণিত আছে।

এই স্তরে আমরা দেখিতে পাই, স্বামী স্ত্রীকে যাহা আদেশ করিত, তাহাকে তাহাই পালন করিতে হইত। পূর্ব্বে আমরা ক্ষেত্রজ পুত্রের দৃষ্টান্তস্থলে ইহা দেখাইয়াছি। অতিথি গৃহে আসিলে তাহার সন্তোষ বিধানার্থেও নিজ স্ত্রীকে তাঁহার নিকট পাঠাইতে কেহ কোন আপত্তি করিত না। মাহিষ্মতীপুরীর রাজকন্যা সুদর্শনার পুত্র সুদর্শন নিজ স্ত্রীকে ঐরূপ আদেশ দিয়াছিলেন। অনুশাসনপর্ব্ব ২।

অন্যত্র,—

"রাজা যুবনাশ্ব ব্রাহ্মণের হস্তে সমুদয় রত্ন, প্রিয়তমা পত্নী ও অতি রমণীয় বাসস্থান সমর্পণ করেন।" শান্তিপর্ব্ব ২৩৪।

আবার "রাজা মিত্রসহ মহাত্মা বশিষ্ঠকে স্বীয় প্রিয় ভার্য্যা মদয়ন্তীকে সমর্পণ করিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছেন।" অনুশাসনপর্ব্ব ১৩৭। তৎকালে ...দান, ভূমিদান ও গো-দানের ন্যায় বিবাহিতা পত্নীকেও দান করা হইত।

পাশাখেলায়ও পত্নীদিগকে পণ রাখা হইত।

যুধিষ্ঠির যখন পাশাখেলায় সমস্ত হারিলেন, তখন শকুনিকে কহিলেন, "হে সুবলনন্দন! যিনি নাতিহ্রস্বা, নাতিদীর্ঘা, নাতিকৃশা ও নাতিস্থূলা; যাঁহার রূপ লক্ষ্মীর ন্যায়............যাঁহার সস্বেদ মুখ পঙ্কজ ...কার ন্যায় মধ্যদেশ বেদীর ন্যায়, সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী দ্রৌপদীকে ...রাখিলাম।" সভাপর্ব্ব ৬৩।

পত্নী বা কন্যাকে বিক্রয় করিবার প্রথাও বর্ত্তমান ছিল।

কর্ণ শল্যকে বলিতেছেন, "হে সূতপুত্র! আতুর ব্যক্তিকে পরিত্যাগ ও পুত্র কলত্রদিগকে বিক্রয় করা অঙ্গদেশে সবিশেষ প্রচলিত আছে।" কর্ণপর্ব্ব ৪৬।

বৈশম্পায়ন কহিতেছেন, "অধিক কি কহিব, এই মহাভারত শ্রবণ সময়ে ব্রাহ্মণগণকে আত্মদান পত্নীদান ও পুত্র দান করিয়াও সন্তুষ্ট করা উচিত।" স্বর্গারোহণপর্ব্ব ৬।

এই যুগে বিধবারও বিবাহ আমরা দেখিতে পাই।

"নাগরাজ ঐরাবত পক্ষিরাজ বৈনতেয় কর্ত্তৃক জামাতার লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে অর্জ্জুনকে সন্তানবিহীনা দীনমনা স্বীয় কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন; অর্জ্জুনও কামবশবর্ত্তিনী সেই কামিনীর পাণিগ্রহণ করিলেন।" ভীষ্মপর্ব্ব ৯১।

এ স্থলে কেবল বিধবা বিবাহ নহে, অসবর্ণ বিবাহও হইয়াছিল। আবার দেখুন,—

"গৌতম কহিলেন, 'রাজন্! আমি সত্য কহিতেছি, মধ্যদেশ আমার জন্মভূমি, কিরাত ভবন আমার বাসস্থান এবং আমি এক বিধবা শূদ্রার পাণিগ্রহণ করিয়াছি।" শান্তিপর্ব্ব ১৭১। এখানেও বিধবা বিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহ একত্র দৃষ্ট হইতেছে।

স্বামী অবর্ত্তমানে স্ত্রীলোকগণ দেবরকে পতিত্বে বরণ করিত।

বায়ু পুরূরবাকে কহিতেছেন, "কামিনীগণ যেমন পতির অবর্ত্তমানে দেবরকে পতিত্বে বরণ করে, তদ্রূপ পৃথিবী ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক পালিত না হওয়াতেই ক্ষত্রিয়কে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন।" শান্তিপর্ব্ব ৭২।

ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন, "নারী যেমন পতির অভাবে দেবরকেই পতিত্বে স্বীকার করে, সেইরূপ পৃথিবী ব্রাহ্মণকে প্রাপ্ত না হওয়াই ক্ষত্রিয়কে পতিত্বে বরণ করিয়াছে।" অনুশাসনপর্ব্ব ৮। এই প্রথা এখনও পশ্চিম ভারতে ও উড়িষ্যায় প্রচলিত আছে।

এইবার আমরা আর্য্যজাতির বিবাহের চতুর্থ স্তর কিরূপ ছিল, তাহাই দেখাইব। এই স্তরে আমরা দেখিতে পাই 'স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষা করা কর্ত্তব্য' ইহা সমাজ বুঝিতে পারিয়াছে এবং উহা রক্ষার জন্য সমাজ বিশেষ চেষ্টিত।

ভীষ্ম যখন কাশীরাজ কন্যা অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া আইসেন, তখন অম্বা কহিলেন, "আমি পূর্ব্বে শাল্বকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি, সুতরাং অপর কাহাকেও আর বরণ করিতে পারি না।" ইহা সতীত্বের প্রথম সোপান ও রাক্ষস বিবাহের প্রতিবাদ। ভীষ্ম অম্বাকে ছাড়িয়া দিলেন। শাল্ব কিন্তু তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন না। কারণ, ভীষ্ম তাঁহাকে গৃহে স্থান দিয়াছিলেন! যাহারা বলপূর্ব্বক অন্যের বিবাহিতা স্ত্রীকে বিবাহ করিত, তাহারা আজ সামান্য সন্দেহের জন্য অনুরক্তা কামিনীকে পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত! সমাজ এই স্তরে অনেক মার্জ্জিত হইয়া আসিয়াছে। অম্বা পুনরায় ভীষ্মের নিকট পরশুরামকে সঙ্গে লইয়া গমন করিল। অম্বার এই সতীত্ব তেমন টেকসই নহে। শাল্ব তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিলে পর সে পুনরায় ভীষ্মের গৃহে অবস্থান করিতে প্রস্তুত হইল। উদ্যোগপর্ব্ব ১৭০ হইতে ১৮৫ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

এ স্থলে অনেকে হয় ত প্রশ্ন করিবেন "ভীষ্মের পরবর্ত্তীকালেও দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের বিবাহ মহাভারতে দৃষ্ট হয়। যথা—দ্রৌপদী, কুন্তী প্রভৃতি। ইহা কিরূপে সম্ভব?" ইহার উত্তরে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, একটি নূতন আলোক সমাজে আসিলে সমগ্র সমাজ এক দিনেই সেই আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে না। প্রাচীন রীতি পরিত্যাগ করিয়া নূতন রীতি গ্রহণ করিতে বহুকাল লাগিয়া যায়। এই জন্য একই সময়ে নানারূপ বিবাহ হওয়াই স্বাভাবিক। আজ পর্য্যন্ত ভারতে নানারূপ বিবাহপ্রথা দৃষ্ট হয়। ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম

উপকূলে নাগার জাতির মধ্যে আজ পর্য্যন্ত বিবাহ প্রথার সৃষ্টি হয় নাই। উহাদের বিবাহ-প্রথা এখনও প্রথম স্তরে রহিয়াছে। বর্ত্তমান সময়োপযোগী একটি উদাহরণ দেখিলেই সমস্ত বিষয়টি সহজে উপলব্ধ হইবে। আমাদের বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলনে দেখিতে দেখিতে তিনটি স্তর পড়িল। প্রথম সকলেই বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিত। দ্বিতীয় স্তরে স্বদেশী কলকারখানাজাত দ্রব্য ব্যবহার প্রচলিত হইল। তৃতীয় স্তর হইতেছে স্বদেশী হস্তজাত দ্রব্য অর্থাৎ খদ্দর প্রভৃতির ব্যবহার প্রচলন। এখন দেখুন, একই সময়ে তিনটি স্তরের লোকই ভারতে রহিয়াছে কি না? সর্ব্বাপেক্ষা শিক্ষিত ব্যক্তিগণ হস্তজাত দ্রব্য ব্যবহার করিতেছেন, মধ্যশ্রেণীর লোকগণ দেশী কলজাত দ্রব্য ব্যবহার করিতেছেন ও অশিক্ষিত লোকগণ এখনও প্রথম স্তরেই রহিয়াছে, অর্থাৎ বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিতেছে। আমাদের দেশে ধর্ম্ম, সমাজ, আচার-ব্যবহার সমস্তই স্তরে স্তরে সংস্কৃত ও মার্জ্জিত হইয়া আসিতেছে, অথবা হয় ত স্তরে স্তরে অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু কোন নূতন সংস্কার অন্যান্য দেশের ন্যায় তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্কারগুলিকে একবারে উঠাইয়া দিতে সমর্থ হয় নাই। সেকারণ বহু পূর্ব্বকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত ভারতে যত রকম ধর্ম্মমত, আচারব্যবহার প্রভৃতির প্রচলন হইয়াছে, সমস্ত পুঞ্জীভূত হইয়া এ দেশে রহিয়া গিয়াছে। খুঁজিলে সবই পাওয়া যায় ও সব মতের লোকই পাওয়া যায়।

যাক্, আমরা পুনরায় শান্তিপর্ব্বে দেখিতে পাই, ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে কহিতেছেন, "ভূপতি যদি বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক শত্রুর কন্যাকে আপনার ভবনে আনয়ন করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহাকে আপনার পত্নী করিবার নিমিত্ত এক বৎসর উপদেশ প্রদান করিবেন। যদি সে এক বৎসরের মধ্যে তাঁহার পত্নী হইতে স্বীকার না করে ও অন্যকে বরণ করিতে অভিলাষ করে, তাহা হইলে ভূপতি আর তাহাকে আপনার আলয়ে স্থান দান করিবেন না।" শান্তি ৯৬। এই নিয়ম অনুসারেই ভীষ্ম অম্বাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। রাক্ষস বিবাহ এইরূপে ক্রমে ক্রমে সমাজ হইতে উঠিয়া যায়।

কায়ব্য নামে এক নিষাদ বলিতেছে, "প্রতিবাসিগণ! তোমরা স্ত্রী, ভীরু, শিশু, তাপস ও যুদ্ধে অপ্রবৃত্ত ব্যক্তির বিনাশ সাধন এবং বলপূর্ব্বক স্ত্রীলোককে গ্রহণ করিও না।" শান্তিপর্ব্ব ১৩৫। পূর্ব্বে যুদ্ধে স্ত্রীলোককে বন্দী করিবার যে প্রথা ছিল, তাহা এই সময় হইতে উঠিয়া যায়।

অসচ্চরিত্রা রমণী আর সমাজে সম্মান পাইত না। শান্তিপর্ব্বে দৃষ্ট হয়, "কুভার্য্যা, কুপুত্র, কু-রাজা, কু-সুহৃদ, কু-সম্বন্ধ ও কু দেশ পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।" শান্তিপর্ব্ব ১২৯।

ভীষ্ম কহিতেছেন, "যে কন্যা আপনার কৌমারাবস্থা দূষিত করে, সে ব্রহ্মহত্যা পাপের চারি অংশের তিন অংশ আর যে পুরুষের সংসর্গে উহা দূষিত হয়, সে একাংশ মাত্র প্রাপ্ত হইয়া থাকে।" শান্তিপর্ব্ব ১৬৫। কানীন পুত্র এই যুগে উঠিয়া যায়।

ভরদ্বাজ ঋষি যাতুধানী নাম্নী এক রাক্ষসীকে বলিতেছেন, "ভদ্রে! আমার যেমন ভার্য্যাপবাদ নিবন্ধন যৎপরোনাস্তি শোক উপস্থিত হইয়াছে, ইহার সেরূপ হয় নাই, এই কারণেই ইহার ও ইহার কুক্কুরের দেহ হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছে।" অনুশাসনপর্ব্ব ৯৩। এই সময় ভার্য্যাপবাদ সমাজে খুব কলঙ্কের বিষয় হইয়াছিল। সেই জন্য ভরদ্বাজ কৃশ হইয়া গিয়াছিলেন।

অঙ্গিরা প্রভৃতি মহর্ষিগণ আপনাদের পত্নীগণের চরিত্রে সন্দিহান হইয়া অরুন্ধতী ব্যতীত আর সকলকেই পরিত্যাগ করেন। পরে বিশ্বামিত্র তাঁহাদের সন্দেহভঞ্জন করিলে পুনরায় তাহাদিগকে গ্রহণ করেন। বনপর্ব্ব ২২৫।

আবার শান্তিপর্ব্বে দৃষ্ট হয়, "যে নারী আপনার পতিকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিকৃষ্ট জাতির সহিত সংসর্গ করিবে, মহীপাল তাহাকে প্রকাশ্য স্থানে কুক্কুর দ্বারা ভক্ষণ করাইবেন। ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী পুরুষকে বহ্নিতপ্ত লৌহময় শয্যায় শয়ন করাইয়া কাষ্ঠ দ্বারা দগ্ধ করা রাজার কর্ত্তব্য।" শান্তিপর্ব্ব ১৬৫। এইরূপ কঠোর নীতি অবলম্বন করিয়া, আর্য্যগণ ব্যভিচার দোষ সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করেন

মহর্ষি জমদগ্নি স্বীয় ভার্য্যাকে ব্যভিচারিণী দেখিয়া স্বীয় পুত্র পরশুরামকে বলিলেন, "বৎস! তুমি অশঙ্ক চিত্তে ত্বদীয় পাপচারিণী জননীকে এই ক্ষণেই সংহার কর।" বনপর্ব্ব ১১৬।

একদা মহর্ষি গৌতম স্বীয় পত্নীকে ব্যভিচার দোষে লিপ্ত দেখিয়া রোষভরে সেই চিরকারী পুত্রকে (গৌতমের পুত্র) সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! তুমি তোমার জননীকে সংহার কর।" শান্তিপর্ব্ব ২৬৬।

উল্লিখিত কয়েকটি উদ্ধৃত অংশ হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, এই সময় হইতে ঋষিগণ পত্নীদিগের অসচ্চরিত্রতার বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়েন। এই স্তরে গান্ধর্ব্ব, আসুর, রাক্ষস প্রভৃতি বিবাহ সমাজ হইতে উঠিয়া যায়। সমাজের নানাবিধ আবর্জ্জনা দূরীভূত হইয়া, সমাজ মার্জ্জিত ও সংস্কৃত হইয়া উঠে। বলপূর্ব্বক স্ত্রীলোক অপহরণ, যুদ্ধে স্ত্রীলোক বন্দী, নিজ পত্নীকে দান বিক্রয় বা অপরের নিকট প্রেরণ, এক স্ত্রীর বহু বিবাহ, স্ত্রীলোকের স্বেচ্ছাচারিতা প্রভৃতি দোষ ক্রমে ক্রমে সমাজে নিন্দনীয় হইয়া উঠে ও লোপ হইয়া যায়। ইহার পরবর্ত্তী স্তরে আর্য্যসভ্যতা চরম সীমায় উঠে। এইটি পঞ্চম স্তর। এই যুগে যাঁহারা লীলা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের নাম সসম্ভ্রমে উচ্চারণ করিতে হইবে। তাঁহাদের চরণ-রেণু স্পর্শে ভারত অদ্যাবধি পবিত্র হইয়া রহিয়াছে। ইঁহাদেরই পদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া আজ লক্ষ লক্ষ ভারত-রমণী চিত্ত-সংযম করিতে ও আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে শিখিতেছে। ইঁহাদের স্বর্গীয় আভায় ভারতের অতীত অন্ধকারের যুগ দূরে পলায়ন করিয়াছে। কবিগণ ইঁহাদেরই গাথা গান করিয়া অমর হইয়া গিয়াছেন। পাঠককে বলিয়া দিতে হইবে কি ইঁহারা কাহারা? ইঁহারা আমাদের চিরপরিচিতা সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়া ভারত-মহিলা।

সাবিত্রী সত্যবানকে মনে মনে বরণ করিলে, নারদ আসিয়া কহিলেন, 'সত্যবানকে বিবাহ করা চলিবে না, কারণ তাহার পরমায়ু অতি অল্প।' সাবিত্রী তাহাতে কি উত্তর দিলেন, শুনুন। "দ্রব্যের অংশ একবার মাত্র নিপতিত হয়, কন্যাকে একবারই প্রদান করে, 'দদানি' এই বাক্য একবারই বলে, হে পিত! এই তিন কার্য্য একবারই অনুষ্ঠিত হয়। অতএব সত্যবান দীর্ঘায়ুই হউন আর অল্পায়ুই হউন, সগুণই হউন, আর নির্গুণই হউন, আমি যখন একবার তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি, তখন তিনিই আমার পতি। আমি কদাপি আর কাহাকেও বরণ করিব না।" বনপর্ব্ব ২৯৩।

দময়ন্তী নলকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বয়ংবর সভায় দেবগণ যখন নল রাজার মূর্ত্তি ধরিয়া বসিলেন, তখন দময়ন্তী তাঁহাদিগকে বলিতেছেন, "আমি হংসের বাক্য শ্রবণ করিয়া অবধি নৈষধকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছি; অতএব হে দেবগণ! এক্ষণে যথার্থরূপে তাঁহাকেই নির্দ্দেশ করুন। আমি অন্য পুরুষগামিনী হইয়া স্বামীর পাপচারিণী না হই।" বনপর্ব্ব ৫৭।

রাবণ যখন সীতাদেবীকে হরণ করিয়া লইয়া গেল ও তাঁহার নিকট বিবাহ প্রস্তাব করিল, তখন তিনি "মুখমণ্ডল পরিবর্ত্তিত করিয়া তৃণরাশির মধ্যে অন্তরিত করিলেন। তাঁহার নয়নযুগল হইতে অনবরত অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি দুরাশয় রাক্ষসরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে রাক্ষসরাজ! তুমি বার বার

...কর দুর্ব্বাক্য সকল প্রয়োগ করিতেছ, এই অভাগিনীও উহা শ্রবণ করিতেছে; আর কেন, যথেষ্ট হইয়াছে, অতঃপর তোমার কল্যাণ হউক, তুমি এই দুরভিলাষ পরিত্যাগ কর। আমি পতিব্রতা, পরপত্নী ...র গ্রহণীয় নহি।" বনপর্ব্ব ২৮০।

রাক্ষসীগণ যখন তাঁহাকে ভয় দেখাইতেছে, তখন তিনি তাহাদিকে বলিতেছেন, "আর্য্যাগণ! আমাকে শীঘ্র ভক্ষণ কর, আমার জীবনে কিছুমাত্র যত্ন নাই. আমি সেই নীল-কুঞ্চিত-কেশ রাজীব-লোচন প্রাণবল্লভ বিরহে ত লগত সর্পীর স্থায় নিরাহারে শরীর শোষণ করিব। তোমরা নিশ্চয় জানিও, আমি সেই রাঘব ব্যতীত অন্য পুরুষের মুখাবলোকন করিব না, ইহার পরে যাহা কর্ত্তব্য থাকে কর।" বনপর্ব্ব ২৭৯।

কৌশিক নামে এক তপঃপরায়ণ ধর্ম্মশীল ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি বহুকাল তপস্যা করার পর অলৌকিক ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার কোপানলে এক দিন একটি বক দগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। তিনি এক পতিব্রতা রমণীকে তাঁহাকে ভিক্ষা দিতে বিলম্ব করায় অভিশাপ দেন, কিন্তু সে অভিশাপে উক্ত রমণীর কিছুই হইল না। বনপর্ব্ব ২০৫।

এই উপাখ্যানে চরিত্রবল যে যোগসাধন অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, তাহাই প্রমাণ হইয়াছে। সাবিত্রী উপাখ্যানটিও তাই। চরিত্রবলের নিকট দেবগণ পরাজয় স্বীকার করেন ও চরিত্রবলে অদৃষ্টকেও ফিরাইয়া দিতে পারা যায়, ইহাই সাবিত্রী উপাখ্যানের সার মর্ম্ম। এই যুগে দৈব ও যোগবল নৈতিক বলের অনেক নিম্নে পড়িয়া গিয়াছে।

এই যুগে আমরা আর একটি অভিনব পদার্থ দেখিতে পাই। পূর্ব্বে রাজারা বহুসংখ্যক বিবাহ করিত। কিন্তু এই যুগে এক পত্নীতেই সকলে সন্তুষ্ট। রামচন্দ্র সীতাদেবীর অবর্ত্তমানে সোণার সীতা নির্ম্মাণ করিয়া যজ্ঞ করিলেন, তথাপি পুনরায় দারপরিগ্রহ করিলেন না।

দময়ন্তী নলকে বরমালা প্রদান করিলে নল কহিতেছেন, "হে কল্যাণি! তুমি সুরগণ সন্নিধানে আমাকেই ভজনা করিলে, এক্ষণে আমি তোমার ভর্ত্তা ও বচনানুবর্ত্তী হইলাম। সত্যই কহিতেছি, আমি যে দিন জীবনধারণ করিব, তত কাল তোমারই প্রণয়-পরবশ হইয়া থাকিব।" বনপর্ব্ব ৫৭।

পাশাখেলার সময় পুষ্কর যখন নলকে দময়ন্তীকে পণ রাখিতে বলিলেন, তখন তিনি ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন ও তথা হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। যুধিষ্ঠির কিন্তু অনায়াসে দ্রৌপদীকে পণ রাখিলেন। পাঠক দেখুন, এই দুইটি যুগ বিভিন্ন যুগ কি না। এই যুগে পুরুষরা স্ত্রীলোককে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখিতেন। এইটিই ভারতের উন্নতির যুগ। ইহার পর নৈতিক যুগ চলিয়া গিয়া পুনরায় যখন অনুষ্ঠানের যুগ ভারতে প্রবর্ত্তিত হয়, তখন ভারতীয় নরনারীগণ তাঁহাদের উচ্চ চরিত্র হারাইতে লাগিলেন। সেই সময় হইতে তাঁহাদের অধঃপতন আরম্ভ হয়।

শ্রীঅমূল্যচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

[লেখক 'এই যুগে' কথাটি বহু স্থলে ব্যবহার করিয়াছেন। 'এই যুগে' অর্থে তিনি কোন্ যুগ বুঝাইতেছেন ভাল বুঝা যায় না। সত্য যুগে বহু সতী স্ত্রীর দৃষ্টান্ত পুরাণে আছে, এ যুগেও আছে। সাবিত্রী, দময়ন্তী, সীতা—মহাভারতের বহু পূর্ব্ব যুগের আর্য্য মহিলা। সুতরাং নারীর বিবাহ ও সতীত্ব কল্পনা সম্বন্ধে লেখক কিরূপে যুগের স্তর বিভাগ করিলেন, তাহা সুস্পষ্ট বুঝা যায় না।—সম্পাদক।]

ভারতীয় নৃত্যকলা-বিদ্যা

সঙ্গীতকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। নৃত্য, গীত, বাদ্য। নৃত্য সঙ্গীতের সহচর। নৃত্য না হইলে সঙ্গীতের পূর্ণতা হয় না। বিলাস সমন্বিত তালমান রসাশ্রয়ে অঙ্গবিক্ষেপকে নৃত্য বলা যায়। নৃত্যকে অঙ্গহারও বলা গিয়া থাকে। অঙ্গ নানাপ্রকারে চালিত ও হৃত হয়, তজ্জন্যই নৃত্যের অন্য নাম অঙ্গহার। তালমানের সঙ্গে অঙ্গ বিক্ষেপ হইলে অঙ্গের একটা মধুরিমা বা মাধুর্য্য হয়। তদ্দ্রূপ নৃত্যে লোক স্বতই আকৃষ্ট হয়। এ স্থলে তালমানকে বাদ দিলে ঐরূপ অঙ্গভঙ্গী নৃত্যপদবাচ্য হইতে পারে না। অসভ্য অবস্থায়ও মানুষের নৃত্য ছিল, তখন তালমানও ছিল। তালমান ও নৃত্য প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ পাতিয়াছে। নৃত্য ভাবপ্রকাশক। আদিমকালে নৃত্য দ্বারা আনন্দ, ধর্ম্ম, দেশাত্মবোধ বা যে কোন বিষয় হৃদোৎফুল্ল হইয়া প্রকাশ পাইত। ভাষা না হইলেও নৃত্য দ্বারা ভাব প্রকাশ হয়। সঙ্গীতের কায়া নৃত্য, গীত তার ছায়া, নৃত্য তার পূর্ণতা প্রদান করে।

আনন্দের উত্তেজনা হইলে তাহা নৃত্য দ্বারা প্রকাশ হইয়া থাকে। শারীরিক ব্যায়ামে দেহের পুষ্টি ও উন্নতি সাধিত হয়, নৃত্য দ্বারা শারীরিক, মানসিক উভয় প্রকারের উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে। নৃত্যে প্রসারণ ও আকুঞ্চন ক্রিয়ার সামঞ্জস্য বেশ অক্ষুণ্ণ রাখিবার ক্ষমতা আছে। সুতরাং নিয়মিত নৃত্যকারীদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। আগে নৃত্য শারীরিক ক্রিয়া মাত্র ছিল, তারপর তাহা ব্যায়ামে পরিণত হইল, অবশেষে আমোদ ও বিলাসকলারূপে প্রচলিত হয়। বিলাসের পূর্ণতা নৃত্য দ্বারাই হইয়া থাকে।

কোন মানুষকেই সঙ্গীতের বিরোধী হইতে দেখা যায় না। কেহ স্বয়ং সঙ্গীতের চর্চ্চা করে, কেহ সঙ্গীত শুনিতে ভালবাসে, যে কিছুই পারে না, সে গুণ্ গুণ্ করিয়া তাল-বেতালে সুর টানে। কলাবিদ্যা নৃত্যকে দৃশ্য-সঙ্গীত নামে অভিহিত করিয়াছে। কোন কোন দেশে মৃতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ নৃত্য প্রচলিত আছে। ব্রহ্ম, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে এই আচার দেখিতে পাওয়া যায়।

অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতে নৃত্য প্রচলিত আছে। মহাদেব সর্ব্বত্র, সর্ব্বদা নৃত্য করিতেন, তাই তাঁহার নাম নটরাজ। নৃত্যশীল মহাদেব মূর্ত্তি গত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই নটরাজ-মূর্ত্তি। গণেশও নৃত্য করিতেন, তাই স্থানে স্থানে নৃত্যগণেশ মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। নৃত্য লক্ষ্মী, নৃত্য সরস্বতীর মূর্ত্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। সরস্বতী সঙ্গীতপ্রিয়। তাঁহার নৃত্য করাটা স্বাভাবিক। সখী ও সখাগণ সহ কৃষ্ণ নাচিতেন, তাঁহার রাসের নৃত্য সর্ব্ববিখ্যাত। কৃষ্ণের নৃত্য-মূর্ত্তি ভগবত-হৃদয়ে জাগ্রত হইয়া আছে। কৃষ্ণের নৃত্য-গোপাল মূর্ত্তি কোন্ ভক্ত হৃদয়ে জাগ্রত না হইয়াছে? স্বর্গের দেবতারাও নৃত্য ভালবাসেন। মেনকা, উর্ব্বশী প্রভৃতি নর্ত্তকীরা তাঁহাদের আমোদ দিয়া থাকেন। গন্ধর্ব্ব কন্যারা নাচকে তাহাদের পেশার মধ্যেই করিয়া রাখিয়াছেন। দেবর্ষি নারদ গান করিতেন, বীণা বাজাইতেন, নাচিতেন। প্রাচীন ভারতে নৃত্য গৃহস্থাশ্রমেও প্রচলিত ছিল। আমোদলাভার্থ রমণীরা মণ্ডলী করিয়া নৃত্য করিতে ভালবাসিত। ঋষিরা গীতবাদ্যের সঙ্গে নৃত্যও প্রচলিত করিয়াছেন। অর্জ্জুন নৃত্য-গীতে প্রাজ্ঞ ছিলেন। তৎকালে রমণীদেরও নৃত্য গীত শিক্ষা অবশ্য করণীয় ছিল। স্ত্রী-পুরুষে মিলিত ভাবে নৃত্যকরা অপ্রচলিত ছিল না। যাদবরমণীরা নৃত্য করিতেন। শান্তনু-পত্নী গঙ্গা স্বামিসহ নৃত্য করিতেন। বলরাম রেবতীকে লইয়া, কৃষ্ণ সত্যভামাকে লইয়া, অর্জ্জুন সুভদ্রার সঙ্গে নাচিতেন। কচ ও দেবযানী বনে থাকিয়াও নাচিতেন, গাহিতেন, বাজাইতেন। রামচন্দ্রের মজলিসে সুন্দরী রমণীরা নাচিতেন। যাদবরা

স্ত্রী পুরুষে মিলিতভাবে এক সঙ্গে নাচিতেন। শ্রীকৃষ্ণ কালীয় নাগের মস্তকোপরি নৃত্য করিয়াছেন। কালীমাতা দেবীযুদ্ধেও নাচিয়াছেন। আমাদের দেশে গৃহস্থ-গৃহে নৃত্যের প্রভাব ছিল। মুসলমানরা আমাদের দেশ জয় করিলে তাঁহাদের অত্যাচারে গৃহস্থ-গৃহ হইতে নৃত্যকলা পলায়ন করিল। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রমণীগণের অন্তঃপুর সৃষ্ট হইল এবং ঘোমটা প্রথা প্রচলিত হইল। ভারতের যে প্রদেশে মুসলমান প্রাধান্য কম হইয়াছে বা মুসলমান প্রাধান্যকে যে প্রদেশ অগ্রাহ্য করিয়া চলিতে পারিয়াছে, সে প্রদেশে গৃহস্থ পরিবারের নৃত্যপদ্ধতি আজিও প্রচলিত আছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি পুষ্কর যাইবার পথে আজমীরে কয়েক দিন বাঙ্গালী বন্ধু-গৃহে অবস্থান করি, তৎকালে তথায় এক উৎসবে গৃহস্থ-পরিবারে নৃত্য দেখিয়াছিলাম। রাস্তার পাশেই উৎসব বাড়ী, সেখানে রজনীযোগে চন্দ্রাতপতলে মজলিস বসিয়াছে, গৃহস্থ-গৃহের সমস্ত আত্মীয়-কুটুম্ব চারিদিকে স্ত্রী-পুরুষরা বসিয়াছে, মধ্যস্থলে পরিবারের স্ত্রীলোকরা মাথায় ঘোমটা দিয়া নাচিতেছে, গাইতেছে। আমি নিঃসঙ্কোচে তথায় উপস্থিত হইলে, আমাকে তাহারা বোধ হয় বাঙ্গালী দেখিয়াই একখানা ভাল আসনে বসিতে দিল, মেয়েরা নিঃসঙ্কোচে নাচিয়া গাহিতেছে। পুরুষরা যন্ত্র-সাহায্যে তাল বজাইতেছে। আমার বড় ভাল লাগিল, আমি কিন্তু গানের কিছুই বুঝিলাম না। এক একবার দুই জন স্ত্রীলোক এক সঙ্গে নাচে, তাহাদের তালে তালে পা ফেলা দেখিয়া আনন্দ বোধ হইয়াছিল। অনেকক্ষণ সেখানে এই নৃত্যামোদ দেখিয়া আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলাম। বাসগৃহে গিয়া জানিলাম, সে প্রদেশে বিবাহাদি উৎসবে গৃহস্থ মেয়েরা এইরূপ নৃত্যগীত করিয়া থাকে। একবার আমি পেশোয়ারে ছিলাম এবং তথা হইতে কাবুল যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম, তখন এক সম্পন্ন গৃহস্থ-গৃহে গান-বাজনা হইতেছে জানিয়া তথায় প্রবেশ করা যায় কি না অনুমতিপ্রার্থী হইলে সে গৃহের লোকরা আমাকে মজলিসের এক কোণে লইয়া উচ্চাসনে বসাইল। সেখানে গিয়া দেখি গৃহস্থ-রমণীরা সাজিয়া-গুজিয়া গান করিয়া নৃত্য করিতেছে। চারিদিকে স্ত্রী-পুরুষ শ্রোতা দর্শক বসিয়াছে। আমি আনন্দে বিভোর হইয়াছিলাম। ভারতের অপর কোন কোন প্রদেশে এরূপ রীতির কথা জানা যায়। বোম্বাই প্রদেশে স্ত্রী-স্বাধীনতা অনেকটা প্রচলিত, সে প্রদেশে এরূপ প্রথার কথা শুনিয়াছি। আমি যখন সুরাট কংগ্রেসে গিয়াছিলাম, তৎকালে এই সংবাদ প্রাপ্ত হই ও জনৈক মার তথাকার এক বন্ধু এইরূপ গৃহস্থ-রমণীর নৃত্য দেখাইবেন বলিয়া আমায় সময়াভাবে দেখাইতে পারেন নাই। এই সময় পুরুষরা বাদ্য করে, মেয়েরা নাচে, গায়। আমাদের দোল বিবাহাদি উৎসবে মেয়েদের গান আছে, নৃত্যটা উঠিয়া গিয়াছে। বাজনা এখন সঙ্গে চলিয়াছে হারমনিয়ম, মেয়েরা গায়, মেয়েরাই বাজায়। এইরূপ প্রথা আমাদের দেশে নূতন নহে। আগে যে নৃত্য আমাদের দেশে ছিল, তাহার আভাস পাওয়া যায়। মেয়েদের নৃত্য এখন আমাদের দেশে পেশাদার নর্ত্তকীদের হস্তে গিয়াছে। ইহার ভাল ভাবটা চলিয়া গিয়াছে। কাশ্মীর প্রদেশে গৃহস্থ গৃহে এইরূপ নৃত্যগীত প্রথা প্রচলিত আছে দেখিয়াছি। কাশ্মীরের রমণীরা অনেকটা স্বাধীন ও শিক্ষিতা। আপন গৃহে সাধারণ উৎসবেও তাহারা নৃত্য-গীত করিয়া থাকে। ব্যবসায়ী নর্ত্তকারও সেখানে অভাব নাই, কিন্তু তাহাদের অন্য দেশে যাইবার অধিকার নাই। তবে কাশী, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতির পেশাদার নর্ত্তকীরা সে প্রদেশে শিক্ষা করিয়া আসিয়া কাশ্মিরী বাইজী বলিয়া নিজকে আখ্যা প্রদান করে। ফলে কাশ্মীরের সঙ্গে তাহাদের জন্মগত অধিকার নাই। আমাদের দেশে মুসলমানী আমলে মুর্শিদাবাদ ও ঢাকা অঞ্চলে পেশাদার নর্ত্তকী অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহার অস্তিত্ব এখনও তথায় বর্ত্তমান রহিয়াছে।

বৈদিক যুগেও স্ত্রী-পুরুষের মিলিত নৃত্যের কথা জানা যায়। তৎকালে যজ্ঞাদি ধর্ম্মানুষ্ঠানেও নৃত্যাদির প্রাচুর্য্য ছিল। আমাদের দেশে অসভ্য যুগেও নৃত্য ছিল। রামায়ণ, মহাভারতেও নৃত্যের অপ্রতুল ছিল না। পার্ব্বত্য প্রদেশে স্ত্রী ও পুরুষের মিলিত নৃত্যের অদ্যাপিও বিলক্ষণ প্রাচুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। ভুটিয়া, মণিপুরী, খাসিয়া, গারো, কুকী, সাঁওতালী প্রভৃতিদের নৃত্য দেখিবার জিনিষ। ইহা ছাড়া দাক্ষিণাত্যের দেবালয়গুলিতে দেবদাসী দেখিয়াছি, উহারা দৈনিক দেবালয়ে নৃত্য-গীত করিয়া থাকে। দাক্ষিণাত্যের এইরূপ ভাবে দেবদাসী রাখিবার ভাবটা উড়িষ্যার মন্দিরাদিতেও সংক্রমিত হইয়াছে। জগন্নাথক্ষেত্রে এইরূপ দেবদাসী অনেকেই দেখিয়াছেন। মুসলমান বাদশাহদের আমলে আমাদের দেশে পেশাদারী নর্ত্তকীর সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। যেখানেই সম্পন্ন অবস্থাশালী মুসলমান দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানেই বহু নর্ত্তকী ছিল, এখনও সেই সকল স্থানে তদ্ধিক তাহার স্মৃতিরক্ষা করিতেছে। সেইকাল হইতে দেশীয় রাজ্যসমূহেও এইরূপ নর্ত্তকীদের সংখ্যাবাহুল্য হইয়াছে। দিল্লী, আগরা প্রভৃতিতে অসংখ্য নর্ত্তকী এখনও তাহার স্মৃতিরক্ষা করিয়া আসিতেছে। নৃত্য, গীত, বাদ্যের একত্র সমাবেশকে সঙ্গীত কহে। নৃত্য সঙ্গীতের প্রধান অঙ্গ।

বিলাতে সঙ্গীতের ধারা অন্যরূপ। য়ুরোপ, আমেরিকায় যে বল-নাচ হয়, তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন। সেখানে স্ত্রী-পুরুষের মিলিত নৃত্য আছে। বিলাতে যে নাচে, সে হয় ত গান বা অভিনয় করিতে পারে না, তথাপি সে এক জন বড় নৃত্যকারী হইতে পারে। ভারতের নৃত্য সেরূপ নহে। এ দেশে গীত ও নাট্যকে বাদ রাখিয়া নৃত্য হইবার উপায় নাই। আমাদের দেশে নৃত্যকলা-কুশলাবদ্ ব্যক্তিকে গীতজ্ঞ হইতে হইবে, সময় সময় তাহাকে অভিনয়েও পারদর্শী হইতে হইবে। ভারতীয় নৃত্যবিদ্দিগের শব্দ-ভঙ্গী ও অঙ্গভঙ্গী বিষয়ে ভালরূপ রসজ্ঞ হইতে হইবে। নৃত্যের আখ্যান বিষয় গানে যতদূর প্রকাশ পাইবে, বাকীটুকু হাবভাবে বিলক্ষণ ফুটিয়া উঠিবে। অঙ্গভঙ্গী, হাবভাব নৃত্যের সকল বস্তু। আমাদের এইরূপ নৃত্যের হাবভাব বিলাতের লোকরা বুঝিতে পারে না। ভারতের অপরাপর কলার যেমন অবনতি হইয়াছে, সঙ্গীতেরও তদ্রূপ হীনতা হইয়াছে। তথাপি অদ্যাপিও প্রাচীন ভারতের কলাবিদ্যাকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে একমাত্র নৃত্য। বর্ত্তমানকালে আমরা সঙ্গীত-বিদ্যায় উদাসীন হইয়া পড়িয়াছি। আমরাই দেশ হইতে সঙ্গীতকে প্রায় তাড়াইতে সমর্থ হইয়াছি। ইহা একটা লজ্জার বিষয় হইয়াছে। অর্থসম্পদশালীরা ইহার আদর করেন না। পিতা বা অভিভাবকের কাছে পুত্রাদি সঙ্গীত করিতে অসমর্থ। হয় ত অভিভাবক পুত্রাদিকে সঙ্গীতের জন্য বিরক্ত থাকিতে শাসন—নিষেধ করিয়া থাকেন। আমাদের দেশে নৃত্যের মৃত্যু ঘটিয়াছে, তাহার সঙ্গে সহমরণ হইয়াছে ভাব ও রসের, গৃহস্থ-পরিবারের নৃত্য আর নাই। নৃত্যের স্বরূপ দেখিতে বা তাহার খবর লইতে হয় থিয়েটারের ষ্টেজে বা যাত্রার আসরে বা পেশাদারী নর্ত্তকীদের মজলিসে। আমাদের ছেলেমেয়েদিগকে কখনও বা গীতবাদ্য শিক্ষা দিয়া থাকি—নৃত্যকে বাদ দিয়া। তাহাদিগকে গান শিক্ষা দিই, বাদ্যাদিও শিখাইয়া থাকি, কিন্তু নৃত্যকে তাহাদের ধারে—কাছেও আনিতে দিই না। আমরা সঙ্গীতের পূর্ণতা দেখিতে পাই না। সঙ্গীতের পরিপূর্ণ আনন্দভোগ নৃত্যের ভিতর দিয়াই করিতে হইবে, অন্যথা অসম্ভব। নৃত্য যে ভাবময়, রসময়, ব্যঞ্জনাময়। নৃত্যে হস্ত দ্বারা অর্থের দ্যোতনা হয়, ভাবের অভিব্যক্তি হয় নয়নের সাহায্যে, আর চরণদ্বয় দ্বারা ছন্দের সুসঙ্গত প্রকটিত হইয়া উঠে। এইকালে অন্তর্নিহিত রস মনের ভিতর দিয়া ফুটিয়া বাহির হইয়া পড়ে। নৃত্যকলা ভারতীয় সঙ্গীতের অচ্ছেদ্য উপকরণ। ইতিহাস বলিতেছে

ভারতীয় সংস্কৃতির অভিব্যক্তিতে অমূল্য সহায়তা করিয়াছে নৃত্য। পাশ্চাত্য সভ্যতার যুগে ভারতীয় নৃত্য পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে। ভারতের গুহা ও মন্দিরে নৃত্যকলার ছবি প্রকটিত রহিয়াছে, নৃত্যকে হারাইয়া সেগুলি আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। উহাদের ব্যাখ্যা কে করিয়া দিবে?

এইরূপ মনের উৎকর্ষব্যাপক রস ও ভাবময় নৃত্যকে হারাইয়া আমরা সঙ্গীতের পূর্ণতালাভে সমর্থ হইতে পারিতেছি না। দেশে এখনও সঙ্গীত আলোচনাকারী ওস্তাদ রহিয়াছেন, তাঁহারা যদি মৃতকল্প নৃত্যের উৎকর্ষতা সাধন করিতে চাহেন, তবে নৃত্যের ভিতর দিয়া সঙ্গীতের পূর্ণতা সম্পাদন করিয়া লউন। এ জন্য বিলাতের দিকে চাহিয়া থাকিলে হইবে না। আমাদের পূর্ব্ব সম্পদকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। তৎসঙ্গে শ্লীলতা রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। বাদশাহী আমলে দেশদেশান্তর হইতে সঙ্গীত কলাবন্ত্যবিদ ওস্তাদরা আসিতেন, তাঁহাদের সাহায্যে এ দেশেও ওস্তাদ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের সাহায্যে আমরা সঙ্গীতের পূর্ণরূপ দেখিতে পাইয়াছি। এখনও পূর্ণ সঙ্গীতের যে কঙ্কাল আছে, তাহাকে খাড়া করিয়া আমরা যদি সঙ্গীতের কলেবর গড়িয়া তুলিতে পারি, তবেই আমাদের মঙ্গল হইবে। আমরা সরস্বতীর ভিতর দিয়া সঙ্গীতের পূজা করিয়া থাকি। মহাদেব ও নারদের পূজায়ও আমাদের সে সিদ্ধি লাভ হইবে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা ভারতের প্রাচীন আদর্শের অনেক বস্তুরই উদ্ধার করিতেছেন, কিন্তু আমাদের দেশের সঙ্গীতকে তাঁহারা তেমন আদর্শে দেখেন না। তাই আমাদের হারানো, লুকানো জিনিষকে আমাদেরই খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

কবিদের নাচিবার রীতি আছে। কবিগানে নাচ আছে। পেশাদারী সব গানেই নাচ দেখিতে পাওয়া যায়। রামায়ণ, পদ্মপুরাণ, গ্রাম্যগীত, কীর্ত্তনাদিতেও নাচ রহিয়াছে। মাণিকপীর, সত্যপীর, গাজীর গান, জারী, ভাসান প্রভৃতিতেও নৃত্যের অপ্রাচুর্য্য নাই। নৃত্য না থাকিলে এ সকল গান অসম্পূর্ণ থাকে। সংকীর্ত্তনের একটি প্রধান অঙ্গ নৃত্য। নৃত্য না থাকিলে গান অচল হইয়া যাইবে। তালের সমতা রক্ষা করে একমাত্র নৃত্য। যে গাহিতে পারে না, সে-ও নৃত্যের ভিতর তালের সমতা রক্ষা করিতে পারে। সুতরাং নৃত্যকে সঙ্গীতের আসর হইতে বাদ দিলে চলিবে না। পেশাদার নাচওয়ালীদের নৃত্যে কুরুচির গন্ধ থাকিলেও তাহাকে সঙ্গীতের মজলিস হইতে তাড়াইয়া দিলে সঙ্গীতের রসবাধ হইবে না। সঙ্গীতরসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই পুনরায় নৃত্যকে আদর করিয়া আমাদের আশেপাশে ছাড়িয়া দিউন; দেখিবেন, সঙ্গীতের পুনর্জন্ম হইবে, সঙ্গীত পুষ্ট ও বলশালী হইবে, ভারতে সঙ্গীতের নবজন্ম লাভ করিয়া তাহার আত্মপ্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে।

তালে তালে নৃত্য সর্ব্বদাই আনন্দবর্দ্ধক। পশুপক্ষীরাও তদ্রূপ নৃত্যে মানুষের আনন্দ বর্দ্ধন করে। পশুপক্ষীকে নর্ত্তন শিক্ষা দিয়া হর্ষ উৎপাদিত হয়। নৃত্য দৈবাগত পদার্থ। ভীষণ প্রাণিহত্যাকারী মহাসংগ্রামেও নৃত্যের পদ্ধতি রহিয়াছে। কুরুক্ষেত্র সংগ্রামে শ্রীকৃষ্ণ নর্ত্তন, কুর্দ্দন করিয়া হৃষ্ট হইয়াছিলেন। যুদ্ধের জয়-সংবাদে যুধিষ্ঠিরও নৃত্য করিয়া হর্ষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। নৃত্য আনন্দ প্রকাশের একটি ধারা। বাদ্যের সহিত নৃত্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। কথায় বলে, "তালেই তাল উঠে"। তাল হইলেই নৃত্য আপনিই আত্মপ্রকাশ করে। লঙ্কা জয়ে হনুমানের নৃত্য সর্ব্বত্র বিদিত। সীতার নিকট সীতা উদ্ধারের বার্ত্তা হনুমান নাচিয়া নাচিয়া গিয়া প্রদান করিয়াছিলেন। হর্ষে আপনিই নৃত্য আসে, দুঃখের সময় নৃত্য আসে না। নৃত্য হর্ষজ্ঞাপক। নৃত্য দ্বারা অন্তরের ভাব প্রকাশ হয়। শুদ্ধভাব রসকে নৃত্যই প্রকাশ করিয়া দেয়। পশুপক্ষীর হর্ষ বা শোকপ্রকাশক কোন বাক্য ভাব দেখা যায় না। তবে অব্যক্ত ভাবপ্রকাশক লক্ষণগুলিকেই ঐ পক্ষে ধরিয়া লওয়া যায়। নৃত্য দ্বারাও তাহারা হৃদয়ের হর্ষভাবটা প্রকাশ করিয়া থাকে। নৃত্য হৃদয়ের হর্ষভাবটা প্রকাশ করিয়া থাকে। নৃত্য হৃদয় পরিষ্কার করে, আবিলতা দূর করে। তালে তালে অঙ্গবিশেষের কম্পন, আহ্বানই নৃত্য, সে কম্পন আহ্বানে শ্রম নাই, আয়াস আছে, দুঃখ নাই, সুখ আছে। আসল, অব্যক্ত, অবর্ণনীয় সুখ ভাবকে পাইতে হইলে নৃত্যই আমাদের সহচর। নৃত্য আসে আসে আসে না, সে যে ঐ তালের অপেক্ষায় থাকে, তালকে লইয়া নামিতে চায়। তালের সঙ্গে বাদ্য, বাদ্য তাল না হইলে দাঁড়াইতে পারে না। তাল বাদ্য দ্বারাই প্রকাশ পায়। তাল একাকী চলিতে পারে না। তালের সঙ্গে বাদ্য ও নৃত্য। নৃত্যকে ছাড়াইয়া লইলে তাল 'আত্‌কাণা' হইয়া যায়।

সাপের নাচ অনেকে দেখিয়াছেন, বাঁশী বাজাইয়া সাপকে হর্ষপ্রফুল্ল করা হয়, সাপ তালে তালে নাচে। সাপ তখন আত্মহারা হইয়া যায়। বানরকেও তালে তালে নাচিতে দেখা যায়। ভল্লুকের নাচও অনেকে দেখিয়া থাকিবেন। নাচিতে ভালবাসে বলিয়াই ভল্লুক সত্বর পোষ মানিয়া থাকে। নাচওয়ালা বানরগুলি সহজে প্রভুর অনুগত হয়। সঙ্গীত প্রভাবে বন্যজন্তুও মুগ্ধ হইয়া যায়। ব্যাধরা সঙ্গীত দ্বারা পশুকে বন হইতে ধরিয়া আনে। সাপুড়িয়ারা সাপকে সঙ্গীত দ্বারা বন ও গর্ত্ত হইতে বাহির করিয়া আনে। ব্যাধের সঙ্গীতের আহ্বানে বন্য হরিণরা বাহির হইয়া আসে। তাহাদের হর্ষ হয়, তাহারাও নাচে। মালবৈদ্যরা সাপের নাচন দেখায় সঙ্গীতেরই সাহায্যে। সঙ্গীতের প্রভাব যেমন নৃত্যের উপরে, তেমনই নৃত্যের প্রভাবও সঙ্গীতের উপরে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

শ্রীরাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী, বিদ্যাভূষণ।

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব

গত বৈশাখের "মাসিক বসুমতীতে" (৭১ পৃঃ) ভক্তপ্রবর শ্রীযুত অমলাধন রায় ভট্ট মহাশয়ের প্রবন্ধ হইতে শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মতারিখ সম্বন্ধে এত ভিন্ন ভিন্ন মত রহিয়াছে দেখিয়া বিস্মিত হইতেছি। অকাট্য প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও এরূপ মতভেদ অযৌক্তিক ও শোচনীয়। ১৪০৭ শকাব্দার ফাল্গুন মাসে চন্দ্রগ্রহণ কালে মহাপ্রভুর জন্ম হয়। পাশ্চাত্য দেশে চন্দ্রগ্রহণ সমূহের সম্পূর্ণ তালিকা বহুবার বহু গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। "বিশ্বকোষে"ও এইরূপ একটি তালিকা মুদ্রিত রহিয়াছে। তদ্দৃষ্টে জানা যায় ১৪৮৬ খৃঃ ১৮ই ফেব্রুয়ারী চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল। বিজ্ঞানবলে চন্দ্রগ্রহণের কাল অতি সূক্ষ্মভাবে যাহা গণিত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বথা বিশ্বাসযোগ্য ও অকাট্য। সুতরাং ১৪৮৬ খৃঃ ১৮ই ফেব্রুয়ারী মহাপ্রভুর জন্ম ঘটে, এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। সামান্য গণিতের আশ্রয়ে জানা যায় উক্ত তারিখ বাঙ্গালা হিসাবে ১৪০৭ শকাব্দা ফাল্গুন মাসের ২৩শে তারিখ বটে, এবং সে দিন শনিবার ছিল। অতএব টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর মতই প্রমাণসিদ্ধ হইতেছে এবং তাঁহার প্রামাণ্য এ স্থলেও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। বলা বাহুল্য, অন্যান্য বিভিন্ন মতগুলি সবই ভ্রান্তিমূলক ও অলীক বলিয়া পরিত্যাজ্য।

বহুকাল যাবৎ একাধিক বাঙ্গালা জ্যোতিষগ্রন্থে (যথা জ্যোতিষরত্নাকর, জ্যোতিষপ্রভাকর ইত্যাদি) চৈতন্যদেবের একটি জাতপত্র মুদ্রিত হইয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষেও (১৩২২ শ্রাবণ) তাহাই গৃহীত হইয়াছে। উহা কাহার দ্বারা প্রথম গণিত জানি না—(কেন্দ্রে, সপ্তম স্থানে) চতুর্গ্রহীযোগে সন্ন্যাস সূচিত হয়, তন্মূলেই বোধ হয় উক্ত জাতপত্রিকা কল্পিত হইয়া থাকিবে। বস্তুতঃ তাহার গ্রহসংস্থান

সর্ব্বত্র শুদ্ধ হয় নাই। শ্রীযুত ফণিভূষণ দত্ত মহাশয়ের প্রদত্ত জাতপত্রই গণনাশুদ্ধ। আমরা গণনা করিয়া ঐ তারিখের দিনপঞ্জিকা, গ্রহস্ফুট এবং তদনুযায়ী মহাপ্রভুর জাতপত্রিকা নিম্নে প্রদান করিলাম।

শকাব্দা ১৪০৭, ২৩শে ফাল্গুন, শনিবার।

ভাগাহ
১১ ৮
৫৩ ৩৭
৯ ৫
০ ২৩

পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রের তৃতীয়পাদে জন্ম নক্ষত্রমান ৬১।৪ পল।

চৈতন্যচরিতামৃতে সিংহলগ্নে জন্ম হওয়ার উল্লেখ আছে। চৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়) পাঠ করিলে জানা যায়, মহাপ্রভুর জন্মসময় এক জ্যোতিষী কোষ্ঠীর ফলাফল কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। আমাদের প্রদত্ত জাতপত্রের সহিত তাহার অমিল নাই, যথা ;—

(ক) "মহারাজ-লক্ষণ সকল লগ্নে কহে।"

লগ্ন ও চন্দ্রে শনি, বৃহস্পতি, মঙ্গল, রবি এবং রাহু এই পাঁচটি গ্রহের পূর্ণদৃষ্টি রহিয়াছে। তদ্দ্বারা রাজযোগ ঘটে (শুদ্ধিদীপিকা ৬ অধ্যায়, ৫৭ শ্লোক।)

(খ) "বৃহস্পতি জিনিঞা হইব বিদ্যাবান।"

পঞ্চমে বৃহস্পতি স্বক্ষেত্রে থাকায় এরূপ হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

(গ) "কেন রসে পাছে হয় দুঃখের প্রকাশ।
অতএব না কহিলা প্রভুর সন্ন্যাস॥"

এই স্থানে সন্ন্যাসযোগের উল্লেখ রহিয়াছে। স্পষ্টতঃ সন্ন্যাসযোগের কোনও বচন প্রমাণ সম্পূর্ণ না মিলিলেও এই জাতপত্রের নানা স্থানে সন্ন্যাসের সূচনা রহিয়াছে। নবম স্থান তপঃ স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ—যথানে (কর্ম্মাধিপতি) শুক্র, বৃহস্পতির পূর্ণদৃষ্টি এবং নবমপতি উচ্চস্থ মঙ্গলের পূর্ণদৃষ্টি প্রত্যেকে তপঃপ্রভাব সূচনা করে। তদ্ভিন্ন লগ্ন ও চন্দ্র শনির পূর্ণদৃষ্টি এবং শুক্লপক্ষীয় বলবান্ বলহীন লগ্নপতিকে পূর্ণদৃষ্টি করে বলিয়াও সন্ন্যাসযোগ সূচিত হইতেছে। এতদ্ভিন্ন মহাপ্রভুর জীবনের অনেকানেক ঘটনাই (তীর্থযাত্রা, পত্নীহানি ইত্যাদি) এই জাতপত্রের ফলের সহিত মিলিয়া যাইতেছে।

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

কাশীর ইতিহাস

প্রমাণ ও সময়

রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ সম্বন্ধীয় কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে ইহাদের প্রামাণ্য ও সময় সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক। বিদেশীয় দেশীয় সমালোচকগণের মত এই প্রবন্ধে সম্পূর্ণ বিচার না করিয়াও সংক্ষেপে আলোচিত হইবে। বৈদেশিক সমালোচকগণের মধ্যে পার্জিটার ভিন্সেণ্ট স্মিথ প্রভৃতি পুরাণের মধ্যে বহুল পরিমাণে সত্যতা, ঐতিহাসিকতা স্বীকার করিলেও সর্ব্বাঙ্গীন সত্যতা স্বীকার করেন না এবং দেশীয় সমালোচকগণের মধ্যেও রাখাল বাবু প্রভৃতি মহাভারতের পুরাণের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না; কিন্তু ইঁহারা তাম্রশাসনাদির লিপি বিশ্বাস করেন এবং এক একটি পদ হইতে কত ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কার করিয়া থাকেন। বৈদেশিকগণ সময় সম্বন্ধে প্রায় সকলেই একমত: তাঁহারা সর্ব্বপ্রাচীন বেদের নির্ম্মাণ-সময়ও খৃষ্ট-পূর্ব্ব দুই হাজার বর্ষ মধ্যে ধরিয়া থাকেন; সুতরাং উপনিষদ্, পুরাণ প্রভৃতি অনেক পরবর্ত্তী কালের। দেশীয় সমালোচকগণের মধ্যে বালগঙ্গাধর তিলক মহাশয়েরই এ সম্বন্ধে যুক্তিপ্রমাণসংযুক্ত বিস্তৃত বিচার দ্বারা প্রমাণিত সময় সর্ব্বাপেক্ষা সমীচীন। তিনি গীতারহস্যের বহিরঙ্গ সমালোচনায় বৈদিক কালের পূর্ব্ব সীমা খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৫০০ বৎসরের কম ধরা যায় না, ইহা দেখাইয়াছেন। বেদের উত্তরায়ণস্থিতিপ্রদর্শক বাক্যের প্রমাণমূলে "ওরায়ণ" নামক গ্রন্থে তিনি তাহা বিস্পষ্টভাবে দেখাইয়াছেন; তাঁহার বিচারে বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি জ্যোতিষের দ্বারা প্রমাণ করিয়া বৈদেশিকগণকেও তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছেন। মৈত্র্যুপনিষদে কালরূপ বিষ্ণু সম্বৎসররূপ ব্রহ্মবিচারাবসরে (৬, ১৪) এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় যে, মঘানক্ষত্রের আরম্ভ হইতে ক্রমশঃ শ্রবিষ্ঠা অর্থাৎ ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের অর্দ্ধাংশের উপর আসা পর্য্যন্ত (মঘাদ্যং শ্রবিষ্ঠার্দ্ধং) দক্ষিণায়ন হয় এবং সার্প অর্থাৎ অশ্লেষা নক্ষত্র হইতে বিপরীতক্রমে (অর্থাৎ অশ্লেষা, পুষ্যা ইত্যাদিক্রমে) গণিত হইলে ধনিষ্ঠার্দ্ধ পর্য্যন্ত উত্তরায়ণ হয়, এই গণনাপদ্ধতি বেদাঙ্গ জ্যোতিষেরও পূর্ব্ববর্ত্তী; কারণ, বেদাঙ্গ জ্যোতিষে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে, উত্তরায়ণের আরম্ভ ধনিষ্ঠার আরম্ভ হইতে হইয়াছে, এই অর্দ্ধ নক্ষত্র পশ্চাতে ফিরিয়া আসিতে প্রায় ৪৮০ বৎসর লাগে। বেদাঙ্গ জ্যোতিষের কাল খৃষ্টপূর্ব্ব ১২ শত বা ১৪ শত বৎসর হইবে। সুতরাং মৈত্র্যুপনিষদের কাল খৃষ্ট-পূর্ব্ব ১৮৮০ বা ১৬৮০ বৎসর হইবে। মৈত্র্যুপনিষদে ছান্দোগ্য বৃহদারণ্যকাদির কথা উদ্ধৃত থাকায় ঐ সকল উপনিষদের কাল আরও প্রাচীন, ইত্যাদি।

বৈদেশিকগণের অনুমিত বা কল্পিত বর্ণনা পাঠ করিয়া যাঁহারা বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণসকলের প্রামাণ্য, অপ্রামাণ্য ও সময়নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন এবং পুরাণ সকলকে (রূপকথা) বেদকে চাষার গান বলিয়া নির্ভয়ে জনসমাজে প্রচার করিয়া থাকেন, অথচ নিজেদের অমূল্য সম্পদের প্রকৃত সংবাদ রাখেন না, বা রাখিবার অধিকারী নহেন, সেই সকল বর্ত্তমান শিক্ষিত যুবক বেদে যাহাদের উল্লেখ নাই, তাহাই অপ্রমাণ এ কথা বলিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না। বেদে উল্লেখ না থাকিলেই অপ্রমাণ এই কথা বলিবার পূর্ব্বে তাঁহাদের একবার বুঝা উচিত যে, বেদের সন্নিবিষ্ট বিষয়ের উপযোগী না হইলে তাহার উল্লেখ থাকিবে কেন? অথবা কালক্রমে লুপ্তপ্রায় অসমগ্র বেদ-মধ্যেই বা সকল কথা কিরূপে পাওয়া যাইতে পারে? কালক্রমে সংস্কার, স্মরণশক্তি, আয়ু ও ব্রহ্মচর্য্যাদির হ্রাসের সহিত বেদেরও বিলোপ ঘটিয়াছে, এই কথা আচার্য্য উদয়ন তাঁহার 'ন্যায়কুসুমাঞ্জলি' গ্রন্থে যুক্তিসহকারে প্রতিপাদন করিয়াছেন:—"আয়ুঃ স্বাস্থ্য বল শ্রদ্ধা সম দম গ্রহণ ধারণাদি শক্তি প্রতিদিন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হওয়ায় ক্রমশঃ বেদাধ্যয়ন ও অভ্যাস হ্রাসপ্রাপ্ত হইলেও বর্ণাশ্রমিমাত্রেরই পরিগৃহীত বলিয়া সহসা সমূলোচ্ছেদ হইবে না; এইরূপ বেদ হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে লোকের শঙ্কা-কলুষিত চিত্তে অনাশ্বাস আসিবে; সেই অবিশ্বাসের আশঙ্কা

[illegible]রিয়াঃ মহর্ষিগণ তাহার প্রতিবিধানকল্পে সংহিতা (স্মৃতি) প্রণয়ন করিয়াছেন। যাহার ফলে এই সম্প্রদায় ও আচার সমূলে উচ্ছেদপ্রাপ্ত হইবে না, বেদের এইরূপ উচ্ছেদ জ্ঞান পূর্ব্বক নহে বলিয়াঃ শ্লাঘার বিষয় নহে কিন্তু অনবধানতা, মত্ততা, অভিমান, আলস্য ও নাস্তিক্য ভাবের [illegible]রিপাকবশ করায় সংঘটিত হইবে তাহার কারণ সরস্বতী নদীর স্রোতের ন্যায় উচ্ছেদের পর প্রবাহ পুনরায় উচ্ছেদ ঘটিবে। (১) পার্জিটার বলেন, ব্রাহ্মণগণই বেদ রচনা করিয়াছেন ও যে সকল রাজার নিকট তাঁহারা ধন পাইতেন, তাঁহাদের কথা বেদে আছে; বেদ ঐ সকল ব্রাহ্মণের প্রশংসামাত্র এবং পুরাণও ঐরূপ রাজাদের কীর্ত্তিসমূহের গাথা সমষ্টি, উহা পরবর্ত্তী কালে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন একত্র গ্রথিত করিয়া চারিখানি বেদ ও ১৮খানি পুরাণ সঙ্কলন করিয়াছেন মাত্র ইত্যাদি।

ঐ বেদ-নর্ম্মাতৃব্রাহ্মণগণ ধনলোভে রাজাদের প্রশংসা করিয়াছেন কিম্বা বৈদিক যাগ-যজ্ঞাদির আচার ধূর্ত্ত-প্রবর্ত্তিত কিম্বা বালকের ধূলা খেলার ন্যায় নিষ্প্রয়োজনক, এইরূপ কল্পনা নিতান্তই অসঙ্গত; কারণ, অনাদি কাল হইতে বৈদিক ক্রিয়াসমূহ অনুষ্ঠিত হইয়া আসা নিবন্ধন উহা নিষ্ফল নহে, অর্থাৎ বালকগণ যেমন নিষ্প্রয়োজনে ধূলার ঘর নির্ম্মাণ করে ও পরক্ষণে আবার ভাঙ্গিয়া দেয়, যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান তদ্রূপ নহে। ইষ্টসাধনতাজ্ঞান না থাকিলে কেহই কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না, সুতরাং নিখিল পরলোকার্থিগণের যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি দেখিয়া বুঝিতে হইবে, উহা নিষ্ফল নহে এবং উন্মত্ত ব্যতীত কেহই নিষ্প্রয়োজন কেবল দুঃখ ভোগের জন্য কার্য্য করিতে পারে না।

সম্মানাদি অর্জ্জন কামনায় এই বৈদিক ক্রিয়া-কলাপ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাও কল্পনা করা যায় না। তাহা হইলে অরণ্যে মুনি-ঋষিগণ সম্মান ধনের আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া ঐ সকল কার্য্য করিতেন না।

ফলকথা খ্যাতিপ্রাপ্তির জন্য বা পরপ্রতারণার নিমিত্ত নিঃস্বার্থ ভাবে অনাদিকাল হইতে একটি অন্ধপরম্পরা (ভ্রম বিশ্বাস) চলিয়া আসিতে পারে না; যে ঋষিগণের প্রণীত গ্রন্থসকল পড়িয়া মানবসমাজ সভ্য, শিক্ষিত ও পরতত্ত্বযুক্ত হয়, তাঁহারা অন্ধ বা উন্মত্ত ছিলেন এইরূপ কল্পনা, তাঁহারাই করিতে পারেন—যাঁহারা অন্ধ, জড় বা উন্মত্ত। যাঁহারা পরের উপকারের জন্য অকাতরে অস্থিদান, সমগ্র জীবনের কঠোর সাধনার ফল সাদরে দান করিতে পারেন, তাঁহারা অন্যকে প্রতারিত করিবার নিমিত্ত এইরূপ প্রভূত দুঃখবহুল ক্রিয়া-কলাপের প্রবর্ত্তক, ইহা কল্পনা করাও বিচিত্র ব্যাপার।

ভারতীয় প্রাচীন সভ্য ও শিক্ষিত সমাজ মহাজন (অভ্রান্ত আদর্শ পুরুষ) পরিগৃহীত বলিয়া বৈদিক ব্যবহার ও বেদকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইঁহাদের মধ্যে বেদের পৌরুষেয়ত্ব বা অপৌরুষেয়ত্ব সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকিলেও বেদ সর্ব্বজ্ঞপ্রবর্ত্তিত, অভ্রান্ত এবং সর্ব্বদাই একরূপ সকল যুগে সকল কালে অবিচ্ছিন্নভাবে সমাজে বর্ত্তমান আছে, এ বিষয়ে মত বিরোধ নাই, অর্থাৎ মীমাংসকগণ শব্দের নিত্যতা মানেন বলিয়া বেদকে নিত্য অপৌরুষেয় বলিয়াছেন এবং তদনুসারে সংহিতাকারদিগের মত-পর্য্যালোচনার অবসরে প্রথমাধ্যায়ে পৌরুষেয়ত্ব-বাদিগণের যুক্তি দেখাইবার জন্যও একটি পূর্ব্বপক্ষ-সূত্রে জৈমিনী বলিয়াছেন 'বেদাংশ্চৈকে সন্নিকর্ষে পুরুষাখ্যা' অর্থাৎ রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদির ন্যায় কেহ কেহ বেদের সম্বন্ধেও তাহার কর্ত্তা আছে, এইরূপ মনে করেন। যেমন রামায়ণ বাল্মীকির, ভারত ও পুরাণ ব্যাসের, তদ্রূপ কাঠক, কৌথুম, বাজসনেয় তৈত্তিরীয় নামে সেই সেই বেদের শাখা প্রচলিত থাকায়, উহাও সেই সেই ব্যক্তির কৃত মনে করিব এবং ববর, কুরুবিন্দ, কুশিকপুত্র দেবাপি প্রভৃতি জন্মমরণশীল ব্যক্তিগণের নাম বেদে থাকায় উহাকে তাঁহাদের পরবর্ত্তিকালের ও পৌরুষেয় বুঝিতে হইবে,—এই প্রশ্নের উত্তরে বৃহদারণ্যকের শ্রুতিতে বেদচতুষ্টয় ও ইতিহাস পুরাণ উপনিষদের ব্রহ্মনিঃশ্বাসরূপতা অভিহিত হওয়ায় উহা অপৌরুষেয় বলিয়াছেন, এবং কাঠক, কৌথুম, তৈত্তিরীয়, বাজসনেয় প্রভৃতি শাখা নাম তাঁহারা সেই সকল অংশ বলিয়াছেন এই কারণেই হইয়াছে, তাঁহারা সেই অংশ করিয়াছেন এইরূপ অর্থে নহে, তাহা হইলে 'তেন প্রোক্তম্' এই পাণিনির সূত্রটি "কৃতে গ্রন্থে" ইহার দ্বারা গতার্থ হওয়ায় নিষ্প্রয়োজন হইত; সুতরাং কঠ প্রভৃতি ঋষিগণ বার্ত্তাবহের ন্যায় বেদ বলিয়াছেন—তাঁহারা করেন নাই। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে 'যো ব্রহ্মাণং' ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মার প্রতি বেদের উপদেষ্টাই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সুতরাং কঠাদি-কর্ত্তৃকত্ব নহে এবং "যুগান্তে বেদ ইতিহাস অন্তর্হিত হইলে মহর্ষিগণ তপস্যা দ্বারা উহা লাভ করিয়াছিলেন" "বিধাতা পূর্ব্ববৎ কল্পনা করিয়াছেন।" "উৎপত্তিবিনাশহীন বেদময়ী দিব্যবাণী ব্রহ্মা প্রথম বলিয়াছিলেন" (২) এই সকল প্রমাণ দ্বারা অনাদি সংসারে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের ন্যায় সৃষ্টি ও নাম হওয়ায় ববরাদির নাম থাকিলেও কোন হানি নাই, ঋষিদিগের নাম কার্য্য প্রভৃতি উহাতে উল্লেখ থাকিলেও কোন দোষ নাই। এইরূপ বহু যুক্তি ও শব্দপ্রমাণবলে মীমাংসক প্রভৃতি মনীষিগণ বেদের অপৌরুষেয়ত্ব স্থির করিয়াছেন।

বেদের পৌরুষেয়ত্ববাদী নৈয়ায়িকগণ বলেন যে, বেদ নিত্য নহে; কারণ, বর্ণই প্রথমে অনিত্য, 'ককার শব্দ শুনিয়াছিলাম' কোলাহল নিবৃত্ত হইয়াছে' এইরূপ প্রত্যক্ষ দ্বারাই শব্দধ্বংসের উপলব্ধি হয়, ঐ শব্দ কোথাও চলিয়া যায় না এবং ফিরিয়াও আসে না; শ্রোতা অনবধান নহে; কারণ, অবহিত হইলেও ঐ শব্দের উপলব্ধি হয় না, অথবা শ্রোতার শ্রবণেন্দ্রিয় দুষ্ট এইরূপও কল্পনা করিবার উপায় নাই; কারণ, পরক্ষণেই শব্দান্তর গ্রহণ করিতেছে; অতএব বর্ণঘটিত পদরাশিরূপ বেদ যে অনিত্য ইহা আর কেন বলিতে হইবে?

বৃশ্চিক ও তণ্ডুলীয়ক (চাঁই শাক) বৃশ্চিক ও তণ্ডুলীয়ক হইতে উৎপন্ন হইলেও প্রথমে বৃশ্চিক গোময় হইতে ও তণ্ডুলীয়ক তণ্ডুলকণা হইতে উৎপন্ন হয়; এইরূপ ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ও ভূতবর্গের উৎপত্তির মূলে এক অনন্ত শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি আছেন, যাঁহা হইতে সকলের প্রথম সৃষ্টি হইয়াছে; তিনি নানামূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া জাগতিক ব্যবহারনিয়ম-শৃঙ্খলাদি আমাদিগকে শিখাইয়াছেন ও নিঃশ্বাসবৎ অনায়াসে বেদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন ও সমাজে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, সেই নিত্য সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বররচিত বেদ বলিয়াই বেদে ত্রিকালের কথা থাকিবে, এমন কি, পুরাণাদিতেও ভবিষ্যাংশ সকল ঐরূপ আর্ষবিজ্ঞান বা যোগ-প্রভাবে জানিয়া লেখা হইয়াছে। অসীম অনবধি মহাকালবক্ষে বুদ্বুদবৎ উদীয়মান ও বিলীয়মান নিখিল পদার্থ সেই জিতেন্দ্রিয় ঋষিগণের সমাহিত চিত্তে দর্পণ-প্রতিবিম্বিত ছায়ার ন্যায় নির্ম্মল

১। তস্মাদায়ুরারোগ্যবলবীর্য্য-শ্রদ্ধা শম-দম গ্রহণ-ধারণাদি-শক্তেরহরহঃপচীয়মানত্বাৎ স্বাধ্যায়ানুষ্ঠানে শীর্য্যমাণে কথঞ্চিদনু-বৃত্তে, বিশ্বপরিগ্রহচ্ছ ন সহসা সর্ব্বোচ্ছেদ ইতি যুক্তমুৎপশ্যামঃ। [illegible]মেব চ কালভ্রমেণ নাশ্বাসমাশঙ্কমানৈর্মহর্ষিভিঃ প্রতিবিহিত-[illegible]তি নোচ্ছেদোহপি। ন চায়মুচ্ছেদো জ্ঞানক্রমেণ যেন শ্লাঘাঃ [illegible], অপিতু প্রমাদমদমানালস্যনাস্তিক্যপরিপাকক্রমেণ, তত-[illegible]চ্ছেদানন্তরং পুনঃ প্রবাহঃ, তদনন্তরঞ্চ পুনরুচ্ছেদ ইতি সারস্বতমিব [illegible]তঃ, অন্যথা কৃতহানপ্রসঙ্গাদিত্যাদি।

ন্যায়কুসুমাঞ্জলি ২য় স্তবক

(২) যুগান্তেঽন্তর্হিতান্ বেদান্ সেতিহাসান্ মহর্ষয়ঃ।
লেভিরে তপসা পূর্ব্বমনুজ্ঞাতাঃ স্বয়ম্ভুবা॥—স্মৃতি।

ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ......বেদ॥

অনাদিনিধনা নিত্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা॥

আদৌ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ॥—স্মৃতি।

।বিকরোদ্ভাসিত নয়নসন্নিকৃষ্ট ম :সংযোগসম্পর্কে প্রতীয়মান পুত্র-কন্যার সংকান্তির ন্যায় উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। ইহাই হইল ভারতীয় প্রাচীন সভ্য ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণের বিশ্বাস এবং এই বিশ্বাসের সাক্ষ্য পুরাণাদিতেও প্রদত্ত আছে। কাশীখণ্ডে সূতের প্রশ্নোত্তরে ব্যাস বলিয়াছেন "হে সূত! পুরাণ ও সংহিতাকারগণ ত্রিকালের কথা বলিয়া থাকেন; অখিল সংসারের সমস্ত তত্ত্বই তাঁহাদের গোচর, সুতরাং শাস্ত্রের প্রতি সন্দেহ করিতে নাই।" (৩) আধুনিক সভ্য সমাজ এ কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারেন না; কারণ, তাঁহারা অব্রহ্মচর্য্য ও অদৃষ্টযোগ-প্রভাব এবং বাল্যাবধি অনাচারে ও অসৎ সঙ্গে তাঁহাদের চিত্ত শ্রদ্ধা-বিশ্বাসহীন হইয়াছে এবং নিজেদের পূর্ব্বপুরুষপরম্পরা যাঁহাকে মাথার মণি বা হৃদয়ের অস্থির মত যতনে রাখিয়াছিলেন, তাঁহারা সেই অমূল্য সম্পদের অধিকারী হইতে পারেন নাই; তাঁহারা অধিকারী হইয়াছেন অনার্য্য সেবিত মতের; যাঁহারা এ দেশ পর্য্যন্ত দর্শন করেন নাই— সংস্কৃত-বর্ণবোধও যাঁহাদের ভাগ্যে ঘটে নাই, কেবল কয়েকখানি অনুবাদমাত্র পাঠ করিয়া যাঁহাদের পাণ্ডিত্য সেই দর্পিত পরোৎকর্ষাসহিষ্ণু বৈদেশিক অনার্য্য অধ্যাপকের প্রদত্ত ভ্রমপূর্ণ অকিঞ্চিৎকর জ্ঞাননামধেয় অজ্ঞানের, সুতরাং শাস্ত্র ও সজ্জনসঙ্গ না থাকায় তাঁহাদের এই বুদ্ধিভ্রংশ হওয়া স্বাভাবিক। আমরা সে জন্য দুঃখিত বা অনুতপ্ত নহি।

বেদ যেমন গুরুপরম্পরাক্রমে শ্রবণ ও অভ্যাসের সাহায্যে মুখেই ছিল এবং সেই এক বেদকে গান, মন্ত্র, ঋক্ ব্রাহ্মণাদিভেদে বিভাগ করিয়া ক্রমিক শ্রেণীবদ্ধভাবে গ্রথিত করিবার জন্য কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস উপাধি লাভ করেন এবং ইনিই পূর্ব্বকালের লোকপরম্পরা-ক্রমে প্রচলিত একমাত্র পুরাণকে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সংগ্রহ ও কোন কোন ঘটনাকে নিজে রচনা করিয়া অষ্টাদশ-পুরাণ নামে প্রচার করেন, তৎ-পূর্ব্বে রাজস্থানের ক্ষত্রবীরগণের কার্য্যকলাপ যেমন চারণগণের গাথায় ছিল, তদ্রূপ পৌরাণিক ক্ষত্রগণের কীর্ত্তি-গাথাও সূতজাতীয়গণের মুখে ছিল, মহাভারতের বহু স্থানে 'ইতি নঃ শ্রুতম্' 'অনুশুশ্রুম ইতি শ্রুতিঃ' এইরূপ থাকাতেও বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, পুরাণসঙ্কলনের পূর্ব্বে এই ঘটনাপরম্পরা শ্লোকাকারে গ্রথিত হইয়া কোন জাতির মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছিল, উহাই বৃহদারণ্যকের শ্রুত্যুক্ত ও যাস্ক মুনির ব্যাখ্যাত 'পুরাণ'; কিন্তু ঐ শ্রুতিতে যে ইতিহাসের উল্লেখ দেখা যায়, উহার আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। বেদব্যাসের পূর্ব্বে এরূপ একখানি ইতিহাসও ছিল, কালপ্রভাবে উহা ধ্বংস হয়। ইতিহাস ও পুরাণ মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের সময়ে পৃথক্ ছিল না; কারণ, চাণক্য-প্রণীত অর্থশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, বিপথগামী রাজাকে পুরাণ ও ইতিহাস শুনাইয়া সুপথে আনয়ন করিবে এবং ইতিহাস ও বেদ, ইতিহাস শব্দে পুরাণ, ইতিবৃত্ত আখ্যায়িকা, উদাহরণ, ধর্ম্মশাস্ত্র, এবং অর্থশাস্ত্র বুঝায়; ইহা ঐ অর্থশাস্ত্রে—১।৫।১০ আছে। অথর্ব্ববেদে ১১।৭।২৪, ছান্দোগ্যোপনিষদের ৩।৪।১ স্থানেও পুরাণের কথা আছে। শতপথ-ব্রাহ্মণে পুরাণকে মধু ও দেবভোজ্য বলা হইয়াছে এবং উহা নিত্য-পাঠ্য বেদতুল্য ধর্ম্মযাজকগণের অত্যুপাদেয়গ্রন্থ বলা হইয়াছে। (৪)

পুরাণ সংগ্রহ ও রচনা করিবার পর বেদব্যাসই পুরাণরচয়িতা বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।

আখ্যানৈশ্চাপ্যুপাখ্যানৈর্গাথাভিঃ কল্পশুদ্ধিভিঃ।
পুরাণসংহিতাং চক্রে পুরাণার্থবিশারদঃ। ব্রহ্মাণ্ড—২।৩৪।২১।
বায়ু—।৩।২১
বিষ্ণু—৩।৬।১৬

বেদব্যাস আখ্যান উপাখ্যান, গাথা ও কল্পযুক্তি দ্বারা পুরাণ সংহিতা নির্ম্মাণ করেন। আখ্যান উপাখ্যান পদে ইতিহাস ও ইতিবৃত্ত বুঝায়, ইহাদের মধ্যে যে প্রভেদ ছিল, তাহা এখন নির্ণয় করিবার উপায় নাই। কল্পযুক্তিপদে সময় ও যুক্তি অথবা কালানুরূপ যুক্তি বুঝায়, পুরাণসংগ্রহের পূর্ব্বে ইতিহাস ও পুরাণ পৃথক্ ছিল, পরে উহা এক হইয়া গিয়াছে। "ব্যাস অষ্টাদশ পুরাণ নির্ম্মাণ করিয়া উহার বিষয় দ্বারা বর্দ্ধিত-কলেবর মহাভারত নির্ম্মাণ করেন।" মৎস্য—৫৩।৭০ আপস্তম্বসূত্রে তিন স্থানে পুরাণ ও তাহার বিষয় উদ্ধৃত হইয়াছে। মনুর ৭।৪০—৪২ শ্লোকে বিনয় ও অবিনয়ের সুফল ও কুফল বর্ণনাপ্রসঙ্গে বেণ, নহুষ, পৃথু, সুদাম, নিমি প্রভৃতির কথা বলা হইয়াছে।

পার্জ্জিটার মনে করেন, সূতজাতির পর যখন ব্রাহ্মণগণ পুরাণরক্ষাকার্য্যে ব্রতী হয়েন, তাহার পরে পুরাণে জ্ঞান ও ভক্তির কথা স্থানলাভ করিয়াছে। এই কথা অত্যন্ত অসঙ্গত; কারণ, মহাভারতে যেমন ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গের কথা আলোচিত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা কোন পুরাণে অধিক নাই; সুতরাং তৎ-পূর্ব্ব হইতেই ব্রাহ্মণদের পৌরাণিকতার কথা থাকা উচিত ছিল, অথচ মহাভারত রচনার পরেও সূতজাতির নিকটেই পুরাণ ধারণের কথার উল্লেখ আছে, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও সূতের পৌরাণিকতার কথা আছে (৫) যজ্ঞাদি উৎসবে আহূত জনসমাজের নিকট উহা কীর্ত্তিত হইত। আমার মনে হয়, সূতজাতির বেদে অধিকার না থাকায় জ্ঞান ও ভক্তির অংশ তাহারা জানিত না, উহা ব্রাহ্মণরা চিরকালই জানিতেন ও বলিতেন। ফলকথা, বেদের ব্যাখ্যারূপ পুরাণের রাজন্য ভাগ বা বংশধারণ সূতজাতির আয়ত্ত থাকিলেও মোক্ষধর্ম্মের বা জ্ঞানের তত্ত্ব উহাদের অনায়ত্ত ছিল। অষ্টাদশ বিদ্যার অন্তর্গত পুরাণ, ইতিহাস নহে; সুতরাং তৎকালে পুরাণ ও ইতিহাস এক হইয়াছিল।

ইতি+হ+আস 'ইহা নিশ্চয় ছিল' এই অর্থে ইতিহাস নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'তত্রৈতিহাসিকা' ইতি ঐতিহাসিকাঃ' যাস্ক নিরুক্তে এই ঐতিহাসিক শব্দে পৌরাণিকগণকে লক্ষ্য করিয়াছেন। পুরাণ শব্দের নিরুক্তে 'পুরাণং কস্মাৎ পুরা নবং ভবতি' ইহা আছে 'পুরাপি নবমিব' এইরূপ অর্থ পৌরাণিকগণ করিয়া থাকেন। বর্ত্তমানে পুরাণসকলমধ্যে সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত ভিন্নও অনেক বিষয় আপাত-দৃষ্টিতে অতিরিক্ত বলিয়া বোধ হইলেও বংশানুচরিতের অন্তর্গত বুঝিতে হইবে। বংশ ও বংশানুচরিত একটি নামের তালিকামাত্র নহে, উহাতে তাহাদের কার্য্যকলাপ থাকিতেই হইবে, সুতরাং অসম্বদ্ধ প্রলাপবাক্য নহে। পার্জ্জিটারের বিশ্বাস যে "ব্রাহ্মণগণ ইতিহাসের বড় ধার ধারিতেন না জ্ঞান ও কর্ম্ম লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন এবং অধিকাংশ লেখকই সহরে বাস না করিয়া অরণ্যে বাস করিতেন এবং ইতিহাসাংশে তাঁহাদের বিশেষ আস্থা ছিল না, সুতরাং তাঁহারা মধ্যে মধ্যে ইতিহাস লিখিতে গিয়া ভুল করিয়াছেন" ইত্যাদি। ভারতের প্রাচীন সভ্য ও শিক্ষিতগণ মনে করেন যে, যাঁহারা শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা ঋষি—অভ্রান্ত এখনকার দিনে যেমন সামান্য সামান্য একটু লেখা পড়া করিয়াই নিজের সামান্য জ্ঞান পল্লবিত করিয়া জনসমাজে প্রচারপূর্ব্বক যশস্বী হইবার জন্য অকিঞ্চিৎকর অতথ্যপূর্ণ বহুল গ্রন্থ প্রচারিত হইতেছে, পূর্ব্বে জনসমাজ অপরীক্ষিত মত সেইরূপ প্রচারিত হইত না—হইলে সে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইত, এই নিয়মের কথা বৈদেশিক ম্যাগাস্থিনিস নামক গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে। যে নিজে ব্রাহ্মণ

(৩) পুরাণসংহিতা তাত ব্রুতে ত্রৈকালিকীং কথাম্।
সন্দেহোনাত্র কর্ত্তব্যো যতস্তদ্গোচরাখিলম্ ॥ কাশীখণ্ড ৪১ অধ্যায়।

(৪) ১১।৫।৬।৮, এবং ১৩।৪।৩।১২—১৩।

(৫) পৌরাণিকস্তু অন্তঃ সূতো মাগধশ্চ ব্রহ্মক্ষত্রাদ্বিশেষতঃ।

...নও পরের নির্ভুল জ্ঞান স্বীকার করিতে পারে না, আদর্শ না ...ে ধারণা হয় না, এ দেশের শিক্ষায় ব্যবহারে যেরূপ শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ... ও উদারতা আছে, তাহা অন্য দেশের শিক্ষায় ও ব্যবহারে না। সুতরাং তাহাদের ঐ সকল শঙ্কা-সমাধান এ দেশের লোকের ...র নহে, তবে যাহারা তাহাদের শিক্ষায় শিক্ষিত ও অনুপ্রাণিত, ...রা উহাতে মুগ্ধ-স্তম্ভিত হইতে পারে। যাহারা বর্ত্তমান যুগেও অ দর্শ-...তৈলঙ্গ স্বামীর ন্যায় মহাত্মগণকে দেখিয়াছেন তাঁহারা ইহা বিশ্বাস ...ে পারেন যে, যোগপ্রভাবে সর্বজ্ঞতা ও দীর্ঘায়ু লাভ প্রভৃতি অলৌকিক শক্তি জন্মিতে পারে।

কাশ্মীর ইতিহাস সঙ্কলন করিতে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিবার মত ...পাইবার উপায় নাই। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই তিন প্রকার ...ই ব্যবহৃত হইবে, কিন্তু বর্ত্তমানের সামান্য কিছু প্রত্যক্ষপ্রমাণ ...প্রমাণিত করিতে পারিলেও অতীত ঘটনা রাশির যে একটুকু ক্ষীণ-...আবিষ্কার করা যায়, উহা অনুমান ও শব্দ-প্রমাণবলেই স্থির করিতে হইবে, কিন্তু ঐ প্রমাণ সকল সুপরীক্ষিত হওয়া আবশ্যক। অনুমান করিতে হইলে উহাতে হেত্বাভাস দি দোষ না থাকে এবং শব্দ সেইরূপ অভ্রান্ত বলিয়া বুঝা দরকার। পুরাণ সকলের ভবিষ্যাংশ হইতে মৌর্য্যবংশের পর্য্যন্ত ইতিহাস পাওয়া যায়। ঐ পুরাণ সকল কখন রচিত হইয়াছে, তাহারও ভবিষ্যৎ কাল কোন্ সময় হইতে ধরিতে হইবে, ইহার নির্ণয়ও ঐ গ্রন্থ হইতে হইতে পারে। ভাগবত পুরাণ যখন শ্রীকৃষ্ণনন্দন শাম্বকে লইয়া আরব্ধ এবং অধিকাংশ পুরাণই যখন জনমেজয় ও তাঁহার প্রপৌত্র অধিসোমকৃষ্ণ বা অসীম-...ের সময়ে কথিত বলা হইয়াছে, তখন ইহা বুঝিতে পারা যায় যে, ভারত-যুদ্ধের পর ১ শতাব্দী পর্য্যন্ত পুরাণসঙ্কলনকাল, উহাই পুরাণের বর্ত্তমান সময় এবং ভারত-যুদ্ধের পূর্ব্বে অতীত কাল এবং ঐ শতাব্দীর পরবর্ত্তী কাল ভবিষ্য। সুতরাং খৃষ্টপূর্ব্ব দেড় হাজারেরও অধিক কাল পূর্ব্বে পুরাণ রচিত হইয়াছে। উহার পরের এই সার্দ্ধত্রিসহস্র বৎসরের ইতিহাসের কোন পুস্তক নাই, উহা কেবল পুরাণের ভবিষ্যাংশ, জনপ্রবাদ, তাম্রশাসন ও ভগ্নাবশিষ্ট মন্দিরাদি দৃষ্টে সঙ্কলন করিতে হইবে।

৪র্থ শতাব্দীর তাম্রশাসনে ভূমিদানের ফলশ্রুতিবাক্য পুরাণ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। বুদ্ধদেবেরও পূর্ব্বে কাশ্মীররাজ নন্দীপুরাণ শুনিয়াছিলেন, ইহা রাজতরঙ্গিণীতে আছে। হর্ষচরিতে, বায়ুপুরাণের নাম আছে। ফল কথা প্রাচীন ও অপ্রাচীন উভয় কালেই পুরাণ প্রমাণ ছিল ও আছে, সুতরাং তাহা হইতে যাহা পাওয়া যাইবে, তাহা প্রমাণসিদ্ধ মনে করিতে হইবে।

ইহার পরবর্ত্তী অধ্যায়ে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ সকলে বর্ণিত কাশ্মীররাজগণের কথা লইয়া রাজন্যগণের ইতিহাস আরব্ধ হইবে বলিয়া পুরাণ সম্বন্ধীয় কয়েকটি কথা বলা হইল।

সময় সম্বন্ধে দেশীয় ও বৈদেশিকগণের মতের একটু নমুনা দেখান হইয়াছে; উহারই সংস্করণান্তর অবান্তর মতসকল এইস্থানে বিচারিত হইল না। বেবার প্রভৃতি জর্ম্মাণ দেশীয় পণ্ডিতগণের মত যে ভ্রান্ত, তাহা তাঁহাদের দেশীয় লোকের দ্বারাই প্রমাণিত হইয়াছে। এক্ষণে রাজতরঙ্গিণীকারের মত সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, তিনি বলিয়াছেন, কলির ৬৫৩ বৎসর গত হইলে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হয়, কিন্তু তাহা হইলে খৃষ্ট-পূর্ব্ব ২৪৪৭ বৎসরে ভারতযুদ্ধ হইয়াছিল এবং তাহাই স্বীকার করিয়া লইলে বিষ্ণুপুরাণাদির প্রদত্ত সময়-সংখ্যাকে ভুল বলিয়া স্বীকার করিতে হয়; কারণ, বিষ্ণুপুরাণের প্রদত্ত হিসাব এরূপ, ভারতযুদ্ধবসানে পরীক্ষিতের জন্ম হইতে মগধরাজ নন্দের অভিষেককাল পর্য্যন্ত ১৫০০ বৎসর, কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে কথিত হইয়াছে, সপ্তর্ষিগণ এক একটি নক্ষত্রে শত বৎসর কাল অবস্থান করেন। ভারতযুদ্ধ সময়ে সপ্তর্ষিগণ ছিলেন মঘা নক্ষত্রে এবং পরীক্ষিতের সময়েও মঘাতেই ছিলেন এবং নন্দের রাজ্য-কালে সপ্তর্ষিগণ পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্রে ছিলেন। ইহা হইতে ১১শত বৎসর কাল নন্দের পূর্ব্বে ভারতযুদ্ধের সময় পাওয়া যায় এবং নন্দ হইতে চন্দ্রগুপ্ত পর্য্যন্ত শতবর্ষ ও চন্দ্রগুপ্ত খৃষ্টপূর্ব্ব ৩২৬ বর্ষে রাজ্যারম্ভ করেন, এই সংখ্যায় ১৫২৬ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ পাওয়া যায়। রাজতরঙ্গিণীর মতে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকালে মঘাতে সপ্তর্ষিগণ ছিলেন; বিষ্ণুপুরাণের মতে পরীক্ষিতের কালে সপ্তর্ষিগণ মঘায় ছিলেন, বলা হইয়াছে। অবশ্য যখন একশতাব্দী এক নক্ষত্রে ঋষিগণ থাকেন, তখন ... জন বা ৪ জন রাজা তৎকালে রাজ্য করিবেন, ইহাতে আর বৈচিত্র্য কি আছে?

বিষ্ণুপুরাণের প্রদত্ত হিসাবানুসারে খৃষ্ট-পূর্ব্ব ১২২ বৎসর ভারত-যুদ্ধের কাল হয়, অথচ নাক্ষত্রিক গণনায় ১৬ শত বর্ষের অধিক হয় না; এই উভয় প্রণালীই বিষ্ণুপুরাণের ৪ চতুর্থাংশে ও ভাগবতে এবং মৎস্য-পুরাণে আছে, ঐ সকল স্থানে আছে—"যদা মঘাভ্যো যাস্যন্তি পূর্ব্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলির্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি।" ইহার অর্থ যদি এই হয় যে, "যে সময়ে মঘাদি নক্ষত্র হইতে পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে সপ্তর্ষিগণ যাইবেন, সেই সময়ে নন্দরাজা হইতে কলি বৃদ্ধি পাইবে"; তবে পুরাণ-কারের স্বয়ং প্রদত্ত হিসাবে ভুল হইয়া পড়ে। বিষ্ণু মৎস্য ও ভাগবত-পুরাণের মতে হিসাব এইরূপ পরীক্ষিৎ পর্য্যন্ত অতীত কলাব্দ ১২ শত বৎসর, বহিদ্রথ ভাবী ২২শ জন রিপুঞ্জয়ান্ত রাজাগণের কাল ১ সহস্র বর্ষ, পঞ্চ প্রদ্যোত রাজার কাল ১৩৮, শিশুনাগবংশীয় ১০ জনের কাল ৩৬২, নন্দরাজ ৯ জনের কাল ১শত বর্ষ, সুতরাং চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যারম্ভ পর্য্যন্ত কলির ২৮ শত বর্ষ, তৎপরে ২২২৫ বর্ষ অতীত হইয়া ২৬শ বর্ষ প্রবৃত্ত হই-য়াছে, সুতরাং বর্ত্তমান কলাব্দ ৫০২৬ বর্ষ মিলিয়া যায়। পরীক্ষিতের কালে কলির ১২ শত বৎসর সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশরূপে অতীত হইয়াছে, এই মত শ্রীধরস্বামী বিষ্ণুপুরাণের টীকায় অভিব্যক্ত করিয়াছেন। এই পুরাণ-বাক্যের মধ্যেও দুইটি প্রশ্ন উত্থিত হয়। ১ম বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশের ২৪ অধ্যায়ে আছে যে, "যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্, এতদ্বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্।" ভাগবতের দ্বাদশের ১ম অধ্যায়ে আছে, "আরভ্য ভবতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্। এতদ্বর্ষসহস্রন্তু শতং পঞ্চদশোত্তরম্।" এই শেষোক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী বলিয়াছেন, "সহস্রং পঞ্চদশোত্তরং শতঞ্চেতি কয়া বিবক্ষয়া অপরান্তরসংখ্যেয়ং, বস্তুতস্তু পরীক্ষিন্নন্দান্তরং দ্বাভ্যামূনং বর্ষাণাং সার্দ্ধসহস্রং ভবতি, যতঃ পরীক্ষিৎসমকালং মাগধং মার্জ্জারিমারভ্য রিপুঞ্জয়ান্তা বিংশতিরাজানঃ সহস্রবৎসরং ভোক্ষ্যন্তীত্যুক্তেঃ ৯ম স্কন্ধে, যে বহিদ্রথভূপালা ভাব্যাঃ সাহস্রবৎসরমিতি ততঃ পঞ্চপ্রদ্যোতনা অষ্টাত্রিংশৎশতং শিশুনাগাশ্চ ষষ্ঠ্যুত্তরশতত্রয়ং ভোক্ষ্যন্তীত্যুক্তেশ্চ।"

"অর্থাৎ ১১১৫ এই সংখ্যা কোন অপর কিছু বলিবার আকাঙ্ক্ষায় বলিয়াছেন। এই সংখ্যা প্রকৃত নহে, বাস্তব সংখ্যা পরীক্ষিৎ ও নন্দের মধ্যে ১৪৯৮ হইবে; কারণ, পরীক্ষিতের সমকালীন মগধরাজ মার্জ্জারি হইতে রিপুঞ্জয়াও ২০ জন রাজা সহস্রবর্ষ ভোগ করিবেন এইরূপ বলা হইয়াছে। ৯ম স্কন্ধেও বলা হইয়াছে যে, বহিদ্রথ ভাবিরাজগণ সহস্র বৎসর রাজ্য করিবেন। প্রদ্যোৎগণ ১৩৮, শিশুনাগগণ ৩৬০ বর্ষ পৃথিবী ভোগ করিবেন এইরূপ বলা হইয়াছে।"

এই উক্ত দ্বারা পরীক্ষিৎ ও নন্দের মধ্যবর্ত্তী কাল যে ১১১৫ নহে ১৪৯৮, ইহা বুঝা যায়। বিষ্ণুপুরাণের ঐ শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী বলিয়াছেন যে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় কত কাল ছিল, এই কথা বলিবার আকাঙ্ক্ষায় ১১১৫ বলিয়াছেন। এস্থলে যদি নাক্ষত্রিক হিসাব ধরা যায়, তবে এই মত মিলিয়া যায়, কিন্তু পুরাণ সকলের প্রদত্ত স্থূল হিসাব মিলিলেও তাহাদের প্রদত্ত সংখ্যাযুক্ত হিসাব মিলিতে পারে না এবং বিষ্ণুপুরাণে ও ভাগবতের মধ্যেও ১ শত বর্ষের ন্যূনাধিক্য ঘটে এবং পুরাণকারের নিজের প্রদত্ত সংখ্যাদ্বারাই নিজের উক্ত অসত্য বলিয়া

প্রতিপন্ন হইয়া পড়ে, অথচ তাঁহারা কোন মাদকদ্রব্য সেবন করিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন, এইরূপ কথা প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ ও তাঁহাদের শিষ্যসমূহ বলিতে পারিলেও আমরা সেরূপ কল্পনায়ও আনিতে পারি না। যাঁহারা ত্রিকালজ্ঞ ঋষি, তাঁহাদের এত বড় ভ্রম, একই অধ্যায়মধ্যে হইতে পারে না। তবে ইহার মধ্যে লিপিকরপ্রমাদনিবন্ধন এই ভ্রম হইতে পারে। আমার বিবেচনায় "জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরং বা শতং পঞ্চদশোত্তরং" এইস্থলে "দ্বয়ে জ্ঞেয়ং পঞ্চশতোত্তরং" পাঠ হইলে সকলসামঞ্জস্য ঘটে, তাহা হইলে প্রশ্নও হয় না।

দ্বিতীয় শঙ্কা এই যে, নাক্ষত্রিক হিসাবে দোষ ঘটে, তাহাতে ১০-২০ নক্ষত্র পর্য্যন্ত গমন করিতে সপ্তর্ষিগণের ১৫ শত বর্ষ লাগিতে পারে না, অথচ স্পষ্টভাবে উভয় পুরাণে "তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলিবৃদ্ধিং গমিষ্যতি" এইরূপ বলা হইয়াছে।

ইহার সমাধানে শ্রীধরস্বামী বলিয়াছেন—"তদা প্রদ্যোতনাৎ প্রভৃতি বৃদ্ধিং গচ্ছন্ কলিঃ, নন্দাৎ প্রভৃতি অতিবৃদ্ধিং গমিষ্যতি।" অর্থাৎ মঘা হইতে পূর্ব্বাষাঢ়ায় সপ্তর্ষিগণ গমন করিলে প্রদ্যোতগণ রাজা হয়েন, সেই সময়ে মূল ক্ষত্রিয়, বহিদ্রথ রাজবংশ ধ্বংস হওয়ায় কলি বৃদ্ধি পাইয়াছে বুঝিতে হইবে এবং নন্দের সময়ে সকলেই শূদ্রপ্রায় হওয়ায় নিখিল ক্ষত্রবীজ ধ্বংস হয় সুতরাং কলির অতিশয় বৃদ্ধি বুঝিতে হইবে। এবং এই ভাব বুঝাইবার জন্যই ঐ শ্লোক প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহাই টীকাকারের মত। শ্রীধরস্বামীর ন্যায় কোন প্রাচীন টীকাকার পুরাণের আছেন বলিয়া দেখা যায় না, তিনি যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাতেও বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতের সময়গত পার্থক্য সম্বন্ধে তিনি কিছুই বলেন নাই এবং সেই সময়েও এই পাঠ বিকৃত ছিল।

এই সকল বিচার দ্বারা স্থির হয় যে, খৃষ্ট-পূর্ব্ব ১৯০৬ বৎসর পূর্ব্বে ভারতযুদ্ধ হইয়াছিল এবং ইহাই প্রাচীন প্রাচ্য পণ্ডিতগণের মত, এবং পূর্ব্বোক্তরূপে পুরাণবাক্যের অর্থসঙ্গত করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বোক্ত বালগঙ্গাধর তিলক যে খৃষ্টপূর্ব্ব ১৪ শত বর্ষের পূর্ব্বে ভারতযুদ্ধের কাল বলেন, উহাও সঙ্গত নহে; কারণ, যে নক্ষত্রে সপ্তর্ষিগণের অবস্থাননিবন্ধন কালনির্দ্দেশ করা হইয়াছে, উহার প্রকৃতার্থের অনুসন্ধান না করিয়া আপাতপ্রতীয়মান অর্থ ধরিয়া লইলেও অর্থাৎ পরীক্ষিৎ ও নন্দের মধ্যে ১১ শত বর্ষ ও তৎপরে খৃষ্ট পর্য্যন্ত ৪২২ বৎসর—উভয় যোগে ১৫২২ বৎসরই হইয়া থাকে।

পার্জ্জিটার সম্বন্ধেও অধিক বক্তব্য নাই; কারণ, তিনি ইংরাজদের দেশীয় সিদ্ধান্তকে রক্ষা করিবার জন্যই তাঁহার সাধক যুক্তি দিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। তিনি বিভিন্ন রাজবংশের এক তালিকা প্রস্তুত করিয়া সকল বংশেরই সমান সময় ধরিয়া গড় পড়তা ১৮, কোথায় বা ১৫ বৎসর ধরিয়া সময় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার এই যুক্তি স্বীকার করিতে পারি না; কারণ, বর্ত্তমান কাশীরাজের ঊর্দ্ধতন দুই জন রাজার ও তাঁহার রাজ্যকাল যোগ করিলে ১৩২ বর্ষ হয়, ইহাতে গড়পড়তা ৪৪ বর্ষ হয় এবং ইহারও পূর্ব্ববর্ত্তী ৩ জন রাজার রাজ্যকাল ধরিলে প্রত্যেকের রাজ্যকাল ৩১ বর্ষ হয়; কারণ, ১৭৪০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই বলবন্ত সিংহ কাশীর রাজা হইয়াছিলেন, ইহা ইতিহাসজ্ঞমাত্রেরই জানিবার কথা, সুতরাং পার্জ্জিটারের বিচার যুক্তিসহ নহে ও তাঁহার মত খণ্ডনার্থ অন্য প্রমাণ উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন মনে করি এবং পুরাণ যখন ইতিহাস, তখন তাহার প্রদত্ত সময়ে অবিশ্বাস করিয়া নিজের অনুমানলব্ধ সময় লইতে যাওয়া এবং তাহা জনসমাজে প্রচার করা অত্যন্ত অন্যায় ও অসমসাহসিকতার পরিচায়ক।

এই বিচারে স্থিরীকৃত সিদ্ধান্ত এই যে, কলির ১২ শত বর্ষ অতীত হইলে ভারতযুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধের পর মহাপদ্মনন্দের রাজত্ব আরম্ভ পর্য্যন্ত ১৫ শত বর্ষ নন্দবংশের রাজ্যকাল, শতবর্ষ তৎপরে খৃষ্ট পর্য্যন্ত মৌর্য্যরাজগণের রাজত্বকাল ৩ শত ২৬ বৎসর, এই সংখ্যা যোগ করিলে বর্ত্তমান কলাব্দ ৫০২৬ হইবে। যুদ্ধকালীন কলির ১২ শত বর্ষ গত হইবার কথা শ্রীধরস্বামী বিষ্ণুপুরাণের টীকায় বলিয়াছেন। এক একটি যুগের সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ সময় সেই যুগ নামে অভিহিত হয়, কেহ কেহ বা তাহাকে পুরাতন যুগ নামেও অভিহিত করেন সুতরাং কৃষ্ণের জীবনকাল পর্য্যন্ত দ্বাপর ও তাহার পরেই কাল এইরূপ বর্ণনা অসঙ্গত বা মিথ্যা নহে। কলি ১২ শত বর্ষ পূর্ব্ব হইতে সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশরূপে প্রবিষ্ট হইলেও তখন পর্য্যন্ত সে স্বরূপে প্রকাশ পায় নাই, ইহাই শ্রীধরস্বামী বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতের টীকায় বলিয়াছেন। [ক্রমশঃ।

শ্রীশ্যামাকান্ত তর্কপঞ্চানন।

কেয়া

সারা আকাশ মেঘ ঝোপেছে,
দুর্দ্দিনেরি দারুণ দেয়া;
পার হ'য়ে কে আসছ আহা
কণ্টকেরি কুটিল খেয়া···
অশ্রু-সজল বাদল-বাতাস—
গন্ধ দিয়ে কে তুই মাতাস্?
করুণ হেসে' বুকের ভাষায়
বল্‌লে সে—"হায়, আমি কেয়া!"

দিন হ'য়েছে রাতের মত
আব্‌ছায়া এক ছায়ার ছাপে,
পথ কাঁদে ঐ পথিক-হারা,
দিক্-বধূরা চক্ষু চাপে;
এ দুর্দ্দিনে কাহার লাগি'
দুখের পথে তুই, অভাগি?
"দুঃখ-জয়ী বিশ্ব-প্রেমের
পূজারিণী আমি যে—হা!"

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী।

চীনে ভারতের চিন্তাধারা

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, শাক্যসিংহ ও কনফিউশিয়াসের পূর্ব্বে চীনের সহিত ভারত, পারস্য ও ব্যাবিলোনিয়ার অধিবাসিগণের সংযোগ ছিল। ভারত-সম্রাট অশোকের সমসাময়িক শিহোয়াংটির সহিত নাকি মৌর্য্যবংশের সম্বন্ধ ছিল। কথিত আছে যে, বৌদ্ধধর্ম্ম খৃষ্টপূর্ব্ব ২১৭ খৃষ্টাব্দে চীনদেশে প্রথম আবির্ভূত হয়, কিন্তু ইহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। হার্থ বলেন, সম্রাট উটির (১৪০-৮০ পূঃ খৃঃ) পূর্ব্বে চীনের সহিত কোন বিদেশী রাজ্যের আদান-প্রদান ছিল কিনা তাহা সন্দেহের বিষয়।

খৃঃ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে হোকুপিং নামক এক বিখ্যাত যোদ্ধা বর্ব্বর জাতিকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া ১২১ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে সৈন্যের সহিত তুর্কীস্থানের সীমা অতিক্রম করিয়া ব্যাকট্রিয়া পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। ফিরিবার সময় যুদ্ধ-জয়ের চিহ্নস্বরূপ বুদ্ধদেবের এক স্বর্ণ প্রতিমূর্ত্তি দেশে লইয়া গিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধি আছে যে, চৈনিক যোদ্ধা নাকি বুদ্ধমূর্ত্তি এক জন হূণের নিকট হইতে লইয়াছিলেন। চীন-সম্রাট এই মূর্ত্তিকে অপরাপর মূর্ত্তির সহিত নিজ প্রাসাদে রক্ষা করিয়াছিলেন। ইহা প্রায় ১০ ফুট উচ্চ ছিল। তিনি ইহার সমক্ষে ধূপধূনা জ্বালাইতেন এবং ইহার পূজা উপাসনা করিতেন।

খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে এশিয়ার পশ্চিমাঞ্চল ভারতীয় ইতিহাসে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বহু প্রাচীনকালে মধ্য এসিয়া আর্য্য সভ্যতার সূতিকাগার ছিল। চীনের সহিত ভারতের ধর্ম্ম, সভ্যতা ও উৎকর্ষ বিষয়ে আদান-প্রদানের সন্ধিস্থল মধ্য-এসিয়া। এই মধ্য-এশিয়া ভারত ও চীনের মিলনক্ষেত্র। এই মধ্য-এসিয়া হইতেই বুদ্ধদেবের স্বর্ণমূর্ত্তি ও সংস্কৃত ধর্ম্মপুস্তক চীনে নীত হইয়াছিল। এই মধ্য-এসিয়ার অধিবাসিগণই ভারতে গ্রীকো-রোমক শিল্প এবং চীনে বৌদ্ধধর্ম্ম ও শিল্প-বিস্তারের সহায়তা করিয়াছিল। এই স্থানের অধিবাসিগণ কোন এক বিশেষ জাতি ছিল না। তাহাদের মধ্যে তাতার, সিথিয়ান, ইউচি, কুশান, শক, হূণ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি ছিল। তাহারা প্রায় সকলে যাযাবর ছিল। তাহারা প্রাচীন ও সভ্য জাতিসমূহের উপর পতিত হইয়া তাহাদের সুগঠিত শাসনপদ্ধতি নষ্ট ও বিধ্বস্ত করিয়া দিত। তাহাদের মধ্যে কোন নূতন চিন্তা বা ভাবের উন্মেষ হয় নাই। তাহারা গঠনপ্রয়াসী ছিল না। তাহাদের জাতীয় জীবনে কোন স্বাধীন চিন্তা জন্মলাভ করে নাই, অঘটনঘটনপটিয়সী কল্পনার রেখাপাত হয় নাই; প্রতিভার তাড়িতালোক তাহাদের জাতীয় জীবনের অমানিশা ভেদ করিয়া আনন্দসঞ্চার করে নাই। তাহারা কেবল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের নূতন ভাববহনকারী ও চিন্তা আদান-প্রদানের সহায়ক হইয়াছিল। তাহারা স্বভাবজাত শক্তির সাহায্যে বীরবিক্রমে পুরাতন সভ্যতা ভাঙ্গিয়া দিয়া চীন, ভারত ও য়ুরোপের ভূমিখণ্ডে নূতন শাসন-প্রণালী স্থাপন করিয়া বিজিত জাতির মধ্যে বসবাস করিত এবং সামাজিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে বিজিত জাতি কর্ত্তৃক পরাস্ত হইয়া তাহাদের মধ্যে নূতন শক্তির সঞ্চার করিত। এই জাতিসঙ্ঘের অন্যতম সম্প্রদায় কুশান নামে বিখ্যাত ছিল। তাহারা উত্তর-পশ্চিম ভারতে রাজ্যস্থাপন করিয়াছিল। কুশানরাজ কণিষ্ক পুরুষপুরে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কণিষ্ক বৌদ্ধ মহাযান স্থাপনে সাহায্য করিয়াছিলেন। পাণিনির জন্মভূমি গান্ধারদেশে কণিষ্কের পৃষ্ঠপোষকতায় অশ্বঘোষ ও বসুমিত্র বৌদ্ধ মহাযান সম্প্রদায় স্থাপন করিয়াছিলেন। কণিষ্কের পূর্ব্ববর্ত্তী ও সমসাময়িক বণিকগণ ব্যাকট্রিয়া হইতে হেলেনিক শিল্প-গান্ধারে আমদানী করিয়াছিলেন। কুশানরাজগণ চীনে ভারত ও রোমক সম্রাট্‌গণের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য স্থাপন করিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। ভিনসেণ্ট স্মিথ তাঁহার সুবিখ্যাত 'ভারত ও সিংহলের ললিতকলায় সাহিত্য' নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন, ৭৩ খৃষ্টাব্দে পানচো নামক এক জন চৈনিক যোদ্ধা খোটানের রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন। প্রথম শতাব্দীর প্রথম পাদে তিনি কাবুলের কুশান নরপতির সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন। খুব সম্ভবতঃ তিনিই কণিষ্ক। পানচোর মৃত্যুর পর কুশানরাজ খোটান পুনরধিকৃত করেন। কুশান নরপতি কর্ত্তৃক খোটান-জয় চীনা তুর্কীস্থানে ভারতীয় ভাষা, বর্ণমালা, ধর্ম্ম ও শিল্প বিস্তারের সাহায্য করিয়াছিল। কুশান হিন্দুগণ মূর্ত্তিপূজক ছিলেন। গৌতম বুদ্ধ, অন্য বৌদ্ধগণ ইন্দ্র বা শক্র, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণের, মহাযান ধর্ম্মানুমোদিত মূর্ত্তিসমূহের পূজা চীন, কোরিয়া অবশেষে জাপানে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সিলভাঁন লেভি বলিয়াছেন, খৃষ্টীয় প্রথম কয়েক শতাব্দীর মধ্যে চৈনিক-তুরস্কের মধ্যস্থ কুচ নামক প্রদেশ বৌদ্ধধর্ম্ম ও সভ্যতা গ্রহণ করিয়া উন্নতিশীল ও ঐশ্বর্য্যশালী স্থানে পরিণত হইয়াছিল।

ভারত ও চীনের সাধারণ শত্রু হূণদিগের বিরুদ্ধে উটি ইণ্ডো-সিথিয়ানদিগের সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে চীনের পরাক্রান্ত যোদ্ধৃগণ ক্যাসপিয়ান হ্রদের তীরে রোমের বিজয় পতাকার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া য়ুরোপের বিস্তৃত বাণিজ্যক্ষেত্রে চৈনিক বণিক্‌গণের রেশম ও লৌহ আমদানী করিবার পথ পরিষ্কৃত করিয়াছিলেন। খৃষ্টজন্মের দুই শতাব্দী পূর্ব্বে চীনের অধিবাসীদিগের চিন্তারাজ্যে এক বিপ্লব ঘটিয়াছিল। এই সময় পারথিয়ার অধিবাসিগণ বিজয়-গর্ব্বে উল্লসিত হইয়াছিল। পশ্চিমে সুদূর রোম হইতে পূর্ব্বে কোরিয়া পর্য্যন্ত নূতন জাগরণের তরঙ্গ বিস্তৃত হইয়া মানুষের মন আলোড়িত করিয়াছিল। চীনবাসী এই সময় ভারত, বুদ্ধ ও পারথিয়ার নাম প্রথম শ্রবণ করিয়াছিল। খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে চীনাগণ পশ্চিম এসিয়ার সহিত রেশম ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছিল। সেকেন্দার সাহের ভারত অভিযানের পর তিন শতাব্দীর মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান আরম্ভ হইয়াছিল। দুই সভ্যতার সংঘর্ষের ফলে পরস্পরের মধ্যে উৎকর্ষের সামঞ্জস্য ঘটিয়া ২ হাজার ২ শত বৎসর পূর্ব্বে জগতে এক অপূর্ব্ব মহামানবতা, এক সাধারণ সভ্যতা প্রথম জন্মলাভ করিয়া ভেদমন্ত্রের প্রধান পুরোহিত আধুনিক ইংরাজ কবি রাডিয়ার্ড কিপ্‌লিংএর যুক্তির অসারতা প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছিল।

৬৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ মিংটি স্বপ্নে দেখিলেন যে, এক স্বর্গীয় দূত আকাশে উড়িতে উড়িতে তাঁহার প্রাসাদে প্রবেশ করিয়াছেন। কেহ বলেন যে, সম্রাট্ নাকি উনত্রিংশ ফুট উচ্চ, সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিবিশিষ্ট এক স্বর্ণ প্রতিমূর্ত্তিকে তাঁহার প্রাসাদে প্রবেশ করিতে স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন। সেই দূত তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, পশ্চিমদেশে লোক পাঠাইয়া পুস্তক ও প্রতিমূর্ত্তি সংগ্রহ করিতে বুদ্ধদেব আপনাকে আদেশ দিয়াছেন। এই স্বপ্নের ফলে পঞ্চদশ লোক লইয়া সি-ইন, সি-কিং এবং ওয়াং সুন্ নামক তিন ব্যক্তি ভারতে প্রেরিত হন। বৌদ্ধধর্ম্ম পুস্তক এবং যদি সম্ভব হয়, বৌদ্ধ-পুরোহিত সঙ্গে লইয়া চীনে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে তাঁহারা আদিষ্ট হন। কয়েক বৎসর পরে ভারতের সীমান্ত হইতে সধর্ম্ম ও কাশ্যপ মাতঙ্গ নামক দুই জন বৌদ্ধ-পুরোহিতের সহিত পুস্তক, ছবি ও প্রতিমূর্ত্তি লইয়া তাঁহারা দেশে ফিরিয়া যান। এই বিদেশী পুরোহিতগণ লোইয়াং নামক স্থানে বাস করিয়া কয়েকখানি বৌদ্ধ-পুস্তক ভাষান্তরিত বা সঙ্কলিত করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে বৌদ্ধসূত্র ও

বুদ্ধজীবন কথা প্রধান। বৌদ্ধধর্ম্ম চীনদেশে এক নূতন ভাব আনয়ন করিয়াছিল। বহু বৌদ্ধ গ্রন্থ ভাষান্তরিত বা লিখিত হইতে লাগিল। দেশে অসংখ্য মন্দির নির্ম্মিত হইল এবং চীন সম্রাট্‌গণ প্রচারকদিগের পৃষ্ঠপোষক হইয়া উঠিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের উচ্চশিক্ষা চীনবাসীর প্রাণে এক নূতন উদ্যম আনিয়া দিয়াছিল। ভারতীয় প্রচারকগণ যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিলেন। অন্যের ভাল করিলে মানুষ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আনন্দ ও সুখভোগ করিতে পারে, স্বার্থের বিষয় চিন্তা করা পাপ, অপরকে ভালবাসা ধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য এই শিক্ষা চীনের অধিবাসিগণের সমক্ষে এক অভিনব আধ্যাত্মিক জগতের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। নূতন শিক্ষার আলোকে চীনবাসী আশ্চর্য্যান্বিত ও পুলকিত হইল। বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি চীনের দেবসজ্যে প্রবেশ করিল। মূর্ত্তিপূজার মনোভাব পূর্ব্ব হইতে চীনে বর্ত্তমান ছিল। কর্ষিত ক্ষেত্র বীজবপনের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। এক দিকে সাহিত্যে ও দর্শনে লেও-জি ও চোয়াং-জি এবং অন্য দিকে কনফিউশিয়াস্ ও মেন্‌সিয়াস্ চীনদিগকে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণের উপযোগী করিয়া রাখিয়াছিলেন। এ পর্য্যন্ত চীনের উপর ভারতীয় চিন্তার প্রভাব সীমাবদ্ধ ছিল। মাত্র কয়েকখানি সংস্কৃত পুস্তক চীনা ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল, হিন্দু ও চীনবাসীর মধ্যে আদান-প্রদান অল্পই হইয়াছিল, ভাস্কর্য্যে ও চিত্রে দুই জাতির মধ্যে বিশেষ কোন সংস্রবের চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয় নাই। ট্যাং সম্রাট্‌গণের আমলে (৬৪৫, খৃষ্টাব্দের পর) ভারত হইতে ওয়ান্ চোয়াং-এর প্রত্যাবর্ত্তনের পর চীনের সাহিত্যে ও শিল্পের ভারতীয় প্রভাব যথাযথরূপে প্রকটিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বুদ্ধমূর্ত্তি ও বৌদ্ধধর্ম্ম চীনে প্রবর্ত্তিত হইলেও চতুর্থ শতাব্দী পর্য্যন্ত চীনের কোন ব্যক্তিকে বৌদ্ধ-পুরোহিত হইতে দেওয়া হয় নাই। খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দী পর্য্যন্ত মাত্র এক জন ব্যতীত বৌদ্ধ পুস্তকসমূহের অনুবাদকারিগণ সকলেই বিদেশী ছিল। জিলস্ বলিয়াছেন যে, খৃষ্টীয় ৩৩৫ শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চীনবাসিগণ পুরোহিত হইতে পারেন নাই। বুদ্ধচিঙ্গ নামক এক ব্যক্তি চীনের লোকদিগকে পুরোহিত হইবার অনুমতি আনয়ন করিয়াছিলেন। ৩৮৫ খৃষ্টাব্দে কুমারজীবের আগমনের পর চীনে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রতিপত্তি ও প্রসার লাভ করিতে লাগিল। বহু বৎসর ধরিয়া তিনি বৌদ্ধ-গ্রন্থ অনুবাদ করিতেছিলেন। ৪১৭ খৃষ্টাব্দে তিনি দেহরক্ষা করেন। তাঁহার অনূদিত গ্রন্থের মধ্যে হীরকসূত্র প্রধান। এই সূত্রের মতে জগৎ মায়াময়। ইহার কোন বাস্তব সত্তা নাই। যখন কুমারজীব চীনে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন ও আট শত পুরোহিত বৌদ্ধধর্ম্মের পবিত্র পুস্তক সমূহের তত্ত্ব শিক্ষা দিয়া চীনে বৌদ্ধধর্ম্মের স্থায়ী স্থান নির্দ্দেশ করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময় ফা-হাইন তাঁহার বিখ্যাত পর্য্যটনে ব্যাপৃত ছিলেন (৩৯৯-৪১৩ খৃষ্টাব্দ)। তিনি তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনীতে বলিয়াছেন,—আমাকে বহু বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, কিন্তু আমি যে পবিত্র উদ্দেশ্যে বহির্গত হইয়াছিলাম, তাহার সিদ্ধির জন্য সরলভাবে ও সাহসের সহিত অগ্রসর হইয়াছিলাম। আমি যে আশা ফলবতী করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলাম, তাহার সহস্রাংশের একাংশও কার্য্যে পরিণত করিতে পারিব মনে করিয়া অবধারিত মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে পশ্চাৎপদ হই নাই। দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে চীন হইতে ভারতে পদব্রজে আসিতে হইলে কত কষ্ট, কত বিপদ সহ্য করিতে হইত তাহার ইয়ত্তা নাই এবং বিপদের অনুপাতে চীনপর্য্যটকের অসীম সাহস, জ্ঞানলিপ্সা ও ধর্ম্মপ্রাণতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বহু পুস্তক ও পবিত্র জিনিস চীনে লইয়া গিয়াছিলেন। বঙ্গোপসাগর পার হইবার সময় প্রবল ঝটিকা আরম্ভ হয় এবং তাঁহার জাহাজে ছিদ্র হইয়া যায়। পাছে বণিকগণ তাঁহার বহু আয়াস-সংগৃহীত পুস্তকাদি সমুদ্রে নিক্ষেপ করে, এই জন্য তিনি ভীতিবিহ্বল চিত্তে কুয়ান্-ইনের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, যেন জাহাজের ছিদ্র বন্ধ হইয়া যায় এবং জাহাজ কোন নিরাপদ স্থানে পৌঁছিতে পারে। যিনি ত্রিলোকের উপাসনা শ্রবণ করেন, তিনি ভক্তের কথায় কর্ণপাত করিলেন। কুমারজীব ও ফা-হিয়ানের সময় হইতে ভারতের সহিত চীনের সম্পর্ক দৃঢ়তর হইয়াছিল। ৫২৬ খৃষ্টাব্দে বোধিধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে গমন করিয়া চীনে বাস করিতে লাগিলেন এবং সেই সময় চীনে বৌদ্ধধর্ম্ম বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিল।

২২০ খৃষ্টাব্দ হইতে ৬১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চীনে অরাজকতার কাল। হ্যানবংশের অবসানের সহিত অসভ্য তাতারগণের আক্রমণে চীন-সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত ও বিভক্ত হইয়া গেল। সাম্রাজ্যের সমস্ত উত্তরাংশ বিদেশী আক্রমণকারিগণের হস্তে পতিত হইল। বহু ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল। ৬১৮ খৃষ্টাব্দে ট্যাংবংশ এক বৃহৎ যুক্তরাজ্যের শাসনাধিকার প্রাপ্ত হইল। এই চারি শত বৎসরের অরাজকতার সময় চীনে বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। ওয়াং-চোয়াংএর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের সহিত যুক্ত ভারত-চীন সাম্রাজ্যের কল্পনা তাঁহার মনে স্থান পাইয়াছিল। ৬৪৫ খৃষ্টাব্দে ওয়াং চোয়াং চীনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং ৬৭১ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত ইচিং তাঁহার চতুর্বিংশতি বর্ষব্যাপী ভারত-ভ্রমণ আরম্ভ করিয়াছিলেন। টাকাকাসু কর্তৃক অনূদিত তাঁহার রোজনামচায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, সপ্তম শতাব্দীর প্রথমাংশে অন্যূন ৬০ জন চীনের বৌদ্ধ-পর্য্যটক ভারতে আসিয়াছিলেন। খৃষ্ট অব্দের প্রথম কয়েক শতাব্দী বিদেশপর্য্যটন ও বাণিজ্যের যুগ। এসিয়ার সত্যানুসন্ধিৎসু চিন্তাশীল দার্শনিক ধর্ম্মপ্রচারকগণও অসম সাহসী বণিকগণ অদম্য উৎসাহে জলপথে ও স্থলপথে দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিয়া ধর্ম্ম ও বাণিজ্যের পতাকা উত্তোলন করিয়া নূতন যুগের অবতারণা করিয়াছিলেন। ফা-হিয়ান গঙ্গা নদীর মোহনায় তাম্রলিপ্ত নগর হইতে বাণিজ্যপোতে সিংহল দিয়া সুমাত্রা দ্বীপে গমন করিয়াছিলেন। যাভা হইতে ক্যাণ্টন যাইবার পথে পোলোমন্ বা ব্রাহ্মণগণ তাঁহার সহযাত্রী ছিল। ই-চিং বলিয়াছেন যে, সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে ২২ জন চীন-পর্য্যটক স্থলপথে এবং ৩৭ জন পর্য্যটক জলপথে ভারতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা সাধারণতঃ ক্যাণ্টন নগর হইতে বহির্গত হইয়া সুমাত্রায় আসিতেন। তৎপরে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের পার্শ্ব দিয়া সিংহলে আসিতেন এবং সিংহল হইতে তাম্রলিপ্তে আসিয়া ভারতের তীর্থসমূহ দর্শন করিতেন। সমুদ্রপথে ভারতে আসিতে ৩ মাস লাগিত।

ট্যাংবংশের (৬১৮-৯০৭ খৃষ্টাব্দ) প্রধান সম্রাট তাই-সুং অসীম বীরত্ব দ্বারা চীনের ইতিহাসকে গৌরবমণ্ডিত করিয়াছিলেন। তিব্বত অধিকার করিয়া তিনি ভারতের সহিত চীনের সংস্রব সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি চীনসাম্রাজ্য পামীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী স্বর্ণযুগে চীনা সাহিত্য, শিল্প ও বৌদ্ধধর্ম্ম তাঁহার নিকট ঋণী। তিব্বত ও পামীরের পথ উন্মুক্ত হইলে ভারত ও চীনের চিন্তা ও ভাবের আদান-প্রদানের সুবিধা হইয়াছিল। এই সময় লোয়াংয়াংএ তিন সহস্রের অধিক বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং দশ সহস্র ভারতীয় পরিবার বাস করিতেছিলেন। তাঁহারা ভারতীয় ধর্ম্ম ও শিল্প চীনদেশে বিস্তার করিয়া চীন ও জাপানী ভাষাকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিলেন।

কনোজ ও এলাহাবাদে সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের পৃষ্ঠপোষকতায় যে সমস্ত উৎসব, মেলা, শোভাযাত্রা, অভিনয় প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইত, তাহা ওয়াং-চোয়াং দর্শন করিয়াছিলেন। জাতীয়জীবনে তাহাদের উপকারিতা উপলব্ধি করিয়া তিনি স্বদেশে তাহা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, ভারতীয় প্রভাবে চীনা নাট্যকলার উন্নতি হইয়াছিল। অষ্টম শতাব্দীর প্রথমভাগে অভিনয়, নৃত্য

র্ম্মানন্দ প্রভৃতি ৭ জন হিন্দু পণ্ডিতের সাহায্যে ই-চিং চীনের সাহিত্য শিল্পে ভারতীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। চীনের চিন্তারাজ্যে যথেষ্ট পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল। চীনের পুরাতন ভাব নূতন ব্যাখ্যাত হইয়া নূতন আকার ধারণ করিল। তাও ও কনফিউশিয়াসের ধর্ম্ম নূতন আলোকে উজ্জ্বলতর হইল। দার্শনিকগণ প্রাচীন সাহিত্যের গূঢ় তত্ত্ব আলোচনা করিবার সময় ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার আশ্রয় লইতে লাগিলেন। চীনে হিন্দুভাব প্রবর্ত্তনের সহিত ভারতের ধ্যান ও নিদিধ্যাসন চীনা সাহিত্য, চিত্র ও দর্শনে প্রতিফলিত হইয়া চীনের জাতীয় জীবনকে মহামহিমময় করিয়া তুলিল, অতীন্দ্রিয়ার মোহন-ভাবে, অধ্যাত্মিকতার আপন-ভুলান স্বর্গীয় প্রভাবে তাহাকে মধুর, সুন্দর ও মনোরম করিয়া তুলিল, চীনবাসী অরূপের সন্ধান পাইয়া রূপসাগরে ডুব দিতে লাগিল।

চীন ও জাপানের বৌদ্ধ দেবদেবীগণের সহিত বর্ত্তমান হিন্দু দেব-দেবীগণের সৌসাদৃশ্য বর্ত্তমান। তাহাদের নাম, কার্য্য, মূর্ত্তির গঠন ও পূজাপদ্ধতির কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকিলেও মুখ্যতঃ তাহারা এক ও অভিন্ন। চীনের বোধিসত্ত্ব টি-স্যাং জাপানে জিজো নামে আখ্যাত ও পূজিত হন। আবার ইনিই মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মে ক্ষিতি-গর্ভ নামে পরিচিত হইয়া থাকেন। চীন, জাপান ও ভারতের ধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্ম নামে অভিহিত হইতে পারে। ভারত হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম রপ্তানী হইয়া চীন ও জাপানের মুক্ত বায়ুতে পরিবর্দ্ধিত, পরিবর্ত্তিত ও রূপান্তরিত হইয়া, নূতন সাজে সজ্জিত হইয়া ভারতে পুনরায় ফিরিয়া আসিল। এসিয়া কল্পনা-প্রবণ। এসিয়ার মৃত্তিকা বিভিন্ন ধর্ম্মভাব পরিস্ফুট করিয়া যুগে যুগে কত ধর্ম্মপ্রাণ মহাপুরুষের জন্ম দিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এসিয়ায় মানবমনের উচ্চতা ও গভীরতা পরিমূর্ত্ত হইয়া ব্যাস, বাদরায়ণ, কপিল, বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ, কন্‌ফিউশিয়াস্, লেওৎসু, চৈতন্য শঙ্কর, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি যুগ প্রবর্ত্তকগণের আকারে প্রকাশিত হইয়া বিশ্ব-রাজ্যে মহামানবতার অবতারণা করিয়াছে। পশ্চিমে জর্ডান নদীর তীর হইতে সিন্ধু-গঙ্গা-গোদাবরী-নর্ম্মদা প্লাবিত ভারত, ভারত হইতে হোয়াংহো ও ইয়াংসি, এবং চীন হইতে জোডো ও সুমিডা পর্য্যন্ত একই প্রেম-ভক্তি বহু আকারে, বহু ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

এসিয়ার আর একটি বিশেষত্ব এই যে, ধর্ম্মপ্রচারে পাশবিক শক্তির প্রয়োগ হয় নাই, বৃহৎ কামান ও গুলীগোলার আবশ্যক হয় নাই, হীন ও অর্দ্ধ-সভ্য জাতিকে উচ্চতর ধর্ম্মের আদর্শ দেখাইয়া তাহাকে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা হয় নাই। ভারতীয় ধর্ম্ম, উৎকর্ষ ও সভ্যতা, স্বার্থান্বেষী ধর্ম্মান্ধ কাণ্ডাকাণ্ডহীন গোঁড়া অর্দ্ধ-শিক্ষিত প্রচারকের দ্বারা দেশ-বিদেশে বিস্তার লাভ করে নাই। হিন্দু প্রচারকগণ মানবজাতির কল্যাণের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বিজাতীয়দের মধ্যে বাস করিয়া, তাহাদের আচার-ব্যবহার গ্রহণ করিয়া, দেশী-বিদেশীর মধ্যে ব্যবধান মুছিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারা ধর্ম্মপ্রচারের অজুহাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা বা বাণিজ্য-বিস্তারের উপায় অনুসন্ধান করেন নাই, তাঁহারা রাজশক্তির সাহায্যে বা পৃষ্ঠপোষকতায় অর্দ্ধ-সভ্য বা বর্ব্বরজাতির ধ্বংসসাধন করিয়া স্বদেশে ধনাগমের পথ পরিষ্কৃত করেন নাই। তাঁহারা জ্ঞানের প্রদীপ হস্তে করিয়া, বিদেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, অমৃতের সন্ধান দিয়া বিদেশীগণের জ্ঞানলিপ্সা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, তাহাদের মোহান্ধকার দূর করিয়া নূতন আলোকের ছটায় তাহাদিগকে মোহিত করিয়াছিলেন, জ্ঞানের সুধাভাণ্ড হস্তে লইয়া, জগৎবাসীকে এক নূতন আদর্শের উচ্চভাবে অনুপ্রাণিত ও উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছিলেন। কাহাকেও হীন মনে না করিয়া, জাতি-নির্ব্বিশেষে সাম্য ও মৈত্রী প্রচার করিয়া প্রাচীন সভ্যজগতের অর্দ্ধাংশে বিশ্বপ্রেম ও মহামানবতার উচ্চ আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন।

শ্রীহরিসাধন ঘোষাল।

জীবন-সংগ্রাম

চলে গেছে দিন, সে দিন যে দিন যৌবনে ছিল ভরা,
মন্দ এলেও ভালর আলোতে উজলিত এই ধরা।
প্রমাদ পরশে বয়ে যেত দিন,
ধিন তা ধিন তাধিন তাধিন,
তব্‌লার বোলে আপনার তালে নেচেছিল এই প্রাণ;
বিশ্বমাঝারে প্রতিদানসুরে গাহিত কতই গান।

স্তবকে স্তবকে কুঞ্জমাঝে ফুটিত কত যে ফুল,
আবেশ বশে সে সব হেরিয়া করেছি কত না ভুল।
ভাবনদী-স্রোতে উজান বাহিয়া,
আশার ছলনে চাহিয়া চাহিয়া,
জীবনের শেষে সকল হারায়ে এসেছি অনেক দূর,
হয় ত আমার হইবে এবার সকল দর্প চূর।

দেহের শকতি নয়ন-জ্যোতিঃ হতেছে লুপ্ত-প্রায়,
মরণ বুঝি বা শিয়রে দাঁড়ায়ে যদি হয় নাহি ভয়।
শুধু মনে হয় কোথায় তাহারা,
সহযোগিরূপে এসেছিল যারা,
চলে গেল তারা আপনার পথে লভিতে শান্তিধারা,
কেহ বা আবার সাগরের বুকে হাবুডুবু খেয়ে সারা।

নীল আকাশের চন্দ্রাতপ-তলে গাজনের ঢাক বাজে,
বধির কর্ণে মহা গোলযোগে রয়েছে যে যার কাযে;
শিবের দেউলে বৎসর শেষে—
সাজায়ে আমারে সন্ন্যাসীবেশে—
সকলে মিলিয়া বাণ-ফোঁড়া করে চড়ক গাছেতে তোলে,
উৎসব মাঝে যাতনা সহিয়া আমিও রয়েছি ভুলে।

শূন্যেতে ঝুলে পুণ্য লভেছি সবারই ধারণা এই,
জগৎ-মাঝারে আপন বলিতে খুঁজে দেখি কেহ নেই।
কোলাহল ভরা স্বার্থ মেলায়,
অবিরত পাক দিতেছে আমায়,
এততেও তবু হৃদি-মন্দিরে রয়েছে জগৎস্বামী—
বিরূপাক্ষের লক্ষ্য হইতে বঞ্চিত নহি আমি।

শ্রীশ্যামলাল চক্রবর্ত্তী।

গোলাপ শিল্প

যদিও অধিকাংশ জাতীয় গোলাপ পারস্য ও আফগানিস্থানের পথ দিয়া কোন অতীত যুগে ভারতে উপনীত হইয়াছিল, তথাপি ইহা ধারণা করা ভুল যে, ভারতের নিজস্ব কোন গোলাপ জাতি নাই! বস্তুতঃ পূর্ব্ব হিমালয়ের কয়েকটি গোলাপ ভারতের আদিম অধিবাসী বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু পারসীক কবিগণ গোলাপের রূপে ও গুণে মুগ্ধ হইয়া যেরূপ উচ্ছ্বলিত ভাষায় উহার মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেরূপ বর্ণনা কোন পুরাণে হিন্দু কবির গ্রন্থে দেখা যায় না বলিয়া বোধ হয় যে, ভারতে গোলাপের বহু বিস্তৃত চাষ অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে গুজরাটে অল্পবিস্তর পরিমাণে গোলাপ উৎপাদিত হইত; তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়। বাবর, জাহাঙ্গীর প্রভৃতি মোগল সম্রাটগণ এ দেশে নানা উৎকৃষ্ট জাতীয় গোলাপের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ফলতঃ মোগলরাজত্বকালেই এতদ্দেশে প্রথমে ব্যবসায়িক হিসাবে গোলাপ চাষ আরম্ভ হয়।

গোলাপের ব্যবসায়িক জাতিসমূহ

কাটা ফুল বিক্রয়ের জন্য কলিকাতা ও অন্যান্য বড় বড় সহরের নিকটবর্ত্তী স্থানে বহুবিধ বিদেশীয় গোলাপ উৎপাদিত হইয়া থাকে। কলিকাতার বাজারে এমন কি মধুপুর, মিহিজাম প্রভৃতি দূরবর্ত্তী স্থান হইতেও শীতকালে কাটা ফুল আইসে। কাটা ফুলের ব্যবসায়ে লাভও মন্দ নহে; কিন্তু উহা আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে। যে জাতীয় গোলাপ হইতে আতর, গোলাপ জল, গোলাপ কুড়ি, পাপড়ি প্রভৃতি উৎপাদিত হয়, সেই গুলিকেই প্রকৃত পক্ষে ব্যবসায়ের গোলাপ বলিতে পারা যায়। [illegible] গোলাপের মধ্যে পাঁচটি প্রধান :—

১। [illegible]a damascena :—ড্যামাস্ক অথবা বসরা গোলাপ। বর্ণ লোহিত। ভারত ব্যতীত পূর্ব্ব তুর্কী, বুলগেরিয়া, মিশর ও পারস্যে ইহার চাষ হয়। আতর ও গোলাপ জল প্রস্তুতের জন্য এই জাতিই প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পঞ্চনদে হোসিয়ারপুর জিলায় এবং লাহোর ও অমৃতসহরের নিকটবর্ত্তী স্থানে; যুক্তপ্রদেশের আলিগড়, কানপুর ও গাজিপুরে এবং বিহারের দুই এক স্থানে বসরা গোলাপের চাষ আছে। কিন্তু দুই শতাব্দীর অধিক কাল হইতেও গাজিপুরই ভারতে গোলাপ-উৎপাদন কেন্দ্রসমূহের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

২। R. moschata ;—ইহাকে মস্ক অথবা মৃগনাভি গন্ধযুক্ত গোলাপ বলে। বর্ণ শ্বেত। উত্তর পশ্চিম হিমালয়ে ইহার বন্য লতানিয়া গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। 'ফুল কুজো' নামে ইহার কুড়ি সংগৃহীত হইয়া বাজারে অল্প বিস্তর পরিমাণে বিক্রয় হয়। বুলগেরিয়ার প্রসিদ্ধ ক্ষেত্রে ড্যামাস্ক গোলাপ ব্যতীত মস্ক গোলাপেরও চাষ হয়। প্রথমোক্তের তুলনায় ইহাতে অর্দ্ধেক পরিমাণে আতর পাওয়া গেলেও, ইহা খুব কষ্টসহ জাতি বলিয়া নিকৃষ্ট জমির পক্ষে উপযুক্ত।

৩। R. centifolia :—শতদল গোলাপ। বর্ণ রক্তাভ। পূর্ণ প্রস্ফুটিত ফুল হইতে দল সংগৃহীত হয়। ভারতে বহু কাল হইতে ইহা উৎপাদিত হইয়া আসিতেছে। পারস্য দেশে ইহা হইতেই আতর ও গোলাপ জল প্রস্তুত হয়।

৪। R. gallica :—রক্ত গোলাপ। দক্ষিণ ফ্রান্সই এই জাতীয় গোলাপ চাষের প্রধান কেন্দ্র। বর্ণ গাঢ় বেগুনি আভাযুক্ত লোহিত। কুঁড়ি হইতে বৃতি ও ফিকে রঙ্গের দল ছাটিয়া ফেলিয়া শুষ্ক করা হয়। ইহাই বিলাতী গোলাপ কুড়ি

৫। জঙ্গলী গোলাপ—ভারতে পূর্ব্ব ও পশ্চিম হিমালয়ে কতিপয় জাতীয় গোলাপ দৃষ্ট হয়। পূর্ব্ব হিমালয়ের গোলাপ আকারে বড় হইলেও ফুলে তেমন গন্ধ নাই পশ্চিম হিমালয়ের সুগন্ধযুক্ত গোলাপসমূহের মধ্যে পূ[illegible] বর্ণিত R. moschata ভিন্ন দেরাদুনের R. multiflora

শিমলা পাহাড়ের ও শিরমুর বা বাঘাট এবং পাতিয়ালা রাজ্যের R. microphylla ও R. sericea এবং কাশ্মীরের R. webbiana বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। এই সমুদয় গোলাপ গ্রীষ্ম ও বর্ষায় পর্ব্বতগাত্রে ও বনমধ্যে এত অধিক পরিমাণে জন্মিয়া থাকে যে, দূর হইতে গিরিরাজি ও বনশ্রেণী এক একটি বিশাল গোলাপকুঞ্জ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ইহাদের গুণাগুণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান অথবা সদ্ব্যবহার এ পর্য্যন্ত হয় নাই।

গাজীপুর ক্ষেত্র

ভারতের গোলাপ শিল্পের কথা বলিতে গেলে উহার প্রধান কেন্দ্র গাজীপুর সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। কাশী হইতে কয়েক মাইল দূরে গঙ্গার উত্তর তীরে অবস্থিত গাজীপুর ক্ষুদ্র সহর হইলেও চতুঃপার্শ্বস্থ সুবিস্তৃত গোলাপ উদ্যানসমূহ উহাকে সৌন্দর্য্য মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে। ক্ষেত্রগুলি সব এক আকারের নয়, কিন্তু চাষ-প্রণালী একই রূপ। গাজীপুর ক্ষেত্র সম্বন্ধে অঙ্কাদি সমন্বিত কোন সঠিক আধুনিক বিবরণ প্রকাশিত হয় নাই। কিছুদিন পূর্ব্বের বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায় যে, ক্ষেত্রস্বামিগণ জমির জন্য ৫৲ টাকা সেলামি ও ২৫৲ টাকা খাজনা বিঘা প্রতি লইয়া আতরওয়ালাগণকে বিলি করেন। প্রতি বিঘায় ন্যূনাধিক এক হাজার গোলাপ ঝাড় থাকে; চাষের খরচ ৮ হইতে ১০ টাকা; ১ বিঘায় প্রায় ১ লক্ষ গোলাপ হয়; গুণানুসারে উহার মূল্য ৪০ হইতে ৭০ টাকা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। চৈত্র বৈশাখ মাস ফুল ফুটিবার সময়; তৎকালে আতরওয়ালাগণ চোলাই যন্ত্রাদি সহ দলে দলে গোলাপ ক্ষেত্রে উপস্থিত হয় এবং নিজ নিজ পছন্দমত ক্ষেত্র জমা লয়। চোলাই যন্ত্র সেকেলে ধরণের; তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন; সুতরাং বর্ণনা অনাবশ্যক। গোলাপজল উপর্য্যুপরি দুইবার চোলাই করিয়া বড় বড় কাচের পাত্রে পূর্ণ করা হয়। পাত্রগুলি কয়েক দিন রৌদ্রে রাখিলে গন্ধ পরিপক্ব হইয়া থাকে। পরে পাত্রের মুখে তুলা ও তদুপরি কর্দ্দম দিয়া বন্ধ করিয়া আতরওয়ালাগণ পাত্রসমূহ স্থানান্তরিত করে।

আতর প্রস্তুতের জন্য এক একটি বিস্তৃত অগভীর ধাতব পাত্রে গোলাপজল ঢালিয়া, মৃত্তিকার পাত্রের অনুরূপ একটি গর্ত্ত করিয়া ও উহার তলদেশ জলে ভিজাইয়া পাত্র উক্ত গর্ত্তে রাখিয়া দেওয়া হয়। ধূলা প্রভৃতি যাহাতে না পড়ে, তজ্জন্য আর্দ্র মখমল খণ্ড পাত্রের উপর চাপা থাকে। সমস্ত রাত্রি এইরূপ ভাবে থাকিলে সকালে গোলাপ জলের উপর একটি পাতলা তৈল-স্তর দেখা দেয়। উহা তুলিয়া শিশিতে রাখা হয়। প্রথম ২।৪ দিনের গোলাপ জল অপেক্ষা পরের চোলাই জলে অধিক আতর পাওয়া যায়। এ স্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে, ১ লক্ষ গোলাপের ওজন কিছু কম সওয়া এক মণ এবং উহা হইতে ২ তোলা আতর ও ১ শত বোতল গোলাপ জল পাওয়া যায়। জল, চন্দনের তৈল, খনিজ তৈল ইত্যাদির সহিত মিশ্রিত হয় বলিয়া গাজীপুরের আতর খুব কম সময়েই বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়।

বুলগেরিয়া ক্ষেত্র

বুলগেরিয়া অথবা বল্কান প্রদেশে গোলাপ চাষ এবং চোলাই প্রথা ভারতাপেক্ষা যে খুব বেশী উন্নত, তাহা বলিতে পারা যায় না। কিন্তু উক্ত প্রদেশের জল, বায়ু ও মৃত্তিকা গোলাপ উৎপাদনের পক্ষে স্বভাবত উপযোগী। বুলগেরিয়ার গোলাপ ক্ষেত্রসমূহ মূল বলকান্ গিরিশ্রেণীর পাদদেশে দক্ষিণাভিমুখে অবস্থিত। সমগ্র গোলাপ চাষের অঞ্চল ১ শত ২৫ মাইল লম্বা ও ৭—১৫ মাইল প্রশস্ত হইবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীসমূহ এই অঞ্চলে জল-সেচের সহায়তা করে। এক একটি ক্ষেত্রের আয়তন প্রায় ৫০ বিঘা। কৃষকগণই এই সকল ক্ষেত্রের অধিকারী। আবশ্যক খাদ্যশস্যের জমি বাদ দিয়া, অবশিষ্ট প্রায় সমস্ত আবাদী জমিই গোলাপ চাষে নিয়োগ করা হইয়া থাকে। ফুল প্রস্ফুটিত হইলে অতি প্রত্যুষে স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাগণ ফুল সংগ্রহ করিয়া চোলাই কারখানায় লইয়া যায়। চোলাই যন্ত্রসমূহ নদীর ধারে বসান হয় এবং এগুলি ভারতের ন্যায়ই পুরাতন ধরণের। ফুল তুলিবার সময় আকাশ ঈষৎ মেঘাচ্ছন্ন ও বায়ু শীতল থাকিলে ফুলে আতরের মাত্রা অধিক হয়। গোলাপ চাষের জন্য বুলগেরিয়ার নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলি সুপ্রসিদ্ধ। ফিলিপোপোলিস্, ষটায়া জাগোরা, কাজানলিক্, কারলোভা এবং ক্লিসৌরা।

বুলগেরিয়া অঞ্চলে প্রতি বৎসর ৩॥০ হইতে ৪॥০ কোটি পাউণ্ড গোলাপ উৎপাদিত হয়। ২ শত ফুলের ওজন প্রায়

১ পাউণ্ড। এক একর (৩ বিঘা) জমিতে ২৫০০—৪০০০ পাঃ গোলাপ জন্মান অসম্ভব নহে। গড়পড়তা হিসাবে দেখা যায় যে, বুলগেরিয়ায় ৩ হাজার পাঃ ফুল হইতে ১ পাঃ আতর নিষ্কাশিত হয়। ১ ফোঁটা আতর প্রায় ৩০টি ফুলের গন্ধসার।

গোলাপজাত দ্রব্যাদি

গোলাপের আতর অথবা বিশুদ্ধ বায়ী তৈল অর্দ্ধতরল, দানাদার, পীতাভ দ্রব্য। তুর্কী রাজত্বের সময় বুলগেরিয়ায় গোলাপের আতরের সহিত সচরাচর জিরানিয়ম্ তৈল ভেজাল দেওয়া হইত। এখন উক্ত প্রথা রহিত হইয়া গিয়াছে। তথাপি বাজারের আতরে নানা প্রকারের দ্রব্য সংমিশ্রিত থাকে। আতরের ন্যায় বহুমূল্য দ্রব্যে এরূপ সংমিশ্রণ অবশ্যম্ভাবী। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বুলগেরিয়া পৃথিবীর মধ্যে আতর উৎপাদনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। এখান হইতে ফ্রান্স, জার্ম্মাণী, ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে আতর চালান যায় এবং লণ্ডন বন্দর দিয়া কতক মাত্রায় ভারতেও আইসে। জগতের গন্ধশিল্পের সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্র গ্রাসেঁই (Grasse) কিন্তু আতরের সমধিক কাট্‌তির স্থান।

য়ুরোপীয় ব্যবসায়ের প্রায় সমস্ত গোলাপজলই ফ্রান্সদেশে প্রস্তুত হয়। ফ্রান্সে তদুদ্দেশ্যে যথেষ্ট মাত্রায় গোলাপ উৎপাদিত হইয়া থাকে। এক গ্রাসেঁ কেন্দ্রেই গোলাপ ফসলের পরিমাণ ৩৩ লক্ষ পাউণ্ডের উপর। তদ্ভিন্ন দক্ষিণ-ফ্রান্সে অন্যান্য কেন্দ্রও আছে। চাষের জাতিসমূহে শ্বেত গোলাপের অনুপাত খুবই কম। লিপ্‌জিগ্‌ সহরের শিমেল কোম্পানী বৎসরে প্রায় ৫ লক্ষ পাউণ্ড গোলাপ ফুল চোলাই করিয়া থাকেন। জার্ম্মাণীর এই প্রসিদ্ধ কারখানার সমতুল্য না হইলেও এরূপ কারখানা জার্ম্মাণী এবং ইটালীতে আরও কয়েকটি আছে। পাপড়ি ও কুঁড়ির জন্য দক্ষিণ-য়ুরোপে অনেক স্থলে গোলাপ চাষ হয়। বস্তুতঃ য়ুরোপে যেরূপ বহুল পরিমাণে গোলাপ উৎপাদিত হইয়া থাকে, ভারতে তাহার তুলনায় কিছুই হয় না।

ভারতে যে আতর, গোলাপ জল, পাপড়ি ও কুঁড়ি উৎপাদিত হয়, তাহা দেশমধ্যেই কাটিয়া যায়। বিদেশে চালান দেওয়ার মত কিছুই থাকে না। বরং পারস্য উপসাগরের বন্দরসমূহ হইতে কিয়ৎপরিমাণে গোলাপজল এবং য়ুরোপ হইতে গোলাপের বায়ী তৈল অল্পবিস্তর পরিমাণে আমদানী হয়। সুরাঘটিত গন্ধসারসমূহ ব্যবহারের বৃদ্ধির সহিত আসল ও নকল উভয় প্রকারের গোলাপ তৈলের ব্যবহার ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। গোলাপজাত দ্রব্যাদির দরের অনেক উঠতি পড়তি হয়; তবুও সাধারণভাবে ইহা বলিতে পারা যায় যে, দর কখনও এত কম হয় না যে, গোলাপ চাষ করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়।

শিল্প-সংগঠন

ভারতের গোলাপ-শিল্প এখন যে অবস্থায় আছে, তাহা হইতে বড় বেশী সুফল আশা করিতে পারা যায় না। পঞ্চনদ, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, উত্তরবঙ্গ ও দাক্ষিণাত্যে ব্যবসায়িক হিসাবে গোলাপ উৎপাদনের উপযুক্ত ক্ষেত্রের অভাব নাই। কিন্তু এ পর্য্যন্ত বড় বড় গোলাপ বাগিচা সৃষ্টির কোন চেষ্টাই হয় নাই। যে সকল গোলাপ চাষ বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, সে সকল স্থলেও উৎকৃষ্ট জাতি-নির্ব্বাচন ও চাষপ্রণালীর উন্নতি-সাধনের জন্য অতি অল্প লোকই আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। দুই চারিটি ক্ষুদ্র পরীক্ষা হইতে কিন্তু স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতি অনুসরণ করিলে অল্পদিনের মধ্যেই দেশীয় গোলাপে বায়ী তৈলের মাত্রা বৃদ্ধি করিতে পারা যায়। যুক্তপ্রদেশে আলিগড় জিলায় সার ও জলপ্রয়োগ দ্বারা যে গোলাপ উৎপাদিত হইয়াছে, তাহা কাণপুর ও গাজীপুরের গোলাপ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। দূরবর্ত্তী স্থান হইতে চোলাইর কারখানায় ফুল আনিতে হইলে, কিংবা এক সঙ্গে অধিক ফুল চোলাই করিতে না পারিলে, সাধারণ লবণ দ্বারা ফুলকে যে ৩।৪ দিন অবিকৃত অবস্থায় রাখিতে পারা যায়, তাহাও দেখা গিয়াছে। আলিগড়ের গোলাপে শতকরা ০·০৪৫ ভাগ হইতে ০·০২৫ ভাগ বায়ী-তৈল পাওয়া গিয়াছে। গড়ে ০·০১৫ ভাগ বলিয়া ধরিতে পারা যায়। কিন্তু উক্ত মাত্রা বুলগেরিয়ার তুলনায় অত্যন্ত কম।

গাজীপুর ক্ষেত্রের উন্নতি-সাধনের জন্য যে সরকারী চেষ্টা হইয়াছে, তাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, আধুনিক ধরণের চোলাই যন্ত্র ব্যবহার করিলে কিছু অধিক পরিমাণে তৈল-নিষ্কাশন করিতে পারা যায়। কিন্তু উহার মাত্রা

অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে হইলে প্রথমতঃ ফুলেরই উন্নতি-সাধন আবশ্যক। বিনা নির্ব্বাচনে একই জাতি বহু বৎসর ধরিয়া চাষ করিলে উহা যে অধোগতি প্রাপ্ত হইবে, তাহা নিঃসন্দেহ। এখন প্রধান ও প্রথম আবশ্যক কার্য্য এই যে, পঞ্চনদ ও যুক্তপ্রদেশে যে সমুদয় গোলাপ জাতি হইতে আতর ও গোলাপজল প্রস্তুত হয়, সেগুলিকে বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ করিয়া সঠিক জাতি নির্দ্ধারণ এবং উক্ত জাতি সমষ্টির সংমিশ্রণ অথবা পৃথক্ করণ দ্বারা কোন উৎকৃষ্টতর জাতি পাওয়া যাইতে পারে কি না, পরীক্ষা করিয়া দেখা। দক্ষিণ-য়ুরোপের উৎকৃষ্ট জাতিসমূহও এতদ্দেশে প্রবর্ত্তনের চেষ্টা সঙ্গে সঙ্গে চলিতে পারে।

বন্য গোলাপসমূহের সদ্ব্যবহার গোলাপ-শিল্পের প্রসার বৃদ্ধি করার আর একটি উপায়। স্পেন, ইটালী ও ফ্রান্সে ফুলের সময় এক এক দল লোক সহজ-বহনযোগ্য চোলাই যন্ত্র লইয়া পর্ব্বতে পর্ব্বতে ঘুরিয়া বেড়ায়; এবং যেখানে অধিক মাত্রায় উৎকৃষ্ট ফুল পায়, সেখানেই যন্ত্র খাটাইয়া গন্ধ নিষ্কাশন করিয়া লয়। এইরূপ যন্ত্র লইয়া সিমলা পাহাড় হইতে আরম্ভ করিয়া কাশ্মীর পর্য্যন্ত নানা স্থানে গন্ধ সংগ্রহ করা চলে। এরূপ অবস্থায় প্রথম চোলাইর তৈল যে খুব খাঁটি হইবে না, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু বড় কারখানাসমূহে উক্ত অবিশুদ্ধ তৈল অনায়াসে শোধিত হইতে পারে। অন্যান্য দেশে বিশেষ বিশেষ ফসল উৎপাদনকারিগণের এক একটি কেন্দ্রীয় সমিতি আছে, যথা—ইতালীর Lemon Growers' Association. বিভিন্ন বাগিচাসমূহ যত দূরেই অবস্থিত হউক না কেন, কেন্দ্রীয় সমিতির সাহায্যে উহারা পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ অটুট রাখিতে পারে এবং চাষ-প্রণালী, উৎপাদন ও বিক্রয় সম্বন্ধেও যথাসম্ভব একতা রক্ষা করিতে পারে। ভারতের গোলাপ শিল্পের মূলেও উক্ত প্রকার একটি কেন্দ্রীয় সমিতি থাকা প্রয়োজনীয়। নচেৎ ধারাবাহিক কার্য্য অথবা উন্নতি সম্ভবপর হইবে না। সমবায় প্রথায় কার্য্য করিতে এতদ্দেশের লোক ক্রমশঃ যেরূপ অভ্যস্ত হইয়াছে, তাহাতে আশা করিতে পারা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে গোলাপ উৎপাদনকারীরা এইরূপ প্রথার সুবিধা গ্রহণ করিতে বিস্মৃত হইবেন না। বহু বৎসরের চেষ্টার ফলে মহীশূর রাজ্য চন্দন তৈল দেশমধ্যে উৎপাদন করিয়া, জগতের চন্দন তৈলের বাজারে যেরূপ আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে, তাহা গন্ধ-শিল্পের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। আশা করা যায় যে, উক্ত দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া ভারতবাসী গোলাপ শিল্পকেও দৃঢ়রূপে দেশমধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিবেন।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

মুক্তি-বন্দনা

রুদ্ধ-কারার পাষাণ-প্রাচীর শাসন-নিগড় ভাঙ্গিয়া আজ
ফিরিয়া কি এলে হে বঙ্গবীর খুলেছ কি প্রিয় যুদ্ধ-সাজ ?
রণশ্রান্ত ব্যথিত অঙ্গে সুরভি-শিকর কোমল পাণি
জুড়াল বুলায়ে জননী গঙ্গে বিটপী-ব্যজনে প্রকৃতিরাণী ?
ফুটিল কি হাসি মুক্তি-প্রভাতে মুগ্ধ নয়নে ও'মুখে চেয়ে
প্রার্থনা সবে করে জোড় হাতে তোমারে আবার ফিরায়ে পেয়ে।

সাধনা-সাধ্য-সিদ্ধি-দুয়ার নব রবিকরে খুলিবে আজ ?
স্থির-কৌশলে মানাবে কি হার অবুত অস্ত্র, অবুত লাজ ?
বিশ্বের প্রেমে আক্রোশ ভুলি একতায় গড়ি সিংহাসন
ভায়ে ভায়ে আজ হবে কোলাকুলি পাবে সম্মান যোগ্যজন ?
"বড়" বড় ব'লে হবে কি পূজ্য সম্প্রদায়ের যাবে বিরোধ ?
ভারতের ত্যাগে, ভারত-সূর্য্য গ্রামে গ্রামে হবে স্বরাজ-বোধ ?

সাধনা-লব্ধ অর্দ্ধ জীবন কারায় বিগত, এ ব্যথা বাজে !
তবু সান্ত্বনা—শাস্তিতে মন ছিল আরাধন, ধ্যানের মাঝে।
লুপ্ত গরিমা হলদিঘাটের ছত্রপতির মহিমালোক—
মেবার, চিতোর, রাজ্যপাটের প্রতাপ, পৃথ্বী পুণ্যশ্লোক !
—পুরাতন যত গৌরব-রবি নূতন আলোকে উজলকর
উদয়-গিরির বিজয়-তোরণে নব রাণা ভীমে মানসে বর।

ফেলি পুরাতন সমরসজ্জা নব-বেশে সাজ শূর-প্রতীক
সত্য, সাহসে, অস্থি, মজ্জা, আয়ু, আরোগ্য, ভরিয়া নিক্ !

শ্রীমতী লীলা দেবী।

অমরনাথ

৯

কয়েক দিন পরে একদা পার্ব্বতী দেবী, জামাইকে লম্বা চওড়া নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। নিমন্ত্রিতের তালিকাভুক্ত ছিলেন অমরনাথ আর ছেলেমেয়ে দুইটি। সহসা এতবড় নিমন্ত্রণের উদ্দেশ্য কেহ বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না, কিন্তু আমরা পার্ব্বতীর মনের ভিতর উঁকি মারিয়া দেখিয়াছি; দেখিয়া বুঝিয়াছি, লতাকে চাক্ষুষ করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে না পারিয়া তিনি এত বড় নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। লতাকে একা আসিতে বলিলে, হয় ত তাহার আসা ঘটিবে না; তাহা' ছাড়া তাঁহার উদ্দেশ্য প্রকাশ হইয়া পড়িবারও আশঙ্কা থাকিবে। অতঃপর কন্যা শোভার সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি জামাতার বন্ধুকেও নিমন্ত্রণ করিলেন। অমরনাথের ইচ্ছা ছিল না নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে, কিন্তু বন্ধুর অনুরোধে আর ভাগ্যদেবীর বিধানে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ স্বীকার করিতে হইল। বন্দোবস্ত হইল, তাঁহারা নরু-লতাকে লইয়া সরাসর মোটরে যাইবেন। কৃষ্ণনাথ সচরাচর শ্বশুরালয়ে মোটরেই যাতায়াত করিতেন; সাত ক্রোশ পথ বই ত নয়। বেলা নয়টা বাজিতে না বাজিতে তাঁহারা রওনা হইয়া পড়িলেন।

চন্দননগর অতিক্রম করিয়া যে পথ গঙ্গার ধার দিয়া কলিকাতা অভিমুখে গিয়াছে, সে পথ গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড নামে ইতিহাসে পরিচিত। কৃষ্ণনাথ প্রভৃতিকে লইয়া মোটর যখন এই প্রশস্ত পথে কোন্নগর ছাড়াইয়া উত্তরপাড়ার নিকটবর্ত্তী হইল, তখন এক দুর্ঘটনা ঘটিল। কোন্নগর হইতে উত্তরপাড়ার দিকে একখানি ভাল ব্রুহাম গাড়ী আসিতেছিল। শকটে যে অশ্বিনী সংযোজিত ছিল, সে বড় তেজস্বিনী; চালক বিপুল শক্তি ও কৌশলে তাহাকে দমন করিয়া রাখিতেছিল, কিন্তু মোটরগাড়ী যখন পশ্চাদ্দিক হইতে আসিয়া বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে অশ্বিনীকে অতিক্রম করিয়া চলিল, তখন সে আর 'রাশ' মানিল না—চারি পা তুলিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। মোটর দেখিয়া হউক, অথবা যে কারণেই হউক, অশ্বিনী ভয় পাইয়া দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিল। অমরনাথ পিছন ফিরিয়া দেখিলেন, ঘোড়া মহাবেগে ছুটিয়া আসিতেছে। শকটের আরোহী, চালক, সহিস সকলেই চীৎকার করিতেছে—ঘোড়া আরও ভয় পাইয়া উন্মত্তের ন্যায় ছুটিতে লাগিল। অমরনাথ মোটর থামাইয়া গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং দৃঢ়পদে ঘোড়ার পথের উপর দাঁড়াইলেন। ঘোড়া মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইল; অমরনাথ একটু ঝুঁকিয়া এক হাতে তাহার নাক, আর এক হাতে তার মুখের লাগাম বিপুল শক্তিতে ধরিলেন। ঘোড়া অনেক লাফালাফি করিল, কিন্তু অমরনাথের কবল হইতে কিছুতেই আপনাকে মুক্ত করিতে পারিল না। যখন সে ক্লান্ত হইয়া পড়িল, তখন স্থির হইয়া দাঁড়াইল। সহিস আসিয়া ঘোড়ার পিঠ চাপড়াইতে লাগিল। ইত্যবসরে কৃষ্ণনাথ নামিয়া আসিয়া ঘোড়ার বাঁধন খুলিয়া দিলেন। ঘোড়া তখন শান্ত হইয়া দাঁড়াইল।

গাড়ীতে আরোহী ছিলেন দুই জন। দুই জনই স্ত্রীলোক—এক জন প্রৌঢ়া, অপরা কিশোরী। উভয়েই বহুমূল্য বস্ত্র-অলঙ্কারে ভূষিতা। গাড়ী হইতে তাঁহারা নামিতেই কৃষ্ণনাথ বলিয়া উঠিলেন, "এ কি, মাসী-মা যে! এ কি, রেবা! তোমরা কোথা যাচ্ছিলে?"

প্রৌঢ়া উত্তর করিলেন, "জামাই—তুমি? আঃ, বাঁচলুম। দিদি আমাদের নেমন্তন্ন করেছেন, তাই যাচ্ছিলাম। পথে আমাদের কি বিপদ্! তুমি রক্ষে না করলে প্রাণটা গিছল আর কি। বেঁচে থাকো বাবা।"

কিশোরী রেবা কহিল, "মা মা, বাঁড়ুয্যে মশাই কিছু

করে নি; ওই যে ভদ্রলোকটি ঘোড়াকে নিয়ে বেড়াচ্ছেন তার আদর কর্‌ছেন, উনিই আমাদের র'ক্ষে করেছেন। মানুষের গায় এত বল থাক্‌তে পারে, আমি তা জানতাম না।"

কৃষ্ণ। অমরের দেহে অসীম শক্তি; সে দিন দু'জন মানুষকে পিঠে ফেলে গঙ্গাগর্ভ হ'তে টেনে এনেছিল। তাঁদের নৌকো ঝড়ে ডুবে গিছল—একে অন্ধকার, তা'তে আবার ভয়ানক ঝড়বৃষ্টি—

রেবা। তাঁরা রক্ষে পেয়েছেন?

কৃষ্ণ। অনেক কষ্টে। আমি সেই সময় গিয়ে পড়েছিলাম। গিয়ে দেখি, অমর আর তার বোন লতা—ওই যে ছোট মেয়েটি গাড়ীতে ব'সে রয়েছে—ওরা নিজেদের বিছানায় বিপন্ন লোকদুটিকে শুইয়ে শুশ্রূষা কর্‌ছে। সূর্য্য উঠতে না উঠতেই তাঁরা চোখ চাইলেন।

রেবা। তাঁরা ভদ্রলোক?

কৃষ্ণ। বেশ ভদ্র—জমীদার—শিক্ষিত!

রেবা। কোথা তাঁরা ডুবেছিলেন?

কৃষ্ণ। রাজমহলের গঙ্গায়; সেখানকার গঙ্গা খুব চওড়া—এর চেয়ে ঢের বড়।

প্রৌঢ়া। তোমার বন্ধুটির বাড়ী কোথা?

কৃষ্ণ। এখন বাড়ী রাজমহলে, আগে ছিল হুগলীতে।

প্রৌঢ়া। মেয়েছেলে নিয়ে রাজমহলে থাকেন?

কৃষ্ণ। অমর আজও বিয়ে করেনি। বাপ-মা নেই, থাকবার মধ্যে ওই ছোট বোনটি।

প্রৌঢ়া। সে কি! বিয়ের বয়স ত হয়েছে।

কৃষ্ণ। বয়েস আর বেশী কি হবে—ছাব্বিশ সাতাশ হ'তে পারে। সব ক'টা পরীক্ষা দিয়েছে, আর সব তাতেই ফার্ষ্ট হয়েছে।

প্রৌঢ়া। বেশ ছেলে ত; যেমন রূপ তেমনই গুণ! কি জাত?

কৃষ্ণ। ব্রাহ্মণ—চাটুয্যে।

প্রৌঢ়া সর্ব্বাণী অন্যমনস্ক হইলেন। তাঁহার অবিবাহিতা কন্যা রেবার জন্য পাত্রানুসন্ধান চলিতেছিল, কিন্তু কোন পাত্রই তাঁহার পছন্দ হয় নাই। এই পাত্রটি বড় ভাল লাগিল। জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছেলেটির স্বভাব-চরিত্র কেমন?"

কৃষ্ণ। অতি নির্ম্মল। মানুষের মধ্যে যদি কেহ নিষ্পাপ ও নির্ম্মল থাকে, তবে অমরনাথই আছে। মুনি-ঋষিদের চেয়ে আমি একে শ্রদ্ধা করি। এখন আপনি রেবাকে নিয়ে মোটরে উঠুন।

সর্ব্বাণী। আমাদের ধরবে?

দূর হইতে অমর কহিলেন, "কৃষ্ণ, তোমরা মোটরে যাও; আমি ঘোড়া জুতে গাড়ী নিয়ে পিছনে যাচ্ছি।"

কৃষ্ণ। তুমি আবার ওই ঘোড়া জুতবে?

অম। আমার সঙ্গে ঘোড়ার ভাব হ'য়ে গেছে, আর কোন দুষ্টুমি করবে না।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে অমর ঘোড়া হাঁকাইয়া লইয়া চলিলেন। যখন তিনি হরনাথের দ্বারে আসিয়া গাড়ী থামাইলেন, তখন তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে অনেকেই দ্বারে দণ্ডায়মান ছিলেন। লতা প্রথমে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা, তোমার হাতে লেগেছে?"

অমর হাসিয়া উত্তর করিলেন, "লাগবে কেন, লতি?"

নরু জিজ্ঞাসা করিল, "ঘোড়াটা আর দুষ্টুমি করেছিল, কাকাবাবু?"

অম। না।

নরু। বাবা কি ঘোড়া! এর চেয়ে মোটর ভাল, সে কখন ক্ষেপে না।

১০

ঘটনাটি সামান্য হইলেও অন্দরমহলে তাহার আলোচনা অতি গুরুতরভাবে চলিতেছিল। গৃহিণী পার্ব্বতীর বড় ঘরে মস্ত এক মজলিস বসিয়াছিল। তথায় রেবা প্রধান বক্তার স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। শোভাময়ী, রূপময়ী প্রভৃতি আড়ষ্ট হইয়া ঘটনার কথা শুনিতেছিলেন। তাঁহাদের জীবনে এরূপ ঘটনার নায়িকা হইবার সুযোগ কখন আসে নাই; সে জন্য তাঁহাদের আক্ষেপ জন্মিতেছিল বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিয়া ঘটনার সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম তত্ত্বটিও জানিয়া লইতেছিলেন। রেবাসুন্দরী ভাবে উন্মত্ত হইয়া অনর্গল বকিয়া যাইতেছিলেন। কখন বলিতেছিলেন, "মোটর থামিয়ে অমর বাবু লাফিয়ে পড়লেন"; কখন বলিতেছিলেন, "মোটর চলছিল, অমর বাবু লাফিয়ে পড়ে একেবারে ঘোড়ার মুখ ধরলেন।"

শোভা। ঘোড়া যদি কামড়ে নিত, বাবা রে!

রেবা। ঘোড়ার সাধ্যি কি? যে জোরে ধরেছিলেন, ঘোড়া যে মরে যায় নি, এই ঢের।

শোভা। তোদের সহিস কোচওয়ান কি করছিল?

রেবা। আল্লা আল্লা করছিল, আর করবে কি?

শোভা। অমর বাবু একাই এত করলেন?

রেবা। তিনি একাই এক শ'।

শোভা। তিনি কলির ভীম বল্।

রেবা। ভীমের মত একটুও চেহারা নয়—বরং অর্জ্জুনের মত কতকটা।

পার্ব্বতী হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কি ভীম অর্জ্জুন দু'জনকেই দেখেছিস, রেবা?"

শোভা মায়ের দিকে ফিরিয়া কহিল, "হাঁ, দেখেছে, তুমি থামো না"—পরে রেবাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি রকম চেহারা, রেবা?"

রেবা। খুব সুন্দর—তোমাদের সকলের চেয়ে রং ফর্শা—জ্যোতির চোখের মত টানা চোখ—পাতলা ছিপছিপে—

পার্ব্ব। ওমা, তুই এরই মধ্যে এত দেখেছিস্?

রেবা। এর মধ্যে আর কি? তিনি কতক্ষণ ধ'রে ঘোড়াকে নিয়ে টহল দিলেন, তার গলা জড়িয়ে আদর করলেন—

পার্ব্ব। অমর বোধ হয় বড় জামাইয়ের বয়িসী—

রেবা। না, মাসিমা, বাঁড়ুয্যে মশাইয়ের চেয়ে অনেক ছোট!

সর্ব্বাণী বাধা দিয়া কহিলেন, "তুই চুপ কর না, রেবা, যা জানিস্ নে, তা' বল্‌তে যাস্ কেন? (পার্ব্বতীর প্রতি) বয়েস এই ছাব্বিশ সাতাশ হবে।"

রেবা। দেখতে কিন্তু খুব ছেলেমানুষ।

শোভা। তোর চেয়ে ছোট না কি?

সর্ব্বা। এখুনি ত আসবে, দেখলেই দিদি বুঝতে পারবে।

ফাঁক পাইয়া পাছে রেবা আবার প্রধান বক্তার স্থান অধিকার করে, এই আশঙ্কায় সর্ব্বাণী তাড়াতাড়ি কহিলেন, "ছেলেটি বড় ভাল, সব ক'টা পাস দিয়েছে—বিয়ে আজও করে নি।"

পার্ব্ব। ও মা, সে কি! অত বড় ছেলে আজও বিয়ে করে নি!

সর্ব্বা। বাপ-মা নেই, কে বিয়ে দেবে?

পার্ব্ব। আহা! কি জাত?

সর্ব্বা। বামুন—চাটুয্যে।

এমন সময় নরু আসিয়া কহিল, "দিদিমা, কাকা বাবু এসেছেন।"

পার্ব্ব। কাকা বাবু কে রে?

নরু। কাকা বাবু আবার কে! কেন, কাকা বাবু।

পার্ব্ব। তার নাম কি?

নরু। শ্রীযুত অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়—এইবার বুঝেছ?

পার্ব্ব। বাবা রে, তুই কি ছেলে হইছিস্।

নরু। মন্দটাই বা কি! এখন বল, তাঁকে এখানে নিয়ে আসি?

পার্ব্ব। ও মা, এখানে কি রে!

সর্ব্বা। নিয়ে আসুক না—বড় ভাল ছেলে—দেখলেই তুমি বুঝবে দিদি—

শোভা তাড়াতাড়ি কহিল, "আমার কাপড়খানা তেমন ভাল নয়।"

রূপ কহিল, "আমার কি একখানা হাতিপেড়ে কাপড় পরণে আছে, আমি নীলাম্বরীখানা প'রে আসি।"

শোভা। তোকে ত আর কেউ বিয়ে করতে আসছে না, তোর অত সাজগোজে দরকার কি, রূপো?

রূপ। তোমার যেমন কথার ছিরি! তোমাকে বুঝি কেউ বিয়ে করতে আসছে, তাই তুমি কাপড় বদলাতে যাচ্ছ?

শোভা। দেখ্ রূপো, মুখ সাম্‌লে কথা কবি।

পার্ব্ব। রূপো কিছু অন্যায় বলে নি; তুমিই ত আগে ঝগড়া বাধিয়েছ, শোভা! তুমি বড় কুঁদুলে—

শোভা। তুমি ত চিরদিনই আমাকে মন্দ দেখ; শ্বশুরবাড়ী যেতে পারলে বাঁচি।

রূপ। সেখানে বনিয়ে ঘর করতে পারলে না ব'লেই ত এখানে এসে রয়েছ।

শোভা। দেখ রূপো, আজ তোর মুখ—

সর্ব্বা। এবার রূপো তুমি অন্যায় কথা বলেছ।

রূপ। আমি সত্য কথা বলেছি।

শোভা। তুই আমার শ্বশুরবাড়ীতে ঘর করে এলি কি না, তাই সেখানকার সব কথা জেনে এইছিস্।

পার্ব্বতী সে সময় তাঁহার কুমারী কন্যা জ্যোতির্ম্ময়ীর কথা ভাবিতেছিলেন। তাহার পানে ফিরিয়া চুপি চুপি কহিলেন, "তুই কালো আলপাকা শাড়ীখানা পরে আয় গে।"

কন্যা। থাক্ গে মা।

শোভা রূপোর কাপড় বদলাইবার অবসর হইল না—কৃষ্ণ ও অমর ঘরের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সঙ্গে কর্ত্তার মধ্যম পুত্র শঙ্কর, নরু ও লতা ছিল। সর্ব্বাণী অতিথিদের আহ্বান করিয়া আসনে বসাইলেন এবং অমরের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাত-পা ধুয়েছ, বাবা?"

"পা ধুই নি—হাত-মুখ ধুয়েছি।"

কৃষ্ণনাথ হাসিয়া কহিলেন, "একটা কথা বলে রাখি মাসীমা, অমর কখন মিথ্যা বলে না, তাই আপনার প্রশ্নের এই রকম উত্তর দিল।"

শঙ্কর কহিলেন, "সে কি! মিছে কথা কখন বলেন না! আমি ত এ রকম মানুষ কখন দেখি নি।"

কৃষ্ণ। তুমি আর মানুষ কোথায় দেখলে? যা' দেখেছ সায়েব আর কুলী

শঙ্ক। সংসারে থাক্‌তে হ'লে বা চাকরী করতে হ'লে মিথ্যে কথা বলতেই হয়।

কৃষ্ণ। সত্যি ব'লে দেখেছ কি?

শঙ্ক। খুব দেখিছি; সায়েবের কাছে যখুনি সত্যি বলেছি, তখুনি গাল-মন্দ—মিথ্যে বলেছি ত পরিত্রাণ পেয়েছি।

সর্ব্বাণী। তোমরা একটু চুপ কর। দিদি, জলখাবার নিয়ে এস—রূপো, ঠাঁই করে দে।

জ্যোতিঃ চুপি চুপি মা'কে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি খাবার নিয়ে আসব মা?"

"নিয়ে এস, সব গুছোনই আছে।"

জ্যোতিঃ প্রস্থান করিল। রূপো দুইখানা আসন পাতিয়া জল আনিল। জ্যোতিঃ দুইখানা থালা আনিয়া দেখিল, দুইখানামাত্র ঠাঁই হইয়াছে; কহিল, "সেজদি, আর দু'খানা আসন প্যাতো।"

"কেন?"

"নরু আর লতার জন্যে।"

"ওরা এর পরে খাবে।"

"তা কি হয়, ওদের যে ক্ষিদে পেয়েছে।"

এত লোকের মধ্যে রূপময়ী আর আপত্তি করিতে পারিল না। সে একবার অমরের পানে চাহিয়া দেখিল; দেখিল, তিনি জ্যোতির মুখপ্রতি চাহিয়া আছেন। আর দ্বিরুক্তি না করিয়া আসন ও জল আনিতে রূপময়ী প্রস্থান করিল।

সকলে আহারে বসিলে সর্ব্বাণী অমরকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "বাবা, কৃষ্ণনাথ আমাদের যে, তুমিও আমাদের সে—"

অমর হাসিয়া কহিলেন, "তা কি হ'তে পারে?"

সর্ব্বাণী তাঁহার মিথ্যা কথার জন্য একটু অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, "তুমি আমাদের প্রাণ দিয়েছ, বাবা!"

অমর। প্রাণ দেবার শক্তি মানুষের নেই।

সর্ব্বাণী। তুমি যাই বল, আমরা চিরদিন বলব, তুমি আমাদের প্রাণ রক্ষে করেছ।

জ্যোতিঃ দেখিল, লতা লিচুটা বড় তৃপ্তির সহিত খাইতেছে। সে কক্ষান্তর হইতে আরও কয়েকটা লিচু আনিয়া লতার পাতে দিল। লতা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি-আপনি কেমন করে জানলেন, আমি লিচু ভালবাসি?"

রূপো কহিল, "আমরা গুণতে জানি—"

জ্যোতিঃ কহিল, "খাও, অনেক লিচু আছে—কারুর কম পড়বে না।"

লতা তাহার দাদার পানে চাহিয়া দেখিল; দেখিল, তিনি তাহার থালার পানে চাহিয়া আছেন। ভাবিল, দ্বিতীয় দফা লিচু খাওয়া তিনি অনুমোদন করিতেছেন না সে কহিল, "আমি আর লিচু খাব না।"

কেন খাইবে না, জ্যোতিঃ তাহা বুঝিল। সে মুখ ফিরাইয়া অমরনাথের পানে চাহিল। অমরনাথও তাহার পানে চাহিলেন। জ্যোতিঃ, অমরের দৃষ্টিতে কি দেখিল জানি না, কিন্তু সে ঝটিতি নয়ন ফিরাইয়া লইল। অমর বুঝিলেন, জ্যোতিঃ তাঁহার কাছে কি চায়। তিনি সহাস্যে লতাকে কহিলেন, "আর কয়েকটা লিচু খেতে পার।"

জ্যোতির মুখখানি প্রফুল্ল হইল।

অমরনাথ নিজে অতি সামান্যই ভোজন করিলেন।

তদৃষ্টে শঙ্কর কহিলেন, "আপনি এত অল্প আহার করেন, অথচ গায়ে এত জোর!"

অমর। বেশী খেলে কি বেশী জোর হয়?

শঙ্কর। আমি ত তাই মনে করি।

অমর। বেশী খেলে আমি ত দুর্ব্বল হয়ে পড়ি—কেমন একটা আলস্য এসে পড়ে।

শঙ্কর। আপনি মাংসটা কি বেশী পছন্দ করেন?

অমর। আমি মাংস খাই না।

শঙ্কর। মাংস—খান—না!

কৃষ্ণনাথ। তুমি জান না শঙ্কর, উনি আজন্ম ব্রহ্মচারী।

শঙ্কর। কই, ব্রহ্মচারীর বেশ ত দেখি না; দিব্যি আমার মত—

অমর তীব্র দৃষ্টিতে কৃষ্ণনাথের পানে চাহিলেন। কৃষ্ণ তাহা লক্ষ্য না করিয়া কহিলেন, "বেশে কি ব্রহ্মচারী হয়?"

শঙ্ক। তবে কিসে হয়?

কৃষ্ণ। মনে—ত্যাগে—প্রবৃত্তি-নিরোধে। উনি বিয়েটি পর্য্যন্ত করেন নি—করবার ইচ্ছেও বড় নেই।

শঙ্ক। সে কি! বি—য়ে ক—র—বে—ন—না!

সর্ব্বাণী দেখিলেন, তাঁহার আশা চূর্ণ হয়; তিনি ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "মা-বাপ নেই, কে বিয়ে দেয় বল; এখন আমাদের দেখে শুনে বিয়ে দিতে হবে।"

কৃষ্ণনাথ। এক ব্যক্তি ত্রিশ হাজার টাকা ও মেয়ে নিয়ে এসেছিলেন; অমর বিয়ে করলে না।

সর্ব্বাণীর ভরা নৌকা ডুবিল; পার্ব্বতীর হৃদয়মধ্যে যে আশাটুকু বাসা বাঁধিতেছিল, তাহাও ঝটিকা-ভিন্ন হইল। সর্ব্বাণী ক্ষীণ আশা ধরিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, "বোধ হয় মেয়ে কুৎসিত—এমন কার্ত্তিকের মত ছেলে—"

শঙ্কর কহিলেন, "ঠিক কথা, কুৎসিত মেয়ে নিশ্চয়ই সে; নইলে উনি বিয়ে করবেন না কেন? সংসারে থাকলে বিয়ে করতেই হবে—আলবৎ হবে।"

শঙ্করের বয়স পঁচিশ; এই বয়সেই তাঁহার দুইটি বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পনর বৎসর বয়সে প্রথম বিবাহ। বিংশতি বর্ষ বয়সে স্ত্রীবিয়োগ ঘটিলে অশৌচান্তে তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করেন। এক্ষণে তাঁহার চারিটি সন্তান।

অমর আহারাদি সমাপন করিয়া কহিলেন, "চল কৃষ্ণ, বাইরে যাই।"

"হাঁ, এখন একবার কর্ত্তার কাছে চল।"

উভয়ে উঠিলেন। নরু—লতাও সঙ্গে চলিল। তাঁহারা অদৃশ্য হইলে শোভা জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ মা, এই ছোট্ট মেয়েটির কথা দিদি লিখেছিল?"

"কি জানি বাছা!"

সর্ব্বাণী কহিলেন,"বেশ ছেলেটি—যত রূপ—তত গুণ—রেবার সঙ্গে বেশ মানায়।"

শোভা। ও কথা বলো না, মাসি-মা; সত্যি বল্‌তে হ'লে বলব যে, রেবা অমর বাবুর যুগ্যি নয়। সকলেরই ত চোখ আছে।

পার্ব্বতী তাড়াতাড়ি কহিলেন, "রেবা বেশ সুন্দর মেয়ে।"

শোভা। আমি ত আর বলছিনে কুৎসিত, আমার কথা এই যে, অমর বাবুর যুগ্যি মেয়ে রেবা নয়। যেমন ভাই, তেমনই বোন—রূপে ঘর আলো করেছিল।

পার্ব্ব। তুই পরকেই সোন্দর দেখিস্; আমার মেয়ে বোনঝিরা কি কুচ্ছিত?

শোভা। কুৎসিত না হোক, তিলোত্তমাও কেউ নয়। আমি উচিত কথা বলব, তোমার ছোট মেয়েটি ছাড়া আর কেউ অমর বাবুর পাশে বসবার যুগ্যি নয়।

জ্যোতিঃ উঠিয়া গেল। রেবাও তাহার পশ্চাদনুসরণ করিল।

সর্ব্বাণী। দেখ্ শোভা, তুই এক ফোঁটা মেয়ে, তোর বুদ্ধি-বিবেচনাও সেই রকম। তুই কেন আমাদের কথায় কথা বলিস্?

শোভা। আমি অন্যায় সইতে পারি নে।

সর্ব্বা। না সইতে পারিস্, উঠে যা।

শোভা তাহার ছেলেটার হাত ধরিয়া হড় হড় করিয়া টানিয়া লইয়া চলিল।

১১

সে দিন অপরাহ্নে সদর মহলের একটা ঘরে বসিয়া কৃষ্ণনাথ অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় অমরনাথের সহিত বাক্যালাপ করিতেছিলেন। অমর কহিতেছিলেন, "দেখ কৃষ্ণ, আজ আমি তোমার উপর বড় বিরক্ত হয়েছি।"

কৃষ্ণ। যদি করে থাকি অপরাধ, ভুজপাশে বাঁধি কর দণ্ড।

অম। তুমি ও-রকম কথা আর কখন বোলো না।

কৃষ্ণ। কও কথা!

অম। তুমি কেন আমাকে ব্রহ্মচারী বলে পরিচয় দিলে? আমি আবার কিসের ব্রহ্মচারী?

কৃষ্ণ। আমি আমার জ্ঞানমত সত্য বলেছি। দোহাই তোমার—বিশ্বাস কর—যাদের রাস্তায় রাস্তায় দেখি, গেরুয়া পরে বাঁশ ঘাড়ে করে মুণ্ডিত মস্তকে কচ্ছহীন অবস্থায় ঘুরে বেড়াতে, তাদের আমি ব্রহ্মচারী মনে করি না। যাহারা চিত্তজয়ী, তাহারাই আমার মতে প্রকৃত ব্রহ্মচারী। এই ভাষ্য আমার প্রণীত অদ্য হইতে সংসারে প্রচার হউক, আর এই ভাষ্যের যিনি টীকা করিবেন, তিনি লিষ্টের মাথায় যেন আমার বন্ধু মহা ব্রহ্মচারী অমরনাথের নাম দেন।

অম। কি তুমি পাগলের মত বকছ! আজ আমি তোমার মুখ চেয়ে কোন প্রতিবাদ করি নি, কিন্তু ভবিষ্যতে—

কৃষ্ণ। ভবিষ্যৎ ব'লে কোন জিনিষ দুনিয়ায় নেই—সব বর্ত্তমান। আমি, তুমি, আমার শালী জ্যোতিঃ, এই গৃহ, এরা সব বর্ত্তমান—

অম। তোমার পাগলামীটাও বর্ত্তমান—

কৃষ্ণ। আজ্ঞে হ্যাঁ, ব্রহ্মচারী মশাই।

অম। ফের ব্রহ্মচারী! তবে আমি ব্রহ্মচারীই হ'ব।

কৃষ্ণ। মাছটা?

অম। ছাড়লুম।

কৃষ্ণ। সেটা?

অম। তা'-ও।

কৃষ্ণ। ঠিক?

অম। মানুষে কথায় ও কাযে এক রাখে।

কৃষ্ণ। ব্রহ্মচর্য্য কত দিন রাখ্‌বি?

অম। যত দিন না বিয়ে করি।

কৃষ্ণ। বিয়ে তা হ'লে কর্‌বি?

অম। বোধ হয়।

কৃষ্ণ। আমি তোর পাত্রী দেখে দেবো।

অম। তোমার পছন্দর আমি সুখ্যাতি করতে পারি নে।

কৃষ্ণ। আমি বাড়ী গিয়েই হিরণকে এ কথা ব'লে দেব।

অমর কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু অবসর পাইলেন না—গৃহস্বামী হরনাথ আসিয়া পড়িলেন। তাঁহার প্রশান্ত মূর্ত্তি, হাস্যবদন, অমরনাথের বড় ভাল লাগিয়াছিল। অমরের মুখে একটা চুরুট ছিল, তিনি ক্ষিপ্রহস্তে তাহা ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কৃষ্ণনাথও শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। হরনাথ কহিলেন, "বাবা, আজ তোমাদের যাওয়া হবে না।"

কৃষ্ণ। আমরা সন্ধ্যার পূর্ব্বে ফিরব, এরূপ ব্যবস্থা করে এসেছি।

হর। একটা 'তার' করে দিলে হয় না, বাবা?

কৃষ্ণ। অমর বোধ হয় থাক্‌তে পারবে না—

হর। (অমরের প্রতি) আপনার থাক্‌তে কি অসুবিধা হবে?

অম। একটু হবে, আপনি যদি আমাকে 'আপনি' বলেন।

হর। (সহাস্যে) বলতে হয় বাবা, না বললে না কি অপরাধ হয়। আজকালকার ছেলেরা পদে পদে বুড়োদের অপরাধ নেয়; আচ্ছা এখন হতে আর আপনি বলব না। তা' তুমি আজ থাক্‌তে পারবে, বাবা?

অম। আপনি আজ্ঞা করলে নিশ্চয়ই থাক্‌তে পারব—আমার কোন অসুবিধা হবে না।

হর। বেশ, বেশ, আমি বড় সুখী হলাম। আজ দুই জন বড় কীর্ত্তনীয়ার পায়ের ধূলি দেবার কথা আছে—

অম। তাঁদের নাম কি?

হর। এক জনের নাম নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী; খগেন বাবুও দয়া করবেন বলেছেন।

অম। তাঁদের কীর্ত্তন শুনতে অনেক দিন থেকে আমার ইচ্ছা—কখন সুযোগ ঘটে নি। আজ যদি আপনার দয়ায়—

হর। বেঁচে থাক বাবা, কৃষ্ণ তোমার মঙ্গল করুন—

এমন সময় পুত্র শঙ্কর আসিয়া কহিল, "হ্যাঁ বাবা, আপনি না কি নবীনকালী বাবুকে কীর্ত্তন শুনতে নিমন্ত্রণ করে এসেছেন?

হর। করেছি; কিছু অন্যায় হয়েছে, বাবা?

শঙ্কর। খুব অন্যায় হয়েছে। তাঁদের সঙ্গে আমাদের ঝগড়া তাঁর নাতনীর বিয়েতে সে দিন আমাদের নিমন্ত্রণ হয় নি।

হর তা' আমি জানতাম না, বাবা, তা' হ'লে তাঁকে আমি আহার করতে নিমন্ত্রণ করে আসতাম। আচ্ছা, আমি ফের যাচ্ছি, তুমি তাঁদের খাবার-দাবারের উদ্যোগ কর।

শঙ্ক। বাবা, আপনি কি পাগল হয়েছেন? যাবেন না—দাঁড়ান—

বৃদ্ধ দাঁড়াইলেন না—প্রস্থান করিলেন।

তিনি অদৃশ্য হইলে শঙ্কর পিতার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে, প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে অনেক নজির খাড়া করিল। কৃষ্ণনাথ বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "মূর্খের মত ব'কে যেও না, শঙ্কর, কর্ত্তা যা' করছেন, তা' মানুষের কায—"

শঙ্কর ক্রুদ্ধ হইল, কিন্তু কিছু বলিল না। কৃষ্ণনাথ তখন অমরের পানে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, অমর, তুই যে কর্ত্তার এক কথায় থাকতে রাজি হয়ে গেলি, এর মানে কি?"

অম। মানে—কর্ত্তার আদেশ আমি মাথা পেতে নিলাম।

কৃষ্ণ। তোর যে বড় ভক্তি দেখছি—

অম। ভক্তি নয়, কৃষ্ণ, আমি পূজ্য ব্যক্তিকে সম্মান দিলাম—এই পর্য্যন্ত।

কৃষ্ণ। আর একটু পরিষ্কার করে বল্।

অম। উনি আসবামাত্র তুমি উঠে দাঁড়ালে কেন?

কৃষ্ণ। গুরুজনকে সম্মান দেখাতে।

অম। আমিও তেমনই তোমার মত তাঁকে সম্মান দেখাবার জন্যে বিনা ওজরে তাঁর প্রস্তাবে সম্মতি দিলাম। যদি তাঁকে আমি এ সম্মানটুকু না দিতাম, তা হ'লে আমার পাপ হ'ত।

কৃষ্ণ। হ্যাঁ, পাপ না কি হ'ত; একটু অভদ্রতা হ'ত এই যা।

অম। না, পাপই হ'ত। তুমি কি নলকুবরের উপাখ্যান পড় নি?

কৃষ্ণ। প'ড়ে থাকব, এখন মনে নেই। বল—শুনি—

অম। নলকুবর ও মণিগ্রীব, কুবেরের দুই পুত্র ছিলেন। তাঁহারা একদা নগ্নাবস্থায় জলবিহার করিতেছিলেন। সঙ্গে কতকগুলি স্ত্রীলোক ছিল, তাহাদেরও অবস্থা তদ্রূপ। এমন সময় দেবর্ষি নারদ তথায় উপস্থিত হইলেন রমণীরা বসন পরিল, কিন্তু নলকুবর ও মণিগ্রীব বসন পরিধান না করিয়া ঋষিকে অসম্মান করিল। এই অসম্মান হেতু তাঁহাদের পাপ সঞ্জাত হইল। সেই পাপে তাঁহাদের বৃক্ষরূপে জন্ম লইতে হইয়াছিল।

কৃষ্ণ। গল্পটা এখন আমার মনে পড়েছে। যক্ষরাজের পুত্রদ্বয় দেবর্ষিকে অসম্মান করাতে কোন পাপ অর্জ্জন করেছেন বলে আমার মনে হয় না; আর সে পাপের জন্যে তাঁহাদের যে যমলার্জ্জুন বৃক্ষদ্বয়রূপে জন্মাতে হয়েছিল, তা'ও আমার মনে হয় না। আমি পড়েছি, ক্রোধপরায়ণ ঋষি, যক্ষদ্বয়ের আচরণে ক্রুদ্ধ হয়ে তাহাদের অভিসম্পাত প্রদান করেন। সেই কারণে—

অম। সেই কারণে নয়। পাপের ফলে তাঁহারা বৃক্ষত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন—ঋষির অভিসম্পাতে নয়। ঋষিরা—যাঁদের সমস্ত প্রবৃত্তির নিরোধ হয়েছে, জীবের মঙ্গল যাঁদের ব্রত, তাঁরা কখন মহারিপু ক্রোধের বশবর্ত্তী হ'তে পারেন না, জীবের অনিষ্ট করবার অভিপ্রায়ে অভিসম্পাত দিতে পারেন না।

কৃষ্ণ। আমি অনেক স্থানে পড়েছি, দুর্ব্বাসা, নারদ প্রভৃতি বড় বড় ঋষিরা একটু এদিক ওদিক হ'লে অমনি অভিসম্পাত দিয়ে বসতেন।

অম। তুমি যা' পড়েছ, তার অর্থ ঠিক বুঝতে পার নি। ঋষিরা পাপের পরিণাম বলে দিতেন, অভিসম্পাত দিতেন না। যে মুহূর্ত্তে যক্ষদ্বয় পূজ্য ব্যক্তিকে অসম্মান করলেন, সেই মুহূর্ত্তে তাঁহারা পাপ অর্জ্জন করলেন; আর সেই পাপের পরিণাম কি হবে, ঋষি তা'ও বলে দিলেন। পরীক্ষিৎ রাজার ঘটনাও ঠিক এই রকম। তাঁর অপরাধ গুরু, তাই তাঁকে প্রাণ দিতে হয়েছিল।

কৃষ্ণ। তা হ'লে তুমি বলতে চাও, শমীকের পুত্র শৃঙ্গী পরীক্ষিতকে অভিসম্পাত দেন নি?

অম। না, দেন নি। শৃঙ্গী যোগবলে জানতে পেরেছিলেন, তাঁহার পিতাকে অপমান করা হেতু যে পাপ পরীক্ষিৎ অর্জ্জন করেছিলেন, সে পাপের পরিণাম কি; তিনি সেই ফলটুকু মাত্র পরীক্ষিতকে বলে দিয়েছিলেন—

অভিসম্পাত করেন নি। যিনি ঋষি, তিনি জিতেন্দ্রিয়, তিনি পরোপকারী—তিনি ক্রোধপরায়ণ হিংস্র জন্তু ন'ন।

শঙ্কর। আপনার হিসাবে দেখছি, বাপ-মায়ের অবাধ্য হলেও পাপ হয়, আর সেই পাপের ফল আমাদের ভোগ করতে হয়।

অমর। অবাধ্য হওয়া দূরে থাক, তাঁদের প্রতি রূঢ় ব্যবহার করলে, অসম্মানসূচক কোন কথা বললেও পাপ হয়; আর সেই পাপের ফল ভোগ করতে হয়।

শঙ্কর ক্ষণকাল নীরবে কি চিন্তা করিল, তার পর উঠিয়া গেল। যাইবার সময় বলিয়া গেল, "যাই নবীনকালী বাবুদের আহারের যোগাড় করি গে।"

অমরও উঠিলেন; বলিলেন, "সন্ধ্যে হয়ে এল, চল গঙ্গার ধারে একটু বেড়াই গে।"

"তুমি এগোও, আমি জামাটা বদলে পিছনে যাচ্ছি।"

অমর অদৃশ্য হইতে না হইতে নরু আসিয়া পিতাকে চুপি চুপি কহিল, "বাবা, লতার সেই ময়ূরটা এখানে এসেছে।"

কৃষ্ণ। উড়ে এলো না কি?

নরু। না বাবা, মেজ মামার ছেলে বোলতাকে মা পাঠিয়ে দিয়েছে।

কৃষ্ণ। তুমি কেমন করে তা' জান্‌লে?

নরু। বোলতাকে জিজ্ঞেস করে জানলুম। মা লাড্ডুর সঙ্গে ময়ূরটা পাঠিয়ে দিয়েছিল।

কৃষ্ণ। লতা ময়ূর দেখেছে?

নরু। দেখেছে, দেখেই সে চিনেছে। ময়ূরের কপালে একটা কালির টিপ পরিয়ে দিয়েছিলাম, সে টিপটুকু পর্য্যন্ত আছে।

কৃষ্ণ। লতা কি বললে?

নরু। একটা কথাও সে বলে নি, চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখলে। তার পর আমার সঙ্গে চলে এলো।

কৃষ্ণ। বাজারে ত অনেক ময়ূর পাওয়া যায়, তাই একটা কিনে তোমার মা পাঠিয়ে দিয়ে থাকবেন। যাই হো'ক, তুমি এ কথা কারুর নিকট বলো না—বুঝলে?

বালক প্রস্থান করিল। কৃষ্ণনাথেরও অন্দরে ডাক পড়িল। সর্ব্বাণী গৃহে ফিরিবেন, কৃষ্ণনাথকে মোটরে করিয়া রাখিয়া আসিতে হইবে। কৃষ্ণনাথ তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া তাঁহাদের লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। পথে যাইতে যাইতে সর্ব্বাণী কহিলেন, "যাই বল বাবা, তোমার বন্ধুটি বড় ভাল লোক নয়।"

রেবা চমকিয়া মায়ের মুখ পানে চাহিল। অমর সম্বন্ধে সে এখন কোন কথা বলে না। সকালে অমর জলযোগ করিতে আসিবার পর হইতে সে যে মুখ বন্ধ করিয়াছিল, সে মুখ আর বড় খুলে নাই—অন্ততপক্ষে অমর সম্বন্ধে কোন কথা সে আর তুলে নাই। অন্তরে তাহার কি হইতেছিল, তাহার সন্ধান এখনও আমরা পাই নাই। এক্ষণে মায়ের কথা শুনিয়া চমকিয়া মায়ের পানে চাহিল।

কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

সর্ব্বাণী। অমর বাপের একমাত্র সন্তান; যদি তার ছেলে না হয়, তবে বংশলোপ পাবে—পিতৃপুরুষ এক গণ্ডূষ জলও পাবেন না। যা'র পিতৃভক্তি নেই, সে বাপের কুপুত্র।

কৃষ্ণ। অমরের পিতৃভক্তি অসাধারণ—

সর্ব্বা। তবে বিয়ে করেন না কেন?

কৃষ্ণ। মনের মত মেয়ে পান না বলে।

সর্ব্বা। তাই না কি? কি রকম মেয়ে উনি চান?

কৃষ্ণ। তা' ত ঠিক বলতে পারি নে—

সর্ব্বা। আচ্ছা রেবার মত মেয়ে ওর পছন্দ হবে?

কৃষ্ণ। আমার বোধ হয়—

সর্ব্বা। বোধ হয় কি? কি?—খুলে বল—

কৃষ্ণ। রেবাকে অমর পছন্দ করে ফেলেছে।

সর্ব্বা। বল কি? বেশ, শুনে বড় আনন্দ হ'ল। তা' রেবাকে কার না পছন্দ হয়!

গাড়ী আসিয়া দ্বারে লাগিল। কৃষ্ণনাথ গাড়ী ঘুরাইয়া ফিরিতেছেন, এমন সময় সর্ব্বাণী কহিলেন, "দিদিকে বোলো, কাল সকালে আমরা যাবো।"

"আচ্ছা" বলিয়া কৃষ্ণ গাড়ী ফিরাইলেন এবং পথের মধ্যে খুব এক চোট হাসিয়া লইয়া শ্বশুরালয়ে গম্ভীরবদনে ফিরিলেন।　　　　[ক্রমশঃ।

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ক্ষুদ্রতম মোটর গাড়ী

নিউইয়র্কের জনৈক শ্রমশিল্পী একটি ক্ষুদ্র মোটর গাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছে। উহা প্রস্থে ২৮ ইঞ্চি এবং দৈর্ঘ্যে ৫ ফুট মাত্র। কিন্তু দ্রুতধাবনে ইহা কোনও বড় মোটর

ক্ষুদ্রতম মোটর গাড়ী

গাড়ীর অপেক্ষা হীন নহে। এক জনমাত্র আরোহী এই গাড়ীতে বসিতে পারে।

নারিকেলের মুণ্ড

জনৈক মার্কিণ শিল্পী ১০ হাজার নারিকেল হইতে নানাবিধ মূর্ত্তি গড়িয়া তুলিয়াছিল। ফুটবলের আকারবিশিষ্ট একটা নারিকেল পাইলে ৪।৫ মিনিটের মধ্যে উক্ত শিল্পী তাহাকে অভিনব রূপ প্রদান করেন। উল্লিখিত নারিকেল মুণ্ডগুলি তিনি ৩ টাকা হইতে ৪৫ টাকা বা অধিকতর মূল্যে বিক্রয় করিয়া থাকেন। এই শিল্পীর নাম মিঃ কাথ্‌কার্ট।

শিল্পীরচিত নারিকেলের বিবিধ মূর্ত্তি

গৃহসমস্যার সমাধান

বার্লিন নগরে বাসগৃহের অল্পতাহেতু সমস্যা জটিল হইয়া উঠায়, কর্ত্তৃপক্ষ একটা প্রসিদ্ধ পুরাতন জলাধার-অট্টালিকাকে বাসভবনে পরিণত করিয়াছেন। উক্ত বৃহৎ জলাধার-অট্টালিকাকে বহুতলবিশিষ্ট করিয়া অনেকগুলি

কক্ষ নির্ম্মিত হইয়াছে; সোপানশ্রেণী সন্নিবিষ্ট করিয়া প্রত্যেক তলে গমনাগমনের সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সুবৃহৎ বাসভবনে অনেকগুলি পরিবার স্বচ্ছন্দে বসবাস করিতে পারে। এই বাসভবনের একটি বিশেষ সুবিধা এই যে, ইহার প্রত্যেক বাতায়ন হইতে চারিদিকের শোভা দৃষ্টিগোচর হয়।

গৃহসমস্যার সমাধান
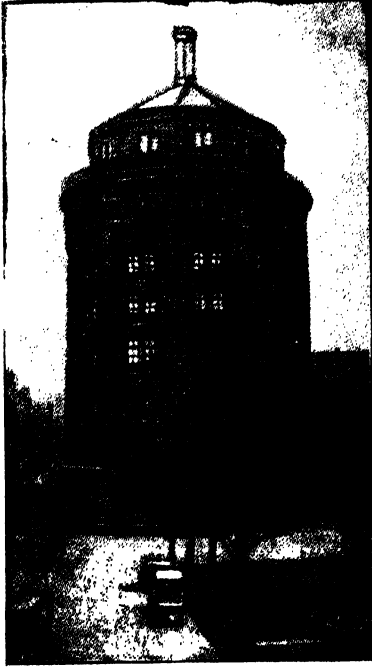
পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হোটেল

আমেরিকার চিকাগো সহরে একটি হোটেল নির্ম্মিত হইয়াছে। এই হোটেলটি সর্ব্বসমেত ২৯ তলা। ভূমির উপর ২৫ তলা এবং ভূগর্ভে ৪ তলা। এই হোটেলে এতগুলি শয়নকক্ষ আছে যে, এক জন লোক যদি প্রতি রাত্রিতে স্বতন্ত্র কক্ষ ব্যবহার করে, তাহা হইলে প্রত্যেক ঘর ব্যবহার করিতে পূর্ণ ৮ বৎসর লাগিবে। যুক্তরাজ্যের সহস্রাধিক বৃহৎ নগরের যে কোনও নগরের সমগ্র অধিবাসীকে এই হোটেলে স্থান দান করিলেও—অবশ্য প্রত্যেক নর, নারী ও বালক-বালিকা স্বতন্ত্র কক্ষে শয়ন করিবে - অন্যান্য যাত্রীর জন্য যথেষ্ট স্থান থাকিবে। যদি কোনও শ্রমিক প্রত্যহ ৮ ঘণ্টা প্রাণপণ পরিশ্রম করে, তাহা হইলে হোটেলের প্রত্যেক বাতায়ন ধৌত করিতে তাহার ৫ মাস সময় লাগিবে। প্রায় সওয়া ৮ কোটি টাকা ব্যয়ে এই হোটেল নির্ম্মিত হইয়াছে। ৭ হাজার কেদারা, ১ লক্ষ ৩৪ হাজার প্লেট, ১ লক্ষ ৩৮ হাজার টেবল ক্লথ, ৩ লক্ষ ঝাড়ন, ৪৮ হাজার পান-পাত্র, ৬০ হাজার তোয়ালে, ৬০ মাইল দীর্ঘ কার্পেট, ৩৬ হাজার ফুট ছবির ফ্রেম, ৩খানা গাড়ী বোঝাই রৌপ্য-নির্ম্মিত তৈজসপত্র প্রভৃতি এই হোটেলের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। নিম্নতলে একটি বল নাচের ঘর আছে। উহা এত বৃহৎ যে,
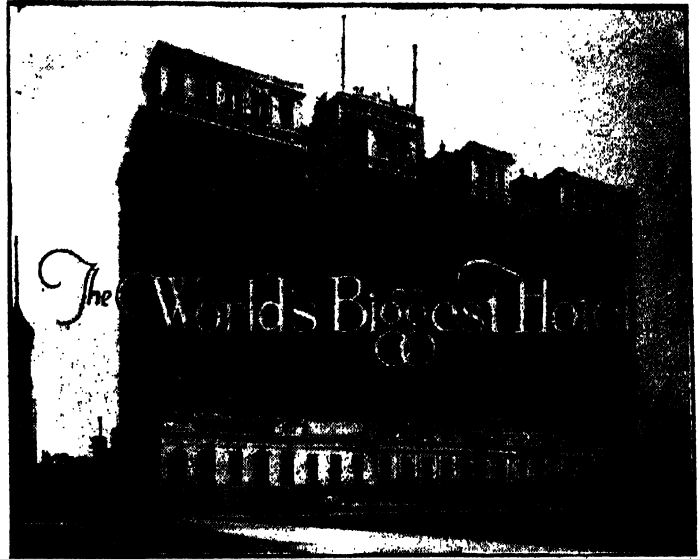
পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হোটেল

৩ হাজার লোক একত্র একই সময়ে নৃত্য করিতে পারে। এতদ্ব্যতীত আরও ৬টি বল নাচের ঘর, ভোজনাগার আছে। তথায় ৫ হাজার ১ শত ৮৪ জন ব্যক্তি আরামে একত্র ভোজন করিতে পারিবে। ১০ হাজার গ্রন্থপূর্ণ একটি পুস্তকাগারও এই হোটেলে বিদ্যমান। পশুশালা, উদ্যান প্রভৃতি ত আছেই। অসংখ্য টেলিফোন-যন্ত্র যাত্রীদিগের ব্যবহারের জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে। হোটেলের কর্ম্মচারীর সংখ্যা ৩ হাজার।

প্রাচীরের কান

বোষ্টনের পুলিস এক প্রকার বৈদ্যুতিক যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছে, উহার সাহায্যে তাহারা প্রাচীরে কান পাতিয়া রুদ্ধকক্ষে কি কথোপকথন হইতেছে, তাহা শুনিতে পায়। দ্বারের একপ্রকার চাকৃতি দরজা অথবা প্রাচীরে সংলগ্ন

করিলে উহার অপর পারে মৃদুস্বরে কথা কহিলেও শুনিতে পাওয়া যাইবে। অবশ্য কানের উপর তাহারা 'ইয়ার-ফোন' যন্ত্রও ধারণ করিয়া থাকে। গোয়েন্দারা এই যন্ত্র-সাহায্যে অনেক গুপ্ত কথা অবগত হইয়া অপরাধীদিগকে গ্রেপ্তার করিতেছে।

পুলিস যন্ত্রসাহায্যে রুদ্ধদ্বারে মন্ত্রণা শুনিতেছে

বিচিত্র জলসেচন যন্ত্র

সম্প্রতি য়ুরোপে একটি প্রদর্শনীক্ষেত্রে উদ্যানে জলসেচনের এক প্রকার বিচিত্র যন্ত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। ঘড়ীর কায যে ভাবে চলে, এই যন্ত্রও অনেকটা তদনুরূপ। জলসেচনের
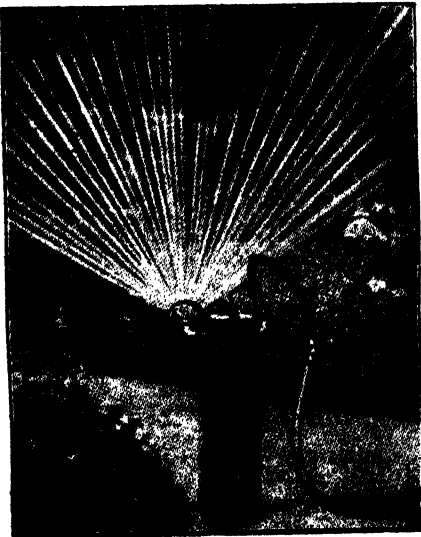
অভিনব জলসেচন যন্ত্র

যন্ত্রের মুখটি এমন ভাবে স্থাপিত যে, উহাতে একবার দম দিয়া দিলে ৩ ঘণ্টাকাল উহা হইতে আপনা আপনি জলধারা নির্গত হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবে। ইহাতে প্রয়োজনাতিরিক্ত জল বাহির হয় না এবং যেখানে জলসেচনের প্রয়োজন, শুধু সেইখানেই জলধারা নিক্ষিপ্ত হইবে।

ট্রেণ পালিশ করা সুড়ঙ্গ

সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, কোনও সুড়ঙ্গের মধ্য হইতে ট্রেণ বাহির হইয়া আসিলে উহা অধিকতর
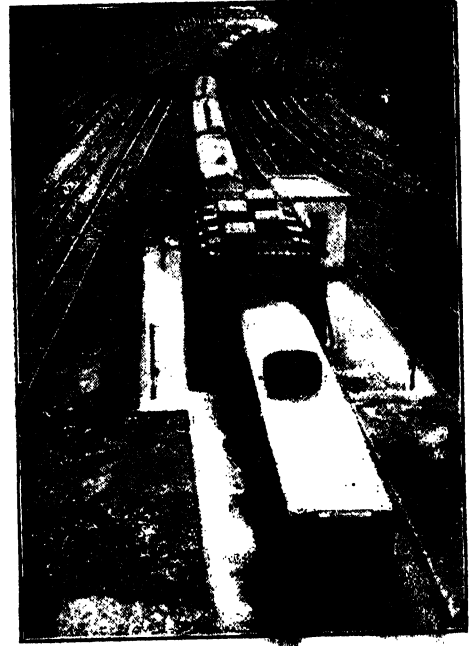
ট্রেণ পালিশ করা সুড়ঙ্গ

ময়লা দেখায়। ধূম-ধূলির জন্যই এইরূপ হইয়া থাকে। ফরাসী দেশে এইরূপ সুড়ঙ্গের মধ্য হইতে কোনও ট্রেণ বহির্গত হইলে তাহাকে সুপরিষ্কৃত দেখায়। ফরাসীরা সুড়ঙ্গের মধ্যে এমনভাবে ব্রুস প্রভৃতি সন্নিবিষ্ট রাখে যে, ট্রেণ উহার মধ্যে প্রবেশ করিলে আপনা হইতে ট্রেণের বহির্ভাগ পরিষ্কৃত হইয়া যায়। ট্রেণ সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে চলিতে থাকে, সেই সময় উল্লিখিত যন্ত্রপাতির ঘর্ষণে ট্রেণের বহিরঙ্গ মসৃণ হইয়া যায়।

নৌকার ছদ্মবেশ

নী দেশে নৌকা-উৎসব উপলক্ষে উহাদিগকে বিচিত্র ছদ্মণ সজ্জিত করা হইয়া থাকে। কোনটি মৎস্যাকারে,
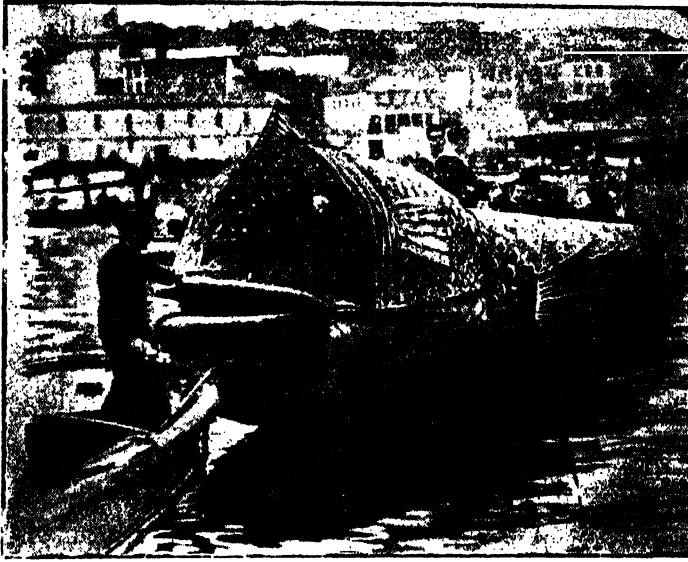
তিমি মৎস্যের ছদ্মবেশে নৌকা

কোনটি বা পুরাণ-বর্ণিত জীববিশেষের আকার ধারণ করিয়া থাকে। উৎসবকালে নরনারীরা যেমন নানাবিধ অপূর্ব্ব ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া থাকে—নৌকার উৎসবেও সেই নিয়ম প্রতিপালিত হয়। এ স্থলে তিমি মৎস্যের ন্যায় একখানি নৌকাকে সজ্জিত করা হইয়াছে।

আকাশপটে বিজ্ঞাপনের ছবি

বিজ্ঞাপন দিবার অভিপ্রায়ে আমেরিকায় কামানের আকৃতিবিশিষ্ট এক প্রকার আলোকাধার নির্ম্মিত হইয়াছে। উহা হইতে তীব্র আলোকধারা বহির্গত হইয়া মেঘলেশহীন আকাশপটে অথবা গৃহপ্রাচীরে চিত্রাবলী অঙ্কিত করিয়া দেয়। আলোক কামানাকৃতি যন্ত্রের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত থাকে। লেন্স বা কাচ কামানের অভ্যন্তরে স্থাপিত। ছবির 'শ্লাইড্'গুলি একটি গর্ত্তের মধ্য দিয়া উহার মধ্যে সহজে প্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়া যায়। লেন্স এমনভাবে সন্নিবিষ্ট যে, ২০ ফুটের দূরবর্ত্তী যে কোনও স্থানে কেন্দ্রীভূত আলোকধারা নিক্ষিপ্ত হইতে পারে। বিবিধ বর্ণ-পরিবর্ত্তনও এই আলোকাধারের সাহায্যে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

বিমানপটে বিজ্ঞাপনের ছবি

পুলিসের নূতন কৌশল

জার্ম্মানীতে পুলিস-প্রহরীদিগের সাহায্যার্থ বহুসংখ্যক কুকুর নিযুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু সাঙ্কেতিক বাঁশী বাজাইয়া কুকুরদিগকে আহ্বান করিলে পাছে অপরাধী পলায়ন করে, এ জন্য কর্ত্তৃপক্ষ বহুদিন সমস্যার সমাধান করিতে পারেন নাই। বহু গবেষণার পর আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, মানুষের কর্ণে যে শব্দ প্রবেশ করে না, তাহা কুকুর অনায়াসে শুনিতে পায়। এ জন্য অধুনা জার্ম্মাণীতে 'নীরব' সঙ্কেত শব্দে কুকুরদিগকে অভ্যস্ত করা হইতেছে।
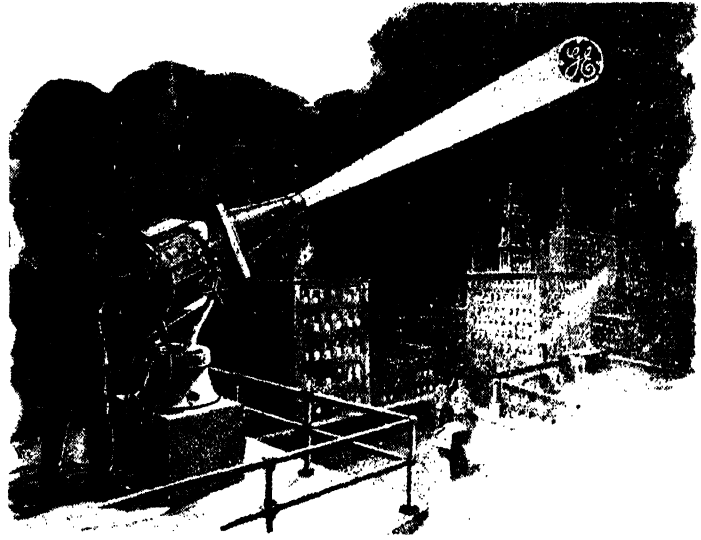
ক্ষুদ্রের দান

ওগো ক্ষুদ্র, পরিত্যক্ত, বিশ্বের পদদলিত, আজি এই ক্ষুদ্রের ক্ষুদ্র অভিনন্দন গ্রহণ কর। তুমি নগণ্য, তুমি অকিঞ্চিৎকর—তোমার ক্ষুধিত তাপিত প্রাণের করুণ ক্রন্দন বাতাসে উঠিয়া বাতাসে বিলীন হইয়া যায়। তোমার পরহিত-রত প্রাণ, পরার্থ-উৎসৃষ্ট তোমার সত্তা, আপনাকে লুকাইয়া পরের জন্য উদ্ভব হইয়া পরের কাযে চলিয়া যায়। সে তোমায় দেখে না, তোমার কথা কহে না, তোমার পবিত্রতা, তোমার সেবা কোন দিন কল্পনাতেও আনিতে পারে না। সর্ব্বগুণ-আকর, সকলের অণু-পরমাণু, সকলের স্রষ্টা, ওগো তুমি সকল সৃষ্টির মূল ক্ষুদ্র; তোমাকে আমি বন্দনা করি।

ক্ষুদ্র বালুকণা—তুচ্ছ ধূলিকণা তুমি, পৃথিবীর অহঙ্কার, পৃথিবীর অলঙ্কার জগতের সমস্ত গৌরব-গরিমা যুগাতীত কাল হইতে গড়িয়া আসিতেছ। তুমিই মিশর, গ্রীস, রোম, পারস্য, ব্যাবিলন গড়িয়াছিলে, ইংলণ্ডও তোমারই রচনা। ভারতের অতীত গৌরব অযোধ্যা, ইন্দ্রপ্রস্থ, সৌরাষ্ট্র, পাটলীপুত্র; অতীত ও নবীন জগতের মধ্যে সুপ্রাচীন অতুল্য সভ্য জনপদ সুপবিত্র বারাণসী তোমা হইতেই উদ্ভূত। মোগলের বিপুল কীর্ত্তি সুমহান দিল্লী, আগ্রার দুর্গ, স্বপ্নময় তাজ, অথবা মিশরের পিরামিড, চীনের প্রাচীর, যাহা কিছু বৃহৎ, যাহা কিছু বিরাট, সমস্তই তুমি আত্মদান করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছ। সুচারু সৌধময় নগর, সুপ্রসিদ্ধ অভ্রভেদী প্রাসাদ-চূড়া, মানব-সভ্যতার সাক্ষ্য দিতে দাঁড়াইয়া আছে। কে দেখিতেছে, একখানির পর একখানি ছোট ইট-পাথর সাজাইয়া কেমন করিয়া সে জনপদ সে প্রাসাদ গড়িয়া উঠে? এ হেন তুমি ক্ষুদ্র, আমি তোমার পূত সত্তাকে নমস্কার করি।

ক্ষুদ্র পল্লী, আজ হেলায় শ্রদ্ধায় তুমি তোমার বুকের ধন ক্ষুধিত পীড়িত অনশনরোগক্লিষ্ট পল্লীসন্তান কতিপয়কে, আর গ্রাম্য শৃগাল কুকুর শকুনি গৃধিনীকে লইয়া পড়িয়া আছ। জমীদারের ভগ্ন আবাস, জীর্ণ পূজার দালান পেচকের আবাসস্থল। বিরাট শূন্যতার মধ্যে তাহার পুরাতনের স্মৃতিটুকু জাগিয়া আছে। আজও তোমার বিগত সৌন্দর্য্যস্নিগ্ধ কোমল শ্যাম-শোভার মধ্যে আত্মহারা প্রেমিকের মত নিজেকে ভুলিয়া বড় সহরের আহার ও নিত্য প্রয়োজনীয় নিত্য ব্যবহারের যাহা কিছু, সবই তুমি যোগাইতেছ! ম্যালেরিয়া কালা-জর-অধ্যুষিত ক্ষুদ্র পল্লী! আজও তোমার শ্মশানের বক্ষে থাকিয়াই তোমার সন্তানগণই সহরের সকল শ্রী-সম্পদের মূল। তোমাকে ও তোমার অনুরক্ত ভক্ত সন্তানদের আমি অভিবাদন করি।

হে ক্ষুদ্র কৃষক কৃষাণ, জন-মজুর, তোমাদের ক্লিষ্ট বদন মলিন বসনের দিকে কি আমরা মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখি! কিন্তু তোমরা না থাকিলে আজ অভিজাতের আভিজাত্য, মহামানীর জগৎযোড়া সম্মান, ধন-কুবেরের অফুরন্ত ধনরাশি, এমন কি দিগ্বিজয়ী সম্রাটের বিশাল সাম্রাজ্য কোথা হইতে কেমন করিয়া গড়িয়া উঠিত? আর আজ যে তুমি সাম্রাজ্যপতি রাজা বা রাষ্ট্র-নায়ক, তোমার এই ক্ষুদ্র প্রজাবৃন্দ না থাকিলে তুমি কাহার উপর রাজত্ব করিতে? উহাদের লইয়াই তুমি রাজা। উহারাই তোমার রাজত্বের যথার্থ উপাদান নয় কি? আর তুমি জমীদার, তালুকদার, পত্তনিদার, রাজার ক্ষুদ্র সংস্করণ! তুমি যে পূর্ব্বপুরুষদের অর্জ্জিত কতকগুলি সম্পত্তির মালিক হইয়া দম্ভ ও আভিজাত্য-মদে মত্ত রহিয়াছ, তাহাও ঐ তোমার জমীদারির ক্ষুদ্র নর-সমষ্টির উপর আধিপত্য রাখিবার সুযোগ পাইয়াছ বলিয়া। আর তুমি প্রতিষ্ঠার কাঙ্গাল! স্বার্থের পদতলে স্বাধীনতা উৎসৃষ্ট করিয়া দেশের নামে প্রতারকের ধর্ম্ম দ্বারা শুধু আত্মতৃপ্তির জন্য জাতীয়তার মাথায় পদাঘাত করিতেছ, দেশের শক্তিকে হীন করিয়া নীচ স্বার্থের বশে আত্মশক্তি সঞ্চয়ে ব্যস্ত। দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া কি চতুর্ব্বর্গ ফললাভের আশায় জানি না, আজ যে রাষ্ট্রীয় পরিষদ হইতে এমন কি ক্ষুদ্র কোন একটা সরকারী বে-সরকারী সভা-সমিতির সদস্য বা আর কিছু পদলাভের জন্য বিভ্রান্ত হইয়া বেড়াইতেছ, সেখানেও তোমার আবশ্যক ক্ষুদ্র ভোটদাতাদের। ধরিত্রীর আবর্জ্জনা কনক-কামিনীর সেবক বিলাসী যুবক, তোমার জঘন্য বিলাস-লালসা চরিতার্থ কি করিয়া হইত, যদি দীন মানব-মানবীর পরিচর্য্যা না পাইতে?

তাহার যা কিছু বল, যা কিছু প্রতাপ, যা কিছু দম্ভ, তার উৎস তুমিই ক্ষুদ্র মানব! শুধু আভিজাত্য বা ধন-কেন, শিক্ষাভিমান বা পাণ্ডিত্যের মদে আজ যে তারা কম্পবান্, এ মদোন্মত্ততা কাহার কাছে বিকসিত হ'ত, যদি মূর্খ নিরীহ মানবদল না থাকিত? তাহারা না থাকিলে কে আজ কার্ণেগি রকফেলার বা হেনরি ফোর্ডকে তাদের মধ্যে ধনিশ্রেষ্ঠ হইবার সুযোগ করিয়া দিত? কে আজ টাটার লৌহ কারখানাকে বর্ত্তমানে ভারত-শিল্পের গরিমাময় উদাহরণ করিয়া দাঁড় করাইতে পারিত? আর কই বা শত শত কল-কারখানার মালিকদের সৌভাগ্য-সম্পাদন হইত? পৃথিবীর যা কিছু দান, তাহার মূলে তোমরাই আছ। জীবনধারণের জন্য অন্নকণা হইতে জড় জগতের সমস্ত কাম্য—সমস্ত প্রয়োজন তোমরা যোগাইতেছ। যেমন ধনীর সম্ভোগে, বিলাসীর বিলাসে, তেমনই আতুরের সেবায়, এমন কি, শ্মশানের বন্ধুহীন প্রান্তরেও সহচর তোমরা ভিন্ন আর কেহ নহে। হে ক্ষুদ্র, জানি না, তোমার মত বড়, তোমার মত ত্যাগ ও সেবাপরায়ণ, তোমার মত মহৎ জগতে আর কে আছে! স্বার্থান্ধ মূঢ়-জন তোমার মহিমা কি বুঝিবে?

মানুষের কথা থাকুক, মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব, স্বজাতি মানুষের জন্য তাহার দান, তাহার ত্যাগের কথা ধরি না; কিন্তু ঐ যে ইতর প্রাণী অশ্ব গো মেষ কুকুর প্রভৃতি বনের জীব, ঐ যে মৎস্য কূর্ম্ম ও বিবিধ খেচর ভূচর, মানুষের সম্পদে তাহারা কতটা সহায়, তাহা কি আমরা ভাবিয়া থাকি? যানাদি বহনে, দেহজাত পশমে এবং পুচ্ছ ও চর্ম্মে, এমন কি, মনুষ্য-ভোগের জন্য তাহার রক্ত-মাংসে মানব-সভ্যতা ও দেহরক্ষায় কতটা উপকার প্রাপ্ত হই, ক্ষুদ্র জীব-মণ্ডলীর হইয়া কে তাহার গণনা করিবে? গজদন্তে, পশম ও রেশমজাত শিল্পে, শুক্তি ও মুক্তা হইতে মানুষের সমাজ কতটা সমৃদ্ধ, তাহা আর কাহাকেও বুঝাইবার আবশ্যক নাই। মধুমক্ষিকা ও ক্ষুদ্র লাক্ষা কীটের দানই কি নগণ্য? মানুষ স্বার্থে বা বিনা স্বার্থে কোন ইতর প্রাণীকে উহার তুল্য দান এ পর্য্যন্ত দিতে পারিয়াছে কি? মানুষ জীবশ্রেষ্ঠ, তাই কি তাহার জগতে কাহাকেও দিবার কিছু নাই, কেবল লইবারই আছে মাত্র? সাপের মাথার মণির মূল্য জানি না, কিন্তু তাহার কালকূটও সময়ে মানুষের কাছে অমূল্য নহে কি? ক্ষুদ্র কার্পাস পাট অথবা ইতর প্রাণীর দেহ বা পশম প্রভৃতিই কি মানব-সভ্যতার মূল নহে? তাহারাই মানব-জগতের লজ্জা নিবারণ করিতেছে। ক্ষুদ্র তণ্ডুলকণা বা গম-যবাদিই মানুষের প্রাণধারণের প্রধান বস্তু।

উদ্ভিদরাজ্যে কাহার দিকে চাহিব! ক্ষুদ্র তরুলতা গুল্ম হইতে শত শত উদ্ভিদ্, কে না তাহার উদ্ভিদ্-জীবনটি মানুষের কল্যাণের জন্য উৎসর্গ করিয়া রাখিয়াছে? ভোজ্য-রূপে, ব্যবহারিক দ্রব্যরূপে, ভেষজরূপে, না হয় ইন্ধনরূপে, কোন্‌টি না মানুষের সেবায় লাগিতেছে? এমন প্রতিদান-হীন উপকার মানুষের জীবনে কখন কি সম্ভব হইবে?

ক্ষুদ্রের মহিমা, ক্ষুদ্রের কায, তাহার উদারতা শিখিতে মানুষ বা এই বড়দের কি কোন দিন অবসর হইবে? বড় চিরদিনই বড়ই থাকিবে, গায়ের জোরে সে কখন তাহার উন্নত মাথা হেঁট করিবে না। ক্ষুদ্র যূথিকা গোলাপ চিরদিনই ফুটিবে, মানবের আকর্ষণে বিচ্ছিন্ন হইয়া হাসি-মুখে তাহার ভোগের উপাদান হইবে। যাহা কিছু ছোট, তাহার ছোট ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া, ক্ষমতায় না কুলায়—সমষ্টি-বদ্ধ হইয়া বড়র সেবায়, বড়র ভোগের উপাদান হইয়া তাহার জীবন-জন্ম সার্থক মনে করিবে। তাহার পদ-দলিত শতলাঞ্ছিত প্রাণ তাহাতেই চরিতার্থ, তাহাতেই সফল জ্ঞান করিয়া চিরদিন মানুষকে শিখাইবে—ত্যাগের সুখ, ত্যাগের তৃপ্তি, ভোগের সুখ তৃপ্তি অপেক্ষা কত বড়। আমরা কি সে দৃষ্টান্ত—সে শিক্ষা লইতে পারিব? এত বড় দান বুঝি মানুষ কখন গ্রহণ করিতে পারিবে না।

শ্রীহরিহর শেঠ।

প্রণয়-শরৎ

প্রণয়ের কাল যেন শরতের বেলা—
এই হাসে রবি নভে এই মেঘমেলা;
এই অশ্রু এই হাসি,
পুন ভালবাসাভাসি,
আবার ঘনায় মেঘ অশ্রু দেয় ঠেলা;
প্রেমের গগনে করে কি রহস্য খেলা!

শ্রীউমানাথ ভট্টাচার্য্য

মলয় দেশে

বাঙ্গালোর হইতে সন্ধ্যাবেলা ডাক-গাড়ীতে যাত্রা করা গেল। প্রতিদিন বাঙ্গালোর হইতে মাদ্রাজ পর্য্যন্ত যে ডাক-গাড়ী যায়, তাহাতে উটাকামণ্ড যাত্রীদের জন্য এক-খানি স্বতন্ত্র গাড়ী থাকে, সেখানি রাত্রি একটার সময়ে জোলারপেট জংসনে কাটিয়া রাখা হয়, পরে উটাকামণ্ড ডাক-গাড়ীতে যুতিয়া দেওয়া হয়। আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ সে দিন বাঙ্গালোর হইতে উটাকামণ্ড পর্য্যন্ত যাত্রিগাড়ী আগে হইতেই ভরিয়া গিয়াছিল। বাঙ্গালোরের ষ্টেশন-মাষ্টারকে অনেক অনুরোধ করায় তিনি আর একখানি গাড়ী লাগাইয়া দিলেন। আনন্দে কেরল যাত্রা করা গেল।

মধ্যরাত্রির পরেই আনন্দ নিরানন্দ হইয়া উঠিল। সহযাত্রীদের কলরবে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। শুনিতে পাওয়া গেল যে, জোলারপেট জংসনে আসিয়া উপস্থিত হওয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু ষ্টেশন-মাষ্টার বলিতেছেন যে, আমাদের গাড়ীখানি সে রাত্রিতে আর চলিবে না। বাঙ্গালোর মেল হইতে উটাকামণ্ড মেলে মাত্র একখানি গাড়ী যুতিবার কথা আছে, ষ্টেশন-মাষ্টার নিজে দায়িত্ব স্বীকার করিয়া দুইখানি গাড়ী যুতিতে প্রস্তুত নহেন। অল্প দূর গিয়া দেখিলাম যে, সঙ্গী শিবরাম পাণ্ডুরঙ্গ মনের আনন্দে প্ল্যাট-ফরমে বিছানা পাতিয়া "পোহে" অর্থাৎ চিঁড়াভাজা ভক্ষণ করিতেছেন। আমাদের গাড়ীখানা সে রাত্রিতে যাইবে না শুনিয়া তিনি সদলবলে নামিয়া পড়িয়াছেন। বিষম বিপদে পড়িলাম। তাঁহারা যে গাড়ীতে ছিলেন, সে গাড়ী মাদ্রাজ মেলের, সুতরাং জোলারপেট জংসনে নামা ভিন্ন তাঁহাদের উপায় ছিল না। ষ্টেশন-মাষ্টার আমাদের কোন কথায় কর্ণপাত করিতে অনিচ্ছুক, অনেক অনুরোধ উপরোধের পর তিনি বলিলেন যে, উটাকামণ্ড মেলের গার্ড যদি একখানি গাড়ীর বদলে দুইখানি গাড়ী যুতিতে আপত্তি না করেন, তাহা হইলে তিনি আমাদের গাড়ীও যুতিয়া দিবেন।

যথাসময়ে উটাকামণ্ড মেল আসিল, আমার সহযাত্রী সাত জনের তর্জ্জন-গর্জ্জনে ভয় পাইয়া গার্ড দুইখানি গাড়ীই যুতিতে স্বীকৃত হইল। জোলারপেটে উটাকামণ্ড মেল প্রায় এক ঘণ্টা দেরী করিতে বাধ্য হইল। যখন গাড়ী ছাড়িল, তখন রাত্রি আড়াইটা। সকাল সাতটার পরিবর্ত্তে নয়টার সময় পোদনুর জংসনে গাড়ী থামিল। উটাকামণ্ড মেল এখান হইতে উত্তর দিকে মেটুপলৈয়মে চলিয়া যাইবে। আমাদের মঙ্গলোর মেলে উঠিতে হইবে। এখন মাদ্রাজ হইতে যে উটাকামণ্ড মেল আসে, তাহার অর্দ্ধেক মেটুপলৈয়মে ও বাকী মঙ্গলোরে যায়, কিন্তু মহাযুদ্ধের সময়ে কোন গাড়ীই মাদ্রাজ হইতে বরাবর মঙ্গলোরে যাইত না।

মঙ্গলোর মেলে বিশেষ যাত্রী নাই। উঠিয়া বিছানা পাতিয়া শুইয়া পড়িলাম। পৌষ মাস, তথাপি নয়টার সময় পাখা চালাইতে হইল, বেশ বুঝিতে পারিলাম যে দক্ষিণে আসিয়াছি। বেলা বারটার সময় গরম অসহ্য হইয়া উঠিল। পুনা ও বাঙ্গালোরের গরম কাপড় ছাড়িয়া ফেলিয়া শাদা কাপড় পরিলাম। ওলবক্কোট জংসনে অনেকগুলি কাঠের দোকান দেখা গেল। দুই এক জন ফেরিওয়ালা ষ্টেশনে কাঠের বাসন বিক্রয় করিতে আসিল। এখান হইতে কাঠের ঘটী, বাটি, দুধ হইতে মাখন তুলিবার যন্ত্র, থালা ও ধান অথবা চাউল মাপিবার পালি বা কাঠা সংগ্রহ করা গেল। ষ্টেশন ছাড়িবার পূর্ব্বেই দূরে পর্ব্বতমালার মধ্যে ফাঁক দেখা গেল। এক জন সহযাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, উহাই পালঘাট, চোলমণ্ডল হইতে মলবর দেশে যাইবার একমাত্র পথ।

পালঘাট পার হইয়া ক্রমে নামিতে আরম্ভ করিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয়, যতই নামিতে লাগিলাম, গরম ততই কমিতে লাগিল। ক্রমে দূরে অনন্ত-বিস্তৃত নীলসমুদ্র দেখা দিল, তখন বুঝিলাম, গরম কেন কমিল। দেখিতে দেখিতে কেরল দেশে আসিয়া পৌঁছিলাম। দেশটা আমাদের বাঙ্গালা দেশেরই মত। চারিদিকে ধানের সবুজ ক্ষেত, বরিশাল বা নোয়াখালি জিলার মত অসংখ্য নদী ও খাল, সমুদ্রতীরে নারিকেল ও সুপারির বন। আম্র পনসের ঘন

...এর মধ্যে ক্ষুদ্র বৃহৎ গ্রাম। এত ঘন বসতি বাঙ্গালা-দেশ ভিন্ন অন্য কোথাও দেখি নাই। রেলের পথে অসংখ্য ...ল, মনে হয় যে গোয়ালন্দ, ফরিদপুর অথবা ঢাকা ময়মনসিংহ রেলে চলিয়াছি। খালে কেরলসুন্দরী স্নান করিতে নামিয়াছে, অথবা বাসন মাজিতেছে, অনাবৃত ...ক তিয়ন (ধীবর) যুবতীরা দলে দলে বাগদা চিংড়ী ও গলদা চিংড়ী (lobster) ধরিতেছে। বড় বড় নদীর ...ভায় শুঁটকী মাছের গন্ধে তিষ্ঠান অসম্ভব। ছোট বড় অনেক রকমের নৌকায় বহু স্ত্রী-পুরুষ জাল দিয়া মাছ ধরিতেছে। লোকজনের চেহারা বদলাইয়া গিয়াছে, পুরুষরা কালো বটে, কিন্তু রমণীরা সত্য সত্যই উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। কেরল দেশে আসিবার পূর্ব্বে তন্বীশ্যামার কমনীয় কান্তি উপলব্ধ হয় নাই। আশ্চর্য্যের বিষয়, নিজ দ্রবিড় দেশে অর্থাৎ মাদ্রাজ হইতে রামেশ্বর পর্য্যন্ত সাধারণ লোক ঘন কালো এবং খর্ব্বাকার, কিন্তু কেরল ও মলয়ে অর্থাৎ ত্রিবঙ্কুর রাজ্য, মলবর এবং উত্তর ও দক্ষিণ কাণাড়া জিলায় সাধারণ লোকও দীর্ঘাকার এবং শ্যামবর্ণ। তিয়ন, তুলু প্রভৃতি নীচ-জাতীয়া স্ত্রীলোকরা সুন্দরী।

অপরাহ্ণে ইতিহাসবিশ্রুত কালিকট্ বা কালিকোট্ট নগরে আসিয়া পঁহুছিলাম। গাড়ী এখানে অনেকক্ষণ থামে, ক্ষুধারও উদ্রেক হইয়াছিল। হিন্দু-ভোজনাগারে প্রবেশ করিয়া কাফি ও চিনি মাখান ভাত খাইলাম। পুণা হইতে শিখাটা সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলাম; কারণ, তাহা না দেখাইলে ব্রাহ্মণ বলিয়া কেহ বিশ্বাস করে না। শিখা বাহির করিয়া কালিকট্ ষ্টেশনের হিন্দু-ভোজনাগারে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল, কিন্তু চারি আনা মূল্যে শর্করামিশ্রিত অন্ন কিনিয়াও খাইতে পারিলাম না। সন্ধ্যার প্রাক্কালে কানানোর ষ্টেশনে আসিয়া শিখা চুলের সহিত মিশাইয়া দিয়া মুসলমান-ভোজনাগারে প্রবেশ করিলাম। শুনিলাম, কাফি ও পাউ-রুটি এবং শুঁটকী চিংড়ীর তরকারি পাওয়া যাইতে পারে। বিফলমনোরথ হইয়া গাড়ীতে ফিরিয়া আসিলে সহযাত্রী এক জন কেরলবাসী ঈষৎ হাসিলেন এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি পার্শী কি না? আমি বাঙ্গালী শুনিয়া তিনি আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন।

সন্ধ্যাবেলায় ডাক-গাড়ী নীলেশ্বর ষ্টেশনে থামিলে, দুইটি কেরল-মহিলা ও একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক গাড়ীতে উঠিলেন। ভদ্রলোকটির সহিত পরিচয় করিয়া জানিলাম যে, তিনি নীলেশ্বরের রাজা, জাতিতে নায়র। রাজা নিজেকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিলেন এবং আমাদের জানাইলেন যে, সঙ্গিনী দুইটি তাঁহার ভগিনী এবং জ্যেষ্ঠা যুবরাজ্ঞী। ভগিনী কেমন করিয়া যুবরাজ্ঞী হইল, তাহা বুঝিতে আমার বিলম্ব হইল। আমি সেই সময় একটা ভীষণ অবিবেচনার কার্য্য করিয়া ফেলিলাম, আমি রাজাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলাম যে, তাঁহার ভগিনীপতি অর্থাৎ যুবরাজ কোথায়? এক জন সহযাত্রী তখন আমাকে নায়র জাতির অদ্ভুত বিবাহপ্রথার কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। তখন হইতে দশ বৎসর পূর্ব্বে রিপণ কলেজে আইন পড়িবার সময়ে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নায়র জাতির বিবাহপ্রথা এবং নায়রবংশে কন্যার অভাব হইলে পোষ্যকন্যা গ্রহণ ব্যাপারটি ভাল রকম বুঝাইয়া দিয়াছিলেন; কারণ, ইহার বিস্তৃত বিবরণ স্বর্গীয় গোলাপচন্দ্র শাস্ত্রীর "হিন্দু আইনে" ছিল না। আমরা বিবাহ বলিতে যাহা বুঝি, নায়র জাতির মধ্যে তাহা নাই। কন্যা পিতৃগৃহে বাস করে, সেখানে তাহার এক প্রকার বিবাহ হয়, কিন্তু সাধারণতঃ উত্তরাধিকার কন্যাগত। রাজ-বংশ বা সম্ভ্রান্তবংশে সম্পত্তি পিতার পরে পুত্রের হস্তগত হয় না। ভাগিনেয় মাতুলের উত্তরাধিকারী হয়। বর্ত্তমান রাজার স্ত্রী আছেন, কিন্তু তাঁহার গর্ভজাত পুত্রগণ নীলে-শ্বরের রাজা হইবেন না। জ্যেষ্ঠা ভগিনীর গর্ভজাত পুত্র মাতুলের পরে রাজা হইবেন। সকল কথা তখন মনে ছিল না। পূর্ব্বোক্ত সহযাত্রী মঙ্গলোরের উকীল, তিনি ইংরাজীতে বুঝাইয়া বলিলেন যে, নায়র-কুলকামিনীর বিবাহের কথা জিজ্ঞাসা করা সুরুচিবিরুদ্ধ, তাঁহাদের বিবাহ হয় না। সম্ভ্রান্ত নায়রবংশে "ব্রহ্মবীজম্" মত প্রচলিত আছে। এ দেশে নাম্বুদ্রী নামক এক সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেবল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ব্রাহ্মণকন্যার সহিত বিবাহ হয় এবং সেই বিবাহে উৎপন্ন কন্যা-পুত্র ব্রাহ্মণ-কন্যা ও ব্রাহ্মণ-পুত্র হইতে পারে। অপর ভ্রাতারা নায়র-কন্যা গ্রহণ করেন। নায়র-কন্যারা ইচ্ছামত নাম্বুদ্রী কুল-জাত ব্রাহ্মণপতি গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং তাঁহারা কখনও বিধবা হয়েন না। কিছু দিন পরে এক ব্রাহ্মণপতির পরিবর্ত্তে দ্বিতীয় ব্রাহ্মণপতি গ্রহণে কোনই বাধা নাই, তবে নায়র-কুলকামিনীরা সাধারণতঃ পত্যন্তর গ্রহণ করেন

না। কোন বংশে কন্যা না জন্মিলে বংশলোপ হইবার উপক্রম হয় এবং তখন বংশ বা "তারবাডের" কর্ত্তা বা কর্ত্রী পোষ্যকন্যা গ্রহণ করিয়া থাকেন। সহযাত্রী উকীলটি আরও জানাইলেন যে, এখন এই প্রথা ক্রমশঃ উঠিয়া যাইতেছে এবং শিক্ষিত নায়র-যুবারা ক্রমে বিবাহ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাদের সন্তান-সন্ততি যাহাতে পিতৃসম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতে পারেন, তাহার জন্য মাদ্রাজের ব্যবস্থাপক-সভা একটি নূতন আইন পাশ করিয়াছেন। বড় লাটের মন্ত্রণা-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সদস্য শ্রীযুক্ত শঙ্করণ নায়র এই বিবাহপ্রথার প্রধান উদ্যোগী

দেখিলে বোধ হয়, রাজা ও তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী এক পিতার ঔরসজাত, কিন্তু কনিষ্ঠা অন্য পিতার ঔরসজাতা বলিয়া অনুমান হয়। জ্যেষ্ঠা ভগিনী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, কিন্তু কনিষ্ঠা স্নিগ্ধা কাঞ্চনগৌরী। আকার বা চেহারা, বেশ ও পরিচ্ছদ, এমন কি, আচার-ব্যবহার পর্য্যন্ত আমাদের দেশের, এমন কি, মহারাষ্ট্র দেশের কুলকামিনী হইতে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন। মহারাষ্ট্র-ললনাদের মত মাথায় কাপড় নাই, চুলে সোনা-রূপার পরিবর্ত্তে ফুলের অলঙ্কারই বেশী, কোমরের অলঙ্কার নূতন ধরণের, ইহা আমাদের দেশে গোট, চন্দ্রহার বা মেখলার মত ঢিলা নহে; সোনার সরু পাত ইংরাজী কোমরবন্ধের মত কষিয়া বসিয়া আছে, তাহার উপরে মণি-মুক্তার কায। আমাদের বাঙ্গালী মহিলাদের মত অলঙ্কারের আধিক্য নাই। হাতে, কানে, নাকে ও গলায় অধিকাংশ অলঙ্কার বড় বড় বহুমূল্য মুক্তার, কেবল মধ্যে মধ্যে দুই একখানি কমল হীরা দেখা গেল।

দেখিতে দেখিতে কেরল দেশ ছাড়াইয়া মলয় দেশে পঁহুছিলাম। সহযাত্রী উকীলটি বলিয়া দিলেন যে, মলয় দেশে চন্দনের গাছ প্রচুর। গাড়ীর জানালা হইতে মুখ বাহির করিয়া দেখিলাম যে, ছোট খাট পাহাড় আর হইয়াছে এবং নদী-নালা কমিয়া আসিয়াছে। নারিকেল ও সুপারি বনের মধ্যে দুই দশটা তাল দেখা দিয়াছে। মনে হইল, যেন বৈদ্যনাথ বা মধুপুর অঞ্চলে আসিয়াছি। চারি দিক্ কিন্তু এখনও ঘনশ্যাম বনরাজিতে আচ্ছন্ন। লোকের বসতি তত ঘন নহে। রাত্রি নয়টার সময়ে ডাক-গাড়ী মঙ্গলোরে পঁহুছিল। নীলেশ্বরের রাজা ও উকীল সহযাত্রী বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। বুঝিলাম, এ দেশের লোক মহারাষ্ট্রীদের মত অতিথিপ্রিয় নহে। আমি বিদেশী, সুদূর বাঙ্গালা দেশ হইতে তাঁহাদের দেশে আসিয়াছি, কোথায় যাইব, তাহা জিজ্ঞাসা না করিয়াই সহযাত্রীরা যখন চলিয়া গেলেন, তখন স্থির করিলাম যে, এত রাত্রিতে আশ্রয় সন্ধান করিয়া বাহির করা কঠিন। সঙ্গী শিবরাম পাণ্ডুরঙ্গের পরামর্শ লইয়া ষ্টেশনেই রাত্রি কাটাইয়া দিলাম।

প্রভাতে সন্ধান লইয়া জানিলাম যে, মঙ্গলোর হইতে কুণ্ডাপুর পর্য্যন্ত "বস্" চলে; কিন্তু ছোট মোটর লইয়া যাইবার উপায় নাই; কারণ, পথে অনেকগুলি নদী ও সমুদ্রের খাড়ী পার হইতে হয়। "বস" কোম্পানী এখান হইতে কুণ্ডাপুর পর্য্যন্ত প্রত্যেক খাড়ী ও নদীর মাঝখানে এক একখানি "বস্" রাখিয়াছেন। নৌকায় নদী বা খাড়ী পার হইয়া পরপারে "বসে" চড়িতে হয়। সেদিনকার "বস" সকালে চলিয়া গিয়াছে, সুতরাং এখন আর "বস্" পাওয়া যাইবে না। যাত্রী জুটিলে দুইটার সময় "বস্" পাওয়া যাইতে পারে। মঙ্গলোরে অনেক সন্ধান করিয়াও আশ্রয় পাইলাম না। অগত্যা ফিরিয়া আসিয়া ষ্টেশনের ওয়েটিংরুমে আশ্রয় লইলাম। বেলা দুইটার সময় "বস্" আসিল, জিনিষ-পত্র লইয়া রওয়ানা হইলাম। [ক্রমশঃ।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহাভারত

অগাধ অমৃত-সিন্ধু এ মহাভারত,—
অতীত গৌরব-স্মৃতি—অতীত পৌরুষ,—
শ্লোকে শ্লোকে আছে গাঁথা নিত্য অকলুষ—
পড়ি গৌড়জন সদা সম্ভ্রমে বিনত।
যুগ যুগ তপস্যার এই পুণ্যধনি,
উদ্ভাসিত পরিপূর্ণ দিব্য মণিজালে
নক্ষত্র-খচিত নভঃ যেন নিশাকালে
কিংবা হিমগিরি নানা রত্নধনে ধনী।
ছন্দ তার মেঘমন্দ্র—গঙ্গার ঝঙ্কার—
কল্পনা কবির স্বপ্নে ত্রিলোকমোহিনী,—
যুগযুগান্তের কত বিচিত্রকাহিনী—
কৌস্তুভমণিতে গাঁথা রতনের হার।
ধন্য বেদব্যাস ধন্য ব্যাসের ভারতী,
করিছে অনন্তকাল দোঁহার আরতি।

মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ
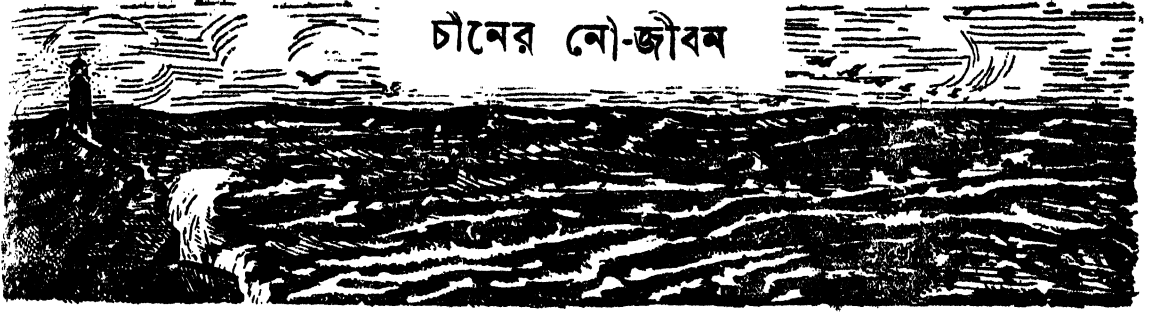
নদীমাতৃক বাঙ্গালা দেশে অনেক সময় বাঙ্গালী মাঝি মাল্লা ধীবর প্রভৃতি নদীবক্ষে নৌকায় জীবন যাপন করিয়া থাকে—কিন্তু উহা কোনও নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য। যাঁহারা চীনদেশ ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা লক্ষ লক্ষ চীনাকে যাবজ্জীবন নদীবক্ষে—নৌকায় পারিবারিক জীবন যাপন করিতে দেখিয়াছেন। হংকং হইতে পান্নল নদীপথে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে ক্যাণ্টন বন্দরে বৈচিত্র্যপূর্ণ চৈনিক নৌ-জীবনের বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। হ্যাংকোর কৃশ্চান কলেজের প্রেসিডেণ্ট মিঃ রবার্ট ফীচ্ দীর্ঘকাল চীনদেশে অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি প্রবন্ধান্তরে লিখিয়াছেন যে, পঞ্চদশ বৎসর পূর্ব্বে ৮৪ হাজার নৌকায় ৩ লক্ষ ৫০ হাজার চীনা শুধু ক্যাণ্টন বন্দরে বাস করিত। একবার ভীষণ বন্যাপ্রবাহে বহুসহস্র নৌকা ধ্বংস হইয়া যায়। সেই সঙ্গে সহস্র সহস্র নরনারীও সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছিল। অধুনা ২ লক্ষেরও অধিক নরনারী তথায় নৌ-জীবন যাপন করিতেছে।

এই সকল নরনারী নদীবক্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া, নদীবক্ষেই বড় হইয়াছে। ইহাদের বিবাহ, পারিবারিক জীবন ও মৃত্যু নদীবক্ষে—নৌকার উপরই সম্পন্ন হইয়া থাকে। নদীকে ইহারা ভালবাসে ও ভক্তি করে—নৌকাই তাহাদের মাতৃভূমি। তাহার জয়গানেই ইহাদের আনন্দ, তৃপ্তি ও স্ফূর্ত্তি। ইহারা স্থলের বিভিন্ন প্রদেশের

নৌকা-মধ্যে চীনা পরিবার

চীনাদের ভাষা বুঝিতে পারে; কিন্তু তথাপি তাহাদের কথিত ভাষার বৈশিষ্ট্য আছে।

সাধারণতঃ যাত্রীদিগকে বহনের জন্যই ছোট ছোট নৌকাগুলি নির্ম্মিত। নৌকার মধ্যস্থলে একটি কক্ষ —প্রায় ১০ ফুট দীর্ঘ ও ৬ ফুট প্রস্থ। এই কক্ষে ৬।৭ জন যাত্রী স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতে পারে। নৌকার অধিকারীরা পশ্চাতের দিকে স্বতন্ত্র কক্ষে অবস্থান করিয়া থাকে। এই কক্ষে তাহাদের আহার্য্য দ্রব্যাদি, শয্যা প্রভৃতি রক্ষিত হয়।

ছোট ছোট শিশুদিগের একটি চরণে রজ্জু দ্বারা আ... করিয়া চীনা মাতারা কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত থাকে, এ... শিশুদের জলে পড়িয়া ডুবিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে না। কাহারও কাহারও কটিদেশে রজ্জু বিলম্বিত থাকে।

ক্যাণ্টনে কোনও চীনা নারী তাহার স্বামীকে বাজার করিবার জন্য নৌকা ছাড়িয়া ডাঙ্গায় উঠিতে দেয় না। নানাবিধ দ্রব্যসম্ভার সহ নৌকা করিয়া বিক্রয়কারীরা নৌকায় নৌকায় দ্রব্যাদি ফিরি করিয়া বেড়ায়। চীনা গৃহিণীরা দর করিয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া
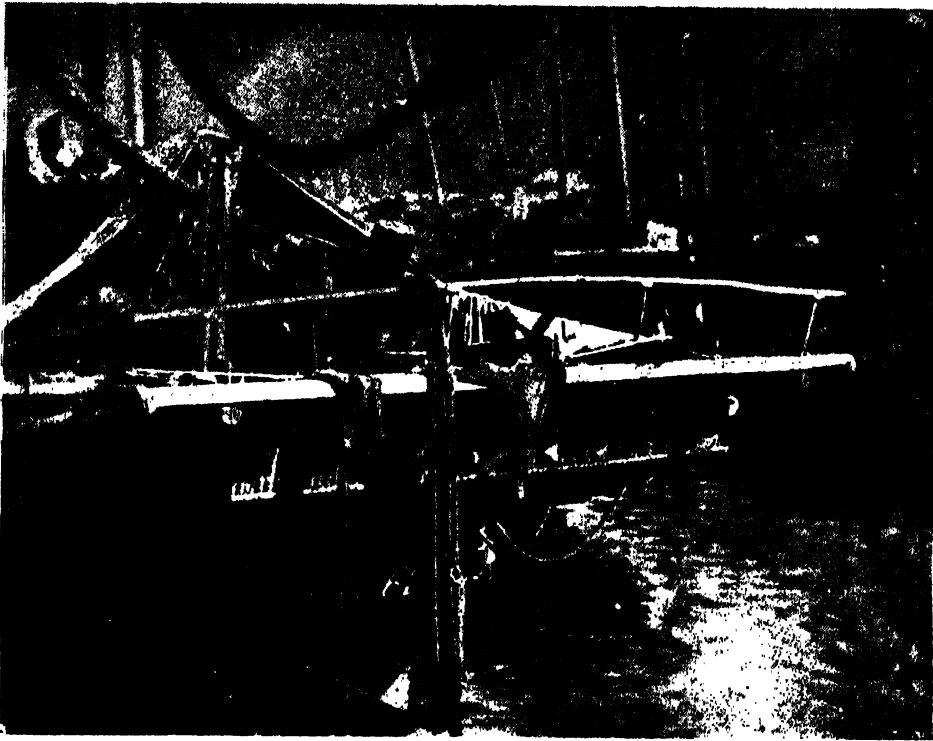
নৌকাপ্রান্ত—বস্ত্রাদি শুষ্ক করিবার স্থান। এইখানে শিশুর চরণে দড়ি বাঁধিয়া রাখা হয়

যে সকল যাত্রী নৌকায় আরোহণ করিয়া স্থানান্তরে গমনাগমন করে, নৌকার মাঝি-মল্লারা তাহাদিগকে আহার্য্য প্রদান করিয়া থাকে—অবশ্য মূল্য-বিনিময়ে। সাধারণতঃ ভাত, তরকারী, মৎস্য এবং ভেড়ার মাংস যাত্রীদিগকে প্রদত্ত হইয়া থাকে। সবই উষ্ণ অবস্থায় থাকে। যাত্রীদিগকে ভোজন করাইয়া নৌকার মালিকগণ একত্র বসিয়া ভোজনক্রিয়া সম্পন্ন করে। পরিমিত ভোজনে নৌ-জীবনে অভ্যস্ত চীনাদের শরীর দৃঢ় ও বলব্যঞ্জক।

থাকে। চীনা বধূরা স্বামীকে যতটা ভয় করে, তদপেক্ষা অনেক বেশী ভয় করে শ্বশ্রূমাতাকে। অনেক সময় বধূ অহিফেন সেবন করিয়া শাশুড়ীর অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে।

এই কারণে বর্ত্তমান যুগের শাশুড়ীও বধূকে সমীহ করিয়া চলেন, মুখরা বধূর সহিত কলহ করিয়া সংসারে অশান্তির ঝটিকা তুলিতে চাহেন না। চীনের নৌ-জীবনে পরদার ব্যাপারটি সম্পূর্ণ অপরিচিত।

বৈবাহিক ব্যাপারে সাধারণতঃ পাত্রপক্ষ হইতেই কন্যাপক্ষের নিকট বিবাহের প্রস্তাব উপস্থাপিত হইয়া থাকে। কোনও ঘটকী কন্যাপক্ষের নিকট বিবাহের প্রস্তাব লইয়া গমন করে। যদি কন্যার পিতামাতা পাত্রটিকে মনোনীত করে, তাহা হইলে জনৈক ভবিষ্যদ্বক্তা গণকের নিকট পরামর্শ গ্রহণ করিয়া থাকে। এ ব্যাপারে দেশের চীনারাও অনুরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে।

চীনের পারিবারিক জীবনের একটা বৈশিষ্ট্যের কথা মিঃ ফিচ বলিয়াছেন। শাশুড়ী ও বধূর মধ্যে যখন কলহ ঘটে, সে সময় পিতা ও পুত্র কোনও পক্ষে যোগ দেয় না। সময়ে সময়ে শাশুড়ী ও বধূর কলহ এমন আকার ধারণ করে যে, উভয় পক্ষ হইতেই শূন্য হাঁড়ি পরস্পরের প্রতি নিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে পিতা ও পুত্র পরম নিশ্চিন্ত মনে নীরব থাকে—মেয়েদের কলহ তাহারা আপনাদের মধ্যেই মীমাংসা করিয়া ফেলুক, পুরুষের তাহাতে যোগ দিবার কোন প্রয়োজন নাই। অনেক সময় তাহারা সন্নিহিত হাঁড়ি-কলসী প্রভৃতি পাত্র তাড়াতাড়ি স্থানান্তরিত করিয়া ফেলে, কারণ, সেগুলি কলহে নিযুক্ত হইলে শুধু শুধু নষ্ট হইয়া যাইবে ত! পুরুষদিগের এইরূপ নিরপেক্ষতার ফলে অনেক সময় আত্মকলহ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া যায়।

চীনা নাবিকরা জলদৈত্যকে অত্যন্ত ভয় করিয়া চলে। তাহারা মনে করে, জলদৈত্য অসীম শক্তিশালী। সুতরাং তাহার ক্রোধের উদ্রেক করিতে কোন চীনা চাহে না। মিঃ ফিচ এ সম্বন্ধে একটি বিচিত্র ঘটনার কথা বর্ণনা করিয়াছেন। একদা রাত্রিতে তিনি নিংপো নদের তীরে নিদ্রা যাইতে-ছিলেন। সেই সময় নদীর উপর একটা চীৎকার ধ্বনি শুনিয়া তিনি অর্দ্ধজাগ্রত হইয়া উঠেন; কিন্তু কারণ নির্ণয় করিতে পারেন নাই। অল্পক্ষণ পরেই সেই চীৎকারধ্বনি আর তাঁহার কর্ণগোচর হয় নাই। পরদিবস প্রাতঃকালে অনুসন্ধান করিয়া তিনি জানিতে পারেন যে, একখানি সুদৃঢ় নৌকা পাথর বোঝাই অবস্থায় নদীপথে আসিতেছিল, অন্ধকারে অপর একখানি নৌকার সহিত সংঘর্ষ হওয়ায় উক্ত নৌকার এক স্থানে ছিদ্র হইয়া যায়। নৌকার মাঝিদিগের কেহই সন্তরণ জানিত না, নৌকা
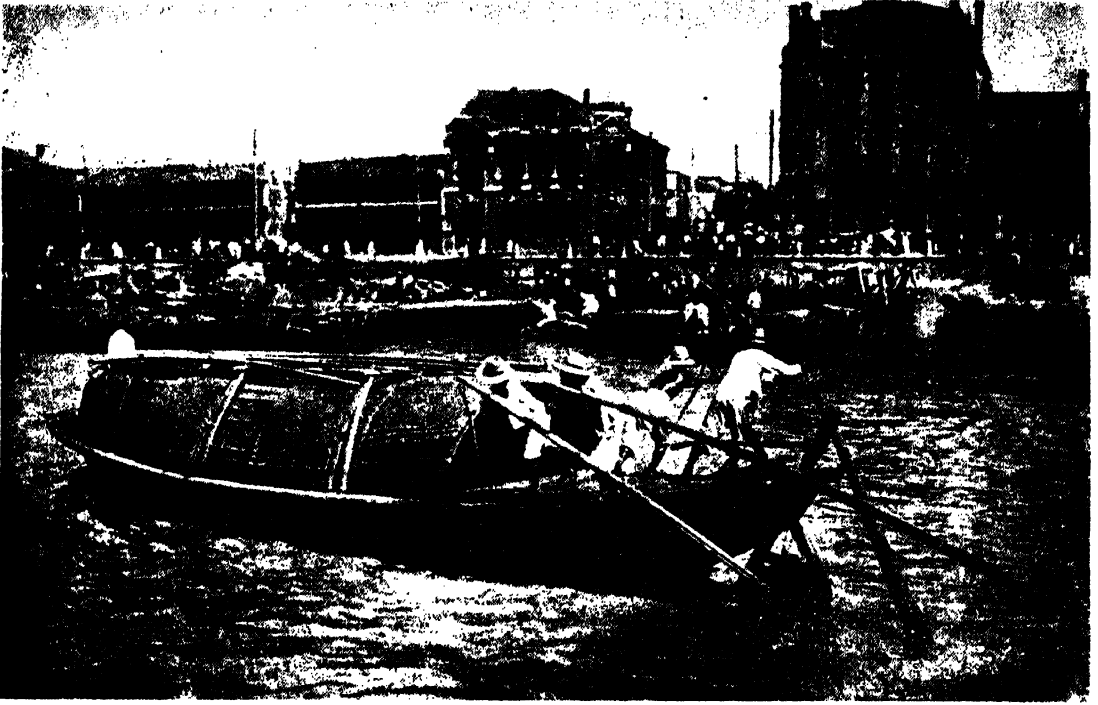
নৌকাগাত্রে অমরত্বের নিদর্শন-চিত্র; চীনাদিগের বিশ্বাস, ইহাতে নৌকার কোন বিপদ ঘটে না

দৈবজ্ঞ শুভদিন নির্ব্বাচিত করিয়া দেন। কিন্তু যদি কন্যা এমন দিনে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, যে দিবস হংসের জন্য নির্দ্দিষ্ট এবং পাত্রের জন্মদিবস শৃগালের জন্য নিরূপিত, তাহা হইলে সে বিবাহ কখনই সংঘটিত হইবে না; কারণ, স্মরণাতীত কাল হইতে শৃগাল হংসকে গ্রাস করিয়া আসিয়াছে।

চীনা নাবিকের নৌ-চালনা

বিচিত্র-দর্শন নৌকা—ইহা সাধারণ নৌকার স্থায় চালিত হয় না। আড়া-আড়িভাবে তীব্রস্রোতা নদীবক্ষে বাহিত হইয়া থাকে
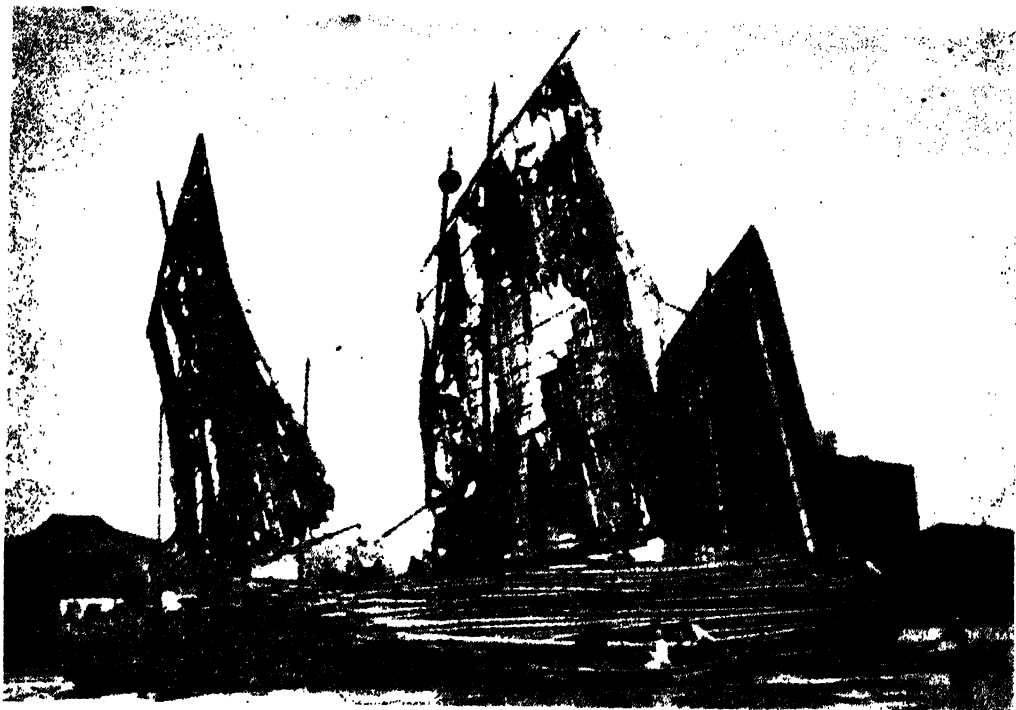
ছিদ্রপূর্ণ পাইলযুক্ত চীনা নৌকা। চীনা মাঝিদিগের বিশ্বাস, অচ্ছিদ্র পাইল অপেক্ষা ছিদ্রবহুল পাইল বিশেষ উপযোগী

সমুদ্র-বক্ষে চীনা-নৌকা

কারুকার্য্যখচিত চীনা নৌকা
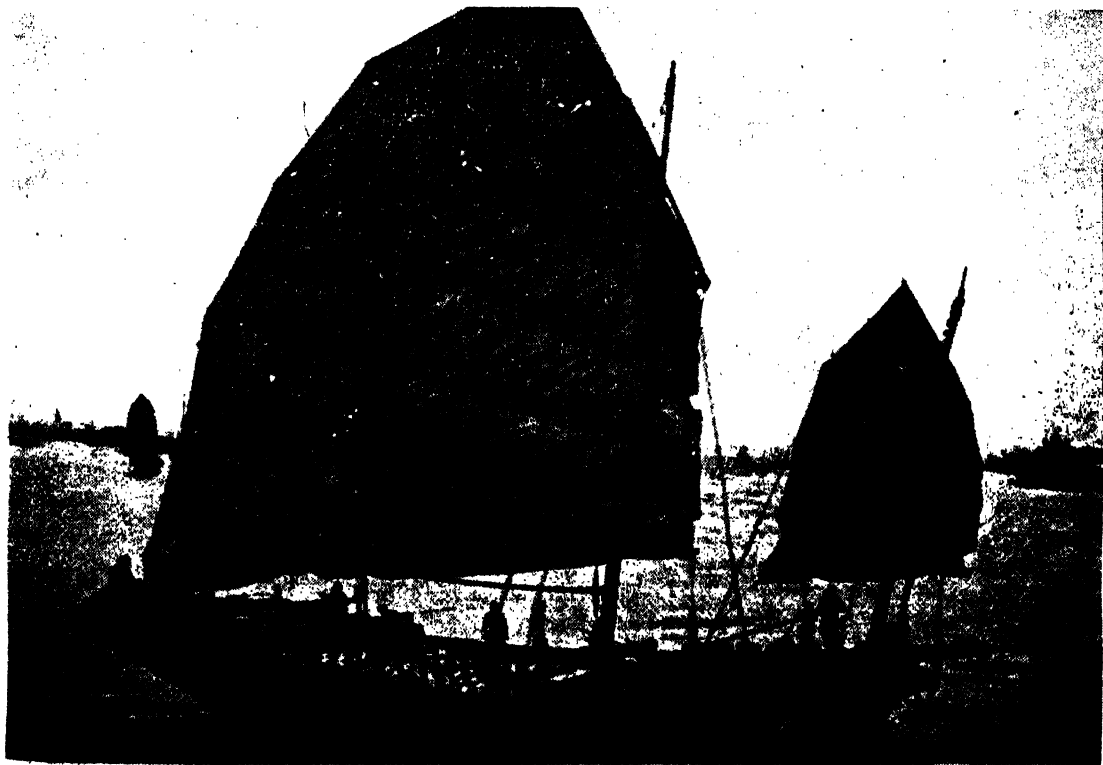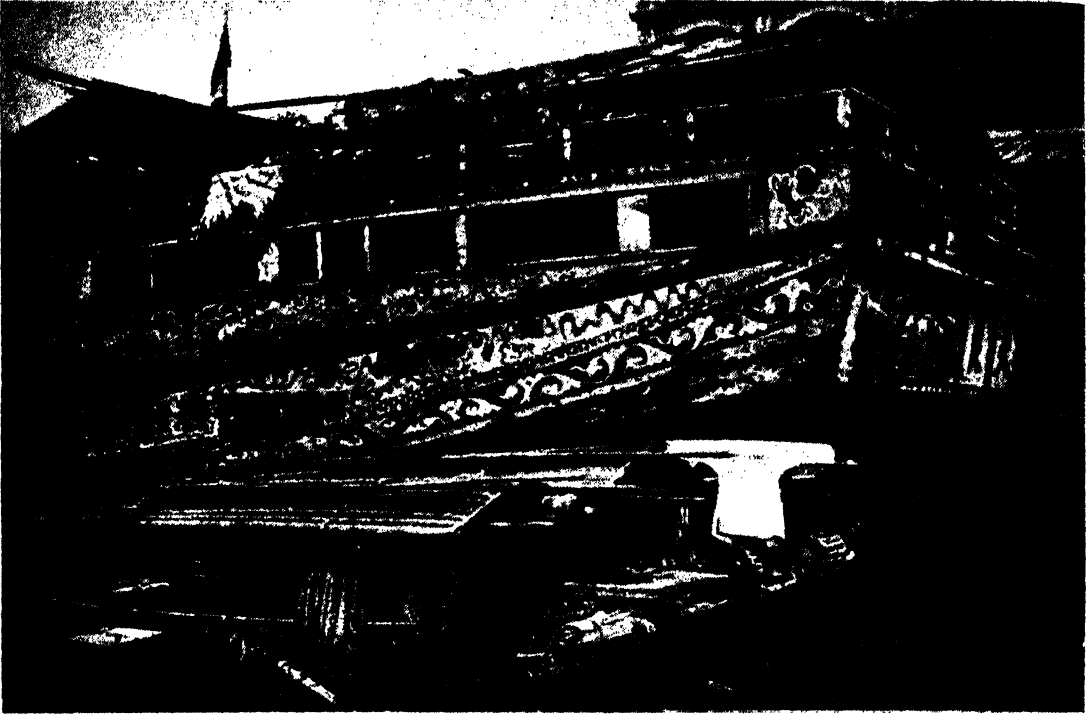
চীনা নৌকার নির্ম্মাণ-কৌশল—কোনও কঠিন পদার্থে অথবা অপর জলযানের সহিত সংঘর্ষ হইলে এই জলযানের সহসা ক্ষতি হইবে না

ক্রমশঃ জলমগ্ন হইতেছে দেখিয়া মাঝিরা সাহায্যার্থ চীৎকার করিতে থাকে। আশ-পাশ দিয়া অনেক নৌকা গতায়াত করিতেছিল। খেয়া ঘাটে প্রহরীর সংখ্যাও অল্প ছিল না, কিন্তু কেহই হতভাগ্যদিগের সাহায্যার্থ অগ্রসর হয় নাই। অবশেষে নৌকাখানি আরোহিগণ সহ জলমগ্ন হয়। জলদৈত্য পাছে ক্রুদ্ধ হইয়া সাহায্যকারীর অনিষ্ট করে, এই আশঙ্কায় কেহ তাহাদের রক্ষায় অগ্রসর হয় নাই। সময়ে সাহায্য পাইলে লোকগুলি নিশ্চিতই রক্ষা পাইত; কিন্তু সকলেই ভাবিয়াছিল, জলদৈত্যের কোপে উহারা প্রাণ হারাইতেছে, তাহাদিগকে সাহায্য করিলে ভবিষ্যতে রক্ষাকারীদিগকেও অনুরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইবে।

শুধু জলদৈত্য নহে—জলমগ্ন ব্যক্তির আত্মাকেও চীনারা ভয় করে। তাহারা বলে, জলদৈত্যের কোপে পড়িয়া যাহারা জলে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করে, তাহাদের আত্মা বিয়োগান্ত দৃশ্যের সন্নিহিত স্থানে সর্ব্বদা ঘুরিয়া বেড়ায় এবং যাহারা ঐ সকল আত্মার প্রতি সম্মানপ্রদর্শন না করে, তাহাদিগের উপর প্রতিশোধপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া থাকে।

চীনাদিগের বিশ্বাস, প্রত্যেক জলযানের একটি দেবতা আছে—সেই দেবতা তাহাকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। এ জন্য প্রত্যেক জলযানে চীনারা একটি চক্ষু অঙ্কিত করিয়া দেয়। তাহারা মনে করে যে, এই চক্ষুর সাহায্যে নৌকার দেবতা জলমগ্ন শৈল, চড়া প্রভৃতি যাবতীয় বস্তু দর্শন করিয়া জলযানকে নিরাপদ করিয়া থাকে। কোন জলযানের অঙ্কিত চক্ষুকে আবৃত করিতে গেলে চীনা নাবিক বা মাঝিরা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবে।

বৎসরে নির্দ্দিষ্ট সময়ে চীনারা নৌকার মহোৎসব করিয়া থাকে। উক্ত উৎসব-দিবসে দ্রুতগতির জন্য নৌকায় নৌকায় প্রতিযোগিতাও হয়। শত শত নৌকা সেই দিন উৎসববেশে সজ্জিত হইয়া নদীবক্ষকে শোভাময় করিয়া তুলে। তীরদেশে অসংখ্য দর্শক এই 'বাচ খেলা' দেখিবার জন্য সমবেত হইয়া থাকে। বাজিতে যে নৌকা জয়লাভ করে, তাহার অধিকারীরা পুরস্কৃত হয়। প্রায় আড়াই হাজার বৎসর ধরিয়া চীনদেশে এই উৎসব চলিয়া আসিতেছে।

ভাটার সময় খালের মধ্যে অসংখ্য চীনা নৌকা

প্রতিযোগী নৌকাগুলি সাধারণতঃ কোন না কোন মন্দিরের সম্পত্তি। প্রতি উৎসবের পরে উক্ত নৌকাগুলি মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত থাকে। আবার উৎসবের পূর্ব্বে মৃত্তিকা খনন করিয়া উহাদিগকে উত্তোলিত করা হয়। নৌকায় সর্ব্বাঙ্গ বর্ণলেপ দ্বারা নূতন করিয়া উহাদিগকে প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে প্রেরণ করা হইয়া থাকে।

প্রবল স্রোতোবেগের বিরুদ্ধে গুণ টানিয়া চলিয়াছে

মাছের ঝুড়ি—তাজা সজীব মাংস ক্রয় করিয়া এই ঝুড়ির মধ্যে রাখিয়া চীনা মাঝি জলের মধ্যে ডুবাইয়া রাখে, প্রয়োজন মত তুলিয়া লয়

নৌকাপ্রান্তে বংশনির্ম্মিত তৈলের পিপা

হংসাকৃতি নিংপো জঙ্ক

তৈল-চর্চ্চিত নৌকা। চীনারা কদাচিৎ নৌকার গায় বর্ণানুলেপ দেয়। শুধু মাঝে মাঝে এক প্রকার গাছের রস বা তৈল দ্বারা নৌকায় অনুলেপন করিয়া থাকে

চীনারা চুণ প্রস্তুত করিতেছে। এই চুণ ও তৈল মিশ্রিত করিয়া নৌকার অঙ্গে মর্দ্দিত করা হয়

নৌকার অধিবাসীদিগের প্রধান কায মৎস্য-শিকার। গ্রীষ্মকালে নদী বা সমুদ্রের কূলে অসংখ্য বরফের ঘর প্রতিষ্ঠিত হয়। মাটী খনন করিয়া গভীর গর্ত্ত নির্ম্মিত হয়। উহার চারি পার্শ্বে মৃত্তিকার প্রাচীর তুলিয়া তাহার উপর তৃণাচ্ছাদন দেওয়া হইয়া থাকে। সমুদ্রগামী মাছের নৌকাগুলি ঐ সকল ভাণ্ডার হইতে বরফ লইয়া কয়েক দিনের জন্য মৎস্য-শিকারে চলিয়া যায়। আমাদের দেশে জালুকগণ যেরূপ ভাবে নদীতে জাল ফেলিয়া মাছ ধরে, চীনা ধীবরগণও অনেকটা সেই প্রণালীতে মৎস্য-শিকার করিয়া থাকে। আবার কোন কোন স্থানে 'ভেড়ী' বাঁধিয়াও মাছ ধরা হইয়া থাকে। জোয়ারের জল চলিয়া গেলে আবদ্ধ মীনকুল নৌকায় সংগৃহীত হয়। মাঝিরা উহা লইয়া সন্নিহিত বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হয়।

মাল ও যাত্রিবহন, মৎস্য-শিকার ব্যতীত চীনা-মাঝিরা অসংখ্য তীর্থযাত্রীকে সময়ে সময়ে সমুদ্র বা নদী-মধ্যস্থ দ্বীপে বৌদ্ধ বা তাও মন্দিরে লইয়া গিয়া থাকে।

পশ্চিম হ্রদ, পুটো দ্বীপ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্রে অসংখ্য যাত্রী প্রতিবৎসর গমনাগমন করিয়া থাকে। সময়ে সময়ে এক একটি তীর্থে বহু সহস্র বৌদ্ধপুরোহিত সমবেত হয়েন।

পুটো দ্বীপে একটি মন্দির আছে। সেই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম করুণা। এই মন্দিরে বৎসরে তিন বার উৎসব হইয়া থাকে। চীনাদের বিশ্বাস, এই দেবতা ভক্তদিগের মনে তাঁহার প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় রাখিবার জন্য একবার করিয়া সমুদ্রে ঝড় তুলিয়া থাকেন। এ জন্য ভক্তগণ বৎসরে অন্ততঃ একবারও তাঁহার মন্দিরে সমবেত হইয়া তৎপ্রতি ভক্তি নিবেদন করিয়া যায়। বিশেষতঃ, সমুদ্রগামী নৌকার মাঝি-মাল্লারাও এ বিষয়ে কখনও ঔদাসীন্য প্রকাশ করে না।

চীনার ক্রোধ দেবতা

অনেকে বলিয়া থাকেন, চীন-সমুদ্রে জলদস্যুর উৎপাত আছে, কিন্তু মিঃ ফিচ্ বলেন যে, চীনদেশে কাহাকেও দীর্ঘকালের জন্য দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতে হয় না। সাধারণতঃ নৌ-জীবন তাহাদিগের জীবিকার্জ্জনের প্রকৃষ্ট অবলম্বন। ইহা দ্বারা স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষ স্বচ্ছন্দে ও ভদ্রভাবে স্ত্রী পুত্রের ভরণ-পোষণ করিতে পারে, কিন্তু যাত্রিবহন, মৎস্য শিকার প্রভৃতি কার্য্য যদি একবারেই না থাকে, তাহা হইলে জলদস্যুতার প্রলোভন এ অঞ্চলে খুবই তীব্র হইবার সম্ভাবনা।

প্রাচীনকালে প্রকৃতই চীনদেশে জলদস্যুর বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল। কোনও চীন-সম্রাট জলদস্যুগণের

চীনা খালে কর্দ্দম কপাট—দক্ষিণ-চীনের খালগুলির সকল স্থানের গভীরতা সমান নহে, এ জন্য অসংখ্য কপাট দৃষ্ট হয়। অনেক স্থানে কর্দ্দমই কপাটের কায করিয়া থাকে। উহার উপর দিয়া নৌকা টানিয়া বাহির করা হয়।

বোতলের আকৃতিবিশিষ্ট নৌকা। চীনা শুল্ক বিভাগ নৌকার মধ্যস্থলের পরিমাণের উপর কত মাল ধরিতে পারে, তাহার হিসাব লইয়া শুল্কধার্য্য করিয়া থাকে। নৌকার মাঝিমাল্লারা মধ্যস্থল সংকীর্ণ ও অগ্র পশ্চাদ্ভাগ প্রশস্ত করিয়া শুল্কের হার হইতে অব্যাহতি লাভ করে। এ জন্য নৌকাগুলি বোতলের আকারবিশিষ্ট। শুল্ক বিভাগের কর্মচারীরা চীনা নাবিকদিগের রস-বোধ দেখিয়া প্রাচীন প্রথামতে শুল্ক আদায় করিয়া থাকে।
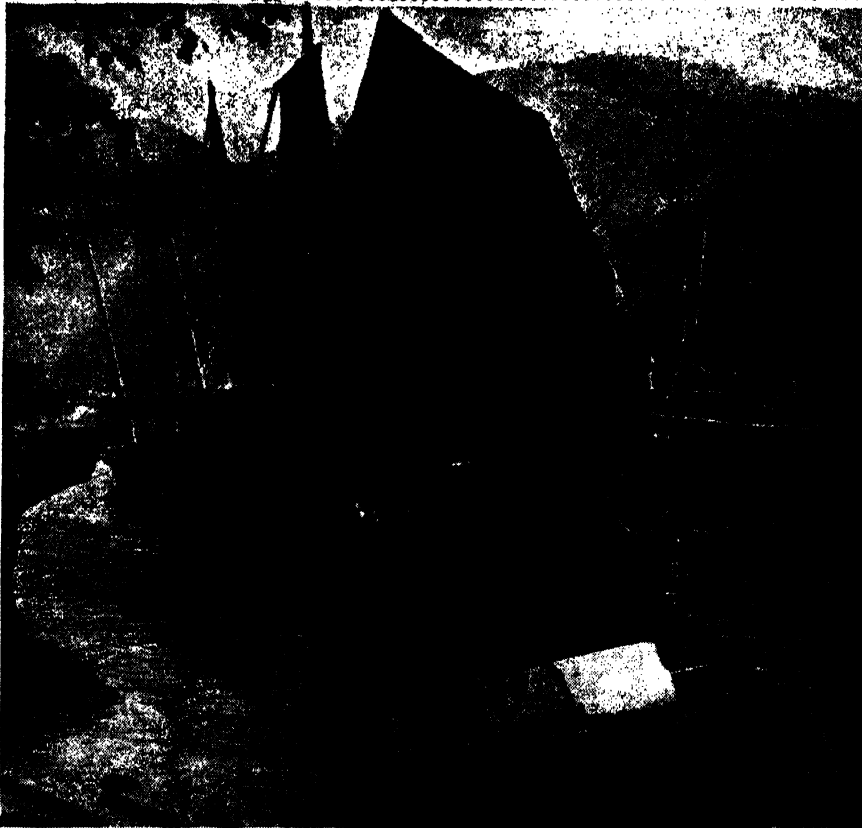
জলযাত্রার পর পাইল শুকাইবার ব্যবস্থা

অত্যাচারে এমনই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, লাল কালীর একটি আঁচড়ে তিনি যাবতীয় বন্দরকে ২০ মাইল দূরে—স্থলের মধ্যে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। বিরাট জন-সংখ্যা এবং নগরগুলি সমুদ্রকূল ও নদীর মোহানা ত্যাগ করিয়া ভিতরে সরিয়া গিয়াছিল। প্রাচীন প্রাচীর ও বাসভবনগুলি পরিত্যক্ত হইয়াছিল—তাহাদের স্থানে নূতন প্রাচীর ও সৌধমালা নির্ম্মিত হইয়া জলদস্যুর উপদ্রব প্রশমিত করিয়াছিল।

উল্লিখিত কারণে অধুনা প্রকৃত সমুদ্রকূলে কোনও চীনা নগর দৃষ্ট হয় না।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

সুখ-স্মৃতি

মানব-মনের লালসা যবে পূর্ণাহুতির অনল হতে—
এলে জগতের কামনা-লতিকা মূর্ত্ত-মাধবী!—মানস-রথে!
চল-চরণের গুঞ্জর-রোলে দোলে বিশ্বের অযুত ভাষা,
তব অঞ্চল-পথ বাহি' আসে মরতের নব মদির আশা!
চারু নয়নের আলো ঝলমলে মানব হিয়ার কমল জাগে—
শত সাহারার বেদনা বিথারি' তৃষিত অধর অমিয়া মাগে!
মানস-কুঞ্জে মুঞ্জরি তব কণ্ঠ-কাকলী তুলিছে দোলা—
চির ফাগুয়ার কল-হিল্লোলে চিত্ত মুরছি' আপন-ভোলা!
বুকে বুকে শত পুষ্প-বিতানে নব মল্লিকা ফুটিয়া হারা,
রচি' মায়াজাল মরত-কামনা গন্ধে অধীর পাগল-পারা!

জ্যোৎস্না-মদির অম্বর-পথে অমিয়ালহরী শিহরি' ভাসে—
স্তব্ধ নিশীথে, কূল দোলাইয়া কল কল তান উলসি' আসে!
জাগে উৎসব-চল-কল্লোল রচে মায়াস্মৃতি কামনা-ভাতি;
যৌবন-বিভা আবেশ-মদিরে অধীর করিছে মরত-রাতি!
দূরে গেছে আজ নিতি-ক্রন্দন অক্ষমতার অযুত গ্লানি,—
দূরে গেছে আজ চিন্তা, বেদনা, প্রিয়াহারা মুখে বিলাপ-বাণী!
ঢেকে দেছে তব পরশ-প্রলেপে চিরাহত মন বেদনা-ক্ষত;—
তব চরণের দোল-হিন্দোলে বেদনা-সিন্ধু তন্দ্রাহত!
হ'ক না ক্ষণিক, হ'ক না স্বপন, তবু যে মানস-কালিমা হরে
মানব-মনের মলয়-পরশ চাই তোমা তবু পরাণ ভরে'!

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়।
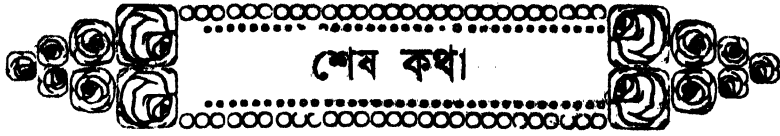
শেষ কথা

প্রায় চারি বৎসর পূর্ব্বে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধে ('মাসিক বসুমতী' আশ্বিন ১৩৩০ হইতে বৈশাখ ১৩৩১) নিজের রোগভোগের কথা, শোকতাপের কথা, ব্যারাম-বিপত্তির কথা বর্ণনা করিয়া সহৃদয় পাঠকের মন বেদনা-ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছি, হয় তো কোনও কোনও স্থলে পাক দিয়া সূতা লম্বা করিয়া বিরক্তির উদ্রেকও করিয়াছি। কিন্তু বৎসরাধিক কাল নানা রোগভোগের পর গত ২।৩ বৎসর হইতে ক্রমেই সুস্থ, সবল ও কর্ম্মক্ষম হইয়াছি; তাহার ফলে, রোগশোকের দাপটে অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় যে বিতৃষ্ণা হইয়াছিল, তাহা কাটিয়া গিয়াছে; এমন কি, গত বৎসর কলেজের কার্য্য ষোল আনার উপর আঠারো আনা নিষ্পাদন করিতে পারগ হইয়াছি এবং এবারকার দীর্ঘ গ্রীষ্মাবকাশে পাটনা, গয়া, কাশী, বিন্ধ্যাচল, লক্ষ্ণৌ, অযোধ্যা, হরিদ্বার, কনখল, হৃষীকেশ, লছমণঝোলা, এই সকল দূরদেশ ভ্রমণ করিতে সমর্থ হইয়াছি; নিদারুণ গ্রীষ্মে এ সকল স্থানে যাতায়াতে ক্লান্তিবোধ করি নাই, বরং স্ফূর্ত্তিবোধ করিয়াছি, অতিরিক্ত শ্রমে ও পথের অনিয়মে স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় নাই—এই সুসমাচার শুনাইয়া পাঠকের হৃদয়ে বেদনা-বিরক্তির স্থলে আনন্দের সঞ্চার করিয়া পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। (লোককে কষ্ট দেওয়া পাপ নহে কি? মহাজন-বাক্য আছে, 'পাপঞ্চ পরপীড়নে।')

আমাদের শাস্ত্রে, দুঃখ-দুর্দ্দিনের বর্ণনায় সমাপ্তি করা নিষিদ্ধ। তাই কীর্ত্তনের আসরে দেখি, বিরহ-অবস্থার বর্ণনায় কীর্ত্তন শেষ করার নিয়ম নহে, যুগলমিলন ঘটাইয়া দিয়া লীলাকীর্ত্তন শেষ করিতে হয়। লম্বা পালা এক বৈঠকে শেষ করিতে না পারিলে 'কল্য রাধাকৃষ্ণের মিলন হইবে' শ্রোতৃবর্গকে এই আশ্বাস দিয়া পেশাদার গায়ক-সম্প্রদায় সেদিনকার মত পালা সাজ করে, এরূপও দেখিয়াছি। (Tragedy) বিয়োগান্ত নাটক লিখিতে নাই, সেইজন্য ভবভূতি বাল্মীকীয় রামায়ণের সুবিদিত বৃত্তান্ত ওলট-পালট করিয়া রামসীতার 'সম্মেলন'-সাধন করিয়া 'উত্তর-রামচরিত' নাটকে যবনিকাক্ষেপণ করিয়াছেন। আমার এই সামান্য কাহিনী কীর্ত্তনও নহে, নাটকও নহে; কিন্তু তথাপি প্রাচীন বিধির অনুসরণে আরোগ্যের দশার উল্লেখে রোগের দশার বর্ণনার দোষ কাটাইয়া দেওয়াই উচিত। আহারের কথা যখন পূর্ব্বে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি (এ বিষয়ে লেখকের চিরদিনই পক্ষপাত), তখন আহারের বিষয় হইতেই একটা উপমা আহরণ করিয়া বলিতে পারি, ইহাতে পাঠকের মুখের—শ্রীবিষ্ণুঃ, মনের তিক্তস্বাদটা কাটাইয়া দিবে (Take the bitter taste from the mouth') এবং 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' নীতির মর্য্যাদা রক্ষা করিবে।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটা কথা না বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে। বহুকালব্যাপী (chronic) কঠিন রোগের কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছি বটে, কিন্তু তাই বলিয়া একেবারে নীরোগ হইবার পাট্টা পাই নাই। 'শরীরং ব্যাধিমন্দিরম্', সুতরাং ছোট খাট রোগ-বালাই তো জীবনের চিরসাথী; যত ক্ষণ দেহ ধারণ করিতে হইবে, তত ক্ষণ ব্যাধিবীজ হইতে শরীর-ক্ষেত্র একেবারে মুক্ত থাকিতে পারে না—বিশেষতঃ শেষ-বয়সে। ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি-কাসি-জ্বরে শীত-বর্ষায় দু'চার দিন ভোগায়; হয় তো ঠাণ্ডা লাগায় গলায় বেদনা হয়, গাল-গলা ফোলে, এ সব উপসর্গ তো উহার আনুষঙ্গিক। কখনও কখনও আহারে মাত্রা ঠিক রাখিতে না পারিলে বদহজম ও পেটের অসুখ হয়, ইহা তো অনিবার্য্য, বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে। যেমন স্বামি-স্ত্রী একত্র ঘরকরনা করিতে হইলে মধ্যে মধ্যে একটু আধটু খিটিমিটি লাগেই (গ্রাম্য কবি বলেন, 'এক ঘরে ঘর করতে গেলে ঝগড়া কি তা' হয় না?'), তেমনি উদর ও রসনা এক ঘরে যখন বাসা বাঁধিয়াছে, তখন রসনা ঝোঁক সামলাইতে পারিল না ও উদর কুপিত হইল। এরূপ ব্যাপার মাঝে মাঝে ঘটিবে বৈ কি! তাই বলিয়া নিক্তির তৌলে পান-ভোজন, রক্তমাংসের শরীর ধারণ করিয়া কি কেহ করিতে পারে? প্রতীকার তো নিজের হাতেই আছে—এক আধ দিন উপবাস ('হরিবাসর') করিলেই লেঠা চুকিয়া যায়, রোগের জড় মরে।

তাহার পর, বুড়া বয়সের ব্যাধি—দন্তশূল মাঝে মাঝে মাথা খাড়া দেয়, তাহাকে রোখে কে? যখন বাঁড়িয়া বসে, তখন 'ত্রাহি ত্রাহি' ডাক ছাড়াইয়া ছাড়ে, আহার-নিদ্রা বন্ধ হয়, বাড়াবাড়ি হইলে শয্যাশায়ী করে। ভুক্তভোগী

জানেন, ইহার কি যন্ত্রণা। অনেক দুঃখে জগতের শ্রেষ্ঠ কবি শেক্‌সপীয়ার বলিয়াছেন—'There was never yet philosopher That could endure the tooth-ache patiently'—অর্থাৎ যিনি যত বড় দার্শনিকই হউন, দন্তব্যাধি সহিষ্ণুভাবে বরদাস্ত করিতে কেহই পারেন নাই। (কবিবরের নিশ্চিত সাক্ষাৎ জ্ঞান ছিল।) ইহা বুড়া বয়সের সঙ্গের সাথী, শেষ পর্য্যন্ত চলিবে। তবে এইটুকু বাঁচোয়া, এ তীব্র যন্ত্রণা এক এক ক্ষেপে ২।৩ দিনের অধিক স্থায়ী হয় না, নতুবা তো অতিষ্ঠ হইতে হইত। দন্ত দেহমধ্যস্থ থাকিয়া যে কত বড় 'ঘরের শত্রু বিভীষণ' তাহার প্রণিধান বুড়া বয়সে প্রত্যক্ষভাবে হয়। এ শত্রু সংহার করিয়াও এড়ান নাই। ভূয়োদর্শী প্রিন্সিপ্যাল মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, দাঁতটি সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেলিয়াছেন, তথাপি সেই শূন্য স্থানে এক এক সময় বিষম শূলুনি উপস্থিত হয়। তাহা হইলে 'মাথা নাই তা'র মাথাব্যথা' কথাটা নিতান্ত আজগবী নহে। দন্তের এই ব্যবহারে বেশ বুঝা যায় যে, ক্রমেই দেহ-ঘরের মিস্ত্রীরা কাযে জবাব দিতেছে, (notice to quit) ঘর ছাড়িতে নুটিস্ দিতেছে। চক্ষুঃকর্ণও ক্রমে ক্ষীণশক্তি হইতেছে, বহির্জ্জগতের সহিত বন্ধন ক্রমেই শিথিল হইতেছে, ফলে পাক ধরিয়াছে, বোঁটা শুকাইতেছে, তথাপি আঠা মরে না, ভোগস্পৃহার নিবৃত্তি হয় না, আমাদের চৈতন্য হয় না।

যাক্, এ সব অধ্যাত্মতত্ত্ব। বুড়াবয়সের আর একটি আশঙ্কার জিনিশ, বাতব্যাধি। বোধ হয় ৩০ বৎসর আগে একবার দর্শন দিয়াছিলেন এবং এক পক্ষ কাল ভোগাইয়াছিলেন। সে ত অতীত যৌবনের কথা। সম্প্রতি মাস কয়েক পূর্ব্বে আবার দেখা দিয়াছিলেন; দুই দিনের বেশী স্থিতি হয় নাই, কিন্তু সেই দুই দিনেই বিলক্ষণ বেগ দিয়াছিলেন। বোধ হয় 'জানান্' দিয়া গেলেন যে, 'আবার আসিব'! দুই বারই ঔষধ-প্রলেপ-মালিশে সারিয়াছে। পিতৃদেব একবার দুই তিন বৎসর ধরিয়া ভুগিয়াছিলেন, যদিও পরে বেশ সারিয়া অনেক দিন জীবিত ছিলেন (জানি না অহিফেন-প্রসাদাৎ কি না)। বড় আশঙ্কা হয়, পাছে আমার অদৃষ্টে শেষদশায় এই ভোগ থাকে। অহিফেনটাও অভ্যাস করি নাই। আশ্চর্য্যের বিষয়, পিতাপুত্র উভয়েরই দক্ষিণ-হস্তে এই ব্যাধি আক্রমণ করিয়াছিল। নিজের বেলায়, ইহাতে তত বিস্ময়ের কারণ নাই; কেন না, আযৌবন দক্ষিণ-হস্ত-চালনা সর্ব্বপ্রকারে বেশী বেশীই করিয়াছি।

আরোগ্যের কথা বলিতে গিয়া আবার রোগের কথাই বলিতে বসিলাম। আর না। এখন অন্য কথা বলি। রোগ যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইয়াছি বটে, কিন্তু শোক-তাপ হইতে নিস্তার পাই নাই। এ বিষয়ে ভগবান্ অভাগা লেখকের প্রতি মুক্তহস্ত। বাল্যে (৮।৯ মাস বয়সে) মাতৃবিয়োগের কথা ধর্ত্তব্য নহে; কেন না, তখন অজ্ঞান শিশুর শোক অনুভব করিবার শক্তি ছিল না; জ্ঞান হইলে অবশ্য বুঝিয়াছি মাতৃহারার কি দুর্ভাগ্য। যৌবনে একাধিক শিশু পুত্র-কন্যা হারাইয়াছি, একটি বালক পুত্রকেও চিরবিদায় দিয়াছি; তখন অবশ্য সেই সব শোক খুবই প্রাণে লাগিয়াছিল; কিন্তু কালের শীতল হস্ত প্রলেপে সে সব ক্ষত (মাতৃহৃদয়ে না হইলেও) পিতৃহৃদয়ে এক প্রকার নিশ্চিহ্ন হইয়া মিলাইয়া গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। তাহার পর, প্রৌঢ় বয়সে, ৬।৭ বৎসরের ব্যবধানে, একবার নহে, দুই দুই বার নিদারুণ পুত্রশোকে হৃদয় জ্বলিয়া পুড়িয়া গিয়াছে, সে অনির্ব্বাণ বহ্নির আর উপশম নাই, রাবণের চিতার মত অবিরত ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে। 'শ্মশান করেছি হৃদি'; 'আর কিছু নাই মা চিতে, চিতার আগুন জ্বল্‌ছে চিতে, চিতাভস্ম চারিভিতে।' রোগ-শোকের সম্মিলিত আঘাতে দেহ-মন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কার্য্যে নিরুৎসাহ, জীবনে বিতৃষ্ণা আ'নিয়া দিয়াছে।

কিন্তু সংসার-বিধানের এমন অমোঘ প্রভাব যে এই নিদারুণ শোকও ক্রমে সহিয়া আসিতেছিল, আবার অল্পে অল্পে কার্য্যে প্রবৃত্তি, সংসারে আসক্তি জন্মিতেছিল; কিন্তু এমনই লীলাময়ের লীলা-রহস্য যে আবার গত বর্ষে নূতন করিয়া শোক পাইতে হইয়াছে, আবার একটি বয়ঃপ্রাপ্ত সন্তানের মায়া কাটাইতে হইয়াছে। ভগবান্ যেন শোকে বৈচিত্র্য-সাধনের জন্য পুনঃ পুনঃ পুত্রশোক দিয়া এবার কন্যার জন্য শোক-তাপের বিধান করিলেন। যে কন্যা নিজে রোগগ্রস্তা হইয়াও, চারি বৎসর পূর্ব্বে যখন আমি ৺কাশীধামে মাসের পর মাস শয্যাগত অবস্থায় দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি, তখন সর্ব্বদা শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আমার শুশ্রূষা করিয়াছে, যাহার অক্লান্ত সেবা দেখিয়া আত্মীয় অনাত্মীয়

সকলেই যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়াছেন, সেই মেয়ের কনিষ্ঠা কন্যা ৩.৪ বৎসর ধরিয়া কালরোগে ভুগিয়া, রোগজীর্ণ জীবনের শেষ কয়েক মাস অসহ্য যন্ত্রণ সহ্য করিয়া, মাতৃজাতির পরমকাম্য সন্তান লালন পালনের সুখ লাভ করার সুযোগ পাইয়াও তাহাতে বিড়ম্বিত হইয়া, বিংশতিবর্ষ বয়সে জীবনের সকল সাধ অপূর্ণ রাখিয়া, কি জানি, কোন্ অজানা দেশে চলিয়া গিয়াছে।

আবার তিন মাস যাইতে না যাইতে ১০।১১ বৎসরের দৌহিত্রী সেই পথেই প্রয়াণ করিয়াছে। 'একস্য দুঃখস্য ন যাবদন্তং তাবদ্দ্বিতীয়ং সমুপস্থিতং মে।' বাস্তবিক, মানুষের প্রাণ কাঠ-পাথরের চেয়েও কঠিন, তাই এত শোকতাপ সহ্য করিয়াও অটুট থাকে। কথায় বলে, 'অল্প শোকে কাতর, আর অধিক শোকে পাথর।' আর বিধাতার প্রাণ ততোধিক কঠোর, নিজের সৃষ্ট জীব-সম্বন্ধে তিনি এই সকল নিষ্ঠুর বিধান সংঘটন করিয়াও নির্ব্বিকার। করুণাময় পরমেশ্বরের এ কি নিষ্করুণ ব্যবস্থা। 'Great are thy tender mercies.' থাক্, এই অবোধ্য রহস্য (the inscrutable ways of Providence) সম্বন্ধে অন্ধ অজ্ঞ আমরা বৃথা জল্পনা করিব না। আর এ বিয়োগ-দুঃখের আলোচনা করিয়া পাঠকের মনে বিষাদ-অবসাদের সঞ্চার করিব না। পাঠককে আনন্দদানের সঙ্কল্প করিয়া প্রবন্ধ আরম্ভ করিয়া তাহার বিপরীত ব্যবস্থা করিলাম, এমনই আমার দুরদৃষ্ট। থাক্, এ প্রসঙ্গ বর্জ্জন করি। বরং এই কয় বৎসর রোগভোগের, এমন কি শোকতাপের ফলে কি লাভ-লোকসান হইয়াছে, তাহারই একটা খতিয়ান পাঠক-সমীপে নিকাশ-আখেরীর মত পেশ করিলে মন্দ হয় না।

যদিও দীর্ঘকাল রোগ-ভোগ করিয়াছি এবং দারুণ যন্ত্রণাও দীর্ঘকাল ধরিয়া সহ্য করিয়াছি, তথাপি এখনকার সুস্থ অবস্থায় দেখিতেছি, মোটের উপর ক্ষতি অতি অল্পই হইয়াছে, লাভই বেশী হইয়াছে। কিন্তু আমরা ভগবানের কঠোর বিধানের গূঢ় মঙ্গল-অভিসন্ধি না বুঝিতে পারিয়া তাঁহার নিন্দা করি, তাঁহার উপর রাগ-অভিমান করি, তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধার, বিরাগের ভাব পোষণ করি। যাক্, এই আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ছাড়িয়া এক্ষণে সূচিকটাহ-ন্যায়ে অল্প ক্ষতির কথা আগে সারিয়া লইয়া অধিক লাভের কথা পরে আলোচনা করিব।

প্রথম ক্ষতি, এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় অধিক শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করিতে পারি না। একটু বেশী ক্ষণ লেখাপড়ার কায করিলে মস্তিষ্কের কেমন যেন অবসাদ আসিয়া পড়ে, আর অধিক ক্ষণ মস্তিষ্ক-চালনার শক্তি থাকে না। আবার খানিক ক্ষণ বেড়াইলে ক্লান্তিবোধ হয়, চরণ আর চলিতে চাহে না। অথচ সমগ্র কর্ম্মজীবনে ইহাই আমার একমাত্র ব্যায়াম (physical exercise) ছিল। অপরাহ্ণে ও সন্ধ্যার পর ৩।৪ ঘণ্টা একটানে পথে পথে টো টো করিয়া ঘোরার বরাবর অভ্যাস ছিল; এখন এক ঘণ্টা চলিলেই অবসন্ন হইয়া পড়ি। ইহা অবশ্য জরার লক্ষণ। ক্রমে এ পরিবর্ত্তন ঘটিতই। তবে রোগ-শোকে শরীর-মন জীর্ণ হওয়ায় একটু যেন শীঘ্র শীঘ্র ঘটিয়াছে, অকাল-বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইয়াছে, ষষ্টিবর্ষ বয়স না হইতেই স্থবির হইয়া পড়িয়াছি। সমবয়স্ক, এমন কি আমা অপেক্ষা ৫।৭ বৎসরের বড়, পুরাতন সহপাঠীদিগের অনেককে যেমন সবল, সুস্থ ও কর্ম্মঠ দেখি, তাহাতে বেশ বুঝিতে পারি, কত সত্বর এবং কত দ্রুত আমার শক্তিহ্রাস হইয়াছে। সত্য বটে, কখনই খুব বলবান্ ও শ্রমসহিষ্ণু ছিলাম না, তথাপি এতটা অবনতি এত শীঘ্র হইবার কথা নহে। যাহা হউক, ইহাতে নিজের ব্যবসায়ের নিয়মিত কার্য্যের কোনও ত্রুটি হইতেছে না, কোনও রূপ অপকর্ষও লক্ষিত হয় না, একথা বুকে হাত দিয়া (with a clear conscience) বলিতে পারি।

দ্বিতীয় ক্ষতি, প্রায় বিশ বৎসর ধরিয়া যে একটা রচনার ঝোঁক, প্রবন্ধ লেখার বাতিক ছিল, সেটা একেবারে লোপ পাইয়াছে। তবে এটাকে ক্ষতি বলিব, কি লাভ বলিব, ঠিক বুঝি না। এক হিসাবে দেখিলে ইহা লাভ; কেন না, নিজের অবলম্বিত ব্যবসায়ে যথেষ্ট পড়াশুনা করিতে হয়, যথেষ্ট মাথা খাটাইতে হয় (যদিও মৌলিক গবেষণা—Original research করিতে হয় না)। তাহার উপর এই দুর্ব্বল দেহ ও মস্তিষ্ককে অন্য ভাবে খাটাইয়া আর বৃথা জীবনী-শক্তির অপচয় করা সুবিবেচনার কার্য্য নহে। এরূপ 'burning the candle at both ends' (বাতীর দুই মুড়া পোড়ান) এ বয়সে সমীচীন নহে। অনেকের অবশ্য বার্দ্ধক্যেও সজীবতা থাকে ('green old age'), তাঁহাদের দেহমনে চিরবসন্ত, চিরযৌবন বিরাজিত। সে সকল অনন্য-সাধারণ প্রতিভার কথা স্বতন্ত্র। আমাদের মত সাধারণ মানবের সুখের চেয়ে

স্বস্ত ভাল। অন্য দশ জনের মত আমারও কোন যোগ্যতা নাই, এই বিশ্বাস জন্মিলে মনে বেশ একটা শান্তির ভাব আসে, আর কোন হাঙ্গামা থাকে না। খ্যাতনামা মার্কিণ লেখক হোম্‌স্‌ বেশ কথাটা বলিয়াছেন—"When one of us who has been led by native vanity or senseless flattery to think himself or herself possessed of talent arrives at the full and final conclusion that he or she is really dull it is one of the most tranquilising and blessed convictions that can enter a mortal's mind,"—বিশেষতঃ যখন স্পষ্ট বুঝা যায়, চেষ্টা করিলেও পূর্ব্বের ন্যায় সেই সরসতা সঞ্চার করার ক্ষমতা আর নাই। স্বীকার করি, শেষ কথাটায় তলায় তলায় বেশ একটু আত্মপ্রশংসার রেষ আছে, কিন্তু ইহা আমার (dead selfএর) মৃত 'আমি'র প্রশংসা এই মনে করিয়া পাঠকবর্গ মার্জ্জনা করিবেন না কি? চারি বৎসর পরে আবার লেখনী ধারণ করিয়াছি, কিন্তু কলমের প্রত্যেক টানেই বুঝিতেছি, পূর্ব্বের সে শক্তি আর নাই। যেন স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছি, দেবী কানে কানে বলিতেছেন, 'বৃথা এ সাধনা'। দেবীর অকালবোধনে শ্রীরামচন্দ্র সুফল পাইয়াছিলেন, কিন্তু আমাদের মত জীবের সে আশা দুরাশা। এ অকালবোধন নহে, কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ। ইহার ফল ভাল হইবার সম্ভাবনা কোথায়? পাঠকের মনে আনন্দের পরিবর্ত্তে বিরক্তির সঞ্চার হওয়ারই ষোল আনা সম্ভাবনা। এক জন বিলাতী লেখক রঙ্গ করিয়া বলিয়াছেন, 'I no longer delight my readers, I punish them', আমি আর পাঠকগণকে আনন্দদান করি না, শাস্তিবিধান করি। এ অক্ষম লেখকের পক্ষে কথাটা রঙ্গতামাসা নহে, প্রকৃত।

এ কথা প্রকৃত হইলেও, আর এক হিসাবে দেখিলে রচনাশক্তির লোপ যে (regrettable) ক্ষোভের বিষয়; সুতরাং ক্ষতির খতিয়ানে ধর্ত্তব্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ শ্রেষ্ঠ লেখকদিগের রচনা পাঠ করিয়া, মনীষিগণের উচ্চ ভাবুকতাময় চিন্তার সহিত পরিচিত হইয়া, এক সঙ্গে আনন্দ ও জ্ঞান লাভ করেন বটে; সে আনন্দ বিমল, সে জ্ঞান মহৎ, তাহাও ঠিক। কিন্তু তথাপি শুধু পরের চিন্তা আত্মসাৎ করিয়া মানব পূর্ণতা লাভ করে না; নিজের চিন্তার স্ফূর্ত্তিতেই, সাহিত্যের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশেই প্রকৃত আনন্দ। উচ্চশ্রেণীর না হইলেও সে রচনায়, সে আত্মপ্রকাশে একটা সার্থকতা আছে; কেন না, সে রচনায় ইহাই সপ্রমাণ করে যে, লেখক বাহির হইতে সংগৃহীত জ্ঞানের জড় মৃদ্‌ভাণ্ড বা প্রগাঢ় অধ্যয়নের অচেতন যন্ত্র নহেন; তাঁহার নিজে চিন্তা করিবার শক্তি আছে এবং সে চিন্তা নিপুণভাবে প্রকাশেরও শক্তি আছে। এ হিসাবে দেখিলে রচনাশক্তির লোপ একটা ক্ষতি বলিয়া মানিতেই হইবে।

তৃতীয় ক্ষতি, দীর্ঘকাল রোগভোগের ফলে এবং বার্দ্ধক্যের জন্য পরিপাক-শক্তি কমিয়াছে; সুতরাং তদনুযায়ী আহারের বহর কমাইতে হইয়াছে, দায়ে পড়িয়া সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইয়াছে। বিশেষতঃ রাত্রির আহার যথাসম্ভব লঘু করিতে হইয়াছে, (চারিটি ভাত, একটু ঝোল ও একটু দুধ), কেন না, নিদ্রাবস্থায় হজমের ব্যাঘাত হয় বলিয়াই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক, রাত্রিতে আহারের মাত্রা একটু-মাত্রও অতিক্রম করিলেই পেটে বায়ু জন্মে, বদহজম হয়, চোঁয়া ঢেকুর উঠে, ইত্যাদি। শেষ পর্য্যন্ত দেখিতেছি একাহারীই হইতে হইবে। পরমহংস-দেবের সূক্ষ্ম ধর্ম্মতত্ত্ববিষয়ক উপদেশগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি আর না পারি, তাঁহার স্থূল বিষয়ে উপদেশ—দিনে বন্দুকগাদা করিয়া খাওয়া ও রাত্রিতে পেটের এক কোণ খালি রাখিয়া খাওয়া—বেশ মনে ধরিয়াছে এবং ইষ্টমন্ত্রের মত এই উপদেশ হৃদ্‌গত করিয়াছি।

ইহাতে কিন্তু একটা বিশেষ অসুবিধা আছে। কলিকাতার সমাজে নিমন্ত্রণটা পনর আনা জায়গায় রাত্রি-ভোজনেরই হয়; সুতরাং নিমন্ত্রণ পাইলে সমস্যায় পড়িতে হয়। ব্রাহ্মণ-সন্তান হইয়া নিমন্ত্রণের আকর্ষণ একেবারে ত্যাগ করা কঠিন। অথচ নিমন্ত্রণ স্বীকার করায়ও আত্মনিগ্রহের আশঙ্কা আছে। আমাদের প্রাচীন 'মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণে'র প্রথা যে কতদূর সমীচীন ছিল, তাহা এক্ষণে বেশ প্রণিধান করিতেছি। কেন না, দিনের বেলায় গুরুভোজন করিলে রাত্রিতে 'লঙ্ঘন' দিলেই সকল গ্লানি কাটিয়া যায়। পক্ষান্তরে রাত্রিতে গুরুভোজন করিয়া পরদিন খাড়া উপবাস করিলেও জড় মরে না, balance ঠিক রাখা যায় না। জানিয়া শুনিয়াও কিন্তু সকল সময়ে সম্পূর্ণ লোভজয়ী হইতে পারি না। আমাদের বয়োবৃদ্ধ প্রতিবেশী

মহাশয় এ বিষয়ে আদর্শ হইবার যোগ্য। তিনি আহারের মাত্রা যথাসম্ভব কমাইয়াছেন, অনশন বা অর্দ্ধাশনের ঘোর পক্ষপাতী হইয়াছেন এবং ইহাতে যে নীরোগ ও দীর্ঘায়ুঃ হওয়া যায়, উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা নিয়ত এই সত্য প্রচার করেন। তাঁহার একটি কথা বড় খাঁটি। তিনি বলেন, সকলেরই জন্মকালে একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্য-পেয়ের বরাদ্দ বিধাতা পুরুষ মাপিয়া দিয়াছেন; বরাদ্দ ফুরাইলে আয়ুঃও ফুরাইবে। নিত্য অধিক করিয়া খাইলে অল্প দিনেই পুঁজি ফুরায়, সুতরাং আয়ুঃ শেষ হয়; আর অল্প করিয়া খাইলে অধিক দিন চলে, সুতরাং আয়ুর পরিমাণও বাড়িয়া যায়! ভাবিবার কথা বটে।

বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য মাছ ও দুধ। ইংরাজী শিক্ষা-দীক্ষা পাইয়া আমরা মাংস-ভোজনে খুব ঝুঁকিয়াছি। যৌবনে যাহাই হউক, এ বয়সে মাছ-মাংস ত্যাগ করাই উচিত। মাংসটা এক প্রকার ত্যাগই হইয়াছে; (যে দিন যোটে না সে দিন খাই না, এই হিসাবে নহে!) তবে এই বৈরাগ্য মনের বলের প্রভাবে নহে, দশনের বলের অভাবে। সুযোগ উপস্থিত হইলে মাংস-চর্ব্বণের ব্যর্থ চেষ্টা না করিয়া ঝোলটুকু চুমুক দিয়া খাইয়া 'মহাপ্রসাদে'র সম্মান রক্ষা করি। মৎস্যটা রবিবারে ভিন্ন অন্য বারে চালাইতে হয়, তবে পরিমিত মাত্রায়। একেবারে ত্যাগ করিলে সাত্ত্বিকতা-বৃদ্ধিও হয়, মস্ত একটা খরচাও বাঁচিয়া যায়; কিন্তু ছাড়িতে কেমন একটু মায়া করে, একটু 'ইতস্ততঃ' বোধ হয়; কেন না, বাঙ্গালীর বিশেষত্বই মৎস্য-ভোজনে। ইহাতে মস্তিষ্কের পুষ্টি হয়, চক্ষুর জ্যোতির্ব্বৃদ্ধি হয়, ইত্যাদি কতকগুলি জন্মগত সংস্কার আছে, সেগুলি কিছুতেই মন হইতে দূর করিতে পারি না। বিশেষতঃ যখন বর্ষার ইলিশ, হেমন্তের গলদা চিংড়ি ও শীতকালের ভেটকি-ভাজন পরিহার করিতে পারি এমন জিতেন্দ্রিয় পুরুষ নহি, তখন দৈনন্দিন আহার্য্যের ফর্দ্দ হইতে চুণোপুঁটী বাদ দিয়া আর কি ফল? কেহ কেহ তর্ক তুলিতে পারেন, পূর্ব্বকথিত চতুর্ব্বিধ মুখপ্রিয় মৎস্যই বা পরিহার করা যাইবে না কেন? তাঁহাদিগের সহিত তর্ক করিয়া ফল নাই; বাঁচিয়া থাকিয়াও খাদ্য-জগতের ওরূপ উপাদেয় পদার্থ হইতে জোর করিয়া নিজেকে বঞ্চিত করাই যে পরমপুরুষার্থ, তাহা আমি মনে করি না। "ভিন্নরুচির্হি লোকঃ।"

দুধটা বাল্যের তথা বার্দ্ধক্যের প্রধান আহার; বিশেষজ্ঞের মুখে শুনিয়াছি, ইহার মত নির্দ্দোষ পুষ্টিকর ও সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ (perfect) খাদ্য আর কিছুই নাই। কিন্তু রোগের অবস্থায় এবং রোগমুক্তির প্রথম অবস্থায় অনেকদিন দুধ একেবারে বন্ধ করিতে হইয়াছিল; শুধু, এমন কি, সাগু বা সোডাপানির সহিত খাইলেও পেটে বায়ু জমিত, বিষম অস্বস্তি হইত, সারারাত্রি হাঁসফাঁস করিতে হইত এবং নিদ্রা হইত না। যাহা হউক, ক্রমে অল্প মাত্রায় অভ্যাস করিয়া এক্ষণে দুইবেলায়ই চলে, তবে পূর্ব্বের অভ্যাসের তুলনায় অল্প পরিমাণে। রাত্রিতে না খাইলেই যেন ভাল হয়—বিশেষতঃ দারুণ গ্রীষ্মে। কিন্তু অভ্যাসটা ছাড়িতে প্রবৃত্তি হয় না। 'পশ্চিমে' দেখিলাম, দারুণ গ্রীষ্মে অনেকে দুগ্ধের পরিবর্ত্তে দুই বেলায়ই দধিভোজন করেন; কিন্তু দিনের বেলায় শীত ও বর্ষাকাল ছাড়া অন্য সময়ে দধিভোজন করি বটে, 'ন রাত্রৌ দধিভোজনম্' নিষেধটা না মানিতে সাহস হয় না। ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ, নালী ক্ষীর, এক সময়ে খুবই প্রিয় ছিল; কিন্তু সে পথে চলা এখন দুঃসাহসের কার্য্য। তবে কখনও ন'মাসে ছ'মাসে এক আধ দিন চলে—তাহাও মধ্যাহ্নে। অতিপ্রিয় পরমান্ন-ভোজন একেবারে আর সহে না। বাস্তবিকই জীবন একটা বিড়ম্বনা হইয়া পড়িয়াছে। জানি না, কতদিন এরূপ আত্মবঞ্চিত হইয়া ধরাধামে থাকিতে হইবে?

দুধ খাইলে পেটে বায়ু হওয়ার কথা বলিয়াছি। এই উপসর্গ-উপশমের উপায়টি তারিফ করিবার জিনিশ। দুই জন বন্ধু দুই রূপ ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, তবে দুইটিই 'সম্বৃত-সোপকরণ' ও আমার মনের মত! প্রথম ব্যবস্থা, মধ্যাহ্নে ভাতের সহিত, যেরূপ সহে সেইরূপ, অল্প পরিমাণে সদ্যঃ-প্রস্তুত গব্যঘৃত; দ্বিতীয়, উক্ত সময়ে ভাতের পাতে ২।১ খানি গব্যঘৃতপক্ক লুচি শুধু লবণ দিয়া আহার। উভয় ব্যবস্থার ফলে উপসর্গটির একদম নিবৃত্তি হইয়াছে এবং ইহার একটি by-product হইয়াছে বড় আরামের। মধ্যাহ্নে ভাতের পাতে কয়েকখানি লুচি সেই অবধি বাহাল রহিয়া গিয়াছে; ঔষধ এখন আহারে পরিণত হইয়াছে; অবশ্য এখন আর গব্যঘৃত ও লবণের বাঁধাবাঁধি নাই। রকমফের হইবে বলিয়া সময়ে সময়ে নিমকি কচুরি শিঙ্গাড়া এমন কি, পাঁপর-ভাজাও চলে, বিশেষতঃ শীতকালে এবং

রবিবারে নিরামিষ আহারে। তবে সবই ব্রাহ্মণের বিধবার মত দুপুরে ভাতের পাতে; বৈকালিক জলখাবার বা রাত্রি-ভোজনে অচল। দধিদুগ্ধের সঙ্গে—বঙ্গ-সীমন্তিনীগণের বেশ-প্রসাধনের পর টিপ পরার মত,—Finishing-touch হিসাবে ২১টা সন্দেশ বা রসগোল্লা ভোগ লাগানও একটি নূতন অভ্যাস হইয়াছে। ফলতঃ আহারে প্রাচুর্য্য না থাকিলেও পারিপাট্য বাড়িয়াছে। আবার নিজের রুচির ঝোঁকে ভোজন-ব্যবস্থার আলোচনায় মত্ত হইয়াছি। স্বভাব যাইবে কোথায়? আর না। এক্ষণে ভোজনে, তথা উহার আলোচনায়, রাশ টানার প্রয়োজন। ফল কথা, ইহাকে যদিও ক্ষতির ফর্দ্দে স্থান দিয়াছি, তথাপি একটু তলাইয়া দেখিলে বুঝিতে পারি যে, এটা প্রকৃতপক্ষে ক্ষতি নহে, লাভ। সংযমশিক্ষা এ ক্ষেত্রে খুবই প্রয়োজনীয়—বিশেষতঃ শেষ দশায়। (আগামী বারে সমাপ্য)

(অধ্যাপক) শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাবণের চিতা

সাগর-তীরে চিতা যখন জ্বল্‌লো রাবণ রাজার,
নর-বানরের সঙ্গে এলো দেবতা-দানব হাজার।
মুখ টিপে কেউ হাসে
দাঁড়ায় কেহ পাশে,
চেয়ে মৃতের মুখের পানে
মুখটা করে বেজার।

আলোচনা কেবল করে কুকীর্ত্তিরই কথা,
ফিরিস্তি তার লম্বা বহুৎ সীতাহরণ যথা।
এত লোকের ভিড়ে
একটাও নাই কি রে?
রাবণ লাগি লাগলো আহা
যাহার বুকে ব্যথা।

এলেন সেথায় সূর্পনখা কর্ণ-নাসা কাটা
কেউ কাঁদে না তিনিই কাঁদেন বিকট করে' হাঁ'টা।
চিতার কাছে ঘুরে
চেঁচান নাকী-সুরে
স্তব্ধ সবাই,—তাহার চেয়ে
ভীষণ তাঁহার ঝাঁটা।

বলেন 'পুরুষ সিংহ' ছিলেন সত্য আমার দাদা,
মস্ত নারীর মর্য্যাদক আর বুকটা ছিল সাদা।
গেল মোদের তরে
লঙ্কাকাণ্ড করে'
চিতায় তাঁহার উঠল না মঠ
দেবতারা দেয় বাধা।

দেবতারা হায় বললে হেসে নিষ্ঠা তোমার বড়,
আমরা পলাই, একলা বসে' দাদার বড়াই কর।
সিংহ যদিই জানো
নাও নি যতন কেনো,
থাকতে সময় পশুশালায়
রাখতে হ'ত দড়।

সিংহ না হ'ক হিংস্র বটে সেটা মহৎ গুণ
বহু দিনের বীরত্ব তার করলে অনেক খুন।
হৃদয় ভরা পাপ
নাইক অনুতাপ
নিরীহেরি লাঞ্ছনা সে
করলে পেয়ে মুণ।

ক্রমে ক্রমে এমনি ভূভার হরণ করেন ধাতা,
সতীত্বেরি আলোয় উজল চির দিবস সীতা।
রাম যে দয়াময়
হরেন ভবভয়
রাবণ গেল রেখে কেবল
কুকীর্ত্তি আর চিতা।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

শিল্প-মঞ্জরী

সলুকা জ্যাকেট ঃ—ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলের মেয়েদের শরীর টাইট রাখিবার জামার মধ্যে ইহা অন্যতম। বাঙ্গালার প্রতি ঘরে ঘরে না হউক, কোন কোন পরিবারে এর ব্যবহার দেখা যায়। মেয়েদের under wear পক্ষে খুব ভাল।

সরঞ্জাম ঃ—(Materials) কাপড় ১·৯" ইঞ্চি (১½ গজ)

সলুকার মাপ ঃ—লম্বা—১৬", ছাতি—৩২"
কোমর—২৮", পুট—৬"
পুট হাতা—১৪", মোহরী—৯"
সেন্ত—১৩"

সলুকা কাটিবার প্রণালী ঃ—সাধারণতঃ এই সলুকা জ্যাকেট ছিটের কাপড়েরই হইয়া থাকে। লম্বা মাপের ১" ইঞ্চির কাপড় বেশী লইয়া এড়ো দিকে ডবল ভাঁজ করিতে হইবে। লম্বা ১৬"+১"=১৭" ইঞ্চি ক থ লম্বা মাপ ক বিন্দু হইতে ছাতির মাপের ¼ অংশ ৮"—২" =৬" ইঞ্চি গ বিন্দু চিহ্ন করিয়া গ বিন্দু হইতে ঘ বিন্দু ১½" ইঞ্চি নীচে ছাতির মাপের চ বিন্দু লইতে হইবে। ক, চ সেন্ত মাপের ১৩" ইঞ্চি স্থানে চিহ্ন করিয়া তৎপর ঘ বিন্দু হইতে ছ বিন্দু ছাতির মাপের ¼ অংশ ৮"+১"=৯" ইঞ্চি পর্য্যন্ত সরল রেখা টানিয়া চ হইতে ঝ বিন্দু কোমরের মাপের ¼ অংশ ৭"+১"=৮ ইঞ্চি স্থানে ঝ বিন্দু চিহ্ন করিয়া সরল রেখা টানিয়া লইয়া গ, জ ৯" ইঞ্চি থ, ট ৮" ইঞ্চি স্থানে সরল রেখা টানিয়া ক বিন্দু হইতে ঠ বিন্দু পুট মাপ ৬" ইঞ্চি ঠ ড বিন্দু গ, জ লাইনের সঙ্গে সংযোগ করিয়া ঠ, জ চিত্রানুযায়ী বাঁকা ভাবে দাগিতে হইবে। ক বিন্দু হইতে ড বিন্দু পর্য্যন্ত ৪" ইঞ্চি স্থানে চিহ্ন করিয়া ড ক, ঢ ৩" ইঞ্চি স্থানে চিহ্ন করিয়া চিত্রানুরূপ ড, ঢ দাগে দাগিতে হইবে। ড বিন্দু হইতে ঠ বিন্দু ১" ইঞ্চি দাগ দিয়া ড, ঠ সংযোগ করিয়া ঢ, ড, ঠ, জ, ছ, ঝ, ট ও থ বিন্দুর লাইনে কাটিয়া লইলে পিঠের অংশ কাটা হইল। সামনের অংশ কাটিতে হইলে অপর কাপড়খানিকে এড়ো দিকে ডবল ভাঁজ করিয়া ঘ, ছ ছাতির মাপের লাইন

চিত্র নং—১
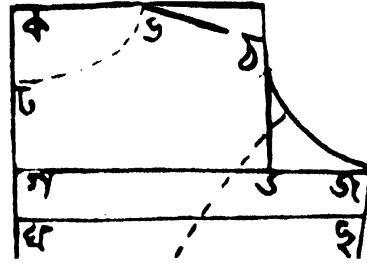
৪ ও ৫ বিন্দুতে ছাতির মাপের লাইন টানিয়া চ, ঝ কোমরের লাইন বরাবর ৯ ও ৮ লাইন সমানভাবে টানিয়া লইয়া মাপ ধরিতে হইবে। ঘ, ছ ৯" ইঞ্চি সহ ৪ বিন্দু হইতে ছাতির মাপের অর্দ্ধেক ১৬"×২½"=১৮½" ইঞ্চি স্থানে চিহ্ন করিয়া চ, ঝ ৮" ইঞ্চি সহ ৮ বিন্দু হইতে কোমরের মাপের অর্দ্ধেক ১৪+২½"=১৬½" ৯ বিন্দু চিহ্ন করিয়া ঘ, ট—৬ ও ৭ চিত্রানুযায়ী সমান রাখিয়া ৫, ৯ ও ৭ চিত্রানুযায়ী দাগ দিয়া লইতে হইবে। কাঁধের অংশ ড, ঠ—৩ ও ১ একটু বাঁকা ভাবে চিত্রের ন্যায় কাঁধ

দাগ দিয়া ৩ ও ৫ মোহোড়ার অংশ ঠ, জ বরাবরে রাখিয়া চিত্রানুযায়ী দাগ দিয়া ১ বিন্দুর লাইন হইতে ৪″ ইঞ্চি নীচে ২ বিন্দু চিহ্ন করিয়া ১ ও ২ বিন্দুতে গলার অংশ কাটিতে হইবে। এখন ৮ বিন্দু হইতে ২ বিন্দু ১″ ইঞ্চি ভিতরে ২, ৪, ৮ ও ৬ বিন্দুতে চিহ্ন করিয়া ৭ বিন্দু ৯ ও ৫ বিন্দু হইতে ১″ ইঞ্চি

চিত্র নং—২

কাপড় বেশী রাখিয়া ৭, ৯, ৫, ৩, ১, ২, ৪, ৮, ও ৬ বিন্দুতে কাটিয়া লইলে সাম্‌নের অংশ কাটা হইল।

হাতের অংশ কাটিবার প্রণালী ঃ—

কাপড়কে লম্বায় ডবল ভাঁজ করিয়া এড়ো দিকে ডবল ভাঁজ করিতে হইবে। থ, দ ছাতির মাপের ⅙ অংশ ৮″ ইঞ্চি প, ধ পুট ৬″ ইঞ্চি বাদ দিয়া পুটহাতা ৮″ ইঞ্চি স্থানে চিহ্ন করিয়া ধ বিন্দু মোহুরীর অর্দ্ধেক ৪½ + ২ = ৬½ ইঞ্চি ধ, প সোজা দাগ দিয়া দ, প চিত্রানুযায়ী দাগিয়া লইয়া

চিত্র নং—৩
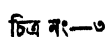
থ, প, দ ও থ দাগে কাটিয়া লইলে হাতের অংশ কাটা শেষ হইল।

সলুকা জ্যাকেট সেলাই ঃ—সলুকার পিছনকার অংশ লইয়া যেখানে বিন্দুর দ্বারা চিহ্নিত করা হইয়াছে, সেই স্থানে দুই দিকে দুইটি সমান বরাবর টেইপ বসাইয়া লইতে হয়। হিন্দুস্থানীরা যে রংয়ের কাপড় হইবে, তাহার ভিন্ন রংয়ের কাপড় বসাইয়া থাকে। সাম্‌নের অংশে বোতামপটী ও কাজঘরপটী ১৷৹ ইঞ্চি পরিমাণ কাপড় জুড়িয়া সলুকার দুই পাশ জুড়িয়া লইয়া কোমরপটী ও নীচের

চিত্র নং—৪
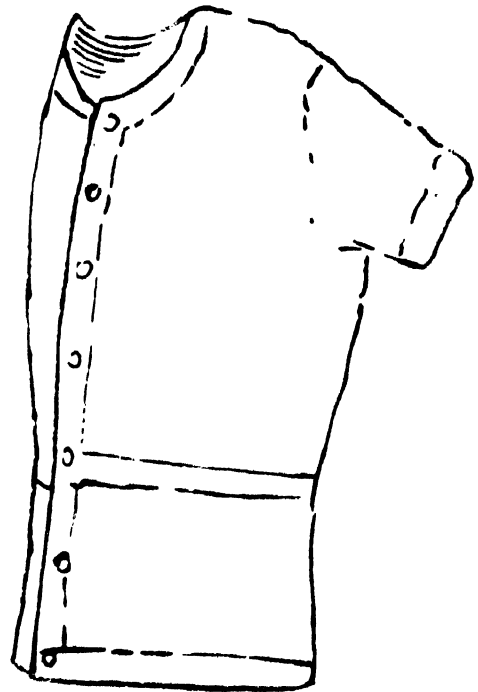
ডাউন পটী বসাইয়া লইবে। তাহার পর কাঁধের অংশ জুড়িয়া গলায় পটী বসাইয়া লইতে হইবে। হাতের মোহুরীতে ২৷৹ ইঞ্চি পরিমাণ পটী ভিতর দিক্ বসাইয়া হাতের বগল জুড়িয়া লইয়া জামার মোহোড়ায় জুড়িয়া লইতে হইবে। বুকে বোতামপটী ১৷৹″ ইঞ্চি ফাঁক রাখিয়া বোতাম-ঘর করিয়া সমস্থানে বোতাম বসাইয়া লইলে "সলুকা" জ্যাকেট সম্পূর্ণ হইল।

শিল্পী—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

হামিদের হিম্মৎ

১৮

মাহা জেল্‌কদ্‌, ৯ তারিখ, নয়া চাঁদের আজ চার রোজ, কাযেই রাত্রি দু'ঘড়ি না হ'তে হ'তেই তার রোসনাই নে'ব নে'ব হয়েছে, কিন্তু তারার ঝল্‌মলে আকাশ বেশ ফরসা। বিজ্‌লি পাঙ্খার ঘূর্ণন কামরার ভিতরের বদ্ধ হাওয়াকে আরও যেন তাতিয়ে তুলেছে, তাই লাউডন ষ্ট্রীটের একটি কুঠীর পিছন দিকের গার্ডেন-চেয়ার-বেঞ্চি-পাতা-লনে মিষ্টার কাসেম সাহেব আজ সান্ধ্য মজলিস ক'রে বসেছেন। সাহেবের পরণে একটি পাঁচ কলিয়া পায়জামা, আর বুকখোলা টুইডের কোটের মাঝখান থেকে ঈষৎ গোলাপী রংএর গেঞ্জি দেখা যাচ্ছে। বাঁকুড়ার উকীল উপস্থিত আছেন মিঞা বেচসম্‌-গোলাম খয়ের খাঁ, এম্‌, এস্‌, সি ; 'তস্‌লি-মাৎ-মুস্‌লিম্‌-মজলিসে'র সম্পাদক কুক্রুৎউল্লা ছাহেব, আরও চার পাঁচ জন মোছলমান ভদ্রলোক ; মাথায় মাড়োয়ারী-ধরণের আস্‌মানী রংএর পাগড়ীবাঁধা এক জন মাত্র হিন্দু-বেশধারীকে সেই মজলিসে উপস্থিত দেখা যাচ্ছে। অনেক-ক্ষণ আগে থেকেই কথাবার্ত্তা চলছিল ; কল্পনা-যন্ত্রবাহিত ব্রডকাষ্টের সাহায্যে সেখানকার ইথারের সঙ্গে গল্পলেখকের কর্ণের যখন সংযোগ হ'ল, তখন বেচসম্‌ মিঞা কাসেম সাহেবকে বলছেন, "আমার পরামর্শটা কার্য্যক্ষেত্রে কতটা ফলদায়ী হওয়া সম্ভব, তা' ক্রমে কিছু কিছু উপলব্ধি করতে পাচ্ছেন ত ?"

কুক্রুৎ। হুজুর, বেচসম্‌ ছাহেব একজনা পাঁচোয়াক্ত নেমাজী, সাচ্চা মোছলমান, ইসে বেলকুল সোভে নেই, লেকিন্‌ ল্যাড়কাপনথে ঐ কাফেরগুলার সাথে তাগোর ইক্‌-স্কুলে স্তাকাপরা কইর‍্যা ওনার জবানটা যে বেদুরস্ত অইয়ে পরচে, স্তাডা কোনো গতিকেই ছামলাতে তাগুৎ অইল না।

বেচসম্‌। কি জানেন সেক্রেটারী সায়েব, বাল্যকালে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় আমি বর্দ্ধোয়ান ডিভিসনের ভেতর ফার্ষ্ট হয়ে স্কলারসিপ পাই ; বি, এ, দিয়েছিলাম যখন, তখন সংস্কৃতে 85 percent রেখেছিলাম, এখনও রঘুর পঞ্চম ষষ্ঠ সর্গ বোধ হয় মুখস্থ বলতে পারি, তাই অশিক্ষিত লোকের তৈরী এই মুসলমানি বাংলাগুলো আমার মুখ দিয়ে বেরোয় না।

মিঃ কাসেম। Excuse me Mr. Chasam, I would rather talk English than be gabbering cursed gibberish of these infidels. Allah be praised that Bapjan did not let me go beyond the Village Pathshala, they say I speak Urdu like one born in Lucknow.

কুক্রুৎ। জনাব! ইয়াদ্‌ রাখবান্‌ ঝে মোগার জবান মাদারে ইসে আরবী। ইসে এ কাফের হালাদের 'পর বাদসাই কত্তি আসাথে মোগার বাপ-দাদারা মেহেরবাণী কইর‍্যা বাংলা বুলিগুলা জবানে-থে নিক্‌লে দিত।

মিঃ কাসেম। Well, we'll return to this topic bye & bye, কেঁও পীর সাহেব! ময়নে আপকে উমেদমে সেপহরসে কোঠীকা বাহার নেহি গয়া ; স্রেফ আপকো গাফিলাৎসে মুঝকো বহুৎ জরুরী কাম্‌—

পীর। ছায়েব! মোর কসুর কি? হালার পুৎ হালা মারুয়াগুলা মোরে রাখলে আটোক্‌ কোরে, তাগোর মিছিলে গাহনা মহলা দিবার লগে ; হালাগোর অং, বং, খং, মোর মুখে কি বার হবার চায়?

মিঃ কাসেম। খয়ের! উয়ো লোগ্‌ আপকা'পর আব্‌তক্‌ কুছ সোভে-ওভে কিয়া নেহি হোগা?

পীর। থানার দারোগা হালারাই সোভে কোরে মোর বরো—

বেচসম্‌। আপনি ঐ কথায় কথায় 'হালা' বলাটা ছাড়ান দিন। পীরের মোকামে বসেছেন, এখন আর—

পীর। মুই তো হালা ছাড়ান দিতি চাই, হালা ঝে

মোরে ছারাত্তি চায় না, তার কি কিনারা করি, ইসে তার হাদস্‌টা কইতি পারো? হালা কাথাটা বাচপন্‌ থে হালার জবানে ইমনি জবর্‌ বাশগারি কইর‍্যা বস্‌চে যে, নিজির আম্মাজানকে কয় দফা হালা বোলে ডাক দিছি। হালাটা মোর মুয়ে গাল না, ওডা হই পরচে মোর পিয়ারের খেয়াল।

মি: কাসেম। খয়ের! ফাল্‌তো কেচ্ছা ছোড়কে মিছিলকা বাৎ কহিয়ে।

পীর। মিছিল নাকচ অইব—অইব—অইব। গোস্তাকী মাপ করবা, আপনাগোর হক্কলের নামে গাল পাইর‍্যা পাইর‍্যা মুই হালার সোমাজি মেয়োদের মাথাটা ইমন্‌ বিগ্‌রে দিছি, আর ইদ্‌গার ছাতের ওপর তোমরা হাজার থান চাকা জমা করি রাখচো, বাজা বাজলেই ঐ চাকা ছুরে মারবা কইচি, যে মাচ্চেয় বৈসে যে মামদোটা মজলিসের খসমের কাম কচ্ছিল, সেডা খারা হোয়ে কইল, ইদগার সামনে বাজা বাজাইমু—বাজাইমু—বাজাইমু; মোদের মারে চাকা—মোরা জবাব দিমু ছোডার বতোল ছুঁইর‍্যা।

এর পর মিনিট পনর ধ'রে ক'জনে মিলে যা ফিস্‌ ফিস্‌ হ'ল, তার ভাইব্রেসন ওয়্যারলেসও ধত্তে পাল্লে না।

১৬

এ দেশে 'কাকের মুখে' সংবাদ ব'লে একটা কথা অনেক কাল থেকে প্রচলিত আছে; এই জন্য অনেকে সময় বিশেষে আপনার আত্মীয়কে উদ্দেশ ক'রে বলে, "যখনই তোমার আবশ্যক হবে, দেখো, আমি একটা কাকের মুখে সংবাদ পেলে তখনই গিয়ে উপস্থিত হব।" আমার মনে হয়, এ "কাক"টা একেবারে আলঙ্কারিকের কল্পনা নয়; সত্যই যেন এমন একটা কাক আছে যে, কখন্‌ কোথা থেকে এসে একটা ডাক দিয়ে যায়, আর মুখে মুখে সে কথাটা দেশময় ছড়িয়ে পড়ে। অভিজ্ঞতা অনেক পুরানো কথা এ সম্বন্ধে স্মরণ করিয়ে দেয়; একটা মাত্র উদাহরণ মনে পড়ছে, তাই বলছি; আজ বছর ৩১।৩২ আগে কলকাতায় একটা কথা উঠল যে, গৃহস্থের মেয়েরা যদি আপনা-আপনির মধ্যে "সই" পাতান, তবে তাঁদের স্বামি-পুত্রের কল্যাণ হবে। কবে কোন্‌ গঙ্গার ঘাটে, মদনমোহনের পাটে, কি অন্য কোনো মেয়েলীহাটে এ কথাটা কেন কার মুখ দিয়ে বেরুল, তা কেউ জানে না—কেউ জিজ্ঞাসাও করে না; অথচ মাস দেড়েকের মধ্যে সমস্ত বাঙ্গালা জুড়ে ও বাঙ্গালা ছাড়িয়ে সংবাদটা উড়ে গিয়ে যেথায় যে দেশে বা প্রবাসে বাঙ্গালী মেয়ে বাস করেন, সেই সব স্থানেই ক্ষেমীর মা থেকে ভব ভব থেকে মোক্ষদা নীরদা, নীরদা থেকে ঝরণা বাবুই পর্যান্ত সবাই একটা একটা সই পাতিয়ে ফেললেন।

এক দিন চৈত্র রাত্রশেষে ঐ রকম একটা কাক কাঁঠাল-ডালের বাসা ছেড়ে কা কা রবে আপনার শুসমাচার প্রচার করতে করতে কলকাতার আকাশে উড়ে যায় যাঁরা লেখাপড়া জানেন, খবরের কাগজ পড়েন, তাঁরা অবশ্য আর্য্য-সমাজ ব'লে একটি ধর্ম্ম-সম্প্রদায় আছে, এ কথা শুনেছিলেন; কিন্তু সাধারণ পথিক ঐ কাকের মুখেই প্রথমে আর্য্যসমাজের নাম কাণে শুনে; ঐ কাকটি আরো ব'লে দেয় যে, আর্য্যসমাজে ঠাকুরপূজা কেমন ক'রে হয়, তা সে জানে না, তবে তাদের দুটা "দৈবী বিদ্যে" আছে; তারা এক রকম জলপড়া জানে, যার নাম শুদ্ধি; সেটা গায়ে ছিটিয়ে দিলেই মোছলমান, কৃশ্চান কি যে জাতই হ'ক্‌, সব হিঁদু হয়ে যায়; আর যেমন টোকো আমের চারার সঙ্গে বোম্বায়ের ডালের জোড় কলম বেঁধে তাতে বে-রেশা মিঠে আম ফলান যায়, তেমনই তারা একটা নতুন মন্ত্র প'ড়ে বামুনের ছেলের সঙ্গে বাগ্দীর মেয়ের বে' দিয়ে দিতে পারে। কাকের ডাকটি প্রথম যার কাণে ঢু'ক, তার নাম হচ্ছে "গুজব"। গুজবটি শাস্ত্রমত নিরাকার হ'লেও তিনি ব্যক্ত হন কখন পুরুষ কখন বা নারীবেশে, যেন—"দিবসে অশ্বিনী হয় নিশায় রূপসী।" এ ক্ষেত্রে গুজব উঠল, আজ আর্য্য-সমাজীদের একটা জাঁকাল রকম মিছিল বেরুবে। হোলীর আমোদের পর বড়বাজার, দোকান-পাট, দালালী, হুণ্ডী ভেজিমন্দী নিয়েই ব্যস্ত ছিল, কোন রকম আমোদের অবসর পাই নি; সংক্রান্তিতে জেলেপাড়ার সং বেরুবে তারও এখন ১৪।১৫ দিন দেরী আছে, তার মাঝে ফাঁকতালে একটা জাকাল রকম শোভাযাত্রা, গান বাজনা করতে করতে পথে বেরুবে, এ মজাটা কে ছাড়ে, তাই রাস্তায় একটা ভীড়ও দাঁড়িয়ে গেল।

১৭

এক সময়ে যে সকল মানসিক অবস্থা রিপুবৃত্তি প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ ছিল, এখনকার অনেক পণ্ডিতের মতে সে সকল এক রকম ব্যাধি ব'লে নির্ণীত হয়েছে; মনস্তত্ত্বের ভিতর

দিয়ে শারীর-বিজ্ঞান আলোচনার ফলে তাঁরা গর্ব্বিত মানবকে লক্ষ্য ক'রে ব'লে থাকেন, তোমরা যকৃৎ, প্লীহা, মস্তিষ্ক, স্নায়ু, মন, হৃদয়, আত্মা যা কিছুরই বড়াই কর, কতকগুলি চক্ষুর অগোচর পোকাই তোমাদিগের লৌকিক লীলার প্রভুশক্তি; আবার সমস্ত বৃত্তির অলক্ষ্যে অবস্থিত পরিচালক হচ্ছে প্রেম বা আসক্তি।

পীতাম্বর গাঙ্গুলীর যে ব্যাধিটি প্রবল ছিল, তার নাম স্বাধীনতা বা আত্মপ্রেম। এক রকম শৈশব থেকেই এই স্বাধীনতার ধ্যানে নিমগ্ন থেকে তিনি ভৌতিক স্তর থেকে আরও ঊর্দ্ধে উঠে গিয়ে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দ্বারা মনে মনে স্থির করেছিলেন যে, চাকরী ত দূরে যাক, কৃষি-বাণিজ্য প্রভৃতি কার্য্যেও পরের অধীনতার গন্ধ আছে। অনেক চিন্তার পর বছর ১৫।১৬ বয়স থেকেই তিনি স্থির ক'রে নিয়েছিলেন যে, ভিক্ষা ও চুরী এই দুটিমাত্র হচ্ছে যথার্থ স্বাধীনতার ব্রত। ব্রাহ্মণ ব'লে ভিক্ষায় তাঁর জন্মগত অধিকার; প্রয়োজনে প্রয়োগ করলেও করতে পারেন, কিন্তু তাতে তাঁর নিজের পৌরুষ কিছু থাকে না; অথচ পুরুষ ব'লে গাঙ্গুলীর একটা গর্ব্ব বাল্যকাল থেকেই ছিল। মৃগয়ায় যেমন শিকারীর একটা আনন্দ আছে, চুরীতে সেই রকম একটা পৌরুষের আনন্দ চোররা মনে মনে ভোগ করে। ছেলের মাথায় হাত দিয়ে চুরী করব না ব'লে দিব্যি ক'রে কোন চোর একশ' বা হাজার টাকা মাস মাইনেতেও যে চাকরী করতে স্বীকার করে, আমার তা মনে হয় না। কারুর কলতলা থেকে একটা ফুটো পেতলের ঘটী সরাতে পারলে চোরের যে আনন্দ হয়, কেউ ডেকে নগদ ২ টাকা হাতে দিলে সে আনন্দ পায় না। ন্যায্য প্রাপ্য এক টাকার চেয়ে ঠকিয়ে নেওয়া ৪ আনার মূল্য তার চোখে বেশী।

পরস্বাপহরণ জীব জগতের সহজ অবস্থা, এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়ে পীতাম্বর গাঙ্গুলী তাঁর পঞ্চদশ জন্মতিথি পূজার দিন নিজের কল্যাণ কামনায় স্বীয় অষ্টমবর্ষীয়া ভ্রাতুষ্কন্যার মাকড়ীটি খুলে নিয়ে ভরত পোদ্দারের দোকানে দেড় টাকায় বিক্রয় ক'রে এক জোড়া সেরাজু পায়রা কেনেন; তাঁর পায়রার সখ ছিল এবং এই পায়রা কেনা-বেচাই ভবিষ্যতে তাঁর জীবিকা-নির্ব্বাহের প্রকাশ্য উপায় ব'লে লোকের কাছে নির্দ্দিষ্ট হ'ত।

পণ্ডিত কৃত্তিবাস বলেন, অযোধ্যায় রামচন্দ্র চৌষট্টি দিবসে চৌষট্টি বিদ্যা আয়ত্ত করেছিলেন। মথুরার পীতাম্বর কয় দিনে কত বিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন, তাহা 'গুরুদক্ষিণার' পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ নেই; কিন্তু সাবর্ণগোত্র-জাত বঙ্গের পীতাম্বর ৬৪ অপেক্ষা অনেক অল্প-স্বল্প দিবসেই নিজের প্রতিভাবলে ও দৈবলব্ধ দু'চার জন বিচক্ষণ সঙ্গীর শিক্ষায় প্রায় ১৭২ রকম চুরী ও জোচ্চুরী বিদ্যায় সুদক্ষ হয়ে পড়েছিলেন।

গড়ের মাঠের যেখানে এখন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল নামক মর্ম্মর-সৌধ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে পূর্ব্বে প্রেসিডেন্সী জেল ছিল; পীতাম্বরের ন্যায় রাজভক্ত প্রজাগণ সেই স্থানটিকে শ্বশুরালয় ব'লে অভিহিত করতেন। এঁরা কখনই স্বীকার করতেন না যে, কোন অপরাধগ্রস্ত হয়ে ব'সে ব'সে গবর্ণমেণ্টের ভাতা খান; তাঁদের দৃঢ়বিশ্বাস যে, পুলিস হচ্ছে সরকারের পোষ্যপুত্র এবং সেই পুলিসকে বেতনলাভের যোগ্য কার্য্য এঁরাই দিয়ে থাকেন, সেই জন্য সরকার বাহাদুর মাঝে মাঝে তাঁদের ব'সে খাবার বন্দোবস্ত ক'রে দেন।

সেই শ্বশুরালয়ে চতুর্থবার প্রবেশের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পীতাম্বর নিজের বেশ-ভূষার পারিপাট্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন। একটামাত্র দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করছি। বছর বাইশ বয়সের সময় পীতাম্বর এক দিন সন্ধ্যার পর একটু স্ফূর্ত্তি করবার ইচ্ছায় নাথের বাগানের একটি খোলার বাড়ীতে প্রবেশ করেন; এক জন চক্‌চকে জুতোর উপর ফুল টকিন পায়ে, গায়ে সাতরঙ্গা রেপার ছোকরা বাবুকে অতিথিরূপে আগত দেখে যে অভাগিনীকে ইঙ্গিতে অগ্রসর হ'তে ব'লে পিছনে পিছনে গিয়ে তার ঘরে ঢুকলেন, সে অভাগিনী শুভসন্ধ্যাকে মনে মনে বার বার নমস্কার করলে। বাবুকে তক্তাপোষের উপর বসিয়ে কল্‌কে হাতে ক'রে স্ত্রীলোকটি যখন বাইরে তামাক সাজতে গেল, পীতাম্বর তখন বেড়ায় খাটানো একগাছা দড়ির দিকে চেয়ে দেখলে যে, দু'খানি বেশ ধোপদস্ত শাড়ী সেই দড়ির আন্‌লায় পাকান আছে। মাঝে মাঝে এমন দিন যায় যে, অন্নের কথা দূরে থাক, এক পয়সার মুড়ী কিনেও খাবার সংস্থান থাকে না; কিন্তু যেমন করেই হোক্ দু'একখানি চক্‌চকে বাহারে পাড়ওয়ালা ভাল শাড়ী এদের কিনে রাখতেই হয়;

পীতাম্বরের পরণে জুতা, মোজা, কামিজ, র‍্যাপার সবই ছিল, কেবল বাড়ী থেকে কাপড়খানি প'রে আসতে তিনি ভুলে গিয়েছিলেন; চৌর্য্যশাস্ত্রে হস্তকৌশল বিদ্যার বিবিধরূপ প্রয়োগ অবশ্য শিক্ষণীয়; পীতাম্বরের হাত এমন তয়ের হয়ে গিয়েছিল যে, একখানি তে-রঙ্গা বায়কোশ পেড়ে কাপড় আন্‌লা থেকে নিয়ে বেশ সহজে প'রে ফেলতে তাঁর ৩০ সেকেণ্ড সময়ও লাগল না; র‍্যাপারের চাক্‌চিক্যে সদুর চোখে এমন ধাঁধা লেগেছিল যে, সে বাবুর কোঁচার প্রতি একেবারেই লক্ষ্য করে নি। এখন ঠাউরে দেখলে বাবুর কাপড়ের পাড় আর তার কাপড়ের পাড় একই রকম। আন্‌লা পানে চেয়ে দেখে, বায়কোশ পাড় কাপড়খানি সেখান থেকে অন্তর্হিত হয়েছে; বেচারার আধখানা বুক ধ্বসে গেল; বাবুকে কিছু বলবার যো নেই; কেন না, তিনি তখনই বলবেন, "হারামজাদি, আমি কি রাস্তা দিয়ে নেংটো হয়ে এসেছি না কি?"

বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাদের বাড়ী ভাল মদ আনান থাকে?"

সদু। বাড়ীওলী রাখে দু' এক বোতল, কিন্তু সে দেশী।

পীতা। আমার চেহারা কাপড়-চোপড় দেখে কি মনে হচ্ছে, আমি দেশী মদ খাই?

সদু। তবে দেখি যদি পানওয়ালার ছোঁড়াটাকে ব'লে ক'য়ে ব্রাণ্ডির জন্য দোকানে পাঠাতে পারি।

পীতা। কতকগুলো দোক্তার জল মিশানো বিষ আনবে আর কি। আমাকে নিজেই যেতে হ'ল। যাব আর আসব। এই চারটে পয়সা নাও. সোয়াদী চানা যায় ত কিনে রেখ।

অভাগিনীর যে সে রাত্রি কেবল কেঁদেই কাটাতে হয়েছিল, তা নয়, বাড়ীশুদ্ধ "বিচক্ষিণী" ভাড়াটিয়ারা তিরস্কারে ও সদুপদেশে তাকে দিন ১৫ ধ'রে এত জ্বালাতন করলে যে, কাপড়ের ক্ষতিটা তার একবারেই মনে রইল না।

জেল, বেত, ঘানিটানা, পাথরভাঙ্গা এ সব ক্রমে পীতাম্বরের কার্য্য-জীবনের লাভালাভের মধ্যে বিবেচিত হবার অবস্থা হয়ে দাঁড়াল। ব্যবসায়ী যেমন মালপত্র কেনাবেচায় লাভ করতে গেলে মধ্যে মধ্যে লোকসান দিতে হয়, এটাও ঠিক ক'রে রাখে; চুরী জুচ্চুরী, জাল, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া প্রভৃতি কার্য্য যারা জীবনের অবলম্বন ব'লে গ্রহণ করে, তারাও মাঝে মাঝে সাজা পাওয়াগুলো মনে মনে একটা লোকসান ব'লে খাতায় খরচ লেখে। পাকা পুরানো কয়েদী ব'লে পীতাম্বর ক্রমে কলকাতা ও বাইরের গোটাকতক জেলের কর্ম্মচারীদের বেশ পরিচিত হয়ে দাঁড়াল এবং শেষাশেষি জেলাররা প্রায়ই গাঙ্গুলীকে কয়েদী ওয়ার্ডারের পদে নিযুক্ত করতেন; ওয়ার্ডারের বেত হাতে করলে পদমর্য্যাদার অহঙ্কারে তাঁর বুকখানা ফুলে উঠত; বেশী কায আদায় ক'রে উপরওয়ালাদের কাছ থেকে প্রশংসা ও পুরস্কার লাভ করতেন; নিজের কয়েদী জীবনের নির্য্যাতন স্মরণ ক'রে নূতন কয়েদীদের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করতেন; আবার তিনি ব্রাহ্মণ ব'লে কোন কোন কয়েদী তাঁর অনেক সেবা করত; কোন কোন ধার্ম্মিক বৃদ্ধ কয়েদী আহারে বসবার পূর্ব্বে গাঙ্গুলীর পাদোদক পর্য্যন্ত গ্রহণ করত। এইরূপে অনেক দিন কাটাবার পর তিনি পাগলা পীরের সহিত মিশে পড়েন।

মুস্কিল আসান অবস্থায় পাগলা পীর ছিল তাঁর অধীন, তিনি ছলে মোছলমানের মুরুব্বী, কিন্তু অনেকটা পীতাম্বরেরই কৌশলে ও সাহায্যে মুস্কিল আসান পীরত্ব লাভ করলে, তখন তার জীবনের শীতের বাতাস কেটে গিয়ে ফাল্গুনে হাওয়া আবার ফোঁস করতে শুরু করলে। আড্ডাটা বেশ জমেছে, দিন এক রকম নশ্চিন্তে মজায় কেটে যাচ্ছে, এই মনে ক'রে গাঙ্গুলী পীরের কটুকাটব্য গালি ও নাচ স্বার্থপরতা ততটা গ্রাহ্য করতেন না; কিন্তু যে দিন প্রভাতে আস্তানায় গিয়ে তিনি দেখলেন যে, পীর অন্তর্দ্ধান, পয়সা কড়ি তৈজসপত্র—এমন কি গাঁজার পুরানো কল্কেটি পর্য্যন্ত নিয়ে সে স'রে পড়েছে, সেই দিন প্রথমে মনুষ্য জাতির উপর তাঁর ধিক্কার জন্মে গেল; তখন থেকে তিনি লোককে এক রকম স্পষ্টই বলতে লাগলেন, দু' পেয়ে জানোয়ারকে কেউ যেন না মোটেই বিশ্বাস করে; মানুষ এতদূর নিমকহারাম, এত নীচ, এত বড় চোর জোচ্চোর যে হ'তে পারে, তা তিনি এত দিন জানতেন না।

হেসো না বাপু, আশ্চর্য্য হবার কোন কথা নেই; আমি নিজে একটি ভদ্রসন্তানকে জানতুম, গণিকাশ্রয়ী, তার ঘর সংসার ছিল, নিজের স্ত্রীর সাংঘাতিক পীড়ার সময়ও নিজে গিয়ে একবার দেখা দেয় নি, অথচ তার

একটি পরিচিত ভদ্রলোক চাকরার জন্য কলকাতায় বাসা ক'রে থাকত. বার বার স্ত্রীর চিঠি পেয়েও শেষ মাস তিনেকের ভিতর দেশে গিয়ে একবার দেখা দিয়ে আসেনি ব'লে তাকে নিষ্ঠুর, স্বার্থপর নারী-নির্য্যাতনকারী কাপুরুষ স্বামী ব'লে ভৎর্সনা করেছে। পাপকে পাপ ব'লে আমরা সবাই জানি, কিন্তু নিজে যখন কোন অন্যায় কাজ করি, তখন তার এমন একটা ন্যায়শাস্ত্রসঙ্গত হেতু তৈরী ক'রে ফেলি, যাতে মনে হয় যে, পৃথিবী শুদ্ধ লোকের অপরাধেই আমার এই দুর্দ্দশা হয়েছে, আমার কৃত কর্ম্ম দুষ্কর্ম্ম নয়—আত্মবিসর্জ্জন।

পীতাম্বর গাঙ্গুলীও আত্মবিসর্জ্জনের জন্য প্রস্তুত হ'লেন। চাকরীকে তিনি জন্মাবধি ঘৃণা করতেন, দারোগা মথুরবাবুকে ধ'রে তিনি পুলিস বিভাগে একটি গুপ্ত গোয়েন্দার চাকরী গ্রহণ করলেন; তিনি প্রাণপণে নিমকের মান রাখতে স্বীকার করলেন বটে, তবে একটা সর্ত্ত ক'রে নিলেন যে, তাঁর সমব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে তিনি কখনও কোন কায ক'রে মিত্রঘাতী হবেন না; যেমন অনেক বড়লোক টাকা কড়ি জমিয়ে নেবার পর পলিটিক্স কি না রাজনীতি নিয়ে পড়েন, গাঙ্গুলীও তেমন এই শেষ বয়সে রাজনীতির চর্চ্চাই করবেন; এমন কি তার জন্য যদি কোন মেসের বাসাটাসায় মাঝে মাঝে ২০।২৫ দিনের জন্য রাঁধুনীগিরি পর্য্যন্ত করতে হয়, তাতেও তিনি স্বীকার।

পীরের ঋণ পরিশোধের পূর্ব্বে যদি তাঁর মৃত্যু হয়, তা হ'লে মহাপাতকের বোঝা ঘাড়ে ক'রে যমদ্বারে পৌঁছুতে হবে, এ বিশ্বাসটা কিন্তু পীতাম্বরের মন থেকে কিছুতেই গেল না।

চাকরী গ্রহণের পূর্ব্বে ও পরে কলাবাগানের বস্তীতে গাঙ্গুলীর সর্ব্বদা গতায়াত ছিল। আর্য্যসমাজীদের মিছিলের সংবাদ প্রচার হবার সময় থেকেই প্রায় প্রতি সন্ধ্যাতেই সেখানে গিয়ে ৭।৮ জন পাকা মোছলমানের সঙ্গে তিনি সলা-পরামর্শ করতে আরম্ভ করলেন। তাঁর বিশেষ নালিস যে, এই সমাজীরা একবারে হিন্দুধর্ম্মটা নষ্ট ক'রে ফেলছে, বিধবার বিয়ে, অজেতের বিয়ে, আরও কত কি যে পাপ কায করছে, এ তিনি শূলপাণির সন্তান হয়ে কখনই সহ্য করতে পারেন না, এই জন্য মোছলমানদের ধ'রে ঐ হতভাগাদের জব্দ করতে চান। গাঙ্গুলীর তর্কের জোরে ও উত্তেজনায় কলাবাগানের অনেক ধার্ম্মিকই গরম হয়ে উঠল, তার মধ্যে খাঁদা ব'লে এক জন রং-মিস্ত্রী, দুগী টিকেওয়ালা আর সবরু গাড়োয়ান ধর্ম্মরক্ষার জন্য একবারে ক্ষেপে গেল।

* * * *

পৃথিবীর মন এত মহৎ, বিনয় ও আত্মবিস্মৃতির ভূষণে এত গৌরবান্বিত যে, শুভকার্য্যের প্রতিষ্ঠাতা ব'লে কোন লোকই আপনাকে বর্ণিত করে না। বিবাহের ন্যায় সদ্যঃ-ফলপ্রদ ও বছর দুয়েকের ন্যায় ফলপ্রদ শুভকার্য্য আর সংসারে নাই; কিন্তু পিতা, মাতা, ঘটক, ঘটকী, দু'দুটো পুরোহিত, মুরুব্বী, বরযাত্র-কন্যাযাত্র মিলে সকল লোকের সামনে দাঁড়িয়ে দু'টি ভাবা-ভাবী দ্বিপদ জীবকে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বেঁধে দিলেও এ শুভকার্য্য যে তাদের কারও দ্বারা সম্পাদিত, এ কথাটা কেউ স্বীকার করে না; সকলেই বলে প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ।

যাক, একটা পতঙ্গের লঘুপৃষ্ঠে দুটো জীবন্ত প্রাণীর সমস্ত জীবনের সুখ-দুঃখের ভার চাপিয়ে দিয়ে সমস্ত গোল চুকে গেল!

কলকাতার শুভ দাঙ্গা-কার্য্যও সেইরূপ নির্ব্বিঘ্নে চুকে গেল; ইটের বদলে ইট, সোডা ওয়াটারের বোতলের বদলে কর্ণিক, পাটা, মাটাম আরও কত কি ছোড়া হ'ল, লাঠীর উত্তর দিলে ছুরী, কুড়ুল; কত নিরীহ দর্শক এম্বুলেন্স গাড়ী চ'ড়ে স্থানত্যাগ করলে, তদপেক্ষা নিরীহ মসিদের দেয়াল ও মন্দিরমধ্যস্থ মূর্ত্তি কুড়ুলের ঘায়ে রাবিসত্ব প্রাপ্ত হ'ল; কিন্তু এ শুভ কার্য্যের সূত্রপাত কা'র দ্বারা হ'ল, কেউ জানতে পারলে না।

ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো আছে এক পুলিস, এরা সরকারী প্রয়োজনে রাজদ্রোহীর হাতেও হাতকড়ি দেয়, সরকারী আয়ের প্রতিপোষক অচেতন মাতালকেও মাথায় ক'রে থানায় নিয়ে যায়, আবার সময়ে সময়ে কোন বিশিষ্ট রাজপুরুষের অভ্যর্থনা সভায় যাবার শোভাযাত্রার সময় রাস্তায় মশাল ধ'রেও সারবন্দী হয়ে দাঁড়ায়। কিছু হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো মাত্র দিন কতকের খোরাক পেয়ে খবরের কাগজওয়ালারা। আমাদের রাজ্য নাই, বাণিজ্য নাই, ফ্যাসানেবল ডিনার বা পোষাক দেখাবার ঐশ্বর্য্য নাই, অথচ যে ইংরাজ গোঁপের ডগা মুড়ুলে আমরাও মুড়ুই, সেই

ইংরাজের খবরের কাগজ আছে, আর আমাদের নাই, এটা লোকতঃ ধর্ম্মতঃ ভাল দেখায় না। এক রকম খবরের কাগজ হয়েছে বটে, যাতে লোক বা সম্প্রদায়বিশেষের উপর গালাগালি দিলে বেশ বিক্রয় হয়, আসন্ন-প্রসবা নারীর যেমন "পাতখোলা" চর্ব্বণের রুচি জন্মায়, তেমনই মরাল ডিসপেপ্‌সিয়াগ্রস্ত পাঠকও অনেক আছেন, যাঁরা অরুচির রুচি ব'লে যা হোক কারও একটা ব্যক্তিগত গালাগালি বা নিন্দা পাঠ ক'রে ক্ষণিক আনন্দ উপভোগ করেন; কিন্তু একটু উঁচুদরের কাগজওয়ালারা সেরূপ অভদ্র মূর্খতার স্তরে নামতে ঘৃণা ও লজ্জা মনে করেন; সুতরাং এঁরা ম্যাটারের জন্য একটা উঁচু রকম দৈব বা লৌকিক বিভ্রাটের জন্য সতৃষ্ণ আশায় অপেক্ষা করেন।

মুদ্রিত অক্ষর ও জনরব কয়েক দিন ধ'রে কত রকমই না সংবাদ রটনা করলে; কেউ বললে, দোষ সমস্ত মোছলমানের; কেউ বললে, না, সমাজীরাই গোলমালের সূত্রপাত করে; কেউ বললে, এদের দু' দলের কারও দোষ নেই, কতকগুলো বাজে ইতর লোক লুঠের প্রত্যাশায় এই হাঙ্গামা বাধিয়েছিল। যাঁরা ঘরের বাইরে কোথাও যান না, তাঁরা বিধাতা ও কলিকালের উপর সমস্ত দোষ চাপিয়ে নিশ্চিন্তে সিগারেট টানতে লাগলেন। পুলিসের সম্বন্ধে এক দল বললে, বেশী জবরদস্ত মধ্যস্থতা করতে গিয়েই হাঙ্গামাটা এত মস্ত ক'রে তুলেছিল; আর এক দল বললে, পুলিস কিচ্ছু করে নি, কেবল তফাতে দাঁড়িয়ে মজা দেখেছে। বড় বড় পলিটিসিয়ানরা বললেন, আমরা যদি ঠিক সেই সময়ে ক্লাবে বিলিয়ার্ড খেলতে না যেতুম, আর গোরা পুলিস কি মিলিটারী অকুস্থলে উপস্থিত না হ'ত, তা হ'লে আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে কেবল ক'রে সব মিটিয়ে দিতে পারতুম; ক' মিনিটের মধ্যে সেইটে কেবল তাঁরা ঠিক ক'রে বলেন নি।

কতকগুলি হতভাগা বখাটে ছোড়া এক্‌জামিনের পড়া বন্ধ ক'রে হোষ্টেলের ডিসিবলিং ভেঙ্গে ক্রিকেটের ব্যাট, খাটের ডাণ্ডা, দরোয়ানদের লাঠী, পুরান লোহার দোকান থেকে শাবলটা গরাদেটা যা পেলে হাতে ক'রে আরও কতকগুলো ভদ্রসন্তান গুণ্ডার সঙ্গে মিলে ঠনঠনের কালীতলার সামনে আরও কোথাও কোথাও দাঁড়িয়ে একটা বাজে বাহাদুরী মেরে গেল। কেউ কেউ বলে যে, ছোঁড়ারা না কি রাগের মাথায় কোন কোন মসিদের গা থেকে চুণ-বালীও খসিয়েছিল; কিন্তু এ কথাগুলো কেউ যেন সত্য ব'লে মনে না করেন; কারণ, এক দিন রাজপুতানার বীররাও যে কায করতে সাহস করেন নি, কতকগুলো ভেতো বাঙ্গালী কলেজের ছেলে সে কাযে হাত দেবে, এ কথা বিশ্বাস করলে বাঙ্গালীর জাতীয় নামে কলঙ্ক পড়বে। তবে সত্যের অনুরোধে একটা বিষয় এইখানে ব'লে রেখে যাওয়া কর্ত্তব্য, নইলে লেখক দেশদ্রোহী দোষে অপরাধী হবে। দাঙ্গা চুকে যাবার মাস দুই পরে যখন বড় বড় রাস্তা থেকে গোরা পাহারা-টাহারা সরিয়ে লওয়া হয়েছে, তখন সহরের উত্তর সীমান্তে টায়ফয়েড-বিষের ডোবাবিশিষ্ট পার্ক নামে ডার্কদেশে সত্বরে পৌঁছবার উপযুক্ত যে একটা খোলা স্থান প্রস্তুত আছে, সেইখানে বড় বড় পলিটিক্যালরা মিলে এক বিরাট সভা আহূত করেন; 'বিরাট' অজ্ঞাতবাসের দেশ, সেই জন্য টাউনহলরূপ প্রকাশ্য প্রাসাদে সভা না হয়ে, হয়েছিল নিকিশীপাড়ায়। সভায় প্রথম প্রস্তাব উপস্থাপিত, অনুমোদিত ও সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে গৃহীত হ'ল যে, "যদিও বর্ত্তমানকালে নির্দ্ধারিতরূপে নির্দ্দিষ্ট হ'তে পারে না যে, হিন্দুধর্ম্ম আভূমিলম্বিত বাহুবিস্তার ক'রে কোন্ কোন্ জাতির ভোজ্যে ব্যবহার্য্যে হাত বাড়াতে পারে এবং কোন্ কোন্ দেশজাতা ভার্য্যার বরমাল্য গ্রহণ করতে পারে, তথাপি আমরা যে হিন্দুধর্ম্মের জন্য তুচ্ছ টাকা পয়সার বা শরীরের একবিন্দু রক্তব্যয়রূপ তুচ্ছ কার্য্য না ক'রে অনায়াসে প্রাণ দিতে পারি, এ কথা জগৎ আজ জানিয়া লইয়া বিস্মিত হউক।" ঘন ঘন করতালির পর দ্বিতীয় প্রস্তাব—"যদিও কালী জগন্মাতা, কিন্তু সেই মাতার হাত পা ভেঙ্গে গেলেও কুমারটুলীতে ফরমাস দিলে এক সপ্তাহের মধ্যে শতাধিক জগন্মাতা পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু দেশমাতা হচ্ছেন, বর্ত্তমানযুগে সবার মাথার মণি, সেই দেশের গায়ে একটু আঁচড় লাগলেই আমাদের মধ্যে অনেকের অশেষ দুর্গতি; দেশমাতার ভালমন্দ হ'লে কোথায় আমরা প্রোপাগাণ্ডা করব, কা'র নাম ক'রে আর চাঁদা তুলব। কোথায় থাকবে আমাদের মোটারের গ্যারেজ, শরীরের পামৃহেজ আর ইউনিভার্সিটী ম্যারেজ; সুতরাং এই সকল মহান্ সৎকর্ম্ম, যাতে জন্মায়ুতেই মিস্‌ক্যারেজ না হয়ে যায়, তার জন্য দেশমাতাকে সর্ব্বাগ্রে রক্ষা করতে হবে।" আবার ঘন ঘন করতালি ও জয় দেশমাতাকি জয়—দেশমাতাকি জয়।

তৃতীয় প্রস্তাব—"দেশমাতার মঙ্গলের জন্য সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন হিন্দু-মুসলমানে একতা। ঐ দেখুন জীর্ণা-শীর্ণা ভগ্না ভারত-মাতা বসিয়া আছেন; মাথায় বরফ, ভয়ানক টায়ফয়েড; মুখে কালাজ্বর; বুকে থায়সিস্, পেটে বাম-দিকে ম্যালেরিয়াজনিত প্লীহা, ডান-দিকে দুর্ভিক্ষ; মা'র শ্রীচরণে কচুরীপানা, সিংহাসনতলে ভীষণ বন্যা। মা'র এক দিক্-কার কোলে ভাই মুসলমান ব'সে সুরুয়া খাওয়াচ্ছেন, অন্য কোলে ব'সে হিন্দুসন্তান ইন্‌জেক্‌সন দিচ্ছেন; সুতরাং হিন্দু-মুসলমানে একতা স্থাপন একান্ত প্রয়োজন।" চতুর্থ ও শেষ প্রস্তাব—"আজিকার এই সভা গভীর গর্ভবেশনার সহিত প্রকাশ করিতেছে যে, দাঙ্গার দিনে কলিকাতার ছাত্র-যুবকরা নেতাদিগের বারংবার নিষেধ সত্ত্বেও মন্দিরাদি রক্ষার ছলে যে নিন্দনীয় ঘৃণিত কার্য্য করিয়াছে, তাহার জন্য স্বদেশ, স্বরাজ ও স্বকায সমাজে মস্তক অবনত করিয়া রহিল; অতএব ঘোষণা করা হউক, যুবকদিগের এই ধৃষ্টতার প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ আগামী দুর্গোৎসবের সময় সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিন দিন মিউনিসিপ্যাল কলিকাতায় হরতাল চলিবে। সভাভঙ্গের পর একটি বিপুল বিরাট মোটার শোভাযাত্রা শ্যামবাজারের পার্কের দরজা হইতে মওলালি দরগা পর্য্যন্ত "জয় কালীমায়ীকি জয়, ভারতমাতাকি জয়, খলিফাৎকি জয়" রবে আকাশ-পাতাল মুখরিত করিয়া তুলিবে।"

দাঙ্গা ত হ'ল; কত মাথা ফাটল, কত বুকের রক্তে রাস্তা কাদা হ'ল, কত পলায়ন, কত ধাবন, কত ধর-পাকড়, কত চালান; কিন্তু ঐ সরু গলিটার ভিতর একটি রক্তাক্ত-কলেবর মাড়োয়ারীকে ধ'রে জন কতক ইতর মুসলমান এখনও যে নির্য্যাতন করছে, তা কি কেউ দেখছে না? দেখছে বই কি—দেখছে বই কি, ঐ যে, এক পাশে দাঁড়িয়ে পীতাম্বর গাঙ্গুলী; গাঙ্গুলী এগিয়ে গিয়ে বললেন, "কি খাঁদু ভাই, দফা রফা, না এখনও—"

সবক্ক বললে শালার বড় কড়া জান্, এখনও গোঁয়াচ্ছে।"

গাঙ্গুলী বললে, "থাক্—থাক্, আর দরকার নেই—যথেষ্ট হয়েছে; তোরা স'রে পড়, এখনি পুলিস এসে পড়বে।"

সসঙ্গী খাঁদু সবক্ক তিন লাফে অদৃশ্য হয়ে গেল; পীতাম্বর আহতের নিকটে এগিয়ে গিয়ে বললেন, "কি পীরের পো, কে আমি, দেখ দেখি চিন্তে পার?"

পীর মরে ত রোখ ছাড়ে না, গোঙাতে গোঙাতে বললে, "ও হালা বামনা, তুই এহানে! মোছলমান হয়ে মোছলমানরে মারলে!"

পীতা। ও পীর! তুমি যে এখন হিঁদু, শুদ্ধি হয়েছ—সমাজী।

পীর। মুই আল্লার কিরে ক'রে বলছি, মুই মোছলমান—হালারা—তবুও উঃ—ছুরীখানা প্যাটের মধ্যি গ্যাছে। মুই আর বাঁচুম না।

পীতা। পৃথিবী তা হ'লে মনের দুঃখে গলায় দড়ী দিয়ে মরবে আর কি!

পীর। মরি মরব—তো হালার কি?

পীতা। আমার বাহাদুরী আর কি। আমি না থাকলে কলাবাগানের খেঁদা কি এ গলিতে ঢুকত!

পীর প'ড়ে গুঙিয়ে গুঙিয়ে খেঁচাচ্ছে, আর পীতাম্বর হাসির চেষ্টায় বিষমাখান দাঁত দেখাচ্ছেন, এমন সময় ভোঁ নেই—পোঁ নেই, পলাতক সোয়ারী শুদ্ধ একখানা ট্যাক্সী হুড়মুড় ক'রে পীতাম্বরকে ফেলে দিয়ে তাঁর একখানা পায়ের উপর দিয়ে ছুটে বেরিয়ে চ'লে গেল। পেছনে পেছনে পুলিস—ইংরেজী, বাঙ্গালা, মিলিটারী; সযত্নে তারা দুটি বন্ধুকে এ্যাম্বুলেন্সে তুলে দিলে, লাল ক্রুশ মেডিক্যাল কলেজের হাঁসপাতালের দিকে চ'লে গেল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

প্রাচীন ভারতের শাসন-পদ্ধতি

প্রাচীন ভারতের শাসনপদ্ধতি কিরূপ ছিল, তাহা বুঝিতে হইলে প্রাচীন হিন্দুদিগের সভ্যতা ঠিক কিরূপ ছিল, সর্ব্বাগ্রে তাহাই বুঝিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কারণ, জাতীয় অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান জাতীয় সভ্যতারই অনুগামী হইয়া থাকে। প্রত্যেক জাতির ধাতু-প্রকৃতি অনুসারে তাহাদের সাধনার প্রভেদ হইয়া থাকে, এবং সাধনাভেদে সভ্যতারও বিভেদ লক্ষিত হয়। সে হিসাবে প্রত্যেক জাতির সভ্যতায় কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে; সে বৈশিষ্ট্য সকল ক্ষেত্রে মজ্জাগত না হইতেও পারে। য়ুরোপের বিভিন্ন দেশের সভ্যতার মধ্যে পার্থক্য আছে সত্য, কিন্তু সে পার্থক্য মজ্জাগত নহে, উহা সমাজ-বৃক্ষের ত্বক্ ও পত্রপল্লব মধ্যেই নিবদ্ধ। নতুবা উহার নমুনা (type) ঠিক একই রকমের। কিন্তু ভারতীয় সভ্যতা সেরূপ নহে। উহার নমুনাই স্বতন্ত্র। য়ুরোপীয় সভ্যতার সহিত উহার মিল নাই। ভারতীয় সভ্যতার সহিত এসিয়ার কতকগুলি দেশের সভ্যতার মজ্জাগত কতকটা মিল দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং এই সভ্যতার নমুনা একই প্রকারের, প্রভেদ—কেবল বাহ্য সূক্ষ্মাংশে।

আজকাল অনেকেই বলিয়া থাকেন, য়ুরোপীয় সভ্যতা বহির্ম্মুখী; ভারতীয় সভ্যতা অন্তর্ম্মুখী। কিন্তু কেবল ঐটুকু বলিলেই উভয় সভ্যতার স্বরূপ নির্দ্দেশ করা হয় না। উভয়ের প্রভেদ ও পার্থক্য এতই অধিক যে, জীবনের ও জগতের যাবতীয় ব্যাপারই দুই ধরণে লালিত-পালিত দুই জন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে দেখিয়া থাকেন। এক জনের দৃষ্টিতে এই পৃথিবী ভোগভূমি, আর এক জনের দৃষ্টিতে ইহা কর্ম্মভূমি। ভারতীয় সভ্যতার মূলমন্ত্র গীতায় এক কথায় বলা হইয়াছে:—

> কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
> মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥

কর্ম্মেই মানবের অধিকার, কর্ম্মফল তাহার কাম্য নহে। সুতরাং মানুষ যেন কর্ম্মফল ভোগের জন্য কর্ম্ম না করে, আবার কর্ম্মফলে অনাসক্তি নিবন্ধন কর্ম্মত্যাগও যেন না করে। মানুষকে কর্ম্ম করিতেই হইবে। কারণ, কর্ম্মই মানবের ধর্ম্ম। য়ুরোপীয় সভ্যতার মুখ্যলক্ষ্যই কর্ম্মফলপ্রাপ্তি এবং কর্ম্মফলের উপভোগ সুতরাং উভয় সভ্যতার মধ্যে প্রভেদ অত্যন্ত অধিক।

প্রতীচ্য সভ্যতার কেন্দ্রভূমি গ্রীস; প্রাচ্য সভ্যতার কেন্দ্রভূমি ভারতবর্ষ। প্রাচীন গ্রীকরা ভোগই জীবনের লক্ষ্য বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা বলেন যে, মানুষ ভোগের জন্যই সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সুতরাং ভোগেই জীবনের সার্থকতা। সেইজন্য গ্রীক-সভ্যতা বাহ্য সৌন্দর্য্যের ও সৌষ্ঠবের জন্যই পাগল। গ্রীকদিগের শিল্পকলায় সেই বাহ্য সৌষ্ঠব বা অঙ্গ-সৌষ্ঠবের (symmetry) দিক্ পূর্ণমাত্রায় পরিস্ফুট। হিন্দুর শিল্পকলায় অঙ্গ-সৌষ্ঠবের দিকে আদৌ দৃষ্টি নাই, উহার দৃষ্টি কেবল অন্তরের ভাবের দিকে। গ্রীক-সভ্যতার লক্ষ্য ভোগের দিকে বলিয়াই উহার দৃষ্টি কেবলমাত্র নিষেকাদ্য মরণান্ত জীবনেই নিবদ্ধ; তাহার এদিক ওদিক কোন দিকই উহা দেখিতে চাহে না। পক্ষান্তরে প্রাচ্য সভ্যতার দৃষ্টি মুখ্যতঃ মরণের পরপারে মানবের চরম গতির দিকে। গ্রীক-সভ্যতাকে বনিয়াদ করিয়াই পাশ্চাত্য সভ্যতা গজাইয়া উঠিয়াছে। অধুনা পাশ্চাত্য সভ্যতার যে সুন্দর প্রতিমা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার খড় দড়ি ও মাটির প্রায় সমস্ত কাজই গ্রীক-সভ্যতার দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে, কেবল মৃত্তিকার শেষ লেপ, বর্ণলেপ, অঙ্গরাগ, চক্ষুর্দ্দান প্রভৃতি পূর্ণতার কার্য্য খৃষ্ট-ধর্ম্ম কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহা ভিন্ন উহার বেশ, পরিচ্ছদ ও অন্যান্য মণ্ডনের কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে আধুনিক য়ুরোপীয় মনস্বীদিগের সাধনার দ্বারা। খৃষ্ট-ধর্ম্মই পাশ্চাত্য সভ্যতার উপর প্রাচ্য ভাব ও প্রভাব সংক্রমিত করিয়া দিয়াছে। উহার ফলে প্রতীচ্য সভ্যতা কতকটা অন্তর্ম্মুখী হইয়াছে সত্য, কিন্তু মজ্জাগত বহির্ম্মুখ ভাবকে নষ্ট করিতে পারে নাই। সেই জন্য পাশ্চাত্য সভ্যতার চক্ষু দিয়া ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের বিচার করিতে গেলে দারুণ ভ্রমে পতিত হইতে হয়। আমরা পাশ্চাত্য চক্ষু দিয়াই সমস্ত পার্থিব অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান দেখিতে ও তাহাদের বিচার করিতে অভ্যস্ত হইয়াছি,—ফলে ভারতীয় রাজনীতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের স্বরূপ-নির্ণয়ে আমাদের ভ্রমপ্রমাদ-সংঘটন একরূপ অবশ্যম্ভাবী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

উভয় সভ্যতার স্বরূপ বিচার করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে, উভয় সভ্যতার পার্থক্য যেমন উভয় দেশের শিল্পকলাদিকে প্রভিন্ন করিয়া দিয়াছে, সেইরূপ উভয় দেশের রাজনীতিক অনুষ্ঠানে এবং প্রতিষ্ঠানেও তাহার প্রভাব পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত করিয়া তুলিয়াছে। সুতরাং এক সভ্যতা-সঞ্জাত রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত তুলনা করিয়া অন্য সভ্যতার প্রসূত প্রতিষ্ঠানের স্বরূপ বুঝা অসম্ভব না হইলেও কঠিন। সেই জন্য খুব সাবধানে ও সন্তর্পণে, সর্ব্ববিধ পূর্ব্বগঠিত সিদ্ধান্ত ও সংস্কার (prejudice) বর্জ্জন করিয়া এই বিষয়ের আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

আজ কাল সমস্ত সভ্যদেশে জনতন্ত্রের যুগ বা হুজুগ পড়িয়াছে। কিন্তু কোন দেশই ডেমক্রেশীকে সফল করিয়া তুলিতে পারে নাই। য়ুরোপীয় ডেমক্রেশীর বহিরঙ্গ অতি সুন্দর ও চিত্তাকর্ষী। উহার সংজ্ঞাও মনোহারিণী। ডেমক্রেশীর সংজ্ঞা এই যে আপামর সাধারণের হিতার্থ সর্ব্বশ্রেণীর লোক কর্ত্তৃক পরিচালিত সাধারণেরই শাসনযন্ত্র (The rule of the people, by the people, for the people)। অর্থাৎ এই শাসনপদ্ধতিতে উচ্চ নীচ নাই, পণ্ডিত মূর্খ নাই, অধিকারী অনধিকারী নাই,—সকলের অধিকার সমান। ইহাতে প্রত্যেক লোকই আপনাকে শাসনযন্ত্রের আংশিক পরিচালক মনে করিতে পারে। প্রত্যেকেই মনে করিতে পারে, রাজনীতিক্ষেত্রে তাহার মতের যথেষ্ট মূল্য আছে। কাহারও সে মত উপেক্ষা করিবার অধিকার নাই। গঠন হিসাবে এরূপ ব্যবস্থা, এরূপ প্রতিষ্ঠান, যে সকলেরই মনোজ্ঞ হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? অধিকাংশ য়ুরোপীয় মনস্বীই মনে করিয়া থাকেন, বিচারবুদ্ধিতে যাহা ন্যায়সঙ্গত মনে হয়, কার্য্যক্ষেত্রে তাহা চেষ্টার দ্বারা সফল করা যাইতে পারে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে প্রকৃত ডেমক্রেশী কোন যুগে, কোন দেশে, কোন জাতি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়া উহার উদ্দেশ্য-লাভে সমর্থ হইয়াছে কি না, সে প্রশ্ন প্রায় কেহই জিজ্ঞাসা করেন না। প্রায় চারি বৎসর পূর্ব্বে মিষ্টার জি, এইচ, বনার বিলাতের বিখ্যাত "নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরী এণ্ড আফ্‌টার" নামক সুবিখ্যাত মাসিকপত্রে এই প্রশ্ন উপস্থিত করিয়া দৃঢ়তার সহিত ইহার উত্তরে বলিয়াছিলেন,—"না, কস্মিন্‌কালে কোন দেশে কোন জাতি কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয় নাই।" উহা প্রবর্ত্তিত না হইবার কারণও তিনি অতি সুন্দরভাবে বিবৃত করিয়াছেন। তিনি বলেন:—"সাধারণ লোক সাধারণ বলিয়াই শাসন-কার্য্য সম্পাদনে অসমর্থ, তাহারা তাহাদের সামর্থ্যহীনতা উপলব্ধি করিয়াও থাকে। অধিকন্তু তাহারা শাসন করিবার অনুমাত্র বাসনাও হৃদয়ে পোষণ করে না। কখন কখন কুশাসন-জনিত কষ্টের প্রভাব এত তীব্র হইয়াছে যে, তাহার ফলে সকল প্রজাই বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে, এ কথা সত্য; ফরাসী-বিপ্লব এবং রুসিয়ার বলশেভিক অভ্যুত্থান তাহার দৃষ্টান্তস্থল। কিন্তু সেই অভ্যুত্থান প্রজাসাধারণের শাসন করিবার বাসনাজনিত নহে; কুশাসনজনিত পীড়া তাহাদের সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রান্ত করিয়া গিয়াছিল বলিয়া তাহারা বিদ্রোহী হইয়াছিল।" *

আমাদের দেশে কোন কালে ডেমক্রেশী অথবা উহার উদ্দেশ্যসাধক কোন শাসনযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল কি না, তাহা বুঝিতে হইলে ঐ শব্দটির প্রকৃত অর্থ এবং ঐরূপ শাসন-পদ্ধতির উদ্দেশ্য কি, তাহা বিশেষভাবে বুঝা উচিত। এই শব্দটির অর্থ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত বিদ্যমান। ইহার প্রকৃত অর্থ demos বা প্রাকৃত জনকর্ত্তৃক পরিচালিত শাসনপদ্ধতি। অর্থাৎ যাহারা শিক্ষায়-দীক্ষায়, ধনে-মানে, এবং কুলে-শীলে অসাধারণত্ব লাভ করে নাই, সংস্কৃত ভাষায় যাহাকে ইতরজন বলে, সেই শ্রেণীর সাধারণ লোক কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত শাসনপদ্ধতিই ডেমক্রেশী নামে অভিহিত। বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটল এই শব্দটি প্রথম ঐ অর্থেই ব্যবহার করেন। তিনি উহা কদর্থেই ব্যবহার

*The people as a people are incapable of ruling and aware of their own incapacity; what is more, they never show the slightest desire to rule. It is true that there have been occasions, as for example, the French Revolution and the Bolshevik upheaval in Russia, when the galls of misrule have chafed so virulently that the body politic has erupted; but the eruption occurred, not primarily because the moujiks wished themselves to rule, but because they could no longer bear to be misruled."

করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে রাজতন্ত্র (monarchy) বিকৃত হইলে যেমন উহা স্বেচ্ছাচারতন্ত্রে (Tyranny) এবং অভিজাততন্ত্র (Aristocracy) বিকৃত হইলে যেমন উহা গোষ্ঠীতন্ত্রে (Oligarchy) পরিণত হয়, শাসন-কার্য্যে সম্পৃক্ত ব্যক্তিগণের বিকার উপস্থিত হইলে সেই শাসনযন্ত্র প্রাকৃততন্ত্রে (Democracy) পরিণত হইয়া থাকে। তাঁহার মতে অভিজাততন্ত্রই (Aristocracy) সর্ব্ববিধ শাসনতন্ত্রের মধ্যে উৎকৃষ্ট এবং শুভফলপ্রদ। এখানে বলা বাহুল্য, তাঁহার মতে অভিজাততন্ত্র বলিতে কেবল সদ্বংশজাত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত শাসনযন্ত্র বুঝায় না, ধার্ম্মিক, মনস্বী, বিদ্বান ও বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত শাসন-পদ্ধতিই বুঝায়। আজ কাল ইংরাজী ভাষায় Mobocracy (ইতর জনতন্ত্র) বলিতে যাহা বুঝায় এরিস্টল Democracy (প্রকৃতি তন্ত্র) শব্দটি যেন অনেকটা যেন সেই অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন। তাহাই ঐ শব্দটির প্রকৃত অর্থ।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে য়ুরোপের রাজনীতি-বিশারদগণ স্বৈরশাসন-পদ্ধতির উপর অতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠেন। তাঁহারা দেখিয়াছিলেন যে, রাজাই হউন অথবা কতকগুলি বিশিষ্ট ব্যক্তিই হউন, যিনি বা যাঁহারা অনিয়ন্ত্রিতভাবে শাসন-যন্ত্র পরিচালিত করেন, তিনি বা তাঁহারাই সাধারণতঃ প্রজাপীড়ক হইয়া থাকেন। সেই জন্য তাঁহারা ইহার প্রতীকারের উপায় নির্দ্ধারিত করিবার জন্য অতিশয় ব্যস্ত হইয়া উঠেন। কোন প্রতিষ্ঠানের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিলে মানুষ সহজেই তাহার প্রতীকারের উপায় উদ্ভাবিত করিবার জন্য উহার ঠিক বিপরীত-ধর্ম্মাবলম্বী প্রতিষ্ঠানের প্রবর্ত্তনা করিতে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা মানুষের স্বভাব। য়ুরোপীয় রাজনীতিকরা যখন দেখিলেন যে, রাজ-তন্ত্র বিকৃত হইয়া স্বেচ্ছাচারতন্ত্রে এবং অভিজাততন্ত্র বিকৃত হইয়া গোষ্ঠীতন্ত্রে পরিণত হয়, তখন তাঁহারা স্বতঃই প্রাচীন এথেন্সের প্রকৃতিতন্ত্র বা সর্ব্বজনতন্ত্রকেই উহার প্রতীকারের প্রধান উপায় সাব্যস্ত করেন। সেই জন্য তাঁহারা পেরিক্লিসের (Pericles) আমলে এথেন্সে যে প্রকার প্রকৃতিতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, ঠিক সেই ভাবের প্রকৃতিতন্ত্রকে শ্রেষ্ঠ শাসন-পদ্ধতি মনে করিয়া তাহার পক্ষ সমর্থন করিতে থাকেন। কিন্তু উহার যে সকল দোষ আছে, তাহা তাঁহারা আদৌ দেখেন নাই। সেই হইতেই ডেমক্রেশী বা সর্ব্বজনতন্ত্রই সর্ব্বজনহিতকর শাসনতন্ত্র বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে।

প্রকৃতিতন্ত্র দ্বিবিধ। যথা—সর্ব্বজনতন্ত্র এবং মুখপাত্র-তন্ত্র। যে ক্ষেত্রে রাজ্যের সকল লোকই সমবেত হইয়া ছোট বড় সকল প্রকার রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, সেই ক্ষেত্রে উহা সর্ব্বজনতন্ত্র (direct type of Democracy) বলিয়া অভিহিত হয়। বড় বড় রাজ্যে সর্ব্বজনতন্ত্র প্রবর্ত্তন অসম্ভব। বাঙ্গালার সাড়ে ৪ কোটি লোকের ভোট লইয়া যদি প্রত্যেক কার্য্য করিতে হয়, তাহা হইলে কোন কাজই করা চলে না। সেই জন্য বড় বড় রাজ্যে মুখপাত্রতন্ত্র (Representative government) প্রবর্ত্তিত করা হয়। এই শাসন-পদ্ধতি অনুসারে প্রজাসাধারণ তাহাদের পক্ষসমর্থনের জন্য এক এক জন প্রতিনিধি বা মুখপাত্র নির্ব্বাচিত করেন। সেই মুখপাত্রগণই প্রজাসাধারণের পক্ষ হইয়া রাজকার্য্য-পরিচালন-ব্যবস্থা এবং বিধি-নিয়মের প্রবর্ত্তন করিয়া থাকেন। এই ব্যবস্থাই কিছুকাল সর্ব্বোত্তম শাসন-পদ্ধতি বলিয়া প্রশংসিত হইয়া আসিতেছে।

কিন্তু এই ব্যবস্থাও যে সর্ব্বোত্তম শাসন-পদ্ধতি সে বিশ্বাস এখন লোকের মন হইতে চলিয়া যাইতে বসিয়াছে। জনসাধারণ যত দিন অভ্রান্ত এবং পূর্ণমাত্রায় স্বার্থলেশশূন্য না হইবে, তত দিন তাহারা কি প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে, কি বিধি-নিয়ম প্রণয়নে, কোন কার্য্যেই সাফল্যলাভ করিতে পারিবে না। ইহার দ্বিতীয় দোষ এই যে, সর্ব্বজনমধ্যে মতভেদের যে আনুপাতিক সংখ্যা আছে,—প্রতিনিধিদিগের মধ্যে মতভেদ ঠিক সেই অনুপাতে প্রতিবিম্বিত হয় না। অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে, দেশে যে মতাবলম্বী লোকের সংখ্যা অধিক, সেই মতাবলম্বী প্রতিনিধির সংখ্যা অল্প হইয়া পড়িয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বিলাতেই ঠিক এইরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছিল। নির্ব্বাচকমণ্ডলীবিন্যাসের দোষেই এরূপ ব্যাপার ঘটিয়া থাকে।

ডেমক্রেশী বা সর্ব্বজনতন্ত্রের আর একটা প্রধান দোষ এই যে, ইহার দ্বারা সাধারণের কল্যাণ সম্যক্‌ভাবে সাধিত হয় না। সকল দেশের সাধারণ লোক প্রায়ই হুজুগপ্রিয় হইয়া থাকে। সুতরাং তাহারা অনেক সময় এক একটা

ধুয়ার (catch-word) দ্বারা পরিচালিত হয়। তাহাদের সাধারণতঃ পরিণাম চিন্তা করিবার শক্তি থাকে না। কাযেই অনেক সময় তাহারা হুজুগপ্রিয় নেতৃগণের (demagogue) দ্বারা ভ্রান্ত-পথে চালিত হয়। সকল সর্ব্বজনতন্ত্র শাসিত দেশে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐ সকল হুজুগে নেতাই জনসাধারণ কর্তৃক প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়া অনেক স্থলে দেশের ও জাতির অনিষ্টসাধন করিয়া থাকে।

জনতন্ত্র যদি প্রতিনিধিত্বমূলক হইয়া সুপথে চালিত হয়, যদি জনসাধারণ সত্য সত্যই যোগ্য ব্যক্তিদিগকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে সমর্থ হয়,—তাহা হইলে সেই জনতন্ত্র কার্য্যতঃ অভিজাততন্ত্র হইয়া পড়ে। তাহার কারণ, নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরা তাঁহাদের নির্ব্বাচক ভোটদাতৃগণের সিদ্ধান্ত অনুসারেই যে সিদ্ধান্ত করিবেন এমন কোন কথা নাই। বিলাতের বিখ্যাত রাজনীতিক বাগ্মী এডমণ্ড বার্ক এই সম্বন্ধে বিলাতের বৃষ্টল সহরে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি নির্ব্বাচক-মণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, প্রতিনিধিগণ নির্ব্বাচক-মণ্ডলীর হিতসাধনেই সর্ব্বদা আত্মনিয়োগ করিবেন, আপনার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পরিহার পূর্ব্বক নির্ব্বাচক-মণ্ডলীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের চিন্তায় রত হইবেন, কিন্তু কোন মতেই স্বীয় বিচার-বুদ্ধি নির্ব্বাচক-মণ্ডলীর বিবেচনা-বুদ্ধির নিকট বলি দিবেন না। আমি এ স্থলে তাঁহার কয়েকটি কথা উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। কথা কয়টি এই :—

It is his duty to sacrifice his repose, his pleasures, his satisfactions to theirs, and above all, ever, and in all cases, to prefer their interest to his own. But his unbiased opinion, his mature judgment, his enlightened conscience, he ought not to sacrifice to you, to any man or to any set of men living. These he does not derive from your pleasure; no, nor from the law and constitution. They are a trust from Province, for the abuse of which he is deeply answerable. Your representative owes to you not his industry only, but his judgment; and he betrays instead of serving you, if he sacrifices it to your opinion. ইহার মর্ম্মার্থ এই ;—"নির্ব্বাচক-মণ্ডলীর অর্থাৎ ভোটদাতৃগণের মঙ্গলের জন্য নির্ব্বাচিত সদস্যের বিশ্রাম, আনন্দ, সন্তোষ পরিহার করা কর্ত্তব্য এবং সর্ব্বোপরি সর্ব্বকালে তাঁহাকে নিজ স্বার্থ পরিহার করিয়া ভোটদাতৃগণের স্বার্থের সেবা করিতে হইবে। কিন্তু তাঁহার পক্ষপাতবর্জ্জিত মতামত, তাঁহার পরিপক্ব সিদ্ধান্ত, তাঁহার সমুজ্জ্বল বিবেক-বুদ্ধি, কোন জীবিত ব্যক্তির বা সম্প্রদায়ের জন্য তাঁহার পরিত্যাগ করা বিধেয় নহে। নির্ব্বাচিত সদস্য নির্ব্বাচকদিগের ইচ্ছা অনুসারে উহা প্রাপ্ত হয়েন না, আইন ও শাসন-পদ্ধতি হইতেও তাহা পায়েন না। ঈশ্বর তাঁহাকে উহা ন্যাস-স্বরূপ প্রদান করিয়াছেন ; উহার অপব্যবহার করিলে তাঁহাকে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে। আপনাদের নির্ব্বাচিত সদস্যের পরিশ্রমই কেবল আপনাদিগকে দেয় নহে, পরন্তু তাহার বিচার-বুদ্ধিও আপনাদিগকে দেয় ; তিনি যদি আপনাদের মতামতের খাতিরে স্বীয় বিচার-বুদ্ধি বিসর্জ্জন করেন, তাহা হইলে তিনি নির্ব্বাচকগণের হিতসাধন না করিয়া অহিত করিবেন।" এই উদ্ধৃত বাক্য হইতেই বুঝা যায় যে, নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি নির্ব্বাচক মণ্ডলীর মত অনুসারেই যে রাজ্যশাসন করিবেন এরূপ কোন কথা নাই। তিনি নিজ বিচার-বুদ্ধি অনুসারেই প্রতিনিধি সভায় তাঁহার মতামত ব্যক্ত করিবেন ; তবে তাঁহার সেই বিচার-বুদ্ধি পক্ষপাতবর্জ্জিত এবং বিদ্যা ও বহুদর্শিতার দ্বারা সমুজ্জ্বল হওয়া আবশ্যক।

কথাটা পরে তিনি আরও বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি তাঁহার সমস্ত কথা উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। তবে তাঁহার এই কথাগুলি বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন যে, "পার্লামেণ্ট বিভিন্ন এবং পরস্পর প্রতিকূল স্বার্থে স্বার্থবান্ ব্যক্তিদিগের সভা নহে যে, প্রত্যেক সদস্য অন্যান্য সদস্যের আক্রমণ হইতে উকীল বা কর্ম্মকর্ত্তার ন্যায় স্বীয় নির্ব্বাচকদিগের স্বার্থ রক্ষা করিবেন। প্রকৃতপক্ষে পার্লামেণ্ট একই স্বার্থে স্বার্থবান্ একই জাতির বিচারপূর্ব্বক কার্য্য করিবার সভা। এইখানে জাতির সার্ব্বজনীন স্বার্থ সাকল্যরূপেই দেখিয়া কর্ত্তব্যের অবধারণ করিতে হইবে। পার্লামেণ্ট স্থানীয় স্বার্থের বা স্থানীয় কুসংস্কারের বা উদ্দেশ্য-সাধনের স্থান নহে। এখানে সর্ব্বসাধারণের কল্যাণই কাম্য ও বিচার্য্য। বৃষ্টলের লোক এক

...ন সদস্য নির্ব্বাচিত করিলেন বটে, কিন্তু নির্ব্বাচিত ব্যক্তি ...স্য হইলে আর বৃষ্টলের সদস্য থাকিবেন না, পরন্তু তখন তিনি পার্লামেণ্টরই সদস্য হইবেন।" বার্কের পূর্ব্বে ব্ল্যাকষ্টোন (Blackstone) প্রভৃতিও এই কথা বলিয়া গিয়াছেন। অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে বিংশ শতাব্দীতে নির্ব্বাচক-মণ্ডলার এবং নির্ব্বাচিত সদস্যের বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে সত্য,—কিন্তু মূল মত সম্বন্ধে এখনও দ্বৈধভাব উপস্থিত হয় নাই। অন্ততঃ চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এই মতই পোষণ করিয়া থাকেন।

এখন পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখুন, বর্ত্তমান সময়ে ডেমক্রেশীর স্বরূপ কিরূপ দাঁড়াইয়াছে। সর্ব্বসাধারণের মতে বা বুদ্ধিতে এখন জনমতমূলক শাসন-যন্ত্র পরিচালিত হয় না। এখন কতকগুলি নির্ব্বাচিত সদস্যের দ্বারা উহা পরিচালিত হইয়া থাকে, সুতরাং উহাকে ঠিক ডেমক্রেশী বলা যায় না। উহা ডেমক্রেশীর গন্ধযুক্ত এরিষ্টক্রেশী বা অভিজাততন্ত্র। ইহার সদস্যগণ সর্ব্বসাধারণের ভোট দ্বারা নির্ব্বাচিত হয়েন,—সেই জন্য উহাতে ডেমক্রেশীর বা জনতন্ত্রের গন্ধ পাওয়া যায়। আজ কাল এ দেশের অনেকে য়ুরোপীয়দিগের উক্তির পুনরুক্তি করিয়া বলিয়া থাকেন যে, প্রাচীন গ্রীসে ও রোমে জনতন্ত্রবাদ পূর্ণমাত্রায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, সে কথা সত্য নহে। এ বিষয়ে এক জন নিরপেক্ষ য়ুরোপীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন,—"আমরা যদি তথাকথিত ডেমক্রেশীর—জনতন্ত্র-শাসিত এথেন্সের ও রোমের কথা—বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া দেখি, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই যে, অধিকতর শক্তিশালী লোকের একটা দল, ধনবান্ এবং বুদ্ধিমান্ লোকের একটা অভিজাততন্ত্র, জনসাধারণের উপর আপনাদেরই ইচ্ছা বিনিয়োগ করিতেছে।" *

এখন মোটামুটি বিচার করিয়া বুঝা গেল যে, এখন যে শাসন-পদ্ধতি ডেমক্রেশী নামে অভিহিত, তাহা কার্য্যতঃ demos বা প্রকৃতিপুঞ্জ দ্বারা পরিচালিত নহে, তাহা স্বরূপতঃ অভিজাততন্ত্রই বটে। তবে লোকমত পরোক্ষভাবে সেই শাসনযন্ত্রের উপর কতকটা প্রভাব বিস্তৃত করিতে পারে। উহাই আধুনিক ডেমক্রেশীর মূল কথা।

এ পর্য্যন্ত য়ুরোপীয় ডেমক্রেশীরই কথা কতকটা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইল। এখন ভারতীয় শাসন-পদ্ধতি কিরূপ ছিল এবং য়ুরোপীয় ডেমক্রেশীর সহিত তাহার কতটা সাদৃশ্য এবং কতটা বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান ছিল, তাহারই আলোচনা করা যাউক। আমরা দেখিতে পাই যে, প্রাচীন পল্লীগ্রামে ও নগরে এক একটি পঞ্চায়েৎ ছিল। এক একটি গ্রাম বা পল্লী যেন এক একটি ক্ষুদ্র জনতন্ত্রবাদমূলক সমাজ ছিল। পল্লীবাসীরা তাহাদের মধ্য হইতে কয়েকজনকে (অনেক সময় ৫ জনকে) তাঁহাদের নিয়ন্তা বা গ্রামণী নিযুক্ত করিতেন। ইঁহারাই ছিলেন গ্রামবাসিগণের মুখপাত্র। ইঁহারা কয়েক বৎসর অন্তর যে গ্রাম্য প্রজাসাধারণের প্রকাশ্য ভোটের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইতেন, সেরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে যিনি স্বীয় চরিত্র, ধার্ম্মিকতা, নিরপেক্ষতা এবং বিচার-বুদ্ধি অনুসারে প্রকৃত পক্ষে গ্রামবাসীর শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণে সমর্থ হইতেন, তিনি গ্রামের নিয়ন্তা বা গ্রামমুখ্য বলিয়া বিবেচিত হইতেন। ইঁহারা গ্রামবাসীর সর্ব্বপ্রকার বিবাদের মীমাংসা করিয়া দিতেন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপরাধের বিচার করিতেন। তখন রাজ-শাসন এত প্রবল এবং সমাজের সর্ব্বস্তরে অনুপ্রবিষ্ট ছিল না। ছোট ছোট ব্যাপার মীমাংসার জন্য রাজদ্বারে নীত হইত না। যাঁহারা মণ্ডল বা পটেল ছিলেন, সেই পঞ্চায়েৎগণ সম্মিলিত হইয়া অপরাধীর বিচার করিতেন। সাধারণতঃ গ্রামপ্রান্তস্থিত বটবৃক্ষ বা অশ্বত্থবৃক্ষমূলে গ্রাম্য পঞ্চায়েতের বৈঠক বসিত। গ্রাম্য জনসাধারণ বিচার দেখিবার জন্য তথায় সমবেত হইতেন। পঞ্চায়েৎ বাদী প্রতিবাদীর কথা ও সাক্ষীদিগের সাক্ষ্য-বাক্য শুনিয়া মামলার বিচার-নিষ্পত্তি করিতেন। সর্ব্বসাধারণের সম্মুখে উক্তি প্রত্যুক্তি করিতে হইত বলিয়া লোক সহসা মিথ্যা কথা বলিতে সাহস পাইত না। শপথ গ্রহণপূর্ব্বক মিথ্যা কথা বলা লোক মহাপাপ বলিয়া বিবেচনা করিত। ফলে সমস্ত প্রতিবেশীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া মিথ্যা কথা বলিতে লোকের সাহসে কুলাইত না। আর কোন্ কথাটা সত্য, কোন্‌টা

*If we examine any of the so-called democracies—Athens and Rome under the Republic—we find the same thing, an inner ring of more powerful men, aristocracy of wealth and brains imposing its will upon the masses.

মিথ্যা, তাহা বুঝিতে বিচারকদিগের বিলম্ব ঘটিত না। যাহারা দোষী বলিয়া বিবেচিত হইত, পঞ্চায়েতের বিচারে তাহারা সামাজিক দণ্ড পাইত। পঞ্চায়েতের মধ্যে মতভেদ প্রায় হইত না; যদি মতভেদ হইত, তাহা হইলে গ্রামের উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ যে পক্ষে মত দিতেন,—সেই মতই প্রবল হইত। আর যদি দুই পক্ষে মতভেদ প্রবল হইত, তাহা হইলে 'পঞ্চগ্রামী' করা হইত। পঞ্চগ্রামী অর্থে পাঁচখানি পাশাপাশি গ্রামের পাচ জন শ্রদ্ধাভাজন ও বিশ্বস্ত ব্যক্তির দ্বারা বিচার বা মীমাংসা। তাঁহাদের বিচারই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইত। ইহা ভিন্ন গ্রামের পঞ্চায়েৎ অভাব অভিযোগ সকল বিষয়ের বিবেচনা করিয়া তাহার উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন। এখন এই ব্যবস্থার কিঞ্চিৎ অবশেষ সুদূর পল্লীগ্রামে দেখিতে পাওয়া যায়। এখন পঞ্চায়েৎরা আর ফৌজদারী বা দেওয়ানী মামলার বিচার করেন না। তবে সামাজিক অপরাধের বিচার করিবার জন্য সময়ে সময়ে বৈঠক বসাইয়া থাকেন।

অতি প্রাচীনকালে এই পল্লী পঞ্চায়েৎ প্রথাই প্রবল ছিল। বড় বড় সহরগুলিতে বহু লোকের সমাবেশ ছিল বলিয়া তথায় গণতন্ত্র দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তথায় বহু লোকই নিয়ন্তার কার্য্য করিতেন। ইহাঁরা সকলে সমবেত হইয়াই সহরের রাজকার্য্য পরিচালিত করিতেন। ম্যাগেস্থেনিস ভারতে আসিয়া এইরূপ সহর অনেক দেখিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন,—At last after many generations had come and gone, the sovereignty, it is said, was dissolved and democratic government set up in the cities. অর্থাৎ বহু পুরুষ আবির্ভূত এবং তিরোহিত হইবার পর জনবহুল নগরগুলিতে রাজতন্ত্র লুপ্ত এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল শুনা যায় (Magasthenes Frag)।

রাজা বা রাজ্যপাল,—সেই সকল গ্রামমুখ্যদিগের মধ্য হইতেই তাহাদের সভাসদ বা পরিষদ মনোনীত করিতেন। সুতরাং তাঁহার মনোনীত ব্যক্তিরাই দেশের লোকের মনোনীত ব্যক্তি হইতেন। কামন্দকীয় নীতিসারে উক্ত হইয়াছে,—

প্রখ্যাতবংশমক্রূরং লোকসংগ্রাহিণং শুচিম্।
কুর্ব্বীতাত্মহিতাকাঙ্ক্ষী পরিবারং মহীপতিঃ॥ কাম ৪।১০

বিখ্যাতবংশ, অক্রূর, লোকসংগ্রাহী, যাহারা মানুষকে সহজে আকৃষ্ট করিতে পারেন এবং যাঁহারা শৌচাচারসম্পন্ন, আত্মহিতাকাঙ্ক্ষী, রাজা তাঁহাকেই পারিষদ মনোনীত করিবেন।

বিষ্ণুসংহিতাতেও ঠিক এইরূপ কথা বলা হইয়াছে, যথা—

জন্মকর্ম্মব্রতোপেতাশ্চ রাজ্ঞা সভাসদঃ কার্য্যা রিপৌ মিত্রে চ
যে সমাঃ কামক্রোধ-ভয়লোভাদিভিঃ কার্য্যার্থিভিরনাহার্য্যাঃ।
বিষ্ণু ৩।৫২।

যে সকল লোক সদ্বংশজাত, ধর্ম্মসংস্কারে সংস্কৃত, নিয়মপ্রতিপালক, শত্রু-মিত্রে সমদর্শী, এবং কার্য্যপ্রার্থীরা যাঁহাদিগকে কাম, ক্রোধ, ভয় এবং লোভ প্রদর্শন করিয়া আপনাদের বশীভূত করিতে সমর্থ নহেন, রাজা এইরূপ লোকদিগকে বাছিয়া বাছিয়া সভাসদ মনোনীত করিবেন।

মহাভারতে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিয়াছিলেন :—

হ্রীনিষেবাস্তথা দান্তা সত্যার্জ্জবসমন্বিতাঃ।
শক্তা কথয়িতুং সম্যক্ তে তব স্যুঃ সভাসদঃ॥ ম শা ৮৩।২

যে সকল ব্যক্তি লজ্জাশীল এবং জিতেন্দ্রিয়, যাহারা সত্য ও সরলতাসম্পন্ন এবং প্রিয় ও অপ্রিয় বাক্য মুখের উপর বলিতে পারেন, সেইরূপ লোকদিগকে বাছিয়া বাছিয়া তুমি সভাসদ করিবে।

পৌরজানপদদিগের মধ্যে এইরূপ পরীক্ষিত লোক বাছিয়া লইতে হইলে গ্রামনায়ক বা গ্রামমুখ্যদিগের মধ্য হইতেই কয়েকজনকে বাছিয়া লইতে হইত। রাজসভায় যে পৌরজানপদবর্গ উপস্থিত থাকিতেন, মহাভারতে ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। এ স্থলে আমি আর তাহার উল্লেখ করিব না। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণকালে কৌরবগণ কৃষ্ণার প্রশ্নের কোন উত্তরদান করিতে পারিলেন না দেখিয়া "সভাস্থ নরদেবগণের লোমহর্ষণ ধিক্কার উপস্থিত হইয়াছিল।" "সজ্জনগণ ধৃতরাষ্ট্রকে নিন্দা করত আক্রোশ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।" ধৃতরাষ্ট্র সেই সংক্ষুব্ধ জনমত অগ্রাহ্য করিতে পারেন নাই বলিয়া যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা ও পাঞ্চালীকে মুক্তি দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। দুর্য্যোধন অনেকটা স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিতেছিলেন, কিন্তু তাহা হইলেও ধৃতরাষ্ট্র তখনও লোকমত উপেক্ষা করিতে

…রেন নাই। সুতরাং লোকমত রাজপরিষদে যে প্রবল …ত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

রাজসভায় কতকগুলি লক্ষণ আছে। রাজা রামচন্দ্র …াহার সভাসদগণকে আহ্বান করিয়া তাহার কতকগুলি …ক্ষণ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। যথা, "যে সভায় বৃদ্ধগণ উপ-…স্থিত থাকেন না, সে সভা সভাই নহে, যে সকল বৃদ্ধ ধর্ম্মের …উপদেশ দেন না, অর্থাৎ যথাধর্ম্ম কার্য্য করিতে বলেন না, …তাহারা বৃদ্ধ বলিয়াই গণ্য নহেন। যে ধর্ম্মে সত্য নাই, সে ধর্ম্ম ধর্ম্ম নহে এবং যে সত্য ছলবিশিষ্ট, সে সত্য সত্যই নহে। যে সকল সভাসদ সভায় যাইয়া চিন্তা করিয়াও (অর্থাৎ একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াও) কোন মতামত প্রকাশ করেন না বা কোন কথা বলেন না, তাঁহারা সকলেই মিথ্যাবাদী; অথবা যাঁহারা প্রশ্নের সদুত্তর জানিয়াও কাম-ক্রোধ বা ভয়-বশতঃ সেই উত্তর প্রদান করেন না, তাঁহারা আপনাদের উপর সহস্র বারুণ-পাশ নিক্ষিপ্ত করিয়া থাকেন।" কৌরব-সভায় বিদুরও ঠিক ঐ ভাবের কথা বলিয়াছিলেন। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, রাজসভায় সজ্জনগণের যথাধর্ম্ম মত হিন্দু আমলের নৃপতিগণকে নিয়ন্ত্রিত করিত। সুতরাং প্রাচীন হিন্দু রাজতন্ত্র দ্বারা গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য অনেকটা সিদ্ধ হইত। অবশ্য এইরূপ শাসনপদ্ধতিকে নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্র বলা যায়। কিন্তু এই নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্রে লোকমত প্রতিবিম্বিত করিবার ব্যবস্থা ছিল। তবে সময়ে সময়ে কোন কোন রাজা স্বেচ্ছাচারী হইবার চেষ্টাও যে না করিতেন, তাহা নহে; কিন্তু সেরূপ রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিবার ব্যবস্থা যে ছিল, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত আছে। ইহা ভিন্ন কোন কোন রাজ্যে গণতন্ত্রও প্রতিষ্ঠিত ছিল। বৌদ্ধদিগের গ্রন্থে ও মেগেস্থেনিস ও চীনা পর্য্যটকের বিবরণ হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিলে প্রবন্ধ অতিশয় দীর্ঘ হইয়া পড়ে। তবে মোটের উপর এইমাত্র বলিতে পারি যে, প্রাচীন ভারতে নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্রই অধিক ছিল। জনসাধারণের প্রতিনিধি-স্থানীয় ব্যক্তিরা রাজসভায় থাকিয়া রাজকার্য্য বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতেন এবং যেখানে অন্যায় কার্য্য অনুষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা ঘটিত, সেইখানেই পুর ও জনপদ হইতে সমাগত সজ্জনবর্গ তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেন। দুর্য্যোধনের ন্যায় স্বেচ্ছাচারী রাজাকেও অনেক সময় সে প্রতিবাদ শুনিয়া কার্য্য করিতে হইত।

রাজশূন্য গণতন্ত্রও ভারতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাহার কথা বারান্তরে আলোচনা করা যাইবে।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

বেদন্-বেহাগ

বড় বেদনায় বীণা বাজিল মরমে মরমে,
ধিক্ এ জীবন যৌবন-ধন শত ধিক্ মম করমে!
বাজিল মরমে মরমে!
তখনো সাঁঝের অপরূপ শোভা আধ আলো, আধ আঁধারে;
যমুনার জলে গাগরী ভরিতে মনঃ-প্রাণ গেল বাঁধা রে;
অদূরে শুনিনু কদমের তলে
বাজিছে বাঁশরী 'রাধা'-'রাধা' বলে—
হৃদয় হইল অস্থির, তবু
কথাটি সরে না সরমে—
বাজিল মরমে মরমে!

চির-নব শ্যাম কূলে দাঁড়াইয়া
আছে দশদিক্ উজলি',
শ্রাবণের ঘন কালো মেঘে যেন
চমকিছে থির বিজলি।
নয়নের কোণে চাহি মোর পানে,
কত যে বেদন জাগাইছে প্রাণে;
যেতে চাহে মন—চলে না চরণ
বলিহারি নারী-ধরমে!
বাজিল মরমে মরমে!

জল নিতে এসে কালোরূপে মম গেল অন্তর ভরিয়া,
কুল-মান ছাড়া শ্যাম-সুন্দরে নিল যে মানস বরিয়া।
প্রাণে বাঁচা ভার হইল আমার,
কালো নামে ঝরে আঁখি শত-ধার,
জানি না পাব কি একটুকু ঠাঁই
চরণ-সরোজে চরমে?
বাজিল মরমে মরমে!

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

রুসিয়ার ছাত্র-বিপ্লব

সকল সময়ে সকল স্থানেই ছাত্রসংঘই দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণে সংগ্রাম করিয়াছে, পৃথিবীর সকল প্রকার বাধা অতিক্রম করিয়া, সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গকে তুচ্ছ করিয়া, পাহাড়-পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া, এই মুক্তিকামী তরুণের দল মৃত্যুর কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িতে মাতৃমন্ত্রের পূজা করিবার জন্য উন্মত্ত উচ্ছ্বাসে ছুটিয়া গিয়াছে। তবে সকলের অপেক্ষা অধিক স্বার্থত্যাগ করিয়াছে রুসিয়ার ছাত্রসংঘ—তাহারা লাভ-ক্ষতি বিচার করে নাই,—সাইবেরিয়া, শ্লুসেলবার্গ গ্রাহ্য করে নাই—তাহারা কেবল অনুভব করিয়াছিল অন্ধকারার অন্ধকারে নির্য্যাতনের রুদ্র-দেবতার পাষাণ-পেষণ!

রুসিয়ার ছাত্ররা ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর—যাহাদের ভিতর হইতে শাসক ও শোষক-সম্প্রদায়ের কখনও অভাব হয় নাই। কিন্তু তাহাদের তরুণ-হৃদয়ের নবীন উন্মাদনা সে সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব হইতে তাহাদের আন্তরিকতাকে মুক্ত করিয়া দিয়াছিল;—তাই তাহারা অন্যান্য রুসিয়াবাসীর মত ভীত না হইয়া অধীর আনন্দে বিপ্লবের আগুনে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল,—তাহার রক্তরাঙ্গা শিখাকে মুক্তির অরুণ-কিরণ বলিয়া মানিয়া লইয়াছিল।

রুসিয়ার সাধারণ গণবর্গের অপেক্ষা তাহারা শিক্ষিত ছিল—তাহাদের মানসিক বৃত্তিসমূহ পরিস্ফুট ছিল। তাই স্বেচ্ছাতন্ত্রের নির্ম্মমতা তাহাদের বুকে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল—কাল-বৈশাখীর ঝঞ্ঝাবাতের মত উন্মত্ত বেগে তাহাদের প্রাণের রুদ্ধ দুয়ারে "ফরিয়াদ" করিয়া ফিরিয়াছিল। সেই জন্য তাহারা প্রতিকারের আকুলতায় ব্যাকুল হইয়া উদ্দাম উন্মাদনার তৃষিত আকাঙ্ক্ষা লইয়া, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে "নিহিলিষ্ট" সম্প্রদায় গঠন করিয়াছিল—আর প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, স্বেচ্ছাতন্ত্রের অত্যাচারের আইন অমান্য করিয়া মানুষের মত মনুষ্যত্বকে বরণ করিয়া তাহারা বক্ষঃস্ফীত করিয়া দাঁড়াইবে। সত্যের প্রতিষ্ঠানের জন্য আদর্শের অক্ষুণ্ণতার জন্য এই "নিহিলিষ্ট"দের দল বিপ্লববাদীরই দল ছিল। তাহারা অনেক রাজনৈতিক গুপ্তহত্যাও করিয়াছিল—রুসিয়ার তখনকার ভাগ্যবিধাতা দ্বিতীয় আলেক্জাণ্ডারের স্বেচ্ছাচার শাসনের অবসান করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে সত্য সত্যই তাহাদের কার্য্যসিদ্ধও হইয়াছিল। এইরূপে দুই চারিবার চেষ্টার পরে ছদ্মবেশী পুলিশ তাহাদের সন্ধান পায়—প্রায় সকলেই ধৃত হয়। প্রধান নেতৃগণের প্রাণদণ্ড হয়—হাজারে হাজারে নিহিলিষ্ট সাইবেরিয়াতে নির্ব্বাসিত হয়—অবশিষ্ট অপরাধীরা প্রহরীবেষ্টিত সুরক্ষিত কারাগারে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্যে আবদ্ধ থাকে। দুই এক জন বিদেশে পলায়ন করিয়া দণ্ড হইতে অব্যাহতি লাভ করে। এইরূপে তাহারা শত শীসক্ষিত জড়ত্বের পাষাণভার দূরে নিক্ষেপ করিয়া, দেশের মধ্যে জাগরণের অগ্নিকণা ছড়াইয়া দিয়াছিল।

এই নির্ভীক নিঃস্বার্থ আত্মদানে তাহারা তাহাদের দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। তাই কারাগারের কঠোরতা তাহাদের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে পদতলে দলিত করিতে পারে নাই। যথেচ্ছাচার শাসনের পাষাণ-পেষণ, পিষ্ট ক্লিষ্ট করিয়াও তাহাদের মথিত মনুষ্যত্বের মর্য্যাদাকে খর্ব্ব করিতে সমর্থ হয় নাই। সেই জন্য পরে ছাত্রের আন্দোলনে জনসাধারণ ও শিক্ষিত-সম্প্রদায় যোগদান করিয়াছিলেন। রুসিয়ার স্বেচ্ছাচার শাসনতন্ত্র তাহাদিগকে বলিত, "Nelegalny" বা আইন অমান্যকারী। আইন অমান্য অবশ্য তাহারা করিয়াছিল; তবে সে আইন শৃঙ্খলার নয়, স্বেচ্ছাচারিতার।

তাহার পর এই আইন-অমান্যকারী বিদ্রোহীদলে হাজারে হাজারে কাতারে কাতারে যখন সকলে আসিয়া যোগ দিতে লাগিল, তখন ছাত্র অপেক্ষা জন-সাধারণের সংখ্যাই অধিক হইল। তাহা দেখিয়া ছাত্ররা শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের হস্তে সেই দলকে ছাড়িয়া দিয়া নূতন করিয়া গোপনে আবার ছাত্রসংঘই গঠন করিল—তাহার নাম কিছুই হইল না—তবে রুসিয়াতে তাহারা "Zemlytchestva" নামে খ্যাত হইল। তাহারা ছিল অন্তরে বাহিরে বিপ্লববাদী—দুঃখ-বিপদ-শোক-তাপ সব তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া মরণপথের চরম পথিক হইয়া তাহারা মুক্তির পথে যাত্রা করিল। তাই স্বেচ্ছাচার রুস সরকার তাহাদের উচ্ছেদসাধনের জন্য নানারূপে চেষ্টা করিয়াছিল, তবে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।

সব দেশেই সাধারণ লোক রাজনৈতিক আন্দোলনকে সমর্থন করিবার জন্য সভাসমিতি করিয়া এই সমস্ত মুক্তিসাধকের নিকট তাহাদের ভক্তি শ্রদ্ধার অর্ঘ্য ঢালিয়া দেয়,—কিন্তু রুসিয়ার কর্ত্তৃপক্ষ সাধারণকে তাহাদের স্বাধীন মতটুকু অকাতরে ব্যক্ত করিবারও ক্ষমতা পর্য্যন্ত দেয় নাই। তাই যেখানে সাধারণ সভায় কেহ রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে একটি কথা বলিয়াছে, সেইখানেই তাহাকে স্বেচ্ছাচারীর অত্যাচারের খড়্গের কাছে মাথা পাতিয়া দিতে হইয়াছে। এই জন্য গত সত্তর বৎসর যাবৎ রুসিয়ার স্বেচ্ছাচারিতার যূপকাষ্ঠে কত লোক যে প্রাণ বলি দিয়াছে, তাহা কেহ নির্ণয় করিতে পারে না।

বিপ্লবপন্থীরা প্রথমে রুসিয়ার প্রত্যেক সহরে তাহাদের কেন্দ্রস্থাপন করিয়াছিল—সেখানে রাজনৈতিক, দার্শনিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক, ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, সকল প্রকার গবেষণাই তাহাদের সমস্যা-সমাধানের জন্য নিযুক্ত হইত। অবশেষে স্থির হইল যে, সহজ সরল পল্লীজীবনের অনাবিল ভাবধারা হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিলে, স্বাধীনতার সংগ্রামে তাহাদের জয় লাভ করা চলিবে না। তাই, তাহারা গ্রামে গ্রামে তরুণ যুবকদিগকে পাঠাইতে লাগিল,—তাহারা কেহ বা শিক্ষক, কেহ বা চিকিৎসক, আবার কেহ বা কামার-কুমোর, কাঠুরিয়া কৃষক-রূপে কৃষকশ্রেণীর সহিত মিলিয়া মিশিয়া তাহাদের মধ্যে বিপ্লববাদ প্রচার করিয়া পরাধীনতা-প্রপীড়িত জীবনের ব্যর্থতাটুকু বুঝাইয়া দিতে লাগিল। বহুসংখ্যক ছাত্রীও এই প্রচারকার্য্যে সাহায্য করিয়াছিল, তাহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শিক্ষয়িত্রী বা ধাত্রীরূপে সজল শ্যামল পল্লী-মায়ের বিজন কোলে সকলকে স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করিতে লাগিল।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই ভাবে তাহাদের প্রচার-কার্য্য বেশ গোপনেই চলিয়াছিল। তার পর হঠাৎ ধরপাকড় আরম্ভ হইল—সম্রাটের মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইল—নারী-পুরুষ সকলের অদৃষ্টে আবার সাইবেরিয়া শ্লুসেলবার্গ, কারাদণ্ড ফাঁসির ব্যবস্থা হইয়াছিল। সাইবেরিয়া, শ্লুসেলবার্গও বড় সহজ শাস্তি নহে—সেই রক্ষী-ঘেরা রাক্ষস-দেউলে যে একবার নির্ব্বাসনে যায়, সে আর রাজতন্ত্রের স্বেচ্ছাচারিতাকে সন্তুষ্ট করিয়া কখনও ফিরিয়া আসিতে পারে না। তবে, এবার আর বিপ্লববাদীরা পূর্ব্বের মত এই সমস্ত নৃশংস, নির্ম্মম নরহত্যা নীরবে সহ্য করে নাই।

প্রচার কার্য্যের ভিতর দিয়া তাহারা এত দিন নির্ব্বিরোধে শান্তভাবে যে বিপ্লববাদ চালাইয়াছিল, এইবার তাহা অশান্ত হত্যালীলায় পর্য্যবসিত হইল। সরকারপক্ষও যত দমননীতি অবলম্বন করিতে লাগিল, তাহাদের বিদ্রোহের আগুনও তত জ্বলিয়া আকাশস্পর্শী হইয়া উঠিল—আর বিপ্লববাদীরা উদ্দাম-উল্লাসে সেই বহ্ন্যুৎসবে ঝাঁপাইয়া পড়িল। মধ্যবিত্ত ও নিম্নশ্রেণীর সকলেই দেখিতে পাইল যে, দেশের বুকের উপর দিয়া অনাচারের কতখানি বিভীষিকা রুদ্রতাণ্ডবে নাচিয়া

প্রলয়-চরণে নাচিয়া বেড়াইতেছে। তাই, পিতাপুত্র-কন্যা সবাই এক সঙ্গে দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত হইয়া এই মুক্তির সংগ্রামে মরণ বরণ করিয়া লইল। প্রাণের বিনিময়ে জাতির জন্মগত অধিকার লাভ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিল।

রুসিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও স্বেচ্ছাচার সরকারপক্ষের এরূপ প্রকৃতির লোকের দ্বারা পরিচালিত হইত, যাহারা ছদ্মবেশী গুপ্ত পুলিস অপেক্ষা কোন অংশে কপটতায় হীন নহে, কিন্তু শাস্তি ও যথেচ্ছাচারিতার উগ্যত খড়্গ দেখিয়াও ছাত্ররা কখনও তাহাদের জাতীয় কর্ত্তব্যের পথ হইতে বিচলিত হয় নাই। সেই জন্য বিংশ শতাব্দীর প্রথমে ফাদার গাপোঁকে (Father Gapon) সঙ্গে লইয়া প্রায় সাড়ে তিন হাজার কুলী যখন স্বেচ্ছাচারী সম্রাটের নিকট তাহাদের প্রত্যেকের স্বকীয় জীবনের দৈন্য কাহিনী নিবেদন করিতে গিয়াছিল এবং প্রতিকারের পরিবর্ত্তে যখন অগ্নিময় গোলার আঘাতে সেণ্টপিটার্সবর্গের রাস্তার উপরেই তাহাদের দারিদ্র্য-প্রপীড়িত, ব্যথাক্লান্ত, বেদনা-জর্জ্জরিত জীবনের লজ্জাকর ও শোচনীয় পরিসমাপ্তি হইয়াছিল, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ লক্ষ ছাত্র স্বেচ্ছাতন্ত্রের রক্ত নয়ন, শাসন বচন অগ্রাহ্য করিয়া ইতিহাসোল্লিখিত সেণ্টপিটার্সবর্গের সেই "Red sunday Massacre"এর প্রত্যেকটি হত্যার প্রতিবাদস্বরূপ এক সঙ্গে ধর্ম্মঘটে যোগদান করিয়াছিল—শাস্তির বিভীষিকাকে তুচ্ছ করিয়া বিপ্লবের মুক্তিসাধক হইবার জন্য নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছিল।

আবার সমস্ত রুসিয়ায় মরণের ডমরু ডিমি ডিমি নাদে বাজিয়া উঠিল—শিবঠাকুরের সর্ব্বনাশা শক্তি সৃষ্টির বুকের উপর সাগ্রহ উল্লাসে তাথৈ ত থৈ নৃত্যে উন্মত্ত হইল।

রুস সরকার চারদিক্ হইতে এইরূপে বিব্রত হইয়া পড়ায় শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল; তাহার উপর জয়োল্লাসোন্মত্ত জাপান-বাহিনী জয়ের নিশান উড়াইয়া রুসিয়ার বুকের উপর হানা দিয়াছিল।—কাযেই রুসিয়াকে বাধ্য হইয়া জাপানের সঙ্গে সন্ধি করিতে হইল—রুসিয়ার সাধারণ সম্প্রদায়কেও কতকগুলি অধিকার ছাড়িয়া দিতে হইল। সবাই মনে করিল, আকাশভরা, জমাট-বাঁধা কাজল কালো মেঘ বুঝি কাটিয়া গেল।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে সম্রাট্ দ্বিতীয় নিকোলাস যে দেশবাসীকে অধিকার দানের প্রতিশ্রুতি দিয়া সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, তাহার উদ্দেশ্য ঐ সমস্ত মুক্তিকামী মরণ-সাধকের দলকে স্বাধীনতা দেওয়া নহে—তাহাদের নিকট হইতে স্বীকারোক্তি লইয়া পাষাণ প্রাচীর দেওয়া কঠিন কারায় পুরিয়া সবাইকে দুনিয়ার বুক হইতে মরণের দুয়ারে পাঠাইয়া নিজের স্বেচ্ছাচারিতার গতিপথকে মুক্ত করিয়া দেওয়া। তাই বিপ্লববাদীরা এই প্রতিশ্রুতিতে প্রতারিত হইয়া যখন গোপনতার অন্তরাল হইতে বাহিরে আসিয়া আবার সহজ সরল জীবন-অতিবাহিত করিতে আরম্ভ করিল, তখন আবার তাহাদের অধিকাংশকে কঠিন কারায় নিক্ষেপ করা হইল। তবু সকলেই সত্যের সম্মান রক্ষার জন্য "শহীদানে"র মত স্বাধীনতাকেই জাতির জীবনবেদ বলিয়া মানিয়া লইয়াছিল। তবে এবারের নির্য্যাতন তাহাদের বিপ্লববাদের মূলে একবারে কুঠারাঘাতই করিয়াছিল—আবার সংঘবদ্ধ হইতে তাহাদের বহুদিনই লাগিয়াছিল।

এই সমস্ত বিপ্লববাদী ছাত্র ছিল অজানা, অচেনা, অজ্ঞাত, অখ্যাত যুবক, যাহারা প্রতিষ্ঠার এক বিন্দু কামনা করে নাই—যাহারা উন্মত্তের মত স্বেচ্ছায় মরণের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িতে একটুও ভয় পায় নাই। এক কথায় বলিতে গেলে তাহারা ছিল সবাই আপন ভোলা ক্ষ্যাপারই দল—যাহারা পাষাণ কারার ভয়াল কোলে যাইতে ভয় পায় নাই, পরন্তু খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া কেবল মুক্তির ধ্যানে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল।

তাদের কাছে—

সে ছিল এক দিন

(যখন) "লক্ষ পরাণে শঙ্কা না জানে, না রাখে কাহারও ঋণ,
জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন।"

স্বাধীন দেশের পরাধীন প্রজা তাহারা—তাই পরাধীনতার পীড়ন মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিল। পিতৃদত্ত অন্নে প্রতিপালিত হইলেও তাহাদের মুক্ত মন কখনও কোনও বাধা নিষেধের গণ্ডীর মধ্যে থাকে নাই—লাভ-লোকসানের হিসাব-নিকাশ করে নাই। তাই আভিজাত্যের মোহপাশ ছিন্ন করিয়া নারী পুরুষ ধনী দরিদ্র, কোনওরূপ বাছ-বিচার না করিয়া এক সঙ্গে এক মনে এক প্রাণে "ছন্নছাড়া, গৃহহারা" জীবনের নির্ম্মল মাধুর্য্যটুকুই অনুভব করিয়াছিল—পরাধীনতাভরা দৈন্যঘেরা প্রাণের ব্যর্থতাটুকুই দেখিতে পাইয়াছিল। সেই জন্য সেণ্টপিটার্শবর্গ মস্কো ও কিয়েসের রাস্তায় রাস্তায় তাহারা এই মুক্তির মন্ত্র প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছিল—রুস জাপানের যুদ্ধের সময় জাপানের জয় কামনা করিয়া সবাই মিলিয়া জাপানকেই অভিনন্দন দিয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যাহারা সভা সমিতি করিত তাহাদের উপরও যে অত্যাচার করা হইত, উহাও বড় কম নির্ম্মম নহে। স্বাধীনতার জন্য যে সব ছাত্র সভাসমিতি করিয়া প্রকাশ্য বিচারে দোষী প্রতিপন্ন হয়, অন্যান্য দেশে তাহাদের "রাজনৈতিক বন্দী" এই বিশিষ্ট আখ্যা দিয়া নিম্ন শ্রেণীর কয়েদীদের নিকট হইতে স্বতন্ত্র রাখা হয়। কিন্তু রুসিয়ায় সভাসমিতি সম্বন্ধীয় আইন-কানুন মানুষের হাতে গড়া হইলেও, তাহাদের প্রয়োগ করিবার ক্ষমতা যাহাদের উপর অর্পিত ছিল, তাহাদের নির্ম্মম নৃশংসতা, নিদারুণ পাশবিকতাকে পর্য্যন্ত অতিক্রম করিয়াছিল। তাই যেখানেই এই সব রাজনৈতিক সভা হইয়াছে, সেইখানেই হঠাৎ সদলবলে সশস্ত্র প্রহরী ঢুকিয়া নিরস্ত্র জনতার উপর গুলী চালাইয়াছে—বেয়নেটের খোঁচায় বিদ্ধ করিয়া মারিয়াছে—দোষী নির্দ্দোষ সকলেরই উপরেই ঐ সব কাপুরুষ কসাক প্রহরীর অনাচার আচরিত হইয়াছে। তাহাতে কেহ বা জন্মের মত অন্ধ হইয়াছে—খঞ্জ হইয়াছে—কেহ বা শেষ শয্যা লইয়াছে—আবার অনেকে অজ্ঞান হইয়াও ধরাশায়ী হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, নিজেদের ভাই বোনের উপর এই রকম হৃদয়হীনভাবে অমানুষিক অত্যাচার করিতে সেই সব সৈন্যদের প্রাণে পাছে ব্যথা লাগে, তাই কোথাও পাঠাইবার পূর্ব্বে বিনা পয়সায় সরাব বিলাইয়া রুসিয়ার স্বেচ্ছাচারী সরকার পক্ষ তাহাদের প্রাণগুলিকে পাষাণে পরিণত করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে।

রুসিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ছিল বিপ্লবায়োজনের পীঠস্থান—আর অধিকাংশ জনসাধারণ ছিল তাহারই প্রচারক ও পোষক;—যাহারা সব সময়েই সাইবেরিয়া ও ফাঁসির প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিত—অন্তরের মর্ম্মস্থলে মরণের "তা তা থেই" গানই শুনিত। তাই বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম ১০।১২ বৎসরের মধ্যে প্রায় ৮০ হাজার বিপ্লববাদী হাসিমুখে, দীপ্ত বুকে সাইবেরিয়া ও অন্যান্য স্থানে চির জন্মের মত নির্ব্বাসনে যাইতে বিন্দুমাত্র কাতর হয় নাই—নির্য্যাতনের রুদ্র আহ্বানের কাছে আত্মসমর্পণ করিতে একটুও দ্বিধাবোধ করে নাই।

এতক্ষণ কেবল ছাত্রদের কথাই বলিয়াছি—সুতরাং ছাত্রীরাও ঠিক এতখানি সাহস সহকারে কায করিত কি না, এ সম্বন্ধেও অনেকের সন্দেহ হইতে পারে। সেই জন্য স্থানাভাবপ্রযুক্ত এইবার একটা দৃষ্টান্ত দিয়াই এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

মেজর জেনারল মিন্ (Major General Min)এর উত্তেজনায় এবং পরামর্শে এক সময় মস্কোর রাস্তা মজুর ও ছাত্রদের রক্তে খুন্-খারাবীর মত রাঙা হইয়া উঠিয়াছিল—তাই ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে Miss Zina Konoplianikova নামে এক যুবতী তাহাকে

বন্দুকের গুলীর আঘাতে খুন করে। দুই সপ্তাহ পরে সে ধরা পড়ে। তাহার পর কোর্ট মার্শেলের বিচারের সময় কথা বলিবার জন্ম তাহাকে উঠিয়া দাঁড়াইতে আদেশ করিলে সে দৃপ্ত কণ্ঠে বলে যে, বিচারালয়ের প্রহসন সে মানে না। তাহার পর নির্ভীকভাবে এমন জবানবন্দী দিল যে, সমগ্র রুসিয়ার চিত্ত তাহাতে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। সে জবানবন্দীর সংক্ষিপ্ত ও সার মর্ম্ম এই,—

"আমি এক জন বিপ্লববাদী, আমিই মিন্‌কে মেরেছি। কারণ হচ্ছে,—তোমরা বোধ হয় মস্কোতে সেই ডিসেম্বরের দিনগুলোর কথা ভুলে যাও নি, যখন মিন্ হাজারে হাজারে নরহত্যা কোরে সেই নররক্ত মেখেছিল, যেন শত্রুর দেশেতে সে অভিযান করতে গেছে। আমি এইবার তোমাদের জিজ্ঞাসা করি, মস্কোর নিরীহ জনসাধারণকে কেন হত্যা করা হয়েছিল? কারণ, তারা ছিল অজ্ঞ, দরিদ্র;—কারণ, তারা দ্বিতীয় নিকোলাসের প্রতারণায় ভুলছিল। এই ত কারণ! আর এই যদি কারণ হয় ত আমিও ভেবেছি—কারণ, মস্কোর রাস্তাতে মিন্ নির্দ্দোষদের রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়েছিল। আমাকে বন্দী করার পর জিজ্ঞাসা করা হয় কি অধিকার আমার আছে যাতে মিন্‌কে আমি হত্যা ক'র্‌। আমিও সেই রকম আজ সমগ্র রুসিয়ার জনসাধারণের প্রতিনিধি স্বরূপ তোমাদের জিজ্ঞাসা করছি, কি অধিকার তোমাদের আছে যে, যুগ যুগ ধ'রে তোমরা আমাদের সবাইকে নির্য্যাতিত, লাঞ্ছিত, দলিত, মথিত, পিষ্ট করবে—আমাদের কারাগারে রাখবে, নির্ব্বাসনে পাঠাবে, পশুর মত নৃশংসভাবে হত্যা করবে—চিরকাল দাসত্বের বন্ধনে বেঁধে রেখে দেবে? কে তোমাদের এ অধিকার দিয়েছে? আমি বেশ জানি, কেউ দেয় নি—তোমরা নিজে নিজে তৈরী কোরে নিয়েছ, আর যত সব চাটুকার ফেরুপালের দল তা সমর্থন করেছে। এই ত? সে অধিকার আজকাল আর চল্‌বে না। আজ বিশ্বের বুকের ওপর এক নতুন অধিকার এসেছে—এ অধিকার দেশের দীনদরিদ্র গণ-নারায়ণের অধিকার—এ অধিকার তোমাদের ঐ অমানুষিক অধিকারের চেয়ে অনেক বড়—অনেক উঁচে। আমি জানি, তোমরা আমাকে ফাঁসি দিতে পারো। কিন্তু আমি যখনই বেরিয়েছি, তখনই মৃত্যু পথের যাত্রী হয়েই বেরিয়েছি। তবে আমি যেখানেই মরি—সে ফাঁসি কাঠেই হ'ক, কি সাইবেরিয়ার যন্ত্রণা কক্ষেই হ'ক—শুধু আমি এই চিন্তা করতে করতেই মরব যে, আমার একটা জীবন—তার বেশী নেই, তাই দেশের জন্যে একটা ছাড়া আর দু'টো জীবন দিতে পারলাম না;—কিন্তু সকলের এই রকম জীবনদানের ফলে এমন এক দিন আস্‌বে, যখন রুসিয়ার রক্তমাখা স্বেচ্ছাচারের সিংহাসন ধুলোয় লুটুতে থাকবে—আর স্বাধীনতার নবসূর্য্য তার দীপ্ত কিরণে সবাইকে স্নান করিয়ে দেবে—ধরণীর শ্যামবক্ষ আলোকিত কোরে তুল্‌বে।"

বিচারে এই স্বদেশ-বৎসলা রমণীকে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হইয়াছিল—এবং ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ১২ই নবেম্বর তাহাকে গুলী করিয়া মারা হইয়াছিল।

শ্রীগুরুদাস রায়।

জানি না সে কবে স্নেহচুম্বনে, তপ্ত পাণিটি মাথায় রেখে,
হিম-ঘোর হ'তে জাগালে আদরে বসুধারে নীর-শয্যা থেকে।
জানি না সে কবে শ্যাম রোমাঞ্চে হলো চঞ্চলা নবীন প্রাণে,
ভয়ে-ভরসায় 'ললিত আশায়' চাহিল প্রথম তোমার পানে।
আজিও তাহারে রেখেছ বাঁচায়ে অবিরত স্নেহ করুণা ঢালি,
সোহাগী দুলালী করেছ তাহারে দশশত করে আদরে পালি'।
ছয়-ছয় ঋতু সহচরী দিলে নব নবরূপে ভূষিতে তারে,
তৃণ-পল্লবে, ফুল-সৌরভে, ফলগৌরবে, জলদভারে।
নিশি দিন তোমা ঘেরি ঘেরি নাচে দিয়া কিবা কর-লহরে তালি,
শুনায় সকাল-সন্ধ্যা কাকলী, সাজায় তোমার পূজার ডালি।
গ্রহতারকার গৃহ-বন্ধন আমাদের এই বসুধা-বালা,
খোঁপায় সূর্য্যমুখী হার পরে কণ্ঠে সূর্য্যকান্ত মালা।

ধরণী ত শুধু সর্ষপ-কণা, তুমি যে বিশ্বে সৃজন ধাতা,
যক্ষরক্ষ দেবদানবের,—সকলেরি তুমি জীবনদাতা।
তেজোব্রহ্ম হে শিবরুদ্র ভাগ্যবিধাতা ত্রিলোকপাল,
তোমারি নির্দ্দেশে চিরনিয়মিত সেই আদি হ'তে এ মহাকাল।
ব্যোম শুধু তব প্রভা-পরিবেশ, যমে নিযমিত প্রভাবধারা,
তব সহস্র কিরণ, ইন্দ্রে দেহে সহস্র-নয়ন তারা।
অশ্বী দুজন নিশ্বাস তব নাসিকার দুটি রন্ধ্র-পথে,
বসাইলে দিলে সৃষ্টি-পটুতা অনূরু অরুণ তোমার রথে।

নির্ম্মিতি তব ভ্রূকুটীর ছায়া উষা তব প্রেমস্নিগ্ধ হাসি,
বহ্নি, সমিধ ইন্ধনাহিত তোমার তৃষিত ময়ুখরাশি।
ইন্দিরা তব হেমময়ী ভাতি। বাঙ্ময়ী ভাতি, সরস্বতী,
তব মরীচির সপ্তবর্ণে যাঁহার সপ্তস্বরোৎপত্তি।
তুমিই ধরেছ অর্য্যমা, পূষা, মিত্র, সবিতা, ভর্গ-তনু,
তুমি রেবন্ত-শনির শাসক, আদি দৈবত, মনুরো মনু।
সোমেরে করেছ প্রেমভাণ্ডারী পীযূষে করেছ প্রহ্লাদন,
যা পেয়ে জুড়ায় ভুবন-জীবন যা পিয়ে অ-মৃত দেবতাগণ।
তোমারি শাতিত তেজে সঞ্জাত বিষ্ণু-চক্র, শিবের শূল,
গুহের শক্তি, যমের দণ্ড দেবারিদলন আয়ুধকুল।
শাতিত ময়ুখে মনোমদরূপে তুমি অনঙ্গ মূর্ত্তিমান,
ব্রহ্মসী তব অর্চ্চির আলা, অগ্নিদেবের তুমিই প্রাণ।

তোমারি প্রসাদে ধন্বন্তরি দিব্য ভেষজ লভেন নিতি,
কল্পতরুতে তব বরাভয় পারিজাতে ফুটে তোমার প্রীতি।
তোমা হ'তে জাত পুষ্টি, তুষ্টি শুদ্ধি, নিখিল বর্ণ রূপ,
তোমারি অঙ্গ-পরিমল লভি বনদেবী জ্বালে গন্ধধূপ।
হিরণ-রজতে সুরভি করেছ, মাটী হ'তে ফুটে বিবিধ নামে,
চম্পা-অতসী-এলা-লবঙ্গ-বেলা-মল্লিকা-শিরীষদামে।
রূপ হ'তে রসে লভি পরিণতি সৌরভে জাগে তোমার বিভা,
গন্ধ হইতে ছন্দের পথে পুন রূপে ফিরে আসিছে কিবা।

...সা হ'তে তাপ, তাপ হ'তে গতি গতিরে ফুটায়ে তড়িদ্বেগে,
... শক্তিরে করিছ চালনা, মেঘ হ'তে জলে—আবার মেঘে।
...শক্তির দশ মহারূপ তোমারি চক্রে আবর্ত্তিত,
... সে তৃষায় স্বশোণিত শোষে কভু বরাভয়ে জাগায় মৃত।
... হ'তে ফল—ফল হ'তে বীজ, বীজ পুন শত শাখায় জাগে,
...ল হ'তে তৃণ—ধেনু—হবিঃ, হবি পুন যাগে বৃষ্টি মাগে।

...ন্দে বৎস কল্পনা করি' দোহন করেছ ধরিত্রীরে,
...দের যজ্ঞ-দর্ব্বী ভরেছ, মিত্র, উর্জ্জোবলের ক্ষীরে।
...য়ার ছদ্মে সংজ্ঞা সেবিছে সহিতে না পারি মরীচি-মালা,
...রসালে তোমার মাধুরী, দাবানলে জ্বলে রোষের জ্বালা।
বরুণেরে চর রেখেছ তরুণ, মরুৎ তোমারি আজ্ঞাবহ,
এক দীপ হ'তে কোটি দীপসম পেয়েছে জীবন তারকাগ্রহ।
বিশ্বচক্রে নেমির মতন কেন্দ্রে বিরাজ', বিবস্বান্,
অরার মতন শক্তিপুঞ্জ করেছে তাদেরে ঘূর্ণামান।
তোমারি সৃষ্টি,—নক্ষত্র মাস-বৎসর, দণ্ড-পল,
মন্বন্তরে কল্পে কল্পে তুমি শাশ্বত সমুজ্জ্বল।
তোমারি অর্চ্চি যজ্ঞীয় ধূমে করি সিন্ধুর গর্ভাধান,
বর্ষে বর্ষে দ্রোণাবর্ত্তক পুষ্করে করে জন্মদান।

...যাগের তুমি হোমাগ্নি, ঋত্বিক তব বিরাট ব্যোম,
সপ্তর্ষিরা হোতা সে যজ্ঞে সোমরস-সুধা যোগায় সোম।
গ্রহতারকারা গাহে সামগান উদ্গাতা তারা সমস্বরে,
ব্রহ্মা স্বয়ং 'ব্রহ্মা' ও যাগে, মহাকাল ঘৃত চমস ভরে'।
প্রেতলোক লভে ওদন কব্য, দেবতা হব্য,—সোমাঞ্জলি,
মহাযোগী লভে ভস্মভূষণ, ভূতগণ লভে বিকির বলি।
চরুপুরোডাশ লভিছে মানব ওষধি তরুর প্রসবরূপে।
...ন্তের বলি-রুধির ঝরিয়া গড়ায় প্রাচীর-ললাট-যূপে।

সম্রাট, রাশি চক্রবর্ত্তী সার্ব্বভৌম করুণাময়,
অয়নে অয়নে অভিযান তব বিশ্ব ব্যাপিয়া দিগ্বিজয়।
প্রতি সংক্রমে সাজাও ভুবনে নব সুষমায় নবীন ক্ষেমে।
শাসনে জিনেছ বিপ্লব-ক্রান্তি, আমেরু জিনেছ কেবল প্রেমে।
ছয়টি ঋতুর ছয় নেমি'পরে হেমরথ তব নিদেশে ছুটে।
তোমার সপ্ত রজস্তুরগে সপ্তসিন্ধু কাঁপিয়া উঠে।
তব পরিবেষ-মণ্ডল-সীমা লঙ্ঘিতে পায় অরাতি ভয়!
রাহু-বিজয়ের জয়কেতু উড়ে ধূমকেতু হয়ে গগনময়।
তব রাজ-যশোমুকুটের প্রভা ইন্দ্র-ধনুতে মেঘের গায়।
সুমেরু শিখরে অরোরার রূপে মরীচিকা রূপে মরুতে ভায়।

ভাগ্যবিধাতা নিখিল প্রজার নিয়মিত করো নিয়তি-ধারা।
স্বচ্ছ তোমার নখ-দর্পণে প্রাক্-বিম্বিত রয়েছে তারা।
তুমি আদর্শ-সম্রাট, রবি, আদান তোমার দানেরি তরে।
একগুণ ল'য়ে দশ শতগুণ ফিরাইয়া দাও প্রজার ঘরে।
তোমার রাজ্যে নিয়মভঙ্গ হয় না কখনো একটি চুল।
তব অনুচর কিঙ্কর চর একটি কণাও করে না ভুল।
... তারাগণ কক্ষ হইতে এক চুলো কভু ভুলে না টলে।
... অনুপল কলা-কাষ্ঠাও ধ্রুব নির্দ্দেশ মানিয়া চলে।

...শিশিরে কান্ত, গ্রীষ্মে ভীষ্ম, রাম-বাম ভীমকান্ত রবি,
...বা সন্ধ্যায় প্রেমিকের রূপে হেরিয়াছে তোমা প্রেমিক কবি।
তব চুম্বনে সরোরমা নিতি হেসে হেসে মেলে কমল-আঁখি।
ফিরাইয়া দাও ভুজে ভুজী চক্রবাকেরে চক্রবাকী।

তোমার সোহাগে বনবালা জাগে পরশে কেশের সুরভি ছুটে।
খেলে শ্যামাঙ্গে সুখ-তরঙ্গ, হাসি-কলরব অধরে ফুটে।
বিদায়-বেলায় চলে-যাও যবে চিবুক পরশি "কনক-করে।"
আর্দ্র রোদনে ব্যাকুল তাহার আঁখি-পল্লবে অশ্রু ঝরে।
গিরি-তটিনীর কণ্ঠে দুলাও তরল সূর্য্যকান্ত মালা।
পূরাও চাঁপার মনের কামনা জুড়াও সূর্য্যমুখীর জ্বালা।
হেম-রথ পরে অজের অঙ্কে রূপসী ইন্দুমতীর মত।
দিবা-বধূ তব ত্রিদিবচ্যুত সুর পারিজাত মালায় হত।
সাশ্রু অরুণ নয়নে, অরুণ, সিন্দুরে তার ভরিয়া সীঁথি।
চন্দনকাঠে চিতা জ্বালি তার শোক-সিন্ধুতে ডুবিছ নিতি।

দেশে দেশে তুমি আদি উপাস্য ধাতার আদিম প্রকাশ তুমি।
ধরায় প্রথম ধর্ম্ম জাগিল তোমারি করুণা-কিরণ চুমি।
ব্রহ্ম-বিভূতি,—বিশ্ব নিখিলে ব্যাপ্ত প্রকট অমূর্ত্ত,—
মূঢ় মানবের প্রত্যয় তরে তোমাতে হলো তা' কেন্দ্রীভূত।
ঊর্দ্ধে টানিয়া মানব-দৃষ্টি ঘুরাযেছ তায় অসীম লোকে
অমৃতস্নাত সেই দৃষ্টিরে ফিরায়ে পাঠালে মনের চোখে।
প্রতিদিনকার মৃত্যু হইতে নিত্যই তুমি বাঁচাও নরে,
তুমি আছ নবজীবনে জাগাতে সে মরণে তাই কেহ না ডরে।
শ্রুতিরে দিয়াছ প্রীতিকুণ্ডল স্মৃতিরে অজর কবচখানি
তব বরে তারা অমর অজেয়, তব জয়গানে ঐকতানী।
'সূর্য্য-হৃদয়' -সঙ্গীত উঠে গঙ্গা-যমুনা-তমসা তীরে
বরাভয় করে বহ্নি হৃদয় গলি' তাই হিমগিরির শিরে।

স্মরি সেই দিন আর্য্যেরা, তব যেদিন নিদেশ লভিয়া শিরে
ভারতে হইল প্রথম অতিথি 'ইরাবতী কুভা বিপাশা' তীরে।
সূর্য্য, তোমার তূর্য্য নিনাদ দূর হ'তে শুনি প্রাতঃস্নাত
সিন্ধুর তীরে প্রাঞ্জলি তারা দাঁড়াত ওরূপ হেরিতে, তাত।
তামস হ্রদের তামরস সম প্রাচী-দিগন্তে জাগিতে নভে,
আর্য্য ঋষিরা মধুকর সম সামগুঞ্জনে বন্দিত যবে।
মিত্র, তোমার মৈত্রী তাদের পাথেয় যে ছিল যাত্রাপথে,
জীবনশুদ্ধি করিত নিত্য তোমারে হেরিয়া কনক-রথে।
তুমি সাবিত্রী-মন্ত্রে তাদেরে দিলে যে দীক্ষা, তোমারি ধ্যানে
জপি সে মন্ত্র সন্ধ্যা প্রভাতে লভিল তাহারা চরম জ্ঞানে।
তোমারি মাঝারে অর্চ্চি' নিত্য বর্চ্চস্বল তেজঃসারে
ত'রে যেত তারা ত্রিতাপ জন্ম জরা মরণের সিন্ধু পারে।
ধ্যানের নেত্রে জাগিতে তাদের ধরি মনোরম মূর্ত্তিখানি,
"রক্তাম্বুজময় বরভুজ বন্ধুকরুচি চক্রপাণি।
হারকুণ্ডল কেয়ূরাঙ্গদমণিমণ্ডিত কিরীটহারী,
শোভিত অক্ষমালায় বক্ষ ত্রিনয়ন, রথে গগনচারী।"
নব নব মহাবিস্ময় নিয়ে জাগিতে তপন উদয়াচলে,
কোন্ সে দৈব অতিলৌকিক কুহক বিথারি মেদিনীতলে।
ইহ জগতের প্রবাসিগণের নিতি অপূর্ব্ব চেতনা দানে
কত উল্লাস কত উৎসব জাগাইলে তুমি অবাক্ প্রাণে।
শিশুসারল্যে মুগ্ধ হে তাত, স্নিগ্ধ করিলে মরীচিধারা
পরমাত্মীয় হলে তাহাদের মিত্র বলিয়া ডাকিল তারা।
সত্যস্বরূপ আত্মার ভূপ! চলিত তোমার শাসন মেনে
সকল বাক্য কর্ম্মে তোমায় চির অতন্দ্র প্রহরী জেনে।
চন্দনলেখা দিত তব ভালে দিত তোমা বলি—"গুড়োদন",
রুদ্রি উদ্দেশে রিষ্টিবারণ,—স্বস্তিবচনে স্বস্ত্যয়ন।

তারা কাশ্মীর কাশী কোণার্কে তখনো গড়ে নি দেউল তব,
তখনো পূজেনি অমুকল্পিত তোমার প্রতীক নিত্য নব।
তখনো তারা যে পূজিতে পারিত তোমারি নয়নে নয়ন রাখি।
হে 'অসেচনক,' তোমা হ'তে তারা তখনো ফিরাতে নারিত আঁখি।
চারি পাশে জ্বালি অনলকুণ্ড নিদাঘে বসিয়া মরুস্থানে,
পঞ্চতপারা করিত যে তপ অনিমিখে চাহি তোমার পানে।
অর্কসমিধে জ্বালি' হোমাগ্নি স পিত তাহারা আহুতিভার,
পুরশ্চরণে জপিত ও-নাম একাসনে তিন লক্ষ বার।

ওগো বিভাবসু, শুধু কি 'আমারে' বাঁচায়ে রেখেছ করুণা দানে?
তরু-লতারাও সে কৃপা হইতে বঞ্চিত নয় দেহে ও প্রাণে।
এ জড়পিণ্ডে করেছ চেতন চিদ্বুদ্ধির গরিমা দিয়া,
রক্তমাংস উদ্ভেদি' মম তুলেছ নেত্রে উদ্বোধিয়া।
বিশ্ব-বোধন দ্বার বাতায়ন খুলিয়া দিয়াছ অন্ধ গৃহে,
প্রকৃতি আমার চিত্তে পশেছে এ দৃক্‌গোচর পন্থা দিয়ে।
আত্মার আমি হয়েছি অমর মোক্ষপথের যাত্রী, রবি,
অন্তরে নবকল্প-বিশ্ব রচেছি তোমার করুণা লভি।
রূপেরি কৃপায় জেনেছি অরূপে গাহি তাই, রূপনিদান, জয়!
এ ইহ-জনম সার্থক মম, বাকীপথ মোর আলোকময়।
বৈবস্বত-কৃপায় আমি এ মানবজনমে আয়ুষ্মান,
মানস-জীবনে পুনর্জন্ম তুমিই দিয়াছ বিবস্বান্।

এত কৃপা যদি করেছ তপন মম মনোলোকে উদিত হও,
স্ফুটকদম্ব-গোলকের মত জ্যোতির কেশরে উজল রও।
শুধু নও তুমি এ মায়ালোকের, চিন্ময় লোকে তুমিই রবি,
তুমি না উদিলে অন্তরে মম বিশ্বরচনা বিফল সবি।
কৃশানু-অর্চ্চিঃ সন্ধ্যার' ভানু জাগো সুষুম্নে, মধুর হাসি,'
'সংজ্ঞা' আমার পারে যেন বুকে সহিতে তোমার ময়ূখ রাশি।
বোধির উষারে জাগাও, সবিতা, মম অজ্ঞান-অন্ধকারে,
সরোজবন্ধু, দলসহস্রে ফুটাও আমার সহস্রারে।
তমোজাড্যার—অসুরগণে পিশাচগণে তাড়াও দূরে,
রসের 'যমুনা' তপের 'তপতী' ছুটুক আমার হৃদয়-পুরে।
প্রদ্যোতনাথ তোমার দ্যুতিতে বস্তুবোধের খদ্যোতিকা
ম্লান হয়ে যাক মায়াপ্রপঞ্চ গোচর-পঞ্চ প্রদীপ-শিখা।

অন্তরে তুমি উদিলে বন্ধু কি রবে দৃষ্টি অন্তরালে?
সৃষ্টির গূঢ়তম রহস্য র ব না গুপ্ত দেশে বা কালে।
হইবে ত্রিলোক হস্তামলক ত্রিকাল হইতে পাণির রেখা,
মনদর্পণে সেই শাশ্বত সত্যধনের পাইব দেখা।
"অসৎ হইতে সতে নিয়ে যাও তমসা হইতে জ্যোতির্লোকে,"
"মৃত্যু হইতে অমৃতে আত্মা যাক্, শোক হতে চির অশোকে।"

"মোদের বুদ্ধি-প্রচোদক" যিনি; যাঁরে ভাবি মোরা নিত্য ধ্যানে,
"তোমারো অর্ঘ্যে যিনি বরেণ্য" সেই ভর্গেরে জাগাও জ্ঞানে।
"যথায় মিহির তুমিও জাগো না চন্দ্র তারকা জাগে না কেহ,"
"যে ধাম লভিয়া এ ধামে ফিরে না কেউ পুন আর ধরিয়া দেহ,"
"মনের সঙ্গে বাক্ নিশিদিন যেই ধাম হ'তে আসিছে ফিরে,"
সেই ধাম মোরে দেখাও বন্ধু অজ্ঞান তমঃসিন্ধু তীরে।

"তব বর্ণেরই মহান্ পুরুষ তমসার পারে নিত্যাসীন,"
"এই ভূতগণ যাঁহা হতে জাত লালিত জীবিত যাঁহাতে লীন,
যাঁহার চরিত্র বর্ণিতে চিৎ বুদ্ধি বচন সকলি হারে,
যিনি "গুহাহিত গহ্বরেষ্ঠ" "অণোরণীয়ান" জানাও তাঁরে।
"যাঁহারে দেখিলে অন্য কিছুই দেখিতে চাব না জীবন ভরি,"
সেই অদ্বয় অমৃত সত্যে দেখাও মিত্র করুণা করি।
সীমায় যাঁহার আভাস পেয়েছি তাঁরে যেন ভানু, ভূমায় লভি,
রূপেরে দেখালে, রূপব্রহ্ম, অরূপরতনে দেখাও, রবি।

শ্রীকালিদাস রায়।

* সূর্য্যের পত্নী, সংজ্ঞা ও ছায়া (সংজ্ঞারূপা ছদ্মবেশিনী)। শ্বশুর—ত্বষ্টা। কন্যা—যমুনা ও তপতী। পুত্র—অশ্বীদ্বয় (অশ্বিনীকুমারদ্বয়—ঘোটকীরূপা সংজ্ঞার নাসারন্ধ্র পথে সঞ্জাত)—রেবন্ত, শনি, যম ও বৈবস্বত মনু (বর্ত্তমান মনু)। অর্য্যমা, পুষা, মিত্র, ভর্গ, সূর্য্যেরই বৈদিক রূপান্তর। ত্বষ্টা (বিশ্বকর্ম্মা) সূর্য্যের তেজঃ শাতিত করিয়া দেবাস্ত্রগুলি নির্ম্মাণ করেন। নিঋতি—অশুভঙ্করী দেবতা, অলক্ষ্মী। গুহ—কার্ত্তিক। পরিবেষ—halo। উর্জ্জোবল—সঞ্জীবন শক্তি—জনন-শক্তি অরা—নেমির শাখা (spokes)। নক্তবাসর—রাত্রিদিন। দ্রোণ, আবর্ত্ত, পুষ্কর—মেঘপুরুষগণ। স্থণ্ডিল—যজ্ঞক্ষেত্র। উদ্গাতা—যজ্ঞে সামগ ঋত্বিক। ব্রহ্মা,—যজ্ঞে ঋত্বিকগণের অধিনায়ক। চমস—আহুতি-পাত্র—দর্ব্বী। ওদনকব্য—পিতৃগণের উদ্দেশে অন্নপিণ্ড। মহাযোগী—রুদ্র। বিকির, বলি—পশুপক্ষীর জন্য বিকীর্ণ অন্ন। পুরোডাশ—হোমের পিষ্টক। প্রসব—ফলফুল। ধ্বান্ত—অন্ধকার। সংক্রম—সংক্রান্তি—সূর্য্যের গতিভেদ। কলাকাষ্ঠা—কলা—৮ সেকেণ্ড, কাষ্ঠা—$\frac{১}{৩০}$ কলা। কুভা—কাবুল নদীর বৈদিক নাম। তামরস—পদ্ম। বর্চ্চস্বল—ব্রহ্মতেজসম্পন্ন। গুড়ৌদন—গুড়মিশ্র অন্ন—সূর্য্যের নৈবেদ্য। অর্কসমিধ—আকন্দ-কাঠ। অসেচনক—যাহাকে দেখিয়া তৃপ্তির সীমা পাওয়া যায় না,—নয়নরঞ্জন। সহস্রার—পরমাত্মার আসন পদ্ম। সুষুম্না—সূর্য্যের স্নিগ্ধ অংশু বিং। প্রদ্যোত—দিব্যজ্যোতি। বস্তুবোধ—empirical knowledge. হস্তামলক—সম্পূর্ণ অধিগত। অণোরণীয়ান্—অণু হইতেও সূক্ষ্ম। সূর্য্যাহৃদয়—সূর্য্যস্তব বিং। বন্ধুক—বাঁধুলীফুল।
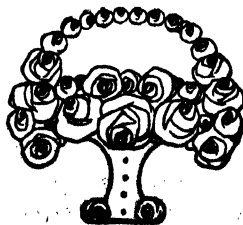
জগতের শান্তি

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ প্রতীচ্য-ভ্রমণ করিয়া সে দেশের সম্বন্ধে বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন। বিশ্বের মানবের মধ্যে সদ্ভাব ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা তাঁহার আন্তরিক কামনা। তাঁহার বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠাও সেই উদ্দেশ্য। এই বিদ্যা প্রতিষ্ঠান সকল জাতির শিক্ষার্থীর পক্ষে মুক্তদ্বার। প্রাচীনের নালন্দা ও তক্ষশীলার দৃষ্টান্ত ইহার আদর্শ। ভারতের প্রতীচ্যকে দিবার অনেক জিনিষ আছে এবং বাহিরের জগৎ হইতে ভারতের পাইবার অনেক কিছু আছে। রবীন্দ্রনাথ বাণীর সেবক, বাণীর কৃপার সাহায্যে বাহিরের সহিত ভারতের সখ্যবন্ধন দৃঢ় করিয়া জগতে শান্তি আনয়নের কামনা করেন। এবার প্রাচ্যের মালয় দ্বীপপুঞ্জে তাঁহার সেই উদ্দেশ্যে যাত্রা। ভারতের বাহিরে প্রাচীন যুগে ভারতের প্রভাব কিরূপ ছিল, এখনও সে প্রভাবের কতটুকু অবশিষ্ট আছে, তাহাও লক্ষ্য করা তাঁহার অন্য কামনাও বটে। কিন্তু মুখ্যতঃ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সহিত ভারতের মানসিক ভ্রাতৃত্ব-সম্বন্ধ স্থাপন করাই তাঁহার প্রধান কামনা বলিয়া মনে হয়; কেন না তিনি বিশ্বের শান্তিকামী।

জগতের বহু স্থানে,—মার্কিণে, জাপানে, চীনে, রাসিয়ায়, জার্ম্মাণীতে কিছু দিন হইতে তরুণগণের এক শান্তি আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এ সকল আন্দোলনে নানা দেশের নানা জাতির নানা ধর্ম্মের যুবক সম্প্রদায় যোগদান করিয়াছেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য, জগতের সকল দেশের মধ্যে শান্তির প্রতিষ্ঠা করা। আজ যে তরুণ, কাল সে সংসারী গৃহস্থ ও নাগরিক। কাযেই তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে এই আন্দোলন সফল হইলে ভবিষ্যতে তাঁহাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির সম্ভাবনা, অনেকে এইরূপ মনে করিয়া থাকেন।

লোকার্ণো ও জেনিভায় বড় বড় শক্তির শান্তিবৈঠক বসিয়াছিল। সে বৈঠকে বড়দের মধ্যে কত জল্পনা-কল্পনা, কত বিচার-আলোচনা হইয়াছে। সকলেরই উদ্দেশ্য, জগৎ হইতে চিরতরে রণদেবতাকে বিসর্জ্জন দেওয়া। এখনও জেনিভায় প্রধান তিন শক্তির মধ্যে নৌশক্তি হ্রাসবৃদ্ধির বাদানুবাদ চলিতেছে। তাই বোধ হয়, অনেকে মনে করেন এইবার যথার্থই এইরূপ নানা দিকের সমবেত চেষ্টায় জগৎ হইতে বিরোধের অন্তর্দ্ধান হইবে, তাহার স্থলে সর্ব্বত্র শান্তির সুবাতাস বহিতে থাকিবে।

একবার জার্ম্মাণ যুদ্ধের কথাটা আলোচনা করা যাউক। এই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, জগৎ হইতে সকল যুদ্ধের অবসান করিতে। এ জন্য জগৎকে কি ত্যাগ করিতে হইয়াছে, তাহার একটা ফর্দ্দ দিতেছি। অন্য দেশের কথা ছাড়িয়া দিয়া কেবল বৃটিশ সাম্রাজ্যের কথা ধরা যাউক। এই যুদ্ধ বৃটিশ সাম্রাজ্যকে ৮ লক্ষ ৭৪ হাজার ৫১ জনকে বলি দিতে হইয়াছে; ৬৪ হাজার ৯ শত ৭ জনের অদ্যাপি কোনও সন্ধানই পাওয়া যায় নাই; ২০ লক্ষ ৫৯ হাজার ১ শত ৩৪ জন বৃটিশ প্রজা আহত হইয়াছে; ৩৯ হাজার বিকলাঙ্গ হইয়াছে; ২ হাজার অন্ধ হইয়া গিয়াছে; ৬ হাজারেরও উপর লোক পাগল হইয়া গিয়াছে। কেবল ইহাই নহে, যুদ্ধের পর ৮।৯ বৎসর গত হইলেও এখনও ১৯ হাজার ৯ শত জন বৃটিশ প্রজা আহত অবস্থায় চিকিৎসিত হইতেছে; ১ শত ৫৪ হাজার নারী যুদ্ধে বিধবা হইয়া সেই অবস্থায় রহিয়াছে; ২ লক্ষ ৬৫ হাজার বালক-বালিকা অনাথ হইয়াছে; আর ৭ লক্ষ ৫০ হাজার লোক বেকার বসিয়া আছে, ইহাদের মধ্যে ৬০ হাজারের এমন অঙ্গহানি হইয়াছে যে, তাহাদের আর খাটিয়া খাইবার সামর্থ্য নাই। আর বৃটিশ সাম্রাজ্যের ঋণ ও ব্যবসায় বাণিজ্যের অবস্থা যেমন হইয়াছে, এমন তাহার ইতিহাসে আর কখনও হয় নাই।

একা বৃটিশ সাম্রাজ্যের এই অবস্থা। ইহা ছাড়া ফ্রান্স, রাসিয়া, ইটালী, মার্কিণ, জার্ম্মাণী অষ্ট্রীয়া, তুর্কী, আরব, মিশর, বলকান প্রভৃতি দেশ আছে। তাহাদের কি ত্যাগস্বীকার করিতে হইয়াছে, তাহা তাহাদের দেশের যুদ্ধের ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যাইবে। মোট কথা, জগৎ হইতে সকল যুদ্ধ তাড়াইবার উদ্দেশ্যে যে জার্ম্মাণ যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল, তাহার ত্যাগের পরিমাণ সামান্য নহে।

কিন্তু কি ফল হইয়াছে? এই 'ঘা খাইয়া' শক্তিপুঞ্জের কি কোনও চৈতন্য হইয়াছে? ইটালীর মসোলিনি এখনও কাইজারের মত জগৎকে বজ্রমুষ্টি দেখাইতেছেন। বৃটেন, মিশর ও ভারতকে 'চোখ রাঙ্গাইতেছেন', চীনে সাম্রাজ্যবাদীরা এখনও স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য সমর বাধাইবার প্রয়াস পাইতেছেন, বলশেভিক রাসিয়াকে কোণ ঠেসা করিয়া ভবিষ্যৎ বিশ্বযুদ্ধের আয়োজন করিতেছেন। জেনিভায় যে তিন শক্তির নৌ-ব্যবস্থার বৈঠক বসিয়াছিল, তাহাও স্বার্থের খাতিরে সুফলপ্রসূ হইল না। ফল কথা, প্যাক্ট কনভেনশন কাগজে-কলমে যতই করা হউক, অন্তরের ময়লা না কাটিলে ফল নাই। শক্তিদের মধ্যে কেহ কাহারও নিম্নের আসন লইতে চাহেন না। কেহ বলেন, তিনি এ যাবৎ জগতের জলপথে চৌকী পুলিসের কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন, সকলের বাণিজ্য পথ পরিষ্কার রাখিয়াছেন, এখন তাঁহার বহুদূর-বিস্তৃত ইতস্তত-বিচ্ছিন্ন সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে হইতেছে, এ অবস্থায় একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ চৌকীদারী সমর-পোতের সংখ্যা তিনি হ্রাস করিতে পারেন। পাল্টা জবাবে অন্য জন বলেন, তাহা হইলে রফা আর কি হইল? যখন চুক্তি করিয়া সকলে বলাবলের সামঞ্জস্য করিয়া লওয়া হইতেছে, তখন এক জনের চৌকীদারীর প্রয়োজন কি? এইরূপ কথা কাটাকাটিই চলিল, জার্ম্মাণ যুদ্ধে লাভ ক্ষতির কথা কাহারও মনে থাকিবে না। ক্ষতের মুখে প্রলেপ দিলে উপরটা হয় ত দুই চারিদিনে শুকাইতে পারে, কিন্তু ভিতরের পচন নিবারণ হয় কৈ?

প্রতীচ্যের চিন্তার ধারা

(১) রঙ্গালয়ের শালীনতা ও শ্লীলতা

এক সময়ে রঙ্গালয় প্রতীচ্যের খৃষ্টান ভজনালয়ের সখা ও হিতৈষী বন্ধুর মত কার্য্য করিয়াছিল। খৃষ্টান পাদরীরা তাঁহাদের ধর্ম্ম বক্তৃতার দ্বারা সমাজের উপর যে সৎপ্রভাব বিস্তার করিতেন, রঙ্গালয়ের উৎকৃষ্ট

চরিত্র চিত্রাভিনয় সেই প্রভাবকে শত গুণে বর্দ্ধিত করিত। বর্ত্তমানে রঙ্গালয় যেন খৃষ্টান প্রভাব হইতে বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে; পরন্তু নিজে কলুষিত হইয়া সমাজকে কলুষিত করিতেছে,—ইহা প্রতীচ্যের কোন কোন চিন্তাশীল সমাজ-সংস্কারকের ধারণা। তাঁহারা দুঃখ করেন,—কলাবিদ্যার নামে অবাধ-কাম-লীলার চিত্রাভিনয় হইতেছে এবং স্বাধীনতার ও স্বাধীন চিন্তার নামে যথেচ্ছাচারকে প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে; অভিনেতা অভিনেত্রীরা পঙ্কিল-পথে বিচরণ করিতেছে; কেহ তাহার প্রেমপাত্রকে গুলী করিয়া মারিতেছে, কেহ বিবাহিত পতির অথবা পত্নীর সহিত বিবাহ-সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ ঘটাইতেছে এবং এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া রঙ্গালয়ের অভিনয়েও ব্যভিচারের আদর্শ আনয়ন করিতেছে।

কিন্তু সকল পাদরীর বা সমাজ-সংস্কারকের অভিমত এইরূপ নহে। মার্কিণ দেশের রাজধানী নিউইয়র্ক সহরের পাদরী ডাক্তার বাণ্ডলফ রে বলেন, এ সকল কথা অতিরঞ্জিত। হয় ত একটি অভিনেত্রী তাহার নূতন প্রণয়পাত্রের জন্ম পুরাতন প্রণয়পাত্রকে গুলী করিয়া মারিয়াছে, অমনই তাহা হইতে রব উঠিয়াছে, রঙ্গালয়ের জীবনে অভিনেতা অভিনেত্রীর মধ্যে নিত্য এই ঘটনা ঘটিতেছে এবং সেই মন্দ আদর্শে অভিনয়ে যথেচ্ছাচারিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা আনীত হইতেছে। অভিনেতা ও অভিনেত্রী আমাদেরই মত সমাজের সাধারণ মানুষ, তাহারাও স্ত্রী-পুরুষে পুত্র-কন্যা লইয়া সুখে বাস করে, ধর্ম্মকর্ম্ম পালন করে, সংসারের সুখ দুঃখ ভোগ করে। বরং দেখা যায়, অভিনেতারা প্রায়ই ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া থাকে। তাহারা রাত্রিতে যখন সকলে বিশ্রাম গ্রহণ করে, তখন উদরান্নের জন্ম পরিশ্রম করে অথচ প্রভাতে গির্জ্জায় যাইতে ভুলে না। তাহার প্রলোভন বিস্তর, তাহার স্বাধীনতা অফুরন্ত, অথচ সাধারণ মানুষ অপেক্ষা সে যে অল্প সংযমী তাহা নহে। সুতরাং এই প্রলোভনের ও অবাধ স্বাধীনতার মধ্যে বাস করিয়াও সে যে সংগৃহস্থ, কর্ত্তব্যপরায়ণ পতি, প্রেমময় স্বামী অথবা ধর্ম্মপরায়ণ প্রতিবেশী হয়, ইহা তাহার পক্ষে নিশ্চিতই গৌরবের কথা। অভিনেত্রীদেরও সম্পর্কে ঠিক এই কথা বলা যাইতে পারে। ডাক্তার Ray তাই বলিতেছেন,—The overage, under most adversed circumstances, live happy, beautiful home lives, are contented wives, affectionate and loyal husbands, self sacrificing children.

ডাক্তার রের মতে রঙ্গালয়ের বিপক্ষে লোকের অবজ্ঞার ভাব ক্রমেই হ্রাস হইতেছে এবং বিশিষ্ট নরনারী এখন রঙ্গালয়ের অভিনেতৃর জীবন-যাপন করিতে দ্বিধা বা সঙ্কোচ বোধ করিতেছেন না। উচ্চশ্রেণীর অভিনেতা ও অভিনেত্রী সর্ব্বোচ্চ সমাজেও সাদরে আমন্ত্রিত ও অভ্যর্থিত হইতেছেন।

তবুও এখনকার অভিনয় কুরুচির সংস্রব বর্জ্জিত নহে; শ্লীলতা ও শালীনতা যেন বহু অভিনয় হইতে অন্তর্ধান করিয়াছে। কেন এমন হয়? ডাক্তার রে ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া বলেন;—

আধুনিক জগতের নৈতিক অবনতির মূলে রঙ্গালয়ের আংশিক দায়িত্ব আছে, এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তবে এ দায়িত্ব যতটা তাহার স্বেচ্ছাকৃত, তদপেক্ষা তাহার লোকের রুচি পরিবর্ত্তনের প্রভাবের দায়িত্ব অনেক অধিক। The stage is reflecting rather than creating a condition, সমাজে যাহা হইতে দেখে, রঙ্গালয় তাহার প্রতিধ্বনি করে মাত্র, নিজে কিছু সৃষ্টি করে না। আমাদের এ যুগের লোকের রুচির অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, শ্লীলতা ও শালীনতার একান্ত অভাব আমাদের মধ্যে দেখা দিয়াছে। আমরা এখন কিছুই গোপন রাখিতে, রাখিয়া ঢাকিয়া বলিতে পারি না। আমরা যাহা ভাবি, তাহাই চীৎকার করিয়া বলি। আমরা উলঙ্গ ইংরাজীতে (undrest) অর্থাৎ অমার্জ্জিত রুচিবিগর্হিত ভাষায় কথা কহিয়া থাকি। দর্শক তাহার নভেলে-নাটকে, ক্লাবে-মজলিসে, নাচে-গানে, সামাজিক কথাবার্ত্তায় এবং আমোদ-প্রমোদে যে অবাধ স্বাধীনতা দেখিতে ও উপভোগ করিতে পায়, রঙ্গমঞ্চেও তাহা দেখিতে ও উপভোগ করিতে চাহে।

সুতরাং রঙ্গমঞ্চে যদি নৈতিক অবনতি ঘটিয়া থাকে, তাহার জন্ম দায়ী সমাজ, রঙ্গমঞ্চ নহে, অভিনেতা অভিনেত্রীও নহে। তাহারা সমাজের মনস্তুষ্টির জন্ম তাহাদের মন বিদ্রোহী হইলেও নীতিহীন শ্লীলতাহীন শালীনভাববর্জ্জিত অভিনয় প্রদর্শন করিয়া থাকে। এ পাপ দূর করিতে হইলে সমাজকে সংযত হইতে হইবে। যাহাতে সমাজের ভাঙ্গন অবশ্যম্ভাবী, এমন অভিনয় দর্শনের স্পৃহা সমাজকে দূরে পরিহার করিয়া যাহাতে সমাজের গঠন হয়, এমন অভিনয়ের আদর করিবার প্রবৃত্তি ক্রমশঃ জাগাইতে হইবে। We must create a demand for plays that are amusing, clever, artistic and above all plays with a moral tone in them.

ইহাতে রঙ্গালয় সাড়া দিবে, অভিনেতা অভিনেত্রীও সাড়া দিবে। অভিনেতা বা অভিনেত্রী সর্ব্বপ্রথমে কলাবিদ (Artist),—সে নীচ জঘন্য মনোবৃত্তির উদ্রেককারী অভিনয়কে আন্তরিক ঘৃণা করে। কেবল দর্শকের মনস্তুষ্টির জন্ম সে সেই অভিনয়ে সম্মত হয়, অন্যথা উচ্চাঙ্গের অভিনয় করিতে পাইলে সে আপনাকে ধন্য ও কৃতার্থ জ্ঞান করে। আশ্চর্য্য, অতি সুন্দর কলা কৌশলপূর্ণ নাটক বা প্রহসন অতি অল্প কাল রঙ্গমঞ্চে বাঁচিয়া থাকে, অথচ মধ্যমশ্রেণীর নাটক বা প্রহসন দর্শকের নীচ প্রবৃত্তিতে ইন্ধন যোগাইয়া বহুদিন বাঁচিয়া থাকে,—এমনই দর্শকের রুচি ও শিক্ষাদীক্ষা!

ইহার একমাত্র প্রতীকারোপায়, সমাজের সুপ্ত সুপ্রবৃত্তিকে জাগ্রত করা—When the American public would read clean books and go to clean plays, the demand would find a great supply. এই বিশুদ্ধ গ্রন্থ পাঠের এবং বিশুদ্ধ অভিনয় দর্শনের চাহিদার আগ্রহ জাগাইতে হইবে কাহাকে? জাতির চিন্তাশীল প্রতিনিধিদিগকে thinking and representative people. আমরাই জাতির চিন্তাশীল প্রতিনিধি—দায়িত্ব আমাদেরই, আমরা যত দিন শুদ্ধ—পবিত্র নাটকের আদর করিব, তত দিন জন-সাধারণ আমাদের দেখিয়া তাহার আদর করিবে।

ডাক্তার রে মার্কিণের সম্পর্কে যে কথা বলিয়াছেন, অধুনা উহা যে আমাদের দেশের সম্পর্কেও একেবারে খাটে না, বলা যায় না। আমাদের দেশেরও চিন্তাশীল বিদ্বৎ সমাজ যদি শুদ্ধ পবিত্র নাটক ও প্রহসনকে আদর করেন এবং ক্ষণিক আমোদ ও তুচ্ছ জঘন্য কুরুচিজনক ইতরতার অভিনয়কে প্রশ্রয় না দেন, তাহা হইলে আমাদের দেশেও রঙ্গালয় ক্রমশঃ নৈতিক উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

(২) বালকের পাঠ্য কি হওয়া উচিত?

প্রতীচ্যের চিন্তাশীল সমাজে এই সমস্যা এখন বড় কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। এখনকার বালকে আর মধ্য ভিক্টোরিয়া যুগের অথবা তৎপূর্ব্বের বালকে প্রভেদ অনেক। সকলের অপেক্ষা অধিক প্রভেদ এই যে, এখনকার বালক নিত্য নূতন কৌতুক ও বিস্ময়প্রদ ঘটনা না পাইলে সন্তুষ্ট হয় না। তাহারা এখন চলচ্চিত্রে দেখিতেছে যে, জুলস ভার্ণের রোমাঞ্চকর অসম্ভব ঘটনা বাস্তবে পরিণত হইতেছে। সে জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর জার্ম্মাণ-যুদ্ধ দেখিয়াছে, অথবা তাহার বর্ণনা পাঠ করিয়াছে। সুতরাং তদনুরূপ ঘটনা না পাইলে সে সন্তুষ্ট হয় না। তাহার স্বভাব এমনই হইয়া গিয়াছে যে, তাহাকে পাঠ্যপুস্তক দিয়া সন্তুষ্ট করা অতীব দুরূহ। পুস্তকের রোমাঞ্চকর ঘটনা হইতে মোটর সাইকেলে অশ্বের রোমাঞ্চকর ঘটনায় সে অধিক

...তহর, আমোদ উপভোগ করে। কেহ তাহাকে বুঝাইতে পারে ...যে, ভবিষ্যতে এমন ঘটনা ঘটিতে পারে, যাহা সে জানে না। ভিক্টোরিয়া যুগের শুচিশুভ্র গার্হস্থ্য-জীবনের উপন্যাস বা গল্প আর তাহাকে মোহিত করিতে পারে না, কেন না, সে নিজের জীবনে তাহার অপেক্ষা বয়সে বড় যুবতী ভগিনীকে ঐ শুচিশুভ্রতাকে শুচি-বায়ুগ্রস্ত বলিয়া অবজ্ঞা করিতে দেখিতেছে।

সে চলচ্চিত্রের অভিনয় দেখিতে যায় এবং তাহার অভিনেতা ও অভিনেত্রীদিগকে সত্য ও জীবন্ত বলিয়া মনে করিতে শিখে। কাযেই তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষার বহর অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে, সাধারণ জীবনের ঘটনাকে সে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। কাযেই তাহাকে পাঠ্যপুস্তকে অনুরাগী করিবার উপায় নাই বলিলেই হয়, প্রাইজরূপে অথবা বড় দিনের উপহাররূপে সেইগুলি দেওয়া ছাড়া স্কুলে ঐগুলি পড়াইয়া উহাতে অনুরাগী করা দুরূহ হইয়া উঠিতেছে।

যদি স্বয়ং সেক্সপিয়ার বা ডিকেন্স, থ্যাকারে আসিয়া আধুনিক বালককে কথা সাহিত্য লিখিয়া দেন, তাহা হইলেও সে তাঁহাদের রচনা দূরে নিক্ষেপ করিয়া হলিউডের (মার্কিনের চলচ্চিত্রের প্রধান আড্ডা) চলচ্চিত্রের প্রধান নায়কের অভিনয়ে অধিক অনুরাগ প্রকাশ করিবে।

কাযেই আধুনিক বালকের জন্য গল্প রচনা করা ক্রমেই কঠিন হইয়া পড়িতেছে। এ অবস্থার প্রতীকার কি? যাঁহাদের লিখিবার শক্তি আছে, তাঁহারাও আধুনিক বালকের তুষ্টি বিধান করিবার উদ্দেশ্যে রোমাঞ্চকর ঘটনা না লিখিয়া পারেন না। এমন ভাবের গল্প না হইলে গল্প বিকায় না। অতীতে রবিনসন ক্রুসো, মাষ্টারম্যান রেডি, ক্যাপ্টেন কিড প্রভৃতি গল্প বালকের মনোরঞ্জনে এবং চরিত্র গঠনের পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক ছিল। এখন জ্যাকি কুগানের অসম্ভব চরিত্রচিত্র না হইলে বালকের মনস্তুষ্টি সাধন করিতে পারে না। আসল কথা, এখন কেবল নিত্য নূতন sensation চাই, বিচিত্র ঘটনা না হইলে বালক ভুলাইতে পারে না। যাহাতে বালক মহান চরিত্রচিত্র দেখিয়া নিজের চরিত্র গঠন করিতে পারে,—সাহসী, সত্যবাদী, নির্ভীক, কর্ত্তব্য-পরায়ণ, স্নেহশীল ও নীতিধর্ম্মপরায়ণ হইতে পারে, এমন চরিত্রচিত্রের যুগ যেন অতীত হইয়াছে বলিয়া অনুমান হয়। এ স্রোত ফিরাইতে হইলে সমাজের গতিপ্রকৃতিও পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে। তাহা সহজ নহে, কালের স্রোত কেহ রোধ করিতে পারে না। তাই প্রতীচ্যের চিন্তা-শীল সমাজ এই সমস্যা লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন।

আমাদেরও এ বিষয়ে ভাবনার কথা আছে। আমরা সকল বিষয়ে এখন প্রতীচ্যের অনুকরণ করিতে শিখিতেছি। সৌভাগ্যের কথা এখনও আমাদের বিরাট জনসাধারণের মধ্যে রোমাঞ্চকর ঘটনার প্রতি আকর্ষণ অনিষ্টকর রূপে দেখা দেয় নাই। সহরের মুষ্টিমেয় বালক হয় ত সেইরূপ ঘটনার প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে। কিন্তু এখন হইতে—সময় থাকিতে তাহাদের সেই উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা ও প্রবৃত্তি যদি নানা উপায়ে সংযত করিবার চেষ্টা হয়, তাহা হইলে আশঙ্কার কারণ না-ও থাকিতে পারে।

(৩) বহু ও অল্প

মার্কিণদেশের প্রেসিডেণ্ট কুলিজ সেদিন এক স্থানে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—এক দিকে বলশেভিক চক্রান্ত, অপর দিকে ফ্যাসিষ্ট দর্পদম্ভ,—এতদুভয় হইতে বর্ত্তমান জগৎ অব্যাহতি লাভ করুক, ইহাই আমার আন্তরিক কামনা। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট কুলিজ যদি একটু চিন্তা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে বুঝিবেন, এই চক্রান্ত ও দর্পদম্ভের মধ্যে সংঘর্ষ আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, জগতের ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম, ইহা হইতে অব্যাহতি জগতের নাই, সুতরাং উহা কামনা করাই বৃথা।

জগতে অল্পের একচেটিয়া অধিকার ও স্বেচ্ছাচারিতা এবং বহুর তাহার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের চেষ্টা, অথবা বহুর ক্ষণিক সাফল্য... এবং তাহার বিপক্ষে অল্পের অভ্যুত্থান, নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনারই ম... বর্ত্তমানে রাসিয়া চীন ও অন্যান্য দেশে বলশেভিজম বা কম্যুনিজম এবং ইটালী, ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশে ফ্যাসিসিজম,—এতদুভয়ের মধ্যে যে সংগ্রাম চলিতেছে, উহাও অল্প ও বহুর মধ্যে সংগ্রাম। সে সংগ্রামে জয় পরাজয় অনিশ্চিত। হয় ত কিছুকালের জন্য এক পক্ষের জয় হইতে পারে; কিন্তু তাহা বলিয়া চিরদিনের জন্য সংগ্রামের অবসান হইবে না। আজ এক পক্ষ জয়ী হইলে দুই দিন পরে অপর পক্ষ প্রবল হইয়া জয়লাভ করিতে পারে। ফল কথা, যাঁহারা স্বপ্ন দেখেন যে, বহু অর্থাৎ প্রকৃত গণতন্ত্র জয়লাভ করিলে জগত প্রকৃত শান্তিলাভ করিবে, অথবা অল্প বহুকে নিপীড়িত করিতে সমর্থ হইলে জগৎ শান্ত হইবে, তাঁহারা ভ্রান্ত। শান্তি কখনও নাই, সংঘর্ষই জগতের নিয়ম, সুতরাং অশান্তি কোন না কোনরূপে বিরাজ করিবেই।

আজ ১০ বৎসর হইল, রাসিয়ার জারের সাম্রাজ্য ধ্বংসের পর রাসিয়ার সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। ৬ মাস যাবৎ এই নূতন সাধারণতন্ত্র য়ুরোপের পশ্চিম অংশে অবস্থিত রাজ্যসমূহের মধ্যে 'জাতে উঠিবার' চেষ্টা করিল। তাহার সে চেষ্টা বিফল হইল। তখন রাসিয়া প্রাচ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। জারের সময় যাহারা নিপীড়িত হইয়াছিল, তাহারাই দেশের কর্ত্তা হইল। কিন্তু জারের সময়ে রাসিয়ার যে প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল, তাহা হ্রাস হইল, প্রতীচ্যের অন্যান্য শক্তিরা রাসিয়াকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল।

ইহাদের মধ্যে ইটালী ও ইংলণ্ডই প্রধান। যাহারা সাম্রাজ্যগর্ব্বী, তাহারা রাসিয়ার নিপীড়িত বহুকে হঠাৎ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইতে দেখিয়া আতঙ্কিত হইল, পাছে রাসিয়ার বিষ তাহাদের দেশে প্রবেশ করে! ইহারা মুখে যাহাই বলুক, কাযে জার্ম্মাণ দার্শনিক ঐতিহাসিক ফ্রেডারিক নিট্‌জ্‌কের মতাবলম্বী। নিট্‌জ্‌কে তাঁহার "Twilight of Idols" গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—কোনও রাজ্য স্থায়ী হইলে এমন একটা শক্তি থাকা চাই যাহা গর্ব্বিত, উদারনীতির বিরোধী—এমন কি স্বাধীন মত প্রকাশের অন্তরায়স্বরূপ হইবে। এই শক্তি শত শত শতাব্দীর অতীত অধিকারভোগের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। এই শক্তিই প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের Imperium Romanum নামে অভিহিত হইত। নিট্‌জ্‌কে Absolutism অথবা স্বেচ্ছাচার শাসন-মন্ত্রের প্রচারক ছিলেন। তাঁহার মতে দুর্ব্বলের স্থান এ জগতে নাই, যে শক্তিমান, সে জগৎ শাসন করিবে।

ইটালীর ফ্যাসিষ্ট মন্ত্রের প্রচারক, মাসোলিনিও এই মন্ত্রের উপাসক। তিনি বহুর প্রভুত্ব একবারেই মানিতে চাহেন না, তিনি আবার জগতে জার-সাম্রাজ্যের মত Absolutism বা স্বেচ্ছাচার শাসন ফিরাইয়া আনিতে চাহেন, আবার ইটালীতে Imperium Romanum প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন। এ বিষয়ে তাঁহার উপাসক অনেকে। যাহারা ধনী ব্যবসাদার, যাহারা বহুর উপর একচেটিয়া প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাহে, তাহারা তাঁহার উপাসক।

সুতরাং কারল মার্কসের কম্যুনিজম বা বহুর প্রভুত্ব মন্ত্রের উপাসকরা ফ্যাসিসিজমের বিরোধী। তাহারা বলশেভিষ্ট অথবা কম্যুনিষ্টরূপে জগতের সর্ব্বত্র অল্পের একচেটিয়া অধিকার ধ্বংস করিবার নিমিত্ত চক্রান্ত করিতেছে, তাহাদের বিরুদ্ধে এইরূপই অভিযোগ। এক পক্ষে ফ্যাসিষ্টরা নিট্‌জ্‌কের মতের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছে,—"উদারতা, শান্তির বাণী, মানুষিকতা সভ্যতা ধ্বংস করিবে।" অন্য পক্ষে কম্যুনিষ্টরা বলিতেছে,—"আধুনিক সমাজ, আধুনিক ব্যবসায়-বাণিজ্য, ট্রাষ্ট ও কম্বাইন এবং অল্পের একচেটিয়া প্রভুত্ব, বহুর দাসত্ব, পাপ, অনাচার ও

যুদ্ধ আনয়ন করিতেছে।" এই মতের দ্বন্দ্ব চিরদিনই চলিবে। মধ্যপন্থা কিছুই নাই। যদি কেহ সেই মধ্যপন্থা আবিষ্কার করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি ভবিষ্যতের Messiah হইবেন সন্দেহ নাই।

নোরার আদর্শ

হেনরিক ইবসেনের Doll's Houseএর নোরার চরিত্রের আদর্শ এতদিনে জানা গিয়াছে। ইঁহার নাম লরা কিলার। ইনি দিনেমার জাতীয়, ইঁহার বয়স এখন ৭৫ বৎসর। ইনি নরওয়ের টিসো নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যৌবনে যখন ইঁহার স্বামী পীড়িত হন, তখন ইনি স্বামীর চিকিৎসা ও সেবার জন্য ঋণগ্রস্ত হইয়াছিলেন। ইঁহার শত্রুরা রটনা করিয়া দিল যে, ইনি জাল-জুয়াচুরির দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। তদবধি স্বামীর সহিত ইঁহার মনোমালিন্য হয়। হেলমারের মত তিনিও ইঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন। ইঁহার জীবন তদবধি বিষময় হইয়া যায়। ইবসেনের সহিত ইঁহার বন্ধুত্ব ছিল। ইবসেন ইঁহার জীবনের কাহিনী শুনিয়া নোরার চরিত্র অঙ্কিত করেন। ফলে ইবসেনের সহিত ইঁহার মনোমালিন্য ঘটে। সেই মনোমালিন্য বহুকাল স্থায়ী হইয়াছিল। মৃত্যুর ৪ বৎসর পূর্ব্বে ইবসেন হঠাৎ এক দিন ক্রিষ্টিনিয়া সহরে ইঁহার সাক্ষাৎলাভ করেন। সমস্ত ঘটনা শুনিয়া ইবসেন কাঁদিয়া ফেলেন এবং ইঁহার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। কথাসাহিত্যের প্রভাব মানুষের জীবনের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে, ইহা তাহার একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ইংরাজ যুবক কবি কীটস সমালোচনার তীব্র কষাঘাতে শুকাইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে।

নূতন বিশ্বযুদ্ধের সূচনা

কোন কোন রাজনীতিক অনুমান করেন, এবার প্রশান্ত সাগরে বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হইবে। হয় চীনের ব্যাপার সম্পর্কে, না হয় মার্কিণ ও জাপানের স্বার্থ-সংঘর্ষের ফলে ঐ অঞ্চলে কালানল জ্বলিয়া উঠিবে। সেই অনলের সংস্পর্শ জগতের অন্যান্য দেশকেও অনুভব করিতে হইবে।

আবার কেহ কেহ বলেন, খাস য়ুরোপেই ভবিষ্যৎ বিশ্বযুদ্ধানলের ইন্ধন সংগৃহীত হইতেছে। গত জার্ম্মাণ যুদ্ধের সূচনা যেমন বলকানে হইয়াছিল, এ যুদ্ধের সূচনাও তেমনই বলকানেই হইতেছে। এবার ফরাসী ও জার্ম্মাণীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা এ যুদ্ধের সূচনা নহে, এবার ফরাসী ও ইটালীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই বিশ্বযুদ্ধের মূল কারণ হইবে। এবার শক্তি-পরীক্ষা টিউটন ও লাটিনে হইবে না, হইবে লাটিন জাতিতে ও লাটিন জাতিতে। কেন হইবে, তাহা বলিতেছি।—

কয়টি কারণে ইটালীর সহিত ফরাসীর মনোমালিন্য ঘটিয়াছে:—

(১) উত্তর আফরিকার টিউনিস ও অন্যান্য স্থানে ইটালীয় প্রবাসীর প্রতি ফরাসী ভাল ব্যবহার করেন না।

(২) ইটালীর লোকের বিশ্বাস, ফরাসী ইটালীর সাম্রাজ্যবৃদ্ধি প্রীতির দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করে না।

(৩) ফরাসীর উত্তরোত্তর নৌবলবৃদ্ধিতে ভূমধ্যসাগরে ইটালীর আশঙ্কা।

(৪) ফরাসীদেশে ফ্যাসিষ্ট আন্দোলনের বিপক্ষতাচরণ।

(৫) আড্রিয়াটিক সাগরে ও আলবেনিয়ায় ইটালীর প্রতিপত্তি বৃদ্ধির বিপক্ষে জুগোশ্লাভিয়ার চক্রান্তে ফরাসীর সহায়তা।

এই কয়টির মধ্যে শেষেরটিই সর্ব্বপ্রধান। ইটালী ও আলবেনিয়ার মধ্যে সম্প্রতি এক সন্ধি হইয়া গিয়াছে। ঐ সন্ধির নাম টিরাণার সন্ধি। ইহার ফলে আলবেনিয়া প্রকৃতপক্ষে ইটালীর রক্ষিত রাজ্যে পরিণত হইয়াছে। ইহাতে জুগোশ্লাভিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়াছে। হইবারই কথা, কেন না, জার্ম্মাণ যুদ্ধের পূর্ব্বে হাঙ্গারী যাহা ছিল, ভার্শাইল সন্ধির পর হইতে জুগোশ্লাভিয়া তাহা হইয়াছে; অর্থাৎ হাঙ্গারী তখন যেমন আড্রিয়াটিক সাগরের পূর্ব্ব উপকূলে অট্রান্টো অঞ্চলে ইটালীর প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার বিরোধী ছিল,—এখন জুগোশ্লাভিয়া আলবেনিয়ায় ইটালীর প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার আয়োজনের তেমনই বিরোধী হইয়াছে।

মাসিডোনিয়া প্রদেশের প্রভুত্ব লইয়া বুলগেরিয়ার সহিত জুগোশ্লাভিয়ার মনোমালিন্য আছেই। এ দিকে মাসোলিনি রাসিয়ার বেসারেবিয়া প্রদেশের উপর রুমানিয়ার স্বত্বাধিকার সমর্থন করেন বলিয়া রুমানিয়া ইটালীকে বন্ধু মনে করে। পরন্তু ইটালী জুগোশ্লাভিয়ার পুরাতন শত্রু হাঙ্গারীর সহিত রাজনীতিক বন্ধুত্ব সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে। এই সকল কারণে জুগোশ্লাভিয়া মনে করিতেছে, ইটালীর চালবাজীতে তাহাকে বলকানে 'এক ঘরে' করিয়া রাখা হইতেছে। ফরাসীও ইটালীর এই চালে সন্তুষ্ট নহেন। তিনিই বলকানে Little Entente 'ছোট মিতাদের' সন্ধি ঘটাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারই উদ্যোগে জুগোশ্লাভিয়া রুমানিয়া ও জেকোশ্লোভিয়ার মধ্যে ত্রয়ী সন্ধি হইয়াছিল। এখন ইটালীর চক্রান্তে জেকোশ্লাভিয়া এই সন্ধি হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছে, রুমানিয়া ইটালীর সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছে। কাযেই বলকানে ফরাসীর প্রভুত্ব ও প্রতিপত্তি হ্রাস হইয়া গিয়াছে।

সুতরাং আড্রিয়াটিক, ভূমধ্যসাগর, উত্তর আমেরিকা এবং বলকান সমস্যা লইয়া ফরাসী ও ইটালীতে বিশেষ মনোমালিন্যের সূত্রপাত হইয়াছে। অবশ্য প্রকাশ্যে কেহ কাহারও পক্ষ নহেন, তাঁহাদের বৈদেশিক সচিবরা পরস্পর বন্ধুতা প্রকাশে কদাচ কার্পণ্য প্রকাশ করেন না; কিন্তু অন্তরে উভয়েই উভয়ের প্রতি ঈর্ষান্বিত। এক দিকে মাসোলিনির উচ্চাকাঙ্ক্ষা—ইটালীকে আবার ভূমধ্যসাগরে প্রাচীন রোমসাম্রাজ্যে পরিণত করিবার ইচ্ছা, অপর দিকে ফরাসীর উত্তর আফরিকায় উপনিবেশ সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রবল আকাঙ্ক্ষা, এতদুভয়ের মধ্যে একদিন সংঘর্ষ বাধিবেই। হয় ত বলকানের টিরাণার সন্ধিকে উপলক্ষ করিয়াই সেই সংঘর্ষের সূত্রপাত হইতে পারে। য়ুরোপীয় রাজনীতিকগণের ইহাই আশঙ্কা।

বর্ত্তমানে আমেদ জগু আলবেনিয়ার প্রেসিডেন্ট। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ২৭শে নভেম্বর তারিখে তাঁহার সহিত ইটালীর 'টিরাণা' সন্ধি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই সন্ধি অনুসারে আলবেনিয়া ইটালীর আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হইয়াছে। এদিকে বার্লিনের এক বে-তার বার্ত্তায় প্রকাশ, ইটালীর সহিত সন্ধির ফলে আমেদ জগু এইবার প্রেসিডেন্ট হইতে রাজার পদে উন্নীত হইতেছেন। এতদর্থে ইটালীর এক প্রতিনিধি ইটালী সরকারের অনুমতিপত্র লইয়া আলবেনিয়ায় যাইতেছেন। ইটালীর ইচ্ছা, আমেদের বংশ এখন বহুকাল যাবৎ আলবেনিয়ায় রাজত্ব করে। তাহা হইলে আলবেনিয়া একরূপ ইটালীরই হইয়া থাকিবে।

কিন্তু ফরাসী কি আমেদ জগুকে রাজা হইতে দিবেন? জাতিসঙ্ঘের বিচারে আলবেনিয়া প্রজাতন্ত্র রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। ইটালী এখন কোন্ অধিকারে জাতিসঙ্ঘের এই ব্যবস্থা বাতিল করিয়া নিজের ব্যবস্থা চালাইতে চাহেন? ফরাসী কি করেন তাহাই দেখিবার জন্য জগৎ উদ্গ্রীব হইয়া আছে।

মুসলমান রাজ্যে ধর্ম্মে নিরপেক্ষতা

তুরস্ক মুসলমান দেশ—মুসলমান স্বাধীন রাজ্যসমূহের মধ্যে প্রধান। তুরস্কের শূরবীর ও মুক্তিদাতা গাজী মাস্তফা কামাল পাশা এখন সে দেশের নিয়ামক ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তিনি তুরস্ক দেশকে প্রকৃত স্বাধীনতা দান করিবার পর হইতে তুরস্কের রাজ্যশাসন ব্যবস্থাকে ধর্ম্মের বন্ধন হইতে মুক্ত করিতেছেন। যে খলিফা ও খেলাফতের সম্মান রক্ষার জন্য ভারতের মুসলমান আকুল আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, নবীন তুরস্কে সেই খলিফা বা খেলাফতের আর স্থান নাই। খলিফা ত রাজ্যচ্যুত হইয়াছেনই, পরন্তু তাঁহার কনষ্টাণ্টিনোপলের প্রাচীন ইল্‌দিজ প্রাসাদ এখন সরকারী সাধারণ কার্য্যালয়ে পরিণত হইয়াছে, তাঁহার এত বিস্তীর্ণ হারেমের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে। কামাল পাশা ইহারও উপরে গিয়াছেন, তিনি শেখ উল্‌-ইস্‌লামকে পদচ্যুত ও নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। ইনি মুসলমান ধর্ম্মজগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনমান্য ছিলেন। সুতরাং ইঁহার নির্ব্বাসনে মুসলমানজগতে চাঞ্চল্য দেখা গিয়াছিল। কিন্তু কামাল পাশা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাঁহার বিশ্বাস রাজ্যশাসনের সহিত ধর্ম্ম জড়াইলে রাজ্যের উন্নতি হয় না। তাই তিনি ধর্ম্মকে স্বতন্ত্র স্থান দিয়া আধুনিক প্রথায় রাজ্যশাসন করিয়া তুরস্ককে অন্যান্য শক্তির সমতুল করিয়া গড়িয়া তুলিবার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার আমলে নারীর অবরোধ প্রথা উঠিয়া গিয়াছে, নারীরা পুরুষের ন্যায় বহু অধিকারভোগ করিতেছেন; এমন কি, বিদেশে গিয়া নানা বিদ্যা অর্জ্জন করিতেছেন। কামাল পাশা তুর্কীর ফেজ উঠাইয়া দিয়া য়ুরোপীয় শিরস্ত্রাণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এখন আবার শুনা যাইতেছে, কামাল পাশা এক সরকারী ঘোষণা দ্বারা সাবালক তুর্কমাত্রকেই নিজের ইচ্ছানুসারে যে কোন ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। এইরূপে তুরস্ক রাজ্যে ধর্ম্মে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা অবলম্বিত হইল। প্রকৃত পক্ষে এখন আর তুরস্ক রাজ্য মুসলমান নহে, ইহা অন্যান্য য়ুরোপীয় রাজ্যের ন্যায় ধর্ম্মসম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইল।

আফগান রাজ্য এতদূর অগ্রসর হয় নাই বটে, কিন্তু সে রাজ্যেও নরপতি মহামান্য আমীর বাহাদুর ধর্ম্মসম্বন্ধে নিতান্ত অনুদারও নহেন। কোনও সম্ভ্রান্ত আফগান যুবক কিছুদিন পূর্ব্বে ভারত পর্য্যটন করিতে আসিয়া দিল্লীর হিন্দু-সভার সম্পাদক পণ্ডিত দেবরত্ন শর্ম্মাকে বলিয়াছেন,—"আমি আপনাদের হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা দেখিয়া দুঃখিত ও বিস্মিত। আপনাদের দেশে এরূপ ঘটে কেন? আমাদের আফগানিস্থানে হিন্দুরা সংখ্যায় মুষ্টিমেয়, অথচ সেখানে হিন্দু-মুসলমানে কোনও বিরোধ নাই। আফগান গভর্ণমেণ্ট হিন্দু বালকগণের ধর্ম্মশিক্ষায় বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। গোহত্যা আমাদের দেশে একেবারে নিষিদ্ধ। মসজেদের সম্মুখে গীতবাদ্য সম্বন্ধে কোন সমস্যা আমাদের দেশে নাই। আফগান দেশে হিন্দু ও মুসলমান প্রজা সমান অধিকার উপভোগ করে।" খাঁটি দুইটি মুসলমান স্বাধীন রাজ্যে ব্যবস্থা এইরূপ। অথচ যে ভারতে হিন্দু-মুসলমান উভয়েই পরাধীন পরের কৃপাভিখারী জাতি, সেই ভারতে মুসলমান, ধর্ম্মসম্বন্ধে এত নিরপেক্ষপরায়ণ কেন, কেহ বুঝাইয়া দিতে পারেন কি? মুসলমান আমলেও এই ভারতে হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি বসবাস করিয়া আসিয়াছে, উভয়ের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ থাকিলেও পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভর করিয়াছে। আজ অকস্মাৎ সে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। এক শ্রেণীর লোকের স্বার্থ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধের ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। তাহাদেরই গুপ্ত প্ররোচনায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধের অগ্নি উত্থিত হইয়াছে। ভোটাধিকার ও চাকুরীর প্রলোভন তাহাতে ইন্ধন যোগান দিতেছে। সুতরাং ইহার নিবৃত্তি হওয়া সহজসাধ্য ব্যাপার নহে।

সাম্রাজ্যের উত্থান পতন

জার্ম্মাণ যুদ্ধের পূর্ব্বে ইটালীর অবস্থা কিরূপ ছিল? ইটালী তৃতীয় শ্রেণীর শক্তি বলিয়াও পরিগণিত হইত না। কিন্তু আজ ইটালী জগতের প্রথম শ্রেণীর শক্তি ইংরাজ, মার্কিণ, ফরাসী, জাপের সহিত একাসনলাভ করিয়াছে বলিয়া শুনা যায়। বেনিটো মসোলিনি এই উন্নতির মূল, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। জার্ম্মাণ যুদ্ধের পূর্ব্ব যুগের কথা ছাড়িয়া দিলেও বলা যায়, জার্ম্মাণ যুদ্ধকালে ইটালী জার্ম্মাণ-শক্তির তুলনায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ছিল, ম্যাকেন্সনের হাতুড়ীর ঘা খাইয়া কোনরূপে প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল। মাসোলিনি নিজের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে এখন ইটালীকে এমন অবস্থায় উন্নীত করিয়াছেন যে, এখন মাসোলিনি ফরাসীকে চোখ রাঙ্গাইয়া কথা কহেন, বলকানে কর্ত্তৃত্ব করিতে যায়েন, ইটালীকে প্রাচীন রোমের সম্রাট সীজারদের ইটালীতে পরিণত করিবার স্পর্দ্ধা রাখেন। তিনি ফরাসীর প্রতি হুমকী দিয়া বলেন, ইটালীর জলে স্থলে ও ব্যোমে এমনই রণসরঞ্জাম প্রস্তুত হইবে যে, যাহার ঘর্ঘর নির্ঘোষে আকাশ ও ভূমধ্যসাগর প্রকম্পিত হইয়া উঠিবে; ইটালীর ৫০ লক্ষ সেনা সর্ব্বদা রণসাজে সজ্জিত থাকিবে।

মাসোলিনি বিরাট পুরুষ সন্দেহ নাই। তিনি ইটালীর ভাগ্য-নিয়ন্তা যুগমানব, ইহাও স্বীকার করা যায়। সামান্য অবস্থা হইতে তাঁহার আশ্চর্য্য উন্নতি যে বিস্ময়কর এবং উহা যে তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক, তাহাও সকলকে স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহার ভূয়োদর্শনের অভিজ্ঞতা নাই, এ কথাও সঙ্গে সঙ্গে বলিতে হইবে। তাঁহার সম্মুখে প্রাচীন রোমক সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ এখনও জাজ্জ্বল্যমান্‌। কত সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন হইল। ইতিহাস তাহাদের স্মৃতি ধারণ করিয়া আছে। মাসোলিনি সে সকল দৃষ্টান্ত জানিয়াও বজ্রমুষ্টির সাহায্যে তাঁহার রাজ্য চিরস্থায়ী করিতে চাহেন, ইহাই আক্ষেপের কথা। বন্দুক-বেয়নেটে কখনও কোন রাজ্য চিরস্থায়ী হয় নাই; গ্রীক সাম্রাজ্য, রোমান সাম্রাজ্য, মোগল সাম্রাজ্য, পাঠান সাম্রাজ্য,—যে কোনও সাম্রাজ্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, কেবল বজ্রমুষ্টিতে সাম্রাজ্য থাকে না, উহার উপরে আরও কিছু চাই—প্রজার মনস্তুষ্টি। মাসোলিনি ইটালীয়ান প্রজার মনস্তুষ্টিবিধান করিতে সমর্থ হইয়াছেন ত? তিনি তাঁহার বজ্রমুষ্টির আঘাতে ইটালী হইতে স্বাধীন জনমতের অস্তিত্ব লোপ করিয়াছেন, ইহা কাহারও অবিদিত নাই, কাযেই ইটালীর প্রজার মনের কথা বাহিরে প্রকাশ হইবার উপায় নাই; কিন্তু তাহা বলিয়া প্রজার মনের অসন্তোষ ত চাপিয়া রাখিবার উপায় নাই, উহা ধিকি ধিকি হউক বা দাউ দাউ হউক, যেরূপেই হউক, জ্বলিবেই।

ইতোমধ্যেই ইটালীতে অসন্তোষের গুঞ্জন উঠিয়াছে। অন্য প্রজার ত কথাই নাই, তাঁহার ফ্যাসিষ্ট দলের ভক্ত উপাসকরাও অসন্তোষের গুঞ্জন তুলিয়াছে। ইহার কারণ ইটালীর অর্থনীতিক অবস্থা। ক্ষুদ্র ইটালী আপনার ক্ষমতার রণসাজে সাজিতে গিয়া এই অবস্থা আনয়ন করিয়াছে। ইটালীয়ান লিরার (প্রচলিত মুদ্রার) মূল্য অসম্ভব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। ফলে কৃষিজীবী, ব্যবসায়ী, শ্রমজীবী এবং জনসাধারণের প্রায় সকল স্তরের লোকেরই ইহাতে দারুণ কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। এমন কি, অনেকের আহার জুটান দায় হইয়াছে। অনেকের কায চলিতেছে না, অনেকের কায জুটিতেছে না। পেট কাঁদিলে কিছু ভাল লাগে না। ফ্যাসিষ্টদের অনেকের এখন ভাল লাগিতেছে না। ফ্যাসিষ্টরাই যখন অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিতেছে, তখন উহার বিরুদ্ধবাদীদিগের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। মাসোলিনি সময় থাকিতে যদি সতর্ক না হন, তাহা হইলে তাঁহার সাধের ঘর একদিনে ভূমিসাৎ

হইতে বিলম্ব হইবে না। জগতে যত সাম্রাজ্যের পতন হইয়াছে, তাহার মূলে দুইটি কারণ বিদ্যমান,—(১) প্রজার অসন্তোষ, (২) কর্তৃপক্ষের বিলাসিতা। মাসোলিনির নব ইটালী সাম্রাজ্যের সবে মাত্র ভিত্তি পত্তন হইতেছে। মুখপাতেই যদি প্রজার অসন্তোষ দেখা দেয়, তবেই ত তাঁহার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইবে।

চীনের সংবাদ

নূতন কথা কিছুই নাই বলিলেও চলে। জাতীয়দল হাঙ্কো, সাংহাই ও নানকিং অধিকারের পর উত্তরের মহাযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। ইয়েলো অথবা পীত নদের তটে উত্তরের দলের সহিত তাহাদের ঘোর সংঘর্ষ বাধিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্ষা না গেলে যুদ্ধের সুবিধা নাই। সকল দেশেই শরতে যুদ্ধযাত্রা করাই নিয়ম। বোধ হয় আগষ্টের শেষে অথবা সেপ্টেম্বরের প্রথমেই উত্তরের চাঙ্গ-সোলিনের সহিত দক্ষিণের দলের সংঘর্ষ বাধিবার কথা শুনা যাইবে।

এ দিকে এক সংবাদে প্রকাশ, তুর্কীর মোস্তফা কামাল পাশা ঘোষণা করিয়াছেন যে, বলশেভিক রাসিয়া তাঁহার তুর্কী রাজ্য হইতে বহু লক্ষ সৈন্য লইয়া চীন-মঙ্গোলিয়াপ্রান্তে সমাবেশ করিতেছেন। এই সকল সৈন্য খাস তুর্কী রাজ্যের নহে, উহারা পূর্ব্বে আর্ম্মিনিয়া, জর্জ্জিয়া ও ককেশিয়া প্রদেশের অধিবাসী ছিল। তাহারা মুসলমান হইলেও রাসিয়ার প্রজা। যখন রাসিয়ার বিপক্ষে আর্ম্মিনিয়া জর্জ্জিয়া ও ককেশিয়া যুদ্ধঘোষণা করিয়া স্বাধীনতা লাভ করে এবং ঐ সকল প্রদেশে সাধারণতন্ত্র গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করে, তখন খৃষ্টান প্রভুরা এই সকল মুসলমান প্রজার উপর ঘোর অত্যাচার করে, তাই তাহারা ঘর-দুয়ার ছাড়িয়া তুর্ক দেশে আসিয়া বসবাস করে। এখন রাসিয়া চাঙ্গ-সোলিনের বিপক্ষে চীনের জাতীয়দলকে সাহায্যদানের নিমিত্ত মঙ্গোলিয়া ও মাঞ্চুরিয়াপ্রান্তে রণসজ্জা করিতেছেন। তাই পূর্ব্ব প্রজাগণকে চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। কামাল পাশার সহিত রাসিয়ার সর্ত্ত আছে যে, বিদেশী কর্তৃক তুর্কী আক্রান্ত হইলে রাসিয়া এই সাহায্যের বিনিময়ে তুর্কীকে সাহায্যদান করিবেন।

এই ঘোষণা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, সুদূর প্রাচ্যে আগামী শরৎকালে ঘোরঘটায় রণবাদ্য বাজিয়া উঠিবে। রাসিয়া যদি সত্য সত্যই চীনের জাতীয়দলের সহায়তায় রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হন, তাহা হইলে অন্যান্য শক্তিও যে ব্যাঘ্রের ন্যায় লোলুপদৃষ্টিতে চীনের দিকে চাহিয়া থাকিবে না, তাহাও সম্ভব নহে।

নারীর নির্ব্বাচনাধিকার

বর্ত্তমান সভ্য জগতের কোথায় কোন দেশে নারীর ভোটাধিকারের নিয়ম কিরূপ, তাহার একটা ফর্দ্দ প্রকাশিত হইয়াছে। ফর্দ্দটি এইরূপ :—

দেশ		অধিকার প্রাপ্তির বয়স
আর্জ্জেণ্টাইন সাধারণ তন্ত্র—	পুরুষ	১৮
	নারী	অধিকার নাই
অষ্ট্রীয়া—	পুরুষ	২০
	নারী	২০
* বেলজিয়াম—	পুরুষ	২১
	নারী	২১
জেকো-শ্লোভিয়া—	পুরুষ	২১
	নারী	২৫
ডেনমার্ক—	পুরুষ	২৫
	নারী	২৫
ফিনল্যাণ্ড—	পুরুষ	২৪
	নারী	২৪
ফ্রান্স—	পুরুষ	২১
	নারী	অধিকার নাই
জার্ম্মাণী—	পুরুষ	২০
	নারী	২০
গ্রীস—	পুরুষ	২১
	নারী	অধিকার নাই
ইটালী—	পুরুষ	২১
	নারী	অধিকার নাই
জাপান—	পুরুষ	২৫
	নারী	অধিকার নাই
হলাণ্ড—	পুরুষ	২৫
	নারী	২৫
নরওয়ে—	পুরুষ	২৩
	নারী	২৩
পোলাণ্ড—	পুরুষ	২১
	নারী	২১
পোর্টুগাল—	পুরুষ	২১
	নারী	অধিকার নাই
রুমানিয়া—	পুরুষ	২১
	নারী	অধিকার নাই
যুগোশ্লোভিয়া—	পুরুষ	২১
	নারী	অধিকার নাই
স্পেন—		পার্লামেণ্ট আপাততঃ নাই
সুইডেন—	পুরুষ	২৩
	নারী	২৩
সুইজারল্যাণ্ড—	পুরুষ	
	নারী	অধিকার নাই
মার্কিণদেশ—	পুরুষ	২১
	নারী	২১

* বেলজিয়ামে জার্ম্মাণ যুদ্ধে নিহত অধিবাসীর বিধবা যদি পুনর্বিবাহ না করেন, তবে তাঁহাদের ভোটাধিকার থাকে; অবিবাহিত অবস্থায় জার্ম্মাণ যুদ্ধে নিহত বেলজিয়ামবাসীর বিধবা জননী অথবা জার্ম্মাণদের দ্বারা যুদ্ধকালে রাজনীতিক অপরাধে আটক নারীদেরও ভোটাধিকার আছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রাবড়ীর বাগিচা

প্রভাতে উঠিয়া আনন্দরাম লক্ষ্মীকে বলিয়া গেল যে, তাহার আজি অনেকটা রাবড়ীর দরকার হইবে। বুদ্ধিমতী লক্ষ্মী যখন জিজ্ঞাসা করিল যে, আন্দাজ কতটা লাগিবে, তখন আনন্দরাম বলিল, "যতটা হয়"। লক্ষ্মীর পিতামহী ও দিদি সকাল হইতে এক মণের অধিক দুধ জ্বাল দিতে বসিলেন। আনন্দরাম বাহির হইয়া গিয়া পুরাতন দিল্লীর নিকটে এক পরিচিত বেণিয়ার দোকান খোলাইয়া ২।৩ বস্তা সবুজ কাপড় কিনিল এবং তাহা সদানন্দ ও বনমালীর মাথায় চাপাইয়া আন্দাজ দ্বিপ্রহরের সময় বাসায় ফিরিল। মহল্লার মুখে সে শুনিতে পাইল যে, মুসলমান গুণ্ডারা সকলেই গরুর সন্ধান পাইয়া তাহার বাড়ী লুঠিতে আসিয়াছিল; কিন্তু পাড়ার হিন্দুরা মিলিয়া তাহাদের তাড়াইয়া দিয়াছে। তাহারা শাসাইয়া গিয়াছে যে, সন্ধ্যার পরে তাহারা দলবল লইয়া ফিরিয়া আসিবে, তখন হিন্দুদের কে রক্ষা করে দেখা যাইবে। পাড়ার মাতব্বর হিন্দুরা আসিয়া আনন্দরামের শরণাপন্ন হইল। সে যে বাঙ্গালার নবাবপুত্রের বন্ধু এবং ধনী, তাহা সকলেই জানিত এবং অনেকেই শুনিয়াছিল যে, বাদশাহের দরবারে তাহার যথেষ্ট খাতির আছে। আনন্দরাম তাহাদের আশ্বাস দিয়া বাসায় আসিল।

লক্ষ্মী দুই গাঁঠরী সবুজ রঙের কাপড় দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। অনেকক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া সে স্থির করিল যে, নিশ্চয়ই ঐ বাঙ্গালী বাবুজীর বিবাহ, তাহা না হইলে এত সবুজ কাপড় কি হইবে! কিন্তু লাল রঙের পরিবর্ত্তে সবুজ রঙের কাপড় কেন আসিল, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। অনেকক্ষণ পরে সে আনন্দরামকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবুজী, তোমার কি সাদী? আনন্দরাম গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, "হুঁ"। "কোথায়?" আনন্দরাম আবার গম্ভীর ভাবে বলিল, "যমের বাড়ী"। "সে কোথায়?" "খুব কাছে, লক্ষ্মী! আমাদের বাড়ীর ছাদের ওপর থেকে কেন— লক্ষ্মী, ইচ্ছা হ'লে এইখানে বসেই দেখা যায়।"

লক্ষ্মী ঘরের জানালা দিয়া যে কয়খানা বাড়ী দেখা যায়, তাহা ভাল করিয়া দেখিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কই বাবুজী, কোন্‌খানা যমের বাড়ী? এ সমস্ত বাড়ীই ত আমি চিনি?" আনন্দরাম হাসিয়া উত্তর দিল, "লক্ষ্মী, যম যখন যেখানে যায়, সেইখানেই তার বাড়ী হয়। হয় ত আজ সন্ধ্যাবেলায় তোমাদের বাড়ীই যমের বাড়ী হবে।" তখনও লক্ষ্মীর সন্দেহ ঘুচিল না, সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "মেয়েটির নাম কি, বাবুজী?" আনন্দরাম আবার হাসিয়া বলিল, "বাব্‌লা"। লক্ষ্মী বুঝিতে না পারিয়া আনন্দরামের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

অপরাহ্নে সদানন্দ গিয়া বুড়া কালে খাঁকে ডাকিয়া আনিল এবং আনন্দরাম অনেকক্ষণ ধরিয়া লক্ষ্মীর পিতামহীর সহিত পরামর্শ করিয়া সন্ধ্যাকালে সমস্ত গরুর দুধ দুহিয়া বড় বড় চামড়ার বোতলে পুরিল। সন্ধ্যার পরে কালে খাঁ, সদানন্দ ও বনমালী সমস্ত গরু সারি সারি করিয়া বাঁধিল। প্রত্যেক সারিতে চারিটি গরু এবং তাহাদের পৃষ্ঠের উপরে একটি ছোট বাঁশ। বাঁশের উপর হইতে সদানন্দ রাবড়ী পূর্ণ একটি বড় হাঁড়ি ঝুলাইয়া দিল। আনন্দরাম যতগুলি চামড়ার বোতল যোগাড় করিতে পারিয়াছিল, তাহাতে টাট্‌কা দুধ পুরিয়া গরুগুলির পিঠে ঝুলাইয়া দিল। এইরূপে পঁচিশ ত্রিশ সারি গরু নূতন সবুজ কাপড়ে যথাসম্ভব মুড়িয়া আনন্দরাম স্বয়ং লুৎফ-উন্না শাহ ফকীর সাজিল এবং সাহেবজাদা আক্রম জমান খাঁর বহুমূল্য পোষাক দুইটা বনমালী বাগ্দী এবং সদানন্দ নাপিতকে পরাইয়া দিল। সাজ-গোজ এবং বন্দোবস্ত দেখিয়া বৃদ্ধ কালে খাঁ ঘন ঘন পানের পিচ্ ফেলিতে

ফেলিতে বলিল, "তাজ্জব, বড় তাজ্জব, বাঙ্গালী জাত বড় হুঁসিয়ার। বাবুজী, মতলব আঁটিয়াছ ভাল! দুধের জন্য আজ দিল্লীর মহল্লায় মহল্লায় হাহাকার পড়ে গিয়েছে, বহুৎ টাকা রোজগার হবে।" আনন্দরাম তাহার কথা শুনিয়া ঈষৎ হাসিল। আনন্দরামের সাজ-গোজ এবং আয়োজন দেখিয়া লক্ষ্মী স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল, আনন্দরাম যখন যাত্রা করিবে, তখন লক্ষ্মী তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "বাবুজী, তুমি কখন ফিরিবে? দিদি যে বড় কাঁদছে!" আনন্দরামের চোখ দুইটি হঠাৎ জলে ভরিয়া উঠিল। স্বদেশ হইতে বহু দূরে এই অপরিচিত পরিবারের মধ্যে অযাচিত স্নেহ ও ভালবাসা পাইয়া সে মুগ্ধ হইয়াছিল। মুখ ফিরাইয়া চক্ষু মুছিয়া সে লক্ষ্মীকে বলিল, "বউ নিয়ে কাল সকালে আসব, লক্ষ্মী?" লক্ষ্মী তাহার কথায় বিশ্বাস না করিয়া বলিয়া উঠিল, "মিথ্যে কথা বাবুজী! দিদি বলেছে যে, বাব্‌লা মানে যমুনাজীর ধারের শ্মশান ঘাট। তুমি ত বিয়ে করতে যাচ্ছ না, তুমি হিন্দুর জন্য মরতে যাচ্ছ। তুমি যেও না, বাবুজী! তুমি গেলে আমি বড় কাঁদব!" আনন্দরাম আর স্থির থাকিতে পারিল না; সে লক্ষ্মীকে কোলে তুলিয়া লইয়া দেখিল যে, তাহার গোলাপের মত মুখখানি চোখের জলে ভরিয়া গিয়াছে. আনন্দরাম অনেক কষ্টে তাহাকে শান্ত করিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল।

তখন কালে খাঁ, বনমালী ও সদানন্দ তিনটা মশাল জ্বালিয়া পথে দাঁড়াইয়াছে। আনন্দরামের ইঙ্গিত মত মহল্লার হিন্দুরা সরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সম্মুখে কালে খাঁ ও সদানন্দ এবং পশ্চাতে বনমালী গরুগুলি তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছিল। গলির মোড়ে আসিয়া আনন্দরাম একটা বিকট চীৎকার করিয়া লাফাইয়া উঠিল, সে বলিল, "আল্লাহ করিম, খোদা মেহেরবান্, আল্লাহ এক, মহম্মদ তাঁর নবী।" সেটা হিন্দুর মহল্লা, সুতরাং পথে কেহ বাহির হইল না। দুই এক জন জানালা খুলিয়া মুখ বাড়াইল বটে, কিন্তু কেহ কিছু বলিল না। অদূরে দরিদ্র মুসলমান পল্লীতে প্রবেশ করিয়া আনন্দরাম চীৎকারের মাত্রা বাড়াইল। সে মহল্লায় মুসলমান তন্তুবায় ও জোলারা বাস করিত। অবরুদ্ধ দিল্লী তাহাদের পক্ষে যমালয়-স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। দরিদ্র জোলারা অন্নাভাবে মরিতেছিল। দুগ্ধের অভাবে মাতৃক্রোড়ে নিত্য শত শত শিশু চিরবিদায় গ্রহণ করিতেছিল এবং তাহাদের অসহায় পিতামাতা মরণ-কাতর পুত্র-কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া বাদশাহ মহম্মদ শাহ ও তাঁহার উজীরকে অভিসম্পাত করিতেছিল।

সেই মহল্লায় আনন্দরাম বলিতে আরম্ভ করিল, "খোদা মেহেরবান্, আল্লাহ্ আমাকে রহম্ করেছেন। আমি আফিমচী, দুধ অভাবে মর্‌ছিলাম, খোদা আমাকে রাবড়ীর বাগিচা দান করেছেন। সেই মেহেরবানের হুকুমে দুধের দরিয়া নিয়ে দিল্লীর পথে পথে বিলিয়ে বেড়াচ্ছি। কোন্ মুসলমানের দুধ চাই? কোন্ আফিমচীর রাবড়ী চাই?"

প্রথমে দরিদ্র তন্তুবায়রা আনন্দরামের কথা বিশ্বাস করিল না, কিন্তু সারি সারি গরু—তাহাদের পৃষ্ঠে রাবড়ীর হাঁড়ি ও আনন্দরামের হাতে দুধের বোতল দেখিয়া শিশুর জননীরা অস্থির হইয়া উঠিল। এক বৃদ্ধা লজ্জার বাধা দূর করিয়া পাত্রহস্তে পথে আসিয়া দাঁড়াইল; আনন্দরাম তাহার পাত্রটি দুধে পরিপূর্ণ করিয়া দিল, তাহা দেখিয়া পুরুষদিগকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া, পল্লীর শত শত রমণী দুগ্ধ ভিক্ষা করিতে পথে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন কালে খাঁ ও সদানন্দকে দুগ্ধ বিতরণ করিতে বলিয়া আনন্দরাম নিজে কেবল চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল, এ দুধ খোদার দান, সুতরাং কাফেরের হারাম, হিন্দু এ দুধ খাইলে মরিবে। এ দুধ কেবল শিশু ও বৃদ্ধের জন্য, জুয়াচুরী করিয়া কেহ লইলে খোদা তাহাকে সাজা দিবেন।

যে সমস্ত মুসলমান গুণ্ডা সকালে আনন্দরামের বাসা লুঠিতে আসিয়াছিল, তাহারা সন্ধ্যাবেলায় ফিরিয়া আসিয়া দূর হইতে মশালের আলো ও চীৎকার শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। দুগ্ধ পাইয়া সমস্ত জোলা কৃতজ্ঞচিত্তে ফকিরের দোয়া লইতেছিল, সেখানে গুণ্ডারা ফকিরবেশী আনন্দরামকে আক্রমণ করিলে পিষিয়া যাইত। তাহারা বুদ্ধিমানের মত অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে দিতে ফিরিয়া গেল।

আনন্দরাম তখন বলিতেছিল, "বাদশাহ মহম্মদ শাহ কাফের, সে শিয়ার পায়ে মাথা রেখেছে। খোদা তাই আমাকে হিন্দুস্থানের বাদশাহী দিয়েছেন। খোদার দয়া অপার, এ রাজ্যে আর কোন মুসলমানের দুঃখ থাকবে না। কার দুধ চাই? কে আফিমচী আছ? আমি ফকীর লুৎফ-উল্লা আফিমচী, রাবড়ী অভাবে মর্‌তে বসেছিলাম,

তুই খোদা আমাকে রাবড়ীর বাগিচা দিয়েছেন, কে আফিমচী আছ, নির্ভয়ে এগিয়ে এস"।

ঘুরিয়া ঘুরিয়া দিল্লীর দরিদ্র পল্লীগুলি আনন্দরাম ভাল রকম চিনিয়া রাখিয়াছিল। সে প্রতি পল্লীতে ফিরিয়া দুগ্ধ ও রাবড়ী বিতরণ করিয়া বেড়াইল। সারা দিল্লী শহরময় সাড়া পড়িয়া গেল। দরিদ্র মুসলমানরা সত্য সত্যই বিশ্বাস করিল যে, অধর্ম্মাচারী মহম্মদ শাহের রাজ্য খোদা ফকির লুৎফ-উল্লা শাহকে দিয়াছেন। দিল্লীর কোতোয়াল হাজী ফুলাদ খাঁ গোলমাল শুনিয়া ছুটিয়া আসিলেন, ফকিরবেশী আনন্দরামের কার্য্যকলাপ দেখিয়া তাঁহার ভক্তি হইল। তিনি বিস্মিত হইয়া ফিরিয়া গেলেন। তৃতীয় প্রহর রাত্রিতে দুগ্ধ বিতরণ শেষ করিয়া আনন্দরাম যখন প্রকৃত ফকির লুৎফ-উল্লার গৃহে পৌছিল, তখন দিল্লীর দরিদ্র হিন্দু-মুসলমান তাহাকে প্রকৃত বাদশাহ বলিয়া মানিয়া লইয়াছে।

প্রকৃত লুৎফ-উল্লা তখন ঝিমাইতেছিল। তাহার রাবড়ী ফুরাইয়া গিয়াছিল, সে পূর্ব্বদিনের ভাঁড়টি শেষ করিয়া, চাঁচিয়া অবশেষে টুকরাগুলি চিবাইয়া খাইয়াছিল। আনন্দরাম উঠানে গরুগুলি বাঁধাইয়া একটি ভাঁড় লইয়া যখন ফকিরের ঘরে ঢুকিল, তখন ম্লান প্রদীপের আলোকে আফিমচীর শুষ্ক-শীর্ণ মুখ সহসা দীপ্ত হইয়া উঠিল, সে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "রাবড়ী এনেছ, বাঙ্গালী রাজা?" আনন্দরাম হাসিয়া উত্তর দিল, "বহুৎ, তোমার দুই দিনের খোরাক।" দ্বিতীয় কথার অপেক্ষা না করিয়া ফকির রাবড়ীর পাত্রটা কাড়িয়া লইয়া তাহাতে একটা চুমুক দিয়া বসিয়া পড়িল। আনন্দরাম বলিল, "শাহ সাহেব, মনে রেখ, খোদা তোমাকে মহম্মদ শাহের বদলে দুনিয়ার বাদশাহী আর রাবড়ীর বাগিচা দিয়েছেন।" লুৎফ-উল্লা চিমটায় করিয়া কলিকায় আগুন দিতে দিতে বলিল, "রাবড়ীর বাগিচা! তোফা! বহুৎ খুব!"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মহম্মদ শাহের প্রত্যাবর্ত্তন

হিন্দুস্থানের বাদশাহ মহম্মদ শাহ ইরাণের বাদশাহ নাদির শাহের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন নৌবৎ বাজাইয়া নিশান উড়াইয়া মহা ধূমধাম করিয়া; আর ফিরিলেন বেত্রাহত কুকুরের মত, লাঙ্গুল গুটাইয়া এবং ইরাণীর দাসত্বের শৃঙ্খল গলায় পরিয়া। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া দিল্লীর হিন্দু-মুসলমান স্তম্ভিত হইয়া গেল। দুই চারি জন মুসলমান তখনও আশা করিয়াছিল যে, ইরাণের বাদশাহ মুসলমান, তিনি মুসলমানের উপর অত্যাচার করিবেন না, কিন্তু যাহারা নাদির শাহের সহিত লড়াই করিতে গিয়াছিল, তাহারা বুঝিয়াছিল যে, সকল মুসলমান এক রকম নহে। নাদিরের সেনাদলে অনেক দেশের মুসলমান ছিল, পাঠান, মোঙ্গোল, তুর্কমান, তাতার বা চীন এবং কিজিলবাশ।

নাদির শাহের দিল্লী আগমনের পরের দিনই দিল্লীর সর্ব্বনাশের সূত্রপাৎ হইল। ইরাণীরা হিন্দুস্থানী মুসলমানদের জয় করিয়া আসিয়াছিল সুতরাং তাঁহারা দিল্লীর লোকের সঙ্গে বিজেতার মত ব্যবহার আরম্ভ করিল। দিল্লীর মুসলমানরা মনে করিয়াছিল যে, ইরাণের বাদশাহ যখন তাহাদের বাদশাহের অতিথি, তখন সমস্ত ইরাণী সৈন্যই তাহাদের অতিথি। অতিথি-সৎকারের ফলে ইরাণীরা যখন ঘর হইতে সুন্দরী নারী এবং বহুমূল্য দ্রব্য বিনা অনুমতিতে সরাইতে আরম্ভ করিল, তখন শিয়া ও সুন্নী সকল মুসলমানের চক্ষু ফুটিল। তাহারা বাধা দিতে আরম্ভ করিলে রক্তপাত হইল।

নিরুপায় দিল্লীর নাগরিক, ফৌজদার লুৎফ-উল্লা খাঁ সাদেকের কাছে গেল এবং শুনিল যে, নাদীর শাহের অত্যাচারে লক্ষ্ণৌয়ের বিশ্বাসঘাতক সাদৎ খাঁ বিষপান করিয়াছে এবং ইরাণী সৈন্যের উপরে মোগল ফৌজদারের হুকুম চলিবে না। তখন হতাশ হইয়া ইতর ভদ্র সমস্ত মুসলমান ফকীর শাহ লুৎফ-উল্লার নিকট ছুটিল।

আদৎ লুৎফ-উল্লা খাঁ তখন মৌজে অচেতন, বুড়া কালে খাঁ দুয়ারে পাহারা দিতেছিল। সদানন্দ ও বনমালী সকালের দুগ্ধ দোহন করিয়া রাবড়ী তৈয়ারী করিতেছিল।

কালে খাঁ দুয়ার খুলিয়া দিল, যাহারা আদৎ লুৎফ-উল্লাকে চিনিত, তাহারা অন্ধকার ঘরে ছিন্ন শয্যার উপরে পতিত ফকির শাহ লুৎফ-উল্লাকে দেখিয়া বুঝিল যে, খোদা ফকীর সাহেবকে দুনিয়ার মালিক করিলেও এখন তাঁহার বাদশাহী করিবার সামর্থ্য নাই, তাহারা ক্ষুণ্ন মনে ফিরিয়া গেল।

আনন্দরাম তখন মুসলমান সাজিয়া দিল্লীর পল্লীতে পল্লীতে ফিরিতেছিল। নাদির শাহের হুকুমে বড় বড়

আমীরদের ঘরে দশ বিশ জন করিয়া ইরাণী সৈন্য আশ্রয় পাইয়াছিল, তাহারা ভাল ব্যবহার পাইয়া অনুগত হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু গলিতে বা নির্জ্জন স্থানে দুই চারি জন ইরাণী সৈনিক পাইলে একবারে খুন করিতেছিল। প্রথম প্রহর বেলায় আনন্দরাম কাবুল দরওয়াজার নিকটে এক জন অল্পবয়স্ক ইরাণীকে গুণ্ডাদিগের হাত হইতে বাঁচাইল। সে ইরাণীর নাম ইব্রাহিম। আনন্দরাম তাহাকে জানাইল যে, সে নিজে পাঠান এবং গ্রাম হইতে তরকারী আমদানী করিয়া দিল্লীর সমস্ত বাজারে সরবরাহ করিয়া থাকে। উপস্থিত তাহার ব্যবসা বন্ধ হইয়া গিয়াছে, কারণ, নাদির শাহ হিন্দুস্থানে আসিবার পরে জাঠ ও গুজরেরা প্রকাশ্যে দিনের বেলায় ডাকাইতি করিতেছে। ইব্রাহিম বলিল যে, সে চাঁদনী চকে বাসা পাইয়াছে। পথে যাইতে যাইতে জানালায় একখানি সুন্দর মুখ দেখিয়া স্থির করিয়াছিল যে, হিন্দুস্থানী রূপের এই নমুনাটি দেশে লইয়া যাইবে; কিন্তু বিবির খসম তাহার মহৎ উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া তাহাকে মারিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে,আসিবার সময় সে ভুলিয়া দুই চার-খানি রূপার বাসন লইয়া আসিয়াছে, তাহা দেখিয়া দিল্লীর গুণ্ডারা তাহাকে আক্রমণ করিয়াছিল। আনন্দরাম ইব্রাহিমের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে চাঁদনী চকের দিকে ফিরিল এবং তাহাকে বাসায় পৌঁছাইয়া দিয়া তাহার সঙ্গীদের সঙ্গে আলাপ করিতে বসিয়া গেল। সে বুঝিল যে, দিল্লীতে খাদ্যদ্রব্য একবারেই পাওয়া যায় না। ফৌজদার লুৎফ-উল্লা খাঁ সাদেক বহু কষ্টে নিত্য আটা যোগাইয়া থাকে, কিন্তু মাংস সকল দিন জুটে না, তরকারীর একান্ত অভাব। বঞ্জারারা সব দেশ ছাড়িয়া পলাইয়াছে। সহসা আনন্দরামের মস্তিষ্কে নূতন মতলব আসিল। সে বলিয়া বসিল যে, গাড়ী এবং ইরাণী সওয়ার পাইলে সে তরকারী যোগাইতে পারে। ইরাণীরা নাচিয়া উঠিল এবং আনন্দ-রামকে তাহাদের কর্ত্তার কাছে লইয়া গেল। কর্ত্তা আনন্দরামকে সন্ধ্যার পরে আসিতে বলিয়া স্বয়ং নাদির শাহের সেনাপতির নিকট গেলেন। আনন্দরাম হাসিতে হাসিতে বাসায় ফিরিল।

সে দিন দ্বিপ্রহরেও হিন্দুপল্লী শব্দহীন। লক্ষ্মী তাহার পিতামহী ও দিদির সহিত সমস্ত রাত্রি নীচের ঘরের জানালায় বসিয়াছিল। আনন্দরামের মুসলমানী বেশ সত্ত্বেও সে তাহাকে চিনিয়া আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার চীৎকার শুনিয়া পাড়ার দুই চারি জন লোক বাহির হইয়া পড়িল, আনন্দরাম তাহাদিগকে নিরস্ত করিয়া অন্দরে প্রবেশ করিল।

লক্ষ্মীর দিদি পদ্মিনী বিধবা। সে আনন্দরামের সম্মুখে বাহির হইত না; কিন্তু আজ আনন্দরাম তাহাকে অনাবৃত মস্তকে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। লক্ষ্মীর পিতামহী আনন্দরামের হাত ধরিয়া অন্দরে লইয়া গেলেন। পদ্মিনীও সেই অবস্থায় তাঁহাদের সঙ্গে চলিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া সমস্ত পরিচয় দিয়া তবে আনন্দরাম সকলকে শান্ত করিতে পারিল। অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া সে দেখিল যে, চিরপরিচিতার মত পদ্মিনী আজ তাহার সঙ্গে অসঙ্কোচে কথা কহিতেছে। আজ আর আনন্দরামের লোক-জন সে বাসায় ছিল না। সুতরাং পদ্মিনীই তাহার কাপড় আনিয়া দিল, ছাড়া কাপড় লইয়া গেল, স্নানের জল তুলিয়া দিল। বাঙ্গালী বাবুজী তেল মাখে, সুতরাং লক্ষ্মী একপাত্র ফুলেল তেল আনিয়া তাহার ছোট ছোট হাত দুইটি দিয়া আনন্দরামের পায়ে তেল মাখাইতে বসিল। সুদূর প্রবাসে এই অপরিচিত ক্ষত্রিয় পরিবারের আন্তরিক প্রীতি দেখিয়া আনন্দরামের চক্ষু দুইটি জলে ভরিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু লক্ষ্মীর ব্যবহার দেখিয়া সে হাসিয়া ফেলিল এবং তাহাকে কোলে তুলিয়া বহু আদর করিল।

অনাবৃত মস্তকে পদ্মিনী তখনও তাহার কাছে দাঁড়াইয়াছিল।

নবম পরিচ্ছেদ

চাচী

এতদিনে বাঙ্গালার নবাবের উকীল এনায়েৎ উল্লা খাঁর মনে সত্য সত্যই ভয় হইয়াছিল। শুজাউদ্দীন সত্য সত্যই মরিয়াছেন, দুর্ব্বৃত্ত সরফরাজ খাঁ বাঙ্গালার নবাব, পিতার দাসী-পুত্র আক্রম জমান খাঁর উপরে তাহার ভীষণ আক্রোশ। এক দিনে ঝড়ের মুখে ধূলার মত এত বড় মোগলের বাদশাহী উড়িয়া চলিয়া গেল। দিল্লী শহরে সুখ, শান্তি তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে। খাঁ সাহেবের মনে

ভীষণ অশান্তি, ষোড়শী রূপসী বিবি কেবল জানালা হইতে মুখ বাহির করিয়া থাকে এবং গলির পারে সেই পাঠান ছোঁড়া ঠিক সেই সময়ে মুখ বাহির করে। এই বিবাদের উপরে দলে দলে ইরাণী, কিজিলবাশ, মোঙ্গোল, তাতার, তুর্কমান ও পাঠান ঘরের ভিতর হইতে সুন্দরী যুবতী টানিয়া লইয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে; বিবি কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র ভয় পায় নাই। এনায়েৎ উল্লার মনে হয় যে, বিবি অন্দরে না থাকিয়া সর্ব্বদাই বাহিরে যাইতে প্রস্তুত। অন্য ভদ্র মুসলমানের কন্যা ও গৃহিণী পথে গোলমাল শুনিলে সর্ব্বাঙ্গে কাপড় জড়াইয়া যখন অন্দরে পলায়, তাঁহার বিবি তখন মাথার কাপড় ফেলিয়া বারান্দায় দাঁড়াইতে চাহে, অথবা তাঁহার নজর না পড়িলে জানালা হইতে মুখ বাহির করে। জীবনের সমস্ত সুখ এক সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে; আফিম পাওয়া যায় না, তামাকু ফুরাইয়া আসিয়াছে, মদ্য গোপনে পান করিলেও মৌজ সমান জমে না।

পাঠান ছোঁড়াটা কয় দিন ধরিয়া বেশী জ্বালাতন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মুন্সী বকাউল্লা কয় দিন ধরিয়া আর আসিতেছে না, দারোগা দয়ারাম মিত্র কর্ণালের যুদ্ধের খবর শুনিয়াই বৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছে। বাড়ীতে থাকিবার মধ্যে কেবল গয়ারাম, সে তামাক সাজে, কিন্তু মুসলমানের হুঁকায় জল ফিরায় না। গুজরী ঝিটা আসা বন্ধ করিয়াছে, সুতরাং ষোড়শী রূপসী রাঁধিতেছেন, বাসন মাজিতেছেন এবং উকীল সরকার খাঁ সাহেব ঝাড়ু মারিতেছেন ও হুঁকায় জল ফিরাইতেছেন। বিবির মেজাজ আগুন অপেক্ষা গরম, সুতরাং বাধ্য হইয়া খাঁ সাহেব বরফ অপেক্ষা ঠাণ্ডা, কিন্তু মনের ভিতরে, প্রাণে আগুন জ্বলিতেছে।

তখনও কিল্লার নকারাখানায় নৌবৎ বাজে, সুতরাং সে দিনও তৃতীয় প্রহরে বাজিল, সঙ্গে সঙ্গে গলির মোড়ে একটা হল্লা উঠিল, তাহা শুনিয়া খাঁ সাহেবের বুক কাঁপিয়া উঠিল। হল্লাটা ক্রমশঃ নিকটে আসিল, গয়ারাম লাঠি গাছটা বাগাইয়া ধরিয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া দিল, কিন্তু সে হল্লা বাঙ্গালার উকীলের দুয়ারের সম্মুখে আসিয়াই থামিল। দুয়ারটা ভাঙ্গিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে দশ পনের জন গুণ্ডা ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল, গয়ারাম লাঠি গাছটা তুলিতেও পারিল না। খাঁ সাহেব বিবির ঘরে গিয়া দেখিলেন যে, বিবি নাই। তিনি তলোয়ার খুলিবার পূর্ব্বেই গুণ্ডারা তাঁহারই পাগড়ী দিয়া তাঁহাকে বাঁধিয়া জিনিষ-পত্র লুঠিতে আরম্ভ করিল। শেষ হইয়া গেলে তাহারা যখন রাস্তায় বাহির হইল, তখন বিবি অলঙ্কারের বাক্সটা লইয়া তাহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। লাঠিয়াল গয়ারাম এবং বৃদ্ধ এনায়েৎ উল্লা বদ্ধাবস্থায় পড়িয়া রহিলেন।

ষোড়শী রূপসী চুড়িওয়ালা-গলির দিল্লীওয়ালী যখন কুলত্যাগ করিয়া নূতন খেলা আরম্ভ করিলেন, তখন হিন্দু ও মুসলমানের খোদা আর এক খেলা আরম্ভ করিয়াছিলেন, বিবি তাহা বুঝিতে পারেন নাই।

যে দিন হইতে দিল্লীর লোক শুনিয়াছিল যে, নাদির শাহ ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন, তাহার পর দিন হইতে বণিয়ারা জিনিষ-পত্রের দর চড়াইয়াছিল; কিন্তু তাহাদের অপেক্ষা বুদ্ধিমান্ আড়ৎদারেরা মাল বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিল। ক্রমে নাদির শাহ আসিয়া পৌঁছিলে খাদ্যদ্রব্য দিল্লী সহরে এমন দুর্ম্মূল্য হইয়া পড়িল যে, ফৌজদার লুৎফ-উল্লা খাঁ সাদেক নাদির শাহের ফৌজের রসদ সরবরাহ করা অসম্ভব বুঝিলেন। স্বয়ং কোতোয়াল ফুলাদ খাঁ জোর করিয়া, মিনতি করিয়া এবং খোসামোদ করিয়াও বণিয়ার বজ্রের মত কঠোর হৃদয় নরম করিতে পারিলেন না। তখন মহম্মদ শাহের বাদশাহী ঘুচিয়া গিয়াছে; সুতরাং উজির নিজাম-উল্-মুলক্ বা কমরুদ্দীন আর কেহই নহেন। ফৌজদার লুৎফ-উল্লা এবং কোতোয়াল ফুলাদ খাঁ বাধ্য হইয়া নাদির শাহের কর্ম্মচারী তহমাপ্স খাঁর শরণাগত হইলেন।

নূতন দিল্লী সহরের বাহিরে আজমীর ফটক দিয়া দিল্লী তর্কাবাদ বা কুতুবমিনারের দিকে যাইবার যে রাস্তা আছে, তাহার দক্ষিণদিকে বহু হিন্দু বণিয়ার বাস এবং আড়ৎ ছিল এবং এখনও আছে। তহমাপ্স খাঁর হুকুমে ইরাণী ঘোড়-শওয়ার নসকচী (পুলিস) পাহাড়গঞ্জের সমস্ত গোলা ঘিরিয়া ফেলিল। ইহার পূর্ব্বে হিন্দু সহরের ভিতর সমস্ত গোলাও আটক করা হইয়াছিল এবং বণিয়ারা হুকুম মত বাঁধা দরে জিনিষ-পত্র বেচিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

পাহাড়গঞ্জের গোলা আটক হইবামাত্র চারি দিক হইতে দলে দলে লোক আসিয়া ইরাণীদের ঘিরিয়া ফেলিল। বণিয়ারা মনে করিয়াছিল যে, কেবল হিন্দুরাই তাহাদিগকে রক্ষা করিতে আসিবে, কিন্তু তাহারা বিস্মিত হইয়া দেখিল

যে, হাজার হাজার মুসলমান এক ফকিরের সঙ্গে আসিয়া হিন্দুদের দলে মিশিল। ফকির সবুজ পোষাক পরা, সে কেবল থাকিয়া থাকিয়া লাফাইয়া উঠে এবং বলে, "আল্লাহ করিম, খোদা আমাকে হিন্দুস্থানের বাদশাহ করেছেন, কার হুকুমে আমার রাজ্যে লুঠ হয়!" তাহার সঙ্গে অনেক সম্ভ্রান্ত মুসলমানও ছিলেন। সৈয়দ নিয়াজ খাঁর অধীনে তাহারা এক মুহূর্ত্তে ইরাণী নসকচীদের দূর করিয়া দিল। ইরাণীরা দেখিতে দেখিতে টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া গেল। তাহাদের সঙ্গে যে কয়জন ফৌজদারের লোক আসিয়াছিল, তাহারা তৎক্ষণাৎ রণে ভঙ্গ দিয়া কেহ দিল্লী কেহ বা পাঁচকুয়ার দিকে পলাইল।

হিন্দু বণিয়াদের গোলা বাঁচাইয়া লোক ক্রমশঃ সরিয়া পড়িল, কিন্তু মুসলমানরা দল বাঁধিয়া আজমীর ফটক দিয়া শহরে ঢুকিল। যে মুহূর্ত্তে ষোড়শী দিল্লীওয়ালী চাচী তাহার নূতন প্রাণেশ্বরের সহিত কুলত্যাগ করিতেছিলেন, সেই মুহূর্ত্তেই তাহারা গলির মোড়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। চাচী হাঙ্গামা দেখিয়া একটু অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল। নূতন দলের এক জন হুকুম দিল। তৎক্ষণাৎ চাচীর প্রাণেশ্বরের গুণ্ডারা চীৎকার করিয়া ধরাশায়ী হইল। এক জন ফকির চাচীকে জিজ্ঞাসা করিল যে, তাহার বাড়ী কোথায়; পতিব্রতা চাচী এনায়েৎ উল্লা খাঁর বাড়ীর উল্টা দিক দেখাইয়া দিল। হিন্দু বা মুসলমান কাহারও কথার উত্তর না দিয়া চাচী তাহাদের সঙ্গে চলিল। তিন জন মুসলমান ও এক জন হিন্দু তাহাদের নেতা। ক্রমে লোকের সংখ্যা কমিয়া আসিতে লাগিল। নেতারা মতিবাজারের মধ্য দিয়া ঘুরিয়া যমুনাতীরে দরিয়াগঞ্জ মহল্লায় উপস্থিত হইল, তখন তাহাদের সঙ্গের লোক কমিয়া দশ পনের জন দাঁড়াইয়াছে। নেতাদের মধ্যে এক জন চাচীকে তাহার বাড়ীতে লইয়া যাইতে চা'হল, কিন্তু চাচী নড়িল না, কোন কথাও কহিল না, নেতারা বিপদে পড়িল। যমুনা-তীরে খয়রাতী ফটকের কাছে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ পরামর্শ করিয়াও কোন ফল হইল না, তখন দুই জন মুসলমান ও হিন্দুটি চলিয়া গেল, কেবল ফকির রহিল। চাচী নড়িল না, তাহা দেখিয়া ফকির ওরফে আনন্দরাম অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া গেল। সেই দিন পথে বিবর্জ্জিতা নারীকে আশ্রয় দিয়া আনন্দরাম প্রথম চালে ভুল করিল। সে ধীরে ধীরে চাচীকে সঙ্গে করিয়া সমস্ত দিল্লী সহরটা পার হইয়া আসল ফকির লুৎফ-উল্লা শাহের ঘরে লইয়া আসিল। পথে দলে দলে দরিদ্র হিন্দু ও মুসলমান তাহাদের ঘিরিয়া চলিল, কিজিলবাশ, তাতার বা মোঙ্গোলকে তাহাদের দিকে আসিতে দিল না। [ক্রমশঃ।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

সবাইকে চাই

সবাইকে চাই আজ সবাইকে চাই—
দূরে পড়ে' থাকা আর সাজে নাক ভাই।
মিছা গড়া ব্যবধানে,
ছাড়াছাড়ি প্রাণে প্রাণে
থেকে থেকে মরণের আর দেরী নাই।
সবাইকে চাই।

সারাদিন মোট বয়ে' যার কাটে দিন,
মাঠে যারা চষে মাটী রোগে দেহ ক্ষীণ,
মানুষ হয়েও' যারা—
সব অধিকার হারা,
বোবা যারা, প্রাণে যার আলো জ্বলে নাই।
তাহাদেরও চাই।

তিলে তিলে পিষে পিষে মরে কত প্রাণ,
কে রাখে হিসাব কেবা দিবে প্রতিদান।
আজ আর গতি নাই,
শুধু এক হওয়া চাই,
বেঁচে থাকা চেয়ে কি রে বড় জাতটাই।
সবাইকে চাই।

আপনারে বেচে বেচে বেঁচে থাকা হীন,
ভুগে ধুঁকে ধুঁকে মরা আর কত দিন;
শত ফাঁকি শত ছল,
কত দিন সব' বল,
মানের দায়ে কি প্রাণ জাগে নাক ভাই!—
সবাইকে চাই।

আপন হইতে আরো আপন যে চাই,
মানুষে মানুষে কোথা ভেদাভেদ নাই;
ছুটে এসো গেয়ে গান,
আজ দিতে হবে প্রাণ,
জগতের কাছে করে' নিজে রে যাচাই।
সবাইকে চাই।

মায়ের দেউলে অই খুলে গেছে দ্বার,
প্রাণের অর্ঘ্য নিয়ে আয় যে যাহার;
ধন্য হইব সবে,
বাঁধন আর না রবে,
মুক্ত আমরা—এই বর যেন পাই।
সবাইকে চাই।

শ্রীকটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
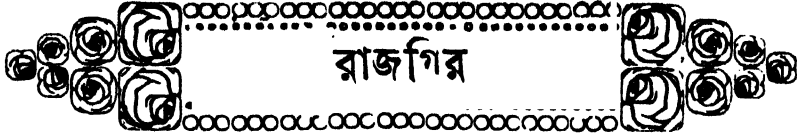
রাজগির

বহুকালের সাগ্রহ অভিলাষ হৃদয়ে পোষণ করার পরে আট বৎসর পূর্ব্বে প্রৌঢ় বয়সের শেষ দিকে 'মগধানাং গিরিব্রজ' দেখিতে যাই। সেই সময়ে যাহা লিখিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহার কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া দিতেছি।

রামায়ণ গাহিতেছে :—

"সুমগধা নদী রম্যা মগধান্ বিশ্রুতা যযুঃ।

পঞ্চানাম্ শৈল মুখ্যানাম্ মধ্যে মানেব শোভতে॥"

মহাভারতে মগধের ঐশ্বর্য্য রাজ-চক্রবর্ত্তী জরাসন্ধের কীর্ত্তিকলাপের সহযোগে স্ফুটতর হইয়াছে। পঞ্চগিরি-বেষ্টিতা ধনধান্য-পূর্ণা গিরিব্রজপুরী সম্রাটের সম্ভ্রমে আরও সম্ভ্রান্ত হইয়াছে। উভয়ত্রই রম্য উপবন-বেষ্টিত, মনোহর হর্ম্ম্য-শোভিত। পুরাণে গিরিব্রজ ও জরাসন্ধের উপাখ্যান কিছু পরিবর্ত্তিত, একটু অলৌকিক ঘটনায় সজ্জিত। চৈত্য-গিরি ভেদ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ভীমার্জ্জুন স্নাতক ব্রাহ্মণ-বেশে চোরের মত নগরে প্রবেশ করিয়া যে নগরের বৈভব দর্শন করেন, সেই গিরিব্রজ পরে রাজগির নাম পায়। বৌদ্ধ সাহিত্যে রাজগহ অর্থাৎ রাজগৃহ নামে পর্ব্বত বহিস্থ নব নগরের কথা অধিক থাকিলেও স্বয়ং বুদ্ধদেব এবং অন্যান্য সন্ন্যাসীর দল পর্ব্বতগুলির উপরিস্থিত মঠে বা গুহায় সাধনার ক্ষেত্র স্থাপন করিয়াছিলেন।

কার্ত্তিকে কাশীতে গ্রহণ দর্শনের ফলস্বরূপ কাশিগ্রস্ত হইয়া যখন আমি সপুত্রক বখ্‌তিয়ারপুরে মার্টিন কোম্পানীর ছোট লাইনের এক কোঠরে আশ্রয় লইলাম, সেই সময়ে আমাদের প্রকোষ্ঠস্থিত এক জামা-জোড়াসহ সমগ্র গেরুয়া পরিহিত নবীন সন্ন্যাসীর সাঙ্গোপাঙ্গের মধ্যে জল্পনা-কল্পনা হইতেছিল যে, আমাদের পাশের দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীর বপুষ্মান্ বাবু এবং তাঁহার অনুকল্পা গৃহিনী ও সঙ্গী ভদ্রলোক দুইজন যাঁহাদের 'দ্বয়োরেব তনুর্মোটা'—তাঁহারাও রাজগিরে হাওয়া খাইতে যাইতেছেন কেন? শিক্ষিত সন্ন্যাসী প্রবরের দলেও নধর বপুর অভাব ছিল না, এবং তাঁহারা শুদ্ধ হাওয়াই খান নাই, পরে দেখিয়াছি। কথা এই, এ কালে ভদ্রলোকে দেশে অর্থাভাব সম্বন্ধে সময় অসময়ে বাকবিতণ্ডা করিলেও তথাকথিত স্বাস্থ্যের জন্য সখের ভ্রমণে গাড়ীর সুবিধায় রাজগির অঞ্চলেও পদার্পণ করেন; কেহ বা ব্রহ্মকুণ্ড তীর্থে স্নানের ফলে ধর্ম্মের খাতায় কিঞ্চিৎ জমা দেওয়া হইল বলিয়া তৃপ্তি লাভ করেন। প্রাচীন স্মৃতির অনুবর্ত্তনে অল্প লোকই এখানে আসেন; বহুপূর্ব্বে রাজগৃহ দর্শনের প্রবল স্পৃহা জাগিলেও যাওয়ার কষ্ট বাধা দিয়াছে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ভাগলপুর সাহিত্য সম্মিলনে গিয়া কল্পনামাত্রই হইয়াছিল। তখন বিলএব অনূদিত হুয়েন সাংই সকলের সম্বল ছিল (এখন ইয়ুন্ চাং বলিতে হইবে); অবশ্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রাচীন রিপোর্ট পূর্ব্বেই ছিল; ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের বিবরণী তখনও আমরা দেখি নাই। এ কালে বিহার-উড়িষ্যার অনুসন্ধানসমিতি রাজগিরের অনেক কথা জানাইয়াছেন। দেখিবার পূর্ব্বে এ সব পড়ি নাই, ভালই হইয়াছিল। নহিলে সবজান্তাভাব আসিয়া দেখার আনন্দে বাধা দিত।

এই রাজগিরের কথায় কবি গাহিয়াছেন:—

'যেথা নৃপতি বিম্বিসার, নমিয়া বুদ্ধে মাগিয়া লইলা চরণ-ধূলিটি তাঁর'। মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্রে লিখিত আছে যে, বুদ্ধদেব এক সময়ে স্বয়ং বলিয়াছিলেন—"ওহে আনন্দ, রাজগহ কি রমণীয় স্থান; তথায় গিঝ্যকুট (গৃধ্রকূট) গোতম নিগ্রোধ, চোর পর্ব্বত বেভার গিরির পার্শ্ববর্ত্তী সপ্তপর্ণীগুহ ইষিগিরির (ঋষিগির) পার্শ্ববর্ত্তী সীত বন, তপোদারাম বেণু-বনে কালন্দক নিবাপ, জীবকাম্ব বন, মধ্যকুচ্ছীতে মৃগারণ্য এ সমস্তই মনোহর, বড়ই সুন্দর।" অন্যত্রও বুদ্ধের উক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ আছে—"গৃধ্রকূটে, চোর পর্ব্বতে, সপ্তপর্ণী গুহায়, সীত বনে আমাদের আশ্রমের স্থান কর।" এ সমস্তই বুদ্ধদেবের নিজের কথা বলিয়া যদি বিশ্বাস নাই করা যায়, শান্তিসুখে বাস করার নিমিত্ত এই স্থান যে বুদ্ধ-দেবের প্রিয় ছিল, বৌদ্ধশাস্ত্রে তাহা প্রমাণিত হয়। পুনরায় শেষ বয়সেও তিনি কিছুদিন এখানে থাকিতেন। প্রকৃত পক্ষে পর্ব্বতমধ্যস্থ প্রাচীন গিরিব্রজ পুরীর মনোরম অব-স্থান লক্ষ্য করিলে চিরদিনই এই স্থান দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করিবে। স্বদেশী মার্টিন কোম্পানীর ক্ষুদ্রতর বাষ্পীয় যান যখন মন্থর গতিতে খাজার রাজা বলিয়া খ্যাত শিলাও ষ্টেশন পার হইয়া দক্ষিণ মুখে অগ্রসর হইল, তখনই দূর হইতে বিপুল গিরির বহির্দৃশ্য লক্ষ্য করিয়া পুলকিত

হইয়াছিলাম। বেলা দশটায় রাজগির ষ্টেশনে নামিয়া কিছুক্ষণ তৈলেন্ধন-চিন্তায় ব্যাপৃত থাকিয়া বাহ্যদৃশ্যের ব্যাপার উদর-পরিতৃপ্তির প্রয়াস অপেক্ষা যে কত নিম্নে স্থান পায়, তাহা বুঝিয়াছিলাম। পূর্ব্বকথিত যুবক সন্ন্যাসী ও মাতাজি ষ্টেশনে নামিতেই এক নধর-বপু মালাধর বাঙ্গালী ভদ্রলোক আসিয়া তাঁহাদের দলকে ধর্ম্মশালায় লইয়া গেলেন। ইনি শুনিলাম মুন্সেফ, এমন আরও দুই তিন জন মুন্সেফ শিষ্য আছেন; সঙ্গে সংস্কৃত এম-এ পাঠার্থী এক মুন্সেফ-পুত্রও ছিলেন। সন্ন্যাসী না কি সংস্কৃতে এম-এ; বাহিরে বেশী আসেন নাই বলিয়া ভাল দারবানের অনুকম্পায় একমাত্র নেয়ারের খাট আমারই ভাগ্যে জুটিল; সাধুর সঙ্গীরা স্পর্শদোষদুষ্ট খট্টাঙ্গের ব্যবহারে হয় ত নারাজ ছিলেন।

কিঞ্চিৎ বিশ্রামান্তে বেলা দুইটার পরে পর্ব্বত-মেখলা-বেষ্টিত গিরিব্রজের পরিত্যক্ত প্রান্তর প্রত্যক্ষ করার কৌতূহল আর চাপিয়া রাখা গেল না। ধর্ম্মশালা হইতে বাহির হইয়া দক্ষিণে প্রায় তিন শত হাত দূরে এক উচ্চ বিস্তীর্ণ আয়তক্ষেত্র দেখা গেল। ইহার দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে এখনও প্রকাণ্ড উচ্চ প্রাকার রহিয়াছে। পাথর ও মাটি মিলাইয়া ইহা নির্ম্মিত; নিম্নের পরিখার মৃত্তিকা
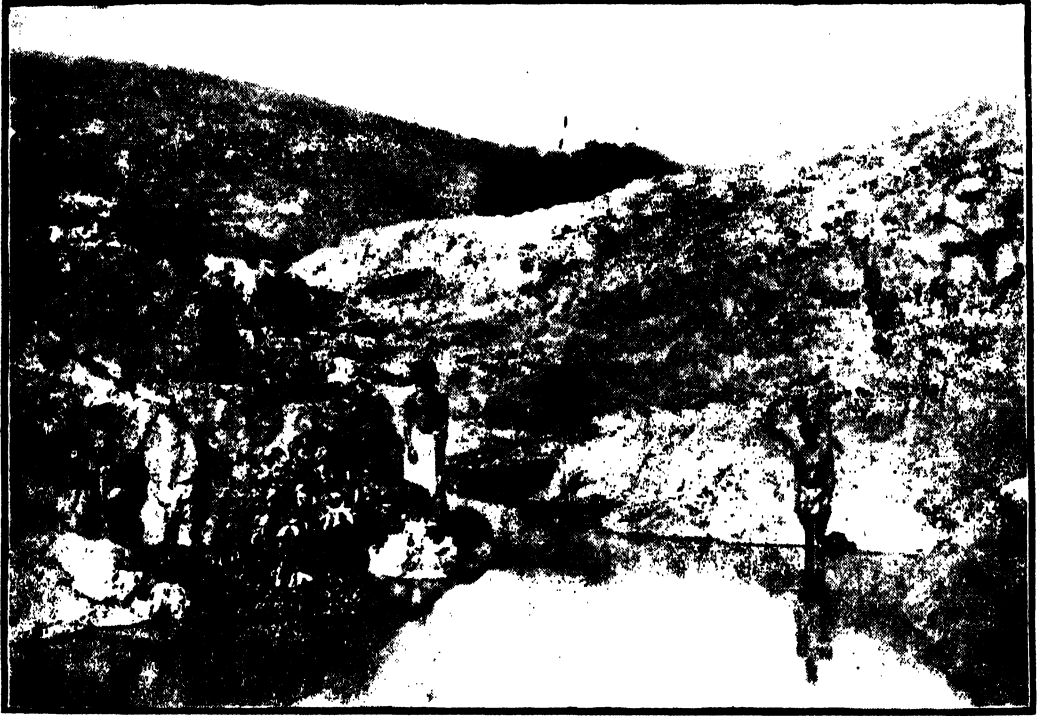
বাণগঙ্গা

আলাপ হয় নাই। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ষ্টেশন মাষ্টারের নির্দ্দেশ মত এক পাণ্ডাত্মজের সঙ্গে আমরাও সেই একই 'আনন্দবাই' ধর্ম্মশালায় গেলাম। এটি সকল হিন্দু ভ্রাতার জন্য, অন্য দুইটির মধ্যে একটি শ্বেতাম্বর ও অন্যটি দিগম্বর জৈন; অবশ্য স্থান থাকিলে দুইটিতেই হিন্দুদিগকেও স্থান দেওয়া হয়। ধর্ম্মশালা তখন মেরামত হইতেছিল, দুইটি ভাল কুঠারী সঙ্গোপাঙ্গ সন্ন্যাসীর অধিকৃত; আর একটির দরজা তখনই সামান্য মেরামত করাইয়া আমরা দখল করিলাম। এই কার্য্যে লাগিয়াছে। দক্ষিণের প্রাকার এখনও প্রায় অবিকৃত অবস্থায় আছে; ইহার মধ্যভাগে উন্মুক্ত পথ অর্থাৎ প্রাচীন তোরণদ্বার দিয়া দক্ষিণাভিমুখে গিরিব্রজের দিকে যাইতে হয়। প্রাকারবেষ্টিত এই বিস্তীর্ণ স্থানই নব রাজগৃহ; কোন মতে বিম্বিসারের, আবার কাহারও মতে অজাতশত্রুর প্রতিষ্ঠিত। গড় পার হইয়া যাইবার পথে ডাহিনে এক নব নিকুঞ্জে বর্ত্তমান ডাক বাংলা একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী দ্বারা বেষ্টিত। আরও কিয়দ্দূর দক্ষিণে

অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর নদীটি (বর্ত্তমান সরস্বতী) সেতুযোগে পার হইয়াই প্রাচীন গিরিব্রজের প্রবেশপথের দক্ষিণ পার্শ্বে ব্রহ্মকুণ্ড এবং মন্দিরাদি বৈভার পর্ব্বতের সানুদেশে দৃষ্ট হইল। নব রাজগৃহের কথায় সপ্তম শতাব্দীতে ইয়ুন-চাং লিখিয়াছেন, "নগরের বহিঃপ্রাকার নষ্ট হইয়া গিয়াছে; ভিতরের প্রকাণ্ড প্রাকারের ভিত্তি স্পষ্ট বর্ত্তমান। ইহার বেষ্টন ২০ লি (প্রায় ৪ মাইল), ইহাতে একটি তোরণদ্বার। তিনি উপরি-লিখিত সুবৃহৎ দক্ষিণ তোরণের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। আমি দুই দিন চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া স্থানের উত্তরভাগে; সম্ভবতঃ জলাভাব লোককে উত্তরের নিম্নভূমিতে বাস করিতে বাধ্য করিয়াছে। পূর্ব্বকালে তোরণদ্বারগুলি সুরক্ষিত থাকিত; রাত্রিকালে কাহারও প্রবেশ অধিকার ছিল না। গল্প আছে যে, রাজা বিম্বিসার স্বয়ং এক বৈকালে বুদ্ধদেবের দর্শনে গিরিস্থিত আশ্রমে গিয়া ফিরিয়া আসিতে রাত্রি হওয়ায় সহরের মধ্যে আসিতে পান নাই।

গিরিব্রজের বেষ্টন শৈলশ্রেণীর নাম বৈভার, বিপুল রত্ন-গিরি, উদয়গিরি এবং সোনাগিরি। উত্তরের প্রবেশদ্বারের
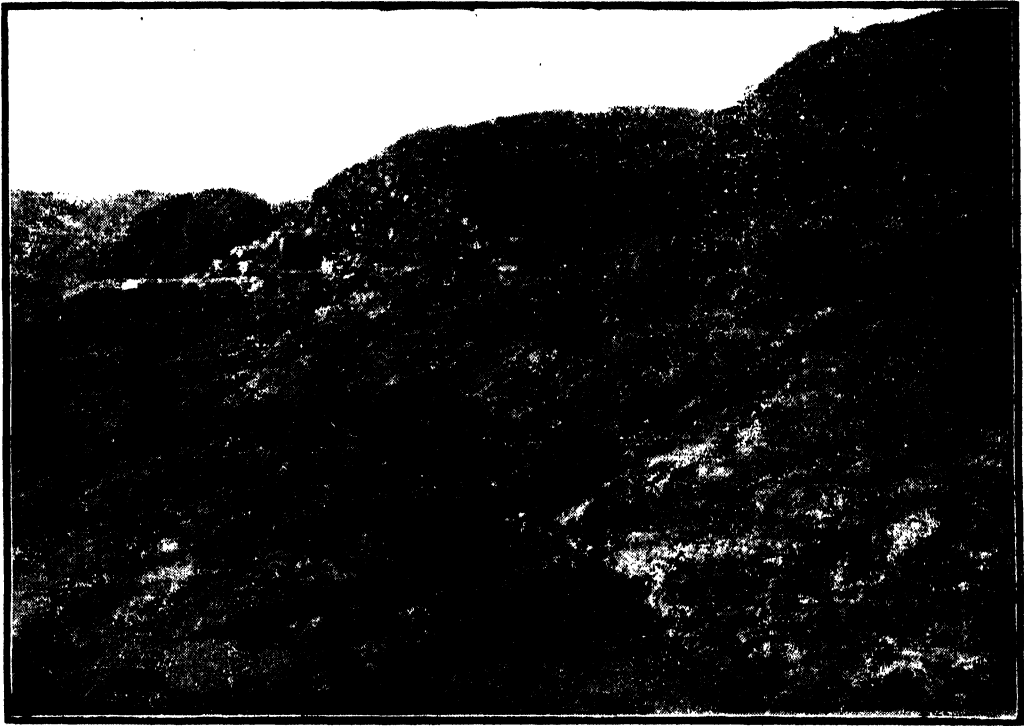
বাণগঙ্গার পার্শ্বস্থ প্রাচীন দুর্গ

আরও দুইটি দ্বারের চিহ্ন পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিকে লক্ষ্য করিয়াছি। বহিঃপ্রাকারের চিহ্ন ও পশ্চিম এবং পূর্ব্বভাগে এখনও আছে। পূর্ব্বদিকে গিরিয়াকূপের দিকে যাইবার এই পূর্ব্বদ্বার উল্লেখযোগ্য; এই পথেই বুদ্ধদেব সন্ন্যাস গ্রহণান্তে গয়া হইতে রাজগিরে প্রবেশ করেন বলিয়া উল্লেখ আছে। ইয়ুন-চাং নব রাজগৃহে মধ্যভাগই বিশেষ লক্ষ্য করিয়াছেন; ইহারই মধ্যভাগে পূর্ব্বকালে প্রাচীন নাগরিকগণের বাস ছিল। সাধারণ লোকের বাস এখন দক্ষিণ পার্শ্বে বৈভার, বাম পার্শ্বে বিপুল; বিপুলের দক্ষিণ-সংলগ্ন রত্নগিরি বা পাণ্ডব শৈল। দক্ষিণদিকে উদয়গিরি এবং তাহার পশ্চিমভাগে সোনাগিরি। পুরাকালের নির্ম্মিত এক বিরাট প্রস্তরপ্রাকার বিপুলের উত্তরদিক হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথমে পূর্ব্বাভিমুখে পরে দক্ষিণমুখে বিপুল ও রত্নগিরির সানুদেশ দিয়া উঠিয়া নামিয়া দক্ষিণের উক্ত উদয়গিরি এবং সোনাগিরির কিয়দংশ পর্য্যন্ত বেষ্টন করিয়া আছে। অবশ্য এ সমস্ত দেখিবার সুযোগ ঘটে নাই। এই

সাইক্লোপীয় (দানবী কীর্ত্তি) প্রাকার প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড-সংযোগে নির্ম্মিত; পৌরাণিক যুগে শৈল-রক্ষিত নগরকে সুরক্ষিত করিবার জন্য রচিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। রত্নগিরির দিকে শ্রীকৃষ্ণ-প্রদর্শিত পথে পাণ্ডবরা যখন নগর-প্রবেশ করেন, তখন ইহা ছিল কি না, কে বলিবে? শুনিলাম, উদয়গিরির দক্ষিণভাগে এই প্রাকারের উপরিভাগ এখনও এমন সুন্দর অবস্থায় আছে যে, মোটর চালান যাইতে পারে। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের বিবরণীতে দেখা যায়, এই প্রাকারের স্থানে স্থানে ভগ্ন হইয়া গেলেও অধিকাংশ দক্ষিণভাগে দৃষ্ট হয়; এই অংশ উত্তরভাগ হইতে অনেক বড়। ইহার পশ্চিমাংশে সোনাগিরি এবং বৈভারের মধ্যবর্ত্তী বনভূমি অবশ্যই প্রাচীন নগরের অংশ ছিল। এই দিকের একটা স্থানকে রঙ্গভূমি বলা হয়; জরাসন্ধ এই স্থানে কুস্তি কসরৎ করিতেন বলিয়া প্রবাদ, অনেকে এই জন্য ইহার মাটী লইয়া আইসেন; গায়ে মাখিয়া যদি পালোয়ান হইতে পারেন। এই তীর্থে পরিচিত আমার নববন্ধু প্রায় ৫০এর কাছে পৌছিয়াও রঙ্গভূমের মাটী লইবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইলেন; তিনি যৌবনে কুস্তিগীর

জরাসন্ধ বৈঠক

বর্ত্তমান, ইহা ২০ হইতে ১৪ ফুট্ প্রশস্ত, কোথাও উচ্চতা ১০১২ ফুট আছে। শৈলশ্রেণীর ভিতরের দিকে নিম্নভূমি দিয়া গিরিব্রজের মধ্যভাগ বেষ্টন করিয়া যে এক অন্তঃপ্রাকার পুরাকালে ছিল, তাহার চিহ্নও অনেক স্থানে বর্ত্তমান; তদ্দৃষ্টে প্রত্নতত্ত্ববিভাগের মানচিত্রও রচিত হইয়াছে। এই ভিতরের প্রাচীরের বেষ্টন প্রায় ৫ মাইল; বহিঃপ্রাকারের পরিমাণ ২৫ মাইলের কম নহে। প্রাকারবেষ্টিত প্রাচীন গিরিব্রজের ধ্বংসাবশেষের কিছু কিছু চিহ্ন এখনও ছিলেন, এক বার তাঁহারা দুই ভ্রাতায় লাঠি লইয়া প্রায় শত জন লোককে জমী দখলে বাধা দিয়াছেন বলিয়া গল্প করেন।

গিরিব্রজ বা ইয়ুন্-চাং কথিত কুশাগারপুর যুগ যুগান্তর ধরিয়া রাজধানী ছিল। ফা-হায়েনের মতে কয়েকবার অগ্নিদাহে প্রাচীন নগর নষ্ট হইয়া গেলে অজাতশত্রু ইহার উত্তরভাগে পরিখাবেষ্টিত স্থানে নব রাজগৃহ নির্ম্মাণ করান। কোন কোন মতে বিম্বিসারই স্থাপনকর্ত্তা; পিতার পত্তন

এবং পুত্রের স্থাপন এই দুই কথাই সত্য হইতে পারে (৫৫২ হইতে ৫৪০ খৃঃ পূঃ)। রামায়ণ মহাভারত দুই মহাকাব্যেই গিরিব্রজ সুন্দর উপবন এবং শস্য-সম্ভারপূর্ণ ক্ষেত্রমধ্যে শৈলবেষ্টিত লতাপাদপ এবং মনোহর হর্ম্ম্য-শোভিত সমৃদ্ধিশালী নগর বলিয়া বর্ণিত। ইহা বাহিরের রাজগৃহের সম্বন্ধে খাটে না। যাঁহারা এই দুই গ্রন্থকে অর্ব্বাচীন প্রতিপন্ন করিতে চান, তাঁহাদিগকে এই বিষয়টি লক্ষ্য করিতে বলি। মহাবস্তু অবদানে "রম্যকাননবনে সমৃদ্ধে মগধস্য মগধাধিপস্য পুরবারে" আছে। এই উক্তি পর্ব্বতমধ্যবর্ত্তী প্রাচীন গিরিব্রজ বিষয়ে নহে। ইয়ুন্-চাং 'মালেব শোভতে' লিখিয়া তৃপ্ত হইতে পারেন। বৌদ্ধ-গ্রন্থে এই স্রোতস্বতীর নাম 'তপোদা'। বৈভারের পার্শ্বের উষ্ণ প্রস্রবণগুলির এবং তাহার নীচে ব্রহ্মকুণ্ডের উষ্ণ জলের নিমিত্ত এই নামকরণ। বিনয় গ্রন্থে লিখিত আছে, মহাস্থবির মোগলান (মৌদ্গলায়ন) এক সময়ে বলিয়াছিলেন, "তপোদা গভীর শীতল স্থির উজ্জ্বল, মৎস্য-কচ্ছপপূর্ণ, পুষ্পিত পদ্মশোভিত, কিন্তু ক্ষীণভাবে প্রবাহিত"— তাহাতে বুদ্ধদেব উত্তর দেন যে, 'দুই নরকের মধ্য দিয়া প্রবাহিত বলিয়া এত ক্ষীণ।' বৈভার এবং বিপুল—উভয়ের পার্শ্বে যে দুই শ্রেণী উষ্ণ প্রস্রবণ, তাহারা এখানে নরকের দ্বার বলিয়া কথিত।

মনিয়ার মঠ

পশ্চিপার্শ্বে সুবর্ণ বর্ণের সুগন্ধি পুষ্পিত কনক তরুপূর্ণ উপবন বসন্তে দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করার বর্ণনা দিয়াছেন। আমরা এ যুগে কার্ত্তিকে গিয়া পুষ্পিত কর্ণিকারের চিহ্ন পাইলাম না; পর্ব্বতবেষ্টিত ত্যক্ত উপত্যকায় ও পাহাড়ের গায়ে জঙ্গলা গাছই খুব দেখিলাম। অবশ্য এ কালে সে রামও নাই, অযোধ্যাও নাই। ক্ষুদ্রসরিৎ 'সুমগধা' সরস্বতী রামায়ণে 'রম্যা' হইলেও এ কলিযুগে ক্ষীণতনু; তবে কবি এখনও এ কালে বৈভার গিরির পাদমূলে ব্রহ্মকুণ্ড এবং উপরের সাতটি ঝরণা গুহা ও মন্দিরাদি দ্বারা সজ্জিত হইয়া হিন্দুর তীর্থ হইয়াছে; বামে বিপুলের পার্শ্বের উষ্ণ ঝরণা। মক্‌দুম শার দরগার অধিকৃত হইয়াছে মুসলমানের অংশে পড়িয়াছে। এই দরগাটি বড়ই রমণীয়; উপরের দিকে তরুগুল্ম শোভিত নির্জ্জন স্থানের মধ্যে মস্‌জিদ।

প্রাচীন গিরিব্রজের প্রবেশ-পথের দুই দিকে স্থানে

স্থানে রক্ষিগণের থানার জন্য প্রস্তর-নির্ম্মিত ক্ষুদ্র গৃহ ছিল; দুই পার্শ্বের পাহাড়ের গাত্রে এইরূপ রক্ষিনিবাসের ভগ্নাবশেষ (watch tower) এখনও আছে। ভিতরের দিকে দক্ষিণমুখে কিছুদূর গিয়া এক স্তম্ভাকৃতি গৃহের অংশ দেখা যায়। ইহার প্রাচীন প্রস্তর-পীঠের নিম্ন ভাগে গণেশ, বিষ্ণু, এবং লিঙ্গমূর্ত্তি ও এক নাগ-নাগিনী মূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে। পুরাতত্ত্ব বিভাগের বিবরণীতে ইহাকে মণিয়ার মঠ বলা হইয়াছে নীচের মূর্ত্তিগুলি দেখিয়া এটি গুপ্ত-অধিকারে নির্ম্মিত বলা হয়; লোক মনে করে, পূর্ব্বকালের রাজাদিগের ধনাগার এই স্থানে ছিল তাই নাগ-রক্ষিত। অনেকে কিন্তু প্রাচীন কালে গণেশ বা বিষ্ণু-মূর্ত্তির অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। মার্শাল মণিয়ার মঠের আকৃতি দেখিয়া সমস্তটাকেই এক প্রকাণ্ড লিঙ্গের আকার বলিয়া ধারণা করেন। আবার বলেন, হয় ত বৌদ্ধ স্তূপ ছিল, লোক খুঁড়িয়া ধনরত্ন বাহির করিবার উদ্যমে ঐরূপ করিয়া ফেলিয়াছে। এ মঠের উত্তর পশ্চিমে তিনি এক রক্ত প্রস্তরের মূর্ত্তির পাদপীঠ দেখিয়াছেন। এই স্থানের কিছুদূর দক্ষিণে এক খণ্ড বড় পাথরের উপরের অল্প গর্ত্তগুলি স্থানীয় লোক ভীম-জরাসন্ধের মল্লযুদ্ধের সময়ের হাঁটুর দাগ বলিয়া গল্প করে। বৈভর পর্ব্বতের দক্ষিণ গাত্রে সোণ ভাণ্ডার গুহা; ইহা এখনও অবিকৃত অবস্থায় রহিয়াছে। ইহার মধ্যে বৌদ্ধ যুগের মূর্ত্তি এবং দুই এক স্থানে লিপি আছে। ব্রহ্মকুণ্ড এবং নিকটস্থ উষ্ণ প্রস্রবণগুলির উপরিভাগে এই বৈভর পর্ব্বতেই আর একটি প্রস্তরগুহা আছে—ইহাকেই অনেকে প্রাচীন পিপ্পল গুহা মনে করেন। অন্য প্রাচীন ভগ্নাবশেষ দেখা গেল না এ কালে জৈনগণ প্রায় সকল পর্ব্বতের উপরেই মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। গিরিব্রজ হইতে রাজগৃহের দিকে আসিতে ডাহিনে এক উচ্চ স্থানে পূর্ব্বে বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ছিল মনে হয়; পাথর ও প্রাচীন ইট অনেক পড়িয়া আছে এবং লোক এখন ইহাকে অন্য প্রকার দেবতার স্থান করিয়া লইয়াছে। গিরিব্রজে প্রবেশ-পথের ডাহিনেই এক তপোবন ও সাধুর আবাস এখনও রহিয়াছে; ইহাকে প্রাচীন তপোদারামের স্থান বলিয়া কেহ কেহ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

এখানে প্রাচীন চীনদেশীয় পরিব্রাজকদ্বয়ের রাজগৃহ সম্বন্ধে বর্ণনা সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি। খৃষ্ট পঞ্চম শতাব্দের প্রথম ভাগে ফা-হায়েন লিখিয়াছেন:—"অজাতশত্রু এই নগর নির্ম্মাণ করেন। এখানে দুইটি সঙ্ঘারাম আছে; নগরের পশ্চিম দ্বার হইতে তিন শত পা গিয়া এক স্তূপ পাওয়া যায়, ইহা রাজা অজাতশত্রু নিজ অংশে বুদ্ধদেবের যে সমস্ত স্মৃতিচিহ্ন পাইয়াছিলেন, তাহার উপরে নির্ম্মাণ করান; এটি খুব উচ্চ। নগরের দক্ষিণ দিকে ৪ লি গিয়া পঞ্চশৈল-বেষ্টিত উপত্যকায় পৌঁছিলাম; পাহাড়গুলি নগর-প্রাচীরের মত এই স্থানকে ঘিরিয়া আছে। ইহাই বিম্বিসারের পুরাতন নগর; পূর্ব্ব-পশ্চিমে ইহা ৫।৬ লি এবং উত্তর-দক্ষিণে ৭।৮ লি। এখানেই সারিপুত্র ও মৌদ্গলায়ন প্রথমে অশ্বজিতের সাক্ষাৎ পান (ইয়ুন চাংএর বিবরণ দ্রষ্টব্য); এখানে নিগ্রন্থ এক অগ্নিকুণ্ড করে ও বুদ্ধদেবকে বিষাক্ত খাদ্য খাইতে দেয় এবং এই স্থানেই অজাতশত্রু কাল হস্তীকে মত্ত করাইয়া বুদ্ধের নিধনের চেষ্টা করে। নগরের উত্তর-পশ্চিমে এক বক্র উপত্যকায় রাজবৈদ্য জীবক অম্বাপলির (এক বেশ্যা যে শেষে সাধু তপস্বিনী হয়) বাগানে এক বিহার নির্ম্মাণ করাইয়া সশিষ্য বুদ্ধদেবকে ঐ ধর্ম্মরতা কামিনীর পূজোপহার গ্রহণের নিমন্ত্রণ করেন। এখানে এখনও ধ্বংসাবশেষ আছে, কিন্তু নগরের ভিতরে সবই ছিন্ন ভিন্ন—অধিবাসী নাই। উপত্যকা দিয়া দক্ষিণ-পূর্ব্বে পাহাড়ে ১৫ লি উঠিয়া গৃধ্রকূটে উপনীত হইলাম; ইহার চূড়া হইতে ৩ লি দূরে এক দক্ষিণমুখী পর্ব্বতগুহা; এখানে বুদ্ধদেব সাধনা করিতেন এবং ইহার ৩০ পা উত্তর-পশ্চিমের গুহায় আনন্দ জপ করিতেন। মার পিশুন গৃধ্ররূপ ধারণ করিয়া গুহার মুখে দাঁড়াইয়া আনন্দকে ভয় দেখাইলে বুদ্ধদেব অলৌকিক ক্ষমতায় পাহাড় ভেদ করিয়া হাত বাড়াইয়া আনন্দের কাঁধ চাপড়াইয়া অভয় দেন। পক্ষীর এবং হস্তের চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান। এই জন্যই ইহাকে গৃধ্রকূট বলে। এখানে কয়েক শত গুহা আছে; অর্হৎগণ তথায় চিন্তামগ্ন থাকিতেন। এই স্থানেই যখন বুদ্ধদেব নিজ গুহার সম্মুখে পাদচারণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে দেবদত্ত উত্তরের উচ্চ স্থান হইতে এক পাথর গড়াইয়া দিয়া তাঁহার পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে আঘাত দেয়।

পাথরখানি এখনও এখানে আছে। বুদ্ধদেব যে গৃহে উপদেশ দিতেন তাহা নষ্ট হইয়াছে, ইটের ভিতের চিহ্ন আছে। এই পর্ব্বতের শিখরদেশ বড় মনোরম (গৃধ্রকূটে ফুল-জল দিতে উঠিলে ফা-হায়েন্‌কে বাঘে তাড়া দিয়াছিল)।

গৃধ্রকূট পর্ব্বত

"পুরাতন নগরের ৩০০ পদ উত্তরে রাস্তার পশ্চিমে কালন্দ বেণুবন বিহার; ইহা এখনও আছে, সাধুগণ এই স্থান পরিষ্কার রাখেন এবং গাছপালায় জল দেন। ইহার ২।৩ লি উত্তরে শ্মশান। দক্ষিণের (অর্থাৎ নূতন রাজগৃহের দক্ষিণ) পাহাড়ের পার্শ্বে ৩০০ পা পশ্চিম মুখে গেলে এক প্রস্তর গুহা দেখা যায়; ইহাই পিপ্পল গুহা, এখানে বুদ্ধদেব মধ্যাহ্নে আহারের পর চিন্তায় বসিতেন। পাহাড়ের উত্তর পার্শ্বে আরও ৫।৬ লি পশ্চিমে এক প্রস্তর-গুহা আছে; এখানেই বুদ্ধনির্ব্বাণের পরে ৫ শত অর্হৎ মিলিত হইয়া বৌদ্ধ-ধর্ম্মশাস্ত্র সঙ্কলন করিয়াছিলেন। (সভার কিছু বিবরণের পর বলিয়াছেন) এই স্থানে পূর্ব্বে এক স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা এখনও আছে; এই পাহাড়ের পার্শ্বে অনেক গুহা রহিয়াছে। পুরাতন নগর ছাড়িয়া উত্তর-পূর্ব্বে ৩ লি গেলে দেবদত্তের প্রস্তরনির্ম্মিত গুহা দেখা যায়; তাহার ৫০ পা দূরে এক কৃষ্ণপ্রস্তর আছে, এই পাথরের উপর আত্মহত্যা করিয়া এক অর্হৎ নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হন।"

ইয়ুন্-চাং কুশাগারপুর (সুগন্ধি ঘাসের সহর) পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত এবং উত্তর-দক্ষিণে কিছু কম বলেন—তাহাই ঠিক (ফা-হায়েন্ হয় ত প্রাচীরবেষ্টিত প্রাচীন নগরের দৈর্ঘ্য বিস্তারের কথা বলেন)। "ইহার বেষ্টন ১৫০ লি এবং মধ্যস্থিত প্রাচীন নগরের ভগ্ন প্রাকারের বেষ্টন ৩০ লি। পথের উভয় পার্শ্বে সুগন্ধি কলিকা ফুলের গাছ বসন্তকালে স্থানটিকে সুবর্ণবর্ণ করিয়া তুলে। নগরদ্বারের বাহিরে এক স্তূপ আছে, এই স্থানে দেবদত্ত এবং অজাতশত্রু যোগ করিয়া তথাগতকে মারিবার জন্য মত্ত হস্তী ছাড়িয়া দেয়, কিন্তু বুদ্ধদেবের পাঁচ অঙ্গুলি হইতে পাঁচটি সিংহ বাহির হইয়া হস্তীকে অভিভূত করে। এই স্থানটির উত্তর-পূর্ব্বে এক স্তূপ আছে, যেখানে সারিপুত্র ভিক্ষু অশ্বজিতের নিকট ধর্ম্মোপদেশ পাইয়া অর্হৎ হন। ইহার কিছু দূরেই শ্রীগুপ্ত গর্ত্তের মধ্যে অগ্নি রাখিয়া ও বিষমিশ্রিত খাদ্য দিয়া বুদ্ধের নিধনের উদ্যোগ করে।

বুদ্ধদেবের বাসের নিমিত্ত ভিষক জীবক যে বিহার নির্ম্মাণ করাইয়া দেন, তাহার এবং জীবকের নিজ বাটীর ধ্বংসাবশেষ ইয়ুন্-চাং দেখিয়াছেন বলেন। চীন পর্য্যটকরা কিছু বা স্বয়ং দেখিয়া এবং কতক লোকমুখে শুনিয়া প্রাচীন গুহা-গৃহাদির স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন মনে হয়। এই

জীবক বিম্বিসারের উপপত্নীর গর্ভজাত পুত্র; ইনি বুদ্ধদেবের প্রিয় ভক্ত ছিলেন; তক্ষশীলায় বিদ্যালাভের পরে রাজগৃহে থাকিতেন। বৃদ্ধ বিম্বিসার গৃধ্রকূট পর্য্যন্ত বুদ্ধের সাক্ষাৎলাভে যাইতে অশক্ত বলিয়া জীবক নিজ বাগানবাটীতে মঠ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। গৃধ্রকূটের কথায় ইয়ুন্-চাং বলেন, বিম্বিসার নীচে হইতে এই পাহাড়ের উপর পর্য্যন্ত এক পথ নির্ম্মাণ করান। এই পাহাড়ের উপর এক প্রকাণ্ড ইষ্টকালয় ইয়ুন-চাং লক্ষ্য করিয়াছেন, সেখানে নাকি বুদ্ধদেব ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। সম্ভবতঃ ফা-হায়েনের সময়ের পরে কোন ধনী বৌদ্ধ এই গৃহ-নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; সেখানে তখন বুদ্ধদেবের উপদেষ্টা ভাবের এক মূর্ত্তি ছিল। দেবদত্তের প্রক্ষিপ্ত প্রস্তরখানিও ইয়ুন্-চাং দেখিয়াছেন এবং তাহার পরিমাণ ৯ হাত উচ্চ এবং চারিদিক্ ৩০ পদ। যেখানে বুদ্ধদেব 'সদ্ধর্ম্ম পুণ্ডরিক সূত্র' উপদেশ দেন, তাহাও পরিব্রাজক লক্ষ্য করিয়াছেন; মারের শকুনরূপে ভয় দেখাইবার কথা ফা-হায়েনের অনুরূপ। 'সদ্ধর্ম্ম সূত্র' যে কোন্ যুগে রচিত, ধার্ম্মিক পরিব্রাজক তাহা চিন্তা করেন নাই। গৃধ্রকূট কোন্‌টি ইহা লইয়া একালে তর্কবিতর্ক চলিয়াছে। কানিংহাম বলিয়া গিয়াছেন, শৈলগিরিই গৃধ্রকূট—এখানে কিন্তু গুহা নাই। দক্ষিণের পাহাড়ে অনেক গুহা আছে এবং প্রাচীনকালে মুনি-ঋষির তপস্যার ক্ষেত্র ছিল;—এখনও কোন সময়ে সাধকের ত্যক্ত ভস্মাদি দেখা যায়, রাজগিরের লোকের মুখে শুনিয়াছি। অজাতশত্রু বৃদ্ধ পিতাকে 'তপনগেহে' বন্দী রাখেন, আবার সেই স্থান হইতে বিম্বিসার গৃধ্রকূটে বুদ্ধদেবের বাসগৃহ দেখিতে পাইতেন, এই কথাও বৌদ্ধগ্রন্থে আছে। শতধারা উষ্ণ ও শীতল প্রস্রবণের কথায় ইয়ুন-চাং বলেন, সেকালেও ঝরণাগুলির মুখ সিংহ, হস্তী প্রভৃতির মত নির্ম্মিত ছিল এবং সমস্ত জল পাথর-বাঁধান চৌবাচ্চায় আসিয়া পড়িত। নানা স্থান হইতে লোক আসিয়া এই জলে স্নান করিয়া ব্যাধিমুক্ত হইত। এই স্থানের উপরের দিকে একালের মত তখনও সাধু-সন্ন্যাসী বাসের গৃহ ছিল এবং ইহার পশ্চিমেই পিপ্পল গুহার স্থান পরিব্রাজক নির্দ্দেশ করিয়াছেন ও ইহার পশ্চাদ্-দ্বার অসুরপুরীর সহিত সংযুক্ত বলিয়া এক গল্পের অবতারণা হইয়াছে।

কালন্দ বেণুবন এবং কালন্দক নিবাপ (পুষ্করিণী) ইত্যাদির কথা অনেক বলিয়া ইয়ুন্-চাং লিখিয়াছেন, বেণুবন হইতে ৫।৬ লি দক্ষিণ-পশ্চিমে এক প্রকাণ্ড গুহা ছিল, সেখানে মহাকাশ্যপ ৯৯৯ জন অর্হৎসহ বুদ্ধের লোকান্তরের পর এক সভায় ত্রিপিটক সঙ্কলন করেন এবং ইহার ২০ লি পশ্চিমে এক অশোক-স্তম্ভ এবং স্তূপ ছিল। এই শেষোক্ত স্থানে অবশিষ্ট অর্হৎগণ সমবেত হইয়া, 'মহাসঙ্ঘিকী নিকায়' শাস্ত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। সিংহলী মহাবংশে বৈভার পর্ব্বতের নীচে সপ্তপর্ণী গুহায় প্রথম সঙ্গীতি হইয়াছিল নির্দ্দেশ থাকায়, এখন এই মতই গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু সপ্তপর্ণীর অবস্থান লইয়া গোল আছে। মার্শাল অনেক কথার পরে সিংহলী ও চীনা মতের সামঞ্জস্য করিয়া বৈভার গিরির উত্তর পার্শ্বে ব্রহ্মকুণ্ডাদি হইতে অনেকটা দূরে সপ্তপর্ণীর স্থান দেখাইতে চান। আমি অনেক দূর পর্য্যন্ত ঐ দিকে বেড়াইয়া কোন গুহা দেখিতে পাই নাই, তবে গুহা-পথ ভাঙ্গিয়া নীচে পড়িলে যেরূপ হয়, ঐ ভাবে পাথর অনেক স্থানে পড়িয়া আছে। ফা-হায়েন এই গুহাকে 'চা-টী' বলেন, ইহা চৈত্য হইতে পারে। সুপ্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীতি রাজগৃহে হইয়াছিল, এইমাত্র লেখা আছে।

রাজগৃহের বর্ণনায় ইয়ুন-চাং গল্পের সঙ্গে বলেন, কুশাগারপুর বারংবার পুড়িয়া যাওয়ার পরে নব-নগর নির্ম্মিত হয়; ইহার অন্তঃপ্রাকার এখনও সম্পূর্ণ আছে এবং নগরের বেষ্টন ২০ লি (অশোকের সময়ে তিনি, এই স্থান ব্রাহ্মণকে বাসের জন্য দেওয়া হয়, এ কথাও লিখিয়াছেন); রাজগৃহের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বিদেশী ভিক্ষুর নিমিত্ত দুই মঠ ছিল। গৃহপতি জ্যোতিষ্কের জন্ম-কথায় অনেক স্থান পূর্ণ করিয়া রাজগৃহের বিবরণ শেষ করা হইয়াছে। সম্প্রতি রাজগৃহের মধ্যে মধ্যে নানা স্থানে খুঁড়িয়া পুরাতত্ত্ব বিভাগ অধিক কিছু করিতে পারেন নাই। পূর্ব্বে এখানে কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহেও ধনীলোকরা বাস করিতেন। ধর্ম্মপদের টীকায় এক স্থানে রাজার কাষ্ঠপ্রাসাদের এবং শেঠের সপ্ততলা হর্ম্ম্যের গল্প আছে; জ্যোতিষ্ক শেঠের আবাস বাটী শেষোক্ত রূপ। আমি খনিত স্থান হইতে দুই তিনখানি ক্ষুদ্র বেধের প্রাচীন ইট লইয়াই ক্ষুণ্ণ মনে রাজগৃহ ছাড়িয়াছিলাম। শ্বেতাম্বর সমাজের জৈনরা এখন এখানে বাটী নির্ম্মাণ করাইতেছেন; ক্রমে লোকসমাগমে ও অনুসন্ধানে অনেক কথা জানিবার সম্ভাবনা আছে।

শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

পুলিসের কাণ্ড

হ্যা, ভিড় হইয়াছিল বটে! সকলেই বলিল—কুম্ভমেলা 'অনেক' দেখিয়াছে, কিন্তু এমন ভিড় কেহ কখনও দেখে নাই। কলিকাতার পথ ঘাট মাঠ সব যেন কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছে নরমুণ্ড আর নরমুণ্ড। সকল খবরের কাগজেই খবর ছাপা হইল, এমন ভিড় কেহ কোথাও দেখে নাই। এক দল লোক আছে, যাহারা খবরের কাগজের খবর মাত্রেরই উপর অনাস্থাবান্, ভিড় সম্বন্ধে তাহাদের উক্তরূপ মত থাকিলেও খবরের কাগজ পড়িয়া উপেক্ষার হাসি হাসিয়া বলিল—খবরের কাগজের মজাই ঐ। গরমের সময় ফি বছরই বলবে, এ বছরের মত গরম কোন কালে হয় নাই। শীতের সময় ঐ কথা। বর্ষা যদি একটু বেশী হইল, অমনই সেই কথা, এমন বর্ষা কেহ কখনও দেখে নাই। কায কর্ম্ম ত নাই, বসিয়া বসিয়া আর কি করে!

আসল কথাটা এই যে, তাহারা খবরের কাগজের খবরে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহে। তাহাদের ধারণা, খবরের কাগজগুলা গুজবের সৃষ্টিকর্ত্তা। যাহা হউক, এ হেন মনোভাবসম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যা খুবই কম; নতুবা খবরের কাগজগুলাকে রীতিমত একাদশী করিতে হইত।

আগে অন্যত্র এমন ভিড় কেহ দেখিয়া থাকুক বা না থাকুক, তাহাতে কিছুই আসে যায় না। খুব ভিড় হইয়াছে, ইহা ত কেহ অস্বীকার করিতেছে না। তাহা হইলেই হইল।

সেই ভিড়ে, গঙ্গার ধারে আঠারো উনিশ বছরের এক মেয়ে সঙ্গিহারা হইয়া দুইচার দল ভলান্টিয়ারের আশ্রয়প্রাপ্ত হইল। আঁচড়া-আঁচড়ি, কামড়া-কামড়ি, ধাক্কা-ধাক্কি করিয়া, নিজেদের ও পরেদের মধ্যে মেয়েটিকে তাহারা গঙ্গাতটের রাস্তা হইতে খানিকদূরে একটা অপেক্ষাকৃত ফাঁকা জায়গায় আনিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। মেয়েটি কোন কথাই বলে না, কেবল কাঁদে।

বাঙ্গালীর জীবনে রোম্যান্সের বড়ই অভাব (বিশেষজ্ঞগণ বলেন, আজকাল চিরদিনের অবরুদ্ধ পথ ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হইয়া আসিতেছে)- যাহারা মেয়েটিকে নিমতলা ঘাটের সোপানশ্রেণী হইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছে, ভিড় জমাইবার পক্ষে তাহারাই যথেষ্ট ছিল; পরে মুখে মুখে খবরটা প্রচারিত হওয়ায় অনেকেই স্ব স্ব স্থানে ও কার্য্যে আবদ্ধ থাকিতে পারিল না।

মেয়েটির একটা ব্যবস্থা করিবার জন্য নানা প্রকার প্রস্তাব নানা জনের মুখ হইতে আগ্রহভরে বাহির হইতে লাগিল। কিন্তু আশ্চর্য্য সেই মেয়েটি! সে না মুখ তুলিল; না মুখ খুলিল। মুখে কাপড় গুঁজিয়া, চোখে কাপড় দিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া সে শুধুই কাঁদিতেছে। এবং ইহাও সত্য যে, তাহার ভাবী আশ্রয়দাতৃগণ যতই পরামর্শ উদ্ভাবন করিতেছে, তাহার ক্রন্দন-বেগ ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। শেষে এমন হইল যে, স্বেচ্ছাসেবকগণ পুলিস-শরণ লওয়া ছাড়া আর যে কি উপায় থাকিতে পারে, তাহা ভাবিয়াই পাইল না।

এমন সময়ে একটা লোক ভিড় ঠেলিয়া, এক লাফে কাছে আসিয়া "এই যে ননী"- বলিয়া মেয়েটির একটা হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে কুতূহলী জনসঙ্ঘকে দ্বিধা-বিভক্ত করিয়া বাহিরে যাইবার চেষ্টা করিল। জনসঙ্ঘ হইতে কেহ কেহ বলিয়া উঠিল; ও, আপনারই লোক! বেহুঁসের মত এমন কাযও করে! বেয়াক্কেলে একেবারে! —ইত্যাদি মুখরোচক ও কালোপযোগী শব্দে ও ভাষায় তাহারা স্পষ্ট বিরক্তি জানাইয়া দিতে লাগিল।

লোকটা পাড়াগেঁয়ে ভূত, উহার যে ফাঁসী হওয়া উচিত - ইহা সাব্যস্ত হইতেও বেশী বিলম্ব হইল না। লোকটা

ভিড় ঠেলিয়া বাহিরে যাইতে যাইতে সব কথাই শুনিতে পাইল, কিন্তু কাহারও কোন কথার কোন উত্তর দিল না অথবা দিবার দরকার বুঝিল না।

মেয়েটি তখন আর কাঁদিতেছিল না বটে; কিন্তু বেশ স্বচ্ছন্দ গতিতে চলিতেও পারিতেছিল না। লোকটি যদি তাহাকে টানিয়া হিচড়াইয়া না লইয়া যাইত, তবে সে হয় ত সেইখানেই আবার বসিয়া পড়িত। কিন্তু লোকটির দেহে অসুরের বল, ননীকে সে একটা ক্ষুদ্র পুঁটুলীর মত অবলীলাক্রমে টানিয়া লইয়া গেল।

বিডন ষ্ট্রীটের মোড়ে আসিয়া সে একখানা খালি ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া, ননীকে উঠাইয়া এক নিমেষে অদৃশ্য হইয়া গেল।

অতিমাত্রায় কৌতূহলী ও পরোপকারপরায়ণ দুই তিন জন ভলান্টিয়ার এতদূর পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়াছিল। ট্যাক্সির নম্বরটা খাতায় তুলিয়া লইয়া তাহারা বিজিত সৈনিকের মত স্বস্থানে ফিরিয়া গেল।

২

গল্প এইখানেই আরম্ভ।

মেয়েটি ট্যাক্সিতে উঠিয়া হক্‌চকাইয়া গিয়াছিল। বাসায় পৌঁছিয়া তাহার উদ্ধারকর্ত্তা বলিল, "তুমি ভয় পাইও না, তোমাকে তোমার আত্মীয়দের কাছে পৌঁছাইয়া দিব।"

মেয়েটি এতক্ষণে কথা কহিল—"আমার বাবা, মা, মাসী মা—এঁরা সব কোথায়?"

"এখন তাঁরা কোথায়, তা ত জানি না। তাঁদের আমি সন্ধ্যের আগে হেদোর মোড়ে দেখেছিলুম, কান্নাকাটি করছিলেন। তাঁদের কাছেই শুনি, মেয়েটির বয়স সতেরো-আঠারো, নাম ননী; রং শ্যামবর্ণ; নিমতলাঘাটে স্নান ক'রে উঠবার সময় হ'তে আর তাকে দেখিতে পাচ্ছি না। লোকে পুলিসে খবর দিতে বলছে, কিন্তু পুলিসকে তাঁরা বড় ভয় করেন, যেতে সাহস হচ্ছে না। তবে কংগ্রেস আফিসে খবর দিতে এক জন লোক গিয়েছে। আমি বেড়াতে বার হয়েছিলেম, ঘাটগুলিতে কি রকম ভিড় হয়েছে দেখতে গিয়ে এক জায়গায় শুনি, লোকে একটি উনিশ-কুড়ি বছরের মেয়ে হারান'র কথা বলছে। অল্প দূরে একটা মস্ত ভিড়। ভিড়ের কাছে এসে উঁকি দিতেই তোমাকে দেখলাম। তার পর ত তুমি জান।"

মেয়েটি বলিল, "আমার বাবাকে যেখানে দেখেছিলেন, সেখানে খোঁজ করলে হয় না?"

"সেইখান দিয়েই ত এলাম। তাঁরা সেখানে নাই।"

"তবে কি হবে?"—মেয়েটি আবার কাঁদিতে লাগিল।

লোকটির নাম নিরঞ্জন। নিরঞ্জন বলিল, "কেঁদ না, সন্ধান মিলবেই। তোমাদের বাড়ী কোথায় বল?"

ননী বলিল, "রাকুশপুর।"

"সে কোথায়? পোষ্টাফিসের নাম কি?"

"মেয়েটি নির্ব্বাক্।"

"তোমার বাবার নাম কি?"

"হাজারী বাবু। সরকার।"

"কোন্ জেলায় তোমাদের বাড়ী?"

মেয়েটি তাহাও জানে না।

এত বড় বয়সের মেয়ে স্বগ্রামের পোষ্টআফিসের নাম বলিতে পারে না, ইহা বিস্ময়ের কথা, সন্দেহ নাই। নিরঞ্জন বিমর্ষ হইয়া পড়িল।

"পোষ্টাফিসের নাম ত জান না, কোন্ ষ্টেশনে উঠেছিলে, বলতে পার?"

"ষ্টেশন কি?"

নিরঞ্জন সত্যই প্রমাদ গণিল।

"কিসে ক'রে এসেছিলে?"

"নৌকোয়।"

"সে নৌকো কোথায়?"

"তা জানি নে।"

"ক'দিন এসেছ?"

"তিন দিন।"

"কোথায় ছিলে?"

"সে একটা বাসায়—কোথায় তা জানি নে।"—বলিতে বলিতে মেয়েটি আবার কাঁদিয়া ফেলিল।

নিরঞ্জন তাহাকে কি বলিয়া অভয় দিবে, তাহা ভাবিয়া পাইল না। বাস্তবিক ব্যাপারটা যত সহজ সে মনে করিয়াছিল, তাহা ত নয়ই; বরং যথেষ্ট দুর্ব্বোধ বোধ হইতেছে। কিন্তু বাহিরে সে ভাবটা না দেখাইয়া বলিল, "তুমি ভয় করো না ননী, যেমন ক'রেই হোক্ খবর পাওয়া যাবে। যে ক'দিন না পাওয়া যায়, তুমি এখানে নিশ্চিন্ত থাক। আমার দ্বারা তোমার কোন অনিষ্ট হ'বে না।"

গেঁথেছি—

বসুমতী প্রেস

শিল্পী শ্রীচঞ্চলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

একটু থামিয়া আবার বলিল, "তুমি ও রকম ক'রে ব'সে থেক না, ওঠ। হাত-পা ধোও, কাপড় ছেড়ে ফেল। ও কি—ও কাপড় ভিজে বুঝি? গায়েই শুকিয়ে যাচ্ছে! ওঠ, ও—ছেড়ে ফেল। সাড়ী কোথায় পাব—ঐ আলনা থেকে একখানা ধুতি টেনে নিয়ে পর গে। আমি খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে ফেলি।"

ননী বলিল, "আমি খাব না।"

"কেন, খাবে না কেন? উপোস ক'রে থাক্‌লে ফল হবে কিছু! নাও, ওঠ—পাগলামী করে না। কাপড়-চোপড় ছেড়ে নাও, ভাত বোধ হয় এতক্ষণ তৈরী। তোমার খাওয়া হ'লে আমরা খাব।"—বলিয়া নিরঞ্জন বাহির হইয়া গেল। খানিক পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, ননী গামছাখানি কোলে করিয়া তেমনই বসিয়া আছে। নিরঞ্জন বলিল, "ছিঃ ননী, বিদেশ-বিভুঁয়ে বিপদে পড়লে অত লজ্জা করতে আছে কি? ওঠ ওঠ! দেখ, তুমি না খেলে আমিও খেতে পারব না। ওঠ লক্ষ্মীটি!"

ননী আর উপেক্ষা করিতে পারিল না। পুরুষের যে বিশেষ বয়সটাকে—কুমারী, বর্ষীয়সী কুমারীরা 'অহেতুক-ভয়' করিয়া থাকে, লোকটি সে বয়স অতিক্রম করিয়াছে, তাহার কণ্ঠস্বরেও অভয় উচ্চারিত হইতেছিল, ননী তাহাতেই সাহস পাইয়া কিছুক্ষণের জন্য যেন তাহার বিপদবার্ত্তা ভুলিয়া গেল।

রাত্রিতে আহারাদির পর নিরঞ্জন তাহাকে একটা ঘরে শোওয়াইয়া দিল। দ্বার-সন্নিকটে বালক ভৃত্য মংরুকে শুইতে উপদেশ দিয়া নিজে অন্য একটা ঘরে শুইয়া ননীর কথা ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

অপরিচিত স্থানে, অপরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যে থাকিয়া ননী কত বিভীষিকা দেখিবার ভয়ই করিয়াছিল, কিন্তু সারা রাত্রি এক নিঃশ্বাসে কাটাইয়া দিয়া ভোরে যখন সে শয্যাত্যাগ করিল, তখন মনের মধ্যে ভয়ের সন্ধান ত পাইলই না; উপরন্তু নিরঞ্জনের ঘর-সংসার দেখিয়া লইবার আশায় মংরুকে সঙ্গে লইয়া এ-ঘর ও-ঘর করিয়া বেড়াইতে লাগিল। নিরঞ্জন তখনও জাগে নাই।

মংরু সোৎসাহে, এই তরুণীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য, কলতলা, রন্ধনাগার প্রভৃতি দেখাইয়া দিল।

৩

৭টা বাজিতে উড়িয়া পাচক আসিয়া, চা প্রস্তুত করিয়া বাবুকে ডাকিয়া তুলিল। নিরঞ্জন চায়ের পেয়ালা হাতে লইয়া ডাকিল—"মংরু!"

মংরু বাজারে চলিয়া গিয়াছে, ননী রোয়াকে বসিয়া আলু কুটিতেছিল, উঠিয়া আসিয়া বলিল, —"সে বাজারে গেছে।"

নিরঞ্জন ননীর এই অকুণ্ঠিত বাক্যালাপে প্রীত হইয়া বলিল—"তুমি এত সকালেই উঠেছ? রাত্রে বুঝি ঘুম হয় নি?"

ননী মাথা নীচু করিয়া বলিল, "এক ঘুমে সকাল হয়ে গেছে। আমি অনেকক্ষণ উঠেছি, স্নান করেছি, এখন তরকারী কুটছিলুম।"

নিরঞ্জন হাসিয়া বলিল—"বাঃ, একবারে গিন্নীর পদ অধিকার করে ফেলেছ যে!"—বলিয়াই নিরঞ্জন মনে মনে জিভ কাটিল, এ কথা বলা উচিত হয় নাই।

কিন্তু কথাটার গূঢ় অর্থ যদি কিছু থাকিয়া থাকে, ননী তাহা বুঝে নাই; সে পূর্ব্ববৎ সহজস্বরেই বলিল—"বাড়ীতে ত আমিই সব করি।"

নিরঞ্জন সুস্থবোধ করিল, বলিল—"একটু চা খাবে না?"

"চা ত আমি খাই নে।"

"চা না খাও, কিছু খাবার খাও! ঠাকুর! ও ঠাকুর!"

"এত সকালে কেন? বেলা হলে খাব'খন"—বলিয়া ননী বাহির হইয়া যাইতেছিল, নিরঞ্জন বলিল, "দাঁড়াও, ননী।" ঠাকুরকে বলিল, "ঠাকুর, এক কায কর। খানকতক ফুলো লুচী আর আলু ভেজে ননীকে খাইয়ে দিও।" ননীকে বলিল—"ননী আমি একটু বেরুচ্ছি, ফিরতে ১১টা-১২টা হবে, তোমার ভয় করবে না ত? না, বেশ। কিন্তু তুমি খেয়ে নিও—বুঝলে?"

ননী নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। নিরঞ্জন আবার বলিল, "দরজার বাইরে কিন্তু যেও না; এ কলকেতা সহর, খারাপ জায়গা। আর লুচী ভাজা হলেই খেয়ে নিও .মিছে বেলা ক'রো না। আর তুমি এতক্ষণ একলাটি কি করবে বল ত ননী? বই বের ক'রে দিয়ে যাব?—পড়বে?"

ননী নতমুখে কহিল—"আমি পড়তে জানিনে।"

"তাই ত! তবে কি করবে?"

"আমি রাঁধব।"

নিরঞ্জন সবিস্ময়ে কহিল, "সে কি হয়? আর বামুন ঠাকুর * রয়েছে, তুমি কেন?"

ননী সসঙ্কোচে কহিল—"আমি রাঁধলে কি…" কথাটা সে যেন লজ্জায় ক্ষোভে শেষ করিতে পারিল না। "আমাদের গ্রামের কয়েকজন মাতব্বর এই রকমের কথাটা মাঝে মাঝে বলতেন বটে!"

নিরঞ্জন প্রথমটা বুঝিতে পারে নাই। তারপর বুঝিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল—"দোষ হবে কিনা তাই বলছ! হ্যাঁ দোষ এই হবে যে, দশ বছর পরে একটি দিন অন্ততঃ পেট ভরে ভাত খেয়ে বাঁচব। বেশ, তুমিই আজ রেঁধো, কিন্তু আমার ঠাকুরের রান্না তোমাকেও এক দিন খেয়ে দেখতে হবে। তা না খেলে তোমার রান্নার দোষ বুঝতে পারবে না।"

নিরঞ্জন চা খাইতে লাগিল। ননী এক মিনিট দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল—"আমার বাবার…"

"সেই খোঁজেই বার হচ্ছি, ননী। মনে হচ্ছে খবর নিশ্চয় পাব। চাই কি, একেবারে সঙ্গে ক'রেই নিয়ে এসে তাঁদের সম্পত্তি তাঁদের হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হব।"

নিরঞ্জন মুখে নিশ্চিন্ত হইবে বলিল বটে, কিন্তু তাহার অন্তর সে কথায় সাড়া দিল না; বরং কথাগুলার সঙ্গে দুঃখই যেন ঝরিয়া পড়িতেছিল।

ননী চলিয়া গেল। নিরঞ্জন চায়ের বাটি নামাইয়া রাখিয়া, সিগারেট ধরাইল। সিগারেট আপনি পুড়িয়া ছাই হইতে লাগিল। নিরঞ্জন চিন্তা-সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতে লাগিল।

নিরঞ্জন লোকটার বয়স চল্লিশ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। শরীরে শক্তি-সামর্থ্য আছে বটে, সেবাহীন যত্নহীন শরীরটা যেন তাহার ইচ্ছাতেই কেমন এক রকম কাঠমত হইয়া গিয়াছে। সে আজিও অকৃতদার। বর্ম্মা মুল্লুকে একাদিক্রমে বিশ বৎসর পুলিসের রাইটার কনেষ্টবলী কায করিয়া বৎসর খানেকের ছুটী লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছে। চাকরীর সঙ্গে কাঠের কারবার করিয়া কিছু পয়সাও যে না করিয়াছে—তাহা নহে। এবার কলিকাতায় আসিয়া থাকার একটা বিশেষ কারণও আছে। কারণটি গোপনীয়, কাহাকেও বলে নাই—সে একটি বিবাহ করিতে চাহে! একটি বেশ বড় সড় স্বজাতীয় মেয়ে পাইলে সে এখনই বিবাহ করে—একক জীবন নিতান্ত দুর্ব্বহ হইয়া পড়িয়াছে। মাস তিন হইল সে কলিকাতায় আসিয়াছে। কিন্তু এখনও কোন সুরাহা হয় নাই। বিবাহ-বস্তুটা নিজের চেষ্টায় বা উদ্যোগে, বোধ হয়, হয় না। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব ব্যতিরেকে সংসারে সকল কার্য্য এক রকম চলিয়া যায়, কিন্তু যাহার হইয়া প্রস্তাব করিবার কেহ নাই, তাহার পক্ষে বিবাহরূপ কার্য্যটা সুসাধ্য নহে। রাস্তায় দাঁড়াইয়া বা লোকের দরজায় দরজায় "আমি বিবাহ করিব গো"—বলিয়া ফিরি করিয়া বেড়ান চলে না; খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া বিবাহ করিতেও সাহসে কুলায় না। কি জানি, কে আসিয়া স্কন্ধারোহণ করিবে। কি জাতি, কেমন ঘর, স্বভাব চরিত্র কেমন—কিছুই জানিবার উপায় থাকিবে না, অথচ সারাজীবন হয় ত দুঃখ-কষ্টেরই কারণ হইয়া পড়িবে।

প্রথম প্রথম কিছুদিন সে কলিকাতার পুলিস বিভাগে কাহারও সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিল, কিন্তু সে আশায় তাহার ছাই পড়িয়াছে। কলিকাতার পুলিস—"সে বড় কঠিন ঠাঁই, গুরুশিষ্যেও দেখা নাই।" বন্ধুত্ব করা ত দূরের কথা, বিনা ফি'তে কথাটিও তাহারা কহে না। এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে ননী তাহার ঘরে আসিয়া পৌঁছিল।

ননী করণীয় ঘরের মেয়ে, অনূঢ়া ত বটেই; গরীবের মেয়ে তাহাতেও সন্দেহ নাই। নিরঞ্জনের মৃতপ্রায় আশা-লতিকাটি যেন এক রাত্রির মধ্যেই পত্রপুষ্পে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। নিরঞ্জন বসিয়া ভাবিতে লাগিল, ননী যদি তাহার গৃহিণী হয়!

নিরঞ্জন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া, জামা-কাপড় বদলাইয়া, ছাতি হাতে বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বারান্দায় আসিয়া যে দৃশ্য দেখিল, তাহাতে আর একটা চাপা নিশ্বাস চাপিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া নির্ব্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। রান্নাঘরের সম্মুখে ননী বসিয়া তরকারী কুটিতেছে। তাহার নিজস্ব লালপাড় সাড়ীখানির অঞ্চল গলায় জড়ানো, পিঠের উপর একরাশ কালো চুল অবিন্যস্তভাবে পড়িয়া আছে, মাথা খোলা—

সিন্দুর-লেশহীন। সামনে বগি থালায় আলু, পটল, বেগুন, মূলার কর্ত্তিকাংশগুলি ভিন্ন ভিন্ন ভাগে রক্ষিত; একটা 'জাম্'-বাটীতে কতকগুলা কুষ্মাণ্ডখণ্ড ভাসমান। বাল্যকালে গৃহস্থ-অন্তঃপুরে নিরঞ্জন এই রকমের দৃশ্য অনেক দেখিয়াছিল। ননী এক মনে কায করিতেছিল, নিরঞ্জন যে ক্ষুধিত দৃষ্টিতে তাহাকেই দেখিতেছে, তাহা সে জানিতেও পারে নাই। ক্ষুধাটা দৃষ্টির নহে, অন্তরের —নিরঞ্জন আবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। বোধ করি, জুতার শব্দও হইল, ননী বারেক মাত্র মুখ তুলিয়া আবার নতমুখে কুষড়া কুটিতে লাগিল।

নিরঞ্জন সে স্নিগ্ধ ছবির সম্মুখে যেন অধিককাল দাঁড়াইতে পারিতেছিল না; বলিল, "আমি ঘুরে আসি ননী!"

ননী ঘাড় নাড়িল।

নিরঞ্জন ঠাকুরকে ডাকিয়া লইয়া ননীকে খাওয়াইবার পরামর্শ দিয়া যখন বাহির হইল, তখনও অস্ফুটকণ্ঠে ইহা না বলিয়া পারিল না যে, ঈশ্বর সহায়! ঈশ্বর সহায়! তিনিই আমার দুঃখ বুঝিয়া ননীকে আমার ঘরের ঘরণী করিয়া পাঠাইয়াছেন।

৩

সহরের সব কয়টি ছোট-বড় থানায় তন্ন তন্ন করিয়া তল্লাস করিয়া বিফলমনোরথ হইয়া বেলা ২টার সময় কাঠফাটা রৌদ্রের মধ্য দিয়া নিরঞ্জন যখন বাসায় ফিরিতেছিল, তখন তাহার মুখ দেখিলে মনোভঙ্গের কোন চিহ্নই দেখা যাইত না। বাস্তবিক সে দুঃখিত হয় নাই। বরং এত শীঘ্র ননীকে বিদায় দিতে হইবে না জানিয়া মনের মধ্যে সে একটা আরামই অনুভব করিল। তাই রৌদ্র তাহাকে পুড়াইতে পারে নাই; স্বেদ তাহাকে কালো করিতে পারে নাই। সংবাদ শুনিয়া ননী দুঃখিত হইল বেশ বুঝা গেল, কিন্তু কান্নাকাটি করিয়া অধীরতা প্রকাশ করিল না।

নিরঞ্জন শুনিল, স্বহস্তে সমস্ত রান্নাবান্না করিয়া ননী উনানে ভাতের হাঁড়ী বসাইয়া শয়নগৃহে শুইয়া ছিল—না নিজে খাইয়াছে, না চাকর-বাকরকে খাইতে দিয়াছে।

মুখে ননীকে সে তিরস্কার করিতে লাগিল বটে, কিন্তু অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে ভগবানের দয়ার জন্য ধন্যবাদ উচ্চারণ না করিয়াও পারিল না। ভগবান্ চিরদিন তাহার প্রতি সহায় ছিলেন, সে তাহা জানে। পুলিস বিভাগে সে এতকাল কার্য্য করিয়াছে সত্য, কিন্তু এক দিনের জন্য হস্ত কলুষিত করে নাই; চরিত্র নিষ্কলঙ্ক রাখিয়াছে—তাঁহার দয়া ব্যতীত তাহা সম্ভব হইত কি? আর আজ—তিনি যে কতখানি দয়া করিয়াছেন, তাহা মনে করিতেও নিরঞ্জনের সর্ব্বাঙ্গ কাঁটা দিয়া উঠিল।

নিরঞ্জন মংরুর দ্বারা সহরের ইংরাজী বাঙ্গালা সমস্ত সংবাদপত্র আনাইয়া রাখিয়াছিল, আহারাদির পর সেগুলা পড়িবার সঙ্কল্প করিয়া শয্যা গ্রহণ করিল। যদি কোন পত্রে ননীর পিতা বিজ্ঞাপন দিয়া থাকেন, ইহাই দেখিবার ইচ্ছা—ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার পূর্ব্বেই সে নিদ্রামগ্ন হইল। অপরাহ্নে চা-পান করিতে করিতে বিজ্ঞাপন-স্তম্ভগুলি ভয়ে ভয়ে লক্ষ্য করিতে লাগিল। ননীর নাম গন্ধ না পাইয়া আর একবার সে অপরিসীম স্বস্তির সহিত ননীকে ডাকাইয়া রাত্রির আহারাদির পরামর্শ করিতে বসিল। ননী এ বেলাও ঠাকুরকে হেঁসেলঘরে ঢুকিতে দিবে না প্রতিজ্ঞা করিয়াছে শুনিয়া নিরঞ্জন বলিল, "দু'বেলা রান্নাঘরের আগুন-তাত সহ্য হ'বে কেন, ননী?"

ননীর অধরপদ্মে হাস্য দেখা দিল। নিরঞ্জন সে হাসি দেখিয়া মুগ্ধ হইল, মরিল। ননী বলিল, "আমি ত বাড়ীতে দু'বেলাই রাঁধি।"

নিরঞ্জন কথায় কথা বাড়াইবার সুযোগ পাইয়া ধন্য মানিল; "তোমাদের বাড়ীতে বুঝি রাঁধুনী নেই?"

"না, আমরা গরীব মানুষ, মাইনে দেব কোত্থেকে!"

"তোমাদের বাড়ীতে কে কে আছেন, ননী?"

"আমার বাপ-মা, বড় ভাই, আর—আমি।"

"বাবা কি করেন?"

"আগে গোমস্তার কায করতেন, এখন কিছুই করেন না।"

"ভাইটি কি করে?"

"কিছু না। সে'ও লেখাপড়া জানে না—ব'সে থাকে। বাবা বলেন, সে যদি কোন কায করতো, আমাদের এতো কষ্ট হতো না।"

নিরঞ্জন সহানুভূতিপূর্ণস্বরে কহিল, "তোমাদের সংসারে বুঝি খুবই কষ্ট, ননী?"

ননী নতমুখে কহিল, "হ্যাঁ।"

"সেই জন্যেই বুঝি তোমার বিয়ে হয় নি?"

ননী কথা কহিল না।

নিরঞ্জন একটু পরে জিজ্ঞাসিল, "আচ্ছা ননী, কি রকম ঘরে তোমার বাপ-মা বিয়ে দিতে চান, তুমি জান ?"

ননী চুপ করিয়া আছে দেখিয়া নিরঞ্জন বলিল, "লজ্জা কি—বল ?"

ননী মৃদুকণ্ঠে কহিল, "কায়েথ হয়, খেতে পায়।"

"এই হ'লেই হ'বে ?"

ননী আর কিছু বলিল না।

নিরঞ্জনের বুকের মধ্যে হৃদয়খানা আনন্দে লাফালাফি করিতে লাগিল। আজ সারাদিন সে ননীর পিতা-মাতার সংবাদ পাইবার জন্য ছুটাছুটিও করিয়াছে, সে যে সংবাদকে ভয় করিয়াছে, এখন সেই সংবাদটাই তাহার একমাত্র কামনার সংবাদ হইয়া দাঁড়াইল। আনন্দের আতিশয্যে বিয়ে-পাগলা প্রৌঢ় লোকটি এমন একটা বিশ্রী প্রশ্ন করিয়া বসিল, যাহার উত্তর দেওয়া ননী কেন—কোন বাঙ্গালীর মেয়ের পক্ষেই সহজ ছিল না। নিরঞ্জন বলিল, "ননী, আমি কায়েথও বটে, খেতে পরতে দেবার সংস্থান ভগবান্ আমাকে দিয়েছেন ; ধর, আমি যদি তোমার বাবাকে বলি যে—"

ননী তীব্রদৃষ্টিতে একবার নিরঞ্জনের পানে চাহিয়া রাজ্যের লজ্জায় যেন হুমড়ি খাইয়া বাহির হইয়া গেল। নিরঞ্জন প্রথমটা হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল, তাহার পর স্থির করিল, উহারই নাম লজ্জা ! লজ্জাই নারীর ভূষণ ! মগের মুল্লুকে থাকিয়া হতভাগাটা সব ভুলিয়া গিয়াছে।

উহা লজ্জা বটে, কিন্তু পরে আর তাহার কোন চিহ্ন দেখা গেল না। ননী দিব্য চক্-চকে থালায় খিচুড়ী বাড়িয়া গাওয়া ঘি ঢালিয়া দিয়া, রেকাবীতে নানাবিধ 'ভাজা' সাজাইয়া, ডাকিল, "আপনি খেতে আসুন।"

নিরঞ্জন খাইতে বসিলে ননী পানের বাটাটা সামনে রাখিয়া পান সাজিতে বসিল। যে লোক প্রায় সারা-জীবন উৎকলবাসী ব্রাহ্মণের রান্না খাইয়া কাল কাটাইয়াছে, তাহার নিকট এই সকল খাদ্য যে অমৃতবৎ অনুভূত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ! নিরঞ্জন অতি শীঘ্রই থালা খালি করিয়া ফেলিল। ননী হঠাৎ থালার পানে চাহিয়া লজ্জিত হইয়া উঠিয়া গেল ও আবার শূন্য থালা পূর্ণ করিয়া দিল। নিরঞ্জন এতক্ষণ কোন কথা বলে নাই, অপরাধীর মত মাথা নীচু করিয়া খাইয়া যাইতেছিল। এই স্নেহঅমৃত পরিবেষণে সে আবার সব ভুলিয়া আত্মহারার মত বলিয়া ফেলিল—"দু'দিন অমৃত খাইয়ে আমায় পাগল ক'রে যদি পালাও—তোমার পাপের কিন্তু পরিসীমা থাকবে না।"

ননী সুপারি কাটিতেছিল, সুপারিটা জাঁতি ফস্কাইয়া ছিটকাইয়া গেল ; কর্ণমূল রাঙ্গা হইয়া উঠিল। নিরঞ্জন পটলভাজা কামড়াইতে আঙ্গুলটাই কামড়াইয়া ধরিয়া "উঃ উঃ" করিয়া হাত ঝাড়িতে লাগিল।

ননী বলিল—"আঙ্গুল কামড়ে ফেল্লেন বুঝি ? গ্লাসে ডুবিয়ে ধরুন, নইলে বড্ড ব্যথা হ'বে। আমি অন্য গ্লাসে খাবার জল আন্‌ছি।"

বলা বাহুল্য, গ্লাসে আঙ্গুল ডুবাইতে হইল না, ব্যথাটা কি জানি কেন তখনও অনুভূত হইল না ; পরেও হয় নাই। ননী ছাড়িল না—গ্লাসে আঙ্গুল ডুবাইতে বাধ্য করিয়া—পাণ সাজিতে বসিল।

প্রণয়-শাস্ত্রকার ইহার কি আখ্যা দিবেন ?

৪

পরদিন সকালে দৈনিক পত্রগুলি খুলিতেই হাজারীলাল সরকারের নামের সাঙ্কেতিক অক্ষরযুক্ত বিজ্ঞাপন দেখা গেল। নিরঞ্জন একখানি বাঙ্গালা সংবাদপত্র খুলিয়া তাহা ননীকে দেখাইল। ননী যে পড়িতে জানে না, ইহা তাহার মনেই ছিল না। ননীকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া মনে পড়িয়া গেল। তখন বলিল—"তোমার বাবা বিজ্ঞাপন দিয়েছেন।"

ননী জিজ্ঞাসিল—"বাবা কোথায় ?"

"দেশে। বিজ্ঞাপনে রুকুণপুর গ্রাম, খামারগাছী পোষ্ট, জেলা হুগলী এই ঠিকানা লেখা রয়েছে।"

"আর কি লেখা আছে ?"

"তোমাকে ফিরিয়ে পাবার জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। লেখা আছে—যদি কোন মহানুভব ব্যক্তি আমার মেয়েটির কোন সন্ধান পাইয়া থাকেন, তবে নীচের ঠিকানায় আমাকে জানাইলে কৃতার্থ হইব।"

ননী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল ; নিরঞ্জনও নীরব। অনেকক্ষণ এই ভাবে কাটিয়া গেল, মংরু চা লইয়া কক্ষে প্রবেশ করিতেই নিরঞ্জন বলিল—"তুমি জল খেয়ে এস, তার পর কথা হবে।"

ননী বলিল—"আমি এত সকালে খাইনে।"

নিরঞ্জন চা পান করিতে করিতে বলিল—"কিন্তু কোন্ দিক্ দিয়ে যে তোমাদের দেশে যেতে হয়, তা ত কিছু লেখা নেই। অবশ্য পোষ্টাফিসের নাম যখন পাওয়া গেছে, তখন সে'টা বার করতে কষ্ট হবে না। তুমি কি আজই যেতে চাও, ননী?"

ননী কথা কহিল না, কেবল একবার মুখটি তুলিয়া চাহিল মাত্র। এই নীরবতাকে তাহার সম্মতি ও দৃষ্টিকে আকুলতা কল্পনা করিয়া নিরঞ্জন মনে ব্যথা পাইল। জাহাজের সারেং যেমন দড়ি ফেলিয়া জল মাপিতে মাপিতে চলে, নিরঞ্জনও একটু জল না মাপিয়া পারিল না। বলিল—"তুমি যদি আজই যেতে চাও ননী, আমি তার ব্যবস্থাও করতে পারি—কিন্তু আজ আমি নিজে যেতে পারব না, একটা বিশেষ কাজ আছে। কোন লোক সঙ্গে দিয়ে তোমাকে পাঠাতে হবে।"

ননী বলিল—"তা হ'লে আজ নাই বা গেলুম।"

নিরঞ্জন অভয় পাইয়া কহিল, "বেশ, কাল যাওয়া যাবে। ইতিমধ্যে আজ আমি পথ-ঘাট সব জেনে আসব, কেমন?"

ননী ঘাড় নাড়িয়া বলিল—"হ্যাঁ।"

কথার পর কথা পাড়িয়া ননীর সঙ্গলাভাশায় লুব্ধ নিরঞ্জন বলিবার মত কথা তখনই কিছু খুঁজিয়া পাইল না। ননীও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

নিরঞ্জন তখনই ডাকিল—"ননী!"

ননী ফিরিয়া আসিতে সে বলিল—"ননী, এর আগে তুমি ত কখনও কলকাতায় আস নি, এখানে দেখবার জিনিষ কত কি রয়েছে—কিছুই দেখনি বোধ হয়?"

ননী বলিল, "না।"

"আজ তবে চল, চিড়িয়াখানা, মরা জন্তু এইগুলো দেখে আসা যাক্। কি বল?"

ননী সোৎসাহে কহিল, "বেশ ত!"

"তবে ঠাকুরকে শীগ্‌গির শীগ্‌গির রান্না-বান্না ক'রে দিতে বল—খেয়ে দেয়ে বেরোন যাক্।"

"রান্না আমার এখনি হয়ে যাবে।"—বলিয়া সে বাহির হইয়া যাইতেছিল, নিরঞ্জন হাসিয়া বলিল—"আজও তবে অন্নপূর্ণার হাতের অন্ন বরাতে লেখা আছে!"

ননী লজ্জারক্তিম মুখে বাহির হইয়া গেল।

এক চিড়িয়াখানা দেখা শেষ না হইতেই সন্ধ্যা হইয়া গেল। জীবজন্তু যা দেখে, ননীর কাছে তাই নূতন। কোনটার ছবিও সে দেখে নাই, যেখানে দাঁড়ায়, সেই-খানেই আধঘণ্টা করিয়া কাটিয়া যায়। কুমীর দেখিয়া বলে, আমাদের গঙ্গায় কুমীর আছে। বাঘের খাঁচার সামনে আসিয়া বলিয়া উঠিল, সেবার আমাদের দুইটা গরু বাঘে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল। সিংহ সম্বন্ধে তাহার মতটা উল্লেখযোগ্য। সে স্থির করিল, বিলাতী কুকুরের মত ইহাদের গায়ে লোম থাকায় ইহাদিগকেও পুষিতে পারা যায়। তাহাদের গাঁয়ের বাবুদের বাড়ীতে ঐ রকম কুকুর আছে।

সন্ধ্যার সময় বাসায় ফিরিয়া নিরঞ্জন বলিল—"সোসাইটি দেখা ত আজ হোল না, ননী।"

ননী বলিল—"কাল দেখব।"

নিরঞ্জন বলিল—"তা' হ'লে কালও তোমার দেশে যাওয়া হবে না যে!"

ননী কোন কথা বলিল না। তবে যাইবার জন্য সে যে খুব অধীর হইয়াছে, তাহার ভাব দেখিয়া ইহাও মনে হয় না।

নিরঞ্জন বলিল,—"এক কায করা যাক্। তোমার বাবাকে একখান চিঠী লিখে দিই যে, ননীর সন্ধান পাওয়া গেছে, দু' একদিনের মধ্যেই তাকে নিয়ে যাচ্ছি। কেমন?"

ননী সম্মত হইল।

কলিকাতার প্রধান দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখা হইয়া গেল। একদিন বায়স্কোপ দেখাও হইল—ননীর আনন্দের আর সীমা নাই। ওদিকে ননীর পিতাকে পত্র লিখিবার পরও চারদিন কাটিয়া গিয়াছে, আর কোন ছলে দেরী করা যায় না, উচিতও নয়। বায়স্কোপ হইতে ফিরিবার পথে ননী বলিল, "কাল বাড়ী যাওয়া হবে ত?" নিরঞ্জন যদিও "হাঁ" বলিল, তথাপি কিন্তু এই "হাঁ"য়ের ভিতর "না" লুকাইয়া ছিল—কিন্তু দেরী করিবার কোন উপায়ও সে খুঁজিয়া পাইল না।

পরদিন সকালে সে একটা উপায় খুঁজিয়া বাহির করিল। ব্যাঙ্ক হইতে কিছু টাকা তুলিবার ও জিনিষপত্র কেনাকাটা করিবার অছিলায় সারাদিন কাটাইয়া আসিল।

সন্ধ্যাকালে কতকগুলি গহনাপত্র ননীর সামনে ধরিয়া জিজ্ঞাসিল,—"ননী, জিনিষগুলো কেমন বল ত ?"

ননীর পক্ষে সকলগুলিই সমান ; বলিল—"বেশ।"

নিরঞ্জন বলিল, "কাল ভোরের জাহাজে আমরা রুকুশপুর যাব।"—ননীর মুখখানি আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

৫

হাজারীলাল সরকার লোকটির বয়স পঞ্চাশ উত্তীর্ণ হইয়াছে, লোকটিকে দেখিলে স্বতঃই মনে অশ্রদ্ধার ভাব জন্মায়, চেহারাটা খেঁকুরে গোছের, কথাবার্ত্তাও বেশ ভাল নহে। কন্যার উদ্ধারকর্ত্তাকে মৌখিক ধন্যবাদ দিল বটে ; কিন্তু তাহার মধ্যে আন্তরিকতার কোন আভাস না পাইয়া নিরঞ্জন দুঃখবোধ করিল। ধন্যবাদের আশায় সে এই কার্য্য করে নাই বটে, তবে কাযটা করিবার পর পুরস্কারের একটা দুরাশা যদি সে মনে ঠাঁই না দিত, তবে হাজারীলালের আচরণে বিস্মিত বা ক্ষুব্ধ সে হইত না। হাজারীলালের ব্যবহারে মনঃক্ষুণ্ণ হইলেও অন্তঃপুরচারিকাদের আদরযত্নে তাহার সকল ক্ষোভ দূর হইয়া গেল। তাই সে ভরসা করিয়া হাজারীলালের নিকট প্রার্থনাটি ব্যক্ত করিল। কলিকাতা হইতে আনীত প্রায় হাজার খানেক টাকার অলঙ্কার দেখাইয়া বলিল—"এ সব আমি ননীর জন্যেই এনেছি।"

হাজারীলাল অলঙ্কারগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিল। জিনিষগুলা লোভনীয় সন্দেহ নাই।

নিরঞ্জন বলিল, "নগদ পাঁচশো টাকা খরচ-খরচা বাবদ দোব, তা'ও এনেছি।" ১০০৲ করিয়া ৫ কেতা নোট সে জামার ভিতরকার পকেট হইতে বাহির করিয়া অলঙ্কারের রুমালের উপর রাখিল।

হাজারীলাল দ্রব্যাদি লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল এবং অর্দ্ধঘণ্টা পরে শুধু হাতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "বাড়ীর মধ্যের ওঁদের খুবই ইচ্ছে দেখলুম ; আর শুনলুম, ননীও তার মাকে ঐ কথাই বলেছে। তা বেশ, এই ফাল্গুন মাসেই শুভ কার্য্য করা যাবে।"

নিরঞ্জন জিজ্ঞাসিল—"আজ বাঙ্গালা মাসের কত ?

হাজারীলাল বলিল, "২২শে। এ মাসের ৮।৯ দিন আছে। কিন্তু বোসজা মশাই! আর একটি কথা আছে।"

"কি বলুন ?"

হাজারীলাল বলিতে লাগিল, "আজ আমাদের অবস্থা খুবই খারাপ হয়েছে বটে, কিন্তু গ্রামের মধ্যে সরকার ঘরটাই সব চেয়ে বড় কায়স্থ ঘর। আমার এই প্রথম কায, খরচ-খরচা কিছু বেশী করতে হবে। পাঁচশো টাকায় কুলোতে পারব কি না তাই ভাবছি। ননীর মুখে শুনেছি, ঈশ্বরেচ্ছায় আপনার কোন কিছুরই অভাব নেই, তাই বলছিলুম কি, আর শ' পাঁচেক টাকা যদি দিতে পারেন, আপনার যোগ্য কায ক'রে মনটায় শান্তি পাই।"

নিরঞ্জন একমুহূর্ত্ত কি চিন্তা করিল ; তাহার পর বলিল, "সরকার মশাই, তাতেও আমার আপত্তি নেই। আমার যথাসর্ব্বস্ব ত ননীরই—এখনই দিই আর তখনই। কিন্তু আজ ত আমার সঙ্গে আর টাকা নেই।"

"পরে দেবেন তার আর কি ?"

হাজারীলাল সরকার বুদ্ধিজীবী লোক। গঙ্গা স্নান করিতে গিয়া কন্যা হারাইয়া গিয়াছে, এ সংবাদ সে ঘুণাক্ষরেও গ্রামের কাহাকেও জানিতে দেয় নাই। সে প্রচার করিয়া দিয়াছিল, ননী তাহার এক দূর সম্পর্কীয়া মাসীর বাড়ী আছে। মাসী ননীর বিবাহের একটি পাত্র খুঁজিতেছেন। পাত্রকে মেয়ে দেখাইয়া পছন্দ হইলে ননীকে তিনি রুকুশপুরে পাঠাইয়া দিবেন। চাণক্যের শ্লোক হাজারীলালের কণ্ঠস্থ ছিল বলিয়াই সে এই সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিল। গৃহিণীকেও বিশেষভাবে সতর্ক করিয়া দিয়াছিল।

পাড়ার মাতব্বরগণ যখন সংবাদ পাইলেন যে, সরকারদের ননী কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে এবং ননীর ভাবী বরও বিবাহের কথা স্থির করিবার জন্য স্বয়ং উপস্থিত, তখন শচীন্দ্র সরকার, তারক হালদার, হরিচরণ চট্টোপাধ্যায়, বামাচরণ চক্রবর্ত্তী, কানাই রক্ষিত, গিরীশ বসু সকলেই সরকারদের চণ্ডীমণ্ডপে দেখা দিলেন।

গ্রাম্য-সিংহগণ হাজারী সরকারের বয়স্থা কন্যার পাত্র জুটিয়াছে দেখিয়া নিশ্চিতই প্রসন্ন হইতে পারেন নাই। তাঁহারা নিরঞ্জনকে লইয়া পড়িলেন।

মহাশয়, পুলিসে কর্ম্ম করেন ? কত বেতন ? দুই পয়সা

বেশই আছে বোধ হয়? এত দিন বিবাহ করেন নাই কেন? বর্ম্মাদেশে থাকেন, সে ত শুনি ম্লেচ্ছর দেশ, সেখানে কি জাত থাকে? আমাদের মেয়েটিকেও কি বর্ম্মাদেশে লইয়া যাইবেন? ইত্যাদি, ইত্যাদি।

নিরঞ্জন যথাসম্ভব উত্তর দিল।

"ম'শায়ের ডান হাতে ও দাগটি কিসের?"—প্রশ্ন করিয়া হরিচরণ চট্টো মহাশয় সকলের পানে সগর্ব্ব দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

নিরঞ্জন বলিল, "পুড়ে গেছল।"

হরিচরণ বলিলেন, "পোড়া দাগ কি অমন হয়? উঁহু—কেমন যেন সন্দেহজনক মনে হচ্ছে যে।"

নিরঞ্জন বিপন্নের মত কহিল, "না মহাশয়, পোড়ারই দাগ। বিশ বছর স্বপাক করতে হয়েছে, এ তারই চিহ্ন"—বলিয়া নিরঞ্জন মৃদুহাস্য করিল।

অন্য পক্ষের মনের ভাব কিছু বুঝা গেল না; তাহারা কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল। এ প্রসঙ্গ অধিক-ক্ষণ আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই বিবেচনা করিয়া তাহারা অন্য কথা পাড়িল। নিরঞ্জন চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

পরদিন বিদায় লইবার সময় নিরঞ্জন বলিল, "তা হ'লে ফাল্গুন মাসের প্রথমেই আমি আসব?"

হাজারীলাল বলিল, "তাই আসবেন।"

নিরঞ্জন যাই যাই করিয়াও ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, ইচ্ছা, বিদায়ক্ষণে এক বার তাহার ননীকে দেখিতে পায়, কিন্তু তাহার কোন সুযোগই মিলিল না। ঈষৎ ক্ষুণ্ণ মনে অগত্যা শ্বশুর মহাশয়কে ভক্তিভরে নমস্কার করিয়া সে বিদায় লইল।

নিরঞ্জন তখনও হয় ত ষ্টীমার ঘাটে পৌছায় নাই, বৃদ্ধ গোপাল বোস্ আসিয়া দর্শন দিলেন। ইনি গ্রামেরই লোক, অদূরবর্ত্তী এক জমীদারের সেরেস্তায় মুহুরীর কার্য্য করিয়া থাকেন, দুই পয়সা রোজগার আছে, গ্রামে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি। হাজারীলালকে ডাকিয়া বলিলেন, "সরকার, তোমার বরাত ফিরেছে হে! জমীদার বাবু তাঁর ও পক্ষের ছেলেদের পৃথক্ ক'রে দিয়েছেন, বিয়ে করতে চান। একটি ডাগর-ডোগর মেয়ের সন্ধান করছেন। আমি ননীর কথা ব'লে এসেছি। কিন্তু দেরী করলে চলবে না, কাল দিন আছে, কালই কায হওয়া চাই।"

হাজারীলাল চিন্তাযুক্ত হইলেন। ইছাপুরের জমিদার! বৎসরে ৩০ হাজার টাকা মুনাফা। তবে বয়সটা ষাটের কাছাকাছি। কিন্তু মেয়েও ত কচি খুকী নহে! তবে যে ব্যক্তিকে ইতঃপূর্ব্বে কথা দেওয়া হইয়া গিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে কি করা যাইবে, তাহাই চিন্তার বিষয়।

গোপাল বোস্ ধমক দিয়া উঠিলেন, "কি হে সরকার, মাথায় হাত দিয়ে বসলে যে! বলি পছন্দ হ'ল না বুঝি! তুমি ততক্ষণ ভাব, আমি অন্যত্র চেষ্টা দেখি। ইছেপুরের জমীদারকে মেয়ে দেবার লোকের অভাব হ'বে না।"—বলিয়া গোপাল বসু মহাশয় উঠিয়া পড়িলেন।

হাজারীলাল ব্যস্ত হইয়া বলিল, "ভায়া, উঠ না, বোসো।"

গোপাল বসু বসিয়া বলিলেন, "কি মতলব বল হে খুলে-খালে, সরকার।"

হাজারীলাল তখন বাধার কথা কহিলেন; শুনিয়া গোপাল বসু পাঁচ মিনিট ধরিয়া এমন হাস্য করিলেন যে, গাড়ু হাতে তারক হালদার বনের দিকে যাইতে যাইতে ফিরিয়া চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

কোথাকার একটা রাইটার কনেষ্টবল আর কোথায় ইছাপুরের প্রবলপ্রতাপ জমীদার শশাঙ্ক বাবু! আরে ছিঃ, এর মধ্যে ভাবিবার আবার আছে কি? বিশেষ আশীর্ব্বাদ হয় নাই, পাকা-দেখা হয় নাই, কোন জিনিষপত্রও লেন্-দেন হয় নাই—আরে ছিঃ!

সরকার বসিয়া ভাবিতে লাগিল, অথচ ইঁহাদেরই তাড়নায় সে রোজই প্রতিজ্ঞা করিত, নিদ্রাভঙ্গে এক দিন যাহাকে প্রথম পথে দেখিব, আপদ-বালাই মেয়েটাকে তাহারই হাতে দিয়া দিব। কানা হোক্, খোঁড়া হোক্, কিছুই বাছিব না।

হালদার বলিলেন, "পুলিস পয়সার জন্যে নিজের শ্বশুরকে জেল খাটায়, জান ত? ওদের অসাধ্য কর্ম্ম নেই। বলে—পুলিস ভাল লোক হ'লে তার জন্মের গোল আছে।"

"কিন্তু কথা দেওয়া গেছে, পুলিসের লোক যদি কোন গোল করে!"

গোপাল বোস্ বলিলেন, "শশাঙ্ক বাবুর উপর সে ভার ছেড়ে দিও সরকার। তোমায় কোন দায় থাকবে না।"

হালদার বলিলেন, "তবে আর কি! সে ইছেপুরের

ডাক সাইটে জমীদার, অনেক পুলিসের বাপের বিয়ে দেখায়!"

তারক হালদার মহাশয় বলিলেন, "শুধু কি তাই, পুলিসটের আবার হাতে কুষ্ঠব্যাধির দাগ—সাদা সাদা! সৎকর্ম্ম করবার ফল আর কি! তখনই আমরা ধরেছিলুম, বল্লে পোড়ার দাগ। আমাদের যেন কচি খোকা পেয়েছে, পোড়া দাগ আমরা চিনি নে! খবরদার সরকার, জেনে শুনে একটা কুটে পুলিসের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিও না।"

৬

ধার্য্য মত ফাল্গুন মাসের ২রা তারিখে নিরঞ্জন আসিয়া উপস্থিত। সরকার মহাশয় চণ্ডীমণ্ডপে শুইয়া ছিল, নিরঞ্জনকে দেখিয়া হাউ মাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

"আর কি দেখতে এলে বাবাজী? মা যে আমার সব্বাইকে ফাঁকী দিয়ে পালিয়েছে! ওঃ হো, ননী রে, বুড়ো বাপের বুকে কি শেলই দিয়ে গেলি মা!"

নিরঞ্জন স্তম্ভিত হইয়া গেল।

হাজারীলাল অনেকক্ষণ কাঁদিল; তাহার পর বলিল, "যাবার সময় মা আমার বল্লে, বাবা, তিনি যে গয়না-পত্র দিয়েছেন, আমাকে পরিয়ে দাও, আমার সীঁথেয় সিঁদুর দিয়ে দাও—আমি ত আর কুমারী নই বাবা। তিনি যে আমাকে গ্রহণ করেছেন। আমি যে তাঁরই।"—বলিতে বলিতে হাজারীলাল কেবলই অশ্রু মুছিতে লাগিল।

নিরঞ্জনের বক্ষমধ্যে যে হাহাকার ধ্বনিয়া উঠিল, তাহারই অল্প আভাস তাহার মুখে চোখে প্রতিভাত হইল। সামান্য দুই তিন দিনের আত্মীয়তায় এত স্নেহ কেমন করিয়া জন্মিয়াছিল, কে জানে; তাহার মনে হইল, তাহার জীবনও বোধ হয় শেষ হইয়া গিয়াছে। আর কিছুতেই তাহার যেন কোন দরকার এখনও নাই; পরেও হইবে না।

শোকের প্রথম বেগ মন্দীভূত হইলে নিরঞ্জন জিজ্ঞাসা করিল, "কিসে এমনটা হ'ল?"

"কিছু বুঝতে পারলুম না ম'শাই, কিছু বুঝতে পারলুম না। ভোর বেলা বল্লে, শরীরটা কেমন করছে; তার পর সেই যে ঐ তুলসীতলায় এসে' শুয়ে পড়ল, মা আমার আর উঠলো না। শুনলুম, তার মা'কে কেবল তোমার কথাই বলেছে।"

নিরঞ্জন গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল। আসিবার সময় আজ কত আশা, কত আনন্দ বহন করিয়াই না আসিয়াছিল, এক মুহূর্ত্তে কি হইয়া গেল। তবে ইহা সে মনে মনে স্বীকার করিল—তাহাকে সংসারী করা ভগবানের অভিপ্রেত নহে। নিরঞ্জন তুলসী-বেদীটার পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

হাজারী বলিল, "বাড়ীর মধ্যে ব'লে আসি—"

নিরঞ্জন বাধা দিয়া কহিল, "না, বলবেন না। তাঁরা শুনলেই আরও কান্নাকাটি করবেন। আমার বুক ফেটে যাচ্ছে, আর কান্না সইতে পারব না। আমি উঠি, সন্ধ্যার পরই একখানা ষ্টীমার আছে শুনে এসেছি, তাতেই ফিরব। কিন্তু আপনি একটি কায করবেন"—বলিতে বলিতে তাহার গলা ধরিয়া আসিল; চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইল।

হাজারীলাল সপ্রশ্ন ও সভয় দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

নিরঞ্জন কহিল, "এই তুলসীতলায় বল্লেন না?"

"হ্যাঁ।"

"একটি কায করবেন।"

পকেট হইতে ৫০০৲ টাকার একখানি নোট বাহির করিয়া বলিল, "ননীর নাম ক'রে এনেছিলুম, এ আর আমি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারব না। আপনি এই টাকা দিয়ে এই তুলসীতলায় একটি ঘর ক'রে দেবেন, তার গায়ে লিখে দেবেন—ননী-মন্দির।"—নিরঞ্জন বালকের মত কাঁদিতে লাগিল।

হাত বাড়াইয়া টাকা লইতে হাজারীলালের হাত ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। নিরঞ্জন বলিল, "বর্ম্মায় আমাদের পুলিস সাহেবের বিয়ের পরই স্ত্রী হঠাৎ মারা যান, সাহেব তখন টুরে—টেলিগ্রাফ পেয়ে ফিরে এসে দেখলেন, মৃতদেহ! মেম যেখানে মারা যান, সাহেব সেইখানে স্মৃতি-মন্দির গড়ে দিয়েছিলেন; আজও সে'টি আছে। আপনিও এই অনুগ্রহটি করবেন"—সে সাশ্রুনয়নে হাজারীলালের হাত ধরিল।

হাজারীলাল নোটখানি লইয়া ভাঙ্গা গলায় বলিল, "করব।"

নিরঞ্জন উঠিল। হাজারী বলিল, "এখনি যাবে?"

"হাঁ। কলকাতায় গিয়ে সব গুছিয়ে গাছিয়ে নিয়ে এই রবিবারের জাহাজেই বর্ম্মায় চ'লে যাব।"

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল; অন্ধকার রাত্রি, নিরঞ্জন হাজারীলালের অন্দরটি পার হইয়া সেই অন্ধকারে মিশাইয়া গেল।

ষ্টীমার আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে ছাড়িয়া দিয়াছিল। নিরঞ্জন ষ্টীমার-ঘাটের সেই ভাঙ্গা চালায় সারারাত্রি কাটাইয়া দিল। ঘাটের মুটিয়া পর দিন বলিয়া বেড়াইল যে, একটা লোক কাল এইখানে শুইয়া কেবল কাঁদিয়াছে, লোকটা বোধ হয় পাগল। ভোরের ষ্টীমারে উঠিয়া চলিয়া গিয়াছে। যাইবার সময় তাহাকে একটা টাকা দিয়া গেল। বোধ হয় পাগল!

৭

এক আধ দিন বা এক আধ বছর নয়, দশ বৎসর পরে।

আষাঢ় মাস, রাত্রি এক প্রহর হইয়া গিয়াছে। আকাশ মেঘভরে অবনত—বৈকালে কয়েক পশলা জোরে বৃষ্টি হইয়াছিল; পথে এক হাঁটু কাদা হইয়াছে, কিন্তু গরম কমে নাই, লোক আশঙ্কা করিতেছে, রাত্রিতে দেবতা আবার জল ঢালিবে। লক্ষণ সেইরূপই বটে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকিতেছে; পুবে হাওয়া বহিতেছে। পল্লীর গাছ-পালা জোনাকীর আলোয় চক্ চক্ করিতেছে, আকাশে কোন ফাঁক দিয়া এতটুকু আলোও দেখা যাইতেছে না।

এক হাতে জুতা, অন্য হাতে ছাতা ও লাঠি, সর্ব্বাঙ্গ কর্দ্দমাক্ত, এক বৃদ্ধ হীরালালের চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া ভগ্নস্বরে ডাকিল, "সরকার মশাই! সরকার মশাই!"

মানুষ কেহ সাড়া দিল না; নিকটবর্ত্তী কোন গৃহ হইতে একটা কুকুর যেন এত রাত্রিতে পল্লীর শান্তিভঙ্গের অপরাধে বিরক্ত হইয়া তীব্র ভৎর্সনা করিয়া উঠিল।

বৃদ্ধ আবার ডাকিল, "সরকার মশাই আছেন কি?"

শান্তিপ্রিয় সারমেয় এই অমার্জ্জনীয় অপরাধে অতি-মাত্রায় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল।

বৃদ্ধ লাঠিগাছটি সোজা করিয়া ধরিয়া ডাক দিল, "বাড়ীতে আছেন কি?"

অন্তঃপুরের দিকে একটি ক্ষুদ্র প্রদীপের মৃদু আলোক দেখা গেল; আগন্তুক তাহা লক্ষ্য করিয়া পুনশ্চ কহিল, "বাড়ীতে কেউ আছেন কি?"

উত্তর আসিল, "কে"?—কণ্ঠস্বর রমণীর।

"সরকার মশাই নাই?"

"না। আপনি কে?"

"আমি অনেক দূর থেকে আস্‌ছি।' নাম বল্লে চিন্তে পারবেন না। সরকার মশাই কোথায়?"

"মারা গেছেন।"

"ও! আর পুরুষ কেউ নেই বাড়ীতে? তাঁর ছেলে—"

"সে'ও নেই।"

বৃদ্ধ সবিস্ময়ে কহিল, "আমি বৃদ্ধ; আমাকে লজ্জা বা ভয় করবার কোন কারণ নেই। যদি আলোটা একটু সরিয়ে নিয়ে আসেন, আমি একটা জিনিষ দেখে এখনি চ'লে যাব।"

রমণীর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল, এই কথার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার হাত হইতে প্রদীপটি মাটীতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল; রমণী আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আপনি! আপনি এসেছেন?"

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসিল, "তুমি কে?—তুমি কে? আমি চোখে ভাল দেখতে পাইনে, কানেও ভাল শুনতে পাইনে, বুড়ো হইছি, সব যেন গোলমাল হ'য়ে যাচ্ছে, তুমি কে বল?"

রমণী মাটীতে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "আমি ননী!"

বৃদ্ধ সভয়কণ্ঠে রামনাম উচ্চারণ করিতে লাগিল। হায় হায়, এত রাত্রিতে একলা এ ভৌতিকস্থানে আসিয়া কি বিভ্রাটেই পড়িল। বৃদ্ধ ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল।

রমণী দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল, "আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন—ভিতরে আসুন। আমি যে ননী। ভয় নেই, আমি মরি নি। এই দেখুন না—" বলিতে বলিতে ননী নিরঞ্জনের এত কাছে আসিয়া দাঁড়াইল যে, নিরঞ্জন তাহার নিঃশ্বাসের উষ্ণতাটুকুও অনুভব করিতে পারিয়া নিশ্চিন্ত হইল।

ননী বলিল, "আসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?"

"যাই" বলিয়া বৃদ্ধ দুই পদ অগ্রসর হইয়া আবার বলিল, "ননী, তবে যে শুনেছিলুম—"

"ননী ম'রে গেছে! সব বলছি আসুন।"

ননী তাহাকে বসাইয়া স্বহস্তে পা ধুয়াইয়া দিয়া বস্ত্রাঞ্চলে মুছাইয়া দিল। রেকাবিতে একটু গুড় ও এক গ্লাস জল আনিয়া বলিল, "আগে জল মুখে দিন। কখোন্ বেরিয়েছিলেন?"

"সকালে।"

"সমস্ত দিন খাওয়া হয় নি ?"

"কই আর হ'ল ? তার জন্যে তুমি ব্যস্ত হয়ো না, ননী ! আগে সব শুনি।"

ননী বলিল, "শুনতে দেরী হ'লেও ক্ষতি হবে না"—বলিয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল। অনেক ডাকাডাকি সত্ত্বেও বাহিরে আসিল না; বলিল, "সমস্ত রাত প'ড়ে আছে, যত পারেন, গল্প শুনবেন—বলব।"

আহারাদির পর নিরঞ্জন বিছানায় আসিয়া বসিল।

ননী যাহা বলিল, তাহার সার মর্ম্ম এই, পাড়ার কয়েকজন মাতব্বর লোকের কুপরামর্শে তাহার বাবা ইছাপুরের জমীদারের সঙ্গে তাহার বিবাহ দিবার আয়োজন করেন। সে অনেক কান্নাকাটি করিয়াও যখন বাবার মত ফিরাইতে পারিল না, তখন এক দিন রাত্রিতে কাহাকে কিছু না বলিয়া পলাইয়া গিয়াছিল। ছয় ক্রোশ দূরে তাহার এক মাসতুতো বোনের শ্বশুরবাড়ীতে গিয়া ছ'মাস দাসীবৃত্তি করিয়া বিপদ কাটাইয়া যখন বাড়ী আসিল, তখন তাহার পিতা ও ভ্রাতার মৃত্যু হইয়াছে, মা মৃত্যু-শয্যায় শয়ান।

নিরঞ্জন অনেকক্ষণ কোন কথা বলিতে পারিল না। ননী নতমুখে নীরবে বসিয়া আছে। নিরঞ্জন বলিল, "তা হ'লে সবটাই ষড়যন্ত্র বল ?"

ননী বলিল, "তার ফল ত হাতে হাতেই ফলল। সেই থেকে একা আমি এই বাড়ীতে ভূতের মত বাস করছি। তবে তুমি যে এক দিন না এক দিন এখানে আসবেই, তা' আমি জানি।"

"কেমন ক'রে জানলে ?"

"তুমি যে ননী-মন্দির গড়তে ব'লে গেছ, তা কি না দেখে থাকতে পার ? মা'র কাছে আমি সব শুনেছিলুম। মা'ও মরবার সময় বলেছিলেন, তিনি যদি আসেন, দেখা হবে না, তুই এখানেই থাকিস্ মা।"

ননী একটু থামিয়া উঠিয়া গিয়া একটা তোরঙ্গ খুলিয়া একটি পুঁটুলী আনিয়া খুলিতে খুলিতে বলিল, "আপনার গয়না, টাকা সব এর মধ্যে আছে, কিছু টাকা বাবা খরচ করেছিলেন, আর এদানী বড় কষ্টে প'ড়ে আমিও কিছু খরচ করেছি। বাকী সব আছে।"

নিরঞ্জনের হৃদয় ভরিয়া গিয়াছিল, বলিল, "ও সবে আর আমার অধিকার কি ননী, ও তোমাকে দিইছি।"

"আমি নিয়ে কি করব ! আমি কি গয়নার—"

"কি ননী, চুপ করলে যে ! কি বলছিলে বল ?"

ননী নিঃশব্দে তাহার পা দুইটি কোলের উপর তুলিয়া লইয়া তাহারই মধ্যে মুখ লুকাইল। সে কাঁদিতে-ছিল।

বৃদ্ধ কহিল, "তাই ত ননী, আমার যে পঞ্চাশ !"

ননী মুখ না তুলিয়াই বলিল, "তোমার ননীই কোন্ খুকীটি !"

বৃদ্ধ বলিল, "তবে শোন ননী, একটা মজার কথা বলি। বর্ম্মা থেকে আস্‌ছি, জাহাজে এক গণককারের সঙ্গে দেখা। বুড়ো আমার হাতটা টেনে নিয়ে দেখ্‌তে লাগল। বললে, বাবুর সন্তানাদি নাই ? আমি বল্লুম, ঠাকুর, ঢাক-ঢাকী কিছুই নাই। বললে, স্ত্রী গত হয়েছেন ? আমি বল্লুম, আগমন বিসর্জ্জন কিছুই হয় নি ঠাকুর। গণক রেগে আমার হাতটা ছুড়ে দিয়ে বল্লে, ঝুট্ ! অর্থাৎ মিথ্যা কথা ! হাতে নাকি চমৎকার বিয়ের রেখা আছে। আরও বললে, দশ বছর আগে বিয়ে হয়েছে। আমি ত অবাক্। যত বলি বিয়ে হয় নি, সে মাথা নাড়ে ! হিসেব ক'রে দেখ ননী, দশ বছর আগে আমি ছুটী নিয়ে আসি, তুমি হারিয়ে যাও, তোমায় আমায় ভাব হয়।"

লাজলজ্জার মাথা খাইয়া ননী বলিল, "গণক মিথ্যা বলে না, সত্যিই দশ বছর আগে বিয়ে হয়েছিল।"

নিরঞ্জন সহাস্যে কহিল "কি রকম ?"

"এই দেখ।"

নিরঞ্জন সাশ্চর্য্যে দেখিল, দ্বিধাবিভক্ত সীমন্ত-রেখা সিন্দুর-রঞ্জিত।

ননী মাথার কাপড়টা আবার টানিয়া দিয়া মাটীতে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল। কথায় বলে না, দুধ মরিয়া ক্ষীর, ক্ষীর মরিয়া চাঁচি, আমাদের বুড়া নিরঞ্জন--ছিঃ ছিঃ, কি কাণ্ডটাই করিল !

আমরা জানিতাম—যুবক-যুবতীদেরই একাধিপত্য ! সুবিধা পাইলে অতিক্রান্তযৌবন নর-নারীও যে অনধিকার-চর্চ্চা করিয়া থাকে, তাহা আমাদের জানা ছিল না।

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার।

ত্রিবেণী

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

জন-সাধারণের যে সমিতি রাজ-অত্যাচারের প্রতিবিধানার্থ নায়ক খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল—ইহাদের মধ্যে প্রধান কয়-জনকে রাজাজ্ঞায় মহাপ্রতিহার ধরিয়া লইয়া গিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন—তাহার অধিকাংশ তরুণ সদস্যই এ ঘটনায় ভীত হইয়া সঙ্ঘ হইতে সরিয়া পড়িয়াছিল, কেহ কেহ বা রাজদণ্ড ভয়ে ভীত হইয়া দেশ ছাড়িয়া পলাইল। তাহাদের মধ্যে আবার কাহারও উদ্দেশ্যে রাজ-দণ্ডনায়ক গুপ্তচর প্রেরণ করিলেন। ইহার ফলে দুই এক জন ধৃত হইয়া ফিরিয়া আসিল, দুই এক জন সুচতুর যুবক চরের চক্ষুতে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া নিরুদ্দিষ্ট হইয়াই রহিয়া গেল।

মহাসামন্তোপাধিক ভট্টারক সুরপাল দেবের ও মহা-কুমার রামপাল দেবের কারাগৃহ-বাস সংবাদ রাজধানীতে গোপন ছিল না। মহামাত্যপুত্র বোধিদেবকেও যে রাজবন্দী হইতে হইয়াছে, ইহাও প্রকাশ্যে না হউক যত্র-তত্র গোপনে আলোচিত হইতেছিল। মগধ ও তীরভুক্তি হইতে যে শীঘ্রই নূতন সৈন্যদল আসিতেছে এবং নগরের প্রতি তোরণে, রাজপ্রাসাদের দ্বারে দ্বারে, রাজরক্ষী সৈন্যদলের মধ্যে যে বহুল পরিমাণে সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটিতেছে, তাহাও দেখিতে পাওয়া গেল। অতঃপর এই হইল যে, রাজ-অত্যাচার যেমন ছিল, তাহা ত রহিলই, উপরন্তু জন-সাধারণের সর্ব্বপ্রকার স্বাধীনতার যেটুকু বা অবশিষ্ট ছিল, তাহাও ঘুচিয়া গেল। এই রাজদ্রোহের অছিলায় এখন যে কোন গৃহে যে কোন সময়েই দণ্ডনায়ক বা মহাপ্রতিহারের প্রেরিত লোক সদলবলে আসিয়া গৃহ অনুসন্ধান ও সন্দিগ্ধ ব্যক্তিকে অনায়াসেই ধরিয়া লইয়া যাইতে সমর্থ হইল। এই উপলক্ষে কত গৃহ কত তরুণ যুবক অবিচারে কারানিক্ষিপ্ত, এমন কি কত সুন্দরী কুলবধূ পর্য্যন্ত অপহৃতা হইয়া গেল। রাজদ্বারে বিচার প্রার্থনা করিতে গেলে রাজদ্রোহী বলিয়া কারা-নিক্ষেপমাত্রই লাভ ঘটে, অথবা দেশ হইতে বিতাড়িত হইতে হয়। দেখিয়া শুনিয়া দেশবাসী নিরাশায় ও শঙ্কায় অধীর হইয়া উঠিল এবং নিরুপায়ের যিনি উপায়—তাঁহাকেই স্মরণ করিয়া দুঃখ নিবেদন করিতে লাগিল, প্রকাশ্যে কাহারও আর কোন প্রতীকার-চেষ্টার ভরসামাত্র রহিল না।

তথাপি সেই তরুণের দল একবারেই হাল ছাড়িয়া দিতে পারে নাই। তাহারা অতিশয় গোপনে কোন নির্জ্জন ভগ্ন দেউলে মধ্যরাত্রিতে সম্মিলনের ব্যবস্থা করিয়াছিল। সেখানে তাহারা নানাপ্রকার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ এবং আলোচনাদি করিত। গোপনে অস্ত্র-সংগ্রহও করা হইত। দিনের বেলা পরস্পরে অপরিচিতের ন্যায় ব্যবহার করাই তাহাদের মধ্যে নিয়ম ছিল। অথবা এমন কি, সময় সময় কোন তুচ্ছ কারণ ধরিয়া তাহাদের মধ্যে রাজপথে বা প্রকাশ্য স্থলে বিবাদ বাধিতেও দেখা যাইত। এইরূপেই তাহারা নিজেদের অস্তিত্বকে গুপ্তচরদের তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণ-নেত্র হইতে গোপন রাখিত। হরি কৈবর্ত্ত এই দলে ঢুকিয়াছিল, তাই ইদানীং গভীর রাত্রিতে সে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যায়, কোন দিন সন্ধ্যা হইতেই বাড়ী থাকে না। এই রকম ঘটনা প্রায়ই ঘটিতে থাকায়, হরির স্ত্রী গৌরবী এক-দিন উজ্জ্বলার কাছে কাঁদিয়া পড়িল। গৌরবী বলিল, "ভাসুর ঠাকুর বেঁচে থাকতে আমাদের মিন্‌সে যে এমন ক'রে অধঃপেতে হয়ে যাচ্ছে, তা' তেনা কি একবার চোক মেলে দেখবেও না? নিজের পড়াপাট আর তোকে নিয়েই দিনরাত মত্ত হয়ে রইলো, জ্ঞাৎ জ্ঞাৎ ক'রে

যে অত টান ছিল; সে কি সবই একেবারে জলাঞ্জলি দিয়ে দিলে।"

হরি ভীমের সম্পর্কে ভাই হইলেও, দুই জনে আজীবন ধরিয়া প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। উজ্জ্বলা সে রাত্রিতে ভীমকে ধরিয়া বসিল, বলিল, "দেখ সেঙ্গাৎনী আজ আমায় নাহোক লজ্জা দিয়েছে। তোমার স্যাঙ্গাৎ যে রোজ দিন রাত্তির বেলায় ঘর থেকে বার হয়ে যায়, তা হ্যাঁ গা! তুমি তার কেমন স্যাঙ্গাৎ যে একটু খোঁজও নাও না? ছুঁড়ী হাপুসুটি কাঁদতে লাগলো, কত দুঃক্ষু ক'রে বল্‌লে।"

ভীম বিস্মিত হইয়া বলিল, "কে রাত্রে বাড়ী থাকে না? হরি?"

উজ্জ্বলা রাগ করিয়া উঠিল, "তা না তো কি তুমি? ওনারই তো কথাই বলছি।"

ভীম ঈষৎ হাসিয়া উজ্জ্বলার উজ্জ্বল গণ্ডযুগলে আঙ্গুল দিয়া একটা টোকা মারিল, উজ্জ্বলাও তাহাতে, "উঃ লাগে না বুঝি?" বলিয়া উহার প্রতিশোধ লইল। ভীম তখন হাসিয়া তাহার একমাত্র প্রিয়তমার সুচারু দেহলতা নিজের বক্ষে টানিয়া আনিয়া তাহার গণ্ডের আহত স্থান প্রগাঢ় স্নেহে চুম্বন করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, "বলি, এবারও আমার ধারটা রাখবে কেন? শীগগির শোধ ক'রে দাও! দাও বলছি, কিছু সুদও দিও।"

তাহার পর তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইয়া গেলে অবশেষে আবার সেই পূর্ব্বের আলোচ্য বিষয়টাই উঠিয়া পড়িল। উজ্জ্বলার দীপ্ত সুন্দর মুখখানির পানে পূর্ণনেত্রে চাহিয়া স্নেহকোমলকণ্ঠে তাহার স্বামী জিজ্ঞাসা করিল, "এইবার বল ত, হরি কি করেছে? এইবার মন লাগিয়ে শুন্‌ছি।"

উজ্জ্বলা গৌরবীর কাছে যাহা যাহা শুনিয়াছিল, হরির বিরুদ্ধে সে সকলই জানাইল এবং বলা হইয়া গেলে পরিশেষে মন্তব্য প্রকাশ করিল, "এর আগে ত স্যাঙ্গাতের রীতচরিত্তির এ ধরণের ছিল না! হঠাৎ এ রকমটা কেন হলো? আহা, স্যাঙ্গাৎনী আবাগী কেঁদে কেঁদে মরতে নেগেছে।"

তাহার পর ব্যগ্র হইয়া স্বামীর মুখের দিকে মিনতিভরা-দৃষ্টি তুলিয়া ধরিল, "তোমায় সে বড্ড মানে, তুমি ওকে এই রাত-বেড়ান রোগ থেকে উদ্ধার কর গো, নৈলে বউটা আর প্রাণে বাঁচবে না।"

ভীম মনে মনে সে বিষয়ে দৃঢ়সঙ্কল্পই হইয়াছিল, কিন্তু তা'ই বা সে হঠাৎ ফাঁস করিতে যাইবে কেন? কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যে মুখ ভারী করিয়া সে গম্ভীরস্বরে উত্তর দিল, "তুমি ত ব'লে চুকলে যে, 'রোগ থেকে উদ্ধার কর', করা কি না খুব সোজা! যদি সে ব'লে বসে যে, ঘরে তার মন টেকে না, তোমার স্যাঙ্গাৎনীকে তার মনে ধরে না; কিসের টানে থাকবো? তা হ'লে কি জবাব দোব ব'লে দাও?"

উজ্জ্বলা এ কথায় বড়ই বিপন্ন বোধ করিল। হরির স্ত্রী দেখিতে তত দূর সুশ্রী নহে, যদিও ইতঃপূর্ব্বে ইহাকেই হরি আর্ত্তি যত্ন করিয়া চলিত এবং তাহার চরিত্রগত কোন দোষের কথাও এ পর্য্যন্ত কখন শোনা যায় নাই; তবে মানুষের মন না মতি, তা বদলাইতে আর কতক্ষণ? তাই উজ্জ্বলা স্বামীর প্রশ্নে ও তাহার গাম্ভীর্য্যে ঈষৎ বিব্রত হইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া কোন উপায় ঠাহর করিতে না পারায় উহারই শরণাগত হইয়া অবশেষে মিনতি করিয়া বলিল, "হেঁই গো! তোমার পায়ে পড়ি, তুমিই ভেবে চিন্তে এর কোন বিহিত ক'রে দাও। আমরা মেয়েমানুষ, তোমার মতন কি পুঁথি পড়েছি, না বুদ্ধিই আছে কিছু? যা বল্লে ভাল হয়, তাই ব'লে দিও। এ কায তুমি ছাড়া আর কারু দ্বারায় হবে না। সে তোমার কথায় বাঁচে মরে।"

ভীম কহিল, "তাই জন্যেই ত ভাবছি বড় বৌ! সে যদি বলে যে, গৌরবীকে আমার মনে ধরে না, তাই বাড়ী থাকি নে, তা হ'লে আমায় ত একটা জবাব দিতে হবে। তা তুমি যখন অনুমতি দিচ্ছো যে, যা হোক ব'লে দিতে, তা হ'লে তাই না হয় বলা যাবে! সেও তা হ'লে খুসী হয়েই ঘরবাসী হবে।"

উজ্জ্বলা অন্তরে বাহিরে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া উঠিয়া সোৎসাহে কহিয়া উঠিল, "কি বলবে বল ত?"

ভীম একটুখানি হাসি চাপিয়া ফেলিয়া চিন্তিত মুখে উত্তর করিল, "আমারটিকে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে আর কি! তোমার যখন আদেশ হয়েছে যে, তার রাত-বেড়ানো রোগ সারাতেই হবে, তখন তা' শুনতেই হবে ত। তা' আমার আর কি আছে? এক এই সাত রাজার ধন মাণিকটুকু আছে, তাই সেইটি দিয়েই ওকে

ভুলুতে হবে আর কি! তা' এখন যদি সে ঘরে বসে এমনটি পায়, তা হ'লে আর পাঁচ দরজায় ভিখ্ মাঙ্গতেই বা যাবে কেন?"

উজ্জ্বলা এইবার স্বামীর দুষ্টামীর কথা ধরিতে পারিল। সে তখন হাস্যস্মিতনেত্রে অথচ কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যযুক্ত মুখে স্বামীকে জবাব দিল, "গৌরবীর সঙ্গে যে পেরথমে তোমারই বিয়ের কথা হয়, সেই দুঃক্ষুটা যখন এখনও মন থেকে যায় নি, তখন না হয় দিন কতক বদল করেই দেখ। আমি তো এখন তোমার আর দরকারে লাগছিনে, পচা পুরানো হয়ে গেছি। যাকে তাকে বিলুতে পারলেই বেঁচে যাও।"

কথাটা যদিও রহস্যের মধ্য দিয়াই আরম্ভ হইয়াছিল, অথচ ইহার শেষের দিক্‌টাতে হঠাৎ অকারণেই উজ্জ্বলার বুকটা যেন কেমন একটু ভারী হইয়া উঠিল এবং তাহার কণ্ঠ দিয়া ঈষৎ একটা নিশ্বাস একটু দীর্ঘ হইয়া উত্থিত হইল। তাহার পর দেখিতে দেখিতে তাহার বড় কালো চোখ দুইটি বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া আসিল। ইহা লক্ষ্য করিয়া ভীম দারুণ অপ্রতিভ হইয়া পড়িল এবং সেই সঙ্গে সে নিজেও যেন ঐ অভিমান বাক্য কয়টিতে তাহার অন্তরের মধ্যে একটা ব্যথা বোধ করিল। সেই যে জীবনের মধ্যে একটি দিন—সে তাহার দুর্ম্মুখী মাতার বাক্যে আহত হইয়া তাহার প্রতি রূঢ় ব্যবহার করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহারই লজ্জাকর-দুষ্ট স্মৃতি তাহার চিত্তকে সময়ে অসময়ে যথেষ্ট পীড়িত করিয়া তুলিতে ছাড়ে না। আবার তাহারই সহিত সংযুক্ত আরও একটা ঘটনার স্মৃতি তাহার সবল চিত্তকে যখন তখনই ঈর্ষা-দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। সে দিন যদি সে ঠিক সেই সময়ে সেখানে না গিয়া পৌঁছিত, তবে তাহার ভাগ্যে না জানি সে দিনে কি ঘটনাই ঘটিয়া যাইত! গভীর উচ্ছ্বাসে সে ব্যগ্রকরে উজ্জ্বলাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া তাহাকে দৃঢ়বলে চাপিয়া ধরিল, উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "উজ্জ্বলা! মাপ কর আমায়। ঠাট্টা করেও এমন কথা আমার মুখ থেকে কি ক'রে বেরুলো? না না, তুই আমার জীবন-মরণের সাথী, আমার সর্ব্বস্ব, আমার বল-বুদ্ধি-ভরসা। তোকে আমি যমকেও দিতে পারবো না, তা' মানুষকে! আয় আমার রাণী! আমার বুকে আয়।"

উজ্জ্বলা বড় সুখে বড় গৌরবেই তাহার একনিষ্ঠ-পত্নী-প্রেমিক স্বামীর বিশাল বক্ষে তাহার সুখ-শিথিল মস্তক এলাইয়া দিয়া আবেশ-মুদিতনেত্রে মনে মনে পুনঃ পুনঃই বলিল, "ওগো, তোমার বুকে মাথা রেখে এখনই যদি আমার মরণ আসে, তাতেও আমার দুঃখ নেই, শুধু তোমায় যেন আমি রেখে মরি।"

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

নিন্দকের রসনা ও আগুনের শিখা কখনই এক স্থানে স্থির থাকে না। বায়ুবেগে সে চারিদিকে প্রসৃত হয় ও যাহা কিছু পায়, তাহাকেই আশ্রয় করিয়া ধ্বংস করে। অনতি-ক্রান্ত যৌবন সুস্থকায় যুবক হরি যখন প্রতি সন্ধ্যায় ও বিশেষ করিয়া রাত্রিতেও অনুপস্থিত থাকিতে আরম্ভ করিল, তখন প্রথমে কানাঘুষা ও পরে প্রবলভাবেই তাহার সম্বন্ধে কুৎসাজাল রটিয়া উঠিতে লাগিল। কেহ কেহ এমন কথাও শুনাইল যে, তাহারা কোন এক বারবনিতার দ্বারদেশে পৈষ্টী পানে বিহ্বলপ্রায় হরিকে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছে। কেহ বা বলিল, ইহা সে দেখে নাই বটে, তবে গণিকা মহাসেনার একটা পরিচারিকার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া সে সে দিন বিপণীর পথে চলিতেছিল, উহাকে দেখিয়াই ছুটিয়া পলাইয়া গেল। ধর্ম্মঠ আসিয়া দিব্যোকের সাক্ষাতেই ভীমের কাছে কাঁদিয়া পড়িল, বলিল, "বাপা! তুই থাক্‌তে তোর স্যাঙ্গাতের এমন কুরীত ঘটলো, তুই তার কিচ্ছুটি করলি নে?"

ভীম যদিও চারিদিক্ হইতেই তাহার প্রিয় সখার এই সব কুৎসা-কাহিনী শুনিতেছিল, কিন্তু যথেষ্ট প্রমাণ সত্ত্বেও সে যেন ইহা অন্তরের মধ্য হইতে ঠিক বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। হরিকে সে যে তাহার জন্ম-মুহূর্ত্ত হইতেই ভাল করিয়া জানে। লোক উপহাস করিয়া বলিত, ওতো ভীমের ছায়া! তাদের মধ্যে কোন দিনই তো কোন কথা গোপন ছিল না! সেই হরি আজ তাহাকে এতখানি দূরে সরাইয়া দিয়াছে!

একদিন এই কথা সে উত্থাপন করিল। তাহার অভি-মান-গূঢ় অভিযোগে হরি প্রথমটা স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার পর যখন ভীম পুনশ্চ ক্ষুণ্ণকণ্ঠে কহিল, "আমি জান্‌তুম, আমাদের মধ্যে কারু কাছে কারু কোন কিছু লুকোবার নেই, কিন্তু এদ্দিনে সে বিশ্বাসটা যা হোক ঘুচলো!"

তখন সেই নিগূঢ় অভিমানাহত চিত্তের গভীর বেদনা অনুভব করিয়া হরি আর স্থির থাকিতে পারিল

না। সে ম্লানহাস্যের সহিত জবাব দিল, "তোর কি মনে হয়, আমি একেবারেই অধঃপাতে গিয়েছি, ভীম ?"

ভীমও সেইরূপ ভাবেই হাসিয়া কহিল, "কি জানি ভাই! প্রমাণ তো তাই পাওয়া যাচ্ছে!"

হরি এ উত্তরে ঈষৎ আহত হইল। "আমায় কি তুই চিনিস্ নে ?"

ভীম কহিল, "কই আর চিনি ? অধঃই হোক, আর ঊর্দ্ধই হোক, একটা কোন নূতন পথ যে তুমি নিয়েছ, এটা তো ঠিক ? আর সেটা আমার অচেনা।"

হরি এবার লজ্জা পাইল। তাহার পর ক্ষণকাল নীরবে কি চিন্তা করিয়া পরিশেষে কহিল, "বেশ, তবে তাই হবে! এ পথের সঙ্গে তুমিও পরিচিত হও।"

রাত্রিকালে হরি আসিয়া চুপিচুপি ভীমকে ডাকিল। "এস স্যাঙাৎ! আমার নূতন পথের পথিক হবে ত এস।"

ভীম তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হইয়া বাহির হইল। রাজমার্গ তখন প্রায় জনহীন, বিশাল নগরী তন্দ্রাচ্ছন্ন ও প্রায় স্তব্ধ। তবে তাহার ইতস্ততঃ কোথাও কোন গৃহে উৎসবের হাসি-বাঁশী নীরব হয় নাই, অন্যত্র শোকের বিলাপ শ্রুত হইতেছে। কোন দেবায়তন মধ্য হইতে সাধ্যায় নিরত নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর কণ্ঠনিঃসৃত শাস্ত্রপাঠ ধ্বনি শুনা যাইতেছিল। মহাবিহারে প্রজ্ঞা পারমিতার প্রচার তখনও বন্ধ হয় নাই। আবার বারনারীদের পান-প্রমত্ত সঙ্গীত-ধ্বনিও ক্কচিৎ শ্রুত হইতেছে। কিছুদূর আসিয়া ভীম মৃদুস্বরে হরিকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছো ?"

হরি কহিল, "নিশ্চয়ই কোন মন্দ জায়গায় নয়।"

ভীম হাসিয়া কহিল "তা' আমি জানি, তবু ?"

"এত অধৈর্য্য কেন ?" বলিয়া হরি ভীমের কাঁধ ধরিয়া একটা নাড়া দিল।

সমিতির সভ্যসংখ্যা এ দিন প্রায় দ্বিশতাধিক হইয়াছিল। হরি পূর্ব্বেই ভীমের কথা ইহাদের বলিয়া রাখায় তাহাকে দেখিয়া কেহই বিস্মিত হইল না, বরং সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিল। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভীমের পরিচিত। তাহারা অনেকেই বলিল যে, "আমরা তোমায় আমাদের মধ্যে পাবার জন্যে কি কম উৎসুক ছিলেম! শুধু ঐ হরিটাই ক্রমাগত বাধা দিয়েছে! আমরা বরাবরই জান্তেম, ভীমের শরীরের বলের মতন মনের বলেরও অভাব নেই।"

এক জন বলিল, "যখন কুমার রামপাল আমাদের প্রত্যাখ্যান করলেন, তখন আমরা যদি আভিজাত্যের পূজা ছেড়ে ভীমের কথা মনে করতে পারতেম, তা হ'লে হয় ত, আমাদের অত বড় সঙ্ঘটা নষ্ট হয়ে যেত না।"

কেহ বলিল, "তা' যা হয়ে গেছে, সে তো এখন আর ফিরবে না! এখন আমাদের মধ্যে ওঁকে পেয়ে আমরা অনেকটাই সবল হ'তে পারলেম, তাতে সন্দেহ নাই!"

ফিরিবার পথে দুইজনেই বহুক্ষণ নীরবে পথ অতিবাহন করিতেছিল, কিন্তু তাহাদের সেই বাহ্য নীরবতার অভ্যন্তরে গভীরতর চিন্তার ধারা প্রবাহিত হইতেছিল, তাহা যদি কেহ সে সময়ে তাহাদের মুখের দিকে চাহিত, তবে তাহার বুঝিতে বাকি থাকিত না। দুইজনেরই চিত্ত খুবই সম্ভব একই বিষয়ের চিন্তায় মগ্ন হইয়াছিল।

কিছুদূর আসিবার পর এতক্ষণকার সেই গভীর নীরবতা ভঙ্গ করিয়া ভীমই প্রথম কথা কহিল, "হরি! এ সব কথা এতদিন আমার কাছে লুকিয়ে রেখেছিলে কেন ?"

এ প্রশ্ন যে উঠিবে, হরিও তাহা জানিত এবং সেইজন্যই ইহার উত্তরও সে প্রস্তুত রাখিয়াছিল। সে তাই প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিল, "দিব্য জ্যেঠা রাজার দয়ায় নূতন ক'রে জমাজমি ফেরৎ পেয়েছে, রাজা তোমাদের 'পরে অনুগ্রহ করছে, তোমরা যদি তার ক্ষতি করতে না চাও, তাই ভরসা হয় নি।"

হরির এই সরল ও স্পষ্ট বাক্যে ভীম মনের মধ্যে আহত এবং বোধ করি কিছু লজ্জিতও হইয়াছিল। তাহার আশৈশব সখার এই সামান্য ইঙ্গিতটুকু তাহার আত্মমর্য্যাদাকে একটুখানি নির্দ্দয়তার সঙ্গেই আহত করিয়াছিল। একটু শুষ্কভাবে সে উত্তর করিল, "জ্যেঠার মধ্যে বরাবরই রাজভক্তির একটা প্রাবল্য আছে স্বীকার করি, কিন্তু আমায় কবে এতটাই ভক্ত দেখলে যে, এত বড় অবিচার ক'রে বসলে ?"

হরি এবার ফিরিয়া লজ্জা পাইল। সে অপ্রতিভ হইয়া মৃদুভাবে কহিল, "মাপ করিস্ ভাই! অত্যাচারী রাজার উচ্ছেদ আমরা চাই, পাছে তুই বাধা দিস্, এই মিথ্যে সন্দেহে আমি তোকে বলতে পারি নি। ভুল করেছিলুম স্বীকার করছি।"

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ভীম কহিল, "তবে কথা এই যে, রাজার উচ্ছেদই যে ঠিক আমার কাম্য তাও নয়। অত্যাচারেরই উচ্ছেদ আমি কামনা করি।"

হরি বলিল, "কিন্তু সেটা কি সম্ভব, ভীম? জড় না মারলে কি গাছ মরে?"

ভীম কহিল, "ভাল করে ছেঁটে-কেটে রাখতে পারলে, গাছ না মারিয়েও ফল হওয়া বন্ধ করা যায় ত?"

হরি হাসিয়া ফেলিল, "ঐ দেখ! রাজভক্তি তোদের হাড়ের মধ্যে বাসা ক'রে আছে। ও যাবার নয়।"

ভীমও হাসিল, যুক্তিপূর্ণ মৃদু-গম্ভীর হাসি হাসিয়া কহিল, "ভক্তি যে খুবই আছে, তা' নয় হরি! তবে কথাটা কি জানো, পালবংশ একটা মস্ত বংশ, এর অনেক রাজাই খুব বড় ও ভাল ছিল, একটা কুলাঙ্গার জন্মেছে বলেই যে চিরদিনের সব কৃতজ্ঞতা সব্বাইকার ফুরিয়ে 'দিতে হবে, তার মানে কি? দেখা যাক্, যদি অত্যাচার বন্ধ করতে পারা যায়, তা হ'লেই অত্যাচারী ত আর সে থাকলো না? অবশ্য যদি মহাকুমার রামপাল অমন ভীরু না হতো, তা হ'লে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা ছিল। অরাজকতাও ত ভাল নয়। রাজবংশে আর উপযুক্ত লোক কই?"

হরি কহিল, "কেন শূরপাল?"

ভীম অবজ্ঞার সহিত উত্তর করিল, "ওই ভাইয়েরই ভাই ত! তাঁরও যদি ভরসায় না কুলায়? যদি ওরা যথার্থ শক্তিমান্ হতো, তা হ'লে কি আর রাজাজ্ঞা পাওয়া মাত্র অমন ভাল ছেলের মতন সুড় সুড় ক'রে কষ্টাগারে গিয়ে ঢুকে পড়ে? আত্মরক্ষার চেষ্টাটিও কি করে না? আরে ছ্যাঃ!' এক ভস্ম, আর ছার, দোষগুণ ক'ব কার'!"

সে রাত্রিতে উজ্জ্বলা জাগিয়া ছিল, স্বামীকে দেখিয়াই উঠিয়া বসিল। কিন্তু কেন এত রাত হইল, তাহার সম্বন্ধে প্রশ্নমাত্র তুলিল না। ভীম এতক্ষণ আশা করিতেছিল যে, হয় ত উজ্জ্বলা এই লইয়া ঘোর অভিমান করিয়া আছে এবং তাহাকে হয় ত তাহার জন্য অনেকটাই বিপন্ন হইতে হইবে। এখনও সে উহার নীরবতাকে মৌন-অভিমানই আন্দাজ করিয়া আর একটু জ্বালাইয়া লইবার লোভে সকৌতুকে কহিল, "তুমি বুঝি এখনও জেগে আছ? আমি কোথায় ভাবলাম যে, চুপি চুপি এসে শুয়ে পড়বো। তোমার চোখে ধুলোটি দেবার যো নেই।"

উজ্জ্বলা হাসিমুখে উঠিয়া আসিল। "ধুলো দিলেই কি সবার চোখে ধুলো লাগে?"

"বড়বৌ! এত রাত অবধি কোথায় ছিলাম, কই জানতে চাইলে না ত?"

স্বামীর প্রশ্নে স্ত্রী তাহার কাঁধের উপর মাথাটা এলাইয়া দিয়া প্রেম-প্রসন্ন দৃষ্টিতে মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে জবাব দিল, "কেন চাইবো? আমার কি তেমনই স্বোয়ামী যে, একদণ্ড চোখ-ছাড়া হ'লেই মনের মধ্যে ধুক্ ধুক্ করতে থাকবে যে, ঐ বুঝি কোন্ ডাইনী মাগী তাকে ছিনিয়ে নিলে?"

"তোর ত বুকের পাটাখানা খুব শক্ত রে! তবে তোদের ঐ গৌরী ছুঁড়ী অমন ক'রে কেঁদেকেটে মরে কেন?"

"ওঃ, কিসে আর কিসে! তোমার সাথে, আর তার সাথে!" বলিয়া স্বামী-গৌরবে গৌরবিনী উজ্জ্বলা সুখোজ্জ্বল হাসিমুখে মুখ তুলিয়া স্বামীর উৎফুল্ল মুখের দিকে চাহিল।

ভীম গভীর প্রেমে তাহাকে প্রগাঢ় চুম্বন করিল, "ঈস্, ওঁর স্বোয়ামীটিই যেন রাজ্যিশুদ্ধু সব্বার চাইতেই ভাল!"

তাহার পর ঈষৎ গম্ভীর হইয়া কহিল, "উজ্জ্বলা! গৌরবৌকে বলিস্ হরিকে সে চেনে না, তাই এ নিয়ে হাঙ্গামা করছে। বলিস্ আমি বলেছি, সে যা ভাবছে, সে সব কিছু নয়। কোন কাযের দরকারে তাকে রাতের বেলায় বাইরে যেতে আসতে হয়, আরও বলিস্, আমিও আজ তার সঙ্গে ছিলুম, যদি আমায় ভরসা থাকে, তবে সে কুকথাগুলোকে যেন মন থেকে বিদেয় দেয়।"

উজ্জ্বলা দ্বিধাহীন আনন্দে সাগ্রহে সম্মতি জানাইল, "তুমি যখন বলছ, তখন নিশ্চয়ই সে প্রত্যয় যাবে। তোমায় ওরা ঠাকুর ব'লে মনে করে যে গো।"

ভীম, পুনশ্চ কণ্ঠলগ্না, বক্ষলীনা পত্নীকে আদর করিয়া হাসিয়া কহিল, "ওরা না তুই? তবু যদি তোর স্বোয়ামী একটা চাষা-ভুষো না হয়ে রাজা মহারাজা হতো, তা হ'লে তুই বোধ করি আমাকে মাটীর গায়ে আর পা ফেল্‌তিস্ নে! না?"

উজ্জ্বলা তাহার ছোট্ট নথটাকে ভীষণভাবে মুখশুদ্ধ ঘুরাইয়া একটা কিল দেখাইয়া মুখ ভেঙচাইয়া জবাব দিল, "নাঃ, মাটীর গায়ে পা ফেল্‌তো না! আকাশে উড়ে যেত! কেন, আমার স্বোয়ামীর উপরে তোমার অত হিংসে কেন বল তো! আমার এই রাজা, এই মহারাজা, এই আমার সব গো সব! আমার মতন ভাগ্যি ক'জনার হয়!" এই বলিয়াই সে শ্রদ্ধায়, প্রেমে পরিপূর্ণ হইয়া স্বামীর পায়ের ধুলি লইয়া সীমন্তে রাখিল। "এই পায়ে যেন জন্ম জন্ম মাত রেখে মরতে পারি, এইটুকুন্ আশীর্ব্বাদ করো গো, আর কিচ্ছুই আমি চাই নি গো, আর কিচ্ছু না।"

আবেগে রুদ্ধ কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া লইয়া ভীম গাঢ় স্বরে উত্তর করিল, "তাই হোক, উজ্জ্বলা! আমরা যেন দু'জনেই দু'জনের উপর এমনই ভালবাসা নিয়ে মরতে পারি, শিব-ভবানী এই করুন! আর দু'জনে যেন একসঙ্গে মরতে পারি, কারুকে ছেড়ে যেন কারুকে থাকতে হয় না।"

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

সত্যাগ্রহী সতীন্দ্রনাথের কারাদণ্ড

বরিশাল পটুয়াখালী সত্যাগ্রহের নেতা শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ সেন বরিশালের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। এই দণ্ডের বিপক্ষে আপীল হইয়াছে, সুতরাং এই মামলা সম্পর্কে এখন আমরা কোনওরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিব না। তবে নিম্ন আদালতে দণ্ডপ্রাপ্তির পূর্ব্বে ও পরে সতীন্দ্রনাথ যে মনোবল দেখাইয়াছেন, তাহা বিশ্লেষণ করিবার অধিকার অবশ্যই বাঙ্গালী মাত্রেরই আছে।

সতীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি দেশের বর্ত্তমান সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও বিরোধের প্রচণ্ডতার সময়ে সরকারী আদেশের বিরুদ্ধে শোভাযাত্রা করিয়া দেশের শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা আনয়ন করিয়াছিলেন। এই অভিযোগে বিচারক তাঁহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে ১ বৎসরকাল শান্তিরক্ষার জন্য ৫ হাজার টাকা মুচলেকা দিতে এবং ২॥০ হাজার টাকা করিয়া দুই জনকে তাঁহার হইয়া জামীন দিতে আদেশ করিয়াছিলেন, অন্যথা বিনাশ্রমে তাঁহার ১ বৎসর কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সতীন্দ্রনাথ মুচলেকা ও জামীন না দিয়া কারাদণ্ড বরণ করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার দণ্ডের বিরুদ্ধে আপীল হইয়াছে।

সতীন্দ্রনাথ সেন বরিশালের একটি যুবক দেশকর্ম্মী, পূর্ব্বে তাঁহার এই মাত্র পরিচয় ছিল। কিন্তু আজ তাঁহার দণ্ডে সমগ্র দেশ আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছে কেন? তাহার কারণ আর কিছুই নহে, যে ত্যাগমন্ত্রে এক দিন অশ্বিনীকুমারের বরিশাল স্বদেশীর পুণ্যদিনে দেশবিখ্যাত হইয়াছিল, সতীন্দ্রনাথ আজ মহাত্মা গন্ধীর মন্ত্রশিষ্যরূপে সেই ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সেই বরিশালকে আবার পুণ্যপীঠে পরিণত করিয়াছেন, ইহাই তাঁহার জনপ্রিয়তার একমাত্র কারণ।

শ্রীযুত সতীন্দ্রনাথ সেন

বাঙ্গালা আজ নেতৃশূন্য। স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা, সঙ্কীর্ণতা, নীচতা, প্রতারণা, বিরোধ, বিদ্বেষ দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। যে বাঙ্গালা এক দিন ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় ছিল, বাঙ্গালা আজ যাহা ভাবে কাল ভারত তাহা ভাবিতে অভ্যস্ত হয়---এ কথা যে বাঙ্গালার সম্পর্কে সকলের মুখে শুনা যাইত, সে বাঙ্গালা পূর্ব্ব গৌরবের বিরাট ধ্বংসস্তূপের উপর দণ্ডায়মান হইয়া আত্মসম্মানের শ্মশানচুল্লীর চিতাধূম আকাশমার্গে পুঞ্জীভূত হইতে দেখিতেছে। বাঙ্গালায় আজ 'মানুষ' নাই, বাঙ্গালার একটি মাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠানও সঙ্কীর্ণ নীচ স্বার্থপরতার ভীষণ ঘূর্ণীবাত্যায় ভূলুণ্ঠিত, 'আজ মারাঠী পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী তৈলঙ্গী বাঙ্গালীকে পিছে রাখিয়া কোথায় উঠিয়া গেল,—এ রব 'বাঙ্গালার যত্র তত্র ধ্বনিত হইতেছে। এমনই বাঙ্গালার শোচনীয় অবস্থা! এ সময়ে এ ঘোর দুর্দ্দিনে যে শক্তিমান্ বাঙ্গালী তরুণ অপূর্ব্ব চরিত্রবলে—আশ্চর্য্য

…র্থত্যাগে বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিতে পারেন, …নি যে বাঙ্গালীর আদরের, বাঙ্গালীর গৌরবের, বাঙ্গালীর আদর্শের …নিষ, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

আজ দীর্ঘ বৎসরাধিককাল ব্যাপিয়া পটুয়াখালীতে যে সত্যাগ্রহ …তেছে, সতীন্দ্রনাথ তাহার প্রাণস্বরূপ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। …জন্য এই সত্যাগ্রহ? সতীন্দ্রনাথের ইহাতে নিজ স্বার্থসাধনের …য় কিছুই নাই। হিন্দুর চিরাচরিত ধর্ম্মাচারের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত সতীন্দ্রনাথের এই সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রবর্ত্তিত। হিন্দুর ন্যায়-সঙ্গত ধর্ম্মের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত সতীন্দ্রনাথ দুঃখ-বিপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া অচল অটল হিমাচলের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়াছেন। যে মসজেদের সম্মুখে হিন্দুরা আবহমান কাল সবাদ্য শোভাযাত্রা করিয়া আসিয়াছে, তাহাতে সরকারপক্ষ বাধা প্রদান করিয়াছিলেন, শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় অন্য ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু সতীন্দ্রনাথ সে ব্যবস্থা হিন্দুর ন্যায়সঙ্গত অধিকারের অমর্য্যাদাকর বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। তাই তিনি তাহার বিপক্ষে সত্যাগ্রহ প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। সরকারের ন্যায়সঙ্গত আদেশ অমান্য করিব বলিয়া অহঙ্কারস্ফীত হইয়া নহে মুসলমানের ধর্ম্মবিশ্বাসে আঘাত দিব বলিয়া নহে,—কেবলমাত্র হিন্দুর ন্যায়সঙ্গত অধিকার রক্ষার উদ্দেশ্যে। অন্যান্য ক্ষেত্রে অন্যান্য ধর্ম্মীর ধর্ম্মাধিকারে হস্তক্ষেপ হইলে সেখানে উগ্রতার সহিত—বাহুবলের সাহায্যে বাধাপ্রদত্ত হইয়া থাকে,—এমন দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই। কিন্তু সতীন্দ্রনাথ মহাত্মা গন্ধীর মন্ত্রশিষ্য, অহিংস অসহযোগী, তাই নিজে কষ্টবিপদ মাথা পাতিয়া লইয়া অহিংসায় অবিচলিত থাকিয়া হিন্দুর ন্যায়সঙ্গত অধিকার রক্ষার জন্য সেই আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। যে অশ্বিনীকুমারের বরিশালে একদিন স্বদেশীর যুগে বাঙ্গালী তরুণ 'বন্দে মাতরম্' গাহিতে গাহিতে, হাসিতে হাসিতে গুর্খা পুলিসের লাঠী খাইয়া নিজরক্তে বরিশালের ক্ষেত্রকে পুণ্যভূমিতে পরিণত করিয়াছিল, সেই বরিশালের পুণ্যক্ষেত্রেই সতীন্দ্রনাথ অহিংসামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া অপূর্ব্ব আত্মিক শক্তির বিকাশ করিয়া হিন্দুর ন্যায়-সঙ্গত অধিকার রক্ষায় মাথা পাতিয়া দণ্ডগ্রহণ করিয়াছেন।

বিচারক তাঁহাকে দণ্ডিত করিলেও তাঁহার গুণমুগ্ধ। দণ্ডদানকালেও তিনি শতমুখে সতীন্দ্রনাথের অসাধারণ চরিত্রবলের, অপূর্ব্ব কর্ম্ম-কুশলতার, আশ্চর্য্য সঙ্ঘগঠন ক্ষমতার, আইনভঙ্গকালেও অহিংসপথ অবলম্বনে পুলিসের হস্তে আত্মসমর্পণ দ্বারা শান্তিপ্রিয়তার পরিচয়দানের, নেতৃত্ব করিবার সামর্থ্যের এবং সাধারণ শান্তিপ্রিয়তার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি বার বার বলিয়াছেন যে, সতীন্দ্রনাথ সত্যাগ্রহ দ্বারা মুসলমান-ধর্ম্মের প্রতি বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন নাই।

অতএব বুঝা যাইতেছে, সতীন্দ্রনাথ কাহারও মনে আঘাত দিবার উদ্দেশ্যে অথবা অবজ্ঞাভরে দেশের আইন অমান্য করিতে সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রবর্ত্তিত করেন নাই। তিনি নিজের জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে যাহা হিন্দুর ন্যায্য অধিকার বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাহাই অক্ষুণ্ণ রাখিতে নিজে কষ্ট বিপদ বরণ করিয়া আইন অমান্য করিয়াছেন। ইহাই পটুয়াখালীর সত্যাগ্রহ। ইহা এখন আর কেবল পটুয়াখালীর নহে, বরিশালের নহে, বাঙ্গালার নহে, সমগ্র হিন্দু-ভারতের সত্যাগ্রহ। সতীন্দ্রনাথের উপযুক্ত নেতৃত্বে সতীন্দ্রনাথের আহ্বানে বাঙ্গালার বাহির হইতেও শত শত হিন্দু অর্থ ও লোকবল লইয়া সত্যাগ্রহে যোগদান করিতেছে। সত্যাগ্রহীরা সতীন্দ্রনাথের মহৎ দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত, তাঁহারই ন্যায় অসাধারণ সংযম ও ত্যাগের পরিচয় দিতেছেন। সতীন্দ্রনাথের সংযমের কথা এবং তাঁহার অনুবর্ত্তীদিগের উপর তাঁহার প্রভাবের কথা বিচারক মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।

এমন উচ্চ আদর্শের ভক্ত অধুনা বাঙ্গালায় বিরল। তাই বাঙ্গালী বিস্ময়-বিমুগ্ধ নয়নে এই উচ্চপ্রাণ বাঙ্গালী তরুণের দিকে চাহিয়া আছে।

শিবলিঙ্গের পুনঃপ্রতিষ্ঠা

বাঙ্গালার নব-নিযুক্ত গভর্ণর সার ষ্ট্যানলী জ্যাক্সন কলিকাতা বির্জ্জতলাও পুলিস ফাঁড়ীর পার্শ্বস্থ শিবলিঙ্গের পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিয়া সমগ্র হিন্দু-সমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন সন্দেহ নাই। প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, বহুদিন পূর্ব্বে সারকুলার রোড ও চৌরঙ্গী রোডের এই সংযোগস্থলে এই হিন্দুবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। একবার ইহার বেদী ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া লিঙ্গ স্থানান্তরিত করিবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু প্রতিবেশী নদীপুরের রাজার চেষ্টায় সেবার এই কালাপাহাড়ী কাণ্ড অনুষ্ঠিত হয় নাই। এবার পুলিস ও সরকারের পূর্ত্তবিভাগের যোগাযোগে বিগ্রহ স্থানচ্যুত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, পুলিসের হিন্দু পাহারাওয়ালারা এবং অন্যান্য হিন্দু এই শিবলিঙ্গের পূজা করিত।

যদিও গভর্ণরের সিদ্ধান্ত ন্যায়বিচার মাত্র, তথাপি বর্ত্তমানে যেভাবে নানাক্ষেত্রে লোকের অধিকার পদদলিত হইতেছে, তাহাতে এই ন্যায়-বিচারের আশা করিতেও যেন জনসাধারণকে সঙ্কুচিত হইতে হয়। সার ষ্ট্যানলি মামুলী লেফাফাদোরস্ত 'লালফিতা' প্রথায় বলিতে পারিতেন,—'আচ্ছা, এ বিষয়ে আমি পূর্ত্তবিভাগের মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া দেখি',—হয় ত এ জবাবও এক মাস পরে আসিতে পারিত। তাহার পর 'পরামর্শ করিতে' হয় ত আরও এক মাস যাইত। শেষে হয় ত চিঠি-চাপাঠির প্রকাণ্ড তাড়া দপ্তরের তাকে বাঁধান অবস্থায় সাজান থাকিত অথবা জঞ্জালের চুবড়ীতে স্থানলাভ করিত। তৎ-পরিবর্ত্তে গভর্ণর হিন্দুর আবেদন পাইবামাত্র কালবিলম্ব না করিয়া কেবলমাত্র এই বিষয়ে ন্যায়বিচার করিবার নিমিত্ত মফঃস্বল হইতে কলিকাতায় ছুটিয়া আসিয়াছিলেন এবং স্বয়ং ঘটনাস্থল দেখিয়া ও সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়া হিন্দুর উপর অবিচারের মূলোচ্ছেদ করিয়াছেন। ইহা অবশ্যই তাঁহার পক্ষে প্রশংসার কথা। তিনি এ দেশে পদার্পণ করিবার পরই সুভাষচন্দ্রকে মুক্তি দান করিয়াছেন। কিছু দিন পরে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্রও মুক্তিলাভ করিয়াছেন। শুনা যাইতেছে, আরও কয়জন বিনা বিচারে আটক রাজবন্দী মুক্তি পাইবে। এ কার্য্যে সার ষ্ট্যানলীর ব্যক্তিত্বের ও রাজনীতিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। পুলিসের প্রশংসাকালেও সার ষ্ট্যানলী পুলিসকে জনসাধারণের প্রতি কর্ত্তব্যের কথা যে ভাবে বুঝাইয়াছেন, তাহাতেও তাঁহার প্রজা-প্রীতির এবং রাজনীতিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। আশা হয়, হয় ত তিনি নিজ ব্যক্তিত্বের দ্বারা সিবিলিয়ান ভৈরবীচক্রের প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন।

এ বিষয়ে সরকারী পূর্ত্তবিভাগের ভারপ্রাপ্ত হিন্দু মন্ত্রী শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী এবং কলিকাতার রক্ষক, প্রজার শান্তিশৃঙ্খলার নিয়ামক, কমিশনার সার চার্লস টেগার্ট যে ব্যবহার দেখাইয়াছেন, তাহা গভর্ণরের ব্যবহারের সহিত তুলনা করিয়া লজ্জায় অধোবদন হইতে হয়। গভর্ণর এ দেশে বহুকাল পরে মাত্র কয়েক মাস পূর্ব্বে পদার্পণ করিয়াছেন। এ দেশের অধিবাসীর আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে, তাহা বলা যায় না। তিনি তাহাদের ধর্ম্মকর্ম্ম সম্বন্ধেও যে বিশেষ অভিজ্ঞ, এমন কথা বলা যায় না। এ সকল বিষয়ে প্রায় সকল গভর্ণরই তাঁহার অধীন রাজপুরুষদের পরামর্শ অনুসারে চলিয়া থাকেন। কিন্তু সার ষ্ট্যানলী সে পথে না চলিয়া মহারাণীর ঘোষণাপত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার নিমিত্ত স্বয়ং কালবিলম্ব না করিয়াই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া প্রকৃত তথ্য অবগত হইতে আগ্রহান্বিত হইলেন, অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় হিন্দুপক্ষ হইতে যখন হিন্দু মন্ত্রীকে এ বিষয়ে জানান হইল এবং প্রতীকার প্রার্থনা করা হইল, তখন তিনি অম্লানবদনে বলিলেন, "আমি ত এ বিষয়ে কিছুই জানি না। আচ্ছা, অনুসন্ধান করিয়া

জানিব!" আর কলিকাতার সহরবাসীর ধনপ্রাণ ও ধর্ম্মকর্ম্মরক্ষক পুলিস কমিশনার বলিলেন, "হিন্দুদিগের ঘটনাস্থলের জমীতে কোনও অধিকার নাই, তাহারা এতদিন ঐ স্থানে অনধিকারপ্রবেশ করিয়া অন্যায়পূর্ব্বক শিবলিঙ্গ রক্ষা করিতেছিল।" কিন্তু ইঁহারা দুই জনেই বহুদিন এ দেশে রহিয়াছেন; এক জন ত এ দেশবাসী, পরন্তু হিন্দু-সন্তান, হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্ম ও আচারব্যবহার নিশ্চয়ই অবগত আছেন। কোন স্থানে হিন্দুর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইয়া যদি বহুদিন পূজা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহা বলপূর্ব্বক স্থানান্তরিত করিলে যে হিন্দুর মনে ব্যথা লাগে, তাহা কি তিনি জানিতেন না? 'কিছু জানি না' বলিয়া একটা জবাব দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেই তিনি কি দায়ে খালাস হইলেন বলিয়া বিবেচনা করিয়া চলেন? তাঁহার হস্তগত বিভাগের অধস্তন কর্ম্মচারীরা এত বড় একটা কালাপাহাড়ী কাণ্ড করিতে যাইতেছে, অথচ তাঁহাকে না জানাইয়া, ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? তবে কি বুঝিতে হইবে, তিনি নামে মন্ত্রী, নৈবেদ্যের সন্দেশের মত হস্তান্তরিত বিভাগের মাথা বসিয়া আছেন, তাঁহার কোনও ক্ষমতা নাই, তাঁহার অধীন পূর্ত্তবিভাগের কর্ম্মচারীরা তাঁহার আদেশের অপেক্ষা রাখে না? তবে বৎসরে প্রজার কষ্টদত্ত ৬৪ হাজার টাকা হস্তগত করিয়া সরকারী 'সংস্কারী শাসনের' মাথায় অনর্থক শোভা করিয়া থাকিবার তাঁহার প্রয়োজন? দ্বৈতশাসনের এই চমৎকার ব্যবস্থা দেখিলেই মনে হয়, আমরা কিরূপ 'প্রকৃত' স্বায়ত্তশাসনের পথে চলিয়াছি!

তাহার পর সার চার্লস টেগার্ট পুলিসের কার্য্যে বহুকাল এ দেশে কাটাইয়াছেন, কমিশনাররূপে এ দেশের লোকের আচার-ব্যবহার, ধর্ম্মকর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায়। তিনি এ দেশে নূতন আইসেন নাই। অথচ তিনি হিন্দু নেতৃবর্গের সহিত পরামর্শ না করিয়া—এমন কি হিন্দুপক্ষের আপত্তি সত্ত্বেও পূর্ত্তবিভাগের সহিত এই কালাপাহাড়ী কাণ্ডে যোগদান করিলেন কেন? আপত্তি শুনা দূরে থাকুক, তিনি না কি হিন্দুগণকে অনধিকার-প্রবেশকারী বলিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। আরও শুনা যায়, তিনি না কি বলিয়াছিলেন যে, তিন জন হিন্দুর দ্বারা লিঙ্গ স্থানান্তরিত করিয়া বাবুঘাটে রাখিয়াছেন, পরে প্রয়োজন হইলে সেই স্থান হইতে লিঙ্গমূর্ত্তির পুনরায় যথাস্থানে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইবে; এইরূপ করিবার পর না কি তিনি মূর্ত্তির বেদী ভঙ্গ করাইয়াছিলেন। তবেই বুঝা যাইতেছে যে, তিনি বিলক্ষণ জানিতেন, যে মূর্ত্তি স্থানান্তরিত করিতেছেন, তাহা পাথর বা নুড়ি নহে, হিন্দুর প্রতিষ্ঠিত দেব-বিগ্রহ। তাঁহার এই জ্ঞানের পরিচয় আরও অধিক পাওয়া যায়, তাঁহার গোপন-কার্য্যে:—তিনি না কি থানা হইতে হিন্দু পাহারাওয়ালাদিগকে অন্যত্র সরাইয়া দিয়া রাত্রিযোগে মূর্ত্তি স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। ইহাতেই তাঁহার মনের ভাব বুঝা যাইতেছে। এ সকল কথা যদি সত্য হয়, তবে বলিতে হয়, তিনি জানিয়া শুনিয়া হিন্দুর পক্ষে ব্যথাদায়ক এবং অপমানকর এই কালাপাহাড়ী কার্য্যে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। অথচ তিনি রাজার অন্যান্য প্রজার সঙ্গে হিন্দু প্রজার প্রদত্ত করের অর্থে পুলিসের কার্য্যে—প্রজারক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত!

হিন্দুরা যে কালাপাহাড়ী কাণ্ডে মর্ম্মে আঘাত পাইয়াছে, তাহা তাহাদের কার্য্যেই প্রকাশ। এই কাণ্ডের কথা লোকমুখে প্রচারিত হইবামাত্র সমগ্র হিন্দুসমাজে বিষম চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইয়াছিল। হিন্দু সংবাদপত্রসমূহে ইহার বিপক্ষে তীব্র সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, সহরের ও মফঃস্বলের নানাস্থানে সভাসমিতি হইয়াছিল, তাহার পর টাউনহলে ও বিরজিতলায় বিরাট হিন্দু মিছিল ও সভা হইয়াছিল, পরন্তু ১৫ই শ্রাবণ রবিবার সহরে হিন্দুদের বিরাট হরতাল অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতীকারের জন্য আবেদনও হইয়াছিল।

যাহা হউক, গভর্ণরের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইবামাত্র তিনি কাহারও পরামর্শ বা মুখাপেক্ষা না করিয়া মফঃস্বল হইতে সরাসর কলিকাতায় আসিয়া হিন্দু ডেপুটেশনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এবং ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়া বলিয়াছেন যে, "তিনি প্রমাণ পাইয়াছেন, অন্ততঃ অর্দ্ধ শতাব্দীকাল বিগ্রহ বিরজিতলায় বিদ্যমান রহিয়াছে। বিগ্রহ স্থানান্তরিত করা ভুল হইয়াছে। অতএব তিনি পুলিস কমিশনারকে পুনরায় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিতে আদেশ দিলেন।" গভর্ণর ন্যায়বিচারই করিয়াছেন।

কিন্তু জিজ্ঞাস্য, এই স্থানেই এ ব্যাপারের যবনিকাপাত হইবে কি না? পুনরায় পুলিস বা পূর্ত্তবিভাগ অন্য স্থানে এরূপ 'ভুল' করিবে কি না, কেহ বলিতে পারে না। সেজন্য যাহারা এই 'ভুলের' জন্য দায়ী—যাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক অবজ্ঞাভরে হিন্দুর মনে এইরূপ ব্যথা দিতে পারে, তাহারা দণ্ডনীয় হইবে কি না? পুলিস কমিশনার যদি বুঝিয়াছিলেন, বিরজিতলার ঘটনাস্থলে হিন্দুরা অনধিকারপ্রবেশ করিয়া বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ও পূজা করিয়াছিল, তবে তিনি দেওয়ানী আদালতে সে সমস্যার মীমাংসা করিয়া লইলেন না কেন? পূর্ব্বে তাহা না করিয়া তিনি বলপূর্ব্বক বিগ্রহ স্থানান্তরিত করিলেন কোন্ সাহসে? সরকারী পূর্ত্তবিভাগের য়ুরোপীয় কর্ম্মচারী না কি হিন্দুর অধিকার অনধিকারের কথা লইয়া ব্যঙ্গবিদ্রূপও করিয়াছিল। সেই লোক-টাই বা এজন্য দণ্ডযোগ্য কেন হইবে না?

গভর্ণর কার্য্য অসম্পূর্ণ রাখিবেন না, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। যাহাতে ভবিষ্যতে অযথা সরকারী কর্ম্মচারী এইরূপে কাহারও ধর্ম্মে আঘাত দিয়া মহারাণীর ঘোষণার অবমাননা করিতে সাহসী না হয়, সেইভাবে অপরাধীর দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা করা তাঁহার কর্ত্তব্য। হিন্দু সমাজের পক্ষ হইতেও দেখিতে হইবে, দেবতার অমর্য্যাদাকারীর রাজদ্বারে উচিত দণ্ডের ব্যবস্থা করা যায় কি না।

ব্যাঙ্ক মামলার রায়

মহামান্য হাইকোর্টের বিচারপতি জষ্টিশ কষ্টেলো বেঙ্গল ন্যাশানাল ব্যাঙ্কের সম্পর্কে যে রায় দিয়াছেন, তাহাতে দেশের লোক যুগপৎ হর্ষবিষাদ অনুভব করিয়াছে। হর্ষের কারণ, বিচারক ন্যায়বিচার করিয়াছেন, ব্যাঙ্ককে বাধ্যতামূলকভাবে বন্ধ করিবার আদেশ দিয়াছেন; আর সঙ্গে সঙ্গে দেশের শত্রু, সমাজের শত্রু, ধর্ম্মের শত্রু, জাতীয়তার শত্রু, ন্যায় ও নীতির শত্রু, স্বার্থসর্ব্বস্ব, নীচ, অনাথ ও বিধবার সর্ব্বনাশকারী ভণ্ডদিগের মুখের মুখোস খুলিয়া দিয়াছেন। বিষাদের কারণ, যাহারা এই ভাবে বিচারকের নির্ম্মম অথচ ন্যায্য কশার আঘাতে আজ জর্জ্জরিত হইয়াছে, তাহারা আমাদেরই দেশের লোক, আমাদেরই পাঁচ জনের এক জন, শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী! কেবল বিষাদ নহে,—ক্ষোভে ও লজ্জায় বাঙ্গালীর উচ্চ মাথা ইহারা আজ হেঁট করিয়াছে।

বাঙ্গালীর বড় আশার, বড় গৌরবের, বড় ইজ্জতের এই বেঙ্গল ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক। বাঙ্গালী কেমন করিয়া দেশের মঙ্গলের জন্য দেশের এই মঙ্গল প্রতিষ্ঠানটিকে গড়িয়া তুলিয়াছিল, তাহা আমাদের বৈশাখ সংখ্যায় বর্ণিত হইয়াছে। য়ুরোপীয় ব্যাঙ্ক দেশীয় ব্যবসাদারকে ঋণদান করিয়া সাহায্য করে না, এই অভিযোগ বহুদিন হইতেই শুনিয়া আসা হইতেছে। এ জন্য দেশীয় ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা বা উন্নতি সম্ভবপর হয় না, এ কথা এ দেশের সরকারও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সাহায্য করা দূরে থাকুক, দেশীয় বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানকে দারুণ প্রতিযোগিতায় রুদ্ধশ্বাস করিয়া মারিতে পারিলে বিদেশী

ক বা মাড়োয়ারী ব্যাঙ্কার ছাড়েন না, তাহা দেশের লোক মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিত। এই অভাব মোচন করিবার উদ্দেশ্যেই বাঙ্গালীর নিজস্ব স্বদেশী ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠা। কত আশায়, কত ভবিষ্যৎ সুখ-স্বপ্নের মোহে বিভোর হইয়া বাঙ্গালী ধনী নির্ধন, পণ্ডিত মূর্খ, পুরুষ নারী সেয়ার ক্রয় করিয়াছিল বা ইহাতে অর্থ গচ্ছিত রাখিয়াছিল, সকলেই জানেন। অতি দরিদ্র মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী কন্যাদায় উদ্ধার হইবার আশায় তাহার জীবনের কষ্টার্জ্জিত অর্থ ইহাতে রাখিতে ইতস্ততঃ করে নাই,—ইহা যে তাহার দেশের ব্যাঙ্ক! বড় আপনার! তাহার বুকের হাড়! অনাথা বিধবা তাহার পুঁজপাটা জমা রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিল, আহা! সে যে ইহাতে তাহার মানিক দুইটি হবিষ্যান্নের সংস্থান করিয়া রাখিল! জনসাধারণ গর্ব্বে স্ফীতবক্ষ হইয়া ভাবিল,—বাঙ্গালী ব্যবসায়-বুদ্ধিতে অনগ্রসর, এই অখ্যাতি আজ ঘুচিল, আজ আমাদের বাঙ্গালীর ব্যাঙ্ক হইল। সে কি আনন্দের, কি আশার, কি গৌরবের দিন! আর আজ?

অকস্মাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের ন্যায় ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ার সংবাদ রটিল। বাঙ্গালী বিলাতের 'সাউথ সি বাবলের' কথা শুনিয়াছে, এলায়েন্স ব্যাঙ্ক ফেল দেখিয়াছে, কিন্তু এমন বুকের হাড় ভাঙ্গিয়া দেওয়া ব্যাঙ্ক ফেলের সংবাদ বাঙ্গালী কখনও শুনে নাই। বাঙ্গালীর এই সবে ধন নীলমণি—কি সর্ব্বনাশ, তাহাও বাঙ্গালীর অকর্ম্মণ্যতায়, বাঙ্গালীর অসাধুতায় চূর্ণ হইয়া গেল! এ কি বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী জাতির প্রতি বিধাতার অভিসম্পাত!

প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে নব্য বঙ্গের গৌরবময় ইতিহাসের প্রারম্ভে বাঙ্গালী নিজের চেষ্টায় দুইটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছিল, তাহার একটি এই ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, অপরটি বঙ্গলক্ষ্মী কাপড়ের কল। পরলোকগত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অশ্বিনীকুমার দত্তপ্রমুখ বাঙ্গালীর জাতীয়তার প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা যখন বঙ্গভঙ্গের দিনে বাঙ্গালীকে স্বদেশ ও স্বজাতির গৌরবমদিরায় মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন, সেই শুভ পুণ্যক্ষণে স্বদেশীর যুগে এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের জন্ম হইয়াছিল। বাঙ্গালী হিন্দু তখন একা এক সহস্র হইয়া আমলাতন্ত্র সরকার ও তাহার পৃষ্ঠপোষক ঢাকার নবাব-পরিচালিত মুসলমানের প্রবল বাধার বিপক্ষে বঙ্গভঙ্গ রদ করিতে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। তখন বাঙ্গালার ঘরে ঘরে অমর বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র ধ্বনিত হইয়াছিল। সে কি উৎসাহের, কি অদম্য মনোবলের, কি দৃঢ় প্রতিজ্ঞার, কি একাগ্রতার, কি একতার, কি দেশপ্রেমের, কি স্বার্থত্যাগের, কি সহনক্ষমতার যুগই বাঙ্গালী হিন্দুর গিয়াছে! ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক ও বঙ্গলক্ষ্মী মিল তাহারই ফল। আজ বাঙ্গালীর বুকের হাড় দিয়া গঠিত সেই সাধের ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক ধূলাবলুণ্ঠিত—আদরের বঙ্গলক্ষ্মী মিলও তাহার পতনের সঙ্গে ভীষণ আঘাতপ্রাপ্ত। কিসে, কাহার দোষে, কি পাপে বাঙ্গালীর এই সর্ব্বনাশ হইল? বলিতে কি লজ্জা হয় না, বাঙ্গালী যাহাদিগকে আপন-জন ভাবিয়া ব্যাঙ্কের ও মিলের পরিচালনভার প্রদান করিয়াছিল, তাহাদেরই অযোগ্যতায় এবং পাপের ফলে একটি প্রতিষ্ঠান ভূলুণ্ঠিত হইল, অপরটি আহত, ক্ষতিগ্রস্ত হইল?

ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ার প্রথম সংবাদ যখন সহরে রাষ্ট্র হয়, তখন জনসঙ্ঘ কিরূপ উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা সকলেই জানেন। বাঙ্গালী প্রথমটা স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু তাহার পর তাহার ক্রোধের সীমা রহিল না। সকলেরই সন্দেহ হইয়াছিল, কোনও অপ্রত্যাশিত কারণে ব্যাঙ্ক ফেল হয় নাই, হঠাৎ ব্যাঙ্কে টান ধরায় ব্যাঙ্ক ফেল হয় নাই, অসৎ উপায়ে ব্যাঙ্ক পরিচালনার ফলে সর্ব্বনাশ হইয়াছে, এই ধারণা সকলের মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল। তাই জনসাধারণ সভাসমিতি করিয়া, সংবাদপত্রে আলোচনা করিয়া ব্যাঙ্কের পরিচালকদের নিকট বার বার উগ্রকণ্ঠে কৈফিয়ৎ চাহিতে লাগিল। প্রথমটা পরিচালকগণ নীরবতা অবলম্বন করিলেন; তখন জনসাধারণের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। পরিচালকগণ অবস্থা দাঁখয়া ভীত হইয়া কৈফিয়তের জন্য সকলকে কিছু অপেক্ষা করিতে বলিলেন তাহার পর যখন কৈফিয়ৎ প্রকাশিত হইল, তখন তাহাতে জনসাধারণ সন্তোষলাভ করিতে পারিল না। আন্দোলন আরও ভীষণ আকার ধারণ করিল। শেষে ব্যাঙ্কের আমানতকারদের চেষ্টায় হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি মিঃ কষ্টেলোর আদেশে কলিকাতার টাউনহলে আমানতদারদিগের এক সভা আহূত হইল। সভায় ব্যারিষ্টার মিঃ ওয়েষ্টমেকট বিচারপতি মিঃ কষ্টেলো কর্ত্তৃক সভাপতি নিযুক্ত হয়েন।

অতঃপর হাইকোর্টে মামলা। মিঃ ওয়েষ্টমেকট বিচারপতি মহোদয়ের সকাশে নিবেদন করেন যে, সভায় দুইটি বিষয়ে আমানতদারদিগের মতামত জানিবার প্রয়োজন ছিল—

(১) তাঁহারা ব্যাঙ্কের পুনর্গঠন চাহেন কি না।

(২) তাঁহারা বাধ্যতামূলক উপায়ে ব্যাঙ্ক বন্ধ করিতে চাহেন কি না।

মিঃ ওয়েষ্টমেকট বে-জামীনদার আমানতদারদিগের (unsecured creditors) মতামত জানিয়া বুঝিয়াছেন যে,—

(১) ৫৩৯ জন আমানতদার একবাক্যে বাধ্যতামূলক উপায়ে ব্যাঙ্ক বন্ধ করিতে চাহেন। তাঁহাদের ব্যাঙ্কের নিকট দাবীর পরিমাণ ১৭ লক্ষ ২৪ হাজার ৩ শত ৭০ টাকা ৫০ আনা ১০ পাই।

(২) ৩১৩ জন আমানতদার ব্যাঙ্কের পুনর্গঠন চাহেন। তাঁহাদের দাবী ৮ লক্ষ ৪৬ হাজার ৯ শত ১৮ টাকা ।০ আনা ৯ পাই।

(৩) স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ব্যাঙ্ক বন্ধের পক্ষে একজন আমানতদারও ভোট দেন নাই।

(৪) জামিনদার আমানতকারীদের (secured creditors) মধ্যে কেহই বাধ্যতামূলক বা ইচ্ছাপূর্ব্বক ব্যাঙ্ক বন্ধ করার পক্ষে ভোট দেন নাই; কেবল একা বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল পুনর্গঠনের পক্ষে ভোট দিয়াছিল; তাহার ব্যাঙ্কের নিকট দাবী ২৭ লক্ষ ১ হাজার ১ শত ১৭ টাকা ।০ আনা ৩ পাই।

বাধ্যতামূলক ব্যাঙ্ক বন্ধ করিবার পক্ষেই বিচারপতি মিঃ কষ্টেলো রায় দিয়াছেন। তিনি বাধ্যতামূলক ব্যাঙ্ক বন্ধ করিবার পক্ষের আমানতদারদের ব্যারিষ্টার মিঃ এস, এন, ব্যানার্জ্জির বক্তৃতা শুনিবার পর বলিয়াছিলেন, "দরখাস্তকারী আমানতদারদিগের পক্ষে যে সকল অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছে এবং যে সকল অভিযোগের প্রমাণ-প্রয়োগ দ্বারা কোন প্রতিবাদ করা হয় নাই, তাহা অতীব গুরু। অভিযোগে বলা হইয়াছে যে, ব্যাঙ্কের পরিচালক ডিরেক্টরগণ নানারূপ দারুণ অপরাধজনক অনিয়ন্ত্রিত কার্য্যের (Irregularities) জন্য দায়ী; কেবল অনিয়ম নহে, তাঁহারা নানারূপ জুয়াচুরীর (fraudulant transactions) জন্যও দায়ী। বস্তুতঃ তাঁহাদের মধ্যে দুই জনের অপরাধ এত গুরু যে, তাঁহারা ফৌজদারী আদালতে মামলা সোপর্দ্দ হইতে পারেন। আমি আমার সম্মুখে উপস্থাপিত এফিডেবিটগুলি দেখিয়া এবং ব্যাঙ্কের একখানা খাতা দেখিয়া বুঝিয়াছি যে, ব্যাঙ্কের অনেক ব্যাপার বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা প্রয়োজন।"

এই দুই জন ডিরেক্টর কে, তাহা বুঝিতে জনসাধারণের বিলম্ব হইবে না। ব্যারিষ্টার মিঃ এস, এন ব্যানার্জ্জি যে সকল এফিডেবিট দাখিল করিয়াছিলেন, তাহাতে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বসন্তকুমার লাহিড়ীকে এই সকল দারুণ অপরাধজনক অনিয়ন্ত্রিত কার্য্যের এবং জুয়াচুরীর অপরাধে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। সেই অভিযোগের মর্ম্ম এই যে, তাঁহারা ব্যাঙ্ক হইতে অত্যন্ত অধিক টাকা

ওভারড্রাফট করিয়াছেন এবং তাঁহাদের বহু বন্ধুবান্ধবকে উহা দান করিয়াছেন, পরন্তু জুয়াচুরী করিয়াছেন এবং ব্যাঙ্কের হিসাবের খাতায় কারচুপি করিয়াছেন; ইহার ফলে তাঁহারা তাঁহাদের কর্ত্তব্যে বিষম অবহেলা করিয়া ব্যাঙ্ক ফেলে সহায়তা করিয়াছেন এবং সহস্র সহস্র আমানতকারীর সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। এই দুই জন ডিরেক্টরের মধ্যে কে প্রধান নায়ক, তাহা ব্যারিষ্টার ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

বুঝিয়া দেখুন, যদি এই সকল ভীষণ অভিযোগের দশমাংশের একাংশও সত্য বলিয়া পরে প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে ইহারা জাতির নিকট, সমাজের নিকট, দেশমায়ের নিকট কত বড় অপরাধী! অভিযোগ এত ভীষণ যে, ব্যাঙ্কের পক্ষ সমর্থন করিতে দাঁড়াইয়া স্বয়ং এডভোকেট জেনারলও বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে যে সকল কথা আদালতে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা শুনিবার পর আর তিনি বাধ্যতা-মূলক ব্যাঙ্ক বন্ধের আবেদনে আপত্তি করা কঠিন বলিয়া মনে করিতেছেন!

ব্যারিষ্টার মিঃ এস, এন, ব্যানার্জ্জি অভিযোগে বলিয়াছেন যে, ব্যাঙ্কের হিসাব-বহি জুয়াচুরী করিয়া তৈয়ার করা হইয়াছিল এবং অডিটারদিগকে (হিসাব-পরীক্ষকদিগকে) এজন্য রীতিমত অর্থ সাহায্য করা হইয়াছিল। মেসার্স ভিনে এণ্ড থারন্টন ব্যাঙ্কের অডিটার ছিলেন। তাঁহারা কোনও জামীন না দিয়া ব্যাঙ্ক হইতে ৭২ হাজার টাকা ওভারড্রাফ্‌ট করিয়াছেন, ইহাও অভিযোগে প্রকাশ। ব্যারিষ্টার মিঃ ব্যানার্জ্জি অভিযোগে বলিয়াছেন, "ব্যাঙ্কের খাতার কারচুপির কার্য্যটা হিসাব-পরীক্ষার সময়ে হইয়াছিল, and the auditors were liberally helped with money." ইহার অপেক্ষা হিসাব-পরীক্ষক কোম্পানীর বিপক্ষে কি অধিক গুরু অভিযোগ হইতে পারে, তাহা সোসাইটী অফ চার্টার্ড একাউণ্ট্যাণ্টস বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। এই অভিযোগ প্রমাণিত হইলে হিসাব-পরীক্ষকরাও ফৌজদারী আদালতে মামলা সোপর্দ্দ হইতে পারেন কি না, তাহাও বিবেচ্য।

তাহার পর ব্যারিষ্টার মিঃ এস, এন, ব্যানার্জ্জি অভিযোগে বলিয়াছেন,—"ব্যাঙ্কের অন্যতম ডিরেক্টর বি, কে, লাহিড়ী বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন। তিনি এতদ্ব্যতীত লিষ্টার এণ্টিসেপ্‌টিক ও ড্রেসিং কোম্পানীর ও অন্যান্য অনেক কোম্পানীর ডিরেক্টর ছিলেন। ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর ভূপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি আর্ট থিয়েটার লিমিটেডের অন্যতম ডিরেক্টর ছিলেন। আর ব্যাঙ্কের হিসাব-পরীক্ষক ভিনে এণ্ড থার্ন্টন কোম্পানী বলিতে এখানে প্লাট এ্যালেন, বাস্তিন, হেলিং জোন্‌স ও কেরাণী বার্ণার্ডকে বুঝিতে হইবে।" অর্থাৎ এই লাহিড়ী, ব্যানার্জ্জি, এ্যালেন, বাস্তিন বার্ণার্ড "এণ্ড কোং"র লিষ্টার কোম্পানী, আর্ট থিয়েটার লিমিটেড ও ভিনে এণ্ড থার্ন্টন ব্যাঙ্ক হইতে প্রচুর অর্থসাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। অথচ কি জামিনে এই সকল টাকা দেওয়া হইয়াছে? লিষ্টার কোম্পানীর অবস্থা সকলেই জানে, অথচ তাহাকে যে টাকা ধার দেওয়া হইয়াছে, তাহা যদি অন্য অনেকগুলি স্বদেশী ব্যবসায়কে ধার দেওয়া হইত, তাহা হইলে দেশের কায হইত। আর্ট থিয়েটার লিমিটেডের সিন ড্রেস আদির মূল্য কত? অথচ ইহাদিগকে এত অধিক টাকা ধার দেওয়া হইয়াছিল কেন? অডিটারদিগকেই বা ৭২ হাজার টাকা দেওয়া হয় কেন? বিচারপতি কষ্টেলো বলিয়াছেন, "I should like to know what the society of Chartered Accountants think of it." অথচ হিসাব-পরীক্ষকদিগের সাধুতার উপরেই যৌথ কারবার চলিয়া থাকে।

ব্যারিষ্টার মিঃ এস, এন, ব্যানার্জ্জি ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জির সম্বন্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন যে, "১৯১৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ব্যানার্জ্জি জামীন না দিয়া ব্যাঙ্ক হইতে প্রচুর অর্থ বাহির করিতেছিলেন, তাঁহার এত অর্থ ব্যাঙ্কে জমা ছিল না। এই ওভারড্রাফ্‌ট লুকাইবার নিমিত্ত তিনি ব্যাঙ্কের হিসাবাদিতে কারচুপি করিয়াছিলেন (Fraudulently manipulated.) হিসাব পরীক্ষার সময় এই কার্য্য সমাধা হইয়াছিল, এবং এজন্য অডিটারদিগকে বেশ মোটা টাকা দিয়া সাহায্য করা হইয়াছিল।" কি ভীষণ অভিযোগ। ব্যারিষ্টার মিঃ ব্যানার্জ্জি বলিতে বাধ্য হয়েন যে, তিনি "ব্যানার্জ্জি" নামে সম্বোধিত হইতে লজ্জানুভব করিতেছেন! বিচারক কষ্টেলো বলিয়াছেন, অভিযোক্তাদের স্বপক্ষে কি বলিবার আছে, তাহা এখনও জানা যায় নাই। অবশ্য পরে তাহা জানা যাইবে।

আজ এই সকল কাণ্ডের জন্য বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর কি সর্ব্বনাশ হইল, তাহা কেহ নির্দ্ধারণ করিতে পারে না। ব্যাঙ্ক-পতনের সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্রের হতাশার গগনভেদী আর্ত্তনাদ, বিধবার অশ্রুস্রোত, বাঙ্গালার কলঙ্ক, বাঙ্গালীর অপমান একত্র মিলিয়া বিরাট প্রতিবাদরূপে উত্থিত হইতেছে। ব্যাঙ্ক-পতনের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলেরও পতনের সূচনা হইল কি? ব্যারিষ্টার মিঃ ব্যানার্জ্জি বলিয়াছেন "বঙ্গলক্ষ্মী মিলের ২৭ লক্ষ টাকা ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে জমা ছিল। কিন্তু ঐ টাকাও বেঙ্গল ন্যাশানাল ব্যাঙ্কে স্থানান্তরিত করা হয়।" ফল কি হইয়াছে? যে রিজার্ভ ফণ্ড মিল এত দিন ধরিয়া সযত্নে গড়িয়া তুলিয়াছিল, তাহা কোথায় গেল? আজ ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য মহাজনের নিকট মিলের ২৪ লক্ষ টাকা দেনা। যে মিলের সেয়ারের দাম ৪৩২ টাকা ছিল, আজ বাজারে তাহার ক্রেতা নাই। ইহা কি কম দুঃখের কথা! কাহার দোষে মিলের এই অবস্থা হইল?

যাহারা বাঙ্গালীর ব্যাঙ্ক ও মিলের এই অবস্থা আনয়ন করিয়াছে, তাহাদিগের বিপক্ষে অভিযোগ সপ্রমাণিত করিতে হইবে, পরন্তু অভিযোগ প্রমাণিত হইলে তাহাদের উপযুক্ত দণ্ডের ব্যবস্থা করিতে হইবে, তবে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের পরিণাম দেখিয়া ভবিষ্যতে যাহাতে লোকের কষ্টার্জ্জিত অর্থের এমন অপব্যয় না হয়, এমন ব্যবস্থা করিয়া বাঙ্গালীকে আবার নবোদ্যমে নূতন ব্যাঙ্ক গড়িয়া তুলিতে হইবে। নিজস্ব ব্যাঙ্ক না থাকিলে স্বদেশী ব্যবসায়ের উন্নতি সম্ভবপর হয় না, হইলেও কষ্টসাধ্য হয়। এ কথাটা স্মরণ রাখিয়া অন্ততঃ বাঙ্গালার মুখ রাখিবার জন্যও আবার বাঙ্গালীকে নূতন ব্যাঙ্ক গঠনে অবহিত হইতে হইবে; দুষ্কৃতদিগের দণ্ডবিধানের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর অধ্যবসায়ের অবসান হইলে চলিবে না। যাহাতে সর্ব্বজনমান্য সাধু বাঙ্গালীর তত্ত্বাবধানে নূতন ব্যাঙ্ক পরিচালিত হয়, তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে।

রঙ্গিলা রসুল

'রঙ্গিলা রসুলের' রচনা সম্পর্কে পঞ্জাব হাইকোর্টে যে রায় বাহির হইয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে এক শ্রেণীর মুসলমানের আন্দোলনের কিছু পরিচয় পূর্ব্ববর্ত্তী সংখ্যায় প্রদত্ত হইয়াছে। এখন দেখা যাইতেছে, এই ব্যাপারটিকে ক্রমে বিশেষ ঘোরাল করিয়া তুলিয়া হিন্দু-মুসলমানে মনোমালিন্য ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করা হইতেছে। এই পুস্তিকাখানি রচনা করিয়াছেন লালা রাজপাল; যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে বুঝা যায়, তিনি পঞ্জাবী আর্য্যসমাজী। যিনি তাঁহার বিচার করিয়াছেন, তিনি কুমার দলীপ সিং দেশীয় খৃষ্টান। অথচ এই ব্যাপারটির জন্য এই শ্রেণীর মুসলমান সমগ্র হিন্দু-সমাজকে অপরাধী করিয়া হিন্দুদিগের বিপক্ষে অযথা অন্যায় আন্দোলন চালাইতে কুণ্ঠাবোধ করিতেছেন না। স্বয়ং মিঃ মহম্মদ আলিই বলিয়াছেন যে, আইনের ধারা অনুসারে যদি রচনা দণ্ডার্হ না হয়, তাহা হইলে কুমার দলীপ সিংহের বিরুদ্ধে

আন্দোলনে লাভ নাই, রাজপালের ফাঁসীর জন্ত আব্দার করিয়াও ফল নাই, পঞ্জাবের হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সাদীলালের পদচ্যুতির দাবী করিয়াও সুবিধা নাই। অথচ অনর্থক আন্দোলনকারীরা এই সকল অন্তায় আবদারই করিতেছেন। মিঃ মহম্মদ আলি বলিয়াছেন, বরং তাহা হইতে কোনও ধর্ম্মপ্রচারকের গ্লানিসূচক রচনা যাহাতে দণ্ডার্হ হয়, তাহার জন্ত আন্দোলন করার সার্থকতা আছে। মুসলমানরা এ পরামর্শ গ্রহণ করিতে অসম্মত। আসল কথা, তাঁহাদের ধর্ম্মরক্ষায় যত না আগ্রহ পরিলক্ষিত হইতেছে, তদপেক্ষা হিন্দুদিগের উপর প্রতিশোধ লইবার অধিক আগ্রহ দেখা যাইতেছে।

ইহার ফল বিষময় হইয়াছে। কেন না, ভারতের বহু স্থানে—এমন কি ভারতের বাহিরে বহুদূর ইংলণ্ডেও ইহার বিষ বিসর্পিত হইয়াছে। সার কোনান ডয়েল প্রমুখ বিশিষ্ট ইংরাজও এই আন্দোলনের ফলে বিশ্বাস করিয়াছেন যে, হিন্দুমাত্রেই মুসলমানের পয়গম্বরের গ্লানিপ্রচারক, তাই তিনি ও তাঁহার দেশস্থ অনেকে 'হিন্দুর' এই অপরাধের পুনরাবৃত্তি অসম্ভব করিবার উপযোগী আইন-প্রণয়নের জন্ত বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষকে আবেদন করিয়াছেন।

আর ভারতে? সে যে কি বিষম হলাহল উত্থিত হইয়াছে, তাহা বর্ণনা করিতে হইলে মহাভারত প্রণয়ন করিতে হয়।

আমরা মাত্র কয়টি দৃষ্টান্ত দিতেছি :—

(১) কোনও কোনও মুসলমান দাবী করিতেছেন, রঙ্গিলা রসুলের লেখক রাজপালকে মুসলমান সরিয়ৎ অনুসারে বিচার করিয়া ফাঁসী দেওয়া হউক। এই পরাধীন দেশে এই আব্দার কেমন চমৎকার! হিন্দুও ত বলিতে পারে, হিন্দুর দেশের মুসলমান নারী বিধবা হইলে তাহাকে হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় পুড়াইয়া মারা হউক, মুসলমান বিধবাকে আর নিকা করিতে দেওয়া হইবে না, ইত্যাদি। উভয়েই যখন এক রাজার অধীন, তখন উভয়কেই সেই রাজার আইন মানিয়া চলিতে হইবে। অন্যথা মুসলমান আমলের দুই প্রাচীরের মধ্যে মানুষকে গাঁথিয়া ফেলা, হস্তিপদতলে মানুষ দলিয়া মারা, ডালকুত্তা দিয়া মানুষ খাওয়ান, অবিশ্বাসিনী নারীকে জীবন্তে কবর দেওয়া প্রভৃতি অনেক আইনের প্রচলনের জন্ত বাহানা করা চলে।

(২) পঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভার মুসলমান সদস্তরা একযোগে ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাঁহারা হিন্দুর সহিত রফার কথায় অথবা মিশ্র নির্ব্বাচনে সম্মত নহেন। এই ঘোষণার প্রভাব নিরক্ষর মুসলমানের উপর কিরূপ হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

(৩) সিন্ধুপ্রদেশে সেখ মহম্মদ আমীন নামক এক ব্যারিষ্টার ও অন্ত এক জন মুসলমান বক্তা গত ১৭ই হইতে ১৯শে জুলাই তারিখে উপর্য্যুপরি কয়েকটি বক্তৃতায় হিন্দুর ধর্ম্ম, হিন্দুর দেবতা ও অবতার এবং হিন্দু নারীর ঘোর অসম্মান করিয়াছিল এবং প্রকাশ্যে মুসলমান জনতাকে গোহত্যা করিতে উত্তেজিত করিয়াছিল।

(৪) মিঃ মহম্মদ আলি লাহোরে বক্তৃতায় অগণিত মুসলমানের সমক্ষে হিন্দুকে 'কাফের' সম্বোধন করিয়াছিলেন এবং মুঞ্জে-মালব্যের দল কলমা পড়িবে বলিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ পায়। কিন্তু মিঃ মহম্মদ আলি প্রেসের এই সংবাদ সত্য নহে বলিয়া পরে প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব ধরা গেল, তিনি স্বয়ং হিন্দু-বিদ্বেষ প্রচার করেন নাই। কিন্তু ঐ সভায় তাঁহার সমক্ষে হিন্দুর বিপক্ষে অন্তান্ত মুসলমান বক্তা যে হলাহল ছড়াইয়াছিলেন, তিনি কি তাহার কোনও প্রতিবাদ করিয়াছিলেন?—না, মৌনে সম্মতি লক্ষণ জানাইয়াছিলেন?

(৫) দিল্লীর 'হিন্দুস্থান টাইমস্' পত্র সংবাদ দিতেছেন,—রঙ্গিলা রসুলের মামলা উপলক্ষ করিয়া পেশোয়ারের খিলাফতীরা হিন্দু ও শিখদিগের বিপক্ষে বিদ্বেষ প্রচার করিয়া বেড়াইতেছে। তাহারা শোভাযাত্রা করিয়া হিন্দু-বর্জ্জন প্রচার করিয়াছে। তাহারা প্রতিদিন হিন্দুর বিরুদ্ধে সভা করিতেছে এবং সীমান্তপ্রদেশে অশান্ত পাঠান ক্ষেপাইয়া হিন্দুর সর্ব্বনাশের আয়োজন করিতেছে। সীমান্তের মোল্লারা খিলাফতীদের প্ররোচনায় ভীষণ উত্তেজিত হইয়াছে। পেশোয়ারে মুসলমানরা হিন্দুর সংস্রব ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছে। খাইবার অঞ্চলে হিন্দু ও শিখের দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছে। মোল্লারা মুষ্টিমেয় হিন্দুদিগকে ভয় দেখাইয়া বলিয়াছে হয় মুসলমান হও, না হয় দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাও। ফলে বহু হিন্দু ও শিখ তাহাদের জন্মভূমি ও কর্ম্মস্থান ত্যাগ করিয়া সর্ব্বস্ব হারাইয়া দরিদ্র অবস্থায় পেশোয়ারে আসিয়া ধর্ম্মশালায়, সরাই ও মন্দিরে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছে। এমনও শুনা গিয়াছে যে, অমরুদে হিন্দুর দোকান লুণ্ঠিত হইয়াছে। লালচাঁদ ও হরিচাঁদ নামক দুই হিন্দু ভ্রাতাকে লাণ্ডিকোটাল লোয়াগী গ্রাম হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে; পথে তাহাদিগকে নিষ্ঠুররূপে আক্রমণ করিয়া ১০ হাজার টাকা কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে; লালচাঁদ পেশোয়ারে হাঁসপাতালে আছে।

(৬) লাহোরের বাদশাহী মসজেদের সভায় শেখ মহম্মদ আমিন মুসলমানদিগকে হিন্দু বর্জ্জন ও হিন্দু সংস্রব ত্যাগ করিতে উত্তেজিত করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রকাশ। তিনি মুসলমানদিগকে লাহোর হাইকোর্ট ও প্রধান বিচারপতি সার সাদীলালের বিরুদ্ধে ঘোর আন্দোলন চালাইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। এই মহম্মদ আমিন কি সিন্ধুর সেই মহম্মদ আমীন?

যাহা হউক, এমন আরও অনেক দৃষ্টান্ত আছে। এই বাঙ্গালা দেশেও ইহার বিষ ছড়াইবার চেষ্টা হইয়াছিল। নানাস্থানে সভা সমিতি করিয়া আন্দোলন জাগাইয়া রাখা হইয়াছিল। সৌভাগ্যের বিষয়, এই সূত্রে হিন্দুর সর্ব্বনাশ সাধনের চেষ্টা হয় নাই। তবে ইহাতে যে হিন্দু মুসলমানে মনোমালিন্ত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহার পরিণাম কি, ভাবিলে শঙ্কান্বিত হইতে হয়।

——

সেনেট হাউস

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এতদিন পরে সেনেট হাউসের পাকা মালিক হইলেন। এই সেনেট হাউস লইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত ভারত-সরকারের মন-কষাকষি চলিতেছিল। ভারত সরকার কলিকাতা ছাড়িয়া দিল্লীতে উঠিয়া গেলে পর কিছুদিন বড়লাট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার রহিলেন, কিন্তু পরে ঐ পদ ত্যাগ করিলেন। তখন বোধ হয় কলিকাতার উপর ভারত সরকারের আর কোন মায়া রহিল না। তাই তাঁহারা সেনেট হাউসটি বিক্রয় করিবার নোটিশ দিলেন, উহা ভারত সরকারের সম্পত্তি। এদিকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিভাবক বাঙ্গালা সরকারের তহবিলে অর্থাভাব, কাজেই সেনেট হাউস বুঝি হাতছাড়া হয়! বিশ্ববিদ্যালয় জিদ্ ধরিলেন, তাঁহারা ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ হইতে সেনেট হাউসের দখলিস্বত্ব ভোগ করিতেছেন, তাঁহারা দখল ছাড়িবেন না। এই ব্যাপার লইয়া ভারত সরকারের সহিত তাঁহাদের বহু বাদানুবাদ হয়। বাঙ্গালা সরকার মধ্যস্থতা করিয়া নানা অনুনয় বিনয় করার পর শিবের মাথায় ফুল পড়িয়াছে। ভারত সরকার দয়াপূর্ব্বক সেনেট হাউস বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করিয়াছেন। কলিকাতায় যে সরকারের বনিয়াদ, আজ দিল্লী যাইয়া সেই সরকার কলিকাতার সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়াছেন, ইহা কি তাঁহাদের অকৃতজ্ঞতার পরিচায়ক নহে?

পরলোকে যোগীন্দ্রনাথ বসু

বিগত ৩১শে শ্রাবণ অমর কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত-লেখক, প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক—কবি যোগীন্দ্রনাথ বসু পরলোকগমন করিয়াছেন। সন ১২৬৪ সালে ডায়মণ্ড হারবারের অন্তর্গত নিতাড়ি গ্রামে কোনও মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন ভদ্রপরিবারে যোগীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি, এ, উপাধি লাভ করিয়া তিনি বৈদ্যনাথ-দেওঘরের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকপদে নিযুক্ত হয়েন। তথায় সুখ্যাতির সহিত তিনি অধ্যাপনা-কার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। সাহিত্য-সেবার প্রতি যোগীন্দ্রনাথের আন্তরিক আগ্রহ, যৌবন প্রারম্ভেই প্রকাশ পাইয়াছিল। "বঙ্গবাসীর" প্রতি বিদ্রূপাত্মক একটি কাব্য তিনি ধূর্জ্জটীপ্রসাদ শর্ম্মা ছদ্মনামে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। দেওঘরে অবস্থানকালে স্বনামধন্য সাহিত্যিক, মনীষী রাজনারায়ণ বসুর সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে। রাজনারায়ণ তখন দেওঘরে বাস করিতেন। তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের প্রভাব যোগীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করিয়াছিল। রাজনারায়ণ বাবু কবিবর মধুসূদনের অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। যোগীন্দ্রনাথও মাইকেলের কাব্য-প্রতিভার গুণমুগ্ধ ছিলেন। রাজনারায়ণ বাবুর সহিত ঘনিষ্ঠতাসূত্রে আবদ্ধ হওয়ার পর মাইকেলের জীবন-চরিত লিখিবার প্রেরণা তিনি তাঁহার নিকট হইতেই প্রাপ্ত হয়েন। অশেষ পরিশ্রম করিয়া যোগীন্দ্রনাথ বাঙ্গালার এই শ্রেষ্ঠ কবির জীবনকাহিনী রচনা করিয়াছিলেন।

দেওঘরের তদানীন্তন মহকুমা হাকিম মিঃ হার্ড সংক্রান্ত অনাচার কাহিনীর বিবরণ কাব্যবিশারদ সম্পাদিত "হিতবাদী"তে প্রকাশিত হওয়ায় মিঃ হার্ডের মনে সন্দেহ জন্মে যে, যোগীন্দ্র বসু ও তদীয় শিষ্য সখারাম গণেশ দেউস্কর উল্লিখিত বিবরণ সরবরাহ করিয়াছিলেন। পণ্ডিত সখারাম দেওঘর বিদ্যালয়ে যোগীন্দ্রনাথের ছাত্র ছিলেন। পরিশেষে উক্ত বিদ্যালয়ের তিনি অন্যতম শিক্ষক নিযুক্ত হয়েন। গুরু শিষ্য হাকিমের রোষানল হইতে মুক্তিলাভের জন্য বাধ্য হইয়া দেওঘর পরিত্যাগ করেন। কাব্যবিশারদ সখারাম গণেশ দেউস্করকে হিতবাদীর সম্পাদকীয় বিভাগে স্থানদান করেন এবং যোগীন্দ্রনাথ স্বর্গীয় কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের পৌত্র শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের গৃহশিক্ষক এবং অভিভাবকের পদে নিযুক্ত হয়েন। দীর্ঘকাল তিনি আপন কর্ত্তব্য সুচারুরূপে সম্পাদন করিয়া যশোলাভ করিয়াছিলেন।

যোগীন্দ্রনাথ অনেকগুলি বিদ্যালয়-পাঠ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত "পৃথ্বীরাজ", "শিবাজী" নামক উপাদেয় কাব্যগ্রন্থও রচনা করিয়া গিয়াছেন। আমাদের মনে পড়ে একবার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের গৃহে "পূর্ণিমা-সম্মিলন" হইয়াছিল। বহু সাহিত্যিক সম্মিলন-ক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছিলেন। সভাস্থলে যোগীন্দ্রনাথ তাঁহার নব-রচিত "শিবাজী" কাব্যের কিয়দংশ স্বয়ং পাঠ করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার কাব্য-প্রতিভার সম্যক্ সমাদর বাঙ্গালী-পাঠক সমাজে হয় নাই। সম্ভবতঃ খণ্ড কবিতা পাঠে অভ্যস্ত বাঙ্গালী অধুনা কাব্য বা মহাকাব্যের রসাস্বাদন শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে। ভবিষ্যতের বাঙ্গালী তাঁহার প্রতিভার সমাদর করিবে বলিয়া মনে হয়। যোগীন্দ্রনাথের পরলোকগমনে বাঙ্গালী এক জন প্রতিভাশালী কবির অভাব অনুভব করিতেছে। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছি ও সেই সঙ্গে তাঁহার পরিবারবর্গের শোকে আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

সামরিক চাকুরীতে ভারতীয়

এবার সরকারী ঘোষণায় জানা যাইতেছে যে, স্যাণ্ডহার্ষ্টের সামরিক কলেজে মোট ৭ জন ভারতীয় শিক্ষার্থীকে গ্রহণ করা হইবে। ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই পঞ্জাবী, দুই এক জন কাথিয়াবাড়ের ও যুক্তপ্রদেশের। ইঁহাদের সকলেই প্রায় ভারতের 'সামরিক' জাতি হইতে উৎপন্ন, মাত্র ২ জন ব্যারিষ্টার এবং শিক্ষকের পুত্র। ফলে বাঙ্গালা বা মাদ্রাজের কোন যুবককে শিক্ষার্থী শ্রেণীভুক্ত করা হয় নাই।

প্রথমতঃ জিজ্ঞাস্য, স্যাণ্ডহার্ষ্টে ১০ জন শিক্ষার্থী লওয়ার কথা ছিল, তৎপরিবর্ত্তে মাত্র ৭ জন লওয়া হইল কেন? এই মনোনীত ৭ জন ব্যতীত অন্য ভারতীয় শিক্ষার্থিরূপে কি কেহ আবেদন করে নাই? অথবা যাহারা আবেদন করিয়াছিল, তাহারা সকলেই অনুপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে? এ সম্বন্ধে সরকারের একটা ঘোষণা দ্বারা জনসাধারণের সংশয় ভঞ্জন করা কর্ত্তব্য।

তাহার পর কথা—বাঙ্গালা বা মাদ্রাজ হইতে অথবা মহারাষ্ট্র দেশ হইতে একটিও শিক্ষার্থী গ্রহণ করা হইল না, ইহা কি বিস্ময়ের বিষয় নহে? অধিক দিনের কথা নহে, মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া ইংরাজকে ভারতের বহু স্থান অধিকার করিতে হইয়াছিল। ইংরাজ যখন দিল্লী আগরা হস্তগত করেন, তখন তথায় এক জন মোগল-সম্রাট ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি তৎপূর্ব্বে মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তে ক্রীড়নকে পরিণত হইয়াছিলেন। সুতরাং মহারাষ্ট্রীয়রা যে সামরিক জাতি ছিল না, তাহা নহে। মাদ্রাজের তৈলঙ্গী সৈন্য লইয়া ইংরাজ বাঙ্গালা দেশ জয় করিয়াছিলেন, এ কথা ইংরাজের ইতিহাসই সাক্ষ্য দেয়। সুতরাং মাদ্রাজীরাও 'বে-সামরিক' জাতি নহে। বাঙ্গালীকে ইংরাজ 'লেখক' জাতি বলিয়াই জগতে জাহির করিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই বাঙ্গালীকে 'লেখকে' পরিণত করিল কে? পূর্ব্বে বাঙ্গালী 'বে-সামরিক' ছিল না। বহু প্রাচীন যুগের কথা নহে, মোগল শাসনকালেও বাঙ্গালার জমীদারদিগের বাহুবল ও লোকবল বড় অল্প ছিল না। বাঙ্গালী বাগ্দী, গোয়ালা ও আগুরী লাঠিয়ালের নাম ইংরাজের অবিদিত নহে। রাজা প্রতাপাদিত্যের ৫২ হাজার ঢালি নায়কত্ব বাঙ্গালীই করিয়াছিল। তাহাদের সেনানীর জন্য পশ্চিম হইতে লোক ধার করিতে হয় নাই। রাজা গণেশ পাঠান রাজার বিপক্ষে যুদ্ধে ভাড়াটিয়া সেনা-নায়ক আনয়ন করিয়া বাঙ্গালী সেনার নেতৃত্বে নিযুক্ত করেন নাই। সীতারাম রায়, চাঁদ রায়, কেদার রায় প্রভৃতি বাঙ্গালী ভূইঞারা কি বাঙ্গালী সেনার নায়কত্ব করেন নাই? অধিক দিনের কথা নহে, যখন জার্ম্মাণ যুদ্ধকালে বৃটিশ সাম্রাজ্য টলমল করিয়াছিল, তখন বিপদে পড়িয়া এই 'লেখক জাতি' (বাঙ্গালী) হইতেও পল্টন গড়িতে হইয়াছিল, সে কথাও কি ইংরাজ ভুলিয়া গিয়াছেন? তাঁহাদের ৪৯ সংখ্যক বাঙ্গালী পল্টন সহনক্ষমতায়, দৃঢ়তায়, অধ্যবসায়ে, সাহসে ও শৌর্য্যে ইংরাজ-সেনানীদের নিকট প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিল। সুযোগ ও অবসর পাইলে যে এই 'লেখক জাতি'ও সমরবিভাগে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারে, তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। তবে বাঙ্গালীর নাম শিক্ষার্থীর তালিকা হইতে বাদ পড়িল কেন?

কংগ্রেস ও অব্রাহ্মণ

মাদ্রাজ বিভাগে ব্রাহ্মণে ও অব্রাহ্মণে মনোবাদের কথা সকলে অবগত আছেন। ইহার ফল এমন বিষময় হইয়াছিল যে

আজ ১০ বৎসর যাবৎ অব্রাহ্মণরা জাতীয় কংগ্রেসের সংস্রব বর্জ্জন করিয়াছেন। মাদ্রাজের "জাষ্টিস" নামক পত্র অব্রাহ্মণদের নেতৃত্ব করিয়া আসিতেছেন, এই হেতু অব্রাহ্মণদিগকে সাধারণতঃ 'জাষ্টিস পার্টি' বলিয়া থাকে। কিন্তু এই পার্টির সকলে যে একমত নহেন, তাহা সম্প্রতি কইম্বাটোরের এক অব্রাহ্মণ সম্মিলনের অধিবেশনে প্রকাশ পাইয়াছে। এই অধিবেশনে উপস্থিত অব্রাহ্মণ প্রতিনিধিরা কংগ্রেসে পুনরায় যোগদান করিবার নিমিত্ত মন্তব্য গ্রহণ করিয়াছেন।

ইহা বস্তুতঃই আনন্দের কথা। যদি কইম্বাটোরের অব্রাহ্মণ সম্মিলনের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া 'জাষ্টিস পার্টির' সকল লোক একমত হইয়া কংগ্রেসে যোগদান করেন, তাহা হইলে কংগ্রেসের 'মরা গাঙ্গে' আবার জল ছুটিতে পারে। কংগ্রেসে সম্প্রতি মুসলমান সদস্যের সংখ্যা হ্রাস হইয়াছে, অব্রাহ্মণরা সদলবলে যোগদান করিলে সেই ক্ষতি বহুলাংশে পূর্ণ হইবে সন্দেহ নাই।

বঙ্গমাতা

কিসের দুঃখ কিসের দৈন্য কিসের লজ্জা কিসের ক্লেশ
সন্তান যার মায়ের রক্ত নিঃশেষে শুষি করিছে শেষ ?

(উপন্যাস)

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

অন্নজল-তত্ত্ব

অ্যালেন হোটেলে পৌঁছিয়া, রেবতী ও হীরালালকে রাখিয়া, বিপিন বাবু রেবতীর গৃহ পরিদর্শনার্থ যাইতে চাহিলে, রেবতী বলিল, "বসুন না ;—কিছু খাওয়া দাওয়া করা যাক আসুন, তার পর বাড়ী দেখতে গেলেই হবে।"

হীরালাল বলিল, "হ্যাঁ, একটু দেরী ক'রে যাওয়াই ত ভাল। করিম এখনও সেখানে নাও পৌঁছে থাকতে পারে। এখন তুমি দেখে আসবে যে লাইন ক্লিয়ার—তার পর, রেবতীকে আমরা যখন রাখতে যাব, তখন হয় ত দেখবো মাতাল করিম সশস্ত্রে হাজির।"

এ যুক্তির সারবত্তা বিপিন বাবু স্বীকার করিলেন। রেবতী খিদমৎগারকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বয়, ক্যা ক্যা চীজ্ তৈয়ারী হায় ?"

ভোজ্যবস্তু যাহা যাহা প্রস্তুত ছিল, বয় তাহা নিবেদন করিল। রেবতী বিপিন বাবুর পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার জন্যে কি আনতে বলবো ?"

বিপিন বাবু, "যা হয়। আপনারা যা খাবেন, আমারও তাই ব'লে দিন।"

রেবতী আদেশ করিল, "দেখো, পহলে তিন প্লেট ফাউল কাটলেট লাও। আউর রোটি মাখ্খন। পিছে কারি পোলাও দেনা।"

"বহুৎ খু হুজুর" বলিয়া বয় প্রস্থান করিল।

তখন রেবতী বিপিন বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার চিন্তামণি কেমন হ'ল ?"

বিপিন বাবু হাসিয়া বলিলেন, "আমার অভিমত ত আমি আগেই হীরুকে বলেছি। ভায়া গিয়ে আপনাকে বলেও এসেছে বলে।"

রেবতী বলিল, "হ্যাঁ হ্যাঁ—আপনি আমায় বর্ণ আর্টিষ্ট বলেছেন। উনি আমায় বলেছিলেন বটে - কিন্তু সে সময় বক্সে করিম গুণ্ডাকে দেখে আমার আত্মাপুরুষ খাবি খাচ্ছিল—তাই কথাটা ভুলে গিয়েছিলাম। আমাকে আপনি বর্ণ আর্টিষ্ট বলেছেন, আমায় স্নেহ করেন বলেই আপনার তাই মনে হয়েছে। চিন্তামণির পার্ট বিশেষ শক্তও নয়—ও পার্ট ভাল অভিনয় করায় বিশেষ কিছু বাহাদুরী নেই।"

বিপিন বাবু বলিলেন, "অভিনয় আপনার নিখুঁৎ হয়েছে। কি বল হীরু ?"

হীরালাল বলিল, "আমার মতের মূল্যই বা কি ? তোমরা হ'লে সমজদার লোক—আজকাল যাকে রসবেত্তা বলে।"

বিপিন বাবু বলিলেন, "তুমিই কি রসের কম বেত্তা ?" —বলিয়া বিপিন বাবু হীরালালের দিকে ক্রূর দৃষ্টি হানিয়া হাসিতে লাগিলেন।

তার পর করিম গুণ্ডা সম্বন্ধে আলোচনা হইতে লাগিল। বিপিন বাবু বলিলেন, "করিমের ঐ শেষ চিঠি পড়ে মনে হয় না যে, সে আপনার বাড়ীতে গিয়ে উপদ্রব করবে। ঝিয়ের মুখে আপনার জবাব পেয়ে, মনের দুঃখে সে নিশ্চয় বাড়ীই চলে গেছে। তবু, খানিকক্ষণ পরে, আমি অবশ্য আপনার বাড়ীতে গিয়ে সমস্ত দেখে শুনে আসবো —তার পর আপনাকে এসে নিয়ে যাব।"

এই সময় খিদমৎগার খাবার আনিল। তিন জনেই ক্ষুধার্ত্ত ছিল, খাবারগুলির সদ্ব্যবহার হইতে লাগিল।

আহার যখন শেষ হইল, রাত্রি তখন প্রায় ১২টা। বিপিন বাবু বলিলেন, "আচ্ছা, এবার তা হ'লে আমি দেখে আসি।"

জয়মিত্রের ষ্ট্রীট এই হোটেলের অল্প দূরেই। বিপিন বাবু পদব্রজেই তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। রেবতীর দ্বারের কড়া নড়িতেই হরি সিং ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিল, "কোন হায় ?"

"হরি সিং— আমি—বিপিন বাবু। দরজা খোল।"

হরি সিং নীরব। দরজাও খুলিল না।

বিপিন বাবু আবার কড়া নাড়িয়া বলিলেন, "কাঁহাজী ? ফির্ শুৎ গিয়া ? দরোয়াজা খোলো।"

হরি সিং ভিতর হইতে বলিল, "আভি তো বাড়ীমে কোই নেহি হায়, বাবু! মাইজী আভি থেটরসে লওটা নেহি।"

বিপিন বাবু বুঝিলেন, লোকটা তাঁহাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিতেছে। বলিলেন, "তা আমি জানি হরি সিং। আমি তোমার মাইজীর কাছ থেকেই আস্‌ছি। একটা বিশেষ দরকারে এসেছি। বাড়ীর মধ্যে আমি যাব না—তুমি দরজাটা খুলে আমার কথা শোন।"

হরি সিং সাবধানে দ্বার একটু ফাঁক করিয়া উঁকি দিয়া দেখিল। বিপিন বাবুকে চিনিয়া বলিল, "ওঃ, আপনি? কি দরকার বাবু?"

বিপিন বাবু বলিলেন, "এক ঘণ্টা কি দু' ঘণ্টার মধ্যে কোনও লোক কি এখানে এসেছিল?"

"না বাবু, কেউ ত আসে নি।"

"কোনও মুসলমান? কিছু দিন আগে যে ওস্তাদজী এসে তোমার মাইজীকে একটা এস্রাজ দিয়ে গিয়েছিল—আসে নি ত?"

"না বাবু, হিন্দু মুসলমান কেউ-ই আসে নি।"

"আচ্ছা, আমি এখন চল্লাম। তোমার মাইজী কিংবা হীরু বাবু ছাড়া, আর যদি কেউ ডাকে কি দরজা খুলে দিতে বলে, তা হ'লে খবর্দ্দার যেন দরজা খুল না। আমি তোমার মাইজীকে আর হীরু বাবুকে আন্‌তে চল্লাম।"

"আচ্ছা বাবু।"—বলিয়া হরি সিং দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

বিপিন বাবু অ্যালেন হোটেলে ফিরিয়া গিয়া রেবতী ও হীরালালকে সকল কথা জানাইলেন এবং বয়কে ডাকিয়া বিল আনিতে বলিলেন। বয় বলিল, "রূপীয়া তো মিল গিয়া বাবু।"

বিপিন বাবু রেবতীকে বলিলেন, "আপনিই বিলের টাকা দিলেন বুঝি? অন্যায় করেছেন!"

রেবতী হাসিয়া বলিল, "না না, অন্যায় করি নি,—আপনারা দু'জনে ত আজ আমারই অতিথি। এখন চলুন, বাড়ী যাওয়া যাক্।"

অতঃপর তিন জনে হোটেল হইতে নামিয়া, ধীরে ধীরে পদব্রজে জয়মিত্রের গলির দিকে চলিলেন। দ্বারে পৌঁছিয়া রেবতী ডাকিতে ও কড়া নাড়িতে হরি সিং দ্বার খুলিয়া দিল।

বিপিন বাবু বলিলেন, "আর ত আপনার কোনও ভয় নেই।—আপনি স্বচ্ছন্দে ঘরে গিয়ে দোরে খিল দিয়ে শুন্ গে। আমরা দু'জন তা হ'লে এখান থেকেই বিদায় হই।"

রেবতী বলিল, "তা, আপনাদের এত রাত্রে আর কি ওজুহাতে আটকাই বলুন! অনেক কষ্ট দিলাম আপনাকে, অবলা রমণীর অপরাধ নেবেন না।—আচ্ছা—তা হ'লে আজ আসুন—নমস্কার।"

"নমস্কার"—বলিয়া বিপিন বাবু হীরালালকে লইয়া, বড় রাস্তায় আসিয়া, ট্যাক্সি লইয়া নিজ হোটেলে ফিরিয়া গেলেন। নিজ কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, টেবিলের উপর দুই জনের খাবার ঢাকা রহিয়াছে।

হীরালাল বলিল, "ওহে, দেখছ,—যেখানে যে দিন যার অন্ন-জল মাপানো থাকে, সেখানে ভিন্ন আর তার গতি নেই—এ কথাটা খুব সত্যি। রেবতী তার বাড়ীতে আমাদের দু'জনেরই খাবার বন্দোবস্ত ক'রে রেখেছিল। এ কথা সে আমায় বলেছে। পাছে সেখানে আমাদের খেতে হয়, এই ভয়ে এখানে তুমি খাবার অর্ডার দিয়ে গেলে। রেবতীর বাড়ীর খাবারও প'ড়ে রইল, এ খাবারও প'ড়ে রইল,—যেখানে মাপানো ছিল, সেখানেই খেয়ে এলাম আমরা!"

বিপিন বাবু বলিলেন, "ঠিক কথা। কাল দুপুরে তোমার অন্ন এই হোটেলে, রাত্রে নতুন মেসের বাসায় বিধি মাপিয়েছেন কি না দেখা যাক্। এস, এখন শোয়া যাক্। কাল একটু সকালে সকালে উঠতে হবে—চা-টা খেয়েই মেসের বাসা খুঁজতে বেরুতে হবে।"—বলিয়া তিনি শয়নের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

মনীষি-সঙ্গম

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া জলযোগ ও চা-পানের পর বিপিন বাবু বলিলেন, "চল হীরুদা, এইবার বেরিয়ে পড়া যাক।"

হীরালাল অসহায়ভাবে বলিল, "চল।"

পথে বাহির হইয়া পদব্রজে কিয়দ্দূর আসিয়া বিপিন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, কোন্ অঞ্চলে বাসা হ'লে তোমার সুবিধা হয় বল দেখি?"

হীরালাল বলিল, "হেদো থেকে আরম্ভ ক'রে শ্যামবাজার পর্য্যন্ত—অর্থাৎ আমার চাকরী স্থান থেকে বেশী দূর না হয়—এই আর কি!"

"আচ্ছা, তবে ট্যাক্সি নিয়ে প্রথমে শ্যামবাজার অঞ্চলে গিয়ে খোঁজা যাক্ চল। তার পর খুঁজতে খুঁজতে হেদো পর্য্যন্ত আসা যাবে। কি বল?"

হীরু বলিল, "বেশ ত।"

"এই—ট্যাক্সি!"—বলিয়া বিপিন বাবু ট্যাক্সি ধরিলেন। উভয়ে তাহাতে আরোহণ করিয়া শ্যামবাজার ট্রাম ডিপোর কাছে গিয়া নামিলেন। শ্যামবাজার ষ্ট্রীট দিয়া, মেস খুঁজিতে খুঁজিতে ক্রমে দুইজনে পশ্চিম মুখে চলিলেন।

এইরূপে খুঁজিতে খুঁজিতে ক্রমে দুইজনে কম্বুলিয়া টোলার কাছাকাছি গিয়া পৌছিলেন,—এতক্ষণে সেখানে এক দ্বিতলের বারান্দা হইতে এক তক্তা লম্বিত দেখিলেন, তাহাতে লেখা আছে—"WANTED MEMBERS"—উভয়ে ভিতরে প্রবেশ করিয়া, মেসের ম্যানেজার বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, কোন্ কোন্ সীট খালি আছে, জানিতে চাহিলেন। দুইটি সীট ম্যানেজার বাবু দেখাইলেন, উভয় সীটই একবারে "অখাদ্য"।—"না মশাই, এ সীট চলবে"—বলিয়া বিপিন বাবু তথা হইতে বাহির হইলেন।

কিয়দ্দূর আসিয়া, উভয়ে দেখিলেন, ডাহিন দিকে 'অ্যাংগ্লো ভার্ণাকুলার স্কুল' গৃহ। রাস্তার ধারের একটি কক্ষে খোলা জানালায় দেখিতে পাওয়া গেল, দীর্ঘ পক্কেশ এক জন বৃদ্ধ, মেঝের ফরাস বিছানার উপর বসিয়া কি সব কাগজপত্র দেখিতেছেন। হীরালাল দাঁড়াইয়া সেইদিকে বিপিন বাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া চুপি চুপি বলিল, "ওহে, উনি কে জান?"

বিপিন বাবু সে দিকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "অমৃত বোস না?"

হীরালাল পূর্ব্ববৎ নিম্নস্বরে বলিল, "হ্যাঁ—আমরা থিয়েটারের লোকেরা ওঁকে ভুনি বাবু বলি।"

"তোমার সঙ্গে আলাপ হয়েছে ওঁর?"

"রাম বল!—আমি হলাম আদার ব্যাপারী,—জাহাজের ধারে যেতে পারি কখনও?"

বিপিন বাবু বলিলেন, "আচ্ছা, গিয়ে আলাপ করলে হয় না?"

"তুমি যদি যাও, আমি তোমার ল্যাংবোট হয়ে যেতে পারি। কিছু মনে করবেন না ত?"

"কেন মনে করবেন? কোনও অপরিচিত ভদ্রলোক আলাপ পরিচয় করতে এলে কি কোনও ভদ্রলোক চটে? চল চল।"—বলিয়া বিপিন বাবু, হীরালালকে প্রায় হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া সেই কক্ষে উপস্থিত হইলেন।

প্রতিভাশালী নাট্যকার ও ক্ষণজন্মা অভিনেতা মহাশয় চক্ষু হইতে চশমা খুলিয়া, আগন্তুকদ্বয়ের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "কোথা থেকে আসছেন আপনারা?"

বিপিন বাবু সবিনয়ে নিজ পরিচয় প্রদান করিলেন। শেষে বলিলেন, "আমরা দু'জনেই, নাট্যকলার কিছু কিছু চর্চ্চা ক'রে থাকি—আপনার অনেক বই, আমাদের কণ্ঠস্থ বল্লেই হয়। এই দিক্ দিয়ে যাচ্ছিলাম, আপনাকে দেখে আপনার সঙ্গে একটু আলাপ ক'রে যাবার লোভ কিছুতেই সম্বরণ করতে পারলাম না!"

"বটে! বটে!—আসুন—আসুন—বসুন। কি সৌভাগ্য আমার!"—নটচূড়ামণি মহা সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া ইঁহাদিগকে বসাইলেন। কাগজপত্র যাহা তিনি দেখিতেছিলেন, একপার্শ্বে সরাইয়া রাখিয়া ইঁহাদের সহিত সদালাপে নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার সরল অমায়িকতা, সরস বাক্যবিন্যাস—সর্ব্বোপরি প্রতিভায় সমুজ্জ্বল তাঁহার বৃহৎ চক্ষুর্দ্বয়—বিপিন বাবুকে মোহিত করিয়া ফেলিল। তিনি দেখিলেন, শুধু নাটক বা থিয়েটরের বিষয়ে নহে—নানা বিষয়ে যে সকল মন্তব্য তিনি প্রকাশ করিতেছেন,

তাহা যেমন সারগর্ভ ও সুচিন্তিত, তেমনই বিশুদ্ধ রসিকতায় ওতঃপ্রোত। দেখিতে দেখিতে দুই ঘণ্টাকাল কোথা দিয়া যে চলিয়া গেল, তাহার হদিশ পাওয়া গেল না। বিপিন বাবু তাঁহার গ্রামস্থ থিয়েটর দলের কথা বলিলেন ;—শীঘ্রই তথায় বিল্বমঙ্গল ও তরুবালা অভিনয় করার বাসনা কথা-প্রসঙ্গে প্রকাশ করিয়াছিলেন। সাড়ে এগারোটা বাজিয়া গিয়াছে দেখিয়া, উঠিবার আয়োজন করিয়া বিপিনবাবু বলিলেন, "আপনার অনেকখানি সময় আমরা নষ্ট ক'রে দিলাম। যদি অনুমতি করেন ত এখন উঠি। আর একটা নিবেদন। আপনার যদি সময় থাকে, আমাদের ড্রেস রিহার্শালের দিন যদি দয়া ক'রে আমাদের গ্রামে আসেন, একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দেন, তা হ'লে বড়ই উপকৃত হব।"

অমৃত বাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "কেন যাব না? অবশ্যই যাব। দিনকতক আগে থাকৃতে আমায় খবর দিও। এ ত আনন্দের কথা।"

বিপিন বাবু বলিলেন, "আগে থাক্‌তে খবর দেবো বৈকি!—আর, সেই সময়, আমি এসে আপনাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব।"

অমৃত বাবুর নিকট বিদায় লইয়া রাস্তায় বাহির হইয়া বিপিন বাবু বলিলেন, "ওহে হীরুদা, সাড়ে ১১টা যে বেজে গেছে। তোমার মেসের ত কোন ব্যবস্থাই হ'ল না!"

হীরালাল,"ওবেলা তখন আবার বেরুনো যাবে—এখন হোটেলে ফেরা যাক্‌ চল। ক্ষিদেয় প্রাণ গেল।"

বিপিন বাবু বলিলেন, "হ্যাঁ, তাই চল। আমরা কোন্‌ দিকে যাচ্ছি বল দেখি?"

হীরালাল বলিল, "আর খানিক এগিয়ে গেলেই ত শ্যামবাজার ষ্ট্রীট শেষ—চিৎপুর রোডে পড়া যাবে।"

"ওঃ—তাই নাকি"—বলিয়া বিপিন বাবু অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিয়দ্দুর গিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ হে, আজ থিয়েটরে তোমাদের কোনও রিহার্শাল-টিহার্শাল আছে নাকি?"

"আছে ত! তিনটের পর আমাদের যেতে হবে।"

"রেবতীকে যেতে হবে?"

"হবে বৈ কি!"

"কটা অবধি রিহার্শেল?"

"এই বড় জোর রাত নটা। কেন বল দেখি খুঁটিয়ে এত খবর নিচ্ছ?"

বিপিন বাবু ক্ষণকাল নীরবে পথ চলিয়া বলিলেন, "দেখ, কাল থেকে একটা কথা আমার মনে হচ্ছে—তোমায় বলি, তুমি কি পরামর্শ দাও শুনি।"

হীরালাল সবিস্ময়ে বিপিন বাবুর মুখ পানে চাহিল। বিপিন বাবু বলিলেন, "আমি ভাবছি কি জান, রেবতী কালকে হোটেল নিয়ে তিন দিন আমায় খাওয়ালে—একদিন ত রীতিমত নিমন্ত্রণ করেই। আমি যদি ওকে না খাইয়ে কলকাতা থেকে লম্বা দিই, সেটাই বা কেমন দেখায় বল দেখি?"

হীরালাল বলিল, "আচরণটা 'ফলারে বামুনের' তুল্য হয় বটে।"

"তাই আমি ভাবছি কি জান? তোমার বাসা টাসা ঠিক ক'রে দিয়ে বিকেলের ট্রেণে বাড়ী যাব মনে করেছিলাম, সে ত হ'লই না। কাল অবধি ত আমায় কলকাতায় থাকতেই হল। আচ্ছা, আজ রাত্রে যদি রেবতীকে নিমন্ত্রণ করা যায় ত কেমন হয়?"

"কোথায়? তোমার হোটেলে ত তাকে নিয়ে যাওয়া চল্‌বে না।"

"না না—আমার হোটেলে কেন? ধর্ম্মতলার ঐ দিকে কোনও একটা হোটেলে টোটেলে, যেমন ধর বম্বে রেষ্টোরাঁ কিংবা ভাভয়—তুমি কি বল?"

হীরালাল বলিল, "মন্দ কি?"

"তা হ'লে ত রেবতীকে এ বেলায় নিমন্ত্রণ ক'রে যেতে হয়। তাকে এখন বাড়ীতে পাব ত?"

"পাবে বৈ কি। সে হয় ত এতক্ষণ খাওয়া দাওয়া করছে। খেয়ে একটু শোবে। ঘুমিয়ে উঠে তিনটের পর রিহার্শেলে যাবে।"

"তবে চল, তাকে নিমন্ত্রণটা ক'রেই যাওয়া যাক্‌। একখানা ট্যাক্সিও যে দেখতে পাচ্ছি নে ছাই।"

হীরালাল বলিল, "ঐ চিৎপুর রোড। মোড়ে পৌছলেই ট্যাক্সি পাওয়া যাবে।"

মোড়ে পৌছিয়া ট্যাক্সি লইয়া উভয় বন্ধুতে আবার জয় মিত্রের গলিতে প্রবেশ করিলেন। রেবতীর গৃহে গিয়া শুনিলেন, সত্যই সে খাইতে বসিয়াছে। বিপিন বাবুকে

বসাইয়া হীরালাল একেবারে রেবতীর খাইবার ঘরে গিয়া উপস্থিত। রেবতী সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "কি গো? বন্দী পালিয়ে এলে কি ক'রে?"

হীরালাল বলিল, "পালিয়ে আসবার যো কি! প্যাদা সঙ্গে সঙ্গেই এসেছে।"

"প্যাদা কে? বিপিন বাবু?"

"হ্যাঁ। ওঘরে ব'সে আছেন। তোমায় নেমন্তন্ন করতে এসেছেন।"

"কিসের নেমন্তন্ন?"

"এই, একটু খাওয়া দাওয়ার আর কি! রাত্রে ধর্ম্মতলা অঞ্চলের কোনও একটা হোটেলে, তিন জনে ব'সে একটু খাওয়া দাওয়া যাবে। তাই তিনি তোমায় বলতে এসেছেন।"

"কিন্তু আজ যে আমাদের রিহার্শ্যাল রয়েছে।"

"সে কথা বলেছি। রিহার্শাল ত রাত ৯টা পর্য্যন্ত। তারপর যাওয়া যাবে! তুমি খেয়ে এস, আমি বিপিনের কাছে বসিগে।"

"আচ্ছা—আমার হয়ে খাতির টাতির করগে ওঁকে, সিগারেট টিগারেট দাও গে।"—বলিয়া রেবতী আবার আহারে প্রবৃত্ত হইল।

মিনিট দশেক পরে রেবতী আহার সারিয়া বসিবার ঘরে গিয়া বিপিন বাবুকে বলিল, "ওঁর কাছে সব শুনলাম। আপনি ইংরেজী হোটেলে খাইয়ে আমার জাতটি না মেরে ছাড়বেন না দেখছি।"

বিপিন বলিল, "হোটেল ইংরেজের হ'লেও যারা রাঁধে তারাও স্বদেশী, যারা পরিবেষণ করে তারাও স্বদেশী—তবে জাত যাবে কেন? বিশেষ রন্ধনাদি সমস্তই শুধু গঙ্গাজলে নয়, রীতিমত ফিল্টার করা পাইপের গঙ্গাজলে হচ্ছে।"

রেবতী বলিল, "তা বেশ, আপনি ভট্চায্যি মশায় যখন পাঁতি দিচ্ছেন, তখন আমার আর আপত্তি কেন হবে? রাত ৯টা পর্য্যন্ত কিন্তু আমাদের রিহার্শাল।"

"আমি রাত দশটার সময় খানার বন্দোবস্ত ক'রে রাখবো। আমি আমার হোটেলেই আপনাদের জন্য অপেক্ষা করবো। থিয়েটার থেকে হীরুদা ট্যাক্সি করে আপনাকে নিয়ে আমার হোটেলে আসবে—আমাকে তুলে নেবে। তার পর সেই ট্যাক্সিতে আমরা তিন জনে ধর্ম্মতলা যাব—কি বলেন?"

রেবতী এ প্রস্তাবে সম্মতিজ্ঞাপন করিল।

"আচ্ছা, এখন তা হ'লে উঠি। চল হে হীরুদা।"

রেবতী বলিল, "এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করুন। এই রোদ্দুর, এখনও আপনাদের খাওয়া দাওয়া হয় নি। বরফ আনতে দিয়েছি—একটু সরবৎ খেয়ে যান।"

বিপিন বাবু বসিয়া বলিলেন, "আপনার আতিথেয়তা আদর্শ স্থল।"

শীঘ্রই দুই গ্লাস সুশীতল সরবৎ আসিল। উভয় বন্ধু তাহা পান করিয়া, পাণ লইয়া প্রস্থান করিলেন।

[ক্রমশঃ।

মুখোপাধ্যায়।

পরলোকে প্রকাশচন্দ্র দত্ত

বিগত ২৪শে শ্রাবণ মঙ্গলবার প্রকাশচন্দ্র দত্তের পরলোকগমন সংবাদে আমরা মর্ম্মবেদনা পাইলাম। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে বহুবাজারের প্রসিদ্ধ অক্রুর দত্তের বংশে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার জননী বাঙ্গালার প্রসিদ্ধা মহিলা কবি গিরীন্দ্রমোহিনী। প্রকাশচন্দ্র সাহিত্যসেবী ছিলেন। সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য পত্রে' ইঁহার রচিত অনেকগুলি সুন্দর গল্প প্রকাশিত হইয়াছিল। "জাহ্নবী" পত্রিকা সম্পাদনকালে প্রকাশচন্দ্র জননী গিরীন্দ্রমোহিনীকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। ইঁহার রচিত 'অপরিচিতের পত্র' ও 'পঞ্চমুখী' বাঙ্গালা-সাহিত্যের সম্পদ। প্রকাশচন্দ্র অধুনা নিউ বেঙ্গল প্রেসের ম্যানেজারের কার্য্য করিতেছিলেন। একখানি বিরাট বাঙ্গালা অভিধান তাঁহারই সম্পাদকতায় সঙ্কলিত হইয়াছিল। এক পুত্র ও ৪টি কন্যা রাখিয়া প্রকাশচন্দ্র পরলোকগমন করিলেন। তাঁহার অকাল-বিয়োগে আমরা এরূপ বিচলিত যে, তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পুত্র-কন্যাগণকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না।

সম্পাদক—শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, বসুমতী 'রোটারী মেসিনে' শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৬ষ্ঠ বর্ষ] ভাদ্র, ১৩৩৪ [৫ম সংখ্যা

স্বামী সারদানন্দ মহারাজ
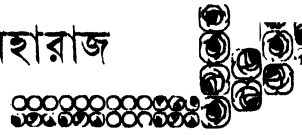
বেলুড় মঠের গৌরব-চূড়া খসিয়া পড়িয়াছে! গত ২রা ভাদ্র, বৃহস্পতিবার রাত্রি আড়াইটার সময় নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষ—আবাল্য ব্রহ্মচারী—ভারতের মুক্তিমন্ত্রের গুরু—পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ—আমাদের প্রিয়াদপি প্রিয় 'শরৎ মহারাজ'—শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত-সম্প্রদায়কে কাঁদাইয়া লীলা-সংবরণ করিয়াছেন। যাঁহাদের ত্যাগদীপ্ত সুকঠোর সাধনায়—প্রতীচ্যের মোহময় প্রভাব চূর্ণ করিবার জন্য—পাশ্চাত্য-শিক্ষা-সংঘাতে বিলাস-স্রোতঃ-প্লাবনের যুগে—ভারতের অশেষ কল্যাণ-উচ্ছ্বসিত, জ্ঞান-ভক্তির গঙ্গোত্রী, বেলুড় মঠ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যে মঙ্গলময়ী জ্ঞান-ভক্তি মন্দাকিনীর ধারা বাঙ্গালার—ভারতের—সুদূর আমেরিকার প্রদেশে প্রদেশে কেন্দ্রে কেন্দ্রে প্রবাহিত হইয়া ভারত—জগৎ স্নিগ্ধ ও পবিত্র করিয়াছে, বিলাসের পঙ্কিল স্রোতঃ স্তব্ধ—বিশুদ্ধ করিয়াছে, সেই জ্ঞান-ভক্তি-মন্দাকিনী-প্রবাহের অন্যতম প্রবর্ত্তক—স্বামী সারদানন্দ।

স্বামী বিবেকানন্দের পর স্বামী ব্রহ্মানন্দ—তাঁহার তিরোভাবের পর স্বামী শিবানন্দ বেলুড় মঠের প্রেসিডেণ্ট হইয়া ধর্ম্মগুরু-পদ সমুজ্জ্বল করিয়াছেন ও করিতেছেন; কিন্তু বেলুড় মঠের প্রতিষ্ঠাবধি মহাপ্রস্থান-কাল পর্য্যন্ত শরৎ মহারাজ ত্রিশ বৎসরাধিককাল একক সেক্রেটারীর গুরু-দায়িত্বপূর্ণ পদে বিরাজিত থাকিয়া বিভিন্ন কেন্দ্রের অসংখ্য শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠ ও সেবাশ্রম সঙ্ঘবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কর্ম্ম-সাধনার—সংগঠন, সম্মিলন, সুনিয়ন্ত্রণ-শক্তির ইহাপেক্ষা কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান নিষ্প্রয়োজন। যে সময়ে যে প্রদেশে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বন্যায় মানব বিপন্ন হইয়াছে—সেই স্থানেই শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সেবাস্রোতঃ—করুণার ধারা—যশের আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া অনাহূত অনাবিলভাবে প্রবাহিত হইয়া, আর্ত্তের সেবায়, বিপন্নের ত্রাণে অজস্র-দানে, অভাবমোচনে মূর্ত্তিমতী করুণাস্বরূপিণী হইয়া অশেষ কল্যাণ সংসাধন করিয়াছে, তাহার মূল উৎস স্বামী

লীলাবসানের অব্যবহিত পূর্ব্বে স্বামী সারদানন্দ মহারাজ

সারদানন্দ। সেবাব্রতে আত্মনিবেদিত-প্রাণ নীরব কর্ম্ম-সাধক তিনি—অসার বক্তৃতার জ্বালাময়ী উচ্ছ্বাসচ্ছটায় দিগন্ত প্রকম্পিত করিয়া কার্য্যকালে পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করিয়াও যে জগতে অতুল ভালবাসার মোহনমন্ত্রে কর্ম্মিগণকে কঠোর কর্ম্মে অনুপ্রাণিত করা যায়—মানব-মঙ্গল-সেবাব্রতে দীক্ষিত করা যায়—সেই অনুপ্রেরণার বলে উদ্দীপিত হইয়া কর্ম্মিগণ আর্ত্তের সেবায়, বিপন্নকে দানে আত্মনিবেদনের জন্য অধীর আগ্রহে ঝম্পপ্রদান করে—প্লেগ, বসন্ত, কলেরা রোগীর অক্লান্ত সেবা-পরিচর্য্যায় আত্মজীবন তুচ্ছ জ্ঞান করে—বন্যাপ্লাবিত দেশে সন্তরণে অভিযান, [illegible]া, দানে শতহস্ত প্রসারিত করিতে পারে—ত্যাগের দীপ্ত-মহিমায় দেশ সমুজ্জ্বল করিতে পারে,—সেই অসীম ভাব-অনুপ্রেরণাময় অলৌকিক ভালবাসার প্রস্রবণ—করুণার হিমগিরি—শরৎ মহারাজ। তাঁহার নিভৃত সাধনা, তপস্যায় বিপন্ন ভারত বহুবার বেলুড়-মঠের মূর্ত্তিমতী করুণার দিব্যজ্যোতিঃ সন্দর্শনে ধন্য হইয়াছে—তিনি করুণাময়। এ স্নেহের অপরিশোধনীয় ঋণে বাঙ্গালী—তথা ভারতবাসী চির-উপকৃত—কৃতার্থ—কৃতজ্ঞ।

তাঁহার ত্যাগ-জ্যোতির্ব্বিবস্বান্ সৌম্যগম্ভীর মূর্ত্তির নিকট বিলাসী, ভোগী, ঘোর সংসারী অগ্রসর হইতে ভয় পাইত—

বেলুড়মঠে স্বামী সারদানন্দ

মন হইতে পাপের কালিমা অপনোদিত না করিয়া, সে জ্ঞান-হিমালয়ের পদপ্রান্তে সমবেত হইবার মত সাহস সঞ্চয় করিতে পারিত না। কিন্তু ভক্তগণ দেখিত—জ্ঞানের পুণ্য কিরণে সমুদ্ভাসিত করুণার কাঞ্চন-শিখর। সেই মহান্ প্রশান্ত হৃদয়ে জ্ঞানের মন্দাকিনী—ভক্তির অলকনন্দা—স্নেহের আকাশ-গঙ্গার ত্রিবেণীসঙ্গম—ভক্তগণ ভালবাসার মাধুরীধারায় স্নাত হইয়া জীবন সার্থক ও পবিত্র জ্ঞান করিত। এ বিশ্বে তাঁহার অনুপম ভালবাসার মাধুর্য্য যাঁহারা মনে-প্রাণে অনুভব না করিয়াছেন, তাঁহাদের জীবন ব্যর্থ; তাঁহারা জগতে ভালবাসা কি, তাহা উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্যে বঞ্চিত। জননী—পত্নী—দুহিতা—ভগিনীর পবিত্র ভালবাসা ইহার নিকট অতি তুচ্ছ!

স্বামী সারদানন্দ বিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শ্রীচরণতলে আত্মসমর্পণ করেন। তখন তিনি বিংশবর্ষীয় যুবক, সেণ্টজেভিয়ার কলেজের ছাত্র। তাঁহার পিতা গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় কলিকাতা পটলডাঙ্গার অধিবাসী ছিলেন। সহরের বক্ষঃস্থল দিয়া হ্যারিসন রোড নূতন বাহির হইলে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ও হ্যারিসন রোডের সংযোগস্থলের নিকটবর্ত্তী

লণ্ডনে স্বামী সারদানন্দ

তাঁহাদের বাড়ী ভগ্ন হইলে তাঁহারা আরপুলি লেনের নূতন বাড়ীতে উঠিয়া যান। শরৎ মহারাজ মেডিকেল কলেজে চিকিৎসা-বিজ্ঞান শিখিতে আরম্ভ করেন। তিনি প্রত্যহ দক্ষিণেশ্বরে, পরে কাশীপুর ও বরাহনগর মঠে যাতায়াত করিতেন। সেই সময় ঠাকুরের আদেশে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত তাঁহার সৌহৃদ্য জন্মিয়াছিল। সেই সৌহৃদ্য—বন্ধু-প্রীতি স্বামীজীর মহানুভাবে ও কর্ম্মে তাঁহাকে এমন ভাবে অনুপ্রাণিত ও উদ্দীপিত করিয়াছিল যে, তিনি গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক আজীবন সেই মহতো মহীয়ান্ আদর্শের সেবায়—স্বামীজীর আরব্ধ অসম্পূর্ণ কার্য্যের সাধনায় অনন্যচিত্ত হইয়া প্রাণপাত পরিশ্রমে আত্মোৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন।

ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট কাশীপুরের বাগানে বিশ্বগুরু স্বামী বিবেকানন্দ, পূজনীয় ব্রহ্মানন্দ, মহাপুরুষ শিবানন্দ প্রভৃতি যে দ্বাদশ জন প্রথম যৌবনে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, স্বামী সারদানন্দ সেই দ্বাদশ জনের অন্যতম। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনুমতিক্রমে এই নবীন সন্ন্যাসিগণ কাশীপুর, বরাহনগর ও কলিকাতার গৃহস্থ বাড়ীতে ভিক্ষা করিয়া, সেই ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যাদি ঠাকুরের শ্রীচরণতলে স্থাপন করিলে, ঠাকুর পরম সমাদরে তাহা

আমেরিকায় স্বামী সারদানন্দ

গ্রহণ করিতেন। শ্রীমা তাহা রন্ধন করিয়া আনিলে ঠাকুর পরম আনন্দে শ্রদ্ধার সহিত তাহা আহার করিয়া, পরম তৃপ্তির সহিত বলিয়াছিলেন—ভিক্ষান্ন পরম পবিত্র। নবীন সন্ন্যাসিগণ সেই প্রসাদ খাইয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিতেন। ধনাঢ্য সম্ভ্রান্ত গৃহের সুশিক্ষিত সন্তান এই নবীন সন্ন্যাসিগণকে ভিক্ষা করিতে দেখিয়া সম্ভ্রমে, বিস্ময়ে, দুঃখে গৃহস্থ-রমণীগণের মাতৃ-হৃদয় আকুল হইয়া উঠিত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব লীলাসংবরণ করিলে, গুরু-বিরহে পাগল—গুরুগতপ্রাণ শরৎ মহারাজ স্বামী প্রেমানন্দ প্রভৃতি গুরুভ্রাতৃগণের সঙ্গে পদব্রজে শ্রীপুরুষোত্তমধামে গমন করিয়া ধ্যান-জপ-সাধনায় নিমগ্ন হন। তাঁহারা ভিক্ষান্নে তৃপ্ত হইয়া রাত্রির পর রাত্রি বিনিদ্র থাকিয়া শ্রীগুরুদেবের দর্শন-লাভের আশায় ব্যাকুল হন। সেই কৃচ্ছ্রসাধনার ফলে গুরু-ভ্রাতৃগণ কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইলে শরৎ মহারাজ অক্লান্ত-ভাবে গুরুভ্রাতৃগণের সেবা করেন। তাহার পর কাশী, বৃন্দাবন প্রভৃতি নানা তীর্থে মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন করিয়া স্বল্পলব্ধ ভিক্ষান্নে তৃপ্ত হইয়া মনোবৃত্তিজয়ের কৃচ্ছ্রসাধনায় প্রবৃত্ত হন। তাহার পর হৃষীকেশে হিমালয়-গুহায় তপস্যা। এ সকল তপস্যার কঠোর সাধনার কথা—তাঁহার মুখে কোন দিন শুনিবার সৌভাগ্যলাভ আমাদের ঘটে নাই। সে কঠোরতার গৌরব করিতে ইঁহাদের কাহাকেও কোন দিন দেখি নাই। সমসাময়িক ভক্তগণের নিকট শুনিয়াছি

'উদ্বোধন'-সম্পাদনে স্বামী সারদানন্দ
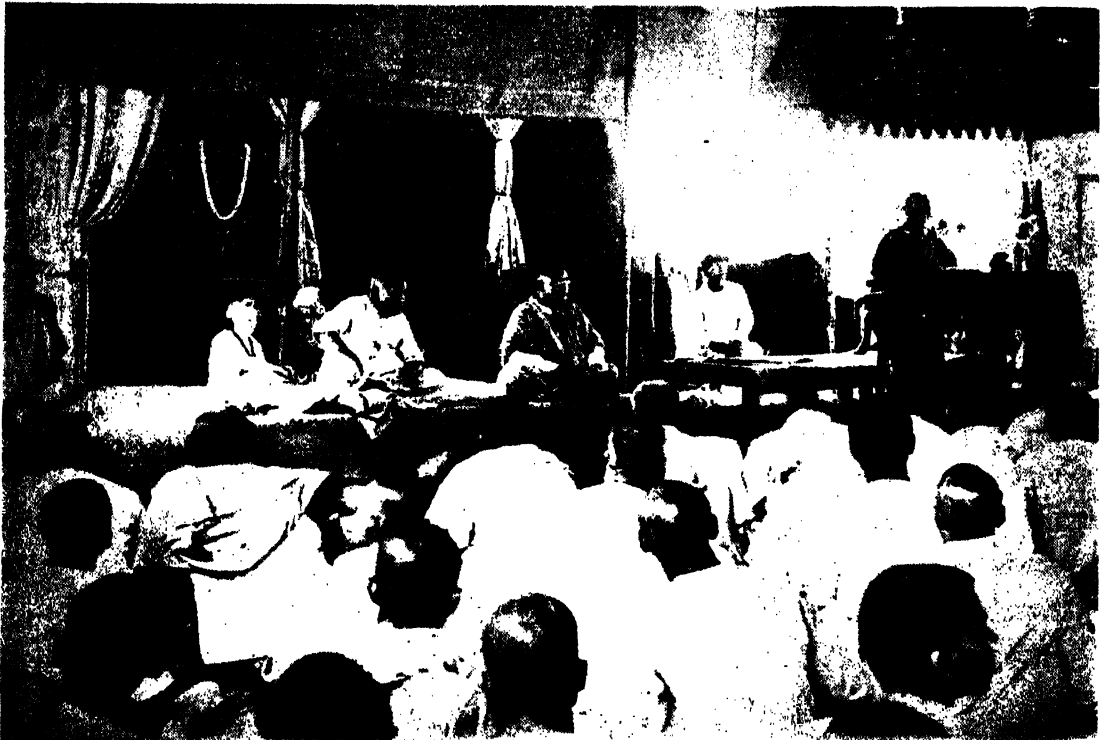
বেলুড়মঠে সন্ন্যাসিসঙ্ঘের সম্মিলনে কনভেন্‌সনের অধিবেশন দৃশ্য—সভাপতি স্বামী সারদানন্দ

জয়রামবাড়ীতে শ্রীমার মন্দিরের পূর্ব্ব অবস্থা

জয়রামবাড়ীতে শ্রীমার মন্দিরপ্রতিষ্ঠা উৎসবে সন্ন্যাসিসম্মিলনে স্বামী সারদানন্দ
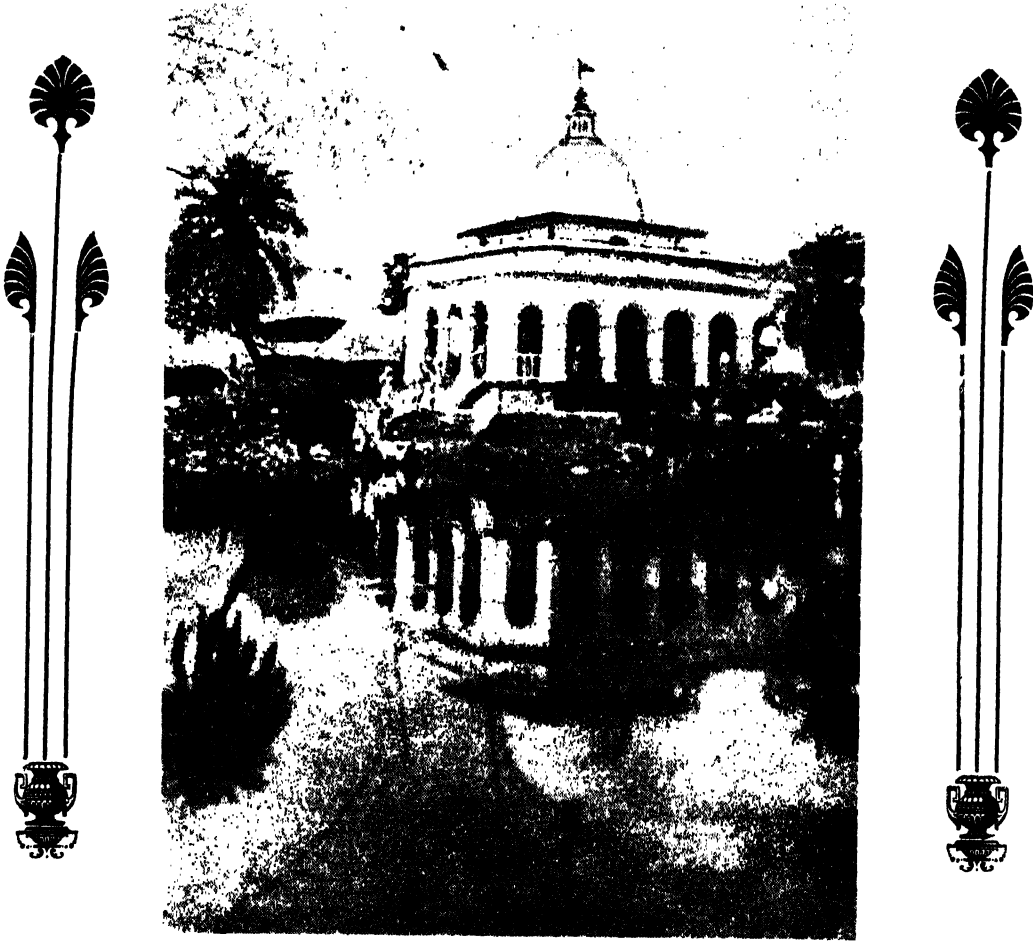
জয়রামবাড়ীতে স্বামী সারদানন্দের আয়োজনে প্রতিষ্ঠিত শ্রীমার নূতন মন্দির

মাত্র। সেই কঠোরতম তপস্যার পর তাঁহারা আবার বরাহ-নগর মঠে সমবেত হইলে স্বামী বিবেকানন্দ প্রথমবার আমেরিকা হইতে ফিরিয়া, বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। বেলুড় মঠ ও নানা কেন্দ্রে মঠ-প্রতিষ্ঠায়, ভক্তবৃন্দের মনোবৃত্তিগঠনে সারাদিন আত্মনিয়োগ করিয়াও সারদানন্দ স্বামীর তপস্যার বিরাম ছিল না। সারারাত্রি বিনিদ্র থাকিয়া তিনি ধ্যানে অতিবাহিত করিতেন।

স্বামী বিবেকানন্দ দ্বিতীয় বার আমেরিকায় গমন করিয়া ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে প্রচারকার্য্যের জন্য গমন করেন। আমেরিকার বোষ্টন, নিউইয়র্ক প্রভৃতি কেন্দ্রে ও লণ্ডনে মঠ-প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত কর্ম্মীর অভাব বোধ করিয়া তিনি শরৎ মহারাজকে লণ্ডনে আহ্বান করেন। স্বামী সারদানন্দ কিছু দিন লণ্ডনে ও ইংলণ্ডের বিভিন্ন স্থানে প্রচারকার্য্য করিয়া আমেরিকায় গমন করেন। আমেরিকার বিভিন্ন কেন্দ্রে কর্ম্মবীর শরৎ মহারাজ দুই বৎসর সনাতন হিন্দুধর্ম্মের উদ্বোধনের জন্য বক্তৃতা ও প্রচারকার্য্য চালাইয়া আবার স্বামীজীর আহ্বানে বেলুড় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সেই গৌরব সেই মুহূর্ত্তে বিসর্জ্জন দেন। তাঁহাকে সে গৌরবের শ্লাঘা করিতে কোন দিন কেহ শুনেন নাই। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সঙ্ঘবদ্ধ হয়।

সাধন-সময়ে স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ স্বামী সারদানন্দের হস্তে মিশনের সেক্রেটারীর গুরু দায়িত্বভার অর্পণ করেন। স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দ প্রচারকার্য্যের জন্য গুজরাটের কাথিয়াবাড় প্রদেশে গমন করেন। তাঁহার প্রচার-প্রভাবে বোম্বাই, গুজরাট কাথিয়াবাড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্বামী শিবানন্দ মহারাজ তাহার উদ্বোধন করিয়াছেন।

আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিয়া স্বামী বিবেকানন্দ প্রথমে 'বসুমতীকে' বেলুড় মঠের মুখপত্ররূপে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরে শ্রীরামকৃষ্ণের অভিনব ভাবপ্রচারের জন্য স্বামীজীর আদেশে 'উদ্বোধন' পত্রের প্রকাশ করিয়া স্বামী ত্রিগুণাতীত আমেরিকায় গমন করিলে শরৎ মহারাজের হস্তে উহার পরিচালনভার অর্পিত হয়। সারদানন্দ স্বামীর ঐকান্তিক চেষ্টায়—'উদ্বোধন' মাসিক পত্র যোগ্যতার সহিত সম্পাদিত এবং স্বামীজীর ইংরাজী বক্তৃতা ও অমূল্য জ্ঞান-গ্রন্থরাজি অনূদিত ও সুলভ মূল্যে প্রচারিত হইয়াছে ও হইতেছে।

নানা শাস্ত্রে ও দর্শনে শরৎ মহারাজের অতুলনীয়, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। চিন্তা ও প্রতিভা-প্রভাবে তিনি দুরূহ শাস্ত্রসমস্যা মীমাংসা করিয়া অপূর্ব্ব ব্যাখ্যায় ও বক্তৃতায় সারমর্ম্ম প্রকাশ করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিতেন। তিনি
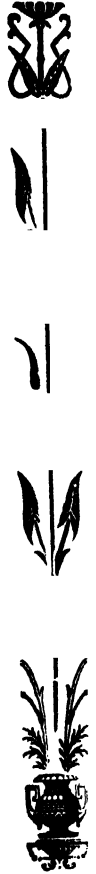
যৌবনে সাধনা-নিরত স্বামী সারদানন্দ

বিবেকানন্দ সোসাইটী ও শ্রীরামকৃষ্ণ অনাথ-ভাণ্ডারের সভাপতি ছিলেন। সনাতন হিন্দুধর্ম্মের গৌরব-প্রতিষ্ঠা—সাধনার প্রবর্ত্তন—গীতার অভিনব ব্যাখ্যা—শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের কর্ম্মী সাধুগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার জন্য মঠে ও বহু স্থানে তিনি যে মর্ম্মস্পর্শিনী ওজস্বিনী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, তাহা তাঁহার মহামানবতার—মহাপ্রাণতার—সর্ব্বজন-কল্যাণের আকুল আগ্রহের বিচিত্র বিকাশ।

স্বামী সারদানন্দ শক্তি-উপাসক ছিলেন—মহিলাদের ভিতর ঠাকুরের ভাব উদ্বোধন না হইলে দেশের, জাতির, সংসারের যথার্থ কল্যাণ সংসাধিত হইবে না, স্বামীজীর এই মহান্ কল্পনা শরৎ মহারাজের মহনীয় ঐকান্তিক সাধনায় কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। বাগবাজারে মাতৃদেবীর আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি শুদ্ধান্তবাসিনী মহিলা-সমাজে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্ত্র প্রচারে যত্নবান্ হয়েন। তাঁহার সাধনা-প্রভাবে দলে দলে সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ 'উদ্বোধন' কার্য্যালয়ের মাতৃ-আশ্রমে সমবেত হইয়া, মাতৃদেবীর নিকট এবং তাঁহার অন্তর্দ্ধানের পর সারদানন্দ স্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া, বাগবাজার ও বেলুড় মঠের উৎসবের দিনে ও অন্য দিনে সমবেত হইয়া, সংসারের ত্রিতাপজ্বালা জুড়াইয়া শান্তি ও তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে মহিলা ভক্তের সংখ্যা পুরুষ ভক্ত-সম্প্রদায়ের সমান বা তদধিক হইয়াছে, তাহার মূলে সংসার-নির্লিপ্ত জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ সারদানন্দের মহিমা। তাঁহারই যত্নে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে বাগবাজারের গৌরবময় প্রতিষ্ঠান সিষ্টার নিবেদিতার বালিকা

প্রচারক স্বামী সারদানন্দ

বিদ্যালয় এবং কুমিল্লায় তাহার একটি শাখা বিদ্যালয়—গৌরীমা'র মহিলা-বিদ্যালয়—জয়রামবাড়ীতে মায়ের মন্দির, বেলুড় মঠে শ্রীমা'র মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়া পারিবারিক মঙ্গলসাধন করিতেছে।

"শ্রীম"-কথিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত' পাঠে ভক্ত-সম্প্রদায়ের তৃষা তৃপ্ত না হইয়া আরও বর্দ্ধিত হইল। শ্রীকথামৃতে কেবল গৃহী ভক্ত-সম্প্রদায়ের নিকট প্রকট ঠাকুরের ভক্তিলীলা দেখিয়া, ত্যাগী সন্ন্যাসিগণের নিকট বিকসিত ঠাকুরের দিব্যজ্ঞানমূর্ত্তি দেখিবার জন্য ভক্ত-সম্প্রদায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তিনি কেবল ভক্তের ভগবান্ নহেন—তিনি যে জ্ঞান-ভক্তির সমন্বয়—জ্ঞানের জ্যোতির্ম্ময় দিব্যমূর্ত্তি। ভক্তহৃদয়ের সে ব্যাকুলতা প্রশমিত করিবার জন্য সারদানন্দ স্বামী রাত্রির পর রাত্রি ধ্যানযোগে ঠাকুরের মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়া ঠাকুরের জ্ঞান-জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গরূপে ভাষার চিত্রে সু-অঙ্কিত করিলেন। বিভিন্ন খণ্ডে লীলা-মহিমময় সংগঠিত প্রকাণ্ড গ্রন্থ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা-প্রসঙ্গ' সাহিত্যে—সমাজে—ভক্ত-সম্প্রদায়ের শরৎ মহারাজের প্রতিভার—সাধনার বিরাট দান। ভক্তগণ—ভবিষ্য-বংশীয় যুগ-যুগান্তরের ভক্তবৃন্দ এ অমিয়লীলামাধুরী পাঠে, শ্রবণে ঠাকুরের দিব্যমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ

শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা-প্রসঙ্গ প্রণয়ন-সময়ে স্বামী সারদানন্দ

করিয়া আশা পূর্ণ করিতে পারিবেন! যখনই সংসার-জ্বালার অবসানের জন্য শান্তিজলের আকাঙ্ক্ষায় অধীর হইবেন, এই চিরপূর্ণ মঙ্গলঘট তাঁহাদিগকে শান্তি ও তৃপ্তি প্রদান করিবে। ভারতের লুপ্তশক্তির উদ্বোধনের জন্য শরৎ মহারাজ ভারতে 'শক্তিপূজা' নামে একখানি শক্তিলীলাময় গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রচার করেন। শক্তি উদ্বোধনের এমন সুচিন্তিত গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যে আর নাই। সিষ্টার নিবেদিতার গ্রন্থরাজি শরৎ মহারাজের যত্নেই "উদ্বোধন সিরিজের" অন্তর্গত হইয়া প্রচারিত হইতেছে।

স্বামী বিবেকানন্দের মানস-কন্যা ভগিনী নিবেদিতা শরৎ মহারাজকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। স্বামীজীর বিলাতযাত্রার সময় তিনি শরৎ মহারাজকে মঠের প্রেসিডেণ্ট করিবার জন্য স্বামীজীকে অনুরোধ করিলে, শরৎ মহারাজ সসম্মানে সে পদ রাখাল মহারাজকে প্রদান করেন। জগতের সকল কিছু গৌরব হইতেই শরৎ মহারাজ দূরে অবস্থান করিতে ভালবাসিতেন।

ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রের মঠগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য গত ১৩৩২ সালে চৈত্রমাসে মঠে যে কন্‌ভেন্‌সনের বিরাট অধিবেশন হইয়াছিল, তাহার সকল আয়োজনের নিয়ন্ত্রণ করিয়াও তিনি কর্তৃত্বের সম্মান গ্রহণ করেন নাই। ইহাই অভিমানবর্জ্জিত প্রকৃষ্ট সাধুর লক্ষণ।

কর্ম্মে—মঠ-নিয়ন্ত্রণে—ভক্ত সম্প্রদায়কে উপদেশদানে—ভালবাসা বিতরণে ব্যাপৃত থাকিয়াও শরৎ মহারাজের সাধনার বিরাম ছিল না। জীবন-লীলার শেষাংশে বহুমূত্র রোগে জর্জ্জরিত, অসুস্থ শরীরে তাঁহার ধ্যান, সাধনা আরও বাড়িয়া চলিয়াছিল। প্রত্যহ প্রত্যূষে ধ্যানে বসিতেন, মধ্যাহ্ন
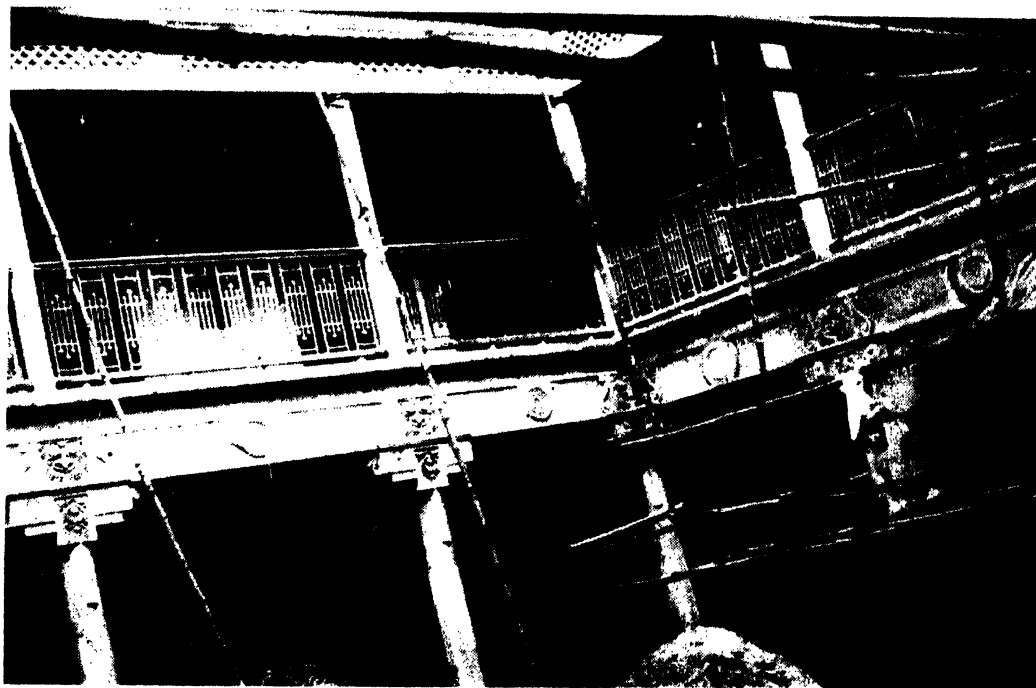
বাগবাজারে সিষ্টার নিবেদিতার বালিকা-বিদ্যালয়ের সম্মুখ দৃশ্য

সিষ্টার নিবেদিতার বালিকা-বিদ্যালয়ের অভ্যন্তর দৃশ্য

শস্ত্রপাঠানরত স্বামী সারদানন্দ

পর্য্যন্ত ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। সামান্য আহারের পর বিভিন্ন মঠের ও ভক্তগণের শতাধিক পত্রের উত্তর দিতেন, 'উদ্বোধন', গ্রন্থপ্রচার, মঠের কার্য্যাদির রিপোর্ট প্রভৃতি দেখিতেন। অপরাহ্নে তিনি সমবেত মহিলাগণকে ও সন্ধ্যার পর হইতে রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত সমাগত ভক্তমণ্ডলীকে উপদেশ দিতেন। ভগ্নদেহে কঠোর ধ্যান হইতে বিরত হইবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ নিবেদন করিলে প্রসন্ন হাস্যে তাঁহার বদন অনুরঞ্জিত হইয়া উঠিত। সে হাস্যে কি স্বর্গীয় ভাব-মাধুরী—প্রশান্তির কি পুণ্যচ্ছটা!

এই কঠোর ধ্যানের ফলে কোন ভক্তের সহিত কথা কহিতে কহিতে গত ২১শে শ্রাবণ শনিবার তিনি দুরারোগ্য সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হয়েন। প্রথমে স্বরবিকৃতি হইলেও তিনি রোগের আক্রমণ অগ্রাহ্য করিয়া দুই একটি কথা কহিয়াছিলেন। সন্ন্যাসিগণ তাঁহাকে সযত্নে শয্যায় শয়ন করাইয়া দিলে ক্রমে ক্রমে তিনি অচৈতন্য হইয়া পড়েন। তাঁহার আকস্মিক রোগের সংবাদ বিদ্যুদ্বেগে বিভিন্ন মঠে, কেন্দ্রে ও ভক্ত-সম্প্রদায়ে সম্প্রসারিত হয়। প্রথমে কয়দিন কবিরাজ শ্রীযুত শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয় চিকিৎসা করিয়াছিলেন। কবিরাজী ঔষধ সেবন করান অসম্ভব দেখিয়া ডাঃ শ্রীযুত জিতেন্দ্রনাথ মজুমদার ও অমরনাথ মুখোপাধ্যায়ের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা চলে। চিকিৎসায় তিনি বাক্‌শক্তি লাভ না করিলেও কয়দিন দুধ ও জল পান করিয়াছিলেন। সমাধিমগ্ন মহাপুরুষ মহা সমাধিস্থ হইলেন—সব অবসান হইয়া গেল—রহিল কেবল ভক্তহৃদয়ে বেদনার

বাগবাজার 'উদ্বোধন' কার্য্যালয় ও শ্রীমার আশ্রম—স্বামী সারদানন্দের পুণ্যস্মৃতিপূত বাসস্থান, এইখানেই তিনি দেহরক্ষা করেন

বজ্রাঘাত—নয়নে অফুরন্ত অশ্রুধারা! মুক্তাত্মা সন্ন্যাসীর জন্য শোক করিতে নাই, এ কথা এখন কাহার প্রাণে শান্তি প্রদান করিতে পারে?

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলা সংবরণের পর স্বামী বিবেকানন্দের জ্ঞান; শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দের ত্যাগ—লোকাতীত ভালবাসা; স্বামী প্রেমানন্দের ভক্তি; স্বামী শিবানন্দের তপস্যা; শ্রীমৎ অদ্ভুতানন্দের যোগবল; স্বামী অখণ্ডানন্দের (গঙ্গাধর মহারাজের) সেবাব্রত—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের (শশী মহারাজ) পূজা এবং তুরীয়ানন্দ স্বামীর (হরি মহারাজের) নিষ্ঠা কঠোরতা—স্বামী সারদানন্দের কর্ম্ম-সাধনা-সমন্বয়ের সম্মিলিত জ্ঞানজ্যোতিঃপ্রভাবে বেলুড় মঠের বিশ্ব-জন-মঙ্গল-প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইয়া জ্ঞানে—ত্যাগে—সাধনায়—ভক্তিতে—ভালবাসায়—সেবায়—করুণায় সূর্য্যসম কল্যাণকর দিব্য-জ্ঞান-জ্যোতির্ম্ময় হইয়াছে। এই জ্যোতিঃমণ্ডলের জ্যোতিঃ-কেন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও এক এক জ্যোতিঃরশ্মি-রেখা—এক এক ত্যাগদীপ্ত সন্ন্যাসী। তাঁহাদের মহিমা-কিরণের প্রভায় ভারত ও জগৎ যুগে যুগে উদ্দীপিত—অনুপ্রাণিত—উদ্বোধিত—সঞ্জীবিত হইবে। এই

সমাধি-শয্যায় স্বামী সারদানন্দ

জ্যোতিঃ অবিনশ্বর—চির-অপরিম্লান। এই পুণ্যপ্রভায় ভারত চিরদিনই জ্ঞান-জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া, পুণ্যের আলোক সম্প্রসারিত করিয়া, জগতের মোহান্ধকার বিদূরিত করিয়া, মঙ্গল সংসাধন করিবে।

'বসুমতীর' প্রবর্ত্তনের মূলে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ-সংগঠয়িতা অন্যান্য সন্ন্যাসীর ন্যায় স্বামী সারদানন্দের আশীর্ব্বাদ। বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির বহুবার তাঁহার পদরেণুপূত হইয়াছে। মন্দির-প্রতিষ্ঠার আদিযুগে উপেন্দ্রনাথের সামান্য বটতলার বহির দোকানও সন্ন্যাসী-সঙ্ঘের মিলন-বৈঠক ছিল। ইঁহাদের সমবেত আশীর্ব্বাদের পুণ্য-প্রভা বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির। ইংরাজী 'বসুমতীর' সূচনায় স্বামী সারদানন্দের আশীর্ব্বাদ—শতকার্য্যের ভিতরেও তিনি প্রত্যহ ইংরাজী 'বসুমতী' পাঠ করিতেন।

সেই দিব্য-জ্ঞান-গঠিত, ত্যাগ-জ্যোতির্ম্ময় ভক্তি-মন্দাকিনী-লীলায়িত, সৌম্যগম্ভীর প্রশান্ত মূর্ত্তি আর বাহ্যদৃষ্টিতে দেখিতে পাইব না—সেই জ্ঞান-কল্পদ্রুমের পাদমূলে সমবেত হইয়া তাঁহার শ্রীমুখ-নিসৃত অমৃতময় উপদেশফলে বঞ্চিত হইয়া ভক্ত-সম্প্রদায় সংসারের ত্রিতাপজ্বালার অশেষ দুঃখ বিস্মৃত হইয়া আবার নবকর্ম্মের উদ্দীপনায় হৃদয় অনুপ্রাণিত করিতে পারিবেন না—জীবনের পরপারেও এ দুঃখ অপনোদিত হইবার নহে। জানি প্রভু, তুমি মানবের মুক্তি-মন্ত্রের গুরু, মুক্ত আত্মা—ব্রহ্ম হইতে কীট পরমাণু সর্ব্বভূতে বিরাজিত, স্বয়ং ব্রহ্ম। জগতে তোমার বিনাশ নাই, তুমি সর্ব্বকালে—সর্ব্বস্থলে—সর্ব্ব অন্তরে নিত্য বিরাজিত; কিন্তু সংসারকূপে পতিত মানব আমরা, তোমার বিচ্ছেদ-ব্যথায় হৃদয় অধীর, এ বিয়োগ-ব্যথা ভুলিবার শক্তি তুমিই দাও প্রভু! সে ব্যথা প্রশমিত করিয়া মানসমন্দিরে বিরাজিত হইয়া দীন ভক্তবৃন্দের প্রীতিভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি চিরদিন গ্রহণ কর! চর্ম্মচক্ষুতে না হউক, মানস-নয়নে ভক্ত-সম্প্রদায় যেন সর্ব্বদা তোমার ধ্যানগঠিত দিব্যমূর্ত্তি সন্দর্শন করিতে পারে। করুণাময় তুমি, তোমার আশীর্ব্বাদের করুণার পূতধারায় ভারত ও জগৎ পবিত্র হউক—ধন্য হউক, বাঙ্গালী মাতৃ-মন্ত্রের সাধনায় জয়লাভ করুক।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

অমরনাথ

১২

কীর্ত্তন সে দিন খুব জমিয়া গেল; প্রেমিক নবদ্বীপচন্দ্র মাতিয়া উঠিলে কবে না কীর্ত্তন জমে? বিশেষ যদি তাঁহার পার্শ্বে সুকণ্ঠ বিদ্বত্তম খগেন্দ্রনাথ থাকেন। রাত্রি যখন তৃতীয় প্রহর অতীত প্রায়, তখন তাঁহাদের চৈতন্য হইল; ঘড়ির দিকে চাহিয়া ভক্তেরা চমকিয়া উঠিলেন এবং সত্বর প্রস্থান করিলেন।

পরদিন অমরনাথের শয্যা ত্যাগ করিতে কিছু বেলা হইয়া গেল। হাত মুখ ধুইয়া দুই বন্ধুতে চন্দননগরে ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় রেবা ও তাহার জননী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সর্ব্বাণী আসিয়াও আগে সহোদরাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "জামাই ও অমর কোথা?"

"তারা বোধ হয় এতক্ষণ চলে গেল।"

"ওরে রাধি, শীগ্গির যা, জামাইকে ডেকে নিয়ে আয়।"

সর্ব্বাণীর আদেশে দাসী অচিরে কৃষ্ণনাথকে হাজির করিল। সর্ব্বাণী, কৃষ্ণকে কহিলেন, "তৈয়ার হয়েছ দেখছি, কিন্তু এ বেলা তোমাদের কিছুতেই যাওয়া হবে না, বাবা!

কৃষ্ণ। কেন মাসীমা?

সর্ব্বা। আমি এলাম তোমাদের দেখতে, আর তোমরা চলে যাবে কি বলে?

কৃষ্ণ। আমাদের কায আছে, যেতেই হবে।

সর্ব্বা। বিকেলে যেও, এক সঙ্গেই আমরা যাব।

কৃষ্ণ। আপনি যখন বলছেন, তখন আমাকে থাক্তেই হবে—অমর যাক্।

সর্ব্ব। সে কেমন করে হবে? মোটর রইল—

কৃষ্ণ। সে রেলে চলে যাবে; আমি তাকে ট্রেণে উঠিয়ে দিয়ে আসি।

সর্ব্বা। না না, তিনি থাকুন।

কৃষ্ণ। সে কিছুতেই আজ থাকবে না

সর্ব্বা। আমি তাঁকে বুঝিয়ে বল্‌ছি—তুমি ডেকে নিয়ে এস।

কৃষ্ণ। কেন মুখ খারাপ করবেন মাসীমা—সে আপনার কথা রাখবে না। আপনিই ত বলেছেন লোকটা ভাল নয়।

সর্ব্বা। না, না, সে ধারণা আমার আর নেই; তিনি খুব ভাল লোক বলেই আমার বিশ্বাস।

অন্তরে একটু হাসিয়া কৃষ্ণনাথ কহিলেন, "এতক্ষণ বুঝি সে চলে গেল—"

সর্ব্বা। তুমি যাও,—যাও—শীগ্‌গীর যাও—তোমাকে যেতে হবে না—আমি রাধীকে পাঠাচ্ছি—আমি নিজেই যাচ্ছি।

বলিয়া তিনি উঠিলেন। সঙ্গে পার্ব্বতী ও রাধীও চলিল। ঘরে রহিল ভগিনী কয়টি ও কৃষ্ণনাথ। কৃষ্ণ কহিলেন, "আজ যে খুব সেজেগুজে এয়েছ রেবা; স্বয়ম্বরা হবে না কি?"

শোভা। স্বয়ম্বরা হ'লে আপনার কি খুব ভরসা ছিল?

কৃষ্ণ। নির্ভরসা হবার বয়সও ত হয় নি।

শোভা। সত্যি! দেখছি বয়েসের চেয়ে আপনার স্পর্দ্ধাটা বেশী।

কৃষ্ণ। তা নইলে এতগুলি দাঁড়কাকের মধ্যে রাজ-হংসের মত একা আমি বিচরণ করতে সাহস পাই?

রূপো চীৎকার করিয়া উঠিল; বলিল, "আমরা হ'লুম দাঁড়কাক, আর উনি হলেন রাজহাঁস! ওরে বাপ রে! ওই ত চেহারা!"

শোভা। তুই এত চটিস্ কেন রূপো! বুড়ো হ'লে মানুষ চাল্‌সে দেখে। উনি কি আজকের! মীরজাফরের আমলের লোক।

কৃষ্ণ। বাঁচা গেল—এতদিনে আমার আবির্ভাবের সময় নিরূপিত হয়ে গেল। ভবিষ্যৎ প্রত্নতত্ত্ববিদরা আমার

নিয়ে আর যে কোন গোল করবেন, এরূপ সম্ভাবনা রইল না।

শোভা। সম্ভাবনা যে একেবারে রইল না, এরূপ মনে করবেন না; কেহ কেহ বল্‌তে পারেন—আপনি ত্রেতাযুগে সীতা-উদ্ধারের সময় অনেক লীলা করেছিলেন।

কৃষ্ণ। গোলমাল না রেখে আমার আবির্ভাবের একটা সময় নিরূপণ করে ফেল। দ্বাপরের পর হ'লেই ভাল হয়।

শোভা। কেন বলুন দেখি ?

কৃষ্ণ। এমন একটা সময় হ'লেই ভাল হয়, যে সময় দ্রৌপদী পুরুষরূপে জন্ম নিলেন, আর পঞ্চ পাণ্ডব পঞ্চ স্ত্রীরূপে তাঁর অঙ্কশায়িনী হলেন।

শোভা। এ রকমটা হওয়া ত সম্ভব নয়।

কৃষ্ণ। খুব সম্ভব, নজির—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য; পূর্ব্বজন্মে তিনি শ্রীরাধা ছিলেন।

জ্যোতি। না, তিনি শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন।

কৃষ্ণ। আর তুমি বুঝি কৃষ্ণের রাধা ছিলে ?

জ্যোতি। আমাকে অমন কথা, নতুন-দা !

কৃষ্ণ। থুড়ি, তুমি যে পূর্ব্বে কর্ণ ছিলে, তা আমার স্মরণ ছিল না।

শোভা। কর্ণের সঙ্গে দ্রৌপদীর বুঝি ভাইসম্পর্ক ছিল ?

কৃষ্ণ। কর্ণকে ষষ্ঠ পতি করবার দ্রৌপদীর গুপ্ত অভিলাষ ছিল, কিন্তু বাসনাটা চরিতার্থ হয় নি। এ জন্মে জ্যোতি—

জ্যোতি। আমি ত আর দাদা বলে ডাকব না।

কৃষ্ণ। সেটা আমার মহালাভ।

জ্যোতি। আচ্ছা থাকুন, আমি গিয়ে বড়দিকে সব বলে দেব।

কৃষ্ণ। তা'হলে তুমি আমার সঙ্গে যাচ্ছ ?

জ্যোতি। মার ইচ্ছে আমি যাই।

কৃষ্ণ। তোমার বুঝি ইচ্ছে নেই ?

জ্যোতি। আমি গেলে বাবার কষ্ট হবে।

শোভা। ওরে বাপ রে ! উনি যেন সব করেন !

কৃষ্ণ। (শোভার প্রতি) ও যা কোর্‌তো, তুমি না হয় সেগুলো কোরো, শোভা।

শোভা। আমার হাতের কাষ বাবার যে পছন্দ হয় না।

কৃষ্ণ। ভক্তি-শ্রদ্ধার সহিত করলেই পছন্দ হবে। রূপো; তুমিও কোরো— [illegible] ধর্ম্ম হবে, পুণ্যি হবে এটা মনে রেখো মাতা-পিতার আশীর্ব্বাদে সব হয়: তাঁরা একটু অপ্রসন্ন হলে ভাগ্যও অপ্রসন্ন হন।

রেবা কহিল, "ও সব কথা রাখুন বাঁড়ুয্যে মশাই; এখন আমাকে আপনার বাড়ীতে নিয়ে যাবেন কি না বলুন।"

কৃষ্ণ। না—নিয়ে যাব না।

রেবা। কেন বলুন দেখি ?

কৃষ্ণ। আমি এতগুলি এক সময়ে সামলাতে পারব না।

রেবা। বুঝেছি; আপনি আমাকে পর মনে করেন।

কৃষ্ণ। পূর্ব্বজন্মে যিনি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ছিলেন, তিনি শুধু আমার আপন, আর সব পর।

রূপ। সে বুঝি দিদি ?

কৃষ্ণ। তোমার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ—

অমরনাথ সহসা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "এ বেলা না কি আমাদের যাওয়া হ'ল না, কৃষ্ণ ?"

কৃষ্ণ। তাই না কি ?

অম। শুন্‌লাম তুমি রাজি হয়েছ।

কৃষ্ণ। ঠিক শুনেছ; তোমার প্রয়োজন থাকে, তুমি চলে যেতে পার—গাড়ীতে উঠিয়ে দিয়ে আস্‌ছি।

অম। আমিও রাজি হয়েছি।

কৃষ্ণ। তা তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পারছি।

অম। আমার মুখে কি দেখলে, পণ্ডিতমশাই ?

কৃষ্ণ। আনন্দ; সেটা যে তোমার মুখে শুধু তা' নয়, আর দু' একখানা মুখে সে জিনিষটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

শোভা। আপনার আজ হয়েছে কি ? আমাদের নিয়ে পড়লেন কেন ?

কৃষ্ণ। কোমল অঙ্গ দেখেই লোকে পড়ে।

এমন সময় লতা আসিয়া কহিল, "তোমাকে কেন এঁরা ধরে রাখলেন জান, দাদা ?"

অম। তুমি না বল্‌লে আমি কেমন ক'রে জান্‌ব ?

লতা। তুমি ভাল গাইতে পার সকলে শুনেছেন; তাই তোমার গান শোনবার জন্যে—

অম। তা হ'লে তুমিই পরিচয় দিয়ে বেড়িয়েছ, আমি ভাল গাইতে পারি।

লতা। অন্যায় করেছি, দাদা ?

অম। ঠিক অন্যায় না হ'লেও আপন জন সম্বন্ধে বেশী কথা বলা উচিত নয়।

কৃষ্ণ। এখন তুমি গান কর, সকলে চরিতার্থ হোক্—আমি সরে পড়ি।

রূপ। আপনি সর্‌বেন কেন ?

কৃষ্ণ। তোমাদের বাড়ীর কীর্ত্তন শুনে শুনে আমার এমনই আতঙ্ক জন্মেছে যে, কোন গান আমি আর বরদাস্ত করতে পারি না।

রূপো চুপি চুপি কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিল, "হারমোনিয়াম আনি ?"

কৃষ্ণ। নিয়ে এস ; কিন্তু তোমাকে নাচতে হবে।

রূপো। আপনি শিখিয়ে দেবেন।

রূপো প্রস্থান করিল।

শোভা। মা ও মাসীকে খবর দি ?

কৃষ্ণ। একেবারেই না ; আজ আমরা এটাকে বাসর ক'রে তুলব, গুরুজনদের স্থান এখানে নেই।

শোভা। বর কে ? আপনি ত পালাচ্ছেন।

কৃষ্ণ। বর অমরনাথ।

শোভা। আর ক'নে ?

কৃষ্ণ। তা' এখন বল্‌ব না।

রেবা মুখ নীচু করিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া শোভা সকলই বুঝিল। বুঝিল, কেন তাহার মাসী অমরকে ধরিয়া রাখিলেন। সে মনে মনে একটু হাসিল এবং রেবার ভাব লক্ষ্য করিতে থাকিল। অমরের ভাবে কিছুই বুঝিতে পারিল না। সহসা জ্যোতির উপর তাহার চক্ষু পড়িল ; ভাবিল, অমরের যোগ্য বধূ পৃথিবীতে যদি কেহ থাকে, তবে সে জ্যোতি—রেবা-টেবা নয়।

অমর কহিলেন, "তুমি ত গান ফরমাজ করছ কৃষ্ণ, কিন্তু এখন ত গানের সময় নয়।"

কৃষ্ণ। সময় তবে কখন।

অম। সূর্য্য উদয়ে ও অস্তে। তা ছাড়া আর এক কথা আছে। কবিরা যেমন ইচ্ছে করলেই কবিতা লিখতে পারেন না, তেমনই ফরমাজ করলে গান আসে না। লিখতে বসলে কালি-কলম মন তিনটে জিনিষ চাই, আর—

কৃষ্ণ। তোমাকে আর বক্তৃতা করতে হবে না, এখন দুটো গান গেয়ে ছুটি নেও—

রূপো বাজনা লইয়া আসিল। অমর গান ধরিলেন,—

"লহ পদতলে টানিয়ে।
চির-তৃষিত জনে, প্রেম-সুধা দানে,
তৃষা দেও মোর মিটায়ে,
যে তোমারে চাহে তুলে তারে নিতে
আস কোথা হ'তে ছুটিয়ে।
যে তোমারে নাহি চাহে,
কোন দিন কই তারেও দেও না ফেলিয়ে,
গোপনে গোপনে ধীরে ধীরে তারে
কি যে ব্যথা দেও জাগায়ে,
সে সব ফেলে দিয়ে আকুল হইয়ে
তব পদে পড়ে লুটিয়ে।
যে তোমার নামে ভক্তি-কুসুমে
দেয় পদ দু'টি সাজায়ে,
চরণ-ছায়ায় জুড়ায়ে দেও কত না আদর করিয়ে,
অঞ্চলে ধূলি মুছাইয়ে তারে লও নিজ কোলে তুলিয়ে।
প্রভু, করুণা তোমার, মরমে জাগিলে
আমি সব ব্যথা যাই ভুলিয়ে,
নির্ভয়ে আমি পশিতে যে পারি মরণের মাঝে হাসিয়ে।
লহ পদতলে টানিয়ে॥"

উচ্চ মধুর কণ্ঠে গানটি বারংবার গাহিয়া অমরনাথ নীরব হইলেন, তখনও সুর কক্ষময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, প্রতিধ্বনি আর্ত্তস্বরে ভিক্ষা চাহিতেছে, লহ পদতলে টানিয়ে। শ্রোতাদের প্রাণের ভিতর একটা আকুল কামনা জাগিয়া উঠিয়াছে—স্পন্দিত ধমনী চীৎকার করিয়া বলিতেছে, ওগো লহ পদতলে টানিয়ে। সকলে নীরব, নিস্পন্দ। সহসা অস্ফুট ক্রন্দন-ধ্বনি সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল। কৃষ্ণনাথ উঠিয়া দেখিলেন, দ্বারপার্শ্বে হরনাথ মুখে কাপড় দিয়া কাঁদিতেছেন। তাঁহাকে সসম্মানে ঘরের ভিতর লইয়া আসিয়া বসাইলেন। অদূরে পার্ব্বতী, সর্ব্বাণী প্রভৃতি কয়েক জন পুর-মহিলা দণ্ডায়মান ছিলেন, তাঁহারাও একে একে ঘরের ভিতর আসিয়া বসিলেন।

হরনাথ ক্রমে শান্ত হইলেন। যখন তাঁহার কণ্ঠ বাষ্প-মুক্ত হইল, তখন তিনি কহিলেন, "বেঁচে থাক বাবা অমর-নাথ, আমাকে বড় আনন্দ দিলে।"

পার্ব্বতী। আনন্দ ত ভারি, কেঁদেই সারা হ'লে

হরনাথ। এ আনন্দ তুমি বুঝবে না। এখন চুপ কর।

অমরনাথ নাক চোখ মুছিয়া কণ্ঠকে শান্ত করিয়া, গান ধরিলেন,—

"কি নাম ধরিয়ে প্রভু, তোমারে করিব আহ্বান,
সকল ভাষা সকল কথা তোমারি ত নাম।
তোমায় বসাতে নাথ কোথা বিছাব আসন,
তুমি ত জুড়িয়া আছ ওগো সর্ব্বময়, বিশ্ব-আসন।
কি দিয়া পূজিব তোমায়, কিবা তোমায় করিব দান,
সকলি যে তোমারি নাথ, সকলেরি তুমি যে প্রাণ।
তুমি যে তুলসী, তুমি যে চন্দন, তুমি যে আমারি গান,
কি দিয়া পূজিব তোমায় ওগো আমার প্রাণেরি প্রাণ।
আমার অশ্রু, আমার মন, আমার সুর, আমার গান,
আবেগ উচ্ছ্বাস, ভাব ও ভক্তি সকলি তোমারি দান।
কি নাম লইয়া ওগো গাইব তোমারি গান॥"

অমরনাথের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। জ্যোতি ক্ষণপূর্ব্বে মুখে কাপড় দিয়া পলাইয়াছিল। হরনাথের অবস্থা গুরুতর হইয়া পড়িল,—তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে অমরের চরণের উপর লুটাইয়া পড়িয়া কহিলেন, "বাবা, আমাকে দয়া কর, আমি বড় অধম।" অমরনাথ তখন তাড়াতাড়ি হরনাথের পদধূলি লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং কৃষ্ণনাথের সঙ্গে অচিরে কক্ষ ত্যাগ করিলেন। কক্ষমধ্যে তখনও সুর ঘুরিয়া বেড়াইয়া বলিতেছিল, 'কি নাম লইয়া ওগো গাইব তোমারি গান।'

১৩

অপরাহ্নে আহারাদির পর অন্দর মহলে একটা ঘরে বসিয়া অমর বন্ধুসহ বিশ্রাম করিতেছিলেন। অকস্মাৎ কক্ষদ্বারে আসিয়া হরনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভিতরে যাব, বাবা ?"

বন্ধুদ্বয় সসম্মানে উঠিয়া দাঁড়াইয়া হরনাথকে অভ্যর্থনা করিলেন, হরনাথ বিছানার এক ধারে বসিয়া কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, "বাবা, সকালে আমি একটা অন্যায় করে ফেলেছি—কিছু মনে করো না—বুড়ো মানুষ—"

অম। আপনার ত তখন জ্ঞান ছিল না, সুতরাং—

হর। ঠিক বলেছ বাবা; কে যেন আমাকে টেনে নিয়ে তোমার পায়ের কাছে নিয়ে গেল। তা' কিছু মনে করো না—

অম। যে কায আপনি ইচ্ছাপূর্ব্বক করেন নি, তার জন্যে এত সঙ্কোচ কেন ? আপনি এ কথা আর তুলে আমাকে লজ্জিত করবেন না।

হর। বেশ, বেশ। আচ্ছা বাবা, আজকের রাতটা থাকলে হয় না ? আজ কীর্ত্তন নাই, যদি তোমার কষ্ট না হয়—

কৃষ্ণনাথ তাড়াতাড়ি কহিলেন, "আজ সন্ধ্যার মধ্যে আমাদের ফিরতেই হবে।"

বৃদ্ধের মুখখানি ম্লান হইয়া গেল। অমর তাহা লক্ষ্য করিয়া বন্ধুর পানে ফিরিয়া কহিলেন, "কৃষ্ণ, তোমার প্রয়োজন থাকে, তুমি যেতে পার—আমি আজ এখানে থাক্‌ব।"

হরনাথের মুখখানি হাসিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "বেঁচে থাক বাবা, তোমার ভক্তি হো'ক্। কৃষ্ণও যাবে না —থাকবে। তা হলে সন্ধ্যের পর—যদি তোমার কষ্ট না হয়—"

অম। গানে আমার আনন্দ বই কষ্ট নেই।

হর। আজ আমি বড় তৃপ্তি পেয়েছি।

অম। যদি অপরাধ না ল'ন, তা'হলে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

হর। স্বচ্ছন্দে কর বাবা, অপরাধ কি ?

অম। আচ্ছা, আপনারা কীর্ত্তনে মেতে গিয়ে এত লাফালাফি করেন কেন ? যিনি খোল বাজান, তাঁর মুখ দেখলে গাম্ভীর্য্য রাখা চলে না। গায়করা পাল্লা রেখে লাফ দিতে থাকেন; কেউ দু' হাত, কেউ বা তিন হাত উচু হ'ন। এ রকম লাফালাফি বা এত চীৎকার করে কি লাভ হয় ?

হর। লাভ হয় আনন্দ—বিপুল আনন্দ; সে আনন্দ বুঝাতে পার্‌ব না।

অম। এই আনন্দই কি আপনাদের উদ্দেশ্য ? না অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে ?

হর। মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ভগবদ্দর্শন।

অম। তবে আনন্দ প্রাপ্তির আশায় কীর্ত্তনাদি কেন ?

হর। এই আনন্দের ভেতর দিয়ে সচ্চিদানন্দকে পাব ব'লে।

অম। যোগী ঋষিরা এ সব করতেন বলে শুনি নি; তাই বলে তাঁরা কি ভগবানকে পেতেন না ?

হর। পরমাত্মাকে তাঁরা নিশ্চয়ই পেতেন ; যোগবলে তাঁকে পাওয়া যায়।

অম। তবে—?

হর। এই দেখ বাবা, তাঁরা দীর্ঘায়ু ছিলেন, যোগযাগ করবার অবসর পেতেন—আমরা স্বল্পায়ু, তা' পাইনে—বেচাকেনা হ'বার আগেই আমাদের দোকান বন্ধ করে যেতে হয়।

অম। যদি দয়া করে কথাটা বুঝিয়ে দেন।

হর। মুনিঋষিরা যোগবলে পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত হ'বার অধিকার লাভ করতেন। সে অধিকার অর্জ্জন করতে কলির জীবের আয়ুতে কুলায় না ; আমরা তাই সে অধিকার অর্জ্জন করে তাঁর কাছে যাবার চেষ্টা করি না—আমরা তাঁর কৃপাপ্রার্থী হয়ে তাঁকে আহ্বান করি, তাঁর নাম গান করি ; তাঁর কৃপা হ'লে দর্শন পাই।

অম। আপনি বল্‌তে চান যে, যোগী নিজের শক্তিতে পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত হ'ন, আর স্বল্পায়ু সংসারী জীব ভগবানকে আহ্বান করেন ? এক জন নিজের শক্তিতে তাঁর কাছে যান, আর একজন শক্তিহীন বলে তাঁর কৃপা প্রার্থনা করেন—এই কথা বলাই আপনার উদ্দেশ্য কি ?

হর। ঠিক বলেছ বাবা, এই কথা বলাই আমার উদ্দেশ্য। তাঁর কৃপা ভিন্ন আমাদের উপায় নাই।

অম। আপনারা কি পরমাত্মার করুণা প্রার্থনা করেন না।

হর। করি না—তাঁর করুণা নেই বলে তাঁর করুণা প্রার্থনা করি না।

অম। তাঁর করুণা নেই ! সে কি !

হর। কি জান বাবা ; ভগবান্ হলেন রাজা, আর পরমাত্মা হলেন নির্ম্মম বিচারক। বিচারক পাপের দণ্ড দেন আর রাজা সকল অপরাধ ক্ষমা করে চরণে আশ্রয় দেন। আমরা তাই এ পাপের বোঝা নিয়ে রাজার চরণে শরণ লই।

অম। এই স্বল্পায়ুর যুগেও ত এমন অনেক মহাজ্ঞানী সাধু সন্ন্যাসী দেখতে পাওয়া যায়, যাঁরা পরমাত্মার সাক্ষাৎ পেয়েছেন, তবে আপনারা চেঁচামেচি ছেড়ে সে পথ অবলম্বন করেন না কেন ?

হর। কেহ কেহ সিদ্ধকাম হয়ে থাকৃতে পারেন, কিন্তু আমরা ভক্তির পথটাকেই শ্রেষ্ঠ মনে করি।

অম। কেন ?

হর। জ্ঞানীরা যাহা লাভ করেন, তার চেয়ে আমরা কিছু বেশী লাভ করি।

অম। একটু পরিষ্কার ক'রে বলুন।

হর। জ্ঞানীরা পান অন্তরে দর্শন, ভক্তরা ভিতরে ও বাহিরে দর্শন পান। একপক্ষের অনুভব চিত্তে, অপর-পক্ষের অনুভব চিত্তে ও নয়নে। কা'র বেশী লাভ হ'ল, বাবা ?

অম। আমি অনেকগুলো কথা এলোমেলো ভাবে আপনাকে জিজ্ঞেস করেছি ; সব কথা যে প্রণিধান করতে পেরেছি, তা' আমার মনে হয় না। আমি বুঝে দেখব, যদি আরও কিছু জিজ্ঞাসা করবার থাকে, পরে—

হর। বাবা, আমি মূর্খ, কিছুই বুঝি না। শাস্ত্র অনন্ত, তিনি অনন্ত, আমি অতি ক্ষুদ্র। তাঁর শুধু নাম করি, তাও অবসরমত, আমি তোমাকে কি বোঝাব বাবা ? যদি কিছু জান্‌তে চাও, তাঁকে জিজ্ঞাসা কোরো ; তোমার মন তাঁর উত্তর বয়ে এনে দেবে।

অমর, হরনাথের পদধূলি লইলেন। হরনাথ আশীর্ব্বাদান্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাজনী পদ তোমার জানা আছে, বাবা ?"

অম। দু'একটা জানি, আপনাদের মত গাইতে পারি না।

হর। যা' পারবে তাই মধুর। কীর্ত্তনের আবার ভাল মন্দ কি ? ভক্তি থাকলেই হ'ল। তা'হলে বাবা সন্ধ্যার পর—

অম। যে আজ্ঞা—

বৃদ্ধ প্রস্থান করিলেন। কৃষ্ণ বড় চটিয়াছেন। তিনি একটু অভিমানের সহিত কহিলেন, "যাই, বাড়ীতে একটা 'তার' করে দিয়ে আসি। কাল সকালে আমাকে কেউ এখানে রাখতে পারবে না।"

"অতটা গর্ব্ব করা ভাল নয় কৃষ্ণ ; গর্ব্ব দেখলেই ভাগ্য-দেবী হাসেন।"

"আচ্ছা, ভাগ্যদেবী আমার কি করেন দেখা যাবে।"

বলিয়া কৃষ্ণনাথ প্রস্থান করিলেন। অমরনাথ ঘরে একা বসিয়া হরনাথের কথাগুলি চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় রেবা একটা পাণের ডিবা হাতে লইয়া ঘরের ভিতর

প্রবেশ করিল। কহিল, "আপনার জন্যে পাণ আনতে মা বল্লেন।"

"আমি পাণ ত বেশী খাইনে।"

"চুরুট আন্‌ব ?"

"কোথায় পাবে ?"

"বড়'দার ঘরে আছে।"

"আন্‌তে পারলে মন্দ হয় না।"

বালিকা দ্রুতপদে প্রস্থান করিল; এবং সত্বর ফিরিয়া আসিয়া ছুইটা চুরোট দিল। অমর ধূমপান করিতে করিতে বলিলেন, "আমি তোমাকে বড় কষ্ট দিলাম।"

"আমার একটুও কষ্ট হয় নি।"

"তুমি কেমন করে জান্‌লে আমি চুরোট খাই ?"

"মোটরে আপনাকে খেতে দেখেছিলাম।"

"তুমি ত বেশ বুদ্ধিমতী। লেখাপড়া কতদূর করেছ ?"

"আমি বাড়ীতে মাষ্টারের কাছে পড়ি; বাঙ্গালা, ইংরিজি, ভূগোল, ইতিহাস—"

"গান শিখেছ ?"

"শিখিছি।"

"আচ্ছা একটা গাও দেখি।"

রেবা মুখ নীচু করিয়া একটু হাসিল। অমর কহিলেন, "গান জিনিষটা পবিত্র, সকলের সাম্‌নে করা যায়; কুৎসিত গান হলে অবিশ্যি করা যায় না।"

"বাজনাটা আনি ?"

"আন।"

হারমোনিয়ম বাজাইয়া রেবা গান ধরিল। প্রথমে একটু বাধবাধ ঠেকিল, তারপর গলা ছাড়িয়া দিল। মিষ্ট গলা, শিক্ষাও আছে। লতা ও জ্যোতি গানের সুর শুনিতে পাইয়া কোথা হইতে ছুটিয়া আসিল। দ্বার-অন্তরালে সর্ব্বাণী দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া বালিকারা ঘরে ঢুকিল। তাহাদের দেখিয়া সুরতালে রেবা বড় গোল করিয়া ফেলিল। গোল একবার বাধিলে গোল বাড়িতেই থাকে। রেবার কান্না আসিল—সে গান বন্ধ করিল।

অমরনাথ লতার পানে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এ গানটা জান লতা ?"

"জানি। গাইব দাদা ?"

"তিন জনে এক সঙ্গে গাও।"

জ্যোতি কহিল, "আমি ত গান জানি নে।"

অমর। সঙ্গে সঙ্গে গেয়ে যাও, তা'হলেই শিখতে পারবে।

জ্যোতি গাহিতে পারিল না—লজ্জা তাহার কণ্ঠরোধ করিল। ছুই জনে গাহিল; অমরনাথ মাঝে মাঝে তাহাদের সহিত যোগ দিতেছিলেন। জ্যোতি ভাবিল, অমরনাথের কথা উপেক্ষা করাটা হয় ত অভদ্রোচিত হইয়াছে। রেবা ও লতা গানটা যখন পাল্টাইয়া ধরিল, তখন সে যোগ দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু লজ্জা আসিয়া কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল। অমর কহিলেন, "তুমি আমার সঙ্গে সুর মেলাও দেখি, আমি আস্তে আস্তে গাচ্ছি।" অমরের কণ্ঠে কি ছিল জানি না, কিন্তু তাঁহার অনুরোধ জ্যোতি এবার উপেক্ষা করিতে পারিল না,—অমরনাথের গলার সঙ্গে গলা মিলাইয়া গান করিল। প্রথমে ধীরে, তার পর উচ্চকণ্ঠে। গান সমাপ্ত হইলে জ্যোতি লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া বসিল। লজ্জা করিবার অবসর না দিয়া অমরনাথ কহিলেন, "আমি তোমাদের একটা গান শেখাব, সন্ধ্যার পর আমাকে শোনাতে হবে কেমন শিখেছ।"

কৃষ্ণনাথ হাসিয়া কহিলেন, "আমাকে শেখাও।"

অম। তুমি ত গান সহ্য করতে পার না।

কৃষ্ণ। তোমার গান আমার বেশ ভাল লাগে, কীর্ত্তনেই ভয়।

অম। এখন আমরা কীর্ত্তন গাইব, সহ্য করতে পারবে ত ?

কৃষ্ণ। দেখি, অসহ্য হলে তোমার মুখ চেপে ধরব।

অমর বাজনাটা কোলে টানিয়া লইয়া কীর্ত্তনের সুর ধরিলেন। যন্ত্রটা যেন শিহরিয়া উঠিয়া কত কথা কহিয়া উঠিল। অমর গান ধরিলেন,—

"নাথ হে
আমায় জনমে জনমে এমনি মানব জনম দিও,
এমনি করে তোমায় দীননাথ ডাকিতে হে শিখাইও।

হরনাথ আসিয়া একপাশে বসিলেন। ক্রমে অনেকেই আসিলেন। অমর গাহিয়া যাইতে লাগিলেন,—

আমি চাই না মোক্ষ, চাই না মুক্তি,
চাই না স্বর্গ, চাই না সিদ্ধি,
শুধু হে তোমার নামটি আমায় বলিতে দিও।
(হরি হে) রূপটি তোমার হৃদয়ে আমার আঁকিয়ে দিও।

(নয়নে আমার ছবিটি তোমার রঞ্জিয়া দিও)।
নির্ব্বাণ মুক্তি তাহারে দিও,
ধন ও রাজ্য তাহারে বিলাইও,
পাহাড়ে জঙ্গলে যে সাধিছে তোমায় পরে নিতে সাধিও।
আমায় শুধু জনমে জনমে তোমার চরণ দু'খানি দিও॥"

পাল্টাইয়া অমরনাথ যখন গানটি গাহিতে লাগিলেন, তখন বালিকারাও তাঁহার সহিত যোগ দিল। স্মরণশক্তিতে কেহই কম ছিল না। একবার শুনিয়া গানের ভূরিভাগ তাহাদের কণ্ঠস্থ হইয়াছিল। অমরনাথের সঙ্গে গাহিয়া যাইতে তাহাদের বড় বেশী বাধিল না। যেথানে সুরের গোলমাল দেখে, সেখানে তাহারা থামিয়া যায়। অমরনাথ বারংবার গাহিয়া গানটির সুর ও কথা তাহাদের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিলেন। মহা উৎসাহের সহিত গলা ছাড়িয়া তাহারা গান করিল। গান বন্ধ করিয়া অমর কহিলেন, "গানটি তোমরা অভ্যাস কর গে; সন্ধ্যার পর শুন্‌ব কে কেমন শিখেছ।"

বলিয়া অমর উঠিলেন। গৃহস্বামী কহিলেন, "তোমাকে কি আর বল্‌ব বাবা! সকালে একটা দোষ করে ফেলেছি, তাই আর কিছু বল্‌তে সাহস হচ্ছে না; কিন্তু বাবা এটুকু বল্‌লে কোন দোষ হবে না, তুমি আমার নির্জ্জীব পুরীকে প্রাণ দিয়েছ। আর কিছু বল্‌ব না—এই জন্যেই শাস্ত্র বলে সৎসঙ্গ করবে।"

অমর। আমি ত কীর্ত্তন ভুলেই গিয়েছিলাম; কিন্তু আপনার বাড়ীর পবিত্র ধূলির এমনি গুণ যে, কীর্ত্তন আপন হ'তে স্ফূর্ত্তি পেয়েছে।

হরনাথ। আমি যদি তোমাকে সন্তানরূপে পেতাম বাবা, তা হলে আমার জীবন ধন্য হ'ত।

পার্ব্বতী। এখন সন্তান করে নেও না কেন?

পার্ব্বতী দেবী জ্যোতি বা রেবা কাহাকে লক্ষ্য করিয়া কথাটা বলিলেন, তাহা বড় কেহ বুঝিল না। শোভা বুঝিল, কিন্তু সে নীরব রহিল। রেবা মনে করিল, কথাটার লক্ষ্য-স্থল সে। সুতরাং সে সনাতন পদ্ধতি অনুসারে মাথা নীচু করিল। পদ্ধতিটার সনাতনত্ব যদিও এখন লোপ পাইয়া আসিয়াছে, বিবাহের প্রসঙ্গ মেয়েরা এখন নিজেই আলোচনা করিয়া থাকে, তথাপি রেবা গুরুজনদের সম্মুখে মাথাটা উঁচু করিয়া রাখা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিল না। সর্ব্বাণীও বুঝিলেন, রেবার সঙ্গে অমরের বিবাহ-কথা উঠিয়াছে। তাঁহার হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল; কিন্তু সংশয়ও কিছু ছিল, কি জানি যদি অমরের পছন্দ না হয়? কিন্তু আজ পছন্দ না করিবার কোন কারণ নাই। আজ রেবার হাতে মুখে যথেষ্ট পাকা রং দেওয়া হইয়াছে, বস্ত্র অলঙ্কারও বহুমূল্য, গান করিয়াছেও ভাল। তবে?

অমর কহিলেন, "আমাকে আপনার সন্তানই মনে করিবেন।"

হরনাথ। আমি তোমাকে সন্তান বলেই গ্রহণ করেছি—কৃষ্ণ তোমার ইচ্ছা!

অমর ধীরপদে প্রস্থান করিলেন। কৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে যাইতে যাইতে কহিলেন, "তোকে আর কোথাও নিয়ে যাব না।"

"কেন বল্‌ দেখি?"

"আমার শ্বশুরবাড়ী, আমাকে কেউ আদর করে না, যত আদর তোকে!"

"আমি যে নতুন।"

"নতুন জামাই না কি?"

"তুই এখন চল্‌ বেড়াতে যাই।—"

এ দিকে পুরুষরা উঠিয়া গেলে মেয়েদের ভিতর মস্ত এক গোল বাধিল। সর্ব্বাণী কহিলেন, "দিদি, শুন্‌লে? অমর রাজি হয়েছে।"

শোভা। তুমি যা মনে করছ, তা নয় মাসীমা।

সর্ব্বা। কি নয়? অমর রাজি নয়?

শোভা। রেবাকে বিয়ে কর্‌তে একেবারেই তিনি রাজি ন'ন।

সর্ব্বা। তুই কেমন করে তা জান্‌লি?

শোভা। রেবা কি তাঁর যুগ্যি? রংই মাখাও, আর গয়নাই পরাও।

সর্ব্বা। তুই রেবার হিংসে করিস্‌—

শোভা। ওর কি আছে যে, ওর আমি হিংসে করব? বড়লোক বা সমান লোকেরই মানুষ হিংসে করে, কাঙ্গাল গরীবের কেউ হিংসে করে না। ওর রূপ আছে, না বিদ্যে আছে, স্বামী আছে, না শ্বশুরঘর আছে যে, ওর আমি হিংসে করতে যাব?

সর্ব্বা। (পার্ব্বতীর প্রতি)। মেয়েকে কি তৈরি করেছ দিদি! এতটুকু মিষ্টত্ব—

পার্ব্ব। হাঁ রে শোভা, মাসীর সঙ্গে এমনি করে কথা কয়! এই বুঝি তোর লেখাপড়া শেখার ফল? এই বিদ্যের আবার অহঙ্কার! ছোট জাতের মেয়েরাও তোর মত কুঁদুলে নয়।

শোভা। আমি কুঁদুলে হই, মন্দ হই, আমি তোমারই পেটের মেয়ে।

পার্ব্ব। তুই আমাকে গাল দিলি!

শোভা। দেখ মা, যেমন দেখাবে, তেমনি শিখব—বাপ-মায়ের দেখেই ছেলে-মেয়েরা শেখে—

পার্ব্ব। আমাকে কি মন্দ কাযটা করতে তুই দেখলি?

শোভা। আমাকে ঘাঁটিও না, মা! আমি আজ শ্বশুরঘর করতে পারিনে কেন? সে তোমারই জন্যে। তোমার কাছে কোঁদল শিখেছি, স্বামীকে অগ্রাহ্য করতে শিখেছি—

বলিতে বলিতে শোভা কাঁদিয়া ফেলিল এবং বেগে নিষ্ক্রান্ত হইল। পার্ব্বতী দেবী স্তম্ভিত, রুদ্ধবাক্, হতজ্ঞান। তিনি আর দাঁড়াইতে পারিলেন না, বসিয়া পড়িলেন।

১৪

সন্ধ্যার পর দ্বিতলের একটি ঘরে খাটের উপর বসিয়া কৃষ্ণনাথ, অমরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল সকালে যাওয়া ঠিক ত?"

অম। এখনও ত ঠিক আছে।

কৃষ্ণ। বেঠিক হ'বার সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয়?

অম। অসম্ভব ব'লে কোন জিনিষই দুনিয়ায় নেই।

কৃষ্ণ। তা হলে—?

অম। তা হলে যাওয়া না যাওয়া সর্ব্বনিয়ন্তার ইচ্ছাধীন, আমাদের ইচ্ছায় কিছু হবে না।

কৃষ্ণ। ভাই, একটা কথা বলে রাখি, ধর্ম্মের কথা আর তুলো না, আমার কান ঝালাপালা হয়ে উঠেছে।

অম। কীর্ত্তন তোমার বরদাস্ত হয় না, ধর্ম্মের কথাও তোমার কান সহ্য করতে পারে না, তাহলে এক কায কর—

কৃষ্ণ। কি করতে হবে বল?

অম। যে হিন্দুর কর্ণের অবস্থা এরূপ, তার কর্ণমর্দ্দন প্রয়োজন।

কৃষ্ণ। এগিয়ে এস, কান বাড়িয়ে দিচ্ছি—

লতা ও রেবা আসিয়া পড়িল। কৃষ্ণ কহিলেন, "কি রে, তোরা কি পড়া দিতে এইচিস্?"

লতা। হাঁ।

কৃষ্ণ। আমি আজ তোদের পরীক্ষা করব।

লতা। (সহাস্যে) তুমি নিজে আগে গাও দেখি।

কৃষ্ণ। আমি নিজের কণ্ঠকে বিকৃত করতে ইচ্ছা করি না, এখন তোদের আর এক জন কই?

রেবা উত্তর করিল, "জ্যোতি এলো না।"

কৃষ্ণ। কেন?

রেবা। তা' আমি জানি নে।

অমর। আচ্ছা, তাঁর জন্যে একটু অপেক্ষা করা যাক্।

রেবা। সে হয় ত আসতে পারবে না, তার অনেক কায

অম। তাঁর যতক্ষণ না কায সারা হয়, ততক্ষণ আমা অপেক্ষা করব।

কৃষ্ণ। তিনটি পোড়ো, তার ভেতর একটি গরহাজি থাকলে চলবে কেন? আর সেই হ'ল প্রিয় ছাত্র।

রেবা কৃষ্ণনাথের পানে চাহিল; তাহার দৃষ্টিতে বিদ্রোহ কৃষ্ণনাথ তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "তুমি বলছিলে অমর, জ্যোতির গলা সব চেয়ে মিষ্ট, আর সেই সব চে ভাল গান করবে।"

অমর কোন উত্তর করিবার পূর্ব্বে নরু আসিয়া কহি "ছোট মাসী আসছে কাকাবাবু, আরতির উদ্যোগ করছি কি না—"

অম। ভাল কাযই তিনি করছেন।

কৃষ্ণ। তাঁর প্রতি সম্ভ্রমে দেখছি অমরের প্রাণ ন হয়ে পড়েছে—প্রিয় ছাত্রী কি না, আর—

জ্যোতি আসিয়া সঙ্কুচিত ভাবে দ্বারপার্শ্বে দাঁড়াই তাহার পশ্চাতে রূপো ছিল। কৃষ্ণনাথ উভয়কে ডাকি তাঁহার কাছে বিছানার উপর বসাইলেন। বসাইয়া ক লেন, "এতক্ষণে ঘর আলো হ'ল।"

রূপো কহিল, "আপনি কি এতই কালো যে ঘর অ কার করে বসেছিলেন? আর আমরা আসাতে—"

কৃষ্ণ। ওগো তোমরার 'তুমি' নও; শ্রীমতী জ্যো র্ম্ময়ীর আগমনে কক্ষ জ্যোতির্ম্ময় হ'ল। অমরকে জি কর, এতক্ষণ ঘরের অবস্থা কি রকম ছিল।

অমর বেহালা তুলিয়া লইয়া গানের সুরটা বাজাইতে লাগিলেন, গান আরম্ভ হইল। তিন জনেই একে একে গাহিল। গান শেষ হইলে কৃষ্ণ কহিলেন, "গানটার তোমরা জান মেরে দিলে। অমরের যেমন বুদ্ধি, এই সব গান এদের শেখায় !"

অমর কহিলেন, "সব চেয়ে ভাল গেয়েছে রেবা, তার নীচে লতা—"

লতা। আমার চেয়ে জ্যোতিদি ভাল গেয়েছে।

অম। না; তাঁর গলা মিষ্ট, এই পর্য্যন্ত।

রেবা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া কহিল, "আমি একটা কীর্ত্তন জানি।"

অম। গাও দেখি।

রেবা। আজ আর সময় হবে না, আপনাকে ত এখনি নীচে যেতে হবে। আপনি যে দিন আমাদের বাড়ীতে যাবেন, সেই দিন শোনাব।

অম। তোমাদের বাড়ীতে আবার যেতে হবে ?

রেবা। হাঁ, আপনাদের নেমন্তন্ন করতে দাদা যাবেন।

কৃষ্ণ। তোমাদের বুঝি এ সব ব্যবস্থা হ'য়ে গেছে ?

রেবা। আমি কিছুই জানি নে।

কৃষ্ণ। তা'ত দেখতে পাচ্ছি। কি কি খেতে দেবে, তা'ও বোধ হয় জান না।

অম। সেখানে ক'দিন আবার থাকতে হবে না কি ?

রেবা। (সহাস্যে) যে ক'দিন দয়া করে থাকেন।

কৃষ্ণ। আমাকে তা হলে বাদ দিতে হবে।

রেবা। সে আপনি মার সঙ্গে বোঝা পড়া করবেন।

কৃষ্ণ। দেখছি আবার এক ফ্যাসাদ জুটল। এ সব অমরের দোষ। এতদিন বিয়ে হয়েছে, শ্বশুরবাড়ীর এ উপদ্রব সইতে হয় নি। কাল বিকেলের গাড়ীতে অমরকে দিল্লী পাঠিয়ে তবে ছাড়ব।

অম। আমাকে দিল্লী হ'তে আনতেও যত ব্যস্ত, পাঠাতেও তত ব্যস্ত। কোন কাযে ব্যস্ত হয়ো না—ভগবান্—

কৃষ্ণ। রক্ষে কর ভাই, আর সে বেটাকে টেনো না, গান শুনতে রাজি আছি, কিন্তু ধর্ম্মকথা শুনতে পারব না।

শঙ্কর আসিয়া অমরকে কহিল, "আপনি এখন নীচে যেতে পারবেন কি ? বাবা ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।"

অমর উঠিলেন। কৃষ্ণ কহিলেন, "লতা ও জ্যোতি তৈরী থেকো, ভোরে উঠে আমরা যাব।"

১৮

কীর্ত্তনাদি আরম্ভ হইতে রাত্রি এক প্রহর হইল। খোলের শব্দ শুনিয়া অনেকেই আসিয়া যুটিলেন। অমরনাথের মধুর কণ্ঠ সকলকে মোহিত করিল। এমন কি কৃষ্ণনাথেরও ইচ্ছা হইল না গান ফেলিয়া উঠেন। মেয়েরাও কেহ কেহ উপর হইতে নামিয়া আসিয়া অন্তরালে দাঁড়াইল। অমরনাথ সে রাত্রি মাতিয়া গেলেন। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইল, কাহারও জ্ঞান নাই। অমরনাথ কাঁদিতে কাঁদিতে গাহিতে লাগিলেন,—

"কখন পশিলে হৃদয়ে আমার জানিতে আমারে দেও নি।
গোপনে আমায় ভাল যে বেসেছ বুঝিতে আমি তা পারি নি।
হৃদয়ের মাঝে আসন তোমার পাতা আছে তা' যে দেখিনি,
বিনা আহ্বানে বসেছ সেখানে ডাকিতে আমায় হয় নি।
তুমি যে আমার এত কাছে থাক হৃদয়-নিভৃত মন্দিরে,
ঘুমঘোর মোর কেটে গেল আজি তোমার চরণ-মঞ্জীরে।
দেখিনু তোমার অপরূপ রূপ, দেখিনু তোমার হাসিটি,
কত যে সহজে সব হ'তে কেড়ে চুপে চুপে নিলে প্রাণটি।
হৃদয়ের রাজা হৃদয়-আসনে ব'সে আছ দিবা-যামিনী,
পরশে তোমার হৃদি শতদল শিহরে উঠিল আপনি।
ওগো মোর সখা, ওগো চিরসাথী,
ওগো দয়াময় ব্যথিতের ব্যথী,
দু'নয়নে ঝরে করুণার লোর,
প্রভু প্রাণেশ্বর, এত কৃপা তোর।
আর নহি একা, হৃদয়ের সখা
হৃদয়-কমলে বসিয়ে,
দেখি মোর ব্যথা, পাও মনোব্যথা,
ব্যথা দিতে আস মুছায়ে।
দাও প্রভু দাও শকতি আমায় তোমার চরণে প্রণমি,
তোমার চরণ-পরশে এ প্রাণ ধন্য হইবে এখনি॥"

গান শুনিতে শুনিতে অনেকে কাঁদিয়া আকুল হইলেন। গায়কের কণ্ঠস্বর মধ্যে মধ্যে বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। তাহার

পর যখন অমর বিদ্যাপতির প্রার্থনা ধরিলেন, তখন ক্রন্দনের রোল চারিদিকে পড়িয়া গেল। দ্বিতীয় প্রার্থনায় অমর গাহিলেন,—

"মাধব বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল, দেহ সমর্পিনু,
দয়া করি না ছাড়িবি মোয়॥
গণইতে দোষ, গুণলেশ না পাওবি,
যব তুহু করবি বিচার।
তুহু জগন্নাথ জগতে কহায়সি
জগ বাহির নহি মুঞি ছার॥"

গান এই পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে না হইতে হরনাথ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার দেহ ঘন ঘন কাঁপিতেছিল; এক্ষণে তিনি ভাব সংবরণ করিতে না পারিয়া ভূপৃষ্ঠে লুটাইয়া পড়িলেন। তখন সকলে তাঁহার চরণধূলা মাথায় লইয়া তাঁহাকে বেষ্টন করতঃ নামকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন।

তাঁহার যখন জ্ঞান হইল, তখন রজনী প্রভাত-প্রায়। চক্ষু খুলিয়া হরনাথ প্রথমেই দেখিলেন, অমরনাথের স্নেহ-ভক্তিমাখা পবিত্র মুখ। যখন কথা বলিবার শক্তি ফিরিয়া পাইলেন, তখন কহিলেন, "বাবা অমর, তোমাকে আমি এখন ছেড়ে দিতে পারব না—দু'চার দিন এখানে থাকতে হবে।"

"সন্তানকে যেমন আজ্ঞা করবেন, সন্তান তেমনি করবে।"

অমরনাথের উত্তর শুনিয়া সকলে 'সাধু সাধু' করিয়া উঠিলেন। হরনাথ কাঁদিয়া উঠিলেন। কৃষ্ণনাথ মুখ ফিরাইয়া উঠিয়া গেলেন এবং মেয়ে-মহলে গিয়া ঝঙ্কার দিয়া কহিলেন, "অমর থাক্, আমি চল্‌লাম।"

পার্ব্বতী। তা' কি হয় বাবা, তোমাকেও থাক্‌তে হবে।

কৃষ্ণ। আমি কিছুতেই থাকতে পারব না—

শোভা। কেন থাকতে পারবেন না শুনি?

কৃষ্ণ। আমার অনেক কায—

শোভা। কায ত ভারি, ব'সে ব'সে কেবল দিদির পদসেবা।

পার্ব্বতী প্রস্থান করিলেন। কৃষ্ণ কহিলেন, "সেটা বুঝি কায নয়?"

শোভা। সে কার্য্যে বাধা না ঘটে, এরূপ ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

কৃষ্ণ। তা'কে এখানে আনবে না কি? তা হ'লে আমার পিসীমা ও মালী দু'টো আর ঝি-চাকরদের—

শোভা। আমরা যা উচিত মনে করব, সেই রকম ব্যবস্থা করব—আপনার অনুরোধে কিছু হবে না।

কৃষ্ণ। দেখ শোভা, আমি এর শোধ হরেনের (শোভার স্বামী) উপর নেব।

শোভা। তা হ'লে সত্যি আমার একটা উপকার করা হবে।

কৃষ্ণ। কারুর উপকার করা আমার অভ্যেস নেই, যদি অপকার করতে বল—

শোভা। অপকার করবেন? তা হ'লে তাকে এখানে একবার ধ'রে আনুন।

কৃষ্ণ। বুঝেছি—বিরহটা উথলে উঠেছে। আচ্ছা, এর পর দেখা যাবে, এখন ত আমি বাড়ী যাই।

শোভা। সেটি হচ্ছে না।

কৃষ্ণ। আমি নিশ্চয়ই যাব। অমরের নিকট কাল আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, আজ সকালে আমি যাব।

লতা ছুটিয়া আসিয়া কহিল, "বড়দা, তোমার গাড়ী নিয়ে নরু যে চ'লে গেল।"

কৃষ্ণ। সে কি রে! সে কোথা গেল?

লতা। চন্দননগরে।

কৃষ্ণ। কেন?

লতা। জ্যেঠামশাই তাকে পাঠিয়েছেন, বউদিকে নিয়ে আসতে।

কৃষ্ণ। কা'র সঙ্গে সে গেল?

লতা। শঙ্কর দাদা গেছেন।

কৃষ্ণ। ব্যবস্থা মন্দ নয় দেখছি; আমি যে একটা মানুষ আছি, তা'ও তোমাদের মনে থাকে না।

শোভা। আপনি মানুষ হ'লে ত সে কথাটা আমরা মনে রাখতে পারি।

কৃষ্ণ। আমাকে যেতেই হবে—

শোভা। কেন বলুন দেখি?

কৃষ্ণ। আমরা ব্যবসাদার মানুষ, অনেক দরকারী চিঠিপত্র আসে—

শোভা। একটু অপেক্ষা করুন, নরু ফিরে আসুক—দেখুন চিঠি-পত্র নিয়ে আসে কি না।

কৃষ্ণ। সেই ভাল। [ক্রমশঃ।

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

শেষ কথা
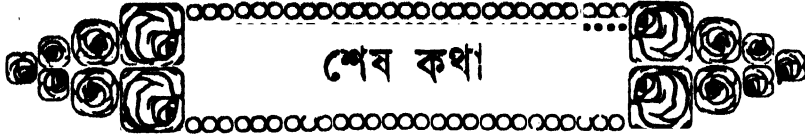
(শ্রাবণ-সংখ্যার অনুবৃত্তি)

প[illegible]রে ক্ষতির কথা বলিয়াছি। এইবার লাভের কথা বলি।

আমার বরাবর বাল্যকাল হইতে বেলায় উঠা অভ্যাস। [illegible]য় তথা চাকরীর জীবনে ইহার জের চলিয়াছে। [illegible] ভিতরের কথা জানেন না, তাঁহারা মনে করেন, [illegible]জীবনে অধিক রাত্রি জাগিয়া পড়ার ফলে এই অভ্যাস দাঁড়াইয়াছে এবং শিক্ষকজীবনেও সেই প্রয়োজনে অভ্যাসটি [illegible] হইয়াছে। আসল কথা কিন্তু তাহা নহে, এ অভ্যাসটি আমার মজ্জাগত। (To burn the midnight oil) রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত তৈল পোড়ান অধ্যয়নশীল ব্যক্তির লক্ষণ হইলেও, অধিক রাত্রি জাগরণ করিয়া পড়াশুনা করার ঝোঁক আমার কখনও ছিল না—প্রয়োজনও বোধ করি নাই। রাত্রি দশটা, জোর এগারোটা পর্য্যন্ত পড়াশুনাই যথেষ্ট মনে করিতাম। অন্যের প্ররোচনায় কচিৎ কখনও ইহার ব্যতিক্রম হইয়াছে। নতুবা জাগরণক্লেশে তবিয়ত খারাপ করা, স্বাস্থ্যভঙ্গ করার উপর আমি চিরকালই নারাজ। রাত্রিতে পড়াশুনা যদি বা করি, রাত্রিতে লেখার অভ্যাস তো কস্মিন্ কালেও নাই—এক দৈনিক হিসাব ছাড়া। প্রৌঢ় বয়সে চালশে ধরার জন্য চশমা লওয়ার পর হইতে রাত্রিতে পাঠের অভ্যাস একদম ছাড়িয়াছি। কেবল যে দিন সন্ধ্যাকালে [illegible] বাহির হইয়া পুরাতন বইএর হাটে মনের মত কোনো বই সস্তার সওদা করিতে পারি, সেই দিন রাত্রিতে তাহা লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া ও দুই চারি পাতা পড়িয়া নিয়মভঙ্গ করি। স্বীকার করি, রাত্রিতে নিরিবিলিতে একাগ্র মনঃসংযোগ হয়, তাহাতে অন্য সময়ের ছয় ঘণ্টার কায দুই ঘণ্টায় হয়। কিন্তু তথাপি এতটা পড়ার আঁঠা এ পক্ষের কখনও নাই। আমার বিলাতী ওস্তাদ ল্যাম্বের রচনার এক স্থানে বেলায় উঠার পক্ষে ও ভোরে উঠার বিপক্ষে খুব একটা জোরাল নজির আছে। (১) কিন্তু ওস্তাদজির সেই উৎকৃষ্ট রচনার সহিত পরিচয়-সৌভাগ্যলাভের অনেক পূর্ব্ব হইতেই আমার এই অভ্যাস ছিল। থাক্, এ সব কেতাবী বিদ্যা জাহির না করিয়া এক্ষণে প্রকৃত অনুসরণ করি।

দীর্ঘকাল রোগশয্যায় পড়িয়া থাকার সময় রোগযন্ত্রণার জন্য সারারাত্রি নিদ্রা হইত না, হয় তো জ্বরের ঘোরে প্রথম রাত্রিতে একটু তন্দ্রা আসিত, কিন্তু বাকী রাতটা খাড়া (?) জাগিতে হইত। যখন কঠিন পীড়া সারিল, তখনও রাত্রিতে পেটে বায়ুর সঞ্চারে এমন অস্বস্তি হইত, এমন হাঁসফাস করিতাম যে ঘুমায় কাহার সাধ্য ? যত রাত্রি হইত, ততই অস্বস্তি বৃদ্ধি পাইত ; রাত্রিতে পেটে কিছু না পড়িলেও এ ভাবের কোনও ব্যতিক্রম হইত না। অনেক তোয়াজে পেটের সে ভাবটা গিয়াছে (শ্রাবণ, ৫৮৪ পৃঃ), কিন্তু সেই অবধি রাত্রিতে সুনিদ্রা হয় না, ৩।৪ বার ঘুম ভাঙ্গে। এবং শেষ বার ভোর রাত্রিতে ঘুম ভাঙ্গা এখন পাকা অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কোনও কারণে কোনও দিন অধিক রাত্রিতে ঘুমাইলেও ঠিক যথাসময়ে ঘুম ভাঙ্গে। গ্রীষ্মকালে ৫টায় বা তাহারও পূর্ব্বে ; শীতকালে ৬টার পূর্ব্বে। ইহা একটা লাভ বলিতে হইবে বৈ কি ? কেন না ইহাতে প্রাতে কায করিবার অনেক সময় পাই। আর আমার রীতিমত লেখা ও পড়ার সময়ই প্রাতঃকাল, রাত্রিকাল নহে। আপশোষের বিষয়, এই অভ্যাসটিও হইল আর প্রভাতে অনেক দিনের অভ্যাস-মত যে রচনাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতাম, সে রচনাপ্রবৃত্তিও গেল। হয় তো দশ বৎসর পূর্ব্বে এই অভ্যাসটি হইলে 'ফোয়ারা' ও 'পাগলা-ঝোরা'কে শতধারা বা সহস্রধারায় পরিণত করিতে পারিতাম। তবে জানি না, তাহাতে সাহিত্যক্ষেত্রের কতটা ক্ষতি-বৃদ্ধি হইত। যাহা হউক, এখন সমস্ত সময়টাই কলেজের কার্য্যের উপযোগী পড়াশুনায় ব্যয় হয়, তাহাতে অধ্যাপনার কর্ম্ম সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারি, ইহাও তো একটা লাভ এবং এই লাভ ভোরে ঘুম ভাঙ্গার নবলব্ধ অভ্যাসের ফল। সুতরাং ইহাকে শাপে বর বলিতে পারি।

এইবার দ্বিতীয় লাভের কথা বলি। সময় অমূল্য রত্ন ; পূর্ব্ব অনুচ্ছেদে প্রচুর কার্য্য-সম্পাদনের মূলধন এই অমূল্য রত্ন-লাভের কথা বলিয়াছি। দ্বিতীয় লাভটি ইহা অপেক্ষাও অমূল্য। কাশীর নিদারুণ গ্রীষ্মে দীর্ঘকাল রোগভোগের অবস্থায় স্ত্রীপুত্রকন্যার যে ঐকান্তিক সেবা-যত্নের পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে মুগ্ধ হইয়াছি এবং মানব-মানবীর হৃদয়কে

---

(১) Essays of Elia, Second Series ; Popular Fallacies : that we should 'rise with the lark.'

এই অগাধ ভালবাসা ও করুণার আধার-স্বরূপ সৃষ্টি করার জন্য ভগবানের প্রতি ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়াছি। অবশ্য পূর্ব্বেও কতবার রোগে ভুগিয়াছি, সেবাও পাইয়াছি। কিন্তু আর তো কখনও এত দীর্ঘকাল এমন কঠিন পীড়ায় শয্যাগত থাকি নাই। সুতরাং দীর্ঘকাল ধরিয়া নিরন্তর এমন অক্লান্ত সেবা পাইবার অবসরও পাই নাই। পত্নীর সেবা সম্বন্ধে স্কটের সেই সুন্দর বাক্যটি উদ্ধৃত করিলেই সকল কথা বলা হইল—

'When pain and anguish wring the brow
A ministering angel thou.'

নিজে রোগগ্রস্তা হইয়াও কনিষ্ঠা কন্যা কিরূপ শুশ্রূষা করিয়াছিল, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি (শ্রাবণ, ৫৮১ পৃষ্ঠা)। সর্ব্বোপরি পুত্রের সেবার একাগ্রতা ও (thoroughness) সম্পূর্ণতা আশীর্ব্বাদ করি, শ্রীমান্ দীর্ঘজীবী হইয়া অব্যাহত স্বাস্থ্যসুখ ভোগ করুন, তাঁহাকে যেন কখনও কাহারও সেবা গ্রহণ করিতে না হয়। মনে হয়, বিধাতা আর কয়েকটি পুত্রকে হরণ করিয়া এই 'শিবরাত্রির সলিতা'টি আমার মুখ চাহিয়া রাখিয়া দিয়াছেন, যাহাতে শেষ বয়সে সেবা-যত্নের কোনও ত্রুটি না হয়। কথাটা স্বার্থপরের মত বলা হইল, কিন্তু সংসারী জীবের হৃদয়ে উচ্চ পবিত্র ভাবের সঙ্গে সঙ্গে স্বার্থপর ভাবও বিরাজ করিতেছে, তাহার লোপ তো সম্ভব নহে।

ইহা ছাড়া, কে আপন কে পর, তাহারও সুস্পষ্ট পরিচয় এই রোগশয্যায় পাইয়াছি। 'বিদেশ বিভুঁই'এ চারি মাস কাল রোগ-ভোগের অবস্থায় যাহাদিগের উপর 'প্রতিবেশিত্ব' ছাড়া আর বিশেষ কোনও দাবী নাই, এমন লোক ইজি-চেয়ার, টানাপাখা, খসখসের টাটি প্রভৃতি আরামের উপকরণ যোগাইয়াছে এবং নিত্য আসিয়া সংবাদ লইয়াছে, কেমন আছি। আর মৃত্যু হইলে দশ রাত্রি অশৌচ পালন করিতে হইবে, এমন জ্ঞাতিও ৪ মাসের মধ্যে ৪ দিন তত্ত্ব লইয়াছেন কি না সন্দেহ—অথচ একই সহরে বাস করিয়া। সর্ব্বাপেক্ষা গভীরভাবে হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে কলিকাতা-বাসী খুড়ামহাশয়ের (পিতৃদেবের পিতৃব্যপুত্র) (১) অকৃত্রিম স্নেহকরুণা। কলিকাতায় প্রাণে প্রাণে আমাকে ফিরাইয়া লই-বার জন্য তাঁহার সে কি আন্তরিক আকুলতা, কি প্রবল চেষ্টা, কি উৎকট দুর্ভাবনা! বোধ হয়, পিতৃস্নেহও ইহার নিকট পরাজিত। এই সব স্নেহসমবেদনার, সেবাযত্নের প্রত্যক্ষ অনুভূতি, মানবচরিত্রের এই মধুর দেবভাবের সাক্ষাৎ উপলব্ধি, ইহা কি একটা কম লাভ? সে দিন পিতৃব্য মহাশয়ের একটি অল্পবয়স্কা বিধবা দাসী বলিতেছিল, "ভাগ্যে বাল-বিধবা হইয়াছিলাম, তাই তো নিঃঝঞ্ঝাট হইয়া ধর্ম্ম-সাধনায় মনঃপ্রাণ উৎসর্গ করিতে পাইয়াছি।" আমারও তেমনই মনে হয়, ভাগ্যে রোগ-যন্ত্রণায় দীর্ঘকাল ধরিয়া ভুগিয়াছি, তাই তো আত্মীয়-অনাত্মীয়ের এই পবিত্র কোমল দেবভাবের ঘনিষ্ঠ পরিচয়লাভের সৌভাগ্য হইয়াছে। এ ক্ষেত্রেও দেখিতেছি, অশিব হইতে শিবের উৎপত্তি। তাই ভক্তের বাণীর প্রতিধ্বনি করিতে ইচ্ছা হয়—

'সূক্ষ্ম দৃষ্টি দাও প্রভু, হৃদয়েতে দাও বল।
অশুভ না হেরি যেন তব কার্য্যে, হে মঙ্গল॥'

এইবার তৃতীয় লাভের কথা বলি। এইটি পরম ও চরম লাভ—আধ্যাত্মিক উন্নতি। একটু গোড়া হইতে আরম্ভ করি, নতুবা কথাটা সুস্পষ্ট হইবে না। শৈশবে মাতৃহীন অবস্থায় নিষ্ঠাবতী ব্রাহ্মণের বিধবা মাতৃসমা ঠাকুরমাতার ক্রোড়ে লালিত-পালিত হইলেও এবং হিন্দুয়ানীর কেল্লা পল্লীগ্রামে বাল্যজীবন যাপন করিলেও হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্মে, আচার-অনুষ্ঠানে একটা আস্থার ভাব জন্মে নাই। গৃহে গৃহদেবতার অভাব বোধ হয় তাহার একটা কারণ (গৃহদেবতা লক্ষ্মীশ্রীযুক্ত প্রবল জ্ঞাতিদিগের গৃহে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন)। তবে লক্ষ্মীপূজা, ষষ্ঠীপূজা, মনসাপূজা প্রভৃতি যথানিয়মে অনুষ্ঠিত হইত। ইংরেজীনবীশ পিতার পুত্র হওয়াতে সম্ভবতঃ আমার এইরূপ মতিগতি হইয়াছিল। তখনকার ইংরেজীনবীশদিগের আচরণের কথা বোধ হয় পাঠকবর্গের অবিদিত নহে। অবশ্য এমন কথা বলিতেছি না যে, তখনকার দিনে ইংরেজী চর্চ্চা করিলেই হিন্দুয়ানী লোপ পাইত। ঋষিকল্প ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের বেলায় এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। সম্ভবতঃ এইরূপ ব্যতিক্রম আরও ২।৪টি ছিল। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই কেমন যেন একটা অবিশ্বাসের আবহাওয়া বহিত।

(১) রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অবসর-প্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশান্স্ জজ্। একণে তিনি ক্ষেত্রসন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া কাশীবাস করিতেছেন ও অনন্তকর্ম্মা হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

বাল্যেই ভিন্ন গ্রামে পিতৃদেবের নিকট পাঠের সুবিধার জন্য (তিনি তথাকার স্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন) স্থানান্তরিত হইয়াছিলাম; সেখানে যে জমীদার-গৃহে আশ্রয় পাইয়াছিলাম, সে গৃহের আবহাওয়া বিশুদ্ধ ছিল; গৃহে শালগ্রামশিলা প্রতিষ্ঠিত, নিত্য পূজারতি ভোগরাগ হইত; ইহা ছাড়া দুর্গোৎসব প্রভৃতি 'বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ' ছিল। বাঙ্গালানবীশ প্রাচীন ব্রাহ্মণ জমীদার মহাশয় আনুষ্ঠানিক হিন্দু ছিলেন। তথাপি এই গৃহের বা গৃহপতির প্রভাব কিছুই অনুভব করি নাই। তবে উপনয়নের পর, কি জানি কেন, (মন্ত্রশক্তি ?) প্রবল উৎসাহ ও পরম নিষ্ঠার সহিত এক বৎসর কাল ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক প্রভৃতি নিত্যকর্ম্ম-পদ্ধতির অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম এবং কখনও আচারহীন হইব না বলিয়া স্নেহময়ী পিতামহী দেবীকে আশ্বাস দিয়াছিলাম।

তাহার পর, কি করিয়া কি হইল জানি না, এক বৎসর পরে সব আচার-অনুষ্ঠান লোপ পাইল, প্রায় 'পৈতা পোড়াইয়া ভগবান্' হইলাম। হয় তো ভিন্ন গ্রামের এই নিষ্ঠাবান্ পরিবারে থাকিলে অভ্যাসটা যাইত না—(অন্ততঃ এত শীঘ্র); কিন্তু 'মাইনার্' পাশ করাতে আবার স্বগ্রামে ফিরিলাম এবং আমাদের ক্ষুদ্র গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামের (মুড়াগাছা) এনট্রেন্স্ স্কুলে ভর্ত্তি হইলাম। পরীক্ষার বৎসরে কৃষ্ণনগর সদরে গেলাম এবং তথা হইতে পর পর দুইটি পরীক্ষা পাশ্ করিয়া কলিকাতায় বি, এ, ও এম্, এ ক্লাসে পড়িলাম। সহরের বাতাসে এই অবহেলার ভাব ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। কৃষ্ণনগরে পঠদ্দশায় শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণির ধর্ম্মোপদেশ স্বকর্ণে শুনিয়াছিলাম, কিন্তু কোন ফল হয় নাই, উহা উষর-ক্ষেত্র-নিহিত বীজের ন্যায় নিষ্ফল হইয়াছিল। কলিকাতায়ও তখন বঙ্কিমচন্দ্র ও অক্ষয়চন্দ্রের, 'প্রচার' ও 'নবজীবনে'র 'যুগ', কিন্তু সেই আন্দোলনও আমাকে স্পর্শ করে নাই। রঙ্গমঞ্চেও তখন 'বিল্বমঙ্গল', 'চৈতন্যলীলা', 'প্রভাস-মিলন', 'নন্দ-বিদায়ে'র পূর্ণ প্রভাব; যাত্রার আসরেও তখন নীলকণ্ঠ ও মতিরায়ের ভক্তি-রসের বান ডাকিয়াছে। কিন্তু সেই সকলের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য উপভোগ করিলেও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিতে পারি নাই। কৃষ্ণনগরে পঠদ্দশায় পর পর দুইজন ব্রাহ্ম হেড্ মাষ্টারের সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম এবং দুইজন ব্রাহ্ম ছাত্রের সহিতও মিশিয়াছিলাম। তাঁহাদিগের প্রভাব কোন আধ্যাত্মিক বৈলক্ষণ্য সংসাধন করিতে পারে নাই। বিজ্ঞান ও গণিতশাস্ত্রে কখনও পোক্ত নহি, জানি না, বিজ্ঞানশাস্ত্রের জটিল নিয়মে হিন্দু ও ব্রাহ্ম প্রভাব পরস্পরকে নষ্ট (neutralise) করিয়া আমার চিত্তক্ষেত্র 'শূন্য' দিয়া পূর্ণ করিয়াছিল কি না। (১)

এই ভাবে কলেজে অধ্যয়নের অবস্থা তো কাটিলই, অধ্যাপনার অবস্থায়ও কোন পরিবর্ত্তন হইল না। ভাগলপুরে অল্প কয়েক মাসের জন্য আদর্শ নিষ্ঠাবান্ হিন্দু মাতুল মহাশয়ের (২) সংসর্গে ও সদ্দৃষ্টান্তেও কোন ফল হইল না। দুর্ভাগ্যক্রমে তথা হইতে বহরমপুরে চাকরী লইলাম ও সেখানে দীর্ঘ তিন বৎসর কাল অবস্থান করিলাম। বহরমপুরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, ৺মোহিতচন্দ্র সেন, ৺বিনয়েন্দ্রনাথ সেন ও ৺সীতানাথ নন্দী—এই চারি জন আদর্শ ব্রাহ্মের সংস্পর্শে আসিলাম। কিন্তু এবারেও মাতুল মহাশয়ের হিন্দু আদর্শ ও এই ব্রাহ্ম আদর্শ—উভয়ের সঙ্ঘাতে আমার ভাগ্যে সেই শূন্যই থাকিয়া গেল। হাঁসের পালক যেমন জলে ডুবিয়া থাকিয়াও ভেজে না, আমিও তেমনি হিন্দু বা ব্রাহ্ম আবহাওয়ার মধ্যে থাকিয়াও নির্লিপ্ত থাকিয়া গেলাম। কুচবিহারে বাসকালে ব্রাহ্মধর্ম্ম (militant) প্রবল রাষ্ট্রধর্ম্ম (state religion) দেখিয়া মজ্জাগত হিন্দুভাবটা (এতদিন চাপা থাকিয়া ?) একবার মাথা খাড়া দিয়া উঠিয়াছিল, ব্যাপারটা তাহার দরুণ বেশ অপ্রীতিকর হইয়াও ছিল; কিন্তু জানি না উদ্ধত যৌবনের সেই বিদ্রোহী ভাব কতটা মৌখিক, এবং কতটা আন্তরিক।

এই তো গেল আমার দীর্ঘকালের অবিশ্বাস ও ক্রিয়াহীনতার ইতিহাস।

তাহার পর, যখন বয়ঃপ্রাপ্ত কৃতবিদ্য উপার্জ্জনশীল সদ্যোবিবাহিত জ্যেষ্ঠ পুত্রের অকালমৃত্যুতে মহাশোকে নিমগ্ন হইলাম, তখন কার্য্য-সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া, সেই শোক ভুলিবার,

(১) একটা কথা যথাস্থানে বলিতে ভুলিয়াছি। ইহার মধ্যে একদিন তান্ত্রিক দীক্ষাও হইয়া গেল। কিন্তু সেটা পূজনীয়া পিতামহী দেবীর আগ্রহে ও সহধর্ম্মিণীর উপরোধে। ব্যাপারটা নিতান্তই উপরোধে ঢেঁকি গেলা হইল। আচার-অনুষ্ঠানের বেলায় যথাপূর্ব্বং থাকিয়া গেল।

(২) টি, এন্ জুবিলি কলেজের প্রথম প্রিন্সিপ্যাল্ ৺হরিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়। কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি কাশীবাস করিয়াছিলেন এবং কাল পূর্ণ হইলে তাঁহার কাশীলাভ ও তাহার ফলে শিবলোক-প্রাপ্তি হইয়াছে।

দাবাইয়া রাখিবার প্রবল চেষ্টা করিলাম, কিন্তু প্রাণের মহা-শূন্যতা সেই কর্ম্ম-বাহুল্যে পূর্ণ হইল না। প্রাণের আকুলতায় আশ্রয় খুঁজিতে লাগিলাম, শান্তির জন্য ব্যগ্র হইলাম, আশ্রয় ও শান্তি পাইলাম 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে।' স্বয়ং পরমহংসদেব ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতধারী হইলেও ভ্রাতুষ্পুত্র-শোকে বিচলিত হইয়াছিলেন এবং ইহার বর্ণনা অল্প কথায় কিন্তু সুস্পষ্টভাবে করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া যেন একটু আশ্বস্ত হইলাম। যাহা হউক, কথামৃত-পানে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা ও শান্তিলাভ করিলেও সমস্ত মনঃপ্রাণ ইহাতে সাড়া দিল না।

তাহার পর, আবার ৬৷৭ বৎসর পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে সদ্যোযশোভাগী কনিষ্ঠ পুত্রের অকালমৃত্যু ঘটিল এবং মধ্যম পুত্রটি সেই একই সময়ে একই রোগে (টাইফয়েডে) শয্যাশায়ী হইয়া দীর্ঘকালে অতি কষ্টে রক্ষা পাইল। নিজেও পূর্ব্ব হইতে রোগে ভুগিতেছিলাম, এক্ষণে শোকে মুহ্যমান হইয়া রোগক্ষীণ শরীরের অবহেলা করাতে এবং রোগের প্রকোপে শরীরপাত হইলেই পরিত্রাণ পাই এই আশায় অনিয়মের মাত্রা বাড়াইয়া তোলাতে, শেষে দুরারোগ্য কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলাম। শরীর ও মনের এই অবসাদগ্রস্ত অবস্থায় চিরাভ্যস্ত লেখাপড়ার কার্য্যে, সরস কাব্য-নাটক হইতে আনন্দ ও জ্ঞানাহরণে, সাহিত্যের মারফত আত্মপ্রকাশে আর সুখ, আনন্দ, শান্তি, সান্ত্বনা বিন্দুমাত্রও পাইলাম না। বরং সারাজীবন ধরিয়া অল্পে অল্পে সংগৃহীত স্তূপাকার গ্রন্থরাজি গঙ্গাজলে ফেলিয়া দিতে বা অগ্নিতে আহুতি দিতে বিলাতী বিদ্যার জাহাজ 'দরিয়ামে ডাল্' দিতে প্রবল ঝোঁক হইল, অধ্যয়ন বিড়ম্বনা ও অধ্যাপনা 'ভূতের বেগার' বলিয়া জ্ঞান হইতে লাগিল। ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হইল, "আমায় দে মা পাগল ক'রে, আমার কায নাই মা জ্ঞান-বিচারে।"

অনন্যোপায় হইয়া আবার সেই 'কথামৃত'-পানে ব্যাপৃত হইলাম, এবার যেন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে শান্তি ও সান্ত্বনা পাইতে লাগিলাম। কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ, পাগল হরনাথ, সাধু নাগ মহাশয় প্রভৃতি সাধু মহাত্মাদিগের উপদেশাবলীও পাঠ করিতে লাগিলাম। মনে একটা গভীর ছাপ পড়িয়া গেল। একটা কিছু আঁকড়াইয়া ধরিবার জন্য আচার-অনুষ্ঠান, পূজাপাঠ, জপধ্যান-প্রভৃতিতে আত্মসমর্পণ করিবার সৎপ্রবৃত্তির উদয় হইল। (পিতৃদেবেরও শেষ বয়সে আচার-অনুষ্ঠানে মন বসিয়াছিল।) বহু ইংরেজীনবীশ অবিশ্বাসী অনাচারী হিন্দুসন্তানেরই শেষ দশায় এইরূপ পরিবর্ত্তন বা বিবর্ত্তন হইয়াছে; সুতরাং আমার এই সুমতির উদয় নূতন বা অদ্ভুত কিছুই নাই।

তাহার পর, বৎসরাধিক কাল দুরারোগ্য রোগভোগ; অনেক সময়ে অসহ্য রোগ-যন্ত্রণা যেন নিদারুণ পুত্রশোকজনিত মনোবেদনাকেও ছাপাইয়া উঠিত। তখন সেই বহুকালের অনভ্যস্ত (কিন্তু হিন্দুসন্তানের মজ্জাগত) 'কালী কল্পতরু শিব জগদ্গুরু', 'দুর্গে দুর্গতিহারিণি', 'হরি নারায়ণ মধুসূদন', (গঙ্গা-নারায়ণ-ব্রহ্মেরও বড় বাকী ছিল না), নাম-উচ্চারণে ও জপে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া রোগ-যন্ত্রণা ভুলিবার, সহ্য করিবার শক্তি-আহরণে সচেষ্ট হইলাম। অলঙ্কার-শাস্ত্রে বিরহে বিনোদের ব্যবস্থা পাওয়া যায়; জানি না, বৈদ্যক-শাস্ত্রে রোগে বিনোদের ব্যবস্থা আছে কি না। থাকুক বা না থাকুক, সঙ্কটে পড়িয়া রোগী এ ক্ষেত্রে নিজের ব্যবস্থা নিজেই করিয়া লইল। উত্থানশক্তিরহিত হইয়া শয্যায় পড়িয়া থাকিয়া থাকিয়াও কালী-দুর্গা-মধুসূদন-নাম-জপ, গায়ত্রী ও ইষ্টমন্ত্রজপ, নানা দেবতার স্তব-পাঠ, গীতা ও চণ্ডীপাঠ (শুধু আবৃত্তি, মর্ম্মার্থগ্রহ নহে), প্রভৃতি চলিতে লাগিল, এবং নানারূপ আচার-নিয়মে নিজেকে ব্যাপৃত রাখিলাম।

ইহা ছাড়া, মৃত্যুভয়ে নহে (মৃত্যু তো শান্তি), যন্ত্রণার দায়ে, ক্রিয়াবান্ লোক অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাদিগের দ্বারা চণ্ডীপাঠ, বটুকভৈরব-স্তবপাঠ, মহামৃত্যুঞ্জয় যাগ, গ্রহযাগ, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতি অনুষ্ঠান সম্পন্ন করাইলাম। ঘোর অবিশ্বাসী অতি-বিশ্বাসীতে পরিণত হইল, দর্পহারী মধুসূদনের এমনই লীলা। ত্রিরত্ন ও ত্রিলৌহ-ধারণ, কবচ-ধারণ, মণিবন্ধে দ্রব্যগুণসম্পন্ন বৃক্ষমূল-ধারণ, কিছুই বাকী রহিল না। জানি না কিসে কি হয়, যে দিন সদাচারী ব্রাহ্মণ দ্বারা বটুকভৈরব-স্তবপাঠ ও নবরূপপুটিত চণ্ডীপাঠ আরব্ধ হইল, সেই দিনই রাত্রি হইতে এক ডিগ্রী করিয়া জ্বর কমিতে লাগিল। তাল তাল কুইনিন্ খাইয়া কিছুই উপকার হয় নাই; বরং যে দিন রীতিমত কুইনিন্ সেবন চলিত, সেই দিনই জ্বরবৃদ্ধি হইত, আর যে দিন কুইনিন্ বন্ধ থাকিত, সে দিন জ্বরের তত্টা বৃদ্ধি হইত না। তাজ্জব ব্যাপার বটে! প্রচণ্ড গ্রীষ্মের পর তখন বর্ষা নামাতেও হয় তো জ্বরের উপশম হইয়াছিল, কেন না; জ্বরটা যে গরমের দরুণ, তাহা বিচক্ষণ ডাক্তার বাবু

...টা সাব্যস্ত করিয়াছিলেন। তথাপি আধিভৌতিক কারণ-...যে সব—আর আধ্যাত্মিক কারণটা কিছুই নহে, প্রাকৃতিক নিয়মেই এই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, অতিপ্রাকৃতের প্রভাব ... ক্ষেত্রে কিছুই নাই, সে কথা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। ইহাতে বিজ্ঞ পাঠকবর্গের অবজ্ঞার হাস্যের পাত্র হইতে হইলেও আপত্তি নাই। শেক্‌স্‌পীয়ারের সেই সুপরিচিত বাণী আমার রক্ষাকবচ হইবে।—'There are more things in Heaven and Earth,......Than are dreamt of in your philosophy.'

ক্রিয়াহীন অবিশ্বাসী ইংরেজী-নবীশের এই ধর্ম্মচর্চ্চার সংবাদে বিজ্ঞ পাঠকবর্গ নিশ্চিতই মুখ টিপিয়া হাসিতেছেন। কিন্তু আর একটি কথা শুনিলে তাঁহারা হয় তো উচ্চহাস্য করিয়া উঠিবেন—বিশেষতঃ যাঁহারা লেখকের কণ্ঠস্বরের সহিত পরিচিত। জ্বরের ঘোরে, রোগের যন্ত্রণায়, সময়ে সময়ে দেবস্তুতি, জপধ্যানে সন্তুষ্ট না হইয়া ধর্ম্মসঙ্গীত গায়িয়া একটু শান্তিলাভের প্রয়াস পাইতাম এবং রোগমুক্ত হইয়াও এ অভ্যাস একেবারে ছাড়ি নাই। তবে এখন সম্পূর্ণ জ্ঞান-চৈতন্য হইয়াছে, সুতরাং প্রতিবেশীদিগের, এমন কি গৃহস্থিত পরিজনবর্গের কাণ বাঁচাইয়া (এবং নিজেরও মান বাঁচাইয়া) গান গাই। নিজের সঙ্গীত-সাধনার নমুনা-হিসাবে নহে, পাঠকবর্গের মনস্তুষ্টি, কৌতূহল-নিবারণ বা কৌতুক-বর্দ্ধনের উদ্দেশ্যে সংক্ষেপে কয়েকটি গীতের উল্লেখ করিতেছি। যখন কাণে শুনিতে হইবে না, শুধু চক্ষুঃ বুলাইতে হইবে, তখন বোধ হয় ইহাতে কাহারও আপত্তির কারণ নাই। তবে আরম্ভ করি। (১)

'বারে বারে যে দুখ দিয়েছ, দিতেছ, তারা।
সে কেবল দয়া তব বুঝেছি মা দুখহরা॥
সন্তান-মঙ্গল-তরে, জননী তাড়না করে,
ওমা তাই বহি মা সুখে শিরে দুখেরি পসরা॥'

'মা, মা, বলে আর ডাকব না, পেয়েছি পেতেছি কত যন্ত্রণা।
ছিলাম গৃহবাসী, কর্‌লি সন্ন্যাসী, আর কি ক্ষমতা রাখ সর্ব্বনাশী॥'

'শ্মশান ভাল বাসিস্ ব'লে শ্মশান করেছি হৃদি॥'

'মনের বাসনা শ্যামা, শবাসনা, শোন্ মা বলি।
অন্তিম কালে জিহ্বা যেন বলতে পায় মা কালী কালী॥
হৃদয়-মাঝে, উদয় হইও মা, যখন কর্‌বে অন্তর্জলী॥'

'মজলো আমার মন-ভ্রমরা শ্যামা-পদ-নীল-কমলে॥'

'এমন দিন কি হ'বে তারা
যবে তারা তারা তারা ব'লে, তারা ব'য়ে পড়বে ধারা॥'

'সকলই তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।
তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা লোকে বলে করি আমি॥'

'যতনে হৃদয়ে রাখ আদরিণী শ্যামা মা-কে॥'

বংশানুক্রমে আমরা শাক্ত, সুতরাং রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি সাধকগণের 'শ্যামাবিষয়' যেমন আমার হৃদয়ে (ইংরেজী শিক্ষাদীক্ষা-সত্ত্বেও) appeal করে, প্রাণে লাগে, তেমন আর কিছুতেই করে না। (পিতৃদেবও এ সব গান গায়িতে ভাল বাসিতেন, তিনি এ অকৃতী সন্তানের মত সুর-তাল-বিষয়ে আনাড়ী ছিলেন না।)

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা আবশ্যক। উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজি-নবীশ বাঙ্গালী কবির দৃষ্টান্তে কালী করালী মূর্ত্তিকে 'অনার্য্যের কালী' বলিয়া সিদ্ধান্ত না করিলেও, যৌবনে এই মূর্ত্তি-দর্শনে হৃদয়ে কেমন যেন আতঙ্ক উপস্থিত হইত, ইংরেজ কবির 'Nature, red in tooth and claw' বাক্যটি স্মরণ করাইয়া দিত। শক্তির 'সৌম্যা সৌম্যতরাশেষ-সৌম্যেভ্যস্ত্বতিসুন্দরী' মূর্ত্তিই (দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, কমলা, গণেশ-জননী) 'সৌম্যানি যানি রূপাণি' ভাল লাগিত, 'যানি চাত্যর্থঘোরাণি' সেগুলি ভাল লাগিত না।

কিন্তু পরিণত বয়সে মহাকালের রুদ্রলীলার প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়া এখন 'কালীপদ-নীলকমলে' আমার 'মন-ভ্রমরা' মজিয়াছে। এখন সেই করালী মূর্ত্তির রৌদ্র সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে শিখিয়াছি।—

'নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি।
তাই যোগী ধ্যান করে হ'য়ে গিরিগুহাবাসী॥'

স্বামী বিবেকানন্দের 'বীরবাণী'র উদাত্ত সুরে এই ক্ষীণ সুর মিলাইয়া আমিও বলি—

'সত্য তুমি মৃত্যুরূপা কালী, সুখ-বনমালী তোমার মায়ার ছায়া।'

আবার হৃদয়ে সঙ্কীর্ণ ভাব পোষণ করি না, হরিনামেও বিমুখ নহি। অত্র প্রমাণং যথা—

'হরি, অন্তে যেন পাই দরশন॥'

'হরি, তোমাতে আমাতে শুধু মুখের কথাতে
হ'বে কি হে পরিচয়।

(১) যাঁহারা সঙ্গীতজ্ঞ, গানগুলি তাঁহাদিগের সুপরিচিত। সেইজন্য ও স্থানাভাবে সমগ্র গীত কোনও স্থলেই উদ্ধৃত হইল না।

আমার ষোল আনা প্রাণ, সংসারেতে টান,
শুধু লোক-দেখানে বলি কোথা দয়াময় ॥'
'সজল-জলদাঙ্গ, সুত্রিভঙ্গ, বাঁকা তরুমূলে।
হেরিলে হরে জ্ঞান-মন, প্রাণ পড়ে পদতলে ॥'
"একবার এস শ্রীহরি।
আমার হৃৎকমলে বামে হেলে দাঁড়িয়ে বাজাও বাঁশরী ॥"
'একবার দাঁড়াও বংশীধারী হরি, হেরি নয়ন মুদে ॥'
'আমার কতদিনে হ'বে সে প্রেমসঞ্চার ॥'

রাধাকৃষ্ণের লীলা-কীর্ত্তনের প্রসঙ্গ আর তুলিলাম না। কেন না, তৎকথনে, শ্রবণে, এমন কি স্মরণে, আত্মহারা হইয়া পড়িতে হয়।

আবার কালীকৃষ্ণের অভেদসূচক এই গানগুলিতেও আনন্দ পাই। যথা—

'আজি কেন কালী কদম্বেরই মূলে।
নরশিরহার লুকালে কোথায়,
বনফুলমালা কে দিল গলে ॥'
'আমার হৃদয়-রাসমন্দিরে,
দাঁড়া মা ত্রিভঙ্গ হ'য়ে।
একবার হ'য়ে বাঁকা, দে মা দেখা,
শ্রীরাধারে বামে ল'য়ে ॥'
'ওমা কালী, মুণ্ডমালী, একবার
বনমালী-রূপ কর মা ধারণ ॥'

শুধু কৃষ্ণকালী কেন, বিশুদ্ধ ব্রহ্মসঙ্গীতে, হালের কান্ত-কবির কান্তপদাবলীতেও নারাজ নহি। যথা,—

'তুমি হে ভরসা মম অকূল পাথারে ॥' 'আমার মন ভুলালে যে, কোথায় আছে সে ॥' 'কেন বঞ্চিত হ'ব চরণে ॥' 'কবে তৃষিত এ মরু ॥'

তবে সত্য কথা বলিতে কি, সাকারে যেমন ধরিতে ছুঁইতে পাই, নিরাকারে তেমন পাই না। তাই কালীকীর্ত্তন-কৃষ্ণকীর্ত্তনে যেমন প্রাণ ভরিয়া যায়, বিশুদ্ধ ব্রহ্মসঙ্গীতে তেমনটি হয় না। ইহা অবশ্য আমারই দোষ, নিম্নাধিকারীর কথা। আমাদের মত অবোধ অধমের হিতের জন্যই তো 'ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।' 'প্রতিমা স্বল্পবুদ্ধীনাম্।'

যাক্, এই নীরস সঙ্গীতচর্চ্চার বিড়ম্বনায় আর কায নাই। অনেক উচিতবক্তা বন্ধু লেখকের এই অপ্রত্যাশিত পরিবর্ত্তন দেখিয়া 'রোগী চ দেবতাভক্তো বৃদ্ধবেশ্যা তপস্বিনী' ইতি শ্লোকার্দ্ধ ঝাড়িয়া অনাস্থার ভাব দেখাইয়াছেন এবং রোগ-যন্ত্রণার তাড়নাজনিত ভক্তিভাব অচিরস্থায়ী ও অধিক দূর শিকড় নামাইতে পারে না, 'কারণস্যাপায়ে কার্য্যস্যাপায়ঃ' ঘটিবেই ঘটিবে, এইরূপ মন্তব্য জারী করিয়া নিজেদের দূরদর্শিতার প্রমাণ দিয়াছেন! কিন্তু পাঠকবর্গকে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, এ 'ভাব'টুকু সুস্থ সবল অবস্থায়ও নষ্ট হয় নাই, স্থায়িভাব দাঁড়াইয়াছে। (It has come to stay.) সমগ্র প্রকৃতির আমূল আলোড়ন করিয়া নূতন সত্তায় পরিণত করিয়াছে। তবে ইহা স্বীকার করি যে, এই 'ভাবে' এখনও বিভোর হইতে পারি নাই, জপধ্যান-ধারণায় তন্ময় হইতে শিখি নাই; হইবার অদূর বা সুদূর সম্ভাবনা আছে কি না, তাহাও জানি না। সকলই গুরুর ইচ্ছা। তাঁহার ইচ্ছা হইলে অবশ্যই 'আসিবে সে দিন আসিবে।'

'সকলই তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।
তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি ॥
* * * *
যে বোল বলাও তুমি, সেই বোল বলি আমি।
আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, তন্ত্রসারে সার তুমি ॥'

আর এ বিষয়ে বেশী বলিব না। দেখিতেছি, মহাজনের নিষেধবাণী বিস্মৃত হইয়াছি।

'আপন ভজন-কথা, না কহিও যেথা সেথা।'

বেশ বুঝিতেছি, এই সুদীর্ঘ নীরস একঘেঁয়ে আত্মকাহিনী পাঠকবর্গের নিরতিশয় বিরক্তিকর হইয়া পড়িয়াছে। চারি বৎসর পূর্ব্বে রোগভোগের বিবরণে বিরক্ত করিয়াছি, সেই বিরক্তি কালের গতিতে লোপ পাইয়াছিল, আবার চারি বৎসর পরে পাঠকবর্গকে বিরক্তির স্থলে আনন্দ দান করিব বলিয়া আরম্ভে প্রতিশ্রুতি দিয়া শেষটা উত্ত্যক্তই করিয়া তুলিলাম। ইহা লেখকের বার্দ্ধক্যদশার অকাট্য প্রমাণ। একটু বিলাতী রসিকতার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। ইহা শুধু 'dotage' (ভীমরতি) নহে,—'anecdotage' বুড়াবয়সের অভ্যাস-মত 'আপন কথা চৌদ্দ কাহন'। এ জন্য পাঠকবর্গের নিকট সানুনয়ে মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়া বিদায় লইতেছি। দীর্ঘ অবকাশ-যাপনের পর কল্য হইতে নিজের ব্যবসায়ের কার্য্যে অনন্যকর্ম্মা হইয়া লাগিব, বিদেশী কবির অতুলনীয় দৃশ্যকাব্যের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে প্রাণ-মন ঢালিয়া দিব। এই ভগ্ন দেহমন লইয়া আর যে কখনও 'জননী বঙ্গভাষা'র সেবা করিবার অবসর ও সামর্থ্য হইবে, এমন ভরসা হয় না। (এখন তো ঝোঁকের মাথায় এই শেষ কথা বলিলাম। তবে দুষ্ট-সরস্বতী ঘাড়ে চাপিলে ভবিষ্যতে কি ঘটিবে জানি না।) ইতি ১৮ই আষাঢ় ১৩৩৪, রবিবার।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

যে নদীতে জল বেশী, সেই নদীতেই নৌকা চলে, তাহার ভিতরের গভীরতাই তাহাকে পার হইবার সাহায্য করে। কিন্তু পারের তরণী না হইলে আবার সে গভীরতাই তাহার পক্ষে দুস্তর হইয়া দাঁড়ায়।

চন্দ্রকলার অন্তরে অন্তরে যে ভীষণ পরিবর্ত্তনের স্রোত বহিয়া গিয়াছিল, তাহার উদ্দাম প্রভাবে তাহাকে একবারেই ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া আবার নূতন করিয়া গঠিত করিয়াছে। রূপ-জীবিনী নর্ত্তকী হইলেও অন্তরের গভীরতা তাহার সামান্যার মতই হয় ত ছিল না, তাই সে দিনের শুভলগ্নে তাহার শুভগ্রহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তাহার চির-তৃষিত অন্তরে অকস্মাৎ স্বর্গীয় পিযূষধারাবৎ পবিত্র প্রেমের প্রবাহ বন্যাধারার মতই প্রবাহিত করিয়া দিয়া তাহার সকল পঙ্কিল আবিলতাকে কোন্ সুদূর মহা পারাবারে ভাসাইয়া লইয়া গেল! তাহার অন্তরের প্রবলতাই তাহাকে মুক্তি-পথের নিশানা দেখাইয়া দিল। মানব-প্রেমের ক্ষুদ্রাভিলাষকে সে দেবতার প্রেমের মত করিয়াই নির্ব্বিকারে নিজের মাথায় তুলিয়া ধরিল। সে প্রেমে আর বাসনা-কামনার মোহ-গন্ধ কোথাও বাকি রাখিল না। শুধু পূজা, শুধু ধ্যান ও ধারণা।

কিন্তু ভাগ্য তাহার সহসা এ সুখেও তাহাকে বাধার দ্বারা প্রচণ্ড আঘাত পাঠাইয়া দিল। এতটাই যে ঘটিতে পারে, এ যেন তাহার মনের মধ্যেও ছিল না! রাজাধিরাজের অতি-প্রণয়ের অনেক নিদর্শনই সে দেখিয়াছে বটে, তবে সে যে এতটাই, এ কথা সে কোন দিনই হিসাব ধরিয়া দেখে নাই। এতটা যদি তাহার জানা থাকিত, তবে রামপালসম্বন্ধীয় নিজের মনোভাবকে সে হয় ত তাঁহার নিকট গোপনের চেষ্টাই করিত। কিন্তু এখন? বৃথাই এ অনুশোচনা! নিজের হাতে,—হউক – তাহা সে নিজেরও অজ্ঞাতে যে আগুন একবার ঘরের চালের উপরে খেলাচ্ছলেও দিয়া ফেলিয়াছে, তাহাকে আর ফিরাইয়া লইবার উপায় তাহার হাতের মধ্যে নাই। সেই স্বহস্তপ্রদত্ত অগ্নিরাশি তাহার সর্ব্বস্ব গ্রাস না করিয়া আর ত ছাড়িবে না। বড় বেশী দয়া করে ত, না হয় তাহাকেও তাহার ক্ষুধিত জঠর-মধ্যে একটু স্থান কৃপা করিয়া দিলেও দিতে পারে এই, পর্য্যন্তই।

চন্দ্রকলার সর্ব্বশরীর সহসা শীতল-কঠিন ভারাক্রান্ত হিম-শিলায় জমিয়া উঠিল। উঃ, কি রাক্ষসী সে! তাহার লোলুপ, লুব্ধ দৃষ্টির শিকার হইয়া ক্ষুদ্র মৃগ নহে, পরন্তু যে মত্ত যূথপতি গজরাজ আজ সামান্য শশরূপেই আততায়ি-শরাঘাতে জর্জ্জরীভূত, তাহাকে তুচ্ছতম ভাবে তাহার এই অত বড় মহৎ জীবনকে সমাধা করিতে হইবে, এ শুধু তাহারই জন্য! এ শুধু তাহারই লোভের ফল,—তাহারই উদ্দাম মোহের প্রায়শ্চিত্ত! হা সুগত! হা সর্ব্বোত্তম! এই কি তোমার অহিংসা-নীতির চরম ফল? পশুবধ যাহাদের নিষিদ্ধ, তাহাদেরই ক্ষুদ্র ঈর্ষার জ্বালায় মানুষকেই সামান্য পতঙ্গের মত ভস্ম হইতে হয়? হা সুগত! কোথায় তুমি! কোথায় তোমার সেই অহিংসার মহাবাণী! একবার এ সময়ে এই চণ্ড-নীতি-পরায়ণ দুর্দ্দান্ত রাজ-রাক্ষসের কঠোরচিত্তে উহা বিবেক-বাণীরূপে প্রেরণ করিয়া ইহাকে এত বড় একটা ভয়াবহ কাণ্ড হইতে নিবৃত্ত করিয়া দাও, দাও প্রভু! দাও – দাও!

ক্ষণকাল ধরালিঙ্গনে পতিত থাকিয়া চন্দ্রকলার মনে হইতে লাগিল—তাহার চারিপাশ ঘিরিয়া সারা পৃথিবী জুড়িয়া যেন একটা যন্ত্রণার্ত্ত হাহারব উঠিয়াছে। সেই অতীন্দ্রিয় মর্ম্মজ্বালাভরা ভীষণ আর্ত্তনাদে তাহার সমস্ত শরীরের রক্ত মাংস ভেদ করিয়া তাহার অস্থিমজ্জা পর্য্যন্ত যেন কাঁপিয়া শিহরিয়া উঠিল। অনুতাপের তীব্র তিরস্কার যেন একগাছা কাঁটার চাবুকের মতই তাহাকে কাটিয়া, বিঁধিয়া,

ছিঁড়িয়া ফেলিবার উপক্রম করিল। সেই অসহ্য যন্ত্রণায় তাহার বুকের পাঁজরাগুলা এক একখানা করিয়া খসিয়া পড়িবার মত হইল। তাহার মনে হইল, পৃথিবীতে আর যেন কোনখানে কিছু নাই, সুখ নাই, শান্তি নাই, মুখ লুকাইয়া থাকিবার মত এতটুকু একটু রন্ধ্র পর্য্যন্ত নাই,—আছে শুধু প্রায়শ্চিত্ত! আছে শুধু প্রতিশোধ! ওজনের তুলাদণ্ডে মাপ করিয়া একবারে মাপে মাপ করা অমোঘ প্রতিশোধ, আর কিছু না।

উঃ! কি ভীষণ স্থান এই পৃথিবীটা! এখানের এতটুকু পাপ কি কোনমতেই ব্যর্থ হইয়া যাইতে পায় না? আর তাহার সে ফলও কি এতই শীঘ্র ফলিয়া উঠে!

অসহ্য ব্যথা যেন গুরুভার মন্দরপর্ব্বতের মতই নর্ত্তকীর আনন্দ-চপল চিত্তের উপর এমনই করিয়া যখন চাপিয়া বসিয়া তাহার শ্বাসরোধ করিয়া দিবার উপক্রম করিতেছিল, তখনই কোথা হইতে একটা অসংবরণীয় অশ্রুর প্রবাহ উদ্দামবেগে ছুটিয়া আসিয়া, তাহার সেই অনিশ্বসিত আর্ত্ততা হইতে তাহাকে যেন কথঞ্চিৎ রক্ষা করিল। ধরালিঙ্গনে লুণ্ঠিতা হইয়া চিরবিলাসিনী চন্দ্রকলা অসহায়-তপ্ত অশ্রুর নিঝর ধারা সেই কঠিন বসুধাবক্ষে সৃষ্টি করিয়া দিল, কিন্তু তথাপি নিজেকে সে শান্ত করিতে পারিল না। তবে এই অজস্র অশ্রুধারা তাহাকে জ্বলিয়া পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যাওয়া হইতে কতকটা যেন রক্ষা করিল। তাই চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে গলবস্ত্রে দীন ও আর্ত্তনেত্রে উর্দ্ধে চাহিয়া সে বারংবার—বার বার এই বলিয়া তাহার অসীম অব্যক্ত কথাকে ব্যক্ত করিতে লাগিল, "হে সুগত! হে আর্ত্তজনত্রাতা! তোমার দয়া হ'লে কি না ঘটে! অন্ধ চক্ষুষ্মান্ হয়, পঙ্গু গিরিলঙ্ঘন করে। সেই কৃপাকণা বর্ষণে তুমিই মহাকুমারকে বিপন্মুক্ত করিয়া দাও। আমার যাবতীয় ধন-রত্ন-সুবর্ণ দিয়া আমি তোমার সুবর্ণময় মূর্ত্তির সহিত বিহার প্রতিষ্ঠা করিয়া দিব। আজন্মের মত সকল আশা-বাসনায় জলাঞ্জলি দিয়া তোমার দ্বারে, শ্রাবিকা ব্রত অবলম্বন করিব, আমার ধন-প্রাণ সবই তোমার চরণে উৎসর্গ করিয়া দিব।"

এমনই করিয়াই দিনের পর দিন চলিয়া গেল, অনাহারে অনিদ্রায় ঘোরতর দুশ্চিন্তায় দেখিতে দেখিতে অপরূপ লাবণ্যময়ী তরুণী চন্দ্রকলা তাহার এই পরিপূর্ণ নব-যৌবনেই যেন জরা-জর্জ্জরিতা বৃদ্ধার মতই হতশ্রী হইয়া পড়িল। অথচ দিন রাত্রি ভাবিয়া ভাবিয়াও সে কোন উপায় বা উপায়ান্তরের সন্ধান করিতে পারিল না। একদিন সাহসে বুক বাঁধিয়া রাজাধিরাজের বিলাস-গৃহে সে ব্যাপিকা গমন করিয়াছিল, কিন্তু তাহার দুর্ভাগ্যক্রমে রাজাধিরাজ গৃহে ছিলেন না। তিনি নদী-পরপারের নবরচিত কানন-গৃহে বিলাস-রাত্রি যাপন করিতে গিয়াছিলেন। পরদিন গিয়াও সে রাজদর্শন লাভ করিতে পারিল না। রাজা অনুপস্থিত। পত্র লিখিয়া উত্তর পাইল,—"যাহার প্রেমে আত্মবিস্মৃত হইয়া আমার প্রেমের অবমাননা করিয়াছ, আমার সেই চিরশত্রুর উচ্ছেদের পর আমাদের পুনঃ সাক্ষাৎ ঘটিবে, ইতিমধ্যে নহে। এক্ষণে ধৈর্য্য ধরিয়া সে দিনের প্রতীক্ষা করিও।"

এই নিষ্ঠুর পত্র পাইবার পর শেষ আশা-সূত্রটুকুকে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া এইবারে সম্পূর্ণ আশাহীনা হইয়া চন্দ্রকলা নিজেকে একেবারে দৃঢ়সঙ্কল্পে কঠিন করিয়া লইল। এইবার সে মুমূর্ষুর শেষ চেষ্টার ন্যায় তাহার প্রচণ্ড দুঃসাহসকে মাত্র সহায় করিয়া লইয়া, নিঃশঙ্ক স্থিরচিত্তে গভীর রাত্রিতে একা অরক্ষিতভাবে গৃহত্যাগ করিল। অভিসারিকার সজ্জিত সুন্দর বেশ ছাড়িয়া সে এক খণ্ড চীর ধারণ করিল, কিন্তু সঙ্গে লইল, তাহার ঐশ্বর্য্যের সারভূত অমূল্য মণিমাণিক্যখচিত পেটিকাবদ্ধ অলঙ্কাররাশি। রাজাধিরাজপ্রদত্ত এই সেদিনকার পাওয়া লক্ষ সুবর্ণ নিষ্ক মূল্যে ক্রীত ভারত-রত্নের সারভূত গজমতিহারটিকেও সে ফেলিয়া গেল না।

নগর-তোরণের দক্ষিণ-পূর্ব্বে নির্জ্জন নিভৃত এক ক্ষুদ্র কৃত্রিম শৈল-সানুদেশে কষ্টাগার নামধেয় নির্জ্জন কারাগৃহের গগনস্পর্শী প্রাচীরের দিকে চাহিয়াই চন্দ্রকলার সকল আশা তাহার ভয়ার্ত্ত অন্তরের মধ্যেই বিলীনপ্রায় হইয়া আসিল। এই দুর্লঙ্ঘ্য ও অভেদ্য পাষাণ প্রাকারের অভ্যন্তরে কোথায় কোন্ নিভৃত গহ্বরে সেই শৃঙ্খলাবদ্ধ রাজবন্দী জনশূন্য—হয় ত শব্দশূন্য পাতালগর্ভের আর্দ্র কঠিন অন্ধকারের মধ্যে মৃত্যুরও অধিকতর যন্ত্রণা সহ্য করিয়া পলে পলে মরণেরই নির্ম্মম স্পর্শ অনুভব ও তাহারই অতর্কিত আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, কেমন করিয়া এই মুগ্ধা অসহায়া নারী সেখানে গিয়া তাঁহার উদ্ধারসাধন

করিবে? এ-ও কথন সম্ভব? সে নিশ্চয়ই ভাবাবেশে ও আত্মকর্ম্মানুশোচনায় উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছিল। নতুবা এত বড় অসম্ভাব্য বিষয়েরও সম্ভব-চেষ্টা কোন-স্থির মস্তিষ্ক ব্যক্তি করিতে পারে কি?

সে কি তবে ফিরিয়া যাইবে? যাহা আকাশমার্গে দুর্গ রচনার মতই অসম্ভব, বৃথা তাহার কল্পনায় ঘুরিয়া মরায় ফল কি?

কিন্তু না, না—না, না,—পিশাচী চন্দ্রকলা! এখনও তোর ঘরে ফেরার সাধ? পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের শ্রেষ্ঠরত্ন তোর লালসার দৃষ্টিতে ক্ষয়প্রাপ্ত—বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে, তোর বুকের রক্তধারা ঢালিয়া দিয়া তাহার উদ্ধারের চেষ্টা না করিয়াই তুই ঘরে ফিরিয়া যাইবি? ওরে কোথা আজ তোর ঘর? সে ঘর যে আগুনের জ্বালায় ভরা, ভয়াবহ অগ্নিকুণ্ড মাত্র। ঘর যে তোর পুড়িয়া গিয়াছে! আজ এই দৃঢ়, রূঢ় অচ্ছেদ্য, অভেদ্য পাষাণকারার পাষাণ প্রাচীরে মাথা ঠুকিয়া মরিলেও তোর বরং শান্তি আছে, তবু সেই অগ্নিদাহভরা নির্ম্মম, কঠোর গৃহের পুষ্পশয্যাও এর চেয়ে তোকে আরাম দিতে পারিবে না। অন্ধকারে স্থির জ্বালাময় দৃষ্টি মেলিয়া পদে পদে স্খলিতপদ হইয়াও নর্ত্তকী সাবধানে শৈলারোহণ করিতে লাগিল। এই ক্ষুদ্র শৈলটি স্বভাবতঃই বালুকা ও নোড়া-নুড়ির তৈরি, তাহাতে কোথাও রাস্তা নাই। খাড়া চড়াই উঠিতে কোমল দেহ শ্রান্ত ও পদযুগল রক্তাক্ত হইয়া গেল। কত বার পড়িতে পড়িতে কোনমতে আত্মরক্ষা করিল। এই ভাবে এক প্রহরকাল ধরিয়া সে সেই ক্ষুদ্র অথচ সঙ্কটময় ছোট পাহাড়টিতে উঠিয়া অতি কষ্টে এবং প্রায় অবসন্ন শরীরে দুর্গপাদমূলে পৌঁছিল।

কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর ঘোর অন্ধকার রাত্রি। তাহার উপর আকাশে সে দিন একটু একটু মেঘ করিয়াও আছে। বাতাসও বেশ জোরে বহিতেছে। মধ্যে দুচার ফোঁটা জলও একবার চন্দ্রকলার মাথার উপর ঝরিয়া পড়িল। তাহার চোখ দিয়াও তখন নিঃশব্দে দুইটি জলের ধারা ঝরিতেছিল। ইহা অতি কষ্টে ও অত্যন্ত উল্লাসে, ভয়ে ও আশায় মিশ্রিত।

সেই নৈশ অন্ধকাররাশির মধ্যে এই নির্জ্জন কৃত্রিম শৈলশিখরে একা অসহায়া নারী ভয়ে ভীত দৃষ্টি তুলিয়া চারিদিকে চাহিতে চাহিতে আবার একটা সুগভীর হতাশার আঘাতে তাহার এতক্ষণকার সমস্ত উদ্যম ও আশা যেন কোথায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়া গেল। তাহার দুই-পায়ের পাতা যেন মুচড়াইয়া পড়িল, তাহার দুই জানু যেন ভাঙ্গিয়া গেল। হতাশ ও ব্যাকুল হইয়া সে সহসা সেই স্থানের কর্কশ কঠিন পাথরের স্তূপের উপর লুটাইয়া পড়িয়া ঊর্দ্ধস্বরে একটি যন্ত্রণার্ত্ত উচ্চ ধ্বনি করিয়া উঠিল—"হায় শাস্তা! এ কি শাস্তি দিলে!"

"কে ওখানে?" সঙ্গে সঙ্গেই অতি গম্ভীর স্বরে এই প্রশ্ন শ্রুত হইল এবং কাহার গুরু পদধ্বনি ক্রমশঃ নিকট-বর্ত্তী হইতে লাগিল। চন্দ্রকলার নৈরাশ্য-পীড়িত অবসাদগ্রস্ত দেহে প্রথমে একটা আশঙ্কার তড়িৎ বহিয়া গিয়াই পরক্ষণেই আর একটা ঈষৎ আশার প্রদীপ ক্ষীণ শিখায় জ্বলিয়া উঠিল। এই বলিয়া সে ভয়টাকে মনের মধ্যে দমন করিয়া লইল যে, "মরার বাড়া তো আর গাল নাই, আমি যখন মরিতেই বসেছি, তখন আমার আবার ধরা পড়বার ভয় কেন? বরং এই নিরুপায় অসহায় অবস্থায় যদিই বা এই মানুষটার দ্বারা কোন এক বিন্দু উপকার পাওয়া যায়।" তাই নূতন আশায় নর্ত্তকীর ছড়াইয়া পড়া শিথিল দেহ মন যেন আবার কেন্দ্রবর্ত্তী হইয়া আসিল।

"কে এখানে কাঁদে রে?" বলিয়া একটা বজ্র-কঠিন হুঙ্কার ছাড়িয়া সেই নিকষ-কালো অন্ধকারকে অধিকতর জমাট করিয়া তুলিয়া এক ভীমকান্তমূর্ত্তি প্রহরী আসিয়া চন্দ্রকলার সম্মুখে দাঁড়াইল। আবার সেই অন্ধকারের জমাট ফাটিয়া শব্দ উঠিল—

"শীঘ্র বল্ কে তুই? এখানে মর্তে এসেছিস্। এখনই মশাল নিয়ে আস্তে আদেশ দোব—"

এই কথায় চন্দ্রকলার সমস্ত শরীরের ভিতর দিয়া একটা প্রবল কম্পন বহিয়া গেল। যে অবস্থাকে সে সুযোগ বোধ করিয়াছিল, তাহাই যে এখনই ঘোরতর দুর্য্যোগে পরিবর্ত্তিত হইতে চলিয়াছে, ইহা বুঝিয়া সে সভয়ে সহসাই উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "আমি নর্ত্তকী চন্দ্রকলা।"

প্রহরী এই ভীমদর্শন কষ্টাগারের প্রহরা-নিযুক্ত প্রহরী, কঠোর জীবনযাপনে বাধ্য হইলে কি হয়? আসলে সে এক জন সৌখীন পুরুষ। সুযোগ এবং অবসর পাইলেই মধ্যে মধ্যে নগরীমধ্যে প্রবেশ করিয়া সম্ভব হইলে একটুখানি আমোদ-প্রমোদে কাটাইয়া আইসে। রাজ-নর্ত্তকী চন্দ্রকলা ও বিদ্যুৎ-মালার নাম, শুধু নামই নয়, উভয়েরই রূপের সহিত তাহার

চাক্ষুষ পরিচয় ছিল। চন্দ্রকলাকে দেখিয়া আসিয়া পাঁচ রাত্রি সে ঘুমাইতে পারে নাই, অহোরাত্রই তাহারই ধ্যান করিয়াছে। বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া গিয়া সে সচমকে উত্তর করিল, "অসম্ভব! রাজ-নর্ত্তকী চন্দ্রকলা এই অন্ধকার দুর্য্যোগ-রাত্রিতে কষ্টাগারের দরজায় কি জন্য আসবে? সে এখন রাজার বিলাস-শয্যার সঙ্গিনী। কে তুই ঠিক ক'রে বল, না হ'লে—"

চন্দ্রকলা এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া কি ভাবিয়া লইল, তাহার পর সে কথা কহিল। মধুর স্বরে কহিল,—"জগতে সবই সম্ভব ভাই, রাজপুত্র তথাগত কিসের দুঃখে সুখসম্পদ ছেড়ে বনবাসী হয়েছিলেন বল ত? তুমি চন্দ্রকলাকে কখন দেখেছ কি?"

প্রহরী কহিল, "নিশ্চয়! আমি এই জঘন্য জায়গাটায় থাকি বটে, তবে দেখা-শোনা আমার কিছুই কম নেই। আমি মহাস্থবির বুদ্ধদত্ত থেকে নর্ত্তকী বিদ্যুৎমালা, চন্দ্রকলা, সব্বাইকেই দেখেছি। শুধু তাই নয়, ওদের নাচ-গানও আমার কিছু কিছু দেখা-শোনা আছে।"

চন্দ্রকলা কহিল, "তবে শোন দেখি, এ গান চন্দ্রকলার গলার কি না? এই বলিয়া সে মৃদু মৃদু গাহিল।"—

"দুল্লহ জন অনুরায়ো, লজ্জাগুরুই পরবস অপ্পা --
পিয়সহি! বিসমম পেম্মং, মরণং শরণং বরি অ মেক্কং।"

আশঙ্কায় ও উত্তেজনায় তাহার গলা কাঁপিতেছিল। ভাষা অস্ফুট হইয়া স্বর বিকৃত হইয়া বাহির হইল, তথাপি তাহা অতি মধুর! প্রহরী কিছু মুগ্ধ হইল, কিন্তু ক্ষণকাল মনে মনে বিচার করিয়া লইয়া বলিল, "আমায় ঠকাতে পার্ব্বে না। তোমার গান মন্দ নয় বটে, কিন্তু চন্দ্রকলার গলার সঙ্গে এর তুলনা তেম্‌নি হয়, যেমন আমার সঙ্গে রাজার! আহা! সেই গান যদি আর একবারও ভাল ক'রে শুনে আমি ম'রেও যাই!"

চন্দ্রকলা অন্ধকারে সরিয়া আসিয়া প্রহরীর অঙ্গ স্পর্শ করিল, "আমি তোমায় আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে গান শোনাবো। বিশ্বাস করো ভাই, আমিই সেই! যদি বিশ্বাস না হয়, কোথায় তোমার মশাল আছে, জ্বেলে নিয়ে এস। না হয় আমায় সেইখানে সঙ্গে ক'রে নিয়ে চলো, দেখবে আমিই সেই রূপসী-শ্রেষ্ঠা গায়িকাকুল-শিরোমণি সুবিখ্যাত নর্ত্তকী চন্দ্রকলা।"

প্রহরীর সন্দিগ্ধচিত্ত তখনও সে দিনের আকাশের মতই ক্ষণে ক্ষণে সংশয়ের মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া যাইতেছিল। সে এই প্রস্তাবে সাগ্রহে সম্মত হইয়া বলিল, "এত হাওয়ায় ত মশাল জ্বালা থাকবে না, তার চেয়ে তুমি আমার ঘরেই এস না কেন?"

চন্দ্রকলার রূপগর্ব্বিত চিত্ত এই একটা সামান্য হীন নাগরিকের আমন্ত্রণে বারেকের জন্য সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়াই পুনশ্চ তাহার সর্ব্বত্যাগী একাগ্র হৃদয়কে একটা নূতন আশার প্রেরণায়, আনন্দে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। সে গভীর আগ্রহভরেই অগ্রসর হইয়া কহিল, "চলো তবে, কোথায় নিয়ে যেতে চাও, আমি আর বেশীক্ষণ দেরি করতে পারবো না।"

তমসাচ্ছন্ন মধ্যরাত্রি; সমস্ত চরাচর তন্দ্রাচ্ছন্ন। ঊর্দ্ধে আকাশপথে চলন্ত মেঘের ক্ষণ ক্ষণ গতায়াতে অসংখ্য তারা লোকলোচন হইতে ক্রমাগতই অদৃশ্য হইয়া পড়িতেছে। বাতাস কখনও মেঘগুলাকে উড়াইয়া দিয়া আনন্দ উপহাসে অট্টহাস্য করিয়া উঠিতেছে; কখনও বা কিছু সংযত ভদ্র-ভাবে অবলোকন করিতেছে। নগরীর বাহিরের এই নির্জ্জন প্রদেশে কোথাও কোন জনমানবের সাড়া-শব্দ নাই। কেবল এই কৃত্রিম শৈলের পদপ্রান্তে বেত ও কসাড় বনের মধ্যে উচ্চ রবে শৃগাল ডাকিতেছিল।

কারা-দুর্গের বিশাল দ্বার রুদ্ধই রহিল, তাহারই মধ্যস্থ একটি কাটা দরজা দিয়া প্রহরী চন্দ্রকলাকে ভিতরে লইয়া আসিল। এই তুচ্ছ নাগরিকের পিছনে পিছনে তাহারই অপরিচ্ছন্ন ক্ষুদ্র কক্ষে প্রবেশ করিতে রাজ-সেবিতা, সম্মানিতা বারনারীর বিলাসী হৃদয় ঘৃণায় ঈষৎ কুণ্ঠিত হইয়া উঠিলেও সে জোর করিয়া অন্তরের সে ভাবটাকে রোধ করিয়া রাখিল। মনে মনে বলিল, "আমার আর লজ্জা মান ভয় কিসের? তাঁহার জন্য সবই ত আমি বিসর্জ্জন দিয়ে দিয়েছি!"

মশালের উজ্জ্বল আলোকে যখন চন্দ্রকলার মুখ সুস্পষ্ট দৃষ্ট হইল, তখন সহসা সেই দরিদ্র প্রহরীর মনে হইল, সে যেন ঘুমন্ত স্বপ্ন দেখিতেছে! এই রাজরাজেন্দ্র-বাঞ্ছিতা আশ্চর্য্য রূপসী ও অতুল ঐশ্বর্য্যশালিনী নারী বাস্তবিকই যে তাহার মত দরিদ্রের কুটীরে পদার্পণ করিয়াছেন, এ অবিশ্বাস্য সত্যকে কেমন করিয়াই বা সে প্রত্যয় করিয়া

লইবে ? একটা অভূতপূর্ব্ব বিস্ময়ে আনন্দে ও ইহাদের সহিত মিশ্রিত ঈষৎ একটা আশঙ্কায় প্রহরীর ক্ষুদ্র প্রাণ যেন সবেগে আন্দোলিত হইতে লাগিল। সে নিষ্পন্দ-নেত্রে তাহার সম্মুখীন সুন্দরী মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া রহিল, কিন্তু একটি কথাও তাহার ঠোঁট ফুটিয়া বাহির হইল না।

চন্দ্রকলা তাহার অবস্থা দেখিয়া তাহার মন-ভুলানো মিষ্ট হাসি হাসিয়া মধুর কণ্ঠে কহিল, "এবার বিশ্বাস হলো ত, ভাই ? আচ্ছা, এখন একটু বসা যাক্ এস, ভয় কি ? আমি ত আর ভূতিনী নই ? আমায় দেখে তুমি অমন শুকিয়ে উঠ্‌লে কেন ?"

বাস্তবিকই প্রহরীর অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছিল বটে। ভূত দেখিলেও সে হয় ত এতটাও আড়ষ্ট হইয়া উঠিত না। এতক্ষণে ঐ মধুর হাসি ও অভয় বাক্য তাহাকে যেন কতকটা সম্বিৎ দান করিল। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস মোচনপূর্ব্বক সে তখন তাহার সেই ময়লা কাঁথাখানার দিকে বারেক চাহিয়া দেখিয়া দুঃখিতকণ্ঠে কহিল, "আপনাকে আমি কোথায় বসাবো ? আমার ত কিছুই নেই !"

"তাতে কি, আমি এইখানেই বস্‌ছি। তুমি বড় গরীব না ? আচ্ছা, কত বেতন পাও, ভাই ?"

প্রহরী কহিল, "বেতন আর পাই কই ? প্রায় সাত মাস একটি কপর্দ্দকও পাই নি। কি কষ্টে যে—"

চন্দ্রকলার মুখ সহসা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, "এত কষ্ট সইছো কেন, ভাই ? এ অবৈতনিক চাকরী ছেড়ে দিয়ে চাষ ক'রে খেলেও ত যথেষ্ট লাভ হ'তে পারে ? কোন ব্যবসা করলেও ত হয়। এমন ক'রে জীবনপাত করা কেন শুধু শুধু ?—"

প্রহরী একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিল, "চাষের জমী, ব্যবসার টাকা সবই তো চাই। আমি যে বড় গরীব, দেখতেই তো পাচ্ছেন।"

চন্দ্রকলার চোখ দুইটি আনন্দের জ্যোতিতে জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিল, "আমি এই মুহূর্ত্তেই তোমায় পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নাগরিকদের মধ্যে ধনিশ্রেষ্ঠ ক'রে দিতে পারি, যদি তুমি আমার একটুখানি সহায় হও। ভেবে দেখ, এই বিনা বেতনের প্রহরী হয়ে থাকতে চাও, অথবা এই মহামূল্য রত্নপেটিকার অধিকারী হয়ে কোন অজ্ঞাত দেশে গিয়ে রাজৈশ্বর্য্য সম্ভোগ করতে চাও ?"

চন্দ্রকলা তাহার বস্ত্রমধ্য হইতে সুবর্ণ পেটিকা বাহির করিয়া তাহার আবরণ মুক্ত করিয়া ধরিল। মশালের উগ্র আলোকে তাহার মধ্যস্থিত মহামূল্য হীরকাদি হইতে একটা অনৈসর্গিক অত্যুজ্জ্বল দীপ্তি বিচ্ছুরিত হইয়া মুগ্ধ প্রহরীর স্তম্ভিত দৃষ্টি ধাঁধিয়া দিল। তাহার কণ্ঠ উগ্র বিস্ময়ে একটা অর্দ্ধস্ফুট শব্দমাত্র উচ্চারণ করিতে সমর্থ হইল।

তাহাকে বাক্যাহত ও বিমূঢ় দেখিয়া পুনশ্চ নূতন আশায় উৎফুল্ল হইয়া চন্দ্রকলা কহিল, "এই সবই তোমায় দিব। এর দামে একটা বড় রাজ্য স্থাপন করা যায়, এ নিয়ে এই রাত্রিতেই তুমি এ দেশ থেকে পালিয়ে গেলে কে জান্‌তে পারছে ? দেখ, জগতে এখনও কোন জনপ্রাণীটিও জেগে নেই। এই অবসর, এ নষ্ট হ'লে তোমার সারাজীবনে আর কি কখন এ সুযোগ তুমি পেতে পারবে ? তাই বলি, আমার প্রস্তাব তুমি অগ্রাহ্য ক'রে নিজের সর্ব্বনাশ ক'রে বসো না !"

প্রহরীর বিস্ময়-বিহ্বলতার স্থান ক্রমশঃই দুরন্ত লোভ আসিয়া অধিকৃত করিয়া লইতেছিল। একটা উদ্দাম আশার দুরন্ত ক্ষুধায় তাহার চোখ দুইটা যেন জ্বলিয়া উঠিল, সে কহিল, "বলুন আমায় কি করতে হবে ?"

চন্দ্রকলা ঈষৎ নিকটস্থ হইয়া নিম্ন স্বরে কহিল, "মহাকুমার রামপালদেবের মুক্তি চাই। তাহারই বিনিময়ে এই লক্ষ লক্ষ সুবর্ণ মূল্যের অলঙ্কাররাশি তোমার প্রাপ্য হবে। বল ? সম্মত ?"

প্রহরী আকস্মিক আঘাতপ্রাপ্তের ন্যায় সর্ব্বশরীরে সুস্পষ্ট চমকে চমকাইয়া উঠিল, তাহার মুখে ভূতাহতের মত আতঙ্কের চিহ্ন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। সে ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিল, "মহাকুমার রামপালদেবের মুক্তি ! সে যে অসম্ভব !"

"অসম্ভব ! কেন অসম্ভব ? রাজভয়ের ত কোন পথই থাকছে না, তুমি এই অলঙ্কাররাশি নিয়ে তাঁরই সঙ্গে গোপনে পলায়ন ক'রে কোন সুদূর দেশে, যেখানে পাল-সাম্রাজ্য নয়, তেমন স্থানে গিয়ে স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতে পার। পৌণ্ড্রে যখন থাক্‌ছই না, তখন তোমার ভাবনা কিসের ?"

প্রহরীর কম্পিত ওষ্ঠাধর কোন মতে উচ্চারণ করিল, "পালাতে পারলে ত নিরাপদ হব। কিন্তু যদি তার পূর্ব্বে ধরা প'ড়ে যাই, সেই মুহূর্ত্তে শূলে চ'ড়ে প্রাণ হারাবো। ভট্টারিকা

চন্দ্রকলা! দয়া ক'রে আমায় আর লোভ দেখাবেন না। প্রাণ, ধনের চেয়ে অনেক বেশী বড় হলেও, এ লোভ দমন করাও আমার মত লোকের পক্ষে হয় ত বা সম্ভব নয়।"

চন্দ্রকলার আশানন্দে প্রফুল্ল স্মিতমুখ দারুণ নৈরাশ্যের মেঘে অন্ধকার হইয়া গেল, যেন পূর্ণিমার চন্দ্রের উপরে একখানা চলন্ত কালো মেঘ আসিয়া আড়াল করিল। অনেক অনুনয়ে ও প্রলোভনেও যখন সেই ভীত প্রহরীকে সম্মত করিতে পারা গেল না, তখন অবশেষে সে গভীর নৈরাশ্যে একটা অগ্নিগর্ভ তপ্তশ্বাস মোচন পূর্ব্বক অগত্যাই উঠিয়া দাঁড়াইল। পেটিকা হইতে একটি মূল্যবান্ অলঙ্কার উঠাইয়া তাহা ঐ কুণ্ঠিত প্রহরীর হাতে দিয়া সে শেষ আশায় কাতর অনুনয়ে কহিল "একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করিয়ে দাও, এইটুকু দয়াও ত করতে পারো। যদি দেখা করাতে পারো, এই মুক্তাহার তোমায় দান ক'রে যাব।"

"আসুন"—বলিয়া লোভ-কম্পিতপদে রক্ষী অগ্রসর হইয়া চলিল। চন্দ্রকলাও নীরবে তাহাকে অনুসরণ করিল, তাহার চিত্তে ক্ষীণ আশার সহিত লজ্জা, ভয় ও নৈরাশ্যের প্রবল তরঙ্গ সঘনে আবর্ত্তিত হইতেছিল।

অন্ধকার ও নিঃসাড় একটা রুদ্ধ গৃহের অর্গল মোচন করিয়া কারারক্ষী চন্দ্রকলাকে ভিতরে আসিতে ইঙ্গিত করিল। অতিক্ষীণ দীপালোকে চন্দ্রকলা সভয়ে দেখিল, সেটি একটি বায়ুসম্বন্ধশূন্য তমসাবৃত ক্ষুদ্র কক্ষ। এইখানে তাহাকে দাঁড়াইতে বলিয়া প্রহরী একটি পাতাল-গৃহের গুপ্তদ্বার টানিয়া তুলিয়া মৃদুকণ্ঠে কথা কহিয়া বলিল, "খুব সম্ভব এর মধ্যেই মহাকুমার আছেন। সাবধান! বেশীক্ষণ যেন দেরী না হয়। অন্য প্রহরীরা জেগে উঠলে এখনই দু'জনের মাথা কাটা যাবে। তা'রা মেয়েমানুষ ব'লে ও রাজ-প্রেয়সী ব'লেও হয় ত তাদের কর্ত্তব্য করতে কুণ্ঠিত হবে না। একমাত্র আমি ভিন্ন নাচ-গানের দাম এদের মধ্যে আর কেউই বোঝে না। আর তার কারণ, আমি ভিন্ন তা'রা সকলেই বাগ্দী ও ডোম, চারুশিল্পসম্বন্ধে জ্ঞান ও শিক্ষা কখন পায় নি।"

সেই পাতালপুরীর সঙ্কীর্ণ সোপান অতি কষ্টে অতিক্রম করিতে করিতে চন্দ্রকলার ধৈর্য্য যেন সীমাহারা হইয়া আসিল। দুঃখে ও ব্যথায় তাহার বুক যেন ফাটিয়া পড়ার মত হইল। মহারাজাধিরাজ-পুত্র হইয়া আজ এই পার্ব্বত্য মূষিকেরও অপেক্ষা অধম জীবনযাপনে বাধ্য হইতে হইয়াছে, এ কি বিধাতার বিধান? এ কি কখনও সহ্য যায়? অথচ এক পিতৃ-রক্তে জন্ম, ভাই হইয়া এই অমানুষিক অত্যাচার অনায়াসেই তিনি করিতে পারিলেন? এই নরদেহধারী পিশাচেরই অঙ্কশয্যায় কত রাত্রির পর রাত্রি তাহাকে অতিবাহিত করিতে হইয়াছে, ইহাকেই প্রমোদিত করিতে চাহিয়া তাহার জীবনের সমুদয়ই সে তাঁহাকে উৎসৃষ্ট করিয়া দিয়াছে। নিজের এই ধিক্কৃত হীন-জীবনের হেয়তা এই অন্ধ তামসে ভরা গভীর নির্জ্জন গহ্বরতলে দাঁড়াইয়া, আজ যেন তাহার যথার্থরূপেই উপলব্ধি হইল। নরাধমের অন্নে পুষ্ট, ইহার উপভুক্ত দেহখানাকে তাহার সেই মুহূর্ত্তে যেন নখ দিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিতে ইচ্ছা করিল। ক্ষোভে, ক্রোধে, অভিমানে দাঁত দিয়া চাপিয়া শুধু সে নিজের অতি সূক্ষ্ম ঠোঁটখানাকেই ক্ষতবিক্ষত করিয়া তুলিল, আর যে কিছুই তাহার করিবার নাই! মনে মনে বলিল, "কতই ত সুযোগ এসেছিল, কেন এর আগে সেই নর-রাক্ষসটাকে হত্যা করার কথা আমার মনে পড়ে নি?" উপরন্তু কত দিনের কত হাস্য-পরিহাস, লাস্যলীলা মনে পড়িয়া নিষ্ফল লজ্জার জ্বালায় তাহার বুকের মধ্যে আগুন লাগার মত ধু ধু করিয়া জ্বলিতে লাগিল। এক একটা স্মৃতি যেন আজ বজ্র-কণ্টকে মনটাকে তার বিঁধিয়া তুলিল।

কষ্টে ঈষৎ আত্মদমন করিয়া লইয়া অন্ধকার গুহামুখে মুখ করিয়া অনতিউচ্চকণ্ঠে সসঙ্কোচে ডাকিল, "মহাকুমার রামপালদেব! মহাকুমার! জাগ্রত কি?"

বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠ চিরিয়া একটা উচ্চ ক্রন্দন যেন ঠেলাঠেলি করিতে লাগিল। "জাগ্রত কি?" না বলিয়া "জীবিত কি?" প্রশ্ন করাই হয় ত বা সঙ্গত ছিল! ইহার মধ্যে যে নিদ্রা, সে এক মহানিদ্রা হওয়াই সম্ভব! আতঙ্কে তাহার বুক ধড়ফড় করিতে লাগিল। হয় ত—হয় ত সত্যই তাই! এত কষ্ট কি সেই সুখপালিত দেহ এত দিন সহিতে পারিয়াছে?

কিন্তু সহসাই হর্ষ ও বিস্ময়ে তাহাকে রোমাঞ্চিত করিয়া তুলিয়া সেই অন্ধকারে অদৃশ্য পাতাল গৃহ হইতে একটি গম্ভীর স্বর শুনা গেল, "মহাকুমার রামপালদেবের কে নাম করে? তুমি কে? মানবী না প্রেতিনী?"

প্রবল হর্ষোচ্ছ্বাসে রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া গিয়াও কোন মতে

বাক্‌সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রগল্‌ভা কহিল, "আমি চন্দ্রকলা।"

"মাগধী!" স্বরে ঈষৎ বিস্ময়।

"নর্ত্তকী।" বলিয়াই গদ্‌গদ্‌ কণ্ঠে চন্দ্রকলা কহিতে লাগিল, "আজ আর দাসীর আবেদন প্রত্যাখ্যান করো না, প্রভু! দীনের পূজা আজ দীননাথ হ'য়ে এই শেষবারের জন্য গ্রহণ কর। এস, তুমি কোথা আছ, আমি যে তোমায় দেখতে পাচ্ছি না। এস, আমার এই নারী-বেশ পরে তুমি এখান থেকে পালিয়ে যাও। প্রহরী তোমায় কোন বাধা দেবে না। যদি দেয়, দেখ, এই নাও তীক্ষ্ণধার কৃপাণ, পথ মুক্ত ক'রে নিও।"

অন্ধকারে পদশব্দ শুনিতে পাওয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গেই অতি নিকটে অপরিচিত কণ্ঠে কেহ বলিয়া উঠিল, "তোমার এ চেষ্টা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই! শুচীস্মিতে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমি রামপাল নই।"

"তুমি রামপাল নও? তথাগত! আমার সব কষ্ট পণ্ড হলো!"

আর্ত্তস্বরে বিলাপ করিয়া উঠিয়া চন্দ্রকলা সবেগে সেই পাতালগৃহের আর্দ্র মৃত্তিকার উপর বসিয়া পড়িল তাহার অঙ্গ গৃহাধিকারীর চরণস্পৃষ্ট হইল।

অপরিচিত কণ্ঠে মৃদু হাসিলেন, হাসির শব্দ শুনা গেল।

"হয় ত কিছুই পণ্ড হয় নি, চন্দ্রকলা! কিন্তু তুমি কি রামপালের মুক্তি চাইছিলে? এই রকমই যেন শুন্‌লেম না? অথচ আমরা সকলেই জানি, তুমি রাজরক্ষিতা!"

চন্দ্রকলা একটা কাতর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল, বিদ্ধকণ্ঠে প্রত্যুত্তর করিল, "ওগো, তারই যে এ প্রায়শ্চিত্ত! কে তুমি? তুমি কেন আমায় এমন ক'রে বঞ্চনা করলে? কেন আমি তাঁর দেখা পেলুম না? আর ত কোন আশা নেই।"

আবার একটুখানি হাসির শব্দ পাওয়া গেল। "বাঃ, আমি যেন ইচ্ছা করেই তোমায় ঠকালাম! বেশ মেয়ে ত তুমি! আচ্ছা, একটা কায করো না? তুমি আমাকেই কেন উদ্ধার ক'রে দাও না? তা করলে রামপালকে হয় ত আমিই উদ্ধার করতে পারবো। আমি বোধিদেব।"

"আঃ! আপনি মহাকুমারের প্রিয়সখা বোধিদেব? ব্রহ্মবিদ্! আপনাকে প্রণাম কচ্ছি, আসুন, এই যে সিঁড়ি। দ্বার মুক্তই আছে। প্রহরী এক জন মাত্র জাগ্রত। সে আমার কাছে অনেক পুরস্কার পেয়েছে, কিন্তু মহাকুমারকে মুক্তি দিতে সে ভরসা করে না। আমার সমস্ত ধনরত্ন বিনিময়েও না। এখন কি উপায়?"

বোধিদেব কহিলেন, "সে উপায় সৌভাগ্যক্রমে আমার হাতেই আছে। আপাততঃ ওই প্রহরীটাকে হয় হত্যা না হয় বন্দী ক'রে এদিকের পথটাকে মুক্ত ক'রে নিতে হবে মাত্র। এস, তুমি আমার সঙ্গে এস।"

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

রামপালের জীবন-নদী একঘেঁয়ে ভাঁটার মুখেই বহিতেছিল। অতি সহসা সেখানে একটা প্রবল বেগের বন্যাধারা নামিয়া আসিল। রাজপ্রাসাদের সুপাচ্য সুখাদ্য ও সুকোমল পর্য্যঙ্ক শয্যা এমন কি সন্ধ্যাদেবীর প্রেম চঞ্চল বিহ্বল কন্যা মধুর মুখ এ সবই যেন একঘেঁয়েত্বের দরুণ তাঁহার কাছে একরকম অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। চিরপরিচিত চিরভোগ্য স্বাচ্ছন্দ্য তাঁহার অন্তরের বিষদিগ্ধ ক্ষতজ্বালার সঙ্গে যেন কোন মতেই আর নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া চালাইতে পারিতেছিল না, তাই বোধ করি, আজ তাঁহার ভাগ্যের ঈশ্বর তাঁহাকে উহারই ঠিক আর একটা দিককে আবরণমুক্ত করিয়া দেখাইতে বসিয়াছেন। অন্ধকারময় মৃত্তিকাতলস্থ নিরালোক গহ্বরকোটরে উপাধান আস্তরণহীন কম্বল শয্যা এবং দিনান্তে বারেকমাত্র সাধারণ অপরাধীদের জন্য প্রস্তুত কদন্ন, তাহাও প্রাণধারণের উপযোগী – আধপেটা পরিমাণে ইহাই আজ সমগ্র বরেন্দ্রী মণ্ডলের ও প্রবলপরাক্রান্ত পাল সম্রাটগণের বংশধর মহাকুমার রামপালদেবের অবলম্বন। আর এই ভয়াবহ, শোচনীয় বন্দিজীবনে তাঁহার প্রধান অবলম্বন হইয়া উঠিয়াছিল গভীর চিন্তারাশি। কর চরণ শৃঙ্খলিত, হিংস্র জন্তুরও অধম অবস্থায় কঠিন আর্দ্র দুর্গন্ধময় গৃহতলে পতিত থাকিয়া অহোরাত্রি নিজের দুর্ভাগ্যরাশির ও সুদূরাপসৃত বিস্মৃতি-গর্ভে বিলীয়মানপ্রায় সুখ শৈশবের স্মৃতিটুকুর ধ্যান, এই দারুণ দুঃখের দিনে রামপালের একমাত্র সুখ! মহাদেবীর স্নেহমাখা মুখ, তাঁহার মাতৃ-হৃদয়ের সহস্র ছোট বড় অভিব্যক্তি আজ ভিখারী রাজপুত্রের একটুখানি দুঃস্বপ্ন! কিন্তু মহাকুমার চেষ্টা করিয়াও এ পর্য্যন্ত সন্ধ্যার কথা একবারও তাঁহার মনের মধ্যে উঠিতে দিতে পারেন নাই। ভাঙ্গা বাড়ীতে পুতিয়া রাখা যক্ষের ধনের মতই তাঁহার

অন্তরের সেই সঞ্চিত রত্নভাণ্ডার তিনি নিজেও বুঝি একবার নাড়িয়া দেখিতেও ভরসা করেন না। সেই সরলা কোমলা অনন্যসহায়া পতিগতপ্রাণা কিশোরীর আজ যে কি অবস্থাই না ঘটিয়াছে, তাহার কল্পনা করিতে যাওয়াও তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য। হয় ত এই নিদারুণ বজ্রপাতে তাহাকে একবারেই ভস্মীভূত করিয়া দিয়াছে। অথবা যদি ততটা সুখও তাহার কপালে না লেখা থাকে, তবে সে অবস্থা যে কি, তাহার পরিমাপ কাহারও না করাই ভাল। বালক যেমন ভূতাপবাদগ্রস্ত ঘরের দিকে চাহিতে ভরসা করে না, রামপালও তেমনই তাঁহার সব চেয়ে প্রিয়তম স্মৃতিটিকেও তেমনই সভয়ে পরিহার করিয়া চলিতেছিলেন। সন্ধ্যা মরিয়াছে, এ চিন্তাও তাঁহার পক্ষে অসহনীয়, আবার সন্ধ্যা তাঁহার এই অবস্থার সংবাদের পর যে অবস্থায় বাঁচিয়া থাকা সম্ভব, সেও যে মনে করিতে পারা যায় না। এর চেয়ে বুঝি তাহার মৃত্যুও ভাল!

একটা ক্ষুদ্রজাতীয় মূষিক রামপালের পৃষ্ঠে দংশন করিয়া পুনশ্চ তাঁহার গায়ের উপর সড় সড় করিয়া উঠিতে লাগিল। গা নাড়া দিয়া সেটাকে ফেলিয়া দিলেও, পৃষ্ঠের দংশনজ্বালা তাঁহাকে নিরুপায়ভাবেই সহিতে হইল। শোণিত ক্ষরিত হইতেছে জানিয়াও তাঁহার উহা মুছিবার শক্তি নাই, হাত লোহার শিকল দিয়া বাঁধা। একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিয়া আবার বিমনা হইয়া রহিলেন। ক্ষণপরে তাঁহার শীর্ণ, ক্লান্ত অধরপ্রান্তে এক ফোঁটা তীব্র দুঃখের হাসি ফুটিয়া উঠিল। "এর জন্য দুঃখ কিসের রামপাল! এই ত তোমার ঠিক উপযুক্ত! সহস্রের আহ্বানকে উপেক্ষা ক'রে যে গর্ত্তের মধ্যে লুকিয়ে বেঁচে থাকতে চায়, গর্ত্তের মুষিকেরও সে অধম নয় ত কি? এই ভাল, এই ভাল। রামপাল! এই ভাল!"

উপর হইতে এই জনহীন শব্দশূন্য আলোকের সম্পর্কবিবর্জ্জিত কষ্টাগারের রুদ্ধদ্বার টানিয়া তোলার কর্কশ ধ্বনি অতি কঠোর শুনাইল। এ অন্ধকারে যদিও দিবারাত্রি একাকার হইয়া গিয়াছিল, তথাপি অন্নদাতা প্রহরীর যে আসিবার সময় হয় নাই, তাহা সহজেই রামপালের বোধগম্য হইয়াছিল। কোন নূতন ব্যাপারের প্রতীক্ষা করিয়া তিনি নিজেকে সেই মুহূর্ত্তেই প্রস্তুত করিয়া লইলেন। হয় ত এত দিনে তাঁহার পলে পলে প্রতীক্ষিত মৃত্যুরই তাঁহাকে আলিঙ্গন দিবার অবসর দেখা দিল। চকিতের মধ্যে বারেকমাত্র সন্ধ্যার মুখখানা চোখের সামনে বিদ্যুতের মতই ফুটিয়া উঠিল। রামপাল জোর করিয়াই সে দিক্ হইতে চোখ ফিরাইয়া লইলেন। মনে মনে বলিলেন, "এইবার, এত দিনে আমার শাপমুক্তি ঘট্‌লো! আঃ, আমি বাঁচি, আমি বাঁচি। তা যে হ'লেই আমি বাঁচি!"

সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকারের নিবিড়তাকে একখানা তীক্ষ্ণধার ছুরিকার মতই সবেগে বিভক্ত করিয়া দিল, একটি আলোকের রশ্মি। কিন্তু এই গাঢ় তিমিররাশিকে বিধ্বস্ত করিতে তাহার সাধ্য হইল না।

ক্রমে গৃহসোপানে পদ-শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল এবং সহসা একটা মশালের আলো হইতে খানিকটা তীব্র আলো আসিয়া রামপালের এই মাসাধিককালের আলোকসহনে অনভ্যস্ত চোখের উপরে আসিয়া পড়িয়া তাঁহাকে বারেকের জন্য চক্ষু মুদিতে বাধ্য করিল।

প্রহরী আসিয়া নীরবে তাঁহাকে শৃঙ্খলমুক্ত করিয়া দিয়া বিনীত অভিবাদন পূর্ব্বক করযোড়ে কহিল, "আমরা রাজাজ্ঞার অধীন, ঘোরতর অপরাধে অপরাধী হলেও কৃপা ক'রে ক্ষমা করবেন।"

এই বলিয়াই সে পথ প্রদর্শিত করিয়া পুনশ্চ সসম্ভ্রমে কহিল, "আসুন মহাকুমার।"

রামপাল নীরব নতমুখে তাঁহার পিতৃরাজ্যের সেই ক্ষুদ্রতম প্রহরীর অনুজ্ঞা পালন করিয়া ভীষণ গহ্বর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

আঃ, কি আনন্দ! জননী ধরিত্রীর ওই নিরালোক, নিরানন্দ বায়ুহীন অন্ধকারমগ্ন জঠরের মধ্যে বাঁচিয়া থাকার চেয়ে, এই স্নেহ-শীতল সহানুভূতিভরা বায়ুস্পর্শের মধ্যে, এই অসীম উদার উন্মুক্ত অনন্ত আকাশের তলায়, তাঁহার সহস্র সুখ, দুঃখ, বাসনা, কামনাময় স্নেহ অঙ্কে একটুখানি স্থান লইয়া মৃত্যুও কত ভাল! শুধু ভাল নয়, সহস্র গুণেই ভাল। চিরজীবী হও রাধাধিরাজ! খাঁচায় ধরা মুষিকের মত সেই পাতালগর্ভেই খোঁচাইয়া না মারিয়া যে আবার এই পৃথ্বীমায়ের চিরপরিচিত বুকের মধ্যে শেষ-শয্যা বিছাইতে দিয়াছ, তোমার এই অযাচিত করুণার জন্য তোমায় আজ এই যাত্রাপথের শেষ প্রান্তে দাঁড়াইয়া সর্ব্বান্তঃকরণেই প্রণাম করি।

অতিমাত্র বিস্ময়ের সহিত সেই অনন্ত উদ্ভালোকে রামপাল

দেখিলেন, তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া এক দীনবেশিনী নারী তাঁহাকে প্রণাম করিতেছে। বিস্ময়ে তাঁহার সর্ব্ব-শরীর যেন স্তম্ভিত হইয়াছিল। নারী! এই ভয়াবহ, দুষ্প্রবেশ্য ভীষণ কারাগারের মধ্যে, এই অন্ধকার মেদ্ব-মেদুর মধ্যরাত্রিতে কে এই দীনা মলিনা, অথচ রূপ-যৌবনের পূর্ণভারে অলৌকিক শ্রীসম্পন্না তরুণী তাঁহাকে অকৃত্রিম ভক্তি-নিবেদন করিতে আসিয়াছে? কে এই রহস্যময়ী নায়িকা? তাঁহার বুক ঠেলিয়া একটা সাতঙ্ক সম্ভাবনার সংশয় অতি সহজেই তাঁহাকে যেন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।—তবে কি, তবে কি, এ তাঁহার সন্ধ্যা? নির্ম্মম রাজা কি তাঁহার শাস্তি বাড়াইতে তাঁহারই নিজ কুলের কুলবধূকেও এই অমানুষিক দণ্ড প্রদান করিয়া এই কষ্টাগারে পাঠাইয়াছেন? হয় ত এ-ও সম্ভব! হয় ত, কিছুই আর তাঁহার পক্ষে অসম্ভব নাই! কিন্তু মহা-দেবী জীবিতা থাকিতে, হয় ত – তা' হয় ত, মহাদেবী জীবিতা নাই?—তাঁহার সমস্ত দেহ-মন যেন এই ভয়ঙ্কর সম্ভাবনার আভাসে আড়ষ্ট হইয়া উঠিল। পরক্ষণেই প্রকট উন্মত্ত, উদ্দাম, অসহায় কোপে সমস্ত শিরা উপশিরার মধ্য দিয়া যেন আগুনের শিখা বিদ্যুতের বেগে মাথার দিকে দ্রুত ছুটিয়া উঠিল। তিনি তীব্র জ্বালাময় তীক্ষ্ণকণ্ঠে ডাকিলেন, "সন্ধ্যা!"

প্রণতা নারী ততক্ষণে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মশাল-ধারীর হাতের আলোটা তাহার অতি সুন্দর, অথচ এক-বারে পাণ্ডুবর্ণ মুখের উপর সেই মুহূর্ত্তেই বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গেই মহাকুমার সবিস্ময়ে দুই পদ পিছাইয়া গিয়া বিস্ময়-স্খলিত কণ্ঠে মৃদু মৃদু কহিলেন, "চন্দ্রকলা!"

"মহাকুমার! রাজাজ্ঞায় আপনি এখন বন্ধনমুক্ত। যথেচ্ছ গমন করতে পারেন।"

রাজপুত্র চমকিয়া উঠিলেন, নিজের শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল না, ত্বরিতে বক্তা প্রহরীর দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন,"কি বল্লে? আমি রাজাজ্ঞায় বন্ধনমুক্ত? আমি?"

প্রহরী নতমস্তকে অভিবাদন জানাইল।

রামপাল তখন সবিস্ময়ে নর্ত্তকীর মুখে অনুসন্ধিৎসু-নেত্রে চাহিলেন, "রাজা আমায় মুক্তি দিয়েছেন? এ কথার অর্থ কি, চন্দ্রকলা?"

উহাকে নীরব দেখিয়া ক্ষণকালমাত্র পরেই পুনশ্চ সোৎকণ্ঠিতভাবে কহিয়া উঠিলেন, "বুঝেছি, এ তোমারই দান! খুব সম্ভব তুমিই রাজার এই অনুজ্ঞা লাভ ক'রে আমায় মুক্তি দিতে এসেছ! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কেন এত করলে? আমার কাছে কিছুই ত তুমি পাওনি, তবে কিসের জন্য এত বড় দান আমায় দিলে? তুমি ত জানো, তোমায় ফিরিয়ে দেবার মত কিছুই আমার সম্বল নেই, কেবল অনর্থক ঋণজালে আমায় আবদ্ধ ক'রে রেখে দিলে, এ ধার শোধবার যে আমার উপায় দেখিনে।"

মহাকুমারকে একান্ত বিমনা ও সন্তপ্ত বোধ হইল। এতক্ষণে নিজের গভীর মানসিক বিপ্লবকে কথঞ্চিৎমাত্র প্রতিহত করিয়া লইয়া চন্দ্রকলা তাহার অবনত মুখ তুলিল। বক্ষে তাহার সমুদ্রমন্থন চলিতেছিল,হৃদ্‌যন্ত্রের সঘন আলোড়নে কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, গভীর উচ্ছ্বাসে ও হর্ষে দৃষ্টি বাষ্পজলে সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছিল, তথাপি প্রাণপণে কোনমতে বাক্য সংগ্রহ করিয়া গদ্‌গদ্ স্বরে কহিয়া ফেলিল, "ওইটুকু, ওইটুকুই শুধু রেখে দিন কুমার! আর ত কিছুই দিতে পারবেন না, শুধু এই ঋণ-স্বীকারটুকুই আমার পক্ষে যথেষ্ট! এ আর শোধ করতে চাইবেন না। এইটুকু দয়া করবেন!" বলিতে বলিতে তাহার অশ্রু-পরিপ্লুত দুই নেত্র আভ্যন্তরিক কি একটা ভাবে যেন সমুজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল, অস্ফুট সজল কণ্ঠ সতেজ ও সহজ অবস্থায় ফিরিয়া আসিল।

"আমার জন্য এই অতটুকুই রেখে, বাকী সবটাই যাতে তাকেই দিতে পারেন, যাকে দিলে যথার্থ আপনি সুখী হ'তে পারবেন, তারই জন্য আজ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে সচেষ্ট থাকবেন, এইটুকুই আমার আপনার কাছে শেষ ও একমাত্র অনুরোধ! মনে রাখবেন, এ পৃথিবীতে তার আপনি ভিন্ন কেউ নেই। অসহায়া অনাথা সে শত্রুপুরে।"

রামপাল নতমুখে ক্ষণকাল নীরবে চিন্তিত থাকিয়া ধীরে ধীরে মুখ তুলিলেন, "জানি না, কি উপায়ে তুমি আমায় এই মৃত্যু হ'তেও সহস্র গুণে ভয়াবহ কষ্টাগারের ঘৃণিত-জীবন হ'তে রক্ষা করলে। আমার অহঙ্কার চূর্ণ হ'য়ে গেছে। জীবিত দেহে এ যন্ত্রণা সহনাতীত! আমি তোমার এ অযাচিত দয়ার দান অবহেলা করতে পারলেম না। আমার পক্ষে এতে যতই হীনতা প্রকাশ হয় হোক, আমি এ মুক্তি সাগ্রহে গ্রহণ করতেম, কিন্তু আমারই জন্য বিপন্ন আমার মধ্যম সুরপালকে এমনি যন্ত্রণাকর অবস্থায় ফেলে রেখে, আমি কেমন ক'রে নিজেকে এই স্বাধীনতা ভোগ করাতে পারি? ভদ্রে! ক্ষমা করবেন, আমি—"

চন্দ্রকলা সাগ্রহে বাধা দিয়া কহিল, "মহাসামন্ত কারামুক্ত হয়েছেন, হয় ত এই মুহূর্ত্তেই তিনিও এইখানে এসে উপস্থিত হবেন। এখন আমার এই বিনীত নিবেদন যে, আপনারা এই মুহূর্ত্তে এখান থেকে প্রস্থান ক'রে, এই রাত্রেই ছদ্মবেশে দেশত্যাগী হউন। পালসাম্রাজ্যে আপনাদের আর এতটুকুও স্থান নেই জানবেন। যত শীঘ্র পালাতে পারেন, ততই মঙ্গল।"

মহাকুমার বিস্মিত হইলেন, তাঁহার সন্দেহ হইল, হয় ত এ রাজাদেশ মিথ্যা! আবার ভাবিলেন, মিথ্যা হইলে এই বায়ুর দুষ্প্রবেশ্য ভয়াবহ কষ্টাগারের মধ্যে তাহার মত এক জন নারীর এ প্রভাব কোথা হইতে আসিল? তথাপি এই উচ্ছৃঙ্খলচরিত্রা নারীর তাঁহার প্রতি এই অহেতুকী শ্রদ্ধাভরা প্রেমের অসামান্য পরিচয়ে তিনি যেন বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইলেন। বারেকের জন্য তাঁহার মনে হইল, কি দিয়া তাহার এ অপরিশোধ্য ঋণ তিনি শোধ করিবেন? ঈষৎ চিন্তিত থাকিয়া পরে ইহার কোন সমাধান করিতে না পারিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া কহিলেন, "প্রভু বুদ্ধ তোমার মঙ্গল করুন, কিন্তু আমার জন্য তোমায় কোন প্রকারে বিপন্ন হ'তে হবে না ত?"

চন্দ্রকলা হেঁট মুখে নীরবে মাথা নাড়িল। তাহার পর মুখ তুলিয়া সেই গাঢ় অভেদ্য নৈশ অন্ধকারের মধ্যে মাত্র অদূরবর্ত্তী মশালের আলোকে ক্ষীণভাবে দৃষ্ট রামপালের চিরসুন্দর মুখের কষ্ট-বিবর্ণতা গভীর বেদনাভরা নেত্রে ক্ষণকাল নীরবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া মৃদু সমবেদনাপূর্ণ শান্ত স্বরে কহিল, "আমি রাজানুগৃহীতা, আমার আবার অমঙ্গল কিসের, মহাকুমার? আমার জন্য আপনি একটুও চিন্তিত হবেন না। এখন নিজেদের রক্ষা করবার উপায় চিন্তা করুন, আর বিলম্ব অবিধেয়।"

প্রহরি-প্রদর্শিত পথে কারাধ্যক্ষের সমভিব্যাহারে মহাকুমার সুরপাল ও রামপাল সেই গর্জ্জমান অশনির ধ্বনিতে মুখর, ঝঞ্ঝা-বায়ুসন্তাড়িত, গভীর দুর্য্যোগময়ী নিশীথে তাঁহাদের মাসাধিক কালের আশ্রয় প্রেত-ভূমি বা মৃত্যুপুরী-সদৃশ কষ্টাগার হইতে বহির্গত হইয়া আসিলেন। মাথার উপর মুক্ত আকাশ নিকষ কালো মেঘের প্রলেপে ঘন প্রলিপ্ত! ইহার কোনখান দিয়া এতটুকু একটু রন্ধ্র পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বজ্র গম্ভীররোলে হুহুঙ্কার করিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের করাল জিহ্বা লক্ লক্ করিয়া লেলিহান হইয়া উঠিল, বায়ু ভীষণ বেগে বড় বড় গাছ পালা ছিঁড়িয়া উপ্‌ড়াইয়া রাশি রাশি ধূলা দিগ্‌বিদিকে উড়াইয়া ছড়াইয়া দিয়া আশ্রয়হীন, সদ্য বন্ধনমুক্ত, শ্রান্ত-ক্লান্ত রাজপুত্রদের তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারই অনুকল্পে যেন তেমনই নির্দ্দয়ভাবে আক্রমণ করিল। তাঁহাদের চিরপ্রিয়তম, চিরদিনের আশ্রয় জনকভূমি হইতে হয় ত বা চিরবিদায়ের অভিনন্দনের জন্য এই অতুল আয়োজন প্রকৃতি দেবী আজ সযত্নেই সজ্জিত করিয়া দুর্ভাগাদের দুর্ভাগ্যের দশাকে পরিপূর্ণতাই দান করিলেন। অথবা এই নিরপরাধে অযথা অত্যাচারিত মহাপ্রাণ যুবকের এইভাবে একটা ঘৃণিত মহাপাপীর মতই গোপন পলায়নের শোকাবহ দৃশ্যে তাঁহার অভাগিনী জন্মভূমি নিজের অদূর ভবিষ্যতের অবস্থা কল্পনায় এই গম্ভীর শোকাভিনয়ে হাহাকার করিতেছিলেন, তাহাই বা কে বলিতে পারে?

কড় কড় শব্দে বজ্র গর্জ্জিয়া উঠিল, সেই উজ্জ্বল বজ্রালোকে কুমার রামপাল দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে সেই উদ্ভাসিত রক্তালোকে কি বিবর্ণ একখানি মুখ! বিশ্বের বেদনা যেন আজ তাহারই মধ্যে একত্র হইয়া রহিয়াছে। তাহার সেই একান্ত ব্যগ্র-ব্যাকুল দৃষ্টি সহ্য করিতে না পারিয়া কুমার শিহরিয়া দৃষ্টি নত করিলেন, সৌভাগ্যক্রমে সঙ্গে সঙ্গেই সেই অত্যুজ্জ্বল লোহিতালোক মুহূর্ত্ত মধ্যেই ঘন জমাট অন্ধকারের রাশির মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া গেল।

তথাপি সতীর সুপবিত্র লজ্জাভরা ভালবাসায় চিরাভ্যস্ত রামপাল এই গর্জ্জমান বজ্রাগ্নি-শিখাদগ্ধ বিক্ষুব্ধ উগ্র প্রেমের পূর্ণ পরিচয়লাভ করিতেই পারিলেন না। প্রচণ্ড ঝঞ্ঝার মত, প্রলয়াগ্নির মত যে ক্ষুধিত ক্ষুব্ধ বাসনার অনির্ব্বাণ বহ্নিজ্বালা চন্দ্রকলার স্তব্ধ নিঃশব্দ বুকের ভিতরটাকে ভস্ম করিয়া দিয়া জ্বলিতেছিল, তাহার প্রতি নিমেষ মাত্র না চাহিতেই রামপালের মানস-দর্পণে তখনই বিভাসিত হইয়া উঠিল, বিচ্ছেদরাত্রির ব্যর্থ প্রতীক্ষায় একান্ত শোকোদ্বিগ্না অশ্রুপ্লুতা সন্ধ্যা-কমলতুল্যা সন্ধ্যার অসহায় ম্লানমুখ।

"বিদায় ভদ্রে! এ জীবনে আপনার এ ঋণ পরিশোধ্য নয়। অভাগা রামপালের চিত্তে আপনার এই মহত্ত্বের চিত্রখানি চিরসমুজ্জ্বল হয়ে থাকবে।"

"মহারাজকুমার! আমি ধন্য হলেম।" [ক্রমশঃ।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

নির্ব্বন্ধ

রাজমোহন কলেজ চন্দনপুরের বিখ্যাত বিদ্যাপীঠ। অঘোর বাবু ইহার প্রতিষ্ঠাতা এবং দণ্ডমণ্ডের কর্ত্তা। ষাট বছর বয়সেও তাঁহার খাটিবার শক্তি অসাধারণ। কদমফুলের মত ছাঁটা তাঁহার মাথার চুলগুলি পাকিয়া সাদা হইয়া গিয়াছে। গোঁফদাড়ী কামানো। কিন্তু ভ্রূ দুইটি নিবিড় কেশাচ্ছন্ন হইয়া যেন গোঁফ এবং দাড়ী কামাইয়া ফেলার প্রতিশোধ লইতেছে! তাঁহার এই ঘন জোড়া ভ্রূ দুইটিও পাকিয়া সাদা হইয়া গিয়াছে। দেখিলে মনে হয়, কে যেন তাঁহার কপালের দুই পাশে আটা দিয়া খানিকটা তুলা আঁটিয়া দিয়াছে! তাঁহার সেই বিপুল ভ্রূযুগলের প্রচুর শ্বেত কেশরাশির একটা স্বাভাবিক বিভীষিকা ছিল বটে, কিন্তু ঠিক তাহার নীচেই তিনি যে সবুজ কাচের গোল চশমা জোড়াটা সর্ব্বদা ব্যবহার করিতেন, সেইটাই ছিল সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক! সেই রঙ্গীণ মোটা চশমা জোড়াটার ভিতরেই যেন অঘোর বাবুর প্রবল প্রভুত্বের সকল রহস্যই গুপ্ত ছিল।

অনেকগুলি ছেলেমেয়েকে অকালে হারাইয়া বুড়ার এখন যে ছেলেটি একমাত্র সম্বল, সেই সুরমোহন তাহার এই ভীমদর্শন পিতাকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভয় করিত। সুরমোহন তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান। স্ত্রী-বিয়োগের পর সংসারে উদাসীন অঘোরমোহন নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া যখন আবার দেশে ফিরিয়া আসিলেন, তখন স্বর্গীয় পিতার নামে স্বগ্রামে এই রাজমোহন কলেজ স্থাপনা করেন।

অঘোরমোহনের এক বিধবা পিসী তাঁহার সংসারভুক্ত হইয়া বাস করিতেন। সুরমোহনকে তিনিই মানুষ করিয়াছিলেন। বড় বৌয়ের যাইবার পর তিনি অঘোরমোহনকে আর একটি বিবাহ করিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু পিসীমার এ সাধ তিনি পূর্ণ করিতে পারেন নাই।

পিসীমার একটি উপযুক্ত পুত্রও এই সংসারে প্রতিপালিত হইতেছিল, তাহার নাম করালীচরণ। করালীচরণের একটি পা শৈশবেই খোঁড়া হইয়া গিয়াছিল। লেখাপড়াও সে বিশেষ কিছু শিখিবার অবকাশ পায় নাই। অঘোরমোহন তাঁহার এই অক্ষম ভাইটিকে স্কুলের কেরাণী পদে বহাল করিয়াছিলেন। কাযে যোগ দিবার প্রথম দিনেই স্কুলের ছেলেরা করালীচরণের চরণাশ্রিত খুঁৎটুকু আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছিল এবং কিছুদিনের মধ্যেই কোনও কোনও সাহসী ছেলে করালীর সম্মুখেই তাহার চলিবার যে একটু বিশেষ খঞ্জভঙ্গী ছিল, তাহার হুবহু অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বুদ্ধিমান্ করালীচরণ অমনই তাহার পরদিন হইতে কোনও ছেলে স্কুলে আসিবার পূর্ব্বেই 'আফিস-ঘরে' প্রবেশ করিত এবং ছুটীর পর যতক্ষণ না ছেলেরা বাড়ী চলিয়া যাইত, ততক্ষণ আর আফিস ঘরটি ছাড়িয়া বাহির হইত না। এমনই করিয়াই রাজমোহন কলেজের আফিস ঘরে নিজেকে নিরাপদে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া করালীচরণ তাহার কেরাণীগিরি নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন করিত এবং প্রতিমাসের বেতন পনেরোটি টাকা সযত্নে ট্যাঁকে গুঁজিয়া হাসিমুখে বাড়ী ফিরিয়া আসিত, আর তাহার তিরিশ দিনের তামাক ও আফিম খরচের হিসাব করিতে বসিত।

গ্রামের সকলেই জানিত যে, সুরমোহন বৃদ্ধের নয়নের মণি। এই ছেলেটিই ছিল অঘোরমোহনের সংসারের একমাত্র আকর্ষণ। কিন্তু তথাপি এই একমাত্র হারা-মরা অবশিষ্ট পুত্রটিকেও বৃদ্ধ অঘোরমোহন যে দিন পাষাণে বুক বাঁধিয়া আইন অধ্যয়নের জন্য বিলাতে পাঠাইয়া দিলেন, সে দিন সমস্ত গ্রামখানি বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু সে আজ তিন বৎসর পূর্ব্বের কথা। সম্প্রতি বিলাত হইতে খবর আসিয়াছে যে, সুরমোহন সেখানে সসম্মানে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং শীঘ্রই দেশে ফিরিবার জন্য রওনা হইবে।

এই তিনটি বৎসর অঘোরমোহনকে সকলেরই চোখে একটু যেন বেশী রকম কড়া ঠেকিত, কিন্তু বিলাত হইতে সুরমোহনের শেষ চিঠিখানা আসিবার পর চিরগম্ভীর অঘোরমোহনকে অনেকে না কি হাসিতে পর্য্যন্ত দেখিয়াছে!

বনের হিংস্র পশুরাও নিজেদের শাবকগুলিকে সস্নেহে প্রতিপালন করে, সুতরাং আপন সন্তানের প্রতি এই গভীর মমতা হইতেই অঘোরমোহনের অন্তরের সঠিক পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে এ কথা সকলেই জানে যে, প্রায় বছর পনেরো আগে হঠাৎ যে দিন তারক বসুর জীর্ণ চালাখানি আগুন লাগিয়া ভস্মসাৎ হইয়া যায়, সেদিন এই অঘোরমোহনই একা অসমসাহসী যুবকের মত সেই অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ছুটিয়া তারক বসুর শিশুকন্যা মলিনাকে বুকে করিয়া তুলিয়া আনিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন।

ভীষণ গৃহদাহ যে দিন শিশু মলিনাকে তাহার অজ্ঞাতসারে পিতৃ-মাতৃহীনা নিরাশ্রয়া পথের ভিখারিণী করিয়া দিয়াছিল, সে দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত মলিনা অঘোরমোহনের স্নেহ-চ্ছায়ায় পিসীমার কোলে পিঠেই বাড়িয়া উঠিয়াছে। সুরমোহনের ছোট বোনটির মত সেই ছিল তাহার শৈশব-সঙ্গিনী—বাল্যখেলার সাথী, কৈশোরের সখী ও যৌবনের বন্ধু!

অঘোরমোহন যে দিন তারক বসুর শিশু কন্যাটিকে আগুনের মুখ হইতে তুলিয়া আনিয়াছিলেন, সে দিন তিনি এ কথা মোটেই ভাবেন নাই যে, এই মেয়েটির ভবিষ্যৎ কি? শুধু অসীম স্নেহ ও অনুকম্পায় জননীর মত এই অনাথা শিশুকে লালন-পালন করিয়াছেন। সেই পনেরো বছর আগেকার কুড়ানো মেয়েটিকে তিনি বরাবর একটি একরত্তি মেয়ের মতই করুণা-মিশ্রিত অবহেলার দৃষ্টিতেই দেখিয়া আসিয়াছেন। তিনি তাঁহার সেই মোটা পাথরের সবুজ চশমা জোড়াটির ভিতর দিয়া একদিনও ভাল করিয়া উঁকি দিয়া দেখেন নাই যে, তাঁহার সেই একরত্তি কুড়ানো মেয়েটি আজ এক স্বপ্ন-রাজ্যের রাণীর মতই বাঁচিয়া উঠিয়াছে।

পঞ্চদশ বসন্ত আজ তাহার কণ্ঠে নন্দনের যে অনিন্দ্য পারিজাতের মালা ছড়াটি পরাইয়া দিয়াছিল, বহু রূপকথার রাজপুত্র সেটিকে বরমাল্য বলিয়া বরণ করিতে প্রস্তুত থাকিলেও, বাস্তব জগতে কিন্তু তাহার একটিও বর পাওয়া যাইতেছিল না। পিসীমার তাড়ায় অস্থির হইয়া অঘোরমোহন নানাস্থানেই পাত্রের সন্ধান করিতেছিলেন বটে, কিন্তু পিতৃ-মাতৃহীনা অনাথা মেয়ে বলিয়া অলক্ষণা সন্দেহে কেহ মলিনাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিতে রাজি হইতেছিল না

দুই এক জন ভদ্রলোক এই মেয়েটিকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা এমন অসম্ভব মূল্য প্রার্থনা করিয়া বসিলেন যে, অঘোরমোহনকে স্পষ্টই বলিতে হইল যে, অত টাকা দিতে তিনি অক্ষম!

মলিনার পাত্র পাওয়া ক্রমেই যখন একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছিল, তখন হঠাৎ একদিন অঘোরমোহন ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, মলিনার বিবাহের জন্য আর চিন্তার কোন প্রয়োজন নাই।

পিসীমা অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"সে কি? অত বড় মেয়ে ঘরে থুবড়ি করে রেখেছিস, গাঁয়ের লোক যে সব তোকে এইবার একঘরে করবে, অঘোর!"

কিন্তু অঘোরমোহন যখন পিসীমাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, মলিনা এই ঘরেই বরাবর থাকিবে, তাহাকে আর কোথাও যাইতে হইবে না; কারণ, তিনি সুরমোহনের সঙ্গে তাহার বিবাহ দিয়া তাহাকেই পুত্রবধূ করিয়া লইবেন,—পিসীমা তখন অত্যন্ত খুসী হইয়া উঠিলেন, এ সংবাদে তিনি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন!

অঘোরমোহনের পিসী মলিনাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। বুড়ীর মাথার পাকা চুল তুলিয়া দিয়া, প্রতিদিন নিয়মিত তাঁহাকে রামায়ণ মহাভারত পড়িয়া শুনাইয়া, মুখে মুখে তাঁহার সমস্ত ফাই-ফরমাইজ পালন করিয়া, মলিনা এই বৃদ্ধাকে তাহার একান্ত আপন জন করিয়া লইয়াছিল। সুতরাং, মলিনা বধূরূপে এই গৃহেই অবস্থান করিবে, তাহাকে আর পরের ঘরে পাঠাইতে হইবে না—এ কথা শুনিয়া তিনি ভগবানের শ্রীচরণ উদ্দেশে অন্তরের উচ্ছ্বসিত কৃতজ্ঞতা নিবেদন না করিয়া থাকিতে পারিলেন না তাহার পর একটু চাপা কণ্ঠস্বরে অঘোরমোহনকে বলিলেন—"ভগবান্ তোকে সুমতি দিয়েছেন। ছেলেটা একে নিয়ে সুখী হবে। আমি জানি, ওরা দু'জনে দু'জনেরই ভারি অনুগত!"

অবিলম্বে এ সংবাদ মলিনা ও সুরমোহনেরও কানে পৌঁছিয়াছিল। মলিনা যেন একটা মুক্তির নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা মানত করিয়া ফেলিল!

সুরমোহন তাহাদের আশ্রিতা এই মেয়েটির অশেষ রূপগুণের আশৈশব পক্ষপাতী। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সে

ক্রমেই মলিনার অনুরাগী হইয়া উঠিয়াছিল। মলিনার চরিত্রের বিশেষত্ব, তাহার অন্তরের সৌন্দর্য্য ও হৃদয়ের ঐশ্বর্য্য প্রত্যেক দিন তাহাকে মুগ্ধ করিত!

অতঃপর আষাঢ়ের এক মেঘলা দিনে খিড়কীর পুষ্করিণীতে মাছ ধরিতে বসিয়া মলিনাকে সে তাহার মনোভাব নিবেদন করিয়া ফেলিয়াছিল। মলিনার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল বটে, কিন্তু সে কোন জবাব না দিয়া নীরবে চলিয়া যাইতেছিল।

কিন্তু যখন সুরমোহন হাসিতে হাসিতে তাহাকে বলিল—"কি মলিন্, 'আকাশ-কুসুমও' তা হ'লে ফোটে!" মলিনা শুধু তাহার মুখের দিকে গভীর সকৃতজ্ঞ দৃষ্টি মেলিয়া ক্ষণকালের জন্য চাহিয়া রহিল। পুলকে নির্ব্বাক্ রসনা সে দিন তাহার বুকের একটি কথাও মুখ ফুটিয়া জানাইতে পারে নাই বটে, কিন্তু তাহার সেই ডাগর চোখ দুটির উজ্জ্বল দর্পণে সে দিন অনেক না-বলা কথাই ধরা দিয়াছিল!

করালীচরণ এই শুভ সংবাদ শুনিয়া হর্ষ ও বিষাদে সমানই অভিভূত হইয়া পড়িল।

মানুষটি খোঁড়া বলিয়া মলিনা একটু বিশেষ যত্নের সঙ্গে তাহার করালী কাকার পরিচর্য্যা করিত। এই মেয়েটির সেবা-যত্নে করালীও বড় পরিতুষ্ট ছিল। মলিনার প্রতি তাহার যে একটা আন্তরিক স্নেহের টান আছে, ইহা আর কেহই জানিতে না পারিলেও মলিনা জানিতে পারিয়াছিল। করালীচরণ চুপি চুপি তাহাকে অনেক জিনিষ উপহার দিত। জিলার মধ্যে যেখানেই মেলা বসিত, করালীচরণ সেখানে গিয়া মলিনার জন্য সোনালী চুড়ি ও রাঙ্গা শাড়ী কিনিয়া আনিবেই!

সুরমোহনের অপেক্ষা সে বছর আষ্টেকের বড়, করালীচরণ তাই কোনও দিনই মলিনাদের—খেলার সঙ্গী হইতে পারে নাই, কিন্তু মনে মনে সে এই মেয়েটিকে একান্ত ভালবাসিত! তাহার খঞ্জতাকে সে সহস্র অভিসম্পাত দিয়া বিবাহের অভিলাষ এ জীবনে একরকম পরিত্যাগই করিয়াছিল। তাহার একটি পায়ের অভাব থাকা সত্ত্বেও কন্যাদায়-গ্রস্ত অনেক পিতাই করালীচরণের ঐ একমাত্র পদেই তাহাদের কন্যাকে সম্প্রদান করিবার জন্য সাগ্রহে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু পাত্র করালীচরণ "খুঁড়িয়ে" বিবাহ করিতে যাইতে কিছুতেই রাজী হয় নাই।

সুরমোহন করালীকে 'খুড়ো' বলিয়া সম্ভাষণ করিত বটে; কিন্তু "খুড়োর" প্রাপ্য সম্মান সে করালীকে কোনও দিনই দিত না! তাহাদের বাড়ীতে থাকিয়া তাহাদেরই অন্নে প্রতিপালিত বলিয়া, করালীচরণ সুরমোহনের সকল অশিষ্টতাই বরাবর সহ্য করিয়া যাইত। সুরমোহন ইদানীং বিলাত যাইবার পূর্ব্বে করালীচরণের সম্মুখে শুধু সিগারেট খাওয়া নহে, তাহার ঘরে ঢুকিয়া "খুড়ো, এক ছিলিম হবে না বাবা?" বলিয়া রীতিমত তাহার হুঁকা লইয়া কাড়াকাড়ি সুরু করিয়াছিল। করালীচরণ মনে মনে চটিলেও মুখে কিছু বলিত না, হুঁকাটি নিঃশব্দে বাড়াইয়া দিত।

সুরমোহনকে করালীচরণ মোটেই পছন্দ করিত না, তাই মলিনার বিবাহ শুনিয়া সে যতটা খুসী হইয়াছিল, ঠিক ততটাই দুঃখিত হইয়াছিল, সুরমোহনের মত এই বানরের গলায় এই মুক্তাহার পড়িতেছে বলিয়া!

* * * *

বিবাহের কথাবার্ত্তা সব পাকা হইয়া গিয়াছিল বটে; কিন্তু সুরমোহন বিলাত হইতে ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত ব্যাপারটা স্থগিত ছিল।

যাইবার সময় সুরমোহন মলিনাকে বলিয়া গিয়াছে, কোন বাধা-বিঘ্নই এ জগতে আর তাহাদের দুই জনকে পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়াই সে এই শুভকার্য্যটা সুসম্পন্ন করিয়া ফেলিবে!

মলিনার সুন্দর মুখখানি সুরমোহনের আসন্ন বিরহে মলিন ও কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। সে তাহার অঞ্চলপ্রান্তের গ্রন্থি হইতে একটি সুবর্ণমণ্ডিত রুদ্রাক্ষের দানা বাহির করিয়া সুরমোহনের দক্ষিণ বাহুপেশীর মূলে বাঁধিয়া রাখিতে অনুরোধ করিয়াছিল। এই রুদ্রাক্ষের দানাটি না কি শিশু মলিনার কণ্ঠে বাঁধা ছিল। সে অঘোরমোহনের পিসীর কাছে শুনিয়াছিল যে, এই দানা তাহার গলায় বাঁধা ছিল বলিয়াই অগ্নিশিখা না কি তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে-নাই!

বংশের হারা-মরা ছেলে বলিয়া সুরমোহনের গলায় যে সোনার রক্ষাকবচখানি ভূমিষ্ঠ হইবার দিন হইতেই ঝুলানো ছিল, হাসিতে হাসিতে কণ্ঠ হইতে সেখানি খুলিয়া ফেলিয়া সুরমোহন মলিনার নিরাভরণ কমকণ্ঠে দুলাইয়া দিতে গিয়াছিল। মলিনা তাহাতে আপত্তি করিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

কিন্তু সুরমোহন যখন তাহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিল যে, জাহাজে অনাচারে ও বিদেশে ম্লেচ্ছের সংস্পর্শে এই পবিত্র কবচের মাহাত্ম্য নষ্ট হইয়া যাইবে, তখন আর সে আপত্তি করে নাই।

কিন্তু সে আজ তিন বৎসর পূর্ব্বের কথা। সুরমোহন বিলাতযাত্রার পর মলিনাকে প্রথম প্রথম প্রায় প্রত্যেক মেলেই চিঠি লিখিত, কিন্তু ক্রমেই তাহার ব্যতিক্রম ঘটিতে ঘটিতে বৎসর শেষ হইবার পূর্ব্বেই মলিনা বুঝিতে পারিল যে, আর তাহার কাছে পত্রের আশা করা বৃথা! পড়াশুনার হাঙ্গামায় নিশ্চয় সে এমন ব্যস্ত যে, তাহাকে আর চিঠি দিবার সময়ই পায় না।

তবু মলিনা মধ্যে মধ্যে সুরমোহনকে পত্র লিখিত। অনেক মেলে অনেকগুলি চিঠি লিখিবার পর হয় ত সে কখনও দুই চারি লাইনের একটু জবাব পাইত, কখনও বা একবারেই চুপচাপ! প্রত্যেক চিঠিতেই কেবল সেই একই বাঁধা গৎ—'আমি ভাল আছি, আশা করি, তোমাদের সমস্ত কুশল!' ব্যস্!

মলিনা কিছু দিন পূর্ব্বে একবার একখানি পত্রে কৌতূহলী হইয়া সুরমোহনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, "তোমার হাতে সে রুদ্রাক্ষটি ঠিক বাঁধা আছে ত?—না, হারিয়ে ফেলেছো?" সে পত্রের উত্তর মলিনা পাইয়াছিল। তাহাতে সুরমোহন তাহাকে জানাইয়াছিল যে, তাহাদের 'ল্যাণ্ডলেডীর' মেয়ে ক্যাথারাইন সেটা তাহার নিকট হইতে চাহিয়া লইয়াছে। বিলাতে থাকিলে ও সব হাতে পরিতে নাই, সাহেবরা অসভ্য মনে করে, তাই সেটাকে হাত হইতে খুলিয়া সে টেবলের উপরই রাখিয়া দিয়াছিল, কিন্তু 'কেট' এক দিন দেখিতে পাইয়া কিছুতেই ছাড়িল না; 'Indian charm' বলিয়া সেটাকে কাড়িয়া লইয়াছে!

* * * *

এডেন হইতে যে দিন টেলিগ্রাম আসিল যে, সুরমোহন অমুক তারিখে বোম্বাইয়ে আসিয়া পৌছিবে, সে দিন অঘোরমোহন অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। রামা চাকরকে ডাকিয়া বলিলেন যে, "একটা পোর্টম্যাণ্টোয় আমার কাপড়-জামা সব পূরে, তোরও সাজ-সরঞ্জাম গুছিয়ে রাখ, বোধ হয় আমার সঙ্গে তোকে বোম্বাই যেতে হবে! তোর দাদাবাবু ফিরে আসছেন, আমরা তাঁকে এগিয়ে আনতে যাবো!"

করালীচরণ মামাবাবুকে অনেক বুঝাইল যে, "আপনাকে আর অত কষ্ট ক'রে বোম্বাই পর্য্যন্ত যেতে হবে না, সে বোম্বাইয়ে নামলে, আমরা কলকাতায় গিয়ে তার জন্য অপেক্ষা করবো। তাকে সেখান থেকে বাড়ীতে নিয়ে এলেই ত' হবে!" কিন্তু অঘোরমোহন তাহা শুনিলেন না, তিনি তারিখ গণিয়া হিসাব করিয়া ঠিক নির্দ্দিষ্টকালে বোম্বাই রওনা হইলেন এবং করালীচরণকে বলিয়া গেলেন যে, বোম্বাইয়ে জাহাজ আসিয়া লাগিলেই তিনি টেলিগ্রাম করিবেন, যেন এ দিকের সব গোছ করিয়া রাখে এবং তিনি সুরমোহনকে লইয়া না ফেরা পর্য্যন্ত যেন খুব হুঁসিয়ার হইয়া থাকে।

করালীচরণ ষ্টেশন পর্য্যন্ত গিয়া তাঁহাকে রেলে তুলিয়া দিয়া আসিল। রামা চাকর সঙ্গে যাইবার সময় নিভৃতে করালীচরণকে এক বার ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাকাবাবু, বোম্বাই ত চলেছি, কিন্তু সে মুলুকটা কোন্ দিকে বল ত? বোধ করি বেশী দূর হবে না। কেন না, সেখান থেকে ত হাটে আমাদের বোম্বাই আম বোম্বাই কুল এ সব টাট্‌কাই আসে!"

করালীচরণ অতি কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া রামাকে বলিয়াছিল—"দেশটা মোটেই বেশী দূর নয়, রামা; তুই এবার সেখানে গিয়ে পেট ভ'রে বোম্বাই আম খেয়ে আসিস্!"

রামা দুঃখ করিয়া বলিয়াছিল—"হায় পোড়াকপাল কাকাবাবু, এখন কি আর আমের সময়! এই শীতে শুধু বোম্বাই কুলটাই পাওয়া যেতে পারে! তা, আমি মনে করছি, দাদাবাবুর গাড়ীতে আমার মলিনদিদির জন্য কিছু বোম্বাই কুল চাপিয়ে আন্‌বো। দিদিমণি খেতে বড় ভালবাসেন!"

উত্তরে করালীচরণ বলিয়াছিল, "সে মন্দ কথা না! আর আমার জন্য যদি কিছু 'বোম্বাই তামাক' পাস্ ত কিনে আন্‌তে ভুলিস্‌নি যেন, রামা!"

রামা "যে আজ্ঞে" বলিয়া দণ্ডবৎ হইয়া করালীচরণের সেই একটি পায়ের ধুলো মাথায় ছুঁইয়া গাড়ীতে গিয়া উঠিয়াছিল।

* * * *

আজ অঘোরমোহনের বাটীর দাসদাসীরা পর্য্যন্ত শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। বিলাত ফেরত ব্যারিষ্টারকে স্বগৃহে

অভ্যর্থনা করিবার অতি পরিপাটী আয়োজনই করালীচরণ করিয়া রাখিয়াছিল।

পিসীমা বাড়ীর ভিতর মলিনাকে তাড়া দিয়া তাঁহার আদরের 'সুরো' যে সব জিনিষ খাইতে ভালবাসিত, সেই সব রাঁধাইয়া রাখিতেছিলেন। সুরমোহনের সুখ-সুবিধার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন হইতে পারে, তাহা সমস্ত আয়োজন করিয়া রাখা হইয়াছিল। সুরমোহনের ঘরখানি মলিনা রোজই নিজ হস্তে ঝাড়িয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিত। আজ সে আবার একবার বিশেষ করিয়া সেই ঘরখানি গুছাইয়া রাখিয়াছে। খিড়কীর বাগান হইতে নিজ হস্তে বাছিয়া বাছিয়া সুগন্ধ ফুল তুলিয়া আনিয়া তাহার টেবলের উপর ফুলদানীতে সাজাইয়া দিয়াছে।

কলিকাতার গাড়ী পৌঁছিবার কিছু আগে করালীচরণ লোকজন ও গাড়ী লইয়া ষ্টেশনে গিয়া অপেক্ষা করিতেছিল।

মলিনা ইতোমধ্যে সমস্ত কায-কর্ম্ম সারিয়া নিজে একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া একখানি ভাল কাপড় পরিয়া বার-বাড়ীর ছাদের আলসের ধারে গিয়া পথের দিকে উৎসুক দৃষ্টি মেলিয়া দাঁড়াইয়া ছিল।

একটু পরেই একখানি গাড়ী রেল ষ্টেশনে যাইবার পথের মোড় ঘুরিয়া তাহাদের বাড়ীর পথে আসিয়া পড়িল। মলিনা দেখিয়াই চিনিতে পারিল যে, উহা তাহাদেরই গাড়ী! আশায়, আনন্দে, কৌতূহলে তাহার বুকখানি দুরু দুরু করিতে লাগিল।

গাড়ী বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। করালীচরণ গাড়ীর ভিতর হইতে নামিয়া অঘোরমোহনের হাত ধরিয়া নামাইয়া লইল। রামা চাকরও কোচবাক্স হইতে নামিয়া আসিল। কিন্তু যাহাকে আজ এই তিন বৎসর পরে দেখিবার জন্য মলিনার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, সে কই? সে কি তবে আসে নাই? মলিনা অস্থির হইয়া ছাদের উপর হইতে নামিয়া আসিল।

অঘোরমোহন তখন পিসীমাকে বলিতেছিলেন—"হতভাগা বিলেত থেকে একটা মেম বিয়ে ক'রে এসেছে। কলকাতার একটা ইংরাজী হোটেলে গিয়ে উঠলো! বাড়ীতে এলো না। না আসুক। আমিও আর সে কুলাঙ্গারের মুখদর্শন করিতে চাই নে।"

পিসীমা প্রায় রোরুদ্যমানা হইয়া বলিলেন, "তাই ত! কি সর্ব্বনাশই হ'ল অঘোর! ছোঁড়াটা মেম বিয়ে ক'রে এলো! এ্যাঁ! বলিস্ কি তুই? আমার মলিনের তবে কি দশা হবে—?"

অঘোরমোহন গম্ভীরভাবে বলিলেন "এই পঁচিশে মাঘ দিনস্থির করেছি। করালীর সঙ্গে মলিনের বিয়ে দেবো, আমার যা কিছু আছে, সব করালীকেই লিখে পড়ে দিয়ে যাবো—"

মলিনা আর অঘোরমোহনকে প্রণাম করিতে ঘরের মধ্যে যাইতে পারিল না। দ্বারপ্রান্তেই বসিয়া পড়িল!

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দেব।

ভাদ্রের বিরহিণী

(বিদ্যাপতির পথে

সখি, ফুল বিছাইয়া সুরভি করিয়া মিছা এ বিছানা পাতি,
পথ চাহি, হায়, রজনী পোহায়, নাহি শয়নের সাথী,
দুখের না দেখি ওর রে
শূন্য মন্দির মোর রে,
এ ভরা ভাদরে নয়নের লোরে কেটে যায় সারা রাতি,
গুরু গুরু দেয়া গরজে
বুকে বাজে তার শর যে,
শুধু কড়কড়ে শিরে নাহি পড়ে—হ'ব কি আত্মঘাতী!
চপলা সহসা আসিয়া
মোর দশা হেরে হাসিয়া,
চাহি মুখপানে অশনির গানে নর্ত্তনে ওঠে মাতি',
গাহিছে দাদুরী অদূরে
নাচিছে ময়ূরী-ময়ূরে
ডাহুকী-ডাহুকে মেলে মুখে মুখে, দুখে ফাটে মোর ছাতি,
গগনের কালো বরণে
কালো শশী পড়ে স্মরণে,
ঘন বরিষণে শ্যাম নবঘনে খুঁজি আরো আতি পাতি,
বুঝিতে বোঝাতে ব্যথা সে
মরমিয়া কবি কোথা রে?
বিরহ-তিমিরে মনোমন্দিরে জ্বালা'তে মিলন-বাতি—
দীন কবি হায় পাইবে কোথায়—বিদ্যাপতির ভাতি!

শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

নব্যভারতে রসায়ন-চর্চ্চার প্রবর্ত্তন

পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, য়ুরোপে জ্ঞানের বিকাশ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া অভিব্যক্তির ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। প্রাচীন য়ুরোপে অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তির একান্ত অভাব ছিল, ধর্ম্মান্ধ কুসংস্কারই রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিত। য়ুরোপীয় সভ্যতার আদিম ও মধ্যযুগের ইতিহাস যে শত সহস্র নিরপরাধ নরনারীর রক্তে রঞ্জিত হইয়াছিল, তাহার আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই মানস-নয়নে ভাসিয়া উঠে, বিরাট কুসংস্কারের ভারে অবনত মোহাচ্ছন্ন একটি সমগ্র জাতির তাণ্ডবলীলা। এই যে সহস্র সহস্র নরনারীকে জীবন্ত দগ্ধ করিয়া য়ুরোপ প্রবল আত্মপ্রসাদ অনুভব করিয়াছে, ইহার বিরুদ্ধে বাক্‌স্ফূর্ত্তি করা কেহই সমীচীন বলিয়া মনে করেন নাই। ঐন্দ্রজালিক ও মায়াবিনী ধর্ম্মের পথের অন্তরায়; ধর্ম্মের জন্য, ভগবানের মহিমা প্রচার করিবার জন্য ইহাদিগকে পুড়াইয়া মারিতে হইবে, ইহাই ছিল সনাতন সত্য। খৃষ্টীয় যাজকগণ ধর্ম্মনীতির দোহাই দিয়া এই অবাধ হত্যাকাণ্ড সমর্থন করিয়াছিলেন। কিন্তু সম্মার্জ্জনী-রথে আরোহণ করিয়া আকাশমার্গে বিচরণ করা মানবীর পক্ষে সম্ভব কি না, ব্যাঘ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রতিবাসীর গৃহপালিত জন্তুর সাহায্যে ক্ষুন্নিবৃত্তি করা মায়াবিনী নারীর সম্ভাবনা কতটুকু, এ সকল তুচ্ছ বিষয় চিন্তা করিবার অবসর কাহারও হয় নাই।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে য়ুরোপে অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তির প্রথম উন্মেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ১৫৬৩ খৃষ্টাব্দে হ্বুয়্যার (Weir) এই যথেচ্ছ কুসংস্কারের ক্ষীণ প্রতিবাদ করেন, কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যেই তৎকালীন প্রথিতযশাঃ ফরাসী দার্শনিক বোডিন্ হ্বুয়্যারের এই সন্দেহমূলক নীতির তীব্র প্রতিবাদ করেন। "ভগবন্নিন্দামূলক এই গ্রন্থ পাঠ করিলে গ্রন্থকারের পাপের প্রত্যবায়ী হইতে হইবে", বোডিন্ উচ্চকণ্ঠে এই বার্ত্তা ঘোষণা করেন। কিন্তু মধ্যযুগীয় প্রভাবের প্রতিক্রিয়া তখন য়ুরোপে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে; সাত বৎসরের মধ্যেই মোতাঞি (Montaigne) ফরাসী ভাষায় অবিশ্বাসের বাণী স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন। সন্দেহের যে ক্ষীণ রশ্মি হ্বুয়্যারের মনে জাগিয়াছিল, মোতাঞি তাহাকেই অবলম্বন করিয়া, যাজকতন্ত্রের প্রকাশ্য বিরোধিতা আরম্ভ করিলেন। আর যে সময়ে য়ুরোপে অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তি জাগরিত হইল, ঠিক সেই সময়ে ভারতবর্ষে কুসংস্কার ও অজ্ঞানতা আত্মপ্রতিষ্ঠালাভ করিতে আরম্ভ করিল। প্রত্নতত্ত্ববিৎ বেবার (Weber) স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, ভারত-গগনের শেষ উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ভাস্করাচার্য্যের তিরোধানের পর গভীর অমানিশায় দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল।

বিজ্ঞানের বর্ত্তিকা প্রজ্বলিত করিয়া বহু যুগের পুঞ্জীভূত অন্ধকার দূর করিবার প্রথম প্রয়াস পায়েন রোজার বেকন। এই খৃষ্টীয় সন্ন্যাসী ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ধর্ম্মজগতের একচ্ছত্র সম্রাট পোপের রোষকষায়িত লোচনের ভ্রূকুটী উপেক্ষা করিয়া নির্ভীকচিত্তে ব্যক্ত করেন। বাইবেল-বর্ণিত যাহা কিছু সবই ধ্রুব সত্য, তদতিরিক্ত সকলই মিথ্যা, বাইবেল-বিরোধী অবিদ্যার প্রশ্রয়দান করা ও অধর্ম্ম অভ্যুত্থানের সহায়তা করা উভয়ই তুল্য পাপজনক, এই ধারণা নরনারী সকলের মধ্যে মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল। জ্ঞানবিস্তারের তদানীন্তন প্রধানতম কেন্দ্র প্যারী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষালাভ সমাপ্ত করিয়া, বেকনের তত্ত্বান্বেষু বিদ্রোহী মন প্রচলিত শিক্ষা-প্রণালীর উপর প্রবল বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। আরিষ্টটলের দর্শন তখন অজ্ঞাত ছিল না, কিন্তু ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ অনুবাদের কৃপায় প্রায় দুর্ব্বোধ্য ও অনেক স্থলে বিপরীতার্থ-বোধক হইয়া পড়িয়াছিল, তথাপি মূল গ্রন্থ পাঠ করিবার স্পৃহা কাহারও মধ্যে জাগরিত হইত না। বিজ্ঞান বলিয়া বিশেষ কিছুই ছিল না, যাহা ছিল, তাহাও আরিষ্টটলের নির্দ্দেশানুযায়ী পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণের সাহায্যে অধীত না হইয়া দেশাচার ও আধ্যাত্মিক প্রমাণের সাহায্যেই পঠিত হইত।

বেকনই প্রথম য়ুরোপে পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানচর্চ্চার প্রবর্ত্তন করেন; ফলে সাম্প্রদায়িক গুরুর আদেশে ইন্দ্রজাল সাধনা করিবার অভিযোগে কারাগারে অবরুদ্ধ হন। দশ বৎসর কারাবাসের পর পোপ চতুর্থ ক্লেমঁ্যা তাঁহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া মুক্তির আদেশ দেন। কিন্তু বিধাতা বেকনের অদৃষ্টে বহুদিন স্বাধীনতা-সুখ লিখেন নাই। ক্লেমার মৃত্যুর পর নূতন পোপ পুনরায় তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন; চব্বিশ বৎসর কারাভোগের পর মৃত্যুর মাত্র দুই বৎসর পূর্ব্বে বেকন মুক্ত বায়ু সেবন করিতে পারিয়াছিলেন।

বেকনই সর্ব্বপ্রথম যাজকতন্ত্রের অজ্ঞতা ও যথেচ্ছাচারিতার তীব্র প্রতিবাদ করেন। কথিত আছে,—তিনিই প্রথম য়ুরোপে বারুদ প্রস্তুত করেন, পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ যখন প্রধান ধর্ম্মযাজক তাঁহাকে আর্দ্র, আলোক-বিবর্জ্জিত, অনতিপ্রসর কারাকক্ষে অবরুদ্ধ করেন, তখনও তিনি অন্যের অজ্ঞাতে নানাপ্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আনন্দ অনুভব করিতেন। Opus Tertium নামক গ্রন্থে তিনিই প্রথম বিজ্ঞানের ঐক্য প্রমাণ করেন, পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানচর্চ্চার প্রয়োজনীয়তাও অন্যত্র লিপিবদ্ধ করেন।

বিজ্ঞানের প্রথম উপাসক রোজার বেকন এই ভাবে নিগৃহীত হইলেও, অনুসন্ধিৎসা-প্রবৃত্তি য়ুরোপে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; বিধাতা মনুষ্যহৃদয়ে সত্য ও জ্ঞানের এমনই একটি স্পৃহা বলবতী করিয়াছেন যে, অত্যাচার ও নিগ্রহের ফলে তাহা কিছুমাত্র দমিত হয় না, বরং উপাসকের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেই থাকে। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে বোহিমিয়ার জন হাস্ যাজকতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া, পোপের আজ্ঞানুসারে বহ্নিকুণ্ডে আত্মাহুতি প্রদান করেন। পোপের যথেচ্ছাচার ও অধ্যাত্মজগতের মানসিক সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে হাস্ ও তাঁহার বন্ধু জেরোমে বোহিমিয়ার নগরে নগরে উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতার সাহায্যে জনসাধারণকে উদ্‌বুদ্ধ করিতে আরম্ভ করেন। যাজকতন্ত্র ভীত হইয়া, অবিলম্বে তাঁহাকে বোলোনা নগরে উপস্থিত হইবার আদেশ দেন। হাস্ অবিচলিত চিত্তে এ আদেশ অমান্য করিয়া, নিজের বুদ্ধি ও বিবেক অনুযায়ী স্বীয় ধর্ম্মমত প্রচার করিতে থাকেন। এ অপমান, এ তাচ্ছিল্য সার্ব্বজনীন মহাগুরু পোপের নিতান্ত অসহ্য বোধ হইল। ১৪১৫ খৃষ্টাব্দে আধ্যাত্মিক মুক্তিকামী বিদ্রোহীদলের প্রথম নেতা জন হাস্ শৃঙ্খলিত-হস্তপদ অবস্থায় অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। কিন্তু জন্ হাস্ যে কার্য্য আরব্ধ করিয়া যান, লুথার তাহা সুসম্পন্ন করিয়া খৃষ্টীয় জগতে অমর হইয়া রহিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে কর্ম্মীর অভাবে কোন সৎকার্য্য অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত য়ুরোপে নিতান্তই বিরল!

কোপর্ণিকস্

য়ুরোপে বিজ্ঞানের প্রাথমিক ইতিহাস শুধু যাজকতন্ত্রের সহিত চিরন্তন সংঘর্ষের ক্রমিক ইতিবৃত্ত মাত্র। বাইবেলের মতে পৃথিবী অচল, সূর্য্যদেব প্রচণ্ড বর্ত্তিকা স্বরূপ চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছেন। বাইবেল ও বেদের মত অভ্রান্ত; সুতরাং ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন পোলাণ্ডনিবাসী নিকলস্ কোপর্ণিকস্ পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতির কথা সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করেন, তখন ধর্ম্মজগতে ধুরন্ধর মহারথিগণ ধর্ম্মলোপের আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত হইয়া পড়েন। টলেমী ও পাইথাগোরাস অচলা মেদিনীর স্বপক্ষে যে সকল

প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছিলেন, কোপর্ণিকস্ যুক্তি ও পর্য্যবেক্ষণের সাহায্যে সে সকল খণ্ডন করিয়া, নূতন মতের প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু নির্য্যাতনের ভয়ে প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরিয়া পুস্তক অপ্রকাশিত রাখিয়াছিলেন। মৃত্যুর তিন বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার ছাত্র জর্জ্জ রেটীকাস্ পুস্তক মুদ্রিত করিবার অনুমতি লাভ করেন। পাছে নূতন মত প্রচারের পাপে পোপ তাঁহার জন্য জীবন্ত অবস্থায় চিতাবহ্নির ব্যবস্থা করেন, এই ভয়ে তিনি গ্রন্থখানি প্রধান ধর্ম্মযাজকের নামেই উৎসৃষ্ট করেন। বার্দ্ধক্য তাঁহাকে এ ভয়াবহ পরিণাম হইতে অব্যাহতি দেয়। যখন পুস্তক প্রকাশিত হইল, তখন কোপর্ণিকস্ অন্তিমশয্যায়, পোপের নজরে আসিবার পূর্ব্বেই তিনি যাজকতন্ত্রের শাসন-সীমা অতিক্রম করিয়া বহুদূর চলিয়া গিয়াছেন।

কোপর্ণিকস্ যে সত্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন, টাইকো ব্রাহি, কেপলার ও গ্যালিলিও তাহারই সাধনা করিয়া, আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদ্যার সূচনা করিয়া যান। ইঁহাদের মধ্যে গ্যালিলিওর জীবন সর্ব্বাপেক্ষা বৈচিত্র্যময় সপ্তদশ বৎসর বয়সে পীসার ভজনালয়ে বিলম্বিত দীপাধারের দোলায়মান গতি লক্ষ্য করিয়া, গ্যালিলিও পেণ্ডুলমের (পরিদোলক) নিয়ম আবিষ্কার করেন এবং পরবর্ত্তী কালে ইহার সাহায্যে জ্যোতিষিক ঘটিকা যন্ত্র নির্ম্মাণ করেন। দারিদ্র্যের কৃপায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিবার সৌভাগ্য তাঁহার ঘটিয়া উঠে নাই। কিন্তু সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ উপাধিলাভের অপেক্ষা করে নাই। পাঁচ বৎসরের মধ্যেই গণিতশাস্ত্র বিষয়ক নানাপ্রকার যন্ত্র ও নিয়ম আবিষ্কার করিয়া, তিনি পুরাতনপন্থিগণের অবিমিশ্র বৈরভাব অর্জ্জন করেন। পীসার তির্য্যক স্তম্ভের শীর্ষদেশ হইতে দুই খণ্ড প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া, যখন প্রমাণ করিলেন যে, নিক্ষিপ্ত বস্তুর গতি ভারের তারতম্যের উপর নির্ভর করে না, তখন জনসাধারণ সনাতন নীতির বিরুদ্ধাচারী এই যুবক অধ্যাপকের উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিল। শীঘ্রই গ্যালিলিও রাজকীয় অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইলেন, বক্তৃতার সময় তাঁহাকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। অগত্যা বাধ্য হইয়া তিনি পীসা ত্যাগ করিয়া, পাডুয়ানগরে গিয়া তত্রত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতাধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিলেন। ১৫৯২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬১০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন; জীবনের এই আঠার বৎসর কাল তাঁহার অতি শান্তিতে কাটিয়াছিল। এই সময় তিনি নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া সাধারণে প্রকাশ করেন। দূরবীক্ষণ প্রভৃতি কয়েকটি প্রয়োজনীয় যন্ত্রও প্রস্তুত করেন। ১৬১০ খৃষ্টাব্দে গ্যালিলিও অধ্যাপকের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া পুনরায় ফ্লোরেন্স নগরে উপস্থিত হন। এই সময়ে জনসাধারণ বুঝিতে পারিল যে, সৌরজগৎ সম্বন্ধে গ্যালিলিওর প্রচারিত মত বাইবেলোক্ত তথ্যের পরিপন্থী। তিন বৎসরের মধ্যেই কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে কোপর্ণিকসের যুক্তি বাইবেলের সাহায্যে সমর্থন করিতে আদেশ করেন। গ্যালিলিও প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন যে, নূতন মত আধ্যাত্মিক জীবনের কোনই অনিষ্ট সাধন করিবে না; কিন্তু যাজকতন্ত্র ইহার মধ্যে যথেষ্ট বিপদ নিহিত আছে আশঙ্কা করিয়া, তাঁহার গ্রন্থসমূহ আত্মসাৎ করেন, এবং কোন প্রকার পুস্তক প্রকাশ বা সাধারণে বক্তৃতা করিবার অধিকার হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করেন। সাত বৎসর ধরিয়া নিঃসঙ্গ অবস্থায় গ্যালিলিও ফ্লোরেন্সের উপকণ্ঠে অজ্ঞাতভাবে যাপন করেন, কিন্তু ইতোমধ্যে যাজকগণ
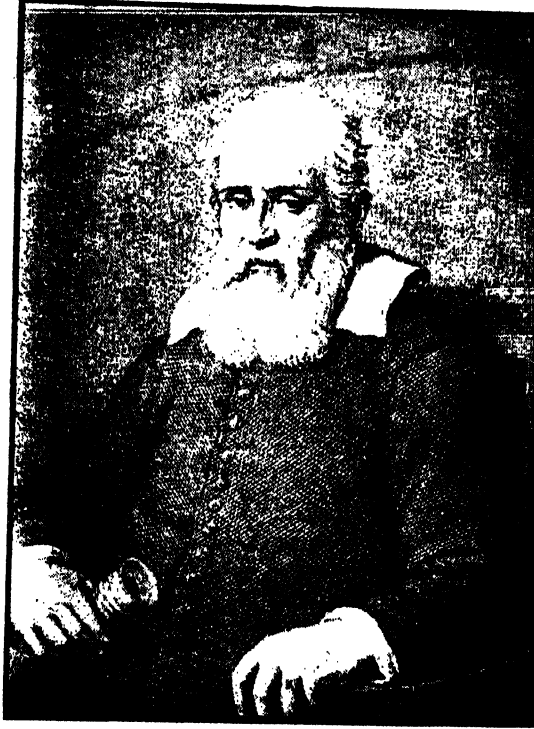
গ্যালিলিও

অসত্যকে আশ্রয় করিয়া, অবাধে নূতনপন্থিগণের কুৎসা প্রচার করিতেছিলেন। গ্যালিলিও আর নির্ব্বাক্ থাকিতে পারিলেন না, পোপের আদেশ অমান্য করিয়া ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই পোপের সমক্ষে উপস্থিত হইবার জন্য রোম হইতে আদেশ আসিল। গ্যালিলিও তখন স্থবির হইয়া পড়িয়াছেন, তথাপি ধর্ম্মগুরুর আদেশের কঠোরতার হ্রাস হইল না; উৎপীড়নের সাহায্যে যাজকগণ নূতন মত প্রত্যাহার করাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মদ্রোহিতা অভিযোগে তাঁহার বিচার আরম্ভ হইল; যাজকগণ বিচারপতিরূপে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "যদি মুক্তি চাও, তবে এই ভ্রমাত্মক বাইবেল-বিরোধী মত অচিরে প্রত্যাহার কর।" জরার প্রকোপে ও যাজকতন্ত্রের অত্যাচারে গ্যালিলিও তখন মুমূর্ষুপ্রায়; বহু কাল কারারুদ্ধ থাকিয়া নিষ্কৃতিলাভের আশায় মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "হ্যাঁ।" বলিবামাত্র শত বৃশ্চিক দংশনের ন্যায় বিবেক বুদ্ধি তাঁহাকে যাতনা দিতে আরম্ভ করিল; পরক্ষণেই তিনি বলিলেন, "না। পৃথিবী নিশ্চয়ই সচলা।" যাহা হউক, "অগ্নি-অংশু পাংশু-জালে বহুক্ষণ আবৃত" রাখা যায় না, নিগ্রহ ও উৎপীড়ন সত্ত্বেও য়ুরোপে জ্ঞানালোক শনৈঃ শনৈঃ বিস্তার লাভ করিতে লাগিল।

ইংলণ্ডে প্রকৃত পক্ষে রবার্ট বয়েলের (১৬২৬-১৬৯১) সময় হইতে রসায়ন-চর্চ্চা আরম্ভ হয়। বয়েল নিউটনের সমসাময়িক, উভয়কে নব্য পদার্থবিদ্যার জনয়িতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইংলণ্ডের ইতিহাসে ষ্টুয়ার্টবংশীয় রাজগণের পুনরুত্থান হইতে আরম্ভ করিয়া, শেষ পতন পর্য্যন্ত রাজত্বকাল কতকগুলি পরস্পর-বিরোধী ঘটনার সমাবেশে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বকাল কুশাসনের চরম দৃষ্টান্ত বলিলেও চলে, জাতীয় ধন-সম্পদের সম্ভবতঃ অন্য কোন সময় এরূপ যথেচ্ছ অপব্যবহার হয় নাই। অন্যদিকে এই সময়ে রাষ্ট্রীয়সংস্কার-সম্পর্কিত যত নিয়ম বিধিবদ্ধ হয়, পূর্ব্বে কখনও সেরূপ হয় নাই। অধ্যাত্ম জগতের অত্যাচার ও সাম্রাজ্যতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও ধীরে ধীরে তীব্রতা লাভ করিতেছিল। সাহিত্যজগৎ যেমন একদিকে অসংখ্য বালখিল্য কবি ও নাট্যকারের অত্যাচারে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, অন্যদিকে মিণ্টনের অমানুষিক প্রতিভা ও ড্রাইডেনের অপূর্ব্ব কল্পনাশক্তি-প্রভাবে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। অক্সফোর্ডের কোন এক মুদ্রাযন্ত্র হইতে প্রকাশিত "সন্দিগ্ধ রাসায়নিক" নামক পুস্তকে এই সাময়িক প্রভাব যেন মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এই অজ্ঞাতনামা তরুণ লেখক অন্ধবিশ্বাসী ও পুরাতন-পন্থিদিগকে নির্ম্মমভাবে কশাঘাত করিয়াছিলেন। অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইল, লেখক অভিজাতবংশীয় এক জন আইরিশ ভূম্যধিকারীর কনিষ্ঠ পুত্র। লর্ড কর্কের কনিষ্ঠ পুত্র রবার্ট বয়েল পূর্ব্ববৎসর বায়ুর স্থিতিস্থাপক ধর্ম্মসম্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়া, প্রচলিত মতসমূহের খণ্ডন করিয়াছিলেন।

ধনীর পুত্র বয়েল অল্পবয়সেই শিক্ষার জন্য ফ্রান্সে প্রেরিত হইয়াছিলেন। শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া, পিতার মৃত্যুর পর যখন তিনি দেশে ফিরিলেন, তখন আয়র্লণ্ডে অন্তঃবিদ্রোহের বহ্নি চতুর্দ্দিকে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। বয়েল এই রাষ্ট্রীয় অভ্যুত্থানে কোনরূপ যোগ না দিয়া, পুস্তক ও পরীক্ষাসংক্রান্ত যন্ত্রপাতির মধ্যে আপনাকে নিমজ্জিত করিয়া রাখিলেন। এই সময় কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হইয়া বয়েল নূতন বিজ্ঞানচর্চ্চা করিবার উদ্দেশ্যে "অদৃশ্য সংঘ" (Invincible college) নামে একটি সমিতি স্থাপন করেন; এই ক্ষুদ্র সভাই কালে ইংলণ্ডের বিখ্যাত রয়াল্ সোসাইটিতে পরিণত হয়। কিন্তু শীঘ্রই এই সভার কার্য্য-পদ্ধতির তীব্র প্রতিবাদ চারিদিক হইতে আসিতে আরম্ভ করিল। বেকনের উপদেশ কার্য্যে পরিণত হইতেছে দেখিয়া, আধ্যাত্মিক উপদেষ্টাগণ ধর্ম্ম ও শৃঙ্খলানাশের আশঙ্কায় বিশাল আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। যাজকগণ অভিসম্পাত দিতে আরম্ভ করিলেন, বাটলার প্রহসন লিখিয়া বৈজ্ঞানিকগণকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পুরাতনপন্থী হবসের চীৎকারে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সকলে মিলিয়া বয়েলকে সমাজের সংস্রব ত্যাগ করিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু এই অভিশাপ, প্রতিবাদ ও বিদ্বেষ সত্ত্বেও রয়েল সোসাইটি উত্তরোত্তর শ্রীসম্পন্ন হইতে লাগিল। অদৃষ্টের বিধানে এই সময়ে (১৬৬৫) লণ্ডন নগর ভীষণ মহামারীতে বিধ্বস্ত এবং পর বৎসর বিরাট অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়। নূতন সহর সংস্থাপনের সময় রয়েল সোসাইটির উপদেশ গ্রহণ করিয়া, লোক নূতন বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। স্বয়ং ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস পরীক্ষাগার স্থাপন করিয়া, অবসর সময়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা

দ্বারা চিত্তবিনোদন করিতে লাগিলেন। অভিজাতবংশীয় মহিলাগণ নবাবিষ্কৃত ফস্‌ফরাসের স্বভাব-ধর্ম্ম আলোচনা করিয়া আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন, সাধারণ লোকের মধ্যে নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক কূটতর্ক আলোচিত হইতে লাগিল। জনসাধারণের মধ্যে নব্য-বিজ্ঞানের প্রতি যে আন্তরিক অনুরাগ এই সময়ে জাগরিত হইয়াছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়াই চলিতে লাগিল।

বয়েল নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক তথ্য আলোচনা করিয়া, কতকগুলি নৈসর্গিক নিয়ম আবিষ্কার করেন। ইংলণ্ডে বয়েল অপেক্ষা অধিক যশস্বী বৈজ্ঞানিক জন্মিয়াছেন, কিন্তু নূতন যুগের পথিপ্রদর্শক হিসাবে বয়েলের কৃতিত্ব অসাধারণ। বয়েলই প্রথম বেকনের আরব্ধ অসমাপ্ত কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া, নব্য-বিজ্ঞানের ভিত্তি সুদৃঢ় করেন। Novum Organum নামক পুস্তকে লিখিত বেকনের উপদেশ অনুসারে পরীক্ষামূলক গবেষণার সূত্রপাত বয়েলই প্রথম করিয়াছিলেন।

[ক্রমশঃ।

(অধ্যাপক) শ্রীসুবোধকুমার মজুমদার (এম, এস, সি

বিস্মরণী

হে ভোলানাথ, ভাঙের ঘোরে ভুবন ভুলে থাকো,
বসনখানা কোথায় গেল ঠিক তারো না রাখো।
তুমিই ঠিকই দেবতা আমার তোমার চরণতলে,
'ভুল্‌তে শিখাও' এই নিবেদন নিত্য নয়নজলে।
যেমন ক'রে বাগ্মী ভুলে সভাগৃহের ভিড়,
যেমন ক'রে জীবন ভোলে সমর-মাঝে বীর,
যেমন ক'রে লক্ষ্যভেদী ভুলে চতুর্দ্দিক,
লক্ষ্যে শুধু দৃষ্টি রেখে তীক্ষ্ণ অনিমিখ।
ঘুড়ির পানে চেয়ে বালক ভোলে যেমন মাটি
মাছ-শিকারী যেমন ক'রে নেহারে ফাৎনাটি।
তেম্‌নি ক'রে ভোলাও মোরে নিখিল এ সংসার,
হে ভোলানাথ, তোমায় ছাড়া চাই না কিছু আর।

শঙ্কা ভুলে 'চিন্তামণির ভৃত্য' যেমন করি',
মড়ায় চ'ড়ে সাঁৎরে নদী, সাপকে ভাবে দড়ি।
যেমন ক'রে ভুল্লো 'মীরা' রাজমহিষীর মান,
ধ্যানী যেমন করে ভোলে আপন দেহখান।
স্বপ্নে যেমন ভুলে মানুষ সকল বেদনায়,
স্তন্য-মুখে শিশু যেমন কাঁদন ভুলে যায়,

শূন্যবাদী শ্রমণ যেমন বিশ্বভুবনটারে,
শূন্য ভাবি' ধ্যান করে সেই বিরাট শূন্যতারে,
শূন্যে বিলীন করি আপন সূক্ষ্ম শরীরেরে,
চন্দ্রলেখার মতন ধ্যানে জীবাত্মারে হেরে,
তেম্‌নি ক'রে ভোলাও মোরে বিশ্বভুবনখানি,
এক নিমেষো ভুল্‌তে পেলে ধন্য জীবন মানি।

ভুবনভোলা ভাবটি ভোলা, অনেক তপের ফল
দেবতা যেমন ভক্ত তেমন উভয়ই পাগল,
নইলে কেন বরটি এমন চাচ্ছি দয়াময়,
অন্ততঃ দাও "ভোলা" ভাষার বর্ণ-পরিচয়।
ভুল্‌তে মোরে শেখাও, ভোলা, পরের অপরাধ,
ভুল্‌তে শেখাও যশের তৃষা-নিন্দা-পরিবাদ।
ভুল্‌তে শেখাও দৈবাসুরের সকল নির্য্যাতন,
ভুল্‌তে শেখাও রোষ অভিমান স্বার্থ প্রলোভন,
ভুল্‌তে শেখাও শোক-যাতনা দুখ-বেদনায় কাঁদা,
ভুল্‌তে শেখাও যাত্রাপথে সকল বাঁধন বাধা।
ভুবনভোলা-বিদ্যালাভের দাও হে হাতে খড়ি,
হে ভোলানাথ, ভুলেই যেন ভিক্ষা-ঝুলি ভরি।

শ্রীকালিদাস রায়

দিল্লীর পুরাতন স্মৃতি
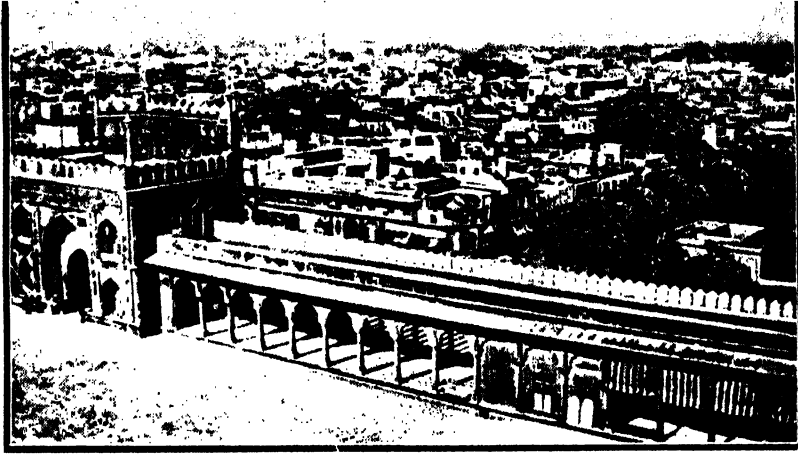
দিল্লী সহরের দৃশ্য

পুরাতনের ইতিহাসে ভারতের যুগযুগান্তরের রাজধানী দিল্লীর স্থান যতটা অধিকৃত, এত আর ভারতের অন্য কোন নগরীর আছে কি না সন্দেহ। দিল্লী ভারতের সাম্রাজ্য-শ্মশান; এখানে যে সকল রাজবংশ ও সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন ও অবসান হইয়াছে, তাহার আলোচনা এখানে আর আমি কি এবং কতটুকু করিব। ইহাই যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপ্রস্থ; ইহাই রাজা পৃথ্বীরাজের দিল্লী, তোগলক সাহার তোগলকাবাদ ও সাহজাহানের সাহজাহানাবাদ। মহাভারতের কুরুক্ষেত্র হস্তিনাপুর সবই ইহার সহিত জড়িত। সুপ্রসিদ্ধ পাণিপথের রণক্ষেত্র এই দিল্লীরই অনতিদূরে অবস্থিত।

ইংরাজ রাজার আজিকার নব-নির্ম্মিত সাধের দিল্লীর পার্শ্বে সেই হিন্দু ও মুসলমানদের দিল্লীর বক্ষে এখানে ওখানে বিক্ষিপ্ত ভাবে শ্মশান--কঙ্কাল-সম যে সব সমাধি, দুর্গ, মন্দির, মসজেদ ও প্রাসাদাদির চিহ্ন আজিও আগন্তুক বা ভ্রমণকারীর চক্ষুতে পড়িয়া তাহাদিগকে উদ্‌ভ্রান্ত, বিস্মাদিত করিয়া তুলে, দিল্লীর সেই সব পুরাতনের যে ছবি আমার নয়নে পতিত হইয়াছে, দিল্লীতে তিন দিন থাকিয়া আমি যেমন পর পর দেখিয়া লিখিয়া আনিয়াছি, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া এই মহানগরীর পুরাতন স্মৃতির একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় মাত্র দিবার এখানে চেষ্টা করিব।
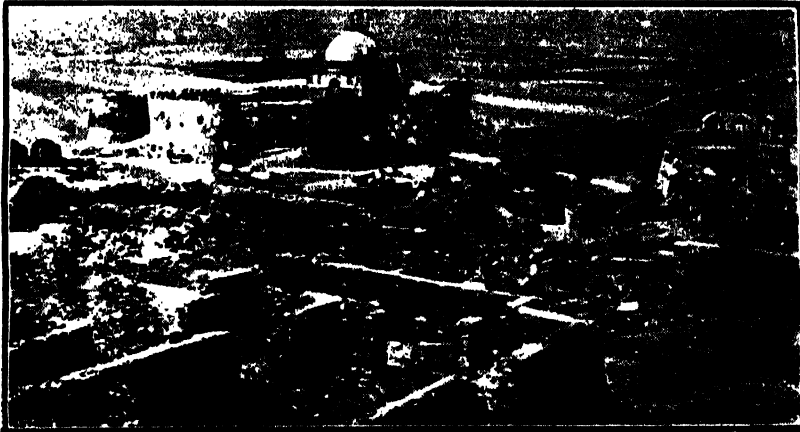
ভোরের আলো তখনও পূর্ব্ব গগনে দেখা যায় নাই, এই সময় আমি ও বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র দে দিল্লী ষ্টেশনে পৌছিলাম। পূর্ব্ব-ব্যবস্থামত রেইসেনায় বন্ধুবর শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাসায় যাইবার জন্য একখানি টঙ্গা লইলাম। একটির পর একটি করিয়া অচেনা পথগুলি অতিক্রম করিতে ঊষালোক প্রকাশ পাইল এবং সেখানে পৌছিয়া তাঁহার বাসায় অনুসন্ধান করিতে বেশ সকাল হইয়া গেল। তাঁহার বাসায় উঠিয়া

সম্রাট তোগলকের সমাধি—তোগলকাবাদ
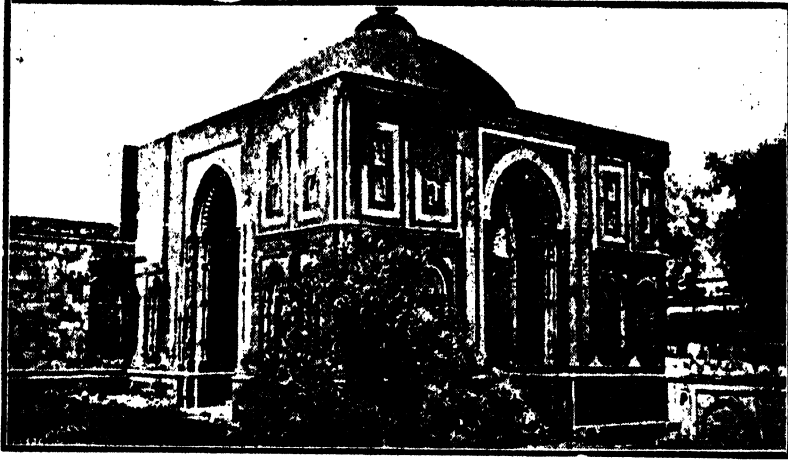
আলাই দরজা

রেইসেনা বা নূতন দিল্লী হইতে প্রায় ১৩ মাইল দূরে অবস্থিত।

পল্লী ছাড়িয়া আমাদের গাড়ী ক্রমে জন-বিরল দীর্ঘপথে আসিয়া পড়িল। এতদিন গ্রন্থাদিতে যে পড়া ছিল দিল্লী ভারতের একটি মহাশ্মশান, ইতিহাস পাঠেও যে কথার সার্থকতা জানা যায়, আজ ভ্রমণের জন্য দিল্লীতে প্রথম পথে বাহির হইয়া যে পথ ধরিয়া কুতব যাইতে হয়, তাহা অতিক্রম

প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তর পরে নিকটস্থ এম্পায়ার হিন্দু হোটেলের উপর একটি ঘর লইলাম। আহারের ব্যবস্থা রহিল বন্ধুবরের বাসায়।

আহারাদির পর দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে একখানি টঙ্গা করিয়া দেবেনের জানিত একটি প্রবাসী কলেজের বাঙ্গালী যুবককে সঙ্গে লইয়া তাহারই কথামত সর্ব্বপ্রথম কুতব দর্শনার্থ যাত্রা করিলাম। কুতব

ক্লক টাওয়ার

করিতে যাহা প্রায় সারা পথ দেখিতে দেখিতে যাইলাম তাহা, ঐতিহাসিকের কথা ছাড়িয়া দিলেও আমার মনে হইতে লাগিল, ইহা শুধু ভারতের বহু সাম্রাজ্যের শ্মশান-ক্ষেত্র নহে, ইহা ভারতের একটি সমাধি-মণ্ডিত স্মৃতিময়ী নগরী। অগ্রসর হইতে প্রথমেই যে সুন্দর প্রকাণ্ড সমাধি-মন্দিরটি নয়নপথে পতিত হইল, তাহা সফদরজঙ্গের সমাধি। ফিরিবার কালীন উহা দেখিব বলিয়া আর এক্ষণে নামিলাম না।

সফদরজঙ্গের সমাধি

কাশ্মীর গেট

সমাধি মন্দিরাদি তরুহীন শূন্য প্রান্তরমধ্যে যেন মাথা তুলিয়া বলিতেছে,—'পথিক, একবার দাঁড়াও, দেখে যাও ঐশ্বর্য্যের পরিণাম, মানবের নশ্বরতা। আমি যে আজও দাঁড়াইয়া আছি, সে কেবল তোমাদের কাছে এই পরিচয় দিবার জন্যই।' ইচ্ছা হইতে লাগিল, প্রত্যেকটির কাছে যাইয়া সব ভাল করিয়া দেখিয়া জানিয়া আসি। কিন্তু কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব,

উহা ছাড়িয়া যাইলে দীর্ঘ পথের উভয় পার্শ্বে দূরে অদূরে একের পর একটি করিয়া যতদূর দৃষ্টি যায়, ক্ষুদ্র বৃহৎ সমাধি মসজেদ প্রাসাদ ও অট্টালিকা-শ্রেণীর ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া যে ভাব মনোমধ্যে উদয় হয়, তাহা লিখিয়া বুঝাইতে পারি, এমন ক্ষমতা ভগবান আমাকে দেন নাই। পম্পিয়াইয়ের প্রসিদ্ধ ধ্বংসনগরী দেখি নাই, সমৃদ্ধিময়ী বাঙ্গালার রাজধানী গৌড় দেখি নাই, কিন্তু এখানকার কোথাও গম্বুজশ্রেণী, কোথাও চূড়াহীন সমাধি বা মসজেদের নিম্নাংশ; কোথাও ভগ্ন প্রাকারবেষ্টিত প্রশস্ত ভূমিখণ্ড; কোথাও ভগ্ন অট্টালিকার লোহিত কৃষ্ণ প্রস্তরস্তূপ, কোথাও কোন প্রাসাদের এক অংশের উচ্ছভিত মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া ঐ সকল ধ্বংসনগরীর কথা মনে পড়িতে লাগিল। আর সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের নির্ম্মাতার সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা, ঐশ্বর্য্য ও আড়ম্বর প্রভৃতির কথা কল্পনায় আসিয়া মনোমধ্যে যে বিষাদবিক্ষোভের সৃষ্টি হইতে লাগিল, তাহা বুঝাইবার নহে।

সৌন্দর্য্যহীন কদাকার ভগ্ন

কে বলিয়া দিবে কোন্‌টি কাহার সমাধি—কোন্‌টি কাহার প্রাসাদ ছিল। জানিবার সুযোগের অভাব, দূরতা, শরীরের সামর্থ্য ও সময়ের অল্পতা হেতু সে ইচ্ছা মনেই রহিয়া গেল। টঙ্গাওয়ালা ও সঙ্গের যুবকটি এ বিষয়ে দুই একটির সম্বন্ধে যাহা জানা আছে বলিতে লাগিল, তাহাতেই আমাদের সন্তুষ্ট হওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর না থাকায় অগত্যা তাহাই শুনিতে শুনিতে যাইলাম।

প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে আমরা কুতব পৌছিলাম। দূর হইতেই ভারতের কুতব, পৃথ্বীরাজের স্মৃতি-বিজড়িত নগরীর বক্ষে মুসলমান সম্রাটের বিজয়স্তম্ভ কুতব মিনার;

লৌহস্তম্ভ
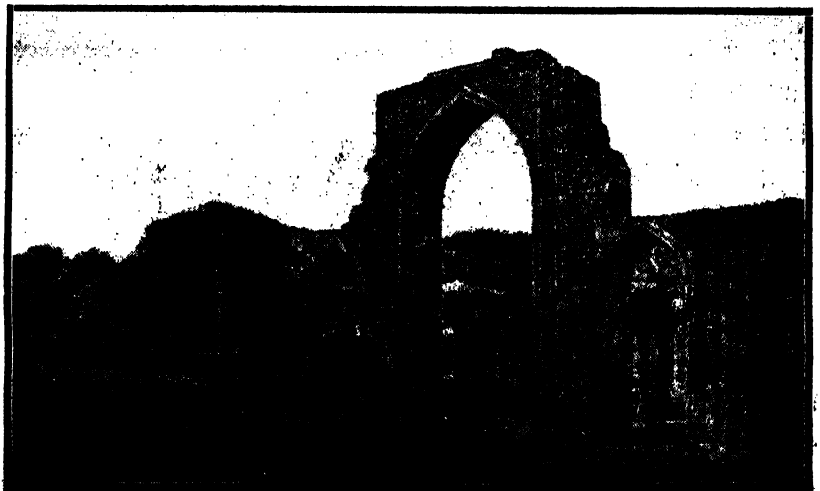
প্রাচীন ভারতের শিল্পের সভ্যতার একটি অপূর্ব্ব নিদর্শন কুতব মিনার দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। কিন্তু যতই নিকটস্থ হইতে লাগিলাম, উহার বিরাটত্ব ও শিল্পীর নৈপুণ্য দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইতে লাগিলাম। আমরা তৎসমীপে পৌছিয়া প্রথম পথের দক্ষিণে অবস্থিত ঐ স্থানের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সমাধি মন্দিরটি দেখিলাম। সৈয়দ আহম্মদ জান নামক স্থানীয় একটি বৃদ্ধ মুসলমান আমাদের সঙ্গে লইয়া সমস্ত দেখাইতে লাগিলেন। তাঁহার কথায় জানিলাম, উহা সম্রাট আকবরের বড় ভ্রাতা আদম কাদের দ্বারা প্রায় চারিশতাধিক বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত। ইহার নিম্নাংশ প্রস্তরনির্ম্মিত।

এখান হইতে অনতিদূরে পথহীন বন্ধুর প্রস্তরময় ভূমির উপর যাইয়া একটি ৮০ ফুট গভীর ৭ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট কূপ দেখিলাম। উহার জল তুলিবার জন্য পার্শ্বে দীর্ঘ সোপান-শ্রেণী আছে। উহা আলতামাসের কূপ নামে খ্যাত য়ুরোপীয়রা উহাকে Jumping well বলে। দুই চারি আনা পয়সা দিলে স্থানীয় কোন কোন লোক উহার উপর হইতে নিম্নে ঝম্প প্রদান করিয়া তাহার কৃতিত্ব দেখাইয়া থাকে। আমরাও অবশ্য তাহা দেখিলাম। ইহার নিকটেই জনশূন্য তৃণগুল্মময় প্রান্তর মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ

যোগমায়ার মন্দির

সুলতানা রিজিয়ার প্রস্তর-সমাধি ও তৎপার্শ্বে রিজিয়ার নামসংযুক্ত আর একটি অপেক্ষাকৃত ছোট কূপ দেখিলাম। উহা এক্ষণে শুষ্ক। রিজিয়ার সমাধি-মন্দিরটি প্রস্তর-নির্ম্মিত, কিন্তু তাদৃশ বৃহৎ নয়। মন্দিরগাত্রে কোরাণের বয়েদ সকল পাষাণে ক্ষোদিত আছে। গম্বুজের স্থানে স্থানে নীল ও হরিৎবর্ণের মিনার কায ছিল, এখনও তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। ইহার ঠিক পার্শ্বে একটি পতিত মসজেদ রহিয়াছে। এখানে এখন আর কোন জনমানব যে কখন ভজনা করিতে যায়, তাহা মনে হইল না।

এই স্থানে চতুষ্পার্শ্বে অনেকদূর পর্য্যন্ত কত যে কবর ও ছোট বড় সমাধিমন্দির রহিয়াছে, উহার মধ্যে কোন্‌টি জ্ঞাতব্য, কে এখন আর তাহা প্রমাণসিদ্ধরূপে স্থির করিবে? ইহার অধিকাংশই ধ্বংসের পথে চলিয়াছে; কালে শুধু প্রস্তরস্তূপ রহিয়া যাইবে মাত্র।

এখান হইতে পথে উঠিয়া যোগমায়া দেবীর মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিলাম। মন্দিরদ্বার বন্ধ ছিল, খুলিয়া অভ্যন্তরে কোন মূর্ত্তি দেখিলাম না। যাহা দেখিলাম, তাহাতে মনে ভয় হইল। বৈদ্যনাথ বা কাশীতে বিশ্বেশ্বরের ন্যায় যেন মৃত্তিকা হইতে সামান্য উন্নত হইয়া কোন বস্তু

আলতামাসের সমাধি
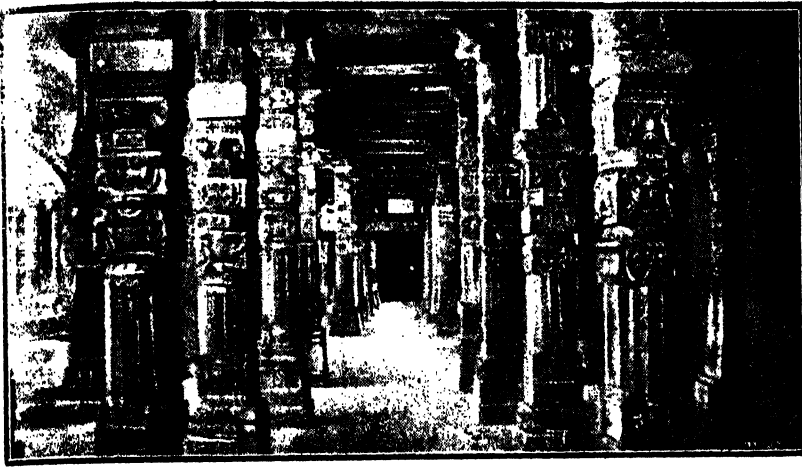
পৃথ্বীরাজের মন্দিরের ভগ্নাবশেষ

মূর্ত্তি পুষ্পদ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া আছে। মন্দির-সেবিকা এক বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, এখানে অন্য কোন মূর্ত্তি নাই, উহা পিণ্ডমূর্ত্তি। কবে কিরূপে প্রতিষ্ঠিতা হন, তাহা অজ্ঞাত। কথিত আছে, পৃথ্বীরাজের কন্যা এই দেবীর পূজা করিতেন। মুসলমান রাজ্য—সমগ্র দিল্লীর মধ্যে এই হিন্দু দেবী প্রসিদ্ধ।

এইবার আমরা কুতব মিনারের উদ্দেশে উহার বহিঃপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া ভিতরে পৃথ্বীরাজের কীর্ত্তি-সমূহ দেখিবার পূর্ব্বে তাঁহার মন্দির-প্রাঙ্গণের বিশাল তোরণপঞ্চকের পার্শ্বে আলাউদ্দীন খিলজির ও আলতামাসের ছাদহীন সুন্দর কারুকার্য্যময় প্রস্তর-নির্ম্মিত সমাধি-মন্দিরদ্বয় ও কবর দেখিলাম। শেষোক্তটির অভ্যন্তরস্থ মন্দির-গাত্রের প্রায় সমস্ত অংশই মুসলমান ধর্ম্মগ্রন্থের শ্লোক সকল উদ্ধৃত করিয়া ক্ষোদিত রহিয়াছে। ইহার মধ্যে কবর ও অন্যান্য অনেকটা অংশ শ্বেতমর্ম্মর-নির্ম্মিত। এই সমাধিমন্দির আলতামাসের পুত্র সুলতান রুকন্‌উদ্দীন ও কন্যা সাম্রাজ্ঞী রিজিয়া কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার ছাদ না থাকার সম্বন্ধে এইরূপ কিম্বদন্তী যে, পাছে আত্মার স্বর্গপ্রাপ্তির কোন বাধা হয়, এই জন্য ছাদ বা গম্বুজ নির্ম্মিত হয় নাই।

পৃথ্বীরাজ মন্দিরের স্তম্ভ

ভিতরের অঙ্গনে প্রবেশ-পথে মধ্য-তোরণের পরই সুপ্রসিদ্ধ লৌহস্তম্ভ। উহা ভারতে নয়—জগতের মধ্যে একটি অপূর্ব্ব স্মৃতিস্তম্ভ। এই লৌহ তাম্র ও দস্তা-মিশ্রিত ধাতু দ্বারা একখণ্ডে নির্ম্মিত নিরেট স্তম্ভটি ৩১৯ খৃষ্টাব্দে হিন্দু রাজাদের দ্বারা স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে। ইহা উচ্চে ২৩ ফুট ৮ ইঞ্চ, ওজন ১৭ টনেরও অধিক নির্ণীত হইয়াছে। ইহাকে ফিরোজ সা লাটও বলিয়া থাকে। উহার বামে ও সম্মুখের কিয়দংশে এবং দক্ষিণদিকের কতকটা স্থানে পৃথ্বীরাজ-মন্দিরের যে প্রস্তরস্তম্ভ সকল দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহার কারুকার্য্য অতীব মনোহর। পূর্ব্বোক্ত তোরণগুলিও অতি সুন্দর ও বৃহৎ। প্রাচীন হিন্দু স্থাপত্যের নিদর্শন স্তম্ভগুলির স্থানে স্থানে যে সব হিন্দু দেব-দেবীর মূর্ত্তি ছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া হতশ্রী করা হইয়াছে, তাহা দেখিলেই বুঝা যায়।

এইবার আমরা ভারত-গৌরব কুতব মিনারের পাদ-দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। একবার উপর পানে চাহিয়া দেখিলাম, উপরে উঠিতে ভয় হইতে লাগিল, কিন্তু সে লোভ ছাড়িতে পারিলাম না। দুই তিন বার বসিয়া উপরে উঠিলাম। দেখিলাম, সোপানশ্রেণী যতদূর সুন্দর ও নিরাপদ করা যাইতে পারে, তাহা করা হইয়াছে। ইহাতে মোট ৩ শত ৮০টি সোপান আছে। ভিতরে অধিক অন্ধকারও নয়। উহার উপর হইতে পার্শ্বস্থ পল্লী, সমস্ত পুরাতন নূতন দিল্লী, অস্থায়ী রাজধানী এবং নূতন দিল্লী যাহা গঠিত হইতেছে, সব বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। এক

জন আমার মত আগন্তুকের পক্ষে ইহার উপর হইতে সত্বর বুঝিবার মত সুবিধা হয়, এত আর কিছুতে হয় না। শুনিলাম, মিনারের শীর্ষাংশের উপর বজ্রপাত হইয়া ভূমিসাৎ হওয়ায় আর উহা পুনর্নির্ম্মাণের উপায় হয় নাই। উহা লর্ড কার্জ্জনের দ্বারা এখন নিম্নে এক স্থানে রক্ষা করা হইয়াছে দেখিলাম। ভারতের মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ স্তম্ভ। ইহা উচ্চে ২ শত ৪২ ফুট, সমস্তটাই প্রস্তর-নির্ম্মিত। ইহা হিন্দুদিগের দ্বারা কি মুসলমানদের দ্বারা নির্ম্মিত, সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও বিবিধ কারণে মনে হয় মুসলমানদের দ্বারাই সৃষ্ট হইয়াছে। কথিত আছে, ২৭টি হিন্দু-মন্দিরের উপাদান লইয়া ১২ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়া সামসদ্দীন আলতামাস কর্ত্তৃক ১২০০ খৃষ্টাব্দে ইহার গঠনের পরিসমাপ্তি হয়।

কুতবমিনার

মিনারের অনতিদূরে যে অপর একটি অপরিচ্ছন্ন স্তম্ভাকারের প্রস্তর-স্তূপ মত দেখা যায়, শুনিলাম উহা আলতামাসের (আলাউদ্দীনের) দ্বারা আর একটি উচ্চতর মিনার নির্ম্মাণের উদ্দেশ্যে গঠিত হইতেছিল। ইহার যে অংশ রহিয়াছে, উহার পরিধি কুতবমিনার অপেক্ষা বৃহৎ বলিয়া মনে হইল। এখানে প্রাঙ্গণ-পশ্চাতে দক্ষিণ পার্শ্বে একটি অতি সুন্দর প্রস্তর-নির্ম্মিত সৌধ ও ফটক আছে, উহা আলাউদ্দীন খিলিজীর দ্বারা নির্ম্মিত। উহার পশ্চাতে উঁহার পুত্র ও কন্যার সমাধি রহিয়াছে। ইহাকে আলাই দরজা বলে।
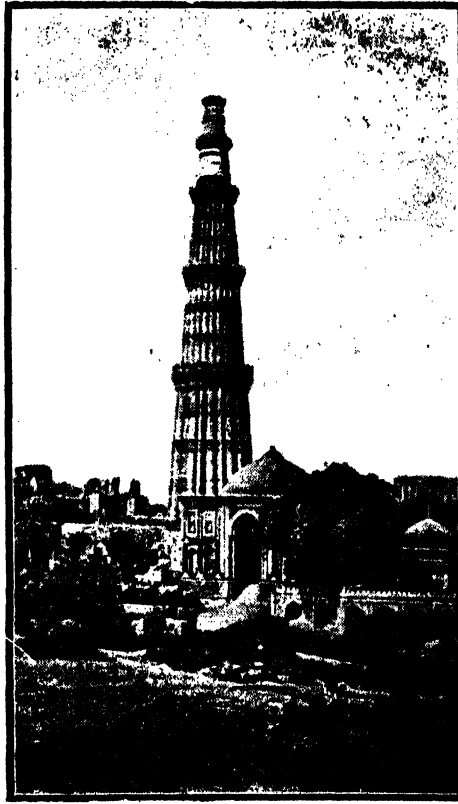
কুতননগরে আমরা এই সব দেখিয়া ফিরিবার পথে পূর্ব্বোল্লিখিত সফদরজঙ্গের লোহিত, শ্বেত প্রস্তরময় বৃহৎ সমাধি দেখিলাম। ভিতরের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়াই প্রস্তরমণ্ডিত দীর্ঘ জলাধার দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। সমাধির দক্ষিণে বাদশা পছন্দ, উত্তরে মোতিমহল এবং পশ্চিমে জঙ্গলমহল নামে তিনটি মহল আছে। এই সমস্ত সফদরজঙ্গের পুত্র সুজউদ্দৌল্লার দ্বারা ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে ৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। মূল সমাধি-মন্দিরে মূল্যবান্ প্রস্তরের কায ছিল, মনে হইল তাহা খুলিয়া লওয়া হইয়াছে। ইহার পর ঠিক সম্মুখের পথ ধরিয়া নিজামুদ্দিন যাইলাম, তথায় প্রবেশ করিয়া প্রথমেই একটি জলাশয় দেখিলাম। উহা অতিক্রম
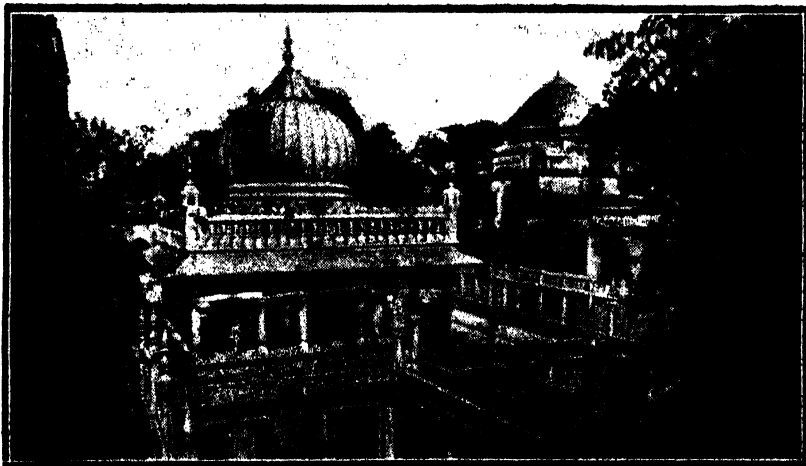
নিজামুদ্দীন আউলিয়া ও জাহানারার সমাধি

হুমাউনের সমাধি-মন্দির

...রিয়াই নিজামুদ্দীনের সমাধি, ...র্শ্বে একটি বড় মসজেদ ...ছে। শুনিলাম নিজামুদ্দীন ...লাউদ্দীনের গুরু ছিলেন। ...র শ্বেতমর্ম্মর-মণ্ডিত সমাধির ...রুকার্য্য ও সোনার কাযগুলি ...ত চমৎকার ও মূল্যবান্। ...খানে এখনও মুসলমান ধর্ম্মের রীতিমত পূজাদির ব্যবস্থা আছে দেখিলাম। ধূপ-ধূনা-কুসুম-কুঙ্কুম-গন্ধে স্থানটি আমোদিত।

এই সমাধির নিকটেই আদর্শ কন্যা সম্রাট-দুহিতা সুপ্রসিদ্ধ জাহানারার শ্বেত-মর্ম্মরময় তৃণাচ্ছাদিত কবর আছে। এই পুতচরিত্রা রমণী-রত্নের স্বরচিত একটি ফারসী শ্লোক এখানে লিখিত আছে। বঙ্গ-কবির ভাষায় তাহার অর্থ,—

"বহুমূল্য আভরণে করিও না সুসজ্জিত
কবর আমার,
তৃণ শ্রেষ্ঠ আভরণ দীন আত্মা জাহানারা
সম্রাট কন্যার।"

এই পিতৃভক্তি-পরায়ণার পুণ্য সমাধিদর্শনে অজ্ঞাতে শ্রদ্ধাভরে শির নত হইয়া পড়ে। দেখিলাম, এখানে এই ঘেরার মধ্যে পাশাপাশি তিনটি—মধ্যে জাহানারা, এক পার্শ্বে মির্জা আলি খাঁ, অপর পার্শ্বে জহরন্নেসার কবর রহিয়াছে। পার্শ্বের অপর একটি প্রস্তর-বেষ্টনী মধ্যে মহম্মদ শা ও দ্বিতীয় আকবর শাহার পুত্র সাজাদা জাহাঙ্গীরের কবর রহিয়াছে। এই সব সমাধির উপর কোন ছাদ নাই, মাথার উপর আকাশ। এইগুলির চতুর্দ্দিকের প্রস্তর-জাল ও এক খণ্ড শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত বিচিত্র কারুকার্য্যময় কবাট অতি রমণীয়। কবি খসরুর সমাধিও ইহার অনতিদূরে অবস্থিত। নিজামুদ্দিনে রবিউশানির ১৭।১৮ই তারিখে প্রতি বৎসর একটি করিয়া মেলা বসিয়া থাকে।
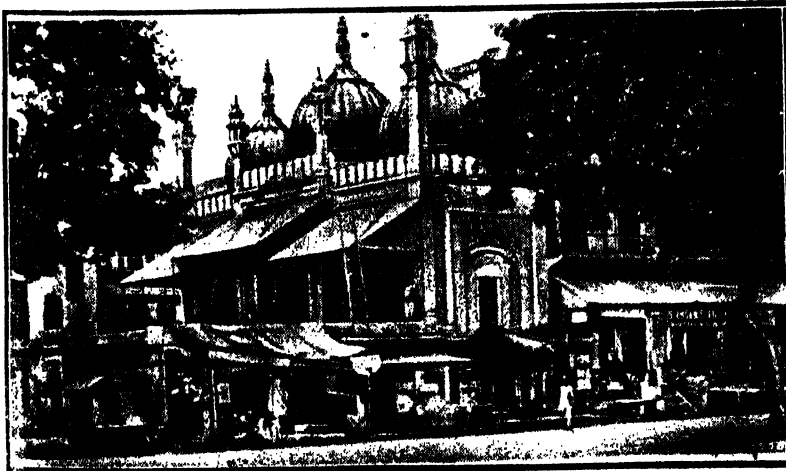
এই স্থান হইতে বরাবর বাদশা হুমায়ুনের সুপ্রসিদ্ধ সমাধি দেখিতে যাইলাম। ইহা একটি সুন্দর উদ্যানমধ্যে স্থাপিত অপূর্ব্ব সমাধি-মন্দির। সেকেন্দ্রায় আকবরের সমাধি ভিন্ন এত বৃহৎ সমাধি মন্দির ভারতে আর আছে কি না জানি না। লোহিত ও শ্বেত প্রস্তরের দ্বারা সুউচ্চ বেদীর উপর ইহা নির্ম্মিত। গভর্ণমেণ্টের প্রদত্ত প্রস্তর-ফলকে দেখিলাম, এই মন্দিরে দারা সেকো, ফরকসায়ার, রুখিউদ্দৌলা প্রভৃতি ১ শত ৭৫টিরও অধিক টাইমুর বংশের বংশধরদের সমাধি আছে। এই বিরাট স্মৃতি-মন্দির হুমায়ুনের পত্নী সম্রাট আকবরের মাতা হামিদা বানু বেগম—যিনি

সোনারি মসজেদ

যন্ত্র-মন্ত্র নামক মান-মন্দির

দ্বিতীয় ..ট এবং এ..ন মনোরম অ..গ্ন মন্দিরও না..।

এই সমা..র পশ্চাতে ..িছু দূরে সের-ম..ল নামে একটি ধ্বংসপ্রায় রাজ-ভবন আছে, ইহা সের শার দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। ফিরোজাবাদের দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া পুরান কেল্লার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব পর্য্যন্ত স্থানে তিনি রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার নাম রাখিয়াছিলেন, "দিল্লী সেরশাহী।"

হুমায়ুন-সমাধির প্রাঙ্গণের বাহিরের এক পার্শ্বেও একটি বৃহদায়তনের সমাধি আছে, উহার গম্বুজটির সমস্ত বহির্দ্দেশ সুন্দর সবুজ বর্ণের মিনার কায করা। উহা কাহার সমাধি, তাহা জানিতে পারিলাম না। প্রাঙ্গণ-প্রবেশপথে তোরণ সম্মুখে একটি অষ্টকোণবিশিষ্ট জীর্ণ সমাধি-মন্দির দেখিলাম। কেহ বলেন, উহা ইসা খাঁর সমাধি; আবার কেহ বলেন, বৈরাম খাঁর পুত্র আবদুর রহিম খাঁ ওরফে খান্না কর্ত্তৃক তাঁহার

সাধারণতঃ হাজি বেগম নামে পরিচিতা ছিলেন, তাঁহার দ্বারা ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে ১৫ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। আগ্রার জগদ্‌বিখ্যাত তাজ যেমন পত্নী-প্রেমের বিরাট উদাহরণ, হুমায়ুনের সমাধি তেমনই পতি-ভক্তির দৃষ্টান্ত। বেগমসাহেবাও সম্রাট স্বামীর পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠে চিরনিদ্রিতা আছেন। এইটি এবং সফদার-জঙ্গের সমাধি-মন্দির ও গম্বুজাদির স্থাপত্য কুতবের পথে দৃষ্ট প্রাচীন সমাধিগুলির সহিত কিছু বিভিন্ন মনে হইল। ইহাদের গম্বুজগুলির গঠন কতকটা লক্ষ্ণৌয়ের সমাধি-মন্দির-গুলির মত। বলা বাহুল্য, লক্ষ্ণৌয়ের এ সব স্থাপত্য অনেক আধুনিক।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী-বিদ্রোহের সময় বাহাদুর শা এই হুমায়ুন মকবরার মধ্যেই লুকাইয়াছিলেন এবং এই স্থান হইতেই তিনি ইংরাজহস্তে আত্মসমর্পণ করেন। এখানে পূর্ব্বে একটি মাদ্রাসা কলেজ ছিল। এই পাষাণ মন্দিরটি একটি অতি রম্য উদ্যানমধ্যে প্রতিষ্ঠিত। সমস্ত দিল্লীর মধ্যে এমন সুন্দর সমাধি-উদ্যান আর

নূতন দিল্লী

সাহজাহানের নির্ম্মিত দুর্গ

যন্ত্র আছে। তথাকার হিন্দুস্থানী তত্ত্বাবধায়ক যন্ত্রগুলির ব্যবহার সম্বন্ধে আমাদের বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া যাহা বলিল, জ্যোতিষ-শাস্ত্রে অনভিজ্ঞতা হেতু তাহা বিশেষ কিছু ভাল করিয়া বুঝিতে না পারিলেও পূর্ব্বকালের হিন্দুদের প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানটি দেখিয়া মনে যুগপৎ আনন্দ ও দুঃখ হইল। কাশীর মান-মন্দিরের যন্ত্রের অনুরূপ দুই তিনটি যন্ত্র এখানেও দেখিলাম, কিন্তু ইহা আকারে আরও বৃহৎ।

পত্নীর সমাধির জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। কথিত আছে, ইহা তুষারধবল ও লোহিত প্রস্তরে নির্ম্মিত থাকায় এক সময় দর্শনযোগ্য ছিল, নবাব সুজাউদ্দৌলা খাঁ সে সমস্ত অপহরণ করিয়া লক্ষ্ণৌএ লইয়া যাওয়ায় ইহা শ্রীহীন হইয়া গিয়াছে।

এই স্থান ও নিজামুদ্দীনের প্রায় মাঝামাঝি শ্বেত প্রস্তর-নির্ম্মিত চৌষট্টিটি স্তম্ভবিশিষ্ট একটি সুন্দর অট্টালিকা আছে, ইহার নাম "চৌষাট খম্বা।" ইহা ১৬০০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখান হইতে আমরা পুরান কেল্লা দেখিতে যাইলাম, কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকারে সে বিরাট ধ্বংসলীলা ভাল করিয়া দেখা হইল না। পুনরায় কল্য দেখা হইবে স্থির করিয়া অননুভূতপূর্ব্ব একটি ভাব হৃদয়ে লইয়া সে দিনের মত বাসায় ফিরিলাম। এই সব দেখিয়া ফিরিতে হৃদয় যে বিষাদে ভরিয়া উঠে, তাহা প্রত্যক্ষদর্শী ভিন্ন অপরের বুঝা অসম্ভব। এমন ধ্বংসলীলা, এমন শ্মশানের বিভীষিকা কখন কোথাও দেখি নাই; পূর্ব্বে কোন দিন কল্পনাতেও আনিতে পারি নাই।

পরদিন প্রত্যূষে বাহির হইয়া জয়পুরাধিপতি মহারাজা জয়সিংহ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত 'যন্ত্র-মন্ত্র' নামক মানমন্দির দেখিতে যাইলাম। দেখিলাম, উহার মধ্যে

তার পর বৃটিশরাজের নূতন দিল্লী—যাহা এখনও গঠিত হইতেছে, তাহার সেক্রেটেরিয়ট বাড়ী, লাটভবন, কাউন্সিল চেম্বার প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ প্রাসাদাদি দেখিতে যাইলাম। বিপুল অর্থব্যয়ে নির্ম্মিত ঐ সব বড় বড় বাড়ীর স্থাপত্য আমার মোটেই ভাল না লাগিলেও রাজধানীর হিসাবে ইহার পথ-ঘাট, উদ্যান, এভেনিউ, পার্ক, প্রভৃতির সৌন্দর্য্য বা সুন্দর নগরবিন্যাস-কৌশল অস্বীকার করিবার উপায় নাই। শুনিলাম, যুরোপের সর্ব্বপ্রধান স্থপতির পরামর্শানুসারে এ সব সৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু আমার মনে হইতে লাগিল, এমন বিফলতার উদাহরণ বুঝি আর কোথাও নাই। নব-দিল্লীর মধ্যমণি কাউন্সিল চেম্বারের বাহিরের থাম ও তাহার

জুম্মা মসজেদ
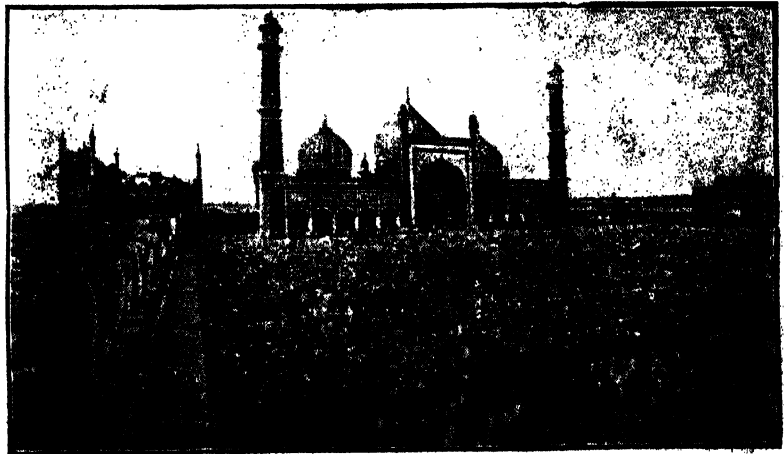
নিম্নাংশের অসামঞ্জস্য দেখিবা-মাত্রই লক্ষ্য হয়। আর আকারের তুলনায় উপযুক্ত উচ্চতাহীন উহার গম্বুজ দেখিয়া মনে হয়, বুঝি ভীমসেন সক্রোধে এক গদাঘাতে উহাকে বসাইয়া দিয়াছিলেন। এই সব দেখিয়া বেলা অধিক হওয়ায় বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

পুরান কেল্লা

আহারাদির পর বাহির হইয়া আজ পুনরায় পুরান কেল্লা দেখিতে যাইলাম। ইহা যমুনার তীরে অবস্থিত। এই স্থানটিকেই অনেকে ইন্দ্রপ্রস্থ বলিয়া থাকে এবং এই দুর্গ ও নগর যুধিষ্ঠির দ্বারা নির্ম্মিত এইরূপ কিম্বদন্তী, কিন্তু প্রকৃত ইন্দ্রপ্রস্থ কোথায় ছিল, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। কুতব প্রদর্শক বৃদ্ধ আমাদের বলিয়াছিল যে, সেই স্থানের নাম ইন্দ্রপ্রস্থ। দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে একটি প্রকাণ্ড তোরণ পার হইতে হয়। অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, চতুর্দ্দিক সুদৃঢ় সু-উচ্চ প্রাকার দ্বারা বেষ্টিত ছিল, এক্ষণে কোন কোন স্থান ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। ভিতরে এই প্রাকার-সংলগ্ন দুই তিন শ্রেণী দীর্ঘ বারন্দার মত, মধ্যে বিস্তৃত ভূমিখণ্ডের উপর দুই তিনটি প্রাচীন অট্টালিকা মাত্র এবং একটি নবনির্ম্মিত ক্ষুদ্র গৃহ ও মন্দির; যমুনার দিক্ ভিন্ন অপর দুই দিকেও দুইটি সুবৃহৎ ভগ্ন তোরণ আছে। মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, শ্বেত প্রস্তরের এক ক্ষুদ্র লিঙ্গমূর্ত্তি ও অন্য একটি শ্বেত প্রস্তরের নির্ম্মিত দেবীমূর্ত্তি। অনুসন্ধানে তত্ত্বাবধায়কের কথায় জানিলাম, উহা কুন্তীদেবী নামে খ্যাত। এই উভয় মূর্ত্তিই কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মৃত্তিকাভ্যন্তর হইতে পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া শুনিলাম।
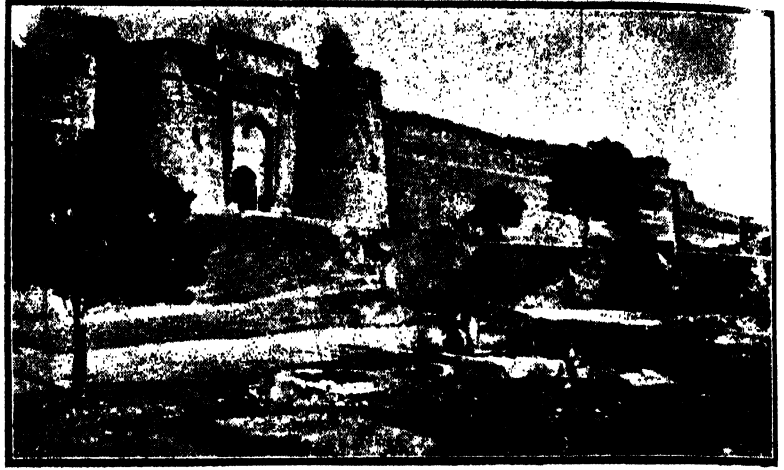
এখানে দ্রষ্টব্যের মধ্যে একটি সুবৃহৎ পঞ্চ অংশে বিভক্ত কারুকার্য্যময় পাষাণনির্ম্মিত মসজেদ ও উহার অনতিদূরে অষ্টকোণবিশিষ্ট একটি উচ্চ অট্টালিকা। কথিত আছে, এই স্থানে হুমায়ুন বাদশার গ্রন্থাগার ছিল এবং এই স্থান হইতেই পদস্খলিত হইয়া মর্ম্মর মণ্ডিত প্রাঙ্গণে পতিত হইয়া তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল। প্রথমোক্ত মসজেদটির বৃদ্ধ মুসলমান রক্ষক, পঞ্চকক্ষ দেখাইয়া বলিল, ইহা পঞ্চ পাণ্ডবের দরবার ছিল। এ কথার মূলে কোন সত্য আছে বলিয়া জানা নাই, কিন্তু এই মসজেদের স্থাপত্য-সকলের মধ্যে অনেক স্থান যে হিন্দু স্থাপত্যের অনুরূপ, তাহা নিঃসংশয়ে

মতি মসজেদ

দেওয়ানে আমের সিংহাসন বেদী

ইহা দেখিয়া ফিরোজ শা কোটলা দেখিতে যাইলাম। ইহা পাঠানরাজের রাজপ্রাসাদ ছিল, এখন প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে। দেখিয়া বুঝা যায়, এক সময় এ স্থানও যথেষ্ট আড়ম্বরপূর্ণ ছিল। ইহাও বেশ সুদৃঢ় প্রাকার-বেষ্টিত ছিল, এক্ষণে অনেক অংশ ভগ্ন। ভিতরে যে সব প্রাসাদাদি ছিল, তাহাও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখানে একটি ভগ্ন মহলের উপর একটি অশোকস্তম্ভ স্থাপিত আছে। উহা সম্রাট্ ফিরোজ শাহ দ্বারা অন্য স্থান হইতে আনয়ন করিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই স্থান হইতে সুপ্রসিদ্ধ জুম্মা মস্জেদ দেখিতে যাই। ইহা সম্রাট্ সাহজাহানের এক বিরাট কীর্ত্তি। কথিত আছে, প্রতিদিন দশ সহস্র লোককে কর্ম্মে নিযুক্ত রাখিয়া আট বৎসর ছয় মাসে প্রায় পনের লক্ষ টাকা ব্যয়ে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই বিরাট উপাসনাগারে প্রবেশ করিতে দীর্ঘ সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া উঠিতে হয়। কথিত আছে, সম্রাট্ সাহজাহান দুর্গ-প্রাসাদমধ্যে সিংহাসনে বসিলে তাঁহার মস্তক হইতে যাহাতে উপাসকদিগের বসিবার স্থান নিম্নে না হয়, এই কারণ উহা এতাদৃশ উচ্চ বেদীর উপর তিনি

বলা যায়। ইহার পার্শ্ব দিয়া যমুনায় যাইবার জন্য সুড়ঙ্গের মত স্থান দিয়া সোপানশ্রেণী দেখিলাম। স্থানীয় রক্ষকের মুখে শুনিলাম, এই পথ দিয়া বেগমগণ যমুনা স্নান করিতেন।

এখানকার সু-উচ্চ ভগ্ন তোরণের উপর হইতে সমস্ত সহরটি বেশ বুঝিতে পারা যায়। কিল্লার বহির্দ্দেশে যে পরিখা ছিল, এখনও তাহার চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয়। হুমায়ুন রাজ্য-প্রাপ্তির পরই এই দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে সের শার সহিত যুদ্ধে পরাভূত হওয়ার পর তাঁহার দ্বারা ইহার নির্ম্মাণকার্য্য সমাপ্ত হইয়াছিল।

কালামহল নামক সৌধটি এই কেল্লার নিকটেই অবস্থিত। ইহাও এখন ধ্বংসের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। দেখিয়া মনে হয়, একদিন ইহা বিশেষ সৌষ্ঠবসম্পন্ন ছিল। ইহা ভিন্ন এ গোরস্থানের চতুর্দ্দিকে দেখিবার আরও বহু সমাধি আছে। এই সমস্তই ইন্দ্রপ্রস্থের অন্তর্গত। এখানকার ভীষণ শ্মশানদৃশ্য দেখিয়া হৃদয় গভীর শোকে আচ্ছন্ন হয়। মনে হয়, এই কি সেই কুরুপাণ্ডবের দেশ, এই কি সেই ধর্ম্মরাজ্য। সূচ্যগ্র ভূমি বিনা যুদ্ধে দিব না, দুর্য্যোধনের সগর্ব্ব উক্তির পর ইন্দ্রপ্রস্থে যে ধর্ম্মরাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল, ইহাই কি সেই ইন্দ্রপ্রস্থ ?

দেওয়ানে খাসের ভিতরের দৃশ্য

নির্ম্মিত করাইয়া ছিলেন। মসজেদের অভ্যন্তরস্থ প্রাঙ্গণ এত প্রশস্ত যে, উহার মধ্যে একসঙ্গে এক লক্ষ লোক নামাজ পড়িতে পারে। উহার উপরের শ্বেত মর্ম্মর-নির্ম্মিত সুবৃহৎ বুরুজ-ত্রয় ও উভয় পার্শ্বের মিনারদ্বয় যথেষ্ট উচ্চ। সমস্ত সহরের মধ্যে এত উচ্চ আর কোন সৌধ নাই। সমস্ত মসজেদটি লোহিত প্রস্তরের দ্বারা নির্ম্মিত। গম্বুজ ও ভিতরের মেজে দেওয়াল প্রভৃতি শ্বেত ও কৃষ্ণপ্রস্তর-শোভিত। সমস্ত সহর হইতে এই মসজেদ-চূড়া দেখিতে পাওয়া যায়।
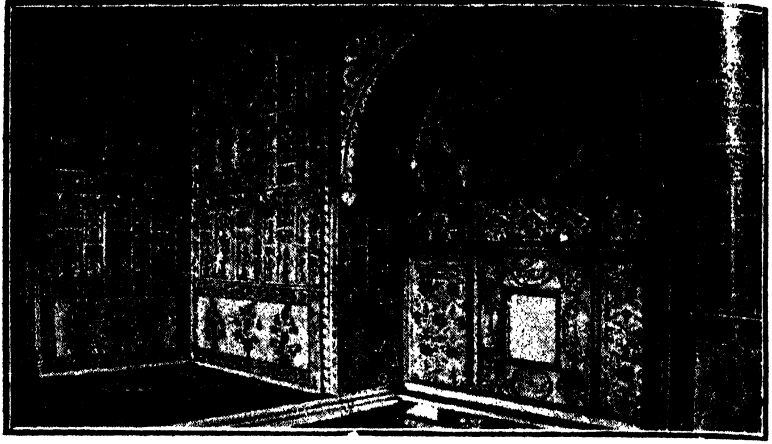
ন্যায়ের মানদণ্ড

মসজেদ হইতে দিল্লী দুর্গে যাইবার পথে এডোয়ার্ড মেমোরিয়াল উদ্যানের মধ্য দিয়া যাইলাম। ইহার মধ্যে সম্রাট্ সপ্তম এডোয়ার্ডের পাষাণময় মূর্ত্তিটি সুন্দর। আমরা এখানে আর বিলম্ব না করিয়া অবিলম্বে পাশ লইয়া দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলাম।

কুতবের পর দিল্লীর এই দুর্গ বা রাজপ্রাসাদ প্রধান দ্রষ্টব্য। তদভ্যন্তরস্থিত 'দেওয়ানে আম', 'রঙ্গ মহাল', 'দেওয়ানে খাস', 'হামাম্', 'মতি মসজেদ' প্রভৃতির তুলনা বোধ হয় জগতে আর কোথাও নাই। প্রথম প্রবেশ করিয়াই নহবৎখানা পর্য্যন্ত পথের উভয় পার্শ্বে সারি সারি বিবিধ দ্রব্যের বিপণীশ্রেণী। নহবৎখানার উপরে এক্ষণে একটি যুদ্ধোপকরণাদির প্রদর্শনী আছে। ইহাতে যুদ্ধ-সংক্রান্ত বিবিধ চিত্র ও দ্রব্যাদি রক্ষিত হইয়াছে। ইহা আকারে খুব বৃহৎ না হইলেও একটি দেখিবার উপযুক্ত স্থান। ইহা দেখিয়া পুরাতন কামানশ্রেণী সজ্জিত বৃত্তাকার পথের পর লোহিত প্রস্তরনির্ম্মিত সুপ্রসিদ্ধ "দেওয়ানে আম।" সম্রাট সাহজাহান এই স্থানে বসিয়া সাধারণভাবে প্রজাদের নিবেদন-আবেদন শ্রবণ ও অন্যান্য রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। বাদসার সিংহাসনের জন্য নির্ম্মিত শ্বেত মর্ম্মরময় উচ্চ বেদী ও উহার পশ্চাতের দেওয়ালগাত্রের অতি মূল্যবান্ কারুকার্য্যগুলি দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। এখানে বহু বর্ণের প্রস্তরাদিসংযোগে এমন সুন্দর লতাপাতা ও পক্ষিসকল অঙ্কিত আছে, যাহা ভারতে আর কোথাও নাই; পৃথিবীতে কোথাও আছে বলিয়াও শুনা যায় না। এই কক্ষেই জগদ্বিখ্যাত কোহিনুর-মণ্ডিত ময়ুর-সিংহাসন স্থাপিত ছিল এবং কক্ষের দেওয়াল, ছাদ ও গৃহকুট্টিম বহুমূল্য হীরক, চুণী, মতী প্রভৃতির দ্বারা শোভিত ছিল।

হামামের প্রথম অংশ
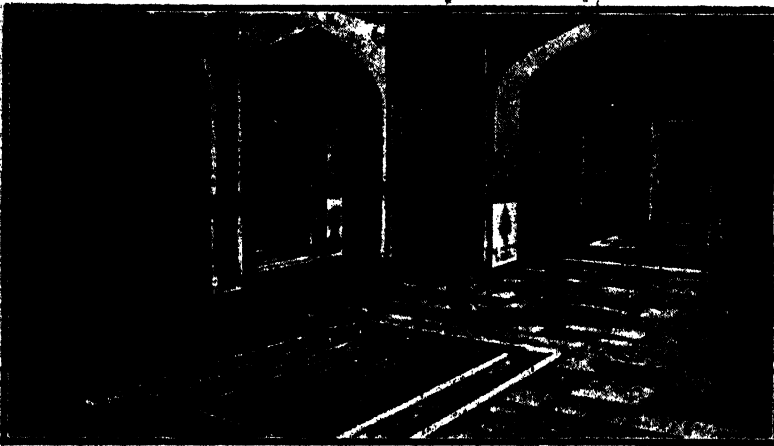
ইহার পশ্চাতে ও তাহার উভয় পার্শ্বে রঙ্গমহল, দেওয়ানে-

খাস, শিশমহল, মতি-মসজেদ, হামাম্ ও শীত-গ্রীষ্ম প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে বিশ্রামের জন্য ভিন্ন ভিন্ন মহল সকলের সৌন্দর্য্য বর্ণনার দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করা আমার মত লোকের পক্ষে বৃথা। প্রায় সকলগুলিই প্রধানতঃ শ্বেত মর্ম্মর দ্বারা নির্ম্মিত। কোথাও সোণালি কায, কোথাও ক্ষোদাই প্রস্তরের লতাপাতা এবং বহু স্থানেই বহুমূল্য প্রস্তর-ক্ষোদিত কারুকার্য্যসকল দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। "দেওয়ানে খাস" নামক সৌধের উত্তর ও দক্ষিণদিকের দেওয়ালে স্বর্ণাক্ষরে যে লেখা আছে—"যদি মরতের মাঝে কোথাও স্বর্গ থাকে, তবে তাহা হেথায়"—এ কথা অনেকেরই মনে হয় বর্ণে বর্ণে সত্য। ইহা পূর্ব্বে কনক-ফলকে লিখিত ছিল।

দেওয়ানে আম
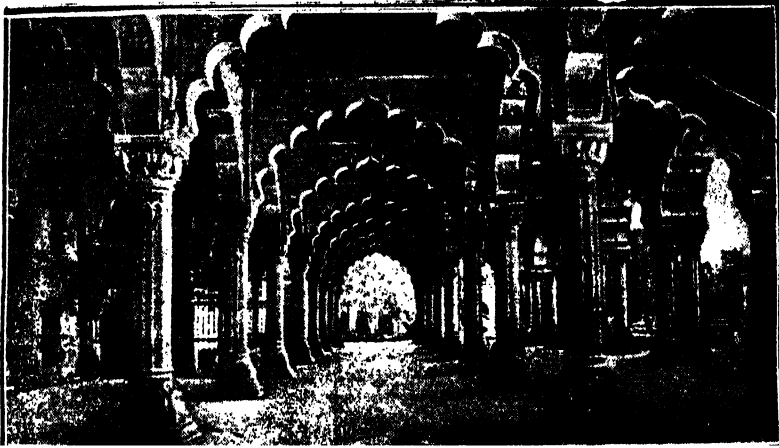
দেওয়ানে আম ও দেওয়ানে খাস নামক কক্ষ দুইটি সম্বন্ধে ফারগুশন যে লিখিয়াছেন,—"They are the gems of the palace", এ কথা ঠিক। পূর্ব্বে সিংহাসনের নিকট যে স্বর্ণনির্ম্মিত মানদণ্ড বিরাজিত ছিল, এখন ক্ষুদ্র পিত্তলফলকে তাহার অনুরূপ নির্ম্মিত হইয়া সংলগ্ন আছে, রক্ষকের দ্বারা তাহার প্রতি দর্শকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়া থাকে। উহার চতুষ্পার্শে আরবী ভাষায় ক্ষোদিত আছে যে "মহাপ্রলয়ের দিন স্বয়ং জগৎপিতা জগদীশ্বর মানদণ্ড ধারণপূর্ব্বক রাজা মহারাজা হইতে কুটীরবাসী দীন ভিক্ষুকের পাপ-পুণ্যের বিচার করিবেন।" এই ন্যায়ের মানদণ্ডের নিম্নে যে প্রস্তরনির্ম্মিত জাফরি বা পাথরের ফারফোর কায প্রভৃতি দেখা যায়, তাহার শিল্পসৌন্দর্য্যও অতুলনীয়।

এখানকার হামাম্ বা স্নানাগার একটি অপূর্ব্ব জিনিষ। ইহার ছাদ দেওয়াল প্রভৃতি সমস্তই দর্পণ দ্বারা সুশোভিত। উষ্ণ ও শীতল জলের বিভিন্ন উৎসরাজি ও জলাধার এখন জলহীন। উহার একটি কক্ষের মধ্যস্থলে পদ্মের মত একটি কুণ্ড আছে, পূর্ব্বে তাহাতে গোলাপজল রক্ষিত হইত বলিয়া শুনা যায়। এখানে বাহির হইতে জলসঞ্চালনের যে সব কৌশল অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। এখানকার মতি-মসজেদ, রাণীমহাল, খোয়াবগা প্রভৃতি সমস্তই দর্শনযোগ্য। এখানকার অধিকাংশ প্রাসাদাদির মধ্যে দেখিলাম, মহা মূল্যবান প্রস্তরসমূহের পরিবর্ত্তে কাচখণ্ড দেওয়া হইয়াছে। প্রাসাদের মধ্যে একটি প্রত্নতত্ত্বাদি বিষয়ক প্রদর্শনী আছে। ইহাও আকারে খুব বৃহৎ না হইলেও ইহার ভিতর দেখিবার বিস্তর পুরাতন সামগ্রী ও চিত্রাদি আছে। দুর্গের ভিতর যে অংশ এখন সৈন্যাবাস, তাহা সাধারণের পক্ষে প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকায় তাহা দেখিতে পাইলাম না। আমরা বাহিরে চলিয়া আসিলাম।

এতাবৎ দেওয়ানে-আম দেওয়ানে-খাস প্রভৃতির যে বর্ণনা পড়িয়াছি বা চিত্রে সৌন্দর্য্য দেখিয়া মনে মনে একটা ধারণা পোষণ করিতেছিলাম, এই সব আজ প্রত্যক্ষ করিয়া বুঝিলাম, তাহার বাস্তবের সহিত তুলনাই হইতে পারে না। এ সব লিখিয়া আঁকিয়া বুঝাইবার নহে। যাঁহারা না দেখিয়াছেন, তাঁহারা অন্যত্র যেমন কোন সুন্দর সুবিশাল প্রাসাদ দেখিয়া থাকুন, তাঁহার সহিত এখানকার একটি স্তম্ভ বা খিলানেরও তুলনা হয় না।

এই প্রাসাদ ও যে সহরে ইহা প্রতিষ্ঠিত, ইহা সমস্তই সম্রাট সাহজাহানের দ্বারা নির্ম্মিত। এই স্থানের নাম সাহজাহানাবাদ। এখান হইতে বাহির হইয়া মোগল বাদশাদের ঐশ্বর্য্য, বিলাসিতা ও আড়ম্বরের কথা ভাবিতে ভাবিতে সাহজাহানের স্থাপিত পুরাতন দিল্লী চক ও অন্যান্য জনবহুল পল্লীর

ভিতর দিয়া বেড়াইয়া ও আইভরি প্যালেশ নামক গজদন্তের দ্রব্যাদির প্রদর্শনী—বিশেষ দোকানখানি দেখিয়া দিল্লীর সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার আমাদের চন্দননগরের শ্রীযুত অতুলচন্দ্র বসু মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বাসায় ফিরিলাম।

পরদিন প্রভাতে অতুলবাবুর প্রেরিত মোটরে বন্ধুবর দেবেন্দ্রনাথ আমাদের লইয়া ব্রিজের উপর দিয়া অস্থায়ী রাজধানী দেখিতে লইয়া যাইলেন। এ দিকে এই প্রথম আসিলাম। শুনিলাম, এই অল্পোচ্চ পাহাড়ের ন্যায় ভূমি সমগ্র দিল্লীকে প্রাচীরের ন্যায় বেষ্টিত করিয়া আছে। কিম্বদন্তী, উহা মহাভারতের সময়ের সেই পৌরাণিক সহরের প্রাচীররূপে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই পথে যাইতে যাইতে সিপাহী-বিদ্রোহের স্মৃতিমন্দির ও আর একটি অশোকস্তম্ভ দেখিলাম। এই অস্থায়ী রাজধানীর লাটভবন, সেক্রেটেরিয়েট প্রভৃতি এবং কর্ম্মচারীদের বাসের জন্য বাঙ্গলো সকল নির্ম্মাণে গভর্ণমেণ্ট বিস্তর অর্থব্যয় করিয়াছেন।

আজ আর অধিক বিলম্ব না করিয়া বাসায় ফিরিলাম

সিপাহী বিদ্রোহের স্মৃতিমন্দির

দিল্লীতে দেখিবার আরও অনেক আছে, কিন্তু সময়াভাবে তাহা আর হইল না। তোগলকাবাদের ভগ্নাবশিষ্ট দুর্গাদি দেখিবার বড় ইচ্ছা ছিল, তাহা আর হইয়া উঠিল না। এখান হইতে এত শীঘ্র বিদায় লইতে ইচ্ছা হইতেছিল না, কিন্তু কার্য্যগতিকে তাহা করিতে হইল। এখান হইতে আগ্রা যাত্রা করিলাম। এই তিনটি দিন এখানে থাকিয়া যে স্মৃতি লইয়া ফিরিয়া আসিলাম, তাহা কখনও ভুলিতে পারিব না।

আগরার পথে ট্রেণে আসিতে সমস্তক্ষণই মনে হইতে লাগিল,—যদি কেহ মরজগতে অমরার সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিমুগ্ধ হইতে চাহেন, সীমাহীন ঐশ্বর্য্যের অতুল্য লীলা দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে চাহেন, কল্পনার বিরাটত্ব দেখিয়া আত্মহারা হইতে চাহেন, যদি ভারতে ইতিহাস মূর্ত্তিমন্ত দেখিতে চাহেন, তবে তিনি এই দিল্লীর মহা শ্মশানক্ষেত্রে আসিয়া এক বার দেখিয়া যান। স্রষ্টারা সব আজ কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সৃষ্টির বিক্ষিপ্ত কঙ্কালসমূহ শ্মশানের ঘোর নীরবতার মধ্যে কি অট্টহাস্যে আজ মানব-নশ্বরতা ঘোষণা করিতেছে। দেখিয়া যান, যুধিষ্ঠির গিয়াছেন, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মরাজ্য ইন্দ্রপ্রস্থের নাম এখনও রহিয়াছে। বিজয়ী কুতব গিয়াছেন, তাঁহার জয়স্তম্ভ আজও রহিয়াছে। সাহজাহান গিয়াছেন, তাঁহার সাধের প্রাসাদ ও তদভ্যন্তরস্থ তুলনাহীন 'দেওয়ানে-আম', 'দেওয়ানে-খাস' এবং জুম্মা মসজেদ প্রভৃতি রহিয়াছে। জয়পুরপতি জয়সিংহ গিয়াছেন, তাঁহার কৃত মান-মন্দির রহিয়াছে। স্রষ্টা যায়, স্মৃতি থাকে। আজ আবার এই সবেরই পার্শ্বে শ্বেত জাতির দ্বারা গঠিত শ্বেত সহর নূতন দিল্লী শ্বেত-শতদলের মতই ফুটিয়া উঠিয়াছে; শুধু সর্ব্বনিয়ন্তা তিনিই জানেন, পরিণামে ইহার কি থাকিবে, আর কি যাইবে!
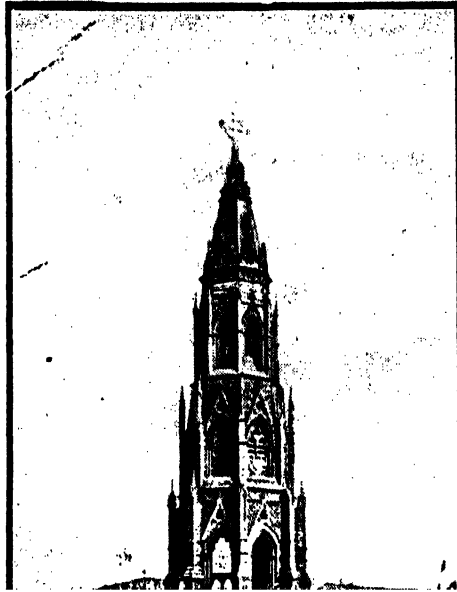
শ্রীহরিহর শেঠ।
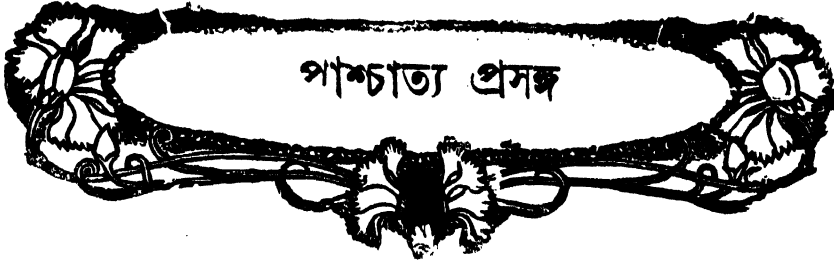
সোফিয়া স্টার্লিংএর আত্মকাহিনী

নেপল্‌সে আসিয়া আমারই স্বদেশীয়া একটি বালিকা দ্বারা প্রতারিত হইলাম! তাহার সরলতার ভান,—আমি সোফিয়া, আমিও বুঝিতে পারিলাম না? তাহার অনশন-ক্লিষ্ট কাতর মুখ দেখিয়া আমার হৃদয় সমবেদনায় পূর্ণ হইল, আমার পাষাণ হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া করুণার উৎস ছুটিল। সে দারুণ বিপদে আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল, অদ্ভুত প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সাহায্যে পুলিসের কবল হইতে আমাকে উদ্ধার করিয়াছিল; আমার যত দোষই থাক্, আমি অকৃতজ্ঞ নহি, তাহার উপকার করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহার প্রতিদানে পাইলাম—বিশ্বাসঘাতকতা! আমি তাহাকে বিশ্বাস করিয়া, তাহাকে আমার ঘরে রাখিয়া তাহার মায়ের সঙ্গে দেখা করিতে চলিলাম, তাহার মায়ের সঙ্গে তাহার পুনর্মিলনের ব্যবস্থা করিয়া আসিলাম, ঘরে ফিরিয়া দেখি—সে আমার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া অন্তর্দ্ধান করিয়াছে!—এই জন্যই কি সে আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল? এইরূপ দুরভিসন্ধি ছিল বলিয়াই কি সে আগ্রহভরে আমার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিল? আমি পিশাচী, আমি রাক্ষসী, কিন্তু সে আমারও অধম; নারীর সকল গুণ আমার হৃদয় হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যায় নাই, কিন্তু এই যুবতীর হৃদয় কি উপাদানে নির্ম্মিত—তাহা আমার বুঝিবার শক্তি নাই।

একবার ইচ্ছা হইল তাহাকে নেপল্‌সের নরক হইতে খুঁজিয়া বাহির করি, তাহার বিশ্বাসঘাতকতার উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করি; তাহার কবল হইতে আমার অপহৃত অর্থরাশি ও অলঙ্কারাদি উদ্ধার করিয়া তাহার ধৃষ্টতার প্রতিফল দিয়া আসি। আমার বিশ্বাস, চেষ্টা করিলে আমি কৃতকার্য্য হইতে পারিতাম। তাহার হৃদয়-শোণিতে আমার ক্রোধানল নির্ব্বাপিত করা অসাধ্য হইত না। কিন্তু আমি বহু আয়াসে সেই প্রবৃত্তি দমন করিলাম। যে আমাকে বিপন্ন দেখিয়া, যে কারণেই হউক, আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল—তাহার ধ্বংস-সাধনে বিরত হইলাম। হাঁ, সর্ব্বান্তঃকরণে তাহার অপরাধ মার্জ্জনা করিলাম। বোধ হয়, কোন কোন পাঠিকা ইহা অক্ষমের ক্ষমা ভাবিয়া আমার প্রতি বিদ্রূপ কটাক্ষপাত করিবেন। তা করুন। আমাকে বোধ হয় তাঁহারা এখনও ঠিক চিনিতে পারেন নাই।

যাহা হউক, আমার ধারণা হইল, আমি অতি অশুভ-ক্ষণে নেপল্‌সে পা বাড়াইয়াছিলাম। এই জন্য নেপল্‌সে আমার ভাগ্যপরীক্ষা করিতে আর ইচ্ছা হইল না, যদি আরও কয়েক দিন নেপল্‌সে থাকিতাম, তাহা হইলে যে কোন উপায়ে আমার ক্ষতিপূরণ করিতে পারিতাম, বাটপাড় ছুঁড়ীটা আমার যে নগদ টাকা ও জহরতাদি অপহরণ করিয়াছিল—তাহার সমপরিমাণ অর্থ আমি নেপল্‌স হইতে সংগ্রহ করিতে পারিতাম; কিন্তু আমার খেয়াল হইল, আর এক দিনও নেপল্‌সে বাস করিব না। আমার যখন যে খেয়াল হইত, অবিলম্বে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতাম। স্থির করিলাম, নেপল্‌স হইতে পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান নগর লণ্ডনে উপস্থিত হইয়া আমার ভাগ্য-পরীক্ষা করিব।

এই সঙ্কল্পের বশবর্ত্তী হইয়া পরদিনই আমি নেপল্‌স নগরীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম এবং ক্রমশঃ রোম, টুরিণ, মাডনা, ডিজোঁ এবং গারে-ডি-লিয়েঁা পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে প্যারিসে উপস্থিত হইলাম। এই সকল নগরের কোনটিতেই আমি দুই এক দিনের অধিক কাল বাস করি নাই; এমন কি, ফরাসী রাজধানীতে পদার্পণ করিয়াও দুই দিনের অধিককাল সেখানে থাকিতে আমার সাহস হইল না। একটু কাযের জন্যই আমি সেখানে দুই দিন বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম; সেই কাযটুকু না থাকিলে

আমি প্যারিসে দুই ঘণ্টাও থাকিতাম না; কারণ হোটেল ক্রিনোতে আমার অবস্থিতিকালে পিট আমার সাহায্যে মার্কিন জহরতওয়ালার বিস্তর জহরত কৌশলে আত্মসাৎ করায় আমার বিরুদ্ধে যে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হইয়াছিল, সেই পরোয়ানা লইয়া পুলিস তখনও আমার অনুসন্ধান করিতেছিল; এ অবস্থায় প্যারিসে দুই এক দিনও বাস করা আমার পক্ষে কিরূপ বিপজ্জনক, তাহার উল্লেখ বাহুল্য মাত্র। এরূপ বিপদের আশঙ্কা সত্ত্বে অন্য কেহ বোধ হয় প্যারিসে প্রবেশ করিত না।

গারে ডি-লিয়োঁ হইতে আমি প্যারিসে গমন করিয়াছিলাম; কায শেষ হইলে আমি ট্যাক্সিযোগে গারে-ডু-নর্ডে উপস্থিত হইলাম। সেখানে আমাকে বোলানগামী এক্সপ্রেস ট্রেণের জন্য ঘণ্টা দুই অপেক্ষা করিতে হইল। অগত্যা আমি ষ্টেশনের রেস্তরাঁয় আহারাদি শেষ করিয়া সেই স্থানেই বিশ্রাম করিতে লাগিলাম।

এক্সপ্রেস ট্রেণখানি প্ল্যাটফর্ম্ম ছাড়িবার কয়েক মিনিট পূর্ব্বে আমি একটি প্রথম শ্রেণীর কামরায় উঠিয়া বসিলাম। একটা কথা পূর্ব্বে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। নেপল্‌সে আমার যথাসর্ব্বস্ব অপহৃত হইলেও আমার হাতব্যাগে যে অর্থ ছিল, তাহা আমার য়ুরোপ ভ্রমণের পাথেয় নির্ব্বাহের পক্ষে যথেষ্ট এবং সেই ব্যাগটি সর্ব্বদা আমার সঙ্গেই থাকিত। আমি প্রথম শ্রেণীর সেই কামরাটিতে একাকী বসিয়া আছি, ট্রেণ ছাড়ে আর কি; প্রায় এক মিনিট পরে গার্ডের হুইশল্ শুনিতে পাইলাম, সঙ্গে সঙ্গে তীব্র বংশীধ্বনি করিয়া ট্রেণ নড়িয়া উঠিল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে হঠাৎ আমার অধিকৃত কামরার রুদ্ধদ্বার খুলিয়া গেল এবং একটি পুরুষ ও একটি রমণী অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া আমার সম্মুখে বেঞ্চিতে বসিয়া পড়িল এবং হাঁপাইতে লাগিল। তাহারা কে, কোথা হইতে আসিল, কোথায় যাইবে, ইহা জানিবার জন্য প্রথমে আমার কৌতূহল না হইলেও আমি তীক্ষ্নদৃষ্টিতে দুই এক বার তাহাদের মুখের দিকে চাহিলাম। কিন্তু তাহাদের মুখ দেখিয়া ও ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করিয়া তাহাদের পরিচয় জানিবার জন্য আমার আগ্রহ প্রবল হইয়া উঠিল। আমি দীর্ঘকাল দস্যু-তস্করদলে বাস করিয়া দস্যুতস্করদিগের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া এরূপ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলাম যে, আমার 'সমব্যবসায়ী' লোক দেখিবামাত্র চিনিতে পারিতাম।

পুরুষ আরোহীটি আমার ঠিক সম্মুখেই বসিয়া ছিল। তাহার চেহারা দেখিয়া অনুমান হইল, তাহার বয়স চল্লিশ বৎসরের অধিক নহে; দুই চারি বার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আমার ধারণা হইল, চুরী-বাটপাড়ীই ভদ্রলোকটির পেশা। তাহার সঙ্গিনীর বয়স প্রায় ত্রিশ বৎসর বলিয়াই মনে হইল; সে উক্ত পুরুষটির চৌর্য্যবৃত্তির সহযোগিনী, এ বিষয়েও আমি নিঃসন্দেহ হইলাম। সুতরাং বলা বাহুল্য, তাহাদের কথা শুনিবার জন্য আমার বড়ই কৌতূহল হইল।

কিন্তু কয়েক মিনিট তাহারা কথা কহিল না, নির্ব্বাক্ হইয়া হাঁপাইতে লাগিল। তাহাদের অবস্থা দেখিয়া মনে হইল, অনেক দূর হইতে তাহারা দৌড়াইয়া আসিয়া অতি কষ্টে ট্রেণ ধরিয়াছে। আর মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্বে আসিলে তাহারা ট্রেণে উঠিতে পারিত না, তাহা আমিও বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

যাহা হউক, ট্রেণ চলিতে আরম্ভ করিলে তাহারা ফিস্ ফিস্ করিয়া কি বলাবলি করিতে লাগিল। আমি তাহাদের পরামর্শ শুনিতে না পাইলেও বুঝিতে পারিলাম, ফরাসী ভাষাতেই তাহাদের পরামর্শ চলিতেছে!

আমি ভাবিলাম, তাই ত, কি কৌশলে তাহাদের পরামর্শটা শুনা যায়? ফরাসী ভাষা তখনও আমি সুন্দররূপে আয়ত্ত করিতে না পারিলেও সেই ভাষায় মোটামুটি আলাপ করিতে পারিতাম এবং ফরাসী ভাষায় কেহ কোন কথা বলিলে তাহা বুঝিতেও আমার কষ্ট হইত না। আমি অল্প দিন প্যারিসে বাস করিলেও সর্ব্বদা ফরাসীদের কথা শুনিতে শুনিতে আমি এরূপ অভ্যস্ত হইয়াছিলাম যে, দুই জন ফরাসী তাহাদের মাতৃভাষায় খুব তাড়াতাড়ি কথা বলিলেও তাহাদের কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিতাম। কিন্তু আমার সহযাত্রিদ্বয় এরূপ মৃদুস্বরে আলাপ করিতে লাগিল যে, তাহা শুনিতেই পাইলাম না, বুঝিতে পারা ত দূরের কথা! তবে আমার ধারণা হইল, তাহারা কোথাও কোন অপকর্ম্ম করিয়া পুলিসের হাতে ধরা পড়িবার ভয়ে তাড়াতাড়ি সেই স্থান হইতে চম্পটদান করিয়াছে এবং ভবিষ্যতে কি কৌশলে পুলিসের দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিবে, সেই প্রসঙ্গের আলোচনা করিতেছে।

ট্রেণ তখন সবেগে চলিতেছিল, হঠাৎ ট্রেণের বারান্দা দিয়া রেলের একটি কর্ম্মচারী আমাদের কামরায় প্রবেশ করিল। তাহার পরিচ্ছদ দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম, সে টিকিট-পরীক্ষক। চলন্ত ট্রেণের ভিতর সে আমাদের টিকিট পরীক্ষা করিতে আসিয়াছে।

টিকিট পরীক্ষককে দেখিবামাত্র আমার মাথায় একটি ফন্দীর উদয় হইল। ইহা আমার বিধিদত্ত শক্তি; এই শক্তির সাহায্যেই আমি অনেক জটিল সমস্যার সমাধান করি; এবারও আমাকে নিরাশ হইতে হইল না। টিকিট পরীক্ষক সর্ব্বাগ্রে আমার সম্মুখে আসিয়া আমার টিকিট দেখিতে চাহিল। আমি তাহার কথা বুঝিতে পারিলেও 'ন্যাকা' সাজিলাম। সে টিকিট দেখিতে চাহিল, আমি ইংরাজীতে বলিলাম, 'লণ্ডনে যাইতেছি।' সে হাত মুখ নাড়িয়া পুনর্ব্বার বলিল, 'আপনার টিকিটখানি দয়া করিয়া দেখাইবেন কি?' আমি ইংরাজীতে বলিলাম, 'ইটালী হইতে প্যারিসে আসিয়াছিলাম, আমার সঙ্গে অন্য কেহ নাই।'

টিকিট-পরীক্ষক নিরুপায় হইয়া আমার সহযাত্রী পুরুষটিকে বলিল, 'এই মহিলাটি ফরাসী ভাষা জানেন না, আপনি কি দয়া করিয়া উঁহাকে বুঝাইয়া দিবেন, আমি উঁহার টিকিটখানি পরীক্ষা করিতে আসিয়াছি।' আমার সহযাত্রী এখন বিশুদ্ধ ইংরাজীতে আমাকে জানাইল, কর্ম্মচারী টিকিট-পরীক্ষক; সে আমার টিকিটখানি দেখিতে চাহিতেছে। আমি তৎক্ষণাৎ টিকিটখানি বাহির করিয়া তাহার হাতে দিলাম, সে আমার ও আমার সহযাত্রিদ্বয়ের টিকিট পরীক্ষা করিয়া সেই কক্ষ পরিত্যাগ করিল; কিন্তু আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। আমার সহযাত্রিদ্বয় বুঝিল, আমি ফরাসী ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা, অতএব আমার সম্মুখে তাহারা ফরাসী ভাষায় অসঙ্কোচে আলাপ করিতে পারে। আমি তাহাদের পরামর্শ শুনিতে পাইলেও বুঝিতে পারিব না!

টিকিট পরীক্ষক আমাদের কামরা হইতে প্রস্থান করিলে আমার সহযাত্রী পুরুষটি তাঁহার সঙ্গিনীর সহিত ফরাসী ভাষায় আমার শ্রুতিগম্য স্বরে পরামর্শ আরম্ভ করিল। আলাপ করিবার সময় তাহাদের আর বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বা কুণ্ঠা রহিল না। আমি মনে মনে বলিলাম, 'এই বুদ্ধিতে তোমরা প্রতারণা-প্রবঞ্চনার ব্যবসায় চালাও! আমি তোমাদের একটু আক্কেল না দিয়া ছাড়িতেছি না।'

সহযাত্রী তাঁহার সঙ্গিনীকে বলিল, "মালটা বেশ সাবধানে লুকাইয়া রাখিয়াছ ত? কেহ সন্ধান পাইবে না?"

স্ত্রীলোকটি হাসিয়া বলিল, "আমাকে কি সেই রকম নির্ব্বোধ মনে কর? আমাকে উলঙ্গ না করিয়া তাহার সন্ধান পাইবে না, ইহা স্থির জানিও।" সে তাহার তলপেটের পোষাকের উপর মৃদু করাঘাত করিল। আমি তাহাদের ভাব-ভঙ্গী লক্ষ্য করিতেছি, এরূপ সন্দেহ করিতে না পারে, এই উদ্দেশ্যে একখানি মাসিক পত্রিকা খুলিয়া তাহাতেই দৃষ্টি সন্নিবদ্ধ করিলাম।

পুরুষটি ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, "বোলোনে তেমন কোন বিপদের আশঙ্কা নাই, সে ধাক্কা কোন রকমে আমরা সামলাইয়া লইতে পারিব, কিন্তু ফোকষ্টনে গিয়া কি কৌশলে হারামজাদগুলার চোখে ধূলা দিব—তাহা ঠাহর করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। কিন্তু চিন্তা করিয়াই বা ফল কি? যেরূপে হউক কার্য্যোদ্ধার করিতেই হইবে।"

স্ত্রীলোকটি বলিল, "আমরা কোন্ সময়ে সেখানে পৌঁছিব, তাহা ম্যানেজারকে টেলিগ্রাফ করিয়া জানাইয়াছ কি?"

পুরুষটি বলিল, "আমি সকল বন্দোবস্ত শেষ করিয়া রাখিয়াছি। তোমার দুশ্চিন্তার কোন কারণ নাই; মুখ বুজিয়া বসিয়া থাক। ঐ ছুঁড়ীটা এ কামরায় না থাকিলে এই পথটা আমরা বেশ আরামের সঙ্গেই পাড়ি দিতে পারিতাম।"

স্ত্রীলোকটি মাথা নাড়িয়া বলিল, "দুশ্চিন্তা তোমারই বেশী দেখিতেছি! ও ছুঁড়ী আমাদের ভাষা জানে না, কথাও বুঝিতে পারিতেছে না; তবে আর তোমার উদ্বেগের কারণ কি?"

অতঃপর তাহারা যে সকল কথার আলোচনা আরম্ভ করিল, তাহাতে কোন গুপ্ত-রহস্যের আভাস না থাকায় আমি সে সকল কথায় কর্ণপাত করিলাম না। তাহাদের কথার ভাবে বুঝিলাম—তাহারা স্বামি-স্ত্রীর ন্যায় বাস করিলেও তাহাদের সম্বন্ধটা বৈধ নহে; কিন্তু ফরাসী দেশে ইহা নিতান্ত স্বাভাবিক।

যাহা হউক, ট্রেণ হইতে বোলোনে নামিয়া এই মাণিক-জোড়কে আর দেখিতে পাইলাম না। অবশেষে জাহাজে উঠিয়া উপসাগর পার হইবার সময় পুনর্ব্বার তাহাদিগকে দেখিতে পাইলাম। আমি পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছিলাম, উহাদের লাভের কারবারে ভাগ না বসাইয়া ছাড়িব না। দৈবক্রমে যথন শিকার সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে—তথন তাহাকে নিরাপদে পলায়ন করিতে দেওয়া নিতান্তই আনাড়ীর কায। জাহাজের উপর আমি তাহাদের কাছে ঘেঁসিলাম না। ফোকষ্টোনে আসিয়া তাহারা লণ্ডনগামী এক্সপ্রেস ট্রেণে উঠিল; তাহারা যে কামরায় প্রবেশ করিল, আমি ঠিক তাহার পাশের কামরাটি অধিকার করিয়া বসিলাম।

ট্রেণথানি যথাসময়ে লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে আসিয়া থামিবামাত্র আমি চট করিয়া আমার কামরা হইতে নামিয়া একটু দূরে দাঁড়াইলাম এবং আমার সহযাত্রিদ্বয় অতঃপর কি করে—তাহা দেখিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। দুই এক মিনিট পরে তাহারা ট্রেণ হইতে নামিয়া এক জন দীর্ঘকায়, চশমাধারী মাতব্বর চেহারার লোকের সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিল। বুঝিলাম, এই মাতব্বরটি তাহাদের অভ্যর্থনার জন্যই ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্মে উপস্থিত হইয়াছিল।

আমি একটা 'পোর্টারকে' ডাকিয়া তাহার হাতে একথানি এক পাউণ্ডের নোট এবং আমার লগেজের রসিদথানি দিয়া বলিলাম, সে যেন আমার লগেজগুলি সংগ্রহ করিয়া 'আমেরিকান এক্সপ্রেস কোম্পানী'র লণ্ডনের আফিসে পাঠাইয়া দেয়।—এইরূপ ব্যবস্থা করায় আমাকে আমার লগেজগুলি সংগ্রহ করিবার জন্য ষ্টেশনে বিলম্ব করিতে হইল না। আমি আমার শিকার-যুগলের অনুসরণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

তাহারা প্লাটফর্ম্ম হইতে ষ্টেশনের বাহিরে যাইবার পূর্ব্বেই আমি তাড়াতাড়ি বাহিরে গিয়া ট্যাক্সির আড্ডার কাছে দাঁড়াইলাম। মুহূর্ত্ত পরে তাহারাও সেই স্থানে উপস্থিত হইল এবং একথানি ট্যাক্সিতে উঠিয়া, লণ্ডনের পশ্চিম পল্লীর একটি ক্ষুদ্র হোটেলের নাম ও ঠিকানা বলিয়া ট্যাক্সিওয়ালাকে সেই হোটেলে যাইতে আদেশ করিল।

আমি তাহাদের ট্যাক্সির অদূরে দাঁড়াইয়া ছিলাম, পুরুষটি ট্যাক্সিওয়ালাকে যে হোটেলের নাম বলিল, সেই নামটি আমি সুস্পষ্ট শুনিতে পাইলাম। আমি তৎক্ষণাৎ আর একথানি ট্যাক্সিতে উঠিয়া তাহাদের আগেই সেই হোটেলে চলিলাম। ট্যাক্সিওয়ালা কিঞ্চিৎ পুরস্কারের লোভে বায়ুবেগে ট্যাক্সি চালাইয়া যথন সেই হোটেলের দরজায় আমাকে নামাইয়া দিল, তথন পশ্চাতে চাহিয়া আমার সহযাত্রিদ্বয়ের ট্যাক্সি দেখিতে পাইলাম না। আমি ট্যাক্সিওয়ালাকে ভাড়া ও বক্‌শিস্ দিয়া বিদায় করিয়া তাড়াতাড়ি হোটেলের আফিসে প্রবেশ করিলাম এবং হোটেলের একটি কুঠরী ভাড়া করিয়া ফেলিলাম।—যথন প্যারিস হইতে লণ্ডনে যাত্রা করি—তথন স্থির করিয়াছিলাম, লণ্ডনের সুবিখ্যাত 'হোটেল সিসিলে' বা "সেভয় হোটেলে" বাসা লইব এবং অষ্ট্রেলিয়াবাসিনী আমেলিয়া কার্টারের মত এরূপ কোন অসম সাহসের কায করিব যে, তাহার পরিচয় পাইয়া লণ্ডনের আবালবৃদ্ধবনিতা স্তম্ভিত হইবে এবং লণ্ডনের সংবাদপত্রসমূহ আমার শক্তি-সামর্থ্যের আলোচনায় পূর্ণ হইবে, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড পর্য্যন্ত আমার বুদ্ধি-কৌশলের তারিফ করিবে, তাহার পর আমার বিরুদ্ধে যথন গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হইবে—তথন আমি আটলাণ্টিক বক্ষে নিউইয়র্কগামী কোন জাহাজের সেলুনে ছদ্মনামে বিরাজিত! কিন্তু মানুষ যাহা মনে করে—অনেক সময়েই তাহা ঘটিয়া উঠে না। কোথায় "হোটেল সিসিল" বা "সেভয় হোটেল" আর কোথায় একটি সঙ্কীর্ণ গলির ভিতর তৃতীয় শ্রেণীর একটা অজ্ঞাতনামা অখ্যাত হোটেল! দৈবের গতি এমনই বিচিত্র। এই হোটেলের নামটি কি কারণে এথানে প্রকাশ করিলাম না—তাহা, আমার আত্ম-কাহিনীর এই অংশ পাঠ করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন।

কয়েক মিনিট পরে আমার ট্রেণের সঙ্গী ও সঙ্গিনীর ট্যাক্সি হোটেলের দরজায় উপস্থিত হইল। তাহারা ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্মে যে দীর্ঘকায় মুরুব্বিটির সহিত পরামর্শ করিতেছিল, সেই লোকটিকেও তাহাদের সঙ্গে ট্যাক্সি হইতে নামিতে দেখিলাম। তাহারা যথন হোটেলে প্রবেশ করিল, তথন আমি হোটেলের বারান্দায় দাঁড়াইয়া তাহাদের ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করিতেছিলাম। পূর্ব্বোক্ত পুরুষ ও স্ত্রীলোকটি আমাকে সেই হোটেলে উপস্থিত দেখিয়া স্তম্ভিত হইল। তাহারা দুই এক মিনিট হাঁ করিয়া আমার দিকে

চাহিয়া রহিল, যেন তাহাদের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইল না। পুরুষটি তাহার 'মুরুব্বিটি'কে একটু দূরে লইয়া গিয়া তাহার সঙ্গে কি পরামর্শ করিতে লাগিল। তাহার কথা শুনিয়া তাহার মুরুব্বিটা সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে পুনঃ পুনঃ আমার দিকে চাহিতে লাগিল। লোকটি কে, জানিবার জন্য আমার আগ্রহ হইল। শেষে সন্ধান লইয়া জানিতে পারিলাম—সে সেই হোটেলেরই মালিক। যাহা হউক, আমি স্থান-পরিবর্ত্তন না করিয়া সেই হোটেলেই বাস করিতে লাগিলাম। হোটেলটি ক্ষুদ্র হইলেও আমাকে তেমন কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হইল না, সেখানে আহারাদির ব্যবস্থা ভালই মনে হইল।

আমি আমার সঙ্গী ও সঙ্গিনীর গতিবিধি লক্ষ্য করিবার চেষ্টা করিলাম; কিন্তু সারাদিনের মধ্যে আর তাহাদিগকে হোটেলে দেখিতে পাইলাম না। আমার ভয়ে তাহারা পলাইল না কি? তাহাদের সম্বন্ধে কোন কথা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করাও সঙ্গত মনে হইল না। আমি রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত তাহাদের প্রতীক্ষায় জাগিয়া বসিয়া রহিলাম; কিন্তু তাহাদিগকে সেই সময় মধ্যে হোটেলে ফিরিতে দেখিলাম না। তখন অগত্যা শয়ন করিতে চলিলাম।

পরদিন সকালে আমার শয়ন-কক্ষ হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় যাইতেই পাশের কুটুরীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম; সেই কক্ষের দ্বার উন্মুক্ত ছিল, দেখিলাম, আমার সঙ্গী ও সঙ্গিনী সেই কক্ষে বসিয়া আছে; বুঝিলাম, তাহারা বাসের জন্য কক্ষটি ভাড়া লইয়াছে। তাহাদের ভাবভঙ্গী দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম—আমাকে তাহারা সন্দেহ করিয়াছে, এ অবস্থায় আমার সংস্রব ত্যাগ করিয়া দূরে না গিয়া তাহারা আমার শয়নকক্ষের পার্শ্বস্থিত কক্ষটি কি উদ্দেশ্যে ভাড়া লইল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আমার ধারণা হইল, আমার গতিবিধি লক্ষ্য করিবার উদ্দেশ্যেই তাহারা এই চা'ল চালিয়াছে। আমি যথাযোগ্য সতর্কতা অবলম্বন করিলাম।

অল্পকাল পরে আমি আমার ঘরে আসিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলাম। তাহারা যে কক্ষে বাস করিতেছিল, সেই কক্ষ ও আমার বাস কক্ষ ঠিক পাশাপাশি অবস্থিত; এই উভয় কক্ষের মধ্যে একটি দ্বার ছিল, কিন্তু সেই দ্বারের কপাটের মুখে লোহার 'পাত' আঁটিয়া দ্বারটি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

আমার মনে হইল, যদি আমি কোন কৌশলে তাহাদের বাস-কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাহাদের মালপত্রগুলি পরীক্ষা করিতে পারি, তাহা হইলে তাহাদের গুপ্তরহস্য জানিতে পারিব। কিন্তু তাহারা উভয়েই বাহিরে না যাইলে আমার এই চেষ্টা সফল হইবার সম্ভাবনা দেখিলাম না। অগত্যা আমি সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

কয়েক ঘণ্টা পরে আহারান্তে তাহারা উভয়েই একখানি ট্যাক্সিতে উঠিয়া কোথায় চলিয়া গেল। তখন আমি পূর্ব্বোক্ত রুদ্ধদ্বার খুলিবার চেষ্টা করিলাম। কাযটি আদৌ কঠিন হইল না। কপাটের জোড়ের মুখে যে লৌহ-ফলকখানি 'স্ক্রু' দিয়া আঁটা ছিল, সেই 'স্ক্রু'গুলি খুলিতে পারিলেই দ্বার খুলিবে বুঝিয়া আমি অদূরবর্ত্তী কোন কামারের দোকান হইতে 'স্ক্রু' খুলিবার একটি যন্ত্র পূর্ব্বেই ক্রয় করিয়া আনিয়াছিলাম। সেই যন্ত্রের সাহায্যে লোহার 'পাত'খানি খুলিতে দশ মিনিটের অধিক সময় লাগিল না। আমি দ্বার খুলিয়া তাহাদের কুটুরীতে প্রবেশ করিলাম।

আমি সেই কক্ষের মধ্যস্থানে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলাম—আগে কোন্ 'লগেজটা' খুলি! সেই কক্ষে দেওয়ালের কাছে দুইটি 'সুটকেস' ও চামড়ার একটি লম্বা ব্যাগ দেখিতে পাইলাম, ডাক্তাররা যে রকম ব্যাগে অস্ত্র-চিকিৎসার উপযোগী অস্ত্রাদি রাখে, সেই ব্যাগটি সেই ধরণের। প্রথমে সেই ব্যাগটি খুলিবার জন্যই আমার আগ্রহ হইল। আমি মাথার একটা কাঁটা দিয়া সেই ব্যাগটি খুলিবার চেষ্টা করিলাম। প্রায় পাঁচ মিনিট ধরিয়া চেষ্টা করিয়া ব্যাগটি খুলিতে পারিলাম। ব্যাগের জিনিস পরীক্ষা করিয়া তাহাদের গুপ্তরহস্যের সন্ধান পাইলাম।

সেই ব্যাগের ভিতর মোটাসোটা কাগজের মোড়ক থরে থরে সজ্জিত দেখিলাম। মোড়কগুলি দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম, সেগুলি কোকেনের মোড়ক! বুঝিলাম, ইহারা গবর্ণমেণ্টের শুল্ক-বিভাগকে প্রতারিত করিয়া প্রচুর 'কোকেন' বিদেশ হইতে আমদানী করে—এবং এই হোটেলে বসিয়া বিনা লাইসেন্সে তাহা গোপনে বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করে। এই পুরুষ ও রমণীটি অবৈধ কোকেন ব্যবসায়ের দালাল! তাহারা অর্থলোভে বিস্তর নরনারীকে

'কোকেন-খোর' করিতেছে, এবং গবর্ণমেণ্টকে প্রতারিত করিয়া বহু অর্থ আত্মসাৎ করিতেছে।

আমি যখন নিউইয়র্কে ছিলাম, সেই সময় নানা শ্রেণীর অপরাধীদের দলে মিশিয়া জানিতে পারিয়াছিলাম, দস্যু-তস্করদের দলে এরূপ লোক বিস্তর আছে, যাহারা আফিং, গাঁজা, কোকেন প্রভৃতি বিবিধ মাদকদ্রব্য গোপনে আমদানী করিয়া অবৈধ ভাবে বিক্রয় করে এবং এই উপায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকে। তাহাদের দলের কোন কোন লোক হোটেল খুলিয়া বসে এবং সেই সকল হোটেলেই ঐ প্রকার মাদকদ্রব্য বিক্রয়ের প্রধান আড্ডা। লণ্ডনেও এই-ভাবে কোকেন বিক্রয়ের ব্যবস্থা দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। আমার সঙ্গী ও সঙ্গিনীর লগেজগুলি পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারিলাম—তাহারা সেই হোটেলে সহস্রাধিক পাউণ্ডের কোকেন আমদানী করিয়াছিল!

যাহা হউক, পরীক্ষা শেষ হইলে আমি সেই দ্বার দিয়া আমার ঘরে ফিরিয়া আসিলাম, এবং দ্বারটি 'স্ক্রু' আঁটিয়া পূর্ব্ববৎ বন্ধ করিলাম। আমি যে তাহাদের কুটুরীতে তাহাদের অজ্ঞাতসারে প্রবেশ করিয়া এই গুপ্তরহস্য অবগত হইয়াছি, এ সন্দেহ তাহাদের মনে স্থান না পায়, তাহার ব্যবস্থা করিয়া আসিলাম।

ঘরে আসিয়া একটি সিগারেট ধরাইয়া লইলাম এবং বিছানায় শুইয়া পড়িয়া, কি কৌশলে উহাদিগকে শোষণ করিয়া দুই চারিশত পাউণ্ড আত্মসাৎ করিব—তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। যাহারা এই সকল মাদকদ্রব্যের অবৈধ ব্যবসায় করে, তাহাদিগকে আমি অত্যন্ত ঘৃণা করি। চোর-ডাকাইতগুলা ইহাদের অপেক্ষা অনেক ভাল; তাহারা দুই চারিজন ধনাঢ্য ব্যক্তিরই অপকার করে, তাহাদের আবশ্যকাতিরিক্ত অর্থ আত্মসাৎ করে; কিন্তু মাদকদ্রব্যের এই সকল 'ফড়ে' সমাজের শত্রু; তাহারা গোপনে এই সকল মাদকদ্রব্য বিক্রয় করিয়া অসংখ্য নর-নারীর জীবনী-শক্তি নষ্ট করে, সমাজ-দেহ বিষাক্ত ও পঙ্গু করে। ইহাদিগকে শাস্তি দেওয়া অন্যায় নহে। কিন্তু কি উপায়ে ইহাদের মাথায় হাত বুলাইব?

এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে আমি 'ডিনার' করিতে চলিলাম, ভোজনকালেও এই চিন্তা ত্যাগ করিতে পারিলাম না। ক্রমে সন্ধ্যা অতীত হইল; তখন আমি সঙ্কল্পসিদ্ধির কোন উপায় স্থির করিতে পারিলাম না। দুশ্চিন্তা প্রশমিত করিবার জন্য সন্ধ্যার পর থিয়েটার দেখিতে চলিলাম; কিন্তু আমোদটা পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করিতে পারিলাম না। কোন কঠিন কায করিবার জন্য যখন আমার ঝোঁক হয়—সেই কায যতক্ষণ পর্য্যন্ত শেষ করিতে না পারি, ততক্ষণ আমি শান্তিলাভ করিতে পারি না, আমার অস্থিরতা দূর হয় না। আমি চিন্তাকুল চিত্তে থিয়েটার হইতে যখন হোটেলে ফিরিলাম, তখন রাত্রি বারটা। হোটেলটা পিকাডেলি পল্লীতেই অবস্থিত, এই জন্য থিয়েটার হইতে সেখানে ফিরিতে আমার অধিক বিলম্ব হইল না।

হোটেলে ফিরিয়া আমার ঘরে প্রবেশ করিব,—ঠিক সেই সময় দেখিলাম, সান্ধ্যপরিচ্ছদে সুসজ্জিতা একটি পরমাসুন্দরী তরুণী আমার ঘরের পার্শ্বস্থ কক্ষ হইতে বাহির হইয়া দ্রুত-বেগে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল!—রাত্রি বারটার সময় ঐরূপ সুন্দরী যুবতীকে একাকিনী হোটেলের সেই কক্ষ হইতে বাহির হইয়া ঐভাবে পলায়ন করিতে দেখিয়া আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না! আমি মনে মনে বলিলাম, "ছুঁড়িটা নিশ্চয়ই কোকেন খাইতে শিখিয়াছে, সে ঐ ঘর হইতে কোকেন কিনিয়া লইয়া পলায়ন করিল।"

আমি আমার ঘরে প্রবেশ করিলাম এবং ঘরে আলো না জ্বালিয়া, দরজার এক পাল্লা ঈষৎ খুলিয়া রাখিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইলাম। সেখানে কয়েক মিনিট দাঁড়াইয়া থাকিতেই দেখিলাম, দলে দলে নরনারী পাশের কুটুরীর দরজার সম্মুখে আসিয়া দ্বারে মৃদু করাঘাত করিতে লাগিল। প্রত্যেক বার দ্বার খুলিয়া তাহাদিগকে সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইল; তাহাদের কায শেষ হইলে তাহারা বাহিরে নামিবা মাত্র পুনর্ব্বার দ্বার রুদ্ধ হইল। দুই চারি মিনিট পরে দ্বারে করাঘাত হইল, আবার দ্বার খুলিয়া আগন্তুকগণকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইল।—দেখিলাম, পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যাই অধিক। কে জানিত, লণ্ডনের এত স্ত্রীলোক—বালিকা, যুবতী, প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা কোকেনের নেশায় মজগুল! ইহাদের অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া আমি যে দস্যুনারী—আমিও শিহরিয়া উঠিলাম! এত বড় একটা উন্নত ও সভ্য জাতি—তাহাদের মেরুদণ্ডে ঘুণ ধরিয়াছে! কি নিদারুণ আক্ষেপের বিষয়!

আমার মনে হইল, দলে দলে নরনারী মধুলুব্ধ ভৃঙ্গের মত ঘরে ঢুকিতেছে এবং মহা উৎসাহে ঘরের বাহিরে আসিয়া দ্রুতবেগে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া যাইতেছে, উহাদের সঙ্গে কোকেন-বিক্রেতার কিরূপ আলাপ হইতেছে, শুনিতে পাই না ? আমি ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া, ভিতরের দরজার সম্মুখে উপস্থিত হইলাম, এই দরজা খুলিয়াই আমি পাশের কুঠরীতে প্রবেশ করিয়াছিলাম। সেই দরজায় কান পাতিয়া শুনিতে পাইলাম,"মাই ডিয়ার, তোমার কতখানি চাই বল ত ?"

—এ সেই ফরাসী স্ত্রীলোকটার কণ্ঠস্বর, যাহাকে বলোন-গামী এক্‌সপ্রেস ট্রেণে উঠিয়া হাঁপাইতে দেখিয়াছিলাম।

উত্তর হইল, "বেশী নয়, আমাকে কুড়ি গ্রেণ দিলেই আজ চলিয়া যাইবে।" বুঝিলাম, ইহা কোন যুবতীর কণ্ঠস্বর !

এক মিনিট পরে পুনর্ব্বার শুনিলাম, "এই কুড়ি গ্রেণ লইয়া যাও, কিন্তু সাধবান, কেহ যেন টের না পায় !"

সে কি মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবিয়াছিল, আমি দরজার কাছে দাঁড়াইয়া সকলই টের পাইয়াছি ?

একটি মেয়ে কুড়ি গ্রেণ কোকেন লইয়া গেল ! সে একাই এই কুড়ি গ্রেণ গিলিবে না কি ? আমি পুনর্ব্বার শিহরিয়া উঠিলাম। কি বিষই ইহারা খাইতে শিখিয়াছে !

মুহূর্ত্ত পরে সেই কক্ষের দ্বার খুলিবার ও সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করিবার শব্দ শুনিলাম। কয়েক মিনিট পরে আর একটি যুবতী সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া আর এক মোড়ক কোকেন কিনিয়া লইয়া চলিয়া গেল। ইহারা এই নেশায় মজগুল হইয়া কিছু কাল যেন আনন্দ-সাগরে ভাসিতে থাকে, সংসারের সকল দুঃখ-কষ্ট বিস্মৃত হয়, কিন্তু নেশা কাটিলে ইহারা কিরূপ নৈরাশ্যের অন্ধকারাচ্ছন্ন গর্ভে নিক্ষিপ্ত হয় এবং কি ভীষণ অবসাদে ইহাদের দেহ-মন ভাঙ্গিয়া পড়ে—তাহা বুঝিয়াও ইহারা এই অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারে না !

আমি সেই স্থানে দাঁড়াইয়াই কার্য্যপ্রণালী স্থির করিয়া ফেলিলাম। আমি তৎক্ষণাৎ আমার ঘর হইতে বাহির হইয়া পাশের কুঠরীর দরজার সম্মুখে উপস্থিত হইলাম এবং অন্য সকলে যে ভাবে সেই দরজায় করাঘাত করিতেছিল, সেই ভাবে দরজায় আঘাত করিলাম।

পূর্ব্বোক্ত পুরুষটি—যে ট্রেণের মধ্যে আমাকে ইংরাজী ভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছিল—টিকিট পরীক্ষককে টিকিট দেখাইতে হইবে—আমার করাঘাতের উত্তরে দ্বার খুলিয়া দিল, কিন্তু সে সেই কক্ষের আলোকে আমার মুখ দেখিবামাত্র ঝপ্‌ করিয়া দ্বার বন্ধ করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু আমি তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া পূর্ব্বেই একখানি পা ও আমার পিস্তলের নলটা সেই কক্ষের ভিতর প্রবিষ্ট করাইয়াছিলাম। অগত্যা সে ভিতর হইতে দ্বারের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া দুই হাতে দ্বার সবলে চাপিয়া ধরিয়া কঠোর স্বরে আমাকে বলিল, "এ ঘরে তোমার কি দরকার ?"

আমি সংযতস্বরে বলিলাম, "দরকার আছে।"—তাহার পর পিস্তলের চোঙ্গটা তাহার মুখের দিকে উঁচু করিয়া ধরিয়া বলিলাম, "দরজা ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইবে ? না, ঘোড়া টিপিব ? আমার এ পিস্তলে পাঁচটা টোটা ভরা আছে, আর ইহাতে 'ম্যাকসিম সাইলেনসার' আছে, গুলী নিঃশব্দে লক্ষ্যভেদ করে। ঘোড়া টিপিলাম !"

আমার কথা শুনিয়া আমার 'প্রতিবেশী' মুখ চূণ করিয়া তৎক্ষণাৎ পিছাইয়া গেল, সেই সুযোগে আমি তাহার কুঠুরীর ভিতর প্রবেশ করিয়া গম্ভীর ভাবে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। দেখিলাম, প্রকাণ্ড টেবলের উপর অসংখ্য কোকেনের মোড়ক থরে থরে সজ্জিত আছে। কোকেনের রীতিমত দোকান আর কি ! আমার 'প্রতিবেশিনী' এক তাড়া ট্রেজারী নোট হাতে লইয়া গণিতেছিল, আমাকে দেখিবামাত্র সে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া স্তম্ভিত ভাবে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিন্তু তাহার সঙ্গী সরোষে গর্জ্জন করিয়া বলিল, "কে তুমি ? পুলিসের গোয়েন্দা না কি ?"

আমি অচঞ্চলস্বরে বলিলাম, "না, পুলিসের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নাই, তোমরাও যা, আমিও তাই, কেবল আমার কার্য্যক্ষেত্র একটু স্বতন্ত্র। তোমরা মানুষের আত্মমর্য্যাদা অপহরণ কর, আমি তাহাদের হীরা-জহরৎ মাত্র আত্মসাৎ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকি !"

পুরুষটি বলিল, "বুঝিলাম তুমি চোর, হীরা জহরতের সন্ধানে না গিয়া আমাদের স্কন্ধে ভর করিতে আসিয়াছ কেন ? আমাদের কাছে হীরা-জহরৎ নাই।"

আমি বলিলাম, "তোমাদের কাছে হীরা জহরৎ নাই বটে, কিন্তু আসল জিনিষ টাকা আছে; প্রবাদ আছে, চোররা পরস্পরের সম্মান রক্ষা করে। কিন্তু আজ আমি এই প্রবাদ-বাক্য অগ্রাহ্য করিব, আজ রাত্রে তোমরাই আমার শিকার। ঐ নোটের তাড়া আমাকে দাও।"

আমার কথা শুনিয়া স্ত্রীলোকটা আর্ত্তনাদ করিয়া দুই হাতে নোটের তাড়াটা বুকের উপর চাপিয়া ধরিল, কাতর স্বরে বলিল, "না, না, এ আমি নিশ্চয়ই তোমাকে দিব না।"

আমি তৎক্ষণাৎ আমার পিস্তলটা তাহার বক্ষঃস্থলে উদ্যত করিয়া বলিলাম, "নোটগুলা শীঘ্র আমার হাতে দাও, এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিলেই ঘোড়া টিপিব।" আমার কণ্ঠস্বর অচঞ্চল, কিন্তু বজ্রনাদের ন্যায় গম্ভীর।

স্ত্রীলোকটা নোটের তাড়াটা নিঃশব্দে আমার হাতে দিল, সে আর কোন কথা বলিল না বটে, কিন্তু সেই সময় তাহার মুখ দেখিয়া আমার মনে হইল—সে তাহার হৃদ্‌পিণ্ডটা স্বহস্তে ছিঁড়িয়া লইয়া আমার হাতে দিল!

আমি নোটের সেই প্রকাণ্ড তাড়া আমার বুকের পকেটে ফেলিয়া পিস্তলটা তাহার দিকে বাগাইয়া ধরিয়াই ধীরে ধীরে পশ্চাতে হটিয়া আসিলাম। দ্বারের নিকট আসিয়া মোলায়েম স্বরে বলিলাম, "বিদায় বন্ধু, আমার একটি উপদেশ স্মরণ রাখিও, ভবিষ্যতে যদি কোন আমেরিকান তোমাদের সুমধুর ফরাসী ভাষা জানেন না—এইরূপ ভাব প্রকাশ করে—তাহা হইলে তাহা সত্য মনে করিয়া তাহার সম্মুখে গুপ্তকথার আলোচনা করিও না।"

তাহারা উভয়ে সক্রোধে তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে লাগিল। আমি বাহিরে আসিয়া দরজা ঠেলিয়া দিয়া নিজের কুঠ্‌রীতে প্রবেশ করিলাম। ঘরে আসিয়াই আমার জিনিসপত্রগুলি তাড়াতাড়ি গুছাইয়া ফেলিলাম। আর এক মুহূর্ত্ত সেই হোটেলে থাকা সঙ্গত নহে। পাশের কুঠ্‌রীতে তখন গালা-গালির বান ডাকিতেছিল। বুঝিলাম, নোটগুলা তাহারা আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিবে।

আমি হাত-ব্যাগ লইয়া নীচে আসিলাম এবং আফিস ঘরের দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া ম্যানেজারকে বলিলাম, "তোমার কি পাওনা হইয়াছে বল, তোমার টাকা মিটাইয়া দিয়া এখনই চলিয়া যাইব।"

ম্যানেজার মোলায়েম স্বরে বলিল, "আসুন, আফিসের ভিতরে আসুন, দরজায় দাঁড়াইয়া রহিলেন কেন? আফিসে আসিয়া বিলের টাকা মিটাইয়া দিয়া যান।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "হোটেলের ব্যবসা খুব তোড়েই চলিতেছে, কিন্তু শেষরক্ষা করিতে পারিবে ত? তোমার ফাঁদে পা দিব, এত বোকা নই, চলিলাম তবে, নমস্কার!"

বিলের টাকা আমিও দিলাম না, সে বেচারাও আমার কথা শুনিয়া কেমন হতভম্ব হইয়া পড়িল, টাকা আদায়ের চেষ্টা করিল না। কয়েক দিন পরে সন্ধান লইয়া জানিতে পারিলাম—তাহার হোটেল উঠিয়া গিয়াছে। আমি পুলিসে সংবাদ দিব এই আশঙ্কায় সে বেচারা হোটেল তুলিয়া দিয়া সরিয়া পড়িল না কি?

আমি ভিক্টোরিয়া ষ্টেশন হইতে আমার লগেজগুলি সংগ্রহ করিয়া, নদীতীরবর্ত্তী একটি প্রকাণ্ড হোটেলের কয়েকটি কুঠ্‌রী ভাড়া লইলাম; মনে করিলাম, সেখানে বহু আমেরিকান ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ হইবে এবং যদি তাহাদের মধ্যে কাহাকেও রাজী করিতে পারি—তাহার সঙ্গে গল্প করিতে করিতে স্বদেশে যাত্রা করিব। কারণ, স্বদেশের জন্য তখন আমার প্রাণ হাহাকার করিতেছিল। আমি কোকেনওয়ালীর নিকট হইতে যে নোটগুলি কাড়িয়া লইয়াছিলাম, তাহা গণিয়া দেখিলাম, তিন শত পাউণ্ড আমার হস্তগত হইয়াছে। ভাবিলাম, স্বদেশ-যাত্রার পাথেয়টা ত সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, এই টাকায় নিউইয়র্কগামী কোন জাহাজের প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনিতে পারিব। স্বদেশের জন্য মন বড়ই চঞ্চল হইয়াছে, একবার দেশ হইতে ঘুরিয়া আসি, কিছু দিন পরে ইংলণ্ডের খ্যাতনামা ডিটেক্‌টীভদের সঙ্গে 'বুদ্ধির যুদ্ধে' প্রবৃত্ত হইলেও ক্ষতি নাই।

কিন্তু সেই হোটেলে কোন আমেরিকান ভদ্রলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল না, বড়ই নির্জ্জনতা অনুভব করিতে লাগিলাম। সেখানে মন বসিল না। দুই দিন পরে অদূরবর্ত্তী সুপ্রসিদ্ধ "সেভয় হোটেলে" উঠিয়া আসিলাম।

'সেভয় হোটেলে' কয়েক জন আমেরিকান নরনারীর সাক্ষাৎ পাইলাম; তাহাদের মধ্যে একটি তরুণ-যুবক ছিল, নিউইয়র্কে তাহার বাড়ী। কি চমৎকার তাহার চেহারা! তাহার সঙ্গে পরিচয় হইল, আলাপ করিয়া মুগ্ধ হইলাম। আমার মনের ভিতর মনুষ্যত্বের একটা আদর্শ ছিল; সেই আদর্শ যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত! আমি মরিলাম, সেই তরুণের প্রেমে মজিলাম। আমি পৃথিবীর লোকের ধনরত্ন অপহরণ করিয়া বেড়াইতেছি, শেষে "সেভয় হোটেলে" আসিয়া আমারই মন চুরী হইল? মরণ আর কি! কিন্তু সে সকল কথা আর এক দিন বলিব।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

সঙ্গীতের প্রসার

দেশে সঙ্গীতের প্রসার যে কমিয়া যাইতেছে, এ কথা প্রায় শুনিতে পাওয়া যায়। সর্ব্বপ্রকার সঙ্গীত সম্বন্ধেই ইহা বলিয়া মনে হয়। ভাল সঙ্গীত শুনিতে ইচ্ছা হইলে, বহু আয়াসস্বীকার না করিলে সে বাসনা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। কাহারও কাহারও ভাগ্যে হয় ত জীবনে সে সুযোগ কদাচিৎ ঘটে। ধ্রুপদ-খেয়ালের কথাই ত নাই, কীর্ত্তন-যাত্রা প্রভৃতিও আর তেমন শুনিতে পাওয়া যায় না। যে আনন্দের প্রস্রবণ হইতে সঙ্গীতকলার সুরধুনীধারা মানবের জীবনে প্রবাহিত হইয়া মনুষ্যজন্ম সার্থক করে, সেই আনন্দ-ধারাই শুষ্ক হইয়া যাইতেছে! শুধু অন্ন-সমস্যাই ইহার একমাত্র কারণ বলিয়া মনে হয় না। পূর্ব্বে দীন-দরিদ্রদিগের মধ্যেও সঙ্গীত-চর্চ্চা প্রবলভাবে চলিত; তাহাদের দারিদ্র্যের মধ্যেও সঙ্গীত দুই দণ্ডের জন্য আনন্দের বার্ত্তা বহন করিয়া আনিত। রোগশোক, দুঃখ-দৈন্য হইতে পরিত্রাণলাভের অন্য কোনও উপায়ই ত নাই। মানুষ যত দিন পৃথিবীতে থাকিবে, তত দিন তাহার রোগ-শোক বাধা-বেদনা থাকিবেই। সঙ্গীতের মধুর প্রলেপে অনেক ক্ষত আরাম হইয়া যাইত; হিংসা-দ্বেষ, বিবাদ-বিরোধ অনেক কমিয়া যাইত। সঙ্গীতের মধ্যে যে সাম্য ও মৈত্রীর প্রেরণা আছে, তাহা বোধ হয়, আর কোথায় নাই। কারণ দল না বাঁধিলে গান হয় না; শ্রোতা না হইলে গান জমে না। সম্প্রদায় চাই, মজলিস চাই, গুণগ্রাহী শ্রোতা চাই, এই সকলের যৌথ বা সমবেত প্রচেষ্টাই সঙ্গীতের প্রাণ। পল্লীতে কোনও ভবনে গান হইলে, তাহা শুনিতে যাইতে কাহারও বাধা নাই। নিমন্ত্রিত, অনিমন্ত্রিত রবাহূত সকলে এক আসনে বসিয়া একই রস আস্বাদন করিতে পারেন। আহারের সম্বন্ধে মুসলমান ও খৃষ্টানদিগের মধ্যে যে সার্ব্বজনীন উদারভাব আছে, হিন্দুদের মধ্যে তাহা নাই। খাওয়া দাওয়া লইয়াই আমাদের যত গোলযোগ। আমাদের পল্লীগ্রামে এখনও প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়, আহার লইয়া যত দলাদলি, যত বাধা-বিপত্তি। সঙ্গীতে সে সব বাধা-সঙ্কোচ কিছু নাই। কাযেই সঙ্গীত আমাদের দেশে সঙ্ঘস্থষ্টির প্রধান সহায় হইয়াছিল। কিন্তু সঙ্গীতের সে সাম্যবাণী এখন আর পল্লীতে পল্লীতে ধ্বনিত হয় না, কাযেই আমাদের মধ্যে মনের মিলও আর তেমন দেখিতে পাওয়া যায় না। সহরে নগরে, হাটে বাজারে বসিয়া আমরা ইহা হয় ত সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব না। কিন্তু এ সকল স্থলেও 'বারোয়ারী' ব্যাপারে আনন্দের কি মহোৎসব পড়িয়া যায়, তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, দল গড়িতে সঙ্গীতের ক্ষমতা অদ্বিতীয়! সঙ্গীতের সমতলক্ষেত্রে ছোট-বড় নাই, ধনী-দরিদ্র নাই, ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ নাই। সঙ্গীতের এই অমূল্য অধিকার হইতে যে জাতি বঞ্চিত, তাহারা যে শুধু Culture হিসাবে নিম্নস্তরে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা নহে, তাহাদের জাতীয় শক্তিও অনেক নিকৃষ্ট হইতে বাধ্য। কোনও জাতির সমবেত শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইলে যে সকল জাগ্রত প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হয়, তাহার মধ্যে সঙ্গীতের স্থান অনেক উচ্চে। ললিতকলার পরিণতি কত দিকে কত প্রকারে যে জাতীয় জীবনকে সৌষ্ঠবসমন্বিত করিয়া তুলে, তাহার ইয়ত্তা নাই। সেই প্রাচীন কালের ঋষিদিগের সামগান হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের অমর গীত বন্দে মাতরম্ পর্য্যন্ত, নারদের বীণার তান হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথের গীতিমুখর কলকাকলি পর্য্যন্ত সঙ্গীতের প্রভাবের দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায়। আমি সে সম্বন্ধে কিছুই বলিতে চাহি না। আমার বক্তব্য এই যে, সঙ্গীতের প্রসার কমিয়া গেলে জাতীয়-জীবনে এত বড় লোকসান হয় যে, সে লোকসান সহজে পূরণ করা অসম্ভব। হিন্দুস্থানী স্ত্রীপুরুষরা যখন দলবদ্ধ হইয়া গান করিতে আরম্ভ করে, তখন তাহাদের মধ্যে এমন একটা মিলনের ভাব জাগিয়া উঠে, যাহাকে জাতীয় যোগ্যতার দিক্ দিয়া অগ্রাহ্য করা চলে না। ইংরাজদিগের জাতীয় সঙ্গীত যখন গীত হয়, তখন এমন কাহাকেও কি দেখিয়াছেন, যে তাহাতে পূর্ণকণ্ঠে যোগদান না করে? তাহাদের ধর্ম্মসঙ্গীতেও ঐরূপ সামাজিকতা দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে দোলের সময় হিন্দুস্থানী সহিস কোচমান পাহারাওয়ালা দরওয়ান একসঙ্গে মিলিয়া সঙ্গীতের কিরূপ তাণ্ডব জুড়িয়া দেয়, তাহা অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সাঁওতালরা পাল-পার্ব্বণে সঙ্গীত-নৃত্যে কিরূপ মাতিয়া উঠে, তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলিতে পারিবেন যে, সেই অসভ্য বর্ব্বর

জাতির প্রাণের স্পন্দন কোনখানে। আমি শিখদিগের ধর্ম্মসভায় স্ত্রী-পুরুষের মিলিত কণ্ঠের উচ্ছ্বসিত সঙ্গীত শুনিয়াছি। এক দিকে শত শত শ্মশ্রুমণ্ডিত বীর, বরেণ্য শিখগণ গান করিতেছেন, অপর দিকে অবগুণ্ঠনবতী অপূর্ব্ব সুন্দরী রমণীগণ তাহাতে অবাধে যোগদান করিতেছেন! আমার এই সকল দেখিয়া মনে হয় যে, বাঙ্গালা দেশে সঙ্গীতের এরূপ সার্ব্বজনীন ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। আমাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে সঙ্গীতের বিকাশ Congregational Singing ক্রমশঃ লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। নাম-সঙ্কীর্ত্তনে কখনও কখনও কিছু উন্মাদনা দেখিতে পাওয়া গেলেও ইহা যে ক্রমশঃ দুর্লভ হইয়া উঠিতেছে, সে সম্বন্ধে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ হিন্দুদিগের মধ্যে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম যেমন সর্ব্বপ্রকার বৈষম্য ভুলিয়া দিয়া দল বাঁধিতে চেষ্টা করিয়াছিল, এমন বোধ হয় আর কোনও সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায় না। বৌদ্ধরা সঙ্ঘকে আপন ধর্ম্মের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বুদ্ধ ও ধর্ম্ম যেমন আদরণীয়, সঙ্ঘও তদ্রূপ। বস্তুতঃ বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘকে তাঁহারা ত্রিরত্ন বলিয়া গণনা করেন। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী-সম্প্রদায় গঠন করিয়া তাঁহারা সঙ্ঘের সৃষ্টি করিলেন। কেহ কেহ বলেন যে, বৈষ্ণব-দিগের নেড়ানেড়ীর দল এই বৌদ্ধ-সঙ্ঘগঠনের আদর্শে গঠিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ 'নাড়ানাড়ী' বৌদ্ধ সহজিয়াদিগেরই একটি সম্প্রদায়-বিশেষ। ইহারা পরে বৈষ্ণবদিগের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। যাহা হউক, বৈষ্ণবরা যে সঙ্ঘের প্রবর্ত্তন করেন, তাহার ভিত্তি সংকীর্ত্তন। মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"সর্ব্বধর্ম্ম সার মোর সংকীর্ত্তন ধর্ম্ম।
বিশেষ জানিবে কলিযুগের এই কর্ম্ম॥
পঞ্চম যে বেদ হইতে প্রকাশ ইহার।
শিব তেঁই পঞ্চমুখে গায় অনিবার॥
নারদ বীণায় গাই বুলয়ে নাচিয়া।
শুক সনকাদি ভক্ত বুলয়ে গাইয়া॥"—চৈতন্যমঙ্গল।

সঙ্গীতের দ্বারা এই যে দলগঠনের (Congregational Singing) চেষ্টা, ইহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। উচ্চতরের সঙ্গীত হউক বা নিম্নস্তরের সঙ্গীত হউক, সে কথা হইতেছে না। কথা এই যে, আমাদের বাঙ্গালীর জীবনে মিলনের এমন একটি সহজ সুন্দর, উপাদেয় উপকরণ সঙ্গীতের মধ্য দিয়া আসিয়াছিল, যাহার তুলনা কিছুতেই মিলে না, সুতরাং সেই মিলন-মন্ত্রটি হারাইয়া ফেলা যে আমাদের জীবনে একটি বিষম দুর্দ্দৈব, এই কথাটি আমি বলিতে চেষ্টা করিতেছি। সংকীর্ত্তন যে সাম্প্রদায়িক, তাহা আমি জানি। ইহার দ্বারা সমগ্র বাঙ্গালী হিন্দু সমাজকে সঙ্গীতে অনুপ্রাণিত করা সম্ভবপর নহে। কারণ সকলেই যে বৈষ্ণব হইবেন এবং সকলেই যে সংকীর্ত্তনে মাতিয়া উঠিবেন, এমন হইতে পারে না, কিন্তু সঙ্গীতের প্রভাব যাহাতে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে অনুসৃত হয়, সকলেই যাহাতে সঙ্গীতের সুপরিসরক্ষেত্রে সম্মিলিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির বিবেচ্য।

এই কথাটি আজকাল কেহ কেহ হয় ত প্রণিধান করিতেছেন। দেশের যে সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান আছে, সেগুলি সমস্তই বৈদেশিক প্রণালীর উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা বিদ্যালয়ে কেবল নীরস গণিত, ভূগোল, ইতিবৃত্ত আর ইংরাজীর কিচিমিচি শিক্ষা করাই পরমপুরুষার্থ বলিয়া মনে করি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি একে একে পাশ করিয়া যখন এক জন যুবক সংসারে প্রবেশ করে, তখন সে আনন্দের কোনও উপকরণই আহরণ করিয়া আনে না। ভাগ্যবশে কেহ যদি একটু আধটু সঙ্গীতের সহিত দৈবাৎ পরিচয়লাভ করিবার সুযোগ পাইয়া থাকে, তবে তাহার সেই শক্তিটুকু কোনও অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্যের ফল মনে করিয়া প্রতিবেশীরা বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে নিরীক্ষণ করেন। ইহা যে তাঁহাদের পক্ষেও সম্ভব হইতে পারিত, এরূপ কল্পনাও অনেকের মনে আইসে না। ফলতঃ ইহা আমাদের শিক্ষা-প্রণালীরই দোষ বলিতে হইবে। আমাদের মধ্যে অনেকেই শৈশবে সঙ্গীত শিখিবার কোনও সুযোগ লাভ করেন না। বাড়ীতে সঙ্গীতশিক্ষক রাখিয়া পুত্রকন্যা-দিগকে সঙ্গীত শিখাইবার সামর্থ্য আমাদের মধ্যে কত জনের আছে? সুতরাং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া যদি শিশু-দিগকে সঙ্গীত শিখানো না যায়, তাহা হইলে আমাদের দেশে সঙ্গীতের ভবিষ্যৎ ক্রমেই শোচনীয় হইবে।

যাঁহারা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্ণধার, তাঁহারাও এই সত্যটির উপলব্ধি করিতেছেন। দিল্লীতে যখন একটি নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তখন তাহার সম্বন্ধে আইন-প্রণয়নের জন্য যে সমিতি (Select Committee) হয়, আমি তাহার অন্যতম সভ্য ছিলাম। সে সময়ে দিল্লী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষার অঙ্গস্বরূপ একটি সঙ্গীত-বিভাগ

(Faculty of Music) খুলিবার প্রস্তাব সাদরে গৃহীত হইয়াছিল। কিছুদিন পূর্ব্বে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি সঙ্গীত-বিভাগ খোলা হইয়াছে। সেখানকার সঙ্গীত-রসজ্ঞের বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অতুলপ্রসাদ সেনের নিকট শুনিয়াছি যে সেখানে এই ব্যবস্থায় সঙ্গীতের আদর বাড়িতেছে। বিশ্বভারতীতেও সঙ্গীতের একটি সুনির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। কলিকাতা বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ পর্য্যন্ত সঙ্গীতের উৎকর্ষ সম্বন্ধে কোনও ব্যবস্থাই হয় নাই। পরলোকগত কর্ম্মবীর স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে এক দিন বলিয়াছিলেন যে, 'আমি যদি কিছুকাল বাঁচিয়া যাই, য়ুনিভার্সিটিতে খোল-করতাল বাজাইয়া দিয়া যাইব।' খোলকরতাল শব্দে তিনি সাধারণতঃ সঙ্গীতকেই উপলক্ষিত করিলেন, হয় ত তাঁহার মনে ইহাও ছিল যে, বাঙ্গালীর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালীর সঙ্গীত, কীর্ত্তন, বিশেষভাবে স্থানলাভ করিবে। বিধাতা তাঁহাকে কয়েক বৎসর বাঁচিয়া যাইতে দিলেন না, তাঁহার মনস্কামনাও পূর্ণ হইল না। আমাদেরই দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।

সম্প্রতি বাঙ্গালার শিক্ষা-বিভাগ এই দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। কিছু দিন পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট যে শিক্ষণীয় বিষয়-তালিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে সঙ্গীতশিক্ষার বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছিল। এক এক শ্রেণীর বালক সমস্বরে নির্দ্দিষ্ট কয়েকটি গান গায়িতে শিক্ষা করিবে। এইরূপে ছাত্ররা সহজ সহজ গান অভ্যাস করিয়া ক্রমশঃ একটু একটু করিয়া কঠিন সুর আয়ত্ত করিতে পারিবে। দলবদ্ধ হইয়া গান করিবার (Class Singing) শক্তি অর্জ্জিত হইলে ছেলেদের যে শুধু সঙ্গীতে রুচি হইবে, তাহা নহে; গান করা এক আনন্দের ও প্রীতির বস্তু হইয়া উঠিবে। এ বিষয়ে আমি এ পর্য্যন্ত কোনও আলোচনা দেখি নাই। আমার মনে হয় যে, এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা হওয়া উচিত। যাঁহারা জনমতের নেতা, তাঁহারা এ বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিলে ভাল হয়। কি প্রকারে সুকুমারমতি বালকদের জীবনে সঙ্গীতের স্বাস্থ্যকর ও আনন্দপ্রদ প্রভাব ক্রমশঃ সংক্রামিত হইতে পারে, তাহা নির্দ্দেশ করিবার অধিকারী তাঁহারা। সুতরাং তাঁহারা এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। গবর্ণমেণ্ট ইতোমধ্যে এ বিষয়ে আগ্রহ দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। পূর্ব্বে সঙ্গীত-সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট বিশেষ কোনও অর্থসাহায্য করিতেন বলিয়া আমি জানি না। সম্প্রতি সঙ্গীত-সম্মিলনীকে গবর্ণমেণ্ট মাসিক বৃত্তি দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। যোগ্য হইলে অন্য সঙ্গীত-প্রতিষ্ঠানও এইরূপ সাহায্য পাইতে পারিবে বলিয়া ভরসা করা অন্যায় নহে। বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা-বিভাগ সঙ্গীতের প্রসার সম্বন্ধে মনোযোগী না হইলে, বঙ্গদেশে সঙ্গীতের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হয়।

(অধ্যাপক) শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র (রায় বাহাদুর, এম্-এ)

মিস্ মেয়োর প্রতি *

তোমার গোটা বইএর মোটা অর্থ
হ'ল তোমার ভারত-ভ্রমণ ব্যর্থ।
পেলে নাক জগন্নাথের দর্শন,
হল নাক মহাপ্রসাদ স্পর্শন,
ভাগ্যহীনা দুঃখেতে দিন বঞ্চ,
মণি-কোটায় দেখলে পুঁইএর মঞ্চ।

অযোধ্যারি বানর দেখেই ফূর্ত্তি,
হেরলে না ক রাম কি সীতার মূর্ত্তি।
কাশী থেকে ফিরলে দেখে ষণ্ড,
ভাবলে না ক যাত্রা তোমার পণ্ড!
জলসা তোমার শুনিয়ে দিলে ঝিল্লি,
লাড্ডু দেখেই তোমার দেখা দিল্লী।

পার নি কি কিছুই তুমি বুঝতে,
কয়লা-খাদে মুক্তা গেলে খুঁজতে।
'আয়া'র কথাই প্রমাণ তোমার সত্য,
'ব্যায়রা' কাছে শুনলে সমাজ-তত্ত্ব।
উচ্চ এ সব অথারিটীর যোগ্য,
কেতাব তোমার সত্যি উপভোগ্য!

মলাট দেখেই করলে পুথি সাঙ্গ,
নিজের সাথেই করলে নিজে ব্যঙ্গ।
নাইক বটে আলাপ তোমার সঙ্গে,
পরিচিত স্বরটি তোমার বঙ্গে।
আমরা মানি 'শাঁকচিরুনী', 'ডাইনী',
দেখছি তারা এখনো সব যায় নি!

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

* ইনি 'মাদার ইণ্ডিয়া' নামক ইংরাজী পুস্তকে ভারতীয়গণের হীন কল্পিত চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন।

পরদিন প্রভাতে বিজয় আসিয়া কহিলেন, "চলুন, আপনাদের মেলাভূমি দেখিয়ে নিয়ে আসি, এর পরে হয় ত অবসর পাব না।"

তিন জনে উঠিলেন। দ্বারে চাবি-তালা লাগাইয়া বাহিরে আসিলেন। বাড়ীটা নিতান্ত ছোট নয়—অনেক ঘর, অনেক ভাড়াটিয়া। বিজয় বাজারের নিকট আসিয়া মোটরে উঠিলেন। কেশব-গোষ্ঠী কখন মোটরে উঠেন নাই; উঠিয়া মহা বিব্রত হইয়া পড়িলেন। গাড়ী চলিতে লাগিলে কেশবের গা তুলিয়া উঠিল—বমি হইতে পারে, উদর এরূপ বার্ত্তা জানাইল। হৈমবতী ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া কেশবের কোমর চাপিয়া ধরিলেন। রমা বিস্ময়ে, গর্ব্বে, আনন্দে স্ফীত হইয়া পথবাহীদের পানে তাচ্ছিল্যভাবে চাহিতে লাগিল। বিজয় চালকের পার্শ্বে উপবিষ্ট থাকিয়া গাড়ী লইয়া গেলেন জোয়ালাপুরে ঋষিকুল আশ্রমে। সেখানে প্রায় এক সহস্র তাঁবু পড়িয়াছে এবং বহু যাত্রী আশ্রয় পইয়াছে। হোমকুণ্ডের ভস্ম মাথায় লইয়া তাঁহারা উত্তরাভিমুখে গাড়ী ছুটাইলেন। ভীমগড়ার সন্নিকটে গাড়ী হইতে নামিয়া পদব্রজে চলিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গিয়া হাঁটিয়া গঙ্গা পার হইলেন। আরও একটু অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, গঙ্গার চড়ার উপর সত্তর আশী জন সাধু নগ্নদেহে ভূশয্যায় অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাদের মাথার উপর আকাশ, পদতলে বালুরাশি, পশ্চাতে নীলধারা ও পর্ব্বতমালা; সম্মুখে ভাগীরথী। এই সকল সন্ন্যাসী হিমালয়ের উচ্চ শিখরে, মনুষ্যসমাগমশূন্য গভীর জঙ্গলে অবস্থান করেন। তাঁহারা লোকালয়ে আসেন না, সংসারী জীবের সংসর্গ পছন্দ করেন না। তাই কুম্ভস্নান উপলক্ষে দুরারোহ পর্ব্বত হইতে নামিয়া আসিয়াও লোকশূন্য স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। দিবসে মাথার উপর প্রচণ্ড সূর্য্য, রাত্রিতে দারুণ পার্ব্বতীয় শীত। কখন কখন বৃষ্টিধারা মাথার উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে। বিজয় তাঁহাদের আশ্রয়ের জন্য কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সে সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। কালী কমলিওয়ালার তরফ হইতে এক শত কম্বল এই মহাপুরুষদের ব্যবহারের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল; এ দানও তাঁহারা গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা নগ্নদেহে উন্মুক্ত আকাশতলে তুষারশীতল জাহ্নবীতটোপরি ভূশয্যায় পড়িয়া রহিলেন।

বিজয় সদলে আসিয়া তাঁহাদের চরণে প্রণাম করিল। তাঁহাদের পায়ের ধূলাও মাথায় লইল। এক মহাপুরুষের চরণ স্পর্শ করিবামাত্র বিজয়ের দেহ রোমাঞ্চিত হইল। তিনি সন্ন্যাসীর মুখপানে ভক্তিপূর্ণ নয়নে চাহিলেন; সন্ন্যাসী হাসিয়া কহিলেন, "বেটা, তেরা ভালা হোগা।" পশ্চাতে রমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এহ তেরা জরু?"

"নেহি বাবা; ম্যায় সাধি নেহি কিয়া।"

"বহুত আচ্ছা।"

"সাধি করবার মতলব নেই, দেশের কায ক'রে জীবন ধন্য করব মনে করেছি।"

"বহুত আচ্ছা।"

"কিন্তু মানুষের মন বড় দুর্ব্বল।"

"ঠিক বাৎ।"

সন্ন্যাসী নীরব হইলেন। কেশব ও হৈম সাধু মহারাজের চরণধূলি লইবার জন্য অগ্রসর হইলে তাঁহার ভাব পরিবর্ত্তিত হইল—করুণাবর্ষী নয়ন সহসা বিদ্যুদ্বর্ষী হইল—তাঁহারা ভীত হইয়া নিরস্ত হইলেন। কিন্তু রমা যখন অগ্রসর হইল, তখন তিনি পূর্ব্ববৎ হাসিয়া উঠিলেন; কহিলেন, "তুই বড় দুঃখী, কিন্তু তোর কর্ম্মফল এ জীবনেই কেটে যাবে—মানুষ ছেড়ে ভগবান্‌কে ভালবাসিস্।"

এক জন সাধু বিজয়কে ডাকিয়া কহিলেন, "এই দেখ, তোর মা কত ঘি, ময়দা, কাঠ পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

বিজয় (যুক্তকরে)। আপনাদের জিনিষ, আপনাদের মা পৌঁছে দিয়েছেন।

সাধু (সহাস্যে)। আমরা নিয়েছি।

বিজয় (সানন্দে)। আমাদের ধন্য করেছেন, কৃতার্থ করেছেন।

বলিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। দেহ ধূলায় লিপ্ত, অশ্রুতে গণ্ড বক্ষঃ সিক্ত। রমা বিজয়ের সে ভাব পূর্ব্বে দেখে নাই। এক্ষণে বিজয়ের ভক্তিপ্লুত, প্রেমসিক্ত, মহিমময় মূর্ত্তি দর্শন করিয়া রমা ভাবিল, "আমি এই মহাধনীর পাশে মহাদরিদ্র—এ ভক্তি, এ বিনয় আমি কোথা পাব ?"

তাঁহাদের বাসায় ফিরিতে মধ্যাহ্ন হইল। হৈমবতী কহিলেন, "দুটো ভাত খেয়ে যাও না বাবা—আমরা তোমার সন্তান।"

বি। আমি মায়ের সঙ্গে হবিষ্যি করি।

হৈ। বরাবরই কি কর ? না এইখানে এসে করছ ?

বি। দু' চার বছর হ'তে করছি।

হৈ। করছ কেন ?

বি। ত্যাগ শেখবার জন্যে—রসনার লোভটাই সব চেয়ে বড়। এখন আমি উঠি, কাল আপনাদের মা'র কাছে নিয়ে যাব।

বিজয় প্রস্থান করিলেন। হৈম রান্না চড়াইলেন। রমা সহসা শুনিল, অদূরে কে গাহিতেছে,—

"কার ঘরের উজল বাতি, কার পরাণের ধন।"

রমা চমকিয়া উঠিল; ঘর হইতে ধীরে ধীরে বাহিরে আসিল। হৈম জিজ্ঞাসা করিলেন, "একা কোথা যাচ্ছিস্ ?"

"কোথাও না—এইখানে।"

বাড়ী ছাড়িয়া পথের ধারে আসিয়া রমা দেখিল, নবকুমার দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কবে এলেন ?"

নব। আজ ভোরে।

রমা। আমাদের সন্ধান পেলেন কিরূপে ?

নব। মটরের পেছনে ছুটতে ছুটতে।

রমা। এখানে হঠাৎ এলেন কেন ? আগে ত কিছু শুনি নি।

নব। এখানে এসেছি তোমার জন্যে—

রমা। আমার জন্যে ! কেন ?

নব। যদি তোমার কোন কাযে লাগি ?

রমা। আমার পিছনে এসে আপনি ভুল করেছেন, আমার কোন কাযে আপনি লাগতে পাবেন না।

নব। রমা, তুমি যে আমার বাগ্‌দত্তা বধূ, তোমার রক্ষণাবেক্ষণ—

রমা। আমি আপনার বাগ্‌দত্তা বধূ নই। এ কথা আর কখন তুল্‌বেন না

নব। তুমি এ কি বলছ রমা ! এর মধ্যে সব ভুলে গেলে ?

রমা। আমি কিছুই ভুলি নি। আমি জন্মাবার আগে বাবা যদি কোন কথা দিয়ে থাকেন, তার দায়ী আমি নই, বোধ হয় বাবাও ন'ন।

নব। আর তোমাকে যদি আমি টাকা দিয়ে কিনে থাকি ?

রমা। আমাকে কিনে থাকেন ? আপনি টাকা দিয়ে আমাকে কিনেছেন ? তামাসার কথা। আমাকে কেনবার-বেচবার কারুর অধিকার আছে, 'তা আমি স্বীকার করি না। আপনি জানবেন, আপনার কোন দাবী আমার উপর নেই

বিস্মিত ও ব্যথিত নবকুমার কহিল, "হৃদয়ের দাবীও কি নেই রমা ?"

রমা। না নেই, আমি কোন দিন আপনাকে ভালবাসি নি।

নব। তুমি ত বল্‌তে—

রমা। আমি কোন দিন বলি নি আপনাকে আমি ভালবাসি, আপনিই বল্‌তেন—

নব। তবে কেন প্রতি সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে দেখা করতে ঘাটে আসতে ?

রমা। আসতাম সঙ্গ-সুখের লালসায়। ছিলাম আমি একা—আপনাকে ছাড়া পৃথিবীতে আর কাউকে তখনও আমি দেখি নি—

নব। এখন দেখেছ ?

সে কথার উত্তর না দিয়া রমা কহিল, "তা ছাড়া ভেবেছিলাম আপনার ঘরে হয় ত এক দিন আমাকে উজল বাতি হ'য়ে যেতে হবে।"

সে কথা কানে না তুলিয়া নবকুমার পূর্ব্ব প্রশ্নের উত্তরের

জন্য পীড়াপীড়ি করিল; কহিল, "বল রমা, এখন তুমি আর কাউকে দেখেছ ?"

রমা। উত্তরের জন্যে পীড়ন করবেন না।

নব। তুমি আমার প্রাণ নিয়ে খেলা করছ, আর কারণটাও জিজ্ঞেস করবার আমার অধিকার নেই ?

রমা। আপনার প্রাণটা যদি প্রত্যেক সুন্দরীর ক্রীড়নক হয়, তা হ'লে আমার কোন অপরাধ নেই। আমার মনের উপর কিন্তু আপনি কোন দিন অঙ্কপাত করতে পারেন নি—

নব। আজ সহসা সে কথা বুঝলে কি ক'রে ?

রমা। জ্ঞান জন্মালেই মানুষ অনেক কথা বুঝতে পারে।

নব। তুমি কার সঙ্গে মোটরে চ'ড়ে আসছিলে, রমা ?

রমা। স্বেচ্ছাসেবক বিজয় বাবুর সঙ্গে।

নব। তুমি কি তাঁকে ভালবাস, রমা ?

রমা। তিনি দেবতা, আপনার আমার মত মানুষ ন'ন; তাঁর কথা এর ভিতর আনবেন না।

নব। তোমার দেবতা থাকেন কোথা ?

রমা। সর্ব্বত্র—যেখানে বিপদ্, সেইখানে তিনি।

নব। তাঁর দেখা পেলে পরিচয় নেব, তিনি আকাশের দেবতার ন্যায় অমর, না তোমার আমার মত নশ্বর ?

রমা। এতক্ষণে তুমি নিজের পরিচয় দিলে। এখন বুঝতে পারছ, কেন তুমি আমার মনের উপর কোন রেখাপাত করতে পার নি ? হিংস্রক কখন কাউকে আকর্ষণ করতে পারে না। তুমি যদি বাসনাতাড়িত পশুর ন্যায় আমার এই দেহটাকে ভাল না বেসে আমাকে কোন দিন একটুও ভালবাসতে, তা হ'লে আজ এ নীচ জঘন্য বৃত্তির পরিচয় দিতে না। যাও, সাধ্য থাকে তাঁকে মার গে।

অকস্মাৎ হৈমর কণ্ঠস্বর শুনা গেল।—কহিতেছেন, "এই যে রমা, আমি ভেবে মরি। তুই কার সঙ্গে কথা কচ্ছিস্ লা ?"

রমা উত্তর না করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

১০

নবকুমার ঘুরিতে ঘুরিতে অপরাহ্নে বিজয়ের দেখা পাইল। তখন তিনি একটি বৃদ্ধকে বুকের উপর ফেলিয়া রামকৃষ্ণ হাঁসপাতালের দিকে ছুটিতেছিলেন। নবকুমার কহিলেন, "আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।"

বি। একটু অপেক্ষা কর, ভাই।

নব। অপেক্ষা করবার আমার অবসর নেই।

বি। এরও যে অবসর নেই; গাড়ীর চাকায় আহত হয়েছেন।

নবকুমার তখন বৃদ্ধের পানে চাহিয়া দেখিল। দেখিল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ রুধিরাক্ত। কহিল, "ফিরতে আপনার কত বিলম্ব হ'তে পারে ?"

বি। তা বলতে পারি না, তুমি আমার সঙ্গে আসতে পার।

নব। ও বুড়া আপনার কে হয় ?

বি। আমার ভাই।

নবকুমার সঙ্গে চলিল। হাঁসপাতালে গিয়া দেখিল, মহাপ্রাণ যুবকরা অপরিচিত নিরাশ্রয় রোগীদের যে ভাবে সেবা করিতেছেন, সে ভাবে লোক কেবল আপন ভাই-বোনদের সেবা করিতে পারে। সেবকদের অন্তরে ভগবান্ রামকৃষ্ণের নাম; তাঁহারই করুণার উপর নির্ভর করিয়া বসন্ত-বিসূচিকা আক্রান্ত রোগীকে তাহারা অসঙ্কোচে সেবা করিতেছে। নবকুমার বিস্মিত হইয়া চারিদিক্ দেখিতে লাগিল। রোগীর পর রোগী আসিতেছে, যুবকবৃন্দ তৎপরতার সহিত তাহাদের সেবায় প্রবৃত্ত হইতেছে। বিরক্তি নাই, ক্লান্তি নাই, বিরাগ নাই। বিজয় কার্য্য সমাধা করিয়া বাহিরে আসিলে নবকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "যাঁকে আপনি রেখে এলেন, তিনি কি সত্যি আপনার ভাই ?"

বি। সত্যি আমার ভাই।

নব। তাঁকে দেখে পাঞ্জাবী ব'লে মনে হ'ল।

বি। পাঞ্জাবী কি আমার ভাই নয় ? আমরা কি এক মায়ের সন্তান নই ?

কথাটা বুঝিতে নবকুমারের একটু বিলম্ব হইল। নীরবে পথ চলিতে লাগিল। পথে বেশ ভিড়, বাক্যালাপ করিবার সুবিধা হইল না। বিজয় আগে আগে পথ করিয়া চলিয়াছেন। সহসা তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, এক বলিষ্ঠকায় বেহারবাসী যুবক, অপর এক পথিককে আক্রমণ করিয়া মুহূর্ত্তে তাহাকে ভূতলশায়ী করিল। আক্রান্ত ব্যক্তি আসামবাসী, তাঁহার পশ্চাতে দুইটি রমণী আসিতেছিলেন; এক জন প্রৌঢ়া বিধবা; অপরা সালঙ্কারা যুবতী। যখন দস্যু ভূপতিত

পথি...কে লইয়া ব্যস্ত, তখন অপর এক দস্যু, যুবতীকে স্কন্ধে উপর ফেলিয়া ছুটিল। লোকের ভিড়ে আশানুরূপ অগ্র...হওয়া সম্ভব নয়। দস্যু চীৎকার করিতে করিতে অগ্রসর হইল, "পথ ছাড়, মেয়েটার ম'রে যাবার হাল হয়েছে।" মেয়েটিও চীৎকার করিতেছিল, কিন্তু তাহার কণ্ঠ ডুবাইয়া দস্যুর চীৎকার উঠিতেছিল। কেহ কেহ সরিয়া পথ দিল। যে দুই চারি জন ঘটনাটি লক্ষ্য করিয়াছিল, তাহারা গুণ্ডাকে বাধা দিতে সাহস না করিলেও চীৎকার করিয়া উঠিল, "ডাকাতে মেয়ে নিয়ে পালাচ্ছে।" দস্যু কয়েকপদ মাত্র অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময় বিজয় পশ্চাৎ হইতে দুই হাতে তাহার গলা টিপিয়া ধরিলেন, দস্যু বসিয়া পড়িল। তাহাকে এক জন ভলন্টিয়ারের জিম্মায় দিয়া বিজয় মেয়েটিকে লইয়া ঘটনাস্থলে আসিলেন।

আসিয়া দেখিলেন, নবকুমার ও আসামবাসী ভদ্রলোক প্রথম গুণ্ডার সহিত মারামারি করিতেছেন। দস্যু অর্থাদি কাড়িয়া লইয়া যখন পলাইতেছিল, তখন নবকুমার সাহস করিয়া তাহাকে ধরিয়াছিল। বিজয় আসিয়া পড়াতে মুহূর্ত্ত মধ্যে যুদ্ধের অবসান হইল। পুলিসও সেই সময় আসিয়া দস্যুকে ধরিল। বিজয় তখন একখানা গাড়ী ডাকিয়া ভদ্রলোককে তাঁহার বাসায় পাঠাইয়া দিলেন।

নবকুমারকে লইয়া বিজয় আবার পথ চলিতে লাগিলেন। চলিতে চলিতে বিজয়, তাহার নাম ধাম জানিয়া লইলেন। কয়েক দণ্ড পূর্ব্বে বিজয় নবকুমারের মা ও ভগিনীকে পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছিলেন। বিজয় তাঁহাদের একটি বাসায় উঠাইয়া নবকুমারের অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। বিজয় একটু হাসিয়া কহিলেন, "এখন তোমার বাসায় চল—দেখ্ছি, সমস্ত দিন পেটে কিছু পড়ে নি।"

ন। তা' না পড়ুক, আপনাকে ব্যস্ত হ'তে হবে না।

বি। একটু ব্যস্ত হ'তে হচ্ছে বই কি, তোমার মা যে খেতে পারছেন না—শুধু কান্নাকাটি করছেন।

ন। আমার মাকে আপনি কোথায় পেলেন ?

বি। পথে। নেও, এখন বাসায় চল।

ন। আমার ত বাসা নেই।

বি। আছে ; সেখানে গেলেই দেখবে, তোমার মা ও দিদি তোমার জন্তে কত টা ব্যাকুল হয়েছেন। তাঁদের কাছে একটি পয়সাও নেই যে কিছু কিনে খাবেন।

ন। আমার কাছেও যে কিছু নেই, চোরে সব নিয়েছে।

বি। ভালই করেছে, এখন চল।

নবকুমার নীরবে বিজয়ের অনুসরণ করিল। যাইতে যাইতে জিজ্ঞাসা করিল, "কেশব বাবুদের সঙ্গে আপনার কোথা পরিচয় হ'ল ?"

"কেশব বাবু কে ?"

"যাঁর স্ত্রী-কন্যাকে নিয়ে আপনি মোটরে ক'রে ঘুরে এলেন।"

"তাঁদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে পথে।"

"আপনি কি তাঁদের আশ্রয় দিয়েছেন ?"

"একটা বাসায় এনে তুলেছি।"

উভয়ে গন্তব্য স্থানে আসিয়া পৌঁছিলেন। একটা ছোট বাড়ী বিজয়ের মা পূর্ব্ব হইতে ভাড়া লইয়া রাখিয়াছিলেন এবং নিরাশ্রয়দের তথায় আশ্রয় দিয়াছিলেন। তাহারই একটা ছোট ঘরে নবকুমারের মা-বোনকে বিজয় তুলিয়াছিলেন, মা পুত্রকে দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন ; পুত্রও একটু কাঁদিল। কান্না শেষ হইলে উভয়ে দেখিলেন, বিজয় তথায় নাই। তাহার পর তাঁহাদের দুঃখের কথা উঠিল। যে দুইটি কুলী তাঁহাদের দ্রব্যাদি আনিতেছিল, সেই দুই ব্যক্তি পথিমধ্যে কোথায় যে দ্রব্যাদি সহ অন্তর্হিত হইল, তাহা মাতা-পুত্র এযাবৎ অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারেন নাই। পুত্রের জামার পকেটে কিছু অর্থ ছিল, তাহা কোন পুণ্যকামী হরণ করিয়া স্বর্গের পথ পরিষ্কার করিয়াছেন। নবকুমার এক্ষণে নিঃসহায়, নিঃসম্বল, ক্ষুধার্ত্ত, তৃষ্ণার্ত্ত। জননী অবসন্ন, বিধবা ভগ্নী ক্রন্দনোন্মত্তা। পুত্র তাঁহাদের মুখপ্রতি চাহিয়া গভীর নিঃশ্বাস সহকারে কহিল, "চল মা, বাড়ী ফিরে যাই।"

জননী। ফিরে যাবার কথা পরে, এখন তোকে খেতে দি কি ?

এমন সময় দিনু ও একটা কুলী আহার্য্যাদি সহ কক্ষে প্রবেশ করিল। বিজয়ের নির্দ্দেশমত দিনু এই সব কায করিয়া বেড়ায়। দিনু হর্ম্ম্যতলে দ্রব্যাদি রক্ষা করিলে নবকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে এ সব রাখছ কেন ?"

"আমার মনিবের হুকুমে রাখছি।"

"তোমার মনিব কে ?"

"তা বল্‌বার হুকুম নেই।"

"বুঝেছি। আকাশের তলে এক জন আছে, যে পরের দুঃখ বুঝে।"

বলিয়া নবকুমার ঝটিতি বাহিরে আসিল। চারিদিকে নেত্রপাত করিয়া বিজয়কে খুঁজিল, কিন্তু কোথাও তাঁহার দেখা পাইল না। খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। যখন অন্ধকার হইল, তখন ক্ষুণ্ণমনে গৃহে ফিরিল।

১১

পরদিন অপরাহ্নে বিজয় তাঁহার মায়ের কাছে হৈম ও রমাকে উপস্থিত করিলেন। রমাকে জাহ্নবীর খুব পছন্দ হইল। ভাবিলেন, এই রকম একটি বউ হয়। তাহাকে কাছে রাখিবার তাঁহার বাসনা হইল। ইচ্ছা প্রকাশ করিবামাত্র মাতৃপ্রাণ সন্তান তৎক্ষণাৎ সেইরূপ ব্যবস্থা করিলেন। দিনু তৈজসপত্রসহ কেশবকে কঙ্খল হইতে লইয়া আসিল; এবং একটা ঘরে তুলিয়া কহিল, "আর আপনাদের ভাবনা কি?—মা-ঠাকুরাণের সুনজরে আপনারা পড়েছেন।"

দরিদ্র কন্যা রমাকে ধনবতী বিদুষী জাহ্নবী যত দেখিতে লাগিলেন, তত তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। যখন শুনিলেন, কেশব তাঁহাদের পাল্টি ঘর, তখন রমাকে বউ করিয়া ঘরে রাখিবার সাধ হইল। কিন্তু—কিন্তু বিজয় কি বিয়ে করবে? আমি বললে সে সম্মত হইতে পারে, কিন্তু সে কি সুখী হবে? সে চায় দেশের কায, পরের সেবা—আত্মসুখ সে চায় না। কিন্তু আমার সুখ কোথা? আচ্ছা, বিজয়কে একবার ব'লে দেখি।

বিজয় সে দিন রাত্রি তৃতীয় প্রহরে বাড়ী ফিরিল। জননী জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ রে বিজু, এত রাত্রি হ'ল কেন?"

বিজয়। আজ তবু ত এসেছি, কাল হয় ত আসতে পারব না।

জননী। কেন?

বি। কাল বিকেল হ'তেই যাত্রীরা ঘাটের দিকে ছুটবে, আমি ত আর অবসর পাব না, মা।

জ। তোমার যে বড় কষ্ট হবে, বাবা!

বি। আমার চেয়েও যে তাদের বেশী কষ্ট, মা। আমি ফাকা জায়গায় দাঁড়াতে পারব, ইচ্ছামত জলপান করতে পার্‌ব, তারা যে ভিড়ের ভিতর চেপ্টে থাকবে, আমরা একটু জল দিলে জল খেতে পাবে—

জ। তোমার যে সুখের শরীর, বাবা—

বি। তাদের মায়ের কাছে তাদের দেহও সুখের মা। কত স্নেহময়ী জননী এসেছেন এই ভিড়ের ভিতর ছেলে মেয়ে নিয়ে। আমরা যদি পূর্ণ স্বাস্থ্য ও শক্তি নিয়ে তাঁদের না দেখি, তবে তাঁদের কে দেখবে মা? আমরা যদি তাঁদের মুখে একটু তৃষ্ণার জলও দিতে না পারি, তা হ'লে ত মা, আমাদের সন্তান-জন্ম বৃথা হ'ল। তৃষ্ণার্ত্তের মুখে একটু জল দিতে পার্‌লে, নিরাশ্রয়কে একটু মাথা গোঁজবার স্থান দিতে পারলে, পীড়িতকে সেবা করবার একটু সুযোগ পেলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করি, জীবন সার্থক জ্ঞান করি—মনে করি যেন আমি তোমারই সেবা করছি, তোমারই চরণে ফুল দিচ্ছি।

জা। যাও বাবা, পরের কায কর গে, আমি তোমাকে আর ধ'রে রাখবো না।

বি। তারা ত পর নয় মা—তারা যে তোমারই সন্তান।

গৃহিণী অঞ্চল উঠাইয়া চক্ষু মুছিলেন। মায়ের মন অন্যদিকে লইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে বিজয় কহিল, "তুমি যদি দেখতে মা, একটি স্ত্রীলোক ছেলে হারিয়ে কি কান্নাটাই কাঁদছিলেন, তা হ'লে তুমি কেঁদে ভাসিয়ে দিতে।"

জা। তার পর? ছেলেকে পাওয়া গেছে?

বি। কাল সন্ধ্যের খানিক আগে হঠাৎ তাকে পেয়েছি। ছেলে ছোট নয়, বয়স বাইশ তেইশ হবে।

জা। কোথা তাঁদের রাখলে?

বি। তোমার সেই কঙ্খলের ভাড়া-বাড়ীতে। এদেরও বাড়ী মৈমনসিংহ জেলায়—কেশব বাবুদের গাঁয়ে। ছেলের নাম নবকুমার। আমার নাম যে সে কি ক'রে জানলে, তা' বুঝতে পারলাম না। এরও সব চুরি গেছে শুনছি।

জ। খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছ?

বি। যিনি কর্ত্তা, তিনি করেছেন; ব্যবস্থা করবার আমি কে মা? আহা, কত লোক যে সর্ব্বস্বান্ত হয়েছে—

জা। সে সব কথা আর বলিস্ নে, আমার বুক ফেটে যায়। কাল আমি তোর সঙ্গে নবকুমারের মাকে দেখতে যাব।

বি। কেশব বাবুরা যে ঘরে ছিলেন, সেই ঘরে নবকুমারকে উঠিয়ে আন্‌তে দিনুকে ব'লে দিয়েছি। তাঁরা কোথা আছেন জেনে তোমাকে নিয়ে যাব। কিন্তু সকালে যেতে হবে, পরে আর সময় পাব না।

জাহ্নবী ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিলেন, "একটা কথা তোক বলবার জন্যে আমার মন বড় ছটফট করছে।"

বি। কি বলবে বল, মা।

জা। এই রমা মেয়েটিকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে।

বি। মেয়েটি ভাল।

জা। খুব সোন্দর—

বি। হ্যাঁ।

জা। লেখাপড়া বেশ শিখেছে—

বি। হবে।

জা। শান্ত, ধীর, নম্র, অনুগত, হাস্যমুখী।

বি। তুমি কি বল্‌তে চাও, মা?

জা। মেয়েটিকে বউ ক'রে ঘরে রাখতে আমার ইচ্ছা হয়।

বি। তোমার ইচ্ছায় বাধা দেবার অধিকার আমার নেই; কিন্তু মা—

জা। কি বাবা?

বি। দেশ যে দূরে স'রে যাবে, ভাই যে পর হবে—

জা। আগে তোমার তৃপ্তি; আত্মার চেয়ে কেউ বড় নয়।

বি। আমার আত্মার তৃপ্তি পরের সেবায়, নিজের সেবায় নয়।

জা। আমার আত্মার কিসে তৃপ্তি, তা'ও ত তোমাকে দেখ্‌তে হবে। যাক, এ সব কথায় এখন আর কায নেই; আগে রমাদের পরিচয় নি নবকুমারের মায়ের কাছ হ'তে। কাল সকালে যাওয়াই স্থির।

১২

পরদিন প্রভাতে জাহ্নবী ছেলেকে লইয়া গাড়ীতে উঠিলেন। সঙ্গে হৈম, রমা, দিনু চলিল। গাড়ী ধীরে ধীরে কন্খলের দিকে চলিতে লাগিল। হরিদ্বার ও কন্খলের মধ্যে গঙ্গার উপর সেতু। এই স্থানে নিরঞ্জনী সম্প্রদায়ের আখড়া। আখড়া অতিক্রম করিয়া মোটর কিয়দ্দুর অগ্রসর হইলে বিজয় দেখিলেন, পথের উপর এক স্থানে অনেক লোক জমিয়া গিয়াছে। গাড়ীর মধ্যে দাঁড়াইয়া দেখিলেন, জনতার মধ্যস্থলে দুইটি বালক রাধাকৃষ্ণ সাজিয়া কীর্ত্তন করিতেছে, আর তিন জন বলিষ্ঠ দেহ প্রৌঢ় ব্যক্তি খোল করতাল সহকারে নৃত্য করিতেছে। পথ বন্ধ, গাড়ী থামিল। বিজয় নামিলেন এবং জনতার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। নৃত্যকারীদের মধ্যে এক জনকে বিজয় কোথায় দেখিয়াছেন বলিয়া তাঁহার মনে হইল। তীক্ষ্ণ নয়নে তাহাকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাহার ছদ্মবেশ ভেদ করিতে তিনি সমর্থ হইলেন। তিনি এক জন পাহারাওয়ালাকে ডাকিলেন এবং অন্য দুই জন সেবকের সাহায্যে দলটিকে গ্রেপ্তার করিলেন। কহিলেন, "আমাদের তাম্বুতে এদের নিয়ে যাও, এরা সব মুসলমান, ছদ্মবেশে হিন্দুদের প্রতারিত করছে।"

ভিড় ভাঙ্গিয়া গেল, গাড়ী আবার চলিতে লাগিল। যখন তাঁহারা মায়াপুর অতিক্রম করিয়া কন্খলের নিকটবর্ত্তী, তখন জনতা আবার তাঁহাদের পথরোধ করিল। এক ব্যক্তি পথিপার্শ্বে শুইয়া পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছিল, জনতা দূরে দাঁড়াইয়া তাহাকে দেখিতেছিল। এক ব্যক্তি কহিতেছিল, লোকটার বসন্ত হয়েছে। কেহ বলিতেছিল, বিসূচিকা। কিন্তু কেহ তাহার নিকটে যাইতেছিল না, পথের উপর দাঁড়াইয়া তাহাকে দেখিতেছিল। বিজয় গাড়ী থামাইয়া নামিয়া পড়িলেন। দেখিলেন, শায়িত ব্যক্তির অঙ্গময় প্রচুর বসন্ত উদ্গত হইয়াছে। বিজয় ফিরিয়া আসিয়া জাহ্নবীকে কহিলেন, "মা, আমার আর যাওয়া হ'ল না, দিনুর সঙ্গে তোমরা যাও।"

"তুই কোথা যাবি?"

"একে নিয়ে (রোগীকে দেখাইয়া) রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে চল্লুম, নিকটেই আশ্রম ও হাঁসপাতাল।"

"এঁর রোগ কি?"

"তা শুনে তোমার কায নেই।"

"তুই কি ক'রে নিয়ে যাবি?"

"এই দেখ না, মা—"

বলিয়া বিজয় দ্রুতপদে রোগীর সমীপস্থ হইলেন এবং তাঁহাকে বুকের উপর ফেলিয়া দূর হইতে জননীকে কহিলেন, "আমি চল্লুম, মা।"

জননী সাশ্রুনয়নে কহিলেন, "ভগবান্ রামকৃষ্ণ তোমাকে রক্ষা করুন।"

"তিনি যে মা সেবকদের নিয়ত রক্ষা করছেন। কোন চিন্তা নেই মা, আমি তাঁর কোলের ভেতর আছি মনে করো।"

জাহ্নবী চক্ষু মুছিয়া গন্তব্য পথে চলিলেন। যে ঘরে রমা পূর্ব্বে ছিল, সে ঘরে আসিয়া জাহ্নবী দেখিলেন, নবকুমার বাসায় নাই, কিন্তু তাহার জননী ও ভগিনী আছেন, অপরিচিতাদের সহসা দর্শন পাইয়া নবকুমারের গর্ভধারিণী রেবতীসুন্দরী একটুও প্রীত হইলেন না, বরং বিরক্ত হইলেন, কহিলেন, "তোমরা আমাদের ঘরে কেন বাপু? এখানে তোমাদের জায়গা হবে না।"

জাহ্নবী (সহাস্যে)। আমরা এখানে থাকতে আসি নি বোন্, তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

রেবতী (সগর্ব্বে)। আমার কাছে তোমাদের কি দরকার?

জা। দরকার না থাক্‌লে কি আলাপ করতে নেই?

রে। বাজে গপ্প করবার আমার সময় নেই বাপু! হ্যাঁ রে নিরি, (বিধবা কন্যা প্রতি) চাল ক'টা ধুয়ে আন্‌লি?

জাহ্নবী নড়িলেন না, হাসিয়া ভূপৃষ্ঠে বসিলেন।

হৈমবতী অগ্রসর হইয়া রেবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁগা, তোমাদের বাড়ী মৈমনসিং জেলায় না?"

রেবতী বিরক্তির সহিত উত্তর করিল, "যেখানেই হোক্ না বাপু, তোমার সে খোঁজে দরকার কি?"

হৈ। তোমার এত ঝাঁজ কেন বল দেখি?

রে। আ গেল যা', বাড়ী ব'য়ে কোঁদল করতে এসেছে! তোমাকে বাড়ী কোথা, নাম কি, হাঁড়িতে কি আছে সব বলি, আর তুমি চুরি কর। এখানে কাউকে আর বিশ্বাস নেই।

হৈ। তোমার সব চুরি গেছে বুঝি?

রে। তবে আর এতক্ষণ বলছি কি? কুলী হতভাগারা সব নিয়ে সরে পড়েছ, আর নবুর পকেটে যা ছিল, তা'ও সর্ব্বনেশে বেটারা চুপি চুপি বার ক'রে নিয়েছে—কিছু রেখে যায় নি।

হৈ। তবে আর চুরির ভয় করছ কেন?

রে। যা' আবার দু'খানা কাপড় গামছা হয়েছে।

হৈ। হ'ল কি করে?

রে। একটি ছেলে দিয়েছে।

হৈ। তার নাম কি বিজয়?

রে। তুমি জান্‌লে কি ক'রে?

হৈ। তাকেই যে ভগবান্ পাঠিয়েছেন দুঃখী কাঙ্গালদের দেখতে।

রে। ওমা, সত্যি না কি?

হৈ। আমারও সব গিয়েছিল, কেঁদে কেঁদে পথে বেড়াচ্ছিলাম, এই বিজয়, এই দেবতার ছেলে দেবতা আমাদের আশ্রয় দিয়েছে, খেতে দিয়েছে, পরতে দিয়েছে। ইনি তার মা।

রে। তা'র মা?

বলিয়া রেবতী আড়ষ্ট হইয়া পড়িল। অভদ্রতার জন্য লজ্জা ও ভয় হইল। ভবিষ্যৎ খোরাক ও ফিরিয়া যাইবার রাস্তা-খরচ এখনও তিনি বিজয়ের নিকট আশা করেন। জননী রুষ্ট হইলে পুত্র বিরূপ হইতে পারেন, এইরূপ তাঁহার আশঙ্কা হইল। তিনি কাতরোক্তির সহিত জাহ্নবীর হাত দুইটি চাপিয়া ধরিলেন। কহিলেন, "আমি মনে করি কি চোররা বুঝি আবার সন্ধান পেয়েছে।" ইত্যাদি।

১৩

২৯শে চৈত্র, মঙ্গলবার, শেষ রাত্রি। একাদশীর চাঁদ আকাশ হইতে অদৃশ্য হইয়াছেন—বুঝি স্নানে নামিয়াছেন, তারকাসুন্দরীরাও আকাশের গবাক্ষ বন্ধ করিয়া ধরাতলে মহাপুণ্যময় তীর্থক্ষেত্রে পূতসলিলা ভাগীরথীতে স্নানার্থে নামিতেছেন। পবনদেব স্তব্ধ, তিনি মায়ের ক্রোড়ে স্থান লইতে গিয়াছেন। সূর্য্যনারায়ণ উদয়গিরি ছাড়িয়া স্নানে আসিবার উদ্যোগ করিতেছেন। অসংখ্য স্নানার্থী মানব, ব্রহ্মকুণ্ড ঘাটের উপরে, নিকটে, দূরে চারিদিকে সমবেত হইয়াছেন, অপরাহ্ণ হইতে ঘাটের নিকটে জনতা আরম্ভ হইয়াছে, অনেকেরই ইচ্ছা ভিড় বাড়িবার আগে স্নান সারিয়া লইবেন, তাই তাঁহারা অপরাহ্ণে আসিয়াছেন; আসিয়া দেখিলেন, তাঁহাদের পূর্ব্বে অনেকেই আসিয়াছেন।

রাত্রি যত বাড়িতে লাগিল, ভিড়ও তত বাড়িতে লাগিল—প্লাবনের পর বন্যা আসিতে লাগিল। যে বড় রাস্তা ঘাটের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, সেটা নদী-বিশেষ। বড় বড় শাখা, নদীতে আসিয়া পড়িয়াছে। একটা বড় শাখা ডাকঘরের সম্মুখ দিয়া আসিয়াছিল। সেই পথের মাথায় একটা বাঁশের বেড়া। বেড়ার পার্শ্বদেশ রক্ষা করিতেছিলেন বিজয়। তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিল নবকুমার।

"ওহে সুন্দর, মম গৃহে আজি পরমোৎসব রাতি !
রেখেছি কনক-মন্দিরে কমলাসন পাতি—"

রবীন্দ্রনাথ।

বসুমতী প্রেস।

শিল্পী— শ্রীহরেকৃষ্ণ সাহা।

…কেও বিজয় সেবক-সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। …ক জন পদাতিক ও অশ্বারোহী শান্তিরক্ষক তথায় ঘুরিয়া …ইতেছিলেন। নবকুমার ছাড়া আরও কয়েক জন …টিয়ার বিজয়ের আশে-পাশে ছিলেন। কেহ ষ্ট্রেচার …ড় করিয়া রহিয়াছেন, কেহ বা জলের কলসী বহিয়া লইয়া …য়াছেন। সেবাপরায়ণ সকলেই, কিন্তু প্রয়াগের সেবকদের …ধৈর্য্য ও শক্তি, কেহ দেখাইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

নবকুমার কহিল, "দেখ বিজয়-দা, যত ভিড় আমাদের …ই বেড়ার কাছে।"

বিজ। দু'ধারে দোকান, কাযেই লোক সব ছড়াতে …রে নি—

নব। প্রায় সব লোকেরই মাথায় পাগড়ি।

বিজ। যাত্রীর বার আনা পাঞ্জাবী, গুজরাটী—

নব। পাঞ্জাবী বেশী; আমাদের আশে পাশে দেখ …কেন—

অকস্মাৎ ঘাটের দিকে এক গুরুভার পতনের শব্দ হইল। …ের পর কোলাহল। ক্রমে লোকমুখে প্রচার হইল, …টের নিকটে গঙ্গার উপর যে কাষ্ঠসেতু নির্ম্মিত হইয়াছিল, …হা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। বহু লোক সেতুর উপর দণ্ডায়মান …ল, গঙ্গার খরস্রোতে তাহারা ভাসিয়া গেল। গঙ্গায় …ল কম, কিন্তু স্রোতঃ প্রবল। কেহ কূলে উঠিল, কেহ …স্তরে আহত হইল, কেহ ভাসিয়া গেল, তাহাদের মধ্যে …হ কেহ প্রাণ দিল। বাঙ্গালার কোন এক মহারাজা …লে ডুবিয়া প্রাণে মরিতে বসিয়াছিলেন, অনেক কষ্টে ও …রক্ষা পাইয়াছিলেন।

দণ্ড দুই পরে বিজয় যখন এ সংবাদ শুনিলেন, তখন তিনি গর্জ্জিয়া উঠিলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল, সেই ইঞ্জিনিয়ারকে আর একটা পদাঘাত দান করেন; কিন্তু তখন সে উপায় নাই। নবকুমার কহিল, "আকাশ পরিষ্কার হয়ে এসেছে—"

বিজয়। কিন্তু আমার মন পরিষ্কার হচ্ছে না—আশঙ্কা হচ্ছে, সম্মুখে আবার কি বিপদ্—

বলিতে বলিতে তাঁহার পাশের বেড়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। বহু লোকের ঠেলা বেড়া সহিতে পারিল না—ভাঙ্গিয়া পড়িয়া জনস্রোতকে পথ দিল। পশ্চাতের লোকরা ভাবিল, বেড়া সরাইয়া পথ দেওয়া হইয়াছে। মাঝে মাঝে বেড়া সরাইয়া পথ দেওয়া হইতেছিল। সুতরাং পিছনের লোকদের কোন অপরাধ নেই—তাহারা ভুল বুঝিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। সাম্‌নের লোকরা মহাবিপদে পড়িল। অশ্বারোহী প্রহরীরা তাহাদের অগ্রসর হইতে দিবে না—পথের মুখে ঘোড়া দাঁড় করাইয়া চাবুক চালাইতে লাগিল। পিছনের যাত্রীরা ঘটনাটি না বুঝিয়া সহস্রে সহস্রে অগ্রসর হইতে লাগিল। দুই দিক্ হইতে তাড়া খাইয়া সম্মুখের যাত্রীরা পড়িয়া যাইতে লাগিল। কেহ বা অশ্বপদতলে প্রাণ দিল, কেহ বা মনুষ্য-চরণে দলিত হইল। বহুলোক মরিল।

নবকুমারও অশ্বচরণে আহত হইয়া মৃতবৎ হইয়াছিল। বহুকষ্টে বিজয় তাহাকে উদ্ধার করিয়া এক দোকানঘরের নীচু ছাদের উপর তাহাকে উঠাইয়া দিলেন। নিজেও উঠিলেন। একটু জল সংগ্রহ করিয়া তাহার মুখে চোখে দিলেন। অনেক শুশ্রূষার পর নবকুমারের চৈতন্যসঞ্চার হইল। [ক্রমশঃ।

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ভাদ্রের গঙ্গা

দুই কূলে ছাপাইয়া পুলকের বন্যা
একি রূপে ছোটো তোর পাহাড়ের কন্যা!
যৌবন সুধা-ধারা তোর সারা অঙ্গে
উছলিয়া বেয়ে চলে থর্ থর্ রঙ্গে!

ফুট্‌ফুটে কচি মেয়ে চিরদিন শান্ত
কোথা আজ ঠোঁট ভরা হাসি তোর কান্ত!
নত মুখে ফুটে উঠে তেজরূপ সজ্জা
প্রাণ ভরা আজ তোর কি বিপুল লজ্জা?

এত দিনে পেয়েছিস্ আভাস কি তার লো?
সেই পথ মুখে কি রে আজি অভি- সার লো!
আজ কি রে বুঝেছিস্ নারী শুধু ধন্য;
নিঃশেষে দেয় ঢালি নাহি কায অন্য!

আজ কি রে সত্যের দেখেছিস্ মূর্ত্তি;
তাই তোর সারা গায়ে আবেশের স্ফূর্ত্তি?
তাই কি রে নব প্রেমে বুকখানি ভর্ত্তি?
তাই কি রে আকুলতা? বল্ না রে! সত্যি?

শ্রীমতী—
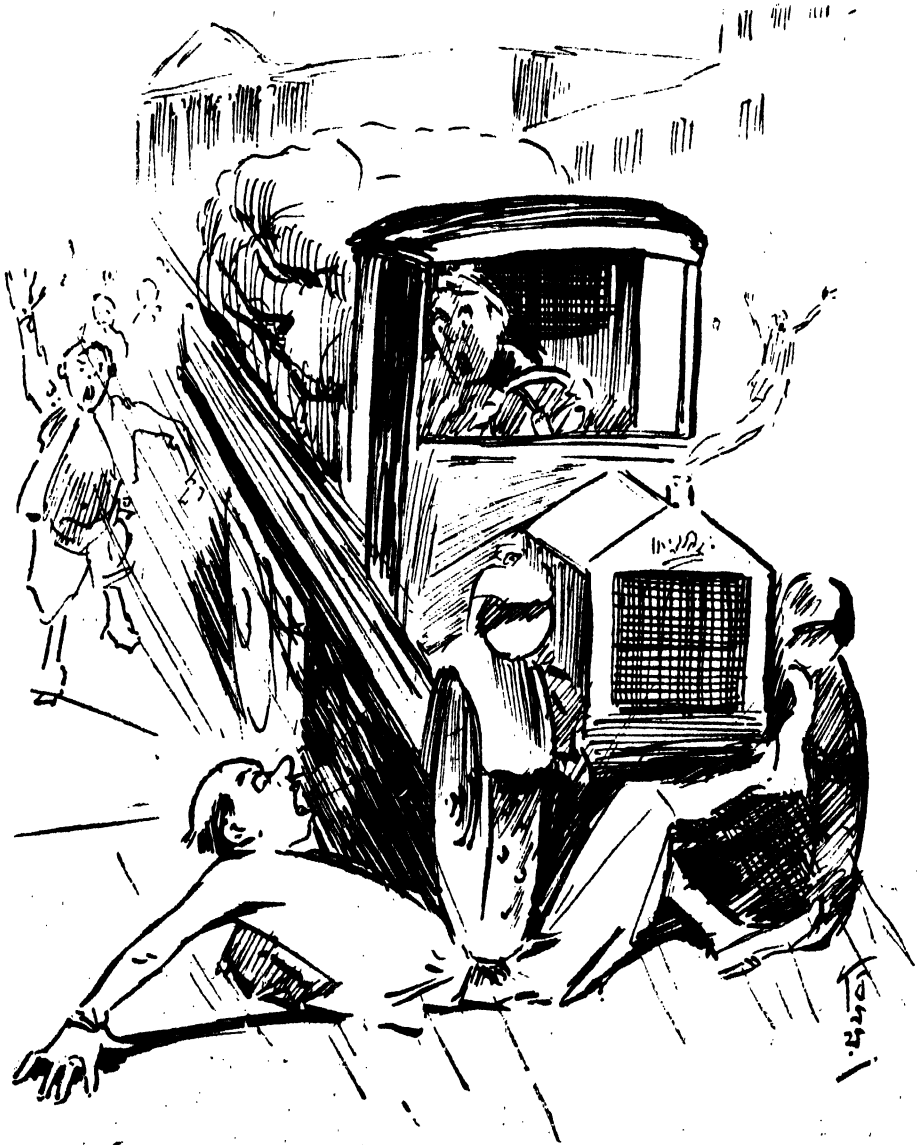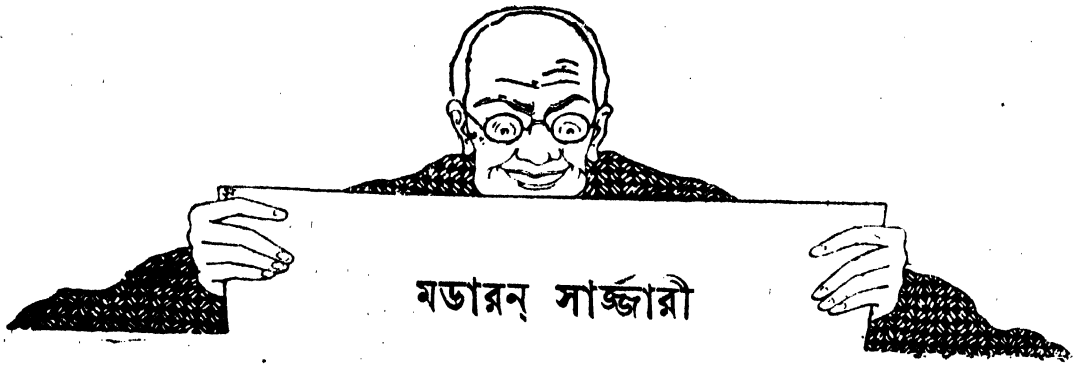
পথিক।—বাপ্ রে বাপ!—

দর্শক।—কল্‌কাতাতে চলা-ফের।—ঐটুকুই ত লাভ!

এনে হাঁসপাতালের ঝোলা—
চল্লো নিয়ে গা ছুলিয়ে গুঁপো পা'রাও'লা !
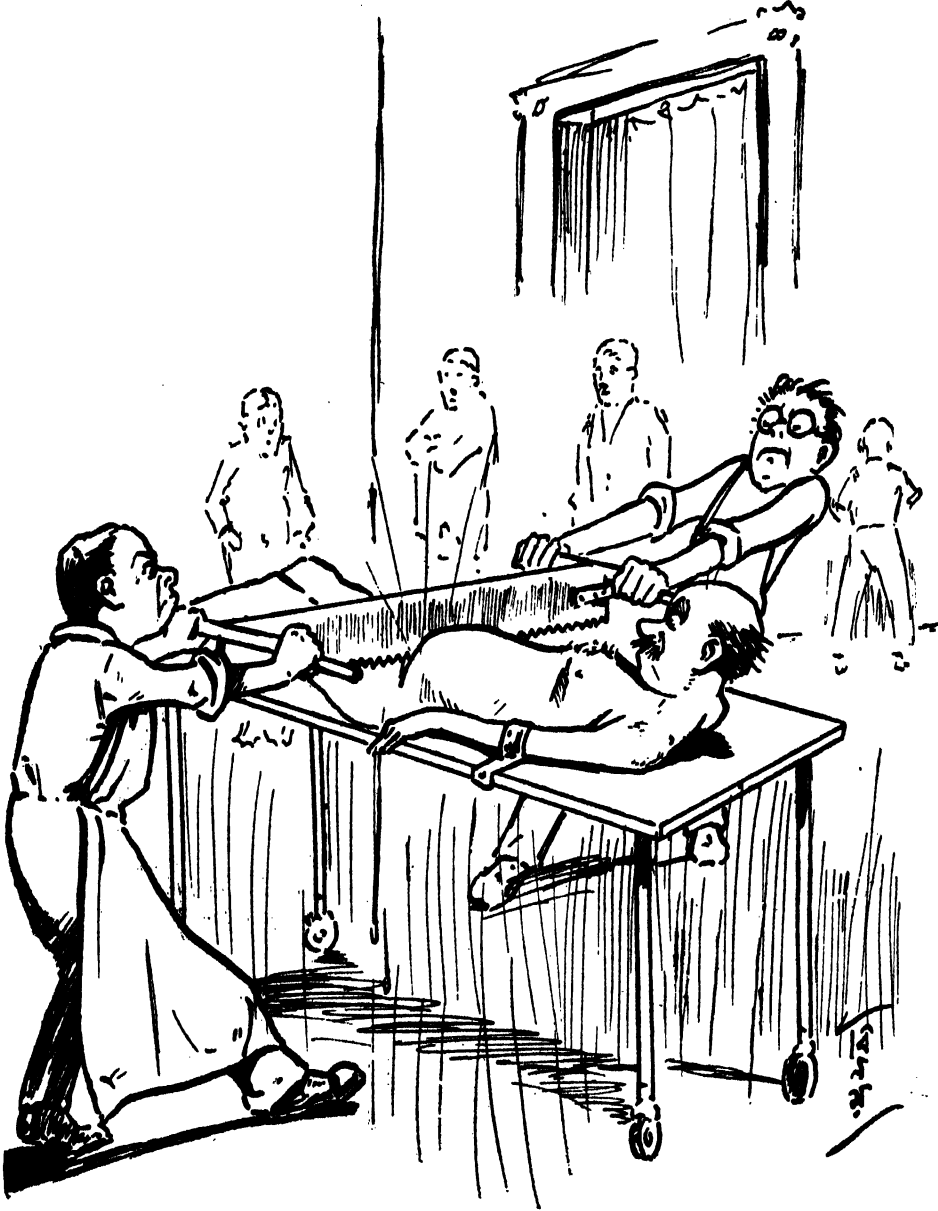
মেটে কলেজ হাঁসপাতালের হুমৃরো-চুমৃরো মিলে
করাত দিয়ে কোমর থেকে আধখানা বাদ দিলে !
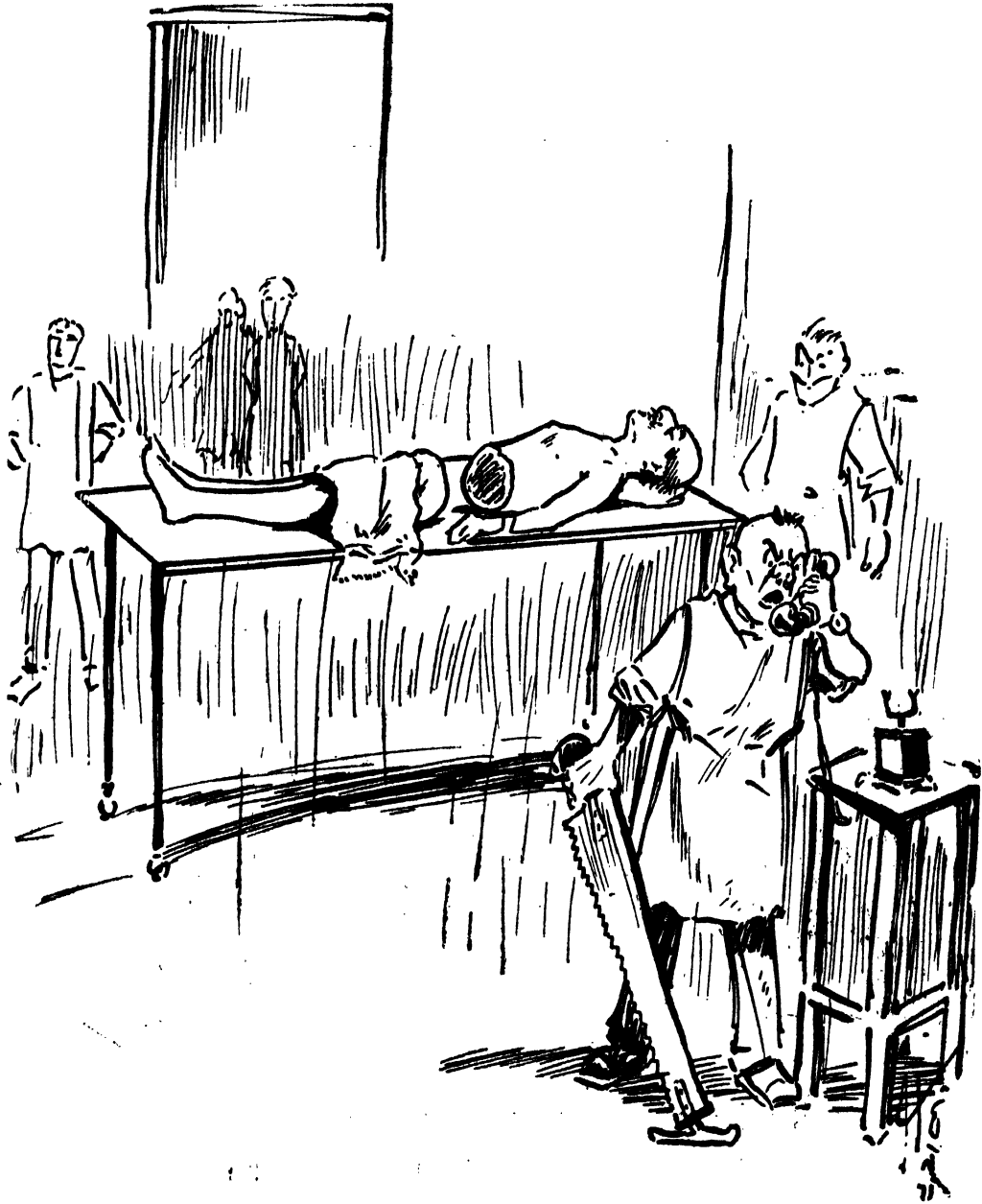
ছেঁড়া কাটা কর্‌তে গোটা কসাইখানায় 'ফোন্'—
"ভাগলপুরের আধখানা গাই দিতে হবে 'লোন্' !"

দুগ্ধবতীর অর্দ্ধাঙ্গটা জোড়ে কোমর থেকে,—
“সার্জ্জারীতে’ কি মজাটাই !”—বদ্যি বলে হেঁকে।

মানুষ-গাইয়ে মিশে-ঘুষে চল্‌ছে 'হাপিস' পানে,
বগল-দাবায় মোড়া ছাতা—নয়না মধুর হানে !

চশমা-আঁটা মানুষ-গরু ব'সে 'হাপিসেতে',
কলম্ চালায় সরর্ সরর্ মাসকাবারী পেতে।
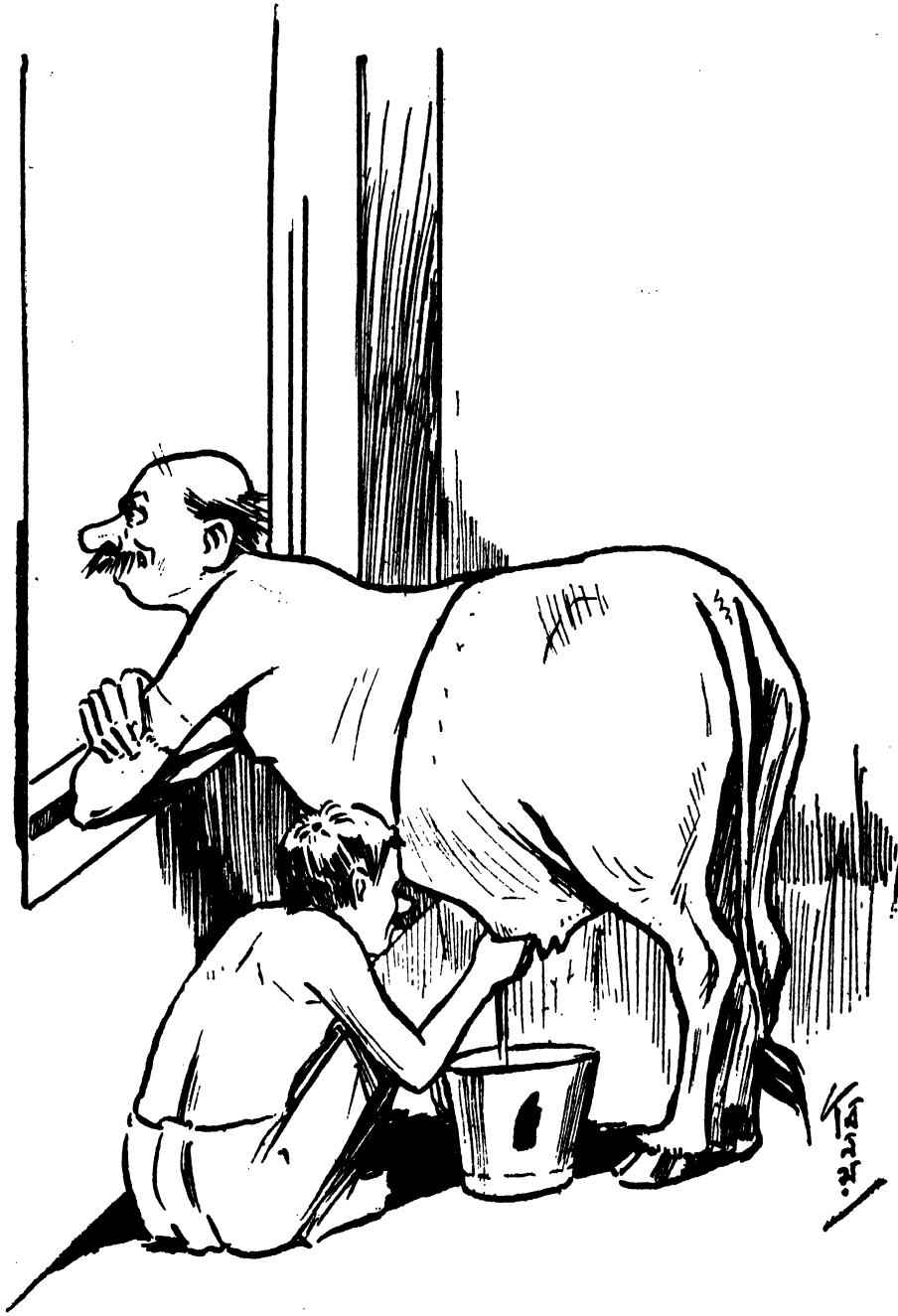
চাকরী ক'রে ফিরে ঘরে ভরা সাঁঝের বেলা—
দিচ্ছে দুধ্‌, কাবু বাবু, পেয়ে শালার ঠেলা !

শিল্পী—শ্রীবিনয়কৃষ্ণ বসু।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সমদুঃখী

কাউণ্ট ভন আরেনবার্গ জুরিচে থাকিলে অপদস্থ ও অপমানিত হইবেন, এই ভয়ে রেবেকার সহিত সাক্ষাতের পর গোপনে ফ্রাঙ্কফোর্টে পলায়ন করিয়াছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, তাঁহাকে না দেখিয়া রেবেকা কিছুদিন পরে জুরিচ হইতে সেণ্টপিটার্সবার্গে ফিরিয়া যাইবে এবং তাঁহার কলঙ্ককাহিনীও লোক ক্রমে ভুলিয়া যাইবে, তখন তিনি জুরিচে ফিরিয়া যাইবেন এবং তাঁহার স্ত্রী ও শ্বাসকদ্বয়ের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া সুখী হইবার চেষ্টা করিবেন। কিন্তু মোজে জীবিত থাকিতে তাঁহার আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা ছিল না; মোজে রেবেকার প্রধান সহায় এবং তাহার উৎসাহেই তাঁহাকে অপদস্থ করিবার সুযোগ পাইয়াছিল; এই জন্য তিনি মোজেকে হত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি ফ্রাঙ্কফোর্টে আসিয়া পূর্ব্বোক্ত অট্টালিকাটি ছয় মাসের জন্য ভাড়া লইয়া সেই স্থানে বাস করিতে লাগিলেন।

এ দিকে মোজে কয়েক দিন জুরিচে থাকিয়া কাউণ্টের কোন সন্ধান না পাওয়ায়, তাহার কার্য্যক্ষেত্র ফ্রাঙ্কফোর্টে প্রত্যাগমন করিল। কাউণ্ট সন্ধান লইয়া তাহার আগমন-সংবাদ জানিতে পারিলেন। তাঁহার মাথায় খুন চাপিল। রেবেকার কয়েকখানি পত্র তখনও তাঁহার কাছে ছিল; তিনি তাহা বাহির করিয়া রেবেকার হস্তাক্ষর জাল করিলেন, এবং একখানি পত্র লিখিয়া মোজের নিকট প্রেরণ করিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, রেবেকার স্বাক্ষরিত পত্র পাইলেই মোজে টাকা লইয়া তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইবে; তিনি তাঁহার পরিচারিকাকে স্থানান্তরে পাঠাইয়া মোজেকে হত্যা করিবেন, তাহার পর টাকাগুলি আত্মসাৎ করিয়া গোপনে তাহার মৃতদেহ অপসারিত করিবেন। কিন্তু তাঁহার এই দুরভিসন্ধির কি ফল হইয়াছিল, পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

রেবেকা যথাসময়ে কাউণ্ট ও মোজের মৃত্যুসংবাদ জানিতে পারিল। সে বুঝিল, ইহা তাহাদের কলহের ফল। মোজের মৃত্যুসংবাদে রেবেকা অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইল এবং তাহার বিশ্বাসঘাতক স্বামী বিশ্বাসঘাতকতার ও প্রবঞ্চনার উপযুক্ত প্রতিফল পাইয়াছে বুঝিয়া সে কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিল। সে জুরিচেই বাস করিতে লাগিল।

ফ্রিজ এই দুর্ঘটনার সংবাদ পাইলেও পিটার ও বার্থা বিদেশে থাকায় এ সংবাদ জানিতে পারিল না। ফ্রিজ পত্রযোগে পিটারকে সকল সংবাদ জানাইলে, পিটার বার্থাকে কাউণ্টের মৃত্যুসংবাদ ভিন্ন অন্য কোন কথা বলিল না। কিন্তু বার্থার পরিচিতা দুই তিনটি মহিলা তাহাকে তাহার স্বামীর শোচনীয় মৃত্যুর আমূল বৃত্তান্ত লিখিয়া তাহার শোকে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিল; কেহ কেহ সংবাদপত্র হইতে এই সংবাদ কাটিয়া পাঠাইল। সুতরাং কাউণ্ট বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাহার কি সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তাহা তাহার অজ্ঞাত রহিল না। দুঃখে, লজ্জায়, মনস্তাপে সে মর্ম্মাহত হইয়া মৃতবৎ পড়িয়া রহিল; কলঙ্কিত জীবনের প্রতি তাহার বিন্দুমাত্র মমতা রহিল না। তাহার ধারণা হইল, নিরপরাধ জোসেফের জীবন ব্যর্থ করায় তাহার অভিসম্পাতেই তাহাকে এই দণ্ড ভোগ করিতে হইল।

দুই তিন সপ্তাহ পরে বার্থা কথঞ্চিৎ সুস্থ হইল। কিন্তু নবীন বয়সেই তাহার সেই অপরূপ রূপলাবণ্য অন্তর্হিত হইল; তাহার অস্থিচর্ম্মসারদেহ যেন মসীলিপ্ত হইল। সমুদ্রভ্রমণ তাহার বিরক্তিকর হইয়া উঠিল। তাহার অনুরোধে পিটার তাহাকে লইয়া জুরিচে ফিরিয়া আসিল।

জুরিচে আসিয়া বার্থা রেবেকা কোহেনের পরিচয় পাইল। এক দিন সে স্বয়ং রেবেকার গৃহে উপস্থিত হইয়া রেবেকাকে নিজের পরিচয় দিয়া বলিল, "আমরা উভয়েই সমদুঃখী; যে বিশ্বাসঘাতক নরাধম স্বার্থলোভে তোমাকে প্রতারিত করিয়াছিল, আমারও সে সর্ব্বনাশ করিয়া আমাকে কলঙ্কসাগরে ডুবাইয়া গিয়াছে। তুমি আমার ভগিনী,

যে কয় দিন বাঁচিব—যেন আমাদের বন্ধুত্ব-বন্ধন ছিন্ন না হয়।"

বোধ করি, রেবেকার মন বার্থার প্রতি বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু বার্থা তাহার গৃহে আসিয়া এই ভাবে সমবেদনা প্রকাশ করায় তাহার মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল, করুণায় তাহার হৃদয় পূর্ণ হইল। সে বার্থাকে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া গদগদস্বরে বলিল, "ভগিনী, সেই সয়তান আমাকে ত প্রতারিত করিয়াছিলই, কিন্তু তোমার প্রতি তাহার ব্যবহার আরও অধিক পাশবিক, তোমাকে আমার অপেক্ষাও অধিক লাঞ্ছনা ও বিড়ম্বনা সহ্য করিতে হইয়াছে। পরস্পরের স্নেহে নির্ভর করিয়া আমরা জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি কাটাইয়া দিব।"

বার্থা রেবেকার কোলে মাথা রাখিয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। রেবেকার চক্ষুও শুষ্ক রহিল না।

সেই দিন সেই দুইটি দুর্ভাগিনী নারীর হৃদয় যে বন্ধুত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হইল, নানা দুঃখ-কষ্টের ভিতর দিয়া সেই বন্ধন ক্রমেই সুদৃঢ় হইয়া উঠিল। বার্থার অভিমান, দর্প, ঐশ্বর্য্যের গর্ব্ব সমস্তই অন্তর্হিত হইয়াছিল; সে তাহার স্বর্গীয়া জননীর সমাধিস্তম্ভ স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিল, সংসারের মোহে সে আর আকৃষ্ট হইবে না; কোন মঠে প্রবেশ করিয়া ভগবৎচিন্তায় অথবা আর্ত্তের সেবায় জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিবে। সে তখনও বিপুল অর্থের অধিকারিণী, কিন্তু ঐশ্বর্য্যের প্রতি তাহার বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল; সে কিরূপে তাহার সম্পত্তির সদ্ব্যবহার করিবে, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল। বার্থার সম্পত্তি পাছে পরহস্তগত হয়, এই আশঙ্কায় ফ্রিজ ও পিটার মিষ্টবাক্যে বার্থাকে ভুলাইয়া সম্পত্তিটা তাহাদের নামে লেখাপড়া করিয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু বার্থা তাহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইল না।

জোসেফ কুরেট বার্থাকে প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিয়াছিল, এ সংবাদ রেবেকার অজ্ঞাত ছিল না। এই জন্য, বার্থার সহিত রেবেকার সুখ-দুঃখের অনেক কথা হইলেও রেবেকা কোন দিন বার্থাকে জোসেফের সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে সাহস করে নাই। কিন্তু রেবেকা তখনও জোসেফের চিন্তা ত্যাগ করিতে পারে নাই; সে দিবারাত্রি নির্ব্বাসিত জোসেফের কথা চিন্তা করিত। স্বপ্নঘোরে জোসেফের মোহন মূর্ত্তি দেখিতে পাইত। সুদূর সাইবেরিয়ার প্রান্তরে নির্ব্বাসিত হইয়া জোসেফ যদি তখনও জীবিত থাকে, তবে কিরূপ দুঃখে কষ্টে তাহার জীবনের দিনগুলি অতিবাহিত হইতেছে, তাহা কল্পনা করিয়া তাহার হৃদয় নিদারুণ বেদনায় হাহাকার করিত। তথাপি সে বার্থাকে কোন দিন জোসেফের কথা বলিতে সাহস করিল না।

কিন্তু বার্থাই এক দিন প্রসঙ্গক্রমে রেবেকার নিকট জোসেফের কথা বলিল। তাহা শুনিয়া রেবেকা আর মনের ভাব চাপিয়া রাখিতে পারিল না। সে চোখ-মুখ রাঙ্গা করিয়া বার্থাকে বলিল, "জোসেফ কুরেটের সঙ্গে তোমার পরিচয় ছিল?"

বার্থা কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "পরিচয়? হাঁ, পরিচয় খুব ভালই ছিল।"

রেবেকা পূর্ণদৃষ্টিতে বার্থার মুখের দিকে চাহিয়া মুখ নামাইল এবং অস্ফুট স্বরে বলিল, "তুমি কি জোসেফকে ভালবাসিয়াছিলে?"

বার্থা বলিল, "তোমাকে তাহার সম্বন্ধে এত দিন কোন কথা বলি নাই, দিদি! তুমি জিজ্ঞাসা না করিলে আজও বলিতাম না। জোসেফের সহিত আমার যখন প্রথম পরিচয়, তখন আমি অপরিণত-বুদ্ধি কিশোরী, আমার মনের ভাব ভাল করিয়া বুঝিবার শক্তি হয় নাই; তাহার প্রতি আমার হৃদয়ের আকর্ষণ প্রকৃত প্রেম কি না, তাহা তখন বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু এখন বুঝিয়াছি, সে আমার হৃদয়ের কতখানি স্থান অধিকার করিয়াছিল। এখন বুঝিয়াছি, তাহার প্রতি আমার হৃদয়ের সেই আকর্ষণ মোহ নহে, তাহাই প্রকৃত প্রেম।"

রেবেকা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইল। তাহার চক্ষু দুটি অশ্রুতে ভরিয়া উঠিয়াছিল।

বার্থা সবিস্ময়ে বলিল, "তুমি জোসেফকে চিনিতে না কি? সে এখান হইতে সেণ্টপিটার্স বার্গ গিয়াছিল কি?"

রেবেকা জোসেফ সম্বন্ধে কোন কথা বার্থাকে বলিতে চাহিল না, নীরবে অশ্রুত্যাগ করিতে লাগিল। তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া বার্থার কৌতূহল বর্দ্ধিত হইল; সে রেবেকার হাত ধরিয়া ব্যাকুলস্বরে বলিল, "বুঝিয়াছি দিদি, তুমি জোসেফকে চিনিতে; হয় ত জোসেফ তোমাকেও মায়ার বাঁধনে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল, নতুবা তাহার কথা শুনিয়া ভরিয়া

তোমার চোখে জল আসিবে কেন? সে ভগ্ন-হৃদয়ে জুরিচ ত্যাগ করিয়াছিল; তাহার পর তাহার আর কোন সংবাদ পাই নাই। তাহার সংবাদ কি জান, বল দিদি! শুনিবার আমার বড়ই আগ্রহ হইয়াছে।"

রেবেকা আর নীরব থাকিতে পারিল না জোসেফ জীবনে বীতস্পৃহ হইয়া কিরূপে নিহিলিষ্ট দলে যোগদান করিয়াছিল, অবশেষে ধরা পড়িয়া কিরূপ দণ্ডলাভ করিয়াছিল, তাহা বার্থাকে বলিল। কিন্তু সে জোসেফের উদ্ধারের জন্য কি ভাবে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহা প্রকাশ করিল না।

বার্থা রেবেকার নিকট বিদায় লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল এবং শয়নকক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয্যায় পড়িয়া রোদন করিতে লাগিল। তাহার ধারণা হইল, তাহারই দুর্ব্যবহারে জোসেফের জীবন ব্যর্থ হইয়াছে। জোসেফের চিরনির্ব্বাসনের জন্য সে-ই দায়ী। প্রথম যৌবনের সকল কথা একে একে তাহার মনে পড়িল। সে ছিন্ন-কণ্ঠ বিহঙ্গীর ন্যায় শয্যায় পড়িয়া ছটফট্ করিতে লাগিল। তাহার জীবনের সকল সুখ, সকল আশার অবসান হইয়াছিল; অতীতের সকল স্মৃতি তাহার হৃদয় হইতে বিলুপ্ত হইল না কেন?

কয়েক দিন পরে বার্থার মন কথঞ্চিৎ সংযত হইলে সে বৃদ্ধ কুরেটের গৃহে উপস্থিত হইয়া তাহার ও তাহার পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিল। বার্থাই জোসেফের সর্ব্বনাশের কারণ মনে করিয়া, কুরেট-দম্পতি প্রথমে তাহার কোন কথা শুনিতে সম্মত হইল না, তাহাকে দুই চারিটি কঠোর কথাও শুনাইয়া দিল। কিন্তু যখন তাহারা বুঝিতে পারিল, বার্থা তাহার ভ্রমের জন্য অনুতপ্ত হইয়াছে, জোসেফকে সে সত্যই ভালবাসিত, এ জন্য তাহার সম্বন্ধে সকল কথা জানিতে আসিয়াছে, তখন বিবি কুরেট জোসেফের রহস্যপূর্ণ জীবনের ইতিহাস ধীরে ধীরে তাহার নিকট বিবৃত করিল; সে কিছু দিন পূর্ব্বে রেবেকাকে যে সকল কথা বলিয়াছিল, বার্থার নিকট তাহারই পুনরাবৃত্তি করিল।

জোসেফ কে, কিরূপ সম্ভ্রান্তবংশে তাহার জন্ম, বার্থার ঐশ্বর্য্যগর্ব্বিতা জননী জোসেফের অপমান ও প্রত্যাখ্যান করিয়া কি ভ্রম করিয়াছিল, তাহা জানিতে পারিয়া বার্থার হৃদয় তাহার মাতা ও ভ্রাতৃদ্বয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল; কিন্তু তাহার মাতা তখন ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছিল; বার্থা বাড়ী ফিরিয়া ফ্রিজ ও পিটারের নিকট জোসেফের পিতামাতার পরিচয় দিল; তাহার বাল্যজীবনের কাহিনী, কিরূপে সে কুরেট-দম্পতির গৃহে পুত্ররূপে প্রতিপালিত হইয়াছিল—তাহার আমূল-বৃত্তান্ত প্রকাশ করিল। ফ্রিজ ও পিটার সকল কথা শুনিয়া স্তম্ভিতভাবে বসিয়া রহিল। তাহারা স্বীকার করিল, তাহাদের মাতা ভ্রমে পড়িয়া বার্থার সর্ব্বনাশ করিয়া গিয়াছে। যদি তাহারা যথাসময়ে জানিতে পারিত, পোলাণ্ডের মহাসম্ভ্রান্তবংশে জোসেফের জন্ম এবং আভিজাত্য গৌরবে কাউণ্ট ভন আরেনবার্গ জোসেফের পদস্পর্শেরও যোগ্য নহে, তাহা হইলে তাহারা বার্থার জীবন এ ভাবে ব্যর্থ হইতে দিত না; তাহাদের মাতাও কায়া ছাড়িয়া ছায়ার পশ্চাতে ধাবিত হইত না। কিন্তু বিধিলিপি অখণ্ডনীয়!

বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী বার্থা জুরিচে প্রত্যাগমন করিয়াছে শুনিয়া জুরিচের অনেক সম্ভ্রান্ত যুবক তাহার মনোরঞ্জনের আশায় তাহার সহিত পরিচিত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, পিটার ও ফ্রিজের কোন কোন বন্ধু তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব ঘনীভূত করিয়া তুলিল এবং নানা উপলক্ষে তাহাদের গৃহে আসিয়া দুই চারি ঘণ্টা কাটাইয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের আশা পূর্ণ হইল না, বার্থা কোন দিন তাহাদের কাহারও সহিত বাক্যালাপও করিল না। বার্থার মাতা যে সুবৃহৎ অট্টালিকা ক্রয় করিয়া বার্থাকে দান করিয়াছিল, বার্থা জুরিচে ফিরিয়া আসিয়া এক দিনও সেই অট্টালিকায় প্রবেশ করে নাই। কিছুদিন পরে সে সেই সুসজ্জিত অট্টালিকা এক জন ধনাঢ্য 'মিলওয়ালার' নিকট বিক্রয় করিল এবং পল্লীর এক প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র বাসগৃহ ক্রয় করিয়া নিতান্ত দীনভাবে সেখানে বাস করিতে লাগিল। তাহার ন্যায় বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণীর এইরূপ দীনতা দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইল। ঐশ্বর্য্যের গর্ব্বে অন্ধ হইয়া সে জোসেফকে হারাইয়াছিল, এই জন্য সে ঐশ্বর্য্যকে সর্ব্বপ্রকারে পরিহার করিয়া দীন-হীন কাঙ্গালের মত কালযাপন করিতে লাগিল। সে সর্ব্বদা নির্জ্জনে বাস করিত, কেবল রেবেকা তাহাকে সেখানে মধ্যে মধ্যে দেখিতে আসিত, তখন তাহারা নিজেদের দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের কথারই আলোচনা করিত, কিন্তু জোসেফের কথা এক দিনের জন্যও তাহারা বিস্মৃত হইতে পারে নাই। জোসেফের মোহন

মূর্তি তাহাদের উভয়ের চিত্ত-ফলকে সুস্পষ্টরূপে অঙ্কিত ছিল; কিন্তু জোসেফ সাইবেরিয়া হইতে জুরিচে প্রত্যাগমন করিবে, এ আশা কাহারও মনে স্থান পাইল না। তাহাদের উভয়েরই ধারণা হইল, জোসেফ নির্বাসনের কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া সাইবেরিয়ার তুষারাচ্ছন্ন প্রান্তরে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

বার্থা এক দিন বলিল, "দিদি, আমার মন বলিতেছে, জোসেফ জীবিত আছে। যদি একবার তাহাকে দেখিতে পাইতাম, সে জন্য আমার সর্ব্বস্ব দান করিতে প্রস্তুত আছি।"

রেবেকা বলিল, "তাহাকে কারাগার হইতে উদ্ধার করিবার জন্য এক দিন আমার এবং আমার পিতার জীবন বিপন্ন করিয়াছিলাম; শুনিয়াছিলাম জোসেফ সাইবেরিয়ার পথে মুক্তিলাভ করিয়াছেন, কিন্তু কোথায় সাইবেরিয়া আর কোথায় জুরিচ! মুক্তিলাভ করিয়া থাকিলেও পথের কষ্ট সহ্য করিয়া সে জীবিত আছে, ইহা কি করিয়া আশা করি ভাই?"

বার্থা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "আমি পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়াছি। সে ফিরিয়া আসিলেও আমি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিব না। আমার জন্য সে অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছে। যদি সে জীবিত থাকে, পরমেশ্বর যেন তাহাকে সুখী করেন, ইহাই আমার কামনা।"

পরমেশ্বর বার্থার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন, সে কথা পরে বলিব।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

প্রলয়ের আলোক হইতে মৃদু দীপালোকে

ফ্রাঙ্কফোর্টের একটি নিভৃত অট্টালিকায় কাউণ্ট ভন আরেনবর্গ ও মোজে পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া নিহত হইবার পর দেড় বৎসর অতীত হইল। এই দেড় বৎসর পরে জেনিভা নগরের একটি 'কাফের' বাহিরে বসিয়া এক দিন সায়ংকালে দুই জন লোক মৃদুস্বরে গল্প করিতেছিল। তখনও সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হয় নাই; পশ্চিম আকাশের ম্লান লোহিতালোক তখনও হ্রদের স্বচ্ছজলে লোহিত আভা বিকীর্ণ করিতেছিল। কাফেগুলি জনপূর্ণ; তাহাদের সম্মুখবর্ত্তী পথে নানাশ্রেণীর নর-নারী দল বাঁধিয়া গল্প করিতে করিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। তাহাদের তরলহাস্যে ও গুঞ্জন ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইতেছিল। কিন্তু সে দিকে ঐ দুই জন লোকের লক্ষ্য ছিল না। তাহাদের এক জন জোসেফ কুরেট, দ্বিতীয় ব্যক্তি তাহার বন্ধু চানস্কি। মাইকেল চানস্কির কথা পাঠক-পাঠিকাগণের স্মরণ থাকিতে পারে।

মাইকেল চানস্কিকে জীর্ণ শীর্ণ ও বৃদ্ধ দেখাইলেও জোসেফকে তাহার তুলনায় আরও অধিক বৃদ্ধ দেখাইতেছিল। তাহার চোখ বসিয়া গিয়াছিল, মুখ বিবর্ণ, তাহাতে প্রফুল্লতার চিহ্নমাত্র ছিল না। অনিয়মে পরিশ্রমে তাহার স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়াছিল; মেরুদণ্ড বক্র হওয়ায় সে কুব্জ হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার দেহের লাবণ্য, কান্তি সমস্তই অদৃশ্য হইয়াছিল; বস্তুতঃ জোসেফকে চিনিবার উপায় ছিল না। যৌবন অতীত না হইলেও তাহার অধিকাংশ কেশ শুভ্রবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। তাহার দেহে যৌবনের কোন চিহ্নই বর্ত্তমান ছিল না। তাহাকে দেখিলেই মনে হইত—সে কোন কঠিন ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করিলেও তখন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারে নাই। কয়েক দিন পূর্ব্বে সে জেনিভায় পদার্পণ করিয়াছিল, এবং সেই দিনই চানস্কির সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তাহাকে স্বীয় নির্ব্বাসিত জীবনের শোচনীয় কাহিনী শুনাইতেছিল। সে ট্রোভিলের মৃত্যুর পর যে কয়লা-বিক্রেতাকে তাহার পথিপ্রদর্শক করিয়া গন্তব্যপথে অগ্রসর হইয়াছিল, সেই কয়লা-বিক্রেতা পুরস্কারের লোভে বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া তাহাকে কি ভাবে কশাক প্রহরিগণের হস্তে অর্পণ করিয়াছিল, এবং প্রহরীরা কি প্রকারে তাহাকে বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহা পাঠক-পাঠিকাগণের স্মরণ থাকিতে পারে, সুতরাং এখানে সেই সকল বিবরণের পুনরুক্তি না করিয়া, অতঃপর তাহাকে কিরূপ বিড়ম্বনা সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহাই এখানে প্রকাশিত হইল।

জোসেফ, চানস্কিকে বলিল, "কশাক প্রহরীরা আমাকে বন্দী করিলে, আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম—যদি পলায়নের চেষ্টায় আমার মৃত্যুকে বরণ করিতে হয়—তাহাও শ্রেয়ঃ। তথাপি আমি পুনর্ব্বার সাইবেরিয়ায় যাইব না। আমি এত কষ্ট সহ্য করিয়া, সাইবেরিয়া হইতে পলায়ন করিলাম, কয়েক মাইল

অতিক্রম করিতে পারিলেই স্বাধীনতা লাভ করিতাম, কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে শত্রুহস্তে বন্দী হইলাম। অকূল সমুদ্র পার হইয়া তীরে আসিয়া আমার তরি ডুবিল!—পলায়নের অতি সামান্য সুযোগ পাইলেও তাহা ত্যাগ করিব না স্থির করিলাম। যে সকল প্রহরী আমাকে গ্রেপ্তার করিয়াছিল, তাহারা আমার প্রতি উৎপীড়ন না করিয়া আমাকে এইমাত্র জানাইয়া রাখিল—আর এক দল প্রহরী আসিয়া আমাকে অদূরবর্ত্তী নগরে লইয়া যাইবে; সেখানে আমাকে কিছুদিন আবদ্ধ থাকিতে হইবে। তাহার পর যখন আর এক দল বন্দী সেই পথে সাইবেরিয়ায় প্রেরিত হইবে—সেই সময় আমাকেও তাহাদের সহিত পুনর্ব্বার নির্ব্বাসনে প্রেরণ করা হইবে। এই কথা শুনিয়া আতঙ্কে আমি অভিভূত হইলাম; আমার সাহস ধৈর্য্য সকলই বিলুপ্ত হইল। আমি পরিত্রাণের কোন উপায় না দেখিয়া আত্মহত্যায় কৃতসঙ্কল্প হইলাম।

"প্রহরীরা আমাকে তাহাদের ঘাঁটিতে আবদ্ধ করিয়া রাখিল। শুনিয়াছিলাম, নূতন এক দল প্রহরী আসিয়া আমাকে অদূরবর্ত্তী কোন নগরে লইয়া যাইবে, কিন্তু এক মাস অতীত হইল—তাহারা আসিল না। যাহারা আমাকে গ্রেপ্তার করিয়া রাখিয়াছিল—তাহারা আমাকে একটি ঘরের ভিতর দিবারাত্রি আবদ্ধ করিয়া রাখিত, আমাকে সেই ঘরের বাহিরে যাইতে দিত না—পাছে পুনর্ব্বার আমি পলায়নের চেষ্টা করি। এই ভাবে দীর্ঘকাল গৃহকোণে আবদ্ধ থাকায় আমার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল, আমি দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া পড়িলাম। আমার শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া, সেই প্রহরীদলের দলপতির মনে করুণা সঞ্চার হইল। বোধ হয়, পরমেশ্বরের ইচ্ছাতেই আমার অবস্থা দেখিয়া তাহার দয়া হইল। সে এক দিন আমাকে বলিল, যদি আমি তাহার নিকট অঙ্গীকার করি—আমি পলায়নের চেষ্টা করিব না—তাহা হইলে সে আমাকে কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা প্রদান করিতে সম্মত আছে; এইটুকু স্বাধীনতা যে, সে যখন শিকার করিতে যাইবে, তখন আমাকে তাহার সঙ্গে যাইতে দিবে। লোকটার শিকারের বাতিক ছিল। বিশেষতঃ, সেই ঘাঁটির অদূরবর্ত্তী পার্ব্বত্য অরণ্যে শিকারেরও অভাব ছিল না। বলা বাহুল্য, আমি তৎক্ষণাৎ তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম; অঙ্গীকার করিলাম আমি পলায়নের চেষ্টা করিব না। কিন্তু পলায়নের সুযোগ পাইলে আমি সেই সুযোগ ত্যাগ করিব না, আমার এই সঙ্কল্প অটুট রহিল। যদি সেরূপ সুযোগ না পাই—তাহা হইলেও আমি পুনর্ব্বার নির্ব্বাসনে প্রেরিত হইবার পূর্ব্বে আত্মহত্যার সুযোগ পাইব—এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইলাম।

"প্রহরীদলের দলপতির সহিত দুই তিন দিন শিকার করিতে চলিলাম; সেই দুই তিন দিন পলায়নের সুযোগ না পাইলেও আমি নিরাশ হইলাম না। দলপতি শিকার করিতে যাইবার সময় তিন চারি জন অনুচর সঙ্গে লইত; তাহারা শিকার করিতে অধিক দূরে যাইত না, এবং ঘাঁটিতে এক দিনের অধিক অনুপস্থিত থাকিত না। দলপতি আমাকে সঙ্গে লইলেও আমাকে কোন অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করিতে দিত না; তবে অরণ্যে আমি নেকড়ে বা অন্য কোন হিংস্র পশু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতে পারি, এই আশঙ্কায় আমাকে একগাছা মোটা ওকের লাঠী আত্মরক্ষার জন্য ব্যবহার করিতে দিত। বস্তুতঃ, তাহাদের কবল হইতে আমার পরিত্রাণ লাভের কোন সুযোগ ছিল না, তথাপি আমি পলায়নের আশা ত্যাগ করিতে পারিলাম না। আমি কোন দিন মুহূর্ত্তের জন্যও তাহাদের দৃষ্টির বাহিরে যাইতে পারিতাম না, এমন কি, তাহারা আমাকে বলিয়া রাখিয়াছিল—যদি আমি তাহাদের অসম্মতিতে তাহাদের দল ছাড়িয়া দশ পনের হাত দূরে যাই, তাহা হইলে আমাকে গুলী করিয়া হত্যা করা হইবে। এই সকল কারণে আমি পলায়নের জন্য কোনরূপ চেষ্টা করিলাম না। কিন্তু অবশেষে আমার ভাগ্য প্রসন্ন হইল। এক দিন শিকারে বাহির হইয়া আমরা একটা প্রকাণ্ডকায় বন্য বরাহের অনুসরণ করিলাম। শূকরটা ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে দৌড়াইতে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিলেও আমরা তাহার অনুসরণে বিরত হইলাম না। অবশেষে আমাদের কাপ্তেন তাহাকে গুলী করিল। শূকরটা সেই গুলীতে আহত হইল বটে, কিন্তু আঘাত সাংঘাতিক না হওয়ায় সে ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, এবং আমাদের দলের এক জন সৈনিক শিকারীকে আক্রমণ করিয়া তীক্ষ্ণ দন্তে তাহার উরু বিদীর্ণ করিল। অন্য শিকারীরা গুলী করিবার পূর্ব্বেই সেটা পলায়ন করিল।

"সৈনিকরা যে ঘাঁটিতে বাস করিত, সেই স্থানে উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্যের অত্যন্ত অভাব ছিল, টাটকা মাংস পাওয়া যাইত

না। এরূপ একটি উৎকৃষ্ট শিকার আহত হইয়াও পলায়ন করিল দেখিয়া, তাহাদের ক্ষোভের সীমা রহিল না। যে শিকারী আহত হইয়াছিল, তাহার আঘাত সাংঘাতিক না হওয়ায় সে তাহার সঙ্গিগণকে শূকরটার অনুসরণ করিতে অনুরোধ করিল। দলপতি কাপ্তেন অন্য দুই জন সঙ্গীর সহিত পরামর্শ করিয়া এক জন প্রহরীকে ও আমাকে আহত শিকারীর সঙ্গে ঘাঁটিতে ফিরিয়া যাইবার আদেশ করিল, পর মুহূর্ত্তে তাহারা তিন জনে শূকরটার পশ্চাতে ধাবিত হইল।

"কাপ্তেনের আদেশ শুনিয়াই আমি স্থির করিলাম, এই সুযোগে পলায়ন করিব, কারণ এরূপ সুযোগ যে আবার শীঘ্র মিলিবে, তাহার সম্ভাবনা ছিল না। শূকরটা যে শিকারীর উরু বিদীর্ণ করিয়াছিল, আমরা রুমাল জলে ভিজাইয়া তাহার আহত উরুতে পটি বাঁধিয়া দিলাম। তাহার পর তাহাকে সঙ্গে লইয়া ঘাঁটিতে ফিরিয়া চলিলাম। আঘাত সাংঘাতিক না হইলেও ক্ষতমুখ হইতে প্রচুর শোণিত ক্ষরণ হওয়ায় লোকটা বড়ই দুর্ব্বল হইয়াছিল; সে তিন চার মাইল চলিয়া আর চলিতে পারিল না, অবসন্ন দেহে পথের ধারে একটা গাছের ছায়ায় বসিয়া পড়িল। দেখিলাম রক্তে পটি ভিজিয়া তাহার ট্রাউজার পর্য্যন্ত রাঙ্গা হইয়া গিয়াছিল। তাহার ক্ষতস্থান পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিলাম, শিরা ছিঁড়িয়া গিয়াছে। রক্তস্রোতের বিরাম হইবে না; শোণিত-স্রাবেই তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য।

"যে প্রহরী তাহার সঙ্গে ছিল, সে বড়ই সঙ্কটে পড়িল। আহত সৈনিককে সেখানে রাখিয়া আড্ডায় ফিরিয়া যাওয়া সে সঙ্গত মনে করিল না, অথচ তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইবারও উপায় ছিল না। সেইস্থান হইতে ঘাঁটির দূরত্ব তিন মাইলের অধিক নহে; ঘাঁটিতে তাহাকে লইয়া যাইতে পারিলে সুচিকিৎসার অসুবিধা হইত না, কারণ ঘাঁটিতে ডাক্তার ও ঔষধ-পত্রাদি ছিল। অবশেষে প্রহরী বলিল, আমরা তাহাকে ঐ পথটুকু কোন রকমে বহিয়া লইয়া যাইব। আমরা তাহাকে ধরাধরি করিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিলাম; কিন্তু তাহাতে বেচারার যন্ত্রণা বৃদ্ধি হইল, এবং ঝাঁকুনী লাগায় অধিকতর বেগে রক্ত ঝরিতে লাগিল। তখন আমি বলিলাম, 'আমি ঘাঁটিতে গিয়া লোক ডাকিয়া আনি, উহাকে ডুলি করিয়া লইয়া যাইতে হইবে। ইহা ভিন্ন অন্য উপায় নাই।' প্রহরী নিরুপায় হইয়া নিতান্ত অনিচ্ছায় আমার প্রস্তাবে সম্মত হইল। আমি প্রহরীর নিকট বিদায় লইয়া দৌড়াইতে আরম্ভ করিলাম; কিন্তু ঘাঁটির দিকে না গিয়া যে দিকে পলায়ন করিলে স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিব মনে করিলাম, সেই দিকে চলিলাম। আহত সৈনিকের প্রাণরক্ষার জন্য আমার স্বাধীনতা লাভের সুযোগ ত্যাগ করিব, আমি তত নির্ব্বোধ নহি। সে মরিলে আমার কি ক্ষতি ?

"আমি নিরস্ত্র, সঙ্গে এক বিন্দু আহার্য্য দ্রব্য ছিল না, পথ-ঘাট সম্পূর্ণ অপরিচিত, তথাপি আমি নিরুৎসাহ বা হতাশ হইলাম না। আমি লোকালয় ত্যাগ করিয়া, পাহাড়ের ভিতর দিয়া দক্ষিণ-পূর্ব্বমুখে চলিতে লাগিলাম। বন্য ফল মূল মাত্র আহার করিয়া তিন দিন এই ভাবে চলিলাম, রাত্রি-কালে কোন গিরিগুহায় বা বৃক্ষশাখায় আশ্রয় গ্রহণ করিতাম। চতুর্থ দিন আমি রুসিয়ার সীমা অতিক্রম করিয়া, পর্ব্বতশ্রেণীর দক্ষিণ পাদমূলে অবতরণ করিলাম। তাহার পর ইরটিস্ নদীর ধারে ধারে চলিয়া চীনসাম্রাজ্যে প্রবেশ করিলাম। রুসিয়ার সীমা অতিক্রম করিয়া আশা হইল, আর আমাকে শত্রুহস্তে পড়িতে হইবে না, আমার এতই আনন্দ হইল যে, মনে হইল আমি হয় ত ক্ষেপিয়া যাইব !

"যাহা হউক, পথের বিঘ্ন তখনও দূর হয় নাই, মন সংযত করিয়া চলিতে চলিতে একটি হ্রদের তীরে উপস্থিত হইলাম। সেই স্থানে একখানি গ্রাম ছিল। আমি সেই গ্রামে প্রবেশ করিবা মাত্র এক দল গ্রামবাসী আমাকে আক্রমণ করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল, এবং সেই গ্রামের মণ্ডলের নিকট লইয়া গেল। মণ্ডল তাহাদিগকে কয়েকটা টাকা দিয়া আমাকে কিনিয়া লইল। সে আমার মনিব হইয়া আমাকে দিবারাত্রি খাটাইয়া লইত; আমি প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়াও তাহাকে খুসী করিতে পারিতাম না। সে মাতাল হইয়া বাঁশের লাঠী দিয়া আমাকে বেদম ঠেঙ্গাইত, অবশেষে এক দিন সে নেশায় বে-সামাল হইলে সেই লাঠী দিয়া তাহার মাথা ভাঙ্গিয়া দিলাম এবং তাহার টাকা-কড়ি যাহা সংগ্রহ করিতে পারিলাম, সমস্তই আত্মসাৎ করিলাম। অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে একখানি সুদীর্ঘ তীক্ষ্ণধার ছোরা পাইলাম, তাহাই হাতে লইয়া সেই গ্রাম হইতে পলায়ন করিলাম। তখন গভীর রাত্রি, কেহ আমার সন্ধান পাইল না।

"আবার চলিতে লাগিলাম, কয়েক সপ্তাহ যে কি ভাবে কাটিল, তাহা বলিবার শক্তি নাই; বোধ হয় কেবল মনের বলেই আমি বাঁচিয়াছিলাম। এইভাবে থিয়ানসান পর্ব্বতমালা পার হইয়া, আমি একটি নগরে উপস্থিত হইলাম, সেই নগরের নাম কাসগড়। আমার অবস্থা তখন অতীব শোচনীয়, উদরে অন্ন নাই, দেহে তন্তুসার বস্ত্র, দেহও অস্থিচর্ম্মসার। আমাকে মানুষ বলিয়া চিনিবার উপায় ছিল না। আমি নিরুপায় হইয়া সেই নগরের জমীদারের শরণাপন্ন হইলাম। লোকটি দয়ালু। তাঁহার কুঠীতে জল তুলিবার একটি 'পাম্প' দেখিলাম, পাম্পটি বিকল হওয়ায় অব্যবহার্য্য হইয়াছিল, তিনি স্থানীয় মিস্ত্রীদের সাহায্যে তাহা মেরামত করাইতে না পারায় অত্যন্ত ভগ্নোৎসাহ হইয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, আমি কল-কবজা মেরামত করিতে পারি, তাঁহার অনুমতি হইলে একবার চেষ্টা করিয়া দেখি। তিনি সানন্দে 'পাম্পটি' আমাকে দেখিতে দিলেন। দুই তিন দিনের চেষ্টায় আমি তাহা কার্য্যোপযোগী করিলাম। জমীদার আমার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে তাঁহার মিস্ত্রীর কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। আমি তিন মাস তাঁহার চাকরী করিলাম। অবশেষে এক দিন জানিতে পারিলাম, এক দল বণিক সেই পথে পঞ্জাবে যাইতেছে। আমি জমীদার মহাশয়ের অনুমতি লইয়া, তাহাদের সঙ্গে পঞ্জাবে যাত্রা করিলাম। জমীদার দয়া করিয়া কিছু টাকাও আমাকে দিয়াছিলেন।

"পঞ্জাবের পথে আমাকে নানা বিপদে পড়িতে হইয়াছিল, এক দল দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া আমি সর্ব্বস্বান্ত হইলাম; তাহারা আমার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া আমাকে প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় একটি জঙ্গলে ফেলিয়া যায়। আমি বহু কষ্টে সেই জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে দিল্লী নগরে উপস্থিত হইলাম। সেখানে একটি সহৃদয়া ইংরাজ মহিলা আমাকে আশ্রয়দান করিয়াছিলেন; আমার লজ্জা নিবারণের জন্য পরিচ্ছদও দিয়াছিলেন। কিন্তু আমি হঠাৎ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হওয়ায় তিনি আমাকে একটি হাঁসপাতালে প্রেরণ করিলেন। আমি সেই হাঁসপাতালের ইংরাজ ডাক্তারের চিকিৎসায় আরোগ্যলাভ করি। আমি তখন নিঃসম্বল। সেই ডাক্তারটিকে আমার সাইবেরিয়া হইতে পলায়নের কাহিনী বলিলাম। তিনি আমার দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া, আমাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন এবং দিল্লীর অনেকগুলি সহৃদয় ভদ্রলোকের নিকট চাঁদা তুলিয়া আমাকে প্রায় হাজার টাকা দান করিলেন। এই ডাক্তারের ন্যায় পরদুঃখকাতর সহৃদয় লোক আমি অল্পই দেখিয়াছি।

"যাহা হউক, আমি ডাক্তারের নিকট বিদায় লইয়া কলিকাতায় আসিলাম। কলিকাতায় এক জন সুইস্ সদাগরের সহিত আমার পরিচয় হইল। তিনি আমাকে ইংলণ্ডগামী জাহাজের একখানি টিকিট কিনিয়া দিলেন। ইংলণ্ড হইতে আমি এখানে আসিতেছি। জানি না, আমার এই লক্ষ্যহীন জীবনের পরিণাম কি, ইহার শেষ কোথায়।"

চানস্কি জোসেফের এই অদ্ভুত কাহিনী শ্রবণ করিয়া কয়েক মিনিট স্তম্ভিতভাবে বসিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "তোমার নির্ব্বাসনের পর জুরিচে অনেক কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে। বুড়ি আনা স্মিট্ অনেক দিন পূর্ব্বেই মরিয়াছে; তাহার ছেলে-মেয়েদের অহঙ্কার, দর্প চূর্ণ হইয়াছে। লজ্জায় সমাজে আর তাহাদের মুখ দেখাইবার উপায় নাই। তাহাদের কলঙ্ককাহিনী খবরের কাগজে ছাপা হইয়া গিয়াছে। সে সকল ব্যাপার উপন্যাসের মত অদ্ভুত। বার্থার স্বামী কাউণ্ট ভন আরেনবর্গ রুসিয়ায় একটি ইহুদীর মেয়েকে গোপনে বিবাহ করিয়া আসিয়াছিল। তাহার নাম রেবেকা। রেবেকা জুরিচে আসিয়া কাউণ্টকে দেশ-ছাড়া করিয়াছিল। কিন্তু কাউণ্ট পলাইয়াও বাঁচিতে পারে নাই। রেবেকার পিতার এক বন্ধু কাউণ্টকে খুন করিয়াছে। সে সকল কথা তোমাকে আর এক দিন বলিব।"

জোসেফ ব্যগ্রভাবে বলিল, "না ভাই, আজই, এখনই সকল কথা শুনিব। আমি জুরিচে গিয়া আমার পিতা-মাতার সহিত দেখা করিবার পূর্ব্বে তোমার নিকট সকল কথা শুনিতে চাই।"

রেবেকা জুরিচে আসিয়াছে শুনিয়া জোসেফ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। চানস্কি, কাউণ্ট ও মোজের বিরোধ ও তাহাদের হত্যাকাণ্ড-সংক্রান্ত যে সকল বিবরণ সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছিল এবং আনা স্মিটের যে সকল পারিবারিক কলঙ্ককাহিনী জুরিচ নগরের সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইয়া জনসাধারণকে স্তম্ভিত

করিয়াছিল, সেই সকল কথা চানস্কি সবিস্তার জোসেফের নিকট প্রকাশ করিল।

জোসেফ চানস্কির নিকট বিদায় লইয়া কুরেট-দম্পতির সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য জুরিচে উপস্থিত হইল। জোসেফের পালক পিতা বৃদ্ধ কুরেট ও তাহার স্ত্রী জোসেফের আশা ত্যাগ করিয়াছিল। দীর্ঘকাল পরে জোসেফকে গৃহে ফিরিতে দেখিয়া তাহাদের আনন্দের সীমা রহিল না। জোসেফ তখন পর্য্যন্ত নিজের পরিচয় জানিতে পারে নাই; কিন্তু কুরেট-দম্পতি অতঃপর তাহার প্রকৃত পরিচয় জোসেফের নিকট গোপন রাখা সঙ্গত মনে করিল না। বিবি কুরেট জোসেফ সম্বন্ধে যে সকল গুপ্ত কথা রেবেকার নিকট প্রকাশ করিয়াছিল, তাহা সমস্তই জোসেফের গোচর করিল। জোসেফ এ কথাও জানিতে পারিল যে, যে নিহিলিষ্ট তাহার পিতা-মাতা কাউণ্ট ও কাউণ্টেস্ মার্ট্রিস্কিকে হত্যা করিয়াছিল—তাহার নাম ষ্ট্রোভিল!

জোসেফ নিজের প্রকৃত পরিচয় জানিতে পারিয়া বিস্মিত হইল বটে, কিন্তু তাহার পিতামাতার হত্যাকারীর পরিচয় শুনিয়া সে স্তম্ভিত হইল। আলটাই পর্ব্বতশ্রেণীর পাদদেশে একটি নিভৃত গিরিগুহায় মৃত্যুশয্যাশায়ী ষ্ট্রোভিলের অন্তিম দৃশ্য তাহার হৃদয়-মুকুরে প্রতিফলিত হইল। ষ্ট্রোভিল মৃত্যুকালে তাহার নিকট স্বীয় অপরাধের যে হৃদয়-বিদারক কাহিনী বিবৃত করিয়াছিল, তাহা তাহার স্মরণ হইল। কাউণ্ট ও কাউণ্টেস্ মার্ট্রিস্কির শোচনীয় হত্যা-কাহিনী শ্রবণ করিয়া, নরহন্তা ও নারীহন্তা ষ্ট্রোভিলের প্রতি তাহার আন্তরিক ঘৃণা জন্মিয়াছিল, তাঁহাদের অনাথ নিরাশ্রয় শিশুপুত্রের দুর্গতির কথা স্মরণ করিয়া, সেই অসহায় বিপন্ন শিশুর প্রতি সমবেদনায় তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়াছিল, তখন কি সে মুহূর্ত্তের জন্য সন্দেহ করিতে পারিয়াছিল—সে স্বয়ং কাউণ্ট ও কাউণ্টেস্ মার্ট্রিস্কির পুত্র? স্বয়ং অনাহারে থাকিয়া যাহার মুখে খাবার তুলিয়া দিয়াছে, নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া যাহার প্রাণরক্ষা করিয়াছে, অক্লান্তভাবে যাহার সেবাশুশ্রূষা করিয়াছে,—সে মিথ্যা সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া তাহার পিতামাতাকে হত্যা করিয়াছে, তাহার জীবন ব্যর্থ করিয়াছে; এতকাল পরে ইহা জানিতে পারিয়া জোসেফের মনের ভাব কিরূপ হইল, ভাষায় তাহা প্রকাশিত হইতে পারে না। জোসেফের বাক্‌শক্তি বিলুপ্ত হইল, সে হৃদয়ে যে আঘাত পাইল, তাহার যন্ত্রণায় অধীর হইয়া কয়েক দিন সে আত্মসংবরণ করিতে পারিল না। তাহার মনে হইল—তাহার জীবনের সকল ঘটনা একটা উৎকট দুঃস্বপ্নের প্রবাহমাত্র, সত্যের সহিত তাহার কোন সামঞ্জস্য নাই। কিন্তু তাহার সেই জীবনব্যাপী স্বপ্নের মধ্যে দুই জন নারীর কমনীয় মূর্ত্তি ধীরে ধীরে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। তাহাদের এক জন রেবেকা, আর এক জন বার্থা। তাহার মনে পড়িল, বার্থা অহঙ্কারে মত্ত হইয়া তাহার প্রেম প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, দম্ভভরে তাহাকে দূরে বিতাড়িত করিয়াছিল, তাহাকে অশেষ লাঞ্ছনা সহ্য করিতে বাধ্য করিয়াছিল, কিন্তু রেবেকা তাহাকে আশ্রয়দান করিয়া সহোদরার ন্যায় স্নেহে তাঁহার হৃদয়-বেদনা প্রশমিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল এবং যদি অসম্ভব না হইত, তাহা হইলে তাহাকে বিবাহ করিয়া সুখী হইতে পারিত। রেবেকার বিবাহের বাধা দূর হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া, জোসেফ মনে মনে বলিল, "রেবেকা জুরিচে আসিয়াছে—আমি তাহার সঙ্গে দেখা করিব, কিন্তু আমি যে কাউণ্ট মার্ট্রিস্কি, এ সংবাদ সে পাইয়া থাকিলেও কাউণ্টরূপে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব না, আমি দরিদ্র জোসেফ কুরেট—এক দিন তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম, সেই দরিদ্র কুরেটরূপেই তাহার সম্মুখীন হইব। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিব—তাহার হৃদয়ে আমার জন্য এক বিন্দু স্থান আছে কি না। আমি অকালবৃদ্ধ হইয়াছি, যৌবনেই জরা আসিয়া আমাকে আক্রমণ করিয়াছে; বহু অনিয়মে ও কঠোর পরিশ্রমে আমার দেহ ভগ্ন ও জীর্ণ-শীর্ণ হইয়াছে; কিন্তু এখনও আমার শ্রমশক্তি ক্ষুণ্ণ হয় নাই, আবার আমার বাঁচিবার সাধ হইয়াছে, যদি তাহাকে পাই—তাহা হইলে আবার আমি সুখী হইতে পারি; কিন্তু সে কি আমাকে সুখী করিতে সম্মত হইবে?"

জোসেফ রেবেকাকে একখানি সংক্ষিপ্ত পত্র লিখিল; সে লিখিল, "যাহার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়াই তোমার ধারণা, সে এখনও জীবিত আছে। তাহার স্মৃতি কি এখনও তোমার হৃদয়ে জাগরূক আছে? না, কালপ্রভাবে তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে? যদি বিলুপ্ত না হইয়া থাকে—তাহা হইলে তাহার কোন নিদর্শন পাইবার সে আশা করে।

জোসেফ কুরেট।"

রেবেকা এই পত্র পাইয়া আনন্দে মূর্চ্ছিত হইল।

আনন্দের বেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া অনেকে প্রাণত্যাগ করে। আকস্মিক আনন্দোচ্ছ্বাস কখন কখন সাংঘাতিক হইলেও রেবেকা বিপুল চেষ্টায় সেই উচ্ছ্বাসদমনে সমর্থ হইল। মূর্চ্ছাভঙ্গে রেবেকা প্রকৃতিস্থ হইয়া দ্রুতবেগে তাহার পিতার কক্ষে প্রবেশ করিল, তাঁহাকে বলিল, "বাবা, বাবা! একটা সুসংবাদ পাইয়াছি; সে বাঁচিয়া আছে। মৃত ব্যক্তি সমাধিগহ্বর হইতে উঠিয়া আসিয়াছে। জোসেফ কুরেট জুরিচে আসিয়াছে।"

বৃদ্ধ সলোমন কোহেন সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে রেবেকার মুখের দিকে চাহিয়া গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "পাগল হইয়াছ, মা! ভাবিয়া ভাবিয়া শেষে তুমি ক্ষেপিয়া উঠিলে!"

রেবেকা বলিল, "না বাবা, আমি পাগল হই নাই, সত্যই জোসেফ বাঁচিয়া আছে; সে জুরিচে আসিয়াছে, ইহার প্রমাণ দেখিতে চাও, এই দেখ তাহার প্রমাণ।"

রেবেকা জোসেফের পত্রখানি তাহার পিতার সম্মুখে রাখিল। সলোমন জোসেফের হস্তাক্ষর চিনিতেন; তিনি বুঝিতে পারিলেন—জোসেফই সেই পত্র লিখিয়াছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ জোসেফের নিকট লোক পাঠাইলেন। রেবেকা যে পত্রখানি তাহার হাতে দিল, তাহাতে একটিমাত্র কথা লিখিত ছিল। রেবেকা লিখিল,—"এসো।"

রেবেকা শতপৃষ্ঠাব্যাপী পত্র লিখিলেও তাহার মনের ব্যাকুলতা ইহা অপেক্ষা অধিকতর পরিস্ফুটরূপে ব্যক্ত করিতে পারিত কি?—এই পত্র পাইবার পর এক ঘণ্টার মধ্যেই জোসেফ রেবেকার সম্মুখে উপস্থিত হইল। রেবেকার মনে হইল, মৃত ব্যক্তি তাহার নিকট ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহার আনন্দ ভাষায় ব্যক্ত হইবার নহে। সলোমনও তাহাকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।

রেবেকা জোসেফের নির্ব্বাসিত জীবনের দুঃখ-কষ্টের বিবরণ শুনিয়া অশ্রুসংবরণ করিতে পারিল না। সে তাহার দেহের অবস্থা দেখিয়াই তাহার কষ্টের পরিমাণ বুঝিতে পারিল। রেবেকা আর তাহাকে ছাড়িয়া দিল না, স্বগৃহে রাখিয়া সযত্নে তাহার সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিল। রেবেকার পরিচর্য্যায় জোসেফ ক্রমে সুস্থ ও সবল হইল।

এক দিন সায়ংকালে জোসেফ রেবেকার পাশে বসিয়া মুক্ত বাতায়ন-পথে সান্ধ্য-প্রকৃতির শোভা নিরীক্ষণ করিতেছিল। জোসেফ মুগ্ধ হৃদয়ে হ্রদের স্বচ্ছ জলরাশির দিকে চাহিয়া থাকিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "দেখ রেবেকা, পরমেশ্বরের সৃষ্টি কি সুন্দর! এরূপ সুশোভার আধার এই পৃথিবীতে মানুষের হৃদয়ও কত সুন্দর। আমার মনে হয়, মানুষের হৃদয়ে হিংসা-দ্বেষ না থাকিলে মানুষ দেবতা হইত। প্রেমই মনুষ্য-হৃদয়ের একমাত্র অবলম্বন হওয়া উচিত। আমি মৃত্যু-দ্বার হইতে তোমার কাছে ফিরিয়া আসিয়াছি; কিন্তু ফাঁকা খেতাব ভিন্ন আমার অন্য কোন অবলম্বন নাই। আমি তাহাই তোমাকে দিতে পারি, তবে আমার হাত দুইখানি এখনও সবল আছে; আমি শ্রমবিনিময়ে জীবিকার সংস্থান করিতে পারিব, ইহা বোধ হয় দুরাশা নহে। তুমি রুসিয়ায় আমাকে তোমার সহোদরের ন্যায় স্নেহ করিতে; তোমার সেই স্নেহ কি প্রণয়িনীর প্রেমে পরিণত হইতে পারে না? তোমার প্রেম কি এখনও আমার পক্ষে দুর্লভ?"

রেবেকা বলিল, "না প্রিয়তম, আর তাহা দুর্লভ নহে; প্রকৃত প্রেম চিরস্থায়ী ও মৃত্যুঞ্জয়ী, তাহা তোমাকে মৃত্যু-গহ্বর হইতে আমার নিকট টানিয়া আনিয়াছে। এই দীর্ঘকাল আমি তোমাকে সমভাবেই ভালবাসিয়া আসিয়াছি। তুমি দয়া করিয়া আমাকে গ্রহণ করিলে আমার জীবন সফল ও ধন্য হইবে। কিন্তু নবীন যৌবনের প্রেমের সেই মাদকতা, কামনার সেই অসংযত উচ্ছ্বাস—এখন আর কোথায় পাইব? কারণ—'এবারের মত বসন্ত গত জীবনে'!"

জোসেফ রেবেকার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া গাঢ়স্বরে বলিল, "কিন্তু প্রেম কেবল বসন্তের সম্বল নহে, তাহা জীবনের অবলম্বন।"—সে তাহার তৃষিত-কম্পিত উষ্ণ ওষ্ঠ দ্বারা রেবেকার ওষ্ঠ স্পর্শ করিল। তাহার পর অস্ফুটস্বরে বলিল, "আমি নূতন জীবন লইয়া তোমার কাছে আসিয়াছি। আবার আমার বাঁচিবার সাধ হইয়াছে। প্রলয়ের উগ্র জ্বালাময় আলোক অদৃশ্য হইয়াছে—সন্ধ্যার স্নিগ্ধকর মৃদু দীপালোক-রশ্মিতে আজ আমাদের হৃদয় আলোকিত; সেই আলোকচ্ছটায় আমাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়-কন্দর-সংগুপ্ত প্রেমকুসুম কি অপূর্ব্ব বর্ণ-রাগে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে!"

বার্থাও জোসেফের প্রত্যাগমন সংবাদ শুনিতে পাইল; কিন্তু সে জোসেফের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সাহস করিল না। সে তাহার জননীর সমাধিস্তম্ভ স্পর্শ করিয়া যে শপথ করিয়া

ছিল, তাহা ভঙ্গ করিয়া জোসেফকে লাভ করিবার আশাকে মুহূর্তের জন্য হৃদয়ে স্থান দিল না; অথচ সে জোসেফকে কত ভালবাসে, তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে লাগিল। পাছে সে তাহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে, পাছে প্রবৃত্তির সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহার হৃদয় পরাজিত হয়—তাহার সকল সঙ্কল্প ব্যর্থ হয়, এই ভয়ে সুযোগ পাইয়াও বার্থা জোসেফের সহিত দেখা করিল না। নিজের প্রতি তাহার বিশ্বাস ছিল না।

এই সকল কারণে জোসেফের প্রত্যাগমনের পর বার্থা সন্ন্যাসব্রত গ্রহণের জন্য ব্যাকুল হইল। সে একখানি উইল করিয়া তাহার বিপুল সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ জোসেফকে দান করিল, অপরার্দ্ধ আর্ত্তসেবায় নিয়োজিত করিল। সে উইলে লিখিল—যে দিন জোসেফ রেবেকাকে বিবাহ করিবে—সেই দিন তাহার সমগ্র সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ জোসেফকে প্রদত্ত হইবে—তাহার পূর্ব্বে জোসেফকে এই দানের সংবাদ জ্ঞাপন করা হইবে না। সে পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিল, রেবেকার সহিত জোসেফের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে; এই প্রণয়িযুগলের কোন সংবাদই তাহার অজ্ঞাত ছিল না।

বার্থা সম্পত্তির এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া তাহার ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল। তাহার উভয় ভ্রাতাই তাহাকে গৃহে রাখিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিল; কিন্তু বার্থার সঙ্কল্প বিচলিত হইল না। সে জুরিচ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়া ইটালীর রোম নগরে উপস্থিত হইল এবং ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের একটি মঠে প্রবেশ করিয়া রোগীর পরিচর্য্যাভার গ্রহণ করিল। সে বুঝিয়াছিল, ধর্ম্মকর্ম্ম অপেক্ষা অনাথ আর্ত্তের সেবায় অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিলে শান্তি ও তৃপ্তিলাভ করিতে পারিবে।

তিন বৎসর পর্য্যন্ত এইভাবে কালযাপন করিবার পর বার্থা নেপল্‌সে উপস্থিত হইল। সেই সময় কলেরা রোগ সংহারমূর্ত্তিতে নেপল্‌স নগরে ভীষণ জনক্ষয় আরম্ভ করিয়াছিল। পরিচর্য্যার অভাবে শত শত রোগী অকালে প্রাণত্যাগ করিতেছিল শুনিয়া, বার্থা নেপল্‌সে আসিয়া তাহাদের সেবার ভার গ্রহণ করিল। অবশেষে এক দিন সে এই কাল ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইল।

মঠের চিকিৎসকরা তাহার প্রাণরক্ষার জন্য যথাসাধ্য করিলেন, কিন্তু যাহার কালপূর্ণ হইয়াছে, কে তাহাকে রক্ষা করিবে? সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া সেবাব্রতা বার্থার জীবনকুসুম অকালে ঝরিয়া পড়িল। তাহার অকালবিয়োগে নেপল্‌সের সেবাসদন হাহাকারে পূর্ণ হইল। 'ভগিনী বার্থা'র ন্যায় রুগ্ন অনাথের সেবা করিবার শক্তি আর কাহারও ছিল না। রোগীর সেবা করিয়া অন্য কোন পরহিতব্রতা সন্ন্যাসিনী বার্থার ন্যায় আনন্দ ও শান্তিলাভ করিত না, ইহাই সকলের ধারণা হইয়াছিল।

বার্থার স্বদেশত্যাগের অল্পদিন পরে জোসেফ কুরেট অর্থাৎ কাউণ্ট মাট্রিস্কি রেবেকার পাণিগ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট জীবন শান্তি-সুখে অতিবাহিত করিল। তাহাদের সেই গভীর মিলনানন্দ কোন দিন ক্ষুণ্ণ হয় নাই। রেবেকাকে বিবাহ করিয়া জোসেফ জানিতে পারিল—সে নিঃসম্বল উপাধিসর্ব্বস্ব কাউণ্ট নহে; বার্থা তাহাকে আট লক্ষাধিক ফ্রাঙ্ক দান করিয়া গিয়াছে। জোসেফ বার্থার দান গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইল না; কিন্তু বার্থা তাহাকে কিরূপ ভালবাসিত, জোসেফ জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহা জানিতে পারে নাই। বার্থা মাতার আদেশে জোসেফের প্রেম-প্রত্যাখ্যান করিয়া যে অপমানসূচক পত্র লিখিয়াছিল, তাহা পাইয়া জোসেফের হৃদয় চূর্ণ হইয়াছিল, জীবনে বীতস্পৃহ হইয়া সে জুরিচ পরিত্যাগ করিয়াছিল; তাহার পর বার্থা দ্বিতীয় পত্রে তাহার মনের কথা খুলিয়া লিখিয়াছিল বটে, কিন্তু সেই পত্র তাহার হস্তগত হয় নাই; কুরেট-দম্পতি সেই পত্র রুসিয়ায় পাঠাইলেও পত্রখানি রুসিয়ায় পৌঁছিবার পূর্ব্বেই জোসেফ সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত হইয়াছিল। জোসেফ সুইট্জারল্যাণ্ড পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে বার্থার দ্বিতীয় পত্র পাইলে তাহার জীবনের গতি হয় ত পরিবর্ত্তিত হইত। কিন্তু ভাগ্যলিপি অপরিবর্ত্তনীয়। বার্থার দ্বিতীয় পত্র যথাসময়ে জোসেফের হস্তগত হইলে সে বার্থাকে লাভ করিতে পারিবে ভাবিয়া সম্ভবতঃ জুরিচ পরিত্যাগ করিত না এবং হয় ত কোন দিন তাহার সেই আশা সফল হইত; কিন্তু তাহা হইলে তাহার জীবন এরূপ ঘটনা-বহুল হইত না এবং বর্ত্তমান উপন্যাসের আকার অন্যরূপ হইত।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ও তিরোভাব কাল

গত বৈশাখ মাসের "বসুমতী" পত্রিকার ১৭১ পৃষ্ঠায় শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জন্মদিনের বার ও তারিখ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে লেখক মহাশয় ঐ বার তারিখ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মত সংগ্রহ করিয়াছেন। ঐ সকল মতের পরস্পর অনৈক্য থাকায় জ্যোতিষিক গণনার দ্বারা শুদ্ধভাবে ঐ বার তারিখ নির্ণয় জন্য লেখক মহাশয় জ্যোতির্বিদগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। ১৩২৭ সালের "প্রবাসী" পত্রিকায় (জ্যৈষ্ঠ মাসের ১৭২ পৃষ্ঠায় ও আষাঢ় মাসের ২৯৩ পৃষ্ঠায়) দুইটি প্রবন্ধে চৈতন্য দেবের তিরোভাবকাল পরিষ্কাররূপে নির্দ্ধারণ হয় নাই বলিয়া লিখিত হইয়াছে। এই উভয় বিষয় জ্যোতিষের সাহায্যে নির্ণয় করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

"চিরপঞ্জিকা" নামে শ্রীশ্রীহরি ভট্টাচার্য্য (কবিরত্ন) কর্ত্তৃক প্রণীত একখানি গ্রন্থ আছে। ১২৯২ সালে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ইহার আর কোন নূতন সংস্করণ আছে কি না জানি না। ইহা বার, তিথি নক্ষত্র, যোগ ও গ্রহণাদির সঞ্চার আদি সহজ উপায়ে গণনার জন্য একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ইহার সাহায্যে বার ও দণ্ড পলাদিসহ তিথি-নক্ষত্রের, গণনা, আমরা পুনঃ পুনঃ পঞ্জিকার সহিত মিলাইয়া শুদ্ধ বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছি। এই পুস্তকখানির সাহায্যে ও ইংরাজী জ্যোতিষ শাস্ত্রের নিয়মাবলী অবলম্বনে আমাদের গণনা সমাধা করিয়াছি। গণনাগুলি কত দূর শুদ্ধ হইয়াছে, তাহা সুধীমণ্ডলীর বিচার্য্য।

প্রথমে শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিব। ১৪০৭ শক, ফাল্গুন মাস, পূর্ণিমা তিথি, সন্ধ্যাকাল, শ্রীচৈতন্যের শুভ জন্মকাল, সে সময়ে চন্দ্রগ্রহণও হইয়াছিল। এ কথাগুলি অবিসম্বাদী। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থে এ সমস্ত আছে। বলা বাহুল্য, ঐ পূর্ণিমা শ্রীকৃষ্ণের দোলপূর্ণিমা ছিল। ইংরাজী জ্যোতিষশাস্ত্রে "মীটনের কালপরিমাণ" (Metonic Cycle) নামে একটি ১৯ বৎসর পরিমিত কালের উল্লেখ আছে। এই ১৯ বৎসর অন্তে তিথি ও তারিখ মিল হইয়া থাকে। যথা, ১৩০০ সালের ১লা বৈশাখ কৃষ্ণা দ্বাদশী ও ১৩১৯ সালের ১লা বৈশাখও ঐ তিথি। ইহা পঞ্জিকা দেখিলেই জানা যাইবে। ঐরূপ ১৯ বৎসর অন্তর দুই সালের পাঁজি লইয়া মিলাইলে দেখা যাইবে যে, সকল তিথিঘটিত পর্ব্বগুলি উভয় বৎসরেই প্রায় একই তারিখে পড়িয়াছে। শ্রীচৈতন্যের জন্ম ১৪০৭ শকে বা ৮৯২ সালে। (শকাব্দ হইতে ৫১৫ বাদ দিলে সাল হয়।) ৮৯২ সাল হইতে কথিত ১৯ বৎসর কাল ১৯ বার গতে, অর্থাৎ ১৯ × ১৯ = ৩৬১ বৎসর গতে, ১২৫৩ সাল হয়। আমরা ১২৫১ সালের পূর্ব্বের কোন পঞ্জিকা পাই নাই। ৮৯২ সালের পর ১৯এর গুণিতক ১২৫৩ সালের পঞ্জিকা পাওয়া যায় বলিয়া ঐ সালের আশ্রয় লইতে হইয়াছে।" 'বঙ্গবাসী' ছাপাখানা হইতে প্রকাশিত ৬০ বৎসরের "পুরাতন পঞ্জিকা" এ বিষয়ে কাযে আসিবে। ইহা ১২৫[illegible] সাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে তারিখের সামান্য কতকগুলি ভুল থাকিলেও আমাদের গণনায় কোন অসুবিধা হইবে না। ১২৫৩ সালের পঞ্জিকা দৃষ্টে দেখা যায় যে, ঐ সালের ১৯শে ফাল্গুন দোলপূর্ণিমা ছিল। পঞ্জিকা দৃষ্টে আরও দেখা যায় যে, ঐ সাল হইতে প্রতি ১৯ বৎসর অন্তে অর্থাৎ ১২৭২, ১২৯১, ১৩১০ ও ১৩২৯ সালেও দোলপূর্ণিমা ফাল্গুন মাসের ১৯এ তারিখেই হইয়াছে। ইহা হইতে মনে হয় যে, মহাপ্রভুর জন্মদিন যে দোলপূর্ণিমায় হইয়াছিল, তাহা ১৯এ ফাল্গুনে ছিল। বর্ত্তমান লেখকেরও ঐ ধারণা ছিল।

পূর্ব্বে যে "চিরপঞ্জিকার" কথা বলিয়াছি, তাহার নিয়মানুযায়ী প্রথমে ইষ্ট তারিখের বার গণনা করিতে হয়। একটি ছোট তালিকার সাহায্যে ইহা করিতে হয়। বার ঠিক করিয়া পরে তিথি, নক্ষত্র ও যোগ গণিতে হয়। এই গণনার জন্য একটি বৃহৎ তালিকা আছে। তদ্ভিন্ন তিথি, নক্ষত্রাদি গণনার জন্য কোন এক বৎসরের পঞ্জিকা আবশ্যক হয়; বার গণনা করিতে তাহা হয় না। বার গণনা অনেকটা সহজ; তিথি নক্ষত্রাদি গণনা একটু জটিল। নিয়মগুলি ঐ পুস্তকখানি দেখিলে বোধগম্য হইবে। 'চির পঞ্জিকার' নিয়মে আমরা গণিয়া দেখিলাম, ১২৫[illegible] সালের ১৯ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১২৩৪ সালের দোলপূর্ণিমাও ১৯[illegible] ফাল্গুনেই ছিল। তাহার পূর্ব্বে ১৯ বৎসর অন্তর ১২১৫, ১১৯৬, ১১৭[illegible] ও ১১৫৮ সালের দোলপূর্ণিমা ২০শে ফাল্গুনে ছিল। আরও গণি[illegible] দেখিলাম, ১৩২৯ সালের পরে ১৯ বৎসর অন্তর ১৩৪৮ ও ১৩৬৭ সালে দোলপূর্ণিমা ১৮ই ফাল্গুনে হইবে ও ১৩৮৬, ১৪০৫ ও ১৪২৪ সালে দোলপূর্ণিমা ১৭ই ফাল্গুনে পড়িবে। ইহাতে দেখা যায় যে, ১৩২[illegible] সালের পরে ১৯ বৎসর অন্তর দোল পূর্ণিমাগুলি ১৯শে ফাল্গুনের পূ[illegible] পড়িবে এবং ১২৩৪ সালের পূর্ব্বের ১৯ বৎসর অন্তর দোলপূর্ণিমাগু[illegible] ১৯এ ফাল্গুনের পরে ঘটিয়াছিল। ইহা দেখিয়া ১৪০৭ শকের (৮৯[illegible] সালের) দোল পূর্ণিমা "চিরপঞ্জিকার" নিয়ম মতে গণিয়া পাইল[illegible] যে তাহা ২৩এ ফাল্গুনে, শনিবারে পড়ে। "চিরপঞ্জিকার" নিয়ম অ[illegible] সারে যে কোন বৎসর হইতে ১০১ বৎসর পূর্ব্বের বা পরের তিথি, নক্ষ[illegible] ত্রাদি গণনা সহজে হয়। ১০১ বৎসর অপেক্ষা অনেক বেশীদিন পূর্ব্বে বলিয়া ৮৯২ সালের দোলপূর্ণিমা নির্ণয় করিতে ১২৫২ সাল হই[illegible] ৯০ বৎসর অন্তর ১১৬২, ১০৭২, ৯৮২, ও ৮৯২ সালের দোলপূর্ণিম[illegible] বার ও তারিখ গণিতে হইল। এইরূপ গণনার দ্বারা ৮৯২ সা[illegible] ২৩শে ফাল্গুন শনিবারে পূর্ণিমা পাওয়া গেল। আরও পাওয়া গেল [illegible] ঐ দিন পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্র ছিল।

অতএব শ্রীচৈতন্যের জন্মদিন ১৪০৭ শক বা ৮৯২ সাল, ২৩শে ফা[illegible] শনিবারে ছিল; ইহা "চিরপঞ্জিকার" নিয়মে গণনা মতে আমরা পা[illegible] লাম। এখন এই গণনা ইংরাজী জ্যোতিষশাস্ত্রের নিয়মানুসারে স[illegible] হয় কি না, দেখিতে হইবে। সমর্থনের দুইটি উপায় আছে—(১) ঐ [illegible]

পূর্ণিমা ছিল কি না, (২) ঐ দিন চন্দ্রগ্রহণ ছিল কি না। প্রথমে আমরা পূর্ণিমা সম্বন্ধে আলোচনা করিব। পূর্ব্বে যে মীটনের কাল-পরিমাণের কথা বলিয়াছি, তাহার সূক্ষ্ম পরিমাণ হইতেছে ৬৯৩৯,৬৮৮ দিন। ১৯ বৎসরের দিনসংখ্যা কখন ৩৬৫ × ১৯ + ৪ = ৬৯৩৯ দিন, ও কখন ৩৬৫ × ১৯ + ৫ = ৬৯৪০ দিন হয়। অর্থাৎ ঐ ১৯ বৎসরে ৪টি Leap year কি ৫টি Leap year থাকে, তদনুসারে মীটন কালের (Metonic Cycleএর) সূক্ষ্ম দিনসংখ্যা এই দুইয়ের মাঝামাঝি। এক পূর্ণিমা হইতে পরের পূর্ণিমা পর্য্যন্ত কিম্বা এক অমাবস্যা হইতে পরের অমাবস্যা পর্য্যন্ত এক চান্দ্র মাস। ইহাকে ইংরাজীতে Lunation বলে। ইহার স্থূল পরিমাণ সাড়ে ২৯ দিন ও সূক্ষ্ম পরিমাণ ২৯·৫৩০৫৮৭৯ দিন। ইহার ২৩৫ গুণে অর্থাৎ ২৩৫ চান্দ্র মাসে ৬৯৩৯·৬৮৮ দিন হয়। ইহাই মীটনের কালের সূক্ষ্ম পরিমাণ। ২০টি মীটন কালের মোট দিনসংখ্যা ইহার ২০ গুণ অর্থাৎ ১৩৮৭৯৩·৭৬। ৮৯২ সাল হইতে ২০ বার ১৯ বৎসরে অর্থাৎ ৩৮০ বৎসরে ১২৭২ সাল হয়। অতএব ৮৯২ সালের ২৩শে ফাল্গুনের পরদিন ২৪শে ফাল্গুন হইতে ১২৭২ সালের দোলপূর্ণিমা ১৯শে ফাল্গুন পর্য্যন্ত (এই উভয় দিন ব্যাপিয়া) ৩৮০ বৎসরে কত দিন হয়, তাহা গণিতে হইবে। এই দিন-সংখ্যা যদি ২০টি মীটন কালের দিনসংখ্যার সহিত মিলে, তাহা হইলে বুঝা যাইবে যে পূর্ব্বগণিত ৮৯২ সালের ২৩শে ফাল্গুন পূর্ণিমা ছিল ও তাহা মহাপ্রভুর জন্মদিন বটে। ৮৯২ সালের ২৪শে ফাল্গুন হইতে ১২৭২ সালের ১৯শে ফাল্গুন কত দিন, তাহা গণিতে হইলে ঐ কালমধ্যে কতগুলি ৩৬৬ দিনের বৎসর ছিল, তাহা দেখিতে হইবে। ইংরাজীতে যাহাকে Leap year বলে, বাঙ্গালা পঞ্জিকায়ও যে সেইরূপ Leap year অর্থাৎ ৩৬৬ দিনে বৎসর আছে, তাহা বোধ হয় অনেকে অবগত নহেন। প্রত্যেক ৩৬৫ দিনের বৎসরে ৫২ সপ্তাহ + ১ দিন থাকে। কাজেই সে বৎসরের প্রথম দিনও যে বার—শেষ দিনও সেই বার হয়। আর যে বৎসরে ৩৬৬ দিন, সে বৎসরের প্রথম দিন যে বারে—শেষ দিন তাহার পরের বারে। বর্ত্তমান ১৩৩৪ সাল ৩৬৬ দিনে সম্পূর্ণ, সে জন্য এ বৎসরের প্রথম দিন বৃহস্পতিবারে ও শেষ দিন শুক্রবারে। ১৩৩১, ১৩৩২ ও ১৩৩৩ সাল ৩৬৫ দিনে ছিল, ১৩৩০ সাল ৩৬৬ দিনে ছিল। বর্ত্তমান কালে খৃষ্টাব্দ গণনায় সাধারণতঃ ৪ বৎসর অন্তর Leap year হয়, অর্থাৎ যে অব্দকে ৪ দিয়া ভাগ করিলে কিছু বাকী থাকে না, তাহাই Leap year; কিন্তু শতাব্দ পূরণের অব্দ যদি ৪০০ দিয়া ভাগ করিলে কিছু বাকী না থাকে, তবে সেটি Leap year হইবে নহিলে হইবে না। এ জন্য খৃষ্টীয় ১৭০০, ১৮০০, ১৯০০ অব্দ Leap year নহে; ২০০০ অব্দ Leap year। ইংরাজীতে প্রচলিত পঞ্জিকার Leap year এইরূপ বাঁধা নিয়মে ঠিক করা হইয়াছে, তাহাও কেবল ১৭৫২ খৃষ্টাব্দ হইতে। কিন্তু আমাদের কোন্‌টি Leap year, তাহা পাঁজি দেখিয়া জানিতে হইবে। পাঁজি না থাকিলে গণনার দ্বারা নিম্নলিখিত প্রকারে ঠিক করিতে হইবে। ইষ্ট বৎসরের ও তাহার পর বৎসরের ১লা বৈশাখ কি বার, তাহা উল্লিখিত "চিরপঞ্জিকার" নিয়মানুসারে গণিয়া ঠিক করিতে হইবে। ইহাতে ইষ্ট বৎসরের প্রথম দিন ও শেষ দিন কি বার ছিল পাওয়া যাইবে এবং তাহা হইতে ঐ বৎসর ৩৬৫ দিনের কি ৩৬৬ দিনের—জানা যাইবে। ৮৯২ সাল হইতে ১২৫০ সাল পর্য্যন্ত কোন্‌গুলি ৩৬৬ দিনের বৎসর (Leap year), তাহা আমরা 'চিরপঞ্জিকার' মতে গণিয়া একটি তালিকা করিয়াছি। ১২৫১ সাল হইতে Leap yearগুলি পাঁজিতেই পাওয়া যাইবে।

এখন আমরা ৮৯২ সালের ২৪শে ফাল্গুন হইতে ১২৭২ সালের ১৯শে ফাল্গুন পর্য্যন্ত দিনসংখ্যা গণনা করিব। ইহা তিন ভাগ করিতে হইবে। (১) ৮৯২ সালের ২৪শে ফাল্গুন হইতে ঐ সালের শেষ দিন পর্য্যন্ত, (২) ১২৭২ সালের ১লা বৈশাখ হইতে ১৯শে ফাল্গুন পর্য্যন্ত; (৩) ৮৯৩ সালের প্রথম দিন হইতে ১২৭১ সালের শেষ দিন পর্য্যন্ত পূর্ণ ৩৭৯ বৎসর। এই তিনটি সংখ্যার সমষ্টি কথিত ৩৮০ বৎসরের মোট দিনসংখ্যা হইবে। ১৪০৭ শকের (৮৯২ সালের) ২৩শে ফাল্গুন শনিবার ছিল পূর্ব্বে পাইয়াছি। "চিরপঞ্জিকা" মতে গণিয়া পাই ঐ শকের ১লা চৈত্র রবিবার ও ১৪০৮ শকের ১লা বৈশাখ মঙ্গলবার। অতএব ১৪০৭ শকের ফাল্গুন মাসের শেষ দিন শনিবার ও চৈত্র মাসের শেষ দিন সোমবার। কাজেই ২৪শে ফাল্গুন রবিবার হইতে ঐ ফাল্গুনের শেষ দিন পর্য্যন্ত—৭ দিন। আর চৈত্র মাসের প্রথম দিন রবিবার হইতে শেষ দিন সোমবার পর্য্যন্ত ৩০ দিন। অতএব ৮৯২ সালের ২৪শে ফাল্গুন হইতে বৎসর শেষ পর্য্যন্ত ৩৭ দিন পাওয়া গেল। তাহার পর ১২৭২ সালের ১লা বৈশাখ হইতে ১৯শে ফাল্গুন পর্য্যন্ত কত দিন দেখা যাইবে। ১২৭২ সালে ৩৬৬ দিন ছিল; ইহা গণনা করিয়া ও পঞ্জিকা দৃষ্টে পাওয়া যায়। ঐ সালের ২০শে ফাল্গুন হইতে ৩০শে ফাল্গুন পর্য্যন্ত ১১ দিন ও চৈত্র মাসের ৩১ দিন, এই মোট ৪২ দিন ৩৬৬ দিন হইতে বাদ দিলে ৩২৪ দিন থাকে। ইহাই ১২৭২ সালের ১লা বৈশাখ হইতে ১৯শে ফাল্গুন পর্য্যন্ত মোট দিনসংখ্যা। শেষ দেখিব ৮৯৩ সাল হইতে ১২৭১ সাল পর্য্যন্ত ৩৭৯ বৎসরের দিনসংখ্যা কত। আমাদের কৃত পূর্ব্বকথিত তালিকা হইতে আমরা পাই ৮৯৩ সাল হইতে ১২৫০ সাল পর্য্যন্ত ৯৩টি Leap year আছে। তাহার পর ১২৫১ সাল হইতে ১২৭১ সাল পর্য্যন্ত ৫টি Leap year (১২৫৩।৫৭।৬০।৬৪।৬৮ সাল)। অতএব ৮৯৩ সাল হইতে ১২৭১ সাল পর্য্যন্ত ৯৩ + ৫ = ৯৮ Leap year বা ৩৬৬ দিনের বৎসর। এই ৩৭৯ বৎসরে ইংরাজী নিয়মে ইহার ৪ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ ৯৪টি Leap year হইত, কিন্তু বাঙ্গালা পাঁজি মতে ৯৮টি Leap year হইতেছে। তাহার কারণ এই যে, আমাদের Leap year প্রতি ৪ বৎসর অন্তর হয় ও মাঝে মাঝে ৩ বৎসর অন্তরও হয়। সে জন্য আমাদের অব্দ খৃষ্টাব্দ অপেক্ষা আগাইয়া যাইতেছে। ১২৫১ সাল হইতে পঞ্জিকা দৃষ্টে পাওয়া যায়, পূর্ব্বে চৈত্রসংক্রান্তি ১১ই এপ্রেলে হইত, পরে ১২ই এপ্রিলে ও এখন ১৩ই এপ্রিলে হইতেছে। এখন আমাদের বিবেচ্য ৩৭৯ বৎসরের মধ্যে যে ৯৮টি Leap year পাওয়া গিয়াছে, তাহা ঠিক কি না, দিনসংখ্যা গণনা করিলেই ধরিতে পারিব। এই ৩৭৯ বৎসরের দিন সংখ্যা হইবে, (৫২ × ৩৭৯) সপ্তাহ + ৩৭৯ দিন + ৯৮ দিন। ৩৭৯ + ৯৮ দিন = ৪৭৭ দিন = ৬৮ সপ্তাহ + ১ দিন। তাহা হইলে ৮৯৩ সালের প্রথম হইতে ১২৭১ সালের শেষ পর্য্যন্ত (৫২ × ৩৭৯) সপ্তাহ × ৬৮ + সপ্তাহ ১ দিন। ৮৯৩ সালের (১৪০৮ শকের) ১লা বৈশাখ পূর্ব্ব গণনায় ঠিক হইয়াছে মঙ্গলবার ছিল। কাজেই ১২৭১ সালের শেষ দিনের পূর্ব্ব দিন সপ্তাহ শেষ হইয়াছে বলিয়া তাহা সোমবার ছিল। অতএব ১২৭১ সালের শেষ দিন মঙ্গলবার হইল। ১২৭১ সালের পাঁজিতেও তাহাই পাওয়া যায়। ইহাতে প্রমাণ হয় যে, আলোচ্য ৩৭৯ বৎসরে আমরা যে ৯৮টি Leap year ধরিয়াছি, তাহা ঠিক। এখন—(৫২ × ৩৭৯) সপ্তাহ + ৬৮ সপ্তাহ + ১ দিন

= ১৯৭০৮ সপ্তাহ + ৬৮ সপ্তাহ + ১ দিন

= ১৯৭৭৬ সপ্তাহ + ১ দিন = ১৩৮৪৩৩ দিন।

এই সংখ্যার সহিত উপরে গণিত ৮৯২ সালের ২৪শে ফাল্গুন হইতে ঐ সালের শেষ পর্য্যন্ত ৩৭ দিন এবং ১২৭২ সালের প্রথম হইতে ১৯শে ফাল্গুন পর্য্যন্ত ৩২৪ দিন যোগ করিতে হইবে। তাহা হইলে ৮৯২ সালের ২৪শে ফাল্গুন হইতে ১২৭২ সালের ১৯শে ফাল্গুন পর্য্যন্ত ৩৮০ বৎসরের মোট দিনসংখ্যা—

১৩৮৪৩৩ + ৩৭ + ৩২৪ = ১৩৮৭৯৪ হইল।

আমরা পূর্ব্বে পাইয়াছি, এই ৩৮০ বৎসরব্যাপী যে ২০টি মীটনের

কাল হয়, তাহার পরিমাণ ১৩৮৭১৩'৭৬ দিন। অতএব উভয় দিন-সংখ্যা প্রায় সম্পূর্ণরূপে মিল হইতেছে। প্রভেদ মাত্র দশমিক ২৪ দিন, অর্থাৎ একদিনের চতুর্থাংশেরও কম। অতএব ১৪০৭ শকের (৮৯২ সালের) ২৩শে ফাল্গুনে পূর্ণিমা ছিল, ইহা সিদ্ধান্ত হইল।

এখন আমরা দেখিব, ঐ দিন চন্দ্রগ্রহণ ছিল কি না। সকলেই জানেন, পূর্ণিমাতে চন্দ্রগ্রহণ ও অমাবস্যাতে সূর্য্যগ্রহণ হয়। ইংরাজী জ্যোতিষশাস্ত্রে ১৮ বৎসর ১১ দিনব্যাপী একটি কালপরিমাণের উল্লেখ আছে; তাহাকে সেরস্ (Saros) বলে। এই ১৮ বৎসর ১১ দিন গতে গ্রহণ ফিরিয়া ফিরিয়া হইয়া থাকে। ১৩৩২ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের "ভারতবর্ষে" শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয় চন্দননগরের এক পাত্রী জ্যোতির্বিদের ১০৪ বৎসরের একটি গ্রহণের তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। উহা দেখিলে এই কথার যাথার্থ্য অবগত হওয়া যাইবে। এই ১৮ বৎসর ১১ দিন পরিমিত "সেরস্" (Saros) কালের সূক্ষ্ম হইতেছে ৬৫৮৫'৩২১১ দিন। এক চান্দ্র মাসের পরিমাণ ২৯'৫৩০৫৮৭৯ দিন, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ২২৩ চান্দ্র মাসে এক "সেরস্" কাল হয়। অতএব তাহার পরিমাণ এক চান্দ্র মাসের ২২৩ গুণে ৬৫৮৫'৩২১১ দিন। ২০টি সেরসে ইহার ২০ গুণে ১৩১৭০৬'৪২২ দিন। ৮৯২ সাল হইতে ৩৬০ বৎসর পরে ১২৫২ সাল হয়। ইহা পঞ্জিকা কালের মধ্যে। অতএব এই সময়ের নিকট যে দিন "সেরস্ কাল পূর্ণ হইবে, সেই দিন গ্রহণ হইয়াছিল কি না, কিংবা গ্রহণের সম্ভাবনা ছিল কি না, তাহা পঞ্জিকা দেখিয়া স্থির করিতে পারা যাইবে। এখন আমরা দেখিব ৮৯২ সালের ২৪শে ফাল্গুন হইতে ১২৫২ সালের শেষ পর্য্যন্ত কত দিন হয়। ৮৯২ সালের ২৪শে ফাল্গুন হইতে ঐ বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত ৩৭ দিন আমরা পূর্ব্বেই পাইয়াছি। ৮৯৩ সালের প্রথম হইতে ১২৫২ সালের শেষ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ ৩৬০ বৎসর। এই ৩৬০ বৎসর মধ্যে আমাদের গণনামতে ৯৩টি Leap year আছে। ইহা ঠিক কি না, পরে পূর্ব্বকথিত নিয়মে ধরা যাইবে। এই ৩৬০ বৎসরে দিনসংখ্যা—

=(৫২ × ৩৬০) সপ্তাহ + ৩৬০ দিন + ৯৩ দিন

=(৫২ × ৩৬০) সপ্তাহ + ৪৫৩ দিন।

৪৫৩ দিনকে ৭ দিয়া ভাগ করিলে ৬৪ সপ্তাহ ৫ দিন হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ৮৯৩ সালের ১লা বৈশাখ মঙ্গলবার ছিল ও সপ্তাহ শেষ সোমবারে। কাযেই সোমবারে সপ্তাহ শেষ হইয়া আরও ৫ দিনে অর্থাৎ শনিবারে ১২২৫ সাল শেষ হইয়াছে। ১২২৫ সালের পঞ্জিকা দৃষ্টে দেখা যায় ইহা ঠিক। ফলে ৯৩টি Leap yearএর দরুণ ৯৩টি অতিরিক্ত দিন যাহা ধরা হইয়াছে তাহা ঠিক। ৮৯৩ সালের প্রথম হইতে ১২৫২ সালের শেষ পর্য্যন্ত ৩৬০ বৎসরের দিনসংখ্যা তাহা হইলে হইতেছে—

(৫২ × ৩৬০) সপ্তাহ + ৪৫৩ দিন

= ৫২ × ৩৬০ × ৭ দিন + ৪৫৩ দিন

= ১৩১০৪০ + ৪৫৩ = ১৩১৪৯৩ দিন।

ইহার সহিত ৮৯২ সালে পূর্ব্বকথিত ৩৭ দিন যোগ করিলে ৮৯২ সালের ২৪শে ফাল্গুন হইতে ১২৫২ সালের শেষ পর্য্যন্ত দিনসংখ্যা হইল ১৩১৫৩০। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, ২০টি "সেরস্" কালের পরিমাণ ১৩১৭০৬'৪২২ দিন। ইহা হইতে ১৩১৫৩০ বাদ দিলে বাকী থাকে ১৭৬'৪২২ দিন। অতএব ১২৫২ সালের সেই দিন পূর্ণিমা হইবার কথা ও গ্রহণেরও সম্ভাবনা। ১২৫৩ সালের পাঁজিতে পাই বৈশাখে ৩১ দিন, জ্যৈষ্ঠে ৩২ দিন, আষাঢ়ে ৩১ দিন, শ্রাবণে ৩২ দিন ও ভাদ্রে ৩১ দিন, মোট ১৫৭ দিন। ১৭৬'৪২২ হইতে ১৫৭ বাদ দিলে বাকী থাকে ১৯'৪২২ দিন। অতএব আর ১৯ দিনে অর্থাৎ ১২৫৩ সালের আশ্বিন মাসের ১৯শে তারিখে পূর্ণিমা ও গ্রহণ হইবার কথা। ঐ সালের পঞ্জিকায় পাই ঐ দিন পূর্ণিমা ছিল, কিন্তু গ্রহণ পাই না। "ভারতবর্ষ" মাসিক পত্রে পাত্রী পণ্ডিতের যে তালিকার কথা বলিয়াছি, তাহাতেও নাই। ঐ ১৯শে আশ্বিনের ইংরাজী তারিখ হইতেছে ১৮৪৬ সাল ৪ঠা অক্টোবর। যদিও ঐ পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ নাই, তথাপি বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় এই যে, পাত্রী মহোদয়ের তালিকায় দেখিতে পাই, তাহার এক পক্ষ পরে ২০শে অক্টোবর তারিখে সুন্দর অঙ্গুরীয়কাকৃতি (annular) সূর্য্যগ্রহণ ছিল ও তাহা গোয়া ও মান্দ্রাজে দৃশ্য ছিল। ইহাতে বেশ বুঝা যায়, মহাপ্রভুর জন্মদিনের গ্রহণটি কালে লুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু চন্দ্র যে স্থানে অবস্থিত থাকিলে চন্দ্রগ্রহণ হইবার কথা, তাহার বেশী দূরে যায় নাই। এরূপ অবস্থায় একটি গ্রহণের পর পক্ষান্তে আর একটি গ্রহণ অনেক সময়ে হইয়া থাকে। অবশ্য একটি চন্দ্রগ্রহণ হইলে অপরটি সূর্য্যগ্রহণ হয়। বর্তমান ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ৫ই জুন চন্দ্রগ্রহণ ও ২৯শে জুন সূর্য্যগ্রহণ ছিল, যদিও দুইটিই ভারতবর্ষে অদৃশ্য। কোনও একটি চন্দ্রগ্রহণ প্রথমে ক্ষুদ্র আংশিকরূপে আরম্ভ হইয়া প্রতি "সেরস" অন্তে গ্রস্তাংশ বৃদ্ধি পাইয়া ক্রমে কিছুকাল সর্ব্বগ্রাস গ্রহণ হয়। পরে আবার গ্রস্তাংশ কমিতে কমিতে একবারে গ্রহণযোগ্য স্থান হইতে সরিয়া যায়, আর সে গ্রহণ হয় না। এইরূপে প্রতি "সেরস্" কাল গতে ৪৮ বার গ্রহণ হইয়া ৮৬৫ বৎসর অন্তে সেই গ্রহণটি আর হয় না। সূর্য্যগ্রহণ এইরূপে ১২০০ বৎসর পর্য্যন্ত আবর্ত্তন করিয়া লুপ্ত হয়। (Newcomb's Popular Astronomy) যাহা হউক, আমরা দেখিলাম, শ্রীচৈতন্যের জন্মদিনের গ্রহণটি আর হয় না; কিন্তু তাহার পরের অমাবস্যায় সূর্য্যগ্রহণ এখনও হইতেছে। পাত্রী পণ্ডিতের পূর্ব্বোল্লিখিত তালিকাটি দেখিলে এই সূর্য্যগ্রহণটির পুনঃাবর্ত্তন ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ১৪০৭ শকের ২৩শে ফাল্গুনের পূর্ণিমাতে অবশ্য গ্রহণ ছিল।

অতএব "চিরপঞ্জিকা" মতে বার ও তিথি গণনা দ্বারা এবং ইংরাজী জ্যোতিষ মতে পূর্ণিমা গণনা দ্বারা ও গ্রহণ গণনা দ্বারা, ১৪০৭ শকের ২৩শে ফাল্গুন শনিবারে, শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের জন্মদিন ছিল, ইহা সিদ্ধান্ত হইল।

আমরা "চিরপঞ্জিকা" মতে গণনায় ইহাও পাইয়াছি যে, ঐ দিন পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্র ছিল। মহাপ্রভুর জন্মকাল সিংহরাশি ছিল, ইহা 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' আছে। সিংহরাশি রাশিচক্রের ১২ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ ৩৬০ ÷ ১২ = ৩০ ডিগ্রী। রাশিচক্রকে সম ২৭ ভাগে বিভক্ত করিলে প্রত্যেক ভাগকে এক নক্ষত্র বলে। এক নক্ষত্রের পরিমাণ ৩৬০ ÷ ২৭ = ১৩⅓ ডিগ্রী। কাযেই ২¼ নক্ষত্রের এক রাশি হয়। প্রথম প্রথম রাশি মেষ ও প্রথম নক্ষত্র অশ্বিনী রাশিচক্রের একই স্থান হইতে আরম্ভ হইয়াছে। চন্দ্র ২৭ দিনে সম্পূর্ণ রাশিচক্র ঘুরিয়া যায় ও এক দিনে এক নক্ষত্র অতিক্রম করে। মেষ হইতে সিংহ পঞ্চমরাশি বিধায় ইহা দশম ও একাদশ নক্ষত্রের সম্পূর্ণ ও দ্বাদশ নক্ষত্রের এক চতুর্থাংশ ব্যাপিয়া আছে। দশম নক্ষত্র মঘা, একাদশ নক্ষত্র পূর্ব্বফল্গুনী ও দ্বাদশ নক্ষত্র উত্তর ফল্গুনী। অতএব পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্র সিংহরাশির মধ্যভাগে। আমরা পাইয়াছি, মহাপ্রভুর জন্মক্ষণে পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্র ছিল, কাযেই সিংহরাশি ছিল। অর্থাৎ সে সময়ে চন্দ্র সিংহরাশির মধ্যে পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রে ছিল।

গত বৈশাখ মাসের "মাসিক বসুমতী" পত্রিকার ৭১ পৃষ্ঠায় যে দ্বিতীয় রাশি-চক্রটি আছে, তাহার সহিত আমাদের গণনার মিল হইতেছে। ঐ রাশি-চক্রের ডাহিনে তিন স্তম্ভে যে একটি ক্ষুদ্র তালিকা অঙ্কিত আছে, তাহার প্রথম স্তম্ভে, উপরে ৭ অর্থাৎ শনিবার ও তাহার নীচে ১৫ অর্থাৎ পূর্ণিমা তিথি; দ্বিতীয় স্তম্ভের উপরে ১১ অর্থাৎ

পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্র এবং তৃতীয় স্তম্ভের উপরে ১৮ অর্থাৎ বরীয়ান যোগ ও শ্রীঃ ২৩ তারিখ লিখিত আছে। অস্ত অঙ্কগুলি দণ্ডপল সম্বন্ধে। এই রাশি-চক্র ও তালিকাটি ১৩২৯ সালের ভাদ্র আশ্বিনের "শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবক পত্রিকায়" আছে বলিয়া "মাসিক বসুমতী"তে লিখিত আছে। ঐ পত্রিকাখানি আমরা দেখিতে পাই নাই।

এখন আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোভাব কাল সম্বন্ধে আলোচনা করিব। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' লিখিত আছে,—"চৌদ্দ শত পঞ্চান্নে হইল অন্তর্দ্ধান।" লোচনদাস ঠাকুরের 'চৈতন্যমঙ্গলে' আছে, আষাঢ় মাসের সপ্তমী তিথি রবিবারে তিনি লীলাসংবরণ করেন। যথা,—

"আষাঢ় মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে।
নিবেদন করে প্রভু ছাড়িয়া নিশ্বাসে॥
* * * *
তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে।
জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে॥"

জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে' আষাঢ় মাসের শুক্লা সপ্তমী মহাপ্রভুর তিরোভাব তিথি বলিয়া পাওয়া যায়। যথা,—

"আষাঢ় সপ্তমী তিথি শুক্লা অঙ্গীকার করি।"

এই উক্তিগুলি লইয়া ১৪৫৫ শকের আষাঢ় মাসের শুক্লাসপ্তমী মহাপ্রভুর তিরোভাব ধরিয়া উহার বার ও তারিখ নির্ণয় করিব ও তাহা রবিবার হয় কি না দেখিব।

প্রথমে "চিরপঞ্জিকার" নিয়মে গণনা করিয়া আমরা পাই ১৪৫৫ শকের ১লা আষাঢ় শুক্রবার এবং ১লা শ্রাবণ সোমবার। কাযেই আষাঢ় মাসের শেষ দিন রবিবার ছিল। ১লা আষাঢ় শুক্রবার বলিয়া ঐ মাসের ৩।১০।১৭.২৪।৩১ তারিখ রবিবার ছিল। ১৪৫৫ শক=৯৪০ সাল। ১৭ বার ১৯ বৎসরে ৩ শত ২৩ বৎসর হয়। ৯ শত ৪০ হইতে ৩ শত ২৩ বৎসর পরে ১২৬৩ সাল হয়। ১২৬৩ সালের পঞ্জিকায় পাওয়া যায়, ঐ সালের ২৭শে আষাঢ় শুক্লা সপ্তমী ছিল। "চিরপঞ্জিকার" নিয়মমতে গণনার সুবিধার জন্য আমরা ১২৬৩ সালের দুই বৎসর পূর্ব্বে ১২৬১ সালকে প্রথমে আশ্রিতাব্দ ধরিয়া ৫১ বৎসর পূর্ব্বে ১২১০ সালের ২৭শে আষাঢ়ের তিথি নির্ণয় করিয়া তাহার পূর্ব্বে ৯০ বৎসর অন্তর ১১২০, ১০৩০ ও ৯৪০ সালের ২৭শে আষাঢ়ের তিথি গণনা করিয়া আমরা পাইলাম, ৯৪০ সালের ২৭শে আষাঢ় বুধবার ও শুক্লা তৃতীয়া তিথি ছিল। তাহা হইলে ঐ সালের অর্থাৎ ১৪৫৫ শকের ৩১শে আষাঢ় রবিবার শুক্লা সপ্তমী হইল। অতএব "চিরপঞ্জিকার" নিয়মে গণনামতে মহাপ্রভুর তিরোভাব ১৪৫৫ শকের বা ৯৪০ সালের ৩১শে আষাঢ় রবিবারে হইয়াছিল।

এখন ইংরাজী জ্যোতিষ মতে গণনা করিব। ৯৪০ সাল হইতে ১২৬৩ সাল পর্য্যন্ত ২ শত ২৩ বৎসরে ১৭টি মীটনের কাল। অতএব ইহার পরিমাণ—৬৯৩৯.৬৮৮ × ১৭ = ১১৭৯৭৪.৬৯৬ দিন।

৯৪০ সালের ১লা বৈশাখ শুক্রবার, ১লা জ্যৈষ্ঠ সোমবার, ১লা আষাঢ় শুক্রবার ও ১লা শ্রাবণ সোমবার, "চিরপঞ্জিকা" মতে গণিয়া আমরা পাই। তাহা হইলে বৈশাখ মাস শুক্র হইতে রবি ৩১ দিন, জ্যৈষ্ঠ মাস সোম হইতে বৃহস্পতি ৩২ দিন ও আষাঢ় মাস (পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে) শুক্র হইতে রবি ৩১ দিন। এই তিন মাসের দিনসংখ্যা হইতেছে ৩১+৩২+৩১=৯৪ দিন। ১৪৫৫ শকের (৯৪০ সালের) ১লা বৈশাখ শুক্রবার ও ১৪৫৬ শকের (৯৪১ সালের) ১লা বৈশাখ (চিরপঞ্জিকামতে গণিয়া পাওয়া যায়) রবিবার। অতএব ১৪৫৫ শক শুক্রবারে আরম্ভ হইয়া শনিবারে শেষ বলিয়া ঐ বৎসরে ৩৬৬ দিন ছিল। এই ৩৬৬ দিন হইতে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়ের ৯৪ দিন বাদে ২৭২ দিন, ৯৪০ সালের (১৪৫৫ শকের) ১লা শ্রাবণ হইতে বৎসর শেষ পর্য্যন্ত ছিল। ৯৪১ সাল হইতে ১২৬২ সাল পর্য্যন্ত (উভয় বৎসরব্যাপী) ৩২২ বৎসরের দিন-সংখ্যা কত এখন দেখিতে হইবে। আমাদের তালিকা ও পঞ্জিকাদৃষ্টে পাই, এই সময় মধ্যে ৮৩টি Leap year বা ৩৬৬ দিনের বৎসর। অতএব ৩২২ বৎসরের দিন সংখ্যা হইতেছে,—

(৫২ × ৩২২) সপ্তাহ + ৩২২ দিন + ৮৩ দিন

= ১৬৭৪৪ সপ্তাহ + ৪০৫ দিন। ৪০৫ দিনকে ৭ দিয়া ভাগ করিলে ৫৭ সপ্তাহ ৬ দিন হয়। ৯৪১ সালের ১লা বৈশাখ রবিবার ছিল বলিয়া সপ্তাহ শেষ শনিবারে। কাযেই ৬ দিন বাকীতে শুক্রবার হয়। পঞ্জিকাতেও পাই ১৪৬২ সালের শেষ দিন শুক্রবার বটে। অতএব আমরা যে Leap yearএর সংখ্যা ধরিয়াছি তাহা ঠিক। তাহা হইলে এখন আলোচ্য দিনসংখ্যা—১৬৭৪৪ সপ্তাহ + ৪০৫ দিন = ১১৭২০৮ দিন + ৪০৫ দিন = ১১৭৬১৩ দিন। ইহার সহিত ৯৪০ সালের ১লা শ্রাবণ হইতে ঐ বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত পূর্ব্বগণিত ২৭২ দিন যোগ করিলে ১২৬২ সালের শেষ পর্য্যন্ত দিনসংখ্যা হয়—১১৭৬১৩ + ২৭২ = ১১৭৮৮৫। ১৭ মীটন কালের দিনসংখ্যা আমরা পূর্ব্বে পাইয়াছি ১১৭৯৭৪.৬৯৬। ইহা হইতে শেষোক্ত ১১৭৮৮৫ বাদ দিলে বাকী থাকে ৮৯.৬৯৬ দিন। এখন এই ৮৯ দিন ১২৬৩ সালের কোন্ মাসের কোন্ তারিখ পর্য্যন্ত হয় দেখিতে হইবে। পাঁজিদৃষ্টে পাই ১২৬৩ সালের বৈশাখ ৩১ দিন ও জ্যৈষ্ঠে ৩১ দিন মোট ৬২ দিন। ৮৯ হইতে ৬২ বাদ দিলে বাকী ২৭। অতএব আষাঢ় মাসের ২৭ দিনে ১৭ মীটন কাল পূর্ণ হয়। ঐ দিনে শুক্লাসপ্তমী ছিল, ইহা পঞ্জিকাতে পাই। কাযেই ঐ ১৭ মীটন কাল আরম্ভের পূর্ব্ব দিন ১৪৫৫ শকের ৩১শে আষাঢ়েও ঐ তিথি ছিল। অতএব আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর তিরোভাব ১৪৫৫ শক ৩১শে আষাঢ় রবিবারেই হইয়াছিল।

শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব সম্বন্ধে ১৩২৭ সালের আষাঢ় মাসের "প্রবাসী" পত্রিকার ২৯৩ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত ভূষণচন্দ্র দাস যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় তিনি মনে করেন, কবিরাজ গোস্বামী 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে' মহাপ্রভুর স্থিতিকাল ৪৮ বৎসর বলিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহা কবি কর্ণপুরের উক্তির সহিত মিলে না। তিনি কবি কর্ণপুরের শ্লোক তুলিয়া লিখিয়াছেন—"অর্থাৎ মহাপ্রভু ৪৭ বৎসর লীলা করিয়া স্বধাম গমন করেন। কবি কর্ণপুর গোস্বামীর হিসাবে ১৪৫৪ শকে মহাপ্রভুর তিরোভাব হয়।" ঐ শ্লোকে মাত্র আছে ৪৭ বৎসর লীলা করিয়া মহাপ্রভু স্বধামে গমন করেন। ইহা হইতে ১৪৫৪ শকে তাঁহার তিরোভাব এ কথা আসে না। ১৪০৭ শকের ফাল্গুন হইতে ১৪৫৪ শকের ফাল্গুনে ৪৭ বৎসর পূর্ণ হয় ও ১৪৫৫ শকের আষাঢ়ে মহাপ্রভুর বয়স ৪৭ বৎসর ৪ মাস পূর্ণ হয়। কাযেই তাঁহার তিরোভাব পূর্ণ ৪৭ বৎসর লীলার পরেও ৪৮ বৎসর বয়ঃক্রম কালে হইয়াছিল। অতএব কবিরাজ গোস্বামীর উক্তি "অষ্টচল্লিশ বৎসর প্রকট বিহারী" ও কবি কর্ণপুরের শ্লোকমতে ৪৭ বৎসর লীলার পর মহাপ্রভুর তিরোভাব, এই দুই কথায় কোন অসামঞ্জস্য দেখা যায় না।

১৩২৭ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের "প্রবাসীর" ১৭২ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত অমৃতলাল শীল লিখিয়াছেন,—১৪৫৫ শকের আষাঢ় মাসের শুক্লাসপ্তমীর দিন অর্থাৎ ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জুন চৈতন্যদেব অন্তর্দ্ধান করেন এবং তিনি বলেন, হণ্টর তাঁহার উড়িষ্যার ইতিহাসে বলিয়াছেন, "রাজা প্রতাপরুদ্র ইহার এক বৎসর পূর্ব্বে ১৫৩২ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।" অতএব বৈষ্ণব গ্রন্থাবলীতে যে মহাপ্রভুর তিরোভাবের পর রাজা প্রতাপরুদ্রের জীবিত থাকার কথার উল্লেখ আছে, তাহা সম্ভবপর হয় না। এ জন্য তিনি হণ্টরের মতানুসরণ করিয়া মহাপ্রভুর তিরোভাব ১৪৫৫ শকে না হইয়া আরও ৬ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ তাঁহার ৪২ বৎসর বয়সে হইয়াছিল বলিয়া সন্দেহ করেন।

পাশ্চাত্য পঞ্জিকা-সংস্কারের ফলে ঐতিহাসিক ঘটনার সন মাস তারিখের গোলযোগ অনেক সময় হইয়াছে। ৪৫ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে রোমের সম্রাট্ জুলিয়স সীজর প্রথম পঞ্জিকা-সংস্কার করেন। নানা কারণে আবার পঞ্জিকার গোল উপস্থিত হয়। সে জন্য ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে পোপ গ্রেগরী পুনরায় পঞ্জিকার সংস্কার করেন। তাহা য়ুরোপের অনেক দেশে শীঘ্রই গৃহীত হয়, কিন্তু ইংলণ্ডে তাহা ১৭৫২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে গৃহীত হয় নাই। ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে একটি আইন দ্বারা ১৭৫২ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের ১১ দিন বিলোপ করিয়া ২রা সেপ্টেম্বরের পর ৩রা সেপ্টেম্বর না হইয়া একবারে ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখ গণনার আদেশ হয় এবং পূর্ব্ববৎসর ১৭৫১ সালের প্রায় তিন মাস ছাঁটিয়া দেওয়া হয়। এই দ্বিবিধ গোল-যোগের ফলে ১৭৫২ খৃষ্টাব্দ পূর্ব্বের সন, মাস, তারিখগুলি লিখিবার গোল পড়িয়া যায়। হর্শেল তাঁহার "Outlines of Astronomy"তে লিখিয়াছেন,—"Previous to that time (1752) the year was held to begin on the 25th March, and the year A. D. 1751 did so accordingly, but that year was not suffered to run out, but was supplanted on the 1st January by the year 1752 which, (as well as every subsequent year) it was enacted, should commence on that day, so that our English year 1751 was in effect an "annus confusionis," and consisted of only 282 days." হর্শেল ইংলণ্ডের ১৭৫১ খৃষ্টাব্দকে "Annus confusionis" অর্থাৎ গোলযোগের বৎসর বলিয়াছেন। ইংলণ্ডীয় ইতিহাসে যাহা ১৭৫০ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী হইতে ২৪শে মার্চ্চ লিখিত হইয়াছে, অর্থাৎ যাহা ঐ বৎসরের শেষাংশ ছিল, তাহাকে পঞ্জিকা-সংস্কারের পর হইতে ১৭৫১ খৃষ্টাব্দের প্রথম ৩ মাসের মধ্যে ধরিয়া লইতে হইবে। এবং সেই মত পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরগুলিও ধরিতে হইবে। প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ কালকে তখন দুইটি খৃষ্টাব্দের অন্তর্গত বলিয়া লেখা হইত। Historians' History of the Worldএ পাই "The 25th February 1751 on whi h day the bill (for reforming the Calender) was introduced into the House of Lords, was ordinarily written 25th February 1750-51". "Boswell's Life of Johnson"এর এক স্থানে আছে,—"The first paper of the Rambler was published on Tuesday 20th of March 1749-50." ভারতে ইংরাজ অধিকার স্থাপনের বহু পূর্ব্বের ভারতীয় ঘটনাকে তৎকালপ্রচলিত ইংলণ্ডীয় পঞ্জিকানুযায়ী অব্দে পরিবর্ত্তিত করিতে হর্ণেরর ভ্রমে পতিত হওয়া অসম্ভব নহে। তিনি যাহাকে ১৫৩২ খৃষ্টাব্দ বলিয়াছেন, তাহা ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দ (অর্থাৎ ১৫৩২-৩৩) হওয়া সম্ভবপর। এই সমস্ত বিষয় মনে রাখিয়া মহাপ্রভুর প্রায় সমসাময়িক পূজ্যপাদ বৈষ্ণব লেখকগণ তাঁহার তিরোভাবের কাল ও রাজা প্রতাপরুদ্র তখন জীবিত থাকা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দিহান হইবার কোন বিশিষ্ট কারণ দেখা যায় না।

এখন শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব ও তিরোভাবের ইংরাজী সন, মাস, তারিখ কি, তাহার আলোচনা করিব। আমরা পূর্ব্বে পাইয়াছি, তাঁহার আবির্ভাবের পর দিন ২৪শে ফাল্গুন, ৮৯২ সাল হইতে ১৯শে ফাল্গুন ১২৭২ সাল পর্য্যন্ত (উভয় দিন ব্যাপিয়া) ১৩৮৭৯৪ দিন। এই কাল ৩ শত ৮০ বৎসরব্যাপী। ১২৭২ সালের ১৯শে ফাল্গুন=১৮৬৬ খৃঃ ১লা মার্চ্চ। ইহার ৩ শত ৮০ বৎসর পূর্ব্বে ১৪৮৬ খৃঃ ১লা মার্চ্চ হয়। এই ৩ শত ৮০ বৎসর মধ্যে Julion Calender মতে ইহার চতুর্থাংশ ৯৫টি Leap year হয়। কিন্তু ইংলণ্ডে Gregorian Calender প্রচলিত হওয়ার পরে ১৮০০ খৃষ্টাব্দটি Leap year হয় নাই। কাযেই ঐ সময় মধ্যে ৯৪টি Leap year ছিল। সে জন্য এই ৩ শত ৮০ বৎসরের দিনসংখ্যা হইতেছে ৩৬৫×৩৮০+৯৪=১৩৮৭০০+৯৪=১৩৮৭৯৪ দিন। অতএব ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দের ২রা মার্চ্চ হইতে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ্চ পর্য্যন্ত (উভয় দিনব্যাপী) ঐ দিনসংখ্যা হইতেছে। ফলে, ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ্চ মহাপ্রভুর জন্মদিন ছিল। আমাদের গণনান্তর্গত কালের মধ্যে ১৭৫২ খৃষ্টাব্দের লুপ্ত ১১ দিন ছিল। কাযেই ১লা মার্চ্চ ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দকে ১১ দিন পিছাইয়া লইতে হইবে। ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দ Leap year ছিল না, অতএব ঐ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাস ২৮ দিনে ছিল। তাহা হইলে ১লা মার্চ্চের ১১ দিন পূর্ব্বে ১৮ই ফেব্রুয়ারী হয়। অতএব চৈতন্যদেবের জন্মদিন ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দ ১৮ই ফেব্রুয়ারী ছিল।

চৈতন্যদেবের তিরোভাবের দিন ৯৪০ সাল ৩১শে আষাঢ় আমরা পাইয়াছি। তিরোভাবের পরদিন, ১লা শ্রাবণ ৯৪০ সাল হইতে ১২৬৩ সালের ২৭শে আষাঢ় পর্য্যন্ত ১১৭৯৭৪ দিন পূর্ব্বে স্থির হইয়াছে। ৯৪০ সাল হইতে ১২৬৩ সাল ৩ শত ২৩ বৎসর হয়। ১২৬৩ সালের ২৭শে আষাঢ়=১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুলাই। ইহার ৩ শত ২৩ বৎসর পূর্ব্বে ১৫৩৩ খৃঃ ৯ই জুলাই। এই ৩ শত ২৩ বৎসরে কত দিন ছিল? শেষ বৎসর (১৮৮৬) Leap year বলিয়া ঐ ৩ শত ২৩ বৎসর মধ্যে ৫১টি Leap year হয়; তবে ১৮০০ খৃষ্টাব্দ Leap year নহে বলিয়া ৮০টি মাত্র Leap year হয়। অতএব ঐ ৩ শত ২৩ বৎসরের দিন-সংখ্যা হইতেছে, ৩৬৫×৩২৩+৮০=১১৭৮৯৫+৮০=১১৭৯৭৫। এই দিনসংখ্যা পূর্ণ ৩ শত ২৩ বৎসরের অর্থাৎ ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুলাই হইতে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দ ৯ই জুলাই পর্য্যন্ত (উভয় দিনব্যাপী)। তাহা হইলে ৯৪০ সাল ১লা শ্রাবণ হইতে ১২৬৩ সাল ২৭শে আষাঢ় পর্য্যন্ত যে আমাদের পূর্ব্ব-নির্ণীত ১ লক্ষ ১৭ হাজার ৯ শত ৭৪ দিন, তাহা ১৫৩৩ খৃঃ ১১ই জুলাই হইতে ১৮৫৬ খৃঃ ৯ই জুলাই পর্য্যন্ত (উভয় দিন ব্যাপী)। অতএব ১৫৩৩ খৃঃ ১১ জুলাই ৯৪০ সালের ১লা শ্রাবণ ছিল; এবং ১৫৩৩ খৃঃ ১০ই জুলাই, ৯৪০ সালের ৩১শে আষাঢ় ছিল, অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের দিন ছিল। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দের বিলুপ্ত ১১ দিন পিছাইয়া ২৯শে জুন ১৫৩৩ খৃঃ প্রকৃত প্রস্তাবে তিরোভাবের দিন হয়।

মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও তিরোভাবের যে ইংরাজী তারিখ পাইয়াছি, তাহার বার মিলান যায় কি না, তজ্জন্য ভাবিতেছিলাম। "চিরপঞ্জিকা" বইখানিতে একটি নিয়ম দেওয়া আছে, কিন্তু তাহা সন্তোষ-জনক নহে। ১৩২৭ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের "প্রবাসীর" ১৬৭ পৃষ্ঠায় "দু' হাজার বছরের পাঁজী" শীর্ষক একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে কয়েকটি নিয়ম পাইলাম। তদনুসারে বার গণিয়া মহাপ্রভুর জন্মদিন ১৪৮৬ খৃঃ ১৮ই ফেব্রুয়ারী শনিবার ও তাঁহার তিরোভাব ২৯শে জুন ১৫৩৩ খৃঃ রবিবার বলিয়া পাই। ইহাতে আমরা পূর্ব্বে যে বার নির্ণয় করিয়াছি, তাহা সম্পূর্ণরূপে সমর্থিত হয়। এ বিষয়ে কাহারও কৌতূহল থাকিলে "প্রবাসী"তে পত্রান্তর হইতে উদ্ধৃত পূর্ব্বোক্ত নিয়মগুলি পরীক্ষা করিতে পারেন। আমরা এই প্রবন্ধে "Boswell's Life of Johnson" হইতে ২০শে মার্চ্চ ১৭৫০ খৃষ্টাব্দ মঙ্গলবার সম্বন্ধে একটি বিষয় উল্লেখ করিয়াছি। ঐ তারিখ মঙ্গলবার ছিল কি না, কথিত নিয়ম অনুসারে গণিয়া পাইলাম, তাহা ঠিক।

আমাদের গণনার ফল এই স্থানে একত্র সন্নিবিষ্ট হইল, যথা;—শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব ১৪০৭ শক বা ৮৯২ সাল, ২৩শে ফাল্গুন, শনিবার ইংরাজী ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দ, ১৮ই ফেব্রুয়ারী এবং তাঁহার তিরোভাব ১৪৫৫ শক বা ৯৪০ সাল, ৩১শে আষাঢ়, রবিবার, ইংরাজী ১৫৩৩ খৃঃ, ২৯শে জুন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও তিরোভাবের বার ও তারিখ নির্ণয় জন্য আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যতদূর সম্ভব চেষ্টা করিয়াছি। "চিরপঞ্জিকা" বইখানির সাহায্য ব্যতিরেকে আমাদের ন্যায় অজ্যোতিষীর এ কার্য্যে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব হইত। আমাদের গণনা শুদ্ধ কি না সুধীমণ্ডলীর বিচার্য্য। যদি ভ্রম হইয়া থাকে, তাহা প্রদর্শিত হইলে কৃতজ্ঞ হইব।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

জ্যোতির্ব্বিদ ওমর খৈয়াম

ওমর খৈয়ামের জীবন অধ্যায় আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি প্রথম জীবন হইতেই দার্শনিক। দর্শনশাস্ত্র তাঁহার উদরান্নের সংস্থান করিতে পারে নাই বলিয়া তিনি উহার আলোচনা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বৈজ্ঞানিক—জ্যোতির্ব্বিদরূপেই তিনি প্রথম জীবন হইতেই অর্থোপার্জ্জন করেন। একথা তিনি তাঁহার "আল্‌জবর ওয়াল মুকাবলা" নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে ব্যক্ত করিয়াছেন। (১)

বৈজ্ঞানিক জগতে জ্যোতির্ব্বিদরূপে তাঁহার স্থান কোথায় এবং মুসলিম বিজ্ঞান-সাহিত্য তাঁহার দ্বারা কিরূপ সমৃদ্ধ হইয়াছিল, আজ আমরা এই প্রবন্ধ সেই কথারই আলোচনা করিলাম।

ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ভারত পর্য্যটক, জ্যোতির্ব্বিদ আবু রাইহান অলবেরুণী জ্যোতিঃশাস্ত্রের সংজ্ঞা এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

যে শাস্ত্র পাঠ করলে জ্যোতিষ্পথস্থিত জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর (Heavenly bodies) স্বরূপ, সঞ্চার, পরিভ্রমণকালে, গ্রহণ, পরস্পরের অন্তর ও তৎসম্বন্ধীয় ঘটনাবলী এবং তাহাদিগের গতি, স্থিতি ও সঞ্চারানুসারে মানবজীবনের শুভাশুভ বিষয় নিরূপণ করিতে পারা যায় তাহাকে জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান কহে '— (২)

জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান দুই ভাগে বিভক্ত, যথা,—(১) ইলম্ উল্ নুজ্জাম্ (গণিত-জ্যোতিষ Astronomy (২) ইলম্ আকাম্ উল্ নুজ্জাম (ফলিত জ্যোতিষ Astrology)। গণিত জ্যোতিষ দ্বারা গ্রহগণের আকার গতি, এবং পরস্পরের দূরত্ব নিরূপণ প্রভৃতি বিষয় গণনা করা যায়। ফলিত জ্যোতিষ দ্বারা গ্রহ নক্ষত্রাদির গতি, স্থিতি ও সঞ্চারানুসারে কার্য্যের শুভাশুভ ফল ও মানবের অদৃষ্টের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান—ত্রিকালের অবশ্যম্ভাবী ঘটনাবলী জানিতে পারা যায়।

প্রাচীন মুসলিম সম্প্রদায় জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানকে ইলম-উৎ-তানজিম নামে অভিহিত করিতেন। ইহাতে গণিত ও ফলিত উভয় জ্যোতিষকেই বুঝাইত। অলবেরুণী জ্যোতির্ব্বিদের সংজ্ঞা এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—যিনি (১) গণিত বিজ্ঞান (Mathematics) (২) সৃষ্টি-বিজ্ঞান (Cosmography) এবং (৩) ফলিত জ্যোতিষ (Judicial astrology)—এই বিদ্যার (Science) সবিশেষ পারদর্শিতা লাভ না করিবেন, তিনি "জ্যোতির্ব্বিদ" নামে অভিহিত হইবার যোগ্য নহেন।— (৩)

সুপণ্ডিত জ্যোতির্ব্বিদ অল্ বেরুণীর পরই জ্ঞান-বিজ্ঞানের উজ্জল-মূর্ত্তি ওমর খৈয়াম জ্ঞানের উজ্জল বর্ত্তিকা হস্তে বিজ্ঞান জগতে আবির্ভূত হন।

মনীষার মূর্ত্ত অবতার ইমাম্ ওমর খৈয়াম্, সুলতান্ মলিক শাহের দরবারে বিজ্ঞান-পারিষদ শ্রেণীভুক্ত হইবার পর নিজ প্রতিভাগুণে "মুনাজ্জাম ই-শাহীর (রাজ-জ্যোতিষী) উচ্চপদে উন্নীত হন। সুলতান মলিক শাহের আদেশে তিনি ইরাণদেশের প্রচলিত পঞ্জিকার সংস্কার দ্বারা জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানে চরম জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়া গণিত বিজ্ঞানের মত জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানেরও অভূতপূর্ব্ব সংস্কার ও ঐ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন।

সুলতান মলিক শাহ বহুকাল হইতে পারস্যের প্রচলিত পঞ্জিকার সবিশেষ সংস্কার আকাঙ্ক্ষা মনে মনে পোষণ করিতেছিলেন, কিন্তু উপযুক্ত ব্যক্তির অভাব ও পঞ্জিকা সংস্কার-কার্য্য মুসলিম ধর্ম্ম-শাস্ত্রানুমোদিত হইবে কি না চিন্তা করিয়া এই কার্য্যে প্রথমতঃ অগ্রসর হইতে পারেন নাই। এই কারণ তিনি প্রথমেই ধর্ম্মতত্ত্ববিদ্ বিচক্ষণ উলেমাগণের সহিত এই বিষয়ে পরামর্শ করেন। উলেমাগণ একবাক্যে পঞ্জিকা-সংস্কারে অভিমত প্রদান করিয়া বলেন যে, উহা মুসলিম ধর্ম্মশাস্ত্রবিরোধী কার্য্য নহে। সকলেই সুলতানের শুভসঙ্কল্প—সংস্কার কার্য্য একবাক্যে অনুমোদন করেন।

সুলতান মলিক শাহ্ যে কারণে ইরাণের প্রচলিত পঞ্জিকার আমূলসংস্কার-প্রয়াসী হইয়াছিলেন, তাহা নিম্নে বিবৃত হইল। সুলতান অলপ্ অরসলানের মৃত্যুর পর মলিক শাহ্ রাজ্যভার গ্রহণ (৪৬০ হিঃ) করিয়া সুলতানপদে অধিষ্ঠিত হয়েন। রাজ্য-রশ্মি গ্রহণ করিবার পরও দেশ প্রচলিত পঞ্জিকানুসারেই রাজ্যশাসন-কার্য্য এবং রাজস্ব গ্রহণ-কার্য্য চলিতেছিল ; কিন্তু ইহা তাঁহার মনঃপুত ছিল না। কারণ তৎকালে সৌরমাস (১) হিসাবে রাজস্ব গ্রহণ করা হইত এবং চান্দ্রমাস (২) হিসাবে ব্যয় নির্ব্বাহ করা হইত। ইহাতে হিসাব রক্ষা কার্য্যের নানারূপ অসুবিধা হইত। এইভাবে রাজস্ব গ্রহণ ও ব্যয়ের হিসাবে দেখা গেল যে, এক বৎসর পরে (৪৬৭ হিঃ ১০৭৫ খৃঃ) রাজকোষ কপর্দ্দকশূন্য হইয়াছে। এই কারণে সুলতান প্রচলিত পঞ্জিকার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া রাজস্বগ্রহণ, রাজ্যশাসনকার্য্য এবং ব্যয়-নির্ব্বাহের সুবিধার জন্য চান্দ্রমাসের পরিবর্ত্তে সৌরমাস হিসাবে গণনা করাইয়া ইহার আমূল সংস্কারের জন্য দৃঢ় প্রয়াসী হন।

গণিতবিদ্ ও নজুমি (ফলিত জ্যোতিষী) হিসাবে ইমাম ওমরের যশঃ সমগ্র ইরাণের বাহিরেও বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। সুলতান, মন্ত্রী নিজাম-উল-মুলকের সহিত পরামর্শ করিয়া, মুনাজ্জম-ই-শাহী সুপণ্ডিত ওমর খৈয়ামকে পঞ্জিকা-সংস্কার কার্য্যের সম্পূর্ণ উপযুক্ত ব্যক্তি স্থির করিয়া তাঁহাকেই এই কার্য্যের ভার অর্পণ করেন। সুলতানের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া জ্যোতির্ব্বিদগণাগ্রগণ্য ইমাম্ ওমর খৈয়াম সানন্দে পঞ্জিকা-সংস্কার কার্য্যের গুরু দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। ওমরের পঞ্জিকা-সংস্কার কার্য্যের সুবিধার জন্য সুলতান মলিক শাহ ৪০৬ হিজরাব্দে (১০৭৪ খৃঃ) মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

৪৭১ হিজরাব্দে (১০৭৯ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ্চ তারিখে) ওমর পঞ্জিকা-সংস্কার কার্য্য আরম্ভ করেন। সাত জন সুবিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ লইয়া মন্ত্রণা-পরিষদ গঠিত হয়। এই সাত জন জ্যোতির্ব্বিদ ইমাম্ ওমর কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হন। ওমর পরিষদের সভাপতিরূপে কার্য্য করেন। যে সাত জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ জ্যোতির্ব্বিদ লইয়া মন্ত্রণা-পরিষদ গঠিত হয়, তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) খোয়াজা আবু হাতেম, উল মুজাফর্ ইল্ফারাজি। ইনি ওমরের সমসাময়িক ও বন্ধু ছিলেন। খোয়াজা গণিত-জ্যোতিষ-খগোলশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। এই তিন বিষয়ে তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থগুলি তাঁহার পাণ্ডিত্য প্রচার করিয়া তৎকালীন মুসলিম বিদ্বৎ-সমাজে তাঁহার স্মৃতিকে অমর করিয়া রাখিয়াছিল। তিনি বহু পরিশ্রম ও মস্তিষ্ক চালনা করিয়া বৈজ্ঞানিক রীতিতে একটি তুলাদণ্ড প্রস্তুত করেন। এই তুলাদণ্ড সম্বন্ধে নাতিবৃহৎ গ্রন্থও (Treatise) রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি তাঁহার তুলাদণ্ড সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, এই তুলাদণ্ড দ্বারা সূক্ষ্ম তৌল হইবে এবং বিশুদ্ধ স্বর্ণ

(১) ওমরের বীজগণিতের পরিচয় "গণিত-বিদ্ ওমর খৈয়াম" প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে প্রদত্ত হইয়াছে।

(২) চহার মকালা।

(৩) চহার মকালা।

(১) সূর্য্যের এক রাশি অতিক্রম করিতে যতদিন অতিবাহিত হয়, তত-দিনে এক মাস হয় এবং ঐ মাসকে সৌরমাস নামে অভিহিত করা হয়।

(২) এক তিথিতে এক চান্দ্র দিবস ; ৩০ তিথিতে অর্থাৎ শুক্ল প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত অথবা অন্য যে কোন এক তিথি হইতে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী তিথি পর্য্যন্ত ৩০ তিথিতে এক চান্দ্রমাস হয়।

অথবা খাদ মিশ্রিত স্বর্ণ অথবা রৌপ্য বুঝিতে পারা যাইবে। রাজকীয় ধনাগারের কঞ্চুকীর নিকট পরীক্ষার জন্য তাঁহার এই তুলাদণ্ডটি প্রেরণ করেন। কঞ্চুকী নিজ চৌর্য্য বিদ্যা প্রকাশ হইবার ভয়ে এই মূল্যবান সূক্ষ্ম তুলাদণ্ডটির এক অংশ ভগ্ন করিয়া কার্য্যের বহির্ভূত করিয়া দেয়। বহুদিবসের পরিশ্রম এবং মস্তিষ্ক চালনাপ্রসূত মূল্যবান তুলাদণ্ডটি কঞ্চুকী কর্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে, সংবাদ পাইয়া তিনি শোকে কাতর হন এবং ইহার কিছুদিন পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

(২) আবুল ফতেহ আবদুর রহমান খাজানি। ইনি মার্ভ প্রদেশস্থ এক ধনীর ক্রীতদাস ছিলেন। গণিত-বিজ্ঞানে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। সুলতান সঞ্জর সেল জুকীর রাজত্বকালে পঞ্জিকা সংস্কার করেন। এই পঞ্জিকা "সঞ্জরী পঞ্জিকা" নামে ইতিহাসে অভিহিত। ক্রীতদাস খাজানি ঈশ্বরপরায়ণ সাধু প্রকৃতির লোক ছিলেন।

(৩) মহম্মদ কাজীন। ইঁহার পরিচয় কিছুই জানা যায় না। গণিত এবং জ্যোতিষ বিজ্ঞানে তিনি যে নিশ্চিতই সুপণ্ডিত ছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। তাহা না হইলে তিনি কখনই ওমর কর্তৃক নির্ব্বাচিত হইতেন না।

(৪) হাকিম আবুল আব্বাস লুকরী। ইনি মারভের অন্তর্গত পনিজসে প্রদেশের অধিবাসী আমীর। ইতিহাসে হকিম (বিদ্বান) লুকরী নামেই পরিচিত। খোরাসানের সুপ্রসিদ্ধ বিদ্বান ও গণিতজ্ঞ বাহান ইয়ারের ছাত্র। খোরাসানে গণিত-বিজ্ঞান অনুশীলনের প্রচার হাকিম লুকরীর দ্বারাই হয়। তিনি গণিত-বিজ্ঞানে এরূপ সুপণ্ডিত ছিলেন যে, তাঁহার সমসাময়িক সুপণ্ডিত ইবন্ কোশাক্ এবং ওস্তি পর্য্যন্ত পাণ্ডিত্যে ইঁহার সমকক্ষ ছিলেন না। তিনি সুকবিও ছিলেন।

(৫) মায়মুন ইবন্ ওস্তি। ইনি প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ও গণিতজ্ঞ। উজীর নিজাম-উল মুলুক তাঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। গণিত-বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার গণিত-বিজ্ঞান গ্রন্থাবলী তৎকালে সাতিশয় প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল।

(৬) মহম্মদ বিন আহম্মদ্ মামুরি বাহকি। ইনি গণিত-বিজ্ঞানে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। পরিমিতি বিষয়ক গ্রন্থ তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক এবং মূল্যবান বলিয়া তৎকালে সাতিশয় প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। সুলতান মলিক শাহ তাঁহাকে ইস্পাহানের মানমন্দিরে গণিত এবং জ্যোতিষ অনুশীলনের নিমিত্ত আহ্বান করেন। ওমর খৈয়াম তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ হিসাবে সাতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। ইনি ইসমাইলি সম্প্রদায়ের ঘাতুক হস্তে নিহত হন।

(৭) আবুল ফতেহ ইবন কুশক্। সুলতান সঞ্জরের রাজত্বকালীন সুপ্রসিদ্ধ গণিতবিদ্। তৎকালে গণিতজ্ঞ হিসাবে তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। গণিত-বিজ্ঞান সম্বন্ধে কতকগুলি গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। সুলতান সঞ্জর তাঁহার গ্রন্থাবলী শ্রদ্ধার সহিত রাজ-পাঠাগারে স্থান দান করিয়াছিলেন।

সুদীর্ঘ তিন বৎসরকাল অনন্যসাধারণ অধ্যবসায়, প্রাণপাত পরিশ্রম ও মস্তিষ্ক চালনা করিয়া সাধক ওমর খৈয়াম সৌরমাস হিসাবে গণনা করিয়া ইরাণের প্রচলিত পঞ্জিকার আমূল সংস্কার করেন। এই সংস্কৃত পঞ্জিকা সুলতান জলালউদ্দিন মলিক শাহের নামে উৎসর্গ করেন। ইহাই তারিখ-ই জলালী (১) নামে ইতিহাসে বিঘোষিত।

জলালি অব্দ ৪৭১ হিজরাব্দ ১০ই রমজান সাব-ই-জুম্মার দিন (শুক্রবার ১০ই মার্চ্চ ১০৭৯ খৃঃ) হইতে আরম্ভ হয়। জলালি অব্দ প্রচলনের পূর্ব্বে সূর্য্য মীনলগ্নের অর্দ্ধ মধ্যাবস্থায় অবস্থান করিত বলিয়া ওমর খৈয়াম ফারওয়ার দিন (১) মাসের প্রথম হইতে যে সময় দিবা এবং রাত্রি সম অবস্থায় (Equinox) বিরাজ করিত, ঠিক সেই সময় হইতে বৎসর গণনা আরম্ভ করেন। যদিও এই সময় বৎসরের ২৮ দিন অতীত হইয়াছিল, তত্রাচ তিনি ফারওয়ার দিন মাস হইতেই বৎসর গণনা আরম্ভ করেন। খৈয়াম-পঞ্জিকার নব বৎসরের নাম "নওরোজ-ই-সুলতানী" নামে অভিহিত হয়।

পঞ্জিকা সংস্কাররূপ দুরূহ এবং দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য সমাধা করিয়া ওমর খৈয়াম সুলতান কর্তৃক আশাতীত প্রচুর পুরস্কার প্রাপ্ত হন ও রাজসম্মানে ভূষিত হন। সুলতানের মন্ত্রী, ওমরের বন্ধু সুপণ্ডিত নিজাম উল-মূলক লিখিয়াছেন, ওমর খৈয়াম পঞ্জিকা-সংস্কার—শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক প্রতিভার জন্য সুলতানের প্রশংসায় পুষ্পাঞ্জলী, বিদ্বানগণের উপযুক্ত উচ্চপদ যথোপযুক্ত রাজসম্মান ও জায়গীর লাভ করেন। (২)

১৫৮২ খৃষ্টাব্দে রোমীয় ধর্ম্মসম্রাট ত্রয়োদশ গ্রেগরীর রাজত্ব সময়ে খৃষ্ট পঞ্জিকার সংস্কার হয়। খৃষ্ট পঞ্জিকার সহিত ওমরের পঞ্জিকার তুলনা করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলী একবাক্যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, গ্রেগরীর পঞ্জিকা অপেক্ষা জলালী পঞ্জিকা সুসংস্কৃত (Perfect) এবং সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ। (৩) ওমর যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া পঞ্জিকা সংস্কার করেন, তাহা সর্ব্বাবস্থায় রাজ্যশাসন কার্য্যের সুবিধাজনক হইয়াছে। (৪) অপিচ ওমরের সংস্কার গ্রেগরীর সংস্কার হইতে সূক্ষ্ম ও সমীচীন। (৫) সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড গীবন (Edward Gibbon) জুলিয়স সীজর প্রবর্ত্তিত পঞ্জিকার সহিত ওমরের পঞ্জিকার তুলনা করিয়া বলিয়াছেন, জলালী পঞ্জিকা গণনার সূক্ষ্মতা, ভ্রমশূন্য হিসাবে জুলিয়স সীজর প্রবর্ত্তিত পঞ্জিকাকেও উৎকর্ষে অতিক্রম (Surpass) করিয়াছে। (৬) দুর্ভাগ্যের বিষয় জলালী অব্দ অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। মোট চৌদ্দ বৎসর কাল—যতদিন সুলতান মলিক শাহ্ জীবিত ছিলেন—ততদিন পর্য্যন্ত স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছিল। সুলতানের সমাধিলাভের সহিত তাঁহার সাধের "জলালী অব্দ"ও সমাধি লাভ করে। সুলতানের উত্তরাধিকারিগণ এই অব্দ রহিত করিয়া দিলেও, ওমরের নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান—"জলালী পঞ্জিকা"—যতদিন পৃথিবীতে জ্ঞানচর্চ্চার আদর থাকিবে, ততদিন অসামান্য প্রতিভার অধিকারী বৈজ্ঞানিক-শ্রেষ্ঠ ওমর খৈয়ামের নাম—কীর্ত্তি—স্মৃতি চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

ওমর যদি অন্য কোন গ্রন্থ রচনা না করিয়া একমাত্র পঞ্জিকা-সংস্কার করিয়া যাইতেন, তাহা হইলেও তাঁহার কীর্ত্তিস্মৃতি পৃথিবীতে অক্ষয় হইয়া থাকিত।

সুলতান মলিক শাহের দরবারে মুনাজেম-ই-শাহী (রাজজ্যোতিষী) রূপে ওমর যে কেবল পঞ্জিকা সংস্কার করিয়াছিলেন

(১) ওমর খৈয়ামের পঞ্জিকা-সংস্কার কার্য্য অতিশয় কৌতূহলোদ্দীপক, এ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত বঙ্গভাষায় কোন আলোচনাই হয় নাই। ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

(১) চৈত্রের প্রথম হইতে বৈশাখের তৃতীয় সপ্তাহ পর্য্যন্ত ফারওয়ার দিন মাস।

(২) নিয়ামৎনামা।

(৩) Macdonald's Muslim theology.

(৪) Introduction of Rubiyath of Umar Khoyyam translated by Whinfield,

(৫) Renanld's Geographie Abul Feda.

(৬) The decline and fall of the Roman Empire by E Gibbon.

তা নহে। পঞ্জিকা সংস্কার ব্যতীত গণিতবিদ্ ও জ্যোতির্ব্বিদগণের গণনা কার্য্যের সুবিধার জন্য জীচ্ (জ্যোতিষিক-তালিকা) প্রণয়ন করেন। ইহাকেও তিনি রাজভক্তির নিদর্শনস্বরূপ সুলতান মলিক শাহের নামে উৎসর্গ করেন। এই তালিকাই ইতিহাসে "জীচ-ই-মলিক-শাহী" নামে পরিচিত।

এতক্ষণ আমরা ওমরের সৃষ্টি-বিজ্ঞান বিষয়িণী প্রতিভার পরিচয় দিয়াছি। এইবার আমরা ফলিত-জ্যোতিষশাস্ত্রে তাঁহার পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি। অলবেরুণী এক কথায় ফলিত-জ্যোতিষ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, ফলিত-জ্যোতিষ প্রাকৃত বিজ্ঞানের শাখা মাত্র এবং ভবিষ্য কথন—(prognostication) সম্পর্কেও ব্যবহৃত হয়। জ্যোতিষ-গণনায় ওমরের ভবিষ্যদ্বাণী কিরূপ সফলতা লাভ করিয়াছিল, তাহা তাঁহার প্রিয় ছাত্র সুপণ্ডিত নিজামী অরুজী প্রদত্ত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যায়।

নিজামী-অরুজী লিখিয়াছেন,—৫০৬ হিঃ অব্দে (১১১২-১৩ খৃঃ) খোয়াজা ইমাম্ ওমর খৈয়াম এবং খোয়াজা ইমাম্ মুজাফর-ই-ইস্ফাজারী বল্‌খ নগরে আমীর আবু সাদের গৃহে উৎসব-আমন্ত্রণে গমন করেন। আমিও নিমন্ত্রিত হইয়া এই উৎসব-সভায় উপস্থিত ছিলাম। আমরা একত্র ভোজনে বসিয়াছি। সরস কথাবার্ত্তার সহিত আমাদের ভোজন চলিতেছে। আমাদের কথাবার্ত্তার মাঝখানে "হুজ্জৎ-উল্-হক্" (সত্যের প্রমাণ-স্বরূপ) ওমর খৈয়াম বলিলেন, "আমার সমাধি এমন স্থানে হইবে, যেখানকার পুষ্পবৃক্ষ আমার সমাধির উপর বৎসরে দুইবার পুষ্পবর্ষণ করিবে।" তাঁহার এই অদ্ভুত ভবিষ্যদ্বাণী তখন আমি মোটেই বিশ্বাস করিতে পারি নাই।—উপরন্তু অসম্ভব বলিয়াই আমার মনে হইয়াছিল। খোয়াজা ইমাম্ ওমর খৈয়াম মিথ্যা কথা বলিবার লোক ছিলেন না, ইহাও জানিতাম। তত্রাচ তখন আমি তাঁহার কথা বিশ্বাস করিতে পারি নাই। কিন্তু পঁচিশ বৎসর পরে আমার এ ভ্রম ঘুচিয়াছিল। ৫৩০ হিজরাব্দে আমি যখন নিশাপুরে উপস্থিত হই, তিনি তখন ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। সেই সময় তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণীর কথা স্মরণ হয়। তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী কিরূপ সফল হইয়াছে, দেখিবার জন্য একজন পথিপ্রদর্শক সঙ্গে লইয়া সাব-ই-জুম্মার দিন (১) সন্ধ্যার সময় তাঁহার সমাধি মন্দির দর্শন করিতে যাই। পথিপ্রদর্শক আমাকে "হীরা" সমাধি-উদ্যানে উপস্থিত করে। এই সমাধি-উদ্যানের বাম কোণের দেওয়ালের নিকট তাঁহার সমাধি অবস্থিত। ওমরের সমাধির চারিধার লাল পীচ্ এবং ন্যাসপাতি ফুলে এরূপ আচ্ছাদিত যে, সমাধির চিহ্নমাত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বল্‌খনগরে উচ্চারিত তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণীর প্রত্যেক বাক্যটি আমার স্মরণপথে উদিত হয়। তাঁহাকে স্মরণ করিয়া আমি তাঁহার সমাধির পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া কেবল ক্রন্দন করিয়াছি। ভগবান্ তাঁহার পরলোকগত আত্মার কল্যাণ করুন এবং তাঁহাকে শান্তিতে রাখুন। তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণীর প্রত্যেক বাক্যটি সফল হইয়াছে দেখিয়া তাঁহার উদ্দেশে বার বার প্রণাম করি (২)

নিজামী-অরুজী ওমর খৈয়ামের আর একটি ভবিষ্যকথনের উল্লেখ করিয়াছেন। ৫০৮ হিজরাব্দে (১১১৪-১৫ খৃঃ) বোখারার সুলতান খাকান-সামস্-উল-মুলক মারভনগরে তাঁহার মন্ত্রী সদরউদ্দিন মহম্মদ বিন্ আল্ মুজাফারকে আদেশ করেন,—জ্যোতির্ব্বিদ ওমর যেন তাঁহার শিকার-যাত্রার শুভদিন স্থির করিয়া দেন। এই দিনটির আকাশ যেন পরিষ্কার ও মেঘশূন্য হয়। ইমাম ওমর খৈয়াম এই সময় মন্ত্রীর গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। দুই দিন বিশেষ সাবধানতার সহিত গণনা করিয়া তিনি সুলতানের আদেশমত শিকার-যাত্রার শুভদিন স্থির করেন। ওমর খৈয়ামও সুলতানের সহিত শিকারযাত্রার সঙ্গী হন। সুলতান ঘোটকারোহণ করিয়া কিয়দ্দূর গমন করিলে আকাশ আশ্চর্য্যরূপে মেঘাচ্ছন্ন হয়। আকাশমণ্ডল কুয়াসায় আচ্ছন্ন হইয়া যায়। রাজপারিষদবর্গ ওমরের উদ্দেশে বিদ্রূপোক্তি করিতে থাকেন। সুলতান বিমর্ষচিত্তে গৃহপ্রত্যাগমনের আদেশ দেন। খোয়াজা ইমাম ওমর, সুলতানকে প্রবোধ দিয়া বলেন, সুলতান! আপনার চিন্তিত হইবার কোন কারণ নাই। এক ঘণ্টার মধ্যে শীঘ্রই আকাশ মেঘশূন্য হইবে; এমন কি, পাঁচ দিন পর্য্যন্ত আকাশের অবস্থা এইরূপই থাকিবে। সুতরাং গৃহে ফিরিবার প্রয়োজন নাই। সুলতান ওমরকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন, তাঁহার কথার উপর নির্ভর করিয়া পুনর্যাত্রা করেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সফল-সাধক ওমর খৈয়াম যেরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রত্যেক বাক্যটি সফল হইয়াছিল। (১)

জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানে অসাধারণ পণ্ডিত অল বেরুণী যে জ্যোতির্ব্বিদের সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তেমনি জ্যোতিষীর কি কি গুণ থাকা আবশ্যক, তৎসম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—কুশাগ্রবুদ্ধিসম্পন্ন, স্থিরচিত্ত, দৃঢ়চরিত্র ও তীক্ষ্ণ স্বাভাবিক জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া জ্যোতিষীর সর্ব্বতোভাবে আবশ্যক। ইহার একটির অভাব ঘটিলে এই ব্যবসায়ে তিনি উন্নতিলাভ করিতে পারিবেন না।

ওমর খৈয়াম সূক্ষ্ম গণনা বা বিচার দ্বারা যে সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার স্থিরচিত্ততা, তীক্ষ্ণ স্বাভাবিক জ্ঞান ও কুশাগ্রবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। এই সকল গুণগ্রামের অধিকারী না হইলে তিনি কখনই পঞ্জিকা-সংস্কাররূপ দুরূহ কার্য্য সমাধা করিয়া সুপণ্ডিত অল বেরুণীর বাক্যের যাথার্থ্য সম্পাদন করিতে পারিতেন না। পক্ষান্তরে এই সকল গুণগ্রামের অধিকারী ছিলেন বলিয়াই জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানে অতুলনীয় প্রতিভার পরিচয় প্রদান এবং মুসলিম জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান-সাহিত্যকে অভাবনীয়রূপে সমৃদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

সারণী বা জ্যোতিষিক তালিকা রচনা ব্যতীত ইমাম ওমর জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক ভাল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থের মত এইগুলিও লোকলোচনের বহির্ভূত হইয়াছে। কেবলমাত্র "মানরত্ন-বিজ্ঞান" নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি বার্লিন পাঠাগারে রক্ষিত আছে। (২)

জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানে ইমাম ওমর খৈয়াম যেরূপ চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়া অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, পঞ্জিকা-সংস্কার, জ্যোতিষিক-তালিকা প্রণয়ন এবং ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা হইতে বুঝিতে পারা যায়; বৈজ্ঞানিক-জগতে তাঁহার স্থান কোথায় এবং বিজ্ঞান-সাহিত্য তাঁহার দ্বারা কিরূপ সমৃদ্ধ হইয়াছিল, নিম্নলিখিত চরিতাভিধানকারগণের উক্তি হইতেও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

ঐতিহাসিক ও ভূগোলবিদ্যাবিশারদ হামদুল্লা মুস্তওফি বলিয়াছেন, খোয়াজা ইমাম ওমর খৈয়াম বিজ্ঞানের সকল বিভাগেই বিশেষতঃ জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানে তৎকালীন জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও বিশেষজ্ঞ ছিলেন। (৩) চরিতাভিধানকার জমলউদ্দিন অলকাফতি লিখিয়াছেন, হাকিম (বিদ্বান্) ওমর খৈয়াম তৎকালীন যুগে একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, দর্শন ও বিজ্ঞানশাস্ত্র (বিশেষতঃ জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানে) অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। (৪) চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে লিখিত আর একখানি

(১) শুক্রবার দিন আত্মীয়-বন্ধু গুরুজনের সমাধিদর্শন করিবার শ্রেষ্ঠ সময়।

(২) চহার মকালা।

(১) চহার মকালা।

(২) Catalogue of Persian and Arabic Manuscripts by Dr. Charles Reind.

(৩) তারীখ-ই-গুজিদা।

(৪) তারীখ-উল-হুকুমা।

চরিতাভিধানে ওমরের জ্যোতির্বিজ্ঞান-প্রতিভা ও জ্ঞান সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ লিখিত আছে:—ওমর-বিন-ইব্রাহিম-অল-খৈয়ামী তাঁহার যুগে একজন অসাধারণ জ্ঞানী এবং জ্যোতিষশাস্ত্রে জ্ঞানের জন্য অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। (১) জ্ঞান-বিজ্ঞানের উজ্জ্বল আধার ইমাম ওমর খৈয়াম জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রত্যেক বিভাগে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে তাঁহার গুরু বা ওস্তাদ আবু-মিনার সহিত তুলনা করিয়া ওমরকে "আবু-মিনার" অবতার আখ্যায় অভিহিত করিয়া সম্মান দেখাইয়াছিলেন। (২)

শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী।

পরলোকের কাহিনী

অমৃতের পুত্র আমরা, "হা অর্থ যো অর্থ করিয়া ছুটিতেছি, সুখের আশায় দুঃখের পুত্তলিকে জড়াইয়া ধরিতেছি। চক্ষু সুন্দরী তরুণীর আরক্ত কপোল-আভা দেখিবার জন্য আকুল, শ্রবণ কামকলার মোহময় সঙ্গীত শুনিবার জন্য পাগল। পরলোকের কথা কে শুনিবে? মৃত্যু শিয়রে—পরলোকের অজানা পথে সকলকেই যাইতে হইবে এই চিন্তা যাঁহারা ক্ষণেকের জন্য করেন—তাঁহারা শুনিতেও পারেন। শুনিতে পাই অনেকে গল্প উপন্যাস ছাড়া বড় কিছু পড়েন না, তাঁহারা কাহিনী বলিয়া পড়িতেও পারেন, তাই নাম দিলাম—"পরলোকের কাহিনী"।

লোক দুইটি.—এক ইহলোক, স্থূল। অপর পরলোক, সূক্ষ্ম। ইহলোক জাগরণবৎ, পরলোক স্বপ্নবৎ। ইহলোকের সুখদুঃখ দেহেন্দ্রিয়-চিত্তসংবেদ্য। পরলোকের সুখদুঃখ মাত্র মানসিক। ইহলোকের প্রতিচ্ছবি হইয়াও পরলোকে এমন কিছু থাকে, যাহা ইহলোকে কল্পনার সামগ্রী, প্রত্যক্ষ নহে। ঐহিক দেহ রক্তমাংসময়। পারলৌকিক দেহ মনোময়—"মনোময়ানি হি শরীরাণি।" পারলৌকিক ভোগও সংস্কারমূলক—"সংস্কার মূলাস্তত্র ভোগাঃ।"

মৃত্যুর পর যাঁহারা শ্রীভগবান্‌কে লাভ করে, তত্ত্বজ্ঞান-অস্ত্রে আসক্তি-বন্ধন ছিন্নকরতঃ মুক্ত হয়—তাহারাই মর্ত্ত্যে আর জন্মগ্রহণ করিতে আইসে না—"ন চ তে পুনরাবর্ত্তন্তে" আসক্তিপরায়ণ ঐহিকসুখান্বেষী ব্যক্তি মৃত্যুর পর বারংবার মৃত্যুকেই প্রাপ্ত হয়। জন্মমরণরূপ সংসারই মৃত্যু।

"জন্মিলে মরিতে হবে" ইহা প্রত্যক্ষ সত্য, কিন্তু "ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ" মরিলে জন্মিতে হবে—আমাদের নিকট ইহাও প্রত্যক্ষবৎই সত্য।

মুক্ত বা ভগবৎপ্রাপ্ত ব্যতীত (তা পুণ্যবান্ বা পাপী যাহাই হউক) সকলকেই স্থূলদেহের পর অপর স্থূলদেহ গ্রহণ করিতে হইবে। (১) কাহারা মৃত্যুর পরক্ষণে, (২) কাহারা এক বৎসরের মধ্যে বা পরে; (৩) কাহারা বা অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য নবজন্ম গ্রহণ করে।

(১) অতি শৈশবে যাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সেই শিশুদের জলৌকাবৎ তৎক্ষণেই নূতন স্থূলদেহপ্রাপ্তি ঘটে, অথবা দেহপ্রাপ্তির যোগ্য অবস্থায় আসিয়া থাকে। (যোগ্য অবস্থা শস্যসংশ্লেষ, স্থাবরাশ্রয় অবস্থা) ইহা বোধ হয় কাহাকে বলিয়া দিতে হইবে না যে, অতি শৈশবে কোন শিশুরই "আমার ইত্যাকারক দেহ" এরূপ সুস্পষ্ট জ্ঞান ফুটে না বা মৃত্যুকালে ঐরূপ সংস্কার লইয়া যাওয়া সম্ভব নহে। কাযেই পূর্ব্বদেহের অনুরূপ কোন ছায়াদেহ—তৎসংস্কারমূলক কোন সংস্কারমূলক দেহ ঐ শিশুরা গ্রহণ করিতে পারে না। এই ছায়াদেহ—ছায়াময়, সংস্কারগঠিত, বায়বীয়, অপার্থিব এক প্রকার সূক্ষ্মদেহ।

"সপ্তদশলিঙ্গোপেতো জীবো ম্রিয়তে।" (সপ্তদশ লিঙ্গ-সূক্ষ্ম চক্ষুরাদি লইয়া মন-উপাধিক প্রাণময় জীব)। স্মৃতিশাস্ত্রে এই দেহই প্রথম কয় দিন আতিবাহিক দেহ, তৎপরে * প্রেতদেহ।

অতি শৈশবে মৃত্যুপ্রাপ্ত হওয়ায় সে জন্মে কোন পাপপুণ্য অনুষ্ঠিত হয় না, এ জন্য কর্ম্মানুগুণ কোন গতিলাভে শিশুরা বাধ্য নহে। দাঁড়াইল—প্রথম অনুকূল কারণবশতঃ, দ্বিতীয় প্রতিকূল বাধার অভাব হেতু শিশুদের ছায়াদেহ ধারণ না হইয়া একবারেই স্থাবরসংশ্লেষ (যাহা জীবমাত্রেরই জন্মের দ্বার) প্রাপ্তি ঘটে। বাধা না থাকিলে নূতন জন্মলাভ—অর্থাৎ নব স্থূলদেহ গ্রহণ জীবের স্বভাবনিয়ত পরিণতি।

শিশুরা ছায়াদেহে থাকে না, পরলোকে বায়ুভূত বা নিরালম্ব হইয়া বিচরণ করে না। কর্ম্মানুগুণ পারলৌকিক সুখ-দুঃখও ভোগ করে না—এইজন্য—তাহাদের মধ্যে শ্রাদ্ধ তর্পণের ব্যবস্থা নাই। অতি-শিশুর দাহ পর্য্যন্ত নাই। ঐ শিশুদের পক্ষে পারলৌকিক চিকিৎসা কোন উপকারে আইসে না।

(১ ক) শিশু-অবস্থায় মৃত্যু সর্ব্বত্রই যে পাপের পরিচায়ক, তাহা নহে। কোন কোন জ্ঞানী, যোগী, ভগবদ্ভক্ত মুক্তিলাভের উপযুক্ত সাধনা করিয়াও দেহাসক্তিটি সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে পারেন নাই, ঐ আসক্তিরূপ কথঞ্চিৎ প্রারব্ধের ফলে একবার জন্ম-মৃত্যুরূপ দুঃখ ভোগ তাঁহাদিগকে করিয়া যাইতে হয়। সে শিশুজন্মে মাত্র প্রারব্ধ ক্ষয় হয়, নূতন কোন কর্ম্মের সৃষ্টি হয় না। ইহারা দৈব শিশু আখ্যায় অভিহিত হইবার যোগ্য। ইহারা অসাধারণ বুদ্ধিমান্, অসামান্য ভাবান্বিত হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

(১ খ) শিশু-অবস্থায় মৃত্যুতে কখন কখন কেবল পাপের ক্ষয়ই হয়। দুই তিন বার বা তদধিক কেবল জন্মমরণ দুঃখভোগই ভুগিতে হয়। ক্ষুদ্র কর্ম্মা, ক্ষুদ্র প্রাণ এই সকল নরনারী কোন কোন ক্ষেত্রে একই বয়সে এই রোগে মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই শিশু বয়সে মৃত্যু, পশুজন্মের মত পাপক্ষয়কর। অনেক ক্ষেত্রে ঐ শিশুরা একই গ্রামে একই বাটীতে হয় ত বা একই পিতামাতার সন্তান হইয়া † জন্মগ্রহণ করে। তবে তাহাদের জন্মান্তর স্মৃতি যে উদ্রিক্ত হয় না—তাহার কারণ, শিশুবেলা দর্শন-শ্রবণাদির সহিত জন্মান্তর দর্শনস্পর্শনাদির পার্থক্যবোধের অভাব। শিশু বলা দেখিয়া শুনিয়া আইসে বলিয়া জন্মান্তরদৃষ্ট—এ সন্দেহই তাহাদের জন্মে না।

(১ গ) মানব যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন পূর্ব্বজন্মের পুণ্য এবং পাপ—শুভ এবং অশুভকর্ম্ম লইয়াই আসিয়া থাকে, কিন্তু বিধাতা সৃষ্টির নিয়মানুসারে কখন কখন মানবকে এমন অবস্থায় আনিয়া দেন, যখন তাহারা পূর্ব্বজন্মের কোন শুভ অশুভকর্ম্মের জের না টানিয়া প্রথম হইতেই জীবন আরম্ভ করিতে পারে। পূর্ব্বজন্মের প্রারব্ধ (ফলোন্মুখ কর্ম্ম), সঞ্চিত (অফলোন্মুখ) ব্যতীত ক্রিয়মাণ (যাহা নূতন করা হইবে) কর্ম্মে মানবমাত্রেরই স্বাধীনতা আছে। মানব ত জড়যন্ত্র নহে যে, তাহার নূতন কর্ম্মে অধিকার থাকিবে না। অধিকার আছে বলিয়াই মানব এক জন্মেই দেবতা ও দানব হইতে পারে, সম্মানিত ও ঘৃণার্হ হইতে পারে। মানব জড়যন্ত্র—"ক্রিয়মাণ কর্ম্মে তাহাদের স্বাধীনতা নাই" মানিলে পুণ্যপাপের আর পুরস্কার দেওয়া চলে না বা ভালমন্দের বিচার করাও চলে না। এই প্রথম হইতে জীবন আরম্ভ করিয়া নিজের শক্তিতে অভ্যুদয় লাভ কর, শ্রেয়ের সন্ধানে যাও, কিংবা পতন প্রাপ্ত হও, প্রেয়কেই আলিঙ্গন করিয়া

---

(১) কারলৌস-উৎ-তওয়ারীখ।

(২) লেখকের অপ্রকাশিত গ্রন্থ "ওমর খৈয়াম" পুস্তকের এক পরিচ্ছেদ।

* প্রেতদেহ—ভৌতিকযোনি নহে। ভৌতিকযোনি অর্থে ভৌতিক জন্ম।

† আমাদেরই বাটীতে এরূপ ঘটনা হয়। এ প্রবন্ধে ও নাম দেওয়া থাকিবে না মনে করিয়া দিলাম না।

থাকে। প্রথম হইতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে যে কর্ম্মের অবশিষ্ট অংশ থাকিয়া যায়, তাহাই শিশুরূপে জন্মিয়া ক্ষয় করিয়া যাইতে হয়। এই শিশু-অবস্থার ভাল কি মন্দ, তাহা পরবর্ত্তী জীবনের গতি না দেখিলে বলা যায় না।

(২) সাধারণ পুণ্যপাপকারী ব্যক্তিরাই এক বৎসরের মধ্যে বা পরে নূতন জন্মলাভ করে। কিন্তু ঐ জন্মলাভ করিবার দ্বার-স্বরূপ স্থাবর-সংশ্লেষের পূর্ব্বে ঐ পরিমিত কাল তাহাদিগকে এক প্রকার সূক্ষ্ম ছায়াময় দেহে অবস্থিতি করিতে হয়। *

আসক্তিপরায়ণ, ইহসর্ব্বস্ব, (না পারলৌকিকার্থ পুণ্য, না উৎকট-পাপকারী) ভোগকেই পুরুষার্থবোধে আলিঙ্গনকারী ব্যক্তিরাই সাধারণ পুণ্যপাপকারী মধ্যে পরিগণিত। ইহারাই এক বৎসরের মধ্যে বা পরে মর্ত্ত্যে জন্মগ্রহণ করে।

"পূর্ণে সংবৎসরে প্রাপ্তে দেহমন্যং প্রপদ্যতে", পূর্ব্বে স্থূলদেহের আসক্তি কাটিতে বড় জোর (জ্বরের ৪৮ দিন বাড়ের মত) এক বৎসর লাগিতে পারে। ইহা প্রকৃতির নিয়ম। প্রার্থনা, শ্রাদ্ধাদি, রোগের চিকিৎসার মত প্রকৃতিরই সহায়তা করিয়া থাকে। চিকিৎসা না করিলে মানবরা মারা পড়িত তাহা নহে; (মানবেতর জীবরা ত বাঁচিয়া থাকে) অথচ চিকিৎসার উপযোগিতা নাই, এমতও বলা চলে না।

পার্থিব স্থূলদেহের উপর আসক্তি বা মায়া জীবের স্বাভাবিক। ঐ স্থূলদেহ ত্যাগ করিবার সময়ে দেহী যেমন আকুলি-বিকুলি করে, লিঙ্গদেহেও পুনর্জ্জন্ম অর্থাৎ স্থূলদেহের জন্য ততোধিক উন্মত্ত হইয়া থাকে। তবে পূর্ব্ব স্থূলদেহের উপর যতদিন আকর্ষণটি না কমিয়া যায়, ততদিন নূতন স্থূলদেহপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাটি বলবতী হয় না। পূর্ব্ব-দেহের উপর যে পরিমাণে আকর্ষণ কমিবে নূতন দেহলাভের ইচ্ছা সেই পরিমাণে বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে; (এ ইচ্ছা জীবের স্বাভাবিক)। পক্ষান্তরে নব-দেহলাভের আকাঙ্ক্ষা বর্দ্ধিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ব দেহের আকর্ষণ ক্ষীণ হইয়া শেষে লুপ্ত হইয়া যাইবে। চক্ষুর উপর প্রিয় দেহ দগ্ধই দেখুক, সমাধিগ্রস্তই দেখুক বা কিছু নাই দেখুক, যখন ঐ দেহ আর পাইবার নহে এই ধারণা জন্মিবে, তখন ক্রমে ক্রমে স্থূল-দেহের (পূর্ব্ব) উপর সে মমত্ববুদ্ধি লোপ পাইবে। এ সময় সেই পূর্ব্বদেহের ছায়া আকারটি স্মৃতিরেখাটির মত ধীরে ধীরে ক্ষীণ, ক্ষীণতর, ক্ষীণতম হইয়া শেষে মিলাইয়া যাইবে। স্বপ্নভঙ্গে স্বপ্নদৃষ্ট মূর্ত্তির মত ঐ সংস্কারমূলক ছায়াদেহটি জীব হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। তখন ঐ জীব ছায়াকার ত্যাগ করত সূক্ষ্মতম অণুরূপে স্থাবরাদিতে লগ্ন হইয়া থাকে। ঐ লগ্ন হওয়ার নামই সংশ্লেষ। স্থাবরাদিতে পড়িয়া যখন জীব স্থাবরসংশ্লেষপ্রাপ্ত (শস্যাশ্রয়ী) হয়, তখন স্থাবরের ছেদনে, ভেদনে বা পেষণে তৎস্থিত জীবের কোন কষ্টই অনুভূত হয় না। সে অবস্থায় জীব সংমূর্চ্ছিতবৎ সুষুপ্তবৎ অবস্থিতি করে। "সংমূর্চ্ছিতবদবতিষ্ঠন্তে কণ্ডনপেষণাদিনা নানুভবঃ" ইতি ছান্দোগ্যভাষ্য। এ সংশ্লেষ (শস্যাশ্রয়ত্ব) কি পাপী, কি পুণ্যবান্, কি অপাপবিদ্ধ যোগী প্রভৃতি সকলেরই জন্মের দ্বার।

যে কয়মাস জীবের নূতন স্থূলদেহ লাভ না ঘটে, তাবৎকাল দেহী ছায়াদেহে থাকিয়া বায়ুভূত নিরালম্ব হইয়া অন্তরীক্ষে বিচরণ করে। "বায়ুভূতো নিরালম্বঃ" ইত্যাদি।

স্থূলদেহের সংস্কারমূলক অপার্থিব সূক্ষ্মদেহকে ছায়াদেহ বলে। "আমার এইরূপ দেহ" ইত্যাকার সংস্কারটি বলবদ্রূপে দেহীর মনে প্রাণে বিজড়িত থাকে বলিয়া মৃত্যুকালে দেহী ঐ ছায়াদেহ গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করে। স্মৃতিশাস্ত্রে এই ছায়াদেহের নামই—আতিবাহিক দেহ, প্রেতদেহ।

এই ছায়াদেহ জন্মের দ্বার বলিয়া বিশ্বের নরনারী (মুক্ত ও শিশুগণ ব্যতীত) সকলকেই এই ছায়াদেহকে বাধ্য হইয়াই গ্রহণ করিতে হয়। এই ছায়াদেহকে (বা প্রেতদেহকে) কেহ যেন ভৌতিক যোনিদেহ বলিয়া বুঝিবেন না। (ভৌতিকযোনি ইহ-পরলোক,—স্থূল, সূক্ষ্ম, পার্থিব, অপার্থিব মিশ্রিত একটি জন্মবিশেষ)। ছায়া-দেহে পাপপুণ্যের ফলভোগ নাই। উহা বিচারের পূর্ব্বে কতকটা হাজতবাসের মত মাত্র। পরলোকে দেহীরা ছায়াদেহে বিচরণাদি করে মাত্র, পুণ্যপাপের ফলভোগ করে না। (ফলভোগ—জন্মান্তরে বা স্বর্গ-নরকে ভোগদেহে)। এই ছায়াদেহে অবশ্য জীবদ্দশার যাবতীয় সংস্কার ক্ষুধাতৃষ্ণা, কতকটা মায়ামমতা বা সাধারণ সুখদুঃখানুভূতি বিদ্যমান থাকে। ক্লান্তি, অবসাদ, স্বস্তি, বিশ্রান্তিও তাহাদের না ঘটে এমত নহে। এই ছায়াদেহের প্রত্যক্ষ দর্শন করিবার মত মহত্ত্ব (স্থূল পরিমাণ) নাই বলিয়া লোকচক্ষুর গোচরে আইসে না; কদাচিৎ যদি আইসে—উহা নিয়মের ব্যভিচার মাত্র।

ভাবনা-ধারার বিচ্ছেদে এই ছায়াদেহচ্যুতি—প্রকৃতির সাধারণ নিয়মানুসারেই ঘটে। স্থাবর-সংশ্লেষ, পশ্চাৎ খাদ্যাদির ভিতর দিয়া জন্মদাতার শরীরে প্রবেশ—বিধাতারই অচিন্ত্য অপরিমেয় লীলা। প্রার্থনা, শ্রাদ্ধ তর্পণাদি আধ্যাত্মিক চিকিৎসা প্রকৃতির মাত্র কোন কোন বিষয়ে আনুকূল্য করে। চিকিৎসা না থাকিলে মানুষরা মরিত না, তাহা নহে অথচ চিকিৎসার উপযোগিতাও নাই বলা চলে না। মৃতের উদ্দেশ্যে ভগবৎসমীপে প্রার্থনা, ফল-পুষ্প-খাদ্যাদি দান—সমন্ত্রক শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি—সমস্তই আধ্যাত্মিক চিকিৎসাবিশেষ।

এই সাধারণ পুণ্যপাপকারী নরনারী দেহত্যাগ কারবামাত্র (সপ্ত-দশলিঙ্গোপেত জীব) প্রথমতঃ দূরে অতিদূরে চলিয়া যায়। প্রথমতঃ একটু স্বস্তিবোধ করিলেও কিয়ৎক্ষণ পরে দেখে—"কই, এ দেহ ত ঠিক সে দেহ নহে।" কেহ কেহ মৃত্যুস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হয়, কেহ কেহ শ্মশানে চক্ষুর উপর আপনার প্রিয় দেহ ভস্মীভূত হইতেও দেখে। পিতা মাতা, স্বামিপুত্র, ভ্রাতা-ভগিনী, স্ত্রী-কন্যা প্রভৃতি আপনার জনকে কেহ দেখিতে বা দেখা দিতে আইসে, কিন্তু তাহাতে পূর্ব্বের সে তৃপ্তি হয় না। আপনাকে দেখা দিয়া যে সুখ, তাহাও লাভ হয় না। কাজেই আকাঙ্ক্ষা আর থাকে না কিন্তু সাধারণ নরনারী মরণের পরে আপনাদের নব নব কর্ম্মজালে, নানাবিধ পুণ্যপাপ-পাশে এমনভাবে আবদ্ধ থাকে, নিজের সুখ-দুঃখ, তৃপ্তি-অতৃপ্তি লইয়া এমনভাবে জড়াইয়া পড়ে অর্থাৎ এক কথায় আপনার ধান্দায় এরূপ ঘুরিয়া মরে—তখন তাহাদের কোথায় বা স্বামিপুত্র কোথায় বা পুত্রকন্যা। সে সময়ে তাহাদের অবস্থা ক্ষিপ্ত শৃগালদষ্ট, জলাতঙ্ক রোগগ্রস্ত ব্যক্তির মত। তবে ইহাও সত্য, আপনার জনের উপর সে আসক্তি থাকে না বটে, কিন্তু যদি সেই আপনার জন প্রত্যক্ষ আইসে, তখন আবার ঐ আসক্তিই প্রবল হইয়া দেখা দেয়। এমন কি, সেই আসক্তি সূক্ষ্মভাবে জন্মান্তর পর্য্যন্ত অনুবর্ত্তন করে।

আমাদের দর্শনশাস্ত্রে বলে, উদ্বোধের কারণ সম্মুখে পড়িলে জন্মান্তর স্মৃতি স্ফুট হউক অস্ফুট হউক ফুটিবেই। উদ্বোধের কারণটি সম্মুখে উপস্থিত হয় না বলিয়াই জন্মান্তর স্মৃতি ফুটিতে দেখা যায় না।

পূর্ব্বজন্মের শুভাশুভ কর্ম্ম, বিশেষ বিশেষ সাধনা পরজন্মে অনুবর্ত্তিত হয়, আর জন্মান্তর-স্মৃতিই বা অনুবর্ত্তিত না হইবে কেন?

কালিদাসের শ্লোকটি মনে পড়িতেছে,—

"রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্য্যুৎসুকো ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্ব্বং ভাবস্থিরাণি জননান্তর-সৌহৃদানি॥"

* পারলৌকিকার্থ পুণ্যকারী ব্যক্তি স্বর্গলোকে, উৎকট পাপকারী নরকে গমন করে। উহারা সাধারণ পুণ্যপাপকারী নহে।

কিছুদিন পূর্ব্বে এমন একটি ঘটনা ঘটে—যাহা আমাদের এই কথার পরিপোষক প্রমাণ। এক ব্যক্তি পরিবারবর্গ লইয়া মথুরাতীর্থ-ভ্রমণে গমন করিতেছিল। সঙ্গে একটি নবম বৎসরের বালিকা ছিল। পথিমধ্যে একটি স্থান দেখিয়া বালিকাটির চিত্তে জন্মান্তরস্মৃতি ফুটিয়া উঠিল; সে বলিল, "এ স্থান আমি চিনি; এই গলির ভিতর আমার বাড়ী, সেখানে আমার ছেলে মেয়েরা আছে "

বালিকাটি ছুটিয়া গলির মধ্যে গেল এবং একটি বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। তৎপরে পুত্রের ও বউমার নাম ধরিয়া ডাকিল এবং এমন অনেক কথা কহিল—যাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়া সকলেই বুঝিল—বালিকার কথাটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী।

ভারতে সূর্য্যপূজায় দার্শনিক তত্ত্ব

বস্তুতন্ত্রতা ব্যতীত মানুষের মন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে নাই। প্রকৃতির দৃশ্যপদার্থসমূহ প্রথমে তাহার নয়ন আকৃষ্ট করিয়াছিল, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুই তাহার নিকট প্রতিভাত হইয়াছিল। জড় প্রকৃতির সমস্ত দৃশ্য পদার্থের মধ্যে সূর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল, প্রভাময় ও ভাস্বর। এই জন্য সর্ব্বপ্রথমে সূর্য্য যে আদি-মানবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সভ্যতার প্রথম স্তরে সূর্য্য দেবতারূপে পরিগণিত হইলেও অজ্ঞ মানুষ তাঁহার উদ্দেশে প্রিয় বস্তু উৎসর্গ করিত, কিংবা অভীপ্সিত বস্তু প্রার্থনা করিয়া ভক্তি প্রকাশ করিত। সভ্যতার দ্বিতীয় স্তরে অপেক্ষাকৃত উচ্চ ধারণা বর্ত্তমান ছিল। এই অবস্থায় বহুবিধ ক্রিয়াকলাপ, বিধিব্যবস্থা পূজার প্রধান অঙ্গরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। কোন কোন স্থলে ইহা জাতীয় ধর্ম্মের বা রাষ্ট্রনীতির কেন্দ্রস্বরূপ হইয়াছিল।

উত্তর আমেরিকার কোন কোন বর্ব্বরজাতির মধ্যে সূর্য্যের স্থান খুব উচ্চ ছিল। গ্রীক ও লাটিন জাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতার নাম জিউস্ পেটার বা জুপিটর ছিল। প্রাচীনকালে পেরুর রাজা ইন্‌কা সূর্য্য-দেবতার প্রতিনিধি ছিলেন। আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরের অপর পারে মরুপ্রধান আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর-পূর্ব্ব অংশে, নীলনদের জলধারা-সিক্ত পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার লীলাভূমি মিশরদেশে, সূর্য্যদেব ভক্তবৃন্দের মনে বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। পারস্যদেশেও সূর্য্য মিথ নামে অভিহিত হইতেন। পারস্য ভাষায় মিথ অর্থে সূর্য্য বুঝাইয়া থাকে। ভাল ও মন্দ, সৎ ও অসতের, অরমজ অহ্রিমণের মধ্যবর্ত্তী দেবতা মিথ। তিনি অসীম করুণাময় ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু। তিনি অনন্ত শক্তিময়, প্রেমময়, মঙ্গলময় শ্রীভগবানের পুত্র, মানবের উদ্ধারকর্ত্তা ও রক্ষাকর্ত্তা। এক্ষণে আমরা দেখিব ভারতীয় চিন্তায় সূর্য্য কিরূপ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

বৈদিক যুগ্মদেবতার মধ্যে মিত্রাবরুণ, দ্যাবা পৃথিবী, অশ্বিদ্বয়, ইন্দ্রাগ্নি, ইন্দ্রবরুণ প্রধান। অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় অনুমান করেন যে, বিভিন্ন দেবপূজক সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিধানের নিমিত্ত ও বিরোধভঞ্জনের জন্য পক্ষপাতশূন্য মীমাংসক ঋষিগণ এইরূপ যুগ্মদেবতার পূজা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। উষা সূর্য্যের জনয়িত্রী। সূর্য্য প্রণয়ীর ন্যায় সেই সুন্দরীর অনুগমন করেন। সূর্য্য উষার ক্রোড়ে দীপ্তি পান। আবার উষা তাঁহার স্ত্রী। অশ্বিদ্বয় সূর্য্যের পুত্র। সবিতা সূর্য্য হইতে পৃথক্। অপর দেবতাগণ সবিতার অনুগামী এবং সকল প্রাণী তাঁহার ইচ্ছাধীন। উষার আগমনের পূর্ব্বে অশ্বিদ্বয়ের রথচালনা করিয়া দেন সবিতা। তিনি উষার পথে বিচরণ করেন।

এইরূপ কবিজনসুলভ বহুবিধ কল্পনার সাহায্যে প্রাচীন বৈদিক ঋষিগণ সৃষ্টিতত্ত্বের জটিলতাজালের মধ্যে আলোক-রেখাসম্পাতে এক অপূর্ব্ব মধুরভাবের সৃষ্টি করিয়াছেন। অপেক্ষাকৃত যুক্তিতর্ক বিচারের যুগে—ঔপনিষদিকযুগে—বিদ্যা ও অবিদ্যা, অসীম ও সসীমের বিশ্লেষণের যুগে, যখন ভারতীয় নর জড়বস্তুর উপাসনায় অতৃপ্তি লাভ করিতে লাগিল, তখন জাগতিক সসীম বস্তুর মধ্য দিয়া পূর্ণ ও শাশ্বত সত্তাকে উপলব্ধি করিবার বাসনা চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের হৃদয়ে স্থান পাইল। তাই দেখিতে পাই শ্রুতি সূর্য্যকে জড় পদার্থরূপে আহ্বান করেন নাই। তিনি পূষণ, জগৎপোষক। সূর্য্যমণ্ডল জ্যোতির্ম্ময় পাত্র। ইহা দ্বারা "সত্যস্যাপিহিতং মুখম্" সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের উপলব্ধির মুখ আবৃত হইয়া আছে। তদ্ যৎ তৎ সত্যমসৌ স আদিত্যঃ, য এষঃ এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষঃ, যশ্চায়ং দক্ষিণে অক্ষণ্ পুরুষঃ, তদুভয়ঃ সত্যং ব্রহ্মোপাসীনো যথোক্তকর্ম্মকৃচ্চ যঃ—এই আদিত্যই সত্য পুরুষ, সূর্য্যমণ্ডলস্থিত পুরুষ ও দক্ষিণ চক্ষুতে সন্নিহিত পুরুষ, এই উভয়ই সত্য-স্বরূপ ব্রহ্ম। এ স্থলে তিনি সত্যরূপী, তাঁহার উপাসনায় মানুষ সত্য-ধর্ম্ম লাভ করে। তিনি একচর, সংযমনকারী ও প্রজাপতিসম্ভূত। তাঁহার রশ্মিসমূহ অপসারিত হইলে, সন্তাপকর তেজ সঙ্কুচিত হইলে তাঁহার কল্যাণতম সুন্দর রূপ দৃষ্ট হয়।

দৃশ্য সূর্য্য জড়। যেন সূর্য্যস্তপতি তেজসেদ্ধঃ—সূর্য্য যাঁহার তেজে প্রদীপ্ত হইয়া তাপ দিতেছে; যতশ্চোদেতি সূর্য্যোঽস্তং যত্র চ গচ্ছতি, সূর্য্যদেব সৃষ্টিকালে যাঁহা হইতে উদিত হয়েন এবং প্রলয়কালেও যাঁহাতে অস্তমিত হয়েন, তিনিই সেই বস্তু। 'তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি' তাঁহার দীপ্তিতে সকল বস্তুই দীপ্তিমান হয়। ন তত্র সূর্য্যো ভাতি, সেই স্বপ্রকাশ আনন্দময় আত্মাকে সর্ব্ববস্তুপ্রকাশক সূর্য্য প্রকাশ করিতে পারে না। ভয়াৎ তপতি সূর্য্যঃ, সূর্য্য ভয়ে তাপ দিতেছেন, সূর্য্য প্রভুর ভয়ে ভৃত্যের ন্যায় সুনিয়তভাবে কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন।

সূর্য্য শুধু জড়পদার্থ নহে। ওঙ্কাররূপী পুরুষ সূর্য্যান্তর্গত। সাধক মৃত্যুর পর তেজোময় সূর্য্যে মিলিত হয়েন, চন্দ্রলোকাদির ন্যায় সূর্য্য হইতে আর প্রত্যাবৃত্ত হন না পরেও সূর্য্যরূপেই থাকেন। বেদান্ত-দর্শনের ৪র্থ অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে—"রশ্ম্যনুসারী" জ্ঞানীর রশ্ম্যনুসরণ হয়। শান্তবিদ্বাংসো ভৈক্ষ্যচর্য্যাং চরন্তঃ। সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তি। বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী ভৈক্ষ্যচর্য্যা অবলম্বন পূর্ব্বক বিরজক, অর্থাৎ পুণ্যপাপ রহিত হইয়া সূর্য্য দ্বারা অর্থাৎ সূর্য্যোপলক্ষিত উত্তরায়ণপথে সেই স্থানে গমন করেন, যেখানে সেই অব্যয়রূপী অমৃত-পুরুষ হিরণ্যগর্ভ বাস করেন। যিনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা সেই বিরাট পুরুষের অগ্নি (দ্যুলোক) মস্তক, চন্দ্রসূর্য্য চক্ষুর্দ্বয়—সেই পরমপুরুষ হইতে সেই অগ্নি সমুৎপন্ন হয় সূর্য্য যাহার সমিধ্, কেন না, সূর্য্য দ্বারাই দ্যুলোক সমিদ্ধ (প্রদীপ্ত) হইয়া থাকে। সূর্য্য সমস্ত বস্তুর প্রকাশক হইয়াও তিনি ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে সমর্থ নহেন। সূর্য্যের স্বভাবসিদ্ধ প্রকাশনশক্তি নাই। তাঁহার দীপ্তিতেই সূর্য্য অপর অন্যান্য বস্তুসমূহকে প্রকাশ করিয়া থাকেন।

জগতের ইতিহাসে সূর্য্য কিরূপ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা দেখিতে হইলে প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হয়। পেরু কিংবা মিশরে জনসাধারণ জড় সূর্য্যের উপাসনায় ব্যস্ত ছিল এবং খৃষ্টান নেতৃগণের নির্ম্মম কঠোর আঘাতে পেরুর সভ্যতা ও ধর্ম্মের কোমল লতাটি অকালে ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। ধনলিপ্সু য়ুরোপের সর্ব্বগ্রাসী ও সর্ব্ববিধ্বংসী সভ্যতা পেরুর জাতীয় ও ধর্ম্মজীবনের উপর এক বিশাল স্থূল যবনিকা টানিয়া দিয়াছিল। প্রাচীন মিশরে একমাত্র ইক্‌নাটন সূর্য্যকে বিশ্বজগতের পিতা ও মাতারূপে কল্পনা করিয়াছিলেন, জড়সূর্য্যে প্রাণশক্তির উদ্বোধন করিয়াছিলেন, কিন্তু ভারতের মনীষিগণ এই ধারণায় সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তাঁহারা গভীর তত্ত্বজ্ঞানের তাড়নায় জগৎপ্রপঞ্চের বাহিরে চলিয়া গিয়াছিলেন। জগৎপ্রপঞ্চের মায়াময় মরীচিকা তাঁহাদের সাধনাপ্রোজ্জ্বল অন্তর্দৃষ্টিকে অন্ধ করিয়া

দেয় নাই। তাঁহাদের প্রার্থনা ও অনুষ্ঠান সেই গভীর তত্ত্বজ্ঞানপ্রসূত। তাঁহারা ব্যষ্টির ভিতর দিয়া সমষ্টিকে চিনিয়াছিলেন, নিজেদের দেহনীর ক্ষুদ্র মন তিমিরজাল ভেদ করিয়া জড়বস্তুর আবরকশক্তি ছিন্ন করিয়া মুক্ত ব্যোমবিহারী পক্ষীর ন্যায় অসীমের রাজ্যে বিচরণ করিয়াছিলেন। তাই তাঁহারা সর্ব্বভূতে নিজের আত্মার উপলব্ধি করিয়াছিলেন, বস্তুজগতের মধ্যে ব্রহ্মসত্ত্বা দেখিতে পাইয়াছিলেন, বিদ্যার দ্বারা অবিদ্যার সুপ্রশস্ত প্রাচীর ভাঙ্গিয়া দিয়া সেই অরূপ বিরাট্ মহান্ চৈতন্যসত্তার সহিত ঐক্য স্থাপন করিয়াছিলেন। এইজন্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যপ্রধান অহংকৃত বস্তুরত জাতিগণের হৃদয় "অন্ধেন তমসাবৃতা", এইজন্য নিজেদের সহিত অপরের মিলন তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়াছিল, এইজন্য অন্যান্য দেশে প্রকৃত আত্মজ্ঞানের বিকাশ সম্ভব হয় নাই। স্বার্থপরতা ও স্বাতন্ত্র্য যাহাদের জীবনের মূলসূত্র তাহারা কখনও আপনাদিগকে বিলাইতে পারে না, বিশ্বজগতের সহিত একসূত্রে গ্রথিত করিতে পারে না, তাহাদের প্রাণ-নদীর ক্ষীণ স্রোতটি সংসার-মরুর অনন্ত বালুকারাশির মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে মহাকবি যে বাণী প্রচার করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিক তাহার পক্ষেই সম্ভব যাহার প্রাণ 'পাষাণকারা' ভাঙ্গিয়া 'জগৎ প্লাবিয়া' গাহিয়া বেড়ায়, যাহার হৃদয় 'জগৎ মাঝারে লুটিতে চায়', যে চরাচরময় তাহার প্রাণ ঢালিয়া দিতে পারে এবং গভীর অচল অটল বিশ্বাসের সহিত কবির ন্যায় বলিতে পারে,—

"যত দেব' প্রাণ বহে যাবে' প্রাণ
ফুরাবে না আর প্রাণ!
এত কথা আছে, এত গান আছে,
এত প্রাণ আছে মোর,
এত সুখ আছে, এত সাধ আছে,
প্রাণ হ'য়ে আছে ভোর।"

প্রাণের সহিত প্রাণের মিলনই ভারতীয় চিন্তাধারার চিরন্তন নিয়ম। ইহাই ভারতীয় সভ্যতার শীর্ণ লতাটিকে এখনও সঞ্জীবিত রাখিয়াছে এবং ইহার অভাবেই জগতের প্রাচীন সভ্যতা প্রত্নতাত্ত্বিকগণের গবেষণার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে ও ইহার প্রাচুর্য্যেই ভারতীয় আধ্যাত্মিক ধারা বিবিধ ঘাতপ্রতিঘাতের কঠোর কঙ্করময় পথে এখনও প্রবাহিত হইতেছে।

শ্রীহরিপদ ঘোষাল বিদ্যাবিনোদ।

ইংলণ্ডে নারী-জাগরণ

ইংলণ্ডে মহিলা-জাগরণ মেরী ওলষ্টোনক্রাফ্‌টের নিকট কতটুকু ঋণী, তাহা দেখানই বর্ত্তমান প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য, কিন্তু তৎসঙ্গে মেরীর প্রসিদ্ধ "নারীর অধিকার" (Vindication of the rights of woman) ও তৎকালীন য়ুরোপীয় সমাজের যৎকিঞ্চিৎ সমালোচনা না করিলে মেরীর কৃতকার্য্যতার সাহায্যকারী বিশেষ কারণগুলি পাঠকবর্গের দৃষ্টি এড়াইতে পারে, এই আশঙ্কায় প্রসঙ্গক্রমে তাঁহাদের সম্বন্ধেও কিছু পরিচয় দিব। বস্তুতঃ "নারীর অধিকার" গ্রন্থের প্রাণময়ী রচনা এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় সমাজে নারীর প্রতি নিষ্ঠুরতম অবজ্ঞা,—এতদুভয়ের সংঘাতেই মেরীর জীবন সার্থক হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাদের কোন একটির অভাব হইলে মেরী হয় ত ইংলণ্ডে মহিলা-আন্দোলনের প্রবর্ত্তক আখ্যার দাবী করিতে পারিতেন না।

সমসাময়িক মতবাদ

ফরাসী-বিপ্লবের সময়ে (১৭৮৯ খৃঃ) ডাঃ প্রাইস্ ইংলণ্ডে সাম্যবাদ প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি যুদ্ধাদির ঘোর বিরোধী ছিলেন। এই সাম্যবাদ ক্রমে বিস্তার লাভ করিয়া, কয়েক বৎসরের মধ্যেই মেরী ওলষ্টোনক্রাফ্‌ট্ প্রবর্ত্তিত স্ত্রী-স্বাধীনতা আন্দোলনের সাহায্য করে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। অন্যদিকে অবশ্য ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের 'গ্লোরিয়াস্ রেভলিউশন' হইতেই ইংলণ্ডের জনমতের শক্তি পরিলক্ষিত হয়। বিবেকের স্বাধীনতা, জনমতের বিরুদ্ধবাদী শক্তির দমন এবং জনসাধারণ কর্ত্তৃক শাসনকর্ত্তা নির্ব্বাচন—সাম্যবাদের এই প্রধান তিনটি সূত্র তখন হইতেই স্বীকৃত হইয়াছিল। সুতরাং এই হিসাবে স্ত্রী-স্বাধীনতার মূল উপকরণ ইংলণ্ডে তখন হইতেই অপ্রত্যক্ষভাবে সংগৃহীত ছিল বলা যায়।

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে বার্কের "Reflections on the French Revolution" (ফরাসী-বিপ্লবের সমালোচনা) প্রকাশিত হইবার কিছুকাল পরেই টম্ পেইন 'পুরুষের অধিকার' নাম দিয়া একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এই পুস্তিকার প্রচার বন্ধ করিবার জন্য পিট্ যথেষ্ট চেষ্টা করা সত্ত্বেও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তখন উক্ত পুস্তকে লিখিত মতবাদের অযৌক্তিকতা প্রমাণ করিয়া মেরী 'নারীর অধিকার' শীর্ষক একটি অতি সুযুক্তিপূর্ণ ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, ইহাই ইংলণ্ডে মহিলা-আন্দোলনের বহিরাকৃতি প্রদান করে এবং তথা হইতে যথারীতি নারী-সমস্যা-সমাধানের প্রবল চেষ্টা তথায় আরম্ভ হয়।

কনডোরসেট্‌এর "Sketch for an Historical Picture of the progress of the Human mind" (মানব-মনের ক্রমোন্নতির ঐতিহাসিক তত্ত্ব) প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী-বিপ্লবের সাম্যবাদ সমগ্র য়ুরোপে ছড়াইয়া পড়িল। তিনি প্রচার করিলেন, মানুষমাত্রেরই সমান অধিকার—জাতিধর্ম্ম, স্ত্রী-পুরুষ, অথবা ব্যষ্টিসমষ্টি ভেদে কোন বৈষম্য থাকা উচিত নহে। এই মতবাদ ইংলণ্ডে তখন অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। স্ত্রী-পুরুষের সম্পূর্ণ সমান অধিকার ও সুযোগ থাকিলে সামাজিক, আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি সকল বিষয়েই বিরাট মানবসমাজ লাভবান্ হইতে পারে—এই ভাব তখন হইতেই জনসাধারণের মধ্যে প্রসারলাভ করিয়াছিল। স্ত্রী-পুরুষের সমভাবে বিদ্যাচর্চ্চার প্রয়োজনীয়তা প্রকৃতপক্ষে তখন হইতেই ইংলণ্ডে অনুভূত হইয়াছিল। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ডে যে কোন সংস্কারের প্রবলতম অন্তরায় ছিল রাজশক্তি, সংস্কারমাত্রই কালক্রমে ফরাসী-বিপ্লবের আকার ধারণ করিতে পারে, এরূপ আশঙ্কা তাঁহাদের সর্ব্বদাই ছিল। তখনকার দিনে কোন সংস্কার সভাতে দর্শক হিসাবে যোগদান করাও দণ্ডনীয় বলিয়া পরিগণিত হইত। কোন সংস্কারসম্বন্ধে গ্রন্থ প্রণয়ন করিলে লেখকের ফাঁসি পর্য্যন্ত হইত। আইনের এরূপ কঠোরতা সত্ত্বেও ডাঃ পেইনের "Age of Reason" (যুক্তি-যুগ) তখনই প্রকাশিত হইয়াছিল। কনডোরসেট, ডাঃ পেইন, মেরী ওলষ্টোনক্রাফ্‌ট প্রভৃতির লেখার প্রভাবে ইংলণ্ডে তখন নারী-জাগরণ যথেষ্ট ব্যাপকভাবে চলিয়াছিল।

স্ত্রী-স্বাধীনতার সংগ্রামে অগ্রণী মেরী ওলষ্টোনক্রাফ্‌ট—ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে স্বজাতীয়ার সাহায্যকল্পে একাগ্রচিত্তে প্রত্যক্ষভাবে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। স্বাধীনতাকামী নারীমাত্রেই মেরীকে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়া থাকেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে স্ত্রী-স্বাধীনতার কোন ধারণাই পাশ্চাত্য-জগতের ছিল না, এ কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। প্রটেষ্টেণ্ট দলের কোয়েকার সম্প্রদায়ের লোকেরা আপনাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার মৌখিক স্বীকার করিত মাত্র। ইংরাজ হইয়া স্ত্রীজাতির অস্তিত্বই স্বীকার করিত না। ফরাসী-বিপ্লবের চিন্তাধারার প্রভাবে সাম্যবাদের ক্ষীণরশ্মি নারী জাতির

কল্যাণার্থেও ব্যয়িত হইবার প্রয়াস পাইয়াছিল মাত্র, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য তখনও তেমন কিছু হয় নাই।

অষ্টাদশ শতাব্দী ও য়ুরোপীয় সমাজে নারীর মূল্য

মেরীর প্রকৃত জীবন-কথা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে অষ্টাদশ শতাব্দীতে নারীদের প্রতি পাশ্চাত্য সমাজের কি বিধি-ব্যবস্থা ছিল, তাহার একটা মোটামুটি (ঐতিহাসিক) নমুনা এখানে দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, মনে করি। কারণ, নারীজাতির প্রতি তৎকালীন সমাজের নিষ্ঠুর অবজ্ঞাই প্রকৃতপক্ষে মেরীর চরিত্র-গঠনের প্রধান সহায় ছিল বলিয়া অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে।

নারীদের সম্বন্ধে সরকারের আইন-কানুনও মোটেই সন্তোষজনক ছিল না। রাজনৈতিক বিষয়ে নারীদের কোন কথা বলারই সুযোগ ছিল না। আইন মতে স্ত্রী, স্বামীর অস্থাবর সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইত। স্ত্রীর ব্যক্তিগত পরিশ্রমের দ্বারা অর্জ্জিত সম্পত্তিতেও স্বামীর সম্পূর্ণ অধিকার আসিত, স্বামীর অনুমতি ভিন্ন স্ত্রী কোন সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় করিতে পারিত না। স্ত্রীকে মারপিট বা অন্য কোন শারীরিক অত্যাচার করার অভিযোগে স্বামী দণ্ডনীয় হইত না। পুরুষের ইচ্ছানুসারে সন্তানের উপর স্ত্রীর দাবী রহিতও হইতে পারিত (এখনও আংশিকভাবে তাহাই প্রচলিত নিয়ম), সরকারের এরূপ বিধি ব্যবস্থা তৎকালীন সামাজিক ভাবধারার প্রতিচ্ছবি সন্দেহ নাই। বলা বাহুল্য, প্রচলিত বিধি নিয়মে অনুপ্রাণিত হইয়া নারীদের চরিত্রও তদনুযায়ী গঠিত হইত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক, মুখে একরূপ বলিত এবং কার্য্যক্ষেত্রে অন্যরূপ করিত, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। অতএব, আমরা যদি বলি, স্ত্রীলোকের ব্যক্তিত্ব তখনকার দিনে পুরুষরা স্বীকার করিত না, তাহা হইলে বোধ হয় খুব বেশী ভুল করা হইবে না। সভ্যতাভিমানী আধুনিক জগতের কোন কোন অংশে এখনও পর্য্যন্ত স্ত্রীজাতি পুরুষজাতির অনুকম্পা আকর্ষণ করিতেও সমর্থ হয় নাই।

অষ্টাদশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় নারীর দুরবস্থার সম্বন্ধে এক জন প্রসিদ্ধ লেখক লিখিয়াছিলেন,—"নারীর প্রতি এই ব্যবহার নারীর ব্যক্তিত্ব এবং মনুষ্যত্ব অস্বীকার করে।" কথাটা অতি সত্য। অন্য লেখক ত দূরের কথা, স্বয়ং রুসো লিখিয়াছেন—"পুরুষের শিক্ষার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া নারীর শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমাদিগকে সন্তুষ্ট করা, আমাদিগের তৃপ্তিসাধন করা, আমাদিগের প্রয়োজনে লাগা, আমাদিগকে তাহাদের ভালবাসিতে ও শ্রদ্ধা করিতে অভ্যস্ত করা, বাল্যে আমাদিগকে শিক্ষিত করা, আমরা বড় হইলে আমাদিগকে যত্ন করা আমাদিগকে সুপরামর্শ দেওয়া ও দুঃখে সান্ত্বনা দেওয়া, আমাদের জীবন মধুময় ও সহজসাধ্য করা, সকল সময়ে নারীর কর্ত্তব্য। এইভাবেই বাল্যকাল হইতে নারীকে শিক্ষিত করা উচিত।" কিন্তু রুসোর রচনায় স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া যেন একটু অপ্রত্যক্ষ ইঙ্গিত করা হইয়াছে। যে স্ত্রীলোকের সাংসারিক হিসাবে এতগুলি কর্ত্তব্য রহিয়াছে, তাঁহার তেমনই শিক্ষারও প্রয়োজন, এমনই একটা ভাব যেন প্রচ্ছন্ন আছে।

মিল্টনে পড়িয়াছিলাম—He for God only, She for God in him—অর্থাৎ স্বামীকে পুরোহিতরূপে মাঝখানে না রাখিয়া কোন স্ত্রীলোক সোজাসুজি ভগবানের নিকট অগ্রসর হইতে পারে না। একটু ঘুরাইয়া বলিলে কথাটা এই দাঁড়ায় যে, অবিবাহিত নারীর জীবন কোন সৎকার্য্যের উপযুক্ত নহে। মিলটন্ (খৃঃ ১৬০৮-৭৪) প্রায় এক শতাব্দী আগের লোক হইলেও তখন হইতেই নারীজাতির প্রতি এরূপ ব্যবহার চলিয়া আসিতেছিল, ইহা হইতে অনুমান করা যায়। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে এরূপ কুৎসিত ধারণা তখনকার লোকের ছিল, ইহা অস্বীকার করা চলে না। ডাঃ কড্‌ভাইনের মতে—"নারী যখন প্রার্থনায় রত থাকে, তখন তাহাকে যত চিত্তহারিণী দেখায়, এত আর কিছুতেই নহে। পুরুষ লালসার দৃষ্টিতে নারীকে পর্য্যবেক্ষণ করে, এই হেতু নারীকে প্রার্থনায় বড় দেখিতে কামনা করে।" মিসেস বারবোল্ড বড় দুঃখেই বলিয়াছেন—"নারী কেবল জানিবে, এই জিনিষটা এই; কিন্তু কেন সে জিনিষটা সেইরূপ, তাহার তথ্যানুসন্ধান করিবার তাহার অধিকার নাই। They can not investigate; they may remember."

ব্যঙ্গ-কাব্য-লেখক সুপ্রসিদ্ধ ডীন সুইফ্‌ট তাঁহার "কোনও যুবতীর বিবাহকালে তাঁহাকে লিখিত পত্র" নামক রচনায় লিখিয়াছেন—"তোমাদের এক দুর্ব্বলতা হইতেছে কাপুরুষতা। তোমাদের জীবনের একই মাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য আছে—বিবাহ। উহাই তোমাদের উন্নতির মূল। তোমাদের কর্ত্তা নিজের শ্রেষ্ঠত্ব সংরক্ষণে সর্ব্বদা যত্নবান্ বলিয়া তোমাদের মধ্যে এক গুণের আদর করে; উহা হইতেছে পুরুষের নিকট তোমাদের বশ্যতাস্বীকার। পুরুষের অধীন নারীর উহাই প্রধান গুণ বলিয়া গণ্য হয়; সুতরাং উহাই তোমাদের নারীত্বের ভিত্তি বলিয়া স্বীকৃত।"

মিঃ লীয়ন ব্রীজ, তাঁহার সুবিখ্যাত "ইংরাজ নারীর বন্ধন-মুক্তি" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন,—"প্রকৃতি নারীকে পুরুষের বশ্যতা স্বীকার করিবার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছে। সুতরাং বাল্যকাল হইতেই নারীকে অনাচার ও অন্যায় বিনা প্রতিবাদে সহ্য করিতে শিক্ষা দিতে হইবে। নারীর পক্ষে ইহা অতীব প্রয়োজনীয় গুণ, কারণ এক জনের কর্তৃত্বের অধীন হইয়া থাকাই নারীর ধর্ম্ম।"

লর্ড চেষ্টারফিল্ড এক জায়গায় মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—"নারী বর্দ্ধিতাকার শিশুরই মত। বুদ্ধিমান পুরুষ তাহার সহিত বালকের ন্যায় ব্যবহার করে, তাহাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে, তাহাদের সহিত খেলা করে, তাহাকে হাসায়, তোষামোদ করে।"

পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতির আশঙ্কায় আর দৃষ্টান্ত দিতে চাহি না। মোট কথা, অষ্টাদশ শতাব্দীতে পুরুষরা নারীকে খেলার সামগ্রী ব্যতীত অন্য কিছু মনেই করিত না। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই খেলাপ্রিয় অজ্ঞান-শিশুই যে খেলানার সন্ধান করে, তাহা তাহারা ভুলিয়াও ভাবিত না। যে সমাজের নারী আজ পর্য্যন্ত ঐরূপ আত্মজ্ঞানহীন অচেতন খেলার সামগ্রী হইয়া রহিয়াছে, সে সমাজের পুরুষরা যে জ্ঞানগরিমার খনি হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া পরিচয় দেয়, ইহা বড়ই করুণ হাস্যরসোদ্দীপক। এরূপ নৈতিকবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীন পুরুষজাতির পক্ষ হইতেই প্রথম প্রতিবাদ হওয়া স্বাভাবিক। ইংলণ্ডে ডিফো এবং সুইফ্‌ট সর্ব্বপ্রথমে ক্ষীণস্বরে প্রতিবাদ করিলেন বটে, কিন্তু কোন সাড়া পাইলেন না। স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে মিঃ হেল্‌ভিটিয়াস্ সুচিন্তিত কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাও লোকের মন তেমন আকর্ষণ করিতে পারে নাই। প্রকৃতপক্ষে বেরণ হলবেক্ লিখিত Systeme Social (১৭৭৪) পুস্তকের 'On women' নামক অধ্যায়েই এ বিষয়ে যথারীতি লিখিত প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ বলা যাইতে পারে। আরম্ভেই তিনি বলিয়াছেন—"সকল দেশেই নারীকে অত্যাচার সহ্য করিতে হয়, ইহাই তাহার অদৃষ্ট। বর্ব্বররা তাহাদের নারীকে ক্রীতদাসীতে পরিণত করে এবং তাহার নারীর প্রতি অবজ্ঞা নিষ্ঠুরতায় পরিণত হয়। আমরা তাহাদিগকে বুদ্ধিমানের মত শিক্ষা দিই না, বরং আমরা তাহাদিগের মনকে অতি তুচ্ছ ব্যাপার ও বিরক্তির খাদ্য প্রদান করি, আমরা তাহাদিগকে খেলানা ও সাজসজ্জা দিয়া ভুলাইয়া রাখি। আমাদের এই ব্যবহার দ্বারা নারীজাতির প্রতি অবজ্ঞা অনুসূচিত করে না? অথচ আমরা সেই অবজ্ঞাকে শ্রদ্ধা ও প্রীতির আবরণ দিয়া ঢাকিয়া রাখি।"

হলবেক্‌এর এই উক্তি নারীর প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুকম্পা প্রকাশ করিতেছে, সন্দেহ নাই। তিনি নারীর কায়িক শ্রম-সাধ্য কার্য্যে উৎসাহ দিতেন না। নারীর প্রতি পাশবিক অত্যাচারকারীর অপরাধ হত্যাকারীর অপরাধের সমান বলিয়া তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। দেশশাসনে পুরুষ ও স্ত্রীভেদে কোন পার্থক্যের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না।

স্ত্রীশিক্ষা-সংস্কারের সূচনা

স্ত্রীজাতির উন্নতিবিধানে কনডারসেট বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার লেখার প্রভাবেই 'হলবেক'এর মতবাদ প্রায় ২০ বৎসরের মধ্যে [১৭৭৪-৯৪ খৃঃ] পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল, বলা যায়। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দের "বিপ্লব সম্মেলন"এ পাঠ করিবার জন্য তিনি জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে একটি আদর্শ প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। তাহাতে স্পষ্টাক্ষরে তিনি লিখিয়াছেন,—জাতীয় শিক্ষাপদ্ধতিতে স্ত্রীপুরুষের সম্পূর্ণ সমান অধিকার থাকা উচিত (প্রায় এই সময়েই মেরীর "নারীর অধিকার" প্রকাশিত হয়) শিক্ষার অসামঞ্জস্য, রাজনীতিক্ষেত্রেও স্ত্রীপুরুষের বৈষম্য সৃষ্টি করে। মাতা শিক্ষিতা হইলে পারিবারিক সুখ-সুবিধার ত অন্তই নাই। ছোট ছেলেমেয়েদের শিক্ষা হইতে পারিবারিক আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ পর্য্যন্ত সমগ্র দায়িত্ব মাতা বহন করিতে পারেন। অপরদিকে মাতা মূর্খ থাকিলে প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র পর্য্যন্ত পরমশ্রদ্ধেয়া মাতাকে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে এবং জটিল বিষয়ে মাতার সঙ্গে পরামর্শ করার কোন প্রয়োজনই বোধ করে না। কনডোরসেট্‌ খুব সুলেখক ছিলেন না; বরং তাঁহার লেখা কষ্টকল্পিত বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু তাঁহার মানবপ্রীতি অতি স্বাভাবিক ও চিন্তাধারা অতি সুযুক্তিপূর্ণ। এই কারণে প্রধানতঃ তাঁহার লেখা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

সংক্ষেপে এইমাত্র বলা যায়, য়ুরোপে অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্ত্রীজাতির সামাজিক বা রাজনীতিক অবস্থা জানিতে হইলে 'হলবেক্‌' এবং কন্‌ডোরসেট্‌কে বাদ দিলে চলে না। কিন্তু তাঁহাদের রচনায় নারীজাতির শুধু বাহ্য অভাব-অভিযোগের কথাই বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই হিসাবে তাঁহাদের লেখা অনেকটা একদেশদর্শী হইয়াছে, বলা যায়। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে মেরী তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "নারীর অধিকার" প্রকাশ করিয়া সে কলঙ্ক দূর করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ যে নূতন ভাবধারার জন্য আদৃত হইয়া থাকে, তাহা নহে, স্ত্রীজাতির জন্য একজন স্ত্রীলোক কর্তৃক লিখিত ইহাই সর্ব্বপ্রথম মৌলিক পুস্তক। ইহাতে আমরা তৎকালীন নারীহৃদয়ের সম্যক্‌ বিকাশ দেখিতে পাই। বিশেষভাবে ইংলণ্ডে এই গ্রন্থ মহিলা-আন্দোলনের যুগপ্রবর্ত্তক, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

[ক্রমশঃ।

শ্রীহরেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

রথযাত্রা

"রথোৎসবে মুকুন্দস্য যেষাং হর্ষোপজায়তে।
তেষাং ন নারকী পীড়া যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ॥"

জীবের নরকযন্ত্রণা নিবারক পরমোল্লাসকর এই মহোৎসবযুক্ত আষাঢ় মাসের "মাসিক বসুমতী"তে রথযাত্রা সম্বন্ধে একাধিক প্রবন্ধ ও কবিতা বড়ই মনোজ্ঞ ও সময়োপযোগী হইয়াছে। তন্মধ্যে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের প্রবন্ধ তাঁহার অনন্যসাধারণ রসময়ী ভাষার গুণে ও অকৃত্রিম প্রেমভক্তির আকর্ষণে সর্ব্বাপেক্ষা উপাদেয়। কিন্তু তিনি তদীয় প্রবন্ধে "বঙ্গের বৈষ্ণব-সম্প্রদায় কেমন করিয়া কি ভাবে এই রথযাত্রা দেখিয়া আপনাকে ধন্য বলিয়া বিবেচনা করিত"—কেবল তাহারই আলোচনা করিয়াছেন; "সমগ্র ভারতবাসী হিন্দু এই মহোৎসবকে কি ভাবে দেখিয়া থাকে" তাহার আলোচনা করেন নাই। এই শেষোক্ত আলোচনার প্রত্যাশায় সাম্প্রদায়ক গণ্ডীর বহির্ভূত ব্যক্তিমাত্রই উদ্‌গ্রীব থাকিবেন, সন্দেহ নাই।

কে কি ভাবে এই উৎসবকে দেখিয়া থাকেন— কেবল তাহাই নহে, এই উৎসবের উৎপত্তি ও উহার সার্ব্বভৌমিকত্ব সম্বন্ধে ইতিহাস জানিবার জন্য অনেকেই উৎসুক হইতে পারেন, অতএব মহামহোপাধ্যায় তর্কভূষণ মহাশয়ের নিকটই আমরা সে তথ্যের প্রত্যাশা করিয়া থাকি। প্রসঙ্গক্রমে পণ্ডিত মহাশয় বলিয়াছেন—শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধোক্ত "ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের সূর্য্যগ্রহণ স্নানপ্রসঙ্গে কুরুক্ষেত্রযাত্রাই শ্রীকৃষ্ণের রথযাত্রার সূত্রস্থানীয়। এই সকল যাত্রায় যাদববন্ধু সমভিব্যাহারে মহার্হ রথে আরূঢ় ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন।" সেই সংবাদ পূর্ব্ব হইতে অবগত হইয়া ব্রজবাসী গোপগোপিকাগণসহ শ্রীনন্দ 'একবার চোখের দেখা দেখিবার' আশায় বৃন্দাবন হইতে কুরুক্ষেত্রে সমাগত হইয়াছিলেন, এবং ব্রজনাথের সাক্ষাৎকার লাভের পর বিদায়-কালে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে যে 'প্রাণের কথা' বলিয়াছিলেন এবং 'ভাবোন্মাদের প্রেরণায়' শ্রীগৌরাঙ্গদেব ভাগবতোক্ত সেই সুপ্রসিদ্ধ শ্লোকটির যেরূপ তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছিলেন, চৈতন্যচরিতামৃতের ভাষায় তাহা যথাযথ বিবৃত করিয়া তর্কভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন—"ইহাই হইল গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের নীলাচলে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-সার-রহস্য।"

দুঃখের বিষয়, যাদবগণসহ শ্রীকৃষ্ণের কুরুক্ষেত্রে রথযাত্রার সঙ্গে নীলাচলে বলদেব ও সুভদ্রাসহ শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার কি সম্পর্ক—কিছু বুঝা গেল না। পণ্ডিত ভবাবভূতি বিদ্যাভূষণ মহাশয় তদীয় প্রবন্ধে উল্লিখিত প্রসঙ্গের কোন উল্লেখ না করিলেও, "কংসবধার্থ শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেবের অক্রূরচালিত রথে বৃন্দাবন হইতে মথুরা প্রয়াণ বিষয়ক ভাগবতোক্ত অন্যতম রথযাত্রার সহিতও প্রচলিত "রথযাত্রার কোন সম্পর্ক নাই" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—কেন না, সে যাত্রায় সুভদ্রার কোন উল্লেখ নাই।

সুভদ্রার উল্লেখ-সংযুক্ত রথযাত্রার কথা বিদ্যাভূষণ মহাশয় একাধিক পুরাণ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন—(১) ব্রহ্মপুরাণ হইতে "স্নানযাত্রার রথে আরোহ পূর্ব্বক গুণ্ডিক মণ্ডপাভিমুখে গমনকারী শ্রীকৃষ্ণ, বলদেব ও সুভদ্রাকে দর্শন" করায় হরিভবনগমনের কথা, আর (২) পদ্মপুরাণ ও স্কন্দপুরাণ হইতে "আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বিতীয়াতে বলরাম, শ্রীকৃষ্ণ ও সুভদ্রাকে রথে আরোহণ করাইয়া উৎসব" করিবার কথা। ইহা হইতে এই মহোৎসবের প্রাচীনত্বের কতক পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু কোন্‌ পৌরাণিক ঘটনাসূত্রে এই উৎসবের উৎপত্তি—তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।

অধুনা প্রচলিত শ্রীশ্রী৺জগন্নাথদেবের বা শ্রীকৃষ্ণের রথযাত্রা ভিন্ন পুরাকালে অন্যান্য দেবদেবীরও রথযাত্রার রীতি প্রচলিত ছিল। বিদ্যাভূষণ মহাশয় দেবীপুরাণ হইতে ভগবতী দুর্গার, ভবিষ্য-পুরাণ হইতে সূর্য্যদেবের এবং একাম্রপুরাণ হইতে মহাদেবের,—পরন্তু চীন পরিব্রাজক 'ফা হিয়ান' বর্ণিত বুদ্ধদেবের ও 'শ্রীমতী হেমারক্তা কারাসিওলো' বর্ণিত সিসিলী দ্বীপস্থ মেরীর—রথযাত্রার পরিচয় দিয়া কৌতূহলী পাঠকের আকাঙ্ক্ষা অনেক পরিমাণে চরিতার্থ করিয়াছেন। এ জন্য তিনি সকলের ধন্যবাদের পাত্র।

দেবী দুর্গার বা অংশুমালী সূর্য্যদেবের রথযাত্রা ভারতের কোন স্থানে এখনও প্রচলিত আছে কি না, বলিতে পারি না। কিন্তু একাম্র-পুরাণোক্ত বৃষবাহন মহাদেবের রথযাত্রার প্রথা সুপ্রসিদ্ধ কাঞ্চীপুরে (Conjeveram) অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে। সেতুবন্ধ-রামেশ্বরের

পথে যাত্রাকালে মান্দ্রাজের দক্ষিণ-পশ্চিমভাগস্থিত স্বনামখ্যাত উক্ত সহরে এক চৈত্র মাসের শুক্লা দশমীতে * আমরা গজানন ও ষড়ানন সঙ্গে ক্ষিতিরূপী † একাম্বরনাথের ভোগমূর্ত্তির ‡ রথযাত্রা দেখিয়া নয়ন সার্থক করিয়াছিলাম।

বুদ্ধদেবের ও সিসিলী দ্বীপের রথযাত্রার উল্লেখ করিলেও, বিদ্যাভূষণ মহাশয় তৎসম্বন্ধে বিশেষ কোন বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন নাই। আমরা এ স্থলে সে সম্বন্ধে যথাজ্ঞান যৎকিঞ্চিৎ নিবেদন করিব। খৃষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতকের সন্ধিক্ষণে ফা হিয়ান তদানীন্তন চীন সম্রাটের আদেশক্রমে বৌদ্ধধর্ম্মের তত্ত্বানুসন্ধানে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন ও নানা স্থান পরিভ্রমণ পূর্ব্বক খোতান (তাতারের অন্তর্গত খোটান) নামক নগরে উপনীত হয়েন। খোটান তখন বৌদ্ধরাজ্য ছিল এবং তথায় ক্ষুদ্র বৃহৎ বিস্তর দেবালয় ফা-হিয়ান দর্শন করিয়াছিলেন। এই খোটানেই রথযাত্রা দর্শন করিয়া তিনি স্বীয় গ্রন্থে তাহার বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন। সেই বর্ণনা হইতে অনুমান হয়, আমাদিগের দেশের রথযাত্রা সর্ব্বতোভাবে তাহারই অনুরূপ। এ দেশের ন্যায় খোটানেও আষাঢ়ীয় শুক্লা দ্বিতীয়াতে রথোৎসব হইত এবং শ্রীক্ষেত্রের ন্যায় প্রতি বৎসর নূতন রথ নির্ম্মিত হইত; রথযাত্রার পূর্ব্বদিন রাজপথ পরিষ্কৃত এবং নগরের চতুষ্পার্শ্বস্থ তোরণ সকল চন্দ্রাতপ ও পুষ্পপতাকাদির দ্বারা পরিশোভিত হইত; নগরপ্রান্তে চতুর্দ্দশ হস্ত উচ্চ, চারিচক্রবিশিষ্ট, রথ নির্ম্মিত হইয়া সপ্তরত্নে ভূষিত এবং কৌশেয় চন্দ্রাতপ পতাকা ও নানা মণিরত্নগ্রথিত ঝালরাদি দ্বারা সুশোভিত হইত; ভূপতি কর্ত্তৃক সম্মানিত মহাযানাবলম্বী পাণ্ডাগণ দ্বারা বাহিত হইয়া ৩টি দেবমূর্ত্তি রথোপরি নীত হইতেন। মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ হইলে মহাসমারোহে রথাকর্ষণ আরম্ভ হইত এবং নগরের বহির্ভাগস্থ তোরণসমীপে রথ উপনীত হইলে নরপতি নববস্ত্রপরিহিত হইয়া নগ্নপদে অগ্নিময় সুগন্ধাধার হস্তে রথের সন্নিহিত হইতেন এবং অভীষ্টদেবকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া রথে রাশি রাশি পুষ্পবর্ষণ করিতেন;—তোরণস্থিত গৃহ হইতে রাজমহিষী ও অন্যান্য পুরাঙ্গনাগণও ঐরূপ দেবোদ্দেশে অজস্র পুষ্পক্ষেপণ করিতেন। উৎসবের এই সমস্ত অঙ্গ পুরুষোত্তমের প্রথার সহিত মিলে; কেবল তাতারের রথোৎসব চতুর্দ্দশ দিবসব্যাপী হইত, আর শ্রীক্ষেত্রে উহা নয় দিন কাল স্থায়ী হইয়া থাকে—ইহাই মাত্র প্রভেদ।

উভয় ক্ষেত্রের ঐক্যের প্রধান লক্ষণ দেবমূর্ত্তিতে প্রতীয়মান হয়। সেখানেও ত্রিমূর্ত্তি—এখানেও তাহাই। সেখানে সিংহাসনোপরি বুদ্ধদেবের প্রধান মূর্ত্তি এবং তাহার উভয় পার্শ্বে বোধিসত্ত্বের দুইটি মূর্ত্তি ছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা উহা বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের মূর্ত্তি বলিয়া অনুমান করিয়াছেন এবং আমাদিগের জগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রা তাহারই অনুরূপ বলিয়া অনেকে অনুমান করিয়া থাকেন। কবি রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কবিতা,—

"এবার নাহি জাতের বিচার,
ছাই শুচি-বাই—ছাইয়ের আচার;
ভাইয়ের সাথে ভাই মেলে আজ—
সেবার দাবী সমান সবার;
ঠাকুর এবার দীনের ঠাকুর,
আমরা এবার দীন-দেবতার।"—

সেই অনুমান হইতেই অনুস্যূত এবং প্রসাদবিতরণাদি স্থানীয় লৌকিক আচারে তাহার ভিত্তি বিশেষভাবে বদ্ধমূল। ব্রহ্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ ও স্কন্দপুরাণের শ্লোকগুলি বৌদ্ধযুগের পরে রচিত বা প্রক্ষিপ্ত কি না, বিচার করা ভিন্ন উক্ত অনুমানের ভিত্তি গ্রাহ্য হওয়া দুরূহ।

সিসিলীর রথযাত্রা বিদ্যাভূষণ মহাশয় "খৃষ্ট-মাতা মেরীর উদ্দেশে অনুষ্ঠিত" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সিসিলী দ্বীপের বৃত্তান্ত-লেখক হাওএলএর মতে উহা তত্রত্য নর্ম্মাণ রাজবংশসম্ভূতা তাপসী শান্তা রোজালিয়ার স্মৃতিপূজার উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয়, সেখানেও রথযাত্রার সময়—আষাঢ় মাস; প্রতি বৎসর নূতন রথ নির্ম্মিত হয়; রথোপরি পুষ্পবর্ষণ হয়; বাদ্য এবং ধূপ, ধুনা ও পুষ্পগন্ধে দিঙ্মণ্ডল আমোদিত হয়; আদিযাত্রা ও পুনর্যাত্রার ন্যায় উৎসবের প্রথম ও শেষ দিনে মহাসমারোহ হইয়া থাকে ও নানা দিগ্দেশান্তর হইতে উৎসব দর্শনার্থ যাত্রিগণ সমাগত হয়। সকল প্রথাই পুরুষোত্তমের মত—প্রভেদের মধ্যে সেখানে উৎসব পাঁচ দিন মাত্র স্থায়ী, আর রথে ত্রিমূর্ত্তির অভাব—রথাধিষ্ঠাত্রী একমাত্র ষোড়শী রজতময়ী শান্তা রোজালিয়া।

হাওএলএর গ্রন্থে মুদ্রিত "রথের" প্রতিকৃতি

রথ প্রকাণ্ড—ঊর্দ্ধে প্রায় ৩০ হস্ত, দীর্ঘে ৪২ হস্ত, প্রস্থে ২০ হস্ত। উহার মধ্যে বাদ্যকরগণের বসিবার স্থান থাকে। পঞ্চাশটা শ্বেত বলদ রথ টানিয়া লইয়া যায়। রথ একবারে টানিয়া লইয়া যাইবার রীতি নাই—দর্শকগণের তৃপ্তিসাধনের জন্য মাঝে মাঝে তাহা থামান হয়। হাওএল্ তাঁহার গ্রন্থে এই রথের প্রতিকৃতি প্রকাশ করিয়াছেন,—পাঠকগণের কৌতূহল পরিতৃপ্তির নিমিত্ত আমরা ঠিক তাহারই

* বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রবন্ধোক্ত শুক্লা অষ্টমীতে নহে। তবে অষ্টমীতে আরম্ভ হইয়া দশমী পর্য্যন্ত উৎসবের স্রোতঃ চলিয়াছিল কি না, বলিতে পারি না।

† দক্ষিণ ভারতের শিবমূর্ত্তির মধ্যে একটু অপরূপত্ব আছে; প্রকৃতির মূল উপাদানগুলির সাক্ষিস্বরূপ পঞ্চস্থানে পঞ্চমূর্ত্তি বিরাজমান—উল্লিখিত কাঞ্চীপুরের 'একাম্বরনাথ' ক্ষিতিমূর্ত্তি; ত্রিচিনাপল্লীর 'জম্বুকেশ্বর' জলমূর্ত্তি, তিরুবন্নমলয়ের 'অরুণাচলেশ্বর' তেজোমূর্ত্তি, কালহস্তীর 'মহেশ্বর' বায়ুমূর্ত্তি ও চিদম্বরমের 'চিদম্বর' ব্যোমমূর্ত্তি।

‡ ঐ প্রদেশের দেব-বিগ্রহেরও একটু বিশেষত্ব আছে। প্রধান প্রধান তীর্থমাত্রেরই অধিদেবতার দুইটি করিয়া মূর্ত্তি বিরাজমান—একটি সাত্ত্বিক ও একটি তামসিক। সাত্ত্বিক মূর্ত্তি নিষ্ক্রিয়—তিনি আপন পীঠে অচলভাবে বিরাজ করিয়া ভক্তের পূজা-অর্ঘ্য গ্রহণ করেন, আর তামসিক বা ভোগমূর্ত্তি তৈলহরিদ্রা মাখিয়া স্নান করেন, নানালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া দর্শকের আনন্দবর্দ্ধন করেন, কেহ বা রথারোহণে নগর পরিভ্রমণ করেন,—কেহ বা নিশাযোগে অভিসারে যান।

যথাযথ প্রতিকৃতি উদ্ধৃত করিলাম। ইহা দ্বারা পাঠকগণ য়ুরোপীয় ও অস্মদ্দেশীয় রথের আকৃতিগত সৌসাদৃশ্য কতক পরিমাণে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। *

রোজালিয়ার 'রজতময়ী' মূর্ত্তিপ্রসঙ্গে মনে আর এক কৌতূহলের উদয় হয়। কি ভারতে, কি অন্য দেশে, মূর্ত্তিমাত্রই প্রায় মৃন্ময়, শিলাময় বা ধাতুময় হইয়া থাকে। জগন্নাথের ন্যায় দারুময় মূর্ত্তি অন্যত্র আছে কি না, বলিতে পারি না—থাকিলেও, বোধ হয়, বিরল। জগন্নাথ মূর্ত্তির এই বিশেষত্বের হেতু কি? কোন ভক্ত লিখিয়াছিলেন,—

"একা ভার্য্যা প্রকৃতিমুখরা চঞ্চলা চ দ্বিতীয়া
পুত্রস্ত্বেকো ভুবনবিজয়ী মন্মথো দুর্নিবারঃ।
শেষঃ শয্যা শয়নমুদধৌ বাহনঃ পন্নগারিঃ
স্মারং স্মারং স্বগৃহচরিতং দারুভূতো মুরারিঃ॥"

স্বীয় পারিবারিক অবস্থা ভাবিয়া ভাবিয়া ভগবান্ কাঠ হইয়া গেলেন! ভক্তের কল্পনায় বেশ ভাবুকতা আছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহাতে ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক কোন গন্ধ নাই। বিদ্যাভূষণ পরন্তু তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের নিকট আমরা এ তত্ত্বের সন্ধান পাইতেও সমুৎসুক।

শ্রীপাঁচকড়ি ঘোষ।

ভ্রম-সংশোধন

আষাঢ়ের "মাসিক বসুমতীতে" প্রকাশিত 'বর্ষার পদ্মা' চিত্রে শিল্পীর নাম ভ্রমক্রমে শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মুদ্রিত হইয়াছে, কিন্তু ছবিখানির শিল্পী শ্রীযুক্ত অন্নদাকুমার মজুমদার। আমরা এই ভ্রমের জন্য ত্রুটী স্বীকার করিতেছি।

* গোটানের ও সিসিলীর রথযাত্রার উল্লিখিত বৃত্তান্ত "শিলং সাহিত্য-সভা" কর্ত্তৃক পরিচালিত "সাহিত্য-সেবক" নামক পত্রে প্রকাশিত "রথযাত্রা-রহস্য" শীর্ষক প্রবন্ধের পুনরাবৃত্তি।

রবীন্দ্রনাথের চিঠি

রবীন্দ্রনাথের "ছিন্নপত্র" বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে সমাদর লাভ করিয়াছে। কবির বিভিন্ন সময়ে লেখা বহু সংখ্যক পত্র একত্র চয়ন করিলে সাহিত্যের দিক্ হইতে তাহা যে বিশেষ উপাদেয় হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই মনে করিয়া সকলের কাছে আজ আমাদের অনুরোধ, রবীন্দ্রনাথের কোন চিঠির সংগ্রহ যাঁহার আছে, তিনি যেন তাহা যথাযথ নকল করিয়া তারিখ শুদ্ধ আমাদের পাঠাইয়া দেন বা কোন মাসিকপত্রে ক্রমশঃ প্রকাশিত করেন।

মূল পত্রগুলি কেহ পাঠাইলে তাহা ফেরৎ দিবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করিব; এবং আপত্তি না থাকিলে পত্রগুলি যাঁহাদের নিকট প্রাপ্ত যথাস্থানে তাঁহাদের নামোল্লেখ থাকিবে।

শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন।

প্রবাসী সাহিত্য-সম্মিলন

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনের ষষ্ঠ বাৎসরিক অধিবেশন আগামী বড়দিনের ছুটীতে মিরাটে হইবে স্থির হইয়াছে। এই সম্মিলন প্রবাসী বাঙ্গালীমাত্রেরই গৌরবের ও আদরের বস্তু। ইহা আমাদের জাতীয় একতা ও অন্তরঙ্গতার প্রতীকস্বরূপ। মৌলিক প্রবন্ধ পাঠ ও তদ্বিষয়ক আলোচনা এই সম্মিলনের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই অনুষ্ঠানটির প্রতি বাঙ্গালীমাত্রেরই সহানুভূতি আকৃষ্ট হউক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

আসা-যাওয়া

আসে না রে, আসে না সে চোরের মতন;
আসে যখন, সঙ্গে আসে জোরের মাতন—
ঝড়ের কেতন
মেঘের মাথায় উড়িয়ে সঘন বেগে
আসে সে যে সকল ভুবন, সকল গগন ঢেকে।
এম্নি স্বরে ভাবে,
আকাশ থেকে বজ্র যেন পড়ে—
গর্জ্জে যেন যুদ্ধ-কামান—পৃথ্বী যেন নড়ে!
আসে যখন, এম্নি করে' আসে!
উঠে' বসায় নিশীথ-শয়ন হ'তে—
নিদ সরে' যায় সভয় নয়ন হ'তে।
বন্ধ থাকে দ্বার যদি ঐ দুর্গগুলার মতন,
ঘর যদি হয় তেমনি দৃঢ়—সেই "অচলায়তন,"
পথ যদি হয় উচ্চ প্রাচীর-আঁটা,
রয় বসানো কাচের কুচির কাঁটা,
তবু,—ওরে পাগল, তবু
বন্ধ তোমার রইবে নাক বন্ধ-করা আগল কভু;
একটা ভীষণ ভূ-কম্পনের বেগে
মুহূর্ত্তেকে
পড়বে তোমার বন্ধ সকল ধ্বসি—
যাবে আগল খসি'।

সে যে সকল বাধা বলে হরণ করে;
আসে—আসে যখন, মত্ত চরণ-ভরে!

যায় সে যখন "পাগলাঝোরা" যায়
তূর্ণ বেগে পূর্ণ—ধরা দায়।
চূর্ণ বারি-ধূমে খ-তল ভরি,'
ভূতল 'পরি
একটা তরল রজত-ঝড়ের মতন—
শিকল দিয়ে বাঁধিস্ যদি, তোর শিকলের বাঁধন
ছিন্ন করে,' ছুটে' যাবে চলে'।
চোখে যদি জড়াস্ বসন, অন্ধকারে ঢাকিস্ যদি,
বন্ধ করে' রাখিস্ যদি
হিমালয়ের আঁধার-কোটা পাথর-গুহার
ভিতর,—তাহার
গতি তবু বন্ধ হবে না রে;
তারে
যাবেনাক বন্দী রাখা,—পাষাণ-প্রাচীর হেলায় যাবে দলে'।
একটা যেন প্রবল আবির্ভাব, একটা যেন প্রবল তিরোধান,
একটা যেন পাগল জোয়ার আসে—যায় যেন এক
সবল ভাটার টান!

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী।

৫৫

পরবর্ত্তী রবিবার সকালে গাঙ্গুলী মহাশয় আমার সহিত দেখা করিতে আসিলেন, তাঁহার মুখের সুপ্রসন্ন ভাব দেখিয়া বেশ বুঝা গেল যে, এবারে আর তাঁহার চেষ্টার ফল নিরাশায় পরিণত হয় নাই। আমিও সেই জন্য তাঁহাকে সানন্দে আহ্বান করিয়া বলিলাম, "বাঃ, কায হাঁসিল ক'রে এসেছেন দেখছি যে!"

আমার কথায় তাঁহার মুখে একটু আত্মপ্রসাদপূর্ণ হাসি দেখা দিল। বলিলেন, "সম্পূর্ণ হাঁসিল না হ'লেও, অনেকটা অগ্রসর হ'তে পেরেছি বটে। মাগীটাকে হাত ক'রে ফেলা গেছে।"

"বলেন কি? আপনার সে দিনের কথাটা একেবারে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন দেখছি! এখনও তিন দিন পার হয় নি।"

"মাগীর সন্ধান আগেই পাওয়া গিয়েছিল, তা ত আপনাকে সে দিনই বলেছিলাম। কাযেই তাকে হস্তগত করতে বেশী বেগ পেতে হয় নি; কিন্তু তাকে বাগ মানাতে যথেষ্টই কষ্ট পেতে হয়েছিল। প্রথমে কোন কথাই আমলে আন্‌তে চায় নি;—সবই তীব্রভাবে অস্বীকার ক'রে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল। আমি পুলিসের লোক; তাকে গ্রেপ্তার করেছি, এখনি তাকে হানাবাড়ীর খুনের অভিযোগে চালান দেব,—এ সব ভয় দেখিয়েও যখন তাকে কাবু করা গেল না, তখন শেষে 'ডিপ্লোম্যাসী' অবলম্বন ক'রে 'দম-পট্টি'র আশ্রয় নিতে হল। তাকে বললুম যে, কান সাহেবকেও এই অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং ষড়যন্ত্রের সে সব কথাই প্রকাশ করে দিয়েছে। বিহারী ঘোষের সম্বন্ধে আপনি যে সব কথা অনুসন্ধানে জেনেছেন, সেই কথাগুলো এমন ভাবে তাকে বল্লাম, যেন সে সব কান সাহেবই আমাকে বলেছে। তখন মাগীর সুর একেবারে বদলে গেল। সপ্তমে ঝঙ্কার দিয়ে, কান সাহেবের উদ্দেশে আর সেই সঙ্গে আপনার সেই স্মৃতিরত্ন ঠাকুরটির উদ্দেশেও, —যে রকম মধুর রাগিণী ভাঁজতে আরম্ভ করলে—"

"ওঃ! তা হ'লে স্মৃতিরত্নও বাস্তবিকই এ ব্যাপারে লিপ্ত ছিল দেখছি!"

"কেন, তাতে কি আপনার কোন সন্দেহ ছিল না কি?"

"সন্দেহ ছিল না বটে, কিন্তু সে যে আসল খুনটার বিষয়ে কতটা সংশ্লিষ্ট ছিল, তা ঠিক বুঝতে পারিনি।"

"আসল খুনের সঙ্গে এদের মধ্যে কার কত দূর সম্পর্ক ছিল, তা এ মাগীর কথাতেও ঠিক ক'রে কিছু জানতে পারা গেল না। সে যে, খুনের সম্বন্ধে নিজে কিছু জানে, তা বোধ হল না। তবে ও যা বল্লে, তা থেকে বিহারী ঘোষকে উমাপতির ঐ বাড়ীতে আনা, সেখানে তাঁকে ঐ মাগীটার স্বামী ব'লে আটকে রাখা, আর শেষে তাঁকে ডাক্তার ভাদুড়ীর আশ্রমে হাজির করা, ইত্যাদি ব্যাপারগুলোর বেশ সঠিক খবর পাওয়া গেছে বটে।"

"যা' হোক, এখন কি কি শুনলেন তাই বলুন!"

"সব কথা আনুপূর্ব্বিক বলতে গেলে কিছু গোলমেলে বোধ হবেই; বিবরণটাও অনেক লম্বা হয়ে পড়বে। সেই জন্য কথাগুলা মোটের উপর আমার নিজের ভাষাতেই বলা যাক্।

"মাগীটার নাম প্রমোদা। ও বাস্তবিক উমাপতির স্ত্রী নয়। উমাপতি বিপত্নীক। প্রায় ৪ বৎসর আগে তার একটি মাত্র ছেলে আর স্ত্রী, প্রায় এক সঙ্গেই মারা যায়। তার কিছু দিন পর থেকে, সে এই প্রমোদাকে নিয়ে ঘর করতে আরম্ভ করে। তাকে নিজের স্ত্রী বলেই লোকের কাছে পরিচয় দেয়। উমাপতির অবস্থা পূর্ব্বে বেশ স্বচ্ছল ছিল, কিন্তু চরিত্রহীন নেশাখোর হয়ে সব নষ্ট করেছিল। থিয়েটারে তার চিরকালই ঝোঁক ছিল। আগে কয়েকটা সখের দলে অভিনয় করে, শেষে সাধারণ রঙ্গমঞ্চেও মাঝে মাঝে পেশাদার অ্যাক্টর হয়েছিল। কিন্তু অভিনয়ের চেয়ে 'ম্যানেজারী' কাযই সে ভাল শিখেছিল। অনেক থিয়েটার

এমন কি দু' একটা ইংরাজী থিয়েটারেও সে ঐ কায সময় সময়ে করেছে। প্রায় এক বৎসর হলো, ঐ রকম একটা ইংরাজী থিয়েটারে সে কিছুদিনের জন্য সহকারী 'ষ্টেজম্যানেজার' হয়েছিল। সেই সময়ে ঐ থিয়েটারে কান সাহেবের সঙ্গে তার প্রথম আলাপ হয়। থিয়েটারের কাযটা শীঘ্রই শেষ হয়ে গেল, কিন্তু ওদের আলাপটা সেই সঙ্গে শেষ না হয়ে, বরং ক্রমেই বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াল। কান সাহেব উমাপতির বাড়ীতে এসে প্রায়ই মদের আড্ডা জমাতে লাগল। প্রমোদার সঙ্গেও সে বেশ আলাপ জমিয়ে ফেললে। তাদের অবস্থার টানাটানি দেখে, মাঝে মাঝে অর্থসাহায্যও করতে লাগল। কিছু দিন রকমে কাটাবার পর, গত শ্রাবণ মাসের প্রথমে সে এক দিন ওদের বিপুল অর্থের লোভ দেখিয়ে বিহারী ঘোষের অস্তিত্ব লোপ করাবার অভিসন্ধির প্রস্তাব করে। আসল উদ্দেশ্যটা প্রকাশ না ক'রে, সে ওদের কাছে জানিয়েছিল যে, বিহারী ঘোষ তার দূর-সম্পর্কীয় জ্ঞাতি; তিনি খুব ধনী, কিন্তু বিপত্নীক ও নিঃসন্তান; নিকট আত্মীয়ও কেউ নাই। বয়স, পঞ্চাশের বেশী; শরীরও এত রুগ্ন ও দুর্ব্বল যে, তাঁর আর বেশী দিন বাঁচবার কোন সম্ভাবনা নাই। তার উপর বহুদিন থেকে আফিমের নেশায় ইদানীং মাথাও খারাপ হয়ে গেছে। ঘর বাড়ী ছেড়ে বিবাগীর মত এ-দিক ও-দিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই সময়ে তাকে একটু বাগিয়ে নিতে পারলে, তার বিষয়-সম্পত্তিগুলা সহজেই হাত করতে পারা যায়।

"তার পর কি উপায়ে বিহারী ঘোষকে বাগাতে পারা যাবে, কান সাহেব সেই অভিসন্ধি ওদের কাছে প্রকাশ করে। বিহারী ঘোষের সঙ্গে উমাপতির চেহারার সৌসাদৃশ্য এবং বিহারীর বাঁ গালে লম্বা ক্ষত-চিহ্নের কথা জানিয়ে তারপর বল্‌লে যে, ঠিক ঐ রকম একটা ক্ষত-চিহ্ন যদি উমাপতির গালেও করিয়ে দেওয়া যায়, তা হ'লে দুজনের মধ্যে আর কোনও পার্থক্য লক্ষ্য করা যাবে না। তখন, উমাপতি বিহারী ঘোষ সেজে অন্যত্র বাস করবে, আর এদিকে আসল বিহারী ঘোষকে উমাপতির বাড়ীতে এনে উমাপতি সাজিয়ে রাখতে হবে। এইটাই একটু মুস্কিলের কায হবে বটে; কারণ, তখন প্রমোদাকে সর্ব্বদা এমন চালে চলতে হবে, যা'তে বাড়ীতে কোন আগন্তুক, এমন কি তাদের ঠিকা ঝিটা পর্য্যন্ত না সন্দেহ করতে পারে যে বাড়ীর কর্ত্তা বাস্তবিক উমাপতি নয়, কিন্তু প্রমোদার যেরূপ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তাতে তার পক্ষে এ কায শক্ত হবে না। তারপর বিহারী যদিও প্রথমে নিজেকে উমাপতি ব'লে স্বীকার করবে না বটে, কিন্তু তার মাথা এত খারাপ হয়ে গেছে যে, এখন আর তার কোন বিষয়ে আপত্তি বা প্রতিবাদ কর্‌বার ক্ষমতাই নাই। তা ছাড়া, তার স্মরণশক্তিও এত কমে গেছে যে, নিজের সম্বন্ধে অনেক কথাই তার মাথায় গোলমাল হয়ে গেছে। সে যে বিপত্নীক ও নিঃসন্তান, তাও তার অনেক সময়ে মনে থাকে না। কাযেই সে যে শীঘ্রই নিজেকে উমাপতি ব'লে স্বীকার, এমন কি বিশ্বাসও করবে, তাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে প্রথম প্রথম যদি কিছু গোলযোগ করে, তা হ'লেও লোক তা বিশ্বাস করবে না। কারণ, উমাপতিও নেশার ঝোঁকে সময়ে সময়ে যে রকম 'বেহেড' গোছের মাতলামী করে, তাতে উমাপতির মাথা খারাপ হয়ে গেছে, এ কথা পাড়ায় প্রচার করিয়ে দেওয়া মুস্কিল হবে না। আসল উমাপতি যদি পূর্ব্বে থেকেই মাঝে মাঝে একটু পাগলামীর ভাণ করে, তা হ'লে কথাটা আরও সহজ হবে। পরে যখন তাকে সরিয়ে দিয়ে বিহারী ঘোষকে নকল উমাপতিরূপে ঘরে আটকে রাখা হবে, তখন কেউ কিছু সন্দেহ করতে পারবে না। তার পরে দুই একমাস এই রকমে তাকে ঘরে বন্ধ ক'রে রেখে, তার আফিমের মাত্রা আরও চড়িয়ে দিলেই, লোকটা শীঘ্র মারা যাবে তা'তে সন্দেহ নাই। ইতিমধ্যে তাকে দিয়ে একখানা উইল করিয়ে নেওয়া যাবে। কিম্বা যদি কোন রকমেই তা না করান যায়, তো সে মারা গেলে, উমাপতি মারা গেছে ব'লে এদিকে প্রকাশ হবে; ওদিকে আসল উমাপতিকে বিহারী ঘোষ রূপে বিহারীর বাড়ীতে হাজির ক'রে, তার রোগ সেরে গেছে ব'লে প্রচার করা দুঃসাধ্য হবে না। তখন উমাপতিই বিহারীরূপে তার বিষয় সম্পত্তির মালিক হয়ে বাকী জীবনটা কাটাবে।

"বিহারীকে যতদিন উমাপতিরূপে উমাপতির বাড়ীতে আটকে রাখা হবে, এবং উমাপতি নিজে বিহারীরূপে অন্যত্র বাস করবে, তত দিন, অর্থাৎ উমাপতিরূপী বিহারীর মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত, আসল উমাপতির ও প্রমোদার সমস্ত খরচপত্র অবশ্য কান সাহেবই যোগাচ্ছে

প্রতিশ্রুত হ'ল। এইরূপে আপাততঃ ওদের আর্থিক দুরবস্থা দূর হবে, আর ভবিষ্যতেও বিপুল সম্পত্তি হস্তগত হবে, এই লোভে ওরা দু' জনেই কান সাহেবের ঐ সব প্রস্তাবে সম্মত হ'ল।"

৫৬

একে রবিবার, তাহাতে বাহিরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছিল, ঘরের ভিতর গাঙ্গুলী মহাশয়ের গল্পটা সেই জন্য বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল। আমিও একাগ্র মনে তাহা শুনিতেছিলাম। এতক্ষণে তাঁহার কথায় একটু ফাঁক পাইয়া বলিলাম, "তা হ'লে দেখছি কান সাহেবই এই ষড়যন্ত্রের মূলাধার! স্মৃতিরত্ন তবে এর ভিতর এসে জুটল কি ক'রে? লোকটা বাস্তবিক কে, থাকেই বা কোথায়, এ সব কিছু জেনেছেন কি?"

"না, মাগীটা তা কিছু বলতে পারলে না, বরং সে নিজেই ঐ সব এখন জানতে বড় উৎসুক। ও না কি মাগীকে টাকাকড়ির সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ফাঁকি দিয়েছে; সেই জন্য মাগীর ওর উপর ভারী আক্রোশ। পরামর্শ ঠিক হবার পর দিনেই, কান সাহেব ওকে সঙ্গে নিয়ে, এদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল যে, ও, বিহারী ঘোষের ম্যানেজারের ভাই, বিহারী ঘোষের 'নাড়ী-নক্ষত্র' সব বেশ ভাল রকম জানে; খুব বিচক্ষণ, কাযের লোক; সেই জন্য ওদের অভিসন্ধি অনুসারে কায করতে গেলে ঐ লোকটির সহায়তা নিতান্ত আবশ্যক। ও, ম্যানেজারকে হাত ক'রে, খরচপত্রের সমস্ত টাকাকড়ি যোগাবারও ভার নিতে রাজী আছে। এই সব কথায়, প্রমোদা ও উমাপতির কাছে প্রথম থেকেই ওর খুব খাতির জমে গিয়েছিল। এখন কিন্তু প্রমোদার দৃঢ় ধারণা হয়েছে যে, লোকটা পাকা জুয়াচোর এবং ম্যানেজারের ভাই ব'লে যে পরিচয় দিয়েছিল তাও মিথ্যা।"

"যাক্, এখন গল্পটা যে ভাবে বলছিলেন, সেই রকম ধারাবাহিক ভাবেই বলুন।"

"স্মৃতিরত্নের সঙ্গে আলাপ হওয়ার দু' এক দিন পরেই, ওদের মন্ত্রণা অনুসারে কায আরম্ভ হ'ল। প্রথমে উমাপতির গালে দাগা দেওয়ার পালা। সেটা কান ও স্মৃতিরত্ন পরস্পরের সাহায্যে করেছিল। ওরা বিহারী ঘোষের একটা খড় গোছের ফটোগ্রাফ এনেছিল, সেই ছবিতে গালে যে রকম দাগ ছিল, স্মৃতিরত্ন ঠিক সেই অনুযায়ী উমাপতির গালে প্রথম খয়ের গোলা জল দিয়ে একটা দাগ করে, যখন সেটা শুকিয়ে গিয়ে সকলের বেশ মনোমত হ'ল, তখন সেই দাগের ঠিক উপরের ও নীচের দিকে, সাদা মোমের মত কি একটা জিনিষ স্মৃতিরত্ন এমন নিপুণ ভাবে লাগিয়ে দিলে যে, সেই দাগের রেখার উভয় দিকে বেশ একটা উঁচু বেড়ার মত হ'য়ে গেল। তার পরে কি একটা তরল জিনিষ তুলির দ্বারা সেই দুই মোমের বেড়ার মধ্যের স্থানটা, অর্থাৎ সেই সরু রেখাটার উপর আগাগোড়া মাখিয়ে দিলে। তাতে উমাপতির খুব জ্বালা বোধ হয়েছিল। একটু চেঁচামেচিও করেছিল বটে, কিন্তু কান ও প্রমোদা তাকে চেপে ধরেছিল ব'লে নড়তে পারে নি। তার পর স্মৃতিরত্ন আর একটা তরল পদার্থ দিয়ে আগের প্রলেপটা ধুয়ে ফেলে, জ্বালা কমবার পর সমস্ত মুখখানায় 'ব্যাণ্ডেজ' বেঁধে দিলে। পর দিনেই সেই রেখার আগাগোড়া বেশ গভীর একটা ঘা হ'য়ে গেল। পরে স্মৃতিরত্নেরই চিকিৎসায় ঘা-টাও যখন বেশ সেরে গেল, তখন সে স্থানটায়, ঠিক ঘোষজা মশায়ের গালের ক্ষতের মতই একটা দীর্ঘ ক্ষতচিহ্ন থেকে গেল। তার পর ওরা উমাপতির একটা ফটো তুলিয়ে আনলে। সেটা ঘোষজা মশায়ের ফটোখানার সঙ্গে এমন মিলে গেল যে, দু' খানাই যেন একই লোকের ছবি ব'লে বোধ হ'ল।"

আমি বলিলাম, "বাঃ! লোক দু'টার খুব বাহাদুরী আছে তো?"

"তাতে আর সন্দেহ আছে? প্রথম থেকেই ওদের কার্য্যকলাপ একবার ভেবে দেখুন না! যেমন নিপুণতা, তেমনি দুঃসাহস! ওরা যদি কোন ভাল কাযে ঐ রকম মাথা খাটাতো, তা হ'লে দেশে মস্ত কিছু একটা কীর্ত্তি রেখে যেতে পারত।"

"যা বলেছেন! তবে, ও সব মাথা-ভাল দিকে খেলতে বড় একটা দেখা যায় না। আর তা না হ'লে, ফৌজদারী আদালত চলবে কি ক'রে,—আমরাই বা দু'পয়সা পাব কোথা থেকে?"

গাঙ্গুলী মহাশয় হাসিয়া, নিজের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "আর, এ গরীবদেরেই বা চাকরী থাকবে কেন?—সেটাও বলুন!"

পরিহাস ছাড়িয়া আমি বলিলাম, "যাক, এখন বাকী কথাগুলো বলুন।"

"আর বোধ হয় বল্‌বার মত কথা বেশী বাকী নাই। উমাপতির গালে দাগ দেওয়ার পালা শেষ হ'লে, কিছু দিন পরে স্মৃতিরত্ন এসে খবর দিলে যে, একটা নিরালা পল্লীতে সে একখানা বেশ সুবিধামত বাড়ী দেখে এসেছে; এক-তলা হলেও নূতন মেরামত করা। তা ছাড়া সে জেনে এসেছে যে, সে বাড়ীতে, তার পিছনের বাড়ী থেকে গোপনে যাতায়াতের একটা উপায় আছে। এটা একটা মস্ত সুবিধা; কারণ, ওদের সকলের মধ্যে পরামর্শ ক'রে স্থির হয়েছিল যে, উমাপতিকে বিহারী ঘোষ সাজতে হ'লে, শুধু সাহেবী চালে থাকলে হবে না; জগতে তার আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধুবান্ধব কেউ নাই এইভাবে সে বাড়ীতে সম্পূর্ণ একলা থাকতে হবে। পথে ঘাটে বা অন্য কোথাও কারও সঙ্গে আলাপ করবে না এবং বাড়ীতেও অপর কাকেও আসতে দেবে না। অথচ ওকে খরচ পত্রের টাকাকড়ি ও এদিকের খবরাখবর দেবার জন্য, স্মৃতিরত্ন বা কান সাহেবের সঙ্গে মাঝে মাঝে ওর দেখা-সাক্ষাৎ হওয়াও দরকার; সেই জন্য এই গোপনে যাতায়াতের পথটা বড় সুবিধার কথা হয়ে দাঁড়াল। তখন আরও ঠিক হ'ল যে, ঐ পিছনের বাড়ীটাতে স্মৃতিরত্ন দুই একটা ঘর ভাড়া নিয়ে সেখানে বাস করবে। এই রকম গোপনে দেখা-সাক্ষাতের সুবিধার জন্য, উমাপতি কোন ঝি বা চাকরকে বাড়ীতে স্থান দিতে পাবে না; ঠিকা চাকরের দ্বারা দু'বেলা ঘরের কাযকর্ম্ম সারা, ও হোটেলে খাওয়া,—এইরূপ ব্যবস্থা ঠিক হ'ল।

"তার পরে, নামকরণের পালা। স্মৃতিরত্ন ও কান-সাহেবের বাস্তবিক যে উদ্দেশ্য ছিল, তা'তে, উমাপতিকে স্পষ্টতঃ বিহারী ঘোষের নাম দিলে হয় ত ওদের সে উদ্দেশ্য-সাধনে কোন ব্যাঘাতের আশঙ্কা ছিল, সেই জন্য ওরা স্পষ্ট বিহারী ঘোষ নামের বদলে, বিহারী ও তার 'নন্দন-কুঞ্জ' এই দুটো নাম জড়িয়ে ঐ কুঞ্জবিহারী নন্দন নামটা ঠিক ক'রে রেখেছিল। ওদেরি পরামর্শ অনুসারে সেই জন্য উমাপতির ঐরূপ নামকরণ হ'ল। ওদের কথামতই যখন সব কায হচ্ছিল, তখন এ নামের সম্বন্ধেও উমাপতির বা প্রমোদার কোন আপত্তি হ'ল না। বরং নামটা একটু মজাদার গোছের বোধ হওয়ায় উমাপতি বেশ খুসীই হ'ল। যা হোক, এই সব পরামর্শ ঠিক হবার পরে, উমাপতি সাহেবী পোষাকে বিহারী ঘোষ সেজে, কুঞ্জবিহারী নন্দন নামে আপনাদের ঐ হানাবাড়ীর বাড়ীওয়ালার সঙ্গে ভাড়ার বন্দোবস্ত ঠিক ক'রে এল। তার পর সেখানে বাসের উপযোগী আসবাব, সরঞ্জাম, পোষাক ইত্যাদি কিনে নিয়ে সেখানে গিয়ে অধিষ্ঠান করলে। টাকাকড়ি সব স্মৃতিরত্নই যোগাতে লাগল; আর সে নিজেও দু'চার দিন পরে, পিছনের বাড়ীতে ঘর ভাড়া ক'রে আড্ডা গাড়লে।" [ক্রমশঃ।

শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (এটর্ণী)।

ভাদ্র

ভাদ্রে ভরা মরা নদী
তোলে যে ঐ কুলুতান
আশ্বিনে সে উৎসবেরই
অগ্রদূতের নয় কি গান!
মাঝে মাঝে সোনার কিরণ
কাল মেঘের কোল দিয়ে,
আলো-ছায়ার নূতন খেলা
রূপ-সাগরের রং নিয়ে!
এই মাসেরই বুধের রাতে
ধন্য কংস কারাগার.

বসুমতীর ভাগ্যে উদয়
নন্দপুরে চন্দ্রমার!
বর্ষাবাসের শেষ এ মাসে
'তথাগতের" বিরাম শেষ,
"অভদ্রা" হায় ভাদ্র তবু—
প্রচার করে আমার দেশ!
ভাদ্রে আশা আশ্বিনেরই—
আস্‌বে যে মা ঐ কালে,
দুঃখ-বেদন ঘুচবে তখন
যত লেখা এই ভালে।

শ্রীসতীশপ্রসাদ সর্বাধিকারী।

ভাওয়ালী স্যানেটোরিয়ম্

ভাওয়ালীর "স্যানেটোরিয়ম্"এর (Bhowali Sanatorium) নাম সম্ভবতঃ 'মাসিক বসুমতী'র অনেক পাঠকেরই সুবিদিত।

ভাওয়ালীতে যে "স্যানেটোরিয়ম্" আছে, উহা কেবল "থাইসিস্" (T. B) রোগীদের জন্য নহে। আজ কাল "স্যানেটোরিয়ম্" বলিতে সাধারণতঃ T. B. (Tuberculosis) বা যক্ষ্মা রোগেরই "স্যানেটোরিয়ম" বুঝায়। ভাওয়ালী ব্যতীত ধরমপুর (Dharampur R. S. সিমলার রাস্তায়) প্রভৃতি আরও ২১ স্থানে এই রোগের "স্যানেটোরিয়ম" আছে। সম্প্রতি বাঙ্গালা দেশেও একটি স্যানেটোরিয়ম্ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; কিন্তু খুব সম্ভব, বাঙ্গালাতে ভাওয়ালীর অপেক্ষা ধরমপুরেরই নাম অধিক বিদিত। তাহার কারণ আমার বোধ হয়, ধরমপুর রেলওয়ে ষ্টেশনের উপরেই সিমলার পথে নামটি জানিতে পারা যায়। নতুবা নানা কারণে ধরমপুর অপেক্ষা ভাওয়ালীর স্যানেটোরিয়ম্ শতগুণে ভাল। যাহাই হউক, ক্রমশঃ এই রোগ ভারতে যেরূপ প্রসারলাভ করিয়াছে ও সে জন্য স্যানেটোরিয়ম্এর প্রয়োজনীয়তা উত্তরোত্তর যেভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে দেখা যায় যে, বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে যে কয়টি "স্যানেটোরিয়ম্" আছে, তাহা আদৌ পর্য্যাপ্ত নহে। প্রত্যেক বৎসরে অনেক রোগীকেই বিঘোরে ও বিনা চিকিৎসায় প্রাণ হারাইতে হয়। নতুবা দেখা যাইতেছে যে, এ রোগের প্রথম অবস্থাতেই যদি কোন "স্যানেটোরিয়ম্"এ রোগীকে স্থানান্তরিত করা হয়, তাহা হইলে এই দুরারোগ্য রোগের কবল হইতে রোগী অনায়াসেই মুক্ত হইতে পারেন। সাধারণতঃ রোগীরা ভাল উপদেশ না পাইয়া প্রথমে এথানে ওথানে চেঞ্জে গিয়া রোগটিকে বেশ বাড়াইয়া তাহার পর কোন উপায়ে ভাওয়ালী বা ধরমপুর বা আলমোড়া প্রভৃতি পার্ব্বত্য অঞ্চলের সন্ধান পাইয়া তথায় চিকিৎসার্থ যাত্রা করেন, কিন্তু তখন হয় ত শেষ অবস্থা—যখন কোন জায়গাতেই আর সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায় না। এ কথা সম্পূর্ণরূপে আমার নিজের নহে। আমার জানা শুনা অনেক লোকই এই রকম মত প্রকাশ করিয়া থাকেন ও তাঁহারা এ বিষয়ে কলিকাতার অনেক ভাল ভাল ডাক্তারের দোষ দেন। তাঁহারা বলেন, কলিকাতার বড় বড় ডাক্তারদেরও এ রোগের 'চেঞ্জের' (Change) সম্বন্ধে জ্ঞানের দৌড়,—সিমুলতলা, ঝাঁঝা, হাজারীবাগ, ঘাটশিলা প্রভৃতি বাঙ্গালার কাছাকাছি স্বাস্থ্যপ্রদ স্থানসমূহ। অনেক ডাক্তারই ভাওয়ালী বা আলমোড়ার সন্ধান জানেন না। এ রোগে "স্যানেটোরিয়ম্" বা আলমোড়া প্রভৃতি পাহাড়ী ঠাণ্ডা জায়গায় যত উপকার পাওয়া যায়, এত আর কিছুতেই পাওয়া যায় না। আর এ সকলের মধ্যে ভাওয়ালী বা ধরমপুরের "স্যানেটোরিয়ম্"ই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল।

এই সব কারণে আমার মনে হয় যে, "থাইসিস্"এর প্রথম অবস্থায় রোগীকে অন্য কোন স্থানে না লইয়া গিয়া যদি কোন "স্যানেটোরিয়ম্"এ লইয়া যাইবার চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে শীঘ্র উপকার হয়। যদি স্যানেটোরিয়মে স্থান পাওয়া না যায়, তাহা হইলে আলমোড়া বা ধরমপুরের কাছে "সোলান" প্রভৃতি পাহাড় অঞ্চলে যাওয়া ভাল। অনেকে মনে করেন যে, "স্যানেটোরিয়মে" অনেক রোগীর বাস। আর রোগীও ভাল মন্দ নানা রকমের। যাহাদের আক্রমণ ভীষণভাবে হয় নাই বা আক্রমণ সবে মাত্র আরম্ভ হইয়াছে, তাঁহাদের কোন স্যানেটোরিয়মে যাইতে স্বভাবতঃই ভয় হয়, কিন্তু এ ভয়টা যে কতদূর অমূলক ও ক্ষতিকর, তাহা "স্যানেটোরিয়মে" আসিলে বেশ বুঝা যায়। স্যানেটোরিয়ম্এ যে রকম বন্দোবস্ত থাকে, তাহাতে "স্যানেটোরিয়ম্"ই রোগ-সংক্রামক (ইন্‌ফেকশন্) বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ এবং "স্যানেটোরিয়মে" সর্ব্বাপেক্ষা শীঘ্র ও অধিক উপকারের আশা করা যায়।

ভাওয়ালী নাইনিতালের ৫ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহার সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধার রেলওয়ে ষ্টেশন হইতেছে আর, কে (R. K) রেলওয়ের শেষ ষ্টেশন "কাঠগুদাম"; ভাওয়ালী হইতে উহা ২১ মাইল। "কাঠগুদাম" হইতে আলমোড়া পর্য্যন্ত একটা বড় রাস্তা আছে। ঐ পথে লরী বা কার্ (Car) যাওয়া-আসা করে। ভাওয়ালী স্যানেটোরিয়ম্ এই গাড়ীর রাস্তার উপরেই অবস্থিত। কাঠগুদাম হইতে আলমোড়া পর্য্যন্ত একটা হাঁটা রাস্তাও আছে। সে রাস্তা দিয়া গেলে ভাওয়ালী ১৪ মাইল। পথে

"ভীমতাল" নামে একটি সুন্দর হ্রদ আছে। কিন্তু এ রাস্তায় বড় 'চড়াই' বলিয়া এ রাস্তা দিয়া বড় কেহ যাতায়াত করে না। ভাওয়ালী হইতে ভীমতাল ৫ মাইল।

মার্চ্চ মাসের মাঝামাঝি হইতেই পাহাড়ে থাকিবার 'সিজেনের' (মরশুমের) প্রারম্ভকাল। কাঠগুদাম ষ্টেশনে লরী ও কারের বড় আমদানী হয়; সুতরাং বিনা কষ্টেই ভাওয়ালী যাইবার লরী মিলিয়া যায়। নৈনীতাল ভাওয়ালীর খব নিকটে হইলেও এক পথে নহে বলিয়া নৈনীতালের জন্য যে গাড়ীগুলি প্রস্তুত হয়, সেগুলিতে ভাওয়ালীর যাত্রীকে লওয়া হয় না বা লইলেও তাহাতে যাওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। "রাণীখেট" (এখানে গোরা সেনাদের গ্রীষ্মনিবাস) বা আলমোড়ায় যে সব লরী বা "কার" যায়, ভাওয়ালী যাইতে হইলে তাহাতেই যাইতে হয় এবং সচরাচর সকলে এই সব গাড়ীতেই যাইয়া থাকে

পূর্ব্বে এই পথটা 'নৈনীতাল মোটার ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর' প্রায় একচেটিয়া ছিল বলিয়া গাড়ীর ভাড়া বড় অধিক ছিল; কিন্তু এখন অনেক কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা হইয়াছে বলিয়া ভাড়া হ্রাস হইয়া গিয়াছে। প্রায় ২।১ টাকাতেই ভাওয়ালী যাওয়া যায়। আলমোড়ার ভাড়াই ৭।৮৲ টাকার বেশী নহে। এখানে "লরী"র সংখ্যা এত বেশী হইয়াছে যে, কোম্পানীদের লোক 'বেরিলী', 'হল্দোয়ানী' প্রভৃতি ষ্টেশন হইতেই যাত্রীকে জ্বালাতন করিতে আরম্ভ করে, আর ভয় দেখাইয়া বেশী ভাড়ার টিকিট কাটাইবার চেষ্টা করে।

"কাঠগুদাম" হইতে ভাওয়ালী আসিতে ৩।৪ ঘণ্টা লাগে। বলিতে গেলে ২ ঘণ্টার মধ্যেই লরী পৌঁছিতে পারে; কিন্তু মধ্যপথে ১২ মাইলের শেষে "ব্রুয়ারী" (Brewary) বলিয়া একটা বড় দরের "মোটার" ষ্টেশন ও "জংসন" আছে, ঐ স্থান হইতে নৈনীতালের দিকে একটা পথ এবং আলমোড়ার দিকে ভাওয়ালী, রাণীখেট হইয়া আর একটি পথ গিয়াছে; এইখানে গাড়ীওয়ালারা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে বলিয়া বিলম্ব হয়। য়ুরোপীয়দের জন্য এই স্থানে একটা রেঁস্তরা ছিল। এবারকার ভীষণ বৃষ্টিতে উহা ধ্বংস হইয়াছে। হিন্দুদের জন্য খাবারের দোকানও ২।১টা আছে, কিন্তু বাঙ্গালীদের পক্ষে উহা থাকা-না-থাকা সমান।

"ভাওয়ালী স্যানেটোরিয়ম্" ভাওয়ালী বাজার হইতে প্রায় ১ মাইল দূরে অবস্থিত এবং কাঠগুদাম হইতে যাইতে পথে পাওয়া যায়। লরীওয়ালাদিগের পূর্ব্বে বলিয়া রাখিলে "স্যানেটেরিয়ম্"এর গেটেই যাত্রীকে নামাইয়া দিয়া যায়। নতুবা সরাসরি বাজারে লইয়া গিয়া বেশ একটু অসুবিধায় ফেলিয়া দেয়। গাড়ী-সড়কের উপরেই স্যানেটোরিয়মের 'গেট'। বড় বড় অক্ষরে কাঠের উপর লিখিত আছে। —কিং এডওয়ার্ড সপ্তম স্যানেটোরিয়ম্। সুতরাং চিনিবার কোনই গোলযোগ হয় না। 'গেটের' পার্শ্বেই ভাজা-ছোলা, চিনেবাদাম প্রভৃতির একটা ছোট দোকান আছে, দোকানদারকে বলিলেই সে কুলী প্রভৃতি যোগাড় করিয়া দেয় ও প্রয়োজন হইলে, স্যানেটোরিয়ম্এ খবর দিতে পারে। "গেট" হইতে স্যানেটোরিয়ম্ "কোয়ারটাস" প্রায় ২ ফার্লং একটু চড়াই সুতরাং রোগীদের জন্য একটা ডাণ্ডির দরকার। স্যানেটোরিয়মের ডাণ্ডি আছে। পূর্ব্বে খবর দিলে আফিস হইতে ডাণ্ডি পাঠাইয়া দেয়। যদি "গেটে" ডাণ্ডি না থাকে, খবর দিলেই আসিয়া যায়। "স্যানেটোরিয়ম্"এর গায়েই একটা বেণের দোকান আছে। দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করিলেই প্রয়োজন মত অনেক খবর পাওয়া যায়। দোকানী-হিসাবে খুব ভদ্র, প্রয়োজন হইলে তাহার সাহায্যও অনায়াসেই পাওয়া যাইতে পারে।

ভাওয়ালী স্যানেটোরিয়ম্ ও ধরমপুর স্যানেটোরিয়ম্ প্রায় এক সময়েই প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই দুইটি স্যানেটোরিয়ম্-এরই নাম কিং এডওয়ার্ড সপ্তম স্যানেটোরিয়ম্। ভাওয়ালীতে যুক্তপ্রদেশের বর্ত্তমান ইন্সপেক্টর-জেনারেল অফ হস্পিটালস্ কর্ণেল ককরেন ১৯১২ খৃষ্টাব্দে যুক্তপ্রদেশের তালুকদারদের ও গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে ভাওয়ালী স্যানেটোরিয়ম্এর স্থাপনা করিয়াছিলেন ও কয়েক বৎসরের জন্য সুপারিণ্টেন্ডেণ্ট ছিলেন। ককরেনের পর কাপ্টেন কক্কার সুপারিণ্টেন্ডেণ্ট হইয়াছেন। ইনি যুক্তপ্রদেশেরই অধিবাসী।

ভাওয়ালী স্যানেটোরিয়ম্এর জমি-জায়গা, বাড়ী-ঘর প্রভৃতি অনেক কিছু যুক্তপ্রদেশের তালুকদারদের দান।

ভাওয়ালী স্যানেটোরিয়ম্এ প্রবেশ করিলেই একটা বিষয় বিশেষ লক্ষ্য করিবার আছে। এখানে য়ুরোপীয়ান ও ভারতবর্ষীয়দের জন্য বেশ একটু পৃথক্ ব্যবস্থা সব বিষয়েই

আছে। য়ুরোপীয়ানদের জন্য একটিই ক্লাস ও একই রকম খাবার প্রভৃতির ব্যবস্থা এবং থাবার ব্যবস্থা স্যানেটোরিয়ম্ নিজেই করে; তবে খরচ অবস্থাভেদে কম-বেশী করিয়া রোগীদিগেরই দিতে হয়। খেলা-ধূলা বা পড়াশুনার ব্যবস্থাও স্বতন্ত্র; তবে এ সব বিষয়ে উচ্চ শ্রেণীর ভারতীয় রোগীরাও য়ুরোপীয়ানদের সঙ্গে সমান অধিকার ভোগ করেন।

ভারতীয়দের জন্য আর্থিক অবস্থাভেদে ৪টা ক্লাস আছে। প্রস্‌পেক্টাস্ পড়িলেই এ সব জানিতে পারা যায়।

ক্লাস ৪টা, এ, বি, সি, ডি। ৪টার মধ্যে প্রথম দুইটি ক্লাসের 'কটেজ'গুলির জন্য ভাড়া দিতে হয়। 'এ' ক্লাসের ভাড়া মাসিক ৬০৲। বি, ক্লাসের ভাড়া ৩০৲। এ, ক্লাসের কটেজগুলি পরস্পর স্বতন্ত্র ও দূরে অবস্থিত। প্রত্যেক কটেজে দুইটি করিয়া ঘর ও একটি বারান্দা; বি, ক্লাসের প্রত্যেক কটেজে দুইটি ঘর; প্রত্যেক ঘর এক একটি রোগীর জন্য নির্দ্দিষ্ট। এ, ও বি, দুই ক্লাসেরই রোগীদের জন্য পৃথক রান্নাঘর ও শৌচাগার কটেজের সংলগ্ন। খাবারের বন্দোবস্ত রোগীদের নিজেরই করিয়া লইতে হয়।

এ, আর বি, ছাড়া ভারতীয়দের জন্য আর যে দুইটি ক্লাস আছে, তাহার জন্য ভাড়া হিসাবে রোগীদের কিছুই দিতে হয় না। ডি ক্লাসে ১৮টি সিট আছে; একটা বড় বারান্দায়, পাশাপাশি ও কাছাকাছি ১৮টা নেওয়ারের খাট পাতা আছে। এই ক্লাসের রোগীদের আহারের বন্দোবস্ত স্যানেটোরিয়ম্ নিজেই করে, কিন্তু তাহার জন্য রোগীদের কিছুই দিতে হয় না; ধোপা নাপিত প্রভৃতি খরচ পর্য্যন্ত স্যানেটোরিয়ম্ দেয়। হাতখরচের জন্য ২।৪ টাকা হইলেই এক জন রোগী বেশ স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে।

স্যানেটোরিয়ম্ হইতে রোগীদিগকে যে আহার্য্য দেওয়া হয়, তাহা যথেষ্ট না হইলেও বিশেষ কম দেওয়া হয় না। দুধ ৫ পোয়া আন্দাজ দেয়—তিন বারে। সন্ধ্যাকালে রুটি ও মাংস; দ্বিপ্রহরে ভাত ও রুটি ও একটা তরকারী (একটু অখাদ্য রকমের) আর একটা ডাল। ধরমপুরের মত এখানে ডিম ও পাঁউরুটি দেওয়া হয় না, তবে প্রয়োজন হইলে রোগীরা ডিম, মাখন প্রভৃতি নিজের পয়সায় কিনিতে পারে।

ডি, ক্লাসের মত সি, ক্লাসেও ১৮টি রোগীর ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেক রোগীর জন্য পৃথক কামরা দুইটি ব্লকএ অবস্থিত, অপার আর লোয়ার; উপরের ব্লকে দুহাত তফাৎ ৬টা করিয়া ১২টা ঘর, সম্মুখে একটি বড় প্রশস্ত বারান্দা, নিম্নের ব্লকে ৬টি ঘর। পূর্ব্বে নিম্নের ব্লকে যে সব রোগী থাকিত, তাহাদের থাবার সরবরাহ করা হইত স্যানেটোরিয়ম্ হইতে এবং তাহার জন্য স্যানেটোরিয়ম্‌কে মাসে মাসে ৩০৲ টাকা দিতে হইত। ডি, ক্লাসের জন্য যে খাবার দেওয়া হয়, এই ক্লাসের রোগীদিগকেও তাহাই দেওয়া হইত। কিন্তু এই বৎসর হইতে সেই নিয়ম উঠিয়া গিয়াছে। এখন হইতে তাহাদের খাবারের বন্দোবস্ত উপরিস্থ ব্লকের রোগীদের মত নিজেই করিয়া লইতে হইবে। এ ব্যবস্থায় আমার মনে হয়, একটু অসুবিধা হইবে। যাঁহারা ডি, ক্লাসের গাদায় যাইতে অভিলাষী নহেন এবং স্বয়ং আহারের বন্দোবস্ত করিবার হাঙ্গামা হইতে অব্যাহতিলাভ করিতে চাহেন, তাঁহাদের জন্য এই মাঝামাঝি বন্দোবস্তটা মন্দ ছিল না।

যাঁহারা সবিশেষ না জানেন, তাঁহারা এই ক্লাস লইয়া বেশ একটু গোলযোগে পড়েন এবং কিছু কিছু ভুলও করিয়া ফেলেন।

যাঁহাদের অবস্থা বেশ স্বচ্ছল এবং যাঁহারা প্রায় ১৫০৲ ২০০৲ খরচ অনায়াসেই করিতে পারেন, তাঁহাদের থাকা উচিত এ, ক্লাসে। স্বতন্ত্র একটা কটেজে তাঁহারা স্বাধীন ভাবেও বেশ আরামে থাকিতে পারেন। আর উহাতে রোগ-সংক্রমণের ভয় তত আর করিতে হয় না। কেন না, কটেজগুলি পরস্পর দূরে অবস্থিত।

যাঁহাদের অবস্থা মোটেই ভাল নহে, তাঁহাদের উচিত ডি, ক্লাসের জন্য চেষ্টা করা। অল্প খরচে, অনেক দিন পাহাড়ে এ রকম সুচিকিৎসায় থাকিবার এমন সুবিধা খুব কমই পাওয়া যায়।

এ কঠিন রোগে যিনি আক্রান্ত, তাঁহার মনে করা উচিত যে, ২।৪ মাসে নিরাময় হইয়া কার্য্যক্ষম হওয়া একরূপ অসম্ভব। দীর্ঘকাল পাহাড়ে বা পাহাড়ী কোন স্যানেটোরিয়মে কাটাইতে পারিলে বেশ ভাল করিয়া নিরাময় হওয়া যাইতে পারে এবং যাঁহাদের আক্রমণ তত ভীষণ হয় নাই, তাঁহারা দুই বৎসরের মধ্যেই তাঁহাদের নষ্ট স্বাস্থ্য আবার ফিরিয়া পাইতে পারেন এবং তাঁহাদের দ্বিতীয়বার আক্রমণ হইতে দেখা বা শুনা যায় না। সুতরাং বেশীদিন এইরূপে চিকিৎসা করাইতে

হইলে প্রথম হইতেই খরচের দিকে একটু লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। সাধারণতঃ ভাওয়ালী স্যানেটোরিয়মে রোগীদের দুইবার করিয়া সুযোগ দেওয়া হয় এবং নিজের খরচে দুই বৎসর পাহাড়ে থাকা, অনেকেরই পক্ষে একটু কষ্টকর—যেহেতু ব্যয়সাধ্য। সে হিসাবে দেখিতে গেলে, একটা বৎসরও যদি বিনা খরচে বা অল্প খরচে ডি, ক্লাসে থাকিতে পারা যায়, তাহা হইলে অনেকটা সুবিধা ও ব্যয়সঙ্কোচ হইতে পারে। অনেকে ডি, ক্লাসে ভর্ত্তি হওয়া অপমানজনক বলিয়া মনে করেন এবং ইহাও ঠিক যে ডি, ক্লাসের রোগী-দিগকে সকলেই অনুকম্পা ও ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। আর পাশাপাশি অনেক রোগীর মাঝে থাকিতে হয় বলিয়া, মনে একটু ভয় হওয়াও অস্বাভাবিক নহে। ইহা সত্ত্বেও প্রাণটাকে যদি বড় মনে করা হয় এবং আর্থিক অবস্থাও খব ভাল না হয়, তাহা হইলে এ সব দিক্ দিয়া বিবেচনা করা উচিত নহে। রোগের দিক্ দিয়া কোন বিশেষ অনিষ্ট তেমন হয় না বলিয়াই জানি।

মধ্যবিত্ত লোকের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল সি, ক্লাস। স্যানেটোরিয়মের অখাদ্যও তেমন খাইতে হয় না—সকলেরই একটা একটা আলাদা ঘর, সুতরাং ডি, ক্লাসের গাদার ভয়ও তত থাকে না। ভাওয়ালী স্যানেটোরিয়মে নারীদের জন্য পৃথক্ বন্দোবস্ত আছে। পূর্ব্বে একটা ব্লকে পাশাপাশি ৬টা ঘরে ৬ জন রোগীর অবস্থানের স্থান ছিল। এই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন যে ব্যবস্থা হইয়াছে, উহা পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল। বর্ত্তমানে স্যানেটোরিয়মের এক ধারে কাছাকাছি তিনটা কটেজের প্রত্যেকটায় দুই জন করিয়া রোগিণীর থাকিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। এই কটেজগুলির আবরুও আছে। রান্নার বন্দোবস্ত নিজেদেরই করিতে হয়। তাহার জন্য স্বতন্ত্র রান্নাঘর আছে। এই গুলিকে ফিমেল সি বলা হয় এবং ঘরের জন্য ভাড়া দিতে হয় না। এতদ্ব্যতীত বি, ও এ, ক্লাসেও নারীদের থাকিবার স্থান আছে।

ধরমপুরে রোগীদের সঙ্গে যাঁহারা আসেন, তাঁহাদের থাকিবার জন্য স্বতন্ত্র ঘরের বন্দোবস্ত আছে, আর তাহার জন্য স্বতন্ত্র ভাড়াও দিতে হয়, কিন্তু ভাওয়ালীতে এ রকম কোন ব্যবস্থা নাই। এ, ক্লাস ছাড়া অন্য সব ক্লাসেই রোগীর ঘরেই তাঁহাদের থাকিতে হয়। ডি, ক্লাসে রোগী ব্যতীত অন্য কোন লোককে থাকিতে দেওয়া হয় না।

বোধ হয় য়ুরোপের স্যানেটোরিয়ম্‌গুলির অনুকরণে ধরমপুর স্যানেটোরিয়ম্ হইতেই প্রত্যেক রোগীকে খাবার দেওয়া হয়। স্যানেটোরিয়ম্‌কে ইহার জন্য দিতে হয় মাসে ৫৫৲ টাকা করিয়া। আর যাঁহারা মাংস খাইয়া থাকেন, তাঁহাদের দিতে হইবে ৭০৲ টাকা।

ভাওয়ালী স্যানেটোরিম্ এ ব্যবস্থা না করিয়া ভালই করিয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন জাতির বিভিন্ন রুচি। অথচ স্যানে-টোরিয়েমের এক রকম রান্না, কাযেই কোন লোকেরই তেমন মনঃপূত হয় না। রোগীরা প্রায়ই নানা অভিযোগ করিতে বাধ্য হয়। এ বিষয়ে বাঙ্গালীদেরই অধিক কষ্ট হয়। তাহাদের ৫টা তরকারী দিয়া ভাত খাওয়া অভ্যাস, তদ্ভিন্ন তাহাদের রান্নার ধারাই স্বতন্ত্র। সে জন্য আমার মনে হয়, য়ুরোপের ব্যবস্থা আমাদের দেশে চলে না। যাঁহার যে রকম রুচি, নিজের লোকের দ্বারা তিনি সেইরূপ রন্ধন করাইয়া লইতে পারেন। আর ভাওয়ালীতে লোকের জন্য বিশেষ ভাবিতে হয় না। অনেক পাহাড়ী চাকর এখানে মাসিক ১৪৲ টাকা বেতনে পাওয়া যায়। তাহার দ্বারা জুতা সেলাই হইতে চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত সব কাযই করাইয়া লওয়া যায়। তাহারা প্রতি বৎসর রোগীর সেবা করে বলিয়া এখানকার কায়দা-কানুন সব জানে, কিছুই বলিয়া দিতে হয় না। এখানকার অনেক চাকর বাঙ্গালী বাবুদের কাছে থাকিয়া বাঙ্গালী রান্নাও অনেক শিখিয়াছে।

স্যানেটোরিয়াম্‌এর অঙ্গনের ভিতরেই একটা বেণের দোকান আছে। তাহার নিকটে চাল, ডাল, তেল, নুন, ঘি, তরী-তরকারী যাহা এখানে মিলে, সবই প্রায় পাওয়া যায়। এক কথায় দোকানটা স্যানেটোরিয়ম্‌এর ভাণ্ডার, জিনিষ-পত্রের দর একটু বেশী। দুধ যোগানর ভার এক গোয়ালার উপর আছে।

তরী-তরকারী যাহা এখানে পাওয়া যায়, তাহা বাঙ্গালী-দের পক্ষে মোটেই সন্তোষজনক নহে। প্রধান তরকারী আলু ও ঢেড়স। বেগুন, কচু, কুমড়া প্রভৃতিও পাওয়া যায়। ডিম স্যানেটোরিয়মেই বিক্রয় হয়। বার আনা হইতে এক টাকার মধ্যে এক ডজন পাওয়া যায়। আর পাওয়া যায়, মাংস; কিন্তু তত ভাল নহে এবং অনেক সময় জাত (sex) সম্বন্ধেও সন্দেহ করিতে হয়। বর্ষাকালে

আপেল, নেসপাতি প্রভৃতি ফল নৈনীতাল ও রামগড় হইতে বিক্রয় জন্য লইয়া আসে। রামগড়, ভাওয়ালী হইতে ১০ মাইল। এখানে একটা ফলের বড় বাগান আছে। আলামোড়ায় হাঁটিয়া আসিতে হইলে ভাওয়ালী দিয়া রামগড় হইয়া আসিতে হয়। কিন্তু এই রাস্তায় রামগড়ের চড়ায়ের ভয়ে আলামোড়ায় যাঁহারা আসেন, তাঁহাদের অধিকাংশই লরীর শরণাপন্ন হন।

ধরমপুরের স্যানেটোরিয়মে এক জন রোগীর থাকিতে যাহা খরচ হয়, তাহার একটা মোটামুটি হিসাব স্যানেটোরিয়মের প্রসপেক্টাসেই পাওয়া যায়। কিন্তু ভাওয়ালীতে ডি, ক্লাস ছাড়া এবং য়ুরোপীয়ানদের ক্লাস ছাড়া, খাওয়ার বন্দোবস্ত সকল রোগীকেই নিজে করিতে হয় বলিয়া, আগে হইতে খরচের হিসাব ঠিক করিতে পারা যায় না; সুতরাং এখানে একজন রোগী যদি একজন নিজের লোক রাখিয়া খাইবার বন্দোবস্ত করেন, তাহা হইলে তাঁহার মাসে মোটামুটি এইরূপ খরচ হইতে পারে।

চাকর—১৫৲
দুধ— ১৫৲
ঘি— ৮৲
মাংস— ৩৲
চাল— ৪৲
আটা—৩৲
তরকারী ইত্যাদি—৫৲
ডিম— ৩৲

৫৬৲

ইহার উপর হাত-খরচের জন্য আরও ৪৲ ধরিলে মাসে ৬০৲ টাকায় একজন ডি, ক্লাসের রোগী স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারেন। একটু কষ্ট করিয়া চলিলে মাসে ৫০ টাকাতেও চলিয়া যায়। যাহারা এ, বি, ক্লাসে থাকিবেন, তাঁহারা এই খরচের সঙ্গে তাঁহাদের কটেজের মাসিক ভাড়া যোগ করিয়া দিলেই খরচের হিসাব করিয়া লইতে পারিবেন। ঔষধের জন্য বিশেষ খরচ নাই।

ভাওয়ালীতে শীত, আলমোড়া বা ধরমপুরের অপেক্ষা অনেক বেশী, কারণ ভাওয়ালী ঐ দুই স্থান অপেক্ষা প্রায় ১৫০০ ফুট অধিক উচ্চ। এখানে বর্ষাও খুব প্রবল হয়। কিন্তু শীত খুব বেশী হইলেও গরম জামা বা কম্বলের বেশী আড়ম্বর করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। একটা ভাল সোয়েটার ও একটা গরম কোট হইলেই চলিয়া যাইতে পারে; বুটেরও দরকার তেমন হয় না।

মে বা জুন মাসে দিনে গরম হয়, সুতরাং সুতার জামাই যথেষ্ট। ভাওয়ালীর শীত আরম্ভ হয় বর্ষাকালে। সেই সময় হইতে বেড়াইবার জন্য গরম কোট প্রভৃতির দরকার। বর্ষাকালে প্রায় রোজই বৃষ্টি হয় বলিয়া একটা "বর্ষাতি" হইলে ভাল হয়। আর অক্টোবর হইতে একটা "ওভারকোট" না হইলে সন্ধ্যার সময় বেড়ান যায় না। এইগুলার সহিত একটা ফ্লানেলের সার্ট থাকিলে মন্দ হয় না। অনেকে তুলার জামাও লইয়া আসেন। রাত্রিতে প্রথম প্রথম একটা লেপেই কায চলে। শেষের দিকে গায়ে দিবার কম্বলের দরকার হয়। লেপের পরিবর্ত্তে ২।৪ খানা কম্বলের ব্যবস্থা করাই সুবিধা। রেলের বা লরীর ভাড়ারও অনেকটা বাঁচিয়া যায়।

ভাওয়ালীর জল-বাতাস খুব সুন্দর। যদি 'হাওয়া'র ভাল মন্দ চীর গাছের (Pine trees) উপর নির্ভর করে, তাহা হইলে ধরমপুর বা আলমোড়ার হাওয়া ভাল, কারণ ধরমপুরে বা আলমোড়ায় ভাওয়ালীর অপেক্ষা চীর গাছ খুব বেশীই আছে। গ্রীষ্মকালটা ভাওয়ালীর ভাল, কারণ মে, জুনে ধরমপুরে বা আলমোড়ায় বেশ একটু গরম হয়। অক্টোবর হইতে পাহাড়ের সর্ব্বত্র মনোরম আব-হাওয়া হয়। নীল আকাশে মেঘের নাম মাত্র দেখা যায় না—সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সূর্য্যদেব অশ্রান্তভাবে কিরণ দিয়া যান, গরমের লেশমাত্র নাই—শীত তখন বেশ পড়ে। অধিকাংশ রোগীই তাঁহাদের নষ্টস্বাস্থ্য লাভ করেন।

ভাওয়ালী স্যানেটোরিয়মে দরখাস্ত না করিয়া একবারে স্যানেটোরিয়মে যাওয়া যায় না। তবে স্যানেটোরিয়মে স্থান না পাইলে বাহিরে নিজের ব্যয়ে ঘর ভাড়া করিয়া থাকা যায়।

ভাওয়ালী স্যানেটোরিয়মে ২ জন ডাক্তার আছেন। ইঁহারা দুই জন প্রত্যহ নিয়মিতভাবে রোগীদের ঘরে গিয়া তাঁহাদের দেখেন ও অভাব অভিযোগ শুনেন। ২ জন ডাক্তার ছাড়া ভাওয়ালী স্যানেটোরিয়মে য়ুরোপীয়ানদের জন্য একজন নার্সও (Nurse) আছে।

"স্যানেটোরিয়মে" রোগী প্রথমে আসিলেই তাহাকে শয্যায় শয়ন করাইয়া রাখা হয়। যত দিন জ্বর থাকে, তত দিন এই ভাবেই চলে। যাঁহাদের রোগের আক্রমণ অল্প হয়, তাঁহাদের অধিকাংশই অল্পদিনের মধ্যে অহোরাত্র শুইয়া থাকার হাত হইতে বাঁচিয়া যান। তাঁহারা শীঘ্রই চলা-ফিরা আরম্ভ করেন। ৩।৪ মাস মধ্যেই তাঁহারা বেশ নিরাময় হয়েন ও ৮।১০ মাইল পর্য্যন্ত হাঁটিবার শক্তি অর্জ্জন করেন। যাঁহাদের শুধু বিশ্রামের দ্বারা জ্বর যায় না, তাঁহাদের জন্য ইঞ্জেক্‌সন্ ও অন্যান্য ঔষধ প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়।

যাঁহারা শয্যাশায়ী, তাঁহাদের খাওয়া ও শোওয়া ছাড়া অন্য কোন কায নাই; কিন্তু যাঁহারা উঠিয়া হাঁটিয়া বেড়ান, তাঁহাদের জন্য একটা কার্য্যতালিকার ব্যবস্থা আছে।

একটু কার্য্যতালিকার নমুনা এইরূপ :—

প্রভাতে ৬ টায় শয্যাত্যাগ ও জ্বর দেখা,
" ৬।৷০ " শৌচ সমাপন ও বেশভূষা,
" ৭ " দুগ্ধ পান, প্রভাতে ৮।৷০ " ব্যায়াম,
" ১০-১১ " খেলাধূলা, " ১১-১২ " বিশ্রাম,
মধ্যাহ্ন ১২।৷০ " মধ্যাহ্ন ভোজন, " ১২।৷০টার পর বিশ্রাম,
অপরাহ্ন ২ হইতে ৪টা খেলাধূলা,
৪টায় দুগ্ধপান, ৪টা হইতে ৫টা ব্যায়াম,
৫টা হইতে ৬টা বিশ্রাম, ৬টায় জ্বর দেখা,
সন্ধ্যা ৭টায় ভোজন, রাত্রি ৮টা হইতে ৯টা খেলাধূলা,
রাত্রি ৯টা দুগ্ধ পান,
" ৯-১৫ মিনিট ঘরের দীপ নির্ব্বাণ।

ধরমপুরের তুলনায় ভাওয়ালীর স্যানেটোরিয়মের বাড়ী-ঘরগুলি খুব ভাল। ঘরগুলার প্রত্যেক বছরই চূণকাম করা হয়—রাস্তাগুলি বেশ চৌরস করা ও কাঁকর বিছান। মোটের উপর, দেখিলেই বেশ একটা তৃপ্তির ভাব আসে।

তবে এক বিষয়ে ধরমপুরের স্যানেটোরিয়ম্ ভাওয়ালীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ধরমপুরের স্যানেটোরিয়মে বহু অর্থব্যয়ে পাতিয়ালার মহারাজ একটা খুব বড় খেলার ঘর করিয়া দিয়াছেন। অনেক রকম খেলার ব্যবস্থা আছে—মায় বিলিয়ার্ড টেবল পর্য্যন্ত। ধরমপুর স্যানেটোরিয়মের পুস্তকাগারে বেশ ভাল পড়িবার মত গ্রন্থও অনেক আছে। কিন্তু ভাওয়ালীতে এ সব বিষয়ে তেমন সন্তোষজনক ব্যবস্থা বিশেষ নাই। য়ুরোপীয়ান এবং এ, বি, ক্লাসের জন্য যে সব খেলার ব্যবস্থা আছে, তাহা মোটের উপর মন্দ নহে। গ্রামোফোন আছে, একটা ছোট বিলিয়ার্ড টেবলও আছে। গ্রন্থাগারে ইংরাজী গ্রন্থ ২।৪ খানা আছে। কিন্তু সি, ডি, ক্লাসের পাঠাগারে হিন্দি ও উর্দ্দু বই ছাড়া অন্য বই নাই, আর খেলার ব্যবস্থা—তাস, দাবা আর "কেরম"।

ভাওয়ালী স্যানেটোরিয়মে সাধারণ ঔষধপত্র বা ইনজেক্‌সনের জন্য কিছুই মূল্য লওয়া হয় না। নূতন নূতন যে সব ইঞ্জেক্‌সন বা চিকিৎসা প্রণালী আবিষ্কৃত হইতেছে, সেই সমস্ত এখানে পরীক্ষা করা হয় এবং তাহার জন্য সব খরচ স্যানেটোরিয়ম্ই বহন করে। ধরমপুরের স্যানেটোরিয়মের পয়সা কম বলিয়া, দামী ইঞ্জেক্‌সনের জন্য রোগীদের খরচ করিতে হয়। ভাওয়ালী স্যানেটোরিয়মে একটা অণুবীক্ষণ যন্ত্র আছে। একটা ইন্‌কিউবেটরও আছে। আরও ২।৪টা যন্ত্রপাতি আছে। কম্পাউণ্ডার একজন মুসলমান—বড় সজ্জন ও মিষ্টভাষী। প্রত্যেক মাসেই রোগীদের থুথু পরীক্ষিত হয় এবং উপরি উপরি ৪ বার পোকা না পাওয়া গেলে আর রোগ নাই বলিয়া মনে করা হয়। এখানে নাকে শুঁকিবার জন্য ষ্টিক ইন্‌হেলেসন্ দেওয়া হয়। আফিস ঘরে, একটা টেলিফোন আছে—নৈনীতালের সঙ্গে তাহার যোগ আছে।

ভাওয়ালীতে দেখিবার মধ্যে স্যানেটোরিয়ম্। বাজারটা ছোট—সব জিনিষই কিছু না কিছু পাওয়া যায়। ডাক-বাঙ্গলা একটা আছে, ডাকঘরও আছে। আর বিলাতী হোটেলেরও অভাব নাই।

ভাওয়ালী স্যানেটোরিয়মে সবশুদ্ধ প্রায় ৭০ জন রোগীর থাকিবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু প্রত্যেক বৎসর রোগীর সংখ্যা এত বেশী হয় যে, অনেকেই চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হয়। যাঁহারা দরখাস্ত করিয়া বিপরীত উত্তর পান, তাঁহাদের এই কথা জানাইতে চাই যে, স্যানেটোরিয়মে স্থান না পাইলেও তাঁহারা যেন একবারেই হতাশ হইয়া সিমুলতলা, হাজারীবাগ বা পুরী যাইবার ব্যবস্থা না করেন। ভাওয়ালীতে স্যানেটোরিয়ম্ ছাড়া, অন্য জায়গাতে থাকিতে পারা যাইতে পারে। এখানে অনেক বাঙ্গলা ভাড়া পাওয়া যায়। স্যানেটোরিয়মের গায়েই কতকগুলি বাঙ্গলা আছে। কুলমণি পাহাড়ী এইগুলির মালিক। ইহা ছাড়া আরও অনেক ভাল ও বড় বাঙ্গলা ভাড়া পাওয়া যাইতে পারে।

শ্রীঅন্নদাপদ মুখোপাধ্যায়।

বাঙ্গালার ব্যবহারিক উদ্ভিদ্

দাক্ষিণাত্যের কোন কোন অংশ অপেক্ষা অনুপাতে কম হইলেও বঙ্গদেশের উদ্ভিদ্ সম্পদ্ নিতান্ত সামান্য নহে। প্রসিদ্ধ উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ সার ডেভিড ব্রেণ তাঁহার Plants of Bengal নামক প্রামাণ্য গ্রন্থে যে বহুবিধ বৃক্ষ, লতা, গুল্মাদির উল্লেখ করিয়াছেন, তদ্ভিন্ন প্রায় প্রতি বৎসরেই দেশ বিদেশ হইতে নূতন নূতন গাছ আসিয়া বাঙ্গালার মাটীতে স্থানলাভ করিতেছে। সেগুলিকে দেশান্তর্জ্জাত উদ্ভিদ্ বলিয়া অনেকে ভ্রম করেন। প্রকৃত পক্ষে বঙ্গদেশের অন্তর্জ্জাত (indigenous) উদ্ভিদের সংখ্যা খুব কম। চতুর্দ্দিক্ হইতে জলপথে ও স্থলপথে নানাজাতীয় উদ্ভিদ্ যুগে যুগে বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছে;—কিন্তু সবগুলিই বাঙ্গালার সর্ব্বত্র বিস্তারলাভ করিতে পারে নাই। সাধারণতঃ গ্রাম্যকুঞ্জে যে সকল গাছ দেখিতে পাওয়া যায়,—যথা, অশ্বত্থ, বট, আম, বাঁশ, নারিকেল, সুপারি, তাল, খেজুর ইত্যাদি,—এক বটজাতীয় বৃক্ষ ব্যতীত সেগুলি সম্বন্ধেও নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় না যে, তাহারা বঙ্গদেশের আদিম অধিবাসী। বঙ্গদেশের উদ্ভিদ্‌সমষ্টির (Flora) তথা সম্যক্‌রূপে বুঝিতে হইলে উহাতে যে কয়টি মূল উপাদান আছে এবং দেশের বিশেষ বিশেষ অংশ যে সকল শ্রেণীর গাছ অধিকার করিয়া আছে, তাহা জানা আবশ্যক।

বঙ্গের উদ্ভিদ সমষ্টির বিশিষ্টতা

যাঁহারা বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছেন—তাঁহারা অবশ্য জানেন যে, বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানের উদ্ভিদ সমষ্টি বিভিন্ন লক্ষণযুক্ত। তাহা হইবারও বিশেষ কারণ আছে। বাঙ্গালার বিভিন্ন অংশের পৃথকভাবে আলোচনা করিলে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। উদ্ভিদ্ সংস্থানের (Distribution of plants) হিসাবে। বঙ্গদেশকে স্থূলতঃ পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়।

(১) **উত্তর-বঙ্গ**—ইহা বঙ্গের উত্তর প্রান্তস্থিত দার্জ্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জিলা দ্বারা অধিকৃত। হিমালয়ের সমুন্নত ভাগের উদ্ভিদাবলী এ স্থলে দৃষ্ট হয়। বলা আবশ্যক যে, উদ্ভিদ্-সমষ্টির পার্থক্যে হিমালয়কে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়—পশ্চিম, মধ্য ও পূর্ব্ব হিমালয়। বঙ্গদেশে পূর্ব্ব-হিমালয়ের বৃক্ষাবলীই দৃষ্ট হইয়া থাকে। সিকিম ও ভূটান হইতে আরম্ভ হইয়া, বঙ্গের উত্তর প্রান্ত দিয়া, আসামের লখিমপুর বিভাগ পর্য্যন্ত এই প্রকার উদ্ভিদের বেষ্টনী বিস্তৃত রহিয়াছে। বাণ (Oak); পাহাড়ী বাদাম (Indian chestnut) এইরূপ উদ্ভিদসমষ্টির বিশিষ্ট উপাদান। হিমালয়ের পাদদেশে অরণ্যের প্রকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এ স্থলে শালের জঙ্গল, বন্য কদলী, বনা বেত, বাঁশ প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

(২) **পূর্ব্ব-বঙ্গ**—এই অংশে বিল, জলার আধিক্যের জন্য জলজ উদ্ভিদের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। জলজ অথবা জলাশয় সন্নিহিত উদ্ভিদের মধ্যে তৃণ, মুথা, পদ্ম, শালুক জাতীয় গাছের সংখ্যা অধিক। বাঙ্গালার একবারে পূর্ব্বপ্রান্তে ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম জিলা। ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম ও উহাদের পার্ব্বত্য অংশের উদ্ভিদসমষ্টির সহিত সন্নিহিত মৈমনসিংহ, ঢাকা ও নোয়াখালি জিলার উদ্ভিদসমষ্টির অনেক পার্থক্য আছে। পূর্ব্বোক্ত জিলাসমূহের গর্জ্জন, নাগকেশর, চিক্রাশি প্রভৃতি বৃহদাকার উদ্ভিদ শেষোক্ত জিলা সমূহে কচিৎ দৃষ্ট হয়। পক্ষান্তরে মৈমনসিংহ জিলার টাঁপির ন্যায় জমীর উচ্চ জমীতে কতকগুলি খাসিয়া পর্ব্বতের গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের অবস্থিতির কারণ এখনও সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারা যায় নাই।

(৩) **পশ্চিম-বঙ্গ**—বীরভূম, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জিলা বাঙ্গালার পশ্চিম সীমান্ত। মধ্য ভারত ও ছোটনাগপুরের বিশিষ্ট উদ্ভিদসমূহ লালমাটির (Latente) সহিত এ সমস্ত জিলায় প্রবেশলাভ করিয়াছে। শাল, পিয়াশাল,

মহুয়া, আসন, পলাশ প্রভৃতি তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। এই তিনটি জিলা ছাড়াইয়া বাঙ্গালার অন্যত্র প্রায় এ সকল বৃক্ষ রোপিত ব্যতীত স্বাভাবিক অবস্থায় দেখা যায় না।

(৪) **দক্ষিণ অথবা নিম্ন বঙ্গ**—এই অংশের প্রান্তদেশে সুন্দরবন বিরাজমান। ২৪ পরগণা, খুলনা ও বাথরগঞ্জ এই তিনটি জিলা ব্যাপিয়া সুন্দরবন অবস্থিত। বর্ত্তমান সুন্দরবনের উত্তরাংশ এক সময় সমধিক উচ্চ ও বসতি-বহুল ছিল। তাহার নিদর্শন এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। সে যাহাই হউক, উদ্ভিদ-তত্ত্বের দিক হইতে সুন্দরবনের অবস্থিতি গঙ্গা ও মেঘনার ব-দ্বীপে; সুতরাং এ স্থলে সমুদ্রতীরবর্ত্তী (littoral) উদ্ভিদেরই প্রাধান্য। সুন্দরবনের উদ্ভিদসমষ্টি সম্বন্ধে সুবিখ্যাত উদ্ভিদ-তত্ত্ববিদ্ ক্লার্ক ও প্রেণ উভয়েই যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন। তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, সুন্দরবনের অন্ততঃ প্রায় ৭০ জাতীয় উদ্ভিদ উক্ত স্থানেই সীমাবদ্ধ। সেগুলি এক দিকে মালয়, পলিনেশিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে এবং অন্য দিকে ভারতের দক্ষিণ উপকূল হইতে আসিয়াছে। গঙ্গা নদী যে সমস্ত বৃক্ষাদির বীজ বহন করিয়া আনিয়া সুন্দরবনে ছাড়িয়া দিয়াছে অথবা মনুষ্য ও ইতর প্রাণী দ্বারা যে সকল বীজ নীত হইয়াছে, কেবলমাত্র সেইগুলিই সুন্দরবনস্থ বঙ্গের সাধারণ গাছ বলিয়া ধরিতে পারা যায়।

(৫) **মধ্য-বঙ্গ**—অতি পুরাকাল হইতেই বঙ্গের সহিত বিহারের (পুরাতন মগধ) ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এতদ্ভিন্ন প্রাকৃতিক অবস্থান হিসাবে যুক্ত প্রদেশের সহিতও বঙ্গ সংযুক্ত; এবং ভাগীরথীই উক্তরূপ সংযোগের প্রধান শৃঙ্খল। যুক্ত প্রদেশে টিহ্‌রি, গড়ওয়াল রাজ্যে গঙ্গার উৎপত্তি। পাহাড় হইতে নামিয়া গঙ্গা যে সকল প্রদেশ দিয়া বঙ্গোপসাগরে উপনীত হইয়াছে, সেই অসমতল প্রদেশকে গাঙ্গেয় প্রান্তর (Indo-Gangetic plain) বলা হয়। মধ্য-বঙ্গের ভিতর দিয়া এই সুবিশাল প্রান্তর চলিয়া গিয়াছে। উদ্ভিদবিদ্ পণ্ডিত প্রেণ ইহাকে India Diluvia আখ্যা দিয়াছেন। নদী-বাহিত পলিমাটি ছড়াইয়া পড়িয়াই গঙ্গার উভয় কূলের সমৃদ্ধিশালী জনপদ সমূহ গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ অবস্থায় ইহা আশ্চর্য্য নহে যে, বঙ্গদেশে এরূপ কতকগুলি গাছ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, যৎসমুদয় উত্তর-ভারতে বিরল নহে। বলা বাহুল্য যে, ইংরাজ আমলের পূর্ব্বে গঙ্গা উত্তর-ভারতের একমাত্র অথবা প্রধান গতি-বিধির পথ ছিল। গঙ্গা ও উহার সহিত যে সমস্ত ক্ষুদ্র, বৃহৎ নদী মিলিত হইয়াছে, তৎসমুদায়ের জলস্রোত বাহিয়া অনেক উদ্ভিদের বীজ বঙ্গে আসিয়াছে। মানব জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে, ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় কতিপয় উদ্ভিদ ভিন্ন দেশ হইতে আনিয়া প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। এতদ্ভিন্ন পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বায়ু-প্রবাহ ও অন্যান্য উপায়েও নানা জাতীয় উদ্ভিদ যে বহু দূরপথ অতিক্রম করিয়া বঙ্গে আসিয়াছে, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

আমরা এ স্থলে বঙ্গের উদ্ভিদসমষ্টির আভাসমাত্র দিলাম। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তদপেক্ষা অধিক আলোচনা সম্ভবপর নহে। নিতান্ত আধুনিক কালে প্রবর্ত্তিত ও অপুষ্পক উদ্ভিদ ব্যতীত বঙ্গদেশে প্রায় সাত শত সপুষ্পক উদ্ভিদ আছে। এই গুলির ব্যবহারিক প্রয়োগ আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। এইরূপ আলোচনা ও গবেষণার উপরেই দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতি নির্ভর করিতেছে। যখন বঙ্গবাসিগণ স্বকীয় গৃহপ্রাঙ্গণ ও চতুঃপার্শ্বস্থ বৃক্ষ, লতা, ও গুল্মাদির মধ্যে যে কি পরিমাণ অর্থ অর্গলবদ্ধ হইয়া আছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারিবে, তখন হইতেই তাহাদের উন্নতির পথ উন্মুক্ত হইবে।

ব্যবহারিক উদ্ভিদ বিদ্যা

উদ্ভিদের স্থূল ও আনুবীক্ষণিক গঠন, শরীরতত্ত্ব, ভৌগলিক সংস্থান, প্রশীল (fossil) অবস্থায় ভূগর্ভে অবস্থিতি, কীট পতঙ্গ জীবাণুজনিত ব্যাধি ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করিবার জন্য উদ্ভিদশাস্ত্রের বিভিন্ন শাখা আছে। উদ্ভিদের ব্যবহারও তদ্রূপ একটি বিশেষ শাখা। বিস্তৃত ভাবে ধরিতে গেলে কৃষি, ভৈষজ্য বিদ্যা প্রভৃতি এই শাখার অন্তর্গত। কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে কর্ষিত উদ্ভিদসমূহের কথা বাদ দেওয়া হইয়াছে; যদিও ফল মূল ও শস্যসংগ্রহ এবং চাষের কার্য্যেই মানব-সমাজের মধ্যে ব্যবহারিক উদ্ভিদ-তত্ত্বের প্রথম উন্মেষ দেখা যায়। মানুষ নিজের চেষ্টা ও কৌশল দ্বারা নিত্য ব্যবহার্য্য উদ্ভিদসমূহের এত উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে যে, আজকাল অনেক কর্ষিত ফসলের পূর্ব্ব-পুরুষ সঠিক চিনিয়া লওয়া শক্ত। ভারতের, বিশেষতঃ বঙ্গের কথা বলিতে গেলে ইহা বলিতে পারা যায় যে, দেশীয়

বিপুল উদ্ভিদ-ভাণ্ডারের মধ্যে অতি সামান্য সংখ্যক উদ্ভিদেরই সদ্ব্যবহার হইয়াছে। অন্যান্য শিক্ষিত দেশে, প্রধানতঃ মার্কিণে, যে সকল তরুলতা গুল্ম আছে, তৎসমুদয় কি কি কার্য্যে প্রয়োগ করিতে পারা যায়, তাহার অবিরত অনুসন্ধান চলিতেছে। স্বদেশীয় গাছে সন্তুষ্ট না হইয়া মার্কিণের উদ্ভিদ-শিল্প-বিভাগের (Bureau of Plant Industry) পর্য্যটকরা পৃথিবীময় ব্যবহারিক উদ্ভিদের তল্লাসে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এতদ্দেশে ব্যবহারিক উদ্ভিদতত্ত্বের উপকারিতা অল্পদিনই উপলব্ধ হইয়াছে এবং ভারত সরকার ও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টসমূহ কৃষি ও বন-বিভাগে ব্যবহারিক উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ নিয়োগ করিয়াছেন। রক্সবর্গ (Roxburgh) প্রমুখ উদ্ভিদবিদ্ পণ্ডিতগণই কিন্তু ভারতীয় ব্যবহারিক উদ্ভিদতত্ত্বের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। প্রসঙ্গক্রমে ইহাও বলিতে পারা যায় যে, ক্লার্ক-সম্পাদিত রক্সবর্গের Flora India নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে বাঙ্গালা দেশের উদ্ভিদের ব্যবহার সম্বন্ধে যে সকল টীকা-টিপ্পনী আছে, বহু বৎসর পরে Sir George Waltএর Dictionary of Economic Products, অথবা তাহার সংক্ষিপ্তসার Commercial Products of India নামক গ্রন্থেও বঙ্গদেশের উদ্ভিদ সম্বন্ধে তদপেক্ষা বড় বেশী কিছু খবর নাই। ওয়াটএর সময় হইতে কলিকাতা যাদুঘরের (Indian Museum) শিল্প ও কলা-বিভাগে যে প্রভূত পরিমাণ দ্রব্যাদি সংগৃহীত হইয়াছে এবং তৎসম্বন্ধীয় যে সকল তথ্যাদি লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, সেগুলির বিবরণ দেশীয় ভাষায় অথবা সহজে বোধগম্য ইংরাজীতে সাধারণের গোচরীভূত করিলেও দেশের অনেক উপকার হইত। কিন্তু এ সম্বন্ধে সরকার একবারেই উদাসীন। ব্যবহারিক পদার্থাদি সম্বন্ধে যে সকল পুস্তক-পুস্তিকাদি সরকার প্রকাশ করেন, অনেক সময় মনে হয়, সেগুলি প্রকাশের প্রধান উদ্দেশ্য—বিদেশীয় বণিক-মণ্ডলীর মনোযোগ আকর্ষণ করা।

বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যবহারিক উদ্ভিদ

আমরা ইতঃপূর্ব্বে বাঙ্গালার বিভিন্ন অংশের উদ্ভিদ-সংস্থানের আভাস দিয়াছি। সমগ্র বঙ্গের উদ্ভিদের কথা বলিতে গেলে ইহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় যে, উক্ত উদ্ভিদাদি হইতে মানবের আবশ্যক প্রায় সকল প্রকার ব্যবহারিক পদার্থ পাওয়া যাইতে পারে। তৎসম্বন্ধে সুতরাং কতিপয় উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

খাদ্য—শিশু ও অসুস্থ ব্যক্তির সহজপাচ্য খাদ্যের পক্ষে শঠি ও টিকুর (দেশীয় আরারুট) বিশেষ উপযোগী। বিলাতী আরারুটও এখন এ দেশের স্থানে স্থানে উৎপাদিত হইতেছে; উহার গাছ এতদ্দেশের জলবায়ু ও মৃত্তিকাসহ (Naturalised) হইয়া গিয়াছে। মেটে আলু, গড়ানে আলু, কেসুর, পাণিফল ইত্যাদি হইতেও পুষ্টিকর উপাদান পাওয়া যায়। ছত্রক জাতীয় উদ্ভিদও (বেঙ্গের ছাতা) উত্তম খাদ্য। বঙ্গদেশে সাধারণতঃ কতিপয়জাতীয় ফল ভূরি-পরিমাণে খাদ্যার্থ ব্যবহৃত হয়, যথা—আম, কাঁঠাল, জাম, বেল ইত্যাদি; কিন্তু সংরক্ষিত ফলের ব্যবসায় এখনও দেশে উন্নতিলাভ করে নাই। পূর্ব্বে ঘরে ঘরে আচার, চাটনি, প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া অনেক পরিমাণ ফলের সদ্ব্যবহার হইত। আধুনিক গৃহিণীরা উক্ত-কার্য্যে অপটু অথবা অসমর্থ। কিন্তু আম, বেল, লেবু, করমচা, ফল্‌সা, টেপারি, পেয়ারা ইত্যাদি ফল স্বল্প আয়াসে সংরক্ষণ করা যায় এবং তদ্দ্বারা অনশনক্লিষ্ট বঙ্গবাসীর শরীর-পোষণের যথেষ্ট সাহায্য হইতে পারে।
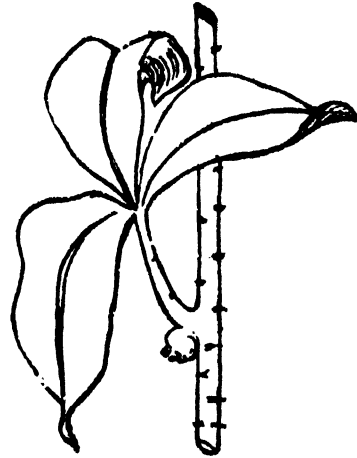
মেটে আলু

তন্তু—ব্যবসায়ের হিসাবে তন্তুসমূহকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। আমাদের সুপরিচিত পাট, শন-জাতীয় তন্তু অনেক প্রকার বন্য লতা-গুল্মাদি হইতে পাওয়া যায়। মুর্গা, সিশাল শন, কদলীপত্র বৃন্ত, আনারস ও কেয়ার তন্তুও উৎকৃষ্ট। কতিপয় বন্য গাছের তন্তু চট, থলে প্রভৃতি বুনিবার পক্ষেও উপযুক্ত। শিমুল, আকন্দ প্রভৃতি গাছের বীজসংলগ্ন তন্তুও বিশেষ কাযে ব্যবহার হয়। মুথা ও তৃণ-জাতীয় কয়েকটি উদ্ভিদের

... অথবা পুষ্পদণ্ড হইতে মাদুর, দড়ি-দড়া ও গৃহ-সজ্জাদি হইয়া থাকে।

টেঁপারি

রং—আলকাতরা প্রভৃতি-জাত কৃত্রিম রংয়ের অনুগ্রহে উদ্ভিজ্য রংয়ের পৃথিবী-ময় উচ্ছেদ-সাধন ঘটিয়াছে। তথাপি যদি দেশে আবার চরকার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে দেশীয় রঞ্জক পদার্থের ব্যবহারও বাড়িবে। বাঙ্গালায় রঞ্জক পদার্থের অভাব নাই—কাঁঠাল কাঠের গুঁড়া, লোধমূল, দাড়িম্ব ফল ও ফুল, লটলন্, শিউলী ফুলের বোঁটা, পলাশ ফুল,

বেঙের ছাতা

মঞ্জিষ্ঠা ফল, আলমূল ইত্যাদি পূর্ব্বে উৎকৃষ্ট রং উৎপাদন করিত এবং এখনও আবশ্যক হইলে করিতে পারে।

কষ—কষ-উৎপাদক উদ্ভিদের ব্যবসায়িক ভবিষ্যৎ রঞ্জক উদ্ভিদের ভবিষ্যৎ অপেক্ষা উজ্জ্বলতর। বাবলা ছাল ও ফল, সোঁদাল, গরাণ, সাই, অর্জ্জুন, মেদী, জঙ্গলী কুল, জাম ইত্যাদির বাঙ্গালায় অভাব নাই এবং এগুলি হইতে যে উৎকৃষ্ট কষায়-সার (Tan extract) প্রস্তুত হইতে পারে, তাহা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে।

কাষ্ঠ—গৃহ, সেতু, পোত, আসবাব, রেলের গাড়ী (wagon) প্রস্তুতের জন্য উপযুক্ত কাষ্ঠ বঙ্গদেশে খুবই পাওয়া যায়। বিভিন্ন শিল্প-প্রসঙ্গে সেগুলির উল্লেখ করা হইবে।

ফলসা

তৈল—কেরোসিন তৈল প্রচলনের পূর্ব্বে বঙ্গে বহুবিধ তৈলের ব্যবহার ছিল। রন্ধনকার্য্যে অবশ্য সরিষার তৈলেরই বঙ্গদেশে অধিক প্রচলন। কিন্তু তিল, তিসি, নারিকেল, মহুয়া প্রভৃতি ভক্ষ্য-তৈলও বাঙ্গালায় অল্প-বিস্তর পরিমাণে উৎপাদিত হয়। খাদ্য ব্যতীত অন্যবিধ কার্য্যেও নানাপ্রকার তৈলের প্রয়োগ চলিত আছে। তৈল কঠিনীভূত করার বৈজ্ঞানিক প্রথায় অনেক অভক্ষ্য তৈলকেও পরিশোধন করিয়া

তক্ষ্য-তৈলে পরিণত করিতে পারা যায়। পুন্নাগ-কুসুম-ফল ও নাগকেশরের তৈল এইরূপে শোধিত হইতে পারে। হিজলী বাদামের তৈল প্রকৃত বাদামের তৈলের সমকক্ষ। ঔষধার্থ যে সকল তৈল ব্যবহৃত হয়, তন্মধ্যে নিম, চালমুগরা ও কাঠকরঞ্জা তৈল অন্যতম।

হিজলী বাদাম
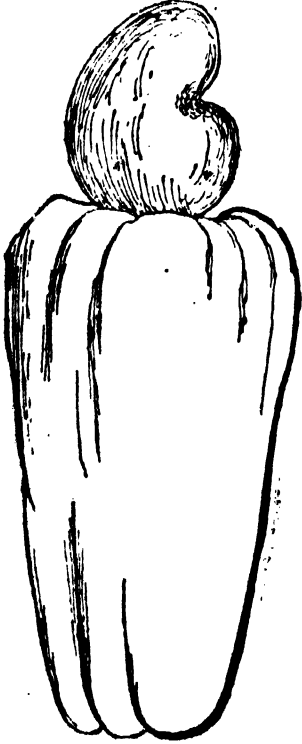
ঔষধ—আয়ুর্ব্বেদোক্ত গাছ-গাছড়া এক শতাব্দী পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বঙ্গবাসিগণের ব্যাধিমুক্ত হওয়ার প্রধান উপায় ছিল। এলোপ্যাথিক ঔষধের দেশীয় ব্যক্তির পক্ষে উপযোগিতার কথা ছাড়িয়া দিলেও ইহা বলিতে পারা যায় যে, দেশের শতকরা দশ ভাগ লোকের মধ্যেও এলোপ্যাথিক ঔষধ পৌঁছায় কি না সন্দেহ। এরূপ ঔষধের মূল্য যোগাইবার আর্থিক অবস্থাও দেশবাসীর নাই। সেই জন্য দেশজাত ঔষধের উপাদান যত অধিক পরিমাণে ব্যবহার হয়, ততই মঙ্গল। গ্রামে ও জঙ্গলে উৎকৃষ্ট ঔষধের গাছ-গাছড়া প্রচুর পরিমাণে জন্মাইয়া অনাদরে লয়প্রাপ্ত হইতেছে।

মশলা—উত্তরপূর্ব্ববঙ্গে এক জাতীয় দারুচিনি ও ২।৩ জাতীয় তেজপাত জন্মিয়া থাকে। ক্ষেত্রজ মসলা (ধনে, মৌরী ইত্যাদি) ভিন্ন বন্য ও অর্দ্ধবন্য অবস্থায় কয়েকটি বিশিষ্ট মশলা দেখিতে পাওয়া যায়। বড় এলাচ, পান, কর্পূর, পিপুল, চই, পুদিনা ও তেঁতুল তন্মধ্যে অন্যতম। উত্তমরূপে সংরক্ষিত বাঙ্গালার তেঁতুল বিলাতী বাজারে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চদরে বিক্রয় হয়।

গন্ধদ্রব্য—এক সময় বঙ্গদেশ গন্ধদ্রব্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এখনও আমাদের কানন-কান্তারে কত সুরভি পুষ্পবৃক্ষ নীরবে ও নয়ন-অগোচরে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। খসখস্, গন্ধবেলা, অগুরু, কেতকী, শেফালিকা, চম্পক, রজনীগন্ধা ইত্যাদির ন্যায় আরও অনেক গন্ধপুষ্প আছে, তৎসমুদয় হইতে মনোরম গন্ধদ্রব্য চেষ্টা করিলেই পাওয়া যায়।

ব্যবহারিক উদ্ভিদমূলক শিল্প

এক্ষণে উক্ত কয়েকশ্রেণীর ব্যবহার্য্য পদার্থ উৎপাদন উদ্দেশ্যে বাঙ্গলার উদ্ভিদের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া কোন্ কোন্ শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তাহার আভাস নিম্নে দেওয়া হইতেছে। বলা বাহুল্য যে, ইহা আভাসমাত্র; বাঙ্গালার ব্যবহারিক উদ্ভিদ্নিচয়ের সম্যক আলোচনা ক্ষুদ্র প্রবন্ধে হইতে পারে না। আমাদের গৃহসান্নিধ্যে যে সকল বৃক্ষ, লতা ও গুল্ম পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মিয়া থাকে, সেইগুলি লইয়া বহুকাল হইতে বহুবিধ শ্রেণীর বাঙ্গালী জীবিকা অর্জ্জন করিয়া আসিতেছিল। সেরূপ শিল্পের মধ্যে অনেকগুলি লোপ পাইয়াছে। বর্ত্তমানে যে সুন্দর গৃহশিল্প অভিনব চেষ্টায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, অথবা যে সকল কারখানায় শিল্পের সৃষ্টি সম্ভবপর, আমরা এ স্থলে সেইরূপ দুই চারিটির কথা বলিতেছি :—

(১) গৃহনির্ম্মাণ ও গৃহসজ্জা। সাধারণতঃ বাঙ্গালীর গৃহ পূর্ব্বে যে ভাবে প্রস্তুত হইত এবং এখনও মফঃস্বলের নানাস্থানে যেরূপভাবে বাসভবন রচিত হয়, তাহাতে একাধারে দেশীয় উপাদানের ব্যবহার ও দেশীয় কারুকার্য্যবিকাশের যথেষ্ট অবসর থাকে। ইটের সাদা দেওয়াল, লোহার বিম, বরগা, রেলিং, গরাদে ও সর্ব্বোপরি করগেটেড টিনের চালা সমস্ত গৃহনির্ম্মাণ বিষয়ক শিল্পকে কণ্ঠরোধ করিয়া মারিয়া ফেলে, ঘরের আসবাব সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা বলিতে পারা যায়। বাক্স, পেটারা, মোড়া, টুল, বেঞ্চ, কেদারা, টেবল প্রভৃতি প্রস্তুতের উৎকৃষ্ট কাষ্ঠ বাঙ্গালায় যথেষ্ট পরিমাণে আছে। সেরূপ কাষ্ঠ হইতে প্রস্তুত গৃহসজ্জা যেমন নয়নমনোরম, তেমনই দীর্ঘস্থায়ী। চাকচিক্য veneer দ্বারা মণ্ডিত অপকৃষ্ট কাঠের যে সমুদায় বিলাতী আসবাব, অনেক ধনীকে বিমোহিত করিয়াছে, তৎসমুদয় সম্বন্ধে এরূপ কথা বলিতে পারা যায় কি? বাঙ্গালার কদম্ব, খদির, শিরীষ, চাপলাস, শিমুল, রোহিতক, শিশু, টুন, পাহাড়ী

ব...ম, আম, গাম্ভারী, আখরোট, জারুল, শাল, পিয়াশাল, ব...ল, গর্জ্জন, নাগকেশর, চিত্রাসি ইত্যাদি কাঠ দ্বারা স্বল্প ও ...মূল্যের সকল রকম আসবাব প্রস্তুত হইতে পারে।

জারুল
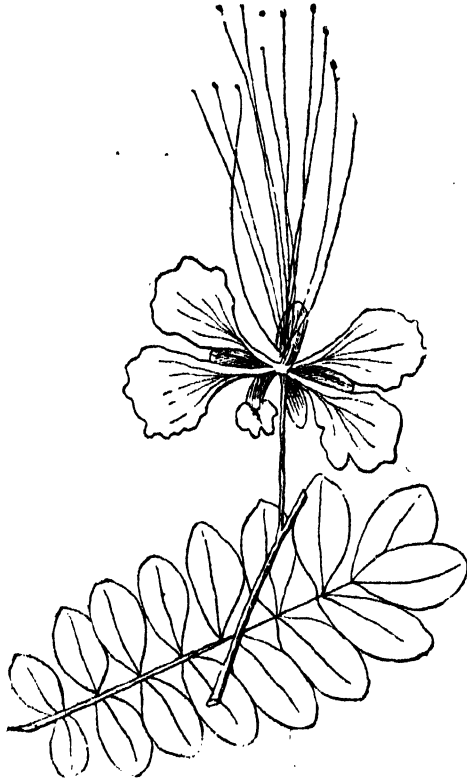
(২) জলযান—ছোট ছোট জেলে ডিঙ্গি হইতে সমুদ্রগামী বৃহৎ পোতসমূহ নির্ম্মাণ অতীতকালে বঙ্গের বিশেষ শিল্প ছিল। বহুবিধ প্রকারের কাষ্ঠ, বাঁশ, বেত ইত্যাদি পোতনির্ম্মাণকল্পে ব্যবহৃত হইত। এমন কি, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমল পর্য্যন্তও বাঙ্গালায় প্রস্তুত জাহাজ দূরদেশে যাতায়াত করিয়াছে। কিছু দিবস পূর্ব্ব পর্য্যন্তও চট্টগ্রামে অল্পবিস্তর পরিমাণে বড় বড় নৌকা এবং ভারত উপকূলে ব্যবসায়ের জন্য ছোট ছোট অর্ণবপোত নির্ম্মিত হইত; এখন আর সে দিন নাই। বস্তুতঃ একদিকে উপকূল ব্যবসায় (coastal-trade) হস্তচ্যুত হওয়ায় এবং অন্যদিকে নদী, খাল প্রভৃতি মজিয়া যাওয়ায় বঙ্গদেশে সর্ব্বপ্রকার জলযানের সংখ্যা ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। ইহা অতীব দুর্লক্ষণ। নদীমাতৃক বঙ্গদেশে জলযানের প্রচুর পরিমাণ উৎপাদন হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

ব্রুস ও সম্মার্জ্জনী—দেশীয় ও বিদেশীয় কতিপয় কোম্পানি কয়েক প্রকার দেশীয় উপাদান হইতে নানাপ্রকার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ব্রুস ও সম্মার্জনী প্রস্তুত করিতেছেন। এই প্রকার উপাদানের কিন্তু সামান্য পরিমাণেই সদ্ব্যবহার হইয়াছে। মুর্গা, বিশে জাতীয় বাঁশ, তাল, তালী, নারিকেল, খর্জ্জুর, কেয়া, শর, হেঁতাল প্রভৃতি এইরূপ শিল্পের অন্যতম উপাদান।

(৪) দড়ি, দড়া, কাছি, মাদুর, মছলন্দ, পাটি, পা-পোষ, ঝুড়ি, টুকরী, পেটারা, কাগজ—এ সমস্ত শিল্পের উপাদান প্রায় এক রকমের উদ্ভিদ হইতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতে পারা যায় যে, এক বাঁশ অথবা শরের বিভিন্ন বয়সের গাছ ও বিভিন্ন অংশ হইতে পূর্ব্বোক্ত সকল প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে। বাঁশের কাগজ এখন এতদ্দেশে উৎপাদিত হইতেছে। গৃহশিল্প হিসাবে নানাপ্রকার ঘাস, বাঁশ ও বেত হইতে পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে।

ছাতার বাঁট, ছড়ি, লাঠি,—এগুলিও সমশ্রেণীর উদ্ভিদ্ হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

(৫) প্যাকিং বাক্স—বর্ত্তমান যুগে পণ্য বহনাবহনের জন্য কাষ্ঠের আধার অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। বিদেশীয় বণিক্‌গণ বাঙ্গালার কাষ্ঠ লইয়া এই প্রকার আধার প্রস্তুতের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু দেশীয় লোকের এ সম্বন্ধে কোন আগ্রহ দেখা যায় না।

গরাণ
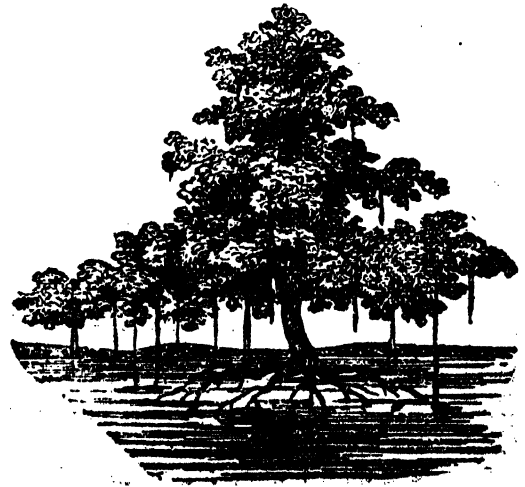
আমাদের শিমুল, দিছু, শিমুল, টুন, আম, কেওড়া, চাপলাস প্রভৃতি কাষ্ঠ সুলভ প্যাকিং বাক্স প্রস্তুতের বিশেষ উপযোগী। আফিং, চা, চুরুট ও অন্যবিধ পণ্য চালান দেওয়ার জন্য এ সকল কাষ্ঠের বাক্স অপেক্ষাকৃত হাল্কা ও মজবুত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। প্যাকিং বাক্স প্রস্তুতের কায কলিকাতা সহরে খুবই লাভজনক ব্যবসায়।

(৬) **সংরক্ষিত ফল**—বিশেষ বিশেষ ফলমূলক শিল্প (যথা কদলী, লেবু, আনারস ইত্যাদি) এতদ্দেশে এখনও বিকাশপ্রাপ্ত হয় নাই। তদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র ফলাদি হইতে নানা প্রকার খাদ্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত করার কার্য্যেও এখনও অধিক লোক হস্তক্ষেপ করে নাই। ইহা একটি প্রকৃষ্ট গৃহশিল্প।

(৭) উন্নত কৃষির জন্য যে পরিমাণ **সার ও পশুখাদ্য** আবশ্যক, তাহা প্রস্তুতের বঙ্গদেশে কোন ব্যবস্থা নাই। কিন্তু আবর্জ্জনাস্তূপ, গলিত মৎস্য, সুন্দরবনের সুটকি চিংড়ি মাছের কারখানাসমূহের পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি অবলম্বনে যে মূল্যবান্ সার প্রস্তুত হইতে পারে, তাহা অল্প লোকই উপলব্ধি করিয়াছে। যাহাকে আমরা আগাছা বলি, তাহা হইতেই পুষ্টিকর পশুখাদ্য পাওয়া যাইতে পারে। দূর্ব্বা প্রভৃতি ঘাসের সহিত মিশ্রিত করিয়া উক্তরূপ বিশেষ প্রকারের আগাছা সংরক্ষণ করিলে অসময়ে অনেক উপকার আসিতে পারে। ফলতঃ খাদ্যের অভাবে বাঙ্গালার গো-বংশ এত অধোগতিপ্রাপ্ত হইয়াছে যে, গো-পালন করায় লাভ হয় না। যথেষ্ট খাদ্য পাইলে এবং সুপ্রজননের ব্যবস্থা করিলে গো-বংশ এবং তৎসহ সাধারণ কৃষিও যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিতে পারে।

বাঙ্গালার ব্যবহারিক উদ্ভিদসম্বন্ধে আলোচনা সবে মাত্র আরম্ভ হইয়াছে। সরকার অন্যান্য উন্নতিশীল দেশের অনুকরণে কয়েকজন ব্যবহারিক উদ্ভিদ্‌বিদ্ নিযুক্ত করিয়াছেন বটে, কিন্তু দেশ, কাল ও পাত্র ভাবিয়া কায করেন নাই। ব্যবহারিক উদ্ভিদতত্ত্বের মুখ্য উদ্দেশ্য উদ্ভিদকে বিশেষ বিশেষ কার্য্যে প্রয়োগ করিবার পদ্ধতি জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়া। কিন্তু সরকারী কার্য্যের ফলে দেশমধ্যে উদ্ভিদের সদ্ব্যবহার (utilisation) না হইয়া তৎসমুদয়ের কেবলমাত্র উৎপাদন ও সংগ্রহ (exploitation) হইতেছে। ইহাতে দেশের কতিপয় ব্যক্তির দিনমজুরী প্রাপ্তি ব্যতীত আর কোনই লাভ নাই। দেশে ধনাগমের পন্থা উন্মুক্ত করিতে হইলে স্কুল-কলেজে ব্যবহারিক উদ্ভিদতত্ত্বের শিক্ষা হওয়া আবশ্যক। সে শিক্ষা যেন কেবল বিদেশীয় বাজারের জন্য কাঁচামাল সরবরাহ করায় পর্য্যবসিত না হয়; প্রকৃত পক্ষে উদ্ভিদ হইতে ব্যবহার্য্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া দেশের অভাব-মোচন ও বিদেশীয় বণিকের বাঁধন হইতে দেশকে মুক্ত করিবার চেষ্টায় যেন সেরূপ শিক্ষা অনুকূল হয়।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

ঝড়ের ডাক

আনমনে আমি ঘর বেঁধেছিনু পল্লীপথের ছায়ে,
ঘূর্ণী পাথায় নিমেষে উড়িল তব উন্মাদ বায়ে;
ঝড়ে-ভরা ঐ এলো অঞ্চল
মুক্তি-মোহন—চল-চঞ্চল—
চল্ চল্ ব'লে ডাক দিয়ে গেল দ্রুত ঝঙ্কৃত পায়ে!

পলকের মাঝে হ'ল বোঝাপড়া মুখামুখি পরিচয়,
বুঝিনু চকিতে, ছিল যাহা মনে, আজি হ'ল তারি জয়;
অন্তর-মাঝে যে ছিল উদাসী
সহসা বাজায়ে সুদূরের বাঁশী,
সেই বুঝি আজ ডাক দিল হাসি' পেয়ে তার সুসময়!

ধরণীর হাটে ক'দিনই বা কাটে, সেই ত ফুরায় বেলা,
না চিনিতে চোখে গোধূলি আলোকে শেষ হয়ে আসে খেলা;
কথনো রাত্রে কথনো বা দিনে,
আজ নয় কাল না জেনে না চিনে
তাজে মহাকাল জড়জঞ্জাল জীবনে মানিয়া

পাগল নহিলে ঘর কে বাঁধিবে জগতের আঙ্গিনায়?
কোটি ফুল যেথা চোখেরি সমুখে ছুটি বেলা ঝরে' যায়;
কোথায় সে হাসি কোথা তার বাস,
কে লেখে তাদের মূক-ইতিহাস!
প্রকাশের মাঝে নিঠুর বিনাশ আড়চোখে হেসে চায়!

জগৎপথের যত বে-দুইন জিপসী ও যাযাবর,
চুরি ক'রে যারা ডাক দিয়ে দিয়ে গিয়েছে নিরন্তর;
এত দিন পরে তাহাদেরি সাথে
হেসে হাতখানি মিলাইনু হাতে,
তাহাদেরি কোলে স'পে দিনু মোরে পথে পথে বাঁধি ঘর।

মায়ার বাঁধন ছায়ার মতন সরে' গেল কোথা ধীরে,
'তুত্তোর' ব'লে পেরোব এবার সরাই-সায়র তীরে;
পরপার হতে ঐ আসে হাওয়া,
এই ধরণীর যত চাওয়া পাওয়া
ভাসাইয়া দিনু বৈতরণীর কূলহারা কালো নীরে।

শ্রী[illegible] ঘোষ।

পাঞ্জাবী

সরঞ্জাম—যাহার গায়ের পাঞ্জাবী হইবে তাহার গায়ের নিম্নলিখিত স্থানের মাপ আবশ্যক।

ঝুল—ঠিক গলা ও কাঁধের জয়েন্টের উপর হইতে যতদূর ঝুল হইবে, তত ইঞ্চি।

ছাতি—ঠিক বগলের নীচে বুক ও পিঠের চারি পার্শ্বের বেড়ের মাপ।

গলা—গলার চারি পার্শ্বের মাপ।

পুট—ইহা পশ্চাদ্দিকে লইতে হয়। ঠিক ঘাড়ের নিকটস্থ মেরুদণ্ড হইতে হস্ত ও দেহের সংযোগস্থল পর্য্যন্ত।

পুট হাতা—ঠিক পুর্ব্বোক্ত স্থান হইতে কব্জির অর্দ্ধ-ইঞ্চি নীচে। যদি এই পুট হাতা হইতে পুটের মাপ বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে শুধু হাতার লম্বার মাপ পাওয়া যায়।

মুহুরী—কব্জির চারি পার্শ্বের মাপ।

পাঞ্জাবী কাটিতে অন্য কোনও মাপের প্রয়োজন হয় না। এখন মনে কর, একটি পাঞ্জাবী কাটিতে হইবে, তাহার মাপ ঃ— ঝুল—৩৬ ইঞ্চি, ছাতি—৩৩ ইঞ্চি, গলা—১৩৸০ ইঞ্চি, পুট ৮৷০ ইঞ্চি, পুট হাতা—৩২৷৷০ ইঞ্চি, (শুধু হাতা—৩২৷৷০ — ৮৷০ = ২৪৷০ ইঞ্চি), মুহুরী—৬৷০ ইঞ্চি।

কতখানি কাপড় লাগিবে—৩৩ হইতে ৪৪ ইঞ্চি পর্য্যন্ত যে কাপড়ের বহর, তাহার দুই লম্বা ও এক হাতা লাগিবে।

অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে—৩৬ + ১ ইঞ্চি (১ ইঞ্চি সেলাইয়ের জন্য) = ৩৭ × ২ = ৭৪ ইঞ্চি = ৭৪ + ২৪৷০ + ১৸০ = ১০০ ইঞ্চি = ২ গজ ২৮ ইঞ্চি কাপড় লাগিবে।
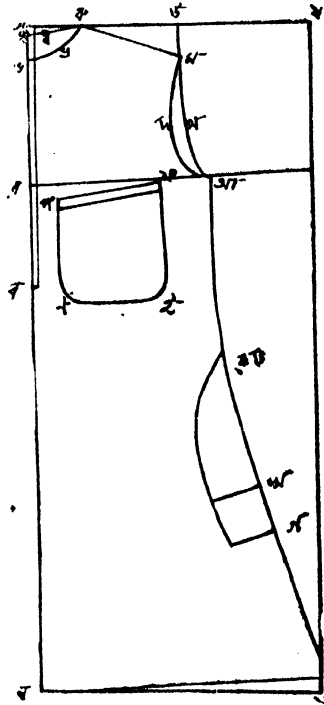
পাঞ্জাবী কাটিবার নিয়ম—থান হইতে দুই লম্বা (৭৪ ইঞ্চি) কাপড় কাটিয়া লও। তাহার পরে তাহার এড়ো দিকে যতখানি ছাতির মাপ, ততখানি ঘের রাখিয়া মুড়িয়া যাও। যখন সমস্ত কাপড় ঐরূপে ভাঁজ করা হইয়া যাইবে, তখন সেই ৭৪ ইঞ্চি লম্বা আধা-আধি করিয়া ভাঁজ করিবে। তাহার পর পার্শ্ববর্ত্তী চিত্রের ন্যায় সমস্ত স্থানে অঙ্কিত করিয়া ও কথিত-মত মাপ ধরিয়া কাট।

১নং—চিত্র

'স' হইতে 'ন'—ঝুল + ১ = ৩৭ ইঞ্চি।

'ন' " 'ত'—অর্দ্ধ ইঞ্চি ঘের = অর্দ্ধ ইঞ্চি ছাতির মাপের সমান = সাড়ে ১৬ ইঞ্চি।

'স' হইতে 'উ'—পুট + ৷০ = সাড়ে ৮ ইঞ্চি।

'উ' " 'ম'—দেড় ইঞ্চি, ছোটর ১ ইঞ্চি।

'স' " 'র'—ছাতির $\frac{১}{৪}$ = ৮৷০ ইঞ্চি।

'ক' " 'স'—ছাতির $\frac{১}{১২}$ = ২¾ ইঞ্চি।

'র' " 'আ'—ছাতি + ৭ ইঞ্চি ঢিলে। তাহার $\frac{১}{৪}$, ৩৩ + ৭ = $\frac{৪০}{৪}$ = ১০ ইঞ্চি

'ত', হইতে 'ও'—১ ইঞ্চি।

'আ' হইতে 'চ'—১০ ইঞ্চি। ছোট ৭, ৮ ইঞ্চি
'চ' 'ঘ'—পকেটের মুখ-- ৭ ইঞ্চি।
'খ' 'গ'—২ ইঞ্চি।
'প'—সাড়ে ৯ ইঞ্চি।
'র' 'প'—দেড় ইঞ্চি।
'স' 'ব'—বুকের চেরাই = ১৫ ইঞ্চি।
'ফ' 'ই'—৭ ইঞ্চি।
'ই' 'ণ'—৬ ইঞ্চি।

লম্বা কাপড়টাকে দুই ভাঁজ করায় সামনা ও পিছন দুই পাত হইল। উহার একটাকে সামনা ও একটাকে পিছন করা হইল। যেটা সামনা, তাহার গলার টলন (ক, ভ, ভ) ও মহড়া (ম, দ, আ) থাড়া একটু বেশী হইবে। 'চ', 'খ' ও 'গ'য়ের নিকট মাত্র নাচি কাটা হইবে, যাহাতে চারি পাতেই মাত্র একটু চিহ্ন করিয়া রাখা যায়। তাহার পর চিত্রে যেরূপ আছে, ঠিক সেইরূপ দাগ করিয়া তাহার পর কাটিতে হইবে। যদি 'ন' ও 'ত' যোগ করিয়া কাটা হইত, তাহা হইলে কোণ ঝুলিয়া যাইত। সেই জন্যই ১ ইঞ্চি উপরে কাটা হইল। ঘের অর্থাৎ 'ন' 'ত' ছাতির মাপে থাকে। এখানে তাই সাড়ে ১৬ ইঞ্চি আছে। কারণ, এটা দুই ভাঁজ করা আছে।
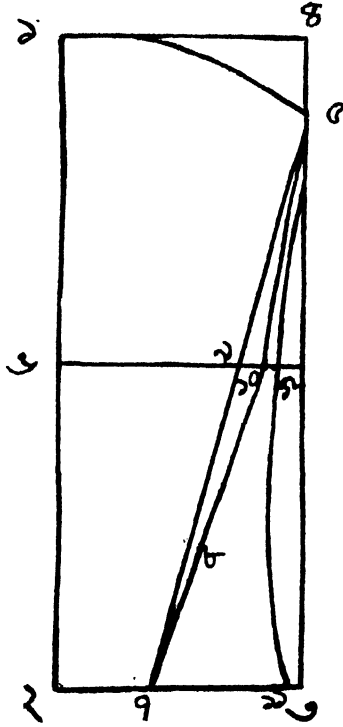
২নং—চিত্র

পার্শ্বের পকেট—লম্বা সাড়ে ১৮ ইঞ্চি ও চওড়া সাড়ে ৬ ইঞ্চি করিয়া কাটিতে হইবে। তাহার পর লম্বা সাড়ে ৭ ইঞ্চি কাপড়কে অনেকটা ধনুকের মত বাঁকাইয়া কাটিতে হইবে। বাকী যে ১১ ইঞ্চি থাকে, তাহাকে দুই ভাঁজ করিয়া পকেটের থলি কর। এইরূপে পকেট সেলাই করিয়া তৎপরে দেহের সহিত সংযুক্ত কর।

হাতা কাটিবার প্রণালী—কাপড় লম্বা ২৬ ইঞ্চি লইয়া তাহার আড়ে ৪ ভাঁজ করিতে হইবে। তাহা হইলে একত্র দুই হাতাই কাটা হইবে।

১ হইতে ২—হাতার লম্বা + ১৸০ = ২৬ ইঞ্চি।
১ " ৪—of ছাতির $\frac{1}{4}$ = ৮।০ ইঞ্চি।
২ " ৭—of মুহুরীর অর্দ্ধ ইঞ্চি + দেড় ইঞ্চি = ৪ ইঞ্চি।
১ " ৬—'১' হইতে '২'এর অর্দ্ধেক এই কনুইয়ের কাছে কাপড় ঢিলে রাখিতে হয়।
৯ হইতে ১০—$\frac{3}{4}$ ইঞ্চি।
৭ " ৮—৬ ইঞ্চি।
৪ " ৫—৩ হইতে সাড়ে ৩ ইঞ্চি।

মাপ যথাস্থানে ধরিয়া তাহার পর চিত্রের মত কাট। ঢিলে হাতা কাটিতে হইলে (৫, ৩) এইরূপ দাগ দাও। কনুইয়ের কাছে ও মুহুরী মাত্র ভাঁজ হইতে একটু কমাইতে হয়। বাস্, পাঞ্জাবী কাটা হইল। এখন সেলাই—

সেলাইয়ের প্রণালী—কাপড় কাটা হইবার পর প্রথমেই সম্মুখের পাত লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে। সম্মুখের পাতের প্রথমে যেখানে বুকের পটির জন্য চেরা হয় (স—ব), সেইটার বামদিকে বোতাম পটি ও দক্ষিণদিকে কায ঘর (বোতামের ঘর) করিবার পটিটি (পুরাতন) সেলাই করিতে হইবে। তাহার পর বুকের পকেটটি বসাইতে হইবে। বুকের পকেট একটু হেলান হইবে। ইহা পকেটের মাথা মুড়িবার কালে হইবে—পকেট বসাইবার কালে নয়, তাহার পর চিত্রের মাপমত কাটিয়া সেলাই কর।

বুক পকেট লাগাইবার পর 'চ,' 'খ,' 'ও', 'ন', পর্য্যন্ত সমস্ত 'হোমিন' করিতে হইবে।

হোমিন করিবার নিয়ম—কাপড়ের কিনারা আগে $\frac{1}{4}$ ইঞ্চি করিয়া মুড়িতে হইবে, তাহার পর আবার তাহাকে অর্দ্ধেক করিয়া মুড়িয়া সেলাই হইবে, যাহাতে পূর্ব্ব-কিনারা দেখা না যায়, 'খ' হইতে 'গ' হোমিন হইবে না। পশ্চাতের পাতও ঠিক ঐরূপ হইবে। তাহার পর সামনা পাত মাটীতে বিছাইয়া ফেল, যাহাতে সিধে দিক উপরে থাকে অর্থাৎ বুক-পকেট উপরে থাকে। আবার ইহার উপরে পশ্চাতের পাত

গেল। এই পশ্চাৎ পাতের সিধে দিক নীচে ও উল্টো দিক উপরে রাখিবে। তাহার পর এই দুই পার্শ্বের কিনারা (আ হইতে চ; খ হইতে গ) একত্র মিলাইবে। তাহার পর হোমিন করিবার সময়ে প্রথমে যেরূপ মুড়িতে হয়, সেইরূপ মুড়িয়া একটা সেলাই হইবে। পুটটাও (ক-ম) ঐরূপে সেলাই হইবে। এইরূপে সেলাই করিলে দুই পাতই জুড়িয়া যাইবে। এক্ষণে ঐ সেলাইকে ডবল করিতে হইবে। যে দুই পাত সেলাই হইয়াছে, সেই দুই পাতকে সেই সেলাইয়ের ঠিক দুই পার্শ্ব হইতে টানিয়া ধরিয়া সেই সেলাইয়ের দাড়টিকে (যাহা উঁচু হইয়া যাইবে) কাপড়ের সঙ্গে (যে পার্শ্বে মুড়িলে পূর্ব্বের সেলাইয়ের কিনারা না দেখা যায়, সেই পার্শ্বে) ফেলিয়া একটি সেলাই হইবে। ডবল সেলাই বলিলেই ঐরূপ বুঝাইবে। ঐরূপে body সেলাই হইয়া গেল। তাহার পর পার্শ্বের পকেট যেরূপ মাপে কাটিবার ও সেলাই করিবার নিয়ম পূর্ব্বে লিখিত আছে, ঐরূপে bodyর সহিত লাগাইতে হইবে। তাহার পর গলা—

সামনের পাত একটু নামাইয়া (ক, ভ, ভ) ও পশ্চাতের পাত (ক, ধ, ধ,) একটু কমাইয়া কাটিতে হয়। মোট কথা, যাহাতে গলা মাপ অপেক্ষা ১ ইঞ্চি বড় হয়। তাহার পর একটি ওরেফ পটি (যাহা টানিলে বাড়ে—অর্থাৎ কোণাকোণি পটি) কাটিয়া তাহা প্রথমে ঐ গলার কিনারার সহিত লাগাইয়া সমানে সেলাই করিতে হয়। তাহার পর তাহা উল্টাইয়া সেই ওরেফ পটির ধার মুড়িয়া bodyর সহিত সেলাই করিলেই গলা হইল। হাতা—যদি ঢিলে হাতা হয়, তাহা হইলে মুহুরী (২-১১) হোমিন হইবে। তাহার পর মুখে মুখে ফেলিয়া (৫, ১২, ১১) ডবল সেলাই হইবে। আর যদি চুড়ি হাতা হয়, তাহা হইলে ৮, ৭, ২ এর কিনারা ½ ইঞ্চি করিয়া ভাঁজ কর। একটি false (বাজে) পটি ১ ইঞ্চি চওড়া করিয়া ভাঁজ করিয়া হাতার সেই ভাঁজের নীচে বসাইয়া তাহা সেলাই কর। তাহার পর '৮' হইতে '৫' পর্য্যন্ত ডবল সেলাই কর। দুই হাতই ঐরূপ হইবে, কেবল Single সেলাই করিবার কালে লক্ষ্য রাখিতে হইবে—যেন দুই হাতই এক হাতের না হয়। যখন Single সেলাই করিবে, তখন দুই হাতার ভাঁজ দুই দিকে করিবে। তাহার পরে আর কিছু লক্ষ্য রাখিতে হইবে না। ঢিলে হাতায় ঐরূপ কিছু করিতে হইবে না। এইরূপে হাতা সেলাই হইলে বাঁ হাতা বাঁ দিকে ও ডান হাতা bodyর ডান দিকে লাগাইবে। হাতার ডাণ্ডি সেলাই bodyর ডাণ্ডির সহিত মিলিয়া যাইবে। যদি বগল 'ম, থ, আ' হাতার ১—৫ হইতে ছোট হয়, তাহা হইলে কাটিয়া সমান করিতে হইবে। সাধারণতঃ মহড়া বড় হয় না। বাস,—তাহার পর bodyর সহিত ডবল সেলাই করিলেই পাঞ্জাবী তৈয়ারী হইল, তাহার পর বোতাম ও বোতামের ঘর করিলেই পাঞ্জাবী—সম্পূর্ণ। পাঞ্জাবী কাটিতে ও সেলাই করিতে হইলে, প্রথম শিক্ষা করিবার কালে একটি তৈয়ারী পাঞ্জাবী সম্মুখে রাখিয়া এই প্রণালীতে করিলেই ভাল হয়। পাঞ্জাবীর "বুক কফ" সার্টের টেনিস হাতার মত।

শ্রীসন্তোষকুমার বসু।

সহজ সত্য

তুমি আমায় ভালবাস,
এমন ধ্রুব আর কি আছে ?
নইলে কেন পাঠালে নাথ,
এমন মধুর বিশ্বমাঝে।
নইলে কেন এমন ক'রে
ভালবাসা দিলে মোরে,
নইলে কেন পরাণ আমার
মাগ' সদাই আমার কাছে।

বিশ্বতলে অযুত ধারায়
ছুটে তোমার প্রেমের ভাষা,
আকাশ বাতাস কানে কানে
জানায় তোমার ভালবাসা ;
জলে স্থলে দিগন্তরে
দিবসরাতি কি মন্তরে,
শুনি আমার এ অন্তরে,
সদাই তোমার কণ্ঠ বাজে।

শ্রীঅশোকবিজয় রাহা।

প্রাচীন ভারতে গণতন্ত্র

আজকাল অনেকেরই ধারণা, গণতন্ত্র সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য প্রতিষ্ঠান, ভারতে কখনই গণতন্ত্র ছিল না। এ ধারণা ভ্রান্ত। ম্যাগেস্থেনিস ভারত হইতে এক জনশ্রুতি শুনিয়া গিয়াছিলেন যে, দিওনাইসস্ (Dionysos) হইতে চন্দ্রগুপ্ত পর্য্যন্ত ১ শত ৫৩ জন রাজা ভারতে ৬ হাজার ৪২ বৎসরকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই সময় মধ্যে ভারতে তিন বার গণতন্ত্র (Republic) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। * ম্যাগেস্থেনিসের উক্তি এখন প্রামাণ্য বলিয়াই স্বীকৃত হইয়া থাকে। ইহাতে বুঝা যায় যে, ঐ গণতন্ত্র কিছুকাল ধরিয়া স্থায়ী হইয়াছিল; কারণ, প্রত্যেক রাজা যদি গড়ে ২০ বৎসর করিয়া রাজত্ব করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও ১ শত ৫৩ রাজার রাজত্বকাল ৩ হাজার ৬০ বৎসরের অধিক হইতে পারে না। সুতরাং ঐ গণতন্ত্র অন্ততঃ তিন বারে ৩ হাজার বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল, ইহা বুঝিতে হইবে। খৃষ্ট জন্মিবার ৩ শত ২১ বৎসর পূর্ব্বে চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশের উচ্ছেদ-সাধন করিয়া মগধের সিংহাসন অধিকৃত করিয়াছিলেন। সেই ঘটনা ২ হাজার ২ শত ৪৮ বৎসর পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। তাহার ৬ হাজার ৪২ বৎসর পূর্ব্বে ম্যাগেস্থেনিস-কথিত দিওনাইসস্ বা দিওনিসস্ রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন। অর্থাৎ ঠিক ৮ হাজার ২ শত ৯০ বৎসর পূর্ব্বে দিওনাইসস্ নৃপতি রাজত্ব করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ ৮ হাজার আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতে যে মানুষ ছিল বা হিন্দু ছিল, কোন য়ুরোপীয়ই তাহা স্বীকার করিবেন না। তাঁহাদের মতে ভারতে আর্য্যদিগের অধিকার বড় জোর ৫ হাজার বৎসরের পুরাতন ঘটনা। তৎপূর্ব্বে এ দেশ নিবিড় জঙ্গলে আচ্ছন্ন ছিল, তখন এ দেশে গারো, নাগা, সাঁওতাল প্রভৃতির ন্যায় অসভ্য জাতি বসবাস করিত। আর্য্যরা উত্তর অঞ্চল হইতে আসিয়া উহাদিগকে পরাভূত করিয়া এ দেশ অধিকৃত করিয়া লইয়াছেন এবং এই দেশে সভ্যতার বিস্তার করিয়াছেন, ইহাই হইল পাশ্চাত্য 'থিওরী'। এ থিওরী যে ভ্রান্ত, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। মহেন্দোজোড়ো ও হারাপ্পার আবিষ্কারের পর য়ুরোপীয়দিগের মতের প্রতিকূলে কতকগুলি প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত মত য়ুরোপীয়দিগের বলিয়া শিক্ষিত সমাজ এখনও উহা পরিহার করিতে পারিতেছেন না। যাহা হউক, বাইবেল-কথিত পৃথিবীব্যাপী জলপ্লাবন বর্ত্তমান সময় হইতে ৪ হাজার ২ শত ২০ বৎসর পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছিল, এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া সমস্ত মানবজাতির ইতিহাসকে সাড়ে ৩ হাজার বৎসরের মধ্যে আবদ্ধ করিবার ইচ্ছা আমার নাই। আমার বিশ্বাস, এই ভারতে আর্য্য ও অনার্য্য মানবজাতি বহু সহস্র বর্ষ ধরিয়া বসবাস করিতেছে। সুতরাং ৮ হাজার বৎসর পূর্ব্বোক্ত ভারতে সুসভ্য মানবজাতির বসবাস অসম্ভব নহে; বরং সম্পূর্ণই সম্ভব।

যাহা হউক, এই দিওনাইসস্ রাজাটি কে? গ্রীকরা যেরূপ ভাবে ভারতীয় নামগুলি বিকৃত করেন, তাহাতে উক্ত রাজার আসল নাম যে কি ছিল, তাহা বুঝিয়া উঠা একবারেই অসম্ভব। ম্যাগেস্থেনিস্ চন্দ্রগুপ্তকে 'সাণ্ড্রোকোট্টাস' লিখিয়াছেন। উহা চন্দ্রকেতু কি চন্দ্রগুপ্ত, তাহা লইয়া কিছুকাল তর্ক চলিয়াছিল। তবে অত্যন্ত প্রবল প্রমাণ ছিল বলিয়া চন্দ্রগুপ্তকে সনাক্ত করা সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু এই দিওনাইসস্কে সনাক্ত করা এখন একরূপ অসম্ভব। ৮ হাজার বৎসর পূর্ব্বে এই ভারতে কোন্ প্রবলপরাক্রান্ত নৃপতি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা এখন অনুমান করাও সম্ভব নহে। ঐ চেষ্টা পণ্ডশ্রমমাত্র। তবে তিনি এক জন প্রবল-প্রতাপ এবং সুপ্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাঁহার নামের পূর্ব্বাক্ষর দ, মধ্যে কোন অনুনাসিক বর্ণ এবং শেষে বা মধ্যে স-কার ছিল। ইনি কি রাজা দুষ্মন্ত? অসম্ভব নহে। দুষ্মন্ত ভরতের পিতা। ভরতের নাম হইতে ভারতবর্ষ নাম হইয়াছে। ইনি অত্যন্ত প্রাচীন রাজা, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহা ভিন্ন পুত্রের কীর্ত্তিতেও পিতা অনেকটা কীর্ত্তিমান্ হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাকে ধরিয়া একটা কাল-গণনা অসঙ্গত নহে। তবে এইরূপ দুর্ব্বল প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া যে সিদ্ধান্ত করা হইল,

* From the time of Dionysos to Sandrocottos the Indians counted 153 Kings and a period of 6042 years, among these a republic was thrice established. *Indika of Arrians* transl by Mc Crindle ch ix.

তাহা ঐতিহাসিক তথ্য বলিয়া গ্রাহ্য না হইবারই কথা। ভারতের জাতীয় ইতিহাসের সহিত এই রাজার দেশীয় নাম লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

ডিওনাইসসের প্রকৃত নাম যাহাই হউক না কেন, তিনি যে ভারতের এক জন প্রাচীন রাজা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই; সুতরাং অতি প্রাচীনকালে যে ভারতে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা এই ভারতীয় প্রাচীন জনশ্রুতি হইতেই কতকটা জানা যায়। কিন্তু বড়ই বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ভারতীয় প্রাচীন গ্রন্থে গণতন্ত্রের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। ভারতের অতীত ইতিহাস বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে,—ইহা আমি কিছুকাল পূর্ব্বে "ইতিহাস ও পুরাণ" নামক প্রবন্ধে বিশেষভাবে বলিয়াছি। ঐতিহাসিক তথ্যকে অবলম্বন করিয়া জনসাধারণকে নীতি এবং ধর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিবার উদ্দেশ্যেই পৌরাণিক আখ্যায়িকাগুলির সৃষ্টি হইয়াছে। উহাতে ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত থাকিলেও উহাকে খাটি ইতিহাস বলিয়া গণ্য করা যায় না। পুরাণে গণতন্ত্রের কথা বিশেষভাবে বর্ণিত নাই। সেই জন্য প্রাচীন গণতন্ত্রের অস্তিত্ব সম্বন্ধে লোকের সন্দেহ স্বাভাবিক।

কিন্তু মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে যে রাজনীতিক উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাতে গণের বা গণতন্ত্রের দোষাদোষের কথা বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে গণের বা গণতন্ত্র সম্বন্ধে উপদেশ দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া নানা প্রশ্নের মধ্যে নিজ সংশয়ের কথা বলিতেছেন,—

"ভেদমূলো বিনাশো হি গাণনামুপলক্ষয়ে।
মন্ত্রসংবরণং দুঃখং বহুনামিতি মে মতিঃ॥"

(মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব ১০৭।৮)

আমার মনে হয় যে, ভেদই (সদস্যদিগের মধ্যে অনৈক্য) গণতন্ত্রের বিনাশের কারণ, দ্বিতীয়তঃ আমার ধারণা, গণতন্ত্রের কর্ত্তা অনেক; সেই জন্য তাঁহাদের মধ্যে মন্ত্রণা গোপন রাখা বড়ই কঠিন।

তদুত্তরে ভীষ্ম বলিতেছেন,—

"মন্ত্রগুপ্তিঃ প্রধানেষু চারশ্চামিত্রকর্ষণ!
ন গণাঃ কৃৎস্নশো মন্ত্রং শ্রোতুমর্হন্তি ভারত॥
গণমুখ্যৈস্তু সম্ভূয় কার্য্যং গণহিতং মিথঃ।
পৃথগ্‌গণস্য ভিন্নস্য বিততস্য ততোঽন্যথা॥"

হে অমিত্রকর্ষণ ভারত! গণের মধ্যে যাঁহারা প্রধান (Leader), তাঁহারাই রাজ্যের গুপ্ত মন্ত্রণাদি এবং প্রস্তাবাদির আলোচনা করিবেন, গণস্থ সকল লোকই একসঙ্গে বসিয়া মন্ত্রণাদি শ্রবণ করিতে পারিবেন না। যাঁহারা গণমুখ্য অর্থাৎ গণের নেতা (গণতন্ত্রের মধ্যে অগ্রণী বা দলবিশেষের নেতা), কেবল তাঁহারাই সম্মিলিত হইয়া পরামর্শ পূর্ব্বক গণতন্ত্র-শাসিত রাজ্যের হিতকর কার্য্য করিবেন; কিন্তু গণস্থ লোকরা যদি পরস্পর পৃথক্‌, ছিন্নসম্বন্ধ অথবা পরস্পর পরস্পর হইতে দূরে অবস্থিত হয়েন, তাহা হইলে তাহার ফল অন্যরূপ অর্থাৎ অহিতকর হইয়া থাকে।

রাজতন্ত্রে রাজাই বিচার করিবেন। বিচারকালে তিনি শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে সঙ্গে লইবেন এবং তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া সিদ্ধান্ত করিবেন,—অথবা শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বারা বিচার-কার্য্য করাইবেন,—শাস্ত্রে এইরূপ ব্যবস্থা আছে। যথা, যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় লিখিত হইয়াছে—

"ব্যবহারান্ নৃপঃ পশ্যেদ্বিদ্বদ্ভির্ব্রাহ্মণৈঃ সহ।
ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারেণ ক্রোধ-লোভ-বিবর্জ্জিতঃ॥" যাজ্ঞ ২।১

অর্থাৎ নরপতি ক্রোধ এবং লোভশূন্য হইয়া সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণদিগকে সঙ্গে লইয়া ধর্ম্মশাস্ত্রের নির্দ্দেশ অনুসারে বিচার-কার্য্য সম্পাদন করিবেন।

যে ক্ষেত্রে রাজা স্বয়ং বিচার-কার্য্য সম্পাদন করিতে অসমর্থ হইবেন, সেই ক্ষেত্রে সভ্যগণের সহিত এক জন সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করিবেন। (যজ্ঞ ২।২) ইহাই হইল রাজতন্ত্রের ব্যবস্থা।

কিন্তু গণতন্ত্রে ত রাজা নাই। সেখানে কি ব্যবস্থা হইবে? সেই জন্য ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে ঐ কথাটি বিশেষভাবে বলিয়াছেন,—

"নিগ্রহঃ পণ্ডিতৈঃ কার্য্যঃ ক্ষিপ্রমেব প্রধানতঃ।"

(মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব ১০৭।২৭)

নিগ্রহ অর্থে বিচারপূর্ব্বক দুষ্টের দমন। গণের প্রধান ব্যক্তিরা অর্থাৎ প্রেসিডেণ্টগণ পণ্ডিত অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা ফৌজদারী মামলার বিচার এবং দুষ্টের দণ্ডবিধান করাইয়া লইবেন।

গণতন্ত্রে রাজা না থাকায় ভীষ্ম বিচার-কার্য্য সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন।

এখানে একটা কথা উল্লেখযোগ্য। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ যে সময়ে ভারতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে ভারতে গণতন্ত্র বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। সেই জন্য তিনি গণসম্পর্কিত ব্যাপারটি ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। তিনি মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের উক্ত অধ্যায়ের টীকা অতিশয় সংক্ষিপ্তভাবে লিখিয়াছেন। গণশব্দের ব্যাখ্যাতেও তিনি একটু যেন গোঁজামিল দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি গণ অর্থে শূরগণস্তোম (confederation of warriors) লিখিয়াছেন। শূর অর্থে সাহসী ব্যক্তি। শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ যেমন পণ্ডিত বলিয়া অভিহিত হইতেন, যোদ্ধা ক্ষত্রিয়গণ তেমনই শূর নামে অভিহিত হইতেন। কিন্তু মূল শান্তিপর্ব্বের ১০৭ অধ্যায়ের কুত্রাপি গণ যে কেবল সাহসী ব্যক্তিদিগের বা ক্ষত্রিয়দিগের সংহতি, এমন আভাসও দেওয়া হয় নাই। ক্ষত্রিয়ের প্রধান কার্য্য যুদ্ধ। সে সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথাই ঐ অধ্যায়ে বলা হয় নাই। নীলকণ্ঠও উহা ক্ষত্রিয়সংহতি এমন কথা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। কারণ, তিনি জানেন, গণকে কুল, জাতি, শ্রেণী ও জনপদ হইতে স্বতন্ত্র ব্যাপার বলিয়া লিখা হয়। যথা যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় :—

"কুলানি জাতিশ্রেণীশ্চ গণাজ্জানপদানপি।"

বীরমিত্রোদয়ে বৃহস্পতির এই বচন উদ্ধৃত হইয়াছে :—

"কুলশ্রেণীগণাধ্যক্ষাঃ প্রোক্তনির্ণয়কারিণঃ।
যেষামগ্রে নিশ্চিতস্য প্রতিষ্ঠা তূত্তরোত্তরম্॥"

এখানেও গণকে কুল এবং শ্রেণী হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। জাতি বা গোষ্ঠীদিগের সঙ্ঘ বা সংহতিকে কুল বলা হয়। উহাদের মুখ্য ব্যক্তিকে কুলিকা * বা কুলপতি বলা হইয়া থাকে। একই বৃত্তি অনুসারী ব্যক্তিদিগের সভা বা সংহতি শ্রেণী নামে অভিহিত। সুতরাং গণ অর্থে ক্ষত্রিয়সঙ্ঘ হইতে পারে না। বিভিন্ন শ্রেণীর লোক লইয়া গঠিত সঙ্ঘ বা সভাই গণ নামে অভিহিত।

শূর শব্দে বীর্য্যবান্ বা ক্ষমতাবান্ ব্যক্তি। শূরগণ-স্তোম অর্থে ক্ষমতাবান্ বা বীর্য্যবান্ বা অগ্রণীগণের সভা। এই হিসাবে নীলকণ্ঠের ব্যাখ্যা ভুল হয় নাই, তবে অস্পষ্ট হইয়াছে। গণ অর্থে মুখ্যজনগণের সংহতি বা সভা।

* "কুলিকাঃ—কুলশ্রেষ্ঠাঃ" বীরমিত্রোদয়ের টীকা।

এখানে একটা কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। অতি প্রাচীনকালে এক একটি জাতি এক একটি গ্রামে বাস করিত। সেই জাতীয় এক এক ব্যক্তি সেই গ্রামের কর্ত্তা ছিল। যথা—গোকুলে গোপগণের বাস ছিল। নন্দঘোষ তাঁহাদের অগ্রণী বা গণমুখ্য ছিলেন। গুহক চণ্ডালদিগের অধ্যুষিত জনপদের অগ্রণী ছিলেন। এইরূপ আভীরপল্লী, নিষাদপল্লী, বৈশ্যপল্লী প্রভৃতি স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত থাকিত। রাধিকার পিতাও একটি স্বতন্ত্র আভীরপল্লীর রাজা ছিলেন। সেই জন্য শ্রীমতী রাজনন্দিনী বলিয়া কথিত হইতেন। এইরূপ দাসরাজ, নিষাদরাজ প্রভৃতির উল্লেখ প্রাচীন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহারা রাজা বা শূর বলিয়াও কথিত হইতেন; ইঁহাদের সকলের সম্মিলিত সভা বা সংহতিই গণ নামে অভিহিত ছিল। সুতরাং সর্ব্বজাতীয় লোক লইয়াই এই 'গণ'-সভা হইত।

কথাটা আর একটু স্পষ্ট করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। ভারতে প্রাচীনকালে জনসাধারণের ভোট দ্বারা সদস্য নির্ব্বাচিত হইত কি না, তাহা বলা অত্যন্ত কঠিন। তবে প্রত্যেক পল্লীতে বা জনপদে এক বা দুই অথবা বহু মুখ্য ব্যক্তি থাকিতেন। গণে তাঁহারাই গণমুখ্য বা সদস্য বলিয়া গৃহীত হইতেন। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বেও যে এ দেশে গণতন্ত্র প্রবর্ত্তিত ছিল,—তাহার প্রমাণ বৌদ্ধ এবং জৈন সাহিত্যে অনেক পাওয়া যায়। যে সময়ে ভারতে গণরাজ্য প্রবর্ত্তিত ছিল, সে সময়ে যে কোথাও রাজতন্ত্র ছিল না, তাহা নহে। অবদানশতকে উহার প্রমাণ আছে। যে সময়ে বুদ্ধদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে মধ্যদেশের কতকগুলি বণিক্ দাক্ষিণাত্যে বাণিজ্য করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহারা যে রাজ্যে বাণিজ্য করিতে গিয়াছিলেন, সেই রাজ্যের রাজা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, "তোমাদের দেশের রাজা কে (রাজা উক্তং ভো বণিজঃ কস্তব রাজেতি ?) উত্তরে বণিক্রা বলিয়াছিলেন,—"আমাদের অঞ্চলে কতকগুলি রাজ্য রাজাধীন আর কতকগুলি রাজ্য গণাধীন ("বণিজঃ কথয়ন্তি। দেব ! কেচিদ্দেশা গণাধীনাঃ, কেচিৎ রাজাধীনা ইতি।") * ইহাতে বেশ বুঝা যায় যে, পূর্ব্বকালে

* শ্রীযুত কে, পি, জয়সওয়ালের Hindu Polity দ্রষ্টব্য। বর্ত্তমান প্রবন্ধটি লিখিবার পূর্ব্বেই আমার ঐ পুস্তক দেখিবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। এ সম্বন্ধে যাঁহারা অধিক জানিতে চাহেন, তাঁহারা উক্ত গ্রন্থখানি পড়িয়া দেখিবেন।—লেখক।

ভারতে এক সময়েই কোন স্থানে রাজতন্ত্র এবং কোন স্থানে গণতন্ত্র প্রবর্ত্তিত ছিল। বৌদ্ধ এবং জৈন গ্রন্থে গণতন্ত্রের অনেক উল্লেখ দেখা যায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও গণতন্ত্রের কথা আছে। বাহুল্যভয়ে আর এখানে তাহা উদ্ধৃত হইল না। তবে একটা কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, গণ এবং সঙ্ঘ ঠিক এক কথা নহে। উভয়ের পার্থক্য ছিল। সামন্নফলসুত্তে "সংঙ্ঘী চৈব গণী চ" অর্থাৎ সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠাতা এবং গণপ্রতিষ্ঠাতা হইতেই ইহা বুঝা যায়।

গ্রীক লেখকগণ ভারতে প্রজাতন্ত্রের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। ম্যাগেস্থেনিস স্পষ্টই লিখিয়া গিয়াছেন যে, তদানীন্তন ভারতে দুই প্রকার রাজ্য ছিল; এক প্রকার রাজাধীন, আর এক প্রকার গণাধীন। তিনি যুদ্ধ করিবার জন্য গ্রীক বীর আলেক্‌জান্দারের সহিত অল্পদিনের জন্য ভারতে আইসেন নাই। তিনি বহুকাল ধরিয়া চন্দ্রগুপ্তের রাজধানীতে ও রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং এরূপ একটা স্থূল বিষয়ে যে তাঁহার ভুল হইবে, তাহা মনে হয় না। তিনি স্পষ্টই লিখিয়াছেন, "যে রাজ্যে রাজা আছে, সেই রাজ্যের লোক রাজার নিকটই সকল কথা নিবেদন করে; যে রাজ্যে রাজা নাই, সেই রাজ্যে প্রজারাই রাজ্যশাসন করে (self governed); সেই রাজ্যের লোক সকল কথা ম্যাজিষ্ট্রেটের গোচর করিয়া থাকে।" (Mc Crindles Magasthenes Arr. 12) অধ্যাপক হফকিন্স লিখিয়াছেন যে, ম্যাগেস্থেনিস স্পষ্টই স্বায়ত্তশাসনসম্পন্ন এবং রাজ্যশাসনসম্পন্ন উভয়বিধ নগরের উল্লেখ করিয়াছেন। ম্যাগেস্থেনিস স্বয়ং গ্রীক। তিনি যে অভিজাততন্ত্রকে প্রজাতন্ত্র বলিয়াছেন, ইহা আমাদের মনে হয় না। ডিওডোরাস (Diodoros) লিখিয়াছেন যে, সম্বস্তগণ সহরবাসী ছিলেন, উঁহাদের শাসনপদ্ধতি জনমতমূলক ছিল। তৌয়ল (Taula) একটি প্রসিদ্ধ সহর; তথাকার শাসনপদ্ধতি স্পার্টার শাসনপদ্ধতিরই অনুরূপ; এই সহরের যুদ্ধকার্য্য-পরিচালনভার দুইটি বংশের দুইটি রাজার হস্তে ন্যস্ত ছিল; পক্ষান্তরে, মুখ্য ব্যক্তিগণের পরিষদই সমস্ত রাজ্যে চরম প্রভুত্ব পরিচালিত করিতেন। এই তৌয়ল নগর কোথায়, তাহা এখন আর ঠিক জানিবার উপায় নাই। অনেকে বলেন,—উহা 'পাতাল' শব্দের অপভ্রংশ। আরিয়ান (Arrian) বলেন যে, মল্লই জাতি স্বাধীনতাপ্রিয়। কিন্তু অক্ষিদ্রকইগণ (Oxidrakai) স্বাধীনতা এবং স্বায়ত্তশাসনপ্রিয়তায় অনন্যসাধারণ; আলেকজাণ্ডার কর্ত্তৃক ভারত আক্রমণের বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই ইহারা স্বাধীনতা এবং স্বায়ত্তশাসন অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। আজকাল কোন কোন য়ুরোপীয় পণ্ডিত সিন্ধু হায়দ্রাবাদকে প্রাচীন পাতাল বলিয়া থাকেন। মল্লই মালবীয় জাতি এবং অক্ষিদ্রকই ক্ষুদ্রক জাতি। এই সকল জাতিকে এখন ঠিক সনাক্ত করা কঠিন হইলেও ভারতে যে বহু জাতি গণতন্ত্রবাদী ছিল, এবং তাহারা যে তাহাদের শাসনযন্ত্র নিয়ন্ত্রিত করিত, সমসাময়িক গ্রীক ইতিহাস-লেখকদিগের উক্তি হইতেই তাহ বুঝা যায়।

বৌদ্ধযুগে রচিত বহু জাতকগ্রন্থেই প্রাচীন ভারতে গণশাসনের অস্তিত্বজ্ঞাপক অনেক প্রমাণই পাওয়া যায়। 'মঝ্‌ঝিম নিকায়' নামক জাতকগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বুদ্ধদেবের প্রশ্নের উত্তরে এক ব্যক্তি বলিতেছেন, কোশলের পশেনদীর এবং মগধের অজাতশত্রুরই কেবল লোকের প্রাণদণ্ড বা নির্ব্বাসন দণ্ডদানের অধিকার নাই, পরন্তু সঙ্ঘের এবং গণেরও ঐ ক্ষমতা আছে। ললিতবিস্তরেও ঐরূপ কথা পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতের বহু জাতিই যে গণতন্ত্রানুসারে রাজ্যশাসন করিত, তাহা ডাক্তার রাইস ডেভিড্‌স (Dr. Rhys Davids) তাঁহার Buddist India নামক গ্রন্থে স্বীকার করিয়াছেন।

কেবল যে বৌদ্ধদিগের গ্রন্থেই গণতন্ত্ররাজ্যের প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা নহে। জৈনদিগের ধর্ম্মগ্রন্থেও উহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। উহাতে কেবল গণরাজ্যের কথা নাই, অধিকন্তু দোরাজ্য, অরাজ্য, বৈরাজ্য প্রভৃতি বহুবিধ শাসনপদ্ধতির প্রমাণ পাওয়া যায় (আচারাঙ্গ সূত্র দ্রষ্টব্য)।

এখন জিজ্ঞাস্য—গণরাজ্যে সদস্যদিগের মতামত সম্পর্কে ভোট গ্রহণ করা হইত কি? বিখ্যাত ঐতিহাসিক মিষ্টার কে, পি, জশোয়াল তাঁহার Hindu Polity নামক গ্রন্থে বৌদ্ধদিগের "মহাভগগ" গ্রন্থ হইতে ভোট-গণনার এক প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে:—

"যে সকল ভিক্ষু ভিক্ষার্থ বাহির হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে লোক প্রশ্ন করিল, 'আপনারা সংখ্যায় কত জন আছেন?'

ভিক্ষুগণ উত্তর করিল :—'বন্ধুগণ, আমরা তাহা জানি না।'

সেই কথা শুনিয়া লোক বিরক্ত হইল।—তাহারা সেই কথা বুদ্ধদেবের গোচর করিল। বুদ্ধদেব সাব্যস্ত করিলেন যে, উপসথ দিনে ভোটদানের টিকেট অনুসারে ভিক্ষুদিগের সংখ্যা গণিত হইবে।

তিনি কহিলেন, 'হে ভিক্ষুগণ' উপসথের দিনে আপনাদিগকে গণমার্গের দ্বারা অর্থাৎ গণসভায় যেরূপ পদ্ধতিতে ভোট গণনা করা হয়, সেইরূপ পদ্ধতিতে (গণমগ্গো গণিতুং) ভিক্ষুকদিগের সংখ্যা গণনা করা হইবে, অর্থাৎ আপনারা 'শলাকা' বা ভোটদানের টিকেট গ্রহণ করিবেন।"

প্রাচীন ভারতে গণপূরক নামে এক শ্রেণীর রাজপুরুষ ছিলেন। গণসভায় আবশ্যকসংখ্যক সদস্য আসিয়াছেন কি না, তাহা গণনা করিবার জন্য এই সকল রাজপুরুষ নিযুক্ত হইতেন। মহাভগ্গ নামক পালি গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে।

যে ব্যাপারে বহু লোকের মতামত লইয়া কার্য্য করিতে হয়, সে ব্যাপারে কোন্ প্রস্তাবের স্বপক্ষে কত লোকের মত হইল, বিপক্ষেই বা কত লোকের মত হইল, তাহা গণনা করিতেই হয়। গণপূরকগণ সেই কার্য্যই করিতেন। কিন্তু প্রজাসাধারণের ভোটে যে গণসভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইতেন, সেরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

এখন জিজ্ঞাস্য—প্রাচীন ভারতে যে গণরাজ্য ছিল, তাহা প্রকৃতপক্ষে Aristocracy না Oligarchy না Republic? গণ বলিতে বহুই বুঝায়। কিন্তু এই তিনটি শাসন-পদ্ধতিতেই বহু শাসকের অস্তিত্ব সূচিত হয়। আমার ধারণা, অভিজাততন্ত্র বা গোষ্ঠীতন্ত্র প্রাচীন ভারতে কুল বা কুলতন্ত্র নামে অভিহিত ছিল। "কুলানি কতিচিৎ পুরুষগৃহীতানি।" কাত্যায়ন বলিয়াছেন, "কুলানাং হি সমূহস্ত গণঃ সংপরিকীর্ত্তিতঃ" অর্থাৎ কুলের সমূহ অর্থাৎ নানাকুলের যে সভা, তাহাই গণ। সুতরাং গণ প্রজাতন্ত্র রাজ্য বলিয়া মনে হয়। অভিজাততন্ত্রের প্রাচীন নাম "কুলরাজ্য।" কুলসভায় সদস্যসংখ্যা অল্পই থাকিত। তাহার কারণ, উহাতে একই শ্রেণীর লোক, যথা কেবল ক্ষত্রিয়গণই থাকিতেন।

আমি 'প্রাচীন ভারতে মন্ত্রিমণ্ডলী' শীর্ষক সন্দর্ভে দেখাইয়াছি যে, প্রাচীনকালে মন্ত্রিমণ্ডলীতে চারি বর্ণের মন্ত্রীরাই থাকিতেন (বৈশাখ মাসের মাসিক বসুমতী দ্রষ্টব্য)। রাজসভায় সভাসদগণমধ্যেও চারি বর্ণের লোক থাকিতেন। মহাভারতের বনপর্ব্বে দেখা যায় যে, দুর্য্যোধন গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন কর্ত্তৃক বন্দী হইবার পর যখন অর্জ্জুন কর্ত্তৃক মুক্ত হইয়াছিলেন, তখন তিনি এই বলিয়া বিলাপ করিয়াছিলেন :—

"ব্রাহ্মণাঃ শ্রেণিমুখ্যাশ্চ তথোদাসীনবৃত্তয়ঃ।
কিং মাং বক্ষ্যন্তি কিং চাপি প্রতিবক্ষ্যামি তানহম্॥"
(মহাভারত, বনপর্ব্ব ২৪৮।১৬)

রাজসভায় যাইয়া ব্রাহ্মণগণ, শ্রেণিমুখ্যগণ, উদাসীনবৃত্তি প্রজাগণ আমাকেই বা কি বলিবে আর আমিই বা তাহাদিগকে কি বলিব? এই শ্রেণিমুখ্য শব্দে নানা শ্রেণীর প্রধান ব্যক্তিদিগকেই বুঝাইতেছে। সুতরাং প্রথমেই ব্রাহ্মণ ও পরে শ্রেণিমুখ্যদিগের উল্লেখ করাতে সর্ব্বশ্রেণীর লোকই রাজসভায় থাকিত, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। উদাসীনবৃত্তি বলিতে কাহাদিগকে বুঝায়, নীলকণ্ঠ তাহা বলেন নাই। কেহ কেহ বলেন, উহারা উচ্চশীল ব্রাহ্মণ, আমার বিশ্বাস উহারা শূদ্র।* সুতরাং রাজসভায় সর্ব্বশ্রেণীর লোক থাকিতেন, তাহা এই ব্যাপার হইতেই বুঝা যায়।

এখন প্রশ্ন, রাজ সভায় যখন সর্ব্বশ্রেণীর লোকই থাকিতেন, তখন গণসভায় যে কেবল শ্রেণিবিশেষই থাকিতেন, এরূপ সিদ্ধান্ত করা কর্ত্তব্য কি? সেই জন্য আমাদের বিশ্বাস, গণসভায় সর্ব্বশ্রেণীর লোকই বিরাজ করিতেন।

বুদ্ধদেব যে নগরে জন্মগ্রহণ করেন, সেই কপিলাবস্তু গণশাসিত ছিল। শাক্যগণই তাহার কার্য্য পরিচালনা করিতেন। বুদ্ধদেবের পিতা সেই গণসভার রাজা বা প্রেসিডেন্ট ছিলেন। উহার সদস্যসংখ্যা প্রায় ৫ শত ছিল। উহা শাক্যদিগের গণ বা সভা হইলেও উহাতে অন্যান্য শ্রেণীর মুখ্য ব্যক্তিগণ ছিলেন বলিয়াই মনে হয়। এই বৃত্তান্ত হইতেই বুঝা যায় যে, গণের বা গণসভায় পরিচালকগণ ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং তাঁহারা স্থলবিশেষে 'রাজা' নামেও অভিহিত হইতেন। জৈনদিগের তীর্থঙ্কর মহাবীরের পিতাও ঐরূপ একটি কুলসভার নেতা ছিলেন। প্রায়ই দেখা যায় যে,

* ঔদাসীন্য একটি বৃত্তি হইতে পারে না। ব্যবহিতত্ব নিবন্ধন যাহাদের বৃত্তিতে অনুরাগ বা বিরাগ নাই, অর্থাৎ যাহারা অন্য বর্ণের দাস নহে, তাহারাই উদাসীনবৃত্তি। শূদ্রের বৃত্তিই অন্য বর্ণের সেবা।

ক্ষত্রিয়রাই কুলপতি বা গণপতি হইলে তিনি রাজা নামেই অভিহিত হইতেন।

শুক্রনীতিসারে দেখা যায় যে, রাজা যদি প্রজাপীড়ক হয়েন, তাহা হইলে প্রজাগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য ব্যক্তিকে রাজা করিবেন। যথা :—

"হিতং রাজ্ঞশ্চাহিতং যল্লোকানাং তন্ন কারয়েৎ।
নবীন-কর-শুল্কাদ্যৈর্লোক উদ্বিজতে ততঃ।
গুণনীতি-বলদ্বেষী কুলভূতোঽপ্যধার্ম্মিকঃ।
নৃপো যদি ভবেৎ তন্তু ত্যজেদ্রাষ্ট্রবিনাশকম্॥
তৎপদে তস্য কুলজং গুণযুক্তং পুরোহিতঃ।
প্রকৃত্যনুমতিং কৃত্বা স্থাপয়েদ্রাজ্যগুপ্তয়ে॥"

শুক্র ২অ (২৭৩-৭৫)

ইহার অর্থ,—যে কার্য্য দ্বারা রাজার হিত হইলেও প্রজার অনিষ্ট হয়, কখনই সে কার্য্য করিবে না। কারণ, প্রজার উপর নূতন কর, শুল্ক প্রভৃতি ধার্য্য করিলে প্রজারা বিরক্ত এবং উৎপীড়িত হইয়া উঠে। রাজা যদি কুলভূত অর্থাৎ প্রসিদ্ধ বংশজাত হয়েন, কিন্তু গুণ, নীতি এবং বলের দ্বেষী ও অধার্ম্মিক হইয়া উঠেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, তিনি রাজ্যের ক্ষয়কারী; সুতরাং তাঁহাকে ত্যাগ (অর্থাৎ রাজ্যচ্যুত) করিবে, পুরোহিত প্রকৃতিবর্গের (প্রজাসাধারণের) অনুমতি লইয়া তাঁহারই বংশসম্ভূত গুণবান্ কোন ব্যক্তিকে রাজ্যরক্ষার জন্য সিংহাসনে স্থাপন করিবেন।

কেহ কেহ প্রকৃতি অর্থে মন্ত্রিমণ্ডলী বা মন্ত্রিবর্গ বুঝিয়াছেন। কিন্তু ঐ মত আমার ভ্রান্ত বলিয়াই মনে হয়। প্রজাসাধারণ অর্থে প্রকৃতি শব্দের ভূরি প্রয়োগ আছে। ইহাতে বুঝা যায় যে, পূর্ব্বকালে অনিয়ন্ত্রিত-শক্তি নৃপতি অধিক ছিলেন না। প্রজাবর্গের শক্তিই অনেক স্থলে প্রবল ছিল। মন্ত্রীদিগের শক্তি যে অত্যন্ত প্রবল ছিল, তাহা ইহার পরবর্ত্তী শ্লোক হইতেই বুঝা যায়। ঐ স্থানে বলা হইয়াছে যে, পুরোহিত এবং মন্ত্রীরা যখন রাজসভায় আসিবেন, তখন রাজা সিংহাসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইবেন এবং তাঁহাদিগকে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া ও আসন গ্রহণ করিতে বলিয়া তবে স্বয়ং উপবেশন করিবেন। কিন্তু অন্য ব্যক্তি আসিলে রাজা সিংহাসনে সৌম্যভাবে উপবিষ্ট রহিবেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, প্রাচীনকালে অনেক স্থলেই রাজশক্তি একান্তই পুরোহিতের ও মন্ত্রিগণের নিয়ন্ত্রণাধীন হইয়াছিল।

কেহ কেহ অনুমান করেন যে, গণরাজ্য এবং কুলরাজ্য সম্বন্ধেই এ ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু সে অনুমান সত্য নহে। গণতন্ত্রের রাজা বা প্রেসিডেণ্ট সম্বন্ধে এ কথা যেমন খাটে, রাজতন্ত্রের রাজা সম্বন্ধেও এ কথা সেইরূপ খাটে। তবে কখন কখন রাজা অত্যন্ত অনিয়ন্ত্রিত হইয়া উঠিতেন। তখন মন্ত্রীরা তাঁহাকে শাসন করিতে সমর্থ হইতেন না। এরূপ স্থলে অন্য রাজার সাহায্যে ঐ অনিয়ন্ত্রিত ও উচ্ছৃঙ্খল রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিবার কথাও শুক্রনীতিসারে বলা হইয়াছে। (৪র্থ অধ্যায়, ৭ম প্র, ৪১৩-১৫)। ফলে প্রাচীন ভারতে রাজশক্তি ক্ষুণ্ণ হইয়া যাওয়াতে গণশক্তিই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল,—এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার যথেষ্ট হেতু আছে।

যে সভায় গণরাজ্যের সদস্যগণ রাজকার্য্য পরিচালিত করিতেন, সেই সভাগৃহের নাম ছিল "সন্থাগার।" কপিলাবস্তুতে ঐরূপ সন্থাগার ছিল। রাজধানীতেই সন্থাগার অবস্থিত থাকিত। ইহা ভিন্ন গ্রামাদিতে গ্রাম্য ব্যক্তিদিগের স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন পরিচালিত করিবার জন্যও ছোট ছোট গৃহ নির্ম্মিত হইত।* প্রাচীন ভারতে নারীরাও সাধারণের আলোচনা-সভায় যোগদান করিতেন।† Dr. Rhys Davids জাতক হইতে তাহার প্রমাণাদি উদ্ধৃত করিয়াছেন। বুদ্ধদেবের মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন করিবার জন্য আনন্দ ঐরূপ একটি পরিষৎ-গৃহে বা সন্থাগারে গমন করিয়াছিলেন। ম্যাগেস্থেনিস বলিয়াছেন যে, Maltecorai Shinhai, Marohai, Rarungai, and Marunai are free, have no kings and occupy mountain heights where they have built many cities.‡ অর্থাৎ মল্টিকোরাই প্রভৃতি ছয়টি জাতির কোন রাজা নাই; তাহারা পর্ব্বতোপরিস্থিত রাজ্য দখল করিয়া তথায় অনেক নগর স্থাপন করিয়াছে।

আমরা দেখিতে পাই যে, পরীক্ষিতের পর জন্মেজয়ই হস্তিনাপুরে রাজা হয়েন। তাঁহার পরই ভারতের ইতিহাস বহুকালের জন্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন। বিষ্ণুপুরাণে পরীক্ষিতের

* Vide Buddist India by Dr. Rhys Davids.

† সর্ব্বত্র ও সকল সময়ে এ ব্যবস্থা ছিল না।

‡ Megasthenes fargm Lvi—এই সকল জাতি কাহারা, তাহা সংখ্যা মতভেদ বিদ্যমান। সিংহাই জাতি সেজর রাজপুত।

পুত্র শতানীকের নাম পাওয়া যায়। ইনি রাজ্যত্যাগ করিয়া ধর্ম্মসাধনমানসে সংসার ত্যাগ করেন। ইঁহারই প্রপৌত্র নিচক্ষুর রাজত্বকালে হস্তিনাপুর গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া যায়। তিনি কৌশাম্বীতে আসিয়া রাজধানী স্থাপন করেন। ইঁহার পর আরও ২৩ জন রাজার নাম পাওয়া যায়। এই সকল রাজার কীর্ত্তিকথা কিছুই শুনা যায় না। সম্ভবতঃ এই সময়েই ভারতে কুলতন্ত্র এবং গণতন্ত্র রাজ্য বহুলভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কারণ, দেখা যায় যে, বুদ্ধদেবের এবং মহাবীরের আবির্ভাবকালের অনেক পূর্ব্বেই ভারতে গণতন্ত্ররাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সুতরাং ইঁহারা কেহ কেহ গণাধিপ হইয়াছিলেন বলিয়া মনে করা অসঙ্গত নহে। ইক্ষ্বাকুবংশে শাক্য নামে এক রাজার নাম পাওয়া যায়। শাক্যের পুত্র শুদ্ধোদন। সম্ভবতঃ এই শাক্যবংশের উত্তরকালে শুদ্ধোদন রাজা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারই পুত্র বুদ্ধদেব। আজকাল কোন কোন য়ুরোপীয় পণ্ডিত বুদ্ধদেবকে শক (Scythian) বংশসম্ভূত বলিয়া অনুমান করিয়া থাকেন। এই অনুমানের পোষক প্রমাণ অত্যন্ত দুর্ব্বল। ভারতীয় গ্রন্থে শুদ্ধোদন ক্ষত্রিয় বলিয়াই উক্ত হইয়াছেন। বিশেষ প্রবল প্রমাণ না পাইলে এই ভারতীয় উক্তি মিথ্যা বলিয়া গ্রাহ্য করা যাইতে পারে না। এই বংশের শেষ রাজার নাম সুমিত্র। সম্ভবতঃ তৎপরে ভারতে ইঁহাদের রাজ্যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়াতেই এই বংশীয় ব্যক্তিগণ আর রাজা নামে অভিহিত হইতেন না। সম্ভবতঃ সুমিত্র রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন। ইহা অবশ্য অনেকটা অনুমানমূলক কথা। যে ইতিহাস অতীতের গর্ভে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে,—তাহার উদ্ধারসাধন এখন একরূপ অসম্ভব। কিন্তু এ কথা সত্য যে, কলিযুগের কিছুকাল গত হইলেই ভারতে গণতন্ত্রবাদমূলক শাসনপদ্ধতি বিশেষভাবে বিস্তার-লাভ করিয়াছিল। চন্দ্রগুপ্তের শাসনকালে অনেক গণতন্ত্র লোপ পায়। যাহা হউক, খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে ভারতে গণতন্ত্র একবারেই লোপ পাইয়াছে। লিচ্ছবী ও পুষ্যমিত্র বংশীয় রাজগণ তখন হীনপ্রভ হইয়া পড়েন। বৈদিক সাহিত্যে যে সভা, সমিতি, সঙ্গতি প্রভৃতির উল্লেখ দেখা যায়, উত্তর-কালে তাহাই গণসভায় পরিণত হইয়াছিল। এ বিষয়ে যাঁহারা বিস্তৃত বিবরণ জানিতে চাহেন, তাঁহারা ডাক্তার শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ লাহার Aspects of Ancient Indian Polity এবং মিষ্টার কে, পি, জশোয়ালের Hindu Polity নামক গ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখিবেন।

বর্ত্তমান সময়ে অনেক ইংরাজ বলিয়া থাকেন যে, গণতন্ত্র ভারতবাসীর ধাতু-প্রকৃতির প্রতিকূল,—তাঁহাদের এই উক্তি ভ্রান্ত। স্মরণাতীত কাল হইতেই ভারতে জনমতের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। গণতন্ত্রের মূল নীতিই ভারতবাসীর মজ্জাগত সংস্কার।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

রূপ না প্রেম !

তোমার ও রূপে আমি ভুলি নাই নারি,
নহি আমি নহি তোর রূপের পূজারী।
রূপের অভাব কোথা ? এ বিশ্বের মাঝে
অনন্ত সৌন্দর্য্য-স্রোত নিত্য চলিয়াছে
প্লাবিয়া নিখিল বিশ্ব ! রূপ কোথা নাই,
চেয়ে দেখ নীলাকাশে ফুটিছে সদাই
সুন্দর আলোক-পুষ্প মেলি লক্ষ দল,
অপূর্ব্ব আনন্দরসে নিতান্ত চঞ্চল !
চাহো ধরণীর পানে স্ফুট ফুলদাম
অনন্ত সৌন্দর্য্যে পূর্ণ এই বিশ্বধাম !
আমি যে তোমারে পূজি নিত্য দিবানিশি
হে আরাধ্যা দেবী মোর অন্তরমহিষী !
সে নহে রূপের লাগি—তব প্রেম-ডোরে,
অশান্ত হৃদয় মম বেঁধেছ আদরে।

শ্রীনিকুঞ্জমোহন সামন্ত।
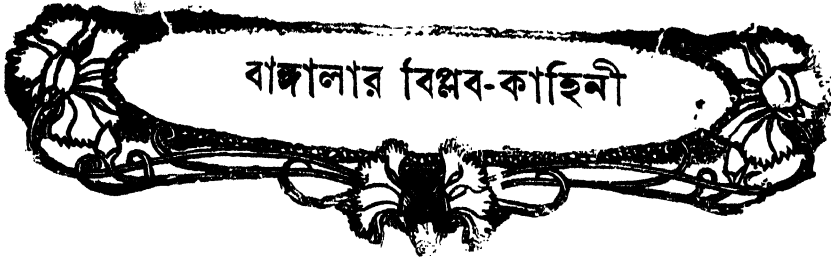
১৯০৮ খৃঃ অব্দের মে

১

৩০শে এপ্রিল মুজঃফরপুরে খুদিরাম মিঃ কিংসফোর্ডের পরিবর্ত্তে মিসেস্ ও মিস্ কেনেডিকে বোমা দ্বারা হত্যা করে। তার সপ্তাহ খানেক আগে তারা কল্‌কাতা থেকে রওয়ানা হয়েছিল। পূর্ব্বেই বলেছি, সন্ধ্যার পর গোয়েন্দা পুলিসের ছুটী হয়ে যেত। সন্ধ্যার পর ওরা যাত্রা করেছিল ব'লে পুলিস তাই ওদের পেছন নিতে পারে নি।

ওদের দু'জনই আমাদের গুপ্ত সমিতির পুরনো সভ্য ছিল এবং অন্যের তুলনায় সব চেয়ে বেশী চতুর, কর্ম্মক্ষম, আর উপদেশপালন সম্বন্ধে বাঙ্গালার ক্যাসেবিয়াঙ্কা ব'লেই বিবেচিত হ'ত। দু'তিন বছর যাবৎ তথাকথিত অনেক "honest attempt" করেছিল। খুদিরাম একবার ফৌজদারী সোপর্দ্দও হয়েছিল। তবু কিন্তু কাযের বেলায় সবই উল্টো করেছিল। কথা ছিল, বোমা ফেল্‌তে যাওয়ার সময় তাদের বেশ-ভূষা অন্য প্রদেশবাসীর অনুকরণে বদল ক'রে, বোমা ফেলা হয়ে গেলে পর তারা আবার সাধারণ বাঙ্গালীর বেশ ধরবে। তখন যা শুনেছিলাম, তাতে মনে হয়, ঠিক উপদেশমত কায তারা করে নি। তার কারণ বোধ হয় এই ছিল যে, উপদেশমত চলা গুপ্ত সমিতির প্রধান কর্ত্তব্য জেনেও তার আবশ্যকতা হয় ত উপলব্ধি করতে পারে নি, অথবা যে suggestion-phobia বাঙ্গালী-চরিত্রের একটা বিশেষত্ব, সেই দুরারোগ্য সংক্রামক ব্যাধি তাদেরও চরিত্রে ছিল। যে সকল কারণে বাঙ্গালীরা সৈন্যের কাযে বিমুখ বা অক্ষম, এই suggestion-phobia সেই সকল কারণের অন্যতম। এ থেকে মনে হয়, এ দেশে বিপ্লবচেষ্টা বিড়ম্বনামাত্র।

বোমা ফাটলে রিভলবার ফেলে দেওয়ার কথা ছিল; তা-ও দেয় নি। উভয়ের, বিশেষ ক'রে খুদিরামের ঐ জিনিষটার ওপর একটা অত্যধিক অনুরাগ ছিল। একটা রিভলবার পাওয়ার জন্য সে বহুবার বহু সাধ্য-সাধনা করেছিল; পাছে অপব্যবহার করে, এই ভয়ে তা দেওয়া হয় নি। মুজঃফরপুরে যাওয়ার দিন দু'জনেই দুটো নিয়েছিল। অধিকন্তু আর একটা সে না ব'লে হস্তগত করেছিল। যেখানে রিভলবার রাখা হ'ত, তা সে জান্‌ত। দুটো রিভলবার পাতলা জামার দুই পকেটে ঝুল্‌ছে, আর দু'হাতে খাবার খাচ্ছে, এ হেন অবস্থায় বোমা ফাটার পরদিন রেল-ষ্টেশনে সে ধরা পড়ল। আর রেলগাড়ীর একটা কামরায়, সেই দিন সবইন্‌স্পেক্টর নন্দলাল ব্যানার্জ্জী প্রফুল্লের বিকৃত চেহারা দেখে সন্দেহ করেন। তার পরের ষ্টেশনে তিনি পুলিস-কর্তৃপক্ষকে টেলিগ্রামের দ্বারা প্রফুল্লের কথা জানান। মোকামায় প্রফুল্লের সঙ্গে নন্দলালও নামলেন। আগে হ'তে প্রস্তুত পুলিস তাকে ধরতে গেলে রিভলবারের দ্বারা সে আত্মহত্যা করে।

ধরা প'ড়লে যা বলবার কথা ছিল, তা বলে নি। বিশেষ ক'রে উকীলের সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে একটি কথাও যাতে না বলে, তা বিশেষ ক'রে শেখান হয়েছিল। প্রফুল্লের ধরা পড়বার পর কথা বল্‌বার অবসর হয় নি যদিও, কিন্তু ধরা পড়বার পূর্ব্বে কথা বলেই যত গোল বাধিয়েছিল। খুদিরাম প্রথমে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে এক রকম স্বীকারোক্তি দিয়ে সেসন কোর্টে নাকি তা সংশোধন ক'রে অন্য রকম দিয়েছিল। তার কারণ বোধ হয় এই ছিল যে, দু'জনের মধ্যে কে এই কীর্ত্তি করেছে, স্বীকারোক্তি না দিলে সাধারণের নিকট পাছে অজানিত থেকে যায় বা প্রফুল্ল করেছে ব'লে পাছে লোক ধ'রে নেয়, এই সন্দেহে স্বীকারোক্তি দেওয়ার লোভ খুদিরাম সংবরণ করতে পারে নি। তার স্বীকার-উক্তিতে প্রফুল্ল ছাড়া আর কারুর নাম প্রকাশ করে নি বা গুপ্ত সমিতি সম্বন্ধেও কিছুই বলে নি।

প্রফুল্লের প্রকৃত নাম খুদিরাম জান্‌ত না। তাই তাকে

দীনেশ ব'লে উল্লেখ করেছে। প্রফুল্ল বোধ হয় এই নামেই তার কাছে পরিচিত ছিল। প্রথম উক্তিতে বলেছিল, দীনেশের সঙ্গে নাকি তার প্রথম দেখা হাওড়া ষ্টেশনে। স্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধে আলাপের পর খুদিরাম 'সাহেব'-হত্যার সঙ্কল্প প্রকাশ করে। তদনুযায়ী দীনেশ তাকে বোমা আদি দেয়, এবং মুজঃফরপুর পর্য্যন্ত সঙ্গে থেকে সাহায্য করে। বোমা ছুড়বার আগের দিন পর্য্যন্ত যে রকম গাড়ী-ঘোড়া চ'ড়ে যে সময় মিঃ কিংসফোর্ড ক্লাব থেকে বাংলোয় আসতেন, ঠিক সেই সময় ঠিক সেই রকম ঘোড়া-গাড়ীতে মিস্ আর মিসেস্ কেনেডি উক্ত মিঃ কিংসফোর্ডের বাংলোতে গেছলেন। তাই নাকি তাদের ভুল হয়েছিল।

দ্বিতীয় উক্তিতে সে অনেকটা দোষ প্রফুল্লের ঘাড়ে চাপিয়েছিল। তখন সে জেনেছিল, প্রফুল্ল আত্মহত্যা করেছে। কাযেই তার ঘাড়ে অপরাধের গুরুত্ব চাপিয়ে দিলে, হয় ত ভেবেছিল, নিজের দণ্ড লঘু হ'তে পারে। এই প্রাণের মায়াটা, বিশেষ ক'রে বাঙ্গালা দেশে যে কি রকম স্বতঃস্ফূর্ত্ত, তা পূর্ব্বে বিশেষ ক'রে বলেছি। তা সত্ত্বেও এ কাযটা যে সে নিছক প্রাণের মায়াতেই করেছিল, তা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। কারণ, আমরা শুনেছি, খুদিরামের পক্ষের উকীল বাবুরা অনেক চেষ্টায় তাকে এ রকম স্বীকারোক্তি-সংশোধনে রাজি করেছিলেন। এটা যে তাঁদের অকারণ চেষ্টা, আর তার ফাঁসীটা যে নিশ্চিত, তা জেনেও উকীল বাবুদের অনুরোধেই নাকি স্বীকারোক্তি-সংশোধনে রাজি হচ্ছে ব'লে সে বলেছিল। খুদিরামের পক্ষ-সমর্থন জন্য মেদিনীপুর, কলকাতা বা পশ্চিম বাঙ্গালা থেকে কোন উকীল যান নি। গিয়েছিলেন রংপুর থেকে। বাঙ্গালী-চরিত্রের এ-ও একটি মহিমা।

প্রফুল্ল বা অন্য কারুকে লোক-চক্ষুতে হেয় প্রতিপন্ন করা এ রকম লেখার উদ্দেশ্য নয়। যে লোক-চরিত্রের বা লোক-মতের আমূল পরিবর্ত্তনের ওপর বিপ্লব (revolution) বা জনসাধারণের পক্ষে প্রকৃত কল্যাণজনক ক'রে বর্ত্তমান শাসন-প্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তনচেষ্টায় সাফল্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে, সেই চরিত্র-গঠনের পথে, যে প্রবল বাধাকে আমরা চিনতে না পেরে, একমাত্র মঙ্গলের উৎস ব'লে জড়িয়ে ধ'রে আছি, তার প্রকৃত স্বরূপটি সম্যক্ দেখানই আমার উদ্দেশ্য। আমার বিশ্বাস, ঐ বাধা যতটুকু দূরীকৃত হবে, ততটুকু আমরা চরিত্রবলে শক্তিমান হ'তে পারব। আমাদের চরিত্র যে পরিমাণে জাতি (nation) গঠনের পোষক হয়ে উঠবে, সেই পরিমাণে আমাদের শাসনতন্ত্র আমূল পরিবর্ত্তনের পথে অগ্রসর হবেই। তখন এ হেন তাণ্ডব লীলার আবশ্যক আর না-ও হ'তে পারে।

যাই হোক, ঐ মুজঃফরপুরের বোমাটা পিক্রিক এসিডে তৈয়েরি ব'লে সরকারী বোমা সম্বন্ধীয় বিশেষজ্ঞরা যে মত প্রকাশ করেছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

৩০শে এপ্রিল সেই বোমা-বিভ্রাট ঘটে। ১লা মে কলকাতায় পুলিসের পরামর্শ মজলিসে, বারীনের সংস্পর্শে যারা তখন এসেছিল, তাদের যে যেখানে ছিল, সকলকে এক সময় পাকড়াও করা স্থিরীকৃত হয়। ২রা মে প্রত্যূষে সাড়ে তিন কি চারটের সময় নিম্নলিখিত স্থান সকল খানা-তল্লাসী আর নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করা হয়।

১। মাণিকতলা মুরারিপুকুর গার্ডেনে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, বিভূতিভূষণ সরকার, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দুভূষণ রায়, উল্লাসকর দত্ত, নলিনীকান্ত গুপ্ত, পরেশ মৌলিক, বিজয় নাগ, শচীন সেন, শিশির ঘোষ, নরেন বক্সী, কুঞ্জলাল শাহা, পূর্ণ সেন, হেমেন্দ্র ঘোষ, এই চৌদ্দ জন। এ ছাড়া ঐ পাড়ার অন্য বাগানের এক মালী ও ভদ্রলোকের দুটি ছেলেকেও পুলিস ধ'রে এনেছিল! দু'দিন পরে তারা ছাড়া পায়।

২। ১৫ নং গোপীমোহন দত্তের লেনে কানাইলাল দত্ত ও নিরাপদ—ওরফে নির্ম্মল রায়।

৩। ১৩৪ নং হ্যারিসন রোডে কবিরাজ দুই ভাই নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও ধরণীনাথ গুপ্ত ও অশোক নন্দী। এ ছাড়া যে দু'জন ধৃত হয়েছিল, তারা কয়েক দিন পরে ছাড়া পায়।

৪। ৮ নং গ্রে ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত অরবিন্দ বাবু, অবিনাশ ভট্টাচার্য্য ও শৈলেন্দ্র বোস এই তিন জন।

৫। ৩৮।৪ রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটে হেমচন্দ্র দাস (ওরফে হেমচন্দ্র কানুনগো)

৬। মেদিনীপুরে সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

মাণিকতলা বাগানে ধৃত বারীন প্রভৃতির উল্লেখ অনুযায়ী ও সেখানে প্রাপ্ত খাতাপত্রে লিখিত নামের সন্ধানে তাদের ঠিকানা থেকে জেনে, পরে পরে যাদের ধরা হয়েছিল,

দুই দুই ভুজ, কিবা বাহে তার, কেমন করিছে প্রণতি ।"

চণ্ডীদাস ।

তারা হচ্ছে—শ্রীরামপুরের নরেন্দ্রনাথ গোঁসাই, হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল, খুলনার সুধীর সরকার, যশোহরের বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, মালদহের কৃষ্ণজীবন সান্যাল, সিলেটের তিন ভাই হেমচন্দ্র সেন, বীরেন্দ্রচন্দ্র সেন ও সুশীলকুমার সেন। নাগপুরের বালকৃষ্ণ হরি কাণে।

আমাদের মধ্য থেকে সন্ধান পেয়ে এবং পরবর্ত্তী তদন্তের ফলে কয়েক সপ্তাহ পরে ধৃত হয়ে এসেছিলেন—দেবব্রত বসু, ইন্দ্রনাথ নন্দী, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাসচন্দ্র ওরফে মাণিক দেব, বিজয়চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, নিখিলেশ্বর রায় আর চন্দননগর ডুপ্লে কলেজের প্রফেসর চারুচন্দ্র রায়।

এ ছাড়া দু' তিন মাসের মধ্যে আরও অনেক নির্দ্দোষকে দিনকয়েকের জন্য ধ'রে জেলে পোরা হয়েছিল। তার মধ্যে ছিলেন স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন।

যে কয় যায়গায় খানাতল্লাসী হয়েছিল, তার মধ্যে দু'টি স্থান ব্যতীত আর কোথাও দু'একখানা চিঠিপত্র ছাড়া, বিপ্লবসংক্রান্ত আর কিছুই পাওয়া যায় নি। উক্ত মুরারিপুকুর বাগানে পেয়েছিল বোমার "সেল" ঢালাই করবার যন্ত্রপাতি;—রিভলবার, বন্দুক, রাইফেল (সর্ব্বসমেত ছ' সাতটা), Noble's dynamite কতকগুলো, ইলেক্‌ট্রিক ব্যাটারী, ফিউজ ইত্যাদি; আর mining Engineerদের পাঠ্য Explosive শেখাবার ইংরাজী বই দুখানা; বৈপ্লবিক বোমা তৈয়ারী ও ব্যবহার শিখবার লিখাতে বৃহৎ পাণ্ডুলিপি একখানা, বৈপ্লবিক গুপ্তসমিতি গঠনপ্রণালীর খাতাদি অন্যান্য আরও কতকগুলা বই, নোটবুক, কাগজপত্র ইত্যাদি।

হ্যারিসন রোডে কবিরাজদের বাড়ীতে পূর্ব্বোক্ত কয়েক বাক্স বোমা আর Explosive তৈয়ারীর যন্ত্রপাতি ও মসলা পাওয়া গিয়েছিল।

২রা মের বিভিন্ন স্থানের ধৃত ব্যক্তিদিগকে লালবাজার পুলিস হাজতে ভিন্ন ভিন্ন ঘরে পৃথক্‌ভাবে রাখা হয়েছিল। বিকালবেলা পুলিস কোর্টের উঠানে সকলকে বের করা হ'ল। তখন আমরা সকলে সকলকে দেখে হতভম্ব হয়ে গেলাম। কারণ, প্রত্যেক দলই মনে করেছিল, কেবল তারাই ধরা পড়েছে। তখন দেখলে, গুপ্তসমিতির বংশে বাতি দিতে আর বাকী প্রায় কেউ নাই। সকলেরই মুখ অত্যন্ত ভীষণভাবে বিকৃত হয়ে গেছল। আমার বেশ মনে আছে, তখন কারও মুখে নির্ভীকতার চিহ্নমাত্র না দেখতে পেয়ে বড়ই অশুভ লক্ষণ ব'লে বুঝেছিলাম।

সকালে ছেক্‌ড়া গাড়ী বোঝাই হয়ে আগে পিছে এক ঝাঁক গোরা কালা পুলিসের পাহারায় কিড ষ্ট্রীটের সি, আই, ডিঃ, আফিসে খুব জাঁকজমকের সহিত নীত হয়েছিলাম। পথে এমন একটাও চেনা লোক কিন্তু চোখে পড়ল না যে, ভারতের এই অভূতপূর্ব্ব বীরদের দর্শন লাভ ক'রে ধন্য হয়ে যেতে পারে। রাস্তায় দু'সারি লোকদের মুখের ভাবে তখন বুঝেছিলাম, আমরা যে কি ভীষণ কীর্ত্তিমান পুরুষ, তা তারা জান্‌তে পারে নি, আর তাদের জান্‌বার তেমন প্রবৃত্তিও যেন ছিল না। দশ বারো ঘণ্টার মধ্যে এমন একটা ভীষণ ব্যাপারের খবর সমস্ত কল্‌কাতাময় রাষ্ট্র হয় নি! এই রকম কোন দুঃখ বা অভিমানের ছায়া যে আমাদের মধ্যে কারো মনে পড়েনি, এ কথা কেউ মাথার দিব্বি ক'রে বল্‌লেও তখন বিশ্বাস করতে পারি নি। এখন বুঝছি, তখনকার কলকাতাবাসীরা ব্যাপারটার বিশেষ কোন কিছু না বুঝেও ঐ রকম স্থলে নিরাপদ ভাবের উদ্বেল উচ্ছ্বাস কি ক'রে হঠাৎ দল বেঁধে প্রকট করতে হয়, তাতে তালিম পান নি।

তখনও আশা ছিল যে, আমরা যে রকম আগে থেকে সাবধান হয়েছি, তাতে খুব জোর এক বছরের বেশী শ্রীঘরবাস হবে না। এতে বরং আমাদের জেল থেকে বেরিয়ে এসে কায করবার পক্ষে, বিশেষ ক'রে টাকার সাহায্য পাবার পক্ষে খুব সুবিধাই হবে। কারণ, কোন গুণ না থাকলেও সুধু 'জেলে গেছলাম' এই সার্টিফিকেট, তথাকথিত দেশের কায করতে গিয়ে, লোকের কাছে আদর কাড়াবার আর আর্থিক, নৈতিক আদি সর্ব্ববিধ সহানুভূতি ও সাহায্য পাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট মূল্যবান হবে ব'লে সেকালেও ধ'রে নিতে পেরেছিলাম। তখনও জানতাম না যে, মুরারিপুকুরে ও হ্যারিসন রোডে কি কি বামাল ধরা পড়েছে, আর বারীন কি রকম "clean breast" দেখিয়েছে বা পরে সে কি করবে।—এই "clean breast" কথাটা সকল পুলিস অফিসারের মুখে তখন লেগেই ছিল।

তার পর আমাদের প্রত্যেককে সি, আই, ডি, আফিসে পৃথক্ পৃথক্ বাসায়, পুলিসের এক এক জন ধুরন্ধর এক এক দলের একরার করাবার ভার নিয়েছিলেন। বারীন, উপেন

প্রভৃতি মুরারিপুকুরের দল ডেপুটী সুপারিন্টেন্‌ডেণ্ট রায় রামসদয় মুখার্জ্জী বাহাদুরের হাতে পড়েছিল। আমার ঘাড়ে চেপেছিলেন মৌলভী সামশুল আলম। তিনি তখন সাব-ইনস্‌পেক্টার ছিলেন। আমাদের মোকর্দ্দমা শেষ হ'তে না হ'তেই তিনি ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং খাঁ বাহাদুর ইত্যাদি হয়েছিলেন। অন্য দলের ভাগ্যে কে কে জুটেছিলেন, মনে নেই। একরার করাবার বিষম চেষ্টা খানিক রাত্রি পর্য্যন্ত চলেছিল। তার পর কোথায় কা'কে রেখেছিল, জানতে পারি নি। শুনেছিলাম, বারীন সেই আফিসেই সম্মানিত অতিথিরূপে ভোজন, বিশেষ ক'রে শয়নের যথেষ্ট আনন্দ নাকি উপভোগ করেছিল। অরবিন্দ বাবুর ভাগ্যেও বোধ হয় তা জোটেনি। আমায় রেখেছিল লালবাজার পুলিস কোর্টে হাজতে, মুরারিপুকুরে ধৃত পূর্ব্বোক্ত মালীর সঙ্গে। ভোজনের জন্য পেয়েছিলাম মুড়ী, আর শয়নের জন্য কম্বল, তাও অত্যন্ত ময়লা। একে বলে এক যাত্রায় পৃথক্ ফল।

ধৃত আসামীদের একরার করাবার জন্য পুলিসের দ্বারা কি কি violent উপায় অবলম্বিত হয়, আগে হ'তে তা খোঁজ ক'রে জেনেছিলাম। কিন্তু violent কোন উপায়ই আমাদের ওপর প্রয়োগ করা হয় নি। আমাদের ওপর যে কয়টি কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছিল, তা নেহাৎ মামুলী ও non-violent,

প্রথমে স্নান আহার বন্ধ ক'রে দেওয়া, তার পর রাত্রিতে ঘুমোতে না দিয়ে, ক্রমাগত প্রশ্নের উপর প্রশ্নের দ্বারা তিতিবিরক্ত ক'রে সহজ বিচার-শক্তিকে একবারে গুলিয়ে দেওয়া, এইগুলি হচ্ছে আসামীকে একরার করাবার পুলিসের প্রচলিত প্রথা।

আমাদের মধ্যে বারীন ছাড়া প্রায় সকলের প্রতি এই রকমই বিধি-ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বারীনের জন্য এর কতকটা উল্‌টো ব্যবস্থাই ফলপ্রদ হবে ব'লে বোধ হয় রায় বাহাদুর রামসদয় বাবু বুঝে ফেলেছিলেন।

আমায় সে দিন সকালবেলা এক জন গোরা ওয়ার্ডার খানিকটা দুধ-শূন্য চা আর রুটি বোধ হয় এই জন্য দিয়েছিল। সে এসে প্রথমে আমায় বল্লে, আমার কাছে যদি টাকা-কড়ি এবং মূল্যবান জিনিস থাকে তা তাকে দিতে হবে। সেগুলি যথারীতি আমার নামে সরকারে গচ্ছিত থাকবে। আমি ভাল ছেলের মত সোনার বোতাম, আংটী, দু'তিনখানা পাথর (আমি তখন Jewellery business-এর ভাণ করতাম) ও কয়েকটি টাকা সমেত ব্যাগ তার হাতে দিলাম। সেই সঙ্গে আমার breakfastএর উল্লেখ করেছিলাম। তৎক্ষণাৎ রুটি-চা নিয়ে এসে অনেক কিছু ব'লে আমায় খুসী ক'রে দিয়েছিল। সব মনে নেই। একটামাত্র কথা মনে আছে, সে বলেছিল, কোন দেশে বিপ্লবের আগুন একবার জ্বললে কখনও তা একবারে নিভে যায় না, আর তার ফল কখনও মন্দ হয় না। তার এত কৃপার কারণ দেড় বছর পরে পোর্ট ব্লেয়ারে যাওয়ার সময় আমার গচ্ছিত ধনের বদলে পেতলের বোতাম আর আংটীটি মাত্র ফেরত পেয়ে বুঝেছিলাম।

যাই হোক, সে দিন রাত্রিতে দু'টি মুড়ী সেই বিপদের সঙ্গী উড়ে মালীর সঙ্গে ব'সে খেয়েছিলাম। বেচারী কি কান্নাই না কেঁদেছিল!

মনে হচ্ছে, প্রথম রাত্রিতে খুব বেশীক্ষণ জাগিয়ে রাখবার চেষ্টা হয় নি অথবা কর্ত্তাদের নিজেদেরই নিদ্রার প্রয়োজন হয়েছিল। কারণ, তার আগের দু'দিন সমস্ত রাত্রি জাগতে হয়েছিল।

সেই দিন প্রথমে মৌলভী সাহেব আমার কাছে প্রেম নিবেদন ক'রে বলেছিলেন, তাঁর মত বন্ধুর কথা মেনে চল্‌লে আমার দোষ খণ্ডে যাবে। তিনি মেদিনীপুরের কোর্ট সাব-ইন্‌স্‌পেক্টার ছিলেন। এমন মিষ্টভাষী মিশুক পুলিসের লোকের মধ্যে দেখি নি। মেদিনীপুর কোর্টে আমার প্রায়ই যেতে হত, গেলে তাঁর আফিসে আড্ডা দিতাম। সেই সূত্রে বন্ধুত্বের দাবী ও প্রেম-নিবেদন।

না খেয়ে না ঘুমিয়ে দিনের পর দিন ক্রমাগত আঁতের কথা নিয়ে পুলিস নামক জীবের সঙ্গে নিয়ত বকবক করলে পেসাদার আসামী ব্যতীত খুব কম লোকই মাথা ঠিক রাখতে পারে। এই রকম ক'রে কিছু না কিছু অপরাধ প্রকাশ ক'রে ফেলতে আসামীরা বাধ্য হয়ে থাকে। একবার কোন গতিকে একটু প্রকাশ ক'রে ফেললে আর চেপে রাখা বড়ই শক্ত।

এ ছাড়া রামসদয় বাহাদুর বারীন প্রভৃতির ওপর কিন্তু আর একটা অভিনব কৌশল প্রয়োগ করেছিলেন। তার নামকরণ কি যে করব, খুঁজে পেলাম না। তাই বারীন

উপেনের কাছে পরে যা শুনেছিলাম, তার সার মর্ম্ম এখানে প্রকাশ ক'রে বলি।

প্রথম দর্শনেই উক্ত বাহাদুর বারীন, উপেন প্রভৃতিকে বহু দিনের অভিন্নহৃদয় বন্ধুর মত প্রগলভ আদরে অভ্যর্থনা করলেন। তাঁর অগাধ হৃৎপিণ্ডে দেশহিতৈষণা আর বিপ্লব-বাদ হুগলী নদীর চোরাবালির মত নিয়ত প্রচ্ছন্নভাবে যে বিদ্যমান, তা নাটকীয় ভাবভঙ্গী সহকারে চুপি চুপি বলেছিলেন, যেহেতু, ওটা তাঁর অন্তরের কথা; পুলিসের চাকরীটা বাইরের। প্রমাণস্বরূপ বলেছিলেন, তাঁর সহধর্ম্মিণী (যিনি কোন দেশীয় স্বাধীন রাজার নিকট-সম্পর্কীয়া) বেদপুরাণে যার তুলনা নাই, এমন উৎসর্গীকৃতপ্রাণ অতগুলি দেশভক্তের গ্রেপ্তারের সমাচার পেয়ে অবধি আহার-নিদ্রা ত্যাগ ক'রে কেবলই কাঁদছেন আর তাদের দেখবার জন্য অস্থির হয়েছেন। তাই তাঁর সহধর্ম্মী রায় বাহাদুর বারীন প্রভৃতিকে পরদিন মধ্যাহ্ন-ভোজনের জন্য নিতান্ত বিনয়ের সহিত তাঁর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করলেন। আরও কত রকম ঢং ক'রে তাদের বিশ্বাস করিয়ে দিলেন যে, তাঁর মত তাদের প্রকৃত হিতৈষী বন্ধু আর এ ভূ-ভারতে নেই। এ হেন বন্ধুর একমাত্র উপদেশ এই যে, গুপ্ত সমিতি সম্বন্ধে তারা বীরপুরুষের মত মুরারিপুকুর বাগানে যা স্বীকার করেছে, তাতে তাদের বিশেষ কিছু সুফল ফলবে না; যেহেতু, তা সম্পূর্ণ নয়; সেই হেতু ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে সব কথা সম্পূর্ণ ক'রে বলতে হবে; তা হলেই তাদের বে-কসুর খালাস সম্ভব।

রায় বাহাদুরের শুভ-ইচ্ছায় অকৃত্রিমতা এবং তাদের খালাস সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাবার জন্য, সকল মুস্কিল আসানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অমোঘ উপায় যে লক্ষ ব্রাহ্মণের (কি কমলাকান্তের ঠিক মনে নাই) পদধূলি, তা তাঁর হাতের মাদুলীর মধ্যে বিদ্যমান, এই ব'লে খানিকটা জলে মাদুলী ধুয়ে বারীন প্রভৃতিকে খেতে দিলেন। তারাও খেল। তার পর বাছাদের চাঁদমুখ মলিন হয়ে গেছে ব'লে ব্যথা জানিয়ে ভাল ভাল খাবার আর কেওড়া-বরফ দেওয়া জল আনতে বরাত করলেন। ইতোমধ্যে গোলাপজলে তাদের মাথাগুলি ঠাণ্ডা ক'রে দিলেন। তখন বারীন, উপেন, উল্লাস অন্যের নাম ধাম ও দোষ উল্লেখ করবে ব'লে পরামর্শ ক'রে স্বীকারোক্তি দিয়েছিল। এর আগে বাগানে অনুসন্ধানের সময় পুলিসের প্রশ্নের উত্তরেও অনেক কিছু ব'লেছিল।

এই সব পরদিন রবিবার খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল।

৩ রা মে রবিবার সকাল থেকে আবার রাত ১২টা কি ১টা অবধি অবিশ্রাম কথা বলাবার চেষ্টা হয়েছিল। এক জন অফিসার থেমে গেলে আর এক জন এসে গোড়া থেকে গাওয়াতে সুরু করেন। সে দিন কারো ভাগ্যে দু'টি খিচুড়ী, কারো দু'টি মুড়ী, আর অনেকের ভাগ্যে কিছুই জোটে নি। মে মাসের গরমে, স্নান আহার, এমন কি, মুখ না ধুয়ে বা মুখে একটু জলও দিয়ে, নিয়ত বকবক ক'রে মাথা ঠিক রাখা যে কি মুস্কিল, তা ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্যের পক্ষে বোঝা শক্ত। সে দিন আমি সকাল থেকে মৌনব্রত নেব ব'লে আগের রাত্রিতেই ভেবে চিন্তে ঠিক করেছিলাম। সেইমত অনেকক্ষণ কারো কথার উত্তর না দিয়ে চুপ ক'রে থাকবার পর, মৌলবী সাহেব বারীন, উপেন প্রভৃতির confession বেরিয়েছে ব'লে, একখানা "Statesman" আমায় দেখতে দিলে, পড়বার লোভ সংবরণ করতে পারি নি। প'ড়ে যা দেখলাম, তার মধ্যে যা তখনও একটু লেগেছিল ভাল, তা হচ্ছে ছাপার অক্ষরে নিজের নামটা। ঐ রকম কোন ভাব আমার মুখে লক্ষ্য করবার জন্য অনেকগুলি চোখ যে তাক করেছিল, তা বেশ বুঝেছিলাম। কাগজখানা ফিরিয়ে দিয়ে আবার মৌনা হয়ে রইলাম। আমার নাম আর অপরাধ প্রকাশ হয়ে গেছে দেখলে, আমারও confession দেওয়ার প্রবৃত্তি জেগে উঠতে পারে, এই আশায় বোধ হয় কাগজখানা আমায় দেখতে দেওয়া হয়েছিল।

"Statesman"এ লিখিত সুদীর্ঘ স্বীকারোক্তির সকল কথা মনে নেই। কিন্তু তার তিনটি বিশেষ কথা মনে আছে।

বারীনের স্বীকারোক্তিতে এই রকম ভাবের কথা ছিল যে, বারীনই বাঙ্গালা দেশে বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতির একমাত্র প্রবর্ত্তক নেতা, আর উপেন, উল্লাস প্রভৃতি তার সহকারী মাত্র ছিল। কিন্তু উপেন ও উল্লাস বলেছিল, তিন জনেই নেতা। তারা পৃথক্ পৃথক্ বিভাগের উপর কর্ত্তৃত্ব করত। নেতা ব'লে জাহির হওয়ার প্রবৃত্তিটা কত মজ্জাগত, তা এতে একটু বোঝা যায়। প্রকৃত নেতা ছিল কারা, তা পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছি।

দ্বিতীয়তঃ, মুজঃফরপুর হত্যা অপরাধের সম্বন্ধে এই

তিন জনের প্রত্যেকেই সম্পর্ক অস্বীকার করতে চেষ্টা করেছে।

তৃতীয়তঃ, তখনও গ্রেপ্তার হয় নি, এমন অনেক লোকের নাম উল্লেখ করেছিল—যাদের সন্ধান পাওয়া পুলিসের পক্ষে সম্ভব হ'ত না। এদের মধ্যে নরেন গোঁসাইও ছিল। এই নামকরণের ফলে যারা ধৃত হয়েছিল, তাদের নাম পূর্ব্বে লিখেছি।

আন্দাজ চারটার সময় এলেন শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র লাহিড়ী, তখন তিনি ইনস্পেক্টার। তার পর না কি তিনি অনেক কিছু হয়েছেন। আমরা ধরা পড়বার আগে পর্য্যন্ত ঐ মানুষটিকে সি, আই, ডি, বিভাগের যত নষ্টের গোড়া ব'লে জানতাম। তাই তাঁর নাড়ী-নক্ষত্র জানবার জন্য কত চেষ্টাই না করেছিলাম। সে জন্য তাঁর সঙ্গে একটু রসিকতা করবার প্রবৃত্তি জেগে উঠেছিল। তখন ব'লে ফেললাম, তিনি যদি বরফ দেওয়া জল এক গ্লাস খাওয়াতে পারেন, তবে তাঁর কথার উত্তর দেব। তাঁর হুকুমমত তৎক্ষণাৎ তাঁর খাসমহল হ'তে মুর্গী, ডিম ইত্যাদি আধা সাহেবী আধা বাঙ্গালী কায়দায় তৈরী এমন সব খাবার এসেছিল, আর তা দু'দিন অনাহারের পর এমন উপাদেয় লেগেছিল যে, আজও ভুলতে পারি নি। যাই হোক, লাহিড়ী মশায় একরার করাবার কুমৎলবে কোন কথাই বলেন নি, মনে আছে।

গত রাত্রির মত প্রত্যেক দলকে পৃথক্ পৃথক্ রাখা হয়েছিল। ফিনিক্স্বাজার থানার ক্ষুদ্র হাজতের এক ধারে অন্ধকারজনক হরেক রকম গন্ধের মধ্যে একটা ছেঁড়া দুর্গন্ধ কম্বলের উপর স্থান পেয়েছিলাম। আমি, আমাদের অবিনাশ, আর সঙ্গী ছিল নেশাতে অর্দ্ধমৃত দু'টি গো-শকট-চালক; তার পাশেই ছিল সুবৃহৎ শৌচের গামলা। কল্‌কাতার মধ্যস্থলে এমন বীভৎস কাণ্ড সে দিন যেমনটি সেখানে দেখেছিলাম, তেমনটি আর কোথাও দেখি নি। ঐ ঘরের মধ্যস্থলে একটা তক্তপোষ barricade রূপে খাড়া ক'রে রাখা; অন্য ধারে বেচারী নির্দ্দোষ নগেন কবরেজও আতঙ্কে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় ব'সে; আর তার সাম্‌নে এক জন সশস্ত্র সিপাই দাঁড়িয়ে নিশা যাপন কর্‌ছিল। মাঝে একবার সেই থানার ইন্‌স্পেক্টারের মেম সাহেব আর মেয়েরা এসে ভীতিবিহ্বলনেত্রে দেখে গেলেন নগেনকে; আমাদের নয়।

৪ঠা মে সোমবারও আমাদের না নাইয়ে না খাইয়ে দশটার সময় পুলিস কোর্টে হাজির করেছিল। সেখানে কমিশনারের কাছে, কেউ একরার, কেউ এজাহার দেওয়ার আর অনেকে কিছু না দেওয়ার পর আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বার্লীর এজলাসে আমাদের সকলকে একে একে হাজির করা হয়েছিল। আমাদের অধিকাংশই আবার কিছু না কিছু স্বীকারোক্তি দিয়েছিল। যারা দেয় নি, তাদের মধ্যে অরবিন্দ বাবু না কি বলেছিলেন, তাঁর বক্তব্য কোন উকীলের মারফত জজকে আবশ্যক হ'লে জানাতে পারেন। আর এক জন বলেছিল, সে গুপ্ত সমিতি আদি সম্বন্ধে কিছুই জানে না; এ ছাড়া আপাততঃ আর এমন কি নিজের নাম-ধাম ইত্যাদি বলাও সে উচিত মনে করে নাই। আর কয়েক জন কিছুই জানে না বলেছিল। উপেন, বারীন, উল্লাস প্রভৃতি আবার বিশেষ ক'রে স্বীকারোক্তি দিয়েছিল।

তার পর সকলকে ক্রমে ক্রমে আলিপুর জেলে (এখন তার নাম হয়েছে প্রেসিডেন্সী জেল) পাঠান হয়েছিল।

যে-একরারকারীদের এ যাবৎ সম্পূর্ণ পৃথক্‌ভাবে রাখা হয়েছিল। সেই রকম পৃথক্‌ভাবেই জেলে পাঠান হ'ল। অরবিন্দ বাবুকে আবার তা থেকে পৃথক্ ক'রে রাখা হয়েছিল। জেল ফাটকের বাইরে নতুন আগন্তুক কয়েদীদের শুদ্ধ ক'রে নেওয়ার জন্য স্নানের ব্যবস্থা ছিল। আমরাও অনেক দিন পরে স্নান ক'রে শুদ্ধ হয়ে জেলে ঢুক্‌লাম।

জেলখানার ভীষণতা সম্বন্ধে পূর্ব্ব হ'তেই একটা ভারী খারাপ ধারণা ছিল। তার ওপর তিন দিন হাজতে যে দুর্দ্দশা ভোগ করেছিলাম, তাতে সে ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়েছিল। কিন্তু জেলে ঢুকেই একটা লোহার থালে অর্থাৎ তাবাতে রেঙ্গুণ চালের গরম গরম ভাত, মশলা আর প্রচুর তেল দিয়ে হিন্দুস্থানী কয়েদী পাচকের দ্বারা প্রস্তুত অড়হর দাল, মাছ আর শাক-পাতড়া দিয়ে রাঁধা ভোজপুরী ঘণ্ট, সমস্ত দিন উপোসের পর সন্ধ্যেবেলা এত ভাল লেগেছিল যে, সারাজীবন জেলখানাতে কাটিয়ে দিতে পারব ব'লে তখন আশা হয়েছিল। আমাদের গুপ্ত সমিতির আড্ডাগুলোতে যে রকম খাওয়া-দাওয়া আর বিছানাদির ব্যবস্থা ছিল, তার পরিচয় আগে দিয়েছি; তার তুলনায় জেলের ব্যবস্থা অনেক অধিক স্বাস্থ্যকর, সঙ্গত ও ভোগ্য ব'লে মনে ক'রে, আর বর্ত্তমান ভারত সরকারের বিরুদ্ধে যে অপরাধে আমরা

আসামী হয়েছিলাম, ঠিক সেই অপরাধে মুসলমান-রাজত্বে, বিশেষ ক'রে হিন্দু-রাজত্বে ধরা পড়লে যে কি রকম অমানুষিক নির্য্যাতন ও অকথ্য অবর্ণনীয় দণ্ডের বিধান হ'ত, তার তুলনায় আমাদের প্রতি ইংরাজ সরকারের ব্যবহার অনিন্দ্যনীয় সভ্য না হ'লেও অনেক বেশী যে ভদ্র, তা ভেবে তখনকার অতুষ্ট মনকে তুষ্ট করতে পেরেছিলাম। সে রাত্রিতে একটা একটু বড় রকম কুঠরীতে নিরাপদ, কানাই, অবিনাশ, শৈলেন ও আমি ছিলাম। এমন একটা দুর্ঘটনার পর এতগুলি সহযাত্রীর সঙ্গে প্রাণ খুলে সুখ-দুঃখের কথা কয়ে খানিকটা দুঃখের লাঘব হয়েছিল আর ধরা পড়া ব্যাপারের অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছিলাম। অকারণ ধরা পড়ার অনুশোচনায় সকলেই ম্রিয়মাণ হয়েছিল। বাকী সকলের প্রত্যেক তিন জনকে এক একটা সেলে রেখেছিল। ২'জনকে এক সঙ্গে রাখা জেল-নিয়মে নিষিদ্ধ।

পরদিন মঙ্গলবার সন্ধ্যার সময় আমায় আবার সি, আই, ডি, আফিসে নিয়ে গেল। সেখানে গিয়েই দেখলাম,—বারীন বাঙ্গালা দেশের প্রত্যেক জেলায়, প্রত্যেক মহকুমায় একমাত্র নিজের যত্ন-চেষ্টায় বৈপ্লবিক সমিতির কেন্দ্র স্থাপন ক'রে, কি রকম অব্যর্থ বিপ্লব আয়োজন করেছিল, তার আষাঢ়ে গল্প রায় বাহাদুর গুণমুগ্ধ ভক্তের মত শুনে ধন্য ধন্য কর্‌ছিলেন।

আমার তলবের কারণ বারীনের কাছে শুন্‌লাম। সে রায় বাহাদুরকে কথা দিয়েছে, যদি আমায় তার সঙ্গে এক রাত্রি থাক্‌তে দেওয়া হয়, তবে সে আমাকে স্বীকারোক্তি দিতে রাজী ক'রে দেবে। বারীনের সঙ্গে একত্র ব'সে অনেক রকম খাবার খেলাম; আমার সুখ্যাতিও অনেক শুন্‌লাম।

বারীনের কথাবার্ত্তার ধরণ-ধারণ দেখে এবং এত বড় দুর্ঘটনার পর আমার সঙ্গে দেখা হ'তে তার এমন বে-পরোয়া ভাবে আমাদের সমিতি সম্বন্ধে আমাকে উদ্দেশ ক'রে কথা কইতে শুনে তখন মনে হয়েছিল, রায় বাহাদুরের স্তোকবাক্যে অব্যাহতি সম্বন্ধে সে নিজে ত নিশ্চিত হয়েছে, আমাকেও তা বিশ্বাস করাতে চেষ্টা করছে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীহেমচন্দ্র কাননগোই।

স্মৃতির আদর

বাস্‌ত ভাল যারা আমার পায়েস পুলী পিঠে
সর্ষে-বাটার ইলিশ-ঝোল ও টক্‌টি মূলোর মিঠে,
আজও তাঁহার তিথির দিনে ও সব জিনিষ তাই
সব বামুনের পাতে পাতে দেওয়া মায়ের চাই।

দিদি মোদের মারা গেছে দশটি বছর হায়!
সবার মনে স্মৃতি তাহার আস্‌লো মুছে প্রায়,
শুধু মা' তার শাঁখা দুটি ঢাকাই নীলাম্বরী
মাঝে মাঝে সজল চোখে রাখেন বুকে করি।

উঠানপরে আছে মোদের একটি আমের গাছ
ফল ধরা তার বন্ধ হয়ে গেছে বছর পাঁচ,
কাটতে তারে সে দিন যখন কর্‌ছি আয়োজন
বল্লেন মা দৌড়ে এসে "ওরে অবোধ শোন!
এমনি ক'রে শুধবি কি তুই বাপ-পিতাম'র ঋণ
পুতেছিলেন ঠাকুর ওরে ও যে তাঁহার 'চিন'!"

একটি মোদের ভাই ছিল সে বাস্‌ত ভাল মুড়ি
সারাদিন সে চাইত মুড়ি মায়ের পাশে ঘুরি,
আজও মায়ের ভাজতে মুড়ি চোখে আসে জল
প্রথম "খোলা" নামিয়ে ডাকেন পাড়ার ছেলের দল!

যখন মোরা ভাইরা মিলে পূবের পোতার পর
কোন রকমে ক'রে দিলাম পাকা ক'খান ঘর।
বল্লাম মা, 'লও না বেছে যেটা তোমার খুসী'
বল্লেন মা সজল চোখে মিষ্ট কথায় তুষি,
"ছিলেন তিনি এই কুঁড়েতে হ'লেন হেথায় লীন,—
এই ঘরেতেই থাক্‌ব আমি শেষের কটা দিন।"

এমনি ক'রে মোদের ঘরে নীরব ঘটাহীন
স্মৃতির আদর স্মৃতির পূজা চল্‌ছে চিরদিন,
নাইকো রে তাই স্মৃতিসভার বিরাট আয়োজন
বক্তৃতারি উচ্ছ্বাসেতে মৃতেরি অর্চ্চন।

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

ঘুমভাঙ্গান ঘড়ী

সাধারণ 'এলার্ম' বা সাঙ্কেতিক ঘণ্টা দ্বারা নিদ্রিত ব্যক্তির নিদ্রাভঙ্গ করিবার ব্যবস্থার পরিবর্ত্তে নূতন ব্যবস্থা হইয়াছে। সুইজারল্যাণ্ডবাসী জনৈক শিল্পী এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছে। উহা হইতে নির্দ্দিষ্ট সময়ে এক প্রকার সুন্দর সুর নির্গত হইতে থাকে। এই সুর শুনিয়া নিদ্রিত ব্যক্তির নিদ্রাভঙ্গ হয়, কিন্তু এলার্ম ধ্বনিতে যে প্রকার রূঢ় এবং প্রচণ্ড শব্দের সমাবেশ থাকে, এই নবাবিষ্কৃত যন্ত্রে তাহার লেশমাত্র নাই। ইহার শব্দ সুমধুর, স্নায়বিক পীড়ায় আক্রান্ত নিদ্রিত ব্যক্তির নিদ্রাভঙ্গে এই মধুরধ্বনি বিশেষ প্রীতিপ্রদ।

ঘুমভাঙ্গান নূতন ঘটিকাযন্ত্র

শ্বাস-প্রশ্বাসশক্তির পরীক্ষা

যাহারা দৌড় খেলায় যোগ দেয়, তাহাদের শক্তি পরীক্ষার এক অভিনব ব্যবস্থা জনৈক ইংরাজ বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন করিয়াছেন। তিনি এক প্রকার মুখোস ও মুখাবরণ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। দৌড়াইবার সময় উহা মুখে সংলগ্ন করিয়া দিতে হয়। পশ্চাদ্ভাগে একটা লঘু আধার, উহাতে বায়িত শ্বাসবায়ু সঞ্চিত হয়। পরে উহা পরিমাপ করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, কতটুকু শক্তি থাকিলে একটা মানুষ নির্দ্দিষ্ট স্থান পর্য্যন্ত দৌড়িয়া বাজি জিতিতে পারে।

দৌড় খেলায় ব্যবহৃত নবাবিষ্কৃত মুখোস-যন্ত্র

দন্তসাহায্যে শব্দশ্রবণ

অভিজ্ঞগণ বলেন, যে সকল ব্যক্তি কানে কম শুনিয়া থাকে, অথবা শ্রবণেন্দ্রিয়ের কোন প্রকার দোষ থাকা বশতঃ

বধিরপ্রায়, যদি তাহাদের মুখবিবরস্থ অস্থির মারফৎ শব্দ সঞ্চালিত করা যায়, তাহা হইলে তাহারা শব্দ বেশ পরিস্ফুটরূপে শুনিতে পাইবে। ফ্লোরিডায় জনৈক বৈজ্ঞানিক এই তত্ত্বটি উদ্ভাবিত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, জন্মবধিরও ফনোগ্রাফের সঙ্গীত শুনিতে পাইয়াছে। একটি কাষ্ঠদণ্ডের প্রান্তে একটা ফনোগ্রাফে ব্যবহৃত সূচ সন্নিবিষ্ট করিয়া উক্ত দণ্ডটি দন্ত দ্বারা চাপিয়া ধরিতে হয়। কল চালাইয়া দিলে

বধির ব্যক্তি কাষ্ঠদণ্ডের সাহায্যে সঙ্গীত শ্রবণ করিতেছে

'রেকর্ডের' সঙ্গীততরঙ্গ কাষ্ঠদণ্ড হইতে ক্রমশঃ দাঁতের ও মুখবিবরস্থ অস্থিসমূহের ভিতর দিয়া শ্রবণেন্দ্রিয়ে পৌছায়।

ত্রিচক্রবাহিত ট্যাক্সী-গাড়ী

ভিয়েনা নগরে সম্প্রতি ত্রিচক্র-পরিচালিত এক শ্রেণীর নূতন ট্যাক্সী-গাড়ীর আমদানী হইয়াছে। এই গাড়ী চালাইতে ব্যয় কম পড়ে, অথচ দ্রুতগতিতে পথ অতিবাহিত করা যায়। এই গাড়ীর আর একটা সুবিধা এই যে, বড় বড় চারিচক্র ট্যাক্সী-গাড়ী অপেক্ষা ইহারা অল্পস্থান অধিকার করিয়া থাকে। জনতার মধ্য দিয়া এই ত্রিচক্রবিশিষ্ট ট্যাক্সী-গাড়ী লইয়া যাওয়া বিশেষ সুবিধাজনক। ত্রিচক্র

ত্রিচক্রবিশিষ্ট ট্যাক্সী-গাড়ী

ট্যাক্সী গাড়ীর প্রচলন ভিয়েনায় অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। জনসাধারণ এই শ্রেণীর গাড়ীর পক্ষপাতী।

নারীর উদ্ভাবিত নখর-পরিষ্কারক যন্ত্র

জনৈক মহিলা নখর পরিষ্কার করিবার এক প্রকার যন্ত্র উদ্ভাবিত করিয়াছেন। একটি ক্ষুদ্র চোঙ্গার এক প্রান্তে একটি নল আছে, এই নলটি ইচ্ছামত খুলিয়া ফেলা যায়। উক্ত নলের মধ্যে নখর পালিশ করিবার চূর্ণ থাকে এবং চোঙ্গার অপর প্রান্তে নখর শ্বেতাভ করিবার চূর্ণ এবং তুলা থাকে।

নখর-পরিষ্কারক ক্ষুদ্র যন্ত্র

চোঙ্গার সহিত ক্ষুদ্র উকা প্রভৃতি অন্যান্য পদার্থও থাকে। এই যন্ত্রটি যেমন সুদৃশ্য, তেমনই ক্ষুদ্রাকার। বেড়াইতে বাহির হইবার সময় মহিলারা উহা ছোট ব্যাগের মধ্যে রাখেন।

বৃক্ষ-ছত্র

কালিফোর্ণিয়ানিবাসী এক ব্যক্তি তাঁহার উদ্যানমধ্যস্থ একটি প্রাচীন বৃক্ষ অপসৃত না করিয়া তাহাকে এমন ভাবে

বৃক্ষছত্র

কাটিয়া ছাঁটিয়া ফেলিয়াছেন যে, দেখিলেই একটি বিরাট ছাতা বলিয়া মনে হইবে। বৃক্ষের পদতলে বসিবার ব্যবস্থা আছে। ইহাতে উদ্যানের শোভাও সমধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে।

বিদ্যুৎ প্রভাবে নখর পরিষ্কার করা

লস্ এঞ্জেলেসে বৈদ্যুতিক শক্তির দ্বারা নখরাদি পরিষ্কার করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহাতে অল্প সময়ে অনেক কায হয় এবং সুচারুরূপে নখরগুলিকে সুসংস্কৃত করা যায়। মোটর-

নখর-পরিষ্কারক বৈদ্যুতিক যন্ত্র

চালিত একটি যন্ত্র টেবলের উপর রক্ষিত হয়, উহাতে নখর পরিষ্কার করিবার উপযুক্ত অস্ত্র সন্নিবিষ্ট থাকে।

হৃদ্‌যন্ত্র পরীক্ষার বৈদ্যুতিক যন্ত্র

নূতন এক প্রকার যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে, ইহার সাহায্যে রোগীর হৃদ্‌যন্ত্রের স্পন্দন রোগীর অজ্ঞাতসারে বহুদূরবর্ত্তী চিকিৎসক অবগত হইয়া রোগনির্ণয় করিতে পারেন। হাঁসপাতালের এক কক্ষে রোগী রহিয়াছে, শুশ্রূষাকারিণী এক জোড়া 'প্যাড' বা বন্ধনী রোগীর হস্তে পরাইয়া দিল। উক্ত প্যাডের সহিত একটা তার সংলগ্ন থাকে। যাহার হাতে প্যাড বা বন্ধনী পরান হইল, সে বুঝিতেও পারিল না, কেন সেবাকারিণী তাহাকে বন্ধনী ধারণ করিতে বলিল। এ দিকে রোগীর নাড়ীর গতি হাঁসপাতালের অপর প্রান্তে বসিয়া চিকিৎসক যন্ত্রযোগে নির্ণয় করিতে লাগিলেন। নাড়ীর গতিবেগ দেখিয়া হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া দোষযুক্ত কি না এবং কি কি দোষ আছে, তাহা চিকিৎসক নির্ণয় করিয়া ফেলিলেন। রোগী কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিল না। রেডিও-যোগে

হৃদযন্ত্র পরীক্ষার বৈদ্যুতিক যন্ত্র

ঐ নাড়ীর গতি বহুদূরবর্ত্তী নগরেও প্রেরণ করা যায়। সুতরাং চিকিৎসক দূর হইতেই রোগীর চিকিৎসা করিতে পারেন।

বিচিত্র খেলার গাড়ী

জার্ম্মাণগণ বালক-বালিকাদিগের ক্রীড়নকগুলিকেও শরীর ও মনের স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী করিয়া নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। সম্প্রতি কোনও জার্ম্মাণ প্রদর্শনীক্ষেত্রে এক প্রকার খেলার ঘোড়ার গাড়ী প্রদর্শিত হইয়াছিল। একটি বগিগাড়ী একটি দারুময় ঘোড়া টানিতেছে। ঘোড়ার দেহের মধ্যে

এমন কৌশলে কল-কব্জা সন্নিবিষ্ট যে, বাহির হইতে কিছুই দেখা যায় না। গাড়ীর উপর চড়িয়া অশ্ববল্গা আকর্ষণ করিলেই অশ্ব সহ গাড়ী আপনা হইতে অগ্রসর হইবে। এইরূপ ক্রীড়নক সাহায্যে আমোদ ও স্বাস্থ্য উভয়ই লাভ করা যায়।

বিচিত্র খেলার গাড়ী

বিজ্ঞানের বাহাদুরী

চলচ্চিত্রের ছবি তুলাইবার সময় অভিনেতা ও অভিনেত্রী-দিগকে নানাবিধ বস্ত্র পরিবর্ত্তন এবং প্রসাধন করিতে হয়। রৌদ্র হইতে তাতিয়া পুড়িয়া আসিয়াই হয় ত ছবি তুলাইতে হইবে—সে সময় রৌদ্রপীড়িত দেহের বর্ণ বর্ণানুলেপন দ্বারা সুদৃশ্য করিয়া না লইলে ছবির মধ্যে ত্রুটি থাকিয়া যাইবে। তাড়াতাড়ি সে ত্রুটি সংশোধন করাও সকল সময় ঘটিয়া উঠে না। এই অভাব দূরীভূত করিবার জন্য জনৈক বৈজ্ঞানিক এক প্রকার চর্ম্মানুলেপন উদ্ভাবন করিয়াছেন। বায়ুপূর্ণ আধার হইতে বায়ুধারা নির্গত হইয়া এই অনুলেপন শরীরের নির্দ্দিষ্ট স্থানটি অত্যল্প সময়ের মধ্যে অনুরঞ্জিত করিয়া দেয়—স্বাভাবিক শরীরের বর্ণ ফুটিয়া উঠে, রৌদ্রদগ্ধ চিহ্ন থাকে না।
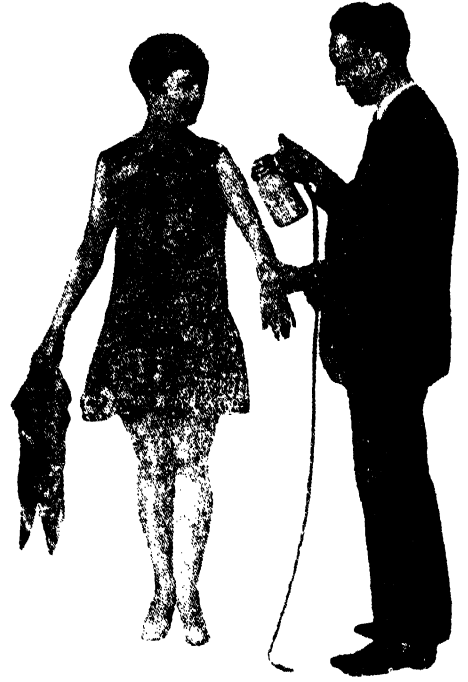
বায়বীয় ব্রুসের সাহায্যে অঙ্গানুলেপন প্রয়োগ

নূতন মোটর দ্বিচক্রযান

চিকাগো সহরে জনৈক শিল্পী উন্নত প্রণালীতে মোটর দ্বিচক্রযান নির্ম্মাণ করিয়াছেন। দ্বিচক্রযানের সংলগ্ন পার্শ্বস্থ বসিবার আসনটিকে প্রয়োজনানুসারে শয়ন-কক্ষে পরিণত
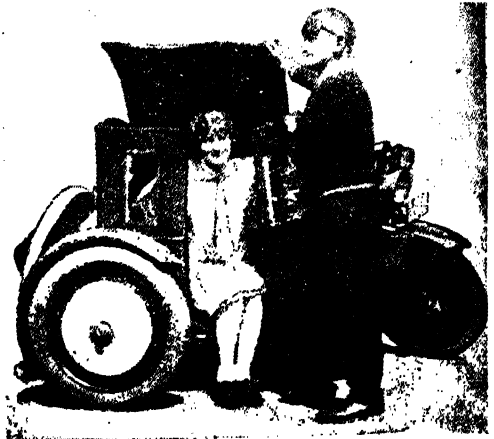
শয়নকক্ষ-সমন্বিত মোটর দ্বিচক্রযান

করা যায় এবং এক জন স্বচ্ছন্দে তাহাতে নিদ্রা যাইতে পারে। উহাতে বাতায়ন, পাদপীঠ এবং আলো জ্বালিবার বন্দোবস্তও আছে। দীর্ঘ পর্য্যটনের সময় এইরূপ দ্বিচক্রযানের সুবিধা অনেক বেশী। সাধারণ মোটর গাড়ী অপেক্ষা এইরূপ দ্বিচক্রযান ব্যবহারে খরচও অল্প পড়ে।
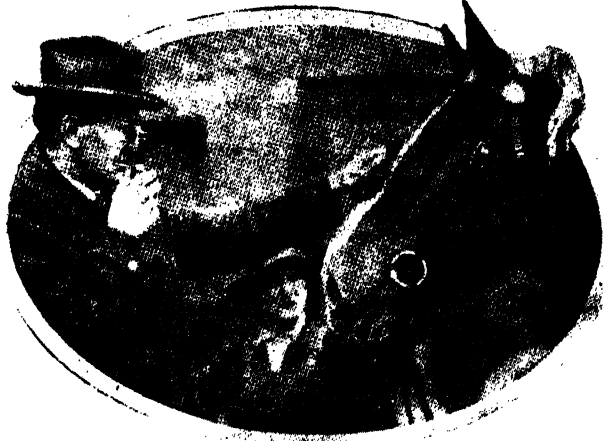
গ্যাসপূর্ণ অভিনব কোমরবন্ধ

রবারের নির্ম্মিত এক প্রকার নূতন কোমরবন্ধ আবিষ্কৃত হইয়াছে। সন্তরণকারীরা উহা কটিদেশে ধারণ করিয়া থাকে। চিত্র দেখিলে উহার ধারণ-প্রণালী বুঝা যাইবে। কোমরবন্ধের এক প্রান্তে একটি স্ক্রু আছে। নল গ্যাসপূর্ণ অথবা শূন্য করিবার সময় স্ক্রুটি খুলিয়া দিতে হয়। এই কোমরবন্ধ কটিদেশে ধারণ করা বিশেষ সুবিধাজনক।

গ্যাসপূর্ণ নূতন কোমরবন্ধ

ঘোড়ার চক্ষু পরীক্ষা করিবার যন্ত্র

বিশেষজ্ঞগণ জানেন, অশ্বের দৃষ্টিশক্তির দোষেই ঘোড়-দৌড়ে অনেক প্রকার দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়া থাকে। জনৈক মার্কিণ অশ্ব-চিকিৎসক বহু গবেষণার পর এক প্রকার যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে অশ্বের চক্ষুর

অশ্বের চক্ষু পরীক্ষা করিবার যন্ত্র

ব্যাধি ও অপরিপুষ্টতা বিশেষভাবে ধরা পড়ে। বিশেষজ্ঞ-গণের মতে বংশানুক্রমেই ঘোড়ার ব্যাধি সংক্রামিত হয়।

সঙ্গীতশব্দতরঙ্গে রোগ-প্রশমন

উদ্ভাবনকারী বৈজ্ঞানিক যন্ত্র লইয়া পরীক্ষা করিতেছেন।

জনৈক বিজ্ঞানবিৎ ও সঙ্গীতজ্ঞ উভয়ে মিলিয়া কতিপয় যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, বৈজ্ঞানিক উপায়ে সঙ্গীততরঙ্গ আলোকরশ্মির সাহায্যে মানবদেহে প্রবেশ করাইলে, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য-ঘটিত নানাপ্রকার ব্যাধি নিরাময় করা যায়। যন্ত্রাদির সাহায্যে তাঁহারা এইরূপে অনেক ব্যাধি নিরাময় করিয়াছেন।

সাম্রাজ্যিকতা বনাম বিশ্বমানবতা

মানুষের নিজের জাতির প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যে গৌরব অনুভব করা স্বাভাবিক, ইহা স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রেমের নামান্তর। কিন্তু এই সাম্রাজ্যগর্ব্ব যখন অন্য দুর্ব্বল জাতির স্বার্থের প্রতিকূল হয়, যখন উহা বিশ্বমানবতার অথবা বিশ্বে সন্তোষ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়, তখনই উহাকে বিকৃত স্বদেশপ্রেম ও স্বজাতিপ্রেম বলিয়া অভিহিত করা যায়। আজ কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ সুদূর প্রাচ্যে ভ্রমণ করিতে গিয়া মলয় উপদ্বীপের প্রবাসী বৃটিশ জাতির নিকটে যে ব্যবহার প্রাপ্ত হইতেছেন, তাহা যে এই বিকৃত সাম্রাজ্যিকতার ফল, তাহাতে সন্দেহ নাই। 'ষ্টেটস্‌ম্যান' পত্রের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক পিলচার 'ষ্টেটস্‌ম্যানের' মারফতে অথবা মার্কিণ নারী ক্যাথারিণ মেও তাহার 'মাদার ইণ্ডিয়া' নামক গ্রন্থের মারফতে হিন্দুজাতির যে মিথ্যা গ্লানি রটনা করিতেছে, তাহাও যে এই বিকৃত সাম্রাজ্যিকতার ফল, ইহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

জগতে প্রাচীন কাল হইতে বহু সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন হইয়াছে। আসিরীয়, বাবিলোনীয়, কালদীয়, ফিনিসীয়, মিশরীয়, গ্রীক, রোমক, হিন্দু, পারসীক, চীন, মোগল, পাঠান,—কত সাম্রাজ্যই জগতে গড়িয়া উঠিয়াছে এবং কালের আবর্ত্তনে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে আধুনিক যুরোপীয় ও মার্কিণ সাম্রাজ্য রোমক সাম্রাজ্যের অনুকরণে গঠিত। বর্ত্তমানে প্রাচ্যের এক জাপ সাম্রাজ্য ব্যতীত জগতের সকল সাম্রাজ্যই রোমক আদর্শের অনুকরণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, জাপ সাম্রাজ্যও যুরোপীয় (বৃটিশ) সাম্রাজ্যকে আদর্শ করিয়া গঠিত হইয়াছে। সুতরাং অধুনা সাম্রাজ্যিকতা বলিতে যুরোপীয় ও তদনুকরণে গঠিত মার্কিণ ও জাপ সাম্রাজ্যের সাম্রাজ্যিকতাকেই বুঝাইয়া থাকে। এ আদর্শের ভিতরের জানটুকু কি, বুঝিতে হইলে—দেশপ্রেম ও জাতিপ্রেমের সহিত বিশ্বপ্রেমের সম্পর্ক কি, জানিতে হইলে প্রথমেই রোমক সাম্রাজ্যের আদর্শের প্রাণটুকু বুঝিতে হইবে।

প্রাচীন রোমক জাতি যখন জনমতকে আদর্শ করিয়া সাধারণতন্ত্র-শাসন অনুসারে চালিত হইত, তখন তাহাদের মধ্যে স্বদেশের ও স্বজাতির প্রতি একটা অকৃত্রিম অফুরন্ত ভালবাসার অস্তিত্ব ছিল। প্রাচীন রোমকরা এই হেতু স্বদেশ ও স্বজাতির জন্য অদ্ভুত ত্যাগস্বীকারের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিল। তাহারা প্রকৃতি-উপাসক (Pagan) হইলেও পরবর্ত্তী খৃষ্টান সিজারদের সাম্রাজ্যের রোমক প্রজাদের অপেক্ষা জাতিত্বগর্ব্বে অথবা দেশ-প্রেমে কোনও অংশে ন্যূন ছিল না। সিনসিনেটাস (কুঞ্চিত কেশ) হলচালনা করিতে যখন নিযুক্ত ছিলেন, তখন দেশের বিপদে তাঁহার ডাক পড়িয়াছিল। তিনি হল ত্যাগ করিয়া রোমান সেনার হাল ধরিয়া শত্রুবিজয় করিয়াছিলেন। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে শত্রু বিজিত হইল, সেই মুহূর্ত্তেই তিনি সেনাদল ত্যাগ করিয়া নিজগ্রামে গিয়া পুনরায় হলচালনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। ইচ্ছা করিলে তিনি রোমে সর্ব্বেসর্ব্বা হইতে পারিতেন, কিন্তু তিনি প্রকৃত দেশপ্রেমিক ছিলেন বলিয়া দেশের বিপদের দিনে নেতৃত্বভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, আবার দেশের বিপদের অবসানে সামান্য প্রজার ন্যায় জীবন যাপন করিয়াছিলেন। এমন অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগ যে জাতিতে সম্ভব হইয়াছিল, সেই জাতি জগতে মহৎ হইবে, ইহাতে সন্দেহ কি? আর এক বিজয়ী রোমক সেনাপতিকে যখন তাঁহার দেশের সেনেটাররা শত্রুর নিকট হইতে যুদ্ধে লব্ধ ধনরত্নাদি উপহার দিতে গিয়াছিলেন, তখন সেই সেনাপতি বলিয়াছিলেন,—"যাঁহারা এই অমূল্য ধনরত্নের মালিক, আমি এবং আমার জন্মভূমি তাঁহাদের উপর প্রভুত্ব করিতেছি, ইহাই আমি অমূল্য সম্পদ বলিয়া মানি, তুচ্ছ ধনরত্ন আমি চাহি না, উহার প্রলোভন আমাকে দেখাইও না।" এত বড় দেশাত্মবোধ যে জাতির মধ্যে ছিল, তাহাদের আদর্শ কত উচ্চাঙ্গের ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। সেই প্রাচীন রোমান কেবল শত্রু-বিজয় করিয়া ক্ষান্ত হইত না, শত্রুকে আপনার আদর্শে অনুপ্রাণিত করিত, তাহাকেও আপনার জন করিয়া লইত এবং রোমকে তাহাদের স্বদেশ বলিয়া ভালবাসিতে শিখাইত। তাহার দেশাত্মবোধ বিশ্বমানবতার অন্তরায় ছিল না। যে জাতিকে সে জয় করিত, সেই জাতিকে সে মিত্রে পরিণত করিতে পারিত এবং সেই জাতি পরে রোমের পতাকাতলে দণ্ডায়মান হইয়া আপনাকে রোমান বলিয়া গর্ব্বানুভব করিত।

কিন্তু সিজারদের আমলের রোম ভিন্ন রোমে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। সিজারদের সাম্রাজ্যের রোমানও দেশপ্রেমিক ছিল, তাহাদের মধ্যেও স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্তের অভাব ছিল না, কিন্তু সেই দেশপ্রেমে অথবা সেই স্বার্থত্যাগের খাঁটি সোনায় কিছু খাদ মিশিয়াছিল,—উহার অন্য নাম বিলাসিতা, অহঙ্কার, আপনাকে প্রকৃষ্ট ও অন্য জাতিকে নিকৃষ্ট বলিয়া জ্ঞান করা। এই হেতু শেষোক্ত রোমানদের বিজিত শত্রু মিত্রে পরিণত হইত না, তাহারা গ্লাডিয়েটার হইয়া সিংহ-ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে নিযুক্ত থাকিয়া রোমান অভিজাতবর্গকে আনন্দ প্রদান করিত, তাহাদের বিলাসিতা ও কামপ্রবৃত্তির চরিতার্থতা-সাধনে নিযুক্ত হইত। রোমানরা এইরূপে আপনাদিগকে জগতের শ্রেষ্ঠ জীব ও অন্য সকলকে বর্ব্বর ও নিকৃষ্ট জীবরূপে গণ্য করিতে করিতে যে সাম্রাজ্যিকতার গর্ব্বে উৎফুল্ল হইত, উহাতে দেশাত্মভাব বিদ্যমান থাকিলেও বিশ্বমানবতা পদদলিত হইত। রোমানরা আপনাদিগকে স্রষ্টার নির্ব্বাচিত অথবা মনোনীত জীব বলিয়া মনে করিত এবং অন্যান্য জাতিকে তাহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সরবরাহকার নিকৃষ্ট জাতি বলিয়া মনে করিত। অন্য জাতির যে তাহাদেরই মত সুখ-দুঃখের অনুভূতি আছে, অথবা অন্য জাতির যে তাহাদেরই মত জাত্যভিমান বা নিজস্ব সভ্যতা ও শিক্ষা-দীক্ষা আছে, ইহা রোমানরা বিশ্বাস করিত না। এই সহানুভূতির অভাবই পরে বর্ব্বর জাতির হস্তে রোম-সাম্রাজ্যের পতনের কারণ হইয়াছিল।

আধুনিক যুরোপীয় ও মার্কিণ সাম্রাজ্যসমূহ রোমের সিজারদিগের সাম্রাজ্যের আদর্শে গঠিত; সুতরাং উহার সকল দোষগুণই উহারা প্রাপ্ত হইয়াছে। রোমের ন্যায় ইহারাও উপনিবেশ-স্থাপনের প্রবৃত্তি লাভ করিয়াছে, বিজিত দেশের মরু বা অরণ্যকে পথ ঘাট সহর গ্রা

আদি স্থাপন ও নির্ম্মাণ দ্বারা সভ্য মানুষের আবাসভূমিতে পরিণত করিবার শক্তি আহরণ করিয়াছে, শত্রুকে জয় করিয়া তাহার ও তাহার দেশের নিকট হইতে আত্মসুখ ও ভোগবিলাসের উপযোগী সম্পদ সংগ্রহ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। ইহারা এই Exploitation ব্যাপারে শত্রুকে রোমের মত Gladiatorএ পরিণত করিয়া উগার নিকট হইতে আমোদ উপভোগের ইচ্ছা করে না বটে, কিন্তু শত্রুকে ক্রমশঃ নিস্তেজ ও হীনবল করিয়া তাহার অনুগ্রহ-নিগ্রহাপেক্ষী অধম ও নিকৃষ্ট জাতিতে পরিণত করিয়া ফেলে। ইহারাও রোমের স্থায় মনে করে, ইহারা স্রষ্টার মনোনীত জীব, অন্যান্য দুর্ব্বল ও অসহায় জাতি নিকৃষ্ট। সুতরাং এই তথাকথিত নিকৃষ্টদিগকে তাহারা নাবালক জাতি বলিয়া মনে করে এবং আপনারা সাবালকরূপে তাহাদের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের ভার গ্রহণ করে। তাহারা মনে করে, ইহা দ্বারা তাহারা স্রষ্টার উদ্দেশ্যসাধন করিতেছে, সুতরাং নিকৃষ্টের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণে তাহারা যে ব্যবস্থাই করুক, তাহা ঈশ্বরের অনভিপ্রেত হইতে পারে না। এই বিশ্বাস তাহাদের মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে।

এই মনোবৃত্তির ফলে তাহাদের সাম্রাজ্যিকতার সহিত বিশ্বমানবতার অবিরাম সংঘর্ষ চলিয়াছে। তাহাদের দেশপ্রেম অথবা দেশের জন্য স্বার্থত্যাগে কাহারও সন্দেহ নাই ; কিন্তু এই দেশপ্রেম তাহাদের একচেটিয়া অধিকার (Privilege) বলিয়া তাহারা মনে করে। প্রাচ্যের কৃষ্ণকায় বা পীতকায় জাতিরও স্বদেশপ্রেম বা জাত্যভিমান থাকিতে পারে, ইহা তাহারা বুঝিতে পারে না। এই হেতু চীনের মুক্তির চেষ্টা দেখিয়া তাহারা বিস্মিত, বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়াছে। এ চেষ্টা কেবল স্রষ্টার মনোনীত তাহাদের মত শ্বেতজাতিরাই করিতে অধিকারী, অন্য জাতি নহে। পোল বা গ্রীক জাতি স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিলে তাহারা সে চেষ্টা বুঝিতে পারে, সে চেষ্টায় সহানুভূতি ও সাহায্য দান করে ; কিন্তু চীন ? সে যে পীত জাতি—নিকৃষ্ট নাবালক জাতি, তাহার আবার স্বাধীনতা কি, মুক্তি কি ? তাহার ভাগ্য ত প্রকৃষ্ট শ্বেতজাতিই নির্দ্ধারণ করিয়া দিবে। শ্বেতজাতির উৎকর্ষ, শ্বেতজাতির একচেটিয়া অধিকার, প্রসার ও প্রতিপত্তি (Power and prestige) সর্ব্বদা অক্ষুন্ন রাখিতে হইবে, এ জন্য সর্ব্বদা প্রচারকার্য্য (Propaganda work) চালাইতে হইবে। পীত বা কৃষ্ণজাতি সেই একচেটিয়া অধিকার, উৎকর্ষ, প্রসার ও প্রতিপত্তি মাথা পাতিয়া মানিয়া লইবে,—ইহাই তাহাদের জীবনের ব্রত (Mission)।

বর্ত্তমান য়ুরোপীয় ও মার্কিণ শ্বেতজাতির (এবং তাহাদের অনুকরণে পীত জাপের) এই মনোবৃত্তিটুকু বুঝিলেই কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের প্রতি মলয় উপদ্বীপের শ্বেত প্রবাসীদিগের বিরাগ ও বিতৃষ্ণার হেতু খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। মলয়যাত্রার পুর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ চীনদেশে বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের দ্বারা ভারতীয় সেনা প্রেরণ সম্পর্কে কোনও সংবাদ-সংগ্রাহকের নিকট নিজের মনোভাব প্রকাশ করিয়াছি.লন। সে সম্বন্ধে কতটুকু সত্য, তাহা রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন কেহ বলিতে পারে না। তবে যাহা সংবাদপত্রে প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহাই যদি রবীন্দ্রনাথের যথার্থ মনোভাব হয়, তাহা হইলে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ সেই মত প্রকাশ করিয়া মহাভারত অশুদ্ধ করেন নাই। বরং তিনি ন্যায়ধর্ম্মের ও বিশ্বমানবতার দিক হইতে সত্য কথাই বলিয়াছেন। তাঁহার মূল কথা এই যে,—"চীনে গৃহযুদ্ধ হইতেছে। ইহার সহিত ভারতের কোনও সম্পর্ক নাই ; সুতরাং সেই চীনে ভারতীয়ের অনুমতি গ্রহণ না করিয়া, ভারতীয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিলাতের ও ভারতের বিদেশী শাসকরা ভারতীয় সৈন্য প্রেরণ করিয়া মনুষ্যত্বের বিপক্ষে অপরাধ করিয়াছেন। ভারত ও চীন বহু প্রাচীন কাল হইতে বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ, ভারতে ও চীনে পরস্পরের প্রাচীন সভ্যতা ও শিক্ষা-দীক্ষার আদান-প্রদান চলিয়া আসিতেছে, ভারতের বুদ্ধই চীনে ধর্ম্মের অনুপ্রেরণা প্রদান করিয়াছেন, চীন মনীষীরা ভারতকে তীর্থক্ষেত্র জ্ঞানে অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতে পর্য্যটন করিতে আসিয়া থাকেন। ভারত এখন পরাধীন, তাহার হস্তপদ বদ্ধ, এ অবস্থায় তাহার ভাগ্যবিধাতারা তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চীনে ভারতীয় সেনা প্রেরণ করিয়া ভারতের বাহিরে ভারতীয়ের হীন অবস্থার কথা জানাইয়া দিলেন। চীন, ভারতীয় সেনাকে দেখিয়া ভারতের প্রতি বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন হইবে, মনে করিবে, ভারতীয়রা তাহাদের শত্রু। এ বিড়ম্বনাও ভারতীয়কে পরাধীনতার জন্য ভোগ করিতে হইতেছে। তাই প্রার্থনা এই যে, প্রভু ইংরাজ ভারতের গণ্ডীর মধ্যে ভারতীয়ের প্রতি যে ব্যবহারই করুন, তাহা ভারতবাসী সহ্য করিবে ; কিন্তু ভারতের বাহিরে যেন প্রভু ভারতীয়ের এই হীন অবস্থার কথা জানাইয়া না দেন।"

রবীন্দ্রনাথ কবি, হৃদয়বান্, বিশ্বপ্রেমিক। তিনি পৃথিবীর সকল মানবের মধ্যে সৌভ্রাত্রসৃষ্টির জন্য উদ্‌গ্রীব। তিনি নিশ্চিতই বিশ্বমানবতাকে সাম্রাজ্যিকতা অপেক্ষা অনেক বড় বলিয়া মনে করেন। সুতরাং তাঁহার পক্ষে এই উক্তি স্বাভাবিক।

কিন্তু শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্যিকের পক্ষে ইহা অসহ্য। ইহা তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। কেন না, তাহারা সাম্রাজ্যিকতাকে বিশ্বমানবতার অনেক উচ্চে স্থান দান করিয়া থাকে। তাই তাহারা রবীন্দ্রনাথের উপর খড়্গহস্ত হইয়া তাঁহাকে তাহাদের পত্রে ভীষণ আক্রমণ করিয়াছে। 'ম্যালে ট্রিবিউন' পত্রের য়ুরোপীয় সম্পাদক এ বিষয়ে অগ্রণী। তিনি ম্যানিলার এক পত্র হইতে রবীন্দ্রনাথের এক পত্র উদ্ধ র করিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, "রবীন্দ্রনাথ ঘোর বৃটিশ-বিদ্বেষী, তাঁহার দুই রূপ, এক রূপে তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্যের শত্রু—যে রূপে তিনি বৃটিশ জাতিকে পরের রাজ্য ও ধনরত্নাপহারী দুর্ব্বৃত্ত বলিয়া অভিহিত করেন, অন্য রূপে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভক্ত প্রজারূপে জগতের সকল জাতির বন্ধু সাজিয়া বৃটিশ উপনিবেশে ও সাম্রাজ্যে সরকারী ও বে-সরকারী বৃটিশারের আতিথেয়তা উপভোগ করেন এবং তাঁহার বিশ্বভারতীর জন্য চাঁদা সংগ্রহ করেন।" তিনি তাই রবীন্দ্রনাথকে হাঁকিয়া বলিয়াছেন,—হয় তিনি তাঁহার নামে প্রকাশিত পত্রের প্রতিবাদ করুন, না হয় 'দস্যু' জাতির আতিথেয়তার ও চাঁদার আশা ত্যাগ করুন। রবীন্দ্রনাথের য়ুরোপীয় সেক্রেটারী মিঃ উইলিয়ামস এই আক্রমণের যথোচিত উত্তর দিয়াছেন! স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, "তিনি কোন পত্রে চীন সম্বন্ধে তাঁহার মতামত ব্যক্ত করেন নাই। তবে প্রাচ্যযাত্রার পূর্ব্বে কোন ভারতীয় সংবাদপত্রের সংবাদ-সংগ্রাহককে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা অতিরঞ্জিত হইয়া চিকাগোর 'য়ুনিটি' পত্রে প্রকাশিত হয় ; পরে উহা হইতে 'সাংহাই টাইমস' ও 'সাংহাই টাইমস' হইতে মানিলার কাগজে উহা অধিক অতিরঞ্জিত করিয়া প্রকাশিত হয়। তাহার পর উহা 'ম্যালে ট্রিবিউনে' ভীষণভাবে রূপান্তরিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি কখনও বলেন নাই যে, 'প্রাচ্য য়ুরোপের বক্ষ বিদীর্ণ করিবার জন্য অস্ত্র প্রস্তুত করিতেছে'; তিনি বলিয়াছিলেন, প্রতীচ্য মনে করে যে, প্রাচ্য প্রতীচ্যের বক্ষ বিদীর্ণ করিবার জন্য অস্ত্র প্রস্তুত করিতেছে। তিনি চিরদিনই বিশ্বের মানবের মধ্যে সৌভ্রাত্রস্থাপনে উদ্যোগী, তাঁহার বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তিনি রাজনীতিক নহেন, দেশে থাকিতে সরকারী শাসকরা (লর্ড লিটন আদি) তাঁহার গৃহে যাইতেন, তিনিও তাঁহাদের গৃহে নিমন্ত্রিত হইতেন। কোনও জাতির প্রতি তাঁহার ক্রোধ বা বিদ্বেষ নাই, তিনি সকল জাতির মধ্যে শান্তিস্থাপনের পক্ষপাতী।" কিন্তু 'ম্যালে ট্রিবিউন' ইহাতেও সন্তুষ্ট নহে। সম্পাদক বলিয়াছেন, কবির নামে প্রচারিত পত্রের শেষাংশ না হয় অতিরঞ্জিত বলিয়া স্বীকার করা গেল, কিন্তু কবি যে বলিয়াছেন, 'ইংরাজ বলপূর্ব্বক হংকং কাড়িয়া লইয়াছে', 'ভারতবাসীকে ক্রীতদাসে পরিণত করিয়াছে', 'চীনের শোষণের জন্য সৈন্য নিযুক্ত করিয়াছে',—

এ সকল কথার প্রতিবাদ ত করি করেন নাই। তবে তাঁহাকে কিরূপে সাম্রাজ্যের মিত্র বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে?

এইরূপ বাদানুবাদ চলিয়াছে। ইহার সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু বলিবার নাই। রবীন্দ্রনাথ কি বলিয়াছিলেন, তাহা যখন তিনি স্বয়ং প্রকাশ করিবেন, তখন সে সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা যাইতে পারে, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে নহে। তবে আমাদের বক্তব্য এইটুকু যে, রবীন্দ্রনাথ যাহাই বলুন, চীনে গান-বোট নীতির সমর্থন না করিলে তিনি এই শ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদীর নিকট কিছুতেই সার্টিফিকেট পাইতে পারিবেন না; পরন্তু ভারতে প্রকৃষ্ট-নিকৃষ্টের অথবা সাবালক-নাবালকের সম্বন্ধ মানিয়া না লইলেও তিনি Loyal subject হইতে পারিবেন না। তিনি বিশ্বমানবতার প্রচারক ও পুরোহিত হইতে পারেন, কিন্তু সাম্রাজ্যিকের দৃষ্টিতে তিনি sane and sober হইতে পারিবেন না। সাম্রাজ্যিকের এক লক্ষ্য,—সাম্রাজ্যের স্বার্থ, শ্বেত জাতির স্বার্থ, তাহার নিকট অন্য সকল স্বার্থই অপকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবে। সে অবস্থায় বাদানুবাদ করা বৃথা।

জজলুল পাশা

মিশরের অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠ জননায়ক সৈয়দ জজলুল পাশা গত ২৪শে আগষ্ট তারিখে ৭৭ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। পরিণত বয়সে শত্রুমিত্রের—বিশেষতঃ দেশবাসীর ভক্তিশ্রদ্ধাপ্রীতি অর্জ্জন করিয়া সংসারের বন্ধন ছিন্ন করিয়া মহাপ্রস্থান করা সৌভাগ্যেরই কথা—এমন সৌভাগ্য কয় জনের ঘটিয়া থাকে? কিন্তু যে জজলুল আধুনিক মিশরকে স্বহস্তে গড়িয়া গিয়াছেন—যাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ও চরিত্রগুণে মিশরের জাতীয় দল ঐকান্তিক দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়াছে—যাঁহার নেতৃত্ব মিশরের শত্রুপক্ষের ভয়ের কারণ ছিল, তাঁহার তিরোভাব যে সময়েই হউক না, তাহা যে মিশরের বর্ত্তমান দ্রুত পরিবর্ত্তনশীল ভাগ্যনির্দ্ধারণের পথে বিষম অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইবে, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। অধুনা মিশর বলিলেই জজলুলকে বুঝাইত। মিশরই জজলুল, জজলুলই মিশর। আরবী পাশার পর মিশরে এমন শক্তিশালী জননায়কের উদ্ভব এ যাবৎ হয় নাই। সুতরাং জজলুলের তিরোধান যে মিশরের জাতীয় মুক্তির পক্ষে বিষম ক্ষতিকর হইল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ—যাঁহারা মিশরকে চিরদিন নাবালকরূপে সাম্রাজ্যের অঞ্চলপ্রান্তে বাঁধিয়া রাখিতে চাহেন, তাঁহারা জজলুলের তিরোভাবে স্বস্তির তপ্তশ্বাস ফেলিবেন, সন্দেহ নাই। তাঁহারা জজলুলকে Stormy petrel of Egypt অথবা মিশরের 'ঝড়ের পাখী' অর্থাৎ অশান্তির অগ্রদূত বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। তাহার কারণ এই যে, তাঁহারা স্বাধীনতা বলিয়া যে শৃঙ্খল মিশরের গলদেশে পরাইয়া দিয়াছেন, জজলুল তাহা কখনও মানিয়া লয়েন নাই—বরং তাহা খুলিয়া ফেলিবার নিমিত্ত সারা রাজনীতিক জীবন চেষ্টা করিয়াছেন।

জজলুল ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। মিশরের বর্ত্তমান রাজনীতিকগণের মধ্যে তিনি যথার্থ মিশরীয়; তিনি মিশরের 'ফেলাহিন' কৃষককুল হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। প্রথমে তিনি এক শেখ ছিলেন, তাহার পর ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে যখন আরবী পাশা ইংরাজের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করেন, তখন জজলুলও তাঁহার সহিত যোগদান করিয়া ইংরাজের বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পর তিনি ইংরাজের সহিত সন্ধি করিয়া বৃটিশ হাই কমিশনার লর্ড ক্রোমারের সহিত ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। জজলুল ইংরাজের বন্ধুরূপে প্রথমে মিশরের শিক্ষা-সচিবের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন ও পরে স্বয়ং শিক্ষা-সচিব হয়েন। তাহার পর ক্রমে তিনি মিশরের এসেম্ব্লির ডেপুটি প্রেসিডেন্টের পদ গ্রহণ করেন। ইংরাজ ১৯১২ খৃষ্টাব্দে মিশরকে নিয়মতান্ত্রিক শাসনাধিকার প্রদান করেন (ইহাকে প্রকৃত স্বায়ত্তশাসন বলা যায় না), জজলুল ডেপুটি প্রেসিডেন্টরূপে তাহা মানিয়া লইয়াছিলেন।

কিন্তু ইহা তাঁহার রাজনীতিক জীবনের প্রারম্ভমাত্র। একবার এসেম্ব্লির উচ্চ পদে আসীন হইয়া তিনি আপনার নেতৃত্বে একটি জাতীয় দল গঠন করিতে লাগিলেন। জাতীয় দল সম্পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী করিলেন। ইহা হইতেই ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীদিগের সহিত জজলুলের বিবাদের সূত্রপাত। এক দিকে প্রবল পরাক্রান্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদিগের সাম্রাজ্যলিপ্সা এবং অপর জাতির উপর কর্তৃত্বের ও প্রভুত্বের প্রবল প্রয়াস,—অপর দিকে সহায়সম্বলহীন ফেলাহিন জজলুলের অদম্য উৎসাহ, স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রবল কামনা। এতদুভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিল। এই সংঘর্ষ প্রায় তাঁহার জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল। সে সমস্ত ইতিহাসের কথার পুনরাবৃত্তি এ স্থলে নিষ্প্রয়োজন। তবে সংক্ষেপে এইটুকুমাত্র বলা যাইতে পারে যে, ইংরাজ মিশরকে 'স্বাধীনতা' দিবার কালে এই ব্যবস্থাটুকু করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, মিশরে (১) তাঁহার হাইকমিশনার থাকিবেন, তিনি মিশরে বৃটিশ স্বার্থ রক্ষা করিবেন, (২) সাম্রাজ্যের রক্ষার জন্য সুয়েজ খালের কর্তৃত্ব ইংরাজের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে, (৩) বিদেশীয়ের আক্রমণ হইতে মিশরকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত মিশরের মিশর-সৈন্যের উপর হাইকমিশনারের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মচারীর ক্ষমতা ও প্রভাব থাকিবে, (৪) মিশরে বিদেশীয়ের রক্ষণাবেক্ষণের এবং স্বার্থ দেখিবার জন্য হাইকমিশনারের ইচ্ছামত মিশরকে চলিতে হইবে। জজলুল তৎপূর্ব্বে সম্পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য যখন আন্দোলন করিয়াছিলেন, তখন ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে তাঁহাকে মাল্টায় নির্ব্বাসিত করা হইয়াছিল; তদুপলক্ষে মিশরে ভীষণ দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইয়াছিল।

হাইকমিশনার লর্ড এলেনবি তাঁহাকে মুক্ত করেন, কিন্তু জজলুল পূর্ব্বতেজে স্বাধীনতার আন্দোলন চালাইয়াছিলেন। ইহার জন্য তিনি দুঃখ-বিপদকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। শেষে নানা ঘটনাবিপর্য্যয়ের পর বৃটিশ সরকার স্বীকার করেন যে, তাঁহারা মিশরের স্বাধীনতা কি আকারের হইবে, সে সম্বন্ধে আপোষ কথা কহিতে প্রস্তুত আছেন। জজলুলের আন্তরিক নির্ভীক আন্দোলনের ইহাই ফল। বাঙ্গালীও এক দিন এমনই ভাবে বঙ্গভঙ্গের নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থাকে আন্তরিক নির্ভীক আন্দোলনের ফলে অনির্দ্দিষ্ট করিয়াছিল।

কিন্তু আপোষেও কোনও ফল হয় নাই। জজলুল পুনরায় নির্ব্বাসিত হয়েন। কিন্তু মিশরের অশান্তির অনল নির্ব্বাপিত হইল না। জজলুলের হাতে গড়া মুক্তিকামী মিশরের জাতীয় দলের আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করিল। অবশেষে ইংরাজ ১৯২২ খৃষ্টাব্দে মিশরের "বৃটিশ রক্ষিত রাজ্য" আখ্যা তুলিয়া দিয়া মিশরকে স্বাধীন রাজ্য এবং পূর্ব্বতন রাজপ্রতিনিধি ফাউদকে মিশরের রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিলেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে জজলুল মুক্ত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য বহুল পরিমাণে সাধিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তখনও মিশরের সুয়েজ খাল রক্ষায় এবং সুদান রক্ষায় ইংরাজসৈন্য নিযুক্ত ছিল; পরন্তু হাইকমিশনার প্রবাসী বিদেশীয়দের রক্ষকরূপে কর্তৃত্ব করিতেছিলেন। মিশরে অপরাধ করিলেও বিদেশীয়রা মিশরের আদালতে বিচারার্থ প্রেরিত বা দণ্ডিত হইতে পারিতেন না। জজলুল এই সকল প্রথারও পরিবর্ত্তনের জন্য আন্দোলন চালাইতে ক্ষান্ত হইলেন না। এই আন্দোলনকালে বৃটিশ সর্দ্দার সার লী ষ্টাক নিহত হয়েন এবং ইংরাজ

মিশরে রণতরী প্রেরণ করিয়া মিশরকে 'ধাতুস্থ' করেন, সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজের নির্দ্দেশে জগলুলকে প্রধান মন্ত্রীর পদত্যাগ করিতে হইল। ইহার পর তিনি জিওয়ার পাশার মন্ত্রিত্ব স্বীকার করিয়া এসেমব্লির প্রেসিডেণ্ট হইয়াছিলেন।

জগলুল এক সময়ে মহাত্মা গন্ধীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষপাতী হইয়া উহার অশেষ সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। কিন্তু নিজে মিশরে উহা প্রবর্ত্তন করেন নাই।

এমন লোক—এমন নেতা কচিৎ কখনও মানবমণ্ডলের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। তাঁহার প্রতিভা, তাঁহার ঐকান্তিক দেশপ্রেম, তাঁহার সঙ্ঘগঠনের ক্ষমতা, তাঁহার সাধুতা ও আন্তরিকতা, বিশেষতঃ তাঁহার অহঙ্কারশূন্যতা তাঁহাকে মানুষের মধ্যে নেতার আসন প্রদান করিয়াছিল। একবার কাইরো রেলষ্টেশনে এক চরমপন্থী তাঁহাকে গুলী করিয়াছিল। সেই মুহূর্ত্তে তিনি বলিতেছিলেন, "আল্লার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি আমার অহঙ্কার দমন করুন।" গুলীতে আহত হইয়া পড়িয়া যাইবার সময়ে জগলুল বলিয়াছিলেন, "আল্লা আমার প্রার্থনা শুনিয়াছেন।" লর্ড ক্রোমার তাঁহার বিপক্ষ-পক্ষের হইলেও বলিয়াছিলেন, "জগলুলের মত নেতা প্রত্যেক শ্রেণীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অর্জ্জন করিতে সমর্থ হয়েন। জগলুল সুদক্ষ নেতা, সাধু-চরিত্র, তিনি যাহা দেশের মঙ্গলকর বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাহা বলিতে কুণ্ঠিত হয়েন না।"

জগলুল পরলোকে প্রয়াণ করিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রভাব যুগে যুগে মিশরের উপর বিসর্পিত হইবে। তিনি গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার স্মৃতি অবিনশ্বর।

নৌবল-হ্রাসের বৈঠক

বৃটেন, মার্কিণ যুক্তপ্রদেশ ও জাপান,—পৃথিবীর এই তিন শ্রেষ্ঠ নৌশক্তি জেনিভা সহরে আপোষ বৈঠক বসাইয়া আপনাদের মধ্যে নৌশক্তি-হ্রাস করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ইহা ব্যর্থ হইয়াছে, মার্কিণ ও ইংরাজ পরস্পরের প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন নাই। জাপান মধ্যস্থতার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রকাশ, ইংরাজ নিজের নির্ব্বন্ধ কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে চাহেন নাই বলিয়া বৈঠক বিফল হইয়া গেল।

সকলেই জানেন, জার্ম্মাণ-যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, জগতে ভবিষ্যতে সকল যুদ্ধের অবসান করিতে। অর্থাৎ যাহাতে আর যুদ্ধ না হয়—যাহাতে আপোষে সকল বিবাদের নিষ্পত্তি হয়, তাহারই জন্ম জাতিনিচয় প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করিয়া জার্ম্মাণ-যুদ্ধ শেষ করিয়াছিলেন। ইহারই ফলে ওয়াসিংটন কন্‌ফারেন্স, লীগ অফ নেশানস্, ডিসার্মামেণ্ট কন্‌ফারেন্স,—কত কি? ফল তাহার যাহাই হউক, আড়ম্বরের ত্রুটি নাই। বৃটেন, মার্কিণদেশ ও জাপান,—ইহারাই জগতে প্রধান তিন নৌশক্তি। নৌবল গঠন যত ব্যয়সাপেক্ষ, এত আর কোনও বলগঠন নহে। প্রতি বৎসরই প্রত্যেক নৌশক্তি প্রতিযোগিতা করিয়া ক্রমাগত নৌবল বৃদ্ধি করিতেছেন—এ বৃদ্ধির যে কবে কোথায় অবসান হইবে, তাহা কেহ স্থির করিতে পারেন না। ফলে এই হইতেছিল যে, দেশের অন্যান্য অত্যাবশ্যক জাতি ও দেশ-গঠনমূলক কার্য্যের ইহাতে সমূহ ক্ষতি হইতেছিল। তাই এই তিনশক্তি পরামর্শ করিয়া লীগ অফ নেশানের আহ্বানে জেনিভায় এই আপোষ-বৈঠক বসাইয়াছিলেন। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ২০শে জুন তারিখে বৈঠকের উদ্বোধন হয়। বৃটিশ পক্ষে মিঃ ব্রিজম্যান (ফার্ষ্ট লর্ড অফ দি এডমিরাল্টি), মার্কিণ পক্ষে মিঃ হিউ গিবসন্ (বেলজিয়ামের মার্কিণ দূত) এবং জাপানের পক্ষে এডমিরাল সাইটো প্রতিনিধিরূপে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। ৪ঠা আগষ্ট পর্য্যন্ত বৈঠকের অধিবেশন চলিয়াছিল; অবশ্য মাঝে মাঝে মুলতুবিও ছিল। তাহার পর ৪ঠা আগষ্ট বৈঠক উহার উদ্দেশ্য সাধন না করিয়াই ভাঙ্গিয়া গেল! পর্ব্বত মূষিক প্রসব করিল! বলা হইতেছে বটে, বৈঠক মুলতুবি রহিল মাত্র এবং পক্ষগণ কাহারও প্রতি বিদ্বিষ্ট ভাব পোষণ করিয়া সরিয়া দাঁড়ান নাই, তথাপি বুঝিয়া লইতে বাকি থাকে না যে, কেহ কাহারও এক চুল স্বার্থ ছাড়িতে সম্মত নহেন। নৌবলের প্রত্যেক অংশের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞরা জানেন, সাধারণ লোক উহার খবর রাখেন না, কাযেই কি সূত্রে ইংরাজ ও মার্কিণে মতবিরোধ ঘটিল, তাহা সবিশেষ বর্ণনা করা কঠিন। তবে এইটুকু বুঝা যায় যে, ক্রুইজার শ্রেণীর রণতরী রক্ষা ও গঠন করিবার অধিকার লইয়াই এই মতবিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল; ডেস্‌ট্রয়ার ও সাবমেরিণ শ্রেণীর রণতরীর সম্পর্কে কোন গোল উপস্থিত হয় নাই।

কিন্তু মার্কিণের প্রতিনিধি ক্রুইজার শ্রেণীর রণতরীর টনেজ (মোট কত টন রণতরী কে রাখিতে পারেন এবং সেই ওজনের মধ্যে কত রণতরী নির্ম্মাণ করিতে পারেন) সম্বন্ধে যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, বৃটিশ প্রতিনিধি তাহাতে সম্মত হয়েন নাই। জাপান মধ্যস্থতার চেষ্টা করেন; কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হয় নাই। এই রফা-বন্দোবস্ত ভঙ্গের ফলে উভয় জাতির মধ্যে বেশ একটু মনোমালিন্য হইয়াছে। যদিও বৃটিশ পক্ষ তাহা স্বীকার করিতেছেন না, তথাপি মার্কিণ সংবাদপত্রসমূহে যে ভাবের মন্তব্য প্রকাশিত হইতেছে, তাহাতে মনে হয়, মার্কিণ এ ব্যাপারে ইংরাজকেই বৈঠক ভঙ্গের জন্য দায়ী করিতেছেন।

বিশেষতঃ লর্ড সিসিল পদত্যাগ করায় এই সন্দেহ ঘনীভূত হইয়াছে। লর্ড সিসিল বৃটিশ মন্ত্রিমণ্ডলের অন্যতম সদস্য। তিনি পদত্যাগের যে কারণ দেখাইয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, তিনি বলডুইন সরকারের অন্যায় জিদকেই রফা-ভঙ্গের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। কিন্তু বৃটিশ সংবাদপত্রসমূহ বলিতেছেন, ইংরাজের স্বার্থরক্ষার জন্য যেটুকু সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন, তাহা ইংরাজ অবলম্বন করিতে বাধ্য। ইংরাজ চিরদিন পৃথিবীর জলপথে শান্তিরক্ষকের কর্ত্তব্য পালন করিয়া আসিয়াছেন, তিনি জগতে সর্ব্বপ্রধান নৌশক্তি; সে জন্য তাঁহার পক্ষে তাঁহার পদোপযোগী নৌবল রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। মার্কিণ যে ভাবের রফার প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। তবে ইংরাজ কিরূপে এ রফায় সম্মত হইতে পারেন?

ফলে এখন নৌজগতে আবার পাল্লাপাল্লি চলিল। মার্কিণ ধনবলে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্; সুতরাং তিনি নিজের নৌবলকে সর্ব্বপ্রধান রাখিতে অর্থব্যয়ে কুণ্ঠিত হইবেন না। ইংরাজ ত নৌবলে প্রধান আছেনই, থাকিবারও চেষ্টা করিবেন। তবেই হইল, আবার জগতে ভবিষ্যতে আর এক বিশ্বযুদ্ধের আয়োজন অনুষ্ঠিত হইয়া রহিল। সুতরাং জার্ম্মাণ-যুদ্ধে লোক ও অর্থক্ষয় বৃথা হইয়াছে, এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। জার্ম্মাণ-যুদ্ধ সকল যুদ্ধের অবসান করিবে, এই ভবিষ্যদ্বাণীর সার্থকতা রহিল না। সাম্রাজ্যবাদের মদিরা যত দিন জগতের শক্তিসমূহকে উন্মত্ত করিয়া রাখিবে, তত দিন জগৎ এই ভাবেই চলিবে, শান্তি-প্রতিষ্ঠার কোনও আশা থাকিবে না।

ষড়যন্ত্রের হলাহল

কে এক জর্জ্জ পিলচার আর ক্যাথারিণ মেও নামে শ্বেতাঙ্গ শ্বেতাঙ্গী, এ দেশের নরনারীর বীভৎস নৈতিক চরিত্রের মিথ্যা চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে বলিয়া, আমাদের মধ্যে বিশেষ চিত্তবিক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছে এবং সেই হেতু দেশের সর্ব্বত্র সভাসমিতি করিয়া, সংবাদপত্রে প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিয়া, তাহাদের জঘন্য উক্তির প্রতিবাদ হইতেছে। হইবারই কথা, কেন না ভারতবাসী বহুদিনের দাসমনোবৃত্তিতে অভ্যস্ত হইয়া বিদেশী বিধর্ম্মীর নিকট সকলপ্রকার অপমান ও লাঞ্ছনা অবাধে গলাধঃকরণ করিতে সমর্থ হইলেও এখনও তাহাদের একমাত্র গৌরবের বস্তু—নৈতিক চরিত্র ও অন্তঃপুরচারিণী কুললক্ষ্মীর সতীত্ব ও শুচিতার বিরুদ্ধে বিন্দুমাত্র কটাক্ষ-ইঙ্গিত সহ্য করিতে পারে না। প্রাচীনকালের মেকলে হইতে আরম্ভ করিয়া, আমাদের সময়ের লর্ড লীটন পর্য্যন্ত অনেক বিদেশী, বিধর্ম্মী, বিশিষ্ট শ্বেতাঙ্গ আমাদের জাতীয় চরিত্রের অযথা বৃথা নিন্দাবাদ প্রচার করিয়া আসিয়াছে—উহা আমাদের 'গা-সহা' হইয়া গিয়াছে, কিন্তু বর্ত্তমানে মেও-পিলচার শ্রেণীর ক্ষুদ্র কীটের দংশনে একটু বিশেষত্ব আছে বলিয়াই দেশময় এই চিত্তবিক্ষোভ দেখা দিয়াছে। মেকলে-লীটন শ্রেণীর লোক যেমন আমাদের জাতির নর-নারীর মিথ্যা কুৎসা প্রচার করিয়াছে, তেমনই উহাদেরই মত শত শত বিশিষ্ট বিদেশী আমাদের নৈতিক চরিত্রের শতমুখে প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন; সুতরাং উহাদের মিথ্যা প্রচারের প্রতিবাদ উহাদের দেশের লোকের দ্বারাই হইয়াছে। এ ক্ষেত্রেও যে হয় নাই তাহা নহে, সেই প্রতিবাদের কথা আমরা পরে উদ্ধৃত করিব। তবে মেকলে-লীটনের প্রচারকার্য্যের সহিত বর্ত্তমানের চুনোপুঁটির প্রচারকার্য্যের প্রভেদ এই যে, মেকলে-লীটন কতকটা অজ্ঞতার জন্য এবং কতকটা কথার ওজন না বুঝিয়া, মিথ্যা রটনা করিয়াছিল, এ ক্ষেত্রে মেও-পিলচার কোম্পানী জানিয়া শুনিয়া স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে ইচ্ছাপূর্ব্বক সত্য গোপন করিয়া, পরের ভাড়াটিয়া গুণ্ডার দ্বারা নরহত্যার মত সাধুতা ও সত্যপরায়ণতার—নীতি ও ধর্ম্মের—নিরপেক্ষতা ও ন্যায়বিচারের হত্যা সাধন করিয়াছে,—একটা প্রাচীন সুসভ্য, ধর্ম্মপরায়ণ, আধ্যাত্মিক জগতে উচ্চ স্থানপ্রাপ্ত জাতির সুনাম, তাহাদেরই নিজের আদর্শের কলঙ্কপঙ্কে টানিয়া আনিয়া নিমজ্জিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে।

ক্যাথারিণ মেও মার্কিণ দেশের নারী বলিয়া অভিহিত। সে অবিবাহিতা 'কুমারী' এবং 'স্বাধীন-উপায়-জীবিনী' (Of Independent means) বলিয়া বর্ণিত। 'স্বাধীন-উপায়-জীবিনী' বলিতে কি বুঝায় আমরা জানি না। তবে এই স্বাধীন-উপায়-জীবিনী অবিবাহিতা কুমারী কি জন্য হঠাৎ এ দেশের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া, এ দেশে আসিয়া নানাস্থান ঘুরিয়া তাহার "Mother India" ভারতমাতা নামক গ্রন্থে ভারতীয় নরনারীর অধঃপতিত কলঙ্কিত নৈতিক চরিত্রের চিত্র অঙ্কিত করিয়া প্রতীচ্যের সর্ব্বত্র প্রচার করিয়াছে, তাহা আমরা বিলক্ষণ বুঝিতে পারি। এই নারী কেবল ভারতের নরনারীর দুঃখে গলিয়া গিয়া, তাহাদের নৈতিক চরিত্র সংশোধনের উদ্দেশ্যে তাহার রচিত গ্রন্থ প্রচার করিয়াছে, ইংরাজী সংবাদপত্রে ইহাই প্রকাশ। অথচ মজা এই যে, যাহাদের 'উপকারের' জন্য এই বীভৎস-করুণাময়ী সংস্কার-প্রয়াসিনী অবিবাহিতা স্বাধীন-উপায়-জীবিনী নারী অযাচিত ভাবে পরিশ্রম করিয়া গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তিনি তাহাদের কাহাকেও একখানি গ্রন্থ পাঠ করিয়া চরিত্র 'সংশোধন' করিবার জন্য প্রেরণ করেন নাই, তাঁহার গ্রন্থ য়ুরোপে ও আমেরিকায় হাজার হাজার প্রচার করিয়াছেন। অথচ এমন নহে যে, তিনি ইতঃপূর্ব্বে কখনও গ্রন্থপ্রণয়ন করেন নাই বা ভারতীয় সংবাদপত্রসেবিগণকে সমালোচনার জন্য প্রেরণ করেন নাই। ইহাতেই তাঁহার সাধু উদ্দেশ্য অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। আরও প্রকাশ, যখন এই যূপকাষ্ঠ সমীপবর্ত্তী পশুসম পরহিতে উৎসর্গিতপ্রাণা অবিবাহিতা কুমারী ভারতের হিতকার্য্য সাধনের জন্য যাত্রা করেন, তখন বিলাতের ইণ্ডিয়া আফিস হইতে এখানকার সরকারের বড় বড় রাজপুরুষদের নামে 'চিঠিপত্র' আনিতে ভুলেন নাই। আবার এ দেশে আসিয়াও এখানকার বহু রাজপুরুষ ও গোয়েন্দা পুলিসের সাহায্যগ্রহণে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য প্রদর্শন করেন নাই। পঞ্জাবের সর্দ্দার শার্দ্দুল সিংহ সংবাদপত্রে এ বিষয়ে যাহা প্রকাশ্যে

ঘোষণা করিয়াছেন, তাহাতেই বুঝা যায়, এই নারী কি উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। তিনি বলেন, এই নারী যখন লাহোরে উপস্থিত হয়েন, তখন এক জন গোয়েন্দা পুলিস তাঁহার আদেশ পালন করিবার জন্য অনুক্ষণ মোতায়েন হইয়াছিল। সেই পুলিস তাঁহার উপকরণ সংগ্রহে সহায়তা করিত। সর্দ্দারজীর এক পুরাতন বন্ধু গোয়েন্দা পুলিসের কর্ম্মচারী ছিলেন, তিনি টেলিফোঁ-যোগে তাঁহাকে এই আমেরিকান নারীর সহিত সাক্ষাৎ ও কথোপকথন করিবার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু সর্দ্দার শার্দ্দূল সিংহ যখন জানিতে পারেন, উহা তাঁহার বন্ধুর ব্যক্তিগত অনুরোধ নহে, কোনও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীর হুকুমমত অনুরোধ, তখন তিনি দেখা করিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। ইহাতেই বুঝা যায়,এ দেশের রাজপুরুষরা এই নারীর উপকরণ সংগ্রহে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। সুতরাং ক্যাথারিণ মেয়োর অযাচিত ভারতপ্রেমের ও সমাজ-সংস্কারের বাসনার মূলে যে অন্য কারণ বিদ্যমান ছিল, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

ক্যাথারিণ মেয়ো এই গ্রন্থ-রচনার পূর্ব্বে এই প্রকৃতির আর একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিল, তাহার নাম 'The Isles of Fear,' অর্থাৎ বিভীষিকাময় দ্বীপপুঞ্জ। এই গ্রন্থের সহিত "Mother India"র ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বীপপুঞ্জ বলিতে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ এবং সেখানকার অধিবাসী ফিলিপিনোরা অত্যন্ত নোংরা অসভ্য কদাচারী জাতি, ইহাই প্রতিপন্ন করা ঐ গ্রন্থের উদ্দেশ্য ছিল। অর্থাৎ তখন ফিলিপিনোদিগকে স্বায়ত্তশাসন দিবার কথা হইতেছিল; ফিলিপিনোরা সে জন্য ঘোর আন্দোলন করিতেছিল এবং মার্কিণের (ফিলিপাইনের মালিক) অনেক লোক তাহাদিগকে স্বায়ত্তশাসন দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছিলেন। ঠিক সেই সময়ে ক্যাথারিণ মেয়ো ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারিয়া ফিলিপিনোদের দুঃখে গলিয়া গিয়া ঐ গ্রন্থ রচনা ও প্রচার করে। ঠিক এই ব্যাপারের মতই কি "Mother India" রচনা ও প্রচারের ব্যাপারের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই? ফিলিপিনোরা যেমন মার্কিণ জাতির অধীন, আমরাও তেমনই ইংরাজের অধীন। তাহারা যেমন স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দাবী করিয়াছিল এবং মার্কিণদের মধ্যে অনেকে ঐ অধিকার দানের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, আমরাও তেমনই স্বায়ত্তশাসন অধিকারের দাবী করিতেছি এবং ইংরাজ প্রভুও রয়াল কমিশন প্রেরণ করিতেছেন। মার্কিণের সাম্রাজ্যবাদীরা ফিলিপাইনের প্রভুত্ব হস্তচ্যুত হয়, এই আশঙ্কায় যেমন কোনও প্রতীকারোপায় গ্রহণ করিতে পশ্চাৎপদ হয় নাই, আর তাহারই ফলে ভাড়াটিয়া লেখক ক্যাথারিণ মেয়োর অভ্যুদয়,—তেমনই রয়াল কমিশন আসিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ক্যাথারিণ মেয়োর ইণ্ডিয়া আফিসের পত্র-গ্রহণ, ভারতযাত্রা, রাজপুরুষ ও গোয়েন্দা পুলিসের সাহায্য গ্রহণ, 'ভারতমাতা' রচনা ও প্রচার।

শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল বলিয়াছেন যে, এই গ্রন্থ প্রচারমূলে রাজনীতিক উদ্দেশ্য নাই, ইহা খৃষ্টান মিশনারীদিগের প্রচারকার্য্যের জন্য লিখিত। কিন্তু আমরা এ কথার সমর্থন করিতে পারি না। যদি তাহাই হয়, তবে ইহা ঠিক, এই সময়ে প্রচারিত হইল কেন? পরন্তু যাহাদের চরিত্র সংশোধনের উদ্দেশ্যে ইহা লিখিত বলিয়া প্রকাশ, তাহাদের দেশে ইহার প্রচার না হইয়া বিলাতে ও অন্যান্য প্রতীচ্য দেশে প্রচারিত হইল কেন? যাহাতে এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া ইংরাজরা ভারতীয় নরনারীর জঘন্য চরিত্রের বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়া তাহাদিগকে বর্ব্বর নিকৃষ্ট জাতি বলিয়া ধারণা করিয়া স্বায়ত্তশাসনের অনুপযুক্ত বলিয়া মনে করে এবং মার্কিণ ও অন্যান্য পাশ্চাত্য জাতিরাও সেইরূপ ধারণার বশীভূত হয়,—এই উদ্দেশ্যে কি ঐ গ্রন্থ পাশ্চাত্য দেশসমূহে প্রচারিত হয় নাই? আর ঠিক এই ভাবের মন্তব্য 'নিউ ষ্টেটশম্যান' প্রমুখ বিলাতী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে—তাহারা বলিতেছে, এমন জঘন্য জাতির পক্ষে স্বায়ত্ত-শাসনের উপযুক্ত হইতে এখনও অনেক বিলম্ব।

জর্জ্জ পিলচারও ঠিক সময় বুঝিয়া বিলাতে ভারতীয় নারীর চরিত্র সম্বন্ধে জঘন্য ইঙ্গিত করিল কেন? সে পূর্ব্বে 'ষ্টেটশম্যান' পত্রের একজন সহকারী সম্পাদক ছিল। এই অভিজ্ঞতার জোরে সে বিলাতে যাইবার পর এ কথা ত বহুদিন পূর্ব্বেই বলিতে পারিত। সে পার্লামেণ্টের সদস্য হইবার পর ত ভারতীয়গণের নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে নিজের মতামত প্রকাশ করিতে পারিত। কিন্তু এত দিন তাহা না করিয়া ঠিক এই সময়ে ক্যাথারিণ মেয়োর গ্রন্থ প্রচারের প্রায় সমসময়ে তাহার অভিমত প্রকাশ করিল কেন? ইহাতেও কি কার্য্য-কারণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ পরিলক্ষিত হইতেছে

না ? সুতরাং মেও-পিলচারের রচনা প্রচারের মূলে যে ঘোর ষড়যন্ত্র আছে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। আর 'ষ্টেটশম্যান' প্রমুখ অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্র এই সকল জঘন্য মিথ্যা রচনাকে বক্ষে স্থান দিয়া যে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছে, তাহাও এদেশের লোকের দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই। 'ষ্টেটশম্যান' মহান্ 'ভারতবন্ধুর' মত ভারতবাসীকে উপদেশ দিয়াছে, ভারতীয়ের নৈতিক চরিত্রের অবনতি দেখাইয়া এই যে সব রচনা প্রচারিত হইয়াছে, ভারতবাসীর পক্ষে তাহার পাল্টা জবাব না গাহিয়া উহাদের যুক্তি সদ্যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করা উচিত। অর্থাৎ ইংরাজ যেন আমাদের নৈতিক চরিত্রের দোষগুণের বিচারে বসিয়াছেন, আর আমরা তাঁহাদের দরবারে আমাদের নৈতিক চরিত্রের দোষক্ষালনের জন্য দ্বারস্থ হইয়াছি !

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারতবাসীর কিছু নাই—তাহার ধনসম্পদ, স্বাস্থ্য, শক্তি, বিদ্যা, বুদ্ধি, আয়ু, যশ, মান কিছুই নাই। কিন্তু এখনও তাহার যদি কিছু গৌরব করিবার থাকে, তাহা হইলে আছে তাহার নৈতিক চরিত্র এবং সর্ব্বোপরি তাহার অন্তঃপুরচারিণী কুললক্ষ্মীদিগের বিশুদ্ধতা, পবিত্রতা, শুচিতা, দেবীত্ব। হিন্দুর গৃহে নারী কুললক্ষ্মী, দেবী ; হিন্দুর গৃহে জননী, ভগিনী, জায়া সাক্ষাৎ দেবীরূপিণী—সংসারের গৃহিণী, সর্ব্বেসর্ব্বময়ী কর্ত্রী, সুখদুঃখবিধায়িনী ভাগ্যনিয়ন্ত্রী,—তাঁহার কোমল অথচ কঠোর শাসন প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র ভ্রাতা অথবা স্বামী সপরিবারে অবনতমস্তকে স্বীকার করে। হিন্দু পরিবারে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতধারিণী বিধবা ধর্ম্মে কর্ম্মে, আর্ত্তপীড়িতের সেবায়, অতিথি-ভিখারীপালনে, সংসারের সুখ-দুঃখ-বিধানে মূর্ত্তিমতী করুণা, ধরিত্রীর মত সর্ব্বংসহা। এক জন পাশ্চাত্য লেখকই বলিয়া গিয়াছেন,—

"Fidelity, devotion, chastity have been the guiding principles of the women of India."

প্রাচীন যুগের সীতা সাবিত্রী দময়ন্তীর কথা তুলিব না, আধুনিক ইংরাজ আমলের বা তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের রাজপুতনারীর আত্মত্যাগের কথা, প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী অহল্যাবাঈ, রাণী ভবানী, জাহ্নবী চৌধুরাণী, শরৎসুন্দরী প্রভৃতি হিন্দু-বিধবার নামও কি পিলচার-মেও কোম্পানী অথবা তাহাদের সুরে পোঁ-ধরা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্র লেখকরা শুনেন নাই ? 'ইংলিশম্যান' মিস কর্ণেলিয়া সোরাবজীর বচন উদ্ধৃত করিয়া, ক্যাথারিণ মেয়োকে সমর্থন করিতে লজ্জানুভব করে নাই। কর্ণেলিয়া সোরাবজীর গৃহে ক্যাথারিণ মেয়ো অতিথি হইয়াছিল। কর্ণেলিয়া সোরাবজী তাহাকে রচনার অনেক উপকরণ যোগাইয়াছিল, ইহাও প্রকাশ পাইয়াছে। পার্শী কর্ণেলিয়া শুনিয়াছি বিজাতীয় আদর্শে গঠিত ; সুতরাং তাহার নিকট অথবা তাহার মত 'ভারতীয়ের' নিকট ক্যাথারিণ মেয়ো ভারতীয়ের নৈতিক চরিত্রের কি পরিচয় পাইতে পারে ? এ দেশের পুরুষের নৈতিক চরিত্রের অথবা নারীর সতীত্বের আদর্শের ধারণা মেও-পিলচারের কিরূপে হওয়া সম্ভবপর ? যাহাদের দেশে একান্নবর্ত্তী পরিবারের কল্পনা অসম্ভব—যাহাদের বিবাহবিচ্ছেদের মামলায় আদালত পুষ্ট, তাহাদের পক্ষে হিন্দু-পরিবারে বিধবার স্থাননির্ণয় করা অথবা নরনারীর নৈতিক চরিত্রের পরিমাপ করা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে ?

পিলচার যথার্থই ক্ষমারও অযোগ্য। এই হতভাগ্য বলিয়াছে যে, The Hindu widows are sluts at home and prostitutes abroad,—অর্থাৎ "হিন্দু বিধবারা গৃহে নোংরা অপরিচ্ছন্না, বাহিরে বেশ্যা !" যাহারা মলমূত্র ত্যাগ করিয়া জলশৌচ করিতে জানে না, যাহারা প্রায় অর্দ্ধসিদ্ধ আমমাংস ভোজনে অভ্যস্ত, যাহাদের শৌচ ও পরিচ্ছন্নতার দৌড় এসেন্স সাবান পাউডার রুজে (নিত্য তিন চারি বার স্নানে বা নিত্যকৃত্যে নহে), তাহারা হিন্দু বিধবার পরিচ্ছন্নতার ধারণা করিবে কিরূপে ? আর যাহাদের মধ্যে গৃহস্থনারীর পরপুরুষের অঙ্কগতা হইয়া নৃত্য করা সভ্যতা-ভব্যতা ও শ্লীলতার অঙ্গ, তাহারা বিধবার ব্রহ্মচর্য্য বা সতীত্বের ধারণা করিবে কিরূপে ? বেশ্যা জগতের কোথায়, কোন জাতির মধ্যে নাই ? কিন্তু জগতের কোথায় বিবাহের আবরণে অসতীবৃত্তি ঢাকিয়া রাখিয়া নারী সমাজে ও পরিবারে গৃহিণীরূপে বিরাজ করে ?

আমরা কোন সমাজের কোন নারীর প্রতি অসম্মান বা অমর্য্যাদাসূচক বাক্যপ্রয়োগে একান্ত অনিচ্ছুক। আমাদের বিশ্বাস, নারীজাতি দেবতুল্য,—এ জগতের ধূলিমলিন পঙ্কিল পথ হইতে দূরে নিরাপদ বিশুদ্ধ অন্তঃপুরে রাখিয়া, আমরা তাই তাঁহাদের পূজা করি। জগতে সকল জাতির নারীই

অন্তরে পুরুষের অপেক্ষা অনেক অধিক পবিত্র, অনেক অধিক দেবভাবাপন্ন, এ ধারণা আমাদের আছে। স্বার্থসর্ব্বস্ব কামান্ধ পুরুষের কঠোর সংস্পর্শে নারীর পবিত্রতা নষ্ট হয় মাত্র! এই হেতু আমরা মেও-পিলচারের মত তাহাদের দেশের ব্রণানুসন্ধানে লেখনী কলঙ্কিত করিতে চাহি না। তবে তাহাদের মিথ্যা রটনার তর্কজাল ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিতে চাহি।

জর্জ্জ পিলচার তাহার জঘন্য মিথ্যা প্রচারের সপক্ষে কোনও যুক্তি প্রদান করে নাই। সুতরাং তাহার মত ক্ষুদ্র কৃমিকীটের বিষোদ্গারের কোনও মূল্য নাই, উহা আমরা ঘৃণাভরে পদদলিত করিতে পারি অথবা যে বিষ্ঠাকুণ্ড হইতে উহা উত্থিত হইয়াছে, সেই বিষ্ঠাকুণ্ডে উহা নিক্ষেপ করিতে পারি!

কিন্তু পিলচার অন্যান্য যুক্তির দ্বারা এ দেশের নানা আচার-ব্যবহারের অপকারিতা যুক্তি-তর্কের দ্বারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। প্রথমে সে বলিয়াছে, ভারতবাসীরা তাহাদের আচার-ব্যবহারের কল্যাণে দুর্ব্বল শিশুতে—পেরামবুলেটারে (ছোট ঠেলাগাড়ীতে) উপবিষ্ট শিশুতে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু মিথ্যাবাদী পিলচার একথাটা বলিতে ভুলিয়াছে যে, দুই শত বৎসরের ইংরাজ-শাসনে ভারতবাসী এই অবস্থায় পরিণত হইলেও, ভারতবাসী চিরদিন এইরূপ ছিল না। ইংরাজ ও ফরাসী যখন ভারতের প্রাধান্যলাভের চেষ্টায় পরস্পর কাটাকাটি করিতেছিল, তখন ভারতবাসীই উভয় পক্ষকে সহায়তা করিয়াছিল। ভারতবাসীর প্রতিকূলতায় ইংরাজ ভারত-জয় করিতে পারে নাই, ভারতবাসীর আনুকূল্যেই করিয়াছিল। ক্লাইভ যখন আর্কট অবরোধ করেন, তখন ভারতীয় সিপাহীরা ফেন খাইয়া গোরাদিগকে ভাত খাওয়াইয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল, আর তাহারাই ক্লাইভের বাঙ্গালা-লাভে পলাশীর ক্ষেত্রে বন্ধুরূপে দাঁড়াইয়াছিল। ইংরাজকে মারাট্টা ও শিখদিগের সহিত রীতিমত যুদ্ধ করিয়া ভারত-জয় করিতে হইয়াছিল। দেড় শত বৎসরের মধ্যে যদি সেই ভারতবাসী দুর্ব্বল শিশুতে পরিণত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেটা তাহাদের আচার-ব্যবহারের পক্ষে কলঙ্কের কথা নহে, সেটা ইংরাজ-শাসনেরই কলঙ্ক; কেন না, আচার-ব্যবহার তখনও যাহা ছিল, এখনও তাহাই আছে। যে 'ষ্টেটশম্যান' পিলচারের কুৎসার রচনা প্রকাশ করিয়াছে, সেই 'ষ্টেটশম্যানই' বলিতে বাধ্য হইয়াছে যে, "বাঙ্গালীর ছেলে খালি পায়ে বড় বড় গোরাদলের বিপক্ষে ফুটবল খেলিয়া যে কৃতিত্ব দেখাইতেছে এবং সন্তরণ বাচ খেলা, হকি খেলা, দৌড়ঝাঁপ ইতি মনুষ্যত্বব্যঞ্জক খেলায় যে পারদর্শিতা দেখাইতেছে, তাহাতে সমস্ত ভারতবাসীকে দুর্ব্বল শিশু বলা সাজে না।" আমরা ইহার উপর এইটুকু যোগ করিয়া দিতেছি যে, ৪৯ সংখ্যক বাঙ্গালী পলটনে অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদাতিক ভারতীয় সেনাদলেও কি সামরিক কর্ত্তারা ঠেলাগাড়ীর শিশু বাছিয়া ভর্ত্তি করিয়াছিলেন? এত বড় পাহাড়ে মিথ্যাবাদী যে স্বার্থসাধনের জন্য হিন্দু-বিধবাদের কুৎসা রটনা করিবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে?

তাহার পর পিলচার বলিয়াছে, "এখনও ভারতবাসীরা ৯ হইতে ১৩ বৎসরের মধ্যে বালিকার বিবাহ দেয়। তাহাদের প্রসূত সন্তানগুলির ওজন গড়ে ৪ পাউণ্ড বা পৌণে ২ সের হইয়া থাকে। তাহাদের এই সন্তানদিগের মধ্যে শতকরা ২৫টি প্রথম বৎসরেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।" পিলচার এই তথ্য কোথায় সংগ্রহ করিয়াছে জানি না, নিজে যে প্রত্যেক ভারতীয়ের সূতিকাগারে গিয়া সদ্যোজাত শিশুকে ওজন করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে, তাহা হইতে পারে না। সম্ভবতঃ দুই একটা freaks of nature হাঁসপাতালে দেখিয়া থাকিবে। এমন তাহাদের দেশেও দেখা যায়। তাহা বলিয়া উহাকে সাধারণ নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না।

আরও এক কথা, এই অনশনক্লিষ্ট ব্যাধিপীড়িত দুর্দ্দশাগ্রস্ত পরাধীন দেশে এমন শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া আশ্চর্য্য নহে। ভারতে বাল্যবিবাহ চিরদিনই প্রচলিত আছে, অন্ততঃ কিছুকাল হইতে যে আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বাল্যবিবাহের ফলে সন্তানসন্ততিরা যে ওজনে কম হয়, তাহা দেখা যায় নাই। তাহিরপুরের রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় সহবাস সম্মতি আইনের আন্দোলনের যুগে সাবিত্রী লাইব্রেরীর সভায় বলিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার জননীর একাদশ বর্ষ বয়সের সন্তান,—এ কথা আমাদের বিলক্ষণ স্মরণ আছে। অথচ রাজা শশিশেখরকে তখন আমরা রীতিমত বলিষ্ঠ ও হৃষ্টপুষ্ট দেখিয়াছিলাম। এই বাঙ্গালার প্রতাপাদিত্য, চাঁদ রায়, কেদার রায়, মেনা হাতী, সীতারাম রায়,—সকলেই বাল্যবিবাহের সন্তান ছিলেন। তাঁহারা যে ঠেলাগাড়ীর শিশুর

মত দুর্ব্বল ও ওজনে কম ছিলেন, ইতিহাসে তাহার প্রমাণ নাই। সেক্সপিয়ারের 'রোমিও জুলিয়েটের' জুলিয়েটের বয়স চতুর্দ্দশ বর্ষ বলিয়া বর্ণিত আছে। সেজন্য জুলিয়েটের প্রেমে বা বিবাহে কোনও প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয় নাই। সুতরাং বাল্যবিবাহের সন্তান হইলেই যে দুর্ব্বল হয়, এ কথা সত্য নহে। বিশেষতঃ এখন ভারতীয় হিন্দুরা আপনা হইতেই বাল্যবিবাহ-প্রথা ধীরে ধীরে উঠাইয়া দিতেছে। পিলচার ২৫ বৎসর পূর্ব্বের বাল্য-বিবাহের কথা তুলিতে পারে, এখনকার দিনে পারে না। এখনকার দিনে হিন্দুর ঘরে ১৫ হইতে ১৮ বৎসরের মধ্যে কন্যার বিবাহ সাধারণ হইয়া যাইতেছে। আর একটা কথা, মুসলমানদের মধ্যেও বাল্যবিবাহ প্রচলিত আছে, সেই বিবাহের ফল ত দুর্ব্বল সন্তান নহে।

পিলচার ভারতীয় বিধবার সতীত্ব সম্বন্ধে কুৎসিত ইঙ্গিত করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার স্বপক্ষে কোন যুক্তি দেয় নাই। তাহার সতীত্বের ধারণা কিরূপ জানি না। তাহাদের দেশে আমরণ কুমারীর সংখ্যা কত, এবং তাহাদের কুকীর্ত্তি কত, তাহার দেশের অনেক কেতাবে প্রকাশ। তাহার দেশে আইন করিয়া যুদ্ধের পর কানীন সন্তানকে (War-babies) বৈধ করিয়া লইতে হইয়াছিল, এ কথাও বোধ হয় পিলচারের অবিদিত নহে। জার্ম্মাণ যুদ্ধ-স্থগিতের দিন (Armistice Day) যে সকল ভারতীয় লণ্ডনে ছিলেন, তাঁহারা সেই দিনের বীভৎস যথেচ্ছাচারের যে বর্ণনা করেন, তাহা শুনিলে কর্ণে অঙ্গুলি দিতে হয়। আর যুদ্ধের সময়ে কুমারীদিগকে হন্যে হইয়া গোরাবারিকের কাছে ঘুরিয়া বেড়ান হইতে নিবৃত্ত করিতে girl guideরা যে নিযুক্ত হইয়াছিল, ইহা তখনকার সমর-ইতিহাসে আছে। ইহাই যদি পিলচারের দেশের নারীর লজ্জাশীলতা ও সতীত্বের মাপকাঠি হয়, তাহা হইলে সেই 'সতীত্ব' হইতে আমাদের দেশের বিধবারা যত দূরে থাকেন, ততই মঙ্গল!

ক্যাথারিণ মেও উক্তি সমর্থনের জন্য অনেক যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়াছে। তাহার গ্রন্থ আমরা পাঠ করি নাই, তবে সেই গ্রন্থ সম্বন্ধে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রসমূহে যে সকল সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, সে আমাদের ধর্ম্মগত ও সমাজগত অনেক 'অনাচারের' নিন্দা করিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কালীঘাটে পশু-বলির সম্বন্ধে তাহার উক্তির কথা উল্লেখ করা যায়। ক্যাথারিণ মেও বলিয়াছে, "হিন্দুনারীরা সন্তান-লাভের আশায় কালীর সম্মুখে বলির ছাগের রক্তপান করে।" এত বড় নির্জ্জলা মিথ্যা বোধ হয় মেকলেও প্রচার করিতে সাহস করে নাই। অথচ তখন ইংরাজ-শাসনের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ! কোন হিন্দু-নারী কালী পূজা দিতে গিয়া ছাগরক্ত পান করে, এমন কথা ভূভারতে কেহ শুনিয়াছেন কি?

তাহার পর এই মিথ্যাবাদিনী নারী বলিয়াছে, "ভারতীয়রা মৃতদেহ সৎকারের পর নাভিকুণ্ডের মধ্যে মোহর দিয়া জলে ফেলিয়া দেয় এবং পুনরায় মোহর লইবার জন্য সন্তরণ-দ্বারা নাভিকুণ্ডের উদ্ধার করে।" কোনও হিন্দু শ্মশানে এই দৃশ্য দেখিয়াছেন কি? প্রাচীন যুগে যখন ইংরাজরা 'ডাইনী" বলিয়া জিন ডার্কের মত মহিলাকে খোঁটায় বাঁধিয়া পুড়াইয়া মারিয়াছিল, আজ ইংরাজ রাজত্বে সেই ব্যবস্থা থাকিলে এই মিথ্যাবাদিনীর কি শাস্তি হইত?

ক্যাথারিণ মেও অন্যত্র বলিয়াছে—

"Bengal is also among the most sexually exaggerated regious of India; and medical and police authorities in any country observe the link between that quality and queer criminal minds."

অর্থাৎ ক্যাথারিণ মেওর মতে 'ইন্দ্রিয়-চালনার বিষয়ে বঙ্গদেশ ভারতের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশ; সকল দেশের চিকিৎসা-শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ব্যক্তিগণ এবং পুলিসের কর্ত্তৃপক্ষগণ বলিয়া থাকেন যে, লোকের এই দোষ থাকিলে তাহার মনও অতি উদ্ভট পাপের পরিচয় প্রদান করে।' ক্যাথারিণ মেও বাঙ্গালা দেশের লোককে নাড়াচাড়া করিয়া তাহাদের আর কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিতে পারে নাই, কেবল এই দোষটাই দেখিয়া গিয়াছিল, এইটুকুই আশ্চর্য্য!

ক্যাথারিণ মেও ভারতবাসীর বিপক্ষে যে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে, তাহার বিস্তৃত বিশ্লেষণের আমাদের সময়ও নাই, স্থানও নাই, প্রবৃত্তিও নাই। মোটামুটি বলিলে ধরা যায়, তাহার মতে "আমরা (ভারতবাসীরা) sexually exhausted অর্থাৎ রতিশক্তিতে ক্লান্ত জাতিতে পরিণত হইয়াছি। এই দুর্ব্বলতা হেতু আমাদের মধ্যে কেবল খর্ব্বাকৃতি বামন মানুষেরই উদ্ভব (dwarfish mannikins) হইতেছে। উহার ফল বহুদূরবিসারী হইতেছে, উহাতে জগতের স্বাস্থ্য ও মঙ্গল বিপদগ্রস্ত হইতেছে। বাল্যবিবাহ,

বাল্যাবস্থায় প্রসব করার ফলে এই অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। এই অবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফল a type of morbid sex mentality, এক প্রকার অসুস্থ যৌন মনোবৃত্তি। সেই মনোবৃত্তির ফলে ভারতবাসীরা পাপ ও অধঃপতনের (vice and degeneration) পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। এই অধঃপতন দৈহিক ও মানসিক দুই দিক হইতেই হইতেছে।"

ইহাই হইল ক্যাথারিণ মেওর আক্রমণের ভিত্তি। এখন দেখা যাউক, ক্যাথারিণ কোথা হইতে এই আক্রমণের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছে। ভারতের লোক যে রতিশক্তিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহার প্রমাণ ক্যাথারিণ মেও গৃহস্থপরিবারে প্রাপ্ত হইয়াছে কি না, তাহার গ্রন্থের সমালোচনার রচনায় প্রকাশ নাই। কেবল এইটুকু প্রকাশ যে, সে বহুকাল পূর্ব্বের পুলিশ আদালতের মামলার এবং হাঁসপাতালসমূহের নথীপত্র ঘাঁটিয়া এই তথ্য সংগ্রহ করিয়াছে।

কথায় বলে মক্ষিকাঃ ব্রণমিচ্ছন্তি। কোনও এক নিকৃষ্ট জীব পুষ্পোদ্যান ত্যাগ করিয়া আঘাটায় গিয়া অমেধ্য দ্রব্যের সন্ধানে আমোদ প্রাপ্ত হয়। এই ক্যাথারিণ মেও মানুষের কুলে জন্মগ্রহণ করিলেও সেই প্রবৃত্তি পোষণ করে বলিয়া হাঁসপাতালে ও পুলিশ আদালতের ন্যক্কারজনক নথীপত্রে মুখ দিয়া আকণ্ঠ অমেধ্য দ্রব্য আহরণ করিয়াছে, উহাতেই তাহার বোধ হয় আনন্দ। এমন লোক দেখা যায়, যাহারা সেক্সপিয়ার-মিল্‌টন না পড়িয়া, রেণল্ড ডেকামেরণ, চাইল্ড হ্যারল্ড না পড়িয়া ডন জুয়ান পড়িতে ভাল বাসে। এই শ্রেণীর নরনারী না থাকিলে জগতে Mysteries of a Convent, The Lustful Turk অথবা Powers of Mesmerism নামধেয় জঘন্য কুরুচিপূর্ণ গ্রন্থ বিকাইত না। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলিয়া রাখি, যে জাতির মস্তিষ্ক হইতে Powers of Mesmerism অথবা Decameron নামক গ্রন্থ উদ্ভূত হইতে পারে, ক্যাথারিণ মেও সেই জাতি হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া ভারতীয়ের নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে আইসে, এইটুকুই বিড়ম্বনা! আমরা পরাধীন বলিয়াই ত এই বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইতেছে।

আর যে জাতির মধ্যে এখনও মহাত্মা গন্ধী, সার জগদীশ, সার প্রফুল্ল, কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ, পণ্ডিত মদনমোহন, লালা লাজপৎ, ডাক্তার আনসারি, হাকিম আজমল খাঁ, মওলানা আবুল কালাম আজাদ জন্মগ্রহণ করিয়া প্রতিভার আলোকে জগৎ উদ্ভাসিত করিতেছেন, সেই জাতি রতিশক্তিতে নিস্তেজ ও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, এই জঘন্য নীচ নির্জ্জলা মিথ্যা কথা রটাইতে এই লজ্জাহীনা নারীর বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বা দ্বিধা বোধ হইল না ? তাহার কারণ এই যে, সে ভারত হইতে দূরে থাকিয়া তাহার নিয়োক্তৃবর্গের পক্ষপুটের আশ্রয়ে থাকিয়া ভারতীয়ের মানহানিকর এই বিষোদ্গার করিয়াছে।

একটা কথা এই নারীকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করে। তাহার নিজের দেশের মত এ দেশের নরনারী উঠিতে বসিতে রোগ হইলে হাঁসপাতালে যায় না, তাহাদের একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে রোগের সেবা-শুশ্রূষা করিবার লোকের অভাব নাই। এখন য়ুরোপীয়দের দেখাদেখি কেহ কেহ হাঁসপাতালে চিকিৎসিত হইতে যাইতেছে বটে। বিশেষতঃ একান্নবর্ত্তী পরিবার ক্রমে ক্যাথারিণ মেওর দেশের প্রবর্ত্তিত শিক্ষার কল্যাণে ভাঙ্গিয়া যাইতেছে বলিয়াও লোক সেবার অভাবে নিরুপায় হইয়া হাঁসপাতালে যাইতেছে। কিন্তু যাহারা যায়, তাহাদের সংখ্যা জনসংখ্যার অনুপাতে মুষ্টিমেয়। ক্যাথারিণ মেও যে সময়ের হাঁসপাতালের নথীপত্র ঘাঁটিয়াছে, সে সময়ে কোন ভদ্র লোক এ দেশে হাঁসপাতালে যাইতেন না—তাঁহারা হাঁসপাতালে যাওয়া অপমানকর ও ঘৃণাকর বলিয়া মনে করিতেন, এখনও অনেকে করেন। ক্যাথারিণ মেওর দেশের নরনারীর মত তাঁহারা রোগ হইলেই হাঁসপাতালে দৌড়ান না। এ অবস্থায় ক্যাথারিণ মেও হাঁসপাতালের রোগী দেখিয়া বিশাল ভারতের বিরাট জনসংখ্যার নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে কিরূপে মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারে ? অতি মুষ্টিমেয় লোকই সে সময়ে হাঁসপাতা[ল] যাইত, যাহারা যাইত তাহারাও ভদ্রলোক শ্রেণীর নহে, নিতান্ত দরিদ্র ও অসমর্থ লোকই যাইত। তাহাদের রোগ দেখিয়া ভারতীয় জনসাধারণের (ইতর ভদ্র সবই) উপর তাহার আরোপ করা কি ইচ্ছাকৃত সত্য গোপন করা নহে ? শুনা যায়, ক্যাথারিণের দেশের কোনও এক ভবঘুরে এ দেশে বেড়াইতে আসিয়া পথে মেছুনীকে মাছের বাজরা মাথায় এবং পরিচারিকাকে পথে মাথার কাপড় খুলিয়া বাজার করিতে দেখিয়া বলিয়াছিল,—"কে বলে বাঙ্গালায় পর্দ্দা আছে ? এখানে নারীরা স্বাধীনা।" ক্যাথারিণের বিদ্যার দৌড়ও তথৈব চ!

হিসাব করিয়া দেখিলে বোধ হয় ধরা পড়িবে, এ দেশের লোকসংখ্যার অনুপাতে হাজারকরা ২ জন লোকও হাঁসপাতালে যায় কি না সন্দেহ। তবে ক্যাথারিণ মেয়োর কথায় "নিউ ষ্টেটসম্যান" প্রমুখ কাগজের এত-লম্ফ ঝম্প কেন? পুলিস কোর্টেও যে সকল মামলা হয়, তাহার ইন্দ্রিয়চালনাঘটিত অধিকাংশই, ভদ্রলোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে, এ কথাও নথী দ্বারা প্রমাণ করা যায়। এ সব অপরাধে অপরাধী প্রায়ই দাগী চোর, 'ছেঁচড়' ও খুনে ডাকাত। আর দেশের লোকসংখ্যার অনুপাতে তাহাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয় মাত্র। সুতরাং উহাকে ভিত্তি করিয়া সমগ্র ভারতের নরনারীকে অপরাধী বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা ষড়যন্ত্র ও নষ্টামীর ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে।

এখন দেখা যাউক, এই মিথ্যাবাদিনীর নিজের দেশের (য়ুরোপ-মার্কিণের) নরনারীর নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞগণের অভিমত কিরূপ। তাহাদের হাঁসপাতালের ও পুলিসকোর্টের নথীপত্রই সাক্ষ্য দিবে যে, ইন্দ্রিয়াসক্তির আধিক্য বশতঃ তাহাদের দেশের বর্ত্তমান 'সভ্যতার' দিনেও কত ঘোর অমানুষিক পাপানুষ্ঠান হইতেছে। সে সব পাপের চিত্র আমরা কল্পনায়ও ধারণা করিতে পারি না।

উহাদের সামাজিক জীবনযাপন সম্বন্ধে আমরা কয়েকটি অভিজ্ঞের অভিমত উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

(১) মেয়র যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত বিলাতে গিয়াছিলেন এবং ইংরাজ-মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার বিলাতের অভিজ্ঞতা অল্প নহে। তিনি বলেন,—"যদি আমরা বিলাতের রবিবারের সংবাদপত্রগুলি পাঠ করি এবং নাইট ক্লাবে অথবা পিকাডিলি সার্কাসে গমন করি, তাহা হইলে ইংরাজের সামাজিক চিত্র সত্যভাবে অঙ্কিত করিতে পারি।"

(২) শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল য়ুরোপ, আমেরিকায় বহুবার গমন করিয়াছেন এবং বহুদিন তথায় অবস্থানও করিয়াছেন। তিনি মার্কিণ যুক্তরাজ্যের চিকাগো সহরে কি দেখিয়াছিলেন, তাহার যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে মনে হয়, আমরা এই 'আধুনিক সভ্য' মার্কিণ জাতির তুলনায় নৈতিক চরিত্রবলে দেবতা। তিনি বলেন, চিকাগোর এক রেস্তোরাঁয় রাত্রিকালে গিয়া তিনি দেখিয়াছিলেন, প্রায় দেড়-শত যুবতী হলের মধ্যে মার্ব্বেল টেবলের চারিধারে বসিয়া আছে। জিজ্ঞাসাবাদে জানিতে পারেন, তাহারা দেহ বিক্রয় করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে সমবেত হইয়াছে। অথচ তাহারা বেশ্যা নহে, গৃহস্থঘরের কন্যা, আফিসে টাইপিষ্টের ও অন্যান্য কাযের চাকুরী করে। কিন্তু বেতনে সংসার চালান কুলায় না বলিয়া, রাত্রিকালে পুরুষকে দেহদান করিয়া বাকী পয়সাটা পুষাইয়া লয়। ইহারাই আবার পরে বিবাহাদি করিয়া সন্তানের জননী এবং গৃহিণী হইয়া ঘর-সংসার করে।

(৩) আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বলিয়াছেন, আমি মোট ছয় বৎসর বৃটেনে বাস করিয়াছি। ঐ সময়ে দেখিয়াছি, সন্ধ্যার পর লণ্ডনের অনেক পার্কের দরজা বন্ধ হয়, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও পার্ক সকলের মধ্যে নানা বীভৎস কামকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়। যুদ্ধের পর ইংলণ্ডে ও মার্কিণে বিবাহবিচ্ছেদের মামলার সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে, বিবাহবন্ধনের পবিত্রতা বহুল পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে।

(৪) ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক লেকি তাঁহার "History of European Morals" গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "য়ুরোপের সকল দেশে সকল সময়ে সকল ধর্ম্মেই অনিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রিয়চালনার ফলে মনুষ্য-সমাজে ঘোর দুঃখ-কষ্ট ও অবনতি উপস্থিত হইয়াছে।" ইংলণ্ডের নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে লেকি বলিয়াছেন, "ইংলণ্ডে পাপের চরম সীমায় উপনীত অন্যূন ৫০ হাজার গণিকার উপস্থিতি দেশে অনিয়ন্ত্রিত পাপের স্রোত বহাইতেছে। এই পাপ রোগ স্বামী হইতে পত্নীতে সংক্রামিত হইতেছে এবং জননী হইতে সন্তানে ন্যস্ত হইতেছে।"

(৫) পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মেও-পিলচার কোম্পানীর ষড়যন্ত্র এবং 'ষ্টেটশম্যানের' ধৃষ্টতা ধরিয়া দিবার বিষয়ে যে আন্দোলন করিয়াছেন, তাহার জন্য তিনি সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র। তিনিই টাউনহলে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করিয়া বাঙ্গালীর প্রাণের কথা প্রকাশিত হইবার সুযোগ দিয়াছিলেন। তিনিও তাঁহার সম্পাদিত "ইংরাজী বসুমতীতে" এ সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

এমন অনেক প্রমাণ দেওয়া যায়, কিন্তু বাহুল্যভয়ে তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত হইল না। যদি উপন্যাস জাতীয় চরিত্র-চিত্রের আধার হয়, তাহা হইলে রেলনড্সের অথবা ভিক্টোরিয়া ক্রসের বা গ্রাণ্ট অ্যালেনের উপন্যাসসমূহ যে ভাবে ইংরাজ-চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছে, অথবা মার্কিণের রবার্ট ডবলিউ চেম্বার্স ও গ্রিফিথসের উপন্যাসসমূহ যে ভাবে মার্কিণ-চরিত্র চিত্রিত করিয়াছে, তাহা যদি তাহাদের বাস্তব জীবনের চিত্র হয়, তাহা হইলে ক্যাথারিণ মেওকে ও পিলচারকে বলি,—"আগে নিজের ঘর সামলাও, তাহার পর পরচর্চ্চা করিতে আসিও।" যদি য়ুরোপ ও মার্কিণের হাঁসপাতালের নথীপত্র এবং পুলিস মামলার সংবাদপত্রসমূহ সত্য সংবাদ প্রচার করে, তাহা হইলে বলি, "ডাক্তার, আগে নিজের রোগ সারাও, তাহার পর রোগী দেখিতে যাইও।" তোমাদের বিবাহবিচ্ছেদের আদালতে নিত্য যে সকল ন্যক্কারজনক মামলা উঠিতেছে, তাহার দ্বারা কি তোমাদের abnormal sexualityর পরিচয় পাওয়া যায় না? তোমাদের এই সমস্ত মামলায় প্রকাশ পায়, তোমাদের বিবাহিত নরনারী সংসারধর্ম্ম মানে না, ধর্ম্ম মানে না, বিবাহের মন্ত্র মানে না, মাতৃত্ব পত্নীত্ব মানে না,—মানে কেবল 'ছাগবৃত্তি—' জানে কেবল ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি, তাহার জন্য তাহারা পতি-পুত্র

পত্নী-কন্যা সকলের সুখ অকাতরে বলি দিতে পারে। তোমাদের মার্কিণ ধনকুবের হ্যারি থ'র মামলায় কি জঘন্য তথ্য প্রকাশ পাইয়াছিল, মনে নাই? মনে করিয়াছ কি, লর্ড এমট্‌হিলের পুত্রের বিবাহবিচ্ছেদের কলঙ্ক-কালিমা-পূর্ণ মামলার কথা ভারতবাসী বিস্মৃত হইয়াছে? সম্প্রতি তোমাদের দেউলিয়া ধনকুবের জেমস্ হোয়াইট আত্মহত্যা-কালে কি স্বীকারোক্তি করিয়া গিয়াছে, তাহাও কি এত শীঘ্র বিস্মৃত হইয়াছ?

কিন্তু মেয়োর ও পিলচারের মত কৃমিকীট থাকিলেও যে য়ুরোপীয় বা মার্কিণ জাতির মধ্যে সত্যবাদী ধর্ম্মবিশ্বাসী মহাপ্রাণ ভদ্রলোক নাই, এমন কথা কখনও বলি না। মহামতি এণ্ডরুজের মত যথার্থ ভদ্রলোক ইংরাজ এখনও আছেন বলিয়া সাম্রাজ্য টিকিয়া আছে। এই মহাপ্রাণ ইংরাজের মত আরও অনেক ইংরাজ আছেন। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীরামপুর মিশনারী কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ রেভারেণ্ড রসনের নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। ইনি মেও পিলচারের মিথ্যা কুৎসাপ্রচারে এত ব্যথা পাইয়াছেন যে, স্বয়ং টাউনহলে বিরাট প্রতিবাদ-সভায় উপস্থিত না হইয়া পারেন নাই। সেখানে তিনি তীব্র ভাষায় এই ষড়যন্ত্রকারী মিথ্যাপ্রচারকারী দলের জঘন্য কুৎসার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন এবং ভারতীয় নারীর সতীত্ব, লজ্জাশীলতা, শালীনতা, ভব্যতা ও ধর্ম্মপ্রাণতার শতমুখে সুখ্যাতি করিয়াছিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় পুরুষের নৈতিক চরিত্রবলের প্রশংসাও করিয়াছিলেন।

প্রাচীন গ্রন্থাদি আলোচনা করিয়াও দেখান যায়, বহু সত্যবাদী নিরপেক্ষ বিদেশীয় মনীষী ভারতীয়ের নৈতিক চরিত্রবলের এবং নারীর সতীত্ব ও শালীনতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। তন্মধ্যে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি।—

(১) ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইতিহাসলেখক সার জন কে, সতীদাহ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"প্রাচীন খৃষ্টান সংস্কারকদিগের মধ্যে অনেকে ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহ হিন্দু সতীদের মত মৃত্যু-কালে মহত্তর ধৈর্য্য দেখাইতে পারেন নাই। এই মহীয়সী মহিলাদের তুলনা জগতে নাই।"

(২) কর্ণেল টড তাঁহার রাজস্থানে লিখিয়াছেন,—"জগতের কোনও জাতির ইতিহাসে হিন্দুনারীর মত গভীর পতিপ্রেম, আত্মত্যাগ এবং পতিপরায়ণতার সমধিক অথবা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয় না।"

(৩) ঐতিহাসিক এলফিনষ্টোন লিখিয়াছেন—"অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়তৃপ্তির পাপ হইতে হিন্দুরা মুক্ত, ইহা তাহাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। তাহারা আমাদের অপেক্ষা শিষ্টাচারে বহু গুণে শ্রেষ্ঠ, এই কথা মনে করিয়া আমি আত্মতৃপ্তি লাভ করিতে পারি না।"

(৪) সার টমাস মনরো বলিয়া গিয়াছেন, "যদি নারীর প্রতি বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও কোমল ব্যবহার করা সভ্যতার পরিমাপ হয়, তাহা হইলে আমি বলিব, হিন্দুরা সে বিষয়ে য়ুরোপীয়দিগের অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে। আর যদি সভ্যতা ইংলণ্ড ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্যের বিষয় হয়, তাহা হইলে আমার বিশ্বাস, ইংলণ্ডই ইহাতে লাভবান্ হইবে।"

(৫) ম্যাক্সমূলার হিন্দুদিগের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার আবৃত্তি এ স্থলে অনাবশ্যক, কেন না, তাহা সর্ব্বজন-বিদিত।

(৬) স্যামুয়েল জনসন বলিয়াছেন, "যাহারা ভারতীয়-দিগকে বহু দিন যাবৎ জানিবার সুযোগ পাইয়াছে, তাহারা নিশ্চয়ই তাহাদের সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট ধারণা পোষণ করিবে। যাহারা ভারতে কায করিবার পর অবসর লইয়া দেশে ফিরিয়াছে, তাহারা বলে, জগতের অন্যান্য জাতির তুলনায় ভারতীয়রা ভাল লোক।

এমন কত শত দৃষ্টান্তের পরিচয় দেওয়া যায়। এই সকল মনীষীর কাছে কৃমিকীট পিলচার, মেও কে? বোধ হয়, ইংরাজকবি শেলী তাঁহার নিজের দেশের লণ্ডন সহরকে যাহা বলিয়াছিলেন, "Hell is a city much like London", তাহা ইহাদের শ্রেণীর দেশবাসীকে দেখিয়াই বলিয়াছিলেন। ম্যাক্সওয়েল রাত্রি ৮টার পর ইংরাজের থিয়েটার, নাচঘর, হোটেল, রেস্তরাঁ ইত্যাদির যে সমাজচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, বোধ হয়, ইহাদের শ্রেণীর নরনারীকে দেখিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন। নতুবা তাহারা নিজের দেশের শত পাপ শত অপরাধ থাকিতেও তাহা দেখিয়া অন্য দেশেরও পাপ অপরাধ সেইরূপ মনে করিবে কেন? আত্মবৎ মন্যতে জগৎ, এ কথা মিথ্যা নহে।

মেও-পিলচারের মিথ্যা প্রচারের মূলে যে গভীর চক্রান্ত আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। লর্ড অলিভিয়ার 'কণ্টেম্পোরারি রিভিউ" পত্রে লিখিয়াছেন, "ভারতের সম্বন্ধে ক্রমাগত আংশিক সত্য ও মিথ্যা ধারণার উদ্রেককারী সংবাদ বৃটিশ-জনসাধারণকে জানান হইতেছে। ইহা বিরাট এক চক্রান্তের ফল। দিল্লী হইতে প্রেরিত 'টাইমসের' দুইটি প্রবন্ধ ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।" সুতরাং বুঝিতে হইবে, এই চক্রান্তের মধ্যে মেও-পিলচার কোম্পানীও বিজড়িত আছে।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।
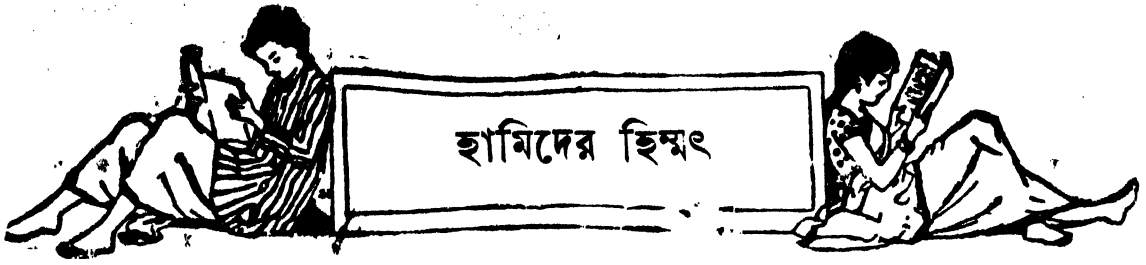
১৮

রোগমুক্ত হবার পর নসীবনের কাছে হামিদ প্রস্তাব করলে যে, সে যে রকম দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে, তাতে একবার হাওয়া বদলে না এলে শরীর আগেকার মত সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে না।

নসী বললে, "তা চল; কোথায় যাবে?"

হামিদ উত্তর করলে, "পশ্চিমাঞ্চলে; আগরা, দিল্লী—"

নসী। না, ও সব যায়গায় গিয়ে কায নেই।

হামিদ। কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য জিনিষ দেখতে পাবে।

নসী। কি আশ্চর্য্য জিনিষ?

হামিদ। দিল্লীর আমখাস, তক্তৃতাউস—

নসী। ময়ূর সিংহাসন? যাতে বাদশা সাজাহান বসত?

হামিদ। হাঁ। মুসলমান বাদশাহীর অমর কীর্ত্তি।

নসী। অমরকীর্ত্তি—না প্রেতমূর্ত্তি? হাঁ অমর বটে, মানুষ মরে, কিন্তু ভূতের মৃত্যু নাই; হিন্দুদের তবু একটা গয়া আছে, আমাদের তারও অভাব।

হামিদ চুপ করিয়া রহিল, কিছুক্ষণের জন্য মাথাটি হেঁট করিয়া চুপ করিয়া রহিল; পরে ধীরে ধীরে নসীর মুখখানির পানে চাহিয়া বলিল, "আমি মনে করতেম নসী, তুমি ভালবাসা ছাড়া আর কিছুই জান না।"

নসী। তুমি আমায় ঠিক চিনেছ, সত্যই ভালবাসা ছাড়া আর আমি কিছুই জানি না।

হামিদ। কিন্তু তোমার প্রাণে এমন স্বজাতি-প্রেম—

নসী। অর্থাৎ ভালবাসা।

হামিদ। জাতির পতন স্মরণে এত বেদনা, জাতির পতনে এমন অপমান বোধ—

নসী। ঐ ভালবাসা গো, ঐ ভালবাসা। তোমরা বিদ্যার বোঝা মাথায় কর ইংরাজের কলেজে ব'সে, আর আমাদের চোখ খোলে ভালবাসার মাদ্রাসায়। প্রেমের মত মৌলবী দুনিয়ায় কোথাও নেই, সাহেব। ভালবাসা আমায় শিখিয়েছে, খাসা ক'রে খানা বানাতে, তোফা ক'রে খোঁপা বাঁধতে, পাখার বাতাসে খসমের সকল তক্‌লিফ তাড়িয়ে দিতে, কদমে হাত রেখে তার গোঁসার গলা টিপে ধর্‌তে; কত সেইর, কত েয়ারিফ, কত অঙ্ক, কত জ্যোতিষ কত হদিস যে শেখাতে পারে ভালবাসা, তা কি সাহেবজান্ সহৎসে বেহেতের এক একটি বোঁচার আঁচে সমঝাতে পার না?

বাম বাহুবেষ্টনে নসীবনকে আপন পার্শ্বে আকর্ষণ করিয়া হামিদ বলিল, "কিন্তু নসী, তোমায় একবার তাজমহলটা দেখিয়ে আনবার বড় ইচ্ছে হচ্ছে, সেটা পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্য্য।"

নসী। সপ্তম।—না, সব চেয়ে বড় প্রথম।

হামিদ। কিসে?

নসী। মৃত্যুর গোলামের গোলাম যে মানুষ, সেই মানুষ মরণের জয়ঘোষণা করবার জন্য অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ মুদ্রা ব্যয় ক'রে গর্ব্বের গম্বুজ খাড়া ক'রে রাখে, এর চেয়ে বেশী আশ্চর্য্য কি হ'তে পারে?

আসল কথা, নসীবনের ভয়, পাছে পশ্চিমাঞ্চল গেলে সেখানকার গোঁয়ার মোসলমানদের সঙ্গে মিশে আবার তার স্বামী পথহারা হয়। সে ভোলেনি তার নিজের জীবন, ভোলেনি পিতা মাতা শ্বশুর শাশুড়ীর জীবন, হিন্দু-মুসলমান-মিশ্রিত যে পল্লীতে সে বর্দ্ধিতা হয়েছে, সেখানকার মধুময় বাল্যজীবন সে কখনও বিস্মৃত হবে না। আর সব চেয়েও তার মনে আছে ও থাকবে তার মাতামহীর পবিত্র জীবন। যে মাতামহীকে হিন্দুরা বলত সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা, মুসলমানরা বলত বেহেস্তের মস্তানী।

প্রকাশ্যে স্বামীকে নিশি বল্‌লে, "এক কায করলে বোধ করি, আমার শরীর-ও ভাল হয় আর অনেক আশ্চর্য্য দৃশ্য-ও দেখা যায়। শুনেছি, অনেকে বলে, শিলং খুব ভাল যায়গা।

চল কলকাতা থেকে জাহাজে ক'রে সুন্দরবনের ভিতর দিয়ে যত দূর পারি যাওয়া যাক, যেখানে ভাল লাগবে না, সেখানে ডাঙ্গা-ও আছে রেল-ও আছে। মানুষের হাতে গড়া বাগান ইমারতের চেয়ে খোদার দৌলৎ নদী, বন, পর্ব্বত, প্রস্রবণ কি আমাদের মন বিস্ময়ে, ভক্তিতে, তৃপ্তিতে বেশী রকম পুর্ণ করতে পারে না? তা ছাড়া শান্তি—আগ্রা, দিল্লী, মিরাট লাহোর যেখানেই যাও, সেখানে-ই এই ইট-পাথরের কঠোর কাঠাম, এই চাকার ঘরঘরানি—এই লোকের কলরব, চল, দিন কতক প্রকৃতির নির্জ্জন শান্তির মাঝে আমরা দু'টি প্রাণী গিয়ে বিশ্রাম ক'রে আসি।"

সত্যই আমাদের নিশি ও হেম দু'জনে "একলাই" বেড়াতে বেরুলো, পুরানো পাড়ার লোক ব'লে মনে ক'রে এই বুড়োকে জাহাজখানার ডেকের একটা কোণে-ও একটু যায়গা দিলে না; কাযে-ই ছোট বড় মাঝারী নদীর মধ্য দিয়ে এঁকে বেঁকে ঘুরে ফিরে দুই তীরের বনের বাহারের মধ্য দিয়ে অগ্নিগর্ভ জাহাজখানি ধুঁয়ার ঢেকুর তুলতে তুলতে ভেসে চল্‌ল, তা ত দেখা হ'ল-ই না, আপ্‌শোষ, আর-ও দেখা হ'ল না, জাহাজ কোথা-ও হঠাৎ আটকে গেলে নিশি শিউরে উঠে সভয়ে কেমন ক'রে হেমের হাতখানা আঁকড়ে ধরেছে, কোন আড্ডায় জাহাজ লাগালে গ্রাম্য লোকরা দুধ, দই, ডিম, মাছ, ফলপাকড় বেচতে এলে নিশি কেমন তাড়াতাড়ি দৌড়ে গিয়ে দর নেই দস্তুর নেই, যা তা কিনে ফেলেছে। ডেকের রেলে হেলান দিয়ে বনের মধ্যে হরিণের পালের কৌতূহল দৃষ্টি দেখে সে একবারে কুমারী বালিকার ন্যায় আহ্লাদে হাততালি দিয়ে খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠেছে।

ইংরাজদম্পতি বিবাহক্রিয়া সমাধার পর-ই প্রবাসের নির্জ্জনতায় যায় মধুচন্দ্রিকার আনন্দ উপভোগ করতে; তাঁদের সমাজে যৌবন বিবাহ প্রচলিত। এ দেশে প্রজাপতি বধূটিকে এনে দেন তার শ্বশুরের সংসাররাজ্যের একটি নূতন প্রজা ক'রে; সুতরাং শ্বশুর-শাশুড়ীর কাযে সেবার সেলামী জমা দিয়ে স্বামীটিকে মৌরসী দখলে আনতে একটু বিলম্ব হয়। দাম্পত্যজীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে অর্থাৎ একটি সন্তানলাভের পর যদি স্বাস্থ্যের আশায় নবীন দম্পতির এই বাঙ্গালা 'হনিমুন' উপভোগের সুবিধা ঘটে, তখন অহর্নিশি অবাধ মিশামিশির লোভে কোন্ যুবক বা যুবতীর হপ্তাকয়েক রোগভোগের সাধ না হয়? দু'টি টুক্‌টুকে পাকা ফলের একসঙ্গে ডালে দুলে যে আনন্দ, প্রাচীন-প্রাচীনার তীর্থদর্শনে সেই আনন্দ; একবৃন্তে দু'টি ফুল ফুটে উঠে সুখের মিলনের সৌরভে পরিপূর্ণ হয়, নবীন-নবীনার একাত্মহৃদয় সৌরভে প্রফুল্ল হয় প্রথম প্রবাসে।

১৯

শিলংএর একটি ছোটখাট ছবির মত বাড়ীতে নিশিকে নিয়ে হেম বাস করে। বায়ুপরিবর্ত্তনে কেবলমাত্র দেহ রোগমুক্ত হয়ে সুস্থ হয় না, মনের বাতিক-ও নির্ম্মল বাতাসের গুণে, প্রকৃতির শান্ত সৌন্দর্য্যের প্রভাবে স্বস্তি লাভ করে; তাই জাহাজে উঠার পর থেকে-ই এরা দু'টি আবার কিশোর বয়সের হেম ও নিশি হয়ে গেছে। নিশি যেন মাটীতে চলে না, টুনটুনীটির মত এ-ঘরে ও-ঘরে এখানে সেখানে উড়ে উড়ে বসে, পাহাড়ের উপর উড়ে বেড়ায়, পাখীর গলায় গান ধরে আর সঙ্গে আনা ছানাটির উপর পাখা ঢাকা দিয়ে পাখীর মত-ই মায়ের খেলা খেলে।

ভাগ্য এখানে হামিদকে একটি নূতন বন্ধু জুটিয়ে দিয়েছে। আফতাফ আলি সাহেব চাঁদপুরের এক জন যুবা জমীদার। তিনি-ও কিছু দিন পূর্ব্বে শিলং-এ এসে বিশ্রামসুখ উপভোগ করেছিলেন। খেলার মাঠে বৈকালে বেড়াতে বেড়াতে হামিদের সঙ্গে আফতাফের প্রথম আলাপ হয়; ক্রমে নিমন্ত্রণের বিনিময়, স্ত্রীতে স্ত্রীতে পরিচয়, শেষে লজ্জা-লয় ও চারিজনের মধ্যে পারিবারিক প্রণয়। হামিদ হ'ল দাদা—আফতাফ ছোট ভাই; নসীবন দিদি—সেলিনা ছোট বোন্।

একবারে খাঁটী বাঙ্গালা দাদা দিদি; কারণ, হামিদ তার নূতন ভাই-ভাজের কাছে ছেলেবেলার গল্প ক'রে হেম ও নিশি নামের উৎপত্তির মর্ম্ম বুঝিয়ে দিয়েছে, আর আফতাফও নিজের বংশপরিচয় মুক্ত মুখে ব্যক্ত করেছে।

তার প্রপিতামহ ছিলেন এক জন বিক্রমপুরের ব্রাহ্মণ; এক বর্ষার প্রচণ্ড প্লাবনে তাঁর গড়ের বাড়ী ভেসে যাওয়ায় অন্যত্র আশ্রয়লাভে বঞ্চিত হয়ে তিনি নিকটস্থ কোন গ্রামের এক পরিচিত বর্দ্ধিষ্ণু মুসলমানের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত আতিথ্য গ্রহণ করেন অর্থাৎ খান সাহেবের গোলাবাড়ীতে কয়েক সপ্তাহের জন্য সপরিবারে বাস করেন। নিষ্ঠা-রক্ষার্থ গ্রাম্যসমা

ব্রহ্মহত্যা নারীহত্যা দেখতে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু যে গোলা-বাড়ীর চালে মাঝে মাঝে মুরগী উড়ে এসে বসে, গলায় দড়ী না দিয়ে তার তলায় উনুন পেতে বামুনের মেয়ে রাঁধছে আর নাস্তিক বামুনটা সেই রান্না ভাত গোগ্রাসে গিল্‌ছে, সমাজ এ কোনমতেই সহ্য করতে পারলে না; ব্রাহ্মণের কেবল যে যবনাপবাদ হ'ল—এমন নয়, বেচারীর উপর নির্য্যাতনের-ও যথেষ্ট চেষ্টা চল্‌ল। ক্ষোভে রোষে ঘৃণায় লোক আত্মহত্যা করে, এ ব্রাহ্মণ সেটা না ক'রে পৈতার অগ্নিসৎকার সম্পাদনান্তে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ ক'রে ফেললে।

ব্রাহ্মণ তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সুশিক্ষিত, মেধাবী ও কর্ম্মপটু চরিত্রবান্ দ্বাত্রিংশদ্বর্ষীয় যুবক। আশ্রয়দাতা খান সাহেবের অনুগ্রহে ঢাকার নবাবের এজলাসে তিনি পরিচিত হন, ক্রমে ক্রমে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর পদপ্রাপ্তি ও একটা বিদ্রোহী মহাল শাসনের গুণে চৌধুরী খেতাব ও চাঁদপুরের জায়গীর-লাভ। বৃটিশ শাসনের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জায়গীর ক্ষয় পেতে পেতে এখন একটি ছোট জমীদারীতে দাঁড়িয়েছে, তবু-ও পল্লীগ্রামের বার্ষিক ৮ হাজার টাকার উপর আয় কম কথা নয়। আফতাফ কলকাতা থেকে এম্, এ পাশ ক'রে এসে নিজগ্রামে বাস করছে। ঈশ্বরের সামীপ্যলাভের জন্য প্রপিতামহ বাধ্য হয়ে যে পথ অবলম্বন করেছিলেন, সাধ্যমত চেষ্টা ক'রে প্রপৌত্র সেই পথের অবশ্য পালনীয় সমস্ত নিয়ম রক্ষা ক'রে চলে, কিন্তু উচ্চশিক্ষা তাকে তুচ্ছ গোঁড়ামীর হাত থেকে বাঁচিয়ে দেছে। অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর পৃষ্ঠে মুষ্টিবৃষ্টি করলে যে আল্লা তুষ্টিলাভ করেন, সে বিশ্বাসে সে ঈশ্বরের অবমাননা করে না। মাংসভক্ষণ অপেক্ষা গো-জাতির বংশবর্দ্ধনে নিজের ও পৃথিবীর অধিক উপকার, সে গোয়াল ও গোচর ভূমি রক্ষা ক'রে পরম সুখের প্রমাণ পেয়েছে। আফতাফ বলেছে যে, তাদের বাড়ীর সিন্দুকের মধ্যে এখন-ও একটি শালগ্রাম শিলা ও কোশাকুশি, শাঁখ, ঘণ্টা প্রভৃতি অনেক পূজার বাসন মজুত আছে, কলকাতায় ফেরবার আগে হামিদদের চাঁদপুরে দিনকতক থেকে সেগুলি দেখে যেতেই হবে। হামিদ একটু আম্‌তা আম্‌তা করতে যাচ্ছিল, এমন সময় চট্ ক'রে নাম্‌তা আউড়ে নসীবন ব'লে ফেল্‌লে, "শিলংএ আর সাত দ্বিগুণে চৌদ্দ দিন—"

আফ। তার পর দেওয়ানগঞ্জে পাঁচ সাত্‌তে পঁ—

নসী। না, চার দ্বিগুণে আট দিন; কেমন?

সেলিনা। দিদি যেন নবাবজাদী, ওঁর হুকুমের পর কে আর কি ওজর করবে?

২০

আফতাফদের দেওয়ানগঞ্জের প্রাচীন ভিটায় দালান-ও আছে চালা-ও আছে। শান্‌কী-ও আছে—থালা-ও আছে, ঘটীও আছে—বদনা-ও আছে; আবার চৌকী-ও আছে—মেরু মাচ্চে-ও (চেয়ার) আছে। পরিচ্ছন্ন বাড়ীঘর, সুখের সংসার। ক্ষেতে-খামারে খাবার; পুকুরে-গোয়ালে পানীয়; ঘৃত-দুগ্ধ মাখম-পনীর ঘরেই প্রস্তুত হয়; আমিষ জোগায় পালিত পক্ষী আর পুকুরের লক্ষ্মী। তেলটা বুঝি ভাঙিয়ে আন্‌তে হয়; আর কিন্‌তে হয় কাপড়-চোপড়গুলো; তা সেলিনা বিবি নিজের অঙ্গুলী-কৌশলে সেলাইয়ের খরচ অনেক বাঁচিয়ে দেন। শরীরের স্বাস্থ্য-ও একটা হোমিওপ্যাথির বাক্সর কল্যাণে চিকিৎসার খরচটা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়।

আসার দিন তিনেক পরে নসীবন বললে, "সেলিনা বোন্, আট দিন-ও নয়, কাল-ই আমাদের পালাতে হচ্ছে।

সেলিনা। সে কি?

নসী। এখানে যদি আর তিন রাত্তির কাটাই, তা হ'লে তোমার সাহেবের প্রস্তাব পঁয়ত্রিশ দিন কেন, পঁয়ত্রিশ বছর থেকে-ও সুখের সাধ মিটবে না।

সেলিনা। ই-স্! দেখো!

নসী। ঠাট্টা নয়, এত সুখ ভাই পল্লীগ্রামে। কলকেতা ছাই—ছাই! কেবল কথায় কথায় যা দোকান—যা দোকান! আর রাস্তার দিবারাত্রি হাঁক—"এ লেবে গো—ও লেবে গো; আলু চাই, পটোল চাই", ঘুগনীদানা, পাঁটার চপ; কবে শুন্‌তে হবে ডেকে বিক্রী ক'রে যাচ্ছে, "গরম গরম মাছের ঝোল," "মজাদার লাউ চিংড়ী।"

সেলিনা। তা গাঁ ভাই তেমনই, বাজার গেলেই রুটী, কাবাব, শিরণী, বাদাম পেস্তা মেঠাই রাবড়ী পাওয়া যায় না; আর পাওয়া যায় না রাবড়ী মালাইয়ের চেয়ে মিষ্টি নিশিদি'র মুখের মিশ্রীর বুকনী; তোমা ছাড়া কার কথায় ভাই নারাণগঞ্জের পাত-ক্ষীরের মতন এমন কোমল মিষ্টতা আছে!

নসী। যার তার—সেলিনা বেগমের মতন ঘরোয়ানা বিবিই বুঝতে পারে।

যখন দু'জনে ব'সে এই বিশ্রম্ভালাপ হচ্ছিল, তখন রাত্রি প্রায় ৮ ঘড়ি। হঠাৎ বার-বাড়ীতে এমন একটা গোল উঠল, যার আওয়াজে একটা বড় উঠান পার হয়ে বাবুর্চ্চি-মহল ছাড়িয়ে একবারে জেনানা-মহল পর্য্যন্ত পৌঁছল। সেলিনা তাড়াতাড়ি উঠে এক জন দাইকে ডাক দিয়ে বললে, "জল্‌দি জাফরাকে বল ত সদরে কিসের গোল হচ্ছে, জেনে আসুক।"

জাফর খবর নিয়ে এল মতি দাইয়ের কাছে, মতি পৌঁছে দিলে সে খবর হুজুরান বরাবর; যথা:—পোয়া তিনেক পথ দূরে দৌলৎ দীঘির পশ্চিম পাড় ছাড়িয়ে আরও খানিক গিয়ে চণ্ডী গাঁয়ে ডাকাত পড়েছে, ঘরে দোরে নাকি আগুন দিয়েছে, লুঠপাট দাঙ্গা মারামারি সব হচ্ছে; দেউড়ীর পাকরা সব সেই দিকে ছুটেছে, খোদ হুজুর আর কলকাতার সাহেবও বন্দুক হাতে ক'রে পেছনে পেছনে গেলেন।

নসীবন শিউরে উঠে বল্লে, "লোকজন সব হামরাই হয়ে গিয়ে পড়েছে, সেই ভাল, এঁরা আবার এই রাত্রে অন্ধকারে গ্রাম ছেড়ে অই দাঙ্গাহাঙ্গামা আগুনের মধ্যে যেতে গেলেন কেন?" সেলিনা বল্লে, "না না, যাওয়া ঠিক হয়েছে; এ দিদি তোমাদের কলকেতা নয়, যে যার আপনার জন্যে-ই ব্যস্ত, গাঁয়ে আমাদের পরস্পরের আপদে বিপদে দাঁড়াতে হয় বই কি। বিশেষ জমীদারী কি খালি খাজনা আদায়ের বিস্তে নিয়েই চলে? যে প্রজার ভাল-মন্দ দেখে না, তার তালুক লাটে ওঠাই ভাল। তবে ভাই সাহেব কলকেতার বাবু, তার না বেরুলেই ভাল হ'ত।" নসী সেলিনার মুখ পানে আধ মিনিটটাক চুপ ক'রে তাকিয়ে থেকে তার পর আস্তে আস্তে বল্লে, "অন্যায় করেছি বোন্, তিন পুরুষ ধ'রে পুলিস পাহারার মাঝে বাস করে, আমাদের—আমাদের—কি বলব পুরুষত্ব, না নারীত্ব—

সেলিনা। যদি চলে গেছে বল্‌তে চাও, তবে নারীত্বই বল্‌বে, সাহসটা কি পুরুষের একচেটে, আমাদের তেজটা সোয়ামীর ওপর দোর বন্ধ ক'রে ঝাল ঝেড়েই খরচ হয়ে যাবে নাকি?"

নসী। না ভাই, আমি বল্‌তে গেলে, অর্দ্ধেক মানুষ হয়েছি—হিন্দুদের বাড়ী থেকে; শুনেছি, মেয়েমানুষের সাহস আরও সব কি, কি পুরুষের অষ্টগুণ, তা ভাই, আষ্টে পৃষ্ঠে বন্ধনে ডাকাত তাড়ান ত দূরে থাক, রন্ধনে-ও এখন শ্রীমতীদের সঙ্গে অনেক মুসম্মত-ও কষ্ট বোধ করেন।

জাফর এসে খবর দিয়ে ছিল যে, চণ্ডী গাঁয়ে ডাকাত পড়েছে ও আগুন লেগেছে, কিন্তু এটা যে চিরপ্রচলিত মামুলী ডাকাতী নয়, তা সে বুঝতে পেরেছিল কি না, বলতে পারি না, কিন্তু তার মুনিব সাহেব ও তাঁর দোস্ত সাহায্য-যাত্রাকালে বুঝতে পারেন নি।

শিলং-যাত্রার জন্য যে রাত্রিতে হামিদ সপরিবারে জাহাজে গিয়ে উঠে, সেই দিন দুপুরবেলা অন্যান্য বন্দোবস্তের সময় নসীবন হামিদকে বলেছিল, তোমার ত খবরের কাগজ না পড়লে ক্ষিদে হবে না, তা একখানা চিঠি লিখে রেখে যাও, যাতে ক'রে কাগজগুলো সেখানে ডাক-বাবুর ঠিকানায় পৌঁছে। এর উত্তরে হামিদ বলেছিল, "না, ক্ষিদে করাবে খোদার বাতাস আর খোদার দেওয়া তোমার অমূল্য দৌলতের হাতের পাকান খানা। দিন কতকের জন্যে এ দুনিয়ায় তুমি আমার, আমি তোমার, এ সওয়ায় আর কেউ কোথায় থাকবে না; আমাদের-ও খবর আর কাকে-ও দেব না, আর কোন যায়গায় কারও খবর আমরা নেব না; খবরের কাগজ পড়লে-ই আমার মনে হবে, যেন আমাদের ঘিরে মহা জটলা কলরব চলছে। চিঠি লেখা, চিঠি পড়াও বন্ধ।" সুতরাং চড়কের আগেই কলকেতায় যে একটা নতুন রকমের গাজনের ধূম হয়ে গেছে, আর তার ঢাকের আওয়াজে সারা বাঙ্গালা জুড়ে বাণফোড়া চলেছে, এ খবরটা হামিদের কানে পৌঁছায় নি। এম,এ, পাশ ক'রে দাওয়ানগঞ্জে ফেরার পর থেকে আফতাফ খান চারেক দেশী বিলিতী কৃষিপত্রিকার জন্য মাত্র বার্ষিক মূল্য দিত; তার রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি একত্র কেন্দ্রীভূত হয়েছিল একমাত্র ক্ষেত্রকর্ষণে ও গো-পালনে; সে আপনাকে জমীদার না ব'লে জেণ্টলম্যান ফার্ম্মার ব'লে পরিচয় দিয়ে বেশী গৌরব ও আনন্দ অনুভব করত! বাজে খবর সে নিজে-ই ভালবাসে না।

ডাকাতীর রাত্রিতে অকুস্থলে উপস্থিত হয়ে দুই বন্ধুতে প্রথম জানতে পারলে যে, কলকাতার এক দল হিন্দুস্থানী হিন্দু-মুসলমান-ধর্ম্মের মহিমা নষ্ট করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছে, তারা বাজনা বাজিয়ে মুসলমান-মন এমন ক'রে মজিয়ে দিতে আরম্ভ করেছে যে, নেমাজের সময় মেজাজ আর কেউ ঠিক রাখতে পারছে না। কলকাতার এই সূত্র ধ'রে সমস্ত দেশের ইসলাম পুত্রদের দেল্ একবারে দেওয়ানা হয়ে উঠেছে। এখন আর সময় অসময় নেই, হিন্দুর ঢোল

বাজলেই মিঞা সাহেবরা ঘর ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন, শাঁখের শব্দে নামডাকা বন্ধ ক'রে ঢাকা মারবার জন্য তৈয়ার হ'তে হয়।

বড় দুঃখেও হামিদ মনে মনে একটু হেসে ফেললে। ছেলেবেলায় সে পুরাণ পড়েছিল, মনে হ'ল, এক দিন বৃন্দাবনে জটিলা কুটিলা এমনি বাঁশীর সুর শুনলেই দুর্ দুর্ ক'রে ঝাঁটা হাতে পথে বেরিয়ে পড়ত।

কিন্তু এখন হাসির সময় নয়, মামলা বড় সঙ্গীন। ক্রোশ চারেক তফাতে এণ্ডাবাড়ী ব'লে একখানি ছোট গাঁ আছে; সেই গ্রামে চাটুর্য্যে পুকুরের ধারে একটা পুরাতন পাকুড়-গাছের তলায় একটি ছোট মাটীর বেদী পীরের আস্তানা ব'লে প্রথিত; স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান, ইতর-ভদ্র, নর-নারী সকলেই ঐ আস্তানায় পূজা দেয়, পীরের কাছে মানত করে, সন্ধ্যাবেলায় চেরাক দেখায়, দুধ বাতাসা ছোট ছোট মাটীর ঘোড়া এই সব দিয়ে অজ্ঞাতনামা পীরের সেবা করে।

আজ পাঁচ ছয় দিন হ'ল, কোত্থেকে নাকি একটা নাগা সন্ন্যাসী এসে পঞ্চমুখী শাঁক বাজাতে বাজাতে বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করে ও সেই শাঁখ বাজাতে বাজাতেই ঐ আস্তানার সামনে দিয়ে যায়। হানিফ গাজীর দোচালা ঐ আস্তানার সামনে, বেচারা সবে সেই সময় গামছা বুনতে বুনতে তাঁতঘর ছেড়ে উঠে এসে তার ভাইপোর নিজের হাতে ধরা সিঙ্গি মাছ জবাই করছিলেন, সন্ন্যাসীর শাঁখের শব্দে ধর্ম্মকর্ম্মে ব্যাঘাত হয়ে হানিফ বেচারীর বুড়া আঙ্গুলের ডগাটা একটু কেটে যায়, সেই রাগে সে তেড়ে এসে অপরাধীর জটা ধ'রে টান দেয়, জ'টেও দেড়সের ওজনের হাতের চিমটেখানি বেশ বাগিয়ে তোলে; ক্রমে গাজী সাহেবের ভেয়ের বেটা, ভাইজান, বাপজান সব ছুটে এল, চাটুর্য্যেদের বাড়ী থেকে লোক বেরুলো, তার পর হিন্দু মোসলমান দুইয়েরই ভীড়—একটা দাঙ্গা। সন্ন্যাসীর শাঁখটাকে ভাগাড়ে ফেলে দিয়েছিল, গাঁয়ের ফুলী পাগলী সেইটে কুড়িয়ে এনে মাথায় ক'রে নেচে বেড়ায়, আর সিঁদুর মাখিয়ে বিজ বিজ ক'রে মন্ত্র ব'লে পূজো করে।

পাগলামীর সঙ্গে সঙ্গে ফুলীর আবার একটু কবিত্ব-ও আছে। নিরক্ষর গ্রাম্য কবির অভাব এখন-ও এ দেশে নাই। ফুলী গান বেঁধেছে, আর সেই গান গেয়ে নাচে:—

(গীত)

আমায় কে শিখাবে বাজাতে বাঁশী।
আমার সাধ হয়েছে বাজিয়ে বাঁশী হব উদাসী॥
বাঁশী না বাজালে বনে বনে,
ঘুম আসে না গোপীর নয়নে,
আমার ঘুচেছে ঘুমের ধূম,
রাত যখন নিঝুম নিঝুম,
আমি ডাক দে বলি, কোথায় গেলি আয় আয় আয় ব্রজবাসী,
আমি তোদের কাছে শিখতে আসি,
কি ফুঁ দিলে বাজবে বাঁশী,
আর কেমন ক'রে বাঁশীর সুরে হ'তে হয় দাসী॥

ফুলী গান গাইবে না কেন, সে কালে কলকাতার আলু-পোস্তায় একবার আগুন লাগে; রামচেঁদে মালী ব'লে একটা পাগল সেই সুযোগে বিনা পয়সায়, বিনা ভিক্ষায় তিন চার দিন ধ'রে পেট পুরে আলুপোড়া খেয়েছিল, তার পর ঐ পোস্তার ধারে ধারে ঘুরে বেড়াত, আর যাকে দেখত, তাকে-ই জিজ্ঞাসা করত যে, আবার কবে আগুন লাগবে?

২১

সেই শঙ্খাসুরবধের দিন থেকে-ই এণ্ডাবাড়ীর আশ-পাশের গ্রামগুলাতে এমন অত্যাচার আরম্ভ হ'ল যে, অল্প-সংখ্যক গরীব হিন্দুদের মনে সর্ব্বদা একটা আতঙ্ক সজাগ হয়ে রইল। ভোরে উঠে লোক মুখ-হাত ধুচ্ছে, খবর এল ছিমন্ত গড়াইয়ের গোয়াল ভেঙ্গে দু'টো বাছুরের গলার দড়ী ধ'রে হিড় হিড় ক'রে কতকগুলো লোক টেনে নিয়ে যাচ্ছে। দুপুরবেলা মাঠ থেকে ফিরে এসে লোক-জন খেতে বসেছে, খবর পেলে, সুতোকাটীর দাঙ্গায় দু'টো লোক ঘাল হয়েছে, আরও ৮।১০টা মাথা ফেটেছে; লাশ প'ড়ে আছে, পুলিসের হুকুমে মৃতের স্ত্রী ডাক ছেড়ে কান্না বন্ধ ক'রে হাঁফাতে হাঁফাতে জবানবন্দী লেখাচ্ছে, আর ধমকের প্রবোধে মুগ্ধ হয়ে "দোহাই কোম্পানী দোহাই কোম্পানী" বলছে। সহরে যখন রাত্রি বড় জোর ৮টা, দরিদ্র পল্লী-গ্রাম তখন নীরব নিষ্প্রদীপ; নিদ্রিত চণ্ডীগ্রাম ঐ রকম সময়ে-ই হঠাৎ আলোর ঘটায় আগুনের তাপে "সর্ব্বনাশ সর্ব্বনাশ" ব'লে হঠাৎ জেগে উঠে দেখে, চুণ, কালি,

সিঁদুর, হর্ত্তেল মুখে-মাথা, লাঠী, মশাল হাতে প্রায় ৩০।৩২ জন লোক যাকে পাচ্ছে, তাকেই মাচ্ছে, যা দেখছে, তাই ভাঙ্গছে—তাই পোড়াচ্ছে, মেয়েগুলো—কারুর কোলে ছেলে, কারুর কাঁকালে ঝাঁপি, কেঁদে হাউ-মাউ করছে, এদিক্ ওদিক্ ছুটছে, আছাড় খেয়ে মাটীতে পড়ছে, ডোবায় গিয়ে-ও দু'এক জন ঝাঁপ দিচ্ছে। আফতাফ ও হামিদ পৌঁছে দেখলে যে, খোরাক ফুরুতে আগুন নিবে গেছে। বৈকালে চণ্ডীর চালার দাবায় ব'সে গ্রামের মাতব্বররা আজ-ও হরিসঙ্কীর্ত্তন করেছে, তার চিহ্নমাত্র নাই। মা মঙ্গলচণ্ডীর পুরাতন পিতলের কলস আগুনের ঝলসে গ'লে গিয়ে উন্নত জগৎকে দেখিয়ে দেছে যে, হিন্দুর ধর্ম্ম-গর্ব্ব তেমন পাকা ধার্ম্মিকের হাতে পড়লে কত শীঘ্র ভস্মীভূত হয়ে যেতে পারে। দু' ঘণ্টা পূর্ব্বে-ও যে ক'খানি ছিন্ন কাঁথা দীন-দম্পতির বিশ্রাম-সুখের সম্পত্তি ব'লে পরিগণিত হচ্ছিল, বাতাসে মিশ্রিত অলোভনীয় গন্ধমাত্র পূর্ব্বাস্তিত্বের পরিচয় দিচ্ছে; সব ভস্ম হয়ে গেছে, একটি অস্থাবর পদার্থের সন্ধান কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না, ভস্মের ভিতরে-ও না; সেই পদার্থটি হচ্ছে গদাই মণ্ডলের ব্যাটার বউ।

দূর হ'তে পাকদের হাঁক শুনেই ধর্ম্মপ্রাণ ইত্যালিদল্ দস্যু সাহেবগণ অন্তর্দ্ধান-বিদ্যার মন্ত্র পাঠ করেছেন, আফতাফ উপস্থিত হয়ে-ই তা বুঝতে পারলে। হুকুম পেয়ে লোকজন দিকে দিকে ছুটল পলাতকদের অনুসন্ধানে। সর্ব্বস্বহারাদের প্রবোধ দেবার মত কোন নীতিবাক্য-ই চৌধুরী সাহেবের মুখে এল না, কিন্তু এ দেশের প্রজার প্রাণে রাজভক্তি এত সহজ যে, স্বয়ং জমীদারকে তাদের বিপদে উপস্থিত দেখে সেই ধ্বংসের ধূলার উপরে দাঁড়িয়ে-ই কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে আভূমিমস্তক অবনত ক'রে সেই আর্দ্রনয়ন ভদ্রতার আধার যুবককে অভিবাদন করলে। আপাততঃ আশ্রয়ের জন্য গৃহহীনদের খামার-বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে রাত্রিবাসের যথাসাধ্য বন্দোবস্ত ক'রে দেবার জন্য বৃদ্ধ সর্দ্দার দেদার খাঁকে আদেশ দিয়ে আফতাফ হামিদকে নিয়ে বাড়ীর অভিমুখে পুনর্যাত্রা করলে। [ক্রমশঃ।

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

[অধুনা সাহিত্যে না বলিয়া পরের রচনা আত্মসাৎ করা যেন সংক্রামক ব্যাধিতে পরিণত হইয়াছে। আমরা বাঙ্গালার গদ্য ও পদ্য সাহিত্যে এমন চুরির দৃষ্টান্ত কয়েকটি প্রাপ্ত হইয়াছি। কবি শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায় আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, বিগত ১৩২৩ সনে প্রকাশিত তাঁহার "মাঠের গানে" শীর্ষক কবিতার সহিত ১৩৩৪ সনের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার "মাসিক বসুমতীতে" প্রকাশিত পাপিয়া দেবী স্বাক্ষরিত 'পাপিয়া' শীর্ষক কবিতাটির ভাবগত ও শব্দগত বিস্ময়কর সৌসাদৃশ্য আছে। আমরা কবিতা দুইটি মিলাইয়া দেখিলাম, তাঁহার অভিযোগ যথার্থ। কবিতা দুইটি পাশাপাশি প্রকাশিত করিয়া লেখিকাকে পাঠকসমাজে অশোভন অবস্থায় উপস্থাপিত না করিয়া আমরা তাঁহাকে ও তাঁহার শ্রেণীর রচয়িতাগণকে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করিয়া দিলাম। বাণীর পূজা-মন্দিরে প্রত্যেক অনুরক্ত ভক্তই তাঁহার সাধনালব্ধ অর্ঘ্য প্রদান করিবেন—পরস্ব নিজস্ব বলিয়া চালাইবার চেষ্টা প্রকৃত পূজার পরিপন্থী।—বঃ সঃ]

সম্পাদক—শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, বসুমতী 'রোটারী মেসিনে' শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৬ষ্ঠ বর্ষ] আশ্বিন, ১৩৩৪ [৬ষ্ঠ সংখ্যা

উদ্বোধন

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চিতিরূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ।

সর্ব্বাধারে বিরাজিতা দেবী সংবোধনী,
তপস্যা-বিহনে মাতা কুণ্ঠিতা নিদ্রিতা,
বীর-সাধনায় জাগ জগৎজননী,
ফুটে বীর-ভক্তকণ্ঠে তব বীর গীতা ।

কুরু-পাণ্ডবের সৈন্য ব্যূহিত সমরে—
করুণায় বিগলিত পার্থের হৃদয়
হৃষ্ট-রোম বিকম্পিত, কহিলা কাতরে,
শ্লাঘ্য বনবাস, শ্লাঘ্য রণে পরাজয় ।

স্ফুরিল কৃষ্ণের নেত্রে বিদ্যুদগ্নিশিখা,
বীরধর্ম্ম স্বধর্ম্মের করিলা ঘোষণা,
রণ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম, রক্তাক্ষরে লিখা
রুধির-কর্দ্দম যজ্ঞে—পুণ্য বীরপণা ।

ভোগমত্ত মহেন্দ্রের মহা অধোগতি,
স্বর্গ দৈত্যকরগত, মহেন্দ্রমুকুট
শোভিছে দৈত্যের ভালে অমৃতবসতি
দেবতার বক্ষে জ্বলে শোক-কালকূট ।

নিদ্রিতা আনন্দলক্ষ্মী, মূর্চ্ছিত-চেতনা ;
পাতিলেন দেবরাজ বীর যোগাসন,
কোথা সংগমনী দেবী পূর্ণেন্দুবদনা !
সর্ব্বদেব তপোরত ; সমাধি-মগন ।

সর্ব্বদেব-দেহ হ'তে উঠে জ্যোতির্জ্বালা,
জ্বলন্ত পর্ব্বতসম জ্যোতির বিলাস,—
শস্ত্রময়ী রণচণ্ডী গলে রত্নমালা,—
স্ফুটমূর্ত্তি দশভুজা তপস্যা প্রকাশ।

বাধিল তুমুল রণ—দলিত অসুর,
শত্রু-রক্ত-রাজটীকা মহেন্দ্রের ভালে ;
সংরাষ্ট্রীর সমাগমে আনন্দ প্রচুর,
পূজিলা চণ্ডীরে দেব নবমধুকালে।

গর্জ্জিছে বিপুল সিন্ধু লঙ্কার সৈকতে,
জ্বলিছে প্রদীপ-শিখা শিবিরে মন্দিরে—
নীরব নক্ষত্রমালা, স্তব্ধ ব্যোম-পথে,
শবময় রণভূমি চর্চ্চিত রুধিরে।

দীর্ঘায়ত বীরতনু জটার মুকুট,
সত্য তপস্যার ভার বহিছে মস্তকে,
যোগের অপূর্ব্বমূর্ত্তি পূর্ণ পরিস্ফুট,
বীর-সাধনায় মৌন, ভোগের নরকে।

বীরতপস্যার ফল ফলিল অচিরে,
ভাঙ্গিল দেবীর নিদ্রা অকাল-বোধনে,
পূর্ণমনস্কাম রাম পূজি শ্রীচণ্ডীরে ;
দিলা বর বীরভক্তে পুণ্য শুভদিনে।

কামক্লৈব্য-পাশবদ্ধ এ আনন্দভূমি,
কামদাস্যে ফলিয়াছে যেই বিষফল,
দ্বেষে রোষে, সেই পাপ ঘুচাবে কি তুমি
ঔষধ নিবৃত্তি-পূত তপস্যা কেবল।

জাগ শুভ সন্ধিক্ষণে, পাত যোগাসন,
মন্ত্র-সাধনায় আজি কর প্রাণপণ—
হৃদিপদ্মে দেখ দিব্য মার শ্রীচরণ—
হও কামজয়ী, কর্ম্মী পুরুষরতন।

মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

বাঁশীর ডাক

তরঙ্গভঙ্গভীষণ অপার, অপরিমেয়, অনন্ত সমুদ্র—মাথার উপরে অনন্ত নীলাকাশে অস্তোন্মুখ তপনদেবের রক্তরশ্মি—হু-হু সমুদ্রগর্জ্জন, হাহা বায়ুর স্বনন,—সকলে মিলিয়া অমলেন্দুর মনোরাজ্যে কি ভাবসমন্বয় সাধন করিয়াছিল, তাহা সে ভিন্ন আর কে বলিতে পারে ?. গলিত সুবর্ণের মত সহস্রাংশুর অংশুধারা সমুদ্রতরঙ্গে কি অব্যক্ত বর্ণবৈচিত্র্য সংঘটন করিতেছিল, অমলেন্দু নির্ণিমেষনয়নে তাহাই নিরীক্ষণ করিতেছিল। দেখিতে দেখিতে সে তন্ময় হইয়া গিয়াছিল। সম্মুখে উড্ডয়নশীল মৎস্যের ঝাঁক তাহাদের রজতবর্ণচ্ছটায় সূর্য্যকরে ঝক্‌মক করিয়া এক স্থান হইতে দুই তিন হস্ত দূরে উড়িয়া পড়িতেছিল, সে দিকে অমলেন্দুর দৃষ্টি ছিল না।

অকস্মাৎ তাহার মাতৃভাষায় কে তাহার সান্নিধ্যেই কথা কহিল, সে চমকিয়া উঠিল। সুদূর প্রবাসে, অনন্তবিস্তার সমুদ্র-বক্ষে কি মধুর এই পরের মুখে উচ্চারিত তাহার সোনার বাঙ্গালা-মায়ের সোনার ভাষা! মুহূর্ত্তে তাহার তন্ময়তা অন্তর্হিত হইল, সে ঝটিতি পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিল। অমনই তাহার ধমনীর রক্তস্রোতঃ রুদ্ধ হইল, সে বিস্ময়-হর্ষ-বিমূঢ় হইয়া আগন্তুকদিগের দিকে পলকহীন দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিল। রক্তরাগরঞ্জিত গোধূলির আলো-আঁধারে পলিতমুণ্ড বাঙ্গালী প্রৌঢ়ের অঙ্গে ভর করিয়া তাহারই দিকে ধীরপদে অগ্রসর হইতেছে, এ কি এ অপরূপ রূপময়ী ভুবন-সুন্দরী তরুণী! এ কি স্বপ্ন? দুর্গম দ্বারকার পথে আরব-সাগর-বক্ষে অর্ণবপোতের যাত্রী বাঙ্গালী তরুণী? অসম্ভব। এ কি তাহার দৃষ্টি-ভ্রম?

"এই দিকে মা, এই দিকে,"—প্রৌঢ় বাঙ্গালী ভদ্রলোক অনবদ্যাঙ্গী তরুণীকে লইয়া অমলেন্দুর বিপরীত দিকের কাষ্ঠাসনে গিয়া উপবেশন করিলেন, তখনও যেন তাঁহাদের অঙ্গ টলিতেছিল। তরুণী কোনও দিকে না চাহিয়া রেলিংয়ের উপর হস্ত দুইখানি ন্যস্ত করিয়া সমুদ্রতরঙ্গের মধ্যে রক্তরবির নিমজ্জনের দৃশ্যে সকল আগ্রহই যেন নিমজ্জিত করিয়া রহিল।

"চমৎকার! অতি সুন্দর! কবিরা এই জন্যই সমুদ্রে সূর্য্যাস্তের এত প্রশংসা করে গেছেন। কি বলেন আপনি?"—প্রৌঢ়ের প্রশ্নে অমলেন্দুর মোহ ভঙ্গ হইল। সে অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "আজ্ঞে হাঁ, সুন্দরই বটে। আপনারা কোথায় যাচ্ছেন?"

প্রৌঢ় হাসিয়া বলিলেন, "দ্বারকায়—তবে কাল সকালে ভেরোয়ালে নামব, প্রভাস আর রৈবতক দেখবার ইচ্ছেও আছে।"

অমলেন্দু বলিল, "ওঃ, তা হলে পোরবন্দর হয়ে যাবেন?"

প্রৌঢ় বলিলেন, "তাই বটে। মহাশয় কোথায় যাচ্ছেন? আপনি বাঙ্গালী ত? দেখেই ঠাওরেছিলুম। জাহাজে উঠবার সময় দেখিনি ত?"

অমলেন্দু বলিল, "না, তার কারণ আছে। জাহাজ ছাড়ে ছাড়ে এমনই সময় জাহাজে এসে উঠেছিলুম।

প্রৌঢ় বলিলেন, "ওঃ, তখন আমরা কেবিনে মালপত্তর গোছগাছ করছি। যাক, আজকালের ছেলেদের মধ্যে তীর্থভ্রমণ—এ ত বড় একটা দেখিনি, দিল্লী আগরাই ত তারা দেখে বেড়ায়। আপনি একা?"

অমলেন্দু ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিল, "একাই বটে। তবে বেড়াতে একলা বেরুই নি। সঙ্গীরা বোম্বাই রয়েছে, কেউ সমুদ্রে পাড়ি দিতে চাইলে না। ভাবলুম, এত দূর যদি এলুম, তা'হলে প্রভাস দ্বারকা না দেখে যাব না। অবশ্য তীর্থ করতে বেরুই নি, দেশ দেখবার সখ।"

প্রৌঢ় হাসিয়া বলিলেন, "যাই হোক, একলা এদ্দূর এসেছেন, এইটুকুই বাহাদুরী। এটা ত প্রথম শ্রেণীর ডেকের বেঞ্চ? বাবা এতক্ষণ কেবিনে প্রাণ হাঁপাচ্ছিল।"

অমলেন্দু বলিল, "আপনাদের বেশ স্বচ্ছন্দ দেখছি, সি-সিকনেস হয় নি ?"

"বোম্বাই ছাড়িয়ে বার সমুদ্রে প'ড়ে প্রথমটা সকলেরই হয়েছিল। বিশেষ আমার এই মেয়ের গর্ভধারিণীর। তিনি ত জাহাজে উঠেই যে শয্যা নিয়েছেন, এখনও তা থেকে মাথা তুলতে পারেন নি ; সঙ্গে যে ঝি এসেছে তারও অবস্থা তাই। এতক্ষণ তাঁদের সেবা করছিলুম, তা আমার মা লক্ষ্মী বললেন, বাইরের খোলা হাওয়ায় একটু থাক্‌তে। ওর গর্ভধারিণী কিছুতেই উঠতে চাইলেন না, ক্রমাগত বমি ক'রে ক'রে এখন একটু সাম্‌লে চুপ ক'রে প'ড়ে আছেন। তাই ইনি বুড়ো বাপকে নিয়ে ডেকের বেঞ্চে এলেন হাওয়া খেতে। কেমন, না মা ?"

এতক্ষণ যুবতী নীরবে তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন, জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন, "কেন বাবা, এমন খোলা হাওয়া, খোলা আলো কি ভাল লাগছে না ?"

পরিষ্কার কণ্ঠস্বর—তাহাতে অন্তঃপুরচারিণী হিন্দু যুবতীর আড়ষ্ট ভাব একটুকুও নাই। সেই অনায়াসগতি কথা-স্রোতের আর কিছুই অমলেন্দু লক্ষ্য করিতে পারিল না, সে লক্ষ্য করিল তাহার অপরূপ বীণার ঝঙ্কার—সেই মধুর স্বর তাহার মনের মধ্যে এক স্বপ্নরাজ্যের সৃষ্টি করিয়া দিয়া গেল !

প্রৌঢ় ভদ্রলোক বলিলেন, "ভাল লাগছে বৈ কি মা—না লাগছে বল্‌লে এই হু-হু বাতাসের অপমান করা হয়—ডেঙ্গায় এ বাতাস কোথায় পাব মা ? তবে কি জান, জাহাজের মুখটা যখন আকাশের দিকে উঠ্‌ছে, তখন নাড়ীভুঁড়িগুলোও সঙ্গে সঙ্গে বুকের দিকে ঠেলে উঠ্‌ছে, আবার যখন জাহাজখানা জলের গহ্বরে নেমে যাচ্ছে, তখন ঐগুলোও সঙ্গে সঙ্গে নেমে যাচ্ছে। এইতেই ত গা বমি বমি করে।"

অমলেন্দু একটা সুযোগ পাইয়া বলিল, "আমার কাছে একটা ওষুধ আছে, সেটা দু'ফোঁটা খেলে বমির ইচ্ছেটা অনেকটা নরম পড়ে—বোম্বাইয়ে কিনেছিলুম, কিন্তু এখনও পরীক্ষার অবসর পাই নি।"

প্রৌঢ় আগ্রহভরে বলিলেন, "আছে না কি ? তা হলে দিন না, একবার এদের—"

যুবতী বাধা দিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, "থাক, এখন দরকার হবে না, মা অনেকটা সুস্থ হয়েছেন।"

প্রৌঢ় অমনই বলিলেন, "তবে থাক এখন, ইন্দু যখন বল্‌ছে। হাঁ ভাল কথা, মশায়ের নামটি কি শুন্‌তে পাই ?"

অমলেন্দু বলিল, "আজ্ঞে, অমলেন্দু দত্ত।"

প্রৌঢ় পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কলকাতাতেই থাকা হয় ?"

অমলেন্দু বলিল, "আজ্ঞে হাঁ, সেখানে পড়াশুনো করি।"

প্রৌঢ় বলিলেন, "বেশ, বেশ। কলকাতার কোন্‌খানে বাসা ?"

অমলেন্দু বলিল, "বাদুড়বাগানে। তবে আমাদের দেশও আছে, অনন্তপুরে—"

প্রৌঢ় চমকিত হইয়া উঠিলেন, সেই সঙ্গে অমলেন্দু তাঁহার কন্যা ইন্দুমতীকেও ঈষৎ চমকিত হইতে দেখিয়াছিল কি ? সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে হয় ত তাহার দৃষ্টিভ্রমও ঘটিয়া থাকিতে পারে।

"কোন্ অনন্তপুর ?"—প্রৌঢ়ের প্রশ্নে হৃদয়ের আকুল আগ্রহ যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছিল।

"বাবা, ঠাণ্ডা লাগ্‌ছে, চল এইবার কেবিনে যাই," কথাটা বলিয়া উত্তরের প্রতীক্ষা না রাখিয়াই ইন্দু সোপানের দিকে অগ্রসর হইল। অমলেন্দু তখন বলিতেছিল, "বসির-হাটের কাছে অনন্তপুর—"

ততক্ষণ তাহার শ্রোতারা সোপান-পথে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। প্রৌঢ় যাইতে যাইতে একবার পশ্চাতে ফিরিয়া বলিলেন, "কাল সকালে আবার দেখা হবে। আমার পরিচয়টা কালই দেব।"

তখন জাহাজের সারা অঙ্গে নক্ষত্রখচিত আকাশের মত বৈদ্যুতিক আলোকমালা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সন্ধ্যার প্রাক্কাল হইতে বাতাস একটু বেগে বহিতে আরম্ভ করিয়াছিল, জাহাজের আন্দোলন সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পাইতেছিল। অমলেন্দুর আর উপরের ডেক ভাল লাগিতেছিল না, অনন্ত-বিস্তার মহাসমুদ্রের বক্ষে জ্যোৎস্নার দুগ্ধস্নিগ্ধ ধবলিমার আনন্দখেলাও তাহার মন আকৃষ্ট করিতে পারিতেছিল না। সে কেবিনে গিয়া শয্যার আশ্রয় লইল। কেবিনে শুইয়া সে ভাবিতেছিল, শান্ত ধীর গম্ভীরপ্রকৃতি ইন্দু কথার মাঝে অকস্মাৎ চঞ্চল চরণে চলিয়া গেল কেন ? তাহার দেশের নামের

সহিত তাহার বিচলিত ভাবের কোন সম্বন্ধ আছে না কি? দূর, তাও কখনও হয়! অমলেন্দু আপন মনে হাসিয়া ফেলিল। ক্ষণপরে সে কেবিনের দ্বারে কোমল বালিকাসুলভ কণ্ঠস্বর শুনিয়া ধড়মড় করিয়া শয্যার উপর বসিয়া পড়িল। বাহির হইতে প্রশ্ন হইল, "আপনার ওষুধটা একবার দেবেন কি?" অমলেন্দু বিস্মিত, স্তম্ভিত হইল,—এ কি ইন্দুর কণ্ঠস্বর না? সে এক লম্ফে দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিল, আপাদমস্তক ওড়নায় আবৃত করিয়া দ্বারে দাঁড়াইয়া ইন্দুমতী —তাহার পশ্চাতে বাঙ্গালী দাসী। সে তখনই সুটকেশ হইতে ঔষধের শিশি বাহির করিয়া দিল, বলিল, "দুই তিন ফোঁটা জলে মিশিয়ে খাইয়ে দেবেন।"

ইন্দু ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া চলিয়া গেল। অমলেন্দু সেদিন রাত্রিতে বহুক্ষণ নয়ন মুদ্রিত করিতে পারিল না, শয্যায় শুইয়া কত কি আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল।

"এই সিঙ্গী? আমি ভেবেছিলুম মস্ত বড় বেরাল! কলকাতার জু-গার্ডেনের সিঙ্গী কত বড়?"

"সে যে আফ্রিকার জঙ্গলের সিঙ্গী—এ যে আমাদের দেশের, খাস গুজরাটের। আফ্রিকার সিঙ্গী বড় হোক্, আমাদের সিঙ্গীর মত দেখতে ভাল না, এত মোটা-সোটাও না।"

জুনাগড়ের নবাব সাহেবের পশুশালায় সিংহের ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অমলেন্দু ও ইন্দুমতীর মধ্যে কথা হইতেছিল।

সে দিন রাত্রিতে ইন্দুমতীকে ঔষধ দিবার পর প্রভাতে যখন প্রথম শ্রেণীর ডেকের উপর আবার তাহাদের দেখা হইয়াছিল, তখন অমলেন্দু ইন্দুমতীর আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল। তাহার সেই পূর্ব্ব দিনের ধীর গম্ভীর অপ্রসন্ন ও বিচ্ছিন্ন থাকিবার ভাব কোনও যাদুকরের মায়াদণ্ড স্পর্শে যেন কোথায় অন্তর্ধান করিয়াছিল। সাক্ষাৎমাত্র সে প্রসন্নমুখে বলিয়াছিল, "আপনার ওষুধটা মার খুব কাযে লেগে গেল, ওতে তাঁর খুবই উপকার হয়েছে, এখন বসতে পারছেন।" যেন অমলেন্দু কতকালের পরিচিত! তাহার পিতাও অমলেন্দুকে অশেষ ধন্যবাদ দিয়া বলিয়াছিলেন, "বড় উপকার করেছেন মশাই! না হ'লে আজ প্রভাসে ওঁকে নিয়ে নামতাম কি ক'রে, বলতে পারি নে। হাঁ, ভাল কথা, আমায় আপনি ঠাকুরদাস বোস ব'লে জানবেন, আমারও নিবাস আপনাদের দেশে, ধলচিতায়।"

ভেরোয়াল বন্দরে জাহাজ ভিড়াইবার জেটি নাই, জাহাজ দুই মাইল দূরে নঙ্গর করে। কাযেই দেশীয় নৌকা পারাপারের ভরসা। উত্তাল তরঙ্গ-সমাকুল সমুদ্রবক্ষে দুই মাইল নৌকায় ভ্রমণ কি সুখকর, তাহা ভুক্তভোগী না হইলে বুঝিবে না। যখন জাহাজের সোপান বাহিয়া নৌকায় নামিতে হয়, তখন সমুদ্র-তরঙ্গ যাত্রীর দেহের উপর দিয়া বহিয়া যায়, ফলে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ত জলসিক্ত হয়ই; পরন্তু সমুদ্র অকাতরে লবণাম্বুর লবণটুকু যাত্রীর অঙ্গে ও পরিচ্ছদে দান করিয়া যায়; সর্ব্বোপরি নৌকায় ঝম্পপ্রদান কালে সোপান হইতে পদস্খলনের আশঙ্কাও যে থাকে না, তাহা নহে। কাযেই কিরূপ উৎকণ্ঠাভারগ্রস্ত হইয়া অমলেন্দু তাহার সঙ্গী যাত্রীদিগকে (খালাসীদের সাহায্য সত্ত্বেও) নিজে নৌকায় নামাইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। সঙ্গীরাও সংখ্যায় অল্প নহে, স্বয়ং কর্ত্তা ও গৃহিণী এবং তাঁহাদের কন্যা; একটি দাসী, দুইটি ভৃত্য, একটি দ্বারবান, এক জন সরকার বা গোমস্তা (তিনি সুপকারও বটে)। এতগুলি লোককে একে একে নৌকায় নামাইতে অমলেন্দুকে বেগ পাইতে হয় নাই, কেবল ইন্দুমতীর বেলা সে বিষম সমস্যায় পড়িল। ইন্দুমতী তখন প্রভাতের সেই প্রসন্নময়ী হাস্য-স্ফুরিতাধরা ইন্দুমতী ছিল না, সে তখন পূর্ব্বদিনের গোধূলির ধীরা, গম্ভীরা, অপ্রসন্না, ইন্দুমতী—সে দৃঢ়সঙ্কল্প; কিছুতেই কাহারও সাহায্য গ্রহণ করিয়া নৌকায় অবতরণ করিবে না। তাহাই হইয়াছিল, সে নিজে বিনা সাহায্যে নৌকায় নামিয়াছিল।

কিন্তু আশ্চর্য্য, প্রভাস-তীর্থে ইন্দুমতী রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছিল। ঠাকুরদাস বাবুর একান্ত অনুরোধে অমলেন্দু তাহাদের সহিত একই বাসায় স্থান গ্রহণ করিয়াছিল; সেই অনুরোধে ইন্দুমতী তাহার মাতার সহিত যোগদান করিয়াছিল। তখন যেন অমলেন্দু তাহাদের কত আপনার! বাসা প্রভাসে পাওয়াই যায় না, তবে পাণ্ডা পুরুষোত্তমজী যে ধর্ম্মশালায় তুলিয়াছিলেন, উহা তখন যাত্রিশূন্য, তাই বাসা যেন তাহাদের নিজস্ব বলিয়াই অনুমিত হইয়াছিল। তীর্থকৃত্য সম্পাদনের পর

ইন্দুমতী সেদিন বৃদ্ধ সরকার মহাশয়কে রন্ধনশালায় যাইতে দেয় নাই, স্বয়ং সৈরিন্ধ্রীরূপে সকলকে পরিতোষ-সহকারে ভোজন করাইয়াছিল। তীর্থে কিছুই পাওয়া যায় না, কেবল শাক, কচু ও কুমড়া। ইন্দুমতী ভাত, ডাল, শাকচচ্চড়ি যাহা রাঁধিয়াছিল, তাহা অমলেন্দুর মুখে বোম্বাইয়ের হোটেলে আহারের পর অমৃত বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। এত সুন্দর উপাদেয় আহার্য্য এই সামান্য উপকরণ হইতে বানাইতে পারে বাঙ্গালীর কুললক্ষ্মীরা, কথাটা মনে করিয়া অমলেন্দুর চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়াছিল, কেন না বহুদূরে তাহার শ্যামা জন্মদার স্নিগ্ধশ্যাম ছায়াশীতল ক্রোড়ে এমনই কুললক্ষ্মী তাহার জননী বহুদিন পূর্ব্বে তাহার মায়াডোর ছিঁড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। আহা! তাঁহারও রন্ধন যে এমনই উপাদেয় অমৃতবৎ ছিল!

পঞ্চস্রোতা সরস্বতীসঙ্গমে প্রভাসে যাদবের মহাশ্মশানক্ষেত্র এবং শ্রীকৃষ্ণের দেহরক্ষার পবিত্র স্থান ভালকুণ্ড ইন্দুমতীকে যতটা বিচলিত করিয়াছিল, এত আর কাহাকেও নহে। অমলেন্দু বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া দেখিয়াছিল, ইন্দুমতীর পরিণতবয়স্ক জনকজননী এই সকল স্থানে ভক্তিভরে প্রণাম ও পূজা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কেহই তাহার মত ভুলুণ্ঠিত হইয়া গললগ্নীকৃতবাসে দরবিগলিতধারে বার বার কোন অজ্ঞাত দেবতার উদ্দেশে নমস্কার করেন নাই। এমন ভাবতন্ময়তা অমলেন্দু আর কোথাও দেখিয়াছে বলিয়া তাহার মনে পড়ে নাই। গভীর ভক্তিমতী হিন্দুকুললক্ষ্মী সে, অথচ তাহার সহিত দুই চারিটি কথা কহিয়াই অমলেন্দু বুঝিয়াছে, সে কিরূপ উচ্চশিক্ষিতা, মার্জ্জিতরুচি ও নারীত্বমর্য্যাদাজ্ঞানসম্পন্না।

তাহার পর রৈবতক, ভারতের মধ্যে পরম রম্য স্থান। প্রভাস হইতে তাহারা রেলগাড়ীতে যখন জুনাগড় সহরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিতেছিল, তখন গাড়ীর মধ্য হইতে ধূমায়মান নীল মেঘের শ্রেণীর মত পরম সুন্দর রৈবতক তাহাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিল। জুনাগড়ে তাহারা যে বাসা লইয়াছিল, তাহার পশ্চাতের গবাক্ষ খুলিলেই রৈবতক বা গির্ণারের গাঢ় নীল মেঘের মত চিত্র তাহাদের নয়নপথে প্রতিফলিত হইয়াছিল। পরদিন তাহারা রৈবতক আরোহণ করিবে, আজ নবাবের পশুশালা দেখিতে গিয়াছে।

পার্ব্বত্য প্রাচীন উপরকোট সহরের উপরেই বর্ত্তমান জুনাগড় সহর নির্ম্মিত, দেখিতে ছবির মত। পথ পার্ব্বত্য, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ধূলিরহিত। নবাব সাহেবের রাজপ্রাসাদের যে অংশ সাধারণের পক্ষে উন্মুক্ত, তাহা দেখিয়া অমলেন্দুরা সন্তুষ্ট হইল না। সজ্জিত হল ঘরে মহামূল্যবান গালিচা কার্পেটের সঙ্গে সস্তার বিদেশী ঝাড় বা পুতুল ও বাদ্যাদি বড়ই অশোভন বলিয়া মনে হইতেছিল। যাহা হউক, তাহারা প্রাসাদ দেখিবার পর নবাব সাহেবের পশুশালা দেখিয়া প্রীতিলাভ করিল।

সিংহ দেখিয়া তাহাদের প্রীতির মাত্রা আরও বর্দ্ধিত হইল। ঠাকুরদাস বাবু বলিলেন, "বাবা, যদি দেখতেই এলাম, তবে ওদের খাবার দেওয়ার সময়টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা যাক্, কি বল।"

অমলেন্দু বলিল, "আমার তাতে আপত্তি নেই। তবে কি জানেন, বিদেশ বিভুঁই, বেলা থাক্‌তে থাক্‌তে বাসায় ফিরে যাওয়াই ভাল। হাঁ, দেখুন, আপনি আমায় আপনি-আপনি করলে বড় লজ্জা পাই, আপনি পিতৃতুল্য।"

ঠাকুরদাস বাবু প্রীত হইয়া বলিলেন, "তোমার সঙ্গে যতই আলাপ ঘনিষ্ঠ হচ্ছে অমলবাবু, ততই তোমায় ভাল লাগছে। ওঃ, ভগবান তোমায় বড় দয়া করেই জাহাজে মিলিয়ে দিয়েছিলেন, না হলে কি বিপদেই যে পড়তুম!"

অমলেন্দু সরকার মহাশয়ের বিষণ্ণ মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "না, না, সরকার মশাই রয়েছেন, ভাবনা কি?"

এই সময়ে ইন্দুমতী অন্যান্য নারীদিগের সহিত অন্যদিক হইতে অগ্রসর হইয়া বলিল, "আচ্ছা, অমল বাবু, এই সিঙ্গীগুলো কোত্থেকে ধরে এনেছে?"

অমলেন্দু বলিল, "ওগুলো এই গুজরাটেরই। যে রৈবতক দেখতে যাব আমরা কাল, সেই রৈবতকের পায়ের তলায় স্বর্ণরেখা নদীর দুই পাশে কালা জঙ্গলের মধ্যে ওরা থাকে।"

ইন্দুমতীর জননী চমকিত হইয়া বলিলেন, "মা গো! পাহাড়ে যেয়ে কায নেই বাপু।"

অমলেন্দু হাসিয়া বলিল, "না, না, সে ভয় নেই। এখানে আর পোরবন্দরের কাছে বর্দা পাহাড়ের জঙ্গলে দু'চারটা সিঙ্গী এখনও আছে। সরকার আন্দাজ ক'রে দেখেছেন যে, এখন গুজরাটে গোটা ৭০।৮০র বেশী সিঙ্গী আর নেই, তাই এখন সিঙ্গী শিকার করা আইনে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।"

এই সময়ে পশুরক্ষক সিংহ দুইটিকে খাওয়াইতে আসিল। ইন্দুমতী তাহাদের দুই পায়ে হাড় ধরিয়া চিবান দেখিয়া হাসিয়া 'কুটিপাটি' খাইল—এ যেন আর সে ধীরা, গম্ভীরা নারীত্বগর্ব্বে গর্ব্বিতা মহিমময়ী নারী নহে, এ যেন চপলা, হাস্যরসপরায়ণা বালিকা! অমলেন্দু মুগ্ধ হইল। বিধাতা এই রমণীরত্ন কাহার ভাগ্যে লিখিয়াছেন!

সেই রাত্রিতে বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ইন্দুমতী স্বহস্তে নানারূপ আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া সকলকে পরিতৃপ্ত করিয়া ভোজন করাইল। সে দেবভোগ্য আহার্য্য এই বিদেশে স্বজন-বন্ধুবান্ধবহীন প্রবাসে অমলেন্দুর কি তৃপ্তিসাধন করিল, তাহা সে ভিন্ন আর কে বলিবে? আহারের পর বাহিরের বারাণ্ডায় বসিয়া ঠাকুরদাস বাবু তামাকু সেবন করিতে করিতে অমলেন্দুর সহিত নানা বিষয়ে আলোচনা করিতে লাগিলেন। অমলেন্দুর মুখে যখন তিনি শুনিলেন, সে এম্ এ পাশ করিয়া ওকালতী পড়িতেছে, তখন বলিলেন, "ঐ লাইনটা আমি পছন্দ করি না, যদিও আমি নিজে উকীল হ'তে জেলা জজও হয়েছিলাম। আমার মনে হয়, এখনকার দিনে বাঙ্গালীর ছেলেরা ওকালতীর দিকে না ঝুঁকলেই ভাল হয়। ওতে দেশের পয়সা নিয়ে দেশেই নাড়াচাড়া করা হয়, পয়সা কেবল হাত-ফিরতি হয় মাত্র, বিদেশ হ'তে দেশে পয়সা আনবার ফিকির ওতে আদৌ নেই। যাতে করে পরের পয়সা ঘরে এনে তোলা যায়, এখনকার কালের দরকার মত সেই রকম বিদ্যে শেখানই আমাদের উচিত।"

অমলেন্দু হাসিয়া বলিল, "তবে আপনারা ওকালতী লাইনে গিয়েছিলেন কেন?"

ঠাকুরদাস বাবু বলিলেন, "বলেছি ত, এখনকার কালে। তখন আমাদের আমলে ওকালতীতে অত ভিড় হয় নি, তা ছাড়া এত হা-অন্ন যো-অন্ন হয় নি! এই দেখ না, এখনকার মত চলতে হয় বলে আমার মা লক্ষ্মীকে কালেজের লেখাপড়া শিখিয়েও ঘরের কত কায শিখিয়েছি। ওতে কত পয়সা বাইরে না দিয়ে ঘরে রাখা যায়। আমার ইন্দু কেবল যে রান্নাবান্নায় আমার সাশ্রয় করে, তা নয়, জামাকাপড় সেলাই থেকে লেপ বালিশ কাঁথা সেলাই পর্য্যন্ত সব করে নেয়। অথচ এমন নীরবে সব কায করে যায় যে, কাউকে জানতে দেয় না। এ দিকে কালিদাস সেক্সপিয়ার আওড়াতে বল, আগাগোড়া মুখস্থ বলে যাবে, আবার ঘরে বিশজনকে খেতে বল, ভিয়েনের বামুন আনতে হবে না।"

অমলেন্দুর মুখে একটা কথা বলি বলি করিয়াও বাহির হইল না। তাহাদের হিন্দুর ঘরে এত বড় যুবতী কন্যাকে তাঁহারা এতদিন অনূঢ়া রাখিয়াছেন কিরূপে, এ কথা সে কিছুতেই জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না। সে কেবল মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কতদূর অবধি পড়িয়েছেন? কথা ক'য়ে দেখেছি অনেক কিছু পড়া আছে।"

"হাঁ, তা আছে। শুধু তা কেন, সাহিত্য—তা বাঙ্গালা ইংরাজী সংস্কৃত যাই হোক্—ও বাড়ীতে যা পড়েছে, তা বি, এ, এম, এ, ক্লাসের ছেলেরাও পড়ে কি না সন্দেহ। তবে পাশ করেছে মাত্র ম্যাট্রিক, স্কুলে প'ড়ে।"

অমলেন্দু উত্তরোত্তর বিস্মিত হইল। বলিল, "এত অল্প বয়সে মেয়েছেলেরা এতটা শিখতে পারে, আমার ধারণাই ছিল না।"

"মেয়েছেলেদের কি আপনি এত ছোট বলে মনে করেন?" কথাটা বলিতে বলিতে ইন্দু বারান্দায় উপস্থিত হইল, "ছেলেদের মত শেখালে মেয়েরাও যে শেখে না, এমন কোন প্রমাণ পেয়েছেন বল্‌তে পারেন?"

অমলেন্দু বিষম অপ্রস্তুত হইল। ঠাকুরদাস বাবু হাসিয়া বলিলেন, "ও বড় শক্ত মেয়ে বাপু, ওর কাছে মেয়ে জাতকে পাল্লায় খাটো ক'রে পার পাবে না অমল, তা ব'লে রাখছি তোমায়!"

ইন্দু আরক্ত মুখে বলিল, "পাল্লাপাল্লির কথা হচ্ছে না। আমাদের দেশে পুরুষরা লেখাপড়াটা একচেটে ক'রে রেখেছেন ব'লে ভাবেন, মেয়েছেলে লেখাপড়া শিখলেই সেটা আশ্চর্য্য। এই ভাবের কথাটাই অমল বাবু বলেছিলেন না?"

অমলেন্দু ততক্ষণে সামলাইয়া লইয়া বলিল, "না, তা আমি কখনও ভাবি নি। আমি বলছিলুম, অল্প বয়সে বেশী শেখার কথা—এইটেই আশ্চর্য্য।"

ইন্দু বলিল, "আশ্চর্য্যটা কোনখানে? অভ্যাসটাই সব; তা ছেলেতেই কি আর মেয়েতেই কি। যাক্, আজ আর রাত করছ কেন, বাবা? কাল ভোরে বেরুতে হবে পাহাড় দেখতে, মনে আছে ত?"

ঠাকুরদাস বাবু বলিলেন, "এই যাই মা! ভাল কথা, গাড়ী ডুলির সব বন্দোবস্ত করে রেখেছ ত, অমল?"

অমলেন্দু জবাব দিবার পূর্ব্বেই ইন্দু গম্ভীরভাবে বলিল, "সে সব সরকার মশাই ঠিক করেছেন। অমল বাবু এয়েছেন বেড়াতে, ওঁর ওপর অত জুলুম করলে চলবে কেন?"

অমলেন্দু ব্যথাহত অভিমানের সুরে বলিল, "আমায় তা হ'লে আপনারা পর মনে করেন এখনও? কিন্তু মা ত তা মনে করেন না।"

ইন্দুর পশ্চাতে তাহার জননীও দাঁড়াইয়া তাম্বুল চর্ব্বণ করিতেছিলেন। তিনি হাসিয়া বলিলেন, "তুমিও যেমন বাবা! ও পাগলীর কথা শোন কেন? ওর ঐ কেঁটকেঁটে কথার জন্যে কোথাও সোয়াস্তি নাই।"

ইন্দু মার কথায় হাসিল বটে, কিন্তু জবাব দিতেও ছাড়িল না, বলিল, "কিন্তু সত্যি বল ত মা, ওঁকে দিয়ে তোমরা কতটা খাটিয়ে নিচ্ছ? মিনি পয়সায়—"

ইন্দু কথাটা বলিতে বলিতে হঠাৎ আনমনা হইয়া থামিয়া গেল। নিকটে কোথায় কে খোলা ছাদে চাঁদের আলোয় বসিয়া বাঁশীতে ফুঁ দিয়াছিল। অকস্মাৎ নিস্তব্ধ রজনীর বক্ষ ভেদ করিয়া বাঁশীর সুর কাঁপিয়া কাঁপিয়া বাতাসে ভাসিয়া আসিল। শুক্লা নবমীর রাত্রি—সুধাংশুর অজস্র রজতাংশুধারায় জলস্থল স্নাত, প্লাবিত হইতেছিল, মনে হইতেছিল যেন সেই সুধাধারায় অবগাহন করিয়া বাঁশীর সুর এক অপার্থিব স্বর্গীয় মাধুরীরসে ভরিয়া উঠিয়া বৃন্দাবনের সেই অতীতের যুগযুগান্তরের মনচোরা বাঁশীর সুরেরই অনুকরণ করিতেছিল। কর্ত্তা গৃহিণী একবার ইন্দুমতীর মুখের পানে তাকাইয়া পরস্পর অস্বস্তির দৃষ্টির বিনিময় করিলেন। আর অমলেন্দু সবিস্ময়ে দেখিল, ইন্দুমতীর চক্ষুর্দ্বয় কি এক অপার্থিব ভাবাবেশে নিমীলিত হইয়া আসিতেছে, তাহার সর্ব্বাঙ্গ থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে, যেন সে শূন্যে কোন অশরীরী অবলম্বনের দিকে বাহু প্রসারণ করিয়া অগ্রসর হইবার উপক্রম করিতেছে। অমনই তাহার জননী দুই বাহুর মধ্যে তাহার মাথাটা বুকের মাঝে টানিয়া লইলেন, ইন্দুমতী সংজ্ঞাহীনার ন্যায় অবশ অঙ্গে তাঁহার বক্ষে লুটাইয়া পড়িল, কর্ত্তা ও গৃহিণীর চারি চক্ষু অকস্মাৎ জলধারায় ভাসিয়া গেল।

মুহূর্ত্ত মাত্র। কিন্তু সেই এক মুহূর্ত্তেই অমলেন্দু যে বিস্ময় অনুভব করিল, তাহা তাহার সারা জীবনে কখনও করিয়াছে বলিয়া মনে হইল না।

৩

অমলেন্দু ঠাকুরদাস বাবুদের সহিত দ্বারকায় আসিয়াছে। প্রথমে রৈবতক, তাহার পর রেলে পোরবন্দর, পোরবন্দর হইতে দ্বারকা। গভীর রাত্রিতে ভেলার মত ক্ষুদ্র নৌকাযোগে পোরবন্দরের খাঁড়ি হইতে তিন চারি মাইল দূরে অবস্থিত জাহাজের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিতে অমলেন্দুরও সাহসে ভরা বুক এক বার কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। যখন নৌকা খাড়ির মোহানা হইতে বাহির সমুদ্রে উল্কাবেগে ছুটিয়া চলিয়াছিল, আর উত্তাল তরঙ্গমালার মধ্যে পড়িয়া পাগলের মত তাণ্ডব নৃত্য করিতেছিল, তখন তাহার মনে হইয়াছিল, সেই বুঝি তাহার শেষ দিন, আত্মীয় স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিদেশে সমুদ্রগর্ভে সমাধিই বুঝি তাহার ভাগ্যলিপি। কিন্তু অমলেন্দু বিস্মিত, স্তম্ভিত মুগ্ধনেত্রে দেখিয়াছিল ইন্দুমতীর দুর্দ্দমনীয় সাহস। সে দেখিয়াছিল, সে কিরূপ অটল অচল হিমাচলের মত তাহার আতঙ্কে মূর্চ্ছাগতা জননীকে অঙ্কে দৃঢ় বন্ধনে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। আর এক দিন রৈবতকের পথেও সে ইন্দুমতীকে এমনই দৃঢ়তার পরিচয় দিতে দেখিয়াছিল।

কাথিয়াবাড় গুজরাটের পাহাড় ও সাগরের বুকে সাজান ছোট ছোট সহরগুলি ঠিক ছবির মত সুন্দর। জুনাগড়, ও পোরবন্দরও তাহাই। কিন্তু সে সকল সহরের সৌন্দর্য্যও ম্লান হইয়া যায় রৈবতকের শোভার নিকটে। যে একবার রৈবতক দেখিয়াছে, সে জীবনে কখনও ভুলিবে না। সৌন্দর্য্যে রৈবতক বুঝি হিমগিরিকেও পরাজিত করে। জুনাগড় হইতে রৈবতকে যাইবার ছবির মত পথ, অম্বামাতার মন্দির, পলাশিনী নদী, পলাশিনী সেতু, দামোদর কুণ্ড, স্বর্ণরেখা নদী—সকলই চিত্রে অঙ্কিত বলিয়া মনে হয়। যতই উর্দ্ধে উঠা যায়, ততই পর্ব্বতের শোভা যেন শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া নয়ন-পথে পতিত হয়। উর্দ্ধ হইতে সানুদেশে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, ঝাঁকে ঝাঁকে ময়ূর-ময়ূরী, কপোত-কপোতী এবং পালে পালে হরিণ-হরিণী বিচরণ করিতেছে। গুর্জ্জরে বাড়ীর চালে এবং গাছের ডালে ময়ূর-ময়ূরী দেখা যায়। সে শোভা অতুলনীয়। ইন্দু পর্ব্বতারোহণ করিতে করিতে বলিয়াছিল, "রৈবতক এত সুন্দর বলেই কি ভগবান্

এইখেনে গাণ্ডীবীকে নিয়ে—যদুদের নিয়ে—বিহার করতে এত ভালবাসতেন ? তাই কি এইখেনে প্রাণের সখার সঙ্গে ভদ্রার মিলন করিয়ে দিয়েছিলেন ?”

কথাটা বলিতে বলিতে ইন্দুর দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিয়াছিল। বস্তুতঃ অমলেন্দু এত ভাবপ্রবণ বাঙ্গালীর মেয়ে দেখিয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারিল না।

পর্ব্বত হইতে অবতরণের পথে একটি দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। ঠাকুরদাস বাবুদের তিনখানি গাড়ী আসিতেছিল, প্রথম খানিতে ঠাকুরদাস বাবু, অমলেন্দু ও সরকার মহাশয়, দ্বিতীয় খানিতে ইন্দুমতী, তাহার জননী ও দাসী এবং শেষের খানিতে ভৃত্যবর্গ ও মালপত্র। ইন্দুদের গাড়ীর কোচবাক্সে দ্বারবান বসিয়াছিল।

পথের একটা বাঁক ফিরিবার পর অমলেন্দুরা দূর হইতে শুনিতে পাইল, তাহাদের পশ্চাতের গাড়ীখানা ভীষণ শব্দ করিয়া ঝড়ের বেগে ছুটিয়া আসিতেছে। অমলেন্দু উদ্বিগ্ন হইয়া গাড়ী হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখিল, পশ্চাতে মেয়েদের গাড়ীখানা বাঁক ফিরিয়া নক্ষত্রের মত ছুটিয়া আসিতেছে। দেখিয়াই সে বুঝিল, একটা কিছু অনর্থ ঘটিয়াছে। সে তখনই গাড়ী থামাইয়া পথে লাফাইয়া পড়িল। পশ্চাতে ফিরিয়া ভাল করিয়া দেখিয়া বুঝিল, সর্ব্বনাশ হইয়াছে, কোনও কারণে মেয়েদের গাড়ীর গাড়োয়ানের হস্ত হইতে অশ্ববল্গা খসিয়া পড়িয়াছে। অশ্বদ্বয় যদৃচ্ছা দ্রুত ধাবিত হইতেছে, গাড়োয়ান ও দ্বারবান অসহায় অবস্থায় কেবল চীৎকার করিয়া সাহায্য ভিক্ষা করিতেছে। কি ভীষণ অবস্থা! উচ্চ পার্ব্বত্য পথ, পথের উভয় পার্শ্বে গভীর খাদ, একবার গাড়ীখানা পথ হইতে ভ্রষ্ট হইলে কাহারও রক্ষা নাই। মুহূর্ত্তে বামাকণ্ঠের আর্ত্তনাদ বাতাসে ভাসিয়া আসিল; অত বিপদের মাঝেও অমলেন্দুর বুঝিতে কষ্ট হইল না যে, উহা আর যাহারই হউক, ইন্দুমতীর নহে।

অমলেন্দু মুহূর্ত্তে অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়া আপনাদের গাড়োয়ানের নিকট হইতে চাবুকটা চাহিয়া লইল এবং পথের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া পশ্চাতের গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। সে মুহূর্ত্ত মাত্র। গাড়ী ঝড়ের বেগে ছুটিয়া আসিতেছিল, অমলেন্দু চাবুকের বাঁটের দ্বারা একটা অশ্বের নাসিকার উপর সজোরে আঘাত করিল। অশ্ব আহত হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া দুই পদ ঊর্দ্ধে তুলিয়া যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া উঠিল; অমলেন্দু মুহূর্ত্তমাত্র অবসর না দিয়া অশ্বদ্বয়ের মুখের লাগাম ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িল এবং দুই তিনবার ঝাঁকানি দিল। অশ্বদ্বয়ের নাসিকা ও মুখ চিরিয়া রক্তস্রোত নির্গত হইল, তখন তাহারা একবারে থামিয়া গিয়া দাঁড়াইয়া থর্ থর্ কম্পিত হইতে লাগিল ও সঙ্গে সঙ্গে আর্ত্ত চীৎকার করিতে লাগিল।

কিন্তু অমলেন্দুও এই ব্যাপারে আঘাত হইতে অব্যাহত থাকে নাই। সে মস্তকে দারুণ যন্ত্রণা অনুভব করিয়া পথের উপরেই সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া গেল। তাহার পর আর ঘটনার কথা সে কিছু জানিতে পারিল না।

সেই দিনটা সে একরূপ সংজ্ঞাহীনই ছিল। তবে সে সেই অবস্থাতেও দেখিয়াছিল যে, ইন্দুমতী তাহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আছে এবং সস্নেহে ও সযত্নে ডাক্তারের আদেশমত তাহার সেবা-শুশ্রূষা করিতেছে। সে সময়ে সে দেখিয়াছিল, তাহার প্রতি ইন্দুমতীর দৃষ্টি নারী-হৃদয়ের সমস্ত কোমলতা, দয়া ও মায়ায় ভরিয়া উঠিয়াছে। পরে সে শুনিয়াছিল, অশ্বখুরের সামান্য স্পর্শে সে চেতনা হারাইয়াছিল। আঘাত যদিও সামান্য, তথাপি মস্তকে বলিয়া তাহাকে চিকিৎসা ও সেবাধীন থাকিতে হইয়াছিল।

দ্বারকায় আসিয়া একদিন এ কথা উঠিয়াছিল। অমলেন্দু যখন একদিন নির্জ্জনে ঠাকুরদাস বাবুর নিকট ইন্দুমতীর সেবাপরায়ণতার শতমুখে সুখ্যাতি করিতেছিল, তখন ঠাকুরদাস বলিয়াছিলেন, “হাঁ, ওর ওটা স্বভাব। যেই দেখলে তুমি প্রাণ তুচ্ছ ক’রে খেপা ঘোড়া ধরতে গিয়ে মাথায় চোট খেলে, অমনিই সেই পথেই ব’সে তোমার মাথা ও কোলে তুলে নিয়ে ওড়না ছিঁড়ে জলে ভিজিয়ে বেঁধে দিলে। তার পর বাসায় ফিরেও একদণ্ড তোমার পাশ ছাড়ে নি। তোমার আমার কথা কি, বাড়ীর ঝি-চাকরের অসুখ-বিসুখ হ’লেও এমনই ক’রে সেবা করে।”

অমলেন্দুর মুখখানা আশায় উৎফুল্ল হইয়াও শেষ কথাটায় ম্লান হইয়া গেল। সে যাহা শুনিবার আশায় উৎকর্ণ হইয়াছিল, তাহা শুনিতে পাইল না; দেবতোদ্দেশ্যে গোমুখের মত শেষে কথাটুকু না পড়িলে কি ক্ষতি হইত?

ঠাকুরদাস বাবুর সে দিকে লক্ষ্য ছিল না, কন্যার কথায় একবার অবতরণ করিলে তাঁহার বাক্যস্রোতঃ সহজে রুদ্ধ

হইত না। তিনি বলিয়া যাইতে লাগিলেন,—"ওর আর একটা বাই আছে, সেটা হচ্ছে কৃষ্ণের কথা। কৃষ্ণের কথা হ'লে ও তাতে তন্ময় হ'য়ে যায়। বলে, 'বাবা শৈশবকাল থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর চরিত্র আর কোথাও কখনও দেখেছ বা শুনেছ?' পাগলী আমার কৃষ্ণনামে পাগল!"

"কে নয় বাবা?" বলিতে বলিতে সেই সময়ে ইন্দু, জননীর সহিত সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। ঠাকুরদাস বাবুরা দ্বারকায় একটি বাসাবাড়ী ভাড়া লইয়াছিলেন। বাড়ী পাওয়া যায় না, বহু কষ্টে পাণ্ডার চেষ্টায় জুটিয়াছিল, সেটি এক শেঠীর বাগান-বাড়ী।

অমলেন্দু বলিল, "তা ঠিক, এমন আদর্শ চরিত্র কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না।"

ইন্দুমতী সাগ্রহে আনন্দভরে বলিল, "কেমন, নয় অমল বাবু? বাবাকে বল্লেই আমায় পাগলী বলেন।"

ইন্দুর জননী সস্নেহে তাহার একরাশ চুলের উপর হাত রাখিয়া হাসিয়া বলিলেন, "পাগলী না ত কি? দেখ্ ত, তোর জন্যেই ত দেশ ঘর ছেড়ে কোথায় এই দ্বারকা, প্রভাস, মথুরা, বৃন্দাবন ছুটে বেড়ান। মা গো! দেশ ত নয়, যেন দত্যির পুরী! জাহাজে চড়া কি বাপু আমাদের বাঙ্গালীর মেয়ের পোষায়?"

ইন্দুমতী বলিল, "না হ'লে ত দ্বারকানাথকে দেখতে পেতে না। আচ্ছা অমল বাবু, এত তীর্থ ত ঘুরেছেন, বলুন দেখি রণছোড়ের মত এমন সুন্দর ঠাকুর আর কোথাও দেখেছেন কি?"

গৃহিণী বলিলেন, "ওমা, রণছোড় আবার কে এল?"

ইন্দুমতী হাসিয়া বলিল, "রণছোড় দ্বারকানাথ, গুজরাটীরা রণছোড়জীকী জয় ব'লে দ্বারকানাথকে পূজো দেয় দেখ নি? জরাসন্ধের অত্যাচারে মথুরা কেবল মানুষশূন্য হচ্ছিল ব'লে শ্রীকৃষ্ণ রণ ছেড়ে দ্বারকায় এসেছিলেন, তাই ওরা রণছোড় বলে।"

গৃহিণী অবাক হইয়া বলিলেন, "এতও তুই জানিস বাপু!"

ইন্দুমতী কথাটা অন্য খাতে চালাইয়া দিয়া অমলেন্দুকে জিজ্ঞাসা করিল, "কই, অমল বাবু, বল্লেন না ত, এমন ঠাকুর আর কোথাও দেখেছেন কি না?"

অমলেন্দু লজ্জিত হইয়া বলিল, "সত্যি যদি বল্‌তে বলেন, তা হ'লে বলি, ঠাকুর বড় কোথাও দেখি নি। বেড়াতে বেরিয়েছি, জায়গাই দেখি।"

ইন্দুমতীর মুখমণ্ডল গম্ভীর আকার ধারণ করিল। ঠাকুরদাস বাবু বলিলেন, "তোর মত ত আর কেউ ঠাকুর-পাগলা নয়। যাক্ গে, আর দেরী করলে চলবে না, এখনই বেরিয়ে পড়া যাক্ চল। পাণ্ডা বলেছে, সন্ধ্যের আগে না গেলে ভাল জায়গা পাওয়া যাবে না।"

সকলে বাহির হইয়া পড়িলেন। মন্দির-দ্বারেই পাণ্ডা হাজীর ছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে লইয়া দ্বারকানাথের সম্মুখে তাঁহাদের দেখিবার সুবিধামত স্থান করিয়া দিলেন ক্রমে যাত্রীর ভীড় জমিতে লাগিল। তাহাদের ঘণ্টা-নিনাদ এবং 'জয় রণছোড়জীকী জয়' রবে মন্দির মুখরিত হইয়া উঠিল। পাণ্ডা ও পূজারীরা আরত্রিকের আয়োজন করিতে লাগিলেন। ধূপ-ধুনা গুগ্‌গুলের সুবাসে মন্দিরের গর্ভগৃহ ও সুপ্রশস্ত দালান ছাইয়া গেল। কাড়া নাকড়া দ্বারে বাজিয়া উঠিল।

একখানি কষ্টিপাথরে রাজবেশে দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি ক্ষোদিত। কি সুন্দর সে মূর্ত্তি! অমলেন্দু সেই মূর্ত্তির পবিত্রতা উপলব্ধি করিতে না পারিলেও তাহার কারুকার্য্যের প্রশংসা না করিয়া পারিল না। পূর্ব্বে সে রুক্মিণী মন্দিরেরও কারুকার্য্যে মুগ্ধ হইয়াছিল।

পূজারত্রিক আরম্ভ হইল। শত শত হিন্দু যুক্তকরে ভক্তিপূর্ণ-হৃদয়ে দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণের নামোচ্চারণ করিতে লাগিল।

আর অমলেন্দু সবিস্ময়ে দেখিল, ইন্দুমতীর দুই নয়নে দরবিগলিত ধারা বহিতেছে! তাহার সর্ব্বশরীরে রোমাঞ্চ হইল। সে হিন্দু বালিকার এই ভক্তিমতী মূর্ত্তি জীবনে আর কখনও দেখে নাই। ইন্দুমতীর কোন দিকে দৃষ্টি নাই, অপলক নীলোৎপলনয়নে সে দ্বারকানাথের দিকে চাহিয়া আছে, তাহার বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়াছিল বলিয়া অমলেন্দুর মনে হইল। কি আশ্চর্য্য! সেও ত হিন্দু সন্তান, তাহার ত এমন তন্ময়তা আসে না! তবে কি উহা তাহার বিকৃত শিক্ষার ফল? না, তাহাও ত হইতে পারে না। ইন্দুমতীও ত তাহারই মত উচ্চশিক্ষিতা, পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার ভাবে ইন্দুমতীও ত অনুপ্রাণিতা। এ কি আশ্চর্য্য প্রহেলিকা!

পাথরের প্রাণহীন মূর্ত্তিতে ইন্দুমতী কি দেখিতে পাইয়াছে? অমলেন্দু শুনিয়াছিল, শ্রীচৈতন্য পুরীর মন্দিরে জগবন্ধুর পূজারত্রিককালে এমনই ভাব-তন্ময় হইয়া যাইতেন, ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া 'হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ' বলিয়া ক্রন্দন করিতেন। সেও ত কাঠের প্রাণহীন মূর্ত্তি! অথচ সে সময়ে শ্রীচৈতন্যের মত শিক্ষিত পণ্ডিত কে ছিল? সত্যই ত এ প্রহেলিকা!

অকস্মাৎ তাহার চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল। তখন আরত্রিক সম্পন্ন হইয়াছে, যাত্রীরা দলে দলে মন্দির ত্যাগ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, বাদ্যাদি বন্ধ হইয়াছে। এই-বার ভোগ, প্রসাধন ও বিশ্রামের আয়োজন হইবে। ঠিক সেই সময়ে মন্দির-প্রাঙ্গণে মধুর বংশীর রব উত্থিত হইল—সে রব আকাশে বাতাসে ভাসিয়া রহিয়া রহিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া যেন জল স্থল ছাইয়া ফেলিল, যেন অমলেন্দুর মনে হইল, বাঁশী 'রাধা রাধা' বলিয়া আকুল আহ্বান করিতেছে। আর অমনই অমলেন্দু দেখিল, ইন্দুমতীর সর্ব্ব অঙ্গ থর থর কম্পিত হইতেছে, তাহার আয়ত নীলোৎপলদল-তুল্য নয়ন হইতে অপরূপ স্বর্গীয় দীপ্তি বিচ্ছুরিত হইতেছে, তাহার ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস নির্গত হইতেছে। দেখিতে দেখিতে মুহূর্ত্তমধ্যে সেই বেপথুমতী যুবতী জননীর অঙ্কে যেন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। রৈবতকে সেই একদিন, আর আজ দ্বারকায় এই একদিন। এ কি প্রহেলিকা, বিস্মিত স্তম্ভিত অমলেন্দুকে কে বুঝাইয়া দিবে?

৪

"দেখুন, ডাক্তার বাবু আপনাকে কথা কইতে বারণ ক'রে গেছেন", ইন্দুমতী রোগশয্যায় শায়িত অমলেন্দুকে কথাটা বলিয়া সতর্ক করিয়া দিয়া আবার বলিল, "জানেন কি, আজ তিন দিন মাত্র আপনি একটু ভাল আছেন?"

অমলেন্দুর রোগপাণ্ডুর বদনে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল, সে ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, "তা হোক, ডাক্তাররা অমন ভয় দেখিয়ে থাকে। তুমি—আপনি—"

"থাক্, হয়েছে। এখন এই ওষুধটা খান দিকি। বোম্বায়ে আপনার বন্ধুদের তার ক'রে দেওয়া হয়েছে—আর কাউকে আসতে হবে না, আপনার কলকাতার বাসাতেও বারণ করে দেওয়া হয়েছে। ডাক্তার বাবু আজ ব'লে গেছেন, ভয়ের কারণ আর নেই। উঃ! কি সর্ব্বনেশে রোগ! সেই বেট দ্বারকা থেকে ফিরে এসেই আপনি পড়েছেন।"

বস্তুতঃ তখন দ্বারকায় কলেরা দেখা দিয়াছিল। যেদিন ঠাকুরদাস বাবুরা বেট দ্বারকা দেখিতে যান, সেই দিন তীর্থ হইতে ফিরিয়া আসিবার কালেই কি জানি কেন অমলেন্দু অসুস্থ বোধ করিয়াছিল। শেষ রাত্রিতে তাহার ভেদ ও বমি আরম্ভ হইল। অবশ্য উহা কলেরা নহে, না হইলেও বিদেশে বন্ধুহীন স্থানে উহাতে আশঙ্কার কারণ যথেষ্ট ছিল। ভাগ্যে বরোদার মহারাজা গাইকবাড়ের দাতব্য চিকিৎসালয়ে সেই সময়ে এক জন বিজ্ঞ বিচক্ষণ ডাক্তার ছিলেন। তাঁহার সুন্দর চিকিৎসাগুণে (তিনি বলেন, ইন্দুমতীর অক্লান্ত সেবার গুণে) অমলেন্দু সে যাত্রা রক্ষা পাইল। কিন্তু তাহার রোগের জন্য ঠাকুরদাস বাবুদের দেশে প্রত্যাবর্ত্তনে বিলম্ব ঘটিল।

অমলেন্দু শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া আগ্রহভরে বলিল, "না, কখনো না। ডাক্তারের অত্যাচারের মাত্রা বড্ড বেশী বেড়ে উঠেছে, আমি কখ্খনো শুয়ে থাকবো না, আমি বেশ সেরে গেছি, বেশ বল পেয়েছি।"

"তা বেশ করেছেন। এখন ওষুধটা খাবেন, না আবার পাঁচ বার সাধতে হবে? মা এই মাত্র বলছিলেন, রোগী বড় একগুঁয়ে হয়।"

"তা হয় ত হয়, তা বলে কচি খোকার মত শুয়ে থাকা—দেখ ইন্দু—তোমায় তুমি বলছি ব'লে রাগ করছ না বোধ হয়?"

"কেন, রাগ করব কেন? আপনি বড় দাদার মত—"

"তা হলে ছোট বোনের মত আমার কথা শুনবে ত? বস দিকি ঐ চৌকীটাতে। আস ঘরে ঝড়ের মত, বেরিয়েও যাও ছুটে বিদ্যুতের মত—এ কি রকম?"

"কি বলবেন বলুন। মা বাবা এখনও ফিরলেন না কেন বুঝতে পারছি না, এর আগে ত ফেরবার কথা।"

"তাঁরা কোথায় গেছেন?"

"শঙ্কর মঠে। আজ আপনি ভাল আছেন বলে গেছেন। আমিও যেতুম, তা আপনাকে একলা ফেলে রেখে—"

"ইন্দু! ইন্দু! আচ্ছা, আমার যখন বড্ড বাড়াবাড়ি হয়েছিল, তখন কি তোমার খুব ভয় হয়েছিল?"

"হয়েছিল বই কি! আমারও হয়েছিল, বাবা-মারও হয়েছিল, কার না হয়? কেবল আপনার জন্যে কেন—বিদেশ বিভুঁই, আহা! গোপালের মারও যদি হ'ত, তা'হলেও কি ভয় হ'ত না?"

অমলেন্দুর আশায় উৎফুল্ল মুখখানা ম্লান হইয়া গেল। এ কি রহস্যময়ী বালিকা! ধরা দিয়াও ত দেয় না!

অমলেন্দু পুনরপি বলিল, "আচ্ছা, সেদিন বেট দ্বারকায় খাঁড়ি পার হওয়ার কথা মনে আছে? উঃ তেষ্টায় ছাতি ফেটে যেতে লাগলো—চার পাশে জল কিন্তু খাবার যো নাই—"

"খুব মনে আছে। জলে ঝাঁপ দিয়ে গুজরাটিদের সেই ছোট ফুটফুটে মেয়েটিকে উদ্ধার করতে না গেলে হয় ত আপনার ফিরে এসে ব্যারাম হত না, অতক্ষণ নোনা জলে থাকা—"

বাধা দিয়া অমলেন্দু বলিল, "মেয়েটি কি সুন্দর! কিন্তু কি অদৃষ্ট ওর—এই বয়েসে বিধবা হয়েছে! আহা!"

"হাঁ, শুনলুম, সবে ৭ বছরের।"

"সাত বছরের? তা, ওর আর বিয়ে হবে না?"

"না, তা কেমন ক'রে হবে—ওরা যে বামুন। আমাদের দেশে বামুন কায়েতের ঘরে কি বিধবার বিয়ে হয়?"

অমলেন্দু দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, "এ কি বদ নিয়ম! স্বামী দেখলে না, চিনলে না যে, সে আস্ত জীবনটা কি করে ব্রহ্মচর্য্য পালন করবে? ভারী অন্যায়!"

ইন্দুমতী ক্ষণকাল নীরবে রহিল; তাহার দৃষ্টি অবনত, নয়নপল্লব প্রায় নিমীলিত। ক্ষণপরে সে মৃদুস্বরে বলিল, "ইংরাজদের দেশে যে সব মেয়ে একটা আদর্শ আঁকড়ে ধরে রেখে আস্ত জীবনটা ব্রহ্মচর্য্য পালন করে, তাদের কি ক'রে তা সম্ভব হয়?"

অমলেন্দু বিস্মিত হইল। উচ্চশিক্ষিতা ইন্দুমতীর মুখে এ কি কথা? সে বলিল, "তুমি কি তা হলে আগেকার পতিদেবতা-টেবতার কথা বিশ্বেস কর? পত্নী দাসী—পতি-পত্নীর ইহযুগে অচ্ছেদ্য বন্ধন—এ সব?"

ইন্দু ধীরকণ্ঠে বলিল, "এখনকার কালেও য়ুরোপে আমেরিকায় স্বামীর অকালমৃত্যুর পর স্ত্রী আত্মহত্যা ক'রে মরেছেন, এ খবরও ত কাগজে পড়েছেন।"

অমলেন্দুর বিস্ময় উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। সত্যই কি ইন্দু প্রহেলিকা? অমলেন্দু বলিল, "হাঁ, তা পড়েছি বটে, কিন্তু সে যাদের বেশী বয়েস হয়েছে, যারা ভাবতে শিখেছে—তারা।"

ইন্দুমতী এতক্ষণ দধি হইতে ঘোল তৈয়ার করিতেছিল। গ্লাসে ঘোল ঢালিয়া লেবুর রস দিয়া গ্লাসটা বাড়াইয়া দিয়া বলিল, "খান।"

অমলেন্দু গ্লাসটা লইয়া বলিল, "তা খাচ্ছি, কিন্তু জবাব না দিয়ে পালালে হবে না।"

ইন্দু হাসিয়া বলিল, "কি জবাব দেবো—আপনি বিদ্বান, আপনার সব কথার জবাব দেবার আমার ক্ষমতা কোথায়?"

"না, না, ও ফাঁকির কথা শুনবো না। কথা যখন উঠেছে, তখন তার শেষ মীমাংসা হওয়া চাই। বলছি কি, যারা স্বামী চিনেছে, তারা স্বামীর সঙ্গহারা হলে সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করে; কিন্তু যারা একবারে শিশু—ধর, ঐ গুজরাটি বামুনের মেয়েটির মত?"

ইন্দুমতীর মুখ গম্ভীর হইল, সে ধীরে ধীরে বলিল, "ওদের দেশে শুনেছেন কি, এক একটা লোক একটা জিনিষের সন্ধানে—এক একটা উদ্দেশ্য আর লক্ষ্যকে আঁকড়ে ধরে জীবনটা কাটিয়ে দেয়? এই যেমন ধরুন, অজানা দেশ আবিষ্কার করা। একটা পাহাড়ের শিখর, একটা নদীর উৎপত্তির স্থান, একটা মরা জাতির ইতিহাস, একটা লুপ্ত পশু বা পক্ষীর পুরাবৃত্ত—এমনই কত কি। তারা বিবাহ করে না, সংসার জানে না, পরিবারের খোঁজ রাখে না—তাদের লক্ষ্য নিয়েই তন্ময় হয়ে থাকে। তেমনই ওদের নারীদের ভেতরেও এমন অনেকে আছে, যারা সেবাধর্ম্ম নিয়ে থাকে অথবা ধর্ম্ম নিয়ে থাকে, নার্স বা নান্ হওয়াই তাদের লক্ষ্য—তারা তাই নিয়েই তন্ময় হয়ে থাকে, সংসার-ধর্ম্ম বোঝে না, বিবাহ বোঝে না, পুত্র-পরিবার বোঝে না। বলছি না যে এটা সাধারণ নিয়ম, এটা তার বাইরে, তাই সাধারণ লোক হঠাৎ ও'র ভেতরের মর্ম্মটা বুঝতে পারে না, তাই ধারণার বাইরে বলে ওটাকে গাল দেয়, ঐরকম পুরুষকে বলে পাগল আর নারীকে ব'লে ছিষ্টি-ছাড়া। তা বলে তাদের অস্তিত্ব ত অস্বীকার করতে পারেন না।"

অমলেন্দু বলিল, "এ দেশের শিশু বিধবাদের সঙ্গে এ তুলনার সম্পর্ক কি হ'ল?"

ইন্দুমতী গম্ভীরভাবে বলিল, "এ দেশের শিশু বিধবারাও এমনই একটা আদর্শ ও লক্ষ্যের সন্ধান পেতে অভ্যস্ত হলে সেইটেকে আঁকড়ে ধ'রে থাকে এমন ত এ দেশে ঢের আছে।"

"বাঃ স্বামী কি যারা জানলে না, তাদেরও কি অন্য পত্নীর মত নূতন ক'রে সংসার পাততে, নারীজন্মের সার্থকতা লাভ করতে, মাতৃত্বের আস্বাদ পেতে ইচ্ছে হয় না? এ কেমন যুক্তি তোমার?"

ইন্দু বলিল, "তার চেয়েও যদি কিছু বড়র সন্ধান তারা পায়? দেহ ছাড়া বড় কিছু আছে ত? তা মানেন ত? যে বড়র আকর্ষণের ধ্বংস নেই, সেই বড়র?"

ক্ষণপরে হাসিয়া বলিল, "ভারী তার্কিক মনে করছেন আমায়, না? বাবা ঐ জন্যে আমায় তার্কিক বলে ঠাট্টা করেন। এ আমার একটা রোগ। যাক্‌গে, ঘোলটা যে হাতেই ধ'রে রইলেন, খেলেন না?"

অমলেন্দু তন্ময় হইয়া কি ভাবিতেছিল, কখন যে ইন্দু-মতী ঘরের বাহির হইয়া গিয়াছিল, জানিতে পারিল না।

* * *

অমলেন্দু অন্নপথ্য করিয়াছে, বেশ সুস্থ ও সবল হইয়াছে। কালই তাহাদের দ্বারকা হইতে যাত্রার কথা।

কয়দিন অমলেন্দুর মনটা বড় চঞ্চল। সে কোন কিছুতে মন স্থির করিতে পারিতেছিল না। কি একটা বিষয়ে সে অহরহঃ চিন্তামগ্ন ছিল, তাহাকে ডাকিয়া শীঘ্র সাড়া পাওয়া যাইতেছিল না।

সন্ধ্যারতি শেষ দেখিয়া আসিবার পর যখন তাহাদের মালপত্রের গোছগাছ করা হইতেছিল, তখন ইন্দুমতী তাহার ঘরে আসিয়া বলিল, "আপনার সুটকেসটা গোছান হয়েছে, অমল বাবু? দিন কি কি গোছাতে হবে।"

ইন্দুমতী একে একে অমলেন্দুর জিনিষপত্র গুছাইতে আরম্ভ করিয়া দিল। সান্ধ্য দীপালোকে তাহার অনবদ্য সৌন্দর্য্য শতগুণে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাহার সুদক্ষ কর-পল্লব দুইটির অবিশ্রান্ত কার্য্য-সম্পাদনের দিকে অমলেন্দু একদৃষ্টে চাহিয়াছিল। সে শুধু তাহার সঙ্গলাভেচ্ছায় তাহাকে কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছিল, অন্যথা সে কখনও তাহাকে সেই ভার অর্পণ করিত না।

অমলেন্দুর ধৈর্য্যের বাঁধ আর বাধা মানিল না। সে উদ্বেগাকুল কণ্ঠে বলিল, "ইন্দু, হয় ত আমাদের এই শেষ দেখা। এর পর তুমি কোথায় যাবে, আমিই বা কোথায় থাকব, তা জানি নি। আমার শেষ একটা কথা শুনবে কি?"

ইন্দুমতী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া গম্ভীরস্বরে বলিল, "কি, বলুন।"

অমলেন্দু কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "একটা ভিক্ষে চাই। তোমার বাপ-মার সঙ্গে কথা ক'য়ে ভাবে বুঝেছি—"

ইন্দু বলিল, "কি বুঝেছেন?"

"তাঁরা আমায় ছেলের মত ভালবাসেন।"

"তা ত বাসেনই।"

"কিন্তু যাতে আমি তাঁদের যথার্থ ছেলের মত হ'তে পারি, —সে সম্বন্ধের দাবী করতে পারি, সেই অধিকার আমায় দাও, এই ভিক্ষে চাই। আমি তোমার অযোগ্য হ'তে পারি কিন্তু—"

কথা শেষ হইল না, ইন্দু দাঁড়াইয়া উঠিয়া কাতর-দৃষ্টিতে অমলেন্দুর দিকে চাহিয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "ছিঃ অমল বাবু! আপনারা পুরুষরা নারীকে কি কেবল কামনার দৃষ্টিতেই দেখেন? নারীর সঙ্গে কি পুরুষের অন্য সম্বন্ধ হ'তে নেই? বন্ধুত্ব পুরুষে পুরুষেই হয়, কিন্তু পুরুষে নারীতে কি ভ্রাতা-ভগিনীর সম্বন্ধ হ'তে পারে না?"

অমলেন্দু দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিল, তাহার সর্ব্বশরীর থর্ থর্ কাঁপিতেছিল, সে আকুল উৎকণ্ঠা ও আশঙ্কা-জড়িত-স্বরে বলিল, "ইন্দু, এ কি বলছ? তুমি কি বুঝতে পার নি, আমি তোমায় কত ভালবাসি—"

"ও কথা মুখে আনবেন না আর কখনও। আপনার সঙ্গে হেসে কথা কই, তর্ক করি, আপনাকে স্নেহ-যত্ন করি, সেবা করি, তাই বলেই কি মনে ভেবে নিয়েছেন, আপনাকে আমি বন্ধুর চেয়ে—ভায়ের চেয়েও বড় আসনে বসিয়েছি? আপনি শিক্ষিত, কিন্তু আজও আপনি নারীকে চিনতে পারেন নি।"

উত্তরের প্রতীক্ষা না রাখিয়াই ইন্দুমতী কক্ষত্যাগ করিয়া গেল। অমলেন্দু আহত বাণবিদ্ধ পক্ষীর ন্যায় ছটফট করিয়া শয্যার উপর শুইয়া পড়িল। যখন তাহার আহারের ডাক পড়িল, তখন সে বলিয়া দিল, সে কিছু খাইবে না, শরীর অসুস্থ।

কর্ত্তা ঠাকুরদাস বাবু তাহার ঘরে ছুটিয়া আসিয়া হন্তদন্ত-ভাবে বলিলেন, "কি হে, আবার কি অসুখ হে—"

বলিয়াই তিনি চমকিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার আর কথা সরিল না। তিনি অমলেন্দুর চেহারা দেখিয়া বিস্ময়ে দুই

চক্ষু কপালে তুলিলেন, বলিলেন, "ব্যাপার কি অমল, সত্যিই অসুখ করেছে ?"

অমলেন্দু তখন তাঁহাকে বসাইয়া সত্য কথা খুলিয়া বলিল। বলিতে বলিতে তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। ঠাকুরদাস বাবু সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! ওকে বিয়ের কথা বলেছ? আমায় আগে একবার বল্লে না কেন? আর ব'লেই বা কি হ'ত? ন বছর বয়সে তোমাদেরই অনন্তপুরের জমীদারের ঘরে ওর বিয়ে দিয়েছিলুম, তারাও দত্ত, বোধ হয় তোমাদের জ্ঞাতি হবে। এক বৎসর পরেই বিধবা হয়। বিয়ের পর মাত্র একবার শ্বশুর ঘরে তিন দিনের জন্যে ঘর করতে গিয়েছিল, তাও তাদের কলকাতার বাড়ীতে। তার পর শ্বশুরঘরের সঙ্গে ওর সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক নেই বলি কেন, যাওয়া-আসা নেই। আমায় ত দেখছ, আমি মেয়েকে কি ক'রে শিক্ষিত করেছি, তাই আমার বাল্য-বিধবার পুনর্ব্বিবাহে আপত্তি নেই। ঢের চেষ্টা করেছি, কিছুতেই রাজী করতে পারি নি। এত লেখাপড়া শিখেছে, তবু ঐ যে কেমন গোঁ—"

অমলেন্দু বলিল, "সে আদর্শের—সে লক্ষ্যের কথা আমায় আর এক দিন অন্য কথায় বুঝিয়েছে।"

ঠাকুরদাস বাবু বলিলেন, "হাঁ, আদর্শ না আমার মাথা! ও একটা গোঁ। সত্যি বলতে কি, তোমায় পেয়ে, আর তোমার সঙ্গে ওর মেলামেশা দেখে আমার বড় আশা হয়েছিল, হয় ত ওর মন ফিরতে পারে। ভালই হয়েছে, তুমিই বোঝাপাড়া ক'রে নিয়েছ, আমার বলার দায়ের ভয় থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছ। জান, অমল! জামাই আমার সুন্দর বাঁশী বাজাতে পারত। গিন্নীর কাছে শুনেছি, ও তাই বাঁশীর গান শুনলে তন্ময় হ'য়ে যায়—সে বাঁশীতে সে কৃষ্ণের সাধা বাঁশীর গান শুনতে পায়। বৃন্দাবনে নাকি ও সত্যিই বাঁশী শুনেছিল। শুনেছি, কোন কোন ভাগ্যবান বৃন্দাবনে বাঁশী শুনতে পায়!"

* * *

পোরবন্দরে যখন ঠাকুরদাস বাবুরা রেলপথে উজ্জয়িনী, মথুরা, বৃন্দাবন হইয়া দেশে ফিরিবার জন্য অবতরণ করিলেন, তখন সকলেরই নয়নে অশ্রু ছাপাইয়া উঠিল। এই কয়দিনে অমলেন্দু তাঁহাদের মনের অনেকটা স্থান জুড়িয়া বসিয়াছিল। ইন্দুমতী নৌকায় নামিবার পূর্ব্বে অশ্রুসজল-নয়নে বলিল, "অমল দাদা, ছোট বোনের শত অপরাধ মার্জ্জনা কোরো, অজ্ঞাতে যদি কোনো কষ্ট দিয়ে থাকি, তার জন্যে ক্ষমা কোরো।"

অমলেন্দু বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "সুখে থাক বোন। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার ইষ্টসিদ্ধি হোক্!"

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু

শারদীয়

এসেছে নূতন শরৎ আজিকে
এনেছে নূতন হাসি ;
এনেছে নূতন প্রাণের পরশ
এনেছে নূতন বাঁশী।
এনেছে সদ্য শিশির-সিক্ত
নূতন শেফালি-মালা ;
এনেছে নূতন রক্ত-করবী
যৌবন-মধু ঢালা।
এনেছে নূতন অলি-গুঞ্জন,—
বাণীর বীণার তান ;
এনেছে সবুজ শস্যের ক্ষেতে
কমলার নব দান।
এনেছে সুদূর ওই সীমাহীন—
অপরূপ নীল-পথে,—
বাল-বীর চির কার্ত্তিকে শ্বেত—
মেঘ-ময়ূরের রথে।
এনেছে মায়ের বক্ষেতে ভরি—
আশীষ সিদ্ধিদাতা ;
করুণায় ভরা আঁখি দুটি তাঁর,—
আসন শিবের পাতা!
এসেছে নূতন সোনার শরৎ—
নূতনের পথ ধরি ;
এনেছে মায়ের সোনার ঝাঁপিটি
সোনার স্বপনে ভরি।
আজ শুধু প্রাণ করে আন্‌চান্‌,
বাঁধিয়া রাখিতে নারি ;
অসীমের বুকে মিশে যেতে চায়
এ ধূলি-শয্যা ছাড়ি।

শ্রীঅমূল্যকুমার রায় বে

২২
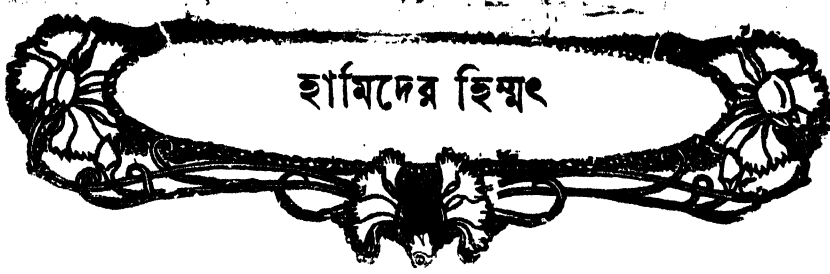
প্রজা ব'লে পীড়িতরা আফতাফের পুত্র; কৃষিক্ষেত্রে শ্রমিক-সহযোগী ব'লে তিনি এদের মিত্র মনে করেন; খোদার জীব, সেই জন্য এরা তাঁর ভাই; স্নেহভালবাসার এতগুলা মধুর সম্বন্ধে যাদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ কুটুম্বিতার বন্ধন, তাদের গাছতলা সার হ'ল, এ দেখে আফতাফ কোন্ লজ্জায় নিশ্চিন্ত হয়ে দোতালায় ব'সে মুখে ভাত তুলবেন। সব শুনে সেলিনা বললে, "তা ত বটে-ই, গোলায় খড় আছে, বাগানে বাঁশ-ঝাড় আছে, পাটের-ও অভাব নেই, আর জন-মজুর—"

আফ। তুমি হুকুম দেছ শুনলে-ই আর সব লোকের কথা দূরে থাক, হাড়-কুড়ে জাফরাটা-ও দা হাতে ক'রে দৌড়বে। তার পর যাদের ভালর জন্য তুমি এই হুকুম দেবে, তারা-ও মেয়ে-মদ্দে খাটতে জানে।

সেলিনা। হা আল্লা! মেয়েরা মট্‌কায় উঠে চাল ছাইবে নাকি?

আফ। মাটী কোপাবে, কাদা করবে, বেড়া নেপবে, এও জান না, পাগলী? কেবল কোঠায় ব'সে রাজমিস্ত্রীর স্বপ্ন দেখ!

সেলিনা। স্বপ্ন আর আমি বেলকুল দেখি না, আমার ছেলেবেলার সব সোনার স্বপ্ন সত্যি সত্যি ফ'লে গেছে, তাই স্বপ্ন আমার কাছে বিদায় নিয়ে আইবুড়োপাড়ায় রাত জাগছে।

আফ। একটা ভাবছি, বাঁশ, দড়ী, খড়, খুঁটী সব-ই যেন আগাম দিলাম; গোলা থেকে ধানটা-ও আপাততঃ বাড়তিতে দিতে হবে, তাও বুঝতে পারছি, নইলে কি খেয়ে বাঁচবে। কিন্তু পরে এ সব আদায় দেবে কোত্থেকে? জমীদারের খাজনার কিস্তিই অনেকে ঠিক আন্জাম করতে পারে না।

সেলিনা। (ঈষৎ হাস্যে) ও পাশকরা মিয়া, বিবিকে আবার একজামিন করা হচ্ছে নাকি,—এস্তাহাম, এস্তাহাম? তোমার কাছে ত চিরকাল দেখছি গরীব-গুর্ব্বো লোক দায় জানাতে-ই আসে, আদায়ের পেয়াদা, তসীলের লাঠী দেওয়ানগঞ্জের চৌধুরীদের কুঠীতে আছে নাকি?

আফ। পরদাদারা লাঠী-ফাটী রাখেনি ব'লে-ই থাকতে ফাঁকি কখনও কোন রেয়তে চৌধুরীদের দেয় নি।

সেলিনা। কিন্তু এবার—তার মানে কালকে-ই তোমায় একগাছা খুব লম্বা শক্ত বেউড় বাঁশ কাটিয়ে লাঠী বানাতে আমি বলছি; সেলিনা বিবির এ হুকুম তোমায় ফওরাণ তামিল করতে হবে।

আফ। এত রাত্রে গোলামের উপর এ হুকুম কেন?

সেলিনা। গোলাম তুমি আমার নয়, আল্লার; দিন দুনিয়ার মালিকের একটি গরীব মেয়ে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল, তা'র তল্লাস করা আগে আবশ্যক। চালা ওঠাবার, ধান-চাল বেটে দেবার চেয়ে-ও বেশী আবশ্যক। আমার বিশ্বাস, গদাই গোড়লের বউ কখন-ও মরেনি; আগুনে পুড়লে নিদেন একখানা হাড় খুঁজে পাওয়া যেত, পুকুরে ডুবলে এদ্দিনে লাশ ভেসে উঠ্‌ত, যদি পালিয়ে কোথাও লুকিয়ে থাকত, এই চার দিনের মধ্যে এসে দেখা দিত না, কি কারুর মুখে একটা খবর পাওয়া যেত না!

আফ। তবে তোমার কি মনে হয়?

সেলিনা। আমার যা মনে হচ্ছে, তা মুখে উচ্চারণ করতে-ও লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে। আর খোদা! আর খোদা! তোমার পবিত্র নামে নারীর উপর অত্যাচার!

আফ। অত্যাচার! উঃ, এটা আমার মনে একবার-ও উঠেনি! সেলিনা! সেলিনা! কি করি বল?

সেলিনা। সে রাত্রের খবর পেয়ে আমি উপোস ক'রে মরতে চেয়েছিলুম; তুমি কি মনে কর দুখানা খড়ের ঘর পুড়ে গেছে ব'লে এত আদরের নবীন প্রাণ, এত সাধের স্বামী ছেড়ে সে কবরের আবরুর ভিতর ঢুকতে চেয়েছিল? তোমার কথায় তার পরদিন আমি মুখে ভাত তুলেছিলুম;

কিন্তু আজ থেকে তিন দিনের মধ্যে যদি মোড়লের বোয়ের কোন কিনারা না হয়—

"কিরে করিস্ নি বোন্ কিরে করিস্ নি", নসীবন একটু তফাতে চুপটি ক'রে ব'সে স্বামি-স্ত্রীর এই কথোপকথন শুন্‌ছিল; শুন্‌তে শুন্‌তে অবাক্, অবাকের উপর আর-ও অবাক্ হয়ে বিস্ফারিতনয়নে যেন একরকম আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। ভাবছিল যে, শুনেছি, সমুদ্রের অগাধ জলের নীচে-ও সময় সময় আপনা-আপনি আগুন জ্বলে উঠে, দেখছি সেটা সত্যি; তা না হ'লে এই সেলিনা স্থিরা, ধীরা, লজ্জায় লালিত্যে লতিয়ে পড়া সেলিনার অন্তর হ'তে এই অনলের ফুৎকার কি বেরুতে পারে? যখন সে দেখ্‌লে, তার ছোট বোন্‌টি কি একটা কঠোর পণ করতে উদ্যতা হয়েছে, তখন বুঝলে যে, এ মিছামিছি ভয় দেখান নয়, অভিমানের আবদার নয়; সেলিনার ভিতর রোস্তমের শক্তির সঞ্চার হয়েছে; আবেগের উচ্ছ্বাসে নসীবনের রুদ্ধ বাক্‌শক্তি বিস্ফুরিত হয়ে গেল, তাই ব'লে উঠল, "কিরে করিস্ নি বোন্ কিরে করিস্ নি।"

আফতাফ বল্‌লে, "সেলিনা, শপথের প্রয়োজন নেই; পুরানো দলীলে দেখেছি, একদিন আমাদের জায়গীর ছিল, এখন দাঁড়িয়েছে এই ক্ষুদ্র জমীদারীটুকুতে, এও বিক্রী হয়ে হায় যাক্, জীবন্ত বা মৃত গদাই মণ্ডলের বৌকে আমি খুঁজে বার করাবই করাব।"

২৩

সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের কাছে সত্যের সংবাদ তাড়িতাধিক বেগে পৌঁছে যায়। সত্য যখন মানবমুখে দৃঢ়তার সহিত উচ্চারিত হয়, তখন ইচ্ছাশক্তি দৈবপ্রভাব সেই সত্যকে নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষ করিয়ে দেখায়। পরদিন সকালেই চৌধুরী সাহেবদের বাড়ী থেকে লাঠী বেরুল, আর এক একগাছা লাঠীর সঙ্গে বেরুল এক এক জোড়া চোখ, সে চোখ দেখলেই লোক বুঝতে পারে যে, ওর তারার পিছনে স্বয়ং যম দাঁড়িয়ে আছেন মশাল হাতে ক'রে। ৮২ বছরের বুড়ো দেদার সর্দ্দার বুঝি আজ বাঁ হাতের পাঞ্জায় তার ২৫ বছরের নাতির গর্দ্দানাটা চেপে ধরলে হাড় ক'খানা দেখতে দেখতে গুঁড়িয়ে ফেল্‌তে পারে। খয়রাতির নানি বুড়ী আস্তে আস্তে হাতছানি দিয়ে ডেকে নিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে কি বল্‌লে। দেদার তার নাতি, হীরে বাগ্দী আর দু'টো পুরানো পাককে সঙ্গে ক'রে চল্‌লো এণ্ডাবাড়ী-বাগে; সে গাঁখানার পোয়া তিনেক তফাতেই শেখের বিল, বিলের উত্তরপারে প্রায় বিঘে দশেক জমী তাল, তেঁতুল, খেজুর, কাঁঠাল, বাঁশ, শিমুল, নিম এই রকম সব গাছের ঘেঁসাঘেঁসিতে একটা যেন বন হয়ে আছে; তার মধ্যে কে জানে কোন্ কালের হিন্দু কি মোছলমান যা হোক্ একটা বিশ্বাসদের পরিত্যক্ত প্রসিদ্ধ ভূতের ভাঙ্গা বাড়ী। বাঙ্গালার তৈয়ারী পাকরা হাতীর মত নিঃশব্দপদে চল্‌তে জানত; সুতরাং হানিফ গাজীর ভেয়ের বেটা যখন বৌটাকে ফেলে তার মুখের ভিতর কুঁকড়ার মাংস ভ'রে দেবার চেষ্টা কর্‌ছিল, আর মেয়েটার চীৎকার ক'রে কান্না শুনে মাণিক্ মোল্লা আর কুদ্রুৎউল্লা দাঁত বার ক'রে হাসছিল, তখন জ্যান্ত চারটে ভূত ঘাড় মট্‌কাবার জন্য ঘরে ঢুকেছে, তা জান্‌তে পারে নি। লাঠী মারা ওদিকে যাক, ওঠাতেও হ'ল না, এমন কি, "শূয়োরের বাচ্চা" কথাটা দেদার সর্দ্দারের মুখ থেকে বার হবার আগে-ই তিনটি ধার্ম্মিক পুরুষ উধাও দৌড়; হীরে বাগ্দীর পায়ের লাথি খেয়ে কুদ্রুৎটা একবার হুমড়ি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছিল বটে, কিন্তু লাঠী যে ঘুরিয়ে মারে, তার হাতের শক্তির চেয়ে পাপীর পায়ে দৌড়বার জোর ঢের বেশী।

দেদারের বয়সী পুরাতন পরিচারকের কাছে আমীর-ওমরার জেনানার পর্দ্দা-ও উন্মুক্ত; "আম্মাজান্, এই নাও তোমার লেড়কী" ব'লে বৃদ্ধ সেলিনার পায়ের কাছে সেলাম করলে। "আমি তোমার বেটীর বেটী, দেদার বক্স, আমায় কি সেলাম করতে হয়", বল্‌তে বল্‌তে ডান দিকের ওপর-হাতের বারো ভরির সোনার বাজুখানি খুলে দেদারের হাতে দিয়ে সেলিনা বল্‌লে, "প'রে এবার আল্লাকে সেলাম কর।" বুড়া বাজুখানা মাথায় পরবার চেষ্টা করতে করতে বাইরে চ'লে গেল।

১৮ বছরের ছেয়ালো-ছোয়ালো বাদামী রংয়ের বৌটি দেখতে বেশ সুশ্রী; ৫।৬ দিনের তাড়নায় উপবাসে পাতলা মুখখানি যেন মলিনতায় আর-ও মিষ্ট হয়েছে; ভয়ে লজ্জায় অনবরত জল ফেলায় চোখের কোণে কে যেন একটু কাজল পরিয়ে দিয়েছে, চুলগুলির ওপর বিস্তর আকর্ষণের অত্যাচার হয়েছে, অন্ধকারের ধূলি-ধূসরিত ঝারা দেখে তা বেশ

বোঝা যাচ্ছে। উৎকণ্ঠাজনিত শুষ্ককণ্ঠে মেয়েটি জিজ্ঞাসা করলে, "আমার কি হবে, কোথায় যাব ?"

সেলিনা। যে ক'দিন না তোমাদের নতুন ঘর ছাওয়া হয়, তত দিন এখানকার খামারবাড়ীতেই থাকবে, তার পর ঘরের বৌ ঘরে যাবে"।

বৌ। আমায় কি আর ঘরে নেবে ?

সেলিনা শিহরিয়া উঠিল, পরে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "কেন, তোমার কি হয়েছে ?"

বৌ। না না, আমি কোন পাপ করি নি, মা মঙ্গলচণ্ডী রক্ষা করেছেন ; বড্ড তেষ্টার সময় যে ঘরে রেখেছিল, তার পাশেই একটা দাম-ভরা ডোবা ছিল, আঁচলা ভ'রে তার জল খেয়েছি।

সেলিনা। তবে ঘরে নেবে না কেন ? আহা! ক'দিন উপোস ক'রে আছ, এটা আমার মনেই হয় নি। বেচুয়া, যা, মেয়েটিকে নিয়ে ঐ জমাদারদের ঘরে, আমার নাম ক'রে মিশরাইনকে বলবি, যেন ঘরে যা রুটী-টুটি আছে, তা একে ভাল ক'রে খাওয়ায়।

বেচুয়া বৌটিকে ডেকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেল।

২৪

"সেলিনা ত বললেন, তবে ঘরে নেবে না কেন ; বড় ঘরের বৌ হ'লে কি হয়, দয়ামায়াও আছে দেখতে পাই, দীনদুঃখীকে দু'পয়সা হাতে তুলেও দেন বটে, তবু হক্‌ কথা বলতে গেলে ধর্ম্ম, যাকে পরকাল বলে, তা ত আর ওঁদের নেই ; সে সবগুলো খাওয়া-দাওয়া ওঁদের ঘরে না থাক্‌লেও জেতে যে মুছুলমান, এ কথা ত আর অস্বীকার করবার যো নেই ; আমরা গরীবই হই আর যা-ই হই, একটু-আধটু শাস্তর-গ্যান ত আছে, নইলে হিঁদুর ঘরে জন্মালুম কেমন ক'রে! গদাই যদি ঐ বৌ নিয়ে আবার ঘর করতে চায়, তা হ'লে এখানকারে কেউ ত ওর হাতের জল খাবে না ; কাযেই যে দিকে দু'চক্ষু যায়, ওকে সেই দিকে যেতে হবে।" যে শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্না স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যিণী এই ব্যবস্থা দিলেন, তাঁর নাম উজ্জ্বলা বোষ্টমী, গোপীযন্ত্র বাজিয়ে সারাদিন গান গেয়ে পয়সা আদায় ক'রে এর দিনগুলি, আর গোপীভাবে গদগদ হয়ে রাতগুলি যৌবন হ'তে আরম্ভ ক'রে প্রৌঢ়ত্বের প্রান্ত-সীমা পর্য্যন্ত পৌঁছে কেটে গেছে। পঞ্চাশের পারে এসে পাকা চুলগুলি কপ্‌চে ফেলেছেন। মাথার মাঝখানে একটি টিকি রেখেছেন। গোপীযন্ত্র ছেড়ে এখন খঞ্জনী বাজিয়ে কলঙ্ক-ভঞ্জনের গান গেয়ে থাকেন, আর গদাইয়ের মামা নিবাস সামন্তর ঢেঁকশেলে শুয়ে রাত কাটান। ডাকাতীর রাত্রিতে ইনি গাঁয়ে ছিলেন না, একখানা ছাড়া কাপড়ও তাঁর পুড়েনি, সুতরাং ফিরে এসে গ্রামখানি ভস্ম হয়েছে দেখে এ সংসার মায়ার খেলা, কেউ কারও নয়, টাকা-কড়ি, ঘর-দোর, গরু-বাছুর এ সব মিছে ব'লে লোককে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, নিবাসকে বেশ ক'রে বুঝিয়ে বলেছেন যে, জমীদারকে ব'লে কোন রকম ফাঁকি দিয়ে সে যেন আর একখানি ছোট ঘর করিয়ে নেয়, যেখানি নিজস্ব ক'রে নিয়ে তিনি নৈশ-আলস্য উপভোগ করবেন।

উজ্জ্বলা ঠাকরুণ ছাড়া চণ্ডীগ্রামে আর দু'জন পণ্ডিত শাস্ত্রজ্ঞ ব'লে সম্মান পেতেন। এক জন মনু, আর এক জন যাজ্ঞবল্ক্য। প্রথমটি হচ্ছেন চণ্ডীঘরের পূজারী ভৈরব ঘোষাল ; আর দ্বিতীয় শীতলার পণ্ডিত ছিরু ডোম। এঁরা দু'জনেই মত দিলেন যে, "বৌয়ের ব্যবস্থার আগে গদাইটিকে যে প্রাচিত্তির কর্‌তে হবে। কথাটা ত সোজা নয়, গাঁখানি কার, সেটা আগে বোঝা উচিত। এ যে মা মঙ্গলচণ্ডীর নিজের সম্পত্তি। ধাড়ার হারু পালুইয়ের আট বছরের অমন ক্রেশাঙ্গী ঘেঁটু ঠাক্‌রুণের মত মেয়ের সঙ্গে ওর বেটার সম্বন্ধ ক'রে দিচ্ছিলুম, তা মেয়ের মুখময় ডোবো ডোবো দাগ দেখে নবাব-পুত্তুরের পছন্দ হ'ল না।" ছিরু বল্‌লে, "পেরত্যক্ষ মা'র অনুগ্‌গর দেখেও সে মেয়ে পছন্দ হ'ল না। ঐ মেয়েটা সেরে উঠতে হেরো রাঙ্গা পেড়ে সাড়ী লগৎ ল'সিকে আর কত কি উপকর্ণ দিয়ে আমার ওখানে পূজো পাঠিয়ে দেয়।"

ঘোষাল টিপ্পনী কর্‌লে, "কলিকাল হে ছিরু, কলিকাল! ঐ লছপটে বৌ যদি ঘরকে না আনবে, তবে শাস্ত ছিষ্টি সেকের পোরা এ গাঁয়ে আসতে যাবেক কেন ? সেই কোরোধেই ত মা গাঁকে গাঁখান পুড়িয়ে নিজে ভস্ম হয়ে গেলেন। এই মাগ্‌গি গণ্ডার বাজার, পেতলের একটা ছোটখাট কলসী কিন্‌তেও কম-বেশ তিন তিনটে টাকা প'ড়ে যাবে ; জমীদার মা হয়, পয়সা আছে, বালাখানা তুলে দিলে, ওর ট্যাকায় কেনা কলসীতে শম্ভু ঘোষালের পৌত্তুর হয়ে আমি ত আর পেরাণ প্রিতিষ্টে কর্‌তে পারব না।"

গদাই মুস্কিলে পড়লো ; সে কাঁদে, তার পরিবার কাঁদে, বৌটা কাঁদে, আর বেটা যেন আপসে বেড়াচ্ছে ; নিজের মাথায় লাঠি বসিয়ে দেবে, কি উজ্জুলীর মুখে গোবর পুরে দিয়ে ঘোষাল আর ডোমটাকে যমের বাড়ী পাঠাবে, তা ঠিক করতে পারছে না।

সেলিনার কানে এ সব কথা যখন পৌছল, সে আকুল হয়ে নসীবনকে জিজ্ঞাসা করলে, "দিদি, এ সব কি শুনছি, কি হবে ?"

নসী বল্‌লে, "ডোমের পণ্ডিতের বিধির ওপর কথা কবার 'সাধ্যি' তোমার দিদির নেই। তোমার অমূল্য নিধির কাছে যাও, দেখ তিনি কি বলেন।"

চাঁদপুরের ইন্দুভূষণ বিদ্যাবিনোদকে ও অঞ্চলে সবাই ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। আফতাফ দিনকতক তাঁর কাছে সংস্কৃত পড়েছিল, তাঁকে আন্‌বার জন্য পেস্কার বীরেশ্বর চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে একটা হাতী পাঠিয়ে দিলে। বিদ্যাবিনোদ মশাই এসে সকল বিবরণ শুনে বল্‌লেন, "এর ত অতি সুন্দর সহজ ব্যবস্থা রয়েছে। খরচ করতে ত তোমার আপত্তি নেই ?"

আফতাফ বল্‌লে, "বলেন কি পণ্ডিত মশাই ! একটা নির্দ্দোষ গৃহস্থের বৌকে গোটাকতক পাষণ্ডতে মিলে ব্যভিচারের পথে পাঠিয়ে দেবার উদ্যোগ করছে ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে, কিছু খরচ করলে যদি এই পাপনিবৃত্তি হয় ত আমি করব না ?"

বিদ্যাবিনোদ বল্‌লেন, "একটা সুবিধা যে, এটা পাড়াগাঁ, দু'শো পাঁচশোর নাম এখানকার লোক শোনেনি, আর এখানকার ঐ ঘোষাল-ফোষালগুলোর বামনাই ত এক গুলি-সুতোর জোরে। আমি যা পরামর্শ দিচ্ছি, কর, তোমার ঐ কৈবর্ত্তের পো'কে ত প্রায়শ্চিত্ত করতে-ই হবে না, অথচ ওর মান বেড়ে যাবে।"

দিন তিনেক পরে গদাই মণ্ডল নতুন কাপড় প'রে জবাফুলের মালা আর রঙ্গীন গামছা গলায়, মাথায় তিন পোয়া জল ধরে, এমন একটি চক্‌চকে রূপোর চুম্‌কি বসিয়ে খামারখানা থেকে নাচতে নাচতে চণ্ডীগ্রামের দিকে চল্‌লো, সঙ্গে তার ছেলে—সে-ও নতুন কাপড় পরা, গলায় মালা, মাথায় একখানা মস্ত চেঙ্গারী, তাতে মায়ের সাড়ী, নারায়ণের জোড়, পূজারীর জোড়, সিঙ্গীর থালা কাপড়, চাঁদমালা, ফুল, বিল্বপত্র, এই সব ; কারুর মাথায় চালের হাঁড়ী, ঘিয়ের কেঁড়ে, দুধের কলসী ; গদাইয়ের মামা নিবাস নিয়েছে শীতলা পূজার সব কাপড়-চোপড় ইত্যাদি ; ঢাক-ঢোল বাজিয়ে হরিবোল দিতে দিতে মিছিল পৌছল গিয়ে চণ্ডীগ্রামে। গদাইয়ের প্রবেশে গ্রাম অপবিত্র হবে ব'লে উজ্জ্বলা এক মালসা গোবরজল হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল, পণ্ডিত মন্দিরে বাজিয়ে গান ধরেছিল :—

"আয় রে ডুম্বুরে বসন্ত আর হাড়ে হাড়ে ফোট।"

আর ঘোষাল ? ব্রহ্মতেজ দ্বিগুণ উজ্জ্বলিত করবার জন্য উপরি উপরি তিন ছিলিম গাঁজা চড়িয়ে পৈতে পুড়িয়ে বাঙ্গালা মুল্লুক উড়িয়ে দেবার চেষ্টায় দেশলাই হাতে ছিল দাঁড়িয়ে। এমন সময়ে গদাই এগিয়ে গিয়ে রূপোর চুম্‌কিটি ঘোষালের হাতে দিয়া বল্‌লে, "নাও ঠাকুর নাও ; একে ত এই বিপদ, তার উপর আবার সাত সাত রাত স্বপনের জ্বালায় চক্ষু বুজতে পারিনি, মা চণ্ডী দিয়েছেন তাঁর সিঙ্গীটাকে লেলিয়ে আমার গুঁতুতে, সেটা তিন তিন'টে শিং বের ক'রে আমায় গোঁচা মারে, আর বলে— 'মাকে তোল—মাকে তোল।' আমি বলি, 'ভালা রে ভালা, কেডারে তুলমু, কোথে তুলমু' ; শ্যায কালকের রেতে হুকুম হ'ল, 'কৈবৎ ডোবায় এক ডুব মেরে যা পাবি, তাই তুলবি আর জানবি সেই আমি।' বিয়ানকে মেরেছি এক ডুব, আর হাতকে ঠেক্‌ছে এই চাঁদীর চুমকীটা। লাও ঠাকুর, তোমার ঠাকুর লাও, পুজোই কর, আর ফুজোই কর।"

উজ্জ্বলার হাতের মালসা খ'সে পড়ল, ছিরুর মন্দিরে বন্ধ হ'ল, ঘোষাল দু'হাত তুলে লাফ মেরে ব'লে উঠল, "মণ্ডল রে, তোর আপগুল পরমায়ু বাড়ুক, এই জন্যেই কি আমি সদাই ধ্যানে দেখতুম যে, রাহু কেতু শনৈশ্চর এক-ঘাটে পুরশ্চরণ ক'রে গদাইয়ের শরীলে ভূমিষ্ঠ হয়েছেন ?"

উজ্জ্বলা বললে, "তা গদাইয়ের বরাবরই বামুন-বোষ্টমে ভক্তি-ছেদ্দা আছে। নইলে অমন সোনার পিত্তিমে বৌ ওর ঘরে আসবে কোথে !"

নিবাস ইতোমধ্যে উজ্জ্বলাকে জনান্তিকে বলেছে যে, তোমারও পুজো মন্দ নেই, ছিরু ডোমও জনান্তিকের মন্ত্রদীক্ষা হ'তে বাদ পড়েনি। সে দিন ঢাক-ঢোল বাঁশী-কাঁসী দৈ-চিঁড়ের রাশি আর গ্রামবাসীদের হাসিতে চণ্ডীগাঁ মসগুল হয়ে উঠল। গরীব গৃহস্থের বউটিকে আর চাঁদপুরের

হাটে ব'সে পানের খিলি গ'ড়ে বেচতে হ'ল না, বাছা আবার কোমরে কাপড় জড়িয়ে শ্বশুরের ছোট উঠানটিতে ধান সিদ্ধ করতে লেগে গেল।

২৫

নিশীথ রাত্রি। হামিদ শুয়ে শুয়ে মনে করছে, নসী ঘুমিয়ে পড়েছে, এমন সময় সে হঠাৎ ডাক দিলে, "ওগো!"

হামিদ। কি গো!—জেগে?

নসী। আমাদের কবে যাওয়া স্থির হ'ল?

হামিদ। ১৭ই রাত্রির গাড়ীতে।

নসী। রাত পোহালেই ত ১৪ই? আট দিন কবে ফুরিয়েছে?

হামিদ। টের পাইনি।

নসী। সত্যি, আমিও না।

হামিদ। কি ভাল লোক এঁরা।

নসী। পরে হচ্ছে—পরে হচ্ছে; এখন যাবে কোথায় বল দেখি?

হামিদ কেন, বাড়ী;—আরও বেড়াবার সখ আছে না কি?

নসী। বেড়াবার নয়, এখন সত্যি সত্যি একটু জুড়োবার সখ হয়েছে।

হামিদ। বাড়ীর চেয়ে জুড়োবার যায়গা পৃথিবীতে আর কোথায় আছে?

নসী। বেশ, মনে থাকে যেন, বাড়ীর চেয়ে জুড়োবার যায়গা পৃথিবীতে আর কোথাও নেই।

ক্ষণকাল উভয়েই নীরব রহিল, পরে নসীর আবার মুখ ফুটল, "কি গো, চুপ ক'রে রইলে যে?"

হামিদ। যা জিজ্ঞাসা করলে, তার ত উত্তর দিলুম, আর কি বলতে হবে, বল?

নসী। বলতে হবে, বাড়ী যাব—বাড়ী যাব—বাড়ী যাব, নিশ্চয়—নিশ্চয়—নিশ্চয়।

হামিদ। তা ত সত্যিই যাব, তাতে এত সন্দেহ হচ্ছে কেন?

নসী। আর কিছুর জন্য নয়, আমাদের বাড়ী কোথায়, সেটা তোমার মনে আছে কি না, তাই ভাবছি

হামিদ। বেশ! এই মাস দুই আড়াইয়ের মধ্যে দর্জ্জিপাড়াটা ভুলে গেলুম

নসী। সেটা ত আমার আজিমার বাড়ী। আর দাদাশ্বশুরের কারবারের যায়গা। আমাদের আসল বাড়ী কোথায়?

হামিদ। ওঃ, তুমি সেকালের কথা তুলছ। কর্ত্তাদের সেই বর্দ্ধমান জিলার ভিটে। গ্রামের নামটাই মনে আসে না; আমি জন্মেছি কলকাতায়।

নসী। বড় লোকের লক্ষণই এই, পাশ ক'রে বিজলীপাখার তলায় বসলে আর কি পৈতৃক ভিটে মনে থাকে?

হামিদ। একটু লজ্জার কথা বটে, তবে জন্মস্থানটা—

নসী। মেহেরুন্নিশা জন্মেছিল তেপান্তর মাঠে, বালির শয্যায় গাছতলায়, তার পর ত সে হয়েছিল আগরার রঙ্গমহলে নূরজাহান।

হামিদ। (ঈষৎ হাস্যে) ঐতিহাসিক গবেষণা?

নসী। না, নসীবনের নূরজাহান হবার উপাসনা।

হামিদ। হঠাৎ এমনটা হ'ল কেন?

নসী। বাদশার বেগম হ'তে কার না সখ হয়? এখন আমি মাতামহীর ধর্ম্মশালার অতিথি; চাই বাদশাই তক্তে বসব শ্বশুরের ভিটেয় গিয়ে।

হামিদ। নসী!

নসী। না, নিশি—

হামিদ। আপাততঃ তৃতীয় প্রহরের প্রান্তে উপস্থিত, একটু নিদ্রা গেলে হয় না?

নসী। প্রেম যদি শুকিয়ে গিয়ে থাকে ত হেম অনায়াসে নাসাধ্বনি করতে পারেন। যা নিয়ে কথা উঠল, তা ভুলছ কেন? বলছিলুম না, আপাততঃ একটু জুড়োবার সখ হয়েছে।

হামিদ। তাই ত আমিও বলছি, একটু ঘুমোও।

নসী। আমি ঘুমুলে তুমি জুড়ুবে; আমি জুড়চ্ছি কি না, ঘুমিয়ে পড়লে টের পাব কেমন ক'রে?

হামিদ রূপক রেখে আসল কথাটা কি, বল না?

নসী। আসল কথা, দ্বিবিধ উপায়ে রসনার সেবা-সাধন, ঐশ্বর্য্যের দীপ্তিতে অঙ্গের মাধুর্য্য আচ্ছাদন, পরনিন্দা ও নিজের প্রশংসা শ্রবণে কর্ণের আনন্দবর্দ্ধন ভিন্ন মনুষ্য-জীবনের আর যে কিছু উদ্দেশ্য আছে, তা এত দিন আমি বুঝতে পারিনি।

হামিদ। তুমি যে সেই আমাদের ছেলেবেলার সাভ্যোম মহাশয়ের ভাষায় কথা কইতে আরম্ভ করলে।

নসী। তাঁর মতন মেটে ঘরে বাস করবার সাধ হয়েছে কি না, তাই। শিলং-এ যে মাস তুই কাটিয়ে এসেছি, সে সময় কেবল মনে হয়েছে যে,—তুমি আমি পাহাড়ে ঝরণা ফুল পাতা ছাড়া দুনিয়ায় আর কিছু থাকবার দরকার নেই। কিন্তু এই কটা দিন মাত্র দেওয়ানগঞ্জে এসে যে সুখ, সহরেও নেই বলেও নেই, এই দুয়ের মাঝামাঝি যে পল্লীবাস, মানুষ মনে করলে সেইখান থেকে জীবনটাকে সুখের সায়রে নাইয়ে নিতে পারে।

হামিদ। ওঃ, বুঝেছি, তোমার বর্দ্ধমানের দিকে যেতে ইচ্ছে হয়েছে।

নসী। চার চারটে পাশ ক'রে কথাটা বুঝে নিতে যে এত দেরী হচ্ছিল, এই আশ্চর্য্য।

হামিদ। তা চল, একবার ঘুরে আস্‌বে।

নসী। একবার নয়—এ—কে-বা-রে!

হামিদ। পাগল! সে পাড়গাঁয়ে তুমি ক'দিন থাকতে পারবে; কলকাতায় জন্ম, কলকাতায় মানুষ—

নসী। সেলিনার মত জমীদারের মেয়ে নয়, ঢাকার দৌত্তরী—

হামিদ। ঘাট হয়েছে নসী, তুমি খুব শিক্ষা দিয়ে দিলে আমায়।

* * * *

আমার কথাটি ফুরুলো, কিন্তু নটেগাছটি মুড়লো না। সোনা উল্লা বেশ কিছু গুছিয়ে নিয়ে দেশে ফিরেছিল; সে কোঠা বানায় নি, কিন্তু বড় বড় চালা কলকাতায় অনেক গৃহস্থবাড়ীর ইটের আঁধার কুঠুরীর চেয়ে ঢের আরামের। বুড়ো এখনও বিছানা নেয় নি; ব'সে ব'সে ফুরসী টানে, ক্ষেতখামারও ঘুরে আসে, আর ব'সে ব'সে লোক পেলেই সে-কালের গল্প করে। নসীর যত্নে ও আহ্লাদের হাসির ছটায় নটেগাছ ত নটেগাছ, ফুলকপি, বাঁধাকপি, গাজর, শালগম, আরও কত কি গজিয়ে উঠেছে; গরুগুলো একটা গাছেও মুখ দেয় না; কেন না, নসী রাশ রাশ ডাল ভাত ঝাল টক দিয়ে রাখালদের খাওয়ায় ব'লে রাখালরা মাঠে নিয়ে গিয়ে গরুগুলোকে পেট ভ'রে খাইয়ে আনে; ছেলেটি এত হৃষ্ট-পুষ্ট শান্ত যে, মোটেই কাঁদে না, তাই নসীর শুধু ভাত রাঁধবার কেন, আরও অনেক কাযের অবসর হয়; আর সবার চেয়ে জব্দ পিঁপড়েগুলো, বুড়ো সোনা উল্লা খোকাকে কোল থেকে নামায় না, তাই পিঁপড়ে তাকে কুটুস কুটুস কামড়ায় না।

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

সমাপ্ত

শেষ যৌবন

শেষ যৌবন, তুই জীবনের
দিব্য শরৎকাল!
নেই বরিষার আবিলতা,
মেঘের মায়াজাল!
কানের পাশে শুভ্ররুচি
এ নহে কেশ,—কাশের গুচি;
মনের মরাল বিহার করে
স্বচ্ছ হৃদির ধার,
মর্ম্ম-মৃণাল-পুটে কাঁপে
শুক্ল কমল-হার!

শেষ যৌবন, তুই জীবনের
প্রথম পূজার বেলা;
শুচি-বসন পর্‌ছি কেবল
ছেড়েই বিলাস-খেলা।
কামনা শ্বেত শিউলী-রূপে
বুকের তলা ভর্‌ছে চুপে,
সেই ফুলে যে করব পূজা
প্রাণের পদ-তল…
আমার পরাগ-দানী পূর্‌ছে প্রীতি—
চোখ দুটি ছল্ ছল্!

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী।

মোমের পুতুল

ইউনুস একবারে কবি-প্রকৃতির। সে অনেক গুণে গুণী। সে শৈশবে ছড়া কবিতা যা শুনতো, তাই মুখস্থ ক'রে সুন্দর সুরে বল্‌তে পার্‌তো; কৈশোর থেকেই সে নিজেই পদ্য রচনা করতে আরম্ভ করে। শৈশবে সে সুন্দর গান মুগ্ধ হয়ে শুনতো এবং একবার দুইবার শুনেই সেই গানের কথা ও সুর আয়ত্ত ক'রে পাখীর মত সর্ব্বক্ষণই গান গেয়ে গেয়ে বেড়াতো—গান গাওয়াই ছিল তার খেলার অনুসঙ্গী কর্ম্ম। তার খেলাতেও সে শিল্পী স্বভাবের পরিচয় দিত—সে মাটী দিয়ে সুন্দর সুন্দর পুতুল গড়ত, আর কাগজ-পেন্‌সিল হাতের কাছে পেলেই স্বাভাবিক অশিক্ষিত-পটুতায় সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকত। শিমের পাতার রসে সবুজ রং, জবা-ফুলের রসে লাল রং, হলুদবাটা গুলে হলদে রং, অপরাজিতার ফুল রগড়ে নীল রং তৈরী ক'রে আর কালী দিয়ে সে তার পুতুল আর ছবিগুলিকে রং করত। শিউলী-ফুলের বোঁটা, কৃষ্ণ-কলি-ফুল, লটকনার বীজ প্রভৃতি থেকেও যে বিভিন্ন আভার রং পাওয়া যায়, তা সে শৈশবেই আবিষ্কার করেছিল; আর আবিষ্কার করেছিল যে,চূণে হলুদে অথবা চূণে খয়েরে মিশালে একটি ভিন্ন প্রকৃতির লোহিতাভ রং উৎপন্ন হয়; হলুদে নীলে মিশালে সবুজ হয়; লালে হলুদে মিশালে কমলা রং পাওয়া যায়, এও তার জানতে বাকী ছিল না। সে সাদা কাগজের উপর কেবলমাত্র কালী দিয়ে দোয়েল পাখীর যে ছবি আঁকত, তার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য দেখে লোক চমৎকৃত হ'ত। পুতুল গড়া আর ছবি আঁকার ঝোঁকের জন্য সে নিষ্ঠাবান্ শাস্ত্রবিশ্বাসী পিতার কাছে কত তিরস্কার প্রহার সহ্য করেছে, তবু তার স্বভাবজ ঝোঁক দূর হয় নি, বরং বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই ঝোঁক আর নিপুণতা বেড়েই চলে-ছিল।

ইউনুস গ্রামের মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর ঘুড়ী তৈরী করত; সে কাঁচা কলা-পাতা, নারিকেল-পাতা আর তাল-পাতা দিয়ে লম্বা ভেঁপু বানিয়ে তার সঙ্গীদের তাক লাগিয়ে দিত; সে কৃষ্ণকলি-ফুলে আর কলমী-শাকের ডাঁটার নলে বাঁশী বানিয়ে তার চেয়ে বয়সে ছোট ছেলেমেয়েদের খুসী ক'রে তুল্‌ত। তার মনটা সর্ব্বদাই খুঁজত—কোন্ সামান্য উপকরণ থেকে সে কি সুন্দর শিল্প সৃষ্টি ক'রে তুল্‌বে।

একবার মহরমের মেলায় গিয়ে ইউনুস একটা বাঁশী কিনে আন্‌লে। আট দশ দিন সেই বাঁশীটার ছিদ্রমুখে ফুঁ দিয়ে দিয়ে সে প্যাঁপোঁ ক'রে বেড়াল। কিন্তু তার পরে ক্রমে ক্রমে সেই বাঁশীর কণ্ঠ থেকে সে যে সুর ও সঙ্গীত বাহির করতে লাগল, তা শুনে লোক মুগ্ধ হয়ে যেত। সবাই বলাবলি করত, ছেলেটা বাঁচলে ওস্তাদ হবে।

ইউনুস ধনীর পুত্র। তার পিতার বিস্তৃত ব্যবসায়-বাণিজ্য আছে, অল্প জমীদারী তালুকও আছে। পুত্রের মন এত বিভিন্ন বিষয়ে বিক্ষিপ্ত ও আকৃষ্ট হ'তে দেখে তিনি শঙ্কিত হচ্ছিলেন যে, ইউনুসের লেখাপড়া শিক্ষায় বিশেষ ব্যাঘাত ঘটবে। কিন্তু ইউনুস লেখাপড়া আরম্ভ করেই অসা-ধারণ মেধার ও মনোযোগের পরিচয় দিয়ে পিতাকে ও শিক্ষকদিগকে চমৎকৃত ক'রে দিলে। সে যখন যে কায করে, তখন তাতেই তন্ময় হয়ে নিবিষ্ট হয়ে যায়; যে কাযে সে হাত দেয়, তাকেই সে সুন্দর ক'রে তুল্‌তে চেষ্টা করে। তাই তার হাতের লেখাও মুক্তার মত সুন্দর হয়ে উঠল।

ইউনুস বি, এ, পাশ ক'রে ইংরাজীতে এম, এ, পড়বে ব'লে ইউনিভার্সিটীতে ভর্ত্তি হয়েছে। এর মধ্যেই সে আট দশটা ভাষা শিখেছে—সেই সেই মূল ভাষাতে সেই সব ভাষার কবিদের কাব্যের রসাস্বাদন করবে ব'লে। ফার্সী আর সংস্কৃত, ফ্রেঞ্চ আর জার্ম্মান্ তার কাছে সমান সমাদর লাভ করে। সে এখন নিজেও কবিতা লিখে প্রকৃত কবি ব'লে সুখ্যাতি অর্জ্জন করেছে; সে নিজের রচিত গজল গেয়ে বড় বড় মজলীস মাতিয়ে তোলে; বেহালা, এসরাজ, সেতার আর সুর-বাহারের তারে তারে তার হাতের আঙুল অবলীলায় সমান খেলে এবং সে নিজের মনের দরদ দিয়ে যন্ত্রের বুক

থেকে মধুর সঙ্গীত বাজিয়ে তোলে। তার আঁকা ছবি আর তার গড়া মূর্ত্তি সিমলা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, লক্ষ্ণৌ আর কলকাতার শিল্পপ্রদর্শনীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদক আর প্রশংসাপত্র পেয়েছে; সে ছবি আর মূর্ত্তি বেচে কিছু কিছু অর্থ উপার্জ্জনও করছে। লোকের চেহারা আঁকার আর মূর্ত্তি গড়ার জন্যও সে ডাক পাচ্ছে, দুই একটা বায়নাও সে নিতে আরম্ভ করেছে। আর্টিষ্টিক ফটোগ্রাফীতেও সে আর্য্য চৌধুরীর প্রতিস্পর্দ্ধী।

ইউনুসকে দেখলেই মনে হয়, সে গুণী শিল্পী বটে। তার বর্ণ গৌর, চেহারা দীর্ঘ, ঋজু, সুশ্রী। তার মাথায় লম্বা কুঞ্চিত বাবরী চুল, তার বেশ নির্ম্মল সুসঙ্গত সুরুচির পরিচায়ক। তাকে দেখলেই তার চেহারার ছবিটা মনের উপর ছাপ রেখে যায়; সাধারণের সামান্যতার মধ্যে সে হারিয়ে যায় না।

ইউনিভার্সিটীতে তেতলায় ইউনুসদের ক্লাস। ইউনুস সিঁড়ি ভেঙ্গে তেতলায় উঠে না, সে লিফ্‌টে চ'ড়ে উঠা-নামা করে। এক দিন সে তেতলায় লিফ্‌টের সুড়ঙ্গের মুখে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে লিফ্‌ট আসবার প্রতীক্ষা করছে। লিফ্‌ট চৌতলে দাঁড়িয়ে যাত্রী গ্রহণ করছে, এখনই নেমে আসবে। একতলা থেকে উর্দ্ধগামী যাত্রীরা লিফ্‌টের ডাক-ঘণ্টার চাবী টিপে লিফ্‌ট-চালককে আহ্বান-সঙ্কেত করলে। ইলেক্‌ট্রিক ঘণ্টা কর্‌র্‌র্‌ ক'রে বেজে ওঠ্‌বার সঙ্গে সঙ্গেই লিফ্‌টের দরজা বন্ধ করার ঝনাৎ ও লিফ্‌ট নামার সোঁ সোঁ শব্দ ইউনুস শুনতে পেলে। ইউনুস দরজার লোহার রেলিং ছেড়ে দরজার সাম্‌নের দিকে একটু পেছু হ'ঠে দাঁড়াল। লিফ্‌ট এসে তেতলার দরজার সাম্‌নে থাম্‌ল। ইউনুস লিফ্‌টের খাঁচার মধ্যে দৃষ্টিপাত করবামাত্র প্রথমেই তার নজরে পড়্‌লো একটি মেয়ে ছাত্রী; তার পরে সে দেখ্‌তে পেলে, খাঁচার মধ্যে দুই জন অধ্যাপক ও এক জন ছাত্রও আছেন। ইউনুস খাঁচার মধ্যে প্রবেশ ক'রে ছাত্রীটির পাশে গিয়ে দাঁড়াল—একবারে মেয়েটির মুখোমুখি। মেয়েটি যে ফর্সা বা সুন্দরী, তা নয়, কিন্তু তার মুখে ধী আর হ্রী মিশে তাকে এমন একটি অনির্ব্বচনীয় শ্রী দান করেছে যে, তাকে দেখ্‌বামাত্রই ইউনুসের কবি-চিত্ত প্রশংসায় পূর্ণ হয়ে ব'লে উঠ্‌লো—"বাঃ!"

লিফ্‌ট যে তখন দোতলা পেরিয়ে একতলায় পৌছে গেছে, তা ইউনুস জান্‌তেই পারে নি। মেয়েটি লিফ্‌ট থেকে নেমে চ'লে যেতে ইউনুসের জ্ঞানোদয় হ'লো; সকল লোক নেমে গেল ও নূতন লোক উঠ্‌ছে দেখেও সে বুঝ্‌তে পারে নি যে, সে একবারে একতলায় এসে ঠেকেছে। হঠাৎ সে খাঁচার বাইরে তাকিয়ে একতলার ঘরের চিহ্ন দেখে চেতনা লাভ করলে ও তাড়াতাড়ি নেমে পড়্‌লো।

মেয়েটির মূর্ত্তি প্রথম দর্শনেই ইউনুসের মনে এমন গভীর-ভাবে মুদ্রিত হয়ে গেল যে, সে সমস্ত দিন শুধু তার রূপই ধ্যান করলে। পরদিন থেকে ইউনুসের চেষ্টা হ'ল—লিফ্‌টে বা চলা-ফেরার পথে কোথাও একবার মেয়েটিকে দেখে মনটাকে খুসী ক'রে নেওয়া।

ইউনুস মেয়েটির অনুসরণ ক'রে ও অনুসন্ধান ক'রে শীঘ্রই জেনে নিলে, মেয়েটি বাঙ্গালা ভাষায় এম-এ পড়ে, তার নাম শুচি চট্টোপাধ্যায়। ইউনুসের মনে হ'ল, শুচি যদি ইংরাজীতে এম-এ পড়্‌ত, তা হ'লে বেশ ভাল হ'ত, তারা একসঙ্গে পড়্‌ত এবং রোজ তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'তে হ'তে হয় ত বা কোন দিন আলাপ হবার সুযোগও জুটে যেত। কিন্তু শুচি পাঠের বিষয় পরিবর্ত্তন করবে, এমন কোন সম্ভাবনা ত থাক্‌বার কথা নয়; বরং সে ত বিষয় পরিবর্ত্তন ক'রে বাঙ্গালা পড়্‌তে পারে। কিন্তু এই ইচ্ছা তার মনে দিনের দিন যতই প্রবল হ'তে লাগ্‌ল, ততই তার লজ্জা হ'তে লাগ্‌ল যে, তার বন্ধুরা ও অচেনা শিক্ষক-ছাত্ররা কি ভাব্‌বে। তাকে যে লোক লোভী লোলুপ ভাব্‌বে, এই লজ্জাতেই সে মনের বাসনা দমন ক'রে রাখ্‌লে এবং যতই আগ্রহ প্রবল হ'তে লাগ্‌ল, ততই লজ্জা বর্দ্ধিত হয়ে তার আত্মসম্বরণ ক'রে থাকায় সাহায্য করতে লাগ্‌ল।

ইউনুসের মন শুচির দিকে অনুরাগে যত আকৃষ্ট হ'তে লাগ্‌ল, সে তত শুচির সাক্ষাৎ পরিহার ক'রে চল্‌তে লাগ্‌ল; তার সদাই ভয় হয়, পাছে তার কোন আচরণে তার অনিচ্ছায় ও অজ্ঞাতসারে সে শুচির বিরক্তি উৎপাদন ক'রে ফেলে; শুচির বিরক্তিভাজন হবার ভয়ে তার প্রীতিভাজন হবার চেষ্টা করতে সাহস পেত না। সে মনে ভাবৃত, পুরাকালের বীররা যে মেয়েকে ভালবাসত, তাকে হরণ ক'রে আনত কেমন ক'রে, তা ত বুঝতে

পারি না; জোর-জবরদস্তি করলে প্রেম, প্রণয়, প্রীতি ত ভয়ে ও বিরাগে পরিণত হয়ে যাবার কথা।

ইউনুস আজ-কাল লিফ্‌টে চড়া ছেড়ে দিয়েছে; সে সিঁড়ি ভেঙ্গে তে-তলা চৌ-তলায় উঠা-নামা করে। এক দিন সে সিঁড়িতে সিঁড়িতে লঘু ক্ষিপ্র পদক্ষেপ ক'রে তর্‌তরিয়ে নীচে নেমে আস্‌ছে, সিঁড়ির বাঁক ফিরেই সে নিজের গতিবেগ সংবরণ ক'রে পাশ কাটিয়ে মুখ নামিয়ে নীচে চ'লে গেল। সে নীচে গিয়ে দেখ্‌লে, সে দিন লিফ্‌ট্ অচল হয়ে গেছে, সিঁড়িই আজ সকলের একমাত্র অবলম্বন। ইউনুসের মনটা একসঙ্গে খুসী ও ভীত হয়ে উঠ্‌ল—হয় ত আবার সিঁড়িতে উঠা-নামা করতে শুচির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে যেতে পারে!

এক দিন ইউনুস বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে দেখ্‌লে, শিরাজী মৌলবী সাহেবের ক্লাসে শুচি ব'সে রয়েছে। শিরাজ দেশের মৌলবীর ক্লাসে বাঙ্গালী হিন্দুর মেয়ে! এই অসাধারণ দৃশ্য দেখে ইউনুসের মন আনন্দ, বিস্ময় ও কৌতূহলে পূর্ণ হয়ে উঠ্‌লো।

ইউনুস খুব সাবধানে সন্ধান নিয়ে জান্‌লে, শুচির পিতা সমরেশ চট্টোপাধ্যায় লক্ষ্ণৌ স্কুলের হেড মাষ্টার ছিলেন; সেখানে থাক্‌তে শুচি বাল্য ও কৈশোরে উর্দ্দু ও ফার্সী ভাষা বল্‌তে, পড়্‌তে, লিখতে শিখেছিল। তার পর সমরেশ বাবু লক্ষ্ণৌ ছেড়ে বাঙ্গালায় চ'লে আসেন; এখানে এসে শুচি বাঙ্গালা ও সংস্কৃত শিখে ম্যাট্রিকুলেশান থেকে বি-এ পরীক্ষা পাশ করেছে। এখন সে বাঙ্গালায় এম-এ পড়ছে, এবং বাঙ্গালার মূলস্বরূপ পালি ও ফার্সী এবং অনুসঙ্গিস্বরূপ উর্দ্দু ভাষা পড়ছে।

বহু-ভাষাভিজ্ঞ ইউনুসের মন বহুভাষাভিজ্ঞা শুচির প্রতি প্রীতি ও সম্ভ্রমে অধিকতর আকৃষ্ট হলো। তার কেবলই মনে হ'তে লাগলো, এমনই একটি সহধর্ম্মিণী যদি পাওয়া যায় ত বেশ হয়। তা হ'লে দুজনে মিলে বিশ্ব-সাহিত্যের সুধা-রস আস্বাদ ক'রে আনন্দে জীবনযাপন করা যায় জীবনটা মধুময় হয়ে উঠে। কিন্তু, তাদের মিলনের পথে মস্ত বড় একটা 'কিন্তু' দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হয়ে আছে—সে মুসলমান ও শুচি হিন্দু!

* * * *

আর্ট একজিবিশন হবে। ইউনুসের ছবিমূর্ত্তি ফটোগ্রাফ প্রদর্শিত হবে ব'লে গৃহীত হয়েছে। একজিবিশন খোলার দিন ইউনুস গিয়েছে। সে একাকী দেয়ালের গায়ে গায়ে ঝোলানো ছবি দেখে দেখে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ একখানা ছবির নীচে সে চিত্রকারিণীর নাম দেখ্‌লে—শুচি চট্টোপাধ্যায়। সে চম্‌কে উঠলো। শুচি তা হ'লে ছবি আঁকতেও পারে। ছবিটা বেশী কিছু নয়,—কালো মেঘে আচ্ছন্ন আকাশাংশের পটভূমিকার উপর একটা বাঁশ-ঝাড় আসন্ন বর্ষণের আশায় অপেক্ষা করছে এবং মরকত-মণির ন্যায় স্নিগ্ধ সবুজ বাঁশ-গাছের ডগায় একটা নীলকণ্ঠ পাখী একখানা পাখা এক পা দিয়ে ছড়িয়ে রেখে ঘাড় গুঁজে গা চুল্‌কাচ্ছে! এই ছবিটির কাছে ইউনুস আট্‌কে গেল। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে এই ছবিখানাকে দেখলে। বাঁশগাছের নয়নরঞ্জন, সবুজ, মেঘের অঞ্জন আর নীলকণ্ঠের নীলাভা ইউনুসের মনকে রঞ্জিত ক'রে তুল্‌তে লাগল। যখন অপর কয়েক জন ইংরাজ সাহেব মেম দর্শক সেই ছবিখানার কাছে এলো, তখন ইউনুসের হুঁস হলো। সে তাড়াতাড়ি সেই স্থান ত্যাগ ক'রে স'রে চ'লে গেল এবং একজিবিশনের সেক্রেটারীর কাছে গিয়ে বল্‌লে—"৯৯ নম্বর ছবিখানা আমি কিন্‌লাম, ওটা আর কাউকে বিক্রী করবেন না।"

সেক্রেটারী বল্‌লে—"না, খাতায় আপনার নামে বিক্রী লিখে রাখছি, আর ছবির গায়েও টিকিট লাগিয়ে দিচ্ছি Sold to—"

ইউনুস তাড়াতাড়ি বল্‌লে—"কাকে বিক্রী করা হলো, না-ই লিখলেন? কেবল জানিয়ে দিন যে, বিক্রী হয়ে গেছে।"

সেক্রেটারী স্বীকৃত হয়ে বল্‌লে—"আচ্ছা।"

একজিবিশন শেষ হয়ে গেলে ইউনুস শুচির ছবিখানি ৫০৲ টাকা দিয়ে কিনে এনে নিজের শয্যার শিয়রে টাঙিয়ে রেখে দিলে।

* * *

মেদিনীপুরে বন্যা হয়েছে বন্যাপীড়িত লোকদের সাহায্যের জন্য বীণাপাণি সম্মিলনীর মহিলারা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের নটীর পূজা অভিনয় করবেন। এই সংবাদে সহরময় হুলস্থূল প'ড়ে গেছে। বইখানার মধ্যে কি আছে, না জেনেই শুচিবাইগ্রস্ত বাঙ্গালার অনেক খবরের কাগজে নিন্দা-গালাগালির ছড়াছড়ি হচ্ছে; সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষার

জন্য সাহিত্য-নগরের কোন কোন স্বাস্থ্যরক্ষক যে ধূলো উড়িয়েছেন, তাতে সাহিত্যের পদ্মাসনে দেবী সরস্বতীর দম বন্ধ হয়ে স্বাস্থ্যহানি ঘটবার উপক্রম হয়েছে। নটী নাম দেখেই যেমন এক দল লোক কবির ও অভিনয়কারিণী মহিলাদের রুচির নিন্দায় নগরবাসীর কান ঝালাপালা ক'রে তুলেছে, তেমনই অপর দিকে এক দল লোক ভদ্রমহিলাদের নটীর পূজা অভিনয় দেখবার জন্য কৌতুকে আগ্রহে মেতে উঠেছে। রুচিবাগীশের গালাগালি যত উচ্চ সপ্তকে উঠছে, কুরুচিগ্রস্তের আগ্রহ তত বেড়ে চলেছে। এক হপ্তার মধ্যে সমস্ত টিকিট বিক্রী হয়ে গেল।

ইউনুস নটীর পূজা বইখানি পড়েছে। দু-চারটা গান সে অপরের কাছে শুনে বা স্বরলিপি দেখে গাইতে শিখেছে। তাই ইউনুস কেবল সাহিত্য-সৌন্দর্য্য ও কলাশিল্পের মাধুর্য্য উপভোগ কর্‌বার জন্য একখানি টিকিট কিনেছে।

অভিনয়ের রজনীতে রঙ্গশালার যবনিকা উন্মোচিত হ'লে ইউনুস সবিস্ময় আনন্দে দেখলে, নটী সেজেছে শুচি! ভিক্ষুণী শ্রীমতীর মর্ম্ম নিজের অন্তরে উপলব্ধি ক'রে শুচির পবিত্র-ভাবদ্যোতক সাবলীল ললিত নৃত্য ও অতীন্দ্রিয় মধুর সুরের সঙ্গীত সকল দর্শক-শ্রোতাকে মুগ্ধ ক'রে দিল; ইউনুস শ্রদ্ধায়, সম্ভ্রমে, অনুরাগে একবারে বিহ্বল হয়ে গেল। শুচির নৃত্য দেখে তার মনে হ'ল, এ ত মানুষের অঙ্গভঙ্গী মাত্র নয়, এ যেন সুকবির পদ্যবন্ধের অনবদ্য ছন্দ; শুচির সঙ্গীত শুনে তার মনে হ'ল, এ যেন পাখীর কণ্ঠের কাকলীর ও ঝঙ্কারের সঙ্গে ওস্তাদের হাতে বাঁধা সপ্ততন্ত্রী বীণার মূর্চ্ছনার সম্মিলনে অতীন্দ্রিয় মাধুর্য্যবর্ষণ! শ্রীমতীরূপিণী শুচির মুখের মাধুরী, শান্তশ্রী ও ভক্তিতন্ময়তা তাকে অতি অতীত ঐতিহাসিক যুগে উপনীত ক'রে কেবলমাত্র অবাস্তব কল্পনায় পরিণত করেছে! ইউনুসের কেবলই মনে হ'তে লাগল, এই ত তার উপযুক্ত জীবন-সঙ্গিনী সহধর্ম্মিণী—রূপে, রসে, লীলায় তার জীবনকে সুধাস্বাদ দিতে সমর্থা।

অভিনয় সাঙ্গ হ'ল। ইউনুস স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় বাসায় ফিরে গেল; সমস্ত রাত্রি তার চোখের সামনে শুচির তনু-তরঙ্গ আর মর্ম্মের মধ্যে স্বর-লহরী খেলে বেড়াতে লাগল।

এই দিন থেকে শুচি আর ইউনুসের কাছে মানবীমাত্র রইল না, সে রসামৃত-মূর্ত্তি ভাবমাধুর্য্যময়ী অর্দ্ধেক মানবী ও অর্দ্ধেক কল্পনা হয়ে উঠল। সৌন্দর্য্য-রূপা লক্ষ্মী ও ভাবরূপা সরস্বতী একত্র শুচির রূপ ধ'রে তার মানস-সরোবরে আনন্দে বিকশিত প্রেম-পদ্মের উপর অধিষ্ঠিত হ'ল; কবি-শিল্পী ইউনুসের মানস-সরসীর রস-হিল্লোল শুচির চরণ-নিয়ে থই-থই কর্‌তে লাগল।

শুচি যতই ইউনুসের চিত্ত অনুরাগ-রঞ্জিত ক'রে তুল্‌তে লাগল, তার ততই ভয় হ'তে লাগল যে, শুচির হিন্দু পিতা হয় ত কন্যাকে মুসলমানের হস্তে সমর্পণ করতে চাইবেন না। সে মুসলমান; বিধর্ম্মী হওয়া ছাড়া সে ত দেশের কোনও যুবকের চেয়ে কোনও বিষয়ে হীন নয়; সে সুরূপ, সুদর্শন, সুচরিত্র, কবিত্বে আর শিল্পকলায় নাম-করা, লেখা-পড়ায় উত্তম এবং ধনী। এত গুণ-সমাবেশ কি কেবল ধর্ম্মের নাম-ভেদে ও আচার-ভেদে অগ্রাহ্য হয়ে যাবে?

ইউনুসের এক একবার মনে হ'তে লাগল, শুচির সঙ্গে সে যদি কোনও সুযোগে পরিচয় ও আলাপ কর্‌তে পারে, তা হ'লে শুচি হয় ত বা তার রূপ, গুণ আর প্রেমের প্রগাঢ়তা ও শ্রদ্ধা-সম্ভ্রমের পরিচয় পেয়ে তার প্রতি অনুরক্ত ও করুণা-পরবশ হ'তে পারে।

এই সম্ভাবনা মনে উদয় হবার সঙ্গে সঙ্গেই ইউনুস আত্ম-সংশোধন ও আত্মোন্নতি করতে মনোনিবেশ করলে। তার চরিত্র, আচরণ, বাক্য সংযত ও শুচি-তর হয়ে উঠতে লাগল; তার কবিতা ও চিত্র হৃদয়াবেগে সুন্দরতর হয়ে উঠল; সে লেখা-পড়ায় অবহিত-চিত্ত হ'ল। ইউনুস সর্ব্বপ্রকারে নিজেকে নিখুঁৎ ক'রে শুচির গ্রহণযোগ্য কর্‌বার তপস্যায় প্রবৃত্ত হ'ল।

কিন্তু কিছুতেই সাহস ক'রে ইউনুস শুচির সঙ্গে পরিচয় করতে পার্‌ছিল না। পরিচয় কর্‌বার সামান্যই সুযোগ তার কাছে আসে; কিন্তু যে অল্প ক্ষীণ সুযোগ জোটে, তা-ও সে তৎক্ষণাৎ অবলম্বন করতে পারে না, দ্বিধান্বিত হয়ে ইতস্ততঃ কর্‌তে কর্‌তে সেই সুযোগ সে হারিয়ে ফেলে। সে শুচির সঙ্গে আলাপের উপক্রম কর্‌লেই তার মনে হয়—যদি শুচি ভাগ্যক্রমে আমাকে গ্রহণযোগ্য মনে করে, আর তার পিতা-মাতার আপত্তি আমাদের দু'জনের মিলনের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তা হ'লে ইচ্ছা অপূর্ত্তির বেদনায় শুচির মন ত ক্লিষ্ট হবে। যাতে শুচি ক্লেশ পেতে পারে, এমন কায ত আমি নিজের, সুখ ত তুচ্ছ, জীবনরক্ষার জন্যও কর্‌তে পার্‌ব না।

এই সঙ্কল্প যখন ইউনুসের চিত্তে দৃঢ়-মুদ্রিত হয়ে গেল, তখন সে স্থির কর্‌লে, আগে সে শুচির পিতার সম্মতি নিতে চেষ্টা করবে এবং তাঁর সম্মতি পেলে পরে শুচির পাণি-প্রার্থনা কর্‌বে।

ইউনুস সন্ধান নিয়ে জান্‌লে, শুচির পিতা সমরেশ বাবু ব্রাহ্ম। এই সংবাদ জেনে ইউনুসের চিত্ত আশান্বিত ও উৎফুল্ল হয়ে উঠল,—যাক্, তা হ'লে শুচিকে মুসলমানের হাতে সম্প্রদান কর্‌তে শুচির পিতার আপত্তি হবে না।

ইউনুস খাঁটি বাঙ্গালীর বেশে সজ্জিত হয়ে সমরেশ বাবুর সঙ্গে একাই দেখা করতে গেল। সমরেশ বাবু বিকালবেলা তাঁর বাসার বাইরের ঘরে ব'সে উপনিষদ পড়ছিলেন; ইউনুসের ভাগ্যক্রমে সেখানে আর কেহ ছিল না। ইউনুস ঘরের দ্বারোপান্তে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি মুখ তুলে ইউনুসের দিকে তাকালেন। ইউনুস যুক্ত হস্তের উপর মস্তক নত ক'রে অমরেশ বাবুকে নমস্কার করলে। তার মাথার লম্বা লম্বা চুল মুখের দিকে ঝুলে পড়্‌লো; সে মাথা তুলে চুল সরিয়ে দিয়ে স্মিত, অপ্রতিভ মুখে সমরেশ বাবুর সম্ভাষণের প্রতীক্ষায় দাঁড়াল। সমরেশ বাবু হাতের বই-খানা বন্ধ ক'রে পাশে সরিয়ে রেখে স্নিগ্ধ স্বরে ডাক্‌লেন—বাবা, এসো। কাকে খুঁজছ।

ইউনুস সঙ্কোচের সহিত ধীর স্বরে বল্‌লে—আমি আপনার কাছেই একটু কাযের জন্য এসেছি।

সমরেশ বাবু স্নেহকোমল স্বরে বল্‌লেন—এসো, বোসো।

ইউনুস অমরেশ বাবুর ফরাসের উপর এক পাশে সম্ভ্রমের সহিত তটস্থ হয়ে বস্‌লো।

সমরেশ বাবু জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—কি কায বাবা?

ইউনুস এমন সঙ্কটের সম্মুখীন হয়ে একবারে ভড়কে গেল; সমরেশ বাবুর অসম্মতির ভয় ও নিজের বিবাহের প্রস্তাব করার লজ্জা ইউনুসের সঞ্চিত সাহসটুকু লুপ্ত ক'রে ফেল্‌লে। সে শুষ্ক মুখ লাল ক'রে তুলে মাথা হেঁট ক'রে ব'সে রইল। তার অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ হ'তে লাগলো; সে কোনমতে উঠে পালাতে পার্‌লে বাঁচতো। ক্ষণকাল নীরবে নতনেত্রে ব'সে থেকে তার যেই মনে হ'ল, সমরেশ বাবু উৎসুক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে তার উত্তরের প্রতীক্ষা করছেন, তখন সে মোরিয়া হয়ে মুখ তুলে খলিত বচনে বল্‌লে—আমি আপনার কন্যার বিবাহের সম্বন্ধে একটা প্রস্তাব এনেছিলাম।

সমরেশ বাবুর কৌতূহলে উৎসুক চোখ প্রশান্ত, উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, তিনি বললেন—ও! তা আমার মেয়ে ত এখন এম-এ পড়ছে।

ইউনুস আবার মাথা নত ক'রে বল্‌লে—কিন্তু কোনও মোটামুটি রকমের সৎপাত্র তাঁর গুণে আকৃষ্ট হয়ে, তাঁকে যদি প্রার্থনা করে?

সমরেশ বাবু চিন্তিতভাবে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—পাত্রটির পরিচয় জান্‌তে পারি কি?

ইউনুস একবার মুখ তুলে সমরেশ বাবুর দিকে তাকিয়ে আবার মুখ নত ক'রে বল্‌তে লাগলো—সে ইংরাজীতে এম-এ পড়ে; অনার্স নিয়ে বি-এ পাশ করেছে; পাঁচ-সাতটা ভাষার সঙ্গে তার অল্প-বিস্তর পরিচয় আছে; কবি, চিত্রকর, ভাস্কর, সঙ্গীতজ্ঞ ব'লে তার একটু নাম-ডাকও আছে; লোক তাকে সুশীল সচ্চরিত্রও বলে; তাদের জমীদারী আর ব্যবসায়ে মিলে বাৎসরিক আয় সত্তর আশী হাজার টাকা হবে।

সমরেশ বাবু প্রফুল্ল হয়ে বল্‌লেন—এ ত বাস্তবিকই সৎপাত্র!

ইউনুস সমরেশ বাবুর কথায় আশান্বিত ও উৎসাহিত হয়ে বল্‌তে লাগল—এক ইউনিভার্সিটীতে আপনার কন্যার সঙ্গে সে পড়ে, তার পর নটীর পূজায় তাঁর অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে—

সমরেশ বাবু ইউনুসকে কথা সমাপ্ত করতে না দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—তা হ'লে সেই ছেলেটির সঙ্গে আমার মেয়ের পরিচয় আছে?

ইউনুস বল্‌লে—"না। আপনার সম্মতি না নিয়ে সে তাঁর সঙ্গে পরিচয় কর্‌তে সাহস করে নি।

সমরেশ বাবু খুশী হয়ে ঈষৎ হাস্য ক'রে বল্‌লেন—বাবা, সেই সৎপাত্র কি তুমিই?

ইউনুসের মুখ লজ্জায়, আনন্দে লাল হয়ে উঠলো। সে নতমুখেই চুপ ক'রে রইল।

সমরেশ বাবু বল্‌তে লাগ্‌লেন—কবি চিত্রকর ব'লে তোমার সুখ্যাতি যদি দেশে জানা হয়ে থাকে, তা হ'লে ত তোমার নাম বললেই আমি চিন্‌তে পারব।

ইউনুস শঙ্কাকুল দৃষ্টি তুলে সমরেশ বাবুর দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বল্‌লে—আমার নাম ইউনুস আলি চৌধুরী।

উড়ো মেঘ সূর্য্যের তলা দিয়ে ভেসে গেলে দিবালোক যেমন ক্ষণকালের জন্য ম্লান হয়ে আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠে, সমরেশ বাবুর মুখের উপর দিয়ে তেমনই একটা ছায়া ভেসে গেল, কিন্তু তিনি পরক্ষণেই প্রফুল্ল হয়ে বল্‌লেন—তুমি ইউনুস! তোমার মত সৎপাত্রের হাতে কন্যা সম্প্রদান কর্‌তে পার্‌লে ত সুখের হ'তো—কিন্তু—

ইউনুস সমরেশ বাবুর বাক্যসমাপ্তিতে দ্বিধা ও সঙ্কোচ দেখে বল্‌লে—কিন্তু আমি মুসলমান? আপনি ব্রাহ্ম, আপনার কাছে ত কোনও ধর্ম্মমতই ঘৃণ্য নয়।

সমরেশ বাবু ব্যস্ত হয়ে ব'লে উঠলেন—না না, ধর্ম্ম কখনও ঘৃণ্য হ'তে পারে? তবে ভিন্ন সমাজের রুচি, আচার, আচরণ ভিন্ন হয়, তাতে আবাল্যের সংস্কারে বাধা লাগে, এবং সেটি পূর্ণমিলনেরও বাধা হয়। তা ছাড়া মুসলমানের সঙ্গে কন্যার বিয়ে দিলে আমাদের হিন্দু আত্মীয়-স্বজনরা ক্ষুণ্ণ হবে, আমাদের নিন্দা করবে।

ইউনুস ক্ষণকাল চুপ ক'রে ব'সে থেকে চট ক'রে উঠে দাঁড়াল এবং পূর্ব্বের ন্যায় অতি বিনীতভাবে নমস্কার ক'রে বল্‌লে—এই আমার কার্ড রইল, যদি ভেবে চিন্তে আমাকে কোনও খবর দেওয়া আবশ্যক মনে করেন, জানাবেন।

ইউনুস সমরেশ বাবুর সামনে সসম্ভ্রমে একখানা নাম-ঠিকানা লেখা কার্ড রেখে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে চ'লে গেল।

ইউনুস দরজার কাছে যেতেই একখানা ট্যাক্সি গাড়ী এসে গতি মন্দ কর্‌লে এবং এক জন কালো বেঁটে মোটা লোক রাস্তায় গাড়ীর উপরে থেকেই ইউনুসকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—হ্যাঁ মশাই, এটা কি সমরেশ বাবুর বাড়ী?

ইউনুস মাথা নেড়ে বল্‌লে—হ্যাঁ।

—তিনি বাড়ীতে আছেন?

—আছেন।

ট্যাক্‌সি থামলেই সেই লোকটি ট্যাক্‌সি থেকে নাম্‌তে নাম্‌তে ইউনুসকে বল্‌লে—আপনি একটু কষ্ট ক'রে তাঁকে আমার এই কার্ডটা দিতে পারেন?

ইউনুস তার সামনে অগ্রসর ক'রে ধরা কার্ডের উপর দেখলে লেখা রয়েছে—বাঁশীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, হার্ডওয়্যার অ্যাণ্ড টিম্বার মার্চ্যাণ্ট, ঢাকা।

ইউনুস কার্ড না দিয়ে বল্‌লে—আমি এ বাড়ীর লোক নই। সমরেশ বাবু এই পাশের ঘরে একলা আছেন, আপনি যান।

ইউনুস দরজা ছেড়ে রাস্তায় নেমে পড়ল এবং বাঁশীমোহন সমরেশ বাবুর সদর-দরজা পার হয়ে বাড়ীর ভিতরে ঢুক্‌ল।

ইউনুস বাঁশীমোহনের পরিত্যক্ত ট্যাক্‌সিখানায় চ'ড়ে ব'সে বল্‌লে—ময়দানে চল, ময়দানে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাওয়া খাওয়াও। তার পর সে গাড়ীর উপর এলিয়ে প'ড়ে চিন্তার ও বিফলতার বেদনার মধ্যে তলিয়ে গেল।

* * * *

ইউনিভার্সিটীতে ছাত্রদের মধ্যে আজকাল আলোচনার বিষয় একটিমাত্র—সেটি হচ্ছে নটীর পূজার অভিনয়ে শুচির নৃত্য-গীত।

ইউনুস ক্লাসে গিয়ে বসেছে। তখনও অধ্যাপক ঘরে আসেন নি। ছেলেরা শুচির কথাই আলোচনা কর্‌ছে। ইউনুসের সেই আলোচনা শুন্‌তে ইচ্ছাও কর্‌ছে,আবার পবিত্র পদার্থকে যতখানি শ্রদ্ধা-সম্ভ্রম নিয়ে স্পর্শ কর্‌তে হয়, তার অভাবের সম্ভাবনায় সে সেই দিকে ভাল ক'রে কান দিতেও পার্‌ছিল না। হঠাৎ তার কানে এক জনের এই কথাটা এসে আঘাত ক'রে তার মনোযোগ আকর্ষণ কর্‌লে—শেষ-কালে একটা বাঁশীমোহনের সঙ্গে শুচিস্মিতার বিয়ে হ'তে চল্‌লো! আহা রে! বাঁদরের গলায় মুক্তার মালা!

—আচ্ছা, ঐ বেঁটেটা কে রে?

—ঢাকাই বাঙ্গাল! লোহা-লক্কড় আর কাঠ-কাঠরার কারবার আছে। টাকার কুমীর! টাকার জোরেই অমন খাসা মেয়েটাকে বাগিয়েছে! নইলে চেহারায় ত হোঁদল-কুঁৎকুৎ, আর বিদ্যায় ত গড়াচর চণ্ড!

—ওকে আমি খুব জানি। ও আমাদের সঙ্গে পড়তো। আই, এ, পাস কর্‌তে না পেরে ন্যাশে গিয়ে ব্যবসা ফেঁদে বেশ দু'পয়সা করেছে!

—লোকটার cheek আছে! সটান গিয়ে মেয়ের বাপকে বল্‌লে—আপনার মেয়ের নাচ-গান আমার মন মুগ্ধ করেছে, আমি তাকে বিয়ে কর্‌ব। বাপ অমনি রাজী।

—কিন্তু শুচি কেমন ক'রে রাজী হলো? ঘেন্না কর্‌লে না? যে unidiomatic চেহারা?

—সর্ব্বদোষো হরেৎ টাকা! বুঝলে হে?

—আমরা এত লোক ছিলাম, কাউকে বেছে নিয়ে স্বয়ংবরা হলেও ত এর চেয়ে ভাল হ'ত।

—বিয়ে হয়ে গেলে পরে স্বয়ংবরা হবে।

—কবে বিয়ে?

—চৌদ্দ দিনের নোটিশ দিয়ে তবে ত ব্রাহ্ম বিয়ে হবে। ২৮এ এপ্রেল বিয়ের দিন স্থির হয়েছে।

ইউনুস আর শুন্‌তে পারলে না। তার সর্ব্বাঙ্গ ঝিম্‌ঝিম্ কর্‌তে লাগল, চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল। সে তাড়াতাড়ি বই নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

এক জন সহপাঠী জিজ্ঞাসা করলে—আপনি চ'লে যাচ্ছেন?—তার পর তার মুখের দিকে তাকিয়ে আবার সে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—আপনার অসুখ করছে?

ইউনুস অস্পষ্ট স্বরে 'হ্যাঁ' ব'লে ঘর ছেড়ে বাইরে চ'লে গেল।

* * * * *

শুচির বিয়ে হয়ে গেছে। সে তার স্বামীর সঙ্গে ঢাকায় এসেছে। বাঁশীমোহনের বাড়ী ফরাসগঞ্জে।

শুচি কল্‌কাতা ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ইউনুসও লেখাপড়া আর কল্‌কাতা দু-ই ছেড়েছে; সে-ও শুচিকে অনুগমন ক'রে ঢাকায় এসে উপস্থিত হয়েছে। ফরাসগঞ্জে বাঁশীমোহনের বাড়ীর ঠিক সাম্‌নে, রাস্তার ওপারে একখানা বাড়ী সে ভাড়া নিয়েছে। সেই বাড়ীতে যে লোক ছিল, তাকে গিয়ে সে বল্‌লে—আমি স্বপ্ন দেখেছি, এই বাড়ীতে আমি না থাকলে আমি দু দিনেই বুক ফেটে ম'রে যাব; অতএব আমাকে এই বাড়ী হয় ভাড়া দিন, নয় বিক্রী করুন; আপনার যত টাকা চাই, আমি তাই দেব, দ্বিরুক্তি কর্‌ব না। আমাকে বিশ্বাস না হয়, আমি প্রত্যেক মাসের টাকা আপনাকে আগাম গুণে দেব।

বাড়ীওয়ালা মনে কর্‌লে, লোকটা পাগল। সে ইউনুসকে ভাগিয়ে দেবার জন্য বল্‌লে—এ বাড়ী আমি এক লাখ টাকা পেলে বিক্রী কর্‌তে পারি, আর মাসে পাঁচ শো টাকা পেলে ভাড়া দিতে পারি।

ইউনুস খুশী হয়ে বল্‌লে—আপনার অনুগ্রহ যে এত সহজে পাব, তা মনে করি নি। আমি এই বাড়ীটি কিন্‌বো; যত দিন না বাড়ী বিক্রীর লেখাপড়া শেষ হয়ে কেনা-বেচা চুকে যাচ্ছে, তত দিন আমি আপনাকে ভাড়া দেব। আপনি দয়া ক'রে শীগগির বাড়ীটা আমাকে ছেড়ে দেবেন, আজ যদি পারেন ত কালকের জন্যে দেরী করবেন না। বুঝ্‌ছেন ত স্বপ্নাদেশ!

এই ব'লে ইউনুস পকেট থেকে মণি-ব্যাগ বা'র ক'রে পাঁচ শো টাকার নোট গুণে দিতে লাগল।

বাড়ীওয়ালা ত অবাক্। যে বাড়ীটার ভাড়া পঞ্চাশ টাকাও হবে না, তার জন্য অনায়াসে পাঁচ-পাঁচ শো গুণে দিচ্ছে! লোকটা নিশ্চয় বদ্ধ পাগল!

বাড়ীওয়ালা ইউনুসকে বল্‌লে—দেখুন, পৈতৃক ভিটেটা বিক্রী কর্‌তে মন সরে না; আপনি যদি বেশী দিন থাকেন, তা হ'লে ভাড়া কিছু কম-সম ক'রে আপনাকে বাড়ী ছেড়ে দিতে ইচ্ছা করি।

ইউনুস বল্‌লে—এ বাড়ী আমার চাই, আর যত দিন আমি বেঁচে থাক্‌ব, তত দিন এ বাড়ী থেকে নড়বো না। শুন্‌লেন ত আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, এক জন ফকীর আমাকে বল্‌ছে যে, এই বাড়ীতে আমি না থাকলে দু' দিনে বুক ফেটে ম'রে যাব। নইলে আমি কল্‌কাতায় এম-এ পড়তাম, আপনার বাড়ীর খবর আমি জান্‌ব কেমন ক'রে বলুন?

বাড়ীওয়ালার লোভের সঙ্গে সঙ্গে ভয়ও হলো—স্বপ্ন আর দৈবাদেশের ব্যাপার, বেশী ঠকালে যদি কিছু হানি হয়,—তাই সে বল্‌লে—তা হ'লে আপনি মাসে তিন শো টাকা ক'রেই ভাড়া দেবেন; কিন্তু ভাড়াটা আগাম দিতে হবে।

ইউনুস আনন্দিত হয়ে বল্‌লে—আপনার মত নির্লোভ ভদ্রলোক আমি আর দ্বিতীয় দেখি নি। আপনার কাছে আমি চির-কেনা হয়ে রইলাম। আমার জীবন-মরণের ব্যাপার, আপনি হাজার টাকা চাইলেও আমাকে দিতে হ'ত, দেবার সঙ্গতি যখন ভগবান্ দিয়েছেন—

পরদিন থেকে ইউনুস সেই বাড়ীতে বাস কর্‌তে লাগল। সে সমস্ত দিন জান্‌লার কাছে ব'সে থাকে; আর সাম্‌নের বাড়ীর খোলা জানালাগুলোর দিকে সতৃষ্ণ

নয়নে তাকায়—যদি কোথাও কোনও ফাঁকে শুচিকে চল্‌তে ফির্‌তে দেখ্‌তে পায়। সে জান্‌লায় ক্যামেরা পেতে ব'সে থাকে আর শুচির দেখা পেলেই ক্যামেরার চকিত দৃষ্টি সেই দিকে পেতে ক্যামেরার বুকের ভিতর শুচির ছবি তুলে নেয়। কোনও দিন বা সে জান্‌লার কাছে ছবি-আঁকার কাঠামো ইজেল পেতে বসে; শুচিকে দেখে দেখে তুলি দিয়ে রং বুলিয়ে বুলিয়ে তার ছবি আঁকে। এমনই ক'রে শুচির নানা অবস্থার ছবি তার অবস্থানের নানা দিক্ থেকে তুলে তুলে ইউনুস তার বাক্‌স-তোরঙ্গ বোঝাই ক'রে ফেল্‌বার ঐকান্তিক সাধনায় নিমগ্ন হয়ে গেল। তার ভারী ইচ্ছা করে, শুচির ছবিগুলি দেওয়ালময় টাঙ্গিয়ে রাখে, আর যখন যে দিকে চোখ ফিরায়, শুচির চেহারাই তার চোখের ভিতর দিয়ে বুকের মধ্যে ফুটে ওঠে। কিন্তু সে তার ইচ্ছা অনুসারে কায করতে পারে না, পাছে তার একমাত্র চাকরাণী আসিয়ার মা তার চুরি দেখে লোকের কাছে গল্প ক'রে বেড়ায়, পাছে লোক শুচির চরিত্রে দোষারোপ করে, এই তার মহৎ ভয়। ইউনুস যখন ফটো তোলে কিংবা ছবি আঁকে, তখন সে ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে রাখে, যাতে আসিয়ার মা তার ত্রিসীমানায় না আস্‌তে পারে। ইউনুস শুচির ছবি আর দূর থেকে তার আবছায়া মূর্ত্তি দেখে দেখে একটি মূর্ত্তি গঠন কর্‌ছে; সে মৃন্ময়ী মূর্ত্তির গায়ে ভিজা কাপড় জড়িয়ে রেখে দেয়; আসিয়ার মা বুঝতে পারে না যে, সেটা কার মূর্ত্তি। কিন্তু ইউনুস আসিয়ার মা'র কাছ থেকে শুচির প্রতি তার অনুরাগ লুকিয়ে রাখলেও শুচির কাছ থেকে তা গোপন করতে পারে নি। শুচিকে দেখতে পেলেই ইউনুসের মুখ-চোখ উজ্জ্বল প্রফুল্ল হয়ে ওঠে, তার সর্ব্বশরীরে আনন্দোল্লাসের হিল্লোল খেল্‌তে থাকে, এ সংবাদটা শুচির দৃষ্টিতে অনেকবারই ধরা পড়েছে।

এক দিন শুচি তার স্বামীকে বল্‌লে—সাম্‌নের বাড়ীর ঐ লোকটা রাত-দিন আমার দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকে।

বাঁশীমোহন খুসী হয়ে হেসে বল্‌লে—ও যদি না দেখত, তা হ'লে ওকে ডেকে বল্‌তাম—

> বিদ্যুদ্দাম-স্ফুরিত-চকিতৈস্তত্র পৌরাঙ্গনানাং
> লোলাপাঙ্গৈর্যদি ন রমসে লোচনৈর্বঞ্চিতোঽসি ॥

লোকটার সৌন্দর্য্যবোধ আছে বল্‌তে হবে।

শুচি স্বামীর হিংসাশূন্য অনাবিল প্রীতির পরিচয় পেয়ে সুখী হয়ে বল্‌লে—লোকটাকে আমি এর আগে কোথায় যেন দেখেছি মনে হয়।

বাঁশীমোহন বল্‌লে—হয় ত ও বেচারাও নটীর পূজা দেখতে গিয়েছিল আর নটীর নৃত্য-গীতে মুগ্ধ হয়েছিল। কিন্তু আমি আর কাউকে তোমার পাণি-প্রার্থী হবার অবসর না দিয়ে সবার আগে তোমাকে প্রার্থনা করেছিলাম এবং সেই জন্যেই মহাজনবাক্য সার্থক করতে পেরেছি—উদযোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ।

শুচি সুখী হয়ে হেসে বল্‌লে—তোমার সেই ঐকান্তিক আগ্রহ দেখেই ত তোমাকে আমার ভাল লেগেছিল, আমার যদি কিছু গুণ থেকে থাকে, তবে তার যথার্থ সমাদর তুমিই প্রথম করেছিলে বাবার কাছে আমাকে পাবার প্রার্থনা ক'রে। তোমার অবাধ আগ্রহই ত আমার মনোহরণ করেছে।

তখন শুচি শুন্‌তে পেলে, ইউনুস তার বাঁশীতে বড় করুণ সুরে কানাড়া রাগিণী আলাপ কর্‌ছে।

* * * *

বছরখানেক পরে। ইউনুস রোজ বিবাহ-সভায় যাবার মত বেশ-বিন্যাস ক'রে বাদামতলী ষ্টীমারঘাটে যাতায়াত করে। ষ্টীমার-আফিসে খোঁজ করে—তার নামে কোন মাল এসেছে কি না। তখনও আসে নি শুনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ফিরে আসে, আবার পরদিন যায়।

দিন দশেক হাঁটাহাঁটির পর এক দিন ইউনুস একখানা গাড়ীর মাথায় লম্বা একটা প্যাক-বাক্স চাপিয়ে প্রফুল্লমুখে বাসায় ফিরে এলো। বাক্সের গায়ে ফ্রান্সের আর সমুদ্র-যাত্রার লেবেল আঁটা। পাড়া-প্রতিবাসী অবাক্ হয়ে ভাবতে লাগল, ফ্রান্স থেকে এর আবার কি এলো? ইউনুস কারও সঙ্গে এ পর্য্যন্ত আলাপ করে নি, কাযেই সকলের কৌতূহল মনেই চাপা রইল।

শুচি স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলে—সাম্‌নের বাড়ীর ঐ মুসলমান লোকটির কি সব জিনিষ এল ফ্রান্স থেকে?

বাঁশীমোহন বল্‌লে, শুনেছি, লোকটা আর্টিষ্ট, ছবি আঁকে, মূর্ত্তি গড়ে, তারই কিছু সরঞ্জাম আনলে বোধ হয়।

শুচি কৌতূহলের সহিত জিজ্ঞাসা করলে, আর্টিষ্ট? ওর নাম কি?

বাঁশীমোহন বল্লে, শুনেছি, ইউসুফ না কি অমনি একটা।

শুচি জিজ্ঞাসা করলে, ইউনুস না ত?

বাঁশীমোহন বললে, কে জানে, ইউনুস কি ইউসুফ।

শুচি বল্লে, কিন্তু যে বাক্সটা এল, সেটা ঠিক কফিনের মত দেখতে। আর্টিষ্টের সরঞ্জামের বাক্স নয়।

বাঁশীমোহন হেসে বল্লে, তা হ'লে মিঞা সাহেব নিজের কফিন নিজেই আগে থাকতে জোগাড় ক'রে রাখ্‌লেন; হঠাৎ রাত-বিরেতে যদি কফিনের দরকার হয়, তা হ'লে কোথায় খুঁজতে যাবে, তাই একটা কফিন এনে রেখে দিলে।

শুচি স্বামীর রঙ্গভরা রসিকতার কথা শুনে হাস্‌তে লাগল, সে আর কিছু বল্লে না। শুচির এবং অপর লোকের কৌতূহল ঐখানেই ক্ষান্ত হয়ে গেল।

কিন্তু আসিয়ার মা দেখলে, তার মনিবের ঘরের দরজা সে দিন থেকে অধিকক্ষণ বন্ধ হয়ে থাকে; সে দরজায় কান পেতে শোনে, তার মনিব কার সঙ্গে কথা বলে, হাসে। এতে আসিয়ার মা'র কৌতূহল প্রবল হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল; তার সন্দেহ হ'তে লাগল, তার মনিব পাগল হয়ে গেল না কি?

সেই দিন থেকে আসিয়ার মা মনিবের ঘরের দরজায় আড়ি পেতে বেড়াতে লাগ্‌ল। দরজার ফাঁকে-ফুটোয় চোখ পেতে সে ঘরের ভিতর দেখবার চেষ্টা করে; কিন্তু কিছুই সে দেখতে পায় না; বন্ধ দরজার কপাটের উপর আবার পর্দ্দা টাঙ্গানো থাকে।

আসিয়ার মা পাড়া-প্রতিবেশীর কাছে দুঃখ জানিয়ে বেড়ায় যে, তার মনিব ক্রমশঃ ক্ষেপে উঠ্‌ছে, শেষে বদ্ধ পাগল না হয়ে ওঠে।

পাড়ার লোক আসিয়ার মা'র কথায় সহজেই প্রত্যয় করে; পাগল নইলে আর ত্রিশ টাকার বাড়ীর জন্যে তিন-শো টাকা ভাড়া দেয়!

এক দিন আসিয়ার মা দরজার ফাঁকে চোখ দিয়েই চম্‌কে উঠ্‌ল! সে দিন কপাটের উপর পর্দ্দা টেনে দেওয়া হয় নি; সে দেখ্‌তে পেলে, ইউনুসের সাম্‌নে সাম্‌নের বাড়ীর বাবুর বৌ ব'সে আছে, আর ইউনুস তার পায়ের কাছে মাটীতে ব'সে তার মুখের দিকে চেয়ে অনর্গল কথা ব'লে যাচ্ছে, আর এক একবার হাস্‌ছে। আসিয়ার মা'র গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ল! বাঁশী-বাবুর জরুর সঙ্গে ইউনুসের আস্‌নাই! ইউনুসের বুকের পাটা ত কম না! ধনে-প্রাণে মজ্‌তে বসেছে! তাই ত ভাবি যে, দরজা বন্ধ ক'রে রাত-দিন সে করে কি? কিন্তু বাঁশী-বাবুর জরু আসে কোন্ দিক্ দিয়ে? এক দিনও ত তার আসা-যাওয়া চোখে পড়ে নি! পুরুষের ছদ্মবেশে আসে? কিন্তু ইউনুসের কাছে ত কোন লোকই আস্‌তে সে দেখ্‌তে পায় না।

আসিয়ার মা মহা সমস্যায় প'ড়ে গেল। দুশ্চিন্তার তাহার আহার-নিদ্রা বন্ধ হ'ল। সে সতর্ক হয়ে রইল, শুচি কোন্ ফাঁকে আসে, তা হাতেনাতে ধ'রে ফেল্‌তে হবে।

আসিয়ার মা সতর্ক পাহারা দিয়েও বাড়ীতে কারও আসা-যাওয়া ধরতে পার্‌লে না। অথচ প্রত্যহই সে মনিবের ঘরের দরজায় কান পেতে শোনে, সে কার সঙ্গে কথা বল্‌ছে।

তখন আসিয়ার মা এক জন ছুতোরের কাছ থেকে একটা গিম্‌লেট চেয়ে এনে দরজায় একটা বড় ফুটো করলে এবং সেই ফুটোটায় একটা কর্কের ছিপি এঁটে রেখে দিলে।

ইউনুস ঘরে দরজা বন্ধ কর্‌লেই আসিয়ার মা দরজার ফুটোর ছিপি খুলে সেইখানে এক চোখ লাগিয়ে দেখে, ইউনুস শুচির পায়ের তলায় ব'সে হেসে হেসে অনর্গল কথা বল্‌ছে।

আসিয়ার মা যখন দু' চার দিন পাহারা দিয়েও ইউনুসের ঘরে শুচির আসা বা যাওয়া কিছুই ধরতে পারলে না, তখন সে স্থির করলে, এর পর ইউনুসের ঘরে শুচিকে দেখ্‌লেই সে দরজা খুলিয়ে তবে ছাড়্‌বে।

এই অবসরের জন্য আসিয়ার মাকে অধিকক্ষণ অপেক্ষা ক'রে থাক্‌তে হ'ল না। সে দেখলে, ইউনুস গিয়ে ঘরে দরজা দিলে। একটু পরেই সে গিয়ে ফুটো দিয়ে দেখলে, ইউনুসের গা ঘেঁসে শুচি ব'সে আছে, আর ইউনুস একদৃষ্টে তার মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে ব'সে আছে।

আসিয়ার মা দেখ্‌তে দেখ্‌তে দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাক্‌লে,—সাহেব, একবার কেওয়াড়া খোলেন ত।

চাকরাণীর ডাক শুনেই ইউনুস চম্‌কে উঠ্‌ল এবং

লাফিয়ে শুচির পাশ থেকে উঠে প'ড়ে দরজার উপর একটা পর্দ্দা টেনে দিলে।

আসিয়ার মা আবার দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাক্‌লে, মিঞা সাহেব, জল্‌দি কেওড়া খোলেন, জরুরী কাম আছে।

মিনিট খানেক পরে ইউনুস দরজা খুলে দিলে।

আসিয়ার মা ঘরে ঢুকে দেখ্‌লে, কেউ কোথাও নেই; যে একখানি গদী-মোড়া বড় দামী চেয়ারে শুচি রোজ এসে বসে, সেই চেয়ারখানা শূন্য প'ড়ে আছে। আর সেই চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে আছে, চাকা-ওলা পায়া দেওয়া একটা সরু লম্বা আলমারী, তার কাঠের কপাটে বিচিত্র লতাপাতার নক্সা কাটা।

শুচি ঘরের কোথাও লুকিয়েছে মনে ক'রে আসিয়ার মা চারিদিকে চোখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল।

ইউনুসের চোখে-মুখে বিরক্তি। সে রূঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করলে—কি কাম আছে তোমার? আমার কাযের সময় তুমি খবরদার আমাকে ডাকাডাকি করবে না, ব'লে রাখছি।

আসিয়ার মা ইউনুসের খাটের তলায়, আল্‌মারীর পাশে, ইজেলের পিছনে উঁকি মেরে মেরে দেখ্‌তে দেখ্‌তে বল্‌লে—একটা চায়ের বাটি কোথায় আছে, তাই খুঁজ্‌ছি।

ইউনুস বিরক্তস্বরে বল্‌লে, এখন কি চা খাবার সময় যে, বাটি খুঁজতে এসেছ?

আসিয়ার মা হাঁটু গেড়ে হুম্‌ড়ি খেয়ে একটা দেরাজের তলায় উঁকি মারছিল; ইউনুসের ধমক খেয়ে সে উঠে দাঁড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে, কিন্তু সে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল—সে জান্‌লা দিয়ে দেখ্‌লে, সাম্‌নের বাড়ীতে জান্‌লার কাছে শুচি দাঁড়িয়ে আছে!

ইউনুস আসিয়ার মা'র বিস্মিত দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে জান্‌লার বাইরে তাকাতেই তার মুখের বিরক্তি ও দৃষ্টির কঠোরতা তৎক্ষণাৎ মিলিয়ে গেল; সেখানে ফুটে উঠলো শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম, লজ্জা ও আনন্দ! আসিয়ার মা যে ঘরে এসে তাকে বিরক্ত করেছে, সে কথা সে ভুলে শুচির দিকে চেয়ে রইল।

আসিয়ার মা মুচ্‌কি হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে চ'লে গেল।

সেই দিন পাড়াময় র'টে গেল যে, শুচি মাটীর তলে কোন সুড়ঙ্গ দিয়ে ইউনুসের ঘরে আনাগোনা করে। সকলেই ফিস ফিস ক'রে এই কথাই আলোচনা করে, আর পরস্পরে বলাবলি করে—বড়লোকের বাড়ীর কেচ্ছা, ও নিয়ে আমাদের আলোচনা না করাই ভাল, শেষে বাঁশী-বাবু শুনতে পেলে আমরাই কোন বিপদে পড়ব!

কাযেই বাঁশীমোহনের শুন্‌তে বিলম্ব হ'ল না।

সে বাড়ী গিয়ে হাসিমুখে শুচিকে বল্‌লে—ওগো নটী, শুনেছ? লোক বলাবলি করছে, তুমি না কি রোজ মাটীর তলায় তলায় সুড়ঙ্গ দিয়ে সাম্‌নের বাড়ীর ইউসুফ সাহেবের কাছে অভিসারে যাও; ইউসুফের চাকরাণী আসিয়ার মা নিজের চোখে দেখেছে।

শুচি হেসে বল্‌লে—আমার তা হ'লে বিদ্যাসুন্দরের উল্টো পালা—সুন্দরের মন্দিরে সুড়ঙ্গ দিয়ে বিদ্যার অভিসার!

বাঁশীমোহন হাস্‌তে হাস্‌তে জিজ্ঞাসা করলে—কিন্তু আসিয়ার মা ত গাঁজা খায় না বোধ হয়, তবে তার এমন অসম্ভব কল্পনা মাথায় ঢুকল কেমন ক'রে?

শুচি একটু কুণ্ঠিত হয়ে বল্‌লে—ইউসুফ সাহেব তার ঘরের দেয়ালময় বড় বড় লম্বা লম্বা আয়না টাঙ্গিয়েছে; হয় ত তাতে আমার ছায়াপাত দেখে আসিয়ার মা'র এই ভ্রম হয়েছে।

বাঁশীমোহন হেসে বল্‌লে—ইউসুফ সাহেব প্রকৃত আর্টিষ্ট তা হ'লে; কায়া না পেয়ে ছায়া ধর্‌বার ফাঁদ পেতেছে! লোকটা যে আমার পছন্দকে এমন ক'রে তারিফ করছে, তার জন্য তাকে এক দিন নেমন্তন্ন ক'রে খাইয়ে দিতে ইচ্ছা করছে! দেখছ, আমি কেমন জহুরী!—কি রত্ন বেছে নিয়েছি!—ন রত্নম্ অন্বিষ্যতে মৃগ্যতে হি তৎ!

আনন্দে ও লজ্জায় শুচির মুখ লোহিতাভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

* * * *

শুচির একটি কন্যা হয়েছে। শুচির পিতা সমরেশ বাবু নাতনীর সঙ্গে শুভদৃষ্টি করতে ঢাকায় এসেছেন।

শ্রাবণ মাস। সন্ধ্যাবেলা। মুষলধারে বর্ষণ হচ্ছে। পথের ধারের ঘরে ইলেক্‌ট্রিক আলো জ্বেলে সমরেশ বাবু নাতনীকে কোলে নিয়ে ব'সে আছেন; তাঁর দু'পাশে ব'সে আছে শুচি আর বাঁশীমোহন।

সমরেশ বাবু নাতনীর মুখের দিকে স্নেহবিগলিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে স্মিতমুখে বল্‌লেন—শুচি, তোমার মেয়ের একটা ছবি আমাকে দিও বাছা ; আমি এই বুড়ো বয়সে আমার এই অতি নবীনা প্রণয়িনীর বিরহ কিছুতেই সহ্য করতে পারব না। তাতে আবার বর্ষাকাল ; আমি আবার বিরহী যক্ষের মত ছবি আঁক্‌তেও জানি না যে, ধাতুরাগ দিয়ে ব'সে ব'সে ছবি এঁকে মনটাকে সান্ত্বনা দেব !

শুচি পিতার মমতাভরা রসিকতায় সুখী হয়ে হেসে বল্‌লে—আমাদের সাম্‌নের বাড়ীতে এক জন আর্টিষ্ট থাকে ; সে সে দিন খুকীর ছবি তুলেছে—

বাঁশীমোহন জিজ্ঞাসা করলে, ইউসুফ খুকীর ছবি তুললে কেমন ক'রে ?

শুচি বল্‌লে—ঝি খুকীকে ঠেলা-গাড়ীতে ক'রে বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছিল, ইউসুফ ঝিকে দাঁড় করিয়ে খুকীর সাম্‌নে পিছনে এ-পাশে ও-পাশে দাঁড়িয়ে নানান দিক্ থেকে অনেকগুলো ছবি তুললে, আমি দেখলাম।

বাঁশীমোহন বল্‌লে—তা হ'লে তার কাছ থেকে খুকীর ফটোগ্রাফের দুই একখানা প্রিণ্ট চেয়ে নিলেই হবে।

সমরেশ বাবু হেসে বল্‌লেন—ফটোগ্রাফে আমার বিরহ-বেদনা ত দূর হবে না। শুচি, তুমি তোমার নতুন মায়ের ছবি নিজে এঁকে আমাকে উপহার দেবে ! যে রং দিয়ে সে আমার চিত্তপটকে রাঙ্গিয়েছে, সেই রং তোমাকে চিত্রপটে ফলিয়ে তুল্‌তে হবে।

শুচি সুখের আবেশে লজ্জিত হয়ে বল্‌লে—আমি ত ছবি আঁকা এক রকম ছেড়েই দিয়েছি—

সমরেশ বাবু বল্‌লেন—ছেড়ে দিয়েছ, আবার ধর। আর এবার পুজোর সময় কল্‌কাতায় একটা বড় আর্ট এক্‌জিবিশন হবে ; তার জন্যও একখানি ছবি খুব ভাল ক'রে এঁকে ফেল, এখনও সময় আছে।

শুচি কুণ্ঠিতকণ্ঠে বল্‌লে—আমাদের ছবি দিয়ে কি হবে ? ইউনুসের সঙ্গে ত পার্‌বার যো নেই !

সমরেশ বাবুর প্রফুল্ল মুখ অকস্মাৎ গম্ভীর হয়ে উঠল ; তিনি ঈষৎ বিষণ্ণ স্বরে বল্‌লেন—গেল শীতকালের কোনও এক্‌জিবিশনেই সে ছবি দেয় নি।

শুচি বল্‌লে—হাঁ্যা, ইউনুসের ছবি বা লেখাও ত আর কোনও কাগজে দেখতে পাওয়া যায় না। অত বড় নাম-ডাক যার হয়েছিল, সে হঠাৎ কোথায় ডুব মার্‌লে ?

বাঁশীমোহন বল্‌লে—মারা-টারা গেল না কি ?

সমরেশ বাবু গম্ভীর বিষণ্ণ স্বরে বল্‌লেন—কি জানি। অবনীন্দ্র ঠাকুর আর যামিনীপ্রকাশ গাঙ্গুলী সে দিন দুঃখ ক'রে বল্‌ছিলেন—অমন প্রতিভাবান্ আর্টিষ্ট কোথায় যে গেল, কেউ তার খোঁজও দিতে পারে না !

সমরেশ বাবুর মনের মধ্যে একটা সন্দেহ অনেক দিন থেকেই কাঁটার মত খচখচ করছিল যে, হয় ত বা শুচিকে প্রার্থনা ক'রে না পেয়েই ইউনুসের সমস্ত শক্তি ও সাধনা ব্যর্থ হয়ে গেছে। কিন্তু তিনি সেই সন্দেহ কন্যা ও জামা-তার কাছে প্রকাশ করতে পার্‌লেন না ; ইউনুস যে শুচিকে যাচ্ঞা করেছিল, সে কথাও যেমন তিনি আর কারও কাছে প্রকাশ করেন নি, তেমনই এ কথাও তিনি গোপন রাখ-লেন। কিন্তু তাঁর মন বিষাদাচ্ছন্ন ভারাক্রান্ত হয়ে গেল ; তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চুপ কর্‌লেন।

যে আলাপ আনন্দ ও রসিকতা দিয়ে আরম্ভ হয়েছিল, তার উপরে একটি শোকের ছায়া এসে পড়ল। পিতার বিষণ্ণ গাম্ভীর্য্যে সমবেদনা অনুভব ক'রে শুচি বল্‌লে—সত্যি, ইউনুস অমন অসাধারণ প্রতিভার আভাস দিতে না দিতে কোথায় যে গেল !

সমরেশ বাবু আর কোনও কথা বল্‌লেন না। ঘর নিস্তব্ধ হয়ে গেল। ক্ষণকাল আর কেউ কোনও কথা বল্‌তে পারল না।

ঘরের মধ্যে আলাপ থেমে গেলে সকলে শুন্‌তে পেলে, সাম্‌নের বাড়ী থেকে উঁচু মিঠা গলার গান ঝড়-বৃষ্টির মাতা-মাতির সঙ্গে বড় করুণ স্বরে আর্ত্তনাদ ক'রে ফির্‌ছে—

নাহি নাহি নিদ্রা আঁখিপাতে !
তোমার ভবনতলে
হেরি প্রদীপ জ্বলে,
দূরে　বাহিরে তিমিরে আমি জাগি যোড়হাতে !
ক্রন্দন ধ্বনিছে পথহারা পবনে,
রজনী মূর্চ্ছাগত বিদ্যুৎঘাতে।
দ্বার খোল হে দ্বার খোল !
ওগো　কর দয়া দেহ দেখা দুঃখরাতে !

*

ইউনুসের ঘরের ভিতরদিকে কপাটের সামনে পর্দা টেনে দিতে যে দিন ইউনুসের মনে থাকে না, সেই দিনই তার কৌতূহল-বিকলা চাকরাণী আসিয়ার মা ফুটার উপর চোখ রেখে দেখে, ইউনুস শুচির সঙ্গে আলাপ করছে। আসিয়ার মা'র সাড়া পেলেই ইউনুস চম্‌কে উঠে তাড়াতাড়ি কপাটের উপর পর্দা টেনে দেয়। আসিয়ার মা'র এই চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ এখন কেউ বিশ্বাস করে, কেউ করে না; শুচি আর বাঁশীমোহন শুনে শুধু হাসে।

এক দিন আসিয়ার মা ফুটোর উপর দৃষ্টি পেতেই চম্‌কে উঠল—সে দেখলে, ইউনুস শুচির মেয়েকে দুই হাতে তুলে মুখের কাছে তুলে চুমু খেলে, আর তার পর শুচির কোলে তাকে ফিরিয়ে দিলে; আবার খুকীকে শুচির কোল থেকে তুলে নিয়ে চুমু খেলে, আবার শুচির কোলে ফিরিয়ে দিলে, বারংবার সে এই রকমই করছে। শুচি চুপ ক'রে ব'সে মৃদু মৃদু শুধু হাসছে!

এই অনাচারের দৃশ্য আসিয়ার মা'র আর সহ্য হ'ল না, সে নিঃশব্দে সেখান থেকে স'রে গিয়ে এক ছুটে বাঁশী-মোহনের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। তখন বাঁশীমোহন তার বাড়ীর বাহিরের বৈঠকখানায় শুচির কোলে খুকীর একখানি ছবির দিকে দাঁড়িয়ে প্রশংসমান স্নেহবিগলিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। আসিয়ার মা রুদ্ধশ্বাসে এসেই বাঁশীমোহনকে বল্‌লে—বাবু, আমার সঙ্গে আসুন, আপনার বিবির রীত নিজের চোখে একবার দেখুন।

স্ত্রীর চরিত্রে দোষারোপের কথা শুনে বাঁশীমোহনের মুখের উপর দিয়ে ঈষৎ ঈর্ষ্যার ছায়ার পিছনে পিছনে আসিয়ার মা'র স্পর্দ্ধায় বিরক্তি ও ক্রোধের ছায়া ভেসে গেল; তার পর তার মুখে কৌতুকের স্মিত হাসি ফুটে উঠল; সে কৌতূহলের আকর্ষণে নীরবে আসিয়ার মা'র সঙ্গে সঙ্গে চল্‌ল।

শুচি বৈঠকখানার পাশের ঘরেই তার বাবার কাছে ব'সে ছিল। সে আসিয়ার মা'র কথা শুনেই চম্‌কে উঠে পিতার মুখের দিকে তাকালো—বাবা যদি এই কথা শুনে থাকেন, তবে তিনি না জানি কি ভাব্‌বেন। শুচি দেখ্‌লে, আশঙ্কা তার সত্য, তার পিতা উৎকণ্ঠাকুল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছেন। শুচির দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি সম্মিলিত হতেই সমরেশ বাবু ব্যগ্র ও উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—ঐ মেয়েলোকটি এসে বাঁশীমোহনকে কি বল্‌লে?

পিতার প্রশ্ন শুনেই শুচির মুখ লজ্জায় অপ্রতিভ হয়ে গেল। সে দৃষ্টি নত ক'রে মৃদুস্বরে বল্‌লে—ঐ লোকটা রটিয়ে বেড়ায় যে, আমি সুড়ঙ্গ দিয়ে সাম্‌নের বাড়ীতে যাই।

সমরেশ বাবু কৌতুকমিশ্র উদ্বেগের সহিত বল্‌লেন—সাম্‌নের বাড়ীতে কে এক জন আর্টিষ্ট থাকে বল্‌ছিলে না? বাঁশীমোহন একলা তার বাড়ীতে গেল; কায ভাল কর্‌লে না, ঝগড়া-গণ্ডগোল কর্‌বে না কি?

শুচি পিতার উদ্বেগে উদ্বিগ্ন হয়ে বল্‌লে—বাবা, চল না, আমরাও যাই। তা হ'লে আজ সকলের সকল সন্দেহ ঘুচে সমস্যা মিটে যাবে।

সমরেশ বাবু মুহূর্ত্তকাল চিন্তা ক'রে বল্‌লেন—আচ্ছা, চল।

বাঁশীমোহন নিঃশব্দে ইউনুসের ঘরের সাম্‌নে গিয়ে আসিয়ার মা'র নির্দ্দেশমত ছিদ্রপথে দৃষ্টি প্রেরণ করেই চম্‌কে উঠল, তার মুখ কঠিন ও কালো হয়ে উঠ্‌ল, তার ললাটে ভ্রূকুটি দেখা দিল। কিন্তু এক মুহূর্ত্ত পরেই তার মুখের কঠোরতা শিথিল হয়ে এল, ললাট প্রশস্ত ও দৃষ্টি প্রশান্ত হ'ল, ধীরে ধীরে তার মুখে বিস্মিত প্রশংসাভরা শ্রদ্ধান্বিত মৃদু হাসি ফুটে উঠ্‌ল। বাঁশীমোহন কপাটের ফুটো থেকে চোখ তুলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দরজা ঠেল্‌লে।

পশ্চাতে লোকসমাগমের শব্দ শুনে বাঁশীমোহন পিছন ফিরেই দেখলে, পিতার সঙ্গে শঙ্কিত মুখে শুচি আসছে। শুচিকে আসতে দেখে আসিয়ার মা'র দুই চক্ষু বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে ঠিক্‌রে বেরিয়ে পড়বার উপক্রম হ'ল—এ কি ভুতুড়ে কাণ্ড! এই একটু আগে যে ছিল ঘরে, সে এল বাহিরে! এরা কি ভেল্কী জানে?

বাঁশীমোহন স্ত্রী ও শ্বশুরকে আসতে দেখে লজ্জিত হাস্যে অপ্রতিভভাবে বল্‌লে—আপনারাও এসেছেন?

ঘরের দরজায় ধাক্কা ও বাহিরে কণ্ঠস্বর শুনে ইউনুস বিরক্ত হয়ে মনে কর্‌লে, আসিয়ার মা'টাই বিরক্ত কর্‌তে এসেছে। সে আসিয়ার মাকে ধম্‌কে তাড়িয়ে দেবার জন্য দরজা খুলে একটু ফাঁক কর্‌লে এবং সেই ফাঁকে নিজের শরীরের আড়াল রেখে মুখ একটু বাহির করেই স্তম্ভিত অবাক্ হয়ে গেল—তার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে আছে তার নিরন্তর আরাধনার ধন শুচি! শুচিকে এত নিকটে দেখ্‌বামাত্র

ইউনুসের সর্ব্বশরীর শিথিল হয়ে এল, হাত অবশ হয়ে পড়ল, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে ঘরের দরজা তার হস্ত-মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ খুলে গেল! সকলে সবিস্ময়ে দেখ্‌লে, ইউনুসের ঘরে সিংহাসন-তুল্য বহুমূল্য চৌকীর উপর শুচি তার মেয়েকে কোলে ক'রে ব'সে মৃদু মৃদু হাসছে!

শুচি আর সমরেশ বাবুর মুখের দিকে চেয়ে হাসিমুখে বাঁশীমোহন বল্‌লে—মোমের পুতুল!

বিস্ময়ের প্রথম আবেশ উপশমিত হ'লে সমরেশ বাবু মোমের পুতুলের দিক্ থেকে চোখ ফিরিয়েই ব'লে উঠলেন—এই ত ইউনুস।

ইউনুসের একান্ত একলার গোপন প্রেম অত্যন্ত নির্দ্দয় নির্লজ্জ রকমে শুচির সাম্‌নে ধরা প'ড়ে যাওয়ার দুঃসহ লজ্জার বেদনায় ইউনুস কেঁদে ফেল্‌লে এবং সেই কান্নার লজ্জা ঢেকে ফেল্‌বার জন্য সে দুই হাতে মুখ ঢেকে মাটীর উপর ব'সে পড়লো, সে নিজেকে যথাসম্ভব সঙ্কুচিত ক'রে ধূলার মধ্যে লুকিয়ে ফেল্‌তে পার্‌লে যেন পরিত্রাণ পায়।

ইউনুসের অবস্থা দেখে শুচির চক্ষুও সজল হয়ে উঠ্‌ল।

বাঁশীমোহন ইউনুসের কাঁধে হাত রেখে বল্‌লে—আজ থেকে আপনি আমার বন্ধু। আমার স্ত্রী আপনাকে আমাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ কর্‌তে এসেছেন। আপনার যখন ইচ্ছা হবে, আমাদের বাড়ীতে আপনি আস্‌বেন।

ইউনুস কোন কথা বল্‌তে পার্‌লে না, সে মুখ ঢেকে নিঃশব্দে কাঁদ্‌তে লাগল।

সমরেশ বাবু ব্যথিত স্বরে বল্‌লেন—এখন আমরা চ'লে যাই এসো। ওঁকে একলা থাকতে দাও।

শুচি ছলছল চোখে আর একবার ইউনুসের দিকে করুণা-ভরা দৃষ্টিপাত ক'রে পিতা ও স্বামীর সঙ্গে সেখান থেকে চ'লে গেল।

শুচিরা বাড়ীতে এসে সবাই গম্ভীর হয়ে রইল; বিভিন্নভাবে তাদের তিন জনের চিত্তই এমন পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল যে, কেউ আর কথা বল্‌তে পারছিল না।

গভীর রাত্রিতে শুচি শয্যায় জেগে শুয়ে আছে। সে শুন্‌তে পেলে, ইউনুস কান্না-ঢালা করুণ স্বরে বিনিয়ে বিনিয়ে নিশীথ নিস্তব্ধতাকে ব্যথিত ক'রে গাইছে—

"হিয়ার ভিতর হইতে কে কৈলে বাহির।"

শুচির চোখ থেকে অশ্রুধারা গড়িয়ে প'ড়ে তার বালিস ভিজিয়ে দিতে লাগল। ব্যথিত অবসন্ন চিত্তে সে যে কখন্ ঘুমিয়ে পড়েছে, তা সে জানতেও পারে নি।

সকালে তার ঘুম ভাঙতেই শুচি ধড়মড় ক'রে উঠে বস্‌লো। দেখলে, তার এক পাশে খুকী ও এক পাশে স্বামী তখনও ঘুমোচ্ছে। সে সন্তর্পণে অবনত হয়ে খুকীকে চুম্বন কর্‌লে ও স্বামীকে প্রণাম ক'রে তার পায়ের ধূলো মাথায় দিলে। তার পর সে ধীরে ধীরে জান্‌লার কাছে গিয়ে ইউনুসের বাড়ীর দিকে একবার দেখলে, কিন্তু প্রতিদিনের মত আজ ইউনুস প্রত্যূষ থেকেই তার জানালায় শুচির দর্শন-প্রাপ্তির আশায় উদ্‌গ্রীব হয়ে ব'সে নেই। শুচির মনে হ'ল,—আহা, বেচারা বড় লজ্জা পেয়েছে।

শুচি পিতার, স্বামীর ও কন্যার পরিচর্য্যার আয়োজন কর্‌তে চ'লে গেল।

শুচি পিতার ও স্বামীর জন্য চায়ের জল ও খুকীর জন্য দুধ গরম ক'রে নিয়ে অপেক্ষা করছে। সমরেশ বাবু তার পাশে ব'সে খবরের কাগজ পড়ছেন; দাসী খুকীকে আনতে গেছে। বাঁশীমোহন বেড়াতে গেছে, ফিরবার সময় হয়েছে।

তখনই বাঁশীমোহন ঘরে এসে প্রবেশ করতে করতে ব্যথিত স্বরে বল্‌লে—ইউনুস সমস্ত জিনিষ-পত্তর ফেলে রেখে কাল রাত্রিতে কোথায় চ'লে গেছে—সঙ্গে নিয়ে গেছে কেবল দুটি মোমের পুতুল!

উচ্ছ্বসিত অশ্রু গোপন করবার জন্য শুচি তাড়াতাড়ি উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে চ'লে গেল।
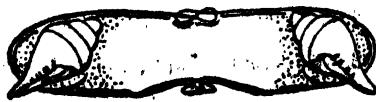
চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৪

নূতন বৎসর আরম্ভ হইতে না হইতে মেলা ভাঙ্গিয়া গেল। যে সহর এত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিল, সে সহর তিন চারি দিনের মধ্যে আবর্জ্জনায় পূর্ণ হইল। সরকারের অনুচররা সহর ত্যাগ করিবার আদেশ যাত্রীদের মধ্যে প্রচার করিল। এমন কি, আশ্রয়হীন যাত্রীদের দাড়াইয়া ষ্টেশন-অভিমুখে লইয়া চলিল, রেল-কর্ত্তৃপক্ষ উপযুক্ত পরিমাণে গাড়ী সরবরাহ করিতে একটুও অবহেলা করেন নাই; কিন্তু লক্ষ লক্ষ যাত্রী তিন চারি দিনের মধ্যে স্থানান্তরিত করা সম্ভবপর নহে। অনেকে ষ্টেশনের সন্নিকটে খোলা যায়গায় পড়িয়া রহিল।

সেবা-সমিতির কার্য্য শেষ হইয়াছে, কিন্তু বিজয়ের কায শেষ হয় নাই। তিনি শয্যাশায়ী নবকুমারের পার্শ্বে বসিয়া অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন। তাঁহাকে নিজের ঘরে আনিয়া তুলিয়াছেন, তাহার মা-বোন্‌কে আনিয়াছেন, তাহাদের সকল অসুবিধা দূর করিয়াছেন।

মেলা শেষ হইবার চারি দিন পরে একদা সন্ধ্যার সময় শয্যাশায়িত নবকুমার পার্শ্বে উপবিষ্ট বিজয়কে কহিল, "এখানে গঙ্গাজলে স্নান করতে এসেছিলাম; গঙ্গাজলে স্নান করা ঘ'টে না উঠলেও তোমার স্নেহজলে খুব স্নান করেছি বিজয়দা।"

বি। কি যে বক্‌ছ কুমার! জ্বর বাড়বে, চুপ কর।

ন। জ্বর আর হবে না, ক্ষতও সেরেছে—সবই তোমার কৃপায়, দাদা। এখানে এসে তোমার কাছে যা পেয়েছি, তা জীবনে আমি কোথাও কারুর কাছে পাই নি। আমি তীর্থফল হাতে হাতে পেয়েছি।

বি। তুমি আর বস্‌তে দিলে না, উঠিয়ে ছাড়লে—

ন। তুমি আমাকে প্রাণ দিয়েছ, অগাধ স্নেহ দিয়েছ, মনুষ্যত্ব কাকে বলে, তা শিখিয়েছ, এত ঋণ ত আমি কারুর কাছে করি নি, দাদা! আমাকে বলতে দেও—

বি। না, বলতে পাবে না।

ন। আচ্ছা দাদা, জীবন কি মধুর! যখন সে দিন রমা আমাকে প্রত্যাখ্যান ক'রে তাড়িয়ে দিলে, তখন আমি স্থির করেছিলাম, মাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে যমুনার জলে ডুবে মরব। কিন্তু যখন ভিড়ের ভিতর মৃত্যু আমার সম্মুখে এসে বল্‌লে, 'এইবার আয়, আমাকে যে বড় ডেকেছিলি,' আমি তখন তাকে বরণ ক'রে নিতে পারলুম না, সমস্ত বুক ফেটে চীৎকার উঠল, 'না, আমি মরতে পারব না, আমাকে বাঁচতে দেও—এমন সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে আমি যেতে পারব না।'

বি। কেন পৃথিবী ছেড়ে যাবে ভাই, রমা ত তোমার; আমি মা'র কাছে সব শুনছি।

নিরি ও রমা কক্ষদ্বার অতিক্রম করিয়া পাশের ঘরে যাইতেছিল। বিজয় রমাকে ডাকিলেন। রমা ও নিরি উভয়ে আসিল। বিজয় কহিলেন, "নবকুমারকে আমি ভাই ব'লে গ্রহণ করেছি, রমা: এখন তার দুঃখ অভিযোগ সকলই আমার। সে ব্যথা পেলে আমি ব্যথা পাই। তাকে আমি স্নেহ, প্রীতি সব দিয়েছি, কিন্তু যা পেলে কুমার সুখী হয়, তা দেবার আমার সামর্থ্য নেই। তুমি তাকে কি তা দেবে, রমা?"

রমা মুহূর্ত্তের জন্য বিজয়ের পানে চাহিল; সে দৃষ্টিতে কত অভিযোগ, কত অভিমান জানাইল। কিন্তু ভাষায় কিছু বলিল না। বিজয় পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল রমা?"

রমা কহিল, "আমারও দিবার সামর্থ্য নেই।"

বলিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। নিরিও পশ্চাদনুসরণ করিল। বিজয় অধোমুখে বসিয়া রহিলেন। নবকুমার চুপ করিয়া বিজয়ের মুখপানে চাহিয়া রহিল। অতঃপর কহিল, "দাদা, রমাকে বিয়ে করতে আমার আর ইচ্ছে নেই।"

বি। কেন ভাই?

ন। আমি রমাকে ভালবেসেছিলাম তার অতুলনীয় রূপে মুগ্ধ হয়ে; আমার সে মোহ এখন কেটে গেছে।

বি। এত শীঘ্র কি ক'রে কাটল ?

ন। জ্ঞান জন্মালেই মোহ কাটে। এখন বুঝেছি, রমা আমার নয়ন আকর্ষণ করেছিল, হৃদয় আকর্ষণ করতে পারে নি।

বি। কি ক'রে তা জানলে ?

ন। বলব দাদা ?

বি। স্বচ্ছন্দে বল।

ন। রমা তোমাকে ভালবাসে, সে আমার আকাঙ্ক্ষিত আর নয়।

বি। বিবাহে আমার উৎসাহ নেই, ভাই।

ন। কেন দাদা ?

বি। বিবাহ আমার সাধনের অন্তরায় হবে।

ন। সাধনটা কি ?

বি। আত্মপ্রতিষ্ঠা; আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি, তাকে চিনে নিয়ে হৃদয়মধ্যে প্রতিষ্ঠা করতে চাই।

ন। তা করবে কর; কিন্তু বিয়ে করতে দোষ কি ?

বি। প্রবৃত্তি বলবান্ থাকতে আত্মপ্রতিষ্ঠা হবে না ত, ভাই।

ন। কেন হবে না ? মুনি-ঋষিরা কি বিয়ে করতেন না ?

বি। করতেন, কিন্তু আত্মপ্রতিষ্ঠিত হবার পূর্ব্বে নয়। এই আত্মপ্রতিষ্ঠাই হচ্ছে স্বরাজপ্রতিষ্ঠা।

ন। বাঃ, তুমি ত বড় মজার কথা বলছ বিজয়দা। দেশের সকলেই ত এখন স্বরাজ স্বরাজ ক'রে চীৎকার করছেন।

বি। চীৎকার করছেন, কিন্তু পান নি; পাবেনও না, পাবার উপযুক্ত হবেন না, যত দিন না হৃদয়মধ্যে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হবেন, যত দিন একনিষ্ঠ ত্যাগী সাধক হ'তে না পারবেন। যার লোভ আছে, সে আত্মসুখী—পরের দিকে সে চাইবে না; যে ক্রোধী, সে অন্ধ; যে বিলাসী, সে অপটু; যে গর্ব্বী, সে মূঢ়। এই সব প্রবৃত্তি যার আছে, সে কখনও আত্মপ্রতিষ্ঠা বা স্বরাজপ্রতিষ্ঠায় সমর্থ নয়।

ন। সংসারক্ষেত্রে এমন কোন জীব দেখি না—যার এ সব প্রবৃত্তি নেই।

বি। কেন এমন জীব থাকবে না ? যে ত্যাগ শিখেছে, সেই পেরেছে। রাণা প্রতাপ, বীর শিবাজী, বাঙ্গালী চিত্তরঞ্জন এঁদের স্মৃতি ভুলে যাও কেন ? এঁরা মহা সাধক ছিলেন, আমি তাঁদের আদর্শ সম্মুখে রেখে চল্‌ব।

ন। তা হ'লে বিয়ে কর; তাঁরাও কেহ অবিবাহিত ছিলেন না।

বি। মায়ের যখন আদেশ হয়েছে, তখন হয় ত আমাকে বিয়ে করতে হবে। কিন্তু রমাকে বিয়ে করব না।

ন। কেন, দাদা ?

বি। রূপ, আসক্তি, ভালবাসা এদের কাছ হ'তে আমি দূরে থাকতে চাই।

ন। যাঁদের নাম করলে, তাঁরা ত রূপ আসক্তি হ'তে দূরে থাকেন নি।

বি। ভুল বুঝেছ—তাঁরা দূরে ছিলেন। স্ত্রী-পুত্রের প্রতি তাঁরা কর্ত্তব্যপালন ক'রে গেছেন, এই মাত্র—আসক্ত হয়ে পথভ্রষ্ট হন নি।

জনৈক ভৃত্য আসিয়া একটা 'তার' দিল। রেল-কর্ত্তৃপক্ষ 'তার' করিয়া জানাইয়াছেন, ৩ দিন পরে রিজার্ভ গাড়ী পাওয়া যাইবে।

১৫

কয়েক দিন পরে জাহ্নবী দলবল লইয়া কলিকাতায় ফিরিলেন। বিশাল অট্টালিকা, মূল্যবান্ আসবাব, গাড়ী-ঘোড়া, মোটর, বহু দাস-দাসী এই সব দেখিয়া শুনিয়া মৈমনসিং অধিবাসীরা চমৎকৃত হইলেন। দেওয়ালের গায়ে বোতাম টিপিলে ঘরের মধ্যে পাখা ঘুরিতে থাকে, এই ব্যাপার দেখিতে দেখিতে নবকুমার জননী এতই বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তিনি অন্নাহার পরিত্যাগ করত সমস্ত দিন পাখার নিম্নে চিৎ হইয়া পড়িয়া থাকিয়া বাতাস খাইয়া অতিবাহিত করিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পর তাঁহার বিস্ময় আরও বাড়িয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন, বোতাম টিপিতেই বাড়ী-ঘর আলোকিত হইয়া উঠিল। বিজলীমালা দেখিতে দেখিতে পল্লীবাসিনীরা লম্বা হইয়া পড়িয়া গেলেন এবং ভক্তিভরে প্রণাম করত যুক্তকরে বর মাগিলেন। ভগবান্ অগ্নিদেবের সাক্ষাদ্দর্শন পাইয়া তাঁহারা বিবেচনা করিলেন, ইহা কুম্ভস্নানের ফল।

দুই চারি দিন কলিকাতায় অবস্থান করিবার পর নবকুমার দেশে ফিরিবার প্রস্তাব তুলিলেন। কিন্তু জাহ্নবী কাহাকেও ছাড়িয়া দিলেন না। স্ত্রীলোকদের ফিরিবার একটুও ইচ্ছা ছিল না। রাজভোগ, বিজলী পাখা, আলো, মোটরে ভ্রমণ, গঙ্গাস্নান, এ সব ছাড়িয়া দেশে ফিরিবার তাঁহাদের তিলার্দ্ধ ইচ্ছা ছিল না; তবে চক্ষুলজ্জাবশতঃ ফিরিয়া যাইবার কথা এক আধবার না তুলিলে ভাল দেখায় না। যখন গৃহিণী ছুটী দিলেন না, তখন তাঁহারা জাঁকিয়া বসিলেন।

ইতোমধ্যে জাহ্নবী রমার বিবাহের প্রস্তাব তাঁহার জননী হৈমর নিকট তুলিলেন। প্রস্তাব শ্রবণ করিবামাত্র হৈম এতটা বিস্মিত ও পুলকিত হইলেন যে, তিনি আত্মসংবরণ করিতে অসমর্থা হইয়া জাহ্নবীর চরণের উপর লুটাইয়া পড়িলেন; কহিলেন, "রমা ত আপনারই দিদি; এত সৌভাগ্য তার হবে, তা ত কখনও ভাবি নি।"

হৈম ছুটিলেন কর্ত্তাকে সংবাদ দিতে। কর্ত্তা তখন জনৈক ভৃত্যকে কহিতেছিলেন, "একটু তামাক খাওয়াতে পার, বাবা?" প্রস্তাব গৃহিণীর মুখে শুনিবামাত্র তিনি প্রথমটা আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলেন; তাহার পর গম্ভীর বদনে ভৃত্যকে কহিলেন, "ওরে, তামাক নিয়ে আয়।"

ভৃত্য তামাক আনিতে প্রস্থান করিলে কেশব চিন্তা করিলেন, "নবকুমারকে কথা দিয়েছি, তা সত্য; কিন্তু তার কাছ হ'তে এখনও ত টাকা নিই নি। হরিদ্বারের খরচা ব'লে দু'শো টাকা যা দিয়েছে, না হয় টাকাটা ফিরিয়ে দেব। এ বিয়েটা হয়ে গেলে আমার টাকার ত আর অভাব থাকবে না। তখন হাওয়াগাড়ীতে চ'ড়ে দু' হাতে টাকা ছড়াতে পারব।"

কর্ত্তাকে বিড়্ বিড়্ করিয়া বকিতে দেখিয়া হৈম অধীর হৃদয়ে ছুটিলেন রমার কাছে। কন্যাকে কোলের ভিতর টানিয়া লইয়া কহিলেন, "রাজরাণী হ'লে মাকে ভুলে যাস নি।"

রমা মুখ ফিরাইয়া কহিল, "আমি বিয়ে করব না, মা।"

হৈম চমকিয়া উঠিলেন; কহিলেন, "ওরে নবকুমারকে নয়—"

রমা। তা জানি।

হৈম। ওরে, এই রাজার সঙ্গে তোর বিয়ের কথা হচ্ছে, তুই রাজরাণী হবি।

রমা। আমি রাজরাণী হ'তে চাইনে—

হৈম। তুই পাগল না কি! তবে কি হ'তে চাস? পাড়াগেঁয়ে চাষাকে বিয়ে করবি? তাদের দেখ্‌লে আমার ঘেন্না হয়।

রমা। অমি বিয়ে করব না।

হৈম। পাগলামী করিস নে রমা।

রমা। আমি পাগলামী করছি নে—ভেবে-চিন্তেই এ কথা বলছি।

গৃহিণীর বুক কাঁপিতে লাগিল; তিনি পাশের ঘরে ছুটিয়া গিয়া কর্ত্তাকে সংবাদ দিলেন। কেশব এই মর্ম্মঘাতী সংবাদ শুনিবামাত্র গর্জ্জিয়া উঠিলেন এবং বকিতে বকিতে রমার ঘরে আসিলেন। কর্ত্তার সকল কথার উত্তর রমা এক কথায় সারিল; "ভেবে-চিন্তেই কথাটা বলেছি—আমাকে আর কিছু ব'ল না।"

"তোর ভারী ত বুদ্ধি, তুই আবার ভাববি-চিন্তবি! এই রাজার রাজ্যি, চাকর-বাকর, গাড়ী-ঘোড়া, লোক-লস্কর—"

রমা কক্ষ ত্যাগ করিল।

১৬

সন্ধ্যার পর জাহ্নবী রমাকে নিভৃতে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার মা'র মুখে যা শুনছি, তা কি সত্যি, রমা?"

রমা। কি শুনছেন, বড়-মা?

জাহ্ন। এই তুমি বিয়ে করবে না—

রমা। ঠিক্ শুনেছেন।

জাহ্ন। কেন বিয়ে করবে না?

রমা। মায়ের কাছে সব কথা বলতে মেয়ে সাহস পায় না।

জাহ্ন। স্বচ্ছন্দে বল, মা, কোন সঙ্কোচ করো না।

রমা অধোবদনে নিরুত্তর রহিল।

জাহ্ন। তোমার কি বিজয়কে পছন্দ হয় না? তাই যদি হয়, তা হ'লে আমি আর জোর করব না।

রমা অনুযোগপূর্ণ নয়নে জাহ্নবীর পানে চাহিল; ধীরে ধীরে কহিল, "এ কথা আর বলবেন না, বড়মা!"

জাহ্ন। কেন বাছা?

রমা। আমার বড় কষ্ট হয়।

জাহ্ন। তুমি কি কাউকে ভালবাস ?

রমা। ভালবাসি আপনাকে, মাকে, বাবাকে, আর—আর—কৈ, আর কাউকে ত ভালবাসি না।

জাহ্ন। নবকুমারের সঙ্গে তোমার বিয়ের কথা হয়েছিল ?

রমা। হয়েছিল।

জাহ্ন। তাকে তুমি ভালবাস ?

রমা। না।

জাহ্ন। একটুও নয় ?

রমা। একটুও না।

জাহ্ন। তবে তুমি বিজয়কে বিয়ে করতে রাজি নও কেন ?

রমা উত্তর করিল না। জাহ্নবী কহিলেন, "তুমি কি লুকুচ্ছ আমার কাছে, খুলে বল মা।"

রমা উত্তর করিল না। পীড়াপীড়ি করাতে কাঁদিয়া ফেলিল। জাহ্নবী তাহার মুখখানি বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া কহিলেন, "মা'র কাছে লুকিও না মা, বল।"

রমা মাথা না তুলিয়া কহিল,"আমরা এক দিন হরিদ্বারে সাধু দেখতে গিয়েছিলাম। এক জন সাধু আমাকে দেখে বলেছিলেন, 'তুই বেটি, সব বিগড়ে দিবি।' তাই—তাই আমি স'রে দাঁড়াতে চাই—দেবতার কাযে বাধা দেব না।"

কথাটা জাহ্নবী ঠিক বুঝিলেন না ; জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিজয় সঙ্গে ছিল ?"

"হাঁা।"

তখন বিজয়ের ডাক পড়িল। বিজয় আসিয়া ঘটনাটি আদ্যন্ত কহিল। গৃহিণী শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন ; কহিলেন, "এর জন্যে তুমি বিজয়কে বিয়ে করতে চাও না ? পাগলী মেয়ে !"

রমা মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। বিজয় প্রস্থানোদ্যত হইলে জাহ্নবী কহিলেন, "তোমরা বসো—যেও না—আমি আসছি।"

জাহ্নবী প্রস্থান করিলেন। রমা মাথা তুলিল না, বিজয় কথা কহিল না। কালো পাথরের মেঝের উপর রমা স্থির হইয়া বসিয়া পায়ের নখ খুঁটিতে লাগিল। বিজয় এ-দিক্ ও-দিক্ নেত্রপাত করিতেছিল, কিন্তু রমার দিকে নয়ন ফিরায় নাই। সহসা বিজয়ের দৃষ্টি পড়িল প্রাচীরগাত্রে বিলম্বিত দীর্ঘায়তন দর্পণ প্রতি। তাহার ভিতর দেখিল, স্তূপীকৃত পদ্ম, আর সেই স্তূপের মাথায় ভ্রমরদল। চমকিয়া বিজয় পশ্চাতে ফিরিল ; দেখিল, রমা তাহার পানে চাহিয়া আছে। রমা লজ্জা পাইয়া, মাথা নীচু করিল। বিজয় কহিল, "সন্ন্যাসী ঠাকুর কি বাজে কথা বলেছেন, রমা ?"

রমা। সে কথা আমাকে জিজ্ঞেসা করছেন কেন ?

বিজ। কেন করছি, তা কি তুমি বুঝতে পার নি ?

রমা নিরুত্তর রহিল। বিজয় কহিল, "তোমার সঙ্গে আমার দেখা না হ'লে ভাল ছিল।"

রমা। আমাকে এখন কি করতে হবে, ব'লে দিন—আমি মূর্খ, অজ্ঞান, মহাপাপী—

বিজ। তোমার কোন অপরাধ নেই, রমা—অপরাধী আমি। ভেবেছিলাম, তাদের আমি মেরে ফেলেছি ; দেখছি,তারা মরে নি—সুযোগ বুঝে সকলেই গর্জ্জে উঠেছে।

রমা। তারা কে ?

বিজ। তারা বাসনা, কামনা, লোভ, মোহ এই সব। এত কাল কোন জিনিষে আমার লোভ পড়ে নি, এখন লোভ জন্মেছে। কখন কোন জিনিষ কামনা করি নি, এখন কামনা আমাকে ক্ষত-বিক্ষত ক'রে তুলেছে। যে আমার অনুগত ছিল, সে এখন আমার প্রভু হয়েছে। স্বরাজ-প্রতিষ্ঠা আমার দ্বারা হ'ল না।

রমা চোখে আঁচল তুলিল। বিজয় বুঝিলেন, রমা কাঁদিতেছে। কহিলেন, "কেঁদ না, রমা, তোমার ত কোন অপরাধ নেই। মা জগদ্ধাত্রী তোমাকে অনন্ত সৌন্দর্য্যের অধিকারিণী করেছেন, তাতে তোমার অপরাধ কি ? তিনি যে নিজে সৌন্দর্য্যের আকর—আমি ধ্যানে কল্পনায় দেখেছি, তিনি অতি সুন্দর—তাঁহার দেহে সুন্দর নদনদী, সুন্দর গিরি-বন, সুন্দর পবন-তপন ; কিন্তু—কিন্তু রমা—না, সে কথা শুনে তোমার কায নেই।"

রমা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "আমি দেশে চ'লে যাচ্ছি—আপনি ও সব কথা আর বলবেন না। আপনি যোগী, সাধক, কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হবেন না—মায়াতে আবিষ্ট হবেন না।"

বিজয়। মায়াকে এত দিন দেখি নি, চিনি নি। এখন দেখছি, মায়া অতি মিষ্ট; অতি সুন্দর—

দ্বার খুলিয়া গেল, জাহ্নবী প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হস্তে বহুমূল্য কণ্ঠহার, পুষ্পমালা, নববস্ত্র প্রভৃতি। রমা ফুলের মালা দেখিবামাত্র চমকিয়া উঠিল; যুক্তকরে বলিল, "মা, আজ আমাকে ক্ষমা করুন।"

"কেন বাছা?"

"আমি ভেবে দেখি।"

"কি ভাববে?"

"ভেবে দেখি, আমি দেবতার কাযে সহায় হব, না অন্তরায় হব।"

"তোমার এ সন্দেহ কেন?"

"সেবকের সাধন-ভজন সব নষ্ট হয় তিনি মায়াবিষ্ট হ'লে। আমি সাক্ষাৎ মায়ারূপে এসে দাঁড়িয়েছি যজ্ঞ পণ্ড করতে, ত্যাগীকে ভোগে মুগ্ধ করতে। আমাকে ক্ষমা করুন, মা।"

"তুমি একটুখানি মেয়ে, এত কথা শিখলে কোথা?"

"কি জানি মা, অন্তর হ'তে কে শিখায়।"

"আমার আশীর্ব্বাদে তুমি বিজয়ের সহায় হবে।"

"একটা দিন আমাকে অবসর দিন, কাল এমনই সময় আপনাকে উত্তর দেব।"

বলিয়া রমা কক্ষত্যাগ করিল।

১৭

পরদিন সন্ধ্যার পর রমার ঘরে প্রবেশ করিয়া জাহ্নবী দেখিলেন, রমা শয্যায় উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে। ভাবে বুঝিলেন, রমা কাঁদিতেছে। তিনি দ্বার বন্ধ করিয়া ধীরে ধীরে রমার পাশে আসিয়া বসিলেন। রমা বুঝিল, কে তাঁহার পাশে আসিয়া বসিয়াছে। সে উঠিল না—মুখ ঢাকিয়া পড়িয়া রহিল। জাহ্নবী তখন তাহাকে ধরিয়া উঠাইলেন এবং শিশিরস্নাত পদ্মদলে চুম্বন করিলেন। অশ্রু-প্লাবিত মুখখানি স্বীয় বস্ত্রাঞ্চলে সযত্নে মুছাইয়া জাহ্নবী কহিলেন, "কাঁদছ কেন মা?"

রমা। আমি যে বুঝতে আর পারছি নে, মা।

জাহ্নবী। কার সঙ্গে যুঝতে পারছ না?

রমা। লোভের সঙ্গে।

জাহ্নবী। লোভ? কিসের লোভ?

রমা। স্বর্গরাজ্যের। আপনি আমার সম্মুখে স্বর্গরাজ্যের দ্বার খুলে দিয়েছেন; আমি দুর্ব্বল, অজ্ঞ, শক্তিহীন—বুঝবার ক্ষমতা আমার নেই, বুঝবার শক্তি আমার নেই—আমাকে পথ দেখিয়ে দিন্ না।

জাহ্নবী উত্তর দিবার পূর্ব্বে শতচুম্বনে রমার মুখখানি রঞ্জিত করিলেন; কহিলেন, "তুমি আমার বিজয়কে এত ভালবাস, মা? আমি ত একটুও বুঝতে পারি নি।"

রমা। আমি ত তাঁকে ভালবাসি না মা—তাঁকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করি—ভক্তি, শ্রদ্ধা, হৃদয়, আমার যা কিছু ভাল-মন্দ ছিল, সব তাঁর চরণে নিবেদন ক'রে দিয়েছি।

জাহ্ন। আর নিজের জন্যে বুঝি রেখেছ তর্ক ও বিচার? যদি সবই দিয়ে থাক,তবে জ্ঞান-বুদ্ধির অভিমান কেন? কাল যখন ব'লছিলে, তুমি বিবেচনা ক'রে আজ উত্তর দেবে, তখন তুমি ত সব দেও নি মা!

রমা বিস্ফারিত নয়নে জাহ্নবীর পানে চাহিয়া রহিল, সহসা উত্তর করিতে পারিল না। একটু ভাবিয়া কহিল, "আমার অপরাধ হয়েছে, মা। আমি বুদ্ধিশূন্য, জ্ঞানশূন্য, অবোধ বালিকা। পূর্ব্বে আমার গর্ব্ব ছিল, আমি বুদ্ধিমতী, রূ—রূপবতী; আমার সে গর্ব্ব চূর্ণ হয়েছে মা—অহঙ্কার অভিমান চূর্ণ ক'রে কে আমাকে পথের ধূলি করেছে। যা অনিবেদিত ছিল, তা-ও নিবেদন করলুম,—আগে জানতাম না, অভিমানটুকুও রাখতে নেই। এখন কি করতে হবে, তাই ব'লে দিন।"

জাহ্নবী। এখন ওঠ, খদ্দরের জামা-কাপড় প'রে আমার ঘরে যাও—আমি ঠাকুরঘর হয়ে যাচ্ছি।

রমা। খদ্দরের কাপড় কেন মা?

জাহ্নবী। শুভ কাযে খদ্দরই প্রশস্ত; তাতে রেশমের গর্ব্ব অভিমান নেই—আছে ত্যাগ ও প্রেম।

* * * *

জাহ্নবীর ঘরে আসিয়া রমা দেখিল, ঘরে কেহ নাই—শুধু কয়েকটা উজ্জ্বল দীপ তারকাবৎ জ্বলিতেছিল। রমা পাখা খুলিয়া দিয়া মেঝের উপর বসিল। একটু পরে বিজয় তথায় আসিলেন। রমাকে একা সেখানে দেখিয়া তিনি কেমন একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন। আত্মসংবরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা কোথায়, রমা?"

রমা। বোধ হয়, পূজার ঘরে।

বিজয়। এমন সময় পূজার ঘরে?

রমা। এখনই আসবেন ব'লে মনে হয়।

তাহার পর বিজয়ের আর কিছু বলিবার নাই; রমাই বা কি ব'লবে? কাযেই উভয়ে নীরব। দুই জনের মনের ভিতর অনেক কথা ঠেলিয়া উঠিতেছে; কিন্তু বলিতে উভয়েরই কেমন একটু সঙ্কোচ আসিতেছে। নীরবতা উভয়কেই পীড়ন করিতে লাগিল। বিজয়ের অন্তর জানে, রমা তাঁহাকে প্রাণতুল্য ভালবাসে; রমার অন্তরাত্মা জানে, বিজয় তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। উভয়ের এ জ্ঞান জন্মিল কিরূপে, তাহা বলা যায় না। যাহা ইন্দ্রিয়ের অতীত, আত্মা বুঝি তাহা বলিয়া দেয়। যাহা হউক, অনেকক্ষণ নীরবতার পর বিজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি স্থির করলে, রমা?"

রমা। আমি অজ্ঞ, বুদ্ধিহীন; আপনি যা বলবেন, আমি তাই করব।

বিজয়। তুমি দেশে ফিরে যাও, রমা।

রমা। তাই যাব।

বিজয়। তা হ'লে আর দেরী করো না, কাল সকালেই যাও।

রমা। আপনার আদেশ শিরোধার্য্য।

বিজয়। আর এক কথা রমা, তুমি দেশে গিয়ে নবকুমারকে বিয়ে কর।

রমা স্তম্ভিত হইল; স্তব্ধচিত্তে ক্ষণকাল বসিয়া রহিল। তাহার বুকের ভিতর যে ঝড় বহিতেছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে শান্ত করিতে অসমর্থ হইয়া নতমুখে কম্পিতকণ্ঠে কহিল, "আমাকে এ আদেশ করবেন না। আমি আপনার দাসী, সেবিকা, আপনি আমাকে পদতলে দলিত করতে পারেন, ইচ্ছামত আমাকে বিদায় দিতে পারেন, আমাকে অপমান করতে পারেন, সকলই পারেন, কেন না, আমি আপনার দাসী; কিন্তু—কিন্তু—"

বিজ। আমাকে ক্ষমা কর, রমা; তোমাকে ব্যথা দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি গুছিয়ে কথাটা বলতে পারি নি। আমার ভেতর এমন একটা তীব্র বাসনা, একটা লোভ জেগেছে যে, আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি। তুমি দূরে স'রে গেলে, আর কাউকে বিয়ে করলে হয় ত আমি আবার আমাকে খুঁজে পাব।

রমা। (বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে) আমি দূরেই স'রে যাচ্ছি; আমার নাম যাতে আপনি আর শুনতে না পান, আমার মুখ যাতে আপনাকে আর দেখতে না হয়, আমি সেই ব্যবস্থাই করব।

বিজয়। শুধু সেইটুকুই করলে হবে না ত রমা—করতে হবে আরও অনেক—

রমা। পৃথিবীর এক প্রান্তেও কি আমার থাকবার স্থান নেই?

বিজয়। এ অবস্থায় নেই রমা। যে ভাষা, যে সুর নিয়ে আমি এত কাল স্বদেশসেবা ক'রে আসছিলাম, সে ভাষা আমি ভুলে গেছি, সে সুর আমি হারিয়ে ফেলেছি। কেন তা জান, রমা? তোমারই জন্যে। তুমি থাকতে, তোমার স্মৃতি থাকতে, তোমাকে পাবার সম্ভাবনা থাকতে আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারব না—দেশের কাযে সমস্ত প্রাণ ঢালতে পারব না।

রমা। এ দেহ বিসর্জ্জন দিলে যদি—

বিজ। ছি ছি, আত্মহত্যার কথা তুলো না; সে যে মহাপাপ। আমি চাই, তুমি সুখী হও, সংসারী হও—

রমা। আপনি কি মনে করেন, নবকুমারকে বিয়ে করলে আমি সুখী হব?

বিজ। এখন না হও, পরে হবে। আর—

রমা। আর কি?

বিজ। আর যখন দেখব, তুমি পরস্ত্রী হয়েছ, তখন আমি নিশ্চিন্ত হব, তখন তোমার স্মৃতি আমাকে আর পীড়ন করতে পারবে না।

রমা চিন্তামগ্ন হইল। ক্ষণপরে কহিল, "আপনার আদেশ শিরোধার্য্য!"

বিজয় বিস্ময়স্তব্ধ হইলেন। তিনি আশা করেন নাই, বোধ হয়, ইচ্ছাও করেন নাই, রমা তাঁহার এ প্রস্তাবে সম্মত হইবে। তাঁহার অন্তরের ভিতর কে যেন চাহিতেছিল, রমা বাদ-প্রতিবাদ করুক, শতবার বলুক, আকাশতলে তিনিই একমাত্র তাহার কাম্য। বিজয়ের কর্ত্তব্যজ্ঞান বলিতেছিল, রমা দূরে সরিয়া যাউক, তাঁহার সাধন-পথ নিষ্কণ্টক হউক; কিন্তু তাঁহার মন কর্ত্তব্যজ্ঞানের আবরণ ঠেলিয়া রমার পানে নিয়ত উঁকি মারিতেছিল। রমার উত্তর শুনিয়া বিজয়ের মন চমকিয়া দাঁড়াইল; কহিল, "আদেশ শিরোধার্য্য! আমি কি বলেছি, বুঝেছ?"

রমা। বুঝেছি।

বিজ। কি বুঝেছ, বল দেখি ?

রমা। আপনার ইচ্ছা—এই—এই—

বিজ। তুমি নবকুমারকে বিয়ে কর।

রমা। হ্যাঁ।

বিজ। তুমি সম্মত আছ ?

রমা। আপনি যদি সুখী হন, শান্তি পান—

দ্বার খুলিয়া গেল—জাহ্নবী প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মুখ গম্ভীর—বিন্দুনিক্ষেপী মেঘের ন্যায় গম্ভীর।

রমা চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সরিয়া দ্বারের নিকট আসিল। জাহ্নবী তাহার হাত ধরিয়া বিজয়ের নিকট আসিলেন। বিজয় কহিলেন, "মা, রমাকে আমি দেশে ফিরে যেতে বলেছি।"

"আর কি বলেছ ?"

"নবকুমারকে বিয়ে করতে বলেছি।"

"সে সম্মত হয়েছে ?"

"এক রকম হয়েছে ; বলেছে,আমি যদি সুখ-শান্তি পাই, তা হ'লে—"

"অর্থাৎ রমা আত্মবলি দিতে সম্মত হয়েছে, আর তুমি আত্মসুখ, আত্মপ্রসাদ লাভের জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছ।"

"মা, মা !"

"তুমি আত্মচিন্তায় এত বিভোর যে, তুমি একবার ফিরে দেখছ না তোমার পথের উপর শায়িত আর এক জনের হৃদয় কতখানি দলিত ক'রে চ'লে গেলে। যে আত্মোৎসর্গের গর্ব্বে তুমি অন্ধ হয়ে আত্মপরিজনের প্রতি চাইলে না, বাইরের দিকেই শুধু চাইলে, সে আত্মোৎসর্গ অতি তুচ্ছ,—রমার এই আত্মবলির পার্শ্বে। তুমি স্বচ্ছন্দে চাইতে পারলে রমার কাছে তাহার সুখ-শান্তি, তাহার ইহকাল, পরকাল, তাহার নারীধর্ম্ম—"

"তা-ও কি আমি চেয়েছি, মা ?"

"চেয়েছ—আমি আড়াল হ'তে তা শুনেছি। তুমি জান, সে তোমাকে ভালবাসে,তোমাকে পতিত্বে বরণ করেছে, জেনে শুনেও তুমি তাকে বলেছ—নবকুমারকে বিয়ে করতে। তুমি তাকে দ্বিচারিণী হ'তে বলেছ, তার নারীধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিতে আদেশ করেছ—"

"মা, আমি অতটা বুঝি নি—"

"বোঝ নি আরও অনেক কথা। তুমি কি মনে করেছ বিজয়কুমার, এই প্রেমময়ী রমাকে বলি দিলে তোমার বিশ্বপ্রেম উথলে উঠবে ?—তার শবের উপর ব'সে, তার রক্তে দেহ চর্চ্চিত করতে পারলে তুমি বীভৎস কাপালিকের ন্যায় সিদ্ধ হ'তে পারবে ? রমার স্মৃতি কি তোমাকে চিরদিন পীড়ন করবে না ?—তার উষ্ণ রক্তের জ্বালা কি তোমাকে জীবনভোর পোড়াবে না ?—তুমি কি মুহূর্ত্তের জন্যও শান্তি পাবে ? আর আমি তোমার গর্ভধারিণী, আমার সুখ-শান্তির দিকেও কি তোমার—"

"ক্ষমা কর, মা, তোমার পায়ে ধরছি—যা বলবে, তাই করব—জান ত আমি চিরদিন অবোধ, জ্ঞানহীন।"

জলন্ত পাবক মুহূর্ত্তে নিবিয়া গেল,—জাহ্নবীর সমস্ত মুখ স্নিগ্ধ শান্ত হইল। তিনি স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন, "নিজের বুদ্ধির অভিমান কখন করো না ; আর নিজের তৃপ্তির জন্যে পরের সুখ-শান্তি নষ্ট করো না। পরের তৃপ্তির জন্যে নিজেকে বরং উৎসর্গ করবে।"

"এ ত উৎসর্গ নয়, মা, এ যে ভোগ। আমি কতটা ত্যাগ করতে উদ্যত হয়েছিলাম, তা কি ব'লে তোমাকে বোঝাব, মা ? এক দিকে আমার সব, আর এক দিকে এই —রমা।"

"এখন পা ছেড়ে ওঠ—এই নেও—তোমাকে আমি দুই দিকই দিলাম—বিধাতার আশীর্ব্বাদ, মায়ের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর।"

বলিয়া তিনি রমাকে বিজয়ের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

১৯০৮ খ্রীঃ অব্দের মে

রামসদয় বাবু কিন্তু আমার গতিক দেখে হতাশ হয়েছিলেন। তাই আমার ওখানে যাওয়ার প্রায় আধ ঘণ্টা পরে বারীনকে বলেছিলেন, একটু আড়ালে গিয়ে আমার সঙ্গে কথা ক'য়ে সুবিধে হবে কি না দেখতে। যদি হয়, তবে রাত্রিতে আমাদের একসঙ্গে থাক্‌তে দেবেন। সি, আই, ডি আফিসের ভিতর আড়ালে ব'সে কোন কিছু যে থাক্‌তে পারে না, বারীনকে কিন্তু তা বোঝাতে পারলুম না। অগত্যা সেই তথাকথিত আড়ালেই আমাদের বোঝাপড়া আরম্ভ হ'ল। সে প্রথমটা যে বক্তৃতা সুরু করছিল, তার সার মর্ম্ম—এ দেশের কল্যাণের জন্য আমারও স্বীকারোক্তি আবশ্যক। তাতে যে সকল যুক্তির অবতারণা করেছিল, তা শুনবার দিকে আমার মন বিশেষ দিতে পারি নি। আমার একমাত্র ভাবনার বিষয় হয়েছিল, কি ক'রে তাকে দেশের এ হেন উৎকট মঙ্গল করবার ব্যাধি হ'তে মুক্ত করা যেতে পারে।

অনেক ভেবে চিন্তে ঐ ব্যাধির যে এক টোট্‌কা ব্যবস্থা করেছিলাম, তা একবারে ব্যর্থ হয়েছিল। নিজে থেকে কোন যুক্তি দিয়ে, স্বীকারোক্তি কেন, তার যে কোন কথার অ-যুক্তি প্রমাণ কর্‌তে যাওয়া যে কি রকম বাতুলতা, তা এই প্রবন্ধের পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে দেখান হয়েছে।

কিন্তু তার সেজদা'র নাম ক'রে কিছু বল্‌লে তা রাখলেও রাখতে পারে, এই আশায় তার বক্তৃতার শেষে বলেছিলাম, অরবিন্দ বাবুর সঙ্গে আমাদের পাঁচ জনের দেখা হয়েছিল; তিনি আমাদের বিশেষ ক'রে ব'লে দিয়েছেন যে, যারা confession দিয়েছে,তাদের, বিশেষতঃ বারীনের সঙ্গে দেখা হ'লে যেন ব'লে দি, তারা যা কিছু স্বীকারোক্তি দিয়েছে, তা যেন প্রত্যাহার (retract) করে। কারণ, উকীলের সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে আসামীর পক্ষে স্বীকারোক্তি দেওয়া কখনও উচিত নয়। যদি কিছু বলতে হয়, তা উকীলের সঙ্গে পরামর্শ ক'রেই উকীলের দ্বারা বা নিজে বলা উচিত। retract করলে স্বীকারোক্তির দোষ খণ্ডে যায়। এতেও যখন বারীন ভিজল না, তখন বলেছিলাম, বিবেচনা ক'রে দেখা উচিত, তার এ রকম স্বীকারোক্তি দোষের ব'লে বিবেচিত হ'তে পারে কি না। এই না শুনে বারীন ভীষণ উত্তেজিত হয়ে যা বলেছিল, তার মর্ম্ম হচ্ছে, সে এই স্বীকারোক্তি দিয়ে যা করছে, তা বুঝবার ক্ষমতা সেজদা বা কোন উকীলের নাই। আমরা সব ভীরু কাপুরুষ। "অরবিন্দ এ সব কি বুঝে ?" (বারীনের মুখের কথা)। এই রকম অনেক কিছু শোনবার পর বারীন অন্যের নাম প্রকাশ করলে কেন, তা জিজ্ঞেস করায় বলেছিল, সে মিথ্যা কথা বলতে আমাদের মত অভ্যস্ত নয়। অত্যধিক উত্তেজনার বশে আরও অনেক কিছু বলেছিল।

রায় বাহাদুর সব শুনছিলেন, আর দেখছিলেন; আমাদের ঝগড়া আর বাড়তে দেওয়া উচিত নয় বুঝেই বোধ হয়, আমায় সরিয়ে নিয়ে, বারান্দায় এক জন সার্জ্জেণ্ট ও দু'জন কন্‌ষ্টেবলের জিম্মায় পেছন দিকে দু'হাতে হাত-কড়া দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলেন, আর অন্যত্র উচ্চহাস্যে বারীনের সঙ্গে আলাপ করতে লাগলেন।

খানিক পরে আমায় লালবাজার পুলিস হাজতে নিয়ে যেতে হুকুম হ'ল। কোমরে একটা কাছি বেঁধে দু'জন কন্‌ষ্টেবল দু'ধার থেকে তার দু'-মাথা সাবধানে ধ'রে হাতকড়া সমেত হাঁকিয়ে নিয়ে চল্ল। সার্জ্জেণ্ট সাহেব পেছনে ছিলেন। এতে বুঝেছিলাম, রামসদয় বাবুও আমার ওপর কম চটেন নি।

যাই হোক, এই ভাবে আমায় নিয়ে গিয়ে লালবাজার পুলিসকোর্টের এক বৃদ্ধ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের হাতে সঁপে দিল। তিনি আমার আপাদমস্তক অনেকক্ষণ দেখে, আফিসের বাহিরে দাঁড় করিয়ে রেখে টেলিফোনে খুব সম্ভব

রায় বাহাদুরের সঙ্গে ঝগড়া আরম্ভ করলেন। সেই ঝগড়ার দু' একটা কথা যা কাণে এসেছিল, তাতে বুঝেছিলাম, উক্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট উপরিওয়ালার হুকুম ব্যতীত আমায় নির্য্যাতন করতে নারাজ। আমি হাজতে বন্ধ হলাম। সঙ্গী কেউ ছিল না। বড়ই উদ্বেগে রাত কাট্‌ল।

পরদিন সকালে আমায় আবার জেলে নিয়ে গিয়ে এক অতীব নির্জ্জন কুঠরীতে বন্ধ করেছিল। এক জন জেলের সিপাই ও আর এক জন পুলিসের কনষ্টেবল সব সময় পাহারায় নিযুক্ত থাক্‌ত। যারা খাবার দিতে বা অন্য কাযে আস্‌ত, তাদের কথা বলার হুকুম ছিল না। এই ভাবে মনে হয়, চার পাঁচ সপ্তাহ থাকতে হয়েছিল। স্বীকারোক্তির জন্য এও এক প্রকার নির্য্যাতন; কিন্তু অতি ভীষণ। মানুষের সঙ্গে মানুষের ভাবের আদান-প্রদান যে মানুষের জীবনে সব চেয়ে বড় কথা, তখন তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম।

বারীনের এই স্বীকারোক্তির ঐতিহাসিক মূল্য অনেক। গোড়াতে এদেশে কি ক'রে বিপ্লবভাবের আমদানী, প্রচার ও বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতির পত্তন হয়েছিল, তা এই স্বীকারোক্তির ওপর নির্ভর করেই অনেক দেশী ও বিদেশী ইতিবৃত্তিলেখক (যেমন বিখ্যাত ভ্যালেণ্টাইন চিরোল সাহেব) বাঙ্গালার বিপ্লবকাণ্ডের গোড়ার বিবরণ লিখেছেন। যে হেতু এই স্বীকারোক্তি স্বতঃপ্রণোদিত ও নিষ্কামভাবে প্রদত্ত, সেই হেতু অভ্রান্ত সত্য ব'লে রাউলাট কমিশন রিপোর্টে গৃহীত হয়েছে। ভবিষ্যতেও অনেক স্থলে গৃহীত হতে পারে। সেই জন্য এই স্বীকারোক্তি সম্বন্ধে একটু বিশেষ আলোচনা আবশ্যক।

মুরারিপুকুর বাগানে গ্রেপ্তার হওয়ার পর-মুহূর্ত্তেই বারীন বঙ্কিম বাবুর ভবানী পাঠকের অনুকরণে নাকি "My mission is over" ব'লে যেখানে যা লুকনো ছিল, তা পুলিসকে দেখিয়ে দিল। যা হাতে-পাতে ধরা প'ড়ে গেছে, তার সম্বন্ধে কোন কিছু লুকনো বা অস্বীকার করা শুধু অনাবশ্যক নয়, তাতে একটু হীনতা প্রকাশ পায়; আর তা না ক'রে সহজভাবে সব প্রকাশ ক'রে দেওয়ার মধ্যে একটা বাহাদুরী দেখান হয়। এই মনোভাব, বারীন যে ভাবে লুকনো জিনিষ দেখিয়ে দিয়েছিল আর পুলিসের প্রশ্নের যেভাবে উত্তর দিয়েছিল, তাতে প্রকাশ পেয়েছিল। অনেক ব্যাপারে দেখা যায়, সাধারণ চোখে যা উচিত ব'লে মনে হয়, আইনের চোখে তা অন্য রকম। এ রকম ব্যাপারে আইনজ্ঞ না হয়েও Comon senseএর সাহায্যে বোঝা শক্ত নয়। কিন্তু ভক্তিতত্ত্ব মাথায় ঢুক্‌লে সাধারণ বুদ্ধি-শুদ্ধি একটু ধোঁয়াটে মেরে যায়।

আগে উল্লেখ করা হয়েছে, কিছু দিন থেকে 'ক' বাবু, অন্যান্য কর্ত্তা আর বারীন, উপেন প্রভৃতি উপনেতারা বৈপ্লবিক ব্যাপারের সঙ্গে আধ্যাত্মিক বা অলৌকিক ব্যাপারের সম্বন্ধ স্থাপন করবার জন্য উঠে প'ড়ে লেগেছিলেন এবং বৈপ্লবিক কর্ম্মীদের ধ্যান-ধারণা, নাকটেপা আদি অবশ্যকর্ত্তব্য হয়েছিল। কারণ, এরূপ "আদেশ"ও নাকি তখন ওপর থেকে হয়েছিল যে, সাধনায় সিদ্ধ না হ'লে দেশের কায করবার কারও অধিকার নাই। ক' বাবু হয় ত সিদ্ধ হব হব করছিলেন, কিন্তু বারীন, উপেন প্রভৃতি তখন নাকি অর্দ্ধসিদ্ধ মাত্র হয়েছিল। এই কারণে বিপ্লব-ব্যাপারের সঙ্গে প্রচলিত আইনের কি সম্বন্ধ, সে খোঁজ করবার অবসর হয়নি। এমন কি, গ্রেপ্তার হ'লে কি বলা আর কি করা উচিত, সে কথা আগে হ'তে স্থির ক'রে সকলকে তা জানিয়ে রাখা যে উচিত, কর্ত্তারাও তা ভেবে দেখবার অবসর পান নি। অথবা পুলিস-কর্ম্মচারীকে এত বেশী বোকা ও নিজেদিগকে এত বেশী চালাক মনে করতেন যে, ধরা যে কখনও পড়বেন, এ আশঙ্কা কখনও মনে জাগে নি। তাই আগে হ'তে তেমন কোন কিছু ভেবে রাখবার আবশ্যকও হয় নি। যাই হোক, এই পর্য্যন্ত বারীন যা করেছিল, তা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নিষ্কামভাবে করেছিল। যারা তখনও ধরা পড়ে নি, তাদের নাম অথবা যারা ধরা পড়েছিল, তাদের দোষ প্রকাশ করতে নাকি বারীন প্রথমে দ্বিধা বোধ করেছিল। কিন্তু রামসদয় বাবুর যে মন্ত্রের জোরে উপেন, উল্লাস প্রভৃতিকে শুধু স্বীকারোক্তি নয়, অন্যের নাম ও দোষ প্রকাশ করতে বুঝিয়ে সুজিয়ে বারীন রাজী করিয়েছিল এবং নিজেও অন্যের নাম ও দোষ প্রকাশ করেছিল, সে মন্ত্রের প্রধান সূত্র ছিল অব্যাহতির আশা।

ওরূপ অবস্থায় অব্যাহতির প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করা বারীনের পক্ষে সহজ হয়েছিল এই জন্য যে, সে সেই ভাবপ্রবণ দেশের বিশেষ এক জন, যে দেশে ভাবপ্রবণতার প্রকোপে কয়েক বছর আগে কোন এক নির্দ্দিষ্ট সুপ্রভাতে

স্বরাজের আগমন প্রত্যাশায়, দেশের ধীমানগণ অন্ধ বিশ্বাস-প্রবণতার যে উৎকর্ষ লীলা প্রকট করেছিলেন, তা বাঙ্গালা দেশে বিস্ময়ের কারণ না হ'লেও, জগতের লোকের কাছে তার সম্ভাব্যতা ধারণার অতীত। এটাও অতীব সত্য কথা যে, যারা এই বৈপ্লবিক কাণ্ডে যোগ দিয়েছিল, তাদের সকলেই ভারতের মত চির-অধীনতার দেশকে বর্ত্তমান অবস্থায় মাত্র পাঁচ ছয় বছরে ইংরাজের কবল হ'তে পূর্ণরূপে স্বাধীন করবার আশায়, অসঙ্কোচে বিশ্বাস করত বলেই এমন ভীষণ বৈপ্লবিক ব্যাপার, যাতে ফাঁসী কিম্বা নিদেনপক্ষে জেল-বাস সুনিশ্চিত ছিল, তাতে আগ্রহের সঙ্গে যোগ দিতে পেরেছিল। এই "বকাণ্ড-প্রত্যাশা-ন্যায়ের" মর্য্যাদা আমরা সকলেই কিছু না কিছু রক্ষা করতাম। কিন্তু বারীন ছিল এর শ্রেষ্ঠ পাণ্ডা। কল্পনার আকাশকুসুম বারীনের কাছে কি রকম ক'রে প্রত্যক্ষ ঘটনায় পরিণত হ'ত, তা পূর্ব্বে দেখিয়েছি। পারিপার্শ্বিক নৈতিক অবস্থা বা লোকমতের প্রভাব বারীনের ওপর কি রকম কায করেছিল, তাই আমাদের এখন দ্রষ্টব্য।

বারীন ধরা পড়বার জন্য যে প্রস্তুত ছিল না, তা সহজেই অনুমেয়। তার উদ্দাম আশা আকাঙ্ক্ষাদি তখনও অপূর্ণ ছিল, এ অবস্থায় হঠাৎ ধরা পড়ারূপ অকূল সমুদ্রে, রামসদয় বাবুর ইঙ্গিতে confessionরূপ তৃণখণ্ডকে মুক্তির একমাত্র উপায় ব'লে আশ্রয় করা ত তার মত কল্পনা-প্রবণের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক।

গোঁসাইর হত্যার পর যখন আমাদের অনেকে পুলিসকে information দিতে সুরু করেছিল, তখন তার নৈতিক সমর্থন এই ব'লে করত যে, তারা এই information দিয়ে যে সামান্য অন্যায় করল, information দেওয়ার ফলে অব্যাহতি পেয়ে তার চেয়ে দেশের অনেক কায ক'রে অনেক বেশী ঐ অন্যায়ের প্রতীকার করতে পারবে। এ সম্বন্ধে আমরা যথাস্থান বিশেষ ক'রে বলব।

আমরা পোর্ট-ব্লেয়ারে যাবার পর যে সকল বৈপ্লবিক কাণ্ড ও হত্যা দেশে ঘটেছিল, তার সম্বন্ধে আমাদের কাছে information নেওয়ার জন্য সি, আই, ডির কড় কর্ত্তা ডেনহাম সাহেব ও পরে টেগার্ট সাহেব গেছলেন। আমাদের মধ্যে অনেকের সঙ্গে পৃথক্‌ভাবে অনেকক্ষণ ধ'রে বাক্যালাপ চলেছিল। তাঁরা কাকে কি জিজ্ঞেস করেছিলেন, আর কে কি উত্তর দিয়েছিল, সকলেই সকলের কাছে তা জানতে চাইত। ঐ স্থলে বারীন আমাদের সকলকে যা বলত, তার সার মর্ম্ম এই যে, পুলিসকে আগে যা দিয়েছে, তার বদলে গভর্ণমেণ্ট তাকে কি দিয়েছেন যে, অপর information সে দিতে যাবে। এই অভিমান-উক্তির খোঁচা জেলার, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, চিফ কমিশনার প্রভৃতি কাউকে সে দিতে ছাড়ে নি।

যদিও গোঁসাইর এপ্রুভার হওয়ার পর রামসদয় বাবুর প্রতিশ্রুত খালাসের আশা অনেকটা চ'লে গেছল, তবু গোঁসাইকে জেলের মধ্যে হত্যা করবার প্রস্তাবে অনেক বার বাধা দিয়েছিল। তার অজুহাত এই ছিল যে, ঐ ব্যাপারে নির্দ্দোষ অরবিন্দ বাবুকে নাকি জড়ান হবে। অথচ তার উদ্ভাবিত জেল ভেঙ্গে পালাবার প্রস্তাবে আমাদের মধ্যে যাঁরা গররাজী ছিলেন, তাঁদের রাজী করতে বারীন অশেষ চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এতেও যে অরবিন্দ বাবুকে জড়ান হ'ত, তা সে গ্রাহ্য করে নি।

পুলিসের প্ররোচনায় আমার নিজের মনেও information দিয়ে অব্যাহতি পাওয়ার প্রবৃত্তি সাড়া দিয়েছিল, তাই একটা দৃঢ় ধারণা হয়েছিল, অন্য সকলের মনেও ঐ প্রবৃত্তি নিশ্চয় জেগেছিল। কার মনে কতটুকু তা জেগেছিল এবং সে জন্য কে কি উপায় অবলম্বন করছিল, তা জানবার জন্য অনেক রকম উপায় অবলম্বন করেছিলাম। সে জন্য সকলের অপ্রীতিভাজনও হ'তে হয়েছিল। তাতে জেনেছিলাম, অন্য যারা confession দিয়েছিল আর গোঁসাইর হত্যার পর অনেকে যারা উপযাচক হয়ে information দিয়েছিল, তাদের সকলেরই প্রধান motive ছিল অব্যাহতি।

কয়েক জন ছেলেমানুষকে গীতাপাঠে অত্যধিক মনোযোগী দেখে তার কারণ নির্দ্দেশ করতে গিয়ে দেখেছিলাম, গীতা-মাহাত্ম্যে লিখিত আছে, গীতাপাঠে সমস্ত মুস্কিল ত আসান হয়ই, সেই সঙ্গে রাজদণ্ড হতে মুক্তিলাভও হয়।

আমাদের মামলার শেষ নাগাদ যখন উল্লিখিত উপায়গুলি ব্যর্থপ্রায় হয়েছিল, তখন দেবব্রত বাবুর অনুকরণে অনেকে জজ সাহেবের ওপর Will force আর Hypnotic suggestion প্রয়োগের সাধনা আরম্ভ করেছিল। এ

ছাড়া অনেকে জজ সাহেবকে প্রেমের দৃষ্টি হেনে, প্রেমের প্রতিদানস্বরূপ খালাসের প্রত্যাশা করেছিল। যা'রা বে-কসুর খালাস হয়েছিল, তা যে এই জন্য হয় নি, তা আমি বলছি না। আমার বক্তব্য এই যে, সকলেরই খালাস পাবার একটা উদ্দাম প্রবৃত্তি জেগেছিল—তা যে কোন উপায়ে হোক না কেন। আর বারীনেরও তা জেগেছিল একটু বেশী রকম। তা প্রকাশ পেয়েছিল যে সকল কথা বা ঘটনা থেকে, তার একটা হচ্ছে এই ; একলা তাকে দু'দিন পায়ে হাঁটিয়ে আলিপুর ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে, সে British born ব'লে দাবী করবে কি না, বলাতে নিয়ে গেছল। যাবার আগে তার ভক্তদের দু'দিনই ব'লে গেছল, কোর্টে যাওয়ার পথে কনষ্টেবলের হাত থেকে নিশ্চয় কেউ না কেউ তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে পালাতে পারে। তার পরে সে আমাদের উদ্ধারের চেষ্টা করবে, সে জন্য আমাদের কি রকম প্রস্তুত হয়ে থাকতে হবে।

এখন দেখা যাক, অব্যাহতি পাবার আশা ছাড়া স্বীকার-উক্তি দেওয়ার অন্য কি কারণ ছিল। বিশেষতঃ এই স্বীকারোক্তির ওপর আমাদের দেশের লোকমতের বা নৈতিক শিক্ষার কতটা প্রভাব ছিল।

গুপ্ত সমিতির কথা ছেড়ে দিলে Confession জিনিষটা সাধারণতঃ সব সময় দূষণীয় না-ও হ'তে পারে। কিন্তু betray করা জনিত দোষের গুরুত্ব-বোধ বারীনের বা আমাদের দেশের লোকের নাই কেন ? নিজ মুখে দোষ স্বীকার করলে লোক ধন্য ধন্য করে। বিশেষতঃ দল বেঁধে কোন দোষের কায ক'রে সহযোগীদের দোষ প্রমাণ করতে পারলে, নিজের দোষ ত খণ্ডে যায়, অধিকন্তু নিজের সাধুতা আবার বেশী ক'রে ফিরে আসে। এই betray করা অর্থাৎ অন্য লোকের দোষ প্রকাশ ক'রে তাকে দোষী করা, আমাদের দূষণীয় ত নয়ই, বরং গৌরবের বিষয় বলেই বিবেচিত হয়। তাই বোধ হয়, এই betray শব্দটির প্রতিশব্দ আমাদের সাধুভাষায় নাই অথবা আমি জানি না। "চুকলী" ব'লে কথাটা ঠিক প্রতিশব্দ নয়। যাই হোক্, এই শব্দটা মহত্ত্বব্যঞ্জক না হ'লে নারদ মুনি দেবর্ষি ব'লে পূজিত হবেন কেন ?

কিন্তু নিজের দোষ প্রকাশ বা গুপ্ত সমিতির গুপ্তকথা পুলিসের কাছে প্রকাশ করা অথবা সহকর্মীদের নাম ও দোষ প্রকাশ করা কেবল betray, চুকলী, প্রতারণা বা বিশ্বাসঘাতকতা নয়, অধিকন্তু স্বপক্ষদ্রোহিতা। এ কায-টাও আমাদের নৈতিক জ্ঞানে বা লোকমতে দূষণীয়, নয়, বরং অতীব মহত্ত্ব-ব্যঞ্জক ! রামায়ণে বিভীষণ, (মাইকেলই বোধ হয় প্রথমে বিভীষণের চরিত্রে স্বপক্ষ-দ্রোহিতার দোষারোপ করেছেন) মহাভারতে মহাপ্রাণ বিদুর, মদ্রদেশাধিপতি শল্য, আর হিন্দুর নৈতিক গুরুর গুরু যিনি নিজের প্রাণ দিয়েও স্বপক্ষদ্রোহিতা ক'রে ধন্য হয়েছিলেন, সেই পিতামহ ভীষ্ম প্রভৃতি আরও অনেকে আদর্শ-চরিত্র ব'লে অজ্ঞানী মূর্খ পর্য্যন্ত সকলের নিকট সমানভাবে পূজ্য। এই রকম মহিমান্বিত দ্রোহিতার দৃষ্টান্ত সর্ব্বজ্ঞ নীতিবেত্তা ঋষিদের প্রণীত সেই সকল শাস্ত্রে দেখা যায়, যা এখনও আমাদের কাছে অপরিবর্ত্তনীয়, অলঙ্ঘনীয় ও অভ্রান্ত ব'লে বিবেচিত হচ্ছে।

পাশ্চাত্যদেশে traitorরা যে পক্ষের সহায় হয়, সে পক্ষ থেকে অনেক প্রকারে পুরস্কৃত হয় সত্য, কিন্তু কখনও আদর্শ-পুরুষ ব'লে পূজা, এমন কি, সাধারণের শ্রদ্ধাও পায় না, বরং ঘৃণিত পাপী বলেই বিবেচিত হয়।

তার পর আমরা শিশুকাল থেকেই চুকলী বা বিট্রে করতে মা-বাপ আত্মীয়-স্বজনের দ্বারা বিশেষভাবে শিক্ষিত হই। অন্য আত্মীয় ত দূরের কথা, বাবা, মায়ের কোন অপ্রিয় কায করলে তা মাকে ব'লে দিয়ে, আর এই ভাবে মা'র কথা বাবাকে ব'লে দিয়ে তাঁদের নিষ্কাম অপত্য-স্নেহ ও আদরের আধিক্য এবং appreciation পেতে ছেলে-মেয়েদের নিত্য দোষ (অবশ্য পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আজকাল এটা কিছু কমছে ব'লে মনে হয়)। বাল্যে, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয়-স্বজন ছাড়া স্কুল-কলেজে শিক্ষক মহাশয়দের দ্বারা বিশেষভাবে এই betrayal নীতিতে practical শিক্ষা পেয়ে থাকি। যে ছাত্র অন্যের দোষ প্রকাশ করে, অর্থাৎ দল বেঁধে কোন অন্যায় কায ক'রে, যে ছেলে দলের ছাত্রদের দোষ প্রকাশ ক'রে দেয়, সে দণ্ড হ'তে অব্যাহতি পায়ই—অধিকন্তু অপেক্ষাকৃত সুবোধ ও শিষ্ট ব'লে সর্ব্বসাধারণের আদর-শ্রদ্ধা অর্জ্জন করে। যে দোষ প্রকাশের জন্য betray করা হয়, সেই দোষের চেয়ে যে betrayalটাই অধিকতর অমার্জ্জনীয়, এ তথ্য আমাদের নীতিতে নাই। তাই শিক্ষকরাও জানেন না।

অবশ্য, এটা ঠিক যে, এই betrayalএর সঙ্গে অন্য কোন বিশেষ কারণে অন্যের দোষ প্রকাশ, যাকে ইংরাজীতে denounce করা বা accuse করা বলে অথবা আর কিছু করা বলে, তার অনেক পার্থক্য আছে। দোষ-প্রকাশের উদ্দেশ্যের ভাল-মন্দর দ্বারা এই পার্থক্যের নিরাকরণ হয়।

চুকলী বা betrayal থেকে স্বপক্ষদ্রোহিতার বীজ লোকমতের আওতায় সহজে উদ্ভূত হয়ে বাঙ্গালার স্বভাবকে এমন আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে যে, আমরা বুঝে উঠ্‌তে পারি না, কি করলে স্বপক্ষদ্রোহিতা হয়, আর কি করলে তা হয় না। তাই অন্য পাপের তুলনায় স্বপক্ষ-দ্রোহিতা কত বড় সাংঘাতিক পাপ অর্থাৎ অন্য সমস্ত পাপ একত্র করলে তার চেয়ে যে এই এক স্বপক্ষদ্রোহিতা অনেক অধিক সাংঘাতিক পাপ, সে জ্ঞান আমাদের নীতি-শাস্ত্র বা লোকমত শেখায় না। আমরা কেবল বুঝি, কি করলে ধর্ম্ম যায়, আর কি করলে তা থাকে। এত করি বলেই আমাদের তথাকথিত ধর্ম্ম নাকি আছে; আর আছে তার দোসর—হিন্দু-সভ্যতা। দেশ যে গেছে, আর সেই সঙ্গে আমাদের মনুষ্যত্বও যে গেছে, সে জন্য কয়েক বছর আগে পর্য্যন্ত আমাদের একটুও পরওয়া ছিল না। এখন একটু নাকি হয়েছে। তাই আমরা আমাদের ধর্ম্ম আর সভ্যতা দিয়ে ত্রিভুবন জয় করবার বায়না ধরেছি। এতেও আমরা সেই "বকাণ্ড প্রত্যাশা ন্যায়েরই" মর্য্যাদা রক্ষা করছি। আমাদের দেশ রঘুনন্দনের ন্যায়ের দেশ কি না!

এ দেশে ধর্ম্মের খোলস প'রে যে যত অধিক দুষ্কর্ম্ম করে, অথবা আগে দুষ্কর্ম্মের চূড়ান্ত ক'রে পরে যত অধিক ধর্ম্মের ভাণ করে, সে তত অধিক পূজ্য হয়ে চতুর্ব্বর্গের মধ্যে যে দু'টি ফল কাযের, তা স্বচ্ছন্দে ভোগ করে।

বারীন এ হেন দেশের যেমন তেমন লোক নয়, দেশ-উদ্ধারের নেতা। সে যদি স্বপক্ষদ্রোহিতার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে না পারে, তবে সে দোষ তার নয়, লোকমতের। যেহেতু তার confessionএ লোকমত তখন ধন্য ধন্য করেছিল।

উপেন, উল্লাস প্রভৃতি প্রথমে স্বীকারোক্তি দিতে রাজি হয় নি। সরল-হৃদয় উল্লাস নাকি স্ব-ইচ্ছায় এই পর্য্যন্ত বলতে রাজি হয়েছিল যে, হ্যারিসন রোডে কবিরাজদের দোকানে ধৃত ব্যক্তিরা নির্দ্দোষ, সেখানে পাওয়া সমস্ত মারাত্মক জিনিষের জন্য সে নিজেই দায়ী। উল্লাসের ধারণা হয়েছিল, তা হ'লেই তাদের নির্দ্দোষিতা প্রমাণিত হয়ে বে-কসুর খালাস পাবে। মুরারিপুকুর বাগানে ধৃত হওয়ার পরেই যখন ছেলেরা পুলিসের দ্বারা একটু নির্য্যাতিত হচ্ছিল, তখন ঠিক ঐ রকম ধারণার বশেই বারীন পুলিসের বড় কর্ত্তার কাছে এই ব'লে দাবী করেছিল যে, সমস্ত দোষের জন্য দায়ী ব'লে সে যখন নিজে স্বীকার করছে, তখন অন্যকে সে জন্য নির্য্যাতন করা হচ্ছে কেন?

যাই হোক, অবশেষে উল্লাস ও উপেন বারীনের স্বীকারোক্তির সঙ্গে মিলিয়ে, সমস্ত কথা একরার করতে বারীনের যে যুক্তির বলে রাজি হয়েছিল, তা হচ্ছে স্বীকারোক্তির সুযোগ নিয়ে দেশে বিপ্লবমন্ত্র বা বিপ্লববাণী প্রচার করা। সে বলেছিল, তারা কি করতে চেয়েছিল, তা দেশকে জানিয়ে দিতে পারলে দেশে বিপ্লববাদ প্রচার হয়ে যাবে। এই জানিয়ে দেওয়া প্রবৃত্তির সুযোগ নিয়ে রামসদয় বাবু বারীনের vanityকে এমন উস্কে দিয়েছিলেন যে, বারীনের আত্মকীর্ত্তি বলবার প্রবৃত্তি অফুরন্ত হয়ে উঠেছিল। গুপ্ত সমিতির তরফ সত্য যা ঘটেছিল, তা ত বলেই ছিল, কল্পনাতে যা ছিল, তা-ও ঘটনা ব'লে প্রকাশ করেছিল, আর তখন বলবার মুখে সম্ভব অসম্ভব বিচার না ক'রে যা পেরেছিল, তাই বলেছিল। আসলে বিশেষ ক'রে যা জানাতে চেয়েছিল, তা হচ্ছে সে-ই এ দেশে বিপ্লবমন্ত্রের আদি ধাতা, বিপ্লবযজ্ঞের হোতা, বিপ্লব সমিতির সর্ব্বময় কর্ত্তা ইত্যাদি।

এই পরিবর্ত্তনাতঙ্ক-রোগগ্রস্ত দেশে বিপ্লববাদ প্রচার বলতে কি ব্যাপার বুঝায়, আর আমাদের সর্ব্বজ্ঞ নেতারা সে সম্বন্ধে কতটুকু ওয়াকীবহাল ছিলেন, তা আগের পরিচ্ছেদে দেখিয়েছি। বারীন ও তার সহকারীদের বিপ্লবমন্ত্র প্রচারের সুবিধার জন্য confession দেওয়ার ফলে, বিপ্লববাদ প্রচার ত হয় নি, যা প্রচারিত হয়েছিল, তা হচ্ছে, বহির্জ্জগতের প্রেরণায় কল্পনা-মোহমুগ্ধ বাঙ্গালী যুবকদের প্রাণে সদ্য উদ্দীপ্ত কর্ম্মপ্রবণতা, চুরী, ডাকাতি, খুন আর কখনও কখনও তিতু মিঞার অনুকরণে ভারতীয় স্বাধীনতা-সমরের খেয়াল দ্বারা বাহাদুরী অর্জ্জনের প্রবৃত্তিতে পর্য্যবসিত হয়েছিল। সে যাই হোক, এই স্বীকারোক্তির তখন সদ্য এই

ফল ফলেছিল যে, সে সময় থেকে যারা এই অপরাধে ধরা পড়ত, তাদের "clean breast" দেখাবার বীরত্বকাহিনী শুনিয়ে পুলিস সহজেই স্বীকারোক্তি দেওয়াতে পেরেছিল। সেই সময় এই confessionএর জন্য কোন কোন আইন-ব্যবসায়ী ও বিশেষজ্ঞ ছাড়া আর সকলের দ্বারা, এমন কি, প্রায় সকল খবরের কাগজে বারীনের বীরত্ব ঘোষিত হয়েছিল। আমাদের দেশে এ রকম লোকমতের মূল্য কত, তার একটা উদাহরণ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

যুগান্তরে রাজদ্রোহসূচক প্রবন্ধের জন্য ফৌজদারী আদালতে প্রথম সম্পাদকরূপে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত আমাদের মামলার কয়েক মাস আগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন, তা আগে লিখেছি। তার আগে সিডিসনের মামলা যা দু' একটা ঘট্‌ত, তাতে অভিযুক্ত রাজদ্রোহিতাকে অস্বীকার অথবা তা রাজভক্তিসূচক ব'লে প্রমাণ করবার চেষ্টা করা হ'ত। ভূপেন বাবুর বেলায় বীরত্ব-ব্যঞ্জক রাজদ্রোহিতার স্বীকারোক্তি দেওয়ার জন্য, ক'বাবু অন্য নেতাদের নিয়ে উঠে প'ড়ে লাগলেন। অতি যত্নে রচিত কথা কয়েকটি রাজপ্রতিনিধি হাকিমের মুখের ওপর স্পর্দ্ধা সহকারে আউড়ে দিয়ে এক বছর কারাদণ্ড নেওয়াতে লোকমতে ধন্য ধন্য প'ড়ে গেছল। ভূপেন বাবুর সৌভাগ্য দেখে তখন আমাদের মধ্যে অনেকের অসূয়া জন্মেছিল। কিন্তু ও রকম নির্ভীকভাবে স্বীকারোক্তি না দিয়ে যদি প্রমাণ করতেন যে, রাজদ্রোহ প্রচার তাঁর প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, তবে প্রকাশ্যভাবে বিপ্লববাদ-প্রচারকের পক্ষে তা ভীরুতা বা কাপুরুষতা বলে কখনও নিন্দিত হ'ত না, নিশ্চয় পূর্ব্বপ্রথানুযায়ী লোকমতে ধন্য ধন্য পড়েও যেত। এখানে বলা বাহুল্য যে, এঁর স্বীকারোক্তিতে betrayalএর কোন সম্বন্ধ ছিল না।

এর কয়েক সপ্তাহ পরে শ্রীযুক্ত অরবিন্দ বাবু "বন্দে মাতরম্" পত্রিকাতে রাজদ্রোহসূচক প্রবন্ধের জন্য অনুরূপ অবস্থাতে সমানভাবে অভিযুক্ত হয়ে ভূপেন বাবুর ঠিক উল্টা ব্যাপার করেছিলেন। তাতেও দেশে ধন্য ধন্য প'ড়ে গেছল। আমাদের লোকমতের বাহাদুরী নয় কি?

যাক, তার পর সাধারণ অপরাধীদের মধ্যে সচরাচর দেখা যায়, তারা ধরা পড়লে যখন দেখে, তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার অর্থাৎ অব্যাহতির আশা একবারে নাই, তখন তার যে সকল সহযোগী ধৃত হয় নি, তাদের ধরিয়ে দিয়ে, তাদেরও ভবিষ্যৎ অন্ধকার করবার প্রবৃত্তি ধৃতদের জেগে উঠে। সাধারণ চোর, ডাকাত, জালিয়াৎদের কথা ছেড়ে দিলেও, স্বদেশী ডাকাতী, বৈপ্লবিক হত্যা বা রাজদ্রোহের অভিযোগে ধৃতদের মধ্যেও এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক দেখা যায়। অব্যাহতির প্রতিশ্রুতি পেয়ে নেতৃস্থানীয় অনেক বৈপ্লবিক এ রকম কর্ম্ম করেছেন, এমন দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। এ বিষয় পরে যথাস্থানে লিখব। আপাততঃ রাউলাট কমিশন রিপোর্ট থেকে এখানে একটু মন্তব্য তুলে দেখাই।—

. . . At this time the leaders when arrested, sometimes after a long period of hiding, have in many though not all cases, been ready to tell the whole story freely. Some speak under the impulse of a feeling of disgust for an effort which has failed. Some, of a different temperament, are conscience-stricken. Others speak to relieve their feelings, glad that the life of hunted criminal is over. Not a few only speak after a period of consideration, during which they argue with themselves the morality of disclosure. We have not failed to bear in mind that information of this kind is not to be blindly relied upon, least of all in India. But we have had remarkable facilities for testing these statements. The fact that they are exceedingly numerous, that they have been made at different dates and often in places remote from one another gives an opportunity for a comparison far more useful if they were few and connected. But this is not all. In numerous instances a deponent refers to facts previously unknown to revolutionary haunts not yet suspected or persons not arrested. Upon following up the statements the facts have been found to have occurred, the haunts are found in full activity, the persons indicated have been arrested and in turn have made statements, or documents have been unearthed and a new departure obtained for further investigation. . .
. . . . A revolutionary and undoubted murderer, since arrested, thus writes in a letter dated the 2nd January, found in January 1918: "one gives out the names of ten others and they in their turn give out something. By this process we have been entirely weakened. Even the enemy don't consider that they who remain are worth taking." (Sedition Committee, 1918, Report, page 29.)

ফাঁসীতে ঝুলবার অব্যবহিত পূর্ব্বে যখন অন্তকে

betray করলে, নিজের অব্যাহতির কিছুমাত্র আশা ছিল না, তখনও স্ব-ইচ্ছায় বাহাল তবিয়তে পুলিসের কর্ত্তৃপক্ষকে ডাকিয়ে এনে সহযোগীদের বিশেষ নেতাকে betray করেছে, তথাকথিত বৈপ্লবিক সহিদ্‌দের ভিতরও এমন দৃষ্টান্ত অনেক আছে। অন্যের নাম প্রকাশ না করে ও স্বীকারোক্তিতে বারীন নিজের কীর্ত্তিকলাপ যত ইচ্ছা, যেমন ক'রে প্রাণ চায় বলতে পারত ; আর দেশহিতার্থ স্বীকারোক্তির ভিতর দিয়ে যা খুসী বিপ্লববাদ প্রচার করতেও পারত, তবে কেন বারীন অত লোকের নাম ও দোষ প্রকাশ করেছিল, তার কারণ আমরা ঠিক ধরতে না পারলেও বারীনের অবস্থায় পড়লে যে দেশ-উদ্ধারীরাও ও-রকম ক'রে থাকে, তা দেখানর জন্যই অত কথা লিখছি।

যাই হোক, বারীন একটি মহৎ কায করেছিল। তা ইচ্ছে ক'রে করেছিল কি তার দ্বারা হয়ে গেছল, জানি না। কিন্তু বার বছর একসঙ্গে থেকেও এই কাযটির মহত্ত্বের দাবী করতে কখনও শুনি নি। সে নিজেকে অদ্বিতীয় একমাত্র নেতা ব'লে জাহির ক'রে প্রকৃত নেতাদের খানিকটা বাঁচিয়ে ছিল। ঐ নেতাদের সকলে তার পর থেকে চুপি চুপি নাকে কাণে খৎ দিয়ে "চাচা আপনা বাঁচা" লৌকিক বেদের এই পবিত্র অনুশাসন কায়মনোবাক্যে পালন করছেন, আর বারীনকে নিত্য-ত্রিসন্ধ্যা দু-হাত তুলে আশীর্ব্বাদ করছেন। এই সকল সাবেক আর বর্ত্তমান নেতা আর উপনেতারা এখন অহং ব্রহ্মের সাধনায় নিমগ্ন। এই সুযোগে আমাদের চোখ থেকে ভক্তির ঠুলিটা খুলে রেখে ভারত-উদ্ধারের বা বিপ্লবের পরিণাম-রঙ্গ উপভোগ ক'রে একটু দিব্যজ্ঞান সঞ্চয় করা উচিত নয় কি ?

[ক্রমশঃ।

শ্রীহেমচন্দ্র কানুনগোই।

নিশাশেষে—নিরাশায়

তখনো ডাকেনি পাখী, তখনো হয়নি ভোর,
আকাশে কুহেলী ঢাকা, চোখে মাখা ঘুম-ঘোর,
জগতে ওঠেনি ফুটে—ধরণীর চারু কায়া,
আলোকে আঁধারে ঘেরা,—যেন সব আবছায়া !
ম্লানমুখে "শুকতারা" চাহে অই আঁখি মেলে,—
এ সময় বল বল, ওগো ! তুমি কেন এলে ?

যামিনী-ললাটে শোভে—এখনো আবিল শশী,—
উষার কনকাঞ্চল—এখনো পড়েনি খসি',—
পবনের পরশনে—এখনো ফোটেনি কলি,—
প্রেম-পরিমল আশে—এখনো জোটেনি অলি,
পূর্ব্বদিকে অরুণিমা—এখনো দেয়নি ঢেলে,
এ সময় বল বল ওগো ! তুমি কেন এলে ?

দেহ-মনে জড়তার কি বিপুল অবসাদ—
না দেখিতে মুখখানি, না পুরিতে মনসাধ,—
চকিতের মত এসে, কেন গো আমারে ফেলে,—
নিশান্তের স্বপ্ন সম সহসা চলিয়া গেলে ?
এ কি রীতি, এ কি ছল, পাছে প'ড়ে যাও ধরা,—
তোমার কি ব্রত দোষ ! আমারে পাগল করা ?

নিশীথের নিদ্রাবেশ—অবসন্ন কলেবর—
পশিল শ্রবণে শুধু তোমার কণ্ঠের স্বর,
ব্যস্ত হ'য়ে শয্যা ছাড়ি—ব'সে চারিদিকে চাই,—
আশেপাশে খুঁজে মরি, দেখি হায় ! তুমি নাই !
তখনো বাজিতেছিল—তোমার নূপুরধ্বনি,
বুঝিতে পারিনু সখি ! তাই তব "আগমনী।"

বুঝিলাম দেখা দিতে—এসেছিলে দয়া ক'রে,
আমার এ ক্ষুদ্র গৃহ গিয়েছিল গন্ধে ভ'রে।
মায়াময়ি ! মোহময়ি ! ছড়াইয়া রূপরাশি—
চ'লে গেছ—আনমনে, ক্ষণেকের তরে আসি !
আমার এ শয্যা'পরে—পদচিহ্ন রেখে দিয়ে—
কি জানি কি দোষ পেয়ে সহসা লুকালে প্রিয়ে !

নাহি কি করুণা-বিন্দু—তোমার পাষাণ-চিতে,
পারিলে না বুঝি তাই,—চোখের দেখাও দিতে ?
আবেশে মরমে জ্বলে—আকাঙ্ক্ষার দাবানল,—
সে অগ্নি কি নিভে যাবে—ঢালিলে নয়নজল ?
একবার ব'লে যাও, তবে কি, তোমার লাগি,'—
ঘুমেরে বিদায় দিয়ে, দিবানিশি রব জাগি' ?

শ্রীশচীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।

দশম পরিচ্ছেদ

সব্জীমণ্ডী

শুক্রবারের দিন মহা সমারোহে ইরাণের বাদশাহ নাদির শাহ হিন্দুস্থানের বাদশাহের সিংহাসন অধিকার করিলেন। পরদিন শনিবারে ঈদের নমাজ, সেই দিন ফতেপুরী মসজেদ ও জুম্মা মস্‌জেদ হইতে নূতন বাদশাহের নামে খেতাব পড়া হইবে, দেওয়ানে-ই-আমে দরবার হইবে, সন্ধ্যাবেলায় মজলীস বসিবে, কিন্তু প্রধান অভাব—তরকারির। শুক্রবারের দিনে সমস্ত বাজার খুঁজিয়া সহরের কোতোয়াল দুই সেরের অধিক শুষ্ক পিঁয়াজ খুঁজিয়া পাইলেন না। সব্জীমণ্ডীতে এক মুষ্টি শাকও মিলিল না, অন্য তরকারি অনেক দিন হইতেই দিল্লীতে দেখা যায় নাই। বিপন্ন হইয়া লুৎফ-উল্লা খাঁ অনেক লোক বাহিরে পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা ফিরিয়া আসিয়া বলিল যে, ফিজিলবাস সওয়াররা দশ ক্রোশের মধ্যে মনুষ্যের বাস রাখে নাই, সুতরাং তরকারি ত দূরের কথা, এক মুষ্টি তৃণও মিলিল না। তখন ইরাণী ইব্রাহিম নকল ফকীর লুৎফ-উল্লাকে তরকারির আড়তদারের বেশে তহমাস্প খাঁর কাছে লইয়া গেল এবং দুই আসরফী বখ্‌শিস পাইল। দ্বিপ্রহরে কুড়িখানা মহিষের গাড়ী ও এক শত সওয়ার সঙ্গে লইয়া লক্ষ্মীদের পাড়ার এক জন বেণিয়া তরকারি আনিতে মথুরার রাস্তায় চলিয়া গেল। ইব্রাহিম বুঝিল যে, তাহার বন্ধু আড়তদারই তরকারি আনিতে গেল, কিন্তু আনন্দরাম তখন ফকীর সাজিয়া দুগ্ধ বিতরণ করিতে বাহির হইয়াছিল এবং তাহার প্রতিবেশী বেণিয়াকে নিজের পোষাকটা পরাইয়া দিয়াছিল।

শনিবারের দিন ঈদের নমাজ। নমাজ শেষ হইয়া গেলে দলে দলে সহর ও নগরবাসী মুসলমান যখন মস্‌জেদ হইতে ফিরিতেছিল, সেই সময়ে কুড়িখানি গাড়ী বোঝাই তাজা শাক ও তরকারি জুম্মা মস্‌জেদের সম্মুখ দিয়া চাঁদনী চক ও ফতেপুরী বাজারে আসিতেছিল। তরকারি দেখিয়া আনন্দে সহরের লোক কোলাহল আরম্ভ করিল, সওয়াররা বহু কষ্টে লুঠ বাঁচাইয়া মাল বাজারে পৌঁছাইয়া দিল। দরবারের খরচ বাদে দিল্লীর লোক যাহা খরিদ করিতে পারিল, তাহা অগ্নিমূল্যে বিক্রয় হইল। সে দিন দিল্লীর বাজারে বেগুন ও শাক দুই টাকা সের দরে বিক্রয় হইয়াছিল। তহমাস্প আড়তদারকে বখশিস্ ও খেলাৎ দিলেন এবং যে বেণিয়া আনন্দরামের পোষাক পরিয়া গিয়াছিল, সে এক দিনের ব্যাপারেই লাল হইয়া গেল। দরবারের হুকুম হইল যে, সে দিন সন্ধ্যাবেলায় দুই দল সওয়ার পঞ্চাশখানি করিয়া গাড়ী লইয়া দুই পথে যাইবে। এক দল মথুরার পথে এবং অন্য দল মচেরীর পথে। আনন্দরাম তাহার বেণিয়া বন্ধুকে ওখলার সরাইটা ভাড়া লইতে বলিয়াছিল এবং বহু কষ্টে তাহাকে রাজী করাইয়া মচেরীর দিকে পাঠাইয়া দিল।

সেই দিন রাত্রিতে আগুন জ্বলিল। ঈদের দিনে দিল্লীর মুসলমানরা অতি গোপনে কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে ভাঙ্গ ও মদ্য পান করিয়াছিল। ইরাণী সৈন্যের মোঙ্গোল, তাতার ও ফিজিলবাসরা এই সকল নিষিদ্ধ পানীয় প্রকাশ্যেই গ্রহণ করিয়াছিল এবং সন্ধ্যার পরেই হিন্দুস্থানী সৌন্দর্য্যের নমুনা স্বদেশে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়া উঠিল, সুতরাং সংঘর্ষ বাধিল। এক ভাঙ্গ-বিলাসী প্রচার করিয়া দিল যে, বাদশাহ মহম্মদ শাহের হুকুমে এক কামার প্রহরিণী নাদির শাহকে গুলী করিয়া মারিয়াছে। এই সংবাদ তুবড়ীর আগুনের মত দিল্লীর বাজারে বাজারে ছড়াইয়া পড়িল। যাহাদের কবিলা বা মাশুক ইরাণীর হস্তগত হইয়াছিল, তাহারা হাতিয়ার লইয়া বাহির হইয়া পড়িল, দলে দলে মোঙ্গোল,

তাতার ও ফিজিলবাশ দিল্লীর পথে নিহত হইল। নিশীথ-রাত্রিতে আনন্দরাম পঞ্চাশখানি গাড়ী ও দুই শত সওয়ার লইয়া মথুরার পথে বাহির হইয়া গেল।

রাত্রি ৩টার সময় দিল্লীর মুসলমানদের মগজ শীতল হইল, নেশা ছুটিয়া গেল, সুতরাং ভবিষ্যতের ভাবনা তাহাদিগকে অধীর করিয়া তুলিল। রবিবার প্রভাতে হোলী। শেষ রাত্রিতে হিন্দুরা দলে দলে হোলীর গান গাহিতে গাহিতে পথে বাহির হইল, যে সকল ইরাণ পলাইয়া বাঁচিয়াছিল, তাহারা তাহাদিগের হস্তে ধরা পড়িয়া মরিল। প্রভাতে নাদির শাহের নিকটে সংবাদ পৌছিল, তিনি প্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া কোতোয়ালীর সম্মুখে রওশন-উদ্দৌলার পুরাতন মস্‌জেদে আসিয়া বসিলেন, তখন দিল্লীর নাগরিক-সংহার আরম্ভ হইল। চাঁদনী চৌক, দরিয়া বাজার, ফতেপুরী বাজার এবং জুম্মা মস্‌জেদ মহল্লা রক্তের স্রোতে ভাসিয়া গেল। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নৃশংস জিঘাংসামত্ত ইরাণী সৈনিকের হস্তে নিহত হইল। বিশাল দিল্লী নগরীর অন্যান্য মহল্লায় হিন্দুরা স্ত্রী-কন্যাকে বধ করিয়া হাতিয়ার লইয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল, সম্ভ্রান্ত মুসলমান রমণীরা কূয়ায় পড়িয়া আত্মহত্যা করিল, অবশিষ্ট লোক বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া উঠিল।

দ্বিপ্রহরের পরে পঞ্চাশ গাড়ী বোঝাই বেগুণ, মূলা ও শাক লইয়া বণিক্‌বেশী আনন্দরাম যখন দিল্লী দরওয়াজার পথে দিল্লী সহরে প্রবেশ করিল, তখন মহানগরী নীরব নিস্তব্ধ, দলে দলে রক্তাক্ত ইরাণী সৈনিক উল্লাসে চীৎকার করিয়া পথে পথে ছুটিয়া বেড়াইতেছে, দলে দলে রূপসী নারী রজ্জুবদ্ধ হইয়া নাদির শাহের সেনা-নিবাসে প্রেরিত হইতেছে, শত শত নরমুণ্ড চাঁদনী চৌক ও জুম্মা মসজেদের পথে গড়াইতেছে। মুহূর্ত্তের জন্য আনন্দরাম ধৈর্য্য হারাইল, বহুকষ্টে সংযত হইয়া মাল বাজারের দারোগার হস্তে সমর্পণ করিয়া বাসায় ফিরিল। এক রাত্রির মধ্যেই সে তাহার সঙ্গী দুই শত সওয়ারকে বাধ্য করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহারা তাহার সঙ্গে আসিয়া বাসায় পৌছাইয়া দিল এবং জন কতক আনন্দরামের অনুরোধে পথে দাঁড়াইয়া রহিল। আনন্দরাম বাসায় আসিয়া দেখিল যে, পদ্মিনীর ঘন ঘন মূর্চ্ছা হইতেছে, কিন্তু লক্ষ্মী তখনও স্থির আছে। তখন সে দ্বিতীয়বার চালে ভুল করিল, মহল্লার সমস্ত রমণী একত্র করিয়া প্রকাশ্য পথ দিয়া তাহাদিগকে ফকীর লুৎফ-উল্লার গৃহে লইয়া আসিল। দশ জন ইরাণী সওয়ার পাহারায় রাখিয়া আনন্দরাম কোতোয়ালীতে ফিরিয়া গেল। নাদির শাহ তখনও রওশন উদ্দৌলার মসজেদে বসিয়া আছেন এবং সংহারলীলা চলিতেছে। আনন্দরাম সন্ধ্যায় পঞ্চাশখানি গাড়ী লইয়া তরকারি আনিতে যাইবার ছাড়পত্র বা দস্তক পাইয়া ফিরিয়া আসিল। তৃতীয় প্রহর বেলায় নিজাম্-উল্-মুলক্ প্রভৃতি প্রধান আমীররা বাদশাহ মহম্মদ শাহের অনুরোধে নাদির শাহের নিকটে আসিয়া রক্তপ্রবাহ স্থগিত করিতে অনুরোধ করিলেন। নাদির শাহের হুকুমে প্রকাশ্য নরহত্যা স্থগিত হইল বটে, কিন্তু গোপনে লুণ্ঠন ও রক্তপাত অব্যাহত রহিল।

আদত লুৎফ-উল্লার গৃহে ফিরিয়া আনন্দরাম যখন ফকীর সাজিয়া পথে বাহির হইল, তখন প্রত্যেক মহল্লার ইতর ও ভদ্র, ধনী ও নির্ধন তাহাকে বেষ্টন করিল। সকলকে আশ্বাস দিয়া আনন্দরাম তাহাদিগকে প্রস্তুত হইতে কহিল। ফকীরের প্রতিপত্তি দেখিয়া ইরাণীরা বিস্মিত হইল। মহল্লায় মহল্লায় হিন্দু ও মুসলমান একত্র হইয়া আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইল। যাহাদের অস্ত্র ছিল না বা কিনিতে পাইল না, তাহারা ধার করিয়া লইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

চাচীর প্রেম

যে দশ জন ইরাণী সৈনিককে লুৎফ-উল্লার গৃহে পাহারা রাখিয়া আনন্দরাম বাহির হইয়া গিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এক জন অজাতশত্রু ফিজিলবাস যুবা ছিল। চাচী দুই দিন ও এক রাত্রি আবদ্ধ ছিল, সেই সময়ে সে লুৎফ-উল্লার দ্বিতলগৃহে তন্ন তন্ন করিয়া সন্ধান করিয়াও প্রেমের আধার খুঁজিয়া পায় নাই। কাগে খাঁ চাচার সমান বয়সী এবং বনমালী ও সদানন্দ তাহা অপেক্ষা দুই চারি বছরের ছোট ; সুতরাং বৃদ্ধাভার্য্যা তরুণীর উচ্ছ্বলিত প্রেমপ্রবাহ ক্ষণেকের জন্য আবদ্ধ হইয়াছিল। ফিজিলবাস যুবাকে দেখিয়া সে প্রবাহ সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া তাহার দিকে ছুটিল। চাচী ফারসী বুঝিত না এবং ফিজিলবাস বাঙ্গালা বা হিন্দুস্থানী জানিত না ; কিন্তু তাহাতে বিশেষ বাধা

উপস্থিত হইল না। প্রেমের নীরব ভাষা উভয়ের মনের দুয়ার খুলিয়া দিল, নিমেষের মধ্যে তরল প্রেম ঘনীভূত হইল। আনন্দরাম তখন মহল্লার পল্লীরক্ষার ব্যবস্থায় ফিরিতেছিলেন। সমস্ত দিনের অনশনক্লিষ্ট মহিলারা যখন সন্ধ্যার পরে রন্ধনের ব্যবস্থা করিতেছিলেন, তখন চাচীর প্রেম-প্রবাহ সহসা বাধা পাইয়া প্রলয়ের সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিল। ইরাণী দূর হইতে অগ্নির আলোকে অবগুণ্ঠনমুক্তা পদ্মিনীকে দেখিয়া ফেলিল। সহসা চাচীর প্রতি তাহার প্রেম শীতল হইয়া গেল। সে বুঝিল যে, হিন্দুস্থানী রূপের নমুনা যদি তাহার সুদূর হিমানী-মণ্ডিত ইরাণে লইয়া যাইতে হয়, তাহা হইলে সে এই চাচী নয়। যৌবনের প্রেম তরল, প্রথম যৌবন অতীত না হইলে প্রেম স্থির ঘনত্ব পায় না, নয়নের তৃষ্ণা না মিটিলে মানুষ মানুষ চিনিতে শিখে না। সুতরাং যুবা ফিজিলবাস চাচীর অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার আকুল আহ্বান এক নিমেষের মধ্যে ভুলিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের নীরব ভাষা চাচীকে বুঝাইয়া দিল যে, তাহার বঁধুয়া তাহারই আঙ্গিনা দিয়া আন বাড়ী চলিয়াছে। তীব্র ক্ষুধা সেই মুহূর্ত্তে তীব্র জিঘাংসায় পরিণত হইল; কিন্তু তাহার তলে আকাঙ্ক্ষা তখনও রহিয়া গেল।

আনন্দরাম ফিরিয়া আসিল, তাহার সঙ্গে পঞ্চাশখানি মহিষের গাড়ী সেই সঙ্কীর্ণ গলির ভিতরে সারি দিয়া দাঁড়াইল। তরকারির ঝুড়ির ভিতরে এক জন দুই জন করিয়া নারী বসাইয়া আনন্দরাম যখন মথুরার পথে যাত্রা করিল, তখন চাচী আসিয়া তাহার পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া আকুল হইল। সে কিছুতেই থাকিবে না, সেই নির্জ্জন পুরীর ভিতরে তাহার প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিতেছে, তাহার উপরে সদানন্দ এবং বনমালী তাহার প্রতি সতৃষ্ণ কটাক্ষপাত করিয়া তাহাকে ধর্ম্মনাশের ভয়ে বিহ্বল করিয়া তুলিয়াছে। আনন্দরাম অনেক বুঝাইল বটে, কিন্তু বুঝিবে কে? চাচী শুনিয়াছিল যে, তরুণ ফিজিলবাস সে রাত্রিতেও আনন্দরামের সঙ্গে চলিয়াছে। তাহার উপরে সে নিজের চোখে দেখিয়াছে, যে গাড়ীতে পদ্মিনী ও লক্ষ্মী উঠিয়াছে, ফিজিলবাস সেই গাড়ীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সে সকল বাধা কাটাইয়া স্থানাভাব না মানিয়া পদ্মিনীর ঝুড়িতে গিয়া বসিল। গাড়ীর সারি চলিল। তহমাস্প খাঁর ছাড়পত্র দেখিয়া দিল্লী দরওয়াজায় পাহারা তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিল।

দিবসের প্রথম প্রহর অতীত হইবার পূর্ব্বে সমস্ত গাড়ী ওখ্‌লার প্রকাণ্ড সরাইয়ের সম্মুখে দাঁড়াইল। সরাইতে রমণীদিগকে রাখিয়া আনন্দরাম বন্দোবস্ত করিতে এক ঘণ্টা কাটাইয়া দিল। তাহার জন্য তরকারি প্রস্তুত ছিল, সুতরাং মাল বোঝাই করিতে বিলম্ব হইল না। দ্বিতীয় প্রহর বেলায় সে গাড়ী ছাড়িয়া দিল, কিন্তু দিল্লী পৌছিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। তখন হইতে দুই এক জন করিয়া সওয়ার কম পড়িতে লাগিল। দিল্লী দরওয়াজায় পৌছিবার পূর্ব্বে সর্দ্দার বলিল যে, সাত জনকে পাওয়া যাইতেছে না। তখন দিল্লীর ভীষণ হত্যাকাণ্ডের সংবাদ চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছে, দিল্লীর চারিদিকের গুজর ও জাঠ জাতীয় হিন্দুরা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। জাঠ বদনসিংহের সৈন্য চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং মুসলমানদিগকে অসতর্ক পাইলেই একেবারে নির্ম্মূল করিতেছে। এই অবস্থায় সাত জন সওয়ার হারাইয়া সর্দ্দার অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িল। সন্ধ্যার পরেই সমস্ত তরকারি বাজারে পৌছাইয়া গেল। আনন্দরাম বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া লক্ষ্মীদের বাড়ীতে ফিরিয়া গেল, কেবল কালে খাঁ অন্ধ ফকীর লুৎফ-উল্লার পাহারায় রহিল।

সাত জনের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে পলায়ন করিয়াছিল সেই ফিজিলবাস। অন্ধকার গাঢ় হইয়া উঠিলে সে পিছাইয়া পড়িয়াছিল এবং আনন্দরামের দল অগ্রসর হইবামাত্র ঘোড়া ফিরাইয়া একেবারে ওখ্‌লার দিকে ছুটিল। তাহার পরে আরও যে ছয় জন দল ছাড়িয়াছিল, তাহারাও রমণীরত্নের সন্ধানে ছিল, কিন্তু অন্ধকারে পথ হারাইয়া সকলে ওখ্‌লায় পৌছিতে পারে নাই। বদনসিংহের জাঠরা তাহাদিগের মধ্যে চারি জনকে পাইয়া কণ্ঠে রজ্জু দিয়া একটা বৃহদাকার বাবুলবৃক্ষে ঝুলাইয়া দিয়াছিল। তিন জন একসঙ্গে মিলিয়া যখন ওখলায় পৌছিল, তখন রাত্রির প্রথম প্রহর শেষ হইয়া গিয়াছে। পল্লীর আলো নিবিয়া গিয়াছে। অন্য সকলে ঘুমাইয়া পড়িলেও চাচী বিনিদ্র ছিল, তাহার প্রখর ক্ষুধা এবং প্রবলতর জিঘাংসা তাহার নেত্র মুদিতে দেয় নাই। প্রেমের নীরব ভাষা চাচীকে বুঝাইয়া দিয়াছিল যে, তাহার প্রেমের আধার ফিজিলবাস নিশ্চয়ই ফিরিবে; সুতরাং চাচী ওখলার রক্তপ্রস্তর-নির্ম্মিত সরাইয়ের দ্বিতল কক্ষের গবাক্ষে বসিয়া ছিল। অন্ধকারে অশ্ব-পদশব্দ শুনিতে পাইয়া চাচী

অতি সন্তর্পণে নীচে আসিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল এবং অন্ধকারে লুকাইয়া রহিল। অল্পক্ষণ পরে চোরের মত ধীরে ধীরে তিন জন ফিজিলবাস সরাইয়ের মধ্যে প্রবেশ করিল। চাচী তখন বাহির হইয়া তিনটি ঘোড়ার একটিতে উঠিয়া বসিল। তিন জন ফিজিলবাস তিনটি রমণীকে লইয়া আসিয়া যখন অশ্বে আরোহণ করিতে যাইবে, তখন একটি ঘোড়া পাওয়া গেল না। দেখিতে দেখিতে রমণীত্রয়ের আর্ত্তনাদে সরাইয়ের লোক জাগিয়া উঠিল, চাচীর প্রেমপাত্র ও তাহার এক জন সঙ্গী ঘোড়া লইয়া পলায়ন করিল; কিন্তু তৃতীয় ফিজিলবাসের মুণ্ড গুজর গ্রামবাসীরা সরাইয়ের দরওয়াজায় টানাইয়া দিল। অন্ধকারে চাচীর ফিজিলবাস বুঝিতে পারিল না যে, সে পদ্মিনীকে পায় নাই। চাচী তাহাদের সঙ্গে নিরাপদে দিল্লীতে ফিরিয়া আসিল। তখন দিল্লীতে আবার আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে, দলবদ্ধ নাগরিক জীবন পণ করিয়া ইজ্জত রক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে, কিন্তু নাদির শাহ তখনও তাহা বুঝিতে পারে নাই।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বাদশাহী মজলীস

নিশ্চিন্ত হইয়া আনন্দরাম যখন বাসায় পৌছিল, তখন তাহার প্রতীক্ষায় এক জন অজ্ঞাত মুসলমান লক্ষ্মীদের বাড়ীর দুয়ারে বসিয়া ছিল। আনন্দরাম তখনও আড়তদারের বেশ ধরিয়া ছিল; সুতরাং আগন্তুক তাহাকে চিনিতে পারিল কি না,তাহা সে বুঝিতে পারিল না। বাড়ীর ভিতরে গিয়া শুনিল যে, সে লোকটি নূর বাঈয়ের নিকট হইতে আসিয়াছে। পোষাক ছাড়িয়া সে তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইল। আগন্তুক আসিয়া তাহার হাতে দুইখানি পত্র দিল;—একখানি ফার্সী ও আর একখানি বাঙ্গালা। ফার্সী পত্রে নূর বাঈ লিখিতেছেন যে, আজ রাত্রিতে দরগায় মজলীস, দিল্লীর আর সমস্ত নর্ত্তকীর সহিত তাহার দরবারে যাইবার হুকুম আসিয়াছে। যদি সে বিপদে পড়ে, তাহা হইলে বাঙ্গালী বাবুজী যেন তাহাকে রক্ষা করে। বাঙ্গালা পত্রখানি গোলাপী, তাহাতে চারিটি কথা ছিল, তাহা পড়িয়া আনন্দরাম কাঁদিয়া ফেলিল। নাজেরজাদা আক্রাম জমাল খাঁ তখনও মদ্যপানে অচেতন, নূর বাঈদের দাস-দাসী সকলই পলাইতেছে। চারিদিকে মোঙ্গোল, তাতার, ফিজিলবাস ও তুর্কমান ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে,উপায় কেবল আনন্দরাম। আগন্তুককে বিদায় করিয়া দিয়া আনন্দরাম দরবারী সাজিল, সে দিন মজলীসে তাহার নিমন্ত্রণ হয় নাই বটে, কিন্তু ইরাণীদের নসকচী বা পল্টনের পুলিস ও মোগল বাদশাহী দরবারের পাহারা এড়াইবার উপায় সে অনেক দিন হইতেই করিয়া রাখিয়াছিল। দরবারী পোষাক পরিয়া আনন্দরাম যখন রাস্তায় বাহির হইল, তখন আর তাহাকে হিন্দু বলিয়া চেনা যায় না। পথে দুই এক জন ফিজিলবাস ও তাতার তাহাকে ধরিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে লোকবল ছিল বলিয়া তাহার অঙ্গে হস্তক্ষেপ করিতে ভরসা করে নাই।

সে যখন প্রাসাদের লাহোরী ফটকে আসিয়া পৌছিল, তখন প্রথম ফটক হইতে নকারাখানা পর্য্যন্ত লোকারণ্য, অপর লোক হইলে সে ভিড় ঠেলিয়া যাইতে পারিত না। আনন্দরাম ও বনমালী দুই দণ্ড ধরিয়া ভিড় ঠেলিয়া নকারাখানায় পৌছিল। সেখানে উজীর কমরুদ্দীন খাঁর পুত্র মীর মন্নু তাহাকে দেখিয়া ছাড়িয়া দিলেন। দেওয়ান-ই-আমের সম্মুখে বিস্তৃত চক্রে শতাধিক নর্ত্তকী নৃত্য করিতেছে, দরবার-গৃহের ভিতরে বিখ্যাত ময়ূর-সিংহাসনে নাদির শাহ ও মহম্মদ শাহ উপবিষ্ট। হিন্দুস্থানের বহু সম্ভ্রান্ত আমীর উপস্থিত আছেন। আনন্দরাম দূর হইতে দেখিল যে, উজীরের প্রধান কর্ম্মচারী মজলীস রায় ও বাঙ্গালার উকীল সরকার এলায়েৎ-উল্লা ওরফে চাচা দরবারগৃহ ও চক্রের এক পার্শ্বে উপবিষ্ট। আনন্দরাম ধীরে ধীরে আশ ও শোটা দরবারের শ্রেণীর অন্তরাল দিয়া তাঁহাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। সেই সময়ে হঠাৎ নর্ত্তকীরা নাচিতে নাচিতে ফিরিয়া গেল, তাহাদের সম্মুখে নূর বাঈ নাচিতেছিল, সে আনন্দরামকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। তাহার নাচের তাল কাটিয়া গেল, পাশের নর্ত্তকীরা বিভ্রাটে পড়িল এবং প্রধান তবলচী বিষম খাইল। নিকটের লোক ব্যস্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু ধূর্ত্ত লোক চারিদিকে চাহিতে আরম্ভ করিল। যে নূর বাঈয়ের জন্য স্বয়ং বাদশাহ মহম্মদ শাহ্ এবং কমরুদ্দীন খাঁ এত দিন ধরিয়া বিষম খাইয়া আসিতেছেন, সে হঠাৎ কাহাকে দেখিয়া নাচের মুখে চমকাইল? এত বড় লোকটা কে?

এতক্ষণ নূর বাঈকে ইঙ্গিত করিয়া আনন্দরাম দূরে সরিয়া গিয়াছিল এবং মজলীসে রায় ও চাচার সম্মুখে পৌছিয়া তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। অল্পক্ষণ পরেই সে ইঙ্গিত করিয়া বনমালীকে নিকটে ডাকিল এবং দূর হইতে নূর বাঈকে তাহার অনুচরকে দেখাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে সরিয়া পড়িল। সে যখন লাহোরী ফটকের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন দরওয়াজার উপরে বাদশাহী নৌবৎ দ্বিতীয় প্রহরের বাদ্য আরম্ভ করিয়া দিল। আনন্দরাম ঘোড়ায় চড়িয়া তীব্রবেগে নূর বাঈয়ের কাঠরার দিকে ছুটিল।

প্রাসাদে যখন এত সমারোহ, তখন দিল্লীর প্রধান রাজপথ অন্ধকারময় ও জনশূন্য। দিল্লীর গুণ্ডারা তাহার পূর্ব্বেই ফিজিলবাস ও তাতারের হস্তে প্রায় নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে, দোকানপাট যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহা ইরাণীরা ভাঙ্গিয়া চূরিয়া লুঠিয়া লইয়া গিয়াছে। পথে দলে দলে ইরাণী সৈন্য চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইরাণের বাদশাহ নাদির শাহের দিল্লী-প্রবেশের চারি দিন পরে মোগল সম্রাটের রাজধানীর এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল।

নূর বাঈয়ের কাঠরার সম্মুখে পৌছিয়া আনন্দরাম দেখিল যে, মহল্লা জনশূন্য, কাঠরার সমস্ত আলোক নির্ব্বাপিত এবং গৃহে মানুষ আছে বলিয়া বোধ হয় না। সঙ্গীদিগকে দূরে রাখিয়া আনন্দরাম কাঠরার দুয়ারে দাঁড়াইয়া লক্ষ্মী-পেঁচার মত ডাকিতে আরম্ভ করিল। ডাক শুনিয়া পথে দুই চারি দল ইরাণী সৈন্য থমকিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু অন্ধকারে কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া যথাস্থানে চলিয়া গেল। দশ বারো বার ডাক দিবার পরে দুয়ারের পিছন হইতে বাঙ্গালায় বামা-কণ্ঠে কে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?" আনন্দরাম অস্ফুট স্বরে উত্তর দিল, "গোলাপী দিদি, আমি আনন্দরাম।" দুয়ার খুলিয়া গেল, আনন্দরাম কাঠরার ভিতরে প্রবেশ করিয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া দিল।

সেই রাত্রিতে নূর বাঈয়ের কাঠরায় মদ্যপানে অচেতন আগ্রাম জমান এবং বাঙ্গালী ব্রাহ্মণকন্যা গোলাপী ব্যতীত আর কেহই ছিল না। আনন্দরাম গোলাপীর সঙ্গে উপরে চলিয়া গেল এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া পরামর্শ করিয়া তাহাকে বুঝাইয়া স্থির করিয়া আসিল যে, পরদিন সন্ধ্যাকালে তাহাকে এবং তাহার প্রেমপাত্র আগ্রাম জমানকে তরকারির ঝুড়িতে বসিয়া ওখলা যাত্রা করিতে হইবে। তৃতীয় প্রহর শেষ হইলে আনন্দরাম যখন বাহিরে আসিয়া নিজের দলে মিশিল, তখন সে দেখিল যে, বনমালী আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সে বলিল যে, মজলীস শেষ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু নূর বাঈ আটক পড়িয়াছে, নাদির শাহ হুকুম দিয়াছেন যে, তাহাকে প্রাসাদেই থাকিতে হইবে। [ক্রমশঃ।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

ডাণ্ডা

ডাণ্ডা আমি আমার প্রবল বাহুবল
অনন্ত প্রতাপ, অনন্যসম্বল।
আমিই মহাবীর
শৌর্য্যেতে অধীর
শঙ্কা ধরিত্রীর উৎকট চঞ্চল।

২

আমি সহিদ্ গাজি দরাজ আমার জান্
আমি মির্জ্জাপুরী আমি রে আফগান।
ফাটা মাথার সার'
রাস্তা যে হামার
ত্রাসেতে কম্পিত লোকের ধন-প্রাণ।

৩

করতে জানে আইন আমারে সম্ভ্রম,
প্রতি পদে পদে দেখায়ে দিই ভ্রম।
হাজার আমার সাথী,
ফুলায়ে যাই ছাতি
পাবনা থেকে লাহোর, কোহাট থেকে প্রোম।

৪

মানুষ আচার স্রষ্টা কাযেই বোঝো মর্ম্ম
নাইক বিবেকবুদ্ধি নাইক ধর্ম্মাধর্ম্ম।
বিধির অভিশাপ—
নাইক অনুতাপ,
বুঝতে দেয় না মোরে ক'রে যাই কি কর্ম্ম।

৫

হিন্দু ও অহিন্দু পাণ্ডা আমার ঢের,
কলিকাতায় দিলাম ভাণ্ডারাও ফের।
বেয়নেটের ঠেলা
কাণে ঝালাপালা
বন্দুক এসে আমার করলে রে হায়রাণ।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

শাস্ত্রে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা

এই পুণ্যশ্লোক ভারতের পুরাতন ঋষিরা স্ত্রীজাতির মহত্ব প্রকৃতরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া এবং স্ত্রীজাতিকে মানব-জননীর জাতি বুঝিয়া বলিলেন যে, সন্তানের জননী বলিয়াই স্ত্রী-সকল বহু কল্যাণপাত্রী ও আদরণীয়া; ইঁহারা গৃহকে উজ্জ্বল করেন; স্ত্রীরা গৃহের শ্রীস্বরূপা, স্ত্রীতে আর শ্রীতে কিছুই পার্থক্য নাই। আর্য্যঋষিগণ স্ত্রীজাতিকে মানব-জননীর জাতি এবং সংসার-গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে দেখিয়া আপামর সর্ব্বসাধারণকে পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ দর্শনের উপদেশ দিয়া সেই আদর্শভাব অনুসরণ করিবার সহজ উপায় শিক্ষা দিয়াছিলেন।

ঋষিরা সর্ব্বপ্রকার শিক্ষার মূলে ধর্ম্মকে রক্ষা করিতেন। তাঁহারা জানিতেন যে, ধর্ম্মকে রক্ষা করিলে ধর্ম্মও তাঁহাদিগকে রক্ষা করেন। ঋষিরা ধর্ম্মের উপর দাঁড়াইয়া ঈশ্বরের মাতৃভাবের এবং জগতে তাঁহারই হস্তাক্ষর স্ত্রীলোকেরও মাতৃত্বের গাম্ভীর্য্য অনুভব করিয়া জগৎকে উপদেশ দিলেন যে, স্ত্রীলোককে, বিশেষতঃ পরস্ত্রীমাত্রকেই মাতৃদৃষ্টিতে দেখিতে হইবে এবং লোকশিক্ষার্থ ও আপনারও শিক্ষার নিমিত্ত মাতৃসম্বোধনে আহ্বান করিতে হইবে।

বর্ত্তমানে শিক্ষিতাভিমানী অনেকের ধর্ম্মের কথা ভাল লাগিবে না। আবার কাহারও কাহারও মতে কথায় কথায় ধর্ম্মের বাঁধনে ফেলিলে ছেলেদের অকালপক্কতা, কপটতা প্রভৃতি নানা গুরু দোষ উপজাত হয়। এটি তাঁহাদের মস্ত ভুল। ঋষিরা নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদ করিতে নিষেধ করেন নাই; শরীর-মন নষ্ট করিয়া ধর্ম্মাচরণের উপদেশ দেন নাই। তাঁহারা বলেন, ধর্ম্মানুগত সকল বিষয় এবং ধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া সকল বিষয় সম্পাদন করিলে কখনই মন্দ হইতে পারে না। জগতের ইতিহাস প্রতিপদে ইহার যাথার্থ্য সপ্রমাণ করিতেছে। ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন বলিয়াই মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আদর্শচরিত্র ইংলণ্ডীয় সমাজকে কত না উন্নত ও বিশুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে! এক ধর্ম্মের বলেই মুসলমানদিগের ভিতরে কি একতাই বিরাজ করিতেছে। হিন্দুরাজগণ যদি ধর্ম্মের পথে থাকিতেন, তবে আজ ভারতের ইতিহাস নিশ্চয়ই পরিবর্ত্তিত দেখিতাম। কিন্তু ধর্ম্ম এমনই পদার্থ যে, ইহাকে প্রতি মুহূর্ত্তে ধারণ করিতে অভ্যাস না করিলে সহজে আয়ত্ত করা যায় না।

শাস্ত্রকার ঋষিরা অধর্ম্মকে মানবের অবনতির কারণ জানিয়া অধর্ম্মসংশ্লিষ্ট আমোদ ও বিলাসিতাকে কিছুমাত্র প্রশ্রয় দেন নাই। তাঁহারা ধর্ম্মকে মানবের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির একমাত্র কারণ জানিয়া তাহারই মূলে স্ত্রীলোককে মাতৃচক্ষুতে দেখিয়াছেন। তাই আমরা ঋষিশ্রেষ্ঠ মনুকে মাতৃত্বের বিজয়-সঙ্গীত গাহিতে দেখি—

> "প্রজনার্থং মহাভাগা পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।
> স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন ॥"

মনু স্ত্রীলোককে "সন্তান নিমিত্ত পূজার্হ" বলিলেও তাহাকে সন্তান-প্রসবকারী পশু বলিয়া দেখেন নাই। তিনি সম্মানের যোগ্য বলিয়াই স্ত্রীলোককে সম্মান দিতে বলিয়াছেন। তিনিই বলিয়াছেন, "যে গৃহে স্ত্রীলোক সম্মানিত হয়, সেই গৃহে দেবতারা আনন্দিত হন এবং যে গৃহে স্ত্রীলোকরা অসম্মানিত হইয়া অশ্রু ফেলে, সে গৃহ শ্মশান সমান হইয়া উঠে।" তিনি বলিয়াছেন—সন্তান প্রসব করা পশুসাধারণ ধর্ম্ম হইলেও তাহার উপর মানুষের হাত নাই, বিধাতার সৃষ্টিই যে এইরূপ; কিন্তু সন্তান-প্রসবরূপ স্ত্রীলোকের পশুসাধারণ ধর্ম্ম থাকিলেও সন্তান নিমিত্তই স্ত্রীলোকরা কল্যাণপাত্রী ও পূজার্হ, কারণ, "অপত্যের উৎপাদন, জাত অপত্যের পরিপালন এবং প্রত্যহ সংসার-যাত্রায় স্ত্রীরাই প্রত্যক্ষ কারণ।" এক কথায়, মনুর মতে, যে সকল কার্য্য রমণীকে জননী ও মাতা করে, সেই সকল কার্য্যের নিমিত্তই অথবা সংক্ষেপে একমাত্র মাতৃত্বের কারণেই নারীজাতি পূজার্হ এবং এই মাতৃত্ব আনয়নের একটি প্রধান সহায় সন্তানলাভ। কিন্তু তাই বলিয়া দৈবক্রমে যে সকল স্ত্রীলোকের সন্তানলাভ হইল না, তাঁহারা যে পূজার অযোগ্য হইবেন, এ কথা মনু বলেন না। তিনি বলেন—"আশৈশব ব্রহ্মচারী ঋষিদিগের ন্যায় ভর্ত্তার মৃত্যুর পর ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারিণী স্ত্রীলোকরা অপুত্রা হইলেও স্বর্গ লাভ করেন।"

মনুর মতে একমাত্র মাতৃত্বের কারণেই নারীজাতি পূজার্হ। তাঁহার মতে স্ত্রীলোকের সকল কর্ম্ম, সকল ধর্ম্ম মাতৃত্ব প্রস্ফুটিত করিবার সহায় হওয়া আবশ্যক, তাই তিনি স্ত্রীলোকের বিবাহ একটি সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া বিধি দিয়াছেন এবং বিবাহকে ধর্ম্মমূলক করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন। মানুষ যতই সভ্যতার শিখরে আরোহণ করিতে থাকে, ততই তাহারা স্ত্রীলোকের মাতৃত্ব অল্পে অল্পে বুঝিতে থাকে এবং ততই তাহারা সুনীতি-সঙ্গত বিবাহকেই স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ ধর্ম্মমূলক করিবার ও মাতৃত্ব পরিস্ফুট করিবার প্রধান সহায় বুঝিয়া বিবাহকে ধর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ করিবার প্রয়াস পায়। কোন পাশ্চাত্য জ্ঞানী ব্যক্তি যথার্থই বলিয়াছেন যে, "স্ত্রীজাতির প্রতি ব্যবহারই দেশের উন্নতি বা অবনতির পরিচয় প্রদান করে।" যে দেশ কামপ্রবৃত্তিকে দমন করিয়া স্ত্রীলোককে মাতৃভাবে দর্শন করিতে শিক্ষা দিতে পারে, সেই দেশই যে উত্তম, তাহা বলা বাহুল্য। ভারতবর্ষই এই বিষয়ে সর্ব্বপ্রথম শিক্ষা দিয়াছে এবং ভারতের মহর্ষি মনুই এই শিক্ষাদানের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান শিক্ষাগুরু।

স্ত্রীলোকের দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণের আধার ও আকর মাতৃত্ব বিকসিত না হইলে তাহার জীবনের সার্থকতা থাকে না। মাতার সন্তানজনিত সুখের সঙ্গে অন্য কোন সুখেরও তুলনা হয় না। বিবাহের পবিত্রতাই এই সুখের মূল। ঋষিরা ইহা পূর্ণরূপে অনুভব করিয়া বিধাতার বিধির অনুসরণে কামজ স্ত্রীগ্রহণ ও অকামজ বিবাহ, এই উভয় প্রকার ঘটনাকেই বিবাহের পবিত্রতার মধ্যে আনিবার চেষ্টা করিয়া উপদেশ দিলেন যে, "ধর্ম্ম ও অকামজ বিবাহই কর্ত্তব্য। কারণ, তাহাতেই সুসন্তানের উৎপত্তি হয়।" মহারাণী ভিক্টোরিয়া,—ইংরাজ-সমাজের উপর ইঁহার প্রভাব বিশেষভাবে আলোচনা করিলে নারীপ্রকৃতির এই মাতৃভাবের প্রভাব কিরূপ পবিত্রতা সঞ্চার করে, তাহা সহজেই বুঝা যাইবে। কোন পাশ্চাত্য জ্ঞানী ব্যক্তি আদর্শ রমণী ভিক্টোরিয়ার মাতৃত্বের প্রভাবের বিষয়ে বলিয়াছেন—"যুদ্ধের তুমুল নিনাদ যখন শান্ত হইবে, তাহার বহুকাল পরে এবং যখন রাজনৈতিক সঙ্কটগুলি ঐতিহাসিকদিগের গবেষণার বিষয় হইবে, সেই সুদূর-ভবিষ্যতেও ভিক্টোরিয়ার মাতৃত্বের গাথা গীত হইয়া কত অগণিত পরিবারকে অভয় প্রদান করিবে।"

পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক মাতৃত্বেরই অপর নাম সতীত্ব। এই সতীত্ব রক্ষার জন্য মনু স্ত্রীজাতিকে গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতে বিশেষরূপে অনুশাসন করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত স্ত্রীজাতির সতীত্বরক্ষার জন্য ঋষিরা আরও অনেকগুলি ব্যবস্থা রাখিয়াছেন। তাঁহাদের সকল ব্যবস্থারই মূল কথা এই যে, ইন্দ্রিয় উত্তেজিত হইবার কোনও অবসরই দেওয়া উচিত নহে। কারণ, ইন্দ্রিয় উত্তেজিত হইলে বিদ্বান্ ব্যক্তিকেও বিপথগামী করে। তাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশে এই লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন যে, দেবপ্রকৃতি মানবরা যেন পশুপ্রকৃতি লাভ না করে এবং পশুপ্রকৃতি মানবরা যেন দেবপ্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, মানবের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির নিদান ব্রহ্মচর্য্যের পথে যেন এতটুকুও বিঘ্ন উপস্থিত না হয়।

এই নিষ্কলঙ্ক মাতৃত্ব বা সতীত্বের মধ্যবিন্দু যে পতিসেবা, তাহা এই ভারতেই প্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং সর্ব্বতোভাবে পরীক্ষিত সত্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তাই ঋষিরা বলিয়াছেন যে, সাধ্বী স্ত্রীলোকের পতিসেবার অধিক কোন যজ্ঞাদি নাই। মনু এক দিকে স্বামীকে স্ত্রীর পক্ষে দেববৎ সেবনীয় বলিয়াছেন, অপর দিকে অনুশাসন করিলেন যে, কন্যা যাবজ্জীবন গৃহে থাকিবে, তাহাও ভাল, কিন্তু পিতা কদাপি বিদ্যাদি গুণরহিত পুরুষকে কন্যাদান করিবে না। ঋষিরা এইরূপে সকল দিকে সামঞ্জস্যবিধান করিয়াছেন।

মনু প্রমুখ ঋষিরা পতিসেবারূপ মধ্যবিন্দুর উপরে দাঁড়াইয়াই পতি প্রবাসে যাইলে স্ত্রীজাতিকে বিশেষভাবে সংযত থাকিবার উপদেশ দিয়াছেন। স্বামী বিদেশে গেলে, ঋষিদের মতে ক্রীড়া, শরীর-সজ্জায় অধিক মনোযোগ প্রদান, সভাদর্শন, উৎসবদর্শন, হাস্যপরিহাস ও পরগৃহে গমন, এই সকল স্ত্রীর পক্ষে নিষিদ্ধ। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, স্ত্রীলোকের সতীত্বরক্ষা-বিষয়ক অন্তরঙ্গ সাধনের সঙ্গে উপরিউক্ত নিষেধবিধির ন্যায় বহিরঙ্গসাধনও পালনীয়।

স্বামীর প্রবাসকালে সতীর কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণের সঙ্গে স্ত্রীলোকের বিধবা অবস্থায় তাঁহাদের আমরণ ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থান-বিষয়ক কর্ত্তব্যও বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সতীত্ব নির্ব্বিরোধে রক্ষিত হইবে বলিয়া ঋষিরা স্ত্রীলোকের স্বাতন্ত্র্যও নিষেধ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন—স্ত্রীলোকের বাল্যাবস্থায় পিতা রক্ষক, যৌবনকালে স্বামী রক্ষক এবং বার্দ্ধক্যে পুত্র রক্ষক—স্ত্রীলোক স্বাতন্ত্র্যের যোগ্য নহে। এরূপই

স্বাতন্ত্র্য দিয়া তাহাদিগকে নির্ভরশূন্য অবস্থায় সংসারের কঠোর সংগ্রামক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিলে তাহারা তাহাদের সেই কোমলতা, সেই শ্লীলতা রক্ষা করিতে পারে কি না সন্দেহ। তাঁহাদের নারীজাতির জন্য এত অবরোধের ব্যবস্থা করিবার কারণ এই যে, সতীত্বের পথ যেমন সুফলপ্রসূ, সেইরূপ প্রলোভন প্রভৃতির কণ্টকময় পথ সংসারে বড়ই দুর্গম। এত সাবধান করিয়া দিবার পরেও যদি পথের দুই একটি কণ্টক তাঁহাদের গাত্রে বিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা থাকে, সে ক্ষেত্রে তাঁহাদের চরিত্রই একমাত্র তাহার রক্ষক। যে সকল কঠিন কণ্টক সংসারের পথে সতীত্বে বড়ই আঘাত প্রদান করে, মনু তাহার উল্লেখ করিয়াছেন—(১) পানদোষ, (২) দুর্জ্জনসংসর্গ, (৩) পতিবিরহ, (৪) বৃথা কারণে নানা স্থানে ভ্রমণ, (৫) অকালনিদ্রা এবং (৬) পরগৃহে বাস।

ভারতে অবরোধপ্রথা ছিল এবং ঋষিরা সতীত্বরক্ষার জন্য তাহা সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু স্বামীর সহিত পত্নীর বা পিতার সহিত কন্যা প্রভৃতির ধর্ম্মসাধন উদ্দেশ্যে নানা স্থানে গমনে ঋষিদের কোনই নিষেধ নাই, বরঞ্চ সে বিষয়ে তাঁহারা উৎসাহই দিয়াছেন। উৎসাহ দিবারই কথা—এ সকল বিষয়ে স্ত্রীপুরুষের অধিকার সমান এবং সমান থাকাই উচিত; বিশেষতঃ যদি স্ত্রীলোকের মাতৃত্ব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকার হয় এবং যদি তাহা ধর্ম্মমূলক হয়, তবে ধর্ম্মকার্য্যে স্ত্রীলোক-দিগেরও বিশেষ অধিকার আছে। মানসিক সংযমের অভাব হইবে বলিয়াই ঋষিরা অযথা ভ্রমণকে স্ত্রীজাতির পক্ষে দোষাবহ বলিয়াছেন।

ঋষিদিগের এই সকল আদেশ ও অনুশাসন মহারাণী ভিক্টোরিয়া ঈশ্বরের কৃপায় স্বীয় প্রতিভাবলে অনুভব করিয়াই যেন চলিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে তাঁহার গৃহে অপরা-জিত শান্তি বিরাজ করিত।

তাঁহার মতে "স্বামীর সম্পূর্ণ অধীন না হইলে গৃহস্থের প্রকৃত সুখ-শান্তি আসিতে পারে না।" তিনি বিধবা অবস্থায় পুনর্বিবাহের প্রসঙ্গ ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহার স্বামীর সহিত পুনর্মিলনের অপেক্ষা করিয়া পুণ্যজীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন।

ঋষিরা পতিসেবাকে নিষ্কলঙ্ক মাতৃত্ব বা সতীত্বের কেন্দ্র এবং গৃহকর্ম্ম প্রভৃতিকে পরিধি করিয়া আর্য্যসমাজকে এক আশ্চর্য্য সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাইয়াছেন। কিন্তু পাশ্চাত্যভাবে গঠিত ব্যক্তি আমার এই কথা শ্রদ্ধার চক্ষুতে দেখিবেন না জানি, কারণ, অবরোধপ্রথা প্রভৃতি তাঁহাদের মতে অকর্ম্মণ্যতার নামান্তর এবং কোন সংহিতা-গ্রন্থে সাহিত্য গণিত প্রভৃতি শিক্ষা দিবার কথা উল্লিখিত হয় নাই। কিন্তু মনু প্রমুখ ঋষিদের প্রণীত শাস্ত্রগ্রন্থ ভালরূপ আলোচনা করিলে তাঁহাদের মতামতের সার্থকতা উপলব্ধ হইবে। মনুসংহিতা আলোচনা করিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে, সে সময়ে ব্যভিচারস্রোত কিছু বেশী রকম প্রবাহিত হইয়া-ছিল এবং স্ত্রীলোকের বিবাহ, স্বাধীনতা প্রভৃতি স্ত্রীজাতির অধিকার-বিষয়ক নানা প্রশ্ন উঠিয়া দারুণ অশান্তিজনক এক মহা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল এবং তাহার ফলে ব্যভি-চারস্রোত বাড়িয়া চলিয়াছিল। মহর্ষি মনু এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া অশান্তির স্থানে শান্তি সংস্থাপন করিয়াছিলেন। মনু এক দিকে স্ত্রীলোককে গৃহলক্ষ্মীরূপে পূজার্হ বলিয়া ঘোষণা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই; অপর দিকে স্ত্রীলোকের সতীত্বের পথ হইতে অতি সামান্যমাত্র মন্দপ্রসঙ্গ অপসারিত করিতে উপদেশ দিয়াছেন। স্বেচ্ছা-চারিতার ঔষধ-স্বরূপেই মনু স্ত্রীলোকের অন্তঃপুরে থাকিয়া পতি-পুত্রাদির সহিত অস্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। মনু-প্রবর্ত্তিত অবরোধপ্রথাকে মুসলমানদের প্রবর্ত্তিত জেনানা প্রথা ভাবিয়া কেহ যেন ভুল না করেন। মনুর ন্যায় ঋষিপ্রবর্ত্তিত প্রথার ফলে ভারতে ব্যভিচার-স্রোত কিরূপ কমিয়া গিয়াছিল, বিদ্যালয়ের অল্পবয়স্ক ছাত্ররাও ইতিহাসে তাহার সাক্ষ্য পাইতেছে।

অনুমান হয়, মনুসংহিতার বহুপূর্ব্বাবধিই অবরোধপ্রথা ভারতে চলিয়া আসিতেছিল। মনুস্মৃতির পূর্ব্বেই বৈদিক কাল। মনু নিজেও বলিয়াছেন—"মনু যে কোন ব্যক্তির যে কোন ধর্ম্ম বলিয়াছেন, সে সকলই বেদে অভিহিত হই-য়াছে।" প্রকৃতই, শ্রুতিগ্রন্থে যে সকল বিধি ও বৈদিক আচার দৃষ্ট হয়, মনু তাঁহার সংহিতায় সেই সকল বিধি বদ্ধ করিয়া সংস্কৃত আকারে আমাদের সম্মুখে ধারণ করিয়াছেন।

বেদে দেখি, দেবোদ্দেশে যাগযজ্ঞ তখনকার একটি প্রধান কার্য্য ছিল। ধর্ম্মমূলক এই সকল অনুষ্ঠানে স্ত্রী-লোকরা বিনা দ্বিধায় যোগ দিতেন। বেদে গৃহ্য অগ্নিতে পত্নীর হোম করিবারও বিধি আছে। এক [illegible] বৈদিক

কালে আর্য্যরা স্ত্রীলোকের সম্মান ও মর্য্যাদা রক্ষা করিতে জানিতেন। স্ত্রীলোক প্রধানতঃ গৃহকার্য্যের উপযোগী বিবেচিত হইলেও ধর্ম্মসাধন যাগযজ্ঞ প্রভৃতিতে অন্তঃপুরের বাহিরে আসিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, কিন্তু সংবৃত হইয়া আসিতেন। অন্যান্য বিশেষ কারণেও তাঁহারা সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত হইতেন। প্রয়োজন পড়িলে বৈদিক রমণী সমরক্ষেত্রে দাঁড়াইতেও পশ্চাৎপদ হইতেন না। 'ব্যতিরেকই নিয়মের প্রমাণ' এই ন্যায় অনুসারে উপরি-উক্ত কয়েকটি ব্যতিরেক স্থলের উল্লেখই বৈদিককালে স্ত্রীলোকের সাধারণতঃ অবরোধপ্রথার অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিতেছে। বৈদিককালে অবরোধপ্রথা ছিল বলিয়াই মনু এ বিষয়ে বিশেষ ঝোঁক দিতে সাহস করিয়াছেন।

অনেকের ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, অবরোধপ্রথা ও বাল্যবিবাহ পরস্পর সহযোগী। বৈদিককালে যথাসঙ্গত অবরোধপ্রথা থাকিলেও বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল না। উভয়ের মধ্যে অপরিহার্য্য কোন সম্বন্ধ নাই। মনুও স্ত্রীলোকের অবরোধ ও অস্বাতন্ত্র্যের পক্ষপাতী হইলেও বাল্যবিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন না। বেদে যে যৌবনবিবাহ সমর্থিত আছে, তাহা একপ্রকার সর্ব্ববাদিসম্মত। মনুও যৌবনবিবাহেরই উপদেশ দিয়াছেন, তবে বিশেষ কারণ থাকিলে বাল্যবিবাহ দিতেও নিষেধ করেন নাই।

মনু বলেন যে, যৌবনের সূত্রপাত হইবার ৩ বৎসর পরে কন্যার বিবাহের উপযুক্ত বয়স হইল জানিতে হইবে। ভাষ্যকারের মতে যৌবনসঞ্চারের কাল দ্বাদশ বৎসর। মনু দেশাচারের অনুসরণ করিয়া অষ্টমবর্ষীয় বালিকার বিবাহ উল্লেখ করিলেও তাহার ফল অবনতি ঘোষণা করিলেন। মনুর মতে ত্রিশ বৎসরের যুবক "হৃদ্য" বা "বাড়ন্ত" হইলে দ্বাদশবার্ষিকী কন্যাকে বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু ষোড়শ বৎসরেও যদি পিতা কন্যার বিবাহ না দেন, তবে মনুর মতে কন্যা নিজের উপযুক্ত পতি বাছিয়া লইয়া বিবাহ করিতে পারে। মনুসংহিতা স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছে যে, উহার বিরুদ্ধে অন্য কোন স্মৃতিরই কোন উক্তিই গ্রহণীয় নয়। কলিতে পরাশর-সংহিতা বা অন্য কোন সংহিতা গ্রাহ্য বলিলেও আমরা তাহা স্বীকার করিতে পারি না। বশিষ্ঠ প্রভৃতি অধিকাংশ সংহিতাকারই মহর্ষি মনুকে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সমর্থন করেন।

যাঁহারা মেয়েদের বাল্যবিবাহ সমর্থন করেন, তাঁহাদের অধিকাংশ "নগ্নিকা" শব্দের উপর নির্ভর করেন। তাঁহারা মনে করেন, যে বয়সে বালিকা উলঙ্গ থাকিলেও লজ্জা বোধ করিবে না, সেই বয়সের মধ্যেই বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহা ভ্রম। মহাভারত প্রভৃতিতে "নগ্নিকা" শব্দের ব্যবহার দেখিলেই "অনৃতুমতী" অর্থে ইহার পারিভাষিকত্ব উপলব্ধ হইবে। মহাভারতে আছে, "ত্রিশবর্ষীয় পুরুষ ষোড়শবর্ষীয়া "নগ্নিকা" কন্যাকে বিবাহ করিবে।

আয়ুর্ব্বেদপ্রণেতা ঋষিরাও বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে বলিয়াছেন। সুশ্রুত স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, "পঁচিশ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক পুরুষ অপ্রাপ্ত-ষোড়শবর্ষীয়ার কন্যাতে সন্তানোৎপাদন করিলে সন্তান দুর্ব্বলেন্দ্রিয় ও অদীর্ঘজীবী হয়।" এমন কি, রঘুনন্দনও বলিয়াছেন যে, "কুড়ি বৎসরের পুরুষ ষোড়শ বৎসরের ন্যূন বয়সের কন্যাতে সন্তান উৎপাদন করিলে অধম সন্তান হয়।"

এইখানে একটি কথা বলা দরকার। স্ত্রীলোকের যৌবন-বিবাহ ব্যভিচার প্রভৃতি দোষের অব্যভিচারী কারণ বলিয়া অনেকের যে ধারণা আছে, তাহাও ভ্রান্ত। এরূপ হইলে, বেদে যৌবন-বিবাহের পরিবর্ত্তে বৈধব্য, দ্যূতক্রীড়া, অর্থলোভ, স্বামী কর্ত্তৃক স্ত্রী-পরিত্যাগ প্রভৃতি ব্যভিচারের কারণ বলিয়া লিখিত হইত না। মনুসংহিতাতেও স্ত্রীলোকের যে সকল দোষের কারণ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে যৌবন-বিবাহের নামগন্ধও নাই। বরঞ্চ মহাভারতে ব্যাসদেব খুব জোরের সঙ্গে বলিয়াছেন যে, "যৌবনবিবাহেই সন্তানগণ হীনবীর্য্য হয় না এবং স্ত্রীর প্রতিও স্বামীর অনুরাগ কমে না।"

মনুসংহিতাতে স্ত্রীলোকের বেদাদি অধ্যয়ন প্রভৃতি বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে কোনই উল্লেখ নাই সত্য; কিন্তু আমাদের অনুমান হয় যে, সাধারণতঃ স্ত্রীশিক্ষার যথেষ্ট প্রচলন ছিল না বলিয়াই সে বিষয়ে বিশেষভাবে কোন উল্লেখ করা মনু আবশ্যক মনে করেন নাই। অত্রিসংহিতায় আছে, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা প্রভৃতি স্ত্রীলোকের পাতিব্রত্যের কারণ—ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, অত্রিসংহিতার কাল পর্য্যন্ত স্ত্রীশিক্ষা বহুল প্রচলিত ছিল।

হিন্দুসমাজে এমন অনেক সাধু মহাত্মা আছেন, যাঁহারা সত্যই মনে করেন যে, শাস্ত্রমতে স্ত্রীলোকদিগের বেদাধ্যয়ন,

ওঙ্কার প্রভৃতি উচ্চারণ নিষিদ্ধ। কোন শাস্ত্রগ্রন্থ স্ত্রীলোককে উচ্চ শিক্ষায়, এমন কি, বেদাদি পঠন-পাঠনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করে নাই। অথর্ব্ববেদে আছে, ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারাই কন্যা যুবা পতি প্রাপ্ত হন। এই ব্রহ্মচর্য্য অর্থে যে ইন্দ্রিয়-সংযমের সহিত বিদ্যাভ্যাস, বিশেষতঃ বেদবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যার অভ্যাস, তাহা শ্রুতি, স্মৃতি, মহাভারত প্রভৃতি আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে। ঋগ্বেদেও দেখা যায়, স্ত্রী-পুরুষে মিলিতভাবে অনেক যজ্ঞ সম্পাদন করিতেন। যজ্ঞসম্পাদন উপলক্ষে যখন স্ত্রীলোককে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইত, তখন ঐ সঙ্গে ওঙ্কার উচ্চারণও অনিবার্য্য ছিল। কেবল গৃহকর্ত্রী কেন, অবস্থাবিশেষে গৃহের নাপিতানী প্রভৃতি পরিচারিকাকেও বেদমন্ত্র পড়িতে হইত। হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান সামাজিক অনুষ্ঠানবিধি, বিশেষতঃ বিবাহবিধি আলোচনা করিলেও দেখা যাইবে যে, আজ পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিবার অধিকার কেহই বিলুপ্ত করিতে পারে নাই।

ঋষিরা স্ত্রীলোকদিগকে বেদাধ্যয়নের সম্পূর্ণ অধিকার দিবার সঙ্গে পুরুষদের সঙ্গে সমানভাবে স্ত্রীলোকেরও পক্ষে উপনয়ন ও ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বনের গুরু অধিকার বিধান করিয়াছিলেন। এমন কি, সে কালে স্ত্রীলোকদিগকে ব্রহ্মবাদিনী ও সদ্যোবধূ, এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইত; কিন্তু উভয়েরই পক্ষে উপনয়ন প্রভৃতি বিহিত ছিল দেখা যায়। তবে মনের স্বাভাবিক গতি অনুসারেই অথবা ইচ্ছাপূর্ব্বক বৈদিক ঋষিরা স্ত্রীলোকের মাতৃত্বের দিকে, এবং গৃহস্থের গার্হস্থ্য সুখ-শান্তির দিকেই বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন।

বৈদিক কাল অবধি স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে যে মত চলিয়া আসিতেছিল, মনু তাহার বিরোধী ছিলেন না, কিন্তু যে সকল উপায়ে গার্হস্থ্য সুখশান্তির বৃদ্ধি হইতে পারে, সেই সকলের দিকেই অধিক দৃষ্টি রাখিয়া সেই সকল উপায়কে বিধিবদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। এই কারণে তিনি অর্থবাদস্বরূপে বলিলেন—স্ত্রীলোকদিগের বিবাহই বৈদিক সংস্কার, পতিসেবা, গুরুকুলে বাস এবং গৃহকর্ম্মই অগ্নিচর্য্যা। ইহা হইতে কেহ যেন না ভাবেন যে, মনু স্ত্রীলোকের উপনয়নাদি নিষেধ করিয়াছেন। বরঞ্চ মনুসংহিতায় একটি শ্লোকে জাতকর্ম্ম অবধি উপনয়ন ও কেশান্ত পর্য্যন্ত সংস্কারগুলি স্ত্রীলোকের পক্ষে অমন্ত্রক করিবার উপদেশ দেওয়া থাকাতেই বুঝা যায় যে, মনুর সময়ে ঐ সকল সংস্কার ত নিষিদ্ধ হয় নাই।

শ্রুতি-স্মৃতি হইতে নামিয়া পুরাণেও স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত থাকিবার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কিন্তু মহাভারতকার ব্যাসদেবের মতে দেখা যায় যে, অতি বিদুষী হইবার অপেক্ষা স্ত্রীলোকের পতিপরায়ণা ও গৃহকর্ম্মনিপুণা হওয়া গৃহকে শ্রীমান্ করিবার কারণ। শ্রুতি হইতে পুরাণ পর্য্যন্ত স্ত্রীশিক্ষার জন্য প্রত্যক্ষ অনুশাসন দেখা যায় না। তন্ত্রশাস্ত্র সেই অভাব পূর্ণ করিয়াছেন। ইহা সর্ব্বজনবিদিত যে, মহানির্ব্বাণতন্ত্রেই আছে—কন্যাকেও পুত্রের ন্যায় সযত্নে পালন করিবে ও শিক্ষা প্রদান করিবে। স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রতিবাদ করিয়াই বোধ হয় এই অনুশাসন দেওয়া হইয়াছিল। পাণিনি ব্যাকরণের পাতঞ্জল ভাষ্যেও আমরা স্ত্রীশিক্ষাপ্রচলনের পরিচয় প্রাপ্ত হই। যাঁহারা স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী, তাঁহারা ভাগবতের একটি শ্লোককে আঁকড়াইয়া ধরেন। —"স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।" ইহা ভাগবতের একটি শ্লোকের অর্দ্ধাংশ মাত্র। প্রথমতঃ ভাগবত ঋষিপ্রণীত কি না, তৎসম্বন্ধে প্রাচীনপন্থীদের মধ্যেও বিস্তর বাদানুবাদ হইতে দেখা যায়। সুতরাং ইহাকে নিঃসংশয়রূপে আর্ষেয় গ্রন্থ বলা যাইতে পারে না। ইহার আর্ষেয়ত্ব স্বীকার করিলেও উপরি-উক্ত শ্লোকার্দ্ধের বিরোধী পক্ষ যে অর্থ করেন, তাহা ঠিক নহে বলিয়া মনে করি। স্ত্রীলোক প্রভৃতিকে বেদ পড়িতে দিবে না, এরূপ অর্থের পরিবর্ত্তে আমাদের মনে হয় যে, গ্রন্থকার দুঃখ করিয়া বলিতেছেন যে, স্ত্রীশূদ্রাদি বেদ অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়াছে। ভাগবতকার যে কারণে দুঃখের সহিত ঐ শ্লোকটি বলিয়াছেন, সেই কারণেই সম্ভবতঃ মহানির্ব্বাণতন্ত্র পুত্রকন্যাদিগকে নির্ব্বিশেষে ভালরকম শিক্ষা দিবার জন্য প্রত্যক্ষ অনুশাসন দিয়াছেন। সংস্কৃত কাব্য-নাটকেও যে স্ত্রীশিক্ষার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা বিষয়ে ভারতের ঋষিমুনিদের সদুপদেশ সকল অগ্রাহ্য করিয়াই আমরা বর্ত্তমান হীন অবস্থায় নিপতিত হইয়াছি।

আমি এ পর্য্যন্ত যাহা বলিয়া আসিলাম, তাহাতে শিক্ষিত সম্প্রদায় যদি স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক শাস্ত্রবাক্যে কিঞ্চিৎ কর্ণপাত করেন, তাহা হইলেই আমার শ্রম সার্থক বোধ করিব। শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মায়ের লীলা

যতীশ মধ্যে মধ্যে দুই চারি দিনের জন্য দেশে আসিত, দেশ-গাঁর বাড়ী-ঘর তাহার ভালও লাগিত। কিন্তু পত্নী সুনীলা পাড়াগাঁয়ের নামে একেবারে শিহরিয়া উঠিত—বিশেষ দীর্ঘবর্ষার অব্যবহিত পরবর্ত্তী পূজার মাসে। বৃষ্টি-বাদল কিছু কমিয়া গেলেও খাল-বিল দীঘি-পুকুর, পাড়ের ঝোপ-জঙ্গল পর্য্যন্ত তখনও একবারে জলে ভরা।—আর সে কি জল, চাহিলেই যেন কম্প দিয়া জ্বর আসে। আর তার কি গন্ধ! তাহার বাসাবাড়ীর মেথরাণীর নাকে গেলেও সে বমি করিয়া ভাসাইয়া দিবে। চারিদিকে আবার কি ঘন বন-জঙ্গল। পথগুলি তায় অন্ধকার। ভন্ ভন্ মশা ডাকে—শৃগাল গোসাপ আসিয়া পায়ে পায়ে বাহির হয়। গাছের উপরে তক্ষক কক্ কক্ ডাকে—প্রাণ আঁতকিয়া উঠে! আর সন্ধ্যা হইলে অসংখ্য শৃগাল যখন বনে বনে হুক্কা হুয়া রবে নিনাদ করিতে থাকে—মা গো! মানুষ যে তখন মূর্চ্ছা পড়িয়া মরিয়া যায় না, তাহাই আশ্চর্য্য। মাটীর ঘরগুলির ত কথাই নাই, পাকাঘরগুলিরও মেঝে সব স্যাঁৎসেঁতে—চৌকীর উপরে শুইলেও গা যেন ছমছম করে। জানালা খুলিলে পাশেই হয় ত একটা পানাপুকুর চোখে পড়ে। ক্যাক্-ক্যাক্ গ্যাঙোর-গ্যাঙ ব্যাঙ এখানে ওখানে ডাকিয়া উঠিতেছে, এক ধারে কালো পচা জলে পাড়ার বধূ কেহ বাসন মাজিতেছে, ওপারে কেহ বা কাপড় কাচিতে কাচিতে অসভ্য ভাষায় কাহারও সঙ্গে ঝগড়া করিতেছে।—উঠান, আনাচ-কানাচ, পথ-ঘাট সব কেমন ভিজা-ভিজা ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা—কোথাও কি পা দেওয়া যায়! আবার, জোঁক, পোকা, কেঁচো, কেন্নুই, পিঁপড়া—রামঃ। কোনও দিকে কি চাওয়াই যায়—না নির্ভয়ে একটু পাইচারী করিবার যায়গা কোথাও আছে!

সুনীলা সহরের মেয়ে, বাপেরও বড় আদুরে, জুতা-জামা পরিয়া স্কুলে যাইত, গাড়ী চড়িয়া পাকা রাস্তায় বেড়াইত। বিবাহের পর দুইবার মাত্র পূজায় শ্বশুর-গৃহে আসিয়াছিল। যে চোখে তাহা তখন দেখিয়াছিল, তাহাতে পল্লীগ্রামের এই চিত্রই তাহার চিত্তপটে আঁকা ছিল। পুকুরঘাটে দুই দিন অবগাহন স্নান করিয়া একবার তাহার জ্বরও হইয়াছিল।

যতীশ মেধাবী ছাত্র—পাঠ শেষ হইবার অল্প পরেই ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী চাকরী পাইল। সুনীলার পিতা তখন জিদ করিলেন, মেয়েকে আর পাড়াগাঁয়ে পাঠাইবেন না, ম্যালেরিয়ায় মারা যাইবে। আর যে ভাবে তিনি তাহাকে নব্য শিক্ষাদীক্ষায় পরিমার্জ্জিত মানুষ করিয়া তুলিয়াছেন, তাহাতে যতীশদের সেকেলে গ্রাম্য-পরিবারের বধূত্ব তাহার ধাতেও সহিবে না।

যতীশের পিতা বড় বিরক্ত হইলেন, কিন্তু আজ-কালকার ছেলে-বউ—জোর-জবরদস্তী ত চলে না। গৃহকর্ত্রী তাঁহার বিধবা ভ্রাতৃজায়া ব্রহ্মময়ীও কহিলেন, "তা থাক্ নিয়ে সাথে, সেই ভাল। ও বউ নিয়ে আমাদের ঘরকন্না চল্‌বে না; টাটে বসিয়ে কে কত দিন তাঁকে ফুল-চন্দন দিয়ে পুজো ক'রে তুষ্টু রাখবে বল।"

একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া তখন রাজীবলোচন নীরব হইলেন।

পাঁচ ছয় বৎসর তাহার পর চলিয়া গিয়াছে, মেজবধূ সুনীলা বাড়ীতে আর আসে নাই। তা প্রতিবৎসর না আসুক, ঘরের বউ একেবারেই ঘরে আসিবে না, এই বা কেমন কথা? লোকেও নিন্দা করে; আর নিজেদেরও প্রাণে কি ইহা ভাল লাগে? দুইটি সন্তান তাহার হইয়াছে, তাহাদেরও এ লাগাৎ কেহ একটিবার চোখে দেখিল না। না, এবার যতীশকে লেখা হউক, বধূ ও পুত্র-কন্যাসহ পূজায় দেশে আসে। বেশী দিন কে তাহাদের থাকিতে বলে? লক্ষ্মীপূজার পরেই না হয় আবার চলিয়া যাইবে।

যতীশ নিজেও বুঝিত—বড় অন্যায় হইতেছে। এ অনুরোধ উপেক্ষা করা গুরু অপরাধ হইবে। অনেক বলিয়া কহিয়া সুনীলাকে সে রাজী করাইল। লিখিয়া দিল, পঞ্চমীর দিন সন্ধ্যায় সপরিবারে বাড়ীতে পৌঁছিবে।

২

বিল্বমূলে দেবীর বোধন-পূজা আরম্ভ হইবে,—পুরোহিত গিয়া আসনে বসিলেন। ঢাক, ঢোল, কাঁসি, শাণাইএর সঙ্গে ঝাঁঝ, ঘণ্টা, শাঁখ বাজিয়া উঠিল, ব্রহ্মময়ী এবং আরও কতিপয় প্রবীণা প্রতিবেশিনী পাশে দাঁড়াইয়া উলুধ্বনি করিলেন। বাড়ীর ও পাড়ার ছেলে-মেয়েরা কলরব করিতে করিতে ছুটিয়া আসিল, দেবেশ গিয়া চণ্ডী-মণ্ডপে বেদীর উপরে স্থাপিতা সজ্জিতা দেবীপ্রতিমার সম্মুখে আলো ধরাইয়া দিল। ঠিক এমন সময়ে যতীশ আসিয়া বাড়ীতে পৌঁছিল। ছেলে-মেয়েরা উল্লাসে চীৎকার করিয়া গিয়া তাহাদের ঘিরিল। জ্যাঠাই-মা, মা এবং প্রবীণা আর যাঁহারা ওখানে ছিলেন, হাসিমুখে সকলে গিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন। গ্রাম্য আদব-কায়দার কথা স্মরণ করিয়া সুনীলা মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিয়া সমাগত গুরুজনগণকে নমস্কার করিল। ঘোর সন্ধ্যায় এত লোকের ভিড়ে ও গোলমালের মধ্যে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে ও পদধূলি লইতে তাহার কেমন বাধ-বাধ ঠেকিল। স্থানের অবসরও বড় ছিল না। জ্যাঠাইমা একটু ভ্রূকুটি করিলেন। মা যেন লজ্জায় মরিয়া গেলেন। অন্য যাঁহারা ছিলেন, চোখ ঠারিয়া একটু মুচকি হাসিলেন। প্রণত যতীশকে আশীর্ব্বাদাদি করিয়া চাকর-ঝির কাছ হইতে জ্যাঠাইমা খোকাকে এবং মা খুকীকে কোলে টানিয়া লইয়া মুখে ও মাথায় চুম্বন করিলেন। প্রতিবেশিনীদের রসনায় ঝাঁকে ঝাঁকে হুলুধ্বনি উঠিল। একটি মেয়ে শাঁখে ফুঁ দিল।

মণ্ডপের কাছে আসিয়া জ্যাঠাইমা কহিলেন, "ঐ যে মা রয়েছেন; দোরে প্রণাম কর, মেজ-বৌমা।"

সুনীলা চাহিয়া দেখিল। আলোর সম্মুখে সাজান প্রতিমাখানি ঝকমক্ করিতেছে, চোখে মন্দ লাগিল না। কিন্তু যতই সুন্দর ও সুসজ্জিত হউক, দেবতাবোধে এই সব মৃৎপুত্তলীর পূজায় সুনীলার বড় আস্থা ছিল না। তবে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা সে কখনও লয় নাই, সুতরাং আপত্তির এমন কারণ কিছু নাই। তাই জ্যাঠাইমার এ আদেশ বা অনুরোধ সে উপেক্ষা করিল না।

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া হুলু ও শঙ্খধ্বনির মধ্যে পুত্র-কন্যাসহ সুনীলা গিয়া প্রধান বাস্তুগৃহে উঠিল। গৃহমধ্যে একটি মঙ্গল ঘট, দীপ এবং একখানি তাম্রপাত্রে ধান, দূর্ব্বা, পুষ্প-চন্দনাদি মাঙ্গলিক দ্রব্য সজ্জিত ছিল. জ্যাঠাইমা, মা ও অন্যান্য গুরুজনগণ বালকবালিকা দুইটিকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। বড়বধূ দুইটি স্বর্ণহার আনিয়া হাতে দিল, রাজীবলোচন আশীর্ব্বাদীর উপহারস্বরূপ পৌত্রপৌত্রীর গলায় তাহা পরাইয়া দিলেন।

ক্রমে ভিড় একটু কমিল। জ্যাঠাইমা আদেশ করিলেন, সেজবধূ কমলমালা একটি আলো ধরিয়া সুনীলাকে তাহার ঘরে পৌঁছিয়া দিল। ঝি-চাকররা পূর্ব্বেই জিনিষপত্র সব আনিয়া তুলিয়াছিল। এক ধারে একটি আলনা ছিল, উপরের কাপড়-চোপড় খুলিয়া সুনীলা তাহার উপরে রাখিয়া দিয়া পাশেই একটা চৌকিতে বসিল। ঝি তাড়াতাড়ি একখানি পাখা লইয়া হাওয়া করিতে আরম্ভ করিল। হাজার হইলেও বধূ ত? খোলা ঘরে একখানা চৌকিতে ঠেসান দিয়া বসিল, ঝি হাওয়া করিতেছে, কমলমালার বড় লজ্জা করিতে লাগিল! তবে বধূ হিসাবে সে আরও ছোট, কিছু বলিতে ত পারে না। আর সে ত সে, স্বয়ং জ্যাঠাইমাও কোনও প্রতিবাদ ইহার করিতে সাহসী হইবেন কি না সন্দেহ। চুপ করিয়া সে যায়ের আদেশ অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল। একটু হাঁফ ছাড়িয়া লইয়া সুনীলা তাহার দিকে চাহিল। কহিল, "তুমি বুঝি সেজবৌ?"

"হাঁ, মেজদিদি।"

"ভাল আছ ত তোমরা?"

"হাঁ, দিদি, আছি। আপনার শরীর ভাল আছে ত?"

"ভাল—হাঁ—তা আছে একরকম। তবে পথের ক্লেশে বড্ড হয়রাণ হয়ে পড়েছি।"

"এখন গা, হাত, পা ধুয়ে একটু জল-টল কিছু খেয়ে নেবেন?"

"গা, হাত, পা—হাঁ, ধুতে ত হবেই। তা বাথরুমটা—"

"বাথরুম!" হাঁ করিয়া কমল মুখের পানে চাহিল, নামও সে কখনও শুনে নাই।

"হাঁ, বাথরুম!—কেন, বাথরুমের বন্দোবস্ত করা হয় নি না কি? উনি ত লিখেছিলেন ব'লে মনে হচ্ছে।"

বিজনবালা তখন কি কাযে গৃহে প্রবেশ করিল। শুনিয়া কহিল, "হাঁ, লিখেছিলেন, সে কথাও হয়েছিল। তা জ্যাঠাইমা বল্লেন, ঢেঁকি-ঘরের ও-ধারে একটা চালা আছে ঘেরা—ঐখানেই জল-টল দিলে চল্বে। জল দিতে বল্ব?"

"ঘেরা চালা! ভিত ত কাঁচা মাটীর?"

"হাঁ, ইট আছে, ক'খানা পেতে দিচ্ছে, আর জলচৌকি একটা দিয়ে দিলে—"

"না! ও সব কিছু আর করতে হবে না। যা ত গোভিন্! দু' লোটা জল তুলে এনে বারান্দায় রাখ, আর একটা তোয়ালে বের ক'রে দে। চোখে-মুখে একটু জল দিয়ে রাতটা ত কোনও মতে কাটাই।"

ভয়ে ও লজ্জায় সেজবৌ যেন মরিয়া গেল! বড়বৌ একটু অপ্রস্তুতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। একটু আমতা আমতা করিয়া শেষে কহিল, "তা নাইতে ত হবেই ভাই, পাড়াগেঁয়ে ঘরে—ওর চাইতে আর—"

সুনীলা উত্তর করিল, "মন থাকলে সব যায়গাতেই সব হ'তে পারে। পাকাঘর আমি কিছু প্রত্যাশা করিনি, তবে কিছু বিলিতী মাটী এনে ঐ চালারই মেঝেটা একটু বাঁধিয়ে দেওয়া এমন কিছু অসম্ভব ব্যাপার ত হ'ত না।"

"দেখি, কাল যদি সেজঠাকুরপো—"

"হাঁ, কাল আর হবে! যে পূজোর ভিড় লেগেছে, তোমাদের ফুরসুৎ হ'লে ত? আর হলেই বা কি? কাল বাঁধান হবে, পরশু শুকোতে যাবে, ক'দিন আর আমি থাকব? দেখছি, আসাটাই আমার বড্ড ভুল হয়েছে। ভালয় ভালয় এখন বেরোতে পার্লে বাঁচি।"

"কি, কি হয়েছে বড়বৌমা? আজই উনি বেরোতে চাচ্ছেন—"

চক্ষু-মুখ সুনীলার লাল হইয়া উঠিল। কিন্তু গ্রাম্য এই বৃদ্ধার সঙ্গে এই বিষয়ে কোনওরূপ বাগ্‌বিতণ্ডা করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। অথবা এমন রাশভারী ভাব জ্যাঠাইমার কথায় ও ব্যবহারে সে ইতোমধ্যেই লক্ষ্য করিয়াছিল যে, ইঁহার মুখের উপরে কোনও কটু মন্তব্য করিতে একটু সঙ্কোচও তাহার হইল। সেজবৌ ঘোমটা টানিয়া ভয়ে পলাইয়া গেল। বড়বৌও সহসা কোনও উত্তর করিল না। জ্যাঠাইমা আবার কহিলেন, "কি, কি হয়েছে, কি? ঐ চালাঘরে ওঁর নাওয়া-খোওয়া কিছু চল্‌বে না না কি?"

আস্তে আস্তে বড়বৌ কহিল, "মেঝেটা বাঁধান হয় নি—একটু অসুবিধে হবে—"

"ওঃ, বাঁধান হয় নি! তা যতীশ ত এসেছেন, কাল রাজমিস্ত্রী ডেকে একটা পাকাকোঠা ক'রে যেন দেন।"

সুনীলা এবার আর বরদাস্ত করিতে পারিল না। বলিয়া উঠিল, "পাকা কোঠার কথা আমি কিছু বলি নি, তবে নাইতে গিয়ে কাদা-মাটীতে লুটোপুটি খাবার অভ্যেসও নেই। যায়গাটা একটু বাঁধিয়ে দিলেই ঢের হ'ত। থাকতেই যদি হয়, কাযেই তা ক'রে নিতে হবে।"

"গেঁয়ে লোক আমরা, বৌ-ঝির নাইতে যে পাকাঘর লাগে, অতটা ত বুঝিনি, বাছা! তা যা লাগে, তোমরা করিয়ে নিও। দু' দিনের তরে এসেছ, কোনও ক্লেশ-কষ্ট তোমায় দিতে চাই নে। তা রেতে কি খাওয়ার অভ্যেস-টভ্যেস ওঁর আছে, জেনে তার বন্দোবস্ত ক'রে দিও, বাছা!" বড়বৌকে লক্ষ্য করিয়া শেষ এই কথা কয়টি বলিয়া জ্যাঠাইমা নামিয়া গেলেন।

বড়বৌ 'থ' হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কি জিজ্ঞাসা করিবে, কিসে কি জবাব শুনিবে, বড় ভয় সে পাইতেছিল। কিছুকাল গুম হইয়া বসিয়া থাকিয়া সুনীলা উঠিল, গোভিন্ বারান্দায় ইতোমধ্যে জল আনিয়া রাখিয়াছিল। সুনীলা গিয়া চোখে-মুখে এবং মাথায় ও গায় খানিকটা জল দিল। গোভিন্ তোয়ালেখানা হাতের কাছে ধরিল। মুখ, হাত, পা মুছিয়া সুনীলা ঘরে আসিল। ঝি একখানি কালাপেড়ে কোঁচান শাড়ী বাহির করিয়া দিল, কাপড় ছাড়িয়া সুনীলা হাঁকিল, "গোভিন্!"

"মাইজী!"

"দেখ ত, ষ্টোভটা বুঝি ঐ বাস্কেটে আছে, বের ক'রে জল তুলে দে, একটু চা তৈরী কর্। আর যা—চট্ ক'রে বাবুকে সুধিয়ে আয়, চা'-টা খাবেন কি না। এসে অবধি বাইরে বসেই আড্ডা দেওয়া হচ্ছে! আর এ ভেতরে যে একটা প্রাণী আমি মারা যাচ্ছি, খোঁজ-খবর একটু নেই।"

বড়বৌ কহিল, "চা খাবে—তা গোভিন্ কেন? ঘরেই এক্ষুণি ক'রে দিচ্ছি?"

"ঘরে!—ঘরে—কি তোমাদের চা'-য়ের চলও আছে?"

"ঠাকুরপোরা মাঝে মাঝে খান।"

"ওঃ, তাঁরাও তবে খান; আচ্ছা, গরম জল বরং একটু পাঠিয়ে দিতে বল দিদি, গোভিন্ এইখেনেই আমার সঙ্গে যে দার্জ্জিলিংএর চা আছে, তাই থেকেই ক'রে দিক।"

"আর খাবার কিছু? নারকেলের—"

"না, না, ও সব কিছু খেয়ে এখন হজম করতে পারব না। অম্বল হবে। বিস্কুট আছে, তাই ক'খানা—"

"বিস্কুট! সর্ব্বনাশ!—বিস্কুট যেন্নও ক'রো না, মেজবৌ!"

"কেন?"

"জ্যাঠাইমা অনর্থ করবেন। শ্বশুরঠাকুর হয় ত ভাতই খাবেন না রেতে। আর পুজোর বাড়ী—না ভাই, ওটা তোমাকে—এনেই যদি থাক, সামলেই রাখতে হবে। বিস্কুট-টিস্কুট এ বাড়ীর ত্রিসীমানায়ও কেউ কখনও আনে না।"

"ও বাবা! এত বাড়াবাড়ি এখনও তোমাদের চলে? তা বল, নাই বের করলুম, কিন্তু সকালে সাঁঝে চা'-য়ের সঙ্গে কি তবে খাব?"

"তা মুড়ি খেতে পার, কি দু'খানা ফুলকো লুচি ভেজেও দিতে পারি।"

একটু দম লইয়া সুনীলা শেষে কহিল, "আচ্ছা, তোমাদের অশান্তি ঘটাতে আমি চাই নি। বিস্কুট—তা এ কয় দিন নাই খেলাম, এটুকু ত্যাগ স্বীকার করতে তোমাদের খাতিরে প্রস্তুত আছি। তবে তোমরাও দিদি দেখো, কেবল খোঁচাখুচি ক'রে আমারও অশান্তি কিছু ঘটিও না। দেখি, যদি এ কয়টা দিন থাকতে পারি, যদি এসেই পড়েছি—"

"দুটো মুড়ি—"

"না, আজ আর কিছু চাই নি। শুধু এক কাপ চা'-তেই চলবে।"

"রেতে কি লুচি খাও, না ভাত?"

"ভাতেও চলে। তবে অসুখ-বিসুখ কিছু হ'লে লুচি খাই।"

"আজ—"

"ভাতই খাব, শরীরটাও বরং কড়াই বোধ হচ্ছে—লুচি-টুচি আজ খেতে পারব না। আচ্ছা, তবে এস দিদি! নমস্কার!"

নমস্কার! মুখ ফিরাইয়া কোনও মতে হাসি চাপিতে চাপিতে বিজনবালা বাহির হইয়া গেল।

৩

পরদিন সকালে নৈবেদ্যের জন্য এক ধামা খোয়া চাল কক্ষে লইয়া ব্রজময়ী যখন চণ্ডীমণ্ডপে প্রবেশ করিলেন, রাজীবলোচন একখানি পত্র হাতে লইয়া বাহিরের দিক্ হইতে আসিয়া ডাকিয়া কহিলেন, "বলি, শুনছ বৌ-ঠাকরুণ?"

"কি ঠাকুরপো?"

বারান্দায় উঠিতে উঠিতে রাজীবলোচন কহিলেন, "এখন কি উপায় করি বল ত? কি মুস্কিলেই যে মা এবার ফেল্লেন—"

ব্রজময়ী উত্তর করিলেন, "কি আর করবে ভাই? গায় তুলো না কিছু, ও সব দিকে চোখ-কানই দিও না। নেহাৎ অনাচারটার সামনা-সামনি কিছু না ক'রে—"

"না, গো না, মেজবৌমার কথা বলছি না। সে যা হবার, তা ত হয়েছে। আগে জানলে কি আর ব'ড়েকে লিখি যে, বৌকে নিয়ে বাড়ীতে আয়! তবু যা হ'ক, ওরা জাতধর্ম্মে ত আছে।"

"ছাই আছে। একেও আবার জাতধর্ম্মে থাকা বলে? তবে নাম কেটে এখনও বেরোয় নি। তা কার কথা বলছ? জাতমারা আবার কে কোত্থেকে এসে তোমায় কি মুস্কিলে ফেলছে?"

"এই ত ছোটবৌমা চিঠি লিখেছেন।"

"কে, ছোটবৌ? সদু? বিনয়ের মা?"

"হাঁ গো, তবে বলছি কি? এখন কি করি, বল দিকিন?"

"কেন, কি হয়েছে? কি লিখেছে সে?"

"লিখেছেন, বৌটিকে নিয়ে ছুটীতে যশোরে এসেছেন ওঁর ভেয়ের কাছে। পুজোয় একবার বেড়াতে আসতে চান দেশে।"

"পুজোয় আসতে চায় দেশে! ও মা, তারা যে বেম্মজ্ঞানী গো!—পুজো-টুজো কিছু মানে না!"

"মানে না ব'লে দেখে আসতে ত কিছু বাধা নেই, পুজো দেখতেও মানা কিছু নেই। এই ত লিখেছেন—কত কাল দেশের পুজো-টুজো কিছু দেখিনি। এত কাছে যদি এসেছি, বড় ইচ্ছে হয়, গিয়ে একবার দেখি। বৌমারও বড় ইচ্ছে—আমার সঙ্গে যায়।"

"বৌমা! ও মা, সে-ও আসবে নাকি?"

বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে ব্রজময়ী দেবরের দিকে চাহিলেন। রাজীবলোচন কহিলেন, "হাঁ, তাই ত লিখেছেন।"

"ও মা, সে যে একেবারে বিবি বৌ গো! ক'টা পাশ নাকি দিয়েছে কলেজে প'ড়ে—"

"হাঁ, বি, এ পাশ করেছেন। এখন এম, এ পড়ছেন।"

"ও মা, জুতো টুতো প'রে যদি খটমট্ ক'রে এসে বাড়ীতে ওঠে—"

"তা উঠতেও পারে! বি, এ, পাশ করেছে! এম্ এ পড়ে!"

কি ভাবিতে ভাবিতে ব্রজময়ীর মুখে একটু হাসি ফুটিল। দেবী-প্রতিমার দিকে চাহিয়া মন্তব্য করিলেন, "আর কত লীলেই যে মা এবার দেখাবেন। তা আসতে চায়, আসুক।"

"আসবে ত! কিন্তু সামলাবে কি ক'রে? কোথায় কি ভাবে তাদের রাখবে? তারা আবার এসে কি চাইবে—"

"মেজ-বৌমা এসে পাকা নাইবার ঘর চেয়েছেন। তাঁরা এসে হয় ত কলের পাইখানাই চেয়ে বসবেন। তা চাইলেই ত আর সব মেলে না।"

"কিন্তু চেয়ে বসলে ত ফ্যাসাদ একটা হবে। এখন কি করি, বল ত?"

"করবে আর কি? আসতে চেয়েছে—তুমি ত আর বলতে পার না যে, না, তোমরা আসতে পারবে না?"

"না, তা আর কি ক'রে বলি? লিখেছেন, যদি আপনাদের অনুমতি হয়, নরু কি দেবু কাউকে পাঠিয়ে দেবেন, তার সঙ্গে যাব—"

"তবে দেও পাঠিয়ে। ওই পূবের ঘরটায় তারা থাকবে। শেষে গেলে বরং সন্তোন-টন্তোন ক'রে শুদ্ধ ক'রে নেব।—"

"খাওয়া-দাওয়ার কি ব্যবস্থা হবে?"

ব্রজময়ী কহিলেন, "সে যা হয় একটা বন্দোবস্ত ক'রে নেব। আলাদা যদি রেঁধে খায়, পাশে ঐ ছোট ঘরটা আছে—সে হবে এক রকম। তবে নরু দেবু যেই যাক, ব'লে দিও বুঝিয়ে একটু ব'লে। এ হ'ল দেশ-গাঁ, হিন্দুর বাড়ী, আবার পুজো-গণ্ডার দিন—অশান্তি টশান্তি কিছু না হয়। তা—সদু মেয়ে নেহাৎ মন্দ নয়, আক্কেল বিবেচনা আছে, কেমন মিষ্টি ক'রে সব চিঠি লেখে। বাড়াবাড়ি বোধ হয় কিছু করবে না।"

রাজীবলোচনের এক ছোট ভাই ছিলেন সঞ্জীব। যৌবনে ইনি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং সস্ত্রীক কলিকাতায় গিয়া একবারে ব্রাহ্ম আচারে সংসারযাত্রা আরম্ভ করেন। ক্রুদ্ধ পিতা সঞ্জীবকে ত্যাগ করেন এবং বাড়ীতে তাঁহার আসা-যাওয়া কঠোর আদেশে নিষেধ করিয়া দেন। সঞ্জীবও তার পর আর বাড়ীতে কখনও আসেন নাই। কয়েক বৎসর হইল, তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। যথেষ্ট অর্থ তিনি উপার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং রাখিয়াও গিয়াছেন। একটিমাত্র পুত্র বিনয় এখন বিলাতে আছে। বিনয়ের মাতা সৌদামিনী পুত্রবধূ কল্যাণীকে লইয়া কলিকাতার বাড়ীতেই থাকেন। মধ্যে মধ্যে সৌদামিনী বায়েদের কাছে পত্র লিখিতেন, তাহাতে বুঝা যাইত, শ্বশুরগৃহ এবং গৃহের স্বজনগণের প্রতি তাঁহার প্রাণের একটু টান যেন এখনও আছে। বিনয়ও দুই একবার বাড়ীতে দুই এক দিনের জন্য বেড়াইতে আসিয়াছে।

"শ্যাম মন্ত্রমালা বিনোদিনী রাধা
জপিতে জপিতে যায়।
রসের আবেশে আনন্দ-হিল্লোলে
তরল নয়নে চায়।" —চণ্ডিদাস।

বসুমতী প্রেস [শিল্পী—শ্রীচারুচন্দ্র সেনগুপ্ত

সৌদামিনীর এক ভাই যশোরে চাকরী করেন, ছুটীতে বধূকে লইয়া তিনি ভাইএর বাসা-বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়াছেন। এত কাছে আসিয়াছেন, ইচ্ছা হইল, বধূকে লইয়া পূজায় এবার দেশের বাড়ীতেও আসেন, তাই অনুমতি চাহিয়া তাহারকে এক পত্র তিনি লিখিয়াছেন।

গৃহকর্ত্রী ভ্রাতৃবধূর অনুমোদন পাইয়া বিপ্রহরের পরই রাজীবলোচন দেবেশকে পাঠাইয়া দিলেন।

সংবাদ প্রচারিত হওয়া মাত্র বাড়ী ভরিয়া ও পাড়া ভরিয়া বেজায় একটা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। বি-এ পাশকরা এম-এ পড়া কি এম-এ নামধরা ছেলে অনেকেই দেখিয়াছে, কিন্তু বি-এ পাশকরা আর এম-এ পড়া বৌ যে কি বস্তু হইতে পারে, তাহা কেহ ধারণাও করিতে পারিল না। কলিকাতায় নাকি দুই চারিটি খৃষ্টানী ঘরের মেয়ে এমন আছে! তাহারা ঘাগ্‌রা পরিয়া জুতা পায়ে দিয়া খোলা গাড়ীতে চড়িয়া বেড়ায়, সভায় যায়, নাকিসুরে ইংরাজী কথা কয়, আর সাহেব-বিবিদের সঙ্গে হাত ঝাঁকাঝাঁকি করে! তা এও কি ঘাগ্‌রা পরিয়া জুতা পায় দিয়া আসিবে, আসিয়াই শ্বশুর-শাশুড়ীদের সঙ্গে হাত ঝাঁকাঝাঁকি করিবে? আর নাকিসুরে ইংরেজী কহিবে? সঙ্গে আয়া-টায়াও দুই একটা কোন্ না থাকিবে? সেগুলা যদি মুসলমানী হয়? কি সর্ব্বনাশ! বৌ আসিলে ওরা ধর্ম্মে ত পতিত হইবেই, জাতিও যাইবে। আবার তাহার শাশুড়ীও আসিতেছে। সে ব্রহ্মজ্ঞানী, বিধবা হইয়াছে, কিন্তু নিকা করে নাই। দূর—গিন্নী-বান্নী আর ছেলের মা, সে-ও নাকি আবার নিকা করে? ইচ্ছা হইলে ওরা নিকা করিতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া সদাসর্ব্বদা সকলে করে না।

না, ওদের ছোটগিন্নী নিকা করে নাই, বিধবা হইয়া বিধবাই আছে। কিন্তু ওরা ত ব্রহ্মজ্ঞানী, আচার-বিচার মানে না কিছু। থান পরে, না শাড়ীই পরে? অথবা সাদা থান কাপড়ই কুচি দিয়া ঘাগ্‌রার মত করিয়া কোমর ঘেরে, জামা উড়্‌নী গায় দেয়? গয়নাগাটি সব খুলিয়া ফেলিয়াছে না গায়েই আছে? জুতা পায় দেয়, না খালি পায়ে থাকে? খালি পায়ে কি থাকে? হয় ত সাদা রঙ্গের জুতা পরে। তা পরার বিচার কিছু করুক না করুক, খাওয়ার বিচার কিছু করে কি না? দেশে আসিতেছে, দুইবেলাই যদি বামী, শামী, ক্ষেন্তীদের মত মাছেভাতে পেট ভরিয়া খায়—ও মা, সে কি বেজায় কথাই হইবে! দেখিয়া তাহারাই যে লজ্জায় মরিয়া যাইবে! এইরূপ কত জল্পনা-কল্পনাই পাড়া ভরিয়া সে দিন হইল! কখন্ সে রাত্রিটা পোহাইবে, দেখিয়া চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিবে, অধীরভাবে সকলে এই প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

সুনীলাও যথাসময়ে এ সংবাদ শুনিল। শুনিয়া মনে মনে একটু হাসিল, হাঁ, এইবার উহাদের ঠিক শিক্ষা হইবে! সে আর কি করিয়াছে, কতটুকুই বা সুবিধা এ বাড়ীতে চাহিয়াছে। এ ত আর উঁাদের মেজবৌ, সেজবৌ নয়। এম এ পড়া ব্রাহ্মমহিলা সে কেবল একটা বাথরুম চাহিয়াছিল, আর চা' খাইয়াছিল। তাহাতেই কত কথা হইতেছে, ভাবে সাব কতই না খোঁটা তাহাকে শুনিতে হইয়াছে! আর এই উচ্চশিক্ষিতা ব্রাহ্মমহিলা যখন আসিবে—এদের চাল-চলন ভাবধরণ সবই ত সে জানে। হাজার হইলেও সে ইঁহাদের ঘরের বৌ। আর এ স্বাধীনা, অনুগ্রহ করিয়া দেশের বাড়ীতে পদার্পণ করিতেছে! যাহাই করুক, বরদাস্ত না করিয়া কেহ পারিবেন না। তবে এটাও বুঝিবেন, শিক্ষিতা মহিলার জীবনের আদর্শ কি? তাহাকে আর বড় নিন্দা কেহ করিতে পারিবেন না। কিন্তু সে কি ভাবে চলিবে? অবশ্য কল্যাণী গ্রাজুয়েট—এম-এও পড়ে। আর সে ইংরেজী স্কুলের পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাত্র পড়িয়াছিল। কিন্তু তবু ত ইংরাজী-শিক্ষিতা সে, শিক্ষিতা নারীর মর্য্যাদাও ভোগ করিয়া আসিতেছে। যে সহরে সে থাকে, পদস্থ লোকরা, সাহেব-মেমরা পর্য্যন্ত 'মিসেস্ রায়' বলিয়া তাহার কথা উল্লেখ করিয়া থাকেন। সভা-সমিতিতে সে যায়। বার্ষিক মেলায় কি অন্য উৎসবাদিতে পরিচালক-সমিতির অন্যতম মহিলা সদস্যও সে হইয়াছে, নারীদের অভ্যর্থনার ভারও পাইয়াছে! দুই একটা পার্টিতে মেমসাহেবদের সঙ্গে এক টেবলে বসিয়া চা' পানও করিয়াছে। একবার লাট-মহিষীও এক পর্দ্দা পার্টিতে করমর্দ্দনে তাহাকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন! সে যে আজ এই গ্রাজুয়েট মহিলার কাছে, পরিমার্জ্জিত আদব-কায়দায় খাটো হইয়া থাকিবে, সে ত কিছুতেই হইতে পারে না। তাই ত! এই বাড়ীতে কি আদব-কায়দা সে দেখাইতে পারে? এই ত ঘর—বেড়াগুলি যদি ছাই, সাদা কাগজ দিয়া মুড়িয়া ফেলাও যাইত, তবু যা হক তাহার অভ্যর্থনা এবারকার মত এ ঘরে চলিত। জুতা জোড়াটাও স্বামীর অনুরোধে ফেলিয়া আসিয়াছে। কল্যাণী যখন আসিবে, বড়বৌ সেজবৌএর মত খালি পায়ে গিয়া তাহাকে তাহার সামনে দাঁড়াইতে হইবে। হায়, হায়! কি ভুলই সে করিয়াছে! একটা বাথরুমের কথা লেখা হইয়াছিল, তাহাও ইঁহারা অবহেলা করিয়া করান নাই। ছি, ছি! কল্যাণী আসিয়া তাহাকে কি জঙ্গলীই মনে করিবে? যাহা হউক, যাহা হইবার হইয়াছে। এখন ইহার মধ্যেই অন্ততঃ ঘরখানিকে কতদূর পরিপাটী করিয়া তুলা যাইতে পারে, কোথায় টেবলটি রাখিলে ভাল হয়, কি আস্তরণ তাহার উপরে দেওয়া যায়, আলনার উপরে জামা, কাপড়, তোয়ালে, তাকের উপরে সাবানের কেস, পাউডারের কৌটা, গন্ধের শিশি কি ভাবে সাজাইয়া রাখিলে মানানসই দেখায়, দোয়াত, কলম, কাগজ, খাম কোথায় গুছাইয়া রাখা যায়, আয়না, চিরুণী, ব্রুস, এক পাশে ছোট একটা টেবলে কি বেড়ার গায়ে একটা ব্রাকেট খাটাইয়া রাখিলে ঠিক হয়, ঘরের চারিদিকে চাহিয়া তাহাই সে ভাবিতে লাগিল। ভাবিয়া যথাসম্ভব ঘরখানিকে কিছু নূতন কায়দায় ফের সাজাইয়া লইল।

৪

রাত্রি পোহাইল। প্রতীক্ষার লোক যতই অধীর হউক, এক একটা দিন ও রাত্রি তাহাতে যতই যুগপ্রমাণ বলিয়া মনে হউক, সব দিনই কাটে, সব রাত্রিই পোহায়। সে দিনও কাটিল, সে রাত্রিও পোহাইল। সকালেই দেবেশের ফিরিয়া আসিবার কথা।

পূজার হাজার কাযের মধ্যেও অধীর-আগ্রহে সকলে পথের দিকে চাহিতেছিলেন।

ও মা, ও কা'রা আসে? দেখেশ না? হাঁ, সেই ত? সঙ্গে ও কা'রা! একটি প্রৌঢ়া বিধবা, আর তাহার পশ্চাতে একটি বধূ—একবারেই সাদাসিধা গৃহস্থ ঘরের বধূটি! হাতে কয়েকগাছি করিয়া চুড়ী, আর তাহার পাশে শাঁখা ও লোহা, পরণে লাল পেড়ে একখানি শাড়ী, মাথার ঘোমটা চক্ষু পর্য্যন্ত নামান, মুখখানি মিষ্ট হাসিতে ভরা! আর ঐ যে বিধবা—ঠিক যেন বড় গিন্নী, আর মেজ গিন্নীও বিধবা হইলে যেমন হইবে,—কেবল বয়সে একটু কাঁচা। কা'রা ও? ওরাই কি তা'রা! না কাহারা আসিয়াছে? অবাক্ হইয়া সকলে চাহিয়া রহিল!

রাত্রি হইতেই ভবময়ীর চিত্ত বড় একটা শক্ত সমস্যায় আন্দোলিত হইতেছিল, দেবরের মৃত্যুর পর বৈধব্যগ্রস্তা যা প্রথম এই বাড়ীতে আসিতেছে,—এ সময় রোদন করিতে হয়। আবার সঙ্গে তাহার নববধূ প্রথম এই শ্বশুরের বাস্তুভিটায় শুভাগমন করিতেছে, মাঙ্গলিক হলু-শঙ্খধ্বনিসহ তাহার এই আগমনকে—আনন্দে সম্বর্দ্ধিত করিতে হয়; কিন্তু একই সময়ে দুইটি কর্ত্তব্য কি ভাবে সম্পাদন করা যায়? এক তিনি ও তাঁহার যা রোদন করিতে পারেন, আর বধূরা ও প্রতিবেশিনীরা নববধূর সম্বর্দ্ধনা করিতে পারে। কিন্তু সেটা বড় বিসদৃশও

হয়। তবে পাড়ায় কোনও গৃহে বধূকে কিছুকাল রাখিয়া আগে তাহাকে গৃহে আনা যাইতে পারে। রোদনের ব্যাপার আগে চুকাইয়া বধূকে আনন্দে শেষে ঘরে আনা যায়। কিন্তু বধূ যে ব্রহ্মজ্ঞানী, জাতি নাই, কে কি বলিবে, বাছা শেষে মনে ব্যথা পাইবে। এ দিকে আবার ছাই সপ্তমী তিথি বেলা দেড় প্রহর মাত্র আছে, পূজা তাহার আগেই সারিতে হইবে। আসিতে তাহাদের হয় ত একটু বেলাই হইবে। এত হাঙ্গামার মধ্যে সময়মত পূজার আয়োজনই বা তিনি কি প্রকারে করিয়া দিবেন? কি করিবেন, কি হইতে পারে, কিসে উভয় দিক রক্ষা পায়, ভাবিয়া ব্রহ্মময়ী কূল পাইতেছিলেন না। যাহা হউক, পূজার আয়োজন সকলের আগে। ভোরে উঠিয়াই একটা ডুব দিয়া আসিয়া তিনি চণ্ডীমণ্ডপে গেলেন। রমাসুন্দরীকে ডাকিয়া কহিলেন, "ওরা এলে শাঁখটা বাজিও, আর উলু দিও, পাড়ার সবাইকে ব'লে এসো একবার আসতে। আমি চণ্ডীমণ্ডপে গেলাম, কে জানে বোন্, মনটা হয় ত অস্থির থাকবে, হাতে আবার পূজার কায, যা জান ক'রো। বৌটি নতুন আসছে, ত্রুটি কিছু না হয়।"

বলিয়াই চণ্ডীমণ্ডপে গিয়া ক্ষিপ্রহস্তে কাযকর্ম্ম আরম্ভ করিলেন।

সৌদামিনী যখন আসিলেন, সাড়া পাইয়া তিনি চাহিয়া দেখিলেন। সমস্ত দ্বিধা ও চিন্তা মুহূর্ত্তে দূর হইল। হাতের কায ফেলিয়া ছুটিয়া বাহির হইলেন। সৌদামিনীর দিকে চাহিয়া চক্ষু ভরিয়া অশ্রুর উচ্ছ্বাস উঠিল,—ভুলিয়া গেলেন, ইহারা ব্রহ্মজ্ঞানী, ইহাদের জাতি নাই। ভুলিয়া গেলেন, স্নানান্তে শুচি বস্ত্র পরিধান করিয়া দেবীপূজার নৈবেদ্য তিনি করিতেছিলেন। দুইটি হাত বাড়াইয়া বিধবা যায়ের গলাটি তিনি জড়াইয়া ধরিলেন, সৌদামিনীও হাত বাড়াইয়া বড় যায়ের গলাটি জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুসিক্ত মুখখানি তাঁহার স্কন্ধে রাখিলেন। অশ্রুর মিলনে ব্যথার ব্যথী দুইটি নারীর মিলনই মাত্র তখন সত্য হইল,—জাতিধর্ম্মের, আচার-নিয়মের সকল ব্যবধান—সকল বাধা—এই সত্যে নিঃশেষে মিলাইয়া গেল।

হুলু ও শঙ্খধ্বনি উঠিল—ধীরে ধীরে ব্রহ্মময়ী যায়ের কণ্ঠালিঙ্গন হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া চক্ষু মুছিয়া বধূর দিকে চাহিলেন। বধূ অগ্রসর হইয়া প্রণাম করিল,—স্নেহে ব্রহ্মময়ী বুকে ধরিয়া তাহার শিরশ্চুম্বন করিলেন।

চণ্ডীমণ্ডপের কাছে আসিয়া সৌদামিনী দেবীপ্রতিমার দিকে চাহিলেন, গলবস্ত্র হইয়া সিঁড়ির উপরে প্রণাম করিলেন। বধূও শাশুড়ীর অনুবর্ত্তন করিল,—উৎফুল্ল মুখে ব্রহ্মময়ী চাহিয়া দেখিলেন। হাসিমুখে কহিলেন, "মা সর্ব্বমঙ্গলা তোদের মনস্কামনা পূর্ণ করুন, ছোট বৌ, বড় সুখী হলাম। তোরাও তা হ'লে ঠাকুর-দেবতা মানিস্? ভক্তি করিস্?"

সৌদামিনী উত্তর করিলেন, "ঠাকুর যদি জোর ক'রে মানান, না মেনে কারও উপায় আছে, দিদি? আজ তোমাদের কাছে এসেছি। ভক্তির ছুঁৎ বুঝি আমাকেও লেগেছে। যে ঠাকুরকে আমরা আরাধনা করি, ঐ প্রতিমার মধ্যে তোমরা তাঁকেই ত পূজো কর, দিদি।"

"তাই ত করি। নইলে ঠাকুর কি আর আলাদা আলাদা আছেন? তবে তোদের না কি ঠাকুর-দেবতাকে প্রণাম করতে নিষেধ আছে—"

"তা আছে। তবে বিধি-নিষেধ কটা আমরা মেনে চলতে পারি দিদি? এটাও না হয় আজ নাই মানলাম। উনিই শেষে বলতেন দিদি, মন যেখানে আপনা হ'তে ভক্তিতে নত হয়ে পড়ে, সেইখানেই ঠাকুর থাকেন; ঠাকুর মানুষকে ডাকেন, সে ডাকাকে অবহেলা করতে নেই।"

"আহা, একটিবার যদি তোদের নিয়ে পূজোর বাড়ীতে আসত—"

অঞ্চলে ব্রহ্মময়ী অশ্রু মার্জ্জনা করিলেন। সৌদামিনীর চক্ষু দুইটি ছলছল, মুখখানি আরক্ত হইয়া উঠিল। অতি আয়াসে তিনি উচ্ছ্বসিত রোদনবেগ সংবরণ করিলেন।

ভৃত্যকে সুনীলা তাড়াতাড়ি চায়ের আয়োজন করিতে আদেশ করিল, কোথায় কি ভাবে কি সাজাইয়া রাখিবে, বিশদভাবে বার বার বুঝাইয়া দিল। তাহার পর সৌদামিনীর ঘরে গেল;—দেখিল, সে যে পরিষ্কার একটি টেবল ভাল আস্তরণে ঢাকিয়া দুইখানি চৌকি সেখানে সাজাইয়া রাখিয়াছিল, সে সব যেমন তেমনই পড়িয়া আছে। মাটীতেই এক ধারে একটি মাদুরে সৌদামিনী বসিয়া আছেন; পাশেই একটু পিছনের দিকে কল্যাণী শাশুড়ী, বড় যা এবং প্রতিবেশিনীও দুই চারি জন ঘরের মধ্যে আছেন, তাঁহাদের সঙ্গে সৌদামিনী আলাপ করিতেছেন। দেখিয়া সে একটু বিস্মিত হইল। থমকিয়া একটু দাঁড়াইয়া থাকিয়া কহিল, "আসুন খুড়ীমা, চা তৈরী হয়েছে, আমার ও ঘরে আসুন।"

সৌদামিনী কহিলেন, "চা!—চা—ত আমি খাইনে, বউমা!"

"চা খান না? কেন?"

একটু হাসিয়া সৌদামিনী কহিলেন, "এই বয়েসে এখন কি আমাদের সকালে উঠেই চা খাওয়া মানায়?" বৌমা সুনীলা একটু অপ্রতিভ হইয়া গেল, ঢোক গিলিয়া কহিল, "কল্যাণী?"

"চা খাবে বৌমা? রাত জেগে এসেছ?"

কল্যাণী মাথা নাড়িয়া জানাইল, না। সঙ্কোচে একবার সুনীলার দিকে চাহিল, উঠিয়া আসিয়া কহিল, "মাপ করবেন দিদি,—আমি চা খাইনে।"

"তুমিও চা খাও না? বল কি?"

"আগে খেতাম,—তা মা খান না, আমারও ভাল লাগে না, তাই ছেড়ে দিইছি।"

সৌদামিনী কহিলেন, "তা ও তৈরী ক'রে এসে ডাকছে, আজ বরং গিয়ে একটু খেয়ে এস না? রাত জেগেও এসেছ—"

আর আপত্তি না করিয়া কল্যাণী সুনীলার সঙ্গে গেল।

নৈবেদ্যাদি সাজাইয়া দিয়া ব্রহ্মময়ী তখন বাড়ীর ভিতরে আসিলেন,; ঘরে উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ ছোটবৌ, তোমার খাওয়া-দাওয়ার কি বন্দোবস্ত করব বল ত?"

সৌদামিনী কহিলেন, "আলাদা একটা রান্নার কি দরকার দিদি, তুমি ত খাবে, তারির দুটি বের ক'রে দিও। এই ঘরে এনে খাব।"

"পূজার দিনে আমরা ত ভাত খাইনে বোন্।"

"ও, তাই ত। তা তুমি যা খাবে, তাই বরং খাব।"

"তা তোকে বরং দুটি ভাত রেঁধেই ছোট বউমা দিক্।"

"না দিদি, ভাতটা তোমরা যখন খাও না—আমিও না-ই খেলুম। দুটো দিন ত—কি হবে? জলটল খেয়ে বেশ থাকা যাবে।"

ব্রহ্মময়ী বড় সন্তুষ্ট হইলেন। একটু কি ভাবিয়া কহিলেন, "তোদের দেখে বোন্ একেবারে আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি। লোক কাল দিন ভ'রে কত কথাই না বলছিল।"

একটু হাসিয়া সৌদামিনী কহিলেন, "কি বলছিল? বিবিয়ানা ঢঙ ক'রে বেড়াব? বাড়ীতে এসে খানাটানা খেতে চাইব?"

ব্রহ্মময়ী কোনও উত্তর করিলেন না, মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিলেন। সৌদামিনী কহিলেন, "লোক বড় ভুল বোঝে, দিদি। আমাদের ধর্ম্মে এ কথা কখনও বলে না যে, সাহেবদের মত চালচলন করতে হবে, টেবলে ব'সে খানা খেতে হবে। পুরুষমানুষও অনেকে নিরেমিষ খান। উনি জীবনে কখনও মাছ-মাংস স্পর্শও করেন নি।"

"ও মা, তাই না কি? তবে শুনেছিলুম বোন্—"

"শুনেছ যা, তা-ও একেবারে মিথ্যে নয়। সাহেবী চালেও অনেকে চলে। কোনও মানা নেই কি না, তাই অনেকে ভাবে, যা খুসী, তাই করা যায়। আর সাহেবী ঢঙে চলতে পারলেই মনে করে, খুব বাহাদুরী হ'ল! বড় ভুল বোঝে তারা। এ দেশের লোক আমরা, বিদেশীর নকল কেন করব? এ ধর্ম্মটা ত বিদেশ থেকে আমদানী হয় নি।"

"খিষ্টেনী ধর্ম্মটা ত শুনেছি সাহেবরাই এ দেশে এনেছে—"

"আমরা ত খৃষ্টান নই দিদি, ব্রাহ্ম। এ ধর্ম্ম এ দেশেরই ধর্ম্ম। এ ধর্ম্মের যা কথা, সব এ দেশেরই শাস্ত্রের কথা।"

"তোকে আর বৌমাকে দেখে ত তাই মনে হচ্ছে। বৌমা আবার না কি কালেজে-টালেজে পড়েছে, বি-এ পাশ দিয়েছে—"

"তা দিয়েছে ব'লে এ কথা কেন ভুলবে যে, সে বাঙ্গালী গেরস্তর মেয়ে, গেরস্তর বৌ। ছেলেরাও ত কত বি-এ, এম-এ দিচ্ছে। ক'জনে সাহেব সাজে? বাঙ্গালী গেরস্তর মত থাকে, কায-কর্ম্ম করে, চলে-ফেরে। মেয়েরা কেন বি-এ, এম-এ পাশ ক'রে বাঙ্গালী গেরস্তর মেয়ের মত—বৌএর মত থাক্তে পারবে না, তেমনই চলতে ফিরতে পারবে না? এই ত আমাদের যতু, নরু, দেবু—"

"ও মা, তারা ত সব লক্ষ্মী ছেলে—"

"নতুন এই বৌমাটিও তোমাদের তেম্নই লক্ষ্মী কেন হবে না?"

"দেখছি ত বোন্, লক্ষ্মীই ত বটে, বড় লক্ষ্মী! আহা, বেঁচে থাক্। বিনয় আমার বড় লোক হয়ে ফিরে আসুক।"

"আশীর্ব্বাদ কর দিদি, টাকায় খুব বড় হ'ক কি না হ'ক, দেশের ছেলেটি যেমন গেছে, ঠিক তেমনই যেন ঘরে ফিরে আসে। আজ বৌমাকে নিয়ে এসেছি। আগামী বছর তাকে নিয়েও যেন এম্নি মুখ তুলে আস্তে পারি।"

৬

পরদিন পূজার আয়োজন করিয়া দিয়া ব্রহ্মময়ী যখন পাকের ঘরের দিকে আসলেন, দেখিলেন, সিঁড়ির উপরে কল্যাণী বসিয়া দ্বারে উপবিষ্টা বড়বধূর সঙ্গে রান্নাবান্নার কথা কি বলিতেছে।

দেখিয়া ব্রহ্মময়ীর প্রাণে যেন কেমন একটা আঘাত লাগিল; কহিলেন, "আহা, ষাট্! বাইরে অমন বাইরের লোকের মত আল্গা হয়ে ব'সে আছিস মা? এও না কি চোখে দেখা যায়? আয়, বারান্দায় উঠে বস।"

"উঠতে পারব; জ্যাঠাইমা? দোষ নেই ত?"

"না, বারান্দায় উঠতে কোনও দোষ নেই, ওঠ্, চল!" বলিয়া স্নেহে তাহার হাতখানি ধরিয়া বারান্দায় আনিয়া বসাইলেন। গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া কহিলেন, "আহা এমন বুকের আনন্দ যারা, তাদেরও এমনই ক'রে বাইরে আলগা ক'রে রাখতে হয়—এ যে কি দুর্ভাগ্যের কথা!"

একটু হাসিয়া কল্যাণী কহিল, "তা আল্গা ক'রে বাইরে কেন রাখেন, জ্যাঠাইমা?"

"কি করব মা? প্রাণটা কি তা চায়? তবে অভ্যাস হয়ে গেছে এক রকম, মনটা খুঁৎ খুঁৎ করে। কি জানিস মা, দেখছি ত খুব ভাল তোরা, তবে অখাদ্যি-টখাদ্যি সব খাস কি না—"

"না, জ্যাঠাইমা, অখাদ্যি আপনারা যাকে বলেন, তা আমরা কক্খনো কিছু খাই না।"

"আচার-বিচের ত মানিস্ নে?"

"মা ত খুব মানেন, না নেয়ে, উপাসনা না ক'রে, কিছু খান না। আলাদা ঘরে হবিষ্যি করেন। দু'দিন ত এসেছেন, তা অনাচার কিছু দেখছেন?"

"না, তা ত দেখছি নে কিছু। ঠিক আমাদেরই মত। তবে শুনেছি, তোরা জাত মানিস্ নে—"

"না, তা মানিনে জ্যাঠাইমা।"

"সব জেতের ছোঁয়া-টোয়া খাস্?"

একটু সলজ্জভাবে কল্যাণী কহিল, "তা জ্যাঠাইমা, আমাদের সমাজে যেমন চল আছে, তেমনই চলতে হবে। তা কলকেতায় আজ-কাল খাওয়া-দাওয়ায় জাত বড় কেউ মানে না। অনেক হিন্দুর বাড়ীতেও বিয়েতে, শ্রাদ্ধে নেমন্তন্ন খেতে গেছি। সবাই ত এক ঘরে পাশাপাশি এক রকম গায়ে গায়ে বসেই খায়। কেউ জিজ্ঞেসাও করে না, কার কি জাত?"

"হাঁ, ছেলেরাও বলাবলি করে বটে। কলকেতা সহরে বড় বড় ভোজে জাতবিচের বড় কেউ করে না। পাড়াগাঁয়েও এর পর হয় ত ওই হবে। ঘোর কলি এখন, ধর্ম্মকর্ম্ম আর কিছু থাকবে না দেখছি।"

"দিনকাল বদলে গেছে জ্যাঠাইমা, নতুন এই কালে এই হবে দেখবেন নতুন ধর্ম্ম—নতুন কর্ম্ম।"

জ্যাঠাইমা হাসিয়া কহিলেন, "যখন হয় হবে, আমরা ত হ্নে পার পাব।"

"না, জ্যাঠাইমা, তা পাবেন না, এটা আপনাদের দেখেই যেতে হবে। হয় ত মেনেও যেতে হবে।"

"কপালে থাকে, হবে।"

হাসিয়া কল্যাণী কহিল, "হ'লে জ্যাঠাইমা, আমি কিন্তু খুব খুসী হব। দেখবেন, আমি রেঁধে দেব, আপনি খাবেন।"

"রাঁধতে জানিস্ তুই?"

"জানি না? মাকে ত আমিই প্রায় রেঁধে দিই।"

মুখের পানে একটু কাল জ্যাঠাইমা চাহিয়া রহিলেন। কি ভাবিতে ভাবিতে শেষে কহিলেন, "আচ্ছা, তোরা গঙ্গাস্নান-টেনান কখনও করিস্?"

"তা মধ্যে মধ্যে করি। আস্বার আগেও ত করেছি। তবে সত্যি বলছি জ্যাঠাইমা, দেবতা ব'লে গঙ্গাকে মানি না। এম্নি যেমন নদীতে লোক নায়—"

"তা নাইলেই হ'ল। মা গঙ্গার এমনই মহিমে, মানুক কি না মানুক, লোক ডুব দিলেই তার জন্ম-জন্মের পাপ ক্ষয় হয়।"

"আমার সব পাপ তবে ক্ষয় হয়ে গেছে?"

"ষাট! এক জাত-টাত কিছু মানিস্নে, নইলে পাপ কি আর কিছু তোতে আছে, মা?"

"ঐ জাত না মানার পাপটুকু তবে ধুয়ে গেছে বলুন?"

হাসিয়া জ্যাঠাইমা কহিলেন, "তাই ব'লে আজই তোর হাতের রান্না খাব না, জানলি?"

"তা জানি। তবে এটাও আপনাকে স্বীকার করতে হবে যে, সে পাপ আমার গায়ে আর নেই। আমার হাতের ভাত যদি না খান, সেটা আপনার বড্ড ভুল হবে।"

"না, এবার তোর কাছে দেখছি হার মানতে হ'ল। পণ্ডিত মেয়ে কি না—"

"আচ্ছা, গঙ্গাস্নানের কথা কেন তুল্লেন জ্যাঠাইমা, বলুন ত?"

জ্যাঠাইমার সেই বার্দ্ধক্যে জীর্ণ মুখখানাও যেন লাল হইয়া উঠিল। একটু হাসিয়া কহিলেন, "ভাবছিলাম কি মা, তুই যে বাইরে থাকিস্, অন্‌জাত লোকের মত বাইরে তোকে দু'টি ভাত বেড়ে দেয়—এটা সত্যি বলছি মা—প্রাণে মোটেই বরদাস্ত হচ্ছে না—"

"ও! তাই ভাবছেন বুঝি, জানে কি অজানে যে ভাবেই হ'ক, গঙ্গাস্নান ক'রে যদি শুদ্ধ হয়ে থাকি, তবে আমাকে ঘরে যেতে দিতে পারেন কি না—আর বড়দি, মেজদি, সেজবৌ এদের সঙ্গেই এক থালে

রান্নাঘরে বসেই ভাত খেতে পারি কি না ?" হি হি করিয়া কল্যাণী হাসিয়া উঠিল।

জ্যাঠাইমাও হাসিয়া কহিলেন, "তা মা, ছেলেবেলা থেকে ধর্ম্ম ব'লে যা শিখেছি, আচার-নিয়ম ব'লে যা মেনে আসছি, তা কি এক দিনে অমনি ঠেলে ফেলতে পারি ? মনের অভ্যেস বড় শক্ত হয়েই মনে লেগে থাকে। আর এই যে সব আচার আমরা মানি, এরও কি কোনও মাহাত্ম্য নেই ? তবে কিসের জন্যে কি নিয়ম হয়েছে, অত আমরা বুঝি-সুঝি না—লেখাপড়া ত কিছু শিখি নি। তা কি জানিস্ মা, সত্যি বলছি, প্রাণটা বলছে, তোকে ঘরে তুলে নিই, বৌমাদের সঙ্গে মিলেমিশে তুই কাযকর্ম্ম কর্, খা' দা'। আবার আচারের অভ্যেস-গুলোও যত খুঁৎখুঁতি এনে বাধা দিচ্ছে। তাই একবার মনে হচ্ছিল, মা গঙ্গা ত পতিতপাবনী, জ্ঞানে অজ্ঞানে যা কিছু পাপ আমরা করি, সব তাঁর স্পর্শে ধুয়ে মুছে যায়—"

"তা হ'লে বলুন, আমারও গেছে।"

"তোরা কি তা মানিস্, মা !"

"মানি, আর না মানি—তবু যায় ত ? আচ্ছা, আপনার খাতিরে না হয় মেনেই নিলুম সেটা। তা হ'লে বলুন, আমাকে ঘরে নেবেন ? দিদিদের সঙ্গে ব'সে খেতে পাব ? আর আপনাকেও রেঁধে দেব ?"

একটু হাসিয়া মাথা নাড়িয়া জ্যাঠাইমা কহিলেন, "ঐটে পারব না মা ! কি জানিস, বিধবা মানুষ, এক নিয়মে জীবনটা কাটিয়ে এসেছি, বড্ড খুঁৎ খুঁৎ করে। তবে—বৌদের কথা আলাদা। ছেলেরাও সব আজ-কালকার ছেলে, কলকেতার সহরে থেকে পড়ে, অনাচারটার কোন্ না করে ? তাদের ত এড়াতে পারিনে, বৌমারাও তাদের পাতেরটা খায়—যদিও আমার হবিষ্যির ঘরের হাঁচ মাড়াতেও তাদের দিই নে।"

"দিদিদের ত দেন ?"

"তা দিই বৈ কি মা, তা দিই বৈ কি ! অত বাড়াবাড়ি কি আর চলে ? তবে রাঁধতে তাঁদের দিই নে। নিজে যদি না পারি, তোর মেজ জ্যাঠাইমা গিয়ে রাঁধে।"

"আচ্ছা, তা হ'লে বরং ওটা আপনাকে মাপই করব। আজ থেকে তা হ'লে ঘরে-টরে যেতে পারি ? দিদিদের সঙ্গে সমান সমান হ'তে পারি ?"

"আচ্ছা, তা যাস্—তাই হ'স্।"

"কিন্তু জ্যাঠামশাই—"

"না, আমি যদি বলি, ঠাকুরপো কিছু আপত্তি করবেন না। আর অত বাড়াবাড়িও তাঁর নেই।"

"আচ্ছা, তবে এই সই ! কিন্তু এও ব'লে রাখছি জ্যাঠাইমা, আজ না হয় কাল, আমার হাতেও আপনাকে খেতে হবে।"

"তা সেই মতি যদি মা জগদম্বা করেন, হবে।"

"জগদম্বাই যদি তাঁকে বললেন জ্যাঠাইমা, তিনি আপনার যেমন মা, আমারও তেমনই মা, সবারই তেমনই মা ! মা কি জাত-বিচার ক'রে তাঁর ছেলেমেয়েদের তফাৎ কিছু করেন ?"

"না, সত্যি ক'রে যদি জগদম্বার মাহাত্ম্য মনে ধ'রে নিতে পারি, তবে আর তা কি ক'রে বলি, মা ! কিন্তু পারি নে, এই যা কথা।"

"যতটুকু পারেন, ততটুকুই সেই মাহাত্ম্য মেনে চলবেন। আচ্ছা, কাল ত আপনারা সবাই চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে অঞ্জলি দিয়ে এলেন।"

"হাঁ।"

"আজও ত যাবেন ?"

"ও মা, তা যাব বৈ কি ?"

"আচ্ছা, আমি যদি আপনাদের সঙ্গে যাই ? জগদম্বার মন্দিরে গিয়ে তাঁ'র পায়ে অঞ্জলি দিতে পারব না ?"

এবার জ্যাঠাইমা একবারেই থমকিয়া গেলেন। সর্ব্বনাশ ! মেয়েটা বলে কি ? ঘর-সংসারে না হয় প্রাণের টানে একটা রফা করিয়া লওয়া যায়। কিন্তু দেবতার পূজায়—

হাসিয়া কল্যাণী কহিল, "কি ভাবছেন জ্যাঠাইমা ! মা কি জগদম্বা কেবল মুখের কথায় ? আর কাযের বেলায় কেবল আপনাদের কয় জনের মা, আর আমরা তাঁ'র কেউ নই ? কাছে গিয়ে দু'টো ফুলও পায়ে ফেলে দিতে পারি নে ?"

কি উত্তর ইহার দিবেন ? একটু ইতস্ততঃ করিয়া জ্যাঠাইমা শেষে কহিলেন, "পাগলী ! তোরা কি মাটীর ঠাকুরকে অঞ্জলি দিয়ে দিবি ! ধর্ম্মে তোদের মানা নেই ?"

কল্যাণী উত্তর করিল, "মানা যাই থাক্ জ্যাঠাইমা, আমাদের ধর্ম্ম আবার এ কথাও বলছে, বিবেক-বুদ্ধিতে যার যা ভাল লাগে, সে তাই করতে পারে। আমাদের যাঁকে ব্রহ্ম ব'লে উপাসনা করতে হয়, তিনিই ত আপনাদের জগদম্বা ? শুনেছি, মাটীর পুতুলে আপনারা তাঁর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা ক'রে তবে পূজো করেন। পুতুল ঠাকুর হন তখনই। তা সেই প্রাণের সাড়া যদি ঐ মাটীর ঠাকুরে আমি পেয়ে থাকি, কেন অঞ্জলি দেব না, যদি আপনারা না নিষেধ করেন আপনাদের ঠাকুর ব'লে ?"

"না, না, তাই কি করতে পারি মা ? আজ ঐ চণ্ডীমণ্ডপে তাঁর মূর্ত্তি গ'ড়ে পূজো করছি ব'লে, এ কথা কি বলতে পারি মা যে, ঠাকুর কেবল আমাদের ?"

"তবে ?"

হার মানিয়া জ্যাঠাইমা শেষে কহিলেন, "আচ্ছা, ইচ্ছে হয়, যাস্ তবে আমাদের সঙ্গে। তোর শাশুড়ী ত আপত্তি করবে না ?"

"না, ভাল কাযে কেন আপত্তি করবেন ? কখনও ত করেন না। কাল ত আপনা থেকেই তিনি ঠাকুরকে প্রণাম করেই এলেন। আর মনে নেই তিনি তখন যা বলেছিলেন ?"

"তা কি আর মনে নেই মা ? আচ্ছা, যাস্ তবে। হয় ত তোর দেখাদেখি ছোটবৌও যাবে। মন্দ কি ? মায়ের লীলে, তোদের হাতে পূজো এবার নেবেন—তাই বুঝি, বাড়ীতে তোদের টেনে এনেছেন।"

"কিন্তু, পুরুতঠাকুর ত আপত্তি করবেন না ? শুনেছি আপনা-দের বামুনঠাকুররা বড় গোঁড়া।"

"তা—আমরা বললে বোধ হয় করবেন না। যদি করেন—সে তাঁর প্রণামী ব'লে দশ পাঁচ টাকা বেশী ধ'রে না হয় দেওয়া যাবে।"

"না, জ্যাঠাইমা, ঘুষ দিয়ে আমি মায়ের পায়ে অঞ্জলি দেব না।"

"ঘুষ কি লো ?"

"ঘুষ বৈ কি ? আপনারা দিয়ে যে অঞ্জলি দেন, বেশী ক'রে তার জন্যে প্রণামী ধ'রে দিয়ে থাকেন ?"

"ও মা, তা কেন দেব ?"

"তবে আমার জন্যেই বা কেন দেবেন ? এই না বললেন, আমি এখন আপনাদের সঙ্গে সমান সমান।"

"বাপ রে বাপ ! মেয়েটা সত্যিই দেখছি পাকা ভট্চায। কথায় পারবার যো নেই। আচ্ছা তাই হবে। প্রণামী কিছু কবুল করব না। বুঝিয়েই অনুমতি আদায় ক'রে নেব ?"

তখন কি মনে হইল। কল্যাণী একটু ইতস্ততঃ করিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, কাল যে মেজদি আপনাদের সঙ্গে অঞ্জলি দিতে গেলেন না ?"

একটু মুখ বাঁকাইয়া জ্যাঠাইমা উত্তর করিলেন, "আর ওর কথা ছেড়ে দে বাছা। তোরা কত লেখাপড়া করেছিস্, আর দুটোকথানেক ইংরিজী প'ড়েই ওর মাথা বিগড়ে গেছে। ওই যে বলে, 'অল্প বিদ্যে

অম্বরী'—ওর হয়েছে ভাই। আবার সকালে উঠেই চা খেল। হ্যাঁ লো, তুই আজ চা খাস্‌নি ?"

"না, জ্যাঠাইমা, খাইনি, শুদ্ধুই আছি।"

"আচ্ছা, ব'স্ তুই। আমি আসি—ঠাকুরপোকে আর পুরুত-ঠাকুরকে ব'লে ক'রে সব ঠিক ক'রে।"

বলিয়া জ্যাঠাইমা উঠিয়া গেলেন। রাজীবলোচন অতি আনন্দে এই প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন, কিন্তু পুরুতঠাকুর চমকিয়া উঠিলেন। এ যে একবারে জাতিমারা কথা, কিন্তু তেজস্বিনী এই যজমানের গৃহিণীর কোনও কথায় প্রতিবাদ করার অভ্যাসই তাঁহার ছিল না, ভরসাও বড় পাইতেন না। একটু খুঁৎ খুঁৎ করিয়া শেষে—বধূ গঙ্গা-স্নান করিয়া কলুষমুক্তা হইয়াছে, এই ওজুহাতটা মনে ধরিয়া সম্মতি দিলেন। ইহাও ভাবিলেন, যদি কলুষস্পর্শ তাঁহার কিছু হয়ও, বৎসরের মধ্যে একবার গিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া আসিবেন। না পারেন, প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ অগত্যা একটা ভোজ্য উৎসর্গ করিবেন।

দ্বিপ্রহরে কল্যাণীকে লইয়া হুলু-শঙ্খধ্বনিসহ সকলে চণ্ডীমণ্ডপের দিকে যাত্রা করিলেন। সৌদামিনীও একখানি গরদ পরিয়া আনন্দে ইঁহাদের সঙ্গে চলিলেন। সুনীলা অবাক্ হইয়া দ্বারে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল। তাহাকে কেহ ডাকিল না, একবারে উপেক্ষা করিয়াই গেল! মনে মনে ইহাতে একটু রাগ হইতেছিল, কিন্তু কল্যাণী আজ যে আদর্শ দেখাইল, মনে মনে তার কাছে সে পরাভব স্বীকার না করিয়াও পারিল না। অভিমান আর বেশীক্ষণ রাখিতে পারিল না। গরদের একখানি শাড়ী তাড়াতাড়ি বাহির করিয়া সে পরিল, দ্রুত-পদক্ষেপে মণ্ডপে গিয়া পৌঁছিল।

একবার অঞ্জলি দেওয়া হইল, দ্বিতীয়বার পুষ্প, বিল্বপত্র হাতে লইয়া ব্রহ্মময়ী চাহিয়া দেখিলেন, মেজবৌও অপর সকলের সঙ্গে পুষ্পাঞ্জলি হাতে লইয়া দাঁড়াইয়াছে।

চা খাইয়াছিল যে! কিন্তু মা জগদম্বার আজ লীলাই এই! ব্রহ্ম-জ্ঞানী, চা-পায়িনী, সুবোধ অবোধ সকল মেয়েকেই মা আজ টানিয়া তাঁহার পায়ে আনিয়াছেন—তাঁহার পূত চরণতলে, অমৃতদৃষ্টির পরশ-ফলে শুচি-অশুচি সকলেই সমান পবিত্র হইয়াছে। মনে পড়িল,—

"অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ॥"

আর মনে পড়িল, দেবীমাহাত্ম্যের সেই অমূল্য শ্লোকরত্ন,—

"বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ,
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ,
কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরাপরোক্তিঃ॥"

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত।

মায়া-মৃগী

পুণ্য-প্রবাস ধন্য আমার হ'ল যাহার গুণে—
লাজ পা'বে সে পরিচয়ে, কায কি সে নাম শুনে,
সে যে হৃদয়-হরণী, সে যে তড়িত-বরণী,
সোনার হরিণ চরণ যে তার ছোঁয় না ধরণী,
অঘ্রাণে যে আমার প্রাণে আনে সে ফাল্গুনে—
ধরবো তা'রে হৃদ্-মাঝারে কল্পনা-জাল বুনে।

শিষ্ট নয় তার মিষ্ট হাসি, দুষ্টামীতে মাখা—
স্বপন-মগন কমল-নয়ন ভাবে আধেক ঢাকা,
বাক্যে সুধা বৃষ্টি ঝরে, দৃষ্টি স্মরণ সৃষ্টি করে,
বিম্বামৃতের পরশ মিশে সরস বিম্বাধরে,
তার সরু সরু জোড়া ভুরু ধনুর মত বাঁকা
পদ্ম-মুখের 'পরে যেন ভ্রমর-পাঁতি আঁকা!

পরণে তার রাঙ্গা পেড়ে শান্তিপুরে ডুরে,
অঙ্গ ঘেরি' রঙ্গে মরি, কেমন গেছে ঘুরে,
চাঁদের আলোর গড়া কায়া, পড়ে না তার ধরায় ছায়া,
সে যে আমার গোপন-রাখা, স্বপন-মাখা মায়া,
বাস করে সে সঙ্গোপনে মনের অন্তঃপুরে,
সকাল সাঁঝে সকল কাযে আছে হৃদয় জুড়ে।

পুণ্য-প্রবাস ধন্য আমার হ'ল তাহার প্রেমে,
বয়স আমার উজান বেয়ে গেল হঠাৎ থেমে,
শৈলে ঝরায় নির্ঝরিণী, মরুর মাঝে মন্দাকিনী,
সঙ্গিনী মোর, রঙ্গিণী মোর এমনই মায়াবিনী,
তা'রি আশে বোশেখ মাসে শ্রাবণ আসে নেমে,
পরশে তা'র প্রাণের আঁধার উজল হ'ল হেমে।

ভোর না হ'তেই ভাবি কখন্ সূর্য্যি যাবে পাটে,
তখন তাহার দেখা পা'ব বৈতরিণীর ঘাটে,
আপন মনে মুদে আঁখি, হৃৎ-কমলে তারে রাখি,
ধ্যানের অতীত হ'য়ে আবার দেয় সে মোরে ফাঁকি,
লুকোচুরী খেলায় যে তা'র পরাণ আমার কাটে,
ভয়-ভরসায় নাগর-দোলায় প্রবাস-বাসর কাটে!

সে দিন যখন সন্ধ্যাছায়া নাম্‌লো নদীর তীরে,
বাজল ঝাঁঝর, ঘণ্টা, কাঁসর মন্দিরে মন্দিরে,
বুকের ব্যথা চেপে বুকে, বিদায় নিলাম হাস্যমুখে,
কইনু, "মোদের লেনা-দেনা আজ থেকে যাক্ চুকে,"
নয়ন-নীরে ভেসে হেসে বলে তখন ধীরে—
"মিথ্যা বিদায়, আমার মায়ায় আস্‌তে হবে ফিরে।"

হায় রে নারী, বুঝ্‌তে নারি তুমি কিসের জোরে,
স্পর্দ্ধাভরে এমন কথা বলতে পার মোরে,
ছিলে অশরীরী মায়া, প্রেমে রচি' তোমার কায়া,
তোমার হলেম বন্দী আমি, আলোর যেমন ছায়া,
হায় ক'রে হায়, পরেছিলাম তোমায় মোহের ঘোরে,
সে হায় এখন নিগড় হয়ে বাঁধ্‌ল মায়ার ডোরে!

শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

অ্যালুমিনিয়াম-শিল্প

অ্যালুমিনিয়ামের সহিত আজকাল আমাদের অনেকেই সুপরিচিত। বর্ত্তমান বৎসরে অ্যালুমিনিয়ামের পূর্ণ এক শত বৎসর বয়ঃক্রম হইল। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মণ বৈজ্ঞানিক হ্বলর (Vohler) এই ধাতুর অস্তিত্ব সাধারণের গোচরীভূত করেন। উক্ত বৈজ্ঞানিক শুধু অ্যালুমিনিয়াম আবিষ্কার করিয়াই মানবজাতির অশেষ উপকারসাধন করেন নাই, নানাপ্রকার জৈব অথবা অঙ্গারক পদার্থ যে পরীক্ষাগারে কিংবা কারখানায় প্রস্তুত হইতে পারে, তাহা Urea প্রস্তুত দ্বারা তিনি প্রত্যক্ষ প্রমাণ করিয়া দেন। বস্তুতঃ কৃত্রিম রং, রেশম, রবর, সুরা ইত্যাদি যে সকল দ্রব্য কারখানায় প্রস্তুত হইয়া উক্ত দ্রব্যাদির ব্যবসায়ে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে, সে সকল দ্রব্যের কৃত্রিম প্রথায় গঠন করিবার কার্য্যে হ্বলরের ইউরিয়া আবিষ্কারই বৈজ্ঞানিকগণকে প্রথম অনুপ্রেরণা প্রদান করে।

অভ্যুত্থানের ইতিহাস

বৈজ্ঞানিকপ্রবর হ্বলর স্বীয় পরীক্ষাগারে অ্যালুমিনিয়ামের প্রথম সন্ধান পাইলেও বহু বৎসর চেষ্টা করিয়াও ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে উহা কয়েক ভরির অধিক পরিমাণে প্রস্তুত করিতে পারেন নাই। তিনি ইহা ব্যবসায়ে প্রয়োগ করিতে ব্যস্ত ছিলেন না। সে কার্য্যে মন নিয়োগ করেন ফরাসী বৈজ্ঞানিক Saint Clere Deville। তাঁহার Glaciereএ সংস্থাপিত ক্ষুদ্র কারখানা হইতে কয়েক বৎসর যাবৎ পৃথিবীর অ্যালুমিনিয়ামের অভাব পুরণ হইত। তৎপরে আরও দুইটি ফরাসী কারখানা অ্যালুমিনিয়াম প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তখনও অ্যালুমিনিয়াম মহার্ঘ্য ধাতু; প্রতি আউন্স (প্রায় আড়াই তোলা) ২৩।২৪ টাকা দরে বিক্রয় হইত। এমন কি, উহা এত বহুমূল্য ধাতু ছিল যে, ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন স্বীয় শিশুসন্তানকে অ্যালুমিনিয়ামের খেলনা উপহার দিয়াছিলেন।

কিন্তু এরূপ অবস্থা অধিক দিন থাকিল না। সর্ব্বপ্রথমে অ্যালুমিনিয়াম Cryolite নামক খনিজ পদার্থ হইতে প্রস্তুত হইত। তাহাতে খরচ অনেক পড়িত। ১৮৬০-৬৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে Bauxite অ্যালুমিনিয়াম প্রস্তুতের কাঁচা মাল হিসাবে গৃহীত হয়। সেই সময় হইতেই এই ধাতুর ব্যবহারিক প্রয়োগের সূচনা হয়। অবশ্য, বৈদ্যুতিক প্রণালীতে প্রস্তুত না হইলে অ্যালুমিনিয়াম এত সস্তা হইতে পারিত না। বৈদ্যুতিক প্রথার প্রথম উদ্ভাবক প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক Bunsen। কিন্তু বর্ত্তমান প্রচলিত প্রথা তাঁহার প্রথা নহে। উহা পরবর্ত্তী কালে নানা বৈজ্ঞানিকের চেষ্টায় উদ্ভাবিত হইয়াছে।

কাঁচা মাল

বক্সাইট অ্যালুমিনিয়াম শিল্পের কাঁচা মাল অথবা raw product। ইহা খনিজ দ্রব্য। সাধারণ, বিশেষতঃ কাঁকুরে মাটীর সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। ইহাতে লৌহ ও টিটানিয়ম-ঘটিত লবণাদিও মিশ্রিত থাকে। বিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়াম প্রস্তুত করিতে হইলে সেগুলি অবশ্য পরিবর্জ্জনীয়। বর্ত্তমান সময়ে যে কয়েকটি দেশ হইতে অ্যালুমিনিয়াম প্রস্তুতোপযোগী কাঁচা মাল পাওয়া যায়, তন্মধ্যে অ্যামেরিকার ক্যানাডা, এবং য়ুরোপের ফ্রান্স ও আয়র্লণ্ড অন্যতম। ভারতের কতিপয় স্থানে বক্সাইট পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু এক মহীশুর ভিন্ন অন্য কুত্রাপি ইহাকে শিল্পে প্রয়োগের বিশেষ চেষ্টা করা হয় নাই।

বক্সাইট দুই প্রকারের;—শ্বেত ও লোহিত। শ্বেত জাতি Aluminous sulphate এবং অন্যান্য তাপসহ দ্রব্যাদি প্রস্তুতের উপযোগী; লোহিতজাতি অ্যালুমিনিয়াম প্রস্তুতের জন্য প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ইহাও জানা উচিত যে, সর্ব্বস্থানের বক্সাইট সমান গুণশালী নহে। সিলিকন্ ও টিটানিয়ম বক্সাইটের আবর্জ্জনা বলিতে পারা যায়। যাহারা অ্যালুমিনিয়ামের চাদর প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার

জন্য বক্সাইট ক্রয় করেন, তাঁহারা এরূপ বক্সাইট চাহেন—যাহাতে উক্ত দুইটি উপাদান একত্র শতকরা ৫ ভাগের অধিক না থাকে। এতদ্ভিন্ন যে বক্সাইটে শতকরা ১৫ ভাগের অধিক iron oxide থাকে, তাহাও বাজারে সুবিধা দরে বিক্রয় হয় না। বস্তুতঃ সর্ব্বপ্রকার আবর্জ্জনা বাদ দিয়া যে বক্সাইট হইতে শতকরা ৬০ ভাগ মাত্রায় ধাতব অ্যালুমিনিয়াম প্রস্তুত হওয়া সম্ভবপর, তাহা কেবল ফ্রান্স দেশেই পাওয়া যায়। মার্কিণের বক্সাইট তদপেক্ষা নিম্ন শ্রেণীর। পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, মহীশূরের বক্সাইটে শতকরা ৫২½ ভাগ অ্যালুমিনিয়াম, ১৪½ ভাগ iron oxide এবং প্রায় ৬ ভাগ টিটানিয়ম্ ও সিলিকন্ আছে। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, মহীশূরজাত বক্সাইট খুব উচ্চ শ্রেণীর নহে। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, মহীশূর সরকার স্বীয় দেশ-জাত বক্সাইট বিলাতী বাজারে যাচাই করিতে ছাড়েন নাই। তাহার ফলে জানিতে পারা গিয়াছে যে, মহীশূর বক্সাইট হইতে আরও অধিক পরিমাণে অ্যালুমিনিয়াম পাওয়া যাইতে পারে এবং সময়ে সময়ে উন্নত প্রস্তুতপ্রণালী অবলম্বন দ্বারা আবর্জ্জনার মাত্রাও খুব কম করা সম্ভবপর।

প্রস্তুত-প্রণালী

অ্যালুমিনিয়াম ধাতু নিষ্কাশন করিতে হইলে প্রথমতঃ বক্সাইটকে পুড়াইয়া চূর্ণ করিতে হয়। তৎপরে লৌহ ও ইস্পাত-নির্ম্মিত পাত্রে কষ্টিক সোডার দ্রাবণ সহযোগে উক্ত বক্সাইট-চূর্ণ সিদ্ধ করা হইয়া থাকে। এই সময়ে প্রতি বর্গ-ইঞ্চে প্রায় ৮০ পাউণ্ড চাপ দরকার হয়। এই প্রক্রিয়ার ফলে বক্সাইট-স্থিত অ্যালুমিনিয়াম দ্রাবণ জলে sodium aluminate রূপে গলিয়া যায়। অদ্রবণীয় অংশ ও iron oxide প্রভৃতি হইতে উক্ত দ্রাবণ ছাঁকিয়া পৃথক্ করিয়া লওয়া ধাতু-প্রস্তুত কার্য্যে তৃতীয় স্তর। পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুতীকৃত অধঃপাতিত অ্যালুমিনিয়াম এক্ষণে পরিষ্কৃত দ্রাবণের সহিত যোগ করিয়া দ্রাবণ সজোরে আলোড়ন করিলে aluminium hydrate পৃথক্ হইয়া পড়ে। এই aluminium hydrateকে ছাঁকিয়া, ধুইয়া ও শুষ্ক করিয়া লইয়া আবার দগ্ধ করিলেই উহা বৈদ্যুতিক প্রথায় (electrolysis) অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনের কাঁচা মাল হইল। Aluminum hydrate পৃথক্ হইবার পর মূল দ্রাবণের যে অংশ থাকিয়া যায়, তাহাও ফেলিয়া দেওয়া হয় না, পরে বক্সাইট সিদ্ধ করিবার সময় ব্যবহৃত হয়। একবারে বিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়ামের প্রস্তুত খরচ এত অধিক যে, অ্যালুমিনিয়াম ধাতু প্রস্তুত-কারকগণ শতকরা ৯৮ ভাগ বিশুদ্ধ ধাতু লইয়াই সন্তুষ্ট থাকেন এবং তাহাই অ্যালুমিনিয়াম-জাত সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যাদি প্রস্তুতে প্রয়োগ হয়। তাহাতে দ্রব্যাদি না খারাপ হইলেও অবিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়ামে যে একটি নির্দ্দিষ্ট প্রকার গন্ধ অনুভব করা যায়, এই সকল দ্রব্যাদিতেও তাহা আছে।

নানাবিধ কার্য্যে ব্যবহার

সাধারণ ব্যবহার্য্য যাবতীয় ধাতুর মধ্যে অ্যালুমিনিয়াম সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক হইলেও অতি অল্পসময়ের মধ্যে ইহা প্রভূত প্রসার লাভ করিয়াছে। অবশ্য, সুলভতাই ইহার অন্যতম কারণ। কিন্তু একমাত্র কারণ নহে। অ্যালুমিনিয়াম অপেক্ষাকৃত কোমল এবং ইহাতে 'মরিচা' ধরে না। ইহার বর্ণও কতকটা রৌপ্যের ন্যায়, এই সমুদয় গুণের জন্য নানাবিধ শিল্পে ইহার ব্যবহার বাড়িয়া চলিয়াছে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য ধাতু অপেক্ষা অ্যালুমিনিয়াম লইয়া কায করা সোজা। শক্ত হইয়া গেলে ইহাকে নরম করা যায় এবং ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব কম। অ্যালুমিনিয়মের আরও একটি বিশেষ গুণ আছে—ইহা অক্সিজেনের সহিত ত্বরিত মিলিত হয়; অ্যালুমিনিয়াম পুড়াইলে উগ্র উত্তাপ উদ্ভূত হয়। ম্যাঙ্গানিজ মলিব্ডেনাম, তাম্র-ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি ধাতু প্রস্তুতে অ্যালুমিনিয়ামের এই বিশেষ গুণের সুবিধা গ্রহণ করা হইয়া থাকে। ইহাকে Goldschmidtএর ধাতু নিষ্কাশন প্রথা বলা হয়। ঢালাই ইস্পাত প্রস্তুতে অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহার দ্বারা পূর্ব্বে যে সমুদয় গহ্বর ও ছিদ্রাদি থাকিত, তাহা আজকাল থাকে না। লোহা ও ইস্পাত ঘুড়িতেও ইহার প্রয়োজনীয়তা আছে। অ্যালুমিনিয়াম-চূর্ণ প্রধানতঃ অ্যালুমিনিয়াম বর্ণের রং প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হয়; কিন্তু ইহার অপর ব্যবহারও আছে। ইহার বিস্ফোরক গুণের জন্য ammonal শ্রেণীর বিস্ফোরক পদার্থাদি প্রস্তুতে প্রয়োগ করা হয়। খনি প্রভৃতির তলদেশে অথবা কঠিন মৃত্তিকাভ্যন্তরে বিস্ফোরক ব্যবহার করিতে হইলে বিশেষভাবে প্রস্তুত অ্যালুমিনিয়াম-চূর্ণ ব্যবহৃত হয়। এক বিন্দু জল সংযোগমাত্র উহা প্রচণ্ড

বেগে ফাটিয়া গিয়া চতুর্দ্দিকের পাথর সমূহ আলগা করিয়া দেয়। বক্সাইটও abrasiveরূপে প্রচুর পরিমাণে নিযুক্ত হইয়া থাকে। কৃত্রিম রত্ন প্রস্তুতের বৈদ্যুতিক চুল্লীতে অত্যন্ত উগ্রতাপ আবশ্যক হয়। সেরূপ চুল্লী প্রস্তুত করিতে বক্সাইটই উপযুক্ত উপাদান। অ্যালুমিনিয়ামের বিবিধ প্রকার গুণ ও ব্যবহার বর্ণনা করিবার স্থান বর্ত্তমান প্রবন্ধে নাই। আমরা এ স্থলে সংক্ষেপতঃ মাত্র কয়েকটি জিনিষের উল্লেখ করিতেছি।

অ্যালুমোনিয়াম-জাত দ্রব্যাদি

অ্যালুমিনিয়ামের দ্রব্যাদির মধ্যে রন্ধনকার্য্যে ব্যবহৃত পাত্রাদির সহিতই সাধারণতঃ সকলে বিশেষ পরিচিত। গৃহস্থালীর সকল প্রকার তৈজসপত্রাদিই অ্যালুমিনিয়াম হইতে প্রস্তুত হইয়াছে। জর্ম্মণীতে প্রস্তুত কতিপয় শ্রেণীর পাত্রের কারুকার্য্য উচ্চদরের। সেরূপ দ্রব্য এখনও এতদ্দেশে প্রস্তুত হয় নাই। মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে দুই প্রকার প্রথায় অ্যালুমিনিয়াম পাত্রসমূহ প্রস্তুত হয়;—(১) ঘূর্ণন (spinning)—ইহা অনেকটা কুম্ভকারের চাক ঘুরাইয়া হাঁড়ি প্রস্তুতের অনুরূপ। এই প্রথায় প্রস্তুতীকৃত দ্রব্যাদি পাতলা পাতলা হয় এবং সহজে বাঁকিয়া চুরিয়া যায়। (২) ঢালাই প্রথা:—এই প্রথায় প্রস্তুত পাত্র সকল দৃঢ়তর ও মজবুদ; ঢালাই জিনিষের উপরিভাগ প্রথমতঃ অমসৃণ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গহ্বরময় থাকে। পরে পালিশ দ্বারা উক্ত দোষ নিবারণ করিতে হয়। পালিশ না করিলে ঢালাই পাত্র খারাপ দেখায় এবং শীঘ্র ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। বর্ত্তমান সময়ে 'শীতল প্রথা' প্রবর্ত্তিত হওয়ায় ঢালাই অ্যালুমিনিয়ামের নানা কার্য্যে ব্যবহারের ক্ষেত্র সমধিক পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ঢালাই করিবার ছাঁচ প্রভৃতিও প্রচুর উন্নতিলাভ করিয়াছে।

গৃহস্থালীর তৈজসপত্রাদির পরই তারের উল্লেখ করিতে পারা যায়। অ্যালুমিনিয়াম তার তামার তার অপেক্ষা পাতলা বটে, কিন্তু তার রজ্জু (Cable) প্রস্তুতের জন্য ইহা তাম্র অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে, অথচ মূল্য অনেক সুলভ। অ্যালুমিনিয়াম পাতেরও ব্যবহার ক্রমশ: বাড়িতেছে; খুব পাতলা পাত শোভাবর্দ্ধক কারুকার্য্যে রৌপ্যপত্রের স্থান অধিকার করিতেছে। অন্য দিকে মোটা পাত মোড়কের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। মোটর গাড়ীর বিশেষ বিশেষ অংশ নির্ম্মাণেও অ্যালুমিনিয়ামের চাহিদা নিতান্ত কম নহে।

অ্যালুমিনিয়াম নানা ধাতুর সহিত মিশ্রিত করিতে পারা যায়; বস্তুতঃ ইদানীন্তন নানা প্রকার অ্যালুমিনিয়াম-মিশ্র (alloy) বাজারে দেখা দিয়াছে। তন্মধ্যে ব্যবহারের হিসাবে নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রধান:—Al-bronze;—ইহা দেখিতে সোনার ন্যায়; ঢালাই লোহার ন্যায় শক্ত এবং সহজে পালিশ করা চলে। Al-silver—ইহাতে শতকরা ৪ ভাগ রৌপ্য আছে, এবং শৈত্য ও উত্তাপে কম পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া তুলাদণ্ড প্রভৃতি অধিক মাপের যন্ত্রাদি প্রস্তুতে ইহার যথেষ্ট প্রয়োগ হয়। যাহাকে সাধারণতঃ aluminium silver বলে, তাহাতে রৌপ্য আদৌ নাই; কেবলমাত্র তামা নিকেল আছে এবং উহার গুণাবলী German silver-এর সমতুল্য। ম্যাগনেসিয়মের সহিত অ্যালুমিনিয়াম সংমিশ্রণে যে মিশ্রধাতু প্রস্তুত হয়, তাহা উড়ো জাহাজের এঞ্জিন ও অন্যান্য সাজসরঞ্জামে ব্যবহৃত হয় বলিয়া তাহার উৎপাদন শনৈঃ শনৈঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। ইংলণ্ড ও জর্ম্মণীতে নানা প্রকারের মিশ্র অ্যালুমিনিয়াম প্রস্তুতের কার্য্যে কতিপয় বৈজ্ঞানিক মন নিয়োগ করিয়াছেন এবং এ সম্বন্ধে বিস্তর অনুসন্ধান চলিতেছে।

ভারতে অ্যালুমিনিয়াম

বর্ত্তমান সময়ে এতদ্দেশে প্রস্তুত যে সমুদয় অ্যালুমিনিয়ামজাত দ্রব্যাদি দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমুদয়ের প্রকৃত জন্মদাতা Sir Alfred Chatterton এবং তাহাদের আদি জন্মস্থান দাক্ষিণাত্যে। বিদেশ হইতে চাদর আমদানী করিয়া তাহা হইতে অ্যালুমিনিয়াম-পাত্র প্রস্তুতের কার্য্য বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে মাদ্রাজ অঞ্চলেই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। তথা হইতে এখন ভারতের নানা স্থানে এইরূপ কার্য্যের প্রারম্ভ হইয়াছে। কলিকাতাতেও দুইটি কারখানা চলিতেছে। কিন্তু ইহাকে আংশিকভাবেই অ্যালুমিনিয়াম-শিল্প বলিতে পারা যায়।

ভারতে অ্যালুমিনিয়াম-শিল্পের ভিত্তি বিলাতী মাল লইয়া। সরকারী হিসাবে দৃষ্ট হয় যে, ১৯২২-২৩ খৃষ্টাব্দে ৮৮ লক্ষ মূল্যের অ্যালুমিনিয়াম ও তজ্জাত দ্রব্য আমদানী হইয়াছিল; ১৯২৪-২৫ খৃষ্টাব্দে উহা ১ কোটির উপরেও উঠিয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে অপ্রস্তুতীকৃত ধাতু অর্থাৎ

চাঙ্গড় (bars, blocks) প্রভৃতি ৩ লক্ষ, প্রস্তুতী-কৃত ধাতু (চক্রাকারে কর্ত্তিত ও চাদর) ৮৩ লক্ষ ও অ্যালুমিনিয়াম সলফেট ১০ লক্ষ টাকার। ইহা হইতেই প্রতীয়মান হইবে যে, চক্রাকারে কর্ত্তিত অ্যালুমিনিয়াম অথবা উহার চাদরেরই এতদ্দেশে চাহিদা অধিক। তাহা লইয়াই নানা প্রকার তৈজসপত্র এতদ্দেশে প্রস্তুত হয়। যদি কোন রকমে উক্ত প্রকার প্রস্তুতীকৃত অথবা অপ্রস্তুতীকৃত ধাতু আমদানীর পথ রুদ্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে ভারতের বর্ত্তমান অ্যালুমিনিয়াম-শিল্পেরও তিরোধান হইবে।

কিন্তু বক্সাইট নামক যে খনিজ পদার্থ হইতে অ্যালুমিনিয়াম প্রস্তুত হয়, তাহার অভাব ভারতে নাই। মহীশূরে উহা প্রাপ্তির কথা আগেই বলা হইয়াছে। ভারতের অন্যান্য স্থানেও অল্পবিস্তর মাত্রায় বক্সাইট পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু অ্যালুমিনিয়াম ধাতু-নিষ্কাশনের চেষ্টা এ পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ইহা অবশ্য বলা আবশ্যক যে, অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদন স্বল্প-আয়াস ও ব্যয়সাধ্য কার্য্য নহে। প্রচুর অর্থব্যয়, ধারাবাহিক চেষ্টা ও অভিজ্ঞগণের সাহায্য এ সমস্তই আবশ্যক। কিন্তু সর্ব্বোপরি প্রয়োজনীয় যে প্রাকৃতিক সুবিধা—যাহা না হইলে আজকালকার বাজারদরে অ্যালুমিনিয়াম ধাতু উৎপাদন অসম্ভব, তাহা ভারতে বিরল নহে। আমরা সুলভ বৈদ্যুতিক শক্তিকে লক্ষ্য করিয়াই এ কথা বলিতেছি। প্রাকৃতিক জলপ্রপাত হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি সংগ্রহ করিতে পারিলে এবং নিকটবর্ত্তী স্থানে বক্সাইট পাওয়া গেলে অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদন লাভজনক হইতে পারে। মহীশূর রাজ্যে এই উভয় অবস্থাই বর্ত্তমান। সেই জন্য আমরা আশা করি যে, উক্ত রাজ্যে অ্যালুমিনিয়াম-সম্বন্ধীয় যে গবেষণা কয়েক বৎসর হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা ভারতে অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনের কারখানায় পর্য্যবসিত হইবে।

অ্যালুমিনিয়ামের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রবর্ত্তনের সময়ের অনুপাতে ইহার প্রসার অসম্ভব পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে যে ধাতুর উৎপাদনের মাত্রা প্রায় ৮০ টন ছিল, তাহা এখন ২ লক্ষ টন পরিমাণে উৎপাদিত হইতেছে এবং তাহাতেও জগতের চাহিদা মিটিতেছে না। আবার উৎপাদনের আধিক্যের সঙ্গে দরও কমিয়া গিয়াছে। এখন বিলাতী দর সের প্রতি প্রায় মোটামুটি ২ টাকা। বলা বাহুল্য যে, এরূপ সুলভ অথচ বহুবিধ শিল্পে প্রয়োগোপযুক্ত ধাতুর প্রভূত প্রসারের পথ রোধ করিবার ক্ষমতা অন্য কোন ধাতুরই নাই। লৌহযুগ, তাম্রযুগ প্রভৃতির ন্যায় ভবিষ্যতে এক সময় অ্যালুমিনিয়াম যুগও আসিতে পারে।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

সাতের আত্মকথা

আমার কথা শুনবে যদি গোল করো না ভাই,—
গোটা কয়েক বল্‌ছি, শুনে অবাক্ হবে তাই!
এই দেখ না 'সাতকাণ্ডে'ই পুরাণ রামায়ণ,—
'সপ্ত রঙের' ইন্দ্রধনু কেমন সুশোভন!
'সপ্তদ্বীপা' এই পৃথিবী শাস্ত্র পুরাণ বলে,
ঘেরা আছে তাহাও আবার 'সাত সাগরে'র জলে!
'সাতপুরুষে'র ভিটার মায়ায় প্রাণটা বড় টানে,
'সাত দিনেতে' সপ্তাহ তা সকল লোকেই জানে!
'নরের দশা সাতটি রকম' বলেন সেক্ষপীর,
'সাতটি তারা' নিয়েই আবার সৃজন সপ্তর্ষির।
'সাত রাজার ধন' একটি মণি লয় যে সবে মানি,
সূর্য্যদেবের রথখানি বয় সাতটি ঘোড়ায় টানি।
'সপ্ত গ্রামের' জমীদারের দয়া যদি হয়,—
'সাত জন্মের' 'সাত খুন মাপ' সত্য সুনিশ্চয়!
'সাত চড়েতে অনেক ছেলে কথাই নাহি কয়,
'সাত রাত আর সাত দিন যে ঝড়বৃষ্টি হয়!
'সপ্ত ডিঙ্গা' সাজিয়ে চলে বণিক চন্দ্রধর,—
'সপ্ত মাতা' সবার চেয়ে পূজ্য ধরার পর!
ধনীর কোপে পড়লে খাবে 'সাত ঘাটেরই জল',
'সাত তুরুপে' হয় না খেলা এমনি মজার কল!
'সাত ভাই যে চাঁপা' ফুটে গাছটি আলো করে,
সপ্তশলা চক্র ঘুরে জ্যোতির্ব্বিদের তরে!
সা, রে, গা, মা, 'সাতটি সু'রে 'সপ্তস্বরা' বাজে'—
'সাত তালেতে' ফিরে মানুষ কাযের ভিড়ের মাঝে;
'সপ্তরথী' ঘিরেছিল অভিমন্যু বীরে,
'সপ্ত তাল' বিদ্ধ হ'ল রামচন্দ্রের তীরে!
'সাতটি জিনিষ অত্যাশ্চর্য্য' বিভব পৃথিবীর,
'সাত পাকে'তে পড়বে বাঁধা হও না যত বীর!
সাতের ধার গায়ের জোরে যদি না কেউ ধারো,
খবর দিও পাক কয়টি খুলতে যদি পারো!

শ্রীবিজয়মাধব মণ্ডল।

কবির কপাল

যশোহর সাহিত্য-সম্মিলনের দ্বিতীয় দিবসের অধিবেশনে কতিপয় তরুণ সাহিত্যিকের প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠ হইল। নানা স্থানের সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিকগণ দেবী ভারতীর পূজাপ্রাঙ্গণে সমবেত হইয়াছিলেন। বৎসরে একবার করিয়া এই পুণ্য সম্মিলন বাঙ্গালীর প্রাণে একটা মধুর রসের উৎস সৃষ্টি করিয়া তুলে।

সভাপতি মহাশয় কয়েকটি প্রবন্ধ ও কবিতার প্রশংসা করিয়া জনৈক তরুণ কবির "মা" শীর্ষক মনোরম কবিতাটির ভাষা, ভাব ও বিচিত্র বর্ণনাভঙ্গীর সবিশেষ প্রশংসা করিলেন। বর্ত্তমান যুগে তথাকথিত গীতি-কবিতার প্লাবন-কাহিনীর উল্লেখ করিয়া তিনি মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, 'মা' কবিতার রচয়িতা বয়সে নবীন হইলেও, সাহিত্যক্ষেত্রে নূতন নহেন। সর্ব্বাপেক্ষা আশার কথা, তিনি গতানুগতিকভাবে শুধু শব্দবৈচিত্র্য ও ছন্দোমাধুর্য্যের সাহায্যে অর্থহীন কবিতা না লিখিয়া, বাঙ্গালী-চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই সুন্দর, মধুর ও পবিত্র ভাবপূর্ণ কবিতা রচনা করিয়া বাঙ্গালীমাত্রেরই আশীর্ব্বাদ-ভাজন হইয়াছেন। মাতৃভাবের চির-উপাসক, মাতৃভক্ত বাঙ্গালী জাতি অধুনা প্রতীচ্য-প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া আত্মবিস্মৃত হইতেছে। ভাষা, ভাব ও কল্পনারাজ্যে স্বৈরাচার, অনাচার প্রবেশ করিয়াছে। পূতিগন্ধবিশিষ্ট অস্বাভাবিক ও অসামাজিক অবস্থার মিথ্যা—বস্তুতন্ত্রহীন বর্ণনায় বাঙ্গালার প্রাণ এবং দেহ সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে। সাহিত্যসাধনা না করিয়া যাহারা সাহিত্যের তপোবনে দৈত্যের ন্যায় প্রবেশ করিয়া ঋত্বিক্ ও যাজ্ঞিক-গণের তপোভঙ্গ করে এবং পবিত্র, ঋষিসেবিত উপবনের পবিত্র সৌন্দর্য্য কলুষিত করিয়া দেব—মাতার বেদীমূলে অমেধ্য পদার্থ পুঞ্জীকৃত করিয়া তুলে, তাহাদের অপরাধ অমার্জ্জনীয়। বাঙ্গালা সাহিত্যের এই দুর্দ্দিনে এই তরুণ কবির লেখনী হইতে জাহ্নবী-ধারার ন্যায় পবিত্র, হৃদ্য এবং মনোরম অমৃতধারা নিঃসৃত হওয়ায় তাঁহার আশা হইতেছে, একবারে আশাশূন্য হইবার প্রয়োজন নাই। এমন অনেক তরুণ সাহিত্যিক আছেন, যাঁহারা প্রকৃত সাধনার পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন এবং বাঙ্গালার প্রাণ ও বৈশিষ্ট্যের প্রতি তাঁহাদের ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও প্রীতি আছে। দানবীয় মায়ারচিত আপাত-মনোরম কুহকজালে মুগ্ধ হইয়া দেশের ও দশের সর্ব্বনাশসাধন তাঁহাদের দ্বারা হইবে না।

সভাপতি মহোদয়ের এই মর্ম্মস্পর্শিনী বক্তৃতা কাহারও কাহারও নিকট হৃদ্য না হইলেও অধিকাংশ রসজ্ঞ সাহিত্যিক ঘন ঘন করতালিধ্বনি সহযোগে তাঁহার মতের সমর্থন করিলেন। প্রিয়দর্শন তরুণ কবি বিনোদলালের সুন্দর আনন লজ্জার রক্তিমরাগে অনুরঞ্জিত হইয়া উঠিল। সত্য বটে, সমগ্র অন্তর দিয়া সে 'মা' কবিতাটি রচনা করিয়াছিল; কিন্তু সুধী সাহিত্যিকগণ যে তাহার এরূপ প্রশংসা করিবেন, ইহা সে একবারও কল্পনা করিতে পারে নাই।

সভাভঙ্গের পর সে এক অব্যক্ত আনন্দের বোঝা লইয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। কয়েক বৎসর ধরিয়া তাহার রচিত কবিতা প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। বন্ধুর দল তাহার কবিত্বশক্তির উচ্চ প্রশংসাও করিয়া থাকে সত্য, কিন্তু আজিকার মত অকপট প্রশংসা—বিশেষতঃ সভাপতির মত শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের নিকট হইতে এইরূপ মন্তব্য লাভ করিয়া সত্যই সে আপনাকে ধন্য মনে করিতেছিল।

"আপনিই কবি বিনোদলাল?"

ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বিনোদ দেখিল, সে দেবীপুরের নবীন

জমীদার শশাঙ্কমোহনের সম্মুখীন হইয়াছে। বিনোদলাল দেবীপুরের অধিবাসী, সুতরাং সে স্বদেশের প্রতাপশালী, সাহিত্য-রসিক, প্রসিদ্ধ ভূস্বামীকে চিনিত, তবে তাঁহার সহিত পরিচিত ছিল না। শশাঙ্কমোহন কদাচিৎ দেশে আসিতেন —বর্ত্তমান যুগে বাঙ্গালার অধিকাংশ জমীদারই স্বদেশের সঙ্কীর্ণ এবং বৈচিত্র্যহীন আবেষ্টনের মধ্যে সুখ না পাইয়াই রাজধানীর ভোগ-বিলাসকে চরম আশ্রয়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন—শশাঙ্কমোহনও তাঁহাদেরই দলভুক্ত ছিলেন। সুতরাং দেশের সহিত পরিচয় থাকিলেও, দেশবাসীর অনেকের সংবাদই তাঁহার জানা ছিল না। বিশেষতঃ ইন্দিরার বরপুত্র না হইলে যখন জগতে প্রতিষ্ঠালাভ সম্ভবপর হয় না, তখন দরিদ্র বিনোদলাল মহামান্য ধনকুবের জমীদার শশাঙ্কমোহনের সহিত পরিচিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিবে কিরূপে?

নবীন কবি নবীন জমীদারের সম্মুখে যেন বিব্রত হইয়া পড়িল।

শশাঙ্কমোহন এই প্রিয়দর্শন কবির লজ্জারক্ত সুন্দর মুখদর্শন এবং বিনয়-নম্র ব্যবহারে মুগ্ধ হইলেন। তিনি বলিলেন, "আপনার কবিতাটি চমৎকার হয়েছে। আপনি থাকেন কোথায়?"

বিনয়নম্র কণ্ঠে কবি বলিল, "আজ্ঞে, দেবীপুরে আমার বাড়ী।"

শশাঙ্কমোহন বিস্মিত হইলেন। "দেবীপুরে?—আমার জন্মভূমি—মাতৃভূমিতে এমন প্রতিভাশালী কবির জন্ম হয়েছে, অথচ আমি আপনাকে এত দিন চিনতুম না?"

বিনোদলাল কি তখন মনে মনে ভাবিতেছিল, সেটা কবির দুর্ভাগ্য, অথবা—

প্রসিদ্ধ অভিজাতবংশের অলঙ্কারস্বরূপ শশাঙ্কমোহন এক জন অখ্যাতনামা যুবকের সহিত আগ্রহভরে কি আলোচনা করিতেছেন, জানিবার জন্য জমীদারের কয়েক জন পার্শ্বচর তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিল। তাহারা শুনিতে পাইল, শশাঙ্কমোহন বিনোদলালের হাত ধরিয়া সহাস্যে বলিতেছেন, "আজ সত্যি আমি নিজেকে ভাগ্যবান্ ব'লে মনে করছি। আপনি যখন কলকাতায় যাবেন, অনুগ্রহ ক'রে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। আমিও দেশে গেলে আপনাকে সংবাদ পাঠাব। আচ্ছা, বন্ধু, এখন তবে আসি।"

বিনোদলাল নবীন জমীদারের শিষ্টাচারে অভিভূত হইয়াছিল। সে শশাঙ্কমোহন সম্বন্ধে ভিন্ন ধারণা পোষণ করিত।

২

আর যাহাই হউক, বাঙ্গালা দেশে সাহিত্য রচনা করিয়া, বিশেষতঃ কবিতা লিখিয়া উদরান্নের সংস্থান কখনই হয় না। বিনোদলাল উদীয়মান সুকবি বলিয়া জনসমাজে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠালাভ করিলেও তৈল, লবণ-তণ্ডুলের সমস্যা-সমাধানে অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল। পৈতৃক যৎসামান্য যে জমী-জমা ছিল, মাতা ও পত্নীর চিকিৎসার জন্য তাহা বিক্রীত হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু উভয়ের কাহাকেও যমদ্বার হইতে সে ফিরাইতে পারে নাই। দুইটি শিশুপুত্র লইয়া অসহ্য শোকেও তাহাকে বুক বাঁধিতে হইল। সে চাহিয়া দেখিল, আশেপাশে কোনও আত্মীয়-স্বজন নাই—যাহার কাছে সে নাবালক পুত্রযুগলকে রাখিয়া উদরান্নের সংস্থান করিবার জন্য চেষ্টা করিতে পারে। তাহার সহধর্ম্মিণীর শেষ ও একমাত্র স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ এই পুত্র দুইটিকে মানুষ করিতে হইবে। কিন্তু উপায় কোথায়?

অনেক প্রচেষ্টায় সে বড় পুত্রটিকে তাহার বড় ভাররার নিকট গচ্ছিত রাখিয়া আসিল। অবস্থাপন্ন মাসী মাতৃহীন বালককে আপন সন্তানের ন্যায়ই পালন করিবার আশ্বাস দিলেন। কনিষ্ঠ পুত্রটি তাহার মাতুলালয়ে রহিল। বিনোদলাল তাহার খরচের জন্য কিছু টাকা দিতেও প্রতিশ্রুত হইল।

বক্ষঃপঞ্জরের ন্যায় প্রিয়তম পুত্রযুগলকে নয়নের অন্তরালে রাখিয়া ভাগ্যান্বেষণে বিনোদলালকে কলিকাতায় যাইতে হইবে—কত কাল তাহাদের মুখ দেখিতে পাইবে না! বিনোদের কবি-হৃদয় যেন শতধা বিদীর্ণ হইতে চাহিল। কিন্তু দেশের মধ্যে পড়িয়া থাকিলে ত উদরান্নের কোনই সংস্থান হইবে না। শোকের ফল্গুধারা বুকের মধ্যে লুকাইয়া কবি কলিকাতায় যাত্রা করিল।

দেবীপুরের সুপ্রসিদ্ধ জমীদারের কলিকাতাস্থিত প্রাসাদে সে অতি সঙ্কোচে ও সন্তর্পণে প্রবেশ করিল। সে যাঁহার পূজারী, ইন্দিরার বরপুত্র-ভবনে তিনিও অতি সতর্কভাবে প্রবেশ করিয়া থাকেন। এক বৎসর পূর্ব্বে শশাঙ্কমোহনের নিকট সে যেরূপ সহৃদয় ব্যবহার পাইয়াছিল, তাহা মনে করিয়াই বিনোদলাল এখানে আসিতে সাহস পাইয়াছিল।

দ্বারবানের নিকট সংবাদ লইয়া সে জানিয়াছিল, বাবু এখন উপরেই আছেন। শোকে ও দুর্দ্দশায় বিনোদলাল অভিভূত হইলেও তাহার স্বাভাবিক প্রিয়দর্শন মূর্ত্তি তাহার অনুকূলে ছিল। বিশেষতঃ বেশভূষার পরিচ্ছন্নতার প্রতিও সে স্বভাবতঃ অনুরাগী। এ জন্য দ্বারবানের অভ্যস্ত দৃষ্টিও বিনোদলালের পরিচ্ছন্ন বেশভূষার অন্তরালে প্রার্থীর মনোবৃত্তির আবিষ্কার করিতে পারে নাই। তাই সে বিনোদলালের প্রদত্ত পরিচয়জ্ঞাপক লিপিখানি জমীদার বাবুর কাছে পৌঁছাইয়া দিল।

সুবৃহৎ উপবেশনকক্ষে শশাঙ্কমোহন অনুগ্রহপ্রার্থী স্তাবকগণে পরিবেষ্টিত হইয়া অপরাহ্নের আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন। বিনোদলাল তথায় নীত হইল। সে দরিদ্র কবি, কল্পনার মায়াবলে সে ইন্দ্রলোকের অবর্ণনীয় শোভা-সম্পদের বর্ণনা করিতে পারে; কিন্তু রাজধানীর সুরম্য প্রাসাদতুল্য অট্টালিকায়, বিলাসী জমীদারদিগের অমরাবতী-লাঞ্ছিত সজ্জিত কক্ষ কথনও দেখে নাই। সুতরাং পারিষদবৃন্দ-পরিশোভিত শশাঙ্কমোহনকে সেই সুসজ্জিত কক্ষমধ্যে দেখিয়া সে সঙ্কোচে যেন এতটুকু হইয়া গেল।

শশাঙ্কমোহন সমাদরে তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। সকলকে বুঝাইয়া দিলেন, কবি বিনোদলাল তাঁহাদের দেশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। কয়েক জন সাহিত্যসেবীও সেই বৈঠকে উপবিষ্ট ছিলেন—শশাঙ্কমোহন তাঁহাদিগের সহিত বিনোদলালের পরিচয় করাইয়া দিলেন।

নবীন কবি ধীরে ধীরে স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

"দেশ থেকে কবে এলেন, বিনোদ বাবু?"

"আজ্ঞে, আজ সকালেই এসেছি।"

"তা কৈ এতক্ষণ ত আপনাকে দেখি নি?"

শশাঙ্কমোহন বোধ হয় মনে করিয়াছিলেন, দেশের কবি, দেশের লোক নিশ্চয়ই তাঁহার গৃহে অথবা অতিথিশালায় আতিথ্য গ্রহণ করিবেন।

বিনোদলাল মৃদুস্বরে বলিল, "একটা মেসেই উঠেছি।"

"সেটা ভাল করেন নি। এখানে এলেই পারতেন।"

অনুগ্রহপ্রার্থীর দল বিনোদলালের প্রতি যে ভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল, তাহাতে নিশ্চয়ই প্রীতির দীপ্তি ফুটিয়া উঠে নাই।

কবি অপেক্ষাকৃত মৃদু কণ্ঠে বলিল, "আপনি আমাদের দেশের রাজা, আপনাদের আশ্রয়ে চিরকালই আছি। হয় ত এখানে আস্‌তেই হবে।"

শশাঙ্কমোহন বিনোদলালের ক্লিষ্ট মুখের প্রতি চাহিলেন।

আপরাহ্নিক চা ও সেই সঙ্গে নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য লইয়া পরিচারকগণ প্রবেশ করিল। অনুগ্রহপ্রার্থীদিগের কেহ কেহ আসনের উপর সোজা হইয়া বসিলেন।

শশাঙ্কমোহন বলিলেন, "একটু চা পান করুন, কবি?"

সলজ্জভাবে বিনোদলাল বলিল, "আজ্ঞে, চা আমি কথনও থাইনে।"

"আচ্ছা, জলযোগে আপত্তি ত নেই?"

প্রবলপ্রতাপ জমীদারের সহৃদয় ব্যবহারে বিনোদলাল কিছু আশ্বস্ত হইল। হয় ত তাহার ভগ্ন অদৃষ্টে কিছু সুরাহা হইতেও পারে।

জলযোগ ও চা-পানের পর কেহ কেহ সে দিনের মত গাত্রোত্থান করিলেন। কিন্তু কতিপয় স্তাবক স্থানত্যাগের কোন লক্ষণই প্রকাশ করিলেন না।

শশাঙ্কমোহন বলিলেন, "আমার কাছে আপনার কিছু বক্তব্য আছে, বিনোদ বাবু?"

কবির হৃদয়মধ্যে তথন তুমুল আলোড়ন চলিতেছিল। এত দিন কোনও মানুষের কাছে সে প্রার্থী হইয়া দাঁড়ায় নাই। তাহার যাহা কিছু আবেদন, অসঙ্কোচে সে শুধু দেবী ভারতীর কাছেই নিবেদন করিয়া আসিয়াছে।

"আছে, কিন্তু—"

শশাঙ্কমোহন বলিলেন, "বুঝেছি, আপনি এ দিকে আসুন।"

কক্ষের এক প্রান্তে অবস্থিত একথানি সোফায় নিজে বসিয়া অপরখানিতে বিনোদলালকে বসিবার জন্য তিনি অনুরোধ করিলেন।

তিন চারি জন পার্শ্বচর তীব্র দৃষ্টিতে বিনোদলালকে দেখিতে লাগিল।

কবি ধীরে ধীরে আপনার দুঃখময় জীবনের কথা শশাঙ্কমোহনকে জ্ঞাপন করিল।

কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া ইন্দিরার বরপুত্র বলিলেন, "আমার এক জন লোকের দরকার। আপনি বোধ হয় জানেন না, সাহিত্যসেবার দিকে আমার বিশেষ আগ্রহ। আমার

রচনাগুলির পাণ্ডুলিপি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। সেগুলি সংগ্রহ ক'রে সাজাতে হবে। আপনি সে ভার নেবেন ?"

বিনোদলাল কলিকাতায় আসিবামাত্র তাহার দেশস্থ জমীদারের নিকট হইতে এই ভাবে সাহায্য প্রাপ্ত হইবে, ইহা কল্পনাও করিতে পারে নাই। সে সাগ্রহে তাহার অভিমত প্রকাশ করিল।

শশাঙ্কমোহন তখনই তাঁহার দেওয়ানকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

"দেখুন, বিনোদ বাবু আজ থেকে এখানে থাকবেন, একটা ঘরের ব্যবস্থা ক'রে দেবেন, দেওয়ানজী। আমার পাণ্ডুলিপির সংস্কার ও সংযোজনার ভার এঁর উপর দিয়েছি। খাতায় নাম লিখে নেবেন, মাসিক বৃত্তি আপাততঃ ৫০৲ টাকা। এখানেই উনি আহারাদি করবেন।"

"যে আজ্ঞা" বলিয়া দেওয়ানজী একবার নবাগত বিনোদলালের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

অদূরে যাহারা বসিয়া ছিল, তাহারা নবাগত যুবকের সৌভাগ্যে কিরূপ উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণের আলোচ্য বিষয়।

বিনোদলাল আকস্মিক সৌভাগ্যলাভের আনন্দে মনে মনে চিরারাধ্য দেবতার চরণে প্রণাম করিল।

৩

মানবচরিত্র—মনোবৃত্তির যাহারা আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা বলেন, গুণগ্রাহী গুণীর সমাদর করেন, কিন্তু গুণী প্রার্থী হইলেই তাহার মূল্য হ্রাস পায়। বিশেষতঃ দারিদ্র্যদোষ গুণরাশিকে বিনষ্ট করে। কথাটা নিশ্চয়ই মূল্যবান্। প্রতিভার বরপুত্র যে মুহূর্ত্তে দারিদ্র্যপীড়িত হইয়া স্বর্ণ-বিলাসীর গৃহদ্বারে নত-মস্তকে প্রবেশ করিল, অমনই প্রতিভার অবদান—শক্তির মূল্য কোন্ স্তরে নামিয়া গেল, বিংশ শতাব্দীতে অভিজ্ঞগণ প্রত্যহই তাহা লক্ষ্য করিতেছেন—মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতে পারিতেছেন। শতচ্ছিদ্র পর্ণকুটীরে, স্বাবলম্বী গুণী ছিন্ন বসনেও বসিয়া থাকুন, গুণগ্রাহী উপযাচক হইয়া তাঁহার মর্য্যাদার মূল্য ঢালিয়া দিয়া আসিবে, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তিনি যাচিয়া গুণগ্রাহীর হেম-মন্দিরে দাসত্বের পণে গুণের পরিচয় দিতে আসিবেন, অমনই তাঁহার মর্য্যাদা ধূলায় লুণ্ঠিত হইবে।

সংসারজ্ঞানশূন্য কবি বিনোদলাল মানব-চরিত্রের এই বিশিষ্ট অধ্যায়টুকুর পাঠ কখনও লয় নাই। অন্ততঃ তাহার তরুণ মন লোক-চরিত্রকে এই দিক দিয়া বোধ হয় অধ্যয়ন করিবার অবসর পায় নাই। দেবী ভারতীর কুঞ্জবনে সে অনুক্ষণ ভ্রমণ করিত, বিশ্বমোহিনী বীণার সুরতরঙ্গের ঝঙ্কার, রাজহংসের অমল ধবল মূর্ত্তি, সহস্রদলের বর্ণবৈচিত্র্য-বহুল মাধুর্য্য তাহার শোকসন্তপ্ত তরুণ হৃদয়কেও বর্ণনাতীত সৌন্দর্য্যরসে অভিষিক্ত করিয়া রাখিত, সুতরাং সে নিজের কার্য্য ছাড়া বাহিরের জগতের দিকে দৃষ্টি মেলিয়া—চাহিয়া থাকিতে জানিত না, তাহার শ্রবণযুগলও অন্য শব্দের সহিত পরিচিত হইবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিত না। তাহার উপর যে কার্য্যের ভার ছিল, সমগ্র সামর্থ্য প্রয়োগ করিয়া সে তাহা সুচারুরূপেই সম্পন্ন করিতে লাগিল। অবসরকালে কাব্যলক্ষ্মীর চরণে শ্রদ্ধানত হৃদয়ের অর্ঘ্যভার ঢালিয়া দিত।

শশাঙ্কমোহন তাহার কার্য্যে সন্তুষ্টই ছিলেন। প্রথম পরিচয়ের সময় সে তাঁহার নিকট হইতে যে শ্রেণীর মর্য্যাদা পাইয়াছিল, তাহার কোন পরিবর্ত্তন হইতেছে কি না, ইহা সে লক্ষ্য করিবার অবকাশ না পাইলেও সে এটুকু বুঝিত যে, এখন সে জমীদারের কৃপাপ্রার্থী এবং কর্ম্মচারী। সুতরাং সে সাধ্যমত সেই ভাবেই চলিবে। দেবী ভারতীর সাম্রাজ্যমধ্যে তাহার একটা বিশিষ্ট স্থান থাকিলেও, ব্যবহারিক জগতে—কমলার রাজ্যসীমায় সে শশাঙ্কমোহনের বেতনভুক্ত কর্ম্মচারী, প্রজা এবং শশাঙ্কমোহন রাজা। জমীদারভবনের আবহাওয়া সে মানিয়াই চলিতেছিল। তথাপি শশাঙ্কমোহনের স্নেহ এবং শ্রদ্ধার পরিচয় সে যে একবারেই না পাইত, তাহা নহে। তবে সম্বোধনটা 'আপনি' হইতে 'তুমি'তে পরিণত হওয়া বিস্ময়কর ব্যাপার বলিয়া সে মনে করিত না।

কিন্তু প্রথম মাসের বেতন পাইবার সময়ই বিনোদলাল মনে মনে কিছু আঘাত পাইয়াছিল। জমীদার সরকারে মাসে মাসে যথাসময়ে বেতন পাওয়া যায় না, সে কথা সে শুনিয়াছিল। তাই দুই মাস পরে যখন খাতাঞ্জী মহাশয় তাহাকে বেতন লইবার জন্য আহ্বান করিলেন, তখন সে একটু ব্যস্তভাবেই দপ্তরখানায় চলিয়া গেল। তাহার পুত্রদিগকে কিছু টাকা না পাঠাইলে আর চলিতেছে না—বালক স্বয়ং অসুবিধার কথা লিখিয়া জানাইয়াছে।

নাম সহি করিয়া বেতন লইবার সময় সে দেখিল, খাতাঞ্জী মাত্র ৪০ টাকা তাহার হস্তে অর্পণ করিলেন। সে সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "এ কি হ'ল? ৫০ টাকাই ত বাবু স্থির ক'রে দিয়েছেন!"

খাতাঞ্জী বৃদ্ধ এবং মনিব-সরকারে কায করিয়া চুল পাকাইয়াছেন, তিনি বলিলেন, "আপনি কবি মানুষ, তাই প্রশ্ন করলেন। অন্য কেহ হ'লে এ কথাই তুল্‌তো না। মাইনে আপনার ৫০৲ টাকাই বটে, তবে ১০৲ টাকা দেওয়ানজী মহাশয়ের প্রাপ্য। এই সহজ কথাটা বুঝতে পারেন না কেন?"

আশে-পাশে যাহারা বসিয়া কায করিতেছিল, তাহারাও খাতাঞ্জী মহাশয়ের হাস্যের সহিত যোগ দিল। সে নীরব হাস্য বিদ্রূপের কশার ন্যায় যেন বিনোদলালের পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিল।

আরক্তমুখে বিনোদলাল আপনার কর্ম্মে ফিরিয়া গেল। শশাঙ্কমোহনের নিকট সে কথাটা একবার তুলিবার সঙ্কল্প করিল; কিন্তু পর-মুহূর্ত্তে সে নিরস্ত হইল। এই কয় মাসে তাহার অভিজ্ঞতা কিছু বাড়িয়াছিল। মাসে ৪০৲ টাকা—তাহাই বা এখন সে হঠাৎ আর কোথায় পাইবে?

ক্রমে বিনোদলালের অভিজ্ঞতার পরিমাণ বাড়িয়া চলিল। সে বুঝিতে পারিল, প্রত্যেক রাজ্যপরিচালনে যেমন রাজনীতির গোলকধাঁধা আছে, জমীদারী-পরিচালনে—ছোট অথবা বড় যেমন জমীদারীই হউক না কেন,—তাহাতেও রাষ্ট্রনীতির নানা ঘূর্ণাবর্ত্ত বিদ্যমান। সে বুঝিল, তাহার প্রতি জমীদার মহাশয়ের অপেক্ষাকৃত প্রীতিদৃষ্টি কর্ম্মচারি-মহলে এবং পারিষদবৃন্দের মধ্যে চাঞ্চল্যের সঞ্চার করিয়াছে।

সে দিন নির্জ্জন দ্বিপ্রহরে শশাঙ্কমোহনের পাঠাগারে বৈদ্যুতিক পাখা খুলিয়া দিয়া বিনোদলাল অন্য দিনের মত কায করিতেছিল। বাবুর আদেশ ছিল, এই ঘরে বসিয়াই সে কায করিতে পারিবে। এমন সময় স্থূলোদর দেওয়ানজী মহোদয় তথায় আসিলেন। সাহিত্যিকদিগকে তিনি কথনও প্রসন্নদৃষ্টিতে দেখিতেন না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, এই শ্রেণীর জীবরা তাঁহার মনিবের তহবিলের যে অংশটুকু খালি করিয়া দিবে, তাহা হইতে তাঁহার ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্য সংগ্রহ করিবার সুবিধা নাই। তাহা ছাড়া সাহিত্যরসিক শশাঙ্কমোহন সাহিত্যসেবী বন্ধুদিগকে যেরূপ সম্মান করিতেন, দেওয়ানজী মহাশয় তাহা শুভ লক্ষণ বলিয়া মনে করিতেন না।

দেওয়ানজী কর্ম্মরত বিনোদলালকে বলিলেন, "ওহে বিনোদ বাবু, বাবু যথন এখানে না থাকেন, তথন তুমি নিজের ঘরে ব'সে কায করতে পার না? সে দিন বাবু একটু রাগ করেছেন।"

বিনোদ শুধু বিস্মিত হইল না, মনে একটু আঘাতও পাইল। কিন্তু এত দিনে সে এই মন্ত্রণাকুশল চক্রীর অনেকটা পরিচয় পাইয়াছিল। সুতরাং শশাঙ্কমোহনের নিকট হইতে কথাটা যাচাই করিয়া লইবার প্রবৃত্তি মনে উদয় হইয়াই বিলীন হইয়া গেল।

জমীদার-ভবনে অনবরতই চক্রান্ত চলিতেছে। এক দল আর এক দলকে পরাস্ত করিয়া কিরূপে প্রাধান্য লাভ করিবে, কর্ম্মচারী ও ভাগ্যান্বেষীদিগের কার্য্যে ও ব্যবহারে তাহারই পরিচয় সুস্পষ্ট। বিসমার্ক, লয়েড জর্জ্জ প্রভৃতিকে যে ভাবে রাজ্যপরিচালন করিতে হইয়াছে, দেবীপুরের দেওয়ানজীকে তদপেক্ষা কম মস্তিষ্ক চালনা করিতে হয় না।

বিনোদলাল কাগজপত্র গুছাইয়া লইয়া বলিল, "আমার ঘরেই যাচ্ছি।"

"হাঁা, রোজ তাই ক'রো। সারাদিন অনর্থক একখানা পাথা খুলে রাখলে মনিবেরই লোকসান। সে দিকে একটু নজর দেওয়াও ত দরকার। কবিদের একটু বিবেচনা-বুদ্ধি কম হবেই কি?"

বিনোদলাল স্বভাবতঃই শান্তপ্রকৃতি। কিন্তু বিজ্ঞ এবং প্রাচীনবয়স্ক দেওয়ানজীর মুখে কবি সাধারণের প্রতি এই অর্থহীন অন্যায় অভিযোগ ও বিদ্রূপ তাহার মনকে কশাহত করিল। আরক্তমুখে কিন্তু সংযতকণ্ঠে বলিল, "দেখুন, কবি-সম্প্রদায়ের উপর অতটা অবিচার করা কি আপনার মত লোকের পক্ষে উচিত?"

দেওয়ানজী তাচ্ছীল্যভরে বলিলেন, "কবি হলেই একটু বোকা হয়, বাবু, তুমি আর তর্ক করো না।"

বিনোদলালের উপর প্রথম দর্শনেই দেওয়ানজী বিরুদ্ধমত পোষণ করিয়াছিলেন। এই সংযতবাক্, প্রিয়দর্শন, কর্ম্মঠ যুবকের প্রতি জমীদারের পক্ষপাতিত্ব তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। ভবিষ্যৎ ভাবিয়া বিজ্ঞ দেওয়ান শঙ্কিত হইয়াছিলেন।

ঈষৎ উষ্ণভাবে বিনোদ বলিল, "আমাকে যা খুসী বল্‌তে পারেন ; কিন্তু যাঁদের আপনি কোন পরিচয়ই জানেন না, তাঁদের সম্বন্ধে আপনার এই উক্তি অত্যন্ত অশোভন এবং প্রতিবাদযোগ্য।"

সে আর তথায় দাঁড়াইল না, আপনার কক্ষে চলিয়া গেল।

দেওয়ানজী অগ্নিগর্ভ গিরির ন্যায় তথায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কলিকাতায় মা শীতলার প্রকোপ নিদারুণ গ্রীষ্মে খুবই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। আকাশ নির্ম্মেঘ, মধ্যাহ্নের বাতাস অগ্নিভরা—প্রভাতে ও রাত্রিতে ঈষৎ শীতের আমেজ। বসন্তের বাতাসে ঋতুর গুটিকা পশু ও মানুষের দেহে নির্ব্বিচারে ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। স্কুল কলেজ বন্ধ হইয়া গেল। ছাত্রের দল দেশে চলিয়া গেল। কেরাণীরা ভগবানের মুখ চাহিয়া চাকরী বজায় করিতে থাকিল। বসন্তে মৃত্যু হইলে নিস্তার আছে, কিন্তু চাকরী গেলে সর্ব্বনাশ! বাঙ্গালী প্রাণ দিতে পারে, কিন্তু চাকরী কখনই ছাড়িতে পারে না।

দেবীপুরের প্রাসাদেও বসন্তভীতি প্রবেশ করিয়াছিল। ধনীর জীবনের মূল্য অধিক, প্রাণের আশঙ্কা অনেক বেশী—সাবধানতাও তাহার উপযুক্ত। দেওয়ানজী আদেশ দিলেন যে, মনিবের অনুমোদনক্রমে তিনি সকলকে জানাইতেছেন, কাহারও জ্বর হইলে অবিলম্বে তাহা কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করিতে হইবে। স্বতন্ত্র একটি বাড়ীতে রোগীদিগকে স্থানান্তরিত করিবার ব্যবস্থা আছে। সরকার হইতে চিকিৎসার বন্দোবস্তও হইবে।

কর্ম্মচারিবৃন্দের মুখে শঙ্কার চিহ্ন—ভারপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থগণ সকলের উপর খরদৃষ্টি রাখিয়াছেন। ব্যাধি অপেক্ষা ব্যাধির ভীতিই অনেককে আকুল করিয়া তুলিল। দুই জনের জ্বর হইতেই তাহাদিগকে স্বতন্ত্র বাড়ীতে রাখিয়া আসা হইল। প্রকৃতই তাহাদের প্রতি মায়ের কোপদৃষ্টি ঘটিয়াছিল। কয়েক দিন পরে জমীদার-ভবনে সংবাদ আসিল, তাহারা ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইয়াছে।

এই ঘটনার পর দেবীপুর প্রাসাদে কড়া পাহারা বসিল। সামান্য অসুখ কাহারও হইলে অবিলম্বে তাহাকে স্থানান্তরিত করা হইবে। যাহাদের অন্যত্র আশ্রয় ছিল, ছুটী লইয়া তাহারা তথায় চলিয়া গেল। অপরে প্রতিষেধক সেবনে অবহিত হইল।

বিনোদলালের অন্যত্র যাইবার উপায় ছিল না, সে খুব সাবধানে রহিল। কিন্তু এক দিন রাত্রিতে মাথা ধরিয়া তাহার জ্বর আসিল। পরদিবস সে জ্বরের ঘোরে যখন অচেতনপ্রায়, সেই সময় দেওয়ানজী প্রভৃতি তাহার অসুস্থতার সংবাদ পাইলেন। ডাক্তার দেখিয়া বলিলেন, জ্বর সম্ভবতঃ বসন্তজনিত না-ও হইতে পারে। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা বলিয়াই তাঁহার অনুমান। কিন্তু মর্‌শুমের সময় শুধু অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া থাকা সঙ্গত নহে। দেওয়ানজী তাহার অঙ্গে কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোহিতাভ চিহ্ন দেখিয়া মত প্রকাশ করিলেন, ডাক্তার বাবুর অনুমান ঠিক নহে। দাগগুলি ঘোর সন্দেহজনক।

বিনোদলাল তখন শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়াছে। সে বলিল, "কাল রাত্রিতে মশারি ফেলিয়া শুই নাই, ওগুলি মশার কামড়ের চিহ্ন।"

দেওয়ানজী স্বয়ং শশাঙ্কমোহনের কাছে সংবাদ দিতে চলিলেন। তিনি জানিতেন, অন্যের সম্বন্ধে যে ব্যবস্থাই হউক না কেন, এই যুবকের প্রতি মনিবের বিশেষ দৃষ্টি আছে, সুতরাং অন্য লোক মারফত বলিয়া পাঠাইলে সুব্যবস্থা হইবে না।

শশাঙ্কমোহন বিনোদলালের অসুখের সংবাদ শুনিয়া উদ্বিগ্ন হইলেন। তাহাকে দেখিতে যাইবার জন্য তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করিতেই অনেকে বলিয়া উঠিল যে, ব্যাধিটা সংক্রামক। এ অবস্থায় দেখিতে যাওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। তাঁহারও সন্তানাদি ত আছে।

দেওয়ানজী বলিলেন, "বিনোদ বাবুকে ও বাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করাই ভাল। সেখানে ঔষধ, পথ্য, সেবা-শুশ্রূষার ভাল বন্দোবস্তই আছে।"

শশাঙ্কমোহন চিন্তাকুলচিত্তে বলিলেন, "তা ত দেবেন ; কিন্তু ওঁকে দেখা-শুনা কর্‌বে কে ?"

"সে জন্য চিন্তার কারণ নেই। ৩।৪ জন চাকর ও-বাড়ীতে সকল সময় থাকে।"

জমীদার বলিলেন, "তাদের ব'লে দেবেন, এক জন যেন

সকল সময় বিনোদ বাবুর কাছে থাকে। আমাকে দু'বেলা সংবাদ দেবেন।"

নবীন জমীদার বোধ হয় মনে মনে তেমন প্রফুল্ল হইতে পারিলেন না। তাঁহার পরলোকগত পিতা স্বনামধন্য রাজীবলোচন রায় কোন সাধারণ কর্ম্মচারী পীড়িত হইলেও তাহার রোগশয্যাপার্শ্বে হিতৈষী বন্ধুর অধিকার লইয়া দিবা ও রাত্রির অধিকাংশ সময় কাটাইয়া দিতেন। অনেক সময় বিলাসী জমীদার স্বহস্তে রোগীর শুশ্রূষাও করিতেন, শশাঙ্কমোহন এ দৃশ্য একাধিকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আজ তিনি হিতৈষী বন্ধু ও কর্ম্মচারিগণের ঐকান্তিক নিষেধ উপেক্ষা করিয়া এই প্রিয়দর্শন কবি ও তাঁহার কর্ম্মচারীর কাছে যাইতে পারিতেছেন না, ইহা কি মনের দুর্ব্বলতা নহে ?

কথাটা পুনঃ পুনঃ তাঁহার মনকে বিক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতেছিল, এমন সময় সংবাদ আসিল, বিনোদলালকে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। তাহার সম্বন্ধে হুজুরের চিন্তার কোন কারণ নাই।

শশাঙ্কমোহন স্থির করিলেন, পরদিবস সকালে তিনি স্বয়ং বিনোদলালকে দেখিতে যাইবেন; কাহারও নিষেধ মানিবেন না। একবার দূর হইতে দেখিলে ব্যাধির বীজাণু তাঁহাকে আক্রমণ করিবে, বিংশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিক যুগে এমন অন্ধ আশঙ্কা বড়ই লজ্জাজনক।

বেলা ৯ ঘটিকার পূর্ব্বে অভিজাত-সম্প্রদায়ের প্রায়ই নিদ্রাভঙ্গ হয় না; শশাঙ্কমোহনও তৎপূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করিতে পারেন নাই। প্রাতঃকৃত্যাদির পর তিনি বিনোদলালকে দেখিতে যাইবার সঙ্কল্প করিতেছেন, এমন সময় দেওয়ানজী বিরস মুখে তথায় আসিলেন।

শশাঙ্কমোহন উদ্বিগ্নভাবে বলিলেন,"কি খবর, দেওয়ানজী মশাই ?"

"আজ্ঞে, বিনোদ বাবু আজ সকালেই মেসে চ'লে গেছেন, আপনার অনুমতি পর্য্যন্ত নেবার তর সইল না !"

"কেন ?"

"তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ওখানে তাঁকে পাঠান হয়েছিল, তাই বোধ হয় রাগ হয়েছে।"

শশাঙ্কমোহনের মুখমণ্ডল সহসা অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। দেওয়ানজী একটু 'রসান' দিয়া বলিলেন, "তিনি কবি মানুষ, তাই মনে করেছেন, তাঁকে মেরে ফেলবার জন্যই হুজুর তাঁকে ওখানে পাঠিয়েছেন। ডাক্তার, ঔষধ, পথ্য, লোকজনের ব্যবস্থা—কিছুতেই তাঁর মন উঠে নি।"

প্রতিদিনের পার্শ্বচরগণের এক জন বলিয়া উঠিল, "সংসারে একেই বলে অকৃতজ্ঞতা !"

যৌবন, ঐশ্বর্য্য, প্রভুত্ব প্রভৃতির একটা প্রচণ্ড মাদকতা আছে। মানুষ ইহার প্রভাব সাধারণতঃ পরিপাক করিতে পারে না। তাহার উপর যদি স্তাবকের কণ্ঠনিঃসৃত বচন-সুরার অপরিমেয় তরলাসার ফেনপুষ্পিত হইয়া উঠে, তখন যুবজনের পক্ষে তাহার মত্ততা সংবরণ করা প্রকৃতই দুঃসাধ্য ব্যাপার।

শশাঙ্কমোহন স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন।

দেওয়ানজী বলিলেন, "যাবার সময় বিনোদ বাবু কিছু টাকা তাঁর মেসে পাঠিয়ে দেবার জন্য ব'লে গেছেন।"

সংক্ষেপে জমীদার বলিলেন, "তা দেবেন বৈ কি। তাঁর টাকার দরকার।"

ঔষধ কি এখনও ধরে নাই ? দেওয়ানজী মৃদুস্বরে বলিলেন, "কত দেব ?"

মুখে কোন কথা না বলিয়া শশাঙ্কমোহন দক্ষিণহস্তের পাঁচটি অঙ্গুলী দেখাইলেন।

কয়েক জন সাহিত্যিক বন্ধু একটু পূর্ব্বেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

দেওয়ানজী বক্রদৃষ্টিতে অবাঞ্ছিত ব্যক্তিগণের প্রতি চাহিয়া কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

সাত দিন রোগভোগের পর বিনোদলাল শয্যায় উঠিয়া বসিল। মেসের ছাত্ররা প্রাণপণে তাহার সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছিল, কিন্তু সে সম্পূর্ণরূপে কপর্দ্দকশূন্য—মেসের ছাত্রদের নিকট কিছু ঋণও হইয়াছে। আসিবার সময় দেওয়ানজীর নিকট সে মাহিনা বাবদ কিছু টাকা পাইবার প্রার্থনা জানাইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু টাকা দেওয়া দূরে থাকুক, দেবীপুরের প্রাসাদ হইতে কেহ তাহার সংবাদ লইতেও আসে নাই। সে মরিল কি বাঁচিল, তাহা জানিবার প্রয়োজন অবশ্য কাহারও নাই, কিন্তু মানুষের

একটা শিষ্টাচার? তাহাও কি বাঙ্গালাদেশ হইতে উঠিয়া গেল?

অর্থাভাবে কাতর হইয়া গতকল্য বিনোদলাল জমীদার বাবুর বরাবর একখানি আবেদনলিপি পাঠাইয়াছে। তাহার এক মাসেরও উপর বেতন যে পাওনা আছে, সে কথার সামান্য আভাসমাত্র না দিয়া সে অতি বিনীতভাবে কিছু সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছে। তাহার বিশ্বাস, জমীদার মহাশয় সেই পত্র পাইয়া অবিলম্বে তাহাকে অর্থসাহায্য পাঠাইবেন।

অপরাহ্ণ ঘনাইয়া আসিয়াছে, এমন সময় বিনোদলালের কক্ষে এক ব্যক্তি প্রবেশ করিল। সে তাহাকে চিনিত, জমীদার সরকারের সে এক জন সামান্য বেতনের মুহুরী। বিনোদলালের আশাহত হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

কুশল-প্রশ্ন সংক্ষেপে সারিয়া সে কবির হস্তে ৫টি টাকা প্রদান করিল। বিনোদলাল সবিস্ময়ে বলিল, "পাঁচ টাকা! এতে আমার কোন উপকারই হবে না। অন্ততঃ ২৫টি টাকা আমায় পাঠিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। আমার মেসের দেনাই যে প্রায় কুড়ি টাকা হবে!"

"দেওয়ানজী বলিলেন, বাবু পাঁচটি টাকাই আপনাকে পাঠাতে বলেছেন। আমরা হুকুমের চাকর, বিনোদ বাবু।"

আপন মনে বিনোদ বলিল, "আমার মাইনের দরুণই ত ৫০।৬০ টাকা পাওনা। আমার এ অবস্থায়—থাক্!"

কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে থাকিয়া বিনোদলাল মৃদুস্বরে পুনরায় বলিল, "টাকাটা এখন আপনি ফিরিয়ে নিয়ে যান। মাইনের যখন হিসেব হবে, তখন নেওয়া যাবে। ভাল কথা, বাবুকে অনুগ্রহ ক'রে জানাবেন, আর দু'দিন পরেই আমি ওখানে ফিরে যাব। শরীরে একটু বল এর মধ্যেই হবে।"

কর্ম্মচারী গম্ভীরমুখে বলিল, "দেওয়ানজী বলেছেন, বাবুর হুকুম, এখন আপনি ওখানে যাবেন না। ভাল ক'রে আগে সেরে উঠুন, তার পর কাযে যোগ দেবার হুকুমনামা বেরুলে খবর পাবেন।"

"ভাল। টাকা কটা দয়া ক'রে দেওয়ানজীর কাছে এখন ফেরত দেবেন।"

দুঃখে, ক্ষোভে, অভিমানে বিনোদলালের রোগ-দুর্ব্বল নয়নপথে অশ্রুর বন্যা বহিয়া আসিতেছিল, কিন্তু প্রচণ্ড চেষ্টায় সে আপনাকে সংবরণ করিল।

রোগের উপর মানুষের কি হাত আছে? সে ত ইচ্ছা করিয়া রোগ ডাকিয়া আনে নাই! সেই জন্য তাহার চাকরী পর্য্যন্ত গেল! কর্ম্মচারীর সংক্ষিপ্ত কথাতেই ত তাহা ছাড়া অন্য কোন অর্থ পাওয়া যায় না। বাবু কি জন্য তাহার উপর অসন্তুষ্ট হইলেন? যে বাড়ীতে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, তাহার অর্দ্ধ-অচেতন অবস্থায় তাহাকে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল, সেখানে সারারাত্রির মধ্যে জনপ্রাণীর পর্য্যন্ত সাড়া ছিল না। কয় দিন পূর্ব্বে দুই জন বসন্তরোগী সেখানে ভবযন্ত্রণা এড়াইয়াছিল! যাহার এতটুকু হৃদয় আছে, সে কি একটা জীয়ন্ত মানুষকে রুগ্ন অবস্থায় মৃতের কক্ষে একাকী ফেলিয়া রাখিতে পারে? সমগ্র বাড়ীর মধ্যে মনুষ্যকণ্ঠ শ্রুত হইবার পর্য্যন্ত ব্যবস্থা নাই। এক রাত্রি সে কেমন করিয়া একা তথায় যাপন করিয়াছিল, তাহা সে-ই জানে! তৃষ্ণায় অধীর হইয়া সে কতক্ষণ জল জল করিয়া ক্ষীণকণ্ঠে ডাকাডাকি করিয়াছিল, কিন্তু কে সাড়া দিবে? প্রাণের ভয়ে কোন ভৃত্যই রাত্রিকালে সেই বাড়ীর প্রাঙ্গণসীমার মধ্যেই ছিল না। অবশেষে গৃহ-কোণে রক্ষিত জলপাত্র হইতে তাহাকে কিরূপ অবস্থায় জলপান করিতে হইয়াছিল, তাহা শুধু সেই জানে, আর যিনি দুর্ব্বল, পীড়িত, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়দাতা, তিনিই জানেন।

দুর্ব্বল, শীর্ণ হস্তে বিনোদলাল নয়নযুগল মুছিয়া লইল। কে যেন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে।

মেসের বন্ধু সুধীর ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, "চুপ ক'রে একা ব'সে থাক্‌তে বড় কষ্ট হয়েছে? এখন এই দুধটুকু খাও, ভাই।—পিয়ন এই চিঠিখানা দিয়ে গেল।"

বন্ধু এক বাটি উষ্ণ দুগ্ধ বিনোদকে পান করিতে দিল। যাহাদিগের সহিত কোনও পূর্ব্ব-পরিচয় অথবা বাধ্যবাধকতা নাই, তাহারা পীড়ার সময় সহৃদয়তার যে পরিচয় দিয়াছে, বিনোদলাল জীবনে তাহা বিস্মৃত হইবে না। ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতা-গর্ব্বের উত্তাপে মানুষের অন্তরের সর্ব্বপ্রকার কোমলতা কি শুকাইয়া যায়?

প্রদীপালোকে বিনোদলাল পত্রখানি পড়িয়া আহত জন্তুর ন্যায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। বন্ধু চমকিতভাবে বলিয়া উঠিল, "কি হয়েছে?"

আরক্তনেত্রে সে নীরবে বন্ধুর হস্তে কম্পিত করে পত্রখানি অর্পণ করিল।

চিঠিতে লেখা ছিল,—

"বাবা,

ছোট ভাইয়ের বড় অসুখ,—আজ দশ দিন। আমি কাল এখানে এসেছি। মাসীমাও এসেছেন। ভাইকে নিয়ে আমরা বড় ব্যস্ত। সে কেবল আপনাকে দেখবার জন্য মাঝে মাঝে চীৎকার ক'রে উঠছে। বাবা, আপনি আসুন, একবার তাকে দেখে যান। তার জন্য আমার প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে, বাবা। গাঁয়ের ডাক্তার দেখ্‌ছেন —জানিনে কি হবে। বাবা, আপনি একবার চ'লে আসুন। আসবার সময় ভাইটির জন্যে বেদানা আঙ্গুর আন্‌বেন। সে খালি ডাক্‌ছে—বাবা! বাবা!

প্রণত—অনিল।"

বন্ধু বিনোদের আর্থিক অবস্থার মোটামুটি সংবাদ রাখিত। সে কোন কথা বলিতে পারিল না। এই রুগ্ন দেহে কপর্দ্দকহীন অবস্থায় দেশে যাওয়া কিরূপ অসম্ভব ব্যাপার, তাহা অনুমান করা কঠিন নহে।

বিনোদের রক্তলেশহীন—বিবর্ণ আনন ও উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি দেখিয়া সুধীর চিন্তিত হইল। সে বন্ধুকে আশ্বাস দিয়া শয্যায় শোয়াইয়া দিল। আজ ত আর গাড়ী নাই, কাল বৈকালে ট্রেণ, যাহা হয় ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বিনোদলাল সঙ্কল্প করিল, কাল সে স্বয়ং যেমন করিয়াই হউক, দেবীপুর প্রাসাদে গিয়া শশাঙ্কমোহনের সহিত দেখা করিবে। তাহার মাহিনার টাকাগুলি পাইলে সে পুত্রকে দেখিতে যাইতে পারে।

* * * *

দুই ঘণ্টা ধরিয়া উঠিয়া বসিয়া কোনও মতে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া বিনোদ জমীদার-ভবনে আসিয়াছিল। তাহার লিখিত আবেদনপত্রের উপর কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ তখনও প্রদত্ত হয় নাই। জমীদার মহাশয়ের বরাবর লিখিত হইলেও সেরেস্তার প্রচলিত বিধান অনুসারে তাহা বক্র নদীর গতিপথের ন্যায় নানা জনের হাত দিয়া মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতেছিল। সুতরাং তাহাকে প্রতীক্ষা করিতেই হইবে। সে ত কবি বিনোদলাল নহে, দেবীপুর জমীদারীর এক জন কর্ম্মচারী মাত্র।

বেলা ৩টার সময় খাতাঞ্জী মহাশয় তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মাহিনা দিবার হুকুমনামা বাহির হইয়াছে। বিনোদলাল কোনও মতে সেরেস্তায় হাজির হইল। খাতাঞ্জী মহাশয় তাহার সম্মুখে খাতা ধরিয়া বলিলেন, "সই কর, বাপু!"

স্বাক্ষর করিবার সময় সে দেখিল, প্রাপ্তির স্থানে মাত্র ১৩॥৶০ আনা। সে চমকিয়া উঠিল। হিসাবমত তাহার প্রায় ৫৫৲ টাকা পাওনা। খাতাঞ্জী মহাশয় কি তাহার সহিত বিদ্রূপ করিতেছেন?

"আমার পাওনা কি মাত্র এই? আমার হিসাবে—"

বিরক্তিপূর্ণকণ্ঠে খাতাঞ্জী বলিলেন, "তোমার হিসাবমত ত কায হবে না, বাপু।"

"কিন্তু আমি ত কিছু বুঝতে পার্‌ছি না, মশাই।"

বিপুল দেহ দুলাইয়া দেওয়ানজী মহাশয় বসিবার কক্ষ হইতে বাহির হইলেন। তিনি বলিলেন, "কি বিনোদ বাবু, তোমার পাওনা-গণ্ডা পেয়েছ?"

খাতাঞ্জী বলিলেন, "উনি হিসাবটা বুঝতে পাচ্ছেন না।"

"তা বেশ ত, বুঝিয়ে দাও না।"

দেওয়ানজী বাহিরে চলিয়া গেলেন।

খাতাঞ্জী মহাশয় যাহা বলিলেন, তাহাতে বিনোদলালের ভ্রম সংশোধিত হইয়া গেল। অসুখের সময় তাহাকে অন্য বাড়ীতে লইয়া যাইবার জন্য গাড়ী ভাড়া, ঔষধ-পথ্যের খরচ এবং অনুমতি না লইয়া মেসে চলিয়া যাওয়ার জন্য অর্দ্ধেক বেতন বাজেয়াপ্ত হইবার আদেশ প্রভৃতির কথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝাইয়া দিলেন।

না,—হিসাবের কোথাও এতটুকু গরমিল নাই।

কিন্তু যাহারা কবি, হয় ত তাহাদের মস্তিষ্কের কোন একটি চাবী কিছু শ্লথ থাকে। সে এই সূক্ষ্ম বিচারের মধ্যেও একটা ফাঁক দেখিতে পাইল। বিনীতভাবে সে বলিল, "কিন্তু মাইনে পাবার জন্য আবেদন করার অপরাধে ঐ ১৩॥৶০ আনা বাজেয়াপ্ত না করা আপনাদের হিসাবের একটা প্রকাণ্ড ত্রুটি নয় কি?"

নিকটে তখন আর কেহ ছিল না। খাতাঞ্জী মহাশয় নিম্নস্বরে বলিলেন, "বাপু, আমি তোমার বাপের বয়সী; একটা হিতোপদেশ দিই, মনে রেখ। ভবিষ্যতে যদি কোন জমীদারী সরকারে কায কর, জমীদারকে তুষ্ট না ক'রে

দেওয়ানজীকে সন্তুষ্ট রাখবার চেষ্টা ক'রো তবেই মঙ্গল হবে। এখন তোমার যে রকম চেহারা আর অবস্থা, যা পেয়েছ, নিয়ে স'রে পড়।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিনোদলাল টাকাগুলি গ্রহণ করিল। অন্ততঃ এই টাকার সাহায্যে সে দেশে গিয়া তাহার সন্তানকে দেখিতে পাইবে ত! তবে একবার জমীদার শশাঙ্কমোহনের সহিত যদি দেখা হয়! তাঁহাকে একটা কথা সে নিবেদন করিয়া যাইতে চাহে।

কিন্তু সেরেস্তার কাহাকেও ধরিলে তাহার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে না। সে বৃদ্ধ দ্বারবানের শরণ লইল। লোকটা তাহাকে শ্রদ্ধা করিত। কয়েকবার বিনোদ তাহাকে পুরস্কৃতও করিয়াছে। একবার তাহার একটা আর্জ্জিও সে এমন ভাবে লিখিয়া দিয়াছিল, যাহার ফলে দ্বারবান্ উপকৃত হইয়াছিল।

নিজের নাম লিখিয়া সে দ্বারবানের হাত দিয়া কাগজখানা শশাঙ্কমোহনের কাছে পাঠাইয়া দিল। অনেকক্ষণ পরে সে ফিরিয়া আসিয়া জানাইল যে, রাজা বাবু (শশাঙ্কমোহনকে তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারী ও প্রজাবর্গ রাজা বলিয়া ডাকিত) তাহার সহিত দেখা করিবেন না; ফুরসুৎ নাই

দ্বারবান্ দুঃখিতভাবে বলিল, "রাজাবাবুকে কেন আপনি চটিয়ে দিয়েছেন, বিনোদ বাবু?"

বিনোদলাল বিমর্ষভাবে বলিল, "তা জানিনে, দরোয়ানজী!"

দ্বারবান্ মৃদুস্বরে বলিল, "রাজাবাবু আপনাকে ৫০৲ টাকা পাঠিয়েছিলেন, আপনি উহভি ফেরত দিয়ে তাঁকে অপমান করিয়েছেন।"

বিনোদলাল যেন আকাশ হইতে পড়িল। দ্বারবান্ এ কি কথা বলিতেছে? তখন সে যাহা জানিত, এই নিরক্ষর ভোজপুরীর কাছে সব প্রকাশ করিল।

দ্বারবান্ বলিল যে, দেওয়ানজী রাজা বাবুকে সেই কথা বুঝাইয়া বলিতেছিলেন, তাই রাজাবাবু বিনোদলালের সহিত দেখা করিলেন না।

অনেক অস্পষ্ট কথা এতক্ষণে বিনোদলালের কাছে সুস্পষ্ট হইয়া পড়িল। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সে মেসের দিকে চলিল। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার ট্রেণ তাহাকে ধরিতে হইবে।

মেসে আসিয়া সে যাত্রার আয়োজন করিতেছে, এমন সময় তার-পিয়ন একখানি হরিদ্রা-রঞ্জিত খাম তাহার কাছে ধরিল। কম্পিতহস্তে খাম খুলিয়া সে পড়িল, শ্বশুর সংবাদ দিয়াছেন—"সব শেষ!"

স্থাণুর ন্যায় বিনোদ সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। বেদনা, শোক কি আজ তাহার হৃদয়কে পাষাণ করিয়া দিয়াছে? অথবা তাহাদের অমোঘ শক্তি আজ ব্যর্থ?

সব শেষ?—না, না, কবির ভাগ্য লইয়া যখন সে বাঙ্গালা দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তখন এত শীঘ্রই সব শেষ হইতে পারে না। অপেক্ষা কর কবি, নূতন দৃশ্যপট রঙ্গমঞ্চে নূতন অভিনয়ের সূচনা করিবে!

সদ্য-ক্রীত বেদানা ও আঙ্গুর ফলগুলি নির্ব্বাক্‌ভাবে যেন কবির দিকে চাহিয়া কি ইঙ্গিত করিতেছিল।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

বন্দনা-গীত

বন্দ সে সারদানন্দ নাম
ধন্য হব স্মরি পুণ্যধাম
সাধুত্তম কর্ম্মযোগী ক্ষমবান্।

রামকৃষ্ণ-লীলা রঙ্গ অঙ্গ
নিত্য সিদ্ধ চিরারাধ্য সঙ্গ
কুমার সন্ন্যাসী শুদ্ধ শক্তিমান।

পণ্ডিত মণ্ডিত-জ্ঞান-জ্যোতি
নিপুণ লেখনী বাণী-দ্যোতি
বিপন্ন-বান্ধব, ত্যাগে আগুয়ান।

গুপ্ত দেবতা, প্রাপ্ত স্বধাম,
ভক্তবৃন্দ কাঁদে অবিরাম।
সান্ত্বনা অন্তিমে ধরার বিধান
"রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ" নাম গান।

শ্রীঅমৃতলাল বসু (নাট্যাচার্য্য (

আগমনী

বাগীশ্বরী—একতালা।

কোটী তপন জিনিয়া আসিল মোর সাধের উমা,
তাই বুঝি দুখ তিমিরময়, লুকাইল আজি দূরে।
বঙ্গের সন্তানগণ যত, পূজিবে তোমারে হ'য়ে পুলকিত,
মা মা ধ্বনি করি অবিরত, ডাকিবে প্রাণ ভরে॥

কথা ও সুর—সঙ্গীত-নায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বরলিপি—শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ।

আস্থায়ী ।

০ | ০ | ২´ | ৩ | ০
র্সা । র্সা | ণা ধপা ধা | ণা ণা পধা | । মা । | মা ধা পধা |
কো ০ টী | ত প ০ ন | জি নি য়া ০ | ০ ০ ০ | আ সি ল |

১ | ২´ | ৩ | ০ | ১ | ২´
ণা ণা ণা | মা মজ্ঞা জ্ঞা | রা সরা জ্ঞসা | সা রা মা | মা মা মা | মা ধা পধা |
০ মো র | সা ধে র | উ মা ০০ | তা ই বু | ঝি দু খ | তি মি র |

৩ | ০ | ১ | ২´ | ৩
ণা ণা ণা | ধা ণা ধা | র্সা র্সা র্সা | ধণা র্সর্রা: র্জ্ঞা: র্রর্সা | ণধা মজ্ঞা রসা |
০ ম য় | লু কা ই | ল আ জি | দূ০ ০০ ০ রে০ | ০০ ০০ ০০ |

অন্তরা ।

০ | ১ | ২´ | ৩ | ০ | ১
{ মা । ধা | ণা ধা র্সা | র্সা র্সা র্রা | না র্সা র্সা | র্সা র্রা র্রা | র্জ্ঞা র্রা র্সা |
{ ব ০ ঙ্গ | র স ০ | ন্তা ন গ | ণ য ত | পূ জি বে | তো মা রে |

২´ | ৩ | ০ | ১ | ২´
র্সনা র্সা র্সা | ণা ধা ধা } | পধা । পধা | ণা ণা ণা | মা মা জ্ঞা |
হ০ য়ে পু | ল কি ত } | মা ০ মা | ০ ধ্ব নি | ক রি অ |

৩ | ০ | ১ | ২´ | ৩
জ্ঞা রা সা | সা রা মা | ধা ণা র্সা | ধণা র্সর্রা: র্জ্ঞা: র্রর্সা | ণধা মজ্ঞা রর্সা |
বি র ত | ডা কি বে | ০ প্রা ণ | ভ০ ০০ ০ রে০ | ০০ ০০ ০০ |

১ম তান—

২´ | ৩
মধা ণর্সা র্রর্সা | ণধা মজ্ঞা রসা |
আ০ ০০ ০০ | ০০ ০০ ০০ |

২য় তান—

০ | ১ | ২´
সরা মমা জ্ঞমা | পপা মপা ধধা | পধা ণণা ধণা |
আ০ ০০ ০০ | ০০ ০০ ০০ | ০০ ০০ ০০ |

৩ | ০ | ১ | ২´
র্সর্সা ণর্সা র্রর্রা | র্সর্রা র্জ্ঞর্জ্ঞা র্রর্সা | ণধা মধা ণর্সা | ণধা মধা ণণা |
০০ ০০ ০০ | ০০ ০০ ০০ | ০০ ০০ ০০ | ০০ ০০ ০০ |

৩
মজ্ঞা রসা ণ্সা |
০০ ০০ ০০ |

অভয়ানন্দের দুর্গোৎসব

গোপালপুরের জমীদার শৈলজানন্দের বর্ষীয়সী গৃহিণী শৈলবালা দেবী জমীদারীর ব্যাপারে বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। ৩ বৎসর পূর্ব্বে শৈলজানন্দের মৃত্যু হইয়াছে, মরণের সময় তাঁহার একমাত্র পুত্র হরনাথ কলিকাতায় এম্,-এ পরীক্ষা দিবার জন্য হোষ্টেলে ছিল, শৈলজানন্দের মৃত্যু হঠাৎ হয়, সে সময়ে হরনাথ উপস্থিত হইতে পারে নাই। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে শৈলজানন্দ উইল করিয়া যান, তাহাতে তিনি পত্নী শৈলবালাকে সমস্ত বিষয়-সম্পত্তির অধিকারিণী করিয়া যান। শ্রাদ্ধের সময় হরনাথ বাটী আসিয়াছিল, যথাবিধি মহাসমারোহের সহিত শ্রাদ্ধ শেষ হইবার পর সে যখন জানিল যে, তাহার স্বর্গীয় পিতার উইল অনুসারে তাহার পৈতৃক বিশাল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী তাহার জননী শৈলবালাই হইয়াছেন; তাহার জন্য মাসিক পাঁচ শত টাকামাত্র বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তখন সে নিতান্তই ব্যথিত ও রুষ্ট হইল। বাড়ীতে হরনাথের গৃহিণী ইন্দুমতীও এ সংবাদ শুনিয়া মর্ম্মাহত হইল। এ অবস্থায় তাহাদিগের পক্ষে কি করা কর্ত্তব্য, ইহা স্থির করিবার জন্য হরনাথ ও ইন্দুমতী সমস্ত রাত্রি জাগিয়া বহু পরামর্শ করিল। পরামর্শের ফলে ইহা স্থির হইল যে, তাহারা স্বামী ও স্ত্রীতে মিলিয়া কলিকাতায় যাইয়া বাসা করিবে। সেইখানে এম্,-এ পরীক্ষার পর হরনাথ একটা চাকরীর সংস্থান করিবে এবং সেইখানে চিরদিনের জন্য বাস করিবে; গোপালপুরের বাড়ীতে তাহারা আর কখনও ফিরিয়া আসিবে না। পরদিন প্রভাতে পূর্ব্ব-রাত্রির পরামর্শ অনুসারে হরনাথ ও ইন্দুমতী কাহাকেও কিছু না বলিয়া, এমন কি, জননীর সঙ্গে সাক্ষাৎ না করিয়াই কলিকাতা-যাত্রা করিল, সেইখানে তাহারা বাস করিতে লাগিল; জননীর সঙ্গে সকল প্রকার পত্রাদি ব্যবহার বন্ধ করিয়া দিল। শৈলবালা পুত্রের এই ব্যবহারে নিতান্ত বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হইলেন, তিনি বৃদ্ধ দেওয়ান জানকীবল্লভকে পুত্রের নিকট কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন, বৃদ্ধ জানকীবল্লভও কলিকাতায় অনেক কষ্টে হরনাথের বাসা খুঁজিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং জানাইলেন যে, হরনাথের ক্রোধ করিবার কোন কারণই উপস্থিত হয় নাই, বিষয় তাহারই আছে, শৈলবালা নামেই বিষয়াধিকারিণী হইয়াছেন। বিষয় রক্ষা করা বা তাহার উপস্বত্ব ভোগ করা শৈলবালার অভিপ্রেত নহে, বিষয় দান ও বিক্রয় করিবার অধিকার তাহার স্বামী তাহাকে দিয়াছেন সত্য, কিন্তু তিনি হরনাথকে দুঃখী করিয়া বিষয় নিজের হাতে রাখিতে নিতান্তই অনিচ্ছুক, বধূমাতার সহিত হরনাথ বাড়ী ফিরিয়া গেলেই তিনি সমস্ত বিষয়সম্পত্তি তাহাকেই দান করিতে প্রস্তুত আছেন। এই যখন অবস্থা, তখন হরনাথের ক্রোধ করিয়া জননীর মনে ব্যথা দেওয়া নিতান্ত অনুচিত ও অস্বাভাবিক।

বৃদ্ধ দেওয়ান জানকীবল্লভের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া যৌবনমদান্ধ হরনাথ বলিল, "পিতা আমাকে অযোগ্য বিবেচনা করিয়া যখন বিষয়-সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন, তখন সেই বিষয় জননী দান করিলেও আমি গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি। যদি কখনও জগতে নিজের যোগ্যতার উপযুক্ত পরিচয় দিতে পারি, তাহা হইলে আবার গোপালপুরে ফিরিব এবং সেই দিন যদি আইসে, তবে জননীর ইচ্ছা অনুসারে বিষয়-সম্পত্তি গ্রহণ করিব—ইহাই আমার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা।

আপনি এই কথা জননীকে জানাইবেন। আশা করি, আমার সহিত আর কোন প্রকার পত্রাদি ব্যবহার আপনারা করিবেন না, করিলেও আমার নিকট হইতে কোনও উত্তরাদি পাইবার সম্ভাবনা নাই।”

হরনাথের এই নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় পাইয়া বৃদ্ধ জানকীবল্লভ দুঃখের সহিত অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে বিষাদ-ভরা বুকে গোপালপুরে ফিরিয়া আসিলেন এবং শৈলবালা দেবীকে সকল কথা জানাইলেন। দেওয়ানের মুখে সকল কথা শুনিয়া শৈলবালা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, অবশেষে ধীর ও গম্ভীরভাবে বলিলেন, “আচ্ছা, তাহাই হইবে। যদি জগদম্বা দিন দেন, তবে নিশ্চয়ই আমার হরনাথকে আমি ফিরিয়া পাইব, আপনি তাঁহার আমলে যেমন করিয়া বিষয়ের ব্যবস্থা করিতেন, সেই ভাবে করিতে থাকুন, আমি নিজেই বিষয়ের ভার তাঁহার আদেশ অনুসারে গ্রহণ করিলাম।”

২

শৈলজানন্দের আমলে প্রতি বৎসর বিশেষ ধুমধামের সহিত বাড়ীতে দুর্গোৎসব হইত, তাহা বন্ধ হইয়া গেল। কলিকাতায় হরনাথের নিকট উইলের সর্ত্ত অনুসারে মাসের প্রথমে পাঁচ শত টাকা পাঠান হইলেও প্রথমবার তাহা ফিরিয়া আসিল, দ্বিতীয় মাসে শৈলবালা দুই মাসের মাসহরার টাকা ইন্সিওর করিয়া পাঠাইলেন। হরনাথ তাহাও লইল না। তৃতীয় মাস হইতে টাকা পাঠান বন্ধ হইল; কিন্তু প্রতি মাসের টাকা ব্যাঙ্কে হরনাথের নামে শৈলবালা জমা দিতে আরম্ভ করিলেন। এ দিকে কলিকাতায় থাকিয়া হরনাথ পৃথক্ বাসা ভাড়া করিয়া দিন কাটাইতে লাগিল। হাতে যাহা কিছু টাকা ছিল, তাহাতেই কষ্টে-সৃষ্টে তাহাদের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে লাগিল। যথাসময়ে সে এম, এ পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগের প্রথম হইয়া উত্তীর্ণ হইল। অল্পদিনে মধ্যেই কোনও প্রাইভেট কলেজে দেড়শত টাকা বেতনে তাহার এক প্রোফেসারী জুটিল, তাহারই উপর নির্ভর করিয়া অভিমানী ধনীর পুত্র হরনাথের সংসারযাত্রা এক প্রকার সুখে দুঃখে কাটিতে লাগিল। গোপালপুরের সহিত সকল সম্বন্ধই বিচ্ছিন্ন হইল।

এই ভাবে ৩ বৎসর কাটিয়া গেল, আবার পূজার সময় উপস্থিত হইল। এবারে বৃদ্ধ দেওয়ান জানকীবল্লভকে ডাকাইয়া শৈলবালা বলিলেন, “দেখুন দেওয়ানজী, কাল রাত্রিতে আমি একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়াছি, আমার মনে হইতেছে, কর্ত্তার স্বর্গারোহণের পর দুর্গোৎসব বন্ধ করিয়া ভাল করি নাই। কাল রাত্রে স্বপ্নযোগে দেখিলাম, কর্ত্তা আসিয়াছেন এবং আমাকে তিরস্কার করিতেছেন যে,‘তোমার হাতে বিষয় দিয়া গিয়াছিলাম কি কেবল টাকা জমাইবার জন্য? এক শত বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া পিতৃ-পিতামহরা এই চণ্ডীমণ্ডপে জগদম্বার চরণে প্রতি বৎসর পুষ্পাঞ্জলি দিয়া গিয়াছেন, আর তুমি কি না সেই আমার বড় সাধের দুর্গোৎসব বন্ধ করিয়া কেবল লোহার সিন্দুকে টাকা জমা করিতেছ! এ টাকা লইয়া করিবে কি?” তাঁহার কথা শুনিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আমি তাঁহাকে বলিলাম, ‘আমাকে বিষয়ের অধিকারিণী করিয়াই তুমি ত এই সর্ব্বনাশ করিয়াছ। তুমি যদি আমাকে বিষয়ের অধিকারিণী না করিতে, তাহা হইলে আজ আমাকে হরনাথকে হারাইতে হইত না, আমি কাহার জন্য দুর্গোৎসব করিব? সে যদি কখনও ফিরিয়া আসে, তবেই দুর্গোৎসব মানাইবে, তাহা না হইলে এ দুর্গোৎসব আমার পক্ষে বিড়ম্বনা ছাড়া আর কি হইবে?’ আমার এই কথা শুনিয়া, আমার মুখের দিকে চাহিয়া, একটা বড় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন, ‘শৈলবালা! তোমাকে কেন বিষয়ের অধিকারিণী করিয়াছি, তাহা তুমি এখনও বুঝ নাই। যদি আমাকে এবং আমার স্বর্গস্থ পিতৃ-পুরুষকে সুখী করিতে চাও, হরনাথকে আবার ফিরিয়া পাইতে চাও, তাহা হইলে অর্থের সদ্ব্যয় কর, জগদম্বার কৃপায় সকল দুঃখই ঘুচিবে, অধীর হইও না।’ ইহার পরই আমার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, তাই বলিতেছিলাম, আমার মনে হয়, এ বৎসর হইতে আবার দুর্গোৎসব করা আবশ্যক, এ বিষয়ে আপনার কি মত, তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি।”

বৃদ্ধ জানকীবল্লভ অতি ধীরভাবে উত্তর দিলেন, “মা, তোমার সম্পত্তি, তুমি যাহা ভাল বুঝিবে, তাহাই করিবার অধিকার তোমার আছে; কিন্তু আমার মনে হয় যে,

দুর্গোৎসব করিবার পূর্ব্বে একবার গুরুদেবের এ বিষয়ে কি অভিপ্রায়, তাহা জানা আবশ্যক।"

"ভাল কথা, গুরুদেবকে আপনি আজই পত্র লিখুন, তিনি যাহা বলিবেন, তাহাই হইবে।" শৈলবালার এই আদেশ পাইয়া জানকীবল্লভ চলিয়া গেলেন। হঠাৎ শৈলবালার কি মনে হইল, তখনই তাঁহাকে ডাকাইয়া তিনি বলিলেন,"দেখুন দেওয়ানজী, গুরুদেবকে পত্র লিখিবার প্রয়োজন নাই, আপনি আমার তথায় যাইবার ব্যবস্থা করুন, আমি কলাই গুরুদেবের চরণদর্শনার্থ যাইব। পত্রে সকল কথা লিখিয়া জানাইবার সম্ভাবনা নাই, সাক্ষাতে আমি সকল কথা তাঁহাকে জানাইব, তাঁহার অভিপ্রায় কি, তাহা জানিয়া আসিব।"

কর্ত্রী ঠাকুরাণীর এইরূপ আদেশ জানকীবল্লভের তত ভাল লাগিল না, তাঁহার বিবেচনায় এই সামান্য কার্য্যের জন্য কর্ত্রী ঠাকুরাণীর তথায় যাওয়া নিষ্প্রয়োজন অথচ ক্লেশকর, একখানি পত্রের দ্বারা যাহা অনায়াসে হয়, তাহার জন্য এত খরচ করিয়া ক্লেশ ভোগ করা স্ত্রীবুদ্ধিতেই শোভা পায়, এই ভাবিয়া তিনি শৈলবালাকে এরূপ সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু শৈলবালার প্রকৃতি তিনি ভালই বুঝিতেন, তিনি যাহা ধরেন, তাহা না করিয়া ছাড়েন না, বাধা দিলে প্রত্যুত বিরক্ত হন, ইহা সুচতুর দেওয়ানজীর ভাল করিয়া জানা ছিল, তাই তিনি তাহা না করিয়া বলিলেন, "সেই ভাল, আপনি যাহা ভাল বুঝিয়াছেন, তাহাই হইবে, আমি যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিতেছি।"

৪

শৈলবালা গুরুগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, গুরুর নাম অভয়ানন্দ বাচস্পতি, তাঁহার বয়স ষাটের উপরে হইবে, দীর্ঘশ্মশ্রু ও জটাজুটে তাঁহার গম্ভীর বদনমণ্ডল আরও গম্ভীরতর। তিনি দীর্ঘাকৃতি, অথচ কৃশ। তাঁহার শরীরে দৈহিক ও মানসিক বলের চিহ্নসকল সকলেরই নিকট পরিস্ফুট হইয়া থাকে। শাস্ত্রে তাঁহার অগাধ জ্ঞান, জপে তপে তিনি সর্ব্বদাই নিরত থাকেন, দরিদ্র হইয়াও তিনি সর্ব্বদা সন্তোষশীল। শৈলজানন্দ ও তাঁহার পত্নী শৈলবালা তাঁহার নিকট বহু পূর্ব্বে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, ধনী জমীদার শৈলজানন্দের গৃহে তিনি কিন্তু এক দিনও আসেন নাই, বহু অনুরোধ করিয়াও শৈলজানন্দ-তাঁহাকে কখনও নিজের বাড়ীতে লইয়া যাইতে পারেন নাই। এই সন্তোষশীল, বিশুদ্ধচরিত্র ও তপোনিরত গুরুকে শৈলবালা বিশেষ ভক্তি করিতেন, ভয়ও করিতেন। মধ্যে মধ্যে শৈলজানন্দ ও শৈলবালা গুরুর সেবার জন্য কিছু কিছু অর্থ পাঠাইলে কোন বার হয় ত তিনি গ্রহণ করিতেন, কোনও বার বা প্রয়োজন নাই বলিয়া ফেরত পাঠাইতেন। শৈলজানন্দের মৃত্যুর পর তাঁহার সমারোহের ক্রিয়ার কালে গুরুকে লইয়া যাইবার জন্য শৈলবালা যথেষ্ট চেষ্টাও করিয়াছিলেন, কিন্তু অভয়ানন্দ যাইবার কোনও প্রয়োজন নাই বলিয়া যান নাই। এহেন গুরুর সহিত কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, তাহা শৈলবালা ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিলেন, সেই জন্য তিনি আর তাঁহাকে বড় পত্রাদি দিতেন না, কিন্তু মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু অর্থ পাঠাইতেন; অভয়ানন্দ কখনও বা লইতেন, কোন বার বা প্রয়োজন নাই বলিয়া ফেরত পাঠাইতেন। গুরুর প্রতি কিন্তু শৈলবালার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল, এবং ইহাও দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তিনি ইচ্ছা করিলে হরনাথ নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিবে এবং গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আবার সংসারের ও জমীদারীর কাযকর্ম্ম করিবে।

হরনাথ বাটী হইতে চলিয়া যাইবার পর সমস্ত ঘটনা পত্র দ্বারা শৈলবালা গুরুদেবকে জানাইয়াছিলেন। পত্রের উত্তরে গুরুদেব লিখিয়াছিলেন, "ব্যাকুল হইও না, প্রতীক্ষা কর, সকল বিপদ্ই কাটিয়া যাইবে।" এই কয়েকটি কথা ছাড়া আর কোন কথা সে পত্রে ছিল না।

বাটী হইতে প্রহরিবেষ্টিত শিবিকার মধ্যে চড়িয়া, দুই দিনের পথ অতিক্রম করিয়া, শৈলবালা তৃতীয় দিবসে দিবা দ্বিতীয় প্রহরে গুরুগৃহে আসিয়া পৌছিয়াছেন; আসিয়া দেখেন, মাধ্যাহ্নিক ধর্ম্মকার্য্য শেষ করিয়া গুরুদেব তাঁহার চালা-ঘরের দাবায় আসিয়া বসিয়াছেন, গুরুপত্নী তাঁহার আহারের উদ্যোগ করিতেছেন। বাটীতে লোকজন বড় কেহই নাই, এক জন ভৃত্য মাত্র দ্বারদেশে বসিয়া তামাকু খাইতেছে। হঠাৎ লোকজন সমভিব্যাহারে অতর্কিতভাবে শৈলবালাকে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া অভয়ানন্দ যেন একটু বিস্মিত হইলেন, এমন সময় শৈলবালা তাঁহার চরণে মস্তক রাখিয়া নমস্কার পূর্ব্বক বলিলেন, "বাবা, না জানাইয়া আসিয়াছি, কন্যার

এ অপরাধ ক্ষমা করিবেন, বড় বিপদে পড়িয়াই শরণ লইতেছি। গুরুদেব, আপনি ছাড়া এ হতভাগিনীর এ অসময়ে আর কেহই রক্ষক নাই।"

অভয়ানন্দ প্রসন্নবদনে উত্তর করিলেন, "মা, ভয় কি, কন্যা পিতার নিকট আসিয়াছে, তাহাতে আবার পূর্ব্বে জানাইবার প্রয়োজন কি? পথশ্রমে বিলক্ষণ ক্লেশ হইয়াছে দেখিতেছি, সুস্থ হও, স্নানাহার কর, তাহার পর সব কথা শুনিব। ভয় পাইও না, জয়দম্বাকে স্মরণ কর, তাঁহার অনুগ্রহে কোন বিপদই থাকিবে না।"

৮

যথাসময়ে স্নানাহ্নিক শেষ করিয়া শৈলবালা গুরুদেবের প্রসাদ পাইলেন, তাহার পর গুরুদেবের পদপ্রান্তে বসিয়া আঁখির জলে বক্ষ ভাসাইয়া প্রাণের সকল বেদনাই শৈলবালা ধীরে ধীরে গুরুদেবকে জানাইলেন, যাত্রা করিবার পূর্ব্ব-রাত্রিতে দৃষ্ট স্বপ্নের কথাও তাঁহাকে জানাইলেন এবং বলিলেন, "আপনি যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে এ বৎসর আমি দুর্গোৎসবের আয়োজন করি, এই অনুমতি পাইবার জন্যই আমি শ্রীচরণান্তিকে উপস্থিত হইয়াছি।"

শৈলবালার কথা শুনিয়া কিয়ৎকালের জন্য অভয়ানন্দ চুপ করিয়া রহিলেন। পরে বলিলেন, "বেশ, সাধু সঙ্কল্প, কিন্তু তোমার নিজ গৃহে এবার দুর্গোৎসব না-ই বা হইল। অনেক দিন হইতে আমার মনে সঙ্কল্প হইয়াছে যে, জীবনে একবার চিন্ময়ীর মৃন্ময়মূর্ত্তি পূজা করিয়া আমার এই গৃহকে ও আত্মাকে পবিত্র করিব, তাই বলি, তুমি এইখানে দুর্গোৎসব কর, আমি নিজেই পূজা করিব, আমার পূজাতে তোমার পূজা হইবে। আমি দরিদ্র, দরিদ্রের মতই পূজা করিব, তুমি বসিয়া সেই পূজা দেখিবে, পূজার জন্য বেশী অর্থ-ব্যয়ের কোন প্রয়োজন নাই, ইহার জন্য আমি যাহা সঞ্চয় করিয়াছি, তাহাতেই পূজা সম্পন্ন হইবে। তবে পূজার সময় তোমার আত্মীয় ও কুটুম্ববর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া তোমাকে এখানে আনাইতে হইবে, তাহাদের যাতায়াতের ব্যয় তুমিই নির্ব্বাহ করিও। আমার কাছে যাহা অর্থ আছে, তাহাতে যদি না কুলায়, তাহা হইলে তুমি অবশিষ্ট অংশ দিলেই চলিবে।"

গুরুদেবের কথা শুনিয়া শৈলবালা বিস্মিত হইলেন। তাঁহার মনে ভয় হইল যে, এ কি কার্য্য আমি করিতে উদ্যত হইয়াছি! আমার জন্য গুরুদেবের কতকগুলি অর্থ-ব্যয় হইবে, অনেক ক্লেশ সহিতে হইবে, অথচ আমার অর্থ আছে, ব্যয় করিবার জন্য আমি প্রস্তুতও আছি, গুরুদেব কিন্তু কিছুই লইবেন না, ইহাতে ত আমারই প্রত্যবায় হইবে, কেন গুরুদেব এরূপ আদেশ করিতেছেন, তাহা ত বুঝিতে পারিতেছি না।

শৈলবালার মনের কথা বুঝিতে তীক্ষ্ণধী অভয়ানন্দের একটুও বিলম্ব হইল না। তিনি হাসিয়া বলিলেন, "শৈলবালা! বৃথা চিন্তা করিয়া ক্লেশ পাইও না, আমি যাহা বলিতেছি, তাহাই কর, জগদম্বার কৃপায় মঙ্গলই হইবে, বৃথা আশঙ্কা পরিত্যাগ কর।"

ইহার উপর আর কোন কথা বলিয়া গুরুদেবকে বিরক্ত করিতে শৈলবালার সাহসে কুলাইল না, তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়া গুরুর চরণে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন, "বাবা, তাহাই হইবে, আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।"

পরদিন হইতেই অভয়ানন্দ পূজার আয়োজন করিতে আরম্ভ করিলেন। সকলেই তাঁহাকে দরিদ্র জানিত, কিন্তু পূজার আয়োজন যে ভাবে তিনি আরম্ভ করিলেন, তাহা দেখিয়া গ্রামের লোকের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তাঁহার ক্ষুদ্র বাড়ীখানির চারিদিকে মাঠ, গৃহের সম্মুখেই একখানি প্রকাণ্ড আটচালা নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হইল, ভাল কুম্ভকারকে কৃষ্ণনগর হইতে আনাইয়া শুভদিনে প্রতিমার গঠন আরম্ভ হইল, সাময়িকভাবে রন্ধনের উপযোগী গৃহ ও ভাণ্ডারঘর প্রভৃতিরও নির্ম্মাণ হইতে লাগিল। অভয়ানন্দের প্রকাণ্ড বাঁশের ঝাড়ও ছিল, সুতরাং ঐ সকল চালা-ঘর নির্ম্মাণ করিতে বাঁশের খরচ তাহা হইতেই হইল। অভয়ানন্দের গ্রামের নিকটেই তাঁহার ব্রহ্মোত্তর জমীতে কতকগুলি প্রজা বাস করিত, তাহারা আসিয়াই গৃহনির্ম্মাণকার্য্যে লাগিয়া গেল। এই ভাবে অল্পদিনের মধ্যে পূজার প্রয়োজনীয় বস্তু-সমূহের যোগাড় হইয়া উঠিল। শৈলবালাকে ডাকিয়া এক দিন অভয়ানন্দ বলিলেন, "আমার ইচ্ছা, মায়ের প্রসাদ পাইবার জন্য এখানে যত লোক উপস্থিত হইবে, সকলেই যেন পেট ভরিয়া প্রসাদ পাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে, এই কার্য্যের জন্য আমার বোধ হয়, অন্ততঃ ষাট মণ চাউল এবং তাহার উপযোগী ডাল ও

তরীতরকারীর প্রয়োজন, তুমি যদি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে এই ব্যয়ভার গ্রহণ করিতে পার।”

গুরুদেবের এই সকল কথা শুনিয়া শৈলবালা বড়ই আশান্বিতা হইলেন এবং বলিলেন, “যদি আজ্ঞা হয়, তাহা হইলে শুধু চালেরই ব্যবস্থা কেন, আমার মনে হয়, বৈকালীর জন্য মিঠাই, পুরী প্রভৃতির ব্যবস্থা করিলে আরও ভাল হয়। আপনি যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে আমি তাহারও ব্যবস্থা করি

গুরুদেব তাহাতে সম্মতি দিলেন সানন্দচিত্তে শৈলবালা সেই দিনই গোপালপুরে পত্র দ্বারা জানকীবল্লভকে জানাইলেন যে, তিনি যেন স্বয়ং উপস্থিত হইয়া এই সকল বিষয়ের ব্যবস্থা করিয়া যান। এই ভাবে দুর্গোৎসবের মহা আড়ম্বরে ব্যাপৃত থাকিয়া শৈলবালা পুত্রবিয়োগক্লিষ্ট অন্তঃকরণে কিছু কালের জন্য যেন একটু শান্তিবোধ করিলেন। গুরুদেবের গ্রামখানির নাম আনন্দপুর। আনন্দপুর ভাগীরথীর তটে অবস্থিত। আনন্দপুরে আনন্দময়ীর এই ভাবে আগমন-সংবাদ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল, দরিদ্র সাধক অভয়ানন্দের গৃহে জগজ্জননীর পূজা দেখিবার জন্য সেই অঞ্চলের দীন ও দরিদ্র ব্যক্তিগণের অন্তঃকরণ আশায় ও উল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

৬

কলিকাতার ক্ষুদ্র বাসায় হরনাথ পত্নী ইন্দুমতীর সহিত সুখে-দুঃখে দিন কাটাইতেছিল। অল্প বেতন বলিয়া এই ছোট সংসারে খুব স্বচ্ছলতা না থাকিলেও শান্তির অভাব ছিল না। পিতার বিপুল জমীদারী, আবাল্য সুখের অঙ্কে লালনপালন, আত্মীয়-স্বজনের আদরমাখা ব্যবহার সে সবই ভুলিয়াছিল, পিতার অকারণ কঠোর ব্যবহারে যে দুর্জ্জয় অভিমান সে বরণ করিয়া লইয়াছিল, তাহার ফলে তাহার হৃদয় কঠোর হইয়া উঠিয়াছিল, সেই জন্য স্বেচ্ছায় অঙ্গীকৃত দারিদ্র্যের কঠোর তাড়না সহ্য করিতে 'তাহার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল, এ কথা সবই সত্য, কিন্তু আজ কেন তাহার মন হঠাৎ এক নূতন বিষাদের অব্যক্ত ছায়ায় অন্ধকার হইয়া আসিতেছে, সে তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছে না। ভাদ্রমাস। আকাশ নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন, সমস্ত দিন বৃষ্টি হইয়াছে, সন্ধ্যার পর সে বাড়ী আসিয়া, ভিজা কাপড় ছাড়িয়া, শয্যার উপর বসিয়া, ইন্দুমতীকে ডাকিয়া নিকটে বসাইলে, ইন্দুমতী পতির মুখের দিকে চাহিয়া একটা আশঙ্কার ভাব অনুভব করিতে লাগিল। প্রতিদিনই হরনাথ বাহিরের কায-কর্ম্ম সারিয়া যখন গৃহে ফিরিয়া আসে, ইন্দুমতীকে দেখিয়া তাহার মন প্রসন্ন হইয়া উঠে। মৃদু হাস্যের কোমলরশ্মিতে বিস্ফারিত নয়নদ্বয়ে যেন শরতের জ্যোৎস্না ফুটিয়া উঠে, আজ এ কি? সে হাসি নাই, সে উল্লাস নাই। মুখ যেন কেহ কালিমায় লেপিয়া দিয়াছে। ইন্দুমতীর জীবনের সারসর্ব্বস্ব স্বামীর এই আকস্মিক ভাবপরিবর্ত্তনে বুকের ভিতর যেন কাঁপিয়া উঠিল। ভীতি-বিহ্বলচিত্তে হরনাথের দিকে চাহিয়া সে বলিল, “আজ কেন এমন দেখিতেছি, তোমার কি কোন অসুখ হইয়াছে?”

হরনাথ বলিল, “শরীরের কোন অসুখ ত বুঝিতে পারিতেছি না, ইন্দু! মনটা কিন্তু কি জানি কেন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। কে যেন বলিয়া দিতেছে, নূতন ভাবের কোন বিপদ্ আসিতেছে। দেখ ইন্দু, আমার মনে হয়, আমরা সোজাপথে চলিতেছি না, পিতার দারুণ দুর্ব্যবহারের কথা মনে হইলে, মনে হয়, যাহা করিতেছি—ঠিকই করিতেছি, কিন্তু মা'র কথা মনে হইলে মনে হয়, সন্তানের কার্য্য আমার দ্বারা হইতেছে না। তাঁহার কি অপরাধ—যাহার জন্য আমরা তাঁহার সঙ্গে এত কঠোর ব্যবহার করিতেছি? এই সকল কথা মনে হওয়ায় আজ মনটা বড়ই চঞ্চল হইয়াছে। তুমি কাছে ব'স, একটু বাতাস কর, আমি একটু শুই, আহার করিতে ভাল লাগিতেছে না, তুমি রান্নাঘরে খাবার-দাবার গুছাইয়া এইখানে আসিয়া ব'স, আমার মাথায় একটু বাতাস কর, আমি একটু ঘুমাইবার চেষ্টা করি।”

পতির কথা অনুসারে ইন্দুমতী তাড়াতাড়ি সকল গুছাইয়া আবার ফিরিয়া আসিল; আসিয়া দেখে, হরনাথ বিছানায় শুইয়া পড়িয়াছে এবং গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে। সশঙ্ক হৃদয়ে হরনাথের মাথায় হাত দিয়া ইন্দুমতীর বোধ হইল, তাহাতে অস্বাভাবিক বেশী রকমের তাপ হইয়াছে। মনে হইল, ইহা জ্বর। অঘোরভাবে আচ্ছন্ন হইয়া হরনাথ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, শুধু মাথায় তাপ, তাহা নহে, সর্ব্বাঙ্গেই তাহার বিলক্ষণ তাপবোধ হইতেছে। ইন্দুমতী বড়ই ব্যাকুল হইল, দাসী কাযকর্ম্ম সারিয়া চলিয়া গিয়াছে, বাসায় আর অন্য জনমানব কেহই নাই, এত বড় জ্বর ইন্দুমতী ত কখনও দেখে

নাই, কাহার সাহায্য লইবে, কাহার সহিত পরামর্শ করিবে, কি করিবে, এই সকল ভাবনায় সে অস্থির হইয়া পড়িল। এই ভাবে তিন চারিঘণ্টা কাটিয়া গেল, শিয়রে বসিয়া সে বাতাসই করিতেছে, হরনাথ কিন্তু অচৈতন্য অবস্থায় সেই ভাবেই পড়িয়া আছে। ক্রমে রাত্রি অনেক হইল, কোনও প্রতীকারের উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া ইন্দুমতী নিজের দুরবস্থার ও অসহায়তার কথা ভাবিতে ভাবিতে কাঁদিতে কাঁদিতে সেই বিছানায় পড়িয়াই ক্লান্তি বশতঃ ঘুমাইয়া পড়িল।

৭

শেষ রাত্রিতে ইন্দুমতীর নিদ্রাভঙ্গ হইল, তাড়াতাড়ি বসিয়া সে পাখা হাতে লইয়া, আবার বাতাস করিতে উদ্যত হইয়া, নিদ্রাভারক্লিষ্ট অস্পষ্ট দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার অন্তরাত্মা ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। সে দেখিল, বিছানা খালি পড়িয়া আছে, হরনাথ তথায় নাই। তাড়াতাড়ি ব্যাকুলভাবে উঠিয়া গৃহের আশে-পাশে খুঁজিয়া ইন্দুমতী দেখিল, কোথায়ও খুঁজিয়া পাইল না, ঘরের বাহির হইয়া তাহাদের ক্ষুদ্র বাসাখানির সকল অংশই সে খুঁজিতে লাগিল, কোথায়ও হরনাথের কোনও চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গেল না; সদর-দরজায় আসিয়া দেখিল, ভিতর হইতে দরজার খিল দেওয়া রহিয়াছে। কেহ যে রাত্রিকালে সেই বাটী হইতে বাহিরে গিয়াছে, তাহার কোন চিহ্নই দেখা যাইতেছে না। এ কি হইল?

দৌড়িয়া ইন্দুমতী ছাদের উপর উঠিল। তথায়ও দেখিল, কোন চিহ্ন পাওয়া যাইতেছে না। ভীতিবিহ্বলা কম্পিতাঙ্গী ইন্দুমতী তখন বজ্রাহত লতিকার ন্যায় ভূমিতে আছড়াইয়া পড়িল এবং শ্রীমধুসূদনকে স্মরণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে দরদরিত অশ্রুধারায় কাঁদিতে লাগিল। সংসার তাহার পক্ষে জীর্ণারণ্যের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল, সকল দিক্ যেন শূন্য হইয়া গিয়াছে, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সব মিলিয়া যেন এক অখণ্ড নিরবধি বিরাট অন্ধকারে মিশিয়া গিয়াছে। আকস্মিক অভাবনীয় বিপৎপাতের দারুণ আঘাত সে সহ্য করিতে পারিল না, তাহার সংজ্ঞা লুপ্ত হইতে লাগিল, সে তখন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

ক্রমে রাত্রি পোহাইল, নবোদিত সূর্য্যের উদ্দীপ্ত আলোকচ্ছটা তাহার আননে প্রতিফলিত হইলে ক্রমে ইন্দুমতীর সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। সে শুনিতে পাইল, বাহিরের দুয়ারে দাসী আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে 'দোর খোল', 'দোর খোল' বলিয়া কড়া নাড়িতে নাড়িতে চীৎকার করিতেছে। অনেক কষ্টে ইন্দুমতী উঠিয়া বসিল, বহুক্ষণব্যাপী মোহের আবেশে তাহার শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল, অতিকষ্টে অতি ধীরে সে উঠিয়া দাঁড়াইল, কাঁপিতে কাঁপিতে নীচে নামিয়া সে দ্বার খুলিয়া দিল এবং বিশ্বস্ত সমবেদনাযুক্ত দাসীকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে 'আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। ব্যাপার কি, তাহা বুঝিতে না পারিয়া ইন্দুমতীর হাত ধরিয়া দাসী তাহাকে উপরে উঠাইয়া হরনাথের পরিত্যক্ত শয্যার উপর শোয়াইয়া দিল এবং বহুক্ষণ শুশ্রূষা ও আশ্বাসবাক্যের দ্বারা তাহাকে কথঞ্চিৎ সুস্থ করিল। কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া ইন্দুমতী একে একে গতরাত্রির সকল কথা দাসীকে বলিল; কথা শেষ করিয়া মুক্তকণ্ঠ হইয়া পাগলের ন্যায় সে আবার কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

এই ভাবে ক্রমে ৯টা বাজিল, দাসী অনেক করিয়া ইন্দুমতীকে বুঝাইতে লাগিল। সে বলিল—"মা, এ যে কি ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহা মানুষ বুঝিতে পারে না। আমার বোধ হয়, ইহার মধ্যে কোনও দৈবঘটনা নিশ্চয়ই রহিয়াছে। আমার মন বলিতেছে, তিনি ইচ্ছা করিয়া কখনই তোমাকে একলা ফেলিয়া এমন নির্দ্দয়ভাবে চলিয়া যাইতে পারেন না। নিশ্চয় কোন অমানুষিক ব্যাপার ইহার মধ্যে ঘটিয়াছে। চোর বা ডাকাত বাড়ী আসিয়া তাঁহার কোন অনিষ্ট করিয়াছে, তাহারও কোন চিহ্নই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। ঐ দেখ, তাঁহার পরিবার জামা ও চাদর ঘরের মধ্যে যেখানে থাকিত, সেখানে নাই, এমন কি, তাঁহার জুতা জোড়াও খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। ইহাতে মনে হয়, তিনি যাইবার সময় জামা ও জুতা পরিয়াই বাহির হইয়াছেন, কেমন করিয়া বাহির হইয়াছেন, তাহাও আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। তিনি নিশ্চয়ই ফিরিয়া আসিবেন, তুমি অত অধীর হইও না।"

দাসীর কথা শুনিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া পাগলিনীর ন্যায় হাসিতে হাসিতে ইন্দুমতী বলিল—"বৃথা চেষ্টা, আমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে, সমূলে উন্মূলিত বৃহৎ অশ্বত্থের মূলে জলসেক করিতেছিস্, তা করায় ফল কি, তাহা ভাবিয়া আমার হাসি পাইতেছে।"

৮

সে দিন অতিবাহিত হইল, অনেক কষ্টে বুঝাইয়া বিন্দুদাসী ইন্দুমতীকে যথাকথঞ্চিৎ স্নানাহার করাইল। সে রাত্রিতে আর নিজের বাসায় গেল না, ইন্দুমতীর কাছেই সে শুইয়া রহিল। অল্পক্ষণের পরে বিন্দু ঘুমাইয়া পড়িল। ইন্দুমতীর নেত্রে নিদ্রা নাই, হৃদয়ে শান্তি নাই, নয়ন হইতে যেন অগ্নিবৃষ্টি হইতেছে। সে বিছানায় উঠিয়া বসিল, উন্মুক্ত গবাক্ষমধ্য দিয়া ভাদ্রের ঘন তমসাচ্ছন্ন রজনীর গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে আকুল হৃদয়ে ভাবিতে ভাবিতে সে অধীর হইয়া পড়িল; প্রত্যেক ক্ষণটি তাহার নিকট এক এক যুগ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল; বসিয়া বসিয়া, ভাবিতে ভাবিতে কোন এক অজানা মুহূর্ত্তে তাহার তন্দ্রার আবেশে ক্ষণকালের জন্য নয়নদ্বয় যেমনই মুদ্রিত হইল, অমনই হঠাৎ 'মা ইন্দুমতী' এই অপরিচিত আহ্বানে তাহার নিদ্রার আবেশ ভাঙ্গিয়া গেল। চোখের সম্মুখে সে যাহা দেখিল, তাহা বিচিত্র, অদ্ভুত ও অভাবনীয়। দেখিল, তাহাদের সেই অন্ধকার গৃহ অকস্মাৎ জ্যোৎস্নার ন্যায় শুভ্র আলোকে ভরিয়া গিয়াছে; নিকটে সম্মুখে এক জটাজূটমণ্ডিত দীর্ঘাকার প্রসন্নবদন পুরুষ তাহাকে ডাকিতেছেন—"মা ইন্দুমতী, ভয় পেয়েছ ? ভয়ের কোন কারণ নাই, তোমার স্বামী ভাল আছেন, ব্যাকুল হইও না, কয়েক দিন ধীরভাবে অপেক্ষা কর, তাহার পর তোমার স্বামীর সহিত তোমার মিলন হইবে।"

এই কয়টি কথা শুনিয়া, তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে উঠিয়া, ইন্দুমতী সেই অপরিচিত পুরুষকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিবে, এই ইচ্ছায় যেমন শয্যা ত্যাগ করিয়া নীচে নামিল, অমনই দেখিল, গৃহ আবার অন্ধকারে ভরিয়া গেল, সে উজ্জ্বল দিব্য আলোক কোথায় মিশিয়া গেল, সে অপরিচিত অদ্ভুত পুরুষমূর্ত্তি শূন্যে মিশিয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি দাসীকে উঠাইয়া প্রদীপ জ্বালিয়া ইন্দুমতী দেখিল, গৃহের দ্বার ভিতর হইতে যেমন রুদ্ধ ছিল, তেমনই রহিয়াছে, এরূপ যে একটা অভাবনীয় ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার কোন চিহ্নই খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। ইন্দুমতীর মুখে সকল কথা শুনিয়া বিন্দু দাসীর মনে হইল যে, সত্য সত্যই ইন্দুমতী বুঝি পাগল হইল। হতভাগিনীর দুঃখের কথা স্মরণ করিয়া সে-ও হায় হায় করিয়া কাঁদিতে লাগিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, ইন্দুমতীর কিন্তু সে ব্যাকুলভাব আর নাই, সে অনেকটা সুস্থ হইয়াছে, আবার নূতন আশায় বুক বাঁধিয়াছে, তাই সে বিন্দুকে বলিল, "তোমার বিশ্বাস হইতেছে না, আমার কিন্তু মনে হয়, সেই মহাপুরুষই আমার স্বামীকে তাঁহারই ভালর জন্য কোথায় লইয়া গিয়াছেন; মনে হয়, তিনি আবার শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন, তুমি ভাবিও না, আমাদের এ দুঃখের দুর্দ্দিন শীঘ্রই কাটিয়া যাইবে।"

৯

আনন্দপুরে অভয়ানন্দের কুটীরে আনন্দময়ীর আনন্দময় শুভাগমনের দিন যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ততই গ্রামের জনসমূহের মধ্যে আনন্দ-সমুদ্র যেন উদ্বেল হইবার উপক্রম হইল। গোপালপুর হইতে বৃদ্ধ কর্ম্মচারী জানকীবল্লভ শৈলবালার আদেশানুসারে স্বয়ং কর্ম্মচারিবর্গের সঙ্গে উপস্থিত হইয়া পূজার আয়োজনে মনে-প্রাণে লাগিয়া গিয়াছেন, অনেকগুলি আরও নূতন চালা-ঘর বাঁধিয়া তাহারই মধ্যে অপর্য্যাপ্তভাবে চাল, ডাল, ময়দা, সুজি, চিনি, মিছরী, নারিকেল প্রভৃতির সম্ভার সাজাইতেছেন। গ্রামের চারিপার্শ্বে প্রায় বিশ মাইল দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে নানাজাতীয় লোক আসিয়া সেই বিরাট আয়োজনে অযাচিতভাবে সাহায্য করিতেছে। শৈলবালা তন্ময় হইয়া গুরুদেবের আদেশানুসারে মহাপূজার মহা আয়োজনে মন-প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছেন। আনন্দপুরে আনন্দ যেন মূর্ত্তি ধরিয়া খেলা করিতেছে।

হঠাৎ এক দিন প্রাতঃকালে অভয়ানন্দ শৈলবালাকে বলিলেন, "দেখ মা, আমি কলিকাতায় চলিলাম, কাল সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসিব, তুমি প্রস্তুত হও, আমার সঙ্গে তোমার হরনাথ আসিবে; কিন্তু তাহাকে যদি পীড়িত দেখ, তাহাতে অধীর হইও না, সে ভাল হইবে। কোন চিন্তা করিও না।" এই বলিয়া দুই জন ছাত্রকে সঙ্গে লইয়া অভয়ানন্দ নৌকাযোগে কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। আটখানি দাঁড়ের নৌকা পূর্ব্ব হইতে তাঁহার আদেশানুসারে ঘাটে বাঁধা ছিল, সেই নৌকায় চড়িয়া তিনি কলিকাতায় প্রস্থান করিলেন। যাইবার কালে গুরুদেবের গুরু-গম্ভীর মুখের দিকে তাকাইয়া শৈলবালার মনে বড়ই আশঙ্কার উদয় হইল, সাহস করিয়া আর কোন কথাই সে জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। পরদিন সমস্ত দিবস শৈলবালার মনে যে কি তোলপাড় করিতেছিল, তাহা লিখিয়া জানাইবার নহে। সে কেবলই পথের দিকে ব্যাকুলভাবে চাহিতেছিল। সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময় দেখিল, একখানি

পাল্কী আসিতেছে এবং তাহার পশ্চাতে প্রশান্ত সৌম্য গম্ভীরমূর্ত্তি গুরুদেব ছাত্র দুইটির সহিত দ্রুতগতি পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছেন। ইহা দেখিয়া ইন্দুমতীর প্রাণটা বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িল, মুখখানি শুকাইয়া গেল, মধুসূদনের নাম জপিতে জপিতে সে গৃহের বাহিরে আসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। পাল্কী আসিলে তাড়াতাড়ি দুইটি ছাত্র ও অভয়ানন্দ ধরাধরি করিয়া হরনাথকে পাল্কী হইতে বাহির করিয়া লইয়া গেলেন এবং নিজের বিছানার উপর শোয়াইয়া দিলেন। হরনাথের জ্ঞান নাই, মুখ যেন কেহ কালি দিয়া মাখাইয়া দিয়াছে, চক্ষু রক্তবর্ণ। শৈলবালা দেখিয়া 'গুরুদেব, এ কি ঘটিল' এই বলিয়া ভীতি-কম্পিতকণ্ঠে অস্ফুটস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। অভয়ানন্দ গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "শৈলবালা, প্রকৃতিস্থ হও,কোনও ভয় নাই, আমি হরনাথকে বাঁচাইব, বাঁচাইব বলিয়াই এখানে আনিয়াছি, তুমি কাঁদিয়া অস্থির হইলে আমার সকল শ্রমই ব্যর্থ হইবে। সাবধান হও, পুত্রের শুশ্রূষার জন্য প্রস্তুত হও।"

কেমন করিয়া কি ভাবে অভয়ানন্দ পূর্ব্ব হইতেই জানিয়া হরনাথকে কলিকাতা হইতে এই অল্পসময়ের মধ্যে লইয়া আনন্দপুরে ফিরিলেন, ইহার মীমাংসা পরে হইবে। অভয়ানন্দ এক জন সিদ্ধপুরুষ বলিয়া আনন্দপুর অঞ্চলে অনেকের নিকট পরিচিত ছিলেন, ইহা আমরা বহুপূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম। তাঁহার সিদ্ধির ধারা বা সাধনার রীতি কি ছিল, সে কথা এখানে না বলাই উচিত মনে হয়।

হরনাথের পীড়া খুবই সাংঘাতিক হইয়াছিল, পনর দিন পর্য্যন্ত সে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ছিল, জ্বর খুব বেশী, এত বেশী যে, প্রতি মুহূর্ত্তেই হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইবার আশঙ্কা হইতেছিল। ভাল চিকিৎসক কলিকাতা হইতে অনেকেই আসিয়াছিলেন, চিকিৎসারও কোন ত্রুটি ছিল না, কিন্তু কোন চিকিৎসকেরই আশা ছিল না যে, রোগী নিরাময় হইবে। চতুর্দ্দশ দিনের রাত্রিতে রোগী যায় যায় হইল, নাড়ী ছাড়িয়া গিয়াছে, খুব ঘাম হইতেছে। শৈলবালা চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গুরুদেবের চরণে আছড়াইয়া পড়িলেন। তিনি তখন বসিয়া সমাহিতচিত্তে নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন,হঠাৎ শৈলবালার চীৎকারে ও ব্যাকুলতায় তাঁহার সমাধিভঙ্গ হইল। শৈলবালার এত ব্যাকুলতা ও মর্ম্মভেদী ক্রন্দনে তিনি তিলমাত্র বিচলিত হইলেন না। তিনি বলিলেন, "শৈলবালা, কেন ব্যাকুল হইতেছ? আজই তোমার পুত্রের জ্বরত্যাগ হইবে, কোন আশঙ্কা করিও না, সে নীরোগ হইবে।" এই বলিয়া তিনি উঠিলেন, জপমালিকা হাতে লইয়া ধীরে ও গম্ভীরপদবিক্ষেপে যে ঘরে হরনাথ মুমূর্ষুভাবে পড়িয়া ছিল, সেখানে উপস্থিত হইলেন। চারিদিকে ডাক্তারের দল ঘিরিয়া বসিয়া আছে, সকলেরই মন বিষণ্ণ। হঠাৎ অভয়ানন্দ সেইখানে দাঁড়াইয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন—"আপনারা সকলেই এই গৃহ পরিত্যাগ করুন, আপনাদিগের চিকিৎসার ফল দেখা গেল, এইবার আমাকে চিকিৎসা করিতে দিন।" অকিঞ্চন দরিদ্র ব্রাহ্মণের এই অসমসাহসের ও দম্ভের কথা শুনিয়া চিকিৎসকগণ অনেকেই তাঁহাকে মনে মনে বাতুল বলিয়া উপহাস করিতে লাগিলেন। দুই এক জনের মনে হইল, তাঁহাকে দুই একটা রূঢ় কথা শুনাইয়া দেন, কিন্তু বিশ্বাসমাখা জাজ্বল্যমান তদীয় নয়নের প্রতি চাহিয়া কাহারও সেরূপ সাহস হইল না, একে একে তাঁহারা রোগীর গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাহিরে চলিয়া গেলেন। গৃহের মধ্যে শৈলবালা রোগীর শিয়রে বসিয়া ছিলেন, তাঁহাকেও গৃহ হইতে অভয়ানন্দ বাহিরে যাইতে আদেশ করিলেন। তাহার পর তিনি সেই গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া অচেতন হরনাথের শিয়রে আসিয়া ধীরভাবে উপবেশন করিলেন। ধীরে ধীরে তাহার মস্তক নিজের অঙ্কে করিয়া একদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। নিজের বাম হস্ত তাহার ব্রহ্মরন্ধ্রে স্থাপিত করিয়া দক্ষিণ হস্ত তাহার সর্ব্বাঙ্গের উপর মস্তক হইতে পাদ পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। প্রায় এক দণ্ড কাল এইরূপ প্রক্রিয়া করিবার পর তিনি রোগীর শয্যা পরিত্যাগ করিয়া ভূমিতে উপবেশন করিলেন এবং জাজ্বল্যমান স্থির দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। এই ভাবে আরও এক ঘণ্টা অতীত হইল, হঠাৎ রোগীর দেহ একটু কম্পিত হইল, অল্পক্ষণ পরে হরনাথ চক্ষু উন্মীলিত করিল। শিয়রে অভয়ানন্দের আদেশক্রমে পূর্ব্ব হইতেই আম্রপল্লব-আচ্ছাদিত একটি তাম্রঘট সন্নিবেশিত হইয়াছিল, তাহা হইতে আম্রপল্লবগুলি উঠাইয়া ঘটের মধ্য হইতে মন্ত্রপূত গঙ্গাজল দ্বারা পল্লবগুলি সিক্ত করিয়া তিনি তাহার দ্বারা হরনাথের মস্তকে জলবিন্দু প্রক্ষেপ করিতে করিতে মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন :—

"সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরাঃ।
বাসুদেবো জগন্নাথস্তথা সঙ্কর্ষণঃ প্রভুঃ।
প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ ভবন্তু বিজয়ায় তে॥"

কিয়ৎকাল পরে হরনাথ আবার নয়নদ্বয় উন্মীলিত করিল। তাহার চক্ষুর দিকে চাহিয়া অভয়ানন্দ বুঝিলেন যে, হরনাথের চৈতন্যসঞ্চার হইয়াছে, তখন তিনি আনন্দবিস্ফারিত নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন; তাহার পর ঊর্দ্ধে অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া নম্রভাবে সাশ্রুনেত্রে প্রণাম করিলেন ও বলিলেন :—

"জয় দেবি! জগন্মাতর্জগদানন্দদায়িনি!
প্রসীদ মম কল্যাণি! কাত্যায়নি! নমোঽস্তু তে॥"

দীর্ঘকাল অজ্ঞানময় অবসাদের সর্ব্বশক্তিহর কবল হইতে অকস্মাৎ মুক্তিলাভ করিয়া সম্মুখে তপস্বাধ্যায়পূত অদৃষ্টপূর্ব্ব ব্রহ্মণ্য-তেজোময় ব্রাহ্মণকে দেখিয়া হরনাথ ভয়ে, বিস্ময়ে ও আবেগে নয়নদ্বয় আবার নিমীলিত করিল। অভয়ানন্দ অতি ধীরে অতি মধুরভাবে তাহার মস্তকে নিজের হাতখানি রাখিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "হরনাথ, ভীত হইও না, আমি তোমার পিতার গুরুদেব অভয়ানন্দ, তোমার জননীও এই-খানে আছেন, ইন্দুমতীকেও এখানে আনা হইয়াছে, তুমি একটু স্থির হও, একটু জলপান কর, তাহার পর সকলকে দেখিতে পাইবে।"

দীর্ঘকালের মোহাবসাদদুর্ব্বল অন্তঃকরণে অভয়া-নন্দের এই কয়টি কথার কোন অর্থ ভাল করিয়া হরনাথ তখন বুঝিতে পারিল না, কিন্তু অভয়ানন্দের আদেশানুসারে সে মুখব্যাদান করিল, অভয়ানন্দ সেই মন্ত্র-পূত গঙ্গাজল তাম্রঘট হইতে গ্রহণ করিয়া, অঞ্জলি পরিপূর্ণ করিয়া তাহার মুখে ঢালিয়া দিলেন। তৃষ্ণায় হরনাথের ছাতি ফাটিয়া যাইতেছিল, সে বলিল, "আহা, কি মধুর ও শীতল জল, আমাকে আরও জল দিন।" অভয়ানন্দ বলিলেন, "অপেক্ষা কর, পরে ইচ্ছামত পান করিও, এখন বেশী জল খাইবার শক্তি তোমার নাই, হরনাথ! তুমি স্থির হইয়া থাক, হঠাৎ উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিও না, সেরূপ করিলে বিপদের সম্ভাবনা আছে। তুমি চুপ করিয়া থাক, আমি এখনই আসিতেছি।"

এই বলিয়া অভয়ানন্দ ঘরের রুদ্ধ দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া বাহিরে আসিলেন, সেখানে ডাক্তার ও কবিরাজগণ দল বাঁধিয়া নীরবে বসিয়া ছিলেন, তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া অভয়ানন্দ বলিলেন, "চিকিৎসক মহাশয়গণ, আমার চিকিৎসা জগদম্বার কৃপায় সফল হইয়াছে, হরনাথ জ্বর-মুক্ত হইয়াছে। তাহার আর কোন ভয় নাই, আপনারা কল্য প্রাতঃকালে তাহাকে দেখিয়া পথ্যাদির ব্যবস্থা করিবেন, আপনাদিগের প্রাপ্য পাথেয় ও দর্শনী প্রভৃতি উপযুক্তভাবে জানকীবল্লভ কালই মিটাইয়া দিবেন। রাত্রি বড় বেশী নাই, আপনারা যাইয়া বিশ্রাম করুন" এই বলিয়া শৈলবালাকে সঙ্গে লইয়া তিনি আবার রোগীর ঘরে ফিরিয়া গেলেন এবং দ্বার রুদ্ধ করিয়া শৈলবালার সঙ্গে হরনাথের রুগ্নশয্যায় যাইয়া উপ-বেশন করিলেন। তাহার পর তিনি কি করিলেন, তাহা এখানে আর বলা আবশ্যক বলিয়া মনে হয় না।

১৯

বোধনের মঙ্গলময় গীতিতে আনন্দপুরের আনন্দময়ীর পূজার মঙ্গলবার্ত্তা উদ্‌ঘোষিত হইতেছে। সন্ধ্যার মঙ্গল-মুহূর্ত্তে বিল্ববৃক্ষের মূলে নিত্য-বুদ্ধদেবীর বোধনের জন্য অভয়া-নন্দ উপবেশন করিয়াছেন। দক্ষিণদিকে কুশাসনে হরনাথ ও ইন্দুমতী পবিত্রভাবে বসিয়া একাগ্রহৃদয়ে পূজার উদ্যোগ দেখিতেছেন। হরনাথ সম্পূর্ণভাবে রোগনির্ম্মুক্ত হইলেও রোগের দুর্ব্বলতা এখনও যায় নাই, ধূপ-ধূনার গুগ্‌গুলের পবিত্র গন্ধে নবনির্ম্মিত চণ্ডীমণ্ডপ সুরভিত হইয়া আছে। ক্রমশঃ গুরুদেব অভয়ানন্দ সন্ধ্যার স্নানাদি কার্য্য শেষ করিয়া দেবীপ্রতিমার ঈশানকোণে অবস্থিত বিল্ববৃক্ষের মূলে আসিয়া আসনে উপবেশন করিলেন, শৈলবালা উপবাস করিয়া পূজার আয়োজনে ব্যস্ত আছেন, পূজার আসনে অভয়ানন্দ আসিয়া বসিলেন দেখিয়া তিনিও সেই-খানে গুরুদেবের নিকটে থাকিয়া হাতে হাতে পূজার উপ-করণ যোগাইবার জন্য ব্যাপৃত হইলেন। মঙ্গলাচরণ, স্বস্তিবাচন ও সংকল্পের পর বিল্ববৃক্ষমূলে সুসজ্জিত গঙ্গাজলপূর্ণ ঘটে নিত্য প্রবুদ্ধ অন্তর্যামিনী চিদানন্দময়ী মহামায়ার উদ্বোধনকার্য্য গুরুদেবকে আরম্ভ করিতে দেখিয়া হরনাথের মনে এক শান্তিময় অপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হইল। এত আনন্দ, এত শান্তি এ জীবনে আর সে কখনও অনুভব করে নাই, বিশেষ যত্ন সহকারে সে সংস্কৃত ভাষা শিখিয়াছিল, বোধনের মন্ত্র-গুলি গুরু যখন পড়িতে পড়িতে ধ্যাননিমীলিত নেত্রে

চিন্ময়ীর বোধন করিতেছিলেন, তখন তাহার মনে হইল, সে যেন এ শোক-তাপ রাগ-দ্বেষ-ঈর্ষ্যাময় চিরপরিচিত পৃথিবী ছাড়িয়া কোন এক অজানা স্বর্গরাজ্যে পৌছিয়াছে, সংসারের চিরপরিচিত জড় প্রকৃতিও যেন ভাবাবেশমধুর চিন্ময় রাজ্যে পরিণত হইয়াছে। অভয়ানন্দ দেবীর পূজা শেষ করিয়া বোধনের মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিলেন :—

"রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ।
অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যাস্তয়ি কৃতঃ পুরা।
অহমপ্যাশ্বিনে ষষ্ঠ্যাং সায়াহ্নে বোধয়ামি বৈ।
শক্রেণ সংবোধ্য স্বরাজ্যমাপ্তং,
তস্মাদহং ত্বাং প্রতিবোধয়ামি,
বিভূতিরাজ্যপ্রতিপত্তি-হেতু………"

মন্ত্র শুনিতে শুনিতে হরনাথ ভাবিতে লাগিল, এ দেবতা কে? রাবণবধের জন্য রামকে অনুগৃহীত করিতে সত্যলোকের অধিষ্ঠাতা জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা যাঁহাকে জাগান, ইন্দ্র যাঁহার জাগরণে স্বরাজ্য লাভ করেন, সকল বিভূতি—সকল সাম্রাজ্যলাভের হেতু যাঁহার জাগরণে, তিনি কে? নিত্য চৈতন্য যাঁহার স্বভাব,যাঁহার আভাস পাইয়া জীব চেতনা পায়, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র যাঁহার প্রভায় প্রভা পাইয়া থাকে, সে দেবতার জাগরণ কাহাকে বলে?

এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে ঔৎসুক্যবিকসিত নেত্রে সে গুরুদেবের দিকে চাহিয়া রহিল। যথাকালে দেবীর বোধন করিয়া হাসিতে হাসিতে অভয়ানন্দ বলিলেন,"হরনাথ, এ দেবীর জাগরণ নিজে না জাগিলে বুঝা যায় না, ব্যস্ত হইও না, অপেক্ষা কর, চিদানন্দময়ীর জাগরণ বুঝিবার জন্য প্রস্তুত হও, কাল জগদম্বার মহাপূজা দেখিলে তখন বুঝিবে, মা কেমন করিয়া জাগিয়া থাকেন। আজ এই পর্য্যন্ত।"

ভূমিষ্ঠ হইয়া সপত্নীক হরনাথ গুরুর চরণে প্রণিপাত করিল। দেবীর বোধনকার্য্য শেষ হইল।

১২

সপ্তমীপূজা আরম্ভ হইয়াছে, বিল্বশাখায় দেবীর আবাহন করিয়া সেই শাখা ছিন্ন করিয়া পূজামণ্ডপে লইয়া যাইবার সময় অভয়ানন্দ মন্ত্র পড়িতেছেন—

"আগচ্ছ চণ্ডিকে দেবি! সর্ব্বকল্যাণহেতবে।
পূজাং গৃহাণ সুমুখি! নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে!"

মন্ত্রপাঠের পর সেই বিল্বশাখা পূজামণ্ডপে আনয়ন করিয়া, যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া গুরুদেব নবপত্রিকার উপর দেবীর মহাস্নান করাইতে লাগিলেন। হরনাথ নিকটে আসনে বসিয়া সেই মহাস্নানের মন্ত্র শুনিতেছিল। সে দেখিল, কদলী, হরিদ্রা, জয়ন্তী, শ্রীফল, দাড়িম, অশোক ও মানবৃক্ষের উপর দেবীর আবাহন করিয়া গুরু অভয়ানন্দ মধুরগম্ভীর স্বরে ভারতের প্রসিদ্ধ স্রোতস্বিনীগণের নাম করিয়া আবাহন পূর্ব্বক বিমল গঙ্গার জলে চিদানন্দময়ী জগজ্জননীর স্নান করাইতেছেন। তিনি বলিতেছেন—দেবতা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর তোমাকে স্নান করান; বাসুদেব, জগন্নাথ, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন তোমার বিজয় ঘোষণা করুন; ইন্দ্র, অগ্নি, যম, বরুণ, পবন, কুবের, মহাদেব, চতুরানন ও অনন্ত এই সকল দিক্‌পাল মিলিত হইয়া তোমার রক্ষাবিধান করুন; কীর্ত্তি, লক্ষ্মী. ধৃতি, মেধা, পুষ্টি, শ্রদ্ধা, ক্ষমা, মতি, বুদ্ধি, লজ্জা, শান্তি, তুষ্টি, কান্তি প্রভৃতি লোকমাতৃকাগণ তোমার অঙ্গে শান্তির বিমল জলধারা বর্ষণ করুন; ঋষি, মুনি, সুরভি, দেবপত্নী, নাগপত্নী, নাগগণ, দৈত্যগণ, অপ্সরাগণ সকলে মিলিত হইয়া তোমার মঙ্গলাভিষেক করুন; সকল অস্ত্র, সকল শস্ত্র, সকল রাজা, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি সকল বাহন তোমার করায়ত্ত হউক; সিন্ধু, ভৈরব, শোণ প্রভৃতি হ্রদগণ,আদিত্য প্রভৃতি গ্রহগণ,লবণ ইক্ষু প্রভৃতি সমুদ্রগণ সকলে মিলিত হইয়া তোমারই বলাধানের জন্য তোমার অভিষেক করুন; আত্রেয়ী, গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, শ্বেতগঙ্গা, কৌষিকী, সরযূ প্রভৃতি নদীগণ পাতালের ভোগবতী ও স্বর্গের মন্দাকিনীর সহিত মিলিত হইয়া তোমার দেহে বলাধানের জন্য নিজ নিজ অমৃতবারি সেচন করুন।"

মন্ত্র শুনিতে শুনিতে হরনাথ তন্ময় ভাবের আবেশে এক নূতন ভাবরাজ্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল, তাহার দৃষ্টির সম্মুখে দেখিল,জগজ্জননীর চিদানন্দময়ী দেবতার মৃন্ময়ী মূর্ত্তি দশদিকে দশবাহু দশবিধ ভূষণে ভূষিত হইয়া আছে; অসুরবিজয়ী সিংহ মায়ের পদতলে আত্মসমর্পণ করিয়া বাহনের কার্য্য করিতেছে; সৌন্দর্য্যের—ঐশ্বর্য্যের—জ্ঞানের—বিজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া মায়ের সঙ্গে মিলিয়াছেন; দেবসেনাপতি ষড়ানন অক্ষয় তূণীর হইতে শর লইয়া, দুর্দ্ধর্ষ ধনুর গুণে সংযুক্ত করিয়া, কোথায় কে শত্রু আছে, তাহার দমনের জন্য আকাশচারী বাহনে সন্নদ্ধভাবে বসিয়া আছেন;

হরনাথের দিব্য নেত্র উন্মীলিত হইল। সে দেখিল, এই ত মৃন্ময়ী আমার মাতা, প্রতি জীবের অন্তর্য্যামিরূপে বিরাজমানা সর্ব্বশক্তিময়ী চিদানন্দরূপিণী জগজ্জননীর শক্তি। দিব্য সাধনাবলে আবাহন করিয়া সেই দেবতার সঙ্গে এই মৃন্ময়ী জননী জন্মভূমির মহামিলন যে পর্য্যন্ত আমরা না করিতে পারিব, সে পর্য্যন্ত আমাদের সুপ্তি ভাঙ্গিবে না, শক্তি জাগিবে না, ব্যষ্টিরূপে পরিচ্ছিন্ন চেতনাশক্তির সমবেতভাবে জাগরণের এই ত আদর্শ, এ আদর্শ যাহার মনে জাগে না, সে জন্মভূমির অযোগ্য সন্তান, ইহাই যেন মহাপূজার অন্তর্নিগূঢ় রহস্য।

এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে হরনাথ এক প্রকার আত্মহারার ন্যায় হইয়া উঠিল। যথাসময়ে সপ্তমীপূজা শেষ হইল, ভাবাবেশবিঘূর্ণিত-মস্তিষ্ক হরনাথ তখনও বিহ্বলের ন্যায়, গ্রহাবিষ্টের ন্যায়, বাহ্যজ্ঞানশূন্য পাগলের ন্যায় সেই মৃন্ময়ী চিদানন্দময়ীর অনন্ত সৌন্দর্য্যময় দিব্য রূপসাগরে আপনাকে মিশাইয়া, ভাবে বিভোর হইয়া বসিয়া আছে। পূজা শেষ করিয়া অভয়ানন্দ হরনাথের সম্মুখে আসিয়া নিজের দক্ষিণ হস্ত তাহার মস্তকের উপরে বিন্যস্ত করিয়া মৃদু হাসি হাসিয়া বলিলেন, "হরনাথ, উঠ, মায়ের চরণে অঞ্জলি দেও।" হরনাথের চৈতন্য ফিরিয়া আসিল, সে ভূম্যবলুণ্ঠিত হইয়া গুরুদেবের চরণে মস্তক ন্যস্ত করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। তাহার নয়নে আনন্দে অশ্রুধারা বহিতেছে, শরীর রোমাঞ্চিত, কণ্ঠস্বর জড়িত। সে বলিল,"গুরুদেব, দয়া করিয়া আজ যে মাতৃমূর্ত্তি দেখাইলেন, তাঁহার করুণা জীবনে অনুভব করিবার উপায় বলিয়া দিন, এরূপ করিয়া জননীর এমন প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি কখনও ভাবি নাই, আজ আমার জীবন ধন্য হইল।"

অভয়ানন্দ হাসিয়া বলিলেন, "অধীর হইও না, জননীর কৃপায় বুঝিবার শক্তি নিশ্চয়ই পাইবে, এখন মায়ের চরণে অঞ্জলি দিয়া বাহিরে চল, মায়ের প্রসাদ পাইবার জন্য সহস্র সহস্র সন্তান একত্র হইয়াছে, তাহাদিগকে প্রসাদ ভোজন করাইয়া তৃপ্ত কর, সুখী কর, দেখিবে, মা আপনিই জাগিয়া উঠিবেন, আর কখনও ঘুমাইবেন না।"

গুরুদেবের আদেশানুসারে মায়ের চরণে যথাবিধি অঞ্জলি দিয়া তাঁহারই সহিত তাঁহারই পশ্চাতে পশ্চাতে হরনাথ চণ্ডীমণ্ডপের বাহিরে উপস্থিত হইল। সেখানে সুপরিষ্কৃত চন্দ্রাতপাচ্ছন্ন বিশাল প্রান্তরভূমিতে মায়ের প্রসাদার্থী হইয়া অগণ্য নরনারী জুটিয়াছিল। প্রবীণ দক্ষ কর্ম্মচারী জানকীবল্লভের সুব্যবস্থার গুণে তাহারা সকলেই আকণ্ঠ পরিপূর্ণ করিয়া মায়ের প্রসাদ খাইয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিল। শৈলবালা, ইন্দুমতী ও হরনাথ স্বয়ং যাইয়া পরিবেষণকার্য্য আরম্ভ করিল। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দলে দলে দীন-দরিদ্র হইতে আরম্ভ করিয়া ধনী ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিগণ মিলিত হইয়া মায়ের প্রসাদ পাইয়া ধন্য হইল। আজ অভয়ানন্দের ভাণ্ডারে দ্রব্য ফুরায় না, দলে দলে লোক আসিতেছে; হাড়ি, ডোম, চাঁড়াল, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সকলে মিলিয়া মায়ের প্রসাদ পাইতেছে ও আনন্দে উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে,—"জয় দুর্গা, জয় জগত্তারিণী, তোমার জয় জগৎ জুড়িয়া হউক!"

এই ভাবে অষ্টমী ও নবমীপূজা বর্দ্ধনশীল জাঁকজমকের সহিত নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হইল। বিজয়ার দিনে সাধের পূজা শেষ করিয়া অভয়ানন্দ পরিজন-সমভিব্যাহারে ভাগীরথীর জলে প্রতিমা লইয়া বিসর্জ্জন করিতে যাইলেন, সেই সময় সেই জ্ঞানী ধীরপ্রকৃতি তপস্বী ব্রাহ্মণের নয়ন হইতে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। ভক্তিগদ্গদ কণ্ঠে ব্রাহ্মণ বলিতে লাগিলেন;—

"গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং স্বস্থানং দেবি চণ্ডিকে!
ব্রজ স্রোতোজলে দেবি বিশ্বমঙ্গলহেতবে।
গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং স্বস্থানং দেবি চণ্ডিকে!
সংবৎসরব্যতীতে তু পুনরাগমনায় চ॥"

প্রলয়সমুদ্রের দিকে দ্রুতগতি ধাবমান কালস্রোতের জলে সিদ্ধিদাত্রী দেবীপ্রতিমাকে ভাসাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পরিজনবর্গের সহিত অভয়ানন্দ গৃহে ফিরিলেন। শূন্য চণ্ডীমণ্ডপে অন্ধকারময় দেবী-সিংহাসনের নীচে ভূপতিত হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক অভয়ানন্দ সেইখানে বসিয়া পড়িলেন, আর সকলকেই সে স্থান হইতে সরিয়া যাইতে আদেশ করিয়া তিনি শৈলবালা, হরনাথ ও ইন্দুমতীকে নিকটে বসাইলেন, এবং হরনাথের দিকে চাহিয়া গুরুগম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিলেন—"দেখ হরনাথ, আমার জীবনের চিরাভিলষিত মহামায়াপূজা শেষ হইল। এমন ভাবে আর যে কবে মায়ের পূজা করিতে পারিব, সে আশাও নাই, অভিলাষও নাই, এখন

বিদায়ের দিন আসিয়াছে। যাইবার পূর্ব্বে আমি যে কয়টি কথা বলিব, তাহা সাবধান হইয়া তোমরা শ্রবণ কর। দেখ হরনাথ, তোমার পিতার মৃত্যুকালে তিনি যে সমস্ত সম্পত্তি তোমার জননীকে দিয়া গিয়াছেন, ইহাতে তুমি বড়ই মনে ক্লেশ পাইয়াছ, তোমার দেবোপম স্বর্গত পিতার প্রতি অকারণ রুষ্ট হইয়াছ, জননীকে চিনিতে পার নাই, এই সকল ব্যাপারের মূল একমাত্র তিনিই, ইহা ভাবিয়া তাঁহার সহিত যেরূপ কঠোর ব্যবহার করিয়াছ, তাহা হিন্দু-সন্তানের উপযুক্ত হয় নাই। কিন্তু ইহার জন্য আমি তোমাকে দোষী বলিয়া বিবেচনা করি না। ইহা কেহই হয় ত জানেন না, তোমাদের এই সকল অনর্থের একমাত্র মূল কারণ আমিই তোমার পিতার গুরু অভয়ানন্দ। কেন আমি এ কার্য্য করিয়াছি, তাহা বলিবার উপযুক্ত সময় আজ উপস্থিত হইয়াছে, তাই বলিতেছি, তোমরা শুন।

তোমার পিতার মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে অকস্মাৎ এক দিন তিনি আমার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হন, এবং বলেন যে, 'গুরুদেব, আমার বোধ হইতেছে, আমি আর বেশী দিন বাঁচিব না। তাই মরিবার পূর্ব্বে আপনাকে প্রণাম করিয়া মরিবার জন্য প্রস্তুত হইতে এখানে আসিয়াছি। হরনাথের কথা ভাবিলে আমার মরিতেও ইচ্ছা হয় না, তাহার ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্ন পিতৃমাতৃভক্ত পুত্রকে ছাড়িতে হইবে, এ কথা মনে হইলে আমি আত্মহারা হই। যাহাই হউক, মরিতেই ত হইবে, মরিবার পূর্ব্বে হরনাথের মঙ্গলের জন্য আমার কি কর্ত্তব্য, সে বিষয়ে আপনি আমাকে উপদেশ দিন।' হরনাথ! তোমার পিতার এই কথা শুনিয়া, আমি তোমার জন্মের সময় তোমার যে কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়াছিলাম, সেখানি আমার বাক্স হইতে বাহির করিয়া তাহারই ফল বিচার করিলাম। আমি যতটুকু জ্যোতিষ জানি, তাহাতে আমার ইহাই বোধ হইল, তোমার পিতার মৃত্যুর পর ৩ বৎসরমধ্যে তোমার মৃত্যুযোগ রহিয়াছে, তাহা হইতে তোমার রক্ষা কিরূপে হইতে পারে, তাহাও বিশেষ যত্ন সহকারে গণিয়া দেখিলাম। সেই গণনার ফলে আমার জ্ঞান হইল যে, তোমাকে যদি এই ৩ বৎসর আকস্মিক বিপদের মধ্যে ফেলিয়া পিতৃসম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখা যায় এবং তোমার মনে তোমার পিতার ও মাতার উপর দারুণ ক্ষোভ ও বিদ্বেষের সৃষ্টি করা যায়, তাহা হইলে তোমাকে এই বিপদ হইতে রক্ষা করা সম্ভব, ইহা ছাড়া অন্য কোন উপায় আমি খুঁজিয়া পাইলাম না। আমার গণনা যে কতকটা ঠিক হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ এই যে, আমারই সম্ভাবিত দিনে তোমার দারুণ সান্নিপাতিক জ্বরের অকস্মাৎ উপস্থিতি। যাহাই হউক, আমারই পরামর্শ অনুসারে তোমার পিতা নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে তাঁহার সম্পত্তির ব্যবস্থা করিবার জন্য উইল করিয়া যান, সে উইলের মর্ম্ম কি, তাহা তোমরা জান। আর অধিক বলিতে চাহি না, তোমার আকস্মিক পীড়ার আবির্ভাবের কথা আমি কি উপায়ে জানিয়াছিলাম, তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। সেই দিনই আমি তাড়াতাড়ি কলিকাতায় যাইয়া গভীর রাত্রিতে তোমার গৃহে অন্যের অদৃশ্যভাবে প্রবেশ করিয়াছিলাম এবং তোমাকে তোমার প্রিয়তমা পত্নীর সঙ্গ হইতে বিচ্যুত করিয়া, ছাত্রদ্বয়ের সাহায্যে কোলে করিয়া, কেমন ভাবে নৌকায় আনন্দপুরে আনিয়াছিলাম, সে সকল না বলাই ভাল। যাক সে সব কথা, আমার কার্য্য শেষ হইয়াছে। তোমরা সেই অচিন্ত্যশক্তি চিদানন্দময়ী জগজ্জননীর চরণ স্মরণ করিয়া আনন্দে আনন্দ উপভোগ করিবার জন্য দুঃখী, দরিদ্র, দীন, বিপন্ন প্রজাবর্গকে সুখী করিবার জন্য, তোমাদের গোপালপুরে হাসিতে হাসিতে ফিরিয়া যাও। যে দুর্গোৎসবের কল্যাণে তোমাদের এত বড় বিপদ্ কাটিয়া গিয়াছে, প্রতিজ্ঞা কর, জীবন থাকিতে সেই দুর্গোৎসব প্রতি বৎসর করিবে।"

এই বলিয়া অভয়ানন্দ নীরব হইলেন। শৈলবালা ও হরনাথ আনন্দের অশ্রুধারায় তাঁহার চরণদ্বয় প্লাবিত করিয়া তাঁহার চরণে মস্তক স্পর্শ করাইয়া ভক্তিভরে প্রণামপূর্ব্বক গুরুদেবের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।

(উপন্যাস)

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

ঔষধ ও অনুপান।

রিহার্শালের পর হীরালাল যথাসময়েই রেবতীকে লইয়া বিপিন বাবুর বাসায় আসিয়াছিল। বোম্বাই হোটেলে ভোজ সুচারুভাবেই সম্পন্ন হইল। রাত্রি ১০টার পর হীরালালসহ বিপিন বাবু ট্যাক্সিযোগে রেবতীকে তাহার বাড়ীতে নামাইয়া দিয়া হোটেলে আসিল। সেখানে পৌঁছিয়া দেখিল, উভয়ের নামেই এক একখানি করিয়া ডাকের চিঠি অপেক্ষা করিতেছে—অবশ্য হীরালালের পত্রখানি বিপিন বাবুর কেয়ারেই আসিয়াছে।

উভয়ে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া নিজ নিজ পত্র লইয়া পড়িতে বসিল। পত্রপাঠ শেষ হইলে বিপিন বাবু বলিলেন, "ওহে, আমার বউ ত চটেই লাল হয়েছে। লিখেছে, কলকাতায় গিয়ে তুমি এত দেরী করবে জানলে আমি তোমায় কখনই যেতে দিতাম না। আর লিখেছে, কলকাতায় যদি বেশী বিলম্ব হবার সম্ভাবনা থাকে, তবে দাসী গিয়ে কেনই বা পদসেবা না করবে? তবে যদি সেখানে গিয়ে একটা কুন্দ-নন্দিনী-টন্দিনী কুড়িয়ে পেয়ে থাক, তবে সে আলাদা কথা! দেখেছ ভায়া, নভেল প'ড়ে প'ড়ে আজকালকার ছুঁড়ীগুলা কি রকম জ্যাঠা হয়েছে!"

হীরালাল বলিল, "কেন, বউমা কি তোমার সঙ্গে একটু রহস্যও করতে পারেন না?"

বিপিন বাবু কৃত্রিম কোপে বলিলেন, "অ্যাঁ! এত বড় আস্পর্দ্ধা! আমি হলাম তার গুরুজন, আমার সঙ্গে রহস্য! ঘোর কলি, ঘোর কলি!"

হীরালাল বলিল, "এখন ত আমায় খুঁজে বের করেছ—আর এখানে দেরী করাটা সত্যি তোমার ভাল হচ্ছে না।"

বিপিন বাবু বলিলেন, "সত্যিই ভাল হচ্ছে না। কাল তোমার একটা আস্তানা ঠিক ক'রে, তোমায় সেখানে স্থাপন ক'রে, পর্শু সকালের ট্রেণেই আমি লম্বা দিই। কি বল?"

"তাই দাও। নইলে আমি বেচারীই শাপ-মন্যি কুড়োবো বৈ ত নয়।"

"কাল এক কায করা যাক্। সকালে উঠে, চা খেয়ে, একসঙ্গে না বেরিয়ে দু' জনে দু' দিকে বেরিয়ে পড়ি চল। তা হ'লেই কেউ না কেউ একটা না একটা বাসা ঠিক করতে পারবই।"

"সেই ভাল।"

বিপিন বাবু একটা সিগারেট ধরাইয়া বলিলেন, "তোমার ও চিঠি কার লেখা? বউদিদির বুঝি?"

"হ্যাঁ। তোমার টেলিগ্রাম পেয়ে এই চিঠি সে লিখেছে। ভাগ্যিস্ টেলিগ্রামে তোমার হোটেলের ঠিকানাটা দিয়েছিলে!"

"কি লিখেছেন, ভাল ত সব?"

"হ্যাঁ, ভাল আছে সবাই। লিখেছে,—এই শোন না।" বলিয়া হীরালাল পত্রখানির এক অংশ পাঠ করিল—"ঠাকুর-পোর তার পাইয়া আমাদের সকলের মৃতদেহে জীবন আসিল। মা তখনই দোকান হইতে বাতাসা আনাইয়া হরির লুট দিলেন। সেখানে তোমার কোনও চাকরী হইয়াছে কি না, তাহা এখনও জানিতে পারিলাম না। ঠাকুরপো তারে লিখিয়াছেন, কাল তুমি পত্র লিখিবে। চাকরী যদি হইয়া থাকে, কত টাকা মাহিনার চাকরী হইল, কিরূপ চাকরী, এ সমস্ত বিস্তারিত লিখিবে।"

বিপিন বাবু বলিলেন, "তুমি যে চিঠি সে দিন লিখ্‌লে, তাতে চাকরীর কথা লিখে দিয়েছ ত?"

"হ্যাঁ, লিখেছি বৈ কি। থিয়েটরে চাকরী হয়েছে, একশো টাকা মাইনে, সব কথাই লিখে দিয়েছি।"

"কার সাহায্যে চাকরীটি হয়েছে, তা-ও লিখেছ না কি ?" বলিয়া বিপিন বাবু মুখ টিপিয়া হাসিলেন।

হীরালাল হাসিয়া বলিল, "না, কেবল সেইটুকু বাদ।"

বিপিন বাবু বলিলেন, "কালই বোধ হয় বউদিদি তোমার সে চিঠি পেয়েছেন। এসে প্রথমেই একশো টাকা মাইনে হয়েছে, এ কথা শুনে সকলেই বোধ হয় একটু আশ্চর্য্যই হয়ে যাবেন, নয় হীরুদা ?"

"সে ত নিশ্চয়ই। প্রথমে ৩০।৪০ টাকার বেশী জুটবে, এ আর কে আশা করেছিল বল ?"

বিপিন বলিল, "বউদিদি খুসী হবেন। ওহে, সেই গানটা জান ? খোকার বাপের চাকরী হওয়ার গান ?"—বলিয়া বিপিন বাবু হাসিতে লাগিলেন।

"না। গানটা কি ?"

"এ গানটা আমার শ্বশুরবাড়ীর দেশের গান। কোনও গ্রাম্য কবির রচিত বোধ হয়। আমার বিয়ের বাসরে একটি মেয়ে গেয়েছিল।"—বলিয়া বিপিন বাবু গুণ-গুণ স্বরে গাহিয়া শুনাইলেন—

"আর শুনেছ মেজ-দিদি গো, খোকার বাপের চাকরী হবে।
তিরিশ টাকা মাইনে পাবে, দশ টাকা সে আমায় দেবে।
দশ টাকা তার পকেট-খরচ, দশ টাকাতে মল গড়াবে।
এ বছরে যেমন তেমন, আস্‌ছে বছর ইট পোড়াবে।"

হীরালাল হাসিতে হাসিতে বলিল, "বাঃ বাঃ—মেজ-দিদির ছোট বোন্‌টি অঙ্কশাস্ত্রে একটি লীলাবতী ! টোটাল্‌টি ঠিক মিলিয়ে দিয়েছে, ভুল হয় নি। ইট বোধ হয় বিনা পয়সাতেই পুড়বে !"

বিপিন বাবু বলিলেন, "না, সে ঠিক আছে। একটু তলিয়ে বোঝ গানের ভাবটা। তুমি ভাবছ, তিরিশ টাকা ত সবই খরচ হয়ে গেল, তবে ইট পোড়াবে কোথা থেকে ? বাবুর পকেট-খরচ আর শ্রীমতীর টাকাটা হ'ল নিত্য খরচ—ওটা মাসে মাসেই লাগবে বটে। কিন্তু মল গড়ানোর খরচটা নৈমিত্তিক বৈ ত নয়। মল গড়ানো হয়ে গেলে, ঐ টাকাটা মাসে মাসে জমবে—তাই দিয়ে আস্‌ছে বছর ইট পোড়ানো হবে।"

হীরালাল বলিল, "তা বটে।"—বলিয়া হাসিতে লাগিল।

বিপিন বাবু বলিলেন, "তোমার একশো টাকা মাইনের চাকরী হয়েছে শুনে বউদিদি তোমায় কি ফরমাস করেন দেখ। আর কি লিখেছেন ?"

"আর লিখেছে—'যদি চাকরী হইয়া থাকে, তবে একটা সোমবার ছুটী লইয়া, শনিবার বিকালের ট্রেণে এখানে আসিয়া আমাদের একবার দেখা দিয়া যাইও। রবিবারটা এখানে থাকিয়া, সোমবার বিকালের ট্রেণে আবার কলিকাতা রওয়ানা হইতে পারিবে। খুকী তোমায় দেখিবার জন্য বড়ই উতলা হইয়াছে'।"

বিপিন বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "খুকী উতলা হয়েছে—খুকীর মা হন নি ত ?"

"তা ত কৈ কিছু লেখে নি। শনিবার গিয়ে রবিবারে আমি সেখানে থাক্‌ব ! সে ত জানে না যে, এ চাকরীতে শনি-রবিবারেই কাযের ভিড় বেশী !"

এইরূপ কথোপকথনে রাত্রি ১২টা বাজিয়া গেল। তাহার পর আলো নিবাইয়া উভয়েই শয়ন করিল।

পরামর্শমত পরদিন প্রভাতে উঠিয়া উভয়েই বাসা খুঁজিতে বাহির হইয়া পড়িল। বেলা ১০টার সময় হীরালাল ফিরিয়া আসিল। আহীরিটোলা ষ্ট্রীটে সে একটি মেস খুঁজিয়া পাইয়াছে। অর্দ্ধঘণ্টা পরে বিপিন বাবুও ফিরিলেন। তিনিও একটি ভাল মেসের সন্ধান পাইয়াছেন,—পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীটে। ঘরের অবস্থা, আলো, হাওয়া প্রভৃতি সম্বন্ধে বর্ণনা উভয়ে উভয়ের নিকট শুনিয়া পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীটের মেসটাই ভাল মনে হইল। কিন্তু সে মেসের অধিকাংশই কলেজের প্রোফে-সর বা স্কুলের মাষ্টার। হীরালাল বলিল, "আমি থিয়েটরে চাকরী করি শুনে তারা আবার নাক সিটকাবে না ত হে ?"

বিপিন বাবু বলিলেন, "তা বিচিত্র নয়। আজকাল অবশ্য পূর্ব্বের মত থিয়েটরের লোককে ততটা হেয় জ্ঞান করে না—তারা অনেকটা জাতে উঠেছে বটে, কিন্তু তবুও—"

হীরালাল বলিল, "সে ত নিশ্চয়। তার পর, তারা সব কেউ বি-এ, কেউ এম-এ, আমি একটা মুখ্যু ম্যাট্রিক ফেল—সেখানে আমি হংসমধ্যে বকো যথা—সর্ব্বদা তটস্থ হয়ে থাক্‌তে হবে ! তার চেয়ে ও আহীরিটোলাই ভাল। তারা কেউ কেরাণী, কেউ দোকান করে, কেউ দালালী করে। আমি থিয়েটরে কায করি শুনে তারা ত লাফিয়ে উঠল, এক জন বল্লে,—বেশ হবে মশাই, আসুন আপনি এই মেসে—মাঝে মাঝে কিন্তু পাস দিয়ে আমাদের থিয়েটর দেখাতে হবে।"

বিপিন বাবু বলিলেন, "তা হ'লে সেই মেসটাই সুবিধে।" একটু থামিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আর জয় মিত্তিরের গলিটাও খুব কাছে হবে। কি বল হে?"

এ কথায় হীরালাল একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল,"তোমার যদি সেই সন্দেহই হয়,তা হ'লে বেশ,ঐ পটলডাঙ্গার মেসেই যাই।"

বিপিন বাবু বলিলেন, "না হে না—ওটা তোমায় রহস্য ক'রে বলেছি। তোমার যদি 'চুলো' নামক সেই রমণীয় স্থানে যাবার মতলবই থাকে, তা হ'লে তুমি পটলডাঙ্গায় বাস করেও স্বচ্ছন্দে যেতে পার, কে তোমায় আটকাবে বল? না, ঐ আহীরিটোলা মেসেই ঠিক কর। চল, খাওয়া-দাওয়ার পর বেরিয়ে তোমার জিনিষপত্রগুলো কিনে ফেলা যাক। বিকেলে সে সব নিয়ে ঐ আহীরিটোলার বাসায় যাওয়া যাবে দু'জনে।"

যে কথা, সেই কায। আহীরিটোলার বাসায় নূতন কেনা জিনিষপত্রগুলা রাখিয়া, সন্ধ্যার পর বিপিন বাবু হীরালালকে লইয়া নিজ হোটেলে ফিরিয়া আসিলেন।

জলযোগাদির পর হোটেলে নিজ কামরায় বসিয়া বিপিন বাবু বলিলেন, "হীরুদা, তোমার সম্মুখে ভীষণ পরীক্ষা, তা তুমি বুঝতে পারছ ত?"

"কি পরীক্ষার কথা বল্‌ছ?"

"আমি রেবতীর কথা বল্‌ছি। এ পর্য্যন্ত যখনই আমি তোমার সম্বন্ধে তার কথা বলেছি, ঠাট্টা করেই বলেছি। কিন্তু ভাই, এখন খুব সিরিয়শ্লিই বল্‌ছি—মোটেই ঠাট্টা নয়। আমি এত দিনে বেশ বুঝতে পেরেছি যে, রেবতী পোড়ারমুখী তোমায় ভালবেসে মরেছে। ও শ্রেণীর স্ত্রীলোকরা সচরাচর যেমন ভালবাসার একটা ভাণ ক'রে থাকে, এ তা নয়। ওরা ভাল রকম আদায় ক'রে নেবার চেষ্টাতেই সে ভাণ করে অবশ্য। কিন্তু তোমার পকেটে ত দাদা—অমৃত বোসের ভাষায় বল্‌তে গেলে—বকেয়া সেলাই ছাড়া আর কিছুই নেই! সুতরাং এ তা নয়। আর তুমিও দাদা, ওর দিকে যে একটু ঝোঁকনি, এমন কথাও বল্‌তে পারি নে। রেবতীকে আমি বিশেষ দোষ দিতে পারি নে। কারণ, ওরা খাঁটি মানুষের সঙ্গ বড় একটা পায় না, অথচ পাবার জন্যে মনের মধ্যে একটা পিপাসা থাকে—এটা মানুষের প্রকৃতি। তোমার মধ্যে একটি খাঁটি মানুষ পেয়েছে, তোমার উপর ওর একটা শ্রদ্ধা জন্মেছে—আর দিনের পর দিন একসঙ্গে বসা-দাঁড়ানো, একত্র কায করা—এই সব সুযোগে সেই শ্রদ্ধাটুকু ভালবাসায় পরিণত হয়েছে। সে যাই করুক, সে স্বাধীন। কিন্তু তুমি ত দাদা স্বাধীন নও—তুমি বিবাহ করেছ—তোমার সন্তান হয়েছে—রেবতীর যে অধিকার আছে—সে অধিকার ত তোমার নেই। তুমি আমার কথা স্বীকার কর কি না?"

হীরালাল নীরবে নত মস্তকে বসিয়া বিপিন বাবুর কথাগুলি শুনিতেছিল। তাঁহার শেষ প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়া পূর্ব্ববৎ নীরবে বসিয়া রহিল।

কয়েক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিয়া বিপিন বাবু আবার বলিতে লাগিলেন, "তুমি তোমার নিজের মনের ভাব সম্বন্ধে আমার এ অভিযোগের কোনও প্রতিবাদ করলে না। ভালই করেছ। প্রতিবাদ করলে, আমি তোমায় ভণ্ড মনে করতাম, তোমার আশা ছেড়েই দিতাম। এখন দুজনে পরামর্শ করা যাক্, এস, এ সঙ্কটে তোমার এখন কর্ত্তব্য কি?"

হীরালাল ধীরে ধীরে বলিল, "কি কর্ত্তব্য আমার, তুমিই বল, আমি প্রাণপণে তা পালন করতে চেষ্টা করবো।"

বিপিন বাবু বলিলেন,"এ অবস্থায় তুমি যদি চাকরী ছেড়ে দিয়ে, কলকাতা ছেড়ে চ'লে যেতে পারতে, তা হলেই সব চেয়ে বেশী নিরাপদ হ'ত। কিন্তু তোমার সাংসারিক অবস্থা যে রকম, তাতে সে কথাও ত তোমায় বলতে পারিনে। কোনও বিপদই হবে না, যদি তুমি তোমার মনকে দৃঢ় করতে পার। রেবতীর বাড়ীতে আর একদম তোমার যাওয়া উচিত নয়। এক থিয়েটরে কায কর যখন, তখন দেখা-সাক্ষাৎ তার সঙ্গে তোমার হবেই। কিন্তু পাঁচ জনের মাঝে দেখা-সাক্ষাৎ—আর নির্জ্জনে—কপোত-কপোতী যথা উচ্চবৃক্ষচূড়ে দেখা-সাক্ষাৎ—এ দুইয়ের মধ্যে অনেক তফাৎ আছে। তুমি সর্ব্বদা সজাগ থাকবে যে, এমন অবস্থায় না পড়, যাতে তার সঙ্গে তোমার দীর্ঘকাল নির্জ্জন সাক্ষাৎ ঘটে। আমার মনে হয়, তা হ'লেই ক্রমশঃ তুমি কাটিয়ে উঠতে পারবে; তোমার মনে যে বিকৃতিটুকু জন্মেছে, তা ক্রমশঃ শুধরে যাবে। তোমার কি মনে হয়?"

হীরালাল বলিল, "শুধ্‌রে যাওয়া ত উচিত।"

বিপিন বাবু বলিলেন, "আর একটা কথা। ওষুধের সঙ্গে অনুপানও দরকার। তুমি মাসে অন্ততঃ দু'টিবার ক'রে বাড়ী যাবে। শনি, রবি, বুধ,—এই তিন দিন তোমাদের প্লে হয় ত?"

"বৃহস্পতিবারেও হয়।"

"তা হোক। কিন্তু চারদিনই যে তোমায় নামতে হয়, এমন ত নয়।"

"না, তা নয়। কিন্তু রিহার্শালও ত আছে।"

"তা থাকুক, কিন্তু যখনই দেখবে, উপরো উপরি অন্ততঃ দুটো দিন তুমি কলকাতা ছেড়ে যেতে পার, তখনই বাড়ী চ'লে যাবে। অবশ্য, এত অল্পসময়ের জন্যে এত টাকা খরচ, অন্য সময় হ'লে আমি তোমায় বলতাম না। কিন্তু এ খরচটি, ওষুধ খরচের মতই ধরতে হবে। আর, একশো টাকা মাইনে হয়েছে তোমার, অর্থাভাবের ওজর করলে চল্‌বে না! না হয়, থার্ড ক্লাসেই যাবে, তার আর কি? আমি যে ট্রেণে কাল যাচ্ছি, সেই ট্রেণেই তুমি রওনা হবে। ৯টা ৩০ মিনিটের ট্রেণ। সেটা পৌছবে ২টো চল্লিশে। তার পর গোরুর গাড়ীতে ৫ ঘণ্টা লাগবে। রাত ৮টা ৯টায় তুমি বাড়ী পৌছে গেলে। তার পরদিন সারাদিন সারা-রাত তুমি বাড়ীতে রইলে, তার পরদিন সকালে বাড়ী থেকে রওয়ানা হয়ে বেলা সাড়ে চারটের সময় হাওড়ায় নেমে সে রাত্রে প্লে বল, রিহার্শাল বল, যা থাকে, স্বচ্ছন্দে করতে পারবে। কেমন, এ কিছু অসম্ভব কথা বলেছি আমি?"

হীরালাল বলিল, "না, অসম্ভব কেন?"

বিপিন বাবু বলিলেন, "আচ্ছা বেশ—এই পরামর্শই তা হ'লে স্থির রইল। তুমি প্রতিবার যাবার আগের দিন বরঞ্চ আমায় একটা টেলিগ্রাম ক'রে দিও—আমি ষ্টেশনে গোরুর গাড়ী পাঠিয়ে দেবো।"

"বেশ, তাই।"

"তা হ'লে বৌদিদিকে গিয়ে আমি সেই কথা বলবো ত? এক সোমবার ছুটী নিয়ে, তিনি ত যাবার জন্যেই তোমায় লিখেছেন। আমি গিয়ে বল্‌বো যে, তাদের ত রবিবারে ছুটী নেই,—দু'দিন উপরো উপরি ছুটী পেলেই সে চ'লে আসবে বলেছে।"

"তাই বোলো। এক কায কর—আজ ত তুমি আমার জন্যে ত্রিশ টাকার উপর জিনিষ কিনে দিয়েছ।—হাতে আমার টাকা বেশী নেই। গোটা দশেক টাকাও আমায় দিয়ে যাও। কারণ, মাসকাবার হবার আগেই যদি দুটো দিন অবসর পাই ত বাড়ী যাব। মাসকাবার না হ'লে ত আর মাইনে পাব না!"

"এই নাও না।"—বলিয়া বিপিন বাবু একখানি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া হীরালালের হস্তে দিলেন।

হীরালাল বলিল, "মাইনে পেলে এক মাসে না পারি, দু'মাসে তোমার সব টাকা শোধ ক'রে দেবো ভাই—তুমি কিছু মনে কোর না।"—বলিয়া হীরালাল উঠিল।

বিপিন বাবু বলিলেন, "আচ্ছা পাগল!—মনে আবার করব কি? কিন্তু তুমি উঠছ যে? যাচ্ছ কোথায়? এখনই খাবার দেবে যে!"

হীরালাল বলিল, "আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে আস্‌ছি।"—বলিয়া সে ব্যস্তভাবে চলিয়া গেল।

দশ মিনিট পরে হীরালাল ফিরিয়া আসিল। তাহার হস্তে এক টিন বিস্কুট, এক শিশি লজেঞ্জুস এবং একটি নূতন পিতলের লণ্ঠন। জিনিষগুলি বিপিন বাবুর সম্মুখে টেবলে রাখিয়া বলিল, "আমার খুকীর জন্যে এই বিস্কুট আর এই লজেঞ্জুস—আর এই লণ্ঠনটা বাড়ীর জন্যে। বাড়ীতে যে লণ্ঠনটা আছে, সেটা একে টিনের, তায় বড্ড পুরানো হয়ে গেছে, ভাল আলো হয় না, কালী পড়ে।"

বিপিন বাবু হাসিয়া বলিলেন, "খুকীর মা'র জন্যে কিছু পাঠাবে না?"

"না, আর টাকায় কুলোবে না। তা ছাড়া, সে কিছু চায়ও নি ত!"

"বিলক্ষণ!—চেয়েছেন বৈ কি। কালই ত তাঁর চিঠি প'ড়ে তুমি আমায় শোনালে। তবে খুকীর বেনামীতে চেয়েছেন, এই যা!"

হীরালাল হাসিয়া বলিল, "বোলো, তার জিনিষও আসবে—কিছু দিন বাদে।—পয়মাল হবে না।"

"না হলেই বাঁচি। এ দিকে যে রাত ১০টা বাজে। এইবার তা হ'লে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে শোয়া যাক, কি বল? ঘুম পাচ্ছে।"

"দিনের বেলায় একটু ঘুমানো তোমার অভ্যাস। আমার জিনিষপত্র কেনবার জন্যে সেটি তোমার আজ হয় নি। সেই সকাল থেকে বলতে গেলে সারাদিনটাই ছুটোছুটি ক'রে কেটেছে, ঘুমের আর অপরাধ কি?"

পরদিন সাড়ে ৯টার ট্রেণে বিপিন বাবুকে তুলিয়া দিয়া হীরালাল সোজা আহীরিটোলার মেসে গিয়া স্নানাহার করিল। [ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

কয়েক দিন ধরিয়া আমাদের ক্লাবে অতীন্দ্রিয় জগতের আলোচনা চলিতেছিল ;—আত্মা,পরলোক, প্রেততত্ত্ব, এমনি সব। ক্লাবটিতে সভ্য ও সভ্যা উভয়ই ছিল। আলোচনা চলিতে চলিতে আমাদের ভিতর যিনি বেশী বিজ্ঞ, তিনি বলিলেন, শোন, আমি মাটীর মানুষ, মাটীর কথাই বুঝি। আমার মত কি জানো ? চার্ব্বাক সেটি সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন—"যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।"

এক যুবা সভ্য বলিল, সে কি! পাশ্চাত্যের বড় বড় বৈজ্ঞানিক অতীন্দ্রিয় জগতের অনুশীলন করবার জন্য সে সভা স্থাপিত করেছেন (Psychical Research Society), তার গবেষণা মানেন না ?

অপর এক সভ্য কহিল, বল কি! বিলাতের ওঁরা ভূত মান্‌ছেন ? তবে ত ভূত আছে !

বিজ্ঞ বলিলেন, ভূত থাক বা না থাক, ভয় আছে।

যুবা বলিল, আপনি বৈজ্ঞানিক গবেষণা মান্‌বেন না ?

মান্‌ব না কেন ? গোঃ গাবৌ গবেষণা ত ? তা বিলাত থেকে ভূত আমদানী করতে হবে কেন ? দেশে কি ভূত নেই ?

থাকবে না কেন, মশাই! বহুত বহুত! বরং বলতে পারা যায়, যত ভূত আছে, তত মানুষ নেই—বলিয়া যুবা বিজ্ঞের দিকে একটা শ্লেষের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

অপর যুবা কহিল, তা থাক, বিলাতী ভূত যত সভ্য-ভব্য, সুশ্রী, দেশী ভূতগুলো তত নয়। এ দেশের ভূতগুলোও যেমন কালো, পেত্নীগুলোও তেমনই কুৎসিত।

এই সময় আমাদের সকলের সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধাভাজন আরতি কহিল, বিবাদে কায নাই। আজ ক'দিন ধ'রে এই আলোচনা চল্‌ছে দেখে আমার একটি জানা ঘটনা লিখে রেখেছি, আপনারা শোনেন ত পড়ি।

বিজ্ঞ বলিলেন, বেশ ত—বেশ ত! কিন্তু ঘটনাটি দেশী না বিলাতী ?

বিলাতী ঘটনা আমি কি ক'রে জান্‌ব ?

কেন ? আপনি ত বিলাতে গিয়েছিলেন ?

তা বটে! কিন্তু সেখানে ত আমি ভূতের সন্ধানে যাইনি!

তা বটে! বেশ, পড়তে সুরু করুন।

আরতি পড়িতে সুরু করিল :—

হবে না—হবে না ক'রে সুদীর্ঘ নৈরাশ্যের পর আঁধার ঘর আলো করিয়া যখন মেয়েটি জন্মিল, তখন পিতা-মাতা তাহার নাম রাখিলেন, জ্যোৎস্নাবালা।

আল্‌তাপাটীর জমীদার দক্ষিণারঞ্জনের অতুল সম্পদ, প্রণয়িনী স্ত্রী। সুখের সংসারে যেটুকু অভাব ছিল, জ্যোৎস্না আসিয়া তাহা পূর্ণ করিল। কিন্তু সুখের মাত্রা পরিপূর্ণ হইলেই পুর্ণিমার চাঁদের মত ক্ষয় হইতে থাকে। ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম এবং সংসারের শোচনীয় ইতিহাস।

সাত বৎসর বড় সুখেই কাটিল। জ্যোৎস্না শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নার মত দিন দিন ফুটিয়া উঠিতেছে। মাতৃত্বের গৌরবে গৃহিনীর প্রবীণ মুখেও কি এক নবীন সৌন্দর্য্যের বিকাশ হইয়াছে, তাহা নিত্য দেখিতে দেখিতে দক্ষিণারঞ্জন এক দিন বলিয়াই ফেলিলেন, আমার ত দাঁতগুলো নড়তে সুরু করেছে, কিন্তু তোমার ত দেখছি নব-যৌবন উথলে—

গৃহিনী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, আঃ, কি বক্‌ছ ? জুনী জেগে রয়েছে যে!

স্বামি-স্ত্রীর এইরূপ বিশ্রম্ভালাপ হইতেছিল মধ্যাহ্ন-ভোজনান্তে বিশ্রামের সময়। মা মেয়েকে ঘুম পাড়াইতে-ছিলেন। দক্ষিণা বলিলেন, তাই ত! মহামান্যমান্ ব্যক্তি, সমীহ ক'রে চল্‌তে হবে!

জুনী বুঝিল, জনক-জননী কি একটা ব্যাপার লুকাইতেছেন। অতি সুবোধ মেয়ের মত প্রশ্ন করিল, নব-যৌবন কি মা ?

মায়ের রাঙ্গা মুখ আরও রাঙ্গা হইয়া উঠিল। তার উপর একটু চোখ রাঙ্গাইয়া মেয়েকে ধমক দিলেন, তোর অত খোঁজে কায কি লা পোড়ারমুখী ! তুই ঘুমো ত !

পোড়ারমুখী ঘুমাইল। কিন্তু পোড়ারমুখীর মা নব-যৌবন-তত্ত্বের ব্যাখ্যা না শুনিয়া ঘুমাইতে পারিলেন না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিলেন,—কি বলছিলে যে—

বলছিলুম, তুমি কি বুড়ী হবে না ?

তার জন্য এত তাড়া কেন ? দাঁড়াও, আগে শ্বাশুড়ী হই, তবে ত !

বল কি, তা হ'লে ত আমি মেয়ের বে দেবই না।

কেন বল দিকি ?

তা হ'লে ইন্দ্রের শচীর মত চির-যৌবনা হয়ে থাক্‌বে।

যে আজ্ঞে ! তাতে আপনার লাভ ?

কথার সুরে এবং ভঙ্গীতে সদ্যঃ কলহের সন্ধান পাইয়া কর্ত্তার আর আনন্দের অবধি রহিল না। বলিলেন, শুধু কি আমারই লাভের জন্য সব হ'তে হয় ! পাঁচ জন তোমাকে দেখে তারিফ করবে !

পাঁচ জন তোমার মত—

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া কর্ত্তা কহিলেন, ছোট লোক নয় ! কি জান, কবি রঙ্গলাল বলেছেন, 'যোগ্য পাত্রে মিলে যোগ্য—'

গৃহিণী ধড়মড়িয়া উঠিয়া বলিলেন, তার মানে আমিও ছোট লোক !

আহা, চট কেন ? হলেই বা ছোট লোক।

গৃহিণী কোন উত্তর না করিয়া আবার শুইয়া পড়িলেন।

শৈশবে পরিণীত এই দম্পতি যৌবনের প্রান্ত সীমায় আসিয়াও পূর্ব্বস্বভাব ত্যাগ করিতে পারেন নাই। উভয়ে উভয়কে এক দণ্ড না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না; কিন্তু ক্ষণিক মিলন হইলেই প্রাতঃস্মরণীয় নারদ ঋষির আবির্ভাব হইত। যে দিন পরস্পরে বচসা হইয়া কিছুক্ষণের জন্য বাক্যালাপ বন্ধ না হইত, সে দিনই মিছা। নিদেন শয়নকালেও সে ব্যর্থ দিনকে সার্থক করিয়া উভয়ে ঘোর সুষুপ্তি-সুখে নিমগ্ন হইতেন। যত দিন দক্ষিণারঞ্জনের মাতা জীবিতা ছিলেন, বালক দম্পতির প্রাত্যহিক কলহ মিটান তাঁর নিত্য কর্ম্ম ছিল। এই প্রৌঢ়া বিধবার স্বভাবও ছিল অতি অদ্ভুত। যে কেহ তাঁহার কাছে আগে অভিযোগ করিত, তিনি নির্ব্বিচারে তাহার বিরুদ্ধে রায় প্রকাশ করিতেন। এ জন্য তাঁহার পুত্রকেই প্রতিবার লাঞ্ছিত হইতে হইত; কেন না, একে ত তেজস্বিনী বধূ কিছুতেই শ্বাশুড়ীর কাছে বাদিনীরূপে দাঁড়াইত না, তাহার উপর সে তাঁহার একান্ত প্রিয়পাত্রী। কিন্তু ক্রমে যখন প্রৌঢ়া সংসারের সকল বাদ-বিবাদের চরম নিষ্পত্তি করিয়া শান্তিময় লোকে চলিয়া গেলেন, তখন বড় বিপদ হইল। দক্ষিণারঞ্জনের আহারের সময় বধূকে শ্বাশুড়ীর শূন্যস্থান অধিকার করিয়া স্বামীর আহারের তত্ত্বাবধান করিতে হয়; তাহার উপর এটা-সেটা প্রয়োজনও আছে। বাক্যালাপ সম্পূর্ণ বন্ধ করিলেও চলে না, অথচ না করিলেও দাম্পত্য-জীবন অ-লবণ ব্যঞ্জনের ন্যায় একবারে বিস্বাদ হইয়া উঠে। অবশেষে দিশাহারা দম্পতি এক অভিনব উপায় আবিষ্কার করিলেন। ঘর-দ্বার, পালঙ্ক, প্রাচীর, তরি-তরকারী প্রভৃতিকে মধ্যস্থ রাখিয়া কলহান্তরিত দম্পতির কথাবার্ত্তা চলিত। সে এক তাজ্জব ব্যাপার ! গৃহিণী জলখাবার সাজাইয়া আসনের সাম্‌নে রাখিয়া বলিলেন, সন্দেশ, এই জলখাবার রইল, খেতে বল।

কর্ত্তা কহিলেন, রসগোল্লা, খাবার ফিরে নিয়ে যেতে বল, আমার ক্ষিদে নেই, আমি খাব না।

গৃহিণী কহিলেন, খাট, তুমি সাক্ষী, যে না খাবে, সে আমার মাথা খাবে।

কর্ত্তা কহিলেন, কড়িকাঠ, তুমি সাক্ষী, আমার পেট ফেঁপেছে—

অতঃপর বিবাদ আবার মুখোমুখি আরম্ভ হইয়া গেল। কিন্তু জ্যোৎস্না জন্মিবার পর এ প্রথার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইল। মধ্যস্থতার ভার পড়িল সেই মানব-ভাষা-অনভিজ্ঞ, অবাক্‌পটু শিশুর উপর। এই প্রবীণ দম্পতি যখন কলহখণ্ডিত কিশোরবয়ঃ নায়ক-নায়িকার মত তাহাকে মধ্যস্থ করিয়া বাক্যালাপ করিতেন, শিশু তখন

বিস্ফারিত-নেত্রে সেই বয়ঃপ্রাপ্ত বালক-বালিকার খেলা দেখিয়া হাসিত।

কিন্তু আজ নিদাঘ-মধ্যাহ্ন নিঃশব্দে বহিয়া যাইতেছে। দুই একটা কাক—আর দূরে বোধ করি, প্রিয়হারা একটা ঘুঘুর কম্পিত কণ্ঠে সকরুণ ডাক ও তরুণ পাতার তর্-তর্ রব ছাড়া সব নিঝুম—নীরব। কর্ম্মকোলাহলময় মধ্যাহ্ন যখন মধ্যরাত্রির মত নিস্তব্ধ হইয়া থাকে, তখন যেন বুকের উপর একটা ভার চাপিয়া বসে। স্বামি-স্ত্রীর মন ক্রমশঃ যেন উতলা হইয়া উঠিতে লাগিল। ঐ ত নিবিড় নীলাকাশ তপনের তপ্ত তরল করে আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। মেদিনীর সর্ব্বত্র আলোক, কিন্তু এ কি বিপরীত ভাব আজ পতি-পত্নীর অন্তরে! পৃথিবীর সমস্ত ছায়া যেন আজ এই দুই নর-নারীর হৃদয়-কন্দরে আশ্রয় লইয়াছে! দক্ষিণা আড়ে আড়ে পত্নীর মুখ দেখিয়া ভাবিতেছিলেন, কি সুন্দর! এ সৌন্দর্য্য কি মাটীর পৃথিবীতে সম্ভব! এ নিশ্চয় স্বর্গের! কবে অকস্মাৎ দু'খানা পাখা বাহির করিয়া উড়িয়া যাইবে! না, আর ঝগড়া করা হবে না। এই ক্ষণস্থায়ী জীবন, তাহার অর্দ্ধেক যায় ঘুমে, আর বাকী অর্দ্ধেকের অর্দ্ধেক যায় আমাদের কলহে। এরূপ কথায় কথায় ঝগড়া নিবৃত্তি করতে হবে। বিশেষ জুনী এখন বড় হচ্ছে! পত্নী শয্যায় শুইয়া ভাবিতেছিলেন, আজ কেন আমার মন উড়ু উড়ু করছে! মনে হচ্ছে, কোথায় যেন ছুটে পালাই! আমার সোনার সংসার, ইন্দ্রতুল্য স্বামী, গৌরীর মত মেয়ে, এমন ঘর-বর ছেড়ে কোথায় আমি সুখী হব! কিন্তু তবু আজ যেন কিছুতেই মন বস্‌ছে না। এই ঘরে আমার ফুলশয্যা হয়েছিল, কত যত্নে সাজিয়েছি। এ ঘর আমার স্বর্গ! এখানে এলেই আমার মন ভ'রে উঠে, কিন্তু আজ মনে হচ্ছে, সব শূন্য!

জ্যোৎস্না তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। মেয়ের কচি মুখখানি দেখিতে দেখিতে মায়ের চক্ষু দুটি ভিজিয়া উঠিতে লাগিল। আজ এ কি ভাব! সে অশ্রুও সংবরণ করা যায় না, আর সে মুখখানি দেখিয়াও তৃপ্তি হয় না! আজ কত দিনের কথা মনে পড়িতেছে। ঠিক এমনি বয়সে তিনি সীঁথায় সিন্দুর পরিয়াছিলেন। যে দ্বাদশবর্ষীয় কিশোর চিত্রকর সে সীমন্ত রঞ্জিত করিয়াছিল, সে অদূরে ঐ শয্যায় শয়ান। ওঃ, কত কথা মনে আসে, আর চোখ দুটি জলে ভাসে! তখন শাশুড়ী ছিলেন একান্ত নির্ভর, আর স্বামী ছিলেন খেলার দোসর। শ্বশ্রূ দুই জনে বিবাদ বাধাইয়া আনন্দ উপভোগ করিতেন, অবশেষে হাতাহাতি যুদ্ধ তিনিই মিটাইয়া দিতেন। কি নির্ম্মল অশ্রু-তরল হর্ষ-পুলক-চঞ্চল সে সব দিন! মায়েরও একান্ত ইচ্ছা, শীঘ্র শীঘ্র জ্যোৎস্নার বিবাহ দিয়া শাশুড়ীর মত খেলা করেন; কিন্তু দক্ষিণার অমত। তাঁহার ইচ্ছা, মেয়েটিকে সুশিক্ষিত করিয়া একটি সুসভ্য, সচ্চরিত্র বিলাত-ফেরতের হাতে সমর্পণ করা। কিন্তু বাল্যের সে অনাবিল আনন্দ কি যৌবনের পরিণয়ে ভোগ হয়?

কিছুক্ষণ এ-পাশ ও-পাশ করিয়া দক্ষিণা বলিলেন, ঘুমুচ্ছ না কি?

গৃহিণী একটু ভিজা ভিজা ভারী গলায় উত্তর দিলেন, হাঁ।

বটে! আমি ভাবছিলুম, জেগে আছ।

না।

স্বপ্ন দেখছ?

হাঁ।

জেগে না ঘুমিয়ে?

জেগেও নয়, ঘুমিয়েও নয়।

কি স্বপন দেখা হচ্ছিল, সুস্বপন না দুঃস্বপন?

গৃহিণী তাড়াতাড়ি বলিলেন, বালাই! দুঃস্বপন কেন হ'তে যাবে? সুস্বপন।

কখন না।

তোমার কথায়, না?

তোমার কথায়, হাঁ?

নিশ্চয়! তুমি কেমন ক'রে জান্‌লে সুস্বপন নয়?

সুস্বপন কি মানুষ চুপ ক'রে দেখে! বেশ ত, শুনি না, কি স্বপন দেখছিলে?

গৃহিণী জানিতেন, কন্যার বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে কর্ত্তার সহানুভূতি নাই। তাচ্ছীল্যের স্বরে বলিলেন, কি আবার!

তবু?

দেখছিলুম, জুনীর বিয়ে—

হায় রে স্বভাব! দক্ষিণার মুহূর্ত্ত পূর্ব্বের সঙ্কল্প কোথায় ভাসিয়া গেল! কলহের একটু আমেজ পাইয়া সোৎসাহে প্রশ্ন করিলেন, জুনীর বিয়ে? কার সঙ্গে?

একটি বেশ টুকটুকে রাঙ্গা বরের সঙ্গে।

যেমন তোমার হয়েছিল? একটা বদমাইস দুরন্ত ছেলের সঙ্গে? সেটি হবে না।

কেন হবে না?

পাঁজিতে এই রকম লিখ্‌ছে।

কি লিখ্‌ছে?

লিখ্‌ছে, ষোড়শবর্ষ বয়সে সুতহিবুকযোগে শুভ-বার-তিথি-নক্ষত্রে,শুভলগ্নে সভ্য ভব্য সুশিক্ষিত শ্রীযুক্ত বিলাতচন্দ্রের সহিত সুশিক্ষিতা শ্রীমতী জ্যোৎস্নাবালার বিবাহ।

গৃহিণী অবজ্ঞায় একটু মুখ বিকৃত করিয়া কহিলেন, মা গো! হ্যাট-কোট প'রে জামাই আসবে যেন রাস্তাবন্দী সায়েব!

কর্ত্তা ঈষৎ হাসিয়া টিপ্পনী করিলেন, হ্যাট-কোটের ওপর রাগ বুঝি তোমার দাদার ওপর ঝাল ঝাড়া?

জ্যোৎস্নার মাতুল একাধারে এক জন কেম্‌ব্রিজ ও অক্সফোর্ড-স্কলার, সিনিয়ার র‍্যাংলার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপ্রতিষ্ঠিত খ্যাতনামা অধ্যাপক। সে কালের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মত কেবল অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় কালাতিপাত করেন।

দাদার তুলনা দিতে ভগিনী একটু উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, হ'লই বা দাদা! হক্ কথা কব গুরুকে। সে তুমি যা-ই বল; মেয়ে আমার—

তোমার মেয়ে কি রকম? এ-ও কি স্ত্রীধন না কি?

স্ত্রী বলিলেন, নিশ্চয়! স্ত্রীধন নয় ত কি? স্বামীর দান হলেই স্ত্রীধন।

বটে! তা জানতুম না।

জানতে না, জেনে রাখ যে, মেয়ে আমার। আমি যাকে পছন্দ করেছি, তার সঙ্গেই বিয়ে দেব।

অন্য দিনের অপেক্ষা পত্নী আজ অল্পেই উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছেন। দক্ষিণা কিছুক্ষণ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, বটে বটে! একেবারে পছন্দ ক'রে রেখেছ? কেবল সম্প্রদান বাকি? কে সে ভাগ্যবান্‌টি, শুনতে পাই না?

পাত্রটিকে স্মরণ করিবামাত্রই গৃহিণীর চিত্ত প্রসন্ন হইয়া উঠিল। বলিলেন, সেই যে, সে দিন পেয়ারা পাড়তে এসেছিল! সোমনাথ ব'লে সেই চাঁদপানা ছেলেটি—

হরি-ই বল! চাঁদপানা না চিনির পানা! একটা গেছো বাঁদর—

বালাই! গেছো বাঁদর কেন হ'তে যাবে! ছেলেবেলা অমন দুরন্ত থাকে!

শুধু দুরন্ত! বেটা চোর! পেয়ারা চুরি করতে এসেছিল!

তোমার যেমন মন! চুরি করতে আসবে কেন? আমায় এসে বল্‌লে, মা—এমনি মিষ্টি কথা, আমার গা-টা কাঁটা দিয়ে উঠল!

তার পর, তার পর? এ যে মস্ত একটা রোমান্স হয়ে গেছে দেখছি! তার পর?

আমাকে বল্‌লে, মা, আমার দিদির অসুখ, পেয়ারা খেতে চায়। তোমাদের বাগান থেকে দু'ট নেব, মা? কথা কইলে যেন আমার কত কালের আপনার। এমন আপ্তিসো ছেলে আমি দেখিনি! দিদি-অন্ত প্রাণ!

আহা! তাই দিদির প্রাণান্ত ক'রে তবে ছাড়বে। তিনি সাত সকালে ওর রেঁধে বেড়ে খাইয়ে-দাইয়ে স্কুলে পাঠিয়ে দেন, আর ও গাছে উঠে ব'সে থাকে। এগার বারো বছর বয়েস, এখনও এ, বি, চেনে না। জুনীর বর হবে! জ্যোৎস্না বানান্ করতে বল দিকি, এখনি অন্ধকার দেখে ফেল্‌বে।

নাই বা জানলে! তুমি শিখিয়ে নেবে।

চাল নেই, চুলো নেই—

না-ই বা রইল! তোমার অভাব কি? তুমি সব ক'রে দেবে।

বাঃ, সব ভারই আমার, কেবল জামাই হবার ভারটি তাঁর! কি আপদ্!

বালাই, ষাট! তুমি অমন আপদ্-বালাই দূর-ছাই কোর না। সে আমার জুনীর বর হবে। তোমার মেয়েকে সে কত ভালবাসে জানো? কিন্তু তোমার জুনী এমনি যে, আমাকে মা বলে ব'লে রাগে গর্-গর্ করে। আমায় বলে, মা, ও কেন তোমাকে মা বলবে? কেমন সুন্দর সুন্দর পুতুল গ'ড়ে দেয়! তোমাকে দেখাব এখন।

তবু ভাল! এর পরে পুতুল গ'ড়েও খেতে পারবে।

সে তখন দেখা যাবে। নারকোলগাছে উঠে পাখীর ছানা পেড়ে দেয়।

'ঐ ছাখ—"

বসুমতী প্রেস] শিল্পী—রাজেন্দ্রপ্রসাদ বিশ্বাস

ওঃ, তাই বল! ঐ রকমে জুনীর চিড়িয়াখানা তৈরী হয়েছে! আমি আজই সব পাখী ছেড়ে দেব!

গৃহিণী আচম্‌কা উঠিয়া বসিয়া অতিশয় উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, কৈ, দাও দিকি দেখি!

দক্ষিণা একটু চকিত হইলেন। তাঁহার দাম্পত্য জীবনের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতায় গৃহিণীর এমন উত্তেজিত ভাব, আরক্ত মুখ একবারমাত্র দেখিয়াছিলেন, যে দিন একটা পুতুল ভাঙ্গিয়া দেওয়ায় তাঁহার বালিকা বধূ অসহ্য ক্রোধে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়াছিল। কিন্তু নিমেষে আত্মসম্বরণ করিয়া গৃহিণী ধীর অথচ দৃঢ় স্বরে বলিলেন, পাখী উড়িয়ে দিয়ে একবার মজাটা দেখ না!

দক্ষিণারও তখন রোখ চড়িয়া গিয়াছে। বলিলেন, কি করবে শুনি?

তা হ'লে এ জন্মে আর কথা কব না। যেখানে দু' চোখ যায়, চ'লে যাব।

ওঃ, তবে ত ভয়ে ম'রে গেলুম! আর যদি চাবি দিয়ে রাখি?

আমি গেলে কিছুতেই রাখতে পারবে না। কারুর সাধ্য নাই, আমাকে ধ'রে রাখে। দশটা চাবি দিলেও নয়।

আচ্ছা, সে তখন দেখা যাবে। মনে করেছ, ঐ ভয় দেখালে আমি ভয় পাবো?

অন্যায় করলে ভয় পেতেই হবে।

এবার মহা উত্তেজিত হইয়া দক্ষিণা বলিলেন, অন্যায় তোমার না আমার? একটা খেয়ালে মেয়েটাকে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিতে চাচ্ছ?

খুব করছি! আমার মেয়ে, আমি যা খুসী, তাই করব।

ইস্‌! তোমার একলার মেয়ে! আমি বেঁচে থাকতে তা হবে না, হবে না, হবে না!

যাহার ভবিষ্যৎ লইয়া এই দুই ভাগ্য-বিধাতা কলহ করিতেছিলেন, সে তখন নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতেছিল। তাহার মুখ দেখিতে দেখিতে মাতা হঠাৎ শুইয়া পড়িয়া বলিলেন, জুনী, আমি যদি বেঁচে থাকি, ঐ রাঙ্গা বরের সঙ্গে তোর বে দেব—দেব—দেব।

কর্ত্তা বলিলেন, জুনী, বল্‌, আমাকে হাত-পা বেঁধে যদি জলে ফেলে দাও, তা হ'লে তুমি মর—মর—মর!

কিন্তু কথা কয়টা মুখ দিয়া বাহির হইতেই দক্ষিণা একান্ত অপ্রতিভ হইয়া শুইয়া পড়িলেন। এমন দিন নাই যে, তাঁহাদের পরিণীত জীবনে এমন একটু আধটু উগ্র বাতাস না উঠে! কিন্তু আজ হঠাৎ তাঁহার মুখ দিয়া এ কি নির্দ্দয় বাক্য নির্গত হইল! গৃহিণী একটি কথাও প্রতিবাদ না করায় দক্ষিণার অন্তরে অধিকতর আঘাত লাগিল। ঘুমাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু নিদ্রা তাঁহার নয়ন স্পর্শ করিল না। মন কেমন উতলা হইয়া উঠিতে লাগিল। সেই ছায়া যেন গাঢ়তর হইয়া তাঁহার হৃদয়ে চাপিয়া বসিয়াছে, নড়িতে চায় না। খানিক এ-পাশ ও-পাশ করিয়া দক্ষিণা উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, কি গো, রাগ হ'ল না কি? কিন্তু কোন উত্তর পাইলেন না। তা বেশ, বলিয়া তিনি আবার শুইয়া পড়িলেন, কিন্তু শয্যায় যেন কাঁটা ফুটিতে লাগিল। উঠিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, না, এ অভিমান এখনই না ভাঙ্গিলে আরও গুরুতর হইবে। গৃহিণীর নিকটে গিয়া ধীরে ধীরে ডাকিলেন, বুল্‌বুল্‌!

ইহা দক্ষিণারই প্রদত্ত আদরের নাম। বুল্‌বুল্‌ লড়ায়ে পাখী, তাই দক্ষিণা পত্নীর এই নামকরণ করিয়াছিলেন। রোষ, অভিমান যতই প্রবল হউক, ঐ নামে সম্ভাষণ কখন নিষ্ফল হয় নাই। কিন্তু আজ কোন সাড়া আসিল না। দক্ষিণা গভীর স্নেহ-বিগলিত মৃদুকণ্ঠে আবার ডাকিলেন, বুল্‌বুল্‌! ওঃ, মটকা মেরে প'ড়ে থাকা হয়েছে! রোস, গায়ে আরসুলো ছেড়ে দিচ্ছি! উঠবে না, উঠবে না! বেশ ত, হাজার ডেকে গলা ফাটালেও আমি আর সাড়া দেব না। দক্ষিণারঞ্জন অভিমানে আপনার শয্যায় গিয়া বসিলেন, কিন্তু তাঁহার কেমন ভয় ভয় করিতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পুনরায় স্ত্রীর কাছে গিয়া গা নাড়া দিয়া বলিলেন, ওগো, সত্যি বল্‌ছি, সাড়া দাও, আমার ভারী মন কেমন করছে! সাড়া দেবে না? দেবে না? দেখি, সত্যি ঘুমুচ্ছ? ঝুঁকিয়া পড়িয়া পত্নীর মুখ পরীক্ষা করিয়া একটু বিস্মিতভাবে বলিলেন, বাবা, এ কি ঘুম! একেবারে অসাড়!

দক্ষিণা পুনঃ পুনঃ ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু শত চেষ্টাতেও সে কাল-ঘুম ভাঙ্গাইতে পারিলেন না। কেবল অধিকতর ব্যাকুল হইয়া বলিতে লাগিলেন, বলছি, আমার ভারী মন কেমন করছে, শুন্‌তে পাচ্ছ না? এ কি ঘুম!

কি ঘুম! যে ঘুম স্বপ্নশূন্য, নিরুদ্বেগ, মোহের মমত্ব-বিহীন, স্নেহের আকুল আহ্বান, বিচ্ছেদের বুকফাটা কান্না যে নিষ্ঠুর নিশ্চিন্ত নিদ্রা ভাঙ্গাইতে পারে না, এ সেই ঘুম!

দক্ষিণা কিছুক্ষণ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া পত্নীর প্রশান্ত মুখ-মণ্ডল দেখিতে দেখিতে আবার বলিতে লাগিলেন, ওগো, শুন্‌তে পাচ্ছ না? চোখ চাও বল্‌ছি, তোমার পায় পড়ি, ওঠ! ওঃ, আমার বুক ফেটে যাচ্ছে! বুল্‌বুল্, মর বলেছি ব'লে ভারী অভিমান হয়েছে, না? ওঠ, আর রাগ করতে হবে না! ওঃ, তুমি যে আমায় এত কষ্ট দিতে পার, এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি! ওঠ!

দক্ষিণা পত্নীর হাত ধরিয়া টানিলেন। এ কি অপ্রিয় শীতস্পর্শ! বুল্‌বুল্! বার বার চোখ-মুখ পরীক্ষা করিয়াও দক্ষিণা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না যে, তাঁহার বুল্‌বুল্ সত্যই পলাইয়া গিয়াছে। মৃত্যুর অতর্কিত আগমন মানুষ সহজে ধারণা করিতে পারে না। অধরোষ্ঠের ঈষৎ বিকাশে হাসির আভাস পাইয়া দক্ষিণা প্রতারিত হইয়া বলিলেন, আহা, কি তামাসাই কর। এ রকম ঠাট্টা আমার ভাল লাগে না। 'মর' বলেছি ব'লে মড়ার মতন প'ড়ে রইলেন! কিন্তু আত্মপ্রতারণা করিয়াও বেশীক্ষণ এ কঠোর সত্যকে দূরে রাখা যায় না। পত্নীর স্থির প্রশান্ত সুন্দর মুখমণ্ডল, তাহার শ্বাসহীন নিস্পন্দ দেহ দক্ষিণারঞ্জন পলকহীন নেত্রে দেখিতে লাগিলেন। মৃত্যুর একটি মহীয়সী সুষমা আছে, যা সব সময় চোখে পড়ে না। মর্ম্মর-মূর্ত্তিকেও শিল্পী ভাবময়ী করিয়া গঠন করেন। কিন্তু এ সৌন্দর্য্য, স্নেহ-করুণা, হর্ষ-বিষাদ,আশা-নিরাশা, ভয়,ষড়রিপুর বিকার-শূন্য। সে নির্ব্বিকার, অচপল সৌন্দর্য্য মুগ্ধনেত্রে দেখিতে দেখিতে একবার দক্ষিণার দৃষ্টি বাতায়নপথে বহির্জগতে ধাবিত হইল। চারিদিকে জীবনের স্রোত টলমল্ করিতেছে! চারিদিকে প্রাণের উচ্ছ্বাস, চাঞ্চল্যের বিকাশ! নীলাম্বরে খণ্ড খণ্ড শুভ্র মেঘ ভাসিয়া যাইতেছে; চিল সে নীলসাগরে পাকে পাকে ঘুরিয়া সন্তরণ করিতেছে; মাঝে মাঝে পারাবতের ঝাঁক সহসা দৃষ্টিপথে আসিয়া অদৃশ্য হইতেছে, তাহাদের পাখায় ছায়ালোকের কি বিচিত্র খেলা! বাতাসে বৃক্ষপত্র দুলিতেছে; সরোবরে বীচিমালা সূর্য্যকরে ঝলমল করিতেছে। সে ঘুঘুটা এখনও তেমনই করিয়া ডাকিতেছে! তাহার সে সকরুণ সুর দক্ষিণারঞ্জনের মর্ম্মস্থলকে আলোড়িত করিয়া তুলিল। স্বভাবে চারিদিকে প্রাণস্পন্দন, আর তাঁর কক্ষে এ কি প্রাণহীন প্রতিমা! দক্ষিণারঞ্জন তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, জুনী, তোর মা কৈ রে?

নির্ম্মেঘ নীলাম্বর হইতে কখন কখন যেমন অকস্মাৎ অশনিপাত হয়, তেমনি আচম্বিতে বজ্রাঘাত মানবের অদৃষ্টাকাশ হইতেও ঘটিয়া থাকে। উভয়ই প্রকৃতির নিয়ম। দক্ষিণার তীক্ষ্ণ চীৎকারে জুনী সহসা জাগিয়া উঠিয়া 'মা মা' করিয়া কাঁদিতে লাগিল। দক্ষিণা স্বপ্নাচ্ছন্নের ন্যায় পত্নীর মুখ চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর ডাক্তার আসিল, শবদেহ তন্ন তন্ন পরীক্ষা করিয়া বলিল, অনেকক্ষণ মৃত্যু হয়েছে।

দক্ষিণা যেন দুঃস্বপ্ন হইতে জাগিয়া বলিলেন, মৃত্যু হয়েছে? তবে কি হবে? না—না, ডাক্তার, তুমি বুঝতে পারছ না! এই একটু আগে কথা কচ্ছিল, আর আমি তামাসা ক'রে মর্ মর্ বল্‌তেই ম'রে গেল! ডাক্তার, তুমি ভাল ক'রে দেখ।

ডাক্তার প্রবীণ। মর্ম্মভেদী এমন অনেক দৃশ্যে তিনি অভ্যস্ত। ধীর সান্ত্বনাস্বরে বলিলেন, আপনি স্থির হন, যাকে কাকতালীয় বলে, এ-ও তেমনই। আপনার কথার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ হার্ট ফেল করেছে।

দক্ষিণা বিস্মিতের ন্যায় বলিল, সে কি?

হৃদ্‌যন্ত্রের স্পন্দন স্তব্ধ হয়েছে!

স্তব্ধ হয়েছে! বলা নেই—কওয়া নেই, অমনি হঠাৎ স্তব্ধ হবে কেন?

হার্ট এমনি হঠাৎই ফেল করে।

করে! তা হ'লে উপায়? জলে ডুব্‌লে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস দিলে অনেকে বেঁচে উঠে। তাই কেন কর না?

এ ক্ষেত্রে যে তাহা সম্ভব নয়, ডাক্তার তাহার বিজ্ঞান-সম্মত কারণ দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলে দক্ষিণা ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া তাহার মুখ চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন, পাগলের মত কি আবোল-তাবোল বক্‌ছে! তিনি আবার ছুটিয়া গিয়া পত্নীর মৃত্যুশয্যার পাশে দাঁড়াইয়া ডাকিলেন, বুল্‌বুল্! তার পর মৃতার বক্ষে কপোল সংলগ্ন করিয়া কান পাতিয়া কিছুক্ষণ শুনিতে শুনিতে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, ডাক্তার, ডাক্তার!

ডাক্তার দ্রুত আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিলে দক্ষিণা

বলিলেন, ষ্টেথস্কোপ দিয়ে দেখ দিকি, আমার মনে হচ্ছে, বুক যেন একটু ধুক্ ধুক্ করছে, বলিয়া পত্নীর বুকের উপর মাথা দিয়া আবার কান পাতিলেন। হ্যাঁ, এই যে স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

নিরর্থক জানিয়াও দক্ষিণার সান্ত্বনার জন্য চিকিৎসক পুনরায় মৃতার বুক পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, কৈ—না।

না কি? আমি স্পষ্ট শুন্‌তে পাচ্ছি। তোমাদের ইচ্ছা নয় যে, ও' বাঁচে। এই ত আমি শুন্‌তে পাচ্ছি।

ও অমন হয়। আপনি আপনার বুকের স্পন্দন শুনছেন

ওর বুকে আমার বুকের স্পন্দন? এক দিন তাই মনে করতুম বটে, কিন্তু ও সব সত্য নয়, কবিত্ব। যদি সত্য হ'ত, ওর সঙ্গে আমারও হার্ট ফেল করত। সত্যি মারা গেছে? আর কোন আশা নেই? ডাক্তার, ঐ যে ফুল—ও সকালবেলায় তুলেছে, এখনও যে তাজা রয়েছে, শুকোয় নি! ওঃ—বলিয়া দক্ষিণা নিজের বুক চাপিয়া ধরিলেন।

শোক যতই তীব্র হউক, সংসারে তাহার নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মের এতটুকু বাদ দেয় না। অনিমেষ অতৃপ্ত নয়নে পত্নীর মৃতদেহ দেখিতে দেখিতে দক্ষিণারঞ্জন বুঝিলেন, ইহাকে আর ঘরে রাখা চলে না। তার পর একে একে সকল আয়োজনই হইল। কুসুম-চন্দনে চর্চ্চিত হইয়া গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রাজরাণীর মত রাজপথ আলো করিয়া শেষ বিশ্রামস্থলে চলিলেন। জ্যোৎস্না ফুল্লোমুখী হইয়া ছুটিয়া আসিয়া বলিল, বাবা, মাকে সাজিয়ে গুজিয়ে ওরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?

দক্ষিণা সহসা গর্জ্জিয়া উঠিলেন, যাক্ যাক্, যে তোমার মুখ চাইলে না, আমার মুখ চাইলে না, তার যেখানে খুসী যাক্! তার পর কন্যার মুখ দেখিতে দেখিতে তাঁহার মনে পড়িল, এমনি একটি বালিকা—অবিকল ইহার নকল—এক দিন এই গৃহে আসিয়া তাঁহার ক্রীড়াসঙ্গিনী হইয়াছিল। আহত শার্দ্দূলের মর্ম্মভেদী চীৎকারের মত একটা উৎকট চীৎকারধ্বনি সেই শোক-মৌন ভবনের স্তব্ধ বায়ু বিদীর্ণ করিয়া শূন্যে ছুটিয়া গেল, জুনী, মা আমার! ওঃ, আমার বুকটা চেপে ধর, নিঙড়ে চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জল বা'র ক'রে দে।

বিহ্বলমতি বালিকা তখনই ছুটিয়া গিয়া প্রবীণা জননীর ন্যায় পিতার সন্তপ্ত মস্তক দুইখানি ক্ষুদ্র বাহুতে বুকে আঁকড়াইয়া ধরিল। এই মূক সমবেদনার সংস্পর্শে দক্ষিণারঞ্জনের জমাট-বাঁধা অশ্রু গলিয়া পড়িল। কন্যাকে বুকে ধরিয়া অবিরল তপ্তধারায় অভিষিক্ত করিতে করিতে এ যাত্রা তিনি বাঁচিয়া গেলেন। কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল, জলন্ত অঙ্গারের ন্যায় শোক তাঁহার মর্ম্মস্থলে ততই গভীর হইতে গভীরতর প্রদেশে প্রবেশ করিতে লাগিল। মেদিনীর মূর্ত্তি, প্রকৃতির আকৃতি যে এক দিনে এমন বদলাইয়া যাইতে পারে, কে জানিত! দক্ষিণার মনে কত কথাই উদয় হয়। কি অপরাধে সে আমায় একলা ফেলে গেল? ঠাট্টা ক'রে বলেছিলুম, পাখীগুলো সব ছেড়ে দেব। তাই কি সে অভিমানে আমার হৃদয়-পিঞ্জর থেকে উড়ে গেল? উঃ! হৃৎ-পঞ্জরগুলো একেবারে ভেঙ্গে দিয়ে গেছে! গেছে, গেছে! কিন্তু মনে ত হয় না, সে গেছে! আমি যেন দেখতে পাই, সে আমার কাছে কাছে রয়েছে।

সারাদিন ধরিয়া দক্ষিণা এ-ঘর ও-ঘর ঘুরিয়া বেড়ান, একান্ত অন্যমনস্কভাবে এটা-সেটা নাড়া-চাড়া করেন। কখন পত্নীর কোন প্রিয় সামগ্রী হাতে করিয়া দীর্ঘকাল শূন্যমনে দাঁড়াইয়া থাকেন। হায়, ভগবান্! তোমার সৃষ্টিতে এ কি অনাসৃষ্টি! ভালবাসার বন্ধন দিয়াছ, কিন্তু বেঁধে রাখবার ক্ষমতা দাও নাই! মাটীর পুতুল যত্নে রক্ষা করিলে চিরদিন থাকে, আর তোমার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ এমনি ক্ষণভঙ্গুর! এই ত সবই যেমন ছিল, তেমনি রহিয়াছে! ঐ ত তাহারি হস্ত-রোপিত গাছ আলো করিয়া কৃষ্ণচূড়াফুল তেমনি ফুটিতেছে! তাহারি যত্ন-লালিত গন্ধরাজের গন্ধে বায়ু বিভোর! পত্র-কিরীটশিরে নারিকেলবৃক্ষ ধীরে ধীরে তেমনি মাথা দোলাইতেছে। কাবুল হইতে আনীত তাহার আদরের বিড়াল "রাণী" ছানা লইয়া তেমনি খেলিতেছে! তাহার স্বহস্ত-পালিতা গাভী "শিবানী" তেমনি করিয়া বাছুরের গা চাটিতেছে! পোষা ময়না "সোহাগী" তেমনি করিয়া বুলবুল্ বলিয়া ডাকিতেছে! কিন্তু আজ আর তাহাকে সাড়া দিবার কেহ নাই! ভালবাসার সুদৃঢ় শৃঙ্খল কাটিয়া, জীবনের সকল সাধে জলাঞ্জলি দিয়া, সর্ব্বপ্রকার সুনিশ্চিতকে অনিশ্চিত করিয়া কাহার অমোঘ অপরিহার্য্য আহ্বানে সে এমন ব্যস্ত হইয়া চলিয়া গেল! কি দুর্জ্জয় অভিমানে একবার ক্ষমা চাহিবার অবসর দিল না, একটা

মুখের কথায় বিদায় নিল না! এ কি শাস্তি! যে চিতা সে জ্বালাইয়া দিয়া গেল, তাহা যে চিরজীবনে নিবিবে না! কিন্তু আমিই যেন অপরাধী, তাহার ক্ষুদ্র শিশু—

বাবা!—জ্যোৎস্না দ্বারের আড়াল হইতে একবার উঁকি মারিয়া অতি সন্তর্পণে ডাকিল, বাবা!

গভীর তন্ময়তাভঙ্গে দক্ষিণা ঈষৎ চকিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, কি মা?

পিতাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বালিকা তাহার শ্রেষ্ঠ পুতুলটি সঙ্গে আনিয়াছিল, দক্ষিণার হাতে তুলিয়া দিল! বেশী নয়, অল্পদিন পূর্ব্বে কত না উৎসাহে দক্ষিণা কন্যার পুতুল-খেলায় যোগ দিয়াছেন! নিজে পুত্র হইয়া তাহার মাটীর খোকা লইয়া স্নেহের কত কলহ, আড়া-আড়ি হইয়াছে! মাটীর খোকার জন্য মাটীর থালে রক্ষিত সেই পিটুলী, গুড়কামানী, ঘোলমৌনী ফল লইয়া কি কাড়াকাড়ি হইত! আচ্ছা, মা, তুমি কোন্ খোকাকে বেশী ভালবাস—বলিয়া সে কি কৌতুকের প্রশ্ন, উত্তরের জন্য কি ঔৎসুক্যের প্রতীক্ষা! মাটীর খোকা তাহার ক্ষুদ্র মায়ের সকল আদেশ, শাসন, তিরস্কার, আদর, অনুযোগ শান্তশিষ্টের মত বিনা বাক্যব্যয়ে মানিয়া লয়, কিন্তু মানুষ-খোকা ত তা নয়! ইহাকে ঘুম পাড়াইতে গেলে শান্ত হইয়া শোয় না, চুপ করিতে বলিলে বক্-বক্ করিয়া বকে, চালুনীজলের দুগ্ধপান করিতে বলিলে খায় না। মানুষ-খোকা বড় দুষ্ট! তার পর মানুষ-খোকাকে ত জ্যোৎস্না সর্ব্বক্ষণ বুকে করিয়া বেড়াইতে পারে না। কিন্তু তবু স্নেহের তুলাদণ্ডে যে কোন্ দিকে ঝুঁকে, সে সমস্যা পূরণ করা শিশু মায়ের পক্ষে বড় শক্ত! প্রবীণা মাতা অন্তরাল হইতে প্রীতি-বিকশিতনেত্রে প্রবীণ-নবীনের এই খেলা দেখিতেন। দক্ষিণার বুকের ভিতর বসিয়া যে আনন্দ এই খেলা খেলাইত, সে আজ কোথায়? আবার এই পুতুল-খেলা! দক্ষিণারঞ্জন কন্যাকে পুতুলটি ফিরাইয়া দিয়া একটু অসহিষ্ণুভাবে বলিলেন, যাও, মা, খেলা কর গে!

জ্যোৎস্না পুতুলটি লইয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল এবং মাতার শয়নকক্ষে গিয়া সেটিকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া মা—মা, মা গো! বলিয়া লুটাইয়া পড়িল। পিতার হৃদয় যে জননীর চিতায় পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে, মাতৃহীনা কন্যা তাহা বুঝিতে পারে না। তাহার স্নেহ-তৃষিত অন্তস্তল হইতে রাত্রি-দিন যে হাহাকার উঠে, তাহারি তীব্র তাড়নায় জ্যোৎস্না দক্ষিণার কাছে ছুটিয়া আসে, দ্বিগুণ বেদনা লইয়া ফিরিয়া যায়। বালিকার পিপাসিত বক্ষঃ স্নেহবিন্দু বর্ষণের জন্য শুষ্ক মরুর মত মৌন প্রত্যাশায় শূন্যে চাহিয়া রহিল।

দক্ষিণারঞ্জন এক দিন শুনিলেন, তাঁহার শয়নকক্ষে কে যেন নিদারুণ মর্ম্মবেদনায় গুমরিয়া কাঁদিতেছে। এ ত জ্যোৎস্নার স্বর নয়। দক্ষিণা তাড়াতাড়ি গিয়া দেখিলেন, সোমনাথ!

সেই সোমনাথ! ইহাকে লইয়াই সেই কাল কলহ! সম্ভবতঃ তাহার প্রিয়তমার শেষ চিন্তা এই দুঃশীল দুর্ব্বৃত্ত বালকই অধিকার করিয়াছিল। অসহ্য বিতৃষ্ণায় দক্ষিণার বুক ভরিয়া উঠিল। তিনি কঠোরস্বরে প্রশ্ন করিলেন, তুমি আবার কি করতে এসেছ?

সোমনাথ একবার আকুল নেত্রে তাঁহার পানে চাহিল, তার পর দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "মা—মা—মা!"

দক্ষিণা বুঝিলেন, যে মন্ত্রে তাঁহার আত্মীয়স্বজন, দাস-দাসী, গৃহপালিত পশুপক্ষী পর্য্যন্ত বশ হইয়াছিল, এই অনাত্মীয় বালকও সেই অকৃত্রিম স্নেহের মন্ত্রে পোষ মানিয়াছে, কিন্তু ইহার ব্যথার ব্যথী নাই। দক্ষিণা ত্বরিত অগ্রসর হইয়া সেই অসহায় শোকাহত বালককে বুকে আঁকড়াইয়া ধরিলেন।

দূর হইতে জ্যোৎস্না তাহা দেখিল। মাতার স্নেহে এই বালক তাহার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। আজ আবার পিতার স্নেহ কাড়িয়া লইতেছে। রোষে, ঈর্ষ্যায়, অভিমানে তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় ফুলিয়া উঠিল, চক্ষু জ্বালা করিতে লাগিল, কিন্তু জল আসিল না। জ্যোৎস্নাকে উপহার দিবার জন্য সোমনাথ স্বহস্ত-গঠিত একটি পুতুল আনিয়াছিল। সহসা তাহাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া সেটি দিতে গেল, কিন্তু পুতুলটি হাতে লইয়াই ক্রুদ্ধা বালিকা দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল।

দক্ষিণা বিস্মিতনেত্রে কন্যার পানে চাহিয়া বলিলেন, ছি, জুনী, কেউ কিছু উপহার দিলে আদর ক'রে নিতে হয়! যাও, কুড়িয়ে নাও গে!

জ্যোৎস্না নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সোমনাথ ক্ষুব্ধ না হইয়া তাড়াতাড়ি বলিল, না না, ও পুতুলটা ভেঙ্গে গেছে। আমি কাল আবার একটা এনে দেব।

রুষ্টা ফণিনীর ন্যায় জ্যোৎস্না তাহার ক্ষুদ্র বেণী দোলাইয়া ফোঁস করিয়া উঠিল, না, তোমাকে আনতে হবে না। কেন তুমি আমার বাবার কাছে—

বালিকা আর বলিতে পারিল না। ঘন ঘন শ্বাসের সঙ্গে তাহার ক্ষুদ্র বুকটি কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে পড়িতে লাগিল।

নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে দক্ষিণা কন্যাকে দেখিতে লাগিলেন। এ মূর্ত্তি যে তাঁহার পরিচিত—যেন কোন্ কৈশোরে কোন্ স্বপ্নে দেখিয়াছেন! তখন তিনিও ঐ সোমনাথের মত। আর এক জন যে ছিল, সে-ও ঠিক এমনি! সে দিন কি লইয়া বিবাদ হইয়াছিল, তাহা মনে নাই, কিন্তু এই জীবন্ত ছবি দেখিয়া সেই স্বপ্ন-চিত্র আজ তাঁহার স্মরণে রেখায় রেখায় জাগিয়া উঠিল। দক্ষিণা কন্যাকে শান্ত করিবার নিমিত্ত ধীরপদে অগ্রসর হইয়া স্নেহ-বিগলিত কণ্ঠে কহিলেন, কি হয়েছে, মা?

একটা দুঃসহ কান্নার বেগ চাপিতে চাপিতে জ্যোৎস্না ছুটিয়া পলাইল।

দক্ষিণা সোমনাথের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, সমি, তুমি ও পাগলীর কথায় দুঃখ ক'র না।

না না, আমি যে ওকে ভালবাসি, বলিয়া বালকও দ্রুতপদে অন্তর্হিত হইল।

জ্যোৎস্না দূরের একটি নিভৃত কক্ষে গিয়া আপনার ক্ষুদ্র তনুকে এলাইয়া দিয়া ফুঁপাইতে লাগিল।

এই সময় স্নেহ-বিগলিত অতি করুণকণ্ঠের আহ্বান আসিল, মা, জুনী!

অসহ্য শোকাহতা স্নেহ-বুভুক্ষু বালিকা ক্ষুধিতা ব্যাঘ্রীর মত মাতুলানীর বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

জ্যোৎস্নার মাতুলকে কার্য্যোপলক্ষে এত দিন বিদেশে থাকিতে হইয়াছিল। তাঁহার একমাত্র ভগিনীর আকস্মিক মৃত্যু-সংবাদ তিনি সেখানেই পাইয়াছিলেন। কায শেষ হইতেই ভগিনীপতিকে সান্ত্বনা ও সঙ্গদান করিবার নিমিত্ত তিনি সস্ত্রীক এইমাত্র আল্তাপাটীতে আসিয়াছেন।

বিশ্রামান্তে প্রোফেসর উপেন্দ্রমোহন ভগিনীপতির শোকাবস্থা দেখিয়া অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, দিনরাত এ চিতা জ্বালিয়ে রাখলে যে তুমিও পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। এক কায কর, কিছু দিনের জন্য জুনীকে নিয়ে কলকাতায় চল। এটা-সেটা পাঁচটা দেখে-শুনে মেয়েটা একটু ভুলে থাকবে, নইলে হেদিয়ে মারা যাবে, তুমি ত ওকে তেমন ক'রে দেখতে পারছ না; তার চেয়ে সেখানে চল। এখানে তার স্মৃতি ছড়ানো রয়েছে, এখানে কি ভুলতে পারবে?

ভুলতে ত চাইনি, ভাই! তুমি চিতা নিববার কথা বলছ, আমার ভয়, পাছে নিবে যায়! সে যদি দেখে, তাকে আমি ভুলে রয়েছি! ছি ছি! আর কি তাকে মুখ দেখাতে পার্‌ব?

প্রোফেসর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে শোকার্ত্তকে দেখিতে লাগিলেন। দক্ষিণারঞ্জন ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, কি ভাবছ, পাগল হয়েছি কি না? তুমি বুঝি ও-সব মানো না? মেনো হে, ও-সব সত্য। এইখানেই সব শেষ নয়; আবার দেখা হয়! তুমি সায়েন্স জান, শক্তি অবিনাশী মানো, আর বিশ্বাস কর যে, এত বড় প্রচণ্ড শক্তি যার, সে ভালবাসা ব্যর্থ? ফুলের মত ফুটবে, আর ঝ'রে যাবে? তা কখন নয়। এ স্বর্গের জিনিষ, স্বর্গে না হ'লে সার্থক হয় না। আমার জন্য ভেব না। যদি মরতুম, তার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম আঘাতেই শেষ হ'ত। আমার জন্য কোন চিন্তা নাই। আমার এখনও কায বাকি আছে। তুমি বরং জুনীকে নিয়ে যাও। আমি তার অবস্থা বুঝতে পার্‌ছি, কিন্তু কিছু কর্‌তে পার্‌ছি না। এক দিনে আমার একশ' বছর বয়স বেড়ে গেছে। ছেলের সঙ্গে ছেলে হয়ে আর পুতুল খেল্‌তে পার্‌ছি না। এখানে থাক্‌লে বাঁচবে না। আর যদি বাঁচে ত ঝি-চাকরের হাতে মানুষ হ'তে হবে।

অপ্রত্যাশিতভাবে ঈপ্সিত বস্তু হাতে পাইয়া মানুষ যেমন সংশয়-পুলকে চঞ্চল হয়, নিঃসন্তান প্রোফেসর তেমনই দোলায়মান চিত্তে প্রশ্ন করিলেন, তুমি কি জুনীকে আমাকে দিলে?

না না, তা কি পারি! যাবার আগে সে কি বলেছিল জানো হে উপীন! বলেছিল, স্ত্রীধন; তার জিনিষ আমার কাছে গচ্ছিত রেখে গেছে। তবে জানো, জুনীর ভালর জন্যই ওকে তোমাদের কাছে দিচ্ছি। এখন ওর মামীর কাছে মানুষ হ'ক্। মেয়েকে মানুষ কর্‌তে মেয়েরাই পারে। পুরুষ-মানুষকে দিয়ে হয় না। মাঝে মাঝে আমিও ওকে দেখতে যাব, ও-ও এখানে আস্‌বে। কি বল? আপাততঃ এই

ভাল নয়? তার পর আমাকে যখন সে ডেকে নেবে, তোমরা বৈ আর ত ওর কেউ থাক্‌বে না। তথন ও তোমাদেরই হবে।

উপেন্দ্রমোহন বলিলেন, বেশ, আপাততঃ তাই হ'ক্। জুনীকে আমরা সর্ব্বকর্ম্ম ফেলে মানুষ করব। আমি কোন স্কুলে দেব না; নিজে লেথাপড়া শেথাব। মনের মতন ক'রে গড়ব। কেমন? এথন এই কথাই রইল। কিন্তু ভাই! আমার আর একটা কথা আছে। কন্যাকাল অতীত হয়ে যাচ্ছে ব'লে তুমি যে মেয়েকে একটা যার-তার গলায় গেঁথে দেবে, সেটি হ'তে দেব না। তুমি কি বল, সে কি ভাল?

দক্ষিণা একটা সুগভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, ভাল যে ভেবেছিল, সে তার সব সাধ-আহ্লাদ বিসর্জ্জন দিয়ে চ'লে গেছে। এথন আর সে কথা কেন, ভাই? যে গড়ত, সে আর নাই। এথন তুমি আমি যেমন ক'রে গ'ড়ে তুল্‌ব, তাই হবে। তার পর ও বাঁচে কি মরে, মা-হারা মেয়ে, ও কথা ভাববার ঢের সময় আছে। এথন আমিও ওকে তোমাদের কাছে গচ্ছিত রাথলুম।

বন্ধ্যা মামী গচ্ছিত ধনকে স্নেহের অজস্র ধারায় অভিষিক্ত করিয়া বুকে তুলিয়া লইলেন। দক্ষিণারঞ্জনের মানসে ও আবাসে অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া উঠিল।

ইহার কয়েক দিন পরেই উপেন্দ্রের নিকট জরুরী তার আসিল—জুনীকে নিয়ে শীঘ্র এস।

উপেন্দ্র এবং তাঁহার পত্নী উপস্থিত হইতেই দক্ষিণা বলিলেন, আজ জুনীর বিবাহ। না, কথা শোন! তর্ক করবার সময় নেই। সে অস্থির হয়েছে। আর একলা থাক্‌তে পার্‌ছে না। কাল এসেছিল।

উপেন্দ্র বলিলেন, ও তোমার কল্পনা।

দক্ষিণা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, থামো! ও সব কথা অনেক জানি। সমস্ত জোগাড় হয়েছে। আজই রাত্রে আমাদের কুল-পুরোহিত এসে বিবাহ দেবেন।

উপেন্দ্র দক্ষিণাকে জানিতেন, আর আপত্তি তুলিলেন না। সেই রাত্রেই দ্বাদশবর্ষীয় সোমনাথ ও সপ্তমবর্ষীয়া জ্যোৎস্নাবালার বিবাহ হইয়া গেল। কোন উৎসব নাই, কেবল শাস্ত্রীয় বিধি পালিত হইল মাত্র। দক্ষিণা একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া কোন অদৃশ্য শরীরীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, বুল্‌বুল্, তোমার মেয়ে-জামাইকে আশীর্ব্বাদ কর।

উপেন্দ্র ভাবিলেন, এ যে ঘোর মস্তিষ্ক-বিকার! হ'তেই পারে, দারুণ শোক! তাই ত, এঁকে আর এথানে একলা রাথা নয়। এবার সঙ্গে নিয়ে যাব।

সেই সময় দক্ষিণা যেন কাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, যাব, যাব, ব্যস্ত হয়ো না। আগে ফটোটা তোলা হ'ক্।

উপেন্দ্র ভাবিলেন, যাক্, হ'ল ভাল! আপনা হ'তেই যেতে রাজী হচ্ছে!

পরদিন সস্ত্রীক উপেন্দ্র, দক্ষিণা ও বর-কন্যাকে বসাইয়া ফটো তোলা হইল। শেষ হইবামাত্র দক্ষিণা বলিলেন, বস্! এইবার ছুটী! বুল্‌বুল্, চল!

উপেন্দ্র দেখিলেন, দক্ষিণা সত্যই চলিয়া গিয়াছেন। ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, এও দেথ্‌ছি হার্টফেল!

গল্প শুনিয়া বিজ্ঞ বলিলেন, আজগুবি। স্বামী বলিলেন, মর্—মর্—মর্; স্ত্রী অমনই হার্টফেল ক'রে মলেন। স্ত্রী ডাক্‌লেন, এস; স্বামী বল্‌লেন, চল—অমনই হার্টফেল!

এক সভ্য বলিলেন, আশ্চর্য্য কি! অনেক দিন থেকেই এমনি একটা কথা শোনা যায় না, সত্য ঘটনা কাল্পনিক ঘটনার চেয়েও বিস্ময়কর!

আরতি বলিল, তা যাই হ'ক্, আমার গল্প কিন্তু এথনও শেষ হয় নি।

বিজ্ঞ বলিলেন, দু'-দুটো হার্টফেল! তবু শেষ হয় নি? তোমার মতলবটা কি?

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

দেশে বাঙ্গালার মাসিকগুলোর জ্বালায় ও কথাটা শুন্‌লে গায় জ্বর আসে। বাকিটুকু এথনই শেষ ক'রে ফেল।

আরতি হাসিয়া বলিল, বেশ! ঘটনাটা আমার কোন আত্মীয়ের। সে ফটো আমার কাছে আছে।

কৈ দেথি!

ফটো দেথিয়া বিজ্ঞ বলিলেন, ইনি বুঝি দক্ষিণা?

আরতি ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ। আর ইনি উপেন্দ্র, উনি তার স্ত্রী।

বিজ্ঞ বলিলেন, রোস—রোস! বর-ক'নের চেয়ারের পিছনে ছায়ার মত এ কা'র চেহারা? ইনি কে আরতি?

বুল্‌বুল্!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

কুন্দলতার পত্র

(গল্প নহে)

কলিকাতা
৭ই ভাদ্র।

প্রাণের সই সুষমা !

ভাই, আজ সাত দিন তুমি চলিয়া গিয়াছ, ইহার মধ্যে কি একখানা চিঠিও দিতে পারিলে না ? আমি যে প্রত্যেক দিন ডাক আসার সময়ে তোমার চিঠির অপেক্ষায় বসিয়া থাকি। তোমার প্রিয়তমের সঙ্গ পাইয়া আমাকে ভুলিবেই ত ! কিন্তু আমি যে তোমাকে দিনের মধ্যে অন্ততঃ এক-বার না দেখিলে থাকিতে পারি না। আমার কথা কি একটুও ভাবিবে না ? আমি তোমা ছাড়া হইয়া কি লইয়া থাকিব ? বোন্, তোর পায়ে পড়ি, ফেরত ডাকে চিঠি লিখিস্। ইতি—

তোমার স্নেহের "কুঁদি।"

২

কলিকাতা
১৪ই ভাদ্র।

প্রাণের সই "সু"—

আজ আমি সকালে কার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিলাম, জানি না। তোমার মধুমাখা চিঠি পাইয়া মনটা ভারী খুসী হইল। তুই ভারী দুষ্টু ! আমার আবার প্রিয়তম কে ? তুই ত জানিস্, আমার ধনুর্ভঙ্গ পণ—আমি মা-বাবাকে বিপন্ন করিয়া কখনই বিবাহে রাজি হইব না। তাঁহারা জোর করিলে, আমি স্নেহলতার পথ ধরিব।

ভাই, দাদার কি আক্কেল ! আমি আজ বৈকালে চিঠি লিখিতে বসিয়াছি, তিনি একপাল বন্ধু বাড়ীতে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন, "কুঁদি, এদের চা দিতে হবে।" মা তখন লতীদের বাড়ী বেড়াইতে গিয়াছিলেন, আমি ঘরে একলা, কি করি, চা ও জলখাবার লইয়া আমাকে তাহাদের সম্মুখে আসিতে হইল। দাদা আমার পরিচয় দিয়া বলি-লেন, "এটি আমার বোন্ কুন্দলতা, এবার ম্যাট্রিক পাশ করেছে।" এই কথা বলিতেই সেই পাঁচ জোড়া চোখ আমার পানে কটমট করিয়া চাহিয়া রহিল—যেন আমাকে গিলিতে চায়। আমি ত লজ্জায় মরিয়া গেলাম। এই কি এদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ? ছি ! আজ আর সময় নেই, এখানে ইতি—

তোমার স্নেহের "কু।"

৩

কলিকাতা
২৫শে ভাদ্র।

প্রাণের সই "সু"—

এবার চিঠি লিখিতে এত দেরী করিলি কেন ? ভাই, সে দিন আমি কি কুক্ষণে দাদার বন্ধুদের চা' দিতে গিয়া-ছিলাম। তাহাদের মধ্যে এক জন ফস্ করিয়া তাহার মনের ক্যামেরাতে আমার একটা ফটো তুলিয়া লইয়াছে দেখিতে পাইতেছি। দাদার সঙ্গে তাহার এমন ভীষণ ভাব হই-য়াছে,প্রায় রোজই আমাদের বাড়ীতে তাঁহার সঙ্গে বেড়াইতে আসে, আর হাঁ করিয়া দরজার পানে তাকাইয়া থাকে। আমি কিন্তু তাহার ত্রিসীমায়ও যাই না। আমি তফাতে তফাতে থাকিয়া তাহার কাণ্ড দেখি আর হাসি। দাদা কাল মাকে বলিতেছিলেন, সে না কি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি উজ্জ্বল রত্ন, এম-এ-তে ফাষ্ট হইয়াছে, তাহার বাপ এক জন বড় উকীল। আমাদের গরীবের ঘরে এ সব রত্নের আগমন কেন হয়, বুঝি না। কালিদাস শকুন্তলা নাটকে লিখিয়াছেন,

যে রত্ন, লোক তাকে খুঁজিয়া বাহির করিবে (মৃগ্যতে)। যাক্ এ সব বাজে কথা। তোমার হৃদয়-রত্নটির কথা তুমি কিছুই লেখ না কেন? তোমার খোকাকে আমার স্নেহের চুমো দিবে। ইতি—

তোমার স্নেহের "কু।"

৪

কলিকাতা
২৯শে ভাদ্র।

প্রাণের সই "সু"—

এবার খুব শীঘ্র চিঠির জবাব দিয়াছ, সে জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু তোমার লজিক্ (Logic) ত খুব আশ্চর্য্য! এবার তোমাকে একটা "ন্যায়রত্ন", "ন্যায়বাগীশ" গোছের উপাধি দিতে হইবে। যেহেতু, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের "রত্নটি" আমাকে খুঁজিতেছেন, সুতরাং আমিও একটি "রত্ন" হইলাম, কারণ, কালিদাস বলিয়াছেন,—রত্নকেই লোক খোঁজে। আমি রত্ন নই, কোন রত্ন-ফত্নরও ধার ধারি না। কাল রাত্রিতে দাদা মাকে বলিতেছিলেন, "কমলের বাপ (সেই রত্নটির নাম কমল) তার বিয়ের জন্য মেয়ে খুঁজিতেছেন, কমল না কি মাকে বলিয়াছে, আমি এখন বিয়ে করিব না। তার মানে, সে সব মেয়ে তাহার অপছন্দ। তাহার বাপ উকীল মানুষ, তাঁহার টাকার খাঁই মস্ত।" মা দাদাকে বলিলেন,—"তবে তিনি বোধ হয় টাকার লোভে খুঁজে খুঁজে ভালো মেয়ে দেখিতেছেন। এমন সোনার কার্ত্তিক ছেলে, সে ত কালো মেয়ে অপছন্দ করবেই।" সোনার কার্ত্তিক হউক, আর লোহার কার্ত্তিক হউক, আমাকে এ সব কথা শুনিতে হয় কেন? আর সেই কার্ত্তিকই বা ঘন ঘন এ বাড়ীতে আসেন কেন? আমি সে কার্ত্তিককে দেখিতে চাই না। তুই ভাই, দাদাকে একটু লিখিতে পারিস্? আজ তবে আসি ইতি—

তোর "কু।"

৫

কলিকাতা
৫ই আশ্বিন।

প্রাণের সই "সু"—

এ তোমার ঘোর অবিচার। তুমি দু'শ মাইল্ দুর হইতে কি করিয়া আমার মনের কথা বুঝিতে পারিলে যে, আমিই সেই "লোহার কার্ত্তিক"কে না দেখিয়া থাকিতে পারি না? এ তোমার ভারী অন্যায়। আমি যাহা লিখিব, তুমি তাহার উল্টা অর্থ করিয়া আমাকে জব্দ করিতে চেষ্টা করিবে কেন? "উল্টো বুঝলি রাম।" যাহা হউক, দাদাকে তোমার কিছু লিখিতে হইবে না, আমার ঘাট হইয়াছে।

তোমাকে আজ একটা নূতন খবর দিতেছি। আমাদের স্কুলের টিচার (teacher) ইন্দিরা দিদির বিবাহ! তিনি এত কাল পুরুষজাতিকে ঘৃণা করিয়া আসিয়াছেন, এখন এই ত্রিশ বছর বয়সে প্রেমের ফাঁস গলায় পরিতেছেন, খুব মজা কিন্তু! শুক্রবার তাঁহাকে বিদায়-অভিনন্দন দেওয়ার জন্য স্কুলে একটা সভা হইবে, আমারও নিমন্ত্রণ হইয়াছে। আমি ত পাশ করিবার পর এই চার মাসের মধ্যে স্কুলঘরের চৌকাঠ মাড়াই নাই। আমাকে লইয়া টানাটানি কেন? তাহার কারণ আছে, আমাকে না কি গান গাহিতে হইবে। আজ এই পর্য্যন্ত।

তোমার স্নেহের "কু।"

৬

কলিকাতা
৯ই আশ্বিন।

প্রাণের সই "সু"—

কাল ইন্দিরাদির "রঘুনন্দন" সভায় গিয়াছিলাম। খুব Grand হইয়াছিল। স্কুলের হলঘর সুন্দর করিয়া সাজান হইয়াছিল। মেয়েরা সাজগোজ করিয়া আসিয়াছিল—যেন এক একটি প্রজাপতি। আমাদের গরীবের ঘরের সাজ কোথা হইতে ভাল হইবে? আমি আমার নীলাম্বরী ঢাকাইখানা পরিয়া গিয়াছিলাম। ইন্দিরা-দি বলিলেন,—'কুন্দ, তোরও দেখ্ছি বিয়ের ফুল ফুটেছে।' আমি লজ্জায় মুখ ঢাকিলাম। আমি, মিনতি, প্রীতি ও সুলেখা এই চারি জনে কোরাসে বিদায়-সঙ্গীত গাহিলাম। আমাকেই ইন্দিরা-দির গলায় "বিদায়-মালিকা" পরাইতে হইল, তখন খুব চটাপট হাততালি পড়িল। অবশেষে মিষ্ট মুখ করিয়া 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' হইল।

কিন্তু ভাই, সন্ধ্যা ৭টায় বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া দেখি, দাদার বড় জ্বর হইয়াছে, খুব ছটফট্ করিতেছেন। আমি অমনই কাপড় ছাড়িয়া পাখা হাতে করিয়া তাঁহার পাশে

বসিলাম। আজ সেই 'লোহার কার্ত্তিক' খুব জব্দ হইয়াছেন। তিনি না কি আসিয়া দাদার কাছে বসিয়াছিলেন এবং দুই একটা কথা বলিয়াই চলিয়া গিয়াছেন। তোরা কেমন আছিস্? ইতি।—

স্নেহের "কু।"

৭

কলিকাতা
১৫ই আশ্বিন।

প্রাণের সই "সু"—

আমার কথা পাল্টাইয়া আমাকে জবাব দেওয়াটা তোর একটা রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে দেখিতেছি। আমি লিখিলাম, "লোহার কার্ত্তিক জব্দ হইয়াছেন,"—তাহার উত্তরে তুই লিখিয়াছিস্—জব্দ আমিই হইয়াছি, কেন না, সেই কার্ত্তিকের সঙ্গে আমার সে দিন চারি চোখের মিলন হয় নাই। তুই যদি এ রকম বেয়াড়া রকমের ইঙ্গিত করিস্, তবে আর আমি তোকে তাহার কথা কিছু লিখিব না।

কিন্তু ভাই, কাল এক কাণ্ড হইয়াছে। দাদার জ্বরটা ছাড়িতেছে না, বুঝি বা রেমিটেণ্টে (remittent) দাঁড়ায়। কাল বৈকালে তাঁহার শরীরের উত্তাপটা কমিয়া আসিতেছিল, আমি পাশে বসিয়া বেদানা ছাড়াইয়া খাওয়াইতেছিলাম, এমনই সময়ে "সত্য বাবু কেমন আছেন?" বলিতে বলিতে সেই 'লোহার কার্ত্তিক' ঘরে ঢুকিলেন। কি রকম বেয়াড়া লোক দেখ ত ভাই, খবর নাই, বার্ত্তা নাই, অমনই ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। আমি পলাইবার পথ না পাইয়া জড়সড় হইয়া দাদার পাশে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিলাম। দাদা তাহাকে পাশের চেয়ারে বসিতে বলিয়া আমাকে বলিলেন,—"ও কি, কুঁদি, তুই লজ্জাবতী লতাটির মতন জড়সড় হয়ে পড়লি কেন? এই কি তোর ব্রাহ্ম-বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষা?" পরে সেই কার্ত্তিককে বলিলেন,—"কমল বাবু,এর পরিচয় ত আর এক দিনই দিয়াছি, আমার বোন্ কুন্দলতা,—ম্যাট্রিক পাশ ক'রে ঘরে ব'সে আই, এ, পড়ছে।" এই কথা শুনিয়া কার্ত্তিক কপালে দুই হাত ঠেকাইয়া আমাকে ক্ষুদ্র একটি নমস্কার করিলেন, আমিও একটু মাথা নাড়িলাম। পরে আমি কি কি বই পড়ি, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বইগুলির নাম করিয়া দাদাকে বলিলাম—"দাদা, এবার তোমার এক জন সাথী জুটেছেন, আমি আসি।" এই কথা বলিয়া ছুট দিলাম। যাক্—আমি এ সব বাজে কথা লিখিয়া তোমাকে ঠাট্টা করিবার সুযোগ দিতেছি। তুই এবার নিশ্চয়ই লিখবি—"এই ত চারি চোখের মিলন হয়েছে!"

দাদার জ্বরটার জন্য ভারী ভাবনা হইয়াছে, ভাই। তোদের কুশল লিখিস্ ইতি—

তোর স্নেহের "কু।"

৮

কলিকাতা, ৩০শে আশ্বিন।

প্রাণের সই "সু"—

আজ দশ দিন তোর চিঠি পাইয়াছি, সময়াভাবে জবাব দিতে পারি নাই। দাদার জ্বর টাইফয়েডে দাঁড়াইয়াছে। আমাকে সর্ব্বদা তাঁহার পাশে বসিয়া সেবা করিতে হয়। তাঁহার অবস্থা খুব-ই খারাপ হইয়াছিল, ঈশ্বরের কৃপায় আজ দুই দিন একটু ভালোর দিকে যাইতেছে। তোমাদের সেই "সোনার কার্ত্তিক" রোজই আসেন, আর ২।৩ ঘণ্টা দাদার কাছে বসিয়া থাকেন। তিনি দাদার সঙ্গে নানা গল্প জুড়িয়া দেন, আমাকেও মধ্যে মধ্যে দুই একটা কথা বলিতে হয়। লোকটি কিন্তু অনেক পড়াশুনা করিয়াছেন। দাদা আমাকে বলিলেন,—'কুঁদি, তোর ইংরাজী বইয়ের যখন যা' বোঝাবার দরকার, কমল বাবুকে জিজ্ঞেস করিস।' কার্ত্তিক বলিলেন—"আমি most gladly আপনাকে help করবো।" কাল আমি Enoch Arden এর কয়েকটা passage এর মানে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি বেশ বুঝাইয়া দিলেন। সংস্কৃতেও বেশ জ্ঞান আছে। আমি শকুন্তলার কথা পাড়িতেই মস্ত এক লেকচার দিলেন, জর্ম্মণীর মহাকবি গেটে না কি বলিয়াছেন, শকুন্তলা স্বর্গ মর্ত্ত্য এক সূত্রে গাঁথিয়াছে। ধন্য কবি কালিদাস! গেটের প্রশংসাবাক্য শুনিয়া আমার বুকটা দশ হাত ফুলিয়া উঠিল। দাদাকে এখন ঔষধ খাওয়াইতে হইবে, এখন তবে আসি।

তোর স্নেহের "কু।"

৯

কলিকাতা, ৫ই কার্ত্তিক

প্রাণের সই "সু"—

তুমি আমাকে সাবধান করিয়াছ, কেন না, সেই "লোহার কার্ত্তিক" আমার চোখে এখন "সোনার কার্ত্তিক" হইয়াছেন,

আর আমি তাঁহাকে মাষ্টার মহাশয়ের আসনে বসাইয়াছি। আমার জন্য তোমার কুছপরোয়া নেই। দাদার জরটা কাল একুশ দিনে ছাড়িয়াছিল, আজ আবার একটু হইয়াছে। ডাক্তার বলিলেন, আর কোন ভয় নেই, তবে সারিতে এখনও সময় লাগিবে। "কার্ত্তিক" পূর্ব্ববৎ আসিতেছেন। দাদা বলিলেন, তাঁহার বাপ নাকি তাঁহাকে দশ হাজার টাকায় বেচিতে চান, তিনি পশুর মত নগদ টাকায় বিক্রয় হইতে চান না। তোমরা কেমন আছ? ইতি—

তোমার "কু।"

১০

কলিকাতা, ১৪ই কার্ত্তিক।

প্রাণের সই "সু"—

দাদার সাত দিন জর হয় নাই, তিনি অন্ন পথ্য করিয়াছেন। ডাক্তার বলিয়াছেন, দাদাকে লইয়া কোন healthy stationএ (স্বাস্থ্যনিবাসে) changeএ (বায়ুপরিবর্ত্তনে) যাওয়া দরকার। বাবা দেওঘরে তাঁহার এক বন্ধুকে একটা বাড়ীর কথা লিখিয়াছেন, যদি বাড়ী পাওয়া যায়, তবে শীঘ্রই আমরা সেখানে যাইব। এবার সোনার কার্ত্তিক খুব জব্দ হইবেন। সত্য বলিতে কি ভাই, আমারও পড়াটা যে ভাবে চলিতেছিল, তাহার খুব ক্ষতি হইবে। আজ তবে আসি। ইতি—

তোর "কু।"

১১

দেওঘর, ৩রা অগ্রহায়ণ।

প্রাণের সই "সু"—

আজ আমরা দশ দিন দেওঘরে আসিয়াছি। যায়গাটা আমার ভাল লাগিতেছে। চারিদিকে খোলা মাঠ, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন, শুক্‌না খটখটে। দাদার এই কয় দিনেই শরীর বেশ সারিয়া উঠিয়াছে। তিনি এখন অল্প অল্প হাঁটিতে পারেন। আমি ত খুব বেড়াই। এখানে মেয়েদের পর্দ্দা নাই। ভাল কথা, তোমাদের সেই "সোনার কার্ত্তিক" কাল এখানে আসিয়াছেন। তাঁহাদের এখানে নিজের বাড়ী আছে। তাঁহার আবার এখন হাওয়া পরিবর্ত্তনের কি দরকার হইল? কাল দাদাকে বলিতেছিলেন, বাড়ীতে বিবাহ করিবার জন্ত বড় পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিয়াছে, সে জন্য পলাইয়া আসিয়াছেন। আমাকে বলিলেন, আপনার পড়া আবার চলুক, আমার এখানে খুব ফুরসুত আছে। কাল আমাদের সঙ্গে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। তোরা একবার এখানে আয় না, খুব মজা হইবে। ইতি—

তোর "কু।"

১২

দেওঘর, ১০ই অগ্রহায়ণ।

প্রাণের সই "সু"—

তুমি লিখিয়াছ, সোনার কার্ত্তিক আমার শনি গ্রহের মত আমার পশ্চাতে ধাওয়া করিয়াছে। তিনি শনি কি মঙ্গল, জানি না, তবে তিনি এখানে আসাতে আমার পড়াটা চলিতেছে ভাল। আর আমাদের তিন জনের সাহিত্যচর্চ্চাও খুব জমিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার বাঙ্গালা সাহিত্য ভাল রকম পড়া আছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা অনর্গল মুখস্থ বলিতে পারেন। কাল হেমচন্দ্রের "আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে" কবিতাটি চমৎকার আবৃত্তি করিলেন। তোমাদের এখানে আসা হইবে না জানিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। দাদা সবল হইলে আমরা এক দিন তপোবন দেখিতে যাইব। এখানে season (মরশুম) আরম্ভ হইয়াছে, বিস্তর বাঙ্গালী স্ত্রীপুরুষ দেখিতে পাই, এটা যেন বাঙ্গালা দেশের একটা colony (উপনিবেশ)। আজ এখানে ইতি—

তোমার "কু।"

১৩

দেওঘর, ১৮ই অগ্রহায়ণ।

প্রাণের সই "সু"—

তুমি ইঙ্গিত করিয়াছ, আমরা দুই জনে প্রেমে পড়িয়াছি। তুমি আমার প্রাণের বন্ধু, তোমাকে এবার আমি ভাঁড়াইব না। কাল আমরা তিন জন মিলিয়া তপোবন দেখিতে গিয়াছিলাম। ছোট একটি পাহাড়, গাছপালায় ঢাকা, বড় সুন্দর যায়গা। আমরা গাড়ী করিয়া পাহাড়ের তলদেশে নামিয়া উপরে উঠিতে লাগিলাম। দাদা বেশী দূরে যাইতে পারিলেন না; একখানা পাথরের উপর বসিয়া পড়িলেন। আমি উপরে উঠিতে লাগিলাম। দেখিলাম, তিনিও পশ্চাতে আসিতেছেন। একটু ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। একটা বন্য বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়াছি। তিনিও তথায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। বাতাসটা বড় মিঠা লাগিতেছিল। সহসা আমার মাষ্টার মহাশয় আমার পানে চাহিয়া

বলিলেন—"কুন্দ, তুমি আমার হবে?" আমি কি বলিব, ভাবিয়া না পাইয়া চুপ করিয়া রহিলাম। আমার বড় লজ্জা করিতে লাগিল। তিনি তখন আমার হাত ধরিয়া বলিলেন,—"তোমাকে প্রথম যে দিন দেখেছিলাম, সেই অবধি আমি মনে এক দিনও শান্তি পাই নাই। আমি তোমাকে না দেখিয়া থাকিতে পারি না, সেই জন্য আমি এই দেওঘরে ছুটিয়া আসিয়াছি। দোহাই তোমার, তুমি 'না' বলিও না, তা হ'লে আমি মারা যাব।" আমি এবার আত্মসংবরণ করিয়া বলিলাম, "আপনার বাবার কথা একবার স্মরণ করুন। আমরা নিতান্ত গরীব, আমরা টাকা কোথায় পাইব?" তিনি গদগদ কণ্ঠে বলিলেন—"দেখ কুন্দ, আমি এখন নাবালক নই, আমার বয়স হয়েছে, আমি লেখাপড়া শিখিয়াছি, আমি কি আর এখন বাপ-মায়ের আঁচল ধরিয়া চলিব? কখনও না। আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন। আমি বাবার কথামত যাকে তাকে বিয়ে করিতে পারিব না।" আমি বলিলাম,—"কিন্তু আপনি বাপ-মা ছাড়িয়া কি থাকিতে পারিবেন? তাঁরা যদি আমাকে গ্রহণ না করেন?" "তুমি সে ভাবনা ভাবিও না। তাঁরা গ্রহণ না করেন, আমি তোমাকে লইয়া স্বাধীনভাবে থাকিব।" "বিবাহ কখন্ হইবে?" তিনি হাসিয়া বলিলেন, "গন্ধর্ব্বমতে আজই, যেমন দুষ্মন্ত-শকুন্তলার হয়েছিল।" এই বলিয়া তিনি পকেট হইতে দুইটি ফুলের মালা বাহির করিয়া একটি আমার গলায় পরাইয়া দিলেন, আমিও তাঁহার পীড়াপীড়িতে কম্পিত হস্তে অপর মালাগাছটি তাঁহার গলায় পরাইয়া দিয়া আমরা দুই জনে বাবা বৈদ্যনাথের উদ্দেশে প্রণাম করিলাম। ভাল করিলাম কি না, বুঝিতে না পারিয়া স্পন্দিত হৃদয়ে নীচে নামিয়া আসিলাম। তিনি আমার হাত ধরিয়া তদবস্থায় দাদার কাছে গিয়া নমস্কার করিলেন। আমিও নত হইয়া দাদার পদধূলি লইলাম। দাদা আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—"কমল, এ কি করিলে, শেষ রক্ষা করিতে পারিবে ত?" তিনি হাসিয়া বলিলেন, "খুব পারিব। তুমি সে ভয় করিও না।" ইহার পরে আমরা বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। ভাই, বিধাতা আমাকে এত সুখ দিবেন, তাহা স্বপ্নের অগোচর। তাই সময় সময় বড় ভয় হয়—কপালে যেন কি আছে। আমার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিও। ইতি—

তোমার স্নেহের "কু।"

১৪

দেওঘর, ২৬শে অগ্রহায়ণ

প্রাণের সই "সু"—

ভাই, আমার সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সাত দিন আগে তোমায় চিঠি লিখিয়াছিলাম, এই সাত দিন তাঁহার সঙ্গ আমাকে কি আনন্দই দিয়াছে! কিন্তু আমার পোড়া কপালে এত সুখ সহিবে কেন? "তে হি নো দিবসা গতাঃ।" কাল প্রাতঃকালে ঘুম হইতে উঠিয়াই তিনি আমাদের বাড়ীতে আসিলেন, আসিয়া আমাদের সঙ্গে বসিয়া চা খাইতেছেন, এমন সময় বাহির হইতে কে এক জন ভীমগর্জ্জনে ডাকিল, "কমল! কমল! কমল এখানে?" তিনি শশব্যস্তে বাহির হইলেন এবং এক স্থূলাকার বৃদ্ধের সহিত ঘরে ঢুকিয়া দাদাকে বলিলেন, "সত্য, আমার বাবা এসেছেন।" দাদা দাঁড়াইয়া উঠিয়া বৃদ্ধকে নমস্কার করিয়া বসিতে দিলেন, আমি পলাইয়া অন্য ঘরে যাইলাম। বৃদ্ধ ক্রোধভরে বলিলেন—"কমল, আজ প্রায় এক মাস হইল, তুমি বাড়ী থেকে এসেছ, তা একখানা চিঠি লিখেও কি খবরটা দিতে নেই? তোমার খবর না পেয়ে তোমার মা আহার-নিদ্রা ত্যাগ করেছেন, আমিও কাযকর্ম্ম ফেলে তোমাকে খুঁজতে বেরিয়েছি। ব্যাপারখানা কি বল ত?" তিনি কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। বৃদ্ধ আবার বলিলেন,—"তোমাকে না লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করেছি, এই কি তোমার ধর্ম্ম?" পরে দাদার দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন,—"বাপু, তোমাদের সঙ্গে আমার কোন দিন পরিচয় নেই, কিন্তু তোমাদেরই বা এ কি ব্যবহার? এই আইবুড়ো সোমত্ত মেয়ে দিয়ে আমার ছেলেকে ভুলিয়ে এখানে এনে রেখেছ? তোমরা হিন্দু না খৃষ্টান?" দাদা কোন জবাব দিবার পূর্ব্বে বৃদ্ধের পুত্র বলিলেন,—"বাবা, যা বলবেন, আমাকে বলুন, ওঁদের কোন দোষ নেই। আমি এই সত্যবাবুর ভগিনীকে বিবাহ করব ব'লে এখানে এসেছিলাম, তিনি এখন আমার বাগ্‌দত্তা পত্নী।" এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধ ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—"কি বল্লি—বাগ্‌দত্তা? আমি না তোর বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক ক'রে রেখেছি, এই ত ৩০শে তারিখ বিয়ে? তুই নিতান্ত নেমকহারাম, পাজি! আমার সঙ্গে চালাকি? উঠে আয়! এখুনি আমার সঙ্গে যেতে হবে—ওঠ্।"

এই বলিয়া বৃদ্ধ রোষকষায়িতলোচনে পুত্রের দিকে তাকাইলেন, তাঁহার পুত্র নিতান্ত কাঁদো-কাঁদো ভাবে যন্ত্রচালিতের ন্যায় তাঁহার পশ্চাদ্‌গমন করিলেন। আমি পাশের ঘরে বসিয়া এই সব কাণ্ড দেখিয়া হতভম্ব হইয়া বসিয়া রহিলাম। দাদা আস্তে আস্তে আমার কাছে আসিয়া বসিলেন, কাহারও মুখে কোন কথা নাই। আমার মাথায় যেন বিনামেঘে বজ্রাঘাত হইল। এক ঘণ্টা পরে দাদা ঘুরিয়া আসিয়া জানাইলেন,—তিনি তাঁহার বাবার সঙ্গে চলিয়া গিয়াছেন। ভাই, এই ত অবস্থা। আমরাও এখান হইতে শীঘ্র কলিকাতায় যাইব। ইতি—

তোর হতভাগিনী বোন্ "কু।"

১৫

নবদ্বীপ, ৩রা চৈত্র।

প্রাণের সই "সু"—

আজ চারি মাস হইল, তোকে শেষ চিঠি লিখিয়াছিলাম। তুই এর মধ্যে কত চিঠি লিখিয়াছিস্, আমি মনের দুঃখে চুপ করিয়াছিলাম। আর এ কালামুখ লইয়া কাহারও কাছে দাঁড়াইতে ইচ্ছা হয় না। আমার দুঃখ এখন চরম সীমায় উঠিয়াছে। তুই আমার বাল্যসখী, প্রাণের সুহৃদ্, তোকে সকল কথা প্রাণ খুলিয়া লিখিলে মনে কতকটা শান্তি পাইব আশা করি। সেই যে "তিনি" দেওঘর হইতে সুশীল ও সুবোধ বালকটির মত বাপের সঙ্গে চলিয়া গেলেন, এ পর্য্যন্ত তাঁহার আর দেখা পাওয়া যায় নাই। তবে তিনখানা চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহাতে আশার কথা অনেক ছিল। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহার ত কিছুই দেখিতে পাইলাম না। আমার এই জীবনটাকে এরূপ ঘোর অন্ধতমসাচ্ছন্ন করিবার তাঁহার কি অধিকার ছিল? ভাই রে, আমি চন্দনতরু ভ্রমে বিষ-দ্রুমকে আশ্রয় করিয়াছিলাম! তিনি আমাকে বুঝাইয়াছিলেন, নরনারীর মধ্যে স্বভাবের আকর্ষণে যে প্রেমের মিলন হয়, তাহাই প্রকৃত বিবাহ, পূর্ব্বে এই হিন্দু সমাজেই তাহা গান্ধর্ব্ব-বিবাহ নামে প্রচলিত ছিল, পরে নাকি স্বার্থপর ব্রাহ্মণরা নগদ কিঞ্চিৎ লাভের জন্য "মন্ত্রপড়া বিবাহ" প্রচলিত করিয়াছে। আমরা পাশ্চাত্য আলোকপ্রাপ্ত নরনারী সেই সব কুসংস্কার মানিব কেন? এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে—স্বাধীনতা-মন্ত্রের উপাসিকা আমি, সংযমের বন্ধনকে ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছিলাম। কিন্তু হায়! তখন একবারও ভাবি নাই, এই উদ্ভট মত সমাজ মানিবে কেন, আমার পিতা-মাতাই বা মানিবেন কেন? তাই সেই গান্ধর্ব্ব "বিবাহের" ফলে আমাকে এই নবদ্বীপ "মাতৃভবনে" আশ্রয় লইতে হইয়াছে। এখানে আমার ন্যায় আরও কয়েক জন হতভাগিনীকে দেখিলাম। এখানকার বন্দোবস্ত খুব ভাল। কেহ কাহারও পরিচয় জিজ্ঞাসা করে না। এখানকার ম্যানেজার বাবু বড়ই দয়ালু, আমি তাঁহাকে বাবা বলিয়া ডাকি, তিনিও আমাকে কন্যার ন্যায় স্নেহ করেন।

কিন্তু আমার ভবিষ্যৎ জীবন বড়ই অন্ধকারময়। যখন সে কথা ভাবি, তখন আমি আর আমাতে থাকি না। তিনি কি এই হতভাগিনীকে গ্রহণ করিবেন? শুনিয়াছি, তিনি এখনও বিবাহ করেন নাই, নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহার বাপও প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, ছেলে তাঁহার অবাধ্য হইলে তাহাকে ত্যাজ্যপুত্র করিবেন। তাঁহার জন্য আমার মনে দুঃখ হয়। তিনি উভয়সঙ্কটে পড়িয়াছেন। ধনী পিতার একমাত্র বংশধর, তিনি কি এই হতভাগিনীর জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিবেন? আমি কিন্তু ভাই, প্রাণান্তেও দ্বিচারিণী হইব না। যদি তিনি আমাকে শাস্ত্রমত গ্রহণ না করেন, তবে আমার জীবন চিরদুঃখেই কাটিবে। বিবাহ কয়বার হয়? আমি ঘোর পাপী, অসংযমী। আমার এই পাপের—ঘোর অসংযমের ফল অবশ্যই ভুগিতে হইবে। তবে তিনি যদি ফিরিয়া আসিয়া আমার পিতামাতার নিকট হইতে আমাকে প্রচলিত বিবাহ-বিধি অনুসারে গ্রহণ করেন, তবেই আমার জীবনে শান্তি পাইব। আমি উদরান্নের জন্য ভাবি না, যেটুকু লেখাপড়া শিখিয়াছি, তাহা দ্বারা একটা চাকুরী জুটাইয়া লইতে পারিব। কিন্তু তাঁহাকে না পাইলে আমি কি প্রকারে বাঁচিব? তিনি কি আমার এই হৃদয়ের বেদনা বুঝিবেন না?

ভাই, আমার জন্য ভগবানের চরণে প্রার্থনা করিস। তোর হতভাগিনী বাল্যসখীকে ভুলিস না। আমি আজ সমাজের কাছে অধঃপতিত, স্বামী দ্বারা পরিত্যক্ত, তুইও কি আমাকে ঘৃণা করিবি?

ইতি—তোমার চিরদুঃখিনী "কু।"

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

অমরনাথ

১৬

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে নরু একতাড়া চিঠিসহ জননীকে হাজির করিল। জননী গেলেন তাঁর মায়ের কাছে, আর চিঠির তাড়া আসিল কৃষ্ণনাথের হাতে। কৃষ্ণ সেগুলি লইয়া অমরের কাছে আসিলেন। অমরের নামে দুইখানি পত্র আসিয়াছিল। একখানি তাঁহার বন্ধু বিপিন দিল্লী হইতে লিখিয়াছিলেন। তাহাতে লেখা ছিল,—"তুমি যে জমীটা নিতে চেয়েছ, সেটা বেচতে মালিক সম্মত আছেন; তবে হাজার একার হাজার টাকার কমে ছাড়বেন না। তোমার যদি এমনই দুর্ব্বুদ্ধি হয় যে,সুদূর পাহাড়ের তলায় এতগুলো টাকা ছড়িয়ে ফেলা আবশ্যক, তা হ'লে সর্ত্তাদি কি চাও, তা লিখে পাঠাবে; অথবা নিজে এসে কথাবার্ত্তা কইবে। তাড়াতাড়ি নেই, কেন না, আমি এখন সিমলা পাহাড়ে চলেছি। ফিরতে এক পক্ষ বিলম্ব হবে। তখন তুমি এসো।"

দ্বিতীয় পত্রখানি এসেছিল পশুপতি বাবুর নিকট হইতে। পত্রখানি এইরূপ—

"পরম-স্নেহাস্পদেষু

দিল্লী হ'তে ফেরবার পথে তুমি যে পত্র লিখেছ, তা আমি যথাকালে পেয়েছি। বিলেত যাবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেছ শুনে সুখী হয়েছি।

আমরা শীঘ্রই রাজমহলের বাসায় উঠে যাচ্ছি। আমাদের একান্ত অনুরোধ, তুমি একবার তোমার বন্ধু ও আমার মা লতিকে নিয়ে সেখানে আসবে। তোমার জ্যেঠা ও জ্যেঠাইয়ের কাছে কোন সঙ্কোচ করবে না, বাবা।

মা'র জন্যে কিছু আম ও লীচু পাঠাচ্ছি; সে সব আমার বাগানের। মাকে দেবে আর বলবে, তার এই বুড়ো ছেলে তার কথা ও গান শুনতে ব্যাকুল হয়ে রয়েছে।

কৃষ্ণনাথকে আমার আশীর্ব্বাদ দিবে।

নিত্য আশীর্ব্বাদক শ্রীপশুপতিনাথ রায়।

পুঃ শুনিলাম, কৃষ্ণনাথ হরনাথের জামাতা আমার স্ত্রী হরনাথের পিসতুতো ভগিনী।"

অমরনাথ পত্র পড়িয়া কৃষ্ণনাথকে পড়িতে দিলেন। পাঠান্তে কৃষ্ণনাথ কহিলেন, "তোমার কল্যাণে দেখছি নূতন নূতন শ্বশুরবাড়ী বেরিয়ে পড়ছে। মালদা জিলায় কেউ যে আছেন, এত দিন তা জানতাম না। কোন্নগরে দশ বছরের ভিতর নেমন্তন্ন খাই নি। এখন বুঝতে পারছি নে, ব্যাপার কত দূর দাঁড়াবে। হয় ত বা দেশ শুদ্ধই আমাকে জামাই ব'লে দাবী করবে।"

এমন সময় বাহির হইতে কে বলিল, "জামাই বাবাজী কোথা গেলেন?"

ঘরের ভিতর কৃষ্ণ চুপি চুপি কহিলেন, "অমর, তুই সাড়া দিস নে, পারিস ত দোর বন্ধ ক'রে দে।"

"কেন বল্ দেখি?"

"বুঝছিস না, এ নবীনকালী বাবুর গলা!"

"তা হলেই বা—"

"তুই ত বললি হলেই বা! আমি আর জামাই হ'তে পারব না, তোর সখ্ থাকে, হ গে যা।"

"তুই রাগছিস কেন?"

"রাগব না, কি! এ কি অত্যাচার! যে কখন দুটো কথা কয় নি, সে আজ জামাই ব'লে ধাওয়া করেছে!"

বাহির হইতে—"এই ঘরে আছে বলছ?"

ভিতরে—"ওরে অমর, শীগ্‌গির খিল বন্ধ কর, এসে পড়্‌ল রে!"

নবীনকালী বাবু কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "এই যে বাবা, তোমরা এইখানেই আছ।"

উভয়ে উঠিয়া নমস্কার করিলেন।

কৃষ্ণ। আজ্ঞে হাঁ, আমরা এইখানেই আছি—

নবী। বেশ করেছ ; মনে করেছিলুম, তোমরা বুঝি অন্দর-মহলে বিশ্রাম নিচ্ছ।

কৃষ্ণ। আজ্ঞে, বিশ্রাম কি আর কপালে আছে!

নবী। কাল রাতে একটুও কেউ শুতে পাও নি ?

কৃষ্ণ। একেবারেই না, আপনি ত দেখেছেন।

নবী। আজ বাবা—

কৃষ্ণ। আজ আবার কি ?

নবী। আজ রাতে আমার ওখানে তোমাদের দু' জনকে আহার করতে হবে।

কৃষ্ণ। আজ্ঞে, একেবারেই অসম্ভব। অমরের জ্বর হয়েছে—খুব জ্বর—আমি ওকে লেপ গায় দিতে বলছিলাম—তা এখানে লেপ নেই ; আর আমার—

নবী। তোমার আবার কি ?

কৃষ্ণ। কি যে হয়েছে—বোধ হয়, পেটের অসুখ।

নবী। আচ্ছা, আমি আমার সেজ ছেলে গোঁদলকে পাঠিয়ে দিচ্ছি ; সে তোমাদের ওষুধ খাইয়ে সারিয়ে নেবে, আর ধরেও নিয়ে যাবে।

কৃষ্ণ। আজ্ঞে, মাপ করবেন—

নবী। কি করব বাবা ! আমার মেয়েরা অমর বাবুর গান শোনবার জন্যে পাগল হয়েছে।

কৃষ্ণ। আমরা যাতে ম'রে না যাই, তা-ও ত দেখতে হবে।

নবী। সেটা গোঁদল এসে দেখবে। আমি হরনাথ দাদাকে বলেছি, তিনি অনুমতি দিয়েছেন।

বলিয়া নবীন বাবু প্রস্থান করিলেন। কৃষ্ণনাথ মহা ক্রুদ্ধ হইয়া অমরকে কহিলেন, "তোর জন্যে এই সব ফ্যাসাদ ! তোকে আজ মেরেই ফেলব।"

"আমি যে ভাই অমর—মাতৃহীন।"

"পরীক্ষা করব, জ্যোতিকে ডাকছি।"

"এখন কি করা যায়, তাই বল্। তুই যাবি ?"

"কিছুতেই না ; আজ সন্ধ্যের পর কিছুতেই আমি ঘর হ'তে বেরুব না।"

"বউদিদির আগমনে সেটা ত আগে হ'তেই স্থির হয়ে গেছে।"

"দেখ্ অমর—"

"কতকগুলো আর মিথ্যে বলিস নে ; তুই মিথ্যে কথায় মোক্তারকেও হার মানিয়েছিস।"

"গীতায় আছে—"

"কি আছে, শুনি ?"

"তুই বুঝ্‌বি কি ? আচ্ছা, শোন্। গীতায় আছে, আত্মরক্ষার্থে যা কিছু কর, তাতে পাপ হয় না।"

নবীন বাবু কি তোকে মারতে এসেছিলেন ?"

"নিশ্চয়ই। মারতে আসা কাকে বল ? ধনুর্ব্বাণ হ'ল স্থূল জিনিষ। চড় উঠালেই চড় মারা হ'ল। এ সব গূঢ়তত্ত্ব তুই বুঝবি নি।"

হরনাথ আসিয়া কহিলেন, "হ্যাঁ বাবা, নবীন বাবু যে তোমাদের নিমন্ত্রণ ক'রে গেলেন—"

অম। আজ আমার শরীরটা ভাল নয়।

হর। তাই ওঁকে ব'লে দিই গে ; কিন্তু আমার এখানে দু'একটা গান—

অম। তা হবে বই কি ?

হর। বেশ, বাবা, বেশ।

হরনাথ কক্ষত্যাগ করিতে না করিতে কৃষ্ণ দুই বাহু তুলিয়া কহিলেন,—

"যে সুখী করিলি মোরে কি আর কহিব তোরে,
(কি বলে—ওই যে—) আশীর্ব্বাদ করি ভাই,
(তার পর ব'লে দে না) (কবিতা-টবিতা আমার আসে না)
তুই বেঁচে থাক্ অক্ষয় অমর হয়ে—
(কি ক'রে যে লোকে কবিতা লেখে)
লয়ে বামে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীরে—

(রেবার প্রবেশ)

থুড়ি, "লয়ে বামে রেবা-সুন্দরীকে।"

রেবা থমকিয়া দাঁড়াইল। ক্ষণপরে কহিল, "আপনারা উপরে চলুন।"

কৃষ্ণ। কেন যেতে হবে কহ ত্বরা ক'রে।

রেবা। আপনার হয়েছে কি ? নেশা-টেশা—

কৃষ্ণ। কবিতা-মদিরা করেছি পান, গদ্যে না কহিব কথা-

রেবা। আপনার হ'ল কি ?

কৃষ্ণ। বড় আনন্দে আছি আমি, নবীন-কবল হ'তে মুক্ত হয়েছি এবে—

রেবা। এখন চলুন দ্রৌপদী, ধর্ম্মরাজ আপনাকে তলব দিয়েছেন।

কৃষ্ণ। ধর্ম্মরাজ, ধর্ম্মরাজ ডেকেছে মোরে! চল ত্বরা অমর।

অম। ধর্ম্মরাজটা কে শুনি?

কৃষ্ণ। আমার জীবনসঙ্গিনী প্যান-প্যানানী ভিজে বেড়ালনী—

১৭

দুই দিন পরে বৈকালবেলা একখানা গাড়ী আসিয়া হরনাথ বাবুর দ্বারে লাগিল। তাহাতে কয়েক ঝোড়া আম, লীচু ছিল। পশুপতি বাবুর সরকার চন্দননগরে আগে গিয়াছিল; সেখানে যখন শুনিল, অমর, লতা প্রভৃতি উত্তরপাড়ায় আছেন, তখন কৃষ্ণনাথের এক জন ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া সরকার মহাশয় আমসহ উত্তরপাড়ায় আসিলেন।

সরকার মহাশয় যখন ঝোড়াগুলি লইয়া হরনাথের সম্মুখে হাজির হইলেন, তখন উভয় পক্ষই একটু মুস্কিলে পড়িলেন। সরকার কহিলেন, "আমার বাবু তাঁর মা'র জন্যে এ সব পাঠিয়েছেন।"

হর। মা? আমার বড় ছেলের শ্বশুরবাড়ী হ'তে আপনি আসছেন?

সর। আজ্ঞে না।

হর। জনাই হ'তে?

সর। না।

হর। তবে আর কে পাঠাবে? ওঃ, বুঝেছি, রূপোর শ্বশুরবাড়ী পটলডাঙ্গা হ'তে আসছেন। তা বললেই ত পারতেন। ওরে কৈলেস, এগুলো নিয়ে যা।

সর। আজ্ঞে, আমি মীরপুর হ'তে আসছি।

হর। মীরপুরে আমার কোন ছেলে-মেয়ের বিয়ে হয় নি। বাড়ী ভুল হয়ে থাকবে। কৈলেস, নিস নে রে।

কৈলাস। আজ্ঞে, খুব ভাল আম—বেশ গন্ধ—

হর। তা হোক—

কৈলা। আবার লীচু আছে; এই দেখুন কর্ত্তা, এক একটা আমড়ার মত।

হর। তা হোক—

কৈলা। এ সব কি ফেরাতে আছে?

হর। থাম্ বুড়ো!

কৈলা। কর্ত্তার চেয়ে আমি দু বছরের ছোট।

হর (সরকারের প্রতি)। আপনি এগুলো নিয়ে যান—বাড়ী ভুল হয়েছে।

সর। আমি চন্দননগর হ'তে ফিরে আসছি; কেষ্ট বাবুর চাকর বাড়ী দেখিয়ে দিতে সঙ্গে এসেছে—বাড়ী ভুল হবার ত সম্ভাবনা নেই।

হর। কেষ্টর চাকর? কৈ সে? ওরে কৈলেস, কেষ্টকে ডাক ত।

কৃষ্ণনাথ আসিলেন। কর্ত্তা কহিলেন, "দেখ বাবা, এ এক ফ্যাঁসাদ। আমি বলছি, এ সব ভুলক্রমে এখানে এনেছ, তা বাবুটি কিছুতেই শুনবেন না।"

কৃষ্ণনাথ দুই চারি প্রশ্নে সরকারের নিকট হইতে আমূল বৃত্তান্ত জানিয়া লইলেন। তখন তিনি অমর ও লতাকে ডাকাইলেন। লতা আসিলে কহিলেন, "তোর ছেলে তোর জন্যে আম, লীচু পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

লতা। আমার আবার ছেলে! বড়দার যেমন কথা!

কৃষ্ণ। হাঁ রে, তোর ছেলে—সেই রাজমহলে—

লতা। ওঃ, বুঝেছি। জ্যেঠামশাই বল।

কৃষ্ণ। হাঁ, হাঁ, তিনিই তোমার ছেলে।

কর্ম্মচারী তখন লতাকে প্রণাম করিয়া কহিল, "আমার মুনিব আপনার জন্যে এই সব পাঠিয়ে দিয়েছেন; আর ব'লে দিয়েছেন, তাঁর মা যেন ছেলেকে চিঠি লেখেন।"

লতার আনন্দ হইল, লজ্জাও হইল। একটু হাসিয়া কহিল, "জ্যেঠামশাই ভাল আছেন? সুকু ভাল আছে?"

"তাঁরা বেশ আছেন, আপনাদের নাম প্রায়ই করেন। আপনারা তাঁদের জীবন দিয়েছেন।"

"দেখ না দাদা, তাঁরা কি সব মিছিমিছি বলেন।"

হরনাথ কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সব কি? কে কা'র জীবন দিয়েছে? আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি নে।"

কৃষ্ণনাথ তখন সমস্ত ঘটনাটি সংক্ষেপে বলিলেন; অবশেষে কহিলেন, "আপনি বোধ হয় জানেন না, লতার ছেলেটি কে?"

হর। আমি ত কিছুই জানি নে বাবা।

কৃষ্ণ। আপনার কোন ভগ্নীর মীরপুরে বিয়ে হয়েছিল ?

হর। মীরপুরে ? সে কোথা ? মালদা জিলায় ? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার এক পিস্‌তুতো বোনের সেখানে বিয়ে হয়েছিল।

কৃষ্ণ। যাঁর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল, সেই পশুপতি বাবু লতার ছেলে।

হর। বল কি ? তিনি যে এক জন বড় জমীদার। অমর তাঁর প্রাণ রক্ষে করেছে ? শুনে বড় আনন্দ হ'ল। অমর, তোমাকে যে বাবা, কি ব'লে আশীর্ব্বাদ করব—

সরকার লতার পানে ফিরিয়া কহিল, "আপনি যদি দয়া ক'রে ছু'ছত্র লিখে দেন—আমাকে এখনই যেতে হবে—"

লতা। লিখে দিচ্ছি, কিন্তু এখন যেতে দেব না; খেয়ে দেয়ে রাতের গাড়ীতে তার পর—না জ্যেঠামশাই ?

হর। মা আমার ঠিক ব্যবস্থা করেছেন। কৈলেস, এঁকে নিয়ে যা; বাবুটির কোন অসুবিধে না হয়।

লতা। এ সব নিয়ে কি করব জ্যেঠামশাই ?

হর। তোমার কি করতে ইচ্ছা হয় মা ?

লতা। যাঁরা কীর্ত্তন করতে আসেন, তাঁদের খাওয়াতে ইচ্ছে হয়।

হর। বেশ বলেছ মা, তাঁদের খাইও।

লতা। সব ত আর লাগবে না; বাকীগুলো নিয়ে জ্যেঠাইমার কাছে দিই গে, কেমন ?

হর। তোমার যা ইচ্ছে, তাই কর।

১৮

সন্ধ্যার পর হিরণ ও শোভা আহার করিতে বসিয়াছে। থালায় আম, লীচু, সন্দেশ, লুচি প্রভৃতি আহার্য্য। হিরণ আম, লীচু, সন্দেশ ঠেলিয়া রাখিল; তদ্দৃষ্টে শোভা জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি যে ওগুলো ঠেলে রাখ্‌লে দিদি ?"

হি। আমি ও সব খাব না।

শো। কেন ?

হি। খেতে ইচ্ছে নেই।

শো। আমার কাছে লুকোও কেন ? সত্যি বল।

হি। ঐ মেয়েটার জিনিষ আমার খেতে ইচ্ছে করছে না।

শো। কেন, ঐ মেয়েটা তোমার কি করেছে ?

হি। আমি ওটাকে দেখ্‌তে পারি নে।

শো। ও কথা ব'লো না দিদি; অমন ফুটফুটে মেয়ে ঘরবাড়ী আলো ক'রে বেড়াচ্ছে।

হি। আমি ত আর রূপ নিয়ে ধুয়ে খাব না।

শো। ওর দোষই বা তুমি এমন কি দেখ্‌লে ?

হি। যে ঘর করে, সেই বোঝে। দিনরাত্রি 'বড়দা' 'বড়দা' ক'রে আদরে গ'লে পড়ছেন। আর তিনিও এমনই হয়েছেন যে, লতা না খেলে উনি খাবেন না, লতা কাছে না শুলে ওঁর ঘুম হবে না; ছেলের পানে চেয়ে দেখেন না, আমার পানে ত নয়ই, দিনরাত্রি শুধু লতা লতা।

শো। আহা, ওর যে বাপ, মা কেউ নাই; তাই কেষ্ট দা ওকে অত যত্ন করেন। এতে ত রাগ করবার কিছু নেই দিদি।

হি। রাগ হয় কি না, তুই একবার গিয়ে দেখিস। ছেলেটাও এমনই হয়েছে যে, নিজে না খেয়ে লতাকে খাওয়াবে, স্কুল বন্ধ হওয়া অবধি দিনরাত্রি তাকে নিয়ে বেড়াবে, খেলবে—পড়াশোনা ত চুলোর দোরে গিয়েছে।

শো। দিদি, তোমার স্বামি-পুত্র লতাকে ভালবাসে, তুমি কেন বাস না ?

হি। আমি অমন রূপ দেখে ভুলে যাই নে।

শো। দিদি, ছোট বোনের একটা কথা শুন্‌বে ?

হি। কি, তুমিও আবার বক্তৃতা দেবে না কি ? বক্তৃতা শুনে শুনে আমার কান ঝালাপালা হয়ে গেছে।

শো। তা' জানি, উপদেশ মানুষের তেতো লাগে। আমারও লেগেছিল; আমি তাই শ্বশুরবাড়ীতে ঘর করতে পারলাম না।

হি। তুই যে দুর্ম্মুখ, তাই পারলি নে।

শো। না, তা নয় দিদি, আমি কারুর উপদেশ নিতাম না ব'লে—স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ী, যা ভালবাসতেন, তা করতুম না ব'লে—নিজের ইচ্ছা অভিলাষকে বড় মনে করতুম ব'লে—

হি। হরেনের চরিত্রও ত ভাল নয়।

শো। সে কথা ব'লো না দিদি। তাঁর চরিত্র ছিল নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক, মন্দ করেছি আমি। তিনি যে জিনিষটা ভালবাসতেন, আমি সে জিনিষটা সরিয়ে ফেলতুম; যে

কাষ আমি করলে তিনি খুসী হতেন, আমি সে কাষ করতুম না; আমার যে সাজগোছ তিনি পছন্দ করতেন, আমি সে বেশবিন্যাস পরিত্যাগ করেছিলাম। ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে, তা কখন মনে করি নি। দেখলুম, যখন তাঁর ধৈর্য্যের বাঁধন ছিঁড়েছে, তখন পালিয়ে এলাম।

হি। তুই যেমন বোকা—

শো। নিজেকে চালাক মনে ক'রো না দিদি—তা অহঙ্কার অভিমান সব নষ্ট করে। তোমার সুখের বাসা—

কৃষ্ণনাথ দ্বারের উপর আসিয়া দাঁড়াইলেন; কহিলেন, "এই যে শোভা; আমি তোকে ছিষ্টি খুঁজে বেড়াচ্ছি।"

"কেন বলুন দেখি ?"

"তোর অপকার করব ব'লে।"

বিদ্যুদ্বৎ শোভা উঠিয়া দাঁড়াইল এবং দ্বারের নিকট সরিয়া আসিয়া দেখিল, কৃষ্ণনাথের পিছনে এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। মুহূর্ত্তে শোভা তাঁহাকে চিনিল। বিপুল আনন্দে শোভার দেহ কাঁপিয়া উঠিল—মাথার কাপড় টানিয়া দিতে ভুলিয়া গেল। আনন্দের বেগ একটু কমিলে শোভা হাত ধুইয়া ফেলিল। তাহার মনের কোণে আশঙ্কাও একটু ছিল। হিরণ জিজ্ঞাসা করিল, "তুই অমন করছিস কেন শোভা ?"

শো। দেখছ মা, দাদা যে আমার অপকার করতে এসেছেন।

কৃষ্ণনাথ সেখানে আর দাঁড়াইলেন না; বলিয়া গেলেন, "তোরা খাওয়া শেষ ক'রে নে, আমি আসছি।"

অর্দ্ধদণ্ড পরে কৃষ্ণ আসিয়া কহিলেন, "যা, তোর ঘরে যা, শোভা।"

মুখরা শোভার মুখে আর কথা নাই; নীরবে কৃষ্ণনাথের পায়ের ধূলা লইল। কৃষ্ণনাথের চক্ষু সজল হইল, তিনি দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন। শোভা, দিদিকে কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে নিজের ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। একবার ইচ্ছা হইল, বেশ-ভূষা করিয়া লয়; পরক্ষণে সে বাসনা পরিত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইল। পথে রেবার সঙ্গে দেখা হইল। সে কহিল,"আমি আজ তোমার কাছে শোব মেজ-দি

"না।"

"কেন ?"

"তুই দিদির কাছে যা।"

"সেখানে কি আমার আর স্থান আছে ?"

"তবে রূপোর কাছে যা।"

"সেজ জামাই যে তাকে নিতে এসেছেন।"

"কখন্ এল ? একটু আগে ? বেশ! তুই তবে জ্যোতির কাছে যা।"

"তোমার কাছে কি ?"

"আমি আজ শোব না।"

বলিয়া শোভা অদৃশ্য হইল। [ক্রমশঃ।

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

শ্যাম সিন্ধু

(কবিগুরু গোবিন্দদাসের ভাবানুসরণে)

তনুটি ঘন রসময়,
গহন মনোদেশে
রমণী মনোমীনচয়
খেলিয়া ডুবে শেষে ॥
তার—মকরে শ্রুতিযুগ সাজে,
কিবা—কম্বু গ্রীবাতটে রাজে,
বিরাজে বুকে মণিমাঝে
কমলা বধূবেশে ॥

বদন-চাঁদে সুধা ঝরে
হসনে ফুটে জ্যোতি,
প্রবাল শোভে ও-অধরে
দশনে লুটে মোতি

কিবা—তিলক শোভে ঐ নাকে
আহা,—জিনেছে তাহা মৈনাকে।
গরল ঢালে সই, আঁখে
চাহিলে হেসে হেসে ॥
রাধে লো এ কি করেছ কি,
বুঝিতে নাহি পারি,
ঘটালে অঘটন সখি
বাহবা, গোপনারী।
শ্যাম—সিন্ধু হেন রাখ ধরি'
হেম—কটোরা যুগ ভরি' ভরি',—
যাহাতে তপজপতরী—
অকূলে যায় ভেসে ॥

শ্রীকালিদাস রায়।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

শক্তিপূজার সময় সমাগত। শক্তিপূজা হিন্দুর সাধনা-পদ্ধতির এক অপূর্ব্ব ব্যাপার। হিন্দুর দুর্গা মহাশক্তিস্বরূপিণী,—অনন্তবীর্য্যা। কেবল দুর্গা কেন, সমস্ত দেবীই শক্তিরই মূর্ত্তি, তাই দেবীপূজামাত্রই শক্তিপূজা। দুর্গাদেবী মহাশক্তি বা আদ্যাশক্তি। অর্থাৎ এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ডে যে মহাশক্তির লীলা প্রকট রহিয়াছে, সেই অনন্ত শক্তির মূর্ত্তিই দুর্গা। ইঁহার দশ হস্ত দশ দিকে প্রসৃত, প্রত্যেক হস্তে এক একটি আয়ুধ। ইহার অর্থ—দশ দিকেই এই মহাশক্তির প্রভাব প্রসৃত, প্রত্যেক দিকেই শক্তি কার্য্যকরী। আয়ুধ অপ্রতিহতপ্রভাবে কার্য্য করিবারই সামর্থ্যসূচক প্রতীক।

আমাদের প্রধান প্রশ্ন, শক্তি কি? শক্তি বলিতে আমরা কি বুঝি? আভিধানিক হিসাবে ইহার অর্থ কার্য্যসাধনের মূলে যে পারগতা নিহিত আছে, তাহাই শক্তি। কেহ হয় ত বলিবেন, উহা ক্ষমতা, বল, সামর্থ্য। কেহ বা বলিবেন, উহা force, energy, power, activity বা strength ইত্যাদি। কিন্তু প্রতিশব্দ দ্বারা বিষয়ের অর্থবোধ বা স্বরূপ উপলব্ধ হয় না। সুতরাং আভিধানিক ব্যুৎপত্তি দেখিয়া শক্তির স্বরূপ বুঝা সম্ভবে না। আসল কথা, এই বিশ্বচরাচরে এত ভিন্ন মূর্ত্তিতে মহাশক্তির খেলা চলিতেছে যে, তাহা মানুষের ধারণার মধ্যেই আসে না। "ততো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" মহাশক্তির* (বা ক্ষুদ্র শক্তির) স্বরূপ কি, তাহা বুঝিবার মত শক্তি তিনি আমাদিগকে দেন নাই। অথবা যদিও তিনি সে শক্তি আমাদিগকে দিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাদের সে শক্তি এখনও সুপ্ত, উহা জাগ্রত করিবার সাধনা আমরা করি নাই। ফলে শক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা অজ্ঞান। তবে আমরা ইচ্ছা করিলে শক্তি সম্বন্ধে দুইটি ব্যাপার জানিতে পারি। কিরূপ অবস্থায় আভ্যন্তরীণ শক্তি বাহিরে ব্যক্ত হয়, তাহা আমরা জানিতে পারিয়াছি এবং আশা করা যায় যে, উত্তরকালে আমাদের বংশধরগণ এই সম্বন্ধে আরও অনেক তথ্য জানিতে পারিবেন। দ্বিতীয়তঃ, শক্তি কিরূপ অবস্থায় অভিব্যক্ত হইলে তাহার ফল কিরূপ হইবে, তাহারও অতি সামান্য অংশ আমরা জানি। জড় বিজ্ঞান এই শক্তিসম্পর্কিত এই দুইটি ব্যাপার অনুসন্ধান করিয়া মনুষ্যসমাজকে চমকিত করিয়াছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত বিবিধ বিষয়সম্পর্কিত বিজ্ঞান যে শক্তির সন্ধান ও আলোচনা করিতেছে বা করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা মহাশক্তির অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশমাত্র। প্রকৃত শক্তির খেলা ও স্বরূপ মানুষের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। শক্তি মানুষের বুদ্ধির নিকট ধরা না দিলে মানুষের বুদ্ধি তাহাকে ধরিতে এবং চিনিতে পারে না। কারণ, আমরা ফল দেখিয়াই সেই ফলপ্রসবিনী শক্তির অনুমান করি। যে জড়জগতে ক্রিয়া করিতেছে, সেই শক্তি জীবে প্রাণশক্তি বা জীবনীশক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। * এই শক্তির ফলেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল কার্য্যই সম্পাদিত হইতেছে। শক্তিই চরাচর

*The great energies of nature are known to us only by their effects; the substances which produce them are as much concealed from our senses, as the Divine essence itself.—Paley.

The actual nature of force—the thing itself—is unknown to us. Our knowledge of force is confined to the conditions under which it is manifested and effects which flow from it. We observe the changes brought about in the condition of matter under the influence of heat, of electricity etc. It is seen that given like conditions similar changes are invariably produced under such influences. Of the intrinsic nature of the agent that brings about the change we are ignorant,—Alfred Hook.

বিশ্বের জননী, ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের নিয়ন্ত্রী। শক্তির শাসনেই সূর্য্য উদিত ও অস্তমিত হইতেছে,—বায়ু বহিয়া যাইতেছে, বিদ্যুৎ চমকিতেছে,—অগ্নি তাপ দিতেছে, সলিল সংসারে রসের সঞ্চার করিতেছে। শক্তির কার্য্যফলেই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবের ও উদ্ভিদের আবির্ভাব, স্থিতি ও তিরোভাব ঘটিতেছে। শক্তির শাসনেই নক্ষত্রনীহারিকা-সমন্বিত কোটি কোটি সৌরমণ্ডল-সংবলিত ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রহগণ নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করিতেছে,—উহা হইতে রেখামাত্রও বিচ্যুত হইতে পারিতেছে না। এক কথায় শক্তিতেই বিশ্বের প্রতিষ্ঠা। শক্তিই সৃষ্ট জগতের সর্ব্বস্ব। তাই শাস্ত্রকার বলিয়াছেন :—

"সর্ব্বং শক্তিময়ং জগৎ"

এই সমস্ত জগৎ শক্তিময়।

তাই মার্কণ্ডেয়পুরাণে দেবীমাহাত্ম্যে কথিত হইয়াছে :—

"নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্।"

তিনি নিত্যা ও জগতের মূর্ত্তিস্বরূপিণী,—এই চরাচর বিশ্বের সর্ব্বত্রই তিনি ব্যাপ্তা হইয়া আছেন।

এমন কি, অণুপরমাণু সমস্তই শক্তিরই মূর্ত্তি। এখন জিজ্ঞাস্য, এই শক্তি চেতন না জড়? পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা এ পর্য্যন্ত বলিয়া আসিতেছেন—শক্তি জড়। উহার আত্মবোধ নাই। কিন্তু জড়বাদীরা সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করিয়া থাকেন, সজীব পদার্থের চৈতন্য শক্তি হইতেই লব্ধ। উহাও শক্তির বিকাশ। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে শক্তিকে আমরা অচেতন বলি কি প্রকারে? "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে" যে দেবী সর্ব্বভূতে চেতনা বলিয়া অভিহিতা, যিনি সকল জীবকে চৈতন্যদান করিতেছেন, তিনি চেতনাহীন, এ কথা বলা কি বাতুলতা নহে? যাহার যাহা নাই, সে কি তাহা অকাতরে সর্ব্বভূতে দান করিতে পারে? য়ুরোপীয় বুধগণ ঐ অসম্ভব কথা বলিতেছেন বলিয়া আমরা উহা বিশ্বাস করি। উহা আমাদের দাসোচিত মনোবৃত্তিরই পরিচায়ক।

আর যদি একান্তই শক্তিকে জড় বলিয়াই কল্পনা করিতে হয়, তাহা হইলে শক্তির অন্তরালে কোন শক্তিমানের কল্পনা অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। যে শক্তি এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকে নিয়মপূর্ব্বক পরিচালিত করিতেছেন, তিনি যদি জড় হয়েন,—তাহা হইলে এত বড় বিশাল ব্রহ্মাণ্ডকে বিধানপূর্ব্বক পরিচালিত করিতেছেন কে? শ্রুতি বলিতেছেন :—

"মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্।"

"ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥"

যিনি এই অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শাস্তা, তিনি অতি ভয়ানক। তিনি বজ্রের ন্যায় দৃঢ় থাকিয়া এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে শাসন (নিয়মিত) করিতেছেন। তাঁহার ভয়ে (শাসনে) ভীত (নিয়ন্ত্রিত) হইয়া অগ্নি তাপ দিতেছে, সূর্য্য জগৎকে উত্তপ্ত করিতেছেন, ইন্দ্র (জলাদিদানে লোক-পালন করিতেছেন, বায়ু সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করিতেছে, এমন কি, মৃত্যুও (যমও) শশব্যস্ত হইয়া প্রাণিগণের প্রাণ হনন করিতেছেন। সেই জন্য মহানির্ব্বাণতন্ত্র তারস্বরে শ্রুতিবাক্য প্রতিধ্বনিত করিয়া বলিতেছেন :—

"যদ্ভয়াদ্বাতি বাতোঽপি সূর্য্যস্তপতি যদ্ভয়াৎ।
বর্ষন্তি তোয়দাঃ কালে পুষ্পন্তি তরবো বনে।
কালং কলয়তে কালে মৃত্যো মৃত্যুর্ভিয়ো ভয়ম্॥"

যাঁহার শাসনে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, সূর্য্য তাপ দান করিতেছে, মেঘ সকল যথাকালে বারিবর্ষণ করিতেছে, অরণ্যমধ্যে বৃক্ষ সকল কুসুমিত হইতেছে, যিনি কাল (প্রলয়-সময়) উপস্থিত হইলে কালকেও (দণ্ডমুহূর্ত্তাদি সময়কে) কবলিত করেন, যিনি মৃত্যুর (সংহারকর্ত্তার) মৃত্যু-স্বরূপ, অর্থাৎ যিনি যমেরও যম এবং ভয়েরও ভয় ইত্যাদি"—

তিনি কে? জড়বাদী বলিবেন, ইহা সমস্তই শক্তির খেলা। শক্তির প্রভাবেই এই অনন্ত মহাশূন্যে কোটি কোটি গ্রহ উপগ্রহ প্রচণ্ডবেগে নিজ নিজ কক্ষপথে ঘুরিতেছে এবং ফিরিতেছে। কোটি কোটি নূতন গ্রহ সৃষ্টি হইতেছে, পুরাতন গ্রহ ক্ষয় পাইতেছে। অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণুবীক্ষণেরও অগোচর জীব ও বস্তু হইতে মহতো মহত্তর মহাগ্রহ পর্য্যন্ত সমস্তই মহাশক্তি,—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী শক্তি কর্তৃক শাসিত। এই শক্তির অন্তরালে কোন অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা বা চেতনা বিরাজ করিতেছে কি না, তাহা মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য। সুতরাং আমাদের উহা জানিবার এবং বুঝিবার চেষ্টা করা বৃথা। উহাতে নিশ্চিত কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার

সম্ভাবনা নাই। এই মতাবলম্বী বৈজ্ঞানিকরা অজ্ঞেয়বাদী (agnostic) নামে অভিহিত।

আমাদের ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরা কিন্তু ভিন্ন কথা বলেন। তাঁহারা বলেন,—শক্তির সহিত শক্তিমানের ভিন্নতা নাই। শক্তি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। মহানির্ব্বাণতন্ত্র বলিতেছেন :—

"কারণং সর্ব্বভূতানাং স একঃ পরমেশ্বরঃ।
লোকেষু সৃষ্টিকরণাৎ স্রষ্টা ব্রহ্মেতি গীয়তে।
বিষ্ণুঃ পালয়িতা দেবি! সংহর্ত্তাহং তদিচ্ছয়া।
ইন্দ্রাদয়ো লোকপালাঃ সর্ব্বে তদ্বশবর্ত্তিনঃ।
স্বে স্বেঽধিকারে নিরতাস্তে শাসতি তদাজ্ঞয়া।
ত্বং পরা প্রকৃতিস্তস্য পূজ্যাসি ভুবনত্রয়ে।"

হে দেবি! একমাত্র পরমেশ্বরই সর্ব্বভূতের কারণ। ব্রহ্মা তাঁহারই ইচ্ছানুসারে সৃষ্টি করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তা, বিষ্ণু পালনকর্ত্তা এবং আমি (শিব) সংহারকর্ত্তা বলিয়া ত্রিলোকে কথিত হইয়াছি। ইন্দ্রাদি লোকপালগণ তাঁহারই বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারই আজ্ঞানুসারে নিজ নিজ অধিকারমধ্যে থাকিয়া জগৎ শাসন করিতেছেন। তুমি (অর্থাৎ আদ্যা-শক্তি) তাঁহারই পরমা প্রকৃতি, সেই জন্য তুমি ত্রিভুবনে পূজ্যা হইয়াছ। অর্থাৎ শক্তিই ব্রহ্মের মূল প্রকৃতি।

তন্ত্রে অন্যত্র আদ্যাশক্তি মহাকালীকে পরব্রহ্ম বলা হইয়াছে, যথা মহাকালসংহিতায়—

"যথা বিম্বমেকং রবেরম্বরস্থং
প্রতিচ্ছায়য়া যাবদেকোদকেষু।
সমুদ্ভাসতে নৈবং রূপং যথাবৎ
ত্বমেকা পরব্রহ্মরূপেণ সিদ্ধা॥

সুতরাং শক্তিতে এবং ব্রহ্মে প্রভেদ নাই। শক্তিই ব্রহ্ম। অতএব শক্তির উপাসনাই ব্রহ্মের উপাসনা। শক্তিকে হিন্দু নানাভাবে উপাসনা করিয়া থাকে।

শক্তি জগৎ-প্রসবিনী। সেই জন্য সাধক জননীভাবেও তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন। অথচ কন্যাভাবেও শক্তির উপাসনা করা যায়। কিন্তু মাতৃভাবে উপাসনাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। সেই জন্য হিন্দু সাধক গাহিয়াছেন :—

"জানি না কি ব'লে ডাকি তোরে, শ্যামা মা!
কভু বা শঙ্করবামে, কভু হর-হৃদি'পরে॥
কভু বা বিশ্বরূপিণী, কভু শ্যামা উলঙ্গিনী,
কভু শ্যাম-সোহাগিনী, কভু রাধার পায়ে ধরে॥
কভু বা বিশ্বজননী, পঞ্চভূতনিবাসিনী,
কভু কুলকুণ্ডলিনী, চতুর্দ্দল-বিম্বোপরে॥
যে যা বলে শুনিব না, মা নামের নাই তুলনা,
আমি তাইতে ডাকি ব'লে মা! মা!
মা! তোর অভয় চরণ পাবার তরে॥"

সিদ্ধ সাধকের এই গানটির গূঢ় অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিলে শক্তিসাধনতত্ত্বের অনেক কথাই বুঝা যায়। কিন্তু আজকালি-কার পাশ্চাত্য শিক্ষায় বিভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের সে প্রবৃত্তি ও চেষ্টা নাই। অল্পকথায় উহার গূঢ়ার্থ প্রকাশ করাও অস-ম্ভব। উহা ঠিক বুঝাইবার মত শক্তি ও সাধনাও আমার নাই। সুতরাং আমি সে চেষ্টায় ক্ষান্ত হইলাম। তবে এইমাত্র বলিতে পারি,—শক্তিসাধকের পক্ষে মাতৃভাবে আরাধনাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রকৃষ্ট।

হিন্দুর পূজার একটি বৈশিষ্ট্য আছে। অন্য ধর্ম্মে তাহা নাই। উহা মনোভাবের সহিত আরাধনাপদ্ধতির সঙ্গতি-সাধন। মানবপ্রকৃতিতে যে ভাবের, যে আকর্ষণের প্রাবল্য অধিক, অর্থাৎ যে আকর্ষণ সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল, সেই আকর্ষণ উপাস্য দেবতায় অর্পণ করিতে হইবে। এই সংসারে প্রত্যেক মানবের প্রকৃতি ভিন্ন। যাহার যেরূপ প্রকৃতি, পার্থিব সম্বন্ধবিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত তাহার অনুরাগেরও সেইরূপ তারতম্য হইয়া থাকে। আমরা দেখিতে পাই, কোন সন্তান মাতৃভক্ত; মা ভিন্ন সে আর কাহাকেও জানে না। জননীর শাসন তাহার অত্যন্ত মধুর মনে হয়। যে ব্যক্তির সেইরূপ প্রকৃতি, সে ব্যক্তি তাহার উপাস্য দেবতাকে মাতৃভাবে সাধন করিবার অধি-কারী। এইরূপ যে ব্যক্তি অত্যন্ত পিতৃভক্ত, যাহার মনে—"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ,পিতরি প্রীতিমা-পন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ" এই ভাব ওতপ্রোত, সে ব্যক্তি পিতৃভাবেই পরদেবতার সাধনা করিবে। এইরূপ কেহ কান্তভাবে, কেহ প্রভুভাবে, কেহ সখিভাবে কেহ বা অপত্য-ভাবে আরাধ্য দেবতার সাধনা করিবেন। এক কথায় যাহার প্রকৃতিতে যে ভাব স্বতঃস্ফূর্ত্ত, সে সেই ভাবেই আরাধ্য দেবতাকে যোজনা করিবে। এই স্থানে এই বিষয়ের শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত হইল :—

"অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি পূজায়া লক্ষণাদিকম্।
আদৌ সম্বন্ধসংস্কারঃ কর্ত্তব্যোঽতিপ্রযত্নতঃ॥
স চ ষোঢ়া ভবেৎ রাজন্ মাতৃত্বাদিবিভেদতঃ।
মাতৃত্বং জনকত্বঞ্চ প্রভুত্বং সখিতা তথা।
কান্তভাবোঽপত্যভাব ইত্যেবং ষড়্বিধো মতঃ॥
যস্মিন্ যেনাধিকঃ স্নেহো মাত্রাদিষনুভূয়তে।
স চ তেনৈব ভাবেন যোজয়েৎ পরদেবতাম্॥
সদা তদ্ভাবনিরতস্তদ্ধেতুপরিচিন্তকঃ।
দৃঢ়ীকুর্য্যাৎ তথা ভাবং যথাদৃষ্টং সুতাদিষু॥
এবং কৃতেঽধিকারঃ স্যাৎ পূজায়াং নরপুঙ্গব।
পূজা চ তৎ স্নেহভাবাৎ পরিচর্য্যাদিকা ক্রিয়া॥"

ইহার অর্থ :—অতঃপর বাহ্যপূজার লক্ষণাদি কি, তাহাই বলিব। উপাসনা করিবার পূর্ব্বে দেবতার সহিত কোন একটি সম্বন্ধসংস্কার করিয়া লওয়া অত্যন্ত আবশ্যক, তাহা না করিলে উপাসনাই পণ্ড হইয়া যায়। মাতৃত্বাদিভেদে জীবের সহিত দেবতার এই ছয়টি সম্বন্ধ হইতে পারে, যথা—মাতৃত্ব, পিতৃত্ব, প্রভুত্ব, সখিত্ব, স্বামিত্ব ও অপত্যভাব। এই ছয়টি হৃদ্‌গত ভাবের মধ্যে যে ভাব যাঁহার হৃদয়ে প্রবল, তিনি সেই ভাবটিই (সুদৃঢ় করিয়া) তাঁহার উপাস্য দেবতায় যোজনা করিবেন। যাঁহার যে ভাব প্রবল, তিনি তদ্ভাবসম্পন্ন হইয়া পুত্রাদিতে তাঁহার যে মনোভাব প্রবল, তাহার বিষয় চিন্তা করিয়া সেই ভাবই দৃঢ়ীভূত অর্থাৎ অধিকতর প্রবল করিয়া লইবেন। হে নরপুঙ্গব! এই প্রকারে সেই হৃদ্‌গত ভাবকে দৃঢ় করিয়া লইলে, তবে বাহ্যপূজায় অধিকার জন্মে। সেই দৃঢ়ীভূত বা প্রবলীকৃত ভক্তি, প্রীতি বা স্নেহ লইয়া দেবতাকে পিতা, মাতা বা সন্তানের ন্যায় পরিচর্য্যা বা সেবা করাকেই (বাহ্য) পূজা বলা হইয়া থাকে।

হিন্দুর পূজার সহিত অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের পূজার বিশেষ প্রভেদ আছে। হিন্দুর পূজাদি কর্ম্মের উদ্দেশ্য,—চিত্তের শুদ্ধিসাধন, ভগবানের প্রীতিসম্পাদন নহে। চিত্তস্য শুদ্ধয়ে কর্ম্ম। চিত্তশুদ্ধিসম্পাদনের জন্য ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়। সেই জন্য যে ভাবটি সাধকের হৃদয়ে প্রবল, সাধক সেই ভাবটিকে তাঁহার উপাস্য দেবতাকে অর্পণ করিবেন। এই প্রকারে সংসার হইতে সেই ভাবকে সংহরণ করিয়া উহা উপাস্য দেবতাকে নিবেদনই পূজা। যে যাহাকে বড় ভালবাসে, সে তাহাকে সমস্ত প্রিয়বস্তু দিয়াই তৃপ্তি লাভ করে। মাতৃভক্ত সন্তানের যে সকল দ্রব্য অত্যন্ত প্রিয়, সেই সকল দ্রব্য মাকে না দিলে তাহার তৃপ্তি হয় না। সে যাহা খাইতে ভালবাসে, তাহা মাকে খাইতে না দিয়া খাইলে তাহার ভাল লাগে না। সে যেরূপ বসনভূষণ ভালবাসে, তাহার দ্বারা মাকে না সাজাইলে তাহার তৃপ্তি হয় না। ইহাই হইল প্রকৃত মাতৃভক্তির লক্ষণ। সেই জন্য যে মাতৃভাবে মহাশক্তির সাধনা বা পূজা করে, সেই সাধকের যাহা কিছু তৃপ্তিকর, তাহা তাহার উপাস্য দেবতাকে নিবেদন করিয়া পরে তাঁহার প্রসাদরূপে তাহা তাহাকে ভোগ করিতে হইবে। সেই জন্য বীর-মিত্রোদয়ে কথিত হইয়াছে,—"পূজা নাম দেবতোদ্দেশেন দ্রব্যত্যাগাত্মকযাদি এব।" অর্থাৎ দেবতার উদ্দেশ্যে (প্রিয়) দ্রব্যাদির ত্যাগ (নিবেদন) নামক যজ্ঞের নামই পূজা। এই জন্য যাঁহারা মাংসাশী অর্থাৎ মাংসভোজন করিতে ভালবাসেন, তাঁহারা দেবতাকে মাংসও নিবেদন করিবেন, এইরূপ ব্যবস্থা আছে। সেই জন্যই পূজায় বলিদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে :—

"মাংসাশনং যে কুর্ব্বন্তি তৈঃ কার্য্যং পশুহিংসনম্।
মহিষাজবরাহাণাং বলিদানং বিশিষ্যতে।"

যাহারা মাংস খায় ও খাইতে ভালবাসে, তাহারাই কেবল পশুহিংসা (দেবোদ্দেশে পশুবলি) করিবে। মহিষ, ছাগ এবং বরাহ বলিদানই প্রশস্ত। যে সাধক মাংসভোজন করে না, মাংসভোজনে যাহার ঘোর অরুচি, সে দেবীপূজায় পশুবলি করিবে না। সে ইক্ষুদণ্ড, কুষ্মাণ্ড, শসা প্রভৃতি ফল বলিদান করিবে। বলা বাহুল্য, বলিদান অধমাধম পূজারই অঙ্গ। নিতান্ত অধমপূজা কাহাকে বলে? শাস্ত্রে তাহার উল্লেখ আছে :—

"উত্তমা মানসী পূজা মধ্যমা ধ্যানধারণে।
অধমা জপযজ্ঞস্তু বাহ্যপূজাঽধমাঽধমা॥"

মানসী পূজাই পূজার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম পূজা, ধ্যান-ধারণাই মধ্যমা পূজা, জপ এবং যজ্ঞই অধমা পূজা এবং বাহ্যপূজা (প্রতিমাদি নির্ম্মাণপূর্ব্বক পূজা) অধম অপেক্ষাও অধমপূজা অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা অধমপূজা।

এখানে বলা আবশ্যক যে, এই অধমাধমপূজাও সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিকভেদে তিন প্রকার। যাহারা তামস প্রকৃতির লোক, তাহারাই মাংসাশী হইয়া থাকে। সুতরাং

তাহাদের পক্ষে পশুবলিই প্রয়োজনীয়। যাহাদের মাংস-ভোজনে ঘোর অরুচি, তাহারা পশুবলি দিবে না। এক্ষণে বলা বাহুল্য, উপাস্যদেবতার নিকট ভাবের ঘরে চুরি করা ঠিক নহে। দেবতাকে নিজ প্রকৃতিটি উন্মুক্ত করিয়া দেখাইতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে যথাসম্ভব সাত্ত্বিক ভাব লইয়া পূজা করা আবশ্যক। হিন্দুর এই পূজাতত্ত্ব বুঝা অত্যন্ত কঠিন। অল্প-স্থানে তাহা বিবৃত করা সম্ভবে না। সেই জন্য এ সম্বন্ধে আর অধিক কথা বলা হইল না। অধিকারিভেদে উপাস্য-দেবতার ভেদাভেদ আছে। আবশ্যক হইলে অন্য সময়ে তাহা বলা যাইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শক্তিপূজায় উপাস্য দেবতাকে দুই ভাবে উপাসনা করা যায় ;—প্রথম মাতৃভাবে, দ্বিতীয় দুহিতৃভাবে। স্ত্রীদেবতামাত্রই শক্তি। সুতরাং স্ত্রীদেবতার পূজা বা শক্তি-পূজা করিতে হইলে সেই দেবতাকে জননী বা কন্যাভাবে আরাধনা করিতে হইবে। এই কথা কেবল মুখে বলিলে চলিবে না, মনে-প্রাণে সর্ব্বদাই এই ভাবে ডুবিয়া থাকিতে হইবে। সর্ব্বদাই অচলভাবে মনে রাখিতে হইবে, আমি বিশ্বজননীর সন্তান,—তিনি এই বিশ্বসংসারে আমাকে জননীর ন্যায় আগুলিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং সংসারে আমার ভয় করিবার কিছুই নাই। এই ভাবে আপ্লুত হইয়া যদি শক্তির আরাধনা করা যায়, তাহা হইলে সেই পূজা সফল হইয়া থাকে। সেইরূপ যদি মেনকার ন্যায় মহাশক্তিকে কন্যারূপে ভাবনা করিয়া অপত্যস্নেহে উচ্ছ্বসিত-হৃদয়ে শক্তির পূজা করা যায়, তাহা হইলে সেই পূজা সার্থক হইবেই হইবে। শক্তিপূজামাত্রেই এই দুই ভাবের এক ভাব গ্রহণ করিতে হইবে।

দুর্গা মহাশক্তিরই নাম। এই শক্তির সাধনা করিলে মানুষ সর্ব্ববিধ দুর্গতির হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়া থাকে। সেই জন্য শাস্ত্রকার বলিয়াছেন :—

"সৈব দুর্গতিমাপন্নান্ নিস্তারয়তি দুর্গতিম্।
তস্মাৎ সা প্রোচ্যতে লোকে দুর্গা দুর্গতিনাশিনী॥"

—মহাভাগবত, ৪৩।

তিনি দুর্গতিগ্রস্ত লোককে দুর্গতির প্রভাব হইতে নিস্তার করেন, সেই জন্য লোকে তাঁহাকে দুর্গতিনাশিনী দুর্গা বলিয়া থাকে। অন্যত্র :—

"একৈব শক্তিঃ পরমেশ্বরস্য
ভিন্না চতুর্দ্ধা বিনিয়োগকালে।
ভোগে ভবানী পুরুষেষু বিষ্ণুঃ
কোপেষু কালী সমরেষু দুর্গা॥"

পরমেশ্বরের একই শক্তি, শক্তির পার্থক্য নাই। তবে বিনিয়োগকালে অর্থাৎ সাধনপদ্ধতিতে প্রয়োগকালে ঐ শক্তিকে চারি প্রকারে বিভক্ত করা হয়, যথা—ভোগবিষয়ে ভবানী, পুরুষ হিসাবে বিষ্ণু, কোপবিষয়ে কালী এবং সংগ্রামে দুর্গা। ভাস্কর রায় কর্ত্তৃক উদ্ধৃত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের বচন এই—

"আদ্যাশক্তির্ম্মহেশস্য চতুর্দ্ধা ভিন্নবিগ্রহা।
ভোগে ভবানীরূপা সা দুর্গারূপা চ সংগরে।
কোপে চ কালিকারূপা পুংরূপা চ মদাত্মিকা॥"

বিনিয়োগকালে পরমেশ্বরের শক্তি চারি ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। ভবানী হইলেন ভোগের অধিষ্ঠাত্রী, দুর্গা হই-লেন সংহারের অধিষ্ঠাত্রী, বিষ্ণু পুরুষ অর্থাৎ বিক্রমের অধি-ষ্ঠাতা আর কালী কোপের অধিষ্ঠাত্রী।

দুর্গা সংগ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইলেও ইনি ভক্তের সকল বাঞ্ছাই পূর্ণ করিয়া থাকেন। এ সংগ্রামক্ষেত্র কেবল বাহ্যজগতে নহে, ইহা অন্তর্জ্জগৎ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। মানুষকে তাহার অন্তরস্থ রিপুগণকে পরাজিত করিতে হইলে তাহাদের সহিত যে সংগ্রাম করিতে হয়, সেই সংগ্রামে জয়লাভ করিতে হইলেও দুর্গাদেবীর আরাধনা করিতে হয়। সেই জন্য দুর্গাপূজান্তে শত্রুমিত্র সকলের সহিত কোলাকুলি করিবার রীতি আছে। অন্তরস্থ রিপুজয়ান্তে সকলের সহিত মৈত্রীস্থাপনের ইহাই ব্যবস্থা।

এই দুর্গানামে সর্ব্বপ্রকার বিপত্তি হইতেই মানুষ উদ্ধার পাইয়া থাকে। যথা—

"মন্দভাগ্যোঽপি সংস্মৃত্য তস্যা নাম পরাক্রমম্।
সৌভাগ্যং সমবাপ্নোতি তস্মাৎ সা পরমেশ্বরী।
মন্দভাগ্যপরিত্রাত্রী প্রোচ্যতে বেদবেদিভিঃ।
সৈব দেবী পরা বিদ্যা লোকানাং রঘুনন্দন।
চতুর্ব্বর্গপ্রদা সর্ব্ববিপক্ষক্ষয়কারিণী॥"

মন্দভাগ্য ব্যক্তি তাঁহার নাম স্মরণ করিলে সৌভাগ্য লাভ করে, সেই জন্যই তিনি পরমেশ্বরী। তিনি মন্দভাগ্যের পরি-ত্রাণকারিণী, ইহা বেদবিদ্গণেরই উক্তি। হে রঘুনন্দন, তিনি পরাবিদ্যা, চতুর্ব্বর্গফলপ্রদা এবং সর্ব্বপ্রকার শত্রুর

ক্ষয়কারিণী, সুতরাং তিনি আধি-ব্যাধিরও বিনাশসাধন করিয়া থাকেন। সেই জন্য শরৎকালে ও বসন্তকালে তাঁহার পূজার ব্যবস্থা আছে। শরৎকালে শারদীয়া পূজা এবং বসন্তকালে বাসন্তীপূজা হইয়া থাকে। দেবীভাগবতে উহার কারণ এইরূপ কথিত হইয়াছে :—

"শরৎ এবং বসন্ত ঋতুতে নানাপ্রকার ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে ; সেই জন্য এই দুইটি ঋতুর নাম যমদংষ্ট্রা। সেই জন্য এই দুই ঋতুতে, বিশেষতঃ শরৎকালে নবরাত্রিব্রত করা কর্ত্তব্য। বসন্ত এবং শরৎ ঋতুতে অনেক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সেই জন্য এই সময়ে সযত্নে এবং ভক্তিভাবে চণ্ডিকাপূজা করা কর্ত্তব্য।—(দেবীভাগবত ৩।২৬।৩-৭।)

ইহা ভিন্ন দুর্গাপূজার এই সময়নিরূপণের অন্য কারণও আছে। এখানে সে কথার আলোচনা হইল না। এক্ষণে দুর্গামূর্ত্তির বিষয় চিন্তা করা যাউক।

দুর্গা মহাশক্তিরই প্রতীক। তাঁহার দশ দিকে দশ বাহু প্রসারিত। উহাতে দশ দিকেই মহাশক্তি ক্রিয়াশীলা, ইহাই বুঝা যাইতেছে। প্রত্যেক হস্তেই এক একটি আয়ুধ বা অস্ত্র রহিয়াছে। উহা ক্রিয়াশীলতার প্রতীক। উঁহার এক চরণ সিংহের উপর, অপর চরণ মহিষাসুরের উপর ন্যস্ত। দুইটি শক্তির সংঘর্ষেই শক্তির অস্তিত্ব বা অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। সিংহ বৈষ্ণবী শক্তি বা পালিকা শক্তি। এক কথায় রক্ষক শক্তি।

"সিংহ ত্বং হরিরূপোঽসি স্বয়ং বিষ্ণুর্ন সংশয়ঃ।

সিংহ হরিরূপী ; সুতরাং পালিকা শক্তি। মহিষ সংহারক শক্তি।

"মহিষস্ত্বং মহাবীর শিবরূপঃ সদাশিবঃ।"

মহিষ শিবরূপ। শিব সংহারের দেবতা। মানুষের আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক রিপু আছে। মহিষাসুর তাহারই প্রতীক। মানবের যত আধি-ব্যাধি শত্রু প্রভৃতি আছে, দুর্গাদেবী তাহাই দমন করিয়া থাকেন, সেই জন্য তিনি জীবের দুর্গতিনাশিনী বৈষ্ণবী শক্তি। এই সংহারিণী শক্তি অতি প্রচণ্ড। দুর্গাদেবী ইহাকে দমন করিয়া রাখিয়াছেন, সেই জন্য ইঁহার বক্ষঃস্থলে মহাশক্তির সংহারক শূল বিদ্ধ এবং মহিষাসুর দেবীর নাগপাশে বদ্ধ। পালিকা-শক্তি ও সংহারিণী শক্তি এই উভয় শক্তির উপরই মহাশক্তি দণ্ডায়মানা।

মহাশক্তির দক্ষিণে লক্ষ্মী ও গণেশ। লক্ষ্মী ঐশ্বর্য্যের দেবতা। শক্তি অর্জ্জন করিতে হইলে ঐশ্বর্য্যের প্রয়োজন। সেই জন্য দুর্গার প্রতিমায় লক্ষ্মীর স্থান। গণেশ সর্ব্বদেবময় এবং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদানকর্ত্তা। ইনি গণশক্তিরও প্রতীক। শক্তিমান হইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে সিদ্ধিদাতা গণনাথের পূজা করিতে হয়। গণশক্তি বা সঙ্ঘশক্তি স্বপক্ষ না হইলে শক্তিমান হওয়া সম্ভবে না।

দেবীর বামে সরস্বতী এবং কার্ত্তিক ; সরস্বতী জ্ঞান-শক্তির ও প্রকাশ-শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী। জ্ঞান, বিদ্যা ও প্রকাশ-শক্তি এই তিনটিও শক্তিলাভের প্রধান সহায়। অজ্ঞতা উন্নতির ও শক্তিলাভের অন্তরায়। সেই জন্য শক্তি-সাধনায় অজ্ঞতানাশের উদ্দেশ্যে জ্ঞানশক্তির আরাধনা করিতে হয়। বাগ্দেবী দুর্গাপ্রতিমায় দুর্গারই সহকারিণীরূপে বিরাজমানা। কার্ত্তিক শৌর্য্য-বীর্য্যের প্রতীক। সাহস ও বীর্য্যবান্ লোকই শক্তিমান হইয়া থাকেন। আবার শক্তিশালী ব্যক্তিই ঐশ্বর্য্য, সিদ্ধি, জ্ঞান ও শৌর্য্য লাভ করিয়া থাকেন। ইহা ভিন্ন দুর্গাপ্রতিমায় জয়া এবং বিজয়া আছেন। যথা :—

"জয়া বামে স্থিতা নিত্যং বিজয়া দক্ষিণে তথা।"

জয়া উপস্থিত কার্য্যে সিদ্ধিদায়িনী, বিজয়া সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী। দুর্গোৎসবে ইঁহাদের ধ্যান এবং পূজা করিতে হয়।

আজকালি অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, দুর্গাপূজা আধুনিক উৎসব। আবার কেহ কেহ বলেন, উহা অনার্য্যেরই উৎসব—বাঙ্গালীরা উহা অনার্য্যদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছে। এই উক্তি একেবারেই মিথ্যা। দুর্গা অতি প্রাচীন দেবতা। অতি প্রাচীন ঋগ্বেদে দেবীসূক্ত ও রাত্রিসূক্ত নামে দুইটি সূক্ত আছে। ভগবতী স্বয়ং অম্ভৃণ ঋষির বাক্‌নাম্নী কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া এই দেবীসূক্ত বলিয়াছিলেন, আর রাত্রিসূক্ত দুর্গাদেবীরই স্তব। সেই রাত্রিসূক্তের ৪র্থ ঋকে বলা হইয়াছে :—

"স্তোষ্যামি প্রযতো দেবীং শরণ্যং বহ্বৃচপ্রিয়াম্।
সহস্রসম্মিতাং দুর্গাং জাতবেদসে সুনবাম সোমম্॥"

এই ক্ষেত্রে দুর্গাদেবীকে স্তব করা হইতেছে, ইহা স্পষ্টই বলা হইয়াছে। তাহার পর আবার বলা হইয়াছে:—

"তমগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং বৈরোচনীং কর্ম্মফলেষু জুষ্টাম্।
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুতরসি তরসে নমঃ॥"

এই ঋকে দুর্গাদেবীকে অগ্নিবর্ণা, স্বকীয় তেজে শত্রুগণকে

দহনকরী, বৈরোচনী অর্থাৎ পরমাত্মা কর্তৃক দৃষ্টা, এবং কর্ম্মফলপ্রাপ্তির জন্য সেবিতা বলা হইয়াছে। আমি সেই দুর্গার স্মরণ লইতেছি। উহাতে বলা হইয়াছে, হে সুতরসি দেবি, তুমি সংসারসাগরের ত্রাণকর্ত্রী, তোমাকে নমস্কার।

যাঁহারা দুর্গাপূজাকে আধুনিক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, তাঁহারা এইখানে বিষম গোলযোগে পড়িয়াছেন। ইহার দ্বারা দুর্গাপূজার অতিশয় প্রাচীনত্ব সপ্রমাণ হয়। সুতরাং তাঁহাদের 'থিয়রী' এইখানেই খণ্ডিত হইয়া যায়। অগত্যা শেষ উপায়স্বরূপ তাঁহারা বলিয়াছেন যে, ঋগ্বেদে রাত্রিসূক্ত প্রক্ষিপ্ত।

কিন্তু প্রক্ষিপ্ত বলিলেই প্রক্ষিপ্ত সপ্রমাণ হয় না। "বৃহদ্দেবতা" নামক অতি প্রাচীন গ্রন্থে ঋগ্বেদের দেবতাদিগের নির্দ্দেশ আছে। উহাতে দুর্গা দেবীকে ঋগ্বেদের দেবতা বলিয়া ধরা হইয়াছে। "ঋগ্বিধান ব্রাহ্মণ" নামক বৈদিক গ্রন্থে (৪।১৯) রাত্রিসূক্ত পাঠের নিয়ম বিহিত হইয়াছে। সায়নাচার্য্য তৈত্তিরীয় ভাষ্যে এই ঋকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রাচীন কালের ভাস্কর রায় চণ্ডীর গুপ্তবতী টীকার উপোদ্‌ঘাতে বলিয়াছেন, ঋগ্বেদে শাকল্য সংহিতায় রাত্রিসূক্ত এবং দেবীসূক্ত প্রসিদ্ধ। এরূপ ক্ষেত্রে উহাকে প্রক্ষিপ্ত বলা যায় কি করিয়া? মরীচিকল্পে দুর্গা সপ্তশতীর পুরশ্চরণকল্পে দেবীসূক্ত এবং রাত্রিসূক্ত দ্বারা হোম করিবার ব্যবস্থা আছে। বিষ্ণুসংহিতায় যে সকল পবিত্র বৈদিক স্তোত্র পাঠ করিলে দ্বিজগণ পবিত্রতা লাভ করেন, তাহার একটা তালিকা দেওয়া হইয়াছে। তন্মধ্যে বেদের 'দুর্গা-সাবিত্রী' অন্যতমা। এই দুর্গা-সাবিত্রী কি? ইহার অতি প্রাচীন টীকাকার নন্দন বলিয়াছেন যে, উহা ঋগ্বেদেরই মন্ত্রবিশেষ। বিষ্ণুসংহিতা অতি প্রাচীন। উহাতে ব্রাহ্মণের চারি বর্ণের কন্যা বিবাহ করিবার ব্যবস্থা আছে। সেই বিষ্ণুসংহিতায় যখন বৈদিক স্তোত্রের মধ্যে দুর্গাসাবিত্রী ধৃত হইয়াছে, তখন দুর্গা যে বৈদিক দেবতা, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবে আধুনিক থিয়রীবাজ লোকরা আপনাদের 'থিয়রী" লইয়াই উন্মত্ত; তাঁহারা এ সকল বিষয় দেখিবার অবকাশ পায়েন না।

এক সম্প্রদায়স্থ লোক বলিয়া থাকেন যে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বাঙ্গালা দেশে মৃন্ময়ী দুর্গামূর্ত্তিপূজা প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন। এই ধারণা কেবল হাস্যজনক নহে, নিতান্ত মূর্খতার পরিচায়ক। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সুতরাং ইঁহাদের মতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বঙ্গে দুর্গামূর্ত্তি-পূজার প্রবর্ত্তনা হইয়াছে। ইহা কখনই ঠিক হইতে পারে না। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য "দুর্গাপূজাতত্ত্ব" এবং "দুর্গোৎসবতত্ত্ব" লিখিয়া গিয়াছেন। রঘুনন্দন শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক লোক। চৈতন্যদেব ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। রঘুনন্দন ১৬শ খৃষ্টাব্দের প্রথমেই দুর্গাপূজাতত্ত্ব প্রভৃতি লিখিয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহা ভিন্ন তিনি তিথিতত্ত্বের মধ্যে দুর্গোৎসবতত্ত্বের কথা আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে বালক, শ্রীনাথ ভট্ট, শূলপাণি, বিদ্যাপতি, বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতিও দুর্গোৎসব সম্বন্ধে বহু নিবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য-কৃত দুর্গাপূজাতত্ত্ব ৪ শত বৎসরের পুরাতন। তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী নিবন্ধকারগণের রচনা যদি তাঁহার অন্ততঃ এক শত বৎসর পূর্ব্বেও হইয়া থাকে, তাহা হইলেও অন্ততঃ ৫ শত বৎসর পূর্ব্বেও বাঙ্গালায় দুর্গোৎসব ছিল, তাহা সপ্রমাণ হয়।

কেহ কেহ বলেন, রাজা কংসনারায়ণ এই পূজার প্রবর্ত্তনা করেন। ইনিই বঙ্গের রাজা গণেশ। ইনি ১৪০৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় রাজত্ব করেন। এই স্বল্পদিনের মধ্যেই যে ইনি বাঙ্গালায়, বিহারে এবং আসামে দুর্গাপূজা প্রচারিত করিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন, —ইহা মনে হয় না। শূলপাণি "দুর্গোৎসববিবেক" "দুর্গোৎসবপ্রয়োগবিবেক" "বাসন্তীবিবেক" প্রভৃতি দুর্গোৎসব সম্বন্ধে নিবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন। ইনি খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইনি রাজা কংসনারায়ণের যদি পূর্ব্ববর্ত্তীও না হয়েন, তাহা হইলে অন্ততঃ তাঁহার সমকালীন হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই শূলপাণিই আবার তাঁহার নিবন্ধে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী নিবন্ধকার বালকের উক্তি প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন। মিথিলার বিদ্যাপতি-কৃত দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী কোন্ সময়ে রচিত, তাহা বলা কঠিন।

সুতরাং দুর্গাপূজা আধুনিক নহে। ইহা অতি প্রাচীন। ইহা হিন্দুর অতি প্রাচীন উৎসব। ভারতের অন্যান্য স্থানে এই পূজা কেন লোপ পাইয়াছে,—এ প্রবন্ধে তাহার আর আলোচনা করিব না। শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

নবাবের দেশে তিন দিন

লক্ষ্ণৌয়ের নবনির্ম্মিত সুবৃহৎ ও সুন্দর রেল-ষ্টেশনটি সর্ব্ব-প্রথম আগন্তুক ও ভ্রমণকারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। তৎপরে ইহার সুপ্রশস্ত নূতন পথ ও তৎপার্শ্বে মধ্যে মধ্যে নূতন অট্টালিকাগুলি দেখিয়া হঠাৎ ভ্রম হয়, যেন কলিকাতার ইম্‌প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের কোন নবনির্ম্মিত পথে আসিয়া পড়িলাম। আমরা যখন ট্রেণ হইতে অবতরণ করিলাম, তখন রাত্রি প্রায় সাড়ে ১০টা, পথে তখন লোক-চলাচল কম। নাসিরাবাদে শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বাটীতে আমাদের (আমি ও বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র দে) আনিয়া দিতেছিল। মনে হইতেছিল, আরব্য উপন্যাসের কোন অলৌকিক রাজ্যের কথা। এখান হইতে জ্ঞান বাবুর বাটী অতি নিকট, তাহা অনুসন্ধান করিয়া লইতে বিলম্ব ঘটিল না। তথায় পৌছিলে গৃহস্বামীর আদর-যত্নে আপ্যায়িত হইয়া লক্ষ্ণৌ-সম্বন্ধীয় বিবিধ কথোপকথনান্তে সে রাত্রির মত সুখ-নিদ্রায় অতিবাহিত করিলাম।

গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত এই লক্ষ্ণৌ নগরী অতি প্রাচীন সহর। ইহার নামোৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ কিংবদন্তী যে, শ্রীরামচন্দ্র রাবণবধান্তে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলে

বারদারী

উঠিবার কথা। টঙ্গাওয়ালা বাড়ী জানে না। এখানে বাড়ীর নম্বর থাকিলেও তাহার হিসাব কেহ রাখে না।

আমাদের গাড়ী আমিনাবাদ পার্কের মোড়ে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন নিস্তব্ধ জনহীন পার্কের ক্লক্‌টাওয়ারের উপরের উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোকগুলি ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছিল। উহার এবং চারিধারের রাস্তার আলোক-শ্রেণীতে পার্কের চারিধারের ঘন-সংবদ্ধ সৌধমালা আমাদের মত আগন্তুকের মনে কি একটা বুঝান যায় না, এমন ভাব ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণকে এই প্রদেশের শাসনভার অর্পণ করেন। তিনিই এই সুরম্য স্থানটি মনোনীত করিয়া তথায় স্বীয় বাস-স্থান নির্ম্মাণ পূর্ব্বক নিজ নামে সহরের নাম লক্ষ্মণপুর বা লক্ষ্মণাবতীপুরী রাখেন। কালক্রমে উহারই অপভ্রংশ হইয়া ইংরাজ রাজত্বে লক্ষ্ণৌ নামে খ্যাত হইয়াছে।

আমরা প্রভাতে প্রথম কৈশরবাগ, পরে বারদারী, যাদু-ঘর, ছত্রমঞ্জিল ও রেসিডেন্সী দেখিতে যাই। চতুর্দ্দিকে সুন্দর অট্টালিকাবেষ্টিত কৈশরবাগ অতি রমণীয় স্থান। উহার

উভয় পার্শ্বের সুদীর্ঘ পীতবর্ণের সৌধশ্রেণী এবং বারদ্বারী নামক প্রাসাদটি চমৎকার। নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ ৮০ লক্ষ মুদ্রাব্যয়ে এই বিলাসভবন নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এখন এখানে জনসাধারণের সভাসমিতি হইয়া থাকে এবং ইহা অন্যান্য অফিসরূপেও ব্যবহৃত হয়। বারদ্বারীর পশ্চাতে নবাব আসফদ্দৌল্লার বৈমাত্র ভ্রাতা সওদৎ আলির ও তাঁহার অনতিদূরে উহার বিবির দুইটি সুন্দর মকবরা অর্থাৎ সমাধি-মন্দির আছে। সংস্কারাভাবে ইহা ক্রমে জীর্ণ হইয়া যাইতেছে। এই সওদৎ আলিই সুপ্রসিদ্ধ 'বেলিগার্ড' নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

কৈশরবাগ-প্রাঙ্গণে প্রবেশের জন্য যে সব পথ আছে, তন্মধ্যে পূর্ব্বদিকের দ্বারকে 'লাখী দরজা' বলে। উহা নির্ম্মাণ করিতে ১ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। উহার কবাটগাত্রে মৎস্যাঙ্গনা-যুগল ক্ষোদিত আছে। এইখানেই শের দরওয়াজা নামে যে আর একটি সিংহদ্বার আছে, একটা কামানের লক্ষ্যশূন্য গোলার আঘাতে সেনাপতি নীল তথায় আহত হইয়াছিলেন, তদবধি ইংরাজরা ইহাকে 'নীলদ্বার' বলিয়া থাকে।

রেসিডেন্সী যাইতে গোমতী-তীরে ছত্রমঞ্জিল নামক একটি অতি সুন্দর প্রাসাদ দেখিলাম। এই প্রাসাদটি এক্ষণে-

ছত্রমঞ্জিল
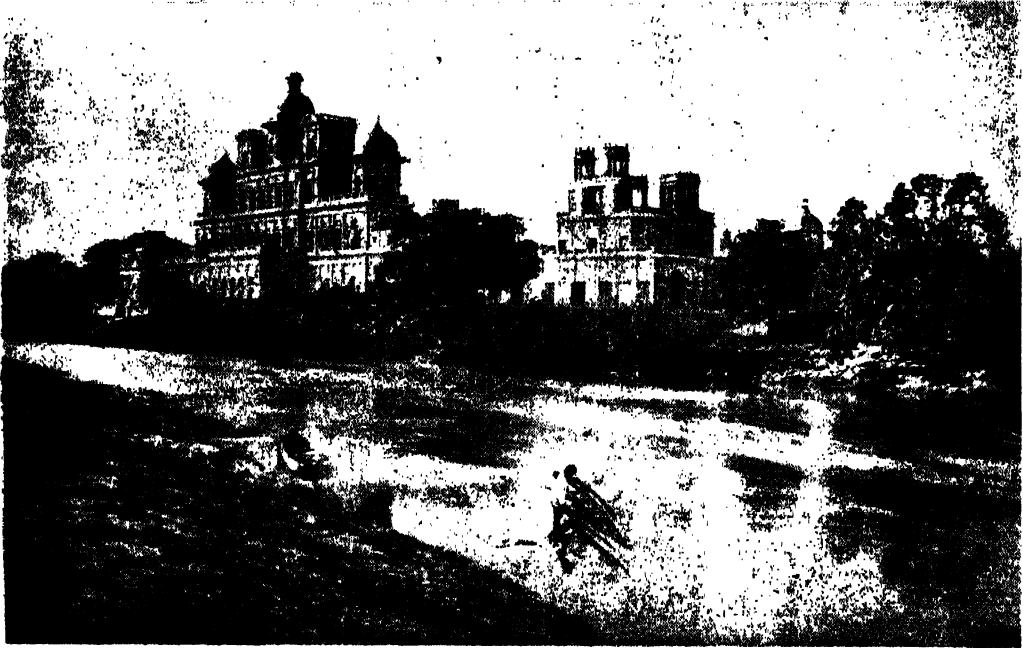
কৈশরবাগ উদ্যান-পার্শ্বে যে হরিদ্রাবর্ণের অট্টালিকাশ্রেণী দেখা যায়, শুনিলাম, ইহা নবাবের প্রায় ৩ শত ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় সুন্দরী বেগমের বাসভবনরূপে ব্যবহৃত হইত এবং মধ্যে যে হামাম আছে, প্রবাদ, তাহা নবাব ও বেগমদের জলক্রীড়ার জন্য গাজিপুরের গোলাপজলের দ্বারা পরিপূরিত থাকিত। অঙ্গনের এক পার্শ্বে আমিরুদ্দৌল্লা নামে একটি সৌধ প্রস্তুত হইয়া তাহাতে সরকারী পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়াছে এবং মধ্যস্থলে যুক্তপ্রদেশের গভর্ণর সার হারকোর্ট বাট্‌লারের একটি প্রস্তর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

য়ুরোপীয়দের ক্লাবরূপে এবং সাধারণের পুস্তকাগারের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। ইহা নসীরুদ্দীন হাইদার কর্ত্তৃক তাঁহার বিবাহিতা পত্নীগণের বাসের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার সর্ব্বোচ্চ সৌধশিরে একটি সুবৃহৎ কনকছত্র বিরাজিত থাকায় ইহার নাম ছত্রমঞ্জিল হইয়াছে।

নিকটেই স্থানীয় যাদুঘরটি দেখিলাম। তুলনায় কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগরের যাদুঘরের অপেক্ষা অনেক ছোট হইলেও, ইহা পুরাতত্ত্বান্বেষীদিগের পক্ষে বিশেষ দ্রষ্টব্যের বিষয়। ইহার মধ্যে সংগৃহীত অন্যান্য

রেসিডেন্সী

বিবিধ দ্রব্যাদির সহিত বহুসংখ্যক শিলালিপি ও তাম্রফলক, প্রাচীন প্রস্তর-মূর্ত্তি এবং পুরাকালের নানা প্রকার দ্রব্যাদির সমাবেশ দেখিলাম। মুসলমানদিগের অনেক প্রাচীন চিত্রও সংগৃহীত আছে। শুনিলাম, অনেক প্রাচীন মুদ্রা এখানে আছে; তত্ত্বাবধায়ক উপস্থিত না থাকায় তাহা দেখিবার সুযোগ হইল না।

এখান হইতে রেসিডেন্সী অতি নিকটে অবস্থিত। ইহা সিপাহী-বিদ্রোহের বহু ইতিহাস-বিজড়িত একটি বিষাদময়

রেসিডেন্সীর সাধারণ দৃশ্য

স্মৃতিসৌধ। ইংরাজরাজ সযত্নে এই স্মৃতির প্রত্যেক অঙ্গটি রক্ষা করিতেছেন। ইহার প্রবেশ-দ্বারটি হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বত্র বিদ্রোহীদিগের প্রতিহিংসাপরায়ণতার স্মৃতি (গোলার দাগ প্রভৃতি) বিরাজিত। তয়খানা,—যেথানে ইংরাজ-নারীদের আশ্রয় দেওয়া হইয়াছিল, ভূগর্ভস্থ কক্ষ; যেথানে তৎকালীন রেসিডেণ্ট হেন্‌রী লরেন্স আহত হইয়াছিলেন, যেথানে বীর-যুবক পামার গোলার আঘাতে গতায়ু হন, সে সব স্থান এখনও ক্ষোদিত লিপি দ্বারা চিহ্নিত হইয়া আছে। লরেন্সের বাসভবনটি ছাদহীন অবস্থায় এখনও গোলাগুলীর শত চিহ্ন বুকে করিয়া তাঁহার বীরত্বের পরিচয় দিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে।

এমন শোকের জীবন্ত-স্মৃতি কানপুরের স্মৃতিকূপ ব্যতীত আর কোথাও আছে কি না, জানি না। রেসিডেন্সীকে বেলিগার্ড (Bailey Guard) নামেও অভিহিত করা হয়।

ইহার অনতিদূরে গির্জ্জা-প্রাঙ্গণে সিপাহী-বিদ্রোহের সময় নিহত বহু ইংরাজ যোদ্ধার সমাধি আছে। হ্যাবলক্, আউটরাম ও জেনারেল নীলের সমাধিও এইখানে আছে।

বৈকালে বাহির হইয়া প্রথমে সুপ্রসিদ্ধ ইমামবারা দেখিতে যাই। উহার প্রবেশপথসমীপে 'রূমি দরজা' নামক প্রকাণ্ড তোরণ দেখিতে পাই। ইহার গঠনপ্রণালী বহু অংশে গ্রীস ও ইটালীর স্থাপত্যের অনুরূপ। এই বিচিত্র

বেলিগার্ড ফটক

এখানকার বিদ্রোহীদিগের নৃশংসতা, নিষ্ঠুরতা ও সেই সঙ্গে বৃটিশ-বিজয়ের স্মৃতিটি পূর্ণমাত্রায় জাগরূক রাখিবার উদ্দেশ্যে রেসিডেন্সীর যাবতীয় অট্টালিকা ধ্বংসমূর্ত্তিতে বর্ত্তমান রাখিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের বিশেষ যত্নপ্রয়াস সর্ব্বত্র স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। আমরা একে একে সকল স্থান দেখিলাম। লরেন্সের নশ্বর দেহ এই স্থানেই সমাহিত আছে। সমাধি-স্তম্ভের উপর শুধু এই কয়টি কথামাত্র লিখিত আছে—Here lies Henry Lawrence who tried to do his duty". সব দেখিতে অনেকটা সময় লাগিল।

তোরণ এখানকার একটি দর্শনীয় বস্তু। ইমামবারার প্রথম ফটকের পর বহিঃপ্রাঙ্গণ পার হইয়া একতলার সমান সোপান বহিয়া তৎপরে দ্বিতীয় দ্বার অতিক্রম করিলে এক সুবিস্তৃত তৃণাচ্ছাদিত প্রাঙ্গণ-সম্মুখে এই ইমামবারা স্থাপিত। ইহা সৌধজগতের এক অদ্বিতীয় সামগ্রী বলিতে পারা যায়। ইহার মধ্যের হলটি লম্বে ১ শত ৬৭ ও প্রস্থে ৫২ ফুট এবং উভয় পার্শ্বের দুইটি অষ্টভুজ কক্ষের ব্যাস ৫৩ ফুট। প্রাচীরের বেধ প্রায় ১২ ফুট, ঘরের উচ্চতা প্রায় ৬০ ফুট। সমস্তই খিলান দ্বারা নির্ম্মিত। ভিতর হইতে

দেখিয়া তাহা বুঝা যায়, কিন্তু সমস্ত ছাদ সমতল। শুনা যায়, এত বড় খিলান-করা ছাদ পৃথিবীতে আর কোথাও নাই। এই খিলানের উপরে চতুষ্পার্শ্বে এরূপ আশ্চর্য্য কৌশলে অপ্রশস্ত পথ সকল নির্ম্মিত হইয়াছে,—যাহার ভিতর কোন প্রদর্শক না লইয়া প্রবেশ করিলে কিছুতেই পথ ঠিক করিয়া বাহিরে আসিতে পারা যায় না। কথিত আছে, অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাগণ এখানে নবাবের সহিত লুকাচুরি খেলিতেন। এই ইমামবারাকে ভুল-ভুলিয়া বা গোলকধাঁধা বলিয়া থাকে। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময় অন্নকষ্টপ্রপীড়িত প্রজাদের সাহায্যকল্পে নবাব

উচ্চ ভূমিমাত্র। মচ্ছিভবন দুর্গ বলিয়া যে অট্টালিকার কথা শুনিতে পাওয়া যায়, উহার সুবৃহৎ প্রাচীরের চিহ্ন এখনও দেখা যায়। একটি অতিবৃদ্ধ মুসলমানের মুখে শুনিলাম, ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে সে দুর্গের বিশেষ চিহ্ন সকল, এমন কি, গোলাগুলী পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, বর্ত্তমানে যেখানে মেডিক্যাল কলেজ নির্ম্মিত হইয়াছে, ঐ স্থানে মচ্ছিভবন ছিল। গোমতী-তীরে এই স্থানে একটি বিগতসৌন্দর্য্য বৃহৎ মসজেদ ও তিনটি কবর দেখিলাম। শুনিলাম, মধ্যেরটি শা পীর মহম্মদ সাহেবের কবর। ইহার মধ্যে একটি শ্বেতমর্ম্মর-নির্ম্মিত,
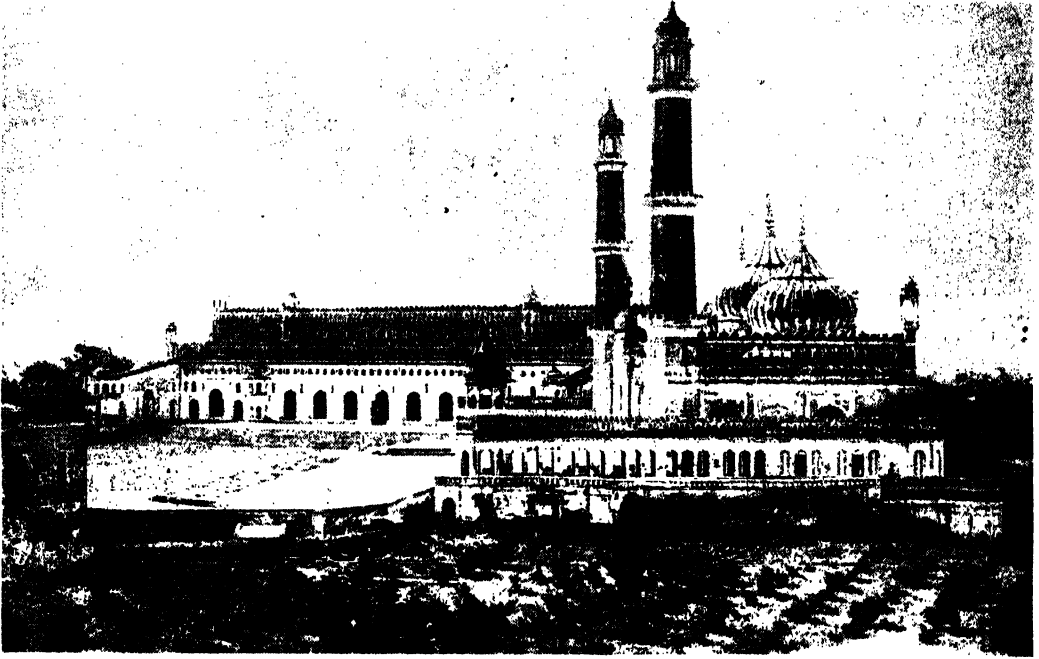
ইমামবারা ও মসজেদ

আসফদ্দৌলা এই অতুলনীয় সৌধ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই হলের মধ্যস্থলেই নবাব চিরনিদ্রায় নিদ্রিত আছেন। ইনি এখানকার ৪র্থ নবাব। ইঁহার চেষ্টায় ইঁহার সময়েই লক্ষ্ণৌ স্থাপত্য-শিল্প চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। বিশাল প্রাঙ্গণে এক পার্শ্বে একটি সুন্দর সুবৃহৎ মসজেদ আছে।

এই ইমামবারার নিকটেই মেডিক্যাল কলেজের ভবন দেখা যায়। আমরা আর ইহার ভিতর প্রবেশ না করিয়া নিকটেই লক্ষ্মণ-টিলা দেখিতে যাই। উহা গোমতী-তীরে প্রাচীন সেতুর পার্শ্বে অবস্থিত, এখন ইহা একটি

দেখিয়া বুঝা যায়, এক সময় উহার সমস্ত অংশ মূল্যবান্ প্রস্তরাদিখচিত ছিল, এখন উহা উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে। মসজেদটি আলমগীরের ভ্রাতা দ্বারা নির্ম্মিত।

মচ্ছিভবন সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন কথা শুনিয়াছি। কেহ কেহ বড় ইমামবারাকেও ঐ নামে অভিহিত করেন। আবার কেহ কেহ বলেন, ছত্রমঞ্জিলের নিকট আর একটি যে ছত্রবিশিষ্ট প্রাসাদ আছে, উহাই মচ্ছিভবন ছিল। মচ্ছি-ভবন অর্থে সিংহাসনগৃহ বুঝায়। যত দূর বুঝা যায়, উহা

বরাবর এক স্থানে ছিল না, সময় সময় উহার স্থান-পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

এখান হইতে রুমি দরজার ভিতর দিয়া ক্লক-টাওয়ার পার্কের এক পার্শ্বে অবস্থিত গ্যালারী অর্থাৎ চিত্রশালা দেখিতে যাইলাম। ইহাও একটি দ্রষ্টব্য। এখানে নবাবদিগের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চিত্র শোভিত আছে। ইহার মধ্যে শেষ নবাব ওয়াজিদ আলি খাঁর ছবিখানি আচ্ছাদিত অবস্থায় দেখিয়া তত্ত্বাবধারক ভৃত্যকে জিজ্ঞাসায় জ্ঞাত হইলাম, এই প্রতিকৃতিতে নবাব একটি পাঞ্জাবী জামা গায়ে দিয়া থাকায় উহার ভিতর দিয়া দেহাংশ দেখা যাওয়ায় মেয়েদের দৃষ্টিতে অশ্লীলতা-দুষ্ট বলিয়া ঢাকা দিয়া রাখা হয়। লক্ষ্ণৌএর মধ্যে পুষ্করিণী অতীব বিরল, এই চিত্রশালার পার্শ্বে একটি সুন্দর বাঁধান জলাশয় আছে।

গ্যালারীর নিকটেই যে ভগ্নপ্রায় অট্টালিকা দেখা যায়, উহার সম্বন্ধে কিংবদন্তী এই যে, মহম্মদ আদিল শাহ দিল্লীর জুমা মসজেদ অপেক্ষাও বৃহত্তর মসজেদ নির্ম্মাণোদ্দেশ্যে ইহা নির্ম্মাণ করাইতে-ছিলেন; কিন্তু তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই, তৎপূর্ব্বেই তিনি পরলোক প্রাপ্ত হন। ইহা সপ্ততল হইবার কথা ছিল, কিন্তু মাত্র চতুস্তল পর্য্যন্ত হইয়াছিল। এই অসমাপ্ত অট্টালিকাকে লোক সাত-খণ্ড বলিয়া থাকে।

ইমামবারা মসজেদ

ইহার পর হোসেঙ্গাবাদে ছোট ইমামবারা দেখিতে যাই। ইহা আকারে ছোট হইলেও কারুকার্য্যাদিতে বড়টি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। উপরের গম্বুজটি সুন্দর। ইহার সংলগ্ন উদ্যানটি মনোরম। ইহা মহম্মদ আলী সাহেব প্রস্তুত করাইয়াছিলেন।

এখান হইতে ফিরিবার সময় কোম্পানীর বাগান নামক সুন্দর উদ্যানের দেবদারু-বীথি দিয়া চকবাজার দেখিতে যাই। বাগানটি অতি পরিপাটী, ভিতরে একটি প্রকাণ্ড প্রস্তর-মূর্ত্তি দণ্ডায়মান আছে। চকবাজারে বহু দূর পর্য্যন্ত দুই সারি দোকান আছে। এখানে সোনারূপার দোকান অনেক। এই বাজার কতকটা কাশী বা কলিকাতার বড়বাজারের কোন কোন বাজারের মত। দোকানের উপরে বারনারীগণ বাস করিয়া থাকে। শুনিলাম, লক্ষ্ণৌয়ের বিখ্যাত বাইজীরাও এই স্থানে বাস করে।

এখান হইতে সে দিনের দেখাশুনা শেষ করিয়া আমিনাবাদে আমিনোদ্দৌলা নামক উদ্যান বেড়াইয়া বাসায় আসিলাম। ইহা সহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এবং সর্ব্বদা জনপূর্ণ থাকে, সকলের সহিত দেখাশুনা হইবার বেশ স্থান।

পরদিন প্রাতে সেকেন্দ্রা, লা-মার্টিনিয়ার প্রভৃতি দেখিবার জন্য বাহির হইয়া প্রথম পশুশালা দেখি। উহাকে স্থানীয় লোকরা বারনসিয়াবাগ বলে। শুনিলাম, ইহা অল্প-দিন মাত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু ইতোমধ্যেই অনেক পশু-পক্ষী রক্ষিত হইয়াছে দেখিলাম। ব্যাঘ্র, সিংহ যে কয়টি আছে, তাহাদের মোতি, ডেভিড, সিরাজ প্রভৃতি নাম দেওয়া হইয়াছে এবং প্রত্যেকের জন্মসাল লিখিত আছে। পশুশালার উদ্যানটি বেশ বড়। ইহার পর উইনফিল্ড পার্ক
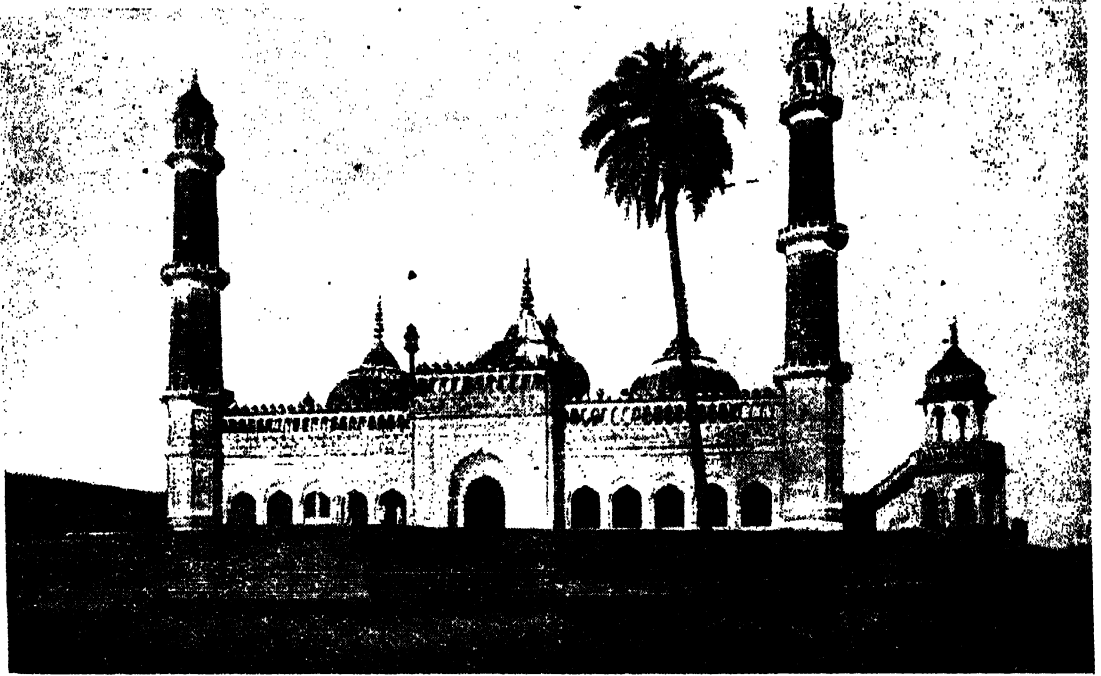
ইমামবারা মসজেদের অপর দৃশ্য

রুমি দরজা
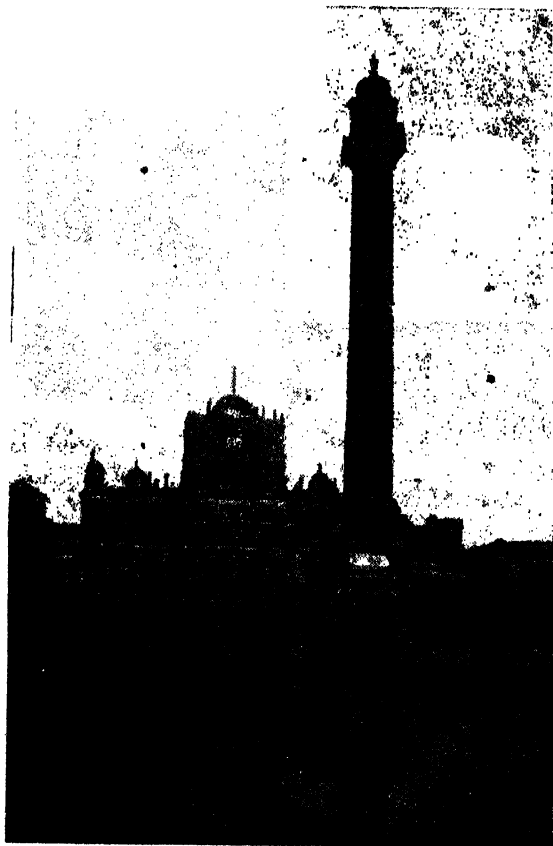
লা-মার্টিনিয়ার কলেজ ও মনুমেণ্ট

ছোট ইমামবারা—হোসেনাবাদ

হোসেনাবাদের সাধারণ দৃশ্য

নামক পরম রমণীয় উদ্যানটি অতিক্রম করিয়া লা-মার্টিনিয়ার দেখিতে অগ্রসর হইলাম। পথে মার্টিনিয়ার পার্কমধ্যে লেফ্‌টনাণ্ট লুকাস্‌, দেকস্তা, উইলিয়ম্‌ ষ্টিফেন্‌, রেক্‌হডসন্‌, আগষ্টাস্‌ ও ক্যাপটেন্‌ ব্রাভের অনাড়ম্বর সমাধিগুলি পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। ইঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহী সিপাহীদের দ্বারা নিহত হয়েন।

মৃত্যুকালে চল্লিশ লক্ষ টাকা শিক্ষা ও জনহিতকর কার্য্যে দান করিয়া যান এবং তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে পরে তাঁহার বাসভবন ইংরাজ-বালকগণের জন্য বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। এইখানেই তাঁহার সমাধি ছিল, কিন্তু সিপাহী-বিদ্রোহের সময় বিদ্রোহীরা উহা ধ্বংস করিয়া ফেলে। অট্টালিকার সম্মুখে দীর্ঘিকার মধ্যে কলিকাতার অক্টারলনি মনুমেণ্টের আকারের একটি মনুমেণ্ট আছে।
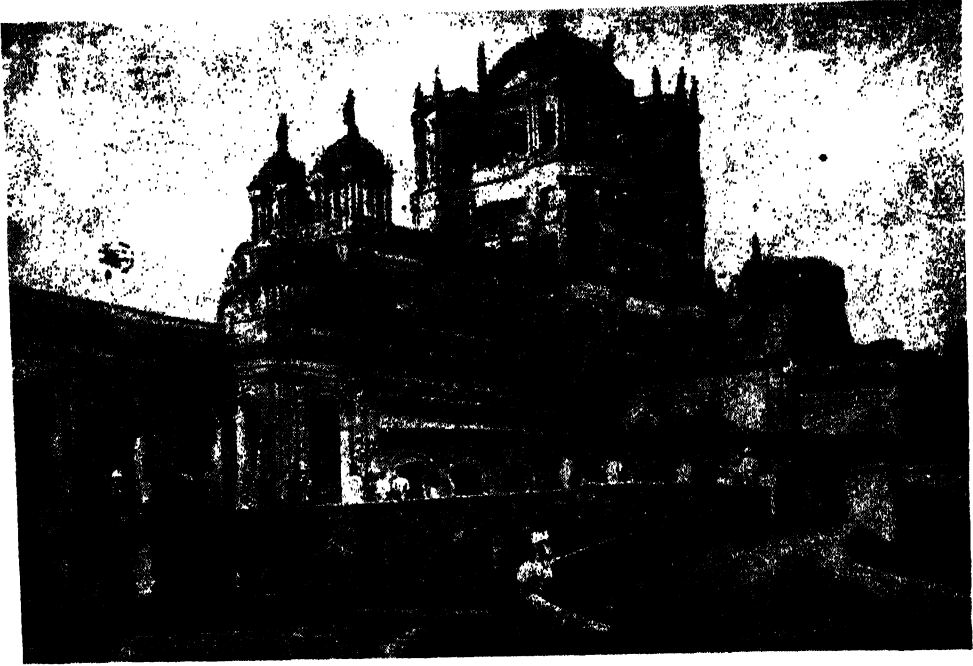
লা মার্টিনিয়ার

কিছু দূরেই লা-মার্টিনিয়ার। ইহা মেজর জেনারল ক্লড্‌ মার্টিনের অমরকীর্ত্তি। ইহা 'মার্টিন কুঠী' নামেই পরিচিত। এই ফরাসী বীর সামান্য সৈনিকরূপে ভারতে আসিয়া স্বীয় প্রতিভাবলে সৈনিক বিভাগে অতি উচ্চপদ লাভ করেন এবং প্রচুর অর্থোপার্জ্জনে সমর্থ হয়েন। ইনি বৃটিশ-গভর্ণমেণ্টের সহিত এই সর্ত্ত করিয়া কার্য্য লইয়াছিলেন যে, যদি প্রয়োজন হয়, তথাপি ইনি ফরাসীদের বিপক্ষে কখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন না। এই সুবৃহৎ অট্টালিকাটি অর্দ্ধবৃত্তাকারের। দীর্ঘ সোপানে উঠিবার পর সম্মুখের চত্বরে তাঁহার নিজ হস্তের নির্ম্মিত সুবৃহৎ কামান সজ্জিত রহিয়াছে। এই বাটীর ভিতরের পাশ্চাত্য কারুকার্য্য ও ছাদের উপরে বিবিধ মূর্ত্তি-শোভিত আলিসা অতি সুন্দর। মার্টিন

মার্টিনের এই মহাকীর্ত্তি দেখিয়া দিল্‌খুসবাগে দিল্‌খুস্‌ প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাই। ইহা লক্ষ্ণৌয়ের আর একটি বিষাদ-স্মৃতি, দেখিলে হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিয়া থাকে। যেখানে এই প্রাসাদ অবস্থিত, সে স্থানটি অতি নির্জ্জন এবং নগর হইতে কিছু দূরে। এই প্রাসাদ ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহীদের দ্বারা বিধ্বস্ত হয়, এক্ষণে ছাদ-হীন ও ভগ্ন, কিন্তু গঠন-কৌশল দেখিয়া ইহার পূর্ব্ব-সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করা যায়। ইহা সওদৎ আলী দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া শিকারাবাসরূপে ব্যবহৃত হইত। তখন এই নির্জ্জন স্থানের চতুষ্পার্শ্বের জঙ্গলমধ্যে নবাবের শিকারের জন্য জন্তুসকল ছাড়িয়া রাখা হইত। এই প্রাসাদপার্শ্বে লেপ্টন্যাণ্ট পল্‌ ও চারলস কিথ ডগউড—যাঁহারা বিদ্রোহী সিপাইয়ের গোলার

প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সমাধি আছে সার হেন্‌রী হ্যাভলকও এই স্থানেই প্রাণ দিয়াছিলেন।

এই স্থান হইতে ক্লাইভ রোড ধরিয়া সেকেন্দ্রা দেখিতে যাই। ইহাও একটি সিপাহী-বিদ্রোহের স্মৃতি-বিজড়িত স্থান। এখানে যে ভগ্ন প্রাসাদ ও বেষ্টিত স্থানটি আছে, তাহা দেখিলে তৎকালের অবস্থা কতকটা কল্পনা করা যায়। এই প্রাসাদ নবাব ওয়াজিদ আলি খাঁ তাঁহার প্রিয়তমা বেগম সেকেন্দর মহলের জন্য নির্ম্মিত করাইয়াছিলেন। এখানে বিদ্রোহী সিপাহীরা আশ্রয় লইলে ইংরাজ সৈন্যগণ যে স্থান ভেদ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তথায় প্রস্তরফলক দ্বারা চিহ্নিত করা রহিয়াছে। বিদ্রোহের সময় ১৬ই নভেম্বর এখানে যে সকল ইংরাজ সৈন্য প্রাণ হারাইয়াছিলেন, তাঁহাদের স্মৃতিরক্ষার্থ একটি স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত আছে এবং উহার গাত্রে মৃত বীরদের নাম ক্ষোদিত আছে। আর ফ্রান্সিস্ ডেভিস্ ও মারে এলেকজাণ্ডার নামক দুই ব্যক্তির সমাধি আছে।

ইহার পর সানজফ নামক বৃহৎ গম্বুজবিশিষ্ট সমাধি-মন্দিরটি দেখিতে যাই। ইহা অযোধ্যার প্রথম নবাব গাজিউদ্দীন হায়দারের সমাধি। এত বড় গম্বুজ এখানে আর নাই। ইহার অন্য নাম নজফআশ্রফ। এই সমাধি-ক্ষেত্রের প্রবেশদ্বারটির মধ্যে কিছু অভিনবত্ব দেখিলাম। তোরণের মাথায় দুইটি সিংহমূর্ত্তি আছে। এতাবৎ যে সমস্ত সমাধি, ইমামবারা, মসজেদ প্রভৃতি দেখিয়াছি, তাহার ফটক বা অন্যান্য যে সব কারুকার্য্যময় স্থান দেখিয়াছি, তাহাতে দুইটি করিয়া মৎস্য ব্যতীত অন্য কোন জীবের আকৃতি দেখি নাই। মৎস্য এখানকার রাজকীয় চিহ্ন। কথিত আছে, অযোধ্যার প্রথম নবাব নৌকাযোগে যখন যমুনার উপর দিয়া আসিতেছিলেন, তখন হঠাৎ তরণীর উপর দুইটি মৎস্য লাফাইয়া পড়ে। উহা শুভ নিদর্শন বলিয়া মানিয়া লইয়া তদবধি উহা রাজকীয় চিহ্নরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। * সানজাফের মধ্যে এখানকার নবাবদের বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি আছে।

দিলখুসবাগের দিলখুসা প্রাসাদ

এই সমাধির অনতিদূরে একটি সুবৃহৎ সুন্দর আকারের চূড়াদি-বিশিষ্ট অতি পুরাতন জীর্ণ মসজেদের মত দেখিলাম। সন্ধানে জানিলাম, উহা পুরাতন কদম্ রসুল।

এখান হইতে ফিরিবার কালে গোমতীর বাঁধ দেখিতে

* এই কিংবদন্তী কথা শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় এম, এ মহাশয়ের নিকট হইতে শুনিয়াছিলাম।

যাই। শুনিয়াছিলাম, উহার কাছে বিপুল জলস্রোতের শোভা দেখিবার মত, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ টঙ্গা যাইবার পথ খারাপ থাকায় উহা দূরস্থিত সেতুর উপর হইতে দেখিতে হইল। তাহাতে মন শান্ত হইল না। আসিবার সময় মল রোডের পার্শ্ব দিয়া হজরৎগঞ্জের পথ ধরিয়া ফিরিয়া আসিলাম। দেখিলাম, এ স্থানটি অতি রমণীয়। সুপ্রশস্ত পথের পার্শ্বে বিভিন্ন দ্রব্যাদিতে সুসজ্জিত দোকানগুলি দেখিলে হঠাৎ কলিকাতার চৌরঙ্গী রোড বলিয়া মনে হয়।

বেলা ২টার সময় লক্ষ্ণৌপ্রবাসী শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সেন মহাশয়ের সহিত স্থানীয় হরিমতি বালিকা-বিদ্যালয় ও হিন্দুমহিলা-বিদ্যালয় দেখিতে যাই। প্রথমটিতে কেবল বাঙ্গালীর মেয়েরা ও আট বৎসরের অনধিকবয়স্ক ছোট ছেলেরা পড়ে। প্রায় ১ শতটি ছাত্র-ছাত্রী আছে। ইহার গৃহনির্ম্মাণ ও অন্যান্য বিষয়ে উন্নতির জন্য প্রবাসী বাঙ্গালীদের বিশেষ চেষ্টা আছে। দ্বিতীয়টি হিন্দুস্থানী ছেলেমেয়েদের জন্য। ইহা একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়। ইহার সঙ্গে ছাত্রীনিবাসও আছে। এখানকার ছাত্র-ছাত্রীসংখ্যা মোট ২ শতের উপর। আমরা পুরুষ বলিয়া শেষোক্ত বিদ্যালয়ের ক্লাশপরিদর্শন ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না,—যদিও শুনিলাম, এখানে পুরুষ শিক্ষকের স্থান আছে। আর একটি বিচিত্র কথা শুনিলাম, এখানে যে শিক্ষয়িত্রী থাকেন, ছাত্রীদের সহিত তাঁহাদেরও মৎস্যমাংস আহার নিষিদ্ধ—যদিও খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী শিক্ষয়িত্রীদের এখানে স্থান আছে। যাহা হউক, এই বিদ্যালয়টি দেখিয়া ও ইহার ব্যবস্থাদি শুনিয়া ভালই মনে হইল। উভয় বিদ্যালয়েই একপ্রকার মানুষে-ঠেলা যান দেখিলাম, উহা আমাদের দৃষ্টিতে নূতন। আমাদের দেশে নারীশিক্ষালয়সমূহে উহা চলিতে পারে কি না, ভাবিবার বিষয়।

এখান হইতে নসরদৌলা কাছারী নামক ভবন দর্শন করিতে যাইলাম। উহা একটি সুবৃহৎ অট্টালিকা, নসির-উদ্দীন দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। উহাতে এখন কমিশনরের আফিস আছে।

সানজফ

সন্ধ্যার পর জ্ঞান বাবু আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া প্রবাসী বাঙ্গালীদের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাসাগর-পাঠাগার ও বেঙ্গলী এসোশিয়েসন দেখিতে লইয়া যাইলেন। দেখিলাম, উহা সারাদিনের পরিশ্রমের পর আত্মীয়বন্ধুহীন বিদেশে অবসর অতিবাহিত করিবার ও প্রবাসী বাঙ্গালীদের মিলিত হইবার একটি সুন্দর স্থান।

রাত্রিতে বাসায় ফিরিয়া আসিবামাত্র শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি তাঁহার বাসায় পরদিন মধ্যাহ্নভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন, আমরা সানন্দে তাহা গ্রহণ করিলাম। পরে নানা বিষয় কথোপকথনান্তে তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন। আমরাও আহারান্তে লক্ষ্ণৌ-প্রবাসের তৃতীয় রজনী সুখ-সুপ্তিতে অতিবাহিত করিলাম।

পরদিন প্রাতে আর বড় কোথাও বেড়াইতে যাইলাম না। লক্ষ্ণৌ ভ্রমণের স্মৃতি-নিদর্শন হিসাবে মাটীর ফল-মূল ও অন্যান্য জিনিষ কিনিবার মানসে একবার বাহির হইয়াছিলাম মাত্র। পূর্ব্বের দিনের কথামত ১১টার সময় রাধাকমল বাবুর বাসায় যাইলাম। একটি মনোরম ছোট বাগানের মধ্যে তাঁহার বাটীর বাহিরের পরিচ্ছন্ন কক্ষটিতে বসিয়া তাঁহার সহিত বহু বিষয়ের বহু কথোপকথন হইল। সেই প্রসঙ্গে শুনিলাম, লক্ষ্ণৌএ যত অধিক লোক টিউবার কুলোসিস রোগে প্রাণ হারায়, জগতে আর কোন দেশে এত লোক এই রোগে মরে না। এমন সুন্দর—এমন মুক্ত আলোকবাতাসময় স্থানে এই ভয়ানক রোগের এত অধিক প্রাবল্য শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। তিনি অনুমান করেন, পথের ধূলার আধিক্যই ইহার কারণ।

যথাসময়ে ব্রাহ্মণবাড়ীতে প্রসাদ পাইলাম। বলা বাহুল্য, আহারটা কিছু গুরুতরই হইয়াছিল, কিন্তু সে দিন লক্ষ্ণৌ পরিত্যাগের সংকল্প থাকায় আর বিশ্রাম না করিয়া তাঁহার সহিত তখনই ক্যানিং কলেজ দেখিতে যাই। তিনি সেখানকার এক জন অধ্যাপক। এই কলেজ-ভবন, উহার পুস্তকাগার, উহার মধ্যস্থ বেনেট মেমোরিয়েল হল প্রভৃতি দেখিলাম। বক্তৃতাদির জন্য এরূপ বৃহৎ ও সুন্দর হল এখানে আর কোথাও নাই। এই হলের উপর বহু দেশ-বিদেশের মহামনস্বী ও বিদ্বজ্জনগণের নাম সুবর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে দেখিলাম; তন্মধ্যে আমাদের কালিদাসের নামটি লেখা আছে। এখান হইতে বরাবর বাসায় ফিরিলাম।

দুই দিন ঘুরিয়া ফিরিয়া সহরটি সম্বন্ধে একটি বেশ ধারণা জন্মিল। শুনা ছিল, লক্ষ্ণৌয়ের খরমুজা, খিলিপান, দোলাই, বালাপোষ, বাইজী আর লক্ষ্ণৌ ঠুংরির কথা। এখানে আসিয়া উদ্যান, মসজেদ, সমাধি-মন্দির ও প্রাসাদময় লক্ষ্ণৌয়ের শিল্পাদি বিষয় অনুসন্ধানে জানিলাম, এখানে চিকনের কায, তামাক, জর্দ্দা, মাটীর পুতুল ও মাটীর ফল-মূল, বিদরি ও ছিটের কাযের জন্য এবং সফেদা নামক আমের জন্য কিছু প্রসিদ্ধি আছে। শুনিলাম, আগ্রার পর এখানকার মত এত জুতার কায ভারতের অন্যত্র নাই। এমন উদ্যানময় ও সুন্দর পথ এবং সৌধবিশিষ্ট সহর খুব কমই আছে। নবাবদের সময় এ স্থান যে সর্ব্বদা আমোদ-প্রমোদে ও বিলাসস্রোতে ভাসিত, এখনও সহর দেখিলেই তাহা মনে পড়ে। বৃন্দাবন বা কাশীতে যেমন একটা উঁচু ছাদে উঠিলে চারিদিকে মন্দিরের চূড়া সকল পরিদৃষ্ট হয়, এখানেও সেইরূপ চতুর্দ্দিকে মসজেদ, মঞ্জিল বা গম্বুজাদি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া নবাবদের ঐশ্বর্য্য, বিলাসিতা ও রুচির কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

এখানকার একটি অতি সুন্দর স্মৃতি লইয়া জ্ঞান বাবুর সরল অকৃত্রিম আতিথেয়তার কথা ভাবিতে ভাবিতে বৈকালে আমরা লক্ষ্ণৌ পরিত্যাগ করিলাম।

শ্রীহরিহর শেঠ।

মেয়ের মেয়ে

মাধব একটা মেয়ে কুড়াইয়া পাইয়াছিল। দয়াপরবশ হইয়া সে তাহাকে আবাসবাটীতে স্থান দিল, তাহার লালন-পালনের ভার গ্রহণ করিল। মাধবের পত্নী ইন্দিরা তাহাতে ঘোর আপত্তি করিয়াছিল। তাহার কথা—রাস্তার ছেলে-মেয়ে কুড়াইয়া আনিয়া মানুষ করায় অনেক বিপদ আছে, সুতরাং ও আপদ-বালায়ে আর কায নাই।

মাধব জিজ্ঞাসা করিল—"আপদ কিসে?"

"যার জন্য বিপদ হ'তে পারে, জাত নিয়ে টানাটানি হ'তে পারে, সে আপদ নয় ত কি?"

"শিশুর আবার জাত কিসের?"

"আজ যে শিশু আছে, কা'ল সে বড় হবে।"

মাধব হাসিয়া বলিল—"তা ত তুমি আমিও হয়েছি—তাতে তোমার আমার জাত গেছে না কি?"

বিরক্ত হইয়া ইন্দিরা উত্তর দিল—"জাত না থাক্‌লে যেত, আছে ব'লেই যায় নি। জাত যদি থাকে ত মারে কে? কিন্তু না থাক্‌লে যাবার ভয়ই সদাসর্ব্বদা।

"বুঝলাম না।"

"বুঝতে পারবেও না ও সব বুঝতে হ'লে কিছু মেধার আবশ্যক আছে।"

"তুমি কি বল, আমার তা নাই?"

"আমার তা বলবার অধিকার নাই, কেন না, আমি হিঁদুর মেয়ে। কিন্তু তুমি আমাকে পচা নাটক-নভেল পড়িয়ে পড়িয়ে আর স্ত্রী-স্বাধীনতার মন্ত্র শিখিয়ে যে রকম ক'রে তুল্‌ছিলে,—"

"কি ক'রে তুলেছি?"

"খাঁটি মেম—মিসেস্ দত্ত।"

"তার পর?"

"তার পর আর কি—ঠাকুরঝির ভর্ৎসনায় লুকিয়ে রামায়ণ, মহাভারত, গীতা প্রভৃতি পড়তে পড়তে আবার যা ছিলাম, তাই হয়েছি।"

বীরের ভঙ্গীতে হাত দুইখানা বুকের উপরে রাখিয়া মাধব শ্লেষসহকারে কহিল—"বেশ করেছ, আমার মাথা কিনেছ। ভগবানের কাছে হিঁদু, মুসলমান, বৌদ্ধ কেরেস্তান্ আছে বুঝি?"

গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে একটু তরল হাসি মিলাইয়া ইন্দিরা বলিল—"কোণঠ্যাসা হয়েছে ব'লে অম্‌নি বেদান্তের ভাব এনে ফেললে বুঝি? যা-ই বল, ও কুড়োন মেয়েকে আমি ঘরে যায়গা দিতে পারব না কিছুতেই। ওকে বরং একটা আশ্রমে পাঠিয়ে দাও—যা খরচ লাগে, আমি দিতে রা আছি।"

মাধব বুঝিল, ভারী গোল। ইন্দিরা যখন ঝুঁকিয়া বসিয়াছে, তখন কুড়ান মেয়েটাকে সে বাড়ীতে আশ্রয় দেওয়া ভারী কঠিন। তবু একবার শেষ চেষ্টা করিল—ক্রোধের ভাণ করিয়া সে কহিল—"আমার কথার উপর তোমার কথা বল্‌তে সাহস হয়?"

"সেই সাহস দিয়েই ত নারায়ণ সাক্ষ্য ক'রে আমাকে তোমার গৃহলক্ষ্মী ক'রে এনেছ। তোমার সেবায় যেমন আমি দাসী, পরামর্শ দিতেও তেমনই আমি মন্ত্রী। বাঘ-ভালুকের মত তোমাকে কেবল ভয়ই করলে আমার বাপ-মা তোমার হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবেন কেন?"

মাধবের হাত দুইখানা এইবার বুক হইতে কোমরে আসিল। পা দুইখানাও একটু আগুপাছু হইয়া গেল। সেই ভাবে দাঁড়াইয়া মাধব কহিল—"তা হ'লে কথা তুমি আমার শুন্‌বে না?"

"যা শুনবার, তা শুন্‌তে বাধ্য; কিন্তু যেটা অন্যায়

ব'লে বেশ মনে হচ্ছে, সেটা কেমন ক'রে শুনি, তা তুমিই ব'লে দাও।"

"ও সব ত হ'ল ন্যাকামীর কথা।"

"কতকটা তাই বটে—ওগুলো হচ্ছে পচা নাটক-নভেলের জাবর কাটা।"

"আমি না তোমার পরম গুরু?"

"কে বলেছে, তুমি অগুরু?"

"রঙ্গ করছ, তামাসা করছ—ঠাট্টা-বিদ্রূপ, কৌতুক?"

"ভগিনীপতি হ'লে ও সব সাজত। আর তোমার সঙ্গে তাই যদি করি, তা হ'লেও কি মান-হানির মামলা হ'তে পারে না কি?"

"আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, তোমাদের যে ঐ সাবিত্রী, যিনি শুনতে পাই, যমের বাড়ী থেকে সত্যবান্‌কে ফিরিয়ে এনেছিলেন, তিনিও স্বামীর সঙ্গে ঐ রকম বাগ্‌বিতণ্ডা করতেন না কি?"

"আমার ত মনে হয়, খুবই করতেন। তা না করলে স্বামীর সঙ্গে বনের ভিতর যেতেই পেতেন না। স্বামি-সোহাগিনী স্বামীকে অন্যায় করতে দিতে পারে না ত।"

"সেই অজুহাতে স্বামীর অবাধ্য হবে?"

"অন্যায় জিনিষটার প্রতিবাদ করা এক,—আর অবাধ্যাচরণ আর।"

"বলি হাঁগা, আমি কি মাষ্টার মহাশয়ের কাছে পড়া নিচ্ছি, না টাউন হ'লে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুনছি? একটা তুচ্ছ জিনিষ নিয়ে তুমি এতটা বাড়াবাড়ি করছ কেন বল ত?"

"বাড়াবাড়ি আমি করছি, না তুমিই করছ? পথের ধূলায় পড়া একটা মেয়েকে ঘরে এনে, তুমি লাঞ্ছিতা করছ তা'কে যে—যে—যে—"

ইন্দিরা আর কথা কহিতে পারিল না। তাহার নয়ন-জলের বন্যা মাধবকে সঙ্কল্পভ্রষ্ট করিয়া দিল।"

শুকচরের চরণ থেটো জাতিতে ধীবর, কিন্তু কায করিত মাঝির। তাহার বাস মাধবের জমীদারীতে, মাধবের পিতাকে একবার নৌকাডুবী হইতে বাঁচাইয়াছিল বলিয়া সে পরিবারে তাহার বেশ একটু স্নেহাদর আছে। কর্ত্তা স্বর্গগত হইয়াছেন। মাধবের স্নেহাদর হইতে সে কিন্তু বঞ্চিত হয় নাই।

চরণ এখন আর শুকচরে থাকে না। বিপত্নীক হইয়া সে বৈষ্ণবের ভেক গ্রহণ করে। তাহার কণ্ঠস্বর ছিল ভাল। মাঝির কায ছাড়িয়া দিয়া কীর্ত্তনের দলে সে যোগদান করিল। উপার্জ্জন তাহাতে তাহার মন্দ হইত না। চরণ থেটো এখন নামকীর্ত্তন করে। কিন্তু পূর্ব্বে যে সে মাঝির কায করিত, যাহার জন্য তাহার 'চরণ নেয়ে' নামের প্রসিদ্ধি, সে নাম কিন্তু এখনও বজায় আছে। তাহার জন্য চরণের দুঃখ নাই। চরণ লোক ভাল। বৃদ্ধবয়সে বুদ্ধির দোষে চরণ কিন্তু একটা গর্হিত কায করিয়া বসিল। তাহার কিছু টাকা ছিল। সেই টাকার লোভেই হউক, আর তাহার সুকণ্ঠ শুনিয়াই হউক, একটি মধ্যবয়স্কা বৈষ্ণবী তাহার স্কন্ধে আসিয়া ভর করিল। পাঁচ সিকা খরচে কণ্ঠী-বদল হইয়া গেল—চরণ আবার গৃহী হইল।

তাহাতেই ত চরণের যত বিপদ্। সে বিপদ বৈষ্ণবীর রূপ প্রযুক্ত। কয়েক জন প্রেমিকের উৎপাতে চরণ স্বগ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতায় মাধু-দাদাবাবুর আশ্রয়ে আসিয়া বৃদ্ধ-বয়সের পুঁটুলী রক্ষা করিবার পরামর্শ ভিক্ষা করিল। আশ্রয়-স্থান সে পাইয়াছিল—মাধবের বাটীসংলগ্ন একটা খোলার বস্তিতে। ঋতু হিসাবে কুল্‌পী-বরফ ও ঘুগ্‌নিদানা বেচিয়া সে এখন জীবিকা উপার্জ্জন করে।

মাধব অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কুড়ান মেয়েটিকে তাহারই তত্ত্বাবধানে রাখিয়া দিল। মেয়েটিকে লালন-পালনের জন্য ব্যয় বহন করিতে হয় অবশ্য মাধবকেই। কুড়ান মেয়ের এখন নাম হইয়াছে—সোহাগ। এমন অপূর্ব্ব নামকরণের কৃতিত্ব অবশ্য শ্রীচরণেরই। কিন্তু সোহাগ বলিয়া তাহাকে বড় কেহ একটা ডাকিত না। সকলেই বলিত—'নেয়ের মেয়ে।'

অনেকের হয় ত ধারণা হইয়াছে, কুড়ান মেয়েটি সম্ভবতঃ "ন্যাক্‌ড়া-চোপ্‌ড়া" চাপা অবস্থায় পথের ধারে আবর্জ্জনা-স্তূপের উপরেই পড়িয়া ছিল। মাধব তাহাকে কুড়াইয়া আনিয়াছে।

সে কথা কিন্তু ঠিক নহে। সোহাগ যখন মাধবের আশ্রয়ে আসে, তখন তাহার বয়স ৩।৪ বৎসর হইবে। শিয়ালদহ ষ্টেশনের নিকটে তাহাকে অসহায় অবস্থায় পাওয়া যায়।

পিতার নাম-ধাম সে কিছুই বলিতে পারে নাই—অথবা যাহা বলিয়াছিল, তাহাতে ঠিকানা করা অসম্ভব।

পুলিসকে জানাইয়া মাধব কন্যাটিকে আপন তত্ত্বাবধানে রাখিবার ব্যবস্থা করিল। সংবাদপত্রাদিতে কুড়ান-কন্যার সম্বন্ধে বিস্তর বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল; কিন্তু তাহার সম্বন্ধে কেহই কোনও অনুসন্ধান করে নাই।

আভিজাত্যের কথা লইয়া মাধবের আত্মীয়-স্বজন অনেক কথা কহিয়াছিল। মাধবের উত্তর—"যখন মেয়েটার বিরুদ্ধে কিছু জানা নাই, তখন ওর জন্ম সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করা যেতে পারে কেমন ক'রে? ও ত বামুন-কায়েতের মেয়েও হ'তে পারে!"

এক জন বিদ্রূপ করিয়া বসিল—"তারা বোধ হয় সখ ক'রে শেয়ালদ' ষ্টেশনে ছেড়ে দিয়ে গেছে—মাধব বাবু তাকে পুষ্‌বে ব'লে!"

মাধব একটু উত্তেজিত হইয়া বলিল—"তারা হয় ত তোমার মত জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনা করে নাই। তবে এটা ত মনে ক'রে নেওয়া যেতে পারে, যাদের মেয়ে হারিয়েছে, তারা হয় ত দারিদ্র্যদোষদুষ্ট, অথবা তারা ও পারে পাড়ি জমিয়েছে।"

"আর তাদের আত্মীয়-স্বজন মেয়েটাকে ছেড়ে দিয়ে গেছে।"

"অসম্ভব কি—সেটা দারিদ্র্যেও হয়, আবার ধনের লোভেও হয়।"

"অর্থম্?"

মাধব হাসিয়া বলিল—"অনর্থম্।"

কূট তর্ক অনেক হইল—মাধবের কিন্তু তাহাতে পরাজয় একবারেই হয় নাই। মাধব শেষ কথা বলিল—"তর্কচ্ছলে যদি স্বীকারই করা যায়, মেয়েটা অজাত কুজাতের, তাতেই বা মহাভারত অশুদ্ধ হইল কোন্‌খানে? তার জন্মের জন্য সে দায়ী নয় এতটুকুও, দায়ী হচ্ছে তা'রা, যা'রা ওকে সংসারে এনেছে। তোমরা তাদের কেশাগ্রভাগও স্পর্শ করতে পার না, আর অত্যাচার কর্‌ছ তার উপরে,—যা'র শৈশবেই স্থান হয়েছে পথের ধূলায়। মাতৃজাতি ইন্দিরাও তাকে আশ্রয় দিতে দ্বিধা বোধ করেছে, তোমরা তাকে যে গলা টিপে মার্‌তে চাইবে, তার আর আশ্চর্য্য কি? ধিক্!"

"ধিক্ কাকে মাধব ভায়া?"

"এই আমাকেই"—কথাটা বলিয়াই সে স্থান ত্যাগ করিল।

৩

সোহাগ নেয়ের মেয়ে হইয়াও বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে আশ্চর্য্য সুন্দরী হইয়া উঠিল। মানুষের মন্তব্যে সেরূপ হওয়াটা কোনওরূপেই বন্ধ হয় নাই—হওয়া সম্ভবও নহে। মানুষের ক্রোধের মাত্রা বৃদ্ধি হইল তাহাতেই। সোহাগ অরূপা হইলে হয় ত তাহা হইত না—হয় ত মানুষ তাহার কথা ভুলিয়াই যাইত। তাহাকে 'অগ্রাহ্যের' গণ্ডীর মধ্যে ফেলিয়া রাখিত।

গোলযোগ আরও বাড়িল নেয়ের মেয়ের গুণালঙ্কারে মাধবের চেষ্টা ও যত্নে সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ের মতই তাহার শিক্ষা ও চালচলন হইয়াছিল। সে জিনিষটা "ছিচরণের" বৈষ্ণবীও পছন্দ করে না, আর ইন্দিরারও মনঃপুত নহে। ইন্দিরার কথা—তাহার স্বামীর সকল বিষয়েই বাড়াবাড়ি। আর বৈষ্ণবী চায় সোহাগকে তাহারই মত রসকলি-সজ্জিতা বৈষ্ণবী করিতে। মাধবের যাহারা জ্যোতিষবেত্তা আত্মীয়-স্বজন, তাহারা বলাবলি করিল—"নেয়ের মেয়েকে অমন ক'রে বাইজী তৈরী করার অর্থ বড় গভীর।"

বৈষ্ণবীর উপদ্রবের কথা—বৈষ্ণব শ্রীচরণের কাণে পৌছাইয়াছিল। বৈষ্ণবীকে ডাকিয়া সে বলিল—"ত্যাখ মাগী, নিজে যা' হয়েছিস, তাই থাক্। মেয়েটার ভাল-মন্দ কথায় তুই যদি থাক্‌বি, মাধু দাদার উপর যদি তুই চাল চালবি, তা' হ'লে তোর সঙ্গে কণ্ঠী-বদল আমি ফিরিয়ে নেব—হাঁ, আমি এমন চরণ নেয়ে নই!"

চরণের শাসনে সোহাগের উপর বৈষ্ণবীর উপদ্রব-অত্যাচার হ্রাস পাইল না, বরং গোপনে গোপনে আরও বাড়িয়া উঠিল। যখন সে অত্যাচার 'সহ্যের' সীমা অতিক্রম করিল, তখন মাধবকে এক দিন সুবিধা সুযোগে নির্জ্জনে পাইয়া সোহাগ বলিল—"আমাকে নিয়ে আপনি কি কর্‌বেন বাবা?"

তাহার কুঞ্চিত সুদৃশ্য কেশগুচ্ছ মুখের উপর হইতে সরাইয়া দিয়া সহাস্যে মাধব কহিল—"কেন মা?"

"এই যে এত কাণ্ড হচ্ছে, এটা ত আমারই জন্যে? আমিই হয়েছি আপদ্।"

তাহার কণ্ঠে অভিমানের সুর ছিল। মাধব সেই সুর-টাকে খুব বেশী ভয় করে। ভয়বশতই সোহাগের কথাটা মাধব চাপা দিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু সোহাগের নয়নজল তাহার সে চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিল। আট দশ বৎসর কাল সোহাগ মাধবের কাছে বাৎসল্য-স্নেহ পাইয়াছে। তাহা-তেই মাধবের উপর তাহার এতটা দাবী।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া মাধব সোহাগকে জিজ্ঞাসা করিল—"তুই আমাকে কি কর্‌তে বলিস্, মা ?"

"তা ত আমি জানি না বাবা। আমি চাই, আপনি কিসে সুখী হন ?"

"ঠিক্ কি তাই ! তুই আমার কে যে, আমার জন্য তুই এতটা ভাবিস্ ? মানুষের স্ত্রী-পুত্র কন্যাও ত আজকালের দিনে এতটা ভাবে না রে ! আচ্ছা, সুখী হবারই চেষ্টা করব। তা হলেই তুই সুখী হবি, কেমন ?"

"হাঁ বাবা।"

আর কোনও কথা না বলিয়া সোহাগ মাধবের মাথার পাকা চুল তুলিতে আরম্ভ করিল।

"মাথায় কেহ হাত দিলেই মাধবের নয়ন মন্ত্রবলে মুদ্রিত হইয়া যায়—সময়ে সময়ে তাহার নিদ্রাকর্ষণও হয়। নয়ন মুদ্রিত করিয়া মাধব জিজ্ঞাসা করিল—"হাঁ রে সোহাগ, কথায় কথায় তুই এত কাঁদিস্ কেন বল্ দেখি ? তোর চোখ ভারী পান্‌সে বাপু। কগাছা পাকা চুল তুল্‌লি রে—মাথা ওজড় করিসনি ত ?"

সোহাগ হাসিয়া বলিল—

"পাকা চুল ত বেশী নেই, বাবা। দু একগাছা যা আছে, তাই খুঁজে খুঁজে তুল্‌ছি।"

"আচ্ছা যা, আজ তোর ছুটী। চরণ টাকা-কড়ির কথা কিছু বলেছে না কি রে ?"

"তিনি বলেন নি—দাসীমা বল্‌ছিল।"

চরণের বৈষ্ণবীকে সোহাগ দাসী-মাই বলে। চরণকে বলে—গোঁসাই।

চক্ষুরুন্মীলন না করিয়াই মাধব বলিল—"চাবী ঐ টেবলের উপরে আছে। যা দরকার, আলমারী খুলে নিয়ে যা। আর ছাখ্—আচ্ছা, এখন থাক্। শুনছিস্ মা—ঐ—ঐ—"

মাধবের সরু মোটা নাসিকা-ধ্বনি হইতে লাগিল। সোহাগ দেরাজ খুলিয়া আবশ্যকমত টাকা লইয়া চাবী যথা-স্থানে রাখিয়া চলিয়া গেল।

৪

গোপনে চেষ্টা করিয়া মাধব সোহাগের জন্য একটি সুপাত্র যোগাড় করিল। পাত্র অসবর্ণ বিবাহের পক্ষপাতী। জাতিবিচারও সে মানিত না। সে স্বয়ং জাতিতে ব্রাহ্মণ। প্রতীচ্য শিক্ষার ফল !

ইন্দিরা শুনিয়া বলিল—"এটা ঠিক্ হচ্ছে না। জাত্ সে না মান্‌তে পারে, কিন্তু আমরা তার পোষকতা করি কেন ?"

বিরক্ত হইয়া মাধব জিজ্ঞাসা করিল—"তা হ'লে তুমি কি বল্‌তে চাও ?"

"আমার কিছু বলা ভারী শক্ত। তুমিই বিবেচনা ক'রে যা করা উচিত, তাই কর।"

"তবে কি একটা হাড়ি, ডোম, মেথর ধ'রে তা'র হাতে মেয়েটাকে দিতে বল ?"

ইন্দিরা সশব্দে হাসিয়া উঠিল।

মাধব জিজ্ঞাসা করিল—"হাস্‌লে যে ?"

"বলি, তুমিই ত এই জাত্ মানছ। কৈ হাড়ি-ডোমকে ত তুমি মেয়ে দিতে পারছ না। তবুও সে নিজের মেয়ে নয়। আর যে বিয়ে করতে চাচ্ছে, সেই কি ঐ হাড়ি-ডোমের ঘরে বিয়ে করতে পারে না কি ?"

মাধব কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেল। সহজে সে আর কথা কহিতে পারিল না। ইন্দিরা বলিতে লাগিল—"সোহাগকে যে সে বিয়ে কর্‌তে চাচ্ছে, তার কারণ—হয় ত রূপের মোহ, না হয় টাকার লোভ। সে ত শুনেছে, তোমার অনেক টাকা, আর তুমি অপুত্রক ?"

মস্তক কণ্ডুয়ন করিতে করিতে মাধব বলিল—"তা ত শুনেইছে।"

"সুতরাং তার আশা, তুমি তার একটা কিছু হিল্লে ক'রে দেবে—অন্ততঃ তার বিলেত যাবার খরচটা তুমি যোগাবে।"

মাধব সাশ্চর্য্যে কহিল—"হাঁ ঠিক তাই—এ সব কথা তার সঙ্গে হয়ে গেছে। তুমি জান্‌লে কেমন ক'রে বল দেখি ?"

ভিখারিণী

ইন্দিরা গম্ভীরভাবে বলিল—"মন নারায়ণ। যাক্ গে সে কথা, এই যে অব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের হুমকী মেরে তোমার পালিত কন্যাকে বিয়ে কর্‌তে চায়, সে নিজের দিন কিনে নিয়ে কি করবে জান ?"

উৎকণ্ঠিতভাবে মাধব জিজ্ঞাসা করিল—"কি ?"

"সোহাগকে ত্যাগ।"

"তাই না কি ?"

"খাঁটি তাই। আর তোমার জ্ঞাতিবর্গ, যারা তোমার বিষয় পাবার আশায় তোমার আমার মৃত্যুকামনা প্রতিদিন করছে, তারা তোমার বেচাল দেখে কি কর্‌বে জান ?"

"না।"

"হতাশ হয়ে গায়ের জ্বালায় নানারকমে তোমার কলঙ্ক ঘোষণা কর্‌বে। তখন তোমার শেষ জীবন অশান্তির আগ্নেয়গিরি হয়ে উঠবে।"

"তা হ'লে তুমি কি পরামর্শ দাও ?"

"আমার পরামর্শ তুমি কখনও গ্রহণ কর নাই, আজ কর্‌বে কি ?"

"কর্‌ব, তুমি বল।"

"মেয়েটাকে একটু ভাল ক'রে লেখাপড়া শিখিয়ে দাইগিরী শেখার স্কুলে ভর্ত্তি করিয়ে দাও। তার পর ওর কপালে যা আছে, তাই হবে।"

কথাটা মাধবের মনঃপূত হইল না। কি করিবে, তাহাই সে বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

চরণ আসিয়া সংবাদ দিয়া গেল—সোহাগের হঠাৎ বেহুঁস জ্বর।

মাধব ডাক্তার আনাইল, চিকিৎসা করাইল, কিন্তু সুবিধা হইল না কিছুই। রোগ ইনফ্লুয়েঞ্জা। ছয় সাত দিন রোগভোগ করিয়া অভাগিনী বালিকা পরপারে চলিয়া গেল। তাহাতে তাহারও মুক্তি হইল আর মাধবও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। মাধব তাহার কিছু সম্পত্তি দানপত্র করিয়া নেয়ের মেয়ে সোহাগের স্মৃতিতে দাতব্য ভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছে। সে ভাণ্ডার হইতে নিঃসহায় বহু পুরুষ ও স্ত্রীলোক সাহায্য পাইয়া থাকে। নেয়ের মেয়ের নামে যাহারা নাসিকা কুঞ্চিত করিত, তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও নাম দাতব্যভাণ্ডারের পাকা খাতায় দেখিতে পাওয়া যায়। নেয়ের মেয়ের স্মৃতিকথা এখন অনেকের ইষ্টমন্ত্রের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিশেষ মহাপূজার সময়ে। নবমীর দিন যে আসিয়া মাধবের কাছে নেয়ের মেয়ের নাম করিয়া দুইটা ভাল কথা বলিয়া যায়, মাধব তাহাকেই একখানি লালপাড় সাড়ী, একটি 'সিধা' ও একটি টাকা দিয়া বলিয়া থাকে—"তোমরা আশীর্ব্বাদ কর, নেয়ের মেয়ের আত্মার সদ্‌গতি হ'ক।"

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।

কালিদাস

অমরার কবি-সভা উজল করেছ আজি
কবিকুলশশী,
ইঙ্গিতে কিন্নরী নাচে, সঙ্গীতে তোমার শিষ্যা
মেনকা উর্ব্বশী।
কুমার, বাজাতে বীণা শিখিছে তোমার কাছে
ফেলি শরাসন,
তন্বী শ্যামা যক্ষরামা অলকায় করে তোমা
আজি নিমন্ত্রণ।
কন্যা ভগিনীরই মত করিছে তোমার সেবা
সীতা ইন্দুমতী
ঔশীনরী শকুন্তলা। দেবতাশুদ্ধান্তে তব
অবারিত গতি।
অকাল-বসন্তে যার দুঃখে কেঁদেছিলে, আজি
সঁপিছে সে পায়,
অর্ঘ্য চিরবসন্তের। যক্ষসখা যুথীহার
উষ্ণীষে পরায়।
পুরূরবা ছত্র ধরে দুষ্মন্ত ব্যজন করে।
ছুড়ে পুষ্পশর
তোমারি নিদেশে স্মর, দূতরূপে বার্ত্তা বহে
আবর্ত্ত পুষ্কর।
সীধুপাত্র মাধবিকা ভরে নিত্য, মালবিকা
মালিনী নন্দনে।
অনসূয়া প্রিয়ম্বদা চর্চ্চিত করিছে সদা
ও-অঙ্গ চন্দনে।
ধরিয়া অঙ্গুলি তব নেচে ঘুরে চিরশিশু
সে 'সর্ব্বদমন।'
পূজিছ বাল্মীকি সাথে শ্রীমন্দার পারিজাতে
বাণীর চরণ।
বহিয়া বিরহব্যথা কহিতে যাদের কথা
মর্ত্ত্যের প্রবাসে
রসানন্দে মাতোয়ারা আজি সবে রয় তারা
ঘেরি চারি পাশে।

শ্রীকালিদাস রায়।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সারারাত্রির সেই ভীষণ দুর্য্যোগের পর মেঘমুক্ত সমুজ্জ্বল দিবস প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রগাঢ় নীলবর্ণের আকাশে শুক্তি-শুভ্র-পুঞ্জ-মেঘ সূর্য্যালোকে তুষার-পর্ব্বতের মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, আবার তাহা সচল থাকিয়া সেই নগরস্থিত দর্শকের বিস্মিত চিত্তে সস্মিতভাব জাগ্রত করাইয়া দিতেছিল, যে দিনে অচলনামধারিগণ সচল হইয়া উঠিয়া, সূর্য্যের গতি-পথ-রোধেরও স্পর্দ্ধা ধারণ করিতেন, আবার নর-দেহধারণ উগ্রতপা মহর্ষির শাসনে চিরদিনের মতই সেই উচ্চাভিলাষে সম্পূর্ণ জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক নিঃশব্দে তাঁহারই চরণোদ্দেশে প্রণত হইয়া রহিতেও হীনতা বোধ করিতেন না। তাঁহারা হয় ত বুঝিতেন, মহতের বিনয়ে হীনতা প্রকাশ পায় না ; পরন্তু তাহাতে মহত্ত্বই প্রকটিত হয়।

গত রাত্রির ঝটিকা ও বজ্রপাত পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরীর ইতস্ততঃ কতকগুলি আক্রমণ-চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছিল। নগরীর মধ্যবর্ত্তী ও প্রান্তবর্ত্তী রাজমার্গের দুই পার্শ্বে ছায়া-তরুগুলির মধ্যে অনেকগুলি পথশায়ী হইয়া আছে। সুন্দর সুসজ্জিত উপবনগুলিতে বিলাসকুঞ্জগুলির লতাজাল ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে বিশালকায় অশ্বত্থ, বট সমূলোৎপাটিত হইয়া তাড়কা রাক্ষসী বা তারকাসুরের বিকট মূর্ত্তি ধরিয়া পড়িয়া আছে। এমন কি, কোন কোন স্থানের বৃক্ষমূলে বাঁধান বেদিটি শুদ্ধ শিকড়ের চাড়ে উঠিয়া আসিয়াছে, নারিকেল ও তালের মাথায় বাজ পড়িয়া তাহা দগ্ধাবশেষ রাখিয়া গিয়াছে মাত্র।

সকালে উঠিয়া প্রায় বিনিদ্র পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের নাগরিকগণ স্নানের ঘাটে, পথে ও প্রতিবেশীর বৈঠকে জমা হইয়া গত রাত্রির ঝড়ের আলোচনা করিতেছিল। অনেকেই বলিল,তাহাদের জীবনে এমন ভীষণ ঝড় তাহারা দেখে নাই। বৃদ্ধগণ বলিলেন, ২০ বৎসর অন্ততঃ এরূপ ঝড় দেখা যায় নাই।

কারাধ্যক্ষ ভদ্রদত্ত প্রসন্ন প্রীতচিত্তে প্রাতঃকৃত্য সমাধান্তে গুন্ গুন্ করিয়া একটি গীত গাহিতে গাহিতে অঙ্গনমধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, তোরণপ্রহরী আসিয়া মহাপ্রতীহারের আগমনসংবাদ জানাইল।

"মহাপ্রতীহার রুদ্রদমন! গত রাত্রির মত দুর্য্যোগের পর এত ভোরে ঘুম ভাঙ্গিয়া এতখানি পথ এসেছেন? বিশ্বাস হচ্ছে না! আর কেউ নয় ত? তোমরা হঠাৎ একটা বড়লোকের নাম শুনেই যেন যাকে তাকে তোরণদ্বার ছেড়ে দিয়ে বসো না।" ইহার পর ভদ্রদত্ত আপন মনেই বলিল, "তবে এখন আর সন্দেহের কোন কারণ দেখছি না, যার জন্য এ সব সাবধানতার প্রয়োজন ছিল, সে ত চলেই গেছে।"

প্রহরী জানাইল, আগন্তুক মহাপ্রতীহারই বটে, তাঁহার সঙ্গে এক দল সশস্ত্র সৈন্য, তিনি অবিলম্বে কারাধ্যক্ষের দর্শন চাহেন।

ভদ্রদত্ত ব্যস্ত হইয়া ছুটিল, মনে মনে বলিল, "আঃ, কালকের মত দুর্য্যোগ রাত্রিতে কি রাজার আত্মহিত-চিন্তার পরিবর্ত্তে পরের অনিষ্টচিন্তাই প্রবল রহিয়াছিল? সকাল হ'তেও অবসর হয় নাই? কি বিপদ্! এক দল সৈন্য লইয়া আবার কা'কে বন্দী করিয়া আনিল? শুনেছি, রাজ্যে একটা বিদ্রোহী দলের সৃষ্টি হয়েছে, তাদেরই না কি?"

ভদ্রদত্ত চিনিল, মহাপ্রতীহারই বটে! সবিনয়ে অভিবাদন জানাইয়া ভিতরে লইয়া আসিল, "মহানায়ক! এ অধীনের উপর কি আদেশ করছেন?"

রুদ্রদমন কারাধ্যক্ষকে একান্তে আনিয়া রাজহস্তের লিখিত আদেশ দেখাইয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, "আদেশ আমার নয়, ভদ্রদত্ত! স্বয়ং ভট্টারক প্রধানের। এই দেখ, কনিষ্ঠ মহাকুমারের প্রাণদণ্ডের আদেশপত্র তিনি স্বহস্তে লিখে দিয়েছেন, তুমি আমি তাঁর আজ্ঞাবহ দাসমাত্র।"

ভদ্রদত্ত বিবর্ণ হইয়া উঠিল। সর্ব্বশরীরে কম্পিত হইয়া

কহিয়া উঠিল, "এ কি ! না না, এ আমায় পরীক্ষা করছেন ! নিশ্চয়ই এ আদেশপত্র মহারাজাধিরাজের লেখা নয়। অথবা—কিন্তু এ কি সম্ভব যে, তিনি স্বয়ং তাঁর এক জন ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ভৃত্যের সঙ্গে এত বড় পরিহাস করবেন !"

রুদ্রদমন অসন্তুষ্ট বিদ্রূপের সহিত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিলেন।

"ভদ্রদত্ত ! কাব্যকথা বা মানসিক বিশ্লেষণ শোনবার অবসর মহাপ্রতীহারের থাকে না, কষ্টাগারের অধ্যক্ষের অবসর যথেষ্ট, তা জানি, ও সব ভাবের ব্যঞ্জনা পরিত্যাগ ক'রে সোজাসুজি মহাকুমারকে তাঁর পাতালগৃহ হ'তে মুক্ত ক'রে লয়ে এস এবং এই কষ্টাগারের মশানক্ষেত্রে জল্লাদের কুঠারে তাঁকে—"

ভদ্রদত্তের কম্পিত অধরমধ্য হইতে স্খলিত হইয়া পড়িল,—"কুমার রামপালকে পাতালগৃহ হ'তে মুক্ত ক'রে কষ্টাগারের গোপন মশানক্ষেত্রে জল্লাদের হস্তে অর্পণ করবেন ! এ কি পরস্পরবিরোধী আদেশ ! মহাকুমার রামপালকে মশানে ? কেমন ক'রে পাঠাব ?"

মহাপ্রতীহারের গম্ভীর মুখ গম্ভীরতর হইল।

"ভদ্রদত্ত ! কর্ত্তব্য কঠিন। সম্পন্ন করবার সামর্থ্য না থাকে, পদত্যাগ করতে পার, আমায় মহাকুমারের গহ্বরপথ দেখাও, আমিই রাজাদেশ পালন করতে প্রস্তুত আছি। যখন আমরা যে পদ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করি, তার সকল দায়িত্ব নির্ব্বিচারে পালন করবো, শপথ করেই তা গ্রহণ ক'রে থাকি না কি ? রাজার আদেশ দেবতার আদেশ মনে করাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য !"

"বুদ্ধ ভগবান্ ! এ কি করলে !"

"ভদ্রদত্ত ! তুমি তোমার সীমা লঙ্ঘন ক'রে যাচ্ছো ! স্মরণ রেখ, মানুষের ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে ! শীঘ্র আমায় মহাকুমারের বন্দিগৃহে নিয়ে চল।"

ভদ্রদত্ত শ্বেতমূর্ত্তিতে মাথা ঘুরিয়া সবেগে মাটীর উপর বসিয়া পড়িল। রুদ্ধশ্বাসে কোনমতে কহিল, "মহাপ্রতীহার ! আপনি আমার কি অবস্থা করছেন, তা জানেন না। আমি যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেছি ! মনে হচ্ছে, আর একবার আপনি আমায় ঐ কথা বল্লেই আমি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়বো।"

ক্রোধে রুদ্রদমনের দুই চক্ষু আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি সকোপে গর্জ্জন করিয়া কহিলেন, "তোমার মত কাপুরুষের নারীর মত মূর্চ্ছিত হওয়াই সঙ্গত ! তবে এ মূর্চ্ছা তোমার সহজেই ভাঙ্গবে, যখন একসঙ্গে পাঁচ শত রাজসৈন্যের মুক্ত কৃপাণ তোমার মাথার উপর উদ্যত হয়ে উঠবে ! ভদ্রদত্ত ! এই শেষ বার তোমায় জানাচ্ছি, মহাকুমার রামপালদেবের গৃহ আমায় প্রদর্শন কর।"

"তাঁর শূন্য গৃহ আমি আপনাকে এখনই দেখাতে পারি, কিন্তু তাঁকে আমি কোথায় পাব যে, আপনাকে দেখাব ? আপনি অনর্থক আমার উপর এ অত্যাচার করছেন, এ অসঙ্গত !"

"তাঁকে কোথায় পাব ? কেন, তিনি কি মৃত ? কৈ, এ সংবাদ ত আমাদের জানানো হয়নি ! আঃ, তা হ'লে ত ভালই হয়েছে ! কৈ, তাঁর মৃতদেহ কোথায়, আমি স্বয়ং দেখতে চাই।"

কারাধ্যক্ষকে যেন বিস্ময়ের প্রাবল্যে ভূতাহতবৎ বিহ্বল দেখাইল,—"তাঁর মৃতদেহ ! কি বলছেন আপনি ? ক্ষুদ্রের সঙ্গে মহতের ছলনা সাজে না ! গত রাত্রিতে পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজের আদেশপত্র পেয়েই আমি তাঁদের দুজনকে মুক্ত ক'রে দিয়েছি কি না, তারই পরীক্ষার্থ নিশ্চয়ই তিনি এই ছলনাবলম্বন করেছেন ! তিনি কি জানেন না, তাঁর আদেশকে আমরা কত বড় মনে করি যে, তা পালন করতে যত বড় দুর্য্যোগই ঘটুক, মাথার উপর আকাশ যদি ভেঙ্গেই পড়তো, তবু কি বিলম্ব করতে পারতেম ? তাঁকে জানাবেন, গত রাত্রিতেই তাঁর ভ্রাতৃদ্বয় বন্দিত্ব হ'তে মুক্ত হয়ে কষ্টাগার ত্যাগ ক'রে গেছেন। সম্ভবতঃ রাজপ্রাসাদেই তাঁদের দেখা পাওয়া যাবে। তবে মহাসামন্ত যদি সোজাসুজি যাত্রা ক'রে থাকেন ত সে কথা বলতে পারি না। খুব সম্ভব, রাজদর্শন না ক'রে যাবেন না।"

এবার বিস্ময়ের সেই গভীর বিহ্বলতা কারাধ্যক্ষের নিকট হইতে মহাপ্রতীহারের উপর আসিয়া পড়িল। রুদ্রদমন সবিস্ময়ে কহিয়া উঠিলেন, "এ কি অর্থহীন প্রলাপ, না সত্য কথা, ভদ্রদত্ত ? রাজার আদেশপত্র পেয়ে মহাকুমারদ্বয়কে গত রাত্রিতে তুমি মুক্ত ক'রে দিয়েছ ? সাবধান, ভদ্রদত্ত ! যা বলছো, ভেবে চিন্তে কথা বলো। তোমার জানা উচিত, এ সম্বন্ধে তামাসা করেও এত বড় কথা তোমার উচ্চারণ করা সঙ্গত নয় ! রাজবন্দীদের সম্বন্ধে তোমায় বিশেষভাবেই উপদেশ দেওয়া হয়েছিল যে,

স্বয়ং মহারাজাধিরাজের স্বহস্ত-লিপি ব্যতীত কোনক্রমেই তাঁদের সম্বন্ধে কোন পরিবর্ত্তন ঘটবে না। স্বয়ং রাজগুরুর বাক্যেও নয়।"

ভদ্রদত্ত এইবার ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইল, "কেন আপনি অনর্থক আমায় ভয় দেখাচ্ছেন মহাপ্রতীহার! আমার কর্ত্তব্যে আমি কোনই ত্রুটি ঘটতে দিই নি। পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজের স্বহস্ত-লিখিত, স্বাক্ষরিত আদেশপত্রের লিখন পেয়ে তাঁর আদেশমতই আমি রাজবন্দীদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছি।"

"কোথায় সেই আদেশপত্র?" মহাপ্রতীহার কোনমতে এই কথা কয়টি উচ্চারণ করিলেন।

"এই দেখুন"—বলিয়া ভদ্রদত্ত বুক ফুলাইয়া গম্ভীরপদক্ষেপে চলিয়া গিয়া ক্ষণমাত্র পরেই রাজার লিখিত ও স্বাক্ষরিত তাহার নামীয় আদেশপত্র মহাপ্রতীহারের হস্তে আনিয়া দিল।

রুদ্রদমন মনে মনে একবার—তুইবার—বার বার করিয়াই তাহা পাঠ করিলেন। এ পত্র বাস্তবিক রাজাধিরাজেরই লিখিত বটে! পত্রবাহকের নিকট হইতে পত্রপ্রাপ্তিমাত্র অবিলম্বে রাজ-ভ্রাতৃদ্বয়ের বন্ধনমোচনপূর্ব্বক তাঁহাদের সম্পূর্ণস্বাধীনতা প্রদান করিবার জন্য সুস্পষ্টই আদেশ রহিয়াছে। না, কোন সংশয়ই নাই, নিশ্চয়ই ইহা রাজার আদেশ।

তবে আজ রাত্রিপ্রভাতের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিয়া এই রূঢ় আদেশ প্রচারের অর্থ কি ছিল? এ ছলনা চিরানুগত তার সঙ্গে কেন? ওঃ, বুঝা গিয়াছে!

বিদ্যুদালোকে যেমন মুহূর্ত্তমধ্যে অন্ধকারের মধ্যবর্ত্তী অদৃশ্য বস্তু সহসাই দৃশ্য হইয়া উঠে, তেমনই তীব্র আলোকপাতে মহাপ্রতীহারের সংশয়াকুল চিত্ত সহসাই উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। হয় ত আমার বিশ্বস্ততার—আনুগত্যের এ একটা কঠোর পরীক্ষা! ঠিক হয় ত তাই!

মনে মনে মহাপ্রতীহার সগর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করিলেন। যাই হোক, এত বড় মহা পরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ হইয়াছি, সেই যথেষ্ট! মগধের মহাসামন্তর পদ কি আমি চাহিলে পাইব না? সুরপালটাকে মুক্ত করা হইল কেন? মগধীরা আবার গোলযোগ না করে।

এই নূতন চিন্তায় ঈষন্মাত্র চঞ্চল থাকিয়া অথচ পরীক্ষোত্তীর্ণ হওয়ার গৌরবে প্রফুল্লচিত্তে মহাপ্রতীহার তখনই কষ্টাগার হইতে বিদায় হইয়া রাজদর্শনে যাত্রা করিলেন।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

এই সংবাদ যখন রাজার কাছে পৌঁছিল, বসুধাবক্ষোবিদারী গৈরিক-নিস্রাব যে নিজের চোখে দেখিয়াছে, সেই লোক তাঁহার অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করা ভিন্ন অন্যের পক্ষে সম্ভবই নহে।

রামপাল বন্ধনমুক্ত! রামপাল পলায়িত! তাঁহার চিরজীবনের মহাশত্রু, তাঁহার সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দ্বী, তাঁহার সম্মানের—রাজগৌরবের—এমন কি, তাঁহার অপ্রতিহত প্রেমরাজ্যেরও প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বী এই ভ্রাতৃ-শত্রু তাঁহার করতলায়ত্ত হইয়াই আজ পলাইয়া গেল! কি অসম্ভবই সম্ভব হইল!

কষ্টাগারের মত সুদৃঢ় দুর্গমধ্যস্থ পাতালগর্ভ-গহ্বরে শৃঙ্খলাবদ্ধাবস্থায় রক্ষা করিয়াও সেই অজেয় রামপালকে তিনি জয় করিতে পারিলেন না! ইহা অপেক্ষা আর আশ্চর্য্য ঘটনা কি ঘটিবার আছে?

ভীষণ জ্বালাময় ক্রোধের অসহিষ্ণুতা রাজাধিরাজকে অতিষ্ঠ করিয়া যেন তাঁহার রক্তপর্য্যঙ্ক হইয়া ঠেলিয়া তুলিয়া দিল। আহত সিংহের ক্ষিপ্ত রোষের মত ক্ষণকাল নির্ব্বাক্ রোষের জ্বালায় নীরবে গুমরিয়া ফিরিয়া ক্ষণপরে ঈষন্মাত্রায় আপনাকে সামলাইয়া লইয়া নৃপতি ঘোর বিস্ময়াভিভূত এই রকমই বাক্যহারা অপর ব্যক্তির সম্মুখীন হইয়া পদচারণা বন্ধ করিয়া দাঁড়াইলেন, "সে আদেশপত্র যে জাল নয়, কেমন ক'রে তা জান্‌লে?"

"আমি ভাল করেই সে লিপি পরীক্ষা-ক'রে দেখেছি, রাজাধিরাজ! লিপি সত্য বলেই মনে হয়। কিন্তু যদি আপনি তা' না লিখে থাকেন, তা হ'লে নিশ্চয়ই তাহা আপনার লেখা নয়।"

রাজাধিরাজ পুনশ্চ অস্থিরপদে কক্ষমধ্যে পরিক্রমণ করিয়া আসিলেন,—"রুদ্রদমন! তাহাতে পত্রবাহকের নাম লেখা আছে?"

"আজ্ঞে না, মহারাজাধিরাজ! পত্রবাহকের নাম লেখা নাই। আমারও এটা অসঙ্গত ঠেকিয়াছিল।"

"তবে নিশ্চয়ই সে পত্র জাল!" রাজাধিরাজের আরক্ত নেত্রদ্বয় অগ্নিবর্ষণ করিল।

"রুদ্রদমন!"

"রাজাধিরাজ!"

"সৈন্যদল সজ্জিত করতে আদেশ দাও, তাদের নিয়ে শীঘ্র সুরপাল ও রামপালকে ধৃত করতে চ'লে যাও। যেখানে পাও, জীবিত কি মৃত তাদের আমার কাছে এনে দেবে। তারা মগধে পৌঁছবার পূর্ব্বেই তাদের বন্দী করা চাই। দণ্ডমাধবকে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি না, তুমি নিজে যাও। সমর্থ হ'লে মহাসামন্তপদ তোমারই। কিসের বিলম্ব? কি বলবার আছে? অনর্থক কেন দেরী করছ? অথবা রামপালকে ক্ষমা করবার কথা তোমার মুখ থেকেও আমায় শুনতে হবে? আমার পৃথিবীর প্রধান শত্রুকে যে ক্ষমা করতে বলবে, সে-ও আমার প্রধান শত্রু জেনে রেখ।"

রুদ্রদমন ঈষৎ আহত স্বরে কহিলেন, "আমি আপনার আদেশ সম্বন্ধে কোন দিনই ত কোন কথা বলি নি, মহারাজাধিরাজ! নির্ব্বিচারেই সমস্ত আদেশ চিরদিন ধ'রে পালন ক'রে আসছি। আমি এইটুকু বলতে চাচ্ছিলেম, কোন স্ত্রীলোক কি মহাকুমারের মুক্তিপত্র আপনার কাছে কোন দিন লিখিয়ে নিতে পারেন না? সে পত্র জাল ব'লে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না।"

রাজার ললাট কুঞ্চিত হইল, "পট্টমহাদেবী! কৈ না! রামপালের বন্দিত্বের পর আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎও করি নি। তিনিও এ সম্বন্ধে আমায় কোন অনুরোধ জানান নি। তুমি বিলম্ব ক'রে ফেলো না, মহাপ্রতীহার! ৫ হাজার, ১০ হাজার, যতই ইচ্ছা সৈন্য নিয়ে তাদের অনুসরণ কর,—শোন রুদ্রদমন! শুনে যাও—"

কুমার রুদ্রদমন দ্বারসমীপস্থ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

"এক দিন এক জনের কুহকে ভুলে গিয়ে সেই এক জনকে আমি একখানা ঐ রকমই আদেশপত্র লিখে দিয়েছিলেম বটে। এখন আমার মনে পড়ছে, হ্যাঁ, আমিই লিখেছিলেম। কিন্তু পরমুহূর্ত্তে তার প্রভাব কাটিয়ে ফেলে তোমায় তাকে বন্দী করতে পাঠাই। তুমি তাকে কষ্টাগারেই রেখেছিলে ব'লে সংবাদ দিয়েছিলে। সেই বোধিদেব,—সেই বোধিদেব এই ষড়যন্ত্রের নায়ক নয় ত?"

রুদ্রদমন সবিস্ময়ে চিন্তিত হইলেন।

"কিন্তু কষ্টাগারের ভূগর্ভে বাস ক'রে সে কেমন ক'রে ষড়যন্ত্রলিপ্ত হবে? নিশ্চয়ই বাহিরের লোকের সাহায্য আছে।"

লজ্জিত হইয়া কুমার রুদ্রদমন মাথা নত করিলেন, "আমার এ কথা মনে পড়ে নি, রাজাধিরাজ! কষ্টাগারের বন্দীকে আমরা জীবিতের বাহিরেই হিসাব ক'রে থাকি, সেই জন্যই ভুল হয়েছে।"

রাজা তীক্ষ্ণ, গম্ভীর স্বরে কহিয়া উঠিলেন, "সেই ভুলেরই এই পরিণাম! রুদ্রদমন! দণ্ডমাধবকে সৈন্য নিয়ে পাঠাও, তুমি দরকার বোধ করলে কষ্টাগারের প্রত্যেকটি ইট খসিয়ে, তাহার মধ্যের সমস্ত লোকের শির স্কন্ধচ্যুত ক'রে এই ষড়যন্ত্রের কর্ম্মকর্ত্তাদের আবিষ্কার ক'রে দাও, তাদের মধ্যে একটি ক্ষুদ্রতর প্রাণীকেও আমি পৃথিবীর সব চেয়ে কঠোর শাস্তি দিতে বাকী রাখবো না। যাও, বোধিদেবকে সর্ব্বপ্রথম আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।"

ক্ষুধিত সিংহকে পিঞ্জরাবদ্ধ রাখিয়া তাহাকে খোঁচা দিলে তাহার যে রকম অবস্থা হয়, রাজারও আজ সেই অবস্থা। রামপাল! রামপাল! আজীবন ঘরে বাহিরে সকল সুখেরই সে চির-হন্তারক! পিতা তাহার পক্ষপাতী, প্রজাবৃন্দ ও আত্মীয়স্বজন তাহার অনুরক্ত, বিবাহিতা স্ত্রী তাহারই পক্ষ, আবার যাহাকে অন্তরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা আদরে স্থান দিয়াছেন, সে-ও তাহারই প্রেমার্থিনী! তাহার জন্য তাঁহাকে তুচ্ছ করে। রামপাল তাঁহার ভীষণ শত্রু! এত বড় শত্রু পৃথিবীর মধ্যে আর দ্বিতীয় কেহ নাই। সেই রামপাল তাঁহার কঠোর শাসন-পাশ হইতে অবলীলায় মুক্ত হইয়া গেল, আর এই অপমান তাঁহাকে নীরবে সহ্য করিতে হইবে? অসম্ভব! ইহার জন্য সমস্ত পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে আগুন জ্বালিতে হয়, তা-ও হইবে।

মহাপ্রতীহারের পশ্চাতে ম্লান ও দীনবেশী, বিশীর্ণমূর্ত্তি বোধিদেব রাজকীয় সুসজ্জিত কক্ষের মধ্যে প্রকৃতির পরিহাসের মতই অসদৃশরূপে প্রবিষ্ট হইয়া দাঁড়াইলেন। রাজাকে তিনি কোন প্রকার অভিবাদন জানাইলেন না। আর উপায়ও বড় ছিল না। হস্ত তাঁহার শৃঙ্খলাবদ্ধ।

রাজা বারেকমাত্র আরক্তনেত্রের দগ্ধকারী দৃষ্টি দিয়া তাঁহার ভূতপূর্ব্ব সচিবের শুষ্ক অথচ প্রশান্ত নির্ভীক মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়া সেই দৃষ্টি তাঁহার মাথার উপর

দিয়া বাহিরের দিকে মেলিয়া ধরিয়া চেষ্টাসংযত গম্ভীর স্বরে কথা কহিলেন, "গত রাত্রিতে রামপাল ও সুরপাল কষ্টাগার হ'তে পলায়ন করেছে, এ সংবাদ নিশ্চয়ই তুমি বিদিত আছ? কিন্তু তুমি নিজে—"

রাজবাক্যের মর্য্যাদা লঙ্ঘন পূর্ব্বক আগ্রহ-মথিত কণ্ঠে বোধিদেব রাজাকে বাধা দিলেন, "জয় হোক রাজাধিরাজ! গত রাত্রিতে যেমন অনিদ্রায় ক্লেশভোগ করেছি, এমন ঐ কষ্টাগারে ঢুকে পর্য্যন্ত আর এক দিনও নয়। যা হোক, তা হ'লে মহাকুমাররা নিরাপদে কষ্টাগার ত্যাগ করতে পেরে-ছেন? জয় ভগবান্!"

রাজার সমস্ত মুখখানা অকথ্য ক্রোধে সকালবেলার সূর্য্যের মতই অরুণাভ হইয়া গেল, দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া তিনি চীৎকার শব্দে কহিয়া উঠিলেন, "নির্ল্লজ্জ ব্রাহ্মণ! তুমি কি জীবনের আশা রাখ না?"

বোধিদেব ঈষৎ হাসিলেন; কহিলেন, "মড়াকে খাঁড়ার ভয় দেখাইতেছেন? কষ্টাগারের বন্দীর কাছে জীবন-মৃত্যুর প্রভেদ কি, মহারাজাধিরাজ?"

"আমি যদি তোমায় শূলে দিই?"

"পালসাম্রাজ্যের তা হ'লে শেষ দিন উপস্থিত জান্‌ব! ব্রাহ্মণের শূলদণ্ড দণ্ডনীতির একেবারেই বহির্ভূত। তবে আমার পক্ষে? তা'তেই বা ক্ষতি কি? মৃত্যু এক জন্মে কাহারও দু'বার হয় না, একবারই হয় এবং তা অনিবার্য্যই। 'জাতস্য হি ধ্রুবো মৃর্ত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ, তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি।' আর মরণ, তা সে শালে হোক, শূলে হোক, রোগে হোক, যুদ্ধে হোক, যে ভাবেই হোক, মৃত্যুযন্ত্রণাভোগ একবার করতেই হবে, তার জন্য কাতর হলেই বা চলবে কেন?"

বিস্ময়াতিশয্যে রাজার সেই অসীম কোপাগ্নি যেন ঈষৎ শীতল হইয়া আসিল। তিনি নিজেকে ঈষৎ সংযত করিয়া লইয়া কহিলেন, "পুরুষানুক্রমে তোমার পিতৃ-পুরুষদের বরেন্দ্রীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদে প্রতিষ্ঠিত রাখার এই পুরস্কার বটে! রাজার ও রাজ্যের মহাশত্রুকে মুক্তি দিলে! ইহার ফলে রাজ্যে রাষ্ট্র-বিপ্লব অনিবার্য্য।"

একটা সকৌতুক ও সকরুণ হাস্যচ্ছটায় তরুণ ব্রাহ্মণের অস্থিময় অথচ তেজোদীপ্ত সৌম্য মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া "সেই পিতৃগণের ঋণমোচনার্থই আমার এই প্রচেষ্টা রাজাধিরাজ! রাষ্ট্রবিপ্লব এ রাজ্যে অনিবার্য্য, সে ধারণা আপনার ভুল নয়, কিন্তু রামপাল সে জন্য দায়ী নন। জানি না, কি কারণে তিনি আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবেন না ব'লে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ! তাই এই লাঞ্ছনা ভোগ করেও নীরব আছেন। যদিও আমি তাঁকে বলেছি যে, ক্ষত্রিয়ের এত বড় ক্লীব প্রতিজ্ঞার কোন মূল্য নাই, কিন্তু সে-ও ত বড় একগুঁয়েমীতে কম নয়। সে বলে, প্রতিজ্ঞারক্ষাই প্রকৃত ক্ষাত্র ধর্ম্ম, কোন লাভ-লোকসানে তাকে বিসর্জ্জন দিতে পারি না। আর একেই আপনি ভয় করেন? বলেন, রাজদ্রোহী!"

রাজা ক্ষণকাল নীরব রহিলেন, বোধিদেবের এই কথা-গুলিকে অবিশ্বাস করিতে গিয়া তাঁহার মন যেন সহসা কতকটা বিশ্বাস করিতে চাহিল, রামপালের সমস্ত ব্যবহার যেন এই কথারই সাক্ষ্য দিতে উদ্যত হইয়া উঠিতে থাকে। কিন্তু না, বিবেকবাণীতে কর্ণপাত করা মহীপালের ধর্ম্ম নয়। তা সে না নিজের, না পরের। সবিদ্রূপ রুষ্ট হাস্যের সহিত তিনি উত্তর করিলেন, "ও সব আষাঢ়ে উপাখ্যান দিয়া পুথি রচনা করো, মূর্খ প্রজারা মুগ্ধ হ'বে, আমার ত ও সব বাজে কথা শোনবার অবসর নেই। এখন তোমায় জিজ্ঞাস্য এই যে, তুমি যখন কারাগারে রয়ে গেলে, তখন এক জন দ্বিতীয় ব্যক্তিকে নিশ্চয়ই সাহায্যকারী নেওয়া হয়েছিল, সে কে?"

বোধিদেব কহিলেন, "আমার নিজের কথাই আমি বলতে পারি, অন্যের কথা বলবার অধিকার আমার নেই। আমি তা-ও কোনমতেই বলব না। এর জন্য আপনার যা ইচ্ছা হয়, করতে পারেন।"

হুতাশনদীপ্তির মতই প্রজ্বলিত ক্রোধে রাজাধিরাজ উঠিয়া দাঁড়াইয়া রক্তপিপাসু বাঘের দৃষ্টিতে মন্ত্রিপুত্রের অকুতোভয় মুখের দিকে চাহিলেন। একটা ভয়ানক কিছু ঘটনার জন্য সকলেই—এমন কি, তিনি নিজেও প্রস্তুত থাকিলেও সেটা কিন্তু তখনই তখনই ঘটিল না। গভীর বলে নিজেকে সংবরণ করিয়া লইয়া তিনি পুনশ্চ আসন গ্রহণ করিলেন।

"তুমি না বল্লেও এ সংবাদ আমি যেমন করেই হোক, বার করবো, মহাপ্রতীহার!"

মহাপ্রতীহার এতক্ষণ প্রশস্ত কক্ষের অপর প্রান্তে

রাজাদেশের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সসম্ভ্রমে সম্মুখে আসিয়া অভিবাদন জানাইলেন।

"তোমার অনুসন্ধানের ফল বল, বোধিদেব! আমার লিখিত আদেশপত্র তুমি ব্যবহার করিলে কেন? কি অধিকারে?"

বোধিদেব কহিলেন, "সম্পূর্ণ অধিকারেই মহারাজ। আপনিই ত তা আমায় ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন। মধ্যে কিছু দিন নিজের বন্দিত্বের বাধায় অব্যবহারে পড়েছিল মাত্র। আপনি কি সে পত্র আমায় স্বহস্তেই দেন নি?"

"কিন্তু তার পরই আমি তোমায় বন্দী করতে আদেশ পাঠাই কি না?"

"নিশ্চয়! কিন্তু সেই সঙ্গে প্রথম আদেশ প্রত্যাহার করেননি ত! করেছিলেন কি? তা যদি করতেন, তা হ'লে সে আদেশপত্র আমার কাছে থাকতোই না। আমি যদি কিছু ক'রে থাকি, সে আপনারই আদেশপালন। তবে কিছু দেরী হয়ে গেছে। সেটা অবশ্য আমার অপরাধ নয়।"

ভূমিতে একটা প্রচণ্ড পদাঘাত করিয়া মহীপাল মহাপ্রতীহারের দিকে ফিরিলেন, "কিছু সংবাদ পেলে কি?"

রুদ্রদমন কহিলেন, "পেয়েছি মহারাজাধিরাজ!"

"আঃ, পেয়েছ! তাদের সবাইকে শূলে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে! নিশ্চয়ই কারারক্ষীরা এর মধ্যে আছে, আর কোন লোক—আর কেহ—"

"হ্যাঁ, এক জন স্ত্রীলোক।"

'স্ত্রীলোক!' রাজা চমকিয়া উঠিলেন, তাঁহার সমস্ত শরীরের রক্ত তরতর্‌ বেগে তাঁহার মাথায় ও মুখে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। তীব্র কণ্ঠে মৃদু গর্জ্জনে উচ্চারণ করিলেন—"মহাদেবী!"

রুদ্রদমন মাথা নাড়িলেন, "না।" তাহার পর ঈষৎ সঙ্কোচের সহিত একটি অলঙ্কার-পেটিকা এবং তাহার উপর ভোরের শিশিরবিন্দুর মতই নির্ম্মল সুগোল একটি মুক্তাহার স্থাপন করিয়া বলিলেন—"সে রাত্রির তোরণরক্ষী প্রহরীর নিকট এইগুলি পাওয়া গেছে, কারাধ্যক্ষ বলেন, রক্ষী তাঁকে বুঝিয়ে রাজাধিরাজের লিখিত আদেশপত্র প্রদর্শন করায়, সেই পত্রের লিখিতমত সে নির্ব্বিচারেই বন্দীকে মুক্তি দিয়েছে, তোরণপ্রহরী এই অলঙ্কারের উৎকোচ নিয়ে উৎকোচদাত্রীকে খুবই সম্ভব বোধিদেবের গহ্বরে কনিষ্ঠ কুমারের গহ্বরের পরিবর্ত্তে প্রবেশ করতে দিয়েছিল। সেখান থেকে এসে তিনি ঐ আদেশপত্রটি প্রদর্শন করেন।"

দেখিতে দেখিতে রাজাধিরাজের সেই গাঢ় রক্তরঞ্জিত মুখ শবশুভ্র হইয়া গেল। তিনি কোনমতে শুধু উচ্চারণ করিলেন—"ওঃ! বুঝেছি!"

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

শাখানিবিড় বটের তলাটি বাঁধানো—পাশেই প্রকাণ্ড দীঘিটি কূলে কূলে ভরা, জল যেন তার কাকচক্ষু। চারি পাশের ঢালু পাড় কচি ঘাসে শ্যামল হইয়া উঠিয়াছে। মাঝখান দিয়া বাঁধনো সোপান। সোপানশ্রেণীর ঠিক উপরেই একটা সুনিবিড় ছায়াভরা আমগাছ। কোথাও কোন জনপ্রাণীটি পর্য্যন্ত ছিল না। আম্রমঞ্জরীর গন্ধে শুধু চারিটি দিক ভরপুর হইয়া আছে। কোথাও বসিয়া একটা ঘুঘু ডাকিতেছিল। চন্দ্রকলা একা সেই আমগাছের ছায়ার মধ্যে চুপ করিয়া বসিয়া গভীর চিন্তায় ডুবিয়া গিয়াছিল। চিন্তা তার নিজের সমস্ত অতীত ও বর্ত্তমান সম্বন্ধে এবং সেই সব ক্ষণিকেই ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল কুমার রামপালের স্মৃতি! সেই নির্য্যাতিত, লাঞ্ছিত, পলাতক ভিখারী রাজপুত্রের অচ্ছেদ্য স্মৃতির কঠিন পাশে তাহার সমুদয় মনটা যেন দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছিল। কিছুতেই ইহা হইতে সে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইতে পারিতেছিল না। সেই তরুণ কন্দর্পের মতই সুন্দর—তরুণ রাজকুমারকে গত রাত্রিতে কি শীর্ণ বিবর্ণ প্রৌঢ়ের মূর্ত্তিতেই সে দেখিয়া আসিয়াছে, সেই অকরুণ দৃশ্যই ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহার মানসচক্ষুতে ভাসিয়া উঠিতেছিল। কানে বাজিতেছিল ক্ষীণ পরিক্লিষ্ট ক্লান্ত করুণ সেই স্বর! ওঃ, চন্দ্রকলা পাষাণীর মতই সে দৃশ্য দেখিয়াছে শুনিয়াছে। তাহার ধৈর্য্য তাহাকে আত্মবিস্মৃতা হইতে দেয় নাই।

গভীর দীর্ঘশ্বাসে তাহার ব্যথিত বক্ষ ফুলিয়া উঠিল, রূপজীবিনীর গর্ভজাতা, সেই শিক্ষা ও আদর্শে অনুপ্রাণিতা রূপজীবিনী সে, এ কি তাহার অন্তরের অবিশ্বাস্য পরিণতি? এত সুখ, এ ঐশ্বর্য্য, এ যে তাহার শ্রেণীর নারীদলের সাধনার সিদ্ধি! এই ভোগৈশ্বর্য্যের সমস্ত আনন্দ ও গৌরব বিষতিক্ত করিয়া ঐ তাহার প্রতি একান্ত বিমুখতার উদাসীন,

ভিখারীরও অধম, দণ্ডিত, পলায়িত, লাঞ্ছিত লোকটাই তাহার সমস্ত মন-প্রাণ অন্তর-বাহিরটাকে অধিকার করিয়া লইল, এ যে কেমন করিয়া, এ যেন বিশ্বাস করিতেও পারা যায় না! অথচ এর হাত হইতে আর উদ্ধারেরও উপায় নাই। ভোগ যেন বিছার কামড়ের মতই অসহ্য মনে হইতেছে। এর চেয়ে যেন সে-ও সহা যায়, যা সেই অভাগা রাজপুত্র এত দিন সহিতেছিলেন, সেই ভয়াবহ কষ্টাগারের পাতাল-পুরীর জীবন!

চন্দ্রকলা সেই ভীষণ গহ্বর স্মরণে শিহরিয়া উঠিল। বোধিদেব তবু শৃঙ্খলাবদ্ধ নহেন!—কিন্তু কি উচ্চ উন্নত চরিত্র ঐ বোধিদেবের! মানুষ জগতে এত ভালও ত থাকে? বেশী আছে কি? হয় ত আছে। আমরা এদের পরিচয় কোথা হইতে পাইব? আমরা যাদের দেখি, তারা স্বতন্ত্র জগতের জীব। এদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কি? আমরা এদের কাছে নরকের দ্বার, আমাদের প্রসঙ্গমাত্র এঁদের কাছে ত্যাজ্যসুখ! হায় মহাকুমার! যদি আমায় একটিবারও ভালবাসিতে? না, ভালই করিয়াছ! ভালবাস নাই, সে ভালই করিয়াছ! তা নহিলে আমায় এমন করিয়া আকর্ষণ ত করিতে পারিতে না! আমায় ভাল ত অনেকেই বাসিয়াছে, আজও বাসে, আমি ত কোন দিনই তাদের ভালবাসি নাই! তবে তোমার কাছে ভালবাসা পাইলেও হয় ত আমার এ গভীর শ্রদ্ধা আঘাত পাইত! ভালবাসাই যে ভালবাসাকে আকর্ষণ করিয়া আনে, তাও ত নয়! কিন্তু বিচিত্র এই মানুষের মন! সেই সর্ব্বপ্রথম দিনের প্রথম দেখা, সেদিনকার তোমার চোখের সেই অকথ্য ঘৃণার লেখা! উঃ, সে কি কঠোর! কি মর্ম্মন্তুদ! অথচ সেই-ই আমায় সর্ব্বপ্রথম তোমার প্রতি এই গভীর আসক্তি এনে দিলে! সেই প্রথমবার আমি মানুষের চোখে বিলাসের, আকাঙ্ক্ষার, দুরন্ত ক্ষুধার পরিবর্ত্তে তপস্বীর সংযমপূত অনাসক্তির দেখা পেলেম। আমার জীবন যৌবন যেন বদ্‌লে গেল।

কিন্তু দুর্ল্লভকে ভালবাসিতে গেলে কান্না ভিন্ন আর কিছুরই যে আশা নেই, এটা বোধ করি বা জগতের একটা সনাতন বিধিই। কিন্তু সেই ভাল, সেই ভাল। হীনের অঙ্কাশ্রিতা থাকার চেয়ে মহৎকে ভালবেসে মরণও শ্রেয়ঃ।

একটা অগ্নিতপ্ত দীর্ঘশ্বাস মোচনপূর্ব্বক চন্দ্রকলা তাহার বাসন্তী কোকিলের সমতুলিত মধুর কণ্ঠে মৃদু মৃদু গাহিয়া উঠিল,—

"দুল্লর্ভ জন অনুযায়ো লজ্জা গুরুই পরবশো অল্পা,
পিয়সহি মরণং শরণং—"

"হ্যাঁ প্রিয়সখি! এইবার মরণ শরণেরই কাল এসেছে। এই মানুষটাকে কি চিন্‌তেও পার্‌ছো না, চন্দ্রকলা! ফিরে একবার চেয়েও যে দেখলে না? বলি, এক দিন সুলভ ছিলেম বলেই কি এতটাই বিরাগ রাখতে হয়? অথবা দুর্ল্লভ জনের অনুরাগে মন এতই ভ'রে আছে যে, এ হতভাগ্য ভূতপূর্ব্ব সুলভের উপস্থিতিটা শকুন্তলার মত জানতেও পারছো না?"

শুধু ফিরিয়া চাওয়াই নয়, উঠিয়া দাঁড়াইয়া করযোড়ে চন্দ্রকলা রাজাধিরাজকে বিনম্র অভিবাদন জানাইল, "ভিতরে চলুন, এখানে রাজযোগ্য সম্মানাসন নেই।"

কঠোর ব্যঙ্গমিশ্রিত কুটিল হাস্যে নৃপতির সুন্দর মুখ অনুরঞ্জিত হইয়া উঠিল, সবিদ্রূপ উত্তর করিলেন, "ধন্যবাদ সুরসিকা! কিন্তু তোমার বহু প্রার্থিত প্রিয়সঙ্গসুখে আনন্দ উপভোগ করবার সুবিধা আপাততঃ আমার নেই, মাত্র বিশেষ প্রয়োজনীয় কয়েকটি প্রশ্নমাত্র করবার আছে। সে এখানেও হ'তে পারবে। চেয়ে দেখ দেখি, এই মুক্তাহার তোমার পরিচিত ব'লে মনে হচ্ছে কি না? এটা এক দিন আমার কাছে তুমি অনেক মান-অভিমান জানিয়া বহু চেষ্টায় চেয়ে নিয়েছিলে—সে কথা কি মনে পড়ে, চন্দ্রা?"

চন্দ্রকলা তাহার নত দৃষ্টি বারেকমাত্রও না তুলিয়া শুধু মৃদু কণ্ঠে উত্তর করিল, "হাঁ।"

"এর দাম যে লক্ষ সুবর্ণ-নিষ্ক, এ কথা তুমি জান্‌তে না কি?"

নর্ত্তকী মস্তক হেলাইয়া ইহারও প্রত্যুত্তর সমাধা করিল।

"এক দিন সেটা তোমার পরম ঈপ্সিততম বস্তু ছিল, আজ প্রেমোন্মাদনার উদ্দাম স্রোতে ভেসে সর্ব্বত্যাগিনী হয়ে তার আর কোন রকম মূল্য নির্দ্দেশ করতেও পারনি? বানরের গলাতেও সেটা ঝুলিয়ে দিতে মমতা হয় নি? কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে হতভাগ্য আমারই কণ্ঠে তোমার অনাদৃত হার ফেরৎ এসে পৌঁছেছে দেখতে পাচ্ছো ত? তোমায় আমায় এমনই দুল্লঙ্ঘ্য সম্বন্ধটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

চন্দ্রকলা নীরব রহিল। বলিবার তাহার ছিলই বা কি যে বলিবে? এই হাস্যপ্রচ্ছাদিত রাজরহস্যের নিম্নভাগে যে জিনিষটার অস্তিত্ব প্রকাশ পাইতেছিল, সেটা শুধু শ্যাম-তৃণপত্রাচ্ছাদিত আগ্নেয়গিরির সঙ্গেই তুলনীয়।

রাজাধিরাজ নিকটস্থ বৃক্ষশাখা হইতে একটি মুকুলিত ক্ষুদ্র আম্রশাখা ছিঁড়িয়া লইয়া তাহারই পত্র ছিন্ন করিতে করিতে ডাকিলেন, "চন্দ্রকলা!"

চন্দ্রকলার কানে সে ডাক পৌঁছিল না। সে ইহারই মধ্যে বিমনা হইয়া ভাবিতেছিল, তত শীঘ্র এ সংবাদ প্রচার হইয়া গেল! রামপাল হয় ত ধরা পড়িবেন, এর মধ্যে কত দূরই বা আর যাইতে পারিয়াছেন!

"চন্দ্রকলা! অনেক দিন আমরা একসঙ্গে একত্র বাস করেছি। আমার অন্নে তোমার দেহও অনেকখানি পুষ্টি লাভ করেছে। আজ তোমার প্রয়োজন না থাক, এক দিন জগতে দুর্লভ মণি-রত্ন যথেষ্ট পরিমাণেই আমি তোমায় পরিয়েছি, তার জন্য একটু কৃতজ্ঞতাও কি নেই আর? আজ দু'একটা সত্য কথা আমার সঙ্গে কইবে কি?"

এবার চন্দ্রকলা রাজার কথা শুনিতে পাইল। কিন্তু এই ভয়াবহ সত্য উত্তর দিতে সে কিছুমাত্র ভীত হইল না। সে মনে মনে বলিল, 'আমার আর ভয় কি?' প্রকাশ্যে কহিল, "চলুন।"

"যাকে তুমি এই অলঙ্কারের প্রলোভন দিয়ে এই দুঃসাধ্য কায করতে পাঠিয়েছিলে, কেমন সাহসিকা সে যে, গত রাত্রির সেই দুর্য্যোগে অত বড় দুর্গম দুর্গের মধ্যে প্রবেশ ক'রে এত বড় অসাধ্যসাধন ক'রে এলো?"

"আমি।" অত্যন্ত মৃদু কণ্ঠে চন্দ্রকলা এইটুকু বলিলেও রাজাধিরাজ সেই সামান্য শব্দটুকুতেও যেন চমকিত হইয়া উঠিলেন।

"তুমি! ওই নধর নবনী-নিন্দিত কোমল দেহ তোমার, তুমি এত কষ্ট সহ্য ক'রে এমন দুঃসাহসের কার্য্য করতে পেরেছিলে, চন্দ্রকলা? কত বড় প্রেমে মানুষকে এত বড় অসাধ্যসাধনের বল এনে দেয়? এত দুর্ব্বল তুমি ত নও? তুমি তাকে এত ভালবাস? আর আমি এত ক'রে এত ভালবেসে তোমার কাছ থেকে কি ফিরিয়ে পেলেম? না, শুধু নিদারুণ বিশ্বাসঘাতকতা। অবিশ্বাসিনী নারী! এই আমার এত প্রেমের পুরস্কার? এই আমার প্রতিদান? এই—এই—এই—

তীব্র ঈর্ষ্যা ও অকথ্য জ্বালাভরা কোপে ক্ষণকাল বাক্যহীন জ্বলন্ত চোখে নিবাত-নিষ্কম্প দীপশিখাবৎ নির্ব্বাক্ মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া পুনশ্চ উচ্চতর কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, "এই জন্যই নারীচরিত্রকে শাস্ত্রকাররা দেবেরও বোধের অতীত বলেছেন! সে তোমায় কি দিয়েছে যে, তারই লোভে তুমি তার জন্য আমার এত বড় সর্ব্বনাশ করলে? হ্যাঁ, আমার সব চেয়ে বড় ক্ষতি! তুমি কি জান না, যে রামপালকে তুমি কাল চাতুরী ও আমারই দত্ত ধনবল দ্বারা মুক্ত ক'রে দিয়েছ, সেই আমায় ধ্বংস করবে? তুমি কি জান না, এর পর রামপাল সুরপাল আমায় কোনমতেই আর ক্ষমা করতে পারে না? তবে জেনে শুনে ইচ্ছা করেই আমায় মৃত্যুর ও ধ্বংসের মুখেই তুমি তুলে দিতে চেয়েছ? জিজ্ঞাসা করি, সত্য ক'রে বল দেখি, আমি কি কখন তোমার কোন ক্ষতি করেছিলেম—যার প্রতিশোধে তুমি আমার সমস্ত আশাকে তার ঠিক পূর্ণ হওয়ার মুহূর্ত্তে নষ্ট ক'রে দিলে? আমার চির-শত্রু, তার শত্রুতা-সাধনের প্রশস্ত অবসর প্রদান ক'রে আমার মৃত্যু নিকটবর্ত্তী ক'রে আন্‌লে।"

বলিতে বলিতে সহসা নৃপতির গৌর মুখ আভ্যন্তরিক প্রচণ্ড উত্তাপে জ্বলিয়া উঠিয়া অগ্নিদীপ্ত দেখাইল। "আমি তোমায় যেমন ভালবেসেছিলেম, এ জীবনে আর কাকেও তেমন বাসিনি। তোমার পদে আমি যে স্নেহ, প্রেম, ধন, মান অকাতরে ঢেলে দিয়েছি, তার এক ক্ষুদ্র অংশ লাভ করতে পেলে আমার বিবাহিতা স্ত্রী পট্টমহাদেবী নিজের জীবনকে ধন্য বোধ করতে পারতো। কিন্তু তুমি ত আর সতী স্ত্রী নও, বারনারীর চপল চিত্তে সে সবের স্থান কোথায়? তারা শুধু সংখ্যার হিসাব দেখে! যাক্, তোমার কর্ত্তব্য তুমি ত পালনই ক'রে ফেলেছ? এখন আমারটাই বাকী আছে। এস চন্দ্রকলা! আমার বড় আদরের প্রিয়া! তোমায় আমি অন্যের হাতে দিতে পারবো না, নিজের হাতেই আজ তোমার সব দণ্ড-পুরস্কারের শেষ ক'রে চুকিয়ে দিই এস—"

"রাজাধিরাজ।" একটা মৃদু আর্ত্তনাদ মাত্র অতি অস্পষ্ট অথচ তাহারই মধ্যে বিশ্বের সমুদয় রাশীকৃত ভয়, ব্যথা, করুণাপুঞ্জ যেন উহাতে জমাট হইয়া জমিয়া থাকা,

এমনই মর্ম্মবিদারক সে ধ্বনি একবারমাত্র বারেকেরই জন্য শুধু সেই স্নিগ্ধ আলোকোজ্জ্বল, আম্রমুকুলের গন্ধে ভরা, বিজন প্রকৃতির অব্যাহত শান্তি-সুখের ব্যাঘাত করিল। তাহার পর সব শান্ত, সব স্থির হইয়া গেল। আমগাছের ডালে বসিয়া শ্যামা দোয়েল তেমনই আনন্দে কলরব করিতে লাগিল, "বউ কথা কও" তেমনই করুণা-কাতর কণ্ঠে নীরব বধূকে সাধ্যসাধনা করিতে লাগিল। দীঘির জলে স্নিগ্ধ শিহরণ তুলিয়া মাতাল বাতাস তেমনই পদ্মদলে আনাগোনা করিতে লাগিল। মৌমাছিরা কখনও পদ্মবনে, কখনও আম্রমুকুলে বিরাট ভোজের সভায় পানে ও গানে প্রমত্ত হইয়া উঠিল।

এই সময় একটা নূতন ঘটনা ঘটিল। কিছু দিন হইতে রাজধানীতে নানাবিধ বিপ্লবাদির সংঘাতে আমোদ-প্রমোদের অভাব ঘটিয়া গিয়াছিল, বোধ করি, তাহারই প্রতিষেধকভাবেই মহারাজাধিরাজ পরমসৌগত মহীপালদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে এবার রাজধানী একটু বিশেষভাবেই উৎসব-সমারোহের আয়োজন করিয়াছিল। নাগরিকগণের প্রতি সেই বিশেষ দিনে প্রতি সৌধ সুসজ্জিত মাল্যদামে ও ধ্বজ-পতাকায় সুশোভিত করিতে আদেশ প্রদান করা হইয়া থাকে, ইহা পূর্ব্বতন বিধি। তবে এবার তাহার উপর রাজ-প্রাসাদসমূহের নব-সংস্কার ও সাজ-সজ্জার আড়ম্বরেরও যেন সীমা ছিল না।

যদিও করভার-প্রপীড়িত অসন্তুষ্ট জনসাধারণ যাহারা অন্তরেও কতকটা, বাহিরেও বর্ত্তমান রাজার পতনকামনা করিতেছিল, তাহারা রাজ-আয়ুর্ব্বর্দ্ধনকারী এই জন্মোৎসব-ব্যাপারে নিজেদের অর্থ-সামর্থ্য ব্যয় করাকে অপব্যয় বোধ করিয়া একটু বিশেষভাবেই অসন্তুষ্ট বা রুষ্টও হইয়াছিল; তথাপি রাজ-আজ্ঞা পালন না করিয়াও উপায় নাই। অগত্যা ভিতরে দারুণ অসন্তোষের অগ্নিশিখা প্রচ্ছন্ন রাখিয়া আশীর্ব্বাদের পরিবর্ত্তে গালি এবং দীর্ঘজীবনের পরিবর্ত্তে ধ্বংসকামনা করিতে করিতে নাগরিকগণ রাজ-সম্মানার্থ তাহাদের ছাদ, অলিন্দ, তোরণাদি সজ্জিত করিতে বসিল। কিন্তু অভাব-গ্রস্ত প্রজাকে তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অর্থব্যয় করা নয়, শ্রদ্ধা ত ছিলই না, বিদ্বেষ বর্দ্ধিত করিল।

মহাপ্রতীহার কুমার রুদ্রদমন বিশেষ যত্নের সহিত এই উপলক্ষে একটি মেলা বসাইয়াছিলেন, এই মেলাস্থানে আর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্য প্রদেশ হইতে নানাবিধ বস্তুজাত আনীত হইয়া প্রদর্শিত হইতেছিল। বারাণসী নগরী হইতে কৌষেয় বস্ত্র, সমতট হইতে জগন্নাথী থান, গৌড়স্থ পাটের পাছড়া, মগধের কৌশাম্বী, গান্ধারের অতি সুক্ষ্মতম বিচিত্র শিল্পজাত। মণি-রত্ন-কাঞ্চনাদি-বিনির্ম্মিত অলঙ্কার, দুর্ল্লভ কাঞ্চন ও কাচ-পাত্র-বলয়াদি, অগুরুচন্দন, চুয়া প্রভৃতি নানারূপ গন্ধদ্রব্য এমনই সর্ব্বদেশজ বিবিধ সুদৃশ্য বস্তু আহৃত হইয়াছিল। এমন কি, সুদূর চীনদেশ ও যাবনিক দেশজ শিল্পাদিরও অপ্রতুলতা ছিল না। শুধু তাই নয়, এই মেলাতলায় স্থানে স্থানে কাব্য-নাটকাদি অভিনয়োদ্দেশ্যে নাট্যমঞ্চ সকল সংস্থাপিত হইয়াছে, কোথাও যবনিকা-অন্তরালে নট ও নটীগণ নাট্যোচিত সাজ-সজ্জায় সজ্জিত হইতেছিল, কোন রঙ্গভূমে উত্তোলিত যবনিকার সম্মুখে নাট্যসূচনায় নট ও নটী তখন শ্লোকচ্ছন্দে প্রস্তাবনারম্ভ করিয়া দিয়াছে। এক স্থানে সর্ব্বাপেক্ষা জনসমাগম, সেখানে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সাগ্রহ সমাবেদনপূর্ব্বক নিমন্ত্রিকা-কলাকুশলিনী নর্ত্তকীবৃন্দ-মধ্যে রাজনর্ত্তকী বিদ্যুন্মালা নানাবিধ ভঙ্গীসহকারে নৃত্য করিতেছিল। মহাপাত্র দণ্ডোপাসিক, মহাপ্রতীহার, মহা-মাঙ্গলিক, মহাসন্ধিবিগ্রহিক প্রভৃতি সম্ভ্রান্তবর্গ এই স্থানেই রাজাধিরাজকে বেষ্টন করিয়া অমরকুল-পরিবেষ্টিত ইন্দ্রসভার শোভা প্রদর্শন করিতেছিলেন। আসব ও অপ্সরা দুইয়েরই এখানে কিছুমাত্রও অপ্রতুলাতা ছিল না।

এ দিকে এক ভাগে সুদৃশ্য পর্ণকুটীর সকল নির্ম্মিত ও তাহার মধ্যে অতি বিচক্ষণ শিল্পী দ্বারা বিনির্ম্মিত হইয়া বুদ্ধদেবের বহুবিধ জাতকলীলা মৃন্ময় প্রতিমায় প্রদর্শিত হইতেছিল। অন্যত্র ঐ ভাবে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ প্রভৃতি অসুরশক্তির সহিত অক্লান্ত সমর-চিত্র মৃৎপ্রতিমায় প্রকটিত। এতদ্ভিন্ন কোথাও কৃষিক্ষেত্রে কৃষক হল প্রদান করিতেছে, শিবঠাকুর ভবানীদেবীর সহিত ষাঁড়ে চড়িয়া চলিয়াছেন, কোথাও হারীতী দেবী ভীষণ রোগশান্তি করিতেছেন। তারাদেবী এবং রক্ষাদেবতা অবলোকিতেশ্বর স্বর্ণ-আসনে উপবিষ্ট। এখানকার অধিকাংশ দর্শক বৌদ্ধ ও বৈদিক, শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ, সাধু ভক্ত পণ্ডিতমণ্ডলী এবং কৃষকসম্প্রদায়।

এই মেলাস্থানের মধ্যভাগে এবার আরও একটা উৎসাহশীল আনন্দের আয়োজন বিশেষভাবেই করা হইয়াছিল—তাহা মল্ল-প্রদর্শনী। রাজপক্ষ হইতে প্রচার করা

হইয়াছিল যে, দেশবিদেশে যত যত মল্ল আছে, সকলেই এই স্থানে নিজ নিজ শৌর্য্য-বীর্য্য প্রদর্শন করিতে পাইবে। ইহার মধ্যে যাহারা মল্লক্রীড়াতে যোগ্যতম বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহাদিগকে যথোচিত পুরস্কৃত করা হইবে, তাহারা ইচ্ছা করিলেই রাজসৈন্যদলভুক্ত হইতে পারিবে, শান্তিরক্ষা কার্য্যে নিয়োগ প্রার্থনা করিলে তাহাও অপূর্ণ থাকিবে না। এ বৎসরের অজন্মা ও তাহার উপর রাজকর যোগাইতে সর্ব্বস্বান্ত গৌড়বর্দ্ধনবাসী চাকরীর জন্য লালায়িত হইয়া ফিরিতেছিল, দলে দলে পালোয়নরা নিজ নিজ শৌর্য্য-বীর্য্য প্রদর্শনে পুরস্কৃত হইবার আশা লইয়া ছুটিয়া আসিল। অবশ্য অনেকেই আবার কেবলমাত্র শক্তি-প্রদর্শনের জন্যই আসিয়াছিল, রাজকার্য্যে নিয়োগ তাহাদের প্রার্থনীয় নহে।

ভীমও মল্লক্রীড়ায় আত্মশক্তি প্রদর্শন করিতে আসিয়াছিল। লোক বলিত, ভীমের দেহ পৌরাণিক কালের ভীমের মতই না কি সবল। মল্লক্রীড়ায় ভীমের মত কৌশলী এ অঞ্চলে কেহ নাই বলিলেও চলে। লাঠি খেলিতে, তীর দিয়া উড়ন্ত পাখী মারিতে—এ সকল কার্য্যেও ভীম প্রায় অসাধারণ। বীরত্ব-প্রদর্শনীতে নিজ বীর্য্যবত্তা প্রদর্শন করিতে সে তাহার সঙ্গী সহচরদের সঙ্গে আমন্ত্রিত হইয়া সাগ্রহে অগ্রসর হইল। রাজাধিরাজ ঘোষণা করিয়াছিলেন, মল্লক্রীড়ায় প্রথম ব্যক্তিকে তাঁহার দেহরক্ষিদলের অগ্রণীর পদ ও সহস্র স্বুবর্ণ-নিষ্ক দ্বারা পুরস্কৃত করা হইবে।

দিব্বোক, রুদ্যোক, ঝড়ো, লঘা, সরব, চিতুয়া, এমন কি, ছোট্ট বিশেটা পর্য্যন্ত তামাসা দেখিতে তাহার দাদাদের ঘাড়ে চড়িয়া উপস্থিত। সনকা দেখিয়া শুনিয়া ঝি, বউ, নাতনী-নাতিগুলাকে মুখে মাথায় তেলহলুদ মাখাইয়া, কানে রূপোর মদনকড়ি, হাতে পিতলের বদলে রূপার খাড়ু, ক্ষার খোল দিয়া কাচা কণ্ঠীটি লটকান ও সিউলিফুলে রাঙ্গাইয়া পরাইয়া সাজসজ্জা করাইল। নিজেও কাঁচা পাকায় মিলানো চুলকে তেলে চুবাইয়া তাহাতে লোটন খোঁপা বাঁধিয়া কাঁকালে ঘটি, পায়ে মল্ল-তাড়ল, হাতে রূপার খাড়ু, কানে সোনার মদনকড়ি ও পাটের পাছড়া পরিয়া সাজিয়া তৈরী হইল। উজ্জ্বলাও সবার সঙ্গে তার জ্যেষ্ঠশ্বশুরের দেওয়া শাড়ী ও নূতন চকচকে রূপার অলঙ্কারে সাজিয়াছিল, শাশুড়ী তাহাকে দেখিয়া বলিল,—"তুই গেলে বুড়ো মা'টায়ে কে আগলাবে লো? তোর আজ আর যেয়ে কাম নেই, দুদিন ত থাক্‌বেই এখন, তুই তখন আরেক দিন যাস্।"

উজ্জ্বলার সে ইচ্ছা নয়, আজ বড় বড় নামজাদা পালোয়ানদের মল্লক্রীড়া হইবে, ভীমও তাহাদের মধ্যে এক জন, উজ্জ্বলার ইচ্ছা, অন্তরালে দাঁড়াইয়া সে তাহার স্বামীর গৌরবটা স্বয়ং দেখিয়া আসে। তাহার বিশ্বাস ছিল যে, ভীম প্রথম পুরস্কার লাভ করিবে। সে তাই ঘোড়ার মত ঘাড় বাঁকাইয়া ঘোর আপত্তির সুরে বলিল, "আজকের মত কোন দিন এমন হবে না, ওদের মধ্যের কেউ তখন আর এক দিন যেয়ে দেখুক না।"

"কে বাপু আজ থাকবে? ওরা সব বাচ্ছা, তুই ধাড়ি হয়েই যখন সামাল দিতে পারছিসনে, তখন কাকে বল্‌ব বল্ ত থাক্‌তে?"

এই অবিচারেই ত উজ্জ্বলাকে আগুন করিয়া তোলে, সে-ই এক ধাড়ী আছে, আর সব বাচ্ছা! বেশ ত! মেজুনী সেজুনী এরা কি বয়সে তার চাইতে কিছু ছোট না কি? দেখিতে ক্ষয়া ক্ষয়া হইলেই বয়স বুঝি তাদের কখন বাড়ে না? এক যায়গায় দাঁড়াইয়া একরকমই থাকে?

রাগে দুই চোখ পাকল করিয়া সে উত্তর করিল, "এতেই ত রেগে মরি! তোদের ত চিরকালই ঐ একচোকোপানা রোগ! কেন, মেজুনী আজ থাক না, ও না হয় কালকে যাবে। আমি আজ যাবই যাব।"

শাশুড়ীর দাঁত কিড়-মিড় করিয়া উঠিল, "বউড়ী মেয়ের এত দ্যামাক! আমি বলেছি যখন তোকে থাকতে হবে, তখন তুই ছাড়া কেউ থাকবে না। তোকে থাকতেই হবে।"

উজ্জ্বলা আর কিছু না বলিয়া দুমদাম শব্দে পা ফেলিয়া ক্রোধভরে বাগানে চলিয়া গেল। সেখানে ছায়া দেখিয়া একটা যায়গায় গিয়া বসিয়া পড়িয়া শাশুড়ীকে জানাইতে চাহিল যে, তাহাকে রাখিয়া গেলে বটে, সে কিন্তু তোমার কোন কাযেই লাগিবে না।

শাশুড়ী তাহা বুঝিল, মেজ বউকে বলিল, "তুই তা হ'লে নয় আজ থাক গা?"

আদুরে বউ তাহার মস্ত বড় সোনার নথটাকে চাকার মত বেগে ঘুরাইয়া দিয়া মুখখানাকে ভীমরুলের চাকের

মত ভারী করিয়া চ্যাটাং করিয়া জবাব দিল, "তা আর নয়! বুড় বয়েসে উনি মজা ক'রে মজা দেখতে চল্লেক, আর আমরা ঘরে বস্যে বস্যে ওঁর মা আগুল্বো! বল্তে একটু লাজও লাগেক্ নি?"

উপযুক্ত উত্তরে প্রশ্নকর্ত্রী নীরবে রহিল ও ইহার পর আর কোন কথাটি পর্য্যন্ত না বলিয়াই আগে আগে পা বাড়াইয়া বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িল। যাত্রাকালে আপনার মনেই গজর-গজর করিতে করিতে "আগো মা ও বুড়ী-ঠাক্রেণ! তোকে খাসা ক'রে পূজো দোব, আজাদরের ডালা দোব, ভাল ক'রে ভোগ দোব, আমার ঘরের ঐ হাড়-হাবাতি হতচ্ছাড়ীডারে তুই তোর কাছকে ক'রে নিয়ে নে'মা। মোর হাড়ডা জুড়ুক। আমি ভেমাকে আবার বিয়া দিই।"

বৃদ্ধা ঠাকুরাণী বা মনসাদেবী স্থানে থাকিয়া স্নেহময়ী শ্বশ্রূমাতার এই পুণ্য নিবেদনটুকু হয় ত বা ভাল করিয়াই শুনিয়া রাখিলেন।

উজ্জ্বলা বড় বেশী রাগিয়াছিল। মানুষের অবিচারেরও ত একটা সীমানা থাকা উচিত! এ কি অসঙ্গত সৃষ্টিছাড়া অন্যায় অবিচার! এ কি তাহার জন্য সর্ব্বকালে ও সর্ব্বদাই উদ্যত হইয়া থাকিবে? কোন দিনই কি ইহা হইতে সে এতটুকুও মুক্তি পাইতে পারিবে না? তাহার সারা চিত্ত গভীরভাবে বিদ্রোহ করিয়া উঠিল। না, এমন করিয়া আর সে সহিতে পারিবে না! পারিবে না কি, সহিবে না। যতই সহিবে, ততই যখন তাহার উপর অবিচারের বাণবর্ষণও চলিতে থাকিবে, তখন না সহাই ত ভাল!

দিব্যোকের বাড়ীর পিছনদিকে অনেকখানি জুড়িয়া বাগান বেড় ও তাহাদের সুবিস্তৃত ক্ষেত্রগুলি নূতন শস্যে আলোকিত হইয়া রহিয়াছে। এ দিকে অপর্য্যাপ্ত সরিষাফুলের হরিদ্র কান্তি, ও দিকে মূলাফুলের শ্বেত-শান্ত তপঃশুদ্ধ মূর্ত্তি; অড়হরের ও কলাইশুঁটির ফুলেরও যথেষ্ট রূপ খুলিয়া গিয়াছিল এবং বেগুনের ছোট ছোট গাছে বড় বড় বেগুনগুলা যেন বালিকা জননীর কোলে দামাল শিশুর মত মাটীর দিকে লম্বাভাবে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। নূতন উৎসাহে দিব্যোক ও রুদ্দোক বুড়া দুই জন এবার তাহাদের ক্ষেত-খামার ও বাগান-বেড়গুলিতে যেন সোনা ফলাইয়া তুলিয়াছে। আর ইহার জন্য পরিশ্রমই বা কি অক্লান্ত!

উজ্জ্বলার মনটা আগুন হইয়া জলিতেছিল। ভীম গত রাত্রিতে তাহাকে বলিয়াছিল, সে-ও যেন তাহার মায়ের সঙ্গে আজ মেলাতলায় যায়, সেখানে দেখিবার শুনিবারও অনেক আছে, তা ছাড়া ভীমদের যে মল্লক্রীড়া হইবে, ভীমের ইচ্ছা, উজ্জ্বলা সেটাও স্বচক্ষুতে দেখিয়া আইসে, যখন এত বড় একটা সুযোগ ঘটিয়া গিয়াছে। তাই উজ্জ্বলার মনটা আজ বেশী খারাপ হইয়া গিয়াছিল। একে ত তাহার এই তরুণ বয়স, দেখিবার শুনিবার কত সাধ-আশাই না তাহার মনের ভিতরটাতে ভরিয়া আছে। তাহার উপর আবার স্বামীর অনুরোধ। এ দুইয়ে মিলিয়া তাহার মনটাকে যেন প্রবলবেগে ধাক্কা মারিতেছিল, এবং নৈরাশ্যে ক্ষোভে তাহাকে ক্ষেপাইয়া তুলিতেছিল, দুঃখে ও রাগে গুম হইয়া থাকিয়া সে মনে মনে বলিল, "একবার ম'রে গিয়েও আমার দেখতে ইচ্ছে করছে, আমি না থাকলে এদের কাযে কে সামাল দেয়? আগে না হয় দারিদ্দির ছিল, এখন ত আগের চাইতে ধন হয়েছে, তবু যে কেমন ক্ষুদ্দুর দৃষ্টি, বউ-এর মাংস সেদ্ধ ক'রে খেতে বড় মিষ্টি লাগছে।"

চুপ করিয়া সে একটা আমগাছের গুঁড়ির উপর পিঠ রাখিয়া বেড়ার পাশে বসিয়া রহিল। আমের মুকুলের গন্ধে ভরা উদাস অবশ বাতাস মাতালের মত টলিয়া টলিয়া বহিয়া যাইতেছে, সামনেই রাজপথ, পথের ধারে গাছের সারি, ছায়াগুলা তার বাঁকা হইয়া পড়িয়া আছে, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ পথের উপর পথিকদের পায়ের তলায় ঝুরো ফুলের রাশি বিছাইয়া দিয়াছিল। উজ্জ্বল রৌদ্রে রাস্তা-পারের ক্ষেত্রের মধ্যে সরিষাফুলে সোনার তরঙ্গ উঠিতেছিল, মৌমাছি-দের গুঞ্জনও সেই দিক হইতেই আধভাসা হইয়া আসিতেছিল, পথের উপর দিয়া এখনও কত লোক আনাগোনা করিতেছে, তাহাদের সকলেরই গায়ে উৎসবের গন্ধ, মুখে-চোখে উথলিত আগ্রহ ও আনন্দ এবং চরণে ত্রস্তগতি। উজ্জ্বলা তাহাদের দেখিতে দেখিতে আবার যেন মনের মধ্যে অশান্ত হইয়া উঠিল। এই যে এত লোক, তাহাদের মধ্যে এত মেয়েও যে একদিক হইতে আসিতেছে, তবু হয় ত তাহাদের মধ্যে কাহা-রও স্বামী তাহার স্বামীর মত বীরপুরুষ নহে, রাজার কাছে নিমন্ত্রিত হইয়া ক্রীড়া দেখাইতে যায় নাই! উজ্জ্বলা একটা গভীর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

"হ্যাঁ গা বউ, এইটেই কি দিব্বোক কৈবর্ত্তের ঘর?"

সহসা এই সম্বোধনে উজ্জ্বলা সবিস্ময়ে মুখ ফিরাইয়া দেখিল, এক জন তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিতা অর্দ্ধবয়সী স্ত্রীলোক তাহাদের বাগানের বেড়ার ধার হইতে তাহাকেই এই বলিয়া সম্বোধন করিতেছে।

উজ্জ্বলা বিস্ময়স্মিত নেত্রে তাহাকে দেখিতে দেখিতে মাথার উপর একটুখানি কাপড় টানিয়া দিয়া খাটো গলায় উত্তর দিল—"কেন গা ?"

আগন্তুকা উজ্জ্বলার কাছের দিকে খানিকটা সরিয়া আসিয়া বেড়ার মধ্যে ঝুঁকিয়া পড়িল ও কণ্ঠস্বরটাকে কিছু ছোট করিয়া মৃদুস্বরে বলিল,—"তুমিই কি ভীম-কৈবর্ত্তর বউ ? তা মা, খাসা রূপ তোমার ! দেখলে চোখ জুড়োয় বটে ! রূপের যেন গড়ামূর্ত্তি ! তা হ্যাঁ গা, তুমি কি আমার সঙ্গে একবার মেলাতলায় আসতে পারবে ? ভীম আমায় অনেক ক'রে ব'লে কয়ে পাঠিয়ে দিলে যে, 'মাসী ! সব্বাই এলো, শুধু বউ আসতে পেলে না, তুমি যদি তাকে একটি-বার সঙ্গে ক'রে নিয়ে এস ত ভালমানুষের মেয়েটা তবু এক-বার দিষ্টি সার্থক ক'রে যায়।' তা ভীম আমার বড় অনুগত মা, বাছা আমার মাসী মাসী ক'রে অস্থির হয়। তোমার কাছে সে কি কোন দিন তার কায়েত-মাসীর নাম করে নি ? হ্যাঁ গা বাছা, আমিই সেই গো ?"

উজ্জ্বলা এই সংবাদে একবারে লাফাইয়া উঠিল। তাহার স্বামী তাহাকে ডাকিতে পাঠাইয়াছে ! তাহার কৃতিত্ব, ক্রীড়াকৌশল দেখাইবার জন্য উজ্জ্বলাকে সে আনিতে লোক পাঠাইয়াছে, আর কি সে না গিয়া থাকিতে পারে ? শিশুর মত ত্রস্ত লঘুপদে সে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল। এক-বারে অপরিচিতার পায় পড়িয়া পায়ের ধুলা তুলিয়া লইয়া তাহার হাত ধরিল, "হ্যাঁ গো মাসী ! আমি যাবোই যাবো গো ! চল, আমরা যাই।" এই বলিয়াই সে সহাস্যস্মিত-মুখে প্রবীণাকে একপ্রকার টানিয়া লইয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

ভীমের মাসী এই তরুণী নারীর এরূপ উদগ্র আগ্রহের প্রবলতায় যেন একটু কেমন দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছিল, ত্বরিতে সেটুকুকে সংবরণ করিয়া লইয়া সে সদ্য নীড়ছাড়া পাখীটির মত হাস্যমুখী চপলা তরুণীটিকে নিজের কাছে টানিয়া লইয়া হাসিয়া বলিল, "আহা হা ! কি অবোধ মেয়ে তুমি মা ! ভীমকে বড্ড ভালবাসিস্ বুঝি, হ্যাঁ গা বাছা ! তা সে-ও বাসে বাপু ! খুব ভালবাসে ! ঐ দেখ না, তোমায় অতটা দূরে হেঁটে যেতে দেরী হবে বলেই না সেই ভেবেই বাছা আমার সঙ্গে ডুলীবাহক দিয়ে দিলে, তবে এস না, ঐ দিকটা পানে তারা রয়েছে, ঐখানে গিয়েই তুমি চড়ে বসো, আমি সঙ্গে সঙ্গেই হেঁটে যাব'খন।"

বিস্ময়ে ও আনন্দে উজ্জ্বলা যেন চমৎকৃত হইয়াছিল। বাস্তবিক তাহার স্বামী তাহাকে কত ভালবাসেন ! এতখানি ভাবিয়া এত ব্যবস্থা করিয়া তাহাকে লইতে পাঠাইয়াছেন। গভীর কৃতজ্ঞতায় তাহার চোখ ছলছল করিতে লাগিল। এরূপভাবে গৃহ ত্যাগ করিয়া গেলে, ফিরিয়া যে অনেক লাঞ্ছনাই তাহাকে সহিতে হইবে, সেই কথাটা মনের কাছা-কাছি ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকিলেও সে এ গৌরব ও আনন্দের মুহূর্ত্তে তাহাকে মনের মধ্যে আমোল দিল না, ভবিষ্যতে যা ঘটে ঘটুক, বর্ত্তমানটাকে সে শুধু এখন প্রাণ ভরিয়া উপ-ভোগ করিয়া লইতে চাহে।

উচ্ছ্বসিত চিত্তে স্বপ্নাভিভূতের মতই সে ডুলী চাপিয়া বসিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই বাহক কয় জন তাহাদের সঙ্গিনীর ইঙ্গিতানুসারে ডুলীর উপর স্থূল বিচিত্র আচ্ছাদনীখানা ক্ষিপ্রকরে টানিয়া দিয়া দ্রুতপদে ডুলী লইয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হইল।

গোধূলিবেলার রক্তালোকধারা তখন দিব্যোকের গৃহে, উদ্যানে, পথের পরে এবং উজ্জ্বলার শিবিকার আচ্ছাদন-বস্ত্রে সর্ব্বত্রই যেন সমুজ্জ্বল লালের আভায় উত্তপ্ত হৃদয়-শোণিতের বর্ণ-সমাবেশ করিয়া দিয়াছিল। দেখিতে দেখিতে পশ্চিমদিগন্তে দিবসান্তের অবসন্ন সূর্য্য নিষ্প্রভ ম্লানমুখে যেন মুমূর্ষুর মতই ঢলিয়া পড়িলেন।

গৃহের মধ্যে ভীমের দিদিমা অসহায় রুষ্ট কণ্ঠে ডাকিতে-ছিলেন, "ওলো ও বড়কী ! বলি, গেলি কোথা লো ? আ মর, মর ছারকপালী ! যেন পাটরাণী হইছেন, গলা কেড়ে ফ্যালালেও সারাবত্তি ভায় না।"

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

পূজায় উৎপাত
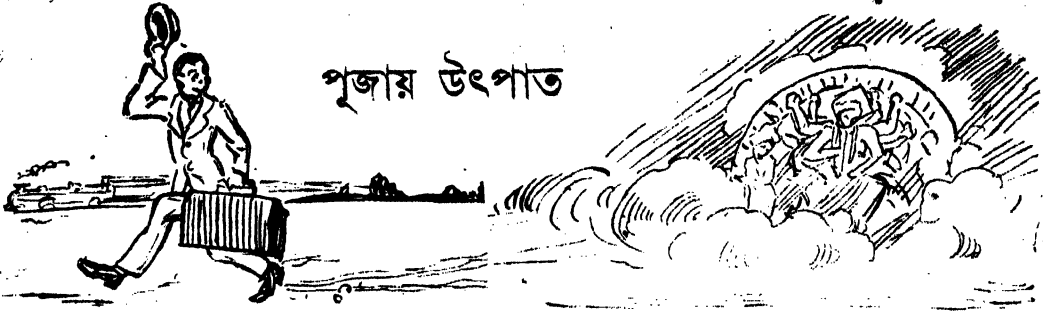
পূজোর সময় "চেঞ্জ" ছেড়ে কে যাবে ছাই বাড়ী,
হুইসেল্‌টা কিসের ? 'আহা, ছাড়্‌লো বুঝি গাড়ী ?
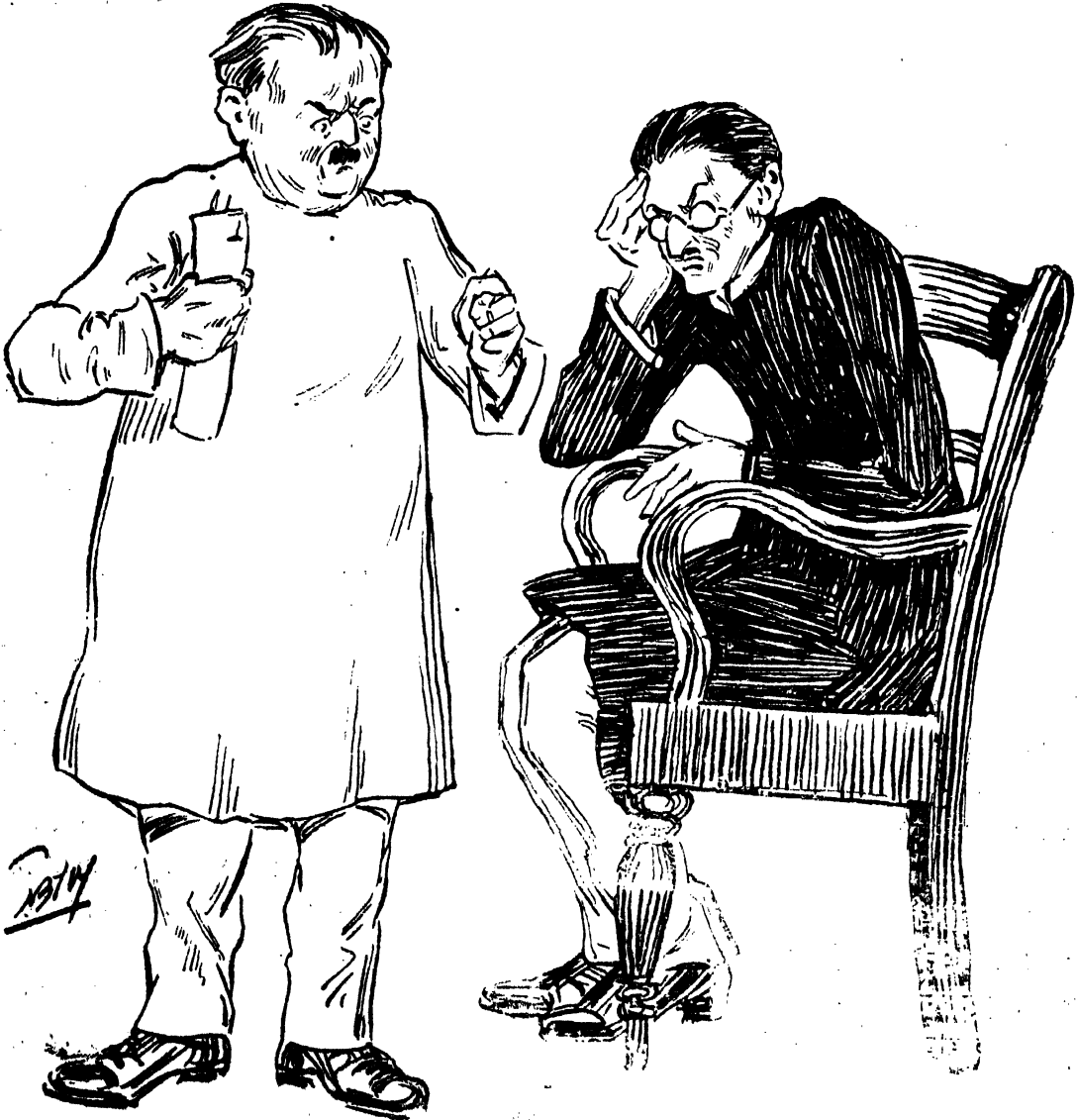
যে তাগাদা লাগিয়েছে ব্যারিষ্টারের বাবু ;
বাস্তু-ঘুঘু এটর্ণী [illegible] একেবারে কাবু !
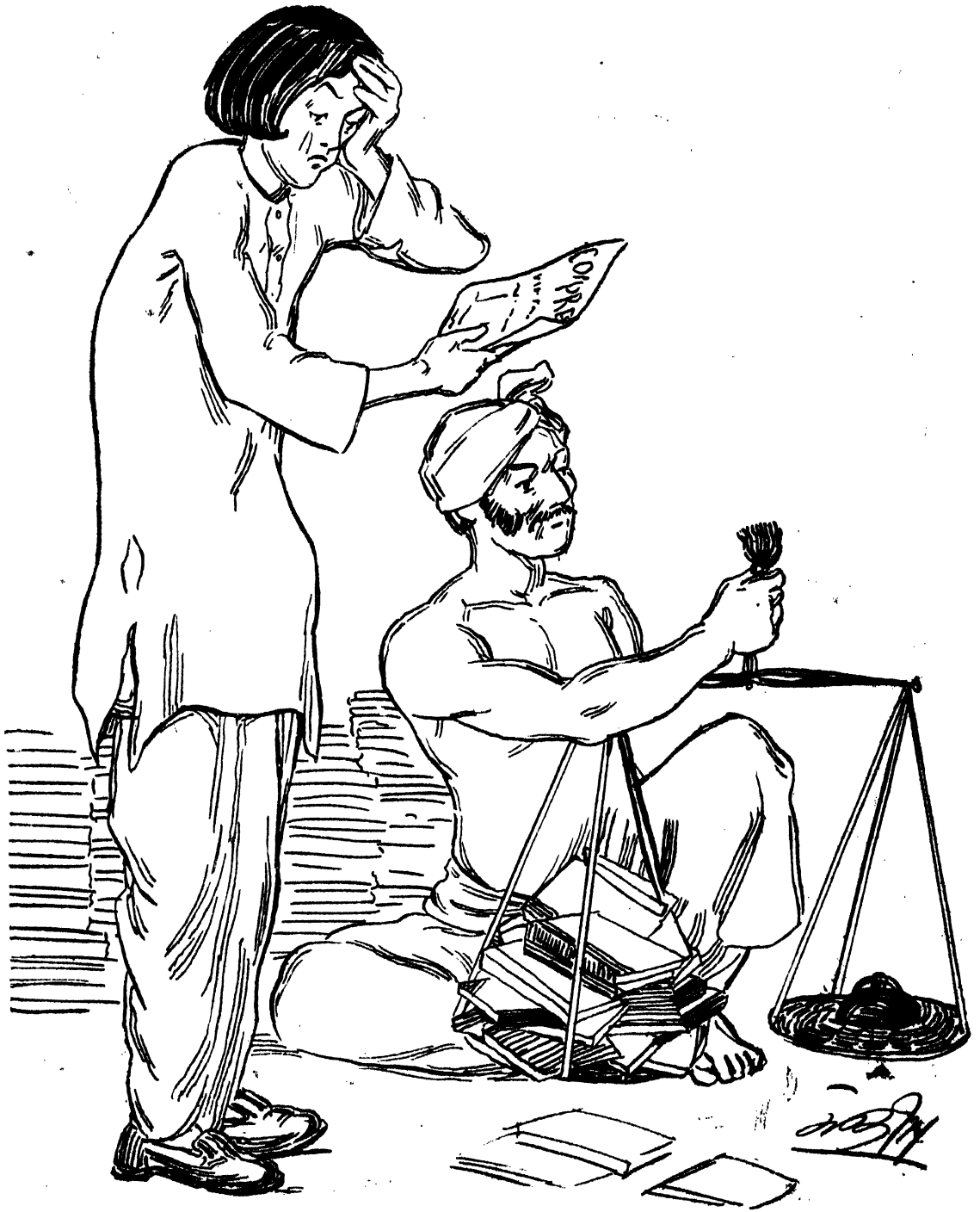
বই ছাপালেম, পড়লে না কেউ, মানুষ ত নাই দেশে ;
ওজন দরে দপ্তরীকে দিতে হলো শেষে !

মায়ের পূজো, ফুর্ত্তি তরে টেনেছি তাই ভাই,
কি নিগ্রহ, এতেও আবার তোমার পূজো চাই ?

জামাইবাড়ী তত্ত্ব যাবে, মেয়ের কাপড় এই !
'ছি ছি' শোনার চেয়ে কাপড় না হলো নেই নেই ॥

যা কিছু এ রাজ্যে আছে, ফর্দ্দে দেখি তাই ;

পড়ি কখন্, কিনি কখন্, টাকাই কোথা পাই ?

কর্ত্তা।— এই ত বেশ হার, হাজার টাকায় এটা যদি পাই ;
ওটা নিয়ে পাঁচ শো কেন বেশী দিতে যাই ?

তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী।—পর্‌বো আমি দেখবে তুমি, জলে ত নয় ফেলা,
চোখ সার্থক হবে তোমার তাতেই আমার বলা।

ট্যাক্সিওয়ালা।—গাড়ীভাড়া শ সাত টাকা কৌড়িটি কম নয় ;
শীঘ্র 'মিটাও থাকে যদি বে-ইজ্জতের ভয়।

বাবু।—এত রাতে অত টাকা কোথায় পাব মিয়া.!
শোধ ক'রে নাও পাওনা বরং ঘড়ী-চে'ন নিয়া॥

পূজোর সময় টাকার, বাবু, বড়ই প্রয়োজন ;
তা নৈলে কি বাঁধা দিতে আসি ভদ্রাসন ?

শিল্পী—শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ

মাধুরী

"ঠাকুরপোর এবার অভিমত কি ?"

"তার মানে ?"

"অর্থাৎ অভিমত কথাটা তোমার কাছে বড়ই সুকঠিন ঠেক্‌ছে, সে জন্য তুমি ঐ কথাটার একটা প্রতিশব্দ জান্‌তে চাচ্ছ ?"

"তোমার প্রথম হেঁয়ালি বুঝতে না বুঝতে তোমার দ্বিতীয় হেঁয়ালি ছুড়ে মার্‌লে। তোমরা সব হ'লে কি, বউদি! 'অভিমত', 'প্রতিশব্দ'—এ সব ব্যাপার কি ?"

"ব্যাপার কিছুই সাংঘাতিক নয়। সেদিনকার সংসদে সুস্থির করা হয়েছে যে, আমাদের বক্তব্যগুলিকে মনোহর এবং সরল করবার জন্যে যতদূর সম্ভব উপসর্গ ব্যবহার করতে হবে।"

"তা এ সব সংসদ্ তোমাদের কোথায় বস্‌ছে ? আর সংসদের আদেশমত এই সব সরল কথা আরও সরল এবং সুন্দর ক'রে ব্যবহার কর্‌বার আগে দয়া ক'রে আমাকে একটা খবর দিলেও পার্‌তে ; আমি একখানা পকেট শব্দকল্পদ্রুমের ব্যবস্থা ক'রে আস্‌তুম। কারণ, এতে তোমাদের ভাষা খুব পুষ্ট হলেও আমাদের মত প্রাণীদের বড়ই ক্লিষ্ট হ'তে হবে।"

"সংসদ্ দক্ষিণদিকের বারান্দাতেই বস্‌ছে। কিন্তু তুমি হাসালে, ঠাকুরপো! দুটো এম, এ,তেই প্রথম স্থান অধিকার ক'রে এবং এত বড় আইনের দিগ্‌গজ হয়েও যদি তোমার 'অভিমতের' জন্য শব্দকল্পদ্রুম আন্‌তে হয়, তা হ'লে ত আমাদের কথা-বলা বন্ধ রাখতে হবে।"

"আচ্ছা, বড় বৌদিদিও কি ভাষার শ্রীবৃদ্ধিতে মন দিয়েছেন ?"

"হ্যাঁ, দিতে হয়েছে বৈ কি!"

"আর দাদারা ?"

"আমি মধ্যম সম্বন্ধে তোমাকে সংবাদ দিতে পারি। তিনি আমাদের সভাপতি। বড় ঠাকুর সম্বন্ধে সংবাদ তোমাকে বড়দির কাছ থেকে নিতে হবে। আমার সে কথা বলা ভাল দেখায় না।"

"এ দুর্ব্বলতাটুকু আর কেন রাখছ,—যখন আর সব ভয়ানক দুর্ব্বলতাই তোমরা জয় ক'রে ফেলেছ ?"

"কি বিজয় করতে দেখলে ?"

"নিজের পতিকে অন্য কারও পতি ক'রে দিতেও তোমাদের বাধছে না। এত বড় আধুনিক হয়েও তোমরা পুরাতন গুণগুলি ছাড় নি। আধুনিকদের দুর্ব্বলতাগুলি জয় ক'রে তোমরা পুরাতন ও নূতনের সমন্বয় ক'রে তুলছ দেখছি।"

"আচ্ছা ঠাকুরপো, আমি সরল ভাষাতেই কথা কচ্ছি। দেশে ব'সে যে কটা পরীক্ষা দেওয়া যায়, সবগুলি শেষ করেছ। এখন বিবাহে ত আর আপত্তি নেই। এখন যদি বল, নিজে উপায় করব, তার পর ও সব কথা, তা হ'লে হয় তোমার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করা, না হয় তোমাকে বয়কট করা ছাড়া আর কোন উপায় থাক্‌বে না।"

"এমন ভাবে আটঘাট বেঁধে কথা কইতে শিখেছ যে, দাদার যদি কোন দিন কোর্ট কামাই করতে হয়, তুমি গিয়েও চালিয়ে দিতে পার। কি বল্‌ব, কি না বল্‌ব, সব যদি বলেই দিলে, তবে আবার জিজ্ঞাসা করা কেন ?"

"আচ্ছা, আমি এবার সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে আসল কথাটাই তোমাকে জিজ্ঞাসা কচ্ছি, বিবাহে তোমার মত কি ?"

"বিবাহটা খুব সৎকার্য্য, পণ্ডিতরা একে শুভকার্য্যও ব'লে থাকেন। যে বিবাহ করে না, সে মূর্খ ও অর্ব্বাচীন। বুদ্ধিমান্ লোকরা তাদের মুখদর্শন পর্য্যন্ত করেন না এবং বৌদিদিরা তাহাকে আদর পর্য্যন্ত করেন না। যে ব্যক্তি আবার ইহাকে বিবাহ করিব না, উহাকে বিবাহ করিব না বলে, কেহ তাহাকে দেখিতে পারে না। বিবাহ শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে—"

"রক্ষে কর ঠাকুরপো! এই বুঝি তোমার সরল উক্তি হচ্ছে?"

"দাঁড়াও বৌদি, শেষ করি; ভুলিয়ে দিও না। বিবাহ শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে হিতোপদেশে পড়েছি, বি পূর্ব্বক বহ ধাতু ঘঙ্, তার অর্থ হচ্ছে—বিশেষরূপে বহন করা। সম্প্রতি একখানি হিন্দী মাসিক পত্রে একটা বিবাহ সম্বন্ধে ছবি বার হয়েছে। ছবিটি হচ্ছে এই—এক গ্রাজুয়েটের ছুটি শিং বার হয়েছে আর পিঠে একটা প্রকাণ্ড বোঝা বয়ে বেচারার মাজা ভেঙ্গে যাবার যোগাড় হয়েছে। পিঠের বোঝাগুলি হচ্ছে এই—এক বোঝা মোটা মোটা বই, তার ওপর তার বিবি ব'সে, আর কোলের কাছে ছুচারটি ছেলে-মেয়ে। কেমন ছবি বল দেখি?"

"তোমার সংক্ষেপে বলা শেষ হয়েছে ত? এবার আমি যৎসামান্য কিছু বল্‌তে পারি?"

"হাঁা, এখন তুমি যৎসামান্য কেন, যৎ-দীর্ঘও বল্‌তে পার।"

"আচ্ছা, ছবি থেকেই কথা আরম্ভ করা যাক। প্রথম কথা—পাশ করার আগে তোমার ঘাড়ে বইয়ের বোঝা ছাড়া কোন বিবির বোঝা চাপান হয় নি। যখন বিবিই নেই, তখন সন্তানাদির কোন বালাই নেই। তার পর মাজা ভাঙ্গা—চট ক'রে মাজা তোমার ভাঙ্গছে না। কারণ, মাজার বল তোমার কিঞ্চিৎ আছে। বাবা তোমাদের ক'ভাইয়ের শিক্ষার জন্য যে টাকা রেখেছিলেন, তোমার দাদাদের সব টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তুমি বরাবর স্কলার্শিপ পাবার জন্য সে টাকা বরং বেড়ে গিয়েছে। তার ওপর গোড়ায় গলদের সে কথা আর তোমাকে মনে ক'রে দিতে হবে না যে, বাবা বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই তোমাকে ত্যাজ্য পুত্র করবেন না। এখন আর একবার ভেবে তোমার সরল বক্তব্যটি বল ত।"

"বৌদি, তুমি আমাকে একবারে বেড়াজালে ফেলে দিচ্ছ। দোহাই তোমার, আর দিনকতক যাক্, তার পর পাকা কথা দেব।"

"দেখ ভাই, তা হ'লে তোমাকে আমি স্পষ্ট কথাই বলি। সবারই ইচ্ছে, তুমি এবার বিবাহ কর। মা, বাবা, তোমার দাদারা ও বড় বৌদিদি সবাই এই চান। তবে তাঁরা ভাবেন, তুমি আমার কথা বেশী শুনবে, সেই জন্য আমার ওপর এই ভার দিয়েছেন। কিন্তু ভার যে কত শক্ত, আর আমি যে কত তুচ্ছ, সে কথা তুমি যেমন জান, তেমন তাঁরা ত জানেন না। কিন্তু আর তোমাকে আমি বিরক্ত করব না। তাঁদের এবার আমি জানাব, তোমার ওপর আমার কোন জোর নেই। তুমি পণ্ডিত বিদ্বান্, আমার মত সামান্য মেয়ে-মানুষের কথা কেনই বা শুনবে?"

"এ কি, বৌদি, তুমি কেঁদে ফেল্লে! তোমার পায়ে পড়ি বৌদি, আমার অপরাধ ক্ষমা কর। আমি এবারটা ঘুরে আসি। এসে তুমি যাকে বলবে ও যে দিন বল্‌বে, আমি বিবাহ করব।"

"না ঠাকুরপো, আমি তা চাইনে। তুমি নিজে পছন্দ ক'রে বে কর। আমাদের কারুর তাতে আপত্তি হবে না; বরং আমরা তাতে আরও খুসী হব। তবে তুমি যদি বল, কি রকম পাত্রী তোমার পছন্দ, আমি খোঁজ করতে পারি। তার পর তোমার যদি পছন্দ হয়, তুমি তাকে বে করবে।"

"অনেক দিন আগে তোমাকে ত বলেই ছিলুম বৌদি, আমার বাবা খুব বড় উকীল, দাদারা সব কৃতবিদ্য, আমার নিজের নামেও টাকা আছে—সম্পত্তি পাবার আশা আছে—এ অবস্থায় যে স্ত্রী পাওয়া যাবে, তার মনের সবটুকু আমার হবে না। কাযেই সে রকম স্ত্রীতে আমার আনন্দ নেই। আমাদের সমান ঘর থেকে যদি বৌ আনা হয়, তা হ'লে সে যে সব আশা ক'রে আসবে, তার কিছুই পাবে না। তুমি ত জান, আমি অত্যন্ত সাদাসিধে থাকি ব'লে কত লোক আমাকে নিন্দে করে। আমি ভাল খাবার না খেয়ে ছোলা-ভিজান খেয়ে জল খাই। এই ক'রে আমি পড়ার সময় কত অনাবশ্যক খরচ বাঁচিয়েছি। তুমি ভেবে দেখ, আজকালকার দিনে কোন্ স্ত্রী এ সব পছন্দ করে?"

"তুমি গরীবের ঘরে বে কর—তা হ'লে ত সে বিপদ ঘটবে না।"

"তা বলা যায় না, বৌদি। হয় ত সে বড়লোকের বাড়ী শুনে বেশী আশা ক'রে আসবে। আমার এই রকম খাওয়া-দাওয়া চালচলন সে হয় ত অশ্রদ্ধার চোখে দেখ্‌বে, আর হয় ত মনে করবে, আমি তাকে অন্যায় ক'রে তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করতে চাই।"

"তা হ'লে গরীবের বা গেরস্থ ঘরের শিক্ষিত মেয়ের কর।"

"কোথায় পাওয়া যাবে বল। সে তত সস্তা নয়।"

"নয় আক্রাই হ'ল—চেষ্টা করলে কি না পাওয়া যায়? তুমিও ঘুরে ফিরে দেখ, আমিও এখানে ব'সে খোঁজ করি।"

"কিন্তু বৌদিদি, এ কথা যেন অপর কাউকে ব'ল না।"

"না, কাউকে বলব না।"

"মেজদাকে বল্‌বে?"

"বোধ হয় বল্‌ব। তবে যদি তাও বারণ কর—"

"না বৌদি, যাতে তোমার কষ্ট হবে, এমন আবদার আমি করব না। তবে মেজদাকে ব'ল—আর কাউকে যেন না বলেন। আর আমি পরশু সকালেই বেরিয়ে পড়ব। আমি গেলে তবে ব'লো। এতে তুমি রাগ করবে না"

"না, তবে তুমি কোথায় কখন্‌ থাকবে, সেটা আমাকে একটু জানিও—অন্ততঃ মাঝে মাঝে।"

"বেশ, তা জানাব। পরশু আমি কাশী রওনা হব। সেখানে দিন ১৫ থাকব। তার পর যেখানে যাব, সেখান থেকে জানাব এখন ত আর আমার ওপর রাগ নেই, বৌদি?"

"না ভাই, তুমি যে সব কথা খোলসা ক'রে আমাকে বলেছ, এতে আমি সত্যই খুসী হয়েছি।"

"তবে এখন একটু বেড়িয়ে আসি?"

"আচ্ছা, যাও।"

২

সারদাশঙ্কর চৌধুরী হাইকোর্টের বিখ্যাত উকীল। তাঁহার তিন পুত্র। প্রথম রামাশ্রয় ব্যারিষ্টার। দ্বিতীয় রামানন্দ I. C. S. বাঙ্গালার এক স্থানে জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট। সম্প্রতি স্বদেশী মোকর্দ্দমার এক জন নেতাকে ছাড়িয়া দেওয়ায় কর্ত্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হইয়াছেন এবং সম্ভবতঃ তাহারই শাস্তিস্বরূপ একটা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর স্থানে বদলী হইয়াছেন—সঙ্গে সঙ্গে তিনি ছুটী লইয়া বাড়ী বসিয়া আছেন। কনিষ্ঠ রামানুজ—ইংরাজী সাহিত্য, ইতিহাস ও দর্শন তিনটি বিষয়ে এম-এ পাশ করিয়া তদুপরি ডক্টর অব্‌ ল হইয়া বসিয়া আছে। বিলাত যাইবার কথা হইয়াছিল, কিন্তু মায়ের আপত্তির জন্য যাওয়া ঘটে নাই। কনিষ্ঠ পুত্রই মায়ের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়, সে জন্য কোনরূপ ভয় বা কুসংস্কার না থাকিলেও ইহাকে বিলাতে পাঠাইতে সম্মত হন নাই। রামানুজ বিবাহ করিতে রাজী নহে—মায়ের সেই দুঃখ। জোর করিলে ছেলে রাজী হয়, কিন্তু পাছে তাহাতে ফল খারাপ হয়, মায়ের সে ভয়ও আছে। মেজবৌয়ের বেশী অনুগত, সে জন্য চুপি চুপি তাহাকে বলিয়া দিয়াছেন, যেমন করিয়া হউক, রামানুজকে স্বেচ্ছায় বিবাহে রাজী করিতে হইবে।

নির্দ্দিষ্ট দিনে রামানুজ সকলের আশীর্ব্বাদ লইয়া ভ্রমণে বাহির হইল।

অতি সামান্য পরিচ্ছদে রামানুজ দেশভ্রমণে যাত্রা করিল। খদ্দরের ধুতি, খদ্দরের কামিজ ও তালতলার চটি, এই হইল পরিচ্ছদ। একখানা গামছা করিয়া বাঁধা খান দুই ধুতি, একটা কামিজ, দুইখানা বই ও খানিকটা কাপড়-কাচা সাবান।

মোগলসরাইয়ে দ্বিপ্রহর রাত্রিতে নামিয়া রামানুজ কাশীর ট্রেণের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল অনেক রাত্রি, কেহ শয্যা পাতিয়াছে, কেহ শুধুই বসিয়া আছে; কেহ একা, কেহ বা সপরিবারে।

একটি যুবক তাহারই প্রায় সমবয়সী। অতি সুদর্শন; গৌরবর্ণ, দীর্ঘদেহ, গায়ে জামা নাই, সুধু একখানি উড়ুনী কাঁধে ফেলা; পায়ে জুতা নাই। যুবক প্ল্যাটফরমে পায়চারী করিতেছিল ও মাঝে মাঝে এক একবার রামানুজের পানে চাহিয়া দেখিতেছিল। রামানুজের মনে হইল, বুঝি যুবকটি তাহাকে কিছু বলিতে চাহে। আর একটু অপেক্ষা করিয়া রামানুজ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কোথায় যাবেন?"

যুবক যেন চমকিয়া বলিল—"আমাকে বল্‌ছেন?"

"হ্যাঁ, আপনাকেই।"

"কাশী যাব। আপনি?"

"আমিও কাশীতে যাচ্ছি, আপনি কোত্থেকে আস্‌ছেন?"

"আমি কাশীতেই থাকি। একটা কাযে আজই এখানে এসেছিলাম। আজই ফিরছি। আপনি কোথেকে আস্ছেন?"

"কলিকাতা থেকে।"

"বেড়াতে এসেছেন?"

"হ্যাঁ।"

"কত দিন থাক্‌বেন?"

"দিন পনর।"

"কোথায় উঠবেন?"

"এখনও কিছু ঠিক করি নি। "সস্তায় একটা ঘর-টর পাই ত নেব; নয় ত পাণ্ডাদের কাছেই আশ্রয় চাইব।"

"আপনি বুঝি এই প্রথম আস্ছেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"যে সে পাণ্ডার কাছেও উঠা ঠিক নয়; কেউ কেউ বড় অত্যাচারও করে। তার চেয়ে একটা ছোট-খাট ঘরই নেবেন।"

"তাই দেখব। প্রথমটা ত ধর্ম্মশালাতেই উঠি, তার পর খুঁজে নেব।"

রাত্রি তিনটা আন্দাজ কাশী যাইবার গাড়ী প্ল্যাটফরমে লাগিতে কথা বন্ধ করিয়া উভয়ে একই গাড়ীতে উঠিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিলে দুইজনে একটু ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় করিয়া লইল। যুবকের নাম দুর্গাদাস বসু। অবস্থা এক সময়ে খুব ভালই ছিল; আজকাল তাহার বিপরীত, কোন গতিকে দিন চলে। পিতার বয়স হইয়াছে। তিনি আর তেমন খাটিতে পারেন না। কাশীতেই তিনি থাকেন, সম্প্রতি বিশেষ কাযে একবার দেশে গিয়াছেন শীঘ্রই, ফিরিবেন। যুবকের নিজের চাকুরী করিবার উপায় নাই। কলেজে পড়িবার সময় একবার রাজনৈতিক আসামী-শ্রেণীভুক্ত হইবার পর হইতে সে পথ বন্ধ। ব্যবসা যে করিবে, তাহারও মূলধন নাই;—কাযেই বৃদ্ধ পিতার উপায়ের উপরই নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। কাশীতে কথন কথন কাহারও ছেলে-মেয়ে পড়াইয়া, কাহারও বা থাতা লিখিয়া দিয়া যৎকিঞ্চিৎ মিলে।

রামানুজ নিজের ভাল অবস্থার কথা সব গোপন করিয়া একটা কাল্পনিক পরিচয় দিল। নিজের নাম বলিল—লক্ষ্মণ;—বোধ হয়, তীর্থস্থান বলিয়া নামের অর্থটা বজায় রাথিবার জন্য ঐ নাম গ্রহণ করিয়াছিল। কি কায করে, জিজ্ঞাসা করাতে মিথ্যা একটু বলিতে হইল। বলিল—অনেক কষ্টে ২৫৲ টাকা মাহিয়ানার একটা চাকুরী পাইয়াছে। তবে বিবাহ করে নাই, তাই রক্ষা; নহিলে স্ত্রীর জন্য পাণ, জর্দ্দা ও চুলের ফিতা কিনিতেই ত অর্দ্ধেক টাকা চলিয়া যাইত।

প্রকৃত পরিচয় গোপন করিলেও এই দুই যুবকের মধ্যে অল্পক্ষণের মধ্যেই বন্ধুত্ব জন্মিয়া গেল। দুর্গাদাস কথায় কথায় বলিল যে, তাহাদের বাসাতে একটা ঘর থালি থাকে; যদি লক্ষ্মণ বাবুর কোন আপত্তি না থাকে ত তিনি সেই ঘরে থাকিলেই সে বড় আনন্দিত হয়। অবশ্য ঘরটা ভাল নয়। তবে কয়টা দিন কোন গতিকে কাটিয়া যাইতে পারে।

রামানুজ হাসিয়া বলিল—'তুমি থাও ভাঁড়ে জল, আমি থাই ঘাটে।' আমার অবস্থা ত আপনার চেয়েও সরেশ, বেশ ত, ঐ বাসাতেই থাকা যাবে।

রাজঘাটে আসিবামাত্র যাত্রীদের মধ্যে রীতিমত সাড়া পড়িয়া গেল। দুর্গাদাস বলিল—"সকাল হ'লে এথান থেকেই সব মন্দির দেখতে পেতেন; গঙ্গার সৌন্দর্য্যও বেশ বুঝ্তে পার্‌তেন। সুন্দর দৃশ্য।"

বেনারস্ ক্যান্টনমেণ্টে গাড়ী থামিলে দুই জনই নামিয়া পড়িল।

ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া দুর্গাদাস বলিল—"হেঁটে যেতে পারেন ত? এই ক্রোশ দেড়েক পথ হবে।"

রামানুজ বলিল—"অনায়াসে।"

তথন দুই জনে গল্প করিতে করিতে পথ হাঁটিতে লাগিল।

নিস্তব্ধ শান্ত পথ—তাহার উপর রামানুজের পক্ষে একবারে নূতন। চৈত্রমাসে পশ্চিমাঞ্চলে দিনের গরমের পর শীতের ভাবটুকু তাহার বড়ই মধুর লাগিতেছিল। মনোমত সঙ্গী লাভ করিয়া সে আরও প্রীত হইয়াছিল।

অর্দ্ধেক পথ অতিক্রম করিতে পথে লোক-চলাচল আরম্ভ হইল। তাহাদের বেশীর ভাগই স্নানার্থী ও স্নানার্থিনী—প্রাতঃস্নানের জন্য যাইতেছেন।

ভোরের আলো ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। সেই স্বল্প-স্নিগ্ধ আলোকে কাশীর পথ, দুই ধারের ঘর-বাড়ী,

মধ্যে মধ্যে মন্দির ও মুক্তস্থান রামানুজের নয়নে বড়ই সুন্দর লাগিল।

আরও খানিক হাঁটিয়া দুই জনে একটা ছোট্ট গলীর মধ্যে প্রবেশ করিল। সেই পথে খানিকটা চলিয়া দুই একবার আঁকিয়া-বাঁকিয়া একটা ছোট একতলা বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইল। দুয়ারে ধীরে ধীরে করাঘাত করিয়া দুর্গাদাস ডাকিল, 'মণি!'

ক্ষণপরে দুয়ার খুলিয়া গেল ও দ্বারপথে এক অতি সুন্দরী তরুণীর প্রফুল্ল মুখ দেখা গেল।

"দাদা! আমি আধ ঘণ্টা থেকে ব'সে ব'সে ভাবছি, তুমি এলে ব'লে। গাড়ী ক'রে এলে কোন্ কালে এসে পৌঁছুতে।"

বলিয়া তরুণী ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল, তাহার দাদার বয়সী আর এক জন কে দাঁড়াইয়া।

লজ্জা ও বিস্ময়ের আভা তাহার সুন্দর মুখে ফুটিয়া উঠিল। দুয়ার ভাল করিয়া খুলিয়া সে একটু সরিয়া দাঁড়াইল।

দুর্গাদাস বলিল, "ইনি লক্ষ্মণ বাবু, আমার বন্ধু, এঁকে লজ্জা করতে হবে না।"

তাহার পর আবার হাসিয়া বলিল, "একা ক'রে এলে এখনই যে আট আনা খরচ হয়ে যেত। তাতে চার দিন বাজার-খরচ চল্‌বে।"

তরুণী আর একবারমাত্র দাদার বন্ধুটিকে দুই জনেরই অজ্ঞাতসারে দেখিয়া লইয়া ধীরে ধীরে সরিয়া গেল।

রামানুজ মণি নাম শুনিয়া প্রথমটা বুঝিতে পারে নাই, নামটা পুরুষের কি নারীর। তাহার মন পূর্ব্ব হইতেই ভাল ছিল। তরুণীর সুন্দর প্রফুল্ল মুখখানি তাহার মন্দ লাগিল না।

কিন্তু দুর্গাদাস বাবু ত তাহার বোনের কথা বলেন নাই। না-ই বা বলিলেন। রামানুজ ত তাহাকে জিজ্ঞাসা করে নাই—বাড়ীতে কে কে আছেন?

রামানুজ দুর্গাদাসের পিছনে পিছনে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল।

৩

প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া দুই জনে বাহিরের ঘরটিতে আসিয়া বসিল। বাড়ীটি একতলা, বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। দুইটি ঘর, প্রথমটি বৈঠকখানারূপে ব্যবহৃত হয়, দ্বিতীয়টি শয়ন-গৃহ। ভিতরের দিকে ছোট একটি বারান্দা, সেইখানেই রান্না হয়। তাহারই এক পাশে কল। দুর্গাদাস বলিল, "অপর ঘরটিতে বাড়ীওয়ালা থাকেন, তাঁহারা সম্প্রতি কি একটা কার্য্যোপলক্ষে এলাহাবাদ গিয়াছেন।"

মণির পুরা নাম মণিমালা। সদ্যঃস্নাতা মণিমালা দুইখানি ছোট রেকাবিতে দুই মুঠা করিয়া ছোলা-ভিজা ও দুইখানি করিয়া বাতাসা আনিয়া উভয়ের সম্মুখে রাখিয়া দিল।

দুর্গাদাস বলিল, "এ খাওয়া বোধ হয়, আপনার অভ্যাস নেই।"

নব-পরিচিত বন্ধুর তরুণী ভগিনীর সঙ্কোচ-নম্র সরল ভাবটুকু রামানুজের হৃদয়কে বোধ হয় মুগ্ধ করিয়াছিল।

গোটা কয়েক ভিজা-ছোলা হাতে তুলিয়া লইয়া রামানুজ হাসিয়া বলিল, "ঠিক এই জিনিষটাই আমার খাওয়া নিত্য অভ্যাস—তবে ইনি আমার অভ্যাসের বাহিরে" বলিয়া দুইটি অঙ্গুলীর সাহায্যে একখানি বাতাসা তুলিয়া ধরিল।

দুই জনেই হাসিয়া ফেলিল। মণিমালাও মৃদু হাসিয়া মাথা নত করিয়া জল আনিতে গেল।

জল আনিয়া মণি দেখিল, তাহার দাদা এখনও দুই একটি করিয়া ছোলা চিবাইতেছে, কিন্তু অতিথির পাত্রে কিছুই অবশিষ্ট নাই।

মণিমালা আসিতে রামানুজ হাসিয়া বলিল, "আমি রোজ এর চারগুণ ছোলা-ভিজে খেয়ে থাকি, কাযেই ঐ ক'টা ফুরিয়ে গেছে। এর উপর এক মুঠা কাঁচা ছোলা হলেও চ'লে যাবে আবার।"

"আমি ভাবলাম, আপনি বোধ হয়, এ সব খেতে পারেন না, তাই কম ক'রে দিলাম। ঘরে আর ত কিছুই ছিল না—দাদা ত কিছুই আন্‌তে দেবেন না।"

দুর্গাদাস তাড়াতাড়ি বলিল, "তাতে আর কি হয়েছে? লক্ষ্মণ বাবু যদি আমাদের বন্ধুই হয়ে গেলেন, তখন আর এতে দোষ কি? আমরা যা খাব, তাই ওঁকে খাওয়াব।"

"আপনি জল খাবেন না, আর এক মুঠা ছোলা-ভিজে নিয়ে আসি।"

মণিমালা চলিয়া গেল। ক্ষণপরে আরও দুই মুঠা ভিজা ছোলা আর দুইখানি বাতাসা আনিয়া অতিথির পাত্রে দিল।

অতিথিকে এই অতি সামান্য খাদ্য দিতে তাহার যে লজ্জা ও দুঃখ হইতেছিল, তাহা এই তরুণীর মুখের ভাবে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছিল।

অতিথি কিন্তু ততক্ষণে পরম আদরে ও তৃপ্তির সহিত জলযোগ সমাধা করিয়া লইয়া স্মিতমুখে ভ্রাতা-ভগিনীর পানে চাহিয়া দেখিল।

মণিমালা বলিল, "আপনার বোধ হয়, বড় ক্ষিদে লেগেছে, আমি এখনই ভাতটা চড়িয়ে দিচ্ছি।"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া রামানুজ বলিল, "আজকে ত আপনাদের রান্না খেতেই হবে—কিন্তু কা'ল থেকে আমার রান্নারও একটা ব্যবস্থা ক'রে দিতে হবে।"

মণিমালা কথাটা ঠিক না বুঝিয়া জিজ্ঞাসুভাবে দাদার পানে চাহিল।

দুর্গাদাস বলিল, "এঁর সঙ্গে কথা হয়েছিল, আমাদের একটা ঘরে অনুগ্রহ ক'রে ইনি থাক্‌বেন।"

রামানুজ হাসিয়া কহিল, "এবং অনুগ্রহ ক'রে খাবেন, এ কথাটা হয় নাই।"

মণিমালা বলিল, "না হয়, এ অনুগ্রহটা আপনি নিজের থেকেই কর্‌লেন।"

তরুণীর এই সপ্রতিভ বাক্‌বৈদগ্ধ্যে রামানুজ অত্যন্ত প্রীত হইল।

রামানুজ নীরবে কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিল—এখন কি বলা উচিত—কি করা কর্ত্তব্য ?

দুর্গাদাস রামানুজকে একটু চিন্তিত দেখিয়া বলিল, "দেখুন, তবে বাঙ্গালা করেই বলি। যখন বিশ্বনাথ এমনই ক'রে আলাপ করেই দিয়েছেন, তখন এখানে আপনাকে এ কটা দিন থাক্‌তেই হবে, আর এখানে যখন থাকবেন, তখন দুবেলা দুমুঠো ডাল-ভাত খেতেই হবে। এতে 'না' বল্লেও শুন্‌ছি না। তবে এ ভরসাও দিচ্ছি, আপনার জন্যে বেশী কিছু করব না। জীবনযাপনের জন্য যেটুকু দরকার, সেইটুকুই পাবেন।"

মণিমালা কিছু না বলিয়া অতিথির পানে শুধু চাহিল; কিন্তু তাহার মধুর দৃষ্টিযুক্ত চক্ষু দুইটি ঐ কথাই বলিতেছিল।

রামানুজ বলিল—"বেশ, তাই হবে। কিন্তু আপনার কি ছোলাগুলো এখনও গোণা হ'ল না ?"

দুর্গাদাস হাসিয়া বলিল—"না, এই যে আমি খেয়ে ফেল্‌ছি।"

বলিয়া যতগুলি ছোলা অবশিষ্ট ছিল, সব একসঙ্গে মুখে পুরিয়া দিল।

রামানুজ বলিল—"আপনাকে দেখলে মনে হয়, আপনি এই রকম খাওয়াটা নতুন আয়ত্ত করছেন এবং সুখাদ্য অর্থাৎ সন্দেশ, রসগোল্লা ইত্যাদির প্রতি আকর্ষণটা এখনও যায় নি।"

দুর্গাদাস একটু সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, "নিজের অবস্থার সঙ্গে জিভটাকে এখনও ঠিক খাপ খাওয়াতে পারি নি।"

রামানুজ বলিল—"এখনও সে দুর্ব্বৃত্ত মাঝে মাঝে বিদ্রোহ ঘোষণা করে!"

সঙ্গে সঙ্গে তিন জনই হাসিয়া উঠিল।

মণিমালা তখন রাঁধিতে গেল।

ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যে রাঁধিয়া, দুই জনকে খাওয়াইয়া, বিশ্রাম করিবার জন্য শয্যা রচনা করিয়া দিয়া, মণিমালা নিজে খাইতে গেল। এই তরুণীর বাহুল্যহীন রন্ধন, আড়ম্বরহীন পরিবেষণ ও মিষ্ট আলাপে রামানুজ বিদেশ হইলেও বড়ই তৃপ্তি পূর্ব্বক আহার করিল। তাহার পর সুরচিত শয্যায় দুই জনে শুইয়া অচিরে ঘুমাইয়া পড়িল।

অপরাহ্ণে নিদ্রাভঙ্গের পর রামানুজ দেখিল, দুর্গাদাস কখন শয্যা হইতে উঠিয়া গিয়াছে। জানালা খুলিয়া দেখিল, বাহিরে সূর্য্যোত্তাপ কমিয়া আসিয়াছে; তাহার উপর মেঘ করায় সময়টা অনেকটা প্রাতঃকালের মত দেখাইতেছে। জানালা খুলিয়া রাখিয়াই রামানুজ পুনরায় শয্যায় আসিয়া বসিল।

একটু পরে ভাবিল, বেশ বিকালটি; এই সময় একটু বেড়াইয়া আসা যাক্‌। দুর্গাদাসকে সঙ্গে লইতে হইবে মনে করিয়া সে ডাকিল—"দুর্গাদাস বাবু ভিতরে না কি ?"

দুয়ার খুলিয়া মণিমালা বাহির হইয়াই বলিল—"আপনি উঠেছেন ? দাদা একটু আগে বেরিয়েছেন; ব'লে গেছেন, ফিরে এসে আপনাকে নিয়ে বেরুবেন। আপনার কোন জিনিষের দরকার আছে কি ?"

রামানুজ উত্তর দিল—"না।"

মণিমালা একটু ভয়ে ভয়ে বলিল—"আচ্ছা, আপনার চা খাওয়া অভ্যাস নেই ত ?"

রামানুজ মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হঠাৎ আপনার এ কথাটা মনে হ'ল কেন ?"

"অনেকের আজকাল চা খাওয়া অভ্যাস কি না, আর অভ্যাস থাকলে না পেলে কষ্টও হয় বড্ড, সেই জন্য বল্‌ছি।"

"আপনি কি ক'রে জান্‌লেন ?"

"দাদার মুখে শুনেছি।"

"আপনার দাদা বুঝি চা খান ?"

"হাঁ, খেতেন খুব—এখন ছেড়ে দিচ্ছেন।"

"দিচ্ছেন। তা হ'লে এখনও দেন নি। এই চা ছাড়ার একটা বড় চমৎকার গল্প আছে। এক ভদ্রলোকের চায়ের বড়ই নেশা। বন্ধুরা তার বড়ই দুর্নাম করে। কেউ বলত, যে দিন ডাল না থাকে, হরেন সে দিন চা দিয়ে মেখে ভাত খায়, আর সে দিন না কি আর সকলের ভাতে কম প'ড়ে যায়। এই দুর্নামের জন্যও বটে আর লোকটা মাঝে মাঝে হিসেবি হয়ে পড়ত বলেও এক দিন খতিয়ে দেখলে যে, তার বাড়ীতে মাসে শুধু চায়ের জন্য ২০৲ টাকা খরচ পড়ে। ভেবে চিন্তে এক দিন বল্লে—'দুত্তোর, দাও চা ছেড়ে।' পরদিন যখন চা এল, তখন সে ব'লে ফেল্লে—'চা খাব না।' বন্ধুরা ত অবাক্—'বল কি হে, চা খাবে না ত খাবে কি ?' চা কিন্তু ফিরে গেল। সে বেলাটা অতি কষ্টে কাট্‌ল। পরদিন সকালে লোকটা অবশ্য বড়ই কাহিল হয়ে পড়ল। এক জন বল্‌লে—'ওহে, সাম্‌নে শীত আস্‌ছে, এ সময়ে হঠাৎ চা-টা ছেড়ো না, শেষ একটা রোগ ক'রে বস্‌বে ? ছাড়তে হয় ত ধীরে ধীরে একটু একটু ক'রে ছাড়।' তার পর তিনি ধীরে ধীরে চা ছাড়তে সুরু কল্লেন এবং আজ পর্য্যন্ত তাই ছাড়ছেন। দুর্গাদাস বাবুর চা-ত্যাগের কল্পনা অনেকটা সেই রকম না হয়ে পড়ে।"

মণিমালা হাসিয়া বলিল, "দাদার চা ছাড়া অনেকটা সেই রকমেরই বটে।"

সে অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। ঠিক এই সময়ে দুর্গাদাস আসিল। ঘরে ঢুকিয়া দুর্গাদাস জিজ্ঞাসা করিল,—"এত হাসি কিসের রে মণি ?"

মণি হাসিমুখে বলিল,—"তোমার চা ছাড়ার কথা বল্‌ছি।"

দুর্গাদাস যেন একটু লজ্জিত হইয়া বলিল,—"ছাড়ি ছাড়ি ক'রে এখনও অভ্যাসটা বদলাতে পারি নি।"

রামানুজ বলিল,—"যদি চা খান ত চট্ ক'রে খেয়ে নিন্—একটু বেড়িয়ে আসা যাক্।"

দুর্গাদাস একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—"আপনি যদি খান ত খাই—নইলে, থাক্ গে, ছেড়ে দিইছি ত ছেড়েই দেব

"কত দিন হ'ল ছেড়েছেন ?"

মণিমালা হাসিয়া বলিল,—"তা অনেক কাল হবে—প্রায় ৪৮ ঘণ্টা !"

রামানুজ মৃদু হাস্যের সহিত বলিল,—"যখন এত কাল ছেড়ে দিয়েছেন, তখন আবার একটু একটু ক'রে সুরু করুন। অন্ততঃ ৪৮ ঘণ্টা যে খান নি, তারির পুরস্কার-স্বরূপ ত খেতে পারেন।"

"আপনি খাবেন ত ?"

"তা না হয় খাব—কারণ, আমার ত এতে পয়সা খরচ নেই।"

তখন মণিমালা চলিয়া গেল। শীঘ্র চা এবং দুইখানি করিয়া রুটী ও কিছু তরকারী দুই জনের কাছে আনিয়া দিল।

ক্ষিপ্রহস্তে খাবার ও চা সমাপ্ত করিয়া দুই জনে ভ্রমণে বাহির হইয়া গেল।

মণিমালা বোধ হয়, চা-পর্ব্বের কথা ভাবিয়া মৃদু হাসিয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া দিল।

এক সপ্তাহ পরে রামানুজ একখানি পত্র পড়িতেছিল, পত্রখানি তাহার মেজ বৌদিদির লেখা তাহাতে লেখা ছিল :—

"স্নেহের ঠাকুর-পো—

তোমার পত্র পেয়েছি। তোমার প্রথম পত্রে যেখানটিতে তুমি যাওয়ার বিবরণ, পথের ঘটনা, বন্ধুলাভ ইত্যাদি চিত্তাকর্ষকভাবে বর্ণনা করেছিলে, বর্ণনাগুলি প'ড়ে সত্যই মুগ্ধ হয়েছিলাম। তোমার দ্বিতীয় পত্র কিন্তু আমাকে আরও আনন্দ দিয়েছে। তোমার তৃতীয় পত্র হয় ত দ্বিতীয়কেও ছাড়িয়ে যাবে, এই আশায় আমি অধীরভাবে তোমার সেই পত্রের অপেক্ষা করছি। মণিমালার কথা শুনে আমি খুব খুসী হয়েছি। সে যে তোমাকে সাবান দিয়ে কাপড় কাচতে দেখে তোমার হাত থেকে সাবান কেড়ে নিয়ে কাপড় কেচে

দিয়েছে, এতে শুধু তার হৃদয়ের পরিচয় নয়, তার মস্তিষ্কের পরিচয়ও পেয়েছি। তুমি তেমন পাত্র নও যে, 'মশাই আপনি রাখুন, আমি কেচে দিচ্ছি' বল্লেই তুমি তার হাতে সব ছেড়ে দেবে। সে এক দিনেই বুঝেছে যে, তোমার কাছ থেকে জোর না কল্লে কিছু পাওয়া যাবে না। সে নিশ্চয়ই অসাধারণ বুদ্ধিমতী। তার সেবা—তার সারল্য—তার সর্ব্বক্ষণ আপনাকে কর্ম্মে ব্যাপৃত ক'রে রাখা এ সবেতে তুমি প্রীত হলেও একটা বিষয়ে তুমি ক্ষুব্ধ হয়েছ জেনে দুঃখ পেলাম। তুমি লিখেছ, এত গুণ থাকা সত্ত্বেও সে অশিক্ষিতা, এই দুঃখ। কিন্তু আমার বিশ্বাস, তোমার সেটা ভুল। যার এত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি—এত তৎপরতা—এত অমায়িকতা, —শিক্ষা তার মধ্যে নিশ্চয়ই আছে। তুমি অবশ্য কেতাবী শিক্ষার কথাই বলেছ। একটু লুকিয়ে সন্ধান ক'রে দেখো, জান্‌তে পারবে, সে শিক্ষাও বোধ হয় তার আছে। তার সে শিক্ষাটুকু সে বোধ হয় গোপনে রেখেছে। তার যে অনাবশ্যক সঙ্কোচহীন ব্যবহার, তাতেই সে বিষয় প্রমাণ কচ্ছে। কি ক'রে তুমি জান্‌তে পারবে, সে কথা তোমায় ব'লে দিই, শোন। যে ঘরে সে শোয়, কোন সুযোগে একবার সে ঘরে যাবে এবং কোন বই, খাতা আছে কি না, সন্ধান নেবে। আমার বিশ্বাস, তোমার আশা পূর্ণ হবে

"ধর, যদি তার মোটা-মুটি শিক্ষাই থাকে, তা হ'লে ত তোমার তাকে মনে ধরবে? মনে ত ধরেছে নিশ্চয়ই, নইলে তার কথা নিয়ে অত মাথা ঘামাতে না—কিন্তু তাতে তোমার ধনুর্ভঙ্গ পণ ভাঙ্গবে ত? সেটা যদি না ভাঙ্গে, তা হ'লে আর সেই তরুণীকে মজিয়ে কায নেই। পত্রপাঠ তুমি চ'লে আস্‌বে, পুরুষের কাছে প্রেম কি পদার্থ এবং নারীর কাছে সেটা কি, তোমাকে মনে করিয়ে দেবার মত ধৃষ্টতা আমার নেই। তুমি আপনিই একবার সেটা মনে ক'রে দেখ। তোমার কাছে অনুরোধ—তার যেন সকল পথ বন্ধ ক'রে জীবনটা অন্ধকার ক'রে এসো না। একটা কথা—যদি দেখ, শেলির কবিতার ২।১ ছত্র সে না আওড়াতেই পারে, তা হ'লে সেটাকে একবারে অমার্জ্জনীয় অপরাধ ব'লে নিও না—যখন শিক্ষার যা আসল উদ্দেশ্য—অন্তরের প্রসার তার আছে। এ দিকে আমি তোমার আর একটা সম্বন্ধ প্রায় ক'রে ফেলেছিলুম। দোষের মধ্যে সে মেয়েটি বড়লোকের মেয়ে—আর কলকাতাতেই বাড়ী

"হয় তোমার তৃতীয় পত্র, নয় তোমার আগমন অপেক্ষা ক'রে রইলুম।

এখানে কাউকে আমি এ খবরটা বলিনি। তুমি ফিরে এলে বা তোমার এ বিষয়কার পত্র পেলে সব কথা বল্‌ব।

এখানকার সব মঙ্গল। লক্ষ্মণ বাবুর কুশলসংবাদ দিবে। মা ব'লে দিলেন, যেন ১৫ দিনের বেশী তোমার কিছুতেই দেরী না হয় স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে, ইতি।

তোমার মেজ বৌদি।"

পত্রখানি আসিয়াছিল ভোরের দিকে। তখন মণিমালা গঙ্গাস্নানে গিয়াছিল আর দুর্গাদাস ছেলে পড়াইবে বলিয়া বাহির হইয়াছিল।

রামানুজ ভাবিল, এইবার মণিমালার ঘরের ভিতর গিয়া দেখি, যদি কিছু সন্ধান পাওয়া যায়।

ঘরটিতে শুধু শিকল তুলিয়া দেওয়া ছিল। রামানুজ আগে বাহির হইতে বাড়ীর মধ্যে আসিবার দুয়ারটা ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দিল। তাহার পর আসিয়া মণিমালার ঘরটি খুলিল। এই অতি সামান্য কাযটি করিতে কেন যে তাহার বুকের ভিতর দুর-দুর শব্দ করিতেছিল, তাহা সে ভাবিয়া পাইল না। কোন তরুণী বা যুবতীর কক্ষে তাহার অসাক্ষাতে অনধিকারপ্রবেশ করাটা অন্যায় বলিয়া কি? কিন্তু তাই বা কি করিয়া বলা যায়? প্রণয়ের জন্য ইহা অপেক্ষা কত বিপজ্জনক ও বিস্ময়কর কায ত লোক করিয়াছে, ইতিহাস ও কাব্য তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। তাহার তুলনায় এ কায আর অন্যায় কেন হইবে?

ঘরের ভিতর আসিয়া রামানুজ দেখিল, ঘরটিতে শৃঙ্খলা ও পরিচ্ছন্নতা সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছে। মেঝের এক কোণে একখানি সতরঞ্চ পাতা, তাহার উপরে একটি ডেস্ক। সতরঞ্চে বসিয়া ডেস্কে রাখিয়া কোন কিছু লিখিবার বা পড়িবার বেশ সুবিধা। ডেস্কের ডালা তুলিয়া দেখিল —কতকগুলি বেশ বাছা বাছা ইংরাজী ও বাঙ্গালা বই। বইগুলি দেখিয়া রামানুজের মনে হইল, মণির পড়া-শুনা কিছু উপেক্ষার বিষয় নহে। সেক্সপিয়রের একখানি নাটকও এখানে আছে। দুই একখানি বই খুলিয়া দেখিল— শুধু গৃহসজ্জার জন্য রাখা নহে—প্রায় পাতায় পাতায় সুদৃশ্য

ও সুস্পষ্ট মেয়েলী অক্ষরে নোট লেখা রহিয়াছে। ইহাতে তাহার বিদ্যা ও বিচারশক্তির পরিচয় সুস্পষ্ট। বাড়ীর বাঁধানো একখানা খাতাও সেখানে দেখিল। খাতাখানি খুলিয়া দেখিল, তাহাতে কতকগুলি বাঙ্গালা প্রবন্ধ লেখা। এক আধটা নাট্য ও ছোট কয়েকটি পাঠ্য পুস্তকের সমালোচনাও তাহার মধ্যে আছে। প্রথম প্রবন্ধের নাম "বিদ্যা ও বিনয়।" রামানুজ পড়িয়া দেখিল বেশ লেখা। যেটুকু জ্ঞান, যেটুকু বিদ্যা আছে,কৃপণের ধনের মত গোপন রাখিয়া বিদ্যার্জ্জনের চেষ্টা করিতে হইবে। তোমার অর্জ্জিত জ্ঞান ও ও বিদ্যাকে যদি গোপন রাখিতে পার, লোকচরিত্র অধ্যয়ন করিবার তুমি অধিক অবসর পাইবে। প্রবন্ধটির সার মর্ম্ম এইরূপ।

বইগুলি যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া রামানুজ পুলকিতচিত্তে আপনার ঘরে ফিরিয়া আসিল। পুলকের বন্যায় তাহার হৃদয় ভরিয়া গিয়াছিল। সাংসারিক ক্ষুদ্র বৃহৎ নানাবিধ কার্য্য দিয়া যে আপনাকে সর্ব্বক্ষণ ঘিরিয়া রাখিয়াছে, তাহার মধ্যে এই শিক্ষার প্রসার রামানুজ পরম শ্রদ্ধা ও অনুরাগের দৃষ্টিতে দেখিল। কিন্তু একটা কথা তাহার মনে উদিত হইল এতক্ষণ সে এই কথাটা ভাবিয়া দেখে নাই। মণিমালার মনের অবস্থার পরিচয় ত সে পায় নাই! মণির বয়স হইয়াছে। ইহাও হইতে পারে, আর কাহারও সহিত তাহার বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে, কিন্তু অপর এক জনকে সে হয় ত—কথাটা সে ভাবিতে গিয়া যেন হৃদয়ে একটা ব্যথা অনুভব করিল।

রামানুজ ২।৩ দিন তাহার মেজ বৌদিদির পত্রের উত্তর দিল না। ভাবিয়াছিল, ঐ ব্যাপারটার সঠিক সন্ধান লইয়া উত্তর দিবে।

কথায় কথায় এক দিন রামানুজ দুর্গাদাসের নিকট মণিমালার বিবাহের কথা পাড়িল। দুর্গাদাস বলিল—"গরীবের ঘরের মেয়ের বিবাহ একটা মহা সমস্যা, তা সে সুন্দরীই হউক আর ভাল লেখা-পড়াই শিখুক। সম্প্রতি বাবা এক স্থানে একটা সম্বন্ধ স্থির করেছেন। পাত্র গুণবান্ এবং অবস্থা বেশ ভাল, কিন্তু প্রথমে বিবাহ করিতে রাজী হয় নাই, পরে অনেক অনুরোধে সম্মতি দিয়েছে। মণিমালা সে কথা শুনে বড়ই রেগে গিয়েছিল। বলে, যে অসম্মত, তাহার হাতে ধরিয়া বাঁধিয়া দেওয়ার জন্য এ চেষ্টা কেন? তার চেয়ে কোন গরীবের ঘরে যাওয়া ভাল।

রামানুজ ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ বলিল—"এ ত ঠিক কথা। মণিমালার এখন বয়স হয়েছে। এখন তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কায করান উচিত নয়।"

তাহার পর দুর্গাদাসকে সে চুপি চুপি বলিল,"যদি মণিমালা সম্মত হয় ও তাঁহাদের অমত না হয় ত সে নিজে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে মণিকে বিবাহ করিতে রাজী আছে। সে গরীব বটে, কিন্তু লেখা-পড়া কিছু শিখিয়াছে, গায়েও শক্তি আছে, মণিমালা বিশেষ কষ্টে পড়িবে না। তবে ইহাও সে উচ্চ কণ্ঠে বলিতে প্রস্তুত যে, মণিমালার মত মেয়ে রাজার ঘরে পড়িলেও মানাইবে।

দুর্গাদাস আনন্দে বলিল—"তা হ'লে ত খুব ভালই হয়। তবে একবার মণির মতটা লওয়া দরকার। আমার বিশ্বাস, সে আপত্তি করবে না। তবে তার মতটা জান্‌তে পারলেই আমি বাবাকে সব লিখে দিই—যদিও বাবা আমার উপরই সব ভার দিয়ে গেছেন।"

উভয়ের এই গোপন আলোচনা আর এক জনের শ্রুতির অগোচর রহিল না। এক জোড়া কৌতুহলী নয়ন পশ্চাতের দরজার পার্শ্ব হইতে অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইয়া গেল।

পরদিন দুর্গাদাসের কাছে রামানুজ জানিতে পারিল, দরিদ্রকে মণিমালা শ্রদ্ধা করে। যাহার হৃদয় আছে, সে দরিদ্র হইলেও সম্রাট অপেক্ষাও ধনী।

মণিমালার মনের ইঙ্গিতটুকু রামানুজের কাছে সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইল। আনন্দে তাহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

রামানুজ বুঝিয়াছিল, একটি ক্ষুদ্র কিন্তু মধুর হৃদয় জয় করিতে যে আনন্দ পাওয়া যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের সব পরীক্ষা পাশ করিয়া অতি শ্রেষ্ঠ পদ পাইলেও তাহার শতাংশের একাংশ আনন্দও মিলে না।

অভিভাবকদের সম্মতি পাইতে আর দেরী হইল না। যেন উভয় পক্ষই আগে হইতেই প্রস্তুত হইয়াছিল। কলিকাতা আসিয়া বিবাহ দেওয়া স্থির হইল। কারণ, দুর্গাদাসের পিতা পত্রে লিখিয়াছিলেন—তাঁহার এখন কাশী

ফিরিয়া যাওয়া সম্ভব নহে—সে জন্য শীঘ্র কলিকাতা ফিরিয়া আসা আবশ্যক। কলিকাতার পাত্রীর এক অতি নিকট আত্মীয় থাকেন, তিনি না কি খুব ধনী। তাঁহার বাড়ীতেই বিবাহ হইবে ঠিক হইয়াছিল।

বিবাহের সময়ে প্রকাশ পাইল, এ সমস্তই রামানুজের মেজ বৌদিদির কাণ্ড। তিনি যাহার সহিত সম্বন্ধ ঠিক করিয়াছিলেন, এ সেই পাত্রী।

মেজ বৌদিদির কথামত গরীবের ছদ্মবেশে ইহারা রামানুজকে জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিল। মণিমালাকে ধনীর কন্যা জানিয়াও রামানুজের তখন আর আপত্তি ছিল না।

বিবাহের সময় দুর্গাদাস ও লক্ষ্মণকে পরস্পরের কাছ হইতে মার্জ্জনা চাহিতে হইয়াছিল, কারণ লক্ষ্মণের আসল নাম রামানুজ, নিবাস খাস কলিকাতা এবং দুর্গাদাসের নাম মৃণাল কান্তি। কোন কালে রাজদ্রোহের আসামী হয় নাই। সম্প্রতি মেডিকেল কলেজ হইতে ডাক্তারী পাশ করিয়া বাহির হইয়াছে।

বাসরঘরে বর-বধূকেও পরস্পরের নিকট একটু মিষ্ট মার্জ্জনা চাহিতে হইয়াছে। কারণ, লক্ষ্মণের যেমন আসল নাম রামানুজ, মণিমালার প্রকৃত নাম তেমনই মাধুরী।

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য ॥

"মিলন !"

[শিল্পী—শ্রীচঞ্চলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

"বোধোদয় !"

শিল্পী—শ্রীচঞ্চলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

-দোসরা কামরামে যাও—সাহাবলোককো হ্যায়।

-সাহাব বন্ যাতা হ্যায়—ঘাবড়াও মৎ !

শিল্পী—শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

—মর্ত্ত্যলোক পদতলে—ঊর্দ্ধে কাব্যলোক !

শিল্পী—শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

হরিষে বিষাদ

১

আহ্লাদী বিষণ্ণ দুঃখেই কাটে দিন—
ছেলেটির উপায় যে কম,
ঠাকুরকে কত ডাকে মুখ তুলে নাহি চান,
কোলেও না টেনে নেয় যম।

২

এ দুঃখ-কষ্টও বরঞ্চ সহে তার,
সব চেয়ে বড় তার দুখ,
বুড়ো হ'তে যায় সে পেলে নাকো দেখ্‌তে
নাতির যে চাঁদপানা মুখ।

৩

ষোলয় পা দিল বৌ, তবু নয় গর্ভিণী,
হায় এ কি ঠাকুরের সাজা,
আবাগীর বেটিটাকে কেন ঘরে আন্‌লেম
শেষকালে হলো কি না বাজা!

৪

আধলা ও গরুটার সেবায় গতর গেল,
এত ক'রে ভগবানে ডাকি,
সে-ও না গাভীন হলো কপালের দুর্ভোগ.
বোয়ের বাতাস পেলে না কি?

৫

মনের বিষাদ লয়ে আহ্লাদী সদা রয়,
কষ্টেই কাটে তার দিন,
পারিল জানিতে শেষ বৌটি পোয়াতী তার
গোরুটিও হয়েছে গাভীন।

৬

কে দেখে আনন্দ তার তুলসীতলায় গিয়ে
কহে কত মানসিক করি,
গড় করে মাটি খায়— এত দিন পরে বুঝি
মুখ তুলে চাহিলেন হরি।

৭

হেনকালে একদিন পাড়ায় গণক এলো
ছিটে-ফোঁটা নামাবলী গায়,
মুখে হরি হরি বোল কাঁধে চাউলের ঝুলি,
বগলেতে পুথি শোভা পায়।

৮

পাড়ার যতেক মেয়ে সবাই আসিল ছুটে,—
এসেছেন গণক ঠাকুর,
যার যা অভাব আছে, যার যা মনের ব্যথা,
সব তিনি করিবেন দুর।

৯

কেহ বা দেখায় হাত, কেহ করে প্রণিপাত
ভক্তিভরে ভূমিতলে লুটে,
গণক এসেছে শুনে ফেলিয়া হাতের কায
আহ্লাদী গেল সেথা ছুটে।

১০

গলায় কাপড় দিয়ে গণকে প্রণাম করি
সমুখে দাঁড়ায় যোড়হাত,
গণক গম্ভীরভাবে তার দিকে চেয়ে কয়—
প্রসন্ন মা তোরে জগন্নাথ।

১১

আহ্লাদী ধীরে কয় প্রসন্ন ত বটে বাবা,
তবে কি না পাব কি সুদিন,
আশীর্ব্বাদ বর প্রভু বউটি পোয়াতী মোর,
গোরুটিও হয়েছে গাভীন।

১২

এক পাশে ছিল বউ শাশুড়ীর ইসারায়
গণকে করিল প্রণিপাত,
"এইটি আমার বউ" আহ্লাদী দিল ব'লে
দেখাইল তাঁরে তার হাত।

১৩

গণক দেখিয়া কয়— কি সুন্দর হস্তরেখা,
সর্ব্ব-শুভযোগের উৎপত্তি,
ব'লে রাখি শোন্ বেটী অখণ্ড্য আমার বাক্য,
পুত্র হ'বে রাজচক্রবর্ত্তী।

১৪

আনন্দে আপন-হারা আহ্লাদী আশা পেয়ে
জিজ্ঞাসিল কথাটি গোরুর,
খড়ি পেতে একমনে গণক বলিল গ'ণে
হ'বে তার বক্না বাছুর।

১৫

গণকের কথা শুনে আশ্বাস পেয়ে মনে
আহ্লাদী আহ্লাদে মগ্না,
বউটির হবে এক চাঁদপারা ছেলে আর
গাইটির হবে এক বক্না।

১৬

ঠাকুরকে গড় করা হরির সে মাটী খাওয়া,
একদম্ বেড়ে গেল তার,
যার তার কাছে সেই যখন তখন বলে,
ঠাকুরের সেবাই ত সার।

১৭

হরি যে গো দয়াময় মুখ তুলে যদি চান,
দুঃখ কি তবে আর থাকে?
মানুষের পাপ মন সবাই তা বোঝে কই
দিনান্তে তাঁয় নাহি ডাকে।

১৮

হেনকালে একদিন ভোরবেলা শোনে লোকে
আহ্লাদী কাঁদে ডাক ছেড়ে,
বউ তার কন্যা প্রসবের পরেতেই
গাইটি বিয়ায়েছে এঁড়ে।

১৯

এর পর থেকে তার মাটী খাওয়া গড় করা
সব গেল গোল্লার তল,
যে হরি না কথা শোনে, অনুরোধ নাহি রাখে,
সে হরিতে কিবা আছে ফল?

২০

আহ্লাদী বলে রাগে সাধে হয় 'খৃষ্টান'
জগতে ঠাকুর নাই আর,
আবাগা সে গণককে পাই যদি দেখতে
মুখখানা পুড়িয়ে দি তার!

শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

সম্পাদক—শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, বসুমতী 'রোটারী মেসিনে' শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত